সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগর…

ঊনবিংশ বর্ষ] শনিবার, ৫ই মাঘ, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 19th January, 1952.

… ভারতের প্রা…

৫ই মাঘ শনিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি। যে মহান প্রাণশক্তির আবর্তনে … ভারতের স্তিমিত ঘরে স্বামীজীর সাধনা … সূচনা করে। অতীত সংস্কারের আবরণ হইতে জাতিকে মুক্ত করিয়া তিনি উদার এবং উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড় করাইয়াছিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদ তাহার আদর্শে উদ্দীপিত হয় এবং স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে অগ্রসর হইয়া … । পাশ্চাত্যের প্রবল সভ্যতার প্রভাবে ভারতের আত্মা অভিভূতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, বীর সন্ন্যাসীর বাণী … তাহার আত্মার সন্ধান দেয় এবং … মহিমা ও মর্যাদা নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। স্বামীজীর আবির্ভাবের পূর্বে পরাধীন ভারতের মহিমা … শুধু জগতের কয়েক-জন মনীষীর আলোচনার বিষয় ছিল। সুতরাং সমগ্র বিশ্বজগৎ ভারতের জীবনস্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীজী বিশ্বের দরবারে ভারতের সত্যের বার্তা বহন করিয়া লইয়া যান। … বিশ্ববাসীর কাছে এই সত্য প্রতিপন্ন … যে, ভারত এখনও মরে নাই এবং … নীর অধীনতা সত্ত্বেও ভারতের আত্মা বিসর্জিত হয় নাই, পরন্তু বিশ্ববাসীকে দিবার … সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাহার আছে। …বতারের আবির্ভাব এ দেশে এখনও … এবং মানব সভ্যতার পুঞ্জীভূত সনাতন আদর্শ প্রজ্ঞানময় প্রভাবে এই ভূমি হইতে …ও সঞ্চারিত হয়। পরাধীন ভারত …র মহিমা ভুলিয়া গিয়াছিল। বৈদেশিক …র দমকে এবং চমকে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া পরানুকরণের দিকেই সে উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল। স্বামীজী বিস্মৃত ভারতের দৃষ্টিতে এই সত্য উন্মুক্ত করেন যে,

এদেশের নরনারীর অন্তরেই নরনারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। যাহারা দরিদ্র, যাহারা পতিত, উপেক্ষিত যাহারা, তাহাদের সেবার পথেই প্রকৃতপক্ষে ভারতের শক্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং সেই শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত এবং সংহত করিবার পথেই দুঃখ-দুর্দশা দূর হইবে—'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'। প্রকৃত-পক্ষে বর্তমান ভারতের … বিবেকানন্দের জীবন… করিয়াছে, তাহার কি… বোধ হয় এখনও আ… পরিপ্রেক্ষা যতই ব… যাঁহারা মহামানব, … ফুটিয়া উঠে। এই হিস… ইঁহারা মৃত্যুঞ্জয় পুরু… ভাবে এই কথাটি স্বচ্ছন্দে … যে, স্বামীজী যদি আম… না হইতেন, তাহা হইলে … স্বাধীনতার জন্য গর্ব … তাহাও আমরা পাইতাম না … অবশ্য রাজনীতিক ছিলেন … শুধু কতকগুলি রাজনীতিক স… স্মরণ করিয়া কোন জাতিই প্রকৃত মহ… করিতে পারে না; বস্তুতঃ সেজন্য অ… শক্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে হ… সমষ্টি-মানবের মর্মমূলকে প্রাণধর্মে… অগ্নিময় স্পর্শ দিয়া শুধু তাঁহারাই উদ্দীপিত করিতে পারেন, যাঁহারা যজ্ঞ-পুরুষ, যাঁহারা তপনীর বর্ণ। বৃহত্তের জন্য পরম তাপ যাঁহারা অন্তরে একান্তভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এমনই একজন মহামানব ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে ভারতভূমি ধন্য হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকের পথ দেখাইয়াছেন, মৃত্যু হইতে তিনি আমাদিগকে অমৃতের পথে পরিচালিত করিয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আমাদের গুরু, সমগ্র জাতির তিনি উপদেষ্টা। স্বামীজীর আবির্ভাব-তিথি উদযাপনের এই

অমর আত্মার
অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন

র্বাচন

পৌষ হইতে কলিকাতার নির্বাচন আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে খাস শহরেও হইবে। পশ্চিমবঙ্গের র নির্বাচন-পর্ব এক প্রকার া যায়; কিন্তু কোন কেন্দ্রের পর্যন্ত ঘোষিত হয় নাই। টের ব্যাপারেই শুধু এই র্শিত হইতেছে। ফলত নির্বাচনের দুই দিনের ফল ঘোষিত হইয়াছে। ক্ষের এ সম্বন্ধে দের যথেষ্ট কর্মচারী কৈফিয়ৎ একেবারেই ব্যবস্থা করার সঙ্গে য়া দেখা উচিত ছিল বস্থা করা তাঁহাদের ভোটের ফল ঘোষণায় সাধারণের মনে নানা র হয়; ইহা ছাড়া প্রকৃত দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইয়া গোলযোগের কথা সম্বন্ধেই আমরা প্রথমে ছি। ব্যালট বাক্স ভাঙ্গা পড়াতে আরামবাগে পুনরায় চনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। পুরের পটাশপুরে নির্বাচন কেন্দ্রে গুলি ব্যালট বাক্স খোয়া যায়। কর্তৃ- পরে জানাইয়াছেন যে, বাক্সগুলি খালি অবস্থায় ভোটগ্রহণ-কেন্দ্রে পাঠানোর সময়েই খোয়া গিয়াছিল; ভোট গ্রহণের পর সেগুলি অপসারিত হয় নাই। আশ্বাসের কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু এইভাবেই বা সেগুলি খোয়া যাইবে কেন? এ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের প্রথম হইতেই সতর্ক ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য ছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতারা অনেকে অশিক্ষিত ইহা সত্য, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও রাজনীতিক বোধ মোটামুটি এই প্রদেশে তাহাদের মধ্যে সমধিক জাগ্রত। বাঙলা স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঐতিহ্য এবং রাজনীতিক সাধনার পটভূমি এখানে জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতিক বোধের জাগরণ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। সহরতলীর এই কয়েকদিনের ভোট-গ্রহণপর্বে পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতাদের নিজে-দের অধিকার পরিচালনে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশি আগ্রহ ও উদ্দীপনার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। যাহা হোক্ শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ কার্য সম্পন্ন হউক; ভোটদাতাগণ সুবিবেচিতভাবে এবং দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া নিজেদের অধিকার পরিচালনা করেন, আমরা ইহাই চাই। উত্তেজনা ও উদ্দীপনা এ সব ব্যাপারে কিছুটা দেখা দিবেই, কিন্তু তাহা যেন আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত না করে এবং ভবিষ্যৎকে আরো অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া না তোলে।

ডক্টর আম্বেদকরের পরাজয়

নির্বাচনের ফলে ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে যাঁহারা একদিন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েক-জনের ভাগ্য বিপর্যয়ের সংবাদ ইহার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীকালা-বেঙ্কট রাও, মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকুমারস্বামী রাজা, বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত মোরারজী দেশাই, শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর আম্বেদকরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। রাজনীতিক ক্ষেত্রে এই ধরণের ভাগ্যবিপর্যয় অবশ্য নূতন কিছুই নয়। শ্রীযুত কালাবেঙ্কট রাও এবং শ্রীকুমারস্বামী রাজার পরাজয়কে অনেকটা সেই ধরণের মামুলী ব্যাপার হিসাবেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রতিপক্ষীয় দলের রাজ-নীতিক প্রভাবই সম্ভবতঃ ইহাদের পরাজয়ের মূলে মুখ্যভাবে কাজ করিয়াছে এবং সেই হিসাবে ব্যাপারটা অনেকাংশে স্থানীয় বলা যায়। কিন্তু ডক্টর আম্বেদ-করের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম। প্রত্যুত তাঁহার পরাজয়ের মধ্যে সমগ্রভাবে ভারতের জনমতের সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট অভি-ব্যক্তিরই পরিচয় মিলে। অধিকন্তু ডক্টর আম্বেদকরের এই পরাজয়ের গুরুত্ব কেবল ভারতের দৃষ্টিতেই নয়, পরন্তু ভারতের বাহিরেও ইহার দূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ঘটিবে এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বের জনমতকে প্রভাবিত করিবে। ভারতে ইংরেজের কূটনীতি হিন্দুসমাজকে খণ্ডিত করিয়া তাহার একাংশকে 'তপশীলী' এই আখ্যায় চিহ্নিত করে। ডক্টর আম্বেদকর ইংরেজের সেই কূটনীতির অংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে তাঁহার পদত্যাগ বহির্বিশ্বের নিকট ভারতীয় সমাজ ও সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়াই প্রচারিত হইয়াছিল। ডক্টর আম্বেদকরের পরাজয়ে সেই অপ-প্রচারের কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইল। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর দল এবং মুসলিম লীগ মিলিয়া ভেদনীতির কূট কৌশলে ভারতকে রাজনীতিক হিসাবে পঙ্গু করিবার যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল ডক্টর আম্বেদকর তাহারই অংশীদার ছিলেন। তাঁহার এইরূপ আচরণ সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভায় তাঁহাকে [illegible] করা হইয়াছিল। অধিকন্তু ভারতের সংবিধান প্রণয়নের ভারও তাঁহাকেই [illegible] হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি প্রচার আরম্ভ করেন যে, ভারতীয় সংবিধানে তপশীলী সম্প্রদায়কে কোন সুযোগই দেওয়া হয় নাই। এরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের জনমত এই অকৃতজ্ঞতার প্রতিদান আজ করিয়াছে। তাঁহার পরাজয়ে এই সত্যই সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে ভেদবাদের যে বিষ-বাষ্প ডক্টর আম্বেদকর স্বার্থে [illegible] আবেগে সৃষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহার অনিষ্টকর প্রভাব হইতে ভারত মুক্ত হইল। দেশদ্রোহীতার এমন শোচনীয় পরিণতি সব ক্ষেত্রে সদ্য সদ্য না ঘটিলেও তাহাতে যে বিশেষ বিলম্ব ঘটে না, ডক্টর আম্বেদকরের পরাজয় সে সত্যই সুনিশ্চিত করিয়া দিল।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে ভারতের প্রভাব

ডক্টর হেলমুট গ্লাসেনাপ জার্মানীর একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। দিল্লীতে কিছুদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত দার্শনিক সম্মেলনের প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি ভারতে আসিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি জার্মান সংস্কৃতিতে ভারতের প্রভাব সম্বন্ধে নয়াদিল্লীতে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, মধ্যযুগ হইতে ভারতীয় ধর্ম এবং সাহিত্যের প্রতি জার্মান পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। প্রধানতঃ গ্রীক্ দার্শনিকদের নিকট হইতেই তাঁহারা এই প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি বহু জার্মান সাহিত্যিক এবং পণ্ডিত ভারতের সাহিত্য এবং দর্শন [illegible]

আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং তাঁহাদের সাধনার প্রভাবে জর্মন সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। জর্মন-সংস্কৃতিতে ভারতের এই প্রভাবের কথা অবশ্য এদেশেরও অবিদিত নহে। বস্তুতঃ ইউরোপ ও আমেরিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপরও ভারতের সংস্কৃতির প্রভাব যে নানাভাবে পড়িয়াছে, এ সত্যও অনস্বীকার্য। রুশ সাহিত্যের উপর এই প্রভাব কিরূপ কাজ করিয়াছে, ডক্টর রণজী সাহানী সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে, ভারতের প্রাচীন যুগের সাহিত্য এবং মনীষীদের অবদানের মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতির এই প্রভাব নিবদ্ধ নয়। ঋক্ বেদ, উপনিষদ কিংবা কালিদাসের লেখাতেই শুধু এই শক্তি নাই; অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ভারতের মনীষাও এক্ষেত্রে কাজ করিয়াছে। জর্মন দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের লেখা হইতে ভারতীয় দর্শনে মনিষী টলস্টয়ের চিন্তাক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। টলস্টয় নিজেই একথা লিখিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা টলস্টয়কে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। স্বামীজীর লিখিত রাজযোগের তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ভগবদ্গীতার অনেকটি অনুবাদও টলস্টয় যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর তখনকার দিনের লেখা একখানি পুস্তকও তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত সাহানী আর একজন ভারতীয় সাধকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি প্রেমানন্দ ভারতী। আমেরিকায় ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যাঁহারা প্রচার করেন ইনি তাঁহাদের অন্যতম। প্রেমানন্দ ভারতী পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ১৮৯৭ সালে আমেরিকায় গিয়া ইনি নিউইয়র্ক এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। ভারতী মহাশয়ের লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণ' নামক গ্রন্থখানি ঐ দেশে বহুল প্রচারিত হয়। এই পুস্তকখানি মনীষী টলস্টয়ের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সে কথাও তাঁহার লেখাতেই পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে রোমাঁ রোলাঁর ন্যায় টলস্টয়ও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত দার্শনিকতায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা এই সত্যই প্রতিপন্ন হয় যে, অনেকে যাহা মনে করেন, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিকতা, বর্তমান এই জড়বাদের যুগেও তেমন অকেজো হইয়া পড়ে নাই। পক্ষান্তরে আজও তাহা জীবন্ত রহিয়াছে। অধিকন্তু মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ-সংগঠনে। সেই সংস্কৃতি বিশেষভাবেই কাজ করিতেছে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ এই জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভারতের সেই অবদানকে নিতান্ত বস্তুনিষ্ঠ জড়বাদেরও সাধ্য নাই যে অস্বীকার করিতে পারে; কারণ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ভারতীয় দার্শনিকতা মানুষের প্রকৃতিগত সার্বভৌম সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

রাজনীতি ও সমাজ-সাধনা

সেদিন পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ারদের এক সভায় রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহাদিগকে জাতি-গঠনে আত্মনিয়োগ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে অন্ন, বস্ত্র এবং আশ্রয়—এই তিনটি বর্তমানে আমাদের সমাজ-জীবনে বিশেষ সমস্যার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। দেশের লোক-সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, অপরপক্ষে উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে। যাহারা কৃষক, তাহারা শ্রমিকভুক্ত হইতেছে। গ্রামের লোকদের বাসস্থানের ব্যবস্থাও সেইরূপ এদেশে সন্তোষজনক নয়। দেশের বস্ত্র-সমস্যাও সেইরূপ জটিল। এ সমস্যার সমাধান করিতে হইলে সর্ববিজ্ঞান-সম্মত কল-কারখানার বিস্তৃতি সাধন প্রয়োজন। ডক্টর মুখুজ্যে যে তিনটি সমস্যার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলির সমাধানে যে একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রকৃতপক্ষে সেগুলির সমাধানের উপরই এদেশের রাজনীতির স্বাধীনতার সার্থকতা এবং সমাজ-জীবনের শান্তি ও প্রতিষ্ঠা অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। ফলত এই সব সমস্যা সমাধানের পথে আমরা যদি আগাইয়া না যাইতে পারি, তবে বৃহত্তর সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের আশঙ্কা আসন্ন হইয়া পড়িবে, এ কথাও সত্য। কিন্তু এগুলি সমাধানের উপায় কি? ব্যক্তিগতভাবে সমাজের প্রতি কর্তব্যের একটা দিক অবশ্য আছে। সমাজ-জীবনের প্রেরণার অভাব বাঙলা দেশে কোনদিন ছিল না। বাঙলার তরুণ দল দুর্গতের দুঃখ দূর করিবার জন্য আহ্বান যখনই আসিয়াছে, আগাইয়া যাইতে সঙ্কুচিত হয় নাই; কিন্তু আমরা আজকাল এই অভিযোগ শুনিতে পাই যে, বড় আদর্শের জন্য তরুণদের পূর্বের ন্যায় তেমন উৎসাহ এবং উদ্দীপনা এখন পরিলক্ষিত হয় না। বাস্তবিক পক্ষে এমন অভিযোগ যে সর্বাংশে সত্য, আমাদের ইহা মনে হয় না। পক্ষান্তরে আমাদের বিশ্বাস এই যে, আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলি কয়েক বৎসরের মধ্যে এতটা ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, ব্যক্তিগতভাবে প্রচেষ্টার দ্বারা সেগুলির সমাধান হওয়া সম্ভবপর নয়। ফলতঃ ব্যক্তি-জীবনে সেবায় যে আদর্শ একদিন বাঙলার সমাজ-জীবনে কাজ করিয়াছিল, বর্তমানে রাষ্ট্রের সাধনার ক্ষেত্রে তাহাকে সংহত করিয়া তোলা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের যাঁহারা পরিচালক, তাঁহাদিগকেই সমাজ-সেবক হইতে হইবে। প্রত্যুত বিদেশীর প্রভুত্ব কালে এদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের মধ্যে একটা ব্যবধান ছিল এবং তাহা থাকাও স্বাভাবিক। বিদেশী শাসক যাঁহারা, এদেশের লোকের সুখ-দুঃখের জন্য তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি থাকিবে, সাধারণত ইহা আশা করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের দুই-এক-জনের উদারতা; কিন্তু সে কথা স্বতন্ত্র। বস্তুত স্বাধীনতা লাভ করিবার পর পূর্ব অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এখন এদেশের লোকদের সমাজ-জীবনের উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করাই শাসকদের মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। ফলত আইন ও শান্তি রক্ষার কাজও সে হিসাবে আমরা গৌণ বলিয়া মনে করি। কারণ, দেশের লোকের সমাজ-জীবনের দুর্গতিকে উপেক্ষা করিয়া আইন ও শান্তিরক্ষার উপর নজর দিতে গেলে শাসকদের অবলম্বিত নীতি কার্যত পীড়ন এবং নির্যাতনের পথে গিয়া পড়িতেই বাধ্য হয়। এদেশে শাসকদের অবলম্বিত নীতিতে যদি সমাজ-সেবার প্রেরণা মুখ্য না হয়, তবে তাহা যে দেশের গণতান্ত্রিক উন্নতির পক্ষে অন্তরায়ই সৃষ্টি করিবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। সুতরাং এদেশের ব্যক্তিকর্মী শিক্ষা এবং সাধনাকে সমাজ-সেবায় সার্থক করিয়া তুলিবার পক্ষে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং কর্তব্যই সমধিক। এই হিসাবে রাজনৈতিক সাধনা এবং সমাজ-সেবা এই দুইটি এখন কার্যত অবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং পৃথক্‌ভাবে এই দুইয়ের গণ্ডি বাঁধিয়া দিতে গেলে ভুল হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

শব্দরূপ

শিবরাম চক্রবর্তী

ফাঁকা আকাশের কোন্ ফাঁকে
কে জানে কে ডাকে
আপনাকে।
সে কি তার নিজ নামগান
আত্মপ্রসাদে ?
স্বকর্ণে নিজের সুর শোনবার সাধে
আত্ম-উচ্চারণের আরাম ?

সেই ডাক বুঝি আলো হয়।
আলো হয়ে আকাশে হারায়
তারায় তারায়—
আর, হারায় মাটিতে
ফুল হয়ে মধু হয়ে ঢের—
ঘনীভূত আলোর মৌচাকে।

তখনো থামে না ডাকাডাকি।
সেই ডাকে পড়ে যেন অসংখ্য সাড়া।
জবাবের চিঠি তাড়া তাড়া
আসে যেন সেই এক ডাকে।
একটি শব্দেরই যেন নানান্ বানান্—
হাজার হাজার মানে—
মানে ও বানানে
বিরাট বিচিত্র অভিধান
সুনীল মলাটে।

শব্দ কি আলো হয়ে ফোটে ?
মানে হয়ে ফোটে ?
ঝাঁক ঝাঁক হয় ?
ফুল হয়ে মধু হয়ে ঢের
মাটি ফিরে আলো হয় ফের ?
সেই আলো ফের ডাক হয় ?
সব মানে মনে জমে মৌচাক হয় ?
কার মানে ? আর, কার মানে ?
কে তা জানে !
কার গলা যায় কার কানে !

মন্ত্রের প্রায়
সব অর্থ এক হয়ে যায়।
নানান্ বানানে
শব্দরা যায়
কোথায় যে শোভাযাত্রায় !
নিজেদের শবযাত্রায় ?
ফেরে বুঝি ফের সেই আকাশের ফাঁকে।
শূন্য হয়ে ফের ফিরে আসে
শূন্যের পাশে।
শব্দে অর্থে এক হয়ে থাকে।

তখনো থামে না ডাকাডাকি।
তখনো কে ডাকে
খালি খালি খালি আপনাকে।

বৈদেশিকী

ট্রুম্যান-চার্চিল আলোচনার পরে যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছে, তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কথা বিশেষ কিছু নেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্যের ঐক্য ঘোষিত হয়েছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে উভয়পক্ষের কর্মনীতির পূর্ণ সমন্বয় এখনো হয়নি, এটা স্পষ্ট বুঝা যায়। সেই সমন্বয়ের চেষ্টাতেই মিঃ চার্চিলের ওয়াশিংটন [illegible]গের পরেও বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ইডেন মার্কিন সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য আরো দুদিন থেকে গেলেন। তাতেও যে উভয়পক্ষের মধ্যে সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ মতের মিল হয়ে গেছে, তা নয়। য়ুরোপ-"সুরক্ষায়", বিশেষ করে য়ুরোপীয় বাহিনী গঠন সম্পর্কে, বৃটিশ সহযোগিতার প্রকার ও পরিমাণ নিয়ে আমেরিকার মনে একটা অসন্তোষ ছিল। [illegible]র্চিল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে অন্তত এটা [illegible] সমর্থ হয়েছেন যে, এ বিষয়ে সম্প্রতি [illegible] ও ফরাসী গভর্নমেণ্ট কর্তৃক যে [illegible]ল্পনা স্বীকৃত হয়েছে, আপাতত বৃটিশ [illegible]ণ্টকে তার চেয়ে বেশীদূর এগুতে [illegible]কান লাভ নেই। আমেরিকা চায় যে, [illegible] এবং উত্তর আতলান্তিক চুক্তির [illegible]তি য়ুরোপের অন্য দেশগুলি নিজেদের [illegible] ভৌমত্ব খর্ব করে একটা য়ুরোপীয় [illegible]াষ্ট্র ধরণের কিছু গড়ে তুলুক, বৃটেন [illegible] কিছুতেই করতে রাজী নয়। ১১ই [illegible] কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক [illegible]ায় মিঃ ইডেন এ বিষয়ে বৃটিশ মনোভাব [illegible] করে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন [illegible] পশ্চিম য়ুরোপে একটি যুক্তরাষ্ট্র তৈরী [illegible] বৃটেন দূরে থেকে সহযোগিতা করতে পারে, কিন্তু তাতে যোগ কখনও দেবে না, আমেরিকা যেন সেজন্য বৃটেনকে পীড়াপীড়ি না করে। আসলে বৃটেন নিজেকে পশ্চিম য়ুরোপের দেশগুলির সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত [illegible] করতেই পারে না এবং আমেরিকা যে [illegible]কে এক চক্ষে দেখবে, এটা বৃটেনের [illegible]ক্ষে অত্যন্ত অপমানকর ও বেদনা-[illegible]ক। বৃটিশ কমনওয়েলথের অথবা মিঃ চার্চিলের কথা বলতে গেলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গৌরব বৃটিশদের মনে এখনো [illegible] রয়েছে। কিন্তু আমেরিকার চক্ষে সকলেই এক জাতের, কারণ সকলেই তার [illegible]মর্ণ।

মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য এক হলেও উদ্দেশ্য সাধনের পথ উভয়ের এখনো সম্পূর্ণ এক হতে পেরেছে বলে মনে হয় না—যদিও প্রেসিডেণ্ট ট্রুমান ও মিঃ চার্চিল ঘোষণা করেছেন—তাঁদের বিশ্বাস যে, প্রস্তাবিত মধ্যপ্রাচ্য সামরিক কম্যাণ্ড স্থাপনের দ্বারাই বর্তমান ইঙ্গ-মিশরীয় বিবাদের নিষ্পত্তি হতে পারে। মধ্যপ্রাচ্য কমাণ্ড স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে কোনো মতদ্বৈধ নেই, কিন্তু মিশরকে এই ব্যবস্থায় যোগ দেওয়াতে হলে কি করা আবশ্যক, সে সম্বন্ধে বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেণ্ট এখনো একমত হতে পারেন নি, তার ইঙ্গিতও সংবাদপত্রে পাওয়া যাচ্ছে। মিশরের রাজাকে সুদানের রাজা বলে স্বীকার করে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য কমাণ্ড স্থাপনের ব্যাপারে মিশরের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করা নাকি মার্কিন গভর্নমেণ্টের মত—এরূপ কথা বহুপূর্বে একবার 'বৈদেশিকী' স্তম্ভে উল্লিখিত হয়েছিল। সাম্প্রতিক সংবাদ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন গভর্নমেণ্ট বোধ হয় সে মত এখনো ত্যাগ করেননি। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাতে এখনো রাজী নন; কারণ তাহলে নাকি সুদানীদের সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে। মনে হয় বৃটিশ গভর্নমেণ্টের চেষ্টা হচ্ছে আরব লীগের দল ভাঙ্গিয়ে মিশরকে একলা ফেলা, যাতে মধ্যপ্রাচ্য কমাণ্ড স্থাপনের পক্ষে মিশরের আপত্তির জোর কমে যায় এবং ততদিন সুয়েজ খাল অঞ্চলে চেপে বসে থাকা, যাতে মিশরীয়রা বুঝতে পারে যে, ইংরেজদের হঠাবার তাদের সাধ্য নেই। এই নীতি শেষ পর্যন্ত সফল হবে কিনা সন্দেহ, তবে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট নাছোড়বান্দা হলে আমেরিকা আরো কিছুদিন বৃটিশ-নীতির পরীক্ষা চালাতে দিতে পারে।

ইরান সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও মিঃ চার্চিল এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপের ফলে তেলের ব্যাপারে ইঙ্গ-পারসীক বিবাদের নিষ্পত্তির সম্ভাবনা হয়েছে। এক্ষেত্রেও বৃটিশদের কতখানি ছেড়ে কতখানি ধরা উচিত, সে বিষয়ে বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেণ্ট সম্পূর্ণ একমত কিনা সন্দেহ। তবে মোটের উপর গত দু-তিন মাস ইরানীদের চেয়ে ইংরেজরাই মার্কিন গভর্নমেণ্টের বেশি সহানুভূতি ও সমর্থন পেয়েছে। তাহলেও মার্কিন গভর্নমেণ্ট কিন্তু ডক্টর মোসাদেকের কর্তৃত্বের অবসান দেখতে চান না, কারণ তাঁদের বিশ্বাস, মোসাদেক অপসারিত হলে ইরানে কম্যুনিস্ট বিপ্লব আসন্ন হয়ে উঠবে। মোসাদেকের উপকারিতা সম্বন্ধে বৃটিশ ও মার্কিন মত এক নয়। বৃটিশ স্বার্থে মোসাদেক যে রকম আঘাত করেছেন, তাতে মোসাদেকের গভর্নমেণ্ট বৃটিশের কাছে বিষবৎ বোধ হবেই, তারা বলে যে, মোসাদেক গভর্নমেণ্টের কার্যের ফলে ইরানের অর্থনৈতিক অধোগতি যেভাবে হচ্ছে, তাতে মোসাদেক থাকলেও বিপ্লব হবে। ইংরেজরা ইরানে মোসাদেকের বিরুদ্ধে একটা দল খাড়া করার চেষ্টা করে আসছে। যাই হোক, বর্তমানে ইরানে যে সাধারণ নির্বাচন চলছে, তার ফলাফলের উপর বৃটিশ ও মার্কিন কর্মনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

চীন সম্পর্কে বৃটিশ ও মার্কিন মনোভাবের পার্থক্য স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলা হয়েছে যে, এই পার্থক্য অতিক্রম করার চেষ্টাও হবে। এ ব্যাপারে বৃটেনকেই পেছুতে হবে বলে মনে হয়। বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে হয়ত পিকিং গভর্নমেণ্টের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করতে বাধ্য করানো হবে না, তবে অন্যভাবে বৃটেনকে মার্কিন নীতির অধিকতর সমর্থন করতে হবে। আমেরিকা জিদ ধরেছে যে, চিয়াং-কাইশেককে চীন গভর্নমেণ্টের নামে (অন্তত ফরমোজা সম্পর্কে) জাপানী সন্ধি-চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে দেওয়া হোক। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট হয়ত শেষ পর্যন্ত এতে রাজি হয়ে যাবেন। ওদিকে কিন্তু জাপানে বর্তমান সন্ধি-চুক্তির বিরুদ্ধে, বিশেষ করে জাপানে মার্কিন ঘাটি ও সৈন্য-সামন্ত রাখার সর্ত-গুলির বিরুদ্ধে আপত্তি ও অসন্তোষ ক্রমশ তীব্র ও ব্যাপক হয়ে উঠছে। কোরিয়াতেও যুদ্ধ-নিবৃত্তি বা যুদ্ধ-বৃদ্ধি, যেটাই হোক, সেটা আমেরিকার ইচ্ছামতোই হবে এবং তাতে বৃটেনকে সায় দিয়ে যেতে হবে বলে বোধ হয়।

ট্রুম্যান-চার্চিল আলোচনা পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পর্কে যে ইঙ্গিতটি পাওয়া যায়, সেটি

বিশেষ আশঙ্কাজনক। শীঘ্রই এই অঞ্চল সম্পর্কে আলোচনার জন্য মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসী সামরিক কর্তারা মিলিত হচ্ছেন। ফরাসীরা বলছে, ইন্দোচীনে ফ্রান্স একলা আর কত রক্তক্ষয় করবে, কম্যুনিস্ট ঠেকানো তো সকলেরই কাজ। আমেরিকা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সাহায্য করছে বটে, কিন্তু তাতে কুলোচ্ছে না। ফ্রান্স দাবী করছে যে, যদি চীন ভিয়েৎমিনের সাহায্যে ভলানটিয়ার পাঠাবার উদ্যোগ করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে চীনের উপর আক্রমণ হবে, একথা আমেরিকা পিকিং গভর্নমেন্টকে জানিয়ে দিক্ এবং তাহলে ইন্দোচীনে মার্কিন সৈন্যেরও আসা দরকার হবে। ফ্রান্সের একটা যুক্তি হচ্ছে যে, ইন্দোচীনে যদি এত ফরাসী সৈন্য আটকে থাকে এবং তার জন্য যদি ফ্রান্সকে এত অর্থব্যয় করতে হয়, তবে য়ুরোপ সুরক্ষার ব্যবস্থায় ফ্রান্স তার যোগ্য অংশ কেমন করে নেবে? যাই হোক, মার্কিন গভর্নমেন্ট এখন পর্যন্ত ইন্দোচীনে মার্কিন ভূ-সৈন্য নামাতে রাজি নন, প্রয়োজন হলে বিমান-যুদ্ধে সাহায্য করতে পারেন। সম্প্রতি আবার ইন্দোচীনে ফরাসী সেনাপতি জেনারেল দ্য লাত্তর মারা গেছেন, তাতে ফরাসীদের প্রতি মার্কিন অনুগ্রহ ও সহানুভূতি একটু বাড়তে পারে। এদিকে ইংরেজরা ইন্দোচীনের উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করতে চাচ্ছে না। তারা মালয়ের গেরিলাদের কেমন করে আগে নিঃশেষ করা যায়, তাই ভাবছে এবং তার উপর তারা নাকি এখন বর্মায় কম্যুনিস্ট উত্থানের আশঙ্কাটাকেই ইন্দোচীনের সমস্যার চেয়েও বেশি গুরুতর বলে মনে করছে। এই সব সংবাদের মধ্যে বোধ হয় কারো মনেই থাকবে না যে, মার্কিনপুষ্ট চিয়াং-কাইশেক ফরমোজা থেকে এই বছরেই চীন আক্রমণ করার হুমকি দিচ্ছেন এবং চিয়াং-এর অনুচর জেনারেল লী চীন-বর্মা সীমান্ত অঞ্চলে বসে চীনের উপর আক্রমণ করার জন্য আমেরিকান অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছেন বলে একটা খবর শোনা গিয়েছিল। আর একটা কথা ভুলে যাওয়া সম্ভব, সেটা হলো এই যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ইংরেজ, ফরাসী বা মার্কিন কারোরই স্বদেশ নয়।

১০।১।৫২

অনাবশ্যক

শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী

ছেচল্লিশ বছর প্র্যাক্‌টিসের পর ওকালতি ছেড়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, ছাড়িনি,—ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। চিন্তাগুলোর কেমন যেন এলা এলা ভাব; কথাগুলো বলতে গেলে আরও এলোমেলো হয়ে জড়িয়ে যায়। তার উপর ছিল ছেলেমেয়েদের অনুরোধ। নইলে প্র্যাকটিস কি আর কেউ ইচ্ছা করে ছাড়ে? প্র্যাকটিস তো ছাড়লাম, কিন্তু বারলাইব্রেরীতে আসা বন্ধ করতে পারলাম কই! রোজ দুপুরে একবার এখানে এসে না বসলে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। অভ্যাস। ছেচল্লিশ বছরের অভ্যাস এই বয়সে কি কাটিয়ে উঠতে পারা যায়? অসম্ভব। কিসে যেন টেনে নিয়ে আসে। নাতিপুতিরা জিজ্ঞাসা করলে বলি যে বারলাইব্রেরীর চায়ের ক্লাবের চা-টা যেমন হয়, তেমনটি বাড়িতে কখনও হয় না। চোখমুখ দেখে বুঝি যে তারা আমার দেখানো কারণটা বিশ্বাস করল না। বোঝাই কি করে এদের যে, একটু একটু করে ছেচল্লিশ বছর ধরে প্রত্যহ, জীবনের কতখানি সেখানে ফেলে এসেছি—সব জমানো আছে সেখানে—কত আশা, আকাঙ্ক্ষা, অভিজ্ঞতা। তোদেরই মত সেগুলোর সঙ্গেও যে আমার আত্মীয়তার সম্বন্ধ। তোরা তো শুধু আমার আপনার জন; তারা যে আমার সত্তার অঙ্গ। ভেবেছিলাম তো যে রিটায়ার করবার পর ধর্মকর্ম করব। কিন্তু সে সবে মন বসে কই। কোথায় একটু গীতা-টীতা পড়ব, তা' নয় আজকেও তো সারা সকাল কাটিয়ে দিলাম, নাতিটার ইতিহাসের বইখানা নাড়াচাড়া করে। আজকাল আবার ধুয়ো উঠেছে যে, ইতিহাস হবে, জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বিবরণ; আগেকার মত রাজা-রাজড়া কেষ্টবিষ্টুদের নাম আর সাল মুখস্থ নয়। এক দিক থেকে কথাটা ঠিকই। কিন্তু তা হলে তো সাধারণ লোকের কথাবার্তাগুলোকে 'সাউণ্ড রেকর্ড'-এ ধরে রাখবার দরকার। তার চেয়ে ভাল ইতিহাসের মালমশলা পাবে কোথায়?...এই দেখ কোন কথা থেকে কোন কথায় এলাম। এমনিই হয় আজকাল। আমার মধ্যের উকিল-আমিটাকেও খুঁজে পাই না; আর অন্য-আমিটাও ধরাছোঁয়া দিতে চায় না। দুটোতে মিলে লুকোচুরি খেলছে; মাঝ থেকে আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। তাদের এই খুনসুড়িটা বাইরে প্রকাশ পায় আমার খেই হারানো কথা আর স্মৃতিবিভ্রমের মধ্যে দিয়ে। মনে থাকে না ভাল করে সব কথা। কিন্তু আশ্চর্য-পুরনো কথাগুলো ঠিক মনে থাকে। এটা কি করে সম্ভব হয় বুঝি না। উকিলের কারবার মন নিয়ে নয়। তার কারবার লেখা আইনের অক্ষর নিয়ে—তারই সূক্ষ্ম চুলচেরা ভেদাভেদ নিয়ে—বড় জোর আসামীর অপরাধের উদ্দেশ্য নিয়ে। অপরাধের উদ্দেশ্যটাকে কোনও রকমে একবার আইনের ধারায় ছকে ফেলতে পারলে সে বেঁচে যায়। বাইরের প্রকাশভঙ্গীটা যে মনের খোলস তা উকিলে বুঝবে না। আসল জিনিস রইল পড়ে যেমনকে তেমন; ছায়া ধরতে ধরতেই জীবন গেল। এই অবজ্ঞার প্রতিহিংসা নেয় মন সুবিধে পেলেই। রক্তের জোর গেলেই সে তোমার সঙ্গে দৌরাত্ম আরম্ভ করে। আমার মত ছিয়াত্তর বছর বয়স হোক আগে, তখন তোমরা বুঝবে আমার কথা, তার আগে বুঝবে না। যা বলেছি তার চেয়ে পরিষ্কার করে গুছিয়ে কথাটাকে প্রকাশ করবার ক্ষমতাই যদি এখনও থাকবে, তবে আর এত কথা বলছি কেন? কথা বেচে সারাজীবন খেলাম; সব খরচ হয়ে গিয়েছে, তাই আর

ঠিক কথা খ‍ুঁজে পাই না। যে লড়াইটার কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে পাটোয়ারী মাথাটার সঙ্গে অব্যবসায়ী লাজুক মনের লড়াই। ক্ষুর দিয়ে মাখনের তাল কাটতে ইচ্ছে হয় কাটো; কিন্তু এক্স-রে দিয়ে কেবল হাড় দেখা যায়—মাংস নয়।—না, তবুও ঠিক বোঝাতে পারলাম না।

যাক্, বার লাইব্রেরীতে এসে পড়া গিয়েছে। আজ না এলেই হত। বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। পোষায় না আর আজকাল এই সব সভাসমিতির হৈ চৈ। আজ ছিল 'দেশাত্মপ্রাণ যাদুঘর' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান—একজন মন্ত্রী করলেন। নিমন্ত্রণপত্র দিয়েছে হরলাল। তাই ভাবলাম একবার ঘুরেই আসি। সেখান থেকেই আসছি।

বারলাইব্রেরীতে ঢুকি।

'ছত্রপতি আসছেন।'

জুনিয়ার উকিলরা নিজেদের মধ্যে কথা বলবার সময় আমার নাম দিয়েছে বৃদ্ধ। বুড়োর বদলে সম্মান দেখিয়ে বলে বৃদ্ধ। আজ হঠাৎ বলল ছত্রপতি! বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু রসজ্ঞান হারাইনি এখনও। সেদিকে তাকিয়ে হেসে বলি—ছিয়াত্তর বছর বয়স হোক, তারপর তোমরাও আমারই মতন শীতকালে ছাতা নিয়ে বেরুবে। বিরাজের ছেলে নতুন উকিল হয়েছে, সে আমার কাছে এসে আমার হাত থেকে ছাতাটা নিয়ে বন্ধ করে দিল। তাই বলো। ছাতাটা মাথায় দিয়েই ঘরে ঢুকেছি! তাই জন্য এরা আমায় ছত্রপতি বলছিল। অপ্রস্তুত হয়ে যাই। মনের রাজপাট এখনই শেষ হবে; তাই শেষ-মুহূর্তে একটু উপদ্রব করে নিজের অধিকার জানিয়ে গেল। সম্মুখের ঐ চেয়ারখানায় বসবার আগে পর্যন্ত আর বিশ্বাস নেই মনটাকে। একজন উঠে দাঁড়িয়ে আমার চেয়ারখানাকে খালি করে দিল। ঐখানাই আমার নির্দিষ্ট চেয়ার। সকলেই জানে। চিরকাল ঐ জায়গাটাতেই বসে এসেছি।

আঃ! চেয়ারখানাতে বসেও তৃপ্তি। এরই অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ থেকে। বসা মাত্র উকিল আমি-কে ফিরে পেলাম। ডাঙা থেকে মাছ আবার জলে আসতে পেরেছে। খানিক আগের আমি আর আমাতে নেই। একজন পুরনো মক্কেল চোখাচোখি হয়ে যাওয়ায় নমস্কার করল। হেসে তাকে প্রতি-নমস্কার জানাই। চেয়ারে বসবার আগে হলে নমস্কার করা দূরে থাক তাকে হয়ত আমি চিনতেও পারতাম না। মক্কেল, মুহুরী, উকিল প্রত্যেকের হাবভাব আমার জানা, প্রত্যাশিত আচরণ আমার মুখস্থ। দেওয়াল ভরে বার অ্যাসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সেক্রেটারীদের ফটো টাঙানো; তার মধ্যে আমারও ছবি আছে। আমার দিকে তাকিয়ে সব ছবিগুলি মৃদু ভর্ৎসনা করছে, খানিক আগে পর্যন্ত আমি গণ্ডি পার হয়ে মনে মনে অনাবশ্যকের রাজ্যে আনাগোনা করছিলাম বলে। ওপথে যাওয়া যে আইন-জীবীদের নিয়মবিরুদ্ধ তা কি তুমি জান না? যা করে ফেলেছো ফেলেছ—আর যেন অমন না হয়। খবরদার, চোখের আড়ালের রাজ্যে, আর না!

লজ্জিত হয়ে যাই। আর কখনও আমি অমন কাজ করি! খবরের কাগজখানা টেনে নিয়ে বসি। ভুল লাইনে যাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে প্রথমেই খবরের কাগজের মামলা-মোকদ্দমার পাতাটা খুলে বসি। দেওয়ালের এই এতগুলি বুদ্ধিজীবী তাঁদের জীবনের প্রতিদিন তিল তিল করে শাণিত বুদ্ধির দ্যুতি এইখানে ছিটিয়ে রেখে গিয়েছেন। তাই দিয়ে চুম্বক বা বিদ্যুতের ক্ষেত্রের মত একটা পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে এখানে। আমি তো কোন ছার—দেশের সব চেয়ে বড় কবি প্রেমিক বা শিল্পীকে এনে বসিয়ে দাও না এখানে। অমনি দেখবে তার পাটোয়ারী বুদ্ধি গজিয়েছে, আবশ্যক আর অনাবশ্যকের মান শিখেছে বললে। Evidence Act-এ অবান্তর প্রমাণ কি করে বাদ দিতে হয় দেখেছ তো। সেই রকম দয়ামায়া বাদ দিয়ে এক্স-রে দিয়ে দেখতে হবে পৃথিবীটাকে।...

পাশের টেবিলে জুনিয়ার উকিলের দল মিউজিয়মের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের গল্প করছে। এরা সকলেই বোধহয় সেখানে গিয়েছিল। এদের মধ্যে থেকে একজন বললে 'এইবার বৃদ্ধের খবরের কাগজ পড়া আরম্ভ হল।'

কে ছোকরাটি? বার লাইব্রেরীর মধ্যে বসে একজন সিনিয়র উকিলকে সমীহ করে কথা বলতে জানে না! নিশ্চয়ই বাইরের কোনও জায়গা থেকে এখানে এসে বসেছে প্র্যাকটিস করতে। আমার চোখে ছানি-কাটানোর পরের মোটা লেন্সের চশমা—আড়চোখে দেখে নেবারও উপায় নেই। দেখতে হলে মাথাটা ঘুরিয়ে লেন্স জোড়া ফোকাস করতে হবে ঐ দিকে। সেটা হয়ত একটু অশোভন হবে আমার পক্ষে। আচ্ছা ছোকরাটি একথা বললে কেন? প্রথমত সে যদি ভেবে থাকে যে, কাগজখানা সারা দিনের মধ্যে বৃদ্ধের হাত থেকে আর বার করা যাবে না, তা হলে আমি তাকে বলব—তোমার এভাবে ভাববার কোন অধিকার নেই। বৃদ্ধ প্র্যাকটিস ছাড়লে কি হবে, সে আজও বার অ্যাসোসিয়েশনের চাঁদা দিয়ে আসছে। প্রমাণ হিসাবে আমি তোমাকে সদস্যদের তালিকা ও চাঁদার খাতা দেখতে বলি। আর তুমি মেম্বর হয়েছ তো? অনেকে আবার আজকাল উকিল হয়েও বার অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হয় না। মোটের উপর আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমি আমার অধিকারের গণ্ডীর মধ্যে থেকেও কাগজখানাকে সারাদিন নিজের দখলে রাখতে পারি। কাজেই আমার বিদ্বান বন্ধুর প্রথম যুক্তি ধোপে টেকে না। দ্বিতীয়ত যদি আমার বিদ্বান বন্ধু ইঙ্গিত করে থাকেন যে বৃদ্ধ সংবাদপত্রের কোনও বিশেষ ধরণের মোকদ্দমার রিপোর্ট পড়বার জন্যই খবরের কাগজের ঐ পাতা খুলেছেন, তা হলে আমি বলব তাঁর দাবি জ্ঞানহীন যুক্তি প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নয়। ছিয়াত্তর বছর বয়সে যে সন্ধ্যালোকের জগতে লোকে থাকে সে সম্বন্ধে তাঁর কোনও জ্ঞান নেই। আমার কড়া কথা ক্ষমা করবেন, তিনি নিশ্চয়ই নিজের বয়সোচিত দৃষ্টি দিয়েই জিনিসটাকে দেখেছেন। তাঁর অজ্ঞতার জন্য আমি তাঁকে করুণা করি। আর [illegible] চেয়ে মূল্যবান প্রমাণ হিসাবে [illegible] হুজুরকে খবরের কাগজের এই পাতা [illegible] পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। সুতরাং [illegible] বন্ধুর এ যুক্তিও অচল...Does not [illegible] water, your honour......

ভ্রূক্ষেপও যে নেই এদিকে। লম্বা [illegible] গপ্পো ঝাড়া হচ্ছে 'দেশাত্মপ্রাণ যাদুঘর' এর উপর! তুই সেদিন এসেছিস এ শহরে, মিউজিয়মটার ইতিহাস তুই কি [illegible] জানবি?...কিন্তু 'আর্গুমেন্ট'এর মুখে [illegible] নতুন কথাটি খুঁজে পেয়েছি—সন্ধ্যালোকের জগৎ।......ওঃ!......অবান্তর......sorry! [illegible] দেওয়ালের আমি, তুমি তো বুঝতেই পারছ। একটুখানি চোখের পাতা ভারি হয়ে এসেছিল বলে মুহূর্তের জন্য তোমাদের আওতা থেকে বার হয়ে গিয়েছিলাম। বড্ডো ধকল গিয়েছে কিনা আজ শরীরের উপর। আর আমি ঢুলুনি আসতে দিই!...অবান্তর!...

—হ্যাঁ, তৃতীয়ত আর একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে, ঐ খবরের কাগজ সংক্রান্ত কথাটির অর্থের। খবরের কাগজ পড়তে

লেই আমার চুলুনি আসে। তাই লক্ষ্য ছি কিছুদিন থেকে যে বার লাইব্রেরীতে টা নতুন ইডিয়ম তৈরী করা হয়েছে। সেই ডিয়ম অনুযায়ী 'বৃদ্ধের খবরের কাগজ ড়া' কথা কয়টির মানে ঘুমনো। আইনের খে স্থানীয় রীতিনীতির গুরুত্ব কম নয়। জেই আসামীর benefit of doubt ওয়া উচিত।

আর্গুমেণ্ট শেষ করে নিশ্চিন্ত হই। এত-ল ধরে ওকালতি করলাম, কিন্তু এখনও র্গুমেণ্ট আরম্ভ করবার ঠিক আগেই কটু উদ্বেগ ও শেষ হবার পর খানিকটা স্তি পাই। ভাল হল কি না তা নিজে নজেই বোঝা যায়। তাই এখন মনটা বেশ প্তিতে ভরে উঠেছে। যতই ঘুম আসুক মুচ্ছি না কিছুতেই। দাঁড়াও তোমাদের ডিয়মটাকেই আজকে রদ করে দিচ্ছি!

সেই উকিলটির সঙ্গে আর এখন আমার কানও রাগারাগি নেই। সে পয়েণ্টটাই শেষ হয়ে গিয়েছে। ওদের টেবিলে মিউ-জিয়মের গল্পই চলছে। বেশ লাগে শুনতে দের গপ্পো।

—মিউজিয়মের নতুন সাইনবোর্ডটি দেখেছো তো? উপরে লেখা 'দেশাত্মপ্রাণ যাদুঘর'। নীচের লাইনে আছে '১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত'। আজকে যার উদ্বোধন অনুষ্ঠান হল সেটা ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হবে কি করে? এমন ডাহা contradictory কথাটা লিখল কি করে হরলাল মোক্তার? যাহা মিথ্যে তাহা আইন বিরুদ্ধ!

—না হে এ হচ্ছে মোক্তারি সত্য। দেখছ না, মোক্তারি আইন পরিবেশন করা হয়েছে বিচক্ষ মন্ত্রীর জন্য।

—মন্ত্রী ছাড়া আর যে কোন রামশ্যাম দুবেধু মিউজিয়মের ভিতরে ঢুকেই লিখিত প্রমাণ দেখতে পেত এর বিরুদ্ধে। সেখানে বরাট পাথরখানায় যে লেখা রয়েছে, 'লি মিউজিয়ম, প্রতিষ্ঠিত ১৯২৮ সাল'।

না, না, ছোকরা বুদ্ধিমান। পয়েণ্টটা ধরেছে ঠিক। তবে নিজের বক্তব্য ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেনি। প্রথমত আজকে একটা উদ্বোধন অনুষ্ঠান নতুন করে হচ্ছে বলে এ প্রমাণ হয়ে যায়না যে সে প্রতিষ্ঠানটা ১৯২৮ সাল থেকে চলে আসছে-না। বাড়ি বদল হতে পারে, প্রতিষ্ঠানটির আদর্শে পরিবর্তন হতে পারে—আরও বহু কারণ ঘটতে পারে, যার জন্য হয়ত একবার নতুন করে উদ্বোধন অনুষ্ঠান প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। দ্বিতীয়ত মোক্তারদের সম্বন্ধে ওরকম সুরে কথা বলা তোমাদের নিজেদের পক্ষেই অসম্মানজনক। তোমাদের কথার ঝাঁজে একটু পরশ্রীকাতরতা প্রকাশ পাচ্ছে। আইনের লাইন হচ্ছে এমন একটা পেশা, যেখানে তোমার যদি প্রতিভা থাকে তা হলে নিশ্চয়ই স্বীকৃতি পাবে। বড় বড় মোক্তারদের নখের যুগ্যি আগে হও, তারপর তাদের সমালোচনা কর। হরলাল মোক্তারের মত মামলার তথ্য সাজাতে কজন উকিলে পারে? এতক্ষণ বসে বসে মোক্তারদের সম্বন্ধে সস্তা রসিকতা না করে, যদি একটু আইনের বই-টই নাড়াচাড়া করতে, তা হলে ভবিষ্যতে আমাদের বিম্বান মোক্তার ভাইদের চেয়ে সত্যি সত্যি ভালভাবে মোকদ্দমা চালাতে পারতে। তৃতীয়ত গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি মন্ত্রীর সম্বন্ধে তুমি যে বিশেষণটি ব্যবহার করেছ, তা ন্যায়সঙ্গত সমালোচনার সীমা পার হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ এইবার আমার শেষ হল।

—যাদুঘরের মধ্যে মিউজিয়ম! একেবারে কৌটোর ভিতর কৌটো যে হে।

—হ্যাঁ, ধুকড়ির ভিতর খাসা চাল। খোসার ভিতর শাঁস। 'লি মিউজিয়ম' লেখা ঐ পাথরখানাই বোধহয় দেশাত্মবোধ যাদু-ঘরের সবচেয়ে প্রাচীন সম্পদ।

—যা বলেছ। ঐ শিলালিপিখানার উপর একখানা থিসিস লিখলেই হয়।

ঐ টুকুই আছে বাকি। তা হলে আমা-দের মোক্তারানন্দ স্বামীর সাধনার ইতিহাস অনেকখানি পাওয়া যায়।

বাঃ, বেশ টিপ্পনীটা কেটেছে বিরাজের ছেলে। এই জন্যই তো বার লাইব্রেরীর গল্প আমি এত ভালবাসি। বাইরের লোক শুনলে হয়তো কথাগুলোকে একটু বেশী ঝাঁজালো বলে ভাববে কিন্তু আসলে এটা ঝাঁজ নয়, বুদ্ধির ঝলকানি। বার লাইব্রেরী হচ্ছে জেলার 'ব্রেন-ট্রাস্ট'। কি ছাই ইতি-হাসের বই পড়ে লোকে! এখানকার বুদ্ধি-দীপ্ত মিঠেকড়া মন্তব্যগুলোই দেশের অলিখিত ইতিহাস—আসল ইতিহাস। এরা প্রত্যহ মুখে মুখে ইতিহাসের ডিক্টেশন দিয়ে যাচ্ছে। তবু সেগুলো কিছুতেই লেখা হবেনা ইতিহাসের টেক্সট বুকের পাতায়। অলিখিত অংশটাই শাঁস, লিখিত অংশটা হচ্ছে খোসা। সাইনবোর্ডটার প্রথম লাইনে লেখা আছে 'দেশাত্ম প্রাণ যাদুঘর'; আর দ্বিতীয় লাইনে আছে '১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত'। কিন্তু এই লিখিত দুটো লাইনই ভুয়ো। আসল ইতিহাস লুকিয়ে আছে এই দুইলাইনের মধ্যের অলিখিত অংশটিতে। ভূষি ঝেড়ে আসল জিনিস আলাদা করতে হয়। সেটা থাকতে চায় চোখের আড়ালে। লুকিয়ে থাকে নীচে, পিছনে। বলার পিছনে থাকে কত না বলা; লেখার পিছনে থাকে কত না লেখা। বার লাইব্রেরীতে বলা কথা একটাও নষ্ট হয় নি। অখিল ব্রাহ্মাণ্ডের সীমাহীন শূন্যতাকে ধাক্কা দিতে দিতে কথাগুলো এগিয়ে চলেছে—কোথায় কে জানে। মনের রেডিও খুলে ধরণা কেন সেগুলো। সারা ইতিহাসের মালমশলা তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে।......

অবান্তর...sorry...ঘুম এসে গিয়েছিল, আমার অজানতে। ফটোর ফ্রেমগুলোর মধ্যে থেকে অমন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমাকে দেখলে আমার উপর অবিচার করবেন আপনারা। বিশ্বাস করুন আমার কথা। বুঝি যে কাউকে বিশ্বাস করা হয়ত আপনা-দের পক্ষে সম্ভব না, কেননা জীবদ্দশায় আপনারা নিজের নিজের ভবিষ্যৎ ছাড়া আর সব বিষয়েই ছিলেন সংশয়ী। কিন্তু আমার পক্ষের বক্তব্যটা শুনবার আগে আমার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া অনুচিত হবে। খানিক আগের বিচ্যুতির সমর্থনে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে বুড়ো বয়সে সম্মুখের দিকে তাকাতে ভয় হয়, তাই এত পিছনে চেয়ে চেয়ে দেখি। এই জন্যই এত পিছন পিছন কর-ছিলাম এতক্ষণ। নইলে আমি কি জানি না, যে লিখিত প্রমাণ থাকতে অলিখিত দলিল অচল? দীর্ঘ ছেচল্লিশ বছর আপনাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের বাহক হিসাবে, এখানে সেবা করবার সুযোগ যার হয়েছে সে আর এটুকু জানবে না? দ্বিতীয়ত আমি নিবেদন করতে চাই যে লিখিত দলিলের শূন্যতা পূর্তির জন্য অন্য প্রমাণ দাখিল করবার আমার আইনসঙ্গত অধিকারও আছে। ঠিক নয় কি?

—মিউজিয়মে পুরনো জিনিস রাখে। তাই বলে মিউজিয়মটাও যে পুরনো, সে কথাও প্রমাণ করবার দরকার আছে নাকি?

—দেশাত্মপ্রাণ মিউজিয়ম যে ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। তখনও ঋষিকুমারবাবু যে 'দেশাত্মপ্রাণ' খেতাব পানই-নি, পাবলিকের কাছ থেকে।

Good! ঠিক পয়েণ্টটা ধরেছে ছোকরা। অনাবশ্যক ছিবড়েগুলো ফেলে দিয়ে

আবশ্যকটুকু নিংড়ে নিতে জানে। পসার জমাতে পারবে ভবিষ্যতে, যদি মুনসেফ-টুনসেফ না হয়ে যায়। ঋষিকুমার মারা যায় ১৯৪৫ সালে। উকিল হিসাবে ভাল না হলেও, লোক ভাল ছিল ঋষিকুমার। নেতা হিসাবে কত বড় ছিল সে সব খবর দিতে পারবে, তাদের আইন ভাঙ্গবার দলের লোকরা; আমরা জানি না। সেই সপ্তাহের 'জেলা হিতৈষী' কাগজে, তার মৃত্যুসংবাদের হেড লাইনে প্রথম দেখেছিলাম স্বর্গীয় ঋষিকুমারের 'দেশাত্মপ্রাণ' পদবী। এ শোনা কথা নয়, আমার নিজের চোখে দেখা লিখিত প্রমাণ। অবশ্য সে কাগজ এখন পাওয়া যাবে কিনা জানি না—নীলামি এস্তাহারগুলো পড়া হয়ে গেলেই সকলে ফেলে দেয় হয়ত; তবে 'লি মিউজিয়ম'এ—sorry দেশাত্মপ্রাণ যাদুঘরে বোধহয় পুরনো কপির ফাইল থাকতেও পারে। আও! আবার! আবার পিছনে তাকাচ্ছো! সাবধান! সোজা হয়ে বস! চোখ রগড়ে নাও! হ্যাঁ যা বলছিলাম—যা লেখা আছে সেইটাই সত্যি, যা উপর থেকে দেখা যায় সেইটারই দরকার। সমুখে যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে সেইটাই আসল; তার পিছনে আছে মাকড়শার জাল—সম্পূর্ণ অনাবশ্যক জিনিস।

—মোক্তারানন্দ স্বামীর সাধনার গোড়ার দিকের স্তরগুলো জানো তো? ঢুকেছিলেন কলেক্টরিতে কেরাণী হয়ে। সেখানে কাজ করতে করতেই মোক্তারি পাস করেন।

—আজকাল কিন্তু তিনি নিজেকে মোক্তার বলে পরিচয় দিতে আনন্দ পান না মোটেই। সাক্ষ্য দিতে হলে নিজের পেশা লেখান legal practitioner—মোক্তার নয়।

—যত সব কি তোমার নজরেই পড়ে!

—তা' উনি নিজের পেশা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানগিরি লেখালেই পারেন। সাপও মরে লাঠিও ভাঙ্গে না।

—বলেছ বেশ কথাটা। পেশা—চেয়ারম্যানগিরি। হাঃ হাঃ হাঃ। জিনিসটা আবার ঠিকেদারদের কানাঘুষোগুলোর স্বীকারোক্তি হয়ে যাবে না তো?

না না না, যদিও আমার তরুণ বন্ধুরা বেশ একটা ticklish পয়েন্ট তুলেছেন, তা হলেও আমি তাঁদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে তাঁরা মানহানির ধারায় অভিযুক্ত হবার মত কথা বলে ফেলেছেন। দ্বিতীয়ত হরলাল মোক্তারের জীবন এখনকার issue নয়। আলোচ্য বস্তু ছিল 'লি মিউজিয়ম' লেখা শিলালিপিখানি; আলোচ্য বিষয় ছিল 'প্রতিষ্ঠিত, ১৯২৮ সাল', লেখাটি। অন্য সব অবান্তর প্রসঙ্গ এর মধ্যে টেনে আনবার কোনই দরকার ছিল না। ওগুলো ছাড়তে হয় চুটকি হিসাবে, আসল আর্গুমেণ্টের ফাঁকে ফাঁকে, হাকিমের মেজাজ বুঝে। নইলে যে তোমার সম্বন্ধে কোর্টের ধারণা খারাপ হয়ে যাবে। আরম্ভ করতে হবে ঠিক আরম্ভের জায়গাটা থেকে। 'প্রতিষ্ঠিত, ১৯২৮ সাল' লিপিটির তুমি পাঠোদ্ধার করছ, সুতরাং তুমি ১৯২৮ সাল থেকে আরম্ভ করতে বাধ্য। তা নয় কখনও এখানে, কখনও ওখানে! খুব খারাপ অভ্যাস। হ্যাঁ, লি সাহেবের কথা এতক্ষণে তুলেছে ছোকরারা। That's it—এইবার ঠিক রাস্তায় এসেছ। লি সাহেব কবে এসেছিল এখানে, তা নিয়ে বাজে তর্ক করে লাভ কি? লিখিত প্রমাণ রয়েছে ১৯২৭ সালের যে সংখ্যার 'জেলা হিতৈষী'তে, সেইখানা দাখিল কর না কেন। লেঠা চুকে যাবে। পরিষ্কার লেখা আছে—'আমাদের জেলার নূতন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্টার ই ডবলু লি গত অমুক নভেম্বর তারিখে নিজের পদের চার্জ বুঝিয়া লইয়াছেন।' সেটা ছিল নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ নিশ্চয়ই, কেননা লি আর তার মেম সাহেবকে যখন প্রথম দেখলাম রাস্তায়, তখন তারা গরম পোষাক প'রে। স্পষ্ট মনে আছে বাইনোকুলার দিয়ে দুজনে অশথ্ গাছের মগডালের হরিয়াল পাখী দেখছিল।

—আরে তেইশ বছর আগেকার শিলালিপি নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করলে ইউনিভার্সিটি নেবে তো?

—নেবে আবার না! তেইশ বছর আগে যার জন্ম হয়েছে, আজকে সে সাবালক হয়ে বাপের সম্পত্তি উড়োচ্ছে। তেইশ বছর কি একটা সোজা ব্যাপার!

—না না সোজা কে বলছে? সাড়ে বাইশের চাইতেও বড় তেইশ। তখনও শফিক মিঞার দাড়ি কাঁচা ছিল।

......এরা দেখছি হেসে একটা সিরিয়াস বিষয়কে হালকা করে দিচ্ছে। তেইশ বছরের ইতিহাস হয়ে গেল হাসির জিনিস! তেইশ বছর ধরে বলা রামশ্যাম যদুমধুর কথাগুলোকে এক জায়গায় জড় করা কি যার তার কর্ম! মনের রেডিওটা খুলে বসি।

এ রাজ্যে উকিল আমির শাসন আর সং
তুলে দাঁড়িয়ে নেই। তাই দূরের জি
কাছে আসতে ভয় পায় না।...নতুন পু
সাহেবকে দেখেছিস? মিস্টার লি রে, মি
লি। যেটা হালে এখানে বদলী হয়ে এসে
বেহেড মাতাল। চলে ঘোঁতঘোঁত ক
নতুন বিয়ে করে এনেছে। যেমন
তেমনি দেবী। সাহেবের টুরের স
সঙ্গে যাওয়া চাই মেম সাহেবের। যে
মোটর চলে না সেখানেও। ঘোড়ার
তো ঘোড়ার পিঠেই সই। স্টেথিস্কো
মত বাইনোকুলার ঝোলানো গলায় দুজ
তার মধ্যে দিয়ে পাখী দেখা না গেলে
গড়িয়ে পড়ে, এ ওর গায়ে। সব সময়
জন আর একজনকে চক্ষে হারায়। জো
রাত হলে তো কথাই নেই।
কপোতী যথা গোদাবরী তীরে।
বলছি। টুরের সময় আবার গীতাঞ্জলি
শোনানো হয়; ঐ যেখান লিখে রবি
মডেল প্রাইজ পেয়ে গেল। না না বাজে
না। পুলিস সাহেবের স্টেনো
বলেছে। তোর গা ছুঁয়ে বলছি।
বললে তোর টম কুকুরটার নাম বদলে
নাম রাখিস। রাখতাম ঠিকই, কিন্তু সে
যে সাড়া দেবে না কুকুরটা। নাম বদ
কি অত সোজা রে! গায়ের ঘাম না
মুছে ফেলে দিবি; মোক্তারবাবু উকিল
চেষ্টা করেও তার নামটা বদলাতে পার
আজও। ও তাই বল! ইংরিজী গীতা
আমি ভাবছিলুম বুঝি বাঙলা!...

আকাশে বাতাসে ছড়ানো
বলা কথাগুলো থেকে আমি একটা ই
শুনে চলেছি। জন্মের তারিখ অপরি
রেখে, শুধু নামটা কি করে বদলে
এ তারই ইতিহাস। ভারী intere
কেবল ইতিহাস বললে ভুল হবে; সে এ
বারে রামায়ণ মহাভারত মশাই—কুরু
কাণ্ড! সবুর করুন। বিজ্ঞলোক আপ
এত উতলা হলে কি চলে। বেশী
পেলে কি আপনি দু হাত দিয়ে ভাত
কুরুক্ষেত্তর কাণ্ডটাই আগে শুনতে
এ তো কম আবদার নয়। দেখুন আ
চটাবেন না বলছি; বুড়ো বয়সে আ
মেজাজ ঠিক থাকে না সব সময়।
দলের অধিকারীকে গিয়ে বলুন না এ
যে যুদ্ধের জায়গাটা আগে দেখিয়ে
জমিদারবাবুর ঘুম পাবো পাবো হ
সেটি হচ্ছে না। বৃথাই অরণ্যে রোদন। এক

সাধারণ নাম বদলাতে গেলে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে ঘোরাঘুরি করতে হয় এফিডেভিট করবার জন্য। আর লি মিউজিয়ামের তো এখনও নামকরণই হয় নি। আগে নামকরণ হবে, তবে তো নাম বদলাবে। হ্যাঁ...... অসুরাগড়ের গপ্পো জানিস তো? যখের ধনের ঘড়া আছে সেখানে, মাটির নীচের সিন্দুকে। এখন সেখানে জঙ্গলে জঙ্গলা-কার। বুনো শুয়োরের আড্ডা। সেই সাতাশ মাইল দূরের অসুরাগড় থেকে আনল কি করে গরুর গাড়িতে এই বিরাট পাথরের চৌকাঠটা! আচ্ছা পাগল সাহেবটা! ধরে আনতে গেল নসে ডাকাতের দলকে সেই জঙ্গল থেকে; ডাকাতরা পুলিস সাহেবকে ফলার খাওয়ানর জন্য সেখানে বসে রয়েছে আর কি! ডাকাতের বদলে নিয়ে এল এই একখান জগদ্দল পাথরের চৌকাঠ। যখের ভাণ্ডারের দরজারই হবে বোধহয়। মেমটারও সাহসের বলিহারি! সেই অজাগর-বীজবন তোলপাড় করতে গিয়েছে স্বামীর সঙ্গে! সব শালা দারোগার শাট থাকে ডাকাতের সঙ্গে; তাই থানার দারোগাকে পর্যন্ত খবর দিয়ে যায়নি। জঙ্গলের পর্ব শেষ করে তো মশাই উঠল গিয়ে থানায় বেলা বারোটায়। সেখানে তখন লোক গিজগিজ করছে; দারোগাবাবু তখনও বাড়ি থেকে বার হবার সময় পাননি। গিয়ে দারোগাকে এই মারে তো সেই মারে। এই গরমাগরমির বাজারে মেমসাহেব কুট্ করে একটি বুকনি ছাড়লেন—কতদিন হল আপনার বিয়ে হয়েছে দারোগা সাহেব? সতর বছর! তবুও! কথার ভঙ্গীতে লী সাহেব পর্যন্ত বকুনি ভুলে হেসে ফেটে পড়ে। হাসতে হাসতেই দারোগার উপর হুকুম হয়ে যায়, অসুরাগড়ের জঙ্গলের পাথরের চৌকাঠ-খানিকে গ্রেপ্তার করে বেঁধে-ছেঁদে চৌকিদার কনস্টেবলের হেপাজতে সদরে পাঠিয়ে দিতে।

আসামী তো সদরে লী সাহেবের কুঠিতে এসে দাঁড়ালো মশাই জোড়া গরুর গাড়িতে। সেই মিছিলকে সঙ্গে নিয়ে সাহেব তখনই গিয়ে ঠেলে উঠল জেলা ইস্কুলের কমনরুমে।

হেড মাস্টার, তুমি ছাড়া এসব ঐতিহাসিক জিনিসের কদর জেলার মধ্যে আর কে বুঝবে? এর পর আরও অনেক ছোট ছোট জিনিস আনবো অসুরাগড় থেকে।

হেড মাস্টার মশাই তো হেঁচে-কেশে, ভুল ইংরেজি বলে অস্থির—সরকারী এডুকেশন কোড-এ নাকি লেখা আছে, ইস্কুলের ঘর এসব কাজে ব্যবহার করা যায় না।

ড্যাম ইয়োর কোড!

ইস্কুলের হলঘরের মেঝে বুঝেছিল লী সাহেবের নাল-দেওয়া বুটের জোর। ঠকাশ করে শব্দটার কাঁপুনি আর বুকের কাঁপুনিতে মিলে হেড মাস্টার মশাইকে বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়েছিল, তার আবার এডুকেশন কোড! হেঃ!

তার পর থেকে চলল দাবার গৈবী চাল। ওরে আমার চালদেনেওয়ালারে! পাকা ছাদ থাকলেও বা হত; ঘরের চাল পুড়িয়ে চাল ভাজা খাইয়ে ছাড়বে! চুনোপুঁটি হরলাল মোক্তার গিয়েছে পাবলিক প্রসিকিউটার খাঁ বাহাদুরের সঙ্গে পাল্লা দিতে! মামদোর পাল্লায় পড়িসনিতো এর আগে। বুঝিয়ে ছাড়বে, কত ধানে কত চাল!

লে লে তুই তো সবই বুঝিস! দেখতে হাড়গিলে হলে কি হয়; হাড়ে ভেল্কি খেলে হরলাল মোক্তারের। চোরাগোপ্তা এমন প্যাঁচ লাগাবে যে, খাঁ বাহাদুর দাঁড়ি চুলকোতেই থেকে যাবে; টেরও পাবে না। হলও কি তাই!

বেবুদ মিয়ার বাগানটা আছে না, হরলাল মোক্তারের বাড়ির সঙ্গে লাগা? বাগান আর বলিস না ওকে, জঙ্গল! দিনমানে শিয়াল ডাকে। হ্যাঁ, এককালে ছিল বটে বাগান। জঙ্গলের মধ্যে ইউকালিপটাসের সার দেখলে এখনও সে কথা বোঝা যায়। ঐ বেওড়া গাছ-গুলো এক নম্বরের অলক্ষুণে। দুচক্ষে দেখতে পারি না ওগুলোকে। যে কম্পাউণ্ডে দেখবি, সেখানেই শুনবি, তাদের সংসারে এককালে লক্ষ্মীশ্রী ছিল; এখন উবে গিয়েছে। তাই বেবুদ মিয়ার পরিবারটাও গেল মরে হেজে। ঐ বাগানটাকে নেবার জন্য হরলাল মোক্তার অনেক কাল থেকে তক্কে তক্কে ছিল। তক্কে তক্কে থাকা কি, এক রকম নিয়েই নিয়েছিল। কুলটা বেলটা কার গভ্ভে যায়? তেঁতুলগাছ দুটো পর্যন্ত ওই বছর বছর জমা দিয়ে দেয়, পশ্চিমা ঠিকেদারের কাছে। কে আর বারণ করতে যাচ্ছে বল। মোক্তারগিন্নি পাড়ার লোককে বকতেও আরম্ভ করেছে আম পাড়লে। কৎবেল আর চাল্তা কুড়োতে গেলেও কুকুর লেলিয়ে দেবে, সেদিন এল বলে। এই বলে রাখলাম। দেখে নিস। বড় দজ্জাল মোক্তারগিন্নি! সে গুড়ে বালি। কোথাকার দেনমোহরে এদের কোন্ জমির টিকি বাঁধা, তা দেবা ন জানান্তি; হরলাল মোক্তার জানবে কি করে। কিন্তু হুদ্-হুদ্, পীর-ফকিরা জানান্তি; তাদের উপর যে সংস্কৃত শ্লোক খাটে না। তাই খাঁ বাহাদুর জানতে পেরেছিল, কোথায় যেন বেবুদ মিয়ার ওয়ারিশরা থাকে। কে জানে, কোথা থেকে এল চোদ্দ পুরুষের ঠাকুরদা এই ওয়ারিশ। এতকাল ছিলি কোন্ চুলোয়? তার কাছ থেকে খাঁ বাহাদুর তলে তলে কিনে নিলে জলের দামে, বেবুদ মিয়ার বাগানটা। খাঁ বাহাদুর নাকি সেখানে মেয়ে-জামাইয়ের জন্য বাড়ি করে দেবে। খবর পেয়ে মোক্তারানন্দ তো সাত হাত জলের নীচে। তার মা কেঁদে বলে, ও হরলাল, তাহলে যে ওদের বাড়ির কুকড়োগুলো উড়ে এসে আমার হবিষ্যি-ঘরে ঢুকবে।

তা আর কি করছি বলো। বললে বটে হরলাল মোক্তার, কিন্তু কিছু না করে হাত গুটিয়ে বসবার পাত্তর সে নয়। বেবুদ মিয়ার বটগাছটার নীচে যে পাথরের চৌকো বেদীটা আছে, সেটাতে রাতারাতি সিঁদুর মাখানো হল।

ভ্রূক্ষেপও নেই খাঁ বাহাদুরের।

নুড়িতে সিঁদুর লাগিয়ে কি আর খাঁ বাহাদুরের মত জাঁদরেল লোককে ঠেকানো যায়। মোক্তারানন্দ, এবার পড়েছ শক্ত পাল্লায়! তুই হলি গিয়ে মাছিমারা মোক্তার, আর সে হচ্ছে সরকারী উকিল! জজ ম্যাজি-স্ট্রেট তার হাতের মুঠোয়!

হরলাল থাকে ঐ ঝিম্ মেরে। হ্যাঁ...

কিন্তু একখানি আসল yellow dove—পাকা ঘুঘু বাবা—একেবারে পেটেপেটে...... হ্যাঁ......সটান চলে গেল পুলিস সাহেবের কুঠিতে।......কি চাও বাবু? খাঁ বাহাদুর চলে ডালে ডালে তো হরলাল মোক্তার চলে পাতায় পাতায়। সাহেবের সঙ্গে কি কথা হল কে জানে! সাহেব মেমেতে গাড়ি নিয়ে বেরুল, সিধে খাঁ বাহাদুরের বাড়িতে—বেবুদ মিয়ার বাগানটা তাঁরা চান—সেখানে মিউজিয়মের ঘর উঠবে। এইবার নেঃ খাঁ বাহাদুর! ঠেলা বোঝ! এ যে একেবারে বিনে মেঘে সর্পাঘাত! বেবুদ মিয়ার জমিটাকে নিয়ে তবে লি সাহেব নিশ্চিন্দি।

নিশ্চিন্দি আর কই! সেই থেকেই তো হল শুরু। রাতদিন মিউজিয়ম আর মিউজিয়ম। আহার নিদ্রা ঘুচলো সাহেব মেমের—কাজে কাজেই হরলাল মোক্তারেরও। ঢালাও হুকুম হয়ে গেল পুলিস অফিসের হেড-ক্লার্কবাবুর উপর প্রতি মাসের টি এ বিলের থেকে ইনস্পেক্টারদের কাটা হবে পাঁচ টাকা, দারোগাদের দু টাকা আর কনস্টেবলদের চার আনা করে।

হেড ক্লার্কবাবু ইশারা ছাড়লে দারোগাদের দিকে। তারাতো ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। চোর ডাকাত ফরিয়াদী আসামী কেউ রেহাই পেল না সে বছর মিউজিয়মের চাঁদা থেকে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলব। সাহেব নিজে প্রথম দফায় চাঁদা দিলে একশ টাকা। তার পরেতে করলে এক কান্ড! হাসতে হাসতে মরি! এক চাঁদা তোলার মিটিঙে, গোঁফের ফাঁকে হেসে নিজের মেম সাহেবের উপর চাঁদা ধরলে মাসে পনর টাকা করে। মিসেস লির তো শুনেই যেন নাকের উপর আরশুলা উড়ে এসে বসলো হঠাৎ। লাফিয়ে উঠেছে চেয়ার থেকে—হিহি খনখনে গলায় একখান মেমসাহেবি অবাক হবার চীৎকার ঝেড়ে। কি আবার হল? ও; না। হাসি হাসি যেন মুখখান! মেমসাহেব বলে কি—এমনি করে এক হাট-লোকের মধ্যে আমাকে অপ্রস্তুত করা! আমার উপর বদনাম চাপিয়ে মিটিঙে নাম কেনবার ইচ্ছে? দাঁড়াও ফাঁকি দিয়ে পাবলিকের কাছে নাম কেনা আমি বার করছি! মিস্টার লি আমার উপর যত মাসিক চাঁদা ধার্য করেছেন, আমি দেবো তার চেয়ে এক টাকা করে বেশী—ষোল টাকা।

তাহলে আমি ধরলাম সতর।
আমি দেবো আঠার।
আমি ধরলাম উনিশ।
আমি দেবো কুড়ি।

শেষকালেতে সাহেব মেমে হল রফা; নিলামের ডাক শেষ হল ছাব্বিশ টাকাতে। মেমসাহেব হেসে বলে, আসছে মাস থেকে বাবুর্চি ছাড়িয়ে দেবো; নইলে এটাকা দেব কোথা থেকে? সাহেব বলে, কখনই না; ছাড়াতে হলে ছাড়াব মালী; সকালে বিকেলে বাগানে মাটি কোপানো শরীরের পক্ষে খুব ভাল।

কান্ড! সাহেব মেমে কুকুরকুন্ডলী লড়াই! মিটিঙের অনেকেই তো ইংরাজী কিচির-মিচির বোঝে না। ভাবলে বুঝি সত্যিকার ঝগড়া সাহেবমেমে। হরলাল মোক্তারের বক্তিমে শোনবার পর বোঝে সারা ব্যাপারটা। সে কি কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বক্তৃতা! বোকাবাবু উকিলের কি রকম সবজান্তা ভাব জানিস-তো? সব বুঝবার হাসি হেসে ফোড়ন দেওয়া হল—এসব সাহেবমেমে বাড়ী থেকে ঠিক করে এসেছিল। অমনি মিটিঙের সবাই হাঁ হাঁ করে ওঠে—চোপরও! বাপ মায়ে নাম রাখতে ভুল করেনি! বোকাবাবু তখন বাপ-মায়ের কাছ থেকে পাওয়া প্রাণটাকে নিয়ে কোনরকমে মিটিং থেকে পালাতে পারলে বাঁচে!

বাবুর্চি ছাড়ালে না মালী ছাড়ালে ভগবান জানেন; সে হল গে তাদের সংসারের ব্যাপার। তবে হরলাল মোক্তার হল মিউজিয়ম কমিটির সেক্রেটারী। সাহেব মেম নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে জঙ্গল কাটালে। বেবুন মিয়ার জমিতে মিউজিয়মের বাড়ী তয়ের আরম্ভ হয়ে গেল।

হরলালের উপর বাড়ি তয়েরের ভার; কিন্তু হেন দিন নেই যে সাহেব মেম একবার সে বাড়ী দেখতে আসেনি। বলিস না, বলিস না! সাহেব-মেমের ভোঁতা চোখের আবার দেখা! হেঃ! দেখলি না ঐ হিঁড়িকে হরলালও নিজের দালান তুললে?

না না। ওসব খাঁ বাহাদুরের দলের রটানো কথা।

রটানো কথা? মোল্লা পীরের মুখ দিয়েই কি আমরা ভাত খাই নাকি? আমাদের নিজের চোখ নেই? চিরকাল তারপর দেখে এলাম, বছর বছর মিউজিয়মের কলি ফেরানোর সময়, মোক্তারের বাড়ীরও কলি ফেরানো; শিবে রাজমিস্ত্রি দুজায়গাতেই কাজ করে। মোক্তারের বাড়ীর দরজা জানলার রং আর মিউজিয়মের দরজা জানলার রং এক কেন? দ্যাখ, আর আমাকে ঘাঁটাস না বলছি! সেই থেকেই হরলাল মোক্তারের চুকচুকুর নেশা; সেই থেকেই তার পসার! স্পষ্ট কথায় কষ্ট নেই! পুলিশ সাহেব যার এক গেলাসের ইয়ার, দারোগা-পুলিশ চোর-ডাকাতগুলো সবাই সে তার বাড়ীতে ধন্না দেয়। লোকটাও ঘড়েল। তিন বছরে ফুলে ফেঁপে উঠল একেবারে।

মাথই থানার দারোগা, ভট্চাজ্যি বামুন। ভারি নিষ্ঠে। তার দূরদৃষ্ট দেখ। কাঠ-চাঁপাতলীর বৈরাগীডিহির আছে না? যেখানে মেলা বসে কার্তিকের পূর্ণিমায়। একজন গাঁয়ের লোক সেখান থেকে ইট খুঁড়ে বার করতে গিয়ে একটা কৌটো পায়। তার মধ্যে একটা পোকাড়ে দাঁত না কি যেন। তার তো দেখেই চক্ষুস্থির। গাঁয়ের লোক ভয়ে অস্থির। চৌকিদার সেটাকে নিয়ে যায় থানায়। বামুনের পো দারোগা কাঠচাঁপা-তলীর শ্মশানঘাটে সেটাকে দাহ করায়, চাঁদা করে চন্দনকাঠ কিনে। অহোরাত্র শ্রীখোলের বাদ্যি আর কীর্তন। দাঁতের মালিকের কাছে তার আওয়াজ পৌঁছেছিল কিনা তিনিই জানেন; তবে এর খবর পৌঁছে গেল লি সাহেবের কানে। হরলাল মোক্তারই দিয়েছিল বোধহয়। তার তখন আঙুল ফুলে কলাগাছ; পুলিশ-সাহেব বন্ধু; ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

তুইতো সব জিনিসের মধ্যে হরলালকে দেখতে পাস! কোন দারোগা কি করে, তার খবর পুলিশ সাহেবকে দেবার জন্য কোনও মোক্তারের দরকার হয় না। যাকগে! মরুক গে! সাহেব শুনেই তো ভট্চাজ্জিপোর উপর খাপ্পা। সঙ্গে সঙ্গে সাসপেন্ড। একেবারে বদ্ধপাগল! এর পর কি আর দারোগা পুলিশে জেলার কোথাও নুড়িপাথর হাড় দাঁত রাখলে। কেউ সদরে খালি হাতে আসে না। এসেই প্রথমে দেখা করে হরলালের সঙ্গে। জেলা জুড়ে সে একেবারে হৈ হৈ কান্ড, রৈ রৈ ব্যাপার! হাহাকার পড়ে যাবার যোগাড় গাঁয়ের দেবতাদের মধ্যে। লি সাহেবের নামে বাঘা দারোগা পর্যন্ত কাঁপে। তাই কারও বুকের পাটা নেই তাকে শালমুনি দেবার। দারোগা চৌকিদারাই বা কি করে; ঐ পাথর ফুড়েই একমাত্র আসতে পারে মোক্তারানন্দ আর লি সাহেবের কৃপাদৃষ্টি।

নাম হয়ে গেল 'লি মিউজিয়ম'। সাহেব মেম প্রথমটায় আপত্তি তুলেছিল। হরলাল তা শুনবে কেন। অশথতলার বেদীর চৌকো পাথরখান সরানো হল; নিজে হাতে লাগানো সিঁদুর নিজ হাতে মোছা হল; খড়ি দিয়ে তার উপর লেখা হল "লি মিউজিয়ম—প্রতিষ্ঠিত ১৯২৮ সাল।" শুধু নিজে পারে না বলেই ডাকতে হল যে লোকটা শিল কাটা কোটে, তাকে—ছেনি দিয়ে লেখার লাইনে লাইনে পাথর কেটে বার করতে।

তাই না লেখার ঐ ছিরি! দিব্যি কেপপুণ! তা নয়! সাহেব মেমকে হঠাৎ অবাক করে দেবার জন্য এই কান্ড। নইলে এত খরচ করে বাড়ী হল, একখানা পাথর কি বাইরে কোথাও থেকে লিখিয়ে আনাতে পারত না। নিজে হাতে ছেনি দিয়ে খুঁদেছে শুনে মেম-সাহেবের তো গদগদ অবস্থা! কেঁদে

ফেলবার যোগাড়! সেই পাথরখানাকেই মিউজিয়মের গেটের পাশে হল রাখা।

অতি বদ মশাই, অতি বদ! এই পাড়ার ছেলেগুলো। ফাজিলের অগ্রগণ্য! তারা বলাবলি করল—লি মিউজিয়ম নয় রে, ৯ মিউজিয়ম। ঋ ৯র ৯। ৯কার ৯কার! ৯কার মানে জানিসতো ইংরিজীতে? বোতলের সেই! এ হচ্ছে ঢুকুঢুকু মোক্তারের ৯কার মিউজিয়ম। সেই রাতেই পাথরের উপরের লি কথাটাকে কেটে, সেখানে কাঠ-কয়লা দিয়ে লিখে দিল ৯কার। হরলাল খবর দিল হেডমাস্টার মহাশইকে। উপরের ক্লাসের অতগুলো ছেলেকে এক সঙ্গে বেত মারবার হুলুস্থুলুতে ইস্কুলে হাফহলিডে হয়ে গেল। অফিসের যেসব আমলাদের গুণধরেরা ছিলেন এর মধ্যে, তারা তো ভয়ে মরে। এখন ভগবানের কৃপায় কোনরকমে এই ব্যাপার ঐ লম্বা সাহেবটার কানে না পৌঁছলে হয়। তা কি হবার জো আছে এ সংসারে! কে যেন গিয়ে লাগিয়েছে! ঐ নিটোল মোক্তার ছাড়া আর কে হবে! তখনই সাহেব মেম গাড়ী হাঁকিয়ে মিউজিয়মের ফটকে এসে হাজির। চক্ষু রক্তবর্ণ। পাড়ার লোকে ত্রাহি ত্রাহি। হরলাল মোক্তার কাঠকয়লা দিয়ে লেখা কথাটার মানে বুঝিয়ে দিল। বুঝতে পেরে সাহেব মেমের সে কি হাসি! বড় মজার কথাটাতো! অতটুকু টুকু ছেলেরা এত রসিকতা করতে জানে? তখনি ফুটবল মাঠে গিয়ে ছেলেদেরে সঙ্গে দেখা করে। ছেলেদের তখন হয়ে গিয়েছে। সাহেব আবার পকেটে হাত ঢুকোয় যে রে বাবা! একচোখ বুজে, হাতের মুঠোর নিশানা করে সাহেব বলে 'ফট্!' বলেই সাহেব মেমে হো হো করে হেসে ওঠে। হাত থেকে বার করে দেয় একখানা দশ টাকার নোট ফুটবল ক্লাবের জন্য।

সাহেবদের খামখেয়ালি তো!

ষাঁড়ের ডালনা! একেবারে ষাঁড়ের ডালনা! এতটুকু শহরে আবার মিউজিয়ম! গোটা শহরটাইতো ছিল চিড়িয়াখানা! এইবার হল মিউজিয়ম! কলকেতা না করে আর ছাড়লে না দেখছি! বাকি শুধু হাওড়ার পুলটা! কি রসই পেয়েছে সায়েব-মেম ঐ মিউজিয়মে! যখন তখন দেবাদেবী সেখানে গিয়ে হাজির। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর পর্যন্ত দুজনে এক একদিন মিউজিয়মের মাঠে এসে পায়চারি করে। জোছনা রাত হলে তো কথাই নেই। সাপের কামড়েরও ভয় নেই? আশ্চর্য! সাপগুলোও কি লোক চেনে নাকি? রাতের বেলায় সাপের কামড়ে চোর মরেছে তাও কখনও শুনিনি, সাহেব মরেছে তাও কোন-দিন শুনিনি। কপোতকপোতী প্রত্যহ মিউজিয়মে এসে কি এত গপ্পো করে, ভারি জানতে ইচ্ছে করে, মাইরি। সেই যে কথা আছে না—আদেখলের ঘটি হল; জল খেতে খেতে বাছা ম'ল,—এদের হয়েছে তাই! পুলিশ-সাহেবের নামে তো আর কোথাও ইস্কুল কলেজ পথ ঘাট তরের হয় না; সেসব একচেটে কলেক্টর আর লাটবেলাটদের। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে কিনা এর, তাই এত হ্যাংলাপনা!

হেঃ! বেড়ালের ভাগ্যের কথাই যদি তুললি, তবে আমি বলব সে হলগে হরলাল মোক্তারের। ওরই দৌলতে লি সাহেব এসেছিল এখানে। নইলে দারোগা পুলিশের মধ্যে নিজের ঢাক নিজে পিটতো কেমন করে। দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাচ্ছে লোকটা। কিন্তু এদিকে ওমন পাইস ফাদার মাদার! গাঁটের পয়সা খরচ করে ওকে একদিনও কেউ মদ খেতে দেখেছে। লি সাহেবের বাড়ী বড়দিনের দিন ঠিক 'মেমের কেমন তিনকোণা খাব' তারই কসরত দেখিয়েছিল। দেখে মোক্তার-গিন্নি ঝাড়ু ঝাঁটা দিয়ে, দিয়েছে আচ্ছা করে!

লি সাহেব যে কদিন আছে করে নে! কিন্তু সাহেব বদলী হলে তখন? কথায় বলে না—এই দিন দিন নয়, আরও দিন আছে!

সেই দিন তার বন্দোবস্ত ঠিক করে রাখা যায়। চলে যাবার আগে লি সাহেব ব্যবস্থা করে দিল যাতে মিউজিয়মটা মিউনি-সিপালিটির সম্পত্তি হয়ে যায়, কিন্তু কমিটির সেক্রেটারী থাকবে হরলাল মোক্তার। ফেয়ারওয়েলের মিটিংএ সাহেব মেমে চোখের জল ফেলে বলে গেল যে তোমাদের মিউজিয়ম যাতে কোনও দিন উঠে না যায় তার ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলাম।

হরলাল মোক্তারও ফাইন বক্তৃতা দিলে—এই মিউজিয়ম আপনাদের ছেলের মত, একে যখন আমাদের হেপাজতে রেখে গেলেন, তখন আমাদের দিক থেকে কোনওরকম চেষ্টার ত্রুটি হবে না। আরও কত কথা। দুবছর পসার জমিয়েই দেখি বেশ বলতে শিখে গিয়েছে গুছিয়ে, হরলাল মোক্তার! অভ্যাস! অভ্যাস! বলা কওয়া সবই অভ্যাসের উপর। হিমালয়ের বরফের উপর খালি গায়ে সাধু-সন্ন্যাসীরা থাকে না? এও সেইরকম। শরীরের নাম মহাশয়, যত সওয়াবে তত সয়!

অ্যাও -ও-ও......! কে হে ছোকরা একজন বার লাইব্রেরীর মেম্বার কাগজ পড়ছে, তার হাত থেকে কাগজখানা টেনে নিতে এসেছে? একজন সিনিয়র মেম্বারের হাত থেকে! আবার ছুতো দেখানো হচ্ছে! আমি ঘুমুচ্ছিলাম? মিছে কথা বল না! নাক-ডাকানি শুনেছ? মিথ্যে কথা! ঘুম ভাঙ্গবার ঠিক আগেই আমি চিরকাল নিজের নাক-ডাকানি নিজে শুনতে পাই। যদি ঘুমুতাম, তাহ'লে এখনও পেতাম। আই সি! কস বেয়ে নাল পড়েছে! এই দেখেই নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছ যে আমি ঘুমুচ্ছি। ওটা ঘুমের নাল পড়া নয়। দাঁত পড়ে গেলে এমনিই হয়। দেখেছ ঠিকই; কিন্তু ঠিক তথ্য থেকে যে জিনিসটা অনুমান করেছ সেটা ভুল। ঘটনা আর ঘটনা থেকে অনুমান এ দুটো জিনিসকে ঘুলিয়ে ফেললে ওকালতি করবে কি করে? যাক! That's a'right! মাপ চাইবার আগেই আমি তোমাকে ক্ষমা করে বসে আছি; ভুলচুক সবারই হতে পারে। দেওয়ানের ছবিগুলোকে উপেক্ষা করবার উপায় নেই—ও দিকে না তাকালেও নয়। না না আপনারা ভুল বুঝবেন না। আমি ইচ্ছা করে আপনাদের আওতা থেকে বেরিয়ে যেতে চাইনি; চেষ্টা করেছিলাম না ঘুমুতে; অসফল হয়েছি; আর ঘুমুব না। বুঝতে পেরেছেন আমার বক্তব্য আপনারা? প্রথমত আমি স্বীকার করছি যে এতক্ষণ ধরে শোনা কথার ভিত্তিতে অলিখিত ইতিহাস খাড়া করছিলাম। এখন বুঝছি যে সেটা ভুল। আইনের চোখে প্রমাণ হিসাবে সেগুলো গ্রাহ্য নয়। দ্বিতীয়ত এতেও যদি আপনারা তৃপ্ত না হন, তবে আমি সোজাসুজি আপনাদের দায়ী করব—আপনাদের রাজ্য থেকে আমাকে বেরুতে দিয়েছিলেন কেন? আপনাদের আওতায় আমাকে টেনে আনবার বেলা যে সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ করেন, তারই কিছুটা আমার ঘুম আসবো আসবো হলে, আমার উপর প্রয়োগ করেন না কেন? তা হলেই তো আমার আর hearsay evidence ব্যবহার করবার সুযোগ ঘটে না। তৃতীয়ত আমার জুনিয়র ভাইস্তুর কাছে এখনই যে ঘুমনোর কথা অস্বীকার করেছি সেটা হয়ত সত্যি নয়; কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার জবাব হচ্ছে যে, যদি সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে হলফ নিয়ে সে কথা বলতাম, তাহলে সেটা অবশ্যই বেআইনী হত। কিন্তু আমি বলেছি শপথ না নিয়ে;

খবরের কাগজ থেকে বেদখল না হওয়ার উদ্দেশ্যে। কাজেই আমি আমার অধিকারের বাইরে যাইনি।

কেমন—খুশী তো! আমার আর্গুমেণ্ট শেষ হ'ল। এইবার আমি আইনগ্রাহ্য লিখিত দলিলের সাহায্যে লুপ্ত ইতিহাস দাঁড় করাচ্ছি। শোনা কথা আর নয়। কিন্তু কান বন্ধ করি কি করে! পাশের টেবিলের জুনিয়র ভাইদের সেই গপ্পো এখনও চলছে যে। এক মুহূর্তও স্থির হয়ে ভাবতে দেবে না ওরা। ওদের গল্প করতে বারণ করবার আমার কি অধিকার আছে।

—হরলালের পসার প্রতিপত্তি যা বল সব তা'র পুঁজি ঐ মিউজিয়ম। ওটাকে নেড়ে চেড়েই ওর খাওয়া। আজকাল না হয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছে, কিন্তু তার আগেও চিরকাল মিউজিয়মের নাম করেই সে হাকিমহুকুমদের সঙ্গে দেখা করে—কাজ না থাকলেও। হেন কলেক্টর আসেনি যে এই মিউজিয়মের জন্য একটা চ্যারিটি নাচগান করায়নি। কে আর অ্যাকাউণ্ট দেখতে যাচ্ছে বলো।—আর হাকিমদের সঙ্গে আলাপ থাকলেই উকিল মোক্তারের প্র্যাকটিস।—হ্যাঁ মক্কেলতো সব তেমনিই। মক্কেলকে বাইরে বসিয়ে অফিসারের ঘরে ঢুকে একটু মিউজিয়মের গপ্পো করে আসতে পারলেই বাইরে এসে তার কাছ থেকে মোটা ফি আদায় করা যায়। বাইরে এসেই বলবেন মক্কেলের কাজ হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ এই রকমই তো প্র্যাকটিস মোক্তারানন্দের। মিউজিয়মটা ওরই পৈতৃক সম্পত্তি—নামেই মিউনিসিপ্যালিটির। ওরই গরু চরে মিউজিয়মের কম্পাউণ্ডে, মিউজিয়মের চাকরটা ওরই বাড়ির বাসন মাজে, মিউজিয়মের আউট হাউসে ওর ছেলের মাস্টার থাকে, ওর বাড়ির ভোজে কাজে এসো জন বস জন, সবই তো মিউজিয়মের হল ঘরে।

—হ্যাঁ, আজকাল আর মিউজিয়ম দেখতেই বা কে যায়? আছেই বা কি?

—যায় কেবল ঐ ইস্কুল পালানো ছেলের দল সিগারেট খেতে। •

—এখন তো আবার মোক্তারানন্দ মিউনিসিপ্যালিটি হাতে পেয়েছে। পোয়া বারো একেবারে! মিউনিসিপ্যালিটির কুলিগুলো তো ওর বাগানেই দেখি সারাদিন কাজ করে।

—মোক্তারি, মিউজিয়ম, মিউনিসিপ্যালিটি—পঞ্চমকারের মই বেয়েই লোকটি উঠে গেল।

—হাঃ হাঃ বলেছ ঠিক। আজকাল আবার মস্ত বড় লিডার হয়ে উঠেছে।

—পেটে ৯কার উপরে লিডার!

—ছিলি হরলাল হলি জ কাটা জহরলাল! ঋষিকুমারবাবুর খালি জায়গাটা নিতে হবে তো।

না না এরা বড় বেশী ব্যক্তিগত করে তুলছে ব্যাপারটা। হচ্ছে শিলালিপি খানার কথা। এরা কেবল তুলবে হরলাল মোক্তারের কথা।—যেন সেইটাই মুখ্য। হরলালের কথা আনবে না কেন, আনো; কিন্তু শিলালিপির ইতিহাস বলতে গেলে যেটুকুনি দরকার সেটাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছ কেন। ভাল ভাল কথা সাজিয়ে বলতে পারলেই আর্গুমেণ্ট হয় না। কোর্ট সে সব বক্তৃতা শোনেও না। প্রাসঙ্গিক ঘটনা দিয়ে আরম্ভ কর। ঋষিকুমারবাবুর মৃত্যু থেকে। দাখিল কর সেই সপ্তাহের জেলা হিতৈষী। এক্‌জিবিট নম্বর দেন পেশকারমশাই! লাল পেন্সিল দিয়ে আণ্ডার লাইন করে দিয়েছি তো 'দেশাত্মপ্রাণ' শব্দটি। হ্যাঁ। বস! ওতেই হবে। তারপর কোর্টে দাখিল কর মিউনিসিপ্যালিটির মিটিংএর এজেণ্ডা, যেটাতে হরলাল প্রস্তাব দিয়েছিল লি মিউজিয়মের নাম বদলাবার। হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে। ঠিক! এমনি করে কাজ করতে শেখো, তবে না!... এজেণ্ডাতে ঐ একটা প্রস্তাবই ছিল। হঠাৎ অসুস্থতার জন্য হরলাল সেদিন যেতে পারে নি, তাই মিটিং স্থগিত হয়েছিল—তলব করে দাও মিউনিসিপ্যালিটির মিটিংএর বই। স্থগিত মিটিংএ কোরামের দরকার হয় না জানো তো? জেলা হিতৈষীর সেই সংখ্যাটা দেখে নিও যেটাতে বড় বড় অক্ষরে বার হয়েছিল 'দেশাত্মপ্রাণ স্বর্গীয় ঋষিকুমারের নাম চিরস্থায়ী করিবার প্রশংসনীয় উদ্যম— মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের'।...হ্যাঁ, চিরস্থায়ী! কথাটা বেছেছে দেখ! এরা আবার কাগজের এডিটারি করে! কর্ণওয়ালিশও করেছিল চিরস্থায়ী, লী সাহেবও ভেবেছিল চিরস্থায়ী! ......লোকে লোকারণ্য। সারা শহর ভেঙে পড়েছে মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে, মায় ডাকপিয়নটা পর্যন্ত। মিউনিসিপ্যালিটির মিটিঙে নাম বদলানো হবে লী মিউজিয়মের। এক মাস আগেই হয়ে যেত, কিন্তু মিটিঙের ঠিক আগের রাত্রে বাড়ির উঠনে হোঁচট খেয়ে চেয়ারম্যানের পা মচকে যায়। মচকানি আর বলিস না ওকে, পা ভেঙে যায় বল। এখনও ব্যাণ্ডেজ খোলে নি। এতদিন তো শয্যাগতই ছিল ভদ্দরলোক। আজ ওই পা নিয়েই এসেছে। রাতের বেলায় একটু, ইয়ে থাকেন কিনা, ঢুকুঢুকু-মোক্তার। নাঃ, সব সময় পরের ছিদ্দির খুঁজে বেড়াস কেন বলতো! উঠনে পড়ে যাবার সময় চেয়ারম্যানের পা টলছিল কি না, তুই দেখতে গিয়েছিলি? আজকের মিটিঙও বাঘের খেলা! খাঁ বাহাদুরের দল বাগড়া দেবে! বাগড়া দিয়ে যেন দেখ! ভাল ছেলের বাপ আঁটকুড়ো! আজকে তাহলে দাড়িটি সমেত আর এখান থেকে ফিরে যেতে হবে না। হরলাল মোক্তারের সঙ্গে তোর রেষারেষি চেয়ারম্যানগিরি নিয়ে; তাই বলে ভাল কাজেও বাগড়া দিতে হবে? ভোটে পারিস না চেঁচিয়ে মরিস কেন? ওই খোঁড়া পা নিয়ে আবার উঠছে কেন ভদ্দরলোক; বসে বসে বললেই তো হয়। লী মিউজিয়মের বদলে 'ঋষিকুমার
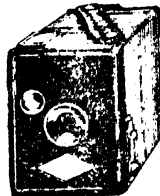
যাদ্যুঘর' নাম রাখা হোক। কি ফাইন বলছে মাইরি! তা খোঁচা মারছিস কেন কন্যুই দিয়ে? দ্যাখ, দ্যাখ, চোখে জল এসে গিয়েছে হরলালবাবুর বলতে বলতে। বল্যু, রুমালে পিঁয়াজের রস লাগানো আছে! বল! 'ছিল ৯ হবে ঋ'! কে বলল? কেরে। ঐ বেগুনের কাবাবের দিক থেকে এসেছে কথাটা। টেনে জিব ছিঁড়ে দেবো। যে লোকটা স্বর্গে গিয়েছে, তার নাম নিয়ে ঠাট্টা! এইবার উঠেছেন খাঁ বাহাদুর। ঠান্ডা তো আমরা মেরেই আছি বাবা; বল না কেন যা বল্বার! লী মিউজিয়ম নামটা খাঁ বাহাদুরও দেখি বদলাতে চায়। একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে? তবে খাঁ বাহাদুর বলতে চান যে কোনও অল ইণ্ডিয়া লিডারের নামে মিউজিয়মটা হলে উপর থেকে টাকাকড়ি পাবার সুবিধা হতে পারে। একেবারে ফেলনা নয় কথাটা। এইবার উঠলো বুড়ো নুটুবাবু। বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি। চিরকাল লোকটা একই রকম থেকে গেল। সেই বারোয়ারি দুর্গোপুজোর নেমন্তন্ন-পত্তর ছাপাবার ঝগড়ার সময় দেখছিলি না— অন্নভোগও লিখতে হবে না, খিচুরিভোগও লিখতে হবে না; দু দলের ঝগড়া মিটিয়ে লিখে দিল খেচরান্নভোগ। ঠিক যা বলেছি। ঋষিকুমারও না, অল ইণ্ডিয়া লিডারের নামও না—নাম দিয়ে দাও 'দেশাত্মপ্রাণ যাদুঘর'। কেমন, বেশ দুজনের কথাই থাকল। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সাঁড়াশিও না, টড়াশিও না, নোয়া বাঁকানো!

এখানেই শেষ ভাবিস নি। আরও মজা আছে। পরের দিন সকালে চেয়ারম্যানের বৈঠকখানাতে ভিড় লেগেছে। সে তো রোজই লাগে। মিউনিসিপ্যালিটির কেরানীরা, ঠিকাদাররা, দলের লোক, মক্কেল, আরও কত লোক। অমন জমজমাট মিটিঙের পরের দিন কি না। মজলিসের গপ্পো থেকে একটু ফুরসৎ হলে ইজি-চেয়ারের দিকে কেরানীবাবু মিউনিসিপ্যালিটির ফাইল-গুলো নিয়ে এগিয়ে যায় দস্তখতের জন্য। লোকজনের সঙ্গে গপ্পো করতে করতেই চেয়ারম্যানবাবু দস্তখত করেন। কিন্তু অত কাজের লোকের কি দুদণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলবার সময় আছে। একটানা চলেছে খস খস করে দস্তখত, খিক খিক করে হাসি, কুট কুট করে টিপ্পনী। এতে বাধা পড়ল; কেরানীবাবু বলেন, এ-চিঠিখানি পড়ে দেখবেন স্যার। কি আবার আছে চিঠিখানায়? বিলেতের দেখছি যে! মেথরের গাড়ি, না হয় ডাস্টবিন সাপ্লাই করবার কোম্পানির নিশ্চয়! না। এ যে দেখছি মিসেজ লীর চিঠি। মিসেজ লী? লী সাহেবের মেম? সেই যে এখানে পুলিশ সাহেব ছিল? হ্যাঁ গো হ্যাঁ। ইন্টারেস্টিং! শুনুন শুনুন কি লিখেছে। —আপনারা শুনে দুঃখিত হবেন যে, আমার প্রিয় স্বামী এরিক উইলিয়ম লী গত ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে স্বর্গগত হয়েছেন। কিছুদিন থেকে তিনি হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন। তিনি আপনা-দের শহরকে, বিশেষ করে আপনাদের মিউজিয়মটিকে কিরূপ ভালবাসতেন, তা আপনারা জানেন। আপনাদের সুন্দর দেশে থাকার সময় কর্মসূত্রে বহু শহরে ও গ্রামে আমরা গিয়েছি, কিন্তু ঐ ছোটটো ক্ষমাশীল শহরের নাগরিকদের কথা কোনও দিন ভুলতে পারিনি। আপনারা পরদেশীকে আপন করে নিতে জানেন। আমাদের ওখানকার জীবনের সহিত স্থানীয় মিউজিয়মটির স্মৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের সেই সময়ের নতুন বিবাহিত জীবনের মধুর ভাবানুষঙ্গগুলো থেকে ওখানকার মিউজিয়মটিকে আমি কিছুতেই আলাদা করতে পারি না। যাকগে। এসব হল আমার ব্যক্তিগত কথা—একান্ত ব্যক্তিগত। যার জন্যে এই চিঠি লেখা, সেটা হচ্ছে যে —আমার স্বামী আপনাদের মিউজিয়মের

জন্য তিনশ' পাউন্ড দিয়ে গিয়েছেন। টাকা সামান্য হলেও এর পিছনের প্রীতির সম্বন্ধের কথা মনে করে আশা করি, আপনারা প্রত্যাখ্যান করবেন না। কিরূপ-ভাবে পাঠালে আপনাদের সুবিধা হয়, জানালে বাধিত হব।'

এ যে একেবারে লম্বা চিঠি। লী সাহেব এদেশ থেকে চলে যাওয়ার আগে ডি আই জি হয়েছিল, না? কান্ড। লক্ষ্য করেছেন, ঐ আঠারই সেপ্টেম্বর রাত্রেই আমারও পা মচকে গিয়েছিল—সেই মিটিঙ স্থগিত হবার আগের দিন—এক মাস আগে। আশ্চর্য! কেরানীবাবু চিঠিখানাকে অনাবশ্যক ফাইলে রেখে দিও। না-না, কোনও জবাব দেবার দরকার নেই। কতই-বা টাকা। ওর চেয়ে অনেক বেশি আমরা সরকারি গ্র্যান্ট পাব।

গিন্নি আবার বাড়ির মধ্যে এত চেঁচামেচি আরম্ভ করলেন কেন? বসুন আপনারা এক মিনিট। আমি একটু বাড়ির ভিতর হয়ে আসি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। সাবধানে। দেখবেন আবার ঠোকর-টোকর না লাগে জখম-হওয়া পাটায়।

শুনেছেন চীৎকার? চেয়ারম্যানবাবুর গিন্নির? বলবেন না আর। নিত্যি তিরিশ দিন এই ব্যাপার। পাড়াশুদ্ধ তটস্থ। ওকি! ও আবার কি বার করছে মিউনিসিপ্যালিটির কুলীরা চেয়ারম্যান সাহেবের উঠন থেকে? ওরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? আজ বাগানে কাজ করছিস না যে বড়? মা বললেন, এই পাথরখানাকে টান মেরে ফেলে দিয়ে আসতে? মিউজিয়মে? কেনরে? এইটাতেই চেয়ারম্যানবাবু হোঁচট খেয়েছিল? আমাদের দিয়েই আনিয়েছিল কুঁয়োতলায় পাতবার জন্য। বলিস কি! ঠিকই তো! ঠিক সেই পাথরখান! ঐ তো লেখা রয়েছে লী মিউজিয়ম, প্রতিষ্ঠিত ১৯২৮ সাল। কান্ড মশাই! দিনের বেলায় গায়ে ছমছমানি ধরিয়ে দিলে। ভূত হয়ে নিজের জায়গা করিয়ে নিলে মিউজিয়মে! কম্মফল! যার যেমন কম্মফল। ঐ একই জায়গায় দেখুন না ঋষিকুমারবাবুকে! এর আর কি করছেন বলুন!......

চমকে উঠেছি.........ঠক করে শব্দ......... নাকের ডাক......ধড়মড় করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠেছি। ও, আমার ছাতাটা চেয়ারের সঙ্গে দাঁড় করানো ছিল; সেইটাই পড়ে গেল বুঝি।

সেই থেকে চেয়ারে ঠায় বসেছিলাম; একেবারে গা-হাত-পায়ে ব্যথা ধরে গিয়েছে। দেওয়ালের তোমরা শুনছ? আর আমি তোমাদের কেয়ারও করি না। বেঁচেছি বাবা, তোমাদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে। একে-বারে হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। এই অনাবশ্যকের রাজ্যই আমার ভাল। এখানকার কনে-দেখা-আলোর জীয়নকাঠি লেগে, বাজে, অবান্তর অকেজোগুলোও জীয়ন্ত হয়ে ওঠে। ভাবো কি তোমরা? উপরের পাথরখানাই সব? তার নীচের জলটা কিছু নয়? পাথরখানার যদি কোন দরকারই না থাকে, তবে সেখানাকে নিয়ে গিয়েছিলে কেন বাড়ির ভিতর চেয়ারম্যানবাবু? মশলা বাটবার শিল করবে বলে? না, কাপড় কাচবার পাটা করবে বলে? কেমন? পারলে ঠেকিয়ে রাখতে? লী মিউজিয়ম লেখা পাথর-খানাকে? আবার এনে রাখতে হল কিনা সেখানা মিউজিয়মের বাড়িতে? ঐ তো এত ভেবে-চিন্তে, কসরত করে সাইনবোর্ড লিখিয়েছিলে, "দেশাত্মপ্রাণ যাদুঘর, ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত"। ভেবেছিলে যে লেখার পিছনটা একেবারে মুছে দিতে পেরেছ। আরে মুখ্যু! তা কি হয়? ঐ ১৯২৮ সালটার মধ্যে দিয়ে তুই যে নিজের অজানতে পুজো করছিস লেখার পিছনের লী সাহেবকে। কত মিষ্টি মনে পড়ার আমেজ, দুটি মনের কত আকুলি-বিকুলি, কত টান, কত বুকের দুরু দুরু, কত একসুরে বাজা, কত না-বলা, কত না-লেখা —সব অনাবশ্যকগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে-ছিল তোমাদের অবিচারের প্রতিবাদে। তাদের দাবীই মেনে নিয়েছ তোমরা '১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত' লিখে। সেইগুলোই ঐ আইনচঞ্চু মোক্তারটার মাথায় ঘা দিয়ে দিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে যে, যাদুঘর যত আগে প্রতিষ্ঠিত দেখাতে পারবে, ততই তার কদর বাড়বে। চোখের আড়ালের বোবা জিনিস-গুলোর বিদ্রোহ। কার সাধ্য তাদের ঠেকায়। অধিকার আদায় করে তবে ছেড়েছে। ইতিহাসের টেক্সট বইয়ে এ-বিদ্রোহের কথা নাই-বা লিখল। নতুন সাইনবোর্ডখানার মধ্যে পরিষ্কার লেখা হয়ে গিয়েছে তাদের অধিকারের অলিখিত শিলালিপি। দেখবে কি করে? তোমাদের যে চোখে ঠুলি।

—একি! বৃদ্ধ হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন কেন? ছাতাটা মেঝেতে ফেলেই যে চললেন।

—একেবারে সেভেন্টি টু!

—আজ চা না খেয়েই চললেন যে আপনি?

ও! বিরাজের ছেলে না? সে ধরে এনে আবার আমাকে চেয়ারে বসালো। সত্যিই তো, চায়ের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে-ছিলাম। ......Sorry! ......আমি এই কলেজ লাইব্রেরীতে বসিয়া সুস্থমনে ও সরল অন্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি যে...না-না Sorry! যে আগাগোড়া ব্যাপারটা সম্পূর্ণ কাকতালীয়। বলছি তো যে, পিছনে ছিটিয়ে-ফেলা মনের মিষ্টি খোসাগুলো কুড়োতে যাওয়া ভুল। আর কি করে বলব? কেমন, এইবার আপনারা Satisfied? ওহে! কি যেন তোমার নাম—বিরাজের ছেলেকে বলছি। মিউনিসিপ্যালিটির 'অনাবশ্যক ফাইল'গুলো তিন মাস পর পর পুড়িয়ে ফেলবার নিয়ম না? আন্দাজে বলো না। আহা, মিউনিসিপ্যাল আইনটা দেখেই নাওনা একবার। সব সময় উত্তর দেবার আগে আইনের ধারার লেখাটা দেখে নিও। লেখা অক্ষরগুলোই আসল বুঝলে হে।

এবং দ্বিতীয়ত......

এই দেখ, সেকেন্ড পয়েন্টটা মনে আসছে না আর।......

৩

আগের দিন যাঁরা প্রায় ঝগড়া মুখে নিয়ে উঠেছিলেন, আজ সারা-দিনের কাজকর্মের মধ্যে অনেকবার মুখোমুখি হলেও সেই বাসন্তী আর কনকলতা কেউ কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বললেন না। বাক্যালাপ বন্ধ রইল বৈদ্যনাথ আর বাসন্তীর মধ্যে। দুজন যে ভাই-বোন, তা সহজে বুঝবার জো নেই। প্রত্যেকেই এমন-ভাবে চলতে লাগলেন যেন কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক তো দূরের কথা, পরিচয় মাত্র নেই। এও ঝগড়া। এই শব্দহীন কলহ দুই পরিবারের মধ্যে কিছুদিন ধরে চলবে। তারপর আপনিই একদিন মিটমাট হয়ে যাবে। এ তো তবু জামাইকে উপলক্ষ্য করে ঝগড়া হয়েছে। এর চেয়েও তুচ্ছ কারণে কলের জলের ভাগ নিয়ে, যৌথ ঝি-এর কাজ আর মাইনে নিয়ে, ছাদে কাপড় মেলার জায়গা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে হঠাৎ কলহ লেগে যায়। তারপর কিছুদিন ধরে চলে মন-কষাকষির পালা। দুই পক্ষই আস্ফালন করে, এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। এই কেলেঙ্কারির মধ্যে আর কেউ থাকবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কারোরই যাওয়া হয় না। সবাই থেকে যায়।

আজ কুড়ি বছর ধরে এমনি হয়ে আসছে। অবশ্য গোড়াতেই যে এত ঝগড়া লাগত, কথায় কথায় কথা বন্ধ হোত তা নয়, তখনকার ঝগড়া ছিল শরতের মেঘের মত। তখন আকাশ এমন থমথমে হয়ে থাকত না। ঝড়-বৃষ্টি কদাচিত হোত। একজনের হাসি-পরিহাসে আর একজনের মনের আকাশ পরিষ্কার হয়ে যেতে মোটেই সময় লাগত না।

দুদিন একদিন নয়, বছর কুড়ি আগে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের এই তেতলা বাড়িটার সামনে একই ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমেছিলেন বাসন্তী আর কনকলতা। তখন এত ছেলেপুলে ছিল না, লোকজন ছিল না। কনকলতার কোলে তখন মাস-কয়েকের একটি ছেলে। আর বাসন্তীরও মাত্র দুটি। তাদের নিয়ে ভুবনময়ী ছিলেন পিছনের গাড়িতে। শ্যামবাজারের বাড়িতে মাস দেড়েক আগে স্বামী মারা গেছেন। শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাওয়ার পর ভুবনময়ী বললেন, 'এ অলক্ষুণে বাড়িতে আমি আর টি'কতে পারব না। এ-পাড়ায়ও আমার আর থাকবার ইচ্ছে নেই। তোমরা অন্য পাড়ায় অন্য বাড়ি দেখ।'

ছেলে আর জামাই দুজনেই তাঁকে বুঝাল, বাড়ির কি দোষ। কিন্তু ভুবনময়ী কিছুতেই সে কথা শুনলেন না। বাড়ি তিনি বদলাবেনই।

অবনী চন্দ আর বৈদ্যনাথ দত্ত দুজনেই শহর ভরে তখন বাড়ির খোঁজ শুরু করলেন। জায়গামত ভালো বাড়ি তেমন পছন্দ হয় না। অবশেষে অবনীমোহনই একদিন খোঁজ আনলেন এই বাড়ির। ঘরের সংখ্যা অনেক। বাড়িটাও প্রায় নতুন। শুধু অসুবিধে এই বাড়িওয়ালা আলাদা আলাদা করে ঘর ভাড়া দেবেন না। দিতে হয় গোটা বাড়িটাই দেবেন একজনকে। ভুবনময়ী বললেন, 'গোটা বাড়িই তো আমার চাই। দু' একখানা ঘর দিয়ে কি করব।'

আগে শ্যামবাজারেও একটি পুরো বাড়ি ভাড়া নিয়ে ছিলেন আদিনাথ দত্ত। কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল ভালো। বেলে-ঘাটার কুণ্ডুদের ধান-চালের আড়তে কাজ করতেন। গোড়ায় দশ টাকার মাইনেতে ঢুকেছিলেন, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই হয়ে উঠেছিলেন মনিবের দক্ষিণ হস্ত। তাঁর আয় শুধু মাইনের টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সোনা-গহনায়, আসবাবপত্রে, নগদ টাকায় বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ বলেই পরিচিত মহলে গণ্য ছিলেন আদিনাথ। কিন্তু বৈদ্যনাথ তো আর তা নয়। পর পর বার-দুই আই এ ফেল করে মার্চেণ্ট অফিসে ঢুকেছেন। একটা গোটা বাড়ি তিনি ভাড়া নেবেন কি করে। আর তার দরকারই বা কি।

কিন্তু ভুবনময়ী বললেন, 'দরকার আছে। পুরো বাড়িই আমার দরকার। আমার ছেলে থাকবে মেয়েও থাকবে। কাউকেই আমি আর কাছ ছাড়া করব না। যাবার সময় তিনি সেই কথাই বলে গেছেন। বলেছেন দু'জনকে একজায়গায় রেখ।

বাবার অসুখের সময় বাসন্তী এসে-ছিলেন তাঁর কাছে। ননদ-ভাজে একসঙ্গে সেবা-শুশ্রূষা করতেন। রাত জাগতেন পালা করে। অবনী থাকতেন মেসে। সেখান থেকে এসে দেখে যেতেন পীড়িত শ্বশুরকে। ভুবনময়ীর প্রস্তাবে অবনীমোহন বললেন, 'তাই কি হয়! একজায়গায় কি সকলের থাকা সম্ভব?'

ভুবনময়ী বললেন, 'কেন, অসম্ভব কিসে? দেশের বাড়িতে কতদিনই বা তুমি আমার মেয়েকে আর ফেলে রাখবে। এখানে যখন চাকরি-বাকরি করছ, এখানেই থাকতে হবে তোমাকে। ভাইদেরও এখানে নিয়ে এসো। তারাও পড়ুক শুনুক, চাকরি-বাকরির চেষ্টা করুক। কলকাতায় তোমার এখন একটা বাসা না থাকলে কি চলে!'

অবনীমোহন ভেবে দেখলেন কথাটা ঠিক। বাবা মা মারা গেছেন। কাকারা আর খুড়তুতো ভাইরা আছেন দেশের বাড়িতে। সম্পত্তির যা আয় তাতে কেউ সেখানে বসে খেতে পারবে না। কলকাতায় আনাতেই হবে ভাইদের। বাসা এখানে একটা করা দরকার। কিন্তু শ্বশুরকুলের সঙ্গে এক-সঙ্গে থাকার প্রস্তাবে তাঁর মন সহজে সায় দিল না। বৈবাহিক সূত্রে যাঁরা আত্মীয় বাইরের দিক থেকে একটু দূরে দূরে থাকলেই তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বজায় থাকে।

ভুবনময়ী জামাইএর মনোভাব আন্দাজ করতে পেরে বললেন, 'আমি জানি তুমি কি ভাবছ। একসঙ্গে থাকতে গেলে কুটুম্বিতা থাকবে না, আমার মেয়ে আর বউয়ের মধ্যে ঝগড়াঝাটি লাগবে, এই হয়েছে তোমার চিন্তা না?'

অবনীমোহন লজ্জিত হয়ে বললেন, 'না না, তা নয়।'

ভুবনময়ী একটু হাসলেন, 'ঠিক তাই। কিন্তু অবনী, এই কি তোমার কুটুম্বিতা বিচারের সময়? তিনি অসময়ে চলে গেলেন। আমি ভাবলাম আমার দুই ছেলে রইল। তুমি বড়, বৈদ্যনাথ ছোট। তুমিই রইলে ওর অভিভাবক। তুমি না থাকলে আমি কাকে নিয়ে ভরসা করে ফের সংসার বাঁধব? ওকে নিয়ে? ওর কেবল বয়সই হয়েছে। কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি-শুদ্ধি ধীরতা-স্থিরতা কি আছে? কথায় কথায় কেমন মাথা গরম করে দেখতো।'

অবনীমোহন ফের ভেবে দেখলেন। অল্প বয়সে মা মারা গেছেন। সেই মাতৃস্নেহের স্বাদ যেন তিনি খানিকটা পেয়েছেন ভুবনময়ীর কাছে। জামাইয়ের মত নয়, নিজের ছেলের মতই তাঁকে দেখেছেন ভুবনময়ী আদিনাথও তাই ভাবতেন। সদ্য শোকার্তা, বিধবা শাশুড়ীকে আঘাত দিতে তাঁর বাধল। মনে মনে ভাবলেন, এখনকার মত ওঁর অনুরোধ রক্ষা করা যাক, পরে সুযোগ-সুবিধেমত ভিন্ন বাসায় উঠে গেলেই হবে। শাশুড়ীর প্রস্তাবে রাজি হলেন অবনীমোহন।

ভুবনময়ী খুশি হয়ে মেয়ে আর বউকে কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা এসো এদিকে, শোন। আমার জামাইয়ের কিন্তু ভয় হয়েছে পাছে তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি হয়। খবরদার পাছে ঝগড়া-টগড়া কেউ করো।'

ঘরে অবনী আর বৈদ্যনাথ দু'জনেই উপস্থিত ছিলেন। তাই বাসন্তী আর কনক শুধু ঘাড় নেড়ে জানালেন যে, তেমন আশঙ্কার কোন কারণ নেই। কিন্তু পরক্ষণেই পাশের ঘরে উঠে এসে দুজনের এই হাসি।

হাসতে হাসতে বাসন্তী গলা জড়িয়ে ধরলেন কনকলতার, 'ঝগড়া করবে নাকি বউদি? কেমন করে করবে?'

কনকলতাও হেসে ননদের দু' কাঁধে হাত রাখলেন, 'করব আবার না? রাতদিন ঝগড়া করব। ভেবেছ কি তুমি?'

বাসন্তী বললেন, 'হুঁ, তুমি আবার করবে ঝগড়া। মুখ থেকে মোটে কথা বেরোয় না। না ভাই তোমার সঙ্গে ঝগড়া করেও সুখ হবে না।'

কনকলতা তাকে ভরসা দিলেন, 'হবে গো হবে। তুমি মুখে বলবে আর আমি চোখ ঘুরোব, হাত-পা নাড়ব, ঠিক আমার ছোট পিসিমার মত।'

বলে কনকলতা হেসে উঠলেন।

বাসন্তীও হাসলেন।

তখন দুজনেই সবে কুড়ি পেরিয়েছেন। বাসন্তীই দু'এক বছরের বড় হবেন বয়সের হিসেবে। কিন্তু কনকলতা তা কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। বলেন, 'বউদি আবার ছোট হয় নাকি কোনদিন। আমিই বড়, ঢের বড়। তোমার পূজনীয়া। চিঠিতে পাঠ লিখবে শ্রীশ্রীচরণকমলেষু। অমন ভাই, বন্ধু-টন্ধু চলবে না।'

বাসন্তী বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা। দেখি শ্রীচরণখানা। ঈস্ এই ছিরি হয়েছে নাকি চরণের। এসো আলতা পরিয়ে দিই। তোমার মত পা হলে আমি আলতার বালতির মধ্যে পা ডুবিয়ে রাখতাম। শিশিতে কুলোত না।'

এরপর শুরু হোল প্রসাধনের পালা। শিশি খুলে দু'জনে দু'জনের পায়ে আলতা পরিয়ে দিলেন। চুল বেঁধে দিলেন পরস্পরের।

বাসন্তী বললেন, 'কই ঝগড়া করলে না? শুরু কর।'

কনকলতা বললেন, 'তুমিই আগে আরম্ভ করো ভাই ঠাকুরঝি।'

কিন্তু কি নিয়ে যে ঝগড়া করবেন কেউ খুঁজে পান না। শেষে ঠিক হোল, আগে শালা-ভগ্নিপতিই শুরু করবে। রাগটা যখন ওদের মুখ থেকে হাতে নামবে, প্রায় হাতাহাতি হবার জো হবে, তখন বাসন্তী আর কনকলতা দু'জনকে হাত ধরে টেনে সরিয়ে দেবেন।

বাসন্তী বললেন, 'কে কাকে ছাড়াবে বউদি?'

কনকলতা বললেন, 'তুমি তোমার দাদাকে ছাড়াবে আর আমি অবনীবাবুকে।'

কনকলতা মুখ টিপে একটু হাসলেন।

বাসন্তী ছদ্ম কোপের ভঙ্গিতে বললেন, 'হুঁ, এই বুঝি মতলব তোমার মনে মনে। তাহলে কিন্তু বলে রাখছি বউদি, ওদের ঝগড়া আর থামবে না। সুন্দরীকে নিয়ে দিনরাত সুন্দ উপসুন্দের ঝগড়া কিন্তু তাহলে লেগেই থাকবে।'

কনকলতা বাসন্তীর মুখ চেপে ধরে বললেন, 'আর তোমাকে কিছু বলতে দেব না। যত সব অকথা কুকথা। বড্ড ফাজিল হয়েছ তুমি ভাই ঠাকুরঝি।'

বউদির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বাসন্তী বললেন, 'আর তুমি বুঝি ফাজিল হওনি; কিছু জানো না, না? ভোরে উঠলে লজ্জায় দাদার মুখের দিকে তাকাতে পারিনে। কেউ নিজের মুখে ফাজিল, কেউ অন্যের মুখে ফাজিল। ফাজিল সবাই।'

বাড়িভাড়ার সময় তর্ক উঠল ভাড়া কার নামে হবে। অবনীমোহন বললেন, 'বৈদ্যদা, আপনার নামেই ভাড়া হোক।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'তা হবে না। তোমার মতলব আমি বুঝতে পারছি অবনী। ... নেই কওয়া নেই, তুমি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ... দিন খিড়কি দোর দিয়ে পালিয়ে যাবে ... আমি গোটা বাড়িটা মাথায় করে ... দাঁড়াব। ভাড়া হবে তোমার নামে।'

ভুবনময়ী মীমাংসা করে দিলেন। বললেন, 'আচ্ছা, দু'জনের নামেই থাক।'

তাই হোল।

রান্নাঘর শুদ্ধ ওপর নিচ সব ... আটখানা ঘর। ভিতরে এক টুকরো উঠোন আছে। মাথার ওপরে সেই মাপের ... টুকরো ছাদ। ভাড়া পঁয়তাল্লিশ। ... জনের ভাগে পড়ল সাড়ে বাইশ করে।

কনকলতা বললেন, 'নাও ঠাকুরঝি, তোমার যে যে ঘর পছন্দ বেছে নাও।'

বাসন্তী বললেন, 'উঁহু, তুমিই ... বাছ।'

ভুবনময়ী বললেন, 'বাছাবাছির কি ... যার যে ঘরে ইচ্ছে ঢুকে পড়। ... শুধু শুয়ে কাটানো। তারপর ... যাদের ও-ঘরও তাদের। আমার অবনীর ... ভাবনাই না ছিল, যদি একসঙ্গে তোমরা ... থাকতে পার। না পারার কি আছে। ... পেটে যাদের জায়গা হয়েছে, এক ... তাদের স্থান হবে না?'

প্রথম প্রথম কোন স্থানাভাবই ... শুধু শোওয়ার ঘর দু'খানাই ... আলাদা রইল। আর সব চলল একসঙ্গে। একখানি রান্নাঘর একটি হাঁড়ি। কোনদি

কনকলতা রাঁধেন, স্বামী আর ভাইকে পাশাপাশি ঠাঁই করে খেতে দেন বাসন্তী।

'মাছের ঝোলটা কেমন হয়েছে দাদা?'

'ভালো।'

'বলতো কে রেঁধেছে?'

'তুই। না হলে কি এত সেধে সেধে জিজ্ঞেস করছিস?'

'মোটেই না। রান্নাটা বউদির।'

'তাহলে কিচ্ছু হয়নি।'

বাসন্তী আর একটা তরকারি পরিবেশন করতে করতে স্বামীর দিকে তাকালেন, 'কি খাচ্ছ বল তো।'

অবনী বললেন, 'মুড়ি-ঘণ্ট।'

'কেমন হয়েছে রান্না?'

'ভালো।'

'কে রেঁধেছে বলতো।'

'সোনা বউয়ের রান্না বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'হুঁ যা ভালো তাই সোনা বউয়ের রান্না। আর বুঝি কেউ কিছু রাঁধতে জানে না, ওটা সোনা বউয়ের সোনার হাতের রান্নার নয়। বুঝেছ?'

অবনী হেসে মুখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'বুঝেছি। কোন পিতলের হাতের রান্না।'

বাসন্তী বললেন, 'শুনলে দাদা, আমার হাতকে পিতলের হাত বলে গাল দিলে।'

অবনীমোহন তাড়াতাড়ি কথাটা শুধরায় 'হাত নয় হাতার কথা বলেছি। হাত তোমাদের দুজনেরই সোনার হাতা দুজনেরই পিতলের। না হলে কি রান্না হয়?'

তখন ষাট টাকা মাইনে পান বৈদ্যনাথ। সামান্য কিছু পকেট খরচ রেখে সব ধরে দিলেন অবনীর কাছে, 'নাও হে সংসার চালাও।'

অবনী বললেন, 'ওসব আমার কাজ নয়।'

বাসন্তী বললেন, 'ভালো মানুষ ঠিক করেছ দাদা। নিজেই চলতে জানে না, আবার সংসার চালাবে। বরং তুমি নিয়ে হিসেবপত্তর করে চালাও সংসার।'

স্বামীর মাইনের আশি টাকা এনে দাদার হাতে ধরে দিলেন বাসন্তী।

বৈদ্যনাথ বললেন, 'আচ্ছা সব টাকা তোর কাছেই রেখে দে। খরচপত্তর যা লাগবে আমি চেয়ে চেয়ে নেব। মোটামুটি একটা জমা খরচ রাখিস তাহলেই হবে।'

বাসন্তী বললেন, 'জমা খরচ রাখবে বউদি।'

কনকলতা বললেন, 'উহু, ও সব আমার দ্বারা হবে না।'

বাসন্তী বললেন, 'তবে তোমার দ্বারা কি হবে। সংসারের কোন্ কাজটা করবে তুমি।'

অবনীমোহন বললেন, 'কেন আর বুঝি কোন কাজ নেই। সোনা বউ ছেলেদের মাথা আঁচড়ে দেবে, জামা পরাবে, পছন্দ মত করে সাজাবে, আর বসে বসে আমার পান সাজবে।'

পানটা একটু বেশি খান অবনীমোহন। অফিসে যাওয়ার সময় ডিবা ভরে পান না নিলে তাঁর চলে না।

বাসন্তী বললেন, 'ভিতরে ভিতরে বুঝি তোমাদের এই চুক্তি হয়েছে? আর তুমি কি করবে?'

স্বামীর দিকে ফিরে তাকালেন বাসন্তী।

অবনীমোহন বললেন, আমি আর কি করব।'

বাসন্তী বললেন, 'উনি শুধু ওপর ওপর কর্তৃত্ব করবেন বুঝলেন দাদা?'

এই যৌথ সংসার চলেছিল একটানা বছর চারেক। তারপর আস্তে আস্তে ফাটল ধরল। অবনীমোহনের দুই ভাই এসে পড়ল দেশ থেকে। একজন পড়বে, আর একজন চাকরি করবে। আত্মীয়স্বজনের যাতায়াত বাড়ল। দুজনেরই ছেলে-মেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল। অথচ আয় সেই হারে বাড়ল না। মাঝখানে রাখী মালের কারবার করে বৈদ্যনাথ পৈতৃক পুঁজি লোকশান দিলেন। তারপর থেকে সাংসারিক ব্যাপারে খুব হিসেবী হয়ে গেলেন। হিসেব করে দেখলেন, একান্নে বড় অসুবিধে, বড় ঝামেলা। সংসারের কোন্ দিক দিয়ে যে কি খরচ হয়, তা টেরও পাওয়া যায় না। জমা-খরচের খাতায় যা ধরা পড়ে না। প্রথম অনেক অদৃশ্য খাতে ব্যয় হয়ে যায় টাকা। অবনীমোহনও অসুবিধেটা বুঝতে পারলেন। তবু নিজে কিছু মুখ ফুটে বললেন না।

কিন্তু আপনা থেকেই ক্রমে সব ফুটে বেরুতে লাগল। যৌথ সংসারে বোন কর্ত্রী, ভাই কর্তা। ব্যবস্থাটা গোড়ার দিকে যত নিখুঁত মনে হয়েছিল, কিছুদিন বাদে তেমন আর রইল না। নানা রকম খুঁৎ বেরিয়ে পড়তে লাগল। কনকলতার হাতে একখানা পোস্টকার্ড কেনার পয়সা থাকে না যে, বাপের বাড়িতে চিঠি লিখবেন। এই নিয়ে একদিন কথান্তর হওয়ায় বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে আলাদা করে হাত-খরচ দিতে লাগলেন। চা-বাগানের শেয়ার থেকে যে টাকাটা আসত, তাও বৈদ্যনাথ ভিন্ন করে রাখলেন। অথচ অবনীমোহন বোনাসের টাকাটা পুরোপুরিই যৌথ সংসারের তহবিলে জমা দিয়েছেন। বাসন্তী কনকলতার কাছে কথাটা উল্লেখ করতে ছাড়লেন না।

অবনীমোহন আর বৈদ্যনাথ দু'জনে মিলে ঠিক করলেন যে, প্রত্যেকেরই ছেলে-পুলে হয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎটা আর না দেখলে চলে না। রোজগারের টাকা সব যদি কেবল বাজার আর বাড়ি-ভাড়াতেই ব্যয় হয়ে যায়, দুদিন পরে কি হবে। স্থির হোল খোরাক পোষাক আর বাড়িভাড়াটা যৌথ তহবিল থেকে ব্যয় হবে। অন্য খরচ যার যার নিজের তহবিল থেকে করবেন। ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম আলাদা আলাদা দেবেন, সে হিসেব সাধারণ জমা-খরচের খাতায় লেখা হবে না। বছরখানেক বাদে পোষাকের বেলাতেও অসুবিধে দেখা গেল। কনকলতার শাড়ি দু'তিনখানা বেশি লাগে। আধ-ময়লা কাপড়ও তিনি পরতে পারেন না। ফলে ধোপা খরচ বেশি হয়ে যায়। একদিন মাসের শেষে দেখা গেল, তাঁর সবগুলি শাড়িই ছিঁড়ে গেছে। একজোড়া শাড়ি না কিনলেই নয়।

বাসন্তী মুখ ভার করে বললেন, 'তহবিলে যা আছে, তা থেকে যদি শাড়ি কেনার টাকা নাও দাদা, একদিন আর বাজার চলবে না।'

বৈদ্যনাথ গম্ভীর মুখে চুপ করে রইলেন। হঠাৎ কোন কথা বললেন না।

বাসন্তী বললেন, ' আর এই বা শাড়ি পরার কি ধরণ। দু'জনের শাড়ি তো একসঙ্গেই এসেছে, কই আমি তো দিব্যি পরছি। আমাকে কে কয় জোড়া শাড়ি বেশি এনে দিয়েছে। আর সপ্তাহে দু'বার করে অত যদি ধোয়ানো হয়, কাপড় কি টেঁকে। কাপড় তো সুতোরই তৈরী, লোহার তো নয়।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'থাক থাক। তোর আর বক্তৃতা দিতে হবে না। শাড়ির আমি ব্যবস্থা করছি।'

বৈদ্যনাথ মাসের শেষে বেশ একজোড়া মিহি চওড়াপেড়ে নতুন শাড়ি কিনে দিলেন স্ত্রীকে।

বাসন্তীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। রাত্রে

স্বামীকে বললেন, 'এ কি এক-চোখোমি বল তো।'

অবনীমোহন বললেন, 'ছি ছি ছি থামো। তাঁর স্ত্রীকে তিনি আলাদা করে কাপড় কিনে দিয়েছেন, এতে আমাদের বলবার কি আছে।'

বাসন্তী বললেন, 'বলবার কিছু থাকত না, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে আলাদা করে অমন জোড়ায় জোড়ায় শাড়ি কিনে দিতে পারতে। আমার শাড়িও তো ছিঁড়ে গেছে। আমি কি পরে বেড়াচ্ছি, তা সংসারের কার চোখে পড়ল।'

অবনীমোহন বললেন, 'আঃ থামো।'

কিন্তু বাসন্তী তখনকার মত থামলেও দিনের বেলায় প্রসঙ্গটা উল্লেখ করতে ছাড়লেন না।

কনকলতাও অধীর হয়ে বললেন, 'কি জানি এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবস্থা তো আমি জন্মেও দেখিনি। একজন শাড়ি পরলে আর একজনের চোখ টাটাবে। বাজারে তো আর শাড়ির অভাব নেই। গিয়ে কিনে নিলেই হয়। কেউ তো কারো ঘাড়ে বসে খাচ্ছে না। যার যার রোজগারে সে খাচ্ছে পরছে। তার অত কথা কিসের।'

তবু কথার পিঠে কথা চলতে লাগল। কথান্তরও হোল এই নিয়ে। শেষে ব্যবস্থা হোল খোরাকটাই শুধু একসঙ্গে চলবে, পোষাকের খরচ যার যার তার তার। কনকলতা নিজের হাতে আলাদা ধোপার খাতা বাঁধলেন। ওপরে গোট গোট করে লিখলেন, 'ধোপার হিসাব। শ্রীকনকলতা দত্ত।' নিজের নামটা নিজের চোখেই বড় সুন্দর লাগল দেখতে। নিজের খরচটা নিজের হাতে আসায় দেখা গেল সপ্তাহে দুবারের বদলে দেড় সপ্তাহে একবার ধোয়ান হচ্ছে তাঁদের ঘরের জামা-কাপড়।

হিসেবটা স্বামীকে বাসন্তীই বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখলে বউদির কান্ড? যখন একসঙ্গে ছিলাম, তখন দু'দিনের বেশি এক শাড়ি পরতে পারত না। এখন তো বেশ পার।'

পোষাকের পর আলাদা হোল দুধ আর জলখাবার। কারণ দুধ নিয়েও একদিন কথা উঠেছিল। অসময়ে বাসন্তীর দেওর মৃগাঙ্কের একদল বন্ধু এসে হাজির, তাদের চা করে দিতে দিতে বাড়ির সব দুধ গেল ফুরিয়ে। রাত্রে আর দুধ মিলল না। কোলের মেয়ে বিরক্ত করায় রাগ করে তার পিঠে [illegible] দিলেন কনকলতা। মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল। বৈদ্যনাথও কম চেঁচালেন না।

তারপর থেকে দুধ আর জলখাবারের বন্দোবস্ত আলাদা হয়ে গেল। যৌথ রইল শুধু ভাত ডাল মাছ তরকারী।

কিন্তু একদিন তা নিয়েও গোলমাল বাধল। কনকলতার ঘুম থেকে উঠতে সাধারণত দেরি হয়। এদিকে আপিসের ভাত দিতে হলে অত দেরিতে উঠলে চলে না। বাসন্তীই আগে উঠে উনোনে আঁচ দিয়ে রান্না চাড়িয়ে দেন। কিন্তু সেদিন বাসন্তী উঠলেন না, বললেন, তাঁর শরীর ভালো নেই—জ্বর হয়েছে।

কনকলতা উঠে দেখেন, ভোরের কাজ সব পড়ে রয়েছে। উনোনে আঁচ দেওয়াও হয়নি। বাসন্তীর ঘরে গিয়ে বললেন, 'ব্যাপার কি ঠাকুরঝি। আজ কি সব আপিস আদালত বন্ধ? এখনো শুয়ে রয়েছ যে?'

বাসন্তী লেপের ভিতর থেকে বললেন, 'এমন কি দাসখত লিখে দিয়েছি সংসারে যে, শরীর খারাপ হলেও একটুকাল শুয়ে থাকতে পারব না? কি এমন দায় পড়েছে যে, অসুখ নেই বিসুখ নেই রাত থাকতে উঠে নিত্যি আমাকে হাঁড়ি ঠেলতে হবে? আপিসের ভাত তো কেবল আমার ঘরের জন্যেই হয় না, সকলের ঘরের জন্যেই দরকার হয়।'

কনকলতা একটুকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'ও, সেই কথা বল। মিথ্যে অসুখ-বিসুখের অজুহাত এতক্ষণ দিচ্ছিলে কেন। কাল রাত্রে বলে দিলেই পারতে যে, তুমি আজ রাঁধতে পারবে না, আমাকে রাঁধতে হবে। এমন তো নয় পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে খাই, আর সংসারের সব কাজই তুমি দেখ।'

বাসন্তী বললেন, 'দেখিই তো। এর চেয়ে আবার বেশি দেখবার ক্ষমতা আছে কার। অসুখ নেই বিসুখ নেই, ঠাকুরঝিকে তো ঝি-এর মত খাটিয়ে নিচ্ছ, তবু তোমার আশ মেটে না বউদি?'

কনকলতা বললেন, 'বেশ খেটে না। দেখি সংসার চলে কি না চলে। কেবল কি আমার জন্যেই খাটছ, আমার আর ক'জন লোক। নিজের সংসারের জন্যে নিজে খাটবে, তার আবার অত খোঁটা কিসের। খাই না খাই খোঁটা আমি কারো শুনতে পারব না।'

ভুবনময়ী এসে বললেন, 'কি হোল আবার। রোজ কাজ নিয়ে তোদের খিটি-মিটি। ছি ছি ছি। তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন একহাতে বত্রিশজন লোকের আমি হাঁড়ি ঠেলেছি। তাও দু-এক বছর নয়, বছরের পর বছর। চেঁচামেচি দূরের কথা, আমার মুখের কথাটি কেউ শুনতে পারেনি। আর তোরা কেবল নিজের নিজের সোয়ামী-পুতকে ভাত রেঁধে দিতে বাড়ি মাথায় করে নিয়েছিস। তোদের কারো কিচ্ছু করতে হবে না। আমি রাঁধব। যাসনে তোরা কেউ রান্নাঘরে।'

কিন্তু এভাবে সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান হোল না। কনকলতা নিজে গিয়ে উনোনে আঁচ দিয়ে ভাত চড়ালেন। সেই সঙ্গে মেজাজও চড়তে লাগল।

বৈদ্যনাথ নিচে নেমে এসে বললেন, 'এ কি কেলেঙ্কারি। কাজ নিয়ে রোজই তোমা-দের মধ্যে ভাগাভাগি ঠেলাঠেলি লেগেই আছে। এর চেয়ে হাঁড়ি আলাদা করে নিলেই হয়।'

বাসন্তী বললেন, 'তোমার মনের ইচ্ছেটা তো তাই দাদা।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'কেবল আমার মনের কেন, সকলের মনেরই সেই ইচ্ছে। শুধু আমার মুখ দিয়ে বের করানোটা ছিল তোদের মতলব। বেশ দিলুম বের করে। আমি অত ঢাক-ঢাক গুর-গুর পছন্দ করি নে। আমি সোজা কথার মানুষ। এক হাঁড়িতে বনিবনাও হচ্ছে না। বেশ, হাঁড়ি আলাদা করে নাও, তাতে লজ্জা কিসের। এ তো আর দুই ভাই নয়, তাই বোন দু'জনের দুই আলাদা সংসার। একসঙ্গে জোর করে মেশাতে গেলে মিশবে কেন।'

অবনীমোহনকেও বৈদ্যনাথ সেই কথা বুঝিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে সঙ্কীর্ণ-চেতা মনে করতে পারো।'

অবনীমোহন বাধা দিয়ে বললেন, 'না না সে কি কথা।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'আমি একটা প্রিন্সিপল্ নিয়ে চলি। আমার প্রিন্সিপল হচ্ছে শান্তিতে থাকা। দেখা যাচ্ছে, আমরা যেভাবে আছি তাতে শান্তি থাকছে না। ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই আছে। মেয়েদের রান্না বান্নার ব্যবস্থা আলাদা করে না দিলে এ ঝগড়া মিটবে না। মাঝখান থেকে বিরোধ আরো বেড়ে যাবে।'

অবনীমোহন একটু হাসলেন, 'শুধু রান্নার হাঁড়ি-উনোন আলাদা করলেই কি সব ঝগড়া মিটবে?'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'অনেকখানি মিটবে। অন্তত রোজ এমন গোলমাল বাধবে না।'

তাই হোল। খুব বেশি যে ঝগড়া-ঝাঁটি হোল তা নয়। দুই ভাই আলাদা হতে গেলে যে হাঙ্গাম লাগে, রাগ দুঃখ ভাবাবেগের পালা উল্টোপাল্টা চলতে থাকে, এ ক্ষেত্রে তা হোল না। তাঁদের পক্ষে স্বতন্ত্র থাকাটাই স্বাভাবিক, একথা দুই পরিবারের সকলেই বুঝতে পেরেছেন। পাঁচ বছর আগেও তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পৃথগন্নে ছিলেন। এখনও তাই থাকবেন, এতে অস্বাভাবিকতার কি আছে।

অবস্থাটা সকলেই শান্তভাবে মেনে নিলেন। কারো মনে খুব যে বেশি আঘাত লেগেছে তা মনে হোল না। শুধু ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন ভুবনময়ী, 'এ তোরা কি করলি, কি সর্বনাশ করলি।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'তুমি থামোতো মা। সর্বনাশ সর্বনাশ কোরো না। তোমার বুদ্ধিতেই সর্বনাশ হচ্ছিল। দুনিয়াভরে যা চলছে, তার উল্টোটা করতে গেলে চলবে কেন।'

রান্নাঘরখানা বেশ বড়। পশ্চিম দিকে আর একটা নতুন উনোন পাতা হোল। এই কাঁচা উনোনে কে রাঁধবে। বাসন্তী সৌজন্য দেখিয়ে বললেন, 'বউদি, তুমিই বরং পুরোন উনোনে রান্না করো, আমি নতুনটা নিচ্ছি।'

কনকলতা বললেন, 'না না ঠাকুরঝি, তোমরা বেশি মানুষ ছোট উনোনে তোমাদের অসুবিধে হবে।'

এ কেবল লোক দেখানো সৌজন্যই নয়, অনেক দিন বাদে দু'জনের মধ্যে ফের যেন খানিকটা আন্তরিকতার সুর বেজে উঠল। রান্না-বান্নার আয়োজনে বাসন্তী কনকলতাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে লাগলেন। কথায়-বার্তায় কনকলতাও তার জন্যে বেশ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

একটু দূরে দূরে ঘরের দুই প্রান্তে বসে দু'জনেই রান্না চড়ালেন। ঠিক প্রথমেই পরস্পরের দিকে কেউ তাকাতে পারলেন না। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগে। মাঝখানে একটা দেয়াল থাকলে যেন ভালো হোত। অন্ততপক্ষে একটা পর্দা।

খানিক বাদে বিরাট স্থূল দেহ নিয়ে ভুবনময়ী এসে বঁটি পেতে মাঝখানে বসলেন। তিনি দু'জনের মাঝখানে দেয়াল নয়, দুই বিচ্ছিন্ন ভূভাগের সংযোজক। ভুবনময়ী বললেন, 'দাও, কার কি কুটতে টুটতে হবে দাও কুটে দিচ্ছি। সাধ যখন হয়েছে আলাদা আলাদা খাবে, খাও। খেয়ে দেখ কি মজা।'

স্বামীকে বললেন, 'এ কি এক-চোখোমি বল তো।'

অবনীমোহন বললেন, 'ছি ছি ছি থামো। তাঁর স্ত্রীকে তিনি আলাদা করে কাপড় কিনে দিয়েছেন, এতে আমাদের বলবার কি আছে।'

বাসন্তী বললেন, 'বলবার কিছু থাকত না, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে আলাদা করে অমন জোড়ায় জোড়ায় শাড়ি কিনে দিতে পারতে। আমার শাড়িও তো ছিঁড়ে গেছে। আমি কি পরে বেড়াচ্ছি, তা সংসারের কার চোখে পড়ল।'

অবনীমোহন বললেন, 'আঃ থামো।'

কিন্তু বাসন্তী তখনকার মত থামলেও দিনের বেলায় প্রসঙ্গটা উল্লেখ করতে ছাড়লেন না।

কনকলতাও অধীর হয়ে বললেন, 'কি জানি এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবস্থা তো আমি জন্মেও দেখিনি। একজন শাড়ি পরলে আর একজনের চোখ টাটাবে। বাজারে তো আর শাড়ির অভাব নেই। গিয়ে কিনে নিলেই হয়। কেউ তো কারো ঘাড়ে বসে খাচ্ছে না। যার যার রোজগারে সে খাচ্ছে পরছে। তার অত কথা কিসের।'

তবু কথার পিঠে কথা চলতে লাগল। কথান্তরও হোল এই নিয়ে। শেষে ব্যবস্থা হোল খোরাকটাই শুধু একসঙ্গে চলবে, পোষাকের খরচ যার যার তার তার। কনকলতা নিজের হাতে আলাদা ধোপার খাতা বাঁধলেন। ওপরে গোট গোট করে লিখলেন, 'ধোপার হিসাব। শ্রীকনকলতা দত্ত।' নিজের নামটা নিজের চোখেই বড় সুন্দর লাগল দেখতে। নিজের খরচটা নিজের হাতে আসায় দেখা গেল সপ্তাহে দুবারের বদলে দেড় সপ্তাহে একবার ধোয়ান হচ্ছে তাঁদের ঘরের জামা-কাপড়।

হিসেবটা স্বামীকে বাসন্তীই বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখলে বউদির কান্ড? যখন একসঙ্গে ছিলাম, তখন দু'দিনের বেশি এক শাড়ি পরতে পারত না। এখন তো বেশ পার।'

পোষাকের পর আলাদা হোল দুধ আর জলখাবার। কারণ দুধ নিয়েও একদিন কথা উঠেছিল। অসময়ে বাসন্তীর দেওর মৃগাঙ্কের একদল বন্ধু এসে হাজির, তাদের চা করে দিতে দিতে বাড়ির সব দুধ গেল ফুরিয়ে। রাত্রে আর দুধ মিলল না। কোলের মেয়ে বিরক্ত করায় রাগ করে তার পিঠে গোটাকয়েক চড় দিলেন কনকলতা। মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল। বৈদ্যনাথও কম চেঁচালেন না।

তারপর থেকে দুধ আর জলখাবারের বন্দোবস্ত আলাদা হয়ে গেল। যৌথ রইল শুধু ভাত ডাল মাছ তরকারী।

কিন্তু একদিন তা নিয়েও গোলমাল বাধল। কনকলতার ঘুম থেকে উঠতে সাধারণত দেরি হয়। এদিকে আপিসের ভাত দিতে হলে অত দেরিতে উঠলে চলে না। বাসন্তীই আগে উঠে উনোনে আঁচ দিয়ে রান্না চড়িয়ে দেন। কিন্তু সেদিন বাসন্তী উঠলেন না, বললেন, তাঁর শরীর ভালো নেই—জ্বর হয়েছে।

কনকলতা উঠে দেখেন, ভোরের কাজ সব পড়ে রয়েছে। উনোনে আঁচ দেওয়াও হয়নি। বাসন্তীর ঘরে গিয়ে বললেন, 'ব্যাপার কি ঠাকুরঝি। আজ কি সব আপিস আদালত বন্ধ? এখনো শুয়ে রয়েছ যে?'

বাসন্তী লেপের ভিতর থেকে বললেন, 'এমন কি দাসখত লিখে দিয়েছি সংসারে যে, শরীর খারাপ হলেও একটুকাল শুয়ে থাকতে পারব না? কি এমন দায় পড়েছে যে, অসুখ নেই বিসুখ নেই রাত থাকতে উঠে নিত্যি আমাকে হাঁড়ি ঠেলতে হবে? আপিসের ভাত তো কেবল আমার ঘরের জন্যেই হয় না, সকলের ঘরের জন্যেই দরকার হয়।'

কনকলতা একটুকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'ও, সেই কথা বল। মিথ্যে অসুখ-বিসুখের অজুহাত এতক্ষণ দিচ্ছিলে কেন। কাল রাত্রে বলে দিলেই পারতে যে, তুমি আজ রাঁধতে পারবে না, আমাকে রাঁধতে হবে। এমন তো নয় পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে খাই, আর সংসারের সব কাজই তুমি দেখ।'

বাসন্তী বললেন, 'দেখিই তো। এর চেয়ে আবার বেশি দেখবার ক্ষমতা আছে কার। অসুখ নেই বিসুখ নেই, ঠাকুরঝিকে তো ঝি-এর মত খাটিয়ে নিচ্ছ, তবু তোমার আশ মেটে না বউদি?'

কনকলতা বললেন, 'বেশ খেট না। দেখি সংসার চলে কি না চলে। কেবল কি আমার জন্যেই খাটছ, আমার আর ক'জন লোক। নিজের সংসারের জন্যে নিজে খাটবে, তার আবার অত খোঁটা কিসের। খাই না খাই খোঁটা আমি কারো শুনতে পারব না।'

ভুবনময়ী এসে বললেন, 'কি হোল আবার। রোজ কাজ নিয়ে তোদের খিটি-মিটি। ছি ছি ছি। তিন শ' পঁয়ষট্টি দিন একহাতে বত্রিশজন লোকের আমি হাঁ[ড়ি] ঠেলেছি। তাও দু-এক বছর নয়, বছরে[র] পর বছর। চেঁচামেচি দূরের কথা, আম[ার] মুখের কথাটি কেউ শুনতে পারেনি। অ[থচ] তোরা কেবল নিজের নিজের সোয়াম[ী] পুতকে ভাত রেঁধে দিতে বাড়ি মাথায় ক[রে] নিয়েছিস। তোদের কারো কিচ্ছু কর[তে] হবে না। আমি রাঁধব। যাসনে তোরা কে[উ] রান্নাঘরে।'

কিন্তু এভাবে সমস্যার কোন স্থা[য়ী] সমাধান হোল না। কনকলতা নিজে গি[য়ে] উনোনে আঁচ দিয়ে ভাত চড়ালেন। সে[ই] সঙ্গে মেজাজও চড়তে লাগল।

বৈদ্যনাথ নিচে নেমে এসে বললেন, '[এ] কি কেলেঙ্কারি। কাজ নিয়ে রোজই তোম[া]দের মধ্যে ভাগাভাগি ঠেলাঠেলি লেগে আছে। এর চেয়ে হাঁড়ি আলাদা করে নিলে[ই] হয়।'

বাসন্তী বললেন, 'তোমার মনের ইচ্ছে তো তাই দাদা।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'কেবল আমার মনে কেন, সকলের মনেরই সেই ইচ্ছে। শু[ধু] আমার মুখ দিয়ে বের করানোটা [ছি]ল তোদের মতলব। বেশ দিলুম বের ক[রে]। আমি অত ঢাক-ঢাক গুর-গুর পছন্দ ক[রি] নে। আমি সোজা কথার মানুষ। এ[ক] হাঁড়িতে বনিবনাও হচ্ছে না। বেশ, হাঁড়ি আলাদা করে নাও, তাতে লজ্জা কিসে[র]। এ তো আর দুই ভাই নয়, ভাই বো[ন]। দু'জনের দুই আলাদা সংসার। একসা[থে] জোর করে মেশাতে গেলে মিশবে কেন।'

অবনীমোহনকেও বৈদ্যনাথ সেই ক[থা] বুঝিয়ে বললেন, 'তুমি আমাকে সঙ্কী[র্ণ]চেতা মনে করতে পারো।'

অবনীমোহন বাধা দিয়ে বললেন, 'না [না] সে কি কথা।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'আমি এক প্রিন্সিপল্ নিয়ে চলি। আমার প্রিন্সিপ[ল] হচ্ছে শান্তিতে থাকা। দেখা যাচ্ছে, আম[রা] যেভাবে আছি তাতে শান্তি থাকছে [না]। ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই আছে। মেয়েদের রা[ন্না]বান্নার ব্যবস্থা আলাদা করে না দিলে ঝগড়া মিটবে না। মাঝখান থেকে [তি]ক্ত[তা] আরো বেড়ে যাবে।'

অবনীমোহন একটু হাসলেন, 'শু[ধু] রান্নার হাঁড়ি-উনোন আলাদা করলেই [কি] সব ঝগড়া মিটবে?'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'অনেকখানি মিটবে[।] অন্তত রোজ এমন গোলমাল বাধবে না।'

তাই হোল। খুব বেশি যে ঝগড়া-ঝাঁটি হোল তা নয়। দুই ভাই আলাদা হতে গেলে যে হাঙ্গাম লাগে, রাগ দুঃখ ভাবাবেগের পালা উল্টোপাল্টা চলতে থাকে, এ ক্ষেত্রে তা হোল না। তাঁদের পক্ষে স্বতন্ত্র থাকাটাই স্বাভাবিক, একথা দুই পরিবারের সকলেই বুঝতে পেরেছেন। পাঁচ বছর আগেও তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পৃথগন্নে ছিলেন। এখনও তাই থাকবেন, এতে অস্বাভাবিকতার কি আছে।

অবস্থাটা সকলেই শান্তভাবে মেনে নিলেন। কারো মনে খুব যে বেশি আঘাত লেগেছে তা মনে হোল না। শুধু ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন ভুবনময়ী, 'এ তোরা কি করলি, কি সর্বনাশ করলি।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'তুমি থামোতো মা। সর্বনাশ সর্বনাশ কোরো না। তোমার বুদ্ধিতেই সর্বনাশ হচ্ছিল। দুনিয়াভরে যা চলছে, তার উল্টোটা করতে গেলে চলবে কেন।'

রান্নাঘরখানা বেশ বড়। পশ্চিম দিকে আর একটা নতুন উনোন পাতা হোল। এই কাঁচা উনোনে কে রাঁধবে। বাসন্তী সৌজন্য দেখিয়ে বললেন, 'বউদি, তুমিই বরং পুরোন উনোনে রান্না করো, আমি নতুনটা নিচ্ছি।'

কনকলতা বললেন, 'না না ঠাকুরঝি, তোমরা বেশি মানুষ, ছোট উনোনে তোমাদের অসুবিধে হবে।'

এ কেবল লোক দেখানো সৌজন্যই নয়, অনেক দিন বাদে দু'জনের মধ্যে ফের যেন খানিকটা আন্তরিকতার সুর বেজে উঠল। রান্না-বান্নার আয়োজনে বাসন্তী কনকলতাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে লাগলেন। কথায়-বার্তায় কনকলতাও তার জন্যে বেশ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

একটু দূরে দূরে ঘরের দুই প্রান্তে বসে দু'জনেই রান্না চড়ালেন। ঠিক প্রথমেই পরস্পরের দিকে কেউ তাকাতে পারলেন না। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগে। মাঝখানে একটা দেয়াল থাকলে যেন ভালো হোত। অন্ততপক্ষে একটা পর্দা।

খানিক বাদে বিরাট স্থূল দেহ নিয়ে ভুবনময়ী এসে বঁটি পেতে মাঝখানে বসলেন। তিনি দু'জনের মাঝখানে দেয়াল নয়, দুই বিচ্ছিন্ন ভূভাগের সংযোজক। ভুবনময়ী বললেন, 'দাও, কার কি কুটতে কুটতে হবে দাও কুটে দিচ্ছি। সাধ যখন হয়েছে আলাদা আলাদা খাবে, খাও। খেয়ে দেখ কি মজা।'

আলাদা আলাদা থালা নিয়ে দুজনেরই তরকারি কুটে দিলেন ভুবনময়ী।

চার বছরের দৌহিত্রী প্রীতি এসে বলল, 'দিদা, তুমি কাদের ভাগে? আমাদের না?'

দু' বছরের পৌত্র বিজু বলল, 'ঈস্ আমাদের। না ঠামা? তাই না?'

ভুবনময়ী বঁটি ফেলে দু'জনকেই কোলে টেনে নিলেন, 'হ্যাঁ, এবার তোরা আমাকে কেটে ভাগ করে নে। তাই তো এখন বাকি আছে।'

কিন্তু ভুবনময়ীকে তখনকার মত ভাগ করা হোল না। তিনি যৌথই রইলেন। সাধ্যমত দুই পরিবারেরই কাজ করেন। ছেলে আর মেয়ে দু'জনেরই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাঁর কাছে শোয়। পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্র-দৌহিত্রী সবারই তিনি পরিচর্যা করেন। ছেলে আর জামাই দু'জনেরই খাওয়ার সময় গিয়ে বসেন সামনে। নিজের রান্না নিরামিষ তরকারি বাটিতে করে দু'জনের সামনেই এগিয়ে দেন।

ভুবনময়ী ছাড়া এই দুই পৃথক পরিবারে আরো কিছু কিছু জিনিস এজমালি রইল, এখনো আছে। বৈঠকখানাটা নামে বৈদ্যনাথদের হলেও এজমালি ঘর হিসাবেই সেখানার ব্যবহার চলে। দুই পরিবারেরই আসবাবপত্র এ ঘরে আছে। বৈদ্যনাথের আছে দেয়াল-ঘড়ি আর তক্তাপোশ, অবনীমোহনদের আছে খানকয়েক চেয়ার। দুজনেরই বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন এখানে এসে বসেন। দু'জনেরই বয়স্ক ছেলেদের কেউ কেউ রাত্রে এ ঘরে এসে শোয়। একখানা বাঙলা কাগজ রাখেন বৈদ্যনাথ, একখানা ইংরেজী দৈনিক রাখেন অবনীমোহন। একই হকার দু'খানা কাগজ একসঙ্গে ফেলে দিয়ে যায়। বাংলা কাগজখানা দুই পরিবারের মেয়েরাই পড়েন, ইংরেজিখানায় দুই পরিবারের মেয়েরাই চোখ বুলোন। বাইরে চিঠির বাক্সও একটাই রয়েছে। দুই পরিবারের চিঠিই এই একই বাক্সে পিওন রেখে দিয়ে যায়।

ছাদের ঘরখানা অবনীমোহনের নামে থাকলেও সেখানেও খানিকটা অলিখিত এজমালি স্বত্ব আছে বৈদ্যনাথের। তাঁর শ্বশুর কি শালা এলে এ ঘরে থাকতে দেওয়া হয়। পরীক্ষার সময় তাঁর ছেলে-মেয়েরাও এই নির্জন ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। কিন্তু বছর দু' তিন ধরে অবনীমোহনের ভগ্নীপতি মুকুন্দ রায় প্রায় স্থায়ীভাবে একটি সীট দখল করায় এ ঘরের সুবিধেটা ইদানীং তেমন পান না বৈদ্যনাথ। তাই অরুণ চাকরির জন্যে বিদেশে যাওয়ায় তার ছোট ঘরখানা কনকলতারাই প্রায় ব্যবহার করছিলেন। এতদিন বড় কি মেজো ছেলে থাকত, চাকরির সন্ধানে ইদানীং মাসকয়েক ধরে সুবিমলও ছিল সেই ঘরে। সে চলে গেল।

কনকলতা স্বামীকে বললেন, 'তেতলার ঘরে আমাদের যদি একেবারেই কোন অধিকার না থাকে, তাহলে একতলার বৈঠকখানা ঘরও তো——'

বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে ধমক দিলেন, 'বেশি বাড়াবাড়ি করো না। তুমি কি বলতে চাও বৈঠকখানা ঘরে আমি ওদের যাওয়া বন্ধ করব? ওরা ছোট হতে পেরেছে বলে পাল্লা দিয়ে আমিও ছোট হব? সব কিছুরই একটা সীমা আছে।'

ধমক খেয়ে কনকলতা চুপ করে রইলেন।

(ক্রমশ)

তিন দিনের ডায়েরী

বটকৃষ্ণ দে

পাহাড়, কাছের মেয়ে, সব চুপ; দেবদারু ডালে
এক মেঘ ফগ্ এসে কারু কাজ করে; সে সকালে
ম্যালের সমস্ত মন উন্মুখর, শুধু দুইজন
একান্ত নির্জনে চুপ; ধু ধু ও ধূসর দূর বন।
কাঞ্চনজঙ্ঘাকে নিয়ে গভর্নর হাউসের দিকে
লালমতো শেডিং-এর তলায় আশ্রয় নিই, ঠিক এ-
সময়ে সেখানে কেউ নেই, তাই ভেবেছি, যদি-বা
মন তার খুলে যায়, বলে ঃ 'ভালোবাসার প্রতিভা,
সে তো জানি একান্তই তোমার; তোমারি তাই আমি'
বললে, ভেবেছি, আমি বললো ঃ 'এবার তবে নামি।'
কিন্তু সে বিমুগ্ধ, চুপ। বললো না একটি কথাও;
যদি-ও আমার মন আবেগ-মেঘের ভিড়, তা-ও
দু'পাশে সরিয়ে হেসে, বললো সে ঃ দ্যাখো কী নির্জন!
এখন কথাকে ক্ষমা করবে না আমাদের মন!'

স্নোভিউ ঃ দার্জিলিং ঃ ১৯৪৯।

'ক্ষমা করবে না মন, যদি তুমি সমুদ্রের মতো
উচ্ছল না হও, তার ঢেউ বুকে নিয়ে না আনত
হও, কথা কও এই বাতাসের ঝোড়ো ভাষা নিয়ে'!
—যতোই কাছের মেয়ে বলুক, বলার ভার দিয়ে
তাকে, আমি চুপচাপ; জনহীন সাগরের কূলে
একটি সায়াহ্ন বেছে, একা-একা লাজুক আঙুলে,
মন এঁকে চলে তার সুবর্ণ স্মরণ ঃ দার্জিলিং!'
সহসা ঢেউএর তোড়ে উড়ে যায় একটি ফড়িং।

সিভিউ ঃ পুরী ঃ ১৯৫০।

আজকে হৃদয় খুলে যতোই কলম দিয়ে লিখি,
জানি না কোন্‌টা তার প্রেম, আর কোন্‌টা যে মেকী!
পাহাড়, কাছের মেয়ে, সব চুপ;—তার প্রেম এই?
নাকি অই সমুদ্রের ভাষায় সে দিয়েছে তাকেই?
পাহাড়, বিমুগ্ধ মন, নির্জন, অরণ্যপথ,—এরা,
সমুদ্র, কথার ঢেউ,—বলো কোথা, কোথায় প্রেমেরা!

কলকাতা ঃ ১৯৫১।

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

(১৫)

বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের প্রমাণ। অন্যান্য জাতীয় নেতাদের হত্যার পরিকল্পনা। হিংসাপন্থী রাজনৈতিক প্রচারকার্য নিষিদ্ধ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের 'নব্য-সংস্কৃতি'। "জানলে রোজেনবার্গও উৎফুল্ল হতেন"! মার্কিণ ব্যাংকপতি বোগড্যান ও জিন্নার আলোচনা। জিন্না বলেছেন—গান্ধীর মৃত্যুতে মুসলমানদের খুবই ক্ষতি হয়েছে। ভারতীয় চরমপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে জিন্নার অভিযোগ। সোস্যালিস্ট জয়প্রকাশ সম্বন্ধে কিংসলি মার্টিন। আবার বিড়লা ভবন। 'দাড়ি দিয়ে ঘেরা একখণ্ড ভূমি'। 'একজন ভারতীয় শার্লক হোমস্'। বিড়লা ভবনে ভোজের আসরে অভিজ্ঞতা।

ভারতের সকল নদী ও সমুদ্রের জলে মহাত্মার দেহভস্ম। ক্যাথিড্রাল চার্চের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেন ও মাথাই। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের কমনীতির খসড়া। সিংহলের স্বাধীনতা অনুষ্ঠান। নেহরুর বক্তৃতায় লংকাদ্বীপ ও ভারতের প্রাচীন সম্পর্ক। "ভোরবেলার পদ্মপাতার শিশির দিয়ে তৈরী চা।" সোভিয়েট সাংবাদিকের চা ও ভারতীয় মনোবৃত্তি। চায়ে দুধ-চিনির ব্যবহার ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাফল্য। নেহরু-প্যাটেল বিরোধের কাহিনী সম্পর্কে নেহরু। "আমরা এক শতাব্দীর চতুর্থাংশকাল পরস্পরের সহযোগী।" নেহরু সকাশে শিল্পপতিদের প্রতিনিধিদল। আলোচনাকালে নেহরুর উষ্মা।

হায়দরাবাদে আবার মঙ্কটন। মাউণ্টব্যাটেন-নিজাম পত্র বিনিময়। নিজামের উক্তি—মাউণ্টব্যাটেনের কোন ক্ষমতাই নেই। "পৃথিবীর কাছে হায়দরাবাদের উচ্চ মর্যাদা।" নিজামেরই আর এক উক্তি—'একমাত্র রাজবংশোদ্ভব মাউণ্টব্যাটেনেরই অমূল্য সাহায্য চাই।' স্থিতাবস্থার আড়ালে সবই অস্থির। হায়দরাবাদে এজেণ্ট-জেনারেল শ্রীযুক্ত মুন্সীর বাসভবন সমস্যা। মাউণ্টব্যাটেনের হস্তক্ষেপে বাসভবন সমস্যার সমাধান। হায়দরাবাদের সীমান্ত অঞ্চলে উপদ্রব বৃদ্ধি। নিজামের অর্ডিন্যান্স—হায়দরাবাদে ভারতীয় মুদ্রা ও নোট বে-আইনী। গোপনে অনুষ্ঠিত নিজাম-পাকিস্থান ঋণ-চুক্তি। হায়দরাবাদ কর্তৃক পাকিস্থানকে বিশ কোটি টাকা ঋণ দানের ব্যবস্থা। মাউণ্টব্যাটেনের অনুসন্ধানে বিচিত্র তথ্যের উদঘাটন।

ভারত-হায়দরাবাদ স্থিতাবস্থা চুক্তি ভংগ করেছেন কোন্ পক্ষ? প্যাটেল বলেন—হায়দরাবাদে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত না হলে স্থিতাবস্থা চুক্তি সফল হবে না। লায়েক আলির প্রস্তাব—সমানসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি নিয়ে গবর্ণমেণ্ট গঠন। প্যাটেলের প্রতিবাদ। হৃদরোগের আকস্মিক আক্রমণে প্যাটেল শয্যাশায়ী। কে এম মুন্সী ও মাউণ্টব্যাটেন। মুন্সীর অহিংসাবাদ। মাউণ্টব্যাটেনের অভিমত—আলোচনারত অবস্থায় হায়দরাবাদে ভারতীয় পুলিশী ব্যবস্থার প্রয়োগ অসংগত। মঙ্কটন লণ্ডন চলে গেলেন। মাউণ্টব্যাটেনের নৈরাশ্য।

"জীবনযাত্রার ন্যূনতম অধিকারের নিম্নতম স্তর"। মাউণ্টব্যাটেনের সম্বর্ধনায় কলকাতার মেয়রের ভাষণ—মাউণ্টব্যাটেনের বলিষ্ঠ বাহু ও নিপুণ অংগুলির সাহায্যে রচিত দুই নিকেতন'—প্যাটেল সম্পর্কে রাজাগোপালাচারী, প্যাটেলের চরিত্রে মাতৃসুলভ স্নেহপরায়ণতার ভাব, রাজাগোপালাচারী বর্ণিত ইতিহাসের চাকা—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের তের নম্বর কক্ষ এবং দিল্লী জেলের পঁয়ষট্টি নম্বর কক্ষ। বাঙালীর জাতীয়তাবাদে সুভাষের স্থান। সরকারবিরোধী সোস্যালিস্ট সংহতির উদ্যোক্তা শরৎচন্দ্র বসু। নিজামের চিঠির উত্তরে ভারত গবর্ণমেণ্টের কড়া চিঠি।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। গবর্ণমেণ্ট এখন যথেষ্ট তথ্য ও প্রমাণ পেয়েছেন যে, শুধু মহাত্মাকে নয়, অন্যান্য বিশিষ্ট জাতীয় নেতাদেরও প্রাণ নাশের একটা গোপন ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। গান্ধীর প্রাণনাশ কোন ব্যক্তির আকস্মিক উত্তেজনার বশে অনুষ্ঠিত ব্যাপার নয়; সুপরিকল্পিত ব্যাপার। একই ষড়যন্ত্রকারীর দল গান্ধী এবং অন্যান্য জাতীয় নেতাদের হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, হিংসামূলক কর্মপন্থার সমর্থক কোন রাজনৈতিক দলকে আর দল হিসাবে থাকতে দেওয়া হবে না এবং সামরিক পদ্ধতিতে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে আর স্বেচ্ছাসৈন্য গঠন করতেও দেওয়া হবে না।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে। এই সঙ্ঘের বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। আমি আজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক দলের পত্রিকা 'দি অর্গানাইজার'-এ লিখিত অদ্ভুত একটি প্রবন্ধ পাঠ করলাম। এ প্রবন্ধে যে মতবাদ প্রচারিত হয়েছে, তার পরিচয় জানতে পেলে রোজেনবার্গের মনও নতুন আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। আট বছর বয়সের শিশু থেকে আরম্ভ ক'রে ষাট বছর বয়স্ক বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেক হিন্দুর মনে এক 'নব্য-সংস্কৃতি'র বীজ বপনের পরিকল্পনার কথা এই প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকা চাই এবং হিন্দু পিতা-মাতার সন্তান হওয়া চাই—তা'হলেই যে-কোন ব্যক্তি এই নব্য-সংস্কৃতিবাদী সঙ্ঘের সদস্য হোতে পারবে। প্রবন্ধের লেখক বলছেন—'আমাদের এই সঙ্ঘ এখন হিমালয়ের মত বিরাট এবং সমুদ্রের মত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে'। প্রবন্ধের লেখক এই সঙ্ঘের বিরাটত্বের পরিচয় আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, যদি সঙ্ঘের আর কোন নতুন শাখা স্থাপিত নাও হয়, তবুও বর্তমানে যতগুলি শাখা আছে শুধু সেগুলিকেই মাত্র একবার ক'রে ঘুরে দেখতে হলে একজনের পঁচিশ বছর সময় লাগবে। প্রবন্ধলেখকের এই উক্তি অবশ্য অত্যুক্তি মাত্র। লেখক তাঁর সাধের কল্পনার কথাই বাগাড়ম্বর করে প্রচার করছেন। বাস্তবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক দল এমন বিরাট একটা বস্তু মোটেই নয়। যাই হোক, গবর্ণমেণ্ট এই সঙ্ঘকে শুধু 'নিষিদ্ধ' করেছেন। কিন্তু কোন সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ

করা এক ব্যাপার এবং ভেঙে দেওয়া আর এক ব্যাপার।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। শ্রোয়েডার্স ব্যাঙ্কিং গ্রুপ অব নিউ ইয়র্কের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নরবার্ট বোগড্যান দিল্লীতে এসেছেন। ভারত ও পাকিস্থানের অর্থনৈতিক শক্তি ও যোগ্যতা এবং আর্থিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বোগড্যান দুই দেশেই ঘুরছেন। করাচীতে জিন্নার সঙ্গে বোগড্যানের সাক্ষাৎ হয়েছিল। বোগড্যান বললেন যে, জিন্নার কাছ থেকে যতটা সহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় পাবেন বলে তিনি মনে করেছিলেন, কার্যতঃ তার চেয়ে বেশীই পেয়েছেন। কাশ্মীরের ব্যাপার নিয়ে জিন্না অবশ্য অত্যন্ত বিচলিত এবং ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছেন। গান্ধীর সম্বন্ধে জিন্না কিছু কিছু বললেন। গান্ধীর মৃত্যুতে জিন্না তাঁর প্রচারিত বাণীতে গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী উদার অভিমত তিনি বোগড্যানের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে প্রকাশ করলেন। বোগড্যানের কাছে জিন্না বলেছেন—গান্ধীর মৃত্যুতে মুসলমানদের খুবই ক্ষতি হয়েছে। জিন্না বললেন যে ভারতের দায়িত্বশীল ক্ষমতার পদে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় ব্যক্তির মনোভাব সম্বন্ধে তিনি বিরুদ্ধ মন্তব্য করে থাকেন, এ অখ্যাতি তাঁর আছে। পাকিস্থানের আর্থিক ও রাজনৈতিক ধ্বংস সাধনের জন্য এই সব ভারতীয় নেতা নানারকম মতলব ও পরিকল্পনা করছেন, জিন্নার এই উক্তি সম্বন্ধে স্বয়ং জিন্নাই মন্তব্য ক'রে বললেন যে,—'এ'দের সম্বন্ধে আমার সন্দেহ না হয় প্রত্যাহার করেই নিলাম। সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এ অভিযোগ হতে দায়িত্বশীল ভারতীয় নেতাদের আমি রেহাই দিতে রাজী আছি। কিন্তু আসল প্রশ্ন হলো, অন্যান্য চরমপন্থী নেতা এ দলগুলির ক্রিয়াকলাপ। এরাই সমস্ত অশান্তির আসল কারণ।' বোগড্যান লক্ষ্য করেছেন যে, গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর ভারত গবর্ণমেণ্ট যেভাবে চরমপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, তাতে ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কে জিন্নার মনের ভাবও একটু ভাল হয়েছে।

একজন 'চরমপন্থী'র মনোভাব ও আচরণ দেখে মনে হচ্ছে যে, গত কয়েকদিনের ঘটনাকে তিনি তাঁর পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব'লে বোধ করেছেন। ইনি হলেন সোস্যালিস্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ। কংগ্রেস হলেন একটি প্রবীণ রাজনৈতিক দল এবং কংগ্রেসের প্রধান সংগ্রামও জয়যুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে একটি গণতন্ত্রসম্মত সোস্যালিস্ট আন্দোলনের পক্ষে শক্তিশালী জনসমর্থন জাগ্রত ক'রে তোলার সাফল্যময় সম্ভাবনা রয়েছে। গান্ধীর মৃত্যুতে এখন সোস্যালিস্টদের সম্মুখে দু'টি পথ দেখা দিয়েছে, এর মধ্যে যে-কোন একটি পথ গ্রহণ করতে পারলে তাঁরা লাভবান হবেন। একটি পথ হলো, খোলাখুলি ও প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করা। আর একটি পথ, কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষে এসে কংগ্রেসকে ভেতর থেকেই দখল করা। একটি সাংবাদিক সম্মেলনও আহ্বান করেছেন জয়প্রকাশ, কিন্তু সম্মেলনে তিনি যা বললেন তাতে ঐ দুই পথের কোনটিরই গ্রহণের ইচ্ছার ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। তিনি ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্যাটেলের নিন্দাও করলেন। এর ফল এই হবে যে, নেহরুর সঙ্গেও সোস্যালিস্টদের কোন মিল ও আপোষ প্রায় একটা অসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে।

কিংসলি মার্টিন বললেন যে, গতকাল জয়প্রকাশের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু হতাশ হয়েছেন মার্টিন। গান্ধীর মৃত্যুতে জয়প্রকাশের মন যদিও এখনো বেদনাভিভূত ও ম্রিয়মান হয়ে রয়েছে, তবুও এইটুকু বুঝা গেল যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রয়াসে যে পরিমাণ মানসিক দৃঢ়তার প্রয়োজন, সে পরিমাণ দৃঢ়তা তাঁর নেই। এই ত্রুটি যেমন বহু সদিচ্ছাসম্পন্ন সোস্যাল ডেমোক্র্যাটের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়, জয়প্রকাশের মধ্যেও তেমনি দেখা গেল। সমর্থক ও অনুগামীদের ইচ্ছা সম্বন্ধে অথবা মন্ত্রিসভায় যোগদান করাই এখন তাঁর লক্ষ্য হওয়া উচিত কি না, এই কটু প্রশ্ন সম্বন্ধে জয়প্রকাশের অদ্ভুত একটা ঔদাসীন্য ও এড়িয়ে যাবার চেষ্টার ভাব লক্ষ্য করেছেন মার্টিন।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। বিখ্যাত জি ডি বিড়লা আজ তাঁর ভবনে আমাকে ভোজনে যোগদান করতে নিমন্ত্রণ করেছেন। সেই বিড়লা ভবনে আবার যেতে হলো। ভবনে ঢুকবার সময় আমি মনের ভেতর অদ্ভুত একটা ভয়-ভয় ভাব অনুভব করছিলাম। সেই সন্ধ্যার হত্যাকাণ্ডের পর আর আমি এই ভবনে আসিনি। হাজার হাজার লোকের মনের বেদনায় ব্যাকুল ও অস্থির সেই সন্ধ্যার কয়েকটি ঘণ্টার যে দৃশ্য এখানে দেখা দিয়েছিল, তার সাক্ষ্য হিসাবে এখন শুধু পড়ে রয়েছে দড়ি দিয়ে ঘেরা এক খণ্ড ভূমি, নিহত মহাত্মা ঠিক যেখানে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়েছিলেন। একটি স্মৃতিফলক এখানে স্থাপিত হবে। এই ভূমিখণ্ডের ওপর থেকে ঘাসের চাপড়া সেই সন্ধ্যাতেই তুলে নিয়ে চলে গেছে সেই শ্রেণীর লোক, যারা সম্মুখে মহাত্মার মৃত্যুর মত একটা শোকাবহ ঘটনার মধ্যেও ঐতিহাসিক স্মারক চিহ্ন সংগ্রহের উৎসাহ বর্জন করতে পারেনি।

বিড়লা হলেন একাধারে শিল্পপতি, সংবাদপত্রের মালিক, দানশীল সেবাকর্মোৎসাহী এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর মধ্যে বিলাসিতার কোন আড়ম্বর দেখা যায় না। বাজ পাখীর মত তাঁর মুখের গড়ন যেন একজন ভারতীয় শার্লক হোমস্। আমার ধারণা, এই বিখ্যাত ডিটেকটিভের মতই বিড়লারও প্রখর বাস্তবদর্শিতার ক্ষমতা আছে। বিড়লা ভবনের এই ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী চেটি, জয়পুরের সুযোগ্য দেওয়ান কৃষ্ণমাচারী, মেটা নামক জনৈক ব্যবসায়ী ধনিক এবং নিউজ ক্রনিকলের সংবাদদাতা [illegible] ক্লিফ।

যতক্ষণ ভোজন চললো, [illegible] ব্যবসায়ের বিষয়ই আলোচিত হলো; ফাইন্যান্স তথা অর্থ সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন ও সমস্যার বিষয়। পাকিস্থান ও ভারতের মধ্যে পণ্যবিনিময়ের ব্যবস্থা ও [illegible] ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানা বিষয়। আলোচনার মধ্যে বহু পরিমাণ তুলো, পাট ও [illegible] কখনো বা রপ্তানি ক'রে ফেলা [illegible] কখনো বা আটকে রাখা হলো। আমার মনে পড়লো, মাত্র সাত দিন আগে ঠিক এই স্থানেই কি ব্যাপার হয়ে গেছে। [illegible] মানুষের মনের বেদনার কোন [illegible] ঠিক এই ঘরগুলির মধ্যেই সমবেত [illegible] চোখেমুখে দেখেছিলাম। সেই দৃশ্যের তুলনায় কি অদ্ভুত এবং কত বিসদৃশ আজকের এই দালালী গবেষণার দৃশ্য।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, [illegible] ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। আজ লক্ষ লক্ষ লোক মহাত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি অনুষ্ঠান পালন করেছে। ভারতের সকল পুণ্যতোয়া নদী এবং সমুদ্রের জলে মহাত্মার দেহভস্ম বিসর্জন করা হয়েছে। প্রধান অনুষ্ঠান পালিত হয়েছে ত্রিবেণী সঙ্গমে, যেখানে গঙ্গা, যমুনা এবং পৌরাণিক সরস্বতীর ধারা এক প্রবাহে মিলিত হয়েছে।

আজ সকালে দিল্লীতে মাউণ্টব্যাটেন ও তাঁর স্টাফ ক্যাথিড্রাল চার্চ অব রিডেমসনে উপস্থিত থেকে গান্ধীর স্মরণে এক প্রার্থনার অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। ভারতীয় খৃষ্টান মাথাইও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ধর্মবাণী পাঠ করলেন। "লীড কাইন্ডলি লাইট", "অ্যাবাইড উইথ মি" এবং "হোয়েন আই সার্ভে দি ওয়াণ্ড্রাস ক্রস"—গান্ধীর প্রিয় এই তিনটি প্রার্থনা সংগীত সমবেত জনতা সমস্বরে গাইলেন। চার্চের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রত্যেক নরনারী যে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগদান করলেন, তাই দেখে আমি আমার বিশ্বাসের এই কথা বলতে পারি যে, এই আন্তরিকতা মহাত্মারই আশীর্বাদে ধন্য হবার যোগ্য।

গান্ধী স্মরণের শেষ অনুষ্ঠান মাউণ্টব্যাটেন উদ্‌যাপন করেছেন আজ রাত্রে তাঁর একটি বেতার ভাষণে। প্রায় প্রত্যেক কংগ্রেস নেতা গান্ধীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিবৃতি দিয়েছেন। এই বিবৃতির মধ্যে কতগুলি বিবৃতি অতি বিশুদ্ধ ইংরাজী গদ্যের এবং ভাষাশিল্পের বিস্ময়কর নিদর্শন। কতগুলি বিবৃতি আবার নিছক ভাবোচ্ছ্বাস ও কথার আড়ম্বরে ভারাক্রান্ত। এই সব নেতার ভাষণে, সংবাদপত্রের লেখায় এবং হিন্দু-অভিমতের মধ্যে একটা বিপজ্জনক মনোভাবের লক্ষণও দেখতে পাচ্ছি। এই ঘটনার পর যে কাজের জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে সকলকে প্রস্তুত হতে হবে, সে কাজের কথার উল্লেখ অথবা সে সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকেই বরং একটা অসহায় অবস্থার দোহাই দিয়ে শুধু আত্ম-করুণার আবেগে নিজেদের নিষ্ক্রিয়তাকেই পরোক্ষভাবে সমর্থন ক'রে চলেছেন।

ভারতের প্রকৃত রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধেই মাউণ্টব্যাটেন এখন বিশেষভাবে চিন্তা করছেন। ভারতের লক্ষ্য হলো, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল গণতন্ত্র। নেহরুর নেতৃত্বে এই আদর্শকেই ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সকলের পক্ষে প্রস্তুত হবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আমাদের অনেক আলোচনাও হয়ে গেছে। এই আদর্শে অগ্রসর হতে হ'লে গবর্ণমেণ্টকে কোন্ পন্থা অনুসরণ করে চলতে হবে, সে সম্বন্ধে একটা খসড়া রচনার ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছিল। সে খসড়া আমি রচনা করে ফেলেছি। কিন্তু আমার রচিত খসড়ার মধ্যে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি একটু বেশী উৎসাহের ঝোঁকে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মাউণ্টব্যাটেন এই খসড়ার শব্দালংকার কিছুটা কমিয়ে দিলেন। তা ছাড়া খসড়ার বক্তব্যও অনেক সংক্ষিপ্ত ক'রে দিলেন।

মাউণ্টব্যাটেন তাঁর ভাষণে গান্ধীকে তাঁর সুহৃদ বলে উল্লেখ করেছেন। সভ্য জগতের প্রত্যেক দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ গান্ধীর মৃত্যুতে যে বস্তুতঃ স্বজন-বিয়োগের বেদনা অনুভব করেছে, সে কথারও উল্লেখ করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। ধর্মের নামে উন্মত্ত মনোভাবের প্রতিরোধেই গান্ধীর এই আত্মোৎসর্গের তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, মহাত্মার প্রাণ হরণের এই ঘটনার আঘাতে ব্যথিত দেশের মানুষ সকল প্রকার ভেদবাদের অবসান ঘটাবার জন্য প্রস্তুত হবেন। এই পন্থাই হলো গান্ধীর আদর্শ অনুসরণ করার এবং ভারতকে তার জাতীয় মহিমার উত্তরাধিকারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র পন্থা।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। আজ আমরা সিংহলের স্বাধীনতা অনুষ্ঠানে যোগদান করলাম। সিংহলও ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ লাভ করেছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশে জাতীয়তা-বাদের অভ্যুদয় যেভাবে নানারকম অশান্তি, গৃহযুদ্ধ ও হিংসামূলক ক্রিয়াকলাপে বিব্রত হয়েছে, সিংহলে তা হয়নি। সিংহলের কাছে স্বাধীনতা এসেছে স্বচ্ছন্দে ও সহজে। স্বর্ণ বর্ণ সিংহের প্রতিকৃতি চিহ্নিত সিংহলের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন দিল্লীতে সিংহলীয় বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ ডি সিল্‌ভা। অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেন এবং নেহরু বক্তৃতা করলেন। নেহরু যেন একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে স্বচ্ছন্দচিত্তে উপস্থিত হয়েছেন, নেহরুর মনের ভাব দেখে তাই মনে হচ্ছিল। নেহরু তাঁর বক্তৃতায় সিংহলকে ভারতীয় নামে 'লংকা' বলেই সম্বোধন করলেন এবং লংকার সঙ্গে ভারতভূমির ধর্ম, ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রাচীন অন্তরঙ্গতা ও সম্পর্কের কথা বললেন।

পতাকা উত্তোলনের পর সিংহলী চা পরিবেশন করা হলো। নেহরুকে দেখে বুঝতে পারছি, তাঁর মন এখন শোকের প্রথম আঘাত এবং দেশব্যাপী বিষাদের প্রকোপ থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। চায়ের আসরে নেহরু আমাদের কাছে এগিয়ে এসে বসলেন। সিংহলী চায়ের স্বাদুতা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা আরম্ভ করতেই নেহরুও চায়ের প্রসঙ্গে নানা গল্প বলতে আরম্ভ করলেন। নেহরু বললেন, চা তৈরী করাও একটা চারুকলা এবং এ চারুকলার চর্চায় যথেষ্ট সৌন্দর্য-বোধ ও সুরুচির প্রয়োজন আছে। তিনি চীন দেশের চা তৈরীর পদ্ধতির অনেক প্রশংসা করে বললেন যে, ভোর বেলার শিশির পদ্মপাতা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সেই শিশিরে চায়ের পাতা ভিজেয়ে 'চা' তৈরী করার একটা প্রথা চীন দেশে প্রচলিত আছে।

চায়ের প্রসঙ্গে মনে পড়লো টাস এজেন্সীর প্রতিনিধি ওলেগ ওরেস্টভের কথা। ইনি এখনো দিল্লীতে রয়েছেন, আর কয়েকদিন পরেই সোভিয়েট ইউনিয়নে ফিরে যাবেন। ইনি সপরিবারে পুরাতন দিল্লীর গরীবদের এক মহল্লায় বাসা নিয়েছেন। ইনি কিছুদিন দিল্লীর বৈদেশিক সংবাদদাতা সমিতির সেক্রেটারী ছিলেন। সেই সময় আমাদের সঙ্গে এক মধ্যাহ্ন-ভোজনে তিনি উপস্থিত থেকে ভারতের 'ক্ষমতা হস্তান্তর' প্রসঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। ভারতের ওপর ব্রিটিশ প্রভাবের দৃঢ়তা সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বললেন এবং তারই প্রমাণ হিসাবে চায়ের কথা তুললেন। তিনি যেভাবে চা তৈরী করেন, তাই দেখে ভারতীয়েরা বিস্মিত হয়। এতে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন ওরেস্টভ। ওরেস্টভ বললেন যে, আমার চা তৈরীর পদ্ধতি দেখে ভারতীয়েরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে থাকেন—'এ চা খেতে কিরকম লাগছে আপনার?'

ওরেস্টভ বলেছেন—'খেতে যেরকম লাগে, ঠিক সেই রকমই লাগছে।'

ভারতীয়েরা বলেন—'কিন্তু এভাবে চা তৈরী করাতো নিয়ম নয়। ইংরাজেরা যে দুধ আর চিনি মিশিয়ে চা তৈরী করেন।'

ভারতীয় রুচি ও মনোভাবের ওপর প্রবল ব্রিটিশ প্রভাবের এই প্রমাণের উদাহরণ উল্লেখ করে ওরেস্টভ বললেন যে, স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় সকল প্রভাব-শালী ভারতীয় ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে জীবনের সর্ববিষয়ে ব্রিটিশ রীতিনীতির উপাসক হয়ে পড়েছেন। ওরেস্টভ বললেন—"এই-খানেই হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সব চেয়ে বড় জয় ও সাফল্য। একটা বিদেশের ওপর থেকে আপনারা সরকারী ক্ষমতা অবশ্য স্বেচ্ছায় লিকুইডেট করেছেন, কিন্তু

আপনাদের চিন্তা-প্রসেস এবং ব্যবহার-প্যাটার্ণ চিরস্থায়ী করেই রেখে গেলেন।"

জয়প্রকাশ নারায়ণ এইবার উপযুক্ত জবাব পেয়েছেন। প্যাটেলের সঙ্গে নেহরুর মতবিরোধের কথা উল্লেখ করে চারদিকে যেসব গল্প ছড়ানো হচ্ছিল, সে সম্বন্ধে নেহরু তাঁর একটি বেতার বক্তৃতায় মন্তব্য করে বলেছেন যে, তিনি এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন। নেহরু বলেছেন—"এটা ঠিকই যে, বিগত বহু বৎসরের মধ্যে বহু বিষয়ে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে আমার মতের অমিল হয়েছে। বহু সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের অভিমতের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ও অন্যান্য পার্থক্যও দেখা দিয়েছে। কিন্তু ভারতের অন্ততঃ এই সত্যটুকু জেনে রাখা উচিত যে, আমাদের উভয়ের এই পার্থক্য নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। জনসেবার ক্ষেত্রে যে বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কাজ করে চলেছি, সে ক্ষেত্রে সকল প্রধান বিষয়ে আমাদের ঐক্যই আমাদের ছোটখাট সকল মতভেদের প্রশ্ন ছাপিয়ে সব চেয়ে বড় সত্য হয়ে উঠেছে। বহু দুরূহ ও মহৎ ব্রতে এক শতাব্দীর চতুর্থাংশ কালেরও বেশি সময় আমরা দুজনে পরস্পরের সহযোগী হয়ে কাজ করে এসেছি। আজ আমাদের জাতীয় পরিণামের এই সংকটের সময় আমরা পরস্পরের বিরোধী হয়ে উঠবো, এ কি কল্পনাও করা যেতে পারে? জাতির কল্যাণ ও স্বার্থকেই সব চেয়ে বড় করে দেখা ছাড়া অন্য কোন স্বার্থকে বড় করে দেখা আমাদের দুজনের কারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়। এ কি সম্ভব যে, আজ এতদিন পরে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থকে বড় করে দেখবার মত ছোট-মনের মানুষ হয়ে যাব?"

নেহরু-প্যাটেল বিরোধের কাহিনী নিয়ে সকল জল্পনা কল্পনার অবসান এখানেই হয়ে যাওয়া উচিত। যাঁরা মনে করেছিলেন যে, ভারত রাষ্ট্রের দুই মহৎ প্রধান ব্যক্তি সহযোগী হবার মত মহত্ত্বের প্রমাণ দিতে পারবেন না, তাঁরা উপযুক্ত জবাব পেয়ে গেছেন। ব্যর্থ হয়েছে তাঁদের গবেষণা। নেহরু-প্যাটেলের ঐক্যের ওপরেই ভারত রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি নির্ভর করে রয়েছে।

সংবাদ পেলাম, শিল্পপতিদের এক প্রতিনিধিদল আজ নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ খবরও শুনতে পেলাম যে, শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে নেহরু তাঁর উষ্মা দমন করতে পারেননি। এই প্রতিনিধিদলে জি ডি বিড়লাও ছিলেন। সেদিনে তাঁর বাড়িতে ভোজসভায় তিনি অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক বিষয়ে যেসব ব্যবস্থার ও সর্তের কথা বলেছিলেন, নেহরুর সঙ্গেও আলোচনা করতে এসে তিনি সেই সব কথারই আবৃত্তি করেছেন। বিড়লা অভিযোগ করেছেন—গবর্ণমেণ্টের নীতির জন্যই ক্যাপিটাল ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, শিল্পোন্নয়নে এগিয়ে আসতে পারছে না। নেহরু উত্তর দিয়েছেন—গবর্ণমেণ্ট তো ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়নি, তবে ক্যাপিটালের এত ভীত হবার কি কারণ থাকতে পারে?

যাই হোক্, আইন সভায় নেহরু অবশ্য অনেকটা মোলায়েম ভাষা ব্যবহার করেছেন। নেহরু তাঁর সরকারী ঘোষণায় বলেছেন যে, শিল্পপতিদের সঙ্গে আলোচনা করে গবর্ণমেণ্ট যেসব বিষয় বুঝেছেন, অর্থনৈতিক নীতি নিরূপণের সময় গবর্ণমেণ্ট সেসব বিষয় বিবেচনা করবেন।

নেহরু যদিও ব্যক্তিগতভাবে সোস্যালিজমের সমর্থনে অভিমত প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু তিনি এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বস্তুতঃ মিশ্র-অর্থনীতির সমর্থন করছেন, যাতে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ও প্রগতিশীল একটা উৎপাদন ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতেও চালিত হতে পারে।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮ সাল। ওয়াল্টার মঙ্কটন হায়দরাবাদে এক সপ্তাহ থেকে আজ দিল্লী এসে পৌঁছেছেন। আমরা আগেই জানতাম যে, মঙ্কটন হায়দরাবাদে এসে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। মাউণ্টব্যাটেন পূর্বেই নিজামকে এক পত্রে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিজাম যেন মঙ্কটনের এই সাক্ষাতের সুযোগে ভারতের সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনীত হবার উপায় সম্বন্ধে ভাল করে আলোচনা করেন। মাউণ্টব্যাটেনের এই পত্রের উত্তরে নিজাম তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিলেন যে, তিনি মঙ্কটনের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করতে রাজী আছেন। নিজামের পত্র পেয়ে আমরা একটু বিস্মিতও হয়েছিলাম, কারণ কিছুদিন থেকে নিজাম মাউণ্টব্যাটেনের সম্বন্ধে লোকের কাছে যেসব কথা বলছিলেন, সেগুলি মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে মোটেই প্রশংসার ব্যাপার নয়। নিজাম লোকের কাছে বলেছেন যে, মাউণ্টব্যাটেন হায়দরাবাদের বন্ধু মোটেই নন, মাউণ্টব্যাটেনের কোন ক্ষমতাই নেই এবং ভবিষ্যতের আলোচনার ব্যাপারে মাউণ্টব্যাটেন কোন সাহায্য করলেইবা এবং না করলেইবা কি? কিন্তু এই চিঠিতে নিজাম লিখেছেন—"আমি আশা করি, ইংলণ্ডের রাজবংশোদ্ভব মাউণ্টব্যাটেন অবশ্যই হায়দরাবাদ ও ভারতের স্থায়ী সম্পর্কের ব্যবস্থা উদ্ভাবনের আলোচনায় হায়দরাবাদকে তাঁর সেই অমূল্য সাহায্য দিয়ে অনুগৃহীত করবেন, যে সাহায্য হায়দরাবাদের মত রাষ্ট্রেরই প্রাপ্য। পৃথিবীর কাছে হায়দরাবাদ বর্তমানে যে উচ্চ-মর্যাদা উপভোগ করছে, সেই মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার আলোচনায় মাউণ্টব্যাটেন সাহায্য করবেন বলে আমি আশা করি।" এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, নিজাম প্রত্যেক পত্রে মাউণ্টব্যাটেনের নামের উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজবংশের দোহাই দিয়ে থাকেন, যেন রাজবংশের মানুষ বলেই হায়দরাবাদের সঙ্গে আলোচনা করবার একটা বিশেষ মর্যাদাগত অধিকার মাউণ্টব্যাটেনের আছে।

স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর মাত্র একটা মাস একরকম ভালভাবেই কেটে গেছে, কোন গোলমাল দেখা দেয়নি, কিন্তু নতুন বৎসর আরম্ভ হতেই এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যাতে বুঝা গেল যে, এই শান্তিপূর্ণ স্থিতাবস্থা একটা বাইরের আবরণ মাত্র, ভেতরে সবই অস্থির। ভারত গবর্ণমেণ্টের নবনিযুক্ত এজেণ্ট-জেনারেল কে এম মুন্সী হায়দরাবাদে কোথায় থাকবেন? এই সামান্য একটা প্রশ্নও একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। যে ভবনে মুন্সী থাকবেন বলে পূর্বে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, নিজাম গবর্ণমেণ্ট জানালেন যে, সেই ভবনকে এখনো মুন্সীর জন্য ছেড়ে দেবার মত ব্যবস্থা তাঁরা করে উঠতে পারেননি। আরও এগার দিন পরে মুন্সীর জন্য বাড়ীর ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন বলে নিজাম গবর্ণমেণ্ট জানালেন। এই অবস্থায় ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করলেন যে, এই এগার দিন মুন্সী হায়দরাবাদের রেসিডেন্সি ভবনে থাকবেন, কারণ এই ভবনটি খালি পড়ে রয়েছে। নিজাম প্রতিবাদ করলেন। ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট পূর্বে যে ভবনে থাকতেন, সেই ভবনে ভারতীয় এজেণ্ট-জেনারেল মুন্সী থাকবেন, এই প্রস্তাবের মধ্যে নিজাম ভারতের একটা অভিসন্ধির ইঙ্গিত দেখতে পেলেন। নিজামের ধারণা হলো যে, এই প্রস্তাব বস্তুতঃ প্রকারান্তরে ও তলে তলে হায়দরাবাদের ওপর সেই অধিরাজত্ব

ক্ষমতা (Paramountcy) প্রতিষ্ঠিত করবারই একটা আয়োজন। নিজামের প্রতিবাদের একটা উত্তরও দিয়ে দিলেন ভারত গবর্ণমেণ্ট। নিজামকে স্পষ্টভাবেই ভারত গবর্ণমেণ্ট জানিয়ে দিলেন যে, যদি মুন্সীকে এখন হায়দরাবাদে থাকবার জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা নিজাম না করে দেন, তবে শুধু মুন্সীই নয়, কোন ব্যক্তিই এজেণ্ট-জেনারেল হয়ে হায়দরাবাদে আর যাবেন না।

এই অবস্থায় মাউণ্টব্যাটেনই মাঝখানে প'ড়ে একটা মীমাংসা ক'রে দিলেন। নিজামের সঙ্গে অনেক চিঠি ও টেলিগ্রাম বিনিময় করার পর মাউণ্টব্যাটেন নিজামকে নরম করতে পারলেন। মুন্সীর বাসভবনের সমস্যা মিটে গেল এবং ৫ই জানুয়ারী তারিখে মুন্সী হায়দরাবাদে গিয়ে তাঁর নতুন কার্যভার গ্রহণ করলেন।

জানুয়ারী মাসের শেষদিকে আবার এমন কতগুলি ঘটনা ঘটতে আরম্ভ করলো যার ফলে স্থিতাবস্থা চুক্তিকে দুই পক্ষই প্রায় অস্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলেন। হায়দরাবাদের সীমানা অঞ্চলে উপদ্রবের ঘটনার সংখ্যা বিপজ্জনকভাবেই বৃদ্ধি পেয়ে চললো। হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্ট কতগুলি বিশেষ শ্রেণীর খনিজ ও ধাতু ভারতে চালান নিষিদ্ধ করে দিলেন। এর পরেও একটা কাণ্ড করলেন নিজাম গবর্ণমেণ্ট। হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে ভারতীয় মুদ্রা ও নোট নিষিদ্ধ করে দিলেন। এখানেই শেষ নয়, ভারত গবর্ণমেণ্টকে সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে, এমনই আর একটি কাণ্ড করলেন নিজাম গবর্ণমেণ্ট। হায়দরাবাদ পাকিস্থানকে বিশ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছেন বলে একটি ঘোষণাও করে দিলেন নিজাম গবর্ণমেণ্ট।

কিন্তু কি করে, কিভাবে এবং কখন্ নিজাম গবর্ণমেণ্ট এই ঋণ পাকিস্থানকে দিলেন? সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যপূর্ণ। মাউণ্টব্যাটেন এ রহস্য সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবেই অনুসন্ধান করলেন। অনুসন্ধানের ফলে যেসব তথ্য জানতে পেলেন মাউণ্টব্যাটেন, তাতে এই সিদ্ধান্ত না করে পারা যায় না যে, হায়দরাবাদের বর্তমান অর্থ-মন্ত্রী মোইন নওয়াজ জঙ্গ যেসময়ে নিজাম ডেলিগেশনের নেতা হয়ে ভারতের সঙ্গে স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা কর-ছিলেন, ঠিক সেই সময়েই পাকিস্থানকে ঋণদানের এই ব্যবস্থাটিও নিজাম গবর্ণ-মেণ্ট করেছিলেন। এর মধ্যে আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবার আছে। পাকিস্থানের প্রাপ্য পঞ্চান্ন কোটি টাকা পাকিস্থানকে প্রদান করা স্থগিত করা হবে কি না, ভারত গবর্ণমেণ্ট যখন এই বিষয়টি বিবেচনা করছিলেন, ঠিক সেই সময়েই পাকিস্থানকে এই বিপুল অর্থ ঋণ হিসাবে প্রদান করবার সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা করে ফেলে-ছিলেন নিজাম গবর্ণমেণ্ট। একদিকে গোপনে এইসব ব্যাপার করে নিজাম গবর্ণমেণ্ট আর একদিকে এবং প্রকাশ্যে ভারতেরই বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ঘোষণা করলেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদকে অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা বিব্রত করতে আরম্ভ করেছেন।

মহাত্মার অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের দিনেই হায়দরাবাদের ইত্তেহাদের সমর্থনপুষ্ট প্রধানমন্ত্রী মীর লায়েক আলি মাউণ্ট-ব্যাটেনের সঙ্গে প্রথম দেখা করেন। মাউণ্ট-ব্যাটেন স্পষ্ট ভাষাতেই লায়েক আলিকে জানিয়ে দিলেন যে, হায়দরাবাদ গবর্ণ-মেণ্টের এ চালচলন আর বেশীদিন চলতে পারে না। চালচলন বদলাতে হবে এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে ভারতের সঙ্গে আচরণের নীতি গ্রহণ করতে হবে।

বাইরে থেকে দেখতে এবং কথা-বার্তায় লায়েক আলিকে একজন সাদাসিধা স্বভাবের মানুষ বলেই মনে হবে। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনের বুঝতে এবং দেখতে একটুও দেরী হয়নি যে, লায়েক আলির এই বাইরের সাদাসিধা আচরণের আড়ালে খাঁটি একটি ইত্তেহাদী প্রকৃতি গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ধর্মের নাম করে হিংসা ও প্রমত্ততা এবং তার সঙ্গে ধূর্ততা—এই হলো ইত্তেহাদী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। লায়েক আলির চরিত্রেও এই বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট প্রমাণ পেলেন মাউণ্টব্যাটেন। লায়েক আলিকে এত স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য বলে দেবার পরেও মাউণ্টব্যাটেনের মনে অবশ্য এই সন্দেহ রয়েই গেল যে, এসব কথা লায়েক আলির মনে আদৌ কোন রেখাপাত করেছে কি না? এখন ভবিষ্যতের অনেকখানি নির্ভর করছে মঙ্কটনের ওপর। মঙ্কটন যদি নিজামকে বুঝিয়ে উঠতে পারেন যে, এখন ভারতের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেই নিজামের চলা কর্তব্য এবং এদিকে মাউণ্টব্যাটেন যদি প্যাটেল ও ভারত গবর্ণমেণ্টকে বুঝিয়ে উঠতে পারেন যে, ধৈর্য না হারিয়ে শেষপর্যন্ত আলো-চনার পথেই একটা নিষ্পত্তির জন্য চেষ্টা করে যাওয়া উচিত, তবেই বৃহত্তর সঙ্কট প।িহার করা সম্ভবপর হতে পারে।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা মার্চ, ১৯৪৮ সাল। হায়দরাবাদের নতুন ডেলি-গেশন দিল্লীতে এসেছেন। এই ডেলিগেশনে আছেন মঙ্কটন, মীর লায়েক আলি এবং মোইন নওয়াজ জঙ্গ। মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে নতুন ডেলিগেশনের দুটি বৈঠকও হয়ে গেছে. একটি গত বৃহস্পতিবারে এবং একটি আজ. দুই বৈঠকেই ভি পি উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল মীর লায়েক আলি করাচী গিয়েছিলেন। যাবার আগে মাউণ্টব্যাটেন লায়েক আলিকে এই কথা বলে দিয়ে-ছিলেন যে, করাচীতে গিয়ে লায়েক আলি যেন বিশ কোটি টাকা ঋণের প্রসঙ্গ লিয়াকৎ আলির সঙ্গে পুনরায় আলোচনা করেন। যতদিন ভারতের সঙ্গে হায়দরা-বাদের স্থিতাবস্থা চুক্তির সম্পর্ক থাকবে, ততদিনের মধ্যে পাকিস্থান যেন ঐ ঋণ ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকা হস্তগত করে না ফেলেন, লিয়াকৎ আলির কাছে এই অনু-রোধ করবার জন্য লায়েক আলিকে বলে দিয়েছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। লায়েক আলি করাচী থেকে ফিরে এসে বললেন, লিয়াকৎ আলি মৌখিকভাবে তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ভারত-হায়দরাবাদ স্থিতাবস্থা চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার আগে পাক-গবর্ণমেণ্ট এই বিশ কোটি টাকার লোন ভাঙ্গাবেন না।

নিজামী ডেলিগেশনের সঙ্গে আলো-চনায় দু' পক্ষ থেকেই অভিযোগের দীর্ঘ ফিরিস্তি উল্লেখ করা হ'লো। ভি পি অভিযোগ করলেন, নিজাম গবর্ণমেণ্ট কেন পাকিস্থানকে এত টাকা ঋণ দিলেন? কেন অর্ডিন্যান্স জারি ক'রে ভারতীয় মুদ্রা ও নোট হায়দরাবাদে 'বে-আইনী' ঘোষণা করেছেন নিজাম গবর্ণমেণ্ট? লায়েক আলিও অভিযোগ ক'রে বললেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট পূর্ণ অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা হায়দরাবাদকে বিপন্ন ক'রে তুলেছেন।

মাউণ্টব্যাটেন ডেলিগেশনকে জানিয়ে দিলেন যে, ভারতে বে-সরকারীভাবে সাম্প্রদায়িক সৈন্যদল গঠন নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন ভারত গবর্ণমেণ্ট। সুতরাং হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্টেরও অবিলম্বে রজাকর দল ভেঙ্গে দেওয়া উচিত। এই রজাকর দলই হ'লো ইত্তেহাদের সংগ্রাম-কারী বাহিনী এবং এদের বহুবিধ উপদ্রবের সংবাদ কিছুদিন থেকে খুব বেশি ক'রেই পাওয়া যাচ্ছে। আর একটি কর্তব্য ডেলিগেশনকে স্মরণ করিয়ে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। আর দেরী না ক'রে হায়দরাবাদে এখন একটি জন-প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত ক'রে ফেলাই কর্তব্য।

- নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা মার্চ ১৯৪৮ সাল। নিজাম ডেলিগেশনের নেতা হয়ে মীর লায়েক আলি এসেছেন ভারত ও হায়দরাবাদের স্থায়ী সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য কিন্তু বর্তমানের 'অস্থায়ী' সম্পর্কই (স্থিতাবস্থা চুক্তি) যেভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে চলেছে, তাতে স্থায়ী সম্পর্কের আলোচনায় কোন সুফল হবে কি না সন্দেহ। এই সন্দেহ করছেন প্যাটেল। তাঁর মতে, স্থিতাবস্থা চুক্তিই যদি ভালভাবে পালিত না হয়, তবে স্থায়ী সম্পর্কের চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা বৃথা। প্যাটেলের ধারণা এই যে, যদি হায়দরাবাদে এখন জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে স্থিতাবস্থা চুক্তিও যথার্থ নিষ্ঠা এবং সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হবে না। কিন্তু প্রথম দিকে সমানসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি নিয়ে গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়া উচিত, এই প্রস্তাব সমর্থন করতে প্যাটেল অবশ্য রাজী নন। এদিকে মীর লায়েক আলি বলছেন যে, ভারত-হায়দরাবাদ স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ বর্তমানের 'স্থিতাবস্থায়' মুসলমান প্রতিনিধিদের চেয়ে বেশিসংখ্যক হিন্দু প্রতিনিধিকে গবর্ণমেণ্টের মধ্যে গ্রহণ করা সম্ভবপর হবে না।

আলোচনার শেষে প্রশ্ন উঠলো, আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে কি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে? এই প্রশ্ন নিয়ে একটা বিরোধের ঝড়ও বেশ প্রবলভাবেই দেখা দিল। স্থিতাবস্থা চুক্তি ঠিকমত প্রতিপালিত হচ্ছে না, বিজ্ঞপ্তির মধ্যে এই কথার উল্লেখ করতে গিয়ে এটা যেন না বলা হয় যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকেও স্থিতাবস্থা চুক্তির নির্দেশ ও সর্ত ভংগ করা হয়েছে। ভারত গবর্ণমেণ্টেরও 'ত্রুটি' হয়েছে, এই ধরণের উল্লেখের বিরুদ্ধে প্যাটেল তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করলেন। এ বিষয়ে প্যাটেল তাঁর অভিমতের এক বিন্দু নড়চড় করতে রাজী হলেন না। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে স্থিতাবস্থা চুক্তি পালনে কোন ত্রুটিই হয়নি। প্যাটেলের এই ধারণা যুক্তিহীন নয়। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের দিক থেকে স্থিতাবস্থা চুক্তির কোন হানিই আজ পর্যন্ত হতে দেখা যায়নি। যদি হয়ে থাকে তবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সরকারী কর্মচারীদের আচরণে হয়েছে। বর্তমানে সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর দিয়েই এমন চাপ যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে শুধু একটা নির্দেশ দিয়ে দিলেই কাজ হতে পারে না। নির্দেশ দেওয়া খুবই সহজ, কিন্তু প্রশাসনিক কর্তব্য পালনে নিযুক্ত কর্মচারীদের পক্ষে সে নির্দেশ সার্থকভাবে পালন করা খুবই কঠিন। এর একটা কারণ অবশ্য প্রশাসনিক কর্মচারীদের অনভিজ্ঞতা। হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত যেসব মালপত্র ভারতীয় অঞ্চলে আটক ক'রে রাখা হয়েছে, সেসব মালপত্র ভারত গবর্ণমেণ্ট ছেড়ে দেবেন—এই সিদ্ধান্তের কথাটি পর্যন্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করতে প্যাটেল রাজী নন। প্যাটেলের মনোভাব দেখে মংকটন দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন আজ টেলিফোনে মংকটনকে জানিয়েছেন যে, তিনি আগামীকাল ব্যক্তিগতভাবে এই সম্পর্কে তাঁর সাধ্যমত একটা চেষ্টা করে দেখবেন যে, বিজ্ঞপ্তির মধ্যে স্থিতাবস্থা চুক্তির 'ভারতীয় ত্রুটি' সম্বন্ধে কোন স্বীকৃতির উল্লেখ করাতে পারেন কি না।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ৫ই মার্চ, ১৯৪৮ সাল। মংকটন হায়দরাবাদে চলে গেলেন এবং মাউণ্টব্যাটেন সেই বিজ্ঞপ্তির সমস্যা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করলেন। নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করলেন মাউণ্টব্যাটেন। নেহরু মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করলেন এবং তাঁর কথার মধ্যে সমর্থনসূচক মনোভাবের পরিচয়ও পাওয়া গেল। কিন্তু নেহরু স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে, হায়দরাবাদ সম্পর্কে যেকোন বিষয়ের আলোচনা করতে হলে প্যাটেলের সঙ্গেই করা বাঞ্ছনীয়, কারণ প্যাটেলই হলেন দেশীয় রাজ্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। আজই বিকালে প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাতে আলোচনা করবেন ব'লে ঠিক করেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন, কিন্তু আজ মধ্যাহ্নেই প্যাটেলের হৃদযন্ত্র হঠাৎ বিকল হয়ে যাবার উপক্রম হলো। প্যাটেল প্রায় মরেই গিয়েছিলেন। দৈবাৎ রক্ষা পেয়ে এখন সম্পূর্ণরূপেই শয্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। ডাক্তারেরা বলে দিয়েছেন, কোন রকমেই কাজ এখন প্যাটেলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কবে তিনি স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন, তা'ও ডাক্তাররা এখন অনুমান করতে পারছেন না। সুতরাং, মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষেও হায়দরাবাদের ব্যাপারে একরকম নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এমনও হতে পারে যে, ভারত থেকে মাউণ্টব্যাটেন বিদায় নিয়ে চলে যাবার আগে প্যাটেল সুস্থ হয়ে উঠতেই পারবেন না এবং হায়দরাবাদ সম্পর্কে মাউণ্টব্যাটেন আর কোন পরামর্শ দেবারই সুযোগ পাবেন না।

আমার মনে হয়, গান্ধীর অন্ত্যেষ্টি-যাত্রার দিনে প্যাটেল ছয় ঘণ্টা ধ'রে শবাধারের অনুগমন করে নিজের শরীরের ওপর যে নির্যাতন করেছিলেন, সেটা সহ্য করবার মত দৈহিক শক্তি তাঁর ছিল না। তার ফলেই প্যাটেলের শরীর এইভাবে আজ হঠাৎ ভেঙে পড়েছে। সেদিন রাজঘাটে আমি প্যাটেলের মুখের দিকে একবার তাকিয়েছিলাম। তখনি মনে হয়েছিল, প্যাটেলের শরীরেও জীবনীশক্তি যেন কিছু আর নেই, যেন সম্বিৎ হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছেন। মহাত্মার প্রাণনাশের ঘটনা প্যাটেলের ওপরেই সবচেয়ে বেশি কঠোর আঘাত হয়ে পড়েছে। তিনিই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, গান্ধীকে রক্ষা করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল তাঁরই। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর ব্যর্থতার জন্য তাঁকে যেভাবে ও যে পরিমাণ সমালোচনার দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছে, সে-পরিমাণ সমালোচনা অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য নয়। কিন্তু এই মাত্রাহীন সমালোচনা নিঃশব্দে সহ্য করেছেন প্যাটেল। তাঁর অসুস্থতাও যে এই সংকটকালে গবর্ণমেণ্টের ওপরে কত বড় আঘাত, সেটাও প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। আর একটা বাস্তব সত্য প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে, এই নতুন ভারত রাষ্ট্র ভারতের দুই প্রধান ব্যক্তির ওপর কত বেশী নির্ভর করে রয়েছে।

হায়দরাবাদ সম্পর্কে প্যাটেলের সিদ্ধান্তের বদলে অন্য কোন সিদ্ধান্ত উপস্থিত করতে পারেন, গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। প্যাটেলের সিদ্ধান্ত বাতিল করার বা বদলে দেবার দায়িত্ব নিতে কেউ রাজী নন। সুতরাং বিজ্ঞপ্তি প্রচার করাও আর হলো না। মাউণ্টব্যাটেনও আজ মংকটনকে এক পত্রে জানিয়ে দিলেন যে, বর্তমান অবস্থায় সংবাদপত্রের জন্য সরকারী কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ৬ই মার্চ, ১৯৪৮ সাল। হায়দরাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় এজেণ্ট-জেনারেল কে এম মুন্সী মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। মুন্সী বেশ কর্মোৎসাহী মানুষ এবং তাঁর মনের সংকল্পও অনেক। আমার মনে হয়, তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ মানুষ। কংগ্রেস মহলে তিনি এখন প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে ঊর্ধ্বে উঠেই চলেছেন, যদিও কংগ্রেসী মর্যাদার সেই বিশেষ তক্‌মাটি তাঁর নেই। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম করে জেল খাটার 'তক্‌মা'। জেলে গিয়ে স্বাদেশিকতার বড় পরিচয় আগে দিতে পারেননি বলেই

হয়তো আজ তিনি খুব বেশীরকম 'স্বদেশী' হয়ে উঠেছেন। মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে মুন্সী বেতারে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তাতে তিনি নিজেকেও অহিংসার উপাসক ব'লে বর্ণনা করেছেন। এই মুন্সীই কয়েক বছর আগে গান্ধীর সঙ্গে অহিংসাতত্ত্ব সম্বন্ধে তর্কে প্রবৃত্ত হতে দ্বিধা করেননি। মুন্সী বলেছিলেন, গান্ধীর ১৯৪২ সালের আইন-অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। মুন্সীর বক্তব্য ছিল, ঐ আন্দোলন "বিশুদ্ধ অহিংস নীতি অনুসারে চালিত হয়নি, কারণ ঐ আন্দোলন বিপক্ষের হৃদয়ে প্রেম উদ্রেক না ক'রে বরং ক্রোধের উদ্রেক করেছিল।"

কিন্তু আজ মুন্সী মাউণ্টব্যাটেনের কাছে যেসব কথা বললেন, তাতে বুঝা গেল যে, হায়দরাবাদ সম্পর্কে তিনি অহিংসা নীতির ওপর খুব বেশি নির্ভর করে থাকতে ইচ্ছুক নন। যদি নিজাম গবর্ণমেণ্ট রাজাকরদের ক্রিয়াকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করতে বা সংযত করতে না পারেন, তবে হায়দরাবাদে ভারতীয় পুলিশের সাহায্যেই রাজাকর দমনের ব্যবস্থা করা উচিত, ভারত গবর্ণমেণ্টকে এই পরামর্শ দিয়েছেন মুন্সী। মুন্সী মনে করেন, হায়দরাবাদের রাজাকর হাঙ্গামা দমনে যদি ভারতীয় পুলিশ নিয়োগ করা হয় তবে সেটা আইনতঃ স্থিতাবস্থা চুক্তির সর্তসংগত ব্যাপারই হবে। মুন্সীর দৃঢ় ধারণা হয়ে গেছে যে, হায়দরাবাদের বর্তমান গবর্ণমেণ্ট রাজাকরদের সংযত করবেন না, সংযত করবার ক্ষমতাও নেই।

মাউণ্টব্যাটেন এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেছেন। তিনিও দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, হায়দরাবাদ সম্পর্কে ভারতকে অত্যন্ত সংগত, নীতিসম্মত এবং নির্ভুল পন্থা অনুসরণ করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে, যাতে পৃথিবীর জনমতের কাছে ভারত নিজেকে দোষমুক্ত বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। এখন হায়দরাবাদের সঙ্গে ভারতের আলোচনা চলছে এবং এই আলোচনারত অবস্থায় মুন্সীর প্রস্তাবিত পুলিশী ব্যবস্থাকে নিতান্তই অন্যায় এবং অসংগত কাজ বলে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর অভিমত সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করলেন। মাউণ্টব্যাটেনের মতে, রাজাকরদের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করবার সুযোগ এখন মীর লায়েক আলিকেই দেওয়া কর্তব্য। স্থিতাবস্থা চুক্তি পালনে এবং দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠনে মীর লায়েক আলি নিজের থেকেই যাতে চেষ্টা করতে পারেন, তার সুযোগ বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত হবে না।

মুন্সী চলে যাবার পর মাউণ্টব্যাটেন আমাকে বললেন যে, মুন্সীর মনোভাব তাঁর একটুও ভাল লাগছে না। মুন্সীর যোগ্যতা ও কর্মশক্তি সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেনের কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি মনে করেন যে, বর্তমানের জটিল অবস্থায় নিজামকে বুঝিয়ে কাজ করাবার মত মানসিক প্রকৃতি এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী মুন্সীর নেই। যথেষ্ট অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে ধৈর্যশীল কূটনৈতিক প্রয়াসে অকুণ্ঠভাবে লিপ্ত থাকাই এখন হায়দরাবাদ সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত পন্থা। মুন্সীকে এই পন্থার উপযুক্ত ব'লে মনে করেন না মাউণ্টব্যাটেন।

মঙ্কটনও লণ্ডন চলে গেছেন। আমাদেরও এই আশঙ্কা হচ্ছে যে, মঙ্কটনও এইবার তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন এবং এ ব্যাপারের মধ্যে আর আসতে চাইবেন না। গত সপ্তাহে যেভাবে আলোচনা হয়েছে, সেভাবে আলোচনা আর চালিয়ে যাওয়াও বৃথা সময় নষ্ট করার ব্যাপার বলেই সম্ভবতঃ মঙ্কটন ধারণা করেন। কিন্তু মঙ্কটন না থাকলে মাউণ্টব্যাটেনও হায়দরাবাদ সমস্যার আর কিছু করতে পারবেন কি না সন্দেহ।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল। দিল্লী থেকে কলকাতা, তারপর উড়িষ্যা এবং উড়িষ্যা থেকে রেঙ্গুণ, রেঙ্গুণ থেকে আবার কলকাতায় ফিরে এসে আসাম যাত্রা। আসাম ভ্রমণ শেষ ক'রে দেশপরিক্রমার এক দীর্ঘ অনুষ্ঠান সমাপনের পর মাউণ্টব্যাটেন আবার দিল্লী ফিরে এসেছেন। তা ছাড়া ভারতের চারটি দেশীয় রাজ্যেও গবর্ণর জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনকে সরকারী কর্তব্য হিসাবে একবার ঘুরে আসতে হয়েছে। কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, উদয়পুর এবং কাপুরথালাও দেখা হয়ে গেছে। মাউণ্টব্যাটেনের উড়িষ্যা ও আসাম ভ্রমণের সময় আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম না। সেই কয়েকটা দিন আমি কলকাতাতেই গবর্ণর রাজাগোপালাচারীর অতিথি হয়ে ছিলাম।

দমদম বিমান ক্ষেত্রে রাজাগোপালাচারী উপস্থিত ছিলেন। আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনার পর মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে আমরা দমদম থেকে কলকাতার গবর্ণমেণ্ট হাউস পর্যন্ত দীর্ঘ পথ মোটরযানে অতিক্রম করবার সময় ভারতের এক বিখ্যাত সহরের রূপ দেখবার সুযোগ পেলাম। গত চার বৎসর ধরে এইভাবে ভারতের অনেক সহর দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। কলকাতা সহরের উপকণ্ঠ এবং বস্তি অঞ্চলের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে মনের মধ্যে যে শঙ্কা ও নৈরাশ্যের বেদনা অনুভব করেছি, সেটা আমার নতুন অভিজ্ঞতা নয়। ভারতের অন্যান্য সহর অঞ্চলেও ভ্রমণের সময় একই অস্বস্তি বরাবর অনুভব করে এসেছি। কি আবর্জনাময় ও নোংরা এইসব সহরে জীবন। মানবীয় জীবনযাত্রার ন্যূনতম আশা ও অধিকারের নিম্নতম স্তরেরও নীচে পড়ে রয়েছে এইসব সহরের জীবনযাত্রার পদ্ধতি। অবনত জীবনের এই রূপ মার্জিত ও উন্নত করা কি ধীরে-সুস্থে চালিত কোন সংস্কারের নীতি ও প্রয়াসের দ্বারা সম্ভবপর? এই অবনত জনতাজীবনের একমাত্র দাবী হলো—'আজই চাই।' এক দিনের মতও অপেক্ষা ক'রে থাকার সংগতি এদের নেই। প্রতিদিনের অভাবের তাড়নায় এই জীবন পর্যুদস্ত! রুটি চাই আজই—এই হলো প্রতিদিনের দাবী। যেখানে একটি দিনের সমস্যারই এই রূপ, সেখানে সমগ্রের উন্নতি যে কত দূরের এবং কত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, সেটাও অনুমান করতে পারি। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, যান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থার শোষণ প্রক্রিয়া এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার বিভীষিকা থেকে এই জনতাজীবনের মুক্তি সুদূরপরাহত বলেই মনে হচ্ছে। এর মধ্যে আর এক সমস্যা হলো কম্যুনিষ্ট প্রবঞ্চকের দল, যারা সব সমস্যা সমাধান করে দেবে ব'লে এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণের অপেক্ষায় রয়েছে।

কলকাতার মেয়র এক চায়ের আসরে মাউণ্টব্যাটেনকে সম্বর্ধনা করলেন। মাউণ্টব্যাটেনের 'ধমনীতে প্রবাহিত রাজবংশের শোণিতের' স্তুতি ক'রে ভাষণ দান করলেন মেয়র। তা ছাড়া আলঙ্কারিক ভাষায় হিজ এক্সেলেন্সীর গুণগ্রামেরও প্রশংসা করলেন। দেশ খণ্ডনের কথা উল্লেখ ক'রে মেয়র বললেন যে, এই অখণ্ড ও অবিভাজ্য প্রাচীন দেশ এক ঐতিহাসিক সত্তাকে ক্ষুণ্ণ ক'রে আজ স্বাধীনতা লাভ করেছে। ভাষণের উপসংহারে মেয়র বললেন, "ইওর এক্সেলেন্সী, আপনি আপনার নিপুণ অঙ্গুলি এবং বলিষ্ঠ বাহুর সাহায্যে দুটি নিকেতন সৃষ্টি করেছেন। আমরা আশা করি, ইওর এক্সেলেন্সী এরপর এই দুই সৃষ্টিকে একটি শান্তির সেতু এবং একটি আনন্দের সেতু দিয়ে যুক্ত করে দেবেন।" এই তুরীয় কল্পনা অথবা চায়ের পেয়ালার শব্দ ঝঙ্কার, কিংবা সভার ভীড়ের নিঃশ্বাসে বাতাস ভারি হয়ে ওঠায়, ঠিক বলিতে পারি না এর মধ্যে কোন্‌টির জন্য মাউণ্টব্যাটেন একটু লজ্জিত হয়ে উঠলেন

এবং একটা অস্বস্তির ভার অনেক চেষ্টায় সহ্য ক'রে তাঁর বক্তৃতাও শেষ ক'রে দিলেন।

বক্তৃতা শেষ হবার পর গবর্ণর রাজাগোপালাচারী আমার টেবিলের কাছে এসে বসলেন। কথায় কথায় কাশ্মীরের প্রসঙ্গ, তারপর প্যাটেলের প্রসঙ্গও এসে পড়লো। রাজাগোপালাচারী বললেন, প্যাটেলের মনের ভেতরে নারীসুলভ একটা মমতাপ্রবণ ভাব আছে। প্যাটেলের সম্বন্ধে গান্ধীর একটি মন্তব্যের উল্লেখ করলেন রাজাগোপালাচারী। গান্ধী বলতেন, সর্দারের চরিত্রে মাতৃসুলভ স্নেহপরায়ণ ভাব দেখা যায়। রাজাগোপালাচারী বললেন, তিনটি বিশেষণের দ্বারা তিনি প্যাটেলের চরিত্র সংক্ষেপে বলে দিতে পারেন—'বিশ্বস্ত, স্নেহশীল ও একরোখা'।

ইতিহাসের চাকা কিভাবে ঘুরে গেল, সে সম্বন্ধেও অনেক কথা বললেন রাজাগোপালাচারী। আজ এই কক্ষে মাউণ্টব্যাটেন ও তিনি এমন শুভলক্ষ্মণপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে একসঙ্গে বসে খাবার খাচ্ছেন, এমন ঘটনাও বাস্তবে ঘটে গেল। রাজাগোপালাচারী বললেন যে, সম্প্রতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর বক্তৃতায় অতীতের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এখন যে অট্টালিকায় দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত, সেই অট্টালিকারই তের নম্বর কক্ষে লেডি মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেন পরিণয়ের অঙ্গীকারসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। মাউণ্টব্যাটেনের এই উক্তি শুনে রাজাগোপালাচারীও তখুনি স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন। সেই সময় তিনি কোথায় ছিলেন? রাজাগোপালাচারীর মনে পড়ে গেল, মাউণ্টব্যাটেন ঠিক যে সময়ে দিল্লীর এই বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের তের নম্বর কক্ষে লেডি মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে পরিণয়ের অঙ্গীকার ঘোষণা করছিলেন, সেই সময়ে রাজাগোপালাচারী ছিলেন এই দিল্লীরই জেলের পঁয়ষট্টি নম্বর কক্ষে।

আজ গবর্ণমেণ্ট হাউসের নৈশ ভোজনের আসরে সুভাষের ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সুভাষ এখনো বাঙালী জাতীয়তাবাদের হিরো। শরৎ এক সময়ে ভাইসরয়ের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। এখন তিনি বাংলার অশান্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে সরকারবিরোধী সোস্যালিস্ট সংহতির অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও সমর্থক।

দিল্লীর গবর্ণমেণ্ট হাউসে এতদিন ধরে কোন চঞ্চলতার সাড়া ছিল না। আমরা ফিরে আসার পরও বিশেষ কোন কাজের সাড়া জেগে উঠলো না, কারণ দিল্লী এসেই আবার কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে যেতে হলো। সুদূর দক্ষিণের কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর এবং নিকটের উদয়পুর ও কাপুরথালা ঘুরে আসতে হয়েছে।

কাপুরথালা গিয়ে কয়েক মুহূর্তের মত একটা সরস আমোদ উপভোগের সুযোগ পেয়েছি। কাপুরথালার মহারাজার বয়স হলো ছিয়াত্তর বৎসর। বিগত একাত্তর বৎসর ধরে তিনি গদিতে রয়েছেন, কারণ পাঁচ বৎসর বয়সেই তাঁকে হিজ হাইনেস হয়ে গদিতে আরোহণ করতে হয়েছিল। মাউণ্টব্যাটেন দম্পতিকে অভিনন্দন জানাবার সময় কাপুরথালার মহারাজা তাঁর বক্তৃতায় বললেন—'লর্ড ও লেডি উইলিংডনকে আজ এ রাজ্যে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার সুযোগ পেয়ে ইত্যাদি'।

কোচিনের মহারাজার সঙ্গে আলাপ করতে মাউণ্টব্যাটেনকে বেশ অসুবিধা ভুগতে হয়েছে। মহারাজার শরীর খুবই অশক্ত ও অসুস্থ ব'লে মনে হলো। মহারাজা শুধু তাঁর ঘরোয়া ও পারিবারিক বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে নানা কথা শোনাতে আরম্ভ করলেন। মহারাজা জানালেন যে, তাঁর পরিবারের লোকসংখ্যা হলো চার শত ষাট। একটি মাত্র রাজনৈতিক প্রশ্ন করলেন মহারাজা। মাউণ্টব্যাটেনকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—স্টালিনের সঙ্গে কি আপনার কখনো দেখা হয়েছে?

দিল্লী ফিরে এসে মাউণ্টব্যাটেন দেখলেন যে, সেই হায়দরাবাদ-সংকটই তাঁর অপেক্ষায় রয়েছে। বর্মা থেকে ফিরে এসেই মাউণ্টব্যাটেন দেখেছিলেন যে, নিজামের কাছ থেকে তাঁর উদ্দেশে লেখা একখানি চিঠি এসে পড়ে রয়েছে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলিতে যাবার জন্য তখুনি মাউণ্টব্যাটেনকে আবার দিল্লী ছেড়ে যেতে হয়েছিল ব'লে তিনি গবর্ণমেণ্টের দেশীয় রাজ্য দপ্তরকেই নিজামের এই চিঠির উত্তর দেবার জন্য অনুরোধ ক'রে গিয়েছিলেন। আর একটি উদ্দেশ্য ছিল মাউণ্টব্যাটেনের। তিনি নিয়মতন্ত্র অনুসারে যা করতে পারেন, একমাত্র সেই কর্তব্যটুকু পালন করা ছাড়া অন্য কোনভাবে এইসব বিরোধবিষয়ক আলোচনার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিলেন না। তিনি নিয়মতন্ত্র অনুসারে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিতে পারেন ঠিকই, কিন্তু 'কাজ' করতে পারেন একমাত্র গবর্ণমেণ্টেরই পরামর্শ অনুসারে।

দেশীয় রাজ্য দপ্তর নিজামকে যে চিঠি প্রত্যুত্তরে পাঠিয়েছেন, তার খসড়া প্রথমে রচনা করেছিলেন ভি পি। প্যাটেলের হাতে পড়ে সে চিঠির ভাষা আর এক দফা কড়া হয়ে উঠলো, নেহরু আবার সে চিঠিকে এক দফা নরম ক'রে দিলেন। এত ক'রেও শেষ পর্যন্ত যে উত্তর তৈরি হলো, তার মধ্যে যথেষ্ট শক্ত ভাষা ও শাসানির ভাব রয়েই গেল। এই চিঠিই নিজামের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন দেশীয় রাজ্য দপ্তর। প্রেরিত হবার আগে এই চিঠি দেখবার সুযোগ পাননি মাউণ্টব্যাটেন। চিঠিতে খোলাখুলিভাবেই নিজামকে এই ব'লে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে, তিনি স্থিতাবস্থা চুক্তি ভঙ্গ করেছেন। চুক্তি অনুসারে অঙ্গীকৃত দায়িত্ব পালনের জন্য নিজামকে বলা হয়েছে। তা ছাড়া ইত্তেহাদ ও রাজাকর দলকে নিষিদ্ধ করার জন্যও নিজামকে অনুরোধ করা হয়েছে।

মঙ্কটন এর আগেই অবশ্য জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি হাত গুটিয়ে নিয়েছেন এবং হায়দরাবাদের ব্যাপারে আর ভিড়তে আসবেন না। কিন্তু ২৮শে মার্চ তারিখেই লণ্ডন থেকে হায়দরাবাদ ফিরে এসে মঙ্কটন আবার এই ঘটনার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের দেশীয় রাজ্য দপ্তরের চিঠি পড়ে এবং চারদিকের ব্যাপার দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন। মঙ্কটন যদিও শান্ত স্বভাবের মানুষ কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের এই চিঠি পড়ে তিনি ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়েছেন। গত রাত্রেতেই তিনি হায়দরাবাদ থেকে সোজা দিল্লী চলে এসেছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নিজামের একখানি চিঠি মাউণ্টব্যাটেনের কাছে লেখা। মঙ্কটন এই ব্যাপার নিয়ে সবারই সঙ্গে যেন যুদ্ধ করবার জন্য একটা উত্তেজিত মনোভাব নিয়ে হাজির হয়েছেন। গবর্ণর জেনারেল হোন্ বা আর যেই হোন্, কাউকে এবার আর ছেড়ে কথা বলবেন না মঙ্কটন। এখন, এইরকম ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত মঙ্কটনের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাউণ্টব্যাটেনকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হবে।

(ক্রমশঃ)

সাহেব বিবির দেশে

নরেন্দ্র দেব
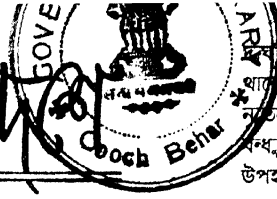
(ফ্রান্স—৬)

সে রাত্রে আমরা আর কোথাও বেরুতে পারিনি। প্রায় সারা দিনটাই বিপুল উৎসাহে বিপুলতর ভের্সাই প্রাসাদের মধ্যে পায়ে পায়ে ঘুরে ঘুরে বেশ একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সবকিছু খুঁটিয়ে দেখবার আগ্রহে ও উত্তেজনায় তখন কিছুমাত্র শ্রান্তি অনুভব করিনি বটে, কিন্তু ফিরে এসে বোঝা গেল কতখানি কাবু হয়ে পড়েছি। ঠাণ্ডাটাও পড়েছিল সেদিন যেন একটু অতিরিক্ত রকমের। সন্ধ্যা থেকে বেশ বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। আমরা সত্বর রাত্রিকালীন দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা সেরে নিয়ে সোজা হোটেলে এসে একেবারে যে যার বিছানায় নরম গরম লেপের মধ্যে আশ্রয় নিলাম। শ্লিপিং স্যুটের উপর পশমী পুলওভার চড়িয়ে শুতে হোলো। এখানে বৃষ্টি নামলে মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক হিটারও চালাতে হত, যদিও প্যারিসে তখন হিটার নেওয়ার সময় নয়। আমরা গরম দেশের মানুষ বলে আমাদের জন্য সদাশয়া হোটেল পরিচালিকা বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি আগেই বলেছি, ফরাসীরা মানুষ ভাল। ইংরেজের মত নাকতোলা 'নেটিভ-হেটার' নয়। ফরাসী সাম্রাজ্য ও উপনিবেশের কত জাতিধর্মের মানুষই না এখানে রয়েছে। ফরাসীদের সঙ্গে সর্বত্র তারা সমান অধিকার ভোগ করে। "মহামানবের তীর্থ" বলা চলে প্যারিসকে। অবশ্য ইংলণ্ডেও সাধারণত এর ব্যতিক্রম দেখিনি, তবে ওখানে অভিজাত ধনী সমাজ অধ্যুষিত কোনও কোনও ক্লাবে, হোটেলে ও প্রীতিসম্মেলনে কালা আদমীরা যে সত্যই অবাঞ্ছিত এতে কোনও সংশয় নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার নকল ইংরেজ উপনিবেশীদের মত এ'রা অতটা বেপরোয়া উগ্র না হলেও এ'দের মধ্যে মোলায়েম রকম বর্ণবিদ্বেষ আছে বৈকি। কিন্তু মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের মধ্যে এ বিষ আজকাল আর নেই। তারা বর্ণ গৌরবের অহঙ্কার থেকে সত্যই মুক্ত। বোধ করি, বর্ণগৌরবের ঝাঁঝটা আসে স্বর্ণ গৌরবের সঙ্গে সঙ্গেই। তা' ছাড়া সমগ্র পৃথিবীর মানব সমাজের জাগরণ সম্বন্ধেও অভিজাত ধনিক সমাজের চেয়েও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজই বেশি সচেতন।

আমরা এখানকার সবরকম সমাজেরই সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলাম। শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা যতদিন ধনমান ও যশগৌরবে স্ফীত না হ'ন, ততদিন তাঁরা বেশ মিলে মিশে থাকেন সাধারণের দলে। সকলের সঙ্গে মেশেন, হাসেন, খেলেন, পান-ভোজন করেন নির্বিকার চিত্তে। কিন্তু খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যদি আবার তাঁরা রাজসম্মান ও উপাধিতে ভূষিত হন বাস্! একেবারে অভিজাত শ্রেণীতে গিয়ে তাঁরা নাম লিখিয়ে বসেন। বাড়ি, গাড়ি, পার্টি, বোলবোলাও। পূর্বজীবনের সঙ্গীদের যেন আর চিনতেই পারেন না! এ দুর্ঘটনা সকল দেশেই বোধহয় ঘটে থাকে। আমাদের দেশের লেখকের কোনও নূতন বই প্রকাশিত হ'লে তাঁর আত্মীয় ও বন্ধুরা তাঁর কাছে বিনামূল্যে একখানি বই উপহার পাবার আশা করেন। কিন্তু এদেশের কোনও লেখকের একখানি নূতন বই প্রকাশিত হ'লে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা পড়ে যায়—কে তাঁর বইখানির প্রথম ক্রেতার গৌরব অর্জন করতে পারবে? নিজের বন্ধু বা আত্মীয় লেখকের প্রথম সংস্করণের বই নিজের কাছে না থাকা এদেশের মানুষের অগৌরবের বিষয়। সেজন্য লেখকের প্রধান ও প্রথম ক্রেতা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়েরা। আমাদের দেশের পত্রিকা সম্পাদকদের কাছে সমালোচনার জন্য বই পাঠালে তাঁরা দীর্ঘদিন বই ফেলে রেখে দেন, একটা প্রাপ্তি সংবাদ পর্যন্ত দেওয়া কর্তব্য বা রীতি-সম্মত বলে মনে করেন না। বইখানির সঙ্গে সমালোচনাটিও লিখে পাঠাতে পারলে তবেই আমাদের দেশের সম্পাদকেরা সেটি ছেঁটে কেটে ধীরে সুস্থে প্রকাশ করেন, কিন্তু এদেশে ঠিক তার বিপরীত। সমালোচনার জন্য বই পাঠালেই সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাপ্তিস্বীকার আসে এবং যতশীঘ্র সম্ভব সমালোচনাটিও বিনা তাগাদায় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। খাতিরে পড়ে খারাপকে এরা
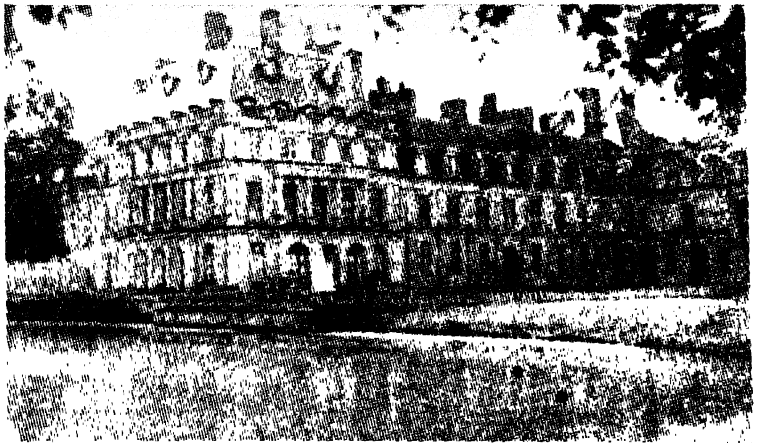
ফঁতেরোয়া রাজপ্রাসাদের পার্শ্বে প্রসিদ্ধ কার্পলেক

মাদাম মাঁতোয়াঁর কেনা বাসভবন ও মাঁতোয়াঁ এস্টেট্

কখনো ভাল বলে না। এ'দের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রচনা পাঠালেও তা হয় যথাসময়ে প্রকাশিত হয়, নয়ত ফেরৎ আসে! প্রকাশিত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে আসে দক্ষিণার চেক্ খানি। আর আমাদের দেশে? ডাক টিকিট পাঠালেও রচনা সম্বন্ধে কোনও খবর পাওয়া যায় না! লেখা প্রকাশিত হলে, তাগাদা করেও পারিশ্রমিক মেলে না! ওদের দেশের সঙ্গে আমাদের শুধু বর্ণগত পার্থকাই নয়, রীতিনীতিগত ও ব্যবস্থাগত পার্থক্যও যথেষ্ট।

সকালে উঠে প্রাতরাশের পর ছুটলাম আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানীর বাস ধরবার জন্য। আজ আমরা চলেছি নেপোলিয়'র জীবনের সুখদুঃখের অক্ষয় স্মৃতি বিজড়িত 'ফ'তেরোয়া' প্রাসাদ দেখতে। পারিস থেকে মাত্র আটত্রিশ মাইল দূরে এই ক্ষুদ্র 'ফ'তেরোয়া' জনপদ। বিশাল ঘন অরণ্য ও অনতিউচ্চ শৈলমালা মণ্ডিত এর সুন্দর প্রাকৃতিক পটভূমিকা। কোলের কাছে প্রসিদ্ধ কার্পলেকের কালোজল টলমল করছে। নগরটিকে দূরে থেকে যেন কোনও শক্তিশালী শিল্পীর আঁকা নিসর্গ চিত্রের 'অয়েল পেণ্টিং' বলে মনে হয়! আমরা এখানে এসে পৌঁছে গেলাম এক ঘণ্টার মধ্যেই।

ফ্রান্সের অগণিত রাজপ্রাসাদের মধ্যে বোধ করি ভের্সাইয়ের পরই এই 'ফ'তেরোয়া' প্রাসাদের নাম করা যেতে পারে। বিশালতার দিক থেকে এবং স্থাপত্য সৌন্দর্যের তুলনায় 'ফ'তেরোয়া' প্রাসাদ হয়ত ভের্সাইয়ের তুলনায় তেমন কিছু নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক গুরুত্বে ও মর্যাদা গৌরবের দিক থেকে এই ফ'তেরোয়া প্রাসাদ ভের্সাই অপেক্ষা কোনও অংশে কম নয়। এ প্রাসাদটির নির্মাণ কার্যও নাকি কয়েক শতাব্দী ধ'রেই চলেছিল। রাজারাজড়াদের খেয়ালখুশী মতো চলেছিল এখানে কেবলই ভাঙাগড়ার খেলা! ফলে, এই প্রাসাদটি দেখতে এলে পরপর কয়েক যুগের ফরাসী স্থাপত্যকলার প্রায় সবরকম নিদর্শনই এখানে মেলে। 'ফ'তেরোয়া' প্রাসাদটিকে দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়'ই অবশ্য প্রথম একটি বিশেষ মর্যাদায় মণ্ডিত ক'রে তুলেছিলেন। এই প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের নামই হয়ে গেছে 'আজ ক্যুর্ দ্য আদিয়্' অর্থাৎ 'বিদায় তোরণ'। ১৮১৪ খৃঃ অব্দে ব্রিটেন রাশিয়া প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার যুক্ত আক্রমণে সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মতো পরাস্ত নেপোলিয়' পশ্চাদপসরণ করে পারিস ছেড়ে এই ফ'তেরোয়া' প্রাসাদে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু অবস্থা ভয়াবহরূপে সংকটজনক বুঝে রাজ্য ও রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হন। এই চলে যাবার দিন ফ'তেরোয়া প্রাসাদের দ্বার দেশে দাঁড়িয়ে তিনি আপনার বিশ্বস্ত পুরাতন দেহরক্ষীদের (ভোয়াগার্দ) একটি বিদায়ী বাণী দিয়ে যান। সেই থেকে এই প্রাসাদে প্রবেশদ্বারের নাম হয়ে গেছে 'বিদা[illegible] তোরণ!'

ফ'তেরোয়া রাজপ্রাসাদটি বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না যে, এই প্রাসাদের মধ্যে পাশাপাশি ও পরস্পর সংযুক্ত পাঁচটি পৃথক মহল আছে। পাঁচটি মহলেরই পাঁচটি সূচাগ্র চূড়া আকাশের দিকে মাথা তুলে এই ঐতিহাসিক প্রাসাদটিকে যেন একটা অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। প্রাসাদের ঠিক মাঝামাঝি প্রাসাদের উপরে ওঠবার অশ্বক্ষুরাকৃতি বিস্তৃত সোপান শ্রেণী প্রাসাদটিকে যেন একটি রাজকীয় মর্যাদায় মণ্ডিত করে তুলেছে। এদিকের প্রত্যেক রাজপ্রাসাদেই প্রায় দেখা যায় প্রাসাদের অভ্যন্তরেই এক একটি উপাসনা মন্দির থাকে। খৃষ্টধর্মই এদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। রাজা ও রাজপরিবারের সকলেই খৃষ্টধর্মে অনুরাগী ছিলেন বলে তাঁদের উপাসনার ব্যবস্থা ছিল প্রাসাদের মধ্যেই। [illegible] সাধারণের জন্য যে সকল [illegible] দ্বার সর্বদা অবারিত রাজা [illegible] রাজকীয় মর্যাদা নিয়ে সর্বসাধারণের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে উপাসনা করবে[illegible] কেমন করে? রাজা তো প্রাসাদ [illegible] বেরুলেই রাজভক্ত প্রজার দল পথে [illegible] জমিয়ে তোলে। সাধারণ গির্জায় [illegible] ঢুকলে কি রক্ষা আছে? তাছাড়া [illegible] অনুচর গুপ্তঘাতকেরাও তো [illegible] মাথাটার সন্ধানে থাকে! কাজেই রাজা[illegible]দের ব্যবহারের জন্য প্রাসাদের মধ্যেই [illegible]ভাবে একটি উপাসনা মন্দির নির্মাণ [illegible] রাখা হ'ত তাঁদের নিরাপত্তার জন্য।

'ফ'তেরোয়া' রাজপ্রাসাদে প্রবেশ [illegible] প্রথমেই আমরা এসে পড়লাম এই [illegible] উপাসনা মন্দিরে। এটির নাম '[illegible] চ্যাপেল'। ট্রিনিটি বলতে আমরা যে '[illegible]' বুঝি—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, অর্থাৎ সৃষ্টি[illegible] কর্তা, পালন কর্তা ও ধ্বংসকর্তা, এ'রা [illegible] 'ত্রয়ী' বোঝেন না। এ'দের 'ত্রয়ী' হলেন [illegible] বাইবেলোক্ত—পিতা, পুত্র ও পবিত্র [illegible]! ('ফাদার—সন এণ্ড্ দি হোলি [illegible]') রাজারাণীদের উপযুক্ত জমকালো উপাসনা মন্দিরই বটে। ভক্তির ছটা তাঁদের কিছু ছিল কিনা জানি না, কিন্তু কারুকার্যের ঘটা

দেখলাম প্রচুর। উপাসনা মন্দিরের পর প্রাসাদের একতলাতেই ছিল ফ্রান্সের জনগণের নির্বাচিত প্রথম রাজ্যপরিচালক নেপলিয়' ও তাঁর পত্নী সুন্দরী যোসেফাইনের মহল। উপরে উঠে পাওয়া গেল প্রথমেই 'সম্রাট নেপলিয়'র' মহল। জনগণের নির্বাচিত রাজ্য-পরিচালক যখন নিজের 'সম্রাট' রূপে প্রকটিত করলেন, তখন প্রাসাদের নিচের তলা থেকে উপরে না উঠে এলে আর সম্রাটের মর্যাদা থাকে না!

সম্রাটের মহলের পর রাণীদের মহল, তারপর 'ডায়নার চিত্রশালা,'। এখানে আগে ডায়নার একটি চমৎকার মূর্তি ছিল। এখন সেটি লুভর মিউজিয়মে স্থানান্তরিত হয়েছে, কিন্তু চিত্রশালার 'ডায়না' ডাক নামটি এখনও আছে। এরপর নৃপতি ফাঁসোয়ার দরবার কক্ষ এবং নৃপতি ত্রয়োদশ লুইয়ের দরবার কক্ষ। এ থেকে বোঝা যায় এক রাজার দরবার কক্ষ পরবর্তী রাজা আর ব্যবহার করতেন না। নূতন রাজার জন্য নূতন একটি দরবার ঘরের ব্যবস্থা করতে হ'ত। তারপর 'সাঁৎ লুই হল' নৃপতি দ্বিতীয় হেনরীর সখের চিত্রশালা। ফ'তেব্লোয়া প্রাসাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দেখলাম এই নৃপতি দ্বিতীয় হেনরীর চিত্রশালা। এ'র পিতা নৃপতি প্রথম ফ্রান্সিসের স্বর্গারোহণের পর ইনি ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ফ্রান্সের রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। যুবরাজ হেনরি যখন মাত্র পনেরো বছরের কিশোর বালক তখন ক্যাথারীন দ্য মেদিসির সঙ্গে এ'র বিবাহ হয়। ক্যাথারীনের বয়স তখন সবে চৌদ্দ বছর। তিনি ফ্লোরেন্সের মেয়ে। ধনী ব্যবসায়ী লরেঞ্জো দ্য মিদিসি, পরে ডিউক অফ্ আর্বিনোর ইনি একমাত্র কন্যা। এই মিদিসি পরিবার ফ্লোরেন্সের ব্যবসায়ী বেনে বংশ। টাকার জোরে এ'রা ফ্লোরেন্সের হর্তাকর্তা হয়ে উঠেছিলেন এবং রাজারাজড়ার ঘরে কুলকর্ম করে অভিজাত শ্রেণীতেও উন্নীত হয়েছিলেন। ফ্রান্সের বনিয়াদী রাজবংশের বধূ হয়ে গিয়েও ক্যাথারীন সেখানে আমল পেতেন না। রাজসভাতেও তাই প্রথমটা তাঁর প্রাপ্য সম্মান তিনি পান নি। বেনের মেয়ে বলে রাজসভায় সকলে তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতো। হেনরী রাজা হবার পরও ফ্রান্সের রাজসভায় তিনি রাণীর উপযুক্ত মর্যাদা পান নি। তারপর তিনি যখন রাজ-
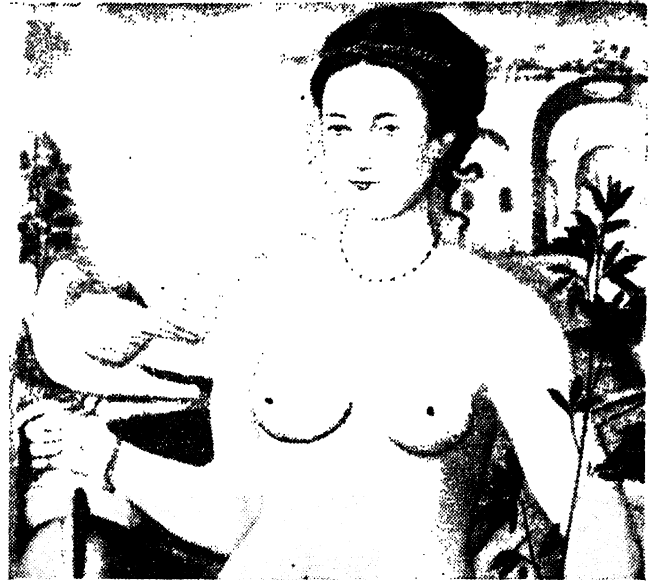
'শান্তি' দেবী (ফ'তেব্লোয়া রাজপ্রাসাদের চিত্র)

মাতা হলেন, পর পর তাঁর দুই ছেলে যখন রাজা হল, বড় ছেলে রাজা দ্বিতীয় ফ্রান্সিসের বৎসরকাল পরেই মৃত্যু হয়, তখন নৃপতি নবম চার্লস রূপে ক্যাথারীনের দ্বিতীয় পুত্র সিংহাসনে বসেন। বালক রাজার অভিভাবিকারূপে এই সময় ক্যাথারীনই একরকম ফ্রান্সের প্রকৃত শাসনকর্ত্রী হয়ে উঠেছিলেন এবং একদিন যাঁরা তাঁকে রাজসভায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিল তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। রাজা দ্বিতীয় হেনরীর চিত্রশালার প্রধান বিশেষত্ব দেখলাম এ ঘরের মেঝেটিতে পাথর বসিয়ে 'ইনলেইডের' কাজ করা এবং ছাতে অতি চমৎকার চৌখুপী ধরণের ছক কাটা কারুকার্যখচিত। এ ঘরে যে ছবিগুলি রয়েছে তার প্রত্যেকখানিই রাজপ্রাসাদে রাখবার উপযোগী অপূর্ব সুন্দর আলেখ্য। এর পরই মাদাম মাতোঁয়ার মহল। ফরাসী রাজপ্রাসাদের ইতিহাসে মাদাম মাতোঁয়া এক রহস্যময়ী নারী। ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে এক অপদার্থ পিতার ঔরসে বোদোঁর দুর্গ মধ্যে এই মেয়েটির জন্ম হয়। সেদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে এই মেয়ে একদিন ফ্রান্সের রাজপরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে দূরকালেও সভ্যজগতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বেকার বাপের নাম ছিল কনস্তান্ত দাউবিঁয়ে। মেয়ের নাম ফ্রাঁসোয়া দাউবিঁয়ে। দশ বছর বয়সে পিতৃহীনা। পনেরো বছর বয়সে মাতৃহীনা, অর্থাৎ, একেবারে অনাথা। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে সাতাশ বছর বয়সে তিনি ফ্রান্সের খঞ্জ কবি স্কারোঁকে ভালবেসে বিবাহ করেন। কিন্তু 'অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায় যায়! দাম্পত্যজীবন বেশীদিন স্থায়ী হল না। কবি তাঁকে আবার অসহায় নিঃসম্বল রেখে স্বর্গে চলে গেলেন। এই সময় নৃপতি চতুর্দশ লুইয়ের প্রণয়িনী শ্রীমতী ম'তেপাঁর গর্ভে রাজপুত্রগণের 'গভর্নেস্' হিসাবে শ্রীমতী স্কারোঁ নিযুক্ত হন। ভগবান তাঁকে আর্থিক সুখসম্পদ থেকে বঞ্চিত করলেও অসামান্য রূপ দিয়েছিলেন। আর গুণ যা কিছু সে তাঁর নিজের বহুকষ্টে অর্জিত শিক্ষার সম্পদ। দরিদ্র পল্লীর অনাথা মেয়ে রাজপ্রণয়িনীর প্রাসাদে এসে প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ বৎসর। যৌবনের দীপ্তি তখনও ম্লান হয়নি। মায়ের অধিক স্নেহে তিনি রাজপুত্রগণের লালন পালন ও শিক্ষার ভার

নিলেন। শ্রীমতী মঁতেপাঁ অত্যন্ত খুশী হলেন তাঁর কাজে ও ব্যবহারে। দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে জন্মাবধি যুদ্ধ করতে হ'লেও চরিত্রের দিক থেকে শ্রীমতী স্কাঁবো প্রকৃতই সাধ্বী ছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের প্রবল প্রতাপান্বিত সর্বজনপ্রিয় রাজা চতুর্দশ লুইয়ের রূপতৃষ্ণার্ত লুব্ধ দৃষ্টি থেকে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারলেন না। চতুর্দশ লুইয়ের বয়স তখন মাত্র একত্রিশ। শ্রীমতী স্কাঁবো তাঁর চেয়ে বয়সে তিন বছরের বড়। কিন্তু হলে কি হবে, রাজা শ্রীমতী স্কাঁবোর জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। যে ধরা দিতে চায় না সে বোধ হয় আকর্ষণ করে বেশী। রাজা তাঁর পূর্বপ্রণয়িনী মঁতেপাঁকে পরিত্যাগ করে শ্রীমতী স্কাঁবোর একান্ত অনুগত ও প্রেমাসক্ত হয়ে পড়লেন। বাইশ বছর বয়সে নৃপতি লুই স্পেনের রাজা চতুর্থ ফিলিপের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। বিবাহের ঠিক বাইশ বছর পরে রাণীর মৃত্যু হয়। রাণীর মৃত্যুর পর রাজা শ্রীমতী স্কাঁবোর চাপে পড়ে তাঁকে গোপনে বিবাহ করতে বাধ্য হন। শ্রীমতী স্কাঁবো কিন্তু তখন আর শ্রীমতী স্কাঁবো বলে পরিচিতা ছিলেন না। নৃপতি চতুর্দশ লুইয়ের অকৃপণ উদার হাত থেকে তিনি এত বেশী অর্থ, অলঙ্কার ও বিবিধ সম্পদ উপহার পেয়েছিলেন যে, সেই অর্থের বিনিময়ে তিনি রাজবাড়িতে প্রবেশ করবার মাত্র পাঁচ বৎসর পরেই ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্গত 'মাতোঁয়া এস্টেট' কিনে রাজার প্রসন্ন অনুগ্রহে অবিলম্বে 'মার্শনেস অফ মাতোঁয়া' উপাধিতে ভূষিত হয়ে রাজসভাতে সসম্মানে গৃহীত হন। ভিখারিণী হলেন রাজরাণী। সেই থেকে সবাই তাঁকে 'মাদাম মাতোঁয়া' বলেই উল্লেখ করে। তাঁর পূর্ব নাম 'শ্রীমতী স্কাবোঁ' রাজ ঐশ্বর্যের ঘূর্ণী হাওয়ায় সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে মুছে গিয়েছিল। একেই বলে এক জীবনেই ঘটে যাওয়া জন্মজন্মান্তর!

এই ফঁতেরোয়া রাজপ্রাসাদের যে-মহলে তিনি বাস করতেন আজও লোকে তাকে 'মাদাম মাতোঁয়ার মহল' বলেই উল্লেখ করে। রাজাকে তিনি স্নেহের সঙ্গে হৃদয়ও দান করেছিলেন। মাদাম মাতোঁয়ার গভীর অকপট প্রেম লুইকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছিল। রাজার মৃত্যু মাদাম মাতোঁয়ার জীবনে যে শূন্যতা এনেছিল তিনি তা সহ্য করতে পারেন নি। আপন শৈশবের অনাথ অবস্থা স্মরণ করে তিনি ফ্রান্সের অনাথ বালিকাদের জন্য যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই আশ্রমের কাজে এইবার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করে দিলেন। কিন্তু বেশি দিন রাজার বিরহ তাঁকে সহ্য করতে হয়নি। নৃপতি চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যুর চার বছরের মধ্যেই সৌভাগ্যশালিনী জন্মদুঃখিনীও তাঁর অনুগমন করেন।

মাদাম মাতোঁয়ার মহলের পর নৃপতি প্রথম ফাঁসোয়ার চিত্রশালায় গেলাম।
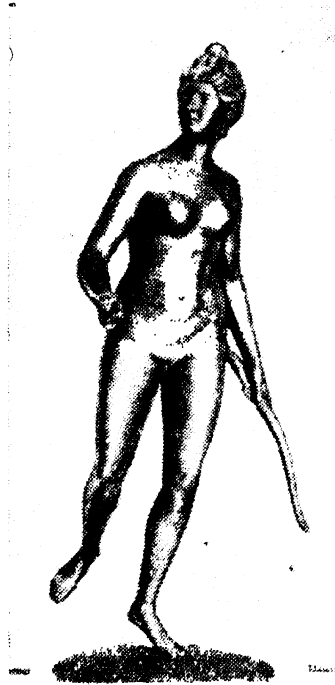
'ডায়না' দেবীর মূর্তি

ফ্রান্সের নৃপতিবৃন্দ যে কত শিল্পানুরাগী ছিলেন তার পরিচয় পাই আমরা তাঁদের মনোহর সব প্রাসাদগুলি থেকে আর তাঁদের এই সব মূল্যবান চিত্রসংগ্রহ থেকে। স্বীকার করি, রাজাদের সংগৃহীত চিত্রশালার অধিকাংশ চিত্রই কোনও না কোনও নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নারীর প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য সংগ্রহের মধ্যেও তাই, কিন্তু এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে যে, তাঁদের রুচি ছিল যথার্থ শিল্পীমানসের। কারণ, তাদের সংগৃহীত চিত্রগুলির একখানিকেও কেউ অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ বলতে পারবেন না। চিত্রশালার পর রাজমাতাদের মহল। এ মহলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। এর পরই কাচের বাসনের প্রদর্শনী। রাজ রাণীরা যা ব্যবহার করতেন। সুতরা অবহেলা করবার নয়। ফঁতেরোয়া রাজ প্রাসাদের সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়েছে এ প্রাসাদের উত্তর দিকস্থ 'ডায়নার উদ্যা ডায়নার প্রতি এখানে বেশ একটু পক্ষ পাতিত্ব ছিল দেখা যায়। কেন তা কে জানে 'ডায়না' দেবরাজ জুপিটারের কন্যা। ইনি 'সতীত্বের' অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আবার মৃগয়া মহাশক্তি। তাই শিকারীদেরও ইষ্ট দেবী ফরাসী রাজবাড়িতে একদা এঁর এত খাতি ছিল কেন বোঝা গেল না। রাজ অন্তঃপুরে মেয়েদের সতীত্ব সম্বন্ধে যে বেশ সু রকম একটা কুসংস্কার ছিল এ কথা কোনও ঐতিহাসিকই দিতে পারেন না তবে রাজারা কেউ কেউ মৃগয়াসক্ত ছিলে বটে, কিন্তু জঙ্গলের হরিণেই মৃ সে মৃগয়া চলতো তাঁদের রাজ্যে রূপসী তরুণী শি দক্ষিণের বাগানটি মূল্যবান ফুল গাছে ভরা! এটি সম্পূর্ণ ই কায়দায় তৈয়েরী। তারপর 'কর্প' এই জলাশয়টিকে ঘিরে যে বাগান সম্পূর্ণ ফরাসী প্রথায় সাজানো। ই ধরণের বাগান আর ফরাসী ধরণের কথা শোনা ছিল বটে, যেমন শোনা 'আমরা ইংরাজী ধরণে কাসি আর ধরণে কাসি!' কিন্তু তফাৎটা কোথা কি তা জানা ছিল না। এখানে এ সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ ফলে আমরা আগেও যেখানে ছিলাম, সেইখানেই রয়ে গেলাম। উদ্যান হিসাবে এদের মধ্যে হয়ত বেশ কিছু শৈলীর ব্যবধান ছিল; কিন্তু মতো আনাড়ীদের অনভ্যস্ত চোখে পড়লো না! দুই বাগানই দেখে মনে বাঃ খাসা! রাজার বাড়ির বাগান এখান থেকে ফঁতেরোয়া প্রাসাদের ভূমিকায় যে নিবিড় অরণ্য তার দৃশ্য সুন্দর দেখায়। এইখানেই পুণ্যাত্মা পোপ যিনি নেপোলিয়ঁর রাজ্যাভিষেকে পৌরোহিত্য করেছিলেন, তিনি নেপোলিয় কর্তৃক বন্দী হয়ে এই ফতেরোঁয়া প্রাসা সুদীর্ঘ তিন বৎসর অবরুদ্ধ ছিলে নেপোলিয়ঁর পতনের পর তিনি মুক্তি পান

সারাদিন ফ্রান্সের এই ইতিহাস প্রাচীন রাজপুরীর কক্ষে কক্ষে স্বপ্নাবিষ্টে

ন্যায় বিচরণ করে, এর উদ্যানে সরোবরে ঘুরে ঘুরে কেটে গেল। সন্ধ্যার আগেই আমরা প্যারিসে ফিরে এলাম। বাস থেকে নামতেই রাস্তার উপর থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠ্‌লেন—'হ্যালো! হ্যালো! ইয়ু আর হিয়ার!' কাছে এগিয়ে এসে হৃদ্যতার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'কবে এসেছো আমাদের দেশে?' বললাম তাঁকে। কিন্তু, তখনও চিনতে পারিনি। প্রাণপণে চেষ্টা করছিলাম চিনবার। তিনি বললেন—'তুমি এসে আমার সঙ্গে দেখা করনি কেন? মনে নেই কলকাতায় সেই ফ্রেন্ডস সার্ভিস ক্লাবে তুমি আমার নাম ঠিকানা লিখে নিয়েছিলে এবং প্যারিসে নেমেই আমার সঙ্গে দেখা করবে বলেছিলে, কিন্তু এই পনেরো দিনের মধ্যে একদিনও আসতে পারলে না? আমার কথা বোধহয় মনেই ছিল না? না? কোথায় উঠেছো এসে?' বললাম তাঁকে। তিনি লাফিয়ে উঠে বললেন—'হা ঈশ্বর! আমাদেরই পাড়ায় এসে রয়েছো আর আমারই সঙ্গে দেখা করোনি? আমি তো থাকি—১৬৯নং র্যু য়ুনিভেরসাইতে!' বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল তাই ত! ইনিই তো ফ্রান্সের সেই তরুণ শিল্পী ও লেখক—'আরমাঁদ্ ফ্রলে'। ফ্রেন্ডস্ সার্ভিসের সঙ্গে ইনি ভারতে গিয়েছিলেন। খুব আমুদে ও মিশুক লোক। সকলের সঙ্গে এগিয়ে এসে আলাপ ক'রেছিলেন। নিজের ক্যামেরায় আমাদের এবং বিশেষ করে শাড়িপরা মেয়েদের অনেকেরই ছবি নিয়েছিলেন। তিনি বললেন আমার গোঁফ জোড়াটা দেখেই আমায় চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে চিনবো কেমন করে। এক বছর আগে দেখা। য়ুরোপে আসবার জল্পনা-কল্পনা তখন থেকেই চলছিল তাই ও'র 'কার্ড' চেয়েছিলাম, প্যারিসে এলে দেখা করবো বলে। ইনি বলেছিলেন, বড় দুঃখিত ম্যুশেঁ দেব! যতগুলো কার্ড এনেছিলাম সব নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। তোমাদের যে এতবড় দেশ আর এত লোক এদেশে বাস করে তাকি জানতুম? বলে নিজেই খুব হেসে উঠলেন। সদানন্দ পুরুষ। পকেট থেকে একখানা কোথাকার বেশ বড় 'ইন্‌ভিটেশন কার্ড' বার করে তার পিছনে বড় বড় করে লিখে দিয়েছিলেন, 'আর্‌মাঁদ্ ফ্রলে', ১৬৯ র্যু য়ুনিভেরসাইতে, প্যারিস —৭'।

ভাগ্যে সেই কার্ডখানা আমি সঙ্গে এনেছিলাম। আমার অ্যাটাচির মধ্যেই সেখানা ছিল। ক্ষিপ্র হাতে বার ক'রে তাঁর সামনে ধরে বললাম—'এই দেখুন, হিয়ার ইট ইজ!' আমরা আজ ডিনারের পরই আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার! পরম করুণাময় ভগবানের দয়ায় পথেই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।' ম্যুশেঁ ফ্রলে' খুশী হয়ে বললেন 'ভেরি গুড়' চলো, আজ তোমরা আমার সঙ্গেই ডিনার খাবে। কিন্তু, বড়ই দুঃখের ব্যাপার হল। আমায় তোমাদের প্যারিসে

পারিসের ফ্যাশান হাউসে—'প্রেস্ প্যারেড্'

আসার খবরটা যদি একটু আগে জানাতে, আমি তাহলে 'ইন্ অনার অব দি ইণ্ডিয়ান পোয়েট কাপ্‌ল্'—একটা পার্টি এ্যারেঞ্জ করতাম।' তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললাম—ঠিক সেই ভয়েই আমরা প্যারিসে এসে আপনাকে কোনও খবর দিই নি। কাল সকালে প্যারিস ছেড়ে চলে যাবো তাই আজ ইভনিংএ আপনার কাছে যাবো ঠিক করেছিলাম। ম্যুশেঁ ফ্রলে' বললেন—'ঠিক করেছিলে কি রকম? একখানা চিঠি না, একটা 'ফোন্' না, আমি ত' এই বেরিয়ে এসেছি, এখন কত রাত্রে বাড়ি ফিরবো তার ঠিক কি? তোমরা তো গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে? আমার সঙ্গে দেখাই হত না!

বললাম—তাই তো ভগবান আপনাকে আমাদের সঙ্গে পথের মাঝে মিলিয়ে দিলেন। আমাদের হতাশ করাটা তাঁর ইচ্ছা নয়। আমরা তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ম্যুশেঁ আর্‌মাঁদ ফ্রলে' হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'য়ু আর এ ভেরি ক্লেভার ফেলো চলো, তোমাকে জব্দ করবো। আজ আমার সঙ্গে খেতে হবে। ভাল ছেলের মতো চললাম তাঁর সঙ্গে। তিনি আমাদের অপেরা হাউসের পাশ থেকে টেনে নিয়ে প্লেস দ্য অপেরায় এসে 'কাফে দ্য লা পাইয়ে' ঢুকলেন। খাবার আগে খেতে খেতে এবং খাবার পরেও অনেকক্ষণ বসে বসে অনেক কথা হল। তিনি বলেন, আমার দেশ তোমাদের কেমন লাগলো? আমি বলি, ভারতবর্ষ তোমাদের কেমন লেগেছিল আগে বলো। ম্যুশেঁ ফ্রলে' বললেন—বিপুল তোমাদের দেশ তার কত টুকুই বা দেখেছি আর ক'দিনই বা ছিলাম সেখানে? তবে যেটুকু দেখতে পেয়েছি, অকপটে বলবো ভাল লেগেছে। আমার মনে হচ্ছিল—আমি যেন দক্ষিণ ফ্রান্সে বেড়াতে এসেছি। তোমাদের আদর অভ্যর্থনা আমাদের মুগ্ধ করেছে, আমাদের অন্তর স্পর্শ করতে পেরেছে। তোমাদের একটা মস্ত গুণ তোমরা বিদেশী মানুষদের খুব শীঘ্র আপনার জন করে নিতে পারো।' বললাম, 'কই মশাই, এই দেড়শো পোনে দুশো বছরেও ইংরেজদের তো আপনার করে নিতে পারি নি? তার কারণ কি জানেন? ইংরেজ আমাদের সঙ্গে মিশতে চায় নি। বোধ হয় ভয় ছিল পাছে তারা ভারতীয়দের প্রভাবে পড়ে যায়। আপনারা এগিয়ে এসেছিলেন, আমরাও দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। ভারতের মটো হচ্ছে 'বসুধৈব কুটুম্বকং'—ওয়ান্ ওয়ার্লড-এর আইড়িয়া আমাদের দেশে বহু পুরাতন।'

ফ্রান্স কেমন লাগল বার বার জানতে চাওয়ায়, বললাম এতটা যে ভাল লাগবে সেটা আমরা আশা করিনি। আমরা কাল দক্ষিণ ফ্রান্সে যাবো শুনে তিনি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন—তোমাদের খুব ভাল লাগবে। ভারতবর্ষকে মনে পড়বে, তোমরা ফ্রান্সকে ভাল না বেসে পারবে না!

বললাম, আমরা এর মধ্যেই 'হেড ওভার ইয়ার্স ইন লাভ উইথ্ হার।' উনি জানতে

চাইলেন, আমরা দক্ষিণ ফ্রান্সে আগে কোথা যাবো। বললাম, পারিস থেকে সোজা 'মার্শাই' যাবো। সেখান থেকে রিভিয়েরার অর্থাৎ মণ্টিকার্লো কান, নীস হয়ে জেনোয়া দিয়ে ইটালিতে ঢুকবো। উনি বললেন, 'ভেরি গুড, কিন্তু যাবে কিসে? ট্রেনে না বাসে?' বললাম, 'তুমি কিসে যেতে পরামর্শ দাও।' ম্যঁশে ফ্রলে' বললেন, আমি তোমাদের একখানি 'প্রাইভেট কার' নিয়ে যেতে বলবো। ট্রেনে গেলে দক্ষিণ ফ্রান্সের অর্ধেক সৌন্দর্যও উপভোগ করতে পারবে না। তোমরা যদি ফ্রান্সের সুন্দর আঙুর ক্ষেতের পাশ দিয়ে, শস্যক্ষেতের ধার দিয়ে, শাকসব্জীর কোল ঘেঁষে, পল্লী অঞ্চলের চাষীদের গ্রামের ভিতর দিয়ে, পাহাড়ের ঝর্ণা আর নদীর সঙ্গে সঙ্গে যেতে চাও, তাহলে মোটর-কোচ অথবা কার নিও।

আহার-পর্ব সমাধা হবার পর ম্যঁশে ফ্রলে' জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা আমাদের অপেরা, ড্রামা এসব দেখেছো? বললাম হাঁ। জিজ্ঞাসা করলেন, ফ্রেঞ্চ ফিল্মও দেখেছো বোধ হয়। আমরা বললাম, 'না'। আমরা ফরাসী ভাষা বুঝতে পারবো না বলে যাইনি। তিনি বললেন, ভুল করেছো। আজকাল প্রায়ই ফ্রেঞ্চ ফিল্মের সঙ্গে আমেরিকানদের বোঝবার সুবিধা হবে বলে ইংরেজি 'ক্যাপসান' দেওয়া থাকে। টাইটেল—সাব-টাইটেলও ইংরেজিতে থাকে। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হবে না কিছুই। তিনি তখনি হোটেলের একটি মহিলা ওয়েটারকে ইশারায় কাছে ডেকে কারেণ্ট উইকের সিনেমা লিস্টটা আনতে বললেন। লিস্ট এল। তিনি সেটা দেখে বললেন, এই কাছাকাছি সাঁজে-লীজেতে 'লা-পারিস' সিনেমায় এক-খানি খুব ভাল ফ্রেঞ্চ ফিল্ম দেখানো হচ্ছে। এ'রা ইংরেজি 'টাইটেল' ছাড়া ছবি দেখান না। তাছাড়া আমি হবো তোমাদের ইণ্টারপ্রেটার' চলো একটু ছবি দেখে আসি। তবে আমাকে অল্পক্ষণের জন্য একটু কাজ সেরে যেতে হবে। তোমরা সেটুকু সময় কেমন করে কাটাবে?

বললাম, পারিসে সময় কাটানো খুব সহজ। এই দোকানগুলোর উইণ্ডো এক-জিবিশন দেখেই কাটিয়ে দেবো। আপনার ফিরতে কত দেরি হবে? ম্যঁশে ফ্রলে বললেন, এখানকার ফ্যাশান হাউসে 'ড্রেস প্যারেড' দেখতে যেতে হবে আমাকে। ওরা আমাকে একজন বিচারক নির্বাচন করেছে। আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে না। তোমরা যদি ফ্যাশানে ইণ্টারেস্টেড হও, আমার সঙ্গে আসতে পারো। আমার মনে হয়, শ্রীমতী দেব এটা অপছন্দ করবেন না।

সিনেমায় যাবার তখনও যথেষ্ট সময় ছিল। একটা নূতন ব্যাপার দেখবার লোভে আমরা তাঁর সঙ্গী হলাম। গিয়ে দেখি, ফ্যাশান হাউসের চমৎকার 'হল'। সেই হলের মাঝামাঝি একটি সুদৃশ্য সুন্দর আলোকোজ্জ্বল মঞ্চের উপর নূতন ফ্যাশানের পোষাক পরিহিতার আবির্ভাব হয় নাটকীয়ভাবে। তাঁকে হেঁটে চলে ঘুরে ফিরে হেঁট হয়ে সব রকম 'পোজ' নিয়ে দেখাতে হয়, পোষাকটি সকল দিক থেকে দেখতে কেমন লাগছে। হলে বড় বড় আয়না রয়েছে। তার মধ্যে পোষাকধারিণীর প্রতিবিম্ব নানা দিক থেকেই প্রতিফলিত হচ্ছে। সেদিকেও বিচারকদের লক্ষ্য রাখতে হয়। অনেকগুলি নূতন ফ্যাশানের পোষাক-পরা মেয়ে নানা ভংগী দেখিয়ে চলে গেলেন। আধ ঘণ্টার আগেই কাজ শেষ হয়ে গেল। ফেরবার পথে ম্যঁশে ফ্রলে' বললেন, তোমরা বোধ হয় জানো না, আমার শিল্প-জীবনের শুরুতে আমি পারিসের অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্না সুন্দরীদের অসংখ্য নূতন ফ্যাশানের পোষাক উপহার দিয়েছি; অর্থাৎ আমি পারিসের একটি বড় দর্জির দোকানের মাইনে-করা আর্টিস্ট ছিলাম। আমার কাজ ছিল, প্রত্যেক সীজনে মেয়েদের জন্য নূতন নূতন ফ্যাশানের পোষাক

ডিজাইন করে দেওয়া। আমার নাম হয়ে গিয়েছিল তখন 'ফ্যাশান আর্টিস্ট' বলে। তিনি বললেন, শ্রীমতী দেব এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, সকল মেয়েকেই সব রকম পোষাক মানায় না। প্রত্যেকের চেহারা ও আকৃতি, তিনি লম্বা না মাঝারি, না বেঁটে? তিনি মোটা না রোগা না দোহার চেহারা? তিনি বয়স্থা, না আধাবয়সী, না তরুণী কুমারী অথবা নবোঢ়া যুবতী—সব কিছুরই উপর নির্ভর করে পোষাকের ফ্যাশান। এদিক থেকে আপনারা খুব সুখী। শাড়ির মতো এমন সুন্দর পোষাক আমি আর দেখিনি। ওটা ফিট করাবার জন্য দর্জির সাহায্যের দরকার হয় না! শাড়ি পরার কায়দার উপর এর যাকিছু বিশেষত্ব নির্ভর করে। কেমন? তাই নয় কি? আমি কি ঠিক বলছি মাদাম?

পত্নী সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন—আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে শাড়ির সম্বন্ধেও জানবেন, আপনার ওই থিওরিটা খুব খাটে। সব চেহারার এবং সব বয়সের মেয়েদের সব রকম শাড়ি মানায় না। শরু বর্ডার, চওড়া বর্ডার, মাঝারি বর্ডার এবং ভ্যারাইটি অফ কলার, এমনকি, শাড়ির টেক্‌শ্চার অর্থাৎ সুতী, রেশমী, ক্রেপ শিফন, জরিদার, ফুলদার—এসবই যদি শাড়ি পরিধানকারিণীর অঙ্গের সঙ্গে 'ম্যাচ' না করে, তাহলে সে মহিলাকে ভালোর পরিবর্তে খারাপই দেখায়।

মঁসিয়ে ফ্রলেঁ আমার স্ত্রীর হাতখানা টেনে নিয়ে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—দ্যাট্‌স রাইট! আপনি খুব সত্য কথা বলেছেন। আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

সিনেমার সামনে এসে পড়েছি তখন। মঁসিয়ে ফ্রলেঁই টিকিট কাটলেন। তাঁর সঙ্গে গেলাম আমরা। সুন্দর ছবি। ছবির নামটা মনে নেই, কিন্তু গল্পটা মনে আছে। স্কুল যাতায়াতের পথে একটি মেয়ের আলাপ হয় একটি ছেলের সাথে। ক্রমে তা গভীর প্রেমে রূপায়িত হয়ে ওঠে। তারপর মেয়েটির এল সুখস্বপ্ন ছিন্ন হবার পালা। দুঃখিনী বিধবা মায়ের একমাত্র মেয়ে সে। মা তাই মেয়ের জন্য একটি অবস্থাপন্ন পাত্র সংগ্রহ করলেন। মেয়ে তাকে বিবাহ করতে রাজী নয়। শেষে মায়ের অনেক কাকুতি-মিনতি ও বোঝানোর পর বিয়ে হয়ে গেল। স্বামীটি ভাল। মেয়েটিকে ভালবেসে বশ করে ফেললে। ভুলে গেল সে তার স্কুলের বাল্য প্রণয়ীকে। সুখে ঘরকন্না করছিল, কিন্তু বিধাতা বিরূপ। বেধে গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। স্বামী তার যুদ্ধে যেতে বাধ্য হল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চিঠি আসে, চিঠি যায়। বিরহিনীর দিন চলছে যেন করুণ মন্দাক্রান্তা ছন্দে। এমন সময় ঘটনাস্থলে হঠাৎ আবির্ভাব হল তার সেই প্রথম জীবনের প্রেমের আলোয় প্রদীপ্ত তরুণ ছেলেটি। চললো অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মজিজ্ঞাসা; সামাজিক বিধিনিষেধের নানা প্রশ্ন, কিন্তু হার মানলে সবাই। প্রথম প্রেমের সে অবিস্মরণীয় মধুস্মৃতির প্রবল আবেগে ভেসে গেল তার সমাজ, ভেসে গেল তার বিবেক, ভেসে গেল তার শুভাশুভ ধর্মবুদ্ধি! আত্মসমর্পণ করলে তার যৌবন সেই কিশোর প্রণয়ীর প্রেমালিঙ্গনে।

দিনের পর দিন যায়। বছরের পর বছর কেটে গেল। যুদ্ধ চলেছে ভীষণ। স্বামীর চিঠি আসে। পড়ে থাকে। পত্রাবরণ পর্যন্ত উন্মোচন করবার প্রয়োজন বোধ করে না মেয়েটি। পুরাতন প্রণয়ীর প্রেমে সে তখন মশগুল! হঠাৎ একদিন মিলিটারী হেড্‌কোয়ার্টার থেকে 'তার' এল—"তোমার স্বামী যুদ্ধে আহত হ'য়ে অমুক হাসপাতালে আছে, তোমাকে দেখতে চায়।" যাই কি না যাই করতে করতে মেয়েটি আর শেষ পর্যন্ত গেল না। তবে মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ কাঁটার মতো বিঁধে রইল। ইতিমধ্যে দেখা গেল, সে সন্তানসম্ভবা। তখন যুদ্ধ-বিরতি ও শান্তির খবর হাওয়ায় ভাসছে। জনসাধারণ উৎসুক আগ্রহ নিয়ে যুদ্ধ বন্ধের প্রতীক্ষা করছে। সহসা একদিন রেডিয়ো টেলিগ্রাম ও নানা সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যায় দেশময় এই আকাঙ্ক্ষিত শুভ বার্তা ছড়িয়ে পড়লো—যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। শান্তি! শান্তি! শান্তি!

সমগ্র ফ্রান্সের নরনারী এই সুসংবাদে আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে উঠলো। কিন্তু, বজ্রাহত হ'য়ে পড়লো এই দুটি তরুণ তরুণী। আবার 'তার' এল। এবার মেয়েটির স্বামী জানাচ্ছেন, তিনি অমুক ট্রেনে অমুক সময় এসে পৌঁছবেন দেশে—স্টেশনে এস!

মেয়েটি ব্যাকুল হ'য়ে পড়লো। ছেলেটিকে বললে—চলো আমরা দেশ ছেড়ে পালাই। ছেলেটি রাজী হয় না। শেষে মেয়েটি যখন মনে করিয়ে দিলে যে, আমার গর্ভে তোমার সন্তান রয়েছে! আমি কেমন ক'রে আমার স্বামীর কাছে মুখ দেখাবো? ছেলেটি তখন মেয়েটিকে নিয়ে পলায়ন করতে সম্মত হল। দিন ও সময় স্থির হ'ল। মেয়েটি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে, কিন্তু ছেলেটি আর এল না! পরের দিন সন্ধ্যায় তার স্বামী এসে পড়ছেন! মেয়েটি পাগলের মতো হয়ে উঠলো! সারাদিন ভেবে ভেবে ক্লান্ত হ'য়ে শেষে ট্রেন আসবার সময় বরাবর চললো স্টেশনের দিকে বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো অর্ধ-অচেতন অবস্থায়।

কিন্তু কী ভীড় সেদিন গ্রামের পথে। দেশশুদ্ধ লোক ছুটেছে স্টেশনের দিকে। দীর্ঘ চার বৎসর পরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরছে তাদের সকলেরই আত্মীয় বন্ধু! যাদের যুদ্ধে হতাহতের মধ্যে নাম বেরিয়েছিল তাদেরও আপন জনেরা আসছে স্টেশনের দিকে ছুটে এই আশায় যে, 'যদি খবরটা মিথ্যে হয়, যদি সে বেঁচে থাকে, যদি সে এই ট্রেনে ফিরে আসে!' ওঃ সে কি করুণ দৃশ্য!

মেয়েটি ভীড়ের মধ্যে ধাক্কা খেতে খেতে চলেছে। আসন্নপ্রসবা সে। এই ভীড়ের চাপ—এই উদ্বেগ—এই উত্তেজনা—তার দুর্বল শরীরে সহ্য হ'ল না। স্টেশনে পৌঁছে সে অজ্ঞান হয়ে পড়লো একটি মৃত সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে! যখন জ্ঞান হ'ল দেখলে সে নিজের বাড়িতে নিজের শয্যায় শায়িত, পাশে স্বামী তার উদ্বিগ্ন হ'য়ে মুখের পানে চেয়ে রয়েছে। সে চোখের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে ক্ষমা, স্নেহ, প্রেম! মেয়েটি কি বলতে চাইলে। স্বামী বললেন, তোমায় কিছু বলতে হবে না, আমি সব জানি! ওই বছরগুলো দুঃস্বপ্নের মতো ভুলে যাও। এস আবার নূতন জীবন শুরু করি।

(ক্রমশ)

চরম জ্ঞান

মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে তাকে। জীবনের যেমন ছেদ নেই, তেমনি অভিজ্ঞতারও শেষ নেই। প্রতিদিন লক্ষ রকম আশাতীত, উদ্ভট ও বিচিত্র ঘটনা ঘটছে সবারই জীবনে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে, অতএব আর কত আলোচনা করা যায় বলুন? মৃত্যুর দিনেই বোধ হয় মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জনের শেষ তারিখ, কিন্তু সে অভিজ্ঞতাটুকু আর কাগজে কলমে লিখে যাবার অবকাশ কোন মানুষেরই কোনদিন হবে না। অতএব 'ক্রমশ' একটা থেকেই যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত, আমিও 'ক্রমশ' রেখেই বাকীটুকু আপনাদের ঠেকে শেখবার জন্যে রেখে বিদায় নিচ্ছি। সমস্ত অভিজ্ঞতা বলে ফেললে আপনারা আগে থেকে সাবধান হয়ে যাবেন হয়তো এবং দেশ তার বৈচিত্র্য হারাবে—অতএব মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্তসার বলে আমার চরম অভিজ্ঞতাটুকু শুধু নিবেদন করে যাই শুনুন।

আসলে, পৃথিবীতে মানুষ নামক প্রাণীর শ্রেণীভুক্ত হয়ে আমি নিজের জাতটার স্বরূপ কিছুই বুঝতে পারলুম না। চতুষ্পদ হলে এদের যথার্থ আদর বা অনাদর কোনটা তা হাবেভাবেই বুঝে ফেলতে পারতুম, এমনকি, বাঁদর হলেও কিছু বোঝা যেত, কিন্তু চাদর গলায় দিয়ে আশপাশে নদর গদর করতে করতে যাঁরা মুখে সাদর আপ্যায়ন জানালেন, অথচ আড়ালে সঠিক সর্বনাশ করে গেলেন—তাঁদের কিছুতেই ধরাছোঁয়া গেল না।

এই জাতের মধ্যে শতকরা আশিজন পাজী, দশজন হিংসুকুটে, পাঁচজন ফিচেল, চারজন সবকিছুর সমন্বয়, মাত্র একজন ভদ্রলোক, নিষ্ঠাবান, সত্যাশ্রয়ী—তাও তাঁরা বাইরে ঘোরেন না, দরজায় খিল এঁটে বসে থাকেন, কোন এক ফাঁকে ফোঁকর দিয়ে চেহারাটা দেখে নিতে হয়।

আমি নিজে কি, তা জানি না। কারণ নিজের বাইরের চেহারা আরশিতে দেখলে গালে চড় মারতে ইচ্ছে করে সত্যি, কিন্তু ভেতরের চেহারাটা কেমন, সেটা অপরে না দেখে এস্টিমেট দিলে বোঝা শক্ত। নিজের বিবেচনায় ভালই মনে হয়, অন্তত আপনাদেরই সামিল বলে ভেবে আরও ধোঁকায় পড়ে যাই।

পৃথিবীতে এসে আমার এইটুকু মোক্ষম অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, মানুষের অতি-সান্নিধ্যে আসার চেয়ে দুঃখু আর নেই, তাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তাপসরা জীবনে কোনদিন লোকের দরজার পাপোষের ওপরও দাঁড়াননি বা তক্তাপোষের ওপর বসেন নি, পাহাড়ের গুহার মধ্যে ঢুকে দিনের পর দিন উপোস করেও সুখে কাটিয়ে গেছেন। কারণ তাঁরা হাড়ে হাড়ে এই জীবটিকে চিনেছিলেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এই যে কথাটা চণ্ডীদাস বলে গেছেন না—এ খুব খাঁটি কথা, যেহেতু তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন যে, আর কোন প্রাণী মানুষের চেয়ে এককাঠি সরেস হতে পারে না। এরকম একের নম্বরের হাড়-হাবাতে জীব দেখা যায় না।

মশাই, লোকটাকে দেখলুম নিপাট ভালমানুষ, সাত চড়ে কথা কয় না, যেটুকু কয়, তাতে যেন মধু ঝরে, কারণে-অকারণে মৃদু মৃদু হাসে, দেখলে প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করে এমন ভাব, আমার চিরকালের ধারণা, লোকটি অতি সৎ, হঠাৎ এসে বললে, বড় ঠেকায় পড়ে গেছি ভাই, যদি শ' পাঁচেক ধার দাও। তৎক্ষণাৎ পোস্টাফিসে মেয়ের বিয়ের জন্যে ছত্রিশ বছর ধরে যে ছশো টাকা জমিয়ে ছিলুম, তার থেকে তুলে এনে বিনা চিঠিতে পাঁচশোটি টাকা করকরে গুণে দিলুম। টাকা হাতে পেয়ে যে প্রশস্তি তিনি করে গেলেন, তাতে মনে হল যে, এ সংসারে আমার চেয়ে ভাল লোক বোধ হয় আর জন্মায় নি। ব্যস্! —তারপর তাঁর আর টিকি দেখা যায় না। মাসখানেক কড়ারে বছর খানেক পেরিয়ে গেল, তাঁর দুঃখের চাকা ঘুরে সুখ এল, গাড়ি হল, বাড়ি হল, সঙ্গে সঙ্গে ভুঁড়িও বাড়লো, ওদিকে আমার সব কমতে লাগলো, দেনার দায়ে নিজের বাড়ি ঘরদোর চলে গেল, কিন্তু তাঁকে আর নাগালের মধ্যে পেলুম না। পুরোনো টাকার তাগাদায় একদিন রাত্রে তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় ঢুকেছিলুম, তিনি ট্রেসপাসের চার্জে আলিপুরে আমার নামে একটি নালিশ ঠুকে দিয়ে বসে রইলেন।

দ্বিতীয়—শুনলুম, ভদ্রলোক চরিত্রবান, অর্থাৎ নিজের স্ত্রী ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চান না—কিন্তু অপরের এক লক্ষ কেচ্ছার খবর রাখেন—তিনি উপর্যুপরি তিনটি স্ত্রী গত হতে সম্প্রতি চতুর্থে রত হয়েছেন, চরিত্র কোন ফাঁক দিয়ে ফসকাতে পারছে না।

তৃতীয়—ভদ্রলোক সাধু, চক্ষুলজ্জায় বাধ বাধ ঠেকে বলে এখনও সংসারে থেকে গেরুয়াটা নেননি, দিবারাত্র বাড়িতে হরি-সংকীর্তন করান। শুনলুম, তেল, ঘি আর ওষুধের কারবার করে ফেঁপে উঠেছেন। তিনবার মিউনিসিপ্যালিটি, চারবার পুলিশ কারবারে হানা দেয়, কিন্তু শেষকালে সবাই না না ইনি আমাদেরই মত, লোক ভাল বলে সার্টিফিকেট দিয়ে চলে যায়।

চতুর্থ—ইনি সমাজ সংস্কারক উদার-পন্থী, পণপ্রথার বিরোধী, অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী ব্রাহ্মণ সন্তান। বড় ছেলে এক বণিকের মেয়েকে বিয়ে করতে চায় শুনে তাকে বাড়িতে চিলে কোঠার ঘরে পুরে রাখলেন, চুপি চুপি শাসালেন যে, ত্যাজ্য-পুত্তুর করবো। এক জায়গায় বংশ, গোত্র, অর্থ সব কিছুর মিল হয়ে গেল, তিনি আগাম কিছু দাদনও নিলেন, কিন্তু ওদিকে খিল খুলে ছেলে পরদিনই রেজেস্টারী করে *এক হিল তোলা জুতো পরিয়ে* বৌমাকে নিয়ে হাজির। তিনি ছেলেকে তো ভাগালেনই সঙ্গে সঙ্গে যারা বায়না দিয়ে গেছলো তাদেরও। স্রেফ বলে দিলেন, এ বিয়ের সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না তোমরা কি দিয়েছ না দিয়েছ, তা আমার মনেও নেই! গোলমালে দরকার নেই—আদালত আছে যাও।

পঞ্চম—আর একজন অতি সংযমী, কোন এক কলেজের অধ্যাপক। একুশটি ছেলে-মেয়ের বাবা, দুশো টাকা মাইনে পান। আগে ক্যাপিটালিস্টদের দারুণ সমর্থক ছিলেন, গুটি পাঁচেক মেয়ে হবার পর

শ্যামের কর্ণকুহর শীতল করা

সোসালিস্ট হন এখন শুধু লাল ঝাণ্ডা ছাড়া আর কথা নেই—কারণ বুঝেছেন যে, এতগুলোকে তাহলে ভবিষ্যতে সামলাবে কে? কিন্তু তারাও শেষ পর্যন্ত এঁর সংগে তাল রাখতে অপারগ হলে যে কি হবে সেটা ভেবে দেখেন না।

ষষ্ঠ—ভদ্রলোক অতি চাপা, গম্ভীর প্রকৃতির। সবার সংগেই সহৃদয় ব্যবহার। বিশ্বাস করে রাম শ্যামের সম্বন্ধে এমনি কতকগুলি মন্তব্য করে বলা বাহুল্য রাম ও শ্যাম বিশেষ বন্ধু। ভদ্রলোক তার পরদিনই শ্যামকে ডেকে রামের কথার ওপর তিন পোঁচ রং চাপিয়ে তাকে অনেক কিছু বলে গেলেন। তার উত্তরে আবার রাম শ্যাম সম্বন্ধে আরও বহু কথা বলে গেল, তিনি তার ঘণ্টা খানেক বাদেই টেলিফোনে সেগুলিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে শ্যামের কর্ণকুহর শীতল করালেন। সাতদিনের মধ্যে উভয়ের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল—ইনি তখন সকলের কাছেই ব্যাপারটা যে কত বড় দুঃখের তা প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন।

সপ্তম—উনি দেশের নেতা। বিশ্বাস করে দেশের উপকারের জন্যে মিটিংয়ে চাঁদা চাইলেন, হাঁদার মত পরিবারের চুড়ি খুলে বাহাদুরী দেখিয়ে এলুম কিন্তু তারপর দেখলুম তিনি তুড়ী দিয়ে সেগুলোকে কি রকম ম্যাজিকের মত উড়িয়ে দিলেন, আর আমরা উপকারের ঠেলায় ভুঁয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগলুম।

অষ্টম—অতি অমায়িক সজ্জন ভেবে এঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একেবারে আত্মীয় করে নিলুম, বছর খানেক পর থেকে বই, ব্যাগ, ঘড়ি, চুড়ি সব সরতে শুরু করলো। বলারও যো নেই এত বেমালুম সরাচ্ছেন, শেষে পাশের বাড়ির এক মুখপুড়ীর সংগে তিনি নিজেই সরলেন, আমরাও বাঁচলুম।

এই সব স্যাম্পেল দেখে শুনেও কি মানুষ জাতটার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারা যায়? সারল্য, আন্তরিকতা, বিশ্বাস, সততা সমস্ত পৃথিবী থেকে পালিয়েছে। খৃষ্ট পূর্ব চল্লিশ হাজার বছরে হয়তো ওগুলো ছিল, কিন্তু এখন নেই, যাই বলুন না কেন। একেবারে নেই বলছি না, কিন্তু ঊর্ধ্বে দেবলোক থেকে এগুলোকে যে-ভাবে এখন কন্ট্রোল করে ছাড়া হচ্ছে, তাতে বেঁচে থাকা চলে না। পৃথিবীর কোন্ কোন্ মানুষের হৃদয় কন্দরে এগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে তা জানতে গেলে রীতিমত গবেষণা করতে হয়। সারাদিন খেটেখুটে এ সব মশাই, আর পোষায় না। অথচ ওপর ওপর কারুকে বোঝবার যো নেই। মুখে এক, কাজে বিপরীত এই তো বেশি। তাহলে কার প্রতি আস্থা স্থাপন করবো?

বিজ্ঞাপনের জোরে বাজারে ভেজাল ঘি চলে, ওষুধ চলে, কিন্তু মানুষও চলে। প্রচার যার দুনিয়া তার, এইটেই এ যুগের স্লোগান। কেউ ভেতরে কতখানি খাঁটি মাল আছে তা দেখতে যাবে না যাচাই করে, শুধু উত্তেজনার খোরাক জুগিয়ে যারা যাচ্ছে তাদেরই কেল্লা ফতে।

ভাল লোক যাঁরা আছেন তাঁরা কোথায় থাকেন যদি দয়া করে আমায় তাঁদের ঠিকানাগুলো দিয়ে দেন তাহলে অন্তত একবার চর্মচক্ষে দেখে আসি। আমার দুর্ভাগ্য সে রকম আঁটি আঁটি লোকের সংস্পর্শে আমি খুব কমই এসেছি—যত পেঁচোয়া, পাজী, হাড়হাবাতে মিচকে, আমার বরাতেই জুটেছে চতুর্দিকে, ছোঁয়াচ হয়তো আমাকেও লেগেছে কিন্তু আপনাদের সেই সংক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে কয়েকটি নিদারুণ অভিজ্ঞতা বলে গেলুম। সে জন্যে গাল দিতে হয় দিন, হাততালি দিতে চান দিতে পারেন—কোন কিছুতেই আপত্তি জানাবো না।

আপনাদের গালাগালি ও হাততালি উভয়কেই বরণ করে নিয়ে আমি বিদায় হচ্ছি। আমার অভিজ্ঞতায় অনেকের স্বরূপ

বিরূপাক্ষ-বিদায়

ফুটে উঠেছে, ভবিষ্যতে তাদেরই আবার নবরূপে দেখতে পেলে টেনে সামনে নিয়ে আসবো। আর যদি তার আগে আপনারা নিজেরাই স্বীয় অভিজ্ঞতার জোরে তাড়াতাড়ি এদের সবাইকে চিনে ফেলেন তাহলে তো আমাকে আর কোন দিন চেল্লাতে আসতেই হবে না।

কোনও একটা অঘটন ঘটে যাওয়াকেই এ্যাক্সিডেণ্ট বলে—এ্যাক্সিডেণ্ট মানেই দুর্ঘটনা নয়। জগতে এত যে নতুন নতুন জিনিস আবিস্কৃত হচ্ছে এর সবটাই সযত্ন চেষ্টাকৃত নয়। অনেক কিছুই হঠাৎ আবিস্কৃত হয়েছে। আঠার বৎসরের বালক উইলিয়ম হেনরী পার্কিন কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন তৈরি করতে করতে টেস্ট টিউবের মধ্যে যে কালো দানাগুলি পেয়েছিলেন, সেগুলো যদি কৌতূহলবশবর্তী হয়ে গরম জলে দিয়ে না গলাবার চেষ্টা করতেন, তাহলে আজ এই কৃত্রিম রঙের উদ্ভব হতো কিনা সন্দেহ। এই দানাগুলি গরম জলে গলিয়ে তিনি বেশ সুন্দর বেগুনী রংয়ের তরল পদার্থ পেলেন। এই তরল পদার্থের মধ্যে তিনি খানিকটা সিল্কের কাপড় রাঙিয়ে নিয়ে তারপর সেটি সাবান দিয়ে ধুয়ে রোদ্রে শুকিয়ে নেওয়ার পরও তার রংয়ের কোনও রকম বিকৃতি ঘটতে দেখেন নি। এর পরই তিনি বুঝলেন যে, তিনি কৃত্রিম রং তৈরির পদ্ধতি আবিস্কার করতে পেরেছেন।

*

কাজে অন্যমনস্কতা বা অসাবধানতা গর্হিত অন্যায় বলেই আমরা জানি, কিন্তু ফরাসী চিত্রকর এবং পদার্থবিদ্ লুই ড্যাগরের অন্যমনস্কতাই বর্তমান ফটোগ্রাফি আবিষ্কারক বলা যেতে পারে। আজকাল যে ফটোগ্রাফি আমরা দেখি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এটা ছিল না। তখনকার দিনে কোনও ছবি তুলতে হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্লেটের ওপর যার ছবি তোলা হবে, তার প্রতিফলন দরকার হতো। একদিন লুই ড্যাগরে অন্যমনস্ক হয়ে ছবি না তোলা একটি প্লেট একটি ড্রয়ারে বন্ধ করে রেখে দেন, সেই ড্রয়ারের ভেতর এক ডিসে খানিকটা পারদও ছিল। ঐ পারদের বাষ্পের প্লেটের ওপর প্রতিক্রিয়া হয়। ফলে ঐ পারদপূর্ণ পাত্রটির একটি ছবি ঐ প্লেটে প্রতিফলিত হয়। এর থেকেই তিনি বুঝতে পারেন যে, প্লেটের ওপর পারদের বাষ্প প্রয়োগ করলে তাড়াতাড়ি ছবি ওঠে। আজ লুই ড্যাগরের এই অন্যমনস্কতা ও অসাবধানতার জন্যই ফটোগ্রাফির এত উন্নতি সাধিত হয়েছে।

চক্রদত্ত

চার্লস গুডইয়ার যদিও বহু বৎসর ধরে রবার নিয়ে গবেষণা করছিলেন, তবুও তিনি যদি-না হঠাৎ সালফার ও রবার এক-সঙ্গে মিশিয়ে গরম স্টোভের ওপর না রাখতেন, তাহলে তাঁর ঈপ্সিত ফললাভ করতে পারতেন না বোধ হয়। এইভাবে গরম করে তিনি দেখেন যে, এই মিশ্রিত পদার্থটি অত্যধিক তাপে শুকিয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওপরের অংশটি দৃঢ় অথচ নরম এবং নমনীয়। তিনি আরও দেখলেন যে, এইভাবে উত্তাপের দ্বারা যে রবার তৈরি হয়, তার চটচটে ভাবটা থাকে না। এই পদ্ধতিকে তিনি 'ভল্‌কানাইজিং পদ্ধতি' বলেন। এই আবিষ্কারের ফলেই আজ আমরা জুতো, বর্ষাতি, গাড়ির টায়ার, গরম জলের ব্যাগ এবং এই রকম হাজার রকম রবারের জিনিস ব্যবহার করতে পারি। এই রবারের বিশেষত্ব এই যে, এগুলো গরমে গলে না, ঠাণ্ডায় ফেটে যায় না।

*

ব্লটিং পেপারও এই রকম সহসা আবিস্কৃত হয়েছিল। অবশ্য ব্লটিং পেপারটা আবিষ্কার করা হয়নি এর পুনরুদ্ধার হয় বলা যায়। কারণ ১৪৬০ সালে এটা ব্যবহার করা হতো তারপর লোকে এটা ভুলে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বার্কশায়ারের একটা কাগজের কলে কাগজ তৈরীর সময় কাগজের মণ্ডকে পাতলা কাগজে পরিণত করার জন্য যে পদার্থটি মেশাতে হয় সেটি মেশাতে ভুল হয়। তারপর যে কাগজ তৈরি হলো সেটা সাধারণ কাগজের মত হয়নি ফলে সমস্তটা নষ্ট হয়। কলের মালিক এই বাতিল কাগজ-গুলো নিজের ব্যবহারের জন্য রাখেন, কিন্তু তিনি এর ওপর কালি দিয়ে লিখতে গিয়ে দেখেন যে, এই কাগজ সমস্ত কালি শুষে নিচ্ছে। লিখতে গেলেই কাগজের চারদিকে কালি ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে তার মনে হয় এই কাগজ কালি শোষণের কাজে বেশ ব্যবহার করা যেতে পারে। সেই সময় ব্লটিং পেপারের বদলে শুকনো বালি ব্যবহার করা হতো। এই সময় ঐ মিলের মালিক ব্লটিং পেপারের বিজ্ঞাপন দিতে থাকেন তাতে তার ঐ কাগজগুলো বিক্রি হয়ে আরও অর্ডার পেতে লাগলেন।

*

বর্তমানে ঘর বাড়ীতে যে সব রঙীন পাথর ব্যবহার করা হয় সেগুলি দেখতে খুবই স্বাভাবিক মনে হয় কিন্তু প্রায় ছয় শতের বেশী রকম রঙের পাথর রং দিয়ে রঙীন করা হয়। এই পাথর রং করার পদ্ধতিও হঠাৎ আবিস্কার করা হয়। একটা পিপে তৈরী করা হচ্ছিল যার ভিতরে পেট্রোল ঢুকতে পারে না। এই পিপেটা কোনও একটা জায়গায় ঠিক করে বসানর জন্য একটা পাথরের টুকরো ঠেকা দেওয়া হয়েছিল। কাজ শেষ হবার পর পাথরের টুকরোটি বার করে দেখা গেল যে, পাথরটির ওপর সুন্দর একটা রংয়ের ছোপ লেগেছে। তখন অবশ্য এই পাথরের টুকরোটিকে অপ্রয়োজনীয় বলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এর পর প্রায় মাস-খানেকের পরে টুকরোটি কি করে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে যায় এবং দেখা যায় যে, পাথরটার ভিতরেও রং ধরেছিল। তখনই বোঝা গেল যে, এইভাবে পাথরে বিভিন্ন রং করা যেতে পারে।

*

সকলেই জানি, কাচ ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু এমন কাঁচও আছে যা পড়লেও ভাঙ্গে না। একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক এডোয়ার্ড বেনেডিকটাস হঠাৎ এটা আবিস্কার করেন। একদিন তার হাত থেকে একটা বোতল পড়ে ভেঙ্গে গেল কিন্তু কাঁচের টুকরোগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো না। এতে তিনি বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান। এটা কি করে সম্ভব হয়। ভাল করে খোঁজ-তল্লাস করে জানতে পারেন যে, এই বোতলে এক সময়ে কলোডিন জাতীয় সেলুলোজ পদার্থ রাখা হয়েছিল। এই পদার্থটি উবে যাবার পরও বোতলের গায়ে একটা পাতলা আস্তরণ পড়ে থাকে আর এই আস্তরণটিই টুকরো কাঁচগুলোকে ছড়িয়ে পড়তে দেয় না। এর পর তার ধরাণা হলো যে, দুখানা কাঁচের চাদরের মাঝখানে নাইট্রো সেলুলোজের একটা পাতলা আস্তরণ রেখে স্যাণ্ডউইচের মত করলে ঐ কাঁচ মাটিতে পড়লেও আর ভাঙ্গবে না।

চিত্রপ্রদর্শনী

কিশোর শিল্প প্রদর্শনী

কলকাতায় যখন প্রথিতনামা শিল্পীদের নানান ধরণের রচনা নিয়ে নতুন নতুন প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হচ্ছে ঠিক এমনই সময়ে বালক আর কিশোর বয়সী

লনোকাট শ্রীমান বিবেক (১২ বৎসর)

ছলেদের শিল্প-রচনা-প্রচেষ্টায় এই দর্শনীটি দর্শক-সাধারণের কাছে এক তুন আস্বাদ পরিবেশনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সেছে। গত ৬ই জানুয়ারী হিন্দী হাই ্কুলের ছেলেদের হাতের নানান্ শিল্প-াজের একটি সুষ্ঠু প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন রেছেন ডঃ ডি এম সেন আর্টিস্ট্রী হাউসে। ল-রঙ, স্টেনসিল, লিনোকাট, হস্তনির্মিত ভিন্ন ধরণের সামগ্রী এই প্রদর্শনীতে ন পেয়েছে। কাজগুলো নবম শ্রেণীর ছাত্র র্যন্তই সীমাবদ্ধ এবং ছাত্রদের বয়স ৬ কে ১৬ বৎসরের মধ্যে। সাধারণে যদি ল্পের মান যাচাইয়ের দৃষ্টি নিয়ে এই দর্শনী দেখতে যান, তাহলে ভুল করবেন। রণ খেলারছলে তাদের যা ভাল লেগেছে আকৃষ্ট করেছে, তাই তারা এঁকেছে বা তৈরী করেছে। পরিণত মনের পরিচয় সেখানে নেই, কিন্তু আছে ঐকান্তিক আগ্রহ যত্ন আর দরদ। কত পরিশ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে তারা এক একটি জিনিস গড়েছে দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। অথচ উপকরণ মাত্র কয়েকটি কাঠের টুকরো, সিগারেট বা দেশ-লাইয়ের বাক্স। নয়তো পেনসিলের একটি টুকরো, সামান্য কাগজ বা চামড়া—কিন্তু সব কিছু দিয়ে এমন এক একটি জিনিস রূপ নিয়েছে যে, বড়দের হাতের কাজ বলে ভ্রম হয়।

জল-রঙের ছবিগুলির মধ্যে কে শ্রীবাস্তবের (১৩ বৎসর) দৃশ্যচিত্রটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয়েছে, কম্পোজিশনে রীতিমত পরিণত মনের পরিচয় আছে। কেদার শর্মার (১৩ বৎসর) বাগানে বিলিতি ছবির প্রভাব থাকলেও আকৃষ্ট করে। ভরতহরি সিংহা-নীয়ার (১৩ বৎসর) 'কবুতর' এবং 'দুটি হরিণ' অনুকৃতি হলেও পরিচ্ছন্নতার জন্য বেশ ভাল লাগে। 'নিত্যকর্ম' আর একটি সুন্দর কাজ। চম্পালাল ভুয়ালকার (১৩ বৎসর) ছবিটিতে ক্যারম খেলায় ব্যস্ত ভাবটির পরিচয় বেশ ফুটেছে। চন্দ্রকুমারের (১১ বৎসর) 'ফুচকা' ছবিটিতে ক্রেতাদের ভীড় ও খাওয়ার ব্যস্ততা এবং দোকানীর ব্যস্ত-সমস্ত মুখের ভাবগুলো ভারী সুন্দর ফুটেছে। এন এইচ কোয়ার (১৩ বৎসর) আচার্য নন্দলালের বীণাবাদিনী ছবিটির বিরাট অনুকৃতিটি বেশ ভাল হয়েছে, তবে ছেলেদের গোড়ার দিকে বড় বড় রচনার কপি না করিয়ে নিজ খেয়াল-খুশি মত কাজ করাতেই উৎসাহিত করা উচিত এবং ঐতিহ্যগত শিল্পরচনার সঙ্গে ছবি এবং মূর্তির মারফৎ আস্তে আস্তে পরিচয় করানো উচিত। পি সি জৈনের (১৩ বৎসর) কিষাণও বেশ ভাল। এস আর বিনানীর (১৩ বৎসর) চাকী পেষা, সূর্য প্রকাশের (৭ বৎসর) রামু ও শামু কাজ দুটিতে স্বতঃস্ফূর্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এস কে নিয়োগীর (৯ বৎসর) স্নানের পুকুর বেশ ভাল—গাছের কর্মে বৈচিত্র্য আছে। ললিত-কুমারের (৭ বৎসর) পিতাপুত্র, সি চুঘের হলদে ঘোড়া বেশ ভাল। ভি সি বর্মণ (১৩ বৎসর) এবং রাজেন্দ্রকুমারের (১৩ বৎসর) স্টেনসিল দুটি, এইচ এল জালানের (১৩ বৎসর) ঘোড়াগাড়ীর এবং বিবেক বর্মণের (১৩ বৎসর) গাছের লিনোকাট

লিনোকাট—এইচ এল জালান (১৩ বৎসর)

দৃশ্যচিত্র—কে শ্রীবাস্তব (১৩ বৎসর)

দুটি বেশ ভাল। নারায়ণ প্রসাদের (১৪ বৎসর) চামড়ার সুন্দর ঝোলাটি দক্ষ হাতের পরিচয় বহন করে। নরহরি কোয়ার এবং ঝওনমলের মহিলাদের হাতব্যাগ দুটি এত সুন্দর হয়েছে যে, পেশাদার শিল্পীর রচনা বলে ভ্রম হয়।

খেলনাগুলোর মধ্যে ডি পি গুপ্তর (১৪ বৎসর) যুদ্ধের প্যানেলটি এবং নিশীথ সিংহের (১১ বৎসর) নতুন কলকাতার স্টেশনটি সত্যই সুন্দর ও বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম নিয়ে করা।

শিশু ও কিশোরদের চিত্ররচনার প্রদর্শনী আমাদের দেশে খুব কমই হয়ে থাকে। অথচ তাদের শিক্ষার ব্যাপারে শিল্পকলার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খুশিমতো ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন তাদের কল্পনারাজ্যের বিস্তার ঘটে, অন্যদিকে তেমনি তাদের মানসিক সৃষ্টিশীলতার সহজ পরিচয় ফোটে। ভবিষ্যতে তারা জীবনের কোন্ কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী হবে, শিক্ষাবিজ্ঞানীরা সেটা সবচেয়ে সহজে বোঝেন তাঁদের শিল্পরচনা অনুশীলন করে। সেদিক থেকে এই ধরণের কিশোর বালকদের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর অত্যন্ত সামাজিক গুরুত্ব আছে। আশা করি, হিন্দী হাইস্কুলের এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ অনুসরণ করে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এই ধরণের অনুষ্ঠানে অগ্রণী হবেন।

দিগন্ত সন্ধান

শ্রীদেবনারায়ণ সেনগুপ্ত

উন্মুখর ব্যস্ততার বিপুল সাগরে—
রবে না কি বালুঘেরা সামান্য সৈকত
যেখানে হয়তো হবে জীবনের ক্ষণিক বিশ্রাম?
শুধু কি জীবন ঘেরা অকূল বিস্তার?
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রাশি রাশি তরঙ্গ দোলায়
ভীত-ত্রস্ত বিপর্যয় হবে বারম্বার?
উত্থানে-পতনে—
স্রোতের মুখে তৃণের মতন
ভেসে চলা দিগন্তের পানে!
চক্রবালে লেখা সে কি জীবনের সব সমাধান?
সেখানে কি মহাকাল শান্ত সমাহিত?
দিগন্তে রেখেছি শুধু অন্তহীন আশা;
ঊর্ধ্বে লেখে নীহারিকা অমোঘ বিধান!

নিষ্পেষিত মনি তবু ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলে'
কেন শান্তি চায়?
আর্তনাদ কেন করে আর?
একি শুধু অশক্তের মূঢ় চঞ্চলতা?—
নয়, সে তো নয়।

চক্রবালে আঁকা এ যে মিথ্যা প্রতারণা,
ব্যঙ্গ মুখে গুপ্ততার কপট বিকৃতি,
ক্ষুটিল কঠোর ভালে ভ্রূকুটি বিলাস।

দূরে, শুধু দূরে রবে সে দিগন্ত অনন্ত বিস্তারে,
আমি পড়ে রব একা চাঁদ-লোভী বামনের মত!
জীবনের সায়াহ্নে যে দিন—
এ শাশ্বত সংগ্রামের অবসান হবে
বক্ষ হবে আশাহীন, মুখ ভাষা-হারা,
সেদিনের পূর্ণচ্ছেদে শান্ত হবে সব চঞ্চলতা।
সে যদি মৃত্যুও হয় তাই হোক তবে,
পাব তার বাহুতে আশ্রয়,
বহু আশা-চর্চিত সে সামান্য বিশ্রাম।
বলে যাব সে মহালগনেঃ
'সতীর্থ আমার,
কর্মক্লিষ্ট জীবনের ইতিবৃত্তে ছিন্ন পাতাগুলি
রয়ে গেল পিছনে ছড়ানো—
আর আমি বিশ্রাম নিলাম।'

বিজ্ঞানের কথা

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'

অশ্বিনীকুমার

বৃষ্টির টাপুর টুপুরের সঙ্গে কত হাসি, কত অশ্রু, কত বিচিত্র ভাবনাই না জড়িয়ে রয়েছে। নীলনভে মেঘাড়ম্বরের ঘটা দেখে কত কাব্য হয়েছে রচিত, কত বিরহীর মর্মবেদনা হয়ে উঠেছে মুখর, কত কুলবধূ মঙ্গলাচরণে জানিয়েছে আবাহন, কত চাষী জানিয়েছে অন্তরের করুণ প্রার্থনা, নীরস ধরণীর তপ্তশ্বাসে পাংশু-প্রায় কত শস্য লালায়িত হয়ে উঠেছে ারিষণের আশায়। তবু হায় এত আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও অনেক সময়েই মেঘলোক ুধু ডম্বুর বাজিয়েই কৃপণের মত চলে যায় নির্দেশের পানে। দু ফোঁটা জল ঝরে না ষিত মৃত্তিকার বুকে। এত ঘটাপটা করেও য় না কোন ফল। দিনের পর দিন চাষীরা য়ে থাকে অসীমের পানে মেঘলোকে, িতক্ষণে বৃথাই আশা করে প্রকৃতির অকৃপণ নহসিক্ত রসধারা। মাঠের পর মাঠে শ্যামল দাদল ঊর্ধ্বশির হয়ে বৃষ্টির অভাবে ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে, রুক্ষ মাটি ফেটে ায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিরহী মানুষের থ। কিন্তু বরিষণহীন মেঘলোক নির্বি-র।

কেন এমন হয়? প্রশ্ন জাগে মনে। এই শ্নের গ্রন্থি উন্মোচনে জেগেছে বিজ্ঞানী। ীতির এই করুণ খেয়ালের যে সন্ধান লছে তাই বলি।

াল্যাবস্থায় পৃথিবীর আবহাওয়াতে । হয় খুব বেশী হাইড্রোজেন ছিল। সূর্য অন্যান্য বড় বড় গ্রহদের মত আমাদের থিবীর আলো এবং দ্রুত সঞ্চরণশীল ড্রাজেন মলিকিউলকে টেনে রাখবার মত । যথেষ্ট মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছিল না। ক হাজার বছরের মধ্যেই এদের বেশীর ই অনন্তশূন্যে ছিটকে পড়ে। অবশিষ্টরা জেনের সঙ্গে মিলে তৈরী হলো জল-। আবহাওয়া ক্রমে শীতল হবার সাথে জলীয় বাষ্প তরল হয়ে বোধ হয় পৃথিবীর তমসাবৃত অংশেই প্রথম বারিধারা-রূপে নেমে এলো। সেই ধারা একত্র হয়ে জন্ম হলো প্রথম মহাসমুদ্রের।

অনন্ত গতিশীল এই জগৎ। তার পদার্থের মলিকিউলও অনন্ত নৃত্যছন্দে আবদ্ধ। পদার্থের সমস্ত অবস্থাতেই তাপের মাত্রার ওপর নির্ভর করে মলিকিউলের চলেছে অবিরাম নৃত্য। ব্রহ্মাণ্ডের তারা, গ্রহ, উপগ্রহের মত মলিকিউলেরও পারস্পরিক আকর্ষণ আছে। তাদের দুটি খুব কাছাকাছি এলে একে অপর থেকে বিচ্যুত হয়, আবার খুব বেশী দূরে চলে গেলে পরস্পরের ওপর আকর্ষণের কোন প্রভাবই থাকে না। ব্যবধান কমিয়ে আনতে আনতে এমন এক জায়গায় এসে পড়তে পারে যখন প্রচ্ছন্ন শক্তি খুবই কমে যায়। কঠিন ও তরল জিনিসের মলিকিউলের অবস্থান এমনই এক জায়গায়। এই নৃত্যরত মলিকিউল যখন দুলতে দুলতে আকর্ষণক্ষেত্রের বাইরে বেরিয়ে পড়ে তখন সুরু হয় বাষ্পীভবন। প্রত্যেক তরল পদার্থের ওপরেই কিছু বাষ্পীয় মলিকিউল বর্তমান রয়েছে। কখন কখনও তারা জমে নীচে পড়ে আবার বাষ্পীভবনে কিছু মলিকিউল তাদের স্থান অধিকার করে। যদি সমানসংখ্যক মলিকিউল তরল অবস্থা থেকে বাষ্পীভূত হয় এবং বাষ্পাবস্থা থেকে তরল হয় তবে বাষ্পকে বলা হয় স্যাচুরেটেড বা পর্যাপ্ত পূর্ণ। জলে উত্তাপ দিলে মলিকিউলের নৃত্যছন্দ বেড়ে যায় ফলে তরল অবস্থা ছেড়ে বেশী মলি-কিউল বার হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়। যে বাষ্প গরম জলের ওপর পর্যাপ্তপূর্ণ হয়ে সাম্য রক্ষা করে রয়েছে তাদের মধ্যে ঠাণ্ডা অবস্থার এরকম বাষ্পের চাইতে বেশী সংখ্যক মলিকিউল থাকে।

হিমেল হাওয়ার বাষ্পীয় মলিকিউলেরা উষ্ণ সমুদ্রাভিমুখী হলে তার বুক থেকে তাই বেশী সংখ্যক মলিকিউল কুড়িয়ে নেয়। ফলে বায়ুতে আর্দ্রতা বেড়ে ওঠে। ঠাণ্ডা হাওয়া এইভাবে যখনই উষ্ণ জলাধারের ওপর দিয়ে যায় তখনই ক্রমে তারা আর্দ্র হয়ে পড়ে। আবার যখন গরম হাওয়া নীচ থেকে ঠাণ্ডা হয় তখন এর অনেকটাই তরল হয়ে পড়ে যার ফলে শীতের ভোরে দেখি শিশিরপাত।

স্থানীয় বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় কিংবা বিভিন্ন অনুভূমিক বায়ুপ্রবাহের এক-স্থানে সংঘাতের ফলে ঊর্ধ্বগামী বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। বায়ু ওপরে উঠতে উঠতে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে। মলিকিউল-গুলি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় তাদের গতিশীল শক্তি কমে যায় এবং ঠাণ্ডা হতে থাকে। অনতিবিলম্বে এই বায়ু কিঞ্চিদধিক অতিপর্যাপ্তপূর্ণ (Supersaturated) হয়ে ওঠে। এর সংস্পর্শে যদি একই তাপের তরল জল থাকতো তবে হয়ত এই বাষ্পীয় মলিকিউল তরল হয়ে পড়তে পারতো। কিন্তু মহাশূন্যে ঠিক ঐ সময়ে একই তাপের জল কোথায়? তাই বারিবিন্দু সহজে গড়ে ওঠে না। একগুচ্ছের মধ্যে কোনও একটি মলিকিউলের ওপর সমষ্টিগত গুচ্ছ মলি-কিউলের আকর্ষণী শক্তির তুলনায় দুইটি একক মলিকিউলের পারস্পরিক টানের জোর খুবই কম। তাই একটি ছোট বারি-বিন্দু একটি বড় বিন্দুর চাইতে অনেক সহজে বাষ্পীভূত হয়ে যায়। বাষ্পীভূত হওয়া যত সহজ একটি একটি করে মলি-কিউলের সংযোগে বিন্দু গঠন তত সহজ নয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে গড়ে এক সেকেণ্ডের ১০ কোটি ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্য দুইটি মলিকিউলের সংযোগ স্থায়ী হয়। যদি তৃতীয় মলিকিউলকে এর সঙ্গে যুক্ত হতে হয় তবে এই সময়ের মধ্যেই এই জোড়ার সঙ্গে মিলতে হবে। এই ত্রয়ীরা অবশ্য জোড়ার চাইতে শতগুণ বেশী স্থায়ী হবে এবং তার মধ্যেই চতুর্থ মলিকিউলকে

বাড়বার সুযোগ পায়। সম্প্রতি রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিকেরা উপযুক্ত মেঘে এই রকম জিনিস ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের গুঁড়ো ছড়িয়ে কৃত্রিম বর্ষণ ঘটিয়েছেন। হিমাঙ্কের ওপরে অবস্থিত কোনও মেঘে শক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা শুকনো বরফ ছাড়লে যখন বরফের কৃস্ট্যাল বাড়তে থাকে, তখন ঐ মেঘলোকের স্থানবিশেষ গরম হয়ে ওঠে এবং এর ফলে পারিপার্শ্বিক মেঘলোক থেকে ওপরে উঠতে থাকে। ওপরে উঠতে উঠতে নীচের অংশ থেকে শুরু হয় বৃষ্টি ধারা। নিউ সাউথ ওয়েলসের ওপর কৃত্রিম বর্ষণের চেষ্টায় ঠিক এরকমটাই দেখা গিয়েছিল। যে বৈমানিক দল মহাশূন্যে গিয়ে শুকনো বরফ ছেড়ে খোদার ওপর খোদকারী চালিয়েছিল, তারা অনন্ত বিস্ময়ে যে অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করেছিল, তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে নীচের ছবি কখানি থেকে।

বৈজ্ঞানিক আজও জ্ঞান মহাসমুদ্রের কূলে কূলে পরশ পাথর খুঁজে ফিরছে। অনেক প্রশ্নই রয়ে গেছে অজ্ঞাত। প্রকৃতি রহস্য থেকে রহস্যান্তরে ঘুরে ফিরছেন ক্ষেপাকে নিয়ে। একদিন মেঘলোকের সমস্ত রহস্য হবে উদ্ঘাটিত। মানুষ স্ব-ইচ্ছায় সৃষ্টি করবে 'ঝরঝর বাদল বরিষণ।'

'হংস-মিথুন'

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে' কবি প্রমথনাথ তা জানেন কি না সন্দেহ। আর, ঐ উড়ো খবরটি আমাদের কানে যদিও পেঁছিচে, প্রাণের অপরোক্ষ প্রত্যয়ে উত্তীর্ণ হতে পারে নি। চাঁদ একটি মরুজ্যোতিঃসলিলশূন্য মৃত উপগ্রহ এ যেমন জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের কথা, 'বাধ্যতা-মূলক' ভাবে প্রাণের নয়, আমাদের উত্তর-পশ্চিম আকাশে আজ হাতুড়ি-সনাথ কাস্তে উঠেছে, চাঁদ ওঠে নি, এও তেমনি বিশেষ দেশকালের বিশেষ অত্যাবশ্য একটা ঘটনা, চিরদিনের ভাবের কোনো রটনা নয়। অন্ততঃ এই তো আমাদের উপলব্ধি। হাটের কেনা-বেচা, ভূয়া জমিদারির ভাগ-বাঁটোয়ারা, আর তারই পরিণামে মুনাফা নিয়ে বিবাদ, তথা অনলবর্ষী কামান ও বোমার ক্রুদ্ধ গর্জন ও দিগ্দাহী বিস্ফোরণ চতুর্দিক থেকে যদি আমাদের ঘিরেই ফেলে এবং 'মেশিন-গান'এর সম্মুখে জুঁই ফুলের গান গাওয়া একেবারে অসম্ভবও হয়ে ওঠে, তা হলে বরং বোবা সাজতে রাজী আছি—চিরকালের নীল ফলকে চিরউজ্জ্বল সোনালি রূপালি রেখাপাত-গুলি বিস্মরণে বিসর্জন দিয়ে 'কাস্তে-হাতুড়ি জিন্দাবাদ' ব'লে চীৎকার করে গলা ভাঙতে পারব না।

রূপরসের বেদনাকে চাপা দিয়ে দলগত আক্রোশ বা আবেদনই যদি প্রবল হয়ে উঠল, তা হলে ছন্দ এবং উপমা এবং বাক্যের নানা কারুকৌশল নিয়ে ব্যস্ত হওয়া ও ব্যস্ত করার প্রয়োজনটা কোথায়, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে চ'ড়ে বসাই তো ভালো। বেলফুলের গাছে পাকা বেলের আশা অহেতুক নয় কি? আপন আপন ক্ষেত্রে উভয়েই সার্থক; তা বলে একটিকে দিয়ে আর একটির কাজ হয় না। জবা ফুলে বা সজনে ফুলে বাসরশয্যা সাজালে, রাত্রে সেই শয়নে স্বপ্নসম্ভোগ আর পরদিন সেই ফুলে বড়া বা ব্যঞ্জন অবাধে হতে পারে সত্য, কিন্তু এরূপ বহুরূপী ফুল বিশ্বসংসারে প্রচুর দেখা যায় না, আর দেখা গেলেও একই বস্তুতে একই কালে বিভিন্ন ভাবের আরোপ সহজ তো নয়ই, হয়তো সম্ভবও নয়। কাজেই উগ্রনবীনদের দ্বারা নিন্দিত হলেও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে—

পুরাতন এ পৃথিবী,
পুরাতন আমার হৃদয়।

আর, সেই সূত্রেই কবি ও রসিকের মধ্যে শাশ্বত পরিচয়ের গ্রন্থিবন্ধন; এ বাঁধনে ভূত ভাবী বর্তমান সকল কাল বাঁধা; কালিদাস আর রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ বিশী একই কল্পলোকের অধিবাসী; মালিনী তীরবর্তী কণ্বাশ্রম, পদ্মার চর, শিলং-সিমলার পাইনবন আর শহর কলিকাতার ছিপি গলি রূপরাগ আলোছায়া আর শব্দগন্ধের চঞ্চল মায়ায় সমভাবে মনোমুগ্ধকর। ফলতঃ একটি যে দোষ আধুনিক বহু রচনায় দেখা যায়, বিচ্ছিন্নতা, প্রমথনাথের আধুনিকতম এই কাব্যগ্রন্থ সে দোষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। মনে পড়ে প্রমথনাথের প্রথম বয়সের একখানি কাব্যের কথা, তার শ্রুতিমনোহর 'বসন্তসেনা' নামটিও আজকালকার পাঠকসাধারণ জানেন কি না সন্দেহ—সেই কাব্যে বিলুপ্ত যুগের চারু দত্ত-বসন্তসেনার অমর প্রণয়বেদনাই শুধু ব্যক্ত হয়নি, আমাদের আটপৌরে পরিচয় জানা খোয়াই আর কোপাই আর শালবনে বসন্তশ্বাস-সমীরিত চঞ্চলতা সে-সবও অনির্বচনীয়ের ব্যঞ্জনায় প্রায়-না-জানার দিগন্তে পেঁাছে—অপূর্ব আলেখ্যের মতো প্রতিভাত হয়েছে। হাল আমলের নগর অট্টালিকার একফালি ফ্ল্যাটে বাস করে, পুঁথিপত্র পরিবৃত থেকে, বিদিশা ব্যাবিলন মিশর পেরু এবং সব-শেষ মহেঞ্জোদাড়ো হরাপ্পা এ-সব নামাবলী জড়ো ক'রে ছড়া-বাঁধা কঠিন কিছু নয়, কিন্তু বিস্মৃত দেশ-কালের যে কোনো ক্ষুদ্র খণ্ডকে হৃদ্বোধের কাছে সম্পূর্ণ সত্য ক'রে তোলা তেমনি দুরূহ, যেমন দুরূহ আজকেরও এই চোখকানের আশপাশের ধুলো মাটি তৃণ কাকলি ও কলরবকে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষতা থেকে চিরন্তন চিন্ময়তায় পার ক'রে আনা। কিন্তু যথার্থ কবিত্বশক্তির গুণে সেই দুরূহও সহজ স্বাভাবিক হয়, সে এই নূতন কাব্যগ্রন্থখানির পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট।

প্রমথনাথের কবিত্বে রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রজালময় বাঁশির সুরের অনুরণন আছে, এ প্রত্যয়ে আমরা কোনো নিন্দাবাদের অবকাশ দেখি নে। এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের, এক কবির সঙ্গে অন্য কবির, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ জুড়ে যে নিরবচ্ছিন্ন যোগ তা সার্থক রচনার উৎকর্ষেরই কারণ এবং অনিবার্য ব'লে আমাদের মনে হয়। এই চিরন্তনতার সূত্রে নূতন নূতন রূপ রস উপমা অলংকার ও সুরের পুষ্পগুলি গেঁথে দেওয়াতেই নূতন কবির কবিত্বের পরাকাষ্ঠা। সেই নূতনত্বের পরিচয় যেমন বিষয় নির্বাচনে তেমনি বাক্যবিন্যাসে ধরা পড়ে। বিশেষ করে সেই নূতনত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে বলা যায়, ভাষায়, পূর্বকালের গুরু চণ্ডালীদোষকে নূতন কালের প্রাণোচ্ছলতার বাহন ক'রে তোলা এই প্রতিভার একটি লক্ষণ। বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্কিম, বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ থেকে সত্যেন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণ প্রভৃতি লেখকদের রচনায় বাঙলা ভাষার ক্রমিক বিবর্তন লক্ষ্য করলেই এ কথার যাথার্থ্যে কোনো সন্দেহ থাকে না। তাই, প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহী হলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি নন।

রী-রী-করা তরুপুঞ্জ স্তব্ধ পরিষদ

বা

পাহাড়ের গা বাহিয়া নামে চন্দ্রালোক
দুধরাজ সরীসৃপ

বা

চাক বেঁধে ওড়ে আর ডাকে শংখচিল

এ সব ছত্রে বাঙলা ভাষা নিয়েও সাহসিক ও সার্থক পরীক্ষার পরিচয় রয়েছে। কেবল চমক লাগাবার জন্য অথবা নিরীহ পাঠককে হতবুদ্ধি করে দেবার দুরাগ্রহে কোনো পদ বা কোনো উপমা প্রযুক্ত হয়েছে যে, তা নয়। সে রকম কালাপানি-পার-হয়ে আসা উগ্র আধুনিকতার ভুখা থাকলে পাঠককে অন্যত্র সন্ধান করতে হবে।

কথাটা পুরাতন যে, সার্থক কবিতা যেমন গান করে, তেমনই ছবি আঁকে। সংগীতের পরিচয় তার সচ্ছন্দ ছন্দোবন্ধনে, তার নিপুণ শব্দ-গ্রন্থনে; চিত্রময়তার পরিচয় তার বর্ণময়ী

বর্ণনায়। কিন্তু, এমন দেখা যায় যে, কোনো রচনায় গানের ডানায় মন এমন ভেসে যায় যে, রূপের রেখাগুলি, পৃথক্ পৃথক্ রঙগুলি প্রায় চোখে পড়ে না; অন্য দিকে কোনো রচনায় বা রেখায় অথবা রঙে রূপ এমন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, এমন মন কেড়ে নেয় যে, সংগীত সংহত ও প্রচ্ছন্ন থাকে। এই কাব্য দেখছি সংগীত আর চিত্র দুই দিক থেকেই মনোহারী। আর, চিত্রে শুধু রেখাবন্ধ রূপ নেই, শুধু আকার আয়তন নেই, রঙ আছে, রঙের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যঞ্জনাগুলি আছে।—

ধীরে ধীরে ওরা উঠে চলে এলো,
পাহাড়ের গায়ে ছুটে চলে এলো,
অজানা ফুলের মধু লুটে এলো
আলোকবিজয়ী কুজ্‌ঝটিকা।
এতখন কোন্ গুহার ভিতরে
পাইনের ছায়ে ছিল যে কি-ক'রে,
গেঁথে নিয়ে মালা নীহার-নিকরে
কপোতধূসর-বরণ-লিখা।
ঐরাবতের দল এলো ওরা আলোকতৃষারি
কুজ্‌ঝটিকা,
রবির কিরণ মৃণালগুলিরে
উপাড়িয়া নিলো শুড়ে তুলিয়ে,
গিরিসঙ্কটে রাস্তা ভুলিয়ে
চলে দুলি দুলি, বরণ ফিকা।

'ঐরাবতের দল' কথাটিতে মেঘের ভাব ভঙ্গী আকার আয়তন ব্যবহার সবই যেন দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। ভিন্ন ছত্রে বলা হয়েছে 'কপোত-ধূসর'। 'ধূসর' প্রমথনাথের কবিতায় একটা অ্যাব্‌স্‌ট্র্যাক্ট, অবাস্তব, আইডিয়া নয়, তাই ধূসরতার সঠিক জাতি পাতি পরিচয় নির্দেশ না করে তাঁর তৃপ্তি হয় নি। অন্যত্র অবসন্ন সন্ধ্যার বর্ণনা পাওয়া যাবে 'মুক্তিধূসর জলে' অথবা 'ধূমল পাটল এক বাদুড়ের ডানা'র বিস্তারে। ধূসরও যে এত বিচিত্র তা চিত্র-করেরা জানেন বটে; বাঙালি কবির রচনায় এরূপ জ্ঞানের পরিচয় বোধ হয় এই প্রথম দেখা গেল। [illegible]য়া পাখির ডানার মতো ধানের সবুজ; চাঁদ, কখনো সে 'মহুয়াপাণ্ডু' কখনো বা হাঁসের ভ্রষ্ট পালকের মতো নিশান্তে ম্রিয়মাণ; তিমিরপুচ্ছ-তাড়িত সাগরে অতর্কিত মুক্তামুঠির চমক; এ সব কেবল কবির আত্মনিষ্ঠ উপলব্ধিতে নয়, [illegible]ইয়ার সুনিপুণ তুলিকাপাতেই যেন [illegible]রিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বর্ণনার অত্যাভি[illegible]তে সত্যিই রঙ তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে [illegible]লে, কিন্তু কবিতায় কী ঘনিষ্ঠ সত্যতায় [illegible]চর হয়ে উঠেছে, যখন বলা হয়েছে—

[illegible]থির প্রান্তে ডোবে রাঙা রবি,
তিমির ঘনায় নিবিড় কেশে।

[illegible]বার, আসলে বর্ণের বর্ণনার কোনো বিষয় নয় তাও প্রমথনাথের অদ্ভুত প্রতিভায় কী [illegible]ন্ত আগ্রহে ছবি হয়ে উঠতে চায়—

অশ্রুর ত্রিশিরা-কাচে জীবনের তাপ
[illegible]গাকাশে ছড়ায় কার প্রগল্‌ভ কলাপ।

[illegible], একেবারে অবর্ণনীয় না হলেও একমাত্র [illegible]তাতেই যা মনোময় রূপ পায়—

স্কন্ধ সিন্ধুপুলিনে সে যেন
করুণ চন্দ্রলেখা।

অথবা

রক্তবরণ পায়
ক্ষণিক কমল বিকাশি বিকাশি
তরুণী যাত্রী যায়।

এবং

অঙ্গে লাগিয়া তার
নিটোল রৌদ্র সহস্র ভাগে
হয়ে গেল চুরমার।

প্রমথনাথ সংযত কামনার কবি, অনুরাগের কবি, তাই রূপরাগেরও কবি। তাঁর স্বভাব-উৎসুক কামনার যে সংযম তা সুষমার অনুরোধে, ছন্দের বন্ধনে, রূপের ও রঙের প্রত্যক্ষতাভিলাষী সংহতিতে। কামনাতীতেরও ব্যঞ্জনা ফুটেছে, জীবনের তমসাবৃত গহনে নিকষিত আলোকের লেখা দেখে কবি যেখানে উপলব্ধি করেছেন—

মৃত্যুর নিমীল নেত্রে সে যেন রে
জীবনের শেষ চন্দ্রকলা,
বলার মুমূর্ষু বৃন্তে অনন্ত না-বলা।

সেই বলা এবং না-বলার ধ্বনিতে প্রতি-ধ্বনিতে বাতাসে তরঙ্গ তুলে বিশ্বমানসের ওপার থেকে এ পারে রসিকজনের নিকটে হংসমিথুন উত্তীর্ণ হোক পরিপূর্ণ বাণীর দৌত্যে, এই আমাদের একান্ত কামনা। প্রমথনাথের পরিণত প্রতিভার পরিচয়বাহী এই নূতনতম কাব্য-গ্রন্থকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাই।

চন্দ্রচূড়

পরিণাম : বিধুভূষণ বসু ঃঃ গ্রন্থকার কর্তৃক ৩।১-বি, গর্চা ফার্স্ট লেন হইতে প্রকাশিত ঃ দুই টাকা।

লেখক অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ, আজন্ম দৃষ্টিক্ষীণ। তাঁহার কৈশোর ও যৌবনে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থ তৎকালীন পাঠকসমাজ কর্তৃক যথেষ্ট আদৃত হইয়াছিল। সেই আশায় ভর করিয়াই তিনি এই বয়সেও সাহিত্যে ব্রতী হইয়াছেন। অবশ্য এই তথ্য গ্রন্থকারের "নিবেদন" হইতেই সংগৃহীত।

আলোচ্য গ্রন্থটি নানা কারণে আমাদের আনন্দ-দানে সমর্থ হয় নাই। লেখকের গুরুচণ্ডালী দোষদুষ্ট ভাষা রসগ্রহণের প্রধান অন্তরায়। অতীতের মন লইয়া বর্তমানের জীবনধারাকে দেখিবার চেষ্টা করিলে যে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা, পুস্তকটির প্রতি পৃষ্ঠা সেইভাবেই বিপর্যস্ত। 'উমা' চরিত্র সম্পূর্ণ অবাস্তব, আধুনিকা শিক্ষিতা মহিলার প্রতিচ্ছবি হিসাবে এমন একটি হাস্যকর চরিত্র আধুনিক সমাজের সহিত লেখকের অজ্ঞতারই দ্যোতক। স্থানে অস্থানে দেশবরেণ্য সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে অর্থহীন ইঙ্গিত অত্যন্ত আপত্তিকর। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে লেখকের নিকট অন্ততঃ এ বিষয়ে কিছু সংযম আশা করিয়াছিলাম।

গ্রন্থের পরিশেষে সন্নিবিষ্ট গ্রন্থকারের "নগণ্য সাহিত্যজীবন" পাঠেও তাঁহার এই নবতম প্রচেষ্টা আমাদের মনে কোন আশারই সঞ্চার করিতে সমর্থ হইল না। ২৬৯।৫১

পৌত্রান্ত : বিধুভূষণ বসু ঃঃ প্রকাশক গ্রন্থকার, ৩।১বি, গর্চা ফার্স্ট লেনঃ দুই টাকা।

ভারত বিভাগের ফলে বাস্তুহারা পরিবারের করুণ কাহিনী আলোচ্য গ্রন্থটির উপজীব্য। লেখক অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ। যৌবনে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়া বিদ্বজ্জনের আশীর্বাদ লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। হয়তো অতীতের সাফল্যই এই পরিণত বয়সেও গ্রন্থ রচনার মূল কারণ। কিন্তু ইতিমধ্যে বঙ্গ-সাহিত্যে যে বিপ্লব সূচিত হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে গ্রন্থকারের কোন প্রকৃষ্ট পরিচয় না থাকায় কি লিখনভঙ্গী, কি চরিত্র চিত্রণ, কি রচনাশৈলী কোনদিক দিয়াই গ্রন্থটি "আধুনিক" হইয়া উঠে নাই। বর্তমানের সমস্যা অতীতের দৃষ্টি-ভঙ্গী দিয়া দেখার যে কুফল সেই সমস্ত কুফলই আলোচ্য গ্রন্থে পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত।

২৬৮।৫১

ভট্‌চায্‌ মশাই

বিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়

পূর্বপুরুষদের অপেক্ষা পাণ্ডিত্যে ও প্রতিপত্তিতে রাম ভট্‌চায অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ব্যবসা ছাড়েন নাই। এখনও পূজা অর্চনা করিয়া কায়ক্লেশে সংসার প্রতিপালন করেন। যে কয়টি ঘর এখনো তাঁহাকে ছাড়ে নাই, সে কয়টিকে বজায় রাখিয়া ছেলের হাতে তুলিয়া দিয়া যাইবেন, এ আশা এখনো পোষণ করেন।

পিতা বর্তমান থাকিতেই গাঁজা ধরিয়াছিলেন—মাত্রা অতিরিক্ত বাড়াইয়া তোলায় লোকে গাঁজাখোর বলিত। রাম ভট্‌চায ইহাতে আপত্তি করিতেন না, বরং উচ্চকণ্ঠে বলিতেন—দেশের মাটি দেড়হাত তেতে আছে—আমাকে দুষলে কি হবে?

এখন ছেলেরা যখন সাধু সাজিয়া প্রশ্ন করে—ভট্‌চাযমশাই, কতটা গাঁজা খেতে পারেন? ভট্‌চাযমশাই হাস্যমুখে কবুল করেন—খেতে আর আজকাল পাই কোথায়—একটা পয়সাও কি আর বাজে খরচ করবার জো আছে—তবে যদি খাওয়াও তো দুচার কলকে এইখানে বসেই—খেয়ে দেখিয়ে দিতে পারি।

প্রত্যাশায় রাম ভট্‌চাযের কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া আসে—এর ওর মুখের দিকে চাহিয়া দেখেন—জনে জনে বুঝাইয়া দেন—তিনি সর্বদাই পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু অপর পক্ষের কৌতূহল না থাকায় তিনি কাহাকেও নিজের ক্ষমতাটা দেখাইতে পারেন না।

যৌবনে একদিন বাপের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় রাম ভট্‌চায দূর গ্রামে গিয়া বাস করিতে শুরু করেন। সেই হইতে দূরে দূরেই থাকিয়াছেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—পিতা যখন কনিষ্ঠের প্রতি অধিক আকৃষ্ট—জ্যেষ্ঠের ভালমন্দ তাঁহার চিন্তার বিষয় নয়—আমার জন্য যখন তিনি মর্মপীড়া ভোগ করেন—তখন দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করি। আমার ছেলেরাও জানুক পিতামহের সম্পত্তিতে তাহাদের কোন অধিকার নাই।

রাম ভট্‌চাযের এখন বয়স হইয়াছে। দীর্ঘ রোগা দেহে আবক্ষবিস্তৃত ঘন দাড়ি এবং কোটরগত দুটি চক্ষু লইয়া বাবুদের ক্রিয়াকর্মে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে ভুল সংস্কৃত বলিয়া তিনি তাঁহার কর্তব্য করিয়া যান। দক্ষিণা নিতান্ত কম হইলে অথবা আয়োজনের দীনতা দেখিলে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলেন—এত কম দিলে আমার চলে কেমন করে? বোঝ না—পেট তো একটা নয়! বুঝলুম না হয় তোমাদের আর আগের অবস্থা নেই—তা বলে এই দুকোশ পথ হেঁটে আসবো হেঁটে যাবো—একটা বিবেচনা নেই?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেহ বিবেচনা করিত না—বলিত—ওই নিয়ে যান—ওই ঢের হয়েছে।

রাম ভট্‌চায এবার সত্যই রাগ করিতেন। বলিতেন—নিয়ে যাবো না তো চলবে কি করে শুনি?—তোমরা কি চাও এও তোমাদের দিয়ে যাবো? অতঃপর বিরক্ত মুখে সামান্য পয়সা কটা ট্যাঁকে গুঁজিয়া, ছোট পুঁটুলিটা তুলিয়া লইয়া বলিতেন—ঈশ্বরেচ্ছায় তোমাদের ভালই হবে—তখন কিন্তু ভাল করে দিও। শুভ কামনায় তাহার মুখ হইতে সকল ক্ষোভ মুছিয়া যাইত।

মেজো তরফ এবার কলিকতার বাস উঠাইয়া বহুকাল পরে গ্রামে আসিয়া বাস করিবেন। খবরটা শুনিয়া অবধি রাম ভট্‌চায আনন্দে অধীর হইয়া বেড়াইতেছেন। যাহাকেই দেখেন, তাহাকেই বলেন—তোবেটাদের মুখে চুণ কালি পড়বে, দেখবি।

মেজো কর্তা বাড়ি আসিয়াছেন—হৈ চৈ পড়িয়া গেছে। সংবাদ পাইয়া রাম ভটচায অতি প্রত্যূষে আসিয়া কর্ত্রীঠাকুরাণীর সহিত নানা আলোচনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি এখন অন্য মানুষ।

কর্ত্রীঠাকুরাণী প্রশ্ন করিলেন—একটু চা খাবেন, ভট্‌চায্‌মশাই? রাম ভট্‌চায কিছু যেন বিব্রত হইয়া জবাব দিলেন—চা?—খায় বটে লোকে, শুনেছি। বৃদ্ধ হয়েছি—এতাবৎ কখনো খাইনি তো, মা।

আগন্তুক অভ্যাগত এবং বাড়ির সকলের জন্য সমারোহ করিয়া চা প্রস্তুত হইতেছিল অনেকগুলি কাপ-প্লেট—অনেক প্রকারে নূতন পাত্র দেখিয়ে ভট্‌চায্‌ প্রশ্ন করিলেন ও জিনিসগুলি কি মা?

কর্ত্রীঠাকুরাণী হাসিয়া জবাব দিলেন—ওই তো চা।

ভট্‌চায সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করিলেন—তুমি কি খাও, মা?

লজ্জিত হাস্যে গৃহিণী বলিলেন—খাই সকলেই খায়। ভাল জিনিস—দুধচিনি ছাড়া তো কিছু নেই ওতে। আপনাকেও দিক্—এতটা পথ আসচেন—ভাল লাগবে আপনার।

রাম ভট্‌চায বলিলেন—তা হলে দাও। জিনিসটা ভালই, কি বল?

এ বাড়ির গৃহিণী বহুকাল শহরে বাস করিয়া চা খাওয়া অভ্যাস করিয়াছেন। চা খাওয়া ভাল কি মন্দ ইহা লইয়া তাঁহার মনে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। ভট্‌চাযমশায়ের কথায় হাসিয়া বলিলেন—না, না—কোন দোষ নেই এতে। তারপর উঠিয়া গিয়া নিজেই এক কাপ চা লইয়া আসিলেন।

কাপের ধূমায়মান স্বর্ণাভ বস্তুটা দেখিয়া ভট্‌চাযের ভালই লাগিল। তথাপি বিজাতীয় পাত্রটার দিকে চাহিয়া সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—অন্য পাত্রে দিলে হত না, মা?

গৃহিণী নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন—আমারই ভুল হয়েছে—আপনাকে পাথর বাটিতে দিই!

পাথর বাটিতে চা পাইয়া রাম ভট্‌চায আগ্রহের সহিত চাখিয়া চাখিয়া নীরবে চায়ের অনাস্বাদিত-পূর্ব মধুর-রস গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন। কোন দিকে দৃষ্টি নাই।

মাথাটা যতদূর সম্ভব পশ্চাতে হেলাইয়া তৃষিত ওষ্ঠাধরের মধ্যে পাত্রটা বার কয়েক উপুড় করিয়া ধরিয়া রাম ভট্‌চায চা খাওয়া শেষ করিলেন এবং পাত্রটা সযত্নে নামাইয়া রাখিয়া একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বৃদ্ধের অতি পুরাতন রুক্ষ দাড়ি গোঁফের মধ্য হইতে শাঁসের মত অতি কোমল একটুখানি হাসি বাহির হইয়া আসিল। মাথা নাড়িয়া

বলিতে লাগিলেন—উত্তম জিনিস!—আমরা তো এ সব জিনিসের সন্ধান জানি না—খুবই সুস্বাদু! তা, মা, এ কেমন করে প্রস্তুত করে?

তাঁহার গদগদকণ্ঠের আগ্রহে কর্ত্রী-ঠাকুরাণী হাসিমুখে চায়ের উৎপত্তি হইতে প্রস্তুত প্রণালী সবিশেষ বর্ণনা করিয়া শেষ-কালে বলিলেন—সর্দি কাসিতে খুব উপকার হয়।

রাম ভট্চায অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন—হবেই তো? গাছের পাতা! এ একপ্রকার ঔষধ কি বল, মা?

পরদিন অতি প্রত্যুষে আসিয়া রাম ভট্চায গৃহিণীকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। বলিলেন,—একবার দেখতে এলুম।—তোমার ওই জিনিসটি অতিশয় উপকারী—ঔষধ!—আমার কাসিটার যথেষ্ট উপশম লক্ষ্য করচি।

ইহার পর রাম ভট্চাযকে কেহ সকাল বেলা অনুপস্থিত দেখে নাই। অল্পবয়স্করা এ লইয়া উপহাস করিলে বৃদ্ধ মাথা ও হাত নাড়িয়া চোখ বড় করিয়া বারম্বার বলিতেন—উত্তম জিনিস—ঔষধ!—কোন দোষ নেই—সুন্দর জিনিস!—তারপর শ্রদ্ধা-বিস্ফারিত চক্ষে মাথা দোলাইয়া শেষ প্রমাণ পেশ করিতেন—তোমাদের মা বলেছেন!

ক্রিয়াকর্মে চা চলিতে লাগিল।

সেদিন কি একটা পার্বণ উপলক্ষে কাজ সারিতে বেলা হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল—অনেক-খানি পথ যাইতে হইবে। এদিকে আয়োজনের পরিমাণ এরূপ যে একা লইয়া যাওয়া শক্ত। বাগানের আম আসিয়াছিল—তাহার অনেকগুলিই ভট্চাযের ভাগে পড়িয়াছে। তা ছাড়া অনেক দিন পরে দেশে আসিয়া প্রথম কাজে ঘরের কর্ত্রী কিছু রাজ হাতেই জিনিসপত্র দিয়াছেন।

রাম ভট্চায অত্যন্ত উত্তেজিত। একখানা মছায় যতখানি সম্ভব বাঁধিয়া লইয়া বাকি ংশ ঝুড়িতে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন—ার. অনর্গল চীৎকার করিতেছিলেন—বেশী শী করে দাও—রোজ তো দাও না—মি যা পারি নিয়ে যাচ্চি—বাকি সব কবে—ওবেলা এসে নিয়ে যাবো—বেশী শী করে দাও। কাহাকে কি সুরে কি লতেছেন সে খেয়াল তাঁহার নাই।

অত্যধিক আগ্রহে তাঁহার চক্ষু দিয়া অগ্নি এবং মুখ দিয়া কেবলি ধমক বাহির হইতে-ছিল।

ছেলেদের একজন ঝুড়িটা দেখাইয়া নিতান্ত নিরীহের মত জিজ্ঞাসা করিল এগুলো আবার কার জন্যে রাখচেন?—আপনি তো ওই নিয়েছেন—গামছায়!

রাম ভট্চায ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন—মুখচোখ পাকাইয়া দাড়ি আস্ফালন করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কুলাঙ্গার কোথাকার!

'ওটা কি হবে?'—ফচকেমি পেয়েছ?—তারপর শীর্ণ হাতখানা তরবারির মত উদ্যত করিয়া মারমুখো হইয়া বলিলেন—তোমার ঠাকুর্দারা স্বর্ণমুদ্রা দিত—তোমার বাবারা রৌপ্যমুদ্রা দিতো—আর তোমরা?—তোমরা দুটো পয়সা দিয়ে কাজ সারচো!

ছেলেটি জবাব দিল—আগে যারা পুজো করতো তারা পন্ডিত ছিল—আপনার মত মুখখু ছিল না—গাঁজা খেয়ে খেয়ে তাদের দাড়ি গোঁফ অমন তামাটে হয়ে যায় নি।

ক্রোধের তাড়নায় রাম ভট্চায কাজ ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—এক্ষণে কম্পিত কলেবরে ট্যাক হইতে কয়েক আনা পয়সা বাহির করিয়া হাত খানা বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'এই কটা পয়সায় ছেলে-পুলে সংসার নিয়ে গাঁজা খাওয়া যায় রে হতভাগা?—আর—আমার পিতা—বলতে নেই পুত্র হয়ে—জিজ্ঞাসা করিস তোর বাপ খুড়োদের।—দুটো সংস্কৃত বললেই পুজো হয়?' চোখে তাঁহার আহত বিস্ময়।

বলিতে বলিতে রাম ভট্চাযের কণ্ঠস্বর নরম হইয়া আসিল—শুষ্ক মুখে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—আমি তো বাবা, ভক্তি করেই পুজো করি—তাঁদের মত শিক্ষা নেই, সে তো আমি অস্বীকার করি না, বাবা! পান্ডিত্য নেই—কিন্তু তা বলে দেবতার কাজে অভক্তি আমি তো করি না।

বৃদ্ধের কুঞ্চিত ললাট আরো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—রগের গর্ত দুটো উদ্বেগে দপ্ দপ্ করিতে লাগিল—শত্রুর কথা তাঁহার আর মনে নাই—তিনি ব্যাকুল হইয়া নিজের অন্তঃস্থল খুঁজিয়া দেখিতেছেন—দেবতার কাজে কোন ত্রুটি করিয়াছেন কিনা।

গৃহিণী ছুটিয়া আসিলেন। এরূপ ঘটনায় অবাক হইবার কিছু নাই—তবু বলিলেন—দুপুর রোদে কেন ওঁকে বিরক্ত করচিস্?—আপনি আর দাঁড়াবেন না

ভট্‌চাযমশাই, অনেকদূর যেতে হবে আপনাকে। একটি জিনিসও আপনার নষ্ট হবে না, আমি নিজের হাতে সব গুছিয়ে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। আপনাকে আসতে হবে না। আর দেরী করবেন না। অনেক বেলা হয়েছে।

রাম ভট্‌চায অকূলপাথারে কূল পাইলেন। হতভাগা ছেলেটার দিকে চাহিয়া বলিলেন—শুনলে তো?—পেছনে লাগার ফল পেলে তো?—তারপর ঘাড় তুলিয়া মধ্যাহ্ন রৌদ্রের চেহারাটা একবার দেখিয়া লইয়া ডান হাতে ভারি পঁটুলিটা তুলিয়া লইয়া রওনা হইবার উপক্রম করিলেন।

শূন্য উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রাম ভট্‌চায আর একবার উচ্চকণ্ঠে সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন—সব বেশী বেশী করে দেবে—ছোঁড়াগুলো না খেয়ে ফ্যালে—

এবার রাম ভটচায সত্যই উঠান পার হইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার পদতলের কালো ছায়াটা এতক্ষণ তবু উঠানে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল—সেটা এখন নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল।

রাস্তার কিনারা দিয়া রাম ভটচায হন হন করিয়া চলিয়াছেন—বোঝার ভারে দেহ-খানি এক পাশে হেলিয়া গেছে—বাঁ হাত-খানা দূরের দিকে বাড়ানো—মাথার উপর পাটকরা ভিজা গামছা।

গ্রামের ছায়া শেষ করিয়া কামার বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া ভট্‌চায একবার সামনের দুস্তর প্রান্তরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তারপর কামারশালের বন্ধ ঝাঁপটার কাছে দাঁড়াইয়া হাঁক দিলেন—ওরে, ও চন্দর!—একটু তামাক খাওয়া দিকি বাবা।

চন্দর ভিতরেই ছিল—বোধহয় তামাক খাইতেছিল। কে? ঠাকুরমশাই। বলিয়া ঝাঁপ সরাইয়া অভ্যর্থনা করিল।

ঠাকুরমশাই ভিতরের ছায়ায় প্রবেশ করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ভারি পোঁটলাটা নামাইয়া রাখিয়া গামছায় ঘন ঘন মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—একটু তামাক খাওয়া—অনেকটা পথ যেতে হবে—ভাবলুম তামাকটা খেয়ে যাই।

ছোট একটা চৌকি হাত দিয়া সাফ করিয়া চন্দর তাঁহাকে বসিতে দিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি ঠাকুরমশায়ের পোঁটলাটার দিকে—তামাকের আবেদন সহসা তাহাকে স্পর্শ করিল না।

ঝাঁপের ফাঁক দিয়া বাহিরের ঝাঁঝ আসিতেছিল—চন্দর ঝাঁপটা একটু টানিয়া দিয়া মন্তব্য করিল—বেজায় রোদ্দুর। মস্ত যন্ত্র হইতে অতিদীন একটু আওয়াজ বাহির হইল।

চৌকিতে বসিয়া রাম ভট্‌চায বলিলেন—ছোঁড়াগুলোই তো দেরী করে দিলে। আজ-কালকার ছেলে—বেজায় ফচকে। দে, তামাক দে একটু।—তাঁহার কণ্ঠস্বর শুষ্ক ও করুণ।

গভীর অবসাদ হইতে জাগিয়া চন্দর কাজে মন দিল—মাথা-বড় ঢ্যাংঢ্যাঙে দেহ-খানাকে খুব কম নাড়াচাড়া করিয়া বসিয়া বসিয়া তামাকের আয়োজন করিতে লাগিল এবং শেষ পর্যন্ত মালসা হইতে দুই টুকরা জ্বলন্ত কয়লা কলিকার উপর চড়াইয়া দিয়া দুই হাতে 'নেন্' বলিয়া ঠাকুরমশাইকে নিবেদন করিল।

এইটুকু পরিশ্রমেই চন্দরের ক্লান্তি আসিয়াছিল। জড় দৃষ্টিতে পোঁটলাটার দিকে আরো কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর বহুরেখাঙ্কিত মুখখানা সাতিশয় কাতর করিয়া বলিল—আর বেঁচে সুখ নেই, ঠাকুর-মশাই।

চন্দরের কামারশালায় ব্যস্ততার কোন-রূপ চিহ্নমাত্র নাই। কতকাল সেখানে কোন কাজকর্ম হয় নাই—চন্দরের মুখের সহিত জায়গাটার মিল সহজেই চোখে পড়ে। যে লোহার পিণ্ডটা হা স্বরের আঘাত বুক-পাতিয়া লইত—যে হাতুড়ি সাঁড়াশীগুলো কাজের ঝন্‌ঝনা তুলিয়া বাঁকাকে সোজা এবং সোজাকে সহজেই বাঁকাইয়া ফেলিত—যে বায়ুভুক যন্ত্রটা ফুঁ পাড়িয়া লোহা গলাইত—এই সবগুলোই হঠাৎ কোন মড়কের স্পর্শে অনেক দিন হইল একসঙ্গে মরিয়া গেছে। আগুনের জায়গাটায় ইঁদুরেমাটির উপর তামাকের গুল ও ছাই।

ঠাকুরমশায়ের পায়ের কাছে উবু হইয়া বসিয়া হাতের কনুই দুইটি উচ্চিত দুই হাঁটুর মধ্যে ন্যস্ত করিয়া দুই হাতে মাথার চুল টানিতে টানিতে চন্দর বলিল—আর তো চলে না, ঠাকুরমশাই—ফাল্‌টালগুলো সারাতে আসতো—তা—দেখছেন তো অবস্থা।

লোহাপেটা হাতে চুলের ঝুঁটি টানিয়া ধরিয়া মাথা ও সমস্ত দেহের ইঙ্গিতে তাহার কাজের জায়গাটা দেখাইয়া চন্দর পুনরায় বলিল—কেউ আর এদিক মাড়ায় না। হিন্দু চাষী যা ছিল কেউ তো আর নেই—ওদিকে দুতিন ঘর মোছলমান কামার হয়েছে—আমার কাছে আর কে আসবে?—বেটারা বেশ খাচ্ছে পরচে—সুখে আছে।

চন্দরের কাজের জায়গাটার সর্বস্বান্ত চেহারা ভটচাযমশাই আসিয়া অবধি দেখিতে-ছিলেন। চন্দরের কথায় কোন জবাব করিলেন না। কলিকায় অনেকগুলো ছোট বড় টান দিয়া মুহ্যমান দেহে কিছু শক্তির সঞ্চার করিয়া লইয়া বলিলেন—সে আর তুই আমায় কি বলবি? নিজে দেখতে পাচ্ছি—বাপঠাকুর্দারা যা করে জমি-পুকুর করে গেল—আমি তাই করে এখন—

কথা শেষ হইল না। ব্রাহ্মণের নজর পড়িল—হাতের ফাঁক দিয়া চন্দর তাঁহার পোঁট্‌লাটার দিকে চাহিয়া আছে—ভিতরের বস্তুগুলোর সরস স্পর্শে নূতন গামছাখানা ভিজিয়া উঠিয়াছে।

রাম ভটচায একবার বাহিরের দিকে চাহিলেন—ঘরের অপরিসীম শূন্যতার মধ্যে বার কয়েক এদিক ওদিক নজর করিলেন—ছিন্ন কন্থা চন্দরের আশাহত মুখখানা দেখিলেন—তারপর, পুঁটুলিটা স্পর্শ করিয়া বলিলেন—তা নে—তুই ওটা রাখ।

চন্দর যেমন ছিল সেই অবস্থাতেই আঁকিয়া বাঁকিয়া পোঁটলাটার দিকে অগ্রসর হইল—কোন আনন্দ করিল না—একটাও কৃতজ্ঞতার কথা বলিল না। রাম ভট্‌চায বার দুই পা ঘসিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং রাস্তায় নামিয়া মুহূর্তকাল ইতস্তত করিয়া পূর্বপথে ফিরিয়া চলিলেন।

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার চুকিয়া গেছে। গৃহিণী মধ্যাহ্ন নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিলেন—এমন সময় রক্তমুখ ভট্‌চাযমশাইকে উঠানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—আবার ফিরলেন যে?

তুমি আছো, মা! ভালই হয়েছে—ভাবলুম ওগুলোও নিয়ে যাই। রাম ভট্‌চাযের বুকের বোঝা যেন নামিয়া গেল।

বিস্মিত কর্তাঠাকুরাণী বলিলেন—তাই এই রোদে আবার ফিরে এলেন?—কি দরকার ছিল এত কষ্ট করবার—বুড়োমানুষ কেন এমন করলেন? আমি ঠিক পাঠিয়ে দিতুম—দেরী করতুম না।

বিদায়কালীন দৃশ্যটা মনে করিয়া—বৃদ্ধের সেই লুব্ধ বালকের ন্যায় আচরণে তাঁহার একবার হাসি পাইল, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্লিষ্টমুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে আহা করিয়া উঠিল—সজল চক্ষে বলিলেন আসুন, আসুন, ওপরে উঠে আসুন—কি কাণ্ড!

রাম ভটচায এ সব কিছুই শুনিলেন না—ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—একটা কিছু দাও দিকি, মা—গামছা-টামছা যা হোক—আমি আবার ফেরৎ দিয়ে যাবো।

তাড়াতাড়ি একখানা গামছা বাহির করিয়া গৃহিণী বলিলেন—আমি সব গুছিয়ে বেঁধে দিচ্ছি—আপনি ততক্ষণ একটু জিরিয়ে নিন।

রাম ভটচায একথাও কানে তুলিলেন না। আবার স্বহস্তে নিঃশব্দে বহুযত্নে পোঁটলা বাঁধিলেন—একটি কণাও ফেলিলেন না। এবারেরটা আরো ভারি।

দড়াপাকানো দীর্ঘ হাতে বোঁচকাটা তুলিয়া লইয়া উঠানে নামিতে নামিতে বলিলেন—কাল প্রাতঃকালেই এ গামছা আমি দিয়ে যাবো, মা। আবার পাঠাতে হত তো, তাই ভাবলুম নিয়ে যাই।

আবার রাম ভট্‌চায গ্রামের প্রান্তে চন্দরের বন্ধ ঝাঁপটার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—তো-বেটার হাতে যদি আর কোন দিন তামাক খাই!

অপচয়

নলিনীকান্ত রায়

সময় চলেছে বয়ে,
তালে তালে তাল রেখে কেটে যায় কাল,
জীবনে বয়স বাড়ে,
সৃষ্টি মাতাল!

এক দুই করে করে কত শত দিন
একে একে ঝরে গিয়ে হয়েছে বিলীন
সময়ের কুক্ষির অতলে।
তারা কি রয়েছে মনে—মনের পাতালে!

তুমি আমি ঝরে যাবো
ঝরে যাবো একদিন শীতের বিকালে
ঝরঝরে ঝরা পাতা সম,
প্রভাতের অনুরাগ গোধূলি বেলায়
ক্ষীণ হতে হবে ক্ষীণতম।

তুমি আমি এ-পৃথিবী সময় হৃদয়
সব যেন ক্ষয়ে যায়—সব অপচয়!

সৈয়দ মুজতবা আলী

২

কোন্ ভিনারের মা

পবননন্দন পদ্ধতিতে এক লম্ফে বার্লিন পৌঁছইনি। বোম্বাই, জেনেভা, জিনীভা, লেজাঁ, বন্, কলোন, ডুসেলডর্ফ হানোফার হয়ে হয়ে শেষটায় বার্লিন পৌঁছলুম। পূর্বেই নিবেদন করেছি, বিষ্ণুচক্রে কর্তিত খণ্ড খণ্ড সতীদেহের ন্যায় আমার বন্ধু-বান্ধব ছড়িয়ে আছেন দেশ-বিদেশে।

৩২এ নাৎসিরা রাস্তায় কম্যুনিস্টদের উপর গুণ্ডামী করতো, ৩৪এ তারা ছিল দম্ভী—এবারে ৩৮এ গিয়ে দেখি, তাদের গুণ্ডামীটা চলছে ইহুদীদের উপর। তার বর্ণনা অনেকেই পড়েছেন, আমাকে আর নূতন করে বলতে হবে না।

পোস্টকার্ডে লিখলুম, 'আমি এর্নস্ট্ কোন্-ভিনারের মিত্র; বরোদা থেকে এসেছি, আপনার সঙ্গে বুধবার দিন সকাল দশটায় দেখা করতে আসব।'

যে মহল্লায় কোন্-ভিনারের মা থাকতেন আমি সে পাড়ায় পূর্বে কখনো যাই নি। যে বিরাট চক-মেলানো বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হলুম, সেখানে অন্তত চল্লিশটা ফ্ল্যাট থাকার কথা। অথচ অবাক হলুম, জর্মন বাড়ির দেউড়িতে যে রকম সচরাচর সব পরিবারের নাম আর ফ্ল্যাটের নম্বর লেখা থাকে এখানে তার কিছুই নেই। অথচ দেউড়ির চেহারা দেখে মনে হল, এককালে নেমপ্লেটগুলো দেউড়ির পাশের দেয়ালে লাগানো ছিল। যে দু-একটি লোক আনাগোনা করছে তাদের চেহারা দেখে পষ্ট বোঝা গেল এরা ইহুদি—অনুমান করলুম, সমস্ত বাড়িটাই ইহুদিদের—এবং চোখে-মুখে কেমন যেন ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব। আমার দিকে তাকালও সন্দেহের চোখে, আড়নয়নে।

বুড়ীর ফ্ল্যাটের নম্বর আমি জানতুম। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'বার নম্বর ফ্ল্যাট যেতে হলে কোন সিঁড়ি দিয়ে ক'তলায় যেতে হয় বলতে পারেন?' 'না' বলে লোকটা কেটে পড়ল। আরো দু'তিনজনকে জিজ্ঞেস করলুম, সবাই বলে 'না'।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হলুম, কারণ আমার অজানা ছিল না যে, ইহুদিরা পাড়া-প্রতিবেশীর খবর রাখে সবচেয়ে বেশী—এবং বিশেষ করে প্রতিবাসী যদি আপন জাতের লোক হয়।

তখন হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে পড়ল, দশ বৎসর পূর্বে কাবুলেও আমার ঐ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সেখানেও রাস্তায় কেউ কারো বাড়ি বাৎলে দেয় না। কারণ অনুসন্ধান করাতে এক বিচক্ষণ কাবুলী বলেছিলেন, 'বলতে যাবে কেন? তুমি যদি লোকটার বন্ধু হও, তবে তার বাড়ি কোথায়, সে-কথা তো তোমার জানা থাকার কথা। হয়ত তুমি স্পাই, কিম্বা রাজার কাছ থেকে এসেছ তাকে তলব করতে। সেখানে হয়ত তার ফাঁসি হবে। লোকটার বাড়ি বাৎলে দিয়ে আমি তার অপমৃত্যুর গৌণ কারণ হতে যাব কেন?'

এখানে ইহুদিরাও ঠিক সেই পন্থাই ধরেছে। হয়ত আমি নাৎসি স্পাই—কি মতলবে এসেছি কে জানে?

শেষটায় অনেক ওঠা-নামা করে বার নম্বর ফ্ল্যাট খুঁজে পেলুম—অনেক ফ্ল্যাটের নম্বর পর্যন্ত ইহুদিরা সরিয়ে ফেলেছে। ঘণ্টা বাজাতে দরজার একটা কাঁচের ফুটো (এ ফুটোটা আবার পিতলের চাক্তি দিয়ে ভিতর থেকে ঢেকে রাখা হয়) দিয়ে কে যেন আমায় দেখে নিলে। আমি একটু চেঁচিয়ে আমার পরিচয় দিলুম।

একটি তরুণী—তারও মুখে উত্তেজনা আর ভীতি—দরজা খুলে দিল। আমি ঢুকতেই তড়িঘড়ি দরজা বন্ধ করে দিল।

আমাকে নিয়ে গেল ড্রয়িং-রুমে। সেখানে দেখি এক অথর্ব থুরথুরে বুড়ী কৌচের এক কোণে কৌচেরই চামড়ার সঙ্গে হাত আর মুখের শুকনো চামড়া মিলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন। আমি বললুম, 'করেন কি, করেন কি, আমি এর্নস্টের বন্ধু, আমার সঙ্গে লৌকিকতা করতে হবে না।'

তবু বুড়ী অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। দুখানা হাড্ডি-সার ফালি ফালি হাত দিয়ে আমার দু-বাহু ধরে বললেন, 'বারান্দায় চলুন—সেখানে আলোতে আপনাকে ভালো করে দেখব।'

বাইরে বসিয়ে আমাকে তাঁর ঘোলাটে চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন।

তারপর হঠাৎ ঝর ঝর করে দু'চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল—আমি তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েছিলুম, হঠাৎ যে এ রকম দু'চোখ ভেঙে জল নেমে আসবে তার কণামাত্র পূর্বাভাস পাইনি।

চোখ মুছে বললেন, 'মাপ করবেন, আমি কাঁদছিলুম না, আমার চোখ দিয়ে যখন-তখন এ রকম জল নেমে আসে। আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারিনে। আমি এখন কাঁদব কেন? আমি কত খুশী। এর্নস্ট্ কি রকম আছে? তার বউ?'

আমি বললুম, 'বড় আরামে আছেন। জানেন তো, ভারতবর্ষ খারাপ দেশ নয়। এর্নস্টের কাজও শক্ত নয়। ভালো বাড়িঘর পেয়েছেন। আর জানেন তো এর্নস্টের স্বভাব—দু'বছর হয়েছে মাত্র এরই মধ্যে অনেক বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে নিয়েছেন। আপনার বৌমা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আমাদের লাঞ্চ-ডিনার খাওয়ান। আমাকেও বড্ড স্নেহ করেন।'

দেখি বুড়ী কাঁপছেন আর বার বার রুমাল বের করে চোখ মুছছেন।

আমার হাত দুখানি ধরে বললেন,—'কিছু মনে করবেন না। আমি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছি—কিছুতেই নিজকে সামলাতে পারছিনে। আমার বুকের ভিতর কি যেন হচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

'আপনি কাল আবার আসতে পারবেন? না,—হয়ত আপনার অনেক কাজ?'

আমি বুঝতে পারলুম, বুড়ী নিজকে সামলাবার জন্য সময় চান। বললুম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি কাল আসব। আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আমার তো এখানে কোনো কাজ-কর্ম নেই; ছুটি কাটাতে এসেছি মাত্র।' (ক্রমশ)

...ক সোস্যালিস্ট প্রার্থীর প্রতীক বলিয়া ...কোন এক ভোটদাতা একটি বৃক্ষে ...াহণ করিয়া গাছের ডালে তার ভোট ...প করিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন, ...তবু ভালো, তিনি গাছে চড়ে ভোট ...েছেন; অনেকে প্রার্থীকে গাছে চড়িয়ে ...জে কোন ভোট না দিয়েই সরে দাঁড়ান।"

*　*　*　*　*

ষাঁড় কংগ্রেস-প্রতীক চিহ্ন বলিয়া অন্য এক ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া জনৈক ভোটদাতা নাকি তার ভোটটি একটি সত্যিকারের ষাঁড়ের গলায় ঝুলাইয়া দিয়াছেন। শ্যামলাল গান ধরিল—"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে......

*　*　*　*　*

দেশকে কে স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছেন, এ সম্বন্ধে নানা প্রার্থীর নানা মত। এই প্রসঙ্গে আচার্য কৃপালনী বলিয়াছেন —দেশকে স্বাধীনতা দান করিয়াছেন ভগবান স্বয়ং, কংগ্রেস নয়। জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"কিন্তু মুশকিল এই যে, ভগবান নির্বাচনে দাঁড়ান নি, সুতরাং.........

*　*　*　*　*

সংবাদে জানা গেল, পশ্চিমবঙ্গে ভোট-গণনার ফলাফল প্রকাশ করিতে একটু বিলম্ব হইবে। শ্যাম বলিল—"তার কারণ What India does to-day Bengal will do to-morrow.

*　*　*　*　*

বিহারে পঁচিশজন অন্ধ ভোটদান করিয়াছেন, এই খবরটি সংবাদপত্রে বেশ ফলাও করিয়া প্রচার করা হইয়াছে। —"কিন্তু ভোটের ব্যাপারে ক'জন চক্ষুষ্মান, আর ক'জন অন্ধ, তার সত্যিকারের পরিসংখ্যান গ্রহণ কি এতই সহজ!!"
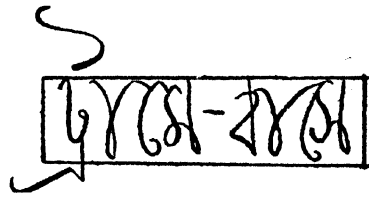
শ্রীযুক্ত নেহরুর নির্বাচনী বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি মন্তব্য করিয়াছেন যে, নেহরুজী এযুগের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় চিত্রাভিনেতা। খুড়োও বলিলেন —"আমরা তবু নেহরুজীকে তারিফ করব এই বলে যে, ভূমিকাটি তাঁর অন্তত যুগোপযোগী। শ্রীমতী দেখেছেন কিনা জানি

না, অনেকে শুধু জারি নাচ দেখিয়েই আসর মাৎ করার তালে আছেন।"

*　*　*　*　*

দিল্লীতে এক পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, মেয়েরা নাকি পুরুষের অপেক্ষা গাড়ি ভালো চালাইতে পারেন। —"অন্য সমস্ত প্রদেশে একরকম বিনা পরীক্ষাতেই জানা গেছে যে, ভালো গাড়ি কেনার ব্যাপারে মেয়েদের চেয়ে পুরুষের দাবীই অগ্রগণ্য"—মন্তব্য বলা বাহুল্য বিশু খুড়োর।

*　*　*　*　*

বদরীনাথের মন্দিরটি এককালে বৌদ্ধদের ছিল এই অছিলায় চীন কম্যুনিস্টরা নাকি এই মন্দিরের অধিকার দাবী করিয়াছেন। —"আমরা কোলকাতা মহবোধি সোসাইটির কথা ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি"—বলে শ্যামলাল।

*　*　*　*　*

ডাঃ ভাটনগর বলিয়াছেন, ভারতে মাটির বাসন-কোসনের অভাব কোনদিনই হইবে না। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"তা জানি, আমাদের অভাব শুধু খাদ্যবস্তুর।"

*　*　*　*　*

এক সংবাদে প্রকাশ, মন্দালয়ে নাকি সম্প্রতি আকাশ হইতে চাউল বৃষ্টি হইয়াছে। —"আমাদের দেশে যে সম্প্রতি আকাশ থেকে নির্বাচনী প্রচার-পুস্তিকা এবং খেলোয়াড় বৃষ্টি হয়েছে, মন্দালয়বাসী এ খবর জানেন কি"—বলেন বিশু খুড়ো।

*　*　*　*　*

একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-বার্তায় জানা গেল, অদূর ভবিষ্যতে জামা-কাপড় কাচার কোন বালাই থাকিবে না। শ্যামলাল বলে—"এটা অবশ্যি ঘর-গেরস্থালির খবর। সর্বসাধারণের চোখের সামনে নোংরা জামা-কাপড় কাচার রেওয়াজ আগে যেমন ছিল, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে, বৈজ্ঞানিকের ওখানেই হার।

*　*　*　*　*

চন্দ্রলোকে যাতায়াতের জন্য বৃটেনে নাকি ইতিমধ্যেই পাসপোর্টের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীদের চেক করার ব্যবস্থাও

যেন ঐ সঙ্গে করে রাখা হয়, কেননা, আমরা জানি, চন্দ্রলোকে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীর সংখ্যাই বেশি"।

*　*　*　*　*

জনৈক সহযাত্রী কলিকাতার জেনানা-বাসে দুইট জেন্টস্ সীট্ রাখার পরামর্শ দিয়াছেন। —বিশু খুড়ো বলিলেন— —"তাহলে জেন্টস্ সীট্ ছেড়ে দাঁড়িয়ে শুনে মনের অবস্থা কী হয়, মা-লক্ষ্মীরা তা খানিকটা আঁচ করতে পারবেন।"

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৭৫

রবীন্দ্রনাথের নিকট হ'তে আশ্বাস লাভের পর প্রেমবাবুকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং চিত্রশিল্পিগণের সহিত সাক্ষাৎ করলাম। ইতিপূর্বেই প্রেমবাবু এঁদের মধ্যে আমার কাগজের পক্ষে খানিকটা প্রচার-কার্য ক'রে রেখেছিলেন। আমার মাসিকপত্র সুবৃহৎ আকারের সচিত্র কাগজ হবে এবং রবীন্দ্রনাথ তা'তে প্রচুরভাবে লেখা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন অবগত হ'য়ে সকলে বিশেষ সুখী হলেন; এবং তাঁরাও যথাসম্ভব সাহায্য করবেন, সে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সেই দিনের রাত্রের ট্রেনেই ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন করলাম।

কয়েকদিন পরেই শরৎকে একটা দীর্ঘ এবং বিস্তারিত চিঠি লিখলাম। রবীন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে লেখা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন জানিয়ে লিখলাম, আর চিন্তার কারণ নেই; তোমাদের উভয়ের লেখার পাখায় ভর দিয়ে আমার কাগজ সফলতার সুদূর আকাশে উপনীত হ'তে পারবে।

শরৎকে বরাৎ দিলাম, প্রথম সংখ্যা থেকে একটি ধারাবাহিক উপন্যাসের এবং মাঝে মাঝে একটি ক'রে গল্পের। যার বাগানে যে ফুল ফোটে, তাকে দিতে হবে সেই ফুলের বরাৎ। রবীন্দ্রনাথের কাছেও একটি উপন্যাসের প্রার্থনা জানিয়ে এসেছি; কাবোর ত' কথাই নেই। মেঘের নিকট জলের প্রার্থনা করবার প্রয়োজন হয় না,—আপনিই পাওয়া যায়।

শরৎকে চিঠি লেখার দিন চার-পাঁচ পর থেকে প্রত্যহই উত্তরের প্রত্যাশায় থাকি, উত্তর কিন্তু আসে না। মনে মনে ভাবি অলস মানুষ, তাড়াতাড়ি উত্তরই বা কেন দিতে যাবে;—নোটিস্ পেয়েছে, হয়ত' একেবারে উপন্যাস ফাঁদবার কাজেই ব্যস্ত আছে।

যতদূর মনে পড়ে, শরৎকে চিঠি লিখেছিলাম ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ মাসে। ১৩৩৩ সালের ফাল্গুন মাস থেকে কাগজ বার করবার তখন আমাদের কল্পনা। সুতরাং হাতে খুব বেশি সময় ছিল না। একটা প্রমাণ আয়তনের মাসিকপত্র আরম্ভ করবার জন্য অন্তত মাস ছয়েককালের উদ্যোগ পর্বের প্রয়োজন। মাস তিনেকের মতো নির্বাচিত মুদ্রণ-বস্তু হাতে না জমিয়ে ছাপাখানায় কপি পাঠালে ভবিষ্যতে অসুবিধায় পড়বার আশঙ্কা থাকে। তা ছাড়া, সচিত্র প্রবন্ধাদির জন্য প্রবন্ধ ও চিত্র সংগ্রহ, ব্লক প্রস্তুত করণ প্রভৃতি সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার ত' আছেই। দিকে দিকে লেখকদের নিকট প্রবন্ধাদির জন্য চিঠি ছাড়তে লাগলাম। শরৎকে আর একখানা স্মারকলিপি লিখব লিখব করছি, এমন সময়ে কলিকাতায় যাবার প্রয়োজন উপস্থিত হ'ল। ভাবলাম, তবে আর চিঠি-চাপাটি কেন, একেবারে সশরীরে সরে-জমিনে উপস্থিত হ'য়ে হয়ত' উপন্যাসের প্রথম কিস্তির কপি হাতে ক'রেই ফিরে আসা চলবে।

তখন সরেজমিন রূপনারায়ণ নদের পূর্ব উপকূলবর্তী হাওড়া জেলার সামতাবেড় গ্রামে। হাওড়া স্টেশনে বেঙ্গল-নাগপুর রেলের ট্রেনে আরোহণ ক'রে দেউলটি স্টেশনে নামতে হয়। সেখান থেকে, হয় পদব্রজে, নয় পাল্কী চ'ড়ে খানিকটা পথ মাঠ ভেঙে, খানিকটা রূপনারায়ণের বাঁধের ওপর দিয়ে মাইল দেড়েক-দুই উত্তরে পানিত্রাস ডাকঘরের অন্তর্গত সামতাবেড় গ্রাম। শরৎচন্দ্রের গৃহ রূপনারায়ণ নদের একেবারে অব্যবহিত উপকূলে।

এই সামতাবেড় গ্রামে শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলার বাস। বর্মা ত্যাগ করার পর হাওড়া বাজে-শিবপুরে একটি গৃহ ভাড়া ক'রে শরৎচন্দ্র বাস করতে আরম্ভ ক... তারপর ভগ্নী এবং ভগ্নীপতির অ... এবং চেষ্টায় সামতাবেড়ে জমি ক্রয় ... গৃহ নির্মাণ করেন। যে সময়ের ... বলছি তার বোধ করি বৎসরখানেক পূ... বাজে-শিবপুরের গৃহ ছেড়ে দিয়ে শরৎচ... সামতাবেড়ে বাস করতে আরম্ভ করেছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের বিশেষ অনুরাগী হ'য়ে ওঠেন। কেহও সামতাবেড়ের নিন্দা করলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বিশেষত সামতাবেড়ের স্বাস্থ্যকরতার বিরুদ্ধে কারো কোনো কথা বলবার উপায়ই ছিল না। শরৎচন্দ্র বলতেন, 'বাঙলাদেশের মধ্যে সামতাবেড়ের মতো স্বাস্থ্যকর গ্রাম আর একটি আছে কিনা সন্দেহ। এখানকার বুড়ো মানুষদের লাঠি মেরে না মারলে রোগে ভুগে তারা মরতে জানে না।' এ কথার প্রমাণস্বরূপ বলতেন, 'মুখুজ্জে মশায় (অনিলার স্বামী) দুঃখ ক'রে বলেন, বয়স ত নিতান্ত কম হল না, তা সত্তর-বাহাত্তর বৎসর ত' হ'ল, কিন্তু একটু নিশ্চিন্ত হ'য়ে যে তামাক খাব, তার উপায় নেই;—হুঁকো হাতে নিয়ে যেদিকে ফিরি, সেইদিকেই দেখি কোনো-না-কোনো মুরুব্বি দাঁড়িয়ে আছে।'

কলকাতায় এসে উঠলাম মেজদাদার বাসায়। বাগবাজার স্ট্রীটের উপর পশুপতি বসুদের বিস্তৃত কম্পাউন্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দ্বিতল গৃহটি ভাড়া নিয়ে তিনি সপরিবারে বাস করছেন। আমি অধিকার করলাম একেবারে পথের ধারের ঘর। সমস্ত দিন কাজ-কর্মের ধান্দায় ঘুরে-ফিরে বেড়াই। রাত্রে বাড়ি ফিরে আহারাদির পর কিছুক্ষণ লেখা-পড়া করি। তারপর রাত্রি বারোটা নাগাদ আলো নিভিয়ে শুয়ে প'ড়ে পারলৌকিক ডাক শুনতে থাকি। সেবার বাগবাজার স্ট্রীটের ধারে সেই ঘরটিতে থাকতে, ওটা যেন আমার একটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নিদেন পক্ষে এক কিস্তি না শুনলে ঘুমটা বেশ নিবিড় হ'য়ে নামত না। কথাটা একটু খুলে বলি।

বাগবাজার স্ট্রীট ঠিক যেন একটা বৃহৎ চুঙ্গীর (funnel) নলের অংশের মতো।

চুঙ্গীর আধার-অংশটা বাগবাজার ঘাটের পূর্বদিকের পাঁচ-সাত বর্গ মাইল বিস্তৃত লোকালয়। চুঙ্গীর নলের অংশটা শেষ হয়েছে কাশীমিত্রের শ্মশান-ঘাটে। সুতরাং পাঁচ-সাত মাইল বিস্তৃত আধার হ'তে নল বেয়ে রথে সওয়ার হ'য়ে যারা আসত তারা সকলেই পরপারের যাত্রী, আর 'বল হরি, হরিবোলে'র যে ডাক শুনতে শুনতে তারা মহাযাত্রা করত, তাকেই বলেছি পারলৌকিক ডাক।

সে সময়ে দণ্ডপাণির কার্যালয়ে বোধ করি বিশেষ একটু কর্মতৎপরতা দেখা দিয়েছিল; সেই জন্যে পারলৌকিক ডাক এক-এক দিন তিন কিস্তি পর্যন্ত শোনা যেত। কাজ-কর্ম যতক্ষণ করতাম, কতকটা অন্যমনস্ক হ'য়ে থাক্‌তাম। কিন্তু সুইচ্ তুলে ঘর অন্ধকার ক'রে শুলেই কান দুটি খাড়া হ'য়ে উঠ্‌ত ডাক শোনার প্রত্যাশায়,—সত্যি কথা বলতে হ'লে, একটু যেন উদ্বেগও। ভয়, এমন কি আতঙ্ক, বলতে যা বোঝায়, তা নিশ্চয়ই হোত না। কিন্তু হঠাৎ যখন আমাদের বাড়ির পূর্বদিকে অনতিদূরে নিসুপ্ত রাত্রির নিশ্চিন্ত স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ ক'রে 'বল হরি' ধ্বনিত হ'য়ে উঠ্‌ত, এবং মিনিট দুয়েক পরেই আমার শয্যার আট-দশ ফুট দূরে পরলোকের যাত্রীর রথের ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দের সহিত ভারবহনের গুরু পদধ্বনি যুক্ত হ'য়ে রাজপথকে চকিত ক'রে তুলত, তখন মনের মধ্যে যে অনধিগমনীয় এবং অনিবার্য অনুভূতির সৃষ্টি হ'ত তার যথোচিত প্রতিশব্দ অভিধানে খুঁজে পেলাম না।

এই অনির্বচনীয় অনুভূতি প্রগাঢ় হ'য়ে উঠ্‌ত, যেদিন শ্রান্ত শ্মশানযাত্রিগণ আমার ঘরের সম্মুখে পথের এক পার্শ্বে শবাধার রেখে শ্রান্তি অপনোদন করত। রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে আমার খাটে শুয়ে সজীব আমি চিন্তাগ্রস্ত; ওদিকে পাঁচ-সাত হাত দূরে শ্রীমান্ নির্জীব মুক্ত আকাশ-তলে তাঁর নিজের খাটে শুয়ে নিশ্চিন্ত। জীবন ও মৃত্যুর এরূপ সন্নিহিত অবস্থায় জীবিতের উত্তপ্ত হৃদয়ের উপর মৃত্যুর হিমস্পর্শ একটু শীতল শিহরণ জাগিয়ে তুলবে, তাতে বিস্ময়ের তেমন কিছু ছিল না।

আমার ঘর ছাড়িয়ে পারলৌকিক শোভাযাত্রা পশ্চিমদিকে অগ্রসর হ'ত। আমি শুয়ে শুয়ে শ্মশানযাত্রীদের ডাক শুনতাম, বল হরি, হরিবোল। বার পাঁচ-সাত বেশ স্পষ্টই শোনা যেত; তারপর ক্রমশ অস্পষ্ট হ'য়ে আসতে আসতে শেষ পর্যন্ত পরিণত হ'ত মাত্র পদান্তের 'ওল্' শব্দে। এই 'ওল্' শব্দ কিছুতেই যেন আমাকে ছাড়তে চাইত না। বহুক্ষণ ধ'রে একটা নেশার মতো আমাকে আকৃষ্ট ক'রে রাখত। প্রথম বার তিন-চার অবশ্য আমার কানই তা শুনত; কিন্তু তারপর, আমার বিশ্বাস, শুনতে থাকত আমার মস্তিষ্ক। ঘুমিয়ে পড়বার আগ্রহে এ-পাশ ও-পাশ করতাম, কিন্তু তারই মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম, 'ওল্!' 'ওল্!' অবশেষে 'ওল' শব্দ বন্ধই হোত, অথবা বন্ধ হওয়ার পূর্বেই আমি ঘুমিয়ে পড়তাম, সব সময়ে তা ঠিক বুঝতে পারতাম না।

কলিকাতায় আমার দিন চার-পাঁচ পরে শরতের সঙ্গে দেখা করতে সামতাবেড় যাবার জন্য প্রস্তুত হ'লাম। বাড়িতে বললাম, "শরতের কাছে যাচ্ছি, বৈকালের আগে কিছুতেই ছাড়বে না; সুতরাং স্নানাহার সব-কিছুই তার বাড়িতে।" মুখ-হাত ধুয়ে চা-খাবার খেয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম।

হাওড়া থেকে রেলে দেউলটি পৌঁছতে ঘণ্টা দুয়েক সময় লাগে। দেউলটি পৌঁছে স্টেশন সংলগ্ন দেউলটির বাজার থেকে একটা পালকি ভাড়া করলাম। এই আমার দ্বিতীয়বার পানিত্রাসে আসা, সুতরাং পথঘাট ততটা সড়গড় নেই। দেউলটি ছেড়ে জগন্নাথ সড়ক পার হ'য়ে খানিকটা গিয়ে পথ একটা ক্ষুদ্র বসতির অলিগলির ভিতর দিয়ে গেছে। প্রথমবারে পদব্রজে যেতে গিয়ে সেখানটায় একটু অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল। তা ছাড়া, ভাদ্র মাস, আকাশে একটু মেঘের আড়ম্বরও আছে; তাই একটা পালকি ভাড়া যুক্তিযুক্ত মনে করলাম।

পালকি চ'ড়ে দুল্‌তে দুল্‌তে অগ্রসর হলাম। ডানদিকে প্রসারিত ধান্যক্ষেত্র; তার সুদূর প্রান্তে লোকালয়ের গাছ-গাছড়া যেন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে শস্যসম্ভারকে আগলে। বাঁধের উপর দিয়ে যাবার সময়ে বামদিকে দৃষ্টিপাত করলে চোখে পড়ে ভাদ্রমাসের পূর্ণাবয়ব রূপনারায়ণের ভৈরব মূর্তি। সবেগে সোচ্ছ্বাসে সফেন-ঘোলাজলের আবর্তের লাট্টু ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে চলেছে অদূরবর্তিনী ভাগীরথীর অঙ্গে নিজ দেহ মিলিত করবার আগ্রহে।

শরৎচন্দ্রের গৃহের নিকটে পৌঁছে পালকি-বেহারারা পথের উপর পালকি নামালে,—একেবারে শরৎচন্দ্রের গৃহদ্বার পর্যন্ত পালকি নিয়ে যাবার মতো পথ নেই। পালকি থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে পাঁচ সিকা ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে অতি সন্তর্পণে একটা বাঁশের পুল অবলম্বন ক'রে নালা পার হ'য়ে শরৎচন্দ্রের গৃহে উপনীত হলাম। বেলা তখন দশটার কাছাকাছি।

বহির্বাটীর বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় অবস্থান ক'রে শরৎ তখন একটা বই পড়ছে। বারান্দার সম্মুখে আমি উপস্থিত হ'তে, আমার পদশব্দেই বোধ হয় সচেতন হ'য়ে, বই সরিয়ে আমার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রেই পুনরায় পূর্ববৎ মুখের সামনে বই রেখে পড়তে আরম্ভ করলে।

কি ব্যাপার! যে শরৎ আমাকে দেখলে সব কাজ ফেলে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে, তার এ কি ভঙ্গী! উপেক্ষা না-কি? কিন্তু উপেক্ষারই বা কি কারণ থাকতে পারে? ভাবলাম, হয়ত একটা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বাক্যের মাঝামাঝি স্থানে রয়েছে, সেইটে শেষ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে কথাবার্তা আরম্ভ করবে।

বারান্দায় উঠে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন আছ শরৎ?"

ঠিক একই ভাবে বই-ঢাকা মুখে অবস্থান ক'রে অনাগ্রহের সুরে শরৎ বললে, "ওই আছি।"

বললাম, "আছ, তা' ত স্বচক্ষেই দেখছি। কেমন আছ, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শরৎ প্রশ্ন করলে, "ভাগলপুর থেকে কবে এলে?"

বললাম, "চার-পাঁচ দিন হ'ল। আমার চিঠির উত্তর দিলে না কেন?

"কি আবার উত্তর দেবো?"

শরতের উত্তর-প্রত্যুত্তরে উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলাম। ব্যাপারটার মধ্যে সরসতার কোনো স্থান আছে কি-না পরীক্ষা করে দেখবার উদ্দেশ্যে মৃদু হাস্য ক'রে বললাম। "উত্তর দেবে, তোমার চিঠি পেয়ে যৎ-পরোনাস্তি খুশি হয়ে উপন্যাস লিখতে বসেছি;—এক সংখ্যার মতো হ'লেই পাঠিয়ে দোবো।"

শরৎ ধীরে ধীরে বইখানা বন্ধ ক'রে পাশের টেবিলের উপর রাখলে, তারপর সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে তীক্ষ্ম কুঞ্চিত নেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "সেই কয়লাবালার ছেলের কাগজে আমাকে উপ-ন্যাস লিখ্‌তে বল?"

সে কি ভয়ানক ফোঁস্! যেন গোখরো সাপের লেজে পা দিয়েছি! কিন্তু সত্যি সত্যিই ত দিইনি। তাই এই অপ্ররোচিত অকারণ ফোঁসের বিরুদ্ধে আমার অন্তরস্থ অভিমানও ফোঁস্ ক'রে উঠ্‌ল। ঠিক একই-রকম তীক্ষ্ম নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে বল্‌লাম, "কয়লাওয়ালা কে? যোগীন মুখুজ্জে?"

শরৎ বললে, "তা নয় ত' আবার কে?"

বল্‌লাম, "কয়লাওয়ালার ছেলে আমার জামাই, তা জানো?"

শরৎ বল্‌লে, "তা জানি আর নাই জানি, আমি ওদের কাগজে লেখা দেবো না।"

বললাম, "কয়লাওয়ালা ইহলোকে এখন আর নেই, তা তুমি জানো?"

শরৎ এ কথার কোনও উত্তর দিলে না। 'কয়লাওয়ালার ছেলে' কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলাম, তার আসল রাগ কয়লাওয়ালার ওপর। একবার ইচ্ছা হ'ল জিজ্ঞাসা করি, কয়লাওয়ালার কি অপরাধ? কিন্তু মনের মধ্যে যে দুর্বার অভিমান রুদ্ধ রোষে তড়পাচ্ছিল, সে ফোঁস্ ক'রে উঠে বললে, খবরদার না! কোনো-রকম বোঝা-পড়ার চেষ্টা দেখিয়ে নিজেকে হাল্কা কোরো না! মনে-মনে বললাম, তবে রইলে তুমি শরৎচন্দ্র তোমার সামতাবেড়ে, রইল তোমার উপন্যাস আর গল্প। একবার দেখাই যাক্, তোমাকে বাদ দিয়ে মাসিকপত্র বার করতে পারি কি-না।

ভালবাসা যেখানে পর্যাপ্ত, প্রত্যাশা যেখানে অসঙ্গত নয়, দাবি যেখানে অনস্বী-কার্য, অভিমান সেখানে, কঠিন ভূমির শিকড়ের ন্যায়, দুরপনেয় হয়। শরৎ যদি আমার আত্মীয় না হোত, বন্ধু না হোত, আমাদের উভয়ের মধ্যে যদি প্রীতির একটা সহজ এবং সুদৃঢ় বন্ধন না থাক্‌ত, তা হ'লে হয়ত তার সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক ঝগড়াঝাঁটি ক'রে যা-হয় একটা মিটমাট্ ক'রে নিতে পারতাম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একমাত্র যে কাজ করা যেতে পারে তাই করলাম; উঠে দাঁড়ালাম।

শরৎ বললে, "কোথায় যাচ্ছ?"

বললাম, "বাড়ি।"

ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে শরৎ বললে, "বাড়ি মানে?"

"বাড়ি মানে, কলকাতা বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়ি।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভেবে শরৎ বললে, "খাওয়া-দাওয়া ক'রে যেয়ো।"

মুখ অবশ্য উচ্ছ্বসিতই হ'য়ে ছিল; সেই উচ্ছ্বসিত মুখে অল্প একটু হাসি হেসে বললাম, "এই কেতাবওয়ালার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতে তুমি আমাকে বল?"

'কয়লাওয়ালার' এক কঠিন পাল্টার জন্য শরৎ নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিল না। সে এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারলে না, অথবা ইচ্ছে ক'রেই দিলে না। মুখটা কিন্তু একটু কঠিন ও আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল; বললে, "অনেকটা পথ এসেছ, যেতেও হবে অনেকটা পথ,—অন্ততঃ চা-খাবার খেয়ে যাও।"

এবার আর উচ্ছ্বসিত মুখে হাসলাম না, কতকটা সহজ হাসি হেসেই বললাম, "ডাল-ভাত খেতে চাচ্ছিনে অভিদের জন্যে ত' নয় যে, চা-খাবার খেতে আপত্তি না হ'তেও পারে। কানমলা খেলাম না, কিন্তু চড়-চাপড় খেয়ে যাব, সে কি কোনো কাজের কথা হ'ল?"

বারান্দা থেকে উঠানে নেমে এলাম। না খেয়ে চ'লে যাচ্ছি সে জন্য শরৎ হয়ত মনে মনে একটু দুঃখিত হয়েছিল। আমার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে সে বললে, "তুমি রাগ করছ উপীন।"

বললাম, "তা হয় ত' করছি, কিন্তু অকারণে করছিনে।" শরতের কম্পাউন্ড ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। শরৎ বোধহয় এক-বার শেষ চেষ্টা করলে; বললে, "অন্যায় ক'রে যাচ্ছ তুমি।"

ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, "অন্যায় ক'রে যাচ্ছি, না অন্যায় পেয়ে যাচ্ছি, সে বিচার ভবিষ্যতে হয়ত' একদিন হ'তে পারবে।"

শরৎ বল্‌লে, "তা হ'লে ভবিষ্যতের দিকেই চেয়ে ব'সে থাকা যাক্।"

এর বেশি শরতের পক্ষে আর কিছু করবার উপায় ছিল না। সে বুঝেছিল, আমাকে তার বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করাবার যদি কোনো উপায় থাকে ত' একমাত্র তা ছিল আমার কাগজে লেখা দিতে প্রতিশ্রুত হ'য়ে। কিন্তু এতটা মচকাতে সে হয়ত' নিজের কাছে একটু অসুবিধা বোধ করছিল। আমি কিন্তু তাকে এই অসু-বিধার অবস্থা হ'তে মুক্তি দেবার অভিপ্রায়ে আর কোনো কথা না ব'লে স'রে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম, সে আমার পথ বন্ধ করলে, কিন্তু আমি ত তার পথ বন্ধ করিনি; যদি কোনো দিন তার মনে হয় সে ভুল করেছিল, তা হ'লে সে আমার কাছে উপস্থিতও হ'তে পারে, চিঠি লিখতেও পারে।

দীর্ঘকাল পরে একদিন অবশ্য তার ভুল ভেঙেছিল। সেদিন সে আমার কাছে উপস্থিত হয়নি, চিঠিও লেখেনি; করেছিল ফোন। আর, ফোনের মাধ্যমে কথোপকথনের মধ্যে চক্ষুলজ্জার তেমন বালাই থাকে না ব'লে বহুদিনকার বিবাদ এক নিমেষে মিটে গিয়েছিল।

কোন্ ভুলের বশবর্তী হ'য়ে শরতের কাছে কয়লা-খনির মালিক কয়লাওয়ালা হয়েছিলেন এবং কেমন ক'রে তেমন ভুল হ'তে পেরেছিল, তার সন্ধান পাই সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুরেন দাদার কাছে। যথাকালে সে সকল কথা প্রকাশ ক'রে বলব।

সেদিন কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে ট্রেনে ব'সে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, কাগজ যদি বার করতে পারি ত' খুঁজে পেতে অখ্যাত শক্তিশালী লেখক বার করব; যদি প্রয়োজন হয়, তাদের দ্বারস্থও হব; কিন্তু প্রাচীন প্রতিষ্ঠাবানের দ্বারে সাধ্যমত আর নয়।

(ক্রমশ)

রঙ্গজগৎ

জবানবন্দী (এ কে ডি প্রডাকসন্স—ইস্টার্ণ টকীজ)—কাহিনীঃ প্রণব রায়, চিত্রনাট্য ও পরিচালনাঃ অমর দত্ত; আলোকচিত্রঃ দিব্যেন্দু ঘোষ, শব্দ-যোজনাঃ পরিতোষ বসু; সুরযোজনাঃ গোপেন মল্লিক; শিল্পনির্দেশঃ মদন গুপ্ত; ভূমিকায়ঃ বিকাশ রায়, রবীন মজুমদার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, শ্যাম লাহা, পশুপতি কুণ্ডু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা, স্মৃতিরেখা, বেলা বসু প্রভৃতি
রাণা এণ্ড দত্তের পরিবেশনে ৪ঠা জানুয়ারি শ্রী, ছায়া, রূপম, উজ্জ্বলা ও মেনকাতে মুক্তিলাভ করেছে।

বাঙলা ছবিকে নির্বিচারে তারিফ করে না গেলে বাঙলা ছবির অস্তিত্ব আর টেঁকানো যাবে না এমন একটা রব চিত্র-নির্মাতা ও চিত্রব্যবসায়ীদের একতরফ থেকে তোলা হয়েছে। বাঙলার লোক হয়ে বাঙলা ছবির ওপর শ্রদ্ধান্বিত হয়ে থাকার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষ-ক্ষেত্রে যদি জানিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয় যে দর্শকদের জ্ঞানবুদ্ধিকে অশ্রদ্ধা করেও রেহাই পেয়ে যাওয়ার জন্যেই অমনধারা আবেদন জানানো হচ্ছে তা'হলে বাঙলা ছবির পৃষ্ঠপোষকদের আর ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

ছবি আমরা তুলে যাচ্ছি এবং জন-সাধারণেরই জন্যে, কিন্তু কৃতিত্বের জোরে তাদের মধ্যে প্রশংসা সঞ্জীবীত না করে, যদি যেমন-তেমন একটা কিছুর জন্যেও তাদের সহানুভূতি ভিক্ষা করতে হয় তো তা নিয়ে কন্দুরই বা চলা যেতে পারে?

এখানে এসব কথা বিশেষ করে উল্লেখ করার কারণ রয়েছে। 'জবানবন্দী'-র নির্মাতা এ কে ডি প্রডাকসন্স নতুন নয়; এর আগে খানকয়েকই ছবি তুলেছেন, দেখিয়েছেন, এবং কিছুটা আশ্বস্ত হবার মতো কৃতিত্বও অল্পবিস্তর ফুটিয়ে তুলেছেন। এদের আগামী কর্মসূচীতে চার-পাঁচখানি ছবির নাম রয়েছে, তার মধ্যে খান দুয়ের কাজও চলেছে। সুতরাং এরা যে ছবি তোলাটা সখের বলে গ্রহণ করেননি তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। সেই এরাই যদি গোঁজামিল দেওয়াটাই কাজ গুছিয়ে নেবার প্রশস্ত উপায় বলে ধরে নিয়ে সেইমতে ছবি তুলতে থাকেন তাহ'লে দর্শক বিশ্বাস করবে কাকে? কোন চিত্রনির্মাতা সামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে যেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং লোকে যেই তার কাছ থেকে কিছু পাবার আশা করতে থাকে অমনিই দেখা যায় সে চিত্রনির্মাতার পণই যেন হয়ে দাঁড়ায় লোকের আশাকে কি করে ভেঙে দেওয়া যায় সেই-ভাবে কাজ করার দিকে।

সাদাসিধেভাবে বেশ ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ সামাজিক গল্প 'জবানবন্দী'। কাহিনীকে জমিয়ে তোলার জন্যে যেরকমের নাটকীয় মোচড় দরকার এতে তাও আছে। কিন্তু লোকের মনে বসিয়ে দেবার জন্যে যে শিল্প-প্রকরণ যেভাবে প্রযুক্ত হওয়া দরকার সে দিকটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনা যেন দরকারই মনে করা হয়নি। সাজানো ঘটনাগুলোকে জুড়ে গল্পটাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া ছাড়া চিত্রনাট্যকার-পরিচালক আর কোন কাজ আছে বলে মনে করেননি। আসলে চিন্তা করাটাই তিনি বাদ দিয়ে রেখে দিয়েছেন, অথবা বলা যেতে পারে চিন্তায় তিনি কুলিয়ে উঠতে পারেননি। তাই দেখা যায় ছবিখানিতে তিনি করেছেন সবই, কেবল চিন্তার দিকটা ছাড়া—সেটা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন দর্শক-দের ওপরে। দর্শকরাও তাই ছবি দেখার সময় মনটাকে ছবির সংগে না জড়িয়ে ছবির ত্রুটি নিরীক্ষণেই বার বার সচকিত হতে বাধ্য হয়। এ অবস্থা হয় ছবির আরম্ভ থেকেই।

ছবির উদ্বোধন পুলিসের চলমান এক-জোড়া পা থেকে। পা থেকে এলো তার মুখ—কলের পুতুলের মতো এদিকে ওদিকে চাইলে এবং শেষ দৃষ্টি ফেললে যেদিকে সেদিক থেকে একটা আর্ত চীৎকার এলো; একটার পর একটা পর পর জানলা খুলে এক একটা মুখ বেরিয়ে আসতে লাগলো। তারপর একটা বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে দলে দলে লোক ওপরে উঠতে লাগলো। বোঝা গেলো খুন হয়েছে, আর লোকে দৌড়চ্ছে সেইদিকে। গল্পের এই হলো সূত্র, কিন্তু দৃশ্যাংশগুলো সাজানোয় স্বতঃস্ফূর্ততার একান্ত অভাব ঘটনার ওপরে কোন জোর আরোপ তো করলেই না, উপরন্তু লোকে বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করে দেয় পুলিসের ঘাড় ফিড়িয়ে চাউনির মধ্যে শেখানো ভাবটা নিয়ে, পর পর জানলা খুলে মুখ বাড়ানোর মধ্যে নির্দেশের স্পষ্টতায় হেসে ফেলে লোকে, ঘটনাস্থলের দিকে লোকের যাওয়ার মধ্যে সাজানো

লাইনে মার্চ করা দেখেও হাসি জাগে। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, পরিচালক একটা আভাস মাত্র সাজিয়ে ধরেছেন বাকীটা ছেড়ে দিয়েছেন দর্শককে বুঝেসুজে গ্রহণ করে নিতে। ফল দাঁড়ালো এই ছবিখানির ওপর প্রথম দৃক্পাতেই ছন্দপাতের যে পরিচয় ধরা পড়ে গেলো লোকের মন সেই থেকে কেবল খুঁত ধরবার দিকেই ব্যগ্র হয়ে উঠলো। ও ভাবটা কাটাতে যে রকম দৃশ্যসৌষ্ঠব ও নাটকীয় তেজ থাকা দরকার পরে আর কোথাও তা না থাকায় শেষপর্যন্ত সারা ছবিখানিই ছন্দহীন বলেই ছাপ রেখে যায়। অথচ এই ত্রুটি শুধরে নেওয়াটা কোন বাড়তি খরচের ধাক্কায় পড়তো না, দরকার ছিলো কেবল পরিচালকের খানিকটা ধৈর্য আর চিন্তার আর সেই সংগে দর্শকের কাছে ফাঁকি ধরা পড়বার লজ্জাবোধ—কিন্তু তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনা হয়নি। এই রকমের অবহেলাই হ'চ্ছে বাঙলা ছবির একটি আসল পীড়া। আরোগ্যক্ষম হলেও এই পীড়াটাকেই পুষে রেখে দর্শকের কাছ থেকে ভিক্ষালব্ধ সহানুভূতির প্রলেপে বাঙলা ছবিকে রুগ্ন অবস্থাতেই জিইয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

"জবানবন্দী" গল্প আরম্ভ করা হলো "ফ্ল্যাশ-ব্যাক" দিয়ে। ইতিপূর্বে যে খুনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেই সূত্রে এক ব্যক্তি থানায় এসে জানালে যে আততায়ী সে নিজে। এই বলে সে তার জীবন কাহিনী বিবৃত করতে আরম্ভ করলে বছর কতক আগেকার ঘটনা ধরে। গোড়ার পরিস্থিতি যা, তাতে 'ফ্ল্যাশ-ব্যাক' এখানে চলে, কিন্তু কাহিনী বিবৃতিতে ও-প্রক্রিয়াটা আগে অধিকাংশ ছবির ক্ষেত্রেই এমনি বেমক্কাভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে, এখন লোকে দেখলেই পরিহাস করে ওঠে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি, যদিও এর কাহিনী যে ধাঁচের তার সংগে 'ফ্ল্যাশ-ব্যাক' দিয়ে গল্পের অবতারণাই নাটকীয় প্রয়োজনে উপযুক্ত।

গল্পের আরম্ভ হলো অতীত থেকে। থানায় যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করতে এসেছিলো তার নাম নিরঞ্জন। সে ভালবাসতো রত্না নামক এক ধনীকন্যাকে, রত্নাও তাকেই পতিত্বে বরণ করার স্বপ্ন দেখছিলো এবং রত্নার বাবা শিবশংকর চৌধুরী এদের মিলনের পক্ষে ছিলেন। ওরা দুজনে পড়তো একই সংগে কিন্তু বি-এ'তে নিরঞ্জন ফেল করে গেলো। গরীব নিরঞ্জনকে হতাশা থেকে রত্নাই বাঁচালে; নিরঞ্জনকে সে টাকা দিয়ে বিলেত পাঠালে নাট্যকলা শিখে এদেশের নাট্যশিল্পকে সমৃদ্ধ করার জন্যে—নিরঞ্জনের স্বপ্নও ছিলো তাই। নিরঞ্জন বিলেতে চলে গেলো। এই সময়ে রত্নার সংগে আলাপ হলো নিরঞ্জনের সুখ্যাত গায়ক বন্ধু সুকান্তের সংগে। আগেই কলেজের একটা অনুষ্ঠানে রত্না সুকান্তর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলো। কয়েকদিনের মধ্যে ওদের আলাপ মিলনের আকাঙ্ক্ষায় এসে দাঁড়ালো। শিবশংকর এ বিয়েতে রাজী হলেন না; বাড়ির পুরনো নায়েব চক্রবর্তী মহাশয়ই ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। শিবশংকর হুকুম দিলেন ওরা যেন বাড়িতে না থাকে। বিয়ের পরে বরবধূ চলে আসবে এমন সময়

নিরঞ্জন উপস্থিত। রত্নাকে বধূরূপে দেখে নিরঞ্জনের সব স্বপন চুরমার হয়ে গেলো। সামান্য কেরাণী সুকান্তর সঙ্গে রত্নার দুঃখে কষ্টে দিন চলতে লাগলো তবে সে নিজেই এ অবস্থা মেনে নিয়েছে বলে এবং সুকান্তর নিশ্ছিদ্র ভালোবাসার জন্যে দিন কাটতে লাগলো। নিরঞ্জন একটি থিয়েটার পরিচালনার ভার নিলে এবং সেইসূত্রে সে রাস্তা থেকে কাজল নামে এক নর্তকীকে কুড়িয়ে নিয়ে নায়িকা করে গড়ে তুললে। এদিকে সুকান্তর চাকরি গেলো। নিরঞ্জন তাকে গানের জন্যে তার থিয়েটারে কাজ দিলে। সুকান্তর প্রতি কাজলের দৃষ্টি পড়লো। সুকান্ত কাজলের টানে রত্নাকে ভুলতে আরম্ভ করলে। শেষে নিরূপায় হয়ে রত্না গিয়ে কাজলের কাছে তার স্বামী ভিক্ষা চাইলে, কাজল তাকে বিদ্রূপ করে তাড়িয়ে দিলে। রত্না গিয়ে দাঁড়ালো নিরঞ্জনের কাছে, সুকান্তর ব্যাপার জানালে তাকে। নিরঞ্জন তার প্রতি রত্নার আগেকার প্রেম ও উপকারের ঋণ শোধ করার এই সুযোগ গ্রহণ করলে। কাজলের সঙ্গে এমনি অভিনয় করলে যাতে সুকান্ত কাজলকে ভুল বুঝতে পারে। এই ব্যাপার নিয়েই সে কাজলকে হত্যা করে বসে। এই হলো আততায়ী নিরঞ্জনের জবানবন্দী।

এমনিতেই দেখা যায় গল্পের মধ্যে নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টির সুযোগ বেশ রয়েছে, কিন্তু তাকে স্পষ্ট করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়নি। উপরন্তু সামান্য সামান্য ব্যাপারে এমনি ত্রুটি ঘটিয়ে ফেলা হয়েছে যে, সেইগুলিই যেনো ছবিখানি উপভোগে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ওপর সংলাপের দুর্বলতাও জুড়ে বসেছে।

নিরঞ্জন বিলেত যাবে বলে তার মা সুটকেশ সাজিয়ে দিলেন, কিন্তু রত্না এসে ডাক দিতেই নিরঞ্জন সেটা যেমনকে তেমনিই রেখে দিয়ে বেরিয়ে গেলো; এমন কিছু মারাত্মক ত্রুটি নয় কিন্তু ওটুকুই লোকে পরিচালকের গাফিলতির নিদর্শন বলে ধরে নেয়। তারপর নিরঞ্জন বিলেত থেকে ফিরে আসার পরও সেই সুটকেশই প্রায় তেমনি অবস্থাতেই ঐ একই জায়গাতে দেখে লোকে না হেসে আর পারে না। এ বিদ্রূপটা কাটিয়ে তোলার কোন অসুবিধেই ছিলো না। নাট্য-দরদী বিলেতে গেলো ওখানকার নাট্যশিল্প থেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে এদেশের মঞ্চকে যাতে গড়ে তুলতে পারে। কার্যতঃ দেখা গেলো নিরঞ্জন মঞ্চে এনে দিলে নিকৃষ্ট ক্যাবারে জাতীয় জিনিস। পুরনো নায়িকাকে বিদেয় দিয়ে থিয়েটারের চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরে আসতেই কাজলকে পেয়ে যাওয়া এমনি চিরাচরিত ধারায় এসে পড়েছে যে, পরে কাজলের নায়িকা রূপটা কোন আকর্ষণই টানতে পারে না। সুকান্তর গানে রত্না এবং কাজল দুজনেই মুগ্ধ হবে এই হলো গল্পের ঘটনা, কিন্তু যে গান সুকান্তর মুখ থেকে শোনা গেলো তা লোককে উলটে আসর থেকে তাড়িয়ে দেবারই মতো। যে সব দোষ থাকবার কোন যুক্তিই থাকতে পারে না, এমনিধারা ছোট ছোট অনেকদিকের ত্রুটি পরিচালকের অজ্ঞতার চেয়ে তার অবহেলাটাই প্রকাশ পেয়েছে বেশী করে এবং লোকে অজ্ঞতাকে যদিও বা সহানুভূতির চোখে দেখতে পারে, কিন্তু অবহেলাকে তারা সহ্য করতে পারে না। 'জবানবন্দী'র বিন্যাসে চারিদিকেরই অবহেলাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্পষ্ট।

অভিনয়ের ব্যাপারে রত্নাদের বাড়ির পুরনো নায়েব চক্রবর্তীর ভূমিকায় কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ই সবচেয়ে বেশী নজরে পড়েন। এটি কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর এক টাইপ চরিত্র-চিত্রণ যা তার বহুমুখিতারই সুন্দর নিদর্শন বলে সুখ্যাত হবে। রত্নার ভূমিকায় স্মৃতি বিশ্বাস দুঃখিনী নারীর চরিত্র চিত্রণে লোকের সহানুভূতি টেনে নিয়েছেন। নিরঞ্জনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়। তার স্বর ও ব্যক্তিত্ব চরিত্র চিত্রণে তার নাম নষ্ট হতে দেননি এই পর্যন্ত, শেষের দিকে অবশ্য অভিনয় ভালো করেছেন। কাজলের ভূমিকায় অনুভাকে একটি নতুন রকমের চরিত্রে দেখা গেলো, তবে ছলনাময়ী নারীর চরিত্রে তেমন মানালো না তাকে, আর তাকে দিয়ে নাচ না দেখালেই ভালো হতো। হাসির দিকটার খানিকটা হাসাতে সক্ষম হয়েছেন থিয়েটারের প্রডিউসর ও তদসহকারীর ভূমিকায় যথাক্রমে শ্যাম লাহা ও পশুপতি কুণ্ডু। কলাকৌশল ও সংগীতাদির দিক আলোচনার অযোগ্য।

ক্রিকেট

ইংলণ্ড দল কানপুরের গ্রীন পার্কে চতুর্থ ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচে ভারতকে শোচনীয়ভাবে আট উইকেটে পরাজিত করিয়াছে। ভারতের এই পরাজয় দুঃখের সন্দেহ নাই; তবে নূতনত্ব কিছুই সৃষ্টি করে নাই। ইতিপূর্বে ভারত সরকারী টেস্ট খেলায় বহুবার পরাজিত হইয়াছে। জয়লাভ করাই সম্ভব হয় নাই। এইবারেও হইল না ইহাই বোধ হয় দুঃখের প্রধান কারণ। তবে এই প্রসঙ্গে তৃতীয় টেস্ট খেলার পর যে সকল আলাপ-আলোচনা শোনা গিয়াছিল, তাহাই স্মরণে জাগিতেছে। অনেকেই বলিয়াছিলেন, কোন টেস্ট খেলাতেই জয়পরাজয় নিষ্পত্তি হইবে না। ঐ সময় আমরা একটা কথা বলিয়াছিলাম, নিশ্চিত করিয়া খেলার ফলাফল সম্পর্কে কেহই পূর্ব হইতে বলিতে পারে না। আমাদের সেই উক্তি যে কতখানি যুক্তিসঙ্গত, তাহাই বর্তমানে প্রমাণিত হইল।

কেন এই পরাজয় হইল, সেই সম্পর্কে রয়টারের বৈদেশিক ক্রিকেট সমালোচক মিঃ লেসলী স্মিথ এক চিন্তাশীল উক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি কথাই যে আমরা সমর্থন করি তাহা নহে, তবে ইহা বলিতে বাধ্য যে, তিনি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কিছু বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "প্রথম ও প্রধান কারণ হিসাবে বলা চলে যে, ইংলণ্ড দল এইরূপ পিচের সহিত লড়িবার বিষয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ—ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ এইরূপ পিচের সহিত প্রতিনিয়তই ইহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। দ্বিতীয়ত ভারতীয় দলের দল গঠন—ইহা আমি বলিতে বাধ্য। দুইজন ডান হাতের স্পিন বোলারকে দলভুক্ত করিবার কোনই যুক্তি দেখিতে পাই না। নির্বাচক জানিতেন, এই পিচে স্লো-বোলারদের সুবিধা হইবে; কিন্তু তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই অবাক হইয়াছেন যে, বল প্রথম হইতেই অধিক স্পিন করিয়াছে। স্পিন উইকেট মানে বাম হাতের স্লো ও অফ্ স্পিন বোলার-দের সাহায্যকারী—লেগ্ ব্রেক্ বোলারদের নহে। ফাস্ট পিচে লেগ্ স্পিন বোলারগণ কার্যকরী হন—স্পিন উইকেটে নহে। অফ্ স্পিন ও বাম হাতের বোলারগণ বলের স্পিন করিবার গতি রোধ করেন। ইহার জন্য পিচের উপরি-ভাগ মসৃণ হওয়া চাই। লেগ্ স্পিন বোলারগণ বলের গতির মুখে স্পিন করেন। ইহাকে সাহায্য করিতে হইলে মাঠ কঠিন হওয়া চাই, যাহাতে হঠাৎ বল ছিটকাইয়া যাইতে পারে। এই পিচে তাহার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। অথচ দলে দুইজন লেগ্ স্পিন বোলার গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা চরম বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নহে। এইজন্য যে এই স্পিন বোলারদের মধ্যে একজন সমগ্র খেলার মধ্যে মাত্র দুই ওভার বল করিয়াছেন। ইহার পরিবর্তে দলে একজন ব্যাটস্‌ম্যান লইলে ভাল হইত। এই খেলায় ৩২টি উইকেট পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে ৩০টি বাম হাতের ও অফ্ স্পিন বোলার-গণ গ্রহণ করিয়াছেন। লেগ্ ব্রেক্ বোলার ১টি উইকেট পাইয়াছেন ও একজন রান আউট হইয়াছেন। এই বিষয়ের দিকে আমি খেলার পূর্বেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। খেলার শেষের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপে উহা বর্তমানে বলিতেছি না।"

ইঁহার উক্তি পাঠ করিলে স্পষ্টই বোঝা যায়, ইনি সি এস্ নাইডুকে দলভুক্ত করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এমন কি সিন্ধেকেও গ্রহণ করার যুক্তি নাই, তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের অধিনায়কের বুদ্ধিমত্তা ও অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থার প্রশংসা করিয়াছেন। ইংলণ্ড দল জয়ী হইয়াছে; সুতরাং তিনি নিজ দেশের তরুণ অধিনায়ককে সমর্থন করিবেন ও প্রশংসা করিবেন—ইহাতে আর আশ্চর্য কি! ভারতের খেলোয়াড় নির্বাচকগণ যে ঠিক চিন্তা করিয়া দল গঠন করেন নাই ইহা আমরা পূর্বেও বলিয়াছি। সুতরাং তিনি যে দুইজন খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করার কোন কারণই ছিল না বলিয়াছেন, তাহাও আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিভাবে ভারত সরকারী টেস্ট খেলায় বিজয়ী হইতে পারে এবং তাহার জন্য কোন্ কোন্ খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করা উচিত, তাহা কেন উল্লেখ করিলেন না—ইহাতেই আমরা আশ্চর্য হইতেছি। বোধ হয় মিঃ স্মিথ চান না যে, ভারত সরকারী টেস্ট খেলায় বিজয়ী হয়। তাঁহার উক্তির মধ্যে মাদ্রাজের শেষ টেস্ট খেলায় ভারত বিজয়ী হইলে কি হইবে বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অবান্তর বলিয়া মনে করি। পঞ্চম টেস্ট খেলায় ভারত বিজয়ী হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে—ইহা তাঁহার জানিয়া রাখা উচিত। টেস্ট পর্যায়ের একটি খেলায় বিজয়ী হইয়া "রবার" লাভ করিয়া এম সি সি ঘরে প্রত্যাবর্তন করিবে—ইহা কোন ভারতীয়ের কাম্য নহে। ইহার জন্য যে ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহা নিশ্চয়ই খেলোয়াড় নির্বাচক-মণ্ডলী করিবেন।

আমরা এই পরাজয়ের কারণ হিসাবে দলের অধিনায়কের চরম নৈরাশ্যজনক ব্যাটিংকেই অধিক দায়ী করি। তিনি দিল্লী ও বোম্বাই টেস্ট খেলায় ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেও কলিকাতায় ও কানপুরে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন। কেন এইরূপ হইল যদি আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে বলিব—আত্মবিশ্বাসের জন্য। যে খেলোয়াড় সম্পর্কে বৈদেশিক ক্রিকেট সমালোচক মিঃ লেসলী স্মিথ দিল্লী ও বোম্বাই টেস্ট খেলার পর লিখিলেন, "ইঁহাকে সহজে আউট করিবার মত বর্তমান ইংলণ্ড দলে কোন বোলার নাই।" ঐ উক্তির পরই দেখা যাইতেছে যে, ইনি শূন্য রানের রেকর্ড করিতে চলিয়াছেন। দলের অধিনায়ক যখন প্রতি ইনিংসে শূন্য রান করেন, ত[...] তাঁহার দলের অপর সকল ব্যাটস্‌ম্যান কো[...] ভরসায় অধিক রান করিবেন? এই কি[...] আমরা উমরিগর ও অধিকারীর শেষ সম[...] খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। উঁহাদের ন্[...] অপর সকল খেলোয়াড় যদি খেলিতেন, তা[...] হইলে ভারতকে এইরূপ শোচনীয় পরাজয় ব[...] করিতে হইত না। আশা করি, ভারত[...] ক্রিকেট খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী এই সব[...] বিষয় চিন্তা করিয়া পঞ্চম বা শেষ টেস্ট খেল[...] দল গঠন করিবেন। নিম্নে চতুর্থ টেস্ট খেল[...] ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

খেলার ফলাফল

ভারত : প্রথম ইনিংস্—১২১ রান ([...] রায় ৩৭ রান, বিনু মানকড় ১৯ রান, সি এ[...] নাইডু ২১ রান; হিল্টন ৩২ রানে ৪টি উইকে[...] ও ট্যাটারসল ৪৮ রানে ৬টি উইকেট পান)

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস্—২০৩ রান (ওয়া[...]কিন্স ৬৬ রান, লোসন ২৬ রান, স্পুনার ২[...] রান রবার্টসন ২১ রান, পুলে ১৯ রান; মানক[...] ৫৪ রানে ৪টি উইকেট ও গোলাম আমেদ [...] রানে ৫টি উইকেট পান)

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস্—১৫৭ র[...] (মাঞ্জরেকার ২০ রান, উমরিগার ৩৬ রা[...] অধিকারী ৬০ রান, সিন্ধে ১৪ রা[...] পি রায় ১৪ রান; হিল্টন ৬০ রা[...] ৫টি উইকেট, রবার্টসন ১৭ রানে ২টি উই[...] ও ট্যাটারসল ৭৭ রানে ২টি উইকেট পান)

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস্—(২ উইকে[...] ৭৬ রান (গ্রেভনী ৪৮ রান নট আউট, রবার্[...]সন ৫ রান নট আউট, লোসন ১২ রা[...] মানকড় ৪৪ রানে ১টি উইকেট ও গোল[...] আমেদ ১০ রানে ১টি উইকেট পান)

ইংলণ্ড ও ভারতের এইবারের টেস্ট খেলার ফলাফল

প্রথম টেস্ট ম্যাচ—দিল্লীতে অনুষ্ঠিত [...] ও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস্—২০৩ রান
ভারত : প্রথম ইনিংস—(৬ উইকেট) ৪১৮ রান (ডিক্লেয়ার্ড)
ইংলণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস্—(৬ উইকেট) ৩৬৮ র[...]

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ—বোম্বাইতে অনুষ্ঠি[...] হয় ও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ভারত : প্রথম ইনিংস্—(৯ উইকেট) ৪৮৫ রান (ডিক্লেয়ার্ড)
ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস্—৪৫৬ রান
ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস্—২০৮ রান
ইংলণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস্—(২ উইকেট) ৫৫ র[...]

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ—কলিকাতায় অনুষ্ঠি[...] হয় ও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস্—৩৪২ রান
ভারত : প্রথম ইনিংস্—৩৪৪ রান
ইংলণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস্—(৫ উইকেট) ২৫২ রান (ডিক্লেয়ার্ড)

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস্—(কেহ আউট না হইয়া) ১০৩ রান

পঞ্চম টেস্ট দল

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী পঞ্চম টেস্ট খেলায় ভারতীয় দল গঠন করিয়াছেন। এই দলে পুনরায় আর ডিভেচা ও গোপীনাথকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এইবারের নির্বাচনে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কারণ হইয়াছে মুস্তাক আলীর নির্বাচন। তিনি যদি এতই কৃতী খেলোয়াড়, তাহা হইলে তাঁহাকে এতগুলি টেস্ট খেলায় কেন মনোনীত করা হয় নাই? তবে এইবারে আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই দল অপর চারিটি দল অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী হইয়াছে। তরুণ বাম হাতের বোলার এইচ্ গাইকোয়াড়কে স্থান দিলে দলের আরও শক্তি বৃদ্ধি পাইত। কর্নেল নাইডুর প্রিয় গাইকোয়াড় অথচ তাহাকে কেন তিনি উপেক্ষা করিতেছেন, ইহাতে আমরা একটু আশ্চর্য হইয়াছি। নিম্নে পঞ্চম টেস্ট খেলায় মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

(১) বিজয় হাজারে (অধিনায়ক)
(২) পি সেন (উইকেটরক্ষক)
(৩) মুস্তাক আলী
(৪) অমরনাথ
(৫) বিনু মানকড়
(৬) ডি জি ফাদকার
(৭) আর ডিভেচা
(৮) পি রায়
(৯) গোলাম আমেদ
(১০) এইচ্ অধিকারী
(১১) সি ডি গোপীনাথ

দ্বাদশ—পি আর উমরিগার

অতিরিক্ত—পি জি যোশী ও এম এ সিন্ধে

এম সি সি বনাম পূর্বাঞ্চল দল

এম সি সি দল জামসেদপুরে পূর্বাঞ্চল দলের সহিত খেলিয়া ৯ উইকেটে বিজয়ী হইয়াছে। ইহাই এম সি সি দলের এইবারকার ভ্রমণের দ্বিতীয় জয়লাভ। ইতঃপূর্বে পশ্চিম ভারত দলকে পরাজিত করিয়া প্রথম জয়লাভের গৌরব অর্জন করে।

পূর্বাঞ্চল দল বাঙলা, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা এই চারিটি রাজ্যের খেলোয়াড়গণ দ্বারা গঠন করা হয়। নির্বাচিত দল খুব শক্তিশালী ছিল না। সেই কারণে এম সি সি দলের জয়লাভে আশ্চর্যের কিছুই হয় নাই। তবে এই খেলায় বাঙলার খেলোয়াড় বি ফ্রাঙ্ক উভয় ইনিংসে বেপরোয়া ব্যাটিং করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন।

খেলার ফলাফল

এম সি সি : প্রথম ইনিংস্—(৫ উইকেট) ৩৭০ রান ডিক্লেয়ার্ড (রবার্টসন ১৮৩ রান, ওয়ার্টকিন্স ৬৩ রান, ডি কার নট আউট ৬৬ রান; সুধীর দাস ৩০ রানে ২টি উইকেট, নির্মল চ্যাটার্জি ২১ রানে ১টি উইকেট, বিমল বসু ৮৪ রানে ১টি উইকেট পান)

পূর্বাঞ্চল : প্রথম ইনিংস্—১৫৮ রান (ফ্রাঙ্ক ৯৮ নট আউট, সুটে ব্যানার্জি ১৫ রান, স্যাকলটন ৬৪ রানে ৫টি উইকেট, লীডবিটার ৫৫ রানে ৩টি উইকেট, ওয়ার্টকিন্স ২৬ রানে ২টি উইকেট পান)

পূর্বাঞ্চল : দ্বিতীয় ইনিংস্—২২৮ রান (ফ্রাঙ্ক ৭৫ রান, পি চ্যাটার্জি ৩৭ রান, নির্মল চ্যাটার্জি ৪৬ রান, গিরিধারী ২৩ রান, সুধীর দাস ১৭ রান; ওয়ার্টকিন্স ৬৪ রানে ৩টি উইকেট, লীডবিটার ৪৪ রানে ৩টি উইকেট, হিল্টন ৫২ রানে ২টি উইকেট, রবার্টসন ০ রানে ১টি উইকেট পান)

এম সি সি : দ্বিতীয় ইনিংস্—(১ উইকেট) ২০ রান (লোসন নট আউট ৭ রান, পি চ্যাটার্জি ৫ রানে ১টি উইকেট পান)

টেবিল টেনিস

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা আগামী ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে বোম্বাইর ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে আরম্ভ হইবে। এই অনুষ্ঠানের গুরুদায়িত্ব যখন ভারতের টেবিল টেনিস ফেডারেশন গ্রহণ করে তখন অনেকেই আশঙ্কা করিয়াছিলেন হয়তো বা বিশ্বের বহু বিশিষ্ট টেবিল টেনিস খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবে না। কিন্তু পরিচালকগণের শেষ বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায় যে কোন বিশিষ্ট টেবিল টেনিস খেলার দেশ যোগদান হইতে বিরত হন নাই। এমন কি চেকো-শ্লাভাকিয়াও শেষ পর্যন্ত যোগদান করিয়াছে। আমেরিকা অর্থের জন্য দল প্রেরণ করিবে না বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তাহাও শেষ পর্যন্ত ভীত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমেরিকা হইতেও প্রতিনিধিগণ বোম্বাইতে আসিতেছেন। এই প্রতিযোগিতা ১০ দিন ধরিয়া চলিবে এবং ইহার বিভিন্ন বিভাগের খেলার তালিকা গঠন করিতে প্রায় দশ ঘণ্টা সময় লাগে। খেলাধুলার কোন বিশ্ব অনুষ্ঠান ইতিপূর্বে হয় নাই। ভারতের এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। বিশ্ব অনুষ্ঠানের খেলার তালিকা গঠনের সুবিধার জন্য ইংলণ্ডের টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন এক বাছাই খেলোয়াড়দের তালিকা গঠন করিয়াছেন। নিম্নে ইংলণ্ড টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন প্রচারিত বাছাই খেলোয়াড়দের তালিকা প্রদত্ত হইল।

পুরুষদের সিংগলস

(১) জনী লীচ (ইংলণ্ড), (২) এণ্ড্রিয়াডিস (চেক), (৩) এস সিডো (হাঙ্গেরী), (৪) টেবোরা (চেক), (৫) জে জুজিয়ান (হাঙ্গেরী), (৬) ডি হারাঙ্গোজো (যুগোশ্লাভ), (৭) বি ভালা (চক), (৮) আর রুথক্ট (ফ্রান্স)।

পুরুষদের ডাবলস

(১) ভালা ও এণ্ড্রিয়াডিস (চেক), (২) ইউ রোজ ও পেক (চেক) (৩) জনী লীচ ও বার্জম্যান (ইংলণ্ড)।

মহিলাদের সিংগলস

(১) রোজিনু (রুমানিয়া), (২) জি ফার্কাস (হাঙ্গেরী), (৩) জি প্রিজ (অষ্ট্রিয়া), (৪) এন জিয়াক (অষ্ট্রিয়া), (৫) এইচ ইলিয়ট (স্কটল্যাণ্ড), (৬) রোজালিণ্ড রো (ইংলণ্ড), (৭) এস সাজ (রুমানিয়া), (৮) ডায়না রো (ইংলণ্ড)।

মহিলাদের ডাবলস

(১) রোজালিণ্ড রো ও ডায়না রো (ইংলণ্ড), (২) রোজিনু ও সাজ (রুমানিয়া), (৩) ফার্কাস ও জে সাইমন (হাঙ্গেরী), (৪) ইলিয়ট ও ওয়ার্টেল (স্কটল্যাণ্ড)।

মিক্সড ডাবলস

(১) ভালা ও রোজিনু, (২) হারাঙ্গোজা ও ওয়ার্টেল, (৩) কুজিয়ান ও ফার্কাস, (ক) বার্ণা ও আর রো।

বাঙলার খেলোয়াড় সম্মানিত

বাঙলার তরুণ টেবিল টেনিস খেলোয়াড় কুমার ঘোষ বর্তমানে ইংলণ্ডে বার্মিংহ্যাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। টেবিল টেনিস খেলা যে অবহেলা করিতেছেন না তাহার প্রমাণ হইল তিনি ওয়ার উইকসায়ার কাউণ্টীর যে ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছেন। ইহা বাঙলা তথা ভারতের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের গৌরবের বিষয়। আমরা শ্রীমান ঘোষের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৭ই জানুয়ারী—নির্যাতিত দেশসেবক ও বিশিষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীঅনিল রায় দীর্ঘকাল রোগভোগের পর রবিবার শেষ রাত্রি ৪-৪৫ মিনিটের সময় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর হইয়াছিল।

অদ্য কলিকাতার প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশক হরতাল পালন করেন। বঙ্গীয় প্রকাশক সভা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এই হরতালের আয়োজন করে।

উড়িষ্যা ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি শ্রীদিবাকর পট্টনায়ক উড়িষ্যা বিধান সভার স্পীকার শ্রীলাল-মোহন পট্টনায়ককে (কংগ্রেস) পরাজিত করিয়া বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

৮ই জানুয়ারী—মাদ্রাজের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী এবং নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীকালাবেঙ্কট রাও বিধান সভার নির্বাচনে কে এম পি প্রার্থী শ্রীরামভদ্র রাজুর নিকট ৫১,৯৬২ ভোটে পরাজিত হইয়াছেন।

নয়াদিল্লীতে ভারতের রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীগোপালস্বামী আয়েংগারের সহিত নেপালের প্রধান মন্ত্রী শ্রী এম পি কৈরালার দুই ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা চলে। ভারত সরকার ও নেপাল মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মধ্যে গতকল্য আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। তিব্বত, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত নেপালের সম্পর্ক এবং নেপালের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলে।

৯ই জানুয়ারী—বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং বোম্বাইয়ের মেয়র শ্রী এস কে পাতিল বোম্বাই শহর দক্ষিণ নির্বাচন কেন্দ্র হইতে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

আগামী ১৮ই ও ১৯শে মার্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান হইবে বলিয়া সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে।

১০ই জানুয়ারী—তামিলনাদ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীকামরাজ নাদার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ২৭,০০০ ভোটে পরাজিত করিয়া লোকসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

মালাবারে সমাজতন্ত্রী প্রার্থী শ্রী কে বি মেনন নির্বাচিত হইয়াছেন। মাদ্রাজে ইহাই সমাজতন্ত্রী দলের সাফল্য।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রী সি পি মাথু সংযুক্ত বামপন্থী প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হইয়াছেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গের ৬টি নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট গৃহীত হয়। তন্মধ্যে বর্ধমান জেলার কুরমুন কেন্দ্রে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। ইহাতে কয়েকজন আহত হয়।

পুরী জিলার বানপুর কেন্দ্র হইতে ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী শ্রীগোদাবরীশ মিশ্র (ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপলস পার্টি) নির্বাচিত হইয়াছেন।

১১ই জানুয়ারী—মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকুমারস্বামী রাজা বিধান সভার নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন।

অন্ধ্র প্রদেশ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি বিধান সভার নির্বাচনে কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রী টি নাগী কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন।

বোম্বাই শহর উত্তর নির্বাচকমণ্ডলীর লোক-সভার সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রী এল এস কাজরোলকার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ভারত সরকারের ভূতপূর্ব আইন মন্ত্রী ও নিখিল ভারত তপশীলী সংঘের নেতা ডাঃ বি আর আম্বেদকরকে ১৪,১৬৪ ভোটে পরাজিত করিয়াছেন।

মধ্যপ্রদেশের নির্বাচনে আরও কয়েকটি কেন্দ্রের যে সকল ফল ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে কংগ্রেস ১০টি আসন লাভ করিয়াছে এবং একটি আসনে কৃষক মজদুর-প্রজা দলের প্রার্থীর নিকট পরাজিত হইয়াছে।

বৃহস্পতিবার গভীর রাত্রিতে হাওড়া পুলের নিকট গঙ্গা-নদীতে গঙ্গাসাগরগামী একখানি নৌকা নিমজ্জিত হওয়ার ফলে ছয়জন নারী এবং একটি শিশু সহ দশজন তীর্থযাত্রীর সলিল সমাধি হয়।

১২ই জানুয়ারী—বোম্বাই শহর উত্তর নির্বাচন কেন্দ্র হইতে ডাঃ ভি বি গান্ধী (কংগ্রেস) সমাজতন্ত্রী প্রার্থী শ্রীঅশোক মেহতা, কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীএস এ ডাঙ্গে প্রভৃতি তাঁহার পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

ভারত সরকারের পূর্ত মন্ত্রী শ্রী এন ভি গ্যাডগিল (কংগ্রেস) পুণা মধ্য নির্বাচন কেন্দ্র হইতে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

অদ্য সর্বশেষ আসনের ফল ঘোষিত হওয়ায় ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্য বিধান সভার নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হইল। সর্বশেষ আসনটি লাভ করিয়াছে সংযুক্ত বামপন্থী সংস্থা। বিধান সভার ১০৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ৪৪টি আসন দখল করিয়াছে।

১৩ই জানুয়ারী—বোম্বাই শহরতলী নির্বাচন কেন্দ্র হইতে শ্রীমতী জয়শ্রী রায়জী (কংগ্রেস) সমাজতন্ত্রী প্রার্থী শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এবং স্বতন্ত্রপ্রার্থী শ্রীযমুনাদাস মেহতাকে পরাজিত করিয়া লোকসভার সদস্যা নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া কংগ্রেসী দল বোম্বাই শহর হইতে লোকসভার সব কয়টি আসন দখল করিল।

বিদেশী সংবাদ

৭ই জানুয়ারী—অদ্য হোয়াইট হাউসে রুদ্ধদ্বারকক্ষে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ও মিঃ চার্চিলের মধ্যে দুইবার বৈঠক হয়। তাঁহারা সামরিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন।

সুয়েজখাল কোম্পানীর জনৈক উর্ধ্বতন কর্মচারী অদ্য এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, সৈয়দ বন্দরের দেড় হাজার মিশরী শ্রমিকের যে ধর্মঘট আরম্ভ হইয়াছে, তাড়াতাড়ি উহার মীমাংসা না হইলে সুয়েজ খালে সর্বপ্রকার জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

৮ই জানুয়ারী—রাষ্ট্রপুঞ্জ রাজনৈতিক কমিটি অদ্য কম্যুনিস্টদের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া পররাজ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য একটি "নিরাপত্তা বাহিনী" গঠনের পরিকল্পনাটি বিপুল ভোটাধিক্যে গ্রহণ করেন।

৯ই জানুয়ারী—অদ্য মিশরীরা একটি বৃটিশ সামরিক কনভয়ের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া একজন অফিসার ও একজন সৈন্যের প্রাণনাশ করিলে ইসমাইলিয়া তেল-এল-কেবির রাজপথে মিশরী ও বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যে ইতস্ততঃ সংগ্রাম আরম্ভ হয়।

১০ই জানুয়ারী—বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল এবং মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ ট্রুম্যান ওয়াশিংটনে এক যুক্ত সরকারী ইস্তাহারে বলেন "আমরা মনে করি না যে, যুদ্ধ অনিবার্য।" তাঁহারা বলেন যে, এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের সমগ্র নীতি পরিকল্পিত হইয়াছে।

১১ই জানুয়ারী—অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জ সাধারণ পরিষদে ক্রমে ক্রমে নিরস্ত্রীকরণ ও অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে ১২টি শক্তির প্রতিনিধিকে লইয়া কমিশন গঠন সম্পর্কিত পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হইয়াছে।

১২ই জানুয়ারী—বৃটিশ সমর দপ্তরের সম্মুখে ১৩জন বৃটিশ সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই সত্যাগ্রহীরা "গান্ধীর নীতি অনুসরণ কর"—এই ধ্বনি তুলিয়া শান্তি আন্দোলন করিতেছিলেন।

১৩ই জানুয়ারী—ইরাণ সরকার ইরাণস্থ বৃটিশ কন্সাল অফিসগুলি আগামী ২১শে জানুয়ারী হইতে বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত ইরাণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার ফলেই ইরাণ সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

ভারতীয় মূল্যঃ প্রতি সংখ্যা—।৵ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্থান মূল্যঃ প্রতি সংখ্যা (পাক) ।৵ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক: শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক: শ্রীসাগরময় ঘোষ

ঊনবিংশ বর্ষ]   শনিবার, ১২ই মাঘ, ১৩৫৮ সাল।   Saturday, 26th January, 1952.   [১৩শ সংখ্যা

ছাব্বিশে জানুয়ারী

২৬শে জানুয়ারী ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। এই পুণ্য তিথিতে জাতি স্বাধীনতা লাভের জন্য সংকল্প-বাক্য গ্রহণ করে এবং এবং ১৯৫০ সালের এই পুণ্য তিথিতেই ভারতে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বস্তুতঃ স্বাধীনতার পথ কুসুমে আবৃত নয়, রুধির-চর্চিত পথেই সব দেশ এবং সকল জাতিকে মানুষের এই মৌলিক বা লোকমান্য তিলকের ভাষার জন্মগত অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। ভারতকেও এই পথ বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর দল সাধ করিয়া এদেশ ছাড়িয়া যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রস্থানের পথ দেখাইয়া দিতে ভারতকে প্রচুর মূল্যই দিতে হইয়াছে। স্বাধীনতার বেদীমূলে এদেশের আত্মদাতাগণ অকুণ্ঠভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। আজ ভারতের উন্মুক্ত আকাশে আমরা স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন দেখিতে পাইতেছি। এই পতাকার বেদীমূল সুদৃঢ় করিতে তাজা রক্তের প্রয়োজন বড় কম হয় নাই। যে নির্যাতন, যে লাঞ্ছনা এবং যে নিপীড়ন দেশকে সহ্য করিতে হইয়াছে, গুলীর আঘাতে এবং ফাঁসীকাঠে যেভাবে এদেশের বীর সন্তানদিগকে মৃত্যু বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে তাহা সামান্য নহে। বিশেষতঃ মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম অভিনব ঐতিহ্য রচনা করিয়াছে! মহামানব মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব ভারতের জাতীয় সংগ্রামের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে জগতের অপর কোন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামেই এইরূপ মহামানবের নেতৃত্বের গর্ব করিতে পারে না এবং রাজনীতিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠামূলে মানবতার এমন উদার প্রতিবেশও অন্যত্র রচিত হয় নাই। ফলতঃ ভারতের স্বাধীনতা সমগ্রভাবে জগতে মানব মুক্তির এক অভিনব প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে এবং বিশ্বমানবকে নূতন পথ দেখাইয়া দিয়াছে। সুতরাং আমাদের এই স্বাধীনতার জন্য সত্যই আমরা গর্ব করিতে পারি। লব্ধ স্বাধীনতা সর্বতোভাবে এখনও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই, একথা অবশ্য সত্য। আমাদের জাতীয় জীবনে দুঃখ-দুর্গতি অদ্যাপি অনেক রহিয়াছে ইহাও অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু সে সব হিসাব অপেক্ষাকৃত পরোক্ষ। বস্তুতঃ স্বাধীনতা হিসাবেই স্বাধীনতার একটা মূল্য আছে। যাহাদের তপ্ত রক্তদানের ফলে এই অধিকার লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, ২৬শে জানুয়ারীর পুণ্য তিথিতে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী শহিদগণের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

গত ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের ষট্পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জগতের ইতিহাসে যে সব প্রচণ্ড প্রাণশক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব পরি-লক্ষিত হয়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম; শুধু তাহাই নয়, মানবতাময় প্রবল এবং প্রখর কর্মপ্রতিভায় ইঁহাদের অনেকের চেয়ে নেতাজীর জীবনাদর্শ সমধিক উজ্জ্বল। বিপুল ব্যক্তিত্বের মানব-মহত্ত্বময় এমন বলিষ্ঠ বিকাশ জগতের ইতিহাসে বড় একটা দেখা যায় নাই, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ভারতের স্বাধীনতা-মূলে কাহার অবদান কতখানি সম্প্রতি শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিক মহলে এ সম্বন্ধে একটা আলোচনা উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারতের সুদীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহ্য লইয়া বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছা আমাদের নাই। তথাপি এ কথা অনস্বীকার্য যে, ভারতের স্বাধীনতার মূলে বাঙলার অবদানই সর্বাপেক্ষা অধিক। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙলার মনীষা এবং বাঙালীর কর্মসাধনার অগ্নিময় বিচিত্র অবদানের বিপুল এবং ব্যাপক সে এক অধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা-সাধনায় বাঙলার বুকে যে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হয় তাহারই বিস্ফুলিঙ্গ সমগ্র ভারতে বৈপ্লবিক আত্মদানের বহ্নিজ্বালা উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। বস্তুতঃ কংগ্রেসের কর্ম-প্রেরণার সেই অগ্নিই আহৃত হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় যজ্ঞের নেতাস্বরূপে ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে পরে আবির্ভূত হন। কিন্তু আগুনের খেলা পূর্বে হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং বাঙলার আত্মদাতা-গণ সেই যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গভূমির ঋত্বিকবর্গের মুখে 'অগ্নিমীলে' মহামন্ত্র ইতিপূর্বেই উদ্গীত হয়। কংগ্রেসের সাধনাকে দৈন্য ও কার্পণ্য হইতে বাঙলার অগ্নিসাধকগণ মুক্ত করেন এবং ফলতঃ বিপ্লবের বহ্নিপ্রিয়-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন। তাহারই ফলে সমষ্টি চেতনায় মাতৃ-মুক্তির মন্ত্রচৈতন্য সাধিত হয়।

ভারত আজ স্বাধীনতালাভ করিয়াছে, কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অগ্নিময় অবদানই প্রত্যক্ষভাবে আমাদের এই স্বাধীনতার মূলে রহিয়াছে। বস্তুতঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্র যদি তাঁহার আজাদ সৈন্যদল লইয়া ভারতের সীমান্তদেশে উপস্থিত না হইতেন, তবে ভারতের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা আজও সম্ভব হইত কি না এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। সুভাষচন্দ্রের সাধনার ফলেই ইংরেজ বুঝিতে পারে যে, এদেশে সাম্রাজ্যবাদ চালানোর দিন তাহাদের শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহার পরও যদি তাহারা এদেশের মাটি কামড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায় তবে তাহাদের পক্ষে সমূহ বিপদ ঘটিবে। কারণ ভারতের সৈন্যশক্তিই তাহাদের প্রধান সম্বল ছিল, সে সম্বল যে তাহারা হারাইয়াছে—সুভাষচন্দ্রের সাধনাই এই সত্য সম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন করে। বলা বাহুল্য যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইত; কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কর্মসাধনা ব্যতিরেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এই চৈতন্য সহজে সম্পাদিত হইত কি? ভারতের রাজনীতিক সংগ্রামের পাক আরো কতদিন তাহাদের কূটনীতির চক্রে চক্রে ঘুরিত কে জানে? ফলতঃ সুদীর্ঘকালের পরাধীনতা জাতির মন ও বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া ফেলে এবং পরাধীনতার সেই পরি-প্রেক্ষায় রাজনীতিকদের বিচারবুদ্ধিও অনেকটা আড়ষ্ট হইয়া যায়। তাঁহাদের অবলম্বিত নীতি বিবেচনার বিভ্রমের মধ্যে গিয়া পড়ে এবং সোজাসুজি বিপুল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া ব্যাপ্তি-চেতনার উদ্দীপনায় সমগ্র জাতির চিত্তে নবসৃষ্টির আবর্ত সৃষ্টি করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হয় না। প্রকৃতপক্ষে এমন বৈপ্লবিক আলোড়ন বিপুল মানবতার সংবেদন-কেন্দ্র হইতেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে প্রাণশক্তি সেখানে উদারতর প্রতিবেশে আত্মনিবেদনের অমোঘ বীর্য ব্যাপকভাবে সমগ্রের জীবন প্রদীপ্ত করিয়া তোলে। মানবতার এমন বৈপ্লবিক বিপুল সংবেদন যে ব্যক্তিত্বের মূলে কাজ করে, তাহা সাধারণ নয়। প্রকৃতপক্ষে এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ-দিগকে আশ্রয় করিয়াই মহাশক্তির লীলা-খেলা চলে এবং বিশ্ব-দেবতা প্রলয়-অনলে নূতন সৃষ্টি গড়েন—বিপদের বুকে সম্পদের লালন করেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনে এবং তাঁহার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের মূলে এই মহাশক্তির ক্রীড়াই আমরা দেখিতে পাইয়াছি।

প্রকৃতপক্ষে এইরূপ বীর্যসম্পন্ন পুরুষদের বিচার, তাঁহাদের প্রচেষ্টার সাফল্য কিংবা অসাফল্যের দ্বারা পরিমাপ করা যায় না; কারণ, সাফল্য এবং অসাফল্যের সাময়িক ও প্রাদেশিক গণ্ডী অতিক্রম করিয়া স্থায়ীভাবে ব্যাপক এবং বৃহত্তর পটভূমিকায় তাঁহাদের প্রাণশক্তির তরঙ্গ-লীলা সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। এইভাবে তাঁহাদের আদর্শ অসাফল্যের ভিতর দিয়াও সাফল্য লাভ করে। ইঁহাদের কাজের সাফল্য যেমন সত্য, অসাফল্য তাহার চেয়ে বরং বেশী সত্য; কারণ স্বার্থ এবং অহঙ্কারের সংস্কার ইঁহাদের প্রাণশক্তিকে সমাচ্ছন্ন করিতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে ইঁহাদের কর্মময় জীবনের তোড়ের মুখে যে রুদ্র-দীপ্ত ব্যক্তিত্বটি আমাদের চোখে পড়ে, বৃহত্তর বেদনারই প্রকৃতপক্ষে তাহা চিন্ময় মূর্তি বা জ্যোতির্ময় প্রকাশ। কর্মফল এমন মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে ইঁহাদের প্রাণপূর্ণ তপস্যায়, ইঁহাদের আত্মদানের পরম মহিমায় যে কাজ সম্পন্ন হইতে যুগযুগান্তের হিসাব আসিয়া পড়ে, তাহাও ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে কয়েক-দিনের মধ্যে সমাধা হইয়া যায়। বহুদিনের অবিদ্যাময় কর্মগ্রন্থি ইঁহারা কয়েকদিনের মধ্যে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং বহুযুগের সাধনাকে সদ্য সদ্য সার্থক করিয়া তোলেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনে আমরা এই সত্যের বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অঘটন তিনি ঘটাইয়াছেন, অসাধ্যকে তিনি সাধন করিয়াছেন। এ কথা সত্য যে, সুভাষচন্দ্র উপস্থিত থাকিলে এ দেশ খণ্ডিত হইত না। তিনি নিজের উদার বীর্যেই জাতিকে সংহত করিয়া লইতেন। সংহতির সত্যকার পথ তিনি দেখাইয়াছেন। বহুদিনের, বহু-যুগের কর্মসাধনায় জাতি যে সব অবীর্য হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই, বহু তীর্থে স্নান করিয়াও জাতির যে পাপ প্রক্ষালিত হয় নাই, সুভাষচন্দ্র জাতিকে সেই সব অবীর্য হইতে মুক্ত করেন। তিনি জাতিকে মানব-মহত্ত্বের মহাতীর্থে লইয়া গিয়া বৈপ্লবিক বৃহৎ আদর্শের তীর্থ-বারিতে সর্বতোভাবে সংপ্লুত করেন। জাতির যুগাগত গ্লানি প্রক্ষালিত হয়। সুভাষ-চন্দ্রের শুভ জন্মতিথিতে তাঁহার মহিমায় আমরা অনুধ্যান করিতেছি। আমরা তাঁহারই জয় কীর্তন করিতেছি।

নেতাজী তাঁহার বার্লিনস্থ বাসভবনের সম্মুখে দণ্ডায়মান

এত কাল পরে

সুবোধ ঘোষ

নাতির কাঁধে হাত রেখে পল্লীর এক বৃদ্ধ চাষী ক্ষেতের আল ধ'রে ধীরে ধীরে আসছিলেন। এক দরিদ্র বৃদ্ধ চাষী, অনেক দিন আগেই দু'চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন।

প্রশ্ন করলাম, কোথায় গিয়েছিলেন?

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, ভোট দিয়ে এলাম।

বয়স সত্তরের ওপর, চোখে দৃষ্টিশক্তি নেই, শরীরও অক্ষম, তাঁর ওপর দারিদ্র্য নামে জীবনের অতি দুঃসহ এক আঘাতের সাক্ষ্য একখানি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়ানো। এ হেন মানুষের মনে ভোট দেবার জন্য এত আগ্রহ আসে কোথা থেকে? কেন, কি আশা ক'রে এবং কিসের জন্য ভোট দিয়ে এলেন এই বৃদ্ধ দরিদ্র ও অন্ধ চাষী?

প্রশ্ন করলাম, কেন ভোট দিলেন? ভোট দিয়ে কি লাভ হলো?

বৃদ্ধ বললেন, এত কাল পরে দেশ যে আবার উঠেছে।

এতকাল পরে দেশ যে আবার উঠেছে, এ সত্য আজ অন্ধও উপলব্ধি করেছে। দুঃখাক্রান্ত এই বৃদ্ধ চাষীর জীবনে এখন সায়াহ্নের ছায়া দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার জন্য কোন বিষণ্ণতা নেই তার মনে। অন্ধ তার হৃদয়ের সহজ অনুভবের চক্ষু দিয়ে দেখতে পেয়েছে এক সূর্যোদয়ের ছবি। দেশ যে আবার উঠেছে! তাই বৃদ্ধ চাষীর মুখে ভারত ইতিহাসেরই এক প্রভাতবেলার বন্দনাবাণী ধ্বনিত হলো। এতকাল পরে দেশের এক অভ্যুত্থানেরই দৃশ্যকে সে দেখতে পেয়েছে।

সত্যিই তো, এতকাল পরে ভারত-ইতিহাসের তোরণ দ্বারে নতুন তূর্যনাদ শোনা গেল। আরম্ভ হলো নব-ভারতের অভিযাত্রা। সাধারণ নির্বাচন, কোটি কোটি সাধারণ মানুষের ইচ্ছায় ও আগ্রহে রচিত এক, অভিনব রাজ্য-সিংহাসন প্রতিষ্ঠার উৎসব। এ নির্বাচন ভারত জীবনে প্রকৃত গণাধীশের অভিষেক অনুষ্ঠান। প্রজাতন্ত্র ভারতের প্রথম গণ-নির্বাচনে ভারতের ইতিহাসেই এই প্রথম সবার-পরশে-পবিত্র-করা রাষ্ট্রকল্যাণের বেদিকা রচিত হলো।

আধুনিকতম গণতন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে সুপ্রাচীন ভারত। বর্তমান বিশ্বেই এই ঘটনা নিতান্ত অভিনব। এই ভারত-ভূমিতে আজিও ছয় হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ভারত গ্রীস হয়ে যায়নি। ইতিহাসকে কখনো অস্বীকার করেনি ভারত। এখানেই গ্রীস, মিশর ও বাবিলন ইত্যাদি প্রাচীন-সভ্যতার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের একটি বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মিশর এবং বাবিলনের মত ভারত তার সভ্যতাকে মরুভূমিতে পরিণত করেনি। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কতগুলি পাষাণ-স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ মাত্র নয়। ভারতের পাষাণ আজিও কথা বলে, এবং সে কথা ভারতীয় মানুষের প্রতিদিনের জীবনে প্রতিধ্বনিত হয়। ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় জীবনের এই সম্পর্ক আজিও অনাহত। পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন মন্ত্র ও স্তোত্র আজিও ভারতের মন্দিরে ধ্বনিত হয়। ভারতের অতীত শ্মশান হয়ে যায় নি। তীর্থ-পথিকের মত ভারতের মন সহস্র বৎসরের ইতিহাসের পথ ধরে চলেছে।

ভারতীয় মনের এই ঐতিহাসিকতাই তার সজীবতা। এবং এই সজীবতাটুকু আছে বলেই নতুনকে গ্রহণ করতে ভারতের কোন বাধা হয় না। নতুনকে গ্রহণ করার অনেক পথ আছে। ভুল পথ আছে, নির্ভুল পথও আছে, নির্ভুলভাবে নতুনকে গ্রহণ করাই জাতির জীবনের ও চিন্তার বলিষ্ঠতার লক্ষণ। ভারত ইতিহাসের এই এক বৈশিষ্ট্য যে, ভারত চিরকাল নতুনকে গ্রহণ করেছে, এবং কিভাবে নতুনকে গ্রহণ করতে হয়, তারও একটা সার্থক্ নিয়ম ভারতই আবিষ্কার করেছে।

এ পথ সমন্বয়ের ও আহরণের পথ। নতুনকে আহরণ করবার শক্তি সেই জাতি ও সমাজেরই থাকে, যে জাতি ও সমাজ তার নিজের ঐতিহ্যে বলিষ্ঠ। অতীতের প্রত্যেক সংস্কারকে উপাসনা করাই ঐতিহ্য রক্ষা নয়। কালের নিয়মে অতীতের বহু সংস্কার প্রয়োজন হারায়। সেই নিষ্প্রয়োজনকে শ্রদ্ধা করার অর্থ জড়োপাসনা মাত্র; যার ফলে জাতির প্রাণধর্মের মৃত্যু ঘটে। আচারের শুষ্ক বালুরাশি জীবনপ্রবাহের স্বাচ্ছন্দ্য গ্রাস ক'রে ফেলে, এটাও ইতিহাসের সত্য। ভারত-জীবনেও এরকম দুর্ভাগ্য অনেকবার ঘটেছে। ইতিহাসকে ভুল বুঝবার কারণে, অতীতের নিষ্প্রয়োজনীয় জীর্ণতাকে আঁকড়ে ধরে থাকার কারণে, এবং জাতির ঐতিহ্যগত সত্যকে অস্বীকার করার জন্য ভারতকে এক একবার অগৌরবের পথে নেমে যেতেও হয়েছে। ভারতের এই ভুল তার রাজনৈতিক পরাধীনতার একটা বড় কারণ।

অতীতকে অস্বীকার করা যায় না, নতুনকেও অস্বীকার করা যায় না। পুরাতনে ও নতুনে সমন্বয়ই এগিয়ে যাবার পথ। তেমনি অতীতের সব কিছুকে স্বীকার করাও সম্ভব নয় এবং নতুনের সব কিছুকেও স্বীকার করলে ভুল হয়। মন্থিত কাল-সমুদ্রে অমৃত ও হলাহল উভয়েরই উদ্ভব হয়। এটা জাগতিক রীতি, ইতিহাসের নিয়ম।

সুপ্রাচীন ভারতকেও আজ বিংশ শতাব্দীর নতুনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সুতরাং, ভারতকে তার ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের এক সংবিধান গ্রহণ করতে হয়েছে। দু'টি মতবাদের উপহার দু'হাতে নিয়ে বিংশ-শতাব্দীর যুগলক্ষ্মী ভারতের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। একটি গণতন্ত্র এবং অপরটি প্রতাপতন্ত্র। একটি সকলের স্বেচ্ছায় ও সহযোগতার আদর্শে জাতীয় জীবন গড়ে তুলবার নীতি, অপরটি ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর ইচ্ছায় সর্বতোভাবে বাধ্য হয়ে চলবার নীতি। একটিতে জনসাধারণের ইচ্ছার অবাধ অধিকার স্বীকৃত, অপরটিতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের ইচ্ছাই সর্বমান্য। উভয় মতবাদই বলে যে—সর্বসাধারণের কল্যাণ চাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পন্থার একটা বৃহৎ পার্থক্য বর্তমান। গণতন্ত্র চায়, সর্বসাধারণের ইচ্ছার ও বিবেচনার অধিকারের কোন বাধা থাকবে না। অপর পক্ষে কর্তৃতন্ত্র (Authoritarianism) চায় সর্বসাধারণের ইচ্ছা কর্তার ইচ্ছাতেই চালিত

হবে। এই দুই তন্ত্রের মধ্যে একটি বেছে নেবার প্রয়োজন হয়েছে ভারতের। ভারত বেছে নিয়েছে গণতন্ত্রকে।

এখানে ভারত তার ঐতিহ্যের এবং ইতিহাসেরই মর্যাদা রক্ষা করেছে। ভারত জানে নিকৃষ্ট পন্থায় উৎকৃষ্টকে লাভ করা যায় না। লক্ষ্য ও পন্থার মধ্যে নীতির সামঞ্জস্য চাই। খারাপ উপায়ে ভালকে পাওয়া যায় না। ভারতের ঐতিহ্যগত মনীষা এই ঐতিহাসিক সত্যটিকেই যুগে যুগে উপলব্ধি করেছে। অশোকের শিলা-শাসনের বাণী থেকে সুরু করে আধুনিক ভারতের বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর বাণীতে এই মানবিক সত্যেরই স্বীকৃতি দেখতে পাই—কল্যাণ লাভের প্রয়াসও কল্যাণকর পন্থায় পরিচালিত হওয়া চাই। সৎ লক্ষ্যের জন্য সৎ পথেরই প্রয়োজন। এ শুধু আধ্যাত্মিক সত্য নয়, সমাজ-বিজ্ঞানেরই সত্য। ব্যক্তি-মানবের চিন্তার সহজ বিকাশ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাধীনতা কর্তৃত্বের প্রতাপে চেপে দিয়ে কর্তার পরিকল্পনা অনুযায়ী যে 'গণতন্ত্র' রচিত হবে, সেটা গণতন্ত্রই নয়। তাই ভারতের আঠার কোটি নরনারীর ইচ্ছাকেই কর্তৃত্বের গৌরব দান করে ভারত পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের জীবনে সার্থক গণতন্ত্রের উদ্বোধন করেছে। এ ঘটনাকে ভারতজীবনেরই এক কল্যাণের অভ্যুত্থান বলে অভিনন্দন জানাই।

যে দেশে ধর্ম এক, ভাষা এক,—পরিচ্ছদ, আচার, সংস্কার, শিল্প, সাহিত্য, উৎসব ও রুচি এক, সে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা খুবই সহজ কাজ। কিন্তু ভারতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রেই এক নূতন দুঃসাহসিক পরীক্ষার প্রয়াস। ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, রুচি এবং জীবন-যাত্রার বহু-বিচিত্র পদ্ধতিতে এ ভারতই বস্তুতঃ একটি পৃথিবী। বৈচিত্র্যকে কখনই 'প্রভেদ' বলে স্বীকার করেনি ভারতের মনীষা। যে ভারতের কবি, কোবিদ, ঋষি ও সাধক বহুর মধ্যে পরম 'একে'র অস্তিত্ব অনুভব করেছেন, সে ভারতের ঐতিহ্যে গণতন্ত্রের মর্ম সহজেই সম্মান লাভ করবে, এটা স্বাভাবিক। শুধু মানুষে মানুষে সমত্ব ও ঐক্য নয়, এই বিশ্বচরাচরের প্রাণেও জড়ের মধ্যেও ঐক্য অনুভব করেছেন ভারতের সুধী। দুঃখের বিষয়, এই উপলব্ধি সত্ত্বেও ভারত ভুল ক'রে অনেকবার প্রভেদ ও অনৈক্যের প্রতি মোহ প্রকাশ ক'রে মানবতার প্রতিষ্ঠা ক্ষুন্ন করেছে। কিন্তু এই উচ্চ-নীচ ভেদবাদের বিরুদ্ধে ভারতেরই আত্মা বার বার বিদ্রোহ করেছে এবং আবাহন করেছে মৈত্রীর, সাম্যের, সহযোগিতার এবং সমানাধিকারের আদর্শকে। বিংশ শতাব্দীর ভারত আজ এই গর্ব করতে পারে যে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারে সর্ব-সাধারণের সমান সুযোগের প্রতিষ্ঠা ক'রে আধুনিক ভারত অতীতের ভারতকেও মর্যাদায় অতিক্রম ক'রে গেছে।

এতকাল পরে ভারতের সেই সাধারণ মানুষ অধিকার লাভ করেছে, যাদের মধ্যে ভারতের শিব ভিখারীর রূপে ঘুরছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যাদের প্রতিষ্ঠার ও অভ্যুদয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারাই প্রজাতন্ত্র ভারতের প্রথম গণ-নির্বাচনে প্রথম অধিকারের গৌরব অনুভব করেছে। তাই বৃদ্ধ চাষীর হৃদয়ের বিশ্বাসকেই অভ্যর্থনা জানিয়ে বলতে পারি, এতকাল পরে দেশ উঠেছে। বিশ্বাস করতে পারি, অতীতের তুলনায় এ ভারতের ভবিষ্যৎ আরও বেশী গৌরবের অধিকারী হবে।

ভবিষ্যৎ গড়বার অধিকারের কথাই মনে পড়ছে। নির্বাচন শেষ হলো, দেশের গবর্ণমেণ্টও গঠিত হবে। তারপর?

তারপর জাতির দায়িত্বের ও কর্তব্যের আর এক পরীক্ষা। সমৃদ্ধি সৃষ্টির জন্য পাঁচবছরের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনা বস্তুতঃ জাতির সম্মুখে এক বিরাট গঠনকর্মের উদ্যোগে আত্মনিয়োগ করা। এখানেই গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত দেশবাসীর সম্মুখে আর এক নৈতিক সত্যকে উপলব্ধি করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রকৃত গণতন্ত্রে 'অধিকার'ই সব চেয়ে বড় ব্যক্তিমাত্র বড় কথা নয়। এর মধ্যে 'কর্তব্য' নামেও একটা বিষয় আছে।

যেমন সবার অধিকারে, তেমনি সবার কর্তব্য বোধে ও পালনে গণতন্ত্র সার্থক হয়। সবার পরশে পবিত্র হয়েছে ভারতের নির্বাচন, তেমনি সবার পরশে ভারতের জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পনাকেও পবিত্র হতে হবে। অধিকারবাদ মানবীয় জীবনের একটা অংশ মাত্র, জীবন পরিপূর্ণ হয় কর্তব্যবাদে। এ সত্য ভারতীয় মনীষারই ঐতিহ্যের দান। বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী আধুনিক ভারতের কাছে মানবধর্মের এই বিশেষ তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করে গেছেন। গণতন্ত্র সহজ স্বচ্ছন্দ ও সার্থক হতে পারে না, যদি কর্তব্য পালনের ব্যাপারকেও একটা অবশ্য পালনীয় নীতি বলে সমাজের মানুষ মনে না করে। নিছক অধিকারবাদ মানুষকে মমতাহীন করে; এমন মতবাদের হাতে মানুষের ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয়। বৌদ্ধ প্রার্থনায় আছে—নিকটে বা দূরে, অতীতে বা বর্তমানে এবং যাঁরা ভবিষ্যতে আসবেন—ভূতো বা সম্ভবেসী বা, সকলেই সুখী হউক। ইতিহাসের প্রাণের ভাষা যে-মানুষ উপলব্ধি করেছে, তার মন এক মহৎ ইচ্ছার পিপাসায় নিরন্তর ছটফট করে—ভবিষ্যতের কল্যাণ হোক্। ভারতচন্দ্রের কাব্যের ঈশ্বরী পাটনীকে অন্নপূর্ণা বলেছিলেন—কি বর চাও? দরিদ্র ঈশ্বরী পাটনী বলেছিলেন—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনায় মানবের সামাজিক ধর্মের এক পরম সত্যের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। ভবিষ্যতের মানুষ, উত্তরবংশীয়, আগামী কালের মানুষ যেন সুখে থাকে। সুতরাং, প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা বর্তমান জাতির কাছে সব চেয়ে বড় কর্তব্যের সঙ্কেত এনে দিয়েছে। সর্বসাধারণের সহযোগিতায় এ পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হবে। গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভারতের কাছে এই গণতান্ত্রিক দায়িত্বও উপস্থিত হয়েছে। আজ এই দায়িত্ববোধেরও উদ্বোধন চাই, নচেৎ নিছক অধিকারবাদী গণতন্ত্রের দ্বারা ভারতের ভবিষ্যতের কল্যাণের পথ অবারিত হবে না।

কিন্তু এমন সন্দেহ করবার, অথবা নিরাশ হবার কি কোন কারণ আছে? এত কাল পরে দেশ যে আবার উঠেছে, অন্ধ চাষীর এই উপলব্ধির মধ্যে কোন ত্রুটি আছে বলে তো মনে হয় না। সারা দেশে, পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর জীবনে কর্তব্যের ও গঠনকর্মের উদ্বোধন দুরূহ হলেও অসাধ্য নয়। এত বড় গণচেতনার সঞ্চার দুরূহ বৈকি, কিন্তু যা সত্য তাই তো দুরূহ এবং দুরূহকেই সফল করে তুলতে সব চেয়ে বেশি আনন্দ। স্বাধীনতা লাভ করা খুবই দুরূহ ছিল, তাই তো স্বাধীনতার আগ্রহ দেশবাসীর চিত্তে ত্যাগ দুঃখ ও শ্রম স্বীকারের শক্তি উদ্বোধিত করেছিল। দেশের সমৃদ্ধি সৃষ্টির পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাও দেশবাসীর চিত্তে নতুন চেতনার উদ্দীপনা জাগ্রত করবে, এ বিশ্বাস যুক্তিহীন নয়। শুনেছি, ময়ূরাক্ষীর বাঁধ নির্মাণের কাজে যেসব ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন, তাঁদের আন্তরিকতা এবং পরিশ্রম করবার আগ্রহ দেখে বিস্মিত হতে হয়। নেহাৎ চাকুরী করার আগ্রহ নিয়ে নয়, দেশের কল্যাণের একটি ভিত্তি স্থাপন করছেন তাঁরা, কল্যাণকৃৎ সেবকের এই আগ্রহ নিয়ে তাঁরা রোদে-জলে কাজ করছেন। দেশের জন্য কিছু করবার আগ্রহ দেশের লক্ষ লক্ষ যুবকের মনে রয়েছে। শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাব্রতী—দেশের অধিকাংশ মানুষেরই মনে এ আগ্রহ আছে। রাজনৈতিকের প্রচারকার্যের ফলে দেশের লোকের মনে এই গঠনকর্মের উৎসাহ সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়েছে মাত্র। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ভারতীয় মনীষা হতে উদ্ভূত আর একটি সত্যের বাণীই বার বার মনে পড়ে এবং নৈরাশ্যের কোন কারণ আর থাকে না। সত্যেরই জয় হয়, অনৃতের নয়। সত্যই আপনি আপনার শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, মিথ্যার আধিপত্য সাময়িক মাত্র। সুতরাং, এ বিরাট ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর জীবন সত্যপথ চিনতে ভুল করবে, এ নৈরাশ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পথ ভুল করিয়ে দেবার চেষ্টাও মিথ্যা হবে। সত্য হয়ে থাকবে শুধু প্রজাতন্ত্র ভারতের বৃদ্ধ চাষীর উক্তি—এতকাল পরে দেশ আবার উঠেছে।
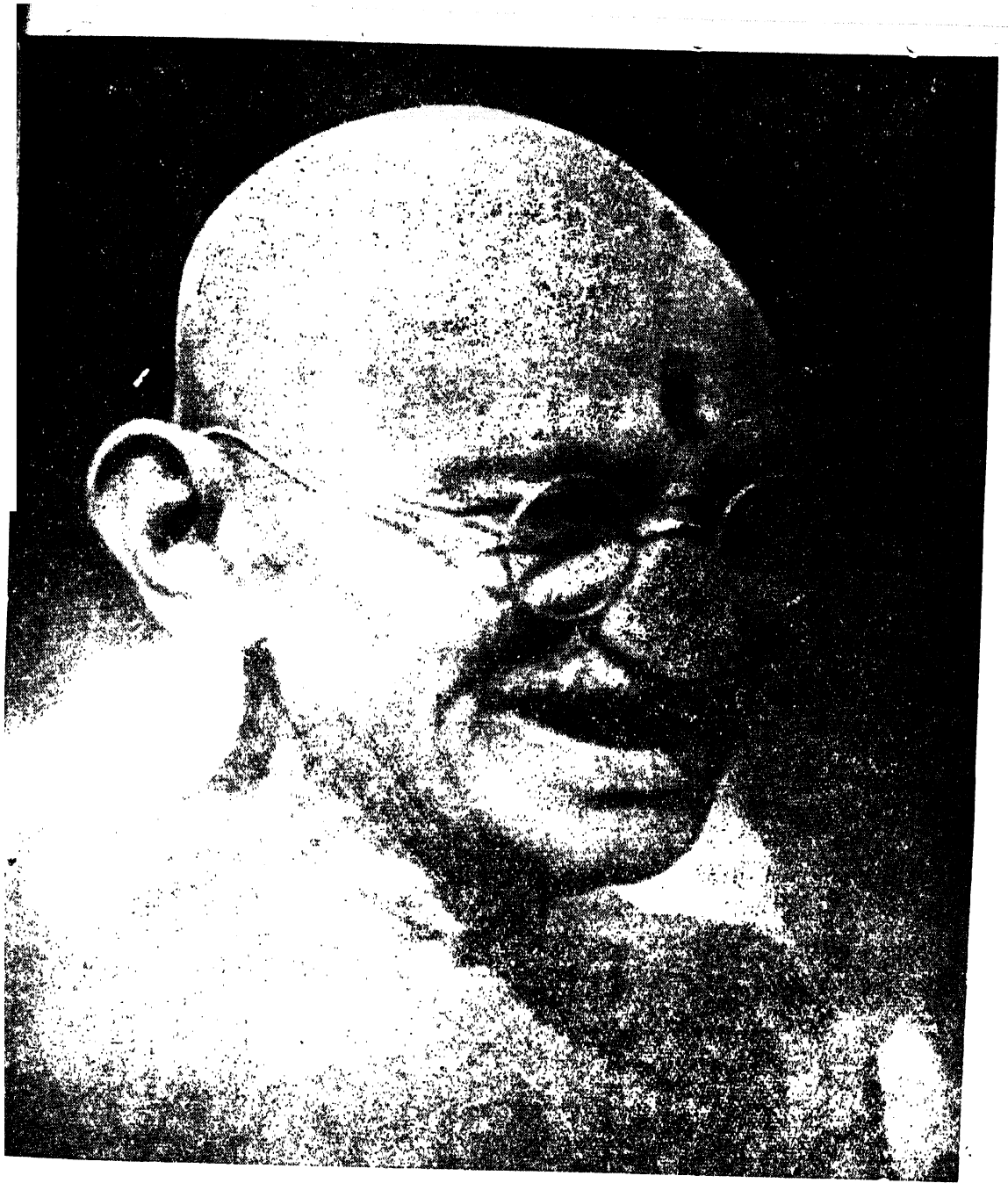
আমি সেই ভারতবর্ষ গঠনের জন্য কাজ করিয়া যাইব, যে ভারতবর্ষে দীনতম ব্যক্তিও মনে করিবে যে, দেশ তাহারই দেশ। এই দেশ
াড়িয়া তুলিতে তাহাদেরও অভিমত কার্যকরী হইবে। সেই ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণী বা নীচ শ্রেণীরূপে মানুষের কোন সমাজ থাকিবে না।
সই ভারতবর্ষে সকল সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত শ্রেষ্ঠ প্রীতির সম্পর্ক রাখিয়া বাস করিবে। সেই ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপের
কান স্থান থাকিতে পারে না, উত্তেজক পানীয় অথবা অন্য কোন মাদক সেবারও কোন প্রশ্রয় থাকিবে না। নারীসমাজ পুরুষ সমাজেরই
ত সমান অধিকার ভোগ করিবে। ইহাই আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ। —মহাত্মা গান্ধী

স্বামী বিবেকানন্দ

"নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েচে, নীরবে সয়েচে,—তাতে পেয়েচে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেচে,—তাতে পেয়েচে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েচে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিন রাত খাটা, এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়!—এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিক্যের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও।....

হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শংকর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটি-মাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

ভারতের সমাজ ধর্ম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে, সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য-স্থানে বিন্যস্ত করিয়া—সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব। সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার নহে, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের উপায় তাহা-দিগকে পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া। পৃথককে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলনসাধনের এই রহস্য জানিত। ভারত-বর্ষের লক্ষ্য ছিল সকলকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা, কিন্তু তাহার উপায় ছিল স্বতন্ত্র। ভারত-বর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করিয়া সমাজকলেবরকে এক এবং বিচিত্রকর্মের উপযোগী করিয়াছিল—নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগতই লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিয়া বিরোধ-বিশৃঙ্খলা জাগ্রত করিয়া রাখিতে দেয় নাই। পরস্পর প্রতিযোগিতার পথেই সমাজের সকল শক্তিকে অহরহ সংগ্রামপরায়ণ করিয়া তুলিয়া ধর্মকর্ম গৃহ সমস্তকেই আবর্তিত, আবিল, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখে নাই। ঐক্য-নির্ণয়, মিলনসাধন এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ, ইহাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল।

বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য যে শক্তি পাইয়াছে, সেই শক্তিচর্চা করিবার অবসর ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাইয়াছে। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা,

ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তিনির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসংগত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা, নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়—পশুযুদ্ধ-ভূমিতে পশুদলের মতো ইহাদিগকে পরস্পরের উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। ইহাদিগকে বিহিত নিয়মে বিভক্ত স্বতন্ত্র করিয়া একটি মূল-ভাবের দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। উপকরণ যেখানকার হউক, সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূল-ভাবটি ভারতবর্ষের।....

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারত-বর্ষের মধ্যে সে প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। বিদেশী যাহাকে পৌত্তলিকতা বলে, ভারতবর্ষ তাহাকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, নাসা কুঞ্চিত করে নাই।

ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম—তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে —তাহার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করিয়া ভারতবর্ষ দেখে নাই—ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতি-রূপে দেখিয়াছে।

পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শ বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা, প্রেমের দ্বারা উপলব্ধি করা এবং জীবনের দ্বারা প্রচার করা—নানা বাধা-বিপত্তি-দুর্গতি সুগতির মধ্যে ভারতবর্ষ ইহাই করিতেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া যখন ভারতের সেই চিরন্তন ভাবটি অনুভব করিব তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইবে।

আমার ভারতবর্ষ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

আমার ভারতবর্ষ নহে সেতো ভৌগোলিক সীমা,
সে যে এক অপূর্ব মহিমা,
সে যে এক নিরঞ্জন রূপ,
স্বর্গ পানে চিরোদ্যত
নিত্য অভীপ্সার মতো
আত্মার মধূপ।

বি-নাল মৃণালশায়ী প্রস্ফুটিত কাল শতদল,
সেথা অচপল
আমার সে মনোমূর্তি, ধ্যানে তার নাহি হেরি সীমা
চিত্ত চকোরের সে যে নীরন্ধ্র নীলিমা।

আমার ভারতবর্ষ, গলে তার অনন্ত নাগিনী,
ডম্বরু নিনাদে ঝরে শাশ্বত রাগিনী,
শুধু একাকিনী
তারি লাগি গাঁথে উমা পদ্মবীজে মালা,
মাঙ্গল্যের থালা
সাজায় সে মানসের চয়নিকা ফুলে,
অশ্রু মুকুতার হার পড়ে যবে খুলে
গলে তার,
তখনো কাঁপে যে বক্ষে আশা দুর্নিবার,
প্রেম সে অজেয়,
শ্রোত্রপেয়
ভোগবতী করুণ মর্মরে
উদ্বেলিয়া তরঙ্গিত তাহার অন্তরে।
সে নারী আমারি চিত্ত, আমি সেই উমা
সরমকুঙ্কুমা,
ধ্যানের অতলে পশি' নাহি পাই সীমা,
আমার ভারতবর্ষ অপূর্ব মহিমা।

*
*

গিরিবর্ত্মের গোমুখী কন্দর উপছিয়ে
কত জনপ্রবাহ ঢুকেছে
এই দেশের সমতলে
কালে কালে;
কেউ করেছে লুণ্ঠন, কেউ করেছে হত্যা,
রক্ত-বন্যার প্লাবন
পিছনে রেখে গেছে ঐশ্বর্যের পলি;
বিজয়ী তুলেছে নরমুণ্ডের তুঙ্গতা
স্পর্ধা করেছে হিমালয়ের শৃঙ্গকে;
পাথরের উপরে পাথর সাজিয়ে
কখনো গড়েছে হর্ম্য,
কখনো গড়েছে দেউল,
মনের অহঙ্কার স্ফীত হয়ে উঠেছে
গম্বুজে, তোরণে, অট্টালিকায়;
তাদের হলাগ্রে ভূমি হয়েছে বিদীর্ণ,
তাদের রথাগ্রে শত্রুব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে
মরীচিকার প্রবাহের মতো;
কতবার ঘনিয়ে এসেছে
বিদ্যুচ্চকিত রক্ত-সন্ধ্যা;
দুর্বাসার অভিশাপের তুলনায় ছুটে এসেছে
উদ্যতঅসি আততায়ী,
কেঁপে কেঁপে উঠেছে সভ্যতার ভিত্তি।
চারিদিকে যখন প্রলয়ের অট্টরোল—

*
*

তখনো আমার চিত্ত উমা বিরহিণী
সংবর্তকিঙ্কিণী
ধ্যানের কমলটিরে করেছে লালন বক্ষে তার,
চক্ষে তার
জল আসে ভরি,
কক্ষে তার
অমৃত গাগরি,
লক্ষ্যে তার
আপনারও অগোচরে ধীরে ধীরে উঠিতেছে গড়ি
সৌন্দর্যলহরী
মানবমানসমন্থী অনিন্দ্য সে আনন্দ প্রতিমা,
কালে কালে দেশে দেশে নাহি যার সীমা।

স'পেছে তাহার কণ্ঠে তপস্বিনী বালা
আপনার মালা,
ঊষা যথা পরাইয়া দেয় ধীরে ধীরে
কিরণ কনক-হার গৌরীশৃঙ্গ শিরে॥

*
*

আমার ভারতবর্ষকে দেখেছি
বৈশাখের পঞ্চাগ্নিপ্রখর
নিস্তব্ধ প্রান্তরের নিঃসীম নির্জনতায়,
আকাশ যখন তৃষ্ণায় বিকল,
একবিন্দু জলের আশায় ব্যাদিতবদন ধরিত্রী,
শনিগ্রহের বেষ্টনীর মতো
চতুর্দিকে কম্পমান মরীচিকার মালা,
রিক্তপত্র অরণ্যের শাখা
ঊর্ধোত্থিত তৃষ্ণার প্রার্থনা,
আর্ত চাতক আপনার প্রতিধ্বনিতে
আশায় বিভ্রান্ত;
তখন দেখেছি আমার ভারতবর্ষকে,
বিশ্বের বুভুক্ষায় কৃশ তার জঠর,
দারিদ্র্যের পাঞ্জা তার বক্ষের পঞ্জরে,
অস্পষ্ট দিগ্বলয়ে বিস্রস্ত তার মৌঞ্জী মেখলা,
পিঙ্গল জটাভার রৌদ্রে বিলীন,
কেবল ক্ষণে ক্ষণে তার লৌহবলয় শব্দিত
লৌহদণ্ডের সংঘর্ষে,
অদৃষ্টের অস্পষ্ট সতর্কবাণী,
আর নয়নে তার অপার অপরিমেয় অতল করুণা,
ললাটে স্নিগ্ধ শান্তি,
আমি দেখেছি সেই চিরকালের তপস্বীকে,
সেই আমার ভারতবর্ষ।

*
*

তারা দেখেনি তাকে
যারা রাজ্য গড়ে,
করে লড়াই,
ধরে মানুষের শিকল দিয়ে মানুষ,
নানা ধ্বনির সিংহনাদ তুলে'
সিংহদ্বার যারা রচনা করে
নকল স্বর্গের সীমানায়।
ওরা কেমন করে জানবে তাকে!
ওরা যে আদর্শের অন্ত্যজ!
ওদের কণ্ঠের সমুচ্চারিত 'না'
সৃষ্টি করেছে ব্যর্থতার চরম 'হাঁ'কে,
ওদের কিছু না মানার দম্ভ
পৌঁছিয়েছে আপনাকে মানার বিদ্রূপে,
উঠ্‌তে উঠ্‌তে ওরা নেমেছে অতলস্পর্শে,
এগোতে এগোতে গিয়ে পড়েছে
আপনারও পিছনে,
ওরা আপন ছায়ার শোভাযাত্রী
তাই ছায়ার চেয়েও মিথ্যা,
ওরা নাস্তিকতার আস্তিক।
ওরা জানবে ভারতবর্ষকে?

*
*

আবার দেখেছি আমার ভারতবর্ষকে
তারকিত নিস্তব্ধতার বিশ্বব্যাপী ভূমিকায়
আসীন মহাতপস্বী;
তার ধ্যানরসের রহস্যে অন্ধকার রোমাঞ্চিত তারায় তারায়;
ধরিত্রীর নদনদী
তরঙ্গের অক্ষমালায় জপছে মন্ত্র,
অনন্ত কাল অনন্ত নাগ
নিঃশব্দ প্রহরী তার আসনের;
অনন্ত দেশ তার করতলে আমলক,
ধ্রুবতারার জ্যোতিতে জ্বলে তার
ললাটের তিলক।
চরাচরের মহামৌন অনুচ্চারিত ওঙ্কার,
সেই আমার ভারতবর্ষ
কালাকালের তপস্বী।

দেখেছি ভারতবর্ষকে
ধৃতযষ্ঠি মুক্ত পুরুষের মুক্তিপথের যাত্রায়,
নির্ঝরতাড়নে সঞ্চালিত উপলখণ্ডের মতো
মানবক দল বিচলিত তার প্রভাবে।
'হাম যব যাত্রা শুরু করেঙ্গে
তামাম হিন্দুস্থান উথল যায়েঙ্গে,'
মানবাত্মার সেই গরুড়
জন্মেছিল বিনতার ক্রোড়ে,
মানবাত্মার সেই গরুড়
পরমাত্মার বাহন।
দেখেছি ভারতবর্ষকে
ভারতচিত্তচন্দ্রমায় ঘনীভূত চন্দনে
রচিত যার ব্যক্তিত্ব,
হৃদয়ের চঞ্চল দোলায় অচঞ্চল পুরুষ।
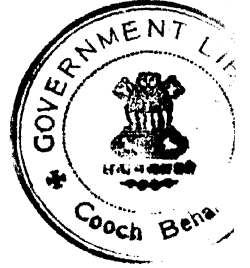
প্রতিভার স্বর্ণসূত্রে তার গ্রথিত হ'ল
এদেশের নদনদী কান্তার,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা;
প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশ
গুজরাট, মারাঠা, বঙ্গ;
মানুষের মন
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ মুসলমান।
সে গানের গঙ্গোত্রী,
প্রাণের মানস,
পূর্বপশ্চিমকে আলিঙ্গনে বিধৃত-করা সে যে মহিমার
হিমালয়।

আর দেখেছি ভারতবর্ষকে
চিরকালের বালকে,
আপন নিয়মের পাঠশালায় যে পলাতক,
জনচিত্তের যুবরাজ,
রাজনীতির ঋতুরাজ,
প্রাচীন চারণেরা যে-কাব্য
রচনা করতে ভুলে গিয়েছে
যেন তারই রাজপুত্র।

এখানে সাধক শাসক কবি এক,
তিনে এক, একে তিন,
এখানে ব্যাস বুদ্ধ অশোক এক
তিনে এক, একে তিন,
এখানে ধ্যান কর্ম কাব্য এক,
তিনে এক, একে তিন,
এক মৃণালের বৃন্তে এখানে ফোটে যে সহস্রদল পদ্ম
শ্বেত রক্ত নীল,
তারই শুভাসনে এখানে প্রতিষ্ঠিত
জন্ম, মৃত্যু, জীবন
তিনে এক, একে তিন,
এই আমার ভারতবর্ষ।

*

*

কাঁদে উমা,
কাঁদে একাকিনী।
শর্বরী নিঝুমা,
কল্লোলের বেণী
খোলে নির্ঝরিণী,
স্তব্ধ হয় ঝিল্লির শিঞ্জিনী
বন-বালিকার।
সেই অন্ধকার
সে যেন দর্পণের বিপরীত দিক;
উমা নির্নিমিখ
চেয়ে আছে আপনার অশ্রুবিম্ব মাঝে,
যেথা রাজে
জগতের রহস্য অপার,
আশা দুর্নিবার
জীবনের মুখ চুম্বি কানে কানে কয়
"অন্ধকারে ভয়?
দর্পণ ঘুরায়ে দেখ্, সুবর্ণ ফলক
দিব্য পদ্মে ফুটায়েছে বিশ্বের আলোক
চিত্তে তার,
বিত্তে তার
চরাচর কি ঐশ্বর্যময়,
ভয়, কোথা ভয়?
তুহারি তপস্বী রাজ
আজ
সগৌরবে অর্ধনারীশ্বর
মহিমা-ভাস্বর
দিকে দিকে কালে কালে নাহি যার সীমা
দেখ্ চেয়ে দেখ্ সেই আনিন্দ্য-প্রতিমা
অপূর্ব মহিমা,
উমাচিত্তচকোরের অচঞ্চল চিন্ময় চন্দ্রিমা।"
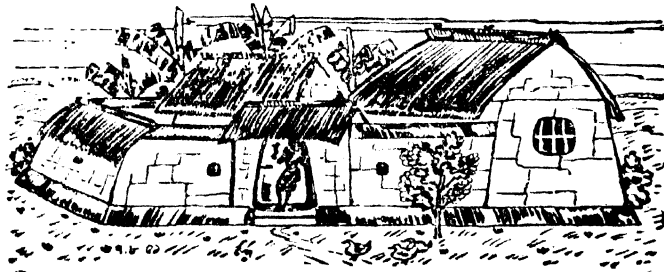
ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দিবসের সংকল্প

"আসুন, এই দিবসে আমরা জাতির জনক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যান্য নায়ক ও যোদ্ধৃবৃন্দ দেশে স্বাধীন, সুখসমৃদ্ধ পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে সুমহান আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন উহাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সুনিশ্চিতভাবে জয়যুক্ত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করি। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা কেবলমাত্র আনন্দোল্লাসের দিন নহে; কৃষক ও মজুর, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমোপজীবিদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতাদানের বিরাট কর্তব্য সাধনের জন্য এই দিবসে আমাদিগকে ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে।

"নিমেষের জন্যও ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, আমাদিগকে গুরুদায়িত্ব পালন করিতে হইবে। আমাদিগকে দেশের প্রতি গৃহে প্রাণোচ্ছলতা ও প্রজ্ঞা, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি এবং সংস্কৃতি ও আনন্দের বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। ইতিহাসের অমোঘ ঘটনা পরম্পরায় ও বিধাতার নির্দেশে আমাদের উপর এই ঐতিহাসিক দিবসে যে কর্তব্য ন্যস্ত হইল, উহা পালন করিতে হইবে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের পূর্বাচার্যগণ তাঁহাদের আরব্ধ কার্য যাহাতে আমাদের দ্বারা সম্পন্ন হয় তজ্জন্য প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদিগকে স্বচ্ছ দৃষ্টি লইয়া এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া অবিচলিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রবীণ ও তরুণ স্ত্রী ও পুরুষ, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী—কাহারও পথভ্রষ্ট অথবা বিচলিত হইলে চলিবে না। প্রবীণের অভিজ্ঞতা, যুবকের কর্মশক্তি, সৈনিকের সঙ্কল্পনিষ্ঠা, ভগ্নীর সস্নেহ পরিচর্যা—সর্বপ্রকার সাহায্যেরই আমাদের প্রয়োজন রহিয়াছে। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের উপরই নির্ভর করিতেছে। আমরা যে ভাবে ভবিষ্যৎকে রূপদান করিব সেইভাবেই ইহা গড়িয়া উঠিবে। কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্প কারখানায় বিদ্যালয়ে এবং গবেষণাগারে, পরিষদ গৃহে এবং সরকারী

অফিসে আমাদিগকে অনলসভাবে কাজ করিতে হইবে। অযথা বাক্যালাপে অথবা ধ্বংসাত্মক কার্যে এক মুহূর্তও ব্যয় করা চলিবে না। ঈশ্বরের আশির্বাদে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশ ধনধান্যে পূর্ণ সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

"১৯৩০ সালের ২৫শে জানুয়ারী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে এই বিরাট দেশের বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে সভাসমিতির অনুষ্ঠান করিয়া জনসাধারণের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প গ্রহণ করি। ইহার পর সংগ্রাম ও সাফল্যের মধ্য

দিয়া ২০টি ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। আমাদের সেই সুমহান ব্রত সার্থক হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের সঙ্কল্পের সিদ্ধিলাভ ঘোষণার্থ গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য আমরা পুনরায় মিলিত হইব।

"অদ্য ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইবে। এই শুভ মুহূর্তে আমাদের দুঃসাহসিক স্বাধীনতা সংগ্রামে জ্যোতির্ময় পথপ্রদর্শক পরম করুণাময় ঈশ্বরের নিকট আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে। আমরা জাতির জনক, আমাদের একান্ত প্রিয় বাপুজীকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করিব। এক যাদু মন্ত্রবলে তিনি আমাদের ক্লান্ত দেহে নবজীবনের সঞ্চার করেন; আমাদের নিরুৎসাহ হৃদয়ে নূতন আশার বাণী ধ্বনিত করেন। নতুবা বিভক্ত আমাদের জাতির তিনি এক আধ্যাত্মিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমাদিগকে দাসত্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিগহ্বর হইতে স্বাধীনতার আলোকোদ্ভাসিত মন্দিরে আনয়ন করেন।"

—রাজেন্দ্রপ্রসাদ

"গান্ধীজী আজীবন শিক্ষা দিয়াছেন যে, চরিত্রবল, দৃঢ়চিত্ততা, সংকল্প, সহানুভূতিশীলতা ও সহযোগিতার মনোভাব এবং কঠোর শ্রমের জন্য প্রস্তুত হইয়া অন্তর হইতে যাবতীয় ভয় ও বিদ্বেষভাব দূরে করিয়া দেশের কোটি কোটি নরনারীর কল্যাণ-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। উল্লিখিত ভিত্তিতে আমরা ভারতে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিব।

ঘটনাস্রোত অতি দ্রুত প্রবাহিত হইতেছে এবং এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে আমরা বহু বিষয়ে গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি না। বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষে দেশের নেতৃবৃন্দ দেশবাসীর উদ্দেশে নানারূপে বাণী প্রচার করেন। কিন্তু পুনরুক্তি বলিয়া নেতৃবৃন্দের বাণী একঘেয়ে শুনায়। উহা সত্ত্বেও ভারত ও ভারতবাসীদের পক্ষে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী চিরস্মরণীয় দিবস। ইহার অর্থ এই যে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু পরবর্তী যে সংগ্রাম চালাইতে হইবে তাহা আরও কঠোর। আমাদের একটি ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। কোন ব্রত উদ্‌যাপিত হইলে স্বতঃই তৃপ্তির আনন্দে অন্তরবল বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

২৬শে জানুয়ারী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—বর্তমানের সহিত অতীতকে ইহা যুক্ত করিয়াছে। অতীতের ভিত্তিতেই বর্তমান গড়িয়া উঠিয়াছে। ২০ বৎসর পূর্বে আমরা সর্বপ্রথম স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য গ্রহণ করি। এই ২০ বছর দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলিয়াছে। বহু সাফল্য ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করিয়াছি। ব্যর্থতার মধ্য দিয়া যিনি আমাদের জয়-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই। তাঁহার সাধনালব্ধ ফল আমরাই ভোগ করিতেছি। আমাদিগকে ইহার মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে। জাতির উন্নতি বহু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। গান্ধীজী আমাদের সেই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা উৎসবে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করায় আমরা ভাগ্যবান। ভবিষ্যৎ বংশধরগণ ইহার জন্য ঈর্ষা অনুভব করিবে। সৌভাগ্য-সম্পদকে সচেষ্টায় রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা শিথিল অথবা আমরা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইলে ইহা হারাইবার আশঙ্কা অতিমাত্রায় বিদ্যমান।

২৬শে জানুয়ারী
১৯৫০

—জওহরলাল
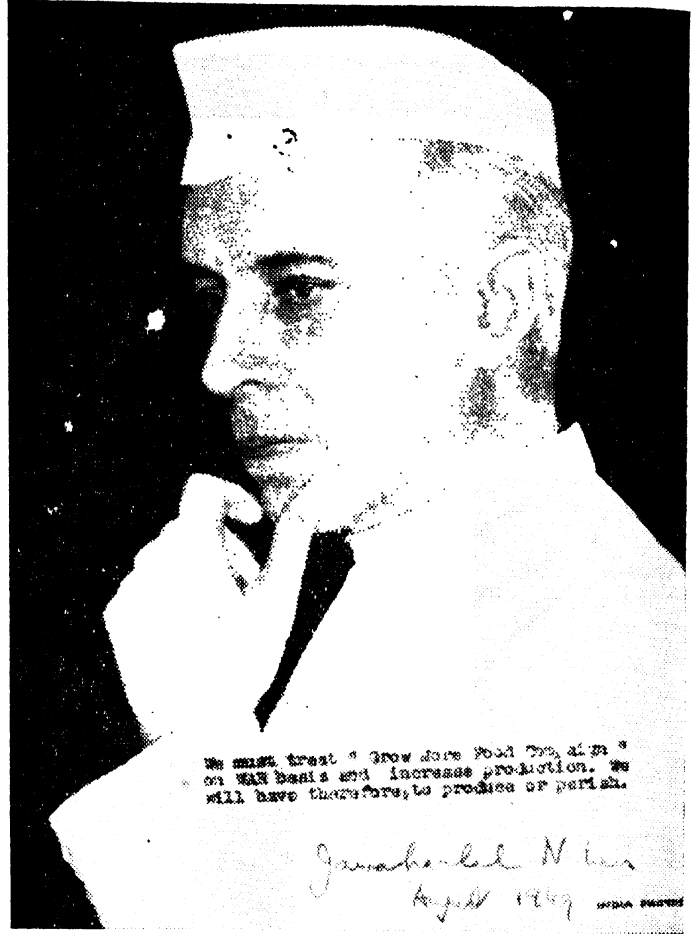
নূতন ভারতের জননায়ক নেহরু

প্রভঞ্জন সেনগুপ্ত

পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা চিত্রকর তাঁর যুগযুগব্যাপী সাধনা, আরাধনা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা যে তেল-ছবি এঁকে শেষ করলেন, সারা পৃথিবী তার সুখ্যাতি করে উঠল, বলল, 'এমন চিত্র এর আগে আঁকা হয়নি, এমন চিত্র ভবিষ্যতে আর কোন শিল্পীর দ্বারা আঁকা সম্ভব হবে কি না—তাও সন্দেহ। এ-চিত্র কেবল শিল্পীরই গৌরবের ধন নয়, সারা পৃথিবীর এ গর্বের বস্তু।'

এই শিল্পী হচ্ছে ভারতবর্ষ, এই তৈল-চিত্রটি জওহরলাল।

এই ছবি আমরা দেখছি খুব কাছে থেকে, একেবারে চোখের সামনে টেনে এনে। এত কাছে থেকে দেখার দরুণ আমরা চিত্রটির অপূর্বতা সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি বলে মনে হয় না। আমাদের চোখে বেশি করে যা ধরা পড়ছে, সেটা হয়তো চিত্রের শিল্পকলাটি ততটা নয়, যতটা তুলির আঁশের দাগগুলি। সুতরাং এই শিল্প-সম্পদটির যথোচিত মূল্য বুঝতে হলে এর থেকে উপযুক্ত তফাতে সরে এসে দাঁড়াতে হবে, খুব কম করে শতবর্ষের ব্যবধানে।

এত ঘনিষ্ঠ নিকটে দাঁড়িয়ে এ-শিল্পের বিচার সম্ভবপর নয়, আমরা যদি আমাদের দৃষ্টি সুদূরে প্রসারিত করে দিতে পারি, যদি অবশ্য আমাদের দূরদৃষ্টি ততটা থেকে থাকে, তাহলেই আমরা বুঝতে পারব, জওহরলাল কি এবং জওহরলাল কে। জওহরলাল শিল্পী-ভারতের সাধনার তুলি দিয়ে আঁকা জীবন্ত তৈলচিত্র।

অশোকের ভারত আমরা দেখেছি, মোগল-পাঠানের ভারত আমরা দেখেছি। সেই সব ভারতের মানচিত্রের পাশে বর্তমানের ভারত-মানচিত্র রেখে বিচার করলে দেখব এ-এক নূতন রূপের নবতর ভারত। আকারে ও আয়তনে বর্তমানের ভারত পূর্বাপেক্ষা বড়, আচারে ও আচরণে ভিন্নতর। প্রকৃত কথা এই যে, বর্তমান কালের ভারত অনেক বলিষ্ঠ এবং অনেক হৃষ্ট। এ-ভারতে প্রাণ-সঞ্চার করে গেছেন যিনি, তিনি গান্ধীজী। এখানে যে মানবমণ্ডলী মূঢ় ও মূক ছিল, তাদের মধ্যে চেতনা ও প্রেরণা এনে দিয়ে-ছিলেন সেই অর্ধনগ্ন ফকীর। সেই সদ্য-চেতনপ্রাপ্ত ভারতবাসীর হাতে ভারতের ভূমির অধিকার অর্পণ করলেন যিনি, তিনি জওহরলাল। প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রতিষ্ঠাতা-রূপে ইতিহাসে জওহরলালের নাম চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ভারত তার শিল্পী-হাত দিয়ে গড়ে তুলেছে তাঁকে, প্রতিদানে তিনি তাঁর শিল্পী-হাত দিয়ে গড়ে তুলেছেন ভারতের ভূমিকে! এই ভূমিতে যে জন্মগ্রহণ করেছে, যে নাগরিক অধিকার পেয়েছে এখানে, প্রত্যেকে যাতে এই ভারতের ভাগ্য নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করতে পারে, তার সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়ে জওহর-লাল প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।
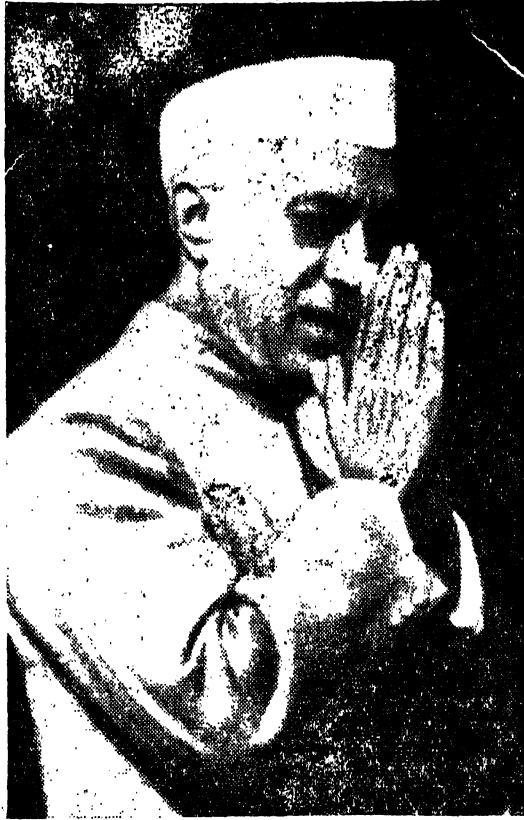
"আজ আমার প্রণতি গ্রহণ কর, পৃথিবী।"

বলেছি, জওহর-লালের পরিপূর্ণ মূল্য উপলব্ধি করা আমাদের সাধ্য নয়। প্রতিভাকে বিচার করতে হলেও প্রতিভারই প্রয়োজন। ধর্মভ্রষ্ট অনাচারী অথচ অসীম প্রতিভাধর বলে যিনি খ্যাত হয়েছেন, সেই মাইকেল মধু-সূদনকে যিনি চিনতে পেরেছিলেন, তিনি আর কেউ নন, তিনিও আর একজন প্রতিভাধর—তিনি বিদ্যাসাগর। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ জ্ঞান নিয়ে এই অসীম প্রতিভাশালী জওহরলালের যোগ্য মর্যাদা যদি দিতে না পারি, তাহলে তার দ্বারা আমাদের ক্ষুদ্রতারই পরিচয় দেওয়া হবে।

কিন্তু একথা বলা যায় যে, ভারতবর্ষ নানারূপ দুঃখ-দৈন্য প্রতিকূলতা অভাব-অনটন ইত্যাদির দ্বারা জর্জরিত হলেও ভারত সৌভাগ্যবান দেশ—ভারত লাভ করেছে জওহরলালের ন্যায় এই ভাগ্য-বিধাতাকে। কর্মের ও ভাবের এমন সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না। আড়াই হাজার

বছরের ইতিহাসের পাতা উল্টেও আমরা এমন একজন নেতার সাক্ষাৎ পাব না। গান্ধীজীর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী এই জওহরলাল। গান্ধীজী যে কর্ম-পন্থার নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যেভাবে দেশকে গড়ে তুলবার পরিকল্পনা গান্ধীজীর ছিল, স্বাধীন ভারতের জওহরলাল সেই পন্থা অনুসরণ করে, সেই পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য অগ্রণী হয়েছেন। তাঁর কর্মের নীতি ও রীতি গ্রহণ করেছেন তিনি গান্ধীজীর কাছ থেকে।

রবীন্দ্রনাথ যেসব 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা' বলে একদা তাঁর সঙ্কল্প জানিয়ে গেছেন, সেই সঙ্কল্প পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে জওহরলাল সাধারণ মানুষের ইচ্ছাকে পূরণ করার, তাদের ইচ্ছাকে প্রকাশ করার অধিকার দেওয়ার জন্যে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন; কেবল ইচ্ছা প্রকাশ ও পূরণের দ্বারাই যে দেশের ও দশের কল্যাণ হবে—এমন নয়, যাতে দেশের মঙ্গল হয়, দশের উন্নতি হয়, তার ব্যবস্থা করার জন্যেও জওহরলালের চেষ্টার ত্রুটি নেই। পাঁচশালা পরিকল্পনার কথা শুনে অনেককে হাসতে শুনেছি। কিন্তু পরিকল্পনা ভিন্ন কোন্ কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে? দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে নদী-উন্নয়নের ব্যবস্থা হয়েছে ভারতবর্ষে। আজ আমরা আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে এর গুরুত্ব যদি বুঝে উঠতে না পেরে থাকি, তাহলে সেটা আমাদেরই ব্যক্তিগত দৈন্য। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হতে যেটুকু সময় দরকার, তা আমাদের দিতে হবে। রাতারাতি যদি ফল পেতে চাই, তাহলে ডাকতে হবে কোন ঐন্দ্রজালিককে। কিন্তু এও সত্য যে, এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন উন্নতি কোন ঐন্দ্রজালিকের দ্বারা সম্পন্ন হয়নি; এ-কাজ হাত-সাফাইয়ের নয়। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা হচ্ছে, সার উৎপাদনের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে অনগ্রসর ভারতে শিল্পোন্নয়নের জন্যে কয়েকটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। জওহরলাল সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে সে সবের তালিকা এখানে দেওয়া শোভা পায় না। যাঁরা দেশের সংবাদ রাখেন, তাঁদের কারুরই এসব অজ্ঞাত নয়।

জওহরলাল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে ব্রত গ্রহণ করেছেন, সে-ব্রত দেশের বিশেষ কোন সমাজের, বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের বা বিশেষ কোন স্তরের লোকের জন্যে নয়—এ-ব্রত ভারতের আপামর জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে। কৃষিজীবী ভারতের কৃষির উন্নতির দিকেই এই কারণে তাঁর প্রথম দৃষ্টি পড়েছে, এই উন্নতি সাধিত হলে তার দ্বারা দেশের প্রতিটি চাষীর, প্রতিটি মজুরের, প্রতিটি বুদ্ধিজীবীর কল্যাণ সাধিত হবে। কৃষক, মজুর বা প্রজার রাজ প্রতিষ্ঠা করাই সম্ভবতঃ তাঁর উদ্দেশ্য নয়, কৃষক-মজুর-প্রজার দেশ করে ভারতকে গড়ে তোলার দিকে তাই তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত।

ভারত প্রায় এক হাজার বছর ধরে অপরের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়েছে। ইংরেজ যখন ভারত ত্যাগ করে যান, তখন ভারতের বেশির ভাগ লোকের নৈতিক মানের অবনতি ঘটে অনেকখানি। যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ এর জন্যে কিছুটা দায়ী। সেই রিক্ত ও নিঃস্ব ভারতবর্ষকে পরিচালন করার ভার পেলেন জওহরলাল। কঠোর সংগ্রামী, অসীম সাহসী, অনলস কর্মবীর বলেই এ-ভার গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। দেশবাসী যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এসে তাঁর পিছনে দাঁড়াত, তাহলে তিনি হয়তো খুশি হতেন; কিন্তু ছোটখাটো অসংখ্য দলে তারা বিভক্ত হল, এতে তিনি হতাশ হলেন না, তাঁর কর্মের গতিও মন্থর হল না। নিজের আরব্ধ কর্ম শেষ করার জন্যে তিনি ধৈর্য ধারণ করে পরিশ্রম করে চলেছেন।

জওহরলাল এমন এক ব্যক্তি, যিনি তাঁর মন থেকে যাবতীয় সংস্কার অনায়াসে বিসর্জন করে দিতে পেরেছেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য এসে মিশেছে এঁর মধ্যে। কখনো এঁকে দেখা যায় পাশ্চাত্ত্য পরিবেশের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে, কখনো দেখা যায় প্রাচ্যের উন্মুক্ত প্রান্তরে কৃষকের সঙ্গে সহাস্য কথোপকথন করতে। আরও আশ্চর্য এই যে, এর কোন জায়গাতেই তিনি বেখাপ নন—উভয় ক্ষেত্রেই সমানভাবে মানিয়ে নেন নিজেকে। এইরূপে সংস্কারমুক্ত বলেই তিনি সংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীর মন থেকে সব রকমের কুসংস্কার দূর করার জন্যে সচেষ্ট। একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা, ভারতবাসীরা নানা রকমের কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছি। আমরা যদি ছেঁড়া কাঁথার মত এই সব জলাঞ্জলি না দিতে পারি, তাহলে আমাদের আত্মোন্নতি বা দেশোন্নতি সম্ভব নয়। কেবল কৃষির দ্বারা শস্য ফলিয়ে এবং কল-কারখানা চালিয়ে পণ্য উৎপাদন করেই একটা দেশ গড়ে উঠতে পারে না। Well fed, well clad এবং well housed হওয়াই বড় কথা নয়, প্রধান কথা ভালো খেয়ে, ভালো প'রে এবং ভালোভাবে থেকে যেন মানুষ হয়ে ওঠা যায়। মানুষে এবং মানুষেতর জীবে তফাৎ কোথায়— হয়তো সব সময় আমরা তা ভেবে দেখি নে। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন, যার মান আছে এবং হুঁস আছে, সে-ই মানুষ। মানুষের আর একটি পরিচয় এই যে, মন নামক পদার্থটির যে অধিকারী, সেই মানুষ। সুতরাং মন এবং মান, এই দুটি জিনিস হচ্ছে মানুষের মান নির্ধারণের দুটি সঙ্কেত। ভালো খেয়ে, ভালো প'রে, ভালোভাবে বাস করার চেষ্টা আমরা অবশ্যই করব, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের মধ্যে প্রবলতর প্রেরণা যেন থাকে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার। জওহরলাল মানুষের এই বিশেষ দিকটির প্রতি পুরোদস্তুর নজর রেখে দেশের মানুষের ব্যবহারিক জীবন উন্নত করার দিকে মন দিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে কলকাতার বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বৈজ্ঞানিকদের উদ্দেশে সম্প্রতি তিনি যে কথা বলেছিলেন, সে কথা মনে করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন পৃথিবীতে এত বৈজ্ঞানিক উন্নতি ঘটছে, আমরা আণবিক যুগে এসে পৌঁছে গেছি, চন্দ্রগ্রহে যাবার বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় রত হয়েছি, কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের মনের উন্নতি সাধন করা সম্ভব হচ্ছে না কেন, বরঞ্চ মানুষের মানসিক মানের অবনতি বেশি করে দেখা যাচ্ছে কেন। যারা বিজ্ঞানের আওতার বাইরে, এত জটিল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে যাদের সংস্রব নেই, সে গ্রাম্য জীবন তুলনামূলকভাবে অনেক উন্নত এর হেতু কি। বৈজ্ঞানিকদের তিনি এ কারণে অনুরোধ জানান যে, তাঁরা যে মানুষের মন নামক এই বিশেষ উপাদানটি পুষ্টির প্রতিও মনোযোগ দেন; তা না হলে দেশে বিজ্ঞানের উন্নতিই হবে, অথচ পৃথিবী থেকে মানবতা লুপ্ত হবে।

জওহরলাল মানবতার উপাসক এবং এই জন্যেই তিনি পৃথিবীতে মানবতার ব্যাপ্তির জন্যে মানুষের মনকে উপেক্ষা করে চল
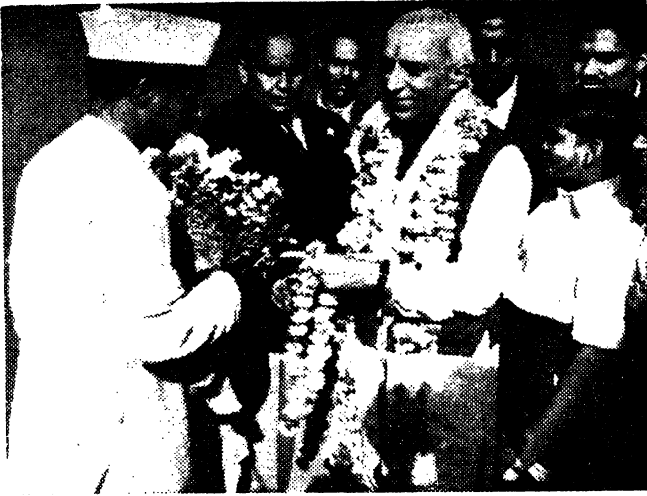
জওহরলাল তাঁর গত জন্মদিনে শিশুদের নিয়ে যখন ক্রীড়ারত, তখন ভিড় ঠেলে সেখানে এলেন একজন কৃষক। তিনি উপহার এনেছেন জওহরলালের জন্যে—নিজের ক্ষেতে নিজের হাতে বপন করা ধানের শীষ।

…পাতী নন। আমরা যদি স্থির মস্তিষ্কে …বে দেখি, তাহলেই বুঝতে পারব, …থিবীর কল্যাণের পথে যা সবচেয়ে বড় …রায়, তিনি তার মূল খুঁজে …য়েছেন। সেই মূলে তিনি নাড়া দিয়ে …লকে সচেতন করে তুলেছেন। বৈজ্ঞানিক-…ায় তিনি যে কথা বলেছেন, সেইটেই …বীর সবচেয়ে বড় সমস্যা। খাদ্যের …টন নামক সমস্যাটি এর তুলনায় কিছু … খাওয়ার জন্যেই যাঁরা জীবনধারণ করার …পাতী, তাঁরা হয়তো একথা মানবেন না; …তু বাঁচার জন্যে খাওয়া যাঁরা আত্মধর্ম … স্বীকার করে নিয়েছেন—তাঁরা …শেই মানবেন।

…থিবীতে নেতা আছেন অনেক, কিন্তু …ষের এমন অন্তরঙ্গ সুহৃদ্-নেতা …জে মিলবে না। গান্ধীজীর মানসপুত্র … নেহরু অভিহিত, নেহরুর এ-পরিচয় …তই। সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে, …ধীজীর কাছ থেকে জওহরলাল যে দীক্ষা … করেছেন, সেই দীক্ষার মন্ত্রের দ্বারা … তাঁর অস্থি-মজ্জা-মন-মেজাজ জারিত … তুলেছেন নিজেরই চেষ্টায় এবং …ষের প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদের …ই।

…শুর প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ দরদেরই অভিব্যক্তি। যেখানেই তিনি শিশুদের মেলা দেখেন, সেইখানেই তিনি শিশুর মন নিয়ে তাদের সঙ্গে মিলে যাবার জন্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। এই শিশুদের মধ্যে যে মনের সন্ধান তিনি পান, সে-মন অকৃত্রিম ও অনাবিল; কোনো বৈজ্ঞানিক-প্রভাবে বা কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে সে-মন কলঙ্কিত হয় নি। মানুষের মন খুঁজে বেড়ান জওহরলাল, তিনি খুঁজে বেড়ান তাঁর মনের প্রতিবেশীকে। এই অকলঙ্ক মনের মিছিলে তাই তিনি সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার জন্যে তাদের সঙ্গ নেন। এই শিশুরাই হবে ভবিষ্যৎ ভারতের নাগরিক ও ভবিষ্যৎ ভারতের কর্ণধার। তাদের মনের সঙ্গে তিনি খেলা করেন এবং তাদের জানিয়ে দিয়ে আসেন যে, তারাই ভবিষ্যৎ ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা হবে, সুতরাং সেই দায়িত্ববোধ নিয়ে তারা যেন অকৃত্রিম মানুষ হয়ে উঠতে পারে।

আমাদের মনের এই অবনতি ঘটেছে বলে আমাদের মধ্যে নানা রকমের complex ও সঙ্কীর্ণতা এসে গিয়েছে। এই সঙ্কীর্ণতায় নাগপাশ ছেদনের উদ্যোগ করার দিকে যেদিন আমাদের স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যাবে, সেই দিন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের মানসিক উন্নতি ঘটছে। কেবল দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি নয়, মানসিক এই উন্নতি সাধনের জন্যেও উদ্যোগী হয়েছেন জওহরলাল। বারংবার তাই তিনি দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আমাদের মধ্যের ধর্মগত, সমাজগত, জাতিগত, জাতগত, প্রদেশগত যত কিছু বাঁধ ও বাধা আছে, সম্মিলিত উদ্যোগে তা ভেঙে ফেলতে হবে। সমবেতভাবে আমাদের সকলকে হয়ে উঠতে হবে ভারতবাসী। যেদিন আমরা আমাদের মনকে বর্তমানের এই ক্ষুদ্রতা হতে ব্যাপ্ত করে ফেলতে পারব, সেই দিন নিজেদের ভারতবাসী বলে পরিচয় দিতে গর্ব ও অনুভব করব।

আমাদের দেশের জমি খণ্ড খণ্ড ভাবে ভাগ করব, সেই খণ্ডগুলি একত্রে যুক্ত করে একটি অবাধ ভূমি সংস্থাপনের উদ্যোগ আমাদের মধ্যে আছে; সেই উদ্যোগের সঙ্গে যাতে আমাদের আল-বাঁধা মনকেও আমরা অবাধ করে দিতে পারি, তার প্রেরণা দিয়ে চলেছেন জওহরলাল।

আমাদের সঙ্কীর্ণতা ও সংস্কারের আর একটি দিকও আছে। সেদিকের প্রতিও জওহরলাল কম সজাগ নন। সেদিকটি হচ্ছে আমাদের দেশের নারীসমাজ। ভারতের ছত্রিশ কোটি দেশবাসীর মধ্যে আনুমানিক তার অর্ধেক, অর্থাৎ আঠারো কোটি হচ্ছে নারী। যদি ভারতের এই নারীসমাজকে সর্বদা অন্তরালে রেখে দেওয়া যায়, তাহলে দেশের হিতসাধন কার্যে এই বিরাট সংখ্যাকে নিয়োগ করা হয় না। এতদিন নারীসমাজ তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। জওহরলাল যে হিন্দু কোড বিল নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, সেই বিল নারীদের অধিকারের বিল। এর বিরোধিতা করেছেন অনেকে, এখনো অনেকে করছেন, কিন্তু জওহরলাল ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর চেষ্টা থেকে বিরত হবেন না, এই বিল যাতে আইনে পরিণত করা যায়, এ বিষয় তিনি চেষ্টা করবেনই। তাঁর এই ঘোষণা থেকে বোঝা যায়, তিনি সাময়িক রাজনৈতিক সুবিধা বা ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ইত্যাদির বিষয় উদাসীন; তিনি দেশের সর্বস্তরের মানুষের সমান ও যোগ্য অধিকার দেবার জন্য কৃতসংকল্প। এই হিন্দু কোড বিল যেদিন আইনে পরিণত হবে, সেই দিনকে আমরা আমাদের সামাজিক বিপ্লবের দিন বলে বরণ করে নেবার জন্যে যেন প্রস্তুত হয়ে থাকি।

ইতিমধ্যে অবশ্য দেখা গিয়েছে, জওহরলাল দেশের যোগ্য নারীদের উপযুক্ত সম্মান

দিতে বিন্দুবিসর্গ কার্পণ্য করেন নি—ভারতের রাজ্যপাল পদে অভিষিক্ত করেছেন তিনি সরোজিনী নাইডুকে, বিদেশে রাষ্ট্র-দূত করে পাঠিয়েছেন বিজয়লক্ষ্মীকে। তাছাড়া শাসন পরিচালন ব্যাপারে দায়িত্ব-পূর্ণ পদে নারীদের নিয়োগ করা হয়েছে, বিচার বিভাগে বিচারকের আসন দেওয়া হয়েছে নারীকে। যদি আমরা এই সব কার্যকে বিপ্লব বলে মনে না করি, তাহলে বিপ্লব বলব কা'কে?

ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইন তৈরি করে এবং সরকারী দপ্তর থেকে ইস্তাহার বের করে ঘোষণা করলেই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না। প্রকৃত যে প্রজাতন্ত্র, ভারতে সেই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন জওহরলাল। জীর্ণতম কুটীরের অধিবাসী থেকে আরম্ভ করে প্রাসাদোপম অট্টালিকার অধিবাসী সকলকে তিনি সমান মর্যাদা দান করেছেন. আজ প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেকের বলার অধিকার হয়েছে, ভারতের ভাগ্য গঠিত হবে কিভাবে এবং কেমনভাবে। আঠারো কোটি ভারতবাসী এই অধিকারে আজ অধিকারী। কুমারিকা থেকে হিমাচল, ব্রহ্মপুত্র থেকে পোরবন্দর পর্যন্ত এই বিশাল ভূখণ্ডে সেই অধিকার প্রয়োগের মহোৎসব আমরা চাক্ষুষ দেখলাম। কিন্তু আগেই বলেছি, প্রতিনিধি-নির্বাচনের অধিকার অর্জন করাই প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মুখ্য কথা নয়। দেশে প্রত্যেক 'প্রজা' যাতে নিজেকে উন্নত করতে পারে, উদার করতে পারে, মানসিক সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারে—তার আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাতে আত্মিক উন্নতি সাধিত হতে পারে—তারই যে সুযোগ ও সুবিধা সৃষ্টি, তাই প্রকৃতপক্ষে প্রজাতন্ত্রের মর্মকথা। ভারতের এই মর্মবাণীর উপাসক ও প্রচারক জওহরলাল।

স্বাধীন ভারতের সৌভাগ্য যে, সে এমন একজন নেতা লাভ করেছে—এমন সংস্কার-মুক্ত, উদার, মানবহিতৈষী দেশনেতা লাভ করা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। অথচ আমরা আমাদের এই পরম ঐশ্বর্য সম্বন্ধে হয়তো সম্পূর্ণ সচেতন নই। যতই আমরা জওহরলালের গুণাবলীর ব্যাখ্যা ও তার বিশ্লেষণ করি না কেন, তা উপযোগী কখনোই হতে পারে না। আমরা তাঁকে এত কাছে থেকে দেখছি যে, তাঁর গুণ আমাদের চোখে তত স্পষ্ট হয়ে ধরা নিশ্চয়ই পড়ছে না।

শিল্পী-ভারতের সাধনা দিয়ে অঙ্কিত এই চিত্রটি শুধু চিত্র নয়—চলচ্চিত্র, প্রাণবান, বেগবান ও উদ্দাম। কর্মের চক্রের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে তিনি তারই বেগের আবেগে ছুটে চলেছেন। দৃশ্যের পর দৃশ্যে তাঁর জীবনের অধ্যায়ের পর অধ্যায়ের পাতা খুলে যাচ্ছে। নিত্যনিয়ত আমরা এই কথা বিস্মিত হয়ে হয়তো ভাবছি যে, এই পুরুষ-সিংহটি আমাদেরই কালের, আমাদেরই যুগের এবং আমাদেরই দেশের? আজ থেকে শত বর্ষ পরে যারা ভারতের ইতিহাস পাঠ করবে, যে-চোখে তারা তখন জওহরলালকে দেখবে, সে-চোখ আমরা পাব কী করে? তা পাব না বলেই জওহরলালের যোগ্য মূল্য নিরূপণ আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়।

আজ যদি তাঁর গুণাবলী আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে নির্দেশ করতে থাকি, তাহলেও আমরা তাঁকে কলঙ্কিত করব। যাঁরা তাঁর মূল্য বুঝতে না পেরে এর সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কথা বলছেন, তাঁদের দ্বারাও তিনি অকারণে কলঙ্কিত হ[illegible] চলেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প ম[illegible] পড়ে গেল। জনৈক শিল্পী একটি ছ[illegible] এঁকে, সেই ছবিটি একটি বাজারের ভি[illegible] একধারে টাঙিয়ে রাখলেন। নীচে লি[illegible] রাখলেন, ছবিটির মধ্যে কোন্ জায়গ[illegible] সবচেয়ে ত্রুটিপূর্ণ, পাশে রাখা তুলি দি[illegible] সকলে যেন তা চিহ্নিত করে দেন। দি[illegible] শেষে শিল্পী ছবিটি আনতে গিয়ে দে[illegible] তাঁর ছবিটির সবটাই কালির ছাপে ঢা[illegible] ছবিটির ত্রুটি দেখাবার জন্যে বাজা[illegible] লোকেরা তুলি দিয়ে একটা করে বি[illegible] চিহ্নিত করে এই দশা ঘটিয়েছে। প[illegible] দিন শিল্পী ছবির উপরের সেই ভুষো কা[illegible] ধুয়ে ফেলে আবার সেইটি সেই বাজা[illegible] ধারে টাঙালেন। এবার তিনি অনু[illegible] জানিয়ে গেলেন, ছবিটির কোন্ জায়গ[illegible] সবচেয়ে ভালো হয়েছে, পাশে রাখা তু[illegible] একটা বিন্দু দিয়ে তা যেন সকলে চিহ্[illegible] করে দেন। দিনের শেষে ছবিটি আন[illegible] গিয়ে শিল্পী দেখলেন, তাঁর ছবির দ[illegible] ঘটেছে একই, তার সর্বাঙ্গ কালির দা[illegible] ঢাকা।

একেই বলে দশের মত, একেই [illegible] বাজারের মত। আমরা যেন আমাদের [illegible] বিচারবুদ্ধি নিয়ে জওহরলালের দোষগ[illegible] বিচার করতে গিয়ে নিজেদের বাহাদুরী [illegible] দিই। আমরা যেন আমাদের সঙ্কীর্ণ বু[illegible] নিয়ে তাঁর বিচারে না নামি।

সম্ভবতঃ, জওহরলাল সম্বন্ধে এই কয়েক[illegible] কথা লিখতে গিয়ে কয়েকটি কালির চি[illegible] আঁকা হল। কিন্তু তাতে কিছু আসে[illegible] না। এই ভুষো কালির নীচে সেই সমুজ্জ[illegible] তৈলচিত্রটি তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নি[illegible] উদ্ভাসিত হয়েই রইল।

এশিয়া ও ভারতের প্রজাতন্ত্র

বসুবন্ধু শর্মা

সম্প্রতি ইংল্যান্ডে ভারতের হাই কমিশনার শ্রীকৃষ্ণ মেননের সঙ্গে বৃটেনের ভূতপূর্ব শ্রমিক গভর্নমেণ্টের পররাষ্ট্র দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারী মিঃ ক্রিস্টোফার মেহুর টেলিভিসনে একটি বিতর্ক হয়ে গেছে। বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল আধুনিক বিশ্ব-রাজনীতিতে ভারতের প্রভাব ও সে প্রভাবের মূল উৎস। আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ মেহু বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষ কি বলে না বলে এবং কি করে না করে তার উপর বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যেরূপ গুরুত্ব দেন তেমনি বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানও গুরুত্ব দেন। এর কারণ খুঁজে না পেয়ে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। বিস্ময় প্রকাশ করবারই কথা এবং শুধু মিঃ মেহু নন—এরূপ বিস্ময় অনেকেই প্রকাশ করে থাকেন।

ভারতবর্ষ আইনগত দিক থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে মাত্র চার বৎসরকাল আর স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্ররূপে ভারতের নব অভ্যুদয় ঘটেছে মাত্র দুই বৎসরকাল। এই সামান্য সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ বিশ্ব-রাজনীতিতে যে প্রভাব বিস্তার করেছে তা রীতিমত অসামান্য। নিজেদের দেশের সবকিছু কৃতিত্বকে ছোট করে দেখার জাতীয় বদাভ্যাস আমাদের আছে বলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের এ প্রভাব আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু বিদেশীদের চোখে এ কৃতিত্ব সহজেই ধরা পড়ে এবং তাই মিঃ মেহুর অনুরূপ কথা আমরা অনেক বিদেশীর মুখ থেকেই শুনতে পাই। পাশ্চাত্যবাসীরা ভারতের এ শক্তির খবর রাখে কিন্তু তার মূল উৎস তারা খুঁজে পায় না। আজকের বলদর্পিত পৃথিবীতে শক্তির অর্থই হ'ল সশস্ত্র শক্তি। যে রাষ্ট্র যত বেশী সৈন্যবল ও সামরিক শক্তির অধিকারী বিশ্ব-রাজনীতিতে তার প্রভাবও তত বেশী। এই কষ্টিপাথরে যাচাই করলে ভারতের প্রভাবের কারণ সত্যই খুঁজে পাওয়া যায় না।

শক্তির উৎস কোথায় ?

সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে যদি আমরা ভারতের আন্তর্জাতিক প্রভাব ও শক্তির উৎস খুঁজতে যাই তবে আমরা ভুল করব। যে সব রাষ্ট্র আজ পৃথিবীতে প্রভুত্ব স্থাপনের আগ্রহে পরস্পরের মধ্যে বিবাদরত তাদের পাশাপাশি দাঁড়াবার মত সৈন্যশক্তি ভারতের নেই। তবু বিশ্ব-রাজনীতিতে স্বাধীন ভারতের অভ্যুদয় যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই প্রস্তাবের মূল কারণ খুঁজতে গেলে আমাদের ভারতের ইতিহাসের গভীরে প্রবেশ করতে হবে। একথা সকলেই জানেন যে, এশিয়ার রাজনীতিতে ভারতবর্ষ আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত। কিন্তু ভারতের পক্ষে এ গুরুত্ব সদালব্ধ নয়—এ গুরুত্ব তার বহু যুগার্জিত। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের অভ্যুদয় নতুন হ'লেও রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষ নতুন নয়। বরং আজকের বলদর্পী পৃথিবীতে যে সব রাষ্ট্র নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন প্রয়াসী তাদের প্রায় সকলের চেয়েই ভারতীয় রাষ্ট্র প্রাচীন। কয়েক সহস্র বৎসরব্যাপী ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, ভারতের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোক লাভ করেনি এশিয়াতে এরূপ রাষ্ট্র বড় একটা নেই। কিভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ খুঁজলে দেখা যায় যে, ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার বিশ্বকল্যাণকামী রূপেই এর জন্যে দায়ী। এজন্যে অস্ত্রবলে অন্য দেশ জয় করে সেখানকার নরনারীদের সভ্য করে তোলার ভাঁওতা দিতে হয়নি ভারতকে। স্বাধীন রাজ্য হিসাবে ভারতবর্ষ চিরদিনই ছিল শান্তিপ্রিয়—নিজে শান্তিতে বসবাস করতে সে যেমন চেয়েছে, তেমনই অপরের শান্তিকেও সে বিঘ্নিত করেনি কোনদিন। অথচ প্রাচ্যের প্রায় সকল দেশের সঙ্গেই তার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল গভীর। মধ্যযুগে প্রাচ্য ভূখণ্ডে অর্থলোভে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি দেশের প্রাণকেন্দ্র ছিল ভারতবর্ষ। সামরিক বিজয় ছাড়াও যে সাংস্কৃতক বিজয় লাভ করা চলে একথা বলদর্পে অন্ধ পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অবিশ্বাস্য হ'লেও ভারতবর্ষ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আধুনিক বিশ্বে ভারতের ভূমিকা ভালভাবে বুঝতে হলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এ পটভূমিকা আমাদের চোখের সামনে রাখতে হবে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের আজ যে প্রভাব সে নিছক নৈতিক প্রভাব—তার পিছনে কোন সামরিক শক্তির ভীতিপ্রদর্শন নেই। অন্যদিকে আজ যারা বিশ্ব-রাজনীতি কুক্ষিগত করে রেখেছে তাদের পিছনে নৈতিক বল বড় একটা নেই—আছে সামরিক শক্তির যোদ্ধার আত্মঘোষণা। ভারত তার এই নৈতিক শক্তি অর্জন করেছে বহু যুগ যুগান্তের সাধনায়। ভারতের এ যুগের শ্রেষ্ঠ জননায়ক ও চিন্তানায়ক মহাত্মা গান্ধী ছিলেন এই যুগান্তব্যাপী ভারতীয় সাধনারই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূরা যাঁকে 'নগ্ন ফকির' আখ্যা দিয়েছিলেন তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্যে একক হস্তে অহিংস সংগ্রাম করেছিলেন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তাঁর এ সংগ্রামের পিছনে একমাত্র নৈতিক শক্তি ছাড়া অন্য কিছু ছিল কি? তিনি জানতেন যে, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলেও তাঁর পিছনে আছে সত্য ও ন্যায়। তাই তিনি বিনা দ্বিধায় অপর পক্ষের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে, অন্যায় যত প্রবল ও শক্তিশালীই হোক্ না কেন, ন্যায় ও সত্যের বিরুদ্ধে সে দীর্ঘদিন টিঁকে থাকতে পারবে না। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর পিছনে যে নৈতিক শক্তির জোর ছিল—আজ বিশ্ব-রাজনীতিতে ভারতের প্রভাবের পিছনেও আছে সেই নৈতিক শক্তির জোর। বিশ্ব-রাজনীতির কলকাঠি আজ যারা নাড়ছে সেই বৃহৎ শক্তি কয়টির সকলেই পৃথিবীর দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে আত্মোন্নতি করতে বদ্ধপরিকর। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সেরূপ কোন অভিপ্রায় নেই বলেই বিশ্ব-রাজনীতিতে বিবদমান কোন রাষ্ট্রগোষ্ঠী বা ব্লকেই ভারতবর্ষ যোগ দেয় নি। বিশ্ব-রাজনীতিতে ভারতবর্ষের যা কাম্য সে হ'ল বিশ্বশান্তি। ভারতবর্ষ চায় যে, পৃথিবী থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ও শোষণের

অবসান হোক্, মুক্ত স্বাধীন সকল দেশ পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে বাস করুক এবং পৃথিবী থেকে সর্বধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা চিরতরে বিলুপ্ত হোক। এই মহান্ আদর্শ সম্মুখে রেখেই ভারতবর্ষ আজ বিশ্ব-রাজনীতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্র কয়টির আজ পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের খাতিরে সুস্পষ্ট দু'টি ব্লকে বিভক্ত এবং পৃথিবীর অধিকাংশ ছোট রাষ্ট্র দুটি ব্লকের যে কোন একটিকে নিরঙ্কুশ সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র ভারতবর্ষই এর মধ্যে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে একটা মধ্যপথ অনুসরণ করছে। পরস্পরবিরোধী ব্লক দু'টির মধ্যে যার অন্যায় ভারতবর্ষ দেখছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সে যেমন কুণ্ঠিত হচ্ছে না, তেমনি কারও কোন ভাল কর্মনীতিতে সমর্থন জানাতেও তার আপত্তি নেই। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতের কর্মনীতি সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের দ্বারা নিরূপিত হয় না, নিরূপিত হয় বৃহত্তর বিশ্বকল্যাণ ও বিশ্বশান্তির আদর্শের দ্বারা। এরূপ নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে গিয়ে ভারতের জাতীয় স্বার্থের হানিও বড় কম হয়নি। ভারত সোজাসুজি কোন একটা ব্লকে যোগ দিলে গত চার বৎসরে তার আর্থিক অবস্থার আরও উন্নতি হয়তো হ'ত—কিন্তু আজ ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে যে সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করে তা তার ভাগ্যে জুটত না। ভারত যে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়েও তার মহত্তর আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে এইখানেই তার প্রভাব-প্রতিপত্তির মূল উৎস নিহিত। এর সার্থকতা বুঝতে হ'লে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সঠিক বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতি

ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেশে বিদেশে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি কম আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। এ নিয়ে কূটতর্ক হয়েছে অনেক এবং এ পররাষ্ট্রনীতির পক্ষে ও বিপক্ষে উভয়রকম মতবাদের সাক্ষাৎই আমরা পেয়েছি। ভারতের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রভাবশালী কোন কোন মহলে তীব্র গাত্রদাহেরও সৃষ্টি করেছে এবং ভারতকে স্বধর্মচ্যুত করার চেষ্টাও বড় একটা কম হয়নি। তবু স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু ভারতের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে সামান্য পরিবর্তনও ঘটতে দেননি। আর দেননি বলেই ভারত বিশ্ব-রাজনীতিতে শুধু মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে নেই, ভারতের মতাবলম্বী রাষ্ট্রের সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সার্থকতারই উদাহরণ। অনেকে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিকে এই বলে আক্রমণ করেন যে, এর কোন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নেই—মূলতঃ এ কর্মনীতি নেতিবাচক। কিন্তু এ অভিযোগ সত্য নয়। ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি বিশ্ববাসীদের সম্মুখে একটা বড় গঠনমূলক কর্মাদর্শও তুলে ধরেছে—সে কর্মাদর্শ হ'ল অহিংসা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি সংস্থাপন। সশস্ত্র যুদ্ধলিপ্সু পৃথিবীতে এ আদর্শের পক্ষে দ্রুত সিদ্ধিলাভ করা হয়তো কষ্টসাধ্য—কিন্তু তাই বলে এ কর্মাদর্শ নিছক নেতিবাচক এমন কথা বলা চলে না। ভারতের এ পররাষ্ট্রনীতি এ পর্যন্ত একাধিক ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূও হয়েছে। দুইটি শিবিরে বিভক্ত রণসাজে সজ্জিত পৃথিবীতে ভারত যে তৃতীয় পক্ষের সন্ধান দিয়েছে সে পথ এশিয়ার ছোট ছোট অনেক রাষ্ট্রকেই নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে এবং ভারতকে কেন্দ্র করেই তাদের পররাষ্ট্রনীতি আবর্তিত হয়ে চলেছে! পরস্পরবিচ্ছিন্ন এশিয়ার বুকে ভারত এই যে ঐক্যের বীজ বপন করতে পেরেছে কালক্রমে সেই বীজই একদিন বিরাট মহীরূহে পরিণত হবে না—এমন কথা কেউ কি জোর করে বলতে পারে?

এক আধটি ক্ষেত্রে ভারতের নৈতিক সাহায্য ও সমর্থন ইতিহাসের চাকাও ঘুরিয়ে দিতে পেরেছে। উদাহরণস্বরূপ ইন্দোনেশিয়ার কথা বলা যেতে পারে। আজ যে স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া এশিয়ার বুকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিত্ররাষ্ট্র তার বৈদেশিক শাসনমুক্তির জন্যে স্বাধীন ভারত কম চেষ্টা করেনি। ডাচদের কবল থেকে ইন্দোনেশিয়া যে মুক্তিলাভ করেছে তার জন্যে মূলতঃ দায়ী ইন্দোনেশিয়ার সংগ্রামী জনসাধারণের আপ্রাণ প্রয়াস; কিন্তু ভারতের নৈতিক সাহায্য ও সমর্থন ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিকে যে দ্রুততর করে তুলেছে সে কথাও অস্বীকার করা চলে না। সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানে বৃহৎ রাষ্ট্রকয়টির পারস্পরিক লড়াই-এর মধ্যে তৃতীয় শক্তিরূপে ভারত এ পর্যন্ত যে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে তার ফলও কম কল্যাণপ্রসূ হয়নি। গত চার বৎসরে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের হিসাব-নিকাশ করলে এ উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হতে পারে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির এই সার্থকতা তাই ইংল্যাণ্ডের প্রগতিবাদী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জে বি এস হ্যাল্ডেনের মত খ্যাতিমান ব্যক্তিকেও অভিভূত না করে পারেনি। সম্প্রতি বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে অধ্যাপক হ্যাল্ডেন যখন কলিকাতায় এসেছিলেন তখন তিনি অযাচিতভাবেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির অকুণ্ঠ প্রশংসা করে গেছেন। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি যদি নিছক স্বার্থপর ও সুবিধাবাদ-প্রণোদিত হ'ত তবে তাঁর মত আদর্শবাদী ও প্রগতিশীল বিদেশী বৈজ্ঞানিক তার প্রশংসা করতেন কিনা সন্দেহের বিষয়।

আর একটি কষ্টিপাথরে বিচার করলেও ভারত রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির এই সার্থকতা আমাদের চোখে পড়ে। ভারতবর্ষ কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের লেজুড় হয়ে তার সর্বকিছু কার্যক্রমকে সমর্থন করছে না বলে পাশ্চাত্যের শক্তিমদমত্ত কোন কোন রাষ্ট্র হয়তো ভারতের উপর বিরূপ—কিন্তু নানাভাবে উৎপীড়িত পৃথিবীর ছোট রাষ্ট্রগুলির সমর্থন ও সদিচ্ছা ভারত বহুল পরিমাণে লাভ করতে পেরেছে। বিশেষ করে বিরাট বহুবিচিত্র এশিয়া মহাদেশে ভারতবর্ষ ঐক্য ও মৈত্রীর যে আদর্শ স্থাপন করতে পেরেছে এশিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাসে তার তুলনা নেই। স্বার্থসংঘাত আছে বলে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্থানের সঙ্গে তার অপ্রীতির প্রসঙ্গ বাদ দিলে এশিয়ার আর কোন দেশের সঙ্গেই ভারতের অসম্প্রীতি নেই। কম্যুনিষ্ট চীনের সঙ্গে যেমন ভারতের সদ্ভাব আছে, তেমনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদানত জাপানের সঙ্গেও তার সদ্ভাব বর্তমান। ফরাসী কূটনীতিতে বিপর্যস্ত ভিয়েৎনাম ও বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের অধীন মালয় ভারতের প্রতি সম-বন্ধুভাবাপন্ন। মধ্যপ্রাচ্যে ভারত যে কূট-নৈতিক জয়লাভ করেছে তার তুলনা বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিটি রাষ্ট্রের অধিবাসীই মুসলমান এবং সে সব রাষ্ট্রকে ভারতের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলার জন্যে পাকিস্থান কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু সর্বত্রই পাকিস্থানের সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। ভারত যে এশিয়ার প্রতিটি রাষ্ট্র ও দেশে নিজের পক্ষে এই ব্যাপক মৈত্রী ও সদ্ভাবের সৃষ্টি করতে পেরেছে তার মূলে আছে ভারতের স্বার্থ-বিবর্জিত নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি। এশিয়ার প্রতিটি দেশ জানে যে, ভারত আর যাই

করুক, কোন বিশেষ ক্ষমতালোভী রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর অন্ধ অনুগামী সে নয় কিংবা নিছক সামরিক শক্তির সাহায্যে পররাজ্য গ্রাসের কোন অভিপ্রায়ও তার নেই। এমন কি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কর্মনীতিতে সামান্য হস্তক্ষেপের মতলবও নেই ভারতের। ভারত যা কিছু করে বা করার চেষ্টা করে তার মূলে থাকে বিশ্বকল্যাণ ও বিশ্বশান্তির মহত্তর আদর্শ। তাই ভারতের প্রতি বিদ্বিষ্ট বা অসদ্ভাবাপন্ন হবার কোন কারণই তারা খুঁজে পায় না। এ কৃতিত্ব যে ভারতের পররাষ্ট্রনীতিরই প্রাপ্য সে কথা কি অস্বীকার করা চলে?

এশিয়া ও ভারতের প্রজাতন্ত্র

এইবার আমার প্রবন্ধের মূল বক্তব্যে আসা যাক্। প্রবন্ধের নাম থেকেই পাঠক পাঠিকারা বুঝতে পারবেন যে, এশিয়ায় ভারতের স্থান কি এবং কি হওয়া উচিত—সেইটিই এ প্রবন্ধের মূল বিচার্য বিষয়। এর সঠিক উত্তর পেতে হলে আজকের পৃথিবীতে এশিয়ার গুরুত্ব কতখানি তাও আমাদের বুঝে দেখা দরকার। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে আমরা বক্তৃতা প্রসঙ্গে একাধিকবার বলতে শুনেছি যে, বর্তমান পৃথিবীতে পাশ্চাত্যের দিন শেষ হয়ে গেছে, শুরু হয়েছে প্রাচ্যের জয়যাত্রা। প্রাচ্যই ভাবী পৃথিবীর ভাগ্য নির্ণয় করবে এমন কথাও তিনি ভিন্ন ভাষায় একাধিকবার বলেছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা-লাভের বহু পূর্বে তিনি তাঁর বহুখ্যাত গ্রন্থ 'ডিসকভারি অফ্ ইণ্ডিয়া'তে (Discovery of India) লিখেছিলেনঃ

"The Pacific is likely to take the place of the Atlantic in the future as a nerve centre of the world. Though not directly a Pacific State India will inevitably exercise an important influence there. India will also develope as the centre of economic and political activity in the Indian Ocean area, in South East Asia and right up to the Middle East. Her position gives an economic and strategic importance in a part of the world which is going to develop rapidly in the future. If there is a regional grouping of the countries bordering on the Indian Ocean on either side of India—Iran, Iraq, Afghanisthan, India, Ceylon, Burma, Malaya, Siam, Java etc,—present-day minority problems disappear, or at any rate will have to be considered in an entirely different context."

জওহরলাল যে প্রসঙ্গেই কথাগুলো বলে থাকুন, তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি যে অনেকখানি গত কয়েক বৎসরের ঘটনাবলী তাই প্রমাণিত করেছে। আজ যে কোন কারণেই হোক, আন্তর্জাতিক ভারসাম্যের মূল প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এশিয়া এবং এশিয়ার সকল ব্যাপারে একটা বড় অংশ গ্রহণ করেছে প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষ। জওহরলালের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলই আজ বিশ্বের ঝটিকা-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আজ পৃথিবী যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তার মধ্যে স্থায়ী শান্তির ইঙ্গিৎ আমরা বড় একটা পাচ্ছি না। রাজনৈতিক ও রণনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে গোটা পৃথিবী আজ স্পষ্টতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—একদিকে কম্যুনিস্ট একনায়কত্বে বিশ্বাসী সোভিয়েট রাশিয়া, ও তার অনুগামী রাষ্ট্রসমূহ এবং অপরদিকে গণতন্ত্রবাদী ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্রদ্বয় ও তাদের অনুগামী রাষ্ট্রসমূহ। যুদ্ধশেষে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ চীনে কম্যুনিস্ট গভর্নমেণ্ট স্থাপিত হওয়ায় এশিয়ার রাজনৈতিক

ভারসাম্য বহুলাংশে গেছে সোভিয়েট রাশিয়ার অনুকূলে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের চেষ্টার ত্রুটি নেই। এশিয়ায় নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখা ও বাড়ানোর জন্যে উভয় পক্ষের যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে তারই বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখেছি কোরিয়ায়। পরস্পর বিবদমান ব্লক দু'টি মুখে যতই শান্তির কথা বলুক, তারা যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছে তার অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। অথচ সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়ার দেশগুলি আদৌ যুদ্ধ চায় না। দীর্ঘকালীন পরাধীনতার ফলে তারা আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের দিক থেকে পড়ে আছে অনেক পিছনে। প্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে যাওয়াই তাদেব বর্তমান লক্ষ্য। এ প্রগতির জন্যে শান্তি হ'ল অপরিহার্য। অথচ সম্ভাব্য যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাদের প্রস্তুত না থেকেও উপায় নেই। তার কারণ বর্তমানে যে কোন যুদ্ধই বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে বাধ্য। আজকের দিনে কোন যুদ্ধই বিশেষ কোন আঞ্চলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না।

বর্তমান অবস্থায় নবজাগ্রত এশিয়ার নেতৃত্বভার কোন্ রাষ্ট্রের উপর পড়বে—এ নিয়ে বহুদিনই তর্কবিতর্ক চলে আসছে। এই প্রসঙ্গে দু'টি রাষ্ট্রের নামই আমরা বরাবর শুনে এসেছি—তার মধ্যে একটি হ'ল মহাচীন ও অপরটি ভারতবর্ষ। জনসংখ্যা, আয়তন ও প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে এই দুইটি রাষ্ট্রই এশিয়ার মধ্যমণি। ভারতবর্ষ অবশ্য কোনদিনই এশিয়ার নেতৃত্ব কামনা করেনি। আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ একাধিকবার ঘোষণা করেছেন যে, নেতৃত্ব অর্থ যদি প্রভুত্ব হয়, তবে সে অর্থে এশিয়ায় ভারতের নেতৃত্ব তাঁরা কোনদিনই কামনা করেন না। কিন্তু কামনা না করলেও প্রকারান্তরে আজ এশিয়ার নেতৃত্ব এসে পড়েছে ভারতেরই উপর। এ নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপ্রণোদিত নয়—এর পিছনে কোন ক্ষমতালোলুপতাও নেই। এ নেতৃত্বকে বলা চলে ভারতের পক্ষে সহজাত। এ নেতৃত্বে এশিয়ায় ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার মত রাষ্ট্র ছিল আর দু'টি—জাপান ও মহাচীন। ঘটনাচক্রে জাপান আজ পদানত ও তার পুনরভ্যুত্থানে আরও সময় লাগবে। অপরদিকে মহাচীন আজ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাষ্ট্র হ'লেও তার পক্ষে এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ সহজসাধ্য নয়। তার একমাত্র কারণ এই যে, কম্যুনিস্ট প্রভাবাধীন মহাচীন আজ দ্বিধাবিভক্ত পৃথিবীতে পরিপূর্ণরূপে সোভিয়েট ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। ফলে তার পক্ষে সামরিক বিজয় ছাড়া অন্য পথে এশিয়ার অন্যান্য দেশের পরিপূর্ণ আস্থা অর্জন করা কঠিন। একটি বিশেষ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সদস্য বলে মহাচীনের প্রতিটি পদক্ষেপ ভিন্ন মতাবলম্বী রাষ্ট্রগুলি সন্দেহের চোখে দেখে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে সেরূপ কোন আশঙ্কার কারণ নেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ কোন ব্লকের কর্তৃত্বই মেনে নেয় নি।—বরং নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে প্রজাতন্ত্রী ভারত এগিয়ে চলেছে গণতন্ত্রের পথে। ফলে তার পক্ষে কম্যুনিস্ট চীনের সৌহার্দ্য অর্জনে যেমন কষ্ট হয়নি, তেমনি এশিয়ার অ-কম্যুনিস্ট দেশগুলির আস্থাভাজনও সে হতে পেরেছে। তাই ভারতবর্ষ না চাইলেও এশিয়ার নেতৃত্বপদ আজ তার উপরেই এসে পড়েছে।

প্রজাতন্ত্রী ভারতের এ কৃতিত্বে আমরা ভারতবাসী মাত্রই আনন্দিত। নিজের দেশ বিশ্বের দরবারে বন্দিত হোক—দেশপ্রেমিক মাত্রই এ কামনা করে। ভারতবর্ষ যখন পরাধীন ছিল তখনই তার অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সকল দেশের জাতীয় আন্দোলনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ৩৮ কোটি মানুষের দেশ স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ভারত আজ সারা এশিয়ার আদর্শ হয়ে দাঁড়াবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মাপকাঠিতে বিচার করলে ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক দিক থেকে এখনও যথেষ্ট অনগ্রসর। কিন্তু প্রাচ্যের মাপকাঠিতে বিচার করলে আমরা দেখি যে, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির তুলনায় অর্থনৈতিক প্রগতির দিক থেকে ভারতবর্ষ অনেকটা অগ্রগামী। এদিক থেকেও প্রজাতন্ত্রী ভারত এশিয়ার অনগ্রসর দেশগুলিকে বহুলাংশে সাহায্য করতে পারে। ভারতবর্ষ নানাভাবে সে সাহায্য করার চেষ্টাও করছে। মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাভাবিক নেতারূপে ভারতবর্ষের স্কন্ধে আজ দায়িত্বও বড় কম নয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বুক থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের চিহ্ন আজও একেবারে অবলুপ্ত হয়নি। সে অবলুপ্তিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে নৈতিক সাহায্যদানের গুরু দায়িত্ব রয়েছে ভারতবর্ষের। বিদেশী শোষণের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশেও অশান্তির আগুন জ্বলছে। সে অগ্নি নির্বাপণ করে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের গুরুদায়িত্বও ভারতবর্ষ এড়িয়ে যেতে পারে না।

সর্বশেষে আর একটি বিষয় আলোচনা না করলে আমার আলোচনা থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। সেটা হল বর্তমানে প্রজাতন্ত্রী ভারতে ১৭ কোটি নরনারীর ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে সাধারণ নির্বাচন চলেছে তার কথা। শুধু এশিয়া কেন, বর্তমান পৃথিবীতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে এত বড় নির্বাচন আর কোন দেশেই আজ পর্যন্ত হয় নি। প্রজাতন্ত্রী ভারতে গণতন্ত্রের আজ যে বিরাট অগ্নিপরীক্ষা চলেছে তা যদি সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয় তবে গোটা এশিয়ার রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা নতুন আদর্শের সৃষ্টি হবে। স্বাধীনতালাভের পর গত চার বৎসরে ভারতবর্ষ ক্রমিক উন্নতির পথেই শুধু এগিয়ে যায় নি—এশিয়ার অনেক দেশে যখন বিপ্লব ও প্রতি-বিপ্লবের সর্বধ্বংসী বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়েছে তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বিশ্বের দরবারে ভারতবাসীদের জাতীয় মর্যাদা অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। বর্তমানে ভারতের বুকে যে বিরাট গণতান্ত্রিক পরীক্ষার সূত্রপাত হয়েছে তা সর্বাংশে সার্থক হয়ে উঠলে ভারতবর্ষ গোটা এশিয়ার মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি আদর্শ রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হবে। এশিয়ার ক্ষুদ্র বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি সেদিন ভারতীয় আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে এবং ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে সেদিন গোটা এশিয়ায় যে প্রাণবন্যার সৃষ্টি হবে তার গতিবেগে পৃথিবীর অনেক মালিন্যই যাবে মুছে। বর্তমানের নৈরাশ্যের যবনিকা ভেদ করে সেদিন নতুন আশার আলোক বিশ্ববাসীরা দেখতে পাবে।

অগ্রগতির পথে প্রজাতন্ত্রী ভারত

ভারতের আর্থিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা

এ দেশের আর্থিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অর্থ-সাহায্য করা স্বাধীনতালাভের পর হইতে ভারত সরকারের অন্যতম প্রধান করণীয় হইয়া রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে যে কেবল তাঁহাদের নিজেদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে অর্থ সরবরাহ করিতে হয় তাহা নহে, রাজ্য সরকারসমূহের পরিকল্পনাগুলির জন্যও তাঁহাদিগকে আংশিক অর্থ সাহায্য করিতে হয়। ভারত সরকার যে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজে হাত দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য যে সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করা আছে সেগুলির আর্থিক দিক মোটামুটিভাবে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

গত বৎসর মে মাসে ভারতীয় সংসদে বাজেট বিতর্কের সময় উত্তরদানকালে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ বলেন—বর্তমান সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখন আমাদিগকে আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে। বিভাগোত্তর ভারতের জন সংখ্যা অখণ্ড ভারতের ভূমি ভাগের তুলনায় অধিকতর এবং ইহার জন-সংখ্যা প্রতি বৎসরে প্রায় ৪০ লক্ষ করিয়া বর্ধিত হইতেছে। এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য খাদ্য সরবরাহ ও শিল্পজাত দ্রব্যের অধিকতর সংস্থান করিতে হইবে।

সেইজন্য ভারত সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ঠিক পরেই দেশের আর্থিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। এ বিষয়ে প্রতিবন্ধক আছে বহু। প্রধান প্রতিবন্ধক হইতেছে দেশ বিভাগজনিত অনিশ্চিত অবস্থা এবং লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন।

দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। দেশের পরিবহন ব্যবস্থার সংস্কার করা হইতেছে এবং বিভিন্ন নদী উপত্যকা পরিকল্পনার কাজ চালান হইতেছে। সিন্দ্রীতে বৈজ্ঞানিক সার উৎপাদনের বৃহৎ কারখানা স্থাপনের কাজ শেষ করা হইয়াছে এবং চিত্তরঞ্জনে একটি রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। পশ্চিম উপকূলে কাণ্ডলা নামক
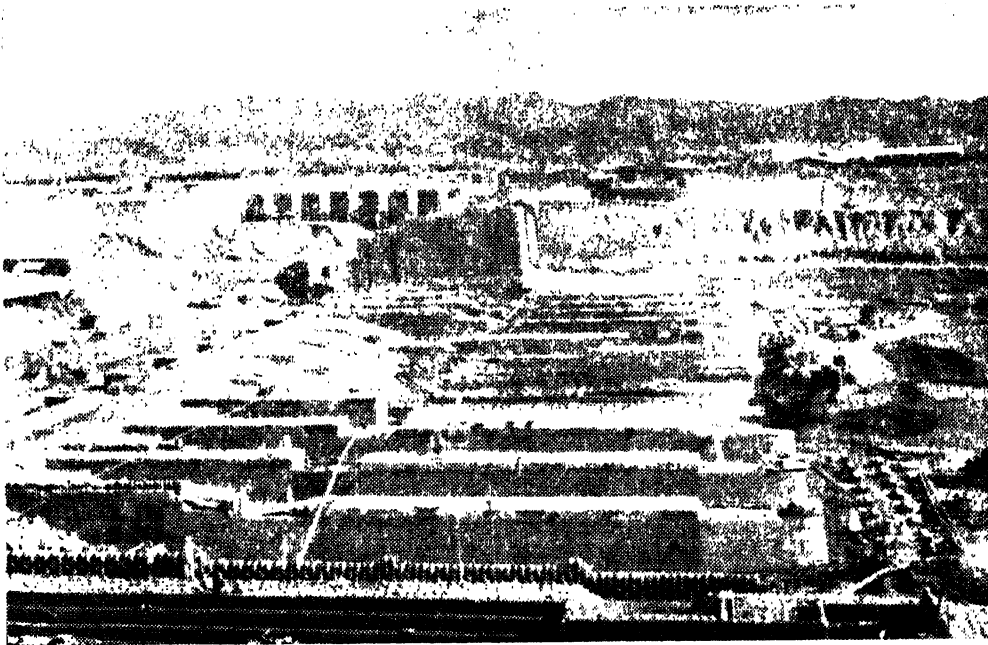
বাখরা-নাঙ্গল বাঁধ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ পরিকল্পনা। ইহার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইলে রুক্ষ ভূমির দেশ পঞ্জাব শস্য শ্যামলা হইয়া উঠিবে। এই বাঁধ-নির্মাণে ১৩০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহা নির্মিত হইলে ৪,০০০০০ কিলোওয়াট্ বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ হইবে এবং ৩৬ লক্ষ একর ভূমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে

নীলক্ষেরী পুনর্বাসন কেন্দ্র—পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তু পরিবার কাপড়-ছোপানো কাজ করিয়া এখানে জীবিকা অর্জন করে

স্থানে একটি নূতন বৃহদাকার বন্দর নির্মাণ করা হইতেছে। বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলিকে সাহায্য দান করিয়াছেন। তুঙ্গভদ্রা সেচ পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ প্রায়।

উন্নয়ন বাবদে ব্যয়

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে গত ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ভারত সরকার রেলওয়ে, ডাক ও তার, অরণ্য, সেচ, কৃষি, শিল্প, বিমান চলাচল প্রভৃতি বিষয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে প্রায় ৪১১ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। এই অর্থের কিছু পরিমাণ নদী উপত্যকা পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে সাহায্য ও ঋণ হিসাবেও দেওয়া হইয়াছে।

কেবল নদী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য ভারত সরকার গত ৩১শে মার্চ (১৯৫১) পর্যন্ত ৫৪ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরের বাজেটে ৪২ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু যথার্থতঃ উহা অপেক্ষা বেশী অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারকে ঐ বাবদে ৫৪ কোটি টাকারও অধিক ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া মনে হয়।

গত ৩১শে মার্চ (১৯৫১) পর্যন্ত শিল্পোন্নয়ন খাতে ৩২ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। চলতি বৎসরের জন্য এই বাবদে ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ১৪২ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে খাদ্য সাহায্য করিবার জন্য আরও ১৪৫ কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা

প্ল্যানিং কমিশন ভবিষ্যতের জন্য একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন এবং চলতি আর্থিক বৎসরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি খসড়া প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে আনুমানিক ১,৭৯৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। পরিকল্পনার ১,৪৯৩ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ প্রথম অংশে যেরূপ উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাতে পাঁচ বৎসর পরে ১৯৩৯ সালের হারে ১৯৫৫-৫৬ সালে দ্রব্যাদি পাওয়া যাইবে। ইহাকে যথেষ্ট বলা না চলিলেও ক্রমবর্ধমান লোক সংখ্যার তুলনায় এ বিশাল কার্য প্রশংসার যোগ্যই বটে। ১৯৩৯ সন হইতে লোকসংখ্যা ৪ কোটির মত বাড়িয়াছে। বর্তমান হারে বাড়িতে থাকিলে ১৯৫৫-৫৬ সালে বৃদ্ধির পরিমাণ পাঁচ কোটিতে গিয়া দাঁড়াইবে।

বিদেশের আর্থিক সাহায্য

পরিকল্পনায় যে সকল উন্নয়নের আয়োজন করা হইয়াছে সেগুলির অর্থ সংস্থানের জন্য ভারতের বিভিন্ন সরকারকে আবশ্যক অর্থের সন্ধান করিতে হইবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য অধিকাংশ অর্থ দেশের ভিতর হইতে পাওয়া যাইবে। কোন বিদেশী সরকার বন্ধুভাবে অর্থ সাহায্য করিতে চাহিলে, তাহা সাদরে গ্রহণ করা হইবে। কোন অনুন্নত দেশ নিজের আর্থিক উন্নয়নের জন্য অপর কোন উন্নত দেশের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কারণ ইহাতে বিশ্বের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাইবে। তবে এইরূপ সাহায্য গ্রহণে কোন প্রকার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। অতীতে কোন কোন দেশ ভারতকে এইভাবে অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক ছিল, কিন্তু সম্প্রতি ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ৫ কোটি ডলার এবং কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া হইতে যথাক্রমে ৭½ কোটি ও ৪½ কোটি টাকা গ্রহণ করিয়াছে। গত বৎসর ভারত আমেরিকার নিকট হইতে ১১ কোটি ডলার মূল্যের গম ধার লইয়াছিল। উহা ১৯৮৬ সালের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

কারিগরি সহযোগিতা

কোন কোন উন্নত দেশ ভারতে নিপুণ কারিগর পাঠাইতে ইচ্ছুক। কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে ভারত কারিগরী সহযোগিতা পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করিতেছে, বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের নিকট হইতে বিশেষজ্ঞ গ্রহণ করিয়াছে এবং চারিদফা সাহায্য এদেশেও প্রসারের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একটি চুক্তি করিয়াছে। ভারতও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করিয়াছে এবং ঐ সকল দেশের শিক্ষার্থীদিগকে এদেশের বিভিন্ন শিক্ষালয়ে শিক্ষা লাভের সুবিধা দান করিয়াছে।

আভ্যন্তরীণ অর্থ সংস্থান

পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ এদেশেই সংগ্রহ করিবার কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। বর্তমান বৎসরের বাজেটকে উন্নয়ন বাজেট বলা যাইতে পারে। কারণ বৃহৎ পরিকল্পনাগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবার সাধারণ রীতি ছাড়াও, উন্নয়ন ব্যয়ের কিছু অংশ মিটাইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াই রাজস্বের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। চলতি আর্থিক বৎসরে রাজস্ব পরিস্থিতি সন্তোষজনক। এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্যন্ত আট মাসে শুল্ক রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫২ কোটি টাকা। বাজেটে সারা বৎসরে ১৫৬ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। ঐ সময়ে আবগারি রাজস্ব ও আয়করের পরিমাণও বাড়িয়াছে।

আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায়, নদী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির জন্য বাজেটে বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা ছাড়াইয়া ৪০ কোটিরও বেশী টাকা ব্যয় করা গিয়াছে। তাহা ছাড়া, রাজ্য সরকারদিগকেও অতিরিক্ত ১৪ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে।

জনসাধারণের নিকট ঋণ গ্রহণ

জনসাধারণের নিকট হইতে সরকারের ঋণ গ্রহণ ও স্বল্প সঞ্চয় ব্যবস্থারও উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত আগষ্ট মাসে (১৯৫১) সরকার ৫০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ ঋণের টাকা সরকারের তহবিলে আসিয়া যায়।

ঐ বৎসরে মাদ্রাজ, বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে ১০ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

স্বল্প সঞ্চয়ের ব্যাপারে গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫১) একটি নূতন পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে চলতি আর্থিক বৎসরের প্রথম আট মাসে ২৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ১৭ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল।

এশিয়ার বৃহত্তম সার কারখানা

ধানবাদ হইতে ১৫ মাইল দূরে দামোদর নদের উত্তর পারে ইস্পাত ও কংক্রীটের বিরাট এক কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে—খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপাদান রাসায়নিক সার এখানে প্রস্তুত হয় এবং ইহাই এশিয়ার সর্বাধুনিক ও বৃহত্তম সার কারখানা। সিন্দ্রী ভারত সরকারের শিল্প-প্রচেষ্টার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর হইয়া রহিয়াছে।

অন্যান্য যে সকল প্রধান শিল্প-প্রতিষ্ঠায় সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন, সেগুলি হইল—বাঙ্গালোরের নিকট জলাহালিতে মেসিন টুল কারখানা, মিহিজামের (পশ্চিমবঙ্গ) নিকট টেলিফোন কেব্‌ল্‌-এর কারখানা এবং বোম্বাই ও পুণার মধ্যবর্তী স্থানে দেহু রোডে পেনিসিলিনের কারখানা। ইহা ছাড়া, বিশাখাপত্তমে সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশনের জাহাজ নির্মাণ কারখানার ভার গ্রহণের জন্য পূর্ত, উৎপাদন ও সরবরাহ দপ্তর পরিকল্পনা রচনা করিতেছেন। আবার নয়াদিল্লীর নিকটে গৃহ নির্মাণের কারখানা স্থাপনের জন্য একটি সুইডিস প্রতিষ্ঠানের সহিত আলাপ-আলোচনা চলিতেছে।

সিন্দ্রী যৌথ প্রতিষ্ঠান

গত বৎসর ৩০শে-৩১শে অক্টোবর মধ্যরাত্রিতে সিন্দ্রী কারখানার উৎপাদন আরম্ভ হয়। গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে উহা "সিন্দ্রী ফার্টিলাইজারস এন্ড কেমিক্যালস লিঃ" নামে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে চলিয়া গিয়াছে। একটি ব্যতীত কোম্পানীর সমস্ত শেয়ারই রাষ্ট্রপতির নামে রহিয়াছে। শ্রী সি সি দেশাই ডিরেক্টার বোর্ডের সভাপতি; ডিরেক্টারগণ হইতেছেন শ্রীজে জে গান্ধী, শ্রীশ্রীরাম, শ্রীশ্রীনারায়ণ মাহথা, শ্রীকে আর পি আয়েংগার ও শ্রী বি সি মুখোপাধ্যায়।

যে দেশে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়, সেখানে এ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত করা খুবই সহজ। কিন্তু ভারতে গন্ধক খুব কমই পাওয়া যায়। উপরন্তু পৃথিবীতে গন্ধকের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় অন্য উপাদান হইতে এ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুতের চেষ্টা দেখিতে হয়।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র এবং ভারতেও প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম সালফেট পাওয়া যায়। গন্ধকের পরিবর্তে এই দ্রব্য ব্যবহার করা চলে। ক্যালসিয়াম সালফেট এনহাইড্রাইড ও জিপসাম—এই দুই প্রকারে পাওয়া যায়। সিন্দ্রীতে জিপসামকেই প্রধান উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারতে এত প্রচুর পরিমাণে জিপসাম রহিয়াছে যে, সিন্দ্রীতে কয়েক যুগ ধরিয়া ব্যবহার করিলেও তাহা নিঃশেষ হইবে না। বর্তমানে রাজস্থান হইতে উহা আনা হইয়া থাকে।

জিপসাম গুঁড়া করিয়া এ্যামোনিয়াম কার্বনেট দ্রাবণে উহা মিশান হয়।
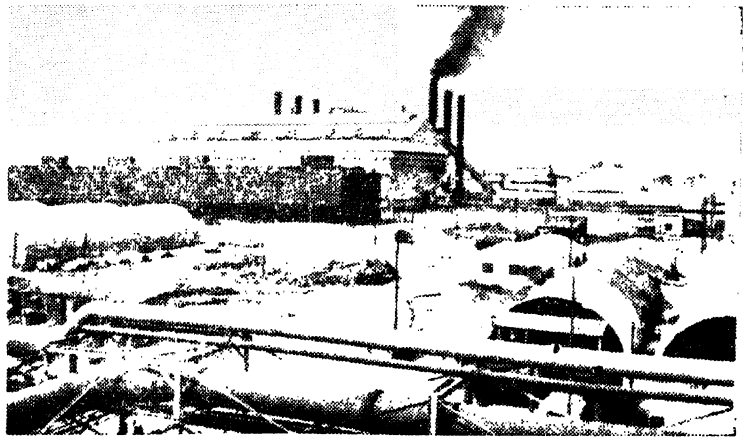
এশিয়ার বৃহত্তম সার উৎপাদন করাখানা সিন্দ্রী

রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে এ্যামোনিয়াম সালফেট ও ক্যাল্সিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত হয়। বায়ুশূন্যে ফিলটারে ক্যাল্সিয়াম কার্বনেট ছাঁকিয়া ফেলা হয়। তারপর এ্যামোনিয়াম সালফেট দ্রবণ বাষ্পীভবনের সাহায্যে ঘনীভূত করিলে এ্যামোনিয়াম সালফেট দানা জমিয়া উঠে। এই দানাগুলি ছাঁকিয়া লইয়া শুকাইয়া বস্তাবন্দী করা হয়। সিন্ধ্রীতে সার গুদামজাত করিয়া রাখিবার জন্য কংক্রীটের বিরাট গুদাম নির্মাণ করা হইয়াছে। এটি ৬৬০ ফুট লম্বা এবং ৮০ ফুট উচ্চ। এখানে ৯০ হাজার টন সার জমাইয়া রাখা যাইবে। সমস্ত গুদামটিই জল ও বায়ুরোধক।

দিনে হাজার টন

বর্তমান বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে দিনে হাজার টন সার উৎপাদন করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। বর্তমানে ভারতে প্রতি বৎসর ৪ লক্ষ টন এ্যামোনিয়াম সালফেট সার আমদানী করা হইয়া থাকে। ভারতের প্রয়োজন ইহার ৫ গুণেরও বেশী। সিন্ধ্রী কারখানায় পুরোদমে উৎপাদন শুরু হইলে বৎসরে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার টন উৎপন্ন হইবে। ইহাতে ভারতের ১০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রাও বাঁচিয়া যাইবে। শুধু এই দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে, এই কারখানা স্থাপন খুব লাভেরই হইয়াছে। কিন্তু চাষীকে অল্প মূল্যে সার সরবরাহ করা ইহার আসল উদ্দেশ্য।

প্রায় ৭ বৎসর পূর্বে সরকার দেশে বৎসরে ৩॥ লক্ষ টন সার প্রস্তুত করিবার সিদ্ধান্ত করেন। তিনজন বৃটিশ বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত এক কারিগরী কমিশন জিপসাম হইতে এ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুতের জন্য একটি বিরাট আয়তনের কারখানা স্থাপনের সুপারিশ করেন। ১৯৪৬ সালে একটি মার্কিন ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানের (কেমিক্যাল কনস্ট্রাকসন কর্পোরেশন) সহিত প্রস্তাবিত কারখানার নক্সা প্রস্তুত, নির্মাণ পরিদর্শন এবং উৎপাদন আরম্ভ করিয়া দিবার জন্য এক চুক্তি করা হয়। যন্ত্রপাতি সরবরাহের ভার একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের (পাওয়ার গ্যাস কর্পোরেশন) উপর অর্পণ করা হয়। প্রাথমিক কাজ যেমন, জমি জরীপ করা, অস্থায়ী বাসস্থান নির্মাণ করা, জমি সমান করা প্রভৃতি ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি সময়েই আরম্ভ হয়। ইহার এক বৎসর পর কারখানা নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হয়।

জল সরবরাহের ব্যবস্থা

ইহার পরবর্তী পাঁচ বৎসর নিদারুণ পরিশ্রম করিয়া তবে কারখানাটি গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এখানে ৮০ হাজার কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করিতে হয়। বয়লার, আলো এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্যের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ এখান হইতেই সরবরাহ করা হইতেছে। নজরে না পড়িলেও উপযুক্ত জল সরবরাহের ব্যবস্থা চালু রাখা আর একটি প্রধান সমস্যা। প্রত্যহ ১ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহের প্রয়োজন হয়। দামোদর নদ গ্রীষ্মকালে একেবারে শুকাইয়া যায়। সারা বৎসর ধরিয়া জল সরবরাহের জন্য দামোদরের উপর নির্ভর করা চলে না। তাই দামোদরের উপ-নদ গোওয়াইয়ে বাঁধ দিয়া ৭০ কোটি হইতে ১০০ কোটি গ্যালন জল ধরিয়া রাখিবার উপযোগী জলাশয় নির্মাণ করা হয়। নদীর তলদেশে বালুরাশির মধ্য দিয়া যে জল চুয়াইয়া যায়, তাহা ধরিয়া রাখিবার জন্য ৫ শত ফুট দূরে "পরিশোধন গ্যালারী" স্থাপন করা হইয়াছে। শুধু নিয়মিত জল সরবরাহের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাই এক বিরাট বিস্ময়ের ব্যাপার।

আধুনিক নগর

কারখানাটি সুদূর পল্লীঅঞ্চলে অবস্থিত। বাহির হইতে কাঁচা মাল লইয়া আসা এবং কারখানার উৎপন্ন দ্রব্য বাহিরে পাঠাইবার জন্য চাই উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেই কারণে নিকটবর্তী স্টেশন হইতে কারখানা পর্যন্ত রেললাইন এবং মাল বোঝাই ও খালাসের জন্য বিরাট মার্শালিং ইয়ার্ড স্থাপন করিতে হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বেও যেখানে মাত্র কয়েকশত লোক বাস করিত, আজ সেখানে একটা আধুনিক নগরী গড়িয়া উঠিয়াছে। আধুনিক যুগের সমস্ত সুখ-সুবিধা, যেমন—বাজার, হাসপাতাল, স্কুল, ক্লাব, শ্রমিকদের সুন্দর বাসগৃহ প্রভৃতি সমস্তই সেখানে রহিয়াছে। সিন্ধ্রী নগরীর সম্প্রসারণের জন্য প্রায় দশ বর্গ মাইল স্থান নির্দিষ্ট রাখা হইয়াছে। কারখানাটিও এমনভাবে স্থাপন করা হইয়াছে যে, কিছু অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি বসাইয়াই উৎপাদন দ্বিগুণে বৃদ্ধি করা যাইবে।

ভবিষ্যতে [illegible]ন্ধী বিরাট রাসায়নিক শিল্পের মূল[illegible]ন্দ্র হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যা[illegible]ছে।

ভারতের কয়েকটি প্রধান কারখানা

মেসিন টুল শিল্প

মেসিন টুল অর্থাৎ ছোট ছোট যন্ত্রপাতি-শিল্পায়নের একটি মূল শিল্প। জাতির সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বহুলাংশে ইহার উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের পূর্বে ভারতে এই শিল্প ছিল না বলিলেই চলে। যুদ্ধের সময় কিছুটা গড়িয়া উঠিলেও তাহা নগণ্যই থাকিয়া যায়। ১৯৪৭ সালে ২৪টি বড় ও প্রায় একশতটি ছোট কারখানা চালু ছিল। এইসব স্থানে বৎসরে মোট প্রায় একশত রকমের ৬ হাজারটি যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হইয়াছে।

দেশ বিভাগের পরে এই শিল্পে বিপর্যয় দেখা দেয় এবং উৎপাদন ক্ষমতাও বহুল পরিমাণে হ্রাস পায়। শেষ পর্যন্ত ১৬টি বড় কারখানা ও ৫০টি ছোট কারখানা চালু থাকে। বৎসরে মাত্র ৪০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি উৎপন্ন হইতেছে। দেশের চাহিদার শতকরা ৩ ভাগও মিটাইবার ক্ষমতা ইহাদের নাই। ভারতে বৎসরে প্রায় ১০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। সেই কারণে সরকার দেশেই মেসিন টুলের বড় কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়া উঠেন। বাঙ্গালোরের নিকট জলাহালিতে কাজও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। মহীশূর সরকার কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় জমি দিয়াছেন।

১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার জুরিকের (সুইজারল্যান্ড) অয়েরলিকন মেসিন টুল ওয়ার্কসের সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন। ইঁহারা ভারতীয় কারিগরদিগকে যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজ শিক্ষা দিবেন এবং বৎসরে ৯ শত লেদ্, ৩৬০টি মিলিং মেসিন ও ২৪০টি ড্রিলিং মেসিন নির্মাণের উপযোগী কারখানা স্থাপন করিয়া দিবেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু হইলে বৎসরে প্রায় চার কোটি টাকার যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইবে।

টেলিফোনের তার

বর্তমানে ভারতের প্রয়োজনীয় টেলিফোনের তার পুরাপুরিই বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়া থাকে। ১৯৫১-৫২ সালে একমাত্র ডাক ও তার বিভাগেই ৮০ লক্ষ টাকার টেলিফোনের তার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু এই শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ হইতেছে এই যে, ভারত এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চাহে না।

এই উদ্দেশ্য লইয়া ভারত সরকার ১৯৪৯ সালের ৩০শে নবেম্বর তারিখে বৃটেনের স্ট্যান্ডার্ড টেলিফোনস্ এন্ড কেব্‌ল্‌স লিঃ-এর সহিত পশ্চিমবঙ্গের মিহিজামে একটি কারখানা স্থাপনের জন্য এক চুক্তি সম্পাদন করেন। কারখানাটি স্থাপন করিতে এক কোটি টাকা ব্যয় হইবে। বর্তমানে আমদানীকৃত কেব্‌ল্-এর মূল্য ধরিলে এখানে বৎসরে ৮০ লক্ষ হইতে এক কোটি টাকার কেব্‌ল্ প্রস্তুত হইবে।

কারখানাটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মারফৎ জমি সংগ্রহ করা হইয়াছে। নির্মাণ কার্যের প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে এখানে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। দালান-কোঠা নির্মাণের কাজ শুরু হইয়াছে এবং আগামী জুলাই মাস হইতে যন্ত্রপাতি আসিতে শুরু করিবে।

এই কারখানায় কাঁচা মাল, মজুরী ইত্যাদির দরুণ ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৭ লক্ষ টাকার কেব্‌ল্ প্রস্তুত হইবে। ফলে বৎসরে অনুমান ২২ লক্ষ টাকা লাভ হইবে।

পেনিসিলিনের কারখানা

ভারতে পেনিসিলিনের কারখানা স্থাপিত হইলে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের এক নূতন পথ খুলিয়া যাইবে। ভারতের এই জনকল্যাণ কার্যে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংঘ এবং আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিল আর্থিক এবং কারিগরী সাহায্যদানের প্রস্তাব করে। ভারত সরকার উক্ত দুই প্রতিষ্ঠানের সহিত গত জুলাই মাসে এক চুক্তি করিয়াছেন।

এই চুক্তি অনুসারে স্থির হইয়াছে যে, সরকার জমি সংগ্রহ করিয়া কারখানা, দালানকোঠা, অফিস, পরীক্ষাগার, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন করিবেন। আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিল ৮॥ লক্ষ ডলার মূল্যের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম দিয়া সাহায্য করিবেন এবং বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংঘ বিশেষজ্ঞ ও কারিগর দিয়া সাহায্য করিবেন; তদ্দরুণ তাহাদের ৩॥ লক্ষ ডলার ব্যয় হইবে।

প্রস্তাবিত কারখানায় প্রথম দিকে বৎসরে ৩৬ শত বিলিয়ন ইউনিট পেনিসিলিন প্রস্তুত করা যাইবে। পরে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ৯ হাজার বিলিয়নে দাঁড়াইবে। ১৯৫৩ সালের শেষভাগে কারখানা নির্মাণের কাজ শেষ হইয়া উৎপাদন আরম্ভ হইবে।

কিন্তু পেনিসিলিনের মত প্রয়োজনীয় ঔষধের আশু চাহিদা মিটাইবার জন্য এখনকারমত বোম্বাইয়ের হফ্‌কিন ইনস্টিটিউটে শিশিতে পেনিসিলিন পুরিবার জন্য একটি ছোট কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। সরকারের এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণেরও চাহিদার কিছুটা অংশ ইহার দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হইবে।

ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেণ্ট

পূর্বে যাহার নাম ছিল ম্যাথমেটিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্টস অফিস (কলিকাতা) এখন তাহার নামকরণ হইয়াছে জাতীয় যন্ত্র-কারখানা বা ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেণ্টস্ ফ্যাক্টরী। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কমিশন

এই কারখানার উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৫১-৫৩ সালের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৫১-৫৬ সালের জন্য ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। কতকগুলি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে ভারতকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার জন্য এবং লাভজনক উপায়ে কিভাবে কারখানাটি পরিচালনা করা যায়, তাহা সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

জাহাজ নির্মাণ ঘাটা

সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর বিশাখাপত্তম জাহাজ নির্মাণ ঘাটায় নিযুক্ত দক্ষ কারিগরদিগকে যাহাতে বেকার বসিয়া থাকিতে না হয়, তজ্জন্য সরকার ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৮ হাজার টনের তিনটি মালবাহী জাহাজ নির্মাণের অর্ডার দেন।

বিশাখাপত্তমে জাহাজ নির্মাণ করিলে প্রতিটি জাহাজের মূল্য পড়িবে ৬৪ লক্ষ টাকা, অথচ বৃটেনে উহা নির্মাণ করাইলে ব্যয় পড়িবে ৪২ লক্ষ টাকা। মূল্যের সমতা রক্ষার জন্য সরকার জাহাজ পিছু ২২ লক্ষ টাকা সাহায্য দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই তিনটি জাহাজ নির্মাণ করা হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে দুইটি সিন্ধিয়ার নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে। জাহাজ নির্মাণ ঘাটা চালু রাখিবার জন্য গত আগস্ট মাসে অনুরূপ আরও তিনটি জাহাজের অর্ডার দিতে হয়।

কিন্তু জাহাজ নির্মাণের অর্ডার দিয়া এবং খয়রাতি করিয়া কারখানা চালু রাখা নিতান্তই সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র; ইহাকে স্থায়ী লাভজনক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে এই প্রচেষ্টা নিরর্থক। তাই সরকার স্থির করিয়াছেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং পরিচালনার জন্য একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে, সরকার ইহার অন্যতম অংশীদার থাকিবেন। প্রয়োজন হইলে বিদেশী জাহাজ নির্মাতাদের সাহায্য লওয়া হইবে।

রেল ইঞ্জিনের কারখানা

রেলওয়ে ইঞ্জিনে দেশকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিবার অন্যতম প্রচেষ্টা হিসাবে সরকার আসানসোল হইতে ২৫ মাইল দূরে চিত্তরঞ্জনে রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন।

১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে এই বিরাট কারখানার কাজ আরম্ভ হয় এবং ইতিমধ্যেই কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য মোট ব্যয় ১৪ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা হইবে। এখন পর্যন্ত ১২॥ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই কারখানা হইতে বৎসরে ১২০টি ইঞ্জিন ও ৫০টি স্বতন্ত্র বয়লার নির্মিত হইবে। ১৯৫৬ সালে এই লক্ষ্যে পৌঁছা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এখানে বৎসরে ২০ হাজার টন ইস্পাত দরকার হইবে এবং তাহার শতকরা ৮০ হইতে ৯০ ভাগ এদেশেই পাওয়া যাইবে।

১৯৫০-৫১ সালে দ্রব্যাদি পাওয়ার অসুবিধা ঘটায় চিত্তরঞ্জন এখন পর্যন্ত মাত্র ২০টি মালগাড়ির ইঞ্জিন নির্মাণ করিতে পারিয়াছে। এইগুলি এখন চলাচল করিতেছে। বর্তমান বৎসরে ৩৮টি ইঞ্জিন নির্মাণ করা সম্ভব হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

কারখানাটির জন্য মিহিজামে ৪ হাজার ২ শত একর জমি সংগ্রহ করা হয়। ১০ লক্ষ বর্গফুট স্থান জুড়িয়া শুধু কারখানা ও অফিস নির্মাণ করা হইয়াছে।

বর্তমানে এই কারখানায় ২৮৫০ জন লোক নিযুক্ত আছে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বাড়িয়া ৪ হাজার ৪ শত হইবে। শিক্ষানবীশ-দিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য এখানে সম্প্রতি একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

বিমান কারখানা

ভারতে বিমান কারখানা স্থাপনের কথা প্রথম বিবেচনা করা হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ বিমান নির্মাণের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালোরে হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফ্ট লিঃ নাম দিয়া একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৯৪২ সালের জুন মাসে ভারত সরকার কারখানাটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এখানে বিমানবাহিনীর বিমানগুলি মেরামত করা হইত। যুদ্ধের পর ভারত সরকার একটি লিমিটেড কোম্পানী গঠন করেন। শুধু ভারত সরকার এবং মহীশূর সরকার ইহার অংশীদার। এখন প্রতিরক্ষা দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীনে এখানে বিমান নির্মাণ করা হইতেছে।

এই প্রতিষ্ঠানে বিমান নির্মাণের পরিমাণ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় নাই, যাহাতে এটি স্বাবলম্বী হইতে পারে। সেইজন্য অসামরিক বিমান প্রতিষ্ঠানের বিমানগুলি এখানে মেরামত করা হইতেছে। ইহা ছাড়া, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীবাহী গাড়ি নির্মাণের জন্য রেলওয়ে দপ্তরের সহিত এক চুক্তি করা হয়। এ পর্যন্ত ২ শতাধিক গাড়ি নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

টেলিফোন শিল্প

সম্পূর্ণ টেলিফোন যন্ত্রের জন্য ভারতকে আর বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয় না। বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ এবং ডাক ও তার বিভাগের কারখানায়
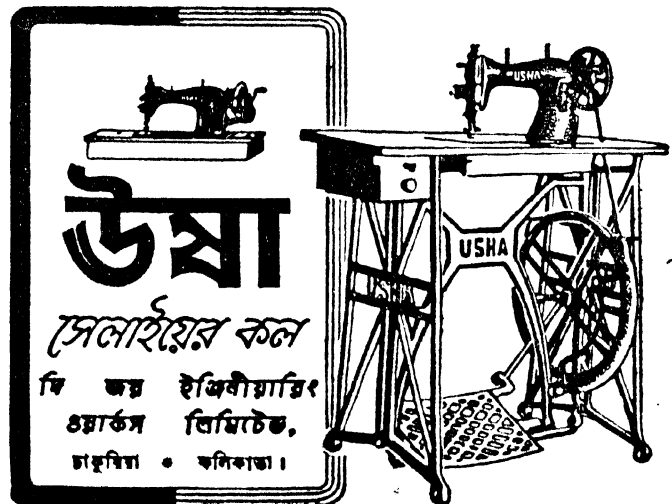
জামশেদপুরে টাটানগরের কারখানায় ইস্পাত গলানোর দৃশ্য

যন্ত্রাংশ একত্র করিয়া টেলিফোন প্রস্তুত করা হইতেছে। একমাত্র ডায়াল ও কন্‌ডেন্‌সার ছাড়া টেলিফোনের আর সকল যন্ত্রাংশই এখন ভারতে প্রস্তুত হয়।

১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে স্থাপিত হইবার কয়েক মাস পর হইতে আমদানীকৃত যন্ত্রাংশ একত্র করিয়া বাঙ্গালোরের কারখানায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রস্তুত করা হইতে থাকে। তাহার পর স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের অনেকগুলি যন্ত্রাংশ এখানেই প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমানে কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৎসরে ২৫ হাজারটি যন্ত্র। পূর্ণোদ্যমে কাজ চলিলে ৫০ হাজার যন্ত্র উৎপাদন করা যাইবে।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কারখানাটি যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠন করা হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ২॥ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৯৫টি শেয়ার ভারত সরকার ও মহীশূর সরকারের; বাকী ৫ ভাগ বৃটেনের অটোমেটিক টেলিফোন এণ্ড ইলেকট্রিক কোং লিঃ-এর।

১৯৫১ সালের শেষভাগ পর্যন্ত এই কারখানায় ৪০ হাজার টেলিফোন প্রস্তুত হইয়াছে এবং বর্তমানে মাসে গড়ে ২ হাজারটি টেলিফোন প্রস্তুত হইতেছে।

শিল্পায়নে ভারতের অগ্রগতি

১৯৫১ সালে ভারতের প্রধান প্রধান অনেকগুলি শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ইহাদের মধ্যে বস্ত্র, পাট, ইস্পাত, কয়লা, লবণ, চিনি, সিমেণ্ট, বৈদ্যুতিক দ্রব্য, রবারের দ্রব্য, কৃত্রিম সুতোসার, যন্ত্রপাতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র এবং ডিজেল ইঞ্জিন শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বস্ত্রোৎপাদন বৃদ্ধি

পর পর দুই বৎসর উৎপাদন হ্রাস হওয়ার পর (প্রধানতঃ উপকরণের অভাব ও শ্রমিক অসন্তোষের দরুণই উৎপাদন হ্রাস পায়) বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্প—ভারতের এই দুইটি প্রধান শিল্পে ১৯৫১ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ বৎসর ৪১০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫০ সালে ৩৬৬ কোটি ৫০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫১ সালে ১৩০ কোটি পাউণ্ড সুতা উৎপন্ন হইয়াছিল; ১৯৫০ সালে হইয়াছিল ১১৭ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড।

তুলা সরবরাহ

তুলা সরবরাহের উপরই বস্ত্র উৎপাদন নির্ভর করে। ৪২ লক্ষ গাঁইট তুলা সরবরাহ করিতে পারিলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প বৎসরে ৪৮০ কোটি গজ বস্ত্র এবং ১৬৬ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা উৎপাদন করিতে পারে। দেশ বিভাগের পূর্বে ভারত বর্তমানে পাকিস্থানের অন্তর্গত অঞ্চলগুলিসহ হইতেই ৩৬ লক্ষ গাঁইট পূর্বে ভারতীয় শ্রেণীর তুলা পাওয়া যাইত। অবশিষ্ট ৬ লক্ষ গাঁইট মিশর, পূর্ব আফ্রিকা ও সুদান হইতে আমদানী করা হইত এবং এই আমদানীকৃত তুলায় মিহি ও অতিমিহি কাপড় তৈয়ার করা হইত।

দেশ বিভাগের পর পাকিস্থান অঞ্চল হইতে তুলা আমদানী হ্রাস পায়, আর

মদ্রাবমল্যোনের পর উহা প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। পর পর কয়েক বৎসর ভারতেও তুলার উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতে যে পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হয় তাহাতে শিল্পের প্রয়োজনীয় চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশ মাত্র সরবরাহ করা চলে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার গাঁইট তুলা উৎপন্ন হয়।

পূর্বে ভারতীয় শ্রেণীর তুলার সরবরাহ অপ্রচুর হওয়ায় ভারতের কাপড়ের কলগুলিকে আমদানীকৃত তুলার উপর নির্ভর করিতে হয়।

এই দেশের সাধারণ ক্রেতার চাহিদা মিটাইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫১ সালে বস্ত্র রপ্তানি হ্রাস করিয়া দেন। ঐ বৎসরের উৎপাদন হইতে মাত্র ৮৪ কোটি ৪০ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানি করিতে দেওয়া হয়। ১৯৫০ সালে ১১২ কোটি গজ রপ্তানি করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরে হস্তচালিত তাঁতের কাপড়ের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জন প্রতি বস্ত্র সরবরাহের পরিমাণ

পূর্ব বৎসরের ন্যায় ১৯৫১ সালেও ৭০ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী করা হইয়াছে। কাজেই পূর্ব বৎসরের ৪৩০ কোটি ৮০ লক্ষ গজ কাপড়ের স্থলে আলোচ্য বৎসরে ৪৯০ কোটি গজ কাপড় মজুত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতিরক্ষা প্রয়োজনের জন্য পূর্ব বৎসরের ন্যায় ৫ কোটি গজ রাখা হয় এবং ৮৪ কোটি ৪০ লক্ষ গজ রপ্তানি করা হয়। কাজেই নাগরিকদের ব্যবহারের জন্য ৪০১ কোটি ৩০ লক্ষ গজ কাপড় অবশিষ্ট থাকে; পূর্ব বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল মাত্র ৩১৩ কোটি ৮০ লক্ষ গজ। ভারতের লোকসংখ্যা ১৯৫০ সালে ৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ এবং ১৯৫১ সালে ৩৬ কোটি ১০ লক্ষ ধরিয়া লইলে দেখা যায় যে, ১৯৫০ সালে জনপ্রতি ৯ গজের স্থলে ১৯৫১ সালে জনপ্রতি ১১ গজ কাপড় পাওয়া গিয়াছে।

১৯৫২ সালে

ভারতীয় তুলার উৎপাদন ১৯৫২ সালে আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং প্রায় ১৬ লক্ষ গাঁইট তুলা আমদানি করা হইবে। কাজেই ১৯৫২ সালে বস্ত্রোৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি

১৯৫১ সালে প্রায় ৮,৭০,০০০ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে প্রায় ৩০,০০০ টন উৎপাদন বাড়িয়াছে। প্রায় দুই বৎসর পর পাটশিল্পে আবার গত ১০ই ডিসেম্বর ১৯৫১ হইতে ৪৮ ঘণ্টা সপ্তাহে কাজ চলিতেছে। পাটের সরবরাহ বৃদ্ধির ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। ভারতে পাট উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বাক্ষরিত ভারত-পাকিস্থান চুক্তির ফলে পাকিস্থান হইতে পাটের আমদানী হওয়ায় এই সরবরাহ বৃদ্ধি পায়।

খাদ্যোৎপাদন ব্যাহত না করিয়া পাট ও তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার যে সুসংহত কৃষি পরিকল্পনা কার্যকরী করেন তাহার ফলেই পাটের উৎপাদন বাড়িয়াছে। দুই প্রকারে শস্য ফলান, কৃত্রিম সারের ব্যবহার, পতিত জমির চাষ প্রভৃতি উপায় অবলম্বনের ফলে যে ক্রমোন্নতি হইয়াছে নিম্নে তাহা দেখান হইলঃ—

১৯৪৮-৪৯ সাল	...	২০·২৬ লক্ষ গাঁইট
১৯৪৯-৫০ সাল	...	৩০·৮৯ লক্ষ গাঁইট
১৯৫০-৫১ সাল	...	৩২·৯২ লক্ষ গাঁইট
১৯৫১-৫২ সাল	...	৪৩·১০ লক্ষ গাঁইট

(অনুমিত)

ভারত-পাকিস্থান বাণিজ্য চুক্তি অনুযায়ী এ পর্যন্ত ১৫,৪৫,০০০ গাঁইট পাট পাওয়া গিয়াছে। পাকিস্থান হইতে নিয়মিতভাবে পাট আসিলে ১৯৫২ সালে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাইবে।

ইস্পাতের উৎপাদনে উন্নতি

১৯৫১ সালে ১০,৪০,০০০ টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়। ১৯৫০ সালে ৯,৮৩,০০০ টন, ১৯৪৯ সালে ৯,৩০,০০০ টন, এবং ১৯৪৮ সালে ৮,৫৪,০০০ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছিল। এই উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালে ইস্পাতের আমদানী কম হওয়ায় কুফল বিশেষ অনুভূত হয় নাই। ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে রপ্তানিকারক দেশগুলি ইস্পাত রপ্তানি কমাইয়া দেওয়ার দরুণই ভারতের আমদানি হ্রাস পায়। আমদানি কম হইলেও প্রতিরক্ষা ও রেলওয়ের সর্বপ্রকার চাহিদা এবং কৃষি ও পুনর্বাসন কার্যের প্রধান প্রধান চাহিদাগুলি মিটান হয়। সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করিবার জন্য অপরিহার্য ন্যূনতম পরিমাণ ইস্পাত সরবরাহ অক্ষুন্ন থাকে।

ইস্পাত উৎপাদন উন্নয়ন ব্যবস্থা

ভারতে বৎসরে ২৫ লক্ষ টন ইস্পাতের প্রয়োজন হয়। অথচ ভারতে মাত্র ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার বর্তমান উৎপাদক কারখানাগুলি সম্প্রসারণে সাহায্য করিতেছেন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। মধ্যপ্রদেশে একটি এবং উড়িষ্যায় আর একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ তাহা কার্যকরী করা যায় নাই।

ভারত সরকার প্রধান প্রধান ইস্পাত কারখানাগুলির সম্প্রসারণ কার্যে বাস্তব সাহায্য করিতেছেন। স্টীল কর্পোরেশন অব্ বেঙ্গলকে বৎসরে ২,০০,০০০ টন করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য ভারত সরকার ৫ কোটি টাকা ঋণ দিয়াছেন। তাহাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা কার্যকরী হইতেছে। টাটা আয়রন এ্যান্ড স্টীল কোম্পানী তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা রূপায়িত হইলে বৎসরে তাহাদের ইস্পাত উৎপাদন ১,৮১,০০০ টন করিয়া বৃদ্ধি পাইবে।

হাতে প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার কিয়দংশ কোম্পানী বহন করিবেন; অবশিষ্টাংশের জন্য তাহারা সরকারের নিকট ঋণের জন্য আবেদন করিয়াছেন। ইহা সরকারের বিবেচনাধীন। মহীশূর আয়রন এ্যান্ড স্টীল কোম্পানীও বৎসরে ৭০,০০০ টন উৎপাদন বাড়াইবার জন্য তাহাদের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ঋণ দিতে ভারত সরকার স্বীকৃত হইয়াছেন। ভারত সরকার লৌহ পিণ্ডের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যও চেষ্টা করিতেছেন।

কয়লা

১৯৫১ সালে ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে। ইতিপূর্বে কোন বৎসরে আর এত কয়লা উৎপন্ন হয় নাই। ১৯৫০ সালের উৎপাদন অপেক্ষা ইহা ২০ লক্ষ টন বেশী। বস্তুতঃ ১৯৪৮ সাল হইতেই ভারতে অভূতপূর্বভাবে কয়লা উৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে আমরা দেশের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইয়া বিদেশে কয়লা অধিকতর পরিমাণে রপ্তানি করিতে পারিতেছি।

চিনি, লবণ ও সিমেণ্ট প্রভৃতি

আলোচ্য বৎসরে আরও কতকগুলি প্রধান প্রধান শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ১১,১৬,০০০ টন চিনি উৎপন্ন হয়; ১৯৪৯-৫০ সালে হইয়াছিল ৯,৭৫,০০০ টন। পূর্ব বৎসরের ৭ কোটি ১৩ লক্ষ মণের স্থলে আলোচ্য বৎসরে ৭ কোটি ৩০ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হয়। ১৯৫০ সালের ২৬,১৪,০০০ টনের স্থলে ১৯৫১ সালে ৩১,২৪,০০০ টন সিমেণ্ট উৎপন্ন হয়।

কাগজের উৎপাদন পূর্ব বৎসরের তুলনায় ১,০৮,০০০ টন হইতে বাড়িয়া ১,২৮,৮০০ টন হইয়াছে।

কষ্টিক সোডার উৎপাদন ১০,৮৩৫ টন হইতে বাড়িয়া আলোচ্য বৎসরে ১২,৫৪১ টন হইয়াছে।

কাচের চাদর উৎপাদন ১৯৫০ সালের ৯৬ লক্ষ বর্গ ফুট হইতে বাড়িয়া ১৯৫১ সালে ১ কোটি ৪ লক্ষ বর্গ ফুট হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক পাখা, বিজলী বাতি, বৈদ্যুতিক মোটর এবং বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার প্রভৃতির উৎপাদনও আলোচ্য বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেডিও রিসিভার যন্ত্রের উৎপাদন বাড়িয়াছে ৭০ শতাংশ। ১৯৫০ সালে ৪৪,৭৬৫টির স্থলে ১৯৫১ সালে ৭৪,৪০০টি যন্ত্র নির্মিত হয়।

পূর্ব বৎসরের তুলনায় ১৯৫১ সালে ২২৫৪টি ডিজেল ইঞ্জিন অধিক (মোট ৬,৮৫০টি) উৎপন্ন করা হইয়াছে।

বিভিন্ন যন্ত্রাংশ একত্র করিয়া পূর্ণাঙ্গ মোটর গাড়ী তৈয়ারের কাজেও আলোচ্য বৎসরে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে।

কয়েকটি শিল্পে উৎপাদন হ্রাস

যে সকল শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে উপরে সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরে উহাদের অধিকাংশের সম্প্রসারণও হইয়াছে। পক্ষান্তরে এমন কতগুলি প্রয়োজনীয় শিল্প আছে যেগুলিতে উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। সালফিউরিক এসিড ও সুপারফস্ফেট্স্ শিল্পের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সালফারের জন্য ভারত সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী। ইহার আমদানি কম হওয়াই উক্ত শিল্প দুইটিতে উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে।

পশমী দ্রব্যের উৎপাদনও হ্রাস পাইয়াছে। উপকরণ আমদানির অভাবেই পশম শিল্পের উৎপাদন কমিয়াছে।

সাইকেলের উৎপাদনও কম হইয়াছে। ১৯৫০ সালে ১,০৪,০০৫টি সাইকেল উৎপন্ন হয়। ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা কমিয়া ৮০,২০১ হইয়াছে। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে হিন্দ সাইকেল ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট ইহার প্রধান কারণ।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসমূহ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পসমূহের অস্তিত্ব ছিল না বলিলেই চলে। আমদানীর অসুবিধা ও যুদ্ধের জরুরী তাগিদে ভারতে এই শিল্পগুলি গড়িয়া উঠে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই সাইকেল, স্টীল, বেল্ট, লেইসিং প্রভৃতি শিল্পগুলি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। লৌহেতর ধাতুশিল্প এ্যালুমিনিয়াম, সীসা, এণ্টিমনি, জাহাজ নির্মাণ, যন্ত্রপাতি প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্পও নূতন স্থাপিত হইয়াছে।

বর্তমানে ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন শাখায় ইঞ্জিনিয়ারিং উন্নয়ন বিভাগে ৭২টি বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে সাহায্যাদি প্রদান করা হইয়া থাকে। উক্ত বিভাগের ও উল্লিখিত শিল্পের কর্মীদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ভারত এখন ড্রাই ব্যাটারি, তাম্র পরিবাহক, বৈদ্যুতিক মোটর, বৈদ্যুতিক পাখা, হ্যারিকেন লণ্ঠন, মোটর কার ব্যাটারি প্রভৃতি অনেকগুলি অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

১৯৫১ সালে ভারতে সর্ব্বপ্রথম স্বয়ংক্রিয় তাঁত, গ্রামোফোনের পিন, এ্যালুমিনিয়াম পাউডার, গৃহস্থালী কার্যে ব্যবহার্য রেফ্রিজারেটার, গৃহস্থালী কার্যে ব্যবহার্য বৈদ্যুতিক মিটার এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজলী বাতি নির্মিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, বল্‌বেয়ারিং, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, প্রভৃতি পিস্টন রিং, অটো-ট্রান্সফরমার প্রভৃতি নানা আকারের যন্ত্রাদি এখন ভারতে প্রস্তুত হইতেছে।

১৯৫১ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং উন্নয়ন শাখার ২৭টি পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে এবং
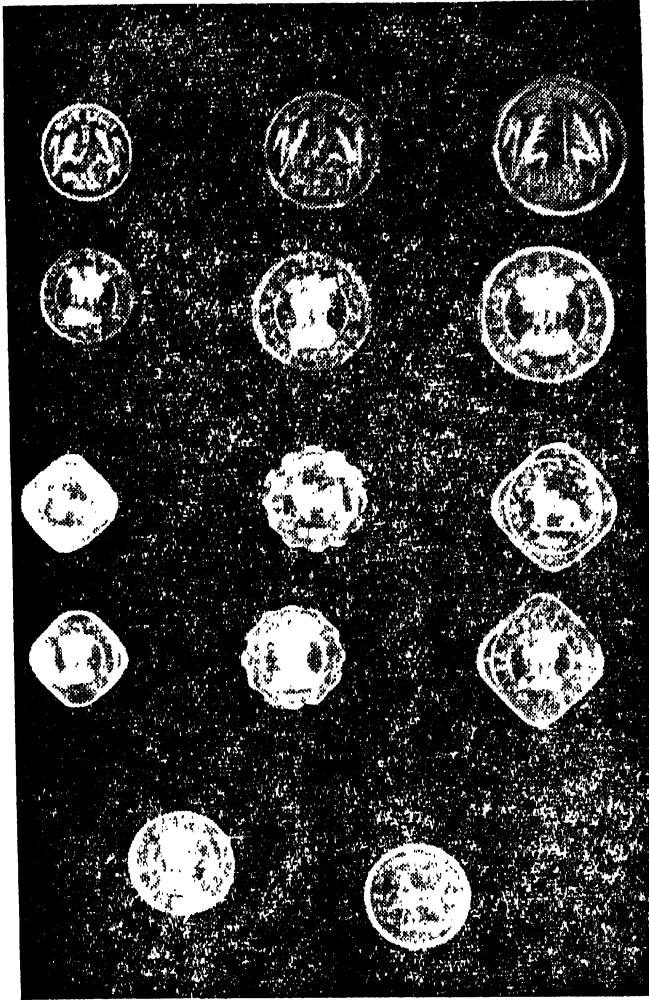
১৯৫০ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে প্রচলিত ভারতীয় মুদ্রা।

ঐগুলিতে উৎপাদন শুরু হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে হ্যারিকেন লন্ঠন, স্টোরেজ ব্যাটারি, ছোটখাট যন্ত্রপাতি, বিজলী বাতি, বৈদ্যুতিক মোটর প্রভৃতির উৎপাদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করিয়া ঐগুলির উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

এখন যে সম্প্রসারণ পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা রূপায়িত হইলে আগামী ৩ বৎসরে সাইকেল, ডিজেল ইঞ্জিন, এ্যালুমিনিয়াম পিণ্ড, রেলওয়ে শকট ও অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে।

উপরে যে সকল দ্রব্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেইগুলি ছাড়া নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিও স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে এই দেশে নিয়মিতভাবে উৎপন্ন হইতেছেঃ—

(১) বল বেয়ারিং;
(২) এ সি এস আর কন্‌ডাক্টার;
(৩) প্লাস্টিক্ কেব্‌ল্
(৪) রেলগাড়ির পাখা;
(৫) হাই টর্ক মোটর·
(৬) কন্‌ডুইট পাইপ;
(৭) পিতলের টিউব ও পাইপ;
(৮) নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের ছুরি, কাঁ[illegible] প্রভৃতি;
(৯) গ্রামোফোনের পিন্;
(১০) ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

অন্যান্য শিল্প

শিল্পায়ন সূচীর সম্প্রসারণের ফলে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ঔষধ এখন এদেশে তৈয়ারী হয়। এইরূপ অনেক ঔষধের আমদানী এখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ আছে অথবা অনেক কমান হইয়াছে। তরল ক্লোরি[illegible] ব্লিচিং পাউডার, কপার সালফেট, সোডিয়া[illegible] থাওসালফেট প্রভৃতি এখন এদেশেই প্রস্তুত হয় বলিয়া এইগুলির আমদানীও বহু[illegible] পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। অন্যান্য কতিপ[illegible] রসায়ন দ্রব্য এই দেশেই প্রচুর পরিমা[illegible] উৎপন্ন হয় বলিয়া এইগুলির আমদান[illegible] সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ রসায়ন ও ভেষজ শিল্পে ভার[illegible] এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, গ্লিসারি[illegible] বাইক্রোমেট্‌স্, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাই[illegible] পটেসিয়াম ব্রোমাইড্ প্রভৃতি ব্রিটেন, মার্কি[illegible] যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি করিতেছে[illegible] এই দেশে প্রস্তুত অনেক ঔষধ এখন ম[illegible] প্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যেও রপ্তানি হইতেছে।

রবার শিল্পেও ভারত উল্লেখযোগ্যভা[illegible] উন্নতি করিয়াছে। গ্লুকোজ পাউড[illegible] উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কতিপ[illegible] ভারতীয়ের সহযোগিতায় কতকগু[illegible] বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান এই দেশে কারখা[illegible] প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

বর্তমান অগ্রগতি অব্যাহত থাকি[illegible] আগামী ৩ বৎসরের মধ্যে শিল্পায়[illegible] ভারতের প্রভূত উন্নতি হইবে বলিয়া আ[illegible] করা যায়।

ভারতীয় মুদ্রার কাহিনী

কোনও দেশের মুদ্রা প্রচলনের ক্ষম[illegible] উহার সার্বভৌমত্বের প্রধান প্রত[illegible] বলিয়া পরিগণিত হয়। একমাত্র রাজা অথ[illegible] রাষ্ট্রই এই মুদ্রা প্রচলনের অধিকার
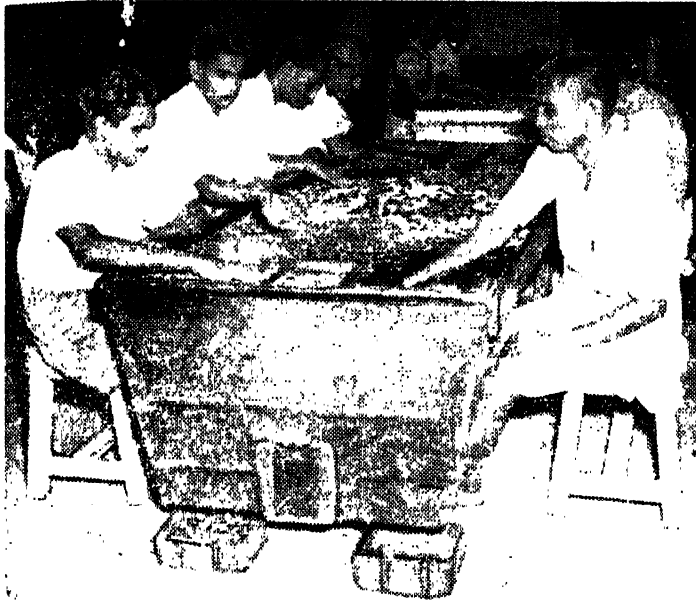
কলিকাতার মুদ্রালয়ে মুদ্রা বাছাই হইতেছে

৭৫৭ সাল হইতে ভারতে আধুনিক মুদ্রা চলনের কার্য আরম্ভ হয়। আলীপুরে রত সরকারের যে নূতন মুদ্রালয় বা কশাল স্থাপিত হইয়াছে এই বৎসরের ম ভাগেই অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ হার উদ্বোধন করিবেন। এই মুদ্রালয়ে কেবল ভারতের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রাই নির্মিত হইতে পারিবে তাহা নহে— দেশী কোনও কোনও রাষ্ট্রের প্রয়োজনও টিতে পারিবে। এই মুদ্রালয় স্থাপনের লে ভারতে মুদ্রার ইতিহাসে নূতন ধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে।

মুদ্রালয়ে মুদ্রা প্রস্তুত হয়। ইহাতে গজের নোট প্রস্তুত হয় না। কাজেই কেবল নাট লইয়াই যাহাদের কারবার তাহাদের পেক্ষা সাধারণ লোক, কারখানার ও ক্ষেতের মজুর এবং গৃহকর্তার নিকট ক্ষুদ্র দ্র মুদ্রার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। দ্রার সরবরাহ অপ্রচুর হইলে তাহাদের টিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। গত যুদ্ধের নয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদ্রার অভাবে যে কত সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সেই-নের স্মৃতি মাত্র।

প্রজাবর্গের জন্য প্রচুর মুদ্রা সরবরাহের ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য। সরকারের পক্ষ হইতে মুদ্রালয় এই কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

ভারতের প্রথম টাকা

১৮২৪ সালে প্রথম ভারতে একটি পূর্ণাঙ্গ মুদ্রালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম মুদ্রালয়াধ্যক্ষ (মিণ্ট মাস্টার) ছিলেন উইলিয়াম নইরেন ফরবেস। মেজর জেনারেল ফরবেস বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স দলের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মুদ্রালয়াধ্যক্ষদের মধ্যে অন্যতম বলিয়া স্বীকৃত। তিনি ভারতে প্রথম মুদ্রালয় স্থাপনে সাহায্য করেন এবং মুদ্রালয়ের কার্য স্থায়ী ও সুশৃঙ্খল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। কলিকাতা মুদ্রালয়টি ১৮২৯ সালের ১লা আগস্ট স্ট্র্যাণ্ড রোডের পার্শ্বে স্থাপিত হয়। অদ্যাবধি উহা ঐখানেই আছে। ইহা ২৬ ফুট দীর্ঘ ভিত্তির উপর নির্মিত।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন দেশে সুন্দরাকৃতি মুদ্রা প্রচলিত আছে। খৃষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দ হইতে গ্রীস দেশে ও এসিয়া মাইনরে মুদ্রা প্রচলিত আছে। ভারতেও অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিভিন্ন ধরণের মুদ্রা প্রচলিত আছে। মুঘল যুগের আসরফি বিখ্যাত।

মুদ্রা প্রস্তুত প্রণালী যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে যে পদ্ধতিতে মুদ্রা প্রস্তুত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বোলটন নামক একজন বার্মিংহামবাসী প্রস্তুতকারক জেমস্ ওয়াটের সহযোগিতায় মুদ্রা প্রস্তুত যন্ত্র পরিচালনায় প্রথম বাষ্প ব্যবহার করিয়া উহার প্রবর্তন করেন।

মুদ্রা প্রস্তুত কার্যে মিশ্র ধাতুর ব্যবহার

কলিকাতা মুদ্রালয়ে ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের বোলটন যন্ত্র স্থাপিত হয়। তখন এই যন্ত্র সাহায্যে দৈনিক দুই লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত হইত। তাহার পর হইতে কলিকাতায় নিকৃষ্ট ধাতু, মিশ্র ধাতু, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত হইতে থাকে। অর্থনৈতিক কারণে মুদ্রা প্রস্তুত ক্ষেত্র হইতে স্বর্ণ উধাও হইয়াছে এবং রৌপ্য ও তাম্র, নিকেল, দস্তা প্রভৃতির নিকট স্বীয় আসন ছাড়িয়া দিয়াছে।

ভারতে বিভিন্ন মুদ্রা প্রস্তুত করিতে যে সকল ধাতু ও মিশ্র ধাতু ব্যবহার করা হয় তাহার পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

টাকা, আধুলি ও সিকি	...	নিকেল
দু'আনী, এক আনী ও আধ-আনী	...	৭৫ শতাংশ তামা ও ২৫ শতাংশ নিকেল
এক পয়সা	...	ব্রোঞ্জ (৯৭ শতাংশ তামা, ২½ শতাংশ দস্তা এবং ½ শতাংশ টিন)

মুদ্রা প্রস্তুত কার্যে ধাতু মিশ্রণে যে তামা ব্যবহার করা হয় তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। হওয়া চাই। অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, তামার সঙ্গে যদি ০.০০৫ শতাংশ বিসমাথ থাকিলেও মুদ্রা অচল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

মুদ্রা প্রস্তুত কার্যে বিশুদ্ধ নিকেলের ব্যবহার এদেশে নূতন শুরু হইয়াছে। ইহার উচ্চ গলনাঙ্ক হেতু (১৪৫২ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড্) এবং কেবলমাত্র বিশেষ যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়াই ইহাকে মুদ্রাকারে পরিণত করা যায় বলিয়া নিকেল মুদ্রা জাল করা খুব কঠিন। ইহার আর একটি গুণ এই যে, ইহা চুম্বকধর্মী—চুম্বক সাহায্যে ইহার যাথার্থ্য নির্ণয় করা যায়।

মুদ্রা নির্মাণ ব্যাপারে প্রতিটি প্রণালীর সূক্ষ্ম নৈপুণ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই সূক্ষ্মতা ও উৎকর্ষতাই জালিয়াতের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়।

প্রত্যেক প্রকারের মুদ্রা প্রস্তুত কার্যে নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এত বৎসরের অভিজ্ঞতার পরও কোনও নূতন ধরণের মুদ্রা প্রস্তুত করিতে হইলে কয়েক সপ্তাহ অথবা কোনও কোনও স্থলে কয়েক মাস পরীক্ষাকার্য চালাইবার পর সাফল্য লাভ করা যায়।

১৯৪৪-৪৫ সালে কলিকাতা মুদ্রালয় হইতে ১০৪,৮৭,২৭,৮০০টি মুদ্রা প্রস্তুত হয়। কলিকাতা মুদ্রালয়ে এত বেশী মুদ্রা আর কোন বৎসর প্রস্তুত হয় নাই। পৃথিবীর অন্য কোনও মুদ্রালয়ে এত বেশী মুদ্রা এক বৎসরে প্রস্তুত হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

বিদেশী রাষ্ট্রের মুদ্রা প্রস্তুত

ভারতের মুদ্রালয়ে এখন প্রচুর মুদ্রা প্রস্তুত হইতে পারে। কাজেই ভারত এখন নিজের চাহিদা মিটাইয়া অন্য দেশের মুদ্রাও প্রস্তুত করিতে পারে। ১৯১৪ সাল হইতে নিম্নলিখিত দেশগুলির মুদ্রা কলিকাতা মুদ্রালয়ে প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে ঃ—অস্ট্রেলিয়া, ভূটান, সিংহল, মিশর, পাকিস্থান, সৌদী আরব এবং স্ট্রেইট্‌স্ সেটেল্‌মেণ্টস্। অতীতে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ, পর্তুগীজ শাসিত ভারতীয় অঞ্চল এবং বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকার মুদ্রাও ভারতে প্রস্তুত হইত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে অস্ট্রেলিয়া সরকারের এক পেনী ও আধা-পেনী মুদ্রা কলিকাতা মুদ্রালয়েই প্রস্তুত হইত।

পদকাদি নির্মাণ

মুদ্রালয়ে যে শুধু মুদ্রা প্রস্তুত কার্যই হয় তাহা নহে। পদক প্রভৃতি নির্মাণও ইহার কার্যের অন্তর্গত। স্বাধীন ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত বীর চক্র ও মহাবীর চক্র প্রভৃতি কলিকাতা মুদ্রালয়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতীতে ভারতে বৃটিশ সরকারের বিবিধ পদকাদি এই মুদ্রালয়েই নির্মাণ করা হইত।

বাটখারা প্রভৃতির ওজন ঠিক আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাও মুদ্রালয়ের অন্যতম কার্য। এই মুদ্রালয় হইতে চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন পৌরসভায় এক এক প্রস্ত আদর্শ বাটখারা সরবরাহ করা হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে ঐগুলি আবার মুদ্রালয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ফেরৎ পাঠান হয়। বস্তুতঃ বাটখারা প্রভৃতির মান নির্ধারণ ব্যাপারে মুদ্রালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

জালিয়াতি নিবারণ

জনসাধারণের জন্য মুদ্রা প্রস্তুত করাই মুদ্রালয়ের প্রধান কার্য। কিন্তু এই ব্যাপারে সরকারের সহিত জনসাধারণের যে অংশ প্রতিযোগিতা করিতে আসে সেই জালিয়াতদিগের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রের একাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। জালিয়াতি নিবারণের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে তাহা কোনও মুদ্রালয়াধ্যক্ষই খুলিয়া বলেন না; কিন্তু এই বিষয়ে সর্বদাই তাঁহার মনোযোগ নিবদ্ধ আছে। দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা খুব বেশী এবং থানাগুলিও খুব দূরে দূরে অবস্থিত বলিয়া জালিয়াতেরা তাহাদের ব্যবসা সহজে চালাইতে পারে। ভারতে এমন কতকগুলি অপরাধপ্রবণ উপজাতি আছে যাহারা মুঘল আমল হইতেই জালিয়াতিতে হাত পাকাইয়াছে। মুদ্রালয়ে একটি শো-কেসে নানাপ্রকার জাল মুদ্রা এবং জালিয়াতেরা কোন্ কোন্ যন্ত্র ব্যবহার করে তাহা রক্ষিত আছে। এই শো-কেস্-এ নিম্নলিখিত কথাটি লিখিত আছে ঃ—'অর্থপ্রিয়তাই সকল অনিষ্টের মূল।'

কলকাতা মুদ্রালয়ে অনেক মূল্যবান দলিল আছে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি ১৭৯: সালের। মুদ্রা বিজ্ঞানের ছাত্রগণের পক্ষে এইগুলি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ।
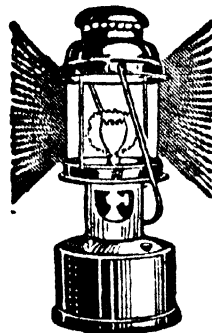
প্রজাতন্ত্র ভারতের প্রথম গণ-নির্বাচন

প্রজাতন্ত্র ভারতের প্রথম গণ-নির্বাচন প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। শুধু এশিয়াতে নহে, সমগ্র পৃথিবীতেই ইহা বৃহত্তম গণ-নির্বাচন। পঁয়ত্রিশ কোটি অধিবাসীর দেশ ভারতের প্রায় আঠার কোটি নরনারী ভোটাধিকার লাভ করিয়াছে। আপন হাতে রাষ্ট্রের ভাগ্য গড়িবার দায়িত্ব ও অধিকার লাভ করিয়াছে ভারতের জনসাধারণ। দেশের গভর্নমেণ্ট গঠিত হইবে জনসাধারণের ইচ্ছায় ও সমর্থনে। নূতন ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র আধার হইল জনসাধারণ। জনসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছাই আজ রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারত-জীবনে গণতন্ত্রের এক বিরাট পরীক্ষার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল! পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার দেশ ভারত আজ আধুনিকতম গণতন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে এক নূতন পরিণাম সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইল। পুরাতনের ও নূতনের সহজ ও স্বচ্ছ সমন্বয়ের এক সার্থক দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল ভারত।

প্রজাতন্ত্র ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার। দীনতম কৃষক এবং কুবের-সদৃশ ধনী উভয়েরই সমান অধিকার। ধর্ম-সম্প্রদায়-ভাষা নির্বিশেষে সবারই সমান অধিকার। পণ্ডিত ও নিরক্ষরের মধ্যে এই অধিকারের কোন কম-বেশী পার্থক্য নাই। ভারতের সাধারণ জনতা-জীবন এত বড় মর্যাদা ইতিপূর্বে কখনো লাভ করে নাই। সাম্প্রতিক গণ-নির্বাচন বস্তুত ভারতের রাজনৈতিক জীবনে এক বিরাট শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের অনুষ্ঠান।

উপরে

দেগংগা—পল্লীর রমণীগণ শোভাযাত্রা সহকারে চলিয়াছেন ভোটদান কেন্দ্রে। জীবনে এই তাঁহাদের নূতন অভিজ্ঞতা।

মধ্যে

বসিরহাট—পল্লীর নিভৃতে মুসলমান নারী ভোটারদের মধ্যে উৎসাহ। গোরুর গাড়ি তাঁহাদের ভোটদান কেন্দ্রে পৌঁছিয়া দিয়াছে।

নীচে

বসিরহাট—নির্বাচন-কেন্দ্র যেখানে কিছু দূরে, সেখানেও নারীদের ভোটদানে উৎসাহ হ্রাস হয় নাই।

নূতন ভারতের জাতীয় চরিত্রের আর এক মহৎ বলিষ্ঠতার প্রমাণ এই নির্বাচনের মধ্যেই প্রমাণিত হইয়াছে। গণতন্ত্রের এত বড় পরীক্ষায় দেশব্যাপী অনুষ্ঠান অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হইয়াছে। বৈদেশিক রাজনীতিকের দল অনেকে শংকামূলক জল্পনা করিয়াছিলেন যে, সাধারণ নির্বাচনে ভারত জুড়িয়া হাঙ্গামা দেখা দিবে। ব্যর্থ হইয়াছে সে জল্পনা। বহু গবেষক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, ভোটাধিকার পাইলেও ভারতের দরিদ্র ও নিরক্ষর জনসাধারণ নির্বাচনে উৎসাহ প্রদর্শন করিবে না। মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে এই গবেষণা। অনেক বিশেষজ্ঞ নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, ভারতের 'অনগ্রসর' নারীসমাজ ভোটদানে কুণ্ঠিত হইবে। কিন্তু এ গবেষণাও ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। ভোট দিয়াছে ভারতের অশীতিপর বৃদ্ধ, নিরক্ষর কৃষকের বধূ ও মাতা, এমনকি জন্মান্ধও। ভারতের জাগ্রত জনতা জাতীয় জীবনের এক পুণ্যব্রতের মত গ্রহণ করিয়াছে এই নির্বাচনের অনুষ্ঠানকে এবং বস্তুত মঙ্গল-ঘট স্পর্শ করিবারই আগ্রহ লইয়া ভোটকেন্দ্রের ব্যালট বাক্স স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষ এবং শিক্ষিতের তুলনায় নিরক্ষর মানুষই ভোটদানে বেশি আগ্রহ ও উৎসাহের প্রমাণ দিয়াছে। ইহা আধুনিক ভারতজীবনের এক নূতন শুভলক্ষণ। প্রজাতন্ত্র ভারতের প্রথম গণ-নির্বাচনে জনজাগৃতির এবং সমষ্টির আত্মপ্রতিষ্ঠার এক নূতন অধ্যায় প্রত্যক্ষভাবেই সূচিত হইল।

উপরে

নয়নসুখ—গ্রাম্য ও নিরক্ষর বলিয়া যাঁহারা অবজ্ঞাত ভোটদানের অধিকারে তাঁহাদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে

মধ্যে

বসিরহাট—অন্তঃপুরিকাগণ আসিয়াছেন ভোটদানে, সঙ্গে ৮০ বৎসর বয়স্কা ন্যুব্জদেহ এক বৃদ্ধা—ইনিও ভোটাধিকার-গৌরবে গৌরবান্বিতা

নীচে

আসানসোল—ভোটদানের জন্য মহিলাগণ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করিতেছেন

উপরে

ডেঁনরীচ—বোরখা-পরিহিতা অসূর্যম্পশ্যা মুসলমান রমণীগণ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য সমবেত

মধ্যে

আলীপুর পুলিশ কোর্ট—বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স পাঠানো হইতেছে।

নীচে
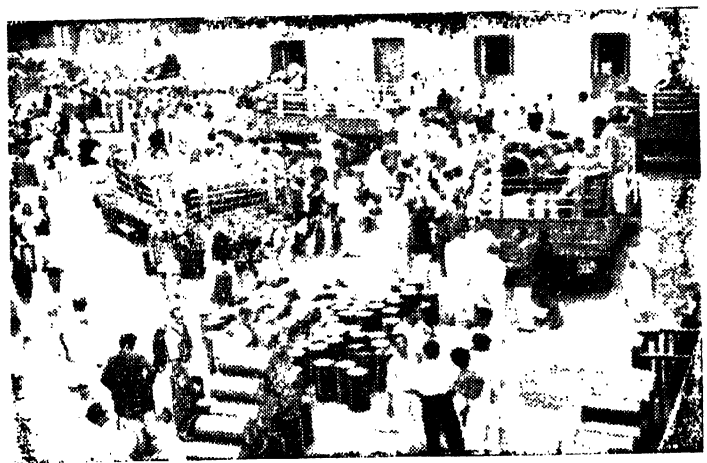
রঘুনাথপুর—সমান অধিকারে অধিকারী হিন্দু ও মুসলিম নারী সারিবন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন ভারত রাষ্ট্রকে নূতনতর রূপে রূপায়িত করিয়া তুলিবার জন্য

দেগংগা—নির্বাচন কেন্দ্রের ১০০ গজের মধ্যে নির্বাচনী প্রচার নিষিদ্ধ। এই কারণে ভোটকেন্দ্র হইতে দূরে ধানক্ষেতের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারপত্র টাঙানো হইয়াছে

ভদ্রেশ্বর—(দক্ষিণে) শ্রমিকেরা অপেক্ষা করিতেছেন ভোটদানের জন্য। (বামে) ভোটকেন্দ্রে সারিবদ্ধ শ্রমিকগণ

ভারতে মাউন্টব্যাটেন

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

(১৬)

মাউণ্টব্যাটেনের কাছে নিজামের 'শেষ আবেদন'। হায়দরাবাদের 'অর্থনৈতিক অবরোধ'ও সত্য ঘটনা নয়। কাশিম রেজভির শোণিত-পিপাসু বক্তৃতা। মঙ্কটন বুঝেছেন, অবিলম্বে রেজভিকে গ্রেপ্তার করা কর্তব্য। হায়দরাবাদে গিয়েই মঙ্কটনের উল্টা সুর। ইত্তেহাদ দলের 'অস্ত্র-সপ্তাহ' উদ্‌যাপন। দক্ষিণ ভারতের শান্তি ক্ষুণ্ণ হবার আশংকা। লায়েক আলি ও রেজভি কর্তৃক জেহাদী বক্তৃতার অভিযোগ অস্বীকৃত। মাউণ্টব্যাটেনের নির্দেশে অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান। দস্তুরমত শার্লক হোমস্‌গিরি। নিজাম, মুন্সী ও রেজভির চর—ছায়ালোকের জীবের মত ধরা-ছোঁয়া যায় না।

হায়দরাবাদ সমস্যায় অচল অবস্থা। মাউণ্টব্যাটেন ও লায়েক আলির নিভৃত আলাপ। মঙ্কটন বুঝেছেন—প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে লায়েক আলির অপসারণ প্রয়োজন। জাইন ইয়ার জঙ্গ হলেন যোগ্য ব্যক্তি। মাউণ্টব্যাটেনের ফরমুলা—চার দফা ব্যবস্থার প্রস্তাব। গবর্ণমেণ্ট হাউসের অতিথি কাশ্মীরের মহারাজা ও মহারাণী। সাংবাদিকের প্রশ্নে মহারাজার নীরবতা। কাশ্মীর মহারাজার গুণগ্রাম কীর্তনে জাম সাহেব। 'বড় বেশি পুরু পালেস্তারা লাগাবার চেষ্টা।'

মঙ্কটনের হায়দরাবাদ ত্যাগ। নূতন গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত না হ'লে উপদেষ্টার কাজ আর করবেন না। নিজামের ফারমান—মাউণ্টব্যাটেনের চার দফা প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতি। গবর্ণমেণ্টে হিন্দুপ্রাধান্য স্বীকার করবেন না নিজাম। "অন্য দেশের অনুকরণে হায়দরাবাদে গবর্ণমেণ্ট গঠন চলবে না'। নেহরুর বক্তৃতার বিবরণ ও ভারতের রাজনৈতিক উত্তাপ। মাউণ্টব্যাটেনের আতঙ্ক। মাদ্রাজী ষ্টেনোগ্রাফারের ভুল। আর মাত্র ছয়টি সপ্তাহ—হায়দরাবাদের জন্য মাউণ্টব্যাটেনের শেষ উদ্বেগ। নিজামকে শেষপত্র দিয়ে সতর্ক করে দেবার ইচ্ছা। নিজামের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের সাক্ষাতের সঙ্কল্প। নিজামকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করবার সিদ্ধান্ত।

হায়দরাবাদ হাউসের অভ্যন্তরে। তুর্কীর খলিফার বৈবাহিক নিজাম। ধর্মতন্ত্রে ও বংশগৌরবে প্রতিষ্ঠা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। মাউণ্টব্যাটেন-নিজাম সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থায় স্থান-সমস্যা। দিল্লী নয়, হায়দরাবাদও নয়, সুতরাং বোম্বাই। মাউণ্টব্যাটেনের আপত্তি। নিজামের প্রত্যুত্তর—হায়দরাবাদের বাইরে যেতে তিনি অক্ষম। "ভারত ও ভারতের বাইরে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হবে।"

নিজাম কি পরের ইচ্ছার ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন? মাউণ্টব্যাটেনকে হায়দরাবাদে যেতে দিতে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনিচ্ছা। ষ্টাফের অভিমত—মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি প্রেরিত হোক। মাউণ্টব্যাটেনের সম্মতি। রজাকার দল ও কম্যুনিষ্ট দলে মিতালী। নেহরুর প্রতিশ্রুতি —নিজামের নিরাপত্তার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট যথাশক্তি ব্যবস্থা করবেন। সন্দেহ হয়, হায়দরাবাদে গোপনে 'প্রাসাদ-বিপ্লবের' ষড়যন্ত্র চলছে। হায়দরাবাদ সীমান্তের দৈনন্দিন হাংগামা সম্বন্ধে নেহরু। "চুপ করে তাকিয়ে দেখার কোন অর্থ হয় না।" জাইন ইয়ার জঙ্গ বললেন—সবই ভাল হবে, যদি ভারত সরকার বাড়াবাড়ি না করেন।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল। নিজামের কাছ থেকে যে চিঠি নিয়ে এসেছেন মঙ্কটন, সে চিঠি পড়ে এটা বুঝা গেল যে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের এই দলিল রচনায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় নিজাম দিতে পেরেছেন। ভারত সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে শাসানি দিয়েছেন, সে ব্যবস্থার যুক্তিহীনতা প্রমাণ করার মত কয়েকটি যুক্তিও দেখিয়েছেন নিজাম। চিঠি পড়ে বুঝা যায় যে, নিজাম তাঁর নিজেরই মনের প্রেরণায় এ চিঠি লিখেছেন। ভারত সরকারের দেশীয় রাজ্য দপ্তর নিজামকে যে পত্র দিয়েছেন, সেই পত্রকে 'চরম-পত্র' বলেই মনে করেছেন নিজাম। মাউণ্টব্যাটেনের কাছে লিখিত পত্রে তাঁর এই ধারণার কথা প্রথমেই উল্লেখ করে নিয়ে তার পর অন্যান্য বক্তব্য বলেছেন নিজাম। নিজাম আরও বলেছেন, ভারত সরকারের এই চিঠিকে হায়দরাবাদের সঙ্গে সকল সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবার প্রাথমিক উদ্যোগ বলে তিনি মনে করছেন। এই অবস্থায় নিজাম মাউণ্টব্যাটেনের কাছে 'শেষ আবেদন' জানিয়েছেন যে, মাউণ্ট-ব্যাটেন যেন তাঁর পদক্ষমতার সাহায্যে এই অবাঞ্ছিত পরিণাম নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

মঙ্কটনের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে, উভয়েই উভয়ের মন ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে সুপরিচিত। সুতরাং ক্ষুব্ধ মঙ্কটনের সঙ্গে আলোচনা করতে মাউণ্টব্যাটেনের কোন অসুবিধা হলো না। খোলা মন নিয়েই দুজনে আলোচনা করলেন। মাউণ্টব্যাটেন এই সত্য কথাটি মঙ্কটনকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, ভারত সরকার সত্য সত্যই নিজামের কাছে কোন 'চরম-পত্র' প্রেরণ করেননি। ঐ পত্রটি মোটেই চরম-পত্র নয় এবং ভারত সরকার হায়দরাবাদের 'অর্থনৈতিক অবরোধে'র জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বা নির্দেশ দান করেননি। আলোচনা আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই নেহরু উপস্থিত হলেন। নেহরুও নিজ মুখেই জানিয়ে গেলেন যে, ভারত সরকার নিজামকে 'চরম-পত্র' হিসাবে এই পত্র দেননি এবং হায়দরাবাদের অর্থনৈতিক অবরোধও ভারত সরকারের কাম্য নয়।

কিন্তু আর একটি ব্যাপারে আবার জল ঘোলা হয়ে উঠেছে। জল ঘোলা

করার মত এই প্রস্তরটি নিক্ষেপ করেছেন ইত্তেহাদের নেতা কাশিম রেজভি। অনেকগুলি ভারতীয় সংবাদপত্রে ধর্মোন্মাদ রেজভির একটি বক্তৃতার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। গত ৩১শে মার্চ তারিখে হায়দরাবাদের অস্ত্র-সপ্তাহ উপলক্ষে আহূত এক জনসভায় রেজভি একটি 'শোণিত-পিপাসু' বক্তৃতা দিয়েছেন। রেজভি তাঁর বক্তৃতায় হায়দরাবাদের প্রত্যেক মুসলমানের উদ্দেশে এই আবেদন জানিয়েছেন যে, যতদিন না ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন পর্যন্ত কোন হায়দরাবাদী মুসলমান যেন তরবারি কোষবদ্ধ না করেন। এই বক্তৃতায় একটি গর্হিত অভিসন্ধিমূলক মন্তব্যও করেছেন রেজভি—'ভারতীয় ইউনিয়নে আমাদের মুসলিম বেরাদারগণ হায়দরাবাদের পক্ষে থেকে পঞ্চমবাহিনীর কাজ করবেন।'

এই ধরণের ভাষার ব্যবহার চলতে থাকলে, পরিণামে দক্ষিণ ভারতের অবস্থা কি রকম শোচনীয় হয়ে উঠতে পারে, সেটা সহজেই কল্পনা করা যায়। দৈবের অনুগ্রহে দক্ষিণ ভারতে এখনো সাম্প্রদায়িক শান্তি রয়েছে। উত্তর ভারতের ভয়ঙ্কর উত্তেজনা এখনো দক্ষিণ ভারতের দেহে ও মনে সংক্রামিত হতে পারেনি। দক্ষিণ ভারতের শান্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যেই রেজভি তাঁর বক্তৃতায় এই ধরণের ভাষা ব্যবহার করছেন বলে ধারণা না করে পারা যায় না।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ১১ই এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল। রেজভি-ষড়যন্ত্র আরও গভীর হয়ে উঠছে। মঙ্কটন গত কালই দিল্লী থেকে হায়দরাবাদে চলে গেছেন। যাবার সময় তিনি একটা বিষয় ভাল করেই বুঝে গেছেন, অবিলম্বে হায়দরাবাদে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা যে বর্তমানে কতখানি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, সেটা তিনি উপলব্ধি করেছেন। আর একটি বিষয়ে মঙ্কটন দিল্লী থেকেই তাঁর কর্তব্য স্পষ্টভাবে বুঝে নিয়ে গেছেন। রেজভিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা কর্তব্য, এই পরামর্শ নিজামকে এখনই দিতে হবে এবং এই পরামর্শ দেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়েই হায়দরাবাদে চলে যাচ্ছেন মঙ্কটন।

কিন্তু আজই মঙ্কটনের কাছ থেকে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে এক টেলিগ্রাম উপস্থিত হলো। মঙ্কটন লিখেছেন যে, রেজভির বক্তৃতার সংবাদটি মিথ্যা। মঙ্কটন খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে, এরকম কোন 'জেহাদী' বক্তৃতা রেজভি দেন নি। মঙ্কটনের ধারণা, ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে যেন আর কোন আলোচনা সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে চালিত হতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই ভিত্তিহীন সংবাদটি ইচ্ছে করেই প্রচার করা হয়েছে।

মাউণ্টব্যাটেন আমাকে এই নির্দেশ দিলেন যে, অবিলম্বে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে হবে, প্রকৃত ব্যাপারটা কি? আমিও সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধান আরম্ভ করে দিলাম। রেজভি-বক্তৃতার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য আমাকে দস্তুরমত ডিটেকটিভ শার্লক হোমসের মতই অতি দুরূহ এক সন্ধানকার্যের ভার নিতে হলো। নানা-সূত্রে প্রাপ্ত যে সব গোলমেলে এবং অসম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করলাম, তার ভেতর থেকে প্রকৃত ব্যাপার আবিষ্কার করতে গিয়ে ডাঃ ওয়াটসনের মত আমাকেও একটা ধাঁধার মধ্যে পড়ে হতভম্ব হয়ে যেতে হলো।

একটা বিশেষ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, রেজভির ৩১শে মার্চের বক্তৃতাটি ভারতীয় সংবাদপত্রে সাতদিন পরে প্রকাশিত হয়েছে। কেন এই বিলম্ব? ভারতীয় সংবাদপত্রে যেভাবে এই বক্তৃতার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে মনে হয় রেজভি সত্য সত্যই ৩১শে মার্চ তারিখে কোন সভাস্থলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছেন। বক্তৃতার বিবরণের মধ্যে উৎসাহী শ্রোতাদেরও নানারকম উল্লাস মন্তব্য ও জয়ধ্বনির উল্লেখও করা হয়েছে। অথচ মঙ্কটন লিখেছেন, কোন 'সভা'ই হয় নি।

দু' দিন আগে নেহরুও আইনসভায় তাঁর একটি বক্তৃতায় রেজভির এই বক্তৃতার কথা উল্লেখ করেছেন। হিংসা ও নরহত্যার প্ররোচক এই বক্তৃতা সম্বন্ধে নেহরুও মন্তব্য করে বলেছেন যে, 'রেজভি এই রকম হিংসা-প্ররোচক বক্তৃতা আরও বহুবার দিয়েছেন।' ভারতীয় সংবাদপত্রে রেজভির পূর্বে প্রদত্ত বিভিন্ন বক্তৃতার অংশ সঙ্কলিত করে একটা নতুন রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে মার্চ মাস পর্যন্ত রেজভি যেসব বক্তৃতা দিয়েছেন, তারই বিভিন্ন অংশের উদ্ধৃতি। এর মধ্যে রেজভির এমন সব উক্তির উল্লেখ দেখছি, যেগুলি ইতঃপূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে আমি দেখিনি। এসোসিয়েটেড প্রেস প্রামাণ্যসূত্রে প্রাপ্ত একটি সংবাদে রেজভির এমন একটি বক্তৃতার বিবরণ দিয়েছেন, যেটা আমার বর্তমানের অনুসন্ধানীয় ৩১শে মার্চের রেজভি-বক্তৃতার চেয়েও অনেক বেশি আক্রমণমূলক ও গর্হিত। অথচ এই বক্তৃতার রিপোর্ট পূর্বে কোন সংবাদপত্রে আমি দেখিনি। এসোসিয়েটেড প্রেসের এই সংবাদে দেখছি যে, প্রতাপশালী মোগল বাদশাহের মত উদ্ধত ভঙ্গী করে রেজভি একটি রাজ্যাংশ দাবী করেছেন। বর্তমান মাদ্রাজ প্রদেশের কয়েকটি অংশ হায়দরাবাদকে ফিরিয়ে দিতে হবে, এই দাবী করেছেন রেজভি। মাদ্রাজের এই সকল অংশ অতীতে হায়দরাবাদ রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। রেজভি বলেছেন— "সেদিন আসতে আর দেরি নেই, যেদিন বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গ আমাদের হায়দরাবাদের বাদশাহের পা ধুইয়ে দেবে।"

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ১৬ই এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল। মীর লায়েক আলি এবং রেজভি, উভয়েই অস্বীকার করেছেন, উভয়েই বলেছেন যে, ৩১শে মার্চ তারিখে 'অস্ত্র-সপ্তাহ' উপলক্ষে কোন জনসভা হয়নি এবং কোন বক্তৃতাও দেওয়া হয়নি। টাইমস পত্রিকার সংবাদদাতা এরিক ব্রিটার এই সময় হায়দরাবাদে ছিলেন। ব্রিটারের কাছ থেকে আমি অনেক সংবাদ সংগ্রহ করে এইবার বুঝতে চেষ্টা করলাম, রেজভির এই জেহাদী বক্তৃতার সত্যতা কতটুকু এবং সংবাদটি ভিত্তিহীন কি না।

বুঝলাম, মীর লায়েক আলি এবং রেজভি ঠিক কথা বলেন নি। ব্রিটার বলেছেন, ৩১শে মার্চ তারিখে সকাল বেলা হায়দরাবাদে একটি জনসভা আহূত হয়েছিল এবং সেই সভায় রেজভি উপস্থিত থেকে সামরিক কায়দায় প্রায় পাঁচশত রাজাকারের অভিবাদনও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই সভায় যতক্ষণ রেজভি ছিলেন, ততক্ষণ কোন বক্তৃতা তিনি দেননি। রাজাকারদের কুচকাওয়াজ শেষ হয়ে যাবার পরেও ব্রিটার সেই সভায় আরও বিশ মিনিট কাল ছিলেন। এর পর রেজভি এবং প্রায় ত্রিশজন লোক সভাস্থল থেকে চলে গিয়ে একটি গৃহে সমবেত হন। ব্রিটারও সেখানে উপস্থিত হন। এই গৃহের ক্ষুদ্র সম্মেলনে চা ও কেক পরিবেশন করা হয় এবং উপস্থিত সকলেই নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া ভাবে নানারকম আলাপআলোচনা করেন। ব্রিটার বলেছেন, রেজভি নিজে দরজা পর্যন্ত এসে ব্রিটারকে বিদায় দিয়েছিলেন। এই পর্যন্ত তথ্য ব্রিটারের কাছ থেকে পাওয়া গেল। ব্রিটার বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর সেই গৃহে রেজভি কোন বক্তৃতা দিয়েছিলেন কি না, সেটা বলতে পারেন না ব্রিটার। সুতরাং রহস্য রয়েই গেল।

রেজভি-বক্তৃতার রহস্য উদ্ঘাটনের ন্য শার্লক হোমসগিরি করতে গিয়ে র একটি তথ্যের সন্ধান পেয়ে গেলাম। দরাবাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে এখন স পক্ষ থেকেই গোয়েন্দাগিরির জাল তো হয়েছে। রেজভি প্রকাশ্যে জনসভায়, থবা গোপনে ঘরোয়াভাবে যেসব কথা লন, সেসব শুনবার জন্য মুন্সী এবং জাম উভয়েরই চর নিয়মিতভাবে খানে উপস্থিত থাকে। এই লুকোচুরির লার মধ্যে রেজভিও অসতর্ক নন। জভির চরও আবার নিজাম ও মুন্সীর তোকটি উক্তি ও আলোচনা শুনে এবং গ্রহ করে রেজভির কাছে রিপোর্ট করে কেন। কিন্তু এই চরদের ধরা ছোঁয়া য় না, চেনাও যায় না। যেন একটা ছায়া-গতের জীবের মত এই সব চর গোপনে জ করে চলেছে। যাই হোক, একটি ষয়ে আমি নিঃসংশয় হয়েছি। রেজভি নন এক ধরণের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করেছেন, যেটা এইভাবে বাধে চলতে থাকলে ভারত ও হায়দরা-দের মধ্যে আলোচনার ভিত্তি সম্পূর্ণ-রেই বিনষ্ট করে দেবে। রক্তপাতের ন্য যেভাবে সদাসর্বদা আবেদন জানিয়ে লেছেন রেজভি, তাতে ভারত-হায়দরাবাদ ম্পর্ক চূড়ান্তভাবেই ছিন্ন হয়ে যাওয়া াভাবিক। আর একটা বাস্তব সত্য এই া, রেজভির কোন ক্রিয়াকলাপের খবর র অজানা থাকছে না। সতর্ক পক্ষের রো যথেষ্ট সংবাদ পেয়ে যাচ্ছে।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ১৬ই এপ্রিল, ৯৪৮ সাল। হায়দরাবাদ-সমস্যায় এখন ত্বতঃ একটা 'অচল অবস্থাই' দেখা য়েছে। মাউণ্টব্যাটেনও সমস্যার মাধানের একটা সূত্র আবিষ্কারের জন্য ষ্টা করে যাচ্ছেন, যা'তে এই অচল বস্থার উপশম হয়। সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই উণ্টব্যাটেনের আলোচনা চলছে। মংকটন ত বুধবারে দিল্লীতে এসেছেন এবং য়েক আলি এসে পৌঁছেছেন বৃহস্পতি-র। গবর্ণমেণ্ট হাউসে সাঁতার খেলার ন্য রচিত কৃত্রিম জলকুণ্ডের পাশে য়াশীতল ও শান্ত উদ্যানভূমির এক ভৃতে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজনে যোগদান করেছেন মীর লায়েক ালি। এই ভোজনের আসরে মাউণ্ট-ব্যাটেন ও লায়েক আলি ছাড়া তৃতীয় ান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন না। এখানে সে প্রায় দু'ঘণ্টা কাল দু'জনের মধ্যে ালোচনা হয়েছে।

মাউণ্টব্যাটেন মনে করছেন যে, লায়েক আলিকে তিনি এখন কিছুটা নরম ক'রে আনতে পেরেছেন, লায়েক আলির মনোভাবের যে পরিচয় এতদিন ধরে পাওয়া যাচ্ছিল, তাতে এটাই বুঝা গিয়ে-ছিল যে, হায়দরাবাদ-সমস্যার সমাধান চাইছেন না লায়েক আলি। সমস্যা এড়িয়ে শুধু সময় পার ক'রে দেবার কৌশল অনুসরণ করেই চলছেন নিজামের এই একরোখা স্বভাবের প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন মনে করছেন যে, এতদিনে তাঁর কথা লায়েক আলির মনের ওপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও লায়েক আলি সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেনের পূর্বের ধারণার কোন পরিবর্তন হয়নি। মাউণ্টব্যাটেন এখনো পূর্বের মতই বিশ্বাস করেন যে, হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রী হবার মত যোগ্যতা লায়েক আলির নেই। এই দুরূহ কূটনৈতিক আলোচনার ব্যাপারে যে পরিমাণ সংযত বিবেচনাশক্তি নিয়ে নিজামের প্রতিনিধির পক্ষে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন, লায়েক আলির মধ্যে তার যথেষ্ট অভাব আছে। বোকা খচ্চরের মত অদ্ভুত একরকমের গোঁ নিয়ে তিনি প্রত্যেক আলোচনায় যে মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছেন, তাতে সমস্যার কোন নিষ্পত্তি তো হতেই পারে না, বরং এই-ভাবে যদি আর কিছুদিন তিনি আলোচনা চালাবার চেষ্টা করেন, তবে ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার ব্যাপারটিই চূড়ান্তভাবে ভেঙে যাবে।

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন বুঝেছেন, আর সময় নেই, যা করবার তা এখনি ক'রে ফেলতে হবে। প্যাটেলও এখন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন, অন্ততঃ আলোচনা করবার মত দৈহিক শক্তি এখন তিনি লাভ করেছেন। মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে এই হলো সুযোগ। এদিকে প্যাটেলকে এবং ভি পিকে পাওয়া যাচ্ছে, ওদিকে নিজাম, মংকটন, লায়েক আলিকেও পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং, আলোচনাকে চরম পর্যায়ে তুলে নিয়ে একটা নিষ্পত্তি ক'রে ফেলবার চরম চেষ্টার সুযোগও এসে পড়েছে। এর মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সত্য সত্যই 'মাঝখানে' থেকে এই আলোচনা পরিচালিত করতে সক্ষম।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল। মীর লায়েক আলির সঙ্গে আলোচনা করবার আগে মাউণ্টব্যাটেন নেহরু, ভি পি এবং মংকটনের সঙ্গে আলোচনা ক'রে নিয়েছেন। গত তিনদিন ধরে প্রতি সকালে অতি বিশদভাবেই প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনা করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। আলোচনা ক'রে চারদফা ব্যবস্থার প্রস্তাব নিয়ে তিনি সমাধানের এক ফরমুলা রচনা করেছেন।

মাউণ্টব্যাটেন আশংকা করছিলেন যে, হায়দরাবাদের অবিলম্বে রাষ্ট্রভুক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থার প্রস্তাবে প্যাটেল এখন আর সম্মতি দিতে রাজী হবেন না। মাউণ্টব্যাটেনের এই নতুন ফরমুলার খসড়াপত্র নিয়ে ভি পি মুসৌরিতে গিয়ে প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করলেন। ভি পি ফিরে আসার পর মাউণ্টব্যাটেন যেমন বিস্মিত তেমনি নিশ্চিন্তও হলেন, কারণ, প্যাটেল আপত্তি করেননি। মাউণ্টব্যাটেনের ফরমুলাকে সুযোগ দিতে রাজী হয়েছেন প্যাটেল।

মাউণ্টব্যাটেনের উদ্ভাবিত চারদফা ব্যবস্থার প্রস্তাব হলো এইঃ

(১) কাশিম রেজভিকে অবিলম্বে সামলাতে হবে। তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রথমে রাজাকর দলের মিছিল, জনসভা, বিক্ষোভ এবং বক্তৃতা নিষিদ্ধ করতে হবে।

(২) হায়দরাবাদ রাজ্য কংগ্রেসের যেসব সদস্যকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে, তাঁদের মুক্তি দিতে হবে। অবিলম্বে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কারাগার থেকে ছেড়ে দিয়ে বন্দিমুক্তির উদ্যোগ আরম্ভ ক'রে দিতে হবে।

(৩) অবিলম্বে দুই সম্প্রদায়ের লোক নিয়ে হায়দরাবাদের বর্তমান গবর্ণমেণ্টকে পুনর্গঠিত করতে হবে। পুনর্গঠন নামে-মাত্র হ'লে চলবে না, যথার্থ পুনর্গঠন চাই।

(৪) অত্যল্পকালের মধ্যে জন-সাধারণের প্রতিনিধিত্ব-সম্পন্ন দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বর্তমান বৎসর শেষ হবার আগেই একটি গণপরিষদ গঠন ক'রে ফেলতে হবে।

মংকটন এই চার-দফা প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। মাউণ্টব্যাটেনকে তিনি একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করবার পক্ষেই তিনি নিজামকে পরামর্শ দান করবেন। আর একটি ইচ্ছার কথা বলেছেন মংকটন। মীর লায়েক আলির বদলে অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করবার জন্য তিনি নিজামকে বলবেন। মীর লায়েক আলিকে ভারতীয় সরকারী মহলে প্রত্যেকে অবিশ্বাস করেন, এটা এখন উপলব্ধি করেছেন মংকটন। বর্তমানে যদি দিল্লীতে নিযুক্ত নিজামের এজেণ্ট জেনারেল জইন ইয়ার জঙ্গ হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন, তবেই সবচেয়ে ভাল হয়।

জইন ইয়ার জঙ্গ প্রধান মন্ত্রী হলে নিজামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখানকার সংশয় ও অবিশ্বাসের ভাব যতখানি দূরীভূত হবে, আর কোন ব্যক্তির নিয়োগে ততখানি হবে কি না সন্দেহ। কারণ এজেন্ট-জেনারেল জইন ইয়ার জঙ্গের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং সুরুচিসম্পন্ন স্বভাবের পরিচয় এখানে অনেকেই পেয়ে গেছেন। নিজামের প্রতি তাঁর আনুগত্যের কোন অভাব নেই এবং সে সম্বন্ধে সন্দেহেরও কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বুঝা গেছে যে তিনি যথেষ্ট বাস্তবসচেতন বুদ্ধিধর মানুষ। জইন ইয়ার জঙ্গ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের মনে, বিশেষ ক'রে ভি পি মেননের মনে খুবই ভাল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল। মঙ্কটন এবং লায়েক আলি হায়দরাবাদ চলে গেছেন। আজ গবর্ণমেণ্ট হাউসে দু'জন নতুন অতিথি এসেছেন—কাশ্মীরের মহারাজা ও মহারাণী। অতিথিদ্বয় চারদিন এখানে অবস্থান করবেন।

কাশ্মীরের মহারাজা এবং মহারাণী গবর্ণমেণ্ট হাউসের অতিথিরূপে এসেছেন, কিন্তু এ ঘটনাও এমনিতে বা সহজে হয়নি। এর জন্যও দস্তুরমত একটা ফরমুলা আবিষ্কারের চেষ্টা আমাদের করতে হয়েছে। হায়দরাবাদের সমস্যা সমাধানের জন্য ফরমুলা রচনার চেষ্টায় আমাদের যতটা মন লাগিয়ে খাটতে হয়েছে, কাশ্মীরের মহারাজা ও মহারাণীকে গবর্ণমেণ্ট হাউসের অতিথিরূপে আনবার চেষ্টা করতে গিয়েও প্রায় ততটাই করতে হয়েছে।

প্যাটেলের কাছ থেকেই মাউণ্টব্যাটেনের কাছে প্রথম অনুরোধ এসেছিল—কাশ্মীরের মহারাজাকে একবার আমন্ত্রণ করা হোক্। মাউণ্টব্যাটেনই যেন মহারাজাকে আমন্ত্রণ করেন, এই ছিল প্যাটেলের প্রস্তাব। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন বুঝলেন যে, তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে মহারাজাকে আমন্ত্রণ করেন, তবে তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত অথবা বিকৃত ধারণা বহুদূরে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে। মাউণ্টব্যাটেনের আশঙ্কা ছিল, বিশেষ করে ভারতের বাইরে এই আমন্ত্রণের ব্যাপার নিয়ে একটা জল্পনার সৃষ্টি হবে এবং মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশ্যও বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হবে। মাউণ্টব্যাটেন তাই প্রত্যুত্তরে প্যাটেলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, স্বয়ং প্যাটেলই যেন ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কাশ্মীরের মহারাজাকে আমন্ত্রণ করেন এবং সেই সঙ্গে যেন এই কথাও মহারাজাকে জানিয়ে দেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট সানন্দে মহারাজাকে গবর্ণমেণ্টের অতিথিরূপেই গবর্ণমেণ্ট-হাউসে রাখবার ব্যবস্থা করবেন। মাউণ্টব্যাটেনের অনুরোধ অনুযায়ী প্যাটেলও মহারাজাকে ভিন্ন পত্রে সরকারীভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন; কিন্তু মহারাজাই প্রত্যুত্তরে জানালেন যে, মাউণ্টব্যাটেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আমন্ত্রণ না করলে তিনি আসবেন না। মাউণ্টব্যাটেন অগত্যা ব্যক্তিগতভাবেই নিমন্ত্রণ করলেন এবং মহারাজাও এলেন। কিন্তু আমার ফাইলে ক'দিন আগের একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি এখনো রয়েছে, যেটা পড়লে এইটুকু সুস্পষ্টভাবেই মনে হবে যে, প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য মহারাজা দিল্লীতে আসছেন। এই বিজ্ঞপ্তি এখনো প্রচার করা হয়নি, প্রচার করবার কথা; কিন্তু আমি মনে করছি, এ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ কাশ্মীরের মহারাজা ভারতে এসে কা'র অতিথি হয়ে গবর্ণমেণ্ট হাউসে রয়েছেন, এ বিষয় নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামাবে না। মহারাজার এতটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব এখন আর নেই। ঘটনার স্রোত অনেক দূর প্রবাহিত হয়ে গেছে।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২১শে এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল। প্যাটেল মুসৌরী থেকে দিল্লী ফিরে এসেছেন। মাউণ্টব্যাটেন সপরিবারে আজ প্যাটেলকে দেখতে গিয়েছিলেন। প্রায় পঁচিশ মিনিটকাল প্যাটেলের কাছে কাটিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউণ্টব্যাটেন পরিবারকেও কাছে দেখতে পেয়ে এবং আলাপ করে প্যাটেল খুবই খুশি হয়েছেন।

আজ গবর্ণমেণ্ট হাউসে ভি পি মেননের ঘরে চা-এর আসরে দশ-বার জন সাংবাদিকও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ভারতীয় এবং য়ুরোপীয়, উভয় শ্রেণীর সাংবাদিকরাই উপস্থিত ছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গে সাংবাদিকদের পরিচয় করিয়ে দেবেন, এই উদ্দেশ্যেই ভি পি এই চা-এর অনুষ্ঠান করেছিলেন।

কাশ্মীরের মহারাজাকে দেখলাম। দেখে মনে হলো, তিনি যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছেন। কথাও বললেন খুব সামান্য। রাজধানী শ্রীনগর থেকে তিনি কিভাবে এবং কেমন করে চলে আসতে পারলেন, সাংবাদিকরা এই প্রশ্ন করলেও মহারাজা চুপ ক'রে রইলেন। উত্তর দিলেন অন্য এক রাজন্য-ভাই। নবনগরের জামসাহেব যেন গোষ্ঠীগত সহানুভূতির আবেগে রাজন্য-গোষ্ঠীর এক ভ্রাতার মুখরক্ষার জন্য অনেক বাখান ক'রে এক কাহিনী শোনালেন। কাশ্মীরের মহারাজার সাহস এবং কর্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন জামসাহেব।

চা-এর আসর থেকে চলে আসার পর আমি কাশ্মীরের মহারাজার কথাই একবার চিন্তা ক'রে দেখলাম। জামসাহেব কাশ্মীর-মহারাজার গুণগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। কিন্তু মনে হচ্ছে জামসাহেব বড় বেশি পুরু পালেস্তার দিয়ে এক রাজন্য-ভাইয়ের বহু ত্রুটি মলিনতা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন। মাত্র কাশ্মীরের মহারাজাকে দেখে মনে হলো, তিনি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। তাঁর মনের অবস্থাও শোচনীয়। তিনি সদা-সর্বদা অত্যন্ত তীব্রভাবে শুধু এই অভিযোগই ক'রে চলেছেন যে, তাঁর ওপর অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁর প্রাসাদও সরকারী কাজের জন্য দখল ক'রে নিয়েছেন। মহারাজা অভিযোগ করেছেন, তাঁর প্রাসাদ নিয়ে নেবার আগে গবর্ণমেণ্ট তাঁকে চিঠি দিয়ে একবার জানাবার প্রয়োজনও উপলব্ধি করেননি। মাউণ্টব্যাটেনের কাছে এই প্রশ্ন করছেন মহারাজা, এই অবস্থার প্রতিকার কোথায়? কার কাছে গেলে তিনি সুবিচার পাবেন? এই সব অসম্মানের হাত থেকে কে তাঁকে রক্ষা করবে? মহারাজার এই অভিযোগের কথা প্যাটেলকে জানিয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। প্যাটেল মাউণ্টব্যাটেনকে এইটুকু কথা মাত্র দিয়েছেন যে, তিনি এ বিষয়ে নেহরুর সঙ্গে আলোচনা করবেন।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন, গতকাল মহারাজার সঙ্গে তাঁর অনেক আলোচনা হয়েছে। কাশ্মীরের বিগত ঘটনাবলীর তাৎপর্য এবং তথ্য সম্বন্ধে মহারাজার সঙ্গে আলোচনা ক'রে মহারাজার মনের এক বিচিত্র অবস্থার পরিচয় পেয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউণ্টব্যাটেন অনুযোগের সুরেই মহারাজাকে বলেছেন,—'বিগত জুন মাসেই আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, ১৫ই আগস্টের আগেই আপনার মন স্থির ক'রে দুই ডোমিনিয়নের কোন একটি ডোমিনিয়নে যোগদান ক'রে ফেলা কর্তব্য। কিন্তু আপনি আমার সে পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। তার ফলে কাশ্মীরের আজ এই অবস্থা।'

মহারাজা তাঁর সিদ্ধান্তহীনতারই পক্ষে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা ক'রে বললেন—"দেখতেই তো পাচ্ছেন, এতদিন দেরী ক'রেও ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রভুক্ত হওয়ামাত্র

হাঙ্গামা কি ভয়ানকভাবে দেখা দিল। যদি আরও আগে ভারতে যোগদান করতাম, তাহলে আরও কত বেশী ভয়ানক হাঙ্গামা দেখা দিত, সেটাই ভেবে দেখুন।"

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন বললেন, মহারাজা যদি যথাসময়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়তেন, তাহ'লে পাকিস্থান এক পা'ও অগ্রসর হতে পারতেন না। তেমনি যদি যথাসময়ে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হবার চুক্তিপত্রে তিনি স্বাক্ষর দান করে ফেলতেন, তবে ভারতও কিছুই বলতেন না কোন আপত্তি করতেন না। মাউণ্টব্যাটেন স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, প্যাটেল এ বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি তে. পূর্বেই ঘোষণা করে রেখেছিলেন।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল। গত ১৯শে এপ্রিল তারিখে মঙ্কটন হায়দরাবাদ ছেড়ে লন্ডনে চলে গিয়েছেন। লণ্ডন থেকে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে এক পত্র লিখেছেন মঙ্কটন। নিজামের সঙ্গে মঙ্কটনের যে সব কথা হয়েছে, এই পত্রে তাই উল্লেখ করে মঙ্কটন বলেছেন যে, চার দফা ব্যবস্থার প্রস্তাব নিয়ে রচিত মাউণ্টব্যাটেনের 'ফরমুলো' নিজাম মেনে নিতে রাজী হবেন বলে মনে হয় না। দিল্লীর এই ফরমুলোর মধ্যে যে প্রস্তাব সম্পর্কে হায়দরাবাদ সবচেয়ে বেশী গোলমাল বাধাবে, সেটা হলো অবিলম্বে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। গবর্ণমেণ্ট গঠনের পদ্ধতি নির্ণয় সম্পর্কেই সমস্যা রয়েছে। এ বিষয়ে নিজাম যে অভিমত পোষণ করেন, তাতে ভারত-হায়দরাবাদ বিরোধের মীমাংসা শীঘ্র অথবা সহজে কখনই সম্ভবপর হবে না। তা ছাড়া, গণপরিষদ গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কেও নিজামের আপত্তি আছে। জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে গণপরিষদ গঠন করতে রাজী হবেন না নিজাম, কারণ, তার ফলে গণপরিষদে হিন্দু প্রতিনিধিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবেন। এক সপ্তাহের মধ্যে এ রকম হিন্দুপ্রধান গণপরিষদ গঠন নিজামের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভবপর ব্যাপার। মঙ্কটন অবশ্য নিজামকে একটি বিষয় জোর দিয়েই বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, রাজ্যের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে যতদূর সাধ্য একটা প্রতিনিধিত্বমূলক গবর্ণমেণ্ট গঠন করার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মঙ্কটনকে আরও কিছুকাল উপদেষ্টা হিসাবে হায়দরাবাদে থাকবার জন্য অবশ্য অনুরোধ করেছিলেন নিজাম, কিন্তু মঙ্কটন এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। মঙ্কটন বলেছেন, হায়দরাবাদের বর্তমান গবর্ণমেণ্টের বদলে নতুন গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত না হলে এবং নতুন গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তিনি পরামর্শ দানের দায়িত্বও আর পালন করতে সক্ষম হবেন না। বর্তমান গবর্ণমেণ্ট যতদিন আছেন, ততদিন তাঁর পক্ষে উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত থাকার অর্থ নিজের বিচারবুদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করা মাত্র।

দিল্লীতে আমরা সকলেই আশা করেছিলাম যে, মাউণ্টব্যাটেনের চার দফা প্রস্তাব সমর্থন করে এবং গ্রহণ করে নিজাম শীঘ্রই একটি ফারমান ঘোষণা করবেন। ফারমান ঘোষণা করতে অবশ্য নিজাম দেরি করেন নি, গতকালই ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের আশাটাই নিতান্ত অমূলক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। নিজাম এক কথাতেই চার দফা প্রস্তাবের সকল মনস্তাত্ত্বিক গুরুত্ব ও বাস্তব সার্থকতা ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

নিজাম তাঁর ফারমানে এইটুকু মাত্র বলেছেন যে, হায়দরাবাদের বর্তমান অন্তর্বর্তী ও অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নেই, তাঁদের আহ্বান করা হবে গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যথাযোগ্য দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। এই উক্তির পর আর একটি উক্তিতে নিজাম যেন হঠাৎ এক মরণ-কামনার বশে তাঁর সেই পুরণো সাধের তত্ত্বটিই আর একবার ঘোষণা করেছেন—"অন্যত্র যে ধরণের গবর্ণমেণ্ট যে পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তারই হুবহু অনুকরণ করে কোন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা হায়দরাবাদে সম্ভবপর হতে পারে না। আমি এই আশঙ্কা পোষণ করি যে, বাইরের কোন গবর্ণমেণ্টের গঠন-তন্ত্রের অনুকরণ করে হায়দরাবাদে গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হলে হায়দরাবাদের বাতাস ঠিক সে-রকমই বিষাক্ত হয়ে উঠবে, যে রকম বাইরের অন্যান্য স্থানে হয়ে উঠেছে।"

শত সদিচ্ছা নিয়েও মীমাংসার চেষ্টা করলে এই ধরণের নিজামী মনোবৃত্তির সঙ্গে কাজ করার আশা বৃথা, সাফল্য আশা করা বৃথা। কত ক্ষুদ্র ও সামান্য বস্তুর জন্য জেদ করতে গিয়ে নিজাম একটা বৃহৎ লাভের সম্ভাবনাকে কত সহজে উপেক্ষা করতে পারছেন, এটাই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। এর কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৪৮ সাল। হায়দরাবাদ ক্রমশঃ আরও উত্তেজনার কারণ ঘটিয়ে চলেছে। হায়দরাবাদে সীমানা অঞ্চলে উপদ্রব ও হাঙ্গামা খুব বেশী করেই চলছে। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াচ্ছে যে, যাদের মাথা আগেই গরম হয়ে উঠেছিল, তাদের মনের ধূমায়িত জ্বালা এখন বস্তুতঃ শিখায়িত হয়ে উঠছে। গত শনিবার বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে নেহরু যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তার একটি রিপোর্ট আজ হাতে এসেছে। নেহরু বলেছেন—'হায়দরাবাদের সম্মুখে এখন মাত্র দুটি পথ খোলা পড়ে রয়েছে, রাষ্ট্রভুক্তি অথবা যুদ্ধ। এই দুই পথের মধ্যে যে কোন একটি পথ বেছে নেওয়া ছাড়া হায়দরাবাদের এখন আর অন্য কোন পথ নেই।' নেহরুর এই উক্তিতে ভারতের রাজনৈতিক উত্তাপের মাত্রা এখন একেবারে স্ফুটনাঙ্কে গিয়ে উঠেছে।

সংবাদপত্রে নেহরুর বক্তৃতার এই বিবরণ যেদিন প্রকাশিত হয়েছে, সেদিন মাউণ্টব্যাটেনের চোখে এই সংবাদটি পড়েনি। পরের দিন সংবাদটি পাঠ করে মাউণ্টব্যাটেন বস্তুতঃ আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। 'রাষ্ট্রভুক্তি অথবা যুদ্ধ'—এই শিরোনামা দিয়ে নেহরুর বক্তৃতার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময় দিল্লীর বাইরে ছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। দিল্লীতে ফিরে এসেই তিনি নেহরুর কাছে জানতে চাইলেন, এ রিপোর্ট কি সত্য?

নেহরু যেমন বিস্মিত তেমনি বিড়ম্বিত হলেন। নেহরু বললেন যে, তাঁর বক্তৃতার সম্পূর্ণ ভুল রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁর বক্তৃতায় রাষ্ট্রভুক্তি অথবা যুদ্ধের কোন উল্লেখই করেননি। ভুল রিপোর্ট প্রচারিত হবার মূল কারণ হলো জনৈক মাদ্রাজী ষ্টেনোগ্রাফারের ভুল, যিনি রিপোর্ট লিখবার সময় নেহরুর হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার অর্থই ধরতে পারেননি।

নেহরু বলেছিলেন যে, পরের দিন এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে তিনি এই ভুল রিপোর্টের প্রতিবাদ করে এবং তাঁর প্রকৃত বক্তব্য সুস্পষ্ট করে একটি বিবৃতি দেবেন। কিন্তু এক সপ্তাহ পার হয়ে গেছে, তবুও কোন সাংবাদিক সম্মেলন আহূত হতে দেখা গেল না এবং নেহরুও ভুল রিপোর্টের সংশোধন করে কোন বিবৃতি দিলেন না। সংবাদ-জগতে এটা একটা কুৎসিত সত্য যে, কোন মিথ্যা সংবাদ একবার প্রচারিত হয়ে গিয়ে জনসাধারণের মনে যে ধারণা সৃষ্টি করে দেয়, সে ধারণা পরবর্তী বহু প্রতিবাদেও সম্যক্‌ভাবে দূরীভূত হয় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ প্রচারিত হলেও মিথ্যা ধারণার

বড় জোর দশ ভাগের এক ভাগও দূরী-ভূত হয় কি না সন্দেহ। ওদিকে হায়দরা-বাদেও মীর লায়েক আলিও আইন পরি-ষদে একটি বড় বক্তৃতা দিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে মাউণ্টব্যাটেনের চার-দফা প্রস্তাবের কোন উল্লেখই করেননি। লায়েক আলির এই কীর্তিতে শুধু এইটুকু মাত্র 'লাভ' হতে পারে যে, নিজামের ফারমানের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে দিল্লীর মন হতে বিশ্বাসের অবশেষটুকুও এইবার ক্ষয় হয়ে যাবে।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ৪ঠা মে, ১৯৪৮ সাল। হায়দরাবাদের অচল-অবস্থা লক্ষ্য করে মাউণ্টব্যাটেন খুব বেশী উদ্বেগ বোধ করেছেন। আর মাত্র ছয় সপ্তাহ বাকী আছে, তার পরেই রাজগোপালা-চারীর হাতে এই বিরাট রাষ্ট্রের গবর্ণর-জেনারেলের সকল দায়িত্ব অর্পণ করে মাউণ্টব্যাটেন স্বদেশে প্রস্থান করবেন। মাউণ্টব্যাটেনের মনের ইচ্ছা, যাবার আগে হায়দরাবাদ-সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান করে দিয়ে খুশি মনে তিনি ভারত ছেড়ে চলে যাবেন। সময় খুবই কম এবং সেই জন্যেই শেষবারের মত একটা চেষ্টা করতেই হবে। ভারত গবর্ণ-মেণ্ট এবং নিজাম, উভয়েরই এখন বুঝা উচিত যে, সময় আর বেশী নেই। মত-ভেদের সব ব্যাপার এখন খুব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলার জন্য দুই পক্ষেরই বিশেষ-ভাবে উদ্যোগী হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন বুঝতে পারছেন না, কেমন করে কি ব্যবস্থা তিনি করতে পারেন। কিভাবে কা'কে বুঝিয়ে প্রভাবিত করতে পারলে সবচেয়ে বেশী কাজ হবে? মঙ্কটনও এখন আর নেই, সুতরাং মাউণ্টব্যাটেন আরও বেশী অসুবিধায় পড়েছেন।

শেষ পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেন এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, তিনি নিজামকে শেষবারের মত সতর্ক করে দিয়ে এক পত্র দেবেন। কিন্তু আমি আপত্তি করেছি। আমি বলেছি, অন্যভাবে চেষ্টা করার সকল উপায় পরীক্ষা না করে এখনই এই ধরণের শেষ-পত্র দিয়ে সতর্ক করে দেওয়া উচিত হবে না। অন্যভাবে সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে তবেই শেষ-পত্র দেওয়া অথবা সতর্ক করে দেবার প্রশ্ন উঠতে পারে তার আগে নয়। নিজামকে দেবার জন্য 'শেষ-পত্রের' একটা খসড়াও রচনা করে ফেলেছিলেন মাউণ্টব্যাটেন। আমি বলেছি, যে ধরণের ভাষায় এবং যে সব যুক্তি ও বক্তব্য উল্লেখ করে এই পত্র রচনা করা হয়েছে, সেটা বর্তমানে ভারত ও হায়দরাবাদের পারস্পরিক মনোভাব আরও ক্ষুন্ন করতেই সাহায্য করবে। এটা ভুল পন্থা।

হিজ এক্সেলেন্সির কূটনীতিক দক্ষতার ও সাফল্যের সবচেয়ে বেশী পরিচয় তখনই পাওয়া যায়, যখন তিনি প্রতিপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলো-চনার দ্বারা মীমাংসার পথ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। এটা মাউণ্টব্যাটেনের প্রতিভার একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমার মতে এখন নিজামের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের একটা সাক্ষাৎকার হওয়া প্রয়োজন। সাক্ষাতে নিজামের সঙ্গে আলোচনা করলে মাউণ্টব্যাটেন নিজামকে প্রভাবিত করতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন হায়দরাবাদে যেতে চাইবেন না। এ বিষয়ে মাউণ্ট-ব্যাটেনের আপত্তি যে খুবই যুক্তিসঙ্গত, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় নিজামকে দিল্লীতে আনিয়ে আলোচনা করাই একমাত্র পন্থা। আমি প্রস্তাব করেছি, আলোচনা সম্বন্ধে কোন রকম সর্ত অথবা বাধ্যবাধকতা আরোপ না করে নিজামকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করা হোক্।

মাউণ্টব্যাটেন আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন। ভি পি বললেন, নিজামকে দিল্লীতে আমন্ত্রণ করলে নিজাম প্রত্যুত্তরে মাউণ্টব্যাটেনকেই হায়দরাবাদে যেতে আমন্ত্রণ করবেন। নিজাম এর আগেও মাউণ্টব্যাটেনকে কয়েকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সুতরাং তিনি আর এক-বার নতুন করে আমন্ত্রণ করবেন। মাউণ্ট-ব্যাটেন নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী আছেন, এটা প্রমাণিত হবার পর নিজামের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করবার কোন যুক্তি মাউণ্টব্যাটেনের আর থাকবে না। ভি পি অবশ্য স্বীকার করলেন যে, একটা যুক্তি অবশ্য পাওয়া যাবে। মাউণ্টব্যাটেনের হাতে সময় এখন খুব কম, আর ছয় সপ্তাহ পরেই তাঁকে চলে যেতে হবে—এই যুক্তি দেখিয়ে মাউণ্টব্যাটেন এখন হায়দরাবাদে যাবার জন্য নিজামী আমন্ত্রণ রক্ষার অক্ষমতা জ্ঞাপন করতে পারবেন।

সিদ্ধান্ত হলো, নিজামকেই দিল্লীতে আসবার জন্য অনুরোধ করবেন মাউণ্ট-ব্যাটেন। নিমন্ত্রণপত্রও রচনা করা হলো। নিমন্ত্রণপত্র নিয়ে আমি চললাম কিংস-ওয়েতে অবস্থিত হায়দরাবাদ হাউসে, যেখানে অতিমান্য নিজামের এজেণ্ট-জেনারেল জইন ইয়ার জঙ্গ অবস্থান করেন।

কিংসওয়ের প্রান্তে অবস্থিত হায়দরা-বাদ হাউসে প্রবেশ করেই প্রথমে বিরাট এক ড্রইংরুমের অভ্যন্তরে গিয়ে বসলাম। ড্রইংরুমের দরজা ও জানালার পর্দা গোটানো ছিল। চোখে পড়লো, একটু দূরেই রয়েছে নিজামের দুই সুন্দরী পুত্রবধূর দুটি বড় ফটোগ্রাফ। নিজামের এই পুত্রবধূদ্বয়ের মধ্যে একজন হলেন তুর্কীর খলিফার কন্যা এবং আর একজন হলেন নিকট-সম্পর্কে খলিফার ভগিনী। সুতরাং এই দুটি ফটোকে অতিমান্য নিজামেরই আভিজাতিক আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বলতে পারা যায়। ইসলামীয় ধর্মতন্ত্রের এবং বংশগত মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য নিজাম কতখানি আগ্রহ পোষণ করেন, খলিফার সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপনের দ্বারাই তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন।

ড্রইংরুমে প্রবেশ করলেন জাইন ইয়ার জঙ্গ ও তাঁর এক ছেলে। ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয়ও করিয়ে দিলেন। তিনজনে এক টেবিলে চা খেলাম। জাইন ইয়ার জঙ্গকে অত্যন্ত মার্জিতরুচি ও সৌজন্যশীল মানুষ বলেই মনে হলো। ইত্তেহাদসুলভ গোঁড়ামির কোন চিহ্ন তাঁর আচরণে অন্ততঃ পেলাম না। ইত্তেহাদী অভিসন্ধির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক আছে, এরকম কোন ধারণা করাও আমার পক্ষে সম্ভবপর হলো না। অথচ এটা জানি যে, ইত্তেহাদ দল জাইন ইয়ার জঙ্গকে বিশ্বাস করেন এবং নিজামের ওপরেও তাঁর বিশেষ প্রভাব আছে। এর কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে অনেক কথাই মনে আসে, কিন্তু এ বিষয়ে একটু সাবধানে ধারণা করাই উচিত।

নিজামের কাছে মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণ এবং নিজামের দিল্লী আসবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার যা বলবার ছিল, সবই জাইন ইয়ার জঙ্গের কাছে বললাম।

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে নিজামের সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করলেন না জাইন ইয়ার জঙ্গ। তিনি উত্থাপন করলেন পথের অসুবিধার কথা। হায়দরাবাদ থেকে দিল্লী অনেক দূর। যদি এই দূরপথের যাত্রায় নিজামের জন্য যানবাহনের ভাল ব্যবস্থা না করা যায়, তাহলে কি করে দিল্লীতে আসবেন নিজাম? জাইন ইয়ার জঙ্গ বললেন, নিজামকে দিল্লীতে আনতে হলে ট্রেণে তাঁর জন্যে বিশেষ একটি ঠাণ্ডা কামরা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে, তা না হলে তিনি ট্রেণে আসতে চাইবেন

না। বিমানযোজ্ঞা আসার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ অতিমান্য নিজাম বিমান সম্বন্ধে নিছক ঘৃণাই পোষণ করেন। হায়দরাবাদে নিজাম এখনো তাঁর সেই পুরণো ১৯১০ মডেলের রোল্‌সে চড়েই যাতায়াত করে থাকেন।

জাইন ইয়ার জঙ্গ প্রস্তাব করলেন, দিল্লীর বদলে বোম্বাইয়ে মাউণ্টব্যাটেন ও নিজামের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হোক। এক পক্ষ দিল্লীকেই সাক্ষাতের স্থান হিসাবে পছন্দ করছেন, আর এক পক্ষ পছন্দ করছেন হায়দরাবাদকে। এই অবস্থায় দু পক্ষের প্রস্তাবের মধ্যে আপোষ হিসাবে বোম্বাই সহরই সাক্ষাতের উপযুক্ত স্থান বলে মনে করছেন জাইন ইয়ার জঙ্গ। তাছাড়া আর একটি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করছেন জাইন ইয়ার জঙ্গ। তিনি বললেন, এই সাক্ষাৎকারের সময় মঙ্কটনের একবার লণ্ডন থেকে না আসলেই চলবে না। মঙ্কটনের অনুমোদন চাই এবং মঙ্কটনের উপস্থিতি চাই। মঙ্কটনকে ফিরে এসে আর একবার বন্ধ নিজামের হাত ধরতে হবে। শেষ পর্যন্ত জাইন ইয়ার জঙ্গ এইমাত্র আশ্বাস দিলেন যে, নিজাম হয়তো মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণ অনুযায়ী দিল্লী আসতে রাজী হবেন। এ বিষয়ে তিনি একেবারে 'সম্পূর্ণরূপে আশাহীন' নন।

গবর্ণমেণ্ট হাউসে ফিরে এসে জাইন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে আমার আলোচনার মর্মার্থ মাউণ্টব্যাটেনকে জানালাম। বোম্বাইয়ে সাক্ষাতের ব্যবস্থার প্রস্তাব পছন্দ করলেন না মাউণ্টব্যাটেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যেভাবে যোগসূত্র রক্ষা করে গবর্ণর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনকে কাজ করতে হয়, বোম্বাইয়ে নিজামের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলে সেই দিক দিয়ে অনেক অসুবিধার ব্যাপার দেখা দেবে বলে মনে করছেন মাউণ্টব্যাটেন।

ষ্টাফের অভিমত জানতে চাইলেন মাউণ্টব্যাটেন। বোম্বাইয়ে যাবার প্রস্তাব বাদ দিয়ে অন্য কোন পদ্ধতিতে নিজামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের ব্যবস্থা হতে পারে কি না?

নয়াদিল্লী, রবিবার, ৯ই মে, ১৯৪৮ সাল। ভের্ণনের কাছ থেকে আজ জানতে পেলাম যে, মাউণ্টব্যাটেন, ভি পি মেনন এবং জাইন ইয়ার জঙ্গ একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে আলোচনা করেছেন। এই বৈঠকের পর শুধু ভি পি ও জাইনের মধ্যে একটি আলোচনাও হয়ে গেছে। আজই সন্ধ্যায় জাইন হায়দরাবাদ থেকে ফিরেছেন। মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণপত্র সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন জাইন এবং ফিরে এসেছেন নিজামের উত্তর নিয়ে।

নিজামের উত্তর পেয়ে বিস্মিত হননি মাউণ্টব্যাটেন, কারণ তিনি যা অনুমান করেছিলেন, তাই হয়েছে। গত ৬ই মে তারিখেই এক টেলিগ্রামে নিজাম মাউণ্টব্যাটেনকে হায়দরবাদে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জাইন ইয়ার জঙ্গ নিজামের কাছ থেকে যে চিঠি নিয়ে এসেছেন, তাতে সেই পাল্টা-আমন্ত্রণের প্রস্তাবই আরও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। টেলিগ্রামটি ৬ই মে তারিখের এমন এক সময়ে হায়দরাবাদ থেকে ছেড়েছিলেন নিজাম, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জাইন ইয়ার জঙ্গ হায়দরাবাদে পোঁছবার আগে তিনি মাউণ্টব্যাটেনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বুঝা যায়, একটা প্রমাণ তৈরী ক'রে রাখবার জন্যই ৬ই মে তারিখের টেলিগ্রামটি বিশেষ একটি সময়ে প্রেরণ করেছেন নিজাম। মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে হায়দরাবাদযাত্রী জাইন ইয়ার জঙ্গ যখন বিমান পথে ছিলেন সেই সময়ে অর্থাৎ জাইন ইয়ার জঙ্গ হায়দরাবাদ পোঁছবার আগেই নিজাম এই টেলিগ্রাম করেছেন। এর দ্বারা নিজাম এই তথ্য তৈরী করে রাখলেন যে, তিনি সত্য সত্যই 'পাল্টা আমন্ত্রণ' করেননি, মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণ-পত্র পাওয়ার আগেই স্বাভাবিক আগ্রহে মাউণ্টব্যাটেনকে হায়দরাবাদের অতিথিরূপে দেখবার জন্য তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

জাইন ইয়ার জঙ্গ যে চিঠি এনেছেন, তাতে দেখা গেল যে, দিল্লীতে আসবার প্রস্তাব সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'না' জানিয়ে দিয়েছেন। নিজাম বলেছেন যে, তিনি স্বয়ং দিল্লীতে উপস্থিত হলে 'হায়দরাবাদে এবং হায়দরাবাদের বাইরে অনেক ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে এবং তিনি এইরকম ভুল ধারণা সৃষ্টির সুযোগ না দিতেই বাধ্য।'

ভের্ণন বললেন, মাউণ্টব্যাটেন এই চিঠি পেয়েও এখনো তাঁর 'পরাজয়' স্বীকার করছেন না। এখনো মাউণ্টব্যাটেনের মনে এই বিশ্বাস টগবগ করছে যে, নিজামকে একবার মুখোমুখি পেলে তিনি অবশ্যই রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাবে নিজামকে রাজী করাতে সমর্থ হবেন।

জাইন এসে এই খবরও দিয়েছেন যে, হায়দরাবাদের রাজনৈতিক অবস্থা সুস্পষ্টভাবেই আরও খারাপের দিকে চলেছে। হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্টের বহু সমর্থক এখন রাজাকরদের সমর্থক হয়ে পড়েছে। মীর লায়েক আলির বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হতে চলেছিল, কিন্তু কোনগতিকে সে প্রস্তাবের উত্থাপন বন্ধ করা গেছে। জাইন বলেছেন, এখন হায়দরাবাদের অনেকের মন এমন চরমপন্থী হয়ে উঠেছে যে, কাশিম রেজভিকেও তারা আপোষবাদী নরমপন্থী ব'লে প্রচার করতে আরম্ভ করেছে। ভি পি মেনন শান্তভাবেই জাইন ইয়ার জঙ্গের সব কথা শুনেছেন। হায়দরাবাদের দাবীর যেসব কথা শুনতে পেলেন ভি পি, সে সম্বন্ধেও সহিষ্ণু মনোভাবেরই পরিচয় দিলেন। তিনি হায়দরাবাদকে কতগুলি বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধার অধিকার দেওয়া সম্বন্ধে, এমনকি উপকূলভাগে বন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য হায়দরাবাদকে পথ দেবার প্রস্তাব সম্বন্ধেও আপত্তি করলেন না। ভি পি বলেছেন, হায়দরাবাদকে এই ধরণের সুবিধা ও অধিকার দিতে তিনি রাজি আছেন।

কিন্তু এর পরেও কি নিজাম রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দানের আগ্রহ প্রকাশ করবেন?

ভের্ণন বললেন, হায়দরাবাদ ক্রমেই একটা বিপজ্জনক পরিণামের হেতু পুঞ্জীভূত করে তুলছে। এমন এক অবস্থার দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি, যেখানে গিয়ে মাত্র দু'টি পথ ছাড়া আর কোন পথ পাওয়া যাবে না। হয় বলপ্রয়োগ করতে হবে, কিংবা বল প্রয়োগের শাসানি দিতে হবে—এই দুই পথ।

আমি সমস্যার একটা ভেতরের ব্যাপার যা বুঝেছি, ভের্ণনকে তারও খানিকটা আভাস দিলাম। হায়দরাবাদের এই সব ব্যাপার দেখে আমার মনে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, হায়দরাবাদের প্রকৃত প্রভু কে? হায়দরাবাদ রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃত অধিকার এখন কার হাতে? নিজামের অবস্থাই বা কি? সত্য সত্যই কি তিনি এখনো রাজ্যের রাজনৈতিক বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করবার যোগ্যতা রাখেন?

আরও একটা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। নিজাম তাঁর নিজের সম্পর্কেই বা কি ধারণা পোষণ করেন? তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং রাজ্যের বাইরের জনমতে তিনি কতখানি ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী ব'লে বিবেচিত হয়ে থাকেন?

এসব বিষয়ে নিজাম তাঁর মনে যে ধারণা পোষণ করে থাকেন, সেটাই একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে ব'লে আমি মনে করি। নিজামের এই আত্মধারণাগুলিকে সোজা উপেক্ষা করা সুবিবেচনার কাজ হবে না। ব্যক্তিগতভাবে নিজামের গুরুত্বটুকু লঘু করে দেবার চেষ্টা না ক'রে বরং তার রাজনৈতিক মূল্য স্মরণে রেখেই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত।

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলাম। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, নিজাম এখন বস্তুতঃ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, মীর লায়েক আলিকে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য নিজামকে অনুরোধ করা হয়েছিল। এই অনুরোধ শুনে নিজাম মনঃক্ষুণ্ণ হননি, রাগও করেননি। নিজাম শুধু পাল্টা প্রশ্ন করেছেন—তাহ'লে প্রধান মন্ত্রী হবেন কে? কাকে ও'রা (ভারত গবর্ণমেণ্ট) চাইছেন?

নয়াদিল্লী, সোমবার, ১০ই মে, ১৯৪৮ সাল। মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে নিজামের ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ ও আলোচনার কোন উপায় উদ্ভাবন করা ষ্টাফের পক্ষে খুবই কঠিন, কারণ স্বয়ং নিজামই এখন কি অবস্থায় আছেন, সে সম্বন্ধে সঠিক তথ্য ষ্টাফের জানা ছিল না। জানা সম্ভবপরও হচ্ছে না। নিজাম সত্য সত্যই নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী চলবার ক্ষমতা এখনো রাখেন কি না, অথবা পরের ইচ্ছা ও ইঙ্গিতের ক্রীড়নকে মাত্র পরিণত হয়েছেন কি না, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত কোন উপায় উদ্ভাবন করাও সম্ভবপর হবে না। আমি ও ভের্নন দুজনেই এ বিষয়ে একমত হয়ে বলেছি যে, বর্তমান হায়দরাবাদের রাজনীতিতে নিজামের প্রকৃত অবস্থার পরিচয়টুকু সঠিকভাবে না জানতে পারলে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে নিজামের সাক্ষাতের কোন উপায় নির্ণয় করা যাবে না।

মাউণ্টব্যাটেন ও নিজামের মধ্যে যে পত্রের আদানপ্রদান হয়েছে, তার বক্তব্য থেকে এইটুকুই বুঝা গেছে যে, আবার একটা অচল অবস্থার মধ্যেই এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। দিল্লীর আমন্ত্রণ নানা তুচ্ছ অজুহাতে উপেক্ষা করেছেন নিজাম, এর পর মাউণ্টব্যাটেনকে হায়দরাবাদে যেতে দিতে কখনই রাজী হবেন না ভারত গবর্ণমেণ্ট। তাছাড়া ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিও এরই মধ্যে তাদের সংবাদ সংগ্রহের সুবিস্তৃত সূত্রজালের সাহায্যে জেনে ফেলেছে যে, নিজামকে দিল্লীতে আনবার জন্য একটা চেষ্টা হয়েছে। এই চেষ্টার সমগ্র কাহিনীই এখন সর্বজনবিদিত তথ্যে পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং এই অবস্থায় মাউণ্টব্যাটেন যদি হায়দরাবাদে যান, তবে সমস্ত ব্যাপারটাকেই নিজামকে তোষণ করবার একটা অবাঞ্ছিত ব্যাপার বলেই লোকের মনে ধারণা হবে।

আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, মাউণ্টব্যাটেনের ষ্টাফেরই কাউকে যদি 'ইংলণ্ড-নৃপতির দূত' গোছের একটা প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা দিয়ে হায়দরাবাদে প্রেরণ করা হয়, তবে কাজ হতে পারে। গবর্ণর-জেনারেল হিসাবে নয়, ইংলণ্ড-নৃপতির ভ্রাতা মাউণ্টব্যাটেন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ষ্টাফেরই কোন ব্যক্তিকে তাঁর প্রতিনিধিরূপে নিজামসকাশে উপস্থিত হবার অধিকার দেবেন। মাউণ্টব্যাটেনের এই ব্যক্তিগত প্রতিনিধি যথোপযুক্ত ও প্রামাণ্য পরিচয়-পত্র মাউণ্টব্যাটেনের কাছ
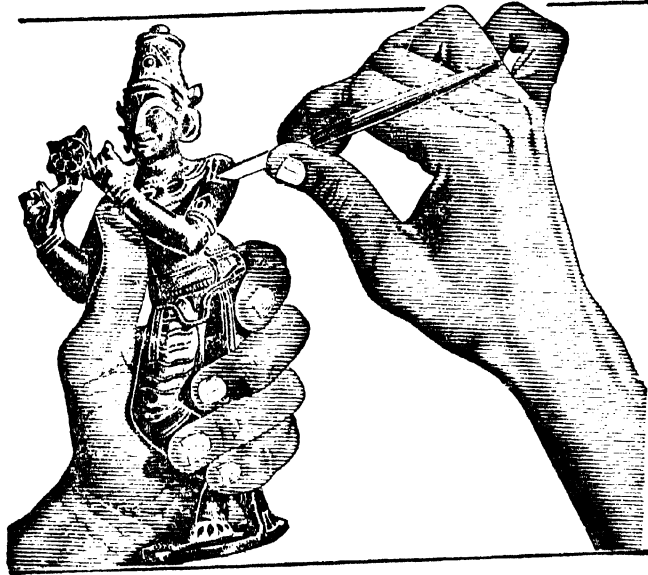
ক নিয়ে যাবেন, যার ফলে তাঁর সঙ্গে লোচনা করতে নিজামের মনে কোন ধা বা আপত্তির কারণও থাকবে না। উণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাতে যেসব মন খুলে বলতে পারতেন নিজাম, উণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত প্রতিনিধির ছেও তাই বলতে পারবেন, এই ধরণের নুরোধসম্বলিত একটি পত্র মাউণ্ট-টেন যদি প্রতিনিধির সঙ্গে দিয়ে দেন। র্তমানের এই বিপজ্জনক অচল বস্থাকে কিছুটা সচল করে তুলতে রা যাবে, যদি মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত তিনিধির সঙ্গেই নিজামের আলোচনার কটা ব্যবস্থা করা যায়।

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করে মরা এই নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করলাম। স্তাব অনুমোদন করলেন মাউণ্টব্যাটেন। ঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই ইচ্ছাও জানিয়ে দলেন যে, ক্যাম্বেল জনসনকেই এই নিয়ে 'রাজার দূতের' ভূমিকায় কাজের র নিতে হবে।

'রাজার দূতের' পরিচয়-পত্রের খসড়া চনা করবার জন্য আমি প্রস্তুত হলাম। উণ্টব্যাটেন বলে গেলেন, তিনি নেহরু এবং জাইন ইয়ার জঙ্গকে এই ব্যবস্থার থা জানিয়ে দেবেন এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি আরও কিছু আলোচনা রবার থাকে, তবে সেসবও তাঁদের জনের সঙ্গে তিনি আলোচনা করে খবেন।

নয়াদিল্লী, বুধবার, ১২ই মে, ১৯৪৮ সাল। সকলেরই অভিমত এই যে, আর দেরি করা উচিত হবে না, আমাকে অবিলম্বে হায়দরাবাদে যেতে হবে। মাউণ্টব্যাটেনের প্রতিনিধিরূপে নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং মুখোমুখি বসে আলোচনা করে বুঝে নিতে হবে হায়দরাবাদের অবস্থার ভেতরের রহস্যটা কি। আরও একটা দায়িত্ব চেপেছে আমার ওপর। যদি সম্ভবপর হয়, তবে নিজাম ও তাঁর পরামর্শদাতাদের মনে একটি বাস্তব সত্যের গুরুত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে। এই রকমের অচল অবস্থা নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না, ভারত সরকারের সঙ্গে আবার আলোচনা আরম্ভ করবার একটা পথ খুঁজে বের করতেই হবে। নিজামকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, মাউণ্টব্যাটেন মাত্র আর কয়েক সপ্তাহ ভারতে আছেন এবং তাঁর অবস্থিতির এই শেষ কয়েকটি দিনের সুযোগ নিজাম ইচ্ছে করলেই ভালভাবে কাজে লাগাতে পারেন এবং ইচ্ছে করাই উচিত।

আজ সকালে আমাদের ষ্টাফের বৈঠকে আমার হায়দরাবাদ যাত্রার প্রস্তাব খুবই আগ্রহের সঙ্গে সমর্থন করলেন ভি পি। সমস্যাগ্রস্ত হায়দরাবাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আর একটি তথ্যও ভি পি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন। এখন যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, হায়দরাবাদে রাজাকর দল ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে মিতালী হয়েছে। এই দুই দল এখন ঐক্যবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে, অথচ হায়দরাবাদের ঘটনাবলীর এই নতুন ব্যাপারটির প্রতি এখনো যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করবার মত মনোভাব কারও বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে না। মাউণ্টব্যাটেন বিশ্বাস করতেই পারছেন না যে, রাজাকর দলে এবং কম্যুনিষ্ট দলে কোন মিতালী আদৌ সম্ভবপর। কিন্তু ভি পি জোর দিয়েই বললেন যে, ঘটনা সর্বাংশে সত্য। ভি পি'র মতে, রাজাকর দল ও কম্যুনিষ্ট দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকেই এখন হায়দরাবাদ-সমস্যার আসল সমস্যা বলে মনে করতে হবে।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ১৩ই মে, ১৯৪৮ সাল। শেষ পর্যন্ত দেশরক্ষা কমিটির একটা বৈঠক আহ্বান করতে পেরেছেন মাউণ্টব্যাটেন। এই বৈঠকে মাউণ্টব্যাটেন কথায় কথায় এমন এক প্রসঙ্গে উপস্থিত হলেন, যখন নেহরু নিজ মুখেই আর একবার সেই প্রতিশ্রুতির কথাই নতুন করে বললেন, যেটা তিনি আগেই মাউণ্টব্যাটেনের কাছে একবার বলেছিলেন। বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম, সুতরাং আমি এইবার স্বকর্ণেই শুনবার সুযোগ পেলাম যে, আমার হায়দরাবাদ যাত্রার প্রস্তাব নেহরু খুশি-মনেই সমর্থন করেছেন। নেহরু বললেন, নিজাম যদি ভারতের রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করেন, তবে নিজামকে রক্ষা করবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁদের যথাশক্তি সকল ব্যবস্থাই করবেন। নিজামের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য সব ব্যবস্থার দায়িত্ব ভারত গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করবেন। আমিও হায়দরাবাদের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমার যে অভিমতের খসড়া রচনা করে গবর্ণর-জেনারেলকে দিয়েছি, তাতে এই সম্ভাবনার দিকটাও আলোচনা করেছি। নিজাম এখন নিজেই তাঁর নিজের ঘরের মালিক নন, এই অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। মনে হচ্ছে, এখন তিনি নিজেই নিজের ঘরে বন্দীর মত অবস্থায় রয়েছেন, ঘরের ওপর কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা তাঁর আর নেই। খুব সম্ভব গোপনে অথচ স্বচ্ছন্দে 'প্রাসাদ-বিপ্লব' ঘটাবার একটা ষড়যন্ত্র চলছে। নিজাম শীঘ্রই তাঁর নিজের লোকের ষড়যন্ত্রের ফলেই প্রভুত্ব হারিয়ে এক রকমের বন্দিদশা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন, এমন অনুমান ভিত্তিহীন নাও হতে পারে।

দেশরক্ষা কমিটির বৈঠক শেষ হবার পর নেহরুর কাছ থেকে আরও কিছু পরামর্শ নেবার জন্য তাঁর সঙ্গে একই মোটরে বের হলাম। নেহরু বললেন যে, তিনি কয়েকটি 'সাধারণ উপদেশ' ছাড়া এ বিষয়ে বিশেষভাবে আর কিছু বলতে ইচ্ছে করেন না। নেহরু বললেন, অশান্তি এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই অনেক সময় অশান্তিকেই এগিয়ে আনবার আসল কারণ হয়ে ওঠে। নেহরু আর একটু পরিষ্কার করে বলে দিলেন যে, হায়দরা-বাদ সীমান্তে প্রতিদিন যেসব হাঙ্গামা ঘটে চলেছে, সেসব এইভাবেই চলতে দেওয়া আর সম্ভবপর নয় এবং গুলী করে মানুষ খুন করবার ঘটনাগুলিকে চুপ করে শুধু তাকিয়ে দেখার কোন অর্থ হয় না।

গবর্ণমেণ্ট হাউসে ফিরে এসে দেখলাম, মাউণ্টব্যাটেন ও ভি পি এখনো আলোচনা করছেন। মাউণ্টব্যাটেন খুবই আশা পোষণ করছেন যে, আমার হায়দরা-বাদ যাত্রা সুফলপ্রসূ হবে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন,—আপনাকে হায়দরাবাদ গবর্ণ-মেণ্টেরই অতিথি হিসাবে যেতে হবে। হায়দরাবাদে আপনি যেখানে থাকবেন ও যেখানে যেতে ইচ্ছে করবেন, তার ব্যবস্থা সবই হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্ট করে দেবেন, এবং আপনাকেও সম্পূর্ণভাবে সেই ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে।

বিকালের শেষ দিকে বেলা পাঁচটার সময় হায়দরাবাদ হাউসে গিয়ে আরও কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার জন্য জাইন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে দেখা করলাম। জাইন ইয়ার জঙ্গ ও তাঁর ছেলে আলি খাঁ'র সঙ্গে কথাবার্তা হলো। জাইন বললেন—সবই ভাল হবে যদি ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁদের দাবী নিজামের ওপর চাপাবার জন্য বেশী বাড়াবাড়ি না করেন।

(ক্রমশঃ)

সাহেব বিবির দেশে

নরেন্দ্র দেব

দক্ষিণ ফ্রান্স্

পারিস থেকে সোজা চলে এলাম মার্সাই। ভূমধ্য সাগরতীর আলোকরা মার্সাই ফ্রান্সের একটি শ্রেষ্ঠ বন্দর। এটি একটি সুন্দর ছোট্ট নগরও বটে। বড় বড় জাহাজ কোম্পানীর যাত্রীবাহী ও মালবাহী পোত সমুদ্রপথে যাতায়াতের বেলা একবার এ বন্দরে এসে নোঙ্গর ফেলেই। পারিস থেকে রেলপথে এলে মার্সাই মাত্র ৫৪৬ মাইল। মোটর কোচে এলে, পথের দূরত্ব এবং ভাড়ার গুরুত্ব দুটোই বেশী। গ্রামের ভিতর দিয়ে যাবার লোভে মোটর ধরবার ইচ্ছাটা ছিল প্রবল, কিন্তু পকেট দুর্বল থাকায় খরচের বহরটা হিসাব করে ঠিক করা গেল, মার্সাই পর্যন্ত রেলেই যাওয়া যাক। মার্সাই থেকে বেরিয়ে সমস্ত রাইভেরিয়াটা বরং মোটরে ঘুরবো। কারণ, টুলোঁ, কান নীস, মঁতে কার্লো, মোনাকো প্রভৃতি দক্ষিণ ফ্রান্সের আকর্ষণীয় স্থানগুলি সবই প্রায় পাশা পাশি। সুতরাং ওগুলি সব টুকটাক্ ক'রে মোটর কোচেই সারা যাবে। যখন এই মোটরে যাবো? কি রেলে যাবো? ভেবে দোনামোনা করছি, পত্নী স্মরণ করিয়ে দিলেন জেরোম কে জেরোমের কথা। 'ডায়ারী অফ এ পিল্‌গ্রিমেজ' বইখানির একস্থানে তিনি বড় রগড় করেই লিখেছিলেন—"বিদেশে বেড়াতে যাচ্ছি শুনে আমার এক বন্ধু মুরুব্বীর মতো মাথা নেড়ে উপযাচক হয়ে বললেন 'তাই তো হে, ওদেশে যাচ্ছো, তা' যথেষ্ট গরম কাপড় সঙ্গে নিচ্ছ তো? জায়গাটা বড় ঠাণ্ডা। মোজা, দস্তানা উলেন ভেস্ট্ এগুলো বেশী করে নিও। ওভার কোট, গরম স্যুট, চেস্টার ফিল্ড্‌কোট এগুলো নিতে যেন ভুলো না!" পরের দিন আর এক বন্ধু আমার বাইরে যাবার খবর পেয়ে মহা উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন "চমৎকার! খাসা জায়গা নির্বাচন করেছো তুমি। ওখানে আর তোমাকে এক রাশি গরম কাপড়ের বোঝা ঘাড়ে করে যেতে হবে না। বেঁচে গেলে। দিব্যি হাল্‌কা হাতে বেরিয়ে পড়ো। স্রেফ্ সাদা সুতীর পোষাক দু' চারটে সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট।"

চতুর জেরোম বুদ্ধি ক'রে দুরকমই সঙ্গে নিয়েছিলেন। আমিও তাই 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা' নীতি অনুসরণে খানিক ট্রেনে খানিক বাসে যাবার ব্যবস্থা করে ফেললাম। রেলপথে আসাটাও কিছু মাত্র খারাপ লাগেনি আমাদের। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দু'পাশে। ফঁতে রোয়ার ঘন অরণ্য, লিয়ঁর পাইন বন, আভিয়োঁর উপত্যকা, আকাশ-ছোঁয়া পপ্‌লার তরু-শ্রেণী, বিস্তৃত কত শস্যক্ষেত, খেলার মাঠ, স্নিগ্ধ সবুজ তৃণভূমি, নদী, নালা, ঝর্ণা, লেক পার হয়ে এলাম। মাঝে মাঝে বড় বড় গির্জার চূড়া মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যেন আমাদের হাতছানি দিচ্ছিল। ক[illegible] আঙুর বাগ, লেবু-বন, আপেল, পিয়া[illegible] আর ফুলের ঝাড়, ছোট-খাটো পাহাড় কত নাম-না-জানা সুদৃশ্য শহর ও গ্রামে[illegible] ঘরবাড়ী, মানুষ-জন ক্ষণে ক্ষণে আকর্ষ[illegible] করছিল আমাদের মন।

মার্সাই আমাদের খুব ভাল লাগলো পাঠক-পাঠিকা আপনারা হয়ত মনে ম[illegible] বলছেন, এরা যা' দেখছে তাই এদের ভা[illegible] লাগছে! এরা নেহাৎ আদেখ্‌লে ভ্রমণকার[illegible] বোধ হয়। কিন্তু তা নয়। ঘু[illegible] বেড়ানোর নেশা আমাদের কিশোরকালে[illegible] শুরু, আজও তা সারলো না। আমার চে[illegible] আমার পত্নীর এ নেশা আরও প্রবল আমাদের বিবাহের পূর্বে আমি বরা[illegible] তাঁকে কখনও এক-জায়গায় ছ'মাস স্থি[illegible] হয়ে থাকতে শুনিনি। আজ তাঁর সং[illegible] পেলাম বিন্ধ্যাচল থেকে, কাল পেলাম আ[illegible] দিল্লী। তিন মাস পরে কলিকাতা। ত[illegible] দুই মাসের মধ্যেই গুজরাট থেকে। আ[illegible] পোরবন্দরের হোটেল থেকে বা সোমন[illegible] তীর্থের পথে ভেরাভেল থে[illegible] তার কয়েক সপ্তাহ পরে শান্তি[illegible] নিকেতন থেকে বা সবরমত[illegible] আশ্রম থেকে, অথবা শিলং পাহাড় থেকে আমাদের উভয়ের মধ্যে সাহিত্যসাধনা[illegible] সাদৃশ্য যতটুকু থাক বা না থাক, এই ভ[illegible] ঘুরেপণার তীব্র নেশা উভয়ের মধ্যেই
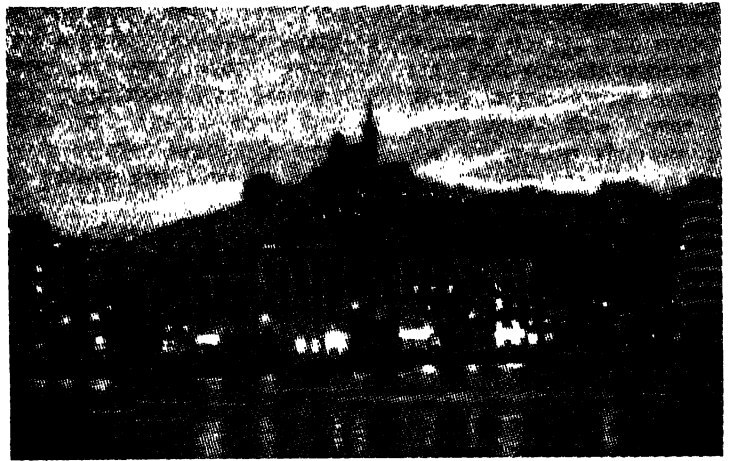
মার্সাই বন্দর (রাত্রের রূপ)

সমান প্রবল, এ সম্বন্ধে সন্দেহের উপায় নেই। উভয়ে মিলিত হবার পূর্বে উভয়েরই জীবনে একমাত্র ব্যসন ও আনন্দ ছিল ভ্রমণ। মিলিত জীবনে সেটা অবরুদ্ধ হোলো না। সামান্যমাত্রও অর্থ হাতে এলে শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত ভ্রমণে ব্যয় করে বরং কিছু ঋণ সংগে নিয়ে ফিরে, উভয়েই উভয়কে উপদেশ দিয়েছি—না, আর নয়। এ' রকম দায়িত্বহীন অমিতব্যয়িতা আর করা হবে না। পরিশেষে এর ফলে একদিন হয়তো দুর্দশাগ্রস্ত হতে হবে। কিন্তু, কোথায় থাকে সেই সুবিবেচনা, ভবিষ্যৎ-চিন্তা, কর্তব্যবুদ্ধি! যখন আবার মন দুলে ওঠে কোনও একটা দূরদেশে যাত্রার স্বপ্নে। কোনও একখানি ভ্রমণকাহিনীর বই পড়তে বসলে তো কথাই নেই। হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোথাও যাওয়া বাকী নেই। সমস্ত সিংহল দ্বীপ পরিভ্রমণ করে এসেছি। প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতিযোগিতায় সাগরমেখলা হিমালয়-কিরীটি ভারতবর্ষ য়ুরোপের কোনও দেশের কাছেই হারবে না, একথা জোর করে বলতে পারি। কিন্তু নগরের সুরুচিকর সজ্জা, পরিচ্ছন্নতা, যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্যময় পথ এবং যানবাহনের নিখুঁত সুব্যবস্থা, থাকা-খাওয়ার সুবিধা, সবার উপরে মানুষের ভদ্র ব্যবহার—এর তুলনা এখানে কোথায় পাবো!

ফ্রান্সের একটি প্রাচীনতম নগর এই মার্সাই। এঁরা বলেন, খৃঃ পূর্ব ৬০০ বছর আগে নাকি এ নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এর প্রাচীনত্বের বিশেষ কোনও নিদর্শন চোখে পড়ল না। শোনা গেল, এই মার্সাই নগর ও বন্দর যে প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, সেই প্রভেনস্ প্রদেশটার অভ্যন্তর প্রদেশে নাকি চারিদিকে সে সব প্রাচীন নিদর্শন ছড়ানো আছে, যেমন—গ্রীক স্থাপত্যকলার ধ্বংসাবশেষ। রোমান কলোশিয়ম বা এ্যাম্ফী থিয়েটার! ভায়াডাক্ট বা পানীয় জলের পয়ঃপ্রণালী। দুর্ভেদ্য প্রাচীর পরিবেষ্টিত সুরক্ষিত নগর ও প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ ইত্যাদি। মোটরকোচে এলে হয়ত এগুলো দেখে আসার সুযোগ পাওয়া যেত, ট্রেনে আসার ফলে এর একটাও দেখা হয় নি। সেজন্য আমাদের কোনও অক্ষেপ ছিল না। কারণ যারা এদেশে এসে এ দেশ জয় করে এইসব নির্মাণ করিয়েছিলেন, আমরা তাঁদেরই দেশে চলেছি। অনেক কিছু দেখবার সুযোগ পাবো।

ইতিহাস বলে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেও মার্সাই ছিল গ্রীক্ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তারপর শুরু হয় এখানে রোম্যান প্রভুত্ব। ৭৫০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রোমের অধীনে থাকার পর মার্সাই আরও দু' এক শতাব্দী ধরে দু' এক হাত ঘুরে—যেমন কারোলিংশিয়াঁরা, আরীর অধিপতি, প্রভৃতি, তারপর আসে প্রভেন্সের কাউন্টদের অধিকারে। এই শেষোক্তদের হাতে মার্সাই ছিল একনাগাড়ে প্রায় সাড়ে চার-শো বছর। এ অঞ্চলটার নামডাকও এখনও তাই প্রভেন্সই রয়ে গেছে।

নোতরদাম্ দ্য' লাগার্দে গির্জার পথে পার্বত্য সেতুর উপর আমরা

প্রাচীনকালে এই বন্দর আর শহরের নাম ছিল 'ফশে'। পরে হয়েছিল 'মাসিলিয়া।' তারপর দেখি মাসিলিয়েঁসিস্। অতঃপর দাঁড়ায় মাসালিয়া। 'মার্সাই' নামটা শুরু হয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এবং আজও পর্যন্ত এই নামটাই বহাল আছে। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ স্থপতি মার্সাইয়েরও জন্মস্থান এখানে।

১৯৪২ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানরা এ বন্দর আক্রমণ করে। তার ফলে মার্সাইয়ের প্রভূত ক্ষতি হয়। পুরাতন বন্দরের দু'ধারের ফাঁকা ময়দান দেখিয়ে দিয়ে গাইড বললেন—'এইখানে ছিল চার হাজার ঘরবাড়ী। জার্মানরা সমস্ত ধ্বংস করেছে।' কেবল মার্সাইয়ের টাউন হলটি রক্ষা পেয়ে গেছে। এটি ফ্রান্সের সপ্তদশ শতাব্দীর বাস্তু-শিল্পের অতি চমৎকার নিদর্শন। এখানে পাহাড়ের উপর একটি সুন্দর বাড়ী আছে। তৃতীয় নেপলিয়'র পত্নী সাম্রাজ্ঞী য়ুজেনীর বসবাসের জন্য সম্রাটের আদেশে প্রসিদ্ধ বাস্তু-শিল্পী মার্সাই এটির পরিকল্পনা ও নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেছিলেন। উপস্থিত এ বাড়ীতে ফ্রান্সের একটি প্রসিদ্ধ মেডিকেল কলেজ রয়েছে। এখানকার 'সাঁৎ ভিক্তর' গির্জাটিও উল্লেখযোগ্য। এটি একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। ভগবানের উপাসনা মন্দির হলেও এটির চারিদিকে রক্ষাপ্রাচীর ঘিরে রাখতে হয়েছিল। কারণ, অখৃষ্টান আক্রমণকারীরা গির্জা আক্রমণ করতেও ছাড়তেন না। এই গির্জার তলদেশে মাটির মধ্যে পাতাল-ঘর আছে, সেগুলিকে বলে 'ক্যাটাকোম্বস্'। খৃষ্ট-ধর্মের প্রথম প্রবর্তনের যুগে এই পাতাল-ঘরের গুপ্ত উপাসনাগৃহে খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের লুকিয়ে উপাসনা করতে হ'ত। মার্সাইয়ের কিম্বদন্তি বলে 'সেণ্ট লাজারাস্' নামে যে মৃত লোকটিকে প্রভু যীশুখৃষ্ট পুনর্জীবন দান করেছিলেন, তিনিই হয়েছিলেন মার্সাইয়ের প্রথম বিশপ।

মার্সাইয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল এখানকার 'নোতরদাম দ্য লাগার্দে' গির্জাটি। ৪৫৬ ফিট উঁচু একটি পাহাড়ের চূড়োর উপর এই সুন্দর উপাসনা-মন্দিরটি স্থাপিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রসিদ্ধ ফরাসী স্থপতি এস্পারান্দো এটি নির্মাণ করেছিলেন। শোনা গেল, ১২১৪ খৃঃ অব্দের তৈরি একটি পুরাতন ভজনালয়ের ধ্বংসপ্রায় ভিত্তির উপর এস্পারান্দো তাঁর এই কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। পাহাড়ে ওঠার পথ আছে, কিন্তু সে পথ দুরূহ। আমরা এখানেও 'ফানিকুলার লিফটে' চেপে পাহাড়ের উপরে এই গির্জা দেখতে গেলাম। এর গঠনভঙ্গীর মধ্যে বাইজাণ্টাইন স্থাপত্যরীতির পরিচয় পরিস্ফুট। রেনেসাঁ যুগের ফরাসী বাস্তু-শিল্পেরও যথেষ্ট নিদর্শন এর মধ্যে রয়েছে। গির্জার চূড়াটি ১৩৫ ফুট উঁচু। চূড়ার

উপর শিল্পী লে ফোঁয়ার তৈরি সোনার পাত দিয়ে মোড়া একটি চমৎকার মূর্তি আছে। এর ভিতর যে ঘণ্টাটি আছে, তার ওজন শুনলাম আট টন।

ফানিকুলার লিফটে পাহাড়ের উপর উঠলে কি হবে, সেখান থেকে আবার অসংখ্য সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উপরে উঠে, একটি পার্বত্য সেতু উত্তীর্ণ হ'য়ে আবার অসংখ্য সিঁড়ির ধাপ বেয়ে মন্দির-দ্বারে পৌঁছতে প্রাণ আমাদের বেরিয়ে গিয়েছিল। অবশ্য সেই স্বর্গের সিঁড় বেয়ে উপরে উঠবার পর চারিদিকে চেয়ে এত ভাল লেগেছিল যে, ভ্রমণ সার্থকবোধ করেছিলাম। পাহাড়ের উপরের যে সুদৃশ্য সেতুটি পার হয়ে উপাসনা-মন্দিরের দ্বিতীয় স্তরের বিরাট সোপানতলে পৌঁছানো যায়, সেখানে ছিলেন উদ্যোগী এক আলোকচিত্রকর। হাঁকছিলেন—"পাঁচ মিনিটে আপনার দুখানি উৎকৃষ্ট ফটো পাবেন, মাত্র পাঁচ শো ফ্রাঙ্ক!" আমরা লন্ডনে শুনে এসেছিলাম এঁদের সঙ্গে দর করলে দাম কমে। বললাম—"নিতে পারি আমি দু'খানা, যদি তিন-শ' ফ্রাঙ্কে দাও।" রাজি হয়ে গেল। এক মিনিটের মধ্যে আমাদের ছবি তুলে নিয়ে ছেড়ে দিলে। বললে, তোমরা উপর থেকে গির্জা দেখে নেমে আসবার পথে নিয়ে যেও। আমি এর মধ্যে ছবিগুলি 'ডেভেলাপ' ও 'প্রিন্ট' সেরে 'মাউন্ট' করে রাখবো।" দিলে সে ছবি আমাদের ফেরার পথে। অত অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু ছবি মন্দ হয়নি।

গির্জার অভ্যন্তরে অসংখ্য সব মানত-করা সামগ্রী সাজানো রয়েছে। তার মধ্যে দেখা গেল, অধিকাংশই বড় বড় সব জাহাজের ক্ষুদে ক্ষুদে সব নকল। বন্দরের উপর গির্জা। জাহাজের নাবিকদের আনাগোনাও এখানে বেশি। অতল অকূল সমুদ্রের বুকে মোচার খোলার মতো জাহাজখানিতে প্রাণটি হাতে করে ঘুরে বেড়ায় বলে এখনও ঈশ্বরের দয়ার উপর বিশ্বাস হারাতে পারে নি। পূজো দেয়, মানত করে, বিশেষ উপাসনার আয়োজন হয়। তাই, চারিদিকে অগণিত "থ্যাঙ্কস্-গিভিং"এর প্রস্তর ও ধাতু-ফলক আঁটা রয়েছে দেখলাম। এগুলি হ'ল ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি সর্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছেন পূর্ণমনস্কাম ভক্তবৃন্দ। আমাদের সঙ্গের পরিদর্শক বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ইংলন্ডের তদানীন্তন মহামান্য কুইন আলেক্‌জান্দ্রার দেওয়া মানতের প্রতি। রাইভেরিয়ার প্রমোদবিলাসে এসে সম্রাট সপ্তম এড্‌বার্ড অকস্মাৎ সাঙ্ঘাতিক পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় কুইন আলেক্‌জান্দ্রা তাঁর আরোগ্য কামনায় এই মানত করেছিলেন। দেব-মন্দিরে মানত করা আর মানতের পূজো দেওয়া শুধু আমাদেরই মা-মাসিমা আর ঠাকুমা-দিদিমারাই করেন না, পৃথিবীর সব মানুষই অল্প-বিস্তর নানা আকারে ও প্রকারে করে থাকে। পৃথিবীর সব মানুষের পত্নীই স্বামীর বিপদে আর সব মাতাই সন্তানের রোগে ঈশ্বরকে ঘুষ-এর লোভ না দেখিয়ে বোধ হয় পারে না। রাণী-মহারাণীরাও বাদ যান না। ঘুষের প্রচলনটা সমাজে আজ ছড়িয়ে পড়েছে বোধকরি এই ভগবানকে ঘুষ কবুল করে পরিত্রাণ পাওয়ার ফলেই! উপাসনা-মন্দিরের ভিতর দিকে সূক্ষ্ম মোজাইকের কারুকার্য করা আছে।

গির্জাসংলগ্ন একটি ছোট্ট দোকান আছে। আশ্রমের ব্রহ্মচারিণী নানেরা এটি পরি-চালনা করেন। এখানে এই সন্ন্যাসিনীদের হাতের তৈরি নানা ধরণের ও নানা আকারের যীশুর মূর্তি, মেরি মাতার মূর্তি, ক্রুশের চিহ্ন, জপের মালা, গির্জার ছবি, বাইবেল ও বাইবেলোক্ত নানা বাণী ও চিত্র ইত্যাদি বিক্রয় হয়। ওখান থেকে আমরা কিছু কিছু জিনিস সংগ্রহ করলাম।

'নোতারদাম দ্য' লেগার্দা' গির্জা পরি-দর্শন করে নেমে আসবার পর গির্জা-সংলগ্ন উদ্যানের মধ্যে দেখা গেল, একধারে একটি মনিহারী দোকান রয়েছে। এখানে অনেক রকম 'সুভেনীর' পাওয়া যায়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এখানে ফ্রান্সের বিশ্ববিখ্যাত সব প্রসাধন সামগ্রী ও এসেন্স খুব সুলভ মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। বাগানের আর একদিকে আছে একটি রেস্তোরাঁ। অতিরিক্ত পরিশ্রমে পিপাসা বোধ হচ্ছিল। গেলাম কিছু শীতল পানীয় সেবনে। গিয়ে দেখা গেল, এখানে এক বোতল লেমনেড লাইমেড্ জিঞ্জার বা অরেঞ্জের যা দাম, এক বোতল উৎকৃষ্ট শেরী, শ্যাম্পেন বা ভার্মুথ কি বার্গাণ্ডীর সেই দাম! মুড়ি-মিছরির এক দর দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম এবং আসলের দাম দিয়ে এক এক বোতল নকল 'পানি' সেবন করে এলাম। অর্থাৎ শ্যাম্পেনের দাম দিয়ে লাইমেড পান করে সপরিবারে তৃষ্ণা নিবারণ করতে হ'ল।

এখান থেকে সমুদ্রবক্ষে একটি ছোট দ্বীপ দেখা যায়। গাইড বললেন, 'কাউন্ট অফ্ মণ্টিক্রিস্টো' নাকি জেল থেকে পালিয়ে ঐ দ্বীপে দীর্ঘকাল লুকিয়ে ছিলেন।

সমুদ্রের ধারে 'বরেলী উদ্যান' বলে একটি বাগান আছে। তার একধারে ঘোড়

'বৃষ-উৎস'

প্যালে লঁশাঁ

ক্যাথিড্রাল
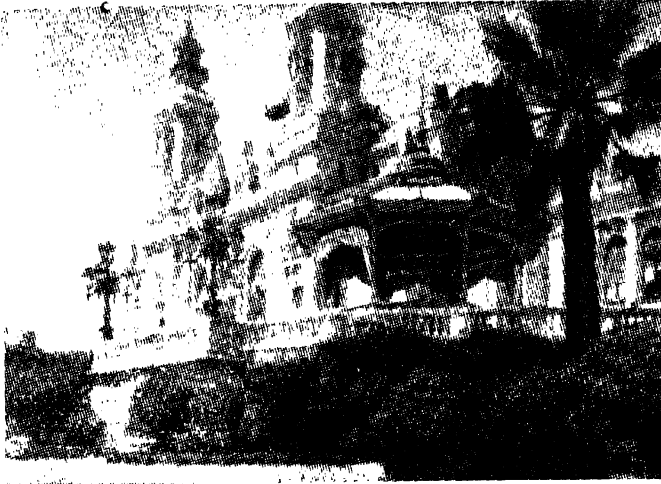
মঁতে কার্লো—ক্যাসিনো

ঘোড়ের মাঠ, আর একদিকে 'বরেলী ভবনে' আছে মার্সাইয়ের প্রত্নশালা। এই প্রত্নশালাটি না দেখলে মার্সাইয়ের অতীতের সংগে কোনও পরিচয়ই হ'ত না। এখান থেকে আমরা গেলাম আভেন্যু দ্য' প্রাদোয় মার্সাইয়ের প্রসিদ্ধ স্মৃতিসৌধ 'পালে লঁ শাঁ' দেখতে। এটি একটি স্থাপত্যকলার দিক দিয়ে অপূর্ব সুন্দর ভবন। সামনেই একটি চমৎকার 'বৃষ-উৎস' জলের ফোয়ারা! এদের দেশে হাতী নেই, নইলে হয়ত 'বাপ্রক্রীড়া পরিণত গজ' ফোয়ারাও দেখা যেত! এখানে উপস্থিত মার্সাইয়ের মিউজিয়াম রয়েছে। চমৎকার একটি চিত্রশালাও রয়েছে এর মধ্যে। এই প্রাসাদের গ্রীক্ স্থাপত্যসুলভ স্তম্ভগুলি সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অতি সুন্দর ভবনটিও বাস্তু-শিল্পী এস্‌পারেন্দোর পরিকল্পনা অনুসারে ও তাঁর তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে শুনলাম। আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতিভাবান স্থপতির উদ্দেশে আমাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার না জানিয়ে পারলাম না।

এখানকার 'লা কানেবারার' পথটি নাকি বিগত সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই বিশ্ব-বিখ্যাত! পথটি অবশ্য ভাল, কিন্তু সেজন্য এর প্রসিদ্ধি নয়। এই পথে একদা জুগো-শ্লাভিয়ার রাজা মহামান্য নৃপতি আলেক্‌-জান্দার নাকি খুন হয়েছিলেন। সেই রাজরক্তে সেদিন এর খ্যাতি লিপিবদ্ধ হয়েছিল পৃথিবীতে। রাস্তার মাঝামাঝি ঠিক যেখানে রাজাকে হত্যা করা হয়েছিল, সেখানে 'PAX' লেখা একটি ফলক আজও আঁটা আছে সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার সকরুণ স্মৃতিটুকু জাগিয়ে তোলবার জন্য।

মার্সাইয়ের হোটেলখরচটা আমরা বাঁচিয়ে ফেললাম। সকালে এখানে নেমেই স্টেশনে সমস্ত মালপত্র 'লেফট্-লাগেজ' করে, রেস্তোরাঁয় প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়েছিলাম সকালের এক্সকার্সান বাসে শহর দেখে আসতে। ওরা ল্যাঞ্চের আগেই আমাদের শহর প্রদক্ষিণ শেষ করে সমস্ত দেখিয়ে ছেড়ে দিলে। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে স্টেশন থেকে লাগেজ খালাস করে মোটর-কোচে রওনা হয়ে গেলাম রাইভেরিয়ার দিকে। এই কোচগুলি ভারি সুন্দর। খুব আরামদায়ক। আমাদের কলিকাতার স্টেট-বাসগুলির চেয়ে অনেক ভাল। দক্ষিণ ফ্রান্সের মনোরম সমুদ্রতীর ধরে চললো আমাদের কোচ সেই ভূমধ্যসাগরকূলের আশ্চর্য সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিতর দিয়ে। মৃদু শীতোষ্ণ আবহাওয়া যেন মাঘের সংক্রান্তিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। সমুদ্রতীরের গাছপালা-গুলোকেও যেন চেনা চেনা লাগছে। খেজুর গাছ, কলাগাছ, আকের ক্ষেত, চীনেবাদাম, আলু, কপি, সীম, কড়াইশুঁটি—এ যেন ভারতেরই কোনও এক না-দেখা প্রদেশে এসে পড়েছি।

মার্সাই থেকে আমাদের মোটর-কোচ এসে দাঁড়ালো একেবারে ট্যুলো। চুয়াত্তর কিলোমিটার পথ। অর্থাৎ প্রায় ৪৭ মাইল। যাত্রীরা সব বৈকালিক সেবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। ট্যুলো ছোট্ট একটু জায়গা, কিন্তু দামী মুক্তার মতো নিটোল সুন্দর। আমরা যখন মোটর থেকে নামলাম, বেলা প্রায় চারটে বাজে। রোদ তখনও ঝলমল করছে। অনেকেরই দিনান্তের সমুদ্র-স্নান শুরু হয়ে গেছে তখন থেকেই। আমরা এখানে সমুদ্র তীরের একটি রেস্তোরাঁয় ঢুকে বৈকালিক চা ও জলযোগটা সেরে নিলাম। খরচ পড়ে গেল তিনজনের প্রায় ছয়শো ফ্রাঙ্ক, অর্থাৎ ন' টাকা। এ থেকে বোঝা গেল যে, আমরা এইবার ফ্রান্সের একটি ব্যয়বহুল অঞ্চলে প্রবেশ করেছি। এইখান থেকেই 'রাইভেরিয়া' শুরু হয়েছে। এখানকার পার্বত্য অঞ্চলকে বলে 'লা-কতে দাস্তুর'। এখানে কান, মতেকার্লো, মনাকো, জাঁ-লে-পিঁ, নীস প্রভৃতি স্থানের 'ক্যাসিনো-গুলি'তে একরাত্রে কত কুবেরের ধনভাণ্ডার শূন্য হয়ে যায়, আবার কত ভাগ্যবান কোটিপতি হয়ে ওঠে।

চা-পর্ব শেষ হতেই যে-যার গাড়িতে এসে উঠলেন। গাইড একবার যাত্রীদের গুণে নিলেন। স্টার্ট পড়লো গাড়িতে। চলেছে আমাদের আসন-পঞ্চবিংশতিক স্নেহ-শকট দক্ষিণ ফ্রান্সের অভিরাম সীমান্ত পরিক্রমায়। চলেছি আমরা ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমিকে সচকিত করে। নরম ভেলভেট আসনে-কুশনে আরামে দেহ ন্যস্ত করে কাচের বাতায়ন দিয়ে অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে। গাড়িতে আওয়াজ নেই, দোলা নেই, কম্পনটুকু মাত্র নেই। রোজই এই মোটর-কোচ যাতায়াত করে। পরিচিত পথ। নিত্য গমনাগমনে অভ্যস্ত হওয়ায় তাদের কাছে হয়ত এর কোনও নূতনত্ব বা বৈচিত্র্য নেই। কিন্তু আমাদের এই সৌন্দর্যের রাজ্যে এটা প্রথম অভিযান। আনন্দে উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল আমাদের সারা দেহ-মন—এক-এক দিকের এক-এক রকম অপরূপ দৃশ্য দেখে। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত থেকে ইতালীর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশ্বের প্রশংসিত আশ্চর্য সুন্দর পথ। পশ্চিমের আকাশ সহসা যেন সোনালি ও নীলে রামধনু হয়ে উঠলো। সূর্য অস্ত যাচ্ছে—সাগরের ওপারে—পাহাড়ের কোলে—সবুজ

বনের সুস্নিগ্ধ পর্দার আড়ালে। আমি ও'কে ডেকে বলি, 'দেখ, দেখ'; উনি আমাকে ডেকে বলেন, 'দেখ দেখ'। প্রকৃতির সে যে কি অদ্ভুত রূপের বিস্ময়কর ঐশ্বর্য। দৃষ্টি অভিভূত—মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে অরণ্যশিরে ও পাহাড়ের কোলে আঁধার নামতে শুরু হল। একে একে সমুদ্রতীরে আলো জ্বলে উঠে আকাশের তারার সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলে। মোটর-কোচ চলেছে—এক অতিকায় জন্তুর মতো, তার দুই প্রচণ্ড হেডলাইটরূপ তীব্র চক্ষুর উগ্র আলোয় সাগরকূলের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে। বিস্তৃত তীরভূমির অসংখ্য তরুলতায় ঝিকিমিকি, কোটি কোটি জোনাকির দীপ্তির সঙ্গে বিশাল জলতরঙ্গে মৃদু দীপ্যমান অসংখ্য ফস্ফরাসের জ্যোতিকণা যেন এক ইন্দ্রজালের মায়া সৃষ্টি করছিল।

নৈশভোজের ঠিক আগেই আমরা দক্ষিণ ফ্রান্সের 'নীসে' এসে প্রবেশ করলাম। সমগ্র নীস শহর দীপ্ত আলোকমালায় সমুজ্জ্বল। মনে হল, আমরা যেন এক বিরাট উৎসব মণ্ডপে এসে প্রবেশ করলাম। বুঝি আজ এই শুভ রজনীতে এদেশের অসামান্যা রূপসী রাজকন্যার সঙ্গে কোন রূপনগরের রূপবান রাজকুমারের বিবাহ হচ্ছে। টুলো থেকে নীস মাত্র ১৫৭ কিলোমিটার পথ। সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে আমরা উড়ে চলে এলাম এখানে। আসবে না কেন? পথ ভাল, ব্যবস্থা ভাল, সব ভাল। গাড়িতে গাইডের সঙ্গে প্রেমটা আমার একটু বেশি রকম হয়েছিল। কারণ প্রশ্ন তাকে যা করবার, গাড়ির সমস্ত যাত্রীর মধ্যে একা আমিই করছিলাম। অন্যেরা সকলেই গাইডের বর্ণনা সুবোধ বালকের মতো মেনে নিচ্ছিলেন। আমি কিন্তু একটু জেরা করে, যাচাই করে নিচ্ছিলাম, অবশ্য কেবল সন্দেহের কারণ ঘটছিল যেখানে। এই ভদ্রলোকের সাহায্যে আমরা নীসে রাত্রিবাসের জন্য একটি হোটেল পেলাম। অন্যান্য যাত্রীরা যে-যার হোটেল পূর্বেই ঠিক করে এসেছিলেন। রাত্রে আর গাড়ি চলবে না। আবার কাল সকালে প্রাতরাশের পর যাত্রা। আমাদের হোটেলের নাম 'হোটেল দা প্রভেন্স'—মালিক একজন মহিলা—শ্রীমতী ফ্রে। মাদাম ফ্রে'র মতো এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রখর মেধাবিনী স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে এর আগে আর কখনও আসবার সৌভাগ্য হয়নি। এ'র হোটেলে মোট ৭৪ খানা ঘর। আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে জিনিসপত্র রেখে মুখ-হাত ধুয়ে, কাপড় বদলে নৈশভোজের চেষ্টায় রেস্তোরাঁ খুঁজতে বেরুলাম। মাদাম ফ্রে আমাদের সতর্ক করে দিলেন, রেস্তোরাঁয় আলাপ-হওয়া কোনও ভদ্রলোকের বা ভদ্র-মহিলার ভাঁওতায় ভুলে যেন তাঁদের সঙ্গে কাসিনোয় গিয়ে ঢুকবেন না। তাহলে খালি পকেটে ফিরে আসতে হবে কিন্তু!

হোটেলের সামনেই দেখা যাচ্ছে অগাধ নীল জলে অবিশ্রান্ত ঢেউ, মাঝে মাঝে দূরে দু-একখানি জাহাজের আলো দেখা যাচ্ছিল। সম্ভবত মালের জাহাজ, চলেছে ইতালীর দিকে। হয়ত সানরেমো হয়ে জেনোয়া বন্দরে গিয়ে লাগবে। নীসের পথে বাসও আছে, ট্রামও চলছে। পথে লোকজনের বেশ ভীড়। দোকান-পাট অসংখ্য। নীসের

তিন দিকে পাহাড়, এক দিকে সমুদ্র। মধ্যে যেটুকু সমতল ভূমি সেইখানেই গড়ে উঠেছে এই শহর। এখানকার যে প্রসিদ্ধ 'কাসিনো' সেটি সমুদ্রের উপর। ডাঙার সঙ্গে সেতু দ্বারা যোগ রয়েছে। ডাঙার উপরও একটি 'কাসিনো' আছে। এটি 'মিউনিসিপ্যাল কাসিনো'। আমাদের হোটেলের খুব কাছে একটি বড় স্কোয়ার বা পার্কের মধ্যে। অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই নৈশ বিলাস ভবন। এর মধ্যে সিনেমা, থিয়েটার, নাচের আসর সবই আছে। এখানকার বিরাট রিফ্রেশমেণ্ট হলে একসঙ্গে দুহাজার লোক বসে কাফি ও সুরাপান করতে পারে।

আমরা ডিনার শেষ করে হোটেলে ফিরে মাদাম ফ্রের কাছে এই সব খবর সংগ্রহ করেছিলাম। রেস্তোরাঁয় শুনে এসেছিলাম মিশরের রাজা ফারুখ নাকি মণ্টেকার্লোর এসে হৈ হৈ লাগিয়ে দিয়েছেন। তিরিশ চল্লিশ লাখ করে এক একটা বাজী ধরছেন। আমাদের পীড়াপীড়ি ও আগ্রহ দেখে মাদাম ফ্রে আমাদের কাসিনোর ভিতর কি হয় দেখাবার জন্য নিয়ে চললেন। নবনীতার যাওয়া হল না। মাদাম ফ্রে বললেন সেখানে নাবালিকাদের প্রবেশ নিষেধ! অগত্যা তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আমরা বেরুলাম। কাসিনোর মধ্যে প্রবেশ করেই দেখা গেল দুধারে দুটি লম্বা হলে 'রুলে' খেলা চলছে। অসংখ্য খেলোয়াড়, কোনও টেবিলই প্রায় খালি নেই। এক ফ্রাঙ্ক থেকে পাঁচশ ফ্রাঙ্ক পর্যন্ত বাজী ধরা যায় এখানে। এক-সঙ্গে তার বেশী বাজী ধরা আইন অনুসারে নিষিদ্ধ। সর্ব দেশের সর্ব জাতের সর্ব রকমের লোককেই দেখা গেল এখানকার টেবিলে। মেয়েরাও অসংখ্য তাদের মনোমুগ্ধকর ডিনার ও নাচের পোষাক পরে বসে টেনিলের শোভাবর্ধন করছেন। মাদাম ফ্রে বললেন 'এখানে রাত দুটো পর্যন্ত খেলা চলে। নাচ-গানও হয়। কাজের শেষে খাওয়া-দাওয়ার পর এ অঞ্চলের প্রায় সব লোকই কাসিনোতে আসে। এটা যেন তাঁদের রিক্রীয়েশান ক্লাব' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশী ভাগ্যান্বেষী ও প্রমোদবিলাসীরা তো আছেনই।

এখানে আর একটি নৈশ প্রমোদাগার আছে তার নাম "প্যালে দ্য' লা মেদি-তেরেনীয়া। এটি সমুদ্রতীরে। বিরাট বাড়ী। যেন রাজপ্রাসাদ! প্রবেশ পথের সামনেই প্রায় পঞ্চাশটি বড় বড় রঙীন ছাতা পোঁতা রয়েছে। মাদাম ফ্রে আমাদের এটিও দেখাতে নিয়ে এলেন। এই ছাতার নীচেয় রেস্তোরাঁ বা কাফিখানা। প্যারিসে পথের ধারে ফুট-পাথের উপর এরকম অসংখ্য আছে। রঙীন ফুলকাটা খাটো কোট গায়ে আমেরিকানের দল এবং অন্যান্য বিদেশীরা এখানে কাফি আর সুরা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিচ্ছেন। আলুভাজা থেকে শুরু করে রকমারী খাবার এখানে পাওয়া যায়। এর সামনে দিয়ে পথ চলে গেছে অসীম সাগরকে বেষ্টন করে। সেই পথে হেঁটে চলেছে কত

নরনারী হাত ধরাধরি করে। জীবনে যেন তাদের কোনও ভাবনা চিন্তা নেই! অসংখ্য মোটর গাড়ী ছুটোছুটি করছে। রেস্তোরাঁর এক কোণে বাজছে সুমধুর অর্কেস্ট্রা। মাদাম ফ্রে বললেন অনেক টাকা দিয়ে এই কাফি হাউসের মালিকেরা এদের বাজাবার জন্য নিযুক্ত করে। সুইট মিউজিক শুনতে শুনতে সুইট ড্রিংকস্—কাজেই এখানে এক পেয়ালা কাফি বা একপাত্র সুরার দাম দিতে হয় একটু বেশি। এই মিউজিকের লোভেই লোকের ভীড় হয় বেশি এই সব রেস্তোরাঁতেই। তা' ছাড়া অনেকেরই 'রাঁদেভো' হচ্ছে এই সব কাফিখানা। অর্থাৎ কেউ কারুর সঙ্গে দেখা করবে, কোনও বিষয়ে জরুরী একটা পরামর্শ করবে, কোনও কিছু সম্বন্ধে একটা কর্মসূচী স্থির করবে, সব হয় এই কফিখানাতে বসে। প্রেমের অভিসারও বাদ যায় না!

'প্যালে দ্য' লা মেদিতেরেনীয়াঁর' মধ্যেও 'রুনে' খেলার হল আছে, থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ আছে, নাচের আসর আছে। এখানকার রঙ্গমঞ্চে নাটকের চেয়ে নৃত্যগীতাভিনয়ই হয় বেশী। এখানকার আলোকসজ্জা অতি অপরূপ। এরা ইচ্ছামতো এখানে ভোরের স্নিগ্ধ আলো, দীপ্ত মধ্যাহ্ন, গোধূলি সন্ধ্যা, গভীর রাত্রি যখন যা খুশী করতে পারে। মুশকিলে পড়া গেল এখানে শ্রীমতীকে নিয়ে এসে! সেই 'সাড়ী ফোবিয়া'! হাউ নাইস্! হাউ বিউটিফল! ও'! প্রেটি! ইত্যাদি বহুশ্রুত উচ্ছ্বাস! আমরা 'মঁতে কার্লো' দেখতে চাই বলায় মাদাম ফ্রে বললেন 'এক রাত্রে আর কত দেখবে? একদিন থেকে যাও, কাল রাত্রে তোমাদের নিয়ে যেতে পারি।' 'তথাস্তু' বলে আমরা থেকে গেলাম আর একদিন নীসে।

'মঁতেকার্লো' কাউন্ট্ অফ্ মনাকোর সম্পত্তি। 'মনাকো' একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য। এখানকার কাউন্ট্ যিনি তিনিই একরকম এখানকার রাজা। তাঁর অধীনে ও তাঁর আদেশ ও ব্যবস্থা অনুসারে এখানকার সব কাজ চলে। এটা ফরাসী দেশের মধ্যে হলেও মতে' কার্লো আইন আদালত থানা পুলিশ সব আলাদা। সারাদিন নীসের চারিদিকে ঘুরে মনের আনন্দে কাটিয়ে রাত্রে নৈশভোজের পর মাদাম ফ্রে'র সঙ্গে আমরা বিশ্ববিখ্যাত প্রমোদাগার মঁতেকার্লোয় এলাম। এই মঁতেকার্লো কাসিনো ছোট একটি পাহাড়ের উপর। এর নীচ দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। সেখানেই 'মঁতেকার্লো' স্টেশন। এখানেও নবনীতার প্রবেশ নিষেধ বলে তাকে আনা হয়নি।

মঁতেকার্লোর মধ্যে প্রবেশ করে এর দেওয়ালে আঁকা সব ফ্রেস্কো চিত্র, প্রাচীরে লম্বিত বিরাট তৈলচিত্র, অপূর্ব সব ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ মূর্তি, ভিতরে সাজানো রাজপ্রাসাদের যোগ্য মূল্যবান সুন্দর জমকালো সব আসবাবপত্র ও আলোকের বাহার দেখে মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম! এখানেও বহু লোক তাঁদের ভাগ্য পরীক্ষা করছেন, লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার। ক্রোড়পতিরা এসেছেন, রাজা ও রাজপুত্র এবং যুবরাজরা এসেছেন। ডিউক ডাচেস, কাউন্ট কাউন্টেস, 'হিজ এক্সেলেন্সী' আর 'হার এক্সেলেন্সী'র ছড়াছড়ি এখানে। সে যে কি তাঁদের পোষাকের ও অলঙ্কারের বাহার, কি তাঁদের চাল চলন; একনজরে বোঝা যায় এরা বংশানুক্রমে অভিজাত নরনারী।

মাদাম ফ্রে জানতে চাইলেন 'খেলার ইচ্ছা আছে নাকি কিছু?' বিপুল ঘাড় নেড়ে মস্ত বড় এক 'না!' বলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলাম। কী আলোই না জেবলেছে এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমারা ভবনে। মঁতেকার্লো কাসিনোর বাইরেটা যেন মনে হচ্ছিল আগাগোড়া আলোয় গড়া! সমুদ্র জলে তার ছায়া পড়ে একটা প্রত্যক্ষ স্বপ্ন হয়ে উঠেছিল যেন!

রাত্রি বারোটা বাজে। ঘুরে ঘুরে পিপাসা বোধ হচ্ছিল। মাদাম ফ্রে বললেন অল্পদূরে তাঁর এক বন্ধুর রেস্তোরাঁ আছে। চলো সেইখানে যাওয়া যাক। আমরা কিছুমাত্র আপত্তি করলাম না। সেখানে মাদাম ও উনি চা এবং আমি কোকো-কোলায় তৃষ্ণা নিবারণ করে মাদাম ফ্রে'র গাড়ীতেই হোটেলে ফিরে এলাম রাত্রি প্রায় একটায়! শোনা গেল ফ্রান্সের এই রাইভেরিয়া অঞ্চলে নাকি অসংখ্য কাসিনো আছে। মঁতেকার্লো, কান, নীস, আঁতিব, মেঁতোঁ, জিঁর্লোপিঁ এবং আরও কত! এখানে যে শুধু সুবর্ণের ও প্রেমেরই প্রেমারা চলে তাই নয়, নৃত্য-গীত অভিনয়, কার্নিভাল, ফুলের শো, পুষ্পযুদ্ধ, নৌ-প্রতিযোগিতা, বিবিধ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাঁতার খেলা, রূপের প্রতিযোগিতা, সৌখীন সাজপোষাকের প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বেকার বড়লোকদের পরমানন্দে জীবনযাপনের সব রকম আয়োজনই আছে। এ জায়গাটাকে ধনীর স্বর্গ বলা যেতে পারে।

আমাদের ফ্রান্স দেখবার সাধ মিটলো। ফ্রান্সের ভাল মন্দ দুটো দিকেরই ছবি নিয়ে পরের দিন সকালের বাস ধরে রওনা দিলাম ফ্রান্সের সীমান্ত পার হয়ে ইতালির দিকে।

(ক্রমশ)

৪

বৈঠকখানা ঘরের মালিকানা নিয়ে কনকলতা আর কোন কথা বললেন না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুধু বললেন, 'আমার তো নিজের ঘর দোর কিছু নেই এ বাড়িতে। আমার ঘরে বাইরেয় বাজে লোক এসে থাকলেও মুখ ফুটে আমার কিছু বলবার জো নেই। এ বাড়িতে আছি এই পর্যন্ত।'

বাস, আর কিছু বলতে হোল না। এতেই সব টের পেলেন বাসন্তী। দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করে করে শুধু মুখের দিকে তাকালেই একজন আর একজনের মনের ভাব টের পান। মুখের কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না।

কনকলতার মনের ভাব টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাসন্তী চলে এলেন বাইরের ঘরে। মণীন্দ্র ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। সে অবনীমোহনের অফিসের বেয়ারা আর বাড়ির বাজার সরকার। অফিস থেকে কোন-রকমে কয়েকদিন ছুটি জোগাড় করতে পারলেই সে অবনীমোহনের কাছ থেকেও ছুটি নিয়ে দেশে চলে যায়। ছোট ভাইয়ের অভিভাবকত্বে এখনো তার বউ আর ছেলে-মেয়েরা পাকিস্থানে গাঁয়ের বাড়িতেই রয়েছে। মণীন্দ্র নিজে কলকাতায় থাকে। কিন্তু মন পড়ে থাকে দেশে। এবার ছুটি পেয়ে অসুস্থ দেহ নিয়েও সেখানে ছুটেছে।

এ ঘরে জোড়া তক্তাপোশের একখানায় থাকে এখন অতুল আর একখানায় শোয় বিজু আর বিনু—ওর দুই মামাত ভাই। তারা অনেক আগেই উঠে গেছে। প্রাত্যহিক অভ্যাসমত আজও অনেক বেলায় ঘুম ভেঙেছে অতুলের। উঠে সে কেবল বিছানা গুটিয়ে রাখছে বাসন্তী এসে দাঁড়ালেন, 'তোর বিছানা আর এখানে রেখে দরকার নেই। ওপরে নিয়ে যা।'

অতুল মার দিকে তাকাল, 'কি যে বল তার ঠিক নেই। ওপরে কোথায় রাখব।'

বাসন্তী বললেন, 'তোর দাদার ঘরে। আজ থেকে সেখানেই শুবি তুই।'

অতুল বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে মা? অতটুকু ঘরে একসঙ্গে শোয়া যায়?'

বাসন্তী বললেন, 'বাড়িতে আর জায়গা না থাকলে কি করবি।'

অতুল বলল, 'কেন এ ঘরে তো যথেষ্ট জায়গা আছে। এ ঘরের কি দোষ হোল?'

বাসন্তী গম্ভীরভাবে বললেন, 'না এ ঘরে তোদের আর থাকা চলবে না।'

অতুল মুহূর্তকাল মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'ফের বুঝি তোমাদের ভাই-বোনের মধ্যে শরিকী বিবাদ শুরু হয়েছে? তোমাদের জ্বালায় আর পারলাম না মা। তা ভাই-বোনে যত খুশি ঝগড়া-ঝাটি কর, কেউ তো বাধা দিচ্ছে না। আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন বাবা। আমাকে এখান থেকে কেউ নড়াতে পারবে না। তোমার দাদা তো দাদা, তোমার মরা বাপ যদি চিতে থেকে উঠে আসে, তারও সাধ্য নেই আমাকে বেদখল করে। ভূতে মানুষে এক গাদ লড়ব, তারপরে যা হয় কিছু একটা সেটেলড্ হবে।'

মনে এত অশান্তি সত্ত্বেও ছেলের কথায় বাসন্তী না হেসে পারলেন না। হাসি চেপে বললেন, 'বাঁদর কোথাকার, আমার বাবা পুণ্যাত্মা ছিলেন। তিনি মরে স্বর্গে গেছেন, তিনি কেন ভূত হতে যাবেন, ভূত তো তুই নিজে।'

অতুল বলল, 'আমি তো ভূতই। সেই জন্যেই তো তোমাদের মত মানুষের সঙ্গে আমার বনে না।'

বাসন্তী বললেন, 'হ্যাঁ যত দোষ তো আমাদেরই। জোয়ান ছেলে। পড়াশুনো করলিনে, চাকরি-বাকরির চেষ্টা দেখলিনে। পাড়াময় কেবল হৈ হৈ করে বেড়াবি। হ্যাঁরে এমনি করেই কি দিন যাবে? এই তো দাদার চাকরিটি গেল, কাকারা যা করে তাতে তাদের নিজেদেরই কুলোয় না। সমস্ত ভার ওই একজন মানুষের ঘাড়ে। সংসারের জন্যে একটুও ভাবনা হয় না তোর?'

অতুল বলল, 'ভেবে কি করব।'

বাসন্তী বললেন, 'তা তো ঠিকই। বাড়ির সঙ্গে তোর তো কেবল খাওয়া আর শোওয়ার সম্পর্ক। আর তো কোন সম্পর্ক নেই। সারাদিনের মধ্যে তোর টিকিটিও দেখা যাবে না। রাত্রেও ফিরবি সেই বারোটা একটায়। কাল কখন ফিরেছিলি?'

অতুল বলল, 'সে খবরে তোমার দরকার কি?'

বাসন্তী বললেন, 'তা তো ঠিকই। সে খবরে আমার দরকার কিসের। আমি মা। তোমার চলা-ফেরার খবর আমি রাখব না, রাখবে পাড়া-পড়শী। তারাই তো রাখছে। তাদের কাছ থেকেই তো সব খবর কানে আসছে আমার। শোন অতুল, আজ থেকে তুমি ওপরে না শোও আমার ঘরে গিয়ে শোবে। আর সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে বাড়ি ফিরবে। অত রাত করতে পারবে না। কথা যদি না শোন অনর্থ হবে আমি বলে দিলুম।'

থলিতে করে নিজেদের বাজার নিয়ে বৈদ্যনাথ এসে ঢুকলেন। অন্দরে যাওয়ার পথ এই ঘরের ভিতর দিয়েই। দাদাকে দেখে বাসন্তী তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন। কেউ কোন কথা বললেন না।

'বেগুন কত করে আনলেন মামা?'

অতুল একপাশে দাঁড়িয়ে পরম নিরীহ-ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

কিন্তু বৈদ্যনাথ একথার কোন জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি সোজা ভিতরে চলে গেলেন।

অতুল পিছন থেকে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, তোমার দাদার মুখ একেবারে——'

বাকি কথাটুকু মুখে না বলে দুই হাতের ভঙ্গিতে একটি হাঁড়ির আকার মাকে দেখাল অতুল।

বাসন্তী হাসি চেপে বললেন, 'বাঁদর কোথাকার। তোর না মামা, গুরুজন না তোর!'

অতুল বলল, 'তাতে কি! তোমার না দাদা, গুরুজন না তোমার? আমি না হয় হাত দিয়ে ও'র হাঁড়িমুখের নকল করেছি। আর তুমি? তুমি তো নিজের মুখখানা শুদ্ধু হাঁড়ি বানিয়ে ও'কে ভ্যাংচাচ্ছ।'

অতুল এবার বিছানাটাকে গুটিয়ে জায়গামত রেখে দিল। তারপর হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে চলে গেল ভিতরে।

বাসন্তী পিছন থেকে ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের মনেই আর একবার বললেন, 'বাঁদর।'

হাত মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে ঢুকে অতুল হাঁক দিল, 'এই প্রীতি আমার জন্যে চা টা কিছু রেখেছিস না কি? রেখে থাকলে দে।'

কেটলীতে চা করাই ছিল, প্রীতি তার থেকে এক কাপ চা আর ছোট বাটিতে করে এক বাটি মুড়ি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নাও মেজদা।'

অতুল চায়ে চুমুক দিয়েই বলল, 'ইস্ একেবারে সরবৎ করে রেখেছিস।'

প্রীতি অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'খুব জুড়িয়ে গেছে বুঝি? দাও আর একবার গরম করে দিচ্ছি।'

অতুল মাথা নেড়ে বলল, 'দিয়েছিস এই ঢের। আমার ওপর যা তোদের দরদ আর ভক্তি শ্রদ্ধা সবই আমার জানা আছে।'

বলে অতুল চা আর মুড়ির বাটি শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

ভুবনময়ী সদর দরজায় ওর পথ আটকে ধরলেন, 'বেরুচ্ছিস বুঝি।'

অতুল বলল, 'হ্যাঁ।'

ভুবনময়ী বললেন, 'সারা শহর ভরে তো টই টই ক'রে ঘুরিস। সুবিমল যে চলে গেল তার একবার খোঁজ খবর নিবিনে তোরা।'

অতুল শুনিনে শুনিনে করে বেরিয়ে চলে গেল।

শুধু অতুলকেই নয়, যার সঙ্গে দেখা হোল ভুবনময়ী তাকেই বললেন, 'তোমরা সুবিমলের কেউ একটা কোন খোঁজ করলে না? এইটা কি উচিত হচ্ছে শত হলেও এ বাড়ির জামাই তো সে?'

বৈদ্যনাথকে ডেকে বললেন, 'হ্যাঁরে বৈদ্য, আর কারো না পড়ুক, তোর তো পোড়ে, তুই এমন গা ছেড়ে দিয়ে বসে আসিছ কেন? বেরিয়ে দেখ একটু চেষ্টা চরিত্র ক'রে।'

বৈদ্যনাথ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, তুমি একটু চুপ করো তো মা। যা করবার করা যাবে তুমি একটু থামো।'

ভুবনময়ী বললেন, 'আমি তো বাপু চুপ করেই আছি। কিন্তু কথা না বললেও চলে না দেখছি। তোমরা একটা না একটা অনাসৃষ্টি বাধাবেই বাধাবে।'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'তুমি কথা বললেই কি অনাসৃষ্টি সব আটকে থাকবে?'

নীচ থেকে শ্যালক আর শাশুড়ীর আলাপ শুনে নিয়ে অবনীমোহন স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'শোন।'

বাসন্তী রান্নাঘরে যাচ্ছিলেন, স্বামীর ডাকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'কি বলছ।'

অবনীমোহন বললেন, 'সুবিমলের একটা খোঁজখবর করা সত্যিই তোমার উচিত ছিল।'

বাসন্তী রেগে উঠে বললেন, 'আমার উচিত ছিল? কেন সুবিমল কি আমার জন্যেই চলে গেছে? বাড়ি থেকে আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি বলতে চাও। সংসারে আমার দোষ ছাড়া কি আর কারো দোষই চোখে পড়ে না?'

জামা কাপড় পড়ে অরুণ পাড়ায় বন্ধু-বান্ধবের খোঁজ খবর নিতে যাচ্ছিল, মা বাপের ঝগড়া শুনে থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি হয়েছে মা, আজ আবার কি চেঁচামেচি শুরু হোল তোমাদের।'

বাসন্তী বললেন, 'তোমরা তো কেবল আমার গলা, আমার চেঁচামেচিই শোন, সংসারে আর তো কেউ কোন কথাও বলে না, আর কারো কোন দোষও নেই।'

অরুণ বলল, 'হয়েছে কি শুনি।'

বাসন্তী বললেন, 'হবে আবার কি, সুবিমলকে আমি যেতে বলেছি, আমি তাড়িয়ে দিয়েছি। সব দোষ হোল আমার। ঘরের লোকে যদি মিথ্যে এমন বদনাম দেয় নান্তু, বাইরের লোকে কি ভাবে বল তো। রাত দিন কথায় কথায় এই যন্ত্রণা আমার আর সয় না, তোরা এখন বাড়ি ঘরে এসেছিস, আমার একটা ব্যবস্থা ট্যাবস্থা কর, আমি চলে যাই, উনি থাকুন ও'র সংসার নিয়ে।'

অরুণ বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাকে মিছামিছি দোষ দিচ্ছেন কেন। সুবিমলবাবু নিজের ইচ্ছাতেই চলে গেছেন।'

অবনীমোহন শান্তভাবে বললেন, 'কেন যে গেছে তা সবাই জানে। কিন্তু গেছে এই কথাটা জেনেই কি তোমরা চুপ ক'রে থাকবে? তাকে খুঁজে আনতে হবে না, তার কাছে একবার যেতে হবে না?'

অরুণ বলল, 'কি ক'রে যাব। তিনি তো শুনেছি কাউকে ঠিকানাই দিয়ে যাননি।'

অবনীমোহন ভাববাচ্যে বললেন, ইচ্ছে থাকলে সবই করা যায়। কলকাতায় তার অন্য যে সব আত্মীয়স্বজন আছে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করতে হয়। ইচ্ছে থাকলে কি একজন লোককে কলকাতা শহরে খুঁজে বের করা যায় না?'

বাসন্তী বললেন, 'হ্যাঁ, অন্য কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে চাকরি বাকরির চেষ্টা না করে দিন রাত গোষ্ঠীশুদ্ধু লোক এখন তাকে খুঁজে বেড়াক, তাহলেই সকলের পেট ভরবে। তা ছাড়া সে কি আমাদের কথায় আসবে? আসতই যদি তাহলে অমন সামান্য কথায় চলে যেত না। সেধে ভজে যারা আনতে পারবে তারা গেলেই পারে। তারা গা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে বসে মজা দেখছে আর আমরা এদিকে মরছি ঝগড়া ক'রে। আচ্ছা জ্বালা হয়েছে আমার।'

অরুণ মুহূর্তকাল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। মায়ের এতখানি সংকীর্ণতা যেমন সহ্য করা যায় না, বাবার অর্থহীন ঔদার্যও তেমন অসহনীয় মনে হয় অরুণের। বাবার মধ্যে কোথায় যেন একটা বাড়াবাড়ি আছে। পারিবারিক ছোট ছোট বিষয়গুলিকে তিনি বড় করে দেখেন, সেইজন্যেই বড় বিষয়গুলি ও'র চোখে পড়ে না। বাবা একান্ত ক'রে পারিবারিক মানুষ হয়ে পড়েছেন। সুবিমল যদি চলে গিয়েই থাকে তা নিয়ে অত মাথা ঘামাবার কি আছে? সত্যিই তো এ বাড়িতে জায়গা হচ্ছে না, নানারকম অসুবিধে হচ্ছে, এ অবস্থায় শ্বশুর বাড়িতে পড়ে থাকা তার পক্ষেও তো তেমন মর্যাদাকর নয়। এই সব নানা দিক ভেবেই সে গেছে। কিন্তু বাবা সেসব মোটেই যেন ভাবতে চাইছে না। তাঁর দুর্ভাবনা পাছে তাঁর শালা আর শালাবউ তাঁকে অনুদার সঙ্কীর্ণ চিত্ত মনে করে। যার সেখানে দুর্বলতা। মনে মনে একটু হাসল অরুণ। তারপর নিজের কাজে বেরিয়ে গেল।

অবনীমোহন ব্যাপারটাকে অন্য দিক থেকে ভেবে দেখছিলেন। এইসব ছোট ছোট উপলক্ষেই মানুষের হৃদয়কে চেনা যায়। এ ধরণের ছোটখাট ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতেই তাঁর চিত্তবৃত্তির স্ফুরণ হতে থাকে। ছোট পরিবারের মধ্যে যাদের চিত্ত উদার নয়, বৃহৎ পরিধিতেও তারা ছোটই থেকে যায়। ঝোঁকের মাথায় হয়ত এক একটা বড় বড় কাজ তারা করে ফেলে, কিন্তু তাতে তারা সত্যি বড় হয় না। ঝোঁকটা সরে গেলেই তাদের সেই মহত্ব ছেঁড়া বেলুনের মত চুপসে

ছোট হয়ে যায়। জোয়ারের জল সরে যাওয়ার পর পাঁকটা তখন আরো বেশি ক'রে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সকলের ভাগ্যে তো বৃহত্তর ক্ষেত্র জোটে না। অল্প-পরিসর চার দেয়াল ঘেরা পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই বেশির ভাগ লোকের বেশির ভাগ জীবন কেটে যায়। তাই দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনকে ছোট বলে তুচ্ছ করা চলে না। এরই মধ্যে মহত্ত্বের, বৃহত্ত্বের অনুশীলন করতে হয়।

অবনীমোহন তক্তপোশ থেকে নামলেন, নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে ঢুকলেন বৈদ্যনাথের ঘরে। বাজার থেকে বৈদ্যনাথ জমাখরচের খাতায় হিসেবটা সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলছিলেন আর পাশে দাঁড়ানো স্ত্রীকে খরচ কমাবার জন্যে উপদেশ দিচ্ছিলেন। অবনীমোহনকে দেখে দুজনেই একবার তাকালেন কিন্তু কেউ হঠাৎ কোন কথা বললেন না।

অবনীমোহন একটুকাল চুপ করে থেকে কনকলতার সঙ্গেই প্রথম কথা আরম্ভ করলেন, 'কি খুব ব্যস্ত নাকি?'

কনকলতা বললেন, 'না, ব্যস্ত আর কি বসুন।'

একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন কনকলতা।

অবনীমোহন একটু রসিকতা করে বললেন, 'তবু ভালো যে ভদ্রতা করে বসতে বললেন। আমি তো ভেবেছিলাম ঘরে ঢুকতেই দেবেন না। যা ঝগড়াঝাঁটি আপনাদের মধ্যে চলেছে আজকাল। বিপক্ষ শিবিরে ঢুকতেই ভয় হচ্ছিল।'

কনকলতাও একটু হাসলেন, 'আপনার সঙ্গে তো আর ঝগড়া হয়নি। তা ছাড়া আপনি তো দূত, অবধ্য। বিপক্ষ শিবিরে আপনার ভয় কিসের?'

অবনীমোহন এলে, পরিহাস করে কথা বললে যত ঝগড়াঝাঁটিই থাকুক কনকলতা আজকালও হেসেই জবাব দেন, পরিহাসের মর্যাদা বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। অবশ্য সব সময় যে প্রসন্ন মনে করেন তা নয়, তবু অবনীমোহনের মত মানুষের সঙ্গে ভদ্রতাটা বজায় না রাখলে চলে না।

পরিহাস ছেড়ে এবার আসল কথায় এলেন অবনীমোহন, 'আচ্ছা, সুবিমলের ঠিকানাটা ... ওর একবার খোঁজ করতে হয় না? বাড়ি শুদ্ধ সবাই যদি আপনারা এমন পাগল হয়ে যান তা'হলে চলে কি করে। ওর ঠিকানাটা বলুন, আর কেউ না যায় ছুটির পর আমি গিয়ে ওর খোঁজ নিয়ে আসব।'

কনকলতার মুখ এবার গম্ভীর হোল, 'বললেন, ঠিকানা তো সে কাউকে জানিয়ে যায়নি। তা ছাড়া অত হাঙ্গামায় আর দরকারই বা কি।'

খরচটা যোগ দিয়ে খাতা বন্ধ করলেন বৈদ্যনাথ, তারপর গামছা কাঁধে নীচে নেমে যেতে যেতে বললেন, 'হ্যাঁ, ওসব হাঙ্গামায় আর দরকার নেই অবনী। যে গেছে তাকে যেতে দাও। এখানে তো সে আর স্থায়ী-ভাবে থাকবার জন্যে আসেনি। চাকরি বাকরি পেলে দু'দিন পরে তো চলে যেত, না পেলেও যেত, না হয় দু দিন আগেই গেছে।'

অবনীমোহন বললেন, 'তবু এভাবে যাওয়াটা তো মোটেই ভালো দেখায় না।'

এ কথার আর কোন উত্তর দিলেন না বৈদ্যনাথ, তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন। তাঁর অফিসের বেলা হয়ে গেছে। অবনী-মোহন কনকলতাকেই আর একবার জিজ্ঞেস করলেন, 'সত্যিই তার ঠিকানা জানেন না আপনি! সুবিমল কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গিয়ে উঠল না কি?'

কনকলতা অবনীমোহনের দিকে তাকালেন, 'যা শিক্ষা হয়েছে, তাতে ফের কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি উঠবে বলে তো মনে হয় না।' বলে একটু হাসতে চেষ্টা করলেন কনকলতা, 'যাই রান্না রয়েছে উনুনে।'

তারপর তিনিও বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। অবনীমোহন ভালোমানুষ সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি ভালো বলে তাঁর সংসারের মন্দ জিনিসগুলি তো আর আটকে থাকে না। অন্যায় অবিচার যা হবার তা হয়ই। ভালো মানুষের সঙ্গে ভালোভাবে একটু কথা বললেন কনকলতা, তামাসার বদলে একটু তামাসা করলেন আর কি করতে পারেন?

দুজনে চলে যাওয়ার পরেও একটুকাল বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন অবনীমোহন। যে আশা নিয়ে তিনি এসেছিলেন তা সফল হয়নি। তিনি এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু ওরা এগিয়ে এল না। এত সহজে যেন ওরা বিরোধের মীমাংসা করতে চায় না, মনো-মালিন্যটা জীইয়ে রাখাই যেন ওদের ইচ্ছা। মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন অবনী, একটু যেন অপমানও বোধ করলেন। কিন্তু তার পরক্ষণেই মনে মনে ভাবলেন, না এও ঠিক হচ্ছে না, এভাবেও তিনি অন্যের ওপর অবিচারই করছেন। ওরাই আঘাত পেয়েছে বেশি, দুঃখ পেয়েছে বেশি। রাগ অভিমান ওদেরই তো হবার কথা। এক-বারের চেষ্টায় ওদের মনের রাগ যদি না মেটে অবনীমোহন ওদের দোষ দিতে পারেন না।

নিজের ঘরে না গিয়ে তেতলায় উঠে এলেন অবনীমোহন। একটা ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে মুকুন্দবাবু একমনে বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলেন, পায়ের শব্দে সামনের দিকে তাকালেন। অবনীমোহনকে দেখে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই যে আসুন।'

অবনীমোহন মৃদু হেসে তাঁকে বললেন, 'তুমি বসো, তুমি বসো মুকুন্দ।' বলে একটা টিনের চেয়ার টেনে নিলেন অবনীমোহন।

মুকুন্দবাবু বই বন্ধ ক'রে বললেন, 'হঠাৎ ওপরে চলে এলেন যে।'

অবনীমোহন একটু হাসলেন, 'মনটা ভালো লাগছিল না, ভাবলাম তোমাদের সাধু সজ্জনদের আস্তানাটা একটু ঘুরে যাই।'

মুকুন্দবাবু হেসে পুনরাবৃত্তি করলেন, 'সাধু সজ্জন! কিন্তু আপনিও তো কম সজ্জন নন, আপনার মনটাই বা হঠাৎ এমন খারাপ হোল কেন।'

অবনীমোহন একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কিছু ভালো লাগছে না মুকুন্দ। সংসারটাকে কিছুতেই নিজের মত করে গড়ে নিতে পারছিনে।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'তেমন ক'রে গড়বার চেষ্টাই কি আপনি করছেন? মাটির জিনিস কাঠের জিনিসের মত তো একে গড়ে তোলা যায় না, এ অনেকটা আপনা-আপনি গড়ে ওঠে। ওপর থেকে জোর ক'রে কিছু চাপিয়ে লাভ হয় না।

অবনীমোহন কোন কথা বললেন না। এতদিন তাঁরও তাই ধারণা ছিল। জোর করে লাভ নেই। কর্তৃত্বের জবরদস্তীতে ফল খারাপ হয় বেশি। তাই তিনি স্ত্রীকে, ছেলে মেয়েদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। লেখা পড়ার জন্যে যতটুকু লক্ষ্য রাখবার রেখেছেন। বেশি জোর খাটাননি। স্বাভাবিক-ভাবে ওরা গড়ে উঠুক। ও যা হ'তে পারে তাই হোক। কিন্তু সবাই ঠিক আশানু-রূপ হচ্ছে কই। খুঁটিনাটি নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাসন্তীর কলহ লেগেই আছে। স্বামী পুত্রের গণ্ডীঘেরা ছোট সংসারের বাইরে সে একটি পা বেশি ফেলতে অনিচ্ছুক। বড় ছেলে এম এ পাশ করেছে,

কিন্তু ভালোরকম চাকরি বাকরি কিছু জোটাতে পারেনি। সবচেয়ে ভাবনার কথা সে একটু বেশিরকম আত্মপরায়ণ। সংসারের সকলের সম্বন্ধে তার মমত্ব কই, অবনী যেমনটি চান ঠিক তেমনি ঔদার্য কই তার মনে। মেজো অতুলের তো পড়াশুনো কিছুই হোল না। দিনরাত আড্ডা আর বন্ধু-বান্ধব নিয়েই আছে। অনেকের ধারণা অবনীমোহনের ঔদাসীন্যেই এমন হয়েছে। বাজে কথা, যে যেমন হবার তেমন সে হবেই। অবনীমোহন কি গোড়ার দিকে কম যত্ন নিয়েছেন, কম লক্ষ্য রেখেছেন ওর ওপর। তবু হোল না, পড়াশুনোর দিকে ওর মনই গেল না। ওর অবাধ্যতার জন্যে মাঝে মাঝে অবনীমোহনেরও ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে। নিজের হাতে ওকে বেত মেরেছেন, বেঁধে আটকে রেখেছেন ঘরে, তার ফল আরো খারাপ হয়েছে। সব দেখে শুনে অবনীমোহন ওর নিজের মতি-গতির ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন ওকে। আর জোর করবেন না। ও যা হতে চায়, ও যা হয়ে ওঠে তাই হোক। কিন্তু তাতেও সমালোচনার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। নিন্দাটা শুনতে হয়েছে বেশির ভাগ স্ত্রীর কাছ থেকে। বাসন্তী বহুদিন বলেছেন, তোমার জন্যেই এমন হোল, তোমার জন্যেই ও এমন ক'রে বিগড়ে গেলো, তুমি ওকে মোটে শাসন করবে না।'

অবনীমোহন বলেছেন, 'যখন শাসন করেছি তখন তো তুমি ঠিক উল্টোটাই বলেছ।'

বাসন্তী জবাব দিয়েছেন, 'বলব বই কি। তোমার সবটাই বেশি বেশি। যখন শাসন করেছ তখন শুধু শাসনই করেছ, আবার আজকাল একেবারে নির্বিকার, খোঁজ খবর তত্ত্বতালাসই করছ না। এভাবে কি আর ছেলেপুলে মানুষ হয়? দেখনা দাদা কি করে?'

তা ঠিক। বৈদ্যনাথের মত সংসারকে অমন আঁটসাঁট ক'রে বাঁধতে পারেননি অবনীমোহন। বৈদ্যনাথ প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। তাদের শাসনও করেন, স্নেহও করেন। বাপকে ছেলেমেয়েরা ভয়ও করে শ্রদ্ধাও করে। সব বিষয়েই বৈদ্যনাথের একটা পরিমিতি বোধ আছে। নিজের পছন্দ অপছন্দটাকে জোর-গলায় তিনি জাহির করতে পারেন, নিজের রীতিনীতি আদর্শকে তিনি ঠিক জায়গা মত প্রয়োগ করতে জানেন। সেই আদর্শ সেই পদ্ধতি অবনীমোহন হয়ত বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তবু নিজের মতে পথে চলতে পেরে বৈদ্যনাথ তো মোটামুটি সুখেই আছেন। স্ত্রী কি ছেলেপুলে নিয়ে তাঁর কোনরকম অশান্তি আছে বলে তো মনে হয় না। শুধু অবনীমোহনেরই যেন নিজের ওপর তেমন আস্থা নেই, সুখী হবার মত জোর নেই মনের।

শুধু কি স্ত্রী-পুত্র সম্বন্ধে, নিজের দুই ভাই সম্পর্কেও অবনীমোহনের চিত্ত এমনি দ্বিধাগ্রস্ত। ভাইরা তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। তবু বাবা মারা যাওয়ার পর ছেলে-বেলা থেকে দুই ভাইকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করেছেন, সব রকম স্বাধীনতা দিয়েছেন, কোনদিন তেমন কোন কড়া কথা বলেননি, কিন্তু তাঁরাই কি তার আশা পূর্ণ করেছে? ছোট সরোজ সারাজীবন রাজনীতি নিয়ে কাটাল। এখনও তাই কাটাচ্ছে। তার কাছ থেকে পরিবারের বিশেষ কোন প্রত্যাশা নেই। মৃগাঙ্ক অবশ্য সংসারী। কিন্তু সেও ব্যাপক ভাবে সমস্ত পরিবারটির কথা ভাবতে চায় না, ভাবতে পারে না। বাইরে তার নিজের খেয়াল আছে, বন্ধুবান্ধব আছে আর ঘরে অবসর যাপনের জন্যে আছে নিজের স্ত্রী-পুত্র। কোন সাংসারিক পরামর্শে সে আসে না, কোন চিন্তাভাবনার ভাগ নেয় না। মাস অন্তে মাইনের সামান্য ভগ্নাংশ দাদার হাতে পেঁৗছে দিয়েই খালাস। তাতে কি হয়।

অবনীমোহন একদিন জিজ্ঞেস করে-ছিলেন, 'আর টাকা কি করলি।'

মৃগাঙ্ক জবাব দিয়েছিল, 'আগের দেনা-টেনা আছে, তাই শোধ করতে হচ্ছে।'

অবনীমোহন আর কোন কথা বলেননি। কিন্তু বাসন্তী পীড়াপীড়ি করতে ছাড়েন না 'নিজে তুমি মুখ ফুটে বল, এমন করলে চলে নাকি, 'যা দেয় তাতে তো ওদেরই হয় না।'

অবনীমোহন বলেছেন, 'ছিঃ চুপ কর। একান্নবর্তী পরিবারে ওদের আর আমাদের বলে আলাদা কিছু নেই, সবই আমাদের। যতদিন চলছে চলুক, যতদিন পারব, চালিয়ে যাব।'

বাসন্তী বলেছেন, 'চালাতে আর পারছ কই, দেনাদায়িকে ক্রমেই তো তলিয়ে যাচ্ছ। ওদের এবার বুঝিয়ে বল।'

অবনীমোহন একটু চুপ করে থেকে শেষে বলেছেন, 'বলবার আর কি আছে। যখন বুঝবে তখন না বললেও বুঝবে। আর যদি বুঝতে না চায় আমি হাজার বললেও কি বোঝাতে পারব। মিছামিছি অশান্তির সৃষ্টি ক'রে লাভ কি।'

বাসন্তী রাগ ক'রে পাশ ফিরে শুয়েছেন, 'বেশ থাকো, তুমি তোমার শান্তি নিয়ে।'

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি মনের মধ্যে পাচ্ছেন কই অবনীমোহন। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে এও ঠিক হচ্ছে না, এও ঠিক হচ্ছে না। ঠিক মত চলছেন না তিনি, ঠিকমত কর্তব্য পালন করছেন না। ছোটদের কর্তব্য নির্দেশও তাঁর কর্তব্য। ওদের একথা বলতে হবে। কিন্তু বলতে গিয়ে বলতে

পারেন নি অবনীমোহন, পিছিয়ে এসেছেন। যদি ওরা ভুল বোঝে, যদি ওরা তাকে ছোট মনে করে, কিংবা যদি তিনি সত্যিই ছোট হয়ে যান। একে তো এই ছোট পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আটকে আছেন। হৃদয়ের পরিধিকে আরো ছোট করলে বাঁচবেন কি ক'রে।

অবনীমোহন যে নিজের মনে ভেবে চলেছেন তা ও'র দিকে তাকিয়েই মুকুন্দবাবু টের পেয়েছিলেন, তাই আর কোন কথা বলে ব্যাঘাত করেন নি। মুকুন্দবাবুর নিজেরও এমনি অভ্যাস। কথা বলতে বলতে ভাবা, পড়তে পড়তে ভাবা। এদিক থেকে অবনীমোহনের সঙ্গে তাঁর অনেকটা মিল আছে।

বৈদ্যনাথের জামাই সুবিমল এ বাড়ি থেকে অমন ক'রে চলে যাওয়ায় দুই পরিবারের মধ্যে যে খানিকটা বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে তা মুকুন্দবাবুর বুঝতে বাকি নেই। কিন্তু বুঝেও তিনি কোন কথা বলেন নি। এদের পারিবারিক বিষয় নিয়ে কথা বলতে যাওয়া মুকুন্দবাবুর মতে তাঁর অধিকারের বাইরে। অধিকারের সীমা তিনি সতর্কভাবে মেনে চলেন। নিজের চার দিকেও তাঁর একটা সীমানা টানা আছে। তার ভিতরে কারো ঢুকবার সাধ্য নেই। এ বাড়িতে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না এই নিয়ে তাঁর নিজের মনেও ইদানীং বেশ একটা সংকোচ হচ্ছে। কলকাতার ইভ্যাকুয়েশনের সময় এ বাড়ি যখন প্রায় খালি হয়ে গিয়েছিল, মেয়েদের আর ছোট ছেলেপুলেদের সরিয়ে দিয়ে এ বাড়ির পুরুষ অধিবাসীরা আত্মীয় বন্ধুদের নিয়ে যখন একটা মেসের আকার দিয়েছিলেন এই বাড়িটাকে, মুকুন্দবাবুও তখন বাসা তুলে দিয়ে স্ত্রী-পুত্রদের দেশে পাঠিয়ে অবনীমোহনের অনুরোধে এই বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপর বাইরের সবাই চলে গেছেন, কিন্তু যাই যাই ক'রে মুকুন্দবাবুর আজও যাওয়া হয়নি। অবনীমোহনও যেতে দেননি। মেসিং চার্জটা তিনি আগের মতই অবনীমোহনের হাতে গোপনে পেঁছে দেন। মুকুন্দের স্বাতন্ত্র্যের কথা ভেবে অবনীমোহনও তাতে আপত্তি করেন না। এ সব বিষয়ে দুজনের মধ্যে নিঃশব্দে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। কিন্তু এবার মুকুন্দের সময় হয়েছে এখান থেকে উঠে যাবার। জায়গা নিয়ে যখন এ'দের মধ্যে মনান্তর ঘটতে শুরু হয়েছে, তখন আর মুকুন্দের এখানে থাকা ভালো দেখায় না। তা ছাড়া বাড়ি থেকে ও'র স্ত্রী কল্যাণীও প্রত্যেক চিঠিতে কলকাতায় বাসা করার জন্যে তাগিদ দিচ্ছেন। অসুবিধের কথা জানাচ্ছেন নানা রকম করে। এবার একটা বাসা না করলেই নয়। কিন্তু বাসা করায়ও কি কম অসুবিধে। একে তো কলকাতায় ইদানীং বাসা পাওয়া দুর্ঘট হয়ে উঠেছে। ভাড়া বেড়ে গেছে, খরচ বেড়ে গেছে চতুর্গুণ। কিন্তু মুকুন্দবাবুর মাস্টারীর আয় তো তেমন বাড়ে নি। এই আয়ে সবাইকে এনে শেষে কি নাস্তানাবুদ হবেন। সব দিক থেকেই বিবেচনা করতে হচ্ছে। স্ত্রীকে প্রতি চিঠিতেই ভরসা দিচ্ছেন, 'উতলা হয়ো না, আমাকে একটু ভেবে দেখতে দাও।'

কল্যাণী জবাব দিচ্ছেন, 'তুমি তো জীবন ভরে কেবল ভেবেই দেখছ। আর কত ভাবতে চাও।'

'বাবা, পিসেমশাই, অফিসের বেলা হল না আপনাদের? নাইতে যাচ্ছেন না যে!'

নিচ থেকে প্রীতি তাগিদ দিতে এলো। ওর স্নান শেষ হয়েছে।

ভিজে চুলের রাশ পিঠময় ছড়ানো। পরনে হালকা চাঁপা রঙের শাড়ি। চমৎকার মানিয়েছে।

দুজনেই স্নিগ্ধ চোখে তাকালেন প্রীতির দিকে। ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার কথা ভুলে গেলেন মুহূর্তের জন্যে।

প্রীতি আবার বলল, 'তেল গামছা কি ওপরে এনে দেব?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'না না আমরাই নিচে যাচ্ছি চল।'

অবনীমোহন মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অণিমা কইরে?'

'নিচে আছে। ডেকে দেব বাবা?

অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বেরুবার আগে আমার সঙ্গে যেন একবার দেখা করে। বলিস ওকে।'

খেয়ে দেয়ে সাদা খদ্দরের জামার পকেটে পানের ডিবেটা ভরে অবনীমোহন ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছেন অণিমা এসে নতমুখে দাঁড়াল, 'আমাকে ডেকেছেন পিসেমশাই?'

অবনীমোহন বললেন, 'হ্যাঁ, তারপর মৃদু একটু হাসলেন, 'বলতো কেন ডেকেছি।'

অণিমা বলল, 'বাঃ রে তা আমি কি ক'রে বলব।'

অবনীমোহন বললেন, 'আচ্ছা তবে আমিই বলি। সুবিমলের ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে দাও তো মা।'

অণিমা মুখ নিচু ক'রে বলল, 'ঠিকানাটা তো দিয়ে যায় নি।'

অবনীমোহন বললেন, 'এই বুঝি, আমার কাছে বুঝি মিথ্যে কথা বলতে হয়! তাহলে কিন্তু এরপর থেকে কোন দিন আর মা বলব না মাসী বলব।'

অণিমা বলল, 'কিন্তু সবাইকে জানাতে যে বারণ করেছে!'

অবনীমোহন বললেন, 'আমি তার মধ্যে নিশ্চয়ই বাদ আছি। ভয় নেই; ঠিকানাটা বলে ফেল। তোমার বাবা মা কেউ নেই ধারে কাছে।'

অণিমা মৃদু হেসে বলল, 'থাকলই বা।'

তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের মেসের ঠিকানাটি দিয়ে দিল পিসেমশাইকে।

সন্ধ্যার পর আবার এসে অবনীমোহন গোপনে সাক্ষাৎ করলেন অণিমার সঙ্গে, বললেন, 'বাবাজীর ক্ষমতা' আছে। মেসে একটি সীট সত্যিই ভাড়া করে নিয়েছে এরই মধ্যে। একটা চাকরির কথাবার্তাও নাকি চলছে। নিমন্ত্রণ করে এসেছি। রবিবার আসবে। আমার ওপর নাকি তার মোটেই রাগ নেই।'

অণিমা খুশি হয়ে বলল, 'নেই-ই তো। আপনাকে সে সব চেয়ে ভালোবাসে।'

'বল কি সব চেয়ে!'

জামাটা খুলতে খুলতে মৃদু হাসলেন অবনীমোহন। অকর্তব্যের গ্লানি থেকে এতক্ষণে তিনি মুক্ত হতে পেরেছেন।

(ক্রমশ)

সৈয়দ মুজতবা আলী

কোন্‌-ভিনারের মা

বানিয়ে বানিয়ে গল্প জমাচ্ছি না, তাই যদি বিবরণটি নন্দনশাস্ত্রসম্মতস্বরূপ গ্রহণ না করে তবে আশা করি সুশীল পাঠক অপরাধ নেবেন না। কোন্‌-ভিনারের মা'র বেদনা নিয়ে সুন্দর গল্প রচনা করা যায় জানি, কিন্তু আমার মনের উপর সে এমনই দাগ কেটে গেছে যে সেটাকে গল্পের খাতিরে ফের-ফার করতে আমার বড্ড বাধো বাধো ঠেকে। সুরসিক পাঠক সেটা হয়তো বুঝতে পারবেন না, তবে সহৃদয় পাঠকের সহানুভূতি পাব সে আশা মনে মনে পোষণ করি।

দ্বিতীয়বারে বুড়ী অতটা বিচলিত হলেন না। এবারেও কাঁদলেন তবে জর্মনি বিজ্ঞানের দেশ বলে তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দিলেন; বললেন, চোখের কাছের যে স্যাক্‌ থেকে জল বেরোয়, বুড়ো বয়সে মানুষ নাকি তার উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। হবেও বা, কিন্তু বিদেশে ছেলের কথা ভেবে মা যদি অঝোরে কাঁদে তবে তার জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কি প্রয়োজন?

শুধালেন, 'এস্‌পেরেগাস্‌ খাবেন—একটুখানি গলানো মাখনের সঙ্গে?'

আমি তো অবাক। এস্‌পেরেগাস্‌ মানুষে খায় পশ্চিম বাঙলায় যে রকম আসল খাওয়া হয়ে গেলে টক খাওয়া হয়। বলা নেই কওয়া নেই, সকাল বেলা দশটার সময় সুস্থ মানুষ হঠাৎ টক খেতে যাবে কেন?

মজাটা সেইখানেই। আমি এস্‌পেরেগাস্‌ খেতে এত ভালোবাসি যে রাত তিনটার সময় কেউ যদি ঘুম ভাঙিয়ে এস্‌পেরেগাস্‌ খেতে বলে তবে তক্ষুনি রাজী হই। ভারতবর্ষে এস্‌পেরেগাস্‌ আসে টিনে করে—তাতে সত্যিকার সোয়াদ পাওয়া যায় না—তাজা ইলিশ নোনা ইলিশের চেয়েও বেশী তফাৎ। সেই এস্‌পেরেগাসের নামেই আমি যখন অজ্ঞান তখন এখানকার তাজা মাল!

মা-ই বললেন, 'আমি যখন এর্নস্টের কাছ থেকে খবর পেলুম, আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, তখন বউমাকে লিখলুম, আপনি কি খেতে ভালোবাসেন সে খবর জানাতে। বউমা লিখলে, পুরো লাঞ্চ খাওয়াতে হবে না,—শুধু এস্‌পেরেগাস্‌ হলেই চলবে। সৈয়দ সাহেব মোষের মত এস্‌পেরেগাস্‌ খান—বেলা অবেলায়।'

বুড়ী মধুর হাসি হেসে বললেন, 'পুরো লাঞ্চ এখন আমি আর রাঁধতে পারিনে, বউমা জানে। তাই আমার মনে কিন্তু কিন্তু রয়ে গিয়েছে, হয়ত আমাকে মেহন্নত থেকে বাঁচাবার জন্য লিখেছে আপনি বেলা-অবেলায় এস্‌পেরেগাস্‌ খান।'

আমি বললুম, 'আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'দেশের' চতুর পাঠককের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখে আর কস্য লভ্য যে আমি পেটুক। উল্টে তারা বুঝে যাবেন, আমি মিথ্যেবাদীও বটি।

এস্‌পেরেগাসের পরিমাণ দেখে আমার চোখ দুটো পটাং করে সকেট্‌ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। মহা মুশকিলে সেগুলো কার্পেট থেকে কুড়িয়ে নিয়ে সকেটে ঢুকিয়ে এস্‌পেরেগাস্‌ গ্রাস করতে বসলুম।

জানি, এক মণ বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু, প্লীজ, আধ মণ না মানলে আমাকে বড্ড বেদনা দেওয়া হবে। সুকুমার রায়ের 'খাই-খাই' খানেওয়ালাও সে-খানা শেষ করতে পারতো না।

আমি ঐ এক বাবদেই আমার মাকে খুশী করতে পারতুম—গুরুভোজনে। ধর্মসাক্ষী, আর সব বাবদে মা আমাকে মাফ্‌ করে দিয়েছেন। কোন্‌-ভিনারের মা পর্যন্ত খুশী হলেন, তাতে আর কিমাশ্চর্যম্‌!

হায়রে দুর্বল লেখনী—কি করে কোন্‌-ভিনারের মায়ের এস্‌পেরেগাস্‌ রান্নার বর্ণনা বতিরাৎ বয়ান করি!' অমিত্রাক্ষর ছন্দে শেষ কাব্য লিখেছেন মাইকেল, শেষ এসেপেরেগাস রেঁধেছেন কোন্‌-ভিনারের মা।

আহারাদি শেষ হলে পর কোন্‌-ভিনারের মা বললেন, 'আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

আমি বললুম, 'আদেশ করুন।'

তিনি বললেন, 'আপনি যদি না করতে পারেন, তবে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হব না।'

একটি অপরূপ হিরে লাগানো সোনার আংটি বের করে বললেন, 'নাৎসিরা এখন আর কোনো দামী জিনিস জর্মনির বাইরে যেতে দেয় না—সে নিয়ে তাদের উপর আমার কোনো ক্ষোভ নেই—আমি কি করে জানবো দেশের মঙ্গল কিসে। কিন্তু এ আঙটিটা এর্নস্টের প্রাপ্য। তার বাপঠাকুর্দা চোদ্দ-পুরুষ এই আঙটি পরে বিয়ে করেছিলেন; এ আঙটিটা তাকে দেবেন।'

আমার আঙুলে ঠিক লেগে গেল। আমি বললুম, 'আপনাকে ভাবতে হবে না।'

একটা সোনার চেনে ঝোলানো জড়োয়া পদক দিয়ে বললেন, 'এটা এর্নস্টের বাপ আমাকে বিয়ের রাতে বাসরঘরে দিয়েছিলেন, (পঞ্চাশ বছর পরে সেই পরবের স্মরণে তিনি একটুখানি লাজুক হাসি হাসলেন) এটা বউমার প্রাপ্য। এটা আপনি তাকে দেবেন।'

আমি কলার খুলে গলায় পরে নিয়ে বললুম, 'নিশ্চিন্ত থাকুন।'

কোন্‌-ভিনারের মা পই পই করে বললেন, 'কাস্টমসের বিপদে পড়লে জানলা দিয়ে ফেলে দেবেন কিম্বা ওদের দিয়ে দেবেন। আমি কোনো শোক করব না। ছেলে, বউকে আমি চিঠিতে এ বিষয়ে কিছুই জানাচ্ছিনে। তাদেরও কোনো শোক হবে না।

বরোদা ফিরে আমি কোন্‌-ভিনারকে আঙটি দিলুম, তাঁর বউকে পদক দিলুম।

* * * * *

ছ' মাস পরে বুড়ি মারা যান। কোন্‌-ভিনার এক বছর পরে মারা যান। তাঁর স্ত্রী এখন কোথায় জানিনে।

বৈদেশিকী

কোরিয়ায় দুই পক্ষই যুদ্ধ-বিরতির আলোচনার দীর্ঘসূত্র টেনে চলেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে ফট্-ফাট্ চলছে, তবে জোরের সংগে নয়। প্রকৃত যুদ্ধ-বিরতি হবে কিনা এবং হলে কবে হবে তার নিশ্চয়তা নেই, তবে মার্কিন নীতি কোন্ ধারায় যাচ্ছে তার একটা আভাস ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্ছে। আমেরিকা কোরিয়ার জমিতে আর বেশি যুদ্ধ করতে চাচ্ছে না। এমন কি, একথাও শোনা যাচ্ছে যে, দক্ষিণ কোরিয়াকে রক্ষা করার জন্য কোরিয়াতে যথেষ্টসংখ্যক মার্কিন সৈন্য-সামন্ত রাখাও নাকি নূতন মার্কিন সামরিক নীতির লক্ষ্যভুক্ত নয়। নূতন মার্কিন নীতি অনুসারে চীনাদের এই বলে শাসিয়ে দেয়া হবে যে, যুদ্ধ-বিরতি চুক্তির পরে তারা যদি তার কোনো সর্ত ভঙ্গ করে তবে চীনের উপর সাক্ষাৎভাবে আক্রমণ করা হবে—চীনের উপকূলে অবরোধ এবং চীনের বড়ো বড়ো শহরের উপর বোমাবর্ষণের দ্বারা।

একদিক দিয়ে দেখলে এটা মূলতঃ জেনারেল ম্যাক আর্থারের যুক্তিকেই স্বীকার করে নেয়া। ম্যাক আর্থার বলেছিলেন যে, কোরিয়ায় সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে হলে চীনের উপর সাক্ষাৎ আক্রমণ প্রয়োজন। সামরিক শক্তির প্রাচুর্য এবং অস্ত্রশস্ত্র ও সর্বপ্রকার যান্ত্রিক বলের অজস্রতা সত্ত্বেও দেড় বছরের উপর যুদ্ধ করেও মার্কিন পক্ষ কোরিয়ায় প্রকৃত জয়লাভ করতে পারে নি। জেনারেল ম্যাক আর্থারের পদচ্যুতির পরেও প্রায় দশ মাস কেটে গেল। এখন আর কোনো সন্দেহ নেই যে, এরকম করে সমগ্র কোরিয়াকে "মুক্ত" করা অসম্ভব। আমেরিকা কোরিয়ায় এই ধরণের যুদ্ধে অনির্দিষ্ট-কালের জন্য লিপ্ত থেকে মার্কিন-রক্তক্ষয় করতে আর চাচ্ছে না, কিন্তু কোরিয়াকে হাতছাড়াও করা যায় না। সুতরাং চীনকে এমন যুদ্ধের ভয় দেখানো দরকার যাতে মার্কিন ভূ-সৈন্য না লাগিয়ে বিমান ও নৌবহরের আক্রমণ দ্বারাই চীনকে ক্ষত-বিক্ষত করা যায়।

ইঙ্গ-মার্কিন রাজনৈতিক অভিধানে যাকে "এগ্রেশন" বলা হয় তার সম্ভাবনা উপরোক্ত নীতিপ্রদর্শনের দ্বারা নিবারিত করা যাবে কিনা সে বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আমেরিকা নিজের সুবিধামত যুদ্ধক্ষেত্র বেছে নিতে চাচ্ছে। সে ভালো করেই বুঝেছে যে, কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র তার পক্ষে অনুকূল হয়নি। কিন্তু চীনারা যদি বেয়াড়া হয়েই চলে তবে মার্কিন নৌ ও বিমানবহরের শক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্রের মধ্যে সংঘর্ষ সীমাবদ্ধ করে রাখার চেষ্টাই কি শেষ পর্যন্ত সফল হবে? ইন্দোচীনে আমেরিকা ফরাসীদের অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে কিন্তু ফরাসীরা এখন আর কেবল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভিয়েৎমিনদের সংগে লড়াই চালিয়ে যেতে পারছে না। এর ওপর আবার তারা চীন থেকে ভিয়েৎমিনের পক্ষে সম্ভাব্য ভলান্টিয়ার বাহিনীর আক্রমণ আশঙ্কায় ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। চীন যদি সত্যই এই দিক দিয়ে চাপ লাগায় তবে আমেরিকা কতদিন আলগোছ হয়ে থাকতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ওদিকে আবার হংকং রয়েছে। হংকং বিপন্ন হলে ইংরেজেরা পরিত্রাহি ডাক ছাড়বে, তখন আমেরিকার ভূমি স্পর্শ না করার নীতি টিকে থাকবে বলে মনে হয় না। মিঃ চার্চিল কি আর সে ব্যবস্থাটুকুও করে আসছেন না? তবে সকলকে নিয়ে জড়িয়ে পড়তে পারলে হয়ত তাতে আমেরিকার আপত্তি হবে না। বর্তমানের যুদ্ধ যাতে এপক্ষে বেশির ভাগ মার্কিন রক্তই ক্ষয় হচ্ছে অথচ নিশ্চিত জয়ের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, এটা আর আমেরিকা বরদাস্ত করতে পারছে না।

আপাততঃ আমেরিকা ম্যাক আর্থারের যুক্তি গ্রহণ করছে বটে, কিন্তু সেই যুক্তি অনুসারে যা করার এক সংগে করতে চাচ্ছে না। পরে করবে বলে আপাততঃ ভয় দেখিয়ে দেখতে চায় যে, কী হয়। যাতে চীনের সংগে ব্যাপকতর সাক্ষাৎ যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়ে এরূপ নীতি গ্রহণে আমেরিকার পক্ষে একটা বড়ো বাধা ছিল তার অন্য মিত্রদের, বিশেষ করে বৃটিশ গভর্নমেন্টের আপত্তি। নানা কারণে ইংরেজেরা চীনের সংগে সাক্ষাৎভাবে ব্যাপক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায়নি, এখনও হয়ত চায় না। কিন্তু কার্যত পরে যাই হোক, বৃটিশ গভর্নমেন্টের নীতিগত আপত্তির বাধা ট্রুম্যান-চার্চিল সাক্ষাৎকারের পরে আর নেই। মার্কিন কংগ্রেসের (আমেরিকার আইনসভা) সম্মুখে বক্তৃতায় মিঃ চার্চিল বলেন যে, কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি হবার পরে যদি চীন তার কোনো সর্ত ভঙ্গ করে তবে "আমরা দেখে নেব"। সুতরাং এটা এখন স্পষ্ট যে, এ্যাটলী গভর্নমেন্টের সময় পর্যন্ত সুদূর প্রাচ্য নীতি সম্পর্কে আমেরিকার ওপর বৃটিশ তরফের ওজর আপত্তির যে একটা চাপ ছিল সেটা নেমে গিয়েছে। অন্তত অনেকটা হাল্কা হয়ে গিয়েছে। পিকিং গভর্নমেন্টের সংগে অকারণে খোঁচাখুঁচি না করার পূর্বতন বৃটিশ নীতি মিঃ চার্চিল অনেকখানি শিথিল করে দিয়েছেন। আমেরিকা জাপানকে দিয়ে চিয়াং কাইশেকের গভর্নমেন্টকে স্বীকার করিয়ে নেবার জন্য ব্যস্ত। ইংরেজের এটা মনঃপূত নয়, কিন্তু তাতে বাধা দেবার কোনো চেষ্টা এখন আর বৃটিশ গভর্নমেন্ট করবেন না। বৃটেন অবশ্য আমেরিকার কাছে এত জায়গায় "ঠেকা" যে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, আমেরিকা যে-ভাবে কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির বনিয়াদ গড়তে চাচ্ছে তার সংগে আমেরিকার অন্য কাজ-গুলির যে-অসংগতি সেটা তার বা তার মিত্রদের চোখে ঠেকছে না! ঠেকছে নিশ্চয়ই কিন্তু বলে কি করে? কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতির কোনো সর্ত ভঙ্গ হওয়ামাত্র চীনের উপকূল অবরুদ্ধ হবে, চীনের শহরগুলির উপর বোমা পড়তে থাকবে, এই ভয়ে কোরিয়ায় চীনারা ও উত্তর কোরিয়ানরা ভালোছেলের মতো ব্যবহার করবে, এই হোল প্রস্তাব। ভালো কথা। কিন্তু ওদিকে ফরমোজায় চিয়াং কাইশেকের রাজত্ব কেবল পাকা করার ব্যবস্থা হচ্ছে না, চিয়াং কাইশেকের দ্বারা চীনভূমি আক্রমণ সম্ভব করে তোলার জন্য যা কিছু সাহায্য সমস্ত দেয়া হচ্ছে। চীন-বর্মা সীমান্তে চিয়াং কাইশেকের অনু-চরগণের একটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে অনেকদিন থেকে শোনা যাচ্ছে এবং থাইল্যান্ড থেকে তাদের কাছে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হচ্ছে, এ অভিযোগ কেবল পিকিং গভর্নমেন্ট নয়, বর্মীরাও করছে। সুতরাং চীনের চক্ষে মার্কিন গভর্নমেন্ট চিয়াং কাইশেককে পুষে কেবল যে চীনকে ফরমোজার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখছেন তা নয়, ফরমোজা থেকে চীনকে আক্রমণ করে চীনের বর্তমান গভর্ন-মেন্টকে ধ্বংস করার পরিকল্পনাও তাঁরা কার্যে পরিণত করার অবিরাম চেষ্টা করছেন। এই যদি অবস্থা হয়, তবে কি আশা করা যায় যে, পিকিং গভর্নমেন্ট হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন? কোরিয়ায় সাময়িকভাবে যুদ্ধ কমুক বা বাড়ুক, কিন্তু মোটের উপর পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপর শীঘ্র যে শান্তি নামবে তার কোনো আশা দেখা যাচ্ছে না, বরঞ্চ বিপরীতটাই আশঙ্কা করা যায়।

২০।১।৫২

বরোদার এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে একটি ভুয়া বরযাত্রীর মিছিল রাস্তায় বাহির হইয়া কংগ্রেসের তরফ হইতে ভোট সংগ্রহের জন্য ক্যান্‌ভাস্‌ করিয়াছে।—

“বিয়েটা নিশ্চয়ই বৃষোৎসর্গের চেয়ে ভালো”—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

" * * *

কোন এক ভোট কেন্দ্রে পল্লী অঞ্চলের ভোটদাতারা নাকি ভগবানকে ভোট দিতে আসিয়াছিলেন।—“তারা জানেন না যে দশচক্রে ভূত হওয়ার ভয়ে ভগবান নির্বাচনে অবতীর্ণ হন নি”—বলে আমাদের শ্যামলাল।

" * * *

ডাঃ আম্বেদকারের নব সংগঠিত দল নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন। জনৈক সহযাত্রী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিলেন—“সংবাদটা নিশ্চয়ই মানুষের কুকুর কামড়ে দেওয়ার পর্যায়ে পড়ে না।”

" * * *

শিলঙ্‌-এর সংবাদে প্রকাশ, সেখানে এক ভোট কেন্দ্রে হাতীর উৎপাতে নাকি ভোট গ্রহণে বড়ই অসুবিধা হইতেছে। শ্যামলাল বলিল—“অনেক কেন্দ্রে মশামাছির উৎপাতও বড় কম হচ্ছে না।”

" * * *

এক সংবাদে জানা গেল, ভারত নাকি বিদেশে প্রচুর জন্তু-জানোয়ার রপ্তানি করিতেছেন।—শ্যাম বলিল, “ভারত নিশ্চয়ই উদ্বৃত্ত অঞ্চল, সুতরাং......

" * * *
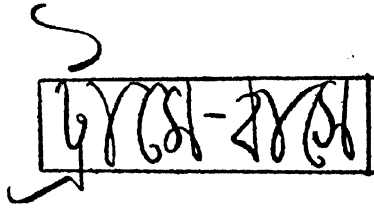
দেশের অন্নবস্ত্র ও গৃহ সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না বলিয়া নাগপুরের ছাত্র-ছাত্রীরা একটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—“কৌপীনবন্তরা চিরকালই ভাগ্যবন্ত বলে শাস্ত্রে একটা কথা আছে, সোজা বাঙলায় যাকে বলে ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়—অন্নবস্ত্র সমস্যার Made Easy সংকলন!!

" * * *

পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, গৃহ সমস্যাই নাকি পানাসক্তির জন্য দায়ী।—“আমরা কিন্তু জানি অন্যরূপঃ—পানাসক্তিতেই গৃহসমস্যা জটিল হয়ে ওঠে”—মন্তব্য করেন খুড়ো।

" * * *

কলিকাতার রাস্তায় কোন রকম অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া চলাফেরা আইনতঃ নিষিদ্ধ হইয়াছে।—“নির্বাচনী অস্ত্র অর্থাৎ

খিস্তি-খেউড় এই আইনের আওতায় আসে নি দেখে ক্যানভাসাররা নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হয়েছেন”—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

" * * *

খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানে সম্প্রতি একটি বনজ তৈলের কারখানার উদ্বোধন করিয়াছেন।—“আমরা কিন্তু জানি সেখানে জান্তব তেলের প্রয়োজনই বেশী” —বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * * *

পাকিস্তানে সম্প্রতি পাই-পয়সা প্রবর্তন করা হইয়াছে। পাইতে লেখা আছে—“হুকুমৎ-ই-পাকিস্তান”।—“অনেকটা কানা ছেলের পদ্মলোচন নামের মতো শোনায় নাকি”—বলেন বিশু খুড়ো।

* * * "

মহামান্য আগা খাঁ ভারতে পদার্পণ করিয়া তাঁর শিষ্য সম্প্রদায়কে জানাইয়াছেন যে, তিনি বর্তমানে বেশ হাঁটিতে পারিতেছেন।—“শিষ্যরা সংবাদ

শুনে নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হয়েছেন, কিন্তু আরো অগণিত শিষ্যরা জানতে চাইছেন তাঁর ঘোড়াগুলো বেশ দৌড়তে পারছে কিনা”—বলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

কলিকাতায় শুনিলাম, একাধিক প্রযোজক-পরিচালক—“কপালকুণ্ডলা” ছবি তুলিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আছেন—“ঠক্‌ঠকানিতে কার কপালে ঘি পড়ে আমরা তাই দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি”—বলে শ্যামলাল

* * * * *

সাগর মেলার প্রক্কালে আমরা গঙ্গাবক্ষে একটি মর্মান্তিক নৌকা নিমজ্জনে সংবাদ পাঠ করিলাম।—“কিন্তু সাগ স্নানের দিনে আরো মর্মান্তিক এক নৌকাডুবির খবর আমরা পেয়েছি কা পুরের গ্রীন পার্ক থেকে; দুর্মদ হিলটন টেটারসল্‌ বাত্যাই নাকি এই দুর্ঘটনার জ দায়ী। ভবিষ্যতে যাত্রীরা ভর্‌ ভর্‌ না ব যেন বদর বদর বলেন”—মন্তব্য করেন বি খুড়ো।

প্রজাতন্ত্রভারতের একটি তথ্য বাহন

পংকজ দত্ত

স্বাধীন হবার পর দেখা যাচ্ছে, ভারত-বর্ষের অনেক ব্যাপারই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের তুলনাতে বিরাটরকমের কৃতিত্বের পরিচায়ক। ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প উৎপাদনের পরিমাপে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম চলচ্চিত্র-শিল্প বলে এখন স্বীকৃত হয়েছে। ভারতের এ কৃতিত্ব কিন্তু অর্জিত হয়েছে বহু বছর আগেই, তবে স্বীকৃতিলাভ ঘটেছে অতি হালে। এখন দেখা যাচ্ছে, ভারত গভর্নমেণ্ট এদেশে ডকুমেণ্টারী ছবির উৎপাদন ও প্রচলনের যে ব্যবস্থা করেছেন তেমন বড়ো প্রচেষ্টাও পৃথিবীর খুব বেশী দেশে নেই।

১৯৪০ সালে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা আহরণে চলচ্চিত্রের সাহায্যে প্রচারের উপকারিতা উপলব্ধি করে দিশী এবং বিদেশী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি চলচ্চিত্র উপদেষ্টা পর্ষৎ গঠন করে। এই পর্ষৎ-এর কাজ ছিলো বৃটেন ও আমেরিকাতে তোলা এদেশের পক্ষে উপযুক্ত প্রচার চিত্র নির্বাচন করে এদেশে দেখাবার জন্যে অনুমোদন করে দেওয়া। এ ব্যবস্থায় আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পর্ষৎটি ভেঙে দেওয়া হয় ও সে জায়গায় ইন্‌ফরমেশন ফিল্মস্ অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা হয়। ইন্‌ফরমেশন ফিল্মস্ বা সংক্ষেপে আই-এফ-আই ইংরাজি, বাঙলা, হিন্দী, তামিল ও তেলেগু ভাষায় যুদ্ধের প্রচার এবং ভারতীয় শিল্প-সম্পদ বিষয়ক ছোট ছবি তোলায় রত হয়। ১৯৪৬ সালের মে মাসে বাজেটের এক ছাঁটাই প্রস্তাবে আই-এফ-আই বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিন বছরের মধ্যে আই-এফ-আই মোট ১০১ খানি ছোট ছবি তুলতে সমর্থ হয়। এদের অনেকগুলি ছবি বিদেশেও পাঠানো হয় এবং কয়েকখানি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে পুরস্কার-লাভেও সমর্থ হয়।

ভারতীয় সংবাদ-চিত্র ব্যাপারে প্রথম আমলের উপদেষ্টা পর্ষৎ ব্রিটিশ মুভীটোন নিউজই ভারতীয় ভাষায় ডাব্ করে দেখাবার ব্যবস্থা চালিয়েছিল। কিন্তু সে-সব বিদেশী খবরের ওপরে লোকের ঝোঁক তৈরী হবার কোন লক্ষণ না দেখে পর্ষৎ ব্রিটিশ মুভীটোনের সঙ্গে এদেশেই ছবি তোলার একটা ব্যবস্থা করে ১৯৪২ সালের মে মাসে। এই সংবাদ-চিত্রের নাম দেওয়া হয় ইণ্ডিয়ান মুভীটোন নিউজ; পনেরো দিনে এর একটি করে সংস্করণ প্রকাশ করা হতো চারটি ভারতীয় ভাষায়—হিন্দুস্থানী, বাঙলা, তামিল ও তেলেগুতে। এর পর আই-এফ-আই প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে ইণ্ডিয়ান মুভীটোন নিউজের নাম বদলে দাঁড়ায় ইণ্ডিয়ান নিউজ প্যারেড এবং সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। ছবিগুলি যাতে কাজে আনানো যায় অর্থাৎ নিয়মিত দেখাবার পথটা খোলা থাকে তার জন্যে এই সময়ে তৎকালীন ভারত সংরক্ষণ আইনের ৪৪ ধারা আরোপ করে দেশের প্রত্যেক চিত্রগৃহকে আই-এফ-আই ও নিউজ প্যারেডের ছবি দেখাতে বাধ্য করা হয়। আই-এফ-আই ও নিউজ প্যারেড—দুয়েরই প্রধান কার্যকেন্দ্র ছিলো বম্বেতে। ১৯৪৬ সালে আই-এফ-আইয়ের নিউজ প্যারেডেরও সমাপ্তি ঘটে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৬ সালের গোড়াতেই সর্দার প্যাটেলের প্রচেষ্টায় বর্তমান ফিল্মস্ ডিভিসন প্রবর্তিত হয় ডকুমেণ্টারি ছবির জন্যে এবং সংবাদ-চিত্রের জন্যে হয় ইণ্ডিয়ান নিউজ রিভিউ। ছোট ছবি প্রদর্শন ব্যাপারে সিনেমাগৃহগুলির উৎসাহের অভাব হেতু এবারেও ছবিগুলি দেখাবার জন্যে বাধ্যতামূলক আইন প্রয়োগ করতে হয়েছে।

বর্তমানে ভারতের স্থায়ী, অস্থায়ী ও ভ্রাম্যমান মিলিয়ে প্রায় ৩০০০ চলচ্চিত্রাগারে নিয়মিতভাবে ফিল্মস্ ডিভিশনের এবং ইণ্ডিয়ান নিউজ রিভিউর ছবি প্রতি সপ্তাহে দেখানো হচ্ছে। ছবিগুলি বিতরণ করার জন্যে বম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ ও নাগপুরে ফিল্মস্ ডিভিশনের নিজস্ব পরিবেশন দপ্তর আছে। সাপ্তাহিক আয় অনুসারে দেশের সমস্ত চিত্রাগারকে কতক-গুলি শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে এবং ছবিগুলির ওপর ভাড়াও নির্ধারণ করা হয় সাপ্তাহিক বিক্রয়ক্ষমতার আনুপাতিক

হিসেবে। ভাড়ার হার হচ্ছে সাপ্তাহিক গড়পড়তা টিকিট বিক্রীর ওপর শতকরা এক টাকা হিসেবে, তবে সর্বনিম্ন ভাড়া হচ্ছে পাঁচ টাকা।

প্রতি সপ্তাহে একখানি করে নতুন ডকুমেণ্টারি ও সংবাদ-চিত্র প্রকাশ করা হয়। ছবিগুলি থাকে পাঁচটি ভাষায়—ইংরাজি, হিন্দী, বাঙলা, তামিল ও তেলেগু। প্রত্যেকখানি ডকুমেণ্টারি ও সংবাদ-চিত্র বড়ো বড়ো শহরের প্রধান প্রধান চিত্রগৃহ-গুলিতে প্রথমে মুক্তিদান করা হয় এবং তার জন্যে দরকার হয় প্রায় ৭৫ খানি করে কপি—ডকুমেণ্টারি ও সংবাদ-চিত্র মিলিয়ে কপির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫০। কোন কোন বিশেষ ছবির ক্ষেত্রে কপির সংখ্যা আরও পাঁচগুণও করা হয়েছে যাতে অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত দেশেই ছবিগুলি দেখানো সম্পূর্ণ হতে পারে। যেমন লোকগণনা ও নির্বাচন ব্যাপারে লোককে অবহিত করার জন্যে প্রত্যেকবার সাতশখানির বেশী কপি ব্যবহার করা হয়েছিলো যাতে অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যেই ছবিগুলি দেশের সমস্ত চিত্রাগারে দেখানো শেষ হয়। তা নয়তো সাধারণক্ষেত্রে দু রকমের ছবি মিলিয়ে ঐ দেড়শোখানি কপি প্রথমে সারা দেশের ঐ সংখ্যক ক-শ্রেণীর চিত্রাগারে মুক্তিদান করা হয়। পরের সপ্তাহে সেই কপি যায় খ-শ্রেণীর চিত্রগৃহে, তারপর যায় গ-শ্রেণীতে এবং এইভাবে প্রত্যেকখানি ডকুমেণ্টারি ও সংবাদ-চিত্র দেশের সমস্ত চিত্রাগার পরিভ্রমণ করে এবং প্রথম মুক্তি থেকে তুলে নেবার সময় পর্যন্ত প্রায় আট মাস সময় লাগে।

ফিল্মস্ ডিভিশন চালাবার জন্যে সরকারী তহবিল থেকে বাৎসরিক বরাদ্দ হচ্ছে ৩৫ লক্ষ টাকা। ছবিগুলি দেখাবার জন্যে যদিও সব চিত্রাগার থেকেই ভাড়া নেওয়া হয় তবু এখনও লোকসানই যাচ্ছে। তবে অনুমান করা যাচ্ছে যে, চিত্রগৃহের সংখ্যা আরও বৃদ্ধিলাভ করলে এবং বর্তমানে চিত্রগৃহের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধিলাভ করতে আরম্ভ করছে তাতে আগামী ১৯৫৩ সালের মধ্যেই লোকসান বন্ধ হয়ে ফিল্মস্ ডিভিশন আত্ম-নির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারবে। গত তিন বছরে ফিল্মস্ ডিভিশন প্রায় ১১০ খানি ডকুমেণ্টারি ছবি তুলেছে এবং প্রতি সপ্তাহের জন্য একটি সংস্করণ নতুন সংবাদ-চিত্র পরিবেশন করেছে। সম্প্রতি বিদেশী নিউজ রীলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইণ্ডিয়ান নিউজ রিভিউতে কিছু কিছু বিদেশী সংবাদ-চিত্রও জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

ফিল্মস্ ডিভিশন প্রবর্তিত হয়ে বাধ্যতা-মূলকভাবে ডকুমেণ্টারি ও সংবাদ-চিত্র দেখাবার সরকারী প্রযত্ন অনেক রকমের আপত্তি ও অনুযোগের মুখে পড়েছিলো। অনেকে বলেছিলেন যে জোর করে দেখানোটা লোকে সহ্য করবে না। কার্যত দেখা গেলো জনসাধারণের তরফ থেকে ডকুমেণ্টারি ও সংবাদ-চিত্র দেখানো নিয়ে কোন আপত্তি তো ওঠেইনি, বরং সংবাদ, তথ্য, শিক্ষা ও কৃষ্টি সম্পর্কিত ছোট ছবি দেখার জন্যে জন-সাধারণের প্রভূত আগ্রহেরই প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে এবং যাচ্ছেও। এখন এমন অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে যে ছবির যে কোন প্রোগ্রামে ছোট ছবি না থাকলেই বরং লোকের মধ্যে একটা অতৃপ্তি দেখা দেয়।
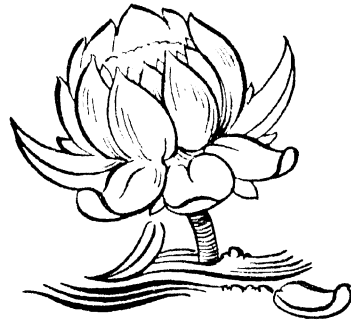
উৎকর্ষের মান বাড়াবার জন্যে অনেক উন্নতির অবশ্যই দরকার, এবং অনেক কিছু করবারও রয়েছে। শহরে চিত্রদর্শকদের যারা বিদেশী ছোট ছবি দেখে তাদের সঙ্গে ফিল্মস্ ডিভিশনের ছবির তুলনা প্রসঙ্গে যে সব মন্তব্য করেন তার অনেক কথা মেনেও নিতে হয়, কিন্তু সব সত্ত্বেও ভারত গভর্নমেণ্টের এই প্রচেষ্টাটির অনেক গৌরবের কথাও অস্বীকার করবার নয়। আর উৎকর্ষের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাবার মতো উন্নত নৈপুণ্যও যে পাওয়া গিয়েছে তার প্রমাণ এ বছরে ভেনিসের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলায় পুরস্কার-প্রাপ্ত 'রাজস্থান' এবং লণ্ডনের রয়েল ফটোগ্রাফিক সোসাইটিতে অনুমোদিত আসামের রেলপথ নির্মাণ সম্পর্কিত ছবি 'দি ভাইটাল লিংক'।

এখনও অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও জনসাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধি ও দৃষ্টি উন্মোচনের কাজে ফিল্মস্ ডিভিশনের ছবিগুলি এখন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ধাপে উঠে আসতে পেরেছে। এখন ছবি দেখার সময় এগুলি না দেখতে পেলেই ফাঁকা ঠেকে। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি ছবি খুবই কাজের বলে প্রমাণিতও হয়েছে। লোকগণনার সময়ে লোকগণনার প্রয়োজনীয়তা, গণনার প্রথা এবং এবিষয়ে জনসাধারণের কর্তব্য দেখানো ব্যাপারে ফিল্মস্ ডিভিশনের ডকুমেণ্টারি ছবি ক'খানি কাজের হয়েছে। তেমনি নির্বাচন ব্যাপারেও লোককে ভারতের নূতন শাসনতন্ত্র ধরে লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভায় দেশের প্রতিনিধি পাঠানোর জনসাধারণকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে উৎসাহিত করে তোলায় বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। দেশের কৃষি ও শিল্প সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে নানাভাবের যে সব বিরাট প্রচেষ্টা আজ চলেছে, হাজার হাজার অক্ষরের সাহায্যে যার সঠিক চেহারা লোকের দৃষ্টিতে এনে দেওয়া সম্ভব নয়, ফিল্মস্ ডিভিশনের একখানি ডকুমেণ্টারিতে বেশ উজ্জ্বলভাবেই তা দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে দেশের এক এক জায়গার শিল্পকলা, সঙ্গীত, প্রাকৃতিক রূপ, ঐতিহ্য নিয়েও ছবি তোলা হচ্ছে। সমাজ-চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্যে কালোবাজারীদের কালোকাজ, রেলে টিকিট ফাঁকি দেওয়া নিয়ে যেসব ছবি তোলা হচ্ছে তেমনি ভীড়েতে কিউ দেওয়ার সার্থকতা বুঝিয়ে দেবার মতও ছবি হচ্ছে। ভারতের গহনতম গ্রামের চিত্রদর্শকও তার গ্রামে বসেই দেখতে ও জানতে পারছে কাশ্মীরকে, প্রতিবেশী নেপালকে, দেখছে ভারতের বিভিন্ন গুহা মন্দিরের শিল্পৈশ্বর্য, রাজপুতানার উটেদের জীবন, ভারতের জাতীয় বাহিনীর দীপ্ত চেহারা, চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিন তৈরী, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এমনিধারা আরও কত কি।

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই ফিল্ম্ ডিভিশন তার সার্থকতা আগের চেয়ে বেশী করেই প্রমাণ করে দিতে পেরেছে। ভারতকে এখন ভালভাবে জানবার জন্যে, তার প্রকৃত চেহারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে, তার কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের স্বরূপটা চিনবার জন্যে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র থেকে ফিল্মস্ ডিভিশনের ডকুমেণ্টারি ছবি চেয়ে পাঠানো হচ্ছে। বিদেশে ভারতের দূতাবাসগুলিতে একখানি করে বিশেষ সংস্করণ ছবি নিয়মিতভাবে পাঠানো হয়। তাছাড়া বৃটেন, আমেরিকা, ইতালি, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের চিত্র ব্যবসায়ীরা ওসব দেশের জনসাধারণকে চিত্রাগার ও টেলিভিশনের সাহায্যে দেখাবার জন্যে ছবি চাইছে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর পৃথিবীর সবায়েরই ভারতকে সম্পূর্ণভাবে দেখবার ও চিনবার আগ্রহ বেড়ে চলেছে—ফিল্মস ডিভিশনের দায়িত্ব এবং কাজও তাই আজ অনেক বেশী। কেবল বর্তমানের চাহিদা মেটাতেই ফিল্মস্ ডিভিশনের কাজ শেষ নয়—আগামী দিনের ইতিহাস রচনার মালমসলা সঙ্কলনেও তার দায়িত্ব রয়েছে। প্রজাতন্ত্রের প্রথম বছরেই দেশকে গড়ে তোলায় যে অদম্য প্রযত্ন দেখা দিয়েছে, ফিল্মস্ ডিভিশনের রেকর্ডে তার সবই রইলো চিত্রিত পরবর্তী যুগের জন্যে।

ক্রিকেট

ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল আগামী এপ্রিল মাসেই লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিবে। কারণ তথা মে হইতেই ভ্রমণের খেলা আরম্ভ হইবে। এম সি সি দলের ভারত ভ্রমণ আগামী মাসেই শেষ হইবে। উহার পরেই ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়গণের নাম কণ্ট্রোল বোর্ড ঘোষণা করিবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ তালিকা প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। ইহার প্রধান কারণ রয়টারের বৈদেশিক ক্রিকেট সমালোচক লেসলী স্মিথ। তিনি কলিকাতার তৃতীয় টেস্টম্যাচের সময়েই এক সম্ভাব্য তালিকা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলেই নানা প্রকার জল্পনাকল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। বহু পাঠকও আমাদের নিকট কোন কোন খেলোয়াড়দের লইয়া দল গঠন করিলে ঠিক ভারতীয় দল হইবে, তাহার তালিকা প্রেরণ করিয়াছেন। এই সকল তালিকা পাঠ করিলেও বেশ কিছুটা আমোদ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কতকগুলি খেলোয়াড় আছেন, যাহারা সকল তালিকায় স্থান পাইয়াছেন। ইহা ছাড়া অধিকাংশ প্রেরকের পছন্দমত খেলোয়াড় বলিতে কেহ না কেহ যে আছেন, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সকল পছন্দ করা খেলোয়াড়দের মধ্যে কয়েকজন বাঙালী আছেন ও কয়েকজন অবাঙালী আছেন। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী ঠিক কোন কোন খেলোয়াড়কে লইয়া দল গঠন করিবেন পূর্ব হইতে কেহই বলিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় কোন দলের নামের তালিকা প্রকাশ করার কোন যুক্তিই আমরা খুঁজিয়া পাই না। তবে যে সকল খেলোয়াড় নিশ্চিত স্থান পাইবেন বলিয়া আমাদের অন্ততঃপক্ষে মনে হইয়াছে, তাহাদের নাম উল্লেখ করিতে কোন পাঠকই বিরত হন নাই। এইরূপে অবস্থায় তাহার উল্লেখ বা পুনরাবৃত্তির কোনই প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। আমরা সকলকে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতেই অনুরোধ করি। আলাপ-আলোচনা প্রকাশিত হইলে নির্বাচকমণ্ডলী প্রভাবান্বিত হইবেন বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা ভুল করিবেন। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যগণ কোন দিনই যে আলাপ আলোচনার মূল্য দেন না ইহা এইবারের বিভিন্ন টেস্ট দল গঠন হইতেই উপলব্ধি করা গিয়াছে। ইহারা যেভাবে চলিয়াছেন, তাহার পরিবর্তন করিতে হইলে ইহাদের অপসারণ ব্যতীত কোন উপায় নাই। উহা বর্তমানে অসম্ভব। এইরূপ অবস্থায় নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ ক্রিকেট দল

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের সেমি ফাইন্যাল খেলায় পশ্চিমবঙ্গ ক্রিকেট দলকে আসাম দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। এই খেলায় পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে যে সকল খেলোয়াড় খেলিবেন, তাহাদের তালিকা সম্প্রতি প্রকাশ করা হইয়াছে। অধিকাংশ ক্রীড়ামোদীর ধারণা ছিল এম সি সি দলের বিরুদ্ধে যে দল খেলিয়াছিল, সেই দলই পুনরায় মনোনীত করা হইবে। কিন্তু ফলতঃ তাহা হয় নাই। বাঙলার পূর্ব দলের অধিনায়ক ছিলেন সি এস নাইডু। এই খেলায় নির্মল চ্যাটার্জিকে অধিনায়ক করা হইয়াছে। সি এস নাইডু কয়েক বারই বাঙলা দলের অধিনায়কতা করিয়াছেন; কিন্তু নির্মল চ্যাটার্জি কখনই করেন নাই অথচ তাঁহাকে হঠাৎ দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত করিয়া নির্বাচকগণ ভাল করিয়াছেন বলিয়া অনেকেই সন্দেহ করিতেছেন। কানাঘুষায় জানা যায়, এই অধিনায়ক নির্বাচন বিষয়টি লইয়া ক্রিকেট পরিচালকদের মধ্যে বেশ কিছুটা মত-বিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত এক যুক্তি—"পেশাদার সুতরাং অধিনায়ক হইতে পারেন না" ইহাই সকলের মনে আধিপত্য বিস্তার করে ও এন চ্যাটার্জিকে অধিনায়ক পদে নির্বাচনের পক্ষে সকলেই এক মত হন। অধিনায়ক পদে "পেশাদার বা বেতনভুক্তকে মনোনীত করা যায় না" এই যুক্তি পূর্বে কোথায় ছিল সেই কথাই বর্তমানে মনে হওয়া স্বাভাবিক। নব নির্বাচিত অধিনায়ক দলকে জয়যুক্ত করিয়া নির্বাচনের যৌক্তিকতা প্রমাণিত করুন, ইহাই আমাদের কামনা। নিম্নে পশ্চিম বাঙলার মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল—

নির্মল চ্যাটার্জি (রাজস্থান) অধিনায়ক, শিবাজী বসু (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), পি রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), সি এস নাইডু (মোহনবাগান), বি ফ্রাঙ্ক (রাজস্থান), প্রেমাংশু চ্যাটার্জি (মোহনবাগান), এস কে গিরিধারী (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), পি সেন (মোহনবাগান), এন চৌধুরী (মোহনবাগান), এস রায় (মিলন সমিতি), অজিত দাশগুপ্ত (কালীঘাট), দ্বাদশ ব্যক্তি—এস কে খান্না (মোহনবাগান), অতিরিক্ত—জে মিত্র (পুলিশ), এস রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) ও এ ভট্টাচার্য (ইস্টবেঙ্গল)।

পঞ্চম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দল

অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এই বারের ক্রিকেট টেস্ট পর্যায়ের খেলায় জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া দল 'রবার' লাভ করিয়াছে। সুতরাং পঞ্চম বা শেষ টেস্ট খেলার কোনই মূল্য নাই। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই পঞ্চম টেস্ট ক্রিকেট দল নির্বাচনের পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন পত্রিকায় দল নির্বাচকদের সম্পর্কে যেরূপ কটূক্তিপূর্ণ অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, ইতিপূর্বে কখনও তাহা পরিদৃষ্ট হয় নাই। অস্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব ক্রিকেট টেস্ট বোলার গ্রিমেটের উক্তিই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য করিয়াছে। তিনি নির্বাচকদের জ্ঞানহীন, অদূরদর্শী প্রভৃতি বলিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করেন নাই। তাঁহার মতে অস্ট্রেলিয়ায় এমন সকল খেলোয়াড় আছেন, যাঁহাদের ঠিক মত নির্বাচন করিলে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল এইরূপভাবে শক্তিশালী হইতে পারে যে, তাহাকে পরাস্ত করা বা বিব্রত করা কোন বৈদেশিক দলের পক্ষেই সম্ভব হইবে না। কোন কোন খেলোয়াড় দ্বারা দল গঠিত হইলে তিনি নির্বাচন ঠিক হইয়াছে বলিলেন তাহা উল্লেখ করেন নাই, ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে বহু ভেদ ও দলাদলি আছে ইহাই আমরা জানিতাম। অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকমণ্ডলীও যে উহা হইতে

নুক্ত নহেন ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। তবে একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে যে, এইরূপ কয়েকজন খেলোয়াড়কে পঞ্চম টেস্ট দলে গ্রহণ করা হইয়াছে, যাহাদের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিরুদ্ধ দলের অভিমতে বিচলিত হইয়া নির্বাচকমণ্ডলী এই কার্য করিয়াছেন কিনা বলা কঠিন। নিম্নে পঞ্চম টেস্টের মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল—
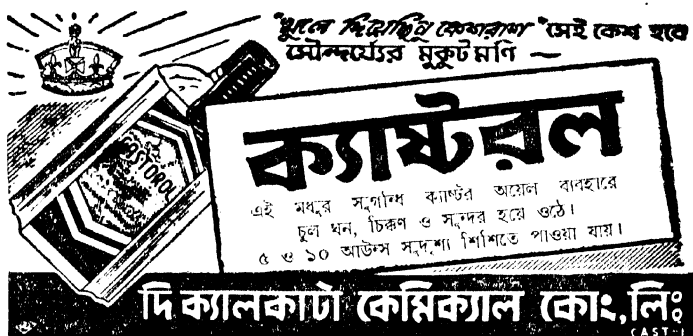
এন হ্যাসেট (অধিনায়ক), আর বিনড, নাল হার্ভে, জি হোল, ডবলিউ জনস্টন, আইয়েন জনসন, জি ল্যাংলে, আর লিণ্ডওয়াল, ই ম্যাক-ডোনাল্ড, কিথ মিলার, ডি রিং ও জি টমাস।

লিণ্ডওয়াল ল্যাঙ্কাসায়ার লীগে খেলিবেন

অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট টেস্ট বোলার আর লিণ্ডওয়াল এই বৎসরে লণ্ডনের ল্যাঙ্কাসায়ার লীগ ক্রিকেটের নেলসন ক্লাবে পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে খেলিবেন। ইহার সহিত নেলসন ক্লাবের এক চুক্তি হইয়াছে যে, তিনি ছয় মাসের জন্য ১৩০০ পাউণ্ড পাইবেন। ঐ ক্লাবেই ভারতের টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ডি জি ফাদকার খেলিতেন। অনেকেই মনে করেন, ফাদকারের স্থানেই লিণ্ডওয়ালকে গ্রহণ করা হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ বহু দিন হইতেই পেশাদারী ক্রিকেট খেলা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করিতেছেন, কিন্তু ক্রিকেট পরিচালকগণ উহা সমর্থন করেন নাই। লিণ্ডওয়ালের ন্যায় খেলোয়াড় যখন পেশাদারী ক্রিকেট ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন, তখন মনে হয়, বহু বিশিষ্ট অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট খেলোয়াড়ই অতি শীঘ্রই তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন। ভারতেও পেশাদারী ক্রিকেট খেলার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিনু মানকড়কে সর্বপ্রথম ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড অনুমতি দিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বহু বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়ই ঐ সুযোগ গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইয়া আসিবেন এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৪ই জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিধান সভার আরও ৭টি কেন্দ্রে ভোট গৃহীত হয়। তন্মধ্যে বজবজ নির্বাচন কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জি এবং কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থী শ্রীবঙ্কিম মুখার্জির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। মৎস্যমন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর ভাঙড় কেন্দ্র হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

অদ্য ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ভোট গ্রহণ আরম্ভ হয়।

বিহার বিধান সভার নির্বাচনে বালিয়া কেন্দ্র হইতে জনতা পার্টির প্রার্থী রাজা কালীপ্রসাদ সিংহ কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হইয়াছেন। বিহারে ইহাই কংগ্রেসের প্রথম পরাজয়।

বোম্বাইয়ের সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীদিনকররাও দেশাই (কংগ্রেস) ও ডাঃ জীবরাজ মেহতা (কংগ্রেস) বোম্বাই বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৫ই জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে রাজ্য বিধান সভার মোট ১৩টি কেন্দ্রে ভোট গৃহীত হয়। এইদিন তমলুক কেন্দ্রে দুই ভ্রাতা অজয় মুখার্জি (কংগ্রেস) এবং বিশ্বনাথ মুখার্জির (কম্যুনিস্ট) মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে।

ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ (কংগ্রেস) এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ (কংগ্রেস) যথাক্রমে বোম্বাইয়ের কোলাবা ও সবরকান্ডা কেন্দ্র হইতে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

বিহার বিধান সভার নির্বাচনে তোপ-চাঁচি কেন্দ্রে জনতা পার্টির প্রার্থী রাজা পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ কংগ্রেস ও সমাজতন্ত্রী প্রার্থীকে পরাজিত করিয়াছেন।

লালকোর্তা দলের বিশিষ্ট নেতা কাজী আতাউল্লা প্রায় তিন বৎসরকাল কারাগারে আটক থাকিবার পর গত শনিবার লাহোরে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। প্রকাশ, স্বাস্থ্যের জন্য তাঁহাকে মুক্তিদান করা হইয়াছে।

১৬ই জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিধান সভার ৬টি নির্বাচন কেন্দ্রে ভোট গৃহীত হয়। এই দিন বিষ্ণুপুর নির্বাচনকেন্দ্রে কংগ্রেসপ্রার্থী পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের সহিত প্রধানত কম্যুনিস্টপ্রার্থী শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

১৭ই জানুয়ারী—বোম্বাইয়ের বুলসার-চিকলি নির্বাচন কেন্দ্রে পুনরায় ভোট গণনা করা হইলে শ্রীঅমল দেশাই (সমাজতন্ত্রী) তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই (কংগ্রেস) অপেক্ষা ১১ ভোট বেশী পাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আরও ৬টি কেন্দ্রে ভোট গৃহীত হয়। এই দিবস চুঁচুড়া কেন্দ্রের ভোট গ্রহণে কংগ্রেসপ্রার্থী পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদারকে মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয়।

১৮ই জানুয়ারী—নয়াদিল্লী নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কৃষক-মজদুর-প্রজা দলের প্রার্থী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস-প্রার্থী শ্রীমতী মনোমোহিনী সেগল-এর তুলনায় ৭ হাজার বেশী ভোট পাইয়া লোকসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ও প্রবীণ অন্ধ্র নেতা শ্রী টি প্রকাশম (কৃ-ম-প্র) মাদ্রাজ রাজ্য বিধান সভার নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন। তাঁহার জামানত জব্দ হইয়াছে।

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বোম্বাই রাজ্য বিধান সভার নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে রাজ্যের কয়েকটি জেলায় মোট ১৩টি কেন্দ্রে ভোট গৃহীত হয়। এইদিন বরাহনগর কেন্দ্রে কংগ্রেস-প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে প্রধানতঃ কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইতে হয়।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান সভার নির্বাচনে দার্জিলিং জেলার কার্সিয়াং শিলিগুড়ি কেন্দ্রের ভোট গণনা আরম্ভ হয়।

১৯শে জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার কার্শিয়াং-শিলিগুড়ি কেন্দ্রের নির্বাচনে গোর্খা লীগের প্রার্থী মিঃ জর্জ মেহবার্ট এবং কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীতেজিং ওয়াংদি যথাক্রমে সাধারণ ও তপশীলী উপজাতীয় সংরক্ষিত আসনে জয়লাভ করিয়াছেন।

দার্জিলিং কেন্দ্র হইতে গোর্খা লীগের প্রার্থী শ্রীদলবাহাদুর সিং নির্বাচিত হইয়াছেন।

মাদ্রাজের পূর্ত মন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম্ (কংগ্রেস) এবং মাদ্রাজের বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীমোহনকুমার মঙ্গলম্ বিধান সভার নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন।

লোকসভার নির্বাচনে আই এন টি ইউ সি'র সভাপতি শ্রীখান্দুভাই দেশাই, কিষাণ সভার প্রার্থী শ্রীইন্দুলাল যাজ্ঞিক এবং অধ্যাপক এন জি রঙ্গ (কৃষিকর লোক পার্টি) পরাজিত হইয়াছেন।

২০শে জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচনে শ্রীপীযূষকান্তি মুখার্জি, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ব্যানার্জি এবং জনাব ইয়াকুব হাসান এই তিনজন কংগ্রেস প্রার্থী যথাক্রমে আলিপুরদুয়ার, বসিরহাট এবং নলহাটি কেন্দ্র হইতে জয়লাভ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। গোর্খা লীগের প্রার্থী শ্রীশিবকুমার রায় দার্জিলিং জেলার জোর-বাংলো কেন্দ্র হইতে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

মাদ্রাজের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রী কে চন্দ্রমৌলি বিধানসভার নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৪ই জানুয়ারী—লণ্ডনের 'ডেইলী মিরর' পত্রিকার প্রকাশ, সুয়েজ খাল এলাকায় জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা রক্ষার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য বৃটেন পৃথিবীর ৪টি রাষ্ট্রকে একখানা হিসাবে যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছে।

১৫ই জানুয়ারী—অদ্য বৃটিশ সৈন্য বাহিনী ২৫ পাউণ্ড ওজনের গোলা নিক্ষেপকারী কামান লইয়া তেল-এল-কবীরে বৃটিশ ঘাঁটি আক্রমণকারী মিশরীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়।

১৬ই জানুয়ারী—অদ্য তেল-এল-কবীরের হাঙ্গামাস্থলের নিকটবর্তী দুইটি গ্রামের উপর এক হাজার বৃটিশ সৈন্য আক্রমণ চালায়। ইহাই তাহাদের বৃহত্তম আক্রমণ।

১৭ই জানুয়ারী—কাশ্মীর মধ্যস্থ ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহাম অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সম্পর্কে দ্বিতীয় দফা রিপোর্ট পেশ করেন।

১৮ই জানুয়ারী—অদ্য সকালে কায়রোতে জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য আপৎকালীন অবস্থা ঘোষিত হইয়াছে।

১৯শে জানুয়ারী—গত রাত্রে সৈয়দ বন্দরের নিকট বৃটিশ সৈন্যদের সহিত মিশরীয় অভিযাত্রী বাহিনীর প্রবল সঙ্ঘর্ষ হয়। প্রকাশ, এই সঙ্ঘর্ষে ৩৫জন বৃটিশ সৈন্য নিহত ও ৬৮জন আহত হইয়াছে।

ভারতীয় মূল্যঃ প্রতি সংখ্যা—।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষাণ্মাসিক—১০৲

পাকিস্তান মূল্যঃ প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষাণ্মাসিক—১০৲ (পাক্)

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬নং চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

ঊনবিংশ বর্ষ

১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

ঊনবিংশ বর্ষ] শনিবার, ১৯শে মাঘ, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 2nd February, 1952. [১৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

৩০শে জানুয়ারী

ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনার সর্বোত্তম যে আদর্শ, তাহার প্রকাশ অভিব্যক্তি বা উদয়, সর্বোদয় দিবস সে সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করে। সে আদর্শ লাভ করিবার কি পথ? এই যে সূর্যকে আমরা এ দিনের প্রভাতে দেখিতে পাইতেছি, এই সূর্য কি সেই পথ আলো করিতে পারিবে? ঋষিবাক্য অনুসরণ করিয়া বলিব, না তাহা পারে না। এ-সূর্যের আলোও আমাদের দৃষ্টির পক্ষে স্থায়ী নয়—দীর্ঘ সে পথ। তবে চন্দ্র? চন্দ্রও সে-পথ আলো করিতে অসমর্থ; কারণ অস্তং গতে চন্দ্রমসি? চন্দ্র তো অস্ত যাইবে! তবে অগ্নি? না অগ্নির সাহায্যেও সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, শান্তে অগ্নৌ? অগ্নি নিভিয়া যাইবে। বস্তুত একজনের বাণীই আমাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে। এই দিবসে আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়া তিনি সেই জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছেন। আমাদের আদর্শ সিদ্ধির পথ দেখাইয়াছেন। তিনি আর কেহ নহেন—মহাত্মা গান্ধী। মৃত্যু তাঁহার জীবনের লয় নয়—সর্বতোভাবে উদয়, সর্বোদয়ে তাঁহার জয়—অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতপক্ষে এমন যাঁহারা মহামানব, মৃত্যু তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। গান্ধীজীরও মৃত্যু নাই। তাঁহার আদর্শের মধ্যেই তিনি জীবন্ত রহিয়াছেন এবং আমাদিগকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতেছেন। বিশেষ দেশে এবং বিশেষ জাতির একান্ত প্রয়োজনে ইঁহাদের আবির্ভাব ঘটে সত্য; কিন্তু ইঁহাদের অবদান দেশ ও জাতির গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া সমগ্রভাবে মানবসমাজকে সমুন্নত করিয়া তোলে। বিশ্বমানবের ইঁহারা গুরু ও উপদেষ্টা। সমগ্র জগৎ আজ বহুবিধ অনর্থে বিপর্যস্ত হইতে বসিয়াছে। হিংসা-দ্বেষের আগুন চারিদিকে জ্বলিতেছে। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও আমাদের বিশ্বাস এই যে, শুধু রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনা এবং গবেষণার সাহায্যে জগতে এই সমস্যার সমাধান হইবে না। মানুষের অন্তঃ-প্রকৃতির পরিবর্তন সাধনই এক্ষেত্রে প্রথমে প্রয়োজন। যাঁহারা রাজনীতিক তাঁহাদের গোটা দৃষ্টিভঙ্গী বদলানো দরকার। বস্তুত শান্তির উদ্দেশ্যে রাজনীতিক বিচার, বিবেচনা এবং গবেষণা তো আমরা অনেক রকমেই দেখিলাম; কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্বার্থের পাক কাটাইয়া যুক্তি বা বুদ্ধি একটুও উপরে উঠিতেছে না।—শান্তির নামেই অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে। শান্তির দোহাই দিয়াই নির্মমভাবে নির্দোষ নরনারীর হত্যা-লীলা চলিতেছে। কোরিয়ায় এত দিন যে হিংস্র লীলা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, আজ মিশরেও তাহা আরম্ভ হইয়াছে। উভয়ত্রই যাহারা অশান্তির প্ররোচক, তাহাদের মুখে বিশ্বশান্তির যুক্তি! সুতরাং এ পথে কাজ হইবে বলিয়া বিশ্বাস আমাদের নাই। ফলতঃ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের প্রতিনিধিদের মুখে শান্তির স্বস্তি-বচন আমাদের কাছে নিতান্তই শূন্যগর্ভ হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী তাঁহার জীবন-সাধনায় মানুষের অন্তরের যে মহিমা প্রদীপ্ত করিয়াছেন, বিশ্বজগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সেই আলোকের অনুসরণ করিতে হইবে। আসুরিক পিপাসা যাহাতে সংযত হয়, মানুষকে অন্তরের তেমন সম্পদের সন্ধান দিতে হইবে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, গান্ধীজীর তিরোভাব-তিথির স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া মধ্য ইটালীর পেরুগিয়ার অন্তঃপাতী এসিসি নামক স্থানে বিশ্ব-শান্তির জন্য এক নূতন আন্তর্জাতিক আন্দোলনের উদ্বোধন সাধিত হইয়াছে। বিশ্ববিশ্রুত খৃষ্ট সাধক সিদ্ধ পুরুষ সেণ্ট ফ্রান্সিসের এই স্থানে সমাধিক্ষেত্র। অধ্যাপক আলডো ক্যাপিটিনী এই আন্দোলনের নেতা। এসিসির সিদ্ধ সাধক ফ্রান্সিস ভারতের চিন্তাশীল সমাজের নিকট অপরিচিত নহেন। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি এবং প্রেম মানব-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। গান্ধীজীর আত্মদানের পবিত্র ৩০শে জানুয়ারীর মাহাত্ম্য জগতের বিভিন্ন জাতি ও সমাজের মধ্যে এইভাবে পরিব্যাপ্ত হয় এবং আদর্শকে বিশেষ উদ্দীপ্ত করিয়া মানব-কল্যাণ তরে একাত্ম বোধকে প্রতিষ্ঠিত করে, ইহাই আমরা কামনা করি।

নির্বাচনের পর

সমগ্র ভারতের সাধারণ নির্বাচন একরূপ শেষ হইয়াছে বলা যায়। উত্তর প্রদেশের কয়েকটি অঞ্চল ব্যতীত অন্য সব স্থানেরই নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। ভারতের এই সাধারণ নির্বাচন জগতে এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। এখানকার ভোটদাতারা অনেকেই অশিক্ষিত এবং ভোটাধিকারের প্রকৃত তাৎপর্যও তাঁহারা হয়ত অনেকে উপলব্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সুশৃঙ্খলার সঙ্গেই এবং শান্তির সহিত এই বৃহৎ কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। নির্বাচনের ফল এ পর্যন্ত যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে কংগ্রেসই কেন্দ্রে এবং অধিকাংশ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখনও ভবিষ্যতের সম্বন্ধে শাসন-নীতিগত একটা সুনির্দিষ্ট নিরিখ করা চলে না। নির্বাচনের এই পথে ভারতে গণতান্ত্রিকতার গতি অবাধ হইবে কিনা, এ সম্বন্ধেও প্রশ্ন উঠিয়াছে। এমন কথাও শোনা যাইতেছে যে, প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি না গড়িয়া তুলিয়া পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রবর্তনের এই চেষ্টা সময়োচিত হয় নাই। বলা বাহুল্য, ইহা নিছক তার্কিকতা মাত্র। জাতির উন্নতি এবং তাহার রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তি ক্রমিকভাবেই হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে উন্নতির একটা ধরাবাঁধা ছক কাটিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। বস্তুত সে পন্থা অবলম্বন করিতে গেলে গণতান্ত্রিকতা আর গণতান্ত্রিকতাই থাকে না, সর্বময় কর্তৃত্ব বা একদলীয় প্রভুত্বই পাকা হইয়া পড়ে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় শাসনে গণতান্ত্রিকতার বর্তমান নীতি অবলম্বন করিয়া, অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনের ধারাটি ধরিয়া ভারত ভুল করিয়াছে, এমন ধারণা সমীচীন নয়। পরন্তু আমরা এই কথাই বলিব যে, গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের দিক হইতে ভারতের এই সাধারণ নির্বাচন সর্বাংশে সফল না হইতে পারে, কিন্তু পথের ভুল সে করে নাই। প্রত্যুত ভারতের এই সাধারণ নির্বাচনের বড় একটা সার্থকতা এই দিক হইতে রহিয়াছে যে, মাত্র জাতির জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতিক দায়িত্ববোধ ইহাতে সম্প্রসারিত হইয়াছে। নিতান্ত যে সাধারণ ব্যক্তি, সে-ও বুঝিতে পারিয়াছে যে, রাষ্ট্রের পরিচালন-ক্ষেত্রে তাহার নিজের একটা দায়িত্ব আছে এবং তাহারও একটা মর্যাদা রহিয়াছে। সমষ্টি চেতনায় এই মর্যাদাবোধকে উদ্বুদ্ধ করার মত শিক্ষাটিও সামান্য নয়। কারণ, প্রকৃত গণতান্ত্রিকতার ভিত্তি এই মর্যাদা-বোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণকে আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবার এই পথ ছাড়া অন্যভাবে গণতান্ত্রিকতার ভিত্তি কি ভাবে গড়িয়া তোলা যাইত বোঝা যায় না। নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনসাধারণ আজ ভুল করিতে পারে, কিন্তু সে ভুলের নিরসন তাহারাই করিবে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেতনা জাতির মধ্যে যদি একবার সম্প্রসারিত হয়, তবে তাহাকে বিনষ্ট করা সম্ভব হয় না, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ভারতেও এ সত্যের ব্যতিক্রম ঘটিবে না। ভারতের জনসাধারণ নিজেদের শক্তির বলেই নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার সত্য করিয়া তুলিবে। সুতরাং এই পথ প্রকৃষ্ট পথ। অন্যান্য স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের ন্যায় এখানে শাসনাধিকার প্রাপ্ত দল এবং বিরোধী পক্ষ এই দুইটি আদর্শের চেতনা এবং ইহা ধরিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অগ্রগতির রীতিটি হয়ত নির্বাচনের ফলে সর্বত্র সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই; কিন্তু ইহাও সত্য যে, নির্বাচনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত উপশমিত হইলে অবস্থা অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিবে। নির্বাচনে জয়ী হইবার প্রয়োজনে যত সব দল এবং উপদলের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, সেগুলির অনেকেই বিলীন হইয়া যাইবে। 'স্বতন্ত্র' বলিতে কিছু থাকিবে না, থাকা উচিতও নয়। সে অবস্থায় বিভিন্ন আইনসভায় বিরোধী পক্ষ একটা আদর্শে নিজদিগকে সংহত করিয়া তুলিতে বাধ্য হইবেন। সঙ্কীর্ণ স্বার্থের পাকে কিম্বা পদ, মান ও প্রতিষ্ঠার লোভে যাঁহারা জড়িত থাকিবেন, তাঁহাদের রাজনীতিক জীবনের অবসান ঘটিতেও বিলম্ব হইবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

ভারতের অপরাধ

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী ডক্টর ড্যানিয়েল মালান এবার তাঁহার নখ-দ্রংষ্টা বিকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণবৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবাদে তাঁহার বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রসভায় একটি অনাস্থা প্রস্তাব আনীত হয়। এই প্রস্তাবের উত্তরে ডক্টর মালান ভারতের বিরুদ্ধে এক গুরুতর অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার অভিযোগ এই যে, এশিয়ার অশ্বেতাঙ্গ দেশগুলি একটা জোট বাঁধিয়াছে। জগতের শ্বেতাঙ্গ এবং অশ্বেতাঙ্গ জাতিগুলির ভিতরের বৈষম্য ও ভেদ দূর করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। ভারত এই দলের নেতৃত্ব করিতেছে। সুতরাং ভারতের অপরাধ সামান্য নয়! স্বয়ং ভগবানেরই বিরুদ্ধতা করা! কারণ জগতের কৃষ্ণাঙ্গ জাতিগুলোকে মানুষ করিয়া তুলিবার পবিত্র দায়িত্ব যে ভগবান্ শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের উপরই অর্পণ করিয়াছেন, শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রনিচয়ের নিয়ন্তৃ-মহাজনগণ, বিশেষভাবে ইংরেজ প্রভুদের মুখে আমরা, ভারতবাসীরা বহুবার কি একথা শুনিতে পাই নাই? আজ ভারত কিনা সেই ভগবৎ-বিধানেরই বিরুদ্ধে অপরাধী, শুধু অপরাধীই নয়, অপরাধী দলের সে নেতা। ডক্টর মালানের মত ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কি ইহাতে বিচলিত না হইয়া পারেন? বাস্তবিক পক্ষে শ্বেত জাতির ন্যায় ধর্মের তিনি যে অবতারস্বরূপ। কৃষ্ণাঙ্গ জাতিরা শ্বেতাঙ্গদের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া নিরাপদে বসবাস করুক, আর শ্বেতাঙ্গ জাতিরাও কৃষ্ণাঙ্গদের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া শান্তিতে জীবনযাপন করুক, প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রীর ইহাই হইতেছে নীতি। ইহার চেয়ে স্থায়ী শান্তির চমৎকার ব্যবস্থা আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীরা এমন মহদনুভব ব্যক্তিরও মূল্য বুঝিল না। তাহারা ডক্টর মালানের এই মহৎ বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জগতে অনর্থ সৃষ্টিরই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী ভারতকে আজ যে অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন, আমরা তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি এবং সেজন্য সত্যই গর্ববোধ করিতেছি। আমরা অবিসংবাদিত চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলির মধ্যে ভেদ-বৈষম্য দূর করিবার ব্রত সত্যই ভারত গ্রহণ করিয়াছে। বস্তুত মানুষের মধ্যে মানুষের বৈষম্য ভারত স্বীকার করে না এবং এই পাপ উৎখাত করিবার জন্য ভারত তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিবে। সে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবে, ডক্টর

মালান যতই অভিসম্পাত এজন্য ভারতের শিরে বর্ষণ করুন না কেন। ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি বিশ্ব-মানবতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। ফলত ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না। শ্বেতাঙ্গ জাতিত্বের গর্বে ও প্রভুত্বের স্পর্ধায় ডক্টর মালান এবং তাঁহার পরিপোষকবর্গ সমগ্র এশিয়ায় অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া তুলিতেছেন। যদি তাঁহারা এখনও এই অনাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হন, তবে মানবতার প্রচণ্ড আঘাত তাঁহাদের উপর গিয়া পড়িবে এবং সেদিনের বেশি বিলম্ব নাই।

সংস্কৃত ও সংস্কৃতি

শ্রীযুত কানাইয়ালাল মুন্সী ভারত সরকারের অন্যতম মন্ত্রী। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে সংস্কৃত সাহিত্যের অবদান সম্বন্ধে সম্প্রতি তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আধুনিক ভারতের অখণ্ড রাষ্ট্রীয় চেতনা এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সংস্কৃতির সংহতি সাধনের ক্ষেত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসার এবং প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রীযুত মুন্সী যেসব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে সংস্কৃত সাহিত্যের শক্তি এখনও লুপ্ত হইয়া যায় নাই এবং যেভাবে গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষাকে লুপ্ত বা মৃত বলা যায়, সংস্কৃত সে অবস্থায় পৌঁছে নাই। বস্তুত সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্য এখনও জীবন্ত রহিয়াছে। অধিকন্তু সমগ্রভাবে এই ভাষা ও সাহিত্যই ভারতের সংস্কৃতির মূলে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিতেছে। আমরাও শ্রীযুত মুন্সীর এই অভিমত সমর্থন করি। শ্রীযুত মুন্সীর ন্যায় আমাদেরও বিশ্বাস এই যে, যাঁহাদের সাধনা ও মনীষার প্রভাবে, সুদীর্ঘ পরাধীনতার মধ্যে ভারতের আত্মা সঞ্জীবিত ছিল এবং যাঁহাদের তপস্যার বলে ভারত আজ পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে, তাঁহারা অনেকেই সংস্কৃত সাহিত্যের উৎস হইতে প্রাণশক্তি আহরণ করিয়াছিলেন। প্রত্যুত ভারত যদি বিশ্ব-জগতে আত্মমর্যাদায় উন্নত আসন অধিকার করিতে চায়, তবে সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যের আশ্রয় তাহাকে ভবিষ্যতেও লইতে হইবে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একদল লোক সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যের গুরুত্ব দিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যের সাধনা প্রাচীন যুগের গোঁড়ামিই আবার জাগাইয়া তুলিবে। দুঃখের বিষয় এই যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোকের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার ফলে এদেশের ছেলেমেয়েরা মহৎ-জীবনের আদর্শ হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছে এবং জাতির অন্তরের যোগসূত্র হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। শ্রীযুত মুন্সী দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, ভারতীয় শাসন বিভাগের কাজের জন্য যাঁহারা সর্বোচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনের বেশি পাণ্ডব-জননী এবং কর্ণের ন্যায় বীর-প্রসবিনী কুন্তীর কথা জানেন না। শ্রীযুত মুন্সীর এজন্য পরিতাপের কারণ যে সত্যই আছে, আমরা তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকি। বস্তুত দীর্ঘ পরাধীনতারই ইহা ফল। রাজনীতিক বাহ্য পরাধীনতার চেয়ে জাতির নৈতিক ক্ষেত্রে বিজেতা জাতির সংস্কৃতির প্রভাবই সব-চেয়ে বেশি মারাত্মক। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা জাতির আত্মাকে অনেকখানি এই অনিষ্টকর প্রতিবেশের মধ্যে ফেলিয়াছে। আমরা জাতির অতীত গৌরব বিস্মৃত হইয়াছি। অবশ্য সকল বিষয়ে অতীতের প্রতি অন্ধ অনুরাগ পোষণের আমরা পরিপন্থী। কিন্তু অতীত ভারতের যেসব অবদান মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে সনাতন সত্যকে উন্মুক্ত করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অশ্রদ্ধা-পরায়ণ হইলে ভবিষ্যৎ আমাদের পক্ষে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে, আমরা এই কথাই বলিতে চাই।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী সপ্তাহ হইতে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক শ্রীবিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নূতন রচনা 'দুয়ার হতে অদূরে' ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক 'দেশ'

পরলোকে রমেশ চৌধুরী

অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট বিপ্লবী নায়ক শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী গত ২৭শে জানুয়ারী পরলোকগমন করিয়াছেন। রমেশচন্দ্রের জীবন বহু দুঃখ কষ্ট এবং নির্যাতনের ভিতর দিয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার আদর্শের জন্য তিনি তিলে তিলে আত্মদান করিয়াছেন। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহা ছাড়া, তিন আইনে, অর্ডিন্যান্সে ও অন্তরীণে তাঁহার ৬৪ বৎসর জীবনের মধ্যে প্রায় ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। রমেশচন্দ্র সুলেখক ছিলেন। 'বিজয়া' প্রভৃতি তৎকালীন সাময়িক পত্রে তাঁহার লেখা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। তাঁহার রাজনীতিক প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীলতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অমায়িক ব্যবহার, সততা এবং আদর্শনিষ্ঠায় তিনি বাঙলার সকল বিপ্লবী দলেরই শ্রদ্ধালাভ করেন। বাঙলার এই স্বদেশপ্রেমিক সন্তানের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

শোচনীয় দুর্ঘটনা

গত ১২ই মাঘ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠানের আনন্দ কলিকাতার একটি নিদারুণ দুর্ঘটনায় ব্যাহত হইয়াছে। ভারতীয় নৌবহরের "দিল্লী" রণতরী গত ২০শে জানুয়ারী কলিকাতায় আসিয়া প্রিন্সেপ ঘাটে নোঙ্গর করিয়াছে। কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ২৪শে, ২৫শে, ২৬শে এবং ২৭শে জানুয়ারী জনসাধারণ প্রবেশপত্র লইয়া এই রণতরী পরিদর্শন করিতে পারিবেন। ঘটনার দিন যুদ্ধ-জাহাজ দর্শনপ্রার্থী জনতার ভিড়ের চাপে জেটির সাঁকোর রেলিং ভাঙিয়া ৫০ জন নরনারী গঙ্গাগর্ভে পতিত হন। ১০ জন নরনারীর মৃতদেহ গঙ্গাগর্ভ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে; আহত অবস্থায় ৬ জন হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছেন; কিন্তু কতজনের যে সলিল-সমাধি ঘটিয়াছে, তাহার নিশ্চিত হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। এই দুর্ঘটনায় যাঁহারা মারা গিয়াছেন, তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনকে সান্ত্বনাদানের কোন ভাষা নাই। আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

নয়াদিল্লীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের দ্বিতীয়

প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতি ভবন হইতে ইণ্ডিয়া গেট অভিমুখে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদকে লইয়া শোভাযাত্রা

প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে উষ্ট্রারোহী সৈনাবাহিনীর যোগদান

বার্ষিকী উৎসবের দৃশ্য

নয়াদিল্লীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবের অনুষ্ঠানে পাঁচটি মূকাভিনয়ের দ্বারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক পরিচয় দেওয়া হয়

উপরে : কেরলের কথাকলি নৃত্যাভিনয়
মধ্যে : হিমাচল প্রদেশের নিসর্গশোভা
নিম্নে : কেরলের পল্লী কুটীর

মাদ্রাজ উপকণ্ঠের বেলাভূমি

এই যে সামনের বালুপাড়ের উপর জেলে-পাড়া এর সঙ্গে মানব সভ্যতার কোথায় যোগাযোগ—এই পাড়ার বাইরে যে সংসার তার উপর সে কতটা নির্ভর করে, কি পরিমাণ সহযোগিতা পায়?

এদের ঘরে যা তৈজসপত্র তা বিক্রি করলে দু টাকার বেশী উঠবে না। যে সব বাসন-কুশন সামনের রাস্তার কলতলায় ধুতে নিয়ে আসে তার অধিকাংশ মাটির। দৈন্য বোধ হয় এদের চরম, কারণ হাঁড়ি-কলসীগুলোও অত্যন্ত মামুলী—তাদের আকারপ্রকারে সামান্যতম সৌন্দর্যের সন্ধান নেই। এমনই এবড়ো-খেবড়ো যে কোনো গতিকে দাঁড় করানো যায় মাত্র—ভার-কেন্দ্র বলে জিনিস বেশির ভাগ হাঁড়ি-কলসীতে নেই।

পুরুষরা কাজকর্ম করে শুধু একখানা কালো রঙের এক বিঘৎ চওড়া নেংটি আর ঘুনসি পরে। সন্ধ্যে বেলায় দেখেছি কেউ কেউ ধুতী-শার্ট পরে—বেশীর ভাগ যে জামা-পাকড় পরে সেগুলো দেখে মনে হয় যেন মাছের বদলে কুড়িয়ে নেওয়া পরিত্যক্ত বুশ-শার্ট, বোতামহীন শার্ট। ময়লা ঝোলা-ঝালা শার্ট-শার্ট দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, নিতান্ত হিম বাতাসের কন্‌কনানিতে বাধ্য হয়ে পরেছে।

মেয়েরা পরেছে উত্তর ভারতে তৈরী মিলের শাড়ি। দক্ষিণ ভারতের সুন্দর সবুজ-সোনালি, মরুন-নীল পরিকল্পনার মামুলী শাড়ি কেনার পয়সা এদের নেই। একরঙা জামা যা পরেছে তা সে এমনি বিবর্ণ আর রুক্ষ্ম যে সেটা পরার কোনো অর্থ বোঝা যায় না—পরার কি প্রয়োজন, আমাদের জেলেনিরা তো পরে না। দু' এক-জনের পায়ে আংটি, হাতে বালা, নাকে ফুল—সবই রুপোর।

এরা কেরোসিনের ডিবে জ্বালায় না রেড়ির তেলের পিদিম এখনো বুঝে উঠতে পারিনি। আর সে জ্বালানোই বা কতক্ষণের জন্য? সন্ধ্যে ভালো করে ঘনাতে না ঘনাতেই সাঁঝের পিদিম দেখিয়ে এরা আলো নিভিয়ে ফেলে।

এদের মাছ-ধরার জাল, খানকয়েক এবড়ো-খেবড়ো তক্তায় জোড়া কাটামারুন ভেলা, দড়াদড়ি সব কিছুই এদের নিজের হাতে তৈরী—সামান্য সীসেগুলি আর লোহার পেরেক হয়ত সভ্য মানবের কাছ থেকে কিনে নেওয়া।

এদের ছেলেমেয়েরা ইস্কুল যায় না, ব্যামো শক্ত না হলে ডাক্তার হাসপাতালের সন্ধান করে না।

শহরের সভ্যতার কাছ থেকে এই নগণ্য,—প্রায় উঞ্ছবৃত্তিলব্ধ—ন্যাকড়াটুকু গুলি-পেরেকটার বদলে এরা সকাল-সন্ধ্যা খাটে। যে মাছ ধরে তার অতি সামান্য অংশ খায়, বেশীর ভাগ 'বিক্রি' করে দিতে হয় ঐ ন্যাকড়াটুকু, ঐ পেরেকটা আর দু' মুঠো চালের জন্য। 'বেচাকেনার' নামে এই নগ্ন প্রবঞ্চনা চোখের সামনে যুগের পর যুগ ধরে চলে আসছে।

'নগ্ন প্রবঞ্চনা?' চক্ষুষ্মান লোকের সামনে এ নগ্নতা ধরা পড়ে।

আর সবাই দেখছে সেই গল্পের রাজা যেন ফক্কিকারের জামা-কাপড় পরে শোভা-যাত্রায় চলেছেন। 'সভ্যতার' এই শোভাযাত্রার মাঝখানে সেই সরল বালকের চেঁচানো কেউ শুনতে পায় না—কিম্বা চায় না।

* * * * *

সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের হাহাকারে যতক্ষণ বারান্দা মুখরিত থাকে, ততক্ষণ রাস্তার কলতলার শব্দ কানে আসে না—শুধু দেখি সমুদ্রপারের জেলেরা আসছে পথের পাশের কলতলায় নাইতে অথবা কাপড় কাচতে; মেয়েরা আসছে জল নিতে, বাসন ধুতে, কাপড় কাচতে, কাচ্চা-বাচ্চাদের নাওয়াতে, মাথা ঘষতে। কল থেকে জল বেরোয় অতি মন্দগতিতে—একটি কলসী ভরতে আধ ঘণ্টাটাক লাগে।

বেশী ভিড় না থাকলে দূর গাঁয়ের মেয়েরা শহরে যাবার মুখে মাথা থেকে চুবড়ি নামিয়ে দুদণ্ড জিরিয়ে নেয়, কলে হাত পা ধোয়।

আপিস কিম্বা কারখানা যাওয়ার তাড়া থাকলে নিশ্চয়ই কলতলায় ঝগড়াঝাঁটি বেঁধে যেত। এখানে সব কিছু ধীরে-সুস্থে এগোয়। ঐ যে জেলেটা আরাম করে কল-তলায় গা এলিয়ে দিয়েছে তার জন্য কলসী-হাতে মেয়েটার কোনো আপত্তি আছে বলে মনে হচ্ছে না। যে কথাবার্তা হচ্ছে তা সমুদ্রের গর্জনে আর বাতাসের শনশনানিতে শোনা যাচ্ছে না।

আজ বাদলার দিন। নাইবার চাড় নেই বলে কলতলায় ভিড় কম। কাচ্চাবাচ্চারা তো একদম আসে নি। কিন্তু কড়া গরম পড়লে এখানে রীতিমত হাট বসে যায়। কড়া গরম পড়ার মানে যে তখন হাওয়া বন্ধ, কাজেই তখন একটু আধটু চিৎকারও শোনা যায়—মেজাজও তখন একটু কড়া হয়ে যায় বলে।

কলতলার ভিড় কমে এসেছে। দুপুর-বেলা খেয়েদেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, একটি জেলেনি কলসী ভরে দাঁড়িয়ে রয়েছে—কলতলায় আর কেউ নেই যে কলসীটা মাথায় তুলে দেবে।

এমন সময় এক রিক্স-ওলা যাচ্ছিল। রিক্স দাঁড় করিয়ে সে কলসীটা তুলে দিয়ে ফের রিক্স টানতে টানতে চলে গেল।

মেয়েটা একবার কৃতজ্ঞ নয়নে তাকালো পর্যন্ত না। রিক্স-ওলাও অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সাহায্যটুকু করে গেল—যেন এরকম ধারা করাটা তার হরবকতই লেগে আছে।

একেই বলে খাঁটি ভদ্রতা।
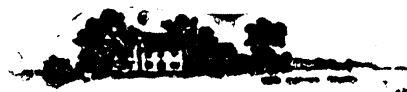
৫

মাসখানেক পাড়া আর অন্য পাড়ার বন্ধু-মহলে ঘোরাঘুরি করেই কাটল অরুণের। সবাই বলল, এসো এসো। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছ ভালোই হয়েছে। ওসব দিল্লী টিল্লী কি আমাদের পোষায়? এত জায়গা তো ঘুরলে, কিন্তু কলকাতার মত এমন শহর কি কোথাও চোখে পড়েছে?'

অরুণকে স্বীকার করতে হোল তা পড়ে নি। কিন্তু দু'বছর আগে ছেড়ে যাওয়া কলকাতার সঙ্গে এই কলকাতার যেন অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। সে প্রভেদটা যতখানি মনে মনে টের পাওয়া যায়, ততটা অবশ্য চোখে দেখা যায় না। আবাল্যের পরিচিত এই পরিবেশের যেন ভিতরে ভিতরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাইরের দিক থেকে সে পরিবর্তন সামান্য। কোন বন্ধুর বিয়ে হয়েছে, কোন বিবাহিত বন্ধু হয়েছে সন্তানের জনক, কোন বেকার বন্ধু চাকরি পেয়েছে, কারো বা উন্নতি হয়েছে চাকরিতে। প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-আলাপ হোল, কেউ কেউ বাড়িতে ডেকে চা খাওয়াল, তাদের মা-বোন কি স্ত্রী দু-একটা কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু ওই পর্যন্তই। আগের মত অন্তরঙ্গ সুর কারো আলাপ ব্যবহারেই ধরা পড়ল না। কিছুতে যেন এই বন্ধুব্যূহের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে পারল না অরুণ। নিতান্তই বাইরের ঘরের অভ্যাগতের মত রয়ে গেল। অরুণ মনে মনে ভাবল একি বন্ধুচক্রেরই দোষ না তার নিজেরই অক্ষমতা। চাকরি-বাকরি না থাকায় নিজের মনের হীনতাবোধই তার আর তার পরিচিত মহলের মধ্যে এমন ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে? তার চাকরি না থাকায় পরিবারের যত অসুবিধা তেমন তো আর কারোরই নয়। তবু অন্য পরিবারের লোকজন মৌখিক সহানুভূতি জানাতে ছাড়ে না, 'কি অরুণ কোন সুবিধে-টুবিধে হোল নাকি? আর যা দিনকাল পড়েছে, চাকরি-বাকরির যা ব্যাপার, তাতে সুবিধে সুযোগ হবেই বা কি ক'রে?'

অনুকম্পায় একটু কোমল শোনায় তাদের গলা। অরুণের ভারি অসহ্য লাগে।

ইতিমধ্যে চাকরির জন্যে চেষ্টা-চরিত্রও শুরু করতে হয়েছে। ওয়ানটেড কলমের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে আবেদন ছেড়েছে কয়েকটা। দেখা-সাক্ষাৎ করেছে সরকারী বেসরকারী দু-একজন পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে। সকলেই মৌখিক আশ্বাস দিয়েছেন অরুণের জন্যে তাঁরা অবশ্যই চেষ্টা করবেন। কিন্তু চেষ্টার ফল এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। অবশ্য এত অল্পেই অসহিষ্ণু হয়ে লাভ নেই। দ্বিতীয়বার তাগিদ দেওয়ার সময় পর্যন্ত আসেনি। কিন্তু পারিবারিক অবস্থা সবুর করবার মত নয়। দারিদ্র্যটা ক্রমেই তার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে উঠছে। বাবা অবশ্য মুখ ফুটে কিছু বলেন না। কাকারাও প্রায় নির্বিকার। শুধু মা-ই মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন, "হ্যাঁরে, কোন ইণ্টারভিউ-টিউর কলও পেলিনে?'

অরুণ বলে, 'না।'

বাসন্তী একটুকাল চুপ করে থেকে বলেন, 'দেখ চেষ্টা-বেষ্টা ক'রে।'

তারপর আস্তে আস্তে নিজের কাজে চলে যান বাসন্তী।

পরিবারের খাওয়া-পরার কৃচ্ছ্রতাও ক্রমেই বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। তেতলার চিলে-কোঠায় থেকেও একতলার চেঁচামেচি মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসে অরুণের।

ছোট ভাই রঙ্কু অনুনাসিক সুরে আবদার তুলেছে, 'আজ আমি মুড়ি খাব না মা। রোজ রোজ বাসি মুড়ি খাব নাকি আমি?'

বাসন্তী ধমক দেন, 'মুড়ি খাবি না, কি খাবি? কোন্ রাজভোগ তৈরী হয়েছে তোর জন্যে?'

রঙ্কু বলে, 'আমি বিস্কুট খাব। বড়দার মত আমিও চা আর বিস্কুট খাব মা।'

চিলেকোঠার ঘরে অরুণের জন্যে প্রীতি চায়ের কাপ আর দুখানা বিস্কুট নিয়ে এসেছিল। বাড়ির বড় ছেলে বলে বেকার হলেও এই সম্মান আর মর্যাদাটুকু তার এখনও আছে। মুড়ি অরুণ পছন্দ করে না, খেতে পারে না। তাই চায়ের সঙ্গে কোনদিন বা দুখানা বিস্কিট কোনদিন বা এক চিলতে পাঁউরুটি তার বরাদ্দে জোটে।

কিন্তু আজ বিস্কিট দুখানা হাতে নিল না অরুণ, শুধু চায়ের কাপটি নিয়ে বলল, 'বিস্কিট তুই নিয়ে যা প্রীতি। আমার দরকার নেই।'

প্রীতি বলল, 'তুমি বুঝি রঙ্কুর কথা শুনে অমন করছ দাদা? রঙ্কুর ওইরকমই স্বভাব। খাওয়া নিয়ে ভারি কোন্দল করে। বিস্কিট দুখানা নাও তুমি। সকালবেলা খালিপেটে চা খাওয়া তো ভালো না।'

অরুণ বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ, কেন মিছামিছি বক বক করছিস। বলছি যে খাব না। কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না, না?'

প্রীতি আর কোন কথা না বলে চলে গেল। অরুণ মনে মনে লজ্জিত হোল। সত্যি ওকে অমন করে এই সকালবেলায় বকুনি না দিলেই হোত। ওর কি দোষ। মেজাজটা আজকাল তার বড়ই খিটখিটে হয়ে গেছে। কিন্তু এত অল্পেই অধীর হলে চলবে কেন। বেকার-জীবনের এই তো সবে শুরু। এর পর দুরবস্থা যখন আরো বাড়বে, তখন করবে কি?

তবু এই পারিবারিক পরিবেশ আর ভালো লাগছে না। এরই মধ্যে সব কিছু দুঃসহ হয়ে উঠছে। কোথাও বেরিয়ে পড়তে পারলে যেন বাঁচে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা পেড়ে গায়ে চড়াল অরুণ। তারপর স্যাণ্ডাল পায়ে বেরিয়ে পড়ল।

খানিকটা অন্যমনস্কভাবে শ্রীগোপাল মল্লিক লেন দিয়ে হেঁটে চলেছে, হঠাৎ বাঁদিকের একটা বাড়ি থেকে ডাক শুনতে পেল, 'আরে ও অরুণ, শোন শোন। ব্যাপার কি? আমাদের যুব-সঙ্ঘে ভুলেও যে আস না আজকাল। হোল কি তোমার?'

অরুণ ফিরে তাকাল। যুবসঙ্ঘের সেক্রেটারী বীরেন গাঙ্গুলী। ক্লাব বাড়ির

রোয়াকে বসে কাগজ দেখতে দেখতে অরুণকে দেখে ফেলেছেন।

অরুণ এগিয়ে এসে বলল, 'এই যে বীরুদা, আছেন কেমন? আমি লক্ষ্যই করিনি।'

বীরেনবাবু বললেন, 'তা করবে কেন, আজকাল বড় হয়েছ, দোতলা-তেতলার ঝুল বারান্দার দিকে নজর। একতলার রোয়াক কি আর ও বয়সে চোখে পড়ে? এসো ভিতরে এসো। কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

যুব-সঙ্ঘের সম্পাদক হলেও যৌবনের সীমা পার হয়ে গেছেন বীরেনবাবু। রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করেন। সংসারে স্ত্রী আছেন। ছেলেপুলে কিছু হয়নি। রেডিও, রেকর্ড নিয়ে তাঁর সময় কাটে। আর বীরেনবাবুর আছে এই ক্লাব। দিনরাত বেশির-ভাগ সময় এই ক্লাবেই কাটে। ক্লাবের জন্ম থেকে একাদিক্রমে এই পনের বছরকাল বীরেনবাবু যুব-সঙ্ঘের কর্মপরিষদের সঙ্গে লেগে রয়েছেন। কোনবার সম্পাদক, কোন-বার কোষাধ্যক্ষ, কোনবার বা সহকারী সভাপতির পদাধিকার তিনি পান। সম্পাদক যিনিই হন না কেন, তাঁর কাজকর্ম বীরেন-বাবুই করেন। যুব-সঙ্ঘের ওপর তাঁর অসীম মমতা। আগেকার সভ্যদের অনেকেরই এখন উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে। ক্লাবের 'প্রতিষ্ঠা দিবস' কি সরস্বতী পুজোর সময় ছাড়া তাঁদের প্রায় আর দেখাই মেলে না। অনেকেই চাকরি-বাকরি, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে গৃহস্থ হয়েছে। শুধু বীরেনবাবুই এখন পর্যন্ত পুরোপুরি ক্লাবস্থ রয়ে গেছেন। তিনি পুরোন সদস্যদের খোঁজ-খবর নেন, নতুন সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। ক্লাব সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ আজও কমেনি।

অরুণকে সঙ্গে করে তিনি ক্লাব-ঘরে ঢুকলেন।

লম্বামত একটা টেবিল, পালিশ উঠে যাওয়া খানকয়েক চেয়ার-বেঞ্চ। পুবদিকের দেয়াল ঘেঁষে ছোটমত একটি আলমারি। তার মধ্যে ক্লাবের খাতাপত্র, অ-বাঁধানো সাময়িক পত্রিকা। আর এক পাশে দেয়ালে ঠেস দেওয়া, উল্টো ক'রে রাখা পুরোন একখানা ক্যারম বোর্ড, একটা মাদুর।

জিনিসগুলির ওপর অরুণ একবার চোখ বুলিয়ে নিল। ক'বছর আগেও এর প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর অরুণের কি অসাধারণ মমতাই না ছিল! এর কর্মপরিষদের নির্বাচনের সময় তার নাওয়া-খাওয়া ঠিক থাকত না। প্রথমবার সে যখন সদস্য নির্বাচিত হয়, নিজেকে পরম গৌরবের অধিকারী বলে মনে করেছিল। কিন্তু এই ক'বছরে পাড়ার ক্লাব তার কাছে সবটুকু গুরুত্ব হারিয়ে বসে আছে। এখন ক্লাবের সব কিছুই তার কাছে একান্ত ছেলেমানুষি মনে হয়।

টেবিলটিকে মাঝখানে রেখে বীরেনবাবু মুখোমুখি বসলেন অরুণের। তারপর বললেন, 'ক্লাবে আস না যে, তুমি দিল্লী থেকে ফিরে আসায় ভাবলাম, এবার ক্লাবটা ফের জমে উঠবে। নতুন করে ঢেলে সাজব যুব-সঙ্ঘকে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! তোমার দেখাই নেই।'

অরুণ বলল, 'মনে শান্তি নেই বীরুদা। জানেন তো সব।'

বীরেনবাবু বললেন, 'জানব না কেন ভাই জানি। তুমি খোঁজ-খবর নিতে না এলে কি হবে, আমি সবই খোঁজ রাখি। চাকরি-বাকরি নেই, বেকার হয়ে আছ এই তো? কিন্তু এ দুঃখ তো ঘরে ঘরে। ঘরের দুঃখ দূর করবার জন্যে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করতে হবে বইকি। আবার—'

অরুণ বীরেনবাবুর মুখের কথা নিয়ে বলল, 'আবার পরের দুঃখ দূর করার জন্যে ক্লাবেও আসতে হবে। এই তো আপনার বক্তব্য, না বীরুদা?' কথা শেষ করে অরুণ মৃদু হাসল।

বীরনেবাবু হাসলেন না, বললেন, 'হ্যাঁ তুমি ঠাট্টা করলেও তাই আমার বক্তব্য। ক্লাবকে যত তুমি ছোট ভাবছ, আসলে তা নয়। এই ছোট প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়েও অনেক বড় কাজ করা যায়, অনেক বড় কাজ করতে হয়। এতো শুধু খেলাধুলো, আড্ডা দেওয়ার জায়গা নয়, আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়ে ছেলেদের চরিত্র গঠনেরও জায়গা। তাছাড়া তুমি তো জান, যত ছোটই হোক, আমাদের একটি নার্সিং বিভাগ আছে, পাড়ার লোকের অসুখ-বিসুখে দরকার হলে তারা সেবা-শুশ্রূষা করে। ভলাণ্টিয়ার বাহিনী আছে, উৎসব অনুষ্ঠানের সময় তাদের বের করে দেই। শহরে কোন সম্মানিত অতিথি অভ্যাগত এলে আমাদের রিপ্রেজেণ্টশন যায়, আরো অনেক প্ল্যান আছে আমার মাথায়। কিন্তু তোমরা যদি কেউ পাশে না দাঁড়াও কি করে সব হবে। তুমি এসো অরুণ, আমি বলছি তুমি এসো।'

আন্তরিক আকুতি ফুটে উঠল বীরেন-বাবুর গলায়।

অরুণ বলল, 'আসব বীরুদা। কাজকর্ম কিছু একটা জোটাতে পারলেই নিশ্চিন্তভাবে আসতে পারব। এখন তো ক্লাবের চার আনা চাঁদা দেওয়ারও ক্ষমতা নেই। কিছু-দিনের মত একটা টিউশানি-টানি পেলেও তো হোত। পকেট-খরচটা চলে যেত।'

বীরেনবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'করবে টিউশানি? দাঁড়াও, আজকেই তো কাগজে একটি ভালো বিজ্ঞাপন দেখছিলাম।'

বলে ইংরেজি কাগজখানা খুলে বিজ্ঞাপনের জায়গাটা বের করলেন বীরেনবাবু। শাঁখারী-পাড়া লেন থেকে এক ভদ্রলোক বিজ্ঞাপন দিয়েছেন ফার্স্ট ক্লাসের একটি ছেলেকে পড়াবার জন্য তাঁর একজন গৃহশিক্ষক চাই। মাইনে যোগ্যতা অনুযায়ী।

'শাঁখারীপাড়া লেন।' অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করল অরুণ, আর সঙ্গে সঙ্গে করবীর কথা অনেকদিন পরে ফের তার মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল করবীর আমন্ত্রণের কথা। এর আগেও কয়েকবার মনে পড়েছে। কিন্তু ইচ্ছা করেই যায়নি অরুণ। শাঁখারী-পাড়া লেন কথাটা অস্ফুটভাবে তার মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল।

বীরেনবাবু বললেন, 'ভবানীপুরে। বড় দূর হয়ে যাবে বলছ। তাতে আর কি হবে। ট্রাম-বাসে যাবে। মাইনে যদি তেমন ভালো না দেয়, একটা সেকসন হেঁটে যাবে, আর একটা সেকসন ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে। যখন যা অবস্থা, তখন সেইভাবে চলবে। আমি তো তাই বুঝি।'

'অরুণ হেসে বলল, 'আমিও না হয় তাই বুঝলুম; কিন্তু আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন টিউশানিটা হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। বিজ্ঞাপনের টিউশানি কি কখনো হয়?'

বীরেনবাবু বললেন, 'কেন হবে না? আরে এম-এ তো পাশ করেছ? হোলই ব বাঙলায়। স্কুলের একটা ফার্স্ট ক্লাসের ছেলের টিউটর হিসেবে তোমাকে নেবে না! নিশ্চয়ই নেবে। অন্তত দেখে আসতে ক্ষতি কি? সকালে-বিকালে দুবারই ইণ্টারভিউ সময় দিয়েছে। সকালের সময় শেষ হয়ে গেছে। তুমি বিকেলেই যেয়ো। হোক না হোক গিয়ে দেখই না একবার। কিসে কি হয়, তাতো বলা যায় না।'

টেবিলের ড্রয়ার খুলে বীরেনবাবু একখানা ব্লেড বার করলেন। তারপরে সেই বিজ্ঞাপনের জায়গাটুকু কেটে হাতে দিলেন অরুণের। না, ভদ্রলোকের পরহিতৈষণা

অস্বীকার করবার জো নেই—অরুণ মনে মনে হাসল।

কাগজের কাটিংটুকু পকেটে ফেলে অরুণ উঠে দাঁড়াতেই বীরেনবাবু বললেন, 'বাঃ, নিজের কাজটুকু গুছিয়ে নিয়ে অমনিই চলে যাচ্ছ। বললুম না, কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

অরুণ অপ্রতিভ হয়ে ফের বসল চেয়ারে, 'বলুন।'

বীরেনবাবু একটু ভূমিকা করে নিয়ে বললেন, 'দেখ কথাটা আমার মুখে ঠিক ভালো শোনাবে না। তবু ছেলেবেলা থেকে তোমাদের দেখে আসছি। তোমাদের ভালো হোক, তাই চাই।'

অরুণ বলল, 'তা তো ঠিকই বলুন।'

বীরেনবাবু বললেন, 'আমি তোমাদের অতুলের কথা বলছিলাম। আচ্ছা, তোমরা ওকে এমন করে বয়ে যেতে দিচ্ছ কেন? ওকে কি কোন শাসনটাসন করবে না? তোমার বাবাই না হয় ওই একরকমের মানুষ, কোন-দিকে কোন খেয়াল-টেয়াল নেই। কিন্তু তোমার কাকারা রয়েছেন, তুমি রয়েছ—'

অরুণ গম্ভীরভাবে বলল, 'হুঁ। নতুন কোন নালিশ আছে নাকি ওর নামে?'

বীরেনবাবু বললেন, 'না, নালিশ আর কি। নিষ্কর্মা বসে থাকলে যা হয় তাই হয়েছে। যত সব খারাপ সঙ্গী জুটেছে পাড়ার। বিশেষ করে ওই গোবিন্দ মুখুজ্যে। ওই ছোঁড়াই ওকে নষ্ট করল। কিছুদিন ধ'রে জোট পাকাচ্ছে ওরা নাকি নতুন একটা ক্লাব গড়বে। এ ক্লাবে ওদের পোষাচ্ছে না। পোষাবে কেন? ইয়ার্কি বাঁদরামির জায়গা তো এটা নয়। এখানকার ছেলে ছোকরাদের ভাঙিয়ে নেওয়ার মতলব ওদের। তা নেয় তো নিক। বাজে এলিমেণ্ট বেরিয়ে যাওয়াই ভালো, পাড়ায় আর একটা কেন, একশটা ক্লাব গজাক না। যুব-সঙ্ঘের তাতে কোন ক্ষতি হবে না।'

অরুণ মনে মনে হাসল। বীরেনবাবুর দুশ্চিন্তার মূলটা কোথায়, তা তার বুঝতে বাকি নেই। অতুলের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগও যে একেবারে অমূলক, তা তার বিশ্বাস হোল না। দিল্লী থেকে ফিরে আসবার পর অতুলের চালচলন সম্বন্ধে আরো দু'একজনের নালিশ তার কানে গেছে। ভেবেছে অতুলকে একটু সাবধান করে দেবে; কিন্তু কিছুতেই সে সুযোগ ঘটে ওঠেনি। অতুল তার কাছে ঘেঁষতেই চায়নি মোটে। কেবলই এড়িয়ে এড়িয়ে গেছে।

ক্লাব-ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় অরুণ বীরেনবাবুকে আশ্বাস দিয়ে এল, 'ক্লাব নিয়ে আপনি কোন চিন্তা করবেন না। এ পাড়ায় নতুন একটা ক্লাব অতুলরা যদি গড়েই তোলে, আমি আপনার ক্লাবেই থাকব।'

বীরেনবাবু অরুণকে শুধরে দিয়ে বললেন, 'ক্লাব আমার নয়, ক্লাব তোমাদের দশজনের; কিন্তু তুমি যদি থাক, তুমি যদি ফের আগের মত উৎসাহী হও, তাহলে ক্লাবটা সত্যিই আবার জেঁকে উঠবে। আচ্ছা, এস, টিউশানির খোঁজটা কিন্তু অবশ্যই নিয়ো। আর কি হয় না হয় সন্ধ্যার পরে আমাকে এসে জানিয়ে যেয়ো।'

অরুণ বলল, 'আচ্ছা।'

খানিকটা এগুতেই গলির মোড়ে অতুল আর গোবিন্দের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অরুণের। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে আর গল্প করছে।

গোবিন্দ অতুলেরই সমবয়সী। বছর বাইশ তেইশ হবে বয়স। তবে অতুলের মত অমন স্বাস্থ্যবান নয়। ফর্সাপানা বেঁটেখাট চেহারা। দীর্ঘকায় বন্ধুর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে গোবিন্দকে বার বার ঊর্ধ্বমুখী হতে হচ্ছিল।

অরুণ একটু দূর থেকে ওদের দুজনের দিকে ভ্রূ-কুঁচকে তাকাল। তারপর ভাইকে ডেকে বলল, 'অতুল, এদিকে আয়, শোন একবার।'

গোবিন্দ অরুণের সামনেই আজকাল সিগারেট খায়। কিন্তু দাদাকে দেখে অতুল হাতের সিগারেটটা একটু আড়াল করে বলল, 'কি বলছ এখানেই বল না।'

অরুণ বলল, 'না, এখানে বলা যাবে না। তুই আয় আমার সঙ্গে।'

গোবিন্দ নিরীহভাবে বন্ধুকে সুপরামর্শ দিয়ে বলল, 'যা না অতুল, অরুণদার যখন বিশেষ দরকারী কথা আছে শুনে আয় না। আমিও যাচ্ছি এবার। পরে দেখা হবে।'

গোবিন্দ চলে গেলে অতুল ফের জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছ?'

অরুণ বলল, 'চল্ কোন একটা জায়গায় গিয়ে বসি। চা খাবি?'

অতুল বলল, 'না, কি বলছিলে বল। আমার অন্য কাজ আছে।'

অরুণ এবার অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'কাজের মধ্যে তো দিনরাত কেবল আড্ডা দেওয়া। আর কি কাজ আছে তোর?'

অতুল স্থির দৃষ্টিতে দাদার দিকে একটু-কাল তাকিয়ে রইল তারপর রাগ চেপে মুখে একটু হাসি টেনেই বলল, 'তাতে কার কি এসে যাচ্ছে। তাছাড়া আজকাল তোমার কাজও তো তাই দাদা। তুমি তোমার বন্ধু-দের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছ। আর আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে আছি। কাজ দু দুভাইতে একই রকম করছি আমরা।'

বছর দুইয়েকের বড় এই দাদাকে ছেলে-বেলা থেকেই অতুল তেমন আমল দেয়নি। বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে অরুণও যখন তাকে শাসন করতে এসেছে অতুল ভারি অপমান বোধ করেছে। না হয় বছর দুই আগেই জন্মেছে, না হয় রাতদিন তোতাপাখীর মত বই মুখস্ত করে করে গোটা কয়েক পাশই করেছে, কিন্তু তাই বলে এমনকি অধিকার হয়ে গেছে ওর যে অতুলকে শাসন করতে আসবে? ওই তো চেহারা, ওই তো শক্তি সামর্থ্য। এক ঘুঁষি দিলে আর এক ঘুঁষির জায়গা দেহে নেই, তার আবার অত বড়াই, আর দাদাগিরি ফলানো কেন। আগে আগে অতুলের এই ছিল মনোভাব। ভাবকে মাঝে মাঝে ভাষাতেও যে প্রকাশ না করেছে তা নয়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতুলের প্রকাশভঙ্গী আজকাল কিছু কিছু বদলেছে। এখন সে সব সময় সবাইকে সোজাসুজি গালাগাল দেয় না, ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে শ্লেষ ব্যঙ্গও করে।

অরুণ একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'আমি কি করছি না করছি তা তোকে দেখতে আসতে হবে না।'

অতুল বলল, 'কেবল আমি কি করছি না করছি তাই বুঝি তুমি দেখে দেখে বেড়াবে? তা কি হয়? দেখলে দুজনের কাণ্ডকার-খানাই দুজনে দেখব, না হলে লজ্জায় কেউ কারো দিকে চোখ তুলে তাকাব না। কেবল তুমি আমার পিছনে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়াবে আর আমি খোঁজ খবর নিতে গেলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে এ কি কথা।'

অরুণ মনের রাগ চাপতে চেষ্টা করে বলল, 'নে না খোঁজ খবর। কে না করেছে। কিন্তু তোর খবর নেওয়ার জন্যে কারো গোয়েন্দাগিরি করার দরকার হয় না। তোর কীর্তিকলাপের কথা আজকাল আপনিই কানে আসে। পরিবারের নাম ডুবিয়ে ছাড়লি তুই, এই তো একটু আগে বীরুদাই কত কি বললেন।'

অতুল উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'কোন বীরুদা? বীরু গাঙ্গুলী! কি বলেছে সে? আমি আরো শুনেছি সে আমাদের নামে অনেক বাজে কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। তোমার কাছে কি বলেছে সে?'

অরুণ বলল, 'সে আমি বলতে চাইনে।'

অতুল বললে, 'বেশ না বলতে চাও না বললে। তার কাছ থেকেই কথা আমি বের করে নেব। কি করে কথা বের করতে হয়, আমার জানা আছে। কিন্তু তোমার মর‍্যাল কারেজের দৌড়টাও আজ দেখে নিলাম।'

বলে অরুণের সামনেই আজ সিগারেটে টান দিল অতুল। যার এতটুকু মনের জোর নেই, তার অগ্রজত্বের দাবী অতুল যেন আর স্বীকার করতে চায় না।

অরুণ মুহূর্তকাল জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ছোট ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সরে এল সেখান থেকে।

গলি থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের ভিতরে ঢুকে পড়ল অরুণ। এই গাছপালা-তৃণগুল্মহীন পার্কটি ছেলেবেলা থেকেই অরুণের খুব প্রিয়। স্কুল-কলেজের পরীক্ষার শেষে কত সকাল-সন্ধ্যা এই পার্কে তার কেটেছে। অতুল এখানে ব্যায়াম করেছে, কসরৎ দেখিয়েছে, অরুণ নিজের সহপাঠী বন্ধুকে নিয়ে একটি বেঞ্চ দখল করে তার সঙ্গে একটানা গল্প করে চলেছে। সদ্য-পঠিত উপন্যাসের আলোচনা থেকে শুরু করে দর্শন, রাজনীতি কিছুই বাদ থাকেনি. সেসব বন্ধুরা এখন এখানে-সেখানে ছিটকে পড়েছে। যারা কাছাকাছি আছে, তাদের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ নেই। এই মুহূর্তে হঠাৎ নিজেকে ভারি নিঃসহায় নির্বান্ধব মনে হোল অরুণের। পার্কটার উত্তর থেকে দক্ষিণে পায়চারী করতে করতে ভাবল অতুলের চালচলন নিয়ে কোন কথা বলতে না যাওয়াই তার উচিত ছিল। ওর সঙ্গে শুধু রক্তেরই সম্পর্ক আছে, আর কোন সম্পর্ক তো তার নেই। প্রাপ্তবয়সে ভাই বন্ধুর স্থান নেয়। সে হয় সুহৃদ। পরস্পরের মধ্যে সেই সৌহার্দ্যই যদি না জন্মাল, তাহলে রক্তের সম্বন্ধের দাবীটা খুব বেশিদিন টিঁকে থাকতে পারে না। অতুল যে শুধু কম লেখাপড়া জানে, তাই নয়, তার সেই অল্প বিদ্যার জন্যে লজ্জা, সঙ্কোচ, বিনয়ের বালাইও তার নেই। আর অরুণকে ছেলেবেলা থেকেই সে ঈর্ষা করে। অল্পবয়সে পিঠোপিঠি দুই ভাইর মধ্যে হিংসা থাকাটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বয়স বাড়ার পরেও সেই বিদ্বেষ ভাবটা অতুলের মোটেই কমেনি। শিক্ষিত বিদ্বান ছেলে হিসাবে পরিবারে, পাড়ায় অরুণের সম্মান বেশি, আদর-যত্ন বেশি, এটা অতুল এখনও ভালোভাবে নিতে পারে না। তার ধারণা অরুণ অনেক জিনিস ফাঁকি দিয়ে আদায় করে। তার ধারণা, অরুণ অনেক বেশি পায় বলেই অতুল তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। এই ধারণা যাতে ভাঙে, তার জন্যে অরুণ কম চেষ্টা করেনি। ছোট ভাইর সঙ্গে মাঝে মাঝে সদয় সহৃদয় ব্যবহারও সে করে দেখেছে। মাঝে মাঝে নিজের অল্প দিন ব্যবহার-করা জামা-জুতো উপহার দিতে গেছে ভাইকে, কিন্তু অতুল কিছুতেই তা নেয়নি। পাড়ার বন্ধুদের কাছ থেকে চেয়ে আনা ছেঁড়া জামা আর পুরানো র‍্যাপারও তাকে গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে, তবু অরুণের দেওয়া জিনিস সে ছোঁয়নি। মুখের ওপর বলেছে, 'ওসব কলেজী পোষাক আমার গায়ে মানাবে না দাদা, ও তুমি নিজেই পর।'

অতুলের এই ব্যবহারে অরুণের মনও ক্রমে বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছে। তবু দিল্লী থেকে দু-একবার ভাইকে অরুণ চিঠি লিখেছিল। অতুল জবাব দেয়নি। ছুটি-ছাটায় বাড়ি এসে অরুণ জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার চিঠির জবাব দিলিনে যে।'

অতুল পরিষ্কার বলেছে, 'ওসব চিঠি-পিঠি আমার আসে না। অত কাব্য করতেই যদি জানব, তাহলে তো তোমার মতই হতাম।'

না, তার কোন দাক্ষিণ্যকেই অতুল গ্রহণ করেনি। তাকে সে বাদ দিয়ে দিয়েই চলেছে। চলুক। ও যদি চলতে পারে, অরুণই বা পারবে না কেন? তাছাড়া সত্যি বলতে কি, ছোট ভাইয়ের সম্বন্ধে কর্তব্য-বোধ যা এক-আধটু আছে, মমত্ব তেমন করে অরুণ বোধ করে না। অরুণকে অতুল যদি আমলই না দেয়, তার বিদ্যাবুদ্ধির গৌরবকে যদি স্বীকার না করে, তাহলে অরুণই-বা কি করে তাকে ভালোবাসবে? মা এখনও মাঝে মাঝে বলেন, ছোট ভাইটাকে দেখিস, ওকে ফেলে দিসনে নান্তু। হাজার হলেও তোরই তো ভাই।'

কিন্তু সেকথা কি কেবল একজনের মনে রাখলে চলে? দুজনেরই মনে রাখতে হয়।

সারাটি দিন বড় বিশ্রীভাবে কাটল অরুণের। খাওয়া-দাওয়ার পর একটা গল্পের বই নিয়ে পড়তে চেষ্টা করল। মন লাগল না। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকবার পর হঠাৎ এক সময় বেরিয়ে পড়ল।

বিকেলের দিকে মনে হোল শাঁখারীপাড়া লেনের সেই ট্যুইশানের বিজ্ঞাপনের কথা। ট্যুইশন এম এ পড়তে পড়তে দু একটা করেছে। চাকরি জোটবার আগেও করে দেখেছে কয়েকবার। কিন্তু এখন এই বয়সে ছাত্র পড়ানো কি ফের পোষাবে? তাও আবার স্কুলের ছাত্র। কেঁচে গণ্ডূষ করা কি ভালো লাগবে? কিন্তু ভালো না লাগলেও একটা কিছু না জোটালে আর চলবে না অরুণের। অন্তত নিজের হাত খরচা চালানোর জন্যেও কিছু একটা চাই। দিল্লী থেকে আসবার পর রাহা খরচা বাদে যা সামান্য দু চার টাকা ছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন নিজের খরচের জন্যে মা কি কাকাদের কাছে হাতপাতা ছাড়া আর জো থাকবে না। তবু সে না হয় লজ্জাসরম ত্যাগ করে চাইল হাত পাতল, কিন্তু সংসারের যা অবস্থা তাতে অন্য খরচ কুলিয়ে তার হাতে যে বাড়তি দু চারটে পয়সা পড়বে তেমন সম্ভাবনাই বা কই, না বীরুদাই ঠিক বলেছেন। তারপর অন্য চাকরি বাকরি পেলে এ ট্যুইশান ছেড়ে দিলেই হবে। অবশ্য এ ট্যুইশান জোটে কিনা তারও তো কিছু ঠিক নেই। কিন্তু জুটুক না জুটুক অরুণ 'বিজ্ঞাপনদাতার' দোরে গিয়ে একবার ধন্না না দিয়ে যে ছাড়বে না। বীরুদার পরমার্শমত এসপ্লানেড পর্যন্ত অরুণ হেঁটেই গেল। তারপর সেখান থেকে উঠল দক্ষিণগামী একটা ট্রামে।

নম্বর মিলিয়ে মিলিয়ে কল্যাপসিবল গেটওয়ালা একটি বড় দোতলা বাড়ির সামনে অরুণ এসে থামল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে আলো জ্বলে উঠেছে ভিতরে বাইরে দরজাটা খোলাই ছিল। ঠেলে ঢুকে পড়ল অরুণ। ফতুয়া গায়ে ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের পাকা চুলওয়ালা এক বৃদ্ধ উঠানের ওপর অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন অরুণকে দেখে এগিয়ে এলেন, 'কি চাই আপনার?'

তরুণ বলল 'আপনারাই কি টিউটরের জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ। দিয়ে ঝকমারী করেছিলাম। সকালে বিকেলে এই নিয়ে জন বার তের এল। যত সব বাজে টাইপের লোক। ছেলে পড়াবে কি নিজেদেরই জ্ঞানগম্যি কিছু নেই। যাকগে, আপনি পড়াতে চান নাকি?'

অরুণ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার নিজের পড়াশুনো কতদূর?'

অরুণ বলল, 'আজ্ঞে এম এ পাশ করেছি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'কোন সাবজেক্টে?'

টুকরো কথা...(১২)

বারোয় পা দিয়ে টুকরো কথা আত্মজীবনী লিখতে বসেছে। বছর নয়, মাস! তবু তো বারো! টুকরো কথার কৈশোর কাটল। বিশ্রামের অবকাশ কোথায়? তারই এক ফাঁকে ফেলে-আসা পথ-চিহ্নের দিকে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। দেখছি কত গাছের পাতা নেই। রোদ যেন খোলস-খসা সাপ। নিস্তেজ। নির্বিষ। মলিন সকাল, পাংশু দুপুর, ধূসর সন্ধ্যা। এখন শীত। আর শীত চিরকালই স্মৃতি-রোমন্থক। স্মৃতি—যা মধুর। টুকরো কথা আশাকে ভাবে না ছলনা, স্মৃতিকে ভাবে না প্রবঞ্চক।

প্রথমে মনে পড়ে সেই অল্প ক'খানা বই: নতুন নয়, পুরনো। ময়লা মলাট, ময়লা পাতা, আলগা বাঁধাই। টুকরো কথা কোথা থেকে খুঁজে নিয়ে এল। দেখতে-দেখতে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন পাঠকরা। সেই শেষ কয়েক কপি—ধূসর পাণ্ডুলিপি আর বনলতা সেন, পাতাল কন্যা আর সোনার কপাট, আত্মচরিত আর নানা কথা, নূতনা রাধা আর ফেরারী ফৌজ—এই শীতে এখন কার টেবিলে? এখনো বাকি রয়েছে—কিছু কঙ্কাবতী, দময়ন্তী, বিদেশিনী, কুসুমের মাস। কিছু গীতিগুঞ্জ, যৌবনোত্তর, তিনপুরুষ আর দ্বিপ্রহর। দক্ষিণায়ন, রাজধানীর তন্দ্রা, কয়েকটি নায়ক, ঘোষালের ত্রিকথা, রুচি ও প্রগতি—সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়নি। কিন্তু ক'খানা আছে? ক'দিন থাকবে?

এই ক'মাসে নতুন-পুরনো কিছু-কিছু উপন্যাসের নাম করেছে টুকরো কথা। ইন্দ্রাণী, পঞ্চশর, সোনার চেয়ে দামী। ইছামতী, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, রঙরুট। ছাই, উত্তরঙ্গ, চলাচল, লখীন্দর দিগার। তিথিডোর, কিনু গোয়ালার গলি, কৃষ্ণপক্ষ, জলজঙ্গল, নাগিনীকন্যার কাহিনী, কোষ্ঠীর ফলাফল। কত হাতে-হাতে সেসব বই এতদিনে বুঝি পুরনো হয়ে এল। কিছু ছোটগল্পের নাম করেছে ঃ চড়াই উতরাই আর জলসাঘর, নিকৃষ্ট গল্প আর রাণুর প্রথম ভাগ আর যৌবনজ্বালা—তারপর আরও কখনো বা ফেটে পড়েছে ছোটদের অশ্রুত অট্টহাসি, ছলছল করেছে অদৃশ্য কচি চোখ এই টুকরো কথার আসরে ঃ দিনদুপুরে, মিঠেকড়া, খাই-খাই। নতুন ছড়া, আবোল তাবোল, হাউই। গল্প আর গল্প, কালোর বই, ভূতুড়ে, রসময়ের রসিকতা। সেসব বই পেয়ে যারা হেসেছে, ছলছল করেছে যাদের চোখ, এই শীতে তাদের স্মরণ করে টুকরো কথা।

ভালো প্রবন্ধ কোথায়? টুকরো কথা বলেছে ঃ কালের পুতুল, বাংলার লেখক, প্রত্যয়। নাম করেছে ঃ নারীর মূল্য, যাত্রী, কথা ও সুর, কল্লোল যুগ, শাশ্বত বঙ্গ, শাশ্বত তরুণ, অব্যক্ত, সেকাল আর একাল—আর—কিন্তু প্রবন্ধ আরও বেশি পড়ে না কেন বাঙলাদেশ? কিংবা আরও কবিতা? উড়ো চিঠির ঝাঁক, হংসমিথুন, নষ্ট চাঁদ, মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়, অন্যপথ—এই তো সেদিনই বেরিয়েছে। তিরিশের যুগের স্মরণীয় কবিতার বইগুলো ফুরিয়ে গেল তো গেলই। টুকরো কথা আক্ষেপ করেছে তা নিয়ে। শুনেছে—সুধীন্দ্রনাথ, সমর সেন কবিতা সংগ্রহ ছাপাবেন, বড় আকারে বেরোবে বনলতা সেন, ছাপা হবে বিষ্ণু দে-র এলিয়ট-অনুবাদ। খবর দিয়েছে ঃ প্রিন্সটন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছায়ায় বসে অমিয় চক্রবর্তী বাংলা কাব্য-নাট্যের খসড়া করছেন। এখন তিনি কানসাসে। শেষ শুনেছে তাঁর নতুন কাব্যগ্রন্থের কথাঃ ছড়ানো মার্কিনী। শিগগিরই বেরোবে। কবিতা পাঠকের সংখ্যা কিছু কি বাড়াতে পারল টুকরো কথা? ষোলো বছর পরে 'কবিতা' পত্রিকা তা হলে উঠে যাচ্ছে কেন?

কবিতা নয়, গল্প নয়, নাটক নয়, উপন্যাস নয়। ভ্রমণবৃত্তান্ত কিংবা প্রবন্ধও না—তবু গদ্যলেখা। নাম রম্যরচনা। প্রধানত বিষয়গুণে নয়, প্রসাদগুণে যার আকর্ষণ। টুকরো কথা পড়তে বলেছিল ঃ পথে প্রবাসে, ইদানীং, জনান্তিকে, দেশেবিদেশে আর ব্যক্তিগত। পড়তে বলেছিল—ইন্দ্রজিতের খাতা, সত্যি ভ্রমণ কাহিনী, হঠাৎ আলোর ঝলকানি, কালপেঁচার নক্সা আর এই-কলকাতায়। আরো বই নিশ্চয়ই বেরোবে টুকরো কথার জীবনস্মৃতির দ্বিতীয় ভাগ লেখার আগে।

লোকশিল্পের সপক্ষে টুকরো কথা আধুনিক-দেব মূর্তির নিন্দা করেছে, কেউ গায়ে মাখেননি। 'বহুরূপী' নাট্যসম্প্রদায়ের প্রশংসা করেছে, সবাই নীরবে শুনেছেন। ঋতু-উৎসবে বই উপহার দিতে বলেছে। এবার অনুরোধ বৃথা যায়নি। সুদৃশ্য কত অসংখ্য প্যাকেট দূর দূরান্তর ডাকঘরে বিলি হয়ে গেল। টুকরো কথা শিল্পীর মৃত্যুতে শোক সংবাদ দেয়নি, শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। শোকের শেষ আছে, শ্রদ্ধার শেষ নেই। মাসে-মাসে প্ল্যান করে 'ব্যক্তিগত সংগ্রহে' বই বাড়াতে বলেছিল টুকরো কথা। কথাটা মনে ধরল অনেকের। টাকা পাঠালেন, অ্যাকাউণ্ট খুললেন, ঝকঝকে বই নিয়ে গেলেন নিয়মিত কয়েক মাস। তারপর—কি বলে গিয়ে—না, তাঁদের উৎসাহ ঠাণ্ডা হয়েছে সেকথা ভাবতে পারে না টুকরো কথা। হয়তো খুব কাজ, ব্যস্ত আছেন। শীত শেষে আবার দেখা দেবেন, হাসিমুখে। হয়তো নিয়ে আসবেন আরও নতুন বন্ধুদের।

দুঃখের বিষয় কারো কারো বিরক্তিরও কারণ হয়েছে টুকরো কথা। তাঁরা ভর্ৎসনা করেছেন, বিদ্রূপ করেছেন। তাঁদের নমস্কার। অনেকে লজ্জা দিয়েছেন অন্যভাবে। **মধ্যপ্রদেশ লিখেছেন**—'বাঙলা দেশে—বাঙলাতেই বা কেন, ভারতবর্ষে—আপনারা পুস্তক ব্যবসায়ে অভিনবত্ব এনেছেন।' **কলকাতা লিখেছেন** ঃ 'লেখক পাঠক-প্রকাশক সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনারা যে সম্প্রীতি ও অন্তরঙ্গতার যোগসূত্র রচনা করবার চেষ্টা করছেন তার জন্য দু'হাত তুলে ধন্যবাদ......।' **খিদিরপুর থেকে** ঃ 'পাঠক ও পাঠাগার কর্তৃপক্ষের টুকরো কথা একান্ত প্রয়োজন।......এতকাল পুস্তকটি কিরূপ তাহা না জানিয়াই পাঠকের হাতে তুলিয়া দিয়াছি। এখন আপনাদের প্রচেষ্টায় সে ভয় দূর হইল।' **মানভূম লিখেছেন** ঃ 'টুকরো কথা গ্রন্থ নির্বাচনে বিশেষ সাহায্য করবে।' **জলপাইগুড়ি** ঃ 'আপনারা বাংলা পাঠকগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়াচ্ছেন এবং রুচি অত্যন্ত পরিমার্জিত করছেন—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।' **হার্ডিঞ্জ হোস্টেল থেকে** ঃ 'সিগনেট বুকশপ বই কেনার উপযুক্ত জায়গা বটে। ব্যবসায়ী মনো-বৃত্তির চেয়ে এখানে সুরুচিকর ও কৃষ্টিসম্পন্ন আবহাওয়াই চোখে পড়ে।' **মালদা** ঃ 'বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে আপনাদের এ সাহায্য বাঙালী কখনও ভুলতে পারবে না।' **জব্বলপুর** ঃ 'বিদেশে থাকি, বাংলা সাহিত্যের অনেক খবরই জানতে পারি না, টুকরো কথা সেই অভাব দূর করল। ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে দেখে আসি সিগনেট বুকশপে মনের মতো বই।' **বিকানির** ঃ 'সুদূর রাজপুতনায় থাকি, বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। টুকরো কথা সেই সমস্যার সমাধান করেছে।' আর **পাটনা লিখেছেন** ঃ 'মাসিক পত্রিকার মতো টুকরো কথারও নেশা লেগেছে।'

এতখানি সহৃদয়তার উপযুক্ত কি টুকরো কথা? সে অভিভূত। বাইরে ওদিকে শীত কি শেষ হল? আশ্চর্য!!

'বাঙলায়?'

ভদ্রলোক কথার ভঙ্গিতে নৈরাশ্যব্যঞ্জিত হোল 'বাঙলায়! বাঙলা দিয়ে কি করব? আমার দরকার যে ইংরেজী আর অঙ্কের। ফার্স্টক্লাসের ছেলেকে ইংরেজী অঙ্ক কষাতে পারবেন?'

অরুণ বলল, 'তা পারব না কেন? ইংরেজী অঙ্ক তো আমাদেরও শিখতে হয়েছে।'

ভদ্রলোক অরুণের সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে কি দেখে নিলেন তারপর বললেন, 'তা অবশ্য হয়েছে। আচ্ছা আসুন, ভিতরে আসুন আলাপ করি আপনার সঙ্গে।'

সোফা কোচে সাজানো বড়লোকের ড্রয়িং রুম। গদি আঁটা একটা নিচুতম চেয়ার দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বসুন। দেখুন, এসব টিউটর-ঠরের হাতে ছেলে মানুষ হয় না। আমরা নিজেরা যখন পড়েছি কোন টিউটরের দরকার হয় নি। আজকাল হচ্ছে। কিন্তু হয়ে লাভ হচ্ছে কি? ও সব টিউটর-ফিউটর কিছুই লাগত না। নিজের ছেলেকে নিজেই পড়াতে পারতাম। কিন্তু দিনরাত রুগীপত্রই ঘাটব, পেটের অন্নই জোগাব না ওই বাঁদরটার পিছনে ছুটোছুটি করে বেড়াব বলুন তো?'

অরুণ বলল, 'তা তো ঠিকই। এইজন্যেই তো টিউটর রাখা পছন্দ না করলেও রাখতে হয়।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিক বলেছেন। পছন্দ না করলেও নিজের প্রিন্সিপ্যালের বিরুদ্ধে গিয়েও অনেক জিনিস করতে হয় সংসারে। ছেলের মা দিনরাত যদি কানের কাছে টিউটর রাখ, টিউটর রাখ করে, তা হলে কে না রেখে পারে মশাই।'

অরুণ বলল, 'সেক্ষেত্রে অবশ্য টিউটর রাখাটাই নিরাপদ। স্ত্রীর কারটেন লেকচার শুনতে হয় না।'

ভদ্রলোক অরুণের দিকে তাকালেন, 'আপনার তো বেশ রসবোধ আছে। নিজে বিয়ে থা করেছেন?'

অরুণ বললে, 'আজ্ঞে না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'বিয়ে করলে বুঝতেন ও লেকচারের বিষয়বস্তু নিত্য নতুন। একবার শুরু হলে ওর আর শেষ নেই। আচ্ছা, আপনি ছাত্রকে 'আমার সামনে একটু পড়ান তো' দেখি। বেশি নয় দু চার মিনিট।

পড়াবার ধরণ দেখলেই আমি বুঝতে পারব। 'এই শঙ্কর! শঙ্কর, এ দিক আয়তো আর একবার।'

কিন্তু ডাকাডাকি ক'রেও শঙ্করের পাত্তা পাওয়া গেল না। চাকর এসে খবর দিল ছোটবাবুকে বাড়িতে দেখা যাচ্ছে না। তিনি বোধহয় পিছনের দোর দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

ভদ্রলোক বললেন, 'দেখুন কান্ড দেখুন ছেলের। এর জন্যে টিউটর রেখে কোন লাভ আছে?'

আমি সামনে বসে আর পিছন দিয়ে ও কিনা পালিয়ে গেল। সাহসটা দেখুন এক-বার।'

ভদ্রলোক ফের অরুণের দিকে তাকালেন, থাকগে। ধরুন আপনি ইংরেজী অঙ্ক দুই-ই পড়াতে পারবেন, কত চান আপনি?'

অরুণ বলল, 'সে আপনি বিবেচনা করে দেখবেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'উঁহু, কেবল এক-পক্ষের বিবেচনার কাজ তো নয়। আপনিও বিবেচনা করে বলুন।'

অরুণ একটু চিন্তা করে বলল, 'সব সাবজেক্ট পড়াতে হলে অন্তত টাকা চল্লিশেকের কম হলে হয় কি করে?

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'চল্লিশ টাকা সোজা কথা নাকি?' চল্লিশ টাকা আপনাকে দিলে আমি খাব কি? উঁহু অত পারব না। টাকা কুড়ির বেশি আমি কিছুতেই দিতে পারব না। আপনি আসুন তাহলে।'

অরুণ ভাবল, কিছু কম-টম করে বললেও হোত। কিন্তু কুড়ি টাকায় সেই বা রাজি হয় কি কোরে। ট্রাম বাসের খরচ বাদ দিয়ে তাহলে তার কিই বা থাকে।

অরুণ বেরিয়ে আসছিল, ভদ্রলোক বললেন, 'আপনার ঠিকানাটা রেখে যান।'

'ঠিকানা রেখে আর কি হবে।'

রেখে তো যান। ঠিকানা সবাই দিয়ে গেছেন। আপনিও ইচ্ছে করলে রেখে যেতে পারেন।'

অরুণ নিঃশব্দে একটুকরো কাগজে নিজের ঠিকানা লিখে দিয়ে ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এল।

খানিকটা এগুতে হঠাৎ মনে পড়ল করবীর সঙ্গে দেখা করে গেলে কেমন হয়। এদিকে তো তার আসা হয় না, আজ যদি এসেছে একবার দেখা করলে ক্ষতি কি। চাকরি গেছে সেকথা গোপন করলেই হবে; বলবে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। টুইশানের উমেদার হয়ে এ-পাড়ায় এসেছিল, সে কথা না বললেই হবে। বলবে অন্য দরকার ছিল। বলবে বন্ধু হিরন্ময়ের খবর নিতে এসেছে। দিল্লী থেকে এসে অবধি তার কোন খোঁজখবর পায়নি অরুণ, চিঠি দিয়ে জবাব পায়নি। আজ দিনটা বড়ই খারাপ গেছে। সারাদিন ভরে চলেছে ক্লান্তির মনান্তর ব্যর্থতা নৈরাশ্যের পালা। এমন দিনে যদি একটি সুন্দরী সৌভাগ্যবতী তরুণীর হাতে স্বাদ-গন্ধ সৌরভময় এক কাপ চা জুটেই যায় অরুণের কপালে মন্দ কি। দিল্লীতে থাকতে করবী অনেক চা করে খাইয়েছে। দূরে কোন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার সময় ফ্লাস্কে করে নিয়ে গেছে চা। মেয়েটি ভারি চা-বিলাসী। খেতে আর খাওয়াতে দুই-ই ভালোবাসে।

নম্বরটা মনে ছিল। খুঁজে খুঁজে একটু ভিতরের দিকে ছোট একটি একতলা বাড়ির সামনে এসে অরুণ দাঁড়াল। কড়া নাড়বার আগে মনে পড়ল করবীর স্বামীর কথা। দিল্লীতে যখন গিয়েছিল স্বামী সঙ্গে যায়নি। তাঁর বর্ণনা দিয়ে করবী বলেছে ভদ্রলোক বড় আমিশুকে, আলাপে অপটু। তার মানে নিশ্চয়ই, লোকজন তেমন পছন্দ করেন না। এতদিন বাদে দিল্লীর সেই আলাপের সূত্র ধরে এক অপরিচিত যুবক তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে দেখে তিনি মনে মনে কি ভাববেন, কে জানে। হয়তো ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করবেন, 'কি চাই।' অরুণ হিরন্ময়ের প্রসঙ্গ তুললে দু-এক কথায় জবাব সেরে বিদায় নমস্কার জানাবেন, এমনও হতে পারে। এক কাপ চায়ের সঙ্গে এ ধরণের একরাশ আশঙ্কাও জড়িয়ে আছে। অরুণ একটু ইতস্তত করল, কড়া না নেড়ে ফিরে যাবে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই অরুণ মত বদলে ফেলল। যা ভাগ্যে আছে হবে। কড়ায় যখন হাত দিয়েছে, নাড়াও দেবে।

অরুণ আর দেরি করল না। আস্তে আস্তে বার দুই কড়া নাড়ল। আর প্রতি-মুহূর্তে আশঙ্কা করতে লাগল একটি ভ্রূ কুঞ্চিত, গুরুগম্ভীর পুরুষ মূর্তি কখন এসে দোর খুলে মুখ বাড়াবে।

(ক্রমশ)

মিশরের পরিস্থিতি যে-রকম গুরুতর আকার ধারণ করেছে তাতে বর্তমান প্রবন্ধ মুদ্রিত হবার পূর্বেই আরো অনেক কাণ্ড ঘটে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। মিশরীয়দের আপত্তি সত্ত্বেও বৃটিশ সৈন্য জোর করেই মিশরীয় ভূমিতে থাকবে, এটা যখন স্পষ্ট বুঝা গেল, তখন থেকেই মিশরের জনমত ক্রমশ উত্তেজিত হতে থাকে এবং সুয়েজখাল অঞ্চলে অবস্থিত বৃটিশ সেনার সঙ্গে অসহ-যোগ করার বেসরকারী আন্দোলন আরম্ভ হয়। একদিকে মিশরীয় শ্রমিক, দোকানদার প্রভৃতি বৃটিশের সঙ্গে কাজ-কারবার বন্ধ করে দিয়ে দূরে সরে যেতে থাকে অন্যদিকে ইংরেজরা দিনের পর দিন নূতন সৈন্য আমদানী করে সুয়েজ অঞ্চল ভর্তি করতে থাকে। ইতিমধ্যে বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে বেসরকারী মিশরীয় স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হতে থাকে। এরা বেশির ভাগই স্কুল-কলেজের ছাত্র, এখান থেকে সেখান থেকে দু-পাঁচটা বন্দুক জোগাড় করে জানের বদলে মিশরের মান রাখার জন্য ছোটে। আনাচ-কানাচ থেকে এদের বন্দুকের গুলী চলে আর তার উত্তর আসে ইংরেজদের ট্যাঙ্ক ও কামানের মুখ থেকে। এদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং এদেরকে সাহায্য করে বা করতে পারে এই সন্দেহের বশে সুয়েজ অঞ্চলের অনেক মিশরীয় গ্রাম ইংরেজরা ট্যাঙ্ক, বুলডোজার দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। কিন্তু তাতেও ইংরেজদের আশঙ্কা দূর হয় না, তাদের উপর উপদ্রবও একেবারে থামে না—সুতরাং ট্যাঙ্ক ও বুল-ডোজারের আওতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। মিশরীয় সরকারী কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য অশান্তি নিবারণের চেষ্টা করেন, কিন্তু ইংরেজরা মিশরীয় পুলিসকে বিশ্বাস করতে পারে না, মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে একটু-আধটু খটাখটিও বাধে। তারই একটা বীভৎস পরিণতি হোল ২৫এ জানুয়ারী তারিখে ইসমেলিয়াতে যখন ট্যাঙ্ক থেকে কামান চালিয়ে ইংরেজরা মিশরীয় পুলিস ব্যারাক ভূমিসাৎ করে দিলে। মিশরীয় পুলিশদের নাকি আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল, তা তারা করে না, আত্মরক্ষার জন্য দু পাঁচটা গুলীও নাকি ছোড়ে। মিশরের পুলিস মিশরের ভূমিতে বৃটিশ সৈন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করলে না, এই অপরাধে তাদের অনেকের প্রাণ গেল, বহু আহত হোল, বাকীরা হোল বন্দী, তাদের ব্যারাক চূর্ণবিচূর্ণ হোল বৃটিশ কামানের গোলায়। এর পূর্বেও কয়েকবার বৃটিশরা এই ধরণের জবরদস্ত ব্যবহার করেছে, কিন্তু ইসমেলিয়ার কাণ্ডটা সবচেয়ে বেশি গুরুতর। এর খবর কায়রোতে পৌঁছুতেই সেখানে জনতা উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। ফলে কিছু দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে, কয়েকজন মারাও গেছে। অশান্তি নিবারণের জন্য মিশর গভর্নমেণ্ট কায়রোতে সামরিক আইন জারী করেছেন। দাঙ্গা সাময়িকভাবে বন্ধ হবে, কিন্তু অবস্থা যেখানে এসে পৌঁচেছে সেখানে থেমে থাকার নয়।

এখন প্রকৃতপক্ষে সুয়েজখাল অঞ্চলটি সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ সামরিক কর্তৃত্বাধীনে চলে গেল, সেখানে এখন আর মিশরীয় বেসামরিক গভর্নমেণ্টের চিহ্ন মাত্র থাকল না। মিশরের পক্ষে যুদ্ধ করে সুয়েজ অঞ্চল থেকে বৃটিশদের হঠানো সম্ভব নয়, যদিও বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সুয়েজ অঞ্চলে মিশরীয় সৈন্য পাঠানো হোক বলে কায়রোর রাজপথে জনতার চীৎকার শুনা গিয়েছিল। মিশরীয় গভর্নমেণ্ট বৃটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সুয়েজ অঞ্চলের দিকে মিশরীয় সৈন্য পাঠাবেন না নিশ্চয়ই। তবে অন্যভাবে বৃটিশকে কায়দা করার চেষ্টা করবেন। মিশরের জনমত যেরূপ বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়েছে তাতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করার কথা ইতি মধ্যেই উঠেছে, হয়ত কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করা হবেও। সঙ্গে সঙ্গে মিশর থেকে (অবশ্য সুয়েজ অঞ্চল বাদ দিয়ে, সেখান-কার প্রশ্ন উঠেই না) ইংরেজদের চলে যেতে বলার দাবীও উঠেছে। কিন্তু এ সবের দ্বারা ইংরেজকে সহজে কাবু করা যাবে না। মিশর গভর্নমেণ্টের ভরসা হচ্ছে ইংরেজরা অন্যদিক থেকে চাপ খেয়ে মিশরের সঙ্গে মীমাংসা করতে বাধ্য হবে।

গোড়া থেকেই মিশর গভর্নমেণ্টের একটা আশা ছিল যে, আমেরিকা যেমন ইংরেজ-দের ইরানে বেশি বাড়াবাড়ি করতে দেয় নি, তেমনি মিশরের বেলায়ও দেবে না। সে আশা কিন্তু এখনও ফলে নি, মিশরের ব্যাপারে আমেরিকা এখন পর্যন্ত ইংরেজের রাশ টেনে ধরে রাখতে পারে নি। শুনা যায় রাজা ফারুককে সুদানের রাজা বলে স্বীকার করে নিয়ে মিশরের সঙ্গে একটা নিষ্পত্তি করে ফেলার পরামর্শ নাকি আমেরিকা বৃটেনকে দিয়েছিল, কিন্তু তাতে ফল হয় নি। হয়ত

ইরানে কিছুটা মার্কিন পরামর্শ শুনেছে বলেই ইংরেজদের ওপর মিশরের বেলায় আমেরিকা ততটা জোর করতে পারছে না। তাছাড়া সুদূর প্রাচ্যে মার্কিন নীতির পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে মিঃ চার্চিল সম্ভবত মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা কর্তৃক বৃটিশ নীতির সমর্থনের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন। সুয়েজখাল রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে বৃটেন নিজের কোনো স্বার্থসিদ্ধি করছে না, ইঙ্গ-মার্কিন জগতের একটা অপরিহার্য আন্তর্জাতিক কর্তব্যপালন মাত্র করছে—বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এখন এই ধ্য়ো ধরেছেন এবং সেটাকে আরো জোরালো করার জন্য মিঃ চার্চিল মার্কিন কংগ্রেসের সম্মুখে বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, তিনি চান যে সুয়েজখাল অঞ্চলে অন্য মিত্রেরা অন্তত কিছু নামমাত্র "token" সৈন্যও পাঠাবেন। অর্থাৎ কোরিয়াতে যেমন মার্কিন যুদ্ধ ইউনোর নামে শুদ্ধ করে নেয়া হয়েছে, মিশরেও সেই ধরণের একটা কিছু করে বৃটিশ কর্মকে আন্তর্জাতিক কর্তব্যপালনের কোঠায় উত্তীর্ণ করা হোক। আপাতত অন্য কেউ যে "token" সৈন্য নিয়ে সুয়েজ অঞ্চলে ইংরেজদের পাশে এসে দাঁড়াবে সে সম্ভাবনা নেই। তবে অবশ্য একটা প্রধান কারণ এই যে ইংরেজ একাই যথেষ্ট, যুদ্ধ করে তাকে হটিয়ে দেওয়ার সাধ্য মিশরের নেই। তবে আমেরিকা 'token force' না দিলেও সহানুভূতি এবং কর্মের স্বাধীনতা বৃটেনকে দিচ্ছে, মিঃ চার্চিল এইটুকু বুঝে এসেছিলেন আমেরিকা থেকে। কিন্তু অবস্থা যেরকম বিগড়ে যাচ্ছে, তাতে মার্কিন গভর্নমেণ্টের পক্ষে আর বেশিক্ষণ চুপ করে চেয়ে দেখতে থাকা কঠিন হবে—এখনো মিশরের এই আশা আছে। ইংরেজরা যা করছে, তাতে কেবল মিশর নয়, সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যকেই তারা ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের পক্ষে বিপজ্জনক করে তুলছে। পৃথিবীর দরবারে ইংরেজের নৃশংস জুলুমবাজির প্রমাণ উপস্থিত করা এখন মিশরের পক্ষে খুবই সহজ। পৃথিবীর দরবারের কথা বাদ দিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের পক্ষে যেটা বিশেষ আশঙ্কার কথা, সেটা হলো এই যে, ইসমেলিয়ার ঘটনায় সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সহানুভূতি মিশরের প্রতি যাবে। মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন আরব রাষ্ট্রের গভর্নমেণ্টকে তলে তলে বৃটেন হাতে রাখার ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু মিশরে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যা করছেন, তাতে সেই সব রাষ্ট্রের জনগণের ভিতর বৃটিশের প্রতি বিদ্বেষ বাড়বে, যাকে অগ্রাহ্য করে চলা শাসক শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব হবে না।

অতলান্তিক সাগরের ধার হতে আরম্ভ করে ভূমধ্যসাগরের ধারে ধারে উত্তর আফ্রিকার কোন দেশেই তো শান্তি নেই, সর্বত্রই তো অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে। মরক্কো, আলবেনিয়া ও টিউনিসিয়া ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের কামড় থেকে এখনো ছাড়া পায়নি। আমেরিকা পূর্বে ফরাসীদের একটু বুঝে-সুজে চলতে পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি; ফরাসীরা জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে কোন মীমাংসার পথে না গিয়ে তাদের দমন করার নীতি চালিয়েছে। লিবিয়া নূতন 'স্বাধীন রাষ্ট্র' বলে ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু সেখানকার অবস্থায় কত লোক সন্তুষ্ট বলা কঠিন। 'স্বাধীনতা' সত্ত্বেও লিবিয়াতে বৃটিশ সৈন্যের আস্তানা রয়েছে এবং থাকবে। মিশর তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আন্দোলন আরম্ভ করে দিয়েছে। তারপর মিশরের সঙ্গে তো এই অবস্থা। মিশরের সঙ্গে এই রকম গোলমাল চললে আরব লীগের অন্য রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতা লাভ সম্ভব নয়। এমনকি, ইসমেলিয়ার এই কাণ্ড-কারখানার পরে ইরানের সঙ্গে মিটমাটের কথা বলাও অপেক্ষাকৃত কঠিন হবে, কারণ সেখানেও এই সব ঘটনার দরুণ জনমত পূর্বের চেয়েও বেশি বৃটিশবিরোধী হয়ে উঠবে। সুতরাং ফরাসী ও বৃটিশ ব্যবহারের দরুণ সমস্ত উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যই অন্তত মনের দিক দিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের নাগালের বাইরে যাবার জো হয়েছে। তাই যদি যায়, তবে কেবল সৈন্য-পাহারা দিয়ে সুয়েজ খাল রক্ষা করার চেষ্টা করে কী লাভ হবে? আমেরিকা এটা বুঝবে ও বুঝে অবিলম্বে বৃটেনের রাশ টেনে ধরবে—মিশরের গভর্নমেণ্ট এ আশা এখনো করছেন বলে মনে হয়। অন্যপক্ষে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বোধ হয় এই ধারণা রয়েছে যে, মিশরের বর্তমান শাসক-শ্রেণী নিজের স্বার্থেই ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের আশ্রয় শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করে যেতে পারবে না।
২৭।১।৫২

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

(১৭)

নিজামের কাছে মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত পত্র। "ভারত থেকে যাবার আগে ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা।" হায়দরাবাদ বিমান-ময়দানে একটি সমস্যা—দুই পক্ষের নিমন্ত্রণ। মুন্সীর ভবনে, না লায়েক আলির ভবনে? গোপন দৌত্যের সংবাদ চারদিকে রটে গেছে। লায়েক আলির অভিযোগ—ভারত গবর্ণমেণ্টের অবরোধ ব্যবস্থার ফলে হায়দরাবাদের দুরবস্থা। হায়দরাবাদের মোটর-বাসের গদি কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে দিয়েছে ভারত। ক্লোরিনের অভাবে হায়দরাবাদ। শাহ মঞ্জিল থেকে কিংকোঠি। ঝাপসা আলোতে রাজা পঞ্চম জর্জের ছবি। মস্তবড় সোফার মধ্যে এইটুকু চেহারার নিজাম। মাউণ্টব্যাটেনের চিঠি পড়ে নিজাম বাহাদুরের প্রশ্ন।

মাউণ্টব্যাটেনের একটি অনুরোধ তুচ্ছ করলেন নিজাম। তৃতীয় ব্যক্তি লায়েক আলির উপস্থিতি। আলোচনার স্বাচ্ছন্দ্যে বাধা। 'আমি জানি মাউণ্ট-ব্যাটেনের ক্ষমতা অল্প।' মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশ্যে নিজামের বিদায়ভঙ্গী। ঘরোয়াভাবে বলবার মত নতুন কোন বক্তব্য নেই। 'রাষ্ট্রভুক্তি' কথাটা শুনতেই নিজামের আপত্তি। আর একটি যুক্তি—শান্তিরক্ষা সম্ভবপর হবে না, সুতরাং গণভোটও হতে পারে না। কম্যুনিষ্টদের উপদ্রব একটা মামুলী ব্যাপার মাত্র। অন্যান্য দেশীয় রাজন্যবর্গ কতগুলি 'রহিস' ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। নিজামের কিসমৎতত্ত্ব। এ জীবন একটা রেসকোর্স। নিয়মতান্ত্রিক রাজাধিকার-বাদ প্রাচ্যে অচল। কমনওয়েলথের মধ্যে থাকা না-থাকার প্রশ্ন। বৃটিশের সৌহার্দ্যে কোন তারতম্য হবে না।

নিজামের সঙ্গে আলোচনার অভিজ্ঞতা। "খামখেয়ালী বৃদ্ধ অধ্যাপকের তত্ত্বকথা"। নিজামের জবরদস্ত অদৃষ্টবাদ। মোইন নওয়াজ জঙ্গের অভিযোগ—ভারতের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝা যাচ্ছে না। রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাবে মোইনের আপত্তি। হায়দরাবাদের আত্মকর্তৃত্বের অধিকার ছেড়ে দেবেন না নিজাম। 'তিনটি ক্ষমতা নয়, তেত্রিশটি ক্ষমতা'। সেকেন্দ্রাবাদের এক নির্জন প্রান্তে এজেণ্ট জেনারেল মুন্সী। মোইন ও লায়েক আলির মধ্যে বনিবনা নেই, নিজামের প্রিয়পাত্র লায়েক আলি। মুন্সীর সঙ্গে হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্টের যোগাযোগ নেই। কাশিম রেজভির সঙ্গে আলোচনা। রেজভির সহযোগিতায় কম্যুনিষ্ট দল। রেজভির আদর্শ হলো মুসলিমের প্রতিষ্ঠা রক্ষা। রেজভি বললেন—এ ভারত রাষ্ট্র দু'বছরের বেশি টিকবে না।

নয়াদিল্লী, শুক্রবার, ১৪ই মে, ১৯৪৮ সাল। মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি-রূপে আগামী কাল আমাকে হায়দরাবাদ রওনা হতে হবে। আজ আবার জাইন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে দেখা করলাম এবং কতগুলি বিষয় শেষবারের মত আলোচনা ক'রে তাঁর চূড়ান্ত অভিমতও জেনে নিলাম। জাইন জানিয়ে দিলেন যে, হায়দরাবাদে আমি যতদিন থাকবো, ততদিন মীর লায়েক আলির ব্যক্তিগত অতিথি হয়ে আমাকে থাকতে হবে। আমি কবে হায়দরাবাদ রওনা হব, সে সম্বন্ধে অবশ্য কোন আলোচনা হলো না, কারণ এই প্রসঙ্গই আমি উত্থাপন করলাম না। আমার হায়দরাবাদ যাত্রার জন্য কোন ধরা-বাঁধা তারিখ এবং সময়ের প্রস্তাবও করলেন না এজেণ্ট জেনারেল জাইন ইয়ার জঙ্গ। তিনি আমার আগেই হায়দরাবাদে পৌঁছে যাবেন বলে আশা করছেন। যদিও তিনি জানেন না যে, আমি কবে হায়দরাবাদে পৌঁছে যাচ্ছি।

মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে যে পত্র নিয়ে আমি নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চলেছি, সে পত্রে মাউণ্টব্যাটন বলেছেন যে, অতিমান্য নিজাম দিল্লীতে আসবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করায় মাউণ্টব্যাটেন মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। একথাও মাউণ্টব্যাটেন লিখেছেন যে, তাঁর পক্ষে হায়দরাবাদ যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, কারণ এখন হায়দরাবাদ যাবার মত সময় ও সুযোগ তাঁর হাতে আর নেই। মাউণ্টব্যাটেন লিখেছেন—"কিন্তু ভারত থেকে যাবার আগে আমি আপনার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ ভাবেই কয়েকটি বিষয় আলোচনা করতে চাই। সরকারীভাবে চিঠিপত্রের বিনিময়ের দ্বারা বা অন্য কোন মামুলী পদ্ধতির আলোচনার দ্বারা পরস্পরের বক্তব্য জানবার যে ব্যবস্থা রয়েছে, তার চেয়ে ঘনিষ্ঠতর একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। তাই আমার প্রতিনিধি হয়ে ক্যাম্বেল জনসন যাচ্ছেন। তিনি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি। আমার ধারণা, অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে অবহিত আছেন।"

পত্রের উপসংহারে মাউণ্টব্যাটেন লিখেছেন—"হায়দরাবাদের কম্যুনিষ্টদের ক্রিয়াকলাপ এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ সম্পর্কে নানাবিধ ঘটনার যে সংবাদ প্রতি-দিন দিল্লীতে আসছে, তাতে আমি নিতান্ত উদ্বেগ বোধ করছি। আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছি এই কারণে যে, কম্যুনিষ্টদের ক্রিয়াকলাপ এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধ উভয়ই আপনার পদমর্যাদা ও স্বার্থের বিশেষ ব্যাঘাতের হেতু হয়ে উঠছে। সুতরাং আমি আশা করি যে, আপনি অকুণ্ঠভাবে আপনার মনের কথা ও বক্তব্য ক্যাম্বেল জনসনের কাছে বলবেন। বর্তমান সমস্যা ও অবস্থা সম্বন্ধে আপনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কি ভাবেন, সাধারণভাবেই বা কি বলবার আছে, সবই আপনি জানিয়ে দেবেন। আমি ক্যাম্বেল জনসনকে বলে দিয়েছি যে, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কারও কাছে আমার এই ব্যক্তিগত অনুরোধ যেন তিনি উপস্থাপিত না করেন। আমার জিজ্ঞাস্য একমাত্র আপনারই কাছে, এবং একমাত্র আপনারই ব্যক্তিগত বক্তব্য আমি জানতে চাই। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে এর মধ্যে আনবেন না, কারণ

তা হলে আমার ও আপনার এই ব্যক্তিগত যোগাযোগের স্বাচ্ছন্দ্য ক্ষুণ্ণ হবে।"

হায়দরাবাদ, শনিবার, ১৫ই মে ১৯৪৮ সাল। প্রাতরাশের অল্পক্ষণ পরেই উইলিংডন বিমানক্ষেত্রে এসে একটি ডাকোটায় উঠলাম। হায়দরাবাদে এসে পৌঁছেছি মধ্যাহ্নভোজনের সময়ের সামান্য কিছুক্ষণ আগে। মাঝে ভোপালে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য একবার নেমেছিলাম।

হায়দরাবাদের বিমান ময়দানে নেমেই দেখি যে মীর লায়েক আলির পক্ষ থেকে ক্যাপ্টেন বেগ উপস্থিত হয়েছেন। আর আছেন মুন্সীর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর ষ্টাফের তিনজন ভারতীয় অফিসার। মুন্সীর প্রতিনিধিরা আমন্ত্রণ জানালেন। এ'রা বেশ জোর দিয়েই দাবী করলেন যে, বিমান-ময়দান থেকে এখন আমার পক্ষে সোজা এবং সবার আগে মুন্সীর ভবনে গিয়েই ওঠা উচিত। আজ সন্ধ্যায় মুন্সীর ভবনেই আমাকে আহার করতে হবে, এই দাবীও তাঁরা জানালেন। হায়দরাবাদের মাটিতে পা দেওয়া মাত্র আমাকে এক জটিল কূটনীতিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হলো। দু'পক্ষই নিমন্ত্রণ করছেন এবং এই দুই নিমন্ত্রণই বস্তুতঃ রাজনৈতিক টানাটানির ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। আমাকেও তিন মিনিটের মধ্যে মনে মনে আমার কূটনীতিক সিদ্ধান্ত করে ফেলতে হলো। আমি বললাম, হায়দরাবাদে এখন আমি মীর লায়েক আলির ব্যক্তিগত অতিথি এবং যতক্ষণ না আমি জানতে পারি তিনি এখানে আমার থাকবার কি ব্যবস্থা করেছেন, ততক্ষণ আমি অন্য কারও ভবনে থাকবার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি না। অবশ্য একথাও আমি জানিয়ে দিলাম যে, মুন্সীর সঙ্গে আমি দেখা করবো।

মুন্সী কদিন আগে বাঙ্গালোরে ছিলেন। আমি হায়দরাবাদে পৌঁছবার আগেই তিনি হঠাৎ বাঙ্গালোর থেকে হায়দরাবাদে উপস্থিত হয়েছেন। মনে হচ্ছে, আমার হায়দরাবাদ আগমনের ব্যাপারের জন্যই তিনি এই সময় বাঙ্গালোর থেকে এখানে চলে এসেছেন। সুতরাং, এটা অনুমান করতে পারি যে, আমার হায়দরাবাদে আসবার ব্যবস্থার কথা তিনি আগেই জানতে পেরেছিলেন। বুঝতে পারছি, হায়দরাবাদে আমার গোপন দৌত্যের এত গোপন ব্যবস্থার কথাও চারদিকে রটে গেছে। আমার হায়দরাবাদ আগমনের ব্যাপার একটা মস্ত বড় সংবাদ সৃষ্টি করুক, এটা আমি চাইনি। বরং, আশা করেছিলাম যে, আমি নিঃশব্দে আমার দৌত্যকার্য লোকচক্ষুর আড়ালেই সেরে নিয়ে দিল্লী ফিরে যেতে পারবো। কিন্তু সে আশা আর নেই। মুন্সী হায়দরাবাদের সকল সংবাদদাতা ও সাংবাদিকদের খবর জানিয়ে দিয়ে রেখেছেন যে, মাউণ্টব্যাটেনের প্রতিনিধি নিজামের সঙ্গে আলোচনার জন্য আসছেন। এখন সাংবাদিকদের পাল্লায় পড়ে এবং তাঁদের প্রচারের চোটে বিখ্যাত হবার দুর্ভাগ্য আমাকে বরণ করতেই হবে।

যাই হোক্, নিমন্ত্রণের কূটনীতিক সমস্যার বাধা পার হয়ে মোটরে উঠলাম এবং সেকেন্দ্রাবাদ থেকে হায়দরাবাদ পর্যন্ত দশ মাইল পথও পার হলাম। পথের পরিচ্ছন্ন চেহারাটাই বিশেষভাবে চোখে পড়লো, কোথাও কোন গোলমালের আওয়াজও শুনলাম না। পথে লোকজনও খুব বেশি দেখা গেল না। পথের ওপর এবং ঘরের মধ্যে লোকজন যারা রয়েছে, তাদের দেখে মনে হয় না যে কোন প্রকারের উত্তেজনা বা গোলমেলে অবস্থার মধ্যে তারা রয়েছে। দেখে মনে হলো, প্রত্যেকেই যে যার নিজের মনে শান্তভাবে নিজের নিজের জীবিকার কাজ করে চলেছে।

শাহ মঞ্জিল—এই ভবনে মীর লায়েক আলি থাকেন। শাহ মঞ্জিলে পৌঁছেই ভেতরে চলে গেলাম এবং লায়েক আলির সঙ্গে দেখা হলো। লায়েক আলির শরীর একটু অসুস্থ। তিনি বললেন যে, আমাকে তাঁর ব্যক্তিগত অতিথিরূপে পেয়ে তিনি খুবই খুশি হয়েছেন। কিন্তু, আজ সন্ধ্যায় আমার আহারের জন্য কোন বিশেষ বন্দোবস্ত তিনি করে উঠতে পারেননি। লায়েক আলি জানালেন, অতএব আজ সন্ধ্যায় আমার পক্ষে মুন্সীর ভবনেই আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেই ভাল হয়। আর একটি বিশেষ যুক্তি আছে। আগামীকাল সকালবেলাতেই মুন্সী আবার বাঙ্গালোরে ফিরে যাবেন, সুতরাং আজ সন্ধ্যাতেই মুন্সীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আসা আমার কর্তব্য। লায়েক আলি বললেন, তিনি হায়দরাবাদের সকল রাজনৈতিক দলের ও সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করছেন। আমার ইচ্ছানুযায়ী হায়দরাবাদের ভেতরে কোথাও যেতে এবং যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করতে কোন বাধা নেই, একথাও জানিয়ে দিলেন লায়েক আলি। তিনি অভিযোগের সুরে বললেন যে, হায়দরাবাদের অর্থনৈতিক অবরোধের উপশম এখনো হয়নি এবং সহরের পানীয় জল সরবরাহে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে, কারণ ভারত গবর্ণমেণ্টের অবরোধ ব্যবস্থার জন্য বাইরে থেকে হায়দরাবাদে ক্লোরিণ আমদানী করা সম্ভবপর হচ্ছে না। তা ছাড়া, হায়দরাবাদ সহরের যাত্রী বহনের জন্য ইংলণ্ড থেকে কতগুলি মোটরবাস কিনেছিলেন নিজাম গবর্ণমেণ্ট, কিন্তু মোটরবাসগুলি বোম্বাইয়ের বন্দরে পৌঁছে এখনো পড়ে রয়েছে এবং পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। মোটরবাসগুলির কলকব্জা খুলে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং গদিও কুটিকুটি করে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। এর ওপর, বন্দরে পড়ে থাকার দরুণ ডেমারেজ চার্জও ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

লায়েক আলির এই সব অভিযোগের বিবরণ শুনে আমিও প্রত্যুত্তরে কয়েকটা কথা বললাম। আমি বললাম, এই ধরণের অভিযোগের বিষয় অমীমাংসিত অবস্থায় বেশি দিন ফেলে রাখা অবশ্যই উচিত নয়। যে বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন লায়েক আলি, সে ঘটনা কতদূর সত্য অথবা মিথ্যা তা আমি জানি না। আমি বললাম, কোন্ পক্ষ অন্যায় করছেন, এই প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে আমি এইটুকুই শুধু বলতে পারি যে, বৃহত্তর রাজনৈতিক বিষয়ে একটা মীমাংসা ও মিল হয়ে গেলে, তবেই এই ধরণের অভিযোগের ব্যাপারগুলিকে সহজে এবং সন্তোষজনকভাবে মিটিয়ে ফেলা সম্ভবপর।

লায়েক আলির ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত হতে বেশ কিছুটা দেরী হলো। আমাকে খবর দেওয়া হলো যে, বেলা পাঁচটার সময় অতিমান্য নিজাম বাহাদুর আমাকে দেখা দিতে রাজী হয়েছেন।

শাহ মঞ্জিল থেকে কিং কোঠি—অর্থাৎ লায়েক আলির ভবন থেকে নিজাম বাহাদুরের সরকারী বাসভবনে উপস্থিত হলাম। কিংকোঠিতে পৌঁছিয়েই দেখলাম, লায়েক আলি উপস্থিত রয়েছেন। তিনি প্রায় দশ মিনিট আগে পৌঁছেছেন। আমাকে পথ দেখিয়ে ছোটখাট একটি ড্রইং-রুমের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসতে বলা হলো। ভিক্টোরিয়ার আমলের নানারকম শিল্পসামগ্রী দিয়ে ড্রইং-রুমটী সাজানো রয়েছে। ঘরের ভেতর ঝাপ্সা আলোর মধ্যেই দেখতে পেলাম, দেয়ালের গায়ে রাজা পঞ্চম জর্জের একটি বড় ছবি ঝুলছে।

মীর লায়েক আলি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মস্ত বড় একটা সোফাকে উদ্দেশ করে আমার পরিচয়বাণী শোনালেন। অতিমান্য নিজাম বসেছিলেন এই সোফারই ওপর। কিন্তু নিজামের মূর্তি প্রথমে আমার চোখেই পড়েনি। আমি দেখেছিলাম শুধু মস্ত বড় একটা সোফা। পরে দেখলাম, সোফার এক কোণে এইটুকু চেহারার নিজাম বস্তুতঃ একটা অদৃশ্য বস্তুর মতই বসে রয়েছেন।

নিজামের চেহারা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। কাঠির মত হাল্কা ও ক্ষুদ্র চেহারার একটি মানুষ। আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে, যে অতিমান্য নিজাম বাহাদুরের সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছি, তিনিই ইনি। নিজামকে যথোচিত অভিবাদন জানাবার জন্য নিজের মনকেই তৈরী করতে আমার বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল।

অত্যন্ত বাজে রকমের পরিচ্ছদে বিশ্রীভাবে সেজে বসে রয়েছেন নিজাম। পরিধানে মোটা সুতীর আচকান আর পায়জামা, পায়ে এক জোড়া চকোলেট রঙের চটি এবং রঙীন সুতীর একজোড়া মোজা। দু'পায়ে পায়জামার ওপর দিয়ে মোজা জোড়া হাঁটু পর্যন্ত টেনে দিয়েছেন। মোজার কোন বাঁধনও নেই, হাঁটু পর্যন্ত উঠে ঢিলে মোজা হাঁ করে রয়েছে। একটি ফেজ টুপি পরেছেন নিজাম, কিন্তু টুপিটা কপাল থেকে সরে গিয়ে মাথার পেছনে হেলে রয়েছে। একে চেহারাটাই ক্ষুদ্র; তার ওপর শরীরের ওপরটা কুঁজোর মত ভঙ্গীতে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। নিজামের মুখের গড়নও কেমন যেন ঢিলে-ঢালা ও শিথিল হয়ে গেছে, দাঁতের অবস্থা শোচনীয়। দেখলাম, নিজামের হাত দুটোও সব সময় কাঁপছে। কথা বলার সময় পা কাঁপিয়ে দুই হাঁটুকে এমনভাবে ঠুকতে থাকেন নিজাম যে দেখে মনে হবে, কোন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর অসাড় শরীর কাঁপছে। নিজামের চেহারার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ একমাত্র রয়েছে তাঁর তাকাবার ভঙ্গী এবং গলার স্বরের মধ্যে। তীব্র দৃষ্টি তুলে তাকানো এবং কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলে জোর দিয়ে কথা বলা—মাত্র এই দু'টি অভ্যাসের মধ্যে নিজামের ব্যক্তিত্বের পরিচয়টুকু পাওয়া যায়।

মাউণ্টব্যাটেনের চিঠি নিজামের হাতে তুলে দিলাম। অত্যন্ত দ্রুত চিঠির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমার দিকে কঠোরভাবে তাকিয়ে নিজাম বললেন—"আর এক মাস মাত্র সময়ের মধ্যে মাউণ্ট-ব্যাটেন এমন কি একটা কাজ করে যাবার আশা করছেন?

হায়দরাবাদ, শনিবার, ১৫ই মে, ১৯৪৮ সাল। মাউণ্টব্যাটেন তাঁর চিঠিতে নিজামকে সুস্পষ্টভাবেই এই কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিজামের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সময় তৃতীয় কোন ব্যক্তি সেখানে যেন না থাকেন। আমিও আশা করছিলাম যে, মাউণ্টব্যাটেনের চিঠি পড়বার পর নিজাম মীর লায়েক আলিকে চলে যেতে বলবেন। কিন্তু চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়ে নিয়েও নিজাম লায়েক আলিকে চলে যেতে বললেন না। স্পষ্টই বুঝলাম যে, নিজাম মাউণ্টব্যাটেনের বিশেষ অনুরোধটি ইচ্ছে করেই তুচ্ছ করলেন এবং মীর লায়েক আলি শক্ত হয়ে বসেই রইলেন।

আমার দিকে তেমনি শক্তভাবে তাকিয়ে নিজাম চেঁচিয়ে উঠলেন—'আমি ভাল করেই জানি যে, ভারতের গবর্ণর জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনের সময়-সুযোগ যেমন খুবই অল্প, তেমনি অল্প তাঁর ক্ষমতা।'

তার পরেই নিজাম বললেন—'হায়দরাবাদ ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যে আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, এই সত্যটি মাউণ্টব্যাটেন ভাল করেই বুঝতে পেরেছেন মনে হচ্ছে, অথচ দেখতে পাচ্ছি যে, হায়দরাবাদে এসে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আমার সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না, সে সুযোগ তাঁর নেই।'

মাউণ্টব্যাটেনকে যেন সোজা বিদেয় ক'রে দিচ্ছেন, তেমনি ভঙ্গীতে হাত নেড়ে নিজাম বললেন—'বেশ তো! না আসতে পারেন, আসবেন না। আমি দুঃখিত। এই অবস্থায় আমিও ওঁকে বলবো, বিদেয় নিন তা'হলে এবং আপনার যাত্রা সফল হোক্।'

নিজাম বললেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁর যা করা কর্তব্য, তার সবই তিনি করেছেন। যে সব সর্তে তিনি ভারত গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে একটা সম্পর্কের মধ্যে আসতে রাজী আছেন, সেসব তিনি পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর নিয়মতান্ত্রিক উপদেষ্টা এবং প্রধান মন্ত্রীর মারফৎ তাঁর ব্যক্তিগত বক্তব্য স্পষ্টভাবেই ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানিয়ে দিয়েছেন। এখন ঘরোয়াভাবে অন্য কোন পক্ষকে জানাবার মত কোন নতুন বক্তব্য তাঁর নেই।

আমি বললাম, ভারত থেকে চলে যাবার আগে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারত ও হায়দরাবাদের মতভেদের একটা নিষ্পত্তি ক'রে দিয়ে যাবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন। যতটুকু করা তাঁর সাধ্য, তিনি আন্তরিকভাবেই সেটুকু ক'রে যাবার সুযোগ খুঁজছেন। এখন অতি-মান্য নিজামের পক্ষেই একবার বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার যে, মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত প্রভাব ও মর্যাদাকে একটা মীমাংসা লাভের চেষ্টায় কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা। নিজামকে আমি একথাও বললাম যে, ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্কের মধ্যে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে মাউণ্টব্যাটেনের সাধারণ অভিমত ও বিচার-বিবেচনার পরিচয় নিজাম বাহাদুরের সবই জানা আছে। যদি মাউণ্টব্যাটেনের বক্তব্যের বিশেষ কোন বিষয় বুঝতে নিজাম বাহাদুর কোন অসুবিধা অনুভব ক'রে থাকেন, অথবা কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা থেকে থাকে, তবে আমি খুশি হ'য়েই এখানে মাউণ্টব্যাটেনের বক্তব্য বিশদভাবেই ব্যাখ্যা ক'রে সে অসুবিধা ও অস্পষ্টতা দূর করতে চেষ্টা করতে পারি।

আমি প্রসঙ্গতঃ একটি তথ্য নিজামকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। হায়দরাবাদের সঙ্গে ভারতের যে স্থিতাবস্থা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তার পিছনে মাউণ্ট-ব্যাটেনের বিশেষ চেষ্টার ইতিহাস রয়েছে। এই চুক্তি বিশেষভাবেই মাউণ্টব্যাটেনের চেষ্টার ফল।

প্রত্যুত্তরে নিজাম বললেন—ওসব ব্যাপার তো হ'য়েই গেছে।

আমি বুদ্ধি খাটিয়ে এইবার মাউণ্ট-ব্যাটেনের আর একটি বক্তব্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম—'মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, রাষ্ট্রভুক্ত হওয়া অথবা রাষ্ট্রভুক্তির সমতুল কোন সম্পর্ক স্বীকার ক'রে নেওয়াই নিজামের স্বার্থের দিক দিয়ে সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা।'

আমার কথাগুলিকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না নিজাম। খুব জোরে হাত নেড়ে একটি আপত্তির ভঙ্গী ক'রে রাষ্ট্র-ভুক্তি কথাটাকেই এবং সেই সঙ্গে সমস্ত বিষয়টাকেই একেবারে বাতিল ক'রে দিলেন।

এইবার গায়ে প'ড়ে কথা বললেন লায়েক আলি। তিনি বললেন, রাষ্ট্রভুক্তি সম্বন্ধে তিনি হায়দরাবাদে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করতে রাজী আছেন। কিন্তু শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই যে একটা সমস্যা! শান্তিপূর্ণভাবে গণভোট গ্রহণ যদি সম্ভবপর হতো, তবে তিনি এখুনি গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু শান্তিরক্ষা করা সম্ভবপর হবে না ব'লেই তিনি গণভোট গ্রহণের ইচ্ছা বাতিল ক'রে দিতেই বাধ্য হয়েছেন।

লায়েক আলির কথায় সায় দিয়ে নিজাম বললেন—বহুৎ খুব, একেবারে খাঁটি কথা!

হায়দরাবাদে কম্যুনিষ্টদের উৎপাত সম্পর্কে নিজামের বক্তব্য জানবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু এ প্রসঙ্গের মধ্যে

আসতেই চাইলেন না নিজাম। তিনি বললেন—'এটা একটা মামুলী ব্যাপার মাত্র, এ বিষয়ে আমার প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে আপনি আলোচনা করতে পারেন।'

নিজামের মুখ থেকে এইবার একটি নতুন প্রসঙ্গের আলোচনা শুনলাম। তিনি বললেন, ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজন্য-দের অদৃষ্টে কি হ'লো বা না হ'লো, সে সম্বন্ধে তিনি চিন্তা করতে রাজী নন। অন্যান্য রাজন্যের ভবিষ্যতের প্রশ্নটা তাঁর কাছে একটা প্রশ্নই নয়। অন্যান্য রাজন্য কোন্ নীতি গ্রহণ করেছেন, সেটা ভেবে দেখবার কোন প্রয়োজনও তাঁর নেই। নিজামের মতে, ভারতের অন্যান্য রাজন্যেরা বস্তুতঃ কতগুলি 'রহিস্' (অভিজাত) ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নন, যাঁরা কত-গুলি বিশেষ অনুগ্রহ মাত্র দাবী করতে পারেন।

এর পর নিজাম আমাকে যেসব কথা বললেন, তার বেশির ভাগ হ'লো মোসলেম-জীবনের নীতি ও দর্শনের কথা। এ বিষয়ে খুব জোরাল ভাষায় একটি বক্তৃতা দিলেন নিজাম। নিজাম বললেন, কিস্‌মৎ, কিস্‌মৎই হ'লো একমাত্র সত্য। জীবনে যা হবে, তা পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, কেউ তা খন্ডাতে পারে না। নিজাম বললেন, হায়দরাবাদের প্রাক্তন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট লোথিয়ানের সঙ্গেও তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করে-ছিলেন। লোথিয়ান ছিলেন নাস্তিক। কিন্তু লোথিয়ানের একটি উক্তি আজও স্মরণ ক'রে রেখেছেন নিজাম। নিজাম বললেন—'লোথিয়ান আমাকে এই ধরণের কথা বলেছিলেন যে, রেস-কোর্সের মতই আমাদের জীবনে দৈবের একটা স্থান আছেই আছে।'

নিজামের অভিমত হ'লো, অদৃষ্টের হাত থেকে কারও ছাড়া নেই। হয় ভাল অদৃষ্ট, নয় খারাপ অদৃষ্ট, এই দু'য়ের মধ্যে একটা হবেই হবে।

বর্তমান অবস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও অভিমত প্রকাশ করলেন নিজাম। আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে অবস্থা ভালর দিকে যেতে পারে। কিম্বা, আরও কয়েকদিন পর থেকে ভাল হতে আরম্ভ করবে। এ বিষয়ে সুনিশ্চিতভাবে তিনি কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু যাই হোক না কেন নসীবে যা আছে, তার জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবেই তৈরী হ'য়ে আছেন।

"মহরমের নাম কখনো শুনেছেন?"—হঠাৎ প্রশ্ন করলেন নিজাম।

আমি সবিনয়ে নিবেদন করলাম—হ্যাঁ শুনেছি।

নিজাম উত্তর দিলেন—"শুনেছেন তো, কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয়ই কিছু জানেন না। মহরম হ'লো পয়গম্বরের পৌত্রের মৃত্যুদিবসের স্মরণ অনুষ্ঠান। মৃত্যু এবং ক্ষতিকে সহজভাবে স্বীকার ক'রে নেওয়াই আমাদের ধর্মবিশ্বাসের একটি অঙ্গ।" (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নিজাম প্রত্যহ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় তাঁর মাতার সমাধি পরিদর্শনে যেয়ে থাকেন এবং সেখানে উপাসনা ক'রে ফিরে আসেন।)

নিজামের গদির অধিকার বংশানু-ক্রমিকভাবে অক্ষুন্ন রাখার বিষয়ে মাউন্ট-ব্যাটেন কতখানি আগ্রহ পোষণ করেন, সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হ'তেই আমি বললাম যে, মাউন্টব্যাটেন নিজে নিয়মতান্ত্রিক রাজাধিকারবাদে বিশ্বাসী। এই কথা শোনা মাত্র নিজাম প্রতিবাদ জানাবার জন্য আমার দিকে তাকিয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন—'ঠিক এইখানেই মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আমার মতভেদ। নিয়মতান্ত্রিক রাজাধিকারবাদ পাশ্চাত্যে এবং য়ুরোপে চলতে পারে এবং সেসব দেশের পক্ষে ভালও হতে পারে, কিন্তু প্রাচ্যে ও জিনিষের কোনই প্রয়োজন নেই। ঐ কথাটাই এদেশে সম্পূর্ণ অর্থহীন।'

মীর লায়েক আলি আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে কমনওয়েলথের প্রসঙ্গে এসে পড়লেন। নিজাম প্রশ্ন করলেন, ভারত কমনওয়েলথের মধ্যেই থাকতে রাজী হবে, এরকম কোন সম্ভাবনা আছে কিনা? আমি উত্তর দিলাম, বর্তমানে এই বিষয় নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা ও বিবেচনার ব্যাপার চলছে। ভারতীয় জনমতের ওপর বিশেষ প্রভাব আছে, এইরকম এক মহলের অভিমত হ'লো, ভারতের পক্ষে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে থাকাই উচিত।

কমনওয়েলথের প্রসঙ্গে নানা কথা উঠতেই আমি এমন আর একটি মন্তব্য করলাম যেটা বস্তুতঃ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের স্টাফের কোন ব্যক্তির মন্তব্য নয়। আমি বললাম, ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা এই যে, ভারত কমনওয়েলথের মধ্যে থাকুক্ বা না থাকুক্, তা'তে ভারতের প্রতি ব্রিটিশ মনোভাব ও নীতির কোন পরি-বর্তন হবে না। ভারতীয় উপমহাদেশের এক অংশ যদি কমনওয়েলথের মধ্যে থাকে এবং অপর কোন অংশ যদি না থাকে, তবে দুই অংশেরই প্রতি ব্রিটিশ জনমত এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মনোভাব সমভাবেই সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে। মাত্র কমনওয়েলথের মধ্যে থাকা বা না-থাকার জন্য ভারতীয় উপমহাদেশের অংশগুলির মধ্যে ব্রিটিশের আনুকূল্যে কোন তারতম্য হবে না। আমি স্পষ্ট ক'রেই বললাম, কমনওয়েলথের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে ব্রিটিশের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে সাহায্য বা সমর্থন পাওয়া যাবে, এইরকম যুক্তিতে কোন ধারণা করলেই একটা মিথ্যা কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে মাত্র।

আমার ধারণা, আমার এই মন্তব্যটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি। আমার উক্তির তাৎপর্য বুঝতে পেরেছেন নিজাম।

হায়দরাবাদ, শনিবার, ১৫ই মে, ১৯৪৮ সাল। অতিমান্য নিজামের সঙ্গে আমার আলোচনার পর্ব এখানেই শেষ হলো। আলোচনার উপসংহারে নিজাম বর্তমান বিশ্বের অশান্তিকর অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বললেন, এবং প্যালেস্টাইনের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। সব শেষে মাউন্টব্যাটেনের উদ্দেশে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন।

প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই নিজামের সঙ্গে আমার আলোচনার ব্যাপার মিটে গেল। আলোচনা করতে যদিও খুব বেশি সময় লাগেনি, কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটাও খুব সহজসাধ্য হয়নি। বিশেষ করে, নিজামের অদ্ভুত চেহারা ও হাবভাব আমার আলোচনার উৎসাহ অনেকখানি এলোমেলো ক'রে দিয়েছিল। তবুও, এই এক ঘণ্টার মধ্যে নিজামের ব্যক্তিত্বের স্বরূপ এবং চিন্তার রীতিনীতি বুঝবার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, এবং যেটুকু বুঝেছি সেটাও তথ্য হিসাবে কম মূল্যবান নয়। শরীরটা জীর্ণ-শীর্ণ হ'লেও নিজামের মনটা বেশ পোক্ত। তাঁর মনের ভেতর যে ইচ্ছা রয়েছে, সেই ইচ্ছাকে শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধ'রে রাখবার মত মানসিক বলিষ্ঠতাও তাঁর আছে। এ ব্যাপারে তাঁর মধ্যে দুর্বলতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। নিজামের কাছ থেকে চলে যাবার আগে আমার মনে হলো, এক খামখেয়ালী বৃদ্ধ অধ্যাপক যেন এতক্ষণ ধ'রে আমাকে তাঁর বিশেষ প্রিয় কতগুলি তত্ত্বকথা শোনাচ্ছিলেন। নিজাম যদিও আধুনিক কালের একজন নৃপতি, কিন্তু চিন্তার দিক দিয়ে তিনি নিতান্ত সে-কেলে অনুদার এবং উদ্ধত স্বভাবের মানুষ তবে, যেখানে তাঁর স্বার্থের ব্যাপার রয়েছে ব'লে মনে করেন, সেখান থেকে তাঁকে টলানো দুষ্কর। এক্ষেত্রে তিনি দুর্ধর্ষতার প্রমাণ দিতে সক্ষম। যতক্ষণ তিনি কথা বললেন, ততক্ষণ তাঁর চিন্তায় ও আচরণে একটা প্রবল অদৃষ্টবাদের

প্রমাণ পেলাম। নিজামের এই অদৃষ্টবাদে অবশ্য আত্মসমর্পণের ভাব আদৌ নেই। এটা হলো একরকমের জবরদস্ত অদৃষ্টবাদ।

নিজাম পরের হাতে বন্দীর মত জীবন যাপন করছেন, এমন অবস্থার কোন প্রমাণ পেলাম না। নিজামের ভবনের প্রবেশ পথে এবং পথের দু'পাশে বহুসংখ্যক পুলিশ অবশ্য সব সময় পাহারা দিচ্ছে, কিন্তু এটা নিজামের বন্দিদশার লক্ষণ নয়, এবং অস্বাভাবিক ব্যাপারও নয়! মনে রাখা উচিত যে, মাত্র কয়েক মাস আগে নিজামের প্রাণনাশ করবার একটা চেষ্টা হয়ে গেছে। তা ছাড়া, নিজামের বাসভবন এই কিং-কোঠি লোকচলাচলের সাধারণ সড়ক থেকে বেশি দূরে অবস্থিত নয়। দিল্লীর সাধারণ অট্টালিকাগুলির মতই নিজামের কিং-কোঠি সড়কের কাছাকাছি অবস্থিত। মীর লায়েক আলি নিজামের কাছেই রয়ে গেলেন। আমি একাই প্রস্থান করলাম।

এর পর যখন আবার প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আলির ভবনে উপস্থিত হলাম, তখন মোইন নওয়াজ জঙ্গ আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন।

মোইনের কথাবার্তা ও প্রশ্ন শুনে বুঝলাম যে, তিনি আমার কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চাইছেন। নিজামের সঙ্গে আলোচনা ক'রে আমার মনে কি ধারণা হয়েছে, এই বিষয়। আমি বললাম, নিতান্ত মামুলী কতকগুলি বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, এবং সে আলোচনা থেকে উৎসাহিত হবার মত কোন বস্তু আমি পাইনি।

গত মার্চ মাসে ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার ফল সম্বন্ধে দুই গবর্ণমেণ্টের যুক্ত-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের যে চেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গই উত্থাপন করলেন মোইন। সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগের সুরে বললেন, ভারতের এই ধরণের মনোভাব লক্ষ্য ক'রে হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্ট বিস্মিত হয়েছেন এবং বুঝে উঠতেও পারছেন না যে, হায়দরাবাদ সম্পর্কে ভারতের মনের আসল ইচ্ছাটা কি?

রাষ্ট্রভুক্তি, না সন্ধি? মোইনের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা হলো। মোইন বললেন যে, রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাবে সম্মত হতে একটা বাধা আছে। তিনি আশঙ্কা করছেন যে, রাষ্ট্রভুক্তিতে সম্মত হলে ভারত গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদের ওপর মাত্র তিনটি অধিকার পেয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন বলে মনে হয় না। রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিপত্রে অবশ্য তিনটি অধিকার ইউনিয়ন কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেবার কথা উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু কাজের বেলায় ভারত গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদের তেত্রিশটি ক্ষমতার বিষয় অধিকার করে বসলেন। সমগ্র ভারতে যে ধরণের আইন প্রচলিত হয়েছে এবং হবে, হায়দরাবাদেও সেই একই ধরণের আইন প্রচলনের দাবী করবেন ভারত গবর্ণমেণ্ট। ফলে, হায়দরাবাদের অভ্যন্তরীণ অটোনমি বা আত্মকর্তৃত্বের অধিকার বিনষ্ট হবে। কিন্তু এ অধিকার ছেড়ে দিতে কখনই রাজী হবেন না নিজাম। মোইন আর একটি বিষয়েও আমাকে তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে দিলেন। হায়দরাবাদের ভেতর দিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে অবাধে যাতায়াত করবার অধিকার দিতে পারেন না হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্ট। এ প্রস্তাব তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য।

লায়েক আলির ভবন থেকে এইবার মুন্সীর ভবনে উপস্থিত হলাম। এখানেই আমার আহারের ব্যবস্থা হয়েছে।

শাহ-মঞ্জিল থেকে মোটরকারে অতি দ্রুতগতিতে চলেও মুন্সীর বাসভবনে পৌঁছিতে চল্লিশ মিনিট সময় লাগলো। সেকেন্দ্রাবাদের দূরপ্রান্তে বিমান-ময়দানের কাছে মুন্সীর বাসভবন অবস্থিত। সহরের জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মুন্সী বস্তুতঃ একাকী একটা নির্জন স্থানে রয়েছেন। একমাত্র যাঁদের প্রচুর সময় আছে, পেট্রল আছে এবং রাজনৈতিক আগ্রহ আছে, তাঁরা ছাড়া আর কেউ মুন্সীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এখানে আসেন না।

দেখলাম, মুন্সী যেন মনমরা হয়ে রয়েছেন, যেন সফলতার কোন আশা তিনি আর দেখতে পাচ্ছেন না। মুন্সী বললেন যে, লায়েক আলিকে তিনি আর বিশ্বাস করতে পারছেন না, কারণ তাঁর বিশ্বাস সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে দেবার মত একটা কাজ লায়েক আলি করেছেন। মুন্সীর সঙ্গে লায়েক আলির সাক্ষাৎ ও আলোচনার একটা সম্পূর্ণ ভুয়া বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছেন লায়েক আলি। মুন্সী আরও একটি তথ্য জানিয়ে দিলেন, তিনি বললেন, মোইন ও লায়েক আলির মধ্যে বনিবনা হচ্ছে না, যদিও ঠিক কি ব্যাপার নিয়ে এই বিরোধ ঘটেছে তা বুঝা যাচ্ছে না। দু'জনের মধ্যে অবশ্য আত্মীয়তার সম্পর্ক (শ্যালক-ভগ্নীপতি) রয়েছে, কিন্তু আজকাল দু'জনে কেউ কাউকে দেখতে পারেন না। তবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, লায়েক আলিই এখন নিজামের প্রিয়পাত্র। মোইনের তুলনায় লায়েক আলিরই বেশি প্রভাব আছে নিজামের ওপর।

মুন্সীর ধারণা, হায়দরাবাদের কর্তৃপক্ষের মধ্যে কেউই সত্যি সত্যি দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার অথবা রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আগ্রহের ধার ধারেন না। একটি বিষয়ে মুন্সী আমার সঙ্গে একমত হলেন। নিজামই যে এখনো হায়দরাবাদের সকল রাজনৈতিক ব্যাপারের প্রধান নিয়ন্তা ও প্রভু, সে সম্বন্ধে মুন্সীরও কোন সন্দেহ নেই। নিজাম যা ইচ্ছা করেন, তাই হবে এবং হচ্ছেও তাই। এ ব্যাপারে নিজাম এখনো পরাধীন হয়ে পড়েননি।

মুন্সীর মনের একটা সন্দেহ দূর ক'রে দিলাম। আমি বললাম যে, আমি এখানে মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে 'ব্যক্তিগতভাবে ঘরোয়া আলোচনা'র জন্য এসেছি এবং আসবার আগে নেহরু ও ভি পি মেননকে জানিয়ে তাঁদের সম্মতিও নিয়েছি।

শুনে খুশি হলেন মুন্সী। তিনি বললেন, আগামীকাল সকালেই তিনি বাঙ্গালোর রওনা হয়ে যাবেন। মুন্সীর স্ত্রী এ জায়গায় থাকতে মোটেই পছন্দ করেন না। মুন্সী বললেন, হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এমনি ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠেছে যে, হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগই এখন আর নেই।

হায়দরাবাদ, রবিবার, ১৬ই মে, ১৯৪৮ সাল। আজ সারা দিনটাই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। অনবরত লোক এসেছে, সবারই সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে এবং সবারই কথা শুনতেও হয়েছে। লায়েক আলিকে বললাম যে, আমি কাশিম রেজভির সঙ্গে একবার ঘরোয়াভাবে আলোচনা করতে চাই, যদি এই আলোচনার সংবাদটা অবশ্য গোপন রাখা সম্ভবপর হয়। আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং খুশি হলেন লায়েক আলি। তিনি বললেন, তাঁরও বিশেষ ইচ্ছা এই যে, রেজভির সঙ্গে আমি একবার দেখা করি। লায়েক আলি জানালেন, আজই সকালে রেজভির এখানে আসবার কথা আছে। লায়েক আলি আজ সফরে বের হবেন, তার আগেই রেজভি তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য আসবেন। 'সুতরাং আপনি এখানেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন'—লায়েক আলির উপদেশ অনুসারে আমিও বসে রইলাম।

রেজভি এলেন। রেজভির সঙ্গে কয়েক মিনিট সাধারণ দু'চারটা কথাবার্তা

ব'লে লায়েক আলি চলে গেলেন। আমার কাছে শুধু রইলেন রেজভি।

আমিই প্রথমে কথা বললাম। প্রসঙ্গের আরম্ভেই বললাম, ঘটনার গতি যেদিকে চলেছে তাতে বিষণ্ণ না হয়ে আমি পারছি না, আমি হতাশ হয়ে পড়ছি।

রেজভি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'আমি একটুও হতাশ হচ্ছি না, এবং কোন পরোয়াও করি না।'

রেজভি বললেন যে, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা। তাঁর একমাত্র আনুগত্য হলো মুসলিম সমাজের প্রতি, অন্য কারও প্রতি নয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কম্যুনিষ্ট দল রাজাকরদের সঙ্গে একযোগে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে চাইছে, এই সংবাদের মূলে কোন সত্যতা আছে কি না?

রেজভি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বললেন—আপনি রাজাকরদের কথা বলছেন, তার মানে আমার কথা বলছেন। তাহ'লে শুনে রাখুন যে, এখানে মুসলমানদের এখন এমন অবস্থায় পড়তে হয়েছে যে, তারা নিজের থেকেই অতি দ্রুত কম্যুনিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি 'তাদের' সাবধান ক'রে দিয়েছি যে, পরিণামে এই রকমেরই ব্যাপার হবে। (এখানে 'তাদের' অর্থে কা'দের কথা রেজভি বলছেন, সেটা স্পষ্ট করে বুঝা গেল না)।

এর পর রেজভি স্পষ্ট ক'রেই বললেন যে, কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে তিনি রাজী আছেন এবং এই দিক দিয়ে একটা প্রাথমিক চেষ্টা ও ব্যবস্থা তিনি এরই মধ্যে ক'রে ফেলেছেন।

রেজভির এই অভিমত একেবারে নিঃসংশয়ে আরও ভাল ক'রে শুনে নেবার জন্য আমি একটা প্রশ্ন করলাম। আমি বললাম—'কম্যুনিষ্টরা অবশ্যই নিজামের বিরোধী, কারণ তারা বলেছে যে, নিজামকে তারা কোন 'প্রশ্রয়'ই দেবে না। এই অবস্থায় কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে আপনাকে নিশ্চয়ই কিছুটা অসুবিধায় পড়তে হবে।'

রেজভি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ভাবলেন। তারপরেই বললেন, 'হ্যাঁ অসুবিধা কিছু কিছু আছে বটে'।

আমি আবার এই প্রসঙ্গই উত্থাপন করলাম। এইবার রেজভি একেবারে মন খুলে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট ক'রেই বলে দিলেন—'হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্টের কথাই বলুন বা নিজামের কথাই বলুন, এঁদের স্বার্থ বা প্রতিষ্ঠা আমার কাছে তেমন কোন গুরুত্বের ব্যাপারই নয়, মুসলিমের স্বার্থ এবং প্রতিষ্ঠার তুলনায়। আমার কাছে আগে মুসলিমের স্বার্থ, তারপর আর কিছু। ধ্বংস হতে মুসলমানদের রক্ষা করার কাজে যদি আমি কম্যুনিষ্টদের একমাত্র সহযোগী হিসাবে পাই, তবে তাদের সহযোগিতা নিতে আমি কোন দ্বিধাই করবো না।'

রেজভি আবেগের সঙ্গে বললেন—'ভারত যদি হায়দরাবাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা না করেন এবং আমাদের ইচ্ছামত কাজ করবার জন্য দু' বছরেরও সুযোগ পাই, তবে আমি জোর ক'রে বলতে পারি যে, এমন জিনিষ আমি তৈরী করবো যা দেখে ভারতের হিংসে হবে।'

আমি প্রশ্ন করলাম—'ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে এখনই যদি একটা রাজনৈতিক মীমাংসা ভালভাবে না হয়ে যায়, তবে দু' বছর পরেও যে বর্তমানের মতই একটা সংকট আবার দেখা দেবে না, একথা কি আপনি বলতে পারেন?'

রেজভি বললেন—হ্যাঁ সংকট দেখা দিতে পারতো, যদি আমার আর একটা অনুমান ভুল হ'তো।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি আপনার অনুমান?

রেজভি বললেন—'ভারত রাষ্ট্রই থাকবে না। এ ভারত দু' বছরের বেশি টিকে থাকতে পারে না, সুতরাং দু' বছর পরে কোন সংকটের প্রশ্নও ওঠে না।'

(ক্রমশঃ)

স্বপ্ন, স্মৃতি, রাত্রি

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

নিরালা রাত, ক্লান্ত চোখ, নাম-না-জানা নেয়ে
শান্তস্রোত হৃদয়-হ্রদে সুরের তরী বায়,
আলতো পায়ে কল্পনার-ই আকাশ-আল বেয়ে
ঘুমের রাণী স্বপ্ন বোনে আঁখির আঙিনায়।

রুপোলি কত রেশমি কথা মনের কানে কানে
উজাড় করে ঢেলে সে যায় গানের তানে তানে
আবেশ-মাখা বিভোল আঁখি তাহার পানে চেয়ে
কোন অতলে রূপমহলে হারিয়ে গেল, আহা!

ঘুমের হিম পাতায় ঘাসে। রাতের মিঠে মাঠে
বিদিশা-নিশা নিদালী মায়া-মুগ্ধ মন হাঁটে।
মহাকবির স্বপ্নঘেরা কল্পলোকে গিয়ে
আমার মন মালবিকার মেখলা-মায়া নিয়ে
শেষের সাথে অশেষ সুরে গেয়ে যে চলে গান
শিপ্রা-রেবা-বেত্রবতীর মধুর কলতান
শুনছি যেন প্রাণের মাঝে; তাদের ঘাটে ঘাটে
বুনছে মম একলা মন স্বপ্নজাল, আহা!

এ রাত যেন বড়ই মিঠে। হাজার তারা হাসে
ফুলের মতো নরম-নীল নভের শাড়ি 'পরে।
সুদূরে নভো-সীমন্তকে চাঁদের সোনা ঝরে,
শিরীষ-শীষে শিউলি ফুলে দূর্বো ঘাসে ঘাসে
খেয়ালী মন আলতো করে রাখল যার নাম
তাহারি তরে আজকে রাতে কবিতা লিখিলাম।

প্রেম

শ্রীদেবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেম সম্বন্ধে কিছু বলতে যাবার মত বিপজ্জনক কাজ বোধহয় খুব কমই আছে। 'ভগবান আছেন কিনা', এই প্রশ্নের মত 'প্রেম' এই শব্দটিও বহু তীক্ষ্ণ বাণবিদ্ধ এবং সংখ্যাতীত বিরুদ্ধ প্রশ্নের দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত। একথা বললে বোধহয় খুব অত্যুক্তি করা হয় না যে, পৃথিবীতে যত লোকসংখ্যা প্রেম সম্বন্ধে প্রায় ততগুলো মত প্রচলিত আছে। আমরা সাধারণ যারা, তারা প্রেমকে চিরদিন একটা আটপৌরে মধুময় বৃত্তি বলে জেনে এসেছি; কিন্তু মানুষের জ্ঞান আহরণের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিরুদ্ধ জ্ঞানের ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের মাঝে জেগেছে সন্দেহ আর অবিশ্বাস। সূক্ষ্ম বিচারের যূপকাষ্ঠে ফেলে একদল বিজ্ঞানভিক্ষু প্রেমকে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে এক লোকোত্তর জগতে নিয়ে গেছেন, আর একদিকে জড়বাদী আর একদল জ্ঞানলিপ্সু প্রেমকে নামিয়ে এনেছেন নিতান্ত সাধারণ এক প্রতিফলিত স্নায়বিক ক্রিয়ায়। এমন কি এঁরা প্রেম শব্দটিকে পর্যন্ত অবৈজ্ঞানিক ভাববিলাসিতা বলে বিদ্রূপ করেছেন কাজেই অন্ধ অহমিকায় এদের যে কোনও একটিকে দিয়ে প্রেমকে সার্থক প্রতিষ্ঠা করা চলে না -

"—পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে—"

কবির এই জিজ্ঞাসায় আমরা জেনেছি এর ব্যাপকতা, এর সর্বজনীনতা। অণু থেকে জীবজগৎ ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্ব যাতে ডুবে আছে তাকে ঠিক কোন নিয়মে বাঁধা যাবে, অথবা আদৌ বাঁধা যাবে কিনা কে করবে এই সীমা নির্দেশ। সুতরাং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপলব্ধি দিয়ে প্রচলিত মতবাদের মূল্য যাচাই করা ছাড়া 'নান্য পন্থা'।

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে প্রেমের স্বরূপ কি? এ সম্বন্ধে যেখানে যত কিছু বলা হয়েছে সেগুলোকে নিংড়ে যদি সারটুকু সংগ্রহ করা যায়, তাহলে বলা যায় যে, ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহৎ তাই থেকে মহত্তর আত্মবিস্তারের মধ্য দিয়ে যে আত্মোপলব্ধি তার নামই প্রেম। অনেকে বলেন, প্রেম একটা মানবীয় অনুভূতি, কিন্তু আমার মনে হয় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয় ইত্যাদির মত এ একটা সহজাত বৃত্তি যার মধ্যে অনুভূতি একটা ভগ্নাংশ বিশেষ—কারণ অনুভূতিগুলো বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা আপেক্ষিক—আর সহজাত বৃত্তিগুলো জীবনধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর। মনোবিজ্ঞানীরা এই সহজাত বৃত্তি ও তৎসাপেক্ষ প্রবৃত্তিগুলোকে মোটামুটি চোদ্দটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—

সহজাত প্রবৃত্তি	হৃদয়াবেগ
পলায়ন বৃত্তি (আত্মরক্ষা, বিপদজ্ঞাপক)	ভয় (আতঙ্ক, ত্রাস, স্বতঃকম্প, আকস্মিক ভীতি)
যোদ্ধৃবৃত্তি (আক্রমণাত্মক, বিবাদপ্রিয়তা)	ক্রোধ (রাগ উন্মত্ততা, বিরক্তি, ক্রূরতা, অপ্রীতিকর অবস্থা)
প্রতিনিবৃত্তি (বিতৃষ্ণা, বিরাগ)	ঘৃণা (বিবমিষা)
স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা (আত্মসমর্থন)	আত্মাভিমান (আত্মম্ভরিতা, দাম্ভিকতা, অসূয়া, ঈর্ষা, স্বেচ্ছাচারিতা, দ্বেষ)
খাদ্যানুসন্ধান — দলবদ্ধ (আক্রমণাত্মক)	নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ববোধ
খাদ্যানুসন্ধান — গোষ্ঠিবদ্ধ (আত্মরক্ষার্থক)	শিকারী মনোভাব, সঙ্গহীনতা)
অর্জনবৃত্তি (মজুতকরণ)	অধিকারবোধ, কর্তৃত্ববোধ
নিষ্ঠুবৃত্তি	জিঘাংসা, হিংসা, নিষ্ঠুরতা
গঠনমূলক	উর্বরতা, লাভপ্রবৃত্তি, উৎপাদন প্রচেষ্টা, উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যাবসায়
আশ্রয় (নিরাপত্তা, অনুনয়, প্রার্থনা)	অসহায় (নিরুপায়, হতাশা)
মিলন (যৌনপ্রবৃত্তি, সৃষ্টিপ্রবৃত্তি)	কাম (আসঙ্গলিপ্সা, প্রবল কামনা, কামুকতা, লালসা, যৌনতা)
পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব (রক্ষণমূলক)	স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা, ভালবাসা, করুণা, অনুকম্পা
বশ্যতা (আনুগত্য)	বিনয়, সৌজন্য, শ্রদ্ধা, প্রীতি, মৈত্রী, ভক্তি, আপেক্ষিক মূল্যহীনতা, অকিঞ্চিৎকরতা
(কৌতূহল) জিজ্ঞাসা, আবিষ্কার, অনুসন্ধিৎসু	ঔৎসুক্য—দুর্জ্ঞেয়তা, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা, রহস্য, আশ্চর্যভাব, অজ্ঞেয়
হাস্য	কৌতুক—পরিহাসপ্রিয়তা, সদানন্দত্ব, আমোদপ্রিয়তা, অনবহিত, চিন্তাশূন্যতা, উদ্বেগহীনতা

এই চোদ্দটা বৃত্তিকে যদি আমরা একটু বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখি তাহলে সহজেই চোখে পড়বে—(১) এদের কয়েকটির সাহায্যে আমরা আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তার করি, (২) কয়েকটির সাহায্যে নতুনকে উপলব্ধি করি ও কৌতূহল চরিতার্থ করি, (৩) এবং কয়েকটি কেবলমাত্র আমাদের আনন্দবর্ধনের সহায়তা করে। উপনিষদের সৎ, চিৎ ও আনন্দের ভাবার্থকে যদি লোকোত্তর জগৎ থেকে লৌকিক জগতে নিয়ে আসি তাহলে এই সবকটি বৃত্তিকে ওদেরই প্রসারিত ভাবাংশ বললে ভুল হবে না। কিন্তু সচ্চিদানন্দময়তা একটা অখণ্ড সত্ত্বা, বৃত্তিগুলো তারই খণ্ডরূপ—কাজেই অংশ কি করে পূর্ণের সমান হয়? একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সৎ, চিৎ ও আনন্দ এ তিনেরই সহজ স্বীকৃতির অবকাশ আছে—তাই যুগে যুগে অমৃতের পুত্রেরা স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে তাঁকে বলেছেন প্রেমময়—কবির আত্মজিজ্ঞাসায় ফুটে উঠেছে।

"হৃদয় কুলায় চায়
পাহাড়ের মত ধ্রুব
চায় মন সীমান্ত নির্ণয়।"

প্রেমই এই সীমান্ত।

সীমার অন্ত দেখার আগে প্রথমেই দেখা যাক প্রেমের শুরু কবে এবং কোথায় এবং কিসের দ্বারাই বা প্রেম অপেক্ষমান—জন্মের প্রথম তিন চার বছর বাদে দেখতে পাই যে, নিতান্ত আত্মরক্ষার আকুতি ছাড়াও শিশুর মধ্যে আসে একটা নবচেতনা। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি একটা অহেতুক মমত্ববোধ। এর পর আসে ভাললাগা, বীরত্ববোধ, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা। এগুলো ছোটবেলাকার ভালবাসার মোটামুটি ইতিহাস। কিন্তু বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের বিচারে এই সময়ে থাকে না তাদের কোনও নির্দিষ্ট যুক্তি। স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ তা তার কাছে তখন অর্থহীন—দিদি শুধু একটু বেশী মোটা বলে সে দাদার চেয়ে দিদিকেই বেশী পছন্দ করতে পারে। মোটামুটিভাবে রক্ষণমূলক বৃত্তি ছাড়া আশ্রয় বৃত্তিও তার মাঝে এই সময় বেশী কাজ করে। শিশুজীবনের এই যে ভালবাসার বৃত্তি মনোবিজ্ঞানীরা এরই নাম দিয়েছেন, Platonic eroticism. কৈশোরের সীমা পর্যন্ত দেহ নিরপেক্ষ এর গতি চলে মানস ক্ষেত্রে—আমাদের প্রেম-জীবনের গোড়াপত্তন হয় এখান থেকেই।

মানুষের জীবনকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়—শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব (পরিণত বয়স) এবং বার্ধক্য। প্রেম হচ্ছে মহৎ থেকে মহত্তর আত্মবিস্তারের মধ্যে আত্মোপলব্ধি—কাজেই সমস্ত জীবন-কালের মধ্যে আমরা নিজেদের অন্তত তিন-বার নতুন করে নতুনতর পরিপ্রেক্ষিতে চিনি। চঞ্চল শৈশব থেকে প্রথমে আমরা ঝঞ্চা-বিক্ষুব্ধ কৈশোরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। এই কৈশরেই আমরা প্রথম আবিষ্কার করি অহংকে এবং তার চারিপাশের পরিবর্তন-শীল জগৎকে। নিজের খুশি দিয়ে গড়া একটা জীবনদর্শন দিয়ে এদুটোকে পরস্পর খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করি। শৈশবে যে জীবন ছিল 'স্থানুরচলোয়ংম', আজ সেখানে আসে গতি, আমরা আবিষ্কার করি ব্যবহারিক সময় ও তার মূল্য। এই মূল্যবিচার থেকে আসে ভবিষ্যতের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এবং তাই দিয়ে বিচার করি অতীতকে। 'সদা সত্য কথা বলিবে', 'সৎ কাজ করিবে', 'বিনয়ী এবং শ্রদ্ধাবানই সুপাত্র'। এই নীতিকথাগুলো তখন আর শুধু পাঠ্যপুস্তকেই থাকে না; তাদের তখন বিচার করি আপেক্ষিক বস্তুজগতের কষ্টিপাথরে এবং যা সেখানে মোটা লাভ ও সুখের সোনার দাগ কাটে না, তাকে মেকি বলে দূরে সরিয়ে দিই। এই থেকে গড়ে ওঠে আমাদের নৈতিক সংস্কার। শৈশবে যে ছিল নিছক কৌতুকময় অর্থহীন পরিবেশ—কৈশোরে সে হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর সত্য এবং বুঝতে পারি, আমরা পরস্পরের পরিপূরক। সেদিনই বুঝতে পারি প্রথমে যে 'আমি' এ কথাটার অস্তিত্ব তখনই সম্ভব, যখনই অনুভব করি 'তুমি' আছ। শৈশবে এই তুমির স্থান যে কেউ পূরণ করতে পারতো; কিন্তু কৈশোরের তুমি স্বতন্ত্র, যাকে আমি চাই—যে আমাকে চায়—এই তুমির অনুসন্ধান থেকেই জেগে ওঠে আমাদের আত্মোপলব্ধির প্রথম ধাপ। কারণ এই তুমিই আমাদের একাকীত্বের নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্ত করে সংসার থেকে সমাজ, তারও পরে মানবগোষ্ঠীর সীমানা ছাড়িয়ে কালের গতিপথে অসীমতার নিয়ে যেতে পারে, এমন এক জগতে—কাল যেখানে স্তব্ধ, যেখানে প্রশ্নের মাঝে নেই শব্দের কাঠিন্য।

শৈশবের Platonic eroticism-এর সঙ্গে কৈশোরের উপলব্ধ দৈহিক যৌনতার আভাস এবং সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক বস্তুময় জগতের সঙ্গে অহংজ্ঞানের ঘাত-প্রতিঘাতে গড়ে ওঠা সময় আর তার মূল্যজ্ঞান, এই থেকে সূচিত হয় ঐহিক ও পারলৌকিক প্রেমের গোড়া পত্তন। যার চরিতার্থতা অপেক্ষা করে থাকে যৌবনের সার্থক সফলতায়। বাস্তবিকই প্রেম চরিতার্থ হয় পরিণত বয়সে। অপরিণত বয়সের প্রেমে থাকে যে উদ্দামতা, অনুভূতির গভীরতার অভাবে যে উচ্ছৃংখলতা, বয়সের আধিক্য তাকে দেয় পরিণত জ্ঞানের পূর্ণতা। কারণ অহংএর অবলুপ্তির দ্বারা আত্মনিবেদনের যে আকুতি তার গভীরতা দিয়েই বিচার করা হয় প্রেমের গভীরতা। কিন্তু কৈশোর এমনকি প্রথম যৌবনেও এই অহং-এর ভাব থাকে এত প্রবল যে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ অসম্ভব। অতএব সে প্রেমও অসম্পূর্ণ—তাই কবিরা বলে গেছেন যে, কৈশোরের প্রেমে আছে অভিশাপ।

বিংশ শতাব্দীর বিচারে প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক যুগে প্রেম সম্বন্ধে কিছু বলতে যাবার আরও একটা বিপদ আছে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম দিনের বিবর্তন থেকে আজ পর্যন্ত প্রেম সম্বন্ধে যাকিছু অবদানে ছিল দর্শনের একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু তাঁরা একে টেনে তুলেছেন পার্থিব সব কিছুর বাইরে অমূর্ত এক লোকোত্তর জগতে—এর পর এল কাব্য, প্রেম এসে পড়লো অনেকখানি ধরা-ছোঁওয়ার আওতার মধ্যে—আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বহু অবদান থাকলেও প্রেমের ব্যাপারে তারা আজও নীরবই বলা চলে। কাজেই দর্শন, কাব্য ও আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে ছাড়া এর বিচারের কোনো আর কিছু দিয়ে সাজানো চলে না। প্রথমেই দেখা যাক দর্শন কি বলেছে।

ধর্মকেও মানুষ আজ অনুভূতির একটা বিশেষ স্তরের ছাপ দিয়ে চালাতে চাইছে যেমন চেয়েছে প্রেমকে। আগেই বলেছি, প্রেমও একটা বৃত্তি—তেমনি ধর্মও একটা নিছক মানবীয় অনুভূতি নয়, ব্রহ্মোপলব্ধির যে আনন্দ, সেটা মিলনের আনন্দ এবং ধর্মাচরণের মধ্যে যে সুখানুভূতি, তাই দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম 'সৎ'-এর সঙ্গে আমাদের মিলনের সম্পূরক—এদিক দিয়ে দেখলে ঐহিক প্রেম আর ভগবৎ প্রেমের সঙ্গে একটা সৌসাদৃশ্য চোখে পড়ে। যদিও ভগবৎ প্রেম ও লৌকিক প্রেমের বহিঃপ্রকাশ এক নয়, তবু এদের মধ্যে যে অনুভূতির একত্ব, সেটা অনস্বীকার্য।

সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনায় আনন্দের জয়গানে বেদের যে অংশ ব্রহ্মোপলব্ধির পথনির্দেশক, সেই বেদান্তকে আশ্রয় করে বহু মতবাদ গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রেমের সেই ব্যাখ্যা-বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও আচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ-রূপে সাধারণ মানবীয় অনুভূতির বাইরে। কাজেই পরবর্তী যুগে সাধারণ মানুষের উপযোগী করে মহর্ষিদের রচনা করতে হয়েছিল পুরানাদি, সমাজদর্শন এবং প্রচলন করতে হয়েছিল প্রতীক উপাসনার। তাই থেকে ক্রমে এলো মূর্তি পূজা। যদিও প্রেম কোনও নির্দিষ্ট সীমার দ্বারা আবদ্ধ নয়, কারণ এটা কোনও অবস্থা নয় —বরং প্রেমের মধ্যে থাকে চিরন্তন প্রশ্ন, অশেষ সন্দেহক্ষত আশঙ্কার অবকাশ, তবু মূর্তি পূজার মধ্য দিয়ে প্রেমাস্পদকে এত কাছে পেয়ে আমরা মুখর হয়ে উঠলেম। অমূর্ত বেদনার সংবেদন আমাদের মধ্যে উঠলো মূর্ত হয়ে, আমরা স্তব রচনা করে

প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে জানতে চাইলেম, সেই বেদনার স্বীকৃতি। সৎএর সঙ্গে একীভূত হওয়ার মধ্যে ছিল যে আনন্দ, এখন সেটা ভক্তের মধ্য দিয়ে তার নিবেদন ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তার স্বীকৃতিতে উঠলো একান্ত মানবীয় হয়ে—প্রেমাস্পদকে সাজিয়ে, আরতি করে, স্পর্শ করে, প্রেম নিবেদনের মধ্য দিয়ে আমরা সার্থক হয়ে উঠলেম। এইখানেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হলো ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠ দুই মতবাদের। শিব, শক্তি এবং কৃষ্ণ-রাধিকা—তাঁরা শিব ও কৃষ্ণকে চৈতন্য, আত্মা বা পুরুষ এবং শক্তি ও রাধিকাকে জড়, অনাত্মা ও প্রকৃতি এই আখ্যা দিলেন। কিন্তু এর অন্তরালে লুকোনো ছিল যে বিপুল সরসতার চাবিকাঠি, পরবর্তী যুগে তাই থেকে তৈরি হলো সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যের অভ্রংলিহ চূড়া, যদিও তখনকার সমাজ-ব্যবস্থানুসারে তাঁরা আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

লোকোত্তর প্রেম ও লৌকিক প্রেম—এই দুয়ের ভারতীয় সমাবেশন হোল হর-গৌরী রূপে। এখানে পাই আমরা এক আত্মভোলা দম্পতি। পরস্পরের অমূল্যতা সম্বন্ধে যারা নিঃসন্দিগ্ধ, কারণ ঘটনা ও বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে ভাল ও মন্দের সূক্ষ্ম বিচার করে এই মূল্য যাচাই করতে হয়নি। প্রেম তাঁদের দিয়েছে এই অন্তর্দৃষ্টি—দিয়েছে সম্পূর্ণতা। দুই চোখে পরস্পর চেয়ে আছেন আত্মোপলব্ধির ঔজ্জ্বল্যে, তৃতীয় নয়নে ঝরে পড়ছে আত্মবিস্মৃত সৃষ্টির ওপর অকৃপণ আশীর্বাদ। এ যেন বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈত বাদ—যেন প্রবৃত্তি-মার্গে প্রেমের সাধনার ইঙ্গিত। এর পরেই আসে কৃষ্ণ-রাধিকার লীলাবাদ। আত্ম-বিস্তারের স্থূল চংক্রমণ শেষ হয়েছে। এক থেকে সৃষ্টি হয়েছে বহু। এবার বহুর বহুত্ব ঘুচে গিয়ে এসেছে একীভবনের আনন্দ। শ্রীরাধিকার উক্তি থেকেই আমরা জানতে পাই যে, তিনি এমন এক অবস্থায় এসে পেঁাছলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহও তাঁদের মিলনের পথে বাধার প্রাচীর তুলে দাঁড়ালো। নিজেকে কৃষ্ণ কল্পনা করে শ্রীমতী তার সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়ে অনুভব করলেন যে, নিজের নারীদেহের সৌষ্ঠবে তিনি নিজেই প্রলুব্ধ হচ্ছেন। প্রেমাস্পদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গিয়ে আত্মোপলব্ধিই হলো প্রেম ও সত্য-সাধনার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ও চরম পথ। এ হলো অদ্বৈতবাদের সোহং। ভারতীয় দর্শনের এই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের রূপ।

ভারতে 'মনু ও বাৎস্যায়ন' বোধ হয় প্রেমের একটা বৈজ্ঞানিক-লৌকিক রূপ দেবার প্রথম চেষ্টা করেন। ভগবৎ প্রেম উপলব্ধ হয় মনে এবং মন দিয়েই তাকে জানতে হয়, কিন্তু লৌকিক প্রেমের সার্থকতায় যে তা ইহজীবনেই মূর্ত হয়ে উঠতে পারে, একথার তাঁরাই বোধ হয় প্রথম একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। বাইবেলে যীশুর উক্তিতে আমরা দেখি, সেই সর্বজ্ঞ, যে সকলকে প্রেম করে'। আমাদের অহং জ্ঞানকে প্রেমের আগুনে পুড়িয়ে আমরা নিজেদের সংস্কারমুক্ত করে অন্য ব্যক্তি-সত্তার সঙ্গে একত্বের স্বীকৃতিতে শঙ্কিত হই না। আমাদের জড় দেহের প্রতি চৈতন্যময় সত্তার এ-এক বিরাট আশীর্বাদ। তাই দেহজ তৃষ্ণা ও দেহাতীত উপলব্ধি এই দুইয়ের সামঞ্জস্যের নাম প্রেম। পূর্ণতার কামনায় এ যেন এক বিরাট বন্যা, অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে হৃদয় তাপে যা উদ্বেল হয়ে উঠে ফেটে পড়তে চায়, দেহের কানায় কানায়। এ যেন এক ক্রিয়মান অনুভূতি, যা শুধু 'সম্মুখে চলিতে চালাতে জানে'। এ যেন আগুনের তাপ লেগে মোমের মত গলে একাকার হয়ে যাওয়া। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেই দেখতে পাই, বিচার-তর্কের দ্বারা যেখানে আমরা স্পর্শও করতে পারি না, শুধু হৃদয়াবেগে তাকে আমরা গলিয়ে ফেলতে পারি। মনীষীরাও একথারই সত্যতা প্রমাণিত করে গেছেন তাঁদের বাণীতে। নীৎসে বলেছেন—'শুধু কেবল-মাত্র ভালবেসেই একজন আর একজনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে।' হেগেল বলেছেন—'একমাত্র প্রেমই দিতে পারে গভীর অন্তর্দৃষ্টি'। প্লেটো বলেছেন—'প্রেম অনুভূতিও নয় বা কামনাও নয়, এ হচ্ছে এক শুদ্ধ সক্রিয় সত্তা, যার দ্বারা আমরা অপর কারুর সূক্ষ্মতম অব্যক্ত অনুরণনকে উপলব্ধি করি।' উপনিষদে অমৃতের পুত্রদের 'আত্মানং বিদ্ধি'র যে উপদেশ, সে এই প্রেমেরই পথে।

আগেই বলেছি উপনিষদের পরের যুগে পুরান, বৈষ্ণব সাহিত্য, কাব্য ও নাট্যকলার মধ্য দিয়ে ভগবৎ প্রেমকে অশরীরী লোকোত্তর জগৎ থেকে আমাদের মানবীয় অনুভূতির স্তরে এনে সর্বসাধারণের বোধগম্য করার জন্য দেহধর্মের আকৃতি নিয়ে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কারণ তাঁরা বুঝে-ছিলেন যে, ধর্ম ও লৌকিক জগতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যগতভাবে প্রেমের যে রূপেই থাক, ব্যক্তি হিসাবে অনুভূতির ক্ষেত্রে এরা সমগোত্রীয়—কাজেই ধর্মের সম্বন্ধে প্রেমের যে নিয়ম প্রচলিত, অন্য সব ক্ষেত্রেও তা একইভাবে প্রযোজ্য।

ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাবার মূলে আছে 'বিশ্বাস', সে ভগবানই হোক বা একজন মরদেহীই হোক। যা কিছুকেই সব থেকে সহজে, সবচেয়ে নিশ্চয় করে জানার মূলে এর চেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা আর কিছু নেই। অনেকে বলেন, বিচার-মূলক জ্ঞানই অভ্রান্ত পথ। তাঁরা আরও বলেন, বিচার এবং বিশ্বাস মানসিক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী। কিন্তু বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে, বিচারে যেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পরে, বিশ্বাসের জোরে বহু বৈজ্ঞানিক বহু আগেই তার প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন। বিচার বিশ্বাসকে দৃঢ়ই করে, যদি-না তাতে একদেশদর্শিতার গোঁড়ামি থাকে। নিউম্যান এক জায়গায় বলেছেন, 'হাজার বাধানিষেধ আমাকে টলাতে পারে না, যতক্ষণ আমি সুস্পষ্ট দেখছি'। প্রেমের ক্ষেত্রে বিশ্বাসই দেয় এই অন্তর্দৃষ্টি। বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের জীবনস্মৃতি থেকে দেখা যায় যে, তাঁরা যেন তাঁদের অনুসন্ধানের বস্তুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেলেন। এই যে তন্ময়তা, এটাই সত্যিকারের প্রেমের পূর্বাবস্থা। এই অবস্থার পরই লোকে প্রেমে পড়ে।

প্রেম অন্ধ এই বলে এর ওপর একটা সামাজিক অপবাদ চাপানো হয়েছে। নজীর-স্বরূপ বহু সংসার ভেঙে যাবার খবর তাঁরা জাহির করবেন, কিন্তু এই অন্ধত্বই প্রেমের সত্যাসত্যের কষ্টিপাথর। প্রেমিকের জগতে প্রেমের পাত্র ছাড়া আর সবই অর্থহীন। সে বলবে—

"—তুমি মোরে করেছ সম্রাট
তুমি মোরে পরায়েছ গৌরব মুকুট—"

কিন্তু সে এমনি এক সাম্রাজ্যের সম্রাট যেখানকার বাজারে বেচাকেনার ক্ষেত্রে

অন্য সাম্রাজ্যের মন্ত্র অচল। অনেকে বলেন, অন্য জগতের ওপর এই যে মূল্যহীনতার দৃষ্টিভঙ্গী, এই যে ঔদাসীনতা, এটা স্বার্থান্ধতারই নামান্তর। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, এ সত্যি নয়—বরং অন্য জগতের ওপর অহেতুক মূল্য স্থাপনের অপপ্রচেষ্টা না করার জন্যই প্রেম টিঁকতে পারে। কারণ প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সমপর্যায়ভুক্ত অন্য একজনের সঙ্গে দোষগুণের তুলনামূলক বিচার করে প্রেম করে না। সে কৃতজ্ঞ শুধু এইটুকুতেই—

"—তুমি যে তুমিই ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন—"

এর চেয়ে বেশি বিচার করার ক্ষমতা তার থাকে না সে ভাবে—

"—দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা
আর পাবো কোথা?"

সত্যি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, প্রেম অন্ধতায় যতটুকু অযৌক্তিক, ততটুকুই সত্যি এবং একনিষ্ঠ।

আগেই বলেছি প্রেম দেয় গভীর অন্তর্দৃষ্টি, যা দিয়ে আমরা সীমার মাঝে দেখি অসীমকে, অসুন্দরের মাঝে সুন্দরকে। প্রেমিক আর প্রেমাস্পদকে নানা আভরণে সাজায়, তাতেও যখন আশা মেটে না, তখন সাজায় গানে, কবিতায়। ভাবের উচ্ছ্বাসে ভাষাও যখন মূক হয়ে আসে, তখন সে নিজ দেহ দিয়ে তার আরতি করে। যারা কোনওদিন প্রেমে পড়েন নি, তাঁরা এসব কিছুকে ন্যাকামি বা ভাবালু কাব্যিক উচ্ছ্বাস বলে চিরকালই নাক সিঁটকেছেন। কিন্তু প্রেমিকের চোখে, সমস্ত দৈন্য সবকিছু গ্লানির মালিন্যের ওপরেও প্রেমের পাত্রের সত্য, শিব আর সুন্দরের রূপটাই ওঠে জেগে। তাই উপনিষদের যুগে এক প্রেমিকশ্রেষ্ঠ আমাদের উদ্দেশ্যে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—'হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শোন—', তিনি বলেন নি তো 'হে দুঃখপীড়িত অজ্ঞ অবোধেরা'। প্রেম আত্মপ্রবঞ্চনা নয়—তাই সে আমাদের সমস্ত কুৎসিত দৈন্যের আড়ালেও, আমাদের সৌন্দর্যময় সত্তাকেই খুঁজে পায়। কারণ প্রেম যেমন পূর্ণবিচার করে না, তেমনি দোষ বিচারও করে না।

প্রেম জীবনে আসে হঠাৎ। মেপে জুপে অঙ্ক কষে প্রেম করা চলে না। শ্রদ্ধা, অনুকম্পা, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, স্নেহ, প্রীতি বাৎসল্য, মৈত্রী—এর যে কোনও একটা পথ ধরে প্রথমে আসে ভাল-লাগা বা আত্মনিবেদনের প্রথমাবস্থা—তার পরেই হঠাৎ আসে প্রেম। প্রথম দর্শনেই সবক্ষেত্রে প্রেম হয় কিনা বলা শক্ত। তবে এটা ঠিক যে, কারুর সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় থাকলেও যদি কখনও তার প্রেমে পড়া যায়, তাহলে মনে হয় সে যেন এক আবিষ্কার—যেন আবির্ভাব। সমস্ত কণ্ঠস্বরের মাঝে হঠাৎ বিশেষ এক স্বরকে, সর্বকিছু ভঙ্গির মধ্যে এক বিশেষ ভঙ্গীমাকে, সব গান ছাপিয়ে এক বিশেষ কূজনকে নিজের সত্তার গোপনে সন্তর্পণে জড়িয়ে নিই, চীৎকার করে বলে উঠি—

"—তুমি আছ তুমি আছ
এ বিস্ময় সওয়া যায় নাকো
অরণ্য কাঁপিছে
মনে মনে নাম বলি
আকাশ চুঁইয়ে পড়ে
গলানো সোনার মত রোদ—"

ঝড়ের উদ্দামতা নিয়ে আসে প্রেম। অন্তরের নির্ঝরের হয় স্বপ্নভঙ্গ। আঘাতের পর আঘাতে নিজের চারিদিকের অহংএর পাষাণ-প্রাচীর পড়ে ভেঙে। জীবনের সব সম্পদের বিনিময়ে এই মহাসম্পদ এসে ধরা দেয় মনের মণিকোঠায়। প্রেমিক শুনেছে সেই আশবাস—

"—উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই—"

মাতৃদেহে জেগে ওঠে এক প্রাণদ্বীপ, এক অথচ স্বতন্ত্র। সেই দ্বীপ একদিন বাইরের আলোকে হাত বাড়াবে, গান রচনা করবে, ভালবাসবে। দুজনকে কেন্দ্র করে যে একত্ব তাই থেকে সৃষ্টি হলো সংসার, সমাজ, দেশ, মহাদেশ পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে এক অতীন্দ্রিয় জ্যোতির্লোক। এই ব্যাপ্তিময়তাই প্রেমের ধর্ম।

প্রেমকে আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভালবাসা নাম দিয়ে অনেকখানি ছোট করে এনেছি। আমরা বই পড়তে ভালবাসি, আইসক্রীম আর চকোলেট খেতে ভালবাসি এবং সংসার, দেশ থেকে আরম্ভ করে ভগবান পর্যন্ত অনেক কিছুই ভালবাসি। কিন্তু এই ভালবাসা হলো অধিকার-বুদ্ধি, তাই এর রূপ হলো খণ্ডিত। কিন্তু প্রেম অখণ্ড পূর্ণতা—এর মধ্যে তাই নেই অধিকারের সীমাবদ্ধতা। মূল্য বিচারের নিকষে ভালবাসার মূল্য নির্ধারণ সম্ভব হলেও প্রেমের কোনও মাপকাঠি নেই। 'ক্লিওপেট্রা' আর 'মার্ক এণ্টনীর' প্রেমের সঙ্গে তুলনায় বস্তির ঝমরু ঝাড়ুদার আর হাঁড়ির মেয়ের প্রেম বড় কি ছোট, এ-বিচার হিমালয় বড় কি মহাভারত বড়, এ-বিচারের মতই অর্থহীন। ভালবাসার পাত্রের তফাৎ হতে পারে—হতে পারে একটা আরেকটার তুলনায় স্বল্পস্থায়ী, কিন্তু প্রেমটুকু উভয় ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ। দুজনেই বলতে পারে—

"—আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব—"

প্রেম আর বেদনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রেম সৃষ্টিমূলক, তাই যে কোনও অন্য আরও সৃষ্টির মতো এর সঙ্গে আনন্দ ও বেদনার সংমিশ্রণ থাকাটা স্বাভাবিক। যেহেতু সৃষ্টির দিক থেকে প্রেম অন্য সব সৃষ্টির চেয়ে গরীয়সী, সেহেতু এর মাঝে বেদনার অবকাশ সীমাহীন। এছাড়া আরও কারণ আছে, প্রেম যেন এক অনন্ত তৃষা কিছুতেই এর তৃপ্তি নেই।

"—জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না ভেল—"

এই যে অকল্পনীয় অক্ষমতা, সত্যিকারের প্রেমের বেদনার অসীমতার এও একটা কারণ। কিন্তু এই অক্ষমতার বেদনাবোধ থেকেই আসে পূর্ণতা। বৃহত্তর প্রেমের জন্ম হয় মহত্তর বেদনা থেকেই।

"—এই করেছ নিঠুর তুমি এই করেছ ভালো
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো—"

প্রেমিকের সামনে অনেক সময় প্রেম বড় কি কর্তব্য বড়, এই রকম একটা সমস্যা এসে উপস্থিত হয়, এই কথাই অনেকে বলে থাকেন এবং নজীরস্বরূপ তাঁরা অনেক ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা আমাদের সামনে এনে তুলে ধরেন। বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ প্রেমের ও কর্তব্যবোধের এই তথাকথিত দ্বন্দ্বের ওপর গড়ে উঠেছে কিন্তু এ ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। আমাদের অধিকারবুদ্ধি এক বিশেষ বিচার-বুদ্ধি

।পর প্রতিষ্ঠিত এবং যে বিচারবোধ বস্তু-ষয়ের আপেক্ষিক তুলনামূলক দোষ-গুণের দ্বারা সীমাবদ্ধ—কাজেই এ বিচার-বাধ সব সময়েই আপেক্ষিক, মূর্ত স্তুকেন্দ্রিক। কর্তব্যের ক্ষেত্রে যুক্তির প্রাধান্য অনস্বীকার্য; কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে ই সূক্ষ্ম যোগ-বিয়োগের ব্যাপার শুধু নরর্থকই নয়, উপরন্তু ক্ষতিকারক। বি বলেছেন—

"—প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
কোথায় কে ধরা পড়ে কে জানে—"

এর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও যুক্তির থান নেই। এ স্বয়ম্ভূ। বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, গান্ধীজী, এদের জীবন আলোচনা রলে আমরা দেখি যে, একটা ব্যাপকতর প্রেমের জন্য এঁরা সর্বকিছুকে আনন্দের ঙ্গে উৎসর্গ করেছিলেন। এঁদের চেয়েও ড় প্রেমিক এঁদের সহধর্মিণীরা। কারণ প্রেমাস্পদের পরিণতির সম্ভাবনায় তাঁরা এক মহান্ প্রেম-জীবনের বীজ রোপিত রে গেছেন আত্মাহুতির নির্মাল্যে। তাঁরাও অনুভব করেছিলেন, 'ভূমৈব সুখম্'। এখানে বেদনার কোনও অবকাশ নেই। কর্তব্য মানুষকে সার্থক কর্তব্য পালনের আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে আত্ম-নগ্রহের বেদনাও থাকে, তা সে যত অল্পই হাক।

আমরা জানি, প্রেমের দৈহিক রূপ যৌনতা। মন জানাজানির পালা শেষ হলে আসে আত্মনিবেদনের পালা। তখন—

"—প্রতি অঙ্গ কাঁদে তার প্রতি অঙ্গ তরে—"

তাই এই যৌন মিলনের সহজ সার্থকতার ওপর দাঁড় করানো হয়েছে আমাদের প্রেম-জীবনের নীতির মূল্য নির্ধারণের মাপকাঠি। বিবাহই এই মিলনের স্বাভাবিক সামাজিক স্বীকৃতি। অতএব একমাত্র বিবাহের দ্বারাই আসে পরিপূর্ণ প্রেম। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ তিনটি বিরোধী মত প্রচলিত আছে। (১) প্রথমত, একদল মহাপুরুষের জীবনী উদ্ধৃত করে দেখাতে চান যে, তাঁরা সকলেই বিবাহিত দাম্পত্য জীবন ত্যাগ করেছিলেন। যীশু-খৃষ্ট, স্বামী বিবেকানন্দ এঁরা আবার বিবাহই করেন নি। কিন্তু এরকম ধারণা যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা একটা ভুল করেন। আগেই বলেছি প্রেম মানে আত্মবিস্তারের পথে আত্মোপলব্ধি। কথাটা যদি ঘুরিয়ে দেখি, অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি মানেই আত্ম-বিস্তার, তাহলেও সেই একই কথা দাঁড়ায়। আমাদের মত সাধারণ স্তরের যাঁরা তাঁদের, সংসার থেকে সমাজ, তাই থেকে দেশ-মহাদেশ ছাড়িয়ে সমগ্র বিশ্বজগৎ এই পর্যায়ক্রমে আত্মবিস্তারের পথে আত্মোপ-লব্ধি হয়, কিন্তু মহাপুরুষ যাঁরা, তাঁদের পক্ষে এ ক্রম স্বতঃসিদ্ধ, কারণ তাঁরা বহুর মধ্যে একাত্মতার উপলব্ধি করেছেন। (২) বিবাহিত জীবনে ভগবৎ প্রেম লাভ করা কষ্টসাধ্য, এই রকম একটা কথা কোনও কোনও ধর্মসম্প্রদায় প্রচার করেন এবং তদনুযায়ী কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেন; এমনকি, তাঁরা স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করাটাকে একটা গর্হিত পাপ কাজ বলে মনে করেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিবৃত্তি-মার্গীদের পক্ষে এর একটা আপাত প্রয়োজনীয়তা মনে হলেও এও একটা ভ্রান্ত ধারণা। গীতায় শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'তপস্বী, জ্ঞানী, কর্মী ও সন্ন্যাসী অপেক্ষা যোগীরা অবশ্যই শ্রেষ্ঠ।' যোগ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যুক্ত হওয়া; ভগবানের সঙ্গে যে সর্বদাই যুক্ত সেই যোগী। কাজেই বিবাহিত জীবনেই বা তা সম্ভব নয় কেন? রামকৃষ্ণ বলেছেন, সংসারী হতে আপত্তি কি শুধু মনটাকে দুধ থেকে তোলা মাখনের মত বস্তুজগৎ নিরপেক্ষ রাখতে হবে—তবেই তো যোগস্থ। আর তাছাড়া বন্ধন সম্বন্ধে যার কোনও বেদনা বোধই নেই, তার পক্ষে মুমুক্ষু হওয়াটা সম্ভব হয় কি করে? বিশ্বকবির বাণীতে তারই অনুরণন শুনি—

"—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ
মহানন্দময়—"

(৩) তৃতীয়ত, যাঁরা বিবাহিত জীবনে প্রেমের অস্তিত্বে সন্দিহান, এঁদের মধ্যে আবার দুটো ভাগ করা যায়। প্রথমত, একদল সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন যে, প্রেম যেহেতু মনসিজ অশরীরী সত্তা, অতএব এর স্বীকৃতি একমাত্র সম্ভব দেহাতীত কোনও স্তরে। পৃথিবীর অনেক বড় বড় শিল্পী ও কবিদের এই দলে ফেলা যায়। এঁদের কথা অবশ্য পুরোপুরি না হলেও বেশিটুকুই সত্যি, কারণ প্রেমের জন্ম স্থূলে দেহ নিরপেক্ষ এবং তা উপলব্ধ হয় সূক্ষ্ম কোনও এক মানস লোকে, কিন্তু তবু দেহেরও প্রয়োজন আছে। যে কোনও এক দম্পতির জীবন যদি আমরা লক্ষ্য করি, ধরে নেওয়া যাক, যাদের অন্য কোনও দিকে কোনও অভাব-অভিযোগ নেই, তাহলে দেখবো প্রথম মন জানাজানির পালা শেষ হলে আসে দেহজ তৃষ্ণা, আসে যৌনতা। কিছুদিন পরে আবার এক নির্দিষ্ট ক্রমে যৌনতায় পড়ে ভাঁটা—আবার মিলন হয় মানস ক্ষেত্রে। অবশেষে মন থেকে আবার দেহ, আবার মন এই পর্যায়ক্রমে তাঁরা বার্ধক্যে এসে মুখোমুখি দাঁড়ান এমন এক স্তরে, যেখানে দেহ-মন পার হয়ে জেগে ওঠে এক লোকোত্তর সত্তা—'আত্মা'। কাজেই দেহকে একেবারে বাদ দিয়ে প্রেম সম্ভব হলেও পূর্ণ নয়। কারুর কারুর পক্ষে দেহকে অস্বীকার করে মানস স্তর থেকে একেবারে আত্মিক স্তরে পোঁছানো হয়তো সম্ভব, কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় এত অল্প যে, তাঁদের স্বচ্ছন্দে অনন্যসাধারণের পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। এই পর্যায়ে সর্বশেষ যাঁরা, তাঁরা হচ্ছেন তথাকথিত 'বোহেমিয়ান' সম্প্রদায়। আজকাল প্রেমের নাম নিয়ে এঁরা যে উঞ্ছবৃত্তি করেন, এর পেছনে আছে অনেক কারণ। প্রথমত, সুশিক্ষার অভাবে নৈতিক সংযমের অভাব এবং দ্বিতীয়ত, বিষদিগ্ধ যুদ্ধোত্তর সামাজিক কাঠামো ও তার ক্ষয়িষ্ণু আর্থিক মান। এ নিয়ে আগে অনেকে অনেক কিছুই লিখেছেন, কাজেই তার পুনরাবৃত্তি বাহুল্য মাত্র; আর সেটা এই প্রবন্ধের উপজীব্য বস্তুও নয়, কাজেই শুধু এইটুকুই বললে যথেষ্ট হবে যে, আজকের ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের যা আর্থিক মান, তাতে ভদ্রভাবে একটা সংসার চালানোর ক্ষমতা শতকরা ৯০ জনের নেই। কাজেই এই অস্বচ্ছলতার ওপর একটা বিবাহিত জীবনের গুরু দায়িত্ব বহন করবার মত মানসিক সবলতাও থাকবার কথা নয়—এই সঙ্গে নৈতিক অসংযমতার অনুশীলন করে করে যৌনতার অশোভন উদগ্রতা সর্বগ্রাসী আকার ধারণ করেছে আবার অন্য দিকে সামাজিক জীবনের পরিবর্তিত ধারা অনুসারে নর ও নারীর মধ্যে একটা অবাধ মেলামেশার সুযোগ ঘটেছে, যেটা আগে ছিল না। ফলে সাধারণ ব্যবহারিক সম্বন্ধ থেকে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে তারা এগিয়ে আসে। এইখানেই ভাল-লাগা ও অর্থ-নৈতিক সামর্থ্যের মধ্যে বাধে এক প্রবল

সংগ্রাম। মনের জোর না থাকলে এইখানে আমাদের একটা আপোষ মীমাংসা করতে হয়। সামাজিক নিষেধের দিকে লক্ষ্য রেখে হয় আমরা আংশিক দেহোপভোগের মধ্যে তৃপ্তি পাই, নয়তো একটা নতুন সম্বন্ধ পাতাবার চেষ্টা করি, যার নাম দিই 'বন্ধুত্ব'। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই এ হলো মনকে চোখ ঠেরে মিথ্যাচারের প্রশ্রয় দেওয়া; একটা নৈতিক চ্যুতি। সত্যিকারের প্রেম মানুষকে প্রকাশ করে, মহৎ করে, সুন্দর করে; কিন্তু মিথ্যাচারকে আশ্রয় করে যে প্রেমের অভিনয়, সে আমাদের কি দিতে পারে? সে নিজেই তো নিঃস্ব। কাজেই খবরের কাগজে, উপন্যাসে, কবিতায় আমরা প্রেমকে কেন্দ্র করে যে ঘর ভাঙার ইতিহাস দেখি, সে প্রেমের ব্যর্থতা নয়—মিথ্যাচারের অট্টহাসি।

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও এই প্রেম নিয়ে পরীক্ষা হয়ে গেছে। শ্রীরামচন্দ্রের কথা গল্পকথা বলে বাদ দিলেও, বুদ্ধদেবের বাণীকে মন্ত্র করে মহারাজ অশোক প্রিয়দর্শী যে বিরাট প্রেমরাজ গড়ে তুলেছিলেন, তার কথা আমরা জানি। নবদ্বীপে কাজির বিরুদ্ধে চৈতন্যদেবের যে প্রতিরোধ, তা শুধু অভাবনীয়ই নয় অনবদ্য। এ-যুগকে লক্ষ্য করে মহাকবি আক্ষেপ করে বলেছিলেন—

"—নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে
বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে
ব্যর্থ পরিহাস—"

কিন্তু এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক মহাত্মা গান্ধী, সগর্বে মাথা তুলে প্রচার করলেন প্রেম অজেয়, অমর, নিঃসংশয়। আমরা জানি, একটা সংসারে সকলে যদি স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহলে সে সংসার ভেঙে পড়ে; আবার তাঁরা যদি শুধু কঠোর কর্তব্যপরায়ণ হয়ে সুষ্ঠুভাবে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পালন করে, তাহলে সে সংসার নিরঙ্কুশ হলেও মধুর হতে পারে না। কিন্তু তারা যদি পরস্পরের প্রতি প্রেম ও প্রীতিপরায়ণ হয়ে কাজ করে তাহলে সময়বিশেষে প্রেমের খাতিরে তাদের যে কেউ অপরের কাছে নিজেকে জানিয়ে এনে কোনও দায়িত্ব পালনে বেদনা অনুভব করে না। জড় ও জীবনের মধ্যে যে পার্থক্য প্রেম ও কর্তব্যের মধ্যে প্রায় এতটুকুই পার্থক্য। সংসার যেমন স্বতন্ত্র ব্যক্তি-সত্তার সমষ্টিগত সমন্বয়রূপ, রাষ্ট্রও তাই। তাই গান্ধীজী বলেছেন, 'পৃথিবীর কোনও ফুলের প্রাণকে আঘাত না করেও তারই মধ্য থেকে সৃষ্টি হতে পারে প্রয়োজনের পণ্য আর সেই পণ্যই নিষ্কলঙ্ক পণ্য। নিজের স্বতঃপ্রবৃত্তির দ্বারা আনন্দের ভাবটুকু বজায় রেখেও নিজের কাছে যে অধীনতা, তারই আক্ষরিক অর্থ স্বাধীনতা। সাম্য ও স্বাধীনতা—এ দুই-ই হলো অধিকার-বুদ্ধি—কাজেই একমাত্র মনের ক্ষেত্রেই প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা এদের প্রকৃত সমাধান সম্ভব। আমরা আরও দেখেছি, বৃহত্তর প্রেমের জন্ম হয় মহত্তর বেদনা থেকে। অতএব আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে যদি শুধু ডাল-ভাতের সমস্যাকে একমাত্র সমস্যা করে তুলে ধরি, তাহলে তার পরিধি হবে এত ছোট যে, তার সীমাবদ্ধতার অসীম দৈন্যে সে একদিন শ্বাসরুদ্ধ করে আমাদের মারবে। তাই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমাদের প্রেমের দৃষ্টিভঙ্গী হবে ভারতের নিজস্ব দুঃখবাদ। সে দুঃখ হচ্ছে অপচয়ের দুঃখ। জড় বস্তুজগৎ থেকে চেতন মহামানবীয় সত্তা পর্যন্ত সবকিছুরই অপচয়। আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল নির্দেশ করতে গিয়ে ভারতের মহাপ্রেমিকেরা এই সীমারই নির্দেশ দিয়েছেন।

* * * * *

এমন যে প্রেম, যার মাঝে আছে অমৃতত্বের প্রতিশ্রুতি, শাশ্বতের ছায়াপাত, তাকেও আমরা দেখি, আমাদের সাধারণ জীবনে বার বার ব্যর্থ হয়ে যেতে। একেই বলে Anti Climax; কিন্তু কেন এরকম হয়? প্রথমেই বলেছি যে, বস্তুজগতের দোষগুণ বিচারের আপেক্ষিকতায় নামিয়ে আনলে প্রেম বাঁচে না। কবিগুরুর শেষের কবিতায় বন্যার চিঠিতে এই প্রতিধ্বনিই পাই—

"—সে আমার প্রেম
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশ্যে

* * * * *

ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ
লেগে
তৃষ্ণার্ত আবেগ বেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তব কোনোও ফুল
নৈবেদ্যের থালে
আমার মানস ভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাব রসের পাত্র বাণীর তৃষায়
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন যা মোর চক্ষের জলে
ভিজে—"

কারণ অসীম স্থৈর্য আর ঔদার্য না থাকলে প্রাত্যহিকতার গ্লানিতে প্রেম মলিন হতে বাধ্য। এইজন্যেই আমাদের শাস্ত্রে ও সমাজ-দর্শনে মাতৃপ্রেমকে শ্রেষ্ঠ প্রেম বলা হয়েছে; কারণ মার চোখে, ভাল হোক বা মন্দই হোক, ছেলে সে তাঁর ছেলেই এবং তার সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দ যেন তাঁর একান্ত আপনারই।

প্রেমের ক্ষেত্রে পরস্পরের কাছ থেকে সাধারণত দেবার নেবার কিছু থাকেই। এক ব্যক্তি-সত্তার পরশ পাথরে আরেকজনের হৃদয়ের লৌহ শৃঙ্খল সোনা হয়ে উঠবেই। কিন্তু এই দান-প্রতিদানের ব্যাপারেও দেবার ও নেবার ক্ষমতা প্রত্যেকের অসহায়ভাবে ব্যক্তিগত আপেক্ষিকতায় সীমাবদ্ধ। চাইলেই যে আশানুরূপ পাওয়া যাবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই—আবার অপর পক্ষে উজাড় করে দিলেই যে আরেকজন সবটুকু গ্রহণ করতে পারবে, এরও কোনও স্থিরতা নেই। কাজেই কারুর জীবনে একদিন আসতে পারে এক পূর্ণচ্ছেদ। আপাতদৃষ্টিতে তখন সেটা আকস্মিক মনে হলেও তার কার্যকারণ সম্বন্ধ পরে হয়তো এই দুটো কারণের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। এই বিরতির ক্ষেত্রে আপোষের চেয়ে বিচ্ছেদ ভালো—কারণ, আর যাই হোক, যুগ্ম ইচ্ছার অবশ্যম্ভাবী চংক্রমণের পথে প্রেমের বিপরীত বিন্দু 'ঘৃণা' এসে প্রেমের জায়গা জুড়ে বসতে পারে না কোনও দিন।

সর্বশেষে আমাদের মনে যখন জাগে নিজেদের সম্বন্ধে অকিঞ্চিৎকর মূল্যহীনতা, তখন ভাঁটা পড়ে আমাদের পার্থিব প্রেমে, আর তাই বেয়ে যে জোয়ার আসে আমাদের মনের কূলে, তারই নাম দিয়েছি আমরা ভগবৎ প্রেম। নিজেদের মধ্যে এক অনির্বচনীয় অবিনশ্বর সত্তাকে আবিষ্কার করে আমরা সেই পরমের সঙ্গে প্রেমে পড়ি। প্রেমের পরিণতির পথে এই যোগসূত্র আমরা লক্ষ্য করেছি, কিন্তু কোথায় যে এই বৃত্তির শুরু, তা আমরা আজও জানি না।

আমার মনে হয়, 'একমেব বহুস্যাম' ভগবানের এই ঈক্ষণই প্রেমের গোড়ার কথা।
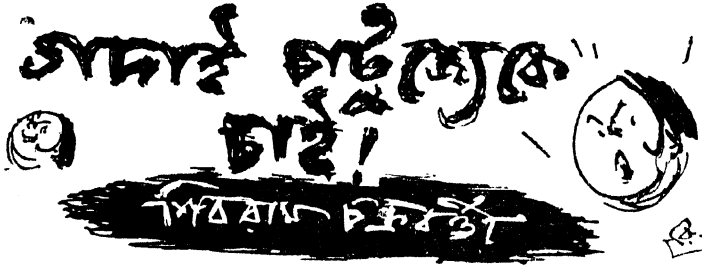
'গদাই!'......গদাম্!

আন্‌মনা চলছিলাম, আচমকা এক আওয়াজ! ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার আগেই, ধ্বনিটির প্রতিধ্বনির মত, পিঠের ওপর এক গদাম্! ঐ গদাঘাত!

কোঁক করে উঠে পিঠ ফেরালাম—নাঃ, মোটেই আমার চেনা নয়। কস্মিনকালেও লোকটাকে দেখিনি।

'বদমাইসের ধাড়ি। বলি, এই সকালে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

থতমত খেতে হোলো। দিন কয়েক মাত্তর বাসা বদলেছি, কলকাতার অন্য পাড়ার থেকে উঠেচি এসে এই পাড়ায়—এখনো পাড়াটে কারো সাথে ভালো করে আলাপ হয়নি—এর মধ্যেই গাছে না উঠতেই এক কাঁদি—এই গদাই-গাদন! পিঠেপার্বণ এই।

কাঁদিয়ে দিয়েছে একেবারে!

বদমাইসের ধাড়ি কিনা তা নিয়ে মতভেদ থাকলেও আমি যে গদাই নই সে বিষয় সন্দেহাতীত। কাঁদিত হয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছি, বাধা দিয়ে সে আমায় চায়ের দোকানে টেনে তোলে—'চা খাওয়া গদা!'

'দে একটা সিগ্রেট্ দে।' দোকানে বসতে না বসতেই আবার ওর আবদার।

'চা আমি খাইনে। সিগ্রেট খেলে আমার অম্বল হয়—'বলে চায়ের ওখান থেকে ওর হাত ছাড়িয়ে চোঁচা এক ছুট্ মারি। চলতি বাসের হাতল ধরে উঠে পড়ি চট্‌পট্।

বিকেলেই আরেক দুর্ঘটনা! ট্রাম থেকে নামছি—আরেকজনার সম্ভাষণ লাভ করলাম।

'এই যে, চাটুজ্যে মশাই যে! আমার ভাগ্যি ভালো বলতে হবে। দেখা পেলাম আপনার। আপনার দর্শনলাভের আশা তো ছেড়েই দিয়েছিলাম......"

'আজ্ঞে—?' আমি একটু হতভম্বই।

'এবার একটু দয়া করুন। অনেকদিন তো হোলো—সুদে আসলে দাঁড়ালোও নেহাৎ কম না।—এবার একটু কেরুপা করুন মশাই। অল্পে অল্পে—কিস্তিতে কিস্তিতেই—আস্তে আস্তে দিন না—নাহয়। নইলে যে আর চলে না।'

গদাহত!

'আজ্ঞে আপনার একটু ভুল হচ্ছে—আমি কোনো চাটুজ্যে নই।'—ও'র চাটুবাক্যের প্রতিবাদ করতে হয়—'নই, এবং কখনো ছিলাম না। এই হতভাগ্য হচ্ছে এক চকরবরতি।

'প্রভু! কেন আর ছলনা করেন! গরিবের কষ্টের টাকা কটা মেরে আপনার কি লাভ হবে? বাড়ি গেলে দেখা মেলে না, বাসার লোকরা বলে গদাইবাবু ছিলেন, এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন। এ সব কি ভালো? ভোল পাল্‌টেছেন—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বোল্ শুনেও বুঝবার যো নেই। গলার আওয়াজও বদলে এনেছেন প্রায়—এখন সামান্য কয়েক শো টাকার জন্য বাপ-দাদার দেয়া নাম—বাপদাদার নাম ডোবাতে যাচ্ছেন—ছিঃ! একাজ শ্রীগদাধর চাটুজ্যের উপযুক্ত নয়।'

এমন কথার পর আর কথা চলে না। কাঁচুমাচু হতে হয়—'যখন বলছেন এত করে—তখন আসবেন কাল সকালে—দেখি কি করতে পারি—কদ্দুর কি করা যায়। সাবেক বাসাতেই পাবেন আমায়। সেই আস্তা-বলেই আছি।' বলে' কোনোরকমে তো পড়ে-পাওয়া পাওনাদারের মায়াপাশ কাটালাম।

কিন্তু ফাঁড়া কি একটাই? শ্রীমান গদাই-এর সম্বন্ধীরা বলতে গেলে, এক গাদাই। সেদিন সন্ধ্যের আগেই আরেকজনের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ।

'আরে শালা গদা! পাকড়েছি তোকে আজ। ভালো জায়গাতেই পাওয়া গেছে।'

পাড়ার চাখানায় অভাবিত আরেক আবির্ভাব। চায়ের পেয়ালার সাথে আমাকেও চল্‌কাতে হলো।

'এই ছোকরা, যা—নিয়ায় চট্ করে—যা তৈরি হয়েছে। কারি, কোর্মা, দোপেঁয়াজী মোগলাই পরোটা। কুছ পরোয়া নেই, লাগে টাকা দেবে আমাদের.........আমাদের গদাইদা খাওয়াচ্ছে।'

চমক ভাঙবার আগেই আওয়াজটা ভাঙলো। আর, বলা বাহুল্য, তারপরে আমার ঘাড় ভাঙলো। আন্‌কোরা ভায়ের দায়ের কোপ থেকে বাঁচানো গেল না।

রেস্তরাঁ থেকে হাল্‌কা হয়ে—ভারী মন নিয়ে ফিরছি, বাড়ির দিকেই—হঠাৎ পাশেই থেকে কে যেন গলা বাড়ালেন—

'এই জন্তু, মাসিপিসিদের চিনতেই পারিসনে আজকাল? এতই বড়লোক হয়েচিস?'

পাশ ফিরে এক বর্ষিয়সীর সামনে হাঁ করে দাঁড়ালাম।

'হ্যারে গদা, তোর নন্তু মাসিকে চিনতে পারচিস্ নে? কার কোলে-পিঠে মানুষ হলি রে—অ্যাঁ?'

আমার হাঁ বুজলো তখন। তখন বুঝলাম যে, আমার সামনে যে মাসিক চিত্র-প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটিত তা আমার নয়—শ্রীমান গদাইয়ের। চিত্রাঙ্গদার দিকে আমি গদ্‌গদ্‌ভাবে তাকালাম—নন্তু মাসি, কিছু মনে কোরো না, ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলাম, তোমায় দেখতে পাইনি...' বলতে বলতে হেঁট হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে হোলো।

না নিলে কি রক্ষে ছিল? বর্ষিয়সীদের জানা আছে আমার। বঁড়শি দিয়ে তো গেঁথেই ছিলেন, তারপরে অসি দিয়ে ফলা ফলা করতেন। মানি যে, সারা পৃথিবীই এক রঙ্গমঞ্চ, কিন্তু তাই বলে কলকাতার সদর রাস্তাকে তার একটা দৃশ্যপট করে তোলার কোনো মানে হয় না। হাত বাড়িয়ে মাসিমার পরিসীমা পাই।

'এত কিসের ভাবনা তোর বাছা—' নন্তু মাসি আপ্যায়িত হন—'শ্বশুরের অমন রাজ-ঐশ্বর্য্য পড়ে থাকতে? কিন্তু তা-ও বলি বাপু, বৌটার কি দোষ? তাকে কি তুই নিবিনে আর!

'কাকে নেবার কথা বলছো?' চমক লাগে আমার : 'কার বৌকে?'

'কার বৌ—অবাক্ করলি তুই। অগ্নি-সাক্ষী করে বিয়ে করেচিস—বলচিস ফের, কার বৌ! শাশুড়ী-মাগীই না হয় দজ্জাল—তা বলে সাতপাকের বৌকে কি কেউ ফেলে দেয়? এমন পরীর মতন বৌ।'

নিজের অজ্ঞাতসারে এক পরির মত মেয়ের সঙ্গে পরিণীত হয়েছি, অপ্রত্যাশিত এই সৌভাগ্যে নিজের প্রতি আমার ঈর্ষাই হতে থাকে—বলতে কি!

"শ্বশুরে মুখপোড়া, জানি, বিষয়আশয় শাশুড়ীর নামে লিখে দিয়ে মরেছে—কিন্তু ও-মুখপুড়ি আর কদিন? বেটি মলে তখন আর তোকে পায় কে? শ্বশুরের অতো সম্পত্তি—অমন বাড়িখানা তুই-ই তো পাবি। এসব হাতছাড়া করবি? আরে বোকা, শাশুড়ীটা চোখ বুজলে সবই তো তোর। তা বুঝিসনে?'

বুঝি তো মাসিমা, কিন্তু শাশুড়ি যে বোজে না। চোখ বোজে না যে।' —দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলি—'তাঁর তো গঙ্গা-লাভের কোনো লক্ষণ দেখিনে।'

'এক কাজ কর্। আমাদের বাড়ি যাস্ একদিন। সেঁকো বিষ আছে—দেবো। সববোনাশীর খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিস্—ল্যাঠা চুকে যাবে—বুঝলি?'

কথাটা ভেবে দেখি। জবরদস্ত্ শাশুড়িকে জব্দ করতে সেঁকো বিষই যে একমাত্র তা আমি বল্‌তে পারিনে। গনগনে আগুনের ওপরে চাটুতে করে সেঁকতে পারলে আরো ভালো হয়। সেক-তাপে অনেক রোগ সারে—তবে বোধ হয় তেমন চুপিসারে হয় না। তাছাড়া, কোনো জামায়ের পক্ষে—এমনকি, চাটুজ্যে হলেও—শাশুড়ির চাটুকার হওয়া শোভা পায় না, তাই ভেবেচিন্তে এক মাত্রার সেঁকো বিষই শ্রেয় জ্ঞান করলাম।

'সেই ভালো মাসিমা। যাবো তোমাদের বাড়ি। এখন তাহলে আসি।' এই বলে মাসিমার আশীর্বাদ কুড়িয়ে নিজের পথ দেখি।

কিন্তু মাসী মান্ত প্রদেশ না পার হতেই তিনজন লোক আমার সামনে যেন মাটি ফুঁড়ে ওঠে—'বলি চাঁদ, হুপ্ করে কোথায়

শাশুড়ির অভি-সেঁক-মন্ত্রণা

ডুব মেরেছিলে শুনি?' চারদিক থেকে তারা চাঁদোয়ার মত ঘিরে—এসে আমায় ছেঁকে ধরে—'আমাদের বখ্‌রা কই?'

'কিসের বখ্‌রা?'

'সেই ব্যাঙ্ক লুটের? বারাকপুরের রাহাজানির? ভারী ন্যাকা সাজচিস্ যে গদাই?'

'আরে চু-চুপ্! সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচায় এমন? চ, ওই পার্কে গিয়ে বসি—সেখানে কথা হবে।'

'আমাদের ভাগ মেরে ফের আবার ভাগবার মৎলব? তাহলে দেখেছিস্—? এই দ্যাখ্। এইখেনেই তোকে শুইয়ে রেখে যাবো—যদি ভোগা দেবার চেষ্টা করিস্।'

আমি দেখি। ওদের তিনজন ছাড়াও আরো তিনটেকে দেখা যায়। ওদের পকেটের তলা থেকেই উঁকি মারে তারা। এক একটি পিস্তল।

মাঠের ঘাসে গা ঘেঁষে বসতে হয়। বোঝাতে হয়—যে পালাইনি আমি। পুলিসের ভয়ে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গেছিলাম। ভেবে-ছিলাম যে ওরাও সব আমার মতই U. G. হয়ে গেছে। তাই কোথায় কাকে খবর দেব, কোথায় কার পাত্তা পাবো—তাই না ভেবেই—

'ইউ জি হয়েছিস্! বটে? ইউ জি হবার কী দরকার ছিলো? পুলিস তো ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। সন্দেহই করেনি আমাদের। তারা তো ব্যাঙ্কের কেশিয়ারকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরে রেখেছে।'

'তাই নাকি? তাহলে তো ভালো—খুবই ভালো হয়েছে। ঠিক কাজই করেছে পুলিস।' কিন্তু ঠিক করলেও আমি একটু বিচলিত হই। বেচারীর জন্যই। আমরা ওর Cash আকর্ষণ করলাম, আর পুলিশ ওর কেশাকর্ষণ করল—কেশিয়ারের জন্য আমার দুঃখ হয়।

দুঃখ হচ্ছিল আরো। ঠিক চোখের সামনেই—পার্কের গা-লাগা বাড়িতে—একটি মেয়ে এক দৃষ্টে এই দিকেই তাকিয়েছিল। কিন্তু এই তিন হতভাগার চক্রান্তে, চক্রবর্তী হয়েও, ভালো করে সেদিকে চাইতে পারছিলাম না—গদাইভাবে বিভোর হয়ে বোকার মত বসে থাকতে হয়েছিল।

একটি ছেলে একটা চিরকুট্-হাতে এলো এমন সময়ে।—'সেজদি আপনাকে ডাকছে একবারটি।'

খোকার অঙ্গুলিনির্দেশ থেকে সেই বাতায়নবর্তিনীকেই আরেকবার দেখলাম। চুম্বকের টানে উঠতে হোলো আমায়।

'এই! চল্লি কোথায়?' ওরাও ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'এক্ষুনি আসছি—দাঁড়া। বোস্ এখানে, ঘাবড়াস্‌নে।'

'পালাবার ফিকির' খুঁজছিস্ বুঝি? তাহলে গদাই, আজকেই তোর শেষদিন, এটাও তুই জেনে রাখিস্।'

ওই তিন শত্তুরের মধ্যে যে একটু খাপসুরৎ—মেয়েটিকে সেও দেখেছিল—শুধু তাকেই একটু কম খাপ্পা দেখা গেল। সেই উঠে স্যাঙাৎদের সামলালো—'থাম্ না তোরা। আমি যাচ্ছি ওর সঙ্গে। পালাবে কোথা? পাহারা দেব বাড়ির দর্জায়—সট্‌কায় কোথ্‌দিয়ে দেখি তো? তোরা এখানে বসে থাক্ চুপ করে।'

বেখাপ্পাটিকে দরোজায় খাড়া করে ভেতরে গেলাম। যেতেই সেজ্‌দি—সেজেগুজে তৈরিই ছিলো যেন—আমাকে দেখেই কঁকিয়ে উঠলো—'আমার এমন সর্বনাশ

র তুমি......তুমি যে এমন ডুমুরের ফুল র, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, এদিকে বাবার কাছে আমার এই কালামুখ আমি করে দেখাই বলো তো......?'

আমি তো স্তম্ভিত! গদাই যে র্তিমান তা জানি—সকাল থেকেই নছিলাম। সকলের কাছ থেকেই নানা-রে তার পরিচয় মিলছিল—কিন্তু এই র-চয়ন-বৃত্তিতেও সে যে আরেক অদ্ভুত র্তি রেখে নিজের ওপর টেক্কা মারবে তা মি ভাবতে পারিনি।

এমন পরিস্থিতিতে কী করবো—কী রবো—ভাবছি তাই। বলতে যাচ্ছি যে পনার ভুল হচ্ছে, ভালো করে চেয়ে থুন—বোধহয় আমি গদাই নই......এমন য়ে সাক্ষাৎ যমদূতের মত এক লোক সেই র এলো। এসে বল্ল, আমার মেয়ের খে সব আমি শুনেছি। নিতু যা কিচ্ছু মায় লুকোয়নি......এখন তোমার কী বার আছে শুনি?

বলে' শোনার অপেক্ষা না করেই লফোনের হাতলটা হাতে নিলো—'হ্যালো, লবাজার। হ্যাঁ হ্যাঁ—থানার কানেক্‌সানটা ন্‌ তো আমায়। আসামী পাক্‌ড়েছি।'

বলে আমার দিকে তাকালো আবার দূত—'এখন—বলোতো বাপু, কী তোমার লব? পুলিস, না পুরুৎ?'

'পুরুৎ।'

আমি বলতে চাইনি কিন্তু আমার মুখ য়ে বেরিয়ে গেল ফুরুৎ করে।

'সেই ভালো। সেই বেশ কথা।' চক্ষের নকে তার মুশকো চেহারা হাসিখুশির য়াট হয়ে উঠলো—'তাহলে পুরুৎ ডেকে নিগে। শুভস্য শীঘ্রং—আজকেই হয়ে ক তাহলে। গোধূলি লগ্ন উৎরে গেছে—যাক্‌। এসব বিয়ের লগ্ন লাগে না। ধুদের খবর দি—সানাইওলাকেও নিয়ে সি।'

গায়ে উড়ুনী ফেলে তিনি বেরুতে তৈরি লন। জানালা দিয়ে আমি পার্কের দিকে কালাম—ডেকে বল্লাম তাঁকে—'দেখুন, রুতের সঙ্গে পুলিশকেও আনবেন। কি নি' বলাতো যায় না—যদি শেষে আমার 5 বদ্‌লায়। কয়েক বছর আর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মধ্যে কোনটা ভালো, ভাবতে ন আমায়। ভাবি ততক্ষণ।'

ও'র অন্তর্ধানের পর আমি মেয়েটির কে তাকাই—গোধূলি-লগ্ন উৎরে গেছে, ন্তু কণ্ঠলগ্ন আসন্নই! গলার মধ্যে কী যেন আমার দলা বাঁধে।—নিতুকে আমি ডাকিঃ 'আচ্ছা, নিতু, এসো একটা পরামর্শ করি। বন্ধুভাবেই পরামর্শ। ব্যাপারটার আলোচনা করা যাক্‌। না হয় একটা কাণ্ড হয়েই গেছে—মুহূর্তের ভুলে অমন হয়ে থাকে—কতো হয়—কিন্তু তাই বলে তোমার মতন এত ভালো মেয়ে যে আমার মত এই অকূল পাথারে ভেসে যাবে তা কি হতে পারে? সেটা কি কখনো উচিত? লোক-লজ্জার দায়ে তোমায় বিয়ে করতেই হবে সেটা বুঝি, কিন্তু আমাকেই করতে হবে—এমন অপদার্থকেই—তার কি কোনো মানে আছে? তার চেয়ে দ্যাখো তো, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন আমার ঐ বন্ধুটি—দেখতে

নিতুই-নব পরিস্থিতি

শুনতে মন্দ নয়—ওকে কি তোমার পছন্দ হয়? হয়তো বলো, ওকে আমার বদ্‌লি দিতে পারি।'

নিতু নীচের দিকে তাকায়। কিন্তু কিছু বলে না। মুখে না বললেও ওর আরক্তিম মুখরতায় তা প্রকাশ পায়। নিতুই নব বলে যে একটা কথা আছে, কথাটা হয়ত মিথ্যে নয়। কোথাও কোথাও খাটে বোধ হয়। নিতুর বেলায় অন্ততঃ খাটলো।

'দাঁড়াও, ওকে ডেকে আনি তাহলে।' বলে আমি রাহাজানি-করাদের একজনার সুরাহা করতে এগুই—'হ্যাঁরে, তুই কি বিয়ে করেছিস্‌? মানে এর মধ্যে—এই আমার—আমার গাঢাকা দেবার ফাঁকতালে......'

'ন্যাকা! কিচ্ছু জানিস্‌নে।' সে মুখ ব্যাঁকায়।

'তাহলে—এই মেয়েটিকে তো দেখেছিস? আমার বেশ জানাশোনা—ভারী ভালো মেয়ে—পছন্দ হয় তো বল্‌—অমন সুন্দর মেয়ে পাবিনে। লাগিয়ে দিই তাহলে আজকেই। কী বলিস?'

সুন্দর মেয়ের সামনে সবাই দুর্বল। দূরে বলতে পারে এমন শক্ত লোক দেখা যায় না। এমনকি, ডাকাতরাও সেখানে কাত।

নিতু আর নবকে এনে মুখোমুখি খাড়া করি।—তোমরা ততক্ষণ আলাপ করো। আমি একটু মাঠ থেকে আসি—কেমন? আমার আর দুজন বন্ধু ওখানে আছে, তাদের বলি গে। শুভ খবরটা দিই সবাইকে। বরযাত্রী হবার দায় তো এখন আমাদেরই।'

বলে আমি আর দাঁড়াই না। নিতুর বর থেকে নিৎবর হবার যে নতুন সুযোগ হয়েছিল তা আমি হেলায় হারাই। না, আর দেরি নয়, ভদ্রলোক কখন পুরুৎ এনে হাজির করেন কে জানে। জামাবদলের মত জামাই-বদ্‌লানো পছন্দ করবেন কিনা তারই বা কী ঠিক? শ্বশুর তো নন্‌—অসুর! পাহারোলাকেও পাকড়ে আনতে পারেন। সানাই বাজবার আগেই আমি সরে পড়ি।

সটান্‌ চলে যাই খবর কাগজের আপিসে—সেখানে হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ-এর কলমে একটা বিজ্ঞাপন চালাই—

'ভাই গদাই! ফিরে এসো। তোমার জন্যে তোমার বন্ধুরা হন্যে, নন্তুমাসি কাতর, নিতু নিতান্ত কাহিল। পাড়ার সবাই পাগল। আর বৃথা দেরি কোরো না। কোনো ভয় নাই। টের পায়নি কেউ—ঘুণাক্ষরেও নয়। দয়া করে ফিরে এসো ভাই।'

বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেরৎ যাই নিজের পাড়ায়—আমার চেনা মহলে। জানাশোনার আওতায়—সাবেক আবহাওয়ায় আমার। নতুন পাড়ার দিকে আর পা বাড়াইনে। বেপাড়ায় এগুবো আবার? বাব্‌বাঃ! বে করতেই লোক বে-পাড়ায় যায়, কিন্তু যেখানে একটা বে হয়ে আছে, আরেকটা হব হব—মানুষগুলোও বেয়াড়া—এই গদাই লক্ষীর বেচাল নিয়ে সেখানে ফিরবো ফের? নাঃ, খুব চোট্‌ গেছে—হল্লা গেল খুব, এখন নিজের মহল্লায় যাই। আর না।

ফিরে চলো—ফিরে চলো আপন ঘরে! মুক্তারামের মুক্ত আরামেই।......অধোবদনে চলেছি নিজের চত্বরে। নিজের চক্করে চক্করবর্তি হতে চলেছি—চলতে চলতে চোখ তুলে চম্‌কে গেলাম হঠাৎ! অ্যাঁ, আমার শ্বশুর মশাই না?......শাশুড়ি ঠাকরুণকে বিষয় বিষে জর্জরিত করে যিনি দেহ রেখেছেন সেই তিনি নন্‌—শ্বশুরের

প্রেত নয়। আমার অনভিপ্রেত শ্বশুর। অনতিদূরেই আমার!

বিয়ের বাজার নিয়ে চলেছেন—মুটেদের মাথায়। এবং—ভুল দেখিনি—পাহারোলা তাঁর পিছনে রয়েছে।

পুলিসের লোক যার পিছনে, আমি আর তার সামনে পড়িনে। হুট্‌ করে এক ছুটে পাশের এক ছবির দোকানে গুটিয়ে যাই।

আর, ঢুকতেই আমার চোখে পড়ে—এজীবনে যাকে কখনো এই চর্মচক্ষে দেখবো এমন দুরাশা করিনি।—ভগবানের মতই দুর্দর্শ্য আর দুর্ধর্ষ—আর সবার আরাধনার—সেই......

শ্রীমান্‌ গদাই চন্দর্‌ আমায় দর্শন দেন!

এই মাত্তর কাগজে বিজ্ঞাপন লাগিয়ে আসছি আর এর মধ্যেই ইনি লাগাও! (নাঃ, খবর কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে যে ফলে থাকে তা মোটেই মিথ্যে নয়)।

দোকানের ভেতরের দিকে দাঁড়িয়ে গদাই—ওদিকের ঘরে। মাঝের দরজার ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার আমার চোখে পড়ে। আমার নকল—অবিকল! হাত পা নাক মুখ চোখ চাউনি—এমনকি, একই রকমের শার্টের কলার ওল্‌টানো—হুবহু আমার মতই। টিকির গোড়া থেকে পায়ের গোড়ালি অব্দি—চুলের জুল্‌পি বা জিলিপি নিয়ে—নিখুঁৎ আমার প্রতিলিপি! লোকে যে আমায় দেখে গদাই বলে ভুল করে তার দোষ কি?

আমার নিজেরই ভ্রম হয়। অদ্বিতীয় আমার এই দ্বিতীয় সংস্করণ এই পোড়া চোখে যে কোনোদিন পড়বে নিজেই কি তা কখনো ভেবেছিলাম!

আস্তিন গুটিয়ে আমি এগুই। লোকটাকে এমন শিক্ষা দেব যে যেন সে কখনো আর আমার ছদ্মবেশে কোথাও না বেরোয়। যা নাকাল হয়েছি ওর জন্যে! নাক মুখ আস্ত রাখবো না ওর।

সেও আমার দিকে এগিয়ে আসে—ঘুষি বাগিয়ে। বাঘের মত তার ঘাড়ের ওপর আমি লাফিয়ে পড়ি। মারের চোটে গদাই ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে। খন্‌খন্‌ করে ভেঙে পড়ে। খান্‌খান্‌ হয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়—আমার চোখের সামনেই।

আমিও কম মার খাইনি। গা হাত পা কেটে কুটে একাক্কার! রক্তারক্তি কান্ড!

ছি ছি! ছবির দোকানে লোকে ছবি দেখতেই যায়, প্রতিচ্ছবি নয়। সেখানে দরোজার মত অতবড়ো আয়না রাখার কোনো মানে হয়?

সুশীল রায়

এক কালে এই রাস্তা ছিল নির্জন আর নীরব। সে বেশি দিনের কথা নয়। কিন্তু এখন এ অঞ্চল লোকে লোকারণ্য, কলরবে মুখর। এই কোলাহল ভেদ করে দূরাগত কোনো ধ্বনি এখন আর শুনতে পাই নে। মনে হয় যেন ম'রে আছি, দূরত্ব নির্বাসিত করেছে আমাকে। তার সঙ্গে সব সম্বন্ধ যেন চুকে গেছে একেবারে, কোনো রকমের আত্মীয়তা আর নেই।

এ ধরণের জীবনকে নেহাতই বন্দী জীবন বলে ঠেকে। এ অনেকটা নিজের ঘরের সব ক'টা দরজা-জানালা বন্ধ করে নিজেকে আটক করে রাখারই সামিল। দম এতে বন্ধ হবারই কথা। সত্যি বলতে কি, আমার নিশ্বাস এতে আটকে আসে। এই কলকোলাহলদের যদি মুখ চেপে ধরতে পারি দু হাতে, তাহলে দূরের আহ্বান কিছুটা অন্তত শুনতে পাব হয়তো।

কলরবের বেড়া-ঘেরা এই সংকীর্ণ সংসারের এক নগণ্য জীবরূপে জীবনধারণ করে চলেছি। যাঁরা স্তব্ধতার অতল অগাধে ডুবে অন্তহীন আরাম উপভোগ করছেন, তাঁরা আমাদের মত জীবদের প্রতি করুণা প্রকাশ করতে পারেন;' বস্তুতপক্ষে আমরা করুণারই পাত্র।

ঢাকের বাজনা নাকি থামলে মিষ্টি। আমিও উৎকণ্ঠ হয়ে দিনের পর দিন কাটিয়ে চলেছি, কবে সেদিন পাব যেদিন এই কলরবদের ডেকে বলতে পারব যে—তোমরা সত্যিই উপভোগ্য। আমার মুখের এ সুখ্যাতি শোনার জন্যে তাদের বিন্দুবিসর্গ আগ্রহ অবশ্য দেখতে পাচ্ছিনে। কোলাহলেরা একটানা কলরব করেই চলেছে।

হাল তাই ছেড়ে দিতে হল। কিন্তু হঠাৎ একদিন এসে গেল এক পরম সুপ্রভাত। কাছেরা সব সেদিন বোবা হয়ে গেছে, দূরেরা গম্ভীর গলায় ডাক দিয়েছে আমাকে। উৎকর্ণ হয়ে উঠে বসলাম। বহুদিন আগের এ যে চেনা গলা—যে দিন এ দিকটা ছিল নির্জন আর নীরব; আজ হঠাৎ যেন সেই দিনেরা তাদের পুরাতন পল্লীকে নাম ধরে ডেকে উঠেছে।

বহু নদ, বহু নদী, আর অগণ্য সমুদ্রের ওপারে বুঝি চলে গিয়েছিল সেই দিনেরা। বন্দরে বন্দরে হোঁচট খেয়ে আজ আবার তারা ফিরে এসেছে তাদের স্বদেশে। স্বদেশের কিনারে এসে ফেলেছে তারা তাদের নোঙর।

তাদের আজের এই আহ্বান যেন সেই নোঙরেরই গান। পরম আরামের আর চরম পরিতৃপ্তির ধ্বনি এই আহ্বানে জড়ানো। দূরাগত এই ধ্বনি শুনে আমার আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এই প্রবল আনন্দকে দু হাতে কিভাবে চেপে ধরে রাখব, ঠিক করে উঠতে পারলাম না। যে দুই হাতে কোলাহলদের গলা চেপে ধরব বলে একদিন ভেবেছিলাম, ঠিক সেই দুটি হাতই আজ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তাদের আলিঙ্গন করার জন্যে।

এখন ভোর। চার দিকের কলরবেরা এখন ঘুমে অচেতন, তারা বোবা হয়ে পড়ে আছে সামনের ওই পিচ-ঢালা চকচকে রাস্তায়, শিশিরে-ভেজা ওই ঘাসের বিছানায়, সিমেন্ট-করা রোয়াকে-রোয়াকে। ইচ্ছে হল, থাক ওরা নিদ্রিত, না জানতে পারুক ওরা আমার আন্দোচ্ছ্বাস, ওদের ওই ঘুমন্ত শরীরের ওপরই ছড়িয়ে দিয়ে আসি আমার আলিঙ্গন। আজ তারা মূক হয়ে মুগ্ধ করে দিয়েছে আমাকে, কৃতার্থ করে দিয়েছে আমার তপস্যাকে। ওদের কল্যাণেই আমি শুনতে পেয়েছি এই নোঙরের গান। এ কেবল ওদের কল্যাণেই নয়, ওদের কৃপাতেও।

ভোরের বাতাসে ভর করে ভেসে এসেছে জাহাজের বাঁশি। এ-বাঁশির আওয়াজ বংশীধ্বনির মত সুরসাল ও সুরেলা না হতে পারে, কিন্তু ওই গুরুগম্ভীর স্বরে উদাত্ত আহ্বান শোনা গেল স্পষ্ট। বলতে সংকোচ নেই, আমি ওই শব্দে অভিভূত হয়ে

গেলাম। মনে পড়ল কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা, কত তুফান, কত তরঙ্গ অতিক্রম করে এসে সে এখানে নোঙর ফেলে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

আমার এ কামরা থেকে সমুদ্র অনেক দূরে। সমুদ্রের বাঁশি এত দূর পর্যন্ত আসতে পারে না। মোহনা ডিঙিয়ে যে জাহাজেরা গঙ্গার বুকে এসে নোঙর ফেলে, এ গলার স্বর তাদেরই একজনের। কোনো দিন চাক্ষুষ দেখা হয় নি এদের কাউকে, কেবল তাদের ওই গুরুগম্ভীর গর্জন-গানের সঙ্গেই আমার পরিচয়। কিন্তু সে পরিচয়টাও ধীরে ধীরে মুছে যাবার উপক্রম হয়েছিল। আজ হঠাৎ এই নির্জন ভোরে ঘুম ভাঙতেই আহ্বান শুনলাম ওই জাহাজের বাঁশির। এ যেন ঠিক বাঁশি না, এ যেন সমুদ্রের স্বপ্ন আর তরঙ্গের স্বাদ বাঁশি হয়ে বেজে উঠেছে।

ওরা নোঙর ফেলে নিশ্চিন্ত হয়েছে। ক্লান্তির পরে তারা ঘাঁটি নিয়েছে বিশ্রামের। তারা অবসাদের হাই তুলছে বলে মনে হতে লাগল আমার। সপ্ত সাগর পাড়ি দিয়ে ওরা পরিশ্রান্ত হয়েছে, কিন্তু আমার এ অবসাদ কিসের এই কথাই কেবল মনে পড়তে লাগল। জনতার সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা অনেকে করে থাকেন, এই জনসাগরে সাঁতার কেটে আমিও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি কিনা, ভেবে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম। এ সমুদ্রে ঝড়-ঝঞ্ঝা-তুফান-তরঙ্গের অভাব থাকার কথা নয়,—হয়তো সেই তরঙ্গের আঘাতে আমি বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকব, হয়তো তারই জন্যে আমারও এই অবসাদ।

যদি এ কথা প্রকাশ্যে বলি তা হলে জনতার তরফ থেকে প্রতিবাদ হওয়া অসম্ভব নয়। তারা বলতে পারে, জনতার আমি কেউ নই, তাদের তরঙ্গে আমি কোনো দিন নিক্ষিপ্তও হই নি, বিক্ষিপ্তও হই নি; আমার এ আক্ষেপ আমার নিজেরই তৈরি। ওই জনতার মধ্যে যদি নির্বিবাদে মিশে যাওয়া যেত, তা হলে এসব বিলাপ করতে হত না আমাকে। ঢেউয়েদের মধ্যে যেমন থাকে অগণিত বুদ্বুদ, আমাকে তারা সেই সব বুদ্বুদের মধ্যের একটি বলেই হয়তো গণ্য করবে। এজন্যে জনতার ওপর দোষারোপ করা চলে না। কেননা, তাদের এ বিচার যুক্তিহীন নয়।

ঢেউ হয়েও আমি জনসমুদ্রে ভাসি নে কখনো, ঢেউয়ের সওয়ার হয়েও জাহাজী মেজাজে সমুদ্রমন্থন করি নি কোনো দিন। যদি ঢেউয়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আমার থেকে থাকে তাহলে আমি নিছক বুদ্বুদই। কিনারে এসে নিত্যনিয়ত সর্বপ্রথম আছাড় খেয়ে পড়ি, সর্বপ্রথম ফেটে চৌচির হয়ে যাই, কিন্তু তবুও ফেনার হাসিটা কখনো ছাড়তে পারিনে।

কিন্তু এ হাসিটা যে নেহাতই ফাঁকি আর ভুয়ো—একথা বিশ্বাস করাই কী করে, এই এক সমস্যা। যারা ঢেউয়েদের পিঠে চড়ে বিশ্ববিজয় করে ঘুরে বেড়ায়, তারা তো সকলের আগেই এ কথা বিশ্বাস করবে না। কেননা, তারা প্রত্যহ চাক্ষুষ এই হাসির মালা প্রত্যক্ষভাবে দেখে দেখে অভ্যস্ত। তারা দেখেছে প্রত্যেক ঢেউয়ের গলায় গলায় এই হাসির হার জড়ানো।

কিন্তু সত্যি কথা কি জানেন? জল-সমুদ্রই হোক আর জন-সমুদ্রই হোক—কোনো সমুদ্রেরই হাসি হয়ে ঘুরে বেড়াতে আর পারা যাচ্ছে না। এবার একটু যেন বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছে, প্রয়োজন হয়েছে একটি নোঙরের। এমন একটা নোঙর, যার গলায় জড়ানো আছে মজবুত শেকল। ঢেউয়ের গলার মালা তো হওয়া গেল অনেক দিন ধরে, এবার নোঙর চাই এবং চাই তার গলায় বাঁধা একটা মোক্ষম হার। নির্লিপ্ত আরামে যাতে পারা যায় প্রাণ ভরে একটু হাই তুলতে।

ভোরের এই বাতাসটা আজ বড় মিষ্টি ঠেকছে। আর মিষ্টি ঠেকছে দূর থেকে ভেসে আসা ওই নোঙরের গানটা। চুপ চাপ সেই শব্দ শুনছি। থেকে থেকে বেজে উঠছে ওই বাঁশি। এ বাঁশি কোনো সংকেত নয়, কোনো হুঁশিয়ারি নয়, এ হচ্ছে অকারণে গর্জে গর্জে ওঠা। ছুটন্ত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুটন্ত জলের মত যা টগবগ করে ওঠে, সেই অগাধ সমুদ্রের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে বিপন্ন গলায় কাউকে ডাকা এ নয়, বিষণ্ণ আর্তনাদও এ নয়, এ শব্দটা নেহাতই অবান্তর। অবান্তর বলেই হয়তো এত ভালো লাগছে এখন। সে নোঙর ফেলেছে, নিশ্চিন্ত হয়েছে, বন্দরে পৌঁছে তার যাত্রার শেষ হয়েছে—এ সেই পরিতৃপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসের ধ্বনি।

মনে হল, ওই ধ্বনির সঙ্গে নিজের কণ্ঠধ্বনিটা মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া যায় কি না, তা দিতে হলে আমাদের এই জনসমুদ্র থেকে পালিয়ে আসতে হবে একধারে, একটা মোহনা খুঁজে বার করে নিতে হবে। দেখতে হবে, কোন গলি-পথ পাওয়া যায় কি না। সেই নিরালা পথে সন্তর্পণে নিজেকে টেনে নিয়ে আসতে হবে। যেমন এসেছে ওই অচেনা জাহাজ গঙ্গার সুড়ঙ্গ দিয়ে শান্ত সলিলের নিরালায়।

জনের অরণ্যের একধারে তাহলে বাঁধতে হবে একটি ডেরা! পালিয়ে চলে যেতে হবে তাহলে একটি সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে? সেখানে গিয়ে ফেলতে হবে নোঙর? কিন্তু এই প্রস্তাবে সায় দেওয়া যাচ্ছে না। পলায়ন করে পরিত্রাণ প্রার্থনা যারা করে, তারা হয়তো পেতে চায় এমনি একটা নিরালা নিভৃতি। তার চেয়ে যদি পাওয়া যায় একটা মোক্ষম নোঙর, তাহলে এই জনসমুদ্রের মাঝেই নিজেকে বেঁধে রাখা যেতে পারে মজবুত শেকল দিয়ে।

মধ্যসমুদ্রে যখন ঝড় ওঠে, তখন জাহাজের বিপন্ন নাবিকেরা আর্তনাদ করে কি না জানি নে, কিন্তু তারা নাকি চারদিকে পাঠায় সঙ্কেত। এ সঙ্কেত হয়তো পাঠাতে হত না, যদি তার হেফাজতে থাকত এমন একটি নোঙর, যা দিয়ে সে নিজেকে সমুদ্রের বুকের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখতে পারত। তা তার নেই, তাই সে সমুদ্র থেকে পালিয়ে একটা জলের গলি দিয়ে চলে আসে নিভৃত একটা সঙ্কীর্ণ জীবনের কিনারে এবং এখানে বেঁধে রাখে নিজেকে।

এমন সঙ্কীর্ণ পরিবেশে নিজেকে বাঁধবার ইচ্ছে আমার নেই; এই জনারণ্যের মাঝখানে যাতে নিজেকে আবদ্ধ করতে পারা যায়, তার অনুরূপ একটি নোঙরের সন্ধান তাই করে চলেছি। ঝড়-জল-কলরব-কোলাহল ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে, আমি যেন তার মধ্যে নিজেকে অটল আর অচল করে রাখতে পারি।

আজের ভোরটা সার্থক বলে ঠেকছে। পরিতৃপ্তির দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত শুনতে পাচ্ছি ওই বাঁশির আওয়াজ। এ-ধ্বনিটা আমার কাছে আর কিছু না, এ একটা সঙ্কেতমাত্র বলে বোধ হল। মনে হল, আমি যেন এই ভোরে নিজেকে এখানে সমর্পণ করেছি একটি নোঙরের হাতে।

দাতব্য চিকিৎসালয়

সরলাবালা সরকার

কৃষ্ণনগরের হাসপাতালটির নাম ছিল দাতব্য হাসপাতাল। স্থানীয় লোকের চাঁদাতেই এই হাসপাতাল চলিত। পাঁচ টাকা, দু টাকা, এমনকি চার আনা আট আনা চাঁদাও তাগাদা দিয়া সংগ্রহ করিতে হইত। অবশ্য সরকারী সাহায্যও যে একেবারে ছিল না এমন নয়। সরকারী বেতনভুক ডাক্তারের সাহায্য তাহার মধ্যে একটি বিশেষ সাহায্য।

আমার দাদা ডাক্তার সরসীলাল সরকার এই হাসপাতালে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার রূপে যখন কৃষ্ণনগর আসেন, তাঁহার আগে যে ডাক্তারটি ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর-বাবু। তিনি রোগকে অত্যন্ত ভয় করিতেন এবং রোগীরাও তাঁহাকে ভয় করিত। 'তফাৎ, তফাৎ' এই ধ্বনির সঙ্গে তিনি হাসপাতালে পদার্পণ করিতেন এবং যতদূর সম্ভব রোগী-দের সহিত দূরত্ব বজায় রাখিয়া রোগ পরীক্ষা করিতেন, রোগীরা তাঁহার নিকটস্থ হইতে সাহসই করিত না। এইভাবে প্রায় তিন বৎসর হাসপাতালের কাজ চলিয়া আসিতেছিল।

কিন্তু 'প্রতিক্রিয়া' বলিয়া একটি কথা আছে। নূতন ডাক্তার আসিবার মাসখানেকের মধ্যেই রোগীদের সাহস এত বাড়িয়া গেল যে, ডাক্তারবাবুর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে কেহ কেহ তাঁহার পোষাক বা হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেও ইতস্তত করিত না, অবশ্য এই দুঃসাহসীরা অধিকাংশই রোগিণী এবং পল্লীগ্রাম হইতে আগত।

দাতব্য হাসপাতালে যাহারা সাহায্যপ্রার্থী তাহারা অবশ্য ধনী নয়, তবে কাহারও কাহারও অবস্থা হয়তো সামান্য কিছু স্বচ্ছল ছিল। তাই মাঝে মাঝে রোগ আরোগ্য হইলে বাড়ি যাইবার সময় তাহারা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারে আসিত কিছু উপহার লইয়া। হয়তো এক ভাঁড় গাওয়া ঘি কি একটি মানকচু বা এক হাঁড়ি দই। এক দিন এইরূপ একটি রোগী এক ভাঁড় গাওয়া ঘি যখন উপহার দিতে আনিয়াছে, তখন দাদা বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন, "কি সর্বনাশ, গৌরী, ও করছিস্ কি? নিসনে, ওর কাছ থেকে ঘি নিসনে।"

ঘিয়ের সুগন্ধে আমার বেশ একটু লোভ হইয়াছিল, ফিরাইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ফিরাইয়া দিতেই হইল। দাদা বলিলেন, "তুই যদি এক ভাঁড় ঘিয়ের লোভ ছাড়তে না পারিস্, তবে কম্পাউন্ডার যখন দাবী করে বসবে, দু ভাঁড় না হলে সে ভাল ওষুধ দেবে না, তা হলে তাকে কি কোন দোষ দেওয়া যায়?"

এ কথার উত্তরে বলা চলিত, "লোকটি খুশী মনে ইচ্ছে করেই যখন দিচ্ছে"— কিন্তু সে উত্তর আমি দিতে পারিলাম না। "খুশী মনে দিচ্ছে" ইহা আমি কি করিয়া বুঝিতে পারিব!

ডাক্তারের কোয়ার্টার হাসপাতালের খুব কাছে। ভাঁড়ার ঘরের জানালা হইতে হাস-পাতালের সম্মুখের কম্পাউন্ড দেখা যায়, আর দেখা যায় সকালে পথ দিয়া চলিয়াছে তীর্থযাত্রীর মত হাসপাতাল-যাত্রীর দল। মেয়ে, পুরুষ ও ছোট ছোট ছেলে দলে দলে চলিয়াছে। সকলেরই হাতে পাকানো সুতার দড়ি গলায় বাঁধা এক একটি শিশি বা বোতল ঝুলিতেছে। প্রায় প্রত্যেক মায়েরই কোলে একটি শিশু, সাত আট মাস হইতে বছর দুই বয়সের। আর একটি ছেলেও হয়তো মায়ের হাত ধরিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে, তাহারও হাতে একটি শিশি। শীতকালে দোলাই কি কাপড়ের টুকরো ছেলেদের গায়ে জড়ানো, ঘাড়ের দিকে গিঁট দিয়া বাঁধা। গরমের সময় কাপড়-চোপড়ের কোন বালাই নাই। পদচারী দলের মধ্যে দুই একটা ছই ঢাকা গরুর গাড়িও দেখা যাইত।

আমি জানলায় বসিয়া প্রতিদিনই এই দৃশ্য দেখিতাম, দেখিয়া দেওঘরের তীর্থযাত্রী দলের কথা মনে পড়িত। না জানি কত দূর হইতে উহারা আসিতেছে, হাসপাতালই উহাদের বাঞ্ছিত তীর্থ, এইখানেই উহাদের যন্ত্রণা ও রোগ দূর করিবার পরমৌষধি রহিয়াছে।

দাদার উপর হিংসা হইত, ভাবিতাম— দাদা কি ভাগ্যবান। এতগুলি লোক আসিতেছে তাঁহারই কাছে, কত আশা, কত বিশ্বাস লইয়া। আর তিনি? তিনিও কি ইহাদের স্বস্তি দিয়া, রোগ আরোগ্য করিয়া মনে অপূর্ব আনন্দ অনুভব করেন না?

একদিন দাদার কাছে এইভাবের কথা তুলিলে তিনি বলিলেন, 'রোগীকে আরাম করতে পারলে ডাক্তার অবশ্য খুশীই হয়, কিন্তু যদি না সারাতে পারে,—তখন? আরামবাগে আমাকে একবার রোগী দেখাতে ডেকেছিল। অবস্থা তাদের খুবই খারাপ, চারটি কি পাঁচটি ছেলেমেয়ে, বাবা সামান্য চাকরী করে, জমিজমা কিছুই নাই। একটি পাঁচ ছয় বছরের ছেলের প্রবল জ্বর, একে-বারে অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছে। ছেলের বাবা বললে,—পাল্কী পাওয়া গেল না, ডাক্তারবাবু কিসে করে যাবেন? তার চোখে মুখে যে কি মিনতি তোকে বুঝাতে পারবো না। আমি তার সঙ্গে হেঁটেই চললাম, অবশ্য খুব বেশী দূর নয়।

গিয়ে দেখি কি ঘরের মধ্যে মা সেই ছেলে কোলে করে' বসে' আছে। আরও দু চারটি ছেলেমেয়েও আছে ঘরের এ পাশে ও পাশে। আমাকে দেখেই ছেলের মা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো, আর্তনাদ করে বললে—'বাঁচাও বাবা, আমার ছেলেকে বাঁচাও। না বাঁচালে আমি তোমাকে ছাড়বো না।' ছেলে কোলে নিয়েই সে দুম্ দুম্ করে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে লাগলো। যেন একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছে।

আমি বললাম,—'আস্তে আস্তে ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দাও, নাড়াচাড়া কোর না।' শুনেই সে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, 'না! না! আমি কোল ছাড়া কোরবো না, কোল ছাড়া কোরবো না। মায়ের কোলে থাকলে যমেও নিতে পারে না।' আর স্বামী মিনতি করে বললে—'ডাক্তারবাবুর কথা শোন্, ও'র কথা যদি না শুনিস, উনি ছেলেকে বাঁচাবেন কি করে?' শুনে সে আবার চেঁচিয়ে উঠলো, 'তুমি চুপ কর! তুমি আর কথা বোল না। 'এতগুলো ছেলে, এতগুলো ছেলে' বলে দিনরাত আমাকে গঞ্জনা দিতে,

এখন—এখন কি হল? তোমার জন্যই তো ছেলে আমার মারা যাচ্ছে, তুমি যে বলতে 'হতভাগারা দু' একটা যদি মরে, তাও তো একটু হালকা হয়' এখন,—এখন তো হালকা হ'তেই বসেছে। তোমারই মনস্কামনা তো পূর্ণ করেছেন ভগবান।'

—বলিতে বলিতে দাদার গলা ধরিয়া আসিয়াছে, একটু স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—'সে ছেলেটি বেঁচে গিয়েছিল, যদিও বাঁচবার কোন আশা ছিল না। পেটে তার অনেকগুলো বড় বড় কৃমি, তাতেই সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। ওষুধ দিয়ে কৃমি বার করতে গেলে হয়তো সে ধাক্কা সামলাতে পারবে না, নাড়ি বিষম দুর্বল। তবু ওষুধ দিতেই হল, কৃমি যত বের হয়ে আসে ততই নাড়ি খারাপ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত 'গেল, গেল' করে কোন রকমে বেঁচে গেল। যদি মারা যেত, সকলেই বলতো, ডাক্তারের ওষুধেই ছেলে মারা গেল। এ রকম কথা ডাক্তারকে শুনতেই হয়। আর, আমার মনেও তো বেশ ধাক্কা লাগতো।'

দাদা সেই সঙ্গে এ কথাও বলিলেন, "আরামবাগের ম্যালেরিয়া ভারী সাংঘাতিক। দেখতে দেখতে জ্বর উঠে যায় ১০৬।১০৭ ডিগ্রী। কিন্তু তবু নদীয়া জেলার মত হুগলী জেলায় অত লোক ম্যালেরিয়ায় মরে না। মরে না কেন জানিস? সকলের ঘরেই সেখানে ধান চাল আছে। সকালে উঠে চাষী মাঠে কাজ করতে যায়, এক রেক চালের মুড়ি সঙ্গে নিয়ে যায়। কাজ সেরে ফিরে এসে তারা যতগুলি ভাত খায় নদীয়া জেলার সে চার পাঁচজনের খোরাক। ঐ ভাতের জোরেই অনেকে বেঁচে যায়। কিন্তু এখানে লোক যে ম্যালেরিয়াতেই মরে এটা সত্য কথা নয়। এ বছর এ জেলায় মারা গিয়েছে প্রায় এক লাখ লোক, আর মারা গেছে পেটভরে খেতে না পাওয়ার জন্য।"

তারপর তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এতগুলো লোক শুধু শুধুই মারা গেল, যদি যুদ্ধে মারা যেত, তা হলেও কিছু কাজ হ'ত।"

কৃষ্ণনগর আর তার কাছাকাছি সমস্ত জায়গাতেই ভয়ানক বাঁদরের উৎপাত। বাঁদরেরা হাসপাতালের পাঁচিলের উপর আসিয়া বসিয়া থাকে—তাড়াইলেও যাইতে চাহে না, কেননা হাসপাতালের সম্মুখের পথটিতে রকমারী খাবারওয়ালার আমদানী হয়। রুটি, বিস্কুট, কাবুলি মটর, চানাচুর পাঁপরভাজা প্রভৃতি। এইসব খাদ্য রোগীদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইলেও রোগীরা সুবিধা পাইলেই কিনিয়া খায়। রোগীদের ফটকের বাহিরে যাইবার হুকুম নাই, তাই তাহারা হাসপাতালের চাকরকে দু' এক পয়সা ঘুষ দিয়া খাবার কিনাইয়া আনে। আবার ড্রেসার ও কম্পাউন্ডার ইহারাও দুই পক্ষ হইতেই কিছু কিছু পয়সা আদায় করে, অবশ্য ইহা শোনা কথা।

একদিন সন্ধ্যার সময় একটি বছর দশের ছেলে বমি করিতে আরম্ভ করিল। ম্যালেরিয়াজনিত শোথে তাহার পা ফুলিয়াছিল ও পেটের অসুখও ছিল। কিন্তু দেখা গেল বমির সঙ্গে আস্ত আস্ত ছোলা উঠিয়াছে, চুরি করিয়া সে ঘুঘ্নি খাইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সে তো বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কে তাহাকে ঘুঘ্নি কিনিয়া আনিয়া দিল?

দাদা ভয়ানক বকাবকি আরম্ভ করিলেন, অবশ্য কেহই কিছু স্বীকার করিল না।

হাসপাতালে রোগীদের নির্দিষ্ট সিট খুবই কম ছিল। এ বিষয়ে দাদা আসিবার পর হইতে রিপোর্টের উপর রিপোর্ট যাইতেছিল, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। এদিকে রোগীর সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছিল। অনেকেই বলাবলি করিত, "দাতব্য হাসপাতালের উপর এত চাপ সইবে কেন। আগের ডাক্তারের আমলে কিন্তু এত রোগী ছিল না।"

কম্পাউন্ডার ও ড্রেসার মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস পায় না, কিন্তু উভয়েই ডাক্তারের উপর দারুণ অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্ট হইবার আরও একটি কারণ এই যে রোগীরা আবার আজকাল নালিশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আগে কি তাহাদের এত সাহস হইত?

আজকাল ডাক্তারের সুনামে আকৃষ্ট হইয়া দূর পল্লী গ্রাম হইতেও গাড়ী করিয়া রোগী আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। কাছাকাছি যে সব রোগীর বাড়ী তাহাদের বরং ফিরাইয়া দেওয়া চলে, কিন্তু দূর হইতে যাহারা আসিয়াছে, তাহাদের কি করিয়া ফিরানো যায়?

অবশেষে মেঝের বিছানা পাতিবার ব্যবস্থা করা হইল। কাঠ রাখিবার ছোট ঘরটিও তখনকার মত কাঠ সরাইয়া তাহাতে দুটি বেড্ করা হইল।

দাতব্য হাসপাতালে এ রকম ব্যবস্থা ইতিপূর্বে আর কখনো হয় নাই। ঘটনাটি অবিলম্বে পল্লবিত আকারে সিভিল সার্জনের নিকট গিয়া পোঁছাইল।

সে সময় সিভিল সার্জন ছিলেন শ্রীযুক্ত ভরত ধর। ইনি দাদাকে কতকটা সম্মান করিয়া চলিতেন। কিন্তু অভিযোগ যখন আসিয়াছে, তখন সে বিষয়ে উপরিওয়ালাকে খোঁজখবর লইতেই হইবে, তাই একদিন প্রত্যুষে তিনি আগে হইতে কোন সংবাদ না দিয়া হাসপাতাল পরিদর্শনে আসিলেন।

রোগীরা তখন প্রায় সকলেই বিছানায় শুইয়া আছে, শীতের দিন, কাজেই এত ভোরে কেহই উঠে নাই। সিভিল সার্জন দেখিলেন ঘরে ঢুকিতে গেলে বিছানা মাড়াইয়া যাইতে হইবে, কেননা দুয়ার পর্যন্ত সারি সারি বিছানা পড়িয়াছে।

ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া দাদা আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সিভিল সার্জন দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। মেঝের রোগীরা তখন তাড়াতাড়ি বিছানা গুটাইতেছে।

সিভিল সার্জন যে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা তাঁহার কথাতেই বুঝা গেল। তিনি বলিলেন, "ব্যাপার কি ডাক্তারবাবু? আপনার হাসপাতাল যে একেবারে মারোয়াড়ীদের ধর্মশালা হয়ে' উঠেছে। এমন করলে তো নিয়মকানুন কিছুই বজায় থাকবে না, রোগীদের স্বাস্থ্যও থাকবে না। আর জানেন তো, হাসপাতালটি হল দাতব্য হাসপাতাল, আয় বুঝে তো ব্যয় করতে হবে।"

দাদা অবশ্য একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন, হয়তো একটু রাগিয়াও গিয়াছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, "হাসপাতাল নামের তা হলে তো কোন মানেই থাকে না, যদি তার দুয়ার থেকে রোগী ফিরিয়ে দেওয়া হয়—আর সেই সব রোগীকে, যারা এসেছে অজ পাড়াগাঁ থেকে—যেখানে ডাক্তার কি ওষুধের নাম গন্ধও নেই। আর যারা এসেছে, একেবারে প্রাণের দায়ে, গাড়ীভাড়া দিতে যাদের ঘটী-বাটী বিক্রি করতে হয়েছে।"

দাদা আরও বলিলেন, "কয়েকদিন আগে গাড়ী ক'রে একটি চৌদ্দ কি পনেরো বছরের মেয়েকে নিয়ে এসেছিল, আধমরা অবস্থায়। মেয়েটি প্রথম অন্তঃসত্ত্বা, এক্লেমসিয়া হয়েছে। বাড়ীর লোকে প্রথমে ভূতের ওঝা ডেকেছিল, আর ওঝা ভূত তাড়াবার জন্য তাকে মারধোরও করেছিল, নাকে হলুদ পোড়া দিয়েছিল। তারপর এক ভদ্রলোক দয়া করে তাকে হাসপাতালে পোঁছে দিয়ে-

ছিলেন। এই রকম অনেক রোগীই আসে, যদি তাদের স্থানাভাবের জন্য ফিরিয়ে দিতে হয়, তাহলে 'চিকিৎসালয়' নামের কোন মানে থাকে কিনা, আপনিই সেটা ভেবে দেখুন।"

সিভিল সার্জন বিশেষ কিছু না বলিয়া ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু সমস্যা মিটিল না। নূতন নূতন ভাবে নানা সমস্যা দেখা দিতে লাগিল।

রোগীদের সকলের জন্য দুধের বরাদ্দ ছিল না, জনকতক বিশেষ বিশেষ রোগী ও শিশু রোগীদের জন্যই ছিল দুধের বরাদ্দ। একজন গয়লা হাসপাতালে বরাবর দুধের যোগান দিত। রোগীদের কেহ কেহ নালিশ করিল, দুধ একেবারে জলের মত। দাদা গয়লা ডাকাইলেন। গয়লা শুধু হাতে আসে নাই, বড় এক হাঁড়ি দই লইয়া আসিয়াছিল। ইহাতে দাদা বিরক্ত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "তোমাকে তো দইয়ের ফরমাইস দেওয়া হয় নি, শুধু শুধু এক হাঁড়ি দই কেন নিয়ে এসেছ?"

গয়লা একটু দমিয়া গেল। কিন্তু সে একজন ঝানু ব্যবসায়ী, সহজে হার মানিতে চাহে নাই, ঘাড় চুলকাইয়া ও ধমকের উপর ধমক খাইয়া অবশেষে স্বীকার করিল, দুধে অবশ্য সে জল মিশায়।. জল মিশানোই তাহাদের ব্যবসায়ের রীতি। তবে এক্ষেত্রে জল না মিশাইয়া তাহার উপায় ছিল না, কেননা তাহাকে কম্পাউন্ডার ও ড্রেসার বাবুর বাড়িতে বিনা পয়সায় নিয়মিত দুধের যোগান দিতে হয়, না দিলে তাহার হাসপাতাল হইতে নাম কাটা যায়।

ইহার পর সে আরও বলিল, "আমি আর কতটা জল দিই মশায়, রোগীরা খাবে,—আমার তো ধর্মভয় আছে। হাসপাতালে ঐ দুধ জল দিয়ে কতটা বাড়ানো হয় তার খবর যদি নেন তবে জান্‌তে পারবেন কেন দুধ জলের মত হয়।"

গয়লার সঙ্গে এই সব কথা আমাদের বাড়িতেই হইতেছিল, দাদা তখনই কি মনে করিয়া জানি না, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন, দইটা যেন না নেওয়া হয়।

ইহার পর ফিরিয়া আসিয়া দাদা যে সংবাদ দিলেন তাহা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। দাদা বলিলেন,—"আমি গিয়ে দেখি কম্পাউন্ডার ও ড্রেসার দুজনেই বড় বড় দুই গেলাস ভর্তি দুধ চুমুক দিয়ে খাচ্ছে। এখন তাদের টিফিনের সময়, আমি যে হঠাৎ গিয়ে পড়ব স্বপ্নেও তারা তা ভাবে নি।"

দাদাকে দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন এক অকূল পাথারে পড়িয়াছেন, কি করা উচিত তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। তিনি বলিলেন, "ওরা দু'জনেই ম্যালেরিয়া রোগী, আবার দু'জনেরই বাড়িতে অনেক পরিবার। মাহিনা যা পায় তাতে ওদের কিছুতেই কুলাতে পারে না। আমি আজই ওদের ছাড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু তারপর? এর পরে যাদের কাজে বহাল করবো, তারা যে চুরি করবে না, তারা যে ঘুষ নেবে না, তারা যে ঠিকমত কর্তব্য করবে, এ কথা কিসে প্রতিপন্ন হবে? দেখ্‌না তুই অঙ্ক কষে, জিওমেট্রি তো জানিস, প্রতিপাদ্যটা কি হয়।"

ইতিমধ্যে ভগবানের দয়ায় একটু সুবিধা হইল, এক রোমান ক্যাথলিক ইটালিবাসিনী এই দরিদ্র হাসপাতালে সেবাব্রত লইবার জন্য দাদার কাছে আবেদন করিলেন। অবিলম্বে সিভিল সার্জনের নিকট অভিমত সংগ্রহ করিয়া আবেদন মঞ্জুর করা হইল। সেবাব্রতী সিস্টারটি আনন্দিত হইয়া তাঁহার কর্তব্য বুঝিয়া লইলেন এবং সেগুলি তাঁহার নিয়মাবলীর খাতায় লিখিয়াও লইলেন।

মেয়েটির বয়স বেশী নয়, হাসি ও চাহনি একেবারে সরল শিশুর মত। আমার এই সেবিকাটিকে খুব ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণা, কাজেই অনর্থক সময় অপব্যয় করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না, তাই রবিবারে একবার মাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইত, এবং তাহাও অল্প সময়ের জন্য।

দাদা এদিকে টাকা জোগাড় করিবার নানা ফন্দী আবিষ্কার করিতেছিলেন। আমাকে বলিলেন, "চাঁদার হিসাবের ভার যদি তুই নিস্ তবে মাসে দশটা টাকা বেঁচে যায়। কি-ই বা এমন কাজ?"

কিন্তু আমি প্রথম মাসেই হিসাব মিলাইতে না পারিয়া কিছু টাকা নিজে দিয়া তহবিল ঠিক করিলাম। ইহাতে দাদার দোষও কিছু ছিল, যখন তখন দু চার আনা জমা করা সহজ নয়। যাহা হউক, দাদা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন না. বলিলেন, "প্রতিষ্ঠানটি যখন দাতব্য প্রতিষ্ঠান তখন দাতব্য খাতে সকলেরই কিছু কিছু খরচ করা উচিত ইচ্ছায় হোক্ বা দায়ে পড়িয়াই হোক্।"

ডেপুটি বাবুর সহিত দাদার বন্ধুত্ব ছিল, মনে হইতেছে, তাঁর নাম ছিল নরেনবাবু। দাদা তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি যে সব টাকা জরিমানা আদায় করেন, তা হাসপাতালের ফণ্ডে জমা দেওয়ার জন্য একটি নিয়ম করুন। বেতমারা দন্ডটি তুলে দিন, তার পরিবর্তে জরিমানা যতটা পারেন আদায় করুন।" আরও বলিলেন, "যাঁর যাঁর ঘরে বন্দুক আছে তাঁদের প্রত্যেকেই বন্দুকের খাতে হাসপাতালে কিছু যেন দান করেন এ রকম ব্যবস্থা করে দেখুন না ফল কি রকম হয়।"

ইতিপূর্বে দূর পল্লীগ্রাম হইতে যে মরণাপন্ন বুড়িকে তাহার দেওরের ছেলেরা হাসপাতালে রাখিয়া গিয়াছিল তাহার ভর্তি হইবার ছয়মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাকে হাসপাতাল হইতে সরাইবার জন্য সিভিল সার্জন মহাশয় একাধিক বার তাগিদ দিয়াছেন। ইহা লইয়াও দাদা এ সময় বিষম বিপদে পড়িয়াছেন, কেননা, বুড়ি কিছুতেই হাসপাতাল ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। অবশ্য সিভিল সার্জন বুড়ির কথা কিছুই জানিতেন না, হাসপাতালের লোকেরাই কথাটি তাঁহার কানে তুলিয়া দিয়াছে। তিনি সংবাদ লইয়া জানিলেন, বুড়ি এখন সুস্থ হইয়াছে, তবে কেন সে শুধু শুধু হাসপাতালে ঘরবাড়ি বাঁধিয়া থাকিবে তাহার কোন কারণই নাই।

আসল কথা এই যে, বুড়ি ছিল বড়ই কর্তৃত্বপ্রিয়। কে কি অন্যায় কাজ করিতেছে তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিতে তাহার এক তিলও বিলম্ব হইত না এবং প্রমাণের সহিত সেই ঘটনাটি ডাক্তারবাবু হাসপাতালে আসিলেই তাঁহাকে জানাইত। যেমন,—"বাবা, শুনেছো আজ হরি চাকরটা তার ও হাড়সার ছেলে বিছানা নোংরা করেছিল বলে' এমন আছাড় দিয়েছে যে, ছেলেটা ভিরমী গিয়েছিল। কি পাষাণ প্রাণ বাবা, ওরই তো নিজের ছেলে।" ইত্যাদি। এইরূপ নানাভাবের নালিস।

হাসপাতালের লোকেদের নিকট বুড়ির এই মুরুব্বিয়ানা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাই বুড়িকে বিদায় করিবার জন্য তাহারা সকলে জোট বাঁধিল।

কিন্তু বুড়ি তো হাঁটিতে পারে না, দু এক পা চলিতে পারে বটে—কিন্তু দু'চার ক্রোশ পথ কি করিয়া হাঁটিয়া বাড়ি ফিরিবে?

তাহার বাড়িতে খবর পাঠানো হইল কিন্তু কেহই তাহাকে লইতে আসিল না। বুড়ি বলিল, "ওরা আবার আমাকে নিতে আসবে? আমাকে বিদায় করে ওরা বেঁচে গিয়েছে। ঘরের জিনিসপত্র, গরু বাছুর সবই এতদিনে দখল করে নিয়েছে, বাড়ি ফিরে আর কি আমি সেখানে ঠাঁই পাব? দোহাই বাবা, যে কটা দিন বাঁচি এখানেই আমাকে পড়ে থাকতে দাও, না হয় আমি এক বেলা খাব।"

হাসপাতালের খরচেই গরুর গাড়ি করিয়া বুড়িকে বাড়ি পাঠানো হইল, কিন্তু যে লোক বুড়িকে পৌঁছাইতে গিয়াছিল সেই আবার সেই গাড়িতেই বুড়িকে ফিরাইয়া আনিয়া জানাইল যে, বুড়িকে তাহার দেওরের ছেলেরা বাড়ি ঢুকিতে দিল না; তাহারা বলিয়াছে যে, "যে মানুষ ছ' মাস হাসপাতালের ভাত খেয়ে এল তার কি আর জাত আছে? ওকে আমরা আর ঘরে ঢুকতে দেব না।'

বুড়ি এক গাল হাসিয়া দাদাকে যখন বলিল, "আবার ফিরে এলাম বাবা। আমি তো আগেই বলেছিলাম যে, তারা আর আমাকে জায়গা দেবে না। দু দুটো দুধালো গরু, চার পাঁচটা বাছুর, বাড়ি ঘর সবই এখন তারাই ভোগ দখল করছে।" দাদা তখন বুড়ির কথার উত্তর না দিয়া চলিয়া আসিলেন। বাড়িতে আসিয়া আমাকে সংবাদটি জানাইয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল যে, যে লর্ড কারমাইকেল কৃষ্ণনগর আসিতেছেন। চারিদিকে "সাজ্ সাজ্" রব উঠিল। সিস্টার হাসপাতাল সাজাইতে লাগিল; দাদাকে যখন বলিল, "তোমাদের জাতীয় পতাকা ওড়াবে না? বিনা পতাকায় কি করে সাজানো হবে? উত্তরে দাদা বলিলেন, "আমাদের জাতীয় পতাকা ওড়াবার অধিকার নেই, আমরা যে পরাধীন জাতি।" এই উত্তরে সিস্টারের মুখ ম্লান হইয়া গেল। তাহার আর হাসপাতাল সাজাইবার উৎসাহ রহিল না।

খুব ঘটা করিয়া দরবার হইল। কৃষ্ণনগরের রাজবাড়িতে লেডী কারমাইকেলকে মহারাণী প্রমুখ মহিলাবৃন্দ সম্বর্ধনা জানাইলেন। ইহার পর দাদা আর বেশী দিন কৃষ্ণনগরে ছিলেন না।

ভিতরের খবরে যাহা জানা গেল, তাহা এইরূপ, শিকারপুরের ডাকাতি মামলায় স্বদেশী ডাকাত ছেলেরা অভিযুক্ত হইবার পর প্রথম দিনের শুনানীতে ডাক্তারের সাক্ষ্য নাকি গভর্নমেণ্টের অনুকূলে তো নয়ই বরং প্রতিকূলেই হইল।

এক তারবার্তায় গভর্নমেণ্টের দপ্তরে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, এই ডাক্তারকে অতঃপর বাঙলাদেশে রাখিলে সাম্রাজ্য বিপদাপন্ন হইবে।

মোকর্দমায় ডাক্তারের সাক্ষ্য লওয়া স্থগিত রাখা হইল এবং অল্পদিন পরেই তাঁহাকে সিভিল সার্জনের পদে উন্নীত করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটিতে বদলী করিয়া দেওয়া হইল।

এই পদোন্নতির সম্ভবতঃ একটি কারণ এই যে, ইহার কিছুদিন পূর্বেই এক রাসায়নিক বিস্ফোরকের আবিষ্কার করিয়া গভর্নমেণ্টের নিকট দাদা তাহার ফরমুলাটি পাঠাইয়াছিলেন এবং গভর্নমেণ্ট হইতে সেই সময় তাঁহাকে পদোন্নতির প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছিল। যদিও সুযোগ্যতার অনেক সুপারিশ সত্ত্বেও তাঁহার কর্মতালিকায় নামের পাশে কাল দাগের মার্কা দেওয়া ছিল।

স্বামী অখণ্ডানন্দ

শ্রীআশুতোষ মিত্র

স্বামী অখণ্ডানন্দ বা গঙ্গাধর মহারাজ শ্রীঠাকুরের দ্বাদশটি অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে একজন। তাঁহার ব্রাহ্মণ শরীর এবং তিনি অল্প বয়ঃক্রমেই শ্রীঠাকুরের নিকট আসেন। গঙ্গাধর মহারাজের সুললিত কণ্ঠে বিশুদ্ধ সংস্কৃত পাঠ শুনিবার যোগ্য জিনিস—বিশেষতঃ আয়ুর্বেদশাস্ত্র হইতে।

যখন ইং ১৮৯৮ সালে লেখক মঠে যোগদান করিয়াছিলেন, তখন স্বামী বিবেকনান্দ মঠে ছিলেন না—দার্জিলিং গিয়াছিলেন। দিন কয়েক পরে তিনি প্রত্যাগমন করিলে একদিন দ্বিপ্রহরে গঙ্গাধর মহারাজ লেখককে স্বামীজীর নিকটে লইয়া গিয়া তাহাকে ভ্রমণার্থে কোথায় গিয়াছে ইংরেজীতে লিখিতে বলিলে সে তাহার ছন্দ বা ভ্রমণ শ্লেটে লিখিয়া দেখায়। গঙ্গাধর মহারাজ সে লেখা পড়িয়া স্বামীজিকে শুনান এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রশংসা করিয়া কহেন, "কালো ছেলেটি কালে প্রচারক হইয়া উঠিবে। এই ১৮ বৎসর বয়সে এমন ভাল লেখে।"

গঙ্গাধর মহারাজ পরে লেখকের সঙ্গে কথা কহিতে থাকেন। "তুমি আমায় জান কি?" তিনি জিজ্ঞাসেন। সে উত্তর করে, "আজ্ঞে, আপনাকে সেইদিন শিয়ালদহ স্টেশনে প্রথম দর্শন করি, যেদিন স্বামীজী বজবজ হইতে স্পেশ্যাল ট্রেনে আমেরিকা হইতে আসেন আর আমরা ছেলের দল তাঁহার গাড়ি হইতে ঘোড়া ৪টি খুলিয়া দিয়া নিজেরা গাড়ি টানিয়া প্রথমে রিপণ কলেজে এবং পরে বাগবাজারে পশুপতি বসুর বাড়ি পর্যন্ত লইয়া যাই।" তিনি জিজ্ঞাসেন, "তা আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কি আর কি-ই বা জিজ্ঞাসা করেছিলে?" আমি "সারদা মহারাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীত) কোথায় আছেন" জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আপনি বলেছিলেন, স্বামীজিকে বজবজ থেকে আনতে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে এখানে এখনই আসবেন। তুমি তাঁর কে হও?" আমি বলেছিলেম—"তিনি আমার দাদা হয়েন।" স্বামীজি আমাদের সব কথা শুনিতে থাকেন।

গঙ্গাধর মহারাজ তিব্বতে লামাদের মঠে মঠে কয়েক বৎসর যাবৎ ঘুরিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই একজন লামা বলিয়া ভ্রম হইত। তিনি দার্জিলিং হইতে তিব্বতে প্রবেশ করেন এবং আসিবার কালে ভারতে ফিরেন কাশ্মীর দিয়া। কাশ্মীরে তাঁহাকে তিব্বতী লামা বলিয়া তথাকার পুলিশ ধরে। পরে স্বামীজির (স্বামী বিবেকানন্দের) সুপারিশপত্রে অব্যাহতি পান।

গঙ্গাধর মহারাজ মুর্শিদাবাদ জিলায় পরে একটি অনাথাশ্রম খুলেন এবং কয়েকটি অনাথ বালককে সুন্দরভাবে প্রতিপালন করেন।

বহু পরে তিনি মঠের ও মিশনের প্রেসিডেণ্ট হন।

সাহেব বিবির দেশে

নরেন্দ্র দেব

ইতালি-মানরেকো-জেনেয়ো-মিলান-পিয়া-রোম

আমাদের মোটরকোচ নীস থেকে মনাকো, মন্তেকার্লো, মেঁতোঁ হ'য়ে একেবারে থামলো এসে ইতালির সীমান্ত নগরী সানরেমোতে। এ তিনটি জায়গাই নীস থেকে পনেরো মাইলের মধ্যে। ফ্রান্সের সীমান্ত পার হ'য়ে ইতালিতে প্রবেশ করবার মুখে ভেঁতামেল উপকণ্ঠে পুলিশ এসে পরীক্ষা করলে আমাদের পাস-পোর্ট। শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা দেখলেন আমাদের বাক্স ব্যাগের মধ্যে কোনও নিষিদ্ধ বস্তু আছে কিনা? আপত্তিকর কিছু না থাকায় অনায়াসে মুক্তি পাওয়া গেল। এই কাস্টমস আর পাস-পোর্ট ব্যাপারটা কিন্তু ভ্রমণকারীদের পক্ষে বড়ই বিরক্তিকর। কখনো কখনো এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা সময় লেগে যায় এদের কাছে রেহাই পেতে। ফ্রান্সের সীমান্ত ভূমি ভেঁতামেল্ থেকে ইতালির এই প্রমোদপুরী 'সানরেমো' মাত্র এগারো মাইল দূরে। এখানে এসে আমরা ইতালিব লিরা ভাঙিয়ে নিলাম। পারিসে ফ্রাঙ্ক নোটের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল ঘাড়ে। এখানেও দেখি তাই! ওখানে হাজার ফ্রাঙ্কের নোটের তাড়া পকেটে করে ঘুরতাম, এখানে একেবারে দশ হাজার লিরার নোটে প্রমোশন পাওয়া গেল। ফরাসী টাকা এক ফ্রাঙ্কের দাম ছিল সিকি পেনি বা এক ফার্দিং, যা আমাদের দেশের এক পয়সা। ইতালির মুদ্রা এক লিরার দাম আধ ফার্দিং বা আমাদের দেশের আধ পয়সা মাত্র। চকচকে এলুমিনিয়মের শোলার মত হাল্কা লিরা মুদ্রাগুলি দেখতে মন্দ নয়।

সানরেমোর চেহারা দেখে আমরা হোম-সিক্ হয়ে উঠলাম। এত ভাল লাগলো যে, সেখানেই রয়ে গেলাম। এতো নগর নয়, যেন ফুলের বাগান! ফুল অবশ্য য়ুরোপের সর্বত্রই দেখেছি, কিন্তু এখানে যেন—'ফুলবনে লেগেছে ফাগুন!' প্রতি তরুলতা এখানে ফুলে ফুলে ফুলময়! সারা সান-রেমোয় ঘুরে বেড়ালাম পাগলের মতো! এখানে শুধু ফুলই নয়, কমলালেবু প্রভৃতি নানা সুস্বাদু ফলের গাছও রয়েছে। শাকসব্জীর ক্ষেতও প্রচুর। শোনা গেল, ইতালির এদিকটায় রীতিমত ফুলের চাষ হয়। এ অঞ্চলের লোকের ফুলের বেসাতিই প্রধান উপজীবিকা। কলকারখানার বালাই নেই। এখানকার পরিবেশটি বেশ ভাল ব'লে সৌখীন ও বিলাসী ধনীর দল অনেকেই এই সুশ্যামল স্নিগ্ধতার মধ্যে তাঁদের উদ্দত সৌধগুলি খাড়া করে তুলেছেন। যেগুলি নেহাৎই বেমানান হয়ে পড়েছে চারপাশের কমনীয় শান্ত সৌন্দর্যের মধ্যে। যারা এখানকার পুরুষানুক্রমিক অধিবাসী, তারা অধিকাংশই হয় দরিদ্র, নয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। আশে পাশে পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট ইটপাথরের অথবা কাঠের তৈরি স্বল্প ব্যয়ের সাধারণ বাসা বেঁধে বাস করে তারা। প্রত্যেক বাড়ির সামনে ও পিছনে কিছু কিছু জমি খালি রেখেছে। কেউ লাগিয়েছে তাতে সারিবন্দী খেজুর ও অন্যান্য ফলের গাছ। কেউ বা বুনেছে কড়াই শুঁটি, শালগম, গাজর, বীট-পালং; আবার কেউ বা ভরিয়ে তুলেছে সমগ্র গৃহাঙ্গন রং বেরংয়ের গোলাপ ফুলে।

সেই ফল ফুলের বাগানের মধ্যে আবার ছোট ছোট জলাশয় তৈরি করে রেখেছে। সিমেন্টের তৈরি অতি সুদৃশ্য বৃহদাকৃতির চৌবাচ্চা সেগুলি। কোনওটা ডিমের আকারে, কোনওটা গোল, কোনওটা বাদামী, ছ'কোণা, আট কোণা নানা আকারের। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও বেশ একটি সামঞ্জস্য আছে। দেখে বোঝা যায়, আমরা কোনও শিল্পীদের দেশে এসে পড়েছি। এখানে ফুলের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে তরুণী মেয়েরা আর সুকুমার শিশুরা। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে এরা রাখে বড় আদরে। ঠাণ্ডা দেশ। গরম কাপড় জড়াতে হয় প্রায় সকলকেই। দরিদ্র বাপ মা নিজেরা হয়ত তেমন শীতবস্ত্র সংগ্রহ করতে পারেননি, কষ্ট করেই আছেন; কিন্তু, ছেলেমেয়েদের যথাসাধ্য আরামে রেখেছেন তাঁরা। প্রায় সবারই গায়ে বেশ সুদৃশ্য ও সুরঙিন পোষাক। দারিদ্র্যের

স্যান রেমো
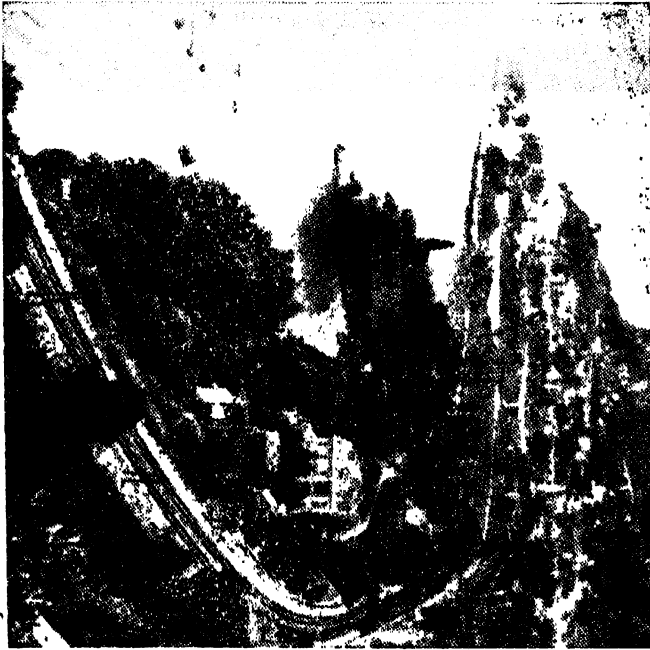
ভূমধ্যসাগর তীরে ইতালির রেলপথ

মধ্যে এটা একটু চোখে পড়ার মত ঠেকেছিল। এটা কি তাদের ভবিষ্যৎ জাতিকে রক্ষার প্রাণপণ প্রয়াস?

উত্তর ইতালির নিচের দিকটায় ভূমধ্য-সাগরের সমগ্র তীরভূমিই সৌন্দর্যে ভরা। তাই এসব স্থান বড় জনপ্রিয়। ছুটি পেলেই ছুটে আসেন এখানে অনেকেই, অবসরের দিনগুলি বিনোদনের মধ্যে যাপন করতে। এদিকে একেবারে জলের ধার পর্যন্ত পাহাড় নেমে এসেছে। কতরকমেরই না গাছপালার ঝোপ তাকে সুদৃশ্য করে তুলেছে। সাগর কিনারা ধরে চলেছে বৈদ্যুতিক ট্রেন কত দুর্ভেদ্য পর্বতের বক্ষ ভেদ করে। বড় বড় সব টানেলের ভিতর দিয়ে তারা যাতায়াত করে প্রকৃতির বাধাকে তুচ্ছ করে। এই পথে ফ্রান্সের মানুষ আসে ইতালিতে, আর ইতালির মানুষ যায় ফ্রান্সের দিকে।

সানরেমোর সমুদ্রতীরে খানিকটা পথ ফুটপাথের মতো নানা বর্ণের ইতালীয় টালি দিয়ে বড় চমৎকার ক'রে বাঁধানো আছে। অনেকেই এখানে বেড়াচ্ছেন দেখলাম। ধারে ধারে বসবার নানারকম ব্যবস্থা আছে। সারি সারি ফুলগাছের টব সাজানো। কতরকম কেয়ারী করে মরশুমী ফুলের চারা বসিয়েছে। নানা রংয়ের পাথরকুচি দিয়ে রকমারী কায়দায় কেয়ারীগুলি সাজানো। দেখে মনে হয়, যেন কোনও বড় বাগান-বাড়ির বিশাল ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছি। সুন্দর সুন্দর সব মর্মরমূর্তি মাঝে মাঝে বসানো রয়েছে। দুই চোখ জুড়িয়ে যায় তাদের আশ্চর্য রূপ দেখে। খেজুর গাছকে আমরা কত না অবহেলার চক্ষে দেখি। এদেশে সেই খেজুর গাছের আদর দেখে অবাক হতে হয়। সত্য কথা বলতে কি, সমুদ্রতীরের এই পাথর বসানো রঙিন পথের ধারে ধারে এক সারিতে বসানো সেই খর্জুর বীথিকা এত সুন্দর লাগছিল যে, বলা যায় না। খেজুর গাছও কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ ও উপযুক্ত পটভূমিকা পেলে যে শিল্পীর ধ্যানের কল্প-বৃক্ষ হয়ে ওঠে, সেটা প্রত্যক্ষ করলাম এখানে এসে।

এখানে একটিমাত্র 'ক্যাসিনো' আছে। শোনা গেল, ইতালি সরকার নাকি জুয়া খেলার প্রশ্রয় দিতে নারাজ। সমগ্র ইতালির মধ্যে এযাবৎ দু'টি ক্যাসিনো রাখতে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য জুয়া খেলার প্রসার এতে বন্ধ হয়নি। এরা জন্ম-জুয়াড়ী, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি অনুমোদিত বাজী খেলা ছাড়াও এরা শেয়ার-মার্কেট, খেলার মাঠ, এমন কি, ইলেক্‌শন বুথেও জুয়া খেলে। সান-রেমোকে এক কথায় ইতালির দার্জিলিং বা মুসৌরী বলা যেতে পারে। বড়লোকেরা উইক-এণ্ডে রাজধানী ছেড়ে এখানে আসেন একাধারে স্ফূর্তির সঙ্গে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে। পাহাড়ের কোলের এই ছোট্ট জায়গাটি নাকি বড় স্বাস্থ্যকর। কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা। সেপ্টেম্বর মাস। 'ফ্যাগ এণ্ড অফ দি সীজন্!' তবু অনেকেই এখানে এখনও পড়ে আছেন, বোধ করি, ক্যাসিনোর ভাগ্য-পরীক্ষার লোভে। ডিনারের পর যাঁরা নাচ তামাসায় যান না তাঁরা এসে এই সানরেমোর রমণীয় সাগরকুলে কিছুক্ষণ টহল দেন। এটা এখানকার একটা সামাজিক ফ্যাশান। আমরা তাঁদের অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছিলাম। মোটা ওভার কোট, কান-ঢাকা টুপি, মোটা দস্তানা, তবুও কি শানায়? শেষে শালখানিও গলায় জড়িয়ে নিয়ে বেরুতে হ'ল। কিন্তু তথাপি পরাজয় স্বীকার ক'রে রণে ভঙ্গ দিলাম। সী-বীচে তো আর 'হীটার' নেই। এখানে রাত্রে বেড়াতে হ'লে কেবলমাত্র পশমী পোষাকের বাহ্যাড়ম্বরে কোনও কাজ হয় না। কয়েক পাত্র তরল অনলের দ্বারা অভ্যন্তরীণ উত্তাপও বাড়িয়ে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ভারতীয় মহিলাদের ইতালীয়ানরা যথেষ্ট সম্মান করেন। তাঁদের মুগ্ধ দৃষ্টির প্রেক্ষণায় তাঁরা ভারতীয় ললনাদের সুন্দরী রমণী বলেই মনে করেন! আলাপে আলোচনায় এ তথ্য জেনে বিস্মিত না হয়ে পারিনি। এখানকার পথে-ঘাটে রেস্তোরাঁয় দস্তুর মতো দর্শকের ভীড় জমে যেত পত্নীর শাড়ীর শোভা দেখতে। তাই আমার ধারণা ছিল এই পোষাকপ্রিয় য়ুরোপীয়দের চোখে শাড়ীখানাই সুন্দর লাগে, শাড়ীপরিহিতা স্বয়ং বোধ করি তাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন না। কিন্তু সে ভুল এরা ভেঙে দিলে। হাজার হোক্ শিল্পীর দেশ। ভারতীয় মহিলাদের বিচিত্র আবরণ ও ততোধিক বিচিত্র আভরণ তো তাদের ভাল লাগেই, তা'ছাড়াও ভাল লাগে তাঁদের ললাটের কুঙ্কুমবিন্দু, সিঁথির সূক্ষ্ম সিন্দুর রাগ, নিবিড় কালো চুলের কমণীয় কবরী ঘেরা সাদা ফুলের

প্রশোকেটনী। সব কিছু মিলে এ'দের বিস্মিত কৌতূহলী দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে। তাঁদের দুই চোখে শিল্পীজনোচিত প্রীতি বিচ্ছুরিত হ'তে দেখি। সরল মানুষ এরা। দেখতে দেখতে খুশী হয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ফেলে—"ব্যোনো! মোল্‌তো ব্যোনো!" অর্থাৎ—সুন্দর—ভারি সুন্দর!

রাত্রি একটার ট্রেন ধরে আমরা সানরেমো ছেড়ে 'জেনোয়া'ভিমুখে যাত্রা করলাম। স্টেশনের বিজলী আঁচে গরম-করা ওয়েটিং-রুমে জিনিসপত্র নিয়ে ব'সে গাড়ির অপেক্ষায় ছিলছিলাম এতক্ষণ! কারণ, এর আগে আর কোনও সুবিধামত ট্রেন নেই যাতে গেলে আমরা পরদিন সকালে জেনোয়ায় পৌঁছতে পারবো। এ ট্রেনখানি ভোর পাঁচটায় আমাদের জেনোয়ায় নামিয়ে দিলে। স্লিপিং কার এবার পাইনি, তবে গাড়িতে বসে বসে ঘুমোবার ব্যবস্থাও কিছু মন্দ নয়। ইতালিতে ট্রেনে দারুণ ভিড় থাকে। ফার্স্ট ক্লাশেরও প্রতিটি আসন যাত্রীপূর্ণ। পূর্বাহ্নে আসন রিজার্ভ না ক'রলে দাঁড়িয়ে যেতে হয়।

জেনোয়ায় প্রবেশ করলাম। কত বড় বড় আন্তর্জাতিক মন্ত্রণা-সভা বসেছে ইতালির এই বন্দরখ্যাত শহরে। পর পর দু'টি বিশ্বযুদ্ধ ইতালির বুকের উপর দিয়ে প্রলয়ের ঝড় তুলে চলে গেছে। শুধু ইতালি কেন, সারা য়ুরোপের কাঠামোকেই এরা ওলোট পালট করে দিয়ে গেছে। য়ুরোপের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে একটা বিদ্বেষ ও বৈরিতা এনেছে। এই বিদ্বেষ ও বৈরিতা বিনষ্ট না হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। আজ পৃথিবীর চিন্তাশীল মনীষীরা মানুষকে তার জাতি-ধর্মের গণ্ডী ছাড়িয়ে, তার শিক্ষা ও সভ্যতার অভিমান এবং বর্ণ গৌরবের দম্ভ ভুলে এক হবার জন্য এগিয়ে আসতে বলছেন। নইলে মানুষের বাঁচার উপায় নাই। এক দেশ অপর দেশের সঙ্গে, এক জাতি অপর জাতির সঙ্গে আজ যদি আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ না' হয়, পরস্পরের সুখে দুঃখে সমান অংশীদার হয়ে আন্তরিক সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সাম্য মৈত্রীর আদর্শে না চলে, তবে অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবেই।

ইতালি অবশ্য বিশ্বের যাত্রীদের জন্য চিরদিনই তার দ্বার খোলা রেখেছিল। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশ বিশেষের কৃষ্ণকায় মানুষদের উপর একালে কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। এ বিষয়ে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সও তার শিষ্য। মানুষের স্বাধীন অধিকারের যে ঐতিহ্য পৃথিবীতে লাতিন সভ্যতার দান বলে স্বীকৃত হয়েছে—ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স তা' কোনওদিনই ক্ষুণ্ণ করেনি। একদা ভুবনস্তুত
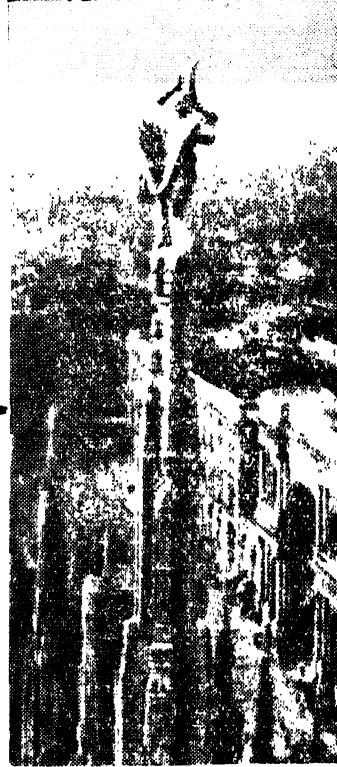
মিলান শহরের দৃশ্য—সম্মুখভাগে গির্জার সর্বোচ্চ চূড়ার উপর স্থাপিত দেবদূতের মূর্তি

রোমের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সারা য়ুরোপেই ছড়িয়ে পড়েছিল. ইতালির সেই প্রাচীন গৌরবের শীর্ণাবশেষ এখনও নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়নি। অল্প কথায়, বিপুল ঐতিহাসিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত ইতালির সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করা মূঢ়তা মাত্র।

পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতা, ভব্যতা, শৃংখলা ও সামাজিক নীতিবোধ রোম সাম্রাজ্য বিস্তারের সংগে সংগে একদা বিস্তৃত হয়েছিল সেখানে। উৎপীড়িত অত্যাচ্যারিত সাধু 'সেণ্ট্ পীটারের' আত্মত্যাগই রোমে তথা সমগ্র য়ুরোপে খৃস্ট ধর্মের প্রথম পত্তন করেছিল। 'নীরো' রোমকে পুড়িয়ে যেন অগ্নিশুদ্ধ করে দিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং য়ুরোপ তার ধর্মের জন্যও আজ ইতালির নিকট ঋণী। য়ুরোপে রেনেসাঁর অগ্রদূতও এই ইতালি। কবি, শিল্পী, ভাস্কর, সাধু সন্ত এবং কত বিশ্ববিশ্রুত বীর, আবিষ্কর্তা ও উদ্ভাবকের পুণ্য জন্মভূমি ইতালি। য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনেকখানিই প্রাচীন রোম্যান সভ্যতারই দান। পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের নানাদিক, তার শিল্পকলা, স্থাপত্যকলা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য নাট্য সকল বিভাগই একদা প্রভাবিত হয়েছিল ইতালির আদর্শ অনুসরণে। আজও এ সকল বিষয়ের যে অগণিত সম্পদ ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে এখানে, তা সকলের পক্ষেই শিক্ষা-দায়ক এবং আনন্দদায়ক। জ্ঞান-চিকীর্ষুর পক্ষে ইতালি এক প্রাচীন তীর্থস্বরূপ। আজ যদি একটি বিশাল 'খ্যাতি মন্দির' গড়ে বিশ্বের কাছে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়, 'তোমাদের দেশে কে কে আছেন লোকোত্তর মানব, যাঁদের খ্যাতি পৃথিবী জুড়ে থাকবে চির অম্লান, পাঠাও তাঁদের প্রতিমূর্তি এখানে,—তা'হলে দেখা যাবে ইতালির মানুষেই ভরে উঠেছে সে খ্যাতিমন্দিরের অধিকাংশ স্থান।

তা'বলে ইতালিকে যদি কেউ মনে করেন যে, এ শুধু প্রাচীন ভারতবর্ষেরই মতো একটা অতীত গৌরবের সমাধিক্ষেত্র মাত্র তা'হলে কিন্তু ভুল করা হবে। ইতালি আজও বেঁচে আছে। বিশ্বের প্রধান হ'য়ে না হোক, বা আমাদের মতো পুতুল হয়ে না হোক, অন্ততঃ ইংরাজিতে তাকে বলতে পারা যায়—'এ লিভ ওয়্যার!' মোটোর-বিক্রেতা মার্কিন বড়লোক হেন্‌রী ফোর্ড অতীতের ঐতিহ্যকে অস্বীকার ক'রে বলেছিলেন যে,—'ইতিহাস শুধু শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর মাত্র!' ফোর্ড সাহেবের মতের সংগে যাঁরা একমত তাঁরা ইতালির অতীতকে অস্বীকার করলেও বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। কারণ, ইতিহাস বিলুপ্ত হ'তে পারে বা অতীতকে অস্বীকার করাও 'হয়ত' সম্ভব মনে করতে পারি, কিন্তু দেখার মতো ক'রে দেখতে জানেন যাঁরা, তাঁরা এই ইতালির নানাদিকের অফুরন্ত শিল্প ঐশ্বর্যকে, তার অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে না দেখে পারেন না। ইতালির প্রশান্ত নির্মল আকাশ বাতাস, তার ঘন সবুজ ও মেঘবর্ণ

অরণ্য পর্বত, তার স্ফটিক স্বচ্ছ নদনদী ও সরোবর, তার তুষার কিরীট তুঙ্গশৃঙ্গ আল্‌পস্, তার অতীত গৌরববাহী নগর-নগরী—রোম, মিলান, ফ্লোরেন্স, ভেনিস, তার পিসা, পম্পাইয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করা তো সম্ভব নয়। একদিন প্রথিতযশা কবি শেলী, বাইরন, কীটস এমন কি মৃদুপন্থী টেনিসন পর্যন্ত যে দেশের আকর্ষণে ছুটে এসেছিলেন এবং যে দেশের স্তবগান বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিলেন, আমরা তাঁদের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, তাই অভিভূত হয়ে পড়েছি হয়ত কিছু বেশী। ইতালির প্রত্যেকটি শহর ও বন্দর, রোম, ন্যাপল্‌স্, পম্পাই, পিসা, জেনোয়া, মিলান, ফ্লোরেন্স, ভেনিস—এদের সঙ্গে যে আমাদের স্কুল থেকেই পরিচয়! অবশ্য তার দিকচক্র ছিল সাধারণ ভৌগোলিক বিবরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারপর শিক্ষার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেদিন ইতালির ইতিহাসের মধ্যে আমাদের প্রবেশ-লাভ ঘটে তার সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গেও অল্পবিস্তর পরিচিত হই, সেদিন আমাদের তরুণ মন এই গ্যারিবল্‌দি, ম্যাজিনীর দেশকে এই দান্তে ভার্জিলের দেশকে, মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফায়েল ও লিওনার্দো দাভিঞ্চির দেশকে, জুলিয়াস সীজার ও মার্কাস অরেলিয়াসের দেশকে ভালবেসেছিল, শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল।

বলা বাহুল্য যে, এ দেশের প্রতি বহুদিনের পূর্বরাগ নিয়েই আমরা এখানে এসেছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমরা যে-বছর ইতালিতে এলাম, মহামান্য পোপ মহোদয় সে বছর রোমে 'হোলি ইয়ার' ঘোষণা করেছিলেন। কাজেই ইতালিতে তখন লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর ভীড় লেগেছিল। পৃথিবীর যেখানে যত রোম্যান ক্যাথলিক ছিলেন, বেরিয়ে পড়েছেন তাঁরা তল্পীতল্পা নিয়ে রোমের দিকে। রেল, স্টীমার ও বিমান কোম্পানীরা তীর্থযাত্রীদের জন্য কম ভাড়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছিলেন। রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের কয়েক শতাব্দী ধরে বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছিল যে, এই 'হোলি ইয়ারে' রোমের 'ভ্যাটিকানে' এসে পোপের সঙ্গে প্রার্থনা করতে পারলে সারা জীবনের যত কিছু দোষ ত্রুটি অন্যায় স্খলন পতন পাপ ও অপরাধ নিঃশেষে ধুয়ে মুছে যাবে। ঈশ্বর তাঁদের প্রসন্ন মনে ক্ষমা করবেন। তাঁরা এখান থেকে বাড়ি ফিরে যাবেন পবিত্র নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক নূতন জীবন নিয়ে। সুতরাং, বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা কি? ধর্ম সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস আজও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষকে দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। আমাদের দেশে কুম্ভমেলায় বা অর্ধোদয় যোগে গঙ্গা-স্নানার্থে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দু'দলেরই অসম্ভব ভীড় হ'তে দেখি। তাতে মনে হয়, অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারে এখনও আমাদের দেশবাসীরা ডুবে আছে। নইলে কি আর এমন ক'রে পাগলের মতো ঘটি-বাটি বেচে, অলঙ্কার বন্ধক দিয়ে, টাকা ধার ক'রে, দলে দলে অগঙ্গার দেশের নরনারী এই গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমিতে ছুটে আসেন—পবিত্র ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে একবার অবগাহন ক'রে কোটি জন্মের পাপক্ষয় করবার লোভে! কিন্তু, আমাদের ভুল ভাঙলো এই সাহেব বিবিদের কান্ড দেখে! যেসব লম্বাদাড়ি খৃস্টান মিশনারী পাদ্রী পুঙ্গবেরা ভারতবাসীদের অন্ধবিশ্বাসী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে গাল দেন ও ঘৃণা করেন তাঁরা দেখি দলে দলে হোলি ইয়ারের পুণ্য লোভে রোমের দিকে ছুটে আসেন! খৃস্টান পাদ্রী, মিশনারী, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনীদের (মংকস্ এন্ড নান্‌স) সঙ্গে গৃহী খৃস্টান ভক্তদের সংখ্যাও অসংখ্য বলা যেতে পারে। শোনা গেল, দৈনিক পাঁচ থেকে দশ লক্ষ লোক নাকি ইতালিতে আসছেন পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে। এখানকার হোটেলে—'ন স্থানং পোস্ত ধারয়েৎ!'

ভোরের আলোয় জেনোয়া শহর আমাদের চোখে মন্দ লাগল না। এটি ইতালির একটি প্রধান বন্দর। সকল দেশেরই বড় বড় জাহাজ এখানে এসে লাগে। এই পথে দেশবিদেশের সঙ্গে ইতালির যোগাযোগ ঘটে। শহরটি অর্ধচন্দ্রাকার। সমুদ্রের ধারে পাহাড়ে ঘেরা এই বন্দর-শহরকে প্রভাত-সূর্যালোকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। এখানকার প্রাসাদোপম বড় বড় বাড়ি দেখে মনে হ'ল বেশ অবস্থাপন্ন লোকেরাই এখানে বাস করেন। আর তাঁরা একটু স্বভাব কৃপণ। জেনোয়ার পুরানো অঞ্চলে দেখা গেল, এখনও কাশীর বাঙালীটোলার গলির মতো সরু সরু পাথুরে পথ বা অসূর্যম্পশ্যা গলি গুলি প্রাচীন যুগের নগর পত্তনের অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইচ্ছা হয়, প্রাচীনপন্থীদের ডেকে এনে একবার দেখাই যে, 'যা কিছু পুরাতন তাই শ্রেষ্ঠ' এ ধারণা তাঁদের কত ভুল।

জেনোয়া বর্তমানে ইতালির একটি শিল্পপ্রধান নগর হয়ে উঠেছে। প্রাসাদ-গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পালাজো ড্যুকাল', 'পালাজো সেণ্ট জর্জিয়ো'। এগুলি কলকাতার বড় বড় ম্যানসনের মতো। জেনোয়ার যে 'ক্যাথিড্রাল' বা গির্জা সেটির গথিক সৌষ্ঠব পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো। 'সেণ্ট মারিয়া' প্রভৃতি আরও একাধিক চার্চের এখানে অধিষ্ঠান বলে 'হোলি ইয়ার' যাত্রীদেরও ভীড় লেগেছে এখানে। দক্ষিণ ভারতীয় একজন পাদ্রী তীর্থযাত্রীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বললেন, যাত্রীরা এখানে, অর্থাৎ জেনোয়ায় এসেছেন বিশেষ করে এখান থেকে 'লিভোর্নো' যাবেন বলে। লিভোর্নো জেনোয়ার নিকটস্থ একটি পার্বত্য জনপদ। এখানে মন্তেনেরো ব'লে ১৭০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর একটি মন্দিরে কুমারী মেরী মাতার নাকি আশ্চর্য এক প্রতিমূর্তি আছে। পাহাড়ের উপর তারে ঝোলা রেলে চড়ে যেতে হয়। সেখানে পূজা দিলে ও উপাসনা করলে ভক্তের সকল প্রকার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হয়। স্থানটির বর্ণনা শুনে যাবার লোভ হয়েছিল, কিন্তু যাওয়া আর ঘটে উঠল না। সারা সকালটা ভবঘুরের মতো জেনোয়ার বাজারে ও পথে পথে ঘুরে আমরা ল্যাঞ্চের পর বেলা দু'টোর ট্রেনে রওনা হয়ে গেলাম ইতালির উত্তর-পূর্ব কোণের শ্রেষ্ঠ নগর মিলানের দিকে। অপরাহ্নে চারটে বেজে কুড়ি মিনিটের সময় ইতালির দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেন আমাদের ৯৫ মাইল পথ উত্তীর্ণ করে ইতালির এই সৌন্দর্যরাজ্যে এনে পৌঁছে দিলে। এই ৯৫ মাইল রেলপথের দু'ধারে যেন কোন রূপকথার স্বপ্নরাজ্যের ছবি দেখতে দেখতে এসেছি। মিলানে এসে যখন নামলাম, দুই চ'খে তখনও ভ'রে রয়েছে সেই রূপসী প্রকৃতির মায়াঞ্জন, কাজেই মিলান বড় ভাল লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে ফেলা হ'ল—আজিকার মিলন-যামিনী মিলানেই যাপন করবো।

রেলের কুলিরাই পৌঁছে দিলে 'ঈডেন হোটেলে'। মিলান যদিও ইতালির লম্বার্ডি প্রদেশের বাণিজ্য প্রধান শহর কিন্তু, তার বাহ্যরূপ মোটেই মহাজনের গদির মতো নয়। বরং শিল্পীর সুসজ্জিত স্টুডিয়োর মতো বলা চলে। শিল্প ও বাণিজ্য যেন এখানে 'হরিহরের' ন্যায় একাত্ম হ'য়ে উঠেছে। আমরা ট্রেনের পোষাক বদলে আধাস্নান সেরে চা'যোগের পর বেরিয়ে পড়লাম শহর দেখতে। রাস্তা ভাল। বাড়িঘর সুন্দর।

গির্জাগুলিও মনোরম। একবার কুমিল্লায় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে শুনেছিলাম, তাঁরা বলছেন,—'কুমিল্লা ইজ এ সিটি অফ ট্যাংকস্ এন্ড ব্যাংকস্!' কথাটা মিথ্যা নয়। অসংখ্য পুষ্করিণী ও ছোট বড় ব্যাংকের ছড়াছড়ি দেখেছিলাম সেখানে। ইতালির প্রত্যেকটি শহর সম্বন্ধে সেই রকম বলা যায় 'এ সিটি অফ চার্চেস্ এন্ড ক্যাথিড্রালস্!' এখানকার বিখ্যাত গির্জা 'দুয়োমো' এক আশ্চর্য উপাসনা মন্দির। আগা গোড়া শুভ্র মর্মর শিলায় নির্মিত। দেখলে মনে হয় না যে, এ মানুষের তৈরি। মনে হয়, বিশ্ব-কর্মার মতো এ কোনো দেবশিল্পী গ'ড়ে দিয়ে গিয়েছেন এই দেব-দেউল। চূড়াটিই প্রায় ৩৫৫ ফিট উঁচু। সূক্ষ্মাগ্র চূড়ার উপরে একটি মূর্তি বসানো আছে। শোনা গেল, এটি ইতালির মধ্যে নাকি দ্বিতীয় বৃহত্তর গির্জা। রোমের 'সেন্ট পীটার্স' গির্জার পরেই এর স্থান। পৃথিবীর যেখানে যত গির্জা আছে, স্থাপত্যকলার নৈপুণ্য ও গঠন সৌকুমার্যের দিক থেকে এর কাছে নাকি কেউ দাঁড়াতে পারে না! কথাটা নেহাৎ মিথ্যা আস্ফালন বলে মনে হ'ল না। কারণ এর মধ্যে মধ্যযুগ থেকে শুরু করে রেনেসাঁর যুগ এবং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প পরিচয়ও সুন্দরভাবে গ্রথিত রয়েছে। স্থাপত্যকলা ও গঠন ভঙ্গীর দিক থেকে বাইজানতাইন, গথিক ও রোম্যান ধারার অতি অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে এর মধ্যে। সত্যই বড় চমৎকার এর গঠন চাতুর্য—যেন ভাব-সমৃদ্ধ ও মধুর ছন্দবদ্ধ একটি কবিতা বা সুরমাধুর্যেভরা একটি ভাগবতী প্রেম-সংগীত!

ইতালির সুপ্রসিদ্ধ স্কালা থিয়েটার ও গ্রান্ড অপেরাও এখানে। অভিনয় দেখবার লোভ হল। গেলাম টিকিট কিনতে, কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরতে হল। ও'রা বললেন, তিন সপ্তাহের সমস্ত টিকিট অগ্রিম বুক হয়ে গেছে। বোঝা গেল এখানে আমার চেয়েও বড় বড় থিয়েটার-পাগল এসেছেন। নইলে সীজন প্রায় যখন শেষ হয়ে এসেছে তখনও রঙ্গমঞ্চে এত বেশী ভীড়! একটু যেন অসাধারণ বলে মনে হল। ব্রেরা পিক্‌চার গ্যালারী তখনও খোলা আছে জেনে আমরা গিয়ে ঢুকলাম সেখানে। 'ব্যাসিলিকা দেল দুয়োমো' যেসব বিশ্ব-বিশ্রুত শিল্পীর তুলির আঁচড় পেয়ে ধন্য হ'য়েছে, এখানে রয়েছে সেই লিওনার্দো, ফিলারেৎ, এ্যালেসি, পায়ারমোরিনী প্রভৃতি অমর ইতালিয় শিল্পীর ভুবনবিদিত কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ ছবি। এখানকার 'অ্যামব্রোশিয়ানো মিউজিয়মটিও' বিশেষ দ্রষ্টব্যের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আমরা ব্রেরা পিকচার গ্যালারীর ছবির যাদু থেকে মুক্ত হয়ে যখন যাদুঘরের দিকে এলাম তখন সেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ইডেন হোটেল থেকে যে লোককে আমরা পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে নিয়েছিলাম তিনি ইংরেজী বলেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা আর উচ্চারণভঙ্গীও তাঁর একটু আধো-আধো, কাজেই, তাঁর কথার কতকটা আমরা বুঝছিলাম আর কতকটা আন্দাজে ধরে নিচ্ছিলাম! রাত্রি দশটা পর্যন্ত মিলান চষে, টাইসিনো ও পো নদীর গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম, টাইসিনো সেতু মিলানো বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রভৃতি দেখে হোটেলে ফিরে এলাম। রাত্রেই ঠিক করা গেল কাল সকালে ৬-৩৫ মিনিটের ট্রেন ধরে 'পিসা' যাবো। মিলান থেকে পিসা ১৭৭ মাইল। পথ বড় কম নয়। সেখানে পৃথিবীখ্যাত 'লিনীং টাওয়ার অফ্ পিসা' দেখে ল্যঞ্চের পর রোমে রওনা হবো।

পরের দিন যখন পিসায় এসে পৌঁছলাম তখন বেলা ১টা বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে। ট্রেনের জানালা থেকেই 'লীনিং টাওয়ার' দেখা যাচ্ছিল। মাত্র সাত ঘণ্টার মধ্যে ইতালির এক্সপ্রেস ট্রেন ১৭৭ মাইল পথ উত্তীর্ণ হ'য়ে চলে এল। আমাদের দেশের রেলগাড়ী কিন্তু এ পথটুকু আসতে সন্ধ্যে ক'রে দিত। সমুদ্রের ধারে ছোট শহর। সারাটা পথ আমাদের ট্রেন ভূমধ্যসাগরের তীরে তীরে ছুটছিল। মেডিটেরীনিয়ানের বেলাভূমি যে কত সুন্দর, কত বিচিত্র—তার পরিচয় পেলাম এই সুদীর্ঘ এক'শ সাতাত্তর মাইল পথে। আমাদের দেশের মতোই উজ্জ্বল রৌদ্রে ঝলমল্ করছিল—শিল্পী পিসানোরই উৎকীর্ণ করা শিলা-শিল্পের অনুরূপ তাঁর সুন্দর জন্মভূমি—এই ক্ষুদ্র পিসা। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে নিকোলা পিসানোর জন্ম। তিনি ভাস্কর্য কলা, বাস্তুশিল্প ও স্থাপত্যবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পিসা, বোলনা ও সিয়েনার তিনটি বিশিষ্ট গির্জায় পিসানোর হাতের কাজ আজও অতুলনীয় হ'য়ে আছে। এ'র ছেলে 'জিওভান পিসানো' এবং প্রিয় শিষ্য আঁদ্রে প'ন্তেদেরা, কিন্তু এ'কেও সবাই বলতেন, 'আঁদ্রে পিসানো'! এ'দেরও হাতের কাজ এখানকার ও অন্যান্য স্থানের একাধিক গির্জার মধ্যে আছে। ব্রঞ্জ এবং মার্বেলের কাজে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে কেউই আঁদ্রে পিসানোর সমকক্ষ ছিলেন না। পিসার 'লীনিং টাওয়ার', তার পাশের গোল গির্জাটি, ও বাড়িগুলি সব সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি। পিসার জাতীয় যাদুঘরে ভাস্কর্য শিল্পের সঙ্গে এখানকার স্থানীয় চিত্রকলাও সংগৃহিত রয়েছে। উৎকর্ষের দিক দিয়ে এগুলির তুলনা মেলে না আজও! একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত এখানকার গির্জাটিও মধ্যযুগীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার চমৎকার নিদর্শন বলা যেতে পারে। এই গির্জার প্রবেশ দ্বার ব্রোঞ্জ নির্মিত। এ'রা বলেন, প্রসিদ্ধ শিল্পী নিকোলা পিসানোর পিতার পরি-কল্পনায় ও তাঁর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে মন্দির দ্বার নির্মিত হয়েছিল। 'লীনিং টাওয়ার অফ পিসা'কে এ'রা বলেন, 'তরে পেনদেন্তে'! এটি একটি সু-উচ্চ গোলাকার প্রাসাদ বিশেষ বলে মনে হয়। হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মতো ইতালির মাথায় আল্পস আর মেখলায় তার আপেনাইনস্ গিরিমালা, ইতালিকে উত্তর ও দক্ষিণে দু'ভাগ ক'রে দিয়েছে। উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণের কোন সাদৃশ্য নেই। পিসার আশে পাশে এই আপেনাইনসের কিছু অংশ ছিটকে এসে পড়েছে। পিসার মর্মররূপে সৌন্দর্যের একটা স্নিগ্ধ আবেদন আছে।

ঘুরতে ঘুরতে বেলা হয়ে গেল। একটা কুড়ির ট্রেন ধরে আমাদের রোমে যেতে হবে। চট্‌পট্ মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিয়ে আমরা স্টেশনে এসে হাজির হলাম। গাড়ী একটা কুড়িতে এল বটে, কিন্তু ছাড়লো বেলা দেড়টায়। ট্রেনের সমস্ত কামরা একেবারে যাত্রীতে বোঝাই। আমাদের সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট ছিল। বারে বারে ওঠানামার হ্যাঙ্গাম আছে বলে আমরা বারে বারে টিকিট কাটার হাঙ্গামাটা সানরেমোতেই চুকিয়ে এসে-ছিলাম। টুরিস্টদের সুবিধার জন্য ওরা তাঁদের ভ্রমণসূচী অনুযায়ী একেবারে সব ক'টি স্টেশনের টিকিটের একসঙ্গে একখানি বই দিয়ে দেয়। যেখানে যেখানে যাচ্ছে, টিকিট চেকাররা সেই সেই স্টেশনের টিকিটখানি ছিঁড়ে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। ট্রেনের অবস্থা দেখে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। কোনও রকমে মালপত্র তুলে আমরা আর পাঁচজন যাত্রীদের মতো ট্রেনের করিডরে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওদেশের মেয়েরাও সব সেই ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে চলেছে দেখে শ্রীমতী জানতে চাইলেন, রোমে আমরা পৌঁছাবো

কখন? বললাম, অপরাহ্ন ৬-২৫ মিনিটে। তিনি একটু চিন্তিত হ'য়ে বললেন, চার পাঁচ ঘণ্টা তুমি দাঁড়িয়ে যেতে পারবে? আমি আর খুকু কোনও রকমে ম্যানেজ করতে পারবো, কিন্তু তোমার জন্যই ভাবনা বেশী। বললাম, ক্লান্তবোধ ক'রলে স্যুটকেশের উপরই বসে পড়া যাবে। দেখা যাক্। পথে নিশ্চয়ই অনেকে নামবেন। দু'শো মাইলের উপর জার্নি। মধ্যে পাঁচ ছটা স্টেশন রয়েছে. একটু বসবার জায়গা হবেই।'

গাড়ি ছেড়ে দিলে। জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। ট্রেনের করিডরও প্যাসেঞ্জার আর তাদের লাগেজে একেবারে ঠাসা প্যাক হয়ে গেছে। কারুর আর সহজে কামরা থেকে বেরিয়ে 'রিফ্রেশমেণ্ট কার' বা অন্য কোথাও যাবার উপায় ছিল না। কেউ কেউ গাড়ির ফ্লোরের উপর স্যুটকেস পেতে তার উপরই বসে পড়েছিলেন। মনে পড়ছিল আমাদের প্রাক্‌যুদ্ধ যুগে পূজো কন্‌সেশানের সময়ের রেলের ভীড়। তফাতের মধ্যে দেখলাম, কেউ কারুর সঙ্গে জায়গা নিয়ে ঝগড়া বা বাদানুবাদ করছে না। ফলে, অত ভীড়ের মধ্যেও আমরা বেশ স্বাচ্ছন্দ্য মনেই চলেছিলাম। ট্রেনের সহযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'তে বেশীক্ষণ সময় লাগল না। গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি দাঁড়িয়ে তো রয়েছি সবাই। আপনি কতদূর যাবেন? 'রোম।' আপনি? 'রোম!' আপনি কোথায়? 'রোম।' শুনে মুখ এবং বুক দুই শুকিয়ে উঠলেও, হেসে বললাম "আই সী, অল্ রোড্ লীডস্ টু রোম!" গাড়ির ভিতর একটা হাসির হল্লা উঠলো। আমরা ট্রেনের করিডরের যে কামরাখানার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই কামরায় একজন উচ্চ পদস্থ মিলিটারি অফিসার সপরিবারে যাচ্ছিলেন। রঙিন জরিপাড় শাড়ী পরা একটি ভারতীয় মহিলা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে বোধ করি তাঁর সামরিক পৌরুষে বাধছিল। তিনি উঠে বেরিয়ে এসে শ্রীমতীকে তাঁর স্ত্রীর কাছে বসতে দিলেন। নবনীতাকে তার আগেই একদল ছেলেমেয়ে তাদের কামরায় ডেকে নিয়েছিল। আমি তখন নিশ্চিন্ত হয় স্যুটকেসের উপরই চেপে বসলাম। বুঝতে পারছিলাম যে, আমার ভারে স্যুটকেস চিপ্‌টে যাচ্ছে, কিন্তু দাঁড়াবার অবস্থা আর ছিল না।

(ক্রমশঃ)

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৭৬

সামতাবেড় থেকে সুসংবাদ নিয়ে ফিরব, এ বিশ্বাস সকলেরই ছিল। তাই কলিকাতায় ফিরে এসে যখন জানালাম শরতের লেখা পাওয়া যাবে না, তখন সকলে দুঃখিত যত না হ'ল বিস্মিত হ'ল তার অনেক বেশি।

কি কারণে শরতের লেখা পাওয়া সম্ভব হল না, তদ্বিষয়ে সকলের কৌতূহল এড়িয়ে যাবার জন্য অবান্তর ও অস্পষ্ট উত্তর দিতে লাগলাম। কাউকে বললাম, শরৎ-বৃক্ষে আমাদের কাগজের জন্যে ফুলই এখনো ফোটে নি ত ফল পাব কেমন করে? কাউকে বললাম, আমরা যদি চন্দ্র-সূর্য দুই জ্যোতিষ্কই অধিকার ক'রে বসি তাহ'লে অন্য সব কাগজ যে অন্ধকার হয়ে যাবে। কিন্তু বৃষ্টিহীন শরৎ-আকাশের শুধু মেঘ-গর্জনই শুনে এসেছি, সেই বেদনাদায়ক আসল কথা কাউকে বললাম না।

আমার জামাতা সুশীল জিজ্ঞাসা করলেন, "ও'র লেখার জন্যে উপযুক্ত দক্ষিণা দেওয়া হবে, সে কথা ও'কে বলেছিলেন?"

বললাম, "ভাগলপুর থেকে যে চিঠি ওকে লিখেছিলাম, তাতে সে কথা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলাম। এবার কিন্তু সে কথা তুললে অবান্তর কথা তোলা হোত।"

কৌতূহল বোধ হয় সুশীলকে থামতে দিচ্ছিল না; বললেন, "তবে রাজি না হওয়ার কারণ কি?"

হাসিমুখে বললাম, "কারণটা আপাতত শুধু আমারই জানা থাক্। তোমাদের শুনে কাজ নেই।"

এ উত্তরের পর সুশীল আর কোন প্রশ্ন করলেন না। কলিকাতার কাজ শেষ করে তিন-চারদিনের মধ্যে ভাগলপুরে ফিরে গেলাম।

শরতের কাছে ধাক্কা খেয়ে এসে আগ্রহের বেগ এবং কাজ করবার শক্তি বেশ একটু বেড়ে উঠ্‌ল। কাগজ বার করবার চিন্তা কল্পনা আর ধ্যানে মশ্‌গুল হয়ে উঠলাম। নদী যখন গতি পরিবর্তন করে, তখন যেমন তার সমগ্র জলরাশি এক কূলের দিকে সরে আসে, আর অপর কূলের দিকে চড়া পড়তে আরম্ভ করে, আমার মনের ভিতরকার অবস্থাও হ'ল ঠিক সেই রকম। সমস্ত আগ্রহ এবং উদ্যম প্রবাহিত হল কাগজ বার করবার কূলের দিকে; ওদিকে ওকালতির কূলে চড়া পড়তে লাগল। নূতন কাজের জন্যে উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিনে; হাতের পুরাতন কাজ গুটিয়ে ফেলতে পারলেই খুশি হই। মক্কেল ঘরে প্রবেশ করলে অনাগ্রহের সুরে বলি, আইয়ে; বনিবনা না হলে দুঃখিত না হয়ে নমস্কার করে সেই একই কথা উচ্চারিত করি, আইয়ে। নোঙর তোলবার সময় যখন আসন্ন, তখন আর নূতন খোঁটায় কাছি বেঁধে লাভ কি? কলিকাতায় যাওয়া-আসা ঘন ঘন হতে লাগল। তার ফলে ক্রমশ বুঝতে পারলাম, ফাল্গুন মাসে কাগজ বার করতে পারা যাবে না। মাস দুই পেছিয়ে দিয়ে ১৩৩৪ সালের পয়লা বৈশাখ, অর্থাৎ একেবারে নববর্ষের প্রথম দিনে, বার করাই স্থির করলাম।

বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতা হাইকোর্ট বন্ধ হলে শ্রীযুক্ত যতিনাথ ঘোষ ভাগলপুরে এলেন। যতিনাথরা তখন ভাগলপুরে বাস করেন; কলিকাতায় অবস্থান করে শুধু যতিনাথ করেন হাইকোর্টে ওকালতি। প্রতি বৎসর তিনি নিয়মিতভাবে শারদীয় পূজার ছুটি এবং বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে ভাগলপুরে এসে অবসরকাল অতিবাহিত ক'রে যান।

যতিনাথকে ভাগলপুরে পেয়ে খুশি হলাম। খুশি হওয়ার দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, যতিনাথ কলিকাতায় থাকেন বলে স্থায়িভাবে আমি তথায় না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর দ্বারা কলিকাতার সাহিত্যিক মহলে

কিছু কিছু প্রচারকার্য চালানো হয়ত সম্ভব হতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, যতিনাথের সাহিত্যবোধ এবং সাহিত্যরুচির প্রতি আমার বিশেষ আস্থা থাকায় মাসিকপত্রের পরিকল্পনা এবং আভ্যন্তরীণ গঠনকার্যের বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে মূল্যবান পরামর্শ লাভের প্রত্যাশা করতে পারি।

বাঙলা দেশের পাঠক-সমাজে যতিনাথ ঘোষ পরিচিত ব্যক্তি নন, একথা স্বীকার করি। কিন্তু লেখক হিসাবে অপরিচিত এই আত্মপ্রবিষ্ট স্বল্পবন্ধু মানুষটির সহিত যাঁরা অন্তরঙ্গ, তাঁরা জানেন বাঙলা দেশের পাঠক সমাজে এমন উচ্চশ্রেণীর নিষ্ঠাবান পাঠকও খুব বেশি নেই। একথা শুধু বাঙলা সাহিত্যের সম্পর্কেই বলছিনে, ইংরেজি সাহিত্যের সম্পর্কে একথা বোধ করি সমধিক মাত্রায় বলা যেতে পারে। যতিনাথ যদি সাহিত্যের শুধু খরিদ্দারই না হতেন, তা হলে আমার বিশ্বাস, তাঁর নিজের সাহিত্যের খরিদ্দারও নিতান্ত অল্প হোত না।

আমি কাগজ বার করছি অবগত হয়ে যতিনাথ অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং সে বিষয়ে তাঁর পরিপূর্ণ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রতিদিন বৈকালে আমাদের বৈঠক বসতে লাগল ভাগীরথী তীরে বন্ধুবর অমরেন্দ্রনাথের গৃহে। সেখানে নানা কল্পনা-জল্পনায় নানা তর্ক-বিতর্কে আসর সরগরম হয়ে ওঠে। একটা প্রদীপ্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বড়দিনের ছুটি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল; যতিনাথও কলকাতায় ফিরে গেলেন।

তার কিছুদিন পরেই আমি কলিকাতায় উপস্থিত হলাম।

ওমর খৈয়াম অনুবাদ কাব্যের সুপ্রসিদ্ধ কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ তখন শ্যামবাজার ডাকঘরের খানিকটা উত্তরে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের উপর তাঁদের পৈতৃক গৃহে বাস করতেন। তিনি যতিনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং আমার সহপাঠী ও বন্ধু যোগেশচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠ সহোদর। একদিন সকালে যতিনাথের সহিত কান্তিবাবুর গৃহে উপস্থিত হলাম। কান্তিবাবু তখন বাড়ি ছিলেন না, কোথাও বেরিয়েছেন। যতিনাথ বললেন, "কোথাও অন্য কোথাও নয়, নিশ্চয়ই অমলবাবুর বাড়ি। সেখানে চলুন, সেখানে দুজনের সঙ্গেই দেখা হবে।"

অমল অর্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান সুযোগ্য প্রচার নায়ক (Director of Publicity) শ্রীযুক্ত অমল হোম। সে সময়ে তিনি সবিশেষ দক্ষতার সঙ্গে 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর সম্পাদন করছেন।

যতিনাথের অনুমানে ভুল হয়নি, অমলবাবুর গৃহে উপস্থিত হয়ে দেখলাম কান্তিবাবু তথায় অবস্থান করছেন। পীত-নিঃশেষিত চায়ের শূন্য কয়েকটি পেয়ালা তখনো টেবিলের মায়া কাটাতে পারে নি। ক্ষণকাল পূর্বে যে মুখগুলির চুম্বনে চুম্বনে তারা সর্বস্বান্ত হয়েছে, বাক্য-মুখর সেই মুখগুলিরই প্রতি তাকিয়ে তাকিয়ে তারা অবহেলার দুঃখ পরিপাক করছে। আমরা দুজনে গিয়ে বসতেই লজ্জা পেয়ে তারা সরে পড়ল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে হয়ত তারাই সুতপ্ত চম্পক বর্ণের পরিপূর্ণতা নিয়ে পুনরাবির্ভূত হয়ে আমাদের ওষ্ঠাধরকে প্রলুব্ধ করে তুললে। উৎকৃষ্ট চা-পান করতে করতে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হলাম।

'সবিতা' নাম সকলেরই ভাল লাগল। বিশেষতঃ ঐ নাম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ না হওয়ার সার্টিফিকেট যখন পেশ করলাম, তখন আর কেহই অপছন্দ করতে সাহস করলে না।

কান্তিবাবু ও অমলবাবুর অফিস আছে, যতিনাথের আদালত; কাজেই সেদিনকার সকাল বেলার বৈঠক অধিকক্ষণ স্থায়ী হতে পারলে না। কান্তিবাবু, যতিনাথ ও আমি পথে বেরিয়ে পড়লাম।

এর পর থেকে প্রত্যহ আমাদের চারজনের বৈঠক বসতে লাগল; হয় সকালে, নয় সন্ধ্যার পর,—কোনো দিন অমলবাবুর গৃহে, কোনো দিন বা কান্তিবাবুর বাড়িতে।

তিন চার দিন পরে একদিন কান্তিবাবু বললেন, "আচ্ছা, কাগজের নাম বিচিত্রা রাখলে কেমন হয়? কবির বিচিত্রা ক্লাবের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখলে কবির সহানুভূতি হয়ত একটু বেশি মাত্রায় দৃঢ় করা যেতে পারে।"

বিচিত্রা নামে রবীন্দ্রনাথের যে অপূর্ব সাহিত্য-রস-মধুর বৈঠকের সুমিষ্ট সৌরভে আকৃষ্ট হয়ে কলিকাতা সাহিত্য রস পিপাসুগণ মাঝে মাঝে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে দলে দলে এসে জুটত, তার জীবনীশক্তি সে সময়ে স্তিমিত। বিদায়োন্মুখ বিচিত্রা বৈঠক যাবার কালে যদি তার নামের উত্তরীয়টা নবজাতকের অঙ্গে ফেলে দিয়ে যায়, তাহলে বাঙলাদেশের বহু সাহিত্যিকের স্মৃতির মধ্যে অন্ততঃ কিছুকাল যাবৎ সে বেঁচে থাকতে পারে। বিচিত্রা মাসিক পত্রিকাও রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা বৈঠকের উত্তরাধিকারী হয়ে গৌরবান্বিতই বোধ করবে।

তা ছাড়া বিচিত্রা নামটাও আমাদের সকলের এত ভাল লাগল যে, আকাশের 'সবিতাকে' তৎক্ষণাৎ আকাশে পুনর্বসিত করে বিচিত্রার বৈচিত্র্যের স্বপ্নে আমরা মগ্ন হলাম। বিচিত্রা নামের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বত্ব সংরক্ষণের মতো অবশ্য কিছু ছিল না, তথাপি বিচিত্রা নাম রাখবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি গ্রহণ করা আমরা সমীচীন মনে করলাম। আমাদের আবেদনে রবীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ আনন্দের সহিত সম্মতি দিলেন।

কবি কান্তিচন্দ্রের এই সময়োচিত হিতকারী খেয়ালটুকুর জন্য এখনো আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর রচনাসম্ভার 'নিঃস্ব-করা দানে' বিচিত্রা মাসিক পত্রিকায় 'নিঃশেষিয়া' দিয়েছিলেন, তার হেতু-মূলে আর যাই কিছু থাকনা কেন, বিচিত্রা নামের প্রেরণাও যে বেশ খানিকটা ছিল, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। আমাদের মাসিকের নাম 'সবিতা'ই যদি থাকত, তাহলেও সেই মাসিকের সর্বপ্রথম বিষয়বস্তু স্বরূপ অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা কবিকে দিয়ে হয়ত 'সবিতা' নামে একটা কবিতা লিখিয়ে নেওয়া অসম্ভব হোত না; কিন্তু সে কবিতা নিশ্চয়ই সে বস্তু হতে পারত না, যা হয়েছিল বিচিত্রার প্রথম ছয় পৃষ্ঠায় ব্লকের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপিতে মুদ্রিত 'বিচিত্রা' নামক কবিতা। উক্ত কবিতার শেষ স্তবক লক্ষ্য করলে একথায় প্রতীতি জন্মাতে বিলব হবে না। শেষ স্তবকটি এখানে উদ্ধৃত করলাম।

বুকের শিরা ছিন্ন ক'রে
ভীষণ পূজা করেছি তোরে,
কখনো পূজা শোভন শত দলে,—
বিচিত্র হে বিচিত্রা
হাসিতে কভু, কখনো আঁখি জলে।
ফসল যত উঠেছে ফলি'
বক্ষ বিভেদিয়া।
কণা-কণায় তোমারি পায়
দিয়েছি নিবেদিয়া।

তবুও কেন এনেছ ডালি
দিনের অবসানে?
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি
নিঃস্ব করা দানে?

শেষ চার পঙক্তির কথা কবি হয়ত' তাঁর মানসী বিচিত্রাকে লক্ষ্য ক'রেই বলেছিলেন, কিন্তু মাসিক বিচিত্রার পক্ষেও একথা ঠিক একইভাবে প্রযোজ্য বলে মনে হোত। প্রার্থনার ডালি নিয়ে আমরা তাঁর কাছে উপস্থিত হতাম, তিনি তাঁর থলি উজাড় ক'রে আমাদের ডালি ভরে দিয়ে নিঃস্ব হতেন। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, পত্রাবলী, স্বরলিপিতে বিচিত্রার ডালি সত্যই বিচিত্র হয়ে উঠত। কোনো মাসিক পত্রের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা পাওয়াই সৌভাগ্যের কথা; আমরা এক-এক বারে পাঁচটা ছটা, এমন কি কখনো-সখনো আটটা নটা কবিতা নিয়ে ফিরতাম।

কিন্তু এই অপর্যাপ্ত প্রাপ্তিকে সামলে পরিপাক করার মধ্যে সময়ে সময়ে বেশ একটু কৌতুকাবহ সংকটও ভোগ করতে হত। হয়ত রবীন্দ্রনাথ একেবারে গোটা ছয়েক কবিতা দিয়ে দিয়েছেন। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত ক'রে আশ্বস্ত হলাম যে, প্রতি সংখ্যা একটি কবিতা দিয়ে আরম্ভ করলে মাস ছয়েকের জন্য এখন নিশ্চিন্ত,—এর মধ্যে কোনো সংখ্যার রবীন্দ্রকাব্যহীন হ'য়ে প্রকাশিত হবার দুর্ভাগ্য ভোগ করতে হবে না। সেই মতলব ক'রে পরবর্তী সংখ্যায় একটিমাত্র কবিতা প্রকাশিত করলাম। হাতে রাখলাম পাঁচটি।

বিচিত্রার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটু ঔৎসুক্যের সহিত অপেক্ষা ক'রে থাকতেন। তিনি কলিকাতায় থাকলে বিচিত্রা প্রকাশিত হওয়া মাত্র আমি নিজে গিয়ে তাঁকে কাগজ দিয়ে আসতাম। তদনুসারে বিচিত্রা নিয়ে গিয়েছি। আমার হাত থেকে বিচিত্রা নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে, দেখলেন, তাঁর ছটি কবিতার মধ্য মাত্র একটি প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনো মন্তব্য করলেন না। তাঁর অপরাপর লেখাগুলির প্রতি মনোযোগী হলেন।

পরের সংখ্যাতেও সেই একই কাহিনী। বইখানা উল্টে-পাল্টে দেখে রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন; তখনো আমার হাতে তাঁর খান চারেক কবিতা মজুদ; প্রথম বিষয়বস্তু হিসাবে সে বারের বিচিত্রায় মাত্র একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

এবার আর রবীন্দ্রনাথ অপরাধ ক্ষমা ক'রে নীরবে থাকলেন না; কুঞ্চিতস্মিত চক্ষে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "দেখ উপেন, কৃপণতা কোনো ক্ষেত্রেই ভালো নয়; কবিতা প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও নয়। আচ্ছা, তুমি কি মনে করেছ আমার কাব্যের উৎস শুকিয়ে গেছে, তাই একটি একটি করে কবিতা ছাপচ?"

ভাল! কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। পরের বারে একেবারে দুটো কবিতা, হয়ত বা গোটা তিনেকই, বার করে দিলাম। কাগজ পেয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে পুনরায় সেই কুঞ্চিত চক্ষের হাসি!—"ওহে উপেন, প্রাচুর্যের দিনে পেট ভরে খাচ্ছ, অনটনের দিনে কিন্তু অনাহারে শুকোতে হবে। তুমি কি মনে কর, আমি পাকা ফলের গাছ যে, নাড়া দিলেই ফল পড়বে?"

মনে মনে বললাম, "মশায়, এগোলেও আপনার যে কথা, পেছলেও তাই—এখন যাই কোন্ দিকে বলুন ত?" মুখে কিন্তু কোনো কথা না বলে শুধু একটু হাসলাম।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত উক্তি দুটিই বিশুদ্ধ কৌতুক রস প্রণোদিত। তাহলেও আমার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে একথা অসংশয়ে বলতে পারি, মোটের উপর লেখা প্রকাশিত হলেই তিনি খুশী হতেন। লেখা শেষ ক'রে বাক্সয় চাবি দিয়ে বন্দী করে রাখা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। কারণ, তিনি লিখতেন দুটি স্বতন্ত্র পক্ষকে আনন্দ দান করবার উদ্দেশ্যে। প্রথম পক্ষ অবশ্য একমাত্র তিনি নিজে; দ্বিতীয় পক্ষ নিজেকে বাদ দিয়ে বিশ্বমানব সমাজ। নিজেকে আনন্দ দানের নগদ-বিদায় চলতে থাকত লেখার সঙ্গে সঙ্গে; কিন্তু লেখা শেষ হলে রবীন্দ্রনাথ সে লেখা দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ বিশ্বমানবের দরবারে ছড়িয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, যেমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে বিকসিত হওয়া মাত্র গাছের ফুল আকাশের দরবারে গন্ধ ছড়িয়ে দেবার জন্যে। দিন ও সময় স্থির করে আমন্ত্রণ পাঠিয়ে রবীন্দ্রনাথ আত্মীয়স্বজন ও অনুরাগী পাঠকবর্গকে পারিবারিক বৈঠকে আহূত করে এনে তাঁর সদ্যোজাত রচনা পাঠ করে শোনাতেন। তারপর সাধারণ সমাজে বিতরিত হবার জন্য পাঠিয়ে দিতেন ছাপাখানায়।

ফুলের গন্ধের সহিত রবীন্দ্রনাথের রচনার তুলনা করেছি। কিন্তু এই দুই বস্তুর প্রকাশ-প্রণালীর মধ্যে পার্থক্যও কিছু ছিল। ফুল প্রস্ফুটিত হলে তার ভিতর হতে গন্ধ স্বতঃই নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে আসে,—কারো কাছ থেকে তাকে কোনো মঞ্জুরি নিয়ে আসতে হয় না। রবীন্দ্র রচনার কিন্তু সে উপায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্নিবাসী কড়া যাচাইকারের কাছে শ্রেষ্ঠতার ছাড়পত্র পেলে তবেই সে রচনা বহির্জগতে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হোত। রবীন্দ্রনাথ লিখতেন, আর সেই কঠোর যাচাইকার সে লেখা কেটে-কুটে ছেঁটে ছুটে কমিয়ে বাড়িয়ে একশা ক'র দিত। রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি দেখবার যাঁদের সুযোগ হয়েছে তাঁদের কাছে যাচাইকারের এই কাটাকুটির কীর্তি অবিদিত নেই।

কিন্তু এর পরও সব সময়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না, সময়ে সময়ে মনের মধ্যে সংশয়ের পীড়া অনুভব করতেন। আমি এক আধবার তার প্রমাণ পেয়েছিলাম।

Hibert লেকচার দিতে রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাবেন,—তখন বিচিত্রায় তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস যোগাযোগ মাসে মাসে প্রকাশিত হচ্ছে। শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ আমাকে চিঠি লিখলেন, "যোগাযোগের ধারাবাহিকতা বিচিত্রায় নষ্ট হয় তা আমি চাইনে। আমি উপন্যাসের অনেকখানি লিখে ফেলেছি, তুমি একজন লেখক নিয়ে এখানে চলে এসে কপি করিয়ে নাও। তাতে কয়েক মাস চলবে। তারপর আমি পথ থেকে ও বিলাত থেকে লিখে পাঠাব।

চিঠি পাওয়া মাত্র আমি বিনোদবিহারী গুপ্ত নামে আমাদের একজন কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হলাম। বিনোদবাবু 'পুরাতন প্রসঙ্গ' লেখক অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্তের কনিষ্ঠ সহোদর। ঘাড় গুঁজে নিবিষ্ট চিত্তে বিনোদবাবু যোগাযোগ নকল করে চলেন; আমি ঘুরে ফিরে বেড়াই। কখনো দিনুবাবুর (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের) গৃহে গিয়ে আড্ডা জমাই, কখনো চিত্রশালায় গিয়ে ছবি দেখি, কখনো বা গুরুপল্লীতে শ্রীযুত নন্দলাল বসুর গৃহে উপস্থিত হয়ে

চিত্রশিল্প বিষয়ে বিতর্ক তুলি। তা ছাড়া প্রধান কার্য হ'ল সকাল-সন্ধ্যা উত্তরায়ণে গিয়ে কবিগুরুর সভায় হাজিরা দেওয়া এবং মধ্যাহ্নে ও রাত্রে তাঁর সহিত আহার করা।

গেস্ট হাউসে একটি আরামদায়ক কামরা দখল করে আছি। প্রত্যুষে উঠে মুখ হাত ধুয়ে চা-পান করে উত্তরায়ণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। ততক্ষণে কাজ-পাগলা বিনোদ-বাবু টেবিলের উপর ঘাড় গুঁজে যোগাযোগ কপি করতে বসে গেছেন। কানে কম শোনেন, সেই জন্যে তাঁর সঙ্গে কম কথা-বার্তা কওয়া আরামদায়ক। তাড়াতাড়ি পথে বেরিয়ে পড়ি। খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে-ঘারে উত্তরায়ণে যখন উপস্থিত হই তখন কবির দরবার পুরোদমে চলছে।

আমি ছাড়া প্রায় সকলেই স্থানীয় অধিবাসী, সুতরাং সকলেরই কাজ-কর্ম আছে, বেলা ন'টা সাড়ে ন'টা বাজতে-না-বাজতে সবাই উঠে পড়েন। আমি তখন জাঁকিয়ে বসি। বাল্যকাল থেকে চিরটা কাল আড্ডা দেওয়ার সাধনা করেছি, সুতরাং আড্ডা দেওয়ার সুষ্ঠু প্রণালী কতকটা জানা আছে; আর, রবীন্দ্রনাথের কোন্ প্রণালী যে অজানা আছে, তা'ত জানিনে। কথায় কথায় আড্ডা জমে ওঠে।

হঠাৎ এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ওহে, একটা কবিতা লিখেছি। পড়ে দেখ ত' কেমন হয়েছে।" ব'লে কবিতাটা আমার হাতে দেন।

আগ্রহ সহকারে আমি কবিতা পাঠ করতে থাকি; আর, কবিতা আমার ভাল লাগছে অথবা লাগছে না অনুমান করবার উদ্দেশ্যে আগ্রহ সহকারে রবীন্দ্রনাথ আমার মুখের রেখা পাঠ করতে থাকেন। অপাঙ্গে দৃষ্টি-পাত করে মাঝে মাঝে আমি তা দেখতে পাই।

পড়া শেষ হলে ঔৎসুক্যের সহিত রবীন্দ্র-নাথ জিজ্ঞাসা করেন, "কি হে, কেমন হয়েছে? চলবে ত?"

রবীন্দ্রনাথের হাতে কবিতা ফিরিয়ে দিয়ে বলি, "চৎকার হয়েছে।"

কোনো দিন বা ঐ একই প্রশ্নের উত্তরে বলি, "খাসা হয়েছে।"

একদিন কিন্তু ঐ ধরণের প্রশ্নের উত্তরে কৌতুকের বশবর্তী হয়ে বলে ফেললাম, আজ্ঞে না, চলবে না। এ একদম অচল।"

রবীন্দ্রনাথ কোনো উত্তর দিলেন না, শুধু নিঃশব্দ হাস্যে তাঁর সমস্ত মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। এর পরও তিনি আমাকে কবিতা পড়তে দিতেন, কিন্তু পাছে আবার বলি 'একদম অচল', সেই ভয়ে সচল-অচলের প্রশ্ন আর তুলতেন না।

নিজের সৃষ্টির বিষয়ে এই যে সংশয়, বস্তুত এ কোনো স্বতন্ত্র ব্যাপার নয়। উৎকৃষ্টকে উৎকৃষ্টতর করে তোলবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে একটা যে অনিবার ব্যাকুলতা ছিল, এ তারই একদিকের বহিঃ-প্রতিক্রিয়া মাত্র। নিজের যাচাই শেষ হওয়ার পরও অপরকে দিয়ে যাচাই করিয়ে নেবার আগ্রহ।

বিনোদবাবুর নিকট হতে যোগাযোগের কপি নিয়ে দেখতাম জায়গায় জায়গায় রবীন্দ্রনাথ পাতার পর পাতা কেটে বাদ দিয়েছেন। বৃহৎ আকারের পাতা,—লাইনে লাইনে অক্ষরে অক্ষরে কাটা সম্ভব নয়,—ওপর নিচে দীর্ঘ লাইন চালিয়ে কেটেছেন। পড়ে দেখতাম, একেবারে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য! এতখানি উৎকৃষ্ট বস্তু থেকে আমার বিচিত্রা বঞ্চিত হচ্ছে দেখে মনটা হায় হায় করে উঠত। রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুযোগ করতাম। তিনি হেসে বলতেন, "না হে, ও ঠিকই করেছি। পরে বুঝতে পারবে।"

পরে বুঝতে পারবার আশ্বাসে হাল-ফিলের ক্ষতিকে পরিপাক করা কঠিন হোত।

তা কঠিন হোক্, এদিকে কিন্তু দেখছি অজ্ঞাতে-অগোচরে রাম না জন্মাতেই রামায়ণ লিখতে আরম্ভ করে দিয়েছি! বিচিত্রা আরম্ভ হতে এখনো চার পাঁচ মাস কাল বাকি, এরই মধ্যে বিচিত্রার খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার সময়ের কথা লেখা আরম্ভ হয়ে গেছে।

সুতরাং যা বলছিলাম, তা-ই উপস্থিত বলি। (ক্রমশ)

চক্রদত্ত
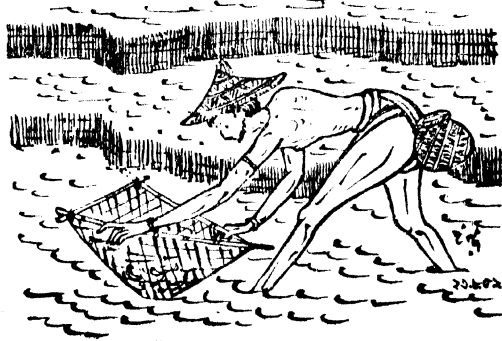
বর্তমান যুগে টিটানিয়াম একটি প্রয়োজনীয় ধাতু। ওজনে টিটানিয়াম ইস্পাত এবং এলুমিনিয়ামের মাঝামাঝি, প্রায় এলুমিনিয়ামের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী ভারী। টিটানিয়ামের প্রধান গুণ হচ্ছে যে, ওজনে বেশ হাল্কা, অথচ খুব শক্ত এবং খুব তাড়াতাড়ি খয়ে যায় না অথবা মরচে ধরে না। কোন কিছুর কাঠামো তৈরী করতে এটা ঠিক ইস্পাতের মত কাজে লাগান যায়। জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি তৈরী করতে এর প্রয়োজন আজকাল খুব বেশী হয়। এতদিন এই ধাতু যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা ছিল এর চড়া দাম। এখন একটা নতুন উপায়ে এই টিটানিয়াম তৈরী করে এর দাম প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগে দাঁড় করান হয়েছে। অবশ্য এটা এখন একটা সংমিশ্রিত ধাতু তৈরী করা হয়েছে—এটার নাম দেওয়া হয়েছে টিটানিয়াম এলুমিনিয়াম ক্রোমিয়াম ধাতু। আর এই সংমিশ্রিত ধাতু বর্তমানের নতুন ধরণের জেট উড়োজাহাজ তৈরীর কাজে খুব বেশী রকম ব্যবহার করা হচ্ছে।

*

কাঠের জিনিসে খুব তাড়াতাড়ি পোকা ধরে যাবার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষতঃ খুব সাধারণ জাতীয় কাঠের তৈরী জিনিসে। কাঠ যদি খুব ভাল জাতের হয় অথবা ভাল করে পাকিয়ে নেওয়া যায় তাহ'লে পোকা ধরবার ভয়টা একটু কম থাকে। বর্তমানে এই পোকা ধরবার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অনেক রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার করা হয়। একটা নতুন উপায় পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে—সেটা হচ্ছে এইসব পোকা নষ্ট করবার রসায়ন দ্রব্য হয় গাছের গুড়িতে ইনজেকশন করে দেওয়া হচ্ছে অথবা গাছের গোড়াতে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। গাছের গোড়াতে ছড়িয়ে দেওয়ার পর গাছের শিকড় দিয়ে সেটা গাছের শরীরের ভেতর যাচ্ছে—ফলে দেখা যাচ্ছে, এই দুই উপায়ে রসায়ন বস্তু গাছের ভেতরে যাওয়ার দরুণ আর সেই সব গাছের কাঠ থেকে তৈরী জিনিসে সহজে পোকা ধরছে না। এই উপায়ে রসায়ন বস্তু ব্যবহার করার জন্য কাঠের দামও বাড়ছে না—যেটা গাছের থেকে কাঠ বার করে তারপর রসায়ন দ্রব্য ব্যবহার করলে দাম অনেক বেড়ে যায়।

*

মানুষের চেষ্টা এবং ইচ্ছা থাকলে বোধ হয় সব কাজই সম্ভব হয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, লোকটি এক হাতে কি রকম বেহালা বাজাচ্ছে। লোকটি নিজের মাথা খাটিয়ে এমন বন্দোবস্ত করে নিয়েছে যে, পা দিয়ে প্যাডেল করবার সঙ্গে সঙ্গে লোহার ডাণ্ডার সঙ্গে লাগান বেহালার ছড়টি বেহালার

লোকটি একটি হাতের সাহায্যে বেহালা বাজাচ্ছে

তারের ওপর ঘসতে থাকবে—আর লোকটি তার ডান হাতটির সাহায্যে বেহালার তারের ওপর আঙুল টিপে সুর বার করতে থাকবে।

*

কথায় বলে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালান। আজকাল চিকিৎসা শাস্ত্র এত বেশী উন্নত হচ্ছে যে, প্রয়োজন হলে মানুষের শরীরেও জোড়াতালি দিয়ে বেশ সুষ্ঠুভাবেই কাজ চালান যাচ্ছে। আমরা জানি, প্রয়োজন হলে শরীরের এক জায়গার চামড়া কেটে নিয়ে আর এক জায়গায় লাগান হচ্ছে; অন্য লোকের চোখ নিয়ে আর একজনের চোখে লাগান হচ্ছে ইত্যাদি। প্রয়োজন হলে মানুষের পাকস্থলী কেটে বাদ দিয়ে সেখানকার অন্ত্র থেকে খানিকটা কেটে নিয়ে জোড়া দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর এই জোড়া লাগাবার পর দেখা যাচ্ছে যে, সেটা সাধারণ পাকস্থলীর মত কাজ করছে। এমন কি, যার শরীরে এই জোড়া লাগান হচ্ছে—সে বুঝতেই পারছে না যে, তার পাকস্থলীতে কোন রকম জোড়া দেওয়া হয়েছে। ডাঃ মারসেল লি এই ধরণের কয়েকটা অস্ত্রোপচার করেছেন। তাঁকে এই অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল পাকস্থলীতে ক্যান্সারগ্রস্ত রোগীর ওপর। আমরা সাধারণভাবে জানি যে, শরীরের কোথাও ক্যান্সার হলে যদি সম্ভব হয় তাহলে সেই স্থান থেকে ক্যানসারগ্রস্ত অংশটি সম্পূর্ণভাবে কেটে বাদ দেওয়া ভাল। ডাঃ লি যখন দেখলেন যে, পাকস্থলীতে ক্যান্সার হওয়ার দরুণ সেটি সম্পূর্ণভাবে কেটে বাদ দিতে হবে তখন তিনি পরীক্ষা করে দেখবার জন্য কয়েক ইঞ্চি অন্ত্র কেটে নিয়ে পাকস্থলীর কাছে জুড়ে দিলেন। তার প্রথম রোগীর বয়স ছিল প্রায় ৫৩, কিন্তু অস্ত্রোপচারের দু'দিন বাদেই লোকটি একজন সুস্থ মানুষের মত চলে ফিরে বেড়াতে আরম্ভ করলো এবং প্রায় দু' সপ্তাহ বাদে এক্স-রে করে দেখা গেল যে, জোড়া দেওয়া নতুন পাকস্থলী সাধারণ পাকস্থলীর মতই কাজ করছে।

*

পুরনো দলিল ইত্যাদি ভালভাবে বহুকাল রাখা প্রায় অসম্ভব বলা যায়—কারণ, পোকা অথবা আবহাওয়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এইগুলো নষ্ট করে। এমেরিকায় বিখ্যাত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দলিল ইত্যাদি রাখার সম্বন্ধে রীতিমত গবেষণা করা হচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যদি এই সব কাগজপত্র হিলিয়াম গ্যাসপূর্ণ আধারের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তা'হলে আর সেগুলো কোন রকমেই নষ্ট হবে না। অবশ্য হিলিয়াম গ্যাস ছাড়াও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই আধারের আর্দ্রতা প্রয়োজন অনুযায়ী কমান বাড়ান যায় এবং এই সব আধারগুলি সূর্যের আলো থেকে তফাতে রাখতে হবে—কারণ সূর্যের আলো যদি এই সব কাগজের ওপর পড়তে থাকে তাহ'লে কাগজগুলোর রং খারাপ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে এই আধারগুলিতে এক বিশেষ ধরণের আলোর সাহায্যে আলোকিত করবার বন্দোবস্ত আছে আরো লক্ষ্য রাখতে হবে যে, হিলিয়াম গ্যাসের ভেতর কোন কারণে অক্সিজেন গ্যাসের অস্তিত্ব না থাকে—কারণ তাহ'লে অক্সিজেন গ্যাস কাগজগুলো তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেতে সাহায্য করবে।

জাতীয় পরিকল্পনার আধার: গ্রামোদ্যোগ

ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার

পরিকল্পনার আধিক্য

ইংরেজ এ দেশ থেকে চলে যাবার পরই সবাই আর্থিক পরিকল্পনা রচনা করার ধুমে পড়ে গেছে। শিল্পপতি, কংগ্রেস ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ব্যক্তিগতভাবে অর্থশাস্ত্রিদগণ এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার, সকলের তরফ থেকেই নানা রকম পরিকল্পনা পেশ করা হচ্ছে। রাষ্ট্র নির্মাণের মহান কর্তব্য যথাসম্ভব শীঘ্র সম্পন্ন করার জন্য সরকার ব্যগ্র। তাঁরা তাই বহুবিধ কমিটি নিয়োগ করছেন ও নানা রকমের বোর্ড স্থাপনা করছেন। শেষ পর্যন্ত একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা ও তাকে কার্যকরী করার জন্য স্বতন্ত্রভাবে একটি পরিকল্পনা কমিশনও স্থাপিত হয় এবং কিছু দিন হল এই কমিশনের রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে।

এ সব যেন হল; কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আমাদের আর্থিক পরিকল্পনার আধার কি হবে? আমাদের পরিকল্পনার সারা আধার কেন্দ্রীভূত শিল্প ব্যবস্থা হবে না বিকেন্দ্রীত স্বাবলম্বী আর্থিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে আমাদের পরিকল্পনা রচিত হবে? আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোকে আমরা এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে চাই যে তার ফলে যেন দেশে এক শোষণহীন এবং বর্গ ও বর্ণবিহীন সমাজ স্থাপিত হতে পারে এবং এই কারণেই পূর্বোক্ত মৌলিক প্রশ্নটির পূর্বাহ্নে সমাধান হওয়া প্রয়োজন। লোকে অবশ্য বলতে পারে, "আমাদের যা বর্তমান অবস্থা, তাতে এ সব বড় বড় কথা ভাববার অবকাশ কোথায়? আমরা তো এ সময়ে শুধু বর্তমান স্থিতির উপর নির্ভর করেই যা হ'ক কিছু একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।" এতে কোন সন্দেহ নেই যে বর্তমানকে বাদ দিয়ে স্রেফ আদর্শের কথা বলার কোন অর্থ হয়না; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির আধারের উপরেই তো একটি মূল নীতি স্থির করতে হবে। তা না হলে এধারে ওধারে মাথা খুঁড়ে আমরা দিশেহারা হয়ে যাব এবং আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

পরিস্থিতির চাপ

দুইশত বৎসরের ইংরেজের শাসন ও শোষণের ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা এক বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। চলে যাবার আগে ইংরেজ আমাদের নাজেহাল অবস্থায় ফেলে গেছে। এই কারণে আর্থিক উন্নতির জন্য আমরা যাই করতে যাই না কেন, তার জন্য প্রতিপদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের সামনে জাতীয় উন্নয়নের বহুবিধ পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাবের জন্য আমরা তার কোনটিতেই হাত দিতে পারছি না। বস্তুত আমাদের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারসমূহ যে সব পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন, তার মধ্যে অনেকগুলিকে মুলতুবী রাখতে হয়েছে। সরকারের সামনে আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আর্থিক সমস্যাবলীর কি করে শীঘ্রাতিশীঘ্র সমাধান করা যায়।

আমাদের কাছে আজ পর্যন্ত খাদ্য সামগ্রী নেই, বস্ত্র এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীরও অভাব রয়েছে। এর উপর আবার আছে সর্বব্যাপী ভীষণ দারিদ্র্য, রোগ, শোক এবং অজ্ঞানতার আচ্ছাদন। যে রকম শোচনীয় অবস্থায় আমাদের ভূতপূর্ব শাসকবর্গ আমাদের কাঁধ থেকে নেমে গেছেন এবং তারপর দেশ বিভাগের পর যে সব জটিলতা এবং গোলোযোগ সৃষ্ট হয়েছে, তাতে আমাদের এ রকম কষ্ট এবং অসহায় অবস্থা হওয়া কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। বরং এত সব বিপত্তি সত্ত্বেও আমরা সাহসের সঙ্গে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। চারিদিকের এই বুভুক্ষা, নগ্নতা, রোগ ও শোক, জড়তা এবং অস্থির চিত্ততার কিভাবে আমরা নিরাকরণ করব, এই হচ্ছে আমাদের মনে আজ সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। আমাদের জনগণের এই সব প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা সমূহকে উপেক্ষা করে আমরা কোন রকম উন্নতি করতে পারব না এবং বিশ্বের দরবারে মর্যাদাপূর্ণ আসনও আমাদের মিলবে না। আমার মনে হয় এ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কোন রকম মতভেদের আশঙ্কা নেই। মতভেদের সূচনা দেখা যায় এই সব সমস্যার সমাধানের ব্যাপার নিয়ে এবং মতভেদ এমনভাবে বেড়ে যায় যে, পুরাতন পুঁথিগত সংস্কারের জন্য নিজ মত আঁকড়ে থাকতে থাকতে আমরা দেশের বাস্তব অবস্থাকে ভুলে যাই। এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করার সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করি না কেন, যা অসম্ভব, তা আমরা কখনই করতে পারব না।

পরিকল্পনার ভূমিকা কি হবে?

আমাদের দেশবাসীর শতকরা পাঁচাশী ভাগেরও বেশী পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছয় লক্ষ গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে এবং এদের মধ্যে শতকরা সত্তরজন কৃষি নির্ভরশীল। পরিকল্পনা রচনাকালে আমরা এই বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করতে পারি না। আর্থিক উন্নয়নমূলক কোন পরিকল্পনা রচনাকালে না এই পটভূমিকার পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব আর না তা বাঞ্ছনীয়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে আমরা যখন রাষ্ট্রের উন্নতি বা অবনতির কথা বলি তখন দেশের এই লক্ষ লক্ষ জনগণের চিত্রই আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে থাকা উচিত। আজ এদের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে এবং যে পরিকল্পনায় এদের পতনের হাত থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা নেই, বরং এদের অবস্থা আরও শোচনীয় করে তোলে, তাকে জাতীয় পরিকল্পনা বলা যায় না।

দ্বিতীয়ত এদের বেকার রেখে বা এদের বেকারত্ব বাড়িয়ে আমরা আমাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারি না। দু চার লক্ষ মাত্র বেকারকে কিছু দিনের জন্য খাওয়ান সরকারের পক্ষে অসম্ভবপ্রায় হয়ে ওঠে আর আমাদের যাবতীয় শক্তি ও উদ্যম তাতেই ব্যয় হয়। এই অবস্থায় এই সব কোটি কোটি আংশিক বেকারদের শুধু খাওয়ানই নয়, তাদের বস্ত্র ও জীবন

ধারণোপযোগী অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া ও শিক্ষা এবং রোগ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কি রকম কঠিন ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়। তা ছাড়া খেয়াল রাখতে হবে যে এ ব্যাপার দু চার দিনের জন্য নয়। চিরদিনের জন্য তাদের এইভাবে খয়রাতি দানে বাঁচাতে হবে।

উনচল্লিশ কোটির বলিদান চলবে না

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে আমরা যদি চাই যে এদের এই ধ্বংসাভিমুখী অবস্থার কোন রকম উন্নতি হ'ক, তা হলে দেখতে হবে যে এরা যেন যথাসম্ভব নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী স্বাধীনভাবে নিজেরা উৎপন্ন করে নেয় এবং এর জন্য তাদের যেন কারও উপর নির্ভর না করতে হয়। কারণ অতি সস্তা দামেও তাদের বাইরে থেকে এ সব জিনিস কেনার জন্য নিজেদের বেকার থাকতে হবে এবং নিজেদের যৎসামান্য আয়ের বেশ খানিকটা অপরকে দিয়ে দিতে হবে। এ রকম অবস্থা তাদের আরও দুর্দশা ঘটাবে। শুধু নিজেদের পরিধেয়ই যদি তারা উৎপন্ন করে নেয়, তবে কয়েক কোটি টাকা তাদের বেঁচে যায়। এই ভাবে তেল, ঘি, গুড় এবং জুতা আদি নিজেদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করে তারা নিজেদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য দূর করতে পারে। দেশ বলতে গান্ধীজী শহরের মুষ্টিমেয় জনকতককে বুঝতেন না বলেই তিনি আজীবন এই কথার উপর জোর দিয়ে এসেছেন। তিনি তো প্রতিনিয়ত শতকরা পঁচাশিজন দেশবাসীর কথা চিন্তা করতেন এবং তাদের যন্ত্রশিল্পের ভীষণতা সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতেন। গ্রামীণ জনতাকে বাস্তব অবস্থা বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "এতে কোন সন্দেহই নেই যে যাঁরা যন্ত্রবাদে বিশ্বাসী, তাঁরাও ভারতের সুহৃদ। তবে তাঁদের সঙ্গে আমার পার্থক্য উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মত। যন্ত্রবাদীদের কথা মত শহরবাসীরা চলতে চান চলুন; কিন্তু আপনাদের মত গ্রামবাসীরা ভুলেও যদি সে পথে চলেন তা হলে ভারতবর্ষের রূপই পালটে যাবে। অর্থাৎ কোটি কোটি দরিদ্রের মৃত্যু ঘটবে এবং এ দেশে থাকবে শুধু এক কোটি ভীমকায় যোদ্ধা। আমার একশত পঁচিশ বছর বাঁচার ইচ্ছা; কিন্তু উনচল্লিশ কোটিকে সংহার করে শুধু এক কোটি থাকবে, অর্থাৎ উনচল্লিশ কোটির বিনাশ ঘটবে—এ আমি চোখের সামনে দেখতে পারব না।"

শুধু গান্ধীজীই নয়, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও ভারতের অবস্থা দেখে ব্যবসায়ীদের বলেছিলেন, "যত দ্রুতগতিতেই আমরা দেশের শিল্পকরণ করি না কেন, আমাদের শেষ লক্ষ্য কোটি কোটি জনসাধারণকে এর দ্বারা কিভাবে কাজ দেওয়া সম্ভব হবে, এ আমি বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের কারখানায় খুব বেশী হলে দু কোটি, তিন কোটি বা আরও কিছু বেশী লোক কাজ করবে। এ সত্ত্বেও যারা কাজ পাবে না, তাদের কি হবে? কুটীরশিল্প, অর্থাৎ ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা অথবা সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে বেকারদের কাছ থেকে কাজ না নেওয়া পর্যন্ত তাদের কার্যক্ষমতায় সম্পূর্ণ উপযোগিতা পাওয়া যাবে না।"*

জ্বলন্ত সমস্যা

বাস্তব অবস্থা দেখে অর্থশাস্ত্রের প্রায় প্রত্যেক পণ্ডিতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তাঁরা এ কথাও বলেন যে, ভারতের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশের আর্থিক পরিকল্পনায় কুটীরশিল্পের এক মহত্ত্বপূর্ণ স্থান থাকা উচিত; কারণ তা না হলে বেকার সমস্যা বিকট রূপ ধারণ করবে। এই ধারণাপ্রসূত হয়েই পণ্ডিত নেহরু বলেছেন যে জনসাধারণের প্রত্যেককে কাজ দিতে হবে। কিন্তু প্রত্যেককে কাজ দেবার জন্য আমরা কোন কুটীরশিল্পে হাত দেব? গ্রামবাসীরা যে সব জিনিস ব্যবহার করে তাকে যন্ত্রশিল্পের কাছে সোপর্দ করে আর এমন কি শিল্প বাকী থাকে যার দ্বারা শতকরা পঁচাশিজন গ্রামবাসী জনতাকে কাজে লাগান সম্ভব? নিঃসন্দেহেই দেশের আর্থিক পরিকল্পনায় আমাদের এই রকম শিল্পের কথা ভাবতে হবে, যার সাহায্যে গ্রামীণ জনতা স্বাবলম্বী হতে পারে।

বস্তুত জনসাধারণের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা সমূহের পরিপূর্তির জন্য শুধু কুটীরশিল্পের উপর নির্ভর না করে, যদি আমরা যন্ত্রশিল্পের দিকে ঝুঁকি, তা হলে এই শতকরা পঁচাশী জনের কি অবস্থা দাঁড়াবে? তাদের সেই দশা দাঁড়াবে, যার বিরুদ্ধে ষাট বছর ধরে দাদাভাই নৌরজী থেকে শুরু করে গান্ধীজীর নেতৃত্বে আমরা আন্দোলন করে এসেছি। আমাদের আন্দোলনের শৈশবাবস্থা থেকে আমরা বলে এসেছি যে, যতদিন ভারতবর্ষ শুধু কাঁচামাল উৎপন্ন করবে এবং ইংলণ্ড তৈরী মাল আমাদের দেবে, ততদিন ভারতবর্ষের লোক বুভুক্ষা এবং বেকারত্বের পাষাণভারে নিষ্পিষ্ট হবেই হবে। আজ যখন আমরা নিজ দেশের পুনর্নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছি, তখন রাষ্ট্রীয় অবস্থায় কি সেই অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটাব? শতকরা পঁচাশী জনের দ্বারা কাঁচামাল উৎপন্ন করে, তাদের প্রয়োজন পূর্তির জন্য তৈরী মাল শহরের শতকরা পনর জনের কাছ থেকে আনার কথা বললে কি তাদের অনশন এবং বেকারত্বের করাল গহ্বরে ফেলে দেওয়া হবে না? দেশের অবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির উপর আমাদের গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে।

এ গেল জাতীয় পরিস্থিতির কথা। এবার আন্তর্জাতিক ভূমিকার দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু আলোচনা করব।

নিরাকার দাসত্বের কবলে

কেন্দ্রীভূত শ্রমশিল্পবাদ বা জনস্বাবলম্বনের ভিত্তিতে বিকেন্দ্রীকরণ, এর যে কোন নীতিতেই দেশের আর্থিক ব্যবস্থার কাঠামো রচনা করা যাক না কেন, যে কোন পদ্ধতিকেই কার্যকরী করতে হলে চারিদিকের অবস্থার প্রতি নজর রাখতে হবে। বস্তুত কোন দেশ বা যুগের কথা ভাবতে হলে, সে দেশ বা যুগের সমসাময়িক এবং মৌলিক প্রয়োজনীয়তার আধারের উপরই চিন্তা করতে হবে। আর্থিক দৃষ্টি থেকে সর্বপ্রথম আমাদের এ কথা বিচার করতে হবে যে যাবতীয় প্রয়োজনপূর্তির জন্য কেন্দ্রীভূত যন্ত্রশিল্পের সাহায্য নিতে হলে আমাদের কত পুঁজি দরকার এবং তার কি পরিমাণ নিজেদের কাছে আছে ও কতখানি বাইরে থেকে জোগাড় করতে হবে। বাইরে থেকে পুঁজি নেবার সময় একটা কথা খেয়াল করতে হবে যে এর ফলে আর্থিক দৃষ্টি থেকে আমরা তো বিদেশী রাষ্ট্রের করায়ত্ত হচ্ছি না। এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে জনস্বাবলম্বনের ভিত্তিতে রচিত গ্রামোদ্যোগের পথ ছেড়ে আমরা যেন শতকরা পঁচাশীজন জনতার শ্রম ও বেকার সময়ের বিরাট পুঁজির প্রতি অবহেলা করে দেশের

* হিন্দুস্থান টাইমস্ ১৪-৩-৫০

অর্থনীতি পরিচালনার জন্য শ্রমশিল্পের ভিত্তিতে পুঁজিরূপী সোনার ভরসা করি, তা হলে আমাদের তাদেরই কাছে যেতে হবে, যাদের হাতে সোনা আছে। অর্থাৎ আমাদের আমেরিকার দরজায় যেয়ে দাঁড়াতে হবে, আর আমেরিকা যে স্রেফ বন্ধুত্ব ও ভালবাসার খাতিরে আমাদের সাহায্য করবে, এ রকম ভরসা বোধহয় আপনাদের মধ্যে কারও মনেই নেই। আমাদের নেতা জওহরলালজী তাঁর একটি বইএ চীনের বিগত দিনের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে লিখছেন, "সেখানে আমেরিকার নিরাকার সাম্রাজ্যবাদ চলছে।" আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে চলতে চলতে লোকে যেমন সাকার থেকে নিরাকারের দিকে প্রগতি করে, তেমনি এ যুগে মনে হচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদও যেন সাকার থেকে নিরাকারের দিকে এগোচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ আজকাল দেশ দখলের প্রাচীন নীতি ছেড়ে তার উপর প্রভাব বিস্তারের প্রযত্ন করছে। আমাদের আর্থিক জীবনে সোনাকে অপরিহার্য করে তুললে আমেরিকার এই প্রচেষ্টার প্রভাব আমাদের গলাতেও পড়বে এবং তার ফলে আমাদের অবস্থা ইংলণ্ডের সাকার দাসত্বের বদলে আমেরিকার নিরাকার দাসত্ব হবে।

অতএব দেশবাসীর প্রয়োজনীয়তা সমূহের পরিপূর্তির সমস্যার সমাধান করার সাথে সাথে আমাদের যদি দেশের শতকরা পঁচাশী জনকে বাঁচাতে হয় এবং অপরিহার্য বিদেশী প্রভাবের কবল থেকে দেশকে বাঁচিয়ে বিশ্বের সামনে যদি নিজেদের মাথা উঁচু রাখতে হয়, তা হলে গ্রামোদ্যোগকে সমগ্র জনসাধারণের প্রয়োজনপূর্তির মুখ্য আধার করতে হবে এবং এই নীতিকে কার্যকরী করার জন্য কোন কারণে যদি বৃহৎ যন্ত্রশিল্প অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে কুটীরশিল্পের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে ও কুটীরশিল্পের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাকে চালাতে হবে।

এবার আমাদের দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে যে নানা রকম সংশয় প্রকাশ করা হয়, তার সম্বন্ধে আলোচনা করলে ভাল হয়।

কেন্দ্রীকরণের বিপদ

আমরা খাদির কথা বললে অনেক বন্ধু বলেন, "এ আপনি কি বলছেন? বর্তমান দুনিয়ার অবস্থা দেখুন। আজকের অবস্থায় প্রত্যেক পরিকল্পনা সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে রচনা করতে হবে। তার মধ্যে খাদি কুটীরশিল্প আদির কি স্থান হবে?" কিন্তু আমি বলি যে সব কাজ সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে করার দরকারই বা কি? এই জন্য, না আমাদের সেই সব বন্ধুর ধারণা হচ্ছে এই যে আজ যুদ্ধের আশংকা বিশ্বকে স্থায়ীভাবে গ্রাস করে ফেলেছে এবং প্রত্যেক দেশের সদাসর্বদা ঐ বিপদ সম্বন্ধে সাবধান থাকা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ আশংকা সত্য বলে ধরে নিলে কুটীরশিল্পকে দেশের শিল্পোন্নতির পরিকল্পনার আধার বলে স্থির করা আরও প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়। স্থায়ী আশংকার অর্থ হচ্ছে এই যে এখন থেকে পৃথিবীতে যুদ্ধের স্থিতি ও যুদ্ধ বিরাম স্থিতির মধ্যে নিরন্তর হের-ফের হতে থাকবে। অতএব যুদ্ধ সম্বন্ধে মোটেই নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। এ রকম অবস্থায় বুদ্ধিমত্তা এবং মৌলিকতার নিদর্শন হচ্ছে এমন পরিকল্পনা রচনা করা যা কিনা সংগ্রাম এবং বিশ্রান্তি উভয় অবস্থাতেই সমভাবে কার্যকরী। আধুনিক যুদ্ধকলার এক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শত্রুপক্ষের জনসম্ভরণ ব্যবস্থা নষ্ট করা। এই জন্য তাদের দৃষ্টি থাকে শিল্পকেন্দ্র এবং পরিবাহন ব্যবস্থার প্রতি। জনতার মৌলিক প্রয়োজন পূর্তির জন্য শিল্পকেন্দ্র সমূহের উপর নির্ভর করে থাকলে যুদ্ধকৌশলের দিক থেকে তা হবে আমাদের পক্ষে চরম দুর্বলতা স্বরূপ। বিগত যুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি যে জাপান কিভাবে শিল্পকেন্দ্র ধ্বংস করে চীনের জনসাধারণকে তাদের পদানত করতে চেয়েছিল। সৌভাগ্যবশত চীনে কুটীরশিল্পের বীজ মজুদ ছিল। তত্রস্থ সরকার কিভাবে সে বীজকে অঙ্কুরিত করে দেশকে বাঁচানর প্রযত্ন করে তাও আমরা দেখেছি। বাস্তববাদী হতে হলে আমাদের এই সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। বিশেষত আজকের পরমাণবিক শক্তির যুগে এ সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

চীন কোন রকমে আত্মরক্ষা করল বটে; কিন্তু তাদের সে সংগঠন যুদ্ধকালীন তাড়াহুড়োর ফল স্বরূপ গড়ে উঠেছিল। সুপরিকল্পিত এবং সুব্যবস্থিত না হওয়ায় স্বভাবতই তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করা যায় নি। তবে একটি দেশের অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে আমরা যুদ্ধ বিরামকালে নিজ আর্থিক ব্যবস্থার বনিয়াদ ঠিক করে নিলে সুষ্ঠুভাবে এর পরিকল্পনা রচনা করতে পারব এবং এর যথোচিত বন্দোবস্তও করতে পারব। এইভাবে আমাদের কার্যক্রম সুসংগঠিত এবং স্থায়ী রূপ নেবে। এই রূপে জনগণ স্বীয় প্রচেষ্টায় স্বয়ংপূর্ণ হয়ে গেলে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দৃঢ়মূল হবে এবং যুদ্ধকালীন অবস্থা যেমনই হ'ক না কেন, তাদের জনসম্ভরণ ব্যবস্থা অটুট থাকায় নৈতিক বল অক্ষুণ্ণ থাকবে। সামরিক দৃষ্টির কথা আলোচনা কালে শুধু সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয়তার দিকে দেখলেই কাজ শেষ হবে না, জনসাধারণকে সামলানর কথাও আমাদের ভাবতে হবে। আজকের সর্বাত্মক যুদ্ধের যুগে জনসাধারণের নৈতিক বল অক্ষুণ্ণ রাখার প্রশ্ন সৈন্যবাহিনীর শুভাশুভের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ তো নয়ই; বরং ক্ষেত্রবিশেষে এর মহত্ব বেশী। এই জন্যই সরকারের কাছে প্রত্যেক যুদ্ধের সাথে সাথে জনসাধারণের নৈতিক বল অটুট রাখার প্রশ্ন একটি মুখ্য বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্য বর্তমানে প্রচারকার্য এক বিশেষ স্থান গ্রহণ করে। আমি আপনাদের এই কথা বলব যে, আত্মনির্ভরতার ফলে জনসাধারণের নৈতিক বল এতটা দৃঢ় হয় যে, অন্য কোন রকম প্রচারে সে রকম হওয়া সম্ভব নয়। জনশক্তির অবহেলা করে শুধু সৈনিক সংগঠন দ্বারা কোন দেশের শক্তি বাড়তে পারে না। সুতরাং সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয়তাকে যদি আপনারা মুখ্য স্থান দেন, তা হলেও দেশের আর্থিক পরিকল্পনাকে স্বয়ংপূর্ণতার ভিত্তিতে কুটীরশিল্পের উপর নির্ভর রাখতে হবে।

আজকের রাজনৈতিক আখড়া : শ্রমিক ক্ষেত্র

যুদ্ধের কথার সাথে সাথে আর একটি কথা মনে পড়ে এবং তা হচ্ছে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা। এই শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যা পৃথিবীতে আজকাল প্রায় যুদ্ধ সমস্যার মত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যা এত জটিল হয়ে উঠেছে যে প্রত্যেক দেশের বাজেটে এই খাতে ব্যয় ক্রমশ বেড়েই চলেছে। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে শতকরা পঁচাত্তর জন শ্রমিকের কেন্দ্রীকরণের কারণেই এই বিভাগ বাবদ এত ব্যয় করতে হয়। শ্রমশিল্পকেন্দ্রে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ঘটার

কারণ শান্তি স্থাপনার জন্য সরকারকে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং এর জন্য হয়রানিও হয় যথেষ্ট। আপনারা বলবেন যে এ সব হয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কায়েম থাকার জন্য। শ্রমশিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ হলে এক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার সমস্যা বিদূরিত হবে। কিন্তু যে দেশ শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ করে শ্রমিকদের চুপচাপ রাখতে চাইবে তাদের নিজ শাসন ব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্রী আদর্শে চালাতে হবে। গণতন্ত্রকে বজায় রেখে এ ব্যবস্থা চালাতে হলে সরকারী নীতির বিরুদ্ধবাদী কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোন না কোন অজুহাতে সরকারী শ্রমশিল্প কেন্দ্রে গোলযোগের সৃষ্টি করে অশান্তি ডেকে আনতে পারে। আজও রেল বিভাগ সরকার কর্তৃক পরিচালিত; কিন্তু এই দিক থেকে দেখতে গেলে সেখানকার অবস্থা অন্য পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত শিল্পের অবস্থার চেয়ে পৃথক নয়। এই ক্ষেত্রে আমাদের যদি কোন রকম সংস্কার সাধন করতে হয়, তা হলে দেখতে হবে যে শিল্পের ক্ষেত্রে যেন মালিক শ্রমিক ও ব্যবস্থাপক কর্মী এ সব কথা যথাসম্ভব কম ওঠে। তা হলে এর উপায় কি? কেন্দ্রীয় উৎপাদন ও বিতরণের আধার ছেড়ে আর্থিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বনের নীতি গ্রহণ করলেই শুধু এ রকম হওয়া সম্ভব। আর এ রকম নীতি গ্রহণ করা সম্ভব শুধু কুটীরশিল্পের পথেই।

আলস্য আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়েছে

দ্বিতীয় প্রশ্ন ওঠে বেকার সমস্যা নিয়ে। তাঁরা বলেন যে, আমরা যে পঁচাত্তর জন বেকার বলে বলেছি, তা আমাদের অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপে তাঁরা পল্লীগ্রামে শ্রমিকের অভাবের কথা উল্লেখ করেন। এরই সমর্থনে তাঁরা অর্থশাস্ত্রবিদদের দ্বারা রচিত পরিসংখ্যানের উল্লেখ করেন। আমি অবশ্য বিশেষজ্ঞ নই। আমি জানিনা যে, অর্থশাস্ত্রবিদরা কিভাবে সেই সব সংখ্যা সংগ্রহ করেন। তবে জীবনের পঁচিশ বছর আমি গ্রামসেবায় কাটিয়েছি। এ-সমস্যা সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। পরিসংখ্যান দ্বারা কেউ যদি প্রমাণ করতে চান যে, গ্রামে বেকার সমস্যা বলে কিছু নেই, তাহলে আমি তাঁকে বলব যে, তাঁর সমস্ত পরিসংখ্যান ভুল এবং সেসব সংগ্রহের জন্য যে পরিমাণ শ্রম ও অর্থ ব্যয়িত হয়েছে, তার সবটুকু বৃথা গেছে। কথা হচ্ছে এই যে, পরিসংখ্যানের জন্য তথ্য সংগ্রহকালে সকলে প্রত্যক্ষ বেকারত্বেরই কথা ভাবেন। প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের দিকে তাঁদের দৃষ্টি যায় না দুজনের কাজে পাঁচজনকে নিয়োগ করলে তার তিনজনকে যে বেকার বলে গণ্য করতে হবে, এ হিসাব তাঁদের নজরে পড়ে না। এই রকম আরও কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সাধারণত দৃষ্টি দেওয়া হয় না। বেকারত্ব থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক না পাবার কারণ হচ্ছে এই যে, বহু বৎসরের শোষণ ও ক্রমাগত কর্মহীন জীবন অতিবাহিত করার জন্য ভারতের গ্রামবাসীরা অলস হয়ে গেছে। আলস্য তাদের স্বভাবের অঙ্গে পরিণত হওয়ায় তারা বরং অনাহারে থাকবে; কিন্তু পরিশ্রমের হাত এড়াতে চাইবে। দেশে শহুরে সভ্যতার প্রসারের ফলে সমাজে অভিজাতবৃত্তি ক্রমশ স্থান করে নিয়েছে এবং গ্রামে আলস্যের প্রতিষ্ঠা বাড়ানর জন্য এই অভিজাত বৃত্তিও অনেকাংশে দায়ী, আলস্যের এই মর্যাদা সহস্র সহস্র লোককে বেকার হওয়া সত্ত্বেও পরিশ্রম করতে দেয় না; কারণ তারা মনে করে যে, তাহলে তাদের বংশের মর্যাদাহানি হবে। তাই পল্লী-শিল্পের সর্বজনীন প্রসার ছাড়া আলস্যের এই বিকট স্থিতির নিরাকরণ অসম্ভব। শুধু 'আলস্য পরিহার করে রাষ্ট্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ কর'— এ জাতীয় আবেদনে কাজ হবে না।

উৎপাদন : খাদ্যদ্রব্যের

তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে উৎপাদনের। লোকে বলে যে, আজ প্রত্যেক জিনিসের এত অভাব যে কলকারখানার সাহায্য না নিলে উৎপাদন বাড়বে না, কিন্তু কোন কোন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে? আজ সবচেয়ে বেশি অভাব খাদ্যদ্রব্যের। অন্নাভাবে লোক হাহাকার করছে, উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা যদি মুখ্য হয়, তবে সে সমস্যা আজ খাদ্য-সমস্যা কেন্দ্রিক। আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, খাদ্য উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত শিল্প চলে, তাতে অধিক উৎপাদন যন্ত্রোদ্যোগ দ্বারা হয় না, হয় গ্রামোদ্যোগ দ্বারা? আজ পর্যন্ত কেউ কি এমন আটা বা চালের কল আবিষ্কার করেছেন যে, তার দ্বারা গম বা চালের অনুপাতে বেশি আটা বা চাল হয়? এ বিষয়ে প্রত্যেক বিশেষজ্ঞের অভিমত হচ্ছে এই যে, এই দুটি খাদ্যশস্যের ব্যাপারে কুটীরশিল্পই আমাদের অধিকতর পরিমাণে খাদ্য ও পুষ্টিকর উপাদান দেয়। তেল, চিনি আদির ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। আপানারা কি এমন কথা বলতে পারেন যে, বিশুদ্ধ চিনাবাদামের তেলের চেয়ে ঐ তেলে উৎপন্ন বনস্পতি ঘি-এ বেশি খাদ্যপ্রাণ আছে? এতে তো তেলের খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়। পুঁজিবাদী অর্থশাস্ত্র কিভাবে যাবতীয় শিক্ষিত সমাজের বুদ্ধিকে বিভ্রম দ্বারা আচ্ছন্ন করে রেখেছে, একথা একটু গভীরভাবে বিবেচনা করলেই বোঝা যাবে। বস্তুত আমরা যদি খাদ্যদ্রব্যের অপচয়, জাতীয় স্বাস্থ্যহানি, গ্রামীণ জনতার সর্বনাশ আদি বন্ধ করতে চাই, তাহলে খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় কলকারখানা বন্ধ করে দেওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

দু নৌকোয় পা দেওয়া চলে না

কেউ কেউ বলেন, 'আপনার গ্রামোদ্যোগের কথা বুঝতে পারি, আর গরীবদের সাহায্য করতে হলে এ ব্যবস্থা ভালও; কিন্তু গ্রামোদ্যোগ এবং মিল—এ দুই এক সাথে চলবে না কেন? কোন কোন ক্ষেতে ট্রাকটার চলুক এবং কোন কোন ক্ষেতে লাঙ্গল চালান যাক। কোথাও কোথাও ধানকল থাকবে এবং কোথাও কোথাও ঢেঁকিও চলুক। এইভাবে কারখানায় যতটা সম্ভব কাপড় হক এবং বাকীটা চরকায় উৎপন্ন করা যাক। কিন্তু জাতীয় পরিকল্পনা এভাবে রচিত হয় না। মানুষ শুধু অংকশাস্ত্রের হিসাবে চলে না। গণিত এবং বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রত্যেক প্রশ্নের বিচার করার সাথে সাথে মানুষের তদানীন্তন মানসিক অবস্থার প্রতি অধিকতর নজর দিতে হবে। পাশের ক্ষেতে ট্রাকটার চললে যার কাছে ঐ রকমভাবে চাষ করার সাজ-সরঞ্জাম নেই, তার লাঙ্গল চালাতে মন চাইবে না। কারণ সাজ-সরঞ্জামবিহীন হবার সাথে সাথে তার মনে নিরাশার প্রভাব পড়বে, আর এইজন্য সে কর্মবিমুখ হয়ে অনশনে থাকবে; কিন্তু লাঙ্গল ছোঁবে না। যে গ্রামে হাজার গজ কাপড়ের প্রয়োজন, সেখানে মিলের সস্তা কাপড় পাঁচশত গজ এসে গেলে তমোবৃত্তির জন্য গ্রামবাসীরা অবসর সময় থাকা সত্ত্বেও

অর্ধনগ্ন অবস্থায় বৎসরের পর বৎসর ঊর্ধ্বমুখী চাতকের মত অপেক্ষা করে থাকবে মিলের কাপড় আসার জন্য; কিন্তু পরিশ্রম করে বস্ত্র উৎপন্ন করবে না। শতাধিক বৎসরের শোষণের পরিণামস্বরূপে দেশবাসীর ভিতরে যে অলসতা ও জড়তার সৃষ্টি হয়েছে, তার কথা স্মরণ রেখে পরি-কল্পনা রচনা করতে হবে। আমরা যদি চাই যে, জনসাধারণের মধ্যে শ্রম প্রতিষ্ঠা এবং স্বাবলম্বনের স্বভাব গড়ে উঠুক, তাহলে তার অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সুতরাং কুটীরশিল্প এবং কেন্দ্রীভূত শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হলে দেশের আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা ও জগতের বর্তমান পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, জনসাধারণের আবশ্যকীয় কোন কোন দ্রব্য কুটীরশিল্প দ্বারা স্বাবলম্বনের আধারে উৎপন্ন করতে হবে এবং কোন কোন বস্তুর উৎপাদন কেন্দ্রীভূত শিল্প-প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিতরণের ভিত্তিতে করতে হবে। কারণ প্রত্যেক শিল্পকে দুই ভাবেই চালানোর কথা শুধু যে বাতুলতা তাই নয়—অবান্তরও বটে।

উপরিউক্ত যাবতীয় প্রশ্নের উপরে বিচার করে যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, দেশের যাবতীয় আর্থিক পরি-কল্পনার আধার গ্রামোদ্যোগই হবে, তারপর কথা উঠবে যে, কিভাবে এই সব গ্রামোদ্যোগ চালান হবে? এমনিতে তো সকলের মুখেই শোনা যাচ্ছে যে, ভারতের সমস্যার সমাধান শুধু কুটীরশিল্প দ্বারাই হওয়া সম্ভব। কিন্তু কুটীরশিল্প সম্বন্ধে তাঁরা যখন নিজেদের ধারণার কথা ব্যক্ত করেন, তখন দেখা যায় যে, সে পথে দেশের মৌলিক সমস্যাসমূহের পরিপূর্তি ঘটা সম্ভব নয়। তাঁরা কুটীরশিল্পজাত পণ্যের জন্য দেশ-বিদেশের বাজারের কথা চিন্তা করেন। স্পষ্ট কথা হচ্ছে এই যে, কুটীরশিল্পের জন্য বিদেশের বাজারের ভরসায় দেশের আর্থিক পরিকল্পনা রচিত হতে পারে না। আর তাছাড়া বাজারের জন্য কি কি মাল আপনি উৎপন্ন করবেন? কিছু কারুকার্যময় ঝুড়ি, সাজি আর চুবড়ি, কিছু ফুলকাটা আর মিনে-করা বাসন-কোশন, নানা রকমের খেলনা, বড়লোকদের ড্রয়িংরুম সাজাবার আসবাব এবং কিছু বিলাসদ্রব্য ছাড়া এমন আর কি জিনিস আছে, যা কিনা কুটীর-শিল্পের ভিত্তিতে উৎপাদিত হয়ে কেন্দ্রীভূত শিল্পে উৎপন্ন পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিক্রি হতে পারে? সাধারণ লোকের প্রয়োজনে জন্য এই সব জিনিসের দরকারই-বা কখন পড়ে? এই দৃষ্টিকোণ থেকে কুটীর-শিল্পের কথা চিন্তা করে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। এতে জীবনের প্রয়োজনীয়তার জন্য না সোনার প্রভাব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, আর না পুঁজিবাদের বন্ধনমুক্ত হওয়া যাবে। কোনমতে দেশ পুঁজিপতিদের হাত এড়ালেও আমলাতান্ত্রিক একাধিনায়কত্বের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। আর এইটুকু গণ্ডির মধ্যে কুটীর-শিল্প চালিয়ে না আমরা যুদ্ধের সম্মুখীন হতে পারব, আর না পারব বেকারত্বের সমস্যার সমাধান করতে।

গ্রামোদ্যোগের মূল নীতি

দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে গ্রামোদ্যোগের কথা ভাবলে চলবে না। কুটীরশিল্প সম্বন্ধে তার মূল নীতির আধারে চিন্তা করতে হবে। উৎপাদন কার্য মানুষ দুরকম উদ্দেশ্যে করে। প্রথমত, নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও দ্বিতীয়ত, অর্থ উপার্জনের জন্য পণ্য উৎপাদন করা। কুটীরশিল্প এবং গ্রামোদ্যোগের মূল নীতি হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক গৃহস্থ ও গ্রামবাসী প্রথমে স্বীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করুক এবং তারপর প্রয়োজনের কিছু অতিরিক্ত উৎপাদন করে অর্থও উপায় করুক। কিন্তু বর্তমানকালের অর্থ-শাস্ত্রী এবং যন্ত্রবাদের সমর্থকগণ অর্থোপার্জনের শিল্পকেই কুটীরশিল্প বলে চালাতে চাইছেন। এইভাবে তাঁরা কুটীর-শিল্পের মূল নীতি বিরোধী পথে চিন্তা করেন। এই কারণেই দেশে কুটীরশিল্প নামে আজ যা চলছে, তার শিকড় সমাজের ভিতরে প্রবেশ না করে শূন্যে ঝুলছে। কোন্ দেশের জাতীয় শিল্প-পরিকল্পনা রচনাকালে লোকে মুখ্যত জাতীয় প্রয়োজনীয়তার কথাই বিবেচনা করে। কুটীরশিল্প এবং গ্রামোদ্যোগ সম্বন্ধেও ঐ দৃষ্টি রাখতে হবে অর্থাৎ মূল পরিকল্পনাই হবে কুটীর এবং গ্রামের প্রয়োজনীয়তার পূর্তির জন্য এবং অতিরিক্ত উৎপাদন বাইরে পাঠান যেতে পারে। সুতরাং কুটীর শিল্পের ভিত্তিতে পরিকল্পনা রচনা করার নীতি যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে জনসাধারণের মৌলিক প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকেই তার বিচার করতে হবে। সে অবস্থায় পরি-কল্পনার সূচনা অন্ন এবং বস্ত্রের ক্ষেত্র থেকেই শুরু করতে হবে। কৃষিকার্য, ধান ভানা, আটা পেষা, চিনি, তেল আদি খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কীয় যাবতীয় ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত শিল্প সমূহকে বন্ধ করে কুটীর শিল্পকেই গ্রহণ করতে হবে। উপরিউক্ত রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে ছাড়া দেশের স্বাস্থ্য ও সম্পদ রক্ষার জন্যও এ পথ গ্রহণ করতে হবে। এইভাবে কাপড়ও চরখা এবং তাঁত দ্বারা উৎপন্ন করতে হবে। তা ছাড়া চামড়া ও কাগজ আদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য কোথাও কোথাও এর কোন কোন প্রক্রিয়ায় হয়ত আমাদের কেন্দ্রীভূত যন্ত্রের সাহায্য নিতে হবে; কিন্তু আমাদের অর্থ-ব্যবস্থার মূলে থাকবে গ্রামোদ্যোগ। বরং যেসব দ্রব্যের উৎপাদন অপরিহার্য বলে যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে করতে হবে, সে সবও বিকেন্দ্রীত পদ্ধতিতে সংগঠন করতে হবে। কারণ এদের আমরা কুটীর-শিল্পের পরিপূরক হিসেবেই চালাব।

গান্ধীজী পথের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন

বস্তুত আজ থেকে চার বছর আগেই গান্ধীজী সরকারকে পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য জানতে হলে তাঁর নিজের কথাই উদ্ধৃত করা সমীচীন হবে। "মন্ত্রীদের কর্তব্য" শীর্ষক রচনায় তিনি লিখেছেন, "সরকার গ্রামবাসীদের জানিয়ে দেবেন যে তাঁরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রামের প্রয়োজনীয় খদ্দর উৎপন্ন করে নেবেন, এই হচ্ছে সরকারের আশা। তারপর তাদের আর কাপড় সরবরাহ করা হবে না। নিজের তরফ থেকে সরকার গ্রামবাসীদের কাপাসের বীজ বা তুলা (ক্ষেত্র অনুসারে যেটি দরকার) দেবেন এবং তৈরী সাজ-সরঞ্জামও এমন সুবিধাজনক সর্তে দেবেন যে তার দাম কিস্তিবন্দিভাবে প্রায় পাঁচ বছর বা দরকার বুঝলে তারও বেশী সময়ে উশুল হতে পারে। প্রয়োজন বুঝলে সরকার তাদের খাদি উৎপাদন কলা শেখানর মত লোক দেবেন আর গ্রামবাসীর প্রয়োজন-পূর্তির পর উদ্বৃত্ত খদ্দর কিনে নেবার দায়িত্ব নেবেন। এইভাবে বিশেষ ঝঞ্ঝাট

না করে শুধু সামান্য কিছু অতিরিক্ত ব্যয় দ্বারা বস্ত্রাভাব দূর করা সম্ভব হবে।

"যে সব জিনিস কোন রকম সাহায্য ছাড়া বা সামান্য একটু পৃষ্ঠপোষকতা পেলে কুটীরশিল্পের ভিত্তিতে উৎপাদিত হতে পারে এবং যে সব জিনিস গ্রামবাসীর ব্যবহারে লাগে এবং বাইরেও বিক্রি করা চলে, গ্রামবাসীদের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে তার একটি তালিকা রচনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ঘানির তেল, ঘানির খইল, ঘানিতে উৎপন্ন জ্বালানী তেল, হাতে কোটা চাল, তাল ও খেজুর গুড়, মধু, খেলনা, মিষ্টান্ন, চাটাই, হাতে তৈরী কাগজ এবং সাবান আদির উল্লেখ করা যেতে পারে। এইভাবে এ দিকে যথোচিত দৃষ্টি দিলে যে সব গ্রাম প্রায় ধ্বংস হয়ে এসেছে বা যে সব গ্রাম ধ্বংস হতে চলেছে, সেখানে প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা সম্ভব। এছাড়া সেখানে সেই সব গ্রামের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন এবং শহর ও নগরের চাহিদা পূর্ণ করার অধিক হতে অধিকতর ক্ষমতা পরিদৃষ্ট হবে।"

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কুটীরশিল্পের পরিকল্পনা রচনা করতে হলে বর্তমানে এর সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে তার পরিবর্তন সাধন করে গান্ধীজী বর্ণিত ধারণানুসারে আমাদের কাজ করতে হবে।

একা কেউ নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে না

কয়েকটি জিনিসের জন্য আমি মিল বন্ধ করতে বললে বা তার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে বললে অনেক বন্ধুর মনে অদ্ভুত বৈকল্যভাব দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁরা ভাবেন যে জোর করে আমরা চরখা আদি কুটীর-শিল্প কিভাবে চালাব? নিজের পায়ের উপর যেটি দাঁড়িয়ে থাকবে, সেইটিই চলবে। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় কোন সিদ্ধান্ত বা কোন বস্তু, কোন মানুষ বা কোন দেশ শুধু নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে না। আজকের জটিল দুনিয়ায় প্রত্যেককে কোন সিদ্ধান্ত বা নীতির ভিত্তিতে কোন রকম নিশ্চিত পরি-কল্পনার অঙ্গ হিসেবেই বেঁচে থাকতে হবে। ভারতের চিনি, ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থা এবং এমন কি স্বয়ং ভারত ও একলা নিজের পায়ের উপর ভরসা করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

মানুষের প্রয়োজনের জন্য এ সবকে যদি রাখা দরকার হয়, তবে এর জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা করতেই হবে। সুতরাং পুঁজির অভাব, বেকার সমস্যা, ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থায়িত্ব, জনসাধারণের আত্মবিকাশের উপায় কায়েম রাখা, গ্রামগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা এবং যুদ্ধকালীন বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য যদি চরখা এবং গ্রামোদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা থাকে, তাহলে যেভাবে বিদেশী চিনির আমদানী বন্ধ করে ভারতীয় শর্করা শিল্পকে বাঁচান হয়েছিল তেমনি কারখানাগুলিও বন্ধ করে চরখা আদিকেই দাঁড় করাতে হবে।

একনায়কত্বের বিপদ

ভারতের প্রত্যেক দল আর প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রস্তাবে বলেন যে, তাঁরা একনায়কত্বের এবং পুঁজিবাদ আদির অবসান করতে চান। তাঁরা বলেন যে, তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে খাঁটি গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমস্ত সমাজের পুন-র্গঠন। তাঁরা আরও বলেন যে, আজকে যে দুনিয়ার এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করছে, তাঁরা তার পরিসমাপ্তি ঘটাবেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এ হবে কেমন-ভাবে? আমাদের আদর্শের অনুকূল ও অনু-রূপ আর্থিক ব্যবস্থা রচনা না করা পর্যন্ত আমাদের সুউচ্চ আদর্শের কথা শুধু প্রস্তাবের শব্দ সম্ভারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে।

বস্তুত আমরা যদি দেশে শ্রেণী বৈষম্য লুপ্ত করে শোষণহীন সমাজ স্থাপনা করতে চাই, তাহলে স্বাবলম্বনের আধারে কুটীর-শিল্পের মাধ্যমে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা রচনা করতে হবে। জনসাধারণের প্রয়োজন-পূর্তির জন্য কোন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করলে আমরা যে ধরণের সমাজ-তন্ত্রবাদেরই কল্পনা করি না কেন, তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ না করে শুধু সংবিধানের শোভাবর্ধন করবে আর আসল ক্ষমতা কোন শক্তিশালী দলের হাতে যেয়ে সমাজতন্ত্রবাদের আসল রূপের বদলে একাধিনায়কত্বের রূপ পরিগ্রহ করবে। আজ সকলে পুঁজিবাদ নাশের কথা বলেন; কিন্তু শুধু পুঁজিপতি-দের ধ্বংস করেই পুঁজিবাদের অবসান ঘটবে না। এ যাবৎ কাল পর্যন্ত সমাজ-তান্ত্রিকরা পুঁজিবাদের বিনাশ সাধন করে পুঁজিকে বাঁচিয়ে রাখার কাজ করে এসে-ছেন। জনসাধারণের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য পুঁজির অনিবার্য আবশ্যকতার নামই হচ্ছে পুঁজিবাদ। সত্য সত্যই যদি পুঁজি-বাদের বিনাশ সাধন করতে হয়, তাহলে মানুষের জীবনধারণের জন্য পুঁজির প্রয়োজনীয়তারই অবসান ঘটাতে হবে। বিশ্বের সামনে গান্ধীজী এর জন্য এক নতুন রাস্তা দেখিয়ে গেছেন। আমি আশা করি যে, দেশবাসী গান্ধীজী কথিত এই পন্থার সাকার মূর্তি রচনা করে বিভ্রান্ত বিশ্বকে আজ আশার বাণী শোনাবেন।

শান্তিময় উপায়ে ভারত সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছে। সেইজন্য এ কথা আশা করা যেতে পারে যে, ভারত পাশ্চাত্যের আড়ম্বরে মোহিত না হয়ে গান্ধীজী কথিত আর্থিক নীতি গ্রহণ করে শান্তিময় উপায়ে পুঁজিবাদ এবং একাধি-নায়কত্বের পরিসমাপ্তি ঘটাবে।

[মূল হিন্দি হইতে শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত]

সাহিত্য প্রসঙ্গ

পার লাগেরকভিস্ট

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১২ সালে সুইডিশ কবি এরিক কার্লফেলদৎকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু কবি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। প্রত্যাখ্যান করবার সমর্থনে তাঁর যুক্তি ছিল এই যে, স্বদেশের বাইরে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত; যে পুরস্কারের পৃথিবীজোড়া খ্যাতি তা সুইডেনের মুষ্টিমেয় পাঠকের মতামতের উপর নির্ভর করে দেওয়া উচিত হবে না। গত বছরের (১৯৫১) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঠিক একই কারণে লাগেরকভিস্টও প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। তাঁর দু'একখানা বই ইংরেজীতে অনুবাদ হয়েছে, কিন্তু তাঁর খ্যাতি আজ পর্যন্ত সুইডেনের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। আমাদের দেশে পৃথিবীর বর্তমান সাহিত্যিকদের অন্যতম লাগেরকভিস্টের নাম বোধ হয় সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

লাগেরকভিস্টের স্বদেশবাসীরা জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষী বলে তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করে। কিন্তু দেশের লোকও তাঁর জীবন সম্বন্ধে খুব অল্পই জানে। স্টকহোমের বাইরে ছোট একটি দ্বীপে লোকচক্ষুর অন্তরালে লাগেরকভিস্ট বাস করেন। নিজেকে নিয়ে একা থাকতেই তাঁর ভালো লাগে। এমনকি, স্বরচিত নাটকগুলির অভিনয়ের সময়ও কদাচিৎ তাঁকে থিয়েটারে দেখা যায়। তাঁর মনন-প্রধান সাহিত্য আলোচনা করলে এই নিঃসঙ্গ-প্রিয়তাকে স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের দক্ষিণ অঞ্চলে এক ধর্মপ্রাণ চাষী পরিবারে পার ফেবিয়ান লাগেরকভিস্ট (Par Fabian Lagerkvist) জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের ধর্মপ্রীতি ছেলেবেলায় গভীরভাবে তাঁকে স্পর্শ করে। যৌবনে তিনি অনেকবার ধর্ম ও বিশ্বাসের বন্ধন ছিন্ন করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু পারিবারিক প্রভাবের ছাপ মুছে ফেলতে পারেন নি। এই দুই বিপরীতমুখী ভাবের দ্বন্দ্ব লাগেরকভিস্টের প্রথম দিকের রচনায় সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ করে লাগেরকভিস্ট ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। এই ভ্রমণের নেশা তাঁকে কখনো ত্যাগ করে নি। সুইডেনের অসংখ্য সমুদ্রখাড়ির মধ্যে নৌকাবিহার লাগেরকভিস্টের বড় প্রিয়। শুধু সুইডেন নয়, য়ুরোপের বহুস্থানে

পার লাগেরকভিস্ট : ১৯৫১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন

তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন,—বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে।

আপসালা থেকে লাগেরকভিস্ট কোপেনহেগেন পৌঁছলেন; সেখান থেকে অনেক ঘুরে ফিরে পৌঁছলেন প্যারিস। প্যারিসের সংস্পর্শে এসে লাগেরকভিস্টের সাহিত্যানুভূতি জেগে উঠল। কিউবিস্ট শিল্পীদের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি তাঁর তরুণ মনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। দেশে ফিরে কিউবিজমের উপর একটি প্রবন্ধ এবং 'শব্দ শিল্প ও চিত্র শিল্প' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কাব্যের আঙ্গিক কিউবিস্ট শিল্পীদের পদ্ধতি অনুযায়ী গঠিত হবে এই ছিল তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। কাব্য রচনার পুরাতন রীতি ছেড়ে এই নূতন পথ অবলম্বন করলে শব্দরচিত ছবিগুলি শিল্পীর আঁকা ছবির মতো প্রত্যক্ষ ও রঙীন হয়ে উঠবে। লাগেরকভিস্ট নিজেই কাব্য রচনার এই আদর্শ সামনে রেখে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে কিউবিজমের আদর্শ সাফল্যের সহিত রূপায়িত হয় নি; বরং প্রায়ই তিনি চিরাচরিত রীতির পক্ষপাতী হয়ে পড়েছেন। লাগেরকভিস্টের কাব্য সাধারণত গুরুগম্ভীর, তাঁর কাব্য-প্রবাহ অনায়াস গতিভঙ্গিমা লাভ করেনি।

লাগেরকভিস্টের সাহিত্যজীবন অনেক পরীক্ষা ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। জীবনের প্রথমভাগে তিনি সাহিত্যের আঙ্গিক নিয়ে নানা গবেষণা করেছেন। সে সময় জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মন ছিল সংশয়ে আচ্ছন্ন। প্রধানত এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগেই তিনি কাব্যের ফসল সঞ্চয় করেছেন। তাই তাঁর কাব্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি।

লাগেরকভিস্ট অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার হিসাবে। এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ক্লাসিক্যাল আদর্শ নিশ্চন্তভাবে অনুসরণ করেছেন। সফল ভাস্করের মতো তাঁর রচনাশিল্পে বাহুল্যের স্থান নেই; যা-কিছু লক্ষ্যের অতিরিক্ত তাকে তিনি নির্মমভাবে ছেঁটে বাদ দিয়েছেন। আজকের দিনে ক্লাসিক্যাল রীতির প্রতি এত বড় নিষ্ঠা কদাচিৎ দেখা যায়।

'জল্লাদ', 'বামন' ও 'বারাব্বাস'—লাগেরকভিস্টের এই তিনটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস ক্লাসিক্যাল পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উপন্যাস না বলে এগুলোকে মনোড্রামা বলা যায়;

একটি রূপক চরিত্রকে কেন্দ্র করে লেখক এ যুগের দরদহীন বিকৃত সমাজকে বিচার করেছেন।

হিটলারের দমনীতি যখন চরমে উঠেছে এবং য়ুরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রেও যখন হিংসা উত্তাল হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন 'জল্লাদ' প্রকাশিত হয়। এর প্রধান চরিত্র জল্লাদ হিংসার প্রতিমূর্তি। সংসারের কলহাস্য-মুখর জলস্রোতের মধ্যে সে উদ্যত তরবারি হাতে রক্ত-রাঙা পোষাক পরে বসে আছে, কখন কার মাথায় তরবারি নেমে আসবে ঠিক নেই। জল্লাদ বলে, মানুষই আমাকে বার বার ডেকে আনে। হিংসার উত্তাপে পৃথিবী যখন তপ্ত হয়ে ওঠে তখনই হয় আমার আবির্ভাব।

১৯৪৪ সালে 'বামন' প্রকাশিত হয়। এর প্রধান নায়ক রেনেসাঁ যুগের রাজসভার আশ্রিত এক বামন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে 'অব-মানব' বাস করে বামন তারই রূপক। সভ্যতার মুখোসের অন্তরালে যে সব পশুপ্রবৃত্তি সত্য ও মহৎকে ব্যর্থ করবার চক্রান্ত করছে লাগেরকভিস্টের নির্মম, তীব্র লেখনী তাদের বিরুদ্ধে এবং আধুনিক মানুষের সীমাহীন লোভ ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে।

লাগেরকভিস্টের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বারাব্বাস' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৯ সালে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই য়ুরোপের সুধীমহলে সাড়া পড়ে যায়। তাদের পুরোধা হয়ে আঁদ্রে জিদ উচ্ছ্বসিত ভাষায় লেখকের প্রশংসা করলেন। আখ্যানবস্তুর নবত্বে এবং রচনাশৈলীর প্রাঞ্জলতায় লাগেরকভিস্টের সাহিত্য-প্রতিভা 'বারাব্বাসে' পূর্ণতা লাভ করেছে। এখানে তাঁর বিদ্রূপের সুর কোমল হয়ে এসেছে, গভীরতর নীতিবোধ গল্পের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে এবং একটা বেদনার ছায়া পাঠকের মন অভিভূত করে তোলে। জটিল, নীতিমূলক আখ্যানবস্তুকে উপন্যাসের উপযোগী করে তোলবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন লাগেরকভিস্ট তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সরল কবিত্বময় ভাষাপ্রবাহে পাঠকের মন পাল-তোলা নৌকার মতো ভেসে চলে।

ইহুদীদের জাতীয় উৎসবের দিনে যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। সেদিন আর একজনেরও প্রাণদণ্ড হবার কথা ছিল,—সে দস্যু বারাব্বাস। রীতি অনুযায়ী উৎসব উপলক্ষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত একজন অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হতো। ইহুদীরা দস্যু বারাব্বাসকে মুক্তি দিয়ে তার ক্রুশে যীশুকে হত্যা করল। বাইবেলের এই ছোট্ট ঘটনা থেকে লাগেরকভিস্ট তাঁর উপন্যাসের উপাদান গ্রহণ করেছেন। নায়ক বারাব্বাস স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক। অপরের মঙ্গলের জন্য কেউ প্রাণ দিতে পারে একথা তার কল্পনার অতীত। সে তাই ভয়মিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে ঝোপের আড়াল থেকে যীশুর আত্মদান দেখল। এই বারাব্বাস আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বাস করছে। সত্যের প্রতি সন্দেহ, মহানের প্রতি অবিশ্বাস এ যুগের সভ্যতাকে ছোট করে দিয়েছে।

স্বদেশে লাগেরকভিস্ট নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। অবশ্য সে খ্যাতি বিদগ্ধ পাঠকসমাজের মধ্যে নিবদ্ধ। কারণ তাঁর নাটক মঞ্চাভিনয়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। লাগেরকভিস্টের মধ্যে ইবসেনের বাস্তববাদ নেই; বরং স্ট্রীণ্ডবার্গ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর নায়ক-নায়িকা কাজের চেয়ে কথা বলে বেশী; তাদের গতিবিধি রূপক এবং কল্পনার রাজ্যে। বিজ্ঞানপুষ্ট য়ুরোপীয় মঞ্চকলাও সে জগতে যথাযথরূপে দর্শকের সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারে না।

লাগেরকভিস্ট তাঁর নাটকগুলিকেও সমাজের নীচতা ও হীনতার বিরুদ্ধে অস্ত্র-রূপে ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় সংসারের খারাপ দিকটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। 'আমাদে বাঁচতে দাও' (১৯৪৯) নাটকে একটা নূতন আশাবাদের সূচনা দেখতে পাই। বার্নার্ড শ'র 'সেণ্ট জোয়ান' নাটকের অনুরূপে এখানে মিলিত হয়েছেন যীশু, সক্রেটিস, জোয়ান অব্ আর্ক প্রভৃতি। এ'দের বড় বড় বক্তৃতা থেকে জানা গেল লাগেরকভিস্টের ঈশ্বর কিংবা মানুষ কারো উপরই আস্থা নেই, আস্থা আছে আত্মার অবিনশ্বরত্বে; এবং বিশ্বাস করেন যে, শেষ পর্যন্ত আত্মা অশুভকে জয় করতে সমর্থ হবে। স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে এই তত্ত্বকথা শিল্পবোধকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করেনি। লাগেরকভিস্টের মধ্যেকার দার্শনিকটি চিরদিনই শিল্পীপ্রভুর তাঁবেদার হয়ে আছে।

আরও তিনজন সুইডিশ সাহিত্যিক এর আগে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এ'দের মধ্যে সেলমা লাগেরলফের নাম তবু শোনা যায়; কিন্তু হেদেনস্তাম ও কার্লফেলদৎ (মৃত্যুর পর ১৯৩১-এ পুরস্কার দেওয়া হয়)-এর পরিচয় খুব কম লোকেই জানে। অন্যান্য দেশের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকরা যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, সে তুলনায় এ'রা অপরিচিত। তার কারণ আছে। এ'দের সাহিত্য সুইডেনের সমাজ, ইতিহাস ও ভূগোল ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। তাই ভিন্নদেশবাসীর পক্ষে সুইডিশ সাহিত্য পুরোপুরিভাবে আস্বাদন করতে পারা কঠিন। লাগেরকভিস্ট সুইডেনের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক যিনি আধুনিক শিক্ষিত মানুষের মন নিয়ে কারবার করছেন। তাই তাঁর গ্রন্থাবলী পৃথিবীর সর্বত্র সমাদর দাবী করতে পারে।

কিন্তু তাই বলে এমন আশা করা যায় না যে, তাঁর বই একদিন ট্রামে-বাসে লোকের হাতে হাতে দেখা যাবে। কারণ লাগের-কভিস্টের রচনায় পরিশ্রান্ত মানুষ বিশ্রাম খুঁজতে এসে ব্যর্থ হবে। তাঁর প্রত্যেকটি কথা মনের দেওয়ালে আঘাত করে, নিশ্চিন্ত আরামে পড়বার জো নেই। সদাজাগ্রত মন নিয়ে লেখকের চমকপ্রদ চিন্তাধারা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় লাভ করতে হয়। কিন্তু কোনও দেশেই এমন পাঠকের সংখ্যা খুব বেশী নেই।

লাগেরকভিস্টের সাহিত্য বিচার করলে দেখা যাবে সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন তাঁর উদ্দেশ্য নয়। হয়তো মুষ্টিমেয় বোদ্ধা পাঠকই তাঁর কাম্য। যতদিন পৃথিবীতে ভণ্ডামি ও নীচতা থাকবে, যতদিন ভালো-মন্দর দ্বন্দ্ব ঘুচবে না, যে পর্যন্ত জীবনের প্রশ্ন নিয়ে মানুষের মন সংশয়াক্রান্ত থাকবে ততদিন লাগেরকভিস্ট আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন।

পুস্তক পরিচয়

প্রাথমিক বিজ্ঞান (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ)—পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর পক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এদেশের মধ্য শিক্ষার ভার গ্রহণ করার পর থেকে বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেছেন, বলা বাহুল্য পুস্তক প্রকাশনা সমিতি (পাবলিশার্স এসোসিয়েশন) তা একটুও ভাল বলেন নি। দৈনিক পত্রিকায় বিবিধ কটু সমালোচনা আমরা পড়েছি।

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ স্থির করেছেন, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে বিজ্ঞান পড়ান শুরু হবে। প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রথম ভাগ হ'ল তার পাঠ্য। পুস্তক প্রকাশনা সমিতির আপত্তি ওটি একমাত্র পাঠ্য। প্রথম ভাগের মূল্য দশ আনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৫। পাঁচটি পরিচ্ছেদে পুস্তিকাটি ভাগ করা। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ধারণা প্রথম পরিচ্ছেদে দেওয়া আছে; বিশেষ ক'রে সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণ। তারপর অন্যান্য পরিচ্ছেদে আছে পৃথিবী সম্বন্ধে,—পৃথিবীর অভ্যন্তর, ভূপৃষ্ঠ, বায়ুমণ্ডল, জল ও বায়ু। প্রসঙ্গক্রমে মিশ্রিত ও মৌলিক পদার্থ, যৌগিক পদার্থ, পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। জীব ও জীবনের ক্রিয়া, জীবজগতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের আদানপ্রদান। উদ্ভিদের কাছে প্রাণীর ঋণ ও প্রাণীর কাছে উদ্ভিদের ঋণ প্রভৃতি প্রসঙ্গও আছে। আর আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি বড় আবিষ্কার ও উদ্ভাবনীর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। প্রথম ভাগ লিখেছেন ভূতপূর্ব অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ প্রথম ভাগের উপাদান হিসাবে যা বিষয় তালিকা নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন, তা অনেকের পছন্দ হয়নি। এতে বিজ্ঞান পাঠনের মান অত্যন্ত খাটো করা হয়েছে বলে প্রকাশ। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বয়সের হার আজকাল বড় জোর দশ বছর। দশ বছর বয়সে প্রথম বিজ্ঞানের বই হাতে ক'রে পাতা উল্টিয়েই যদি তারা একবার বইটি বন্ধ ক'রে রাখে তবে আর কোন দিন বিজ্ঞান তাদের প্রিয় বস্তু হ'য়ে উঠবে! সেদিকে বিশেষ নজর রেখেই পর্ষৎ সহজ ও তথাকথিত ছোট মানের পাঠ্যবিষয়ক তালিকা নির্ধারণ করেছেন। পাঠ্যপুস্তকের যাতে বিষয়বস্তু অত্যন্ত সহজ ও মনোগ্রাহী হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য বলেছেন। এর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশান-এ বিজ্ঞানের পাঠ্য বিষয়-তালিকা, যার মান দীর্ঘ ও শ্রেষ্ঠ ব'লে সন্তোষ প্রকাশ যাঁরা শুরুতে করেছিলেন, তাঁরাই তো শেষকালে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, দুরূহ বাক্য সংযোজনায় বিজ্ঞানের সহজ তথ্যগুলিও অপাচ্য হ'য়ে উঠেছে। আজ তো সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্যই পর্ষদের এই নব প্রচেষ্টা। ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রাথমিক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের মান, বিষয়বস্তুর মাত্রার দিকে চেয়ে আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকগুলির মান খাটো হয়েছে বললে সম্পূর্ণ বলা হয় না। পাশ্চাত্ত্য দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা ছেলেবেলা থেকে পরীক্ষাগারেই বেশী হয়। যন্ত্রপাতি ব্যবহার ছাত্রছাত্রীরা প্রথম থেকেই শুরু করে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, কলিকাতা শহর থেকে অনেক দূরে গ্রামে যে-সব বিদ্যালয় রয়েছে, তারাও বিজ্ঞান পড়াবে। কলিকাতার সব বিদ্যালয় যেমন হাতেকলমে শেখাবার জন্য উপযুক্ত পরীক্ষাগার রাখতে পারে না, তেমনি গ্রামের বিদ্যালয়েও আদৌ পারে না। কেন পারে না, পারা উচিত; নইলে চলবে কেন? এ সব তর্কের মীমাংসা হবার মত দেশের অবস্থা আজও আসেনি। মোট কথা পারে না। পাঠ্যপুস্তকে আলোচিত সামান্য দুই একটা যন্ত্র চাক্ষুষ করতেও ছাত্রেরা সুযোগ পায় না। হাতে নেওয়া তো দূরের কথা। বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষক বেশীর ভাগ অঙ্ক, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে বি এস্‌সি পাশ করা। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায়, যেমন উদ্ভিদ-বিদ্যা, জীবতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কথা তাঁদের ভাল ক'রে জানবার সুযোগ ছাত্র অবস্থায় ঘটে না। তারপর উত্তরকালে বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা করবার বা শোনবার, পরীক্ষাগার ইত্যাদি দেখার সুযোগ না পাওয়ায় বিজ্ঞানের প্রসার বিজ্ঞানবিষয়ক পাঠনের প্রণালী ইত্যাদি থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বিজ্ঞান পাঠের বর্তমান প্রতিকূল অবস্থায় কেবল শিক্ষণ বিষয়ের মান বৃদ্ধি এবং কালে প্রশ্নপত্রে বিজ্ঞানের জটিলতার পারদর্শিতা দেখালে দশ বারো বছরের ছেলেদের বিজ্ঞান শেখানো হবে কি?

বাঙলা দেশের ছেলেরা এই প্রথম ভাগটি পড়ে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবেশ করবে। প্রথম ভাগটি তাই যতদূর সম্ভব সহজ করবার দিকেই গ্রন্থকার লক্ষ্য রেখেছেন। গ্রন্থকার স্বয়ং আজীবন শিক্ষক এবং সফল শিক্ষক। বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্য জনসাধারণের কাছে অনেক দিন থেকেই পরিবেশন করে আসছেন। তাঁর রচনাভঙ্গী সহজ ও সাবলীল। তাঁর রচনা পড়ে ভবিষ্যতের ছাত্রেরা উপকৃত হবে বলে মনে হয়। গ্রন্থকার সব সময়েই শিক্ষকের শিক্ষণপদ্ধতির উপর অনেক বিষয় ছেড়ে রেখেছেন। যদি ভাগ্যবশে উদ্যোগী শিক্ষক ও ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর সমাবেশ হয় তো এই জাতীয় পাঠ্যপুস্তকের সূত্র টেনে শিক্ষক অনেক কিছুই ছাত্রকে শিখিয়ে দিতে পারবেন। পাঠ্যপুস্তক রচনাকালে গ্রন্থকার সব সময়ে মনে রেখেছেন যে, ছাত্রেরা কোন পরীক্ষা হাতে কলমে করবার সুযোগ পাবে না; হয়তো বা শিক্ষকও ক'রে দেখাবার সুযোগ পাবেন না। পুস্তিকাটি সেইভাবে পরীক্ষা করার সম্ভাবনা এড়িয়ে লেখা। যদি কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রের সে সুযোগ ঘটে, তবে শিক্ষক অবশ্যই পরীক্ষা ক'রে ছাত্রদের কৌতুক নিবৃত্ত করবেন।

দ্বিতীয় ভাগটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৯। মূল্য বারো আনা। লিখেছেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। এটি সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য। অর্থাৎ পড়বে এগার বছরের ছেলেমেয়েরা। এটিতে দশটি অধ্যায়। বিষয়বস্তু জীববিদ্যা। ফুল ও বীজের কথা, উদ্ভিদের খাদ্য, প্রাণীর কথা, কই মাছ, প্রজাপতি, পিঁপড়ে ও ব্যাঙের বিষয় ওরই মধ্যে একটু বেশি আলোচনা আছে। জীববিদ্যার প্রাথমিক পুস্তকে যেটি বিশেষ দরকার, সেটির অভাব পুস্তিকাটিতে হয় নি। পুস্তিকার ছবিগুলি ভালই বলতে হবে। আর যে সব বিষয় পরীক্ষা করার কথা বলা আছে, সেগুলি সহজে করা যায় বলেই বিশেষ করে পুস্তিকাটিতে উল্লেখ করা আছে। লেখক স্বয়ং পিঁপড়ে, মাছ ইত্যাদির কার্যকলাপ, স্বভাব, ইত্যাদি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এ সব বিষয়ে সহজ ভাষায় জন-প্রিয় প্রবন্ধাদি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। আমরা পড়ে খুশী হয়েছি যে সাধারণ বৈজ্ঞানিক পাঠ্য পুস্তিকার গুরুগাম্ভীর্য তিনি লঘু করেই শিল্পচাতুর্য দেখিয়েছেন এবং ছাত্র ও শিক্ষকের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। শুনেছি বইটিতে নাকি অনেক কিছু বিষয় আলোচিত হয় নি। এবং বইটির জীববিদ্যা হিসাবে মান নাকি অনেক খাটো। বিজ্ঞান বিষয়ে পরীক্ষার সময় পূর্ণ সংখ্যা বিবেচিত হবে ৫০। সে স্থলে কেবল পৃষ্ঠা ও অনুচ্ছেদ বৃদ্ধি করে পাঠ্যবস্তুর গুরুত্ব ছাত্রদের অনুক্ষণ স্মরণ করিয়ে বিভ্রান্ত করে তোলা কি সমীচীন হবে? কিছুকাল আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা ভাষার এক ব্যাকরণ ব্যবস্থা করেছিলেন। আমাদের তা পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। অকপটে স্বীকার করি তার এক বর্ণ হৃদয়ঙ্গম করবার বুদ্ধি আমাদের ছিল না। পরে এইটুকু করেছি, সেই ব্যাকরণ-মুষল দিয়ে আর আমাদের ছোট ভাইদের বা ছেলেদের আঘাত করি নি।

শারীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ রয়েছে তৃতীয় ভাগে। এটি অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য। এর দাম বারো আনা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৩। এর ছয়টি অধ্যায়, আমাদের দেহের ভিতরকার গঠন, হাড়, মাংসপেশী ও রক্ত, জীবকোষ, নার্ভ ইত্যাদির আলোচনা আছে। আমাদের অদৃশ্য শত্রু, জীবাণু, টিকা, শস্ত্র চিকিৎসা, ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, খোস, পাঁচড়া, দাদ ইত্যাদি আমাদের সুপরিচিত রোগগুলির আক্রমণ নিবারণ করার কথা আছে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় প্রাথমিক সাহায্য, শরীরের পরিচ্ছন্নতা, ড্রেন পায়খানা, জলসরবরাহ 'ভিটামিন' ইত্যাদি বিষয়ে মোটা-মুটি আলোচনা আছে। পুস্তিকাটি লিখেছেন অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। আমরা অত্যন্ত

কৌতূহলের সঙ্গে পুস্তিকাটি পড়েছি। ঐ সপ্তম শ্রেণীতে আমরা পড়েছি সে যুগে চার্লস্ ব্যাঙ্কের হাইজিন। বলা বাহুল্য দুরূহ ইংরাজি ভাষায়। আমাদের যে বন্ধুটি হাইজিনে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন তাঁর হাতে বড় নখ, গায়ে পাঁচড়া, চুল রুক্ষ, গায়ের ত্বক খস্খসে। ভরসা করি এই পুস্তিকাটি যারা পড়বে, তাদের তা হবে না। তারা সবাই হয়ত পরীক্ষায় নম্বর বেশি পাবে না, তবে কারও নখ চুল বড় থাকবে না, পাঁচড়া ত দূরের কথা! ১৪, ১৫, ১৬।৫২

ছায়াপথের রূপকথা ঃ বাগীশবন্ধু মুৎসুদ্দি ঃঃ ইন্ডিয়ানা লিঃ ঃঃ ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচসিকা।

চীন ও জাপানে অনুষ্ঠিত ছায়াপথের বয়নরতা মেয়ে তালাবাতা শুমের উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া এই উপাখ্যানটি রচিত হইয়াছে। এই পুস্তকটির বিশেষ আকর্ষণ শেষভাগে সন্নিবেশিত কবিতাগুলি। এই কবিতাগুলি অষ্টম শতাব্দীতে রচিত "মানিও শু" গ্রন্থ হইতে গৃহীত। বারো শত বৎসর পূর্বের জাপানী জীবন ও চিন্তাধারা এই 'তকা'গুলির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট অলংকরণ প্রথম শ্রেণীর। ২৩০।৫১

নির্বাচনী সভায় শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ সুস্পষ্ট পথ বাছিয়া লইতে নির্দেশ দিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"পথ অবশ্যি বেছে নেওয়া শক্ত নয়, শক্ত হলো পথ চলা; পথে পথে ফেরিওলাদের অসম্ভব ভীড়।"

* * * * *

মোরারজী আর আমূলে দেশাইর নির্বাচনী রেসে ফটো ফিনিস্ চেয়ে নেওয়া হয়েছিল, ফলে অবশ্যি আমূল পরিবর্তন কিছু হয় নি"—মন্তব্য করেন জনৈক রেস্-রসিক।

* * * * *

হিন্দু-বিবাহ-আইনের বিরোধিতা করিবার আশ্বাস দিয়া জনৈক ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত নেহরুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য নির্বাচনে নামিয়াছেন।—"কিন্তু আশ্বাসটা ব্রহ্মচারীর থেকে না পেয়ে সংসারীর থেকে পেলেই কি সত্যিকারের কাজ হতো না?—বলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

পিপীলিকারা কী ভাষায় কথা বলে তা আয়ত্ত করার চেষ্টা করা ভারতের কর্তব্য—বলিয়াছেন প্রফেসার হলডেন্।—"কিন্তু সে যে বড়ই শক্ত, যে-সব মানুষ পিঁপড়ের মতো গর্তে ধান-চাল লুকিয়ে রাখেন, সেই মানুষের ভাষাই যে আমরা আয়ত্ত করতে পারছিনে"—মন্তব্য করেন, বিশু খুড়ো।
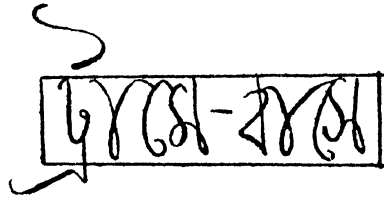
* * * * *

নির্বাচন-প্রতীকের প্রসঙ্গে অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"অনেকে বলেন, স্লোগান আওড়ালে কিছু হয় না, কিন্তু আমরা কোলকাতার নির্বাচনে প্রত্যক্ষ করেছি গলার জোরে গমও ধান হয়ে যায়!"

* * * * *

ভুয়া ভোট প্রতিরোধের জন্য ভোটারদের বামতর্জনীটি কালি চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।—"প্রার্থীদের কারু কারু চূণ-কালির ব্যবস্থা অবশ্যি ভোটাররাই করেছেন"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * * * *

কালনার একটি ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া জনৈক সাঁওতাল নাকি দাবী জানাইয়াছে যে, হাঁড়ি ভর্তি পচাই না হইলে সে ভোট দিতে অক্ষম।—"সাঁওতালটির দাবী ক'জন সমর্থন করেন তা ভোট নিয়ে জানতে পেলে বেশ রগড় হতো—অবশ্যি ভোটটা যে ব্যালট্ প্রথায় হওয়া দরকার তা বলাই বাহুল্য"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * * * *

এক সংবাদে প্রকাশ পাকিস্থানে সম্প্রতি একটি ছায়াচিত্র তোলা হইয়াছে, কাফেরের বিরুদ্ধে জেহাদে নামিবার জন্য আহ্বানই শুনিলাম এই ছবির প্রধান আখ্যান বস্তু। বিশু খুড়ো বলিলেন—"হিট্ পিকচার করতে হলে প্রচার-উজীর যেন বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করে—শুধু উন্মাদের জন্যে।"

* * * * *

জনৈক বৈজ্ঞানিক সূর্যের উত্তাপে রান্না করিয়া নাকি নেহরুজীকে খাওয়াইয়াছেন এবং আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত রান্নাই সূর্যের উত্তাপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব।—"কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে রান্নার জিনিসপত্র সুলভ হবে বলে নেহরুজী কোন আশ্বাস দিয়েছেন কিনা, সে সম্বন্ধে সংবাদে কিছু বলা হয় নি"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * * * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গলা সাহিত্য সম্পর্কে কতিপয় বিশিষ্ট পুস্তক

প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস —ডাঃ তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত। আট শতাধিক পৃষ্ঠা। মূল্য—বারো টাকা। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের তথ্যপূর্ণ বিস্তৃত আলোচনা।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কথা—ডাঃ তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত। ৩৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্য—সাত টাকা আট আনা। ইহাতে দশটি বাঙ্গলা প্রবন্ধ ও নয়টি ইংরাজী প্রবন্ধ আছে। গ্রন্থকার-লিখিত 'ভূমিকা' জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।

ব্রাহ্মণ - রোম্যান-ক্যাথলিক-সংবাদ —ভূষণার রাজপুত্র দোম আন্তোনিয়ো দো রোজারিয়ো প্রণীত। পর্তুগালের অন্তঃপাতী এভোরার সাধারণ গ্রন্থালয়ে রক্ষিত পুঁথি হইতে অধ্যাপক ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত। বধাই ও কাগজ সুন্দর। ৮৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য—দুই টাকা।

বঙ্গসাহিত্যের পরিচয়—রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, সম্পাদিত। সুবৃহৎ দুই খণ্ডে সমাপ্ত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—২০৮৭। মূল্য—ষোল টাকা বারো আনা। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ইহা এক বিরাট সংকলন-গ্রন্থ।

বাঙ্গলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় —প্রমথনাথ চৌধুরী প্রণীত। মূল্য—আট আনা।

গোবিন্দ দাসের করচা—রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এবং প্রভুপাদ বানোয়ারীলাল গোস্বামী সম্পাদিত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—১৭৬। মূল্য—দেড় টাকা।

প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্য—শ্রীশিবরতন মিত্র সংকলিত। ১৯৪ পৃষ্ঠা। মূল্য—তিন টাকা।

হরিলীলা—লালা জয়নারায়ণ সেন প্রণীত এবং রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও বিশ্ববল্লভ শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত। ১৬৫ পৃষ্ঠা। মূল্য—এক টাকা চৌদ্দ আনা।

সহজিয়া সাহিত্য—অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র-মোহন বসু সম্পাদিত। ২০৬ পৃষ্ঠা। মূল্য—দুই টাকা।

সত্যপীরের কথা—রামেশ্বর ভট্টাচার্য বিরচিত এবং শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত। পাইকা অক্ষরে ছাপা। ৭৩ পৃষ্ঠা। মূল্য—আট আনা।

জাতক-মঞ্জরী—রায় বাহাদুর ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক তৎকৃত সমগ্র জাতকের বঙ্গানুবাদ হইতে সংকলিত। পাইকা অক্ষরে ছাপা। ৩৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য—আড়াই টাকা।

পটুয়া - সঙ্গীত — গুরুসদয় দত্ত, আই-সি-এস সম্পাদিত। এগারখানি চিত্র-সম্বলিত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—১০৫। মূল্য—দেড় টাকা।

চণ্ডীমঙ্গল - বোধিনী (প্রথম ভাগ)—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ৬৭২ পৃষ্ঠা। মূল্য—ছয় টাকা।

ঐ (দ্বিতীয় ভাগ)—উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪২৫। মূল্য—সাড়ে চারি টাকা।

পূর্ববঙ্গ - গীতিকা (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা)—রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন সংকলিত। একুশখানি চিত্র-সম্বলিত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—৫৮৫। মূল্য—পাঁচ টাকা।

এই খণ্ডে 'ধোপার পাট', 'মইষাল বন্ধু', 'কাঞ্চনমালা', 'শান্তি', 'লীলা', 'ভেলুয়া', 'কমলারাণীর গান', 'মাণকতারা বা ডাকাইতের পালা', 'মদনকুমার ও মধুমালা', 'সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া', 'নেজাম ডাকাইতের পালা', 'দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদালি', 'সুরৎ জামাল ও অধুয়া' এবং 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান' নামে চৌদ্দটি পালা-গান আছে।

পূর্ববঙ্গ-গীতিকা (তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা)—রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, সংকলিত। একখানি ত্রিবর্ণের, তেইশখানি এক বর্ণের ছবি আছে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—৫৭৭। মূল্য—পাঁচ টাকা।

এই খণ্ডে 'মাঞ্জুর মা', 'কাফেন চোরা', 'ভেলুয়া', 'হাতী খেদা', 'আয়নাবিবি', 'কমল সদাগর', 'শ্যাম রায়', 'চৌধুরীর লড়াই', 'গোপিনী কীর্তন', 'সুজা-তনয়ার বিলাপ' ও 'বার তীর্থের গান' নামে এগারটি পালা-গান আছে।

পূর্ববঙ্গ-গীতিকা (চতুর্থ খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা)—রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, সংকলিত। কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—৫৪৮। মূল্য—পাঁচ টাকা।

এই খণ্ডে 'নছর মালুম', 'শীলাদেবী', 'রাজা রঘুর পালা', 'নুরন্নেহা ও কবরের কথা', 'মুকুট রায়', 'ভারইয়া রাজার কাহিনী', 'আন্ধা বন্ধু', 'বগুলার বারমাসী', 'চন্দ্রাবতীর রামায়ণ', 'সন্নমালা', 'বীরনারায়ণের পালা', 'রতন ঠাকুরের পালা', 'পীর বাতাসী', 'রাজা তিলক বসন্ত', 'মলয়ার বারমাসী', 'জীরালনী', 'পীরবানুর হাঁহলা', 'সোণারায়ের জন্ম' ও 'সোণাবিবির পালা' নামে উনিশটি পালা-গান আছে। পালা-গানগুলি যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে, তজ্জন্য প্রত্যেক খণ্ডের প্রত্যেক পালা-গানে যত দুরূহ বা অপ্রচলিত শব্দ আছে, তাহাদের ব্যাখ্যা পাদটীকায় দেওয়া হইয়াছে।

পদ্মা-পুরাণ (নারায়ণদেবের মনসা-মঙ্গল) —দ্বিতীয় সংস্করণ; ডাঃ তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত। ৩১৯ পৃষ্ঠা।—দুইখানা প্লেট সম্বলিত। মূল্য—সাড়ে সাত টাকা।

মনসামঙ্গল (কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ-রচিত) —শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত। ৬০০ পৃষ্ঠা। মূল্য—১২।৷০ টাকা।

হারামণি—মৌলবী মহম্মদ মনসুর উদ্দীন কর্তৃক সম্পাদিত। ৩৩৫ পৃষ্ঠা। মূল্য—আড়াই টাকা। এই গ্রন্থে ২৭৪টি লোক সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র—দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ১০৩ পৃষ্ঠা। মূল্য—এক টাকা।

গিরিশচন্দ্র—মন ও শিল্প—মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। মূল্য—দেড় টাকা।

বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ —শ্রীমন্মথমোহন বসু, ২৮১ পৃষ্ঠা। মূল্য—সাত টাকা। পুস্তকখানি আট অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে প্রাক্-আর্য ও আর্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গলা নাটকের আধুনিক উন্নতি, ধারাবাহিক রূপে সাবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্র — শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত। ২৫৩ পৃষ্ঠা। মূল্য—দুই টাকা চারি আনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা — শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। ১৫০ পৃষ্ঠা। মূল্য—দুই টাকা।

বঙ্কিম-পরিচয় — ডাঃ শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—২১২। মূল্য—আট আনা।

বিহারীলালের কাব্য-সংগ্রহ—কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্য। মূল্য—সাড়ে সাত টাকা।

সাহিত্যে নারী—স্রষ্ট্রী ও সৃষ্টি—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত। ৪৫২ পৃষ্ঠা। দাম—ছয় টাকা। পৃথিবীর যাবতীয় নারী লেখিকা ও সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাদের দান সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বাঙ্গলা বচ্যাভিধান—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। ২২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস—ডাঃ কল্যাণী মল্লিক। ৬৬৬ পৃষ্ঠা। মূল্য—১৫৲ টাকা।

সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় : বিস্তৃত পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন।

রঙ্গ জগৎ

ফ্লওয়াড়ী (আই-এন-এ পিকচার্স—ক্যালকাটা ম্ভীটোন)—কাহিনী ঃ রবীন্দ্রনাথ; চিত্রনাট্য ঃ চার্ রায়; পরিচালনা ঃ প্রফুল্ল রায়; আলোকচিত্র ঃ জি কে মেটা; শব্দযোজনা ঃ বাণী দত্ত; স্রযোজনা ঃ কমল দাশগ্প্ত; শিল্পনির্দেশ ঃ চার্ রায়; ভূমিকায় ঃ প্রভাতকুমার, প্রফুল্লকুমার, আর পি কাপ্র, ভিটলদাস পাণ্ডোটিয়া, প্রীতি মজ্মদার, যম্না, প্রণতি, রামপিয়ারী প্রভৃতি।
ইনা ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনে ২৫শে জান্য়ারী বস্শ্রী, বীণা ও জনতায় ম্ক্তিলাভ করেছে।

আমাদের চিত্রনির্মাতারা যে কতকগ্লি বিচিত্র ধারণাকে বদ্ধম্ল করে রেখেছেন, তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে—কাহিনীকার যতো নামকরা হবে, তার রচনার চিত্রর্প দেওয়া হবে ততই কঠিন ব্যাপার এবং রচনা যতো নামকরা হবে,, সেটা ছবিতে দাঁড় করানো অবশ্যই দ্র্হ কাজ হবে। কোন্ য্ক্তি ধরে যে এই ধারণার স্ষ্টি, তা জানা নেই, কিন্তু কি জানি কেন, শরৎচন্দ্রই কেবল এই ধারণার মধ্যে আসেন না, নয়তো বাঙলা সাহিত্যের অমর কীর্তিগ্লোর প্রায় সব ক'খানিরই ক্ষেত্রে এই রকমই মনোভাব চিত্রনির্মাতাদের পোষণ করতে দেখা যায়। তাছাড়া তাঁরা এও মনে করেন যে, নামকরা রচনা হলেই তার চিত্রর্প দিতে বেশ বেগ পেতে হবেই এবং ম্ল রচনার মধ্যে কিছ্ পরিবর্তন করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনীগ্লির ওপরে সবায়ের মতোই চিত্রনির্মাতাদেরও অগাধ শ্রদ্ধা আছে। রচনা হিসেবে তারাও রবীন্দ্র-রচনাকে প্থিবীর শ্রেষ্ঠ রচনা বলেই স্বীকারও করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন রচনাকে চিত্রাকারে র্প দেবার কথা হলেই সব নির্মাতাই দেখি কাজটা বিশেষ রকমের দ্র্হ বলে মনে ধরে নিয়ে পিছিয়ে যান। বলেন, ছবির ছকে নিয়ে আসার স্যোগ বিশেষ থাকে না। আর ঠিক পর্দায় র্পায়িত করে দেওয়ার মতো করেই যে কার্র রচনা থাকতে পারে, এ তো তাঁরা ভাবতেই পারেন না. তা সে রবীন্দ্রনাথই বা হোন না কেন। 'ফ্লওয়াড়ী'র ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

'ফ্লওয়াড়ী' রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ'এর ভিন্ন র্প। 'ফ্লওয়াড়ী'র গল্প আরম্ভ ফ্লবাগানে এক মর্মর ম্র্তি নিয়ে। আদিত্য রোজ সকালে এসে ম্র্তিটিতে প্ষ্পস্তবক অর্পণ করে যায়—ম্র্তি হচ্ছে তাঁর পরলোকগতা স্ত্রী নীরজার। এই প্রাত্যহিক প্ষ্পাঞ্জলির ইতিহাস বর্ণনা করবার জন্যে ঘটনাকে পিছন দিক থেকে টেনে আনা হয়েছে। ম্ল 'মালঞ্চ' আরম্ভ বিছানায় শায়িতা নীরজাকে নিয়ে। অক্ষম চলচ্ছক্তিহীনা নীরজা ঘরের জানালা দিয়ে নীচের বাগানে তার নিজের হাতে তৈরি অর্কিডের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে আর আস্তে আস্তে মনে করছে প্রনো সব কথা। এখানেও কাহিনীকে পিছন দিক থেকেই এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। শিল্পী-শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর উপস্থাপনে অমন চমৎকার চিত্রটি এঁকে দিয়ে গেলেও কেন যে তা চলচ্চিত্র র্পদাতার দ্ষ্টি এড়িয়ে যেতে পারলো. বোঝা গেল না।

নীরজার যে রকমের চরিত্র, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাহিনী আরম্ভ করিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক তার সঙ্গে ছন্দ রেখে। চলচ্চিত্রের বেলাতে কাহিনীর স্ত্রটাই এমনিভাবে ধরিয়ে দেওয়া হলো যাতে সেই ছন্দটাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া অর্ধেক ছবি শেষ হবার আগে পর্যন্ত সম্ভব হতে পারেনি। শেষের অংশ অবশ্য খ্বই জমেছে কিন্তু গোড়ার জোর তেমন না থাকায় কেমন যেন ইতস্তত-ভাবে।

"মালঞ্চ"-র কাহিনী সংলাপপ্রধান এবং "ফ্লওয়াড়ী"-তেও তাই আছে। কিন্তু কাহিনীর নাটকীয় পরিণতিকে ঘোর করে তোলার জন্যে "মালঞ্চ"-তে খ্চখাচ অনেক ঘটনা শ্র্ থেকেই স্ষ্টি করে দেওয়া রয়েছে যেগ্লো থাকায় নীরজাকে এবং তার মনের ভাবগতিক ঠিক করে ব্ঝে নেওয়া যায়। "ফ্লওয়াড়ী"-তে কাহিনীর সেইসব ভিৎগ্লিকেই বাদ দেওয়া হয়েছে, নয়তো এমনি সাদাসিধেভাবে কয়েকটি ঘটনা দেখানো হয়েছে যেগ্লোর জের ম্ল কাহিনীর ওপর থাকতে পারে বলে কোন [illegible] না।

গল্প হচ্ছে, আদিত্যের ওপর নীরজার ভালবাসা নিয়ে। নীরজা আদিত্যের সবট্কু ভালোবাসা দখল করে রাখতে চায়, কেউ তা থেকে এতট্কুও ভাগ নেবে এ তার কাছে অসহনীয়। এমন কি আদিত্যর পোষা কুকুর ডলির আদরও সে সইতে পারতো না বলে ডলিকে সে তার আর আদিত্যর মাঝ থেকে যতটা সম্ভব সরিয়ে রাখার চেষ্টা করতো। ছবিতে ডলিকে সরিয়ে রাখার দ্শ্য রয়েছে কিন্তু তার কারণটা আরোপ করা নেই। ফ্লবাগান গল্পের পট ও সোপানের কাজ করেছে এবং ফ্লেরও একটা ভূমিকা রয়েছে। ছবিতে বিরাট ফ্লবাগান দেখানো হয়েছে এবং ফ্লও রয়েছে অজস্র—এতো বেশি আর এতো স্ন্দর যা এ পর্যন্ত কোন ছবিতেই দেখা যায়নি—কিন্তু ফ্লের কোন ভূমিকা নেই। ফ্ল ছবিতে নয়নম্গ্ধকর শোভা এনে দিয়েছে, কিন্তু মনে আকুতি স্ষ্টি করিয়ে দেবার মতো নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা ম্র্ত করে তুলতে পারেনি। তাছাড়া এক একটা ফ্লকে ধরে তাদের সামনে তুলে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে গল্পের দিকেই লোকের আগ্রহ যেমন টেনে ধরা যেতো তেমনি নীরজার প্রতিও; ফ্ল সম্পর্কে লোকের নতুন একটা আগ্রহ তো জাগতোই। "মালঞ্চে" তাই ছিলো এবং "ফ্লওয়াড়ী"তেও তাই থাকা দরকার ছিলো। "মালঞ্চ"এর পরিবেশটাই হচ্ছে আসল।

গল্প খ্বই অল্প; মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটাই হচ্ছে এর আসল দ্রষ্টব্য। তা ব্ঝিয়ে দেবার জন্যে ছোট ছোট ঘটনার স্ষ্টি করা রয়েছে "মালঞ্চে"। ছবিতে তার অনেকগ্লি আছে কিন্তু তার কার্যকারণকে স্পষ্ট করে দেওয়া নেই। "মালঞ্চ"-এর গোড়াতেই রয়েছে, র্গ্না নীরজা বিছানা থেকে চাইতেই তার চোখে পড়ে বাগানে সরলাকে, আর সরলাকে দেখেই ওর মনে যতো সব ঘটনা ভেসে আসতে থাকে, যে-সব ঘটনা আদিত্যর ওপর সরলার প্রণয়প্রশস্তি বলে নীরজার কাছে প্রতীয়মান হতে থাকে। ছবিতে নীরজার মনে এ প্রতীতি এনে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ফাঁক রেখে রেখে।

পরিচালনার যথার্থ কৃতিত্ব দেখতে পাওয়া গিয়েছে ছবির শেষের দিকটায় নীরজার ম্ত্যুর খানিকক্ষণ আগেকার অংশ থেকে। [illegible]

মাধুর্য রক্ষা করে গিয়েছে ফুলবাগান আর ঘরদোরের শোভা আর দৃশ্যসজ্জা, যে ব্যাপারে শিল্পনির্দেশক চারু রায় বেশ একটা সুস্মিত আবহাওয়া ফুটিয়ে দিয়েছেন। ছবিখানির সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্বের কথা বলতে শিল্প নির্দেশের কথাই উল্লেখ করতে হয়।

কাহিনীর ঘটনাস্থল স্বল্পপরিসর স্থানে সীমাবদ্ধ এবং প্রধানতঃ বিবৃতিমূলক। নীরজা পুরোপুরিভাবে আদিত্যকে নিজের করে আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিলো। কিন্তু তার অসুবিধে ছিলো সে বিছানায় শোয়া, বাইরেকার একটা কিছু খবর শুনলেই তার আশংকা হতো আদিত্যের ভালোবাসা বোধ হয় তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। আদিত্যর সম্পর্কিতা বোন সরলা সহায়হীনা হয়ে নীরজাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলো। নীরজার সন্দেহ, সরলাই যেনো আদিত্যকে আকর্ষণ করে নিচ্ছে। ওর মন বিরোধী হয়ে ওঠে। একবার মনে করলে যে, তার জীবনলীলা যখন নিভেই যেতে বসেছে তখন আদিত্যকে দেখাশুনোর ভার সরলার হাতেই সঁপে দিয়ে যাবে। কিন্তু প্রাণভরে পারলো না সে সেই দান করতে। মন ঠিক করেও শেষ মুহূর্তে ভেঙে পড়লো, আর সেই আঘাতেই তার মৃত্যু হলো।

নীরজার মৃত্যুর পরও ছবিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আদিত্যকে ধরে। দেখানো হচ্ছে আদিত্য নীরজার একটি মর্মর মূর্তি তার সাধের ফুলবাগানে প্রতিষ্ঠা করেছে, আর রোজ সকালে এসে নীরজার স্মৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে যায়। নীরজার প্রতি আদিত্যর প্রেমের অচ্ছেদ্যতা দেখাবার জন্য মর্মর মূর্তির অবতারণাটা কাহিনীর ভাবের সঙ্গে তেমন যেনো খাপ খেলো না; শিল্পীর কল্পনার ব্যতিক্রম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গুটিতিনেক মাত্র চরিত্র তাদের মধ্যে একজন রোগশয্যা শায়িতা—ঐটুকু জায়গা আর সহায়ক শুধু সংলাপ—এই নিয়েই পরিচালক ছবির শেষার্ধটুকু মনকে ভরিয়ে তোলার মতো জমাট নাটক সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এখানে তার যেমন পরিচালন-কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তেমনি তাকে সাহায্য করেছে নীরজার ভূমিকায় শ্রীমতী যমুনা। মৃত সন্তান প্রসব করার পর নীরজার অসুস্থতা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত "ফুলওয়াড়ী" দর্শকমনকে নিবিড় করে ধরে রেখে দেয় এবং এই অংশই ছবিখানিকে সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত করে দিয়েছে।

সর্বাদক মিলিয়ে ধরলে "ফুলওয়াড়ী"-কে একটি বিশিষ্ট অবদান বলে স্বীকার করা যায়। ছবিখানি "স্বয়ংসিদ্ধা" ও "মাইকেল মধুসূদন"-এর প্রযোজক মণি গুহর যোগ্য অনুসৃতি। এখন গুহের মতো অমন রুচিবান ও শিল্পমনা প্রযোজক বড়ো একটা দেখা যায় না। প্রযোজক গুহ সমগ্র বাঙলা চিত্রশিল্পের মান বৃদ্ধির যে ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলেছেন "ফুলওয়াড়ী" তার সে ব্রতকে জয়যুক্ত করে তোলার একটি উজ্জ্বল অবদান। বিকৃতরুচি এবং ভুয়ো ও চোলাই করা জিনিসের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে "মালঞ্চ"-র মতো শিল্প ও সাহিত্য-সমৃদ্ধ ছবি এনে দেওয়ার জন্য প্রযোজক মণি গুহ সুরুচিসম্পন্ন এবং সাহিত্য ও শিল্পপ্রিয় সমাজেরই ধন্যবাদার্হ।

অভিনয়ে নীরজার ভূমিকায় যমুনা তার শিল্পী জীবনের তো বটেই, ইদানীংকালে দেখা অধিকাংশ কৃতিত্বকে পিছনে সরিয়ে দিয়েছেন। আদিত্যর ভূমিকায় নবাগত প্রভাতকুমার বাচনে ও অভিব্যক্তিতে নাটকীয়তা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন, কিন্তু সম্ভবত সাজ-পোষাকের দোষেই তার সটান লম্বা চেহারাটা দৃষ্টিকটু ঠেকেছে। সরলার ভূমিকায় প্রণতি ঘোষ যে অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তার পরবর্তী ছবির ওপরে লোকের আগ্রহ বাড়িয়ে দেবে। রমেনের ভূমিকায় প্রফুল্লকুমারের অভিনয় প্রশংসা করা যায়।

সংগীতের দিকটায় বিশেষভাবে কৃতিত্ব ফোটাবার সুযোগ ছিলো, যদি রবীন্দ্রনাথেরই গান অনুবাদ করে অথবা অন্তত সুরও যোগ করে নেওয়া হতো। সারা ভারতে আজ রবীন্দ্র-সংগীতই সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় এবং জনপ্রিয় সংগীতধারা—রবীন্দ্রনাথের রচনার চিত্ররূপে সেই সংগীতই অনুপস্থিত থাকাটার কোন যুক্তিই নেই। ছবির মাধুর্য তাতে ঢের বেশি যোগ করা যেতে পারতো। এমনিতে গান, সুর বা আবহসংগীত নিন্দনীয় হয়নি। মালিদের চটুল নাচ সহযোগে একখানি গান এ ছবিতে খাপ খায়নি। ছবির গোড়ার দিকে ফুলবাগানের পটে শান্তিনিকেতনী ঢঙে একটি সম্মিলিত দীর্ঘ নাচ অভিনবত্ব দেখিয়েছে এবং ছবিখানির আকর্ষণও বাড়িয়েছে।

যন্ত্রকৌশলের দিকটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল শক্তির পরিচয় দিয়েছে—আলোকচিত্র এবং শব্দগ্রহণ দুদিক থেকেই—সেটা পরিস্ফুটনের দোষেই হোক আর প্রক্ষেপণের দোষেই হোক। শিল্প ও ভাবৈশ্বর্যে এমন সমৃদ্ধ একটি বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যান্ত্রিক কৌশলেও অসাধারণ কৃতিত্ব আশা করা স্বাভাবিক—কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয়নি।

"ফুলওয়াড়ী" আই এন এ পিকচার্সের পূর্ববর্তী অবদান "স্বয়ংসিদ্ধা" ও "মাইকেল"-এর মতোই বাঙলার চিত্রশিল্পের প্রতি সারা দেশের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

ক্রিকেট

পশ্চিমবঙ্গ ক্রিকেট দল রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের সেমি-ফাইন্যাল খেলায় আসাম দলকে শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস্ ও ৪১৩ রানে পরাজিত করিয়াছে। তাহা ছাড়াও এই খেলায় বাঙলা দল প্রথম ইনিংসে ৭৬০ রান সংগ্রহ করিয়া রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বাঙলা দলের মোট রানসংখ্যার যে রেকর্ড ছিল, তাহা ভঙ্গ করিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলায় বাঙলা দল মাদ্রাজের বিরুদ্ধে ৫১৫ রান করিয়া মোট রান-সংখ্যার রেকর্ড করে। এই খেলায় ঐ রেকর্ডই ভঙ্গ করা হইয়াছে। এই খেলায় আরও উল্লেখ-যোগ্য যে, দলের চারিজন খেলোয়াড় শতাধিক রান করিয়াছেন। ইতিপূর্বে কোন খেলায় বাঙলা দলের চারিজন খেলোয়াড় এক ইনিংসে শতাধিক রান করেন নাই। সুতরাং ইহাও বাঙলার রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার—এমন কি বাঙলার ক্রিকেট ইতিহাসের এক নূতন রেকর্ড বলিলে কোনরূপে অত্যুক্তি করা হইবে না। বাঙলা ক্রিকেট দলের এই কৃতিত্বপূর্ণ ও গৌরবজনক সাফল্য খুবই আনন্দের ও প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। তবে এই কথা কখনও বিস্মিত হওয়া উচিত নহে যে, আসাম খুবই শক্তিহীন দল। এই দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই তরুণ ও অনভিজ্ঞ। এইরূপ দলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিষয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করায় বাঙলার ক্রিকেট ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান খুবই উন্নততর স্তরের হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা চলে না। বাঙলা ভারতীয় ক্রিকেটের কোন্ স্থানে পড়িয়া আছে, তাহার প্রকৃত পরিচয় শীঘ্রই পাওয়া যাইবে। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে বাঙলা দলকে হোলকারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। এই খেলা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। তবে এই খেলার ন্যায় হোল-কারের বিরুদ্ধে বাঙলা অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন বলিয়া যদি কেহ ধারণা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অত্যন্ত ভুল করিবেন। উহা একেবারেই অসম্ভব। বাঙলা অধিকাংশবারেই হোলকারের বিরুদ্ধে খেলিয়া শোচনীয় পরাজয় বরণ করিয়াছে। এইবারে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর পরাজয় বরণ করিলেও আমরা সন্তুষ্ট হইব।

বাঙলা বনাম আসামের খেলা

বাঙলা দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে চা-পানের পূর্ব পর্যন্ত খেলিয়া ৭৬০ রান সংগ্রহ করে। আসাম দল খেলা আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় দিনের শেষে ৪ উইকেটে ১২৩ রান করে। তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বেই ১৮০ রানে ইনিংস্ শেষ করে। ফলে ফলো অন্ করিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ও ১৬৭ রানের অধিক সংগ্রহ করিতে পারে না। আসাম দলের এ গুহ রায় প্রথম ইনিংসে ৮৪ রান করিয়া নট আউট থাকিয়া ও দ্বিতীয় ইনিংসে এ হাজারিকা ৬১ রান করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

:: ফলাফল ::

পশ্চিমবঙ্গ : প্রথম ইনিংস্—৭৬০ রান (পি রায় ১৪৬ রান, শিবাজী বসু ১৪৫ রান, অজিত দাশগুপ্ত ১১৭ রান, নির্মল চ্যাটার্জি ৭৫ রান, সি এস নাইডু ১১৯ রান, এস কে গিরিধারী নট আউট ৭৩ রান, পি চ্যাটার্জি ২৪ রান; জে বড়ুয়া ১০২ রানে ৩টি উইকেট, এ গুহ রায় ১৩২ রানে ২টি উইকেট, এল ডোরান ১৩৩ রানে ২টি উইকেট ও এন চৌধুরী ১৩০ রানে ২টি উইকেট পান)

আসাম : প্রথম ইনিংস্—১৮০ রান (এ গুহ রায় নট আউট ৮৪ রান, এ হাজারিকা ৩৪ রান; এন চৌধুরী ৫৩ রানে ৪টি উইকেট, সি এস নাইডু ১৮ রানে ৩টি উইকেট, পি চ্যাটার্জি ১৮ রানে ১টি উইকেট, এস বসু ১০ রানে ১টি উইকেট পান)

আসাম : দ্বিতীয় ইনিংস্—১৬৭ রান (এ হাজারিকা ৬১ রান, এল ডোরান ৩৬ রান, এন চৌধুরী ২৩ রান; সি এস নাইডু ২৭ রানে ৩টি উইকেট, এস গিরিধারী ৩৬ রানে ২টি উইকেট, এস বসু ১৩ রানে ২টি উইকেট, পি রায় ১০ রানে ২টি উইকেট পান)

হোলকারের বিরুদ্ধে বাঙলা দল

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যালে হোলকার দলের বিরুদ্ধে খেলিবার জন্য পুনরায় বাঙলা দল গঠন করা হইয়াছে। আসাম দলের বিরুদ্ধে যে সকল খেলোয়াড় খেলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই পুনরায় মনোনীত হইয়াছেন। একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইয়াছে অধিনায়কের পদ। সি এস নাইডুকে পুনরায় বাঙলা দলের অধিনায়ক করা হইয়াছে। এই পরিবর্তন সাধারণ চক্ষে কিরূপ লাগিয়াছে বলা কঠিন; তবে আমাদের মোটেই ভাল লাগে নাই। খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলী যে কোন যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া দল বা দলের অধিনায়ক নির্বাচন করেন না—ইহাই প্রমাণিত হইল। এই ক্ষেত্রে পেশাদার খেলোয়াড় দলের অধিনায়ক হইলে কোন ক্ষতি হইল না কেন, এই প্রশ্ন আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। নিম্নে মনোনীত খেলোয়াড়-গণের নাম প্রদত্ত হইল:—

সি এস নাইডু (মোহনবাগান)—অধিনায়ক, নির্মল চ্যাটার্জি (রাজস্থান), পি সেন (মোহন-বাগান), পি রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), পি চ্যাটার্জি (মোহনবাগান), এস বসু (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) ,বি ফ্রাঙ্ক (রাজস্থান), এস কে গিরিধারী (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), অজিত দাশ-গুপ্ত (কালীঘাট), এন চৌধুরী (মোহনবাগান), জে মিত্র (মোহনবাগান), জি রায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) ও এস ব্যানার্জি (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)

বোম্বাই বনাম গুজরাট

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলায় বোম্বাই দল এক ইনিংস্ ও ১২৪ রানে গুজরাট দলকে পরাজিত করিয়াছে। ফাদকার ও সিন্ধের মারাত্মক বোলিংই যে গুজরাট দলের শোচনীয় পরাজয় সম্ভব করিয়াছে—ইহা বলিলে কোনরূপে অত্যুক্তি হইবে না। তবে এই খেলায় বোম্বাই দলের দুইটি তরুণ খেলোয়াড় এম আপ্তে ও এম আমলাদি ব্যাটিংয়ে অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই দুইটি খেলোয়াড় অদূরভবিষ্যতে ভারতীয় দলে স্থান পাইবে—ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

:: ফলাফল ::

বোম্বাই : প্রথম ইনিংস্—৫০৬ রান (আপ্তে ৯৩ রান, আমলাদি ৮৭ রান, রামচাঁদ ৫৪ রান, মানকড় ৮২ রান, সোহনী ১০৩ রান, ডিভেচা ২৭ রান; উমরিগার ৭৯ রানে ২টি উইকেট, জে সোধন ৫৫ রানে ২টি উইকেট, লায়ালচাঁদ ১৬৩ রানে ২টি উইকেট, নাথুদা ৯০ রানে ২টি উইকেট পান)

গুজরাট : প্রথম ইনিংস্—১৪৬ রান (পাণ্ডালী ২৫ রান, কিষেণচাঁদ ৩৩ রান, জে সোধন ৫৫ রান, মাকা ১৫ রান, উমরিগার ১১ রান; ডি ফাদকার ৫১ রানে ৫টি উইকেট, সিন্ধে ২৪ রানে ২টি উইকেট পান)

গুজরাট : দ্বিতীয় ইনিংস্—২৩৬ রান (মাকা ৪৫ রান, উমরিগার ৩১ রান, কিষেণচাঁদ ৭৯ রান, নাথুদা ৪০ রান, খাম্বাটা ১৬ রান; ডি ফাদকার ৭৪ রানে ২টি উইকেট, সিন্ধে ৮৩ রানে ৫টি উইকেট, আর ডিভেচা ৪৫ রানে ২টি উইকেট পান)

সার্ভিসেস বনাম দক্ষিণ পাঞ্জাব

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উত্তরাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলায় সার্ভিসেস দল ১৫০ রানে দক্ষিণ পাঞ্জাব দলকে পরাজিত করিয়াছে। এই খেলায় সার্ভিসেস দলের পক্ষে এইচ অধিকারীর উভয় ইনিংসের ব্যাটিংই উল্লেখযোগ্য। শেষ সময় দক্ষিণ পাঞ্জাবের পক্ষে লালা অমরনাথ ও পৃথ্বীরাজের শতাধিক রানও প্রশংসনীয়। তবে প্রথম ইনিংসের অসাফল্যই দক্ষিণ পাঞ্জাব দলকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

:: ফলাফল ::

সার্ভিসেস্ : প্রথম ইনিংস্—২৯০ রান (অধিকারী ৮৩ রান, গাদকারী ৩৮ রান, রায় সিংহ ৩৬ রান, খান্না ৩১ রান, রণবীরসিংহজী ২২ রান; রাজদান ৬১ রানে ৪টি উইকেট, রামকিশোর ৫৮ রানে ২টি উইকেট, নিজ্কারাম ১১২ রানে ২টি উইকেট পান)

দক্ষিণ পাঞ্জাব : প্রথম ইনিংস্—১৮৯ রান (পৃথ্বীরাজ ৪৯ রান, রাজদান ৪৮ রান, রাজ-কিষেণ ৪৫ রান; স্বামী ৫১ রানে ৫টি উইকেট, ইন্দ্রজিৎ ৫৪ রানে ৩টি উইকেট, ইকবালকরণ ৩৮ রানে ২টি উইকেট পান)

সার্ভিসেস্ : দ্বিতীয় ইনিংস—৪১২ রান অধিকারী ১১৫ রান, গাদকারী ৫২ রান,

গুডবোল ৭০ রান নট আউট, খাম্না ৩৪ রান, ইন্দ্রজিৎ ৮৪ রান; অমরনাথ ৪৯ রানে ২টি উইকেট, মেন্ডোজা ৫৫ রানে ২টি উইকেট, খাম্না ৫০ রানে ২টি উইকেট, নিক্কারাম ৮৪ রানে ২টি উইকেট পান)

দক্ষিণ পাঞ্জাব ঃ দ্বিতীয় ইনিংস্—৩৬৩ রান (পৃথ্বীরাজ ১৫০ রান, অমরনাথ ১১০ রান; মোহনলাল ৪১ রানে ৩টি উইকেট, ইন্দ্রজিৎ ১১৬ রানে ৪টি উইকেট পান)

মহীশূরে বনাম মাদ্রাজ

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় দক্ষিণাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলায় মহীশূরে দল ১৭৪ রানে মাদ্রাজ দলকে পরাজিত করিয়াছে। এই খেলায় কোন পক্ষের বোলিং বা ব্যাটিংয়ে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। খেলাটি অতি সাধারণ শ্রেণীর হয়।

ঃঃ ফলাফল ঃঃ

মহীশূরে ঃ প্রথম ইনিংস্—২২৮ রান শ্রীনিবাশন্ ৬১ রান, স্যুতিয়া ৫১ রান, থিম্মায়া ৩৪ রান; কানাইয়ারাম ৫৯ রানে ৬টি উইকেট পান)

মাদ্রাজ ঃ প্রথম ইনিংস্—১৯৪ রান (গোপীনাথ ৪৮ রান, স্যর্যনারায়ণ ৩৪ রান, কৃষ্ণান ৬০ রানে ৪টি উইকেট, কস্তুরীরঙ্গণ ২৬ রানে ২টি উইকেট পান)

মহীশূরে ঃ দ্বিতীয় ইনিংস্—২৯১ রান কৃষ্ণ ৬২ রান, থিম্মায়া ৪৭ রান, শিবশঙ্কর ২৩ রান; ভেঙ্কটেসন ৬৭ রানে ৪টি উইকেট, পার্থিক ১১২ রানে ৩টি উইকেট পান)

মাদ্রাজ ঃ দ্বিতীয় ইনিংস্—১৫১ রান (গোপীনাথ ৩১ রান, স্যর্যনারায়ণ ২৯ রান, আলভা ২২ রান; কৃষ্ণা ৫৪ রানে ৩টি উইকেট, আদিশেষ ৪০ রানে ২টি উইকেট পান)

এম সি সি দলের সাফল্য

ভারত ভ্রমণকারী এম সি সি দলের ভ্রমণের শেষ পর্যায়ের খেলায় সাফল্যলাভ একরূপ একচেটিয়া হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের মাঠের সহিত যে ইহারা প্রকৃতই পরিচিত হইয়াছে এবং অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে, তাহার যথেষ্ট নিদর্শনই পাওয়া যাইতেছে। ভারত ভ্রমণ শেষে গৌরবোজ্জ্বল সম্মানের সহিত স্বদেশ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিলে কোনরূপ আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

নাগপুরে মধ্য অঞ্চলের সহিত তিনদিনব্যাপী খেলায় যোগদান করিয়া এম সি সি নয় উইকেটে বিজয়ী হইয়াছে।

মধ্য অঞ্চল দলের অধিনায়কতা করেন প্রবীণ চতুর ক্রিকেট খেলোয়াড় কর্নেল সি কে নাইডু। তিনি এই খেলায় উভয় ইনিংসে দৃঢ়তাপূর্ণ ও বেপরোয়া ব্যাটিংয়ের অপূর্ব নিদর্শন দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। ইহার জন্যই এম সি সি দলের বৈদেশিক ক্রিকেট সমালোচক মিঃ লেসলী স্মিথ পর্যন্ত কর্নেল নাইডুর ব্যাটিংয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কর্নেল নাইডুর সহিত কোন এক কলিকাতার বিশিষ্ট ক্রীড়া-সাংবাদিকের আলোচনাই মনে পড়িতেছে। ঐ সাংবাদিক কর্নেল নাইডুকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার বয়স প্রায় ৬০ হইতে চলিল, আপনি আর কতদিন খেলিবেন।" কর্নেল নাইডু স্মিতমুখে সাংবাদিককে বলিলেন, "চোখে এখনও বল দেখিতে পাই—কবে সে শক্তি আমার নষ্ট হইবে, তাহা আমি কি করিয়া বলিব?" কর্নেল নাইডুর সেই উক্তি যে কতখানি সত্য, তাহা এই খেলায় পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা এই প্রবীণ ভারতীয় খেলোয়াড়কে অভিনন্দিত করি।

ঃঃ ফলাফল ঃঃ

মধ্য অঞ্চল ঃ প্রথম ইনিংস্—১৩৪ রান (সি কে নাইডু ৩৭ রান, কামরাজ কেশরী ৩০ রান, অর্জুন নাইডু ১৮ রান; রিজওয়ে ২৪ রানে ২টি উইকেট, স্যাকলটন ৩০ রানে ৩টি উইকেট, হিল্টন ৩৭ রানে ৩টি উইকেট পান)

এম সি সি ঃ প্রথম ইনিংস্—২৯৬ রান (কিনিয়ান ৫৯ রান, গোসন ৩৩ রান, কার ৪০ রান, পুল ৪৭ রান ওয়াটকিন্স ২৯ রান, লীডবিটার ৩২ রান; সারভাতে ১০৭ রানে ৬টি উইকেট, কামরাজ কেশরী ৬৭ রানে ২টি উইকেট পান)

মধ্য অঞ্চল ঃ দ্বিতীয় ইনিংস্—১৯৬ রান (খাম্না ৪৪ রান, সারভাতে ৫৪ রান, সি কে নাইডু ৩১ রান, নরসিংহম ১৯ রান; রিজওয়ে ৪৫ রানে ২টি উইকেট, স্যাকলটন ৩৩ রানে ৩টি উইকেট, কার ৪১ রানে ২টি উইকেট ও হিল্টন ২৩ রানে ২টি উইকেট পান)

এম সি সি ঃ দ্বিতীয় ইনিংস—(১ উইকেটে) ৩৮ রান (লোসন নট আউট ১৪ রান, কার নট আউট ১৫ রান; গাইকোয়াড় ৭ রানে ১টি উইকেট পান)

এম সি সি ও হায়দরাবাদ দল

এম সি সি ও হায়দরাবাদ দলের তিন দিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। এম সি সি দলের অধিনায়ক এন ডি হাউওয়ার্ড অসুস্থ থাকায় সহঅধিনায়ক ডি বি কার দলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ম্যাটিং উইকেট দেখিয়া টসে জয়ী হইয়াও হায়দরাবাদ দলকে প্রথম ব্যাট করিতে দেন। ইহার ফলেই খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়া সম্ভব হইয়াছে। হায়দরাবাদ দল ভাল উইকেট পাইয়া দৃঢ়তার সহিত ব্যাট করিয়া প্রথম ইনিংস ৩২০ রানে শেষ করে। পরে কার ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহা কার্যকরী হয় না। অধিনায়ক দলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ তাহার বিচারবুদ্ধির উপর দলের অবস্থা কি হয় তাহার চরম নিদর্শন এই খেলায় পাওয়া গিয়াছে। হায়দরাবাদ দলে কৃতি কোন খেলোয়াড় না থাকা সত্ত্বে এম সি সি খেলায় বিজয়ী হইতে পারে নাই। তবে এই খেলায় উভয় দলের কয়েকজন ব্যাটিং ও বোলিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। খেলার ফলাফলঃ

হায়দরাবাদ প্রথম ইনিংসঃ—৩২০ রান (আলী হোসেন ৯৫, আইবরা ৭৬, নাসির আলী ৩২, ববজী ৬৬, স্ট্যাথাম ৫০ রানে ৩টি, স্যাকলটন ৭৬ রানে ২টি, টাটারসল ৮৪ রানে ২টি, কার ৫৯ রানে ২টি উইকেট পান)।

এম সি সি প্রথম ইনিংসঃ—৮ উইঃ ৪৪১ রান (কেনিয়ান ১১২, গ্রেভলী ৯৬, লোসন ৩৭, পুল ৭৯, লীডবিটার নট আউট ৬৩, গোলাম আমেদ ১২৩ রানে ৫টি, নাসির আলী খাঁ ৬৭ রানে ২টি উইকেট পান)।

হায়দরাবাদ দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৩ উইঃ ৮২ রান (সঞ্জীব রাও ২১ রান আউট আউট, আলী হোসেন ২৯, স্যাকলটন ২১ রানে ১টি ও লীডবিটার ২৩ রানে ১টি উইকেট পান)।
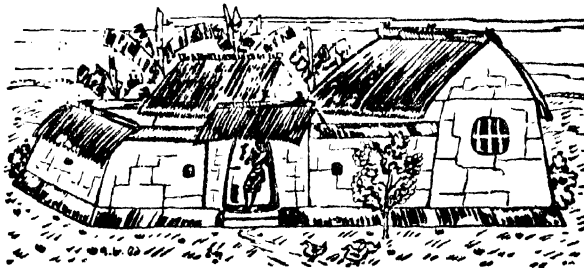
দেশী সংবাদ

২১শে জানুয়ারী—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচনে ১৬টি আসনের ফল ঘোষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কংগ্রেস ১০টি আসন দখল করিয়াছে। শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি (কংগ্রেস) তালডাংগা কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন। লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ সত্যবান রায় উলুবেড়িয়া কেন্দ্রে জয়লাভ করিয়াছেন।

কাছাড় হইতে রাজ্য বিধান সভার নির্বাচনে কংগ্রেস মোট ১৫টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিল; তন্মধ্যে ১৩ জন প্রার্থীই নির্বাচিত হইয়াছেন।

বোম্বাইয়ের কয়রা নির্বাচন কেন্দ্র হইতে শ্রীমতী মণিবেন প্যাটেল লোকসভার সদস্যা নির্বাচিত হইয়াছেন।

২২শে জানুয়ারী—অদ্য ভারতের বৃহত্তম নগরী কলিকাতায় ভোট গ্রহণ নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচনের আরও ২১টি আসনের ফল ঘোষিত হইয়াছে। ইহা লইয়া এ পর্যন্ত মোট ৪৫টি আসনের ফল ঘোষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কংগ্রেস ৩২টি, কম্যুনিস্ট ও বামপন্থী ৫টি, কৃষক-মজদুর-প্রজা দল ১টি, স্বতন্ত্র ১টি এবং অন্যান্য দল ৬টি আসন লাভ করিয়াছে।

কটক জেলার রাজনগর কেন্দ্র হইতে শ্রীমতী সরস্বতী দেবী (কংগ্রেস) নির্বাচিত হইয়াছেন। ইহার ফলে উড়িষ্যা বিধান সভার নির্বাচনে তিনজন মহিলা প্রার্থীই নির্বাচিত হইলেন।

২৩শে জানুয়ারী—ভারতের নানাস্থানে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৫৬তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়।

নেপাল রক্ষীদলের কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক গত রাত্রিতে সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ করে এবং সিংহ দরবার, বিমান ঘাঁটি, বেতার স্টেশন এবং রাজধানীর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অধিকার করিয়া লয়। পরে প্রায় চারিশত বিদ্রোহী সরকারী সৈন্যদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচনে আরও ৬টি আসনের ফল ঘোষিত হইয়াছে। এই ৬টি আসনের মধ্যে ৪টি আসন কংগ্রেস ও ১টি আসন মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক পাইয়াছে এবং অপরটিতে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন।

লোকসভার নির্বাচনে শ্রীরামপুর কেন্দ্র হইতে কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীতুষারকান্তি চ্যাটার্জি নির্বাচিত হইয়াছেন।

২৪শে জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার আরও ১৮টি আসনের ফল ঘোষিত হইয়াছে। এই ১৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১০টি আসন লাভ করিয়াছে। অদ্য প্রকাশিত ফলাফলের মধ্যে পটাসপুর কেন্দ্রে মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী

মাইতি, বজবজ কেন্দ্রে মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জি, বর্ধমান কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীউদয়চাঁদ মহাতাবের পরাজয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নেপালাধীশ ত্রিভুবন নেপালে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন এবং শাসনকার্য পরিচালনের ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমাতৃকা-প্রসাদ কৈরালার হস্তে সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করিয়াছেন। রাজধানীতে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা ঘোষিত হইয়াছে।

বোম্বাই রাজ্য বিধান সভার নির্বাচন ফলাফল ঘোষণা সমাপ্ত হইয়াছে। বিধান সভার মোট ৩১৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৬৯টি আসন দখল করিয়াছে।

উড়িষ্যার স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী শ্রীকপিলেশ্বর প্রসাদ নন্দ বিধান সভার নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন।

২৫শে জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার আরও ২১টি কেন্দ্রের নির্বাচনের ফল পাওয়া গিয়াছে। এই ২১টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৪টি, কম্যুনিস্ট দল ৬টি এবং জনসংঘ ১টি আসন লাভ করিয়াছে। টালিগঞ্জ উত্তর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের নিকট পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক দলের নেত্রী শ্রীমতী লীলা রায় প্রভৃতি পরাজিত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার মহেশতলা কেন্দ্রে কম্যুনিস্ট প্রার্থীর নিকট পরাজিত হইয়াছেন।

অদ্য হাওড়া শহরে রাজ্য বিধান সভার চারিটি কেন্দ্রে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ পর্ব প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে।

সমগ্র নেপাল রাজ্যে কম্যুনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

অদ্য ভারতের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীতখৎমল জৈন এবং বিহারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা বিধান সভার নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন।

২৬শে জানুয়ারী—অদ্য অপরাহ্নে কলিকাতা বন্দরে প্রিন্সেপ ঘাটে "দিল্লী" রণতরী দেখিবার জন্য বিপুল দর্শক সমাবেশের ফলে জেটির একাংশ ধ্বসিয়া গিয়া অন্যূন আটজনের সলিল-সমাধি হইয়াছে।

আজ যোধপুর হইতে ৬০ মাইল দূরবর্তী জাওয়াই বাঁধ নামক স্থানে এক বিমান দুর্ঘটনায় যোধপুরের মহারাজা নিহত হইয়াছেন। ঐ বিমানের পাইলট এবং অপর একজন আরোহীও দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন।

অদ্য ভারতের সর্বত্র প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের যে সব ফল ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, তমলুক কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅজয় মুখার্জি তাঁহার প্রতি কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জিকে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হইয়াছেন।

২৭শে জানুয়ারী—এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মোট ১১৯টি ও লোকসভার ৬টি আসনের ফল জানা গিয়াছে। ইহার মধ্যে কংগ্রেস ৭৮টি আসন দখল করিয়াছে। অদ্য যে সব ফল ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বিধানসভার নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন। মন্ত্রী শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা বর্ধমান জেলার গলসী কেন্দ্র হইতে এবং কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ বেলগাছিয়া কেন্দ্র হইতে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ মালদহ কেন্দ্র এবং আর এস পি প্রার্থী শ্রীত্রিদিব চৌধুরী বহরমপুর কেন্দ্র হইতে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

২১শে জানুয়ারী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ১৯৫২-৫৩ সালের জন্য ৮,৫৪০ কোটি ডলার বাজেট পেশ করিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এক বাণীতে বলেন, আগামী আর্থিক বৎসরে মধ্যপ্রাচ্য তথা এশিয়ার সামরিক সাজ-সরঞ্জামের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া বরং অর্থনৈতিক ও কারিগরী সহায্যের উপর বেশী জোর দেওয়া হইবে।

অদ্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলেন যে, তিনি 'অভিনব' আণবিক অস্ত্র উৎপাদন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভের প্রস্তাব অনুমোদন করিতে বলিবেন।

২৩শে জানুয়ারী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে ৫ কোটি ডলার কারিগরী সাহায্য পরিকল্পনা রূপদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৫শে জানুয়ারী—অদ্য ইসমাইলিয়ায় বৃটিশ কামান হইতে মিশরী অক্সিলিয়ারী পুলিশের প্রধান কার্যালয়ের উপর গোলাবর্ষণ করা হয়। কয়েক ঘণ্টা সংঘর্ষের পর অবরুদ্ধ মিশরী অক্সিলিয়ারী পুলিশের প্রধান দলটি বৃটিশ সৈন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

২৭শে জানুয়ারী—মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাস পাশা মিশরের সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতীয় মূল্যঃ প্রতি সংখ্যা—।৶০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্থান মূল্যঃ প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৶০ আনা, বার্ষিক—২০, ষণ্মাসিক—১০, (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ঊনবিংশ বর্ষ] শনিবার, ২৬শে মাঘ, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 9th February, 1952. [১৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার নির্বাচনে কংগ্রেস দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং কংগ্রেস দলই যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে আহূত হইবেন এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শাসনভার যে তাঁহাদের উপরই ন্যস্ত হইবে, তাহা এখন নিঃসংশয়। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নিজেও নির্বাচিত হইয়াছেন; সুতরাং মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করিবেন, ইহাও একরূপ নিশ্চিত। ডাক্তার রায় এ সম্বন্ধে নিজে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেসের এই জয়লাভে তাঁহার গর্ববোধ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এই নির্বাচনের ফলে কংগ্রেসের ভিতরকার দোষ ত্রুটি এবং দুর্বলতাও যে কিছু কিছু ধরা পড়িয়া গিয়াছে, তিনি সেকথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বস্তুত কংগ্রেসের জয়লাভে আশ্চর্য হইবার কিছু ছিল না। বিরাট এবং বিপুল তাহার ঐতিহ্য রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এই সত্যই বারংবার প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কোন দলই তাহার পিছনে অর্থ, বিত্ত, ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিপত্তি যতই থাকুক না কেন, কংগ্রেসের কাছে দাঁড়াইতে পারে না। জনসাধারণের অন্তরের অগ্নিময় আগ্রহ কংগ্রেসের সব প্রতিকূলতাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। দেশের তরুণেরা কংগ্রেসের সাফল্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বিগত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলেও কংগ্রেসের সমর্থনে জনসাধারণের তেমন সর্বজনীন আগ্রহ এবং উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় নাই। তরুণের দল তফাতেই ছিল বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে ভোটের হিসাব করিলে দেখা যাইবে, বিরোধী দলগুলির মিলিত ভোট কংগ্রেসের পক্ষে মোট ভোটের চেয়ে বেশি। সুতরাং বিরোধী পক্ষগুলি যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইত, তবে কংগ্রেসের পরাজয়ই একান্ত হইয়া উঠিত, এই সত্যটি বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। কংগ্রেসের নীতি যে দেশের সর্বসাধারণকে আর তেমনভাবে আকৃষ্ট করে না; পক্ষান্তরে বিরুদ্ধতার একটা ভাব উত্তরোত্তর পশ্চিমবঙ্গেও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে, নির্বাচনের ফলে কংগ্রেস গরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও ইহা সুস্পষ্ট। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ফল হইতে কংগ্রেসী দলের আত্মানুসন্ধানে সচেতন হওয়া দরকার। ডাক্তার রায় নিজেও কংগ্রেসের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিমণ্ডলের সরবরাহ মন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীর পরাজয় বিশেষভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ, ডাক্তার রায় ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি না। সরবরাহ মন্ত্রী মহাশয়ের পরাজয় ঘটিয়াছে পনেরো হাজারেরও অধিক ভোটে এবং খাদ্যমন্ত্রী একুশ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। ইঁহাদের এমন পরাজয় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলের বিশেষ নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের অনাস্থারই ভাব প্রকট করিয়াছে। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিও কোন ক্ষেত্রেই পরাজিত মন্ত্রীদের কাহাকেও উপনির্বাচনের মারফতে আইনসভায় ঢুকাইবার চেষ্টা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের এই পরাজয়ের অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও তাৎপর্য যদি মুখ্যমন্ত্রী অনুধাবন করেন এবং তদনুযায়ী নীতি নির্ধারণ করেন, তবে তাঁহার পক্ষে সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হইবে। কারণ এই দুইটি বিভাগের সহিত জনসাধারণের জীবনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে এবং খাদ্য ও সরবরাহ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ ক্ষোভ ও অভিযোগ দেখা যায়। প্রকৃত কংগ্রেস দল গরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের সম্বন্ধে জনমতের এই যে সুস্পষ্ট অনাস্থার অভিব্যক্তি, ইহার গুরুত্ব উড়াইয়া দেওয়া চলে না। জয়ের উল্লাসে মাতিয়া কংগ্রেস পক্ষ যদি এক্ষেত্রে জনমতের মর্যাদা রক্ষা করিতে —নির্বাচনের এই শিক্ষালাভ করিয়াও অগ্রসর না হন, তবে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা নিজেরাই কুঠারাঘাত করিবেন।

বাঙলা বনাম উর্দু

পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকায় আসিয়া ঘোষণা

করিয়াছেন যে, একমাত্র উর্দুই পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া পরিগণিত হইবে। খাজা সাহেব অবশ্য আজ কায়েদে আজমের দোহাই দিয়া এ সম্বন্ধে নিজের দায়িত্ব এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু জনমতকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত মতকে দৃঢ় করাই যে তাঁহার এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য, এটুকু সহজেই বোঝা যায়। পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজ বহুদিন হইতেই তাঁহাদের মাতৃভাষা বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন, খাজা সাহেবের এই বিবৃতিতে তাঁহাদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আন্দোলনের দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের তরুণদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রহিয়াছে। তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের মর্যাদাবুদ্ধিকে আমরা প্রশংসা করি। প্রকৃতপক্ষে গণ-তান্ত্রিকতার দিক হইতে বিচার করিতে গেলে বাঙলাই পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করিবার দাবী রাখে, যোগ্যতার প্রশ্ন না তুলিলেও চলে; কারণ সেদিক হইতে উর্দু বাঙলা ভাষার কাছেও ঘেঁষিতে পারে না। পূর্ববঙ্গ পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রধান অংশ এবং পাকিস্থানের বিভিন্ন অংশের চেয়ে বাঙলা ভাষাই এই নবগঠিত রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা। সুতরাং ইংরেজির পরিবর্তে যদি অন্য কোন ভাষাকে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে হয়, বাঙলার দাবীই অগ্রগণ্য হইয়া দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য, ভারতে বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করিয়া হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা কেন করা হইল, এ-যুক্তি এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণই অবান্তর; কারণ সংখ্যার হিসাবে বাঙলা ভাষাভাষীর সংখ্যাই সুস্পষ্ট-ভাবে পাকিস্থানে অধিক। পরন্তু যে উর্দুকে পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হইতেছে, তাহাও পাকিস্থানের কোন রাষ্ট্রের ভাষা নয় বরং ভারতেরই অন্যতম ভাষা বলা যাইতে পারে। প্রধান কথা হইতেছে এই যে, পাকিস্থানের বর্তমান পদাধিকারীগণ বাঙলা ভাষা এবং বাঙলার সংস্কৃতিকে ভীতির দৃষ্টিতেই যেন দেখিতেছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মত তাঁহাদেরও ধারণা জন্মিয়াছে যে, বাঙলা ভাষা ও বাঙলার সংস্কৃতি যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবে পাকিস্থানের দ্বিজাতি-তত্ত্বের মূলীভূত যে সাম্প্রদায়িক চেতনা তাহারই গোড়ায় গিয়া আঘাত করিবে। তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ ভিত্তির উপর পাকিস্থানের সংহতিগত যে একটা কৃত্রিম চেতনা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহাই নষ্ট হইবে। বস্তুত পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতির বর্তমান নিয়ামকদের এই ধারণা নিতান্তই ভুল, অধিকন্তু সমগ্র রাষ্ট্রের উন্নতির পক্ষেই তাহা অনিষ্টজনক। প্রত্যুত সংস্কৃতির সর্বজনীন উদার ভিত্তির উপর রাষ্ট্রের আদর্শ যদি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে আধুনিক জগতে তেমন রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি সম্ভব হইতে পারে না। ফলত মধ্যযুগীয় চিন্তার ধারা বর্তমান যুগে যে রাষ্ট্রের পতনের পথই প্রশস্ত করে, এ সত্যটি পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ এখন অবশ্য স্বীকার করিয়া লইতে সঙ্কুচিত হইতেছেন, কিন্তু একদিন তাঁহাদিগকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। পূর্ববঙ্গের তরুণ দল সেই আদর্শ যে তাঁহাদের দৃষ্টিতে উন্মুক্ত রাখিয়া চলিতেছেন, ইহা আশারই কথা।

কর্পোরেশনের নির্বাচন

বিধান সভা এবং ভারতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ফল পুরাপুরি ঘোষিত হইতে না হইতেই এবং যাঁহারা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তে যখন উল্লাস ও নেতৃত্বাভিমানে উদ্দীপ্ত আশা আর আকাঙ্ক্ষার আবর্ত উঠিতেছে এবং পরাজিত সদস্যদের অন্তর অবসাদে অভিভূত সেই অবস্থার মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন সম্বন্ধে সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনেকটা আকস্মিকভাবেই উপস্থিত হইয়াছে। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী ১৮ই এবং ১৯শে মার্চ কর্পোরেশনের নির্বাচন হইবে এবং ৮ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই সদস্যপদ প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল শেষ করিতে হইবে। চার বৎসরকাল কর্পোরেশনের কর্তৃত্বভার নিজেদের করতল-গত রাখিবার পর সাধারণ নির্বাচনের হুল্লোড় মিটিতে না মিটিতে কর্তৃপক্ষ কর্পোরেশনের নির্বাচনের অধ্যায় ঠিক এই সময়টিতে উন্মুক্ত করিতে কেন প্রবৃত্ত হইলেন, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠে। কারণ, কর্পোরেশনের এই নির্বাচন ব্যাপারটি নিশ্চয়ই খেলাখেলি নয়। নূতন আইনে কর্পোরেশনের নির্বাচকমণ্ডলী গঠন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। নূতন এইরূপে প্রতিবেশের মধ্যে যে নির্বাচন হইতেছে, তজ্জন্য প্রার্থী হইবার এবং প্রার্থী মনোনয়নের সময় আরও কিছু বেশী করিয়া দেওয়া উচিত। এরূপ অবস্থায় ৮ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই মনোনয়ন-পত্র দাখিল শেষ করিতে হইবে, এইরূপ নির্দেশ নিতান্তই অসমীচীন, অধিকন্তু স্বৈরাচারমূলক বলিয়াই আমরা মনে করি। সময়ের মেয়াদ বাড়াইয়া দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। কর্পোরেশনের পরিচালনায় অনেক গলদ ঢুকিয়াছিল, ইহা সর্বজনবিদিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রণীত নূতন কর্পোরেশন আইন সেসব গলদ সম্পূর্ণ দূর করিবার উপযোগী হইয়াছে, আমাদের এ বিশ্বাস নাই। তথাপি উপযুক্ত প্রতিনিধিরা যদি নির্বাচিত হন এবং তাঁহারা পৌর-সেবার আন্তরিকতা লইয়া কাজ করেন, তবে নূতন কর্পোরেশনের পূর্বেকার ত্রুটি ও অভিযোগের কারণ অনেকটা দূর করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সমস্যা তো এইখানেই। কর্পোরেশনের প্রতিনিধিত্বে পৌর-কর্তৃত্ব এবং দায়িত্বের প্রতি জনগণের এই আদর্শ অতীতে নিতান্ত নির্লজ্জভাবেই লঙ্ঘিত হইয়াছে। সুতরাং আসন্ন নির্বাচনে পৌরবাসীকে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক হইতে হইবে। জনসেবার জন্য যাঁহাদের আন্তরিক আগ্রহ এবং তেমন চরিত্রবল ও আদর্শনিষ্ঠা আছে, শুধু তাঁহাদিগকেই নির্বাচন করিতে হইবে। দল, মান এবং প্রতিষ্ঠা এসব দিকে তাঁহাদের বিচার করিলে চলিবে না। বস্তুতঃ নবনির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এরূপ হওয়া চাই যাহাতে কর্পোরেশনের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন তাহাদের পক্ষে একটা উপরি কাজ না হইয়া দাঁড়ায় এবং নেতৃত্বের বিলাস-ব্যবসায়ে পর্যবসিত না হয়। বিভাগীয় গলদ, কর্মচারীদের ত্রুটি, প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ কর্পোরেশনের কাজে হামেসাই শোনা যায়, জন-প্রতিনিধিরা নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন ও অমনোযোগী হওয়াতে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রশ্রয়ের ফলে সে সব ঘটিয়া থাকে, এ সত্য পৌরবাসীর কাছে সুস্পষ্টই হইয়া পড়িয়াছে। কর্পোরেশনের আগামী নির্বাচনে আদর্শহীনতার এই প্রতিবেশ এবং তাহার

লগত স্বার্থ-ব্যবস্থার কূটচক্র ভাঙ্গিয়া চলিতে হইবে; পৌরবাসীদের এজন্য যথাসময়ে সচেতন হওয়া আবশ্যক।

বিরোধী দলের আশা

কৃষক-মজদুর-প্রজা দলের নেতা ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বিরোধী পক্ষীয় বিভিন্ন দলকে ঐক্যবন্ধ হইতে আহ্বান করিয়াছেন। আইন সভায় কংগ্রেসের প্রাধান্যকে উৎখাত করিয়া কংগ্রেসী শাসনের বিলোপ ঘটাইবার জন্য এই বিবৃতিতে ইঁহাদের আগ্রহের ভাবও বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এরূপ ইচ্ছা তাঁহাদের থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেই সব সময় তাহা কাজে পরিণত করা যায় না। এইরূপ ক্ষেত্রে সেজন্য ত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা ও জনগণের সেবায় আগ্রহ প্রদর্শন এবং তদুপযোগী কর্মনীতি ও দলীয় সংহতি প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিরোধী দল সংহতিবোধের পরিচয় দিতে পারেন নাই এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কথাটা সোজাসুজি এভাবে স্বীকার না করিলেও প্রধানত সেজন্যই বিরোধী দলের পরাজয়ও ঘটিয়াছে। প্রত্যুত এই সংহতিবোধের অভাবের মূল খুঁজিতে গেলে নৈতিক দুর্বলতাই ধরা পড়িবে। দেখা যাইবে, সেখানে রহিয়াছে ব্যক্তিগত নেতৃত্বাভিমান কিংবা উপদলীয় স্বার্থের আকর্ষণ; পরন্তু দেশ ও জাতির সেবার একান্ত আগ্রহের অভাব। এ সত্য কথা যে কংগ্রেসকে নিন্দা করিলেই নৈতিক এই যে ত্রুটি, ইহার নিরাকরণ হইবে না। বিভিন্ন দলের মধ্যে সংহতিবোধ যদি সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হয়, ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থের উপর দেশের স্বার্থকে স্থান দিতে হইবে এবং নিঃস্বার্থ ত্যাগের প্রবৃত্তিই সেই নৈতিক শক্তি গড়িয়া তুলিতে সমর্থ। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত বা দল হিসাবে পরাজয়, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র; সেজন্য বিক্ষুব্ধ হওয়া সুবিবেচনার পথ নয়। প্রত্যুত মন্ত্রিগিরি দখল করিতে পারিলেই যে চতুর্বর্গ সিদ্ধ হইবে, এমন ধারণাও নিতান্তই ভুল। দেশ ও জাতির সেবাই বড় কথা। বিভিন্ন দলগুলি যদি ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সংহত হইতে সমর্থ হয়, তবে বিরোধী পক্ষ হিসাবেই তাঁহারা দেশকে অগ্রগতির পথে অনেকখানি আগাইয়া লইতে পারেন এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করিবার সুবিধাও তাঁহাদের বেশি রহিয়াছে বলা যায়। পক্ষান্তরে বিরোধী পক্ষীয় বিভিন্ন দলগুলি সেবা ও ত্যাগের আদর্শে নিষ্ঠাবুদ্ধিতে নিজেদের নৈতিক শক্তি দেখাইতে যদি না পারেন, তবে প্রতিপক্ষকে শুধু নিন্দা করিয়া তাঁহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হইবেন না।

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্য বিধান

বিদেশ হইতে সম্প্রতি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিদের আগমনে কয়েকদিন হয় স্বাস্থ্য-সাধনার সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের চিন্তাশীল সমাজের দৃষ্টি একটু বেশি রকমে আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়া কয়েকটি চিকিৎসা-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এতদসম্পর্কিত সম্মেলনের আলোচনাও দেশের লোকের চিন্তাশক্তি এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আলোচনা, গবেষণা এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের মূল্য এক্ষেত্রে না আছে, আমরা এমন কথা বলি না; কিন্তু স্বাস্থ্য-বিধান সম্পর্কে সরকার হইতে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের উপরই সর্বকিছু নির্ভর করে। প্রত্যুত জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্তব্যবোধ জাগাইবারও সেই পথ। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও আমাদের সেই একই বিশ্বাস যে, শাসন এবং সমাজ-সেবা এই দুইটি পৃথক করিয়া দেখিবার দিন আর নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, শাসন সম্পর্কিত পদাধিকারে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের মুখে আইন ও শান্তির সম্বন্ধে দায়িত্বের কথাটা আমরা যতটা জোর দিয়া বলিতে শুনি, সমাজ-সেবা কিংবা স্বাস্থ্য-বিধান সম্পর্কিত কর্তব্য প্রতিপালনে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের ততটা আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনসাধারণকে উপদেশ দিয়াই ইঁহারা নিজেদের কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি কলিকাতা শহরে পাকাপাকিভাবে ঘাটি করিয়াছে বলা যায়। বর্তমান যুগে এসবই প্রতিষিদ্ধ ব্যাধি এবং এগুলির প্রতিকারের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাও নির্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু সেদিকে কাজ হইতেছে কোথায়? গত চার বৎসর সরকার কর্পোরেশনের দায়িত্ব নিজেদের হাতে লইয়া কাজ চালাইয়াছেন। কিন্তু শহরের স্বাস্থ্য বিধান সম্পর্কিত ব্যবস্থার দিক হইতে এই চার বৎসরে উন্নতি কিছুই ঘটে নাই; পক্ষান্তরে অবনতি যে ঘটিয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট। সরকারী কর্তৃত্বে কর্পোরেশনের ট্যাক্সের হারই বাড়িয়াছে, কিন্তু শহরের আবর্জনা পরিষ্কার, আলোক বিধান, জল সরবরাহ, এ সব দিক হইতে লোকের অভিযোগের কারণ একটুও কমে নাই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভোর কমিটি যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, এ পর্যন্ত তাহা প্রতিপালিত হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম অঞ্চলগুলি স্বাস্থ্য-বিধানের দিক হইতে এখনও উপেক্ষিত হইয়াই চলিতেছে। এসব কাজে টাকার প্রয়োজন, ইহা আমরা বুঝি; কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনের চেয়ে সে প্রয়োজন কম কিছু নয়, বরং বেশি। আমরা এই এই কথাই তাঁহাদিগকে বলিতে চাই; কারণ লোকে যদি বাঁচে, তবে তো আইন ও শান্তি রক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে জয়লাভের পর ভারতীয় বণিক সভার অভিনন্দনের উত্তরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনে তাঁহার সংকল্পের কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, গ্রাম-উন্নয়নের কথাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থনীতিক এবং ভূমি বিধান সংস্কার, জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধন এ সব কথা তিনি এড়াইয়া গিয়াছেন। কিন্তু গোঁজামিল দিয়া চলিবার সময় এখন আর নাই; সাহসের সঙ্গে সমগ্রভাবে অর্থনীতিক এই দুর্গতির প্রতিকার বিধানে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্যক্তিগত উদারতার দিকে তাকাইয়া থাকার মত সমস্যা, ইহা নয়। প্রকৃতপক্ষে এদেশের স্বাস্থ্য-সমস্যা খাদ্য-সমস্যার সঙ্গেই প্রধানত জড়িত রহিয়াছে। লোকে যদি উপযুক্তভাবে পুষ্টিকর খাদ্য না পায় এবং খাদ্যের অভাবে অখাদ্য, কুখাদ্য খাইয়া তাহাদিগকে উদরপূর্তি করিতে হয়, মুনাফা শিকারীর দল শাসকদের ঔদাসীন্য এবং অব্যবস্থার ছিদ্রপথে ভেজালরূপে বিষ খাওয়াইবার পাপ ব্যবসাই যদি চালাইবার সুবিধা পায়, তবে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মাত্র সরকারী মামুলী গবেষণাতেও কোন কাজ হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার কয়েকটি প্রতিমা
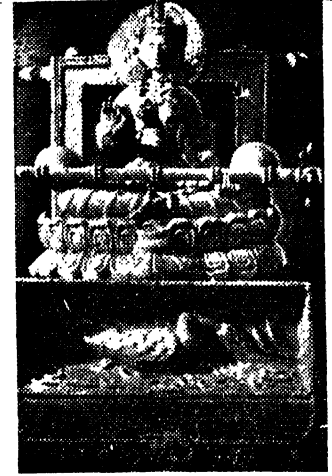
উপরের সারি:

বামে: রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটে নবারুণ সংঘর প্রতিমা।

মধ্যে: বেলগাছিয়া কচি সংসদের বাণী প্রতিমা।

দক্ষিণে: মুরাদনগর (মীরাট) প্রবাসী বাঙালীদের প্রতিমা।

নীচের সারি:

বামে: আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকা কার্যালয়, বাণী-প্রতিমা।

দক্ষিণে: শ্যামবাজার বলরাম দে স্ট্রীটে, হিন্দু সংঘের বাণী-প্রতিমা।

দিল্লীতে মহাত্মাজীর মৃত্যুবার্ষিকীঃ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রাজঘাট (দিল্লী) মহাত্মাজীর সমাধির নিকট এক বিশেষ প্রার্থনা। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু এবং দিল্লীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।
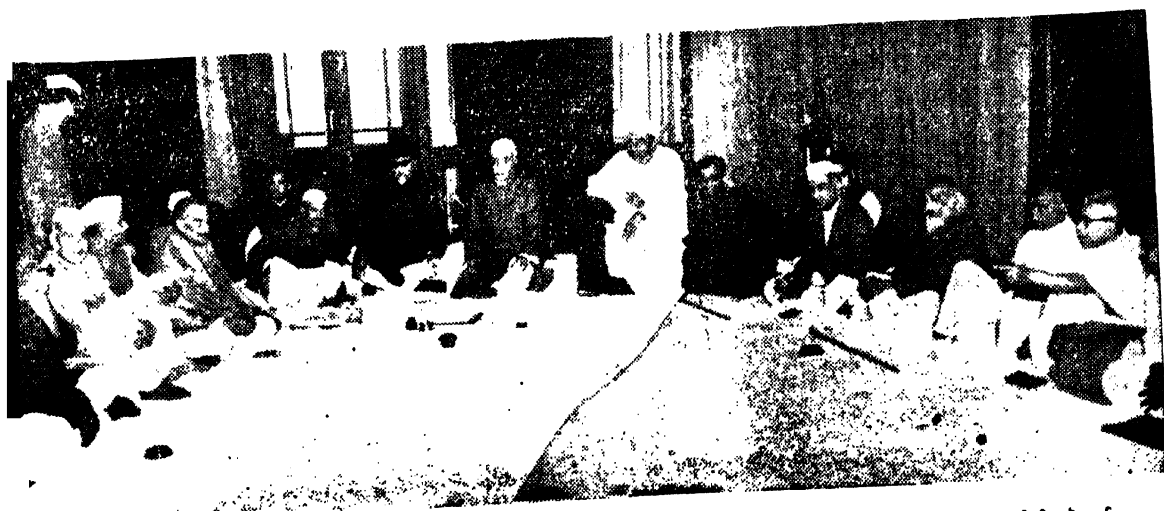
গত ২রা ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের দৃশ্য। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছাড়াও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অধিবেশনে আমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

আর্নিকি পার্সিকিভি

এক বাঙালী দম্পতির সঙ্গে জিনীভার এক বড় হোটেলে উঠেছি। প্রথম দিনই খানা ঘরে লক্ষ্য করলুম আমাদের টেবিলের দিক মুখ করে বসেছেন এক দীর্ঘাঙ্গী যুবতী। দীর্ঘাঙ্গী বললে কম বলা হয়, কারণ আমার মনে হল এঁর দৈর্ঘ্য অন্তত পক্ষে পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি হবে— আর আমরা তিনজন বাঙালী গড়পড়তায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি হই কি না হই।

দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মিলিয়ে সুগঠিত দেহ— সেইটেই ছিল তাঁর সৌন্দর্য, কারণ মুখের গঠন, চুলের রঙ এবং আর পাঁচটা বিষয়ে তিনি সাধারণ ইয়োরোপীয় রমণীদেরই মত।

ভদ্রতা বজায় রেখে আমরা তিনজনই যুবতীটিকে অনেকবার দেখে নিলুম। ফিস ফিস করে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ভিতরে আলোচনাও হল। তখন লক্ষ্য করলুম, আমাদের দিকে তিনিও দু' চার-বার তাকিয়ে নিয়েছেন।

সেই সন্ধ্যায় বাঙালী ভদ্রমহিলাটি হোটেলের ড্রয়িংরুমে বারোয়ারী রেডিয়োটা নিয়ে স্টেশন খোঁজাখুঁজি করছিলেন; আমি একপাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলুম। হঠাৎ সেই যুবতী ঘরে ঢুকে সোজা মহিলাটির কাছে গিয়ে পরিষ্কার ইংরিজিতে বললেন, 'আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি? আপনি কি কোনো বিশেষ স্টেশন খুঁজছেন? আমার বেতার-বহি আছে।'

পরিচয় হয়ে গেল। রোজ খাবার সময় আমাদের টেবিলেই বসতে আরম্ভ করলেন। নাম আর্নিকি পার্সিকিভি—দেশ ফিনল্যান্ডে।

ফিনল্যান্ডের আর কাকে চিনব? ছেলেবেলায় ফিন্ লেখক জিলিয়াকুসের 'রুশ বিদ্রোহের ইতিহাস' পড়েছিলুম আর তাঁর ছেলে জিলিয়াকুসও বিখ্যাত লেখক— প্রায়ই 'নিউ স্টেটসম্যানে' উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। ব্যস্।

কিন্তু তবু যেন পার্সিকিভি নামটা চেনা-চেনা বলে মনে হল। সে কথাটা বলতে আর্নিকি একটুখানি লজ্জার সঙ্গে বললেন, 'আমার বাবা ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট।'

আমরা তিনজনেই একসঙ্গে বললুম, 'অ'।

আর্নিকির সঙ্গে আলাপ হওয়াতে আমাদের ভারী সুবিধে হল। বাঙালী দম্পতি ইংরিজি আর বাঙলা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা জানতেন না, কাজেই আমাকে সব সময়ই ওঁদের সঙ্গে বেরতে হত। আর্নিকি অনেকগুলো ভাষা জানতেন; তিনি তাঁদের নিয়ে বেরতেন আর আমি য়ুনি-ভার্সিটি, লাইব্রেরি, মিটিং-মাটিং করে বেড়াতুম।

সুইস খানা যদিও বেজায় পুষ্টিকর তবু একটুখানি ভোঁতা—আর্নিকি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কয়ে তার পরিপাটি ব্যবস্থা করে দিলেন। শামুনিক্স্ দেখতে যাবার জন্য মোটর ভাড়া করতে যাচ্ছি—আর্নিকি এক দোস্তের গাড়ী ফিরি-গ্র্যাটিস-অ্যান্ড ফর-নাথিং জোগাড় করে দিলেন। তা ছাড়া জিনীভা, লজান, মন্ত্রো, ভিলনভ্ (রমা রলাঁ সেখানে থাকতেন) সম্বন্ধে দিনের পর দিন নানাপ্রকারের খবর দিয়ে আমাদের ওয়াকিবহাল করে তুললেন।

সূক্ষ্ম রসবোধও আর্নিকির ছিল। আমি একদিন শুধালুম, 'আপনি অতগুলো ভাষা শিখলেন কি করে?'

বললেন, 'বাধ্য হয়ে। ইয়োরোপের খানদানি ঘরের মেয়েদের মেলা ভাষা শিখতে হয় বরের বাজার কর্নার করার জন্য। ইংরেজ ব্যারন, ফরাসি কাউণ্ট, ইতালিয়ান ডিউক সক্কলের সঙ্গে রসালাপ না করতে পারলে বর জুটবে কি করে?'

তারপর হেসে বললেন, 'কিন্তু সব শ্যাম্পেন টক্! এই পাঁচ ফুট এগারোকে বিয়ে করতে যাবে কোন ইংরেজ, কোন ফরাসি? তাকে যে আমার কোমরে হাত রেখে নাচতে হবে বিয়ের রাতের বল ডান্সে! যা দেখতে পাচ্ছি, শেষটায় জাতভাই কোনো ফিন্‌কেই পাকড়াও করতে হবে।'

আমি শুধালুম, 'ফিনরা কি বেজায় ঢ্যাঙা হয়?'

বললেন, 'ছয়, ছয় তিন, ছয় ছয় হামেশাই। তাই তো তারা আর পাঁচটা জাতকে আকসার হাইজাম্পে হারায়।'

রসবোধ ছাড়া অন্য একটি গুণ ছিল আর্নিকির। হাজির-জবাব। কিছু বললে চট করে তার জুৎসই জবাব তাঁর জিভে হামেহাল হাজির থাকত।

একদিন বেড়াতে বেরিয়েছি তাঁর সঙ্গে। এক ডেপো ছোকরা আর্নিকির দৈর্ঘ্য দেখে তাকে চেঁচিয়ে শুধালে, 'মাদমোয়াজেল, উপরের হাওয়াটা কি ঠান্ডা?'

আর্নিকি বললে, 'পরিষ্কার তো বটেই। তোমার বোটকা প্রশ্বাস সেখানে নেই বলে।'

আর্নিকির সঙ্গে আমাদের এতখানি হৃদ্যতা হয়েছিল যে তিনি আমাদের সঙ্গে লজান, মন্ত্রো, লুৎসের্ন, ইন্টেরলাকেন, ৎসুরিশ সব জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন।

বিদায়ের দিন শ্রীমতী বসু তো কেঁদেই ফেললেন।

* * * * *

দু' এক বৎসর আমাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার ছিল। তার পর যা হয়—আস্তে আস্তে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল।

তারপর বহু বৎসর কেটে গিয়েছে। এখানে এক ফিন্ মহিলার সঙ্গে আলাপ। শুধালুম, 'প্রেসিডেন্ট পার্সিকিভির মেয়েকে চেনেন?'

গুম্ হয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ। তারপর শুধালেন, 'আপনার সঙ্গে এখন কি তাঁর যোগাযোগ নেই?'

আমি বললুম, 'বহু বৎসর ধরে নেই।'

বললেন, 'তিনি চার মাস ধরে হাসপাতালে। পেটের ক্যানসার। বাঁচবেন না। আপনি একটা চিঠি লিখুন না? অবশ্য অসুখের কথা উল্লেখ না করে! জাস্ট্ এমনি, হঠাৎ যেন মনে পড়েছে।'

সে রাত্রেই লিখলুম।

দিন চারেক পরে আরেক পার্টিতে সেই ফিন্ মহিলার সঙ্গে দেখা। শুধালেন, 'চিঠি লিখেছেন?'

আমি বললুম 'হাঁ'।

বললেন, 'দরকার ছিল না। কাল দেশের কাগজে পড়লুম, মারা গেছেন।'

জীবনাবেদ

জীবনানন্দ দাশ

অনেক বছর কেটে গেছে,
আরো কিছু দিন চলে যাবে;
ফুরিয়ে ফেলেছি নীড় শিশির অনেক,
আরও রৌদ্র আকাশ ফুরাবে,
অনেক চিহ্নিত গাছ মাঠ স্তম্ভ জনতা বন্দর
আছে, তবু কাছে নেই আর;
মনন আভার মত ঘিরে
রেখেছে সে সব অন্ধকার।

শরীরের থেকে শক্তি ক্ষ'য়ে
গলিত মোমের মত যাবে
ক্রমে আরো ক্ষমাহীন অগ্নির ভিতরে;
বিষয়ের থেকে দূর বিষয়ে হারাবে
মানুষের ক্ষুধাতুর মন;
প্রেমের বিষয়ে তবু স্থির
হয়ে থেকে ভয়াবহ ইতিহাস কিছু স্নিগ্ধ ক'রে
নিভে যাবে মনন শরীর।

মাটী ও আমি

গোপাল ভৌমিক

এবার যাযাবরীর শেষ। আকাশ পরিক্রমা
একাদিক্রমে অনেক হল। বুঝেছি মূল কথা
ঋণের বোঝা বাড়েই শুধু, শূন্য থাকে জমা
দুরন্ত সে তৃষ্ণা বাড়ায় মনের চপলতা।

আকাশ থাকে আগের মত। নিঃসীমতা-ঘেরা
হাজার চন্দ্র তারার আধার। সাধ্য কি কার
ভেদ করে সে অপরাজেয় প্রতিরোধের বেড়া
দু হাত দিয়ে ধরবে খুলে রহস্যময় দ্বার।

এ পৃথিবী বিরাট বিপুল। ক্ষুদ্র অনুকণায়
লুপ্ত হাজার গোপন কথা। জেনে শুনে যে-জন
অকারণে তার বাইরে নিজের দৃষ্টি ছড়ায়—
ব্যর্থ হতে বাধ্য যে তার সকল আবেদন।

ঝড়ের রাতের পাখী আমি, ভগ্ন ডানায় চেপে—
ফিরে এলাম এই মাটিতে সকল আকাশ মেপে !

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দ্বারভাঙ্গা
১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮

প্রীতিভাজনেষু,

জীবনে সবচেয়ে কিসে বেশি আনন্দ পেয়েছি জানতে চেয়েছ। বড় শক্ত প্রশ্ন। এই অর্ধশতাব্দী ধ'রে একটা জীবন, মহাকালের দিকে একবার চোখ তুলে দেখলে যেমন কিছুই নয়, একটা বুদ্বুদ মাত্র, যা এইবার ফেটে মিলিয়ে যাবে, মানুষের সীমাবদ্ধ আয়ুষ্কালের তুলনায় আবার তেমনি অনেকখানিই তো? এতে এরই মধ্যে কতভাবে কত আনন্দের আলো ফুটল, কত দুঃখের ছায়াপাত হোল, গভীরতার অনুপাতে তাদের ওপর নম্বর বসিয়ে হিসাব করে বলা কি সহজ?

উত্তরটা দেবার চেষ্টাই করতাম না, "একরকম আছি......সর্বাঙ্গীণ কুশল তো?" বলেই সেরে ফেলতাম চিঠিটা, হঠাৎ মনে পড়ে গেল একটা জিনিসে খুব আনন্দ পেয়েছি এক সময়। সবচেয়ে বেশি কিনা—তোমার এই সবচেয়ে শক্ত প্রশ্নটার উত্তর দেবার চেষ্টা না করে কথাটাই সোজাসুজি বলে যাই, লিপির দীর্ঘতা দিয়ে যদি আনন্দের গভীরতা মাপবার চেষ্টা কর, আমার আপত্তি নেই।

ঘোরা বাই ছিল খুব বেশি। ভুল বুঝতে পার তাই বলে দিই এ-ঘোরার মধ্যে কোন আভিজাত্য ছিল না। হোল্ড-অল-সুটকেস-ব্র্যাডশ-বিবর্জিত এই ঘোরা, এর একদিকে যেমন ছিল না সিমলা-শিলং-উটী, অন্যদিকে তেমনি ছিল না—কাশী-কাঞ্চী-রামেশ্বরম্। বড় কাজের পর বড় অবসরে একটু বড় করে হাঁপ ছেড়ে আসা নয়, নিত্যকর্মের মধ্যে সামান্য একটু পলাতক-বৃত্তি—এই ছিল আমার ঘোরার মূল কথা। এত সামান্য কথা যে লিখতে কুণ্ঠা আসে।

কিন্তু কি করব? ঐতেই পেতাম আনন্দ, হয়তো সবচেয়ে বেশিই। যদি বলি, ঐ একটুখানি ঘুরে আসার নেশা আমায় ঘটা করে ঘোরার উল্লাস থেকে বঞ্চিত করেছে তো মিথ্যে বলা হবে না। নিতান্ত কেজো ভ্রমণের মধ্যে ফাঁকি দিয়ে আমি দিল্লী, আগ্রা, প্রয়াগ এদের টুরিস্টদের ফাঁকির নজরে যা একটু দেখে নিয়েছি এককালে; তাই—লিখতে লজ্জিত হচ্ছি—পাঁচজন জানিয়ে-দেখিয়ের মধ্যে বসলে একটু মাথা হেঁট করেই বসতে হয় আমায়।......"না মশাই, কাশ্মীরটা দেখিনি;...দার্জিলিংটা হব-হব করেও হয়ে ওঠে নি এখনও...না, যাব যাব করেও চন্দ্রনাথটা কৈ আর হয়ে উঠল?"......এত 'না'-য়ের সঙ্কোচের মধ্যে সোজা হয়ে থাকা যায় কেমন করে?

বিপদ এইখানে যে বাঙলাদেশ আমার প্রবাসী মনটাকে অষ্টপ্রহর রাখত টেনে—এর নদী-নালা, ডোবা-জঙ্গলের অদ্ভুত মোহ দিয়ে; এর ভাঙা অট্টালিকা, পুরনো দেউল, জটিল বট-অশ্বত্থের মৌন স্বপ্ন দিয়ে মৃত্যুর কোলে এর জীবনের যতটুকু বেঁচে আছে—এখানে-সেখানে—তার হাসি-অশ্রুর অপূর্ব মাধুর্য দিয়ে। তর সইত না; কাজ নিয়ে গেলে ক্রমাগতই মনটা ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে পড়বার অবসর খুঁজত, আর যখন শুধু অবসর বিনোদনের জন্যেই যেতাম দেশে তখন তো কথাই নেই, নাকে মুখে তাড়াতাড়ি দুটি গুঁজে সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তায় পা না বাড়ালে চলতই না আমার।

কি করব?—ঘরের মোহ কৃপণ করে রাখত আমায়। কবিগুরু যার জন্যে আপসোস করে গেছেন—

'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের ওপর একটি
শিশির বিন্দু—'

—তারই সাতরঙা আলো থেকে যদি আমি চোখ ফিরিয়ে দূরের দিকে চাইতে না পেরে থাকি তো আমায় দুষবে কেমন করে?

মনকে একেবারে মুক্তি দিয়ে বেরুতাম, বয়স ভুলে, অবস্থা ভুলে, পদবী ভুলে। পাছে এই মুক্তির মধ্যে একটুও বাধা এসে পড়ে এই জন্যে আমার এ ধরণের পর্যটনে কখনও সাথী নিতাম না। যেখানে খুশি যাব, যা খুশি দেখব, যখন যেখানে যেভাবে খুশি বসব, যতক্ষণ খুশি মূঢ় বিস্ময়ে হাঁ করে থাকব চেয়ে—এত নিজেকে এলে দেওয়া ভ্যাগাবণ্ডিজমের সাথী পাওয়া দুষ্কর; আর সত্যি কথাই বলছি, এই ভূতে পাওয়া মানুষটাকে বুঝবে এত অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আত্মীয় আমি পাই নি এখনও। আমার সত্ত্বার এখানটা অনাত্মীয়ই থেকে গেল।

ধরো, গ্রীষ্মের দুপুর ঝাঁঝাঁ করছে, আমি চুপ করে বসে আছি ফলতা-কালীঘাট রেল-ওয়ের মাঝেরহাট স্টেশনে; এই লাইন ধরে যেতে হবে। কোথায় যাওয়া তা এখনও ঠিক করে উঠতে পারি নি। পৌনে দুটো হয়েছে দুটো সাতচল্লিশে গাড়ি ছাড়বে, ততক্ষণ বসে আছি টিকিট ঘরের সংলগ্ন বারান্দার বেঞ্চটাতে। আমার একদিকে নিচে একটি ঝুড়ি, একটি চাঙারিতে মুড়ি নিয়ে বসে আছে, এ-বর্ধমানের এই সীতাভোগ-মিহিদানা। কিনেছিলাম চার পয়সার, শেষ হয়ে গেছে। আমার বাঁয়ে বেঞ্চের ওপর বসে আছে বদন, জাতিতে ধীবর; একটি ধূলিধূসর পা (আমার দিকেরটাই) বেঞ্চের ওপর মুড়ে তোলা একটা উবুর-করা মাঝারি সাইজের ঝুড়ির ওপর। পরিচয় হয়েছে; বদনের বাড়ি বড়-জাউলে, সরারহাট স্টেশন থেকে চার ক্রোশ। ঝুড়িটা মাছের, বদন বলছে—"আর কন কেন, সেই কোন রাত তিনটেয় বেইরেছিলাম, মাছ নে, গলদাচিংড়ি, উাঁদককোর ওটা নামী কিনা, ধাপার চিংড়ি ফেলে খেতে হবে—কালিঘাটের বাজারে ফোড়েকে ডিলিবারি দিয়ে আসচি।"

"রোজ আস?"

"আজ্ঞে না, একদিন অন্তর দে।"

"কত থাকে ফি খেপে—মোটা রকম বাঁচে কিছু?"

"থাকার কথা আর কইবেন না; তবে হ্যাঁ জিনিসটোর ডিম্যান্ড আচে।...ঐ শুনি, তা মেড়ো ফোড়ে ব্যাটারা আর আমাদের দেয় কোথায়?"

"তা বাঙালী ফোড়েদের সঙ্গে ব্যবস্থা কর না কেন?"

একটা ঘরোয়া গাল দিয়ে বললে—"ও...রা আরও বেইমান। নিজের জাত কিনা।...মাচিস্ আছে?"

ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী একত্র ক'রে বাঁ হাতের মুঠোর ওপর ঘষলে। বললাম—"নেই, রাখি না।"

একটা বিড়ি দাঁতে চেপে ধরেছে, সেই-ভাবেই মুখটা ঘুরিয়ে চারিদিকে চাইলে,—কাকে ধরে? দুপুরের গাড়ির যাত্রীও কম, এখনও জোটেও নি সব। উঠে গেল।

কি রকম মনে হচ্ছে তোমার? রুচিতে আঘাত দিচ্ছি, না? কিন্তু আমার সে চমৎকার লাগছিল। তুমি ঐটুকুতেই ঘাবড়াচ্ছ?... আমি অরুচির ব্যাপারটুকু আরও রুচিকর করে নেবার চেষ্টা করলাম এর পাশে গতকাল আর পরশুকে এনে ফেলে, অর্থাৎ by contrast আজকের এই রুচিহীন দুপুরটিকে আরও ফুটিয়ে তুলে।...পরশু আমি আমার অফিসে, এখান থেকে তিনশ মাইল দূরে আমার ম্যানেজারীর আসনে বসে আছি। দৈনিক ইংরাজী কাগজের ম্যানেজারী। কদিনের জন্যে কলকাতায় যাব, সবাইকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে, ডিউটি সবন্ধে তাগিদ করে দিতে হবে। অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজার বসে আছে টেবিলের পাশে, বাকি সব ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্জরা টেবিল ঘেরে দাঁড়িয়ে আছে, প্রায় সবাই; রিভল্‌ভিং চেয়ারে নিজের অক্ষের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তাদের সঙ্গে কথা কইছি। পরিধানে স্যুট, নেকটাই, হাতে জ্বলন্ত সিগরেট, কথার ফাঁকে অ্যাস-ট্রেতে ছাই ঝাড়ছি মাঝে মাঝে।

কাল ছিলাম প্রবাসী অফিসে, ব্রজেনবাবু, শৈলেনবাবু, আরও সবাই; কবি অপূর্ববাবু এলেন। জমাট আড্ডা—সাহিত্য, রাজনীতি, খোস গল্পও—যার যে রকম পুঁজি বা যখন যেদিকে ঢল নামছে।...ব্রজেনবাবু রাঁচির অভিজ্ঞতা শুনিয়ে চলেছেন—কলকাতা থেকে আগত 'ড্যাম-চি' বাবুদের কথা; সস্তা বাজার দেখে দরদস্তুর না করে যা দেখছে তাই কিনে যাচ্ছে বাবুরা, যা বলছে সেই দরে।......"ডিম? ডজন কতয়?"......"দু' আনা।" "ওঃ, ড্যাম্‌ চীপ! দে তিন ডজন। তোর কপি?......তিন পয়সা? ড্যাম চীপ!" ড্যাবাচাকা মেরে গেছে, ডিমের মতন তো ডজন-ডজন নেওয়া চলবে না!

স্থানীয় খদ্দেরে থৈ পায় না; দর গেছে অসম্ভব চড়ে, একটু নামাবার চেষ্টা করলে শোনে—"যা কেনে, তুদের সাদ্যি নয়, ড্যামচি বাবুরা লিবে......"

—জমাট গল্পের মধ্যে মাঝে মাঝে হাসির হররা উঠছে।

আজ এই মাঝেরহাট স্টেশনে। খন খনে রোদ চারিদিকে ঠিকরে পড়ছে। ওপরে টিনের ছাত, সামনে প্যাসেঞ্জার গাড়ি খানা নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সময় হলে এইটেই আমাদের নিয়ে যাবে। শকটশিল্পের মূর্তিমান প্রত্নতত্ত্ব। তা হোক, লাগছে ভালো। এই দুপুর আজ আমায় বর্তমান থেকে বহুদূরে নিয়ে গেছে, সে-দূরের বাসিন্দা হল বদনেরা। সে এক চির-অতীতের দেশ, মানুষ সেখানে কোন এক যুগে খানিকটা এগিয়ে সেই যে এক সময় থেমে গেছে, আজ পর্যন্ত থেমেই আছে। বদন যে এ-যুগের অতি-

আধুনিক ডিজেল-ইঞ্জিন-চালিত আট চাকার বগি গাড়িতে চড়ে আসন্ন স্বাধীনতার আলোচনা করতে করতে তার সেই স্বপ্নের দেশ থেকে যাওয়া-আসা করে না, পরন্তু এই চার চাকার বাক্সগুলিই তার বাহন—এই ব্যাপারটা আজকের এই দুপুরেটির সঙ্গে যেন বড় মানানসই।

স্টেশন প্রাঙ্গণের ও দিকেই বি এ আর-এর (এখন ই আই) বড় লাইন; কিক্‌ড়ি বের করতে করতে চলে গেছে ক্যানিং ডায়মন্ডহারবার, বজবজ। ওদের মাঝেরহাট খালের পুলটার ওদিকেই। একখানি গাড়ি বালিগঞ্জের দিক থেকে বিপুল গতিতে এসে বেরিয়ে গেল—তর্জনগর্জন, গতি, অঙ্গক্ষেপ সব তাইতেই যেন বিদ্রূপ ঠাসা ফলতা লাইনের বেচারি এই প্রত্নতত্ত্বটিকে নিয়ে।... আগেই বলেছি, গতি-শ্রুতি-দৃষ্টির মতো মনটাকেও একেবারে মুক্তি দিয়ে বেরুই, সে-বয়সের মতো ইচ্ছে যা খুশি ভাবি, সেই জন্যে শৈশবের একটি অবুঝ আক্রোশ এসে গেছে মনে বড় গাড়ির এই অহংকেরে ঠাট্টায়। মনে মনে বললাম—"ঢের দেখেছি, বাপের ব্যাটা হোস তো আমাদের ওদিক-কার তুফানমেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবি।"

অর্থাৎ শৈশব হলে যা মুখ ফুটে বলতাম—হাঁক পেড়ে—সেটা যেন একলা পেয়ে কি করে আপনি এসে মনের দুয়ারে ধাক্কা দিলে।

কেমন যেন সব জড়িয়ে যাচ্ছে, না—প্রেসের ম্যানেজার, সাহিত্যিক, বদনের বন্ধু; চুরুট নেভিকাটের সঙ্গে বিড়ি, প্রৌঢ়ের সঙ্গে শিশু, নিশ্চল অতীতের সঙ্গে শ্রান্তিহীন বর্তমান। কি করব, এই জট-পাকানো আবর্তই আমার আনন্দ; এই নেশাতেই কাশ্মীর হল না, রামেশ্বরম্ হল না, আরও কত কী যে হল না, তার কি হিসেব রেখেছি?

বদন ধরানো বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে নির্জের জায়গায় এসে বসল, এবার দুটো পা-ই তুলে। গড়গড়ায় তাকিয়ার মতো বিড়ির পক্ষে এইটেই বোধ হয় রাজাসন, তোয়াজ জমে ভালো। একটু কি যেন ভাবলে, তারপর ফতুয়ার পকেটে হাতটা সাঁদ করিয়ে কতকটা কুণ্ঠিতভাবে একটা বিড়ি বের করে বললে,—'ইচ্ছে করেন?'

চকিতে ম্যানেজারের গদি-আঁটা রিভলভিং চেয়ারটা মনে পড়ে গেল একবার; কিন্তু নিতান্ত ক্ষণিকের জন্য, কাটিয়ে উঠে বললাম,—"করি বৈকি, দাও, ভালো জিনিস?"

কিছু না বলে জ্বলন্ত বিড়িটা বাড়িয়ে দিলে, ভাবটা আমার মুখ থেকেই উত্তরটা বেরুক না। ধরিয়ে নিয়ে দুটো টান দিয়ে তার প্রত্যাশী দৃষ্টির দিকে চেয়ে বললাম—"নিন্দের নয়তো, বাঃ!"

কেমন একটা সাধ হচ্ছে জানাই, এ-ব্যাপারে আমি নিতান্ত আনাড়ি নই; অর্থাৎ মিশে যাওয়ার আর কিছু ব্যবধান রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে না; বললাম—"কি মার্কা? —মোহিনী, না, মোহন, না, দরবারী, না, রাজারাম?"

বদন একটু গোড়া থেকেই আরম্ভ করলে; প্রশ্ন করলে—"আপনারা?"

উত্তর করলাম—"ব্রাহ্মণ।"

"পাতঃ পেন্নাম হই। এই এক বিড়িতে বসে আচি, ইদিকে হাতে আগুন, মিথ্যে কইলে রনন্ত নরক—মদ নেই, তাড়ি নেই, গ্যাঁজা-চণ্ডু কিছু নেই, নেশার মধ্যে এই এক বিড়ি আর তামুক, তাও সে কদিচ-কখনও (একটু বাদ-সাদ দিলাম, বদন কামিনী-কাঞ্চনের নেশার কথাটাও তার নগ্ন মেঠো ভাষায় জুড়ে দিয়েছিল); তা এতে কেফায়েৎ করিনে মশই। কি হবে ক'ন মহাপ্পেরাণীকে কষ্ট দিয়ে? সঙ্গে করে কিছু বেঁধে নিয়ে যেতে পারব?"

বিড়িটা নিভে গিয়েছিল, হাত বাড়ালে। আমি নিজেরটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—কে আর কবে পেরেচে?

বিড়িটা ধরে এসেছে, কিন্তু হঠাৎ কি মনে হওয়ায় তাচ্ছিল্যভরে বদন সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে—বোধ হয় কেফায়েৎ না করার একটা সদ্য উদাহরণ হিসেবে। পকেট থেকে নতুন একটা বের করে ধরিয়ে আমারটা ফেরৎ দিয়ে গোটাকতক টান দিলে। তারপর বললে—"মার্কাও খেয়েছি এককালে, খাইনি বললে খেলাপ বলা হবে, তবে এ-জিনিস খেয়ে মার্কায় এখন আর মন ওঠে না, তা আপনার গিয়ে যত বড় নামকরা মার্কাই হক। এ আমার যা দেখছেন, একেবারে ইস্পিসেল; আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"স্প্যাসালটা বুঝলাম নাতো।"

"বড়জাউলি ঢুকতে প্রেথমেই আপনার পড়বে চণ্ডীতলার হাট—সোম, বেস্পতি আর শনি। সোম বাদ দিয়ে, বেস্পতি বাদ দিয়ে শনিবারের যে হাট, তাইতে দেখবেন একধারে একখানি চট বিছিয়ে বুড়ো রমজান মিঁয়া বসে আচে। সামনে, বেশি নয়, মেরে কেটে এই পঁচিশ-তিরিশ বাণ্ডিল বিড়ি, পুরো এক হপ্তায় বুড়ো যা বাঁধতে পারে, নিজের হাতে। হাটে নিন না কত রকমের মার্কাওলা বিড়ি নেবেন, উদিকে হাওয়াগাড়ি আচে, রামরাম আচে—সিগ্রেট, কিন্তু......"

পাশে খট্ করে আওয়াজ হল, টিকিট-বাবু জানালা খুলেছেন। টিকিট নেবার পর বদনকে আর দেখতে পেলাম না; খুঁজলামও না। আমার এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় এও একটা বিশেষত্ব রেখেছি। এক-এক সময় যখন ইচ্ছে হয়, ছবি কিম্বা কাহিনী একেবারে যতটুকু চোখে পড়ল বা কানে গেল, সেইটুকুই করি গ্রহণ; একেবারেই যখন মুক্ত রাখছি মনটাকে তখন সম্পূর্ণতার পেছনেও ছুটি না, সেও তো বাঁধন একটা। আর ওটা একটা আমাদের মনের রোগও—এই'শেষকালে কি হল' খুঁজে বেড়ানো, একটা পূর্ণচ্ছেদ না বসিয়ে নিস্তার না পাওয়া। সৃষ্টিতে তো ওটা নিয়ম করে নেই, না সময়ের দিক দিয়ে, না স্থানের দিক দিয়ে; খণ্ডের মালা অখণ্ড স্থান আর কালের সূত্রে গেঁথে চলেছে—সেই খানিকটা সৌন্দর্যই তো মনকে রাখে মাতিয়ে। চলতি গাড়ি থেকে দেখা ছবির মতো ছবি আমি জন্মে দেখলাম না। এই অসমাপিকার সুরেই মনটাকে বেঁধে রাখতে চাই—শেষ খুঁজতে গিয়ে একটা নিয়ে পড়ে থাকতে গেলে একমেবাদ্বিতীয়মের মরুভূমিতেই যে দিন কেটে যাবে।

কিন্তু আবার বলি, এও তো একটা নিয়মই; শেষ খুঁজব না বলেই বা অশেষের পায়ে দস্তখৎ লিখে দিই কেন? ...তাই এমনও হয়,—পূর্ণতাকে না পাওয়ার যে অশান্তি, তাকে তৃপ্ত করবার জন্যে হয়ে উঠি ব্যস্ত এক-এক সময়, সেটুকু যা অভিজ্ঞতার আড়ালে পড়ে, মনের রং দিয়ে সেটা পূর্ণ করে নিই।

কথাটা হচ্ছে জীবনে সবচেয়ে বড় মুক্তি খেয়ালের দাসত্ব করা, কেননা, খেয়ালের চেয়ে মুক্ত আর কিছুই নেই যে চরাচরে

ক্রমশ

খ্যাপা-খেপীর মেলা : জয়দেব

গৌরকিশোর ঘোষ

কেমন করে যে দেশটার 'কামকোটি' নামখানা খসে গেল, কারা এসে কবে যে 'বীরভূমি' এই সাইনবোর্ডখানা ঝুলিয়ে দিলে, সে তথ্য আমার কাছে দূর ঠিকানার। লায়েক ইতিহাসবেত্তারাও যে নিশানা নিরীখে সব্যসাচী এমত মনে হয় না। মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকা এক লাইনেই সেরে দিয়েছে, 'কামকোটি বিরভূম জানিবে নির্য্যাস।' তা না হয় জানলাম। কিন্তু জানিলে মানিতে হবে, এমন কি কথা? গোটা বীরভূমের সরকারী দলিলদস্তাবেজে 'কামকোটি' নামটি গরহাজির কেন? থাকগে পণ্ডিতদের উনুনে খিচুড়ি চাপিয়ে হাঁড়ি অবধি ফাটাবার বাসনা আমার নেই। কাজে কাজেই ও পথ পরিত্যাজ্য।

আমার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে বীরভূম কামকোটি কিনা তাতে মতদ্বৈধ থাক্‌তে পারে, কিন্তু বীরভূম যে আদৌ বীরের ভূমি নয়, বৈরাগীর ভূমি সে বিষয়ে আমার মত একেবারে অদ্বৈত।

বীরভূমে পা যখনই ঠেকাই কেন জানিনে সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ দুটো গিয়ে ঠেক্‌ খায় আকাশে। যাতায়াতের পথে কোনো একদিন এই দেশটির ঢলঢলে কাঁচা মুখখানিতে উদয় অস্তের ফেরীদার সূর্যদেব আলগোছে এক সোহাগের চিহ্ন এঁকে সটকে পড়েছিলেন। সেই প্রণয় চিহ্নই বোধ করি ঝলসানো বীরভূমের সর্ব-অঙ্গে মাখা। টানের দেশ, প্রায়-নেই-জল বললেই হয়। তবে বীরভূম মাটির সরসতার অভাবের কড়াক্রান্তি উশুল দিয়েছে লোকের মনে রসের দেদার জোগান দিয়ে। দেশটা বেশভূষার বাহার ছেড়েছে। যোগিনীর গেরুয়া তুলে গায়ে দিয়েছে আর মানুষগুলোকেও পরিয়েছে আলখাল্লা, নিজের ধুলোয় রঙদান করে। এদের দেশে রঙ, এদের বেশে রঙ, এদের মনে রঙ, রঙে রঙে রংছুট। গেরুয়া পাগলিনীর রঙ। প্রেমিকও পাগল। প্রেমের স্বভাব বোঝা দায়। তাই সোজা লোকও বাঁকা বলে।

প্রেম কথাটি শুনতে ভালো
প্রেমের স্বভাব বাঁকা গরলমাখা
প্রেম ভেবে ভেবে অঙ্গ কালো॥

যদি প্রেম সাধ চাও আচরিতে
কুলসাধ রেখনা চিতে
মিঠে বলে এঁঠো খেলাম
পেট ভরল না জাতও গেল॥

নিশিযোগে দীপভাসে
আনন্দ গুণ গায় সকলে॥

মেওয়া খেতেও নারে যেতেও নারে
উভয়ারে সেইদিনের দিন কেমনে ঠেলো॥

যে মেওয়া গলায় তুলেও গেলা যায় না, গলা থেকে ফেলাও যায় না তাই প্রেম-মেওয়া। এই প্রেম পেতে চাও তো কুল ছাড়। গরঠিকানা হও। পাগল বনো। পাগলদের আবার ঠিক ঠিকানা কি? সাকিন মোকাম কোথায়? তাই এরা সবাই বেঠিক, সবাই বেভুল, এরাই বাউল। বিচিত্র আচার এদের, সচিত্র আকার।

বাউলের সঙ্গে পড়ে, ঘুরে ঘুরে ভবের মাঝে
ভেবে মরি

দেখে এদের রঙ্গভঙ্গ জ্বলে অঙ্গ
কিছুই ব্যাপার বুঝতে নারি॥

একতারা আছে ধরে, হস্ত নাড়ে, এই বুঝি ওর
হাতে খড়ি।

জানেনা এসব তত্ত্ব মদে মত্ত,
করে বেড়ায় ছলচাতুরী।

বাঁয়া বাজাচ্ছে যেটা, ঐ বেটা
ভুলেও ভাবেনা হরি॥

তালে তো দো...রে তাল,
বড় বেতাল তালবেতালে বাজায় জুড়ি॥

গুপিযন্ত্র যে ধরে ঝিমিয়ে পড়ে
মৌতাত লেগেছে ভারি।

খঞ্জনি বাজায় যে জন বুঝি সে জন
দম দিয়েছে আহা মরি॥

বাউল-সঙ্গ

দেখি তোর একী বেহাল, যেন ইন্দ্রজাল
দীর্ঘ ফোঁটার কারিকুরী।
গলাতে কণ্ঠি পরে, মাথা নেড়ে
গাচ্ছে সবে আহা মরি॥
আনন্দলহরী করে, আনন্দভরে,
নৃত্য করে বলে হরি।
নয়নে চিনে নেনা, করে সোনা
সে ধন হরি নামের তরী॥

বাউলের রূপ বর্ণনা ওদের কথাতেই দিলাম। বাউলদের সম্পর্কে আগ্রহ ছিল। শুনেছিলাম মকর সংক্রান্তিতে বাউলদের এক মেলা বসে জয়দেব-কেন্দুলীতে। কেন্দুলী হচ্ছে বীরভূম জেলায়। পোষাকী নাম কেন্দুবিল্ব। 'পদ্মাবতী চরণ-চারণ চক্রবর্তী' কবি জয়দেবের খাস মোকাম। দুটোর সমাসে নাম পত্তন নতুন করে দাঁড়িয়েছে এসে জয়দেব-কেন্দুলীতে। জয়দেব যাবার বাসনা হল। সে বাসনা তাতিয়ে তুললেন দুই গুণীজন। রাজেশ্বর মিত্র এবং অহিভূষণ মালিক। একজন যদি সুরকার তো অন্যজন তুলিকা-সার। আর গুণ বোঝাই এই দুই ওয়াগনের মধ্যে 'বাফার'-রূপী সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষাকারের এক জ্যান্ত এক্সাম্পল স্বয়ং আমি।

পথ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম না। পানাগড় থেকেই মেলার কদিন বাস চলে। বর্ধমান আর অন্ডাল থেকেও সিধা মেলার বাস ছাড়ে। সুলুক সন্ধান জানা ছিল না। অন্ডালে নেমে ট্রেন বদলিয়ে উখরা স্টেশন থেকে বাস ধরলাম। নামলাম অজয় নদের এপারে। ওপারে জয়দেব। এপারে গ্রাম ওপারে গ্রাম মধ্যখানে চর।

ইস্কুলে যখন পড়তাম এ তখনকার গল্প। ভূগোলের মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'নদ কাহাকে বলে।' একটি ছেলে জবাব দিয়েছিল, 'আজ্ঞে নদীর মতো যাকে দেখতে অথচ নদী নয়, যাহার মধ্যে জলের বদলে থাকে শুধু বালু, তাহাকে।' সেদিন হেসেছিলাম। আজ নদ দেখে বুঝলাম আমার আগাম হাসিটা তার ঠোঁটে গিয়েই উঠেছে। অজয় নামেই নদ। জল বওয়া যেন মহা অপমানের কাজ। কেউ দেখে ফেললেই 'প্রেস্টিজ নট্' হয়ে যাবে। তাই ছিটেফোঁটা জল বালুর পোষাকের নিচে লুকিয়ে রাখবার জন্য সদা সচেষ্ট। মাইল প্রমাণ বালুর বিছানা মাড়িয়ে আমরাও জয়দেবে উঠলাম আর ডিউটি-খতম দেব দিনমণি রাত্রির জিম্মায় আমাদের গছিয়ে দিয়ে ঘরমুখো লম্বা দিলেন।

কোথায় উঠব, কোথায় থাকব কিছু ঠিক ছিল না। পথে শুনলাম, ভয়ভাবনার কিছু নাই। থাকবার স্থানের অভাব নাই। দু তিনতলা বাড়ি আছে। উকিল ব্যারিস্টার, কত বড় বড় বাবুরা এসে থাকেন। ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে। এসে দেখি, হরি হরি কোথায় দোতলা তিনতলা বাড়ি। একটা বড় কোঠা বাড়ি আছে অবশ্যি, কিন্তু তা গদীর মোহান্তের দখলে। অন্যান্য আস্তানা ভাড়া হয়ে গেছে। কলকাতার এক ভদ্রলোক সপরিবারে গিয়েছিলেন। একটা মাঠকোঠার দুটো কামরা নিয়েছেন, ভাড়া ষাট টাকা। বাউল বোষ্টমদের কয়েকটা স্থায়ী আখড়া আছে। কাঙাল ক্ষ্যাপার আখড়ায় যেতেই স্থান মিলে গেল। ঘরের ভেতর বসেছিলেন এক বাউল। একগাল হেসে বললেন, জয়া ক্ষ্যাপার মেলায় এসেছেন, ভয়ভাবনা দূরীভূত করুন। মনের ভেতর আসন পাতুন আনন্দের।

বাউল আনন্দেরই জীবিতরূপ। বাউল-তত্ত্ব বড় চমৎকার। আনন্দই কেবল। আনন্দ ধ্যান, আনন্দ জ্ঞান, আনন্দ শুধু সার। আনন্দ বন্যায় রসের তরীখানা শুধু পারাপার করছে। এই পাথার পারাবারের লক্ষ্যের পারে আছে বাউল তার নৃত্য নিয়ে গীত নিয়ে আর অন্য যে পার সেই অলক্ষ্যে আছেন এক অলখ-রসিক। নানা কর্মে একেবারে চৌকস।

মানব জন্ম রে ভাই তাঁতির তাঁত বোনা।
ভবের মাঝে মানব তাঁতে বুনছে কাপড় একজনা॥
(হরি বলো)
ও ভাই মানব জাতির চোদ্দ পোয়া মাপ
নানা বর্ণের সুতো তাঁতে উঠছে পড়ছে ছাপ
টৌরিকাটায় টেনে ধরে পাপ
ও বাপ বিষনলী দিচ্ছে জোগান (হায় হায় রে)
বাঁটি নেয় তা ছয়জনা॥
আপনারে যে জড়ায়ে সুতো
আবার টানা গেঁথে নানা মারছে রে গুঁতো
দিনে দিনে গুণছে মনমতো
জীব কর্মসূত্রে মাকুর মতো
ওরে করতেছে আনাগোনা॥
ওই তাঁতি আছে তাঁতসালে বসে
ভক্তি দন্তি সাজনি করে বেঁধে মায়াপাশে
ওরে টৌপর নলী টিপছে সাহসে
ও রামচরণ বলে তাঁতি মলে
তখন এ তাঁত চলবে না॥

এই মানব জন্মের মধ্যেই নানা রঙ্গ আছে। প্রতিটি কর্মই রঙ্গঠাসা। এই রঙ্গের রং অঙ্গে মাখো। আর তামাসা-রসে হাবুডুবু খাও। যতদিন দেহ ধরো ততদিন আনন্দ করো। দেহ-তাঁতি ফৌত হলে মৌতাত আর জমবে না। এই তত্ত্বই বোধ করি দেহতত্ত্ব।

ঘুরছিলাম ফিরছিলাম, এই আনন্দের তুফান গায়ে লাগাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম জয়া ক্ষ্যাপার কথা। আঁকিয়ে বন্ধুটি খাতা পেন্সিল নিয়ে বাউলদঙ্গলে জাঁকিয়ে বসেছেন বাউলের ভাবরূপের ছাপ তুলবেন

বিদগ্ধ বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ মশাই, জয়দেব সংবাদ কি বলুন তো? এই ব্যাপার আসর এখানে কেন? বন্ধুটি জবাব দিলেন, বড় গোলমেলে ব্যাপার, সঠিক আর আমি কি বলব বলুন। এ বিষয়ে বিশজন মুনির অন্তত এক কুড়ি মত। কেউ বলেন, জয়দেব মিথিলা ফেরৎ। বিদ্যা-শিক্ষাটি ওখানেই করেছেন। কেউ বলেন, তিনি এখানেই সিদ্ধাই লাভ করেন। আবার কোথাও পাই তাঁকে মহারাজ লক্ষণসেনের সভাকবি রূপে। পুরীরাজসভার হাজরে খাতায় তাঁর নাম প্রেজেণ্ট আছে দেখি।

পূর্ববঙ্গের বাউল

বৌদ্ধ সাধন পদ্ধতি উত্তরকালে নানা খণ্ডিতভাবে ইতরজনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। তন্ত্র ও সহজযান সাধারণতত্ত্বই রাঢ় দেশে বিশেষ করে জনসাধারণের আচরণীয় হয়ে ওঠে। সহজিয়াভাবের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটা কোর্টশিপও তৎকালে হয়। আর তা শেষ পর্যন্ত পাঁটছড়াও বাঁধে। এই বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রধান হলেন নয়জন রসিক। কেন জানিনে জয়দেবও কেমন করে এই নবরসিকদের একজন, শুধু একজন নয় আদিজন বলে কল্কে পেয়ে এসেছেন। সহজিয়ামার্গে আর বাউল সাধনায় মিল অমিল প্রচুর আছে। কিন্তু বর্ডার লাইনে আগল তোলা নেই। এক পা এ ধারে এক পা ও ধারে দিয়ে দিব্য থাকা যায়। এই মেলায় যাঁরা জমায়েত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু একজন ছাড়া বেশীর ভাগই দু দিকে পা দেওয়া।

ওদের মধ্যে ঘুরছিলাম, হেথা হোথা বসছিলাম, গান শুনছিলাম আর টুকটাক জিজ্ঞাসা করছিলাম। প্রকাণ্ড বটগাছের নিচে বাউলদের জমায়েত। নানা স্থান থেকে এসে হাজির হয়েছে। সুদূর ময়মনসিংহ আর এদিকে মানভূম, পাল্লা বড় কম নয়। তবু পথের পাড়ি জমাতে ঠিকে ভুল হয় নি কারো।

কলকাতার চিড়িয়াখানায় একটা ঝিল আছে। শীতকালে উড়ে-আসা পাখীতে সেটা ভরে টইটম্বুর। কোথাকার পাখী না আসে? মানস সরোবর আর সাইবেরিয়া কত দিক দিক থেকে এসে জড়ো হয়। যতক্ষণ দেশে থাকে ততক্ষণ কোন দলটা বা সাইবেরিয়ার কোনটা বা মানস সরোবরের আর কোনটা বা গডুইন অস্টেনের ওপারের। ঝিলে এসেই মিলে মিশে একাকার, জাতবিচারে তালা ঝোলে। এদের মধ্যেও সেই একই ব্যাপার। যতদিন গেরস্থ ছিলে ততদিনই তুমি তাঁতি কি জোলা। কিন্তু যেদিন থেকে আলখাল্লাটি সার করে কাঁথার ঝোলা কাঁধে তুলেছ, যেদিন ঘরের বার হয়েছ সেদিন থেকে তুমি শুধু বাউল। কামার কি কুমোর, নাপিত কি তাঁতি, হিন্দু কি মহম্মদী—তোমার সব লেবেল ঘুচে গেছে। এবার মন থেকে ঘরের চিন্তা ছাড়। ঘরের বাইরে মনকে আনলেই চলবে না, মনের ঘরে গিয়ে ঢুকতে হবে। বাইরে ঘোরাঘুরি কিসের জন্যে? রহস্য রস সবই তো ভেতরে।

ঘরে গেলে নারে মনা, বাইরে ঘোরালে
ঘরে গিয়ে দেখলি নারে মন পাগলা
একতালা খুলিয়া দেখ খোলা আছে নয়তালা।
তালায় তালায় ফুল ফুটেছে
ভ্রমর বেড়ায় মধুর লোভে
জোয়ারে সে ফুল ভেসে যায় গঙ্গা যমুনায়
চব্বিশে এক ছনের ছানি
নিরলে বেন্ধেছে বেণী
দশনম্বরে তার জুড়ে গাঁথুনি তিন তারে টানা
ষোড়শ তালার উপরেতে হংসের বাসা
চারযুগে এক ডিম পাইড়াছে, ডিমেতে কুসুম সোনা
মধাম গেছ কদমতলা সদাই করে নৃত্যলীলা
দ্বিজদাস কয় ওরে পাগলা চেয়ে দেখলি না॥

সত্যি বলতে কি, আমাদের অবস্থা একটু শোচনীয় হয়েই দাঁড়িয়েছিল। আমরা পাকা জহুরী নই যে হাঁ দেখেই আসল নকল চিনে নেব। আমাদের কাছে সব ভুটানীরই ভোঁতা নাক, আসামী করবো কাকে' গোছ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তবে আবার একটা গল্প বলি, শুনুন। একদিন কথা হচ্ছিল, বোঁচা নাক ভুটানীদের সকলেরই এক রকম চেহারা, চেনা বড় মুশকিল। এক বন্ধু বললেন, তা হলে ওরা নিজেদের চেনে কি করে? ভিন্ন করার চিহ্ন একটা কিছু আছে।

সেই চিহ্নই আমরা খুঁজছিলাম। কিন্তু কেশের বাহার বেশের বাহার সকলেরই তো এক। লম্বা চুল, লম্বা দাড়ি। তাই এ পথে একদম আনাড়ি আমরা আর বাছবিচার
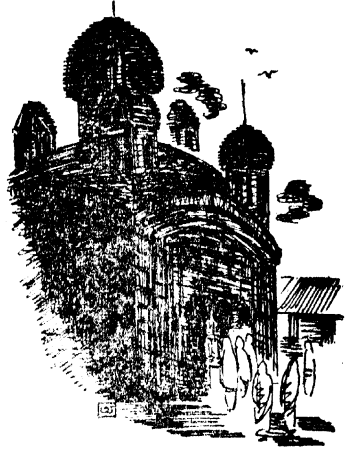
রাধামাধবের মন্দির

করলাম না। একধার থেকে বাউলসঙ্গ করতে শুরু করলাম। যেখানে বাউল দেখি সেখানেই বসে পড়ি। কাঁচ হও কি কাঞ্চন হও আমার কি আসে যায়। কিছু গান শোনাও, ভাল যদি লাগে দুদণ্ড বসব। মওকা পেলে সঙ্গে করে নিয়ে যাব দু একখানা।

একপাশে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ বাউল। এক হাতে গোপীযন্ত্র আর অন্য হাতে ডুগি।

গান শুনতে চাইলাম কথা না বলে ডুগিতে তাল দিতে দিতে গান ধরলেন।

তাল খেয়ে তাল ঠাণ্ডা করো আমার মন
ঐ তালে জুড়ায় রে জীবন
তাল বাল্যকালে ভক্ষণ করে শিশুগণ।
ওরে কাঁচ তাল খেতে ভাল অতি মিষ্ট তাহার জল
বাটির ভেতর হয় তরল অতিশয়
পক্কতা হলে হয় কঠিন
তালের গুণ বলতে নারি তালের রসে নেশা ভারী
মেহরোগের উপকারী সকলেতে কয় বচন।
আবালবৃদ্ধ পুরুষ নারী চিবিয়ে খায় ছোবড়া মাড়ি
আঁটি রাখে যতন করি শাঁসটি খেতে যাদের মন।
ভাই দেখ তালের ডোঙ্গায় জলপথে হয় চলাচল
ওরে গড়ল ডোঙা চিতমাঝারে বুঝে নেরে
কথার ঘোর
নীলকণ্ঠের এই বাণী তাল খেয়ে বেতালে গেলি
(ওরে) দেখবি যদি বনমালী তালবনে কর গমন॥

বীরভূম বৈরাগীর দেশ, ক্ষ্যাপাক্ষেপীর আস্তানা। একা কি জয়া ক্ষ্যাপা? বিল্বমঙ্গল নেই? কেন্দুলীর থেকে কুল্লে এক মাইল হবে কিনা সন্দেহ বিল্বমঙ্গলের সিদ্ধপীঠ। নান্নুর কোথায়? সেও তো এই বীরভূমেই। চণ্ডীদাস ক্ষ্যাপার আপন আখড়া সেখানে। এখানে, এই বীরভূমের ক্ষ্যাপাক্ষেপীর ছড়াছড়ি। জয়দেব মেলাতে ক্ষ্যাপাক্ষেপীরই প্রাধান্য।

মেলাটার দুটোভাগ। একটা পণ্যের, অন্যটা পুণ্যের। পণ্যের দিকটা সচরাচর-দৃষ্ট। মাইলখানেক জায়গা ব্যাপী দোকান। পরিচিত পসরা সাজানো। খাবারের দোকান সুপ্রচুর। মনোহারী, বেলোয়ারী—সব বাইরে থেকে আমদানী। স্থানীয় শিল্প সবই কাঠ আর লোহার। হালের কাঠ, দরজার কাঠামো। এর মধ্যে চমক খেলাম পাল্কীর ঠাঁট দেখে। যাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বাসিন্দা বলে জানি তাকে হঠাৎ জ্যান্ত ঘুরে বেড়াতে দেখলে যে অনুভূতি জাগে, পাল্কী বিক্রি হতে দেখে ঠিক তার সহোদর অনুভূতি নাও যদি টের পেয়ে থাকি, তো যেটা সেদিন অনুভব করলাম সেটা যে ওরই মাসতুতো পিসতুতো তাতে আর ভুল নেই।

পণ্য আর পুণ্যের এই খিচুড়ীশালার রসুইকারটি নিশ্চয়ই কাঁচা। আসিদ্ধ খিচুড়ী থেকে সহজে আলাদা-করা চাল ডালের মতো দুটো দিক মিশ খায় নি।

মকরসংক্রান্তির জোরে স্নান-যোগ। এই দিন এইখানে অজয় নদে স্নান করলে গঙ্গা স্নানের ফল লাভ হয়। কারণ কি? না সেই দিন এইখানে গঙ্গার আবির্ভাব ঘটে। কেন?

জয়দেব কেন্দুলী থেকে রোজ কুড়ি বাইশ ক্রোশ দূরে কাটোয়ায় যেতেন গঙ্গা স্নান করতে। তখন তিনি পুঁথি লিখছেন—গীতগোবিন্দম। কৃষ্ণ আগের রাত্রে রাধিকার কুঞ্জে আসেন নি। রাধিকা ভেবেছেন অন্য কোথাও তিনি রাত্রি যাপন করেছেন তাই অভিমানে

জোড়া বাঁশীতে শুধু একটা সুরই বাজে—"রাধা বোল রাধা বোল"

তাঁর গাত্রদাহ। এ দুর্জয় অভিমান ভাঙাতে কৃষ্ণ রাধিকার পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দেবেন। কিন্তু ইষ্টকে অত হীন করতে ভক্তের মন চাইছে না। শেলাক অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। পাদপূরণ করবেন কি করে? জয়দেব অতিক্লেশে স্নান করতে চলেছেন কাটোয়ার ঘাটে। ভক্তবৎসল ভক্তের এই কষ্ট আর সহ্য করতে পারলেন না। জয়দেবের রূপ ধরে ফিরে এলেন। অসময়ে স্বামীকে ফিরতে দেখে পদ্মাবতী বিস্মিত। প্রভু একী! প্রভু বললেন, শেলাকের পাদপূরণ হয়নি, শেলাকটা মনে পড়তেই ফিরে এলাম। তুমি ভোজনের আয়োজন কর। ভোজনান্তে প্রভু ভেতরে শয়নে গেলেন। স্বামীর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পদ্মাবতী সবেমাত্র মুখে তুলেছেন, এমন সময় স্নাত জয়দেব আগমন করলেন। একী পদ্মাবতী, একী আচরণ তোমার! আমি অভুক্ত আর তুমি খেয়ে চলেছ। পদ্মাবতী হতভম্ব। বললেন, রহস্যটা বোধগম্য হচ্ছে না। আপনি ফিরে এলেন, পাদপূরণ করলেন, ভোজন করলেন, শয়নে গেলেন। আমি তাই প্রসাদ পেতে বসেছি। জয়দেব ততোধিক বিস্মিত, চমৎকৃত। পাদপূরণ করেছি! ছুটে চললেন ঘরে। পুঁথি খুলে দেখেন কি আশ্চর্য। দেহিপদবল্লভমুদারম্। যে পদটি তার মনে মনে ছিল, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছিলেন না, রাধিকারমণ সেটি নিজ হাতে পূরণ করে দিয়ে গেছেন। স্বেচ্ছায় প্রসাদ পেয়ে গেছেন। ছুটে গিয়ে জয়দেব পদ্মাবতীর উচ্ছিষ্ট খেতে বসলেন। পদ্মাবতী বাধা দিতে গেলেন, জয়দেব বললেন, পদ্মা, তুমি অতুল ভাগ্যবতী। তোমার উচ্ছিষ্ট কি, এ-পাতে যদি কুকুরের উচ্ছিষ্ট থাকত তো তাও আমি খেতাম।

যেখানে স্বয়ং নারায়ণ হাজির হতে পারেন, সেখানে গঙ্গা আসবেন, এ আর বেশী কথা কি? গঙ্গা বললেন, বাছা তোমাকে আর কষ্ট করে আমার কাছে যেতে হবে না, আমিই তোমার কাছে আসব। তাই গঙ্গা মকরসংক্রান্তির যোগে উজান বেয়ে আসেন। তাই তিন দিনব্যাপী এখানে অন্ন বিতরণ হয়। সমপংক্তিতে বসে আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল অন্ন গ্রহণ করেন আর চীৎকার করে জানান, সাধু সাবধান, ফের করি অবধান। একজনের সাবধানবাণী সবাই মিলে প্রাপ্তি স্বীকার করেন, সমস্বরে বলে ওঠেন হাঁ—আ—আ।

অনেকেই বললেন, এ আর কি দেখছেন, এতো কিছুই নয়। আগে যা হত। আগে কি হত তা জানবার সুযোগ আমার ঘটেনি। যা দেখলাম তাতেই আমি তৃপ্ত। এই তৃপ্তির ভাব সঙ্গী দুজনের মুখেও লক্ষ্য করলাম।

ফেরবার পথে একজন শুধু বললেন, এলাম বীরভূমে, কিন্তু না দেখলাম একটা বীর, না পেলাম একখণ্ড বীরখণ্ডি। আফসোস শুধু ওইটুকুই।

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

(১৮)

কাশিম রেজভির হিন্দুবিদ্বেষ। "হিন্দুদের একবার দেখে নিতে চাই।" হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্ট রেজভির মতামত জিজ্ঞাসা করে থাকেন। ধর্মোন্মাদ অথচ উদ্ভট ধারণার মানুষ রেজভি। "কংগ্রেসী নেতারা খড়ের তৈরী মানুষ।" চার্লি চ্যাপলিন ও ক্ষুদে পয়গম্বরের সংমিশ্রণ। হায়দরাবাদের আরবদেশীয় সেনাপতি এল এদ্রুস। এল এদ্রুসের অভিযোগ—দুর্বৃত্তদের সাহায্য করছে সীমান্তের ভারতীয় সৈন্য। হিম্মতসিংজীর সুযোগ—হায়দরাবাদ পরিদর্শন করবেন, অনুসন্ধান করতে পারবেন না। এল এদ্রুসের অভিমত—চাপ না দিলে হায়দরাবাদ পাকা ফলের মত ভারতের কোলে ঝরে পড়তো। হায়দরাবাদে গেরিলা পদ্ধতিতে সংঘর্ষের আয়োজন। আবার লায়েক আলি। হায়দরাবাদের বর্তমান আইনসভা বাতিল করা হবে না। গণ-পরিষদের গঠন সম্পর্কে লায়েক আলি। ভোটার তালিকায় মুসলিম সংখ্যা-প্রাধান্য।

লায়েক আলির অভিযোগ—হায়দরাবাদের কংগ্রেস অসহযোগিতা করছেন। 'হায়দরাবাদ কংগ্রেসই জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান নয়'। রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাব সম্বন্ধে লায়েক আলি। 'ভারত গবর্ণমেণ্ট একানব্বইটি ক্ষমতা চাইছেন'। ভারত-হায়দরাবাদ বিশেষ-সন্ধির কথা। ভারতের চাপ, মুন্সীর ক্রিয়াকলাপ ও মুসলিম মনের প্রতিক্রিয়া। মুন্সীর প্রচারিত মুক্তিদিবসের তারিখ। নিজামের নির্ভীকতা সম্বন্ধে লায়েক আলি। রেজভির সমর্থনে লায়েক আলির ওকালতী। 'জাতির চাপে সুপুরির মত অবস্থা'। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়—দক্ষিণ ভারতে মুসলিম সংস্কৃতি প্রসারের আশা। প্রিন্স অব বেরারের সংগে সাক্ষাৎ। কূর্ণিশবিশারদ প্রাইভেট সেক্রেটারী সমদার ইয়ার জংগ। 'মাউণ্টব্যাটেনও ঠিক জাঁহাপনার গুণগুলিই পেয়েছেন।'

প্রিন্স অব বেরারের দাঁতের চিন্তা। হায়দরাবাদের তথ্যপ্রচার বিভাগে চতুর ইংরাজ সাংবাদিক। কম্যুনিষ্ট হাংগামার সাম্প্রদায়িক রূপ। এল এদ্রুসের কাছ থেকে নতুন তথ্য। "নিজাম দিল্লী গেলে তাঁকে ধরে রাখা হতো।" যুদ্ধ বাধলে হায়দরাবাদ দক্ষিণ ভারতকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। সন্ধি প্রসংগে এল এদ্রুস। "এর বেশি আর কি আশা করেন ভারত?" "ভারত বাড়াবাড়ি করলে হায়দরাবাদ ভাল করেই বাধা দেবে।" শাহ মঞ্জিলে ভোজসভা। হাদয়রাবাদ পুলিশের বড়কর্তা দীন ইয়ার জংগ। নিজামের গদির পিছনে আসল ক্ষমতার স্তম্ভ। ইত্তেহাদী বিক্ষোভের প্রচ্ছন্ন সমর্থক দীন ইয়ার জংগ। ভোজসভায় একটি অভিজ্ঞতা। বিদ্বেষের রূপ তেমন উগ্র নয়। উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে সৌভাগ্যের পার্থক্য।

হায়দরাবাদের উপদ্রুত অঞ্চল। ব্রিগেডিয়ার হবিব আহমদ ও সামরিক ব্যবস্থা। সীমান্ত অঞ্চলের রুদ্ধ সড়ক। আতঙ্কিত গ্রামবাসী গ্রাম বর্জন করেছে। **'দেশীয় পদ্ধতি'তে পুল ধ্বংস করার চেষ্টা।** শুল্ক অফিসগুলির **উপর একচল্লিশবার আক্রমণ। আক্রান্ত** 'আবগারী গাছ'। কম্যুনিষ্টচালিত গন্দের দল কর্তৃক নিশ্চিহ্নভাবে ভস্মীভূত গ্রাম। একটি ভৌগোলিক সমস্যা **ও শাসনকার্যের অসুবিধা। 'জ্বলন্ত আকাশপথে'** চারশত মাইল। অদ্ভুত **একটি চায়ের আসর। উত্তপ্ত পরিবেশ।** কংগ্রেসী নেতা ও মজলিসী নেতার **কথা কাটাকাটি। হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কংগ্রেসীদের আনুগত্য সম্পর্কে মন্তব্য। হায়দরাবাদে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে পাল্টা মন্তব্য।**

হায়দরাবাদ, রবিবার, **১৬ই মে, ১৯৪৮** সাল। কাশিম রেজভির ধারণা, আর দু বছর পরে ভারত নামে কোন রাষ্ট্র থাকবে না। সুতরাং যুক্তি ও মীমাংসার দাবী করে হায়দরাবাদকে বিড়ম্বিত করবার কোন সুযোগও ভারত পাবে না। রেজভি বললেন, ভারতের সংগে হায়দরাবাদের বিরোধ এমনই এক সমস্যা হয়ে উঠেছে যার শান্তিপূর্ণ কোন সমাধান একেবারেই সম্ভবপর নয় এবং সমাধানের আশাও তিনি পোষণ করেন না।

হিন্দুদের কথা উঠতেই রেজভির মনের আর এক দিকের পরিচয় পেয়ে গেলাম। হিন্দুদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি উগ্র জাতিবিদ্বেষে পরিপূর্ণ নানারকম মন্তব্য করলেন। রেজভি বললেন, হিন্দুরা যে কি চরিত্রের মানুষ সেটা গান্ধীর হত্যাতেই প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুরা চিরকাল তাদের দেবতাকে অতি-দেবতা ক'রে তুলবার জন্যই হত্যা করেছে।

আমি প্রশ্ন করলাম, বর্তমানে হায়দরাবাদে যে কম্যুনিষ্ট দল কাজ করছে, তাদের অধিকাংশই কি হিন্দু নয়?

রেজভি বললেন,—হ্যাঁ, এ কথা সত্য। কিন্তু অন্যান্য দলের তুলনায় কম্যুনিষ্টদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ভাব কম।

জিজ্ঞাসা করলাম—একথা কি ঠিক যে, আপনিই হায়দরাবাদের প্রকৃত 'শক্তিমান' ব্যক্তি? চারদিকে তো এই ধরণেরই অভিমত শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এ বিষয়ে আপনার অভিমত জানতে চাই।

রেজভি উত্তর দিলেন—ওসব কথা কখনই বিশ্বাস করবেন না। আমার সম্বন্ধে চারদিকে এই নিন্দা প্রচার করা হয়েছে যে, আমিই হলাম হায়দরাবাদের আসল ব্যক্তি, আমারই হাতে সব ব্যাপারের চাবি কাঠি রয়েছে এবং আমিই নাকি আড়ালে থেকে আমার ইচ্ছামত হায়দরাবাদের গবর্ণমেণ্ট ভাঙছি আর গড়ছি। এ সব প্রচারিত নিন্দাবাদ সম্পূর্ণ অমূলক, আমি এখানে একজন নগণ্য ব্যক্তি মাত্র। আমি শুধু একজন মুসলিমসেবক, মুসলিমের স্বার্থ-রক্ষাই আমার একমাত্র ব্রত এবং কারও সাধ্য নাই যে আমাকে আমার এই ব্রত হতে নিবৃত্ত করতে পারে। হ্যাঁ, হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্ট অবশ্য মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে আমার মতামত জিজ্ঞাসা করেন এবং আমিও অকপটভাবে ও স্পষ্ট করে আমার মতামত জানিয়ে দিই।

রেজভি বললেন, মুসলিমের প্রাণ এবং মুসলিম নারীর সম্মান রক্ষা করার জন্য তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছেন। তাঁর মতে, হায়দরাবাদে কংগ্রেসের যেসব নেতা ও প্রতিনিধি রয়েছে, তারা কতগুলি খড়ের তৈরী দুর্বল মানুষ মাত্র।

হেসে ফেললেন রেজভি। এতক্ষণ ধরে কথাবার্তার মধ্যে এই প্রথম হাসলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন—হিন্দুদের আমি একবার দেখে নিতে চাই।

বুঝলাম, রেজভি একজন সম্পূর্ণ ধর্মোন্মাদ ব্যক্তি। তাঁর দু চোখের দৃষ্টি যেন সূচীমুখের মত তীক্ষ্ম। যার দিকে তাকান তার দেহে যেন এই দৃষ্টি বিঁধতে থাকে। শত্রু-মিত্র উভয়কেই সন্ত্রস্ত করে তোলার মতই রেজভির চোখের দৃষ্টি, কিন্তু একটি কারণে রেজভির এই ত্রাস-সঞ্চারকারী ব্যক্তিত্বের জোর তেমন করে সফল হয়ে উঠতে পারে না। রেজভির কথাবার্তায় সহজেই এটা ধরা পড়ে যায় যে, লোকটির প্রকৃতিতে একটা উদ্ভট কিছু রয়েছে। মেজাজ চড়িয়ে যখনই কথা বলেন, তখনই বুঝা যায় যে, আজগুবি ও অবাস্তব কতগুলি ধারণায় এই লোকটির মন ভরে রয়েছে। তখন লোকটিকে নিতান্ত হুজুগবাজ বলে ধারণা না করে পারা যায় না এবং তাঁর কথাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করার মত বস্তু বলেও মনে হয় না। বরং মনে হয়, মানসিক ব্যাধির মত একটা ক্ষমতাবোধের মোহ লোকটির মন আচ্ছন্ন করে রয়েছে। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে রেজভির ধারণা বাস্তবতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

চেহারা ছিপছিপে, আচরণে ছটফটে, চোয়াল ও চিবুক থেকে একগুচ্ছ দাড়ি ঝুলছে এবং মাথার ওপর বেঁকিয়ে বসানো একটি ফেজ—এ হেন মূর্তিতে কাশিম রেজভি যখন দ্রুতপদে হেঁটে চলে গেলেন, তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো যে, চার্লি চ্যাপলিনে ও এক ক্ষুদে পয়গম্বরে মিলিয়ে তৈরী একটি মূর্তি চলে যাচ্ছেন।

রেজভি-পর্ব শেষ হলো। এর পর দেখা হলো হায়দরাবাদ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল এল এদ্রুসের সঙ্গে। জাতিতে এল এদ্রুস হলেন হাশেমী আরব। দীর্ঘাকৃতি ও সুন্দর চেহারার এল এদ্রুস অফিসার হিসাবেও বেশ যোগ্য বলেই আমার ধারণা। মাউণ্টব্যাটেনের অধিনায়কতায় পরিচালিত বর্মা-যুদ্ধে তিনি কাজ করেছিলেন। মাউণ্টব্যাটেন সম্পর্কে এল এদ্রুস অত্যুচ্চ শ্রদ্ধাও পোষণ করেন।

এল এদ্রুস বললেন যে, শোলাপুর অঞ্চলে (হায়দরাবাদ সীমানার বাইরে) কিছু কিছু হাঙ্গামা হয়েছে এবং ভারতীয় সৈন্য স্থানীয় দুর্বৃত্তদের সীমানা পার হয়ে হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকতে সাহায্য করছে। এল এদ্রুস আর একটি অভিযোগ করলেন—ভারতীয় বিমান পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে হায়দরাবাদের আকাশে অনেকবার চক্কর দিয়ে গেছে। তিনি বললেন যে, এ ঘটনার কথা তিনি বুশার ও এলমহার্স্টের কাছে পত্র লিখে জানাবেন। অবশ্য সরকারীভাবে নয়, 'প্রাইভেট' পত্র দেবেন এল এদ্রুস। অর্ডিন্যান্স প্রসঙ্গেও কয়েকটি কথা তিনি বললেন।

"হিম্মতসিংজীকে (দেশীয় রাজ্যের ফৌজ সম্বন্ধে ভারতীয় বাহিনীর উপদেষ্টা) আমি পরিষ্কার সুযোগ দিয়েছি। তিনি এসে স্বচক্ষে সব ব্যাপার এখানে দেখে যেতে পারেন"—এল এদ্রুস মন্তব্য করলেন। তাঁর কাছ থেকেই আরও জানতে পেলাম যে, হিম্মতসিংজী এসেছিলেন এবং স্বচক্ষেই সব দেখে নিয়ে চলে গেছেন। এল এদ্রুস বললেন, হিম্মতসিংজীর সন্দেহ মিটে গেছে এবং তিনি খুশী হয়েছেন বলেই তাঁর ধারণা।

প্রসঙ্গক্রমে এল এদ্রুসের কাছ থেকে এই তথ্যটুকুও জানবার সুযোগ পেলাম যে, হিম্মতসিংজী এসে শুধু পরিদর্শন করেই ফিরে গেলেন, অনুসন্ধান করবার কোন সুযোগ তাঁকে অবশ্য দেওয়া হয়নি।

ভারত ও হায়দরাবাদ, উভয় পক্ষের মনে এখন যে তীব্র সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, সে সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন সেনাপতি এল এদ্রুস। তিনি বললেন—'আমি এটা বুঝতে পারি না, ভারত গবর্ণমেণ্ট কেন এ রকম কঠিন চাপ দিচ্ছেন?'

আমি বললাম—'একটা বিষয়ে আপনার বুঝে দেখা উচিত যে, দেশ খণ্ডিত হয়ে একটা অংশ পাকিস্থানে পরিণত হবার পর ভারত ইউনিয়নের শাসনকার্যের জন্য একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করার খুবই প্রয়োজন হয়েছে।'

এল এদ্রুস বললেন—তাঁরা (ভারত) কি ভুলে গেছেন যে, পাকিস্থান তাঁদেরই নিজের হাতের সৃষ্টি? এটাও কি তাঁরা বুঝতে পারেন না যে, চাপ দিতে গিয়ে, তাঁরা এই হায়দরাবাদেও একটা সংকট এবং মুসলিম ধর্মোন্মাদ জাগিয়ে তুলছেন?

এল এদ্রুস আরও বললেন—'ভারত যদি মুন্সীকে এখানে পাঠিয়ে চাপ দেবার পন্থা গ্রহণ না করতেন, তবে আমার মতে, হায়দরাবাদ এতদিনে পাকা কুলের মত ভারতের কোলে ঝরে পড়তো।

এল এদ্রুস জানালেন, কিন্তু এখন অবস্থা খুবই খারাপের দিকে চলেছে। গেরিলা পদ্ধতিতে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের আয়োজন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে।

আমি বললাম, কিছুক্ষণ আগেই রেজভির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। রেজভি সম্পর্কে একটি মন্তব্যও আমি করলাম—'রেজভির নাম শুনে তাঁকে লম্বা-চওড়া চেহারার মানুষ বলেই আমার ধারণা হয়েছিল, কিন্তু দেখলাম যে, তিনি নিতান্ত ছোটখাট চেহারার মানুষ।'

অতিকায় এল এদ্রুস হেসে ফেললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করলেন—'ছোটখাট চেহারার মানুষেরাই ভয়ানক হয়ে থাকে।'

জেনারেল এল এদ্রুসের সঙ্গে আলাপ সমাপ্ত হবার পর আমি আবার প্রধান মন্ত্রী লায়েক আলির কাছে উপস্থিত হলাম। দুজনে এক টেবিলেই মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিলাম এবং দু ঘণ্টার ওপর দুজনের মধ্যে আলোচনাও হলো।

লায়েক আলি বললেন যে, তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন গবর্ণমেণ্ট গঠনের পরিকল্পনা করছেন। আপাততঃ তিনি অবশ্য বর্তমান আইনসভা বাতিল করে দিতে পারবেন না, কিন্তু গণ-পরিষদ গঠন করার জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তিত করবার ইচ্ছা তাঁর আছে। বর্তমান আইনসভা থাকবে এবং নতুন গণ-পরিষদও গঠিত হবে, এই রকম কল্পনা তিনি করেছেন। তিনি বললেন, হায়দরাবাদের সকল দলের সঙ্গেই তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নির্বাচনের পদ্ধতি নির্ণয়ের ভার তিনি রাজনৈতিক দলগুলির ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। রাজনৈতিক দলগুলি যে পদ্ধতি পছন্দ করবেন, লায়েক আলিও সেই পদ্ধতি স্বীকার করে নেবেন। বর্তমানে যে ভোটার তালিকা আছে, ইচ্ছে করলে রাজনৈতিক দলগুলি সেই তালিকাই রাখতে পারেন। অন্যথা, নতুন করে ভোটার তালিকাও প্রস্তুত করা যেতে পারে।

আমি জানি, বর্তমানে যে ভোটার তালিকা রয়েছে, সেটা বস্তুতঃ মুসলিম সম্প্রদায়কেই অতিরিক্ত সংখ্যাপ্রাধান্য দিয়ে রচিত একটি তালিকা; যাই হোক, লায়েক আলির নতুন অভিমত শুনলাম। তিনি আরও বললেন, তাঁর মতে, নতুন ভোটার

তালিকা প্রস্তুত করতে এবং নির্বাচনের অনুষ্ঠানও সমাপ্ত করতে দেড় বছরেরও কম সময় লাগবে।

প্রায় দু'বছর হলো হায়দরাবাদে আইন সভা স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু কংগ্রেস প্রথম থেকেই এই আইনসভাকে বয়কট করেছে এবং এখনো সেই বয়কট চলছে। লায়েক আলি বললেন, কংগ্রেসের এই ধরণের অসহযোগিতা তাঁকে একটা ধাঁধার মধ্যে ফেলেছে। জনসাধারণের সমর্থনে গবর্ণমেণ্ট গঠন করতে হলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার যে বুনিয়াদ তৈরী করতে হবে, তাতে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ করারই প্রয়োজন ছিল; কিন্তু কাজের দিক দিয়ে কংগ্রেস কোন সহযোগিতা করলেন না। প্রতিনিধিত্বমূলক গবর্ণমেণ্ট চাই, কংগ্রেস শুধু কথার জোরে এই দাবী করা ছাড়া আর কোনভাবে সাহায্য করছেন না। লায়েক আলি বললেন, অগত্যা কংগ্রেসের অসহযোগিতা সত্ত্বেও নিজের উদ্যোগে জন-প্রতিনিধিত্বমূলক গবর্ণমেণ্ট গঠনের উপায় তাকে খুঁজতে হচ্ছে। হায়দরাবাদের কংগ্রেস সম্পর্কেও লায়েক আলি তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন। হায়দরাবাদের কংগ্রেসই কি যথার্থ জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান? লায়েক আলি বললেন, ভারতের অন্যান্য স্থানের কংগ্রেস যেমন সাধারণের নির্বাচনের দ্বারা গঠিত, হায়দরাবাদের কংগ্রেস মোটেই সেরকম প্রতিষ্ঠান নয়। বয়কট নীতি গ্রহণের পূর্বে হায়দরাবাদের কংগ্রেসই সাধারণ সদস্যদের নির্বাচনের দ্বারা প্রতি-নিধিত্ব অর্জন করে যথার্থ জনপ্রতিষ্ঠান-রূপে নিজেকে গঠিত করেনি। লায়েক আলি বললেন, তিনি সকল রাজনৈতিক দলের অভিমত জানবার ও বুঝবার অপেক্ষায় রয়েছেন এবং আশা করছেন যে, এই মাসের শেষ দিকেই এবিষয়ে সরকারী নীতি ঘোষণা করতে পারবেন।

হায়দরাবাদের রাষ্ট্রভুক্তির প্রসঙ্গে লায়েক আলি ঠিক মোইন নওয়াজ জঙ্গেরই অভিমতের অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করলেন। এ রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাব ভারতকে মাত্র তিনটি বিষয়ে ক্ষমতা ছেড়ে দেবার প্রস্তাব বস্তুতঃ নয়। লায়েক আলি বললেন—ভারতের সংবিধানে ঘোষিত নির্দেশগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে বিবেচনা করলে বুঝা যায় যে, তিনটি ক্ষমতার নাম করে ভারত গবর্ণমেণ্ট দেশীয় রাজ্যগুলিতে পুরোপুরি একানব্বইটি বিভিন্ন ধরণের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার চাইছেন। এর ফলে হায়দরাবাদের অভ্যন্তরীণ আত্মকর্তৃত্বের অস্তিত্বই সম্পূর্ণভাবে মুছে যাবে।

লায়েক আলির ইচ্ছা, ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদের একটা বিশেষ 'সন্ধি' হোক। হায়দরাবাদ এ ধরণের সন্ধি একমাত্র ভারতের সঙ্গেই করবেন, অন্য কোন দেশের সঙ্গে নয়। সন্ধিতে স্বীকৃত হবে যে, ভারত ও হায়দরাবাদ একই পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করবে। তা ছাড়া, দেশরক্ষা সম্বন্ধেও একটা 'চুক্তি' এই সন্ধিরই অন্তর্ভুক্ত করা হবে। হায়দরাবাদ পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত একটি বাহিনী রাখবেন, এর মধ্যে দশ হাজার সৈন্য ভারত ইউনিয়নের পরিচালনাধীনে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর একটি বিষয় হলো, হায়দরা-বাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর ভারত ইউনিয়নের অধিকার। লায়েক আলি বললেন, এবিষয়েও ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে একটা চুক্তি সম্পাদন করতে বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না।

হায়দরাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ভারত গবর্ণমেণ্ট যেরকম ব্যস্ততা দেখাচ্ছেন এবং ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলবার জন্য যে চাপ দিচ্ছেন, তাতে হায়দরাবাদে মুসলিম সমাজের মন খুবই বিক্ষিপ্ত ও বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে। মুন্সীর বিরুদ্ধে অনেক কথা বললেন লায়েক আলি। মুন্সী প্রকাশ্যভাবেই এই কথা বলে বেড়াচ্ছেন যে, এই হায়দরাবাদ রাজ্য আজ যেখানে অবস্থিত, অতীতে সেখানে একটি হিন্দু রাজ্য অবস্থিত ছিল। মুন্সী এখানে শুধু কংগ্রেসী বন্ধুবর্গের সঙ্গে মেলামেশা করেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে আলোচনায় আসন্ন এক 'মুক্তিদিবসের' কথা বলে থাকেন। মুক্তিদিবসের এক একটি তারিখও প্রায়ই ঘোষণা করেন মুন্সী। প্রথমে বলেছিলেন, ১০ই মার্চ তারিখে হায়দরা-বাদের 'মুক্তি' হবে। তারপরে বললেন, মার্চ মাসেই 'মুক্তিদিবস' দেখা দেবে। এর পর ২৩শে এপ্রিল তারিখ নির্দিষ্ট করলেন। এইভাবে মুক্তিদিবসের নানা তারিখ প্রচার করতে করতে মুন্সী নিজেকেই এমন লঘু করে ফেললেন যে, হিন্দুরাও তাঁর কথা আর বিশ্বাস করতে পারলেন না। অগত্যা মুক্তিদিবসের তারিখ ঘোষণার অভ্যাস ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন মুন্সী।

আমি এইবার নিজামের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। আমি বললাম, নিজাম যেভাবে অদৃষ্টের ওপর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে বসে রয়েছেন, সেটা আমার খুবই খারাপ লেগেছে। সমস্যার সমাধান যদি করতে হয়, তবে অদৃষ্টবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আরও কিছু তাঁকে করতে হবে।

লায়েক আলি বললেন—'একটা বিষয় আপনি বুঝে রাখুন যে, নিজাম বরং বুক এগিয়ে দিয়ে এবং গুলীর আঘাত বরণ করে নিয়ে মৃত্যু স্বীকার করবেন, তবুও তিনি এমন কোন কাজ করতে রাজী হবেন না, যার ফলে তাঁর প্রজার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে।

অতিমান্য নিজামের নির্ভীকতা সম্বন্ধে আমি অবশ্য কোন প্রশ্ন উত্থাপন করলাম না, কিন্তু একটি কথা আমি বিশেষ স্পষ্ট করেই লায়েক আলিকে জানিয়ে দিলাম। সমস্যার সমাধান যদি না হয় এবং ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে যদি সংঘর্ষই দেখা দেয়, তবে সবচেয়ে বেশি দুঃখ ও দুর্ভোগের মধ্যে যাদের পড়তে হবে, তারা হলো নিজাম বাহাদুরেরই সাধারণ প্রজা, তথা হায়দরাবাদের জনসাধারণ।

কাশিম রেজভির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ এবং আলোচনার কথাও লায়েক আলিকে বললাম। আলোচনার ফলে আমার কি ধারণা হয়েছে, সেবিষয়েও বললাম। প্রশ্ন করলাম, রেজভির এইসব মন্তব্যের অর্থ কি? এ সম্বন্ধে আপনি কি ধারণা করছেন?

লায়েক আলি বললেন, রেজভি সম্ভবতঃ এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে, যদি নিজাম অথবা হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের চাপে ভেঙে পড়েন, তবে শেষ উপায় হিসাবে তিনি কম্যুনিষ্ট-দের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধের সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

আমি উত্তর দিলাম—কিন্তু রেজভির কথা থেকে তাঁর এরকম কোন নীতি বা উদ্দেশ্য প্রমাণিত হয় না।

এইবার আমি আমার বক্তব্য স্পষ্ট করেই লায়েক আলিকে শুনিয়ে দিলাম। রেজভিকে সামলাতে হবে। যদি আর বেশী দিন রেজভিকে এইভাবে অবাধে তাঁর ইচ্ছামত আন্দোলন করবার সুযোগ দেওয়া চলতে থাকে, তবে নিজাম এবং তাঁর গবর্ণমেণ্ট, উভয়েরই সেই অবস্থা লাভ করতে হবে, জাঁতির চাপে সুপুরির যে অবস্থা হয়।

লায়েক আলি পর্ব এখানে শেষ হলো। তাঁর সঙ্গে আমার এই আলো-চনারও কোন ফল হয়েছে কিনা সন্দেহ। হায়দরাবাদে প্রতিনিধিত্বশীল গবর্ণমেণ্ট স্থাপনের, অথবা রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে এর আগে লায়েক আলি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আজও হুবহু সেই অভিমত এবং সেই মনোভাব প্রতি-ধ্বনিত করলেন। আলোচনার ফলে আমরা কিছু বা বিশেষ কিছু 'অগ্রসর' হয়েছি বলে মনে করতে পারি না।

আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্বও সমাপ্ত হয়েছে। এর পর ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে রওনা হলাম।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে মোইন নওয়াজ জঙ্গেরই কীর্তির সাক্ষ্য। এই কৃতিত্বের জন্য গর্ব বোধ করতে পারেন মোইন, বিশেষ প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। মোসলেম এবং হিন্দু স্থাপত্যের রীতি এক সঙ্গে মিলিয়ে এই ভবন প্রতিষ্ঠায় সত্যি সত্যিই এক সাংস্কৃতিক দুঃসাহসের প্রমাণ দিয়েছেন মোইন। এখনো এ ভবনের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু যেটুকু নির্মিত হয়েছে, তাতে এটা যথেষ্ট স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, দক্ষিণ ভারতে মুসলিম সংস্কৃতি প্রসারের এক বিরাট আশার নিদর্শন হিসাবে এই প্রতিষ্ঠান ও ভবন গড়ে উঠছে।

নিজামের উত্তরাধিকারী হলেন প্রিন্স অব বেরার। বিকেল হতেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। পিতা নিজাম যে ধরণের ভবনে বাস করেন, পুত্র থাকেন তার চেয়ে অনেক বেশি জাঁকজমকে পরিপূর্ণ এক ভবনে। প্রিন্স অব বেরারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখলাম যে, সেখানে জেনারেল এল-এদরুসও রয়েছেন। আর আছেন, প্রিন্সের প্রাইভেট সেক্রেটারী সমদার ইয়ার জঙ্গ। গলার স্বর কর্কশ এবং আচরণে সাধারণ ভৃত্যের মত একটা বাধ্যতার ভাব, প্রাইভেট সেক্রেটারী সমদার হিজ হাইনেস দি প্রিন্স অব বেরারের প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে সঙ্গে কুর্নিশ করে যেন ভেঙে পড়ছিলেন।

মাউণ্টব্যাটেনের অত্যুচ্চ যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা সম্পর্কে প্রিন্সের সঙ্গে আমার আলোচনা হলো। এখানে একটা মজার ব্যাপারও হয়ে গেল। প্রিন্স অব বেরার, সেনাপতি এল-এদরুস এবং আমি—সকলেই অকুণ্ঠভাবে মাউণ্টব্যাটেনের প্রশংসা করছিলাম। সকলেরই অভিমত এই যে, মাউণ্টব্যাটেন নিঃসন্দেহেই অত্যুচ্চ কর্মোৎসাহ এবং দৃঢ় সংকল্পের মানুষ।

এই কথা শোনা মাত্র প্রাইভেট সেক্রেটারী সমদার ইয়ার জঙ্গ যেন প্রিন্সের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তার সঙ্গে নিজের মন্তব্য জুড়ে দিয়ে বললেন—ঠিক কথাই বলেছেন জাঁহাপনা। মাউণ্টব্যাটেনও ঠিক আপনারই গুণগুলি পেয়েছেন।,

প্রিন্স অব বেরারের সঙ্গে নানারকম আলাপ ও গল্প হলো। বেশির ভাগই সাধারণ বিষয়। প্রিন্স বললেন—'এখনো চেষ্টা করলে মাউণ্টব্যাটেন হায়দরাবাদে আসতে পারেন এবং আসবেন বলেই আমি আশা করি।' কুর্নিশবিশারদ প্রাইভেট সেক্রেটারীও এই আশা প্রকাশ করলেন যে, 'ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্কে উন্নতি হোক, এই ইচ্ছাই আমরা পোষণ করি।'

হায়দরাবাদ, রবিবার, ১৬ই মে, ১৯৪৮ সাল। প্রিন্স অব বেরারকে দেখে মনে হলো না যে, হায়দরাবাদের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন চিন্তা বা দুশ্চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে আছে। শুধু একটি বিষয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হলো—তাঁর দাঁত আর গলা সম্বন্ধে। প্রিন্স বললেন, হয় তাঁর দাঁতের জন্য গলা কষ্ট পাচ্ছে, নয় গলার জন্য দাঁত খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, দাঁত অথবা গলা
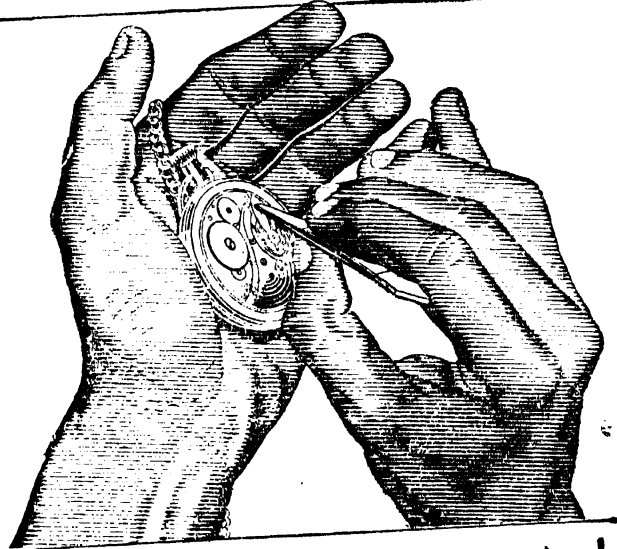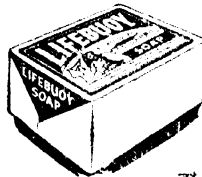
এই দুয়ের মধ্যে যে-কেউ দোষী হোক না কেন, আগামী জুন মাসের শেষে একবার লণ্ডনে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবার ইচ্ছা তাঁর আছে। প্রিন্স বললেন—'কিন্তু এখন লণ্ডনে যাবার অনুমতি পেতে আমাকে কতগুলি বাধা ও অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে' (এর অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, নিজাম আপত্তি করেছেন)।

প্রিন্স অব বেরারের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় পেলাম, তাতে এটা বুঝতে পারলাম যে, হায়দরাবাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার আগে-পাছে এ ধরণের মানুষ থাকতে পারেন না এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এহেন ব্যক্তির কোন গুরুত্বও নেই। লায়েক আলি আমাকে একবার বলেছিলেন যে, হিজ হাইনেস শুধু সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটিয়ে যেতে ভালবাসেন। লায়েক আলি হলেন প্রিন্সের ছেলেবেলার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুতরাং এটাও ধরে নিতে পারা যায় যে, প্রিন্স যখন হায়দরাবাদের গদিতে বসবেন, তখন লায়েক আলির প্রধান মন্ত্রিত্বেরও কোন ব্যতিক্রম হবে না। লায়েক আলির রাজনৈতিক গুরুত্ব ভবিষ্যতেও অক্ষুণ্ণ থাকবে বলেই মনে হয়।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় মিঃ ক্লড স্কটের সঙ্গে দেখা করলাম। স্কট এখানে গত পাঁচ মাস যাবৎ হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্টের তথ্যবিভাগের অধ্যক্ষরূপে (ডিরেক্টর অব ইনফরমেশন) কাজ করছেন। গত আগষ্ট মাসে বোম্বাইয়ে স্কটের সঙ্গে আমার একবার দেখা হয়েছিল। তখন তিনি টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সহ-সম্পাদক ছিলেন। স্কটের মত তুখোড় চতুর সাংবাদিককে পেয়ে হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্ট সংবাদ প্রচারের বিভাগীয় ব্যবস্থা যে বেশ পোক্ত করে ফেলেছেন, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

স্কট বললেন, তাঁর মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় নেই যে, নিজামই এখনো হায়দরাবাদের সর্বেশ্বর। রেজভির এমন কোন শক্তি নেই যে, হায়দরাবাদের মুসলিম জনসাধারণকে নিজামের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারেন। নিজামের প্রতি মুসলমানের আনুগত্য দুর্বল করে দেওয়া রেজভির সাধ্য নয়। স্কট জানালেন, দক্ষিণাঞ্চলে কম্যুনিষ্টদের উদ্যোগে পরিচালিত হাঙ্গামা এখন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার রূপ গ্রহণ করেছে। কম্যুনিষ্ট হাঙ্গামাকারীর দল অনেক গ্রাম আক্রমণ করেছে, কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, হিন্দুদের গ্রামগুলি তারা স্পর্শ করেনি।

সন্ধ্যার শেষ দিকে, সাড়ে সাতটার সময় আর একবার আলোচনার জন্য জেনারেল এল এদ্রুসের ভবনে গেলাম। নিজাম কেন দিল্লীতে যেতে রাজী হননি, সে সম্বন্ধে এল এদ্রুসের মুখ থেকেই নতুন কতগুলি তথ্য জানবার ও শুনবার সুযোগ পেলাম। এল এদ্রুস বললেন, নিজামের দিল্লী না-যাওয়ার একটি কারণ এই যে, গেলে তিনি আর ফিরে আসতে পারতেন না। দিল্লীতে নিজামকে ধরে রাখা হবে, এই ভয় ছিল।

সামরিক ব্যাপারে হায়দরাবাদ রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা করলেন এল এদ্রুস। তিনি বললেন, এদিক দিয়ে হায়দরাবাদের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে এবং সুবিধাও আছে। —'হ্যাঁ, অস্ত্রবলে ও সৈন্যবলে হায়দরাবাদের বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর তুলনায় দুর্বল বটে, কিন্তু ভারতের সঙ্গে যদি সামরিক সংঘর্ষ বাধে, তবে আমরা দক্ষিণ ভারতকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারি এবং করে ফেলবো'। এই মন্তব্য করার পর এল এদ্রুস রাজনৈতিক বিষয়েও মন্তব্য করলেন। "যদি রাজনৈতিক নেতারা গোলমাল এবং আপত্তি না করে ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদকে একটা সন্ধি স্থাপন করবার সুযোগ দিতে সম্মত হন, তবে বিরোধের অবসান হতে পারে। সন্ধিসূত্রের মধ্যেই এই চুক্তি সহজেই হতে পারে যে, হায়দরাবাদের বৈদেশিক সম্পর্ক এবং দেশরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর ভারতের নিয়ন্ত্রণাধিকার থাকবে।

"এর বেশি আর কি আশা করেন ভারত?"—প্রশ্ন করলেন এল এদ্রুস। শেষ পর্যন্ত এই কথাও জানিয়ে দিলেন সেনাপতি এল এদ্রুস—'যদি ভারত এর চেয়ে বেশি কিছু দাবী করেন এবং তার জন্য চাপ দিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করেন, তবে কোনই সন্দেহ নেই যে, আমরা ভাল করেই বাধা দেব।'

এল এদ্রুস যা বললেন, স্কটও তাই বলেছেন। এ বিষয়ে উভয়েরই অভিমতে কোন পার্থক্য দেখলাম না।

ফিরে এলাম 'শাহ মঞ্জিলে', লায়েক আলির বাসভবনে। আমাকে সম্বর্ধনা জানাবার উপলক্ষ্যে এখানে এক ভোজসভা আহ্বান করা হয়েছে। প্রায় আশি জন অতিথি নিমন্ত্রিত হয়েছেন। অতিথিদের মধ্যে হায়দরাবাদের প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিবর্গ আছেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে অত বেশি সংখ্যক লোকের সঙ্গে আলাপ করার ফল যা হয়, তাই হয়েছে। লোকের কথাবার্তা থেকে অবস্থা সম্বন্ধে সমগ্রভাবে একটা ধারণা লাভ করতে পারছি না।

আলাপ হলো দীন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে। অল্পভাষী, পক্বকেশ ও ভারিক্কি চেহারার দীন ইয়ার জঙ্গ হলেন হায়দরাবাদ পুলিশের বড়কর্তা। অনেকের ধারণা, হায়দরাবাদের গদির পিছনে এই ব্যক্তিই হলেন আসল ক্ষমতার স্তম্ভ। স্কট আমাকে বলেছেন যে, গত ২৫শে অক্টোবরে যে ইত্তেহাদী জনতা হায়দরাবাদ ডেলিগেশনের তিন সদস্যের ভবন ঘিরে ধরেছিল, সেই জনতাকে পথ দিয়ে যেতে দেখেও অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন দীন ইয়ার জঙ্গ। তিনি অনায়াসে জনতাকে নিবৃত্ত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে পাশ কাটিয়ে আড়ালে সরে গিয়েছিলেন।

দীন ইয়ার জঙ্গ প্রতিদিন একবার নিজামের সঙ্গে দেখা করে থাকেন। দীন ইয়ার জঙ্গের মুখের ভাব ও কথাবার্তার রকম দেখে বুঝলাম যে, 'নিজাম তাঁকে আমার কাছ থেকে কিছু কথা বের করার জন্য বলে দিয়েছেন। নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করে আমি কি ধারণা করেছি, সম্ভবতঃ এইটুকুই জানবার ইচ্ছা করছেন দীন ইয়ার জঙ্গ।

সামান্য কিছুক্ষণ দীন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হলো। কিন্তু আমি এই সামান্য কিছুক্ষণের সুযোগেই আমার ধারণা দীন ইয়ার জঙ্গের কাছে স্পষ্ট করে প্রকাশ করে দিলাম। আমি বললাম—'অতিমান্য নিজাম যে পথ ধরেছেন, সেটা আমার কাছে মোটেই ভাল লাগছে না। সমস্যার সমাধান করতে হলে অবিলম্বেই করতে হবে। নতুন অবস্থার সঙ্গে হায়দরাবাদকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য যেসব সম্ভাব্য পন্থা আছে, সেই পন্থার কথাই চিন্তা করতে হবে, অন্য পন্থার কথা ছেড়ে দিয়ে।'

আর একটি বিষয়ও দীন ইয়ার জঙ্গের সঙ্গে আলাপের মধ্যে উল্লেখ করলাম। [illegible]র একবার দিল্লী যাওয়া উচিত ছিল। নিজাম দিল্লীতে গেলে কোন্ দিক দিয়ে এবং কি কি বিষয়ে নিজামেরই পক্ষে সুবিধাজনক হতো, সে সম্বন্ধে কতগুলি কথা দীন ইয়ার জঙ্গকে শুনিয়ে দিলাম।

শাহ মঞ্জিলের এই ভোজসভার আসরে বসে একটি অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। বেশ স্বচ্ছন্দেই তো সামাজিক মেলামেশার একটি উৎসব এখানে হতে পারছে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে সম্মিলিত হয়েছেন। যদিও এ উৎসবের পরিবেশের মধ্যেও একটা অস্ফূর্তির ভাব প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তবুও কারও চোখে-মুখে বা কথাবার্তায় এমন কোন ভাব দেখতে পাচ্ছি না, যাতে মনে হবে যে, ভয়ানক রকমের একটা সংকট আসন্ন। হায়দরাবাদ রাজ্য জুড়ে তাঁর প্রচারকার্যের দ্বন্দ্ব অবশ্যই চলছে, কিন্তু সেই মুখর বিরোধের কোন পরিচয় এই উদ্যানের আলো-ছায়া ও অভ্যাগতদের শান্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে পেলাম না। এখানে বসেই দেখতে পাচ্ছি, সম্মুখে হ্রদের জল শান্ত ও সুস্থির। দেখা যায়, গোলকুণ্ডার গিরিমালা এবং আরও দূরে গোলকুণ্ডার দুর্গ। সবই শান্ত। এই ভোজসভার আসরে যাঁদের দেখছি, তাঁদের জীবনে সমস্যা দেখা দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু সমস্যার জন্য এ'দের প্রাত্যহিক জীবনে তেমন কিছু উগ্রতা ও অস্থিরতা দেখা দেয়নি। সমাজ ও মতবাদের দিক দিয়ে এ'রাও উত্তর ভারতের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এ'দেরই স্বসমাজী ও স্বমতবাদীর জীবন উত্তর ভারতে যে ভয়ানক হিংস্র ঘটনাবলীর অভিশাপে বিপর্যস্ত হচ্ছে, এখানে এখনো ঘটনার রূপ সেভাবে দেখা দেয়নি। এদিক দিয়ে দক্ষিণ ভারত উত্তর ভারতের তুলনায় বেশি ভাগ্যবান্।

হায়দরাবাদ, সোমবার, ১৭ই মে, ১৯৪৮ সাল। মীর লায়েক আলি বলেছেন—'হায়দরাবাদে যখন এসেছেন তখন হায়দরাবাদের অন্যান্য অঞ্চলও একবার ঘুরে দেখে যাওয়া আপনার উচিত। আপনার ইচ্ছামত যেকোন স্থান দেখে আসতে পারেন।'

আমি বললাম—'সব চেয়ে ভাল হয়, যদি হায়দরাবাদের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলটি দেখবার সুযোগ পাই। শুনেছি, হায়-দরাবাদের এই অঞ্চলটির ওপরেই মাদ্রাজের দিক থেকে অনেকবার কম্যুনিস্টদের আক্রমণ হয়েছে।'

বিশেষ অনুগ্রহ করলেন জেনারেল এল-এদ্রুস। আমার ভ্রমণের জন্য হায়-দরাবাদ বাহিনীর একখানি এক্সপিডাইটার বিমান তিনি ছেড়ে দিলেন। প্রথমে যাব খামাম অঞ্চলে। আকাশপথে প্রায় চারশত মাইল যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিলেন এল-এদ্রুস।

সকাল সাতটার সময় যাত্রা করলাম। খামামে পে'ছিতেই ব্রিগেডিয়ার হবিব আহমদ এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তা ছাড়া স্থানীয় পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর বিভাগীয় অফিসারেরাও এলেন। এখান থেকে আবার মোটরযানে মোট এক'শো আশি মাইল পথ ভ্রমণ করতে হলো। এখন এই অঞ্চলের গ্রীষ্ম দুঃসহ। সীমান্তের কাছাকাছি অঞ্চলে তাপমান ১১৮ ডিগ্রীরও উপরে উঠে গেছে।

খামাম-মাদেইরা রোড ধরে অগ্রসর হলাম। মাদেইরা অঞ্চলেই সব চেয়ে বেশি হাঙ্গামা হয়েছে। প্রায় ষাটটি গ্রাম নিয়ে এই মাদেইরা মহল বস্তুতঃ চারদিকে ভারতীয় অঞ্চলের দ্বারা পরিবেষ্টিত, শুধু একদিকে খুব সংকীর্ণ একটি ভূখণ্ডের দ্বারা হায়দরাবাদ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত। এই যোজক-পথটি কোনস্থানেই আধ মাইলের বেশী চওড়া নয়।

এই সংকীর্ণ যোজক-পথের কাছে এসেই আমাদের গাড়ি থেমে গেল, কারণ আরও অগ্রসর হবার পথে বাধা ছিল। এ বাধা গতকালও এখানে ছিল না। আজই সকালে ই'ট-পাথর জড়ো ক'রে রাস্তার ওপর একটা বাধার প্রাচীর তুলে দেওয়া হয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার হবিব এই 'বাধা' সরিয়ে আরও অগ্রসর হতে চাইছিলেন। তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, আরও ভেতরের দিকে ঢুকলেও কোন বিপদে পড়বার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমি আপত্তি করলাম, এবং এখান থেকেই ফিরে যাবার জন্য জেদ ধরলাম। আমি বললাম যে, এখানে আমি আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছায় ও আগ্রহেই এই অঞ্চলের অবস্থা দেখবার জন্য এসেছি। কিন্তু যদি এখানে কোন ঘটনা হঠাৎ হয়েই যায়, এবং আমাকে সে ঘটনার মধ্যে পড়তে হয়, তাহলে মাউণ্টব্যাটেনকে এবং হায়দরাবাদ গবর্ণ-মেণ্টকেও বিড়ম্বিত হতে হবে। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার শেষ পর্যন্ত হায়দরা-বাদের সরকারী বিড়ম্বনা এবং মাউণ্ট-ব্যাটেনেরও ব্যক্তিগত বিড়ম্বনার ব্যাপারে পরিণত হবে। এ রকম সম্ভাবনা যেখানে আছে, সেখানে আমি অগ্রসর হতে ইচ্ছা করি না। এখানকার কয়েকটা গ্রামের অবস্থা দেখবার লোভে আমি এত বড় ঝুঁকি নিতে পারি না।'

ফিরে চললাম আমরা। এইবার খামাম-শিবরাওপেট রোড ধ'রে অন্য দিকে অগ্রসর হলাম। দু'পাশের গ্রামগুলির অবস্থাও চোখে পড়ল।

সত্যি সত্যি ধ্বংস ও ক্ষতির চিহ্ন খুব বেশি দেখলাম না। যেটুকু দেখলাম, সেটুকুও খুব বেশি ক্ষতির নিদর্শন নয়। কিন্তু আক্রমণ ও সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যটি সফল হয়েছে। এক একটা গ্রামের প্রায় সকল অধিবাসীই ভিটে-মাটি ছেড়ে দিয়ে এবং সীমানা পার হয়ে চলে গেছে।

'দেশীয় পদ্ধতি'তে পুল ধ্বংস করবার চেষ্টা কয়েকটি স্থানে হয়েছে, তার প্রমাণও দেখলাম। স্থানে স্থানে

...ছের গুঁড়ি স্তূপীকৃত ক'রে রাস্তা বন্ধ করাও হয়েছে। এই ধরণের অশান্তের ব্যাপার দমনের জন্য হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্ট সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, এবং সামরিক দিক দিয়ে বিচার করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অবস্থা আয়ত্তের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু এটা স্পষ্টই বুঝা গেল যে গ্রামবাসীর মনে নিরাপত্তার ভাব আর নেই। গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত ও বিচলিত।

সড়কের ক্ষতি তেমন কিছুই নয়। যতগুলি সড়ক আমার চোখে পড়লো, সবই খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে। যেটুকু ক্ষতি করা হয়েছিল, সেটুকু মেরামত করে ফেলা হয়েছে।

শুল্ক অফিসগুলির ওপরেই সব চেয়ে বেশি আক্রমণ হয়েছে। শুনলাম, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীর মধ্যে এক-চল্লিশবার শুল্ক অফিসগুলির ওপর আক্রমণ হয়েছে। ব্যাপকভাবে 'আবগারী গাছ', (তাড়ি তৈরীর জন্য সংরক্ষিত তাল গাছ) ধ্বংস করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ধ্বংসের চিহ্ন দেখলাম শিবরাওপেট নামক গ্রামটির মধ্যেই। এই গ্রামটি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর প্রায় গা ঘেঁসে রয়েছে। গত জানুয়ারী মাসে দু'-তিন হাজার গন্দ (স্থানীয় আদিবাসী গোষ্ঠী) এই গ্রামটি আক্রমণ করেছিল। সীমান্তের এপারে আর ওপারে, দু'দিকেই গন্দেরা বাস করে। শুনলাম, কম্যুনিষ্টদের পরিচালনায় এই গন্দের দল গ্রামটিকে একেবারে নিখুঁতভাবে পুড়িয়ে শেষ ক'রে দিয়ে যায়। আক্রমণকারীরা গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়েরই ঘর লুণ্ঠন ও দগ্ধ করেছিল। স্থানীয় একজন অফিসার বললেন যে, প্রথম দিকে যেসব আক্রমণ হয়েছিল, তা'তে দেখা গেছে যে, আক্রমণকারীরা হিন্দু-মুসলমান বিচার করেনি। উভয় সমাজেরই ঘরবাড়ী লুঠ করেছে। কিন্তু শেষ দিকের আক্রমণগুলি সাম্প্রদায়িক পদ্ধতিতেই চালিত হয়েছে এবং শুধু মুসলমানদের ঘর-বাড়ীর ওপরেই আক্রমণ হয়েছে।

ব্রিগেডিয়ার হবিব বললেন যে, এরই মধ্যে সামরিক ব্যবস্থার সাফল্য যেটুকু দেখা গেছে, তা'তে তিনি খুশিই আছেন। আক্রমণের ব্যাপারগুলি তেমন কিছু জবরদস্ত বা জোরদার ব্যাপার নয়। হঠাৎ এসে লুটপাট ক'রে পালিয়ে যাওয়া, সাধারণতঃ এই হলো আক্রমণের পদ্ধতি।

জেনারেল এল-এদরুসের প্রধান দপ্তরে সামরিক ব্যবস্থার মানচিত্রটি দেখে অবস্থা সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য-পূর্ণ ধারণা লাভ করতে পেরেছি। স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে হায়দরাবাদের শুধু এই দক্ষিণ-পূর্ব সীমানার সংলগ্ন অঞ্চল নয়, পশ্চিম ও উত্তর সীমানাকেও বাইরের আক্রমণ সহ্য করতে হচ্ছে। বোম্বাই এবং মধ্য প্রদেশের দিক থেকেও আক্রমণ হচ্ছে। এর ফলে হায়দরাবাদ বাহিনীর বহুসংখ্যক সৈন্য সীমানার নানা দিকে ও নানা স্থানে ছড়িয়ে দিতে হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের মনে সাহস ও নিরাপত্তার ভাব অক্ষুন্ন রাখার জন্য হায়দরাবাদ বাহিনীর বহুসংখ্যক সৈন্যকে টহল দিয়ে ফিরতে হচ্ছে।

স্থানীয় পুলিশের প্রধান অফিসার সম্প্রতি সীমান্তের অন্য অঞ্চল (বোম্বাইয়ের দিক) থেকে ফিরেছেন। কথা প্রসঙ্গে এই পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম—'শান্তি রক্ষার কার্যে রাজাকর দলের কাছ থেকে আপনারা কিরকম সাহায্য পাচ্ছেন?'

পুলিশ অফিসার উত্তর দিতে গিয়ে হেসে ফেললেন—'সাহায্য করবার যোগ্যতাই বা কি আছে রাজাকরদের? ওরা শুধু জানে সহরের ভেতরে শোভাযাত্রা আর প্যারেড করতে এবং এ ছাড়া আর কোন যোগ্যতা ওদের নেই।'

এই অঞ্চলের ভৌগোলিক জটিলতার একটা বিষয়ে বুঝতে পারলাম। যেমন হায়দরাবাদ রাজ্যের এক টুকরো জমি ভারতীয় অঞ্চলের ভেতর গিয়ে ঢুকে রয়েছে, তেমনি ভারতীয় অঞ্চলেরও একটি খণ্ড হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরে ঢুকে রয়েছে। উভয় খণ্ডই মাত্র সংকীর্ণ এক একটি পথের দ্বারা নিজ নিজ রাজনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। এই অবস্থাটাও অশান্তির সহায়ক এবং শাসনব্যবস্থার দিক দিয়ে উভয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই অসুবিধাকর। দুই গবর্ণমেণ্টই যদি সীমানা একটু কাটছাঁট করে ফেলতে রাজী হন, তবে কোন গ্রামকেই এভাবে 'বন্দী-অঞ্চল' হয়ে থাকতে হয় না এবং শাসন-কার্যেরও সুবিধা হয়।

ফিরে এলাম খামামে এবং বিকাল হবার আগেই এক্সপিডাইটারের আরোহী হয়ে জ্বলন্ত আকাশপথে পাড়ি দিলাম। কী প্রচণ্ড গ্রীষ্ম! তাপমান কতদূর উঠেছে জানি না, কিন্তু বেশ অনুভব করতে পারলাম যে, আমার নিঃশ্বাস দিয়েই যেন আগুন বের হচ্ছে। ধাবমান এক্সপিডাইটার যখন নীচের বায়ুস্তরে নেমে গোলকুণ্ডা গিরিমালার শীর্ষের কাছাকাছি একটা চক্কর দিল, তখনই শুধু শীতল বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ পেলাম! মাটিতে পা দিয়েই বিস্মিত হলাম। দেখলাম একটি চা-এর আসর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই অভাবিত আয়োজনের মূলে রয়েছেন হায়দরাবাদের বৈদেশিক দপ্তরের উৎসাহী সেক্রেটারী জহির আহমদ। তিনি এরই মধ্যে চায়ের আসরে দশ-বার জন বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান নেতাকে এনে বসিয়ে রেখেছেন। মজলিসের নেতারা আছেন, রাজ্য কংগ্রেসের নেতারাও আছেন। এ'রা পরস্পরের সঙ্গে বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে একবার মুখ দেখাদেখিও করেননি।

নতুন ও অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা লাভ করলাম এই চায়ের আসরে। শাহ-মঞ্জিলের ভোজসভার সেই আলো-ছায়ার শান্ত পরিবেশ আর এই চায়ের আসরের পরিবেশে অনেক পার্থক্য। বুঝলাম, বড় বেশি উত্তাপ।

রাজ্য কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতা মিঃ গানেরিওয়াল ও বিশিষ্ট মুসলিম সম্পাদক মিঃ রেইসের মধ্যে প্রথমেই গরম গরম কথার ও মন্তব্যের আদান প্রদান আরম্ভ হয়ে গেল। মিঃ রেইস আবার হায়দরাবাদ আইনসভার সদস্য। দু'জনেই নিজের নিজের অভিমত একেবারে চরমে তুলে নিয়ে তর্ক করলেন।

মিঃ রেইস বললেন যে, কংগ্রেসের কোন মুখপাত্রের কোন অভিমতকে তিনি বিন্দুমাত্র গুরুত্ব ও মর্যাদা দিতে রাজী নন, যতক্ষণ কংগ্রেসের রাজনৈতিক আনুগত্যের রূপ সুস্পষ্ট না হয়। এদিকে নিজাম আর ওদিকে ভারত, দু'দিকে দু'রকম আনুগত্য রাখার অভ্যাস কংগ্রেসকে ছাড়তে হবে।

মিঃ গানেরিওয়াল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন যে, তিনি হায়দরাবাদের কোন গবর্ণমেণ্টের ধার ধারবেন না—যতদিন না জনসাধারণের প্রতিনিধিদের নিয়ে দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ক্রমশঃ)

দাক্ষায়ণী

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা বানান পদ্ধতির সমালোচনা করবার আগে একটা কথা ভেবে দেখবেন আপনারা। আর কিছু করুক আর না করুক,—যুক্তাক্ষর ভেঙে, দ্বিত্ব বর্জন করে 'য' ফলা আর 'ঙ্গ'এর অকারণ উৎপীড়ন থেকে সে আমাদের বাঁচিয়েছে। যারা অল্পশিক্ষিত, কোনো রকমে হুঁচোট খেয়ে পড়তে পারে কিংবা নামটা দস্তখত করতে পারে,—তাদের কাছে বাঙলা ভাষা পড়া ও লেখা কতটা সহজ হয়ে এসেছে বলুন দেখি!

ধরুন পাড়াগাঁয়ের সাদাসিদে বিধবা মহিলা। লেখা-পড়ার ধার ধারেন না। মেরে-কেটে নামটা সই করে খালাস। হাতে কিছু নগদ পুঁজি আছে, তাই নিয়ে সামান্য একটু তেজারতি করে থাকেন। কিন্তু পাওনা টাকাটা নিয়ে রসিদে স্বাক্ষর করতে হবে তো! তার ওপর নামটা যদি হয় মাতঙ্গিনী—তা হলে?

পান দোক্তা গালে ঠুসে' যতই শক্তি সঞ্চয় হোক্ না কেন, 'ঙ্গ'তে এসে আটকে যাবেই। তখন? দুদিক থেকে দুখানা পাখার বাতাসের প্রয়োজন। সমবেত সাহায্যে, এইরকম করে এক-একটা টাল সামলাতে সামলাতে তিনি আর কতদিন বাঁচবেন? সেদিন এক বর্ষীয়সী বিধবা আমায় দেখে একগাল হেসে বললেন, "কতো সুবিধেই আজকাল করে দিয়েছো বাবা! অনুস্বারের একটা ফোঁটা আর ন্যাজ-টুকুন টেনে দিলেই নিশ্চিন্দি! হাঙ্গামারও ভয় নেই।"

দাক্ষায়ণী সম্পর্কেই এই বানান সমস্যার কথা মনে পড়ে গেল। 'ক্ষ' লিখতে হ'ত তার প্রাণান্ত। তবু অশেষ ধৈর্য আর পরিশ্রম দিয়ে নামসই করা তার চাইই। দাক্ষায়ণী ছিল স্বনাম-ধন্য মানুষ। যাঁরা তাকে দেখেননি বা তার নাম শোনেননি, তাঁদের অবগতির জন্য দাক্ষায়ণীর এই সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচয়-টুকুই প্রয়োজন।

বছর তিরিশের কিছু ওপরই হবে, দাক্ষায়ণী তার কাপড়ের ব্যবসায় নেমেছে। তাঁতিনীর কাজটা অবিশ্যি তার জাত-ব্যবসা বা জন্মগত সংস্কার নয়। সে হ'ল উগ্র-ক্ষত্রিয় বংশের মেয়ে। আবাদের কোল ঘেঁসে দক্ষিণের কোনো এক গণ্ডগ্রা... সম্পন্ন চাষী গৃহস্থ ঘরে তার জন্ম। শুধু অবস্থার ফেরেই তাকে আজ কাপড় কেনা-বেচার জীবিকা স্বীকার করতে হয়েছে। এই কথাটা সে জোর গলায় প্রচার করে এসেছে। পাছে লোকে ভুল ভাবে, তাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে—এই আশঙ্কায় সে খদ্দেরের খাতায় আপনার পুরো নাম আর পদবীটাও স্বাক্ষর করে অপটু হস্তে। কিন্তু নামের আগে একটা শ্রীমতী না লিখে সে বসায় চন্দ্রবিন্দু, বোধ হয় বেশি সম্মানের প্রত্যাশায়।

একখানি বর্ণপরিচয় পড়ে বিদ্যাসাগর হতে না পারলেও 'ঈশ্বর' হতে বাধা কিসের? জীবদ্দশায় স্বর্গপ্রাপ্তি নিয়ে কত লোকে তাকে ঠাট্টা তামাশা করেছে। কিন্তু দাক্ষায়ণী অচল, অটল। স্বর্গীয় পদমর্যাদার চিহ্নস্বরূপ চন্দ্রবিন্দুটিকে সে আঁকড়ে থাকে প্রাণপণে। জীবনে অনেক কিছুই নাকি তার মিলেছিল আর সে সবই বরবাদ হয়ে গেছে। তাই ওটিকে ছাড়তে দাক্ষায়ণী কোনো মতেই রাজী হয় না। অনেক যত্ন আর নিষ্ঠা দিয়ে সে নামসই করে—"দাক্ষায়ণী দাসী।

দাক্ষায়ণীর বয়স পঞ্চাশের কোঠার মাঝা-মাঝি। কিন্তু তাকে দেখলে বয়স আরো বেশি মনে হয়। স্বল্পকায় মানুষটি। দাঁত পড়ে গেছে, গাল ভেঙে পড়েছে—কিন্তু এখনও পর্যন্ত সে বেশ কর্মক্ষম। কলকাতা শহরের প্রায় সর্বত্রই তার অবাধ গতিবিধি। থাকে ঐ নেবুতলা অঞ্চলে, কোনো এক অখ্যাতনামা গলিতে ছোট্ট একখানা ঘর নিয়ে। নিজেই রাঁধেবাড়ে, দোকান-বাজার করে। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে, আলকাতরা মাখা পেরেক-ঠোকা দরজাটিতে শিকল-তালা লাগিয়ে মাথার ওপর ছোট্ট একটি বৈষ্ণবী-চুড়ো বেঁধে কাপড়ের বস্তা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। মধ্য কলকাতার অনেকেই দেখেছে ও জানে। পথে-ঘাটে তার সঙ্গে আপনাদের দেখা হওয়া বিচিত্র নয়।

নেহাৎ বালিগঞ্জ কিংবা বরানগরের কোনো কোনো সৌখীন বাড়িতে ফরমাস মত কাপড় যোগানো ছাড়া অন্য কোথাও যেতে হলে দাক্ষায়ণী ট্রাম-বাসের পেছনে অযথা পয়সা খরচ করতে নারাজ। বেশির ভাগ সময়েই সে পদব্রজেই কাজ সারে। স্বভাবতই সে অল্পভাষী স্ত্রীলোক, অনর্থক বাক্যব্যয় সে ভালবাসে না। চট্‌পট্ কাজ সেরে উঠে পড়ে। ভাবটা এই—দরে পোষায়, কাপড় রাখো। নইলে রেখোনা। মাথার দিব্বি দিয়ে কেউ বসে নেই। বিশেষ করে নগদ দেনাপাওনার কারবার যখন এটা নয়, তখন বাজার দরের চেয়ে চার আনা আট আনা দাম বেশি কেন, এরকম অন্যায় অসঙ্গত বায়নাক্কা ধরলে চলবে কি করে? তার চেয়ে নিজেরা বিবি সেজে দোকানে সওদা করতে গেলেই হয়, নয়তো সোয়ামীদের হাওড়া কি মগরার হাটে দর যাচাই করতে পাঠালে ভালো হয়। গরীব দুঃখী মানুষ হয়ে সে তো আর দানছত্তর খুলতে আসেনি যে নামমাত্র মুনাফায় কাপড় বিলিয়ে দিয়ে ঘরে বসে ঘরের ভাত আরো বেশি করে খাবে! কর্তাদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে কোনো পরামর্শ করাই ভুল! তাহলে আড়ালে দুপুর বেলায় যা দু এক-খানা কাপড় নেওয়া যায় সে পাট শিকেয় উঠবে!

অধর্ম কোনোদিন দাক্ষায়ণী করেনি, করবেও না—একথা শপথ করে সে বলতে পারে। অদৃষ্ট বিপাকে এই ব্যবসা তাকে নিতে হয়েছে। কেনা-বেচার দর কষাকষি কাজে মানুষের মন ও মেজাজ ঠিক থাকে না,—নইলে পরে কবে এই ধুত্তোর ঝকমারির কাজ ফেলে দিয়ে সে চলে যেত। তবে নেহাৎ অখ্যাতির কাজ নয়, এই যা! তাছাড়া নিজের একটা পেট হলেও চালাতে হবে তো! আর এ বয়সে কারুর গলগ্রহ হয়ে সে থাকতে নারাজ। কিছু থাকুক না থাকুক, মর্যাদাজ্ঞান তার টনটনে। দাক্ষায়ণী দাসী সে মেয়েই নয় যে পরের কৃপায় বা অন্নে প্রতিপালিত হতে যাবে। অবিশ্যি হাতে এখনও কিছু নগদ পুঁজি রয়েছে। কিন্তু বসে খেলে পরে কলসীর জল গড়াতে গড়াতে আর কতদিন চলবে? মানুষের ভালো জিনিসটা লোকে সইতে পারে না। তাই বুড়ো বয়সে আজ বদনাম হয়েছে, কৃপণ।

দাক্ষায়ণী সহজে মুখ খোলে না। কিন্তু একবার যদি তাতিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে অনেক কিছুই বেরিয়ে পড়ে। দু একটি বাড়ির বৌ-ঝিকে কেন কি জানি সে একটু বেশ স্নেহের চোখেই দেখে। তাদের কাছে কখনো-সখনো সে মন খুলে কথা বলে থাকে।

তবে দয়া ভিক্ষার জন্য নয়, সহানুভূতি কুড়োবার ফিকিরে মন ভেজানো ব্যবসা তার নয়। সামান্য কাপড়ের ফেরি-করা তাঁতিনী হলে কি হয়, তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য যেন একটু আভিজাত্যের স্পর্শ এনে দেয় তার শীর্ণ মুখখানায়। রাশভারী দাক্ষায়ণী বাড়িতে এলে বাচাল কিংবা ফচ্‌কে বৌ-ঝিরা পর্যন্ত একটু সমীহ করে চলে, কথা কম বলে।

খদ্দের হলো লক্ষ্মী। তাই বলে লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের চেষ্টায়, খদ্দেরের বাড়ি এসে জল-পান চেয়ে নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পর-চর্চা বা রসালো গাল-গল্প অথবা মন জোগানো বাজে মিষ্টি কথা বলা, কোনোটাই দাক্ষায়ণী করে না। ছাঁ-পোষা গেরস্ত বাড়িতে নাক উঁচু করে কিংবা ভুরু কুঁচকে কথা সে বলে না, আবার ষষ্ঠীতলার সদু অথবা মনসাডাঙার মোনার মার মত আশ্রিত পোষ্যের মনোভাব নিয়ে সে বড়-লোকের বাড়িতেও ঢোকে না। দাক্ষায়ণীর চোখে সব ঘরই সমান, বাঁধা মক্কেলের সামিল। সহজ, অসঙ্কোচ তার গতিবিধি। যেখানে দেখে গরমিল,—অসম্মানের আশঙ্কা, সে পথ দাক্ষায়ণী আর দুবার মাড়ায় না।

সেদিন সারা দুপুরে টাকা আদায়ের চেষ্টায় বিফল হয়ে দাক্ষায়ণী অবশেষে টালিগঞ্জের পুল পেরিয়ে তার এক পুরোনো খদ্দেরের বাড়ি ঢুকল।

এ বাড়ির বউটিকে দাক্ষায়ণী 'মা' বলে। এ পাড়ায় যখনি আসে, 'মা'র সঙ্গে তার একবার দেখা করে যাওয়া চাই-ই। বৌটি কখনো-সখনো দু-একখানা কাপড় নেয়। সাদাসিদে আটপৌরে কাপড়ই তার পছন্দ, বেশি দাম দিয়ে শাড়ী রাখার মতন তার সচ্ছলতা নয়। কিন্তু দাক্ষায়ণীর সঙ্গে সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়িয়েছে মধুর এবং ব্যক্তি-গত। বৌটি সত্যিই ভালো—বড় ঠাণ্ডা ও লক্ষ্মীমন্ত। সংসারের আবর্তে পড়ে ঐ বয়সী ঘুণ গিন্নীর মতন এখনও চতুর ও স্বার্থপর হয়ে ওঠেনি। যেন সরল ও স্নিগ্ধ শরতের একটুকরো পরিষ্কার আকাশ। মোলায়েম ঝকঝকে হাসি। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

এই দরিদ্র, অকাল বার্ধক্যে পীড়িত রমণীটির ওপর তার এক বিশেষ ধরণের মমতা পড়েছিল। দাক্ষায়ণী বাড়ি এলে তাকে না খাইয়ে সে বিদায় দিত না। বাকি টাকা সে ফেলে রাখত না কখনো। দাক্ষায়ণী কতবার অনুযোগ করেছে, "হাতে হাতে শোধ কেন মা? তুমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছ না?" বৌটি বলে "তা হয়না বাছা। সবাই যদি টাকা আটকে রাখে, তুমিই বা মহাজনকে কি দেবে?"

স্বামী ধর্ম-মেয়ের ধর্মিষ্ঠা মাকে নিয়ে কতদিন ঠাট্টা তামাসা করেন। বলেন, "এতো মা-মা শুনি, তা বুড়ির কাছ থেকে যদি সস্তা গণ্ডায় কিংবা মুফতে কিছু কাপড়-চোপড় বাগাতে পারো, তাহলে বুঝি এই দুর্দিনের বাজারে একটু সুরাহা হলো। তা নয়—যত্তো সব......"

বৌটি হাসিমুখে স্বামীর রসিকতা স্বীকার করে নেয়। তবে রসিকতার পিছনে স্থূল ইঙ্গিতটুকু একত্র করায় মনে খোঁচা দেয়। কিন্তু গায়ে মাখে না সে—

সেদিন অসময়ে দাক্ষায়ণীকে দেখে বৌটি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দুটো নারকেল নাড়ু আর এক ঘটি জল দিল এগিয়ে। দাক্ষায়ণী একটু জিরুলে, বৌটি তার সঙ্গে গল্প করতে বসল। বললেঃ

"তোমার খবর বলো মেয়ে। বিক্রি-সিক্রি কেমন হচ্চে আজকাল?" "কিছু না মা—কিছুনা। ও কথা আর তুলোনা। মাস সবে শুরু হয়েচে। ভাবলুম; বকেয়া টাকাগুলোর একটা বিহিত না করলে আর নয়—মাস কাবার হয়ে এলে কেউ তো ফিরেও তাকাবে না। কিন্তু পোড়া কপাল আমার! সারা সকাল আর এতখানি বেলা পর্যন্ত টো-টো করে ঘুরে মাত্র দুখানি শাড়ির দাম আদায় করতে পেরেছি।"

"কেন তোমার সেই ব্যারিস্টার-গিন্নী টাকা দিলে না? এ মাসে রোক-শোধ করবে, বলেছিল না?"

"হ্যাঁ উনুনের ছাই দেবে! শুধু মুখেই লম্বা-লম্বা চাল! এস্তক নাগাদ কাপড় জুগিয়ে আসছি মা—টাকা বাকি রাখা নিয়ে কোনও দিনই গণ্ডগোল করিনি। তবে দরকার-সরকার পড়লে, মহাজনকে দিতে হলে, টাকা চাইব না?" আর চাইতেই কিনা একেবারে মারমুখী। বলে কিনা আমায় —"নগদ দান দিলেই কেনা হলো আর মাস-কাবারী টাকাটা বুঝি ফেল্‌না! এখন টাকা-কড়ি কিছু দিতে পারব না। ইচ্ছে হয় আদালত করগে যাও।"

শোনো কথা, একবার বাক্যির ছিরি দেখো। এ আমার হকের পাওনা, নয়? আদালত করতে আমিও পারি। ওসব কারবার ঢের দেখেছি বাপের আমলে। যদি করতুম, অনেক আগেই করতুম। করিনি শুধু বিশ্বাসের জন্যে। আজ এ কাপড় মেয়ের জন্যে, কাল ও কাপড় নাতনীর জন্যে, পরশু আর একখান বন্ধুর মেয়ের জন্যে—এন্‌তার কাপড় রাখছে। তখনই আমার সন্দ হয়েছিল, মা—গতিক ভালো নয়। বোঝা উচিত ছিলো—এমন উড়নচণ্ডী মেয়েমানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আমার জিব বেরিয়ে যাবে..."

"কতো বাকি আছে?" বৌটি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে। "তা সাড়ে তিন কুড়ি টাকা এখনও বাকি। বলি, এখন তো সোজা আদালত দেখিয়ে দিলে আমায়। কিন্তু আরো যে এক ওপরওলা আদালত আছে, তার বিচারে কি হবে তখন শুনি"

দাক্ষায়ণী বেশ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অক্ষম আক্রোশে, আর ব্যর্থ পরিশ্রমে অনেক কথাই সে বলে ফেলে।

"ভেবেছেন সোয়ামী ব্যারিস্টার—তবে আর কি? ধরাকে সরা দেখছেন! তোমায় বলবো কি মা, শুনলুম কর্তার নাকি মোটেই আয় নেই, শুধু ধড়াচুড়ো বাঁধাই সার! আগে ওরা যখন ভিন্‌পাড়ায় ছেলো, তখন ওরা অনেক দেনা করে চলে এসেছে। সে সব টাকা এক পয়সাও শোধ হয়নি। বলি, হবে কি করে? অমন দেমাকী হতচ্ছাড়া পরিবারের পাল্লায় পড়লে লক্ষ্মি ঘর থেকে আপনি পালায় যে গো! এদিকে মেয়েদের দামী দামী বাহারে কাপড় পরানো চাই—তাও ধারের কারবার। নিজে আবার যুবো সেজে পার্টিতে যাওয়া চাই, নইলে মান ইজ্জৎ বজায় থাকে না। আ মরি মরি। কি ইজ্জৎ! মান তো ছাই গাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। পাওনাদার ঠকিয়ে যে খায়, অমন মেয়েমানুষের গলায় দড়ি, গলায় দড়ি......"

উত্তেজিত মন্তব্যের পর দাক্ষায়ণী দস্তুর মত হাঁপাতে থাকে। অনেকদিন পরে সে আজ স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করে বস্‌ল।

একথা সে কথায় বেলা গড়িয়ে যায়। একই গল্প দাক্ষায়ণীর কাছে কতবার শোনা। বৌটির একরকম মুখস্থ হয়ে গেছে। তবু শোনে...ভালো লাগে......

তাঁতিনীও এমন মনের মতন ধৈর্যশীল শ্রোতা পেয়ে উৎসাহে ফুলে ওঠে। বড় গাঙের ধারে তেরো বিঘে বাগান-জমি নিয়ে প্রাসাদতুল্য বাড়ি। তাতে একশো বাইশ জোড়া কপাট...তার ইঁট কাঠ বেচেই কতো

লোক বড় মানুষ হয়ে গেলো! এখন সেখানে সব ভূতের নেত্য। বাপ মায়ের আদুরে মেয়ে, ছেলেবেলায় শুধু-পায়ে মাটিতে কখনো হাঁটিতে পায়নি। বিয়ে হয়েছিল ভিন্ গাঁয়ের এক অবস্থাপন্ন ঘরে। সেখানেও শ্বশুর শাশুড়ীর একমাত্র সাধের বৌ......কিছু কাজ করতে দিতনা তারা......আদরের চাপেই প্রাণ বেরুবার জোগাড়!

দাক্ষায়ণীর দীর্ঘশ্বাস ঘনিয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায়, অল্প বয়সী স্বামীর দৌরাত্মির কথা। সময় নেই অসময় নেই—খোলাখুলি, লুকিয়ে-চুরিয়ে খালি ডাকের ওপর ডাক। না গেলেই তুলকেলাম! রাগ, অভিমান, না খাওয়া, এমন কি মধ্যে মধ্যে, চুলের মুঠিও... পুরানো দিনের কাহিনীর কল্পিত মাধুর্যে দাক্ষায়ণীর চোপ্সানো গাল ভরে ওঠে। বলে,

"ওসব কথা যাক্‌গে মা! বলে মিছে মন খারাপ। সে সব দিনতো আর ফিরবে না, কেউ বিশ্বাস করতেই চাইবে না হয়তো। এখন সে সব শ্মশান সমভূম হয়ে গেছে। তিনকুলে কেউ নেই। টাকা? বিধবা হবার পর শ্বশুর যা ধুলিগুঁড়ি ছিল, নিকে দিছল সব। আন্দেকের ওপর শুধু ফুরিয়ে গেছে জ্ঞাত-গুষ্ঠির সংগে মামলা করে। তখন বিশ্বাস করে টাকা দেওয়ার ফল এখন হাতে-নাতে ভুগছি। যা সামন্য আছে তাই নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া। আর কি হবে মা? যাই উঠি এখন......বেলা গেল। আবার সেই আসছে হাটবারে আঁটপুরের নতুন প্যাটার্ন সরু পাড় কাপড় নিয়ে আসব। কিন্তু যাই বলো মা, হাল ফ্যাসানের কাপড়ের চেয়ে সেই সাবেকী 'চাঁদের আলো' আর খড়কে-ডুরে 'গংগাজলী' তোমায় যা মানায়......!"

দাক্ষায়ণী চলে গেলে বৌটি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। নিস্তব্ধ অপরাহ্ন। বোধ হয় ঝড় উঠবে। খুব ঘন কালো মেঘ উঠছে আস্তে আস্তে। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। কাপড় তুলতে সে ছাদে গিয়ে দাঁড়ালো।

শহরতলীর এদিক্‌টা একেবারেই ফাঁকা। বহুদূর বিস্তৃত খোলা জায়গার ওপর দিয়ে দৃষ্টি চলে যায়, বাধা পায় না। অলস মনে রৌদ্র-শূন্য কাজলাভা আকাশের দিকে তাকিয়ে আসন্ন আর্দ্রতায় মনটা যেন একটু একটু করে ভিজে ওঠে......২০.. মনে হয় —তাঁতিনীর বাপের বাড়িটা হয়তো ঐ দক্ষিণ দিকেই। পুরানো ন্যাড়া তালগাছটা পেরিয়ে রেল লাইনের সীমানার ওধারে। যে প্রকাণ্ড মাঠ, তারও ওপারে—যেন আরও অনেক—অনেক দূরে। কেমন বেশ ভাবতে ভালো লাগে—সে যেন নিজে ছোট বয়সের দাক্ষায়ণী। গ্রামের পথে, পুকুর পাড়ে, গাঙের ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কিসের সন্ধানে। শেষে যেন অন্য কারুর সংগে বিয়ে হয়ে গেল। আহা! বুড়ির শেষ জীবনটা কি কষ্টের! কতোবার সে বলেছে, জোর করেছে ...'এই বাড়িতে এসে থাকোনা মেয়ে, বার-দিকের ঘরটা ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার নিজের তো পয়সা আছে......পরের ভাত খেতে হবে না...তবে এত কিন্তুটা কিসের? নাঃ, তোমাকে বলতেই হবে মেয়ে...দাক্ষায়ণী কথাটা কিন্তু বরাবরই এড়িয়ে গেছে, মিষ্টি কথায় তুষ্ট করেছে। কিন্তু রাজী হয়নি কিছুতেই। ভা-রি একজেদী মানুষ!

সেবার দু তিন মাস হয়ে গেল, তাঁতিনী আর আসে না। অনেকদিন খোঁজ খবর নেই। বৌটি ভাবে, বুড়ী বোধ হয় শেষ পর্যন্ত কাশীবাসই করল। শেষকালে, একজন ফোঁটা-তিলক কাটা ঠাকুর গোছের প্রৌঢ় লোক এসে ওঁকে ডেকে নিয়ে গেল এক সকাল বেলায়। তারপর অনেক বেলায় উনি বাড়ী ফিরলেন। তখন সব খবর পাওয়া গেল......

প্রায় মাস খানেক আগে, চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে দাক্ষায়ণী কালীঘাটে এসেছিল গংগা-স্নান করতে। তারপর বাসায় আর ফিরতে হয়নি। কলেরায় ধরে আর গুরু গংগা কালীর সামনেই মারা যায়। মরবার সময়ে সে জগন্নাথের কাঁসার একটা বড় ঘটি, তার মধ্যে জমানো নগদ আট শো টাকা আর খান-কয়েক নিজের পছন্দমত মিহি জমির শাড়ী তার 'মা'কে দিয়ে গেছে। দেনা-পত্তর তার কিছুই ছিল না আর পাওনা টাকাগুলোর মমতাও সে কাটিয়েছে। শুধু 'মা'র জন্যে রাখা টাকা ও কাপড়গুলো একটা দানপত্র করে অনেকদিন আগেই বাড়ীওয়ালার কাছে জিম্মা করে গেছে। সাক্ষী হল কালীঘাটের পুরানো পাণ্ডা।

স্বামী ফিরে এলেন। বাইরে তখন অসহ্য গুমোট। ঘামে-ভেজা জামাটা আলনায় মেলে দিয়ে তিনি একখানা মোটা কাগজ বৌটির দিকে এগিয়ে ধরেন। দলিলখানা পড়া আর হয় না......শুধু নীচের গোটা-গোটা হরফে লেখা দস্তুর মত অপটু এক স্বাক্ষর—'দাক্ষায়ণী দাসী।

চোখোচোখি হতেই দেখতে পেল, স্বামীর শুক্‌নো মুখে একটি স্থূল তৃপ্তির ভিজে ছাপ। চোখ ফিরিয়ে নিল বৌটি......ভাবতে লাগল বুড়ীর সেই তোবড়ানো গালভাঙা মুখখানায় সরল আর নির্লোভ চাউনি।

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

আমার ভৃত্য চন্দোরের ইতিহাসটা এর চেয়েও বিস্ময়কর—"সেণ্ট্ স্টিফেন্সের অধ্যাপক সেন বলে উঠলেন।

বাড়ির চাকর সম্বন্ধেই গল্প হচ্ছিল। চাকরগুলো দিন দিন ভয়ানক বেয়াদপ হয়ে উঠছে। দুধ চুরি করে খেয়ে জল না মিশিয়ে, শুধু দুধটা চুরি করলেই তো হত। দুধ চুরি ও জল মেশানো এই ডবল অপরাধের জন্য দর্শনের অধ্যাপক মুখার্জি তাঁর ভৃত্যের পিঠে আস্ত একখানা যষ্ঠি ভেঙ্গেছেন। কলেজে তাঁর যষ্ঠির অনুপস্থিতিতেই এ গল্পের অবতারণিকা।

আমি বল্লাম, "আমার পুরোনো চাকর যতনের জন্যই আমি নিশ্চিন্ত মনে আড্ডা মারতে পারতাম। কিন্তু তার জীবন অবসানের সাথে সাথে আমার আড্ডার মাত্রা শূন্যে এসে নেমেছে। ঠিক করেছি জীবনে চাকর আর রাখবো না।

যতন প্রথম যেদিন আমার কাজ আরম্ভ করেছিল সেদিনের দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। নির্মল, নিরীহ বড় বড় দুটো চোখ নিয়ে যতন দিল্লীতে এসেছিল চাকরীর সন্ধানে। মড্ রোডের মোড়ে উঁচু কবরটার পাশে বাংলা কথা শুনে এসে ধরেছিল আমাকে। প্রথম প্রথম মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরোয় নি। বাড়ি গিয়ে ধীরে ধীরে অতি কষ্টে বলেছিল, "চাকর চাই, দাদা?"

মাইনে ঠিক না করেই কাজ শুরু করে দিল। আম কাটতে গিয়ে আঙ্গুল কাটে, সকালে তুলে না দিলে ঘুম ভাঙ্গে না, সাইকেল তুলতে গিয়ে নিজেই খানিকটা চক্কোর দিয়ে আসে আশে পাশে—প্রতি পদবিক্ষেপে অপটুতার একটা উলঙ্গ ছাপ নিয়ে ছায়ার মতন আমার সাথে সাথে ঘুরে বেড়ায় যতন—ভৃত্য নয় বন্ধুর মতন।

কিন্তু তার মধুর ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমি অনেকবার তার উপস্থিতির পূর্বে পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েও তাকে তিরস্কার করতে পারি নি—শুধু তার ভাসা ভাসা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে—মাথা নত করে দাঁড়িয়ে যতন; আলু থালু চুলগুলো হাওয়ায় এদিকে ওদিক নেচে বেড়াচ্ছে—এ দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

কলেজ থেকে একদিন একটু আগেই চলে এসেছিলাম। এসে দেখি, বাইরের দরজা খোলা। কেউ ঘরে নেই। ঠিক করলাম এ অপদার্থ দায়িত্বহীন ভৃত্যের প্রয়োজন নেই। আজ বিদায় দিয়েই ছাড়বো ওকে। পাখাটা খুলে বৈঠকখানায় বসে ভাবছি কাণ্ডজ্ঞানহীন অপদার্থটা কোথায় যেতে পারে এই দুপুরে? হাঁক মারি একটা? হাঁক দিতে হল না। রান্নাঘরের ওদিকের বাইরের কলতলা থেকে গানের সুর ভেসে এলো—"এই করেছো ভালো নিঠুর হে"—শ্রীমান যতন বাক্স থেকে বড় বড় প্লেটগুলো নামিয়ে সাবান দিয়ে ধুচ্ছেন—সাথে সাথে চলছে সঙ্গীত সাধনা। ভৃত্য রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে! শুনেছেন কোন-দিন? পরিহাস করে বলছি না, সত্যিই বলছি অত্যন্ত বেসুরে সে সঙ্গীত কিন্তু হাসতে পারিনি তাতে—কোথায় যেন খানিকটা সত্য লুকিয়ে ছিল!

ঠিক করলাম বাইরে থেকে তালা দিয়ে গেলেই হবে। হতভাগার জীবনে নিশ্চয়ই আঘাত লেগেছে, না হলে এত প্রাণ ঢেলে কেউ গাইতে পারে? তখনও নির্বিকার নির্লিপ্তভাবে চলেছে সঙ্গীত সাধনা—'আঘাত সে যে পরশ তব সেই তো পুরস্কার।'

বড্ড খরচ করতো যতন।—"দাদা জারটা ভেঙ্গে ঘি সব পড়ে গেছে। ঘি আনতে হবে। টাকা—"

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জনের টাকা। তার এ দুরবস্থা। মেজাজ সংযত

রাখা বড় শক্ত ব্যাপার হয়ে পড়ে। ঠোঁটের গোড়ায় এসে পড়ে—"তোমার মাইনে থেকে সব কাটবো"—বলতে পারি না। আটকে যায়। মনে পড়ে বেসুরে গলার আবেগ-পূর্ণ আবেদন, "নিঠুর হে—"

যতন জীবনে কি চেয়েছিল?

দিনগুলো আপন মনে যাচ্ছিল কেটে। যতন ছিল তার কাজ নিয়ে মেতে। যখন কাজ থাকতো না তখন সে কাজ সৃষ্টি করতো। গোছানো ঘরখানার জিনিসপত্তর সরিয়ে আবার সেগুলো গোছাতে সে নিজেকে মগ্ন রাখতো। আমি ছিলাম আমার কাজে ব্যস্ত।

একটু দেরীতেই খবরটা পেলাম। আগে পেলেও কতটুকু কাজে লাগাতে পারতাম জানি না। তখন যতন মারা গেছে—হ্যাঁ আরুইন হাসপাতালেই—অসুখটা ধরার আগেই—শেষ কথা বলে গেছে কেঁদে কেঁদে, "না, না, মা, আর মেরো না, মেরো না। কালই চলে যাবো মা—"

ময়মনসিংহের জমিদার চৌধুরী লিখলেন, একমাত্র সন্তান বিমাতার তাড়নায় পলাতক হয়ে কোথায় গেছে, অনেক চেষ্টা করেও তা জানতে পারেন নি। আমি তার শেষ শয্যায় কাতর উন্মুখ নয়নে অভয় দিয়েছি বলে ধন্যবাদ জানিয়ে জমিদার চৌধুরী লিখেছেন, "তার জামাকাপড়গুলোর কথা লিখেছেন? সেগুলো নিয়ে কি করবো? যদি পারেন তার ডায়েরীখানা রেজিস্টার করে পাঠিয়ে দেবেন। তাছাড়া তার সঞ্চিত দেড়শো টাকা? সে অনুগ্রহ করে তার সমবয়স্ক দরিদ্রদের দিয়ে দেবেন। আমার পাপের যে এতখানি শাস্তি পাবো কল্পনা করিনি। সান্ত্বনা জানিয়েছেন সেজন্য অজস্র ধন্যবাদ। পুত্রশোক কোন সান্ত্বনা মানে না।

তারপর থেকে আমি চাকর রাখি নি।

(দুই)

চাকর সম্বন্ধে অধ্যাপক সেনের অভিজ্ঞতা আরও গভীর। টিন থেকে খানিকটা তামাক বার করে পাইপে ভরতে ভরতে তিনি বলতে লাগলেন, "বছর পনেরো আগে এলাহাবাদ থেকে এম এ পাশ করে সদ্য কলেজে ঢুকেছি। ছেলেরা সবেমাত্র জুতোর মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ ছেড়ে একটু একটু লেক্‌চার নোট করতে আরম্ভ করেছে। এমন সময়ে এক সুপ্রভাতে শাদা কেম্বিসের জুতো, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি আর একটা খদ্দরের পাঞ্জাবী গায়ে এক ভদ্রলোক এসে হাজির—বয়স চল্লিশ থেকে ষাটের কোঠায়—আন্দাজ করা শক্ত—রীতিমত আহার, নিদ্রার অভাবে সমস্যাটা আরও জটিলতর হয়ে পড়েছিল। এসে বল্লে, "এখানে কলেজের মাস্টার মশাই কোথায় থাকেন জানেন মশাই?"

—আজ্ঞে বলুন।

—আমি বাঙলা দেশ থেকে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি। চাকরী চাই। তারিণী চক্কোত্তি নাম আমার। বরিশালে এহেন স্টীমার প্যাসেঞ্জার নেই তারিণী চক্কোত্তির রান্না খেতে আদর্শ হোটেলে যিনি একবার না চরণধুলো দিয়েছেন।

—তা বরিশাল ছেড়ে এখানে আসা কেন?

—আজ্ঞে আপনার কি দরকার? কলেজের মাস্টার মশাইকে একটু যদি ডেকে দেন তা হলে তারই কাছে নিবেদন জানাই।

—আমিই কলেজে পড়াই, বলতে পারেন আপনার বক্তব্য।

আপাদমস্তক একবার, দুবার, তিনবার দেখে নিয়ে হাঁ করে তারিণী আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বল্লে—আপনি সব কিছু পড়া শেষ ক'রেছেন—মানে বিলেতের পড়া পর্যন্ত?

বল্লাম, "হ্যাঁ, তা আপনার কি প্রয়োজন সেটা ঝটপট সেরে ফেলুন, আমাকে আবার ক্লাস নিতে যেতে হবে।

—কোন্‌ কোন্‌ ক্লাস?

আচ্ছা মুশ্‌কিলে পড়া গেছে তো। সকাল সকাল এ কি উপদ্রব?

—তা মশাই আপনার কি দরকার? কি প্রয়োজন আপনার বল্লেই তো পারেন, অক্রুর সংবাদের অবতারণিকা কেন?

পা দুটো জড়িয়ে অর্ধপক্ককেশ বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলো, এতো পাশ করেছো মাস্টার মশাই, তুমি কলেজে পড়াও, তুমি চটো না। পন্ডিত লোকেরা কি কখনও চটে?

—তা আপনি চান কি?

—তুমি আমাকে আপনি বল না মাস্টার মশাই। আমি যে শুধু তারিণী রাঁধুনী।

—তাতে কি হয়েছে? তা বেশ, তুমি রাঁধুনীর কাজ চাও বিকেলে এসো। কারুর বাড়িতে রাঁধুনী চাই কিনা খুঁজে দেখবো'খন।

—না, না, না। মাস্টার মশাই, তোমার বাড়িতে—কলেজের মাস্টারের বাড়িতেই আমি কাজ করবো। দেখো তুমি ভারী ভালো হবে আমার রান্না। অন্যদের বাড়ি হলে পিতৃ-পুরুষের ভিটে বরিশাল ছেড়ে আসবো কেন তোমাদের কাছে? এ্যাঁ ঠিক রাখবে তে

রাখলাম তারিণীকে। তারিণী সত্যি "আদর্শ হোটেল" খুলেছিল কিনা জা না—তবে রাঁধে ভালোই—খুব ভালো।

একদিন কলেজ থেকে এসে দেখি ঘ ইলেক্‌ট্রিক বাতির ভিতরই পিলসুজে ওপর প্রদীপ জ্বালিয়ে দরজা জানালা ব করে চারিদিকে ধূপের ধোঁয়ায় আঁধার ক প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে—বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে—সামনে মাটির ঘ ঘড়ার গায়ে পুরোনো নিমন্ত্রণ পত্র থে কাটা একখানা সরস্বতীর ছবি।

—সরস্বতী পুজো শেষ হয়ে গেল আ কাল থেকে রোজ মাইনে দিতে হবে মাস্ট মশাই। কোনো কোনো দিন একটু বে করে।

—বেশ বেশ কালকের কথা কাল ভা যাবে। কিন্তু তারিণী রোজ রোজ মাই নেবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মাস্টার মশাই।

—তা কি হিসেবে নেবে?

—আজ্ঞে দিনে একখানা করে এনসা ক্লোপিডিয়া বৃটেনিকা।

আমি হাঁ করে ওর দিকে তাকি রইলাম। দুপুর থেকে এইসব রাজে বন্য ফুল জোগাড় করেছে পুজোর উপহা লোকটা গাঁজা টাজা খায় না তো?

পরদিন সকালে চা দিয়ে অন্যদিনে মতন চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইলে বল্লাম, "কি হে আজ আবার কি পুজো?

—আজ্ঞে, হেঁ হেঁ হেঁ, মাস্টার মশ আজ কিন্তু আমার এনসাইক্লোপিডিয়া চা

খুব গুরুতরভাবে ওর কথাটা নিই নি কলেজ থেকে এসে দেখি অধীর আগ্র দরজার কাছে বসে রয়েছে তারিণী—এনে মাস্টার মশাই বইখানা?

লজ্জিতই হলাম। আনলেই তো হ বৃদ্ধের এ শিশুসুলভ আব্দারটা রক্ষা কর ক্ষতি কি ছিল?

ইউনিভার্সিটি রোডের ওপারেই কলেজ লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট আমিন তখনও বা যায়নি। বল্লাম এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটেনি লিখে দিতে আমার নামে। আমি খানিকক্ষণ তাকিয়ে কি ভাবলো, তার বইখানা বার করে দিল। বইখানা লাইব্রে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়া নিষেধ।

বইখানা নিয়ে শিশুর মতন লাফা শুরু করে দিলে তারিণী। বল্লে, "মাস্ মশাই এরকম ক'খানা শেষ করেছো তুমি

আমার আর ক'টা দিনই বা বাকী আছে? আহা হা যদি আগে তোমার এখানে চাকরীটা হত?

সত্যিই বলতে কি ওর সাথে বক্ বক্ করার অভিরুচি প্রবৃত্তি বা অবসর কিছুই আমার ছিল না। অবসরক্ষণেই তারিণী এন্‌সাইক্লোপিডিয়া নিয়ে আপন মনে পড়তে বসতো।

মাঝে মাঝে এসে প্রশ্ন করতো তারিণী, "মাস্টার মশাই রবীন্দ্রনাথ জিনিয়াস ছিলেন?

—হ্যাঁ

—আচ্ছা মাস্টার মশাই জিনিয়াস মানে কি?

—ডিক্‌শনারী দেখো।

—আচ্ছা মাস্টার মশাই 'নব নব উন্মেষ-শালিনী শক্তি' মানে কি?

—চলন্তিকা দেখো—

—কিছুই হল না, এ জীবনে কিছুই শেখা হল না; তুমি বলবে না?

মাঝে মাঝে এসে সত্যিই ভয়ঙ্কর বিরক্ত করতো তারিণী। আমার মাথায় অর্থনীতির আঁকা বাঁকা কার্ভগুলো ঘুরছে। কোন্‌টা কেমন করে আঁকতে হবে ঠিক করে নিচ্ছি এমন সময় এসে হাজির তারিণী, "মাস্টার মশাই,—"

—হাতে এন্‌সাক্লোপিডিয়া।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে যেতো আমার। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করতাম।

মাস শেষ হয়ে গেল। মাইনে দেবার সময়ে তারিণী বিপদে ফেল্লে আমাকে। কোন টাকা তার চাই না। মাইনে নেবে না সে।

—যদি পারো মাস্টার মশাই কিছুদিন পরে একখানা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটেনিকা কিনে দিও।

তারিণী জানে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটেনিকা থাকে শুধু কলেজে আর বড় বড় পণ্ডিতদের কাছে। তারিণী পণ্ডিত হবে।

দিন পনের পরের কথা বলছি। কাণ্ডটা এতখানি গড়াবে ভাবিনি। কলেজ থেকে এসে সবেমাত্র বসেছি। তারিণী এসে দাঁড়ালো সামনে,—সেই পুরোনো পোষাক—পায়ে শাদা কেম্বিস, হাঁটু পর্যন্ত ধুতী আর খদ্দরের একটা মোটা পাঞ্জাবী। এসে সজল নয়নে বল্লে—মাস্টার মশাই পাঁচ টাকা চার আনা দাও।

—পাঁচ টাকা চার আনা কেন হে? তোমাকে আমি তারও অনেক বেশী দেবো কিন্তু একি? এ পোষাক পরে চল্লে কোথায়?

—হরিদ্বারে। এ জীবনে কিছুই শেখা হল না। অনেক আশা করে তোমার কাছে এসেছিলাম কিছু শিখতে। এতদিনে এক-খানা পাতাও মুখস্থ হল না। তা হবে কি করে? তুমি তো আর পড়ালে না?

অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, এন্‌সাইক্লোপিডিয়া মুখস্থ করার দরকার নেই। বরং রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই এনে দিচ্ছি একখানা পড়তে পড়তে মুখস্থ হয়েও যেতে পারে। কে কার কথা শোনে? কোন্ অশুভক্ষণে কে ওর কানে এন্‌সাইক্লো-পিডিয়ার মন্ত্র দিয়েছিল কে জানে?

—এ জন্মে বিদ্যা অর্জন কিছুই হল না। উদ্যোগ করে দেখি যদি জন্মান্তরে নব নব উন্মেষশালিনী শক্তি বিকাশ লাভ করে।

তারিণী নিবেদন, চরণধুলো, পদার্পণ, বিকাশ, নব নব উন্মেষশালিনী শক্তি—কতকগুলো পাকা পাকা কথা চলন্তিকা থেকে গিলে খেয়েছিল—হজম করতে পারে নি।

ভূমিষ্ট হয়ে ওর জীবনের আদর্শ দেবতা কলেজের মাস্টারকে প্রণাম করে চলে গেল।

(তিন)

"আমার ভৃত্য চন্দোরের ইতিহাসটা কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময়কর—" অধ্যাপক সেন বলে চল্লেন।

যখন তখন তাকে দিয়ে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত যে কোন কাজ করিয়ে নেওয়া যেতো। কিন্তু সন্ধ্যের পর আর তার টিকিটি দেখার যো ছিল না। যতই প্রয়োজনীয় কাজ থাকুক না কেন, শ্রীমান চন্দোর ঠিক সন্ধ্যের পর সেই যে রীজের জঙ্গলের দিকের চাকর কুটীরে একবার ঢুকবে তাকে আর ঘরের বাইরে করে কার সাধ্যি? হ্যাঁ, দুদিন সে সেই ঘর থেকে বেরিয়েছিল নিজের ইচ্ছায়—একদিন হল চব্বিশে বৈশাখ, যেদিন বিভূতিবাবু এসেছিলেন রাণীকে সেতার শেখাতে। বৈশাখী ঝড় উঠেছিল বাইরে। ভিতরে এক মনে বিভূতিবাবু বাজিয়েই চলেছিলেন তাঁর সেতার। চন্দোর হাঁ করে অপলক দৃষ্টিতে সেতারের ঝঙ্কার গিলছিল যেন।

আর একদিন, যেদিন হাত থেকে পড়ে গিয়ে রাণীর সেতারটা ভেঙ্গে গেল। চুপটি করে উদাসভাবে চন্দোর বসেই রইলো যতক্ষণ পর্যন্ত রাণী না ঘুমুতে গেল।

কলেজের ক্লাসগুলো শেষ করে ইউনি-ভার্সিটি রোড্ ধরে পায়চারি করতে করতে খাইবার পাশের কাছাকাছি প্রায় চলে গিয়ে-ছিলাম। আসার সময়ে সিভিল লাইনস্‌'এ বন্ধুর বাড়িতে সান্ধ্য আসরে একটু দেরী হয়ে গেছিল। শীতটা একটু বেশীই পড়ছিল, ক'দিন থেকে বেরুতে পারি নি, ফিরতে রাত হয়ে গেল। রাস্তায় কুয়াশা ঘনতর হয়ে আসছিল। আকাশ থেকে রাস্তা পর্যন্ত কে যেন একটা ফাইন শাদা সিল্কের পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

রীজের চারিদিকের নাম-না-জানা গাছ-গুলো থেকে টপ টপ করে ঝরে পড়ছিল সমস্ত সন্ধ্যার টিপটিপে বৃষ্টির জমানো অশ্রু অর্ঘ্য। কোত্থেকে সেতারের একটা গৎ ধীরে ধীরে আসছিল ভেসে। বাড়ির দিকে অগ্রসরের সাথে সাথে সেতারের ঝঙ্কার ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। রাণী বাজাচ্ছে কি? উঃ কি করুণ আবেগপূর্ণ ঝঙ্কার তরঙ্গ। বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছিল না—এমন কি রাস্তার ওপারের ক্যাথেড্রালের ক্রসটাও না। দরজা খোলা ছিল। ঘরে ঢুকলাম।

—রাণী! রাণী!

—তোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি?

কোণের সোফায় হেলান দিয়ে রাণী কি পড়ছিল। তবে? তবে কোত্থেকে আসছে ভেসে ইমন কল্যাণের প্রাণমাতানো এ সুর-তরঙ্গ?

—কোত্থেকে এ তারের ঝঙ্কার আসছে রাণী? তুমি শুনতে পাচ্ছো না কি?

পরীক্ষার্থিনী পরীক্ষা প্রস্তুতির অপরাধেই এতক্ষণ এদিকে মন দেয় নি

—হ্যাঁ, কিন্তু জঙ্গলের দিক থেকেই তো আসছে। ওখানে তো কেউ থাকে না। বাঁ দিকের ফ্ল্যাগস্টাফে ওঠার রাস্তাও তো বেশ খানিকটা দূরে। অতদূরে থেকে কি আওয়াজ এখানে পৌঁছুতে পারে?

হাঁক দিলাম, "চন্দোর, চন্দোর ও চন্দোর!"

রক্তবর্ণ [illegible] চন্দোর উপস্থিত। বোধ হয় কাঁচা ঘুম ভেঙেছে গেছে!

—জঙ্গল থেকে বাজনার আওয়াজ আসছিল না?

—বাজনার আওয়াজ? কোন দিকের জঙ্গল থেকে?

—তোমার ঐ ঘরের দিকের জঙ্গল থেকেই তো মনে হল। ঠিক ধরতে পারছি না। শোনো না, ঐ ডাল ভাঙ্গা শিশু গাছটার তলা থেকেই তো মনে হচ্ছে—যেখানে বর্ষাকালে ময়ূর জোড়া রাণীর হাত থেকে খাবার খেতে আসতো

—কৈ না তো। কিসের বাজনা? কোন্ দিক্ থেকে? কিছুই তো শুনছি না।

রীতিমত আহাম্মক বনলাম। তাই তো! কোনো বাজনার আওয়াজই তো আসছে না। রাণী আমার দিকে জিজ্ঞাসাপূর্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো। ভয় পায়নি তো ও? অপটুদের পক্ষে মেয়েদের সামলানো বড় মুশকিল।

বল্লাম, হবে হস্টেলের কোন ছেলে। কাল খোঁজ নিলেই জানা যাবে। যতই নিয়ম বাঁধো ওদের কি তাতে বেঁধে রাখা যায়? বাড়ির পিছনে রাঁচীর গায়ে ওখানে যে জলের নতুন জোড়া ট্যাঙ্ক হচ্ছে সেখানে কুলি ছাড়া কি রাত্তিরে কেউ থাকে?

রাণী কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়েছে। পরদিন থেকে সন্ধ্যা থেকেই বাড়িতে আটকে রাখার ফন্দী আঁটলো—গণিতের কোর্সটা রিভিশন করার আগ্রহ ওকে হঠাৎ পেয়ে বসলো।

আমার আড্ডার অধ্যায়ে ফুলস্টপ পড়লো।

বন্ধু সুশান্ত কলকাতা থেকে এসেছিলো। প্রেসিডেন্সীর কৃতি ছাত্র। গভীর রাত পর্যন্ত বেশ কিছুক্ষণ অনেকদিন পর আড্ডা জমানো গেল। কলকাতায় আমরা বিদ্যাসাগর স্কুলে এক সাথে পড়াশুনো করেছি। শৈশবের ফেলে আসা দিনগুলো চোখের সামনে উঁকি ঝুঁকি মেরে বেশ একটা নস্টালজিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো।

রাত তখন অনেক। ক্যালেন্ডারের ভাষায় দিন হয়ে গেছে। শুতে গেলাম দুজনেই। ঘুম এসেছিলো কি? তখন বিদ্যাসাগর স্কুল কলেজের হাজার হাজার ছাত্র মিলে ব্যান্ড বাজিয়ে ওয়েলিংটন স্ট্রীট ধরে কলেজ স্কোয়ারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিদ্যাসাগরের মর্মরমূর্তিকে অভিবাদন জানাতে সমবেত হচ্ছি। কাল দরিদ্রনারায়ণ সেবা। হাজার হাজার ভিখারী আসবে—পন্ডিতমশাই, হেডমাস্টার মশাই ছুটোছুটি করছেন এদিক-ওদিক—ওরে ও নরুন, অরুণ তারা এদের এদিকে পায়েস ঢাল।

কিন্তু ও কাঁদে কে? পায়নি ও পায়েস? তবে? ওর ছেলে হারিয়ে গেছে? ভিখারীর সর্দার লাঠির বাড়ি মেরেছে বুঝি? কিন্তু না, লাঠি মারলে এত করুণভাবে সুর দিয়ে দিয়ে কাঁদবে কেন?

ঘুম ভেঙ্গে গেল। কান্না কিন্তু থামেনি। এখনও চলেছে ধীরে ধীরে ফুঁপিয়ে কান্নার বুক ফাটানো আর্তনাদ। কে কাঁদে? ধড়মড় করে লাফিয়ে বসলাম। সুশান্ত কখন উঠে গিয়ে জানালার ধারে বসেছিল। আমাকে উঠতে দেখে শুধু প্রশ্ন করলো, "মণি, কে বাজাচ্ছে রে? এত সুন্দর সেতার কে বাজায় এ জঙ্গলে?

আবার সেই সেতার! রাণীর ঘুম না ভাঙ্গে আবার। চন্দোর চন্দোর বলে ধীরে ধীরে ওর ঘরের দিকে বড় টর্চটা ফেলে ডাক দিলাম।

চন্দোরেরও বোধ হয় ঘুম ভেঙ্গে গেছিল। এসে হাজির হল। দুজন একই সাথে বলে উঠলাম—

—কে বাজায় রে?

—কি?

—শুনছিস না সেতারের ঝঙ্কার?

—এত রাত্তিরে কে বসেছে সেতার বাজাতে? ঘুমোও তোমরা।

—বলছি পরিষ্কার সেতার বাজ্ছিলো। তুই তো একটা কুম্ভকর্ণ, তুই তা শুনবি কোত্থেকে? কেবল ঘুম আর ঘুম।

—কোথায় বাজনা বলই না—

বাজনা থেমে গেছে। চন্দোর বিড় বিড় করতে করতে ঘুমুতে গেল। সুশান্তও বল্লে, "শোওয়া যাক্ মণি। তোর বাড়িটা কিন্তু ভারী সুন্দর। রাঁচীর উপর চারিদিকে গাছপালার মাঝে যেন "শ্যামলী।"

আমার মনে কিন্তু একটা প্রশ্নই ঘুরপাক খেয়ে বেড়াতে লাগলো। কে বাজায়?

দিনের অগণিত কাজ এবং অকাজের মাঝে সে রাতের প্রশ্নের অনুসন্ধান স্পৃহা কখন যে হারিয়ে গেল টের পাইনি। সেতার বাজনা শোনার নিমন্ত্রণ পেলাম।

বন্ধু বিনয় সেতার বাজনা শিখছে। অনেকদিন ধরেই অনুরোধ করেছে তাদের সেতারের আসরে একদিন রাণীকে নিয়ে যেতে। ভারতের এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী ওদের কর্ণধার। সেদিন যেন কিসের একটা ছুটি ছিল। বোধ হয় মহালয়া। সারাটা দিন প্রাণভরে আড্ডা দেওয়া গেল। বিকেলে বিনয় ধরলো—আজ যেতেই হবে ওদের জলসায়। কিছুতেই রেহাই নেই। সেতারের নামে রাণী তো পা বাড়িয়েই ছিল। আমিও তৈরী হয়ে নিলাম। বিনয়ের গাড়িতেই জলসাঘরে পৌঁছলাম। আজ বিশেষ জলসা। হলের বাইরেও একটা মাইক্রোফোন লাগানো ছিল। আমাদের আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে। জলসা আরম্ভ হয়ে গেছে। কে যেন বাজনা আরম্ভ করেছে। ইমন কল্যাণের সুরে সেতারের তারগুলো জীবন্ত হয়ে গভীর শ্রদ্ধার সাথে অনন্তের পায়ে নিজেদের লুটিয়ে দিচ্ছিল। পূর্ণ হলঘরে প্রবেশ করলাম।

মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ থেকে একটা বজ্র পড়লেও এতটা আশ্চর্য হতাম না। চোখ দুটো মুছে নিয়ে চশমা পরিষ্কার করে ভালো করে তাকালাম। না—ভুল তো নয়—এও বিশ্বাস করতে হবে? কিন্তু না-ই বা করি কি করে? ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ঠিক মাঝখানে বসে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো কপালের উপর নেড়ে নেড়ে শত শত মুগ্ধ দর্শকের সামনে সেতারের সুরের সাথে যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, সে যে আর কেউই না—আমাদেরই চন্দোর!

(চার)

তাল গাছের ছোট ডিঙায় কত খাল নদী পার হয়ে যেতাম সেতার শিখতে। একদিন দুদিন নয়, দশ দশটা বছর ধরে শেখার পর ওস্তাদ বল্লেন, "চন্দ্রশেখর, এবার তোমাকে সকলের সামনে বাজাবার অনুমতি দিলাম—শেখা যদিও সম্পূর্ণ হয়নি। ওস্তাদকে প্রণাম করে চলে এলাম। দশ বছরের সাধনা।

ওস্তাদের বাড়ির আকর্ষণ আমাকে চুম্বকের মতন টানতে লাগলো। যখন তখন, সময়ে অসময়ে আমি তাঁর বাড়ি ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলাম। সকালবেলার সেতার অভ্যাসের বন্দোবস্ত আমি ওস্তাদের বাড়িতেই করলাম। বিকেলেও। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতা এমনভাবে আমার ঘাড়ে চেপে বসতে লাগলো যে, আমার বাজনা উল্টো-পাল্টা হতে লাগলো। আর গোপন রইলো না—ওস্তাদ নন্দিনী কমলাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। যে ছিল ছ'বছরের ফ্রকপরা শিশু, আজ সে তার পূর্ণ যৌবন নিয়ে নন্দনবাগে দাঁড়ালো এসে আমার সামনে। কোন্ অজানা হাওয়ার পুলকিত স্পর্শে আমার হৃদয় নেচে উঠলো নবপল্লব মর্মর ছন্দে। আমি পরাজিত হলাম তার তীক্ষ্ম বাণে।

—চন্দ্রদা একটা ঝাঁকি দিয়ে দাও না জাম গাছটাতে, দেখো ওদের বাড়ির পারুর

কোঁচড় ভরে গেছে জামে। আমি কিছু পাচ্ছি না।

—ঝাঁকি কেন, চলো আমি গাছ থেকে তোমায় জাম পেড়ে দিচ্ছি। মাটিতে পড়লে পাকা জামের কি কিছু থাকে?

দড়ি বেঁধে নামিয়ে দিলাম পিসিমার ফুলের সাজিভরা জাম। জাম নামালাম। নিজেকে নামাতে পারলাম না। দড়াম করে ডালটা ভেঙে পড়লো পুকুরের দক্ষিণ ঘাটের পদ্মবাগানের মাঝখানে। আমি তখন চারিদিকে সভয়ে তাকিয়ে দেখ্‌ছি কেউ দেখে নি তো আমার এ অধঃপতন?

কমলা হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো—আজ সকালে কাকটা যখন ব্রতের চাল খেয়ে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল, তখনই জেনেছি আজ একটা অমঙ্গল ঘটবে। তুমি কেন গাছে উঠতে গেলে? আমি এখন কি করি?

—কি আবার করবে? বাড়ি যাও জাম নিয়ে। আমার মোটেই লাগেনি। যাও। আমি যাই বাড়িতে ওষুধ লাগাতে হবে।

কিছুই লাগাতে হয়নি। পদ্মবাগানের কোমল তৃণশয্যায় পড়লে কি আঘাত লাগে?

পরদিন সকালে একটু তাড়াতাড়িই চলে গেলাম। ওস্তাদ তখন মন্দিরে উপাসনা করছেন। কমলা রাস্তার দিকে হাঁ করে নির্ণিমেষ চোখ দুটো ফেলে বসেছিল বারান্দায়। ছুটে এলো—

—কৈ? ওষুধ লাগাওনি চন্দোরদা? তুমি আমার একটা কথাও কি শুনবে না?

ওর শাসনে হাসি পায়। সেদিনই অনুরাগের প্রথম দাগ পড়েছিল কি না কে জানে?

হঠাৎ ওস্তাদ উঠে পড়ে লেগে গেলেন বিয়ের বন্দোবস্ত করতে। ওস্তাদ খুব গম্ভীরতার সাথে আমাদের বল্লেন, দেখো হে গাঁয়ের সকলে বলছে 'ওস্তাদ আর কদিন রাখবে ঘরে? মেয়ের বয়সও তো হয়েছে। একটা বন্দোবস্ত কর। তা আমি প্রায় সবই বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। জামা-কাপড়, গয়নাপত্তর—এমন কি খেজুরী গুড় পর্যন্ত কেনা হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছো, আমার মরবার ফুরসৎ নেই। এখন বাকী রয়েছে শুধু একটা বর খোঁজা।

অপটু ওস্তাদ! ঐ কোণের তারআলা যন্ত্রটা ছাড়া এ দুনিয়ার ও আর কি জানে?

বর সংগ্রহে কষ্ট বিশেষ কিছুই হল না। চেলীর শাদা কাপড়খানা প'রে নিস্তব্ধ গম্ভীর রাতে কমলাকে সমস্ত জীবনের জন্য গ্রহণ করলাম। কোনো সানাই বাজলো না, কোনো ডে লাইটের সারি দিয়ে পান্সি নৌকো এলো না; জমিদারের ছেলে বংশাভিজাত্যের অবমাননা করেছে—কে আসবে জমিদারের হুকুম অমান্য করে? হোক্ না কেন সে ওস্তাদ-দুহিতা—পিঙ্গলাকাঠির জমিদার চৌধুরীর গৃহবধূ হবে সে? মান থাকে?

তাতেও দুঃখ আমার লাগে নি। কমলাকে নিয়ে কলকাতায় এলাম। সেতার শেখাবার স্কুল খুল্লাম। ছাত্র-ছাত্রীর কলরবে আমার গৃহ হয়ে উঠলো মুখরিত। চঞ্চলা কমলা কিন্তু ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে উঠলো। সমাজের এ ফাঁকা আভিজাত্যের দম্ভের কাছে কি সে চেয়েছিল নিজেকে সমর্পণ করতে? জানি না।

রোজই ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে ছুটির পর বাড়ি গিয়ে দেখি সে জীবন্ত কমলা যেন প্রাণের প্রাচুর্য হারিয়ে ফেলতে বসেছে। তার এ ক্লান্তি কিসের?

—বাজাও না, তোমার সেই ইমন্-কল্যাণের সুরটা।

কমলা ইমন্-কল্যাণ ভালবাসে। কল্যাণময়ী কমলা। সমাজের অর্থবিহীন দম্ভ চূর্ণ করতে যে তীব্র কশাঘাত করেছিলাম, সে আঘাত কখন কমলাকে আহত করেছে গিয়ে।

ডাক্তার বল্লেন, "এ হৃদ্‌রোগ—সারানো শক্ত। মনে আনন্দ ফিরিয়ে আনার চেয়ে এর জন্য বড় ওষুধ আর নেই।

ওস্তাদ এলেন। সেতারের স্কুল বন্ধ করে দিলাম। অনুতপ্ত পিতা এলেন তাঁর শাসনের তীব্রতাকে ক্ষমার জলে ধুইয়ে দিতে।

কমলা তখন ধীরে ধীরে জ্ঞানশক্তি হারিয়ে ফেলছে। ডাক্তার, ওস্তাদ, পিতা তিনদিকে বসে। আমি বসে নীচে মেঝের উপর।

—কমলা, কমলা, তোমার ইমন-কল্যাণ; শোনো কমলা, শোনো।

মনে হ'ল কমলা যেন আমার দিকে ফিরে তাকালো—জ্ঞান ফিরে আসছে? হ্যাঁ ঠিক তাই; জ্ঞান ফিরে এসেছে। প্রাণপণে বাজিয়ে চল্লাম ইমন-কল্যাণ। চোখ বন্ধ করে একই সুরের পুনরাবৃত্তি করে বাজিয়েই চল্লাম। তানসেনের মেঘমল্লার বৃষ্টি এনেছিল—আমার এ দীর্ঘ পনেরো বছরের সাধনা ঢেলে দিলেও কি একজনের প্রাণে সাড়া আনতে পারবো না? এ যে তারই প্রিয় সুর। বাজনা থামলেই আবার তার জ্ঞান হারিয়ে যাবে।

কতক্ষণ বাজিয়েছি, জানি না। বাজাতে বাজাতে কখন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলাম, তাও জানি না। হঠাৎ চোখ খুলে দেখি ঘরে কেউ নেই। ঘর খালি। ডাক্তার, ওস্তাদ, পিতা—কেউই না। কমলাও নেই। কমলাও আমাকে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে গেল? ঘরে কেউ নেই—রয়েছে পড়ে শুধু অপরাধীর মত হতবাক্ এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার একমাত্র বন্ধু এই সেতারটা। ধীরে ধীরে ওকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—

চক্রদত্ত

আজকাল উড়ো জাহাজের সংখ্যা যেমন বেড়ে চলেছে তেমনি দুর্ঘটনাও সেই অনুপাতে ঘটছে। অবশ্য বিজ্ঞান এর প্রতিকারের চেষ্টা করে চলেছে। উড়ো জাহাজের অঘটন দুর্ঘটন নিবারণ করার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় মাটির থেকে আকাশে খবরাখবরের আদান প্রদান। উড়ো জাহাজে উড়ো খবর প্রেরণ করলে চলে না। তাই বেতারের সাহায্যে খবর আদান প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হয়। এতদিন পর্যন্ত যে ধরণের বেতার যন্ত্র ব্যবহার করা হতো তাতে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট চারিটি দিকেই খবরের আদান প্রদান চলতে পারতো। যে সব এরোপ্লেন আকাশে উড়তো তারা ঐ নির্ধারিত চারিদিকের যে কোনও একটি দিকে থাকতে চেষ্টা করতো কারণ, তাহলেই মাটির খবর পেতে পারতো এবং আকাশের খবর দিতে পারতো। এরোপ্লেনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থেকে চলাচল করা সম্ভব হলো না। আজকাল এইজন্য বার্তা আদান প্রদানের একটি নতুন ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বার্তাবাহী যন্ত্রটিকে 'ওমনিরেঞ্জ' বলে। 'ওমনি' কথাটির অর্থ 'সমগ্র'। সুতরাং এই ওমনিরেঞ্জ যন্ত্রে বায়ুমণ্ডলের সর্বদিকেই খবরের লেন দেন চলতে পারে। মাটির ওপর এই ওমনিরেঞ্জটি দেখতে অনেকটা একটি কিনারাওয়ালা টুপির মত। আর এর ওপর ঠিক মাঝখানে একটি পনর ফিট উঁচু গম্বুজের মত থাকে। আগেকার বেতার ব্যবস্থায় অনেকগুলো অসুবিধা ছিল। প্রথমত এটি মৃদু তরঙ্গে কাজ করতো, কিন্তু বজ্রাঘাত বা ঝড়-ঝাপটার সময় যখন এই যন্ত্রের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন হতো তখনই এটি প্রায় অচল হয়ে যেতো। এছাড়া এরোপ্লেনগুলি যদি ঐ নির্ধারিত চারিদিকের মধ্যে না থেকে কোনও কারণে দিক্‌-ভ্রষ্ট হয়ে পড়তো তাহলে আবার ঐ নির্দিষ্ট পথে ফিরে যাওয়া তাদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। ওমনিরেঞ্জ ব্যবহারে এত সব অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। প্রধানত এর সাহায্যে খুব উচ্চ তরঙ্গেও খবর আদান প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া দিক্‌ সম্বন্ধে চালককে খুব বেশী হুঁসিয়ার হতে হয় না বলে জাহাজ চালনার প্রতি বেশী মনযোগী হতে পারে আর ফলে দুর্ঘটনাও কম হয়। মাটির থেকে অল্প দূরত্বে বা বেশী দূরত্বেও ওমনিরেঞ্জে খবর আদান প্রদান চলতে পারে। জমি থেকে ৫০০ ফিট ওপরে এবং বায়ুমণ্ডলের ত্রিশ মাইলের মধ্য থেকে আরম্ভ করে বিশ হাজার ফিট উর্ধ্বে এবং ২০০ মাইল পরিব্যাপ্তির মধ্যের খবর আদান প্রদান চলতে পারে।

টুপির মত দেখতে ওমনিরেঞ্জ

সাধারণ রেডিওর ডায়াল ঘুরিয়ে আমরা যেমন কোন স্টেশন বা কত ওয়েভ, মিটার ঠিক করি ওমনিরেঞ্জেও ঠিক ঐ রকম ব্যবস্থা আছে। এই ওমনিরেঞ্জের ডায়ালটি ৩৬০ ডিগ্রীতে ভাগ করা আর তার সঙ্গে একটা কাঁটা থাকে। কোনও উড়ো জাহাজের চালক নির্দিষ্ট কোনও স্থানে যেতে হলে উড়ো জাহাজের জন্য প্রস্তুত ম্যাপটি দেখে নিয়ে কোন ডিগ্রীতে সেই স্থানটি অবস্থিত এবং কত তরঙ্গে ঐ স্থানে ওমনিরেঞ্জটি কাজ করবে দেখে নিয়ে ডায়ালের কাঁটাটি সেই মত ঘুরিয়ে নিয়ে এয়ার ফোনটি কানে লাগিয়ে নিয়ে দেখে নেয় যে, ওমনিরেঞ্জটি ঐ অবস্থায় ঠিক মত কাজ করছে কিনা। এরপর কাঁটাটি ঐভাবে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে উড়ো জাহাজ চালনা করতে থাকে। এর মধ্যে যদি সে দেখে যে, ঐ কাঁটাটি ডান দিকে বা বাঁদিকে হেলে পড়েছে, তাহলে বুঝতে পারে যে তার উড়ো জাহাজ ঐ দিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে। এইভাবে নির্ধারিত গতি অনুসারে সে স্বচ্ছন্দে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারে।

*

উড়ো জাহাজ চালানের চেয়ে উড়ো জাহাজ চালানোর শিক্ষা দেওয়া বেশী কষ্টকর। শিক্ষক এবং শিক্ষানবীশকে সব সময় সজাগ থাকতে হবে—কারণ যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সাধারণ উড়ো জাহাজ চালানোর চেয়ে আবার জেট্‌ চালিত উড়ো জাহাজ চালানো শিক্ষা করা আরও কষ্টকর। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য একটা নতুন উপায় বার হয়েছে। জেট উড়ো জাহাজের চালকের কেবিনের মত একটা কেবিন মাটির ওপর তৈরী করে তার মধ্যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কেবিনের ভেতর বসার সঙ্গে সঙ্গে কেবিনের মাথার ওপরকার ঢাকনা বন্ধ হয়ে যায় এবং আকাশে ওড়বার সময় যে রকম বায়ুর চাপ এবং গতি ইত্যাদি হয়, সমস্তই এই মাটির ওপর বসান কেবিনের ভেতর সৃষ্টি হয়। চালকের যন্ত্রপাতিও ঠিক আকাশে ওড়বার মত সমস্ত কিছুর নির্দেশ দিতে থাকে। এই ধরণের কেবিনের মস্ত বড় সুবিধা হচ্ছে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ইলেক্‌-ট্রিকের সাহায্যে চলে বলে খরচ কম হয় এবং শিক্ষক একসঙ্গে দু তিনজন শিক্ষানবীশকে নিয়ে কেবিনের মধ্যে বসে শিক্ষা দিতে পারেন, যেটা আকাশে চালানোর সময় সম্ভব হয় না।

সাহেব বিবির দেশে

নরেন্দ্র দেব

ইতালী—রোম—আধুনিক ও প্রাচীন

রোমে পৌঁছতে ট্রেন এক ঘণ্টা লেট হয়ে গেল। কথায় বলে 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়!' একেই গাড়িতে বেজায় ভীড়। রোমে পৌঁছবার জন্য প্রতি মিনিটটি গুণছি, এমন সময় রোমের প্রায় কাছাকাছি এসে গাড়ি গেল আটকে। 'লাইন ক্লিয়ার' নেই। আমাদের ট্রেন ইনস্পেক্টার নেমে গেলেন। ড্রাইভার নেমে গেলেন। গার্ডও নেমে গেলেন। পথের মাঝে পরিত্যক্ত ট্রেনখানির সঙ্গে আমরাও যেন অনাথ হয়ে পড়ে রইলাম। উৎসাহী ও অল্পবয়সী যাত্রীরা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য যতটা না হোক হাত-পা-গুলো একটু খেলিয়ে নেবার জন্য ঝপাঝপ্ গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। গাড়ি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে দুপাশে শুধু জঙ্গল। যাঁরা তামাসা দেখতে নেমে গেলেন আমরা তাঁদের জায়গায় সেই ফাঁকে একটু আরাম করে বসলাম। সুটকেসের ধারটা যে তেমন স্বাচ্ছন্দ্যকর আসন নয়, এটা কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ উপলব্ধি করতে পারছিলাম।

কতক্ষণ পরে ট্রেন পরিচালকবর্গের মধ্যে একজন ফিরে এসে খবর দিলেন, আমাদের গাড়ির ঠিক পূর্ববর্তী একখানি ট্রেন হঠাৎ লাইনচ্যুত হয়ে পড়েছে। তাকে পুনরায় স্বপথে প্রতিষ্ঠিত করবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চলছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই গাড়ি চালু হওয়ার সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিদারুণ দুর্ভাবনা নিয়ে আমরা অতি উৎকণ্ঠিত হয়ে গাড়িতে অপেক্ষা করছিলাম। প্রতি পাঁচ মিনিট সময়কেই মনে হচ্ছিল এক ঘণ্টার উপর হয়ে গেল যেন! অবশেষে গাড়ি চললো। রেলযাত্রীরা করতালি দিয়ে হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো। যেন পুরীর যাত্রীরা গাড়ি থেকে জগন্নাথের মন্দির দেখতে পেয়েছে।

বহু শতাব্দীর অগণিত ঘটনার ইতিহাস পরিকীর্তিত রোমের সুপ্রাচীন ভূমিতে যখন গিয়ে নামলাম, রাত্রি আটটা বেজে গেছে। ঠ্যালা গাড়ির কুলির 'হুইলব্যারো'য় মাল চাপিয়ে তাকে নিয়ে বেরুলাম হোটেল খুঁজতে। রোমের রোমে রোমে তখন যাত্রীর ভীড়। 'হোলিইয়ারের' পুণ্যার্থীরা সেখানে অনর্থ বাধিয়ে বসেছে। একটার পর একটা হোটেলে যাই আর 'স্থান নেই' শুনে বিষণ্ণ মুখে ফিরি। পর পর পাঁচটা হোটেলে বিমুখ হওয়ার পর অবশেষে যে হোটেলটিতে শ্রীমতীর বচনপ্রভাবে আমাদের স্থান মিললো সে হোটেলটির নাম 'সান্‌রেমো'। 'হোটেল য়ুনিভার্সো'র ঠিক সামনে বেশ বড় ভাল হোটেল। সান্‌রেমোর ম্যানেজারের দেশাত্মবোধ আছে দেখা গেল। শ্রীমতী তাঁকে বললেন, "দেখ সিগ্‌নোর, আমরা এখান থেকে আট হাজার মাইল দূরস্থ পৃথিবীর আর একপ্রান্ত থেকে এসেছি তোমাদের দেশে অতিথি হয়ে। এই 'হোলি-ইয়ারে' তোমরা যদি দূরদেশবাসীদের দু'দিন থাকার জন্য ব্যবস্থা করে না দাও, আমরা কোথায় যাবো বলো? আমাদের দেশে গেলে কিন্তু তোমাদের কখনও কোনও জায়গা থেকেই ফিরতে হবে না। কেননা, অতিথিরা আমাদের কাছে দেবতা স্বরূপ! আজ রাত্রের মতো আমাদের একটু ব্যবস্থা করে দাও, কাল সকালে আমরা অন্যত্র কোথাও একটা বাসস্থান ঠিক করে নেবো কিংবা এখান থেকে চলে যাবো। বিদেশী অতিথিকে ফিরিয়ে দিলে ইতালির সুনামে কলঙ্ক হবে যে!"

ম্যানেজার এই মোক্ষম বচনে একটু নরম হয়ে বললেন, "এক ভদ্রলোক আমার হোটেলে একটি 'থ্রী-বেড রুম' আগে থেকেই রিজার্ভ করে রেখেছেন। সেই ঘরে আজ রাত্রের মতো আপনারা থাকতে পারেন, কিন্তু কাল সকালে অতি অবশ্য ছেড়ে দিতে হবে।" আমরা 'তথাস্তু' বলে সেখানেই গাড় প্রবেশ করলাম। চুক্তি হল, দৈনিক ঘরভাড়া দিতে হবে দু হাজার পাঁচশ' লীরা আর খাওয়া 'সান্‌রেমো' রেস্তোরাঁতেই করা চলবে। প্রতি তিনপদ 'ব্রেক ফাস্ট' 'ডিনার' বা 'লাঞ্চ' মাথাপিছু পাঁচশ' লীরা করে পড়বে। অতিরিক্ত যে যা খাবে তার আলাদা দাম দিতে হবে। বিনা বাক্যব্যয়ে তা শিরোধার্য

ত্রেভীর ফোয়ারা
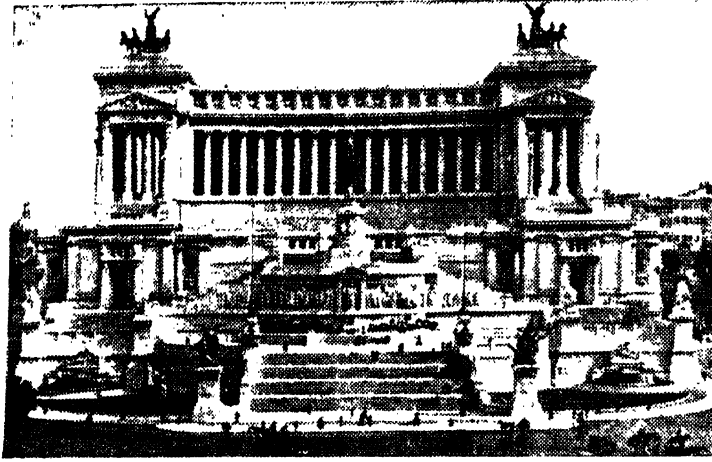
ভিক্টর এমানুয়েল স্মৃতিসৌধ

করে নিলাম। শ্রীমতী এগিয়ে না এলে হয়ত এখান থেকে ফিরতে হত।

তিনতলার উপর ঘরটি ভাল। সঙ্গে বাথরুম সংলগ্ন আছে। ডিনারে যা খেতে দিলে তা উৎকৃষ্ট এবং সুস্বাদু। মনে মনে কামনা করলাম 'ভদ্রলোক কাল যেন না আসেন।' সময়ে সময়ে প্রার্থনা আন্তরিক হলে ভগবানের কানে পৌঁছায়। পরদিন খবর পেলাম ভদ্রলোক 'তার' করেছেন—বিশেষ কাজে আটকা পড়েছি আজ আর যাওয়া হল না। কাল যাবো। অতএব আর একদিন সময় পাওয়া গেল। ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আর কাল বিলম্ব না করে হোটেলে বসেই এক্সকার্সান বাস ঠিক করে ফেললাম। দু দিন ধরে সকালে বিকেলে আমাদের চারিদিক ঘুরিয়ে সারা রোম শহরটি দেখিয়ে আনবে। দৈনিক মাথাপিছু দু হাজার লীরা দক্ষিণা।

সকালে প্রাতরাশের পর গাড়ি এসে আমাদের হোটেল থেকে যখন তুলে নিয়ে গেল তখন ন'টা বেজে গেছে। যেতে যেতে আরও একাধিক হোটেল থেকে এ'রা যাত্রী সংগ্রহ করলেন। প্রকান্ড মটোর কোচ প্রায় ভরে গেল। আমাদের সকলের [illegible] এক একখানি ইংরাজীতে ছাপা সচিত্র ভ্রমণ সূচী দিয়ে গেল। তাতে দু'দিনই সকালে বিকালে কোথায় কোথায় যাওয়া হবে তার ফর্দ দেওয়া আছে। শুধুই নামাবলী। *কোনও বর্ণনা নেই। বুঝলাম সেটা গাইড আমাদের বুঝিয়ে দেবেন।* প্রথম দিন সকালে আমরা গেলাম হাল আমলের মডার্ন রোম দেখতে। কি কি দেখলাম তার বিশদ বর্ণনা দেবার স্থানাভাব। কারণ, যা যা দেখেছি সবই বলবার মতো! তবে ওরই মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যেসব দ্রষ্টব্য কেবল তারই একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিচ্ছি এখানে। কিন্তু তার আগে বোধহয় আপনাদের স্মৃতিশক্তিকে সক্রিয় করে তুলবার জন্য অল্প একটু রোমের ইতিহাস দেখে নেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

সপ্তগিরি পৃষ্ঠে স্থাপিত এই প্রাচীন নগরী রোম বিশেষজ্ঞদের মতে দু' হাজার দু'শো বছর আগে গড়ে উঠেছিল। কবিরা একে বলেন—'হ্রস্ব-বিশ্ব' (টাইনি ওয়ার্লড্), বলেন 'ধ্রুবপুরী' (ইটার্নাল সিটি). কবি বাইরন রোমকে 'হিরণ্যগর্ভ নগরী' (সিটি অফ্ দি সৌল) ব'লে এর স্তুতিগান গেয়েছিলেন। ধর্মপ্রাণেরা একে বলেন 'পুণ্যধাম' (হোলি সিটি)। মহামানব যীশু তাঁর খৃষ্টধর্ম নিজে ও শিষ্যমুখে প্রচার করেছিলেন বটে, কিন্তু সেই খৃষ্টধর্মকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এই রোম। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির জনক, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতকলার প্রথম সাধক রোম তার ললাটে লিখে রেখেছে মানুষের শক্তির, মানুষের মহত্ত্বের গৌরবময় ইতিহাস। মানুষের মতোই তা অনাদ্যন্ত। সাতটি পাহাড়ের পর্বতাকার আর এখন নেই। দু হাজার বছর ধ'রে চাঁচা ছোলার ফলে প্রায় সমতল হ'য়ে এসেছে। তবে এর উঁচু নিচু পথ ঘাট থেকে বোঝা যায়, এটা পার্বত্য প্রদেশই ছিল।

একদা তরুণ বয়সে রোমের ইতিহাস প'ড়ে যে স্বপ্ন জেগে উঠেছিল সেই কিশোর মনে, আজ পরিণত বয়সে রোমের রাজপথে দাঁড়িয়ে কেবলই মনে হ'চ্ছে সত্যই কি এসেছি সেই বিশ্ববরেণ্য, বিশ্বস্তুত রোমের ঐতিহাসিক অঙ্গনে। যেখানে একদিন রোমের বীরপুত্র জুলিয়াস্ সীজার তাঁর অমূল্য জীবন হারিয়েছিলেন, ঋষি সেণ্ট পীটার তাঁর শেষ রক্তবিন্দু দান করেছিলেন, মহামান্য পোপের অপ্রতিহত প্রভাবে যে রোম একদিন পৃথিবীর মহাতীর্থ হ'য়ে উঠেছিল, যে রোমে আগুন দিয়ে সম্রাট নীরো একদিন আনন্দে বেহালা বাজিয়ে ছিলেন। যার কলোশিয়ম, যার ফোরম, যার গ্ল্যাডিয়েটার একদিন আমাদের কল্পনাকে উত্তেজিত করে তুলতো, আজ এসেছি তা'কে দুই চক্ষুভরে প্রত্যক্ষ দেখে যাবার জন্য। আমাদের সেই পুঁথির পাতায় পড়া যৌবনের পরিচিত রোমের রাজপথে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেহমন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিল। রোমে এসেছি আমরা—একথা ভাবতেও কত যে ভাল লাগছিল!

রোমের যে-সব দ্রষ্টব্য এ'রা আমাদের আধুনিক ব'লে দেখালেন সেগুলির অধিকাংশই তিন চারশো বছরের পুরাতন। রোমের বয়সের তুলনায় আধুনিক বটে। যেমন—বারবেরিনী প্রাসাদ, ট্রাইটন ফোয়ারা, ভিলা বর্গেস্, বিচার-ভবন (প্যালেস অফ জাস্টিস) চিয়েসা দেল যেশু' অর্থাৎ 'খৃষ্ট মন্দির', নদীচতুষ্টয়ের উৎস, লাইট হাউস, জাসেপে গ্যারিবল্ডি ও অ্যানিতা গ্যারিবল্ডির মূর্তি, রোমের বিশ্ববিদ্যালয়, পিয়াজা দেল পোপোলো', নৃপতি দ্বিতীয় ভিক্টর ইম্যানুয়েলের স্মৃতি, 'পিয়াজা ভেনেজিয়া' রাজপথ, মোজেস্-এর ফোয়ারা ও মূর্তি, ফোরো ইতালিকো' (খেলাধূলার স্টেডিয়াম), নায়াদের ফোয়ারা, কুইরিনেল প্রাসাদ ও ত্রেভী ফোয়ারার নাম করা যেতে পারে। আরও অনেক কিছু উল্লেখযোগ্য ছিল কিন্তু বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে।

বারবেরিনী প্রাসাদ তৈরি হতে আরম্ভ হয় পোপ অষ্টম উর্বানের আমলে, স্থাপত্য-শিল্পী মর্দানোর পরিকল্পনা অনুসরণে। কিন্তু শেষ হয় ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে শিল্পী বরমিনি ও বের্নিনীর সহযোগিতায়। এর প্রবেশদ্বারের দু'ধারে যে দু'টি মূর্তি অলংকৃত স্তম্ভ আছে তার শোভা অতি অপূর্ব। এই প্রাসাদ সংলগ্ন চত্বরে বা অঙ্গনে 'ট্রাইটন ফোয়ারা'। এটিকে 'মৎস্য-রাজের উৎস' বলা যেতে পারে। একটি অর্ধমৎস্যাকৃতি জলদেবতা তাঁর অদ্ভুত এক বাহনের পিঠে ব'সে মুখ উঁচু ক'রে দু'হাতে সুরাপাত্র তুলে ধরে পান করছেন।

বারবেরিনী প্রাসাদের পিছনে আরও উপর দিকের রাস্তায় মোজেসের ফোয়ারার শিল্পী প্রসপেরো আন্টিকীর তৈরি বিরাট এক মোজেসের মূর্তি আছে। এখানে জনপ্রবাদ যে, এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার দিন যখন মূর্তির উপর থেকে আবরণ উন্মোচন করা হয়, এর রূপ দেখে সমবেত দর্শকবৃন্দ নাকি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করে ওঠেন। যার ফলে শিল্পী মর্মান্তিক আহত হয়ে শীঘ্রই ভগ্ন হৃদয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সুগঠিত সুন্দর উপাসনা মন্দির ও নানা শিল্পকলা মণ্ডিত জলের উৎস রোমের চারিদিকে অসংখ্য রয়েছে। আর প্রাচীন রোমান যুগের স্তম্ভ, গৃহ, মন্দির, মূর্তি ও নানা শিল্পমণ্ডিত বস্তুর ধ্বংসাবশেষও রোমের সর্বত্র চোখে পড়ে। ত্রেভী ফোয়ারার জল অতি নির্মল এবং স্বাস্থ্যকর। নানা মূর্তি ও অলংকরণে মণ্ডিত প্রাসাদ-মুখের (ফেকেড্) ন্যায় শিল্পসমৃদ্ধ বিরাট এই উৎস। মধ্যে জলদেবতা নেপচুনের প্রকাণ্ড মূর্তি, তাঁর দু' পাশে 'স্বাস্থ্য' ও 'উর্বরতার' মূর্তি স্থাপিত রয়েছে। এই ফোয়ারা সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে, এই ফোয়ারার জল যে পান করবে বা এর জলে যে পয়সা ফেলবে তাকে নিশ্চয় আবার রোমে ফিরে আসতে হবে। আমরা তাই শুনে অবশ্য জল পান করতে সাহস হল না, তখনি তিনজনে তিনটি 'টাপেনস' (দু' পেনি) ফেলে দিলাম জলে। কারণ, ইতালির কোনও ধাতু মুদ্রা আমাদের কাছে ছিল না। আমাদের সঙ্গের যাত্রীরাও অনেকে অনেকরকম মুদ্রা ফেললেন। আমাদের পূর্বগামী যাত্রীরাও অনেকে অনেক রকম মুদ্রা ফেলে গিয়েছেন দেখলাম। স্বচ্ছ ও অগভীর জলের মধ্যে সেগুলি সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনেক পয়সা টাকা জলে প'ড়ে রয়েছে, কাড়াকাড়ি ক'রে কেউ তুলে নেয় না ওদেশে। 'ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের' ন্যায় একটি পৌরাণিক গল্পও জড়িত আছে এর সঙ্গে। রোমান বীর মহাবল অগ্রিপ্পা সর্বপ্রথম রোমে হরণ ক'রে নিয়ে এসেছিলেন কুমারী জলকন্যাকে একটি পয়ঃপ্রণালী খনন করে। ফোয়ারাটি ১৭৩৫ খৃঃ অব্দে পোপ দ্বাদশ ক্লেমেন্টের আমলে শিল্পী সাল্‌ভী নির্মাণ করেছিলেন শিল্পী বের্নিনী স্কুলের আরও অনেকে একে অলংকৃত করেছেন।

'ভিলা বর্গেস' রোমের একটি অনুপম সুন্দর উদ্যানভবন। এটি দেখে বোঝা যায়—রোমের মোহন্ত মহারাজেরা একদা কত উদার বিলাসী ছিলেন এবং সেদিনের শিল্পীরা কত সুনিপুণ ছিলেন। এরকম অনুপম উদ্যান বাটি নাকি পৃথিবীর আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এর ইতিহাস হ'চ্ছে বর্গেসীয় পোপ পঞ্চম পল যখন মোহন্ত মহারাজরূপে নির্বাচিত হলেন, তখন তিনি তাঁর এক তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে মোটা টাকা মাস-হারার ব্যবস্থায় একেবারে 'কার্ডিন্যালে'র পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই কৃতজ্ঞ ভাইপোর ইচ্ছায় তদানীন্তন ইতালির শ্রেষ্ঠ শিল্পী ফায়ামিংগো এই অপরূপ উদ্যান বাটির পরিকল্পনা করেছিলেন। এটিকে সে সময়ের লোকেরা বলতো 'প্রীতির স্বর্গ!' (প্যারাডাইজ্ অফ্ ডিলাইট!)। এই ভিলা বর্গেসের মধ্যে প্রসিদ্ধ জার্মান কবি গ্যয়তে ও প্রসিদ্ধ ফরাসী কবি ও কথাশিল্পী ভিক্টর হিউগোর দু'টি চমৎকার প্রতিমূর্তি আছে। হিউগোর চেয়ে গ্যয়তের মূর্তিটি যেন বেশী সুন্দর লাগে! এখানে বর্গেসদের মিউজিয়ম ও চিত্রশালাও রয়েছে। ইতালির তদানীন্তন তরুণ শিল্পী বের্নিনীর হাতের কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভাস্কর্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এখানে আছে। যেমন কবি ভার্জিল বর্ণিত ট্রয়ের অগ্নিদহনের বর্ণনায় প্রভাবিত শিল্পী বের্নিনীর গড়া 'আংকাইজ ও আস্কানিয়োকে নিয়ে 'এনীয়ার পলায়ন।' 'ডেভিডে'র বাটুল নিক্ষেপ,' 'প্রসারপাইনের উপর পাশবিক অত্যাচার' এবং 'এপোলো ও ডায়নে'। টিশিয়ান, র‍্যাফায়েল প্রভৃতি বড় বড় চিত্রকরের আঁকা বহু প্রসিদ্ধ চিত্র আছে।

স্টেডিয়ম—ক্রীড়া ক্ষেত্র

টাইবার নদীর তীর ধরে' আমরা এসে পড়লাম ডিউক্ দায়োস্তা সেতুর সামনে 'ফেরো ইটালিকো'র কাছে। শ্বেত মর্মর প্রস্তরে নির্মিত রোমের এই খেলাধুলোর আধুনিক স্টেডিয়ামটি ভারি সুন্দর। এটিকে ঘিরে প্রমাণ মানুষের আকারের ষাটটি ষাট রকম খেলোয়াড়ের শ্বেতপাথরের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়েছে। এই স্টেডিয়ামের কাছেই একটি শ্বেতপাথরের ফোয়ারা আছে, এটিকে বলে 'ভূগোল ফোয়ারা' (ফাউন্টেন অফ্ দি গ্লোব)। প্রকাণ্ড একটি শ্বেতপাথরের

বল, তার চার পাশে শ্বেতপাথরের একটি চক্র, সেই চক্র থেকে চক্রাকারে জলধারা উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে ভূগোলটিকে ধৌত করছে! স্টেডিয়ামটির বিশেষত্ব হচ্ছে এটি ভূগর্ভের মধ্যে, ভূপৃষ্ঠে নয়। এর মধ্যে এক লক্ষ দর্শক বসবার ব্যবস্থা আছে। রোমের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরই তিরিশ হাজার দর্শক বসবার মতো আর একটি 'ক্রীড়া-চক্র' দেখালে। এটির নাম 'পিয়াজা নাভোনা' বা 'সার্কো আগোনেল'। এখানেও তিনটি চমৎকার ফোয়ারা আছে। মাঝখানের টিকে এ'রা বলেন 'মর্মরে রচিত রূপকথা!' এই ফোয়ারাটি যে কত চিত্তাকর্ষক তা' এর নামেই প্রকাশ!

রোমের বিচারভবন দেখে ভক্তি হয়। য়ুরোপকে একদিন যাঁরা আইন মেনে চলতে ও আইন রচনা করতে শিখিয়েছিলেন তাঁদের বিচারালয় তো 'প্যালেস্ অফ্ জাস্টিস্' ব'লেই গণ্য হবে। বিরাট এই ভবন, বিপুল এর স্থাপত্য গৌরব। বাস্তুশিল্পী কাল্-দেরিনীর পরিকল্পনা অনুসারে এই বিশাল গৃহ ও তৎসংলগ্ন ন্যায়বিধানের কল্পনা-মূলক মর্মর মূর্তিগুলি নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দূর থেকে এ বাড়ি-খানি দেখলে মনের মধ্যে একটা সম্ভ্রম জেগে ওঠে।

এইবার 'পিয়াজা ভেনেজিয়া'র পথে আমরা এসে পড়লাম। রোমের কেন্দ্রস্থল হল এই 'পিয়াজা ভেনেজিয়া'। 'পালাজো ভেনেজিয়া' বা 'প্যালেস অফ ভেনিস্' থেকে এই পথের নামকরণ হয়েছিল। ১৪৫৫ খৃঃ অব্দে ভেনিসের দানবীর কার্ডিনাল যিনি পরে 'পোপ দ্বিতীয় পায়োলো'রূপে পরিচিত হয়েছিলেন তাঁরই অর্থানুকূল্যে রোমের বুকে 'প্যালেস অফ্ ভেনিস' তৈরি হয়েছিল। রোমে খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের পর এত সুন্দর প্রাসাদ আর দ্বিতীয় একটি নির্মিত হয়নি। রোমের স্থাপত্যকলায় তখন সবেমাত্র রেনেসাঁর ঢেউ এসে পেঁাছেচে। এই সময় ওখানে 'দুর্গগুলি একে একে প্রাসাদে রূপান্তরিত হচ্ছিল। পোপ দ্বিতীয় পায়োলো এই প্রাসাদটিতে তাঁর সংগৃহীত বিবিধ শিল্পসম্ভারে ভরে তুলেছিলেন।

'নৃপতি দ্বিতীয় ভিক্টর এমানুয়েলের স্মৃতি সৌধ' রোমের একটা মস্ত ঐশ্বর্য হয়ে উঠেছে। সুন্দর ও সুকল্পিত এই স্মরণ অর্ঘ্যকে ইতালিয়ানরা বলেন, "ভিত্তি-রিয়ানো" অর্থাৎ 'জয়স্তম্ভ'। ইতালির স্বাধীনতার যুদ্ধে সফলকাম বীরবৃন্দের প্রতি বন্ধনমুক্ত জাতির সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাঞ্জলি! এটি দেখতে দেখতে কেবলই আমাদের 'মহাজাতি সদনের' কথা মনে হ'য়ে দুই চক্ষু জলে ভরে উঠেছিল। কবে সে সদন সুসম্পূর্ণ হয়ে বাঙলার তথা ভারতের একটি গৌরবসূচক সম্পদ হয়ে উঠবে কে জানে? এটি কাউণ্ট জুসেপে স্যাকনির পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হয়েছিল। ক্যাম্পিদোলিয়ো গিরি-

মার্কাস্ অরেলিয়াসের স্মৃতিস্তম্ভ
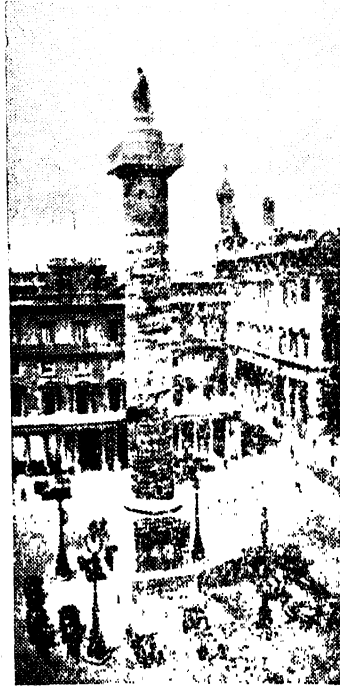
মূল থেকে এই বিরাট স্মৃতি-সৌধ আকাশের দিকে মাথা তুলেছে। এর নির্মাণ কৌশলের মধ্যে আগাগোড়া সবটাই নবপ্রচলিত গ্রেকোরোমান স্থাপত্যকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। এর মধ্যে যে সব রূপক ব্যঞ্জনা স্থান পেয়েছে, যে সব রণজয়ের স্মৃতি-চিহ্ন সংযুক্ত হয়েছে, এর স্তম্ভগুলি, পাষাণফলকে উৎকীর্ণ চিত্রগুলি সমস্তই শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য-শিল্পীদের হাতের অতুলনীয় কাজ। এগুলি আমাদের প্রাচীন রোমের অলংকরণ পদ্ধতি এবং তার সমারোহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজা ভিক্টর এমানুয়েলের যে অশ্বারোহী প্রতিমূর্তিটি এখানে স্থাপিত হয়েছে, শোনা গেল, ভেনিসের প্রসিদ্ধ ভাস্কর চীয়ারাদিয়া দীর্ঘ বিশ বৎসর অক্লান্ত পরি-শ্রমের পর রাজার এই নিখুঁত মূর্তিটি গ'ড়ে তুলতে পেরেছিলেন। কিন্তু তিনি এর চরম শ্রী সম্পাদন করে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর শিল্পী গাল্লোরী এটিকে সুসম্পূর্ণ করেন। মূর্তি যে বেদীটির উপর স্থাপিত তার চার পাশে অতীত ইতালির সাম্রাজ্যভুক্ত যে সব নগরে তাঁদের শাসন পরিচালিত ছিল সেগুলি উৎকীর্ণ করা আছে। এগুলি শিল্পী মাক্কানানির হাতের কাজ। ইনি শিল্পগুরু সাক্কোনীর শিষ্য। 'আমাদের দেশ জনকের বেদী'র চতুর্দিকে যে উৎকীর্ণ করা শিলাচিত্র আছে তা শিল্পী জানোত্তির কাজ। রোমের একটি প্রতিমূর্তি আছে এখানে। শিল্পীর কল্পিত রোম যেভাবে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে এখানে তা যথার্থ প্রশংসনীয়। রোমের এই প্রতিমূর্তির নিচেয় 'অজ্ঞাত বীরেদের সমাধি' রয়েছে। এটি দেখে মনে পড়লো য়ুরোপ আজও রোমক সভ্যতার কাছে ঋণ গ্রহণ করছে।

রোমের যেসব জমকালো গির্জা আছে তার মধ্যে 'খৃষ্ট মন্দিরটি'কে একটি অতি জমকালো উপাসনাগৃহ বলা যেতে পারে। ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে ইতালির প্রসিদ্ধ শিল্পী ভীনোলার পরিকল্পনা অনুসরণে এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে এটির নির্মাণকার্য শুরু হয়েছিল। কিন্তু মন্দিরটি সমাপ্ত করে-ছিলেন তাঁর শিষ্য জ্যাকোমো দেল্লা পোর্তা। মন্দিরের ভিতর দিকটি সোনালী প্রভৃতি নানা রঙে আগাগোড়া আশ্চর্য কারুকার্য করা। দেওয়ালগুলিতে মনে হয় যেন জড়োয়ার কাজ করা রয়েছে—'হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ছটা'! একে 'বারোক্' স্থাপত্য বা অদ্ভুত ধরণের মণ্ডনকলা বলা যায়।

'নদীচতুষ্টয়ের উৎসের' মধ্যে 'টাইবার' ও 'পো'র সঙ্গে 'নীলনদ' ও 'ভাগীরথী' রয়েছে দেখে খুবই আনন্দ হ'ল। দেশকে যে আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেও কতখানি ভালবাসি তার পরিচয় পাই এই বিদেশে এসে যখন কোথাও স্বদেশের কিছু চিহ্ন মেলে। 'পিয়াজা দেল পোপোলো' পথটি সবচেয়ে নূতন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে শিল্পী ভ্যালাদিয়ার এর পরিকল্পনা করেছিলেন। এই রাস্তার প্রশস্ত চৌমাথার ঠিক মাঝখানে আছে একটি মিশরীয় স্তম্ভ। রোমে বারো তেরটি এইরকম স্তম্ভ দেখেছি। এই চতুষ্কোণ সূক্ষ্মশীর্ষ স্তম্ভগুলিকে বলে
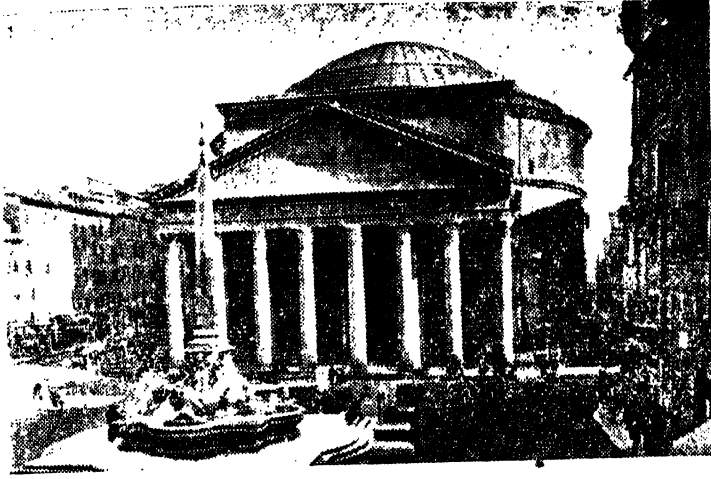
প্যান্থিয়ন— দেবদেউল

'ওবেলিস্ক্'। এটিকে নৃপতি আগস্টাস্ তুলে নিয়ে এসেছিলেন। পোপ পঞ্চম সিক্সটাসের আমলে স্থপতি ফন্‌তানা এই স্থানটিই নির্বাচন ক'রে এটিকে বসেয়িছিলেন। এই ওবেলিস্কটিকে কেন্দ্র ক'রেই রাস্তাটি তৈরি হয়েছে।

'কুইরিন্যাল' হ'ল রোমের 'এস্কুলাইন', 'ক্যাম্পিডোলিয়া', 'ক্যাপিটেলাইন' প্রভৃতি সাত পাহাড়ের একটি। এই পাহাড়ের নাম 'কুইরিন্যাল' হবার কারণ হ'ল পুরাকালে এই পাহাড়ে 'মঙ্গল' দেবতার (মার্স্) মন্দির ছিল। এই মঙ্গল দেবতাকে স্যাবাইনরা বলতেন 'কুইরিনো'। এখানে ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী এক বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত মহামান্য পোপ মহাপ্রভুদের এটা ছিল গ্রীষ্মাবাস। তারপর রাজপ্রাসাদে পরিণত হয়। ইতালির শেষ রাজা এইখানেই বাস করতেন। এখন এখানে থাকেন 'প্রেসিডেণ্ট্ অফ্ দি রিপাব্লিক'। রাজোচিত পরিকল্পনা এই প্রাসাদের। মর্দানো, বের্নিনী, গুইদোরেনী, জুলিও রোম্যানো প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা এই প্রাসাদের সৌন্দর্য সাধনের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রশস্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণেও একটি ওবেলিস্ক্ সংযুক্ত ফোয়ারা এবং কতগুলি প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

সকালে আধুনিক যুগের রোম দর্শন শেষ ক'রে বিকেলের এক্সকার্সন বাসে আমরা এলাম সীজারদের আমলের প্রাচীন রোম দেখতে। এর তো অধিকাংশই আজ ধ্বংসাবশেষ মাত্র। পিয়াজা কোলোনার পথ ধরলো আমাদের বাস। সামনেই 'মার্কাস অরেলিয়াস্ স্তম্ভ!'। রোমের এই ধর্মপ্রাণ ও জ্ঞানী দার্শনিক সম্রাট 'মার্কাস্ অরেলিয়াস্' দেহরক্ষা করবার পর 'রোম্যান সেনেট্' বা রাজসভার সদস্যবৃন্দ সম্রাটের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটি মন্দির এবং এই স্তম্ভটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই স্তম্ভের শীর্ষদেশে সম্রাটের প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে। এখান থেকে প্রাচীন রোমের শ্রেষ্ঠ গৌরব দেখতে দেবমন্দির 'প্যান্থিয়নে' এলাম। খৃঃ পূঃ ২৭ সালে রোমের সেনাপতি দিগ্বিজয়ী বীর আগ্রিপ্পা এই বিরাট মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, এটি তাঁর পূর্ববর্তী সম্রাট্ হ্যাড্রিয়ান নির্মাণ করিয়েছিলেন। আগ্রিপ্পা মন্দিরটির সংস্কার সাধন করেছিলেন মাত্র।

সে যাই হোক্, 'প্যান্থিয়ন' ছিল খৃষ্টপূর্ব যুগের দেব দেউল। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের উপর মূর্তিপূজক রোম একদিন অমানুষিক অত্যাচার করেছিল। বোধ করি, তারই প্রতিশোধ নিতে খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা এতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, লুঠ করেছিল, এর পাথর ও অন্যান্য ইমারতি মালমসলা খুলে নিয়ে গিয়ে গির্জা তৈরি করেছিল। শুনে ভারতবর্ষে বৌদ্ধদের উপর হিন্দুর অত্যাচারের কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল, হিন্দুদের উপর মুসলিম অত্যাচারের কথা। বৌদ্ধ বিহার ভেঙে হিন্দু মন্দির গড়ার কথা আবার হিন্দু মন্দির ভেঙে মোসলেম মসজিদ নির্মাণের কথা। রোমের রাজপথে যেখানে যেখানে রোমান নৃপতি ও বিজয়ী বীরবৃন্দের স্মৃতিস্তম্ভের উপর তাদের প্রতিমূর্তি স্থাপিত ছিল, পোপের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি নামিয়ে নিয়ে সেই সব দিগ্বিজয়ীদের অপর দেশ থেকে জয় ক'রে উপড়ে আনা ওবেলিস্ক্ বা চতুষ্কোণ ও সূক্ষ্মশীর্ষ
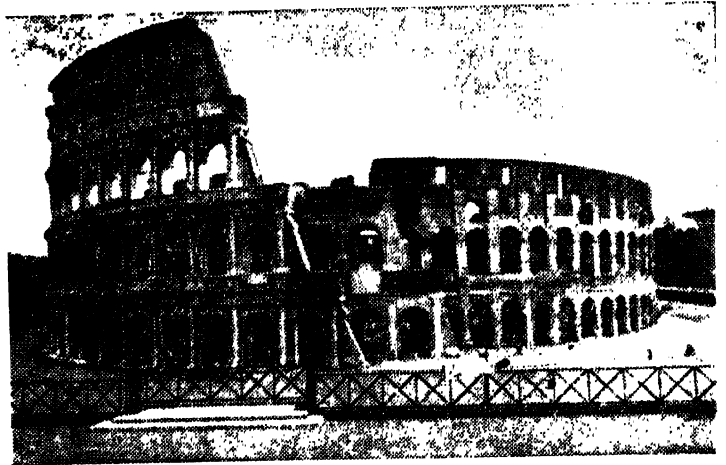
কলোশিয়ম

স্তম্ভগুলির উপর যীশুখৃষ্টের প্রধান প্রধান শিষ্যগণের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। খৃষ্টধর্মগুরু পোপেদের রাজশক্তি করায়ত্ত হওয়ার ফলে তাঁরা অনেকেই মোহন্ত মহারাজ হ'য়ে উঠেছিলেন। তবে, একথাও অনস্বীকার্য যে, রোমকে তাঁরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যশালী নগরী ক'রে তুলেছিলেন। প্যান্থিয়ানকে পোপ মহারাজ ইতালির সকল খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত জাতীয় উপাসনামন্দির ব'লে ঘোষণা করেছেন। খৃষ্টধর্মের ইতিহাসে এ তাঁদের একটা নূতন কীর্তি বটে। এ না-করলে প্যান্থিয়নের অস্তিত্ব এতদিনে বিলুপ্ত হ'ত। এই মন্দিরের বিশেষত্ব হ'চ্ছে, এর শীর্ষদেশে যে বিরাট চূড়া আছে তার মাথার উপর যেখানে কলস থাকে সেখানটি খোলা। আকাশ দেখা যায়। আলো আসে, হাওয়া আসে, রৌদ্র আসে, বৃষ্টি হলে জলও আসে। পুরাকালে এ মন্দিরে একাধিক দেবদেবী ছিলেন। দেড় হাজার বছর আগে এ মন্দিরটি খৃষ্টানেরা দখল করবার পরে দেবদেবীরা বিতাড়িত হয়েছেন। একাধিক খৃষ্টান শহীদ্ যাঁরা এই নূতন ধর্ম গ্রহণ ও প্রচারের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন তাঁদের মৃতদেহ সেই ক্যাটাকোম্বের গোপন মৃত্তিকা গহ্বর থেকে উদ্ধার করে এনে মহা-সমারোহে ও সসম্মানে এখানে সমাহিত করা হয়েছে।

কয়েকজন যশস্বী খৃষ্টান রাজা এবং কয়েক-জন প্রথিতযশা খৃষ্টান শিল্পীর সমাধিও এর মধ্যে স্থান পেয়েছে, যেমন, 'পাইরীন দেল ভাগা', যিনি র‍্যাফায়েলের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। প্রধান শিষ্য জুলিয়ো রোম্যানোর পরেই ছিল এ'র স্থান। তারপর প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও স্থপতি বাল্দাসার পেরুজীর সমাধি, রাজা প্রথম হাম্বার্ট এবং রাণী মার্ঘেরিতার সমাধিও এখানে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমাধি হল এখানে মহাশিল্পী র‍্যাফায়েলের। এ'র সমাধিমূলে যে শিলা-লিপি উৎকীর্ণ করা আছে, তাতে লেখা আছে, "ইনি যখন বেঁচেছিলেন তখন প্রকৃতির সৌন্দর্যসৃষ্টিকে পাছে এই শক্তি-শালী শিল্পীর সৃষ্টি অতিক্রম করে যায় এই ছিল প্রকৃতির ভয়, কিন্তু শিল্পীর পরলোকগমনের পর প্রকৃতির এখন আতঙ্ক হয়েছে, পাছে তাঁর নিজের এইবার অকাল-মৃত্যু ঘটে।" এখানে আজ মন্দিরে প্রকৃত অধিষ্ঠাতৃ দেবতার পরিবর্তে 'ম্যাডোনা'র মূর্তি অর্থাৎ প্রভু যীশুখৃষ্টের কুমারী জননীর প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়েছে। এই মূর্তিটি র‍্যাফায়েলের আর এক শিষ্য শ্রীযুক্ত লরেঞ্জেত্তোর তৈরি। তারপরই কবরশায়িনী রয়েছেন র‍্যাফায়েলের বাগদত্তা পত্নী কুমারী মারিয়া ভাইবিয়েনা। এ'র মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যে শোকসন্তপ্ত ও বিহরবিধুর শিল্পী নিজেও দেহত্যাগ করেন। রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর এমানুয়েলের রাজকীয় সমাধিও এর মধ্যেই স্থান পেয়েছে।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা 'ত্রাজান স্তম্ভ', 'ত্রাজান ফোরাম' ও ত্রাজানের বাজার দেখে জুলিয়াস সীজারের 'ফোরাম' দেখতে গেলাম। কাছাকাছিই রয়েছে এরা। ত্রাজান স্তম্ভটি অক্ষত আছে বটে, কিন্তু বাকী সর্বত্র ধ্বংসাবশেষ মাত্র! এই স্তম্ভশীর্ষে ত্রাজানের প্রতিমূর্তি রয়েছে। পাদমূলে প্রোথিত আছে তাঁর দেহের ভস্মাবশেষ। স্তম্ভটির বিশেষত্ব হচ্ছে, এই স্তম্ভগাত্রে পাকে পাকে উৎকীর্ণ করা আছে ত্রাজানের কীর্তিমালা, যার মধ্যে পাই আমরা সমসাময়িক ইতিহাসের শিলাচিত্র। এর ভিতর একটি ঘোরানো সিঁড়ি আছে, স্তম্ভের মাথার উপরে গিয়ে উঠা যায়। কিঞ্চিদধিক আঠারো শো বছর আগে রোমে যে স্থাপত্যকলার নিদর্শন দেখলাম, য়ুরোপের সকল প্রদেশেই প্রায় দেখে এসেছি এরই হুবহু অনুকরণ। জুলিয়াস সীজারের ফোরামের ভগ্নাবশেষের মধ্যে এই বিশ্ব-বিজয়ী বীরের একটি প্রতিমূর্তি স্থাপন

করা হয়েছে। দু' হাজার বছর আগে যে মানুষটি সারা পৃথিবীতে একটি বিপুল আলোড়ন এনেছিলেন, যিনি মরণশীল হয়েও আপন অক্ষয় কীর্তির দ্বারা মৃত্যুঞ্জয় হয়েছেন, যাঁকে সেদিনের জগৎ যেমন অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতো, শ্রদ্ধা করতো, আজকের পৃথিবীও তেমনি শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে, বিশ্ব-ইতিহাসের সেই অদ্বিতীয় মহানায়কের উদ্দেশে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়ে এলাম।

এখান থেকে আসা হল ক্যাম্পিডোলিও পাহাড়ের উপরে ওঠবার 'কার্দোনাতা' নামে বিশাল সোপানশ্রেণী দেখতে। এই সোপান-শ্রেণী শিল্পী ও স্থপতি মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরি। 'পিয়াজা ডেল ক্যাম্পিডোলিও' রাস্তাটিও এই প্রতিভাবান শিল্পীর পরিকল্পিত। এখানে রাজর্ষি মার্কাস অরেলিয়াসের একটি অশ্বারোহী প্রতিমূর্তি আছে। মূর্তিটি দেখলেই মনে হবে, বরেণ্য রাজা যেন হাত বাড়িয়ে তাঁর রাজ্যে উপস্থিত বিদেশী অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন! এই দার্শনিক রাজার জ্ঞানবৃদ্ধ সৌম্যমূর্তি দেখে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আপনিই মাথা নত হয়। এটি রোমের বহু পুরাতন একটি ব্রোঞ্জের মূর্তি। শোনা গেল, ব্রোঞ্জের মূর্তি এখানে যত ছিল সব লুঠ করে নিয়ে গেছে আক্রমণকারী বর্বরেরা। কেবল এই একটি মূর্তিই কোনও রকমে তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

এখান থেকে রোমান ফোরাম, ভেনাস ও রোমের মন্দির দেখে, কলোশিয়মে যাওয়া হল। প্রাচীন রোমের এ-এক বিস্ময়কর কীর্তি। মুক্ত আকাশের নীচেয় এই বিশাল এ্যাম্ফি থিয়েটার তৈরি হতে দীর্ঘ আট বছর সময় লেগেছিল। রোমের ইতিহাসে এমন কোনও ঘটনা নেই, যার সঙ্গে এখানকার ফোরাম আর কলোশিয়মের যোগ নেই। কলোশিয়মের অনেকটা অংশই ভেঙে পড়েছে বা লোকে ভেঙে নিয়ে গেছে নিজেদের গৃহনির্মাণের মালমসলার প্রয়োজনে। পোপ চতুর্দশ বেনেডিক্ট উদ্যোগী হয়ে সাধারণের এই অত্যাচার বন্ধ করেন, তাই কলোশিয়মের বাকি অংশ রক্ষা পেয়েছে। সহস্র সহস্র রক্তপিপাসু দর্শকের নির্মম উৎসুক দৃষ্টির সামনে কত গ্ল্যাডিয়েটার দ্বন্দ্ব যুদ্ধে এর মধ্যে প্রাণ দিয়েছে। কত জীবন হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে শক্তির প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে বিনষ্ট হয়েছে এখানে। কত অসংখ্য নব ধর্ম-বিশ্বাসীর পবিত্র রক্তে একদা রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল রোমের এই প্রাচীন কলোশিয়মের অভিশপ্ত মৃত্তিকা। এটি উঁচু চারতলার সমান। ব্যাসের পরিমাপ ২০৫ গজ। একে ঘিরে বৃত্তাকারে রচিত হয়েছে প্রতি তলায় দর্শকদের আসন। পরিবেষ্টনীর একদিকের মধ্যস্থলে রাজা বা সম্রাটের আসন। এদিকটার আসনগুলি রোমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও উচ্চ রাজকর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকতো। যদিও এই বিরাট কলোশিয়ম খোলা আকাশের নীচেয়, কিন্তু কোনও কিছু খেলা দেখবার সময় বৃষ্টি আসবার সম্ভাবনা আছে বুঝলে এর উপর প্রকাণ্ড ভারি এক পাল খাটিয়ে দেওয়া হত। সাধারণ দর্শকদের আসনের অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ ছিল, যেমন বিবাহিতদের আসন, অবিবাহিতদের আসন, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের আসন, সপরিবারে এসে বসবার আসন এবং ভৃত্য ও পরিচারকগণের আসন। সাধারণ শ্রমিকদের আসন এবং মহিলাদের জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থাও ছিল।

'কলোশিয়ম' থেকে বেরিয়ে রোমের দ্বাদশ সীজারের মধ্যে যিনি একাদশতম, সেই 'টাইটাস' ও রোম-সম্রাট 'কনস্ট্যানটাইনের' 'বিজয়-তোরণ' দুটি দেখে আমরা 'কারাকাল্লার বাথ্' বা স্নানাগার দেখতে এলাম। বিজয়-তোরণ দুটি দেখেই বোঝা গেল, ফ্রান্সের রাজারা এবং মহাবীর নেপলিয়ঁ প্যারিসে তাঁদের 'আর্ক দ্য ট্রায়াম্ফ' নির্মাণ করিয়েছিলেন এরই অনুকরণে। 'কারাকাল্লার বাথ্' যে রাস্তায় পড়ে, সেটির নাম 'আপ্পিয়ান পথ'। রোমের সবচেয়ে পুরানো রাস্তা এটি। খৃষ্ট জন্মের ৩১২ বছর আগে আপ্পিয়ান ক্লডিয়াস এটি নির্মাণ করতে শুরু করেছিলেন। ইনি ছিলেন রোমের তদানীন্তন দশজন শাসনকর্তার অন্যতম। এ-পথের দুধারে মাইলের পর মাইল জুড়ে রোম্যানদের বিংশতি পুরুষের গৌরবময় অতীতের ভগ্ন জীর্ণ চূর্ণ ঐশ্বর্যের চিহ্ন-সমূহ, সমাধি মন্দির ও চিতার মঠের অসংখ্য টুকরো চোখে পড়ে। রোমের কেবলমাত্র অভিজাত সম্ভ্রান্ত ঘরের শবই এখানে সমাহিত হতে পারতো। সমাজের অন্য স্তরের মৃতদেহের এখানে ছিল প্রবেশ নিষেধ। কারাকাল্লার এই স্নানাগারে ষোলশ' লোক একত্রে একই সঙ্গে স্নানপর্ব সেরে নিতে পারতেন। এখানে পৃথক স্নানের ঘর আছে, যেখানে ঠাণ্ডা, গরম ও ঈষদোষ্ণ জলের সরবরাহ ব্যবস্থা ছিল। এখান থেকে রোম্যান বীর সিপিয়নীর সমাধি, দিগ্বিজয়ী যুবরাজ ড্রুশুসে'র বিজয়তোরণ ও 'ক্যুয়োভেদিস' গির্জা দেখে শেষে ক্যাটাকোম্বস গিয়ে নামলাম। এটি হল 'সেণ্ট ক্যালিক্স-টাসের' ক্যাটাকোম্বস্। রোমের প্রথম খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের ভূগর্ভস্থ আদি সমাধি গুহা এটি। সুড়ঙ্গ পথের সিঁড়ি দিয়ে মাটির ভিতর বা পাতালে নেমে যেতে হয় প্রায় একতলার চেয়ে বেশি। বাতি জেবলে, টর্চ নিয়ে অথবা মশাল হাতে ভিতরে যেতে হয়। মঠের সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীরা সঙ্গে করে নিয়ে যান। প্রত্যেকটি সমাধি দেখিয়ে বুঝিয়ে পরিচয় জানিয়ে দেন। যে-পথে আমরা এর মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম, তার বিপরীত দিকের পথ দিয়ে 'ক্যাটাকোম্বস্' থেকে বেরিয়ে এলাম। (ক্রমশ)
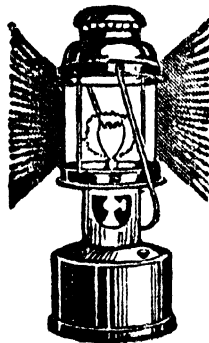
চেনা মহল

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

৬

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হোল অরুণকে। তার পরে আলো জ্বলল। খিল খোলার শব্দ হোল দরজার। অরুণ যা আশংকা করেছিল, তা হয়নি। কোন অপরিচিত গৃহকর্তা তার সামনে এসে দাঁড়াননি। করবীই এসে দরজার পাল্লা খুলে ধরেছে।

'আপনি!'

অরুণ বলল, 'হাঁ, আপনারা তো আর কোন খোঁজখবর নিলেন না। আমিই এলাম শেষ পর্যন্ত খুঁজতে খুঁজতে। তারপর কেমন আছেন? পরেশবাবু কই?'

করবী এসব প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে শুধু বলল, 'আসুন।'

অরুণ তার পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকল। ছোট্ট সরু প্যাসেজটুকু পার হতেই সামনে খানিকটা উঠান। উত্তর-পূব কোণে কল আর চৌবাচ্চা। সেখানে চৌদ্দ-পনের বছরের একটি ছেলে এঁটো হাত ধুচ্ছিল, মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কে বউদি?'

করবী বলল, 'অরুণবাবু, আমার দাদার বন্ধু। আর এটি আমার দেওর দিলীপ। তোমার এরই মধ্যে খাওয়া হয়ে গেল দিলু? আর কিছু লাগল না?'

দিলীপ একবার ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'না বউদি।'

পশ্চিমের দিকে সারে সারে তিনখানা ঘর। বাঁ দিকের ঘরখানায় প্রথমে অরুণকে নিয়ে বসাল করবী। বেশ বোঝা যায়, মধ্যবিত্ত পরিবারের এটি একখানা ড্রয়িংরুম। দক্ষিণ দিকে একটি বইয়ের সেলফ। বেশির ভাগ বই-ই রবীন্দ্রনাথের। শান্তিনিকেতনের খানতিনেক বেতের চেয়ার-ঘেরা ছোট একটি টেবিল। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের বড় একখানা ফটো। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি আঁকা একখানি সুন্দর ক্যালেন্ডার। তার নীচে কুলুঙ্গির মধ্যে ছোট একটি টাইমপিস ঘড়ি। ছোট একটা টুলের ওপর বসানো রেডিও সেট।

দু দিকের দেয়ালের তিনটি জানলায় হাল্কা-নীল পর্দা টানা। উপকরণের কোন বাহুল্য নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি জিনিসে আর তার রাখার ভঙ্গীতে বেশ একটি পরিচ্ছন্ন শোভন রুচির ছাপ আছে। অরুণ মনে মনে ভাবল, এমন একখানা ঘর যদি তার হোত। করবীর দিকে মুখ তুলে তাকাল অরুণ। বলল, 'বাঃ, ঘরখানা তো চমৎকার সাজিয়েছেন। তারপর খবর কি আপনার? কথাবার্তা বলছেন না যে? আপনার চেহারাও তো খুব খারাপ হয়ে গেছে। কোন অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি?'

করবী বলল, 'না।'

অরুণ বলল, 'তবে কি বাড়ির কর্তার ভয়ে এই বাক্‌সংযম? সত্যি আপনাকে দেখে যেন চেনাই যায় না।'

করবী কোন কথা বলল না।

অরুণ বলল, 'দেওরের সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলেন। এবার তার দাদাটিকে বার করুন। না কি, তাকে লুকিয়েই রাখবেন? পরেশবাবু কোথায়?'

করবী শান্তভাবে বলল, 'আপনি কি কিছুই জানেন না?'

'না,'।

করবী বলল, 'তিনি আজ বাইশ দিন ধরে নেই।'

অরুণ বলল, 'কোথায় গেছেন?'

করবী বলল, 'মারা গেছেন।'

বলেই মুখ নিচু করল।

অরুণ বিস্মিত হয়ে শুধু বলতে পারল 'সে কি!'

মুহূর্তকাল দুজনেই চুপ করে রইল। শান্ত স্তব্ধ ঘরখানায় শুধু ঘড়ির টিক টিক শব্দ শোনা যাচ্ছে। কেউ ঘড়িটিকে জোর করে বন্ধ করে দিলেই যেন ভালো হোত। অরুণ করবীর দিকে আর একবার তাকিয়ে নিল। সে তেমনি মুখখানা নিচু করে রয়েছে। মাথায় আঁচল নেই। সিঁথি সিঁদুরহীন সাদা। কালো ফিতে পেড়ে একখানা শাড়ি পরণে। গলায় সরু এক চিলতে হার। হাতে দুগাছি চুড়ি। আর কোন আবরণ নেই। সত্যি করবীর চেহারা এবং তার শুকনো মুখ দেখে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা আগেই অরুণের বোঝা উচিত ছিল। অনুমান করা উচিত ছিল তার দুরদৃষ্টকে কিন্তু অরুণ তা পারেনি। মেয়েদের পোষাক পরিচ্ছদের দিকেও বেশি তাকায় না। এসব ব্যাপারে ও ভারী অন্যমনস্ক। সারাদিন ধরে নানা অপ্রীতিকর ঘটনায় নিজের দুর্ভাগ্য নিয়েই অরুণ বিব্রত রয়েছে। কিন্তু করবীর যে দুর্ভাগ্য ঘটেছে তার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না। এ শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। সহানুভূতি প্রকাশ নিরর্থক আনুষ্ঠানিক আচার মাত্র।

অরুণ সে চেষ্টা করল না, শুধু বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। বসুন।'

দাঁড়িয়ে থাকতে বোধ হয় করবীর নিজেরও কষ্ট হচ্ছিল। অরুণের সামনের বেতের চেয়ারটায় এবার ও বসে পড়ল।

ফের একটুকাল চুপ করে থাকবার পর অরুণ জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল ওঁর?'

করবী বলল, 'ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। দুদিন মাত্র ভুগেছিলেন।'

অরুণ ফের কি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল দিলীপ এসে দাঁড়াল, 'বউদি। মা ডাকছেন তোমাকে। কে এসেছেন জিজ্ঞেস করছিলেন। আমি পরিচয় দিতে তিনি তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বললেন।' অরুণ করবীর দিকে তাকাল।

করবী বলল, 'আমার বিধবা শাশুড়ী ব্লাড প্রেসারে ভুগছেন। এই ঘটনার পরে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কে এল গেল শুয়ে শুয়েই সব খবর রাখা চাই। আপনি কি যাবেন?' করবী একটু ইতস্ততঃ করল।

অরুণও মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রইল। বাকপটু বলে বন্ধু মহলে তার খ্যাতি আছে। অল্প সময়ের মধ্যেই সে আলাপ জমাতে পারে। কিন্তু সদ্য পুত্র শোকাতুরা অপরিচিতা একটি মহিলার সঙ্গে সে কি আলাপ করবে। তবু তিনি যখন যেতেই বলছেন না যাওয়াটা ভালো দেখায় না, পালিয়ে যাওয়াটা অন্যায় হয়।

অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন'।

করবী তাকে সঙ্গে নিয়ে মাঝখানের ঘরটা বাদ দিয়ে সব চেয়ে শেষের ঘরখানার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'মা।'

ঘরের দুদিকে দুখানি তক্তাপোশ। তার একখানিতে পরেশের মা নিভাননী শুয়েছিলেন। অরুণদের দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসতে চেষ্টা করলেন।

করবী বলল, আপনি উঠছেন কেন শুয়েই থাকুন, দিলু ওঘর থেকে একখানা চেয়ার নিয়ে এসো তো।

নিভাননী কিন্তু শুয়ে রইলেন না, উঠেই বসলেন, দিলু একটা চেয়ার এনে তাঁর বিছানার সামনে পেতে দিল।

নিভাননী অরুণের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বোসো। তারপর নিজেই একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন—'

কিছু মনে কোরো না। তুমি আমার ছেলের বয়সী। তুমিই বললাম তোমাকে।

অরুণ বলল, 'তাতে কি।' নিভাননী তাকালেন তারদিকে, অরুণও একটুকাল চেয়ে রইল। পঁতাল্লিশ ছেচল্লিশ বছরের একটি বিধবা মহিলা।

একটু রোগাটে চেহারা। যৌবনে যে খুব সুন্দরী ছিলেন তা এখনো বোঝা যায়। সৌন্দর্যের সঙ্গে মুখভঙ্গিতে বেশ খানিকটা শিক্ষা আর ব্যক্তিত্বের ছাপও আছে বলে অরুণের মনে হোল।

নিভাননী বললেন, 'করবীর মুখে তোমার নাম এর আগেও শুনেছি। দিল্লীতে হিরণ্ময়ের বাসায় বুঝি তোমাদের আলাপ হয়েছিল?'

অরুণ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

নিভাননী বললেন, 'দিল্লী থেকে কবে এসেছ। হিরন্ময়রা সব ভালো আছে?'

অরুণ বলল যে, মাসাখনেক আগেই সে এসেছে।

নিভাননী বললেন, 'এতদিনের ছুটি? আর হিরন্ময় তো এসে দু দিনের বেশি রইল না।'

অরুণ বলল, 'ছুটি নয়। রিট্রেঞ্চমেণ্টে চাকরি গেছে।'

করবী বলল, 'চাকরি নেই আপনার?'

অরুণ তার দিকে চেয়ে বলল,—'না।'

প্রথমে ভেবেছিল এই চাকরি না থাকার কথাটা কি করেই না বলবে। যদি এ প্রসঙ্গ না ওঠে তাহলে গোপনই করে যাবে কথাটা। কিন্তু এখন অতি সহজেই বলে ফেলল। আর বলতে পেরে একটু যেন তৃপ্তিই বোধ করল অরুণ। করবী জানত দুর্ভাগ্য শুধু তার একারই ঘটেনি, অরুণও কিছুটা খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়েছে। যদিও দুইয়ের মধ্যে মোটেই তুলনা হয় না, তবু অরুণ যে আগের মত সুখে নেই বেকার জীবনের দুঃখ দুর্ভোগ ভোগ করছে তা করবীকে জানাতে পেরে খানিকটা স্বস্তিই যেন সে বোধ করল।

করবী বলল, 'টেলিগ্রাম পেয়েই দাদা চলে এসেছিলেন। আর কোন কথা জিজ্ঞেস করবার মত তখন অবস্থা ছিল না। মাত্র দু'দিনই ছিলেন কলকাতায়।'

নিভাননী বললেন, 'হিরণ্ময় নিয়ে যেতে চেয়েছিল করবীকে। আমিও বললুম যাও, ঘুরে এসো। কিন্তু এমন জেদী মেয়ে, কারো কথা শুনল না।'

করবী বলল, 'শুনলে কি পিপলুকে ছেড়ে আপনি থাকতে পারতেন? এই তো শ্যামবাজারে বাবার বাসায় গিয়ে দুদিন ছিলাম তিনবার আপনি দিলুকে পাঠিয়েছেন খবর নিতে।'

একথার কোন জবাব না দিয়ে নিভাননী বললেন, 'পিপলু কি না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল না কি?'

করবী শাশুড়ীকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'না। খাইয়েই ঘুম পাড়িয়েছি। আপনি ভাববেন না। শুয়ে পড়ুন এবার।'

নিভাননী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'না, আর ভাববার কি আছে আমার সব ভাবনা চিন্তা তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। আমার সব শূন্য ক'রে দিয়ে গেছে সে।' অরুণের দিকে ফিরে তাকালেন নিভাননী, 'এই শূন্যপুরীতে দিনরাত কি করে যে আমি কাটাব ভেবে পাইনে অরুণ। একবার ভাবি এখান থেকে বেরিয়ে কোথাও চলে যাই। কিন্তু যাব কি করে। সে আমার পায়ে শিকল পরিয়ে রেখে গেছে যে, শেল রেখে গেছে আমার সামনে। ওর এই মূর্তি চোখের ওপর আমি আর দেখতেও পারিনে আবার চোখের আড়াল করব যে তারও জো নেই। যার জিনিস সে তো কত সহজে মায়া কাটিয়ে গেল অরুণ, কিন্তু আমি কাটাতে পারছি কই।'

এতক্ষণে নিভাননীর দুই চোখ জলে ভরে উঠল। আবেগে আটকে গেল গলা।

অরুণ বলল, 'আপনি এবার শোন। শুয়ে বিশ্রাম করুন।'

নিভাননী বললেন, 'আমি বিশ্রাম না করলে আর কে করবে। আঁচল দিয়ে নিজেই চোখের জল মুছলেন নিভাননী, তারপর বললেন, এসো মাঝে মাঝে। আমাদের আত্মীয় স্বজন বড় কেউ নেই। সময় পেলে এসে খোঁজখবর নিয়ো।'

অরুণ বলল, 'আসব বই কি। নিশ্চয়ই আসব।'

একটু বাদে নিভাননীর ঘর থেকে অরুণ আর করবী দুজনেই বেরিয়ে এল। দিলীপ চেয়ার দিয়েই সরে এসেছিল, ও ঘরে আর দাঁড়ায়নি।

অরুণ বলল, 'পিপলু ঘুমুচ্ছে বুঝি?'

করবী বলল, 'হ্যাঁ, এই ঘরে।' তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'আসুন।'

ভেজানো দরজা ঠেলে মাঝখানের বড় ঘরটিতে দু'জনে ঢুকল। করবীদের শোয়ার ঘর। পশ্চিমদিকের দেয়াল ঘেঁষে পাতা বেশ বড় একখানা খাট। একপাশে ছোট্ট একটু কোলবালিশের ওপর পা তুলে দিয়ে বছর তিনেকের একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। শিয়রের কাছে দেয়ালে টানানো একটি যুবকের ফটো। অরুণ সেদিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল। এ প্রতিকৃতি যে করবীর মৃত স্বামী পরেশের তা বলে দেওয়ার দরকার হোল না। অরুণ মনে মনে ভাবল বেশ সুপুরুষই ছিলেন ভদ্রলোক।

অরুণ বলল 'ফটো তো বেশ উঠেছে। কতদিন আগে তুলেছিলেন?'

করবী বলল, 'দু বছর আগে। ওর জন্মদিনে তোলা হয়েছিল।

ঘরের মাঝখানে বড় একটি কাঁচের আলমারি। ওপরের তাকে সৌখীন জিনিসপত্র। নানারকম খেলনার মধ্যে শ্বেতপাথরের ছোট্ট এ[illegible] তাজমহলের প্রতিকৃতি। অরুণের মনে পড়ল মাস কয়েক আগে তিন দিনের ছুটি নিয়ে আগ্রায় যখন হিরন্ময় আর করবীর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল অরুণ, সে সময় সে-ই পছন্দ করে করবীকে

কিনে দিয়েছিল জিনিসটি। করবী দাম সাধাসাধি করেছিল, অরুণ নেয়নি।

করবী বলেছিল, 'ও, আপনি উপহার দিচ্ছেন? সেকথা স্পষ্ট বললেই তো হয়। তার অত লুকোচুরির কি আছে? ভালোই হোল। এর পর সব সময় আপনাকে সঙ্গে করে দোকানে বেরোব। দেখি, আপনি কত উপহার দিয়ে উঠতে পারেন।'

এখন কিন্তু করবী সেই তাজমহলটার দিকে তাকাল না। একটু এগিয়ে পুব দিকের জানালা ঘেঁষা একটা টেবিলের ধারে গিয়ে বলল, 'এটা তাঁর লেখবার টেবিল।'

করবীর স্বামী যে কাস্টম অফিসের চাকরির ফাঁকে ফাঁকে নানা মাসিক সাপ্তাহিকে কবিতা আর প্রবন্ধ লিখত একথা দিল্লীতেই কথায় কথায় করবী অরুণকে বলেছিল। কিন্তু তার অনুপস্থিত স্বামীর সম্বন্ধে অরুণ তখন তেমন ঔৎসুক্য দেখায়নি। এখন আগ্রহের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল, 'তাই নাকি? ওঁর আগের লেখা-টেখাগুলি সব আছে আপনার কাছে? বইটই কিছু বেরিয়েছিল?'

করবী জবাব দিল, 'না, বেরোবার কথা হচ্ছিল। আর সময় হোল না।'

বলতে বলতে দুজনেই টেবিলের ধারে এসে দাঁড়াল। করবীর নিজের হাতের এমব্রয়ডারি করা সুন্দর সাদা একখানি টেবিল ঢাকনি। ফটো স্ট্যাণ্ডে স্বামী স্ত্রীর দুখানি ফটো পাশাপাশি দাঁড় করানো। কালিভরা একটি পার্কার ফিফটি ওয়ান। একপাশে সুদৃশ্য চামড়ায় বাঁধানো ফাইলে লিখবার কাগজ।

অরুণ বলল, 'সব সাজিয়ে রেখেছেন?'

করবী বলল, 'এই রকমই ছিল। আমি আর সরাইনি। মাঝে মাঝে মনে হয় লিখতে লিখতে উঠে গেছেন। ফের এসে বসবেন চেয়ারে।'

গদি আঁটা একখানা চেয়ার সামনেই পাতা ছিল। অরুণ লক্ষ্য করল সে চেয়ারে তাকে করবী বসতে বলল না। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, 'দিলু, লক্ষ্মী ভাইটি, চেয়ারখানা ওঘর থেকে আর একবার এনে দাও তো।'

অরুণ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না, আর চেয়ারে দরকার নেই। আমি এবার উঠব। রাত হয়েছে।'

করবী বলল, 'সে কি। একটু চাও খাবেন না?'

এতক্ষণে চায়ের কথা মনে পড়েছে করবীর।

অরুণ বলল, 'নানা। চা আজ থাক।'

করবী বলল, 'থাকবে কেন। আপনি বরং ওঘরে গিয়ে একটু বসুন, আমি এক্ষুনি চা করে আনছি। চা তো আপনি খুব ভালো-বাসেন খেতে।'

এত দুঃখ দুর্ভাগ্যের মধ্যেও করবী যে সেকথা মনে রেখেছে তা দেখে অরুণের বেশ একটু ভালো লাগল। আর কোন আপত্তি না করে বাইরের ঘরে একটা চেয়ারে বসে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু বাদে এক কাপ চা হাতে করবী এল ঘরে। বলল, 'নিন, শুধু চা-ই দিলাম।'

অরুণ বলল, 'শুধু চা-ই তো ভালো। কিন্তু আপনি নিলেন না যে।'

করবী বলল, 'আমি! আমি তো এ সময় চা খাইনে।'

অরুণ কোন কিছু না ভেবেই বলল, 'আগে তো খেতেন? আগে তো চায়ের বেলায় আপনার সময় অসময় ছিল না।'

করবী একথার কোন জবাব না দিয়ে একটুকাল চুপ করে থেকে অরুণকে বুঝিয়ে দিল আগের সঙ্গে এখনকার অবস্থার মোটেই আর মিল নেই।

একটু পরে করবী বলল, 'চা একদমই ছেড়ে দিয়েছিলাম। মা বকাবকি করতে লাগলেন। বললেন শরীর খারাপ করবে। তাই শুধু সকালে এক কাপ করে খাই। কিন্তু কোন স্বাদ পাইনে। আগে ঠিক সময়-মত চায়ের কাপটি না হলে কি খারাপই না লাগত। কষ্ট হোত, মাথা ধরত রীতিমত। আজকাল টেরও পাইনে। কেন এমন হয় বলতে পারেন?'

অরুণ চা শেষ করে কাপটি মাটিতে রাখতে যাচ্ছিল করবী তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে সেটি নিল। বলল, 'দিন আমার কাছে।'

অরুণ করবীর আগের কথার জবাবে বলল, 'দেখুন আজ পর্যন্ত কোন বড়রকমের শোকের অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। কিন্তু আপনাকে দেখে জীবনে শোককে যেন আমি এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম। আপনার মত চঞ্চল স্ফূর্তিবাজ ধরণের মেয়ে যে এমন-ভাবে বদলে যেতে পারে তা না দেখলে আমি বিশ্বাস করতুম না। কিন্তু এই শোকও তো আপনাকে কাটিয়ে উঠতে হবে। সংসারে আপনার অনেক কর্তব্য আছে, অনেক দায়িত্ব। আপনার সারাজীবন পড়ে আছে সামনে।'

'না না, অমন করে বলবেন না। আমি সে কথা, সারাজীবনের কথা ভাবতেও পারিনে। আমার আর কিছু নেই, কিছু নেই।'

করবীর চোখ সজল হয়ে উঠল। তাড়া-তাড়ি সে অরুণের সামনে থেকে সরে গেল। প্রায় মিনিট দশেক কাটল সে আর ফিরে এল না।

অরুণ এবার আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, ঘরের বাইরে এসে ডাকল, 'দিলীপ।'

দিলু এসে সামনে দাঁড়াল

অরুণ বলল, 'তোমার বউদিকে বলো আমি চলে গেছি।'

দিলীপ বলল, 'বউদিকে ডেকে দেব?'

অরুণ বলল, 'না, আর ডাকতে হবে না।'

দিলীপ সদর দরজা পর্যন্ত অরুণকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আর একদিন আসবেন।'

অরুণ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

ট্রামে পিছনের দিকে একটা নিরালা সীটে বসে সারাটা পথ অরুণ করবীর কথাই ভাবতে লাগল। স্বামীপুত্রে সৌভাগ্যবতী করবীকে দেখে একদিন সে মনে মনে ভেবেছিল মেয়েটির মধ্যে কোথায় যেন একটু বেশী দেখানোপনা আছে। নিজের সম্পদভাগ্যে যেন বড় বেশী সুখী মেয়েটি, বেশী রকম পরিপূর্ণ। অতি পুষ্টাঙ্গী মেয়েকে যেমন অশোভন দেখায়, নিজের সুখ সম্বন্ধে অতি সচেতন মেয়েকেও তেমনি স্থূল মনে হয়। কিন্তু আজ শোকার্তা করবীকে দেখে অরুণের মনে হতে লাগল এর চেয়ে ওর সেই স্থূল সৌভাগ্যই বরং ভালো ছিল। ভালো ছিল ওর সুখানুভূতির আতিশয্য। পরনে চড়া রঙের শাড়ি সিঁথিতে পুরু সিঁদুরের দাগ, আর গা'ভরা গয়না এই রিক্ততার চেয়ে সেই সবই যেন বেশী মানিয়েছিল করবীকে। ওর উচ্ছলতা সয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওর শুষ্কতা শূন্যতা একেবারে দুঃসহ।

আজ পরেশের অনুপস্থিতিটা অরুণ মনে মনে কামনা করেছিল। কিন্তু এমন চির-কালের জন্য সংসার ছেড়ে যে চলে যাবে তাতো অরুণ ভাবেনি, চায়ওনি। পরেশ তো কেবল নিজেই সরে যায়নি, করবীকেও ভিতরে ভিতরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এত-দিন আড়ালে থেকে পরেশই আলো ফেলছিল

ওর মুখে। সেই আলো নিবে যাওয়ায় সব অন্ধকার হয়ে গেছে। করবীর সেই তনু সুন্দর দেহাধার তেমনি রয়েছে। কিন্তু রস নেই, রঙ নেই, প্রাণচাঞ্চল্য নেই, নদীর আকৃতি ঠিক তেমনই রয়েছে, শুধু পথে পথে বরফ হয়ে গেছে জল। না, অরুণ কোনদিন আর যাবে না করবীদের ওখানে। গিয়ে আর কি হবে।

কিন্তু পরক্ষণেই নিজের স্বার্থপরতার কথা ভেবে অরুণ লজ্জিত বোধ করল। ছিঃ এ কি ভাবছে সে। করবী তার সংগে আজ হেসে কথা বলেনি, চটুল হাসি-পরিহাসে যোগ দেয়নি, সেই জন্যেই নিজেকে সে বঞ্চিত মনে করছে, আর তারই ঘনিষ্ঠ পরিচিত বান্ধবীপ্রায় একটি মেয়ে যে চির জীবনের জন্য বঞ্চিত হোল, সে কথা অরুণ একবার ভেবেও দেখছে না।

বেশ রাত হোল বাসায় ফিরতে। রান্নাঘরে ঠাঁই করে, ভাত বেড়ে দিতে দিতে বাসন্তী জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ। কখনকার রান্নাভাত। যা গরম। নষ্ট হয়ে গেছে কিনা দেখ।'

অরুণ খেতে খেতে বলল, 'না, ঠিকই আছে। আজ একটি মেয়েকে দেখে বড় দুঃখ লাগল মা।'

বাসন্তী হাতায় করে ছেলের পাতে পাতলা ডাল তুলে দিতে দিতে বললেন, 'কেনরে। কোন্ মেয়েকে, কোথায় আবার দেখলি তুই।'

অরুণ করবীর পরিচয় দিয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর তার অবস্থার কথা বর্ণনা করে বলল, 'মেয়েটি সম্পূর্ণ বদলে গেছে মা। মোটেই যেন আর চেনা যায় না।'

বাসন্তী সহানুভূতির সুরে বললেন, 'চেনা না যাওয়ারই তো কথা নান্তু। সিঁথির সিঁদুর মুছলে হিন্দুর মেয়ের আর থাকে কি। আহাহা বেচারা। ওই একটি বুঝি পোনা রেখে গেছে?'

অরুণ খেতে খেতে বলল, 'হ্যাঁ। ওই একটি ছেলে।'

বাসন্তী বললেন, 'এখন ওই সব আশা-ভরসা। ওকে মানুষ করে তুলতে পারলে তবেই তো—। ওকি, আর একমুঠো ভাত নিলি নে নান্তু? এই পাখীর আহার খেয়ে তুই বাঁচবি কি করে হ্যাঁরে।'

অরুণ হেসে বলল, 'এই সাতাশ বছর ধরে বেঁচে তো এলাম। আমি যদি এক-এক বেলায় একসের চালের ভাতও খাই, তাহলেও তো তোমার কাছে পাখীর আহারই থাকবে।'

বাসন্তী বললেন, 'হ্যাঁ, সেই ভাগ্যই করে এসেছি কিনা যে, রাশ রাশ ভাত তোমাদের সামনে ধরে দিতে পারব। কত কল-কারসাজি করে যে রাত্রে এই ভাত ক'টি রাখি, তোমার জন্যে, তা আমি জানি।'

রেশনে দু বেলার যোগ্য চাল পাওয়া যায় না। কিছু কিছু ব্ল্যাক মার্কেটে কিনতে হয়। সব সপ্তাহে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই রাত্রে একেবারে ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া সকলের জন্যেই রুটির ব্যবস্থা করতে হয় বাসন্তীকে। অরুণ রুটি খেতে পারে না। তাই ওর জন্যেও ভাতই রাখেন বাসন্তী। কথাটা অরুণের মনে পড়ে যাওয়ায় সে একটু অসহিষ্ণু ভংগীতে বললে, 'রোজ রোজ আমার জন্যে ভাত তোমাকে কে রাখতে বলে মা? না রাখলেই পারো। আর পাঁচজনে যা খায়, আমিও তাই খাব।'

বাসন্তী কোন জবাব দিলেন না। শুধু মুখ টিপে একটু হাসলেন। আর পাঁচজনে যা পারে, তাঁর নান্তু তা পারে না। সকলের ধাত তো আর সমান নয়। খাওয়া নিয়ে ছেলেবেলা থেকে এই ছেলে কি কম কোন্দল, কম কেলেঙ্কারি করেছে। আজ-কাল আর তেমন কিছু করে না, কিন্তু একটু এদিক-ওদিক হলেই খাওয়া ফেলে উঠে চলে যায়। পছন্দমত মাছ-তরকারি না হলে আসতেই চায় না খেতে। বলে, 'আমার ক্ষিদে নেই।' এদিক থেকে তাঁর অতুলই বরং লক্ষ্মী। ক্ষিদের সময় যা পায়, তাই তার যথেষ্ট। শুধু পরিমাণে বেশি

হলেই হোল। শাক হোক, মাছ হোক, কোন দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সবই তার মুখে রোচে। অনেক বিষয়েই অনেক রকমের গুণ আছে অতুলের। শুধু যদি পড়াশুনোটা হোত, তাহলে আর দুঃখ ছিল না।

'আচ্ছা ওর একটা কাজকর্ম খুঁজে পেতে তোরাও তো জুটিয়ে দিতে পারিস।'

অরুণ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কার কথা বলছ।'

বাসন্তী বললেন, 'কার কথা আবার। ওই পোড়াকপালে হতভাগাটার কথা। অতুলের একটা ব্যবস্থা কি তোরা করবিনে?'

সকাল বেলায় ছোট ভাইয়ের ব্যবহারের কথা মনে পড়ে গেল অরুণের। খানিকটা বিতৃষ্ণার ভঙ্গীতে সে বলল, 'ওর কথা আমার কাছে আর তুলো না মা।'

বাসন্তী অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'তুই বলিস আমার কাছে তুলো না, উনি বলেন আমার কাছে তুলো না; ওর কথা আমি তাহলে কার কাছে বলব বল দেখি। মহা জ্বালা হয়েছে আমার।'

অরুণ বললে, 'কারো কাছেই বলে দরকার নেই। পারো তো ওকেই বলো।'

বাসন্তী বললেন, 'আমি বুঝি বলিনে ভাবিস; দিনরাত রোজ দুবেলা খাওয়ার সময় আমি তো ক্যাট ক্যাট করছিই। ও যদি না শোনে, তো করব কি।'

অরুণ বলল, 'তেমন করে বলতে পারলে ও শোনে না ওর ঘাড় শোনে।'

আর কথা না বাড়িয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল অরুণ।

মুখ ধুয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিল ভুবনময়ী পিছন থেকে ডেকে বললেন, 'ও নান্তু, এত রাত করলি যে আজ?'

অরুণ ফিরে এসে ভুবনময়ীর সামনে
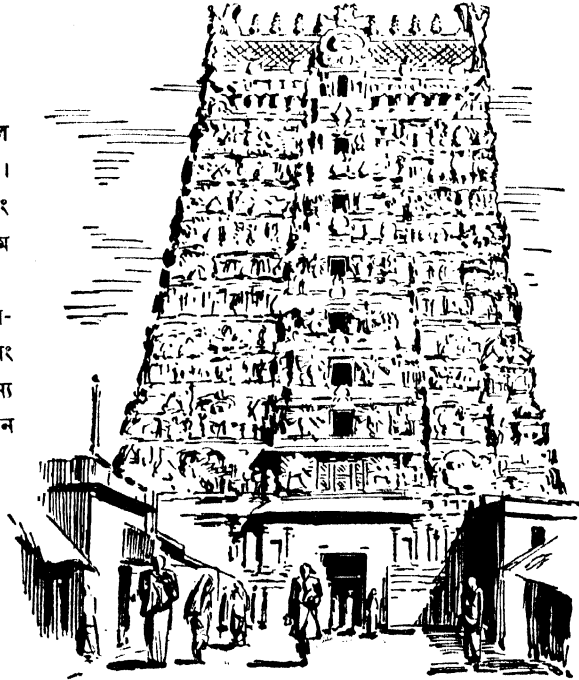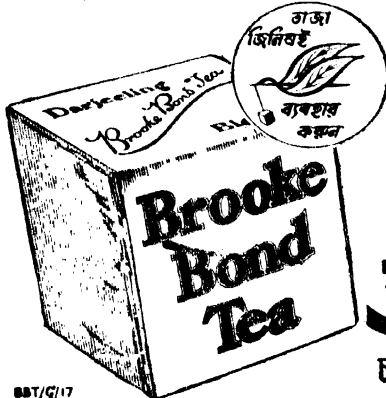
দাঁড়াল, 'এমনিই একটু রাত হোল দিদা। কি খাচ্ছ?'

দোরের সামনে বসে একটা বাটীতে করে খানিকটা সাদা খই আর একটু গুড় দিয়ে রাত্রের জল-খাওয়া শেষ করছিলেন ভুবনময়ী, নান্তুর দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'দেখ এসে না কি খাচ্ছি। কত রাজভোগ, মোহন-ভোগ আছে হাঁড়িতে। খাওয়ার জিনিসের আমার অভাব আছে নাকি কিছুর? 'আয় নিবি একগাল? দেব?'

অরুণ হেসে বলল, 'না দিদা। এইতো ভাত খেয়ে এলাম। তুমি খাও।'

জুতো ছেড়ে দিদিমার পাশে এসে উটকো-ভাবে একটু বসল অরুণ, তারপর ভুবনময়ীর খাওয়া দেখতে দেখতে হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা দিদা?'

'উঁ।'

'বিধবা হওয়ার পর থেকেই তুমি কি রোজ রাত্রে এই খই খেতে শুরু করেছ? প্রায়ই দেখি তোমাকে খই খেতে।'

ভুবনময়ী বললেন, 'আর কোন্ পোড়া ছাই খাব।'

অরুণ বলল, 'মাঝে মাঝে লুচি-টুচিও তো খেতে পার।'

ভুবনময়ী বললেন, 'দূর। ওসব আমার পিরবিত্তি হয় না। বলে বয়সের কালেই খাইনি। এখন তো বুড়ো হয়ে মরতে চলেছি।'

করবীর কথা মনে পড়ল অরুণের। করবীও হয়ত এই রকম সামান্য কিছু খই-টই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছে। অথচ মেয়েটি মাছ, মাংস, পোলাও, কালিয়ার কি ভক্তই না ছিল। অবশ্য খাওয়ার চেয়ে রান্নাতেই বেশি সখ ছিল করবীর। বাবর রোডে হিরন্ময়ের বাড়িতে কোমরে আঁচল জড়ানো ওর সেই মাংস রান্নার ছবিটি চোখের সামনে ভেসে উঠল অরুণের। রাঁধতে রাঁধতে খানিকটা মাংস ছোট একখানি প্লেটে করে এনে অরুণের সামনে ধরেছিল করবী, 'নিন, একটু চেখে দেখুন তো। ঠিক মত নুন ঝাল হয়েছে না কি। বুঝব জিভের তাক।'

অরুণ ঝোলের একটু স্বাদ নিয়ে বলে-ছিল, 'ঠিকই আছে।'

করবী বলেছিল, 'অমন ওপর ওপর দখলে হবে না ভালো করে চাখুন। একটু বেঠিক হলে কিন্তু সমস্ত দোষ আপনার ঘাড়ে চাপবে।'

অরুণ বলেছিল, 'সব আমার ঘাড়ে? রাঁধুনীকে বুঝি কোন জবাব-দিহিই আর করতে হবে না।'

করবী বলেছিল, 'মোটেই না, সব জবাব-দিহির দায় তখন চাখুনীর জিভের।'

অরুণ গম্ভীর হয়ে বলেছিল, 'বেশ, আপনার মাংসে আরো খানিকটা নুন লাগবে তা হলে,'

করবী একটু বাদে অরুণের দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল, 'এই বুঝি? আমার মাংসকে নুনে কাটা করবার মতলব? তোমার বন্ধুর কাণ্ড দেখছ দাদা?'

একটু দূরে ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে হিরন্ময় নির্বিবাদে সিগারেট টেনে যাচ্ছিল। বোনের কথার জবাবে বলল 'দেখছি বই কি। কিন্তু চাখুনী রাঁধুনীর লড়াইটা গরীবের মাংসের ওপর দিয়ে না চালালেই ভালো হয়।'

করবী অরুণের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমার গরীব দাদার আবেদনটা শুনলেন তো? তার মুখের দিকে চেয়ে এবার লক্ষ্মী ছেলেটির মত ঠিক করে বলুন সত্যিই নুন ঝাল কিছু লাগবে কি না।'

নমিতা পিপলুকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসে বলেছিল, 'অত সাধাসাধি কিসের জন্যে। রাঁধুনীর নিজের সঙ্গেও তো একটা জিভ আছে।'

অরুণ বলেছিল, 'থাকলে কি হবে। সে জিভের তাকের ওপর রাঁধুনীর বেশি ভরসা নেই। সাধে কি আর কাউকে সাধতে আসে?'

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া আর হৈ হুল্লোড় চলেছিল হিরন্ময়ের বাসায়।

অরুণ খেতে খেতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিল, 'চমৎকার রান্না হয়েছে আপনার।'

করবী ছদ্ম কোপের ভঙ্গিতে বলেছিল, 'থামুন থামুন। আপনার জিভকে আর বিশ্বাস নেই। এমন চমৎকার মাংস নুনে পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন আপনি। আপনার উচিত শাস্তি কি জানেন? সারা-জীবন মাংস বন্ধ করা।'

উল্টো শাস্তিটা অকারণে করবীকেই পেতে হোল। সারাজীবনের জন্যেই ওর মাছ-মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ভেবে ভারি খারাপ লাগল অরুণের।

'ও মা, ও কিভাবে বসলি নান্তু? বসবিই যদি ওই বিছানার ধারটায় বসনা গিয়ে।'

দিদিমার কথায় চমক ভাঙল অরুণের। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'না দিদা, আর বসব না। যাই শুই গিয়ে।'

শুয়েও অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। অবশ্য সকালে উঠেই সব ভুলে গেল অরুণ। যুব সঙ্ঘের ঘরে সেদিন লোকজন ডেকে খুব একটা বড় রকমের আড্ডা সেদিন জমিয়ে তুললেন বীরু গাঙ্গুলী। কিছু-ক্ষণের জন্য নিজের বেকারত্ব আর করবীর বৈধব্য কোন কথাই আর অরুণের মনে রইল না। সন্ধ্যার পর যখন বাসায় ফিরল প্রীতি একটা পোস্ট কার্ড এগিয়ে দিল 'দাদা তোমার চিঠি।'

অরুণ পড়ে দেখল শাঁখারীপাড়া লেন থেকে ডাক্তার বিনোদবিহারী মজুমদার ইংরেজীতে একটা চিঠি দিয়ে তাকে জানিয়েছেন ছেলের টিউটর হিসাবে অরুণকে রাখাই ঠিক করেছেন তিনি। তবে চল্লিশ টাকা নয়, তিরিশ টাকা পর্যন্ত দিতে পারবেন। অরুণ যদি তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয় তবে যেন অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

প্রীতি চিঠিটা আগেই পড়ে ফেলেছিল, বলল, 'তিরিশ টাকার জন্যে অতদূরে গিয়ে টিউশানি করবে দাদা?'

অরুণ বলল, 'উপায় কি। তিরিশের বেশি এখন আর জুটছে কই।'

প্রীতি বলল, 'কিন্তু পথেই যে তোমার সব খরচ হয়ে যাবে দাদা।'

অরুণ বলল, 'সব খরচ হবে না। দু' চার টাকা অন্তত বাঁচবে। তোর স্নো সাবানের পয়সাটাতো অন্তত হয়ে যাবে। কি বলিস?'

প্রীতি বলল, 'আহাহা।'

(ক্রমশ)

পুমা

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

মাঝে মাঝে খবরের কাগজে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নতুন নতুন জন্তুর আমদানীর কথা জানতে পারা যায়। জাপানী স্যালাম্যান্ডার সেরূপ একটি জন্তু। কিছুদিন পূর্বে খবরের কাগজে দেখেছিলাম চিড়িয়াখানায় দক্ষিণ আমেরিকা হতে দুটি পুমা এসেছে। পুমা এদেশে একেবারে নতুন জন্তু এমন কি আমরা অনেকেই এদের নামের সঙ্গেও পরিচিত নই। কিন্তু যাঁরা ইংরেজ কবি হাড্সন্ (W. H. Hudson) সাহেব কৃত Naturalist in Laplata নামক গ্রন্থখানা পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন পুমা কিরূপ জন্তু। হাড্সন্ সাহেবের গ্রন্থ পাঠ করে পুমার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করবার ইচ্ছে জাগেনি এমন লোক খুব কমই আছে। কিছুদিন পূর্বে সে ইচ্ছা পূরণ করবার জন্য আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম জন্তু দুটি দেখতে।

পুমা বিড়াল জাতীয় জন্তু সুতরাং সিংহ ও বাঘের ঘরেই ওদের দেখতে পাব বিবেচনা করে সেখানেই গেলাম। কিন্তু সে-বাড়িটার চারদিক ঘুরেও পুমার সঙ্গে দেখা পেলাম না। একটা ঘর দেখলাম শূন্য পড়ে আছে। প্রত্যেক কুঠরীর লোহার গরাদের গায়ে একটি ফলকে ভিতরের জন্তুর যে পরিচয় লেখা থাকে, তাও পড়ে পড়ে দেখলাম। কিন্তু কোনটিতেই পুমার নাম নেই। তবে কি জন্তু দুটি মরে গেলো? নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছি এমন সময় বাগানের একজন ভৃত্যের সঙ্গে দেখা হলো তাকে জিজ্ঞেস করায় সে সেই শূন্য কুঠরীর কথাই আমাকে বলে দিলো। ঘরটি শূন্য বাইরেও কোন ফলকে কিছুই লেখা নেই। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ নজরে পড়লো উপরের বসানো একটি প্রশস্ত তক্তার দিকে। এই তক্তাটির কথা ভৃত্যও আমাকে বলে দিয়েছিলো। তক্তাটির দিকে ভালো করে তাকাতেই এবার জন্তু দুটি দেখতে পেলাম কিন্তু খুব সামান্য অংশই। দুটিই তক্তার উপর গা মেলে দিয়ে পড়ে আছে। মনে হলো দুটিই নিদ্রিত। নতুন জন্তু অধ[illegible]রীর গায় ফলকে কোনরূপ পরিচয় লেখা নেই দেখে আশ্চর্য হলাম। কর্তৃপক্ষের এ-ত্রুটি অমার্জনীয় বলে মনে হলো।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু তাদের নিদ্রাভঙ্গের কোন লক্ষণই দেখা গেলো না। তক্তার গায় মইয়ের আকারে গাছের একটি ডাল লাগানো আছে। ডালটির গা মসৃণ ও চকচকে। তাতে মনে হলো ডালটি দিয়ে ওরা উপরে নীচে ঘন ঘন ওঠা-নামা করে। ঘরে পোষা বিড়াল ও তাদের সমজাতীয় জন্তু গাছে চড়তে একেবারে অপটু নয়। বাঘ সিংহ গাছে উঠতে পারে না, তাদের বিরাট দেহের জন্য। চিতা বাঘও ও তাদেরই সমজাতীয় দক্ষিণ আমেরিকার বাঘ জেগুয়ার গাছে চড়তে বেশ পটু। দক্ষিণ আমেরিকার নিবিড় অরণ্য প্রদেশের পুমাও দিনের বেলাটা প্রায় গাছেই কাটায়।

তক্তার উপরে নিদ্রিত পুমা দুটির দেহের যে-অংশটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম, তাতে তাদের পরিচয় কিছুই পাওয়া গেলো না। বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন তাদের নিদ্রাভঙ্গের কোন লক্ষণই দেখা গেলো না, তখন অন্য দিকে গিয়ে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করতেই দেখি ভৃত্যগণ বালতি বালতি খাবার নিয়ে যাচ্ছে বাঘের ও সিংহের ঘরের দিকে। তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুমার ঘরেও খাবার পড়েছে আর খাবারের গন্ধে নিশ্চয়ই তাদের ঘুমও ভেঙ্গেছে, সুতরাং এবার তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে মনে করে গেলাম আবার সেদিকে। এবার কুঠরীর কাছে যেতেই তাদের সঙ্গে দেখা হলো, দুটিই ভোজ সমাপ্ত করে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মেঝের উপরে। টুকরো টুকরো কাঁচা মাংস মেঝেতে এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। দুটিই দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মতো স্থির নিশ্চলভাবে। চোখ দুটি কেবল এদিক ওদিক ঘুরছে।

হঠাৎ দেখে মনে হলো আমাদের দেশেরই যেন বৃহদায়তনের একটি হুলো বিড়াল। মুখটা অপেক্ষাকৃত একটু লম্বা ধরণের; মাথার দুপাশের দুটি কান বিড়ালের কানেরই ন্যায় ছোট ছোট ও খাড়া খাড়া। দক্ষিণ আমেরিকার সিংহ বলে পরিচিত হলেও আয়তনে পুমা আমাদের দেশের পশুরাজ সিংহ অপেক্ষা অনেক ছোট বলে মনে হলো। নাকের ডগা থেকে লেজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অনুমানে পাঁচ ফুটের অধিক বলে মনে হলো না। দেহের মাংসপেশীও সিংহ বা বাঘের মাংসপেশীর ন্যায় দৃঢ় শক্ত মজবুত নয়। পেটের দিকটা কেমন ঝুলে পড়েছে। কারণ হয়তো প্রচুর আহার্যের অভাব অথবা এদেশের জলবায়ু। কুঠরীর গায় পরিচয়পত্র না থাকায় এদের বয়স কত ঠিক জানা গেল না। পূর্ণ বয়স্ক না হলে এদের আরও বড় হবার সম্ভাবনা আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় পূর্ণ বয়স্ক পুমা আয়তনে আট ফিটেরও অধিক হয়ে থাকে। ওদের গায়ে কোথাও ডোরা বা ফোঁটাকাটা দাগ-কাটা নেই—মুখের দুপাশে দুটি সাদা দাগ ও ঠোঁট দুটি ও লেজের শেষ প্রান্ত কালো লোমে আবৃত। পিঠ ও উপরের অংশের রং অনেকটা আমাদের পশুরাজ সিংহেরই গায়ের রঙের মতো কিন্তু তদপেক্ষা উজ্জ্বল ও চকচকে। সেইজন্য প্রথম যাঁরা ইউরোপ হতে দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করতে এসেছিলেন, তাঁরা পুমার চামড়া দেখে ওদের এশিয়া বা আফ্রিকা মহাদেশীয় সিংহ বলেই মনে করেছিলেন। পরে তাদের সে ভ্রম দূর হয়। যতক্ষণ তাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, ততক্ষণ ওরা একই স্থানে স্থির স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলো। কাজেই ওদের চলার ভঙ্গির কোন পরিচয়ই পাওয়া গেলো না। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। সিংহ ও বাঘের চোখের দিকে তাকালে যেমন ভয় হয়, ওদের দৃষ্টি তেমন ক্রূর ও হিংস্র নয়। অথচ পুমা যে খুব নিরীহ প্রকৃতির জন্তু তাও নয়।

এক সময় পুমা দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিলো। সেদেশের নিবিড় অরণ্যাঞ্চলে তখন তাদেরই ছিলো প্রাধান্য। সে দেশের আদিমবাসীরা কখনও তাদের হত্যা করে না। তারা বরং তাদের সম্ভ্রমের চক্ষেই দেখে। কারণ, তারা জানে বনেজঙ্গলে পুমা যেমন তাদের বন্ধু এমন অন্য কোন জন্তুই নয়। বনেজঙ্গলে হিংস্র জন্তু বিশেষভাবে সে দেশের চিতেবাঘ, জেগুয়ার দ্বারা আক্রান্ত হলে অনেক সময় পুমা তাদের সে বিপদ হতে উদ্ধার করে থাকে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা উপনিবেশ স্থাপিত

দক্ষিণ আমেরিকার একটি পুমা। মানুষকে এরা মিত্ররূপেই দেখে কিন্তু কখনো পোষ মানে না

হবার পর হতে দক্ষিণ আমেরিকা হতে পুমার সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে।

পুমা মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু মানুষের পোষা জন্তুজানোয়ারের প্রতি তাদের কিছুমাত্র মমতা নেই। শীতের সময় পাহাড় হতে নেমে এসে ওরা সমতলভূমির পোষা গরু ঘোড়া ভেড়ার পালের উপর চড়াও করে। তখন তাদের হত্যা করতে না পারলে পোষা জন্তু রক্ষা করাই কঠিন হয়ে ওঠে। তাই সে দেশের শেতাঙ্গ অধিবাসী-দের পুমার উপর বিষম ক্রোধ। সে দেশের বহু শেতাঙ্গ অধিবাসীর ব্যবসা গরু ঘোড়া মেষ দলের পালন। সেগুলি সে দেশের বিস্তীর্ণ তৃণ প্রান্তরে দিনরাত্রিই ছাড়া থাকে। পুমার শিকারের লক্ষ্য তাদের ছানা-গুলি। অনেক সময় গরুর বাচ্চা ধরতে গিয়ে তাদের মায়ের শিঙের গুঁতোয় পুমাকে প্রাণও হারাতে হয়। নিবিড় অরণ্য প্রদেশে পুমা হরিণ, শুয়োর, টেপির প্রভৃতি জন্তু শিকার করে। হরিণের উপর এমন অতর্কিত-ভাবে লাফিয়ে পড়ে যে হরিণ ছুটে পালাবারও সময় পায় না। হরিণ বা অন্য জন্তুর উপর লাফিয়ে পড়েই গলাটা ছিঁড়ে ফেলে। ওরা জন্তুদের আক্রমণ করে ঘাড়ের দিক থেকে। ঘাড়ে লাফিয়ে পড়া ও গলা ছেঁড়া মুহূর্তের কাজ। গলা ছিঁড়ে ফেলেই ওরা রক্তটা প্রথমে খেয়ে নেয়। তারপর বুকের দিকের খানিকটা মাংস খেয়ে গোটা জন্তুটাকেই ফেলে রেখে যায় সেখানে। তখন সেটা হয় বনের শেয়াল কুকুর শকুনী প্রভৃতির খাদ্য। বাঘ বা সিংহের মতো অর্ধ-ভুক্ত জন্তুর মায়ায় সেদিকে আর ফিরে আসে না। ক্ষিদের সময় প্রতিবার ওরা নতুন নতুন জন্তু শিকার করে খায়। হরিণ শিকার করতে গিয়ে অনেক সময় হরিণের শিঙের গুঁতোয় তাদের জব্দও হতে হয়, গা অনেক সময় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয় হরিণকেই। শিকারে ওরা যেমন চতুর তেমনি চটপটে।

কোথাও পুমার উপদ্রব আরম্ভ হলে সে স্থানের শেতাঙ্গ অধিবাসীরা দল বেঁধে পুমা শিকারে বের হয়। পুমা শিকার করতে হলে সঙ্গে কুকুর থাকা প্রয়োজন। কুকুর না হলে বনের ভিতরে ওদের খুঁজে বের করা শক্ত। তাছাড়া কুকুরের উপর পুমার বিষম ক্রোধ। কুকুর দেখতে পেলে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও পুমা তাদের আক্রমণ করে। কুকুরের মাংসের প্রতি ওদের কিছুমাত্র লোভ নেই, কুকুর মেরে ওরা কুকুরের মাংস স্পর্শও করে না। শুধু যেন জন্মগত একটা বিদ্বেষ অথবা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যই এরা কুকুরদের দর্শন মাত্রই আক্রমণ করে। পুমা শিকারে কুকুর শিকারী-দের সাহায্য করে শুধু তাদের খুঁজে বের করতে; নিতান্ত দায়ে না পড়লে কুকুর কখনও পুমাকে আক্রমণ করতে সাহস করে না। হডসন সাহেব তার পুস্তকে পুমার কুকুর-বি[illegible] একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ঘটনাটিতে পুমার প্রকৃতির একটা দিক আশ্চর্যরূপে পরিস্ফুট হয়েছে। হডসন সাহেব এই ঘটনার কাহিনী শুনেছিলেন সে দেশবাসী একজন স্কচম্যানের কাছ থেকে। ভদ্রলোকটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী,

সুতরাং আজগুবি বলে মনে করবার কোন কারণ নেই।

ভদ্রলোকটি ছিলেন একজন মেষপালক। একদিন তিনি তার মেষপাল নিয়ে দূরে কোন একস্থানে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলো তার কয়েকটি কুকুর। বনের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে কুকুরগুলি হঠাৎ ঝোপের ভিতরে একটি পুমা আবিষ্কার করে ফেলে। কিন্তু আবিষ্কার করে তাকে আক্রমণ করতে তাদের সাহসে কুলোচ্ছিলো না। ভদ্রলোকটি পথে পুমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই সঙ্গে তিনি কোন অস্ত্র, না বন্দুক না ছোরা এমন কি একটি লাঠিও নেন নি। মেষপালের শত্রু পুমাকে সামনে পেয়ে তাকে ছেড়ে দিতেও তিনি প্রস্তুত নন। সেখানে একটা গাছের ডাল পড়ে থাকতে দেখে সেটা তুলে নিয়েই তার দিকে তিনি অগ্রসর হলেন। তার জানা ছিলো পুমা সহজে মানুষকে আক্রমণ করে না। সে একরূপ নির্ভয়েই তার কাছে গিয়ে ডালটা তুলে তার মাথায় মারতে উদ্যত হলেন। কিন্তু তিনি আশ্চর্য হলেন দেখে পুমাটা তার দিকে দৃকপাত না করে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, কুকুরগুলির দিকে। রাগে তার দুই চোখ আগুনের মতো জ্বলছে। তিনি ডালটা তুলে কয়েকবারই তার মাথায় মারতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হলেন পুমাটা মাথা এদিক ওদিক সরিয়ে নেওয়ায়। তার প্রতি পুমার তাচ্ছিল্যভাবে ও বারবার ব্যর্থ-কাম হওয়ায় তার রাগ গেলো আরো চড়ে। তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে সজোরে তার মাথার দিকে আঘাত হানতেই সেটা পুমার মাথায় না পড়ে মাটিতে লেগে ডালটা গেলো দ্বিখণ্ডিত হয়ে। এবার তিনি সম্পূর্ণ অস্ত্রহীন. পুমাটি তার কাছ থেকে মাত্র দুই গজ দূরে। তিনি কি করবেন ভাবছেন এমন সময় পুমাটি একলাফে একেবারে তার গা-ঘেঁষে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। তার আক্রমণের লক্ষ্য কুকুরগুলি। কুকুরের দল পলায়ন করবার চেষ্টা করতেই ক্রুদ্ধ পুমা তাদের পিছনে পিছনে তাড়া করলো। ভদ্র-লোকটির তখন আর কিছু করবার ছিলো না। কুকুরগুলি এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে যতই আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলো পুমাটিও ততই তাদের পিছু পিছু তাড়া করে বেড়াতে লাগলো। সেই অবসরে ভদ্র-লোকটির সঙ্গী এসে পড়ায় পুমার জীবন লীলা সেইখানেই সাঙ্গ হলো। সঙ্গীটির হাতে ছিলো একটি বন্দুক।

গাছের ডালের সঙ্গে মিশে আছে একটি পুমা

বারবার দেখা গেছে মানুষ ও কুকুরের দ্বারা আক্রান্ত হলে পুমার কুকুরকে শত্রু বলে চিনতে কিছুমাত্র দেরি হয় না, কিন্তু সেই একই সময়ে মানুষকে ওরা বন্ধু বলেই গণ্য করে নেয়। শত্রু-মিত্র ভেদাভেদে তাদের এই অদ্ভুত ব্যবহার এক মহা বিস্ময়ের বিষয়।

কুকুরও মানুষকে ভালোবাসে কিন্তু সে পোষা কুকুর ও সে-ভালোবাসা প্রধানত তাদের মনিবের প্রতি। মানুষের প্রতি কুকুরের ভালোবাসার পিছনে রয়েছে মানুষের সঙ্গে তাদের যুগ-যুগান্তরের সম্বন্ধ। কুকুরের প্রভু-প্রীতি সেই যুগ-যুগান্তরের সম্বন্ধেরই ফল। কিন্তু পুমা? তাকে আজ পর্যন্ত কেউ পোষ মানায়নি। বাচ্চাবস্থায় বন থেকে ধরে এনে কেউ সখ করে তাদের পোষ মানিয়েছে। কিন্তু শৈশবাবস্থা কাটিয়ে ওরা বেশি দিন বাঁচে নি। পুমা যখন বনে জঙ্গলে নিজের জীবন বিপন্ন করেও মানুষকে অন্য হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হতে রক্ষা করে, তখন সে মানুষের সঙ্গে তার পূর্ব পরিচয়ে কথা ভাবে না, প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ তো নয়ই। যার রক্ষক সে হয়, বনের মধ্যে তাকে সে কোনদিন চোখেও দেখে নি।

দক্ষিণ আমেরিকার জেগুয়ার আমাদের দেশের চিতেবাঘেরই সমগোত্রীয় যেমন হিংস্র তেমনি শক্তিশালী। পুমার সঙ্গে জেগুয়ারের চিরকালের শত্রুতা। একে অন্যকে দেখতে পেলে উভয়েই রাগে ফুলতে থাকে। সামনা সামনি হলে যুদ্ধ অনিবার্য। একজন রণে ভঙ্গ না দেওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত জেগুয়ারকেই রণে ভঙ্গ দিতে হয়। দক্ষিণ আমেরিকার লোক বনে জঙ্গলে জেগুয়ারকেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভয় করে। অস্ত্রহীন অবস্থায় একাকী একবার জেগুয়ারের সামনে পড়লে প্রাণ বাঁচানো শক্ত। এরূপ অবস্থায় ঘটনাচক্রে পুমার আবির্ভাব হলে জেগুয়ারকে মানে মানে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। অনেক সময়ে উভয়ের মধ্যে বল পরীক্ষাও হয়ে থাকে।

শেষ পর্যন্ত জেগুয়ারকেই পুমার নিকট হার মানতে হয়। জেগুয়ারের আক্রমণ হতে পুমার সাহায্যে লোকের প্রাণরক্ষা হয়েছে হডসন্ সাহেব সে দেশ ভ্রমণকালে এরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ বহু পেয়েছেন। তার পুস্তক হতে সেরূপ একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা গেলো।

একদল শিকারী,—সংখ্যায় প্রায় ত্রিশজন,—উটপাখী ও অন্যান্য জন্তু শিকার করবার জন্য বন ঘেরাও করেছে। চার দিক থেকে শিকার তাড়িয়ে আনবার কালে উত্তেজনার মুখে একজন শিকারী ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। পা ভেঙ্গে গিয়ে তার আর উত্থান শক্তি ছিলো না। অন্য শিকারীরা তখন শিকারে মত্ত। সঙ্গীর এই বিপদের কথা তারা কিছুই জানতে পারলো না। সন্ধ্যের সময় তার ঘোড়াটি একাকী বাড়ি ফিরে এলে সকলে জানতে পারলো সে আসে নি। পর-দিন সকালে আবার সকলে বের হোলো তাকে খুঁজতে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন তার সন্ধান পাওয়া গেলো, তখন দেখা গেলো উত্থানশক্তি রহিত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। সমস্ত রাত্রি একা একা সে বনে কাটিয়েছে তবু সে কোন হিংস্র জন্তু দ্বারা আক্রান্ত হয় নি। তাদের বিস্মিত হতে দেখে কেন যে সে হিংস্র জন্তু দ্বারা আক্রান্ত হয় নি, সে কথা তাদের বললো।

অন্ধকার হবার কিছুক্ষণ পরেই একটি পুমা তার কাছাকাছি এসে একটি স্থান অধিকার করে বসলো। কিন্তু তার মনে হলো পুমাটি যেন তাকে দেখতেই পাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেলো সে যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। একবার সে উঠছে, একবার সে বসছে, একবার সে জায়গা ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। এরূপ-ভাবে বার কয়েক আসা-যাওয়া করবার পর একবার দেখা গেলো সে আর ফিরে আসছে না। তখন তার মনে হলো পুমাটি চলে গেছে আর সে ফিরবে না। হঠাৎ মাঝ রাত্রিতে জেগুয়ারের গর্জনে সে চমকে উঠলো। এবার একেবারে সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে মুখোমুখি হবে মনে করে সে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে হতাশ ভাবে সে স্থানে পড়ে রইলো। এর মধ্যে একবার সে কোনরূপে দুহাতে ভর দিয়ে ঘাড় উঁচু করে যে দিক থেকে গর্জন আসছিলো, সে দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো একটি জেগুয়ার এক-পা দু-পা করে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু দৃষ্টি তার বিপরীত দিকে নিবদ্ধ। মনে হলো মুখ ঘুরিয়ে সে যেন কাকে দেখছে ও আক্রমণের সুযোগ খুঁজছে। একটু পরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেলো পুমার তীব্র কণ্ঠের গর্জন। দুটিতে যে লড়াই আরম্ভ হয়েছে সে সম্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহ রইলো না। ভোর হবার পূর্বে কয়েকবারই জেগুয়ারটি তার দিকে আসবার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু প্রতিবারই পুমার কাছ থেকে বাধা পেয়ে তার কাছ পর্যন্ত আসতে পারে নি। সূর্যোদয়ের পর সে আর জেগুয়ারটি দেখতে পায় নি।

বনে জঙ্গলে মানুষকে শুধু আক্রমণ করতে নিরস্ত থাকাই নয়, অন্য কোন হিংস্র জন্তু কর্তৃক আক্রান্ত হলে তাদের রক্ষার জন্য নিজ হতে অন্য কোন হিংস্র জন্তু মানুষের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হতে পারে, এমন কি নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও, এরূপ ঘটনা শুধু অবিশ্বাস্য নয় অনেকের নিকট তা অসম্ভব বলেই মনে হতে পারে। এরূপ সন্দেহের কথা হডসন্ সাহেবের মনেও যে উদয় হয় নি তা নয়। তবে তার বিশ্বাস করবার কারণ এরূপ ঘটনা একটি দুটি নয় বহু স্থানে বহুলোকের নিকট এরূপ ঘটনার কথা তিনি শুনেছেন; শুধু জনশ্রুতি নয়, প্রত্যক্ষদর্শী লোকের মুখ থেকেও। যে সব ঘটনা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছেন, তিনি শুধু সেরূপ ঘটনার কথাই তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

পুমা নিতান্ত দুর্বল বা ভীরু স্বভাবের প্রাণী নয়। অন্য জন্তুদের আক্রমণ করবার সময় তার হিংস্র স্বভাবেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, বল, বিক্রম সাহসেও সে কম নয়। মানুষের বেলায়ই শুধু তার এরূপ বৈরাগ্যের, শুধু বৈরাগ্য নয়, বন্ধুস্বভাবের কারণ কি? এ সম্বন্ধে হডসন্ সাহেব একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তার সিদ্ধান্ত এই যে মানুষের সামনে পড়লে পুমা এমন এক অজ্ঞাত জন্মগত সংস্কারের (instinct) দ্বারা পরিচালিত হয়, যার রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয় নি। অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় বিশেষ কোন রং, গন্ধ বা শব্দের দ্বারা কোন কোন জন্তু এমন মোহাবিষ্ট বা অভিভূত হয়ে পড়ে যে মুহূর্ত মধ্যে তাদের সমুদয় প্রকৃতি বদলে যায়। মানুষের গায়ের গন্ধেই হক বা চেহারাতেই হক পুমা মানুষের সামনে পড়লেই তাদের সেই বিশেষ জন্মগত সংস্কার (Instinct) দ্বারা তারা এমনভাবে প্রভাবান্বিত হয় যে, তারা মানুষকে আর শত্রু বলে মনে করতে পারে না—মানুষ তখন তাদের কাছে প্রতিভাত হয় মিত্র ও পরম আত্মীয়রূপে।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৭৭

দুটি বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে কতকটা হাল্কা নিশ্চিন্ত মন নিয়ে ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন করলাম। প্রথমতঃ, মাসিকের নাম হ'ল বিচিত্রা; আর দ্বিতীয়তঃ, ফাল্গুন মাসের পরিবর্তে বিচিত্রার প্রথম প্রকাশের তারিখ স্থির করলাম ১৩৩৪ সালের পয়লা আষাঢ়। দেখতে দেখতে ফাল্গুন মাস এতটা কাছিয়ে এসেছিল যে, সবরকম যোগাড়-যন্ত্র উদ্যোগ-আয়োজন শেষ ক'রে অত শীঘ্র কাগজ বার করা সম্ভব মনে হ'ল না।

ভাগলপুরে ভাগীরথীর তীরে উপবেশন ক'রে বন্ধুবর অমরেন্দ্রনাথ দাস ও আমি প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখতাম। স্বপ্নটা ছিল একটু বড় বহরের,—হিন্দু মুসলমানের মিলন সাধনের স্বপ্ন। জীবনের ক্রিয়া-শীলতার বেশ-খানিকটা অংশ এই যৎ-পরোনাস্তি প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যয়িত করবার আগ্রহে আমরা দুই বন্ধু উচ্ছল হ'য়ে উঠতাম। আমাদের সামর্থ্যের সংকীর্ণতার বিষয়ে নিশ্চয়ই আমরা সচেতন ছিলাম; কিন্তু এ কথাও বিস্মৃত হতাম না, ক্ষীণতম সরিৎও তার অতি-সংকীর্ণ জল-প্রবাহের দ্বারা বিশালকায় নদীকে খানিকটা বিশালতর ক'রে তুলতে পারে।

হিন্দু মুসলমান সঙ্ঘর্ষের যে দুরন্ত ঝটিকা স্বাধীনতা অর্জনের অল্পকাল পূর্বে সারা ভারতবর্ষকে ভেঙ্গে-চুরে দুমড়ে-মুচড়ে বিধ্বস্ত ক'রে দিয়েছিল এবং যার উদ্ধত রোষ এ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হ'ল না, বিশ-বাইশ বৎসর পূর্বে তার মেঘ সঞ্চয়ের উপক্রম-পর্ব লক্ষ্য করে আমরা শঙ্কিত হ'য়ে উঠতাম,—আর স্বপ্ন দেখতাম, কি ক'রে এই ঝটিকার মেঘসঞ্চয়কে ফুৎকারে ফুৎকারে চূর্ণ ক'রে আকাশ থেকে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

এই ফুৎকার অবশ্য প্রেমের ফুৎকার। আমাদের দেশ প্রেমের দেশ। এক সময়ে এই দেশে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমের ফুৎকারে অনেক বৈষম্যের মেঘকে চূর্ণ ক'রে আকাশ নির্মল করেছিলেন। আমাদেরও সেইরকম সাধ যেত, কিন্তু সাধ্য খুঁজে পেতাম না।

অমরেন্দ্র বললেন, "এবার ত' সাধ্য খানিকটা দেখা দিয়েছে, অস্ত্র পেয়েছেন। কলকাতায় গিয়ে কাজে লাগুন। সরকারী কাজ থেকে অবসর পাওয়ামাত্র আমি গিয়ে আপনার সঙ্গে যোগ দোব।"

বললাম, "সেই কথাই ভাল। বিচিত্রা-লাঙ্গল দিয়ে আমি বিদ্বেষ-বিরোধের কণ্টকক্ষেত্র কর্ষিত ক'রে রাখিগে, তারপর আপনি গেলে দুজনে মিলে বীজ বপনের কাজে লাগা যাবে।"

বীজ বপনের কাজে শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের দুজনের মিলিত হওয়া সম্ভব হ'তে পারেনি। দুর্বার দৈব নির্মমভাবে অমরেন্দ্রনাথের কলিকাতায় যাবার পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। কিরূপে দিয়েছিল, সে অতি-করুণ কাহিনী অকথিত থাকাই ভাল।

ভূমিকর্ষণের কাজে অবশ্য আমি যথাশক্তি আত্মনিয়োগ করেছিলাম। সে বিষয়ে সভাসমিতি করিনি, তর্ক-বিতর্ক চালাইনি, এমন কি, প্রবন্ধ লিখিনি, অথবা লেখাইনি; —শুধু বিচিত্রার প্রাঙ্গণে প্রবেশের পথ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে একইভাবে সুগম করেছিলাম এবং একই-প্রকারে উন্মুক্ত রেখেছিলাম। বিচিত্রাকে করতে চেয়েছিলাম হিন্দু-মুসলমান লেখকের চিন্তা প্রেরণের এবং হিন্দু-মুসলমান পাঠকের চিন্তা গ্রহণের যন্ত্র, এবং সেই উপায়ে হিন্দু-মুসলমানের মননশীলতার ক্ষেত্রে একটা সাংস্কৃতিক একতার বীজ উৎপন্ন করতে কতকটা সক্ষমও হয়েছিলাম।

এ প্রণালী অবশ্য মন্থরগতির প্রণালী। এ প্রণালীর দ্বারা যা আসে তা বিলম্বিত পদে এবং স্বল্প পরিমাণে আসে; কিন্তু যতটুকু ক'রে আসে, পাকা ভাবেই আসে। বৈপ্লবিক গতিতেও আমরা অনেক সময়ে একত্র হই বটে, কিন্তু তার দ্বারা আমরা আবদ্ধ যতটা হই, সব সময়ে মিলিত হইনে ততটা। বিপ্লব অনেকটা বন্যার জলের মতো। সে যখন আসে, ত্বরিত গতিতে দুকূল ভাসিয়ে এসে একেবারে জলস্থল নদী-নালা একাকার ক'রে দেয়; কিন্তু চ'লে যখন যায়, প্রায় সব জলটাই সঙ্গে নিয়ে যায়, খালে-বিলে তড়াগে-দীঘিতে যেটুকু ফেলে যায়, তা নিতান্তই সামান্য।

একটা প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক আছে, তার অর্থ হচ্ছে, কবিতা এবং বনিতা যখন স্বয়মাগতা হয় তখনই তা হয় স্বাগতা, অর্থাৎ শুভাগতা। শ্লোকটির মধ্যে যে সত্য আছে, মিলনের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। মিলন যখন টানাহেঁচড়ার তড়িঘড়ির পথে না এসে স্বেচ্ছায় শান্তগতিতে আসে, তখনই তা যথার্থ আসে এবং তখনই তা হৃদয়ের রিক্ততা শূন্যতা পূর্ণ ক'রে যথার্থভাবে অবস্থান করে,—বন্যার জলের মতো অকস্মাৎ একদিন স'রে পড়ে না। শুধু ব্যষ্টির মধ্যেই নয়, সমষ্টির মধ্যেও এ কথা সত্য। তার পরিচয় আমি বিচিত্রা পরিচালনাকালে বহুরূপে বহুবার পেয়েছিলাম। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সে কথার সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে।

অভিজ্ঞান নামে আমার একটি ধারাবাহিক উপন্যাস কিছুকাল ধ'রে বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসে পাঁচ-ছয়টি মুসলমান স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্র ছিল, তন্মধ্যে মহবুব নামে একটি দুর্বৃত্তের চরিত্রও ছিল। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের অথবা সদুদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে আমি 'অভিজ্ঞানে'র মধ্যে এ চরিত্রগুলির অবতারণা করিনি; একমাত্র কাহিনী গঠনের জন্যই তাদের সহায়তা গ্রহণ করেছিলাম; আর, সে কাহিনীগঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য সৃষ্টি করা। তৎসত্ত্বেও অযাচিতভাবে নিঃশব্দপদসঞ্চারে বাঙলাদেশের মুশ্লিম সম্প্রদায়ের নিকট হ'তে যে অকপট এবং উন্মুক্ত অভিনন্দন আমার কাছে উপস্থিত হয়েছিল তা আমাকে গভীরভাবে অভিভূত করেছিল।

বহু মুসলমান পাঠক, এমন কি দুই-এক জন মুসলমান পাঠিকাও, আমার অফিসে ও গৃহে আগমন ক'রে 'অভিজ্ঞান' সম্বন্ধে আমাকে তাঁদের অকুণ্ঠিত প্রশংসা এবং অনুমোদন জ্ঞাপন ক'রে যেতেন। বিচিত্রায় অভিজ্ঞান শেষ হওয়ার পর রাজসাহী নওগাঁর মুশ্লিম সম্প্রদায় নওগাঁয় আমন্ত্রিত ক'রে নিয়ে গিয়ে অভিজ্ঞান রচিত করার জন্য আমাকে সম্বর্ধিত করেছিলেন। পুলিশ

কোর্টের অন্যতম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, সুসাহিত্যিক এস, ওয়াজেদ আলি সাহেবের কলিকাতা ঝাউতলা রোডের গৃহেও কয়েকজন বিশিষ্ট মুশিলম ভদ্রলোক মিলিত হ'য়ে অভিজ্ঞান রচিত করবার জন্য আমাকে অভিনন্দিত করেন।

কিন্তু ১৩৩৪ সালের ২২শে আশ্বিন তারিখের 'প্রজাশক্তি' নামক সাপ্তাহিকপত্রে প্রকাশিত 'হিন্দু লেখনীতে মুশিলম নায়ক-নায়িকা' শীর্ষক প্রবন্ধে 'অভিজ্ঞান' সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য পাঠের পর এই কথা উপলব্ধি ক'রে আমার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না যে, সামান্য একটু সহানুভূতির দ্বারা অপরের হৃদয় জয় করা কত সহজ কারবার, অথচ কত সামান্য ভুলভ্রান্তি-অজ্ঞানতা-অবোঝাবুঝির ফলে এই কারবারে আমরা কত সময়ে কত সহজে দেউলে হ'য়ে যাই! 'প্রজাশক্তি' পত্রের পরিচালক ছিলেন মৌলভী আবদুল জব্বার পাহলোয়ান এম-এল-এ সাহেব; সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ শরিফুল ইসলাম; এবং উল্লিখিত প্রবন্ধের লেখক ছিলেন কাজী নওয়াজ খোদা। কত সহজে, কত সামান্য কারণে বিগলিত হ'য়ে, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের কাছে এগিয়ে আসে, উল্লিখিত প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যগুলি হ'তে তা সুস্পষ্ট হবে।

"......বিচিত্রা সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'অভিজ্ঞান' আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই উপন্যাসটি লিখিয়া উদারহৃদয় উপেনবাবু মুশিলম জনসাধারণের যে উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। এই উপন্যাসটি মুশিলম সমাজে Renaissance-এর সৃষ্টি করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

"......সীতা-সাবিত্রীর ন্যায় রমণী যে মুশিলম ঘরেও জন্মগ্রহণ করিতে পারে 'আমিনাই' তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।"

"......ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র নাসির, অর্থাৎ আমিনার দেবর, সন্ধ্যাকে যখন ভগিনী সম্বোধন করিল, তখন মনে হইল মানুষ যে কোনো ধর্মাবলম্বী হউক না কেন, স্নেহ ও প্রীতিই তাহাদের প্রধান ধর্ম ও অন্তরের সামগ্রী।"

"......উপেনবাবু অসাধ্য-সাধন করিয়াছেন। বাঙলা সাহিত্যের চির-লাঞ্ছিত ও চিরনিগৃহীত মোসলেম চরিত্রগুলি তাঁহার হস্তের সোনার-কাঠির স্পর্শে যেন উজ্জ্বল ও সজীব হইয়া উঠিয়াছে।"

কিন্তু একান্তই যদি তেমন কিছু হ'য়ে থাকে ত' অন্তরের সহজনিষিক্ত সহানুভূতির সিঞ্চন লাভ করেই তা হয়েছে,—যত্নকৃত চেষ্টা-চরিত্রের ফলে হয়নি। এত সহজে যদি 'অসাধ্য সাধন' করা যায়, তা হ'লে কেন এত দ্বন্দ্ব, কেন এত অপ্রীতি, কেনই বা এত সংশয়, সেই কথাই ভাবি! পূর্বে বলেছি অভিজ্ঞানের মুশিলম চরিত্রগুলির মধ্যে মহবুব নামে একজন দুর্বৃত্তের চরিত্রও আছে। কিন্তু তার জন্য কোনও ক্ষতি হয়নি। মন যখন সংশয়মুক্ত হয়, চোখে তখন রঙিন কাঁচের চশমা পড়ে না; প্রত্যেক জিনিসই তখন দেখা দেয় শুভ্র আলোকের অনাবিল কিরণে তাদের আপন আপন নিজস্ব বর্ণে। সংশয়মুক্ত সমালোচক মহবুবকেও তাই সত্যকে যথার্থকে দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন সহজ চোখের সাদা আলোকে।

"......মানব চরিত্রে দোষ ও চন্দ্রে কলঙ্ক অবশ্যম্ভাবী। সম্পূর্ণ নির্দোষ মানব কোনো সমাজেই নাই। সুতরাং মুশিলম সমাজই বা তাহার ব্যতিক্রম হইতে যাইবে কেন? সেই জন্য অভিজ্ঞানে উপেনবাবু মহবুবের ন্যায় এক পাষণ্ডের চরিত্রও অঙ্কন করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রদ্ধেয় লেখক নিরপেক্ষভাবে সত্যকার মুশিলম চরিত্রই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

এ থেকে এ কথাও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শ্রদ্ধেয় সমালোচক নিরপেক্ষভাবে সত্যকার সমালোচনাই লিপিবদ্ধ করেছেন। এ কার্য কিন্তু সহজ কাজ নয়। বুদ্ধি যখন সংস্কারমুক্ত আর বিবেক যখন সত্যনিষ্ঠ থাকে তখনই এমন কার্য করা চলে।

প্রবন্ধের শেষ কথাটুকুও উধৃত করলাম।

"......পরম শ্রদ্ধাস্পদ উপেনবাবু মুশিলম সমাজের অন্তরের নীরব কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। বাঙলার দীন মুশিলমেরা তাঁহাকে প্রাণের ভক্তি-সিংহাসনে স্থান দিয়াই ক্ষান্ত হইবে, কারণ তাহার অধিক তাহাদের সাধ্যাতীত।"

অনেক ইতস্তত সহকারে যৎপরোনাস্তি কুণ্ঠা ও সঙ্কোচের সহিত উল্লিখিত মন্তব্যগুলি, বিশেষ শেষ মন্তব্যটি, উদ্ধৃত করলাম। কেবলই মনের মধ্যে সংশয় পীড়া দিচ্ছিল, এর দ্বারা নিজেকে প্রচার করা হবে না ত?

জীবনে আত্মপ্রচার কখনো করিনি যদি বলি, তা হ'লে বোধকরি আর-এক আকারে সেই আত্মপ্রচার করাই হয়। তবে একথা যদি বলি, সে কার্য খুব বেশি করিনি,—আর যখনই মনে হয়েছে করছি, তখনই নিজেকে সম্বৃত করবার চেষ্টা করেছি,—তা হ'লে বোধ হয় তেমন কিছু অপ্রকৃত কথা বলাও হয় না। যে কথা উপস্থিত আমার প্রতিপাদ্য,—অর্থাৎ নিজের মনকে সামান্য একটু উন্মুক্ত করলে পরের মনে প্রবেশের পথ অতি সহজে উন্মুক্ত হয়,—এই প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রমাণে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে যেটুকু অবিনয় করতে হ'ল তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আদালতে শপথ গ্রহণ কালে শুধু 'যা-কিছু বলব সত্য বলব, মিথ্য বলব না' বললেই পরিত্রাণ পাওয়া যায় না,—'কোনো কথা গোপন করবনা'ও বলতে হয়। আমি তাই একথাগুলি গোপন না করে প্রকাশ করলাম। আশা করি আমার জবানবন্দির দ্বারা আমার প্রতিপাদ্য সত্য প্রতিপন্ন করতে কতকটা সক্ষম হয়েছি।

কোনো মিলন সাধন এমন কি হিন্দু-মুসলমান মিলন সাধনও, অসাধ্য ব্যাপার নয়। শুধু তার জন্য চাই সামান্য একটু ভালবাসা আর অল্প একটু সহানুভূতি।

বিচিত্রা পরিচালনার জন্য আমি পাকা-পাকিভাবে ভাগলপুর ত্যাগ করলাম ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসে। কলিকাতায় আগমন করলাম, কিন্তু সমূলে উৎপাটিত হয়ে নয়। মূল, অর্থাৎ আমি বাদে বাকি সংসার, আপাতত ভাগলপুরেই রইল। বারো বৎসর ধরে যে মূল গভীরভাবে আত্ম-বিস্তার ক[illegible] সহসা উৎপাটিত হতে তা বেদনা বোধ করলে।

সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় তখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলাত যাত্রার উদ্যোগে রত।

তখনো তিনি সুবিখ্যাত, এমন কি বিখ্যাতও হননি। ঠিক মনে পড়ছে না, কি প্রকারে তাঁর সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় অথবা সংবাদ পেয়েছিলাম। অন্নদাশঙ্কর কটকে বাস করতেন। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী নির্মলাও বাস করতেন কটকে। তাঁর স্বামী, বর্তমানে পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন কটকে ওকালতি করেন। নির্মলার দ্বারা অন্নদাশঙ্করের সহিত যোগ স্থাপন করে বিচিত্রায় তাঁর লেখা প্রকাশিত করবার ব্যবস্থা করলাম। ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসে অন্নদাশঙ্কর বিলাত যাত্রা করলেন; তার তিন মাস পর থেকে, অর্থাৎ কার্তিক মাস থেকে বিচিত্রায় প্রকাশিত হ'তে লাগল তাঁর বিখ্যাত রচনা 'পথে প্রবাসে', যা অবিলম্বে তাঁকে সুবিখ্যাত করে তুলেছিল। একটি লেখার দ্বারা অন্নদাশঙ্কর যে বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা খুব বেশি নেই। 'পথে প্রবাসের' মধ্যে অন্নদাশঙ্কর যে উন্নত শ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন, আজও তা সতেজে পল্লবিত ও পুষ্পিত হয়ে প্রসার লাভ করে চলেছে।

'পথে-প্রবাসে' বিচিত্রায় অন্নদাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত রচনা নয়। বিলাত যাত্রার পূর্বে তিনি 'রক্তকরবীর তিনজন' নামে একটি প্রবন্ধ দিয়ে গিয়েছিলেন, যেটি বিচিত্রার ভাদ্রমাসের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

(ক্রমশ)

অবন্ধনা

বনফুল

১

ওগো প্রকাশের দেবতা অবন্ধনা,
তোমার প্রকাশে সীমায় বেঁধেছি মোরা,
দৃষ্টি মোদের সীমায় বাঁধা যে দেবি
অতি ভীরু ক্ষীণ আড়ষ্ট ভাঙা-চোরা।

শীতের অন্তে তোমারে দেখিতে চাই
হংসবাহিনী কুন্দ-শুভ্রা-বাণী
শতদল 'পরে বিছায়ে আসন তব
হাতে তুলে দিই বই আর বীণাখানি,

আমের মুকুলে যবের শীষের রূপে
দীপ্ত দিবার প্রখর আলোর মাঝে,
তোমার প্রকাশ দেখিতে শিখেছি মোরা,
অতি নির্মল নিখুঁত শুভ্র সাজে।

২

অতি নির্মল নিখুঁত তুমি কি শুধু?
কালোর মাঝারে রাখনি আসন পাতি?
দুখীর দুঃখে শোকের ছায়ায়, দেবি,
নাই কি তোমার প্রকাশ-বেদনা-ভাতি?
দিনের আকাশে যে সূর্য ঝলমল
রাতের আকাশে থাকে না যবে সে রবি
সে কালো আকাশে তুমিই তিমিরময়ী
আঁক যে তখন তমসালোকের ছবি।
লক্ষ সূর্য চক্ষু মেলিয়া হেরে
অন্ধকারেতে সে নব প্রকাশ তব,
আমরা একথা বুঝিতে শিখিনি আজও
তুমি অনন্ত বিচিত্র অভিনব।

৩

তুমি নহ শুধু বসন্ত-সহচরী
সকল ঋতুই তোমার বাণীতে ভরা
তপ্ত নিদাঘে তুমিই রুদ্রা দেবি,
বর্ষা গগনে তুমিই মেঘাম্বরা,
হেমন্ত শীতে তোমারই প্রকাশ ব্যথা
নিগূঢ় আবেগে সবার বুকেতে কাঁপে,
তোমারই পরশে সরমে শেফালি ঝরে
শরৎ কালের সোনালি রোদের তাপে।
তুমি শৈশব, তুমি কৈশোর দেবি,
তুমি যৌবন, তুমিই আবার জরা,
সুরে ও অসুরে দেবে ও দানবে ঘিরি
তোমার প্রকাশ নিখিল বিশ্বভরা।
একটি ঋতুর একটি প্রতিমা নহ
প্রতিটি ক্ষণের তুমি ক্ষণ-শাশ্বতী
নিখিল প্রাণের তুমি জীবন্ত ভাষা
নিখিল গানের অন্তবিহীন গতি। *

---

* ভাগলপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সরস্বতী পূজার দিনে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাহিত্য সভায় পঠিত।

কলিকাতায় সম্প্রতি এক নামজাদা যাদুকর তাঁর যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া দর্শকের বিস্ময় অর্জন করিতেছেন। —"ভোটকেন্দ্রে আমরা এর চেয়ে বড় ভানুমতীর খেল্ দেখেছি, জয়-পরাজয়ের ভেল্কীতে অনেকেই হাঁ হয়ে গেছেন"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

" * * *

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করিয়াছেন—আমার জয়, আইন ও

শৃঙ্খলারই জয়। —"মিথ্যে বলেননি, আইনের অন্য নাম বিধান—সুতরাং বিধান-সভায় বিধানেরই জয়"—বলে শ্যামলাল।

" * * *

মন্ত্রণাবাগীশ মন্ত্রীদের অনেকেরই পরাজয়ের প্রসঙ্গে জনৈক সহযাত্রী গান ধরিলেন—"কোন্‌খানে যে ভুল ছিল গো ভুল ছিল"!!

" * * *

নির্বাচনের ক'দিন কলিকাতায় আশাতীতরূপে ইলিশ মাছের মূল্য হ্রাস হইয়াছে।—"অন্নবস্ত্রের মূল্য হ্রাসও অসম্ভব ছিল না, শুধু যদি দু'দিন আগে"— — — বক্তা খুড়ো তাঁর মন্তব্য শেষ করিলেন না।
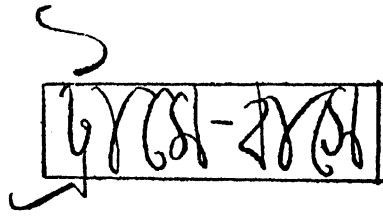
* * * * *

ডাঃ বিধান রায় তাঁর নির্বাচনী শেষের ভাষণে বলিয়াছেন—আমাদের আগে চলিতে হইবে, তা না হইলে অচিরেই পিছনে পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইব। শ্যামলাল বলিল—"সেইজন্যেই তো আমরা নিত্যি তিরিশ দিন ট্রামে-বাসে চড়েই সহযাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দিই—একটু এগিয়ে যান দাদারা"!

" * * *

এক সংবাদে প্রকাশ কলিকাতায় একটি খাদ্য-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। —"প্রদর্শনের চেয়ে ভক্ষণের ব্যবস্থা করলে

জনসাধারণ উপকৃত হতেন"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

টেলিফোনের কলকব্জা আমদানীর জন্য এখন আর বিদেশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে না বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত

হইয়াছে।—"তাড়াতাড়ি নম্বর পাওয়ার জন্যে অদৃষ্টের দিকে তাকিয়ে না থাকতে হলেই আপাততঃ আমরা খুশী"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

" * * *

আমাদের এক সহযোগীর সচিত্র প্রবন্ধের [illegible] [illegible] of making money.—"কিন্তু রোমান্সটা টাঁকশালের, ট্যাঁকের নয় সুতরাং আপনার আমার পক্ষে সে-টা বিরহ-কাব্য হয়েই থাকল"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

" * * *

বম্বেতে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ছায়াচিত্র প্রদর্শনী চলিতেছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"এটা অবশ্যি সরকারী ব্যবস্থা; বেসরকারী ব্যবস্থায় পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে সর্বত্র আমরা চিত্রশিল্পীদের প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করছি"!

* * * * *

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী বি আর সেন বলিয়াছেন যে, আজ পশ্চিমের পক্ষে এশিয়ার মন বুঝিবার সময় আসিয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"মনের চেয়ে উদর [illegible] আগে বুঝবেন তাঁকেই আমরা ঔদারিক বলে গ্রহণ করব।"

আহত মিশর

২৫শে জানুয়ারী ইসমেলিয়াতে বৃটিশ সৈন্যের কাণ্ড-কারখানা এবং তার পরের দিন কায়রোর দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরে মিশরের পরিস্থিতিতে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটবে, একথা আমরা গত সপ্তাহে বলেছিলাম। তাই ঘটেছে। তবে ঘটনার গতি মোটেই মিশরের অনুকূলে নয়। রাজা ফারুক ওয়াফ্দ্ পার্টির মন্ত্রিমণ্ডলীকে বরখাস্ত করেছেন। নাহাস পাশার স্থলে আলি মেহের পাশা মিশরের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। ইংরেজরা খুব খুশি। তারা এই ধরণের একটা পরিণতির জন্যই চেষ্টিত ছিল। ২৬শে জানুয়ারী তারিখে কায়রোর দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরে নাহাস পাশা ও ওয়াফ্দ্ পার্টির অন্য নেতারা একেবারে ঘাবড়ে গেলেন। ইংরেজরা ভয় দেখালো যে, দরকার হলে 'বিদেশী ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য' বৃটিশ সৈন্য কায়রো দখল করতে ইতস্তত করবে না। শুধু ইংরেজের ভয় নয়, নাহাস পাশা ও ওয়াফ্দ্ পার্টি ২৬শে জানুয়ারীর ঘটনার মধ্যে বিপ্লবের গন্ধ পেলেন। ওদিকে রাজা ফারুক ও তাঁর পার্ষদরাতো ইংরেজদের সঙ্গে মিটমাট করে ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়েই ছিলেন। ২৬শে জানুয়ারীর ঘটনা নাহাস পাশা ও ওয়াফ্দ্ পার্টির মন্ত্রিমণ্ডলীকে বরখাস্ত করার অজুহাত ও সুযোগ এনে দিলে। সবচেয়ে লজ্জাকর হোল নাহাস পাশা ও ওয়াফ্দ্ পার্টির পরবর্তী ব্যবহার। তাঁরা রাজা ফারুকের হাত দিয়ে বৃটিশের বেত্রাঘাত খেয়ে কেবল চুপ করেই থাকলেন না, আলি মেহের পাশার নেতৃত্বাধীনে 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'এরও শরিক হলেন। এই থেকে মিশরের শাসকশ্রেণীর অন্তর্দৌর্বল্যের পরিমাণ আন্দাজ করা যায়। ইংরেজরা অনেকখানি এর উপর নির্ভর করছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, দরিদ্র শোষণপুষ্ট মিশরের শাসকশ্রেণী যখনই দেখবে যে, জনসাধারণ এতদূর এগিয়ে যাচ্ছে, যেখানে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, তখনই তারা ভয় খেয়ে যাবে এবং নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই ইংরেজদের সঙ্গে সংবাদ ফিরিয়ে আনতে ব্যস্ত হবে। 'পাশা' ও 'ফেলা'র (Fellah) মধ্যে এই স্বার্থ-দ্বন্দ্বের সুযোগ নিতে

পারবে বলে ইংরেজরা যে আশা করেছিল, সেটা অনেকখানি সফল হয়েছে। ২৬শে জানুয়ারী তারিখে কায়রোর ঘটনার পিছনে প্রকৃতপক্ষে কোন বৈপ্লবিক প্রেরণা ছিল বলে বিশ্বাস হয় না। ইংরেজ-বিদ্বেষ অবশ্য অতিশয় তীব্রভাবে প্রকট হয়েছিল। কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামার রূপ দেখে ওয়াফ্দ্ গভর্নমেণ্টের নেতারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন। ওদিক থেকে ইংরেজরা খুব সম্ভবত রাজাকে জানিয়ে দেয় যে, নাহাস পাশার মন্ত্রিমণ্ডলীকে অবিলম্বে না সরালে ইংরেজরা 'বিদেশী ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য' কায়রোতে সৈন্য নিয়ে আসবে। যাই হোক, ঘটনার গতি ইংরেজদের এত অনুকূলে গেছে যে, অনেকের মনে সন্দেহ হয়েছে যে, কায়রো দাঙ্গা-হাঙ্গামার পিছনে ইংরেজের উস্কানি নেই তো! ইংরেজের উস্কানি থাক আর নাই থাক, পরবর্তী অবস্থায় যে ইংরেজের কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা খুবই বেড়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আলি মেহের পাশা অবশ্য মুখে বলেছেন যে, নীল নদের উপত্যকার ঐক্য (অর্থাৎ সুদান মিশরের হওয়া চাই) এবং মিশর-ভূমি থেকে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণের দাবী পূর্ববৎই আছে, কিন্তু কার্যত যে মিশর গভর্নমেণ্টের নীতির পরিবর্তন হয়ে গেছে, তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে। বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও তুর্কীর পক্ষ থেকে যে মধ্যপ্রাচ্য সামরিক কমাণ্ড স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছিল, মিশর ইতিপূর্বে সেটা আলোচনা করতেও রাজি হয়নি, কারণ উক্ত প্রস্তাবে রাজি হলে সুয়েজ অঞ্চল থেকে বৃটিশ সৈন্য কোনদিনই যাবে না, কেবল একটা নামবদল মাত্র হবে। আলি মেহের পাশা কিন্তু ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, উপরোক্ত চতুঃশক্তির প্রস্তাবিত মধ্যপ্রাচ্য সামরিক কমাণ্ড স্থাপন সম্বন্ধে আলোচনা করতে নূতন মিশর সরকার রাজি আছেন। মিঃ চার্চিল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে বুঝিয়ে এসেছিলেন যে, এই মধ্যপ্রাচ্য সামরিক কমাণ্ড স্থাপনই হবে মিশর সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান। মিশর তাতে রাজি ছিল না এবং নাহাস পাশার দলের মনে হয়ত আশা ছিল যে, বেঁকে বসে থাকলে শেষ পর্যন্ত আমেরিকা বৃটেনের উপর চাপ দিয়ে মিশরের কিছু সুবিধা করে দেবে। সে আশা এখন গেছে, আলি মেহেরের গভর্নমেণ্ট মিঃ চার্চিলের প্রস্তাবিত সমাধানের দিকেই এগিয়ে চলেছেন। নাহাস পাশা ও ওয়াফ্দ্ দলও পিছনে পিছন চলেছেন। সুতরাং মিশরের নেতৃবৃন্দ বলতে যাঁদের বুঝায়, তাঁরা সকলেই আজ জনতার রক্তাক্ত, জাতিপ্রেমের অপমান স্বীকার করে ইংরেজের সঙ্গে ইংরেজের সর্তে মিটমাট করতে অগ্রসর হয়েছেন।

ওয়াফ্দ্ দলের পরিণামই সবচেয়ে অদ্ভুত। গত যুদ্ধের সময়ে রাজা ফারুক যখন মিশরের নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিতে ইতস্তত করছিলেন, তখন ইংরেজেরা এক রকম ঘাড়ে ধরে তাঁকে নিজেদের পক্ষভুক্ত করে এবং মিশর মিত্রপক্ষের ঘাটিও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। রাজা ফারুকের যখন মনস্থির করতে দেরি হচ্ছিল, তখন ইংরেজরা রাজপ্রাসাদের দিকে তাক করে কামান বসিয়েছিল। সেই সময়ে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজা ফারুক ইংরেজের আজ্ঞানুসারে ওয়াফ্দ্ দলের মন্ত্রিমণ্ডলী নিযুক্ত করেন। এখন আবার ইংরেজেরই ইঙ্গিতে ওয়াফ্দ্ দলের মন্ত্রিমণ্ডলী বরখাস্ত হোল। তাতে কিছু আসতো যেতো না, যদি নাহাস পাশা ও তাঁর অনুগামীরা তাঁদের পরবর্তী ব্যবহারে এরূপ মেরুদণ্ডহীনতার পরিচয় না দিতেন। মিশরের পক্ষে সবচেয়ে বিপদের কথা এই যে, মিশরের জনসাধারণের সামনে আজ এমন কোন নেতৃত্ব দেখা যাচ্ছে না, যার প্রতি মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধার উদ্রেক হতে পারে। মিশরের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের এই দেউলিয়া-রূপ সত্যই বড়ো ক্লেশদায়ক।

আরো একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, ইংরেজরা যখন বলে যে, সুয়েজ খালের নিরাপত্তা রক্ষা একটা আন্তর্জাতিক কর্তব্য এবং সেই কর্তব্য পালনের অছিলায় যখন বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও তুর্কী মধ্যপ্রাচ্য সামরিক কমাণ্ড স্থাপনের প্রস্তাব করে, তখন এটা কারো মনে হয় না যে, আন্তর্জাতিক কর্তব্যই যদি হয়, তবে সেটা

পালনের জন্য অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও তো ইউনোকে একবার বলা উচিত। তা-না করে এই চতুঃশক্তি কোন্ অধিকারে মধ্যপ্রাচ্য সামরিক কমাণ্ড স্থাপিত করে তার মারফৎ মিশর ভূমিতে বিদেশী সৈন্য রাখার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে চায়? এ-প্রশ্নের জবাব কে দেবে!

ইন্দোনেশিয়ার সংকট

ইন্দোনেশিয়ার গভর্নমেণ্ট নানাভাবে বিব্রত হয়ে পড়েছেন। মধ্য এবং পশ্চিম জাভায় অশান্তি নিবারিত করা সহজ হচ্ছে না। 'দারুল ইসলাম'এর দুর্বৃত্ত দল এখনো চরে বেড়াচ্ছে। ওলন্দাজরা এদের নানাভাবে সাহায্য করছে। এটা বন্ধ করা কঠিন, কারণ এখনো জাভায় দু লক্ষের উপর ওলন্দাজ বাসিন্দা রয়েছে, এরা সুবিধা পেলেই অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচারীদের সহায়তা করছে। তার ওপর সম্প্রতি কিছু-সংখ্যক সৈন্যও বিগড়ে গিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ওদিকে নিউগিনি সম্বন্ধেও যে একটা শীঘ্র সুরাহা হবে, তার সম্ভাবনাও অল্প। ওলন্দাজরা নিউগিনি সহজে ছাড়বে না, এ সম্বন্ধে হেগে যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছিল, তাতে বিশেষ কিছু ফল পাবার আশা নেই। আরো মুশকিল হয়েছে, আমেরিকা ও বৃটেনের ভাবগতিকের জন্য। ওলন্দাজদের নিউগিনি আঁকড়ে ধরে থাকায় বৃটেন ও আমেরিকার কেবল সম্মতি নয়, সমর্থনও যে আছে, এটা এখন বুঝা যাচ্ছে। তৎসত্ত্বেও ইন্দো-নেশিয়ার গভর্নমেণ্টকে ক্রমশ আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হচ্ছে বলে মনে হয়। ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনে আমেরিকার প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে।

২।২।৫২

পুস্তক পরিচয়

উড়ো চিঠির ঝাঁক ঃ অশোকবিজয় রাহা। প্রকাশক ঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য আড়াই টাকা।

অশোকবিজয় রাহা মহাশয়ের কবিখ্যাতি আছে। নামে রূপে এই গ্রন্থখানিকে সহজেই কাব্য বলিয়া সন্দেহ হয়; গোল বাধে আখ্যাপত্রাদি পার হইয়া পাতার পর পাতা উল্টাইয়া, স্বরূপের পরিচয় লইতে গেলে। গদ্যে লেখা বলিয়া আপত্তির কারণ নাই। গীতিকবিতার গানটা যদি বা না পাওয়া যায়, কবিতাটুকু অর্থাৎ ভাব-সম্বোধন প্রাণটুকু লিপিকা পুনশ্চ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায় বৈকি। অথচ এই যে গ্রন্থখানি হাতে আসিয়াছে ইহার ছাপা সুন্দর, সাজসজ্জা হয়তো আরও সুন্দর, কাগজ মূল্যবান, এবং ছত্র ভাঙিয়া ভাঙিয়া সাজানো হইয়াছে এবং রচনার মধ্যে মধ্যে ফুল পাখী মেঘ ঝর্ণা। শতচন্দ্রিকা ও পাহাড়ী যুবতীর উল্লেখ দেখা যায়, ইহা ছাড়া ইহাকে কবিতা বলিবার আর কী যুক্তি আছে? মধ্যবিত্ত, সুশিক্ষিত, নানা ভাষায় নানা কাব্যসাহিত্য পড়া আছে এবং বয়সেও সম্ভবতঃ তরুণ, এরূপ কোন ভাবালু ভ্রমণকারীর টুকিটাকি নোট-পরিকীর্ণ ডায়ারি মনে করিতে দোষ কী? যেমন—"আজ বিকেলের নতুন ঘটনা। হাইড্রো-ইলেকট্রিকের পথে দেশমুখের সঙ্গে পরিচয়। দেশমুখ উত্তর-তিরিশ—তবে চিরতরুণ। এখনো চলছে কুমার ব্রত। দিব্যি চেহারা। একহারা গড়ন। ফর্সা রঙ। ধারালো নাক-চোখ। এককালে স্কটিশের ছাত্র। এখন এক্সাইস ইন্সপেক্টর" (পৃ ২৫)* অথবা—"সিংজী কাল টেরাইয়ের জঙ্গলের গল্প বলছিল। ও যখনি আসে। আশ্চর্য হয়ে যাই। রাজপুতানার মরুস্থান। বিন্ধ্য আরাবল্লী। কাবেরীর মোহানা। নীলগিরি রামেশ্বর। কোনারকের সূর্যমন্দির। সিংজী ভারতবর্ষের ভূগোল।" (পৃ ৩৮)* অবশ্য, আগাগোড়া গ্রন্থখানি এমন সাদাসিধা 'নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র' নয় এবং আজকাল সংবাদদাতারাই বা 'কবিত্ব' করিতে ছাড়েন নাকি, তবু এই নিছক গদ্যের সমতলভূমি হইতে, এই আধো-আধো ভূগোল পরিচয়ের এলেকা ছাড়িয়া, এই কবিতার ঝাঁক সত্যই যে কোনো সময় তেমন ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে বা দূরে অভিসার করিয়াছে তাহা বলা যায় না। কোনো একটি চরিত্র ঘিরিয়া, কোনো একটি ভাব লইয়া, কোনো একটি নির্ণিমেষ নেত্রে দেখিবার মতো ছবি ফুটাইয়া অথবা কোনো বিশেষ রসের শিহরণ জাগাইয়া, এ রচনা কোথাও যেন দানা বাঁধিতে পায় নাই। রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা সাহিত্য যখন বারো আনা নগরেই লেখা হইতেছে, নাগরিকেরাই উপভোগ করিতেছে (লেখক বা পাঠক বস্তুতঃ নগরে বাস করুন আর নাই করুন) অন্য একটা উপমার আশ্রয়েও বলিতে পারি—যেমন বৈদ্যুতিক শক্তি পরিবাহন ভেদে পাখা ঘুরায়, ট্রাম চালায়, চুল্লি জ্বালায়, তাপ দেয়, শক দিতেও ছাড়ে না, কিন্তু আলোক দেয় বিশেষ ব্যবস্থায়, অতিশয় সূক্ষ্ম ও সুকুমার তারের ভিতরে সঞ্চারিত হইয়া অথবা বিশেষ গ্যাসের অনুপরমাণুপুঞ্জে চমক লাগাইয়া, অন্যরূপে নয়। তেমনি কোনো প্রেরণা যদি বা লেখকের কায়মনোবাক্যে ভাব আবেগ ঔৎসুক্য বিদ্যাবত্তা শ্রমপ্রবৃত্তি ও কলানৈপুণ্য জাগাইয়া তোলে তবু কবিতা হয় না, জ্যোতি বিকিরণ করে না, বিস্ময়ে সুখে অভিভূত ও আনন্দিত করে না, যতক্ষণ না অনির্বচনীয় রসে উত্তীর্ণ হয়। রস কী? অনির্বচনীয় যে সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। উহা ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর এক বস্তু, এমন কথা প্রাচীনেরা বলেন। কথা দিয়া নিঃশেষে ব্যাখ্যা যাহার এত দিনে হয় নাই, আজও না হয় নাই হইল, কিন্তু রসিক ব্যক্তি চাখিয়া যদি বুঝিতে পারেন তাহা হইলেই কি যথেষ্ট হইল না।

১৮৪।৫৭

* যথাযথ উদ্ধৃত; কেবল ছত্র ভাঙিয়া সাজানোর পরিবর্তে দণ্ডচিহ্ন ব্যবহার করা হইল।

রাষ্ট্রনীতি পরিচয় ঃ বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় ঃঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪নং বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা ঃ দুই টাকা।

স্বল্প-পরিসর পুস্তকে পাশ্চাত্য দেশের প্রচলিত রাষ্ট্রনীতির পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা সহজসাধ্য নহে। গ্রন্থকার স্বনামধন্য রাষ্ট্রনীতিবিদ। বিজ্ঞানসম্মত বিষয়-নির্বাচন ও গ্রন্থের পরিশেষে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ পরিচয় ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিভাষা সংযোজিত হওয়ায় পুস্তকটির মর্যাদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গ্রন্থটির প্রকৃত আকর্ষণ নিরাসক্ত ও নিস্পৃহ-ভাবে রাষ্ট্রনীতির কঠিন তথ্যের প্রাঞ্জল আলোচনা। বিশেষত মৎস্য-ন্যায়, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, সোস্যালিজম প্রভৃতি দুরূহ বিষয়ের

সুষ্ঠু এবং নিরুচ্ছ্বাস বিবরণ। মার্কস, হেগেল, এঙ্গেলস, হবস, কৌটিল্য প্রভৃতি বিশ্বের চিন্তা-নায়কগণের মতামতও প্রতিটি প্রবন্ধের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রনীতির ছাত্র ও রাষ্ট্রতত্ত্বে আগ্রহশীল পাঠক-সাধারণ সকলের পক্ষেই গ্রন্থটি অপরিহার্য। ১৮৩।৫১

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব বা রহস্য বিদ্যা—শ্রীমৎ বিজয়-**কৃষ্ণ** দেবশর্মা কথিত। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি চণ্ডীর অনুবাদ বা আক্ষরিকভাবে ভাষ্য নয়। চণ্ডীতত্ত্বের মূলীভূত গূঢ় অধ্যাত্ম রহস্য তত্ত্বদর্শী সাধকের উপদেশ-সূত্রে ইহাতে উন্মুক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বাকতত্ত্বের উপরই হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা। শ্রুতি বলিয়াছেন "বাগসৌনায়ং জ্যোতির্ভবতি।" বাক্ই সেই পরম দেবতাকে প্রাপ্তির পথে জ্যোতিঃস্বরূপ। যিনি পরব্রহ্মস্বরূপ তিনি বচনস্বরূপে, এবং সেই বচনের সম্বন্ধসূত্রে সংবেদনময় দেহ-সংস্পর্শে অগ্নিময় দীপ্তিতে আত্মাকেই সর্বত্র পরিস্ফুর্ত করিয়া তুলিতে-ছেন। বাঙ্ময় তনুকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার চিন্ময় তনু দর্শন করিতে হয়। বস্তুতঃ এইটিই রহস্যসূত্র, এবং সেই সূত্রের ধারা ধরিয়াই ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা বিভিন্ন আকারে, বিস্তার লাভ করিয়াছে। শ্রুতির নির্দেশেই সে সাধনার সঙ্গতি। আলোচ্য গ্রন্থের উপদেষ্টা প্রগাঢ় প্রজ্ঞানময় অনুভূতির বলে চণ্ডীর মূলীভূত বাক্তত্ত্বের সেই গূঢ় রহস্যটি ব্যক্ত করিয়াছেন। বচন হইতে শ্রবণ, শ্রবণ হইতে দর্শন, সাধনার এই যে সূত্রটি সাধারণ মনোবুদ্ধির পক্ষে ইহা অধিগম্য নয়, অথচ এই সূত্রটি ধরিতে না পারিলে আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে না। নাম ও রূপে যিনি বিশ্বে পরিব্যক্ত এবং প্রকাশিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে অব্যবহিত ভাবে অর্থাৎ একান্ত করিয়া উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব বা রহস্য বিদ্যার আত্মপ্রবাহ—বচনাত্মিকা চণ্ডী সেই উপলব্ধির পক্ষে বিশেষভাবে সাহায্য করিবে।

যুগবাহু : গৌতম সেন :: পূর্বাচল পাব-**লিশার্স** : ২৫নং ভবানী দত্ত লেন। মূল্য—দুই টাকা।

গ্রন্থকার সাহিত্যজগতে নবাগত নহেন। ইতিপূর্বে তাঁহার একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আলোচ্য গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হয় নাই। স্থানে স্থানে রাজনৈতিক মতবাদের অপ্রয়োজনীয় বুকনি রসগ্রহণের বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চরিত্র-চিত্রনেও অবহেলার ছাপ। ইন্দ্রজিত নায়কোচিত রূপের অধিকারী হইলেও কর্মদক্ষতা ও বিচার-বুদ্ধিতে তাঁহার নায়কসুলভ [illegible] পরিচয়ই পাওয়া যায় না। সুজাতার মস্তিষ্ক বিকৃতির যে মনস্তাত্ত্বিক কারণ উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত হাস্যকর। পরিশেষে সুজাতার মানসিক পরিবর্তনের পিছনেও যুক্তিসহ প্রস্তুতির অভাব। অত্যধিক রঙ লেপনের ফলে অজিত দত্তের চরিত্র বিলাত প্রত্যাগত বাক্য-বাগীশে পরিণত হইয়াছে। সোমেশ চরিত্রও অসম্পূর্ণ। বিজন ও বেবী চরিত্রের সার্থকতা উপলব্ধি করা গেলো না। অন্তর্দৃষ্টি ও গভীরতর জীবনবোধের অভাবে কোন ঘটনাই দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, ফলে উপন্যাসটি কতক-গুলি সংলাপের তন্তুবিস্তারই হইয়াছে, বয়ন-চাতুর্যের অভাবে বস্ত্রের সামগ্রিক রূপলাভে সমর্থ হয় নাই। ২৭১।৫১

আগামী : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :: বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪নং বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। এক টাকা চার আনা।

লেখক আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী কিশোর—অবহেলা ও অনাদরে প্রকাশিত আটাত্তর পৃষ্ঠার পুস্তক, অন্নদাশংকর রায়ের ভূমিকা ও নন্দলাল বসুর চিত্র সত্ত্বেও প্রথমে কোনরূপ আকর্ষণ অনুভব করি নাই, এ কথা স্বীকার করিতে লজ্জা নাই। ইদানীং যে প্রচুর অপসাহিত্যের আগাছার সৃষ্টি হইতেছে, আলোচ্য পুস্তকটি তাহাদেরই সংখ্যা বর্ধিত করিবে মাত্র, এই অনুমানই করিয়াছিলাম। কিন্তু কয়েকটি লাইন পাঠ করিবার পরই ভ্রম দূরীভূত হইল। সাবলীল প্রকাশভঙ্গী, সংযত ভাষা পরিণত বিন্যাসের ছাপ গ্রন্থটির প্রতি ছত্রে। জিয়ল, সাবু আর আকন্দর জঙ্গলে ভরা সনাতন মাঝির ছোট পৃথিবীটি রূপে রসে অনবদ্য রূপ গ্রহণ করিয়াছে লেখকের সুনিপুণ লেখনীমুখে। মনে হয়, ইহা শুধু চোখ দিয়া দেখাই নয়, মন দিয়া অনুভব করা। অর্জুন ও আফজল অতীতের জনার্দন ভুইঞা আর ওসমান চৌধুরী দেশ, কাল ও জাতির গণ্ডী ছাড়াইয়া মানবতার নবরূপে মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও জীবনবোধের প্রভাবে পূর্ববঙ্গের গাছপালা মানুষ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার উৎস এক কিশোরের অপরিণত বোধশক্তি সে কথা ভাবিলেও আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। দ্বিধাবিভক্ত বাঙলায় হিন্দু-মুসলমানের বর্তমান মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সনাতন ও মমতাজের মতন চরিত্র কল্পনা করাও যে কত মুন্সীয়ানার পরিচায়ক তাহা আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ না করিলে জানা সম্ভব নয়। স্বাগত লেখকের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে কিশোরলেখক যে পরিমাণ সাফল্যলাভ করিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর।

আশা করি, বাঙলা সাহিত্য লেখকের বলিষ্ঠ দানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। 'আগামী' সেই গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা মাত্র। ৩০৪।৫১

ইলিয়াডের গল্প : নবকৃষ্ণ ঘোষ :: গ্রন্থ-ভান্ডার : ২০নং অবিনাশ ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। মূল্য দেড় টাকা।

বিশ্বসাহিত্যের এই বিখ্যাত সাহিত্য ছোটদের উপযোগী চিত্তাকর্ষক ভাষায় রচনা করিয়া গ্রন্থকার ছোটদের অনুবাদ সাহিত্যের একটি বড় অভাব দূরীভূত করিয়াছেন। পুস্তকটি যে কিশোরদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে, চতুর্থ সংস্করণই তাহার বলিষ্ঠ প্রমাণ। ৩০৩।৫১

মেজাজ

অমরেন্দ্রকুমার সেন

রামবাবুর মেজাজটা অত্যন্ত কড়া। একটুতেই ভয়ঙ্কর চটে ওঠেন। সেদিন তিনি আর তাঁর স্ত্রী পাশের বাড়ির কালীবাবুর গৃহিণীর সঙ্গে তাস খেলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাস খেলায় রাম বাবুরা হেরে যান। বাড়ি ফিরে রাম বাবু স্ত্রীর ওপর অত্যন্ত রেগে যান, হেরে যাওয়ার দোষটা যেন তাঁর স্ত্রীরই। উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত বচসা হয় এবং রাম বাবুর স্ত্রী তাঁর স্বামীর গালে ঠাস্ করে এক চড় কসিয়ে দেন। এর পর রাম বাবু আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না, তিনি কান্ডাকান্ডবিহীন হয়ে স্ত্রীকে এমন এক ধাক্কা দিলেন যে, তাঁর স্ত্রী উঁচু রকের ওপর থেকে নীচে উঠোনে পড়ে গেলেন এবং বাঁ হাতের হাড় ভেঙে গেল। তারপর......তারপর থেকে পাড়ার লোকেরা রাম বাবুকে আড়ালে দুর্বাসা বলে ডাকে।

মেজাজ অবশ্য সব লোকের সমান নয়, কারও মেজাজ বেশ ঠান্ডা, আর কেউ-বা বেশ কড়া মেজাজী। ক্রোধকে জয় করেছে এমন লোক খুব কমই আছে, কারণ মানুষ ক্রোধ নিয়েই জন্ম নেয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর যে ক্রন্দন, তা ক্রোধের পরিচয় দেয়। এই নতুন পৃথিবীকে সে যেন সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। আমরা যা পাই, তা না পেলে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমাদের মেজাজ উঠতে থাকে, যা বেশির ভাগ সময়েই অব্যক্ত অথবা ব্যক্ত ক্রোধে পর্যবসিত হয়।

সুখের বিষয় যে, অধিকাংশ লোকেরই মেজাজ কড়া নয়। তবে অধিকাংশ লোকই খিটখিটে মেজাজের, তাঁরা কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট নন, তাঁরা সব কিছুরই সমালোচক, পৃথিবীতে তাঁর নিজস্ব কিছু ছাড়া সব কিছুই মন্দ, তাঁরা পরের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারেন না। সময়ে সময়ে এঁরা ধৈর্যশীল নীরব শ্রোতা পেলে মনের কথা খুলে বলে ফেলেন, তাতে তাঁদের মন খোলসা হয় এবং মেজাজটাও কিছু কালের জন্য বেশ ভালই থাকে। সেদিন এক রাজ্য বিধান সভায় একজন সদস্য কথা-প্রসঙ্গে বলেন যে, 'বদমেজাজী বলে তাঁর যে কেন বদনাম আছে, সেটা তিনি বুঝতে পারেন না। জীবনে একবার মাত্রই তাঁর মেজাজ খারাপ হয়েছিল।' সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলের একজন সদস্য জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই ত, কিন্তু সেই একবার মাত্র খারাপ হওয়া মেজাজ আপনার কবে ভাল হবে?'

কিন্তু মানুষের এই যে রাগ হওয়া, এর যেমন একটা খারাপ দিক আছে, তেমনি একটা ভাল দিকও আছে। রাগ না থাকলে মানুষ সম্ভবত জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে পারত না এবং পৃথিবীতে আজ তার কোন অস্তিত্বই থাকত না। অর্থাৎ মানুষ যখন-তখন রেগে ওঠে বলেই সে পৃথিবীতে টিকে আছে।

ফোঁড়া ফেটে গেলে যেমন দৈহিক জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম হয় তেমনি ক্রোধ দ্বারা মানুষ নানারকম তীব্র মানসিক উত্তেজনার চাপ থেকে নিষ্কৃতি পায়। অতিরিক্ত ক্রোধ অবশ্য সমর্থনযোগ্য নয় পরন্তু তাকে বিপজ্জনকই বলতে হবে। অতিরিক্ত ক্রোধে আত্মহারা হয়ে মানুষে কখন কি করে বসে বলা যায় না। তার দ্বারা ভাল ত হয়ই না বরঞ্চ অনেক সময়ই এমনই খারাপ হয় যে আফ্‌সোসের আর সীমা থাকে না, অনুশোচনায় মন ভরে ওঠে। এতো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। হৃদ্‌রোগ, আন্ত্রিক পীড়া, মাথাধরা, স্নায়বিক গণ্ডগোল এবং শরীরের আভ্যন্তরীণ গ্রন্থিগুলির নানাপ্রকার পীড়ার মূল হল এই রাগ। আমরা অনেক সময় শুনে থাকি যে অমুক লোক এমন রেগে উঠেছিল যে তার মাথার শির ছিঁড়ে গেছে। কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। আপনার হৃদ্‌যন্ত্র যদি দুর্বল হয় অথবা আপনার ধমনী যদি জোরালো না হয় তাহলে আপনার রাগ করা শোভা পায় না। রাগ করলে আপনার অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস নামে হৃদ্‌রোগ হতে

পারে অথবা আনুষঙ্গিক কোনো রোগ হতে পারে।

রাগী লোকেরা সর্বদা আন্ত্রিক কোনো রোগে ভোগে অথবা যাদের অজীর্ণ আছে তারা প্রায়ই রাগী অথবা বদমেজাজী হয়। তাছাড়া ভীত, ক্লান্ত অথবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তিদের হজম রসগুলি ঠিকভাবে নিঃসৃত হয় না, তার ওপর ক্রোধান্বিত হলে যে মানসিক উত্তেজনা হয় তার দ্বারাও পাকস্থলীতে হজমরসগুলি এসে পৌঁছয় না, যার জন্য মানুষকে হজমজনিত রোগে ভুগতে হয়।

যাঁরা ঘন ঘন রাগ করেন তাঁরা প্রায়ই কোনো না কোনো প্রকার শিরঃপীড়ায় ভোগেন। সর্বাপেক্ষা খারাপ ধরণের যে শিরঃপীড়া যাকে বলে আধ কপালে তা হয় মস্তিষ্কে কোনো শির ফেটে গেলে। রাগ; যা আবার রক্তের চাপ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ তারই জন্য এই আধ কপালে হয়। রাগ হলেই রক্তের চাপ বাড়ে যার জন্য মস্তিষ্কের শিরা ফেটে ঐ আধ কপালে হয়। অতএব আধকপালে থেকে মুক্তি পেতে হলে রাগ ত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু মুক্তির উপায় কি? রাগটাকে কি করে দমন করতে হবে? আপনি যে রাগ করেছেন সেটা স্বীকার করবার আপনার সাহস থাকা চাই, অস্বীকার করে নিজের মনকে অথবা পরকে ধোঁকা দিয়ে কোনো লাভ নেই। রাগের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা উচিত, রাগ যদি নেহাৎ সামলাতেই না পারেন তাহলে তা যেন সীমা ছাড়িয়ে না যায়; আর যদি অন্যদিকে রাগটাকে চালিয়ে দিয়ে নিজেকে শান্ত করতে পারেন তাহলে সব দিক দিয়েই ভাল। দপ্ করে রাগটা হয়ে পড়লেই যে মনে করতে হবে রাগের কারণটা তখনই ঘটেছে, এমন কথা মনে না করলেও চলে। রাগের কারণ হয়ত ঘটেছে কাল, কিংবা পর্শু, কিংবা এক সপ্তাহ আগে। আপনি রাগটা মনে মনে পুষে রেখেছিলেন। সেই জন্যই রাগের কারণটা আগে ভাল করে অনুধাবন করা দরকার।

রাগের আর একটা প্রধান কারণ হল ক্ষুধা। বাপ-মায়েরা হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে শিশুরা সাধারণত খাবার সময় হলেই কাঁদে। বয়স্ক ব্যক্তিরা ক্ষুধা পেলে অবশ্য কাঁদে না কিন্তু ঠিক সময়ে খাবারটি না পেলে বিরক্ত হন অথবা 'মেজাজ দেখান'। এমন দৃষ্টান্তও আছে যে কৃষক ক্ষেত থেকে দিনান্তে ফিরে এসে ভাত না পেয়ে স্ত্রীকে খুন করে ফেলেছে এবং পরে শান্ত হয়ে নিজেই থানায় যেয়ে ধরা দিয়েছে। ক্ষুধা পেলেই রাগ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে খাবার পেয়ে অনেকে প্রথম কয়েকটা খুব বড় বড় গ্রাস মুখগহ্বরে চালিয়ে দেন। তারপর পেটে গিয়ে যখন কিছু পৌঁছয় তখন মেজাজটা ঠান্ডা হয়। ক্লান্তির জন্যও অনেক সময় মেজাজ খারাপ হয়। আফিসে সারাদিন খাটুনির পর ক্ষুধা ব্যতীত ক্লান্তির জন্য যাদের মেজাজ খারাপ হয় তাদের উচিত বাড়ী ফিরে চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা। অনেক সময় একটু তন্দ্রাসুখ উপভোগ করে নিলেও মেজাজ ঠান্ডা হয়। স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবন উপভোগ সামঞ্জস্যের অভাবের জন্য মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত ও চাপের ফলেও পুরুষ অথবা নারীর মেজাজ খিটখিটে হয়, পরস্পর পরস্পরের দোষ খুঁজে বার করে; পরন্তু বিবাহিত জীবনে তৃপ্ত হলে উভয়েরই মেজাজ ভাল থাকে অবশ্য যদি না আর কোনো গুরুতর কারণ ঘটে।

আপনার জীবিকা অর্জনের পেশা হয়ত আপনার খিটখিটে মেজাজের জন্য দায়ী। যারা ঘড়ী মেরামত করে অথবা কোনো একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন কাজ করে এবং ডাক্তার ও বিজ্ঞানীরা প্রায়ই খিটখিটে মেজাজের হয়ে থাকেন। বদমেজাজের আর একটি প্রধান কারণ হল জীবনে যা চেয়ে পাওয়া যায় না তার জন্য অথবা বিফল দিবাস্বপ্ন। আপনি কিছু একটা একান্তভাবে চাইছেন কিন্তু কিছুতেই তা পাচ্ছেন না তখনই আপনার মেজাজ যায় বিগড়ে। বিফলতা সেইজন্য অনেক সময় ক্রোধের কারণ হয়। অনেকের কাছে ক্রোধ আবার পরের মনোযোগ আকর্ষণ করবার একটা কৌশল বিশেষ। উদাহরণস্বরূপ স্বামী স্ত্রীর রাগের উল্লেখ করা যেতে পারে, নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করবার জন্য অথবা সংসারে, বাড়ীতে নিজের গুরুত্ব উপলব্ধি করাবার জন্য অনেকেই এই কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। অনেক বড়বাবু অফিসে রাগ করেন এই জন্যই। তাঁরা মাঝে মাঝে 'শেক দি বটল্' করে নেন। অনেক স্বামী-স্ত্রী প্রায়ই ঝগড়া করেন। প্রশ্ন করলে তাঁরা জবাব দেন তাঁদের কাছে এইটাই স্বাভাবিক; বেশীদিন ঝগড়া না করলে তাঁরা গুরুতর কিছু একটা আশঙ্কা করেন।

রাগের সময় বহু ব্যক্তি একটা কিছু তছ-নছ অথবা চুরমার না করলে রাগ থেকে বিরত হন না। ছোট ছেলে কাউকে কামড়ায় নয়ত পায়ের জুতো ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বড়রা চায়ের কাপ ভাঙেন কিংবা বেশী টাকার জিনিস কিনে ফেলেন, কেউ কেউ আবার অনেক বেশী কাজও করে ফেলেন। উইনস্টন চার্চিল রেগে গেলে অর্ধেক সিগার চিবিয়ে খেয়ে ফেলেন। তবে অনেকে সহানুভূতিশীল কারও সঙ্গে কথা বলে রাগের উপশম করেন ও মানসিক শান্তি লাভ করেন। সেই ব্যক্তিও ঠিক পথ বাৎলে দিতে পারেন। অনেক সময় অত্যন্ত ক্রোধান্বিত ব্যক্তিও আবার বিপরীত কোনো ঘটনা দেখে অথবা কোনো কথা শুনে হেসে ফেলেন। ছোট ছেলের মুখের সামনে আর্শী ধরলে তারা ত প্রায়ই হেসে ফেলে এবং তারপর তার রাগ জল হয়ে যায়।

সন্তানের সামনে পিতামাতার রাগ পরিহার করা কর্তব্য কারণ যদি সে বুঝতে পারে যে তার বাবা মা রাগ করলেই অভীষ্ট বস্তু পাচ্ছেন তাহলে সেও সেই পথ অবলম্বন করবে। রাগ অনেক সময় সংক্রামক তাই সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হল রাগ না করা। চেষ্টা করলে রাগকে নিশ্চয়ই বর্জন করা যায়। রাগ প্রতিবন্ধক বিশেষ। রাগী ব্যক্তিকে সকলেই বর্জন করতে চেষ্টা করেন।

রঙ্গজগৎ

ভিন দেশের মেয়ে (বাণীচিত্রম্ - ইন্দ্রপুরী স্টুডিও)—কাহিনী ও পরিচালনা—ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য; আলোকচিত্র—নৃপেন দাস; শব্দগ্রহণ—জে ডি ইরাণী; সুরযোজনা—পঞ্চানন মিত্র। ভূমিকায়—দীপক, সমর রায়, আশু বোস, মনোরঞ্জন, জহর, তুলসী চক্রবর্তী, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, সিতারা, প্রমীলা ত্রিবেদী, পদ্মা দেবী প্রভৃতি।

গোল্ডেন মুভীজের পরিবেশনে গত ২৫শে জানুয়ারী শ্রী পূরবী, উজ্জলা ও মেনকায় মুক্তিলাভ করেছে।

অজ্ঞতা আর অক্ষমতার ক্ষ্যাপামি বাঙলা ছবির পক্ষে কি পরিমাণে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেটাই চোখে ধরে বুঝিয়ে দেবার জন্যেই যেনো 'ভিন দেশের মেয়ে'র আবির্ভাব। নিজে কিছু না জানলে বা কিছু করবার ক্ষমতা না থাকলে এবং তা সত্ত্বেও ছবি তৈরি করার সুযোগ পেয়ে গেলে যে কেলেংকারী ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক হয়, এ-ছবিতে তার চেয়ে অবশ্য বেশি কিছু ঘটেনি। ভোঁতা কল্পনাশক্তির রুচি-বিকৃতির বেশ একটা উদাহরণ এ-ছবিখানা।

নিজের শক্তি নেই বলে ছবিখানিকে পরিচালক অন্যভাবে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করেছেন। তিনি আমদানী করেছেন বম্বে থেকে সিতারাকে আর সেই সঙ্গে বোম্বাই ছবির আদি বৃত্তিকে। ধরেই নিয়েছেন যে, সিতারা আর তার যৌন-বিলসন পেলেই বাঙলার দর্শকরা একেবারে ভেঙে পড়বে 'ভিন দেশের মেয়ে'কে দেখতে।

জানি না, আগে গল্পটা তৈরি করে তার পরে সিতারাকে নিয়ে আসার কথা মনে হয়েছিলো, কি সিতারাকে আগে নিয়ে এসে তারপর তার মতো করে গল্পটা তৈরি করে নেওয়া হয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দুজনে দুজনকেই ল্যাঙ্ মেরে বসেছেন। সিতারাকে আমদানী করার কোন সার্থকতা যেমন প্রমাণ করানো যায়নি, তেমনি গল্পও পারেনি ওকে মানিয়ে নিতে। বস্তুত এমন গোঁজামিলে ভরা গল্প অতি বাজে ছবির ক্ষেত্রেও কমই দেখা যায়।

ছবির নামের সঙ্গে মিল রেখে দেবার জন্যে অথবা ওকেই নামের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্যে, সিতারাকে করা হয়েছে এক পাঞ্জাবী মেয়ে যে বদরিকাশ্রমে গিয়েছিলো বুড়ী মাকে তীর্থ করাতে। বদরিকার সে কি দৃশ্য! তবুও বুড়ীর মরতে হলো সিতারা, অর্থাৎ মীনাকে অসহায় করে দেওয়ার জন্যে। পাঞ্জাবী মেয়ে বলেই বোধ হয় সহায় সে জুটিয়ে নিলে রাস্তা থেকে এক যুবককে জবরদস্তী পাকড়াও করে। নাম সুন্দর, বাঙলা দেশে জন্ম পাঞ্জাবী সন্তান। ওদের সঙ্গে জুটলো এক পণ্ডিতজী; মীনা চললো ওদের সঙ্গে বংগাল মুলুকে। মেয়ে হলেও সে পণ্ডিতজীর গলগ্রহ হয়ে থাকবে না, সেই আশ্বাস দেবার জন্যেই মীনা পথে দোকান থেকে সার্ট-ট্রাউজার চুরি করে পুরুষ সেজে চানাচুর বিক্রী করে পণ্ডিতজীকে তাক্ লাগিয়ে দিলে। পণ্ডিতজী মীনাকে নিয়ে এসে তুললেন শহরে তার এক যজমানের বাড়িতে। সেটা স্টুডিও বাড়ি, শিল্পীর নাম শ্রীজীব। শ্রীজীব তখন সফরে বেরিয়ে গেছেন। মীনাকে শহরে নিয়ে আসার মাঝখানে আর একটা কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে, তাতে কোন রকম করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দাঙ্গার ফলে এক বিবাহিতা উদ্বাস্তু হয়ে আসবার সময় পথ থেকে খোয়া যান এবং পরে তিনি রাস্তা চিনে শহরে এসে হঠাৎ শ্বশুর-শাশুড়ির দেখা পেয়ে যান, কিন্তু তার কোলে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটা ছেলেকে দেখেই শ্বশুর মহাশয় তার নামের সঙ্গে কুলটা কথাটা জুড়ে দিয়ে তাকে ফেলে চলে যান। সেই হতভাগিনীর স্বামীই হচ্ছে শ্রীজীব। শ্রীজীবের বাড়িতে মীনা নিজেকে পুরুষের পোষাক পরিয়ে পণ্ডিতজীর শ্যালক বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু শ্রীজীব এসে পড়তেই ধরা পরে গেলো। শ্রীজীব ওকে নাচ-গান শেখাবার ব্যবস্থা করে দিলে। ওদিকে শ্রীজীবের স্ত্রী বিতাড়িতা হয়ে আবার যখন পথ ধরলে, তখন তাকে ভুলিয়ে বাড়িতে এনে তুললে এক বেশ্যা। সেখান থেকে পালিয়ে গেলো সে; পথ থেকে মাতালদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করে আশ্রয় দিলে সুন্দর। ওরা সেবাব্রতী একটি দলের সহায়তায় একটি শিশু আশ্রম খুললে। সেই আশ্রমের সাহায্যকল্পে এলো মীনা। সারা দেশ ঘুরে নেচে গেয়ে টাকা তুলে আনলে সে। ইতিমধ্যে শ্রীজীব মীনার প্রেমে পড়ে গিয়েছে, মীনাও শ্রীজীবের। শ্রীজীবের একটি শিশুপুত্র ছিলো, থাকতো

বর্তমান সপ্তাহের নুতন বাঙলা ছবি সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত এম পি প্রডাকসন্সের 'সঞ্জীবনী' চিত্রে সন্ধ্যারাণী ও উত্তমকুমার

তার মামার বাড়িতে। মামীর অসুখ হওয়ায় ছেলেকে দেখাশুনা করার জন্যে একজন লোকের দরকার হওয়ায় মীনা শ্রীজীবের স্ত্রীকেই সেখানে এনে দেয়। মীনা অবশ্য সে মেয়েটিকে শ্রীজীবের স্ত্রী বলে জানতো না, এমনকি, মামা-মামী এবং সর্বোপরি ছেলেটিও তার মাকে চিনতো না। শ্রীজীব বুঝে নিলে সে তার স্ত্রীকে খুঁজে পাবে না, তাই মীনাকে বিয়ে করা ঠিক করলে। বিয়ের দিন হঠাৎ মীনা জেনে ফেললে কে শ্রীজীবের স্ত্রী। ফলে বিয়ে হওয়ার সারাটাক্ষণ শ্রীজীব কনেকে এক ঝিলিকও দেখতে পেলে না, দেখলে বিয়ের পর বাসরে ঘোমটা তুলতে এবং দেখে অবাক হলো যে, সে তারই পূর্ব-বিবাহিতা স্ত্রী।

ম্যাজিকের মতো মিলিয়ে যাওয়া সব ঘটনা। মীনাকে ভিনদেশী দেখাবার জন্যে তাকে বর্দারিকা থেকে ঠেলে গড়িয়ে দেওয়া হলো বাঙলা দেশে। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসার সময় শ্রীজীবের স্ত্রীর সঙ্গে না তার বাপের বাড়ির কেউ, আর না স্বামী বা ওদের আর কেউ। সে সন্তানসম্ভবা কিনা, তার শ্বশুর-শাশুড়ি জানতেন না, কারণ জানলেই তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়ে ওঠে না। রাস্তায় এক বেশ্যা ওকে দেখেই বিনা ভণিতাতেই নিয়ে এলো বাড়িতে। ওর পিছু নেওয়া মাতালরা জানতো, সুন্দর হাজির হবে, তাই সামনে পড়ার আগেই সরে পড়লো। শ্রীজীবের মামা-মামী তার স্ত্রীকে চেনেন না, কারণ চিনলেই তাকে ওদের বাড়িতে ওরই ছেলেকে দেখবার কাজ নিয়ে এনে ফেলার মতো অমন দুঃখময় ঘটনা বাঁধা যায় না। মীনা স্টুডিও বাড়িতে বহুদিন রইলো, এমন অন্তরঙ্গভাবে যে, শ্রীজীব তার হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীর বিরহে মুহ্যমান ছিলো, তাকেও ভুলে মীনাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হলো, অথচ সেই মীনা শ্রীজীবের আঁকা তার স্ত্রীর ছবি-খানি একদিনও দেখতে পেলে না তার ঠিক বিয়ের দিনের আগে।

সময়ের ব্যবধান বলতে কিছু নেই। পাঞ্জাবী মেয়ে মনে হলো পণ্ডিতজী আর সুন্দরের সঙ্গে দ-পা [illegible]তেই বাঙলা ভাষা বেশ রপ্ত করে নিলে; শ্রীজীবের বাড়িতে দু-একটা দিন থাকতেই লেখাপড়ায় জ্ঞানবুদ্ধিতে, নাচে-গানে, আদব-কায়দায় হয়ে উঠলো পুরোদস্তুর উগ্র আধুনিকা বাঙালী মেয়ে, ঠিক ম্যাজিকের মতো। শ্রীজীবের স্ত্রীর হারিয়ে যাওয়া এবং শ্বশুরের দেখা পাওয়ার মাঝে সময়ের কোন ব্যবধানই নেই, যাতে তারা তাদের পুত্রবধূর চরিত্রে সন্দেহ করার অবকাশ পেতে পারে। শ্রীজীবের ছেলেই বা তার মাকে চিনলো না কেন?

গোড়া থেকেই যেরকম আবোল-তাবোল আসতে থাকে, তাতে হাজার তিনেক ফিটের বেশি বসে থাকা ধৈর্যকে পীড়া দেওয়া হয়। বসে থাকতে পারলে খানতিনেক গান আর সিতারার কথক নাচটায় সামান্য স্বস্তি পাওয়া যায়। এমন চৌকশ বাজে কাজ বহুকাল পরে দেখা গেলো।

প্রহ্লাদ (অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন)—চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—ফণী বর্মা; আলোকচিত্র—বঙ্কু রায়; শব্দযোজনা—পরেশ দাশগুপ্ত; সুরযোজনা—বিভূতি দত্ত; আবহসঙ্গীত—দক্ষিণামোহন ঠাকুর; শিল্পনির্দেশ—সত্যেন রায় চৌধুরী। ভূমিকায়—মাস্টার বিভু, শিশির মিত্র, শ্যাম লাহা, হরিধন, জগদিন্দ্র, অপর্ণা, রাণী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।
অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের পরিবেশনে গত ১৮ই জানুয়ারী উত্তরা, পূরবী, উজ্জলা ও আলেয়াতে মুক্তিলাভ করেছে।

পৌরাণিক ছবি প্রগতিবিরোধী মনে করে তার বিপক্ষে যত কথারই অবতারণা করা যাক না কেন, একটি বিষয়ে পৌরাণিক ছবির অদ্বিতীয়তা অনস্বীকার্য। সেটি হচ্ছে গল্পের দিকটা। পৌরাণিক ছবি মানে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির অন্তর্ভুক্ত উপাখ্যানসমূহ অবলম্বনে তোলা ছবি। আর আদর্শ বিষয়বস্তু হিসেবে এসব উপাখ্যানের তুলনা নেই ভূভারতে। মানুষের মনে যত রকমের বৃত্তি থাকতে পারে, বৃত্তি অনুশাসিত চরিত্র যত রকমের কল্পনা করা যেতে পারে, পুরাণাদির কোন-না-কোন উপাখ্যানে সেসবই আছে। সর্বদেশের সর্বকালের শাশ্বত আবেদনযুক্ত এমন উপযুক্ত বিষয়বস্তু আর কল্পনাও করা যায় না। তবুও পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে তোলা ছবি আধুনিক মনে যে তার আবেদনটা ধরিয়ে দিতে পারে না, সেটা হচ্ছে সেই সব উপাখ্যানের বিন্যাসে পুরাণাদিতে বর্ণিত অলৌকিকতার অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্য দিয়ে রূপায়িত করার জন্যে।

এখন বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে অনেক জিনিস যা এককালে মানুষের কাছে অসম্ভব মনে হতো, আজ তার অনেক রহস্যই বেফাঁস হয়ে গিয়েছে। বিষ্ণুর নিয়েছে শিবদেহ পরিগ্রহ, উত্তাল সমুদ্রের ওপর প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে পদ্ম ফুটে ওঠা, সুদর্শন চক্রের ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে একটা কাণ্ড করে বসা। দেয়াল কেটে কারুর আবির্ভাব—এসবগুলো সরাসরি চেহারায় সামনে দেখালে লোকে অবাস্তব ব্যাপার না মনে করে পারে না। সত্যিই এসব আজকালকার মনে হাস্যকর হয়ে ওঠাও অহেতুক নয়।

লোকের মন গড়ে তোলার কাজে পুরাণাদির উপাখ্যানগুলির সার্থকতা রয়েছে; প্রয়োজনীয়তাও। কিন্তু সেগুলি এখনকার মনে ধরিয়ে দিতে গেলে এখনকার ধারণায় খাপ খায় এমন বাস্তবতার সহায়তাতেই সেই সব ঘটনার অবতারণা করা দরকার। এসব উপাখ্যানে তেমন অবাধ সুযোগ দেওয়াও রয়েছে। যে কোন কালের চিন্তাধারার মতো করে সাজিয়ে নেবার এমন অসীম ফাঁক রয়েছে, এই সব উপাখ্যানে যে বিশ্বাসকে তাক লাগিয়ে দেবার মতো অলৌকিকত্ব আরোপ না করেও নিছক বাস্তবের আকারেই এঁকে গেলেও সে-ছবি সমানই আবেদন ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। আমাদের যাঁরা পৌরাণিক ছবি করেন, তাঁরা এই বিষয়টার কথা খেয়াল করেন না; তাঁরা পৌরাণিক ছবি তোলেন পুরাকালে কল্পিত অলৌকিক ঘটনার আশ্রয়েই। সেই সব প্রতিটি ঘটনাকে তাঁরা এখনকার মতো করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারেন না। কাজেই তাঁদের ছবিও এখনকার বিজ্ঞান-প্রভাবিত মনে গ্রাহ্য হয় না। এই অগ্রাহ্যতাকেই তাঁরা পৌরাণিক কাহিনীর ওপরে লোকের বিতৃষ্ণা বা অশ্রদ্ধা বলে ধরে নেন।

'প্রহ্লাদ'ও চিত্রনির্মাতাদের ঐ ধারণার ব্যতিক্রম নয়। প্রহ্লাদের যে চরিত্র এবং আলোচ্য ছবিতে তার কাহিনী যেভাবে রচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে অলৌকিকত্ব না ফেঁদেও তাকে সমান শ্রদ্ধেয় করেই ফুটিয়ে তোলার সুযোগ ছিলো। কিন্তু পরিচালক সে-পথ দিয়ে মনকে টানতেই চাননি। তিনিও আর সব পৌরাণিক চিত্র পরিচালকদের মতোই যুক্তির চেয়ে যাদুকেই অবলম্বন করে নিয়েছেন।

ছবিখানি নির্মল এবং বিষয়বস্তু শিক্ষাপ্রদ তবে তার আবেদন ছোটদের সাদা মনেই

পৌঁছতে পারে। দৃশ্যসজ্জাদির ব্যাপারে শিল্প নির্দেশকের কৃতিত্ব দেখা যায়। নাম-ভূমিকায় শ্রীমান বিভূ ভট্টাচার্য লোকের দৃষ্টি ও স্নেহ টেনে রাখেন।

এ সপ্তাহের নতুন ছবি 'সঞ্জীবনী'

প্রেমের চরম সার্থকতা সংসারের কল্যাণে। সে শুধু দূরকে কাছেই টানে না—তাকে উন্নত করে, অনুপ্রাণিত করে। সেখানে সব শুভ-অমঙ্গলের দিকে সদা প্রসারিত তার কল্যাণ স্পর্শ।

'সঞ্জীবনী' চিত্রে এম-পি প্রেমের এমনি এক মহত্তর আদর্শের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। এক উদীয়মান প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেছিলো ধাপে ধাপে। শুধু প্রেমের শক্তিতে এক অবলার তার বিরুদ্ধে অকুণ্ঠ সংগ্রাম কাহিনীতে এনেছে অভিনব আবেদন। সন্ধ্যারাণী এই ভূমিকাটিকে তাঁর শিল্পী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে মনে করেন। অপরাপর অংশে আছেন উত্তমকুমার, জহর, পদ্মা, প্রীতিধারা, কানু, গুরুদাস প্রভৃতির বিশিষ্ট সমাবেশ।

সাধারণ্যের বিষয়বস্তুর সাহায্যে নাটকীয় আবেদনে গড়ে তোলায় খ্যাত সুকুমার দাশগুপ্ত ছবিখানির পরিচালনা করেছেন। অনুপম ঘটকের সুরসংযোজনাও ছবির সংগীতাংশের আকর্ষণ সূচিত করে।

ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের কার্যসূচী

আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৯ই মার্চ পর্যন্ত কলকাতায় আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভেল-এর আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী বিভিন্ন দেশের চিত্রসংক্রান্ত প্রদর্শনী ছাড়াও কলকাতার সিনেমা-শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদেশী অতিথি-দের চিত্তবিনোদনের জন্যে নানাবিধ সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন করেছেন। বিদেশ থেকে যেসব শিল্পীরা আসবেন তাঁরা যাতে বাঙলাদেশের নৃত্য, অভিনয় ও গানের মধ্যে এ'দেশের সত্যিকার সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় লাভ করেন এ বিষয়ে বেঙ্গল মোশন পিকচার্স-এর কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট রয়েছেন। এই ফেস্টিভেল উপলক্ষে নৃত্যগীতাভিনয়ের জন্য ইডেন গার্ডেনের একাংশে একটি বিশেষ প্যাভি-লিয়ন তৈরী করে নতুন মঞ্চ নির্মিত হচ্ছে এবং সাধারণ প্রদর্শনী থেকে এই মঞ্চগৃহ পৃথক আবেষ্টনীতে রাখা হবে ব'লে এর প্রবেশপত্রও আলাদা হবে। এখানে বিদেশী অতিথিদের চিত্তবিনোদনের যে আয়োজন করা হচ্ছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছেঃ—পল্লীগীতি, লোকনৃত্য, আধুনিক সংগীত, আধুনিক নৃত্যকলা, যন্ত্রসংগীত, ক্ল্যাসিক্যাল সংগীত, পুতুল নাচ, ফ্যান্সী মেলা, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য শ্যামা ইত্যাদি। শ্রীপংকজ মল্লিক, শ্রীশান্তি-দেব ঘোষ, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং শ্রীজ্ঞান-প্রকাশ ঘোষ প্রভৃতি এই সংস্কৃতিকমূলক প্রমোদানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

প্রতিপাদিত্য

এম পি'র পরবর্তী এই বিরাট চিত্র প্রচেষ্টার 'মহরত' পর্ব গত সপ্তাহে তাঁহাদের ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওতে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। বহু সাংবাদিক ও জনপ্রিয় চিত্র-তারকার উপস্থিতিতে কার্যারম্ভ সূচিত হয়। শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ও ছবিখানির পরিচালকমণ্ডলী অগ্রদূত অনুষ্ঠানকে মনোজ্ঞ করে তোলায় যত্নবান ছিলেন।

ক্রিকেট

ভারত ও ইংলণ্ড দলের পঞ্চম বা শেষ ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ মাদ্রাজে আরম্ভ হইবে। এই খেলাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহার ফলাফলের উপরই ভারতীয় ক্রিকেট খেলার মানসম্মান সকল কিছুই নির্ভর করিতেছে। যে চারিটি টেস্ট ম্যাচ ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ৩টি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় ও একটি খেলায় ইংলণ্ড দল বিজয়ী হইয়াছে। পঞ্চম টেস্ট খেলাটি যদি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় তাহা হইলে ইংলণ্ডই "রবার" বিজয়ীর গৌরব অর্জন করিবে। ইংলণ্ড দল যদি পরাজিত হয় তাহা হইলেই ভারতের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পরাজিত হইলে কোন কথাই নাই। এইজন্য ভারতের প্রত্যেক ক্রীড়ামোদীরই আন্তরিক কামনা "ভারত পঞ্চম টেস্ট খেলায় বিজয়ী হউক"। ইহা আমাদেরও যে কামনা বলাই বাহুল্য। তবে ইহা কিরূপে সম্ভব এই চিন্তা সকলেই করিতেছেন। এই চিন্তার ফলস্বরূপ কি পাইয়াছেন আমরা জানি না তবে আমাদের যতদূর মনে হইতেছে ভারত এই খেলায় বিজয়ী হইবে। ইহার প্রধান কারণ হিসাবে দলের অধিনায়ক এন জি হাউওয়ার্ডের অনুপস্থিতি উল্লেখ করা যাইতে পারে। হাউওয়ার্ড হায়দরাবাদে খেলায় যোগদান করিতে পারেন নাই। মাদ্রাজেও পারিবেন না। তিনি "প্লুরেসী রোগে" আক্রান্ত হইয়াছেন। এই রোগ কয়েক দিনের মধ্যে উপশম হয় না। ইহার জন্য দীর্ঘদিন প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি কিছুতেই পঞ্চম ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচে যোগদান করিতে পারেন না। তাঁহার অবর্তমানে এম সি সি দলের অবস্থা যে কিরূপ হয়, তাহা আমরা বিভিন্ন খেলায় লক্ষ্য করিয়াছি। বিশেষ করিয়া হাউওয়ার্ডের ব্যাটিং ও বোলিং ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার তুলনায় সহ-অধিনায়ক কারের দল পরিচালনায় অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। যাহা হউক, এই খেলাটি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হইবে। ভারতীয় দলের নির্বাচিত সকল খেলোয়াড়ই খেলিবেন একমাত্র হিমু অধিকারী খেলিতে পারিবেন না। তিনি বোম্বাইর দাদারের ফুটপাতে চলিবার সময় পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া কব্জিতে আঘাত পাইয়াছেন। ঐ আঘাত অতি সামান্য নহে। ডাক্তারগণ ১০ দিন পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিয়াছেন যাহার জন্য অধিকারীকে বাধ্য হইয়া ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডকে জানাইতে হইয়াছে যে, তিনি খেলিতে পারিবেন না। ইহার পরিবর্তে তরুণ খেলোয়াড় মঞ্জুরেকারকে গ্রহণ করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। যদি গ্রহণ করা হয় অন্যায় করা হইবে না। মঞ্জুরেকার অধিকারীর সমতুল্য ব্যাটসম্যান না [illegible] ও নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় বল[illegible] চলে। কেহ কেহ সারভাতের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে অভিমত দিয়াছেন। সারভাতে সম্প্রতি রণজি ক্রিকেট খেলায় উন্নততর ব্যাটিং ও বোলিংয়ের পরিচয় দিয়াছেন সত্য, কিন্তু দলভুক্ত হইয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি

না। নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি কর্ণেল সি কে নাইডু। তিনি তাঁহার দলের মুস্তাক আলীকে পঞ্চম টেস্টে দলভুক্ত করিয়াছেন। পুনরায় সারভাতেকে করিবেন বলিয়া মনে হয় না। তবে এই কথা ঠিক যে, অভিজ্ঞতার দিক হইতে সারভাতের অন্তর্ভুক্তি দলের ব্যাটিং, বোলিং ফিল্ডিং সকল বিষয়ের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

পূর্বাঞ্চলের ফাইনালে পশ্চিমবঙ্গ দল পরাজিত

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় পশ্চিমবঙ্গ দল হোলকারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ৭ উইকেটে পরাজিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ দলের এই শোচনীয় পরাজয় অনেককেই দুঃখিত করিয়াছে। কিন্তু আমরা একেবারেই আশ্চর্য হই নাই। আমরা পূর্বেই জোর করিয়া উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, পশ্চিমবঙ্গ দল আসামের বিরুদ্ধে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেও হোলকারের বিরুদ্ধে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে পারিবে না। হোলকার গত বৎসরের রণজি ক্রিকেট কাপ বিজয়ী এবং এই দলের অধিনায়ক প্রবীণ ধুরন্ধর ক্রিকেট খেলোয়াড় কর্নেল সি কে নাইডু। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ অভিজ্ঞ খেলোয়াড় যে দলের অধিনায়ক তাহার পরাজয় কখনই সম্ভব নহে। আমাদের সেই ধারণা ও উক্তি যে সত্যে পরিণত হইয়াছে ইহা দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। এই পরাজয় বাঙ্গলার ক্রিকেট পরিচালকগণের কিছুটা জ্ঞান সঞ্চার করিবে বলিয়া মনে করি। সাধারণ ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিং ও বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করিলেই যে ক্রিকেট খেলার সকল কিছু শিক্ষা হয় না ইহাও পশ্চিমবঙ্গ দলের খেলোয়াড়গণের স্মরণ রাখা উচিত। ইহার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক ও আন্তরিক সাধনার প্রয়োজন। এইবারে হোলকার দলে ধানওয়াদে নামক একটি তরুণ খেলোয়াড় খেলিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যাটিং ও বোলিংয়ে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। এই খেলোয়াড়টির নাম ইতিপূর্বে কেহই জানিত না। কর্নেল সি কে নাইডুর শিক্ষার গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে ইহাকে ভারতীয় দলে খেলিতে দেখিলেও আশ্চর্য হইবার কোন কারণ থাকিবে না। শক্তিহীন দলের বিরুদ্ধে রেকর্ড করিয়া এইজন্যই উল্লাস না করিতে পশ্চিমবঙ্গ খেলোয়াড়দের অনুরোধ করি। পশ্চিম বাঙ্গলার খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এখনও ভারতের প্রথম শ্রেণীর খেলা বলিয়া গণ্য হইবার মত নহে ইহা আশা করি, পরিচালকগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

খেলার **ফলাফল ঃ—**

পশ্চিমবঙ্গ প্রথম ইনিংস—১৮০ রান (নির্মল চ্যাটার্জি ৬২, সি এস নাইডু ৩২, শিবাজী বসু ১৯, পি সেন ১৭, এস কে গিরিধারী ১৬ সারভাতে ২৩ রানে ৪টি, ধানওয়াদে ৬৫ রানে ৩টি উইকেট পান।)

হোলকার প্রথম ইনিংস—৩৬৭ রান (এম এম জাগদেল ৪৮, কম্পু নাইডু নট আউট ৬০, ধানওয়াদে ৪৮, সারভাতে ৬২, নিভসরকার ২৬, মুস্তাক আলী ২৭, সি কে নাইডু ২০, পি চ্যাটার্জি ৪৭ রানে ২টি, এস কে গিরিধারী ১২৫ রানে ৬টি, এন চৌধুরী ৭৯ রানে ১টি ও সি এস নাইডু ৫৩ রানে ১টি উইকেট পান।)

পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় ইনিংস—৩১৫ রান (পি রায় ৫২, এ দাশগুপ্ত ৪৩, নির্মল চ্যাটার্জি ২৪, এস কে গিরিধারী নট আউট ৬৯, বি ফ্রাঙ্ক ৪৩, পি চ্যাটার্জি ৩৪, এইচ গাইকোয়াড় ৮৮ রানে ৪টি ধানওয়াদে ১১০ রানে ৫টি উইকেট পান)।

হোলকার দ্বিতীয় ইনিংস—৩ উইঃ ১২৯ রান নিভসরকার ৪৪, সারভাতে নট আউট ৭৬, মন্টু ব্যানার্জি ৫০ রানে ২টি, সি এস নাইডু ১৫ রানে ১টি উইকেট পান।)

এম সি সি বনাম হায়দরাবাদ

এম সি সি বনাম হায়দরাবাদ দলের তিনদিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইয়াছে। এই খেলায় এম সি সি দলের সহ-অধিনায়ক ডি বি কার টসে জয়ী হইয়াও হায়দরাবাদ দলকে প্রথম ব্যাট করিতে দেন। কারের অদূরদর্শিতার জন্যই খেলার এই ফলাফল হইয়াছে বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। তবে এই খেলায় হায়দরাবাদ দলের পক্ষে আলী হোসেন ব্যাটিং ও গোলাম আমেদ বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেন। ইহার পরেই হায়দরাবাদ দলের আইবরা, নাসির আলীর খেলারও প্রশংসা করা চলে। এম সি সি দলের ডোনাল্ড কেনিয়ান এই খেলায় তাঁহার ভ্রমণের প্রথম শতাধিক রান করিবার গৌরব অর্জন করিয়াছেন। এম সি সি দলের অধিনায়ক হাউওয়ার্ড অসুস্থ থাকায় খেলায় যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুপস্থিতি এই খেলায় বিশেষভাবেই অনুভূত হইয়াছে। বৈদেশিক ক্রীড়া সমালোচক মিঃ লেসলী স্মিথ ইহা যে বিশেষভাবেই অনুভব করেন তাহার পরিচয় তাঁহার প্রকাশিত অভিমতের মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। তিনি খেলোয়াড়দের ফিল্ডিং, বোলিং ও ব্যাটিং সকল বিষয়েরই শিথিলতার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন "দলের সকল খেলোয়াড় যেন অতিরিক্ত শ্রমজনিত ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।" ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে পঞ্চম বা শেষ টেস্ট খেলায় ভারতীয় দলের জয়লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ঐ খেলা শীঘ্রই মাদ্রাজে আরম্ভ হইবে। সুতরাং ফলাফলের জন্য অধিক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে না। ভারত পঞ্চম টেস্ট খেলায় জয়ী হউক ইহা সকলেরই কামনা। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হইলে এম সি সি দল

টেস্ট পর্যায়ের বেলায় "রবার" লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবে। ইহা কখনও সম্ভব হইতে দেওয়া উচিত নহে।

খেলার ফলাফলঃ—

হায়দরাবাদ প্রথম ইনিংস—৩২০ রান (আলী হোসেন ৯৫, আইবরা ৭৬, বরজী ৬৬, নাসির আলী ৩২, স্ট্যাথাম ৫০ রানে ৩টি, স্যাকলটন ৭৬ রানে ২টি, ট্যাটারসল ৮৪ রানে ২টি, কার ৬৯ রানে ২টি উইকেট পান)।

এম সি সি প্রথম ইনিংস—৮ উইঃ ৪১১ রান (কেনিয়ান ১১২, লোসন ৩৭, গ্রেভনী ৯৬, পুল ৭৯, লীডবিটার নট আউট ৬৩, গোলাম আমেদ ১২৩ রানে ৫টি, নাসির আলী ৬৭ রানে ২টি উইকেট পান)।

হায়দরাবাদ দ্বিতীয় ইনিংস—১ উইঃ ৮২ রান (আলী হোসেন ২৯, সঞ্জীব রাও ২১, স্যাকলটন ২১ রানে ১টি ও লীডবিটার ২৩ রানে ১টি উইকেট পান।)

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের সাফল্য

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল পঞ্চম বা শেষ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে ২০২ রানে পরাজিত করিয়াছে। এই খেলাটিও প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ হয়। অস্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট করিয়া মাত্র ১১৬ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলা আরম্ভ করিয়াও ৭৮ রানে ইনিংস শেষ করে। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ৩৭৭ রানে ইনিংস শেষ করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৪১৬ রান পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। প্রথম খেলোয়াড় স্টোলমেয়ার শতাধিক রান করেন, কিন্তু লিণ্ডওয়ালের মারাত্মক বোলিং দলের অপর সকল খেলোয়াড়কে বিব্রত করে। দ্বিতীয় ইনিংস শেষ পর্যন্ত ২১৮ রানে শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়া ২০২ রানে বিজয়ী হয়। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল টেস্ট পর্যায়ের পাঁচটি খেলার মধ্যে চারিটিতে বিজয়ী হইয়া ইহাই প্রমাণিত করে যে, এখনও তাহারাই ক্রিকেট খেলায় বিশ্বচ্যাম্পিয়ান দল। ইহা সত্যই প্রশংসনীয়। তবে দুঃখ হয় এই যে, এই দেশের ক্রিকেট মহলে অন্তর্কলহ দেখা দিয়াছে। ঠিক কি কারণে জানা যায় নাই। তবে আশা করা চলে যে, এইবারের টেস্ট পর্যায়ের সাফল্য ক্রিকেট পরিচালকগণের অন্তর্কলহ কিছুটা প্রশমিত করিবে।

খেলার ফলাফলঃ—

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস—১১৬ রান (ম্যাকডোনাল্ড ৩২, মিলার ২০, হার্ভে ১৮, টমাস ১৬, বিল জনস্টন নট আউট ১৩, গোমেজ ৫৫ রানে ৭টি, ওরেল ৪২ রানে ৩টি উইকেট পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস—৭৮ রান এ্যাটকিনসন ১৩, ওরেল ১৪, রেই ১১, স্টোলমেয়ার ১০, মিলার ২৬ রানে ৫টি, জনস্টন ২৫ রানে ৩টি, লিণ্ডওয়াল ২০ রানে ২টি উইকেট পান)।

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস—৩৭৭ রান (ম্যাকডোনাল্ড ৬২, টমাস ২৮, হ্যাসেট ৬৪, মিলার ৬৯, হোল ৬২, লিণ্ডওয়াল ২১, ওরেল ৯৫ রানে ৪টি, গোমেজ ৫৮ রানে ৩টি, ভ্যালেণ্টাইন ৭৯ রানে ২টি উইকেট পান)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস—২১৮ রান (স্টোলমেয়ার ১০৪, রেই ২৫, উইকস্ ২১, ওরেল ১৮, লিণ্ডওয়াল ৫২ রানে ৫টি, মিলার ৫৭ রানে ২টি উইকেট পান।)

মুষ্টিযুদ্ধ

কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম স্টেডিয়ামে বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন পরিচালিত জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা বিশেষ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙলা দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করিয়াছে। গত বারেও বাঙলা দল বোম্বাইর সহিত সমান সংখ্যক পয়েণ্ট পাইয়া দলগত চ্যাম্পিয়ান হইয়াছিল। এই বারের প্রতিযোগিতায় তরুণ মুষ্টিযোদ্ধা শক্তি মজুমদারের ফ্লাই ওয়েট চ্যাম্পিয়ানসিপে সাফল্য ও ভারতীয় ওয়েল্টার ওয়েট চ্যাম্পিয়ান হিমাংশু পালের পরাজয়ই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শক্তি মজুমদার অপূর্ব দৃঢ়তার জন্যই শেষ পর্যন্ত ভারতীয় চ্যাম্পিয়ানসিপের গৌরব অর্জন করিয়াছে। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী বোম্বাইর তরুণ মুষ্টিযোদ্ধার লড়াইও উপেক্ষা করা চলে না। হিমাংশু পাল মধ্যপ্রদেশের ১৭ বৎসর বয়স্ক মুষ্টিযোদ্ধা নরিসের নিকট বহু পয়েণ্টের ব্যবধানে পরাজিত হইয়াছে। এই নবাগত মুষ্টিযোদ্ধার দৈহিক গঠন সুন্দর ও বুদ্ধিও প্রখর। অদূর ভবিষ্যতে ইহাকে অন্যান্য ক্রীড়াক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করিতে দেখিলে কোনরূপ আশ্চর্য হইবার কারণ থাকিবে না।

জাতীয় প্রতিযোগিতা তিনদিন ধরিয়া ফোর্ট উইলিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনে দর্শক সমাগম অধিক না হইলেও শেষ দুই দিনে যেরূপ দর্শক সমাবেশ হয় এইরূপ পূর্বে কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রতিযোগিতা পরিচালনার গুরুদায়িত্ব বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন গ্রহণ করিলে আশংকা ছিল ফেডারেশন দেনাগ্রস্থ না হয়, কিন্তু দর্শক সমাগম দেখিয়া আমরা নিশ্চিত হইয়াছি। বাঙলার ক্রীড়ামোদিগণ এই বিষয় পরিচালকগণকে যে সাহায্য করিয়াছেন খুবই সুখের বিষয়।

এই বারের প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করিয়া ইহাই মনে হইয়াছে যে, ভারতের মুষ্টিযুদ্ধের স্ট্যাণ্ডার্ডের অবনতি হয় নাই। হেলসিঙ্কির বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিলে সুনাম লাভের সম্ভাবনা আছে ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। নিখিল ভারত অলিম্পিক এসোসিয়েশন অর্থাভাবের জন্য মুষ্টিযুদ্ধ দল প্রেরণ করিবেন না বলিয়া সভায় স্থির করিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছি। এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া তাঁহারা যদি ভারতীয় মুষ্টিযুদ্ধ ফেডারেশনের উপর দল প্রেরণের ভার অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় এই সমস্যার সমাধান হইত। আমরা আশা করি, নিখিল ভারত অলিম্পিকের পরবর্তী অধিবেশনে এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করা হইবে। নিম্নে জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

ফ্লাই ওয়েটঃ—শক্তি মজুমদার (বাঙলা) পয়েণ্টে পি খাটাউকে (বোম্বাই) পরাজিত করে।

ব্যাণ্টম ওয়েটঃ—এ সিকুউরা (বোম্বাই) পয়েণ্টে অজিত ব্যানার্জিকে (বাঙলা) পরাজিত করে।

ফেদার ওয়েটঃ—বি বসু (বাঙলা ও রেলওয়ে) পয়েণ্টে সি জ্যাকসনকে (বাঙলা) পরাজিত করে।

লাইট ওয়েটঃ—জিনি রেমণ্ড (বোম্বাই) পয়েণ্টে ডি মার্সডেনকে (বাঙলা) পরাজিত করে।

ওয়েল্টার ওয়েটঃ—আর নরিস (মধ্যপ্রদেশ) পয়েণ্টে হিমাংশু পালকে (বাঙলা) পরাজিত করে।

মিডিল ওয়েটঃ—ই ক্রানস্টন (বাঙলা ও রেলওয়ে) দ্বিতীয় রাউণ্ডে সি আর্নল্ডকে (বোম্বাই) নক আউটে পরাজিত করে।

লাইট হেভী ওয়েটঃ—আস্কার ওয়ার্ড (বাঙলা) প্রথম রাউণ্ডে সি রুলড্রীকে (রেলওয়ে) নক আউট করে।

হেভী ওয়েটঃ—রণি মুর (বাঙলা) দ্বিতীয় রাউণ্ডে সি প্রিনকে (বোম্বাই) নক আউটে পরাজিত করে।
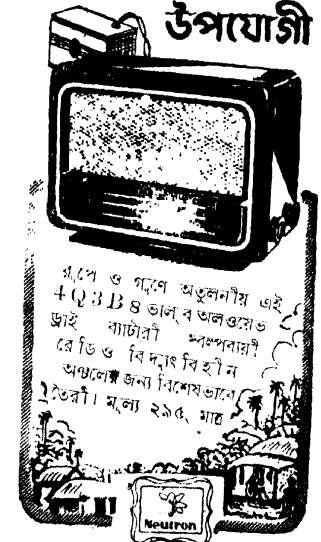
দেশী সংবাদ

২৮শে জানুয়ারী—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচনের যে সমস্ত ফল প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে বহুবাজার কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জয় এবং আরামবাগ কেন্দ্রে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের পরাজয়। এইদিন কৃষক-মজদুর-প্রজা দলের নেতা ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি বেলিয়াঘাটা কেন্দ্রে মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীসুহৃদকুমার মল্লিক চৌধুরীর নিকট পরাজিত হইয়াছেন। ভবানী-পুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী মীরা দত্ত গুপ্তা নির্বাচিত হইয়াছেন।

পশ্চিম দিনাজপুর কেন্দ্র হইতে লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীসুশীলরঞ্জন চ্যাটার্জি জয়লাভ করিয়াছেন।

মাদ্রাজ বিধান সভায় কংগ্রেস দলের অন্য নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের সমস্ত আশা নির্মূল হইয়াছে। এ পর্যন্ত কংগ্রেস দল ৩৭৫টি আসন বিশিষ্ট মাদ্রাজ বিধান সভার ১৩৭টি আসন লাভ করিয়াছে এবং বিরোধী দলগুলি যুক্তভাবে ১৮৯টি আসন লাভ করিয়াছে।

২৯শে জানুয়ারী—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার আরও ২৬টি আসনের নির্বাচন ফল ঘোষিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কংগ্রেস ১৭টি আসন লাভ করিয়াছে। এইদিন দেগঙ্গা (২৪ পরগণা) কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় মন্ত্রী কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ আর আমেদ, বড়বাজার কেন্দ্রে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঈশ্বর-দাস জালান, শ্যামপুকুর কেন্দ্রে শ্রীহেমন্তকুমার বসু (ইউ-এস-ও) এবং টালীগঞ্জ দক্ষিণ কেন্দ্রে শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তীর (কম্যুনিস্ট) জয়লাভ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাওড়া উত্তর কেন্দ্রে সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীশিবনাথ ব্যানার্জির শোচনীয় পরাজয় এইদিনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই কেন্দ্রে কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীবীরেন ব্যানার্জি নির্বাচিত হইয়াছেন।

বিহারের রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় বিধান সভার নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন।

৩০শে জানুয়ারী—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচনে ১৬টি আসনের ফল ঘোষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কংগ্রেস ১১টি আসন লাভ করিয়াছে। এইদিন মেদিনীপুর জেলার খেজুরী কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী আভা মাইতি, হাওড়া পূর্ব কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীশৈলকুমার মুখার্জি এবং কালীঘাট কেন্দ্রে কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেনের জয়লাভের সংবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী জনাব মহম্মদ খুদাবক্স লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

হায়দরাবাদ রাজ্য বিধান সভায় মোট ১৭৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস প্রার্থীরা ৯৩টি আসনে নির্বাচিত হওয়ায় কংগ্রেস অন্য নিরপেক্ষ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৩১শে জানুয়ারী—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার তিনটি আসনের ফল ঘোষিত হয়। এইদিন ভাঙ্গড় কেন্দ্রে সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস প্রার্থী বন ও মৎস্য মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর নির্বাচিত হন। এই কেন্দ্রে সাধারণ আসনে কম্যুনিস্ট তপশীলী প্রার্থী শ্রীগঙ্গাধর নস্কর নির্বাচিত হন। কৃষ্ণনগর কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীবিজয়লাল চ্যাটার্জি নির্বাচিত হইয়াছেন।

১লা ফেব্রুয়ারী—অদ্য পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ২০১টি আসনের ফল ঘোষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কংগ্রেস ১২৭টি আসন লাভ করিয়া স্বতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। কম্যুনিস্ট পার্টি ২৫টি আসন দখল করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং ডাঃ মনোমোহন দাস (কংগ্রেস-তপশীলী) বর্ধমান কেন্দ্র হইতে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। লোক-সভার নির্বাচনে ঘাটাল কেন্দ্র হইতে কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী চৌধুরী নির্বাচিত হইয়াছেন।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ আজ মুঙ্গের জেলার খড়্গপুর কেন্দ্র হইতে বিহার বিধান সভায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

অদ্য প্রকাশিত ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক বুলেটিনে বলা হইয়াছে যে, ১৯৫২ সালে ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবে।

এ পর্যন্ত ভারতের ২২টি রাজ্য বিধান সভার মধ্যে ১৩টিতে কংগ্রেস অন্য নিরপেক্ষ সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছে। এইগুলি হইতেছে ৯টি 'ক' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের মধ্যে বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম; ৭টি 'খ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের মধ্যে হায়দরাবাদ, মধ্যভারত, মহীশূর ও সৌরাষ্ট্র এবং ৭টি 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের মধ্যে আজমীর, ভূপাল, কুর্গ ও হিমাচল প্রদেশ।

২রা ফেব্রুয়ারী—এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ২১০টি আসনের ফল ঘোষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কংগ্রেস ১৩৪টি আসন লাভ করিয়াছে। হিন্দু মহাসভার নেতা শ্রী এন সি চ্যাটার্জি লোকসভা নির্বাচনে হুগলী কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইয়াছেন।

উড়িষ্যা বিধানসভার ১৪০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস এ পর্যন্ত ৫৬টি আসন দখল করিয়াছে এবং অ-কংগ্রেসীদের সংখ্যা ৭০তে দাঁড়াইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধি-বেশন আরম্ভ হয়। বৈঠকে নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজ্যের রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

৩রা ফেব্রুয়ারী—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকে রাজ্য বিধান পরিষদের একটি আসন দেওয়া হইবে। বিধান সভায় কোন সদস্যপদ শূন্য হইবামাত্রই তাহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা দক্ষিণ-পূর্ব কেন্দ্র হইতে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, উত্তর-পূর্ব কলিকাতা কেন্দ্র হইতে কম্যুনিস্ট প্রার্থী অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি হাওড়া নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীসন্তোষ-কুমার দত্ত এবং তমলুক কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব বিধানসভার নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন।

পাঞ্জাব ও বিহার রাজ্যের বিধানসভায় কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে জানুয়ারী—মিশরের প্রধান মন্ত্রী নাহাশ পাশা রাজা ফারুক কর্তৃক পদচ্যুত হইয়াছেন। গতকল্য কায়রোর দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় অবহেলা প্রদর্শনের জন্য নাহাশ পাশার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে। গত রাত্রে আলী মেহের পাশার নেতৃত্বে মিশরে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

২৮শে জানুয়ারী—জোহান্সবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে আসন্ন সংগ্রামে সর্বতোভাবে যোগদানের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের নিকট আবেদন জানান হইয়াছে। ডাঃ ইউসুফ দাদু পুনরায় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

ব্রহ্ম সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, রণদুর্ধর্ষ বর্মী সৈন্যদল অদ্য প্রায় ছয় হাজার জাতীয়তাবাদী চীনা সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ঐ চীনা সৈন্যরা ব্রহ্মের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিল।

২৯শে জানুয়ারী—গতকল্য মিশরের নূতন প্রধান মন্ত্রী মিঃ আলী মেহের পাশা রাজা ফারুকের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁহার সরকার বৃটেনের সহিত কোনপ্রকার চুক্তি সম্পাদন করিবেন না।

৩১শে জানুয়ারী—অদ্য নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর বিরোধ মীমাংসার জন্য নিযুক্ত ডাঃ গ্রাহামের কার্যকাল আরও দুই মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৩রা ফেব্রুয়ারী—কোরিয়ায় যুদ্ধবন্দী সাব-কমিটির বৈঠকে গত ৫২ দিনের মধ্যে অদ্য সর্বপ্রথম আলোচনা কিছু অগ্রসর হইয়াছে। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীরা পুনরায় যুদ্ধে যোগদান করিবে না বলিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জ পক্ষ যে প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহার সহিত একমত হইয়া কম্যুনিস্টরা বন্দী বিনিময় সম্পর্কে এক নূতন ৯ দফা পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন।

ভারতীয় মূল্য। প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০,
পাকিস্থান মূল্য: প্রতি সংখ্যা (পাক) ।৵০ আনা বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০ (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৬নং চিন্তামণি দাস লেন কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

ঊনবিংশ বর্ষ। শনিবার, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 16th February, 1952 [১৬শ সংখ্যা

রাজা ষষ্ঠ জর্জের পরলোকগমন

ইংলণ্ডেশ্বর রাজা ষষ্ঠ জর্জ পরলোকগমন করিয়াছেন এবং তাঁহার কন্যা দ্বিতীয় এলিজাবেথ ইংলণ্ডের মহারাণী পদে অভিষিক্তা হইয়াছেন। রাজা ষষ্ঠ জর্জ ভারতের সর্বশেষ সম্রাট। তাঁহারই রাজত্বকালে ভারতের সুদীর্ঘ বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটে এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর দল এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এই হিসাবে রাজা ষষ্ঠ জর্জ ভারতের রাষ্ট্রীয়-সংগ্রামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেন এবং ভারতের জনসাধারণ ইংলণ্ডেশ্বরস্বরূপেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্তও হয়। ভারতে বর্তমানে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু সেজন্য অপর কোন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের এবং স্বাধীনতার মর্যাদার প্রতি সে অনবহিত নহে। আজ সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড এবং ভারতের অতীত কালের দুঃখদায়ক সকল স্মৃতি ভুলিয়া গিয়াই ভারত ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জের অকালমৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিতেছে এবং ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী এলিজাবেথকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

নির্বাচনের পর

সাধারণ নির্বাচনে মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুরে দলগত বিপর্যয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে সচেতন করিয়াছে। তাঁহারা কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র সংশোধন এবং পরিবর্তন সাধনের দ্বারা সময়োচিত সমস্যার সম্মুখীন হওয়া কর্তব্য বোধ করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে সমস্যা পশ্চিমবঙ্গেও কম নয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী দল বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলেও এখানকার কংগ্রেস-পরিচালিত গভর্নমেণ্টের শাসন-সম্পর্কিত নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ এবং বিক্ষোভের ভাব বিগত সাধারণ নির্বাচনে বেশই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী সহ এখানকার ১১ জন নির্বাচন-প্রার্থী মন্ত্রীর মধ্যে সাতজনই পরাজিত হইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে বাদ দিলে যে সব বিভাগে কিছু গুরুত্ব আছে বলিতে গেলে তাহার ভারপ্রাপ্ত সব কয়জন মন্ত্রীই এখানে পরাজিত হইয়াছেন। কম্যুনিষ্ট দল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় সংখ্যার দিক হইতে তেমন জোর লাভ না করিলেও প্রধান বিরোধী দল হিসাবে তাহারা সংহত হইয়া উঠিয়াছে এবং আইনসভার ভিতর দিয়া জনমতকে আকর্ষণ, অধিকন্তু গভর্নমেণ্টের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার সমধিক সুযোগ পাইয়াছে। সুতরাং দল হিসাবে কংগ্রেসের সম্মুখে এখানে সমস্যা জটিল। ফলত পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্ট যদি জনসাধারণের মনের এই অসন্তোষের ভাবের গুরুত্ব যথেষ্টরূপে উপলব্ধি না করেন এবং তদনুযায়ী তাঁহাদের শাসন-নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে সমর্থ না হন, তবে কয়েক মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে শাসন-সঙ্কট সৃষ্টি হইবে, এমন আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নহে। সুতরাং শাসনের দায়িত্ব লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সুনির্ধারিতভাবে নীতি-নিয়ন্ত্রণের উপর পশ্চিমবঙ্গের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তাহার উন্নতি ও অগ্রগতি অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসকে শুধু জয়ের দিকটা দেখিলে চলিবে না, পরাজয়ের বিচারও করিতে হইবে এবং গভীরভাবে তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কলিকাতা এবং সহরতলীর নির্বাচনের বিচার করিলে দেখা যাইবে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটা বিপুল অংশের কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্যের ভাব আর পূর্বের মত নাই। সহরতলীর শ্রমিক প্রধান অঞ্চলেও কংগ্রেসই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বস্তুত কংগ্রেসের ঐতিহ্য এবং প্রতিষ্ঠিত শাসনের প্রতি আনুগত্যের একটা সংস্কার শ্রমিকদের মধ্যে এক্ষেত্রে প্রধানত কাজ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে মফঃস্বলের কোন কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে ২৪ পরগণা, মেদিনীপুরে কৃষকদের সমর্থন কংগ্রেস পায় নাই। কংগ্রেস সদস্য-পদপ্রার্থী কয়েকজন বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির পরাজয় এ-

সত্য সুনিশ্চিত করিয়া দিয়াছে। এগুলি উপেক্ষার বিষয় নয়। ফলত বাঙলা দেশে এমন দৃশ্য ইতঃপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। সুতরাং কংগ্রেস পক্ষ যদি নিজেদের প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখিতে চাহেন, তবে বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে তাঁহাদের অগ্রসর হইতে হইবে এবং জনচিত্তের সঙ্গে সমবেদনার সূত্রে সংবন্ধ হইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে যে সমস্যাগুলি বিশেষভাবে দেখা দিয়াছে, সেইগুলির সমাধানের জন্য সাহসের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং সেই পথে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে একটা অসহায়ত্বের ভাব দেশ জুড়িয়া দেখা দিয়াছে। আদর্শের প্রেরণা লোকের মধ্যে পূর্বের মত নাই। পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব সমস্যাসমূহের সমাধানে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়া আদর্শের প্রেরণা আবার জাগাইয়া তোলা নিতান্ত প্রয়োজন। তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করা দরকার। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি এখনও সেই কথাই বলিব যে দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে এই প্রদেশের লোকে জানে। বৃহৎ আদর্শে প্রেরণা পাইলে দুঃখ-কষ্ট যে তাহারা সহ্য করিতে পারে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাসই এ সত্য প্রমাণ করিবে। ফলত স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য যাহারা এত দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, লব্ধ স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত ও সুদৃঢ় করিবার জন্য এবং তাহাকে সার্থক করিয়া তুলিবার নিমিত্তও তাহারা যে দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে চাহে না, কিংবা পারে না, আমাদের ইহা মনে হয় না। স্বাধীনতা লাভ করিলেই রাতারাতি সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে, এমন ধারণাও জনসাধারণের মনে নাই। দেশ সেবার আদর্শ তাহারা শাসন-নীতিতে জ্বলন্ত এবং জীবন্ত দেখিতে চায়। শাসন-নীতিতে সকলের দুঃখ-কষ্টের প্রতিকারের জন্য আন্তরিক বোধ নিঃস্বার্থ ত্যাগের পথে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে—দুর্নীতির নিরসন হয় এবং দেশের দুর্দশা লইয়া যাহারা ধন, মান ও প্রতিপত্তির পাপ-ব্যবসা চালাইতেছে সমাজজীবন হইতে তাহাদের উৎসাদন ঘটে, দেশের জনসাধারণ আজ ইহাই কামনা করে। বস্তুত বিগত সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গকে তাহার রাষ্ট্র-জীবনের একটা সন্ধিস্থলে আনিয়া ফেলিয়াছে। কংগ্রেস-পরিচালিত নূতন গবর্ণমেণ্ট যদি জনমতের অনুবর্তন করিতে আন্তরিকতার সঙ্গে এখনও জাগ্রত হইতে না পারেন, তবে ভবিষ্যৎ তাঁহাদের পক্ষে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে।

রাজবন্দীদের মুক্তি

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় কম্যুনিষ্ট-প্রার্থী হিসাবে যাঁহারা নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজবন্দীস্বরূপে আটক ছিলেন। নির্বাচন-সম্পর্কে তাঁহাদিগকে সাময়িকভাবে মুক্তিদান করা হয়। নির্বাচিত হইবার পর ইঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত কি না সম্প্রতি এই প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। ভারতীয় পার্লামেণ্টে এতৎসম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু এই কথা জানাইয়াছেন যে, যে সব রাজবন্দীর হিংসাত্মক কার্যের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রমাণ নাই, ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহকে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। প্রশ্নোত্তর হইতে জানা যায় আইনসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত রাজবন্দীদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন বিবেচনার কথা উঠে নাই। সে প্রশ্ন অবশ্য অনেকটা অবান্তরও বটে। নির্বাচনের ফলেই জনসাধারণের কাছে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে ইঁহাদের প্রশ্নটি আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং জনমতের দিক হইতে বিষয়টি উপেক্ষা করিবার মত নয়। প্রকৃতপক্ষে দেশের জনমত বিনা-বিচারে আটক রাখিবার নীতির আগাগোড়াই বিরোধী। বৃটিশ প্রভুত্বের আমল হইতে এমন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং অধুনা জনমতের জোরে যাঁহারা জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে যদি জনমত-বিরোধী এমন বিশেষ ব্যবস্থার বলে আটক রাখা হয়, তবে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিবে, এমন কারণ রহিয়াছে। বস্তুত শুধু সরকারী এমন নীতির প্রতিবাদস্বরূপে এবং সেজন্য জনসাধারণের বিশেষ সমর্থন লাভ করিয়াই রাজবন্দীস্বরূপে আটক কম্যুনিস্ট সদস্য-প্রার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন-দ্বন্দ্বে কংগ্রেসকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় সাধারণ নীতির ভিত্তিতে যাহারা রাজবন্দী-স্বরূপে আটক আছেন, কিংবা পুনরায় আটক হইবার মত অবস্থার মধ্যে রহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে মুক্তিদান করাই আমরা সমীচীন মনে করি। রাষ্ট্রের শান্তি এবং নিরাপত্তা নষ্ট হয়, ইহা নিশ্চয়ই কেহ চাহেন না, তেমন আশঙ্কার সত্যই যেখানে কারণ ঘটে, সেখানে সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতাও শাসকদের হাতে থাকা আবশ্যক, আমরা ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু বিগত সাধারণ নির্বাচনের মত একটা ব্যাপারের পর জন-প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য-বোধ যাহাতে সুপরিক্ষীত হয়, সেজন্য সুযোগ দান করা কর্তব্য। নূতন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নিজেদের নীতি জনমতানুকূল পথে প্রবর্তিত করিবার পথই এতদ্দ্বারা প্রশস্ত হইবে।

পল্লী-উন্নয়নের সাধনা

বিশ্বভারতীয় পল্লী-গঠন কেন্দ্র শ্রীনিকেতনের ত্রিংশ বাৎসরিক উৎসব সম্প্রতি সম্পন্ন হইয়াছে। ডক্টর এলমহার্স্ট তিন দিবসব্যাপী ঐ উৎসবের উদ্বোধন করেন। এই বিভাগ যাঁহারা সংগঠন করিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম এবং তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচালক পদে বৃত হইয়াছিলেন। ডক্টর এলমহার্স্ট তাঁহার অভিভাষণে পল্লী-সংগঠন কার্যে আধুনিক যন্ত্র-বিজ্ঞানেরও সাহায্য গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই যুক্তি সমর্থন করি; কিন্তু এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রাক্তন ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতি-স্বরূপে শ্রীযুত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের উক্তির গুরুত্বও অস্বীকার করা চলে না। তিনি পল্লী-সংগঠনে প্রাচীনপন্থী হইবার পক্ষপাতী নহেন, কিন্তু তাঁহার কথা এই যে, যন্ত্র যেখানে ক্ষতিকর, সেখানে স্থান-কালপাত্রভেদের বিচার না করিয়া তাহার প্রয়োগে একদেশদর্শিতা অবলম্বন করা উচিত নয়। বস্তুতঃ যন্ত্রের দোষ নাই, তন্ত্র বা তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতির উপরই সব নির্ভর করে। সমগ্রভাবে সমাজ-জীবনের

সুসংস্থান এবং সমুন্নতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যন্ত্রের প্রয়োগ করিতে গেলেই বিপর্যয়ের আশঙ্কা ঘটিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পল্লীর জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মর্যাদাবুদ্ধিই এই ক্ষেত্রে সংগঠন কার্যকে সার্থক করিয়া তুলিতে সমর্থ। রবীন্দ্রনাথের পল্লী-সংগঠন প্রচেষ্টার মূলে এই দৃষ্টিটাই প্রজ্ঞানময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সমবায় সংগঠনকার্য সম্মেলনের সভাপতি-স্বরূপে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই বিষয়ের উপরই জোর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কবি গ্রামকে দয়া ক'রে, অনুগ্রহ ক'রে বাঁচাতে যাননি। গ্রাম থেকেই তিনি একদা বাঙলার তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির দেবতাকে আবিষ্কার করেছিলেন, সেই দেবতাকে তিনি নবীনরূপে প্রকাশিত এবং অভিষেক ক'রে এনে তাঁহার সেই চিরন্তন পাদপীঠে সমগ্র বাঙলার গ্রাম-জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সেই তাঁহার শুভ্র পদ্মাসন।" তারাশঙ্কর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি কবির যে শ্রদ্ধাবুদ্ধির কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্রদ্ধাবুদ্ধি আমরা হারাইতে বসিয়াছি; সমস্যা তো এইখানেই। আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, এ কথা সত্য, কিন্তু যখন আমরা পরাধীন ছিলাম, তখন জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবুদ্ধি যতখানি ছিল, এবং সেই সংস্কৃতির যাঁহারা ধারক, বাহক এবং সাধক, তাঁহাদের জীবনাদর্শের প্রতি যে পরিমাণ মর্যাদা আমরা দেখাইতাম আজ আমাদের পক্ষে তাহা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ফলে দেশের গ্রামবাসীদের মনের সঙ্গে এদেশের রাষ্ট্র-সাধনার আদর্শে আন্তরিক একটা সংযোগ-সূত্র স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেছে না। নেতৃত্বাভিমান তুষ্ট, পুষ্ট করিবার জন্য গ্রামোন্নতির কথা অনেকের মুখে যত্রতত্র শোনা যায়; কিন্তু গ্রামবাসীদের জন্য ব্যথার অনুভূতি কোথায়? পল্লী-উন্নয়নের প্রচেষ্টা যদি সত্যই সার্থক করিতে হয়, তাহা হইলে এদেশের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সংগঠনের দিকটার উপর জোর দিতে হইবে। নেতৃত্বাভিমানের মূলে নাগরিক আভিজাত্যবোধের যে একটা পরিস্ফীতি রহিয়াছে, তাহাকে তুচ্ছ করিয়া পল্লী-সংগঠন এবং পল্লীর সেবাব্রতে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই সর্বাধিক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বস্তুতঃ নরনারায়ণের যেখানে অধিষ্ঠান, সেই পল্লীকে উপেক্ষা করিলে দেশ ও জাতির উন্নতির সব চেষ্টাই নিরর্থক।

সরকারী বিভাগে দুর্নীতি

সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি দমনের জন্য পাঁচ বৎসরের মেয়াদে একটি বিধান অবলম্বিত হইয়াছিল, আগামী ১৯৫২ সালের ১১ই মার্চ তাহার মেয়াদ শেষ হইবে। সম্প্রতি এই বিধানের মেয়াদ আরও ৫ বৎসর কালের জন্য বর্ধিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিব ডক্টর কাটজু একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করিয়াছেন। প্রস্তাবটি অবশ্যই পার্লামেণ্টে গৃহীত হইবে, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, যে ৫ বৎসর এই বিধান প্রবর্তিত ছিল, তাহার মধ্যে অপরাধের গুরুত্ব কিছু হ্রাস পাইয়াছে কি? ডক্টর কাটজু তাঁহার বিবৃতিতে সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই, শুধু অপরাধীদের জরিমানার পরিমাণ কিছু হ্রাস পাইয়াছে, তাঁহার বিবৃতিতে ইহাই দেখা যায়। কিন্তু এতদ্দ্বারা অপরাধ অনুষ্ঠানের পরিমাণ যে কমিয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। এ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, সরাকারী বিভাগে দুর্নীতির পরিমাণ কার্যত কিছুই হ্রাস পায় নাই; পক্ষান্তরে অপরাধ অনুষ্ঠানে চাতুর্যই বাড়িয়া গিয়াছে। প্রকৃত সমস্যা হইতেছে এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই যে সরিষায় ভূত ছাড়াইতে হইবে, সেই সরিষাতেই ভূত ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সরকারী কর্মচারীরা সকলেই দুর্নীতিপরায়ণ এমন নহেন, তাঁহাদের মধ্যে সাধুও যেমন আছেন, অসাধুও তেমনই রহিয়াছে। কিন্তু কর্মচারীদের অসাধু বৃত্তি কিংবা তাঁহাদের দুর্নীতি নিবৃত্ত করিতে হইলে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। অপরাধীদের সাজা দিবার মত বিবেকবুদ্ধি এবং নিরপেক্ষ কর্তব্যপরায়ণতা বিভিন্ন বিভাগের যাঁহারা কর্তাব্যক্তি তাঁহাদের থাকা দরকার। এই কয়েক বৎসরের কংগ্রেসী শাসনে এই প্রয়োজন কতটা মিটিয়াছে, জনসাধারণের মনে সে সম্বন্ধে যথেষ্টই সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। বস্তুত কংগ্রেস আজ যে জনপ্রিয়তা হইতে পূর্বাপেক্ষা বঞ্চিত হইয়াছে, ইহাই তাহার অন্যতম কারণ। মন্ত্রীরা পর্যন্ত জনসাধারণের দৃষ্টিতে সন্দেহের অতীত নহেন। আমরা জানি, কংগ্রেস-পক্ষের কর্তাব্যক্তিরা এই অভিযোগ অস্বীকার করিবেন; কিন্তু তাঁহাদের শুধু সেই অস্বীকৃতিই যাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভুক্তভোগী, সেই জনসাধারণের মনের সন্দেহ দূর হইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বলা বাহুল্য, কর্মচারীদের সততার উপরই গভর্নমেণ্টের মর্যাদা এবং গণতান্ত্রিক শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এজন্য প্রত্যেক দায়িত্বসম্পন্ন গভর্নমেণ্টই এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোন কোন দেশে সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি দমনের জন্য অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপে চীনের নূতন গভর্নমেণ্টের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানে এই শ্রেণীর অপরাধে অপরাধী কর্মচারীদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইতেছে। চীনের দৃষ্টান্তই যে এদেশে অনুসরণ করিতে হইবে, আমরা অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু দুর্নীতিমূলক অপরাধে এদেশে এ পর্যন্ত কয়জন কর্মচারীর কারাদণ্ড হইয়াছে, আমরা এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে চাই। প্রকৃতপক্ষে এ সম্বন্ধে আইনের বিধান যতই কড়া হোক্ না কেন, আইনকে ফাঁকি দিবার ফাঁক বাহির করিতে, উচ্চপদে যাঁহারা অধিষ্ঠিত তাঁহাদের পক্ষে সব সময়ই সুযোগ জুটিবে। ফলত যাঁহারা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এবং উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র তাঁহাদের চরিত্রবল, সততা ও কর্তব্যনিষ্ঠাই এমন পাপ-ব্যবসা হইতে জাতিকে রক্ষা করিতে পারে এবং সেই পথেই গভর্নমেণ্টের মর্যাদার প্রতিষ্ঠা হওয়াও সম্ভব।

হেত্বাভাস

হীরালাল দাশগুপ্ত

সমুদ্রে সমুদ্রে আর সৈকতে সৈকতে
শাদা, কালো, অশান্ত, প্রশান্ত, নীল,
উত্তরে
দক্ষিণে
সূর্যের আলোয় আর নক্ষত্রের তীক্ষ্ম অন্ধকারে,
মৎস-শিকার আর পণ্য-বিনিময় শেষ কোরে
অবশেষে নাবিকেরা তীরে এসে জ্বালিলো কি
জীবনের বিষণ্ণ আগুন?

দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে আর তারা যাবে নাকি
স্বপ্নমৃগ শিকার সন্ধানে?
চক্রপথে পথ-পরিক্রমা—
মৃত্যু-ঘন-কৃষ্ণ-নীল অরণ্য অন্তর
বৈধব্যের মতো শুভ্র নিঃস্ব মরুভূমি
সজল-কাজল-কালো শ্যামল প্রান্তর;—
জীবনের যাত্রা শেষ জীবনের মৃত মধ্য পথে
ঘূর্ণমান চক্রপথে শুধু চংক্রমণ—
আরম্ভেই শেষ আর শেষই আরম্ভ তার জানি!
তবু বারংবার
বিস্মৃতি সুড়ঙ্গ পথে স্মৃতির আলোয়
ধীরে ধীরে নেমে আসে শকুন্তলা রায়
(পাশে বসি' মোটর হাঁকায় তার নিরঞ্জন সেন—
কী যেনো সে-গাড়ীটার নাম?
দাম যার হাজার তিরিশ?)
কোন কালে নরকের আকাশে আকাশে এক
অকাল-আগুন লেগেছিলো.
পৃথিবীর মানুষের ঘরে ঘরে আজ
সে-আগুন লেলিহান জ্বলে—
পুড়ে যায় জীবন-বেদের পূর্ণ প্রেম-পাণ্ডুলিপি,
ছেঁড়া-ছেঁড়া-পোড়া-পোড়া পাতাগুলো তার
এখানে-সেখানে পড়ে আছে,
হলুদ মলাটে তার এখনো আগুন নেভে নাই—
এখন নতুন কোরে লেখা আগাগোড়া
—শিকড়-কাণ্ড-ডাল-পালা—
কোথা সেই উপাদান—ভৌমধাতু—উপধাতু—
গৈরিক মধ্যাহ্ন আর রহস্য-গোধূলি?
ভৌগোলিক ব্যাভিচারে বিলুণ্ঠিত ইতিহাস
করে আর্তনাদ!
কোথা সে-সিসৃক্ষা-স্বপ্ন-শিতি-সম্ভাবনা?

শুধু জন্ম
শুধু মৃত্যু
সঙ্গম
সংগ্রাম!
সর্বাঙ্গে বিষাক্ত ব্যাধি প্রসাধনে ঢাকা
সহর-সুন্দরী
বিকশিয়া লৌহদন্তরাজি
মুহুর্মুহু ত্বরান্বিত
স্থানান্তরে
বিচূর্ণ করিতে মরা মানুষের হাড়!
তবুও হৃদয়!
হৃদয় কি মেনে চলে মানুষের সমবায় সমিতি নিয়ম!
ছায়াপথ শত ছিদ্র পথে
তারার আলোর জল চুয়ে চুয়ে পড়ে
নরম মাটির বুকে
ঘাসের ডগায়—
তাইতো হৃদয়!

দেশভ্রমণ

প্রায়ই প্রশ্ন শুনতে হয়, 'সব চেয়ে কোন্ দেশ ভাল?'

পাঁড় 'মাই কানট্রী রাইট্ অর রঙ্, মাই মাদার ড্রাঙ্ক্ অর সোবার্' জাতীয় লোক হলে তো কথা নেই, চট করে বলবে, তার দেশই সব চেয়ে ভালো কিন্তু আপনি যদি সে গোত্রের প্রাণী না হন তবে কি উত্তর দেবেন? কেউ যদি প্রশ্ন শুধায়, 'সব চেয়ে খেতে ভালো কি?' তা হলে যে রকম মুশকিলে পড়তে হয়।

তখন উল্টে শুধাতে হয়, 'ভালো দেশ' বলতে তুমি কি বোঝো? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আবহাওয়া, আহারাদি, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, সৌন্দর্যের পুজো, ধনদৌলত, আতিথেয়তা, তুমি চাও কোনটা?' 'সব কটা মিলিয়ে হয় না?' 'আজ্ঞে না।'

তবু যদি কেউ পিস্তল উঁচিয়ে বলে, 'এখুনি তোমায় এদেশ ছাড়তে হবে; কোথায় যাবে বলো!' (যাঁদের ভ্রমণে সখ তাঁরা অবশ্য উল্লসিত হয়ে বলবেন, 'পিস্তল ওঁচাতে হবে না, একবার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেই হল') তা হলে বোধ হয় সুইটজারল্যাণ্ডের নামই করব।

ধরে নিচ্ছি খর্চাটা আপনিই দিচ্ছেন—কারণ খর্চা যদি না দেন তবে তো সক্কলের পয়লাই ভাবতে হবে কোন্ দেশে গেলে দু' মুঠো অন্ন জুটবে। তা হলে 'সাউথ সী-আয়লেণ্ড' বা আফ্রিকার এমন কোনো দেশের কথা ভাবতে হবে যেখানে এন্তার কলা নারকোল রয়েছে, জীবন সংগ্রাম কঠোর নয়—বেঘোরে প্রাণটা যাবার সম্ভাবনা কম। সেদিক দিয়ে অবশ্যি মালদ্বীপ সব চেয়ে ভালো। ওদেশে কেউ কখনো সখ করে যায় নি তাই 'অতিথি' শব্দটা মালদ্বীপের ভাষায় ঝাঁ চকচকে নূতন হয়ে পড়ে আছে, কখনো ব্যবহার হয় নি। মালদ্বীপের প্রত্যেকটি দ্বীপ এত ছোট যে কেউ যে কোনো মুহূর্তে আপন বাড়ী ফিরে যেতে পারে—অতিথি হতে যাবে কে কার বাড়ী?—এখানে অবশ্য পালা নেমন্তন্নের কথা উঠছে না। তাই কেউ যদি কখনো পাকে-চক্রে মালদ্বীপ পৌঁছয় তবে তাকে এর বাড়ীতে ওর বাড়ীতে এ দ্বীপে ও দ্বীপে দু' দিন চারদিন থাকতে গিয়ে হেসেখেলে বছর তিনেক কেটে যায়। আমার জীবনে আমি মাত্র একটি মালদ্বীপ-বাসীর সঙ্গে কাইরোতে পরিচিত হই। প্রতিবার দেখা হলেই ভদ্রলোক মালদ্বীপ যাবার আমন্ত্রণের কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতেন।

তাই বলছিলুম, খর্চা যখন আপনিই দিচ্ছেন তবে সুইটজারল্যাণ্ডই সই। সুইটজারল্যাণ্ডের মত আক্রা দেশ ইয়োরোপে আর নেই—সেখানকার খর্চা যদি আপনি বরদাস্ত করতে পারেন তবে আর সব দেশ তো ফাউ। টুক করে প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা ঘুরে আসতে পারবেন। খর্চা সুইট-জারল্যাণ্ডে থাকলে যা বার্লিন ঘুরে এলেও তা।

স্বপ্নেই যখন খাচ্ছেন, তখন ভাত কেন, পোলাওই খান (সিঙ্গী প্রবাদে বলে, "স্বপ্নের পোলাওই যখন রাঁধছো তখন ঘি ঢালতে কঞ্জুসি করচো কেন?") স্বপ্নেই যখন ভ্রমণ করছেন তখন থার্ড ক্লাস কেন, গোটা জাহাজ চার্টার করে ডা লুক্স কেবিনে কিম্বা প্রেশারাইজড্ প্লেনে করে জিনিভা চলে যান।

লেক অব জিনিভার পারে একটি ছোট, অতি ছোট কুটির (শালে) ভাড়া নেবেন আর একটি রাঁধুনি জোগাড় করে নেবেন।

শুনেই নাভিশ্বাস উঠলো তো? বিদেশ বিভূঁই জায়গা, তার চুরি-চামারী ঠেকাবে কে? হিসেবে আলুর সের আড়াই টাকা দেখিয়ে বলবে না তো, 'কত্তা, দাওয়ে মেরেছি, না হলে আসলে দাম তিন টাকা'?

এই হল সুইটজারল্যাণ্ডের প্রথম সুখ। ছুঁচোমো, ছাঁচড়ামো ও দেশ থেকে প্রায় উঠে গিয়েছে। সুইটজারল্যাণ্ডের হোটেলেও তাই। আক্রা বটে—বসবাস খাই-খরচের জন্য হয়ত দৈনিক কুড়ি টাকা নিল কিন্তু তার পরও আপনাকে মাখনটাতে ফাঁকি, মুর্গীটাতে জুচ্চোরি এসব করে না। আপনার খাওয়া দেখে যদি তার সন্দেহ হয় আপনি পেটভরে খান নি তবে এসে বলবে, 'আপনি বিদেশী, এ রান্না আপনার হয়ত পছন্দ হয় নি। আপনি কি খেতে চান বাৎলে দিন, আমরা সে রকম রেঁধে দেব।'

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; আপনার রাঁধুনি আপনাকে ফাঁকি দেবে না।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই বিছানার পাশের বেতামটি টিপবেন। পাঁচ মিনিটের ভিতর গরম কফি, মুরমুরে রুটি আর শিশির-ভেজা মাখমের গুলি। রাঁধুনি বলবে, 'স্যর, চমৎকার ওয়েদার। আপনি বেরুচ্ছেন তো? আমি বাজার চললুম।'

লেকের পারে এসে একখানা বেঞ্চিতে বসবেন। খবরের কাগজটি পাশে রেখে তার উপর হ্যাট চাপা দেবেন।

আহা কী গভীর নীল জল জিনিভা লেকের। লেকের ওপারে যে আল্প্স্ সেও যেন নীল, আর তার মাথায় মাথায় সাদা সাদা বরফের টুপি। তার উপর চুড়োর কাটা কাটা সাদা ঝালরে সাজানো আকাশের ঘন নীল চন্দ্রাতপ। আর আকাশ-বাতাস, হ্রদের জল, পাহাড়ের গা, বরফের টুপি সব কিছু ভরে দিয়েছে কাঁচা হলুদের সোনালি রোদ। সকাল বেলার বাতাস একটু ঠাণ্ডা; কিন্তু প্রতি-ক্ষণে আপনার গালে কানে আদর করে করে সে বাতাস কুসুম-কুসুম গরম হতে থাকবে। ওভার কোটের বোতামগুলো খুলে দিয়ে, পাইপটা ঠাসতে আরম্ভ করবেন। হয়তো গুন্গুন্ করতে আরম্ভ করবেন, 'আমি চিনি, চিনি, চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী'।

নীল জলের উপর দিয়ে সাদা জাহাজের এ-পাড় ও-পাড় খেয়া। জলের উপর আল্প্সের কালো ছায়া পড়েছে, ফাঁকে ফাঁকে নীল জল, তার উপর সাদা জাহাজ। সেই আল্পনার উপর জাহাজের চাকার তাড়ায় ভেঙে পড়ছে লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের চুমকি। যেন কোনো খেয়ালি বাদশা টাকশাল থেকে এই-মাত্র বেরনো টাকা নিয়ে খোলামকুচির খেলা লাগিয়েছেন।

পাল তুলে দিয়ে চলেছে, জেলের নৌকো। অতি ধীরে অতি মন্থরে। জাল টেনে তোলার সময় রোদ এসে পড়ছে ভেজা জালে। কালো জাল যাদুর ছোঁয়া লেগে রুপোর জাল হয়ে গেল।

এই রকম রুপোর জাল দিয়ে আপনার প্রিয়া তার খোঁপা সাজাতো না?

তৎক্ষণাৎ বুকটা চড়চড় করে ইস্-পার উস্-পার ফেটে যাবে। কোন্ মূর্খ বলে দেশ-ভ্রমণে অবিমিশ্র আনন্দ?

স্বামী সুবোধানন্দ

শ্রীআশুতোষ মিত্র

স্বামী সুবোধানন্দ বা সুবোধ মহারাজ শ্রীঠাকুরের দ্বাদশটি অন্তরঙ্গ ভক্ত মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। ইঁহার গুরুভ্রাতারা সকলেই ইঁহাকে ইঁহার বাটির ডাকনামে 'খোকা' বলিয়া ডাকিতেন। ইনি ঠনঠনের শঙ্কর ঘোষেদের বংশধর ছিলেন। আমাদের কয়েক-বার ইঁহার বাটীতে যাইয়া খাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ইঁহাকে আদর করিয়া 'খোকা' বলিয়া ডাকিতেন। ইনি আমাদের সঙ্গে স্বামীজির সেবায় সময় সময় আপনা হইতে নিযুক্ত থাকিতেন।

ইনি প্রায়ই তামাক খাইতেন এবং আমাদের মধ্য হইতে কাহাকেও না কাহাকেও দিয়া সাজাইয়া লইতেন আর খাইতেও শিখাইয়াছিলেন। একবার স্বামী বিবেকা-নন্দের সঙ্গে ঢাকা যাইতেছি। তাঁহার সঙ্গে আমরা কয়েকজন আছি। যখন স্টীমার গোয়ালন্দ হইতে নারায়ণগঞ্জ অভিমুখে যাইতেছে, তখন স্বামীজি পাইখানায় প্রবেশ করিলে তাঁহাকে তথায় বসাইয়া লেখক অপর সঙ্গীদের নিকট আসিয়া তামাক খাওয়া হইতেছে দেখিয়া একজনের নিকট হইতে হুঁকাটি লইয়া খাইতেছে—স্বামীজি ওদিকে পাইখানা না হওয়ায় সেখানে একবার আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিতে পাইয়া সে তাড়াতাড়ি হুঁকাটি সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ স্বামী নিত্যানন্দের (ইনি বৃদ্ধ এবং স্বামীজির শিষ্য হইলেও তাঁহার সম্মুখে তামাক খাইয়া থাকেন) হাতে দিতে অগ্রসর হইলে তিনি উহা লইতে বিলম্ব করিলে স্বামীজি দেখিতে পাইয়া এবং ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া লেখককে জিজ্ঞাসা করেন, 'হ্যাঁরে খোকা! তুই এই কম বয়সে তামাক খেতে শিখেছিস, কে শিখিয়েছে রে—বোধহয় খোকা (সুবোধ মহারাজ)—না?' সে চুপ করিয়া রহিল কিন্তু নিত্যানন্দ উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, কে আর শেখাবে? তিনিই সাজিয়েছেন আর খেতে শিখিয়েছেন।' স্বামীজী পরে তাঁহার শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দকে (উনি পরে মঠের প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন) জিজ্ঞাসা করেন, 'হ্যাঁরে সুধীর! তুইও তামাক খাস? তোর Organic defect (ইনি চক্ষে কম দেখেন—ট্যারাও ছিলেন) সত্ত্বেও তামাক খাস?' শুদ্ধানন্দও চুপ করিয়া রহিলে ইহার পর তিনি বলিতে থাকেন, 'তাম[illegible] কোন উপকার হয় না। তবে বলতে পা[illegible] —আমি খাই কেন? আমি কোন উপ[illegible] দেখি না; তবে হ্যাঁ, একটা বিষয় ভাব[illegible] সে সময় যদি কেউ তামাক খেতে দিয়ে [illegible] তখন খেতে খেতে সে বিষয়ে একটা তন্ম[illegible] এসে যায়—এইটুকুই যা বুঝি না[illegible] কিছুই না।'

সুবোধ মহারাজ খুব ত্যাগী ছি[illegible] প্রায়ই তাঁহার ভিতর বৈরাগ্য দেখা দিত [illegible] তিনি হঠাৎ মঠ ছাড়িয়া একাকী পর্য[illegible] যাইতেন। তিনি কাশী, কেদার-বদরিকা [illegible] তীর্থ পর্যটন করিয়াছেন আবার পর্যটনা[illegible] হঠাৎ মঠে ফিরিয়া আসিতেন। তিনি পু[illegible] ভদ্রক, কোঠার প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছিলে[illegible] ওদিকে নর্মদাতীরে কিছুদিন ছিলেন ব[illegible] আমরা শুনিয়াছি। সুবোধ মহারাজ আ[illegible] দিগকে খুব ভালবাসিতেন এবং আ[illegible] দিগের হইতে নিজের পার্থক্য রাখি[illegible] না। শ্রীঠাকুরের কথা প্রায়ই শুনাই[illegible] এবং মঠে কিছুদিন শ্রীঠাকুরের পূজা[illegible] আরাত্রিক করিয়াছেন। তাঁহার পূজ[illegible] শীঘ্রই সমাধা হইত। এ বিষয়ে [illegible] বলিতেন, 'ঠাকুরঘরে বেশীক্ষণ থাকিতে [illegible] —মনে নানারকম ভাব আসিতে পারে।'

সাময়িকী

শ্রী আরতি দাস

রংয়ে ও রেখায়
সে-ছবি কিছুতে ভুলতে পারিনি
মনে পড়ে সেই সব-ই,
তোমার মুগ্ধ চোখের চাহনি,
তাই ত' হয়েছে ছবি।
সময়কে তবু নিষ্ঠুর বলে জেনেছে ত কেউ,
বলেছে, 'নিছক্ সময়ের ঢেউ
নির্মম হাতে মুছে নেবে সব,
মনে করানোর,
মনে পড়ানোর,
কোথায় তখন এত বৈভব?'

আমি ত ভুলেও কোনো কথা
আজো শোনাইনি সই
সময়কে, এত সময়ই বা কই?
আমার সময়, হ'ক না সে যত
কিছুতেই সে ত সকল সময় নয়!

পৌষের রাত নিশুতি নিঝুম্,
দূরে থেকে থেকে
কাদের কুকুর ওঠে যেন ডেকে,
সারা রাত ভ'রে
কুয়াসার ঘোরে
জাল বোনে চাঁদ,
পথ ঘাট দূর প্রান্তর সব ছবি,
তোমার মুগ্ধ চোখের চাহনি
হ'ক্ না সে চাওয়া দূরান্তরের,
আজকের রাতে সেই ত অনেক,
(সখি) সেই ত আমার সব-ই।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

গাড়ি ছাড়ল। বিক্রম আছে, ঘোড়ার সংগে সংগেই স্পীড। অবশ্য স্পীডের একটা ফুটনোট আছে—গাড়ি যে সাঁ-সাঁ ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে তা নয়, শুধু ইঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জন আর গাড়ির উৎকট ঝাঁকানি; আড়ম্বর দেখলে মনে হয় এখন পঁচিশ-ত্রিশ মাইলের জন্যে হাত-পা গুটিয়ে বসা চলে।

একটা মোড়, তারপর গোটা দুই তিন ছোটখাট বাঁক, তারপরেই ঘোলসাহাপুর এসে পড়ল, আধ মাইলের কয়েক গজ বেশী। ইঞ্জিন হাঁপাচ্ছে, গাড়ির কাঁচক্যাচানি থামতে চায় না।

দেখছি এইটেই এ লাইনের জামালপুর: একাধারে হাওড়া-জামালপুর বললেই ঠিক হয়। গোটা তিনেক বাড়তি ইঞ্জিন, একটা উঁচু জলের ট্যাংক, একটা ওয়ার্কশপ; একটা ইঞ্জিনের চিকিৎসাও চলছে দেখলাম—অস্ত্রোপচার;—টেণ্ডার আলাদা, বয়লার আলাদা, চাকা আলাদা। জনচারেক লোক হাতুড়ি-সাঁড়াশি নিয়ে খুব ঠোকাঠুকি করছে, নীল নেকার-ব্রোকার পরা ওরই মধ্যে ভারিক্কে গোছের একজন দেখলাম আমাদের গাড়ি পৌঁছুবার সংগে সংগে একটা খোলা চাকার ওপর একটা পা তুলে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুকতে আরম্ভ করলে। মাঝে মাঝে ওদের কি নির্দেশ দিচ্ছে, মাঝে মাঝে আমাদের গাড়িটার দিকে চাইছে। সাধারণের মধ্যে নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলবার আর্টটা দেখছি চমৎকার আয়ত্ত করা আছে লোকটার, মনে হতেই হবে, নেহাৎ লোকো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট না হোক, ফোরম্যান তা না হয়ে যায় না। অথচ বোধ হয় আমাদের স্কুলের জোখন মড়রও হ'তে পারে।

জোখন ছিল আমাদের স্কুলের পিয়ন। কিন্তু এমন ঠাটবাট ক'রে থাকত সে ছেলেদের কাছে একটা রোয়াব তো ছিলই, বাইরের লোকেরাও অনেক সময় মাস্টার ব'লে ভুল করে বসত। চেহারাটা নিন্দের ছিল না; স্কুলের আবহাওয়ায় থেকে গোটাকতক ইংরিজীর বুকনিও আয়ত্ত ছিল, তার ওপর হেড মাস্টারের পুরনো কোট, থার্ড মাস্টারের কামিজ, ড্রিলটিচারের হাফপ্যাণ্ট, কারুর বা জুতো—এই রকম গোছের দু'তিন সেট সংগ্রহ করা ছিল, স্কুলের পালপার্বনে কোনটা —বা তেমন তেমন বুঝলে পুরো একটা সেটই পরে আসত। একবার ইনস্পেক্টারকে শেকহ্যাণ্ড করে নামিয়ে নিয়ে এল।... আসতে দেরি হচ্ছে দেখে হেড মাস্টার ক্লাশগুলো ঠিক গোছগাছ আছে কিনা একবার দেখে আসতে গিয়েছিলেন, জোখন মড়র ফটকের কাছে অপেক্ষা করছিল। ঠিক এই অবসরে ইনস্পেক্টারের মোটর এসে হাজির। হাতটা অবশ্য জোখন আগে বাড়ায়নি, তবে ইনস্পেক্টার বাড়ালে বেশ সহজভাবেই, বোধ হয় একটা ইংরিজী বুকনি দিয়েই তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়েছিল।... রহস্য ভেদ হলে ইনস্পেক্টার জোখনকে ডিসমিস করবার হুকুম দেন; হাতে ধ'রে নিয়ে এসেছিল, পায়ে ধ'রে সে যাত্রা রক্ষা পায়।

ঘোলসাহাপুর বেহালার স্টেশন। দুদিকে ঘর, মাঝখানটায় খোলা একটা বারান্দা, টী-স্টল আছে, আরও দু'তিনটা দোকান আছে, পাসেঞ্জারের আমদানীও মন্দ নয়, কয়েকখানা গাড়ি-রিক্সাও থাকে বাইরে। এক কথায় বেহালা সে পরিমাণে কলকাতা, ফলতা লাইন সে পরিমাণে ই আই আর, ঘোল-সাহাপুরও সেই পরিমাণে হাওড়া; বেহালা এখানে দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়ে নিচ্ছে।

সানুষ্ঠানে গাড়ি ছাড়ল; ঘণ্টি, হুইসিল, গার্ডের বাঁশি, গলা বাড়িয়ে ড্রাইভার-গার্ডে মুখ দেখাদেখি। স্টেশন না ছাড়তে ছাড়তে সেই স্পীড, অংগক্ষেপ, ফলতা মেল তাঁর পঁচিশ মাইল রানের যাত্রা শুরু করলেন।.. ভুল বুঝো না, ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল নয়, মাঝেরহাট থেকে ফলতা—এই সমস্ত পঁচিশ মাইলের দৌড়টুকু কিঞ্চিদধিক দু'ঘণ্টায়।

হাত তিনচার পরেই দু'ধারে তারের বেড়া, তারপরেই ঘন বসতি—গ্রাম বা শহর যা-ই বলে বেহালা এখানে নিজের পরিচয় দেয়।

একটি ডোবা, ওদিকে দুটি বাড়ির দুটি ঘাট খিড়কি থেকে এসেছে নেমে, আম-জাম-নারকেলের ঘন ছায়া বেয়ে। একটি ঘাটে জন পাঁচেক মেয়ে—সব বয়সের, বাসন মাজার দোলার মধ্যে থেমে গিয়ে গল্প হচ্ছে। গাড়ি এসে পড়তে একজন হাতের উল্ট পিঠ দিয়ে মাথার কাপড়টা টেনে দিলে, একজন একটি

ারী বধূকে বললে টেনে দিতে। বধূটি
র ঘোমটা কিন্তু টানলে না, হয়তো বধূ
ঝিউড়ি মেয়ে, গাড়ির কু-দৃষ্টিকে আমল
না। অন্য ঘাটের মাথায় একটি ছোট
, কোমরে ডুরে শাড়ি, আসন পিঁড়ি হয়ে
দুলিয়ে দুলিয়ে একটা বেড়াল ছানাকে
র করছে। মা (বোধ হয় মা-ই হবে)
নের গোছা নিয়ে উঠতে নিজেও বেড়াল
ঃ করে উঠল।...বাড়ির গায়ে বাড়ি—
, বড়, মাঝারি; গাড়ির বেগে একটি আর
টিকে আড়াল করে ঘুরে আছে। সংগে
গ জীবনের ঐ ছোট ছোট ছবিগুলোও।
হ গাছে ছয়লাপ, মাঝেরহাট স্টেশনের
রোদ সবুজের স্পর্শে যেন জাত হারিয়ে
লেছে—তাপসের তেজ যেন বনবালিকার
ত গেছে নষ্ট হয়ে। সময় নিয়ে একটু
ন্দহ হ'তে হাত উল্টে দেখি, তিনটে দশ।
পাশের লোকটি বড়ই উৎপেতে দেখছি:
পরাধের মধ্যে লড়াইয়ের পরিণাম সম্বন্ধে
একটা আলগা মন্তব্য করছিলাম, সেই
কে ও আমায় একজন প্রচ্ছন্ন চার্চিল বা
টালিন ঠাউরে প্রশ্নে প্রশ্নে অতিষ্ঠ করে
লেছে।..."তাহলে আপনার মতে শেষ
র্যন্ত মিত্রশক্তিকেই নাকে খৎ দিতে হবে?"
বানিয়ে বলছি না, 'নাকে খৎ'টা ওরই
ষা, আমি নাকে খৎ দিলে যদি থামে তো না
য় তাই দিই। সবুজের স্রোতে ছবির পর
বি যাচ্ছে ভেসে, দৃষ্টি অপলক রেখেও
খতে দেখতে মিলিয়ে যায়, এর ওপর
ানের কাছে এই উপদ্রব। বললাম—"তাই
তা মনে হয়।"

—বেশ সে সন্তুষ্ট হয়ে বলছিল, গা-ঝাড়া
দবারই ইচ্ছে, এটা নুকুবার কোন চেষ্টাই
রলাম না।

"কেন, এই তো রাশিয়া প্রায় বাপের নাম
ুলিয়ে দিলে, মিত্র শক্তিই তো?"

বেশ ইডিয়াম দিয়ে কথা বলতে পারে,
চাইতে আরও যেন গায়ে বিষ ছড়িয়ে দেয়।

বললাম—"একটু ভেবে দেখলে নিজেই
ুঝতে পারবেন।"

না ভেবেই বললে—"কৈ, ভেবে তো কুল
পাচ্ছি না মশাই।"

"রাশিয়া নিজের শক্তির কথা টের পেলে
আর এদের সংগে থাকবে মিত্রতা? ভেবে
দেখুন না।"

চুপ করলে।

ব'ড়শে-বেহালার খিড়কি দিয়ে চলেছে
গাড়ি।

পাকা আমটির মতো এক বুড়ো, ঘরের দরজা খুলে সামনের রকটিতে মাদুর পাতলে একটা, ওপরে জামরুল গাছ, থোবা থোবা মুক্ত ফলে রয়েছে। বৃদ্ধের সংগে ফ্রক পরা ফুটফুটে মেয়ে একটি, নিশ্চয় নাতনি; পুকুরের ওপারে তবু মনে হয় হাতে ওটা দাবার ছকই।...নিদ্রাপর্ব শেষ হোল, এবার ব্যসন পর্ব, সাথীরা জুটবে। মুখের পানে একবার চোখ তুলে চেয়ে নিয়ে নাতনি যেমন ঘটা করে ছক পেতে বসল, মনে হয় খেলা ততক্ষণ ওর সংগেই চলবে।...হাঁসের সার পুকুরের ধার বেয়ে উঠছে। ওপরের গুটিকতক হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল; একটা রোমন্থনরত গোরু, তার পিঠে একটা কাক—এই সামান্য একটা দৃশ্যের মধ্যে হাঁসের দল "কাকতালীয়" গোছের কোন ন্যায়-সূত্রের খুঁট ধরতে পেরেছে নাকি?...এই জাতটার ওপর কেমন একটা শ্রদ্ধা আছে আমার—স্কুল বয়সে পঞ্চতন্ত্রে 'হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ' পড়া ইস্তক। ওরা যে জলের মধ্যে থেকে ক্রমাগত পাঁকই বেছে নিচ্ছে এতে আমার শ্রদ্ধা এতটুকুও পঙ্কিল হয়নি। তারপর মনুষ্যত্বের উৎকর্ষেরও একদিকের সার্টিফিকেটে ওদেরই ছাপ,—পরমহংস; শৌর্যের দিকটা যেমন সিংহ অধিকার করে বসেছে। এটা আমার চিরদিনই একটা রহস্য বলে মনে হয়েছে—ওরা যেমন জলের মধ্যে থেকে দুধ বেছে নেয় বলে, তেমনি সমস্ত পাখীর মধ্যে থেকে ওদের বেছে নিয়ে কে এই মহা গৌরবের আসনে বসিয়েছে! আর কেনই বা? দিনকতক একটা সমাধান করে নিশ্চিন্ত ছিলাম যে এই সাধুবাদ বোধ হয় ওরা নির্বিচারে ডিম দিয়ে যায় ব'লে—নিঃস্বার্থভাবে বুকে চেপে তা দিয়ে রাঁধবার উপযোগী ক'রে। একেবারে ছেলেবেলাকার সমাধান, যে বয়সে মনকে যাহোক একটা উত্তর দিতে না পারলে ঘুম হোত না। এ সমাধান অবশ্য বেশিদিন টেঁকল না, তারপর এখন পর্যন্ত কিছু পাইও নি।

শুধু তো এক রকম নয়, মরাল-গমন ওদের নিয়েই; একেবারে এরা না হোক, এদেরই জাতভাই তো? তারপর সোনার ডিম প্রসব করতেও ওরাই; মানুষ যেন ওদের পেয়ে বসেছে।

আর কি রকম মানুষের মতো দেখেছ! একটা কিছু হোক, কাছে পিঠে যদি গোটা-কতক হাঁস থাকে, কৌতূহল দৃষ্টি নিয়ে এসে দাঁড়াবেই। আর একটু পাশ থেকে দেখো, ঠোঁটে একটা মুরুব্বিয়ানার হাসি লেগেই আছে অষ্টপ্রহর।

জাতটার থৈ পেলাম না।

সবুজের নিজের এলাকায় এসে পড়েছি। বাড়িঘর গেছে কমে, গাছপালার নিবিড়তা সেই পরিমাণে গেছে বেড়ে, এক এক জায়গায় এত লাইন-ঘেঁষা যে ডালপালাগুলো ছপ ছপ করে গাড়ির গায়ে এসে পড়ছে, ফলতা-মেলের মানসম্ভ্রম আর থাকতে দিলে না এই অর্বাচীনের দল। আমরা সবুজের মধ্যে একেবারে গেছি ডুবে, গাছপালা ভেদ ক'রে রোদের যে একটা আভা প্রবেশ করছে গাড়ির মধ্যে সেটাও খুব হাল্কা সবুজে রঙের; অনুভব করছি সেটা মনের মধ্যেও করছে প্রবেশ, সমস্তটুকুর সংগে তপ্ত বনভূমির একটা মিশ্র গন্ধ মিশে গিয়ে যেন একটা নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে।

"আসুন, সিগারেট খান তো?"

সেই ভদ্রলোক; বেঞ্চের পিঠে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, আবার উঠে পড়েছে। এসব লোকের মরণ হয় না, তবু যদি একটানা খানিকক্ষণ ঘুমোয় তাহলেও লোকে বাঁচে, তাও নয়। বললাম—"আজ্ঞে না, অব্যেস নেই।"

ও মাঝেরহাট স্টেশনে আমায় যদি বদনের হাত থেকে বিড়ি নিয়ে ফুঁকতেও দেখে থাকে তো এই উত্তরই দিতাম। লোকটা এত বোঝে, শুধু এইটুকু কেন বুঝছে না যে আমি বিরক্ত হচ্ছি?

"অ্যামেরিকান মিলিটারি সিগারেট, এ মাল বাজারে পাবেন না; এক বেটার সংগে ভাব হয়েছে, মাঝে মাঝে দেয়, মিলিটারি সাপ্লাইয়ে কাজ করছি কিনা।"

এতগুলো কথার উত্তরে শুধু বললাম—"ও!"

"চলবে একটা?"

দুধার একটু ফাঁকা হয়ে গিয়ে দৃশ্যপট গেছে বদলে, এতটুকু যদি হারাই তো মনে হচ্ছে আপসোসের সীমা থাকবে না।

উত্তর করলাম—"বললাম তো অব্যেস নেই; অব্যেস না থাকলে মোটর-মার্কাই বা কি, অ্যামেরিকান মিলিটারিই বা কি। বলুন না?"

—দেখি, বাঁড়িয়ে বললেও যদি নিষ্কৃতি দেয়, কিন্তু কার ব'য়ে গেছে?

"শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথকে তো আর দিয়ে আসেন নি।......অব্যেস নাই-বা রইল।"

নিজের রসিকতায় হেসে উঠল, আমি একেবারেই যোগ না দিয়ে বললাম—"ও পাটই নেই।"

"তাহ'লে থাক। অ্যামেরিকান বলেই যে সদ্য সদ্য হাতেখড়ি করতে হবে...আর, একটা বদ্‌অব্যেসও মশাই, নিজের বদ্‌অব্যেস বলেই যে রেখেঢেকে বলতে হবে এমন তো নয়।...তবে ঐ একটি, তাও শুধু সিগারেট, তার ওপরে নয়।"

একটা আধ-শুকনো বেলগাছকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে কি একটা চেনা-চেনা লতা হলুদে ফুলে বোঝাই হয়ে উঠেছে। হর-গৌরী। কিন্তু একটু দুচোখ ভরে' দেখতে দিচ্ছে কে?...

উত্তর করলাম—"নেশা বাদে অন্য বদ্‌-অব্যেসও তো থাকতে পারে মানুষের।"

"আমার কথা বলছেন?"

একটু সামলে নিতে হোল, তবুও হাতে রাখলাম খানিকটা। বললাম—"না, বিশেষ ক'রে আপনার কথাই নয়, সাধারণভাবে মানুষের দুর্বলতার কথা বলছি, নিজেদের দোষ আমরা তো দেখতে পাই না সব সময়, খুঁজে-পেতে দেখবার চেষ্টাও করি না।"

খোলা কেসের মধ্যে থেকে একটি সিগারেট বের ক'রে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে ডালাটা কয়েকবার খুট্ খুট্ করে বন্ধ করলে, কয়েকবার খুললে; আমার কথাটা ভাবছে। একটু পরে কেসটা পকেটে রেখে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ ক'রে এমন নির্লিপ্তভাবে টানতে লাগল, মনে হোল নিরাশ হ'য়ে ওদিকটা ছেড়েই দিয়েছে। থাকে চুপ ক'রে, ভালোই, নয়তো যেমন মাথামোটা দেখছি, এবার মুখ খুললে সোজা ধমক দিয়েই চুপ করাতে হবে বোধ হয়।

'সখের বাজার' খানিকক্ষণ আগে ছাড়িয়ে এসেছি, গাড়ি এসে দাঁড়াল 'ঠাকুরপুকুর' স্টেশনে। সেই এক ছাঁদ; একদিকে ছোট একটি বুকিং আফিস, বাকিটা খালি, ওপরে টিনের চাল, তার মধ্যে দিয়েই বাইরে যাবার ব্যবস্থা। কাছে-পিঠে আর বাড়ি নেই, তাতে এইটুকুই যেন বেশি করে নজরে পড়ে।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই একটি রাস্তা, তার দুদিকে নারকেল আর সুপারির সারি, মাঝামাঝি একটা পুল। গাছগুলোর বেশি বয়স নয়, সবে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। এই আগাছার জঙ্গলের মাঝখানে এইটুকু যেন অদ্ভুত একটা কৌতুক জাগায় মনে। স্টেশনে আসবার জন্যে এমন একটি বীথি-পথ রচনা করেছে, কে সে সৌখিন মানুষ? এক সময় ছিল অবশ্য এইরকম প্রাচুর্যের অতি-সৌখিনী খেয়াল; প্রাচুর্য মানে অবসরের প্রাচুর্য, অর্থের প্রাচুর্য, তার সঙ্গে প্রাণের প্রাচুর্য; খরচ করবার লোকে পথ পেত না, তাই পথেঘাটেই খরচ ক'রে হালকা হ'ত। কিন্তু সে কি এই বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার কথা?—নারকেল-সুপুরি গাছ-গুলার বয়স দেখে বরং একটু বাড়িয়েই বলছি।...কিন্তু মন যখন রোম্যান্স রচনা করবেই, তখন অত করে ইতিহাসের তারিখ ঘেঁটে বের করতে চায় না। রেলগাড়ি তখন স্বপ্নেরও অতীত। রাস্তাটা বেঁকে যেখানে ঘন গাছপালার মধ্যে গেছে মিলিয়ে সেই-খানে—সেই সুদূর অতীতেই একটি সৌধ রচনা করলাম—ঠাকুরপুকুরের ডাকসাইটে ঠাকুরদের জমিদার বাড়ি। কে তারা জানি না, ছিল কি না কখনও তাও জানি না—তবে রাজধানীর পাশে তাদের এই নিজের রাজধানীতে তাদের ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ আর তাদেরই সাতমহল বাড়ির সিংদরজা থেকে এই পথ বেরিয়ে এদিক দিয়ে কোথায় গিয়েছিল চলে— হয়তো রুদ্রদের ঠাকুরের (ধরে নিচ্ছি নামটা) প্রমোদভবনে!... কিংবা রূপসায়রের ধারে বাণলিঙ্গ শিবের মন্দিরে (এ দুটোও ধরে নেওয়া নাম) যাওয়ার পথ —পুরাঙ্গনাদের জন্যে—সিংদরজা থেকে মোটেই বেরোয়নি—একেবারেই উল্টো দিকে অন্দর মহলের একটি সঙ্কীর্ণ দ্বার থেকে এসেছে চলে—ষোল বেয়ারার পাল্কি এসে লাগত, প্রতিদিনই বা ক্কচিৎ কখনও কোনও পর্বদিনে—আগে-পিছে পাইক-বরকন্দাজ—রাণীমা চলেছেন দেবার্চনায়—

সেসব আর কিছুই নেই, কিছুই ঘটে না আর। বনের মাঝখানে অতি যত্ন করে রচিত রাস্তার খানিকটা আছে পড়ে—তার এক দিকের মহাল আর অন্য দিকের দীঘি-দেউল গেছে মুছে—নারিকেল-সুপুরীর দোলাতে মনে হচ্ছে যেন একটা রোম্যান্সের গোটা কতক পাতা-ছেঁড়া বইয়ের মাঝখানে কি করে আছে আটকে—কোন্ অতীত বসন্ত দিনে রচা, আজকের এই নিদাঘ বায়ুতে ফর ফর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

তুমি হাসছ নাকি?

তাহলে কোনও বৈশাখ-জৈষ্ঠ্যের দুপুরে আমার মতো এখানে এসে দাঁড়িও। চারি-দিকের শ্যামলিমার ঠিক ওদিকে যে চোখ ঝলসানো রূপোলী পর্দাটা দুলছে, তার গায়ে এই রকম ছায়াচিত্র উঠবে জেগে—একদিন যা হয়েছিল বা হতে পারত। যা একেবারে প্রত্যক্ষ, নিতান্ত কাছের, নিতান্তই আজকের—এই স্টেশন, যাত্রী, রেল সবকিছু দুপুরের দাহনে হয়ে গেছে মূর্ছিত; জেগে রয়েছ শুধু দুটিতে—তুমি আর অতীতের এমনি একটি ছবি। কিছু অসম্ভব বলে মনে হবে না; দুপুর রাতের গায়ে অশরীরীদের আবির্ভাব যেমন অসম্ভব বলে মনে হয় না। এদিক দিয়ে রাত দুপুরের সঙ্গে দিন দুপুরের একটা আত্মীয়তা আছে চমৎকার, বিশেষ করে খর গ্রীষ্মের দুপুরের সঙ্গে। খানিকটা সময় নিয়ে দিনটা হয়ে পড়ে, নিঃসঙ্গ, নিরালা, মাঝ রাতের মতোই অবয়বহীন, তখন তুমি যাই চাও না কেন, দিব্যি করে তার শূন্যতা-টুকু পূর্ণ করে দিতে পারে।

হয়তো মিছেই বকে গেলাম খানিকটা—এ সমস্তটা নিতান্ত আমার ব্যক্তিগত; আর সব সময় বাদ দিয়ে বৈশাখের দুপুরে ফলতার গাড়িতে চড়ে বেড়াবার সখ, বদনের অফার-করা রমজান মিঁয়ার 'ইসপিসেল' বিড়ির ওপর ভক্তি, আরও যা সব উদ্ভট ব্যাপার, যা হয়তো তোমাদের পরিচিত (?)

এই জীবটিতেই সম্ভব, আর ভগবান যাদের এই ছাঁচে গড়ে ধরাতলে দিয়েছেন নামিয়ে।

ব্যক্তিগত আর একটা কথা তাহলে বলে দিই এইখানেই। কলকাতার দক্ষিণের সমস্ত জায়গাটাই আমার চোখে বড় রোম্যাণ্টিক বলে মনে হয়। কলকাতার উত্তরে যে-জায়গাটা, সেখানে কোম্পানী আর রাজা মিলে ইংরেজি আমল যেন চেপে বসে আছে—রাজশক্তির প্রত্যক্ষ তদারকের নীচে রোম্যান্স সেখানে বিকশিত হবারই অবকাশ পায়নি—বিশেষ করে গঙ্গার দুধারে—নদীবাহিত বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে বণিক-রাজের দৃষ্টি সেখানে বরাবরই ছিল সজাগ। ...আমার একটা মত বা ধারণার কথা বলছি, একে তর্কের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রিসেফশন করবার দরকার নেই। দোহাই তোমার, আজকের দিনের সবকিছুই তোমার ঐ তর্ক থেকে বাদ দাও—শাস্ত্রের তর্ক, সম্ভাবনার তর্ক, সামঞ্জস্য আর উচিতানুচিতের তর্ক। নিয়ম আর সুসঙ্গতির বাইরে এক ধরণের out law করে রাখো আমার এই একটি দিনকে।

আমার ধারণা, দক্ষিণ যেন এখনও একটা অনাবিষ্কৃত ভূখন্ড; অলঙ্কারের সাহায্য নিয়ে একটা গ্রন্থই বলি, যার অর্ধেকটা সুন্দরবনের ঘন মসিলেপে চিরতরেই অবলুপ্ত হয়ে আছে।

মতে না মিললেও দক্ষিণে এসে বেড়িয়ে যেও মাঝে মাঝে। ...তবে, আর কতদিনই বা? দক্ষিণও হয়ে উঠছে উত্তর—বেহালা গেছে বড়শে গেছে, কলকাতা উপচে ঠাকুরপুকুরকেও করলে বুঝি গ্রাস।

"একটা কথা......কিন্তু আপনি আবার কিছু জিজ্ঞেস করলেই যা বিরক্ত হয়ে উঠছেন!"

—সেই ভদ্রলোকটি। বিরক্ত যে হচ্ছি, সেটা টের পেয়েছে এতক্ষণে। ভরসা হোল একটু, বললাম—"বলুন।"

"বলছিলাম, কবি নয়তো?" —মানে, বাইরের দিকে যেমন চুপ করে চেয়ে বসেছিলেন......"

ভাবের ঘোরে ধরা পড়ে গিয়ে একটু অপ্রতিভভাবেই হেসে বললাম—"না...এটা কি কবিতা করবার সময়?"

"তাইতো ভাবছিলাম...একটুকরো মেঘও নেই কোনখানে যে...দুটোর মধ্যে একটা তো দরকারই, কি বলেন?"

"দুটো কি?"

"হয় মেঘ, নয় কোকিল—সেই কালিদাসের আমল থেকে যা চলে আসছে...ইস্তক আমাদের রবিঠাকুর পর্যন্ত।"

এর পরে আর কথা কইতে ইচ্ছে করে না, শুধু মূর্খতার বহর দেখে নয়, অসভ্যতার জন্যও। কিছু বলতে গেলেই খুব বেশি কড়া হয়ে পড়বে; চুপ করেই রইলাম।

ঠাকুরপুকুর থেকে বেরিয়ে খানিকটা এসে লাইনটা ডাইনে বেঁকেছে। ঝোপ-ঝাড়ও এসেছে কমে। বাঁ দিকের একটা টানা মাঠের মাঝখানে খানিকটা দূরে একটা অদ্ভুত ধরণের বাড়ি; টানা দোতলা, কিন্তু নীচের তলাটা নেই, গোটা কতক খুঁটি ধরে রয়েছে ওপরটাকে। কাঠের বাড়ি বলেই মনে হয়। একেবারে মেঠো জায়গা, বাড়িটাতে লোকজন কেউ নেই, কাছেপিঠে আর কোন বাড়িও নেই; এর আবার কি ইতিহাস, কে জানে। ভদ্রলোককে জিগ্যেস করলে বোধ হয় ঢের পাওয়া যায় কিছু, এই পথে যাওয়া-আসা আছে, জানতে পারে। কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না, নিজে ওপর-পড়া হয়ে যা বলছে, তাই বরদাস্ত করা শক্ত, কিছু জিগ্যেস করতে গেলে তো আরও মাথায় উঠে বসবে। বাঁকের মুখে আড়ালেও পড়ে গেল বাড়িটা। ...আমার কৌতূহলী কল্পনা ওর শূন্য গহ্বরে কি যেন খোঁজাখুঁজি করছে,—কারা ছিল এমন আজগুবি জায়গায়, আজগুবি বাড়িতে? কি কাজ নিয়ে? গেল কোথায়?

ডাইনে বনের মধ্যে থেকে খানিকটা লাইন বেরিয়ে এসে এই লাইনটাতে মিলেছে। হয়তো আগে এইটেই ছিল রাস্তা, ডায়মন্ড হারবার রোডের ধারে ধারে, এখন যেমন এইখান থেকে হোল আরম্ভ।

হ্যাঁ, এইবার বাঁদিকে একটু ঘুরে গাড়িটা উঠে পড়ল ডায়মন্ড হারবার রোডের ওপর। কিনারায় আমাদের লাইনটা পাতা, ডান দিকেই পিচঢালা সড়ক, এখানটা নাকের সোজা চলে গেছে একেবারে। মাল-বোঝাই গাড়ি, মানুষ-বোঝাই বাস, গলা পিচের ওপর দিয়ে চর-চর শব্দ করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছে—কোন্ মায়ার প্রদীপ জ্বালতেই যেন একটা শতাব্দী ডিঙিয়ে কোথায় পড়লাম এসে—বিংশ শতাব্দীর একেবারে মধ্যাহ্ন—১৯৪৫—কলকাতার সভ্যতাক্লিষ্ট তপ্ত নিঃশ্বাসের শব্দ যায় শোনা এখান থেকে। মাঝখানে ঐটুকু যে কি করে এখনও ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সবুজ স্বপ্ন দেখছে, বুঝে উঠতে পারা যায় না—ঐ ঘোলসাহাপুর থেকে ঠাকুরপুকুর, তাও সমস্তটা নয়—ঊনবিংশ শতাব্দীর 'আদি অকৃত্রিম' রেলপথ সদর বেহালা আর বড়শে থেকে আত্মগোপন করে যেখান দিয়ে সন্তর্পণে এসেছে বেরিয়ে।

পরিবেশটা গেছে একেবারে বদলে আগাছার নাম মাত্র আর নেই। রাস্তা তার পরেই দুদিকে টানা মাঠ, সেটা শেষ হয়েছে গিয়ে একেবারে গ্রামের কোলে। অনেক দূরে দূরে বাড়িঘর ক্বচিৎ পড়ে চোখে; গাছপালার একটা নীল রেখা, নিশ্চল, শুধু নারিকেল গাছের মাথাগুলো একটু একটু দুলছে। রেখাটা যেখানে যেখানে এগিয়ে এসেছে, গাছগুলোও একটু স্পষ্ট, সেখানে দু'একখানা বাড়ি চোখে পড়ে। কৃষকপল্লীর প্রান্ত, পোয়াল গাদা, দু' একখানা গোরুর-গাড়ি মাথা নীচু করে আছে দাঁড়িয়ে, ধরিত্রীকে প্রণাম করার ভঙ্গিতে, পাশেই ঘরের উঁচু দাওয়ার ওপর গোয়ালপাতার চাল এসেছে নেমে, কোনটায় আবার রাঙা রাণীগঞ্জের-টালি, কালো মেয়েদের মাঝখানে হঠাৎ একটি যেন টুকটুকে।...পুকুরের পাশ দিয়ে একটা রাস্তার রেখা, নির্জন, যেখানটায় গাছের ছায়া পড়েনি, দুপুরের রোদে চিকচিক্ করছে।......চক্রবালের নীল রেখাটা আবার দূরে সরে গেল।

ডায়মন্ডহারবার রোডটা আমার বড় প্রিয়। কয়েকবার বলে থাকব তোমায়; ওর আলোচনা উঠলে (আমিই তোলার পথ খুঁজতে থাকি তেমন শ্রোতা পেলে) আমি একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। পাহাড়ের কথা বাদ দিলে, টানা সমতলভূমির ওপর এমন চমৎকার রাস্তা আমি আর মাত্র একটি দেখেছি,—রাজগীরের রাস্তা, যেখান থেকে সেটা বক্তিয়ারপুর পেরিয়ে ই আই আর-এর লাইন টপকে দক্ষিণ মুখো হোল। অবশ্য দুটোর সৌন্দর্য দু'ধরণের, ওটাতে আছে একটা এপিক গ্র্যানজার (পরিভাষা সমিতি কি বলেন দেখো), আর ডায়মন্ড-হারবার রোডে আছে একটা লিরিক বিউটি। এ দুটির আবার নিজের নিজের ঋতু আছে।

রাজগীর রোডের খোলতাই হয় ভরা বর্ষায়। দুদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি—যতদূর দৃষ্টি যায়, একেবারেই আকাশের কোল পর্যন্ত। পুনপুন্ নদী, পাহাড় থেকে বয়ে এসেছে, গঙ্গার সঙ্গে মাঝে মাঝে হয়েছে ভেট-মোলাকাৎ, গতির উল্লাস গেছে বেড়ে। টানা হাওয়ায় বড় বড় ঢেউ, ফেনায় চুরমার হয়ে রাস্তার গোড়ায় পড়ছে আছড়ে; রাজগীর রোড নিঃশঙ্কভাবে মাথা তুলে গেছে সোজা এগিয়ে, পাশ দিয়েই এই রকম লাইনের একটি পাড়—বিহার-বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের, মাঝে মাঝে দীর্ঘ শাঁকো, পুনপুনের সঙ্গে আপোস, রাস্তা না ছেড়ে দিলে সে প্রলয় ঘটাবে, ছোট্ট নদী বলেই তার মর্যাদাবোধ আরও বেশী; আর, তার ন গঙ্গার সঙ্গে কুটুম্বিতা!

ডায়মণ্ডহারবার রোডের রূপ খোলে শরতে। মাঝখানটিতে পিচের কালো রেখাটুকু, পুরু দূর্বাঘাসের চাপ দু'দিক থেকে ঠেলে এসেছে, এতটুকু খালি জায়গা নজরে পড়ে না। তদারকের কড়া দৃষ্টি সত্ত্বেও মাঝে মাঝে দু'একটা অজানা লতাগুল্ম, (বিভূতি বন্দ্যোপধ্যায় নাম বলতে পারতেন)—কোনটার সবুজ ফুলের গুচ্ছ, টোপারির মতো ঢাকনা-দেওয়া ফল; কোনটায় বা রঙীন ফুল। এর পরে রাস্তার গোড়া থেকে গ্রামের সেই নীল রেখা পর্যন্ত ধান, ধান, আর ধান। সমস্তর ওপর শরতের আকাশ ঝলমল করছে; মন্থর, সাদা মেঘের স্তূপ; শুধুই সবুজ, আর নীলের একঘেয়েমিটা নষ্ট করবার জন্যে শিল্পী ঐ সাদার ছোপছাপগুলো মাঝে মাঝে দিয়েছে বসিয়ে। তৃপ্ত পরিপূর্ণতার এমন চোখ-জুড়ানো রূপ আমি আর কোথাও দেখিনি।

রাজগীর রোড যেন পৌরুষে সমুজ্জ্বল—সিধা, সমুন্নত, একক, কতকটা রুক্ষই; ডায়মণ্ডহারবার রোডের সু-বঙ্কিমঠাম, অঙ্গে জড়ানো সবুজ শাড়ি, তার সঙ্গে সচল পরিপূর্ণ জীবনের কত দিকই যে রেখেছে জড়িয়ে তার যেন হিসাব হয় না। সে যেন সত্যিই একটি নারী, স্মিতাননা, কল্যাণময়ী।

রাজগীর রোড যদি হয় একটি চৌতালের ধ্রুপদ তো ডায়মণ্ডহারবার রোডকে বলতে হয় মনোহরসাহী কীর্তন।

'নীলাঙ্গুরীয়'টা পড়েছ? মীরা আর শৈলেন যেদিন সবচেয়ে কাছাকাছি হয়েছিল, সেদিন তাদের এনে বসিয়েছিলাম এই ডায়মণ্ডহারবার রোডের পাশে খানিকটা সবুজ ঘাসের ওপর—দুটি পরিপূর্ণ চিত্ত আর চারিদিকের এই পরিপূর্ণতা—সময়টা ছিল সন্ধ্যা, সূর্যাস্ত হয়ে গিয়ে চাঁদ আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ওটার সিনেমা-রূপ তুমি দেখোনি নিশ্চয়, তোমার পুণ্যের জোর আছে, বেঁচে গেছ। ওরা সেই মিলনটুকু ঘটিয়েছে একটা ডোবার ধারে, নারকেল গুঁড়ির ঘাটের রাণার ওপর বসিয়ে। বোধ হয় এই ত্রুটিটুকুর সংশোধন হিসেবেই একেবারে শেষে দুজনের হাতে মালা জড়িয়ে দিয়ে ভেবেছে শেষরক্ষা হোলো। হায় শৈলেন—মীরা, হায় আর্ট, হায় সিনেমা।

ওটা বোধ হয় আমার কুষ্টী-ঠিকুজী-গত ব্যাপার একটা, ভগবান বেছে বেছে একজন বেরসিককে আমার সঙ্গে গেঁথে দেবেনই। ওপরে ঐ উদাহরণ দিলাম একটা। নিমন্ত্রণে গেলে প্রায়ই আমার পাশে এমন একটি লোক আসন নিয়ে বসে যার ভয়ে পরিবেশকেরা সেদিকটাই মাড়াতে চায় না পারতপক্ষে, মাড়ালেও এমন নিঃসম্বল হয়ে ওঠে যে তাদের কিছু ফরমাস করতে পারা যায় না, করলেও কিছু ফলের আশা থাকে না। সিনেমা থিয়েটারে গেলে যে-লোকটা সবচেয়ে কম বোঝে, সে না জানি কি করে' আমার পাশটিতে, পেছনে বা সামনে জায়গা পেয়ে যায়, থাকেও প্রায় সদলবলে। একবার হিন্দী মেঘদূত দেখতে গিয়ে একদল গাড়োয়ালী সেপাইয়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম মনে আছে। কখনও ভুলব না। তুমি এটা জান কিনা বলতে পারি না—মৃত্যুর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে জীবন কাটাতে হয় বলে একরকম জাতিগতভাবেই সেপাইরা স্বভাবতঃই বড় স্ফূর্তিপ্রবণ হয়ে থাকে—কতকটা সবচেয়ে মারাত্মক জিনিসটা কণ্ঠস্থ করে নিয়ে সদাতুষ্ট নীলকণ্ঠ হয়ে থাকার মতো। ...ওদের ধারণা ওরা একটা হাসির 'খেল্' দেখতে এসেছে। কি করে হয়েছিল জানি না, তবে আমার ডান পাশে যেটি বসেছিল, আমায় একবার বললে—"বাবুজী, এর যেখানে যেখানে হাসি আমাদের একটু ব'লে ব'লে দেবেন কি?"

অদ্ভুত প্রশ্নের একটা উত্তর জোগাতেই দেরি হোল একটু, তারপর বললাম— "সে কি সর্দারজী, এই খেল্‌টার তো আগাগোড়াই..."

ঠিক এই সময় আরম্ভ হয়ে গেল সিনেমা... এবং তারপরেই আমার শেষ কথাটা একেবারে চাপা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই হাসি; সর্দারজী শুধু একবার হাসির মধ্যে সবাইকে জানিয়ে দিলে এর আগাগোড়াই হাসি, তারপর সেই যে আরম্ভ হোল, শেষ হবার আগে থেমেছিল কিনা, আমার জানা নেই, কেননা আমি নিজেই শেষ পর্যন্ত থাকতে পারিনি।... জিগ্যেস করবে থামিয়ে দিলে না কেন, উঠিয়েই বা দিলে না কেন। ওঠাবার কথাই আসে না। সেটা আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, বিলিতী আর অ্যামেরিকান সেপাইরা দু'একটা সিনেমায় মদ খেয়ে হুল্লজতও করেছে। তবু থামাবার চেষ্টা হয়েছিল। গোড়াতেই যখন ডজন দুয়েক লড়াইয়ে মুক্তকণ্ঠে হাসিটা ওঠে, একটা আপত্তির রবও উঠেছিল—"থামো, থামো!... থামুন!... খামোশ!... বত্তি! বত্তি বার দেও!!" বত্তি কিন্তু যখন বারা হোল, ঘর একেবারে ঠাণ্ডা—হাসির উৎস-মুখগুলির দিকে চেয়ে কারুর আর হেম্মৎ হোল না যে, দাঁড়িয়ে উঠে মনের ভাবটা ব্যক্ত করে। আমি তিনটা প্রচেষ্টা পর্যন্ত দেখেছিলাম—প্রায় মিনিট পনের। তৃতীয়বারে ম্যানেজার বা ঐরকম কেউ একজন স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে দলটির দিকে চেয়ে হাতজোড় করে "খামোশীকে সাথ" দেখবার অনুরোধ করলে —লোকটা ছিল থলথলে মোটা, নিতান্ত দৈবাৎই, তার ওপর প্রথম শ্রেণীর দূরত্ব থেকে তার হাত-পা নাড়াছাড়া বিশেষ কিছু বোঝাও যাচ্ছিল না; এটা হাসির 'খেলের' একটা নবতর অভিব্যক্তি ভেবে যে প্রচণ্ডতর হাসিটা উঠল, আমি আর আশা না দেখে তার মধ্যেই ওঠে আসি।

কুষ্টী-ঠিকুজীর কথা কেন বলছি? একবার নিতান্তই গল্প প্রসঙ্গে আমার এই সব দুর্ভাগ্যের কথাটা বলি পাঁচ সাতজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে। তার মধ্যে ঠিক বান্ধবের স্তরে না পড়লেও একজন আমার শুভানুধ্যায়ী এদেশী পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই বলেন—ওটা হয়, আর তার খণ্ডনও আছে শাস্ত্রে—এতখানি ওজনের লোহার বাসন, তিল, রাই-সর্ষপ মাষকলাই (সব বিশেষ [illegible] ওজনে) প্রভৃতি দান করতে হয় অমাবস্যায়, [illegible] মন্ত্রানুষ্ঠানও আছে। কতকটা ভূত ছাড়ানো আর কতকটা রাহু মুক্ত হবার মতো বিধান।

অতটা বিশ্বাস করা শক্ত, নিশ্চয় উচিতও নয় এযুগে, তাই কান দিইনি। এবার ভাবছি

অমাবস্যার অন্ধকারে একদিন এ-যুগকে লুকিয়ে ওটা সেরেই নোব।

আবার সেই লোকটি। টের পেয়েছি, ক'বারই সিগারেট টানার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে ঘুরে দেখছে; একটু হেসে বললে—"একটা কিছু আছে, 'না' বললে শুনবে কে? একবার নোট বুকটাও বের করতে যাচ্ছিলেন। না কবি তো লেখক তো নিশ্চয়।"

হাসিও পায়। বোধ হয় তাই থেকেই আমার রাগটা প'ড়ে গিয়ে একটু দুষ্টুমির কথা মনে পড়ে গেল; কতকটা সেই 'সিংহির মামা ভোম্বলদাস'-এর গল্পের মতো—অনেকগুলো বাঘ মেরেছে আর একটা হ'লেই পুরো হয়, তারই জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে জঙ্গলে।

চতুর একটু হাসি নিয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে, আমি হেসেই উত্তর দিলাম—"না, এবার আর সত্যিই নুকোন গেল না। আছে একটু একটু বাতিক; কিন্তু আপনি টের পেলেন কি ক'রে?"

"ঐ যে বললাম, নোট বইটা বের করতে যাচ্ছিলেন, তার ওপর একটা ছমছমে ভাব। ...এসব জিনিস নজরকে এড়িয়ে যেতে পারে না মশাই। শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখলেই টের পাওয়া যায়"—

—হাসিটা আর একটু স্পষ্ট করলে।

বললাম—"গোঁফ মুড়িয়েও যখন নিষ্কৃতি নেই, তখন মেনে নেওয়াই ভালো। আছে বাতিক একটু, তবে কবিতা নয় মশাই। তিথিটা তৃতীয়া, তাই আকাশের চাঁদটা ঐরকম তেরছা হয়ে উঠেছে; কথাটা সোজা না ব'লে যদি আমায় বলতে হয় আকাশ-সমুদ্রে একটা রুপোর নৌকো ভেসে যাচ্ছে তো তাতে আমি রাজি নই।"

"উচিতও নয় রাজি হওয়া। না এটা সমুদ্র, না ওটা নৌকো। অথচ সেই আমিই আবার ছেলেকে বলছি—'সদা সত্য কথা বলিবে।'...নিন্, একটা ধরান্।"

নিলাম একটা অ্যামেরিকান সিগারেট, যেন এ-সম্বন্ধে আগে কোন কথাই হয়নি। ধরিয়ে বললাম—"আজ্ঞে হ্যাঁ, যে কলম দিয়ে ঐসব মিথ্যের ডাঁই লিখছেন, সেই কলম দিয়েই আবার তার 'সত্যবাদিতা'র এসেও (Essay) টি ছুন করেক্ট (correct) ক'রে। সে-ছেলে যুধিষ্ঠির হ'য়ে দাঁড়াবে এটা তো আশা করতে পারেন না? দেশ উচ্ছন্নও যাচ্ছে।"

"যাবেই, বৃথা চেষ্টা।...কিন্তু...একটা কথা রেখে কথা বলব। এসে করেক্ট (Essay correct) করবার কথায় মনে পড়ে গেল—একটি ভালো মাস্টার সন্ধানে আছে?

আমার সেই ভোম্বলদাসের ফন্দিতে বাধা পড়ে যাচ্ছে, যেমন এক কথা থেকে অন্য কথায় গিয়ে পড়ছে লোকটা; তবু প্রশ্ন করলাম—"কোন ক্লাসের ছাত্র?"

"নাইন্থ্ ক্লাসের, আমার ছেলেই। আছে মাস্টার একজন, কিন্তু তাকে আর রাখা চলবে না।"

হাতের সিগারেটটা একবার কষে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেললে বাইরে, মাস্টারকে রাখা চলবে না এটা জোরালো করবার জন্যেই বোধ হয়, কেননা বেশি পোড়েনি সেটা তখনও।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখের পানে চাইলাম।

"আজ্ঞে না, চলবে না রাখা। বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি, কানে গেল ছেলেটাকে শেখাচ্ছে—রিউম্যাটিজ্ম (Rheumatism) মানে রোমন্থন। বুঝুন, একটাতে পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা, আর একটাতে ক্রমাগতই চোয়াল নাড়ছে!...বেরুচ্ছি, তখন আর কিছু বললাম না, মনে মনে ঠিক করলাম—'দাঁড়াও, এসেই তোমায় বিল্বিপত্র শোঁকাচ্ছি, বাড়ি গিয়ে যত খুশি রিউম্যাটিজ্ম করোগে ব'সে বসে।...আর আণ্ডার ম্যাট্রিক রাখব না, কান মলেছি। আই-এ হ'লেই ভালো, অন্ততঃ ম্যাট্রিক; খাওয়া, থাকা, কুড়ি থেকে প'চিশ টাকা মাইনে। পান তো এই ঠিকানা আমার, পাঠিয়ে দেবেন।

মিলিটারী কণ্ট্র্যাক্টারের একটা ছাপানো কার্ড বের করে আমার হাতে দিলে।

"হ্যাঁ, কবিতার দিক মাড়ান না বলছিলেন, তাহ'লে?"

"এই গল্প, উপন্যাস..."

"কিন্তু আবার তো সেই মিথ্যেই এসে পড়ল ঘুরে?"

"ঠিক চাঁদকে নৌকো বলার মতন নয়তো। তারপরেও যে মিথ্যেটুকু ছিল, তাও কেটে এসেছে ক্রমে ক্রমে—আজকাল আবার রিয়েলিজ্মের (Realism) দিকে ঝোঁক কিনা পাঠকদের, আমাদেরও তাই জোগাতে হচ্ছে।"

"শুনি বটে। আদার ব্যাপারী, বুঝি না অত ব্যাপারখানা কি। Real তো হোল আসল; Ism আজকাল গার্ডের গাড়ির মতন গুড্স, এক্সপ্রেস্, পার্সেল, প্যাসেঞ্জার—সবতেই দিচ্ছে জুড়ে..."

এবার বেশ আস্তে আস্তে এসে গেছি, আবার নতুন ফিকড়ি না বের ক'রে বসে। বললাম—"ঠিকই ধরেছেন—Real হোল আসল, বাস্তব Ism-টা হোল যাকে বলে বাদ। বাস্তববাদ, মানে দেখো আর লেখো।"

"বুঝেছি; আর অত মাথা ঘামাবার দরকার রইল না; আসান্ ক'রে এনেছে বলুন না এক কথায়।"

একটু চুপ করে থেকে কুণ্ঠিতভাবে চোখ তুলে হাসলাম, বললাম—"হয়েছে কি আসান? একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে
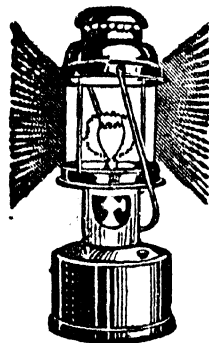
পারবেন। এই আমার কথাই ধরুন না—কোথায় ইলেক্‌ট্রিক পাখার নিচে বসে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকলেই চলে যেত—এক রকম বলতে গেলে অকাশ থেকে উপন্যাস দুয়ে নেওয়া—তার জায়গায় দুপুর রোদ্দুরে ছেলেধরার মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে—পকেটে নোট বুক নিয়ে..."

"মানে?"—রহস্যভরে হেসেই জিগ্যেস করলে।

"ঐ Realism খসড়া একরকম ঠিক; আর সব চরিত্র পেয়ে গেছি, শুধু একটা ধরা দিতে চাইছে না। ঠিক ভিড়ের মধ্যে যখন তখন তো পাবার নয়, তাই এই দুপুর রোদ্দুর মাথায় ক'রে শহরের বাইরে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। নিগ্রহ নয়?"

"একশ বার। তা, কি রকম লোক এখন দরকার আপনার? লোক চরিয়ে খাচ্ছি, বোধ হয় দিতেও পারি সন্ধান।"

এই ধরুন, কাজ থাক আর না থাক, আপনার ঘাড়ে প'ড়ে একথা সেকথা তুলে উদ্বাস্তু ক'রে মারবে আপনাকে—আর সব-জান্তা..."

—স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে, মুখটা হ'য়ে গেছে ফ্যাকাশে, একটু হাসবার চেষ্টা করে শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—"তাই নোট নিয়ে রাখছেন?"

"চেহারা, প্রত্যেকটি কথা, অবশ্য যতদূর সম্ভব। মানে Realistic হওয়া চাই তো। সমালোচকদের তো চেনেন না। আজকালকার পাঠকও তেমনি—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে—যদি ভূমিকায় জানিয়ে দিতে পারেন অমুক চরিত্রটাকে অমুক ঠিকানায় দেখেছি তো আরও ভালো, একশ'র মধ্যে একশ' মার্ক পেয়ে গেলেন।"

"পেয়েছেন দেখা?" মুখটা একেবারেই ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম উঠেছে জমে।"

স্টেশন এসে যেতে লোকজনের ওঠা-নামায় যে একটা বিরতি হোল, তাইতে আমাদের আলাপ গেল একটু থেমে। গাড়িটা এখানে একটু থামবে, ওদিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। দেরি হচ্ছে দেখে একটু উঠে গিয়ে প্ল্যাটফর্মের উল্টা দিকে মুখ বাড়িয়ে দেখি অনেক দূরে ইঞ্জিনের ধুঁয়ার রেখা দেখা যাচ্ছে। সরে এসে নিজের জায়গায় বসতে যাব, দেখি সে-লোকটি নেই।

গাড়িটা আসতে দেরি করছে; হয়তো মালগাড়ি। এসব কথা ভুলে, নিতান্ত গাড়ির গরমের জন্যেই নেমে গিয়ে স্টেশনে চালা-টুকুর মধ্যে দাঁড়ালাম একটু। ট্রেনটা এসে যেতে আবার গাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ নজর পড়ল ইঞ্জিনের পরের গাড়িটার মধ্যে একেবারে ও-কোণে একটি লোক তীব্র ঔৎসুক্যে আর আতঙ্কে আমার পানে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে আছে। গাড়িতে একটু অন্ধকার ছিল, কিন্তু চিনতে দেরি হোল না। তারপর কখন্ কোন্ স্টেশনে নেমে গেছে খোঁজ রাখিনি।

এক ধরণের আত্ম-আবিষ্কার হোল সেদিন,—আমরাও তাহলে একেবারে নিরস্ত্র নই! (ক্রমশঃ)

এ গোধূলি দেখ্‌ল'না এরা

সঙ্গীত চট্টোপাধ্যায়

আজ যেন বিকেলের ছায়াছন্দে মায়াভরা মাঠ—
এখন সেখানে শুয়ে সুবিপুল ক্লান্ত সবুজেরা;
সুদূরে দিগন্ততীরে বন্ধ করে দিনান্ত কপাট।
আজকের এ গোধূলি দেখ্‌ল'না কাজে ব্যস্ত এরা!
নারকেলপাতাগুলো নড়ে ঝিল্‌মিল্—
তার মাঝে খেলা করে অরুণিত নীল—
বিমনা বনের শিরে বিদায়ী আলোরা ছেঁড়াছেঁড়া—
(আজকের এ গোধূলি দেখ্‌ল'না কাজে ব্যস্ত এরা!)

ভাঙা মেঘে রাঙাছায়া ফেলা গাঙ্‌টির জলে নীল
গাগরী ভ'রতে আসে একে একে গাঁয়ের মেয়েরা—
আলো আল্‌গোছে ছোঁয় ঢেউদের হাসির মিছিল;
অপরূপ এ গোধূলি দেখ্‌ল'না কাজে ব্যস্ত এরা!
ঢালু নীলে উড়ে যায় বকেদের ঝাঁক,
কোথায় বাছুর দেয় পথভুলে ডাক,
পাতাঝরা সেগুনের ডালে ব'সে বুড়ো শকুনেরা—
(অপরূপ এ গোধূলি দেখ্‌ল'না কাজে ব্যস্ত এরা!)

হাওয়ায় বাজিয়ে শিষ শস্যের শীষ গান গায়,
বনভূমে আবছায়া আঁধারের বাঁধা বুঝি ডেরা—
ইতিহাস সারে দিন, অবসাদ আবেশ ছড়ায়ঃ
মায়াভরা এ গোধূলি দেখ্‌ল'না কাজে ব্যস্ত এরা!
প্রান্তরের প্রান্তরেখা আজ যেন, হায়,
আবেগে আকুল হ'য়ে ছুটে যেতে চায়
সুদূরে অজানা যেথা লালিমার প্রেম দিয়ে ঘেরা—
(মায়াভরা এ গোধূলি দেখ্‌ল'না কাজে ব্যস্ত এরা!)

শুধু কাজ, শুধু কাজ—কাজ আজ কিনেছে সময়,
অবকাশ অবশেষ ঃ নিরলস খাটে মুহূর্তেরা—
বিস্মিত বিশ্বাস মেখে' দেহমন অবসন্ন হয়;
তাই আজ এ গোধূলি দেখ্‌ল'না কাজে ব্যস্ত এরা!
ভুলে গেছে মানুষের কাজে মজামন
কাজ ছাড়া আর আজকে অন্য মনন—
ছায়া ফেলে সেখানে কি রাখালের গাভী নিয়ে ফেরা!
(তাই আজ এ গোধূলি দেখ্‌ল'না কাজে ব্যস্ত এরা!)

সমুদ্রে মাছ ধরা

গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারে মাছ ছাড়াও আনন্দ পাওয়া যায় প্রচুর। ভারত সরকারের দুইটি ট্রলার অশোক ও প্রতাপ নিয়মিত-ভাবে মৎস্য শিকার করিয়া সেই অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করিয়াছে।

বোম্বাইয়ের প্রিন্সেস ডকে দুই দিন মাত্র কাটাইয়া অশোক গভীর সমুদ্রে মৎস্য শিকারে বাহির হয়। সমুদ্র উপকূলের ২০ হইতে ৬০ মাইল দূরবর্তী অঞ্চল তাহার শিকারের সীমা। প্রতিবারে ৮ হইতে ১০ দিন সমুদ্রে থাকিতে

বোম্বাই সমুদ্রে মাছ ধরার জাহাজ 'অশোক'। জাল হইতে মাছগুলিকে জাহাজের উপর ফেলা হইয়াছে। 'অশোকে'র ঠাণ্ডা-ঘরে ৩০ টন মাছ রাখা যায়

হয় এবং এই সময়ে যে পরিমাণে মৎস্য ধরা পড়ে তাহার পরিমাণ ৫ হইতে ১০ টন হইবে। জাহাজের অভ্যন্তরভাগে তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকায় ৩০ টন পর্যন্ত মাছ অবিকৃত অবস্থায় রাখা চলে।

২৪০ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ডিজেল ইঞ্জিনের দ্বারা জাহাজটি পরিচালিত হয়। দুইটি কাঠের শক্ত খুঁটির সহিত সংলগ্ন ৬২ ফুট দীর্ঘ জাল সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয় এবং তলদেশের উপর দিয়া প্রায় ১০ মাইল টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এই সময় জাহাজের গতি ৭ নট হইতে কমিয়া মাত্র ২॥ নট থাকে। তারপর যন্ত্রে সাহায্যে মাছসহ জাল টানিয়া উপরে তোলা হয়। সমুদ্রে প্রধানতঃ গোল, দাড়াল, পমফ্রেট, প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। সমুদ্রে থাকাকালে প্রায় সর্বক্ষণই জাল টানার কাজ চলে।

ট্রলারের পরিচালককে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। মাঝে মাঝেই ছোট ছোট দেশী নৌকায় স্থানীয় জেলেরা মাছ ধরিয়া বেড়ায়। জাল ফেলিবার উপযুক্ত স্থান তাহাকেই স্থির করিতে হয়। হাতলের উপর হাত রাখিয়া পরিচালক সর্বদাই সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আছে। বে-ওয়ারিশ সমুদ্র বক্ষে যে কোনও মুহূর্তে যে কোনওরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে; কিন্তু প্রায়ই তাহা ঘটে না।

পরিচালকের অধীনে ৮ জন ক্রু থাকে। পরিচালকের মত তাহারাও অভিজ্ঞ এবং উৎসাহী। একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক সুখী পরিবারের মত তাহারা কাজ করিয়া যায়। ট্রলারের মধ্যেই তাহাদের থাকিবার ঘর —খুব ছোট, বোধ হয় ট্রলারে স্থান বাঁচাইবার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মৎস্য শিকারে বাহির হইবার সময় তাহাদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে পানীয় জল ও খাদ্য দিয়া দেওয়া হয়। খুব ভোরে চা, আটটায় প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন, বিকালে চা, বিকাল ছটায় খাবার আবার নৈশ ভোজনের ব্যবস্থা জাহাজেই করা হয়।

মৎস্য শিকারের কাজ খুবই শ্রমসাধ্য। তাহাদের বিশ্রামের সময় খুবই কম, প্রায় নাই বলিলেই চলে। জাল সমুদ্রে ঠিক মত পড়িল কি না, তাহা ঠিক মত টানা হইতেছে কি না তৎপ্রতি সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়।

সমুদ্র বক্ষের ১৮ হইতে ২৫ ফ্যাদম নীচ দিয়া সাধারণতঃ জাল টানা হইয়া থাকে। তবে একশত ফ্যাদম পর্যন্ত নীচে জাল নামান চলে।

জাহাজ বন্দরে আসিয়া পৌঁছাইবার সঙ্গে সঙ্গে শিকার-করা মাছ সরাসরি বাজারে চালান দেওয়া হয়, নতুবা বন্দরের তাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়।

ট্রলারের পরিচালক মনে করেন যে, বড় জাহাজ এবং উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম থাকিলে ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ মাছ ধরা যায়।

বোম্বাই উপকূলে মৎস্য শিকারের প্রধান অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে পরিচালক বলেন, উপকূল হইতে ৩০ মাইল দূরে একবার তিমির সম্মুখীন হই। তিমিটি প্রকাণ্ড। আমাদের জাহাজটিকে লইয়া যেন খেলা শুরু করিল। একবার এপাশে মুখ তুলিয়া ডুব দেয়, আবার ওপাশে গিয়া উঠে। দীর্ঘকাল ধরিয়া মৎস্য শিকারের কাজ করিতেছি কিন্তু কখনও এইরূপ অভিজ্ঞতা হয় নাই।
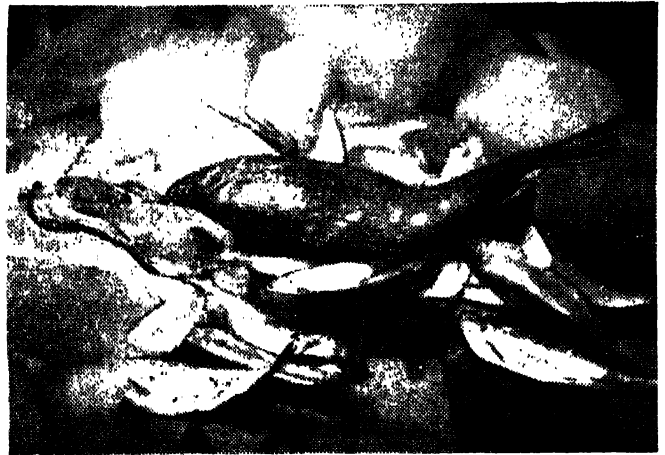
জাহাজের মধ্যে বরফ-দেওয়া ঘরের এক্যাংশে রক্ষিত কয়েকটি সামুদ্রিক মাছ

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

দেয়াল-ঘড়িতে ঢং-ঢং করে বারোটা বাজতেই কলম থামালেন শিবদাস। পেছনে থেকে ক্যাপটা খুলে ধীরে ধীরে এঁটে দিলেন কলমের মুখে। হাড়ের কলম-ধারকে কলম রেখে আড়চোখে তাকালেন একবার ঘড়ির দিকে। না, মিথ্যা নয়। সত্যি সত্যি বারোটা উতরে গেছে খানিক আগেই। জনহীন রাস্তার বুক গড়িয়ে বইছে হিমেল হাওয়া। বরফ-দাঁতের কোপের তোড়ে শিরশিরিয়ে উঠছে দেহের বাঁধন। তেল-পালিশ রাস্তার বুকে জড়িয়ে যাচ্ছে ভৌতিক নৈঃসংগ।

না। আর জাগা ঠিক হবে না। এমনিতেই ঘুম ভাঙতে বেলা হয়ে যায় তাঁর। এর ওপর রাত জাগলে ত আর কথাই নেই। উঠতে উঠতে সূর্য লাফিয়ে উঠবে মাঝ-আকাশে। তারপর মুখ-হাত ধুয়ে জলখাবার খেলে থলে হাতে নিত্যনৈমিত্তিক বাজার। গমগমে বাজারের এ-দোকান, সে-দোকান ঘুরে, কম দামে পচা-ভালোয় মিশেল সওদা করে, ফিরতে ফিরতে বেলা গড়িয়ে পড়বে ওপাশে। তারপর স্নান-খাওয়া সেরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে পাড়াপড়শীর দুপুরের ঘুম শেষ হবে। তখন আর কলম চালানো যাবে কি?

অথচ কলম তাঁকে চালাতেই হবে। সামনে পুজোর মরশুম। দশ-বারোটা নামকরা কাগজ থেকে লেখা পাঠাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন তিনি। পাঁচটা কবিতা, চারটি গল্প, আর উপন্যাস গোটা তিনেক। সবগুলোই প্রায় সেরে এনেছেন, কেবল উপন্যাস তিনটে বাদে। তাও আনকোরা রাখেননি। প্রায় সিকিটাক লেখা হয়ে গেছে এর মধ্যেই। একেবারে শেষ করে দিতে পারলে সবশুদ্ধো অন্তত হাজার খানেক টাকা ঘরে ঢুকবে এসে।

আর তাই এত তাড়া।

তাড়া থাকবেই-বা না কেন? টাকার কত দরকার এ-সময়টায়। পাঁচ-পাঁচটি সন্তান তাঁর। দুটি মেয়ে, তিনটি ছেলে। ষোল থেকে ছ'এর ভেতর সীমায়িত তাদের বয়েস। মেয়েরাই বড়। বয়সের সাথে সমতা রেখে কাপড়-জামা কিনতে হবে সবার। শাড়ি-ব্লাউজ-ফিতে, জামা-প্যাণ্ট-মোজা। জুতোও কিনতে হবে দুজোড়া। সন্তুর আর মান্তির। ওদের জুতোর শুকতলা নাকি ক্ষয়ে ক্ষয়ে ফতুর হয়ে [illegible] কোন্‌কালে। মায়ের তাড়া খেয়ে নিজের মুখেই বাবাকে জানিয়েছে ওরা সে-কথা। প্রথম প্রথম ভয় খেলেও আমতা আমতা করে সবটুকুই বলতে পেরেছিল দু ভাইবোন।

বাবা, মা বললে—

কি বললে?

মা বললে, আমাদের জুতো লাগবে।

জুতো লাগবে? বেশ ত! কি জুতো চাই তোদের?

আমার বাটার জুতো—কবিতা!

আর আমার—ফ্লেক্স!

বাঃ, বাঃ! নাম অবধি মুখস্থ করে ফেলেছিস দুজনে—এ্যাঁ?

শিবদাস হাসলেন অমায়িক করে। দরজার দিকে তাকিয়ে একটু স্তব্ধ হলেন। শিবানী, সমীরণ, দেবাশীষ। মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাল্লা ধরে। ভয়-বেদনায় শুকিয়ে করুণ হয়েছে ওদের চাহনী।

কিরে, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? আয়-আয়, কাছে আয়। তোদের কি চাই? পুজোয় কি নিবি এবার?

আমার প্যান্ট। আর হাওয়াই সার্ট।

আর আমার নয় বুঝি? —দাদার কথার পিঠে ঝাম্‌টি মেরে দেবাশীষ মুখ ভার করল—আমারও চাই দাদার মত।

আর তোর? শিবদাস অবাক হয়ে তাকালেন বড় মেয়ের দিকে। সবার পেছনে শুকনো মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। লজ্জায় কথা বলতে পারছে না ওদের মত। বড় মায়া হয়। তোর কি চাই, খুকি? শিবানীকে আদর করে ও-নামেই ডাকেন তিনি। যখন খুব আদর করতে ইচ্ছে হয়, শুধু তখন।

আমার শাড়ি। পাইপীন। তাছাড়া ব্লাউজও। —কথাগুলো বলতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে শিবানী। বলতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠল।

বেশ-বেশ, হবে, সব হবে। সবাই ইচ্ছে-মত পাবে। ভয় কি?

দুহাতে সবাইকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে গভীর আবেগে বললেন শিবদাস। দিনান্তে একবারও ছেলেদের সংস্পর্শ পান না তিনি। চেষ্টা যে না করেন, তাও নয়। কিন্তু ওরাই পারতপক্ষে ধার ঘেঁষে না। সযত্নে মায়ের মত পরিহার করে তাঁর সংগ। হয়ত শিবদাসের নির্ভেদ গাম্ভীর্যকে ভয় করে ওরা। মায়ের মতই বিস্ময় হয়।

তবুও আজ ওদের বুকের ভেতর পেয়ে যেন অনেক বল পেয়েছেন তিনি। একগাদা কাপড়-জামা-জুতো। অর্থসঙ্কটের দিক থেকে বিচার করতে গেলে হয়ত অগ্নি-মূল্যই হবে। তবু কত নির্ভরতা এ-চাওয়ায়। কত বিশ্বাস। কত দাবী।

তোদের মায়ের কিছু চাই না?

শিবদাস চুপে চুপে প্রশ্ন করেছিলেন ওদের।

ঘাড়ের দেনা শোধ করে শেষে সোহাগ দেখাতে এস!

দেনা!

রমার আকস্মিক উপস্থিতিতে চমকে উঠেছিলেন শিবদাস। মুখ থেকে বেফাঁসে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা।

আকাশ থেকে পড়লে যে বড়? ছ' ছ'টি মাসের বাড়িভাড়া যে বাকী, সেকথা এখন সুযোগ বুঝে ভুলে যাবার ভাণ করলে চলবে কেন?

ভাণ ত আমি করিনি রমা! তবে আচমকা মনেও করতে পারিনি!

স্ত্রীর নির্মম পরিহাসের পিঠে সকাতরে বলেছিলেন শিবদাস।

পারবেও না! এ ধার-করিয়েদের জাতের স্বভাব, তোমার আর দোষ কি?

রমা!

দুরন্ত বিস্ময়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিলেন শিবদাস।

তুমি না আমার স্ত্রী?

মন্ত্রের জোরে সে কথাই বলা যায় বটে, কিন্তু অধিকারের আগেই আসে সর্তটা।

বলতে বলতে সমস্ত পেলবতা শুষে নিয়ে নির্মম কাঠিন্যে রুক্ষ হল রমা। গলার স্বর ক'পর্দা চড়ালো। স্বামী বা বাপের উপযুক্ত কী-এমন এ পর্যন্ত করেছ তুমি?

রমার কথায় স্তব্ধ হয়ে রইলেন শিবদাস।

বলে কি রমা? জোর গলায় স্বামীত্বের দাবী জানাবার অধিকারও কি তাঁর নেই? এতই অপরাধী তিনি? সর্তাসর্তের তুলা-দণ্ডে বিচার হবে তাঁদের নিবিড় সম্পর্ক? স্ত্রী-পুত্রের পেটের ক্ষিদে মিটিয়ে দেওয়াতেই পরিচয় স্বামীর? এত স্বার্থপর দুনিয়া?

হয়ত তাই।

অবিশ্যি রমার অভিযোগও সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়। প্রয়োজন মত অনেক কিছুই সংসারে সরবরাহ করতে পারেন না তিনি। পারবেনই বা কি করে? চাকুরী-বাকুরী ত আর করেন না। লিখে যা পান, তার সঙ্গে ধার-বাকীর গোঁজা দিয়ে কোনক্রমে চালিয়ে নেন মাসিক খতিয়ান। তাতে সিনেমা-থিয়েটারের সখ মেটে না ঠিকই, কিন্তু দুবেলা দুমুঠো পেট পুরে আহার জোটে না, একথা বলাও অন্যায়। তাছাড়া চুপ করেও বসে নেই তিনি। দিন-রাত্তির চব্বিশ ঘণ্টাই ত লিখছেন। কিন্তু লিখে আর কত হয়? কাগজের বাজারের যা মন্দা, আর আহারের অনুপান যে পরিমাণে মহার্ঘ, তাতে নিছক লেখক হিসেবে শুধু খেয়েই বাঁচা যায়, দু-দশটা সখের মুখ কচিৎ-কদাচিৎ দেখবার কথা কল্পনায়ও আনা যায় না।

তাঁর আর দোষ কি?

দোষ রমারও নয়। নিত্য-নৈমিত্তিক অভাব-অভিযোগ ত লেগেই আছে। আজ, ঘুটের পয়সা নেই। কাল, অর্থাভাবে কয়লা-মলিন কাপড়গুলো ক্ষার-কাঁচাও করা যাচ্ছে না। পরশু, বাড়িওয়ালা দাঁত-খিঁচুনির সাপ্তাহিক কর্তব্যাদি করে গেছেন। গত মাসের মাইনে না পেয়ে ঠিকে-ঝি রমার নাকের ডগায় দুহাতের দশ আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাড়া মাথায় করে পাঁচকথা শুনিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

এ সমস্তই ত রমাকে একা পোহাতে হয়। তার আর দোষ কি? সে-ও ত মানুষ। কত আর সহ্য করবে সে?

তবু।

রাগ নয়, দুঃখ হয় শিবদাসের। এরই ভেতর থেকে কি কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে নেওয়া যেতো না সংসার? ধার শোধরাবার জন্যে দু-চারটে করে পয়সা উদ্বৃত্ত রাখা চলত না? কী এমন খরচ তাঁদের? আমোদ-প্রমোদের ধার দিয়েও ত যায় না কেউ। কাপড়-চোপড়েও এমন কোন বৈচিত্র্য নেই। শিবদাসেরও নেশা নেই কোন। একযুগে বেদম চা খেতেন তিনি। বছর খানেক হল তাও ছেড়ে দিয়েছেন। তবুও এমন অচলাবস্থা কেন সংসারের?

হয়ত চাল-ডালের দাম আগের তুলনায় বেড়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর পারি-শ্রমিকের হারও ত না-বেড়ে থাকেনি। আগে লেখাপিছু পেতেন ত্রিশ টাকা করে। আর এখন পান চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ। প্রত্যেক মাসে আগে সংসারে দিতেন দেড়শো। আর এখন দিচ্ছেন দুশো করে।

কিন্তু তবুও সংসার হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলছে কেন? কেন তার সেই আগেকার স্বাভাবিক সুস্থতা নেই?

সংসারের দিকে ফিরে তাকাবার অবসরই যদি তোমার থাকবে ত ছেলে-বউ না খেয়ে খেয়ে মরবে কেন?

ওটা তোমার রাগের কথা।

বিনীত ভঙ্গীতে শিবদাস উত্তর দিয়েছিলেন।

ঘি-দুধ হয়ত জোটে না, কিন্তু তা বলে নির্জলা উপবাসও আমাদের করতে হয় না।

কিন্তু সেটাও এমন কোন পৌরুষের কথা নয় যে, জোর গলায় শোনাচ্ছ।

রাগের দমকে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল রমা।

জানি।

অসহায়ের মত কাতরস্বরে বলেছিলেন শিবদাস।

কিন্তু কি করবো বল?

অনেক কিছুই পারো করতে, কিন্তু সে-সবে ত তোমার মন নেই।

বলে একটু স্তিমিত হল রমা। মনে মনে বারকয়েক গজ গজ করে শেষে মুখ খুললো।

রাতদিন উপুড় হয়ে অকাজ না করে এক-আধটু চাকুরী-বাকুরীর চেষ্টাও করতে পারো ত?

চাকুরী!

শরাহত পাখীর মত অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিলেন শিবদাস।

হ্যাঁ, চাকুরী!

জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠলো রমা।

চমকে উঠলে যে বড়? অন্যায়টা কি বলা হয়েছে শুনি?

ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নয়, তবু তা হয় না। তুমি যেতে পারো!

পাথরের মূর্তির মত শিবদাস কেটে কেটে বলেছিলেন।

কিন্তু কি হয় বলতে পারো?

হতে পারে সবই, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত, কিন্তু পরের গোলামী নয়!

শিবদাসের কণ্ঠস্বর কেমন ভয়াবহ শোনালো।

কিন্তু স্ত্রী-পুত্রকে না-খাইয়ে রাখবার কি অধিকার আছে তোমার?

শিবদাসের মেঘ-গম্ভীর গলায় চমকে উঠেছিলো রমা। জীবনের প্রথম। তাই। তারপর সামলে নিল নিমেষে। সামলে নিয়ে বলল। আবেগের উত্তেজনায় কেঁদে ফেললো কথার শেষে। আর কাঁদতে কাঁদতেই ছুটে পালাল পাশের ঘরে।

অধিকার?

টেবিলে ছড়ানো কাগজগুলো ভাঁজ করতে করতে নড়েচড়ে বসলেন শিবদাস। বাঁ দিকের ড্রয়ার টেনে লেখা-আধলেখা কাগজগুলো রেখে দিলেন তার মধ্যে। ড্রয়ার বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন বার কয়েক। শাব্দিক হাই তুলে অলস ভঙ্গীতে তাকালেন দেয়াল-ঘড়ির দিকে। একটু চমকে উঠলেন। আধঘণ্টা উত্‌রে গেছে এরই মধ্যে। হু-হু করে বেড়ে চলেছে রাত। অথচ ঘুম নেই কেন চোখে? ঘাড়টা ঈষৎ কাৎ করে তেরছা চোখে শয্যার দিকে তাকালেন একবার শিবদাস। বেঘোরে ঘুমুচ্ছে রমা। চারপাশ ঘিরে ছিটকে রয়েছে ছেলে-মেয়েরা। বিশৃঙ্খল-ভাবে। কারও মাথা নীচের দিকে। কারও পা অপরের ঘাড়ে। সংসারটার মতই বিশৃঙ্খল ওরা। কিংবা ওদের জন্যই ছন্দ-পতন ঘটেছে সংসারের। হয়ত ওদের মায়ের জন্যেই। রমা কি পারতনা ওদের সামলাতে? পারত না ওদের নিয়মানুবর্তী করে তুলতে?

অধিকার?

মনে মনে কথাটা আউরে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলেন শিবদাস।

অধিকারের প্রশ্ন তোলে আজ রমা। যে রমাই একদিন সাহিত্য-পথে জোর করে টেনে এনে ফেলেছিল তাঁকে। স্নেহ-সহানুভূতির জল সিঁচে সিঁচে বাঁচিয়ে রেখেছিল তাঁর কবি-মানসের চারাগাছটি। নয়ত কোথায় উবে যেত নতুন কাব্যখ্যাতির উৎস! অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে পড়ে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে যেত সমস্ত উৎসাহ!

সেই রমাও কি-না আজ প্রশ্ন তোলে কর্তব্যবোধের!

আশ্চর্য!

অথচ সাংসারিক কর্তব্যের কতটুকু করতে পেরেছে রমা? ছেলে-মেয়েদের মানুষের মত গড়ে তুলতে পারেনি। বলিষ্ঠতা আনতে পারেনি ওদের চিন্তাধারায়। নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত সাহস যুগিয়ে দিতে পারেনি ওদের প্রাণে। বাপের সাথে কথা বলতে পর্যন্ত ভয়ে কাঁপে ওরা!

ভাবতে ভাবতে চোখ ঘুরিয়ে আবার ওদের দিকে তাকালেন শিবদাস।

সমীরণটা কত বড় হয়েছে। অথচ লেখা-পড়া শিখলো না কিছু। মায়ের আবদার পেয়ে পেয়ে একেবারে বিগড়ে গেছে ও। ইস্কুল ছেড়ে দিয়ে দিব্যি মায়ের বাজার-সরকার হয়ে বসেছে। সকালের বাঁধা-বাজার ছাড়াও চব্বিশ ঘণ্টা কত জিনিসের প্রয়োজন রমার। দু' পয়সা-চার পয়সার সওদা। সেগুলো ত আর তাঁকে দিয়ে হয় না, সমীরণকে ডাকতে হয়। দু'চার পয়সা এদিক-ওদিক করে হয়ত ছেলেটা, তবু, অসময়ে ওকে দিয়ে কাজও হয় অনেক। ও না-থাকলে নাকি সংসার-করা সিঁকেয় উঠতো রমার। নানা কথার ছুঁতোয় অষ্টপ্রহর এ-কথা শোনাতে ভোলে না রমা।

তারপর দেবাশীষ। দাদারও এক কাঠি ওপরে উঠেছে সে। সেদিন নাকি পকেট থেকে আধপোড়া কয়েকটা বিড়ি বেরিয়েছিল তার। রাস্তাঘাটে কেউ বিড়ি-সিগ্রেট্ খেয়ে ছুঁড়ে ফেললেই ছুটে গিয়ে ও পকেটস্থ করে তা। তাছাড়া পথে-ঘাটে সুন্দরী মেয়ের দেখা পেলেই নানারূপে উড়ো-মন্তব্য করে সে। দু' চার কলি হিন্দী গানের সুর ভাঁজে। নানারূপ কান-গরম-করা মন্তব্য করে। সেদিন নাকি কোন একটি পড়শীর সোমত্ত মেয়েকে হিজিবিজি-মাথামুণ্ড লেখা এক-টুকরো ভাঁজ করা কাগজ ছুঁড়ে মেরেছিল। আর তাই নিয়ে দুই গিন্নীতে তুমুল তর্ক। ছেলের পক্ষে সওয়াল করে জিতলেও, ওদিকের নিবৃত্তি হতেই, ছেলেকে নিয়ে পড়েছিল রমা। মারতে মারতে আধ-মরা করে আনতে আর সহ্য করতে পারেননি শিবদাস। ছুটে গিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিলেন ওকে। তারপর রক্তচক্ষু নিয়ে স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন।

ওদের গায়ে হাত তোলবার মত দুঃসাহস তোমার এল কোত্থেকে?

শিবদাসের কথা শুনে চমকে উঠেছিল রমা। কিন্তু একটি মুহূর্ত। তারপরই দুর্নিবার।

মুখ সামলে কথা বল—বলছি! আমাদের মা-ছেলের ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে এলে কোন কথায়?

কিন্তু ওরা আমারও সন্তান!

শিবদাস আহত হলেও গাম্ভীর্যে ছেদ আসতে দেন না।

সন্তান! হুঁ!

রমা নির্মম পরিহাসে ভেংচি কাটল।

কত বড় মুরদ? তা বাবা যখন, খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ কর না ওদের! সে-সময় নেংটি ইঁদুর! ভাগ তুমি আমার সামনে থেকে। বেহায়া কোথাকার!

আশ্চর্য!

সত্যি সত্যি নেংটি ইঁদুরের মতই সুর সুর করে ঘরে ঢুকলেন শিবদাস। আরো আশ্চর্য, ছেলে-মেয়েগুলো মাকেই জড়িয়ে থাকল। ইস্তক দেবাশীষ পর্যন্ত। কেবল শিবানী বাদে। রান্নাঘরের চৌকাঠ ধরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়েছিল ও। কোনরূপ বাক্যস্ফূর্তি নেই। অভিযোগ নেই।

ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই আবার চমকে উঠলেন শিবদাস।

প্রায় একটা বাজে। সাত মিনিট বাকি।

রাত অনেক হল। কিন্তু ঘুম ত নেই চোখে?

চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়ে আবার চোখ পড়ল ওদের দিকে।

নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে শিবানী। শিবানী! বড় ভালো মেয়ে। ওর নামটার মতই ভালো। শান্ত, আর সৎ। রাত-দিন বোবার মত মুখ বুঁজে কাজ করে যায়। মার ফাই-ফরমাস খাটে। ছোট-ভাই-বোনের তদারক করে। ডেকে ডেকে হাতে করে খাইয়ে দেয় ওদের। নিজহাতে আঁচিয়ে দিয়ে জামা-কাপড় পরিয়ে দেয় সবাইকে। একেবারে ছোট দুটির চোখের কোলে আবার কাজলও জড়িয়ে দেয় সুরমা-রেখার মত। জানে, ক'মিনিট পরে লেপে-পুছে একাকার হবে; তবু দেয়। কাজল পরলে বড় সুন্দর দেখায় ছোটদের!

শুধু শিবদাসের কাছেই আসে না ও। হয়ত ওদের মতই ভয় খায়।

দিন-রাত্তির লেখার ভেতর ডুবে থাকলেও শিবদাসের চোখ এড়ায় না তা।

বড় ভালো মেয়ে, বড় ভালো মেয়ে শিবানী। ওদের মত দাবী করে নিতে পারে না কিছু। মুখ ফুটে চাইতে পারে না। যা পায়, যেটুকু পায়, তাতেই সন্তুষ্ট থাকে শিবানী। সমস্ত পৃথিবীর ওপরেই যেন কোন অভিযোগ নেই তার। কোন আকর্ষণ নেই, অতি অল্পেই সন্তুষ্ট সে, সামান্যতেই তৃপ্ত। ঠিক শিবদাসেরই মত। মায়ের সাথে আশ্চর্য ব্যতিক্রম কেবল ওই। অন্য ভাই-বোনের মত একেবারে উচ্ছন্নে যায়নি এখনও।

হামেশাই এরা ঠকে থাকে।

ভাবতে গিয়ে বুক চিরে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে শিবদাসের। সত্যি এরা ঠকে যায়। বাস্তব-বিশ্বের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। তাই ঠকে যায়।

মাটির পৃথিবীটা কি তবে সৎ-লোকের জন্য নয়?

মনে মনে কথাটা আউড়ে চমকে ওঠেন শিবদাস।

হয়ত তাই। হয়ত কেন, সত্যি তাই। কুড়ি বছরের সাধনা দিয়ে এ-কথারই প্রতিধ্বনি শুনলেন তিনি। প্রথম যৌবনের দিনগুলি ত প্রাক্-বার্ধক্যে দাঁড়িয়ে হুবহু মনে করা যায় না। তবুও জোর গলায় বলতে পারেন শিবদাস, অজ্ঞানেও কারো ক্ষতি করেননি তিনি। অবস্থার তাড়নায় উপকার হয়ত তেমন করতে পারেননি, কিন্তু সর্বনাশ করেননি কারোও। এ-আত্মবিশ্বাস, এ-গর্ব তাঁর আছে।

তবুও পৃথিবীর সাথে তাল রাখতে পারছেন না তিনি কেন?

জগতের কাছে দাবী ত তাঁর বেশি নয়। দুটি আহার আর কয়েকখণ্ড শান্ত অবসর। অথচ বিনিময়ে তিনি দিচ্ছেন কী প্রাণ-প্রাচুর্য! কত মহার্ঘ সামগ্রী! জীবনের রস-সম্ভার তিল তিল করে নিঃশেষিত করে ভরিয়ে তুলছেন রূপময় পৃথিবী। রূপ-রস-গন্ধের অপরূপ সংকরতায় মিলছে সূর্যমুখ সুস্বাস্থ্যের সুঘ্রাণ।

তবু তিনি পরাজিত কেন?

ঢং করে দেয়াল-ঘড়িতে শব্দ উঠতেই চমক ভাঙলো শিবদাসের।

একটা বাজলো। আর জাগা ঠিক হবে কি? সমস্ত পৃথিবী নিঃসাড়ে সুষুপ্তির কোলে ঢুলে পড়েছে। রাস্তার বুকেও আর বাজছে না টুকরো কথার ঝঙ্কার। ক্লান্ত রিক্সার ক্ষীণ টুং-টাং ধ্বনি।

রাত অনেক হল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শিবদাস। ঘূরণ-চেয়ারের মত নিজের ঊর্ধ্বাঙ্গকে ঘুরিয়ে একবার দেখে নিলেন বিছানার দিকটা। না, এখনও নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে ও। এতটুকু ছেদ পড়েনি ওদের শান্তিতে। এতটুকু ব্যাঘাত ঘটেনি।

তাঁর জীবনেও কি অমন শান্তি আসতে পারে না? ওই অবাধ ঘুমান শান্তি? ফুলে-ফলে উচ্ছ্বসিত করে তুলতে পারে না তাঁর জীবন?

না। তা আর হয় না। সে সময় চলে গেছে এক যুগ আগেই। সে সময়ই দরকার ছিল তাঁর। যখন জীবনকে রাঙিয়ে তুলতে পারতেন তিনি। পূর্ণ স্বাস্থ্যে বিকশিত করতে পারতেন। প্রাক্-বার্ধক্যে দাঁড়িয়ে আজ আর সে-ব্যর্থ জীবনকে রাঙিয়ে তোলা যায় না।

কিন্তু শিবানী কি পেতে পারে না? ওর ওই ঘুমের মত নিটোল শান্তি জীবনেও পেতে পারে না সে? সুস্থ আঙুরের মত বেঁচে থাকতে পারে না অপার উচ্ছলতায়? রূপ-রসে রাঙিয়ে উঠতে পারে না ওর জীবন? এ-কূল ভেঙে গড়া যায় না নদীর ও-কূল?

সুপ্রকাশ!

হ্যাঁ, সুপ্রকাশই ত। সুপণ্ডিত সুদর্শন সুপ্রকাশ। শিবানীর মতই নিটোল। শিবানীর মতই লোভনীয়। শিবানীর মতই সূর্যমুখ।

শিবানী ভালোবাসে তাকে। চায় তাকে! ভক্তি করে দেবতার মত।

সুপ্রকাশের বাবার অনেক খাঁই। অনেক। বাবার বাজার দরে সুপ্রকাশ রাজকন্যার কণ্ঠলগ্ন। চাঁদের মতই সুদুর্লভ।

কিন্তু! শিবানী কি শুকিয়ে যাবে? ভরা-জোয়ারের অবাধ উচ্ছলতায় মর্মরিত হবে না ওর জীবন-সংগীত? শিবদাসের মতই ঝড়ে পড়বে ধূলি-রুক্ষ ধরণীর ধূসরতায়, গড়িয়ে পড়বে পদ্মপত্রের নিটোল শিশির-বিন্দু?

না!

আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে শিবদাস ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন শিবানীকে। আচমকা ঘুম-ভাঙায়, ভয়ে আর্তনাদ করে চোখ মেলে তাকাল শিবানী। বাবার দিকে তাকিয়ে কাঁপতে কাঁপতে মূর্চ্ছা এল তার।

ভয় কি!—ভীরু পাখীর মতই ডানার আড়ালে ঢেকে রাখলেন ওকে শিবদাস—হ্যাঁ, শুধু তোর জন্যেই চাকরী করব আমি!

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

(১৯)

বিক্ষুব্ধ চায়ের আসরে হায়দরাবাদের রাজনীতি। মজলিসী নেতার দাবী—বৈদেশিক নীতির স্বাধীনতা চাই। পাকিস্থান সম্পর্কে মজলিসী নেতার চিন্তা। মুসলিম নেতা মিঃ রেইসের স্বীকৃতি—হায়দরাবাদ হলো মুসলিম রাষ্ট্র। "মুসলমানেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোনমতেই হাতছাড়া করতে রাজী হবে না।" রাজনৈতিক তিক্ততা ও সামাজিক অন্তরঙ্গতার সংমিশ্রণ। লায়েক আলির বক্তব্য—নিজাম কেন দিল্লী গেলেন না। ইংলণ্ডের বিরোধী দলের সমর্থন আশা করছেন নিজাম। জইন ও নিজামের আলোচনা। নিজাম আবার ক্ষুব্ধ। আইন প্রণয়নের অধিকার কখনই ছেড়ে দেবেন না নিজাম। নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠনের প্রশ্ন। রাজাকর দলের সাহায্যে এল-এদ্রুস।

হায়দরাবাদের কুছ্-পরোয়া-নেই মনোভাব। নীরব দীন ইয়ার জঙ্গ। সকল ব্যাপারের মূলে নিজামের অনুমোদন। রাজ্যের অভ্যন্তরীণ আপত্তি দমনে নিজামের শক্তি। 'স্যামসন' পদ্ধতি ও নিজামের প্রস্তুতি। রাজ্যের ভাঙ্গন সম্পূর্ণ করবার পরিকল্পনা। ভগ্ন হায়দরাবাদও সমস্যা হয়েই থাকবে। নিজামের মনোভাব—'নিয়মতান্ত্রিক অধিপতি'র পদ অমর্যাদাকর। স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রভুক্তিতে কখনই সম্মত হবেন না নিজাম। হায়দরাবাদ সম্পর্কে ভি পি মেননের মনোভাব কঠিন হয়েছে। হায়দরাবাদের ইতিহাস সম্পর্কে নেহরু। নিজামের ব্যক্তিগত ধনরত্নের অধিকারের প্রশ্ন ও নেহরুর আশ্বাস। নিজামের বীরোচিত ভঙ্গী সম্বন্ধে নেহরু। ভি পি ও জইন ইয়ার জঙ্গের আলোচনা বিফল। শেষ চেষ্টার জন্য প্রস্তুতি।

হায়দরাবাদ, সোমবার, ১৭ই মে, ১৯৪৮ সাল। বিক্ষুব্ধ চায়ের আসরে বসে কংগ্রেসী ও মজলিসী নেতাদ্বয়ের বিতণ্ডা শুনলাম। মুসলিম নেতাদের মধ্যে অনেকেই হায়দরাবাদের বৈদেশিক নীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন যে, এ বিষয়েও হায়দরাবাদের স্বাতন্ত্র্য বর্জন করা উচিত হবে না। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে হায়দরাবাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। মুসলিম নেতাদের অনেকেই শুনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন যে, ভারত ইউনিয়ন হায়দরাবাদের বৈদেশিক নীতির স্বতন্ত্রতা লুপ্ত করে দিতে ইচ্ছে করছেন। ভারতের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে হায়দরাবাদের বৈদেশিক নীতিকেও এক ক'রে ফেলবার প্রস্তাবে এ'রা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ক্ষুব্ধ হবার বিশেষ একটি কারণও আছে এবং সেটা এ'দেরই কথা থেকে বুঝতে পারলাম। পাকিস্থান সম্পর্কে ভারত যদি বিরোধিতার নীতি অবলম্বন করেন, তবে হায়দরাবাদ কেমন করে সেই নীতিকে অনুমোদন করবে? একি সম্ভবপর? এই প্রশ্নই হায়দরাবাদের মুসলিম নেতাদের চিন্তা অধিকার করে রয়েছে।

দু পক্ষের নেতারাই অবশ্য একটি বিষয়ে একমত হলেন। হায়দরাবাদের সমস্যা হায়দরাবাদের 'ভেতর' থেকেই সমাধান করতে হবে, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। হায়দরাবাদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার জন্য যে ব্যবস্থা প্রয়োজন, সেটা হায়দরাবাদেরই ভেতর থেকে এবং হায়দরাবাদের নিজের চেষ্টাতেই করতে হবে। বাইরের হস্তক্ষেপে কোন সমাধান সম্ভবপর নয় এবং সেটা বাঞ্ছনীয়ও নয়। কংগ্রেস পক্ষের নেতারাও বললেন যে, নিজামের প্রতি তাঁদের আনুগত্য আদৌ শিথিল হয়নি এবং সেরকম কোন সম্ভাবনাও নেই। মজলিসী নেতা মিঃ রেইস হঠাৎ বলে ফেললেন যে, হায়দরাবাদ হলো একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং প্রশ্ন হলো—এই মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষমতা থাকবে কাদের হাতে? মিঃ রেইস বললেন, হায়দরাবাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করার ব্যাপার নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। সোজা কথায়, এই দ্বন্দ্বই হলো বর্তমান হায়দরাবাদের সমস্যা। আরও সোজা সত্য কথা এই যে, এই দ্বন্দ্বে হায়দরাবাদের মুসলমানেরা তাদের ক্ষমতা কোনমতেই ছেড়ে দিতে রাজী হবেন না।

চা-পানে পরিতৃপ্ত হতে পারছিলাম না। অন্য কিছু পানীয়ের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। সুতরাং গাত্রোত্থান করলাম।

আমি বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে চায়ের আসরও ভেঙ্গে গেল। সকলেই বিদায় নিলেন। সভাভঙ্গের পর বিদায়ের দৃশ্যটাও চোখে বড়ই অদ্ভুত লাগলো। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হাতে হাত মিলিয়ে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন। অন্তরঙ্গ সুহৃদের মত প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হাত ধরে বললেন—আজ চলি, আবার দেখা হবে।

ভদ্রমণ্ডলীর কাছ থেকে আমিও নানারকম প্রশংসার উপহার লাভ করলাম। সকলেই একবাক্যে আমার সম্বন্ধে এই ধারণা প্রকাশ করলেন যে, বয়সে অল্প হলেও আমার মোটামুটি ভাল রকমেরই বিচক্ষণতা আছে। চায়ের আসরে দুই বিপরীতের মিশ্রণ দেখে আমি আবার বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। বাইরের ঘটনার দিকে তাকিয়ে বুঝা যায় যে, চায়ের আসরের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মন রাজনৈতিক কারণে কিরূপ তিক্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক তিক্ততা সত্ত্বেও সামাজিক আচরণে কি অদ্ভুত সৌজন্য ও সৌহার্দ্যের ভাব!

সভাভঙ্গের পর এসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি এসে সম্মুখে উপস্থিত হলেন এবং প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বললাম, তার মধ্যে স্পষ্ট ক'রে কোন মন্তব্যের ধার-কাছ দিয়েও গেলাম না। যা বললাম, সেটা বস্তুতঃ কিছু না বলারই মত। রাজনৈতিক পরিবেশ যেখানে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে, সেখানে সামান্য কোন মন্তব্য করলেই কোন-না-কোন পক্ষ থেকে বিরুদ্ধ

সমালোচনার ঝড় দেখা দেবে, এ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। আমার ধারণা, মন্তব্য না করলেও সমালোচনা হবে। কিন্তু এটা জানি যে সে ক্ষেত্রে সমালোচনার পরিমাণও তেমন বেশী কিছু হবে না। আমার বিশ্বাস, দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপকভাবে আমার দৌত্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশের বা বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্ভাবনা আমি সযত্নে পরিহার করতে পেরেছি।

রাত্রি আটটার সময় প্রধান মন্ত্রী মীর লায়েক আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ আলাপও এইবার শেষ হলো।

লায়েক আলীকে আমি বললাম—ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হবে এই আশংকা করেই নিজাম দিল্লী যেতে রাজী হননি, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

লায়েক আলী বললেন—নিজামের মনে হয়তো এ ধরণের একটা সন্দেহ ছিল; কিন্তু দিল্লীর আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন প্রধানতঃ অন্য একটি কারণে এবং এইটিই হলো আসল কারণ। নিজামের ধারণা এই যে, তিনি দিল্লী গেলে হায়দরাবাদের ভেতরেই তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা রকম ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হতো এবং সেটা তাঁর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হতো।

লায়েক আলীকে আমি আর একটি বিষয়ে আমার মনের কথা জানিয়ে দিলাম। ইংলণ্ডের বিরোধী দলের মুখ চেয়ে বসে থাকার কোন অর্থ নেই, চার্চিলের নেতৃত্বে চালিত বিরোধী দলের কাছ থেকে নিজাম সমর্থন লাভ করবেন, এই বিশ্বাস ও আশার ওপর নির্ভর ক'রে থাকা নিতান্তই ভুল। আমি বললাম—নিজামকে ইংলণ্ডের বিরোধী দলের সমর্থনের আশা ক'রে বসে থাকতে দেখে আমি দুশ্চিন্তাই বোধ করছি। এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই যে, বিরোধী দলের সমর্থন আশা করা নিজামের পক্ষে বস্তুতঃ একটা বিপজ্জনক কল্পনায় মোহগ্রস্ত হ'য়ে থাকা ছাড়া আর কিছু নয়। বৃটেনের কমন্স সভায় বিভিন্ন দলের বিতর্কে ও মতভেদে হায়দরাবাদ সত্যি সত্যই যদি একটা প্রশ্ন হয়েও ওঠে, তবুও তাতে হায়দরাবাদের তথা নিজামের কোন লাভ হবে না।

লায়েক আলী বললেন যে, তিনি আমার প্রত্যেকটি যুক্তির সত্যতা স্বীকার করছেন। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর কোন মতভেদ নেই। লায়েক আলী আরও বললেন যে, ব্যক্তিগতভাবে এটলীর সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ ধারণা পোষণ করেন। লায়েক আলীও চান না যে, হায়দরাবাদের প্রশ্ন নিয়ে ইংলণ্ডের বিভিন্ন দলের মধ্যে কোথাও মতভেদ ও তর্কের হানাহানি হোক্।

আমি হায়দরাবাদে আসাতে খুবই প্রীত হয়েছেন লায়েক আলী—আলোচনার উপসংহারে তিনি এই কথা জানালেন। আরও বললেন, আমার হায়দরাবাদ আগমন সব দিক দিয়ে খুবই সহায়ক হয়েছে।

জইন নওয়াজ জঙ্গের পুত্রের ভবনে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। জইনের পুত্র ও সুন্দরী পুত্রবধূর সঙ্গে এক টেবিলে আহারের পর্ব সেরে নিলাম। তার পরেই জইনের কাছ থেকে আহ্বান এলো, আমার সঙ্গে একবার তিনি সাক্ষাৎ করতে চান। আজই বিকালে দিল্লী থেকে হায়দরাবাদে এসেছেন জইন।

জইনের ভবনে যখন পেঁৗছলাম, তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। জইন বললেন যে, তিনি হায়দরাবাদে পেঁৗছেই নিজামের সঙ্গে দেখা করেছেন। নিজাম আবার ভয়ানক রকমের চটেছেন।

জইন বললেন, কিন্তু সর্বদা চটে থাকাই তো তাঁর স্বভাব।

নিজামের সঙ্গে কি বিষয়ে জইনের আলাপ হয়েছে, তার বিবরণও শুনলাম। নিজের রাজ্যে নিজের ইচ্ছামত আইন করবার ক্ষমতা হাতছাড়া করতে রাজী নন নিজাম। আইন প্রণয়নে নিজামের 'সার্বভৌম' ক্ষমতা এক বিন্দুও এদিক-ওদিক হতে দিতে তিনি চান না। এ বিষয়ে মনোভাব অত্যন্ত কঠিন ক'রে বসে আছেন নিজাম।

জইন নিজামকে বলেছেন যে, বর্তমানে যে গবর্ণমেণ্ট রয়েছে, সে গবর্ণমেণ্টকে দিয়ে আর কাজ চালান উচিত নয়। গবর্ণমেণ্ট গঠনের ভিত্তি আরও প্রশস্ত হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয় এবং তার খুব প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে। জনসাধারণের অধিকতর প্রতিনিধিত্বশীল একটি নতুন গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে গঠন করা কর্তব্য।

জইনের কথা থেকে বুঝলাম যে, শেষ পর্যন্ত নিজাম ও লায়েক আলী উভয়েই এই পরিবর্তনটুকু করতে রাজী হয়েছেন—বর্তমান গবর্ণমেণ্টের বদলে একটি অধিকতর জনপ্রতিনিধিত্বশীল গবর্ণমেণ্ট গঠন।

জইনের কাছে আমার কথাও উল্লেখ করেছেন নিজাম। নিজাম বলেছেন, 'আমি আমার মনের কোন কথা চেপে না রেখে ঐ লোকটিকে সব বলে দিয়েছি। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন যে হায়দরাবাদে আসবেন, এমন কোন আশাই আর দে[খতে] পাচ্ছি না।'

জইনের কাছেও প্রশ্ন করেছেন নি[জাম] —'আপনি কি মনে করেন? মা[উণ্ট]ব্যাটেন কি আসবেন?'

জইন উত্তর দিয়েছেন—মাউণ্টব্যাটে[নের] ব্যক্তিগত প্রতিনিধি এখান থেকে দিল্লী ফিরে গিয়ে তাঁকে যে ধরণের রি[পোর্ট] দেবেন, তারই ওপর অনেকটা নি[র্ভর] করছে মাউণ্টব্যাটেন হায়দরাবাদে আস[বেন] কি না।

একথা শোনবার পর নিজাম আ[মার] সম্বন্ধে জইনের কাছে প্রশ্ন করেছেন সত্যি সত্যি ঐ লোকটা কে বলুন তো কি করে লোকটা? এর রাজনীতিই [বা] কি ধরণের?

আমার কাছে এইবার জইন তাঁর মনে[র] কথা খুলে বললেন। তাঁর ধারণা, সমস্যা[র] সমাধান হতে পারে, যদি আইন প্রণয়নে নিজামের ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা বিশে[ষ] নীতি ভারত গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করতে রাজী হন। আইন প্রণয়নে নিজামের কিছুটা ব্যক্তিগত ক্ষমতা ভারত স্বীকার ক'রে নিলে গোলমাল অনেকখানি মিটে

যায়। জইন বললেন, এদিক দিয়ে ভারত সরকার একটু উদার হলে 'রাষ্ট্রভুক্তি' কথাটার বিরুদ্ধে নিজামের আপত্তিকেও দূর করা সম্ভবপর হবে।

জইন বললেন যে, তিনি আগামী মঙ্গল ও বুধবার নিজামের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করবেন এবং প্রসঙ্গক্রমে এই প্রস্তাবটিই উত্থাপন করবেন। আইন প্রণয়নে নিজামের কিছুটা ব্যক্তিগত ক্ষমতা যদি স্বীকৃত হয়, তবে রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাবেও সম্মত হওয়া চলতে পারে, এই হলো জইনের প্রস্তাব। অবশ্য রাষ্ট্রভুক্তির অর্থ ভারতকে তিনটি মাত্র ক্ষমতা ছেড়ে দেবার ব্যাপার বুঝাবে, আর কোন ক্ষমতা নয়। 'দেখি, নিজাম সম্মত হন কি না'—জইন বললেন।

জেনারেল এল-এদরুসের সঙ্গেও আলোচনা করবেন জইন। জইন বললেন, দিল্লী এই অভিযোগ উত্থাপন করেছে যে, এল-এদরুস রাজাকর দলকে সামরিক সাহায্য দিচ্ছে। এ ব্যাপার নিয়ে দিল্লীতে অত্যন্ত উদ্বেগ ও তিক্ততা দেখা দিয়েছে। সুতরাং এল-এদরুসকে স্পষ্ট ক'রেই কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে।'

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার—১৮ই মে, ১৯৪৮ সাল। প্রাতরাশ সমাপনের পর মীর লায়েক আলির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ক্যাপ্টেন বেগ বিমান ময়দান পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গেই রইলেন। এইবার হায়দরাবাদের কাছ থেকেই বিদায় নিলাম।

হায়দরাবাদ এসে সকল পক্ষের নেতাদের কাছ থেকেই তাঁদের অভিমত জানবার সুযোগ পেয়েছি। এদিক দিয়ে আমাকে কোন বাধা পেতে হয়নি: সকলে মন খুলেই কথা বলেছেন। দীন ইয়ার জঙ্গ অবশ্য একমাত্র ব্যতিক্রম, তিনি কথা বলেছেন খুবই কম। কিন্তু নীরব দীন ইয়ার জঙ্গও আমার বক্তব্য বেশ আগ্রহ নিয়েই শুনেছেন এবং তাঁর আচরণেও সৌজন্যের কোন অভাব হয়নি।

আরও একটা কথা ভাবছি। আমার হায়দরাবাদ আগমনে এবং হায়দরাবাদের এই সব বিশিষ্ট ও প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলোচনায় কোন সুফল হলো কি না? আমার ধারণা, একটা সুফল হয়েছে। একটা কুছ-পরোয়া-নেই ধরণের মনোভাব এখানে খুবই প্রবল হয়ে উঠেছিল। যেন একটা ইজ্জতের লড়াই আরম্ভ হয়েছে এবং হয় ইজ্জৎ নিয়ে বাঁচবো, না হয় মরবো—এই রকম একটা মনোবৃত্তির প্রভাবেই এখানকার রাজনৈতিক সমস্যা কঠিন ও জটিল হয়ে ছিল। আমার ধারণা, আমি আসাতে এই মনোভাব অনেকটা নরম হয়েছে। আলোচনার পথে এখনো কাজ হতে পারে এবং আলোচনার পথ খোলাও আছে, এই ধারণা খুবই ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি অন্ততঃ এইটুকু করতে পেরেছি যে, আলোচনার পথেই মীমাংসার জন্য আর একবার চেষ্টা করার কথাটা অনেকেই ভাবতে আরম্ভ করেছেন।

নিজামই হায়দরাবাদের প্রধান 'শক্তি'। নিজামের অনুমোদন, ইঙ্গিত অথবা পরামর্শ ছাড়া হায়দরাবাদের কোন নীতিই রচিত হয় না। ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদের আচরণ ও মনোভাবের প্রত্যেকটি ব্যাপার নিজামেরই অনুমোদনে পরিচালিত হয়ে থাকে। এটাও নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছি যে, ভারতের সঙ্গে কোন ব্যবস্থায় অথবা কোন চুক্তি পালনে যদি প্রতিশ্রুতি দান করেন নিজাম, তবে সেই প্রতিশ্রুতির মর্যাদাও তিনি রক্ষা করবেন। রক্ষা করবার শক্তিও তাঁর আছে। তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরে কোন পক্ষ যদি আপত্তি করে, অথবা প্রতিরোধ করতে উদ্যত হয়, তবে নিজাম সেই অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ দমন করতেও পারবেন।

অদ্ভুত একপ্রকারের 'জবরদস্ত অদৃষ্টবাদে'র প্রকোপে অভিভূত হয়ে আছে নিজামের মন। ভারত গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আচরণে তিনি বস্তুতঃ 'স্যামসন' পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য তৈরী হয়ে রয়েছেন। এ কাজ করার মত শক্তিও তাঁর আছে। যদি ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন নীতি, কাজ বা চাপের ফলে নিজামকে তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অধিকার হারাতে হয়, তবে তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে হায়দরাবাদ রাজ্যের সমগ্র রাজনৈতিক ও সামাজিক আয়তনও যেন ভেঙ্গে পড়ে। যাতে ভেঙ্গে পড়ে, সেই ব্যবস্থাই করে রেখেছেন নিজাম। এ ছাড়া রয়েছেন কাশিম রেজভি। তিনি যে পন্থায় কাজ করে যাচ্ছেন, তার উদ্দেশ্যও বস্তুতঃ নিজামের এই পরিকল্পনাকেই সাহায্য করা। হায়দরাবাদ রাজ্যকে যদি ভাঙ্গতেই হয়, তবে সে ভাঙ্গন একেবারে সম্পূর্ণ ক'রে দিতে হবে, এই হলো রেজভি-নীতি। ভগ্ন হায়দরাবাদও ভারত গবর্ণমেণ্টের কাছে একটা সমস্যা হয়েই থাকবে, হয়তো সামরিক শক্তির সাহায্যে হায়দারাবাদ জয় করে নেবেন ভারত গবর্ণমেণ্ট, কিন্তু জয় ক'রে নেবার পরেও হায়দরাবাদের সমস্যার যেন সমাধান না হতে পারে, এই উদ্দেশ্য নিয়েই রেজভি কাজ ক'রে যাচ্ছেন।

কিন্তু এ সত্ত্বেও নিজাম আবার আর একদিক দিয়ে এবং প্রচ্ছন্নভাবে একটা মীমাংসাই খুঁজছেন। তাঁর পক্ষে যাতে যথোচিত মর্যাদাসম্মত একটা মীমাংসা হয়, তারই জন্য আড়ালে আড়ালে এবং পাকে-প্রকারে একটা চেষ্টা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নিজাম। 'নিয়মতান্ত্রিক অধিপতি'র পদ গ্রহণের প্রস্তাব তিনি অমর্যাদাকর বলেই মনে করেন। এই 'ফাঁদে' তিনি আবদ্ধ হতে চান না। এবিষয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মনে যে ধরণের আপত্তি ছিল, নিজামের মনেও যেন সেই ধরণের আপত্তি ও প্রতিবাদ অত্যন্ত প্রবল হয়ে রয়েছে।

আমার ধারণা, বাস্তব অবস্থা ও যুক্তির দিক দিয়ে নিজাম যতই কোণঠাসা হয়ে পড়বেন, তিনি ততই বেশী ক'রে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভুত্বের 'বিশেষ অধিকার' নিয়ে জেদ আর বাড়াবাড়ি করতে থাকবেন। নিজাম যে স্বেচ্ছায় 'রাষ্ট্রভুক্তি' স্বীকার ক'রে নেবেন, এটা আমি [illegible] বিশ্বাস করি না। নিজেরই রাজ্যের অভ্যন্তরে আইন ও কানুনের মাত্র একজন 'সরকারী' নিয়ন্তা হয়ে থাকতে হবে, এ অবস্থা মেনে নিতে কখনই রাজী হবেন না নিজাম।

অনেকেই অবশ্য এখনো এই ধারণা করছেন যে, একমাত্র মাউণ্টব্যাটেনেরই ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা মীমাংসার একটা পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নিজাম এটা বিশ্বাস করেন না। এ বিষয়ে নিজামের মনে যথেষ্ট সংশয় আছে।

আপাততঃ নিজামের সঙ্গে বুঝা-পড়া করার মত আর কিছু নেই। নিজামের সঙ্গে আলোচনা ক'রে মতভেদের অথবা বিরোধীয় বিষয়গুলির কোন মীমাংসা বা সামঞ্জস্য সাধনের কোন সুযোগ নেই। একমাত্র ভরসা, ভি পি মেনন ও জইন ইয়ার জঙ্গ। এই দুই ব্যক্তি যদি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মতভেদের বিপুলতা ও জটিলতা হ্রাস ক'রে ফেলতে এবং মীমাংসার কোন সূত্র নির্ণয় করতে পারেন, তবেই মাউণ্টব্যাটেনের 'শেষ চাপে' একটা সুফল হতে পারে।

দিল্লীতে এসেই আমি প্রথমে গিয়ে ভি পি'র সঙ্গে দেখা করলাম। ভি পি এখন দেশীয় রাজ্যগুলির প্রদেশভুক্তির পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন।

ভি পি বললেন যে, আমার হায়দরাবাদ যাত্রার ফল ভালই হবে বলে তিনি মনে করছেন। আমি হায়দরাবাদের সেই বিশেষ দাবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম। রাজ্যের অভ্যন্তরে আইন প্রণয়নে নিজামের ব্যক্তিগত অধিকারের দাবী। ভি পি এ বিষয়টি আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন না এবং আলোচনা করবার কোন আগ্রহও ভি পি'র আচরণে দেখা গেল না। বুঝতে পারলাম হায়দরাবাদ সম্বন্ধে ভি পি'র মনোভাব আগের তুলনায় এখন আরও বেশি কঠিন হ'য়ে উঠেছে। আমি হায়দরাবাদে যাবার আগে ভি পি-কে হায়দরাবাদের প্রতি এতটা শক্ত হতে দেখিনি। এখন এসে দেখছি, এই ক'দিনের মধ্যেই তাঁর ধারণা অনেকখানি বদলে গেছে।

জইন আর কয়েক দিনের মধ্যেই হায়দরাবাদ থেকে দিল্লী এসে পৌঁছবেন। আমি ভি পি'কে অনুরোধ করলাম—জইন না আসা পর্যন্ত এবং তাঁর সঙ্গে আপনার একটা আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত আপনি হায়দরাবাদ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ধারণা অবলম্বন করবেন না।

ভি পি বললেন যে, তিনি হায়দরাবাদকে 'চূড়ান্ত প্রস্তাব' জানিয়ে দেবার কথাই চিন্তা করছেন। চূড়ান্ত প্রস্তাবের বক্তব্যগুলিও কিছু কিছু উল্লেখ করলেন ভি পি। কিন্তু আমারও শরীরের ও মনের ক্লান্তিও চূড়ান্ত অবস্থা লাভ করেছিল। ভি পি'র বক্তব্য ও বক্তব্যের যৌক্তিকতা বুঝতে আমারও অসুবিধা হলো। বুঝতেও পারলাম না।

নয়াদিল্লী, বৃহস্পতিবার, ২০শে মে, ১৯৪৮ সাল। মাউণ্টব্যাটেন আছেন সিমলাতে। আমাকেও সিমলা যেতে হবে। কিন্তু যাবার আগেই মাউণ্টব্যাটেনকে আমার হায়দরাবাদ-দৌত্যের একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবার জন্য তৈরী হয়েছি। পুরো একটা দিন রিপোর্ট লিখতেই কেটে গেল।

আজ বিকালে নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাঁর সঙ্গে আলোচনা হলো। হায়দরাবাদ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ও অভিমত মোটামুটিভাবে নেহরুর কাছে বর্ণনা করলাম।

নেহরু বললেন, হায়দরাবাদের ইতিহাসটাই অগৌরবের ইতিহাস। যখনই বাইরের কোন শক্তি হায়দরাবাদের ওপর চাপ দিয়েছে, তখনই হায়দরাবাদ আত্মসমর্পণ করেছে, কখনো প্রতিরোধ করেনি। মারাঠা শক্তির দাপটে হায়দরাবাদ কিভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল, সেই ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করলেন নেহরু।

নেহরু বুঝেছেন যে, নিজাম তাঁর ধনরত্নের পুঁজি এবং ব্যক্তিগত 'বিশেষ অধিকার' রক্ষা করার জন্য খুবেই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। নেহরু বললেন, এ বিষয়ে তিনি নিজামকে আশ্বাস দিতে রাজী আছেন। হায়দরাবাদের ওপরে ভারতীয় সংবিধান চাপিয়ে দেবার কোন উদ্দেশ্য নেহরু পোষণ করেন না। হায়দরাবাদ রাষ্ট্রভুক্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হলে হায়দরাবাদের ওপর 'তিনটি' অধিকার ছাড়া আর কোন অধিকার লাভের কথা চিন্তা করেন না ভারত গবর্ণমেণ্ট। যদি কখনো প্রয়োজন হয়, তবে সে বিষয় নতুন ক'রে এবং ভিন্নভাবে আলোচনা করা হবে, তার জন্য স্বতন্ত্র চুক্তিরও প্রয়োজন হবে। নেহরু বললেন, হায়দরাবাদের সৈন্যবাহিনীকেও গ্রাস ক'রে ফেলবার, অর্থাৎ ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করবার কোন পরিকল্পনা তিনি পোষণ করেন না।

নিজামের ধর্মবিশ্বাসের কথা এবং মহরম সম্বন্ধে নিজামের মন্তব্যও নেহরুর কাছে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করলাম। নেহরু বললেন যে, মহরম সম্বন্ধে নিজামের আগ্রহপূর্ণ উক্তির একটা বিশেষ অর্থ আছে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকেই কেন্দ্র ক'রে যে বিরোধের সূত্রপাত হয়, তার ফলে মুসলমানেরা শিয়া ও সুন্নি নামে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। হায়দরাবাদী মুসলমানেরা হলেন সুন্নি। অনেকেই সন্দেহ করেন যে, নিজাম হলেন প্রচ্ছন্ন শিয়া।

নিজামের মতিগতি বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য—মন্তব্য করলেন নেহরু। হয় জীবনে গৌরব ও ইজ্জৎ, নয় মৃত্যু—এরকম বীরত্বপূর্ণ ভাবনার দ্বারা নিজামের প্রকৃতি গঠিত কি না, সে বিষয়ে নেহরুর সন্দেহ আছে। নেহরু বললেন, নিজাম যে কোনরকমের বীরোচিত ক্রিয়াকলাপের পরিচয় দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, একথা আমি বিশ্বাস করি না, কারণ সে যোগ্যতা তাঁর একেবারেই নেই।

জইন দিল্লীতে এসেছেন, কিন্তু ভি পি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন কি না, সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। কিন্তু আজই রাত্রি ৯টার সময় ভি পি জইনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য হায়দরাবাদ হাউসে উপস্থিত হলেন। আর কিছুক্ষণ পরেই আমিও সেখানে উপস্থিত হলাম।

ভারত হ'তে মাউণ্টব্যাটেনের বিদায়ের অবধারিত দিনটি ক্রমেই নিকটতর হয়ে আসছে। ওদিকে হায়দরাবাদ রাজ্যের সীমানা-অঞ্চলের অবস্থাও উপদ্রবে ও উত্তেজনায় অস্থির। ভি পি এখন অত্যন্ত স্পষ্ট এবং কঠোরভাবেই বলতে আরম্ভ করছেন—এ অবস্থা আর বেশী দিন চলতে দেওয়া যায় না।

জইনের সঙ্গে আলোচনায়ও কোন ফল হলো না। পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করার জন্য কয়েকটি কর্মসূচীর প্রস্তাব এই আলোচনার মধ্যে উত্থাপিত হলো ঠিকই, কিন্তু উত্থাপিত হলো মাত্র। দু'পক্ষই সেসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

মাত্র এই প্রস্তাব করা হলো যে, মীর লায়েক আলিকে আগামী ২২শে তারিখে দিল্লীতে আসার জন্য আমন্ত্রণ করা হবে। নেহরু এবং ভি পি যাবেন মুসৌরীতে, প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনার জন্য। আর, মাউণ্টব্যাটেনকে তৈরী থাকতে হবে ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার ব্যাপারে শেষবারের মত কিছু করবার জন্য।

(ক্রমশঃ)

পুরানো দিনের দানাপুর

সরলাবালা সরকার

সন ১২৯৭ সলের মাঘ মাস। একষট্টি বৎসর আগের কথা। হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভের যোগ। দলে দলে যাত্রী রওনা হইতেছেন। আমি এক যাত্রীদলের সঙ্গেই রওনা হইয়াছিলাম, কিন্তু হরিদ্বার পর্যন্ত না পৌঁছিয়া নামিয়াছিলাম দানাপুরে।

যাত্রীদলে ছিলেন আমার ঠাকুরমা, পিসিমা এবং আরও অনেকে। আমাকে হরিদ্বারে সঙ্গে লইয়া যাওয়া যদিও তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাবার মত ছিল না। বাবা দানাপুরে তার করিয়া দিয়াছিলেন আমার মেসোমহাশয়ের কাছে, যেন স্টেশনে লোক পাঠাইয়া আমাকে নামাইয়া লইয়া যাওয়া হয়।

আমার মায়েরা ছিলেন তিন বোন, আর মাসীমা (যাঁর নাম স্থিরসৌদামিনী) তিনিই ছিলেন বোনেদের মধ্যে সকলের বড়। মাসীমার পরের দুই বোন এ সময় কেহই জীবিত ছিলেন না, তাই তিনিই ছিলেন মাতৃহীনদের মা। মেজমাসীমার দুই ছেলে ছোড়দাদা আর বড়দাদা তাঁরই কাছে থাকিতেন, দুই বৌ এবং নাতিনীরাও তাঁরই কাছে থাকিত। আর তাঁর নিজের একটি-মাত্র ছেলে, তিনি বয়সে আমারই এক বয়সী, মাত্র কয়েক মাসের বড়, তাঁকে তাঁর মামাতো এবং পিস্তুতো ভাইবোনেরা—যারা তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট সকলেই সোনাদাদা বলিত। গুরুজন এবং যাঁরা বয়সে বড় সকলেই বলিতেন 'ছোট হাঁদা,' কেন না আমার দাদাই ছিলেন বড় হাঁদা।

সেকালের পারিবারিক জীবন ছিল বিচিত্র রকমের। ভাইবোন যারা, তাদের মধ্যে আপন পরের কোন ব্যবধানই ছিল না। তাই মাস্তুতো, পিস্তুতো, জাঠ্তুতো, খুড়তুতো, বা মামাতো এ সব কথার উল্লেখই শোনা যাইত না।

দুই ভাইয়ের নাম ছিল হাঁদা, কিন্তু দুজনেই ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমান। সোনাদাদার বয়স তখন মাত্র পনেরো বৎসর, কিন্তু তিনি তাহার আগের বৎসর বেহার সার্কেলে এন্ট্রেন্স পরীক্ষায় সকল ছাত্রের মধ্যে প্রথম হইয়াছিলেন, ছাত্রীদের পরীক্ষা দেওয়ার রীতি তখনও প্রবর্তিত হয় নাই। আর পরীক্ষার নাম ম্যাট্রিক ছিল না, ছিল এন্ট্রেন্স অর্থাৎ প্রবেশিকা।

দানাপুরের কথা বলিতে গিয়া পরিচয়ের পালা আসিয়া পড়িল। তবে দানাপুরের সেই প্রথম পরিচয়ের স্মৃতির সঙ্গে পারিবারিক জীবনের এক মধুর স্মৃতিও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া আছে। তাই 'দানাপুর' নামটি স্মরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে প্রবাসের এমন এক জীবনযাপনের দিনগুলি যাহা এই বৃদ্ধ বয়সেও স্মৃতিতে উজ্জ্বল হইয়া আছে।

স্টেশনটির নাম তখন কি ছিল তাহা ঠিক মনে নাই। তবে যেখানে স্টেশন সে জায়গাটির নাম ছিল 'খগোল।' দানাপুর শহর হইতে জায়গাটি পাঁচ ছয় মাইল দূরে হইবে বলিয়া মনে হয়। আমরা ঘোড়ার গাড়ি করিয়া স্টেশন হইতে রওনা হইয়াছিলাম, পথে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। বাড়ি পৌঁছিয়া সোনাদাদার চীৎকারে ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে রাত্রে দানাপুরের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হয় নাই।

ভোরে যখন ঘুম ভাঙিল তখনও গাড়ির দুলুনি যেন গায়ে ছিল; প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই কোথায় আছি, কিন্তু সোনাদাদা আসিয়া যখন হাত ধরিয়া টানিলেন তখনই মনে হইল যে, এটা দানাপুরের বাড়ি।

ঘরের সম্মুখে চাতাল, তাহার পর ছোট একটু ছাত। ছাতে ফুলগাছের টব সাজানো। তখনও কুয়াসায় চারিদিকের দৃশ্য ভাল করিয়া দেখা যাইতেছে না, তবুও যাহা দেখিলাম সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

বাড়িখানি একেবারে গঙ্গার উপরে, গঙ্গার জলরাশি কুয়াসা আর আকাশ যেন এক হইয়া গিয়াছে। অস্পষ্ট আলোকে গঙ্গার জলের ভিতর যেন একটি দ্বীপও দেখা যাইতেছে, সবুজ গাছে ভরা শ্যামল এক ভূভাগ-খণ্ড। কানে আসিতেছে সমবেত স্তোত্রধ্বনি! কোথা হইতে এ স্তোত্রের ঝঙ্কার আসিতেছে? চাহিয়া দেখিলাম ছাতের নীচেই একটি প্রশস্ত চাতাল, সেখানে একদল গেরুয়াপরা সাধু আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইঁহারাও কুম্ভমেলার যাত্রী। চাতালে দাঁড়াইয়া তাঁহারাই স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছেন। অর্থ যদিও বুঝা যাইতেছে না, কিন্তু ছন্দের সহিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ যেন কানে মধুবর্ষণ করিতেছে।

গঙ্গার সিঁড়ির উপরে যে চাতালটিতে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম তাহা সেই ছাতের ঠিক নীচে। চাতাল হইতে প্রশস্ত সিঁড়ির সারি গঙ্গাগর্ভে নামিয়া গিয়াছে ওই বাড়ির মালিক দুই ভাই, তাঁহাদের নাম অমরচাঁদ ও করমচাঁদ। পদবী কি তাহা মনে নাই, তবে তাঁহারা 'বানিয়া' এইরূপ শুনিয়াছিলাম। ইঁহাদের এক পূর্ব পুরুষ গঙ্গার উপরে এই চাতাল ঘাট ও সিঁড়ি বাঁধাইয়া দিয়াছেন, মেসোমহাশয় এই বাড়িটি ভাড়া লইয়াছেন। এমন সুন্দর জায়গায় বাড়ি, দানাপুরে আর কোথায়ও নাই, অবশ্য বাড়িটি যেমনই হউক না কেন।

বাড়ির নীচের তলার ঘরগুলিতে আলো বাতাস ঢুকিবার পথ নাই, কিন্তু গ্রীষ্মের দিনে এই ঘরেই আস্তানা লইতে হয়।

গ্রীষ্মের সময় এত গরম যে, উপরের ঘরে থাকা সম্ভব হয় না। আমি গ্রীষ্মকালেও দানাপুরে এবার এবং আরও একবার ছিলাম। তখন তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া লওয়া হইত, বাবুরা আফিসে চলিয়া যাইবার পর বাড়ির মেয়েরা ও ছোট ছোট ছেলেরা সকলেই এই নীচের অন্ধকার ঘরে আসিয়া আশ্রয় লইত। ঘরে আগে হইতেই পাটি পাতা থাকিত, দু'একটি বালিস এবং কচি ছেলের বিছানা, একটি জলের কুঁজা, একটি প্রদীপ ও একজোড়া তাস প্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্ত জিনিসই গুছানো থাকিত। খাওয়া ও আঁচানো হইলেই সকলে নীচে নামিয়া আসিতেন এবং বিকালে রৌদ্র পড়িয়া গেলে তাহার পর সকলে উপরে উঠিতেন।

গঙ্গার উপরের এই ছাত,—এই ছাত হইতে দেখা যায় গঙ্গার জলরাশি, গঙ্গার ঢেউয়ের খেলা, গঙ্গার ভিতরের সেই দ্বীপের মত চড়াটি। একটু আলো ফুটিতেই সিঁড়ি ও চাতাল লোক-সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ঘাগরা পরা মেয়ের দল কলসী

মাথায় সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে, কাহারও বা কলসীর উপর আরও একটি কলসী বসানো আছে। বাতাসে তাহাদের ওড়না উড়িতেছে, দুই হাত নাড়া দিয়া স্বচ্ছন্দগতিতে সিঁড়ি দিয়া এমনভাবে নামিতেছে যে, কলসী পড়িয়া যাইতে পারে তাহাদের সে ভয় একটুও আছে বলিয়া মনে হয় না।

আবার দেখিলাম বড় বড় ঝুড়ি মাথায় লইয়া একদল মেয়ে গঙ্গার জলে নামিতেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, উহারা ঝুড়ি মাথায় নিয়া গঙ্গার ভিতরে ক্রমশঃই আগাইয়া যাইতেছে, প্রথমে হাঁটু তাহার পর কোমর ও কাহারও বুক পর্যন্ত ডুবিয়া গেল, তবু তো উহারা থামিতেছে না। আমি ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিলাম, 'দেখ, দেখ সোনাদাদা, ঐ মেয়ে-গুলো ডুবে যাবে যে! ওরা জলের ভিতর দিয়ে এমন করে' কোথায় যাচ্ছে।'

সোনাদাদা বলিলেন, 'দ্যাখ্ না কোথায় যাচ্ছে? জল আবার ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে দেখ্ছিস্ তো! ওরা ওই চড়ায় থাকে, কাল হাটবার ছিল, তাই ঐ সব ঝুড়ি ভরে' জিনিস এনেছিল হাটে বিক্রী করতে। আজ ভোরে খালি ঝুড়ি নিয়ে আবার চড়ায় ফিরে যাচ্ছে। ওদের তো খেয়া নৌকায় পার হ'বার পয়সা নেই, তাই যে সময় গঙ্গার জল কম থাকে সে সময় হেঁটেই পার হয়। ঐ যে চড়ায় অড়হড় গাছের আড়ালে ছোট ছোট ঘর দেখা যাচ্ছে, ঐগুলিই ওদের ঘর। আর ঐ দ্যাখ্ মোষ চরুছে, দেখ্তে পাচ্ছিস্ কি?'

তখন পূর্বদিকে সোনালী আলোয় ঝলমল করিতেছে, কাজেই দূরের জিনিসও কতকটা দেখা যাইতেছিল। তাই চড়ার গাছপালা কুঁড়ে ঘর ও গরু মহিষও দেখিতে পাইলাম, আর মনে হইল ইহারা যেন এক নির্বাসিতের দল, গঙ্গার জলের ভিতর ঐটুকু চড়ার ভিতর দিন কাটায়।

বাড়ির কাছেই ছিল একটা মাঠ, সেখানে সপ্তাহে দুইবার হাট বসিত। আর হাটের একপাশে, বাড়ির সম্মুখেই ছোট একখানা চালা ঘর, সেই ঘরে এক কুমোর বুড়ি সমস্ত দিন চাক ঘুরাইত। মাটি ছানিয়া তাল তাল করিয়া রাখিয়াছে। এক একটি তাল চাকের উপর চড়াইত, বোঁ বোঁ শব্দে চাক ঘুরিত, আর বুড়ি নিপুণ আঙ্গুলের চালনায় এক একটি মাটির পাত্রকে মূর্তি দান করিত। হাঁড়ি কলসী গড়িত বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ গড়িত মাটির গেলাস। রাশি রাশি গেলাস এক একদিন গড়া হইত, গেলাসগুলি মাঠে রৌদ্রে শুকাইতে দিত। বুড়ির ৭।৮ বৎসরের এক নাতি লাঠি হাতে নিয়া গেলাস পাহাড়া দিত, রাত্রে সেগুলি আমাদের বাড়ির নীচেকার ঘরে তুলিয়া রাখিত আবার সকালে রৌদ্র উঠিলে মাঠে বাহির করিয়া দিত। তাহার পর অনেক গেলাস গড়া হইয়া গেলে সেগুলি পোনে পোড়ানো হইত।

'এত গেলাস কি হয়?' আমার মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। সোনাদাদা বলিলেন, 'সব গেলাসই খোলা ভাঁটিতে যায়।' প্রথমে মনে হইয়াছিল 'খোলা ভাঁটি' বোধহয় হোটেলের মত কিছু হইবে। পরে শুনিলাম, এ দেশে ভাত পচাইয়া একরকম মদ তৈরী হয়। খোলাভাঁটিতে সেই মদ বিক্রী হয়, আর যারা দিনমজুরী করে তারা সমস্ত দিনের খাটুনীর পর ঐ খোলাভাঁটিতে সেই মদ খাইতে যায়, ইহাতে নাকি গভর্নমেন্টের অনেক আয় হয়।

এই সব মজুরের দল! তাহাদের ভাত খাইবার সংস্থান নাই, কিন্তু সেই ভাত-পচানো জিনিস যেন না খাইলেই নয়। ছেলে বুড়ো সকলেই খাইতেছে; চা খাওয়ারও খুবই চলন আছে। আর সকলেই তামাক খায়, এমন কি ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত। আমাদের বাড়িতে যে ঝি কাজ করিত তাহার একটি সাত আট বৎসরের মেয়ে ছিল, সে সর্বদাই তাহার মাকে দিয়া তামাক সাজাইয়া লইত, 'দাই গে এ দাই, থোড়া ছিলাম্ ভর্ দে বুড়িয়া!' এ-দেশে ঝিকে 'দাই' বলে। সোনাদাদা আমাকে বলিয়াছিলেন, ''ঝি' কথার মানে যেমন মেয়ে, 'দাই' মানেও সেইরকম ধাত্রী। ধাত্রী বলতে মা-কেও বোঝায়।'

একদল মজুর ও মজুরণীকে দেখিয়া-ছিলাম, কমিসেরিয়েটের বড়বাবু নববাবুর বাড়িতে ছোলা ঝাড়াই বাছাই করিতে। দানাপুর ক্যান্টনমেন্টের শহর। গোরাসৈন্য, অশ্বারোহী গোরাসৈন্যের ঘোড়া এবং মালবাহী খচ্চর ও ক্যান্টনমেন্টের লোকজন সকলেরই রসদ সরবরাহ করিবার কর্তৃত্ব ছিল সে সময় শিববাবু ও নববাবুর উপর। ইঁহাদের পূর্ণনাম শিবপ্রসাদ সিংহ ও নব-কুমার সিংহ। শিববাবুর একমাত্র পুত্র মথুরানাথ সিংহ তখন বাঁকিপুর ছিলেন, ইনি ল পাশ করিয়া পরে বাঁকিপুরের বারে শ্রেষ্ঠ উকীল হইয়াছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার অল্পদিন আগে শিববাবু মারা গিয়াছেন। দানাপুরে প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারের ভিতর প্রায় সকলের সহিতই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল, বিশেষতঃ মাসীমা প্রতিদিন কাজকর্ম শেষ হইলে ভাড়া গাড়ি করিয়া এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়াইতে যাইতেন, ইহার মধ্যে দ্বিপ্রাহরিক তাস খেলাও বাদ যাইত না।

মাসীমা দানাপুরে 'মাসীমা' নামেই বিখ্যাত ছিলেন, কেননা তিনি ছোড়দাদা রঞ্জনবাবুর মাসীমা। বিবাহাদি কাজকর্মে, অসুখ বিসুখে ও বিপদে আপদে সর্বাগ্রে তাঁহার ডাক পড়িত। দানাপুর একবার কলেরা মহামারীতে যখন উজাড় হইতে বসিয়াছিল, তখন মাসীমা ও ছোড়দাদা আহার নিদ্রা ছাড়িয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিতেন। ছোড়দাদা ঘুরিতেন হোমিওপ্যাথিক বাক্স লইয়া, কেননা তখন স্যালাইন ইঞ্জেক্শন বাহির হয় নাই।

মাসীমার এক ননদ কুম্ভমেলা হইতে ফিরিয়াছেন, ইনি অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রামচরণবাবুর স্ত্রী। সুন্দর চেহারা, হাসি হাসি মুখ্, নাকে বহুমূল্য মুক্তার নথ, (এই নথের দামের কথা তিনি অনেকবার উল্লেখ করিতেন)। সম্প্রতি বিখ্যাত বালানন্দ স্বামীর নিকট হরিদ্বারে তিনি ও তাঁহার স্বামী দুজনেই দীক্ষা লইয়াছেন, তাই তাঁহার প্রকোষ্ঠে ও উপরের হাতে অলঙ্কারের সঙ্গে রুদ্রাক্ষের মালাও শোভা পাইতেছে। পূজার সময় কপালে ও বাহুতে বিভূতি লেপন করিতেন এবং সর্বদাই 'গুরুমহারাজ' বলিয়া ধ্বনি উচ্চারণ করিতেন।

মাসীমার অপেক্ষা ইনি বয়সে ছোট ছিলেন, রামচরণবাবু তখনও অবসর গ্রহণ করেন নাই। পরে ইঁহারা দেওঘরে স্থায়ী-ভাবে বাস করিয়াছিলেন এবং সে সময় শ্রীমৎ বালানন্দ স্বামীও রামচরণবাবুর অনুনয়ে দেওঘরে গিয়া প্রথমে তপো-পাহাড়ের নিভৃত সাধন গুহায় তপস্যা করেন, পরে করুণিবাগে আশ্রম করিয়াছিলেন।

মাসীমা ছিলেন একান্ত গৌরভক্ত, তিনি ও মেসোমহাশয় পূজার ঘরে পাশাপাশি আসনে বসিয়া অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকিতেন।

যাহা হউক মাসীমা তাঁহার ননদ আসিয়াছেন ইহাতে খুশী হইয়াছিলেন; দানাপুরের বাঙ্গালীদের সহিত পরিচয় করাইবার জন্য তিনি প্রতিদিন দৈনিক তাসখেলা বন্ধ রাখিয়া তাঁহাকে লইয়া এক একজনের বাড়ি বেড়াইতে যাইতেন।

যেদিনের কথা আমি বলিতেছি সেদিন তাঁহার যে বাড়িতে যাইবার কথা ছিল, চাকর রামলাল ভুল করিয়া সে বাড়িতে না লইয়া গিয়া তাঁহাকে শিববাবুর বাড়ি লইয়া গেল।

শিববাবুর বাড়িও গঙ্গার ধারে, সম্মুখে বিঘা কতক জমি, সেখানে মজুর ও মজুরণীরা প্রতিদিন ক্যান্টনমেন্টের ঘোড়ার খাদ্য ছোলা ঝাড়াই ও বাছাই করে। ক্যান্টনমেন্টের ঘোড়া! তাহাদের খাদ্য পরীক্ষার জন্য খাদ্য পরীক্ষক আছে, ঝাড়া ও বাছা ঠিকমত হইয়াছে কিনা তাহারও তদারক করিবার জন্য লোক আছে। প্রায় একশো মজুর ও মজুরণী ভোর হইতে আরম্ভ করে এই ঝাড়া বাছার কাজ, আর সন্ধ্যার সময় কাজ শেষ হইলে তাহাদের কাপড় ঝাড়া দিয়া (ছোলা চুরি করিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য) মজুরণীদের ছয় পয়সা ও মজুরদের দুই আনা পারিশ্রমিক দিয়া বিদায় করা হয়।

সারাদিন কি তাহারা অনাহারে থাকে? অবশ্য ইহা সম্ভব নয়।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সারাদিন তাহারা কাঁচা ছোলা চিবায় ও মাঝে মাঝে গঙ্গার ধারে গিয়া অঞ্জলী ভরিয়া জল খাইয়া আসে। ইহাতে ছোলা অবশ্য ওজনে কমিয়া যায়, কিন্তু পরিস্কার করিয়া ঝাড়াই বাছাই করিতে গেলে ওজনে নিশ্চয়ই কম হইবে। ওইতো স্তূপাকার মাটিমিশানো জঞ্জাল রহিয়াছে, উহারা ওজন করিলেই বুঝিতে পারিবে কতটা বাহির হইয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় একদল গোরা খচ্চর নিয়া আসে, বস্তাবন্দী বাছাই ছোলা লইবার জন্য। তাহারা ওজন করিবার উল্লেখও করে না, একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করে 'অল্ রাইট?' তাহার পর খচ্চরের পিঠে বস্তা তুলিয়া দিয়া ক্যান্টনমেন্টের দিকে চলিয়া যায়।

মজুর মজুরণীরা ছোলা ও গঙ্গার জলেই পেট ভরাইয়া লয় বটে, কিন্তু যখন কলেরা আরম্ভ হয় তখন ইহার ফল খুব ভয়ানক হয়।

যাহা হউক আমরা ভুলক্রমে শিববাবুর বাড়ি গিয়া পেঁ'ছিলাম, মজুরদের ছোলা খাওয়া দেখিলাম এবং বাড়ির ভিতর গিয়া আদর-আপ্যায়ন বিশেষভাবেই লাভ করিলাম। মাসীমা তাঁহার ননদের সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং তাঁহারাও কুম্ভমেলার বিবরণ ও গুরু-মহারাজের অলৌকিক কৃপার কাহিনী শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি যেন আর একবার দেওঘর ফিরিবার আগে এ বাড়িতে আসেন সেজন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন।

ইহার পর ফিরিবার সময়! গোরারা খচ্চর লইয়া আসিয়াছে ও বস্তাগুলি খচ্চরের পিঠে চাপাইতেছে, আমরাও সকলে —অর্থাৎ আমি, মাসীমা, মাসীমার ননদ ও বড়দাদার মেয়ে মেঘমালা, আমরা গাড়িতে চড়িয়াছি, গাড়ি যেমন মোড় ফিরিতেছে অমনি একটা শব্দ হইল 'মড়্, মড়্, মড়াৎ'। তাহার পর কি যে হইল ঠিক মনে পড়ে না, কেবল মনে পড়ে ঘোড়া দু'টি যেন লাফাইয়া গাড়ির চালে উঠিয়া পড়িল এবং আমরা গাড়ির ভিতর একেবারে চাপা পড়িয়া গেলাম।

বেশীক্ষণ এভাবে থাকিলে আমরা পিষিয়া মারা যাইতাম, কিন্তু গোরারা তখনই দ্রুতহস্তে ঘোড়া দুটিকে ধরিয়া ফেলিল এবং ভাঙ্গা কবাট খুলিয়া ফেলিয়া আমাদের বাহির হইবার পথ করিয়া দিল। একজন খুকি-মেঘমালাকে কোলে করিয়া নামাইল, বাড়ির লোকও সকলে তখন আসিয়া পড়িয়াছিলেন। কোচ্ম্যান ও রামলাল গাড়ির উপর হইতে ছিটকাইয়া স্তূপাকার বস্তার উপর পড়িয়াছিল তাই তাহাদের বিশেষ আঘাত লাগে নাই।

আবার গাড়ি আসিল, 'গৌর, গৌর' জপ করিতে করিতে মাসীমা ও তাঁহার ননদ 'গুরু মহারাজ! গুরু মহারাজ!' বলিতে বলিতে গাড়িতে উঠিলেন এবং এবার আমরা নিরাপদেই বাড়ি ফিরিলাম।

বাড়ি ফিরিয়া মাসীমা প্রথমে আমাকে একদফা বকুনি দিলেন, বলিলেন, 'যেখানে আমি যাব, ওর সেখানে যাওয়া চাইই চাই।' আরও বলিলেন, 'শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাতেই আজ বিপদ কাটল, না হ'লে কিশোরী সরকারের কাছে কি বলে মুখ দেখাতাম?'

আর মাসীমার ননদ বলিলেন, 'আহা বৌ, গুরু মহারাজ যেন সেই বিপদে মূর্তি ধরে অবতীর্ণ হ'লেন, না হলে একটি প্রাণীও বাঁচতো না।'

সোনাদাদা এইসব শুনিয়া হাসি হাসি মুখে আমাকে চুপি চুপি বলিলেন, 'বাঁচালে তো তোদের সেই গোরারা, যারা ছোলা নিতে এসেছিল। তবে শ্রীগৌরাঙ্গ আর গুরু মহারাজ দু'জনেই মাঝে থেকে কৃতজ্ঞতা লাভ ক'রলেন, এটি হ'ল তাঁদের বিশেষ প্রাপ্য।'

আমার গোরা দেখিলেই কেন জানি না মোটেই ভাল লাগিত না, কিন্তু তাহারা যে সকলেই মন্দ লোক তাহা নয়। আমাদের বাড়ির কাছে কতকগুলি শ্রেণীবন্ধ ঘর ছিল, সেখানে একদল মেয়ে বাস করিত। সেখানকার লোকে ঐ ঘরগুলিকে বলিত 'চাক্লা মহল্লা।' আমি দেখিতাম মেয়েগুলি বেশ সৌখীন, মাথায় বেলফুলের মালা জড়াইয়া বিকালে রঙিন কাপড় পরিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতে আসিত। সেই সময় একটা গোরা পিছন হইতে আসিয়া একটি মেয়েকে হয়তো এমন ধাক্কা দিল যে, সে সামলাইতে না পারিয়া একেবারে গঙ্গার ভিতর গিয়া পড়িল। যদি সে সাঁতার না জানিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই ডুবিয়া মরিত।

শুধু কি তাই, গোরারা ছুটি পাইলেই দলে দলে রাস্তায় বাহির হইয়া দুষ্ট ছেলের মত উৎপাত করিত। কলসী মাথায় মেয়েদের দেখিলেই ধাক্কা দিবার জন্য যেন তাহাদের হাত সুড় সুড় করিয়া উঠে, কত মেয়েকে যে ধাক্কা দিয়া তাহাদের মাথার কলসী ভাঙ্গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। মেয়েরাও ছাড়িবার পাত্র নয়, উচ্চৈঃস্বরে গালাগালি দিত, আর গোরারা সেই গালা-গালি শুনিয়া হাততালি দিয়া হাসিত, শেষে কলসীর দাম দিয়া রফা করিয়া লইত। কুমোর বুড়ির ঘরে ঢুকিয়া গোরার দল চাক ঘুরাইতে বসিত, আর একটির পর একটি গেলাস যখন ভাঙ্গিত তখন তাহাদের যেন আমোদের অবধি থাকিত না। এইরকম অনেকগুলি নষ্ট করিয়া শেষে হয়তো বুড়িকে একটা সিকি ফেলিয়া দিত। সোনাদাদার মুখে শুনিয়াছি উহাদের নামে যদি নালিশ হয় তবে উহাদের কঠিন শাস্তি হয়। কিন্তু এক এক দিন রাত্রে চাকলা-মহল হইতে কান্না ও চীৎকারের শব্দ শোনা যাইত। গোরারা নাকি চাকলা মহলের ভিতর ঢুকিয়া মেয়েগুলিকে মারধোর করিতেছে। সে সময় কিন্তু কেহই মেয়ে-গুলিকে রক্ষা করিতে যাইত না, অথবা নালিশও জানাইত না।

একদিন ক্যান্টনমেন্টে গিয়েছিলাম। প্রকাণ্ড ব্যারাক, আর সম্মুখে খুব বড় উঠান। ক্যান্টনমেন্টে মণিবাবুর প্রকাণ্ড দোকান ছিল গোরাব্যারাকে দুটি বড় বড় ঘর তিনি পাইয়াছিলেন, একটি দোকান আর একটি তাঁহার ক্লাব ঘর। ভিতরের দিকে আবার তাঁহার পরিবার থাকিবার কোয়ার্টারও ছিল।

তাঁর স্ত্রী ছিলেন কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার আর জি কর অর্থাৎ রাধাগোবিন্দ করের ভগ্নী। কলিকাতায় তাঁহাকে অনেক-বার দেখিয়াছি, আমরা তাঁহাকে 'নেড়ীদিদি' বলিতাম। 'মণি বোস' বলিলে দানাপুরে সকলেই বুঝিতে পারিত, আর মণিবাবুর ক্লাব ছিল বাঙ্গালীদের একটি মিলন-নিকেতন। ছোড়দাদা আফিস হইতে আসিয়া প্রতিদিন এই ক্লাবে যাইতেন, বাঁকীপুর হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী মাঝে মাঝে উৎসব উপলক্ষে ক্লাবে আসিতেন, এমন কি জয়পুর রাজ্য হইতে সংসার সেন এবং সুহৃদ সেনও ছুটি পাইলে এই ক্লাবে আসিতেন। মণিবাবুর ছেলে প্রবোধ বসু পরে দানাপুরে বড় উকীল হইয়াছিলেন।

ক্যান্টনমেন্ট গোরায় গোরায় পরিপূর্ণ, ইহার ভিতর বাঙ্গালী পরিবার কি করিয়া যে দিনে ও রাত্রে বাস করেন ভাবিয়া আমার আশ্চর্য মনে হইয়াছিল। গোরাদের শাস্তিও খুব কঠোর ছিল। দেখিলাম গুদামের মত এক অন্ধকার ঘরে একটি গোরাকে হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। নেড়ীদিদির মুখে শুনিলাম, তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টা অর্থাৎ একদিন ও এক রাত্রি এইভাবে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আবার আর একটি গোরা বন্দুক কাঁধে অনবরত এধার ওধার পায়চারী করিতেছে। তাহার থামিবার বা কাঁধ হইতে বন্দুক নামাইবার হুকুম নাই। কতক্ষণ যে তাহাকে এইভাবে পায়চারি করিতে হইবে, কে জানে।

জয়দয়ালদের বাড়ি মাসীমা মাঝে মাঝে যাইতেন, ইঁহারা দানাপুরের এক সম্ভ্রান্ত ক্ষেত্রী পরিবার। জয়দয়াল সোনাদাদা অপেক্ষা বয়সে যদিও ৩।৪ বৎসরের বড় তবু ওঁদের দু'জনের মধ্যে সমবয়সীর মতই বন্ধুত্ব ছিল। জয়দয়ালের বিবাহ অনেকদিন আগেই হইয়াছে, এমন কি তাহার ছোটভাই শ্যামলিয়ারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রী এবং ছত্রীদের বিবাহে জনমপত্রি বা কুষ্ঠির মিল হওয়াই প্রথম ও প্রধান কথা। সেজন্য অনেক সময় বরের অপেক্ষা বধূর বয়স বেশী হইয়া যায়। শ্যামলিয়া চৌদ্দ বছরের ছেলে, কিন্তু তাহার বৌ ভগবন্তিয়ার বয়স কুড়ি বৎসর। বৌ অত্যন্ত ঝগড়াটে, মাঝে মাঝে শ্যামলিয়াকে মারে, তাই সে আজকাল ভয়ে বাড়ির ভিতরই যাইতে চাহে না। জয়-দয়ালের বৌও জয়দয়াল অপেক্ষা বয়সে বড়। জয়দয়ালের মা সোনাদাদার এখনও কেন বিবাহ দেওয়া হইতেছে না সেজন্য মাসীমাকে প্রায়ই অনুযোগ করেন।

ফাল্গুন মাস, দানাপুর যেন ফুলে ফুলে ফুলময়। রাস্তায় অনবরত ফুলওয়ালা চলিয়াছে, ফুলের পাখা, ফুলের মালা প্রভৃতি লইয়া। তাহাদের বিক্রয় বেশীর ভাগ খগোল স্টেশনে হয়। এই সময় বিবাহ প্রভৃতি উৎসবও ছত্রী ও ক্ষেত্রীদের ঘরে ঘরে লাগিয়া থাকে। জয়দয়ালের ছোট বোন চম্পা-বৌয়ার বিবাহের তিলক উপলক্ষে তাহাদের বাড়িতে মহাসমারোহ চলিয়াছে। আমাদের সকলেরই নিমন্ত্রণ; খাওয়ার নিমন্ত্রণ এবং তিলকের তত্ত্ব দেখিবার নিমন্ত্রণ। এই নিমন্ত্রণ সকল বাঙ্গালীদের বাড়িতেই করা হইয়াছে, বাঙ্গালী ও ক্ষেত্রীর ভিতর তখন বাদাবাদি বা বিরোধ ছিল না।

নিমন্ত্রণ বাড়িতে ঢুকিলেই সমবেতকণ্ঠে গানের সুর শুনিতে পাওয়া যায়। ক্ষেত্রীদের ভিতর অবরোধপ্রথা খুব বেশী, কিন্তু চিকের আড়াল হইতে উচ্চৈঃস্বরে গান গাওয়া দোষের নয়। এই গান উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ। ছোট বালিকা হইতে বৃদ্ধা পর্যন্ত গানের সুরে সুর মিলাইয়া থাকেন। আবার এই গান নাকি 'গারি' অর্থাৎ বরপক্ষীয়দের গালি দেওয়া।

যে ঘরে তিলকের তত্ত্ব সাজানো হইয়াছে সেটি একটি প্রকাণ্ড দরদালান। একধারে ঝুড়ি ঝুড়ি ফল ও মিষ্টদ্রব্যের থালা, ইহার প্রত্যেক জিনিসই পঁচিশটি করিয়া। পঁচিশটি পিতলের গাগরি এবং থালা প্রভৃতি সমস্ত বাসনই পঁচিশটি করিয়া। একটি রূপার রেকাবীতে পঁচিশটি মোহর ও অপর একটিতে পঁচিশটি আংটি। মাথার টুপিও পঁচিশটি দেওয়া হইয়াছে।

জয়দয়ালের মা মাসিমাকে বলিলেন, 'বহিন, এক লেড়কীর সাদিতে কত খরচ দেখ। আমার শ্বশুর তাঁর লেড়কীদের সাদির তিলকের সময় সব পঞ্চাশ পঞ্চাশ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মেয়েদের সাদিতে পঁচিশের বেশী দিতে পারলাম না। মেয়েদের সাদি দিতে দিতেই ক্ষেত্রী আর রাজপুত ফতুর হয়ে যায়। তাই তো আগের দিনে কচি বাচ্চাকে দুধে আফিং মিশিয়ে খাইয়ে খুন করা হ'ত। হায় ভগবান! মায়ের প্রাণের যে কি দুঃখ তা কে বুঝবে? আংরেজের মুলুকে এখন আর সে সব ব্যাপার নেই। তবে এখনও যে লুকিয়ে কেউ কেউ করে না এমনও নয়।' এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি নীচু সুরে তাঁহাদেরই জ্ঞাতির বাড়ির একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন শিশুটিই ছিল তাহার মায়ের প্রথম সন্তান। তাহার মা তাহাকে বাঁচাইবার জন্য কতই যে কাকুতি-মিনতি করিয়াছিল, কিন্তু নির্দয়া শাশুড়ী রাতে ঘুমন্ত মেয়েকে তুলিয়া নিয়া গিয়া বিষ খাওয়াইয়া দিয়াছিল; বৌটি এখন পাগল হইয়া গিয়াছে।

কি দারুণ ঘটনা! শুনিলে যেন বিশ্বাসই হয় না। ইহাদের এই তিলকের তত্ত্ব কি না করিলেই নয়? সমস্ত উৎসবই আমার কাছে একেবারে বিস্বাদ হইয়া গেল। যাহা হউক এখন যে, এ রকম ঘটনা হয় না ইহাই মঙ্গল।

রজকের কাচা কাপড়ও গঙ্গার জলে না ডুবাইয়া ক্ষেত্রী বা ছত্রীদের বাড়ি লইবার নিয়ম নাই। যদি কেহ সে কাপড় ছুঁইয়া ফেলে তাহা হইলে তাহাকে গঙ্গায় ডুবিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। কিন্তু দশ-হরার উৎসবের সময় গঙ্গার ধারে গিয়া ছাগ বলি দেওয়া হয়, ইহার নাম 'মাইজীকা পূজাকা ওয়াস্তে চড়ানো।' আমরা নৌকায় করিয়া দশহরার সময় বড়গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিলাম। দানাপুরের কাছে যে গঙ্গা সেটি ছোট গঙ্গা আর চড়ার ওপাশে যে গঙ্গা সেইটি বড় গঙ্গা। সেই গঙ্গা পার হইয়া ওপারে ছাপরায় যাইতে হয়।

আমি এই গঙ্গার ধারে বলি দেওয়ার কথা আগে জানিলে হয়তো দশহরা গঙ্গা-স্নানে যাইতে চাহিতাম না, কেননা যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে গঙ্গাস্নানে আর প্রবৃত্তি থাকে না। সারি সারি ছাগবৎসের ছিন্নমুণ্ড গঙ্গার কূলে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে আর রক্তের ধারা গিয়া গঙ্গার পবিত্র বারিপ্রবাহে মিশিতেছে। অনেক খুঁজিয়া একটি নির্জন ঘাটে কোনরকমে আমাদের স্নান সমাধা হইল।

ইহার পর দানাপুরে ইলিসমাছের সময় আসিয়া পড়িল। জেলেরা মাছ ধরিয়া গঙ্গার ধারে মাছ বোঝাই জাল ঝাড়িতেছে, আর সে কি মাছের স্তূপ! রৌদ্রে সাদা সাদা মাছের স্তূপগুলি চিক্ চিক্ করিতেছে। মাছ এত সস্তা হইয়া গেল যে, গরীব লোকেরা কেবল মাছই খাইতে লাগিল; ইহার ফলে শীঘ্রই চারিদিকে কলেরা আরম্ভ হইয়া গেল, তখন আবার হুকুম আসিল সমস্ত মাছই পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে। জেলেরা খুব তড়াতাড়ি মাছগুলির পেট

চিরিয়া ডিম বাহির করিয়া লইয়া নুনের কলসীতে ভরিতে লাগিল। কেবল কলসী কলসী মাছের ডিমই বাজারে আসিতেছে, কিন্তু কলেরা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ডিম কেনাও বারণ হইয়া গেল।

দানাপুরে এইভাবেই বার বার কলেরা আরম্ভ হয় ও সংক্রামক আকার ধারণ করে। সেই সময় আবার অনেক বাড়িতে কতকগুলি মেয়ের উপর দেবীর আবির্ভাব হয়। এই মেয়েগুলি প্রায়ই নিম্নজাতীয়া। যাহার ভর হয় সে মাথা চালিতে আরম্ভ করে এবং এমন সব ভবিষ্যৎবাণী প্রচার করে যাহাতে মহা সাহসীরও হৃৎকম্পন উপস্থিত হয়। ইহা ছাড়া মুখে মুখে কত কথাই যে প্রচারিত হইতে থাকে তাহার আদি অন্ত নাই। আমি দানাপুরে থাকিবার সময়ই একবার এইরূপ মহামারী হয়, ইলিশ মাছ সস্তা হইবার অল্প কয়েকদিন পরে। সে সময় এক বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারে আটটি মেয়ের জন্মগ্রহণের পর যে একটি-মাত্র ছেলে অনেক দেবতার মানত করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সেইটি কলেরা হইয়া মারা যায়। বাড়ির কর্তা ছিলেন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালী মহলে পুরোহিতের কাজ করিতেন। মেয়েগুলির ভিতর দুটি মেয়ে বিধবা, তাহাদের বয়স আঠারো ও ষোলো। অন্য মেয়েগুলির বিবাহ হয় নাই।

মাসীমা তাহাদের বাড়ি যাইবেন শুনিয়া 'আমিও যাইব' বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম। মাসীমা প্রথমে খুবই আপত্তি করিয়াছিলেন, পরে আমার উপর যেন রাগ করিয়াই রাজী হইলেন, বলিলেন, 'সৃষ্টি-ধরের মা ছেলের শোকে তিনদিন উপোস করে আছে, আর বেচারী মেয়েগুলো,—তাদেরও কি গতি হচ্ছে কে জানে, তাই না গিয়ে পারলাম না। তোমার আবার, যেখানে আমি যাব সেখানে তো না গেলেই নয়!'

গিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা আজিও ভুলিতে পারি নাই। আমরা যাইবামাত্র সৃষ্টিধরের মা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ও দিদি, কি দেখতে এলে দিদি, সৃষ্টিধর আমার ঘর অন্ধকার করে চলে গিয়েছে, আর ওই পোড়ারমুখীরা (বলিয়া মেয়েদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন) জল-জ্যান্ত বসে আছে। হায়রে হায়! সাত সাতটা বোন সাতদিনে মরলো না কোল জোড়া ধন সৃষ্টিধর কেন আমার কোল জুড়ে রইল না?'

মেয়েগুলির মুখ এত শুকাইয়া গিয়াছে যে, মনে হয় তাহারাও এ কয়দিন কিছুই খায় নাই। যাহা হউক মাসীমা বুঝাইয়া ও সান্ত্বনা দিয়া 'দিদি ভেবনা, তোমার সৃষ্টিধর আবার তোমার কোলেই আসবে' এইরকম অনেক কথা বলিয়া সৃষ্টিধরের মাকে আগে কিছু খাওয়াইলেন, পরে মেয়েগুলিকেও অন্য ঘরে লইয়া গিয়া সঙ্গে যে খাবার আনিয়াছিলেন তাহাই খাওয়াইয়া তখনকার মত বাড়ি ফিরিলেন। বাড়ি ফিরিয়া আমাকে ভয়ানক বকিতে লাগিলেন, আর যেন তাঁহার সঙ্গে ঐরকম বাড়ি না যাই সেজন্য বিশেষ-ভাবেই সতর্ক করিলেন। এই সতর্ক করার একটি বিশেষ কারণও ছিল, সেটি এই যে, সৃষ্টিধরের মা যখন বিলাপ করিতে করিতে সৃষ্টিধরের অসুখের বিবরণ বর্ণনা করিতে-ছিলেন, তখন তিনি যে সকল ভীষণ ভীষণ দৃশ্য দেখিয়াছেন তাহারই বর্ণনা এমনভাবে করিতে লাগিলেন যেন তাহাতে তিনি বেশ একটু তৃপ্তিলাভ করিতেছেন। তিনি বলিলেন, 'এক ভীষণা দেবীমূর্তি, এলো-চুল, পরনে লাল কাপড়, এক হাতে জ্বলন্ত কাঠ আর এক হাতে খাঁড়া, দক্ষিণমুখে ছুটিয়া চলিয়াছেন, আর গর্জন করিয়া বলিতেছেন, রাখবো না, রাখবো না, একটি প্রাণীকেও রাখবো না। সব ধ্বংস করে দিয়ে যাব।'

মাসিমা আমাকে বারবার নিষেধ করিলেন যে এইসব কথার একটি কথাও যেন আমি বাড়িতে কাহারও কাছে না বলি। সে রাত্রে আমার ঘুম হইল না, সেই মেয়েগুলির মলিনবেশ আর ম্লান মুখগুলি কেবলই মনে হইতে লাগিল। তাহাদের মা, সেই মাই এত নিষ্ঠুর, তাহাদের উপর এত নির্দয়? ক্ষেত্রীবাড়ির কচি বাচ্চাকে বিষ খাওয়ানোর কথাও মনে পড়িয়া গেল, আর মনে হইতে লাগিল আমাদের দেশে মেয়ে কেন জন্মায়?

দানাপুরের কথা বলিতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বাঁকিপুরের কথাও আসিয়া যায়। দানাপুর আর বাঁকিপুর, এক জায়গা আর এক জায়গার সঙ্গে একেবারে যুক্ত। দানাপুর ক্যান্টনমেণ্টের শহর, আর বাঁকিপুর সংস্কৃতি কেন্দ্র। বাঁকিপুরেই সমস্ত অফিস আদালত; পাটনার বাঙ্গালীর অনেকেই অভিজাত এবং সম্পত্তিশালী। অনেক বাঙ্গালী বিহারের স্থায়ী অধিবাসী। কিন্তু বিহারীদের সঙ্গে তখন কোন বিরোধ ছিল না। বরং বাঙ্গালীর বিদ্যা, বুদ্ধি ও ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব বিহারবাসী স্বীকার করিয়াই লইতেন। উভয়ের ভিতর আত্মীয়তাও ছিল।

বাঁকিপুরে বাঙ্গালীর প্রবর্তিত লোন অফিসে দানাপুরের অনেক বাঙ্গালী শেয়ার কিনিয়াছিলেন। সাহিত্যচর্চাও বেশ ভালভাবেই চলিতেছিল। লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, ভাগলপুর, মতিহারী ও পাটনা সাহিত্য চর্চার সূত্রে যেন এক হইয়া বঙ্গভাষার বেদী স্থাপনার কার্যে এক পুজকদল গড়িয়া উঠিতেছিল। সেই সময় কলিকাতায় স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় মথুরানাথ সিংহ সেই পত্রিকার একজন লেখক ছিলেন। ১২৯... সালের শেষভাগের স্মৃতির সহিত এই ঘটনাগুলিতে স্মৃতিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

দৌলৎ কাজির কাব্য ও আলাওল

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল

দৌলৎ কাজিকে ইতিহাস-নিবন্ধ মুসলমানী বাঙলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য আদি কবি বলা যাইতে পারে। আধুনিক কবিদের মতো তখনকার কবিদের জন্ম-মৃত্যুর তারিখ খুঁজিয়া পাইবার কোনোই উপায় নাই। দৌলৎ কাজিরও জন্ম-মৃত্যুর সন তারিখাদি জানিবার কোনোই পথ নাই। তবে কাব্য রচনাকাল নির্দিষ্ট করিবার পন্থা তেমন জটিল নহে। সুতরাং আর কিছু না হউক কবির স্থিতিকালের একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

দৌলৎ কাজি আরাকান রাজসভার কবি ছিলেন এবং তাঁহার কাব্যের নাম "সতী ময়না" বা "লোর চন্দ্রালী।" বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের যে সংস্করণ হইতে এই কাব্যের আলোচনা করা হইতেছে তাহা 'হামিদী প্রেস' হইতে মুদ্রিত। এই সংস্করণে 'চন্দ্রাণী' শব্দ মুদ্রিত আছে; কিন্তু অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, ইহা 'চন্দ্রালী' হইবে; কেননা আদি শব্দটি 'চন্দ্রাবলী'। যাহাই হউক, দৌলৎ কাজি তাঁহার 'সতী ময়না' কাব্যের মধ্যে পাতায় পাতায় রোসাঙের রাজপাত্র আশরফ খানের গুণকীর্তন করিয়াছেন। ইহা হইতে স্বভাবতই বুঝা যায় যে, আশরফ খান যে রোসাঙ্গরাজের রাজপাত্র ছিলেন, তাঁহারই আশ্রয়ে এই কাব্য রচিত হয়। এখন আশরফ খান ছিলেন 'সুধর্ম' বা 'শ্রী সুধর্মা' নামক রোসাঙ্গরাজের 'লস্কর উজীর' বা সেনাপতি।

> শ্রীআশরফ খান লস্কর উজীর।
> যাহার প্রতাপে বৃষ চূর্ণ অরি শির॥

অবশ্য অন্য স্থানে লিখিত আছেঃ

> শ্রীযুত আশরফ অমাত্য প্রধান।
> ষোলকলা পূর্ণ যেন চান্দ্রমা সমান॥

কাজেই তাঁহাকে কেবলমাত্র সেনাপতি বলা বোধ হয় ঠিক হইবে না। এদিকে শ্রীসুধর্মার রাজ্যকাল পাওয়া যাইতেছে ১৬২২ হইতে ১৬৩৮। অতএব দৌলৎ কাজির সতী ময়না কাব্যের রচনাকাল ইহার ভিতর কোনো এক সময়। অর্থাৎ ধরা যাইতে পারে এই কাব্যের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের মাঝামাঝিকাল (অনুমান ১৬৩৫ খৃঃ)।

দৌলৎ কাজি শক্তিমান কবি। হিন্দু পুরাণাদিতে তাঁহার উত্তম অধিকার। তাঁহার রচনায় আরবী, ফার্সি শব্দ নাই বলিলেই চলে। কেবল প্রথম চারি-পাঁচ পৃষ্ঠায় ঈশ্বর (বা খোদা) প্রশস্তির মধ্যে কিছু আরবী-ফার্সি শব্দ আছে। অন্যত্র প্রায় নাই-ই।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ রচনার প্রারম্ভে বলিয়াছেন যে, রঘুরাজবংশ বর্ণনা করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে ভেলায় চড়িয়া সাগর উত্তরণের মত কঠিন বা অসম্ভব ব্যাপার। দৌলৎ কাজিও বিনয় করিয়া বলিতেছেন যে, ঈশ্বর গুণ-ব্যাখ্যান তাঁহার মতো ব্যক্তির পক্ষে অনুরূপ কঠিন ব্যাপার—

> সে গুণের ভাগ্য কেবা বাখানিতে পারে।
> পিপীলিকা যেন সিন্ধু তরঙ্গ সন্তরে॥

রোসাঙ্গ নগরের বর্ণনা কাজি সাহেবের কাব্যে এইরূপঃ—

> কর্ণফুল নদি (নদী) পূর্বে আছে এক পুরী।
> রোসাঙ্গ নগর নাম সর্গ (স্বর্গ) অবতারি॥
> রোসাঙ্গরাজ "প্রতাপে প্রভাতভানু বিখ্যাত ভুবন।
> পুত্রের সমান করে প্রজার পালন॥"

তাঁহার প্রবল প্রতাপে চতুর্দিক থরহরি কম্পমান। তাঁহার ভয়ে হাতী পিপীলিকাকে পর্যন্ত পদদলিত করিতে সাহস করে না; জরতী বৃদ্ধার নিকট হইতে মহাবলীও রত্নভার অপহরণে দুঃসাহসী হইতে ভরসা পায় না; পরমাসুন্দরী যুবতীর দিকে সহস্র চক্ষু থাকিলেও কেহ (অথবা স্বয়ং ইন্দ্রদেবও) চাহিতে সাহস করে নাঃ

> মধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি।
> রাজভয়ে মাতঙ্গে না যায় তারে ঠেলি॥
> বিধবা-নির্বলী-বৃদ্ধা বেচে রত্নভার।
> ভীম সম বলীয়া (বলী) না করে বলাকার॥
> সীতা সম সুন্দরী যদি সে রহে বনে।
> রাজভয়ে না নিরক্ষে সহস্র লোচনে॥

দৌলৎ কাজির কাব্যের কাহিনীটিকে একেবারে নিখুঁত বলা চলে না। কেননা চন্দ্রালীর প্রথম স্বামী ত্যাগ (অবশ্য নপুংসক বামন বলিয়া)ও পরে লোর রাজাকে বিবাহ করা কেমন যেন সংস্কারে বাধে।

চন্দ্রালীর চিত্র দেখিয়া রাজা লোরের চিত্তে প্রেমভাব জাগরিত হইলে কবি লিখিতেছেনঃ

> মানুষের গুপ্ত প্রেম ভাবে ব্যক্ত করে।
> সুবর্ণ বরিখে যেন দরিদ্রের ঘরে॥

উৎপ্রেক্ষাটি চমৎকার হইয়াছে। কাব্যের প্রতি ছত্রেই হিন্দু পুরাণাদির প্রতি কবির প্রীতি লক্ষ্য করা যায়। মুসলমানী ধর্ম কাহিনীর প্রভাব বিশেষ চোখে পড়ে না। স্বামি-প্রেম-বঞ্চিত চন্দ্রালীর দুঃখের বর্ণনা এইরূপঃ

> একাকিনী নারী দেখি দুরন্ত বসন্ত।
> পুষ্প শর লইয়া করে লাঘব অনন্ত॥
> স্বামী বিনে বিষণ্ণ কামের সে কামিনী।
> চন্দ্রের বিচ্ছেদে যেন তাপিত রোহিণী॥

নপুংসক স্বামীর প্রেম-প্রার্থনা প্রসঙ্গে চন্দ্রালী বলিতেছেনঃ

> সখিগণ সঙ্গে তাকে পুজিলুম বিস্তর।
> বিদ্যাধরিগণে যেন পুজে পুরন্দর॥
> স্বামিভাবে আপ্ত (আত্ম)ভাব করি বহুতর।
> সেবিলুম তাহারে যেন প্রত্যক্ষ শঙ্কর॥

বামনের সহিত যুদ্ধে লোর রাজা যখন বিপর্যস্ত, চন্দ্রালী তখন কাতর কণ্ঠে ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন,—

> সব ত্যজি রাজসুতা নিরঞ্জন স্তবে।
> ত্রিলোক ঈশ্বর নাম কায়মনে জপে॥
> তুমি হরি হর তুমি কমল-লোচন।
> তুমি দেব নৃপ, তুমি শ্রীমধুসূদন॥
> তুমি কৃষ্ণ তুমি বিষ্ণু গোবিন্দ মাধব।
> তোমা নাম প্রভাবেত (তে) জয় অসম্ভব॥"
> ....
> তুমি রেণু মরু কর, বিন্দু সিন্ধু ভর।
> মহাশূন্যে বুন্দের (বিন্দু) উৎপত্তি তুমি কর॥

এইরূপ অজস্র বর্ণনা যত্র-তত্র আছে।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর উল্লেখ তিন-চার স্থানে আছে, যেমন—

> চন্দ্রালীর তোমার মিলন মনোরম।
> বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম॥

অথবা,

> চন্দ্রালীর রূপ ভাবি লোরক ফাঁপর।
> বিদ্যারসে মগ্ন যেন বৈদেশী সুন্দর॥

Epigram ধরণের উক্তিও কাজি সাহেবের কাব্যে প্রচুর আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি চিন্তাশীল দার্শনিকের উক্তির মত সারবান। এখানে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইলঃ

> ভালে ভাল সমযুক্ত মন্দে মন্দ যথা।
> বিদ্বানেতে বিদ্যা কহি মূর্খেত মূর্খতা॥

অথবা,

আপনা শরীর যদি না হয় আপনা।
পৃথিবীতে আপ্ত (আত্ম) আর হইব কোন্ জনা॥

অথবা,

দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার।
এক যায় আন (অন্য) আইসে কেহ নহে সার॥

অথবা,

ধন নষ্ট হইলে পুনি উপার্জনে পায়।
অগ্নি শেষ হইলে পুনি পাথরে জন্মায়॥
চন্দ্র সূর্য অস্তাগিতে পুনি উগি যায়।
যৌবন চলিয়া গেলে পলটি না পায়॥

নানারূপে মিথ্যা ছলনা সাহায্যে মালিনী যখন ময়নাকে ব্যভিচারে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে, কবি তখন লিখিতেছেন—

কুত্যা সুতে পুষ্পবাক্য গাঁথিয়া কপটী।
গরল পিলায় যেন অমৃত লেপটি॥

অর্থাৎ sugar-coated তিক্ত 'পিল' গেলানো হইতেছে। বৎসরের বারোটি মাসের বর্ণন-সহযোগে নায়িকার মানসিক অবস্থার প্রসঙ্গোল্লেখ মধ্যযুগের বাঙলা কাব্যের একটি অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ। মুকুন্দরাম হইতে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সকলের কাব্যেই এইপ্রকার মাসক্রমিক ঋতু বর্ণনা আছে। ইহাকে বলা হয় 'বারমাস্যা' বা বারমাসী। কাজি সাহেবের কাব্যেও বারমাস্যার বর্ণনা বেশ চিত্তগ্রাহী। আষাঢ় হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত পর পর ক্রমে দ্বাদশ মাসের বর্ণনা আছে। অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে একাদশ মাস পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া দৌলৎ কাজির লেখনী স্তব্ধ হইয়া যায়, মহাকালের আহ্বানে তাঁহাকে পরলোক যাত্রা করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনা হইতে শুরু করিয়া বাকি কাব্যটুকু মুসলমানী বাঙলা সাহিত্যের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কবি আলাওল কর্তৃক লিখিত হয়।

যাহাই হউক, দৌলৎ কাজির কাব্যে ঋতু বর্ণনা বেশ কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। আষাঢ়ের শুরু এইভাবে—

প্রথম বরিষা দেখ প্রবেশ আষাঢ়।
বিরহিনী বিরহ বাড়ায় অতি গাঢ়॥

আষাঢ়ের সমস্ত বর্ণনাটির উপর বৈষ্ণব কাব্যের সুস্পষ্ট ছাপ আছে। যেমন,—

শুনহ উকতি, করহ ভকতি মান ও সুরতি রাই।
নাগর সুজন, মিলাই দেম (দিব)
যেন রাধ... কোলে কানাই॥

শ্রাবণের বর্ণনায় বাস্তব চিত্র বা realistic pictureটি বেশ ফুটিয়াছে,—

তিতিল অঙ্গেত যদি পাটম্বর শাড়ী।
অঙ্গে বস্ত্র লাগে যেন বস্ত্রহীন নারী॥

অতঃপর আদিরসের ব্যঞ্জনাটি মধুর—"তাতে নারী-পুরুষের জন্ময় বিগার (বিকার)।" শ্রাবণের বর্ণনা আরও চলিতেছে এইরূপঃ

শ্রাবণেত গগনে সঘন ঝরে নীর।
তবু মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর॥
মদন ঐষিক জিনি বিজলির নেহা (স্নেহ)।
তর্কয় যামিনী কাম্পয় মোর দেহা॥

লোর রাজমহিষী ময়নাকে যখন 'ছাতন' নামক রাজপুত্রের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা চলিতেছে শ্রাবণ বর্ষণ মধ্যে বিরহ-বিধুরা ময়না তখন ছাতনের দূতী মালিনীকে বলিতেছে—

লাখ পুরুষ নহে লোরক স্বরূপ।
কোথায় গোময়-কীট, কোথায় মধুপ॥

এখানে 'বিষম' অলঙ্কারটি চমৎকার হইয়াছে।

কার্তিক মাসের আরম্ভের বর্ণনাটিও বেশ—

কার্তিকেত কান্ত তোর গেল দিগান্তর।
বনপন্থ এড়ি যেন গেল দিবাকর॥

অগ্রহায়ণের আগমন এইরূপঃ—

অঘ্রান আইল নব, সুগন্ধি সাইল (সালি ধান্য?)
সব, বিবিধ ক্ষেত ক্ষেতি শোভয়॥

মাঘ মাস আসিতেই মুসলমান কবিরও প্রথমেই মনে পড়িল শ্রীপঞ্চমীর কথা—

মাঘ মাসেত শ্রীপঞ্চমী উজ্জ্বল।
রস বহু রঙ্গ কুশল॥

ফাল্গুনের আগমনেও কবির চিত্তে সর্বপ্রথম ফাগের কথাই উদিত হইল,—

ফাল্গুনে দেখ সখি, ফাগুন করে রঙ্গ
সবে মিলি ফাগু বসাই।
রতি-রস খেলাই, প্রিয়া সনে(?) চাই,
আনন্দ উৎসব চোহাই॥

মাঝে মাঝে অনুপ্রাসের প্রয়োগ মন্দ হয় নাইঃ—

নব চূত, অঙ্কুর, কিসলয় মঞ্জুল,
রঞ্জিত তরুলতাপুঞ্জে।
কোকিল কাকলী, কলকল কূজিত,
লুলিত ললিত নিকুঞ্জে॥

কবি নিশ্চয়ই জয়দেবের পদের কথা ভাবিতে-ছিলেন। দুইটি পদে দৌলৎ কাজি সংস্কৃত ভাষা মিশাইয়া কবিতা রচনার অতি হাস্যকর প্রয়াস করিয়াছেন। অনুস্বর দিলেই সংস্কৃত হয়, এইরূপ একটা উদ্ভট ধারণা বোধ করি কোনক্রমে তাঁহার মাথায় ঢুকিয়া থাকিবে। নচেৎ অন্তে অনুস্বর দিয়া এই ধরণের পদ রচনা করিবেন কেন?

ভাদ্র মাসে চন্দ্রমুখী, সুচরিতা কামিনী,
একাকী বসতি, তিমির অতি ঘোরাং।
অধর মধুরো, তাম্বুল বিনে ধুসরো,
নিশ্চল চকোর আঁখি ঝুরং॥

অথবা,

লাখ উপায়, মিটাতে কে পারয়
যে বিধি লিখিছে ললাটং।
" * * *

সো মধু তাজিয়ে করাওছি বিষপান,
ভালো ধাই, কহ উপদেশং॥

এই ধরণের অনুস্বর বিকীর্ণ দুইটি মাত্র পদ পাঠকের চক্ষু-কর্ণকে পীড়িত করে।

পূর্বেই বলিয়াছি, দৌলৎ কাজি তাঁহার কাব্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বারমাস্যা পদের একাদশ মাসের বর্ণনার পর কবি আলাওল এই কাব্যে লেখনী-ক্ষেপ করেন প্রায় বিশ বৎসর পরে। জ্যৈষ্ঠ মাসের বর্ণনা হইতে আলাওলের রচনা। কবি আলাওলের নিজের কথাতেই এই প্রসঙ্গের বর্ণনা দেওয়া যাক্—

সুচারু পয়ার মিলে নানা ছন্দগীত।
একাদশ মাস সাঙ্গ হৈল বিরচিত॥
আসরফে আদ্য বারো মাস আরম্ভিলা।
বৈশাখ সমাপ্ত জ্যৈষ্ঠ অসাঙ্গ
(যাহা সাঙ্গ বা সমাপ্ত নহে) রহিলা॥
তবে কাজি দৌলৎ স্বর্গেত হৈল লীন।
খণ্ড বাক্য পুস্তক আছিল চিরদিন॥......

অর্থাৎ অনেক দিন—

প্রসঙ্গ হইল লোর চন্দ্রানীর কথা।
অসাঙ্গ রহিল রঙ্গরস বাক্যকথা॥
সাঙ্গ হৈলে পুস্তক সম্পূর্ণ রস হয়।
শুনি(?) পাঠকের মনে আরতি পুরয়॥
এতেক ভাবিয়া সোলেমান মহামতি।
হরষিতে আদেশ করিল আমা প্রতি॥
এই খণ্ড পুস্তক পুরাও মোর নামে।
দুগ্ধ মধু আনিয়া মিলাও এক থামে॥

আলাওল-কৃত অংশের আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই চোখে পড়ে, আলাওলের ঈশ্বর প্রশস্তির ভিতর ফার্সি আরবী কথা একেবারেই নাই, এ বিষয়ে তিনি কাজি সাহেবকেও টেক্কা দিয়াছেন। যেমন,—

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।
সেয় প্রভা খণ্ডবাক্য করয় পূরণ॥

এই সুরেই বরাবর চলিয়াছে। একবার মাত্র মহম্মদের নামোল্লেখ আছে, তদ্ব্যতীত মুসলমানী-ধর্মপ্রসঙ্গ চোখেই পড়ে না।

আলাওল সংস্কৃতজ্ঞ কবি এবং পাণ্ডিত্যের দিক দিয়া তাঁহাকে কাজি সাহেবের উপরে স্থান দেওয়া যায়। কাব্য-রচয়িতা কবিগণ সম্পর্কে আলাওলের মন্তব্য আশ্চর্য সুন্দর—

কদাচিৎ নহে কবি সামান্য মনুষ্য।
শাস্ত্রে কহে কবিগণ ঈশ্বরের শিষ্য

শব্দকে যে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, আলাওলের

বোধ হয় তাহাও অজ্ঞাত নহে। তাই তিনি বলিতেছেন—

বচন অধিক রত্ন আর কিছু নাই।
তে কারণে স্বর্গ হৈতে পাঠালেন গোঁসাই॥

কাব্যকে আলাওল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন-সমূহের অন্যতম বলিয়াছেন,—

সংসারেত যত বস্তু সৃজিয়াছেন বিধি।
মনবে করিছে শ্রেষ্ঠ দিয়া কাব্য নিধি॥

"সতী ময়নামতী" কাব্যখানি ছাপার অক্ষরে সর্বসমেত ১৯৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহার মধ্যে ১০৩ পৃষ্ঠা দৌলৎ কাজির রচনা, বাকি ৯৫ পৃষ্ঠা আলাওল রচনা করেন। একজনের আরব্ধ রচনা বহুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তৃতীয় ব্যক্তির আদেশে আর একজনের পক্ষে সমাপ্ত করা রীতিমত পীড়াদায়ক ব্যাপার—একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। মনে হয়, দৌলৎ কাজির গ্রথিত কাহিনীর জের টানিতে গিয়া আলাওলও এইরূপ অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হইয়া থাকিবেন। বোধ করি সেই কারণেই তিনি তাঁহার রচিত ৯৫ পৃষ্ঠার মধ্যে পুরা ৪৬ পৃষ্ঠাই প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত হিসাবে অপর এক কাহিনী আনিয়া পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। লোর রাজা আপন রাজ্য ও প্রথমা পত্নী ময়নামতীকে ভুলিয়া চন্দ্রাণীকে বিবাহ করিয়া নূতন শ্বশুরের রাজ্যে যখন দীর্ঘকাল ধরিয়া বসতি করিতেছেন, তখন বিরহিনী ময়নাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহার এক সখী তাঁহাকে এই কাহিনীটি দৃষ্টান্ত হিসাবে শুনায়। স্বামী-নৃপতি-উপেন্দ্রদেব কর্তৃক পরিত্যক্তা রাজ্ঞী রতন-কলিকা অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করিবার পর কি করিয়া ভাগ্যবলে পুনরায় স্বামীকে ফিরিয়া পাইল কাহিনীটিতে ইহাই সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। সতী ময়নামতীও যে একদিন না একদিন তাঁহার স্বামী লোর রাজাকে পুনরায় ফিরিয়া পাইবেন, কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয় ইহাই।

নপুংসক বামন বলিয়া চন্দ্রাণীর স্বামী-ত্যাগ ও পরে তাহার মৃত্যুর কারণ ঘটানো ব্যাপারটিকে Plot হিসাবে কবি আলাওলও খুব সহজভাবে লইতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য কাজি সাহেবের কাহিনীর জের টানিতে গিয়া আলাওল চন্দ্রাণীর সতীত্ব সম্বন্ধে এক স্থানে কিছু পরিমাণে দ্বিধান্বিত আলোচনার প্রশ্রয় দিয়াছেন। লোর রাজার চিত্তে যখন ময়না-মতীর চিন্তার উদয় হইল, ময়নামতী-প্রেরিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-দূতের এক সারিকা পক্ষীর ঘটনা বর্ণন হইতে সেই সময় কথা প্রসঙ্গে লোর রাজা চন্দ্রাণীর সতীত্ব সম্পর্কে প্রথম কটাক্ষ করিলেন। তখন চন্দ্রাণী কর্তৃক আপন কার্যের সমর্থনের যুক্তিটিও মন্দ উপভোগ্য হয় নাই।

কথা আচ্ছাদিয়া রাণী বলিলা সত্বর।
পশ্চাতে কহিও আগে শুন পদুত্তর (প্রত্যুত্তর)॥
বালী সুগ্রীবের সঙ্গে ভুঞ্জি সুখ রতি।
দুই পতি তারার সকলে বলে সতী॥

যাহা হউক, ময়নামতী চন্দ্রাণী ও লোর রাজাকে লইয়া যে triangular সমস্যা দেখা দিল, আধুনিক হইলে ইহা হইতে নানাভাবে tragedyর সৃষ্টি করা চলিতে পারিত। আলাওল কিন্তু বেশ সহজেই এই সমস্যার গ্রন্থি উন্মোচন করিয়াছেন। অর্থাৎ চন্দ্রাণী ময়নামতীর কথা শুনিয়া এক মুহূর্তে সপত্নীর সংসারে গিয়া থাকিতে রাজি হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে-ও সতীনামে যশস্বিনী হইয়া উঠিল।

চন্দ্রাণী বলয় আমি বলি যথোচিত।
হেন প্রিয়া ত্যজি রহ শুনিতে কুৎসিত॥
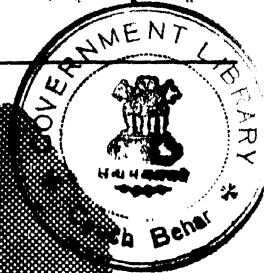
মোর প্রেম লাগি এই হইছে কুকাম।
এতো অধিক ময়না দুঃখে আমার দুর্নাম॥

*   *   *   *   *

ঝাটে চল এথাতে রহন নাহি কার্য।
পুত্র বিভা (বিবাহ) করাইয়া সমপহ রাজ্য॥

*   *   *   *   *

এত শুনি হাসিয়া বলিল নরপতি।
ধন্য ধন্য চন্দ্রাণী কুলবতী সতী॥

ইহার পর দুই সপত্নীতে মিলিয়া সুখে স্বামীর সংসার করিতে লাগিল—

এই মতে লোর চন্দ্রাণী ময়না সঙ্গে।
গোঁয়াইল চিরকাল নানা সুখরঙ্গে॥
ভক্তিভাবে দুইজনে সেবে নিজ পতি
নাহিক পিশুন হুষে (=রিষ-ঈর্ষা) দুই এক মতি॥

ময়নামতীর সতীত্ব প্রসঙ্গে কাজি সাহেব এবং আলাওল দুজনেরই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বেশ একটা স্বাধর্ম্য আছে বলিয়া মনে হয়। দৌলৎ কাজির মনোভাব বেশ বুঝা যায় ময়না ও মালিনীর বাদানুবাদের মধ্য দিয়া। অবশ্য এই বাদানুবাদের মধ্যপথেই কবির জীবনপথে ছেদ পড়ায় আলাওল এই প্রসঙ্গের জের টানেন। কিন্তু বাদানুবাদের ধারাটি আলাওল বেশ যোগ্যতার সহিতই চালাইয়াছেন। মালিনী ময়নাকে ছাতন নামক রাজকুমারের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ময়না সতীত্বের জয়-গান করিয়া মালিনীকে নিবৃত্ত করিতেছে। ময়নার মনের কথা কাজি সাহেব স্পষ্টই বুঝাইয়া দিলেন এইভাবে—

"সতী নামে ময়নামতী জগতে রাখিনু খ্যাতি
মরণে ত মুক্ত স্বর্গদ্বার।"

আলাওল আরও স্পষ্টভাবে bluntly বলিলেন,—

নির্দোষী পুরুষে শত নারী বিলাসনে।
রমণী অসতী হয় দ্বিতীয় কল্পনে॥

আলাওল অসতীত্বের স্বপক্ষে কোন যুক্তিই গ্রাহ্য করেন নাই। এমন কি শাস্ত্রের দৃষ্টান্তও তিনি উড়াইয়া দিয়াছেন দেবতার অজুহাত দিয়া—

সাধু বলে পঞ্চ পতি বরিয়া দ্রৌপদী সতী
দুই যুগ উজ্জ্বল হইল।
কালক্রমে তারাবতী সুগ্রীবে করিল পতি
তথাপিহ সতীত্ব রহিল॥

কিন্তু সতী রতনকলিকা (আলাওল বর্ণিত দৃষ্টান্ত কাহিনীর প্রধানা নায়িকা) এ যুক্তিও একেবারে উড়াইয়া দিলেন,—

কন্যা বলে তারা সব ছিল দেব পরাভব,
নরনারী হেন না সম্ভবে।

ময়নামতীর অনুপম সতীত্ব কাহিনীই এই কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইলেও চন্দ্রাণীও সতীত্বের উন্নত পর্যায়ে উঠিতে সক্ষম হইয়াছেন। শেষ অবধি দুই সতীই লোর রাজের মৃত্যু হইলে স্বামীর চিতায় উঠিয়া সহমরণে গমন করিয়া সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গেলেন—

ব্যাধি হই মৈল যদি লোর নরপতি।
সেই চিতা প্রবেশি চলিলা দুই সতী॥

এইখানেই সমগ্র কাহিনীর সমাপ্তি। ইহার পর আলাওল সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে সদুপদেশ দিয়া নিজের রচনা সম্পর্কে বহু বিনয় প্রকাশ করিয়া কাব্য শেষ করিয়াছেন। কাব্য সমাপ্ত করিবার পূর্বে আলাওল কিন্তু কবি দৌলৎ কাজিকে তাঁহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা-প্রশস্তি নিবেদন করিতে ভুলেন নাই—

শ্রীযুক্ত দৌলা কাজি মহা গুণবন্ত।
তানে আদ্যে করিয়া রচিল আদি অন্ত॥

তান সম আমার না হয় পদ গাঁথা।
গুণিগণ বিচারিয়া কহ সত্য কথা।

প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে এই কাব্যের ভাষা সম্পর্কে মাত্র দুই একটি মন্তব্য করিব। প্রথমেই বলিয়া রাখা দরকার যে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের এই রচনায় ছাপার অক্ষরেও আমরা বহু পুরাতন বাঙলা শব্দ, বিশেষ করিয়া পুরাতন রীতিতে শব্দের ও ধাতুর বিভক্তি প্রয়োগ এবং ক্রিয়াপদের অনেক অধুনালুপ্ত রূপ দেখিতে পাই। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া এইগুলির আলোচনা খুব মূল্যবান। একটি জিনিস বিশেষ করিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—তাহা এই কাব্যে প্রচুর নামধাতুর প্রয়োগ। কাব্যপাঠকালে আশ্চর্য হইয়া ভাবিয়াছি, মাইকেল মধুসূদনকে অদ্ভুত নামধাতু প্রয়োগের জন্য কেন যে বিদ্রূপ করা হইয়াছিল কে জানে! দৌলৎ কাজির (এবং আলাওলের অংশেও) কাব্যে প্রায় সর্ব-প্রকারের অদ্ভুত নামধাতুর প্রয়োগই মিলে। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।—

আরোহিলা (আরোহণ করিল), সমর্পিলা (সমর্পণ করিল), নির্মিল (নির্মাণ করিল), ইচ্ছে (ইচ্ছা করে), * আদেশিলা (আদেশ করিল), প্রণমিয়া, নিবেদিলুম, প্রবেশিল, গমিল (গমন করিল), দর্শাওসি (দেখাইতেছে), বিবর্তিলা (বিবৃত করিল), পরার্থিল (প্রার্থিল=প্রার্থনা করিল), পুরস্কারি (পুরস্কার দিয়া), তুষিলা (তুষ্ট করিল), স্মরাইলা (স্মরণ করাইয়া দিল), ইত্যাদি ইত্যাদি।

* ইহার সহিত মধুসূদনের "তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে" তুলনীয়।

সাহেব বিবির দেশে

নরেন্দ্র দেব

(রোম—পোপের রাজ্য—ভ্যাটিকান প্রাসাদ—ন্যাপলস্-'ম্পাই)

এক্সকার্শান মোটর কোচ্ পরদিন সকালে যথাসময়ে হোটেলে এসে আমাদের নিয়ে চললো রোমের চারটি প্রধান 'ব্যাসিলিকা' দেখাতে। 'ব্যাসিলিকা' বলতে বোঝায় রাজপ্রাসাদ তুল্য বৃহৎ অট্টালিকা, যার সম্মুখে প্রাঙ্গণ আছে, চার পাশে স্তম্ভ আছে, শীর্ষদেশে গম্বুজ আছে। রোমে এই ধরণের যতগুলি গির্জা নির্মিত হয়েছে, তাদের নাম হয়ে গেছে 'ব্যাসিলিকা'। রোমে ছোট-বড় মিলিয়ে মোট সাতটি 'ব্যাসিলিকা' আছে। তার মধ্যে 'সেণ্ট পীটার্স', 'সেণ্ট জন', 'সেণ্ট পল', আর 'সেণ্ট মেরী'—এই চারটিই প্রধান। এগুলি সব মহামান্য পোপের অধিকারে, তাঁরই এস্টেট বা সম্পত্তিরূপে গণ্য। অবশ্য পোপের রাজ্য-সম্পদ সবই দেবোত্তর সম্পত্তি; তাঁদের নিজস্ব কিছু নয়। যে যখন ধর্মসংঘ কর্তৃক পোপের পদের জন্য নির্বাচিত হন, তখন তিনিই সাময়িকভাবে হয়ে উঠেন এসব সম্পত্তির একমাত্র মালিক বা সর্বেসর্বা!

আমরা প্রথমেই এসে নামলাম সেই কালকের দেখে যাওয়া 'মোজেস ফোয়ারা'র বাম দিকের একটি গির্জার সামনে। এটির নাম 'সান্তা মারিয়া দেল্লা ভিক্তোরিয়া'। রোমের অসংখ্য গির্জার মধ্যে এটিকে দেখলে মনে হয় যেন হীরের টুকরো। ইতালিতে যত রকমের মূল্যবান মার্বেল পাথর ছিল, সব যেন খুঁজে খুঁজে জড়ো করে এই অনুপম উপাসনা মন্দিরটি তৈরি হয়েছে। প্রাগের সন্নিকটে বিয়াংকো পাহাড়ে সার্বভৌম অধিরাজিক ক্যাথলিক সৈন্যবাহিনী ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধে জয়লাভ করায় সেই বিজয়কে অবিস্মরণীয় করে রাখবার জন্য দানবীর 'পোপ পঞ্চম পল' এই সুন্দর উপাসনা মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে মেরী মায়ের নামে উৎসর্গ করিয়েছিলেন। এর ভিতরের শিল্পকর্ম ও বাহিরের কারুকার্যে রোমের তিনজন শ্রেষ্ঠ কলাবিদের হাত ছিল—বের্নিনী, সোরিয়া ও কার্লো মাদার্নো।

এখান থেকে বেরিয়ে 'সেণ্ট সুজানা' ও 'সেণ্ট কার্লিনো' গির্জা দুটিতে উঁকি মেরে চলে এলাম কুইরিন্যালের 'সেণ্ট এ্যানড্রু' গির্জাটি দেখতে। শিল্পী বের্নিনীর যাকিছু শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সবই রয়েছে এর মধ্যে। শিল্পী এই উপাসনা মন্দিরটির ভক্ত ছিলেন। এখান থেকে বেরিয়ে আবার আজ এসে পড়লাম 'পিয়াজা ভেনেজিয়ায়'। এখানে প্রথম আমাদের টাইবার নদীর একটি সুন্দর সেতু পার করে এনে দেখালে 'সেণ্ট এঞ্জেলোর দুর্গ'। এটি সম্রাট সাজাহান পত্নী মমতাজের সমাধি মন্দিরের ঠিক বিপরীত! অর্থাৎ নৃপতি মোসোলোর প্রিয়তমা মহিষী আলি কার্নেসোর রাণী আর্টেমিশিয়া তাঁর পরানপ্রিয় পতি নৃপতি মোসোলোর স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করিয়েছিলেন। রাণীর সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। রাজা মোসোলোর সঙ্গে তাঁর প্রিয়তমা আর্টেমিশিয়াও আজ জগতে অমর হয়ে গিয়েছেন—তাঁর নির্মিত এই চমৎকার এক জমকালো সমাধি মন্দিরের কল্যাণে। এটিকে লোকে পৃথিবীর কয়েকটি আশ্চর্য বস্তুর মধ্যে অন্যতম বলেও প্রচার করেন। মোসোলোর এই সমাধি মন্দির থেকেই যে-কোনও বৃহৎ সমাধি মন্দিরের নাম হয়ে গিয়েছে এখন 'মোসোলিয়ম'। এটি পাঁচতলা এক প্রকাণ্ড বৃত্তাকার ভবন। এত বড় বিরাট সমাধি মন্দির যথার্থই পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই সমাধি মন্দিরটি দুর্গ হল কেন? সে দীর্ঘ ইতিহাস ও এর পাঁচটি তলার বিশদ বর্ণনা দেবার একান্ত স্থানাভাব এখানে।

'সেণ্ট এঞ্জেলোর দুর্গ' থেকে বেরিয়ে আমরা রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ 'ব্যাসিলিকা' এবং পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে যেটি বড় গির্জা, সেই 'সেণ্ট পীটার্স' দেখতে এলাম। তার আগে এঁরা আমাদের দুর্ধর্ষ হেরোদ রাজা যে লৌহ শৃঙ্খলে ঋষি সেণ্ট পীটারকে বন্দী করে রেখেছিলেন, সেই শৃঙ্খল বা চেইনটিকে
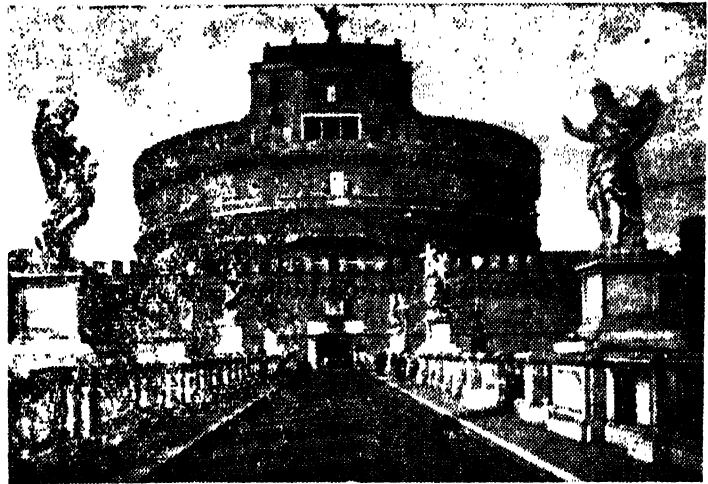
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমাধি মন্দির—'সেণ্ট এঞ্জেলো দুর্গ'
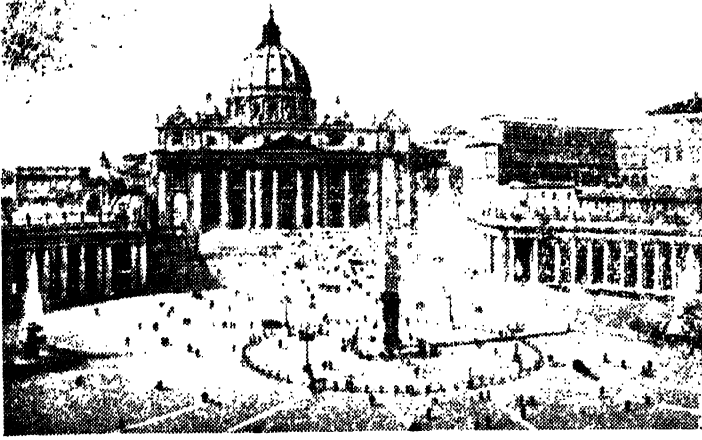
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় উপাসনা মন্দির—'সেণ্ট পীটার্স চার্চ'

সযত্নে রক্ষা করবার জন্য যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল, সেইটি দেখিয়ে আনলে। এখানে সব যাত্রীরাই আসেন, বিশেষ করে শিল্পীশ্রেষ্ঠ মাইকেল এঞ্জেলোর হাতের তৈরি ঋষি মোজেসের বিরাট প্রতিমূর্তিটি দেখতে। দেখবার মতোই বটে এ-মূর্তি। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, সত্যদ্রষ্টা ঋষি জীবন্ত মোজেসই যেন পৃথিবীর লোককে ডেকে বলতে চাইচেন—'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ!

সেণ্ট পীটার্স গির্জার সুবিশাল প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে প্রোথিত সূক্ষ্মশীর্ষ দীর্ঘ চতুষ্কোণ 'ওবেলিস্ক' স্তম্ভটি, দু পাশের দুটি শূন্যে উৎক্ষিপ্ত নির্মল জলের সুবৃহৎ উৎস, মন্দিরে ওঠবার বিরাট প্রশস্ত সোপানশ্রেণী প্রথম দর্শনেই ক্ষুদ্র এই মানুষের মনের মধ্যে মস্ত একটা চমক আনে। প্রভু যীশুখৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে অন্তরঙ্গ ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ সেণ্ট পীটার। যীশু ক্রুশবিদ্ধ হবার পর সেণ্ট পীটার খৃষ্টের বাণী ও খৃষ্টধর্মরূপ নব-বিধান প্রচার করতে গিয়ে হেরোদ রাজার কোপে পড়ে বন্দী হয়েছিলেন। সেখান থেকে পালিয়ে তিনি রোমে এলেন. কিন্তু এখানেও খৃষ্টধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সম্রাট নীরোর আদেশে সেণ্ট পীটারকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হল। সেই পবিত্র রক্তের সংস্পর্শে এসে রোমের মাটি তীর্থ হয়ে উঠলো এবং উত্তরকালে খৃষ্টধর্ম ধন্য ও বরেণ্য বলে সর্বজনের স্বীকৃতি পেলো। এই আত্মত্যাগী ঋষি সেণ্ট পীটারের পুণ্য সমাধির উপর রোমের প্রথম খৃষ্টান সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইন এই বিরাট ব্যাসিলিকা নির্মাণ করিয়ে দিয়ে-ছিলেন। খৃষ্টধর্মের প্রতীক যে ক্রুশচিহ্ন, ভূমির উপর সেই ক্রুশের আকারে ভিত্তি করে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় খৃষ্টধর্ম মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। রসেলিনী, ব্রামান্তে, র‍্যাফায়েল, সানজেলো, মাইকেল এঞ্জেলো, মাদার্নো, বেনিনী প্রভৃতি বিশ্ব-বিশ্রুত ইতালিয়ান শিল্পী, ভাস্কর ও স্থাপত্যবিশারদেরা একের পর এক সুদীর্ঘ শতাব্দী কাল ধরে এই আশ্চর্য প্রার্থনা-মন্দিরটিকে সুসম্পূর্ণ করেন। এর শীর্ষ-দেশে গগনস্পর্শী এক বিরাট আশমানী রংয়ের গম্বুজ নীলাভ আকাশের বুকে মিশে গেছে। সে যেন দর্শকদের মনে অদৃশ্য বিরাটের 'স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত' একটি স্বচ্ছন্দ সুন্দর স্বপ্নেররূপ পরম শ্রদ্ধায় জাগিয়ে তোলে। শিল্প-সাধনায় সিদ্ধ সাধক, কলাকুশল কীর্তিধর মাইকেল এঞ্জেলোর অমর প্রতিভা যেদিন এই বিশ্বস্তুত ভাগবত উপাসনা গৃহের পরিকল্পনা করে-ছিল, সেদিন শিল্পীর অন্তরে বোধ করি, অনন্তের রূপ বিরাট হয়ে সান্তের মধ্যে ধরা দিয়েছিল। সেই 'আদিত্য বর্ণং পুরুষম মহান্তমের' পরম দিব্য ভাবে অনুভাবিত হয়েছিলেন তিনি, নইলে চিত্তের মহত্তর অনু-ভূতিকে উদ্বোধিত করে তোলে, আত্মার গভীর কেন্দ্র স্পর্শ করে, এমন আনন্দ রসঘন মন্দির নির্মাণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। আশ্চর্য এ-মন্দির! দেখতে দেখতে মনে হয়, যাকিছু পবিত্র, যাকিছু মহৎ, যাকিছু অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সাপেক্ষ, শিল্পী যেন তাকে মহা তপস্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে মূর্ত করে তুলেছেন। ঋষি পীটারের সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত এই দেউলটিকে খৃষ্টধর্মের এবং মধ্যযুগীয় শিল্পোন্নতির বিজয়-বৈজয়ন্ত বলা যেতে পারে। অসংখ্য সুদীর্ঘ স্তম্ভ পরিবেষ্টিত অর্ধ-চন্দ্রাকার এর বিরাট বহিপ্রাঙ্গন উত্তীর্ণ হয়ে, অসংখ্য বিশাল সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে, ব্রোঞ্জের অলংকারমণ্ডিত বিপুল দ্বারপথে মন্দিরের মধ্যে যখন প্রবেশ করলাম, মন্দিরাভ্যন্তরের সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে সমস্ত মন ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়ে উঠলো। অগণিত তীর্থযাত্রী নরনারী, বালক-বৃদ্ধা-যুবা, ভক্তিভরে নতজানু হয়ে, নত-শিরে, হৃদিলগ্ন যুক্তপাণি ও তন্ময়চিত্তে প্রার্থনারত। অসংখ্য দীপশোভিত বেদীর উপর সুগন্ধ ধূপ-ধুনা পুড়ছে। নিস্তব্ধ মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজ করছে শুধু অসীম ভক্তি ও বিশ্বাসের এক অশরীর অভিব্যক্তি।

মহামান্য পোপ এসেছিলেন মন্দিরে সেদিন। জরির কাজ করা রক্তবর্ণ মখমলের চাঁদোয়া তলে পোপের পতাকামণ্ডিত দ্বিতলের ঝরোকায় দক্ষিণপাণি বরদানের মতো উর্ধ্বে তুলে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। অঙ্গে তাঁর রাজ-ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিশ্বের ধর্মগুরুর জমকালো ঝলমলে পোষাক। মাথায় তাঁর সেই ধর্মধ্বজের সূক্ষ্মাগ্র সুদীর্ঘ স্বর্ণময় মুকুট। আশে পাশে তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বিশপ ও কার্ডিন্যাল তাঁদের নিজ নিজ পদোচিত সমুজ্জ্বল আঙরাখায় শোভিত হয়ে দণ্ডায়মান ছিলেন। পোপের দণ্ড ও ছত্রধর সন্ন্যাসী ও পিঠবস্ত্রধারী ব্রহ্মচারীরাও সঙ্গে ছিলেন। বেদীর দক্ষিণে ও বামে বিশেষ আসনে রোমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই সমাসীন বলে মনে হল। মহামান্য পোপ তখন সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে আশীর্বাদ করছিলেন। আমরা বড় দেরিতে গিয়ে পড়েছিলাম। উপাসনা তখন সবেমাত্র শেষ হয়ে গিয়েছে। শুনলাম প্রায় চল্লিশ মিনিট আগে তিনি এসেছেন। আমরা আসবার একটু পরেই তিনি চলে গেলেন—তাঁর সেই গুরু-

মহারাজের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট সুবর্ণ তাঞ্জামে চড়ে। কাঁধে করে নিয়ে চললো তাঁকে তাঁর ভক্ত শিষ্য-বৃন্দ। বেজে উঠলো বিবিধ ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে তুরি-ভেরী ও সুদীর্ঘ শিঙা। লক্ষ কণ্ঠে উঠলো বিপুল জয়ধ্বনি। পোপের মিছিল চলে গেল যে পথে তাঁর দুপাশে দণ্ডায়মান বিশাল জনতা তাঁকে অভিবাদন জানাতে লাগলো। পোপের চলে-যাওয়া-পথের ধূলি নিয়ে তাঁরা ওষ্ঠ ও হৃদয়ে স্পর্শ করছে ও ক্রুশচিহ্ন আঁকছে; দেখে মনে হল, ভক্তির অভিব্যক্তি সব দেশের মানুষের মধ্যেই এক। ভাগ্যবান সিদ্ধ সাধকেরাই শুধু ভগবানকে প্রত্যক্ষ করেন শুনেছি, কিন্তু জনসাধারণকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় ভগবানের প্রতিনিধি ও অধ্যাত্ম পথপ্রদর্শক এই সব ধর্মগুরুকে নিয়েই। গুরুবাদী ভারতবর্ষের গুরু-মহারাজ ও স্বামীজীদের কথা মনে পড়ছিল। এমনিতরই 'প্রোসেশান' বেরোয়—বাজনা-বাদ্যি করে, হাতী-ঘোড়া সাজিয়ে এদেশের মোহন্ত মহারাজদেরও। সাধু-সন্ন্যাসীদের এই রাজসিক আড়ম্বরকে কোনও দিনই সুনজরে দেখতে পারিনি। পোপ মহারাজেরও এই আড়ম্বরপূর্ণ নাটকীয় প্রস্থান মনকে ভক্তির পরিবর্তে বিরুদ্ধ প্রশ্নে বিদ্রূপ-চঞ্চল করে তুললো। বুঝতে পারলাম, ভক্তির অঞ্জন চক্ষে না থাকলে এবং ভক্তির অমৃত অন্তরে ক্ষরিত না হলে এ-দৃশ্যের মধ্যে যে ঐশীভাব আছে, তা আমাদের কাছে ধরা পড়বে না!

সেণ্ট পীটার গির্জার সামনে ছাদের প্রাচীরের উপরে, গির্জার অভ্যন্তরে, চারি-দিকের দেওয়ালের ধারে ধারে, স্তম্ভের গায়ে গায়ে, উপরে ও নিচেয় যে অসংখ্য বিরাট সব মর্মরমূর্তি স্থাপিত আছে তার প্রত্যেকটি কোনও না কোনও ভুবনবিখ্যাত শিল্পীর নির্মিত ভাস্কর্য কলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মন্দির তলের ও ভিত্তিগাত্রের মূল্যবান মোজাইক ও মার্বেলের কাজ এবং বিচিত্র সুন্দর স্তম্ভরাজী অতীত রোমের অগাধ ঐশ্বর্যেরই পরিচয় দিচ্ছে। মাইকেল এঞ্জেলোর নির্মিত সেই বিরাট গম্বুজের ঠিক নিম্নভাগে আছে ঋষি সেণ্ট্ পীটার্সের সমাধি এবং প্রার্থনার উচ্চ বেদী। প'চানব্বইটি দীপ দিবারাত্র প্রজ্বলিত আছে সেই সমাধির সামনে। এর শীর্ষদেশে শিল্পী বের্নিনীর তৈরী চন্দ্রাতপখানি চারটি প্যাঁচের মতো ঘুরোনো ডিজাইনের থামের উপর বিরাজ করছে। কালো রংয়ের ব্রোঞ্জের উপর সোনালী কাজ করা দেখে মনে হয় যেন জাপানী শিল্পের অনুকরণ।

মূর্তিগুলির প্রত্যেকটিই অতি সুন্দর। তবে, বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাইকেল এঞ্জেলোর হাতে গড়া সেই করুণা-ময়ী কুমারী মায়ের কোলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ—তাঁর মৃত সন্তানটি। জগতের শাশ্বত জননীর জানুর উপর শুয়ে পড়ে আছে মরণাহত যীশু—যেন মৃত্যুঞ্জয়-যৌবনের

ঋষি মোজেসের প্রতিমূর্তি
শিল্পী—মাইকেল এঞ্জেলো

চিরন্তন প্রতীক! চিরনিদ্রায় শায়িত পুত্রকে কোলে নিয়ে মায়ের সে স্তব্ধ-গম্ভীর শোকার্ত রূপের তুলনা হয় না।

যে চারিটি বিরাট চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর সেণ্ট পীটারের প্রকাণ্ড গম্বুজটি আছে সেই থাম চারিটির মধ্যে চারিটি খোপ আছে। শোনা গেল খৃষ্ট জন্মের পবিত্র সপ্তাহে জনসাধারণকে এই চারটি খোপের মধ্যে কি আছে খুলে দেখান হয়। একটিতে আছে 'সেণ্ট্ এ্যানড্রুর মস্তক' যা রোমে নিয়ে আসা হয়েছিল। আর একটিতে আছে 'সেণ্ট্ ভেরোনিকার আবরণ'। কথিত আছে জেরু-জালেমের অধিবাসিনী ভেরোনিকা তরুণ-কান্তি যীশুকে গলগাথার পথে প্রকাণ্ড ক্রুশ কাঁধে বয়ে নিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছেন দেখে কৃপাপরবশ হয়ে নিজের ওড়নাখানি মাথা থেকে খুলে দিয়েছিলেন ক্লান্ত যীশুর স্বেদাপনোদনের জন্য। ভেরোনিকার সে করুণার দান যীশু-বহুমানে গ্রহণ করেছিলেন এবং মুখ মুছে সে আবরণ ধন্যবাদের সঙ্গে ভেরোনিকাকে ফেরত দিয়েছিলেন। ভেরোনিকা তখন একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন যে যীশুর সেই কণ্টকমুকুট শিরে ক্রুশবাহকের মূর্তিটি তাঁর মুখমোছা সেই ওড়নায় এমন-ভাবে মুদ্রিত হয়ে গেছে যে সে ছবি আর মোছে না!

আর একটিতে আছে সেই আদি 'ক্রুশ কাষ্ঠের' একটু টুকরো, যা রাজা কন্স্ট্যান-টাইনের মাতা সাম্রাজ্ঞী হেলেনা সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

আর একটিতে আছে সেই তরবারিখানি যা জনৈক নিষ্ঠুর সৈনিক আমূলবিদ্ধ করে দিয়েছিল বিশ্বের ত্রাণকর্তা প্রভু যীশখৃষ্টের পঞ্জরের মধ্যে।

'সেণ্ট্ পীটার্স' ব্যাসিলিকা দেখা শেষ করে আমরা এলাম 'সেণ্ট্ পল্' ব্যাসিলিকায়। এও এক বিরাট উপাসনা মন্দির। সেণ্ট্ পল থেকে এলাম 'সেণ্ট্ জন' ব্যাসিলিকায়। সেণ্ট্ জন ব্যাসিলিকা থেকে এলাম 'সেণ্ট মেরি' ব্যাসিলিকায়। সম্রাট কনস্ট্যান-টাইনের আদেশে সেণ্ট্ পলের মন্দির তৈরি হয়েছিল ঋষি পলের সমাধির উপর। চমৎকার এ মন্দির। দেড়শ' স্তম্ভ ঘেরা একটি চতুষ্কোণ দ্বারমণ্ডপের বা বাহিরাঙ্গণের মধ্যস্থলে সেণ্ট্ পলের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। চারিদিকে মোজাইক ও মার্বেলের উপর সোনালী কাজ করা। ভিতরে প্রবেশ করে দেখা গেল এটির অভ্যন্তরভাগ আবার পঞ্চ দেউলে বিভক্ত। অর্থাৎ পাঁচ-ফোকরে দালান! ফলে, মন্দিরাভ্যন্তরটি বেশ প্রশস্ত ও রহস্যের গূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে হয়। ভিতরের অগণিত স্তম্ভ, দুসারি আলাবাস্তারের বা স্ফটিকশুভ্র স্বল্প স্বচ্ছ শিলা নির্মিত বাতায়ন হতে বিনির্গত হচ্ছে আবছা আলো, শ্বেতশুভ্র ছত্রতলে সমুজ্জ্বল সোনালীর কাজ, ঝক্‌ঝকে মর্মরমণ্ডিত গৃহতল, যার উপর বাতায়নের শুভ্র স্বচ্ছ স্ফটিক ভেদ ক'রে আসা বিচ্ছুরিত আলোক ধারা প্রতিবিম্বিত হয়ে একটা জলাশয়ের বিভ্রম উৎপাদন করছিল। মন্দিরের বাতায়ন ও স্তম্ভরাজির ফাঁকে ফাঁকে মোজাইক ফলকে আঁকা রয়েছে প্রত্যেক

পোপের প্রতিমূর্তি। এখানকার নিভৃত উপাসনার স্থানটি (ক্লইস্টার) এত সুন্দর যে লোভ হয় এখানে বসে ধ্যানস্থ হবার। সেণ্ট পলের আলাবাস্তার থামগুলি চমৎকার। তার উপরের চন্দ্রাতপও সুন্দর। গায়ক ও যাজকবৃন্দের জন্য নির্দিষ্ট স্থানগুলিও অপূর্ব। শোনা গেল সাম্রাজ্ঞী গল্লা পিয়াশিদিয়া পঞ্চম শতাব্দীতে এই মোজাইকের কারুকার্য করা আসনগুলি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। আজও কিন্তু এগুলি সেই দেড়হাজার বছর আগের মতই ঝক্‌ঝক্‌ করছে। একটি সুগঠিত বৃহৎ প্রস্তর পেটিকার মধ্যে নাকি ঋষি পলের ব্যবহৃত বস্ত্রগুলি সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা 'সেণ্ট জন' ব্যাসিলিকায় এলাম। এটির প্রধান বিশেষত্ব হল পৃথিবীর মধ্যে এইটিই সর্বপ্রথম নির্মিত খৃষ্টধর্মের উপাসনা-গৃহ। সেণ্ট্ জন ব্যাসিলিকা নির্মিত হবার আগে বিশ্বের কোথাও নাকি কোনও গির্জা ছিল না। এটিও সম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইনের কীর্তি। এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হল অন্যান্য নানা প্রতিমূর্তি ছাড়াও যীশু খৃষ্টের দ্বাদশটি সেরা শিষ্যের দ্বাদশ প্রতিমূর্তি আছে এখানে। পাষাণ ফলকে উৎকীর্ণ করা সুন্দর শিলাচিত্রও অসংখ্য আছে এই মন্দির প্রাচীরে, তার সঙ্গে আছে অপূর্ব সব ফ্রেস্কো বা প্রাচীর-চিত্র এবং মোজাইকের ফলকে আঁকা রঙীন ছবি। এটির মধ্যেও সেই পঞ্চ মণ্ডপ বা 'পাঁচফুকর'। ব্যাসিলিকাগুলি অভ্যন্তরের প্রায় একই রকমের বলা যেতে পারে, প্রভেদ শুধু পরস্পরের সঞ্চিত সম্পদের ও ঐশ্বর্যের পরিমাণের। এখানে কাঁচে ঢাকা একখানি প্রাচীর চিত্র দেখলাম। এটি শিল্পী জিওত্তোর আঁকা। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহামান্য পোপ সর্বপ্রথম যে খৃষ্টধর্মের জুবিলি উৎসব প্রবর্তন করেছিলেন, চিত্রখানির বিষয়বস্তু তাই। পোপ অষ্টম বনিফেস্ জুবিলি ঘোষণা করছেন। এখানে রোমের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সমাধি রয়েছে। রাজা-মহারাজা, জ্ঞানী-পণ্ডিত ও তার সঙ্গে ধর্মগুরু পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের শ্বেত দেহও সমাহিত রয়েছে এখানে। সেণ্ট্ ফ্রান্সিসের ব্রোঞ্জ মূর্তিটিও উল্লেখযোগ্য।

এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া হল 'সেণ্ট্ মেরী মেজর' ব্যাসিলিকা দেখতে। কুমারী মেরী মাতার নামে উৎসর্গ করা এত বড় মন্দির পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই মন্দির সংক্রান্ত একটি কিম্বদন্তী আছে শোনা গেল যে, রোমের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মিঃ জন এবং তদানীন্তন পোপ লিবোর্তো ৩৫২ খৃঃ অব্দে একদা একই সঙ্গে স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন মেরী মাতার নিকট হতে যে কাল রাত্রে যেখানে প্রথম তুষারপাত হবে তোমরা সেখানে একটি উপাসনা মন্দির নির্মাণ কোরো। পরদিন রাত্রে বরফ সত্যিই এখানে পড়েছিল এবং স্বপ্নাদেশ মত সেখানে মেরীমাতার নামে উৎসর্গীকৃত এই ব্যাসিলিকাও

অনাদি জননীর কোলে শাশ্বত শিশু মানব
শিল্পী—মাইকেল এঞ্জেলো

নির্মিত হয়েছিল। প্রায়ই প্রত্যেক ব্যাসিলিকার বহিপ্রাঙ্গণে একটি করে সূক্ষ্মমুখ দীর্ঘ চতুষ্কোণ স্তম্ভ স্থাপিত আছে, যাকে 'ওবেলিস্ক্' বলেন এ'রা। এখানেও একটি আছে। এর চূড়ার উপর একটি ক্রুশ চিহ্ন সংযুক্ত আছে। এগুলির মিশর দেশ থেকে আমদানী হয়েছিল মনে হয়। রোমের মধ্যে মোট ১৩টি ওবেলিস্ক আছে। ভিতরে সারি সারি থাম দু'পাশে, মধ্যে প্রশস্ত হল, দু'ধারে অলিন্দ। থামের মাথার উপর বারান্দার মতো কাজ করা। দেওয়ালের গায়ে ও গম্বুজের নিম্নে ভিতর দিকটায় চমৎকার সুরঙ্গীন অলঙ্করণ ও প্রাচীর চিত্র রয়েছে। সিংহাসনে যীশু ও মেরীমাতা আসীন। দু'ধারে দেবদূতেরা ও ভক্তেরা তাঁদের স্তব-স্তুতি করছে। বড় সুন্দর এ ছবিগুলি। হঠাৎ দেখলে ভারতীয় দেব-দেবীর চিত্র বলে মনে হয়। শিল্পী বোর্নিনীর হাতের মূর্তি ও উৎকীর্ণ শিলাচিত্র এ মন্দিরে একাধিক আছে এবং এইখানেই রয়েছে দেখলাম সেই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সমাধি। তুরিয়তি, ফ্লামিনিও পাঞ্জা, ভালাদিয়ার, ফন্তানা, রীঙ্কী প্রভৃতি শিল্পী ও স্থপতির অসামান্য প্রতিভার দান এই সেণ্ট্ মেরী ব্যাসিলিকার সর্বত্র চোখে পড়ে। এ'দের হাতের প্রত্যেকটি কাজের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পুঁথি বেড়ে যাবার আশঙ্কায় সে লোভ দমন করা ছাড়া উপায় নেই।

আজ সকালে এই চারটি উপাসনা মন্দির খুঁটিয়ে দেখতেই মধ্যাহ্নভোজের সময় হল। আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। যথারীতি আবার বেলা দুটোর পর বাস এসে আমাদের তুলে নিয়ে চললো ভ্যাটিকান পাহাড়ের দিকে। ভ্যাটিকান সিটি, প্যালেস ও মিউজিয়ম দেখিয়ে আনতে। এই ভ্যাটিকান সিটি অর্থাৎ পোপের ধর্মানুমোদিত রাজধানী, রোমের মধ্যে স্থাপিত হলেও রোমের রাষ্ট্রাধিকারের অন্তর্গত নয়। বিগত ছ'শো বৎসর ধরে পোপ মহারাজেরা এই নগরে বন্দী হয়ে আছেন। কারণ, তাঁরা বড় একটা কোথাও বেরোন না। তার আগে অবশ্য এ'রা নব্বই বছর ছিলেন আভিঁয়োতে। তার আগে ছিলেন লেতেরানে। সর্বশেষে এ'রা আসেন এই ভ্যাটিকানে। রোমকে সুন্দর করে সাজানো, একে সকল দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে তোলার ব্যাপারে পোপেদের দান বড় সামান্য নয়। এই ভ্যাটিকান সিটি ও ভ্যাটিকান প্রাসাদকেও তাঁরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু 'পোপ' মহারাজের বসবাসের উপযুক্ত করে রেখেছেন।

ঋষি সেণ্ট্ পীটারের সিংহাসনে আজ পর্যন্ত একে একে দু'শো যাট জন পোপ পর পর অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ'দের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত ঋষি-তপস্বী ও ধর্মার্থে জীবন উৎসর্গকারী মহাপুরুষ ছিলেন। এ'দের সকলের জীবন ও কর্মের নানা ইতিহাস শুধু যে রোমক সভ্যতারই কাহিনী, তাই নয়, তাকে বিশ্বের ধর্ম ও সংস্কৃতির একটা অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসও বলা চলে। সেই আত্মদর্শন প্রয়াসে জড় ও চৈতন্যের নিয়ত দ্বন্দ্ব, মানবের অন্তর্প্রকৃতির সেই একাধারে নিয়মানুবর্তিতা ও

ভস্মাবরণমুক্ত পম্পা ইয়ের ধ্বংসাবশেষ

উচ্ছৃঙ্খলতা—অর্থাৎ, শান্ত ও রৌদ্র ভাব, সেই মানসলোকে সত্য ও মিথ্যার অবিরত বিরোধ, সেই বন্ধন ও মুক্তির মধ্যে মানুষের আনন্দ ও বেদনার অনন্ত আকুতি যা ভারতকে একদিন জ্ঞানমার্গে পরিচালিত করেছিল, রোমকেও সেই পথের যাত্রী হতে দেখা যায়। রাজর্ষি জনকের ন্যায় এই সব জ্ঞান-তপস্বী পোপ মহাপুরুষেরা ছিলেন রাজোচিত ভোগ ঐশ্বর্যের মধ্যেও নিষ্কাম ও অনাসক্ত পুরুষ। কালক্রমে আর্য ব্রাহ্মণের ন্যায় এঁদেরও অধঃপতন ঘটেছিল এবং ধর্মের চেয়েও বিষয়াসক্তি এদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধবিগ্রহ, রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র, কূটনীতির কুটিল চাল সবই একে একে এঁদের মধ্যে এসেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ধর্মটা রাষ্ট্রেরই বাহনস্বরূপ এক 'আধ্যাত্মিক ব্যবসা-বাণিজ্যে' পরিণত হয়েছিল। কোটি কোটি মানুষের ভক্তি ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভ্যাটিকানের অতি নির্লজ্জ দোকানদারী আজ বড় বে-আব্রু-ভাবে চোখে পড়ে। কিন্তু ধর্ম নাকি মানুষকে অন্ধ করে দেয়, তাই ধর্মান্ধ মানুষ আজও এই অন্তঃসারশূন্য ভ্যাটিকানের ধর্মীয় কঙ্কালটাকে বুদ্ধের পবিত্র অস্থির মতোই আঁকড়ে ধরে পূজা করে। জীবনের সাধনা তার অর্থ-উপলব্ধি এবং সার্থকতা পরিস্ফুট করার দিকে সক্রিয় হয় না।

দু' হাজার বছর ধরে এই ভ্যাটিকানের ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসের সর্ব প্রধান অধ্যায় হয়ে আছে। ঝড়ের পর ঝড় এসেছে, জগতের বুকে কত প্রলয়, কত ওলোট পালট হয়ে গেছে; শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল-স্রোতে মিশে গেছে। পুরুষ পরম্পরা মানুষ জন্মেছে, মরেছে। কত পীড়ন, কত নির্যাতন, কত ভয়, কত বাধা—তবু কিন্তু ভ্যাটিকানের যে সংস্কার একদিন খৃষ্টান জগতের চিত্তকে ওতোপ্রোতভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা থেকে বিংশ শতাব্দীর এই অতি আধুনিক বিজ্ঞানের যুগও তার সব-কিছু প্রগতিমূলক শিক্ষা-দীক্ষা নিয়েও তাকে মুক্তি দিতে পারেনি। লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীর নানা দিক থেকে আজ রোমে ছুটে আসছে 'হোলি ইয়ারে' পুণ্যার্জনের প্রলোভনে। এ দেখে মনে হয় ঈশ্বরে বিশ্বাসই মানুষের স্বভাবধর্ম। অবিশ্বাসটা স্বল্প-জ্ঞানের অহঙ্কারপ্রসূত!

ইতালির রাজশক্তির সঙ্গে একটা আপোষ-চুক্তি নিষ্পন্ন করে গত ১৯২৯ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই ভ্যাটিকান নিজেদের একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য বলে ঘোষণা করেছেন। ভ্যাটিকান প্রাসাদ তার ঐশ্বর্যের মহিমায় বহু রাজপ্রাসাদকে ম্লান করে দেয়। সে কি বিরাট প্রাসাদ এবং তার মধ্যে সে কি বিপুল সম্পদ! পৃথিবীর যেখানে যা কিছু ছিল সুন্দর, মহান, অমূল্য ও অনুপম পোপের ভাণ্ডারে সেগুলি সব যেন এসে জড়ো হয়েছে। এ যেন একটা আলাদা জগতের মধ্যে এসেছি। গুণে দেখিনি, কিন্তু মুদ্রিত তালিকায় রয়েছে এই প্রাসাদের মধ্যে এগারো হাজার ঘর আছে! মিউজিয়াম, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, প্রার্থনাঘর, বারান্দা, উঠান অলিন্দ, বাগান সব কিছুই শিল্প-শোভায় ও কলা সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়। প্রকৃতপক্ষে রেনেসাঁর পর থেকে ইতালির এমন কোনও বিভাগের এমন কোনও শিল্পী নেই যাঁর প্রতিভার যাদু স্পর্শে ভ্যাটিকান ধন্য হয়নি। এর মধ্যে দ্রষ্টব্য আছে বহু। প্রথমেইতো ভ্যাটিকানপ্রাসাদের উপরে ওঠবার ও নামবার জন্য নির্মিত সোপান দুটিই এক বিস্ময়। বাস্তুশিল্পীর এ এক অতি অদ্ভূত উদ্ভাবন! একটির উপর দিয়ে আর একটি সিঁড়ি একই দিকে এমনভাবে সুকৌশলে নির্মান করা হয়েছে যে একদল যখন সেই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছেন তখন আর একদল হয়ত উপর থেকে নিচেয় নামছেন, কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পাবেন না।

ভ্যাটিকানের এই প্রাসাদের মধ্যে যে সব বিভাগ আছে এবং সেই সমস্ত বিভাগে যে সমস্ত সম্পদ আছে তার একটা 'মোটামুটি' বর্ণনাও দিতে গেলে তিনচার সপ্তাহ লেগে যাবে। এই জন্যই পারিসের বিশ্ববিখ্যাত 'লুভার' মিউজিয়মের বিশদ বিবরণ এ নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব হয়নি। ভ্যাটিকানের সব কথাও এখানে বলা চলবে না। কারণ, ভ্যাটিকানের সংগ্রহও লুভারের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। সিসটাইন চ্যাপেল, বর্জিয়ার ঘর, র‍্যাফায়েলের মহল ও বারান্দা, পোপ পঞ্চম নিকোলাসের প্রার্থনাগৃহ, পায়ো-ক্লেমেন্তিনো সংগ্রহশালা, শিয়ারা-মান্তি সংগ্রহশালা, এট্রুস্কান সংগ্রহশালা, মিশরীয় মিউজিয়ম, ধর্মসংক্রান্ত সংগ্রহশালা, জীব-জন্তুর যাদুঘর, গ্রন্থশালা, দীপশালা, চিত্রশালা, ভূগোলঘর বা মানচিত্রশালা—কত আর নাম করবো। আমি কেবল পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য এখানে অল্প একটি দর্শনীয় বস্তুর নাম-মাত্র উল্লেখ করে ক্ষান্ত হবো। একতলায় 'সিসটাইন চ্যাপেল' বা প্রার্থনা ঘর। পোপ চতুর্থ সিক্সতাস্ এটি নির্মাণ করান। এ ঘরের আপাদ মস্তকে প্রাচীর চিত্র শোভা

পাচ্ছে। একদিকে খৃষ্টের সমগ্র জীবন, আর একদিকে মোজেসের সমগ্র জীবন আঁকা রয়েছে। সে সময় (১৪৮১ খৃঃ অঃ) প্রায় প্রত্যেক উপাসনা মন্দিরের ভিতরটায় এই রকম চিত্রিত করে নেওয়া রেওয়াজ ছিল। এ সব ছবি মাত্র একজন শিল্পীর দ্বারা আঁকিয়ে নেওয়া সম্ভব হত না, কারণ এক একখানি চিত্র শেষ করতে এক একজন শিল্পীর পাঁচ ছ' বছর সময় লাগতো। একাধিক শিল্পী এতে কাজ করেছেন। ডল্সি, পেণ্টুরিশো, র‍্যাফায়েল, পেরুজিনো, বত্তিচেলী, রসেলী, শেষ পর্যন্ত মাইকেল এঞ্জেলোরও ডাক পড়েছিল। তিনি এর ছত্রতল চিত্রিত করে দিয়েছিলেন। মাইকেল এঞ্জেলো যে কত বড় একজন শিল্পী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় এই ছত্রতলের চিত্রগুলির কল্পনা ও বিষয়বস্তুর নির্বাচনের রুচি থেকে। কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করছি—'তিমির গর্ভ হতে আলোকের উদ্ভব' 'চন্দ্র সূর্যের আবির্ভাব' 'আদি মানবের জন্ম'—অভিজ্ঞেরা বলেন, মাইকেল এঞ্জেলো যদি আর কিছুই না করতেন, তাহলেও, কেবলমাত্র এই চিত্রখানির জন্যই তিনি অমরত্ব লাভ করতে পারতেন! 'ঈভের সৃষ্টি' এবং 'মহাপ্রলয়'ও তাঁর অপূর্ব চিত্র। কিন্তু সব ছবিকে ছাপিয়ে উঠেছে মাইকেল এঞ্জেলোর 'শেষ বিচার' ছবিখানি। ভগবানের দরবারে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের শেষ দিনের অন্তিম বিচার চিত্রে শিল্পী যে আশ্চর্য কল্পনা করেছেন, দেখে বোঝা যায় তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে গিয়েছিল। ভগবানকে অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন নিশ্চয়, নইলে এ কল্পনা কোথায় পেলেন তিনি? যার মধ্যে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় একাধারে প্রকট? মাইকেল এঞ্জেলোর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের মধ্যে এই চিত্রই বোধ করি তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি। এ একেবারে অনুপম, অননুকরণীয় ও মহান। আরও বহু চিত্র এখানকার একাধিক চিত্রশালায় রয়েছে সেগুলির কথা বিশেষ করে র‍্যাফায়েল সম্বন্ধে বলতে শুরু করলে সংক্ষেপে শেষ করা যাবে না। অতএব নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ।

ভাস্কর্য শিল্পের যে অমূল্য সংগ্রহ এখানে আছে, বিশেষজ্ঞেরা বলেন এ নাকি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। 'আপোলো' 'ভেনাস', 'লাওকুন', 'তোর্সো' প্রভৃতি কতকগুলি মূর্তি শুধু দুর্লভ নয়, অতুলনীয়। মূর্তিগুলি শ্রেণী হিসাবে এখানে সুন্দরভাবে ভাগ করা আছে, যেমন পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি বিভাগ, অর্ধাবয়ব অর্থাৎ আবক্ষ বা কটিদেশ পর্যন্ত প্রতিমূর্তি বিভাগ, 'মুখমণ্ডল' বিভাগ অর্থাৎ শুধু মুণ্ড বা মাথাটি; জীব জন্তু বিভাগ, তৈজসপত্র বিভাগ ইত্যাদি। যে 'তোরণ চতুষ্টয়ের' (কোয়াট্রো ক্যানসেলি) বা চার দোয়ারী ফটকের ভিতর দিয়ে গ্রন্থাগারে যেতে হয় সেটিও দেখবার মতো। লাইব্রেরীতে সেকালে কিভাবে কেমন করে বই রাখা হত তার একটা পরিচয় পাই। লাইব্রেরীর মধ্যে বহু অধুনা বিলুপ্ত মূল্যবান গ্রন্থ আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এখানে সোনারূপো ও হীরা জহরতের কাজ করা প্রচ্ছদপটের মধ্যে বৃহদাকার, মাঝারি ও অতি ক্ষুদ্র কয়েকখানি ধর্মগ্রন্থ আছে।

এখানকার 'দীপশালা' (গ্যালারি অফ দি ক্যান্ডেলাব্রা) উল্লেখযোগ্য। সেকালে কতরকম দীপ যে ব্যবহার হত, ঝাড়-লণ্ঠন, বাতিদান, শাখা প্রদীপ, গাছ প্রদীপ, বেললণ্ঠন, দেওয়ালগিরি প্রভৃতি অসংখ্য এখানে সংগৃহীত আছে। এখানকার 'নব-সরস্বতীর মহল'ও (হল অফ দি মিউজেস) উল্লেখযোগ্য। ঝাউফলের মতো কোনাচে প্রাঙ্গণ; (দি কোর্ট ইয়ার্ড অফ্ ফারকোন্) পার হয়ে বেলভেডিয়ার মহল ঘুরে মানচিত্রের দালানে আসা যায়। পৃথিবীর প্রারম্ভ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত কিভাবে যুগে যুগে কালে কালে ভূগোলের পরিবর্তন হয়েছে। রোম সাম্রাজ্যের পত্তন থেকে তার ক্রমবিস্তার কিভাবে হয়েছিল পর পর মানচিত্রের সাহায্যে সেগুলি দেখানো হয়েছে। আধুনিক চিত্র সংগ্রহও এখানে প্রচুর আছে। 'নবসরস্বতীর দালানে' প্লেটো পেরিক্লিস, সফোক্লিস প্রভৃতি কয়েকজন বিশ্বকবি ও জ্ঞানীর প্রতিমূর্তি আছে। এই 'নবসরস্বতী'র পরিকল্পনা রোমের নয়, প্রাচীন গ্রীসের। আমরা একমাত্র দেবী সরস্বতীকেই চৌষট্টীকলা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী বলে পূজা করি, কিন্তু গ্রীসে নয়টি প্রধান প্রধান কলাবিদ্যার জন্য নয়টি পৃথক পৃথক দেবী পরিকল্পিত হয়েছিল। 'মিউজ' সেই গ্রীক বাগ্দেবীগণের একজন। তাঁরই নামে উৎসর্গ করা এই 'হল অফ দি মিউজেস।' এক কথায় এটিকে 'প্রতিভা-মন্দির' বলা চলে।

ভ্যাটিকানের সব কিছু দেখে ফিরতে বেলা পড়ে এল। ফেরার পথে আমাদের 'কেয়ুস সেস্টুসের' পীরামিড দেখিয়ে এ'রা নিয়ে এলেন খৃষ্টান প্রোটেস্ট্যাণ্ট সমাধি ক্ষেত্রে কারণ, মহাকবি শেলী ও কীটসের সমাধি সন্দর্শনের জন্য আমরা অনেকেই অনুরোধ জানিয়েছিলাম। এই দুই অস্তমিত কবি-সূর্যের সমাধি বেদীর উপর আমরা যখন শ্রদ্ধাভরে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করছিলাম রোমের সাতপাহাড়ের আড়ালে সেদিনের ইতালির আকাশের সূর্যও তখন অস্তাচল-মুখী। সেই বিদায়ী ভানুর অন্তরাগে কবি-দ্বয়ের পুষ্পোকীর্ণ সমাধি দুটি রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। এ'দের সমাধিমূলে ফুলের অর্ঘ দিয়ে বড় তৃপ্তি পেলাম।

রোমের যা কিছু দেখবার দুদিনের মধ্যে দেখে নিয়ে আমরা পরেরদিন ন্যাপলস রওনা হোয়ে গেলাম। কারণ, হোটেল সেদিন আমাদের ছেড়ে দিতেই হবে কথা ছিল। হোটেল কর্তৃপক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ককে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে আমরা ভোরের ৬-১৫ মিনিটের ট্রেন ধরবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। শ্রদ্ধেয় দর্শনাচার্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার ও বন্ধুবর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রোমের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নামে পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন আমাদের, কিন্তু, সময়াভাবে তাঁদের কারুর সঙ্গেই দেখা করা সম্ভব হল না। ট্রেনখানি দশটা পনেরো মিনিটে আমাদের ন্যাপলস্ বন্দরে এনে পৌঁছে দিল। রোম থেকে ন্যাপলস্ ১৫৬ মাইল পথ। মাত্র চার ঘণ্টায় ইতালীর এক্সপ্রেস ট্রেন আমাদের ন্যাপলস বন্দরে এনে ছেড়ে দিলে। এবার ট্রেনে আমাদের কোনও কষ্ট হয়নি। তবে মানসিক দুঃখ ভোগ খানিকটা হল। কারণ, ট্রেন ছেড়ে দেবার কিছু পরেই দেখা গেল নবনীতা তার নূতন কেনা দামী ক্যামেরাটি রোমের হোটেলে ফেলে চলে এসেছে! ক্যামেরার জন্য কষ্ট যত না হোক আমাদের তোলা কতকগুলি ভাল ভাল ছবির জন্য কষ্ট হল বেশি। গাড়ী থেকেই

টেলিগ্রাম করে দিলাম হোটেলের ম্যানেজারের কাছে। চিঠি দিলাম রোমের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সুহৃদ্বর শ্রী বি আর সেনকে ক্যামেরাটি উদ্ধার করবার জন্য। সেকেন্ড ক্লাস সীট তিনখানি একদিন আগে থেকেই রিজার্ভ করে রেখেছিলাম। ট্রেনে এসে দেখা গেল 'রিজার্ভেশন স্লীপ' একদম মাঠে মারা গেছে। ট্রেন একেবারে ফাঁকা। অত ভোরে এদেশে কে বিছানা ছেড়ে উঠে আসবে ট্রেন ধরতে? সাড়ে সাতটায় আর একখানা গাড়ী ছিল। কিন্তু আমরা আগের গাড়ীতেই রওনা হয়ে গেলাম, একটু সকাল সকাল মহাবীর নেপলিয়ঁর কীর্তিবহা নগরী ন্যাপলসে পৌঁছাবো এবং সম্ভব হলে ন্যাপলস দেখে সেইদিনই ভস্মাবরণমুক্ত প্রাচীন 'পম্পাই' নগরী সন্দর্শনে যাবো।

ঠিক বেলা দশটা পনেরো মিনিটে ন্যাপলস বন্দরে এসে নামলাম। বন্দর ও শহর এক সঙ্গেই প্রায়। চমৎকার সুদৃশ্য শহর। ছবির মতো সুন্দর। চিত্তপ্রফুল্লকর এর পরিবেশ। অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য স্মরণ-সৌধ রয়েছে এখানে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে 'ক্যাসল নুভো'র। এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রথম নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে এটিকে আবার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। ল্যায়ানার 'আর্ক দা ট্রায়াম্ফ' বা বিজয়তোরণটিও ভারি সুন্দর। এখানে আর আমরা 'এক্সকার্শান বাস' নিইনি। নিজেরাই ঘুরে ফিরে যা পারি দেখে নিচ্ছিলাম। ন্যাপলস উপসাগর তীরে বিস্তৃত এই বন্দর সমৃদ্ধ রূপসী নগরী যেন কোনও লোক-সঙ্গীত ও রূপকথায় শোনা সাগর-বালার মনোমুগ্ধকর কাহিনীর মতো চিত্তাকর্ষক। এখানেও বহু যাত্রী এসেছেন দেখলাম। ন্যাপলসের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যও প্রচুর। চারিদিকে ঘনসবুজের 'শ্যাম সমারোহ', ঊর্ধ্বে অনন্ত প্রসারিত নির্মল নীলাকাশ। সাগরবেলার বালুকণা যেন স্বর্ণ রেণু বলে ভ্রম হয়। ভূমধ্য সাগরের স্বচ্ছ সমুদ্বেল জলতরঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে ছুটে এসে যেন এর চারুচরণ চুম্বন করে ধন্য হয়ে যাচ্ছে! প্রশস্ত রাজপথ সমূহ। রেস্তোরাঁ, কাফে বা হোটেলের কোনও অভাব নেই। থিয়েটার সিনেমাও প্রচুর। এখানকার সান কার্লো অপেরার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। ন্যাপলসের উপকণ্ঠে আজও গ্রীস ও রোমের কোনও কোনও ঘর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। 'নেরোঁর নাট্যশালা', 'ভার্জিলের সমাধি', 'সেন্ট রেস্টিচুটা ব্যাসিলিকা' ন্যাপলসের গৌরবময় দর্শনীয় সম্পদের মধ্যে। আরও অনেক গির্জা বা উপাসনা মন্দির চোখে পড়লো, কিন্তু সদ্য রোমের ফেরত আমাদের কাছে তার আর কোনও আকর্ষণ ছিল না। মিউজিয়ম ও আর্টগ্যালারীগুলিতে ন্যাপলসের মধ্যযুগের যুদ্ধপ্রবণতার ইতিহাস, রেনেসাঁর গৌরবের যুগ, 'বারোক'যুগের অদ্ভুত মণ্ডনশিল্পের প্রাচুর্য এবং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বহুবিধ শিল্প-প্রগতির নিদর্শন দেখে প্রচুর আনন্দ পাওয়া গেল।

ল্যাঞ্চের আগেই আমাদের ন্যাপ্‌লস্ দেখা শেষ হয়ে গেল। এখান থেকে বাস্ নিয়ে চলে গেলাম যুগযুগান্তের ভস্মস্তূপ হতে উদ্ধার করা 'পম্পাই' শহরের প্রাচীন রূপটি দেখতে। লর্ড লিটনের 'পম্পাইয়ের শেষ দিনগুলি' (লাস্ট ডেজ্ অফ পম্পাই) শীর্ষক উপন্যাসখানি যখন পড়ি, তখন প্রথম যৌবনের রোমাঞ্চ-ভরা তরুণ হৃদয়, নয়নে কল্পনার কত না রঙীন ভাবাঞ্জন। সহসা আগ্নেয়গিরি ভীষু-ভীয়সের ধূম-জ্যোতি, গলিত ধাতু ও তরল অনল এবং ভস্মরাশি উদ্গীরণের ফলে সেই সুসমৃদ্ধ পম্পাই শহর দেখতে দেখতে কেমন করে একদিনে ভস্মস্তূপের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেল, সেই ভীষণ দুর্দিনের—সেই ভয়ংকর দুর্ঘটনার যে আশ্চর্য বর্ণনা রেখে গেছেন লিটন তা' বার বার মনে পড়তে লাগলো আজ এই পম্পাই দেখতে এসে। আজ থেকে দু' হাজার বছর আগেও এ শহর জীবন্ত ছিল—যেমন ছিল একদিন রোম, মিলান, ফ্লোরেন্স্, ভেনিস। ইং ৭৯ খৃঃ অব্দে পম্পাই চাপা পড়েছিল ভস্মস্তূপের নীচে। কিছুদিন আগে ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে ইতালির প্রত্নবিভাগের কর্মকর্তারা লুপ্ত শহরটিকে উদ্ধার করেছেন। যদিও গোটা শহরটির সব কিছু আজ আর অক্ষত অবস্থায় নেই, তবু এই পম্পাই দেখে সুস্পষ্ট বোঝা যায় দু' হাজার বছর আগের মানুষেরা যে শহরে বাস করতেন, সে শহর কেমন ছিল। আজকের পৃথিবীর যে কোনও একটি ভাল শহরের চেয়ে যে সেদিনের শহর কোনও অংশে ন্যূন ছিল না এর প্রমাণ পেলাম ভস্মস্তূপ বিমুক্ত প্রাচীন পম্পাইয়ের ধ্বংসাবশেষের দিকে চেয়ে। সুন্দর রাস্তা ছিল পম্পাইয়ে। শহরবাসীদের ঘরবাড়ি-গুলিও বেশ ভাল ছিল। দোকানপাটও যথেষ্ট ছিল। এমনকি রীতিমতো থিয়েটারও দেখতেন সেযুগের মানুষেরা। 'ফোরামের' অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে ইতালির সব শহরেই আবহমানকাল থেকে ছিল। পম্পাই শহরের বুকের উপর যে ফোরামটি ছিল, সেটি প্রায় অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার পেয়েছে। পম্পাই তখনও প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয় নি। তাই এখানে দেবদেবীদের দেউল ছিল, কিন্তু উপাসনা মন্দির ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এখানে রোজেরিয়ো ধর্ম-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কুমারী মেরি-মাতার নামে একটি সুন্দর প্রার্থনা মন্দির স্থাপিত হয়েছে। প্রাচীন পম্পাইয়ের ভগ্নস্তূপের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ক্ষণে ক্ষণে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছিল। মনে হচ্ছিল হয়ত একদা অতীতে আমি ছিলাম এই অভিশপ্ত শহরের একজন অধিবাসী। সেই ঘোর দুর্যোগের মধ্যে সেদিন—কে জানে?—আমিও হয়ত' প্রাণভয়ে বাঁচবার আশায় এর সেই ধূমাচ্ছন্ন অন্ধকার রাজপথে ব্যাকুল হয়ে কত ছুটাছুটি করেছি। তারপর কখন সংজ্ঞাহীন হয়ে হয়ত' সেই গলিত অগ্নি-স্রোত ও অশ্রান্ত ভস্মবৃষ্টির প্রলয়ালিঙ্গনে রুদ্ধশ্বাসে আত্মসমর্পণ করেছি। (ক্রমশ)

এটা একটা ছোট ক্যামেরা গোল একটা আধুলির মত। এতে ছবি তোলবার জন্য এক বিশেষ ধরণের ফ্রিম তৈরী করা হয়েছে। একটা ফ্রিমে ৬টা ছবি তোলা যায়। তবে ছবিগুলো বড় না করলে দেখা সম্ভব হয় না। ফ্রিম ক্যামেরায় লাগাবার কোন

ক্যামেরাটা আঙ্গুলের মধ্যে ধরা আছে

অসুবিধা নেই। ক্যামেরায় এমন বন্দোবস্ত করা আছে যে, যাতে করে হঠাৎ ছবি না উঠে যায়।

*

কয়লার খনিতে দুর্ঘটনা প্রায়ই লেগে থাকে। অবশ্য দুর্ঘটনা বন্ধ করবার চেষ্টারও অন্ত নেই। তবে একবার কয়লার খাদ ধ্বসে পড়লে তখন যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সেখানকার ধ্বস সারাবার চেষ্টা করতে হয়। কারণ যে সমস্ত লোকেরা ধ্বসের ওধারে আটকা পড়ে যায়, তারা বেশী দেরী হলে বাতাসের অভাবে মারা পড়ে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য একটা নতুন ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটবার পর, উদ্ধার কার্য করবার জন্য যে সমস্ত লোক থাকে তাদের যথাসম্ভব শীঘ্র খবর দেবার প্রয়োজন হয়। বন্দোবস্ত করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কয়লার খনি থেকে একটা ইলেকট্রিক বেল উদ্ধার কার্য করবার অফিসের সঙ্গে যোগ করা থাকবে—দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সেটা সেখানে বাজতে থাকবে ফলে উদ্ধার কার্য করবার লোকরা খবর পাবে কোথায় কোন খনিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া খনির ভেতর যারা কাজ করতে নামবে তাদের কাছে 'সালডাস্' নামক শ্বাস গ্রহণের এক নতুন ধরণের যন্ত্রও থাকবে। যার সাহায্যে যতক্ষণ না ধ্বসের মাটি সরিয়ে তাদের উদ্ধার করা

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

হচ্ছে ততক্ষণ তারা বাতাসের অভাবে যেন কষ্ট না পায়। অবশ্য খুব বেশী দেরী হলে এই সালডাস যন্ত্র কোন কাজে লাগবে না। এই নতুন ব্যবস্থা সীতারামপুরে এবং ঝরিয়ার কয়লার খনিগুলিতে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

*

গত মহাযুদ্ধের ঠিক আগে "জেনা" য়ুনিভার্সিটিতে কাজ করতে করতে একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক একটি রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। এই পদার্থটি যে কোনও স্তন্যপায়ী প্রাণীর রক্তের সঙ্গে মিশলেই প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। পরে অবশ্য তাঁর এই আবিষ্কার চাপা পড়ে যায়, এখন আবার বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁদের মতে এটি খুনী আসামীকে সহজেই সনাক্ত করতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে, এক ফোঁটা রক্তের সঙ্গে তরল থ্রি এ্যামিনোপথ্যাল হাইড্রাজাইড মিশালে রক্ত বিন্দুটী এক ঘণ্টা দীপ্তিমান থাকবে। কোনও খুনী খুন করার পর ঘরেদোরে রক্তের চিহ্ন মাত্র না রেখে পরম নিশ্চিন্তে থাকতে পারে কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশ যদি ঐ স্থানে কিছুটা এ্যামিনোপথ্যাল হাইড্রাজাইডের সলিউশন ছড়িয়ে দেয় তাহলে জায়গাটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠে খুনের সাক্ষ্য দেবে। অবশ্য ঐ রক্তের চিহ্ন কোনও মানুষের রক্ত না অন্য কোনও স্তন্যপায়ী জীবের রক্ত এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর আরও গবেষণা-সাপেক্ষ।

ডাক্তারেরা অবশ্য এটীকে কোনও জন কল্যাণকর কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বলেন যে, এই সলিউশনটী ক্যান্সার রোগ ধরার কাজে লাগান যেতে পারে। এই ওষুধটী শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলে সমস্ত রক্ত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে সুতরাং অন্ধকার স্থানটীকে ক্যান্সার রোগগ্রস্থ স্থান বলে ধরে নিতে হবে কারণ ক্যান্সার রোগগ্রস্থ স্থানের টিস্যুগুলি মৃত হওয়ার দরুণ রক্ত থাকে না ফলে এ্যামিনোপথ্যাল হাইড্রোজেনও ঐ স্থান প্রদীপ্ত করে তুলতে পারে না। অবশ্য এই ওষুধ দেহে প্রয়োগ করার অসুবিধাও আছে। এই রাসায়নিক প্রদার্থটী শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলেই রক্ত কণিকা থেকে অক্সিজেন টেনে নিতে থাকে। সুতরাং অক্সিজেনের অভাবে রোগী মারা যেতে পারে। সেই জন্য এই রাসায়নিক পদার্থটি শরীরে প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে পারলে এটী ডাক্তারি শাস্ত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা হবে।

প্রতিবাদ

সবিনয় নিবেদন,

২৬শে মাঘ, ১৩৫৮ (Feb 9, 1952) 'দেশ' সংখ্যায় চক্রদত্ত লিখিত বিজ্ঞান বৈচিত্র্যে এরোপ্লেনের সঙ্গে বেতারে খবরাখবর আদান-প্রদান করার কয়েকটি কথা, যা তিনি লিখিয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন—

"এতদিন পর্যন্ত যে ধরণের বেতারযন্ত্র ব্যবহার করা হতো তাতে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট চারিটি দিকেই খবরের আদান প্রদান চলতে পারতো। যে সব এরোপ্লেন আকাশে উড়তো তারা ঐ নির্ধারিত চারিদিকের যে কোনও একটি দিকে থাকতে চেষ্টা করতো কারণ, তাহলেই মাটির খবর পেতে পারতো এবং আকাশের খবর দিতে পারতো। এরোপ্লেনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থেকে চলাচল করা সম্ভব হলো না। আজকাল এইজন্য বার্তা আদান প্রদানের একটি নূতন ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বার্তাবাহী যন্ত্রটিকে 'ওমনি-রেঞ্জ' বলে।"

ভারতবর্ষে এখনও 'ওমনিরেঞ্জ' আসে নাই। কিন্তু বর্তমানে উড়ন্ত এরোপ্লেন যেদিকেই থাকুক না কেন, এরোড্রোমের সঙ্গে বেতারে তাহার খবর আদান-প্রদান করা সম্ভব—হইয়াও থাকে তাই। কোন নির্দিষ্ট দিকে এরোপ্লেনকে আসিতে হয় না ইহার জন্য। লেখক সম্ভবত রেডিওরেঞ্জের কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা বেতারে খবর আদান প্রদান করার কোন যন্ত্র নয়, মাটিতে অবস্থিত অনেকগুলি ন্যাভিগেশনাল এইডস্-এর ইহা অন্যতম। বিনীত—অশোককুমার মিত্র, কলিকাতা।

৭

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ছাত্রটি যে কি পদার্থ অরুণ তা বেশ ভালোভাবেই টের পেয়ে গেল। ছেলেটি ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে; কিন্তু ইংরেজী বাংলার জ্ঞান ফোর্থ ক্লাসের উপযোগীও নয়। খেলাধুলো, সিনেমা, রাজনীতি সব বিষয়েই শ্যামলের উৎসাহ আছে। শুধু পড়াশুনোয় তেমন আগ্রহ নেই। আর প্রাইভেট টিউটর যে বেতনভুক কর্মচারী মাত্র সে বোধটা এরই মধ্যে শ্যামলের জন্মে গেছে। পড়তে পড়তে হঠাৎ শ্যামল এক সময় উঠে যায়, 'মাস্টার মশাই বসুন' আমি একটু ওপর থেকে আসছি।'

'ওপরে আবার তোমার কি দরকার পড়ল?'

'আছে একটু দরকার।'

তারপর মিনিট পনের কুড়ির মধ্যে আর শ্যামলের দেখা মেলে না। আর একদিন পাটিগণিত থেকে দুটি স্কোয়ার মেজারের অংক দেখিয়ে দিয়ে শ্যামল বলল, 'করুন তো মাস্টার মশাই।'

অরুণ বলল, 'তুমি কর, ভুল গেলে আমি দেখিয়ে দেব।'

শ্যামল বলল, 'সোজা দেখে আপনি দু'একটা আগে করে দিন তারপর বাকিগুলি আমি করব।'

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম অংকটার সঙ্গে ফলে মিল হোল না।

অরুণ আবার চেষ্টা করে দেখছে শ্যামল অংকের বইটা হঠাৎ বন্ধ করে ফেলে বলল, 'যাকগে' যেতে দিন মাস্টার মশাই। ও আমি অন্য কোন ছেলের খাতা দেখে টুকে নেব। আপনি বরং ইতিহাসই পড়ান আজ।

শ্যামলের কথার ভঙ্গিতে একটু যেন বিদ্রূপের সুর ছিল। অরুণ তা লক্ষ্য করে বিরক্ত হয়ে বলল, 'ইতিহাস পরে পড়াচ্ছি। অংকটা কেন মিলছে না আগে দেখা যাক।'

শ্যামল বলল, 'ও আর দেখবেন কি। কতকগুলি অংক অমন বেয়াড়া অমিল ধরণেরই হয়। ও নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। একটা অংক যতক্ষণ বসে আপনি করবেন ততক্ষণে পাঁচটা অংক আমার টোকা হয়ে যাবে।'

অরুণ বলল, 'না বুঝে টুকে লাভ কি।'

শ্যামল কি বলতে যাচ্ছিল বিনোদবাবু ঘরে ঢুকলেন। স্টেথোস্কোপটা গলায় ঝুলানো। কলে বেরোচ্ছেন। যাওয়ার পথে একবার খোঁজ নিয়ে গেলেন, 'কি মাস্টার মশাই, পড়াশুনো কেমন চলছে?'

অরুণ বলল, 'ভালো।'

'ছাত্র কথাটথা শুনছে তো?'

'হ্যাঁ।'

বিনোদবাবু এবার ছেলের দিকে তাকালেন, 'কিরে ভালো করে বুঝে শুনে নিচ্ছিস তো সব?'

শ্যামল সবিনয়ে বলল, 'হ্যাঁ বাবা।'

'অংকটংক?'

শ্যামল বলল, 'সব বুঝে নিচ্ছি। কোন অসুবিধে হচ্ছে না। আগের মাস্টার মশাইর চাইতেও ইনি বেশ—'

বিনোদবাবু ধমক দিয়ে বললেন,—'থাক থাক, তোকে আর তুলনা করতে হবে না। নিজে তো বিদ্যের বিশারদ। আবার মাস্টার মশাইয়ের বিচার হচ্ছে।'

বাইরে গাড়ি দাঁড়ানো ছিল। বিনোদবাবু গিয়ে উঠে বসলেন।

গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলও উঠে দাঁড়াল 'আজ থাক মাস্টার মশাই। মাথাটা বড় ধরেছে।'

অরুণ বলল, 'এরই মধ্যে তোমার মাথা ধরে গেল?'

শ্যামল বলল, 'হ্যাঁ, বাবা দূরেই বেরিয়েছেন। শিগগির ফিরবেন না।'

বলে বই খাতা গুছিয়ে রেখে শ্যামল বলল, 'যাই মাস্টার মশাই।'

বাবা বেরিয়ে গেলেও মা বেরোননি। শ্যামলের মার গলা শোনা গেল, 'ওকি এরই মধ্যে তোর পড়া হয়ে গেল খোকন!'

'হ্যাঁ মা, আজ আর পড়ব না। বড্ড মাথা ধরেছে।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে শ্যামল জবাব দিল।

শ্যামলের মা বললেন, 'আজ মাথা ধরা কাল পেটব্যথা। তোর একটা না একটা অজুহাত তো লেগেই আছে। আচ্ছা এ ফাঁকি তুই কাকে দিচ্ছিস খোকন? নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছিস না? মাসের পর মাস এতগুলি টাকা জলে যাচ্ছে।' কিন্তু শ্যামলের আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

ভিতর থেকে বাইরের পড়বার ঘরে ঢুকলেন শ্যামলের মা হেমাঙ্গিনী। মাঝ বয়সী মোটাসোটা মহিলা। অরুণ উঠে দাঁড়িয়েছিল। তিনি মাথায় আঁচলটা একটু টেনে দিয়ে বললেন, 'আপনি বসুন মাস্টারমশাই। ওকে রোজ রোজ অত সকাল সকাল ছেড়ে দেবেন না। আরও একটু বেশি সময় আটকে রাখবেন।'

অরুণ বলল, 'আজ্ঞে তাই তো রাখি। আজ মাথা ধরেছে বলে উঠে গেল।'

হেমাঙ্গিনী বললেন, 'ওর কোন কথা বিশ্বাস করবেন না। সব ফাঁকি। এমন ফাঁকিবাজ ছেলে পাড়ায় আর দুটি নেই।'

মা ছেলের যতই নিন্দা করুন না, প্রাইভেট টিউটরের পক্ষে অতখানি ছাত্র নিন্দা শোভা পায় না। তাই একটু রেখে ঢেকে ছাত্রের দোষ ত্রুটির ওপর খানিকটা স্নেহের প্রলেপ বুলিয়ে অরুণ বলল, 'হ্যাঁ পড়াশুনোয় একটু যেন অন্যমনস্ক।'

হেমাঙ্গিনী বললেন, 'একটু কেন খুব। নিজের ছেলে বলে আমি যে তার দোষ দেখব না, কেবল মাস্টার মশাইদের দায়ী করব তা নয়। অনর্থক পরকে দোষ দিয়ে লাভ কি? আপনি একটু ভালো করে চেষ্টা করে দেখবেন। গালমন্দ করে হোক, মেরে ধরে হোক যেভাবে পারেন। আমি কিছু বলব না।'

অরুণ হেসে বলল, 'আজ্ঞে মারধোর

করবার বয়স তো আর নেই। তাতে বরং উল্টো ফলই হয়। আমার নিজের একটি ভাইও ঠিক এমনি হয়েছে। মনে হয় ছেলেবেলায় অতিরিক্ত শাসনের ফলেই তার কিছু হোল না।'

অতুলের সম্বন্ধে হঠাৎ কেমন একটু মমতা বোধ করল অরুণ।

হেমাঙ্গিনীও পারিবারিক কথা পাড়লেন। চার মেয়ের পর এই ছেলে। বাড়িতে একটু আদর যত্নই পেয়েছে। বিনোদবাবু নিজেও মানুষ বড় ভালো নন। আদর যখন করবেন তখন খুবই আদর করবেন ছেলেকে। আবার শাসনের সময়ও একেবারে সীমা ছাড়িয়ে যাবেন। ফলে ছেলেও হয়েছে একগুয়ে বদমেজাজী।

'কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না মাস্টার মশাই। বাপমাকে চেষ্টা তো করতেই হবে।'

একটু অনুনয়ের ভঙ্গিতে বললেন হেমাঙ্গিনী।

অরুণ বলল, 'তাতো নিশ্চয়ই। আপনি ভাববেন না। অল্প বয়সে অনেকেই এরকম থাকে। তারপর শুধরে যায়।'

হেমাঙ্গিনী খুশি হয়ে বললেন, 'দেখুন চেষ্টা চরিত্র করে।'

ধীরে ধীরে আরো অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হোল। অরুণের কথাবার্তা শুনে প্রথম-দিনই হেমাঙ্গিনী তাকে পছন্দ করেছেন। বয়স্ক স্কুলমাস্টারের চাইতে অল্পবয়সী ছেলেরাই অনেক সময় ছাত্রদের ভালো পড়ায়। তারা ছাত্রের মন বুঝে তার সঙ্গে মিলে মিশে চলতে চেষ্টা করে। তাতে ফল অনেক সময় ভালো হয়। হেমাঙ্গিনী লক্ষ্য করে দেখেছেন বুড়ো মাস্টাররা একেবারেই শ্যামলকে বাগে আনতে পারেন না। ওর যেটুকু যা হয় কমবয়সী ছেলে ছোকরাদের কাছেই হয়। কিন্তু বিনোদবাবুর মোটে ধৈর্য নেই। কেবলই মাস্টারদের পরখ করবেন, মাস্টার বদলাবেন। অত অধীর হলে কি চলে। অরুণ যেদিন প্রথম আসে হেমাঙ্গিনী আড়াল থেকে তাকে দেখেছিলেন, তার কথাবার্তাও শুনেছিলেন। তিনিই স্বামীকে দিয়ে জোর করে চিঠি লিখিয়েছেন। পড়ানো আবার দেখবে কি, কথাবার্তায় তো বেশ ভালো ভদ্রঘরের ছেলে বলে মনে হোল। একেই রাখ। আর কত টাকা কত দিকে বেরিয়ে যায়, যত হিসেব বুঝি তোমার ছেলের টিউটর রাখবার বেলায়। যা চেয়েছে তাই দিয়েই রাখ টিউটর। বেশি টাকা না দিলে কি ভালো লোক পাওয়া যায়, না কেউ মন দিয়ে পড়ায়?'

অরুণকে ভরসা দিলেন হেমাঙ্গিনী টার্মিনাল পরীক্ষায় শ্যামল একটু ভালো ফল করলেই তিনি তার মাইনে পুরোপুরি চল্লিশ করে দেবেন। অরুণ যেন তাঁর ছেলের দিকে একটু লক্ষ্য রাখে। ভালো করে মন দিয়ে যত্ন নিয়ে পড়ায়। অরুণ ছাত্রের মাকে আশ্বাস দিয়ে বলল তার চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। হেমাঙ্গিনী খুশি হয়ে এতদিন বাদে ছেলের টিউটরের জন্যে চা-জলখাবার আনালেন। চাকরকে বললেন রোজ অরুণকে চা দিয়ে যেতে।

ছাত্রের ডেপোমিতে অরুণ ভারি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল; কিন্তু ছাত্রের মার ব্যবহারটুকু এবার তার ভালো লাগল। নিজের মার কথা মনে পড়ে গেল, তার মনে পড়ল অতুলের জন্যে তাঁর উদ্বেগ অশান্তির কথা।

হেমাঙ্গিনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অরুণ বেরোচ্ছে পথে দেখা হয়ে গেল দিলীপের সঙ্গে। তার হাতে একটা মিকশ্চারের শিশি। বৈঠকখানারই লাগা বিনোদবাবুর ডিসপেনসারি। কম্পাউন্ডারের কাছে ওষুধ নিতে এসেছিল দিলীপ।

অরুণ বলল, 'অসুখ কার? তোমার মার নাকি?'

দিলীপ বলল, 'না। বউদির।'

অরুণ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সেকি তাঁর আবার কি হোল?'

দিলীপ বলল, 'জ্বর হয়েছে। আপনি যেদিন গেলেন না, তার পর দিন থেকেই জ্বর। আসবেন? দেখে যাবেন বউদিকে?'

ছাত্রের বাড়িতে আসা যাওয়ার পথে রোজই অরুণের মনে হয়েছে করবীর সঙ্গে আর একবার দেখা করলে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই তার মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে। একটি শোকার্তা বিধবার কাছে বার বার গিয়ে কি লাভ। লোকে যেমন সান্ত্বনা দেয় তেমন মামুলী মৌখিক সান্ত্বনা অরুণের আসে না। অরুণ জানে সময়ই সব শোকের বড় সান্ত্বনা। সময় সমস্ত শোকের ওপর বিস্মৃতির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। তার আগে মোহমুদ্গর আউড়ে কোন লাভ হয় না। কিন্তু শোকে যে অভিভূত তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা না করাও এক ধরণের অশোভন অসামাজিকতা। তাই অরুণ যতটা পারে এসব অবস্থায় দূরে থাকতে চেষ্টা করে। কিন্তু অন্য সকলের সম্বন্ধে যাই হোক, করবীর বেলায় দূরে সরে থাকাটাও ঠিক যেন ভালো লাগছিল না অরুণের। প্রায় তার বাড়ির সমুখ দিয়েই রোজ যাতায়াত করে; কিন্তু একবার খোঁজ নিয়ে যেতে পারে না, অথচ খোঁজ খবর নেওয়ার দেখা করার ইচ্ছা হয় নিজের মনের এই অকারণ দ্বিধায় তার নিজেরই ভারি খারাপ লাগছিল। দেখা করার ইচ্ছাটাকে নিজের মনেই সে বাতিল করে দিয়েছিল। কোন উপলক্ষে সে দেখা করবে। আর কোন নতুন ঘটনা, নতুন কারণ ঘটেছে যে সেই সূত্র ধরে সে করবীর খবর নিতে যাবে। তার সঙ্গে তো এমন কোন আত্মীয়তা নেই, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব নেই যে, যখন তখন ইচ্ছা করলেই যাওয়া যায়। তাছাড়া অরুণকে দেখে করবীর মনের ভাব তেমন প্রীতিকর নাও হতে পারে। দিল্লীর সেই চপল উচ্ছল দিনগুলির স্মৃতি করবীকে হয়তো এখন আর আনন্দ দেয় না। হয়তো করবী মনে মনে ভাবে সেই একটা মাস স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় কাটালেই ভালো হোত। স্বামী সান্নিধ্যের সুখ জীবনে আরও একটি মাস বাড়ত তাহলে।

কিন্তু অত হিসেব না করেও তো যাওয়া যায়। বলা যায় এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলাম, একটু কাজ ছিল এদিকে আপনারা কেমন আছেন খোঁজ নিয়ে গেলাম। করবীর সঙ্গে তার যতটা পরিচয় তাতে যাতায়াতের পথে এমন মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ নেহাৎ অশোভন হয় না, এমন খোঁজ-খবর নেওয়াটা সামাজিক আদবকায়দার মধ্যেই পড়ে। কিন্তু করবী যদি জিজ্ঞেস করে 'কি কাজ ছিল আপনার।' যদি মনে মনে ভাবে এতদিন অরুণের এদিকে কোন কাজ ছিল না, হঠাৎ কি কাজ পড়ল একথা যদি তার মনে ওঠে। তার মনের সংশয় দূর করবার জন্যেই অরুণকে সত্য কথাটাই বলতে হবে তাহলে। বলবে, এই রাস্তাতেই বিনোদবাবুর বাড়িতে একটা টুইশান জুটেছে। সেইজন্যে রোজ আসতে হয়। কিন্তু যে অরুণ দিল্লীতে সরকারী চাকরি করত, সে শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকে এতদূরে এই ভবানীপুরে একটি স্কুলের ছেলেকে সামান্য মাইনেয় রোজ পড়াতে আসে একথাটা শোনার সঙ্গে অরুণের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে করবীর মনের ভাবটা কিরকম হবে। অরুণের

দারিদ্র্যের কথা বুঝতে কি কিছু আর বাকি থাকবে তার। কি দরকার একটি মেয়ের সামনে নিজের আর্থিক দৈন্যকে অমন করে উদ্ঘাটন করবার। তার চেয়ে আড়ালে থাকাই ভালো। নিজের অভাব অনটন দুঃখ দৈন্যকে আড়ালে রাখাই ভালো।

কিন্তু দিলীপ যখন করবীর অসুখের খবর জানিয়ে অরুণকে তাদের বাসায় আসবার জন্যে অনুরোধ করল তখন না যাওয়াটা ভারি অভদ্রতা হবে বলে মনে হোল অরুণের।

দিলীপের কথার জবাবে বলল, 'আচ্ছা চল।'

যেতে যেতে দিলীপ বলল, 'আপনি বুঝি এ বাড়িতে শ্যামলকে পড়ান? আপনাকে সেদিনও দেখলাম—'

অরুণ স্বীকার করে বলল, 'হ্যাঁ ওকে পড়াই আমি। শ্যামলের সঙ্গে আলাপ আছে নাকি তোমার?'

দিলীপ একটু হেসে বলল, 'বাঃ আলাপ থাকবে না? এক ক্লাসেই তো পড়ি আমরা। এক বছর ওপরে ছিল আমার। গত বছর ফেল করায়—'

বলতে বলতে দিলীপ থেমে গেল।

অরুণ লক্ষ্য করল এক ক্লাসে পড়লেও শ্যামলের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ছেলে দিলীপ। বয়সের তুলনায় একটু যেন বেশি শান্ত আর গম্ভীর।

অরুণ কড়া নাড়তে আজ করবীর শাশুড়ী নিভাননীই এসে দোর খুলে দিলেন। অরুণকে দেখে তিনি বললেন, 'এই যে, এসো।'

দিলীপ আর তার মার সঙ্গে করবীর ঘরে ঢুকল অরুণ। খাটে শোয়নি করবী। মেঝেতেই রোগশয্যা পাতা হয়েছে। এই কদিনের জ্বরে বেশ একটু রোগা হয়ে গেছে চেহারা। অরুণকে দেখে করবী একটু মৃদু হাসল, বলল, 'আজ বুঝি দিলীপের হাত আর এড়াতে পারেন নি? ও জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে?'

অরুণ বলল, 'বাঃ ধরে নিয়ে আসবে কেন?'

করবী একথার কোন জবাব না দিয়ে দিলীপের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিলু, অরুণবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। বসতে দাও ও'কে।'

দিলীপ তাড়াতাড়ি টেবিলের সামনে থেকে পরেশের সেই গদীআঁটা ভালো চেয়ারটাই টেনে আনল।

করবী দিলীপের দিকে একবার তাকালো কিন্তু কোন কথা বলল না। বরং অরুণের দিকে চেয়েই অনুরোধ করল 'বসুন আপনি।'

অরুণ অবস্থাটা বুঝতে পারল। করবীর স্বামীর চেয়ারটা এগিয়ে দেওয়ার সময় দিলীপ তেমন খেয়াল করেনি। কিন্তু এগিয়ে যখন একবার দিয়েইছে তখন তো আর সরিয়ে নেওয়া যায় না। তখন বসতে বলতেই হয়। কিন্তু কেউ একটু মৌখিক ভদ্রতা করে কিছু অনুরোধ করলেই অরুণ তা রক্ষা করবে তেমন ছেলেই সে না। এগিয়ে দেওয়া চেয়ারটায় না বসে অরুণ মেঝের ওপরই বসে পড়ে বলল, 'না না চেয়ারে দরকার নেই, চেয়ার থাক।' নিভাননী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ওকি তাই বলে মাটিতে বসলে কেন তুমি। অরুণকে একটা আসনটাসন এনে দে না দিলু।'

তাই হোল। একখানা আসন এনে দিলু করবীর বিছানার কাছে পেতে দিল। তারপর মেজার গ্লাসে শিশি থেকে ওষুধ ঢেলে দিয়ে করবীর মুখের সামনে এগিয়ে ধরে বলল, 'নাও বউদি।'

করবী ওষুধটুকু খেয়ে ফেলে বলল, 'দেখেছেন? সামান্য একটু ইনফ্লুয়েঞ্জা না কি হয়েছে তাতে মা আর ছেলে দুজনে মিলে আমাকে ওষুধ খাওয়ার কি ধুম লাগিয়েছেন।'

নিভাননী বললেন, 'হুঁ, সামান্যই তো। দু'দিন তো জ্বরের ঘোরে একেবারে অজ্ঞান হয়ে ছিলে।'

করবী মৃদু স্বরে বলল, 'বেশ ছিলুম। জ্ঞান যদি একেবারে ফিরে না আসত তাহলেই বাঁচতুম।'

একথার কেউ কোন জবাব দিল না। একটু বাদে নিভাননী পাশের ঘরে চলে গেলেন।

একটি প্লেটে করে বেদানার দানা ছাড়িয়ে দিলু করবীর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'খেয়ে নাও বউদি।'

করবী বলল, 'আঃ, আবার ওগুলি এনেছ কেন।'

দিলীপ বলল, 'খাও, এই তো তেতো ওষুধ গুলি খেলে। মুখটা ভালো লাগবে।'

করবী সস্নেহে ছোট দেবরের দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে অরুণের দিকে চেয়ে বলল, 'ভারি ভালোবাসে আমাকে, ও আমার এক-সঙ্গে দেওর আর ননদ। এই অসুখের মধ্যে কি সেবাটাই না করছে। দিলু তোমার অরুণদাকে একটু চা করে খাওয়াতে পারো এবার?'

দিলীপ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'যাচ্ছি বউদি।'

অরুণ বাধা দিয়ে বলল, 'না না চা এখন থাক, চা আমি এইমাত্র খেয়ে এলাম।'

করবী বলল, 'কোত্থেকে খেলেন? ছাত্রের বাড়ি থেকে?' ক্ষীণ একটু হাসল করবী। রোগশীর্ণ শুষ্ক ঠোঁটে সেই হাসিটুকু ভারি সুন্দর লাগল অরুণের চোখে।

অরুণ বলল, 'কি করে জানলেন আপনি।'

করবী বলল, 'আমি সব জানি। সব খবর রাখি। দিলুই সেদিন বলল আমাকে, বউদি অরুণদা রোজ আসেন এপাড়ায়। ডাক্তারবাবুর ছেলে শ্যামলকে পড়ান। বললুম আসতে বলো আমাদের এখানে। তা ও যা লাজুক। বোধ হয় বলতেই পারেনি। কিন্তু বলতেই বা হবে কেন। আপনি রোজ এদিকে আসছেন। অথচ একবারও খোঁজ নেন না।'

এই অভিযোগের উত্তরে অরুণ কি বলবে হঠাৎ ভেবে পেল না, করবী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সেদিন আমার ব্যবহারে আপনি বোধহয় রাগ করেছিলেন। আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে এলাম। খানিকক্ষণের মধ্যে কিছুতেই আর যেতে পারলাম না। যাওয়ার মত শরীরের অবস্থা ছিল না। সারা শরীর কেবল কাঁপছিল। কিছুক্ষণ বাদে ফের যখন গেলাম ও ঘরে দিলু বলল, আপনি চলে গেছেন। কিছু মনে করবেন না।'

রোগ শয্যায় শুয়েও আজ করবী অনেক কথা বলছে। কিন্তু এ যেন আর এক করবী। সেই পরিহাস চপল উজ্জ্বল প্রগলভা করবীর সাক্ষাৎ যেন আর কোন দিন মিলবে না। তবু এ করবীকে অরুণের ভালো লাগতে লাগল। ভারি কোমল আর করুণ ওর কথাগুলি। বলবার ভঙ্গিতে যেন ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা মাখানো। অরুণ চেয়ে দেখল ওর মুখের স্বাভাবিক গৌরবর্ণ একটু যেন ফ্যাকাসে হয়েছে। মাথায় আঁচল নেই। রুক্ষ কালো চুলের রাশের সিঁথির সাদা রেখা। ঠিক কুমারীর সিঁথির মত করবীর দিকে তাকালে এখন আর বোঝা যায় না ওর কোনদিন বিয়ে হয়েছিল। অরুণের যেন মনে পড়তে চায়না দিল্লীতে মাসখানেক ধ'রে সিঁদুর রঞ্জিত এই সিঁথিই সে দেখেছিল রোজ।

কিন্তু করবীর এই সাদা সিঁথিই যেন এরই মধ্যে বেশ ওর চেহারার সঙ্গে মানিয়ে গেছে বরং যেন বেশিই মানিয়েছে। কুমারী অবস্থায় করবীকে তো অরুণ কোনদিন দেখেনি, তখন সিঁথির শুভ্রতা কি এরও চেয়ে সুন্দর দেখাত? কিন্তু এখনও করবী ঢের সুন্দর। রূপবতীকে যে কোন বেশেই সুন্দর দেখায়। বাইরের রঙীন বসনভূষণ ছেড়ে রিক্ত হ'তে চাইলে কি হবে রূপের ঐশ্বর্য যে করবীর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে।

করবী অরুণের দিকে তাকিয়ে বলল 'কি ভাবছেন?' অরুণ বলল 'কিছুই ভাবছি না। আপনি ভারি রোগা হয়ে গেছেন তাই দেখছিলাম।'

করবী একটু লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে তারপর বলল, 'ও রোগা; কিন্তু আপনি আসল কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন। সে দিন আপনি রাগ ক'রে চলে গিয়েছিলেন কিনা সত্যি ক'রে বলুন তো।'

অরুণ বলল, 'আচ্ছা আপনি বলুন আমাকে কিরকম মানুষ বলে আপনি মনে করেন। আমি কি অতই হৃদয়হীন যে আপনার এই অবস্থাতেও আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার ত্রুটি ধরব? আপনি কি ভাবে রিসিভ করলেন কিভাবে বিদায় দিলেন তার খুঁটি নাটি বিচার করব। আমাকে কি আপনি সেই রকম লোক বলে ভাবেন?'

করবী বলল, 'না তা ভাবিনে।'

দিলু ঘরে ঢুকল। এক কাপ চা ক'রে নিয়ে এসেছে। অরুণের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নিন অরুণ দা। দেখুন তো খাওয়া যায় কি না।'

এতক্ষণে মৃদু একটু হাসল দিলীপ।

অরুণ কাপে একবার চুমুক দিয়ে বলল, 'বাঃ চমৎকার হয়েছে। খাওয়া যাবে না কি বলছ। তোমার চায়ের হাত তোমার বউদির চেয়েও ভালো।'

করবী একটু হেসে বলল, 'নাও হোল তো? একেবারে চা রসিকের সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে।'

দিলীপ লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না, আমি অত ভালো করতে পারিনে। বউদি এবার কি পিপলুর দুধটা স্টোভে গরম করে নেব?'

করবী বলল, নাও। কিন্তু ও তো মাও করতে পারতেন। তুমি না হয় একটু পড় গিয়ে দিলু। তোমার পড়াশুনোর কত ক্ষতি হচ্ছে। এবারই তো পরীক্ষা।'

দিলীপ একথার কোন জবাব না দিয়ে বোধ হয় দুধ গরমের জন্যেই পাশের ঘরে চলে গেল।

অরুণ বলল, 'পিপলু কোথায়?'

করবী জবাব দিল, 'মার কাছে ঘুমুচ্ছে। কদিন ধ'রে মার কাছেই থাকে।'

অরুণ বলল, 'ওর সঙ্গে আর দেখাই হোল না। যে দিন আসি সেদিনই শুনি ঘুমুচ্ছে।'

করবী বলল, 'ওর কথা আর বলবেন না। সন্ধ্যা হতে না হতেই ওর চোখ বুজে আসে। জ্বালায় বেশি রাত্রে। ওর সঙ্গে দেখা করতে হ'লে আপনাকে সন্ধ্যার আগে আসতে হবে। কাল তাই আসুন না। একটু সকাল ক'রে আসুন। টিউশনিতে যাওয়ার আগে এখানে হয়ে চা খেয়ে যাবেন।'

অরুণ ঘাড় নেড়ে বলল, 'আচ্ছা।'

আরো কিছুক্ষণ বাদে এ কথার ও কথার পর উঠে দাঁড়াল অরুণ। দাঁড়াতেই পরেশের লিখবার টেবিলটা চোখে পড়ল। আজও সুন্দর ক'রে গুছানো রয়েছে টেবিল। দু পাশে বই। ফটো স্ট্যাণ্ডে স্বামী স্ত্রীর সেই দুখানি ফটো। পরেশের ফটোতে একটি বেল ফুলের মালা জড়ানো। এক পাশে ছোট একটি ফুলদানিতে কয়েকটি রজনীগন্ধা।

অরুণ বলল, 'রোজ এসব করেন বুঝি?'

করবী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'যেদিন আমি না পারি দিলুই করে। দাদা অন্ত প্রাণ ছিল ওর। তিনিও ওকে ভালোবাসতেন খুব। দিলু কিন্তু একবারও মুখে তাঁর নাম করে না। তার কথা উঠলে সামনে থেকে সরে যায়। সইতে পারে না।'

অরুণ বলল, 'কলমটী কি হোল?'

করবী বলল, 'ও সবই আপনার চোখে পড়েছে?'

'কলমটি তুলে রেখেছি। পিপলু নষ্ট ক'রে ফেলছিল। দামী জিনিস।'

অরুণ করবীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দামী তো নিশ্চয়ই।'

করবী এ কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'কাল আসছেন তাহলে।'

বেরিয়ে এসে অরুণ মনে মনে ভাবল করবীর সবই ভালো' কিন্তু এই ফটো পূজার মধ্যে যেন একটু বাড়াবাড়ি আছে। অরুণ নিজে এমন প্রকাশ্যভাবে মৃত প্রিয়জনের পূজা অর্চনা করতে পারত না। গভীর শোককে মনের গভীরে লালন করত। অন্যের সামনে কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দিতনা তার কিন্তু পরক্ষণেই অরুণের মনে হোল সে হয়ত করবীর ওপর অবিচার করছে। জীবন্ত স্বামীর পূজা করাই যে দেশের রীতি মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে সে দেশে পুষ্পার্ঘ্য যদি করবী দেয়ই অরুণের তাতে আপত্তি করবার কি আছে।

পরদিন করবীর অনুরোধ রাখল অরুণ টিউশানিতে যাওয়ার আগে তাদের বাড়ি হয়ে গেল। করবীর জ্বর ছেড়ে গেছে কিন্তু দুর্বলতা যায় নি। অরুণকে দে একটু হেসে বলল, 'এই যে আসুন।'

পিপলুর সঙ্গেও আজ দেখা হোল ভারি দুরন্ত ছেলে। ঘরময় ছুটোছু করে বেড়াচ্ছে। অরুণ ওকে ধরে কা আনতে গেল কিন্তু কিছুতেই ও এল না অরুণ বলল, 'আপনার ছেলে তো ভা অকৃতজ্ঞ। ও আমাকে একেবারেই ভুলে গেছে।'

করবী হেসে বলল, 'তার জন্যে দুঃ করবেন না। দু একদিন যান আসুন তখ ও আপনার পিছু ছাড়তে চাইবে দেখবেন।'

দিন কয়েকের মধ্যে যাতায়াতটা বে সহজ হয়ে এল। কোন দিন ছাত্র পড়াব আগেই আসে অরুণ, কোনদিন পড়ি আসে। করবীর অসুখ সেরে গেছে। সু হয়ে চলাফেরা কাজকর্ম করছে ও। সব অরুণের সঙ্গে বসে গল্প করবার করব সময় হয় না। শুধু একবার এসে দে দিয়ে খোঁজ নিয়ে যায়। কিংবা সংসা কাজ করতেই করতেই কথা বলে। য করবী থাকে না অরুণ দিলীপের মার স কি দিলীপের সঙ্গে আলাপ করে। পড়াশুনার খোঁজ খবর নেয়। অংক ক ট্রানশ্লেসন করতে দেয়। প্রথম দিলীপের ভারি সংকোচ ছিল। সে অরু কাছ থেকে কোন সাহায্য নিতে চাইত কিন্তু দিলীপকে সাহায্য করার তার স ভাব জমাবার গরজ অরুণেরই যেন কারণ অরুণ এটা লক্ষ্য করেছে করবী খুশি হয়। করবী চায় দিলীপ আর মধ্যে শ্রদ্ধা আর প্রীতির সম্পর্ক উঠুক। কিন্তু দিলীপ কথা বলে যা বয়স সেই তুলনায় চাপল্য চাঞ্চল্য ওর প্রায় নেই বললেই চলে। ভারি গম্ভীর প্রকৃতির ছেলে।

দিলুর স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে ওর অসাক্ষাতে করবী আর তার শাশুড়ীর সংগেও মাঝে মাঝে আলাপ করে অরুণ।

'আপনার দেওরটি একেবারে জন্ম বুড়ো।' অরুণ অন্তব্য করে। 'এই বয়সের এত গুরু গম্ভীর ছেলে আমি আর দেখি নি।'

করবী বলে, 'হ্যাঁ, ও ওই রকমই।'

নিভাননী বলেন, 'একেবারে এতটা গম্ভীর ছিলনা আগে। দাদার শোকে ও যেন একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে। প্রথম কদিন তো ওকে নাওয়াতে খাওয়াতেই পারি নি। ঘরের কোণে দেয়ালে মাথা রেখে চুপ করে বসে থাকত। কারো সামনে কাঁদত না লুকিয়ে কাঁদত। ওর ভাবচরিত্র দেখে ওকে নিয়েই হোল আমার চিন্তা। যে গেছে সে তো গেছেই এখন ওকে বাঁচাতে পারলেই হয়। আজকাল ও দেখনা কি রকম ভাব। খেলানো বেড়ানো কিছু নেই, স্কুলে কারোর কাছে যায় আসে না। স্কুল থেকে ফিরে এসে বইপত্র নিয়ে বাড়িতেই থাকে। বাকি সময়টুকু সংসারের কাজকর্ম করে। রেশন বাজার সব তো এখন ওকেই দেখতে হয়।'

অরুণ উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'এমন তো ঠিক নয়, ও যাতে একটু অন্য-মনস্ক হয়, স্বাভাবিকভাবে খেলাধুলো হাসিগল্প করে সেই চেষ্টাই তো করা উচিৎ সকলের।'

নিভাননী বলেন 'দেখনা বাপু তুমি একটু চেষ্টা চরিত্র ক'রে, তবু তুমি যাও আস, পড়াশুনো নিয়ে আলাপ করো, গল্প করো আমার বেশ ভালো লাগে। যতক্ষণ তুমি থাকো ততক্ষণ বরং বাড়িতে একটু সাড়া-শব্দ থাকে। অন্য সময় তো টেঁকাই যায় না।'

এ বাড়িতে তার প্রয়োজনীয়তা নিভা-ননীও যে অনুভব করছেন, সে কথা মুখ ফুটে স্বীকার করছেন তা দেখে অরুণের খুব ভালো লাগে। বেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়। নিভাননী আলাপ ব্যবহারে বেশ ভালো। বাঙলা লেখাপড়া ভালোই জানেন। বয়স্কা হিন্দু বিধবা হওয়া সত্ত্বেও তেমন বিশেষ রক্ষণশীলতা নেই। এক সময় ছেলেকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ওর স্বামী সেখানে মাস্টারী করতেন। ছেলে স্কুলে পড়ত। সে গল্পও মাঝে মাঝে করেন। রবীন্দ্রনাথের সংগে ও'র ব্যক্তিগত আলাপ ছিল বেশ একটু আত্মপ্রসাদের ভঙ্গিতে সেই পুরোন দিনের কথা বলতে থাকেন নিভাননী, তখন তাঁর মুখ দেখলে মনে হয়না এই কিছুদিন আগেও অতবড় একটা শোক তিনি পেয়েছেন।

বেশ লাগে অরুণের এই একটি নতুন পরিবারের সংগে ক্রমে তার প্রীতির আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠছে। কত পুরোন বন্ধু হারিয়ে গেছে, কত আত্মীয়তার ধারা শুকিয়ে এসেছে কিন্তু ভবানীপুরের এই গলিতে আর একটি পরিবারকে লোনা সমুদ্রে একটু নতুন সবুজ দ্বীপের মত আবিষ্কার করেছে অরুণ। ভারি অদ্ভুত এই জীবন। কোন দিক দিয়ে যে সে কি ভাবে ক্ষতিপূরণ ক'রে দেয় তা বলা যায় না।

আজকাল নিজের বাড়ির চেয়ে, বন্ধু বান্ধবের দলের আড্ডার চেয়ে করবীদের এই ছোট সংসারের পরিবেশই যেন বেশি ভালো লাগে অরুণের। এ বাড়িতে আসার জন্যে সমস্ত মন যেন ওর উন্মুখ হয়ে থাকে। সবদিন আসে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে ক'রেই দু একদিন বাদ দেয়। কিন্তু বাদ যে দিল—গেল যে না সে কথাটা দিনের মধ্যে অনেকবার করে মনে পড়ে। পরদিন একটু আগে আগে গিয়েই উপস্থিত হয়। পকেটে করে লজেনস কি বিস্কিট নিয়ে যায় পিপলুর জন্যে। করবী অনুযোগ দেয়, 'কেন রোজ রোজ ওসব আনেন।'

অরুণ বলে, 'দেখি, পিপলুর সঙ্গে খাতিরটা ফিরিয়ে আনতে পারি কিনা।'

কিন্তু খাতিরটা কেন যেন ঠিক আগের মত ফিরে আসতে চায় না। পিপলু অরুণের দেওয়া জিনিসগুলি ঠিকই নেয়, কিন্তু তার কোলের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকে না একটু বাদেই ছুটে চলে আসে।

অরুণ বলে, 'এসো এসো।'

পিপলু দূরে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে, 'না যাব না। তুমি ভালো না।'

অরুণের মুখখানা একটু গম্ভীর দেখায়। করবী হাসে, ছেলের এই অসৌজন্যে সস্নেহে বেশ একটু ধমকও দেয়, 'একথা বলে নাকি? অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম ছেলে। এতক্ষণ ধরে লজেনসগুলি খেলে কার? আর ফুরিয়ে যাওয়ার সংগে সংগেই বলছ উনি ভালো নয়। আর কক্ষণো ওকে কিছু এনে দেবেন না বুঝলেন?'

অরুণের দিকে তাকিয়ে করবী একটু হাসে।

কিন্তু এই শাস্তির ভয়ে পিপলুকে মোটেই দমতে দেখা যায় না। ও তার সুন্দর লাল টুক টুক ঠোঁট দুটি উল্টিয়ে বলে, আমার কাকা আনবে, আমার বাবা আনবে।'

হঠাৎ মার কাছে এগিয়ে আসে পিপলু, 'আমার বাবা কোথায় গেছে মা?'

করবী কোন জবাব দেয় না।'

পিপলু নিজেই বলে, 'স্বগগে গেছে না? ঠাম্মা বলে।'

করবী সায় দেয়, 'হুঁ',

পিপলু আবার জিজ্ঞেস করে, 'স্বগ্গ থেকে বাবা কবে আসবে মা?' কতদিন তো গেছে, আসে না কেন?' এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে করবী চুপ করে থাকে। অরুণ আবার ডাকে, 'পিপলু এ দিকে এসো। শোন একটু, এসো আমার কাছে। আজ রাস্তায় কি হয়েছিল শোন। একটা ট্রাম আর একটা বাস বুঝলে'—

পিপলু এবার সত্যিই এগিয়ে আসে কিন্তু ট্রাম বাসের গল্প শোনার জন্যে অন্য দিনের মত তার তেমন আগ্রহ দেখা যায় না, অরুণকে ঠিক আগের প্রশ্নই করে পিপলু, 'বাবা কবে আসবে বল না।'

অরুণ বলে, 'আসবে একদিন।'

পিপলু বলে, 'কাল?'

অরুণ উত্তর দিতে না পেরে চুপ করে থাকে।

পিপলু আবার বলে, 'কাল আসবে না পরশু আসবে। পরশু, ঠিক আসবে, তাই না?'

অরুণ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে করবী ঘর থেকে কখন চলে গেছে। আচ্ছা মানুষ তো। একা একা অরুণকে পিপলুর এই সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নের সামনে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে করবী।

পিপলুকে জানলার কাছে টেনে নিয়ে গেল অরুণ, 'দেখ দেখ একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছে। কত বড় একটা ঘোড়া দেখেছ?'

পিপলু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে সত্যিই একটা ঘোড়ার গাড়ি চলেছে রাস্তা দিয়ে। মোটেই বড় নয়। হাড় বের-করা, রোগাটে চেহারার একটি ঘোড়া একখানি বোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে। গাড়ির ভিতরে মানুষ, ওপরে মাল।

পিপলু বলে, 'ওই গাড়িতে করে বাবা আসবে, না কাকু?'

অরুণ সায় দেয়, 'হুঁ'।

পিপলু পরক্ষণেই মাথা নেড়ে বলে, 'উঁহু, গাড়িতে নয়। ঘোড়ায় চড়ে আসবে, বাবা ঘোড়ায় চড়ে আসবে কি মজা। কিন্তু বাবা তো ঘোড়ায় চড়তে জানে না, আসবে কি করে। তুমি ঘোড়ায় চড়তে জানো? বল না জানো?'

একটু বাদে নিভাননী এসে উদ্ধার করেন অরুণকে। নাতিকে কোলে করে নিয়ে যেতে যেতে বলেন, 'পিপলু এসো, খাবে এসো।'

কিন্তু পিপলুর এ ধরণের শক্ত প্রশ্ন ছাড়াও সংসারে আরও প্রশ্ন আছে। তাও নেহাৎ কম কঠিন নয়। সে প্রশ্নের অস্তিত্ব অরুণ সেদিন টের পেল।

ছাত্র পড়াতে যাওয়ার আগে অরুণ সেদিনও করবীদের খোঁজ নিতে এসেছে। নিভাননী দোর খুলে দিয়ে তাকে বাইরের ঘরে নিয়ে এসে বললেন, 'বসো'। করবী একটু বেরিয়েছে এক্ষুণি আসবে।'

'আর দিলীপ?'

নিভাননী বললেন, 'তাকেও তো দেখছিনে।'

এরপর পিপলুর কথা জিজ্ঞেস করল অরুণ।

নিভাননী বললেন, 'এতক্ষণ দুষ্টুমি করছিল অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি।'

তারপর আর কোন কথা জমল না। নিভাননী নিজের থেকেও আর কোন প্রসঙ্গ তুললেন না। তার মুখের ভাব গম্ভীর। একটু যেন চিন্তাক্লিষ্ট।

অরুণ জিজ্ঞেস করল, 'আপনার শরীর কি ফের খারাপ হয়েছে?'

নিভাননী বললেন, 'আর শরীর। না শরীর আমার ভালোই আছে। আসছি বসো তুমি।'

বলে তিনি কি একটা কাজে ভিতরে চলে গেলেন।

একটু বাদেই সদরের কড়া নড়ে উঠল। অরুণ-ই উঠে গিয়ে দোর খুলে দিল। করবী।

অরুণ একটু হেসে বলল, 'অন্য দিন আপনি দোর খুলে দেন, আজ আপনার বাড়ির দোর আমি খুললুম। কি ব্যাপার, বেরিয়েছিলেন কোথায়? মুখটুক শুকনো খুব হয়রান হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।'

করবী একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'হুঁ।'

ভিতরে এসে করবী বলল, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

অরুণ বলল, 'এই খানিকক্ষণ আগে। কিন্তু আপনি আমার কথার জবাব তো দিলেন না।'

'দিচ্ছি বসুন।'

বলে একটা চেয়ার একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে করবী জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা আপনি কি চাকরিটাকরি পেয়েছেন?'

অরুণ একটু হেসে বলল, 'কেন, আমার চেহারা দেখে কি সেই রকম কিছু মনে হচ্ছে। না পাইনি। চাকরি কোথায় যে পাব।'

করবী আস্তে আস্তে বলল, 'আমিও পেলাম না।'

অরুণ বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি। আপনিও কি চাকরির খোঁজে বেরিয়েছিলেন নাকি?'

করবী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ। না বেরোলে চলবে কি করে বলুন।'

একথার জবাবে অরুণ কি বলবে হঠাৎ কিছু ভেবে পেলনা। করবীরও যে এ সমস্যা আছে একথা এতদিন তার মনেই হয় নি। আসবাবপত্রে এদের বেশ সাজানো গুছানো ঘরদোর আর জানলায় দরজায় রঙীন পর্দা দেখে অরুণের মনে হয়েছিল বাড়ির একমাত্র উপার্জনক্ষম পুরুষ মারা যাওয়ার পরেও যারা এভাবে গুছিয়ে টুছিয়ে নির্বিবাদে থাকতে পারে, তাদের নিশ্চয়ই অন্য কোন সংস্থান আছে। হয় টাকা আছে ব্যাংকে, না হয় শেয়ার টেয়ার থেকে অর্থাগমের অন্য কোন ব্যবস্থা রয়েছে। করবীদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এক একবার যে কৌতূহল অরুণের না হয়েছে তা নয়, কিন্তু এতদিনের আলাপেও কিছুতেই সে কথা মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারে নি। করবী নিজে থেকেও ওসব প্রসঙ্গ তোলে নি কোনদিন। এমন কি নিভাননীও নয়।

তাই আজ যখন করবী বলল চাকরির চেষ্টা ছাড়া তাদের চলবে না অরুণ বেশ একটু বিস্মিতই হোল। খানিকবাদে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনাকে ওসব কষ্ট করতে হবে না।'

করবী একটু হাসল, 'কেন করতে হবে না? আমাদের খুব বড়লোক বলে ভেবেছিলেন, না?'

অরুণ বলল, 'না বড়লোক ঠিক নয়। তবে ভেবেছিলাম পরেশবাবু কিছু রেখে টেখে গেছেন।'

করবী বলল, 'কি আর রাখবেন বলুন। রাখবার সময় পেলেন কই। সব নিয়ে বছর পাঁচেকের তো চাকরি। তাও গোড়ার দিকে মাইনে তো খুবই কম ছিল। শেষে কিছু বাড়ল সঙ্গে সঙ্গে খরচও বাড়তে লাগল।'

অরুণ বলল, 'তাহলে কিছুই জমত না?'

করবী মাথা নাড়ল, 'না। মোটেই হিসেবী ছিলেন না। আমার হাতে দু চার টাকা থাকলে তাও চেয়ে নিয়ে খরচ করে ফেলতেন। বছর দুই আগে এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে হাজার আড়াই টাকার ইনসিওরেন্স শুধু করে গেছেন। তাই কেবল সম্বল। সে টাকা ইনসিওরেন্স অফিসেই পড়ে আছে। তা যদি এখনই ভাঙি, পরে বিপদে আপদে—'

অরুণ বাধা দিয়ে বলল, 'না না, সে টাকা এখনই খরচ করবেন কেন। সে কোন কাজের কথা নয়।'

একটু বাদে বলল, 'আচ্ছা, আপনাদের কোন আত্মীয় স্বজন নেই?'

এতদিন যা বলেনি, সে সব কথাও আজ ধীরে ধীরে বলতে লাগল করবী। আত্মীয় স্বজন থাকবে না কেন, আছেন। বাবা আছেন দাদা আছেন। কিন্তু প্রত্যেকেরই অল্প আয়, সংসারে খাইয়ে বেশি, খরচ বেশি। এই দুর্দিনে তাঁদের কারো গলগ্রহ হওয়ার ইচ্ছে নেই করবীর। শ্বশুরকুলে স্বামীর দূর সম্পর্কের কাকাও একজন আছেন। কিন্তু তাঁরও ঠিক একই রকম অবস্থা। তাছাড়া অনেকদিন আগে থেকেই তাঁরা পৃথগন্ন। আজ দুর্দশায় পড়েছে বলেই করবীরা তিন চারজনে সেখানে গিয়ে উঠতে পারে না। ভিতরে ভিতরে শাশুড়ীরও তা ইচ্ছে নয়। তাই করবীকে নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে। নিজের রোজগারেই চালাতে হবে সংসার। শাশুড়ী প্রথম প্রথম আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু এখন চার দিক দেখে শুনে মত দিয়েছেন। ভালো জায়গায় ভদ্র রকমের চাকরি টাকরি কিছু যদি পায় করবী তা করুক। কিন্তু শাশুড়ীর সম্মতি পেলে কি হবে, চাকরি যে পাওয়া যাচ্ছে না। কালীঘাটে একটি গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে জানাশোনা আছে করবীদের। কলেজে একসঙ্গে পড়ত। সেই রেবা সেনের কাছেই

গিয়েছিল করবী। তার স্কুলে একজন টিচারের দরকার হতে পারে বলে রেবা জানিয়েছিল। কিন্তু করবীকে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। রেবাদের স্কুলে এখন কোন টিচার নেওয়া হবে না। সেক্রেটারী পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন কম লোক দিয়েই এখনকার মত কাজ চালিয়ে নিতে হবে। পরে নতুন বছরের শুরুতে দেখা যাবে চেষ্টা করে। কিন্তু তার তো আরও তিন চার মাস দেরি। ততদিন চলবে কি করে।

সব শুনে অরুণ বলল, 'আপনি এতদিন বলেন নি কেন।' করবী একটু হাসল, 'বললেই বা কি করতেন। আপনি নিজেই তো চাকরি খুঁজছেন।'

অরুণ বলল, 'সেই সঙ্গে আপনার চাকরিও খুঁজতুম।'

করবী বলল, 'সে খোঁজার সময় তো এখনও যায় নি।'

অরুণ বলল, 'তা ঠিক, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি। কিছু মনে করবেন না। কতটা অবধি পড়াশুনো করেছিলেন? করবী একটু লজ্জিত হয়ে বলল, সে আর জিজ্ঞেস করবেন না। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছিলাম। তার পর আর এগোয় নি। আমার খুবই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কেবল একজনের ইচ্ছেতেই তো হয় না।

মৃত স্বামীর বিরুদ্ধে একটু অভিযোগের ইঙ্গিত দিয়ে করবী চুপ করল। অরুণ বিস্মিত হয়ে ভাবল করবীর সাহস তো কম নয়, এই বিদায় আজকালকার দিনে চাকরি জোগাড় করে সে পরিবার প্রতিপালন করতে চায়। স্কুলে যদি চাকরি জোটেই তাহলেই বা কত টাকার মাইনে হবে। বড়জোর চল্লিশ, তাতে কি করে সংসার চালাবে করবী, নিজের ভাবনার চেয়ে মুহূর্তের জন্যে করবীর সমস্যাই যেন বেশি হয়ে উঠল অরুণের কাছে।

একটুকাল চুপ করে থেকে করবী বলল, 'দু একটা অফিসেও এর মধ্যে ইণ্টারভিউ' দিয়ে এসেছি। বলেছিল তো খবর দেবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তো কোন চিঠিপত্র পেলাম না। অন্তত আপনার মত একটি টিউশানি পেলেও হোত। তার জন্যেও খোঁজখবর করছি; কিন্তু যখন জোটে না তখন কিছুই জুটতে চায় না?'

অরুণ বলল, 'তা ঠিক। আচ্ছা আপনি করবেন টিউশানি?'

করবী বলল, 'পেলে নিশ্চয়ই করব। আছে নাকি আপনার হাতে?'

অরুণ বলল, 'হাতে মাত্র একটি টিউশানিই আছে। আপনাদের ওই ডাক্তার বাড়ির টিউশানি। ওইটিই আপনি করুন না। বলুন যদি রাজী থাকেন বলে কয়ে ঠিক করে দেই। বাড়ির কাছে আছে। তিরিশ টাকা করে পাবেন।'

করবী বলল, 'তা না হয় পেলাম। কিন্তু ছেলের জন্যে মেয়ে টিউটর ওরা রাখবেই বা কেন?'

অরুণ বলল, 'এতদিন পুরুষ টিউটরেরা তো ওকে একেবারে বিদ্যা দিগগজ করে ছেড়েছে, এবার আপনাদের একটা চান্স দেওয়া ভালো।'

করবী একটু হেসে বলল, 'তাই নাকি। কিন্তু খুব যে উদারতা দেখছি। আপনার নিজের টিউশানি আমাকে ছেড়ে দিতে চাইছেন।'

অরুণ বলল, 'আপনার প্রয়োজন আমার চাইতে বেশি সেইজন্যে।'

করবী বলল, 'সত্যিই কি তাই। না, তিরিশ টাকায় একটা বাজে টিউশানি বলে, ছাত্রকে ম্যানেজ করতে পারছেন না বলে ছেড়ে দিয়ে রেহাই পেতে চাইছেন? এই যদি তিনশ টাকার একটি মোটা চাকরি টাকরি হোত তাহলে প্রাণ ধরে দিতে পারতেন আমাকে?'

করবীর কথার ভঙ্গিতে পরিহাসের সুর অনেক দিন পরে, সেই উচ্ছল তারল্য যেন ফিরে এসেছে ওর ভাষায় ভঙ্গিতে। অরুণ বলল, 'নিশ্চয়ই পারতাম।'

পরিহাসপ্রিয় সেও বড় কম নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তার কথার ধারটা মোটে ঠাট্টার মত শোনাল না। সে যেন করবীকে সত্যিই নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে তেম একটা দামী চাকরিও অরুণ করবীর জন্যে ছেড়ে দিতে পারে।

করবী অরুণের দিকে একবার চেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। সে যেন এমন নিশ্চিত আশ্বাস আশা করে নি। পরিহাসের জবাবে অরুণের কাছ থেকে পরিহাস চেয়েছিল।

অমনভাবে একথাটা বলে ফেলে অরুণ নিজেও কম অপ্রস্তুত হয় নি। এবার যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলি।'

করবী বলল, 'সে কি, চা-টা খে যাবেন না?'

অরুণ বলল, 'না, আজ আর সময় হ না, আজ যাই।'

করবী আর তেমন অনুরোধ করল বলল, 'আচ্ছা।'

দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বল 'আসবেন তো আর একদিন?'

অরুণ সংক্ষেপে বলল, 'আসব।'

(ক্র

শিক্ষাপ্রসঙ্গ
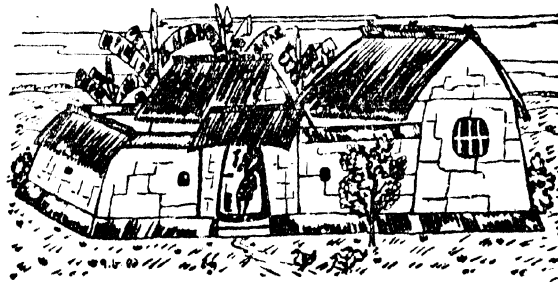
বিজ্ঞান-চর্চা ও শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যম

শ্রীচিত্তরঞ্জন বসু

বিজ্ঞানের প্রসার ও আবিষ্কার প্রবল-ভাবে এগিয়ে চলেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে আণবিক বোমার (Atom bomb) কথা শোনা যায়। খেলা-চ্ছলে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও হয় যদিও তারা মোটেই জানে না এর ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে। বাস্তবিক যদি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা ও আবিষ্কার মানব সমাজের কেবলমাত্র উপকারের জন্য সৃষ্টি হোত এবং মানুষে মানুষের সঙ্গে, দেশবিদেশের সঙ্গে ও এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে হিংসা কলহ বিবাদ ভুলে গিয়ে "আমরা সকলে পরের তরে" এই ভাবটা যদি সকলের মনে ফুটে উঠত, না জানি পৃথিবীটা আজ কত সুন্দর হোত।

আমরা ইংরাজীর মাধ্যমে অনেক তথ্য পড়িয়ে থাকি, লিখেছিও অনেক। ক্লাসে পড়াতে যেয়ে একটা বিষয় আবিষ্কার করেছি এই, আজকাল ছাত্ররা বাঙলা ভাষার মাধ্যমে সবকিছু পড়ে এসে হঠাৎ কলেজে এসে সর্ষেফুল দেখছে। কারণ এখানে সবকিছু ইংরাজী ভাষায় পড়ান হয়। (ধন্য আমাদের য়ুনিভার্সিটি। ধন্য তাঁরা, যাঁরা উপর দিক্‌কার শিক্ষার মাধ্যমের কথা না ভেবে প্রবেশিকা ক্লাস পর্যন্ত যাবতীয় বাঙলা ভাষায় পড়তে হবে, প্রশ্ন হবে কিন্তু ইংরাজী ভাষায়" প্রবর্তন করে সস্তা দরের বাহবা নিয়ে সরে পড়েছেন)। দুগ্ধ (জল মেশান কিংবা পাউডার গোলা) পোষ্য শিশুদের পাঠ্যের তালিকা ও বিষয় সূচীর দিকে তাকালে আমাদেরই আঁৎকে উঠতে হয়।

ফলে এই হয়েছে, ছাত্ররা পড়ায় আনন্দ পায় না, ক্লাসে যা পড়ান হয় বোধগম্য হয় না, পরীক্ষায় অকৃতকার্যের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সমাজের ও দেশের কর্ণধার যাঁরা, তাঁরা যেন এইসব ছেলেমেয়েদের স্তরে এসে দেখেন, দোটানায় পড়ে তারা কিরকম হাবু-ডুবু খাচ্ছে।

আমার লেখা পড়ে মনে কোরবেন না আমি সব কিছু ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষার পক্ষপাতী। তবে কথা হচ্ছে ইংরাজকে তাড়িয়েছি বলে তার শিকড়শুদ্ধ উৎপাটন কোরতে হবে এইরকম মনোভাব আমার নয়। ঐ জাতের মধ্যে এবং ঐ ভাষার মধ্যে অনেক কিছু শিক্ষার আছে। ভালটুকু নিতে দোষ কি? পৃথিবীময় যদি ঘুরতে হয় এবং নানান বিষয়ের গবেষণা করতে হয় তাহলে আমার মনে হয় অন্যান্য বিদেশী ভাষা অপেক্ষা ইংরাজী ভাষাই আমাদের কাছে বেশী পরিচিত।

আলোচ্য বিষয়ে আসা যাক্—বিজ্ঞান কিভাবে শেখান দরকার। যাতে শিক্ষার্থীরা সহজভাবে বুঝতে পারে ও লিখতে পারে অর্থাৎ নীচের ক্লাসে কোন একটা কথা বাঙলায় জেনে এলাম, উপরের ক্লাসে এসে আবার ইংরাজী ভাষায় নূতন করে শিখতে যেন না হয়। য়ুনিভার্সিটি পরিভাষা কমিটি তৈরী হয়েছিল, কিছুদিন কাজও হোল তারপর হয়ত পণ্ডশ্রম হবে মনে করে আর কমিটির কাজ অগ্রসর হয় না। এসব নাটক করার আদৌ দরকার আছে কি? কমিটি, প্রতিশব্দ তৈরী করার প্রয়োজনই বা কি?

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জগতে যে সব কথা চলে আসছে বা মেনে নেওয়া হয়েছে, তার জন্য সংস্কৃত অভিধান ঘেঁটে প্রতিশব্দ তৈরী করে উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষার্থীদের বিব্রত করার হেতু দেখি না। বিজ্ঞান বিষয়ক আন্তর্জাতিক কথাগুলি বাঙলা হরফে লেখা হোক আর মূল বিষয়টি বাঙলার মাধ্যমে পঠন ও পাঠন চলুক। যারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী তাদের ইংরাজী ভাষা কেন উচ্চস্তরের গবেষণা করতে গেলে অন্যান্য বিদেশী ভাষায়ও পারদর্শী হতে হবে। তারপর তারা যদি সহজভাবে সেইসব তথ্য মাতৃভাষায় লেখে, তাহলে আমাদের মাতৃভাষা আরও সমৃদ্ধিলাভ করবে।

কতগুলো উদাহরণ দিলেই আমার আলোচ্য বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

রেন বো'র (Rain bow) প্রতিশব্দ চলে এসেছে ইন্দ্রধনু বা রামধনু বলে। কথাটা বৃষ্টির সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আছে কিন্তু বাঙলার প্রতিশব্দের ভেতর বৃষ্টির নাম-গন্ধও নাই। এই দিক থেকে রেন বোর প্রতিশব্দ রামধনু হয় কি করে?

ইলেক্‌ট্রন (Electron), প্রোটন (Pro. ton) ও নিউট্রন (Neutron) কথাগুলোর (এই তিনটা কণা নিয়েই সমস্ত পদার্থ তৈরী হয়) মাতৃভাষায় নামকরণ করতে যাও ধৃষ্টতা মাত্র।

প্রেসবায়োপিয়ার (Presbyopia) প্রতি শব্দ হয়েছে 'চাল্‌শে'। চল্লিশ বছরে পর সাধারণতঃ চোখের এই রোগ দে যায়। সেই সঙ্গে অন্য রোগও থাকা পারে। সুতরাং 'চাল্‌শে' প্রতিশব্দ বিজ্ঞানমতে ঠিক হয় নাই।

আন্তর্জাতিক রাসায়নিক শব্দ যে অক্সিজেন (Oxygen), নাইট্রোজেন (Nit gen) ইত্যাদি গ্যাসের প্রতিশব্দ তৈ করার প্রয়োজন কি? হয়ত হয়েছেও কি কিছু কিন্তু সেসব প্রতিশব্দ চালু হাও পক্ষপাতী আমি নই—কারণ সম্বন্ধে আ আগেই বলেছি। ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাণি ইত্যাদি বিজ্ঞানের আর যে সব শ প্রশাখা আছে তাদের সম্বন্ধে একই য প্রযোজ্য। উদাহরণ বা আলো নিষ্প্রয়োজন।

সর্বশেষে একটি অপ্রিয় সত্যের অবতা করতে বাধ্য হচ্ছি। প্রবেশিকা ক্লাস পর চারটি ভাষায় (বাঙলা, ইংরাজী, সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা) ব্যুৎপত্তি লাভ করে ভাষাবিদ হয়ে নীচু ক্লাস থেকেই বিভিন্ন বিষয় বড় পণ্ডিতের লিখিত মোটা মোটা বই পাণ্ডিত্য কইনাইনের মত গলাধঃকরণ ক যে বাঙালী ছাত্রসমাজ গড়ে উঠেছে, ত যে কেবল অন্য প্রদেশের কাছে প্র যোগিতায় হেয় প্রতিপন্ন হবে তা নয়, এ বাঙলার ঐতিহ্য, বাঙলার গৌরব, বাঙ পদমর্যাদা এবং 'বাঙলা যা ভাবছে ত অন্য সব ভাববে কাল' এই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবে বলে মনে হয় এর জন্য দায়ী করব সেই সব শিক্ষা বি কর্ণধারদের যাঁরা এখন পর্যন্ত উচ্চ শি সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিম্নস্তরের শিক্ষা মাধ্যম সম্বন্ধে মতিস্থির করতে পাচ্ছেন

চিত্রপ্রদর্শনী

শ্রীমতী মীরা

শিল্পী আফান্দীর প্রতিকৃতি

শ্রীমতী মীরার একটি একক চিত্র-প্রদর্শনী ১নং চৌরঙ্গী টেরেসে অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। শ্রীমতী মীরার শিল্পী-জীবনের ধারাটি একটু বিচিত্র। প্রথমে তিনি ওরিয়েণ্টাল সোসাইটিতে শ্রীকালীপদ ঘোষালের কাছে শিল্পদীক্ষা পান। কিছু দিন শিল্পাভ্যাসের পর তিনি দিল্লীর পলিটেক্‌নিকে যোগ দেন। এখানে তাঁর শিল্প একটি বিশেষ পরিণতির দিকে মোড় ফেরে। পরে তিনি মূর্তিশিল্পী ধনরাজ ভগতের কাছে মূর্তি নির্মাণ শিক্ষা আরম্ভ করেন। এর পরেই তাঁর শিল্পী জীবনে দীর্ঘ ছেদ পড়ে। গত বৎসর ইন্দোনেশীয় শিল্পী আফান্দীর সঙ্গে পরিচয় হবার পর তিনি তাঁর নিরন্তর উৎসাহে আবার নূতনভাবে শিল্প রচনা আরম্ভ করেন।

শ্রীমতী মীরার শিল্পী-জীবনের এই দুটি অধ্যায় কিন্তু একেবারে ভিন্ন জাতের। একটির সঙ্গে অন্যটির কোন যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর প্রথম যুগের ছবিগুলির মধ্যে যে পরিচ্ছন্নতা, সৌকর্য ও বিশিষ্ট পরিণতি দেখা যায়, নতুন ছবিগুলোতে তার একান্ত অভাব। এই দুই সময়ে আঁকা ছবিগুলোর আঙ্গিকগত প্রভেদও যথেষ্ট। প্রথম দিকের অঙ্কনরীতি সতর্ক, সুচিন্তিত ও বর্ণপ্রধান; পরবর্তী সময়ের অঙ্কনরীতি রেখাবহুল, অসতর্ক, মোটা তুলির টানে বলিষ্ঠতার আভাস আনবার চেষ্টা। কিন্তু শ্রীমতী মীরার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তাঁর প্রতিকৃতি চিত্রগুলিতে (portraits)। তাঁর পূর্ব যুগে আঁকা প্রতিটি প্রতিকৃতিই সার্থক সৃষ্টিঃ—এর মধ্যে "স্বামীজী" (৩৪) ও "আয়েশা" (২৯) চিত্রদুটি আমাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়েছে। তাঁর পরবর্তী যুগেরও প্রায় সবকটি প্রতিকৃতিই সার্থক। "আউং শাউ" (২৩) কাজটির আবেদন অতি সুন্দর; "আফান্দী" (২৬) একটি বলিষ্ঠ চিত্র, তুলি চালনায় বলিষ্ঠতা আছে। "সেতারী" (৭) ছবিটির প্রতিকৃতির অংশটুকু বেশ ভাল এবং বর্ণবিন্যাসও প্রশংসনীয়, কিন্তু দৃষ্টি-কোণের ত্রুটির জন্য এবং অসাবধানতার জন্য

শূকর

ড্রইং-এর ভুল চোখে লাগে, কোথাও কোথাও অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

এই প্রদর্শনীর অধিকাংশ ছবিই শিল্পী অধুনা এঁকেছেন এবং এর প্রায় প্রতিটি ছবিতেই শিল্পী আফান্দীর প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। এসব ছবির প্রধান দোষ হল অবকাশের (relief), যত্ন ও সতর্কতার অভাব। পশ্চাৎপটেই শিল্পীর অসাবধানতা বেশী লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অনেক ছবিই এই অসতর্কতার জন্য রসোত্তীর্ণ হতে

ক্লান্তি

পারেনি। "সাঁওতাল" (১২) ছবিটি রঙ-এ, রেখায় একাকার হয়ে গেছে। "উৎকর্ণ" (Listening—৮নং) ছবিটির সার্থকতা নষ্ট করেছে অসতর্ক পশ্চাৎপট। "শুকর" (৬) ছবিটি গুটি কয়েক রেখায় ও আঁচড়ে আঁকবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। "হস্তীযুগল" (৫) অবকাশের অভাবে একাকার। আরেকটি শুকর" (Another pig—১১নং) ছবিটি জীবন্ত, কিন্তু এখানেও সেই অসতর্কতা ছবিটিকে রসোত্তীর্ণ হতে দেয় নি। "মাংসের বাজার" (৪), "জাহাজ ঘাট" (২২) ইত্যাদি অনেক ছবিতেই অবকাশ ও পরিচ্ছন্নতার একান্ত অভাব। "Bored" (১৭) ছবিটিতে বহু ঈপ্সিত অবকাশ ও হাল্কা রঙ-এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া গেলেও অসতর্ক রেখার টানে ছবিটি শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। "বাঁশ ঝাড়" (১৬)এ রঙ-এর প্রয়োগ ভাল, কিন্তু রেখাবাহুল্য এর প্রধান দোষ। "পাহাড়ের সানুদেশ" (৩৭)এ রঙ, কম্পোজিশান ও ফর্ম চিত্তাকর্ষক, পশ্চাৎপটের রঙ ভাল হলে ছবিটি আরও ভাল হত।

শ্রীমতী মীরা যে সার্থক শিল্পী তার পরিচয় তাঁর পূর্ব যুগের ছবিতেই মেলে। বিশেষ করে প্রতিকৃতি শিল্পে তাঁর দক্ষতা অবিসংবাদিত। শিল্পী আফান্দী তাঁকে শিল্প চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে ভারত শিল্পের অনেক উপকার করেছেন। কিন্তু শ্রীমতী মীরার শিল্প এখনও এই শিল্পীর প্রভাব-আচ্ছন্ন। আমাদের মনে হয়, এই পর্যায়টি শ্রীমতী মীরার এক নূতন অনুশীলনের পথে এগিয়ে চলেছে। আশা করি, তিনি এই প্রভাব কাটিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য আবার খুঁজে পাবেন।

শিল্পী শ্রীবীরেনেরও চারটি ছবি এই প্রদর্শনীর সঙ্গে প্রদর্শিত হচ্ছে। ইনি মাত্র দু মাস হল শিল্পশিক্ষা আরম্ভ করেছেন। সুতরাং কোন পরিণতির আভাস এ সকল ছবিতে আশা করা ভুল। কিন্তু শিল্পীর কল্পনাপ্রবণ মনের বেশ একটা ছাপ এই ছবিকটিতে পাওয়া যায়। ছবিগুলোর রঙ বেশ ভাল।
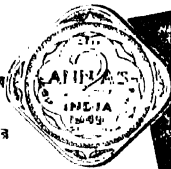
সম্প্রতি দিল্লীতে বর্তমান সংসদের সর্বশেষ অধিবেশনের উদ্বোধন হইয়া গেল।—"অদ্যাই শেষ রজনী বলে চাঁদনী চকে লাড্ডুর দোকানের ভীড় আমরা দূর থেকেই আঁচ করছি"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

নির্বাচনী কমিশনারের বিবৃতিতে জানা গেল—পরাজিত প্রার্থীদের এগারো লক্ষ টাকা জামানৎ বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।—"খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি করতে গেলে এ-ই হয়"—বলে শ্যামলাল।

* * * *

চিকাগোর এক চিকিৎসক এই মর্মে এক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হার্টের উপর মাঝে মাঝে একটু "শক্" লাগা ভাল।—"সখের প্রার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্বাচনে আর কোন ভয় রইল না"—বলেন খুড়ো।

* * * *

শিখগণের পৃথক সত্তা স্বীকৃত না হইলে আমরা সকলে কমিউনিস্ট হইয়া যাইব—বলিয়াছেন মাষ্টার তারা সিং।

জনৈক সহযাত্রী আবৃত্তির সুরে বলিয়া উঠিলেন—"দেখিতে দেখিতে তারার মন্ত্রে ঘুমায়ে পড়িল শিখ!!"

* * * * *

ভারতের চিকিৎসায়তনগুলি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য থাইল্যান্ড হইতে **কয়েকজন চিকিৎসক এ দেশে আগমন**
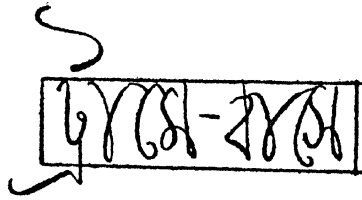
করিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"তাঁরা যেন ঐ সঙ্গে ঝাড়ফুঁক-তুকতাক্-মানৎ প্রভৃতি মোক্ষম চিকিৎসা রীতিগুলোও পরখ করে যান, তা না হলে তাদের আগমন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।"

* * * * *

কেন্দ্রীয় খাদ্য-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সী বলিয়াছেন—ভারতে দুধের ব্যবসা সব চেয়ে কম লাভজনক।—"মুন্সীজী কল

বা ডোবার জলের ভাও জানলে এত বড় ভুল করতেন না।"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

আকোলার জনৈক কবিরাজ নাকি একটি মৃতসঞ্জীবনী বটিকা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বটিকার মাহাত্ম্যে নাকি মৃতের পুনর্জীবন লাভ **সম্ভব। শ্যামলাল বলিল—"তার চেয়ে**

মোক্ষম সঞ্জীবনী অনেক আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে নওগাঁয় আর তা দিয়ে শুধু **বাঁচাই** নয়, তার এক ছিলিমে যেমন-তেমন, **দুই** ছিলিমে তাজা, তিন ছিলিমে উজীর-**নাজীর,** চার ছিলিমে রাজা—পর্যন্ত হওয়া **যায়!"**

* * * * *

বাংলার বদলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা **বলিয়া** ঘোষণা করায় পূর্ব **পাকিস্তানের** ছাত্রগণ নাকি সম্প্রতি বিক্ষোভ **প্রকাশ** করিতেছেন।—"কিন্তু তারা ভেবে **দেখেছেন** কি লড়কে লেঙ্গের মতো জুৎসই **ভাষা** বাংলায় নেই"—মন্তব্য করেন **জনৈক** সহযাত্রী।

* * * *

ইডেন উদ্যানের গাছগাছড়া **কাটিয়া** সাফ করা হইতেছে বলিয়া **জনৈক** পত্র-প্রেরক দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—কলিকাতার এমন একটি সৌন্দর্য-**কেন্দ্রকে** এইভাবে নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত **নয়।** বিশু খুড়ো বলিলেন—"সৌন্দর্য **চুলোয়** যাক মশাই, ফুটবল মরসুমে গাছে চড়া **বন্ধ** হলে যে সব ফর্সা"।

* * * *

দিল্লীতে অবস্থিত পাক্ হাই **কমিশনারের** দপ্তর সম্বন্ধে নানা **রকম** অভিযোগ শোনা যাইতেছে। **সংবাদদাতা** বলিতেছেন যে, রকমারী খরচের **খাতে** সম্প্রতি সতর হাজার টাকা মূল্যের **শাড়ী**

খরিদ করা হইয়াছে কিন্তু শাড়ীগুলি কাহার জন্য ক্রয় করা হইল হিসাবের খাতায় তার কোন উল্লেখ নাই।—"তা অবশ্যি আমরাও বলতে পারব না তবে একথা ঠিক, যে শাড়ীগুলো অন্তত জনাব জাফরুল্লা বা খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবের ব্যবহারের জন্য খরিদ করা হয় নি!!"—বলে শ্যামলাল।

পুস্তক পরিচয়

ভুতুড়ে—শ্রীমতী পুষ্প বসু। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—১৸০ আনা।

অশরীরী ভুত-প্রেত কেউ বিশ্বাস করেন, কেউ করেন না; কেউ এই সূক্ষ্ম দেহধারীদের ক্রিয়া-কলাপ ব্যক্তিগত জীবনে অনুভব করেছেন, কেউ করেননি। কিন্তু একথা খুবই সত্য যে, এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভুত সম্বন্ধীয় গল্প বা প্রবন্ধ পাঠের কৌতূহল সমানভাবে বিদ্যমান। দেহাবসানের পর মানুষের কোন অস্তিত্ব থাকে কি না বা তার স্থান কোন রহস্যাবৃত লোকে সে সম্বন্ধে চিরকালই মানুষের কৌতূহল। সূক্ষ্মদেহ বা আতিবাহিক দেহ নিয়ে অনেকেই এদেশে ও ইউরোপে বহু গবেষণা করেছেন এবং অনেকে বিশ্বাসও করেছেন যে, অশরীরীর অস্তিত্ব আছে, ইচ্ছা করলে তারা দেহধারণ করতে পারে—পৃথিবীর মানুষের ভালোমন্দ করতে পারে। 'জন্মান্তর রহস্য', 'ভুত ও মানুষ', 'কঙ্কাবতী'—এই সব অশরীরীদের নিয়ে লেখা প্রাচীন বই। অধুনাও এ সম্বন্ধে অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শ্রীমতী পুষ্প বসুর এ বইখানি সেগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে অনেক ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষ-দর্শী এবং অনেকগুলি বিশ্বস্তসূত্রে শোনা। অভিনব রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশে গল্পাকারে তিনি সেগুলি এই বইয়ের মধ্যে প্রকাশ করেছেন এবং রচনার কৌশলে গল্পগুলি সার্থক রচনা হয়ে উঠেছে। ছোট থেকে বড়রা সকলেই বইটি পড়ে খুশি হবেন। বইটি সচিত্র। ১৩।৫২

সোনার চেয়ে দামী: মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাবলিসার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, মূল্য দুই টাকা।

রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থা ও ধনতান্ত্রিক শোষণের চাপে নিষ্পিষ্ট বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের নিশ্চেষ্টতা ও নির্বেদ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার প্রধান উপজীব্য। সুস্পষ্ট জীবনবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহার রচনা মূলতঃ আবেগধর্মী নহে, সমস্যা সমাধানের কোন স্থূল ইঙ্গিতও রচনাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে না, কিন্তু সমস্ত রচনার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে সুস্থ সবল সত্যনিষ্ঠার স্বাক্ষর। মানব-চরিত্র বিশ্লেষণের দুরূহ কার্যে বাংলা সাহিত্যে তিনি একক। সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরের ভাববিলাসী মানবমানবীর কল্পনাবিলাস মাণিক-বাবুর লক্ষ্য নহে, সমাজের অবহেলিত নিম্ন-স্তরের নরনারীর আশাআকাঙ্ক্ষা, দ্বিধাসংশয়, সমষ্টিগত সমাজচেতনা তাঁহার লেখনীমুখে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। দারিদ্র্যের নাগপাশে জর্জরিত, জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত নরনারীর গভীর মর্মজ্বালা লেখকের অন্তর্দৃষ্টির স্পর্শে স্ফুলিঙ্গের রূপ পরিগ্রহ করে। ঠিক সেইজন্যই তাঁহার রচনায় শুধু জীবন সংগ্রামে পরাজিত মানবমানবীর কাহিনীই বর্ণিত হয় না, তাহাদের সমষ্টিগতভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার বলিষ্ঠ প্রয়াসেরও সাক্ষাৎ অজস্রভাবে পাওয়া যায়।

মাণিকবাবুর সর্বাধুনিক গ্রন্থ 'সোনার চেয়ে দামী''ও ভাঙনধরা মধ্যবিত্তজীবনের এক অপরূপ আলেখ্য। অব্যবহার্য ছিন্ন স্বর্ণহার কণ্ঠচ্যুত করার সাময়িক দুঃখবোধ বৃহত্তর জীবনবোধের পরিপ্রেক্ষিতে এক সময়ে বিলীন হইয়া যায়। কণ্ঠহার তখন বন্ধনের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়, শ্রেণীসচেতনতার স্থূল ইঙ্গিত। স্বর্ণমারীচের সর্বনাশা প্রলোভন এড়াইয়া মানুষ মহত্তর জীবনের সন্ধান পায়, পায় মানুষের পাশে দাঁড়াইবার বলিষ্ঠ অধিকার।

বেদনামধুর এই কাহিনীটি মাণিকবাবুর শিল্পনিষ্ঠার অনবদ্য পরিচয়। রচনাচাতুর্যে আশা, বাসন্তী, সঞ্জীব, রাখাল প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৬।৫১

আনন্দমঠ : সম্পাদক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য :: বাণীবিতান : ৬৪-সি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা—২৯। এক টাকা চার আনা।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সংক্ষেপিত সংস্করণের প্রবর্তন করিয়া অধ্যাপক বিজন-বিহারী ভট্টাচার্য প্রকৃত সাহিত্যরসিকদের যথেষ্ট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইঁহার সম্পাদিত যাবতীয় গ্রন্থ জনসাধারণের নিকট যে প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থটির নবতম সংস্করণই তাহার প্রমাণ। সংক্ষেপিত গ্রন্থমালার সর্বাপেক্ষা সুবিধা এই যে, অতি ব্যস্ত পাঠক-পাঠিকারাও নীরটুকু বাদ দিয়া ক্ষীর আস্বাদন করিতে সমর্থ হন।

ছাপা, বাঁধাই ও মূল্যে পুস্তকটি বালক বয়স্ক সকলকেই প্রীত করিতে সমর্থ হইবে এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ৩০২।৫১

'মন'প্যাথি : শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী :: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : ২০৩।১।১, কর্ণ-ওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি পরশুরামের সুবিখ্যাত রস-রচনা "চিকিৎসা-সঙ্কটের" নাটকায়িত রূপ। কাহিনীর যে টুকু পরিবর্তন ও সংযোজন সাধিত হইয়াছে তাহা অভিনয়ের সুবিধার্থেই। মূল রসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাহিনীর এই রূপান্তর নাট্যকারের রসজ্ঞানের পরিচায়ক। ভারতের বহু স্থানে এমন কি ভারতের বাহিরেও নাটকটি একাধিকবার সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে।

নাটকটি বহু মঞ্চে অভিনীত এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে রূপায়িত হওয়া ছাড়া, একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াও জনপ্রিয়তার বিশেষ লক্ষণ। ৩০৫।৫১

চিত্রবাণী চিত্রবার্ষিকী, ১৯৫১—গৌর চট্টো-পাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত; চিত্রবাণী প্রকাশনী, ৫, হাজরা লেন, কলিকাতা ২৯ থেকে প্রকাশিত; দাম—আড়াই টাকা।

বাঙলা দেশের ছায়াছবি সম্বন্ধে কৌতূহলী এবং চলচ্চিত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে মাসিক পত্রিকা 'চিত্রবাণী' আজ আর অপরিচিত নয়। এই পত্রিকার উদ্যোগে প্রকাশিত 'চিত্রবাণী চিত্রবার্ষিকী ১৯৫১' ছায়াছবি জগতের বহুতর তথ্যের সমাবেশে সংকলিত। সাধারণত 'ইয়ার-বুক' জাতীয় বই বলতে আমরা যা বুঝি বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে এটি ঠিক সেই জাতীয় বই। বহু জ্ঞাতব্য ও চিত্তাকর্ষক বিষয়-সূচীর মধ্যে আছে শিল্পী ও টেকনিসিয়ানদের সংক্ষেপিত জীবনী, বিভিন্ন স্টুডিওর বিশদ পরিচিতি, ছবি সেন্সর করার নিয়মাবলী, ফিল্মস ডিভিসনের পরিচয় ও ছবির তালিকা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চিত্রগৃহের সংখ্যা ও মোট বসবার আসনের সংখ্যা, ভারতীয় চিত্রশিল্পের আয়-ব্যয়ের হিসাব, একটি সাধারণ ছবি তুলতে কি পরিমাণ খরচ হতে পারে, বাঙলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যার চিত্রগৃহসমূহের নাম, প্রচার সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ইত্যাদি। তাছাড়া বহু শিল্পী ও কলাকুশলীদের আর্ট পেপারে ছাপা বহু ছবি।

এক কথায়, বাঙলা চলচ্চিত্রশিল্পের কোনো বিষয় জানবার ইচ্ছা হলে সঙ্গে সঙ্গেই সেই কৌতূহল মেটাবার সম্পূর্ণ উপকরণ পাওয়া যায় এই একখানি বইতে। ছাপা ও বহিরাঙ্গ সমেত বইখানি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি অপরিহার্য রেফারেন্স বুক হিসেবে। ২০৭।৫১

জীবন অধ্যয়ন—শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য। প্রকাশক—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার, ২২৭।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৪। পৃঃ ২৭০ + পরিশিষ্ট। মূল্য তিন টাকা।

দুঃসাহসিকতা দুর্বলতারই উগ্রপ্রতিক্রিয়া, মনোবিজ্ঞানীরা হয়ত বলবেন, অথবা "অন্নপায়ী" বাঙালী আমরা যে দুর্বল নই একথা প্রমাণ করবার জন্য আমরা চরম মূল্য দেবার সংকল্প করেছিলাম, আর সেইজন্যই বিপ্লব-প্রচেষ্টার রক্তরাঙা সেইসব বিগতদিনের স্মৃতি এখনো ভাঙা বাঙলার ঘরে ঘরে আনন্দে বেদনায়, গৌরবে ও গর্বে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেই বিগত দিনের কাহিনী বলা শুরু হয়েছে, বাঙলা সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ অংশ আজ বিপ্লবী-দের আত্মজীবনী, কারাকাহিনী ও বিপ্লব-প্রচেষ্টার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের বিস্তৃত বর্ণনা। কত জানা ও অজানা মুক্তি সাধক ও সাধিকার জীবন দিয়ে যে এই ইতিবৃত্তের বনিয়াদ রচনা করা হয়েছে তার সংখ্যা নাই। যাঁরা বন্দীশালায় ফাঁসিকাঠে চিরনীরব হয়েছেন তাঁদের জীবনই

তাঁদের বাণী, তার বেশি কিছু তাদের বলে বলার সুযোগ হয়নি। যাঁরা লাঞ্ছনা ও নিগ্রহের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আজও জীবিত আছেন তাঁদেরই দায়িত্ব হল বাঙলা দেশের সেই মহান ঐতিহ্যকে জনসাধারণের নিকটে পরিচিত করা। শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য যে জীবন অধ্যয়ন করেছেন সে কেবল তাঁর একলারই জীবন, বহু আদর্শনিষ্ঠ মানুষের জীবনের সঙ্গে কর্মোদ্যমের তাঁর ভাবনাসাধনা মিশিয়েছিলেন বলেই তাঁর জীবন অধ্যয়ন সার্থক হয়েছে! এ কেবল ঘরোয়া সুখদুঃখের কথা নয়, এর পটভূমিকা যেমন বিরাট, আলোয় অন্ধকারে ঝলমল তেমনি এই কাহিনীর বিপুল গতিবেগ।

লেখিকার পরিচয় নূতন করে দেওয়া প্রায় নিষ্প্রয়োজনই। নেতাযী সুভাষচন্দ্রের শিক্ষাগুরু আচার্য বেণীমাধব দাসের দুই কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী ও বীণা বাঙলা দেশের মরণ-বিজয়ী স্বাধীনতা অভিযানে নিঃসংশয়েই বীর নারীদের পুরোভাগে স্থান পেয়েছেন। শ্রীমতী বীণা দাসের (ভৌমিক) আত্মকাহিনী "শৃঙ্খল ঝঙ্কার" ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে এবং সাহিত্য হিসাবে প্রশংসা অর্জন করেছে। শ্রীমতী কল্যাণীর বর্ণনাভঙ্গী আরও সহজ এবং হয়ত মাঝে মাঝে একটু শিথিলও। 'শৃঙ্খল ঝঙ্কার' ও 'জীবন অধ্যয়নের' তুলনা করলে দুজনেরই উপর অবিচার করা হবে। শৃঙ্খল ঝঙ্কার যখন লেখা হয়েছে, তখনও শৃঙ্খল ভাঙেনি সম্পূর্ণ, ইতিহাসের পাতা সবেমাত্র উল্টান হয়েছে বা হচ্ছে; কাজেই ঐ গ্রন্থে শৃঙ্খলের ঝনৎকার উগ্র, লেখায় আছে একটা কঠিন উজ্জ্বলতা এবং দাহ। 'জীবন অধ্যয়নের' লেখিকা স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করেছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি, আর সেইসব দিনে যাঁরা তাঁর কাছে এসেছিলেন, পরম বেদনার মুহূর্তগুলিতে তাঁদের আলেখ্য তিনি এঁকেছেন শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে। জীবন অধ্যয়নে তাই রাগ অপেক্ষা অনুরাগের সুর প্রবল, আর সেই জন্যই হৃদয়বৃত্তির সরসতায় এই গ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠা বেদনামধুর। জীবন অধ্যয়ন কেবল পড়বার মতো নয়, বারবার পড়বার মতো। লেখিকা তাঁর কারা জীবনের কাহিনী মাত্র বলেন নি; নানা রাজনৈতিক কর্ম প্রচেষ্টার চিত্তাকর্ষক বর্ণনাও এই গ্রন্থের একমাত্র আকর্ষণ নয়। বহু সাধারণ চরিত্র ও সুখদুঃখের কাহিনী লেখিকা বর্ণনা করেছেন অপূর্ব সহানুভূতির সঙ্গে। তাঁর নিজের কথা যেখানে বলেছেন, তার মধ্যেও কোন আত্মগরিমা বা আত্ম প্রচারের চেষ্টা নাই। আরও একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যা আমাদের রাজনীতিক ও সমাজসেবীদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। কতকটা বিচারের প্রহসনে এবং অনেক পরিমাণে সামাজিক নীতিবিধানের বুদ্ধিহীন প্রয়োগের ফলে অনেক হতভাগিনীকে কঠিন কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় আমাদের দেশে; এরা সাধারণ কয়েদী, এদের লাঞ্ছনা ও অধোগতির বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় আদৌ অবহিত নন। শ্রীমতী রাণী চন্দের 'জেনানা ফাটক' ও শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্যের 'জীবন অধ্যয়ন' এই দিক দিয়ে মূল্যবান সামাজিক তথ্যপূর্ণ, সেই তথ্য ব্যবহার করার মত স্থিরচিত্ততা ও উদারবুদ্ধি আমাদের দায়িত্বশীল রাজনীতিকদের আছে কিনা বলা কঠিন। তবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, লেখিকার জীবন অধ্যয়ন একখানি সার্থক গ্রন্থ এবং উদার মানবধর্মী বাঙালী মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

৩০৭।৫১

শ্রীশ্রীগৌর-স্মরণ মঙ্গল—মহানাম ব্রতব্রহ্মচারী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯নং মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা। মূল্য—১৲ টাকা।

ডক্টর মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী বাঙলাদেশের ধর্মপ্রাণ এবং চিন্তাশীল সমাজে সুপরিচিত। আলোচ্য পুস্তকখানিতে সুপণ্ডিত গ্রন্থকার ১০৮টি স্তবকে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব হইতে গম্ভীরা-লীলা পর্যন্ত সমগ্র লীলা পদ্যছন্দে বর্ণনা করিয়াছেন। অতি সরল সহজ এবং সুললিত ভাষায় ভাবের এমন ঐশ্বর্যে মর্মস্পর্শী করিয়া তোলা, লীলার মাধুর্যে যিনি অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, শুধু তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। ব্রহ্মচারী মহানাম ব্রতের এই স্তবগীতি সে দিক হইতে তাঁহার প্রগাঢ় অধ্যাত্মানুভূতির পরিচায়ক। বৈষ্ণব সমাজের সর্বত্র তাঁহার লেখাটি সমাদৃত এবং তাঁহার এই গীতি-বন্দনা প্রকীর্তিত হইবে।

ইসি পত্তন—ভিক্ষু শীলাচার সংকলিত। ৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১॥০ টাকা।

বর্তমান সারনাথের প্রাচীন নাম ঋষিপত্তন অথবা পালি ভাষায় ইসি পত্তন। ভগবান বুদ্ধ এই পুণ্যতীর্থে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। পালি ভাষায় সুপণ্ডিত গ্রন্থকার ঋষিপত্তনের উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সারনাথে তাহার পরিণতির ইতিহাস আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সহজ ও সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতীয় আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল বারাণসীর সন্নিহিত ভারতের এই প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থের উদ্ধার এবং আধুনিক আকারে সংগঠনের মূলে স্বর্গীয় অনাগারিক দেবমিত্র ধর্মপালের সাধনা পুস্তকখানির উপসংহারভাগে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যে রহস্যময় সারনাথের পুরাতত্ত্ব এবং সুবিস্তৃত ঐতিহাসিক বিবরণ সম্বলিত এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সকলেই উপকৃত হইবেন। ২০।৫২

ভক্তিধারা—শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী বিরচিত। মূল্য—ছয় আনা। প্রাপ্তিস্থান—আর জি পাল এন্ড সন্স, ১৫/১, শশিভূষণ রো, ভবানীপুর, কলিকাতা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধনোচিতভাবে নামকীর্তন, নামমাহাত্ম্য এবং ভজন-গীতিমূলক পুস্তিকা। এ সম্বন্ধে যাঁহারা শ্রদ্ধাপরায়ণ, তাঁহাদের উপকারে আসিবে। ২২।৫২

লাঞ্ছিত যারা—ডস্টয়ভস্কী রচিত 'দি ইনসাল্টেড্ এন্ড ইনজিওর্ড' উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ; অনুবাদ করেছেন গৌর চট্টোপাধ্যায় ও মনোজ সান্যাল; প্রকাশক হয়েছে চিত্রবাণী প্রকাশনী, ৫, হাজরা লেন, কলিকাতা—২৯ থেকে; দাম—চার টাকা।

রুশ সাহিত্যের দিক্‌পাল ফিয়োডোর ডস্টয়ভস্কীর পরিচয় সাহিত্য রসপিপাসুদের কাছে অজানা নেই। তাঁর রচিত যে উপন্যাস কখানি রসিক পাঠকসমাজকে আকৃষ্ট করে

সেগুলির অন্যতম হলো 'দি ইনসাল্টেড এ্যান্ড ইনজিওর্ড'। গ্রন্থকার নিজেই যেন একটি ভূমিকা নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনের কয়েকটি অতি সাধারণ চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘটনার জাল বুনেছেন। বিদেশী পটভূমিকায় রচিত হলেও পড়তে পড়তে ঘটনাস্রোতে কোথাও এতটুকু বাধা পেতে হয় না, মনে হয় যেন আমাদের নিজেদের দেশেরই কোনো কাহিনী পড়ছি এবং তা সম্ভব হয়েছে অনুবাদকদ্বয়ের স্বচ্ছ এবং সাবলীল অনুবাদের গুণে। মূল উপন্যাসটিকে অবিকৃত রেখে যে নিষ্ঠা ও দরদ দিয়ে অনুবাদ করা হয়েছে তার জন্যও অনুবাদকদ্বয় ধন্যবাদার্হ। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র বেশ ফুটে উঠেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি জানবার জন্য মন আগ্রহাকুল এবং উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই অনুবাদ-গ্রন্থ রচিত হয় বিদেশী সাহিত্য থেকে সেইসব দেশের সাহিত্য তথা সেইসব দেশের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। এই উদ্দেশ্য 'লাঞ্ছিত যারা' উপন্যাস সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে বিপ্লবপূর্ব রুশ-সাহিত্যে একটি জীবনধারার বিকাশে। সেই হিসেবে বাঙলা অনুবাদ-সাহিত্যের ভাণ্ডারে এই উপন্যাসখানি অন্যতম সম্পদ হয়ে থাকবে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে, তা হলো সমগ্র উপন্যাসখানিতে চলচ্চিত্রের উপযোগী একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী।

সাড়ে চারশো পাতার এই বইটি এর বৈশিষ্ট্য সমান বজায় রেখেছে এর ছাপা এবং আঙ্গিক সজ্জায়। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি সুন্দর শিল্প-মনের পরিচয় দেয়। এই জাতীয় বই-এর মধ্যে এই বইটি দামের দিক থেকেও সস্তা হয়েছে বলা চলে। ১৮১।৫১

ছেলেদের গীতা—অধ্যাপক হরিপদ শাস্ত্রী, এম-এ প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার গীতার ক্রম-নির্দেশ নূতনভাবে করিয়াছেন। গীতা শাস্ত্র অধ্যয়নে বিদ্যার্থি-সমাজ ধারাটি অপেক্ষাকৃত সহজে ধরিতে পারিবে। ব্যাখ্যা-ভাষ্য ছেলেদের পক্ষে ঠিক যে উপযোগী হইয়াছে, একথা বলা যায় না। তত্ত্ব বিচার অতখানি না থাকিলেই পুস্তকখানি তরুণদের পক্ষে সমধিক উপযোগী হইত বলিয়া মনে হয়। ২৪।৫২

আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা—(পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতির নিকট খোলা চিঠি)—শ্রীজগদিন্দু বাগচী, ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির। ৭১নং শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।

লেখক শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষা বিধানের ক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। খোলা চিঠিতে তিনি শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে যে সব অভিমত উপস্থিত করিয়াছেন সেগুলি সবিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ২৮।৫২

শতদল—অধ্যাপক হরিপদ শাস্ত্রী, এম-এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। মূল্য—১৸৹ টাকা।

'সরল ভাষায় লিখিত ধর্মপুস্তক পাঠ করিলে বালক-বালিকাদের নমনীয় হৃদয়ে ধর্মভাব জাগিবে'—এই উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি গীত ও কবিতার আকারে লিখিত হইয়াছে। ভাষা সহজ হইলেও আধ্যাত্মিক দুরূহতত্ত্ব-বিচারে ভারাক্রান্ত। আত্মা, মন জড়দেহ, শব্দব্রহ্ম, সৃষ্টিতত্ত্ব এইসব বড় বড় বিষয়ের অবতারণা কিশোর-কিশোরীদের পক্ষে উপযোগী হইয়াছে বলা যায় না। শিশু সাহিত্যের ধারাটি অন্য রকম হওয়া উচিত ছিল। বস্তুতঃ সেকেলে পাণ্ডিত্য-রীতি বর্তমানে অচল। ২০।৫২

আকাশপথের যাত্রী—শ্রীসুষমা মিত্র প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১-১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ৪৸৹ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি তিন মাসে বিমানপথে ইউরোপ ও আমেরিকার ভ্রমণের কাহিনী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লেখিকা তাঁহার কন্যা-সহ স্বামীর সহিত বিশ্ব ভ্রমণে বাহির হন। এই গ্রন্থে লেখিকা যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ ও ডলারস্ফীত আমেরিকার যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তথ্যের দিক দিয়া যেমন মূল্যবান, ঘরোয়া বর্ণনাভঙ্গির জন্য তেমনি সুখপাঠ্য। লেখিকা তাঁহার নারীসুলভ দৃষ্টিতে সে-দেশের সাংসারিক জীবনের যে চিত্র এই গ্রন্থে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা সাম্প্রতিক প্রকাশিত অন্য কোন ভ্রমণ কাহিনীতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থখানি আগাগোড়া মসৃণ আর্ট পেপারে মুদ্রিত এবং প্রতি পৃষ্ঠায় ঘরোয়া-ভাবে তোলা বহু চিত্র থাকায় পাঠের আনন্দ অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বইখানি পাঠক-চিত্তকে শুরু হইতেই যেভাবে আকর্ষণ করে, এক নিশ্বাসে পাঠ শেষ না করিয়া উপায় নাই। ইহা ছাড়া সাম্প্রতিক ইউরোপ ও আমেরিকার বহু বিখ্যাত মনীষী, বিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিশারদ ও সমাজ সেবকের সহিত লেখিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বাঙলা দেশের পাঠক-পাঠিকাদের মনে ঔৎসুক্য জাগায়। গ্রন্থের মুদ্রণ যেমন প্রথম শ্রেণীর প্রচ্ছদসজ্জা ও তেমনই সুদৃশ্য। বাঙলার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই, বিশেষ করিয়া ভ্রমণ-অপারগ বাঙলার বধূরা তাঁহাদেরই একজনের এই বিশ্ব ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কাহিনী পড়িয়া গৌরববোধ করিবার অনেক কিছু পাইবেন। ১২।৫২

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময় প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

ধীরে বহে ডন—অনুবাদক শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্তী, প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৫্। ১।৫২

সাহিত্য সংগমে—শ্রীবিনায়ক সান্যাল, প্রকাশক—"শৈলশ্রী", ১।১।১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৫্। ২।৫২

কৃষ্ণচরিত্র—আর কে পাবলিশিং কোং, ১১এ, গোকুল মিত্র লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹। ৩।৫২

আনন্দমঠ—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১্। ৪।৫২

এরোপ্লেনের গল্প—শ্রীঅশোককুমার মিত্র। মূল্য ১৷৹। ৫।৫২

ছোটদের আবুহোসেন—শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। মূল্য ।৷৹ আনা। ৬।৫২

অতীতের ছায়া—শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার। মূল্য ১৷৹। ৭।৫২

ছবি-কথা—কাফী খাঁ। মূল্য ২্। ৮।৫২

সেরা গল্প—শ্রীমিহির সেন, ৪৪।১, শাঁখারী-টোলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।৹ আনা। ৯।৫২

শাশ্বত বঙ্গ—কাজী আব্দুল ওদুদ, ৮বি, তারক দত্ত রোড, কলিকাতা। মূল্য ৫।৹। ১০।৫২

শ্রীঅরবিন্দ—নীরদবরণ, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী। মূল্য ১্। ১১।৫২

আর এক দিন—শ্রীগোপাল হালদার, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪্। ১৭।৫২

বাঙলার ছেলেদের সমস্যা—শ্রীগোপীকৃষ্ণ ভৌমিক, সিরাটি, কলিকাতা। মূল্য ।৹ আনা। ১৯।৫২

আধুনিকী—শ্রীঅতুলচন্দ্র দাশ, ৪০, মিডল রোড, বারাকপুর। মূল্য ।৷৹ আনা। ২১।৫২

সহজ হিন্দী শিক্ষা—শ্রীঅমল সরকার, এস সি সরকার এণ্ড সন্স লিঃ, ১সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹। ২৫।৫২

ক্রিকেট

ভারত পঞ্চম বা শেষ ক্রিকেট টেস্ট খেলায় মাদ্রাজের চীপক মাঠে ইংলণ্ড দলকে শোচনীয়-ভাবে এক ইনিংস ও ৮ রানে পরাজিত করিয়া কেবল যে এইবারের টেস্ট পর্যায়ের সম্মান অক্ষুন্ন রাখিয়া ও কানপুরের চতুর্থ টেস্ট খেলায় আট উইকেটের পরাজয়ের কালিমা বিদূরিত করিয়াছে তাহা নহে, ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসেও এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। ভারত প্রথম ও সর্বপ্রথম টেস্ট বিজয়ের গৌরবে ভূষিত হইয়াছে। ১৯৩২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বৎসরের মধ্যে ভারত, ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি খ্যাতিমান ক্রিকেট দলের সহিত টেস্ট খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া হয় পরাজিত না হয় অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করিয়াছে। বিজয়ী হওয়া কখনই সম্ভব হয় নাই। ইহার ফলস্বরূপ সকলেরই মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ভারত কখনও টেস্ট খেলায় বিজয়ী হইবে না। কিন্তু মাদ্রাজের টেস্ট খেলায় অপূর্ব সাফল্যের পর শুধুই যে সেই হতাশাব্যাঞ্জক অবস্থার দূরীকরণ হইল তাহা নহে, সকলের প্রাণে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশারও সঞ্চার করিল। যে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়-গণ ইহা সম্ভব করিলেন তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইলেন, উপরন্তু তাঁহাদের নাম ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসেও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, প্রধান সেনাপতি জেনারেল কারিয়াপ্পা, বিভিন্ন রাজ্যের গভর্নর, মন্ত্রিগণ, এমনকি দেশের সহস্র সহস্র গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মহিলাগণের আশীর্বাণী ও শুভেচ্ছা ইতিমধ্যেই খেলোয়াড়গণের উপর বর্ষিত হইয়াছে, হওয়াও যুক্তিসঙ্গত। জনগণের মধ্য হইতেও লক্ষ লক্ষ শুভেচ্ছাসূচক পত্র ও তার প্রেরিত হইয়াছে। ইহার পর আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপনের কোন মূল্য থাকিতে পারে কি না সন্দেহ তাহা হইলেও আমরা আমাদের দেশের এই কৃতী সন্তানগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ইহারা ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে যে নূতন অধ্যায় রচনা করিলেন তাহার পুনরাবৃত্তি না হইলেও সমতুল্য কৃতিত্ব ইংলণ্ডের মাঠেও করুন ইহাও আমাদের আন্তরিক কামনা।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইতিপূর্বের টেস্ট খেলাতেই সাফল্যলাভ করা উচিত ছিল। কেবল আত্মবিশ্বাসের অভাবেরই জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই, ইহা বর্তমানে আমরা না বলিয়া পারি না। দিল্লীর প্রথম টেস্ট খেলায় ভারতের জয়লাভ ছিল একরূপ নিশ্চিত, কেবল আত্মবিশ্বাসের অভাবের জনাই তখন তাহা হয় নাই। কানপুরের টেস্ট খেলার যে পরাজয় তাহাও ঐ একই কারণে হইয়াছে। পঞ্চম টেস্ট খেলায় প্রথম হইতেই আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় ও শেষ পর্যন্ত তাহা বজায় থাকায় জয়লাভ সম্ভব হইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি, ইহার পর হইতে আর অভাব পরিলক্ষিত হইবে না।

মানকড়ের অপূর্ব কৃতিত্ব

ভারতীয় টেস্ট দলের চৌখস খেলোয়াড় বিনু মানকড় পঞ্চম টেস্ট খেলায় বোলিংয়ে যেরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তাহা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ

বোলারদের অনেকেরই ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই। ইঁহাকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেস্ট বোলার বলিয়া অভিহিত করিলেও কোনরূপ অন্যায় হইবে না। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে ইনি প্রথম ইনিংসে মাত্র ৫৫ রানে ৮টি উইকেট দখল করিয়া ইংলণ্ড দলের খেলোয়াড়গণের আত্মনির্ভরতার
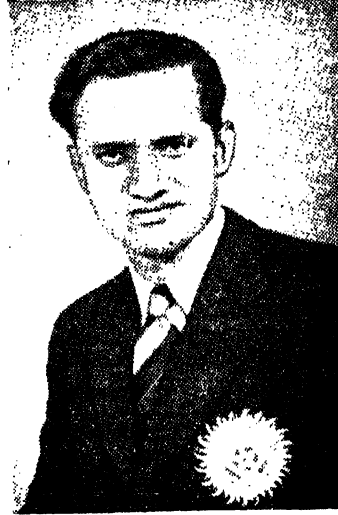
অধিনায়ক হাজারে

মূলে কুঠারাঘাত করার ফলেই ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে আর ব্যাটিংয়ে সুবিধা করিতে পারে না। তাঁহার ন্যায় গোলাম আমেদ বল করায় এইজন্যই দ্রুত উইকেট পতন আরম্ভ হয় ও মানকড় তাহা আরও দ্রুততর করিয়া তুলেন। মানকড় এই খেলায় মোট ১২টি উইকেট দখল করিয়াছেন। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় টেস্ট বোলারের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। এমনকি ইনি সমগ্র টেস্ট খেলায় মোট ৩৪টি উইকেট দখল করিয়াছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের টেস্ট খেলায় এক নূতন রেকর্ড বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পি সেনের উইকেট রক্ষকতা

বাঙলার তরুণ উইকেট রক্ষক পি সেন এই খেলায় একাই পাঁচ জনকে স্টাম্পড আউট করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রথম ইনিংসে ৪ জনকে স্টাম্পড আউট করিয়া ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে কেন বিশ্বের ক্রিকেট ইতিহাসেও বিস্ময়কর কৃতিত্ব হিসাবে লিখিত হইবার মত কার্য করিয়াছেন।

পি রায়ের ব্যাটিংয়ে নূতন রেকর্ড

বাঙলার অপর তরুণ খেলোয়াড় পি রায় পঞ্চম টেস্টে প্রথম খেলোয়াড় হিসাবে শতাধিক রান করিয়াছেন। ইতিপূর্বে বোম্বাইর প্রথম টেস্ট খেলাতেও শতাধিক রান করেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে মোট রান সংখ্যা রেকর্ড ছিল বিজয় হাজারের। পি রায় উহা অতিক্রম করিয়াছেন। ইনি এইবারের টেস্ট পর্যায়ের খেলায় ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলিয়া মোট ৩৮৭ রান করিয়াছেন। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ের পক্ষেই ইহা করা সম্ভব হয় নাই। বাঙলার এই তরুণ খেলোয়াড় ভারতীয় ক্রিকেট খেলায় যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন ইহা খুবই আনন্দের ও সুখের বিষয়। আমরা ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

পলি উমরিগারের ব্যাটিং

পলি উমরিগর বিভিন্ন টেস্ট খেলায় ব্যাটিংয়ে সুবিধা করিতে না পারায় ইহাকে পঞ্চম টেস্ট দল হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। হঠাৎ অধিকারী আহত হওয়ায় ও অধিনায়ক হাজারে জিদ করায় ইহাকে দলভুক্ত করা হয়। ইনি এই খেলায় ১৩০ রান করিয়া নট আউট থাকিয়া দলভুক্ত হইবার যে যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছেন ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। ইহার অপূর্ব ব্যাটিং দলের রান উঠায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে ইহাও উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। ইনি আগামী ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় দলে যে স্থান পাইবেন এই বিষয় আর কোনই সন্দেহ রহিল না।

খেলার বিবরণ

ইংলণ্ড দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করেন। ২৬৬ রান করিয়া প্রথম ইনিংস শেষ করেন। পরে ভারতীয় দল খেলা আরম্ভ করিয়া তৃতীয় দিনের চা-পানের পর ৯ উইকেটে ৪৫৭ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করেন। পরে ইংলণ্ড দল খেলা আরম্ভ করেন। চতুর্থ দিনের চা-পানের ২০ মিনিট পূর্বেই দ্বিতীয় ইনিংস ১৮৩ রানে শেষ করেন ও খেলায় ইনিংসে পরাজিত হন। পঞ্চম দিনব্যাপী খেলা চতুর্থ দিনেই শেষ হয়।

খেলার ফলাফল :

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস:—২৬৬ রান (স্পুনার ৬৬, গ্রেভনী ৩৯, রবার্টসন ৭৭, ডি কার ৪০, মানকড় ৫৮ রানে ৮টি, হাজারে ১৫ রানে ১টি, ফাদকার ৪৯ রানে ১টি উইকেট পান)।

ভারত প্রথম ইনিংস:—৯ উইঃ ৪৫৭ রান ডিক্লেয়ার্ড (পংকজ রায় ১১১, উমরিগার ১৩০ রান নট আউট, দাতু ফাদকার ৬১, অমরনাথ ৩১, গোপীনাথ ৩৫, বিনু মানকড় ২২, হাজারে ২০, মুস্তাক আলী ২২, ট্যাটারসল ৯৪ রানে ২টি, হিল্টন ১০০ রানে ২টি, কার ৮৪ রানে ২টি, ওয়াটকিন্স ৫০ রানে ১টি, স্ট্যাথাম ৫৪ রানে ১টি, রিজওয়ে ৪৭ রানে ১টি উইকেট পান)।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস:—১৮৩ রান (রবার্টসন ৫৬ ওয়াটকিন্স ৪৮, গ্রেভনী ২৫, হিল্টন ১৫, মানকড় [illegible] রানে ৪টি, গোলাম আমেদ ৭৭ রানে ৪টি, ফাদকার ১৭ রানে ১টি ডিভেচা ২১ রানে ১টি উইকেট পান)।

ইংলণ্ড ও ভারতের টেস্ট খেলার ফলাফল

১৯৩২ সাল:—লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড ভারতকে ১৫৮ রানে পরাজিত করে।

১৯৩৩-৩৪ সাল:—(১) বোম্বাইতে ইংলণ্ড ভারতকে ৯ উইকেটে পরাজিত করে।

(২) কলিকাতায় ইংলণ্ড ও ভারতের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

(৩) মাদ্রাজে ইংলণ্ড ভারতকে ২০২ রাণে পরাজিত করে।

মানকড়

পি সেন

১৯৩৬ সাল:—(১) লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড ভারতকে ৯ উইকেটে পরাজিত করে।

(২) ম্যাঞ্চেস্টার মাঠে ইংলণ্ড ও ভারতের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

(৩) ওভাল মাঠে ইংলণ্ড ভারতকে ৯ উইকেটে পরাজিত করে।

১৯৪৬ সাল:—(১) লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড ভারতকে ১০ উইকেটে পরাজিত করে।

(২) ম্যাঞ্চেস্টার মাঠে ইংলণ্ড ও ভারতের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

(৩) ওভাল মাঠে ইংলণ্ড ও ভারতের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

১৯৫১-৫২ সাল:—(১) দিল্লীর মাঠে ইংলণ্ড ও ভারতের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

(২) বোম্বাইর মাঠে ইংলণ্ড ও ভারতের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

(৩) কলিকাতার মাঠে ইংলণ্ড ও ভারতের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

(৪) কাণপুরের মাঠে ইংলণ্ড ভারতকে ৮ উইকেটে পরাজিত করে।

(৫) মাদ্রাজের মাঠে ভারত ইংলণ্ডকে এক ইনিংস ও ৮ রাণে পরাজিত করিয়াছে।

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার ফলাফল

১৯৪৭-৪৮ সাল:—(১) অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ২২৬ রাণে ভারতকে পরাজিত করে।

(২) অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

(৩) অস্ট্রেলিয়া ২২৩ রাণে ভারতকে পরাজিত করে।

(৪) অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১৬ রাণে ভারতকে পরাজিত করে।

(৫) অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১১৭ রাণে ভারতকে পরাজিত করে।

ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার ফলাফল

১৯৪৮-৪৯ সাল:—(১) ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলা অমীমাংসিত।

(২) ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলা অমীমাংসিত।

(৩) ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলা অমীমাংসিত।

(৪) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারতকে এক ইনিংস ১৯৩ রাণে পরাজিত করে।

(৫) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারতের খেলা অমীমাংসিত।

১৯৩২ সাল হইতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত
টেস্ট খেলার ফলাফল

	খেঃ	জঃ	পঃ	অমীমাংসিত
ভারত	২৫	১	১২	১২

টেবিল টেনিস

ভারতীয় টেবিল টেনিস ফেডারেশন পরিচালিত ঊনবিংশ বার্ষিক বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা বিশেষ সাফল্যের সহিত বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এশিয়ার দল হিসাবে ভারত প্রতিযোগিতায় বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিলেও জাপান সর্বপ্রথম যোগদানকারী দল হইয়া বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের বিভিন্ন বিভাগে পরাজিত করিয়া পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহা এশিয়াবাসীর গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

কর্বিলিয়ান কাপ প্রতিযোগিতা

মহিলাদের দলগত কর্বিলিয়ান কাপ প্রতিযোগিতার খেলায় জাপানের প্রতিনিধি নিশিমুরা ও নারাহারা বিভিন্ন খেলায় অপূর্ব ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়া সাফল্যলাভ করেন। ইহারা নিজেরাই বলিয়াছেন, "হাঙ্গেরীর মহিলা খেলোয়াড়দ্বয়কে পরাজিত করিতে আমাদের রীতিমত লড়িতে হইয়াছে।

কর্বিলিয়ান কাপের ফলাফল

দল	জঃ	পঃ	পয়েণ্ট
জাপান	১৮	৫	৬
রুমানিয়া	১৬	৯	৪
ইংলণ্ড	১৩	৯	৪
হাঙ্গেরী	১২	১০	৩
অস্ট্রিয়া	১২	১০	৩
হংকং	৫	১৪	১
ভারত	২	১৮	০
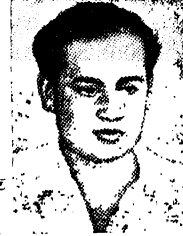
পি রায়

উমরিগর

কর্বিলিয়ান কাপ প্রতিযোগিতার শেষ নিষ্পত্তির খেলায় জাপান ৩—০ গেমে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। ফলাফল—

নারাহারা (জাপান) ২১-১৯, ২১-১৭ গেমে রোজালিণ্ড রোকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

নিশিমুরা (জাপান) ২১-১৪, ২১-১৭ গেমে ডায়না রোকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

নারাহারা ও নিশিমুরা (জাপান) ২১-১৪, ২১-৯ গেমে রোজালিণ্ড রো ও ডায়না রোকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

সোয়েথলিং কাপ প্রতিযোগিতা

এই প্রতিযোগিতা প্রথমে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লীগ প্রথায় পরিচালিত হয়। ইহাতে প্রথম বা "এ" গ্রুপে ইংলণ্ড প্রথম স্থান অধিকার করে। জাপান তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর দ্বিতীয় স্থান ও ভারত চতুর্থ স্থান লাভ করে। দ্বিতীয় বা 'বি' গ্রুপে হাঙ্গেরী প্রথম স্থান ও হংকং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ফলে ফাইনালে হাঙ্গেরীর সহিত ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা হয়। হাঙ্গেরী একরূপ সৌভাগ্য বলেই ৫-৪ খেলায় জয়লাভ করিয়া কাপ বিজয়ী হয়।
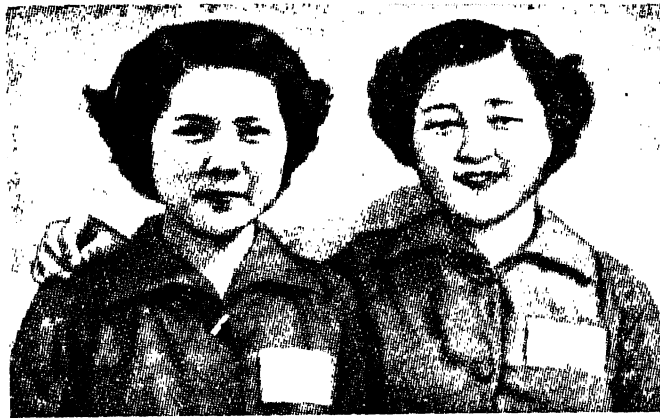
বিশ্ব টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপের কার্বিলিয়ান কাপ ও ডাবলস চ্যাম্পিয়ন জাপানী মহিলা খেলোয়াড়দ্বয় সিজুকা নারাহারা ও টোর্নিনিশিমুরা।

সোয়েথলিং কাপের তালিকা

'এ' গ্রুপ

দল	জঃ	পঃ	পয়েণ্ট
ইংলণ্ড	৩৫	৬	৭
জাপান	৩২	৭	৬
ফ্রান্স	২৯	১২	৫
ভারত	২৩	২৩	৪
জার্মানী	২০	২৪	৩
পর্তুগাল	১২	২৬	২
কাম্বোডিয়া	৮	৩২	১
পাকিস্থান	৬	৩৫	০

'বি' গ্রুপ

দল	জঃ	পঃ	পয়েণ্ট
হাঙ্গেরী	৩০	৪	৬
হংকং	২৭	৭	৫
ভিয়েৎনাম	২২	১২	৪
ব্রেজিল	১৮	১৭	৩
সিঙ্গাপুর	১২	২১	২
চিলি	৭	২৬	১
আফগানিস্থান	১	৩০	০

ফাইন্যাল খেলার ফলাফল

ফাইন্যাল খেলায় হাঙ্গেরী ৫-৪ গেমে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। ফলাফল প্রদত্ত হইল—

জনী লীচ (ইংলণ্ড) ৮-২১, ২১-১৪, ২১-১৫ গেমে কালমেন জেপেসীকে (হাঙ্গেরী) পরাজিত করেন।

জোসেফ কোজিয়ান (হাঙ্গেরী) ২১-৭, ২১-১৬ গেমে এ সাইমনসকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

রিচার্ড বার্জম্যান (ইংলণ্ড) ২১-১৬, ২১-১৭ গেমে এফ সিডোকে (হাঙ্গেরী) পরাজিত করেন।

জোসেফ কোর্জিয়ান (হাঙ্গেরী) ২১-১৪, ২১-১৫ গেমে জনী লীচকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

রিচার্ড বার্জম্যান (ইংলণ্ড) ২১-১৩, ২১-৬ গেমে কালমেন জেপেসীকে (হাঙ্গেরী) পরাজিত করেন।

এফ সিডো (ওয়াক ওভার) সাইমনস (ইংলণ্ড) (স্ক্র্যাচ)।

রিচার্ড বার্জম্যান (ইংলণ্ড) ২১-১২, ২১-১৯ গেমে কোজিয়ানকে (হাঙ্গেরী) পরাজিত করেন।

এফ সিডো (হাঙ্গেরী) ২১-১১, ২১-১৭ গেমে জনী লীচকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

কালিমেন জেপেসী (হাঙ্গেরী) ২৩-২১, ৮-২১, ২১-১৬ গেমে সাইমনসকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

জাপানের সাফল্য

জাপানের ২৭ বৎসর বয়স্ক ঘড়ি নির্মাতা হিরাজী স্যাটো পুরুষদের সিঙ্গলসের খেলায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইনি এশিয়াবাসী হিসাবে সর্বপ্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হইলেন। আরও উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রতিযোগিতার কোন একটি খেলাতেই ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইহার নিকট হইতে একটিও গেম ছিনাইয়া লইতে পারেন নাই। মহিলা বিভাগের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন রুমানিয়ার ৩০ বৎসর বয়স্কা মহিলা সাংবাদিক মিসেস এঞ্জেলিকা রোসিনু। ইনি এইবার লইয়া উপর্যুপরি তৃতীয় বার সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হইলেন। মহিলা বিভাগের ডাবলস চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন জাপানের কার্বিলিয়ান কাপ বিজয়ী মিস নারাহারা ও নিশিমুরা। ইহাদের পুনরায় ফাইন্যালে গত বৎসরের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান ইংলণ্ডের রো ভগিনীদ্বয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়। পূর্বের অভিজ্ঞতার জন্য দেখা যায়, ইহারা স্ট্রেটে প্রতিদ্বন্দ্বী যমজ ভগ্নীদ্বয়কে পরাজিত করিয়াছেন।

জাপানের দুইজন তরুণ খেলোয়াড় ফুজি ও হায়াসী ফাইন্যালে জনী লীচ ও বার্জম্যানকে পরাজিত করিয়া ডাবলসের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করিয়াছেন।

মিক্সড ডাবলসের খেলায় রুমানিয়ার কৃতী মহিলা খেলোয়াড় মিসেস রোসিনু হাঙ্গেরীর সিডোর সহযোগিতায় ইংলণ্ডের জনী লীচ ও মিস ডায়না রোকে পরাজিত করিয়াছেন। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইল—

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

হিরাজী স্যাটো (জাপান) ২১-১৯, ২১-১৭, ২১-১৪ গেমে কোজিয়ানকে (হাঙ্গেরী) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

মিসেস এঞ্জেলিকা রোসিনু (রুমানিয়া) ২১-১৭, ১১-২১, ২১-১৮, ১৭-২১ ২১-১৪ গেমে গিজি ফারকাসকে (হাঙ্গেরী) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল

ফুজী ও হায়াসী (জাপান) ১২-২১, ৯-২১,

বিশ্ব টেবিল টেনিসের ভূতপূর্ব ডাবলস চ্যাম্পিয়ান ইংলণ্ডের যমজ ভগ্নীদ্বয় রোজালিণ্ড রো ও ডায়না রো।

২১-১৮, ২১-১৭, ২১-১২ গেমে জনী লীচ ও আর বার্জম্যানকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইন্যাল

টোনি নিশিমুরা ও নারাহারা (জাপান) ২১-১১, ২১-৭, ২২-২০ গেমে রোজলিণ্ড রো ও ডায়না রোকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল

এফ সিডো (হাঙ্গেরী) ও মিসেস এঞ্জেলিকা রোসিনু (রুমানিয়া) ২১-১৯, ২১-১৩, ২১-১৮ গেমে জনী লীচ ও ডায়না রোকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

ভারতীয় টেবিল টেনিসের সৌভাগ্য

আন্তর্জাতিক টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সাধারণ সভায় বিভিন্ন দেশের খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড বিবেচনা করিয়া সোয়েথলিং কাপ ও কর্বিলিয়ান কাপ প্রতিযোগিতার ক্রমপর্যায় তালিকা গঠিত হইয়াছে। ভারতের পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, সোয়েথলিং ও কর্বিলিয়ান কাপের উভয় বিভাগেই প্রথম শ্রেণীর দলের মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। ইহার পর অদূর ভবিষ্যতে ভারত এই স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে খুব আনন্দের বিষয় হইবে। নিম্নে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ক্রমপর্যায় তালিকা প্রদত্ত হইল—

সোয়েথলিং কাপ

প্রথম শ্রেণীর দল—(১) হাঙ্গেরী, (২) ইংলণ্ড, (৩) চেকোশ্লোভাকিয়া, (৪) জাপান, (৫) ফ্রান্স, (৬) হংকং, (৭) যুগোশ্লাভ, (৮) আমেরিকা, (৯) ভিয়েৎনাম (দক্ষিণ), (১০) [অস্ট্রিয়া, ব্রেজিল, জার্মানী, ভারত, পর্তুগাল ও সুইডেনকে একত্রে রাখা হইয়াছে।]

দ্বিতীয় শ্রেণীর দল—(১) বেলজিয়াম, (২) কাম্বোডিয়া, (৩) চিলি, (৪) মিশর, (৫) কোরিয়া (দক্ষিণ), (৬) নেদারল্যাণ্ডস, (৭) সিঙ্গাপুর, (৮) সুইজারল্যাণ্ড।

কর্বিলিয়ান কাপ

প্রথম শ্রেণীর দল—(১) জাপান, (২) রুমানিয়া, (৩) ইংলণ্ড, (৪) অস্ট্রিয়া, (৫) হাঙ্গেরী, (৬) আমেরিকা, (৭) স্কটল্যাণ্ড, (৮) ওয়েলস, (৯) চেকোশ্লোভাকিয়া, (১০) হংকং ও ভারত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দল—(১) অস্ট্রেলিয়া, (২) বেলজিয়াম, (৩) মিশর, (৪) ফ্রান্স, (৫) জার্মানী, (৬) যুগোশ্লাভিয়া।

ভারতীয় ক্রমপর্যায় তালিকা

ভারতীয় টেবিল টেনিস ফেডারেশন খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে ঐ তালিকা প্রদত্ত হইল—

পুরুষ বিভাগ

(১) টি তিরুভেঙ্গদম, (২) কল্যাণ জয়ন্ত, (৩) রণবীর ভাণ্ডারী, (৪) ভি শিবরামণ, (৫) টি হরিহর শাস্ত্রী, (৬) ইউ এম চন্দ্রাণা।

[জয়ন্ত দে, ডি পি সম্পৎ, এম ভি এস ভিঠল ও যতীন্দ্র ভায়াসের উপযুক্ত ফলাফল না থাকায় তালিকাভুক্ত করা হয় নাই।]

মহিলা বিভাগ

(১) সৈয়দ সুলতানা, (২) মিসেস গুল নাসিকওয়ালা, (৩) মিসেস বিজয় রাজাগোপালন, (৪) এলিদ বোকারো, (৫) রুবি তারাওয়ালা, (৬) মিসেস চমন কাপুর, (৭) মিসেস সি কে পিলাই।

[মিস রুক্মিণীর উপযুক্ত ফলাফল না থাকায় তালিকাভুক্ত করা হয় নাই।]

চলচ্চিত্র মেলা সম্পর্কে

আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলার অনুষ্ঠান এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়, সপ্তাহে হবার কথা ছিলো দিল্লীতে। কিন্তু ষষ্ঠ জর্জের পরলোকগমন হেতু দিল্লীর অনুষ্ঠান এক সপ্তাহ আগিয়ে দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে কলকাতার অনুষ্ঠানও বাধ্য হয় এক সপ্তাহ পিছিয়ে যেতে। এখন কলকাতার মেলাটি বসবে ২৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে।

চলচ্চিত্র মেলা প্রথমে আরম্ভ হয় বোম্বেতে ২৪শে জানুয়ারী। মেলাতে বাইরেকার বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে যোগদান বিষয়ে উদ্যোক্তাদের যে ন্যূনতম আশা ছিলো তা ছাপিয়ে অনেক বেশীই যোগদান করেছে। সবশুদ্ধ চব্বিশটি দেশ যোগদান করেছে ছবি পাঠিয়ে। তার মধ্যে চলচ্চিত্র নির্মাণে খ্যাত রাষ্ট্রগুলির সকলেই আছে। তাছাড়া, রাশিয়া, চীন, মিশর, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি কতকগুলি দেশ তাদের প্রতিনিধি দলও পাঠিয়েছেন। নানা দেশ থেকে মোট ৪৩ খানি পূর্ণ দৈর্ঘ্য এবং ৮০ খানি ছোট, প্রামাণ্য ও শিক্ষামূলক ছবি মেলাতে জড়ো হয়েছে। কিন্তু মেলার আয়োজন মোটেই সন্তোষজনক হয়নি। বম্বেতে উৎসব তো রীতিমতো কেলেঙ্কারীতে পর্যবসিত হয়ে দাঁড়ায়। মেলার সরকারী উদ্যোক্তারা চলেছেন এক-

দিকে আর চলচ্চিত্রশিল্পের উদ্যোগ মোড় নিয়েছে আর এক মুখো হয়ে, কাজেই সংঘর্ষ অনিবার্য; হয়েছেও সেই কেলেঙ্কারী। বম্বের উৎসব শুদ্ধু ব্যর্থই হয়নি, বিদেশী-দের মধ্যে খুবই খারাপ ছাপ ধরিয়ে দিয়েছে। মান বাঁচাবার জন্যে এখন সুযোগ রয়েছে কেবল দিল্লী এবং তারপর কলকাতার অনুষ্ঠান।
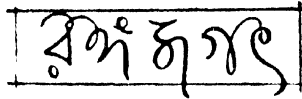
দিল্লীতে আর যাই হোক, বিদেশী অভ্যাগতদের সরকারী তরফ থেকে আপ্যায়নের কোন ত্রুটিই হবে না বরং যে আতিথেয়তার জন্য ভারতের খ্যাতি রয়েছে দেশে ফিরে যাবার আগে বিদেশীরা যাতে সেই খ্যাতি দেখে যেতে পারে সেদিক থেকে বিরাটভাবেই আয়োজন করা হচ্ছে। রাজধানী দিল্লীর খাতির পেয়ে বিদেশীরা হয়তো আগেকার ছাপ মুছে ফেলতে পারবে। কিন্তু তারপরই আবার কলকাতা নিয়ে হচ্ছে কথা।

এখানেও সরকারী মহল এবং চলচ্চিত্র-শিল্পের উদ্যোগের মধ্যে কোন সংযোগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারী উদ্যোক্তারা এখানে ঐ ৪৩ খানি পূর্ণ দৈর্ঘ্য এবং ৮০ খানি ছোট ছবি দেখাবার জন্যে এ পর্যন্ত নয়টি চিত্রগৃহ ঠিক করেছে। এ ছাড়া ওদের উদ্যোগে আর কোন সূচীর কথা চেষ্টা করেও জানতে পারা যায়নি। চলচ্চিত্র শিল্পের তরফ থেকে বি-এম-পি-এ এই উপলক্ষে, মুখ্যত বিদেশী প্রতিনিধিদের উদ্দেশে এবং সেইসঙ্গে এদেশের লোকের মধ্যেও চলচ্চিত্রের ওপর একটা টান এনে দেবার জন্যে, একটি শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। চলচ্চিত্র বিষয়ক তথ্যাদি, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ছাড়া, চলচ্চিত্র শিল্পীদের গান এবং যাত্রা, থিয়েটার, পুতুলনাচ প্রভৃতি হবে এই প্রদর্শনীর আকর্ষণ। এই প্রদর্শনী এবং ছবির মেলা যদি কেবলমাত্র বিদেশী প্রতি-নিধিদলের জন্যেই হতো তাহলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু আসলে হচ্ছে এসবের অনুষ্ঠান দেশের লোকের জন্যেই। অথচ এমনি ব্যবস্থা যে দেশের কোন উৎসাহী লোকের পক্ষেই মেলায় বা প্রদর্শনীতে পূর্ণ-মাত্রায় যোগদান করা অসম্ভব।

ছবির জন্যে নির্বাচিত চিত্রগৃহগুলিতে প্রতিদিন তিনটি করে প্রদর্শনী, কাজেই সব কাজকর্ম থেকে ছুটি নিয়ে বিশেষ চেষ্টা করলে একজন উৎসাহী তিনখানি মাত্র ছবি দেখতে পাবেন। ছবির মেলা সাতদিন থাকবে বলে স্থির হয়েছে, অর্থাৎ কারুর পক্ষেই ঐ সময়ের মধ্যে ২১—২৭ খানির বেশী ছবি দেখে ওঠা সম্ভব হতেই পারে না। যতো উৎসাহীই হোন না কেন, কোন

র্শকের পক্ষেই মেলায় দেখানো অর্ধেকের বশী ছবি দেখানো সম্ভব হবে না। এরপর য়েছে ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনী, প্রতিনিধি দের ইতস্ততঃ বক্তৃতা ইত্যাদি। উদ্যোক্তারা রে এক সপ্তাহের মধ্যে কি করে যে সব মলে উঠবেন সেটাও ভাববার বিষয়। তাই াশঙ্কা হয়, এখানকার ব্যাপারও বম্বের তো কেলেঙ্কারীতে না দাঁড়িয়ে যায়।

আওয়ারা—(আর কে ফিল্মস)—কাহিনীঃ খাজা আহ্‌মদ আব্বাস ও ভি পি সাথে; পরিচালনাঃ রাজ কাপুর; আলোকচিত্রঃ রাধেশ কর্মকার; সুরযোজনাঃ শঙ্কর ও জয়কিষণ; ভূমিকায়ঃ রাজ কাপুর, পৃথ্বীরাজ, কে এন সিং, নার্গিস, লীলা চীৎনীশ প্রভৃতি।
সিলেক্ট পিকচার্সের পরিবেশনে ছবিখানি ২৫শে জানুয়ারী মুক্তিলাভ করেছে।

বম্বের হিন্দী ছবির বিষয়ে আলোচনা করার অবকাশ আমরা বিশেষ পাই না। এর কারণের খানিকটা হচ্ছে স্থানাভাব, আর খানিকটা হচ্ছে হিন্দী ছবি দেখবার মত আক্কেলের স্তিমীততা। বম্বের ছবি দর্শকে দেখিয়েছে অনেক কিছুই কিন্তু তার তুলনায় যে ক্ষতি করেছে তার ের অনেক বেশী।। —বম্বের ছবির মুখ্য কৃতি হচ্ছে দেশের শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে লাঞ্ছিত করে কোথাকার কি যে এক আবহাওয়া এনে হাজির করে যা, না বিলাতির সার্থক অনুকরণ, আর না দিশী জীবন ও মনে বরদাস্ত করে নেবার যোগ্য। বিদেশের নানা জায়গা থেকে সম্প্রতি যে সব সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি চলচ্চিত্র মেলা উপলক্ষ্যে এদেশে এসে পেশছেছেন, এদেশের ছবি সম্পর্কে তারা খুব তারিফ করার মতো কথা কিছু বলতে পারছেন না। এদেশের ভালো ছবি বলতে তাদের নিয়ে গিয়ে দেখানো হচ্ছে কলাকৌশলের দিক থেকে প্রশংসনীয় অবদানগুলিকে। কলা-কৌশলে এখন বম্বের ছবি পৃথিবীর স্ট্যান্ডার্ডে দাঁড়াতে পারার মতো কৃতিত্ব অর্জন করেছে। সুতরাং বিদেশীরা দেখছেন সেইসব বম্বাই ছবি। আর দেখে তারা আক্ষেপ করছেন এই বলে যে ও ছবিগুলিতে তারা এদেশকে খুঁজে পাচ্ছেন না। এ মন্তব্য তারা আলোচ্য 'আওয়ারা' ছবিখানি সম্পর্কেও করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'আওয়ারা' এমন সব উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে যে জন্যে ছবিখানি সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের গৌরব বরং বাড়িয়েই দিয়েছে বলা যেতে পারে।

'আওয়ারা'র বিদেশী পরিবেশটা হচ্ছে ওর সাজ-আসবাবের দিক থেকে, কিন্তু ওর বিষয়বস্তুর আবেদনটা এমন সর্বজনীন যে, এবং সেই আবেদনকে তোলা হয়েছে সর্ব-বিষয়ে উৎকর্ষের এমন চরম কৃতিত্বের সঙ্গে যে, বিদেশীয়ানাটাই বড় কথা হয়ে দাঁড়ায় না; নাটকীয় বক্তব্য বেশ তেজের সঙ্গে এবং স্পষ্টভাবেই মনের ওপরে ভর করে।

কাহিনীর প্রেরণাই 'আওয়ারা'কে অনন্য-সাধারণ হয়ে ওঠায় সহায়তা দান করেছে। পৃথিবীর একটা মস্ত বড়ো সমস্যার কথা সামনে তুলে ধরা হয়েছে এতে।—অপরাধী বংশানুক্রমেই হয়ে আসে কিনা, আর, এক-বার অপরাধ করে বসলে সেই কলঙ্কের জন্যে আজীবনই কি তাকে সমাজের কাছে পরি-ত্যাজ্য হয়ে থাকতে হবে? এখানে অবশ্য এই দুই বিচারকেই খণ্ডন করা হয়েছে। এখানে এক সরকারী উকিলের ছেলেকে অপরাধীরূপে দেখতে পাওয়া যায়। সৎ-

ভাবে সে জীবনযাপন করতে চাইলেও সমাজ তাকে বার বার বিতাড়িত করলেও পরিশিষ্টে সমাজের উচ্চতম কোঠাতেই সে স্থান পেয়ে যায়।

গল্প হচ্ছে রাজকে নিয়ে। রাজ সরকারী উকীলের ছেলে হলেও তার জন্ম হয় বস্তীতে। কারণ, তার পিতা রঘুনাথ তার মাকে তখন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো এই কারণে যে, সে ডাকাত কর্তৃক অপহৃতা হয়েছিলো। অপহরণ করেছিলো জগ্গু ডাকাত-রঘুনাথের ওপরে প্রতিশোধ নেবার জন্যে। কারণ তার কোন অপরাধ না থাকলেও রঘুনাথ তাকে শাস্তি পাইয়ে দিয়েছিলো এই অপরাধে যে, সে এক অপরাধীর সন্তান বলে। জগ্গু রঘুনাথের স্ত্রী লীলাকে অন্তঃসত্ত্বা দেখে ছেড়ে দেয়। রঘুনাথ লীলাকে গ্রহণ করে কিন্তু পরিজন ও প্রতিবেশীর বাক্যবাণ তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে এবং সে লীলাকে তাড়িয়ে দেয়। বস্তীতে আশ্রয় নিয়ে লীলার কোলে জন্মায় রাজ। লীলা রাজকে মানুষ করে তুলতে থাকে, তার আশা রাজ তার বাপের মতোই উকীল হবে। রাজের কাছে তার বাপের পরিচয় অজ্ঞাত রইলো। দারিদ্র্যের কষ্ট রাজকেও ব্যাকুল করে তোলে। স্কুলে তার সঙ্গী জজসাহেবের মেয়ে রীতা। দুজনের মধ্যে তখন থেকেই অচ্ছেদ্য ভালোবাসা। কিন্তু রাজকে স্কুল ছাড়তে হলো কারণ সে তার মায়ের কষ্ট লাঘব করার জন্য জুতো পালিস করে পয়সা উপার্জনে ব্রতী হয়েছিলো বলে। রাজেদের দুরবস্থার সুযোগ নিলে জগ্গু ডাকাত। ঐ দুর্বল মুহূর্তে সে রাজেদের সাহায্য করে রাজকে দুর্বৃত্ত করে গড়ে তুললে। দেখতে দেখতে রাজ পাকা শয়তান হয়ে বড়ো হলো। একদিন ডাকাতিতে বেরিয়ে আকস্মিকভাবে সে রীতার সন্ধান পেয়ে গেলো। আবার ফিরে এলো ওদের মধ্যে, শিশু বয়সের সেই আকর্ষণ এবং প্রেম। রাজ শয়তানী ছেড়ে সৎভাবে জীবনযাপনের চেষ্টা করলে কিন্তু দাগী আসামী জেনে তাকে কেউই আর কাজ দিতে চাইলে না। রীতার বাবা মৃত্যুর ... তাকে রঘুনাথের হেপাজতে রেখে দিয়ে যায়। রঘুনাথ রাজের সঙ্গে রীতার প্রণয় মঞ্জুর করলেন না। এই সময় একদিন জগ্গু পুলিসের তাড়া খেয়ে রাজেদের ঘরে এসে লুকোবার চেষ্টা করে। লীলা তাকে চিনতে পেরে পুলিসে ধরিয়ে দিতে যায়। জগ্গু লীলাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন এসে উপস্থিত হয় রাজ। দুজনের মারামারিতে জগ্গু নিহত হয়, রাজ খুনের দায়ে ধরা পড়ে। রীতা রাজকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে গিয়ে রাজের আসল পরিচয় আবিষ্কার করে। রঘুনাথ প্রথমে রাজকে তার সন্তান বলে অস্বীকার করে, কিন্তু শেষে স্বীকার করে। আত্মরক্ষার জন্যে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে এই অপরাধে রাজের তিন বছরের জেল হয়। রীতা তার পথ চেয়ে অপেক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

ছবিখানি আরম্ভ হতেই এমন একটা ... দেয় যা আমাদের দেশের ছবির ... সম্পূর্ণ বিরল। কাহিনীর বিন্যাসে রা... কাপুর যে নাটকীয় কল্পনাশক্তির প... দিয়েছেন তা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচালক... পাশে তাকে দাঁড় করিয়ে দেবে। তার ... কল্পনাকে মূর্ত করে নাটকীয় তেজে আ... মহিমান্বিত করে তুলেছেন আলোকা... রাধেশ কর্মকার। কেবলমাত্র আমাদের দে... নয়, আলোকচিত্রের যাদুকরী ক্ষ... ফুটিয়ে তুলতে কর্মকার যে কৃ... দেখিয়েছেন তা পৃথিবীর যে কোন দে...

শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের সঙ্গেই তুলনীয়। রাজের জীবনস্বপ্নকে মূর্ত করে তোলার জন্যে, তার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার গতিপ্রগতির আভাস দেবার জন্যে একটি নৃত্য দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। ম্যাদাম সিমকীর পরিকল্পনায় এবং কর্মকারের আলোকচিত্রগ্রহণে নৃত্যাংশটি আমাদের দেশের ছবিতে এক অভূতপূর্ব সৃষ্টি।

'আওয়ারা'তে কথা অল্প, দেখবার অংশই বেশী। এবং দৃশ্য রচনায় নাট্যপ্রতিভা ও শিল্পশক্তির এমন গভীর ছাপ পাওয়া যায় যে, গোড়া থেকেই ছাবিখানি মনকে নিবিড় করে ধরে রেখে দেয়। প্রায় তিন ঘণ্টার ছবি, কিন্তু সামান্যও ক্লান্তি আসে না; বুঝতেই পারা যায় না কোথা দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে এমনিই গতি এনে দেওয়া হয়েছে। সংগীতেও শঙ্কর জয়কিষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। পুরো দিশী সংগীত নয়, দিশী বিদেশী মিশানো কিন্তু প্রচণ্ড আবেশের সৃষ্টি করে; গান ক'খানি দেখবার পরও মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

অভিনয়ে একটি নূতন স্ট্যাণ্ডার্ড দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে বলা যেতে পারে। রাজের ভূমিকায় রাজ কাপুরই যদিও সবচেয়ে বেশী প্রশংসা অর্জন করে নেন, কিন্তু তাহলেও পৃথ্বিরাজ, কি নরগীস, কি লীলা চিৎনীশ, কে এন সিং কারুরই কথা বাদ দেবার নয়।

'আওয়ারা' সর্বদিক থেকেই ভারতীয় ছবির নতুন মান নির্ণয় করে দিয়েছে। এতো বিরাট কৃতিত্বের মধ্যে বিদেশী পরিবেশটা মনে অবশ্যই আক্ষেপের সৃষ্টি করে কিন্তু ছবিখানিকে এক অনিন্দ্যসুন্দর কৃতিত্ব বলে স্বীকার করে নিতে মনে দ্বিধা লাগে না।

মেঘমুক্তি—(করুণাময়ী পিকচার্স—ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিও)—কাহিনী: গিরিজা সাধু; পরিচালনা: চিত্ত বসু; আলোকচিত্র: বিভূতি লাহা; শব্দযোজনা: যতীন দত্ত; সুরযোজনা: উমাপতি শীল; শিল্পনির্দেশ: তারক বসু; ভূমিকায়: অসিতবরণ, বিকাশ রায়, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, সন্ধ্যারাণী, রেণুকা রায়, মনোরমা, রাণীবালা প্রভৃতি। প্রাইমা ফিল্মসের পরিবেশনে গত ১লা ফেব্রুয়ারী রূপবাণী, অরুণা ও ভারতীতে মুক্তিলাভ করেছে।

চেহারায় শ্রী তেমন ফুটে উঠুক আর না উঠুক, ছবির গল্প সুস্থ ও সংযত হলে ছবিরও স্বাস্থ্য ফুটে ওঠে। 'মেঘমুক্তি'-কে এর উদাহরণ বলে ধরা যেতে পারে। এমনিতে, বিন্যাসে দৃশ্যসজ্জাদি ব্যাপারে বা কলাকৌশলেও শ্রী বলতে কিছু নেই, কিন্তু একটি বেশ রসসমন্বিত পরিপুষ্ট গল্প থাকায় ছবিখানি উপভোগ করার মতো হতে পেরেছে।

ট্রেন দুর্ঘটনায় মিত্রা জ্ঞানহারা হয়ে খানায় পড়ে যায়। তাকে তুলে নিয়ে আসে হিমাদ্রি, জগদীশপুরের যুবক স্টেশন মাস্টার। হিমাদ্রির হিতৈষী ডাক্তারবাবুর চিকিৎসায় মিত্রা শারীরিক সুস্থ হলো, কিন্তু স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছিলো। ডাক্তার তাকে ও অবস্থায় কোথাও ছেড়ে দিতে রাজী হলো না। মিত্রার সঙ্গে বিয়ের কথা ছিলো অনিমেষের। অনিমেষ মিত্রার সন্ধানে কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে, হিমাদ্রীর হাতে সে বিজ্ঞাপন পড়লো কিন্তু, তবুও ডাক্তার রাজী হলো না মিত্রাকে ছেড়ে দিতে। ডাক্তার হিমাদ্রীকেই মিত্রার পরিচর্যায় নিয়োগ করলে। বিঘোর অবস্থায় মিত্রা হিমাদ্রীর প্রতি আসক্তা হয়ে উঠলো, হিমাদ্রীও মিত্রাকে ভালবাসলে; ডাক্তারের প্ররোচনায় ওদের দিয়ে হলো। তারপর একদিন তেমনি বিঘোর অবস্থায় ট্রেনের বাঁশীর শব্দে উতলা হয়ে মিত্রা হিমাদ্রীকে ছেড়ে কলকাতায় পেঁছিলো। কলকাতায় ঐভাবে রাস্তায় চলতে সে এক মোটর দুর্ঘটনায় পড়লো। এই দুর্ঘটনায় মিত্রা তার পূর্বস্মৃতি ফিরে পেলে। সোজা গিয়ে উঠলো সে অনিমেষের কাছে। অনিমেষ তাকে পেয়ে চমকিত হলো কিন্তু মর্মাহত হলো শিপ্রা অন্তস্বত্বা জেনে। অনিমেষ মিত্রাকে ভালবাসতো, এ ব্যাপারে সে পাগল হয়ে গেলো এবং তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে নিলে। মিত্রা তার জ্ঞান ফিরে পেলে কিন্তু হিমাদ্রীর সঙ্গে তার জীবনের অধ্যায়টি ভুলে গেলো একেবারে। হিমাদ্রীর তখন চাকরী গিয়েছে। সেবা সঙ্ঘের কাজে সে আত্মনিয়োগ করলে। সেবাব্রত নিয়ে গ্রামে গ্রামে বহু বছর ঘোরবার পর একদিন সে মিত্রার খোঁজ পেলে, কিন্তু মিত্রা তাকে চিনতে পারলে না। পরিচিত পরিবেশের মধ্যে পড়লে যদি স্মৃতি ফিরে আসে এই আশায় মিত্রাকে জগদীশপুরে নিয়ে যাওয়া হলো। আস্তে আস্তে মিত্রার স্মৃতির ওপর থেকে মেঘ কেটে গেলো, হিমাদ্রীকে সে চিনতে পারলে।

বিন্যাসে ত্রুটি রয়েছে যথেষ্টই। কিন্তু একথাটা স্বীকার করতে হবে যে, ট্রেন দুর্ঘটনায় স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়া তারপর মোটর দুর্ঘটনায় হঠাৎ আগেকার স্মৃতি ফিরে পেয়ে মাঝের ক'মাসের কথা স্মৃতিতে মুছে যাওয়ার মতো অস্বাভাবিক ব্যাপারও হাস্যকর হয়ে ওঠেনি। কলাকৌশলের দিকটা যথেষ্টই নিস্তেজ; এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে পিছনের আঁকা পটও ধরা পড়ে যায়। কাহিনীর বৈচিত্র্য এবং অভিনয়ের জোরই ছবিখানিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মিত্রাকে কুড়িয়ে নিয়ে আশা এবং ধীরে ধীরে হিমাদ্রীর ওপরে তার ভালোবাসার অধ্যায়টি সন্ধ্যারাণী ও অসিতবরণের অভিনয়ে ভালো জমেছে। এদের মধ্যে জহর গাঙ্গুলী তার অভিনীত দয়াবান ডাক্তারের চরিত্রটিকে একেবারে দুর্বৃত্তের মতো রূপ দিয়ে ফেলেছেন। অনিমেষ চরিত্রটিকে গল্পেতে বেশী করে দেখানো হয়েছে মনে হওয়া অনুচিত হয়, তবে ব্যর্থ প্রেমিকের ভূমিকাভিনয়ে বিকাশ রায় চরিত্রটির ওপরে লোকের সহানুভূতি টেনে ধরেন বলে মানিয়ে যায়। এক সেবিকা নারীর ভূমিকায় রেণুকা রায়ও ভিন্ন প্রকৃতির চরিত্রাভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবিতে হাল্কা রসের দিকটাতে সেবা সঙ্ঘের স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায় শ্যাম লাহা বেশ খানিকটা হাসির সুযোগ এনে দিয়েছেন। ওদিক থেকে স্টেশনের পশ্চিমা পয়েণ্টম্যান ও তার স্ত্রীর ভূমিকায় যথাক্রমে তুলসী চক্রবর্তী ও মনোরমাকেও উল্লেখ করা যায়।

সংগীতের দিক থেকে মৌলিকত্ব কিছু নেই, তবে অসিতবরণের দুখানি গান গাওয়ার গুণে ভালো লাগে। বাংলার এখন একমাত্র গায়ক অভিনেতা অসিতবরণ অভিনয় এবং গানে দু'দিক থেকেই এ ছবিখানিতে অনেক ছবির পর আবার লোকের মনে তার আসন করে নিতে পেরেছেন।

দেশী সংবাদ

৫ই ফেব্রুয়ারী—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অদ্য বর্তমান সংসদের পঞ্চম ও শেষ অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার উদ্বোধন ভাষণে বলেন, যে সকল বিতর্কমূলক বিষয় নূতন সংসদের জন্য মূলতুবী রাখা যাইতে পারে, গবর্নমেণ্ট সেগুলি উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক নহেন।

অদ্য আরও দুইজন মন্ত্রী পরাজিত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে এযাবৎ মোট ৬জন মন্ত্রী পরাজিত হইলেন। পূর্ত ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ বিষ্ণুপুরে স্থানীয় কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়ের নিকট ৫৭৭৪ ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। চুঁচুড়ায় (হুগলী) সেচমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের নিকট ৮২০ ভোটে পরাজিত হইয়াছেন।

কলিকাতার উত্তরপশ্চিম কেন্দ্র হইতে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ মেঘনাদ সাহা কংগ্রেসপ্রার্থীকে পরাজিত করিয়া লোকসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী—ভারতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনা সম্পর্কিত একটি বিল উত্থাপিত হয় এবং তৎসম্পর্কে আলোচনা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে ৫টি আসনের ফল ঘোষিত হইয়াছে। এই ৫টির মধ্যে ৪টি কংগ্রেস ও ১টি জনসংঘ পাইয়াছে।

শ্রীনিকেতনে এক প্রশান্ত পরিবেশের মধ্যে বিশ্বভারতীর গঠনমূলক কর্মকেন্দ্র শ্রীনিকেতনের ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবের তিন দিনব্যাপী অধিবেশনের উদ্বোধন হয়। মিঃ এল কে এলমহার্স্ট অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

মৌলানা আবুলকালাম আজাদ, শ্রীশ্রীপ্রকাশ ও সর্দার বলদেব সিং ভারত সরকারের এই তিনজন মন্ত্রী লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে ৪টি আসনের ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এই ৪টির মধ্যে কংগ্রেস ৩টি আসনে পরাজিত এবং ১টিতে জয়লাভ করিয়াছে। এই দিন শিয়ালদহ কেন্দ্র হইতে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীপান্নালাল বসু এবং কুমারটুলী কেন্দ্র হইতে মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী শ্রীনেপাল রায় জয়লাভ করিয়াছেন।

নদীয়া জেলার শান্তিপুর কেন্দ্র হইতে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব কটক নির্বাচন কেন্দ্র হইতে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

বিন্ধ্যপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস অন্য-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

৮ই ফেব্রুয়ারী—মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকুমারস্বামী রাজা মাদ্রাজের রাজ্যপালের নিকট তাঁহার এবং তাঁহার দশজন সহকর্মীর পদত্যাগপত্র পেশ করেন। রাজ্যপাল শ্রীকুমারস্বামী রাজা ব্যতীত নির্বাচনে পরাজিত অন্যান্য মন্ত্রীর পরত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীকুমারস্বামী রাজাকে অন্যান্য মন্ত্রীর সহিত আপাততঃ তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রিসভার কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ জানান।

সাপ্তাহিক সংবাদ

সংসদ অদ্য রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ৫টি আসনের ফল ঘোষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কংগ্রেস ২টি, কম্যুনিস্ট ১টি, জনসংঘ ১টি এবং কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টি ১টি আসন লাভ করিয়াছে। বরাহনগর কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীজ্যোতি বসুর নিকট পরাজিত হইয়াছেন।

ভারতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কাটজু ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার প্রত্যেক রাজবন্দীর বিষয় নূতন করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত রাজ্য সরকারসমূহকে নির্দেশ দিতেছেন। যে সকল রাজবন্দী শাসনতন্ত্র ধ্বংস করিবার বা জননিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিবার উদ্দেশ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপে নিযুক্ত ছিল বলিয়া সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, তাহাদিগকে মুক্তিদানের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে।

সংসদে খাদ্যমন্ত্রী বলেন যে, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, কুর্গ, ত্রিপুরা, পেপসু, মণিপুর এবং বিলাসপুর ব্যতীত ১৯৫২ সালের ভারতের অপর সমস্ত প্রদেশেরই খাদ্যশস্যের ঘাটতি হইবে বলিয়া মনে হয়।

৯ই ফেব্রুয়ারী—প্রজাতন্ত্র ভারতের প্রথম নির্বাচনে আগামী ৫ বৎসরের জন্য ভারত কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট বাছিয়া লইয়াছে। সংসদের মোট আসন সংখ্যা ৪৯৬এর মধ্যে যে ৩৫৬টি আসনের ফল ঘোষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কংগ্রেস এ পর্যন্ত ২৪৯টি আসন অধিকার করিয়াছে।

লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্র হইতে কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীযুক্তা রেণু চক্রবর্তী এবং কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীপতিরাম রায় নির্বাচিত হইয়াছে। শ্রীমতী চক্রবর্তী মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বি সি রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী।

নেপালের বিদ্রোহী নেতা ডাঃ কে আই সিংএর তিব্বতে প্রবেশের সংবাদ নেপালের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীসূর্যপ্রসাদ উপাধ্যায় সমর্থন করিয়াছেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার জোড়াসাঁকো কেন্দ্র হইতে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বসু (সম্মিলিত সমাজবাদী) এবং বিদ্যাসাগর কেন্দ্র হইতে ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায় (স্বতন্ত্র) নির্বাচিত হইয়াছেন।

লোকসভা নির্বাচনে ভারতের বৃহত্তম নির্বাচন কেন্দ্র উত্তরবঙ্গ হইতে তিনজন কংগ্রেস প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছেন। এইদিন কলিকাতা দক্ষিণ-পশ্চিম নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্ত লোকসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন মন্ত্রিসভা রাজপ্রমুখের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছেন। রাজপ্রমুখ তাঁহাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং ৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত বর্তমান মন্ত্রিসভাকে তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রিসভারূপে কাজ চালাইয়া যাইবার নির্দেশ দিয়াছেন।

কংগ্রেস উত্তর প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। এ পর্যন্ত বিধান সভার ২৩৬টি আসনের ফল ঘোষিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে কংগ্রেস ২১৬টি আসন অধিকার করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৬ই ফেব্রুয়ারী—ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জ গতকল্য শেষ রাত্রিতে স্যাণ্ড্রিংহামে তাঁহার পল্লীভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। এক সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, তিনি নিদ্রিত অবস্থায় শান্তিতে মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর হইয়াছিল। রাজা ষষ্ঠ জর্জের জ্যেষ্ঠা কন্যা ২৬ বৎসর বয়স্কা রাজকুমারী এলিজাবেথ ইংলণ্ডের রাণীর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এলিজাবেথ কমনওয়েলথ পরিভ্রমণে বাহির হইয়া বর্তমানে কেনিয়ায় রহিয়াছেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী—গত ২৬শে জানুয়ারী কায়রোতে যে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, উহার তীব্র নিন্দা করিয়া বৃটিশ গবর্নমেণ্ট মিশরের নিকট এক প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকাশ, এই হাঙ্গামার সময় বৃটিশ প্রজাগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে এবং বৃটিশ সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করা হইয়াছে।

৮ই ফেব্রুয়ারী—লণ্ডনে সেণ্ট জেমস প্রাসাদে আড়ম্বরের সহিত নূতন রাণীকে "দ্বিতীয় এলিজাবেথ" বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

৯ই ফেব্রুয়ারী—রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিগণ কম্যুনিস্টদের জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধবিরতির পর কোরিয়া সমস্যার সমাধানকল্পে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সম্মেলনের আয়োজন করার জন্য কম্যুনিস্টরা যে প্রস্তাব করিয়াছেন, নীতি হিসাবে তাঁহারা সেই প্রস্তাবে সম্মত আছেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী—রাষ্ট্রপুঞ্জে ইতালীকে গ্রহণের প্রস্তাবে রাশিয়া ক্রমাগত 'ভিটো' প্রয়োগ করায় ইতালী রাশিয়ার প্রতি বাধ্যবাধকতা সরকারীভাবে অস্বীকার করিয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রা: প্রতি সংখ্যা—।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্তান মুদ্রা: প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৬নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ঊনবিংশ বর্ষ] শনিবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 23rd February, 1952. [১৭শ সংখ্যা

নির্বাচন ও কংগ্রেস

কংগ্রেসের সভাপতিস্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহের নিকট সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। এই পত্রে বিগত নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি কংগ্রেসের কর্মপন্থার আলোচনা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। কংগ্রেস-সভাপতি বিগত নির্বাচনের ফলাফলকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কংগ্রেসকর্মীদের আত্মানুসন্ধানের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি সমধিক প্রযুক্ত হইয়াছে। নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য তাঁহাকে উল্লসিত করিতে পারে নাই; পরন্তু ভবিষ্যতের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্বন্ধেই সমধিক সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুত কংগ্রেসের কাজ যেভাবে চলিতেছে, তাহা যে সন্তোষজনক নয়, একথাটা অনেকের কাছে অপ্রিয় শুনাইলেও তিনি কথাটা সোজাসুজি বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। তাঁহার অভিমত এই যে, কংগ্রেস বর্তমানে জাতি সংগঠনের কাজ চালাইবার পক্ষে অত্যন্তই দুর্বল। এই সত্যই বিগত নির্বাচনে তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়াছে। দেশের লোকের মধ্যে কংগ্রেস আদৌ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ চালাইতে পারিতেছে না, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। পণ্ডিত জওহরলালের অভিমতানুসারে কিছু-দিন হইতে কংগ্রেস জাতির অন্তরের যোগসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেকটা উপর-উপরভাবেই কংগ্রেসের কাজ চলিতেছে, অর্থাৎ নেতৃ-স্থানীয় কতকগুলি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যেই কংগ্রেসের রাজনীতিক তৎপরতা নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন, কংগ্রেসে যদি প্রতিষ্ঠা লাভ সত্যই করিতে হয়, তবে রাজনীতিক নেতৃত্বের বাহ্য এই আলোড়ন ও আড়ম্বরের মোহ হইতে কংগ্রেসকর্মীদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। যাঁহারা কর্মী, তাঁহাদিগকে দেশের লোকের সঙ্গে মিলিতে হইবে, মিশিতে হইবে। তাঁহাদিগকে গ্রামে গ্রামে কর্মকেন্দ্র সম্প্রসারিত করিতে হইবে, স্থানীয় সমস্যা-গুলি বুঝিতে হইবে এবং সেগুলি সমাধানের জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে; কংগ্রেসকর্মীদিগকে জনসাধারণের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হইয়া তাহাদের সঙ্গে কাজ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, কংগ্রেস-সভাপতিস্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল কংগ্রেসকর্মীদের সম্মুখে আজ যে আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন, ইহা নূতন কিছু নয়। মহাত্মা গান্ধী এই আদর্শেই কংগ্রেসকে প্রাণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আত্ম-দানের ভিতর দিয়াই জনসেবার সেই আদর্শকেই তিনি উদ্দীপ্ত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মহাত্মাজীর তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। বর্তমানে আইনসভার আসন অধিকার এবং সেই সূত্রে পদ, মান ও প্রতিষ্ঠার জৌলুষে আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছে। মন্ত্রিত্ব না পাইলেই যাঁহারা পাকা কংগ্রেসকর্মী, তাঁহাদেরও অনেকের মুখ শুকাইয়া যায় এবং চিত্তবিক্ষোভ ঘটে। আইনসভার সদস্য হইবার সুযোগ লাভ না করিলেই তাঁহারা চোখে অন্ধকার দেখেন। নিঃস্বার্থ দেশসেবার এবং গঠনমূলক কাজের মধ্যে তাঁহারা আর পূর্বের মত আনন্দ পান না। অথচ নিঃস্বার্থ সেই সেবা এবং ত্যাগের পথে কংগ্রেসের প্রকৃত শক্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রত্যুত সেই শক্তিতেই কংগ্রেস একদিন জাতির অন্তরকে অধিকার করে এবং বৈপ্লবিক কর্মসাধনার প্রভাবে বৈদেশিক প্রভুত্বকে উৎখাত করিতে সমর্থ হয়। বস্তুত দেশের জনচিত্ত ঠিকই আছে এবং আদর্শের অনুপ্রেরণা তাহারা একটুও হারায় নাই। অশিক্ষা কুশিক্ষা যতই থাকুক, এদেশের সংস্কৃতির একটা শক্তি আছে, সেই শক্তিতে এখানকার নরনারী মানবতার মহিমায় সমধিক জাগ্রত। বিগত গণভোটেই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কংগ্রেস-সভাপতি এজন্য গর্ববোধ করিয়াছেন, আমরাও করি। বিগত নির্বাচনে এ সত্য সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, আমরা [illegible]দিগকে অশিক্ষিত মনে করি, তথাকথিত শিক্ষিত লোকদের চেয়ে তাঁহারাই অধিক দায়িত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন

এবং নানারূপ প্রচারকার্যের কুজ্ঝটিকার মধ্যে পড়িয়াও প্রতিনিধি নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। জাতির ভবিষ্যৎ ইঁহাদের উপরই প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করিতেছে। সুতরাং দেশ ও জাতির যাঁহারা প্রকৃত কল্যাণকামী, ইঁহাদের সেবাতেই তাঁহাদের আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। যাঁহারা সেজন্য আগ্রহপরায়ণ নহেন এবং জনসেবার আন্তরিক ভাব যাঁহাদের অন্তরে নাই, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদের স্থান হওয়া উচিত নয়। বস্তুত শুধু নীতি-নির্দেশের সাহায্যে এ-কাজ হইবে না; পরন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থের যাঁহারা ক্রীতদাস, দেশের দুর্দশা লইয়া নেতাগিরির ব্যবসা যাঁহারা চালাইতে চায়, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিতে হইবে—এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডল

মাদ্রাজে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন লইয়া ইহার মধ্যেই বিভিন্ন দলের ভিতর বোঝাপড়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সে সমস্যা নাই। এখানে কংগ্রেস সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। তথাপি নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা এখানেও যে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। নূতন মন্ত্রিমণ্ডল কবে গঠিত হইবে, এ সম্বন্ধে এখনও কোন নিশ্চয়তা নাই। ঊর্ধ্বতন সভার জন্য নির্বাচন এখনও বাকী রহিয়াছে, ঊর্ধ্বতন সভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করা সম্ভব হইবে না, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কিছুদিন পূর্বে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আপাতত পরাজিত মন্ত্রীরাই কাজ চালাইয়া যাইবেন, ইহাই স্থির হইয়াছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থানুযায়ী ইহা আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। দুই দিন বাদেই যাঁহাদিগকে যাইতে হইবে এবং জনগণ যাঁহাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে অনাস্থার ভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহাদের ঘাড়ে এই অবাঞ্ছিত দায়িত্ব চাপাইয়া না রাখাই উচিত ছিল এবং গণতান্ত্রিক মর্যাদার দিক হইতেও তাহাই শোভন হইত বলিয়া আমরা মনে করি। নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের দায়িত্ব যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর উপরই ন্যস্ত হইবে, অসংশয়িত-ভাবে একথা বলা যায়। গত নির্বাচনের অভিজ্ঞতা এ সম্বন্ধে ডাক্তার রায়কে কর্তব্য নির্ধারণে সাহায্য করিবে, আমরা এমন আশা করিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে যোগ্য ব্যক্তিদিগকেই এক্ষেত্রে নির্বাচন করা উচিত. যোগ্যতা বলিতে শুধু বিদ্যাবুদ্ধি এবং মনীষার কথাই আমরা বলিতেছি না, অবশ্য সেসবও থাকা দরকার; কিন্তু সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতা, জনপ্রিয়তা ও সংগঠনের ক্ষমতাও তাঁহাদের থাকা প্রয়োজন এবং সেই হিসাবে ব্যক্তিত্ব কিছু থাকাও আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম-বঙ্গের সমস্যা সকল দিক হইতেই জটিল। ভারতের মধ্যে এমন সমস্যাপূর্ণ প্রদেশ একটিও নাই, একথা বলা চলে। এরূপ অবস্থায় নিতান্ত ভাল মানুষ হওয়া চাই মন্ত্রিপদের যোগ্যতায় এমন নিরিখ হওয়া উচিত নয়। যাঁহারা মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন তাঁহাদের চরিত্রবল যেমন থাকা দরকার সেইরূপ আদর্শনিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয় এবং সঙ্কল্পশীলতা থাকাও প্রয়োজন। বস্তুত নীতির ভিতর দিয়া দেশের অন্তরে কর্মসাধনা উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবার মত প্রাণশক্তি যাঁহাদের আছে, মন্ত্রিত্ব লাভের যোগ্যতা তাঁহাদেরই রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। সত্যই সমস্যা জটিল, কারণ মন্ত্রী হইবার বাসনা মনে মনে পোষণ করেন সাধারণভাবে সদস্যেরা সকলেই; সুতরাং নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হইলেই দরবার শুরু হয়। দলপতি যিনি, তিনি সমূহ সঙ্কটে পড়িয়া যান। নিজের দিকে ভোটের জোর বাড়াইবার দায়ে আইন-সভায় যাঁহার পিছনে কিছু সদস্যের সমর্থনের জোর আছে, যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার না করিয়া তাঁহাকেই মন্ত্রিপদে আনিয়া বসানো হয়; ইহাতেও যেখানে সমস্যা মিটে না, নিরাশ সদস্যদের ক্ষোভে দলের মধ্যে অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কা ঘটে এবং মন্ত্রীদের বহর অনাবশ্যকরূপে বাড়াইয়াও তাহা মিটে না, তখন একদল লোককে পার্লা-মেণ্টারী সেক্রেটারীস্বরূপে নিযুক্ত করিয়া তুষ্ট-পুষ্ট করিতে হয়, অথচ ইঁহাদের যে কি কাজ লোকে কিছুই জানে না। এইভাবে মন্ত্রিগিরির ব্যসন এবং ব্যভিচারে গরীবের শোণিতসম অর্থ অনর্থক ব্যয়িত হইয়া থাকে। এমন ক্যাংলামির কারবার বন্ধ করা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের সম্মুখে যেসব সমস্যা দেখা দিয়াছে, গভর্নমেণ্ট নিজের চেষ্টায় সেগুলির অবশ্যই সমাধান করিতে পারেন না, সমগ্র দেশের কর্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াই সেগুলির সমাধান করিতে হইবে, মন্ত্রীদের কাজে এমন প্রাণশক্তির সাড়া জাগে এমনটি হওয়া একান্তই আবশ্যক। এই দিক হইতে ব্যক্তিত্বের অভাবেই যে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলের সদস্যদের সকলের না হইলেও অধিকাংশের পরাজয়ের কারণ ঘটিয়াছে, এ সত্যটি এক্ষেত্রে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে দায়িত্বসম্পন্ন-পদে কোন ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিয়া বসাইলেই যে এমন ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে, এমন ধারণা সত্য নয়। পক্ষান্তরে সুদীর্ঘ কালের সাধনা এবং সংস্কৃতি জনগণের সংবেদননিষ্ঠ তেমন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

কাপড়ের সঙ্কট

ভারত সরকারের ব্যবসা ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহতাব সেদিন ভারতীয় পার্লামেণ্টে স্বীকার করিয়াছেন যে, মাঝারি ধরণের ধুতি ও শাড়ির অভাব দেশের সর্বত্রই রহিয়াছে। এই অভাব অল্প দিনের মধ্যে যে কমিবে, মন্ত্রী মহাশয় তেমন কোন ভরসা দিতে পারেন নাই। তাঁহার উক্তিতে শুধু এইটুকু আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে যে, ভারতের উৎপন্ন তুলোর ফসল যদি আশানুরূপ হয়, তবে বর্তমান বৎসরের শেষভাগে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। কারণ উপযুক্ত তুলার অভাবেই ঐ শ্রেণীর কাপড় মিলগুলিতে যথেষ্টভাবে উৎপন্ন হইতেছে না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মোটা এবং মাঝারি ধরণের ধুতি এবং শাড়ির সম্বন্ধেই এই সমস্যা, অথচ মিহি ও অতি-মিহি কাপড় মিলগুলিতে যথেষ্ট, এমনকি, প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবেই বর্তমানে উৎপন্ন হইতেছে। এস্থলে প্রশ্ন উঠিবে এই যে, বিদেশ হইতে তুলা আমদানী করিয়া ধনীদের উপযোগী মিহি কাপড় উৎপাদন করা যদি সম্ভব হয়, তবে সেইভাবে তুলা আমদানী করিয়া মাঝারি এবং মোটা রকমের ধুতি ও শাড়ির উৎপাদন কেন বাড়ানো হইতেছে না! প্রকৃত

প্রস্তাবে বাণিজ্য-মন্ত্রী তুলার অভাবের যে কৈফিয়ৎ উপস্থিত করিয়াছেন, আমরা তাহার সংগতি উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। আমাদের বিশ্বাস এই যে, মিলওয়ালাদের লাভের প্রবৃত্তিই এক্ষেত্রে মুখ্যত কাজ করিতেছে। মোটা এবং মাঝারি কাপড়ের দাম সরকার কয়েকবার কমাইয়াছেন, কিন্তু মিহি বা অতি-মিহি কাপড়ের মূল্য কমানো হয় নাই। মিলওয়ালারা এই লাভের দিকটা দেখিয়া লইয়াছেন, এজন্য মিহি কাপড় উৎপাদনের উপরই তাঁহারা জোর দিতেছেন। অন্য দিক হইতেও এদিকে তাঁহাদের সুবিধা রহিয়াছে। মিহি এবং অতি-মিহি কাপড় মিলগুলিতে জমা হইয়া পড়িতেছে। সাধারণ লোকে চড়া দামের জন্য সেগুলি ক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছে না, অবিক্রীত জমা কাপড়ের হিসাব দেখাইয়া ক্ষেত্র প্রশস্ত করিয়া লইতেছেন। দেশের লোকদের দুঃখ-কষ্টের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি কোনদিনই নাই। এই ভাবে মিলওয়ালারা কৌশলে দিব্য লাভের ব্যবসা চালাইয়া যাইতেছেন। এরূপ অবস্থায় সরকার হইতে যদি মোটা ও মাঝারি ধরণের কাপড় উৎপাদনের জন্য মিলওয়ালাদের উপর চাপ না দেওয়া হয়, তবে ব্যবসা তাঁহাদের চলিতেই থাকিবে এবং দেশের জনসাধারণের কাপড়ের কষ্টও কোনদিন দূর হইবে না—একদিকে মিহি এবং অতি-মিহি কাপড় গুদামে জমা হইয়া বিদেশ হইতে অর্থ আমদানীর প্রলোভন বৃদ্ধি পাইবে, অপর দিকে উপযুক্ত পরিধেয়ের অভাবে ভারতের অগণিত নরনারীর দুর্দশা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিবে। অথচ একদিনে দেশের লোকের সাহায্য এবং সহানুভূতির জোরেই মিলওয়ালারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আজ তাঁহারা স্বচ্ছন্দেই সেকথা বিস্মৃত হইয়াছেন। উপদেশের কথায় তাঁহাদের অন্তরে কৃতজ্ঞতা বোধ জাগানো সম্ভব হইবে না, ইহা আমরা বহু পূর্বেই বুঝিয়া লইয়াছি। ভারত গভর্নমেণ্ট ইঁহাদের এমন মনোভাবের পরিচয় পাইয়াও ইঁহাদিগকে সংযত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন, ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গে বন্দিমুক্তি

কমিউনিস্ট, বিপ্লবী কমিউনিস্ট এবং এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী—এই তিন দলের ২৭১ জন সদস্য পশ্চিমবঙ্গে রাজবন্দী স্বরূপে আটক ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইঁহাদের মধ্যে ৪৬ জনকে মুক্তি দিয়াছেন। আটক বন্দীদের মধ্যে ১৯ জন নির্বাচন-প্রার্থী হইয়াছিলেন এবং স্বচ্ছন্দভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিবার জন্য সরকার তাঁহাদিগকে সাময়িকভাবে মুক্তিদান করেন। মুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ইঁহাদের মধ্যে ৮ জন পরাজিত প্রার্থী ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখেই জেলে ফিরিয়া গিয়াছেন। বাকী ১১ জনের মধ্যে ৩ জনকে মুক্তি দিয়া ৮ জনকে গত শনিবার পুনরায় আটক করা হইয়াছে। মুক্তিপ্রাপ্ত তিনজনের মধ্যে বেলগাছিয়া কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত গণেশ ঘোষ, মাণিকতলা হইতে নির্বাচিত ডাক্তার রণেন সেন এবং বর্ধমান কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত বিনয় চৌধুরী আছেন। বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সিদ্ধান্ত আমরা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। অধিকন্তু ইহাতে অনর্থ বাড়িবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কারণ তিনজন নির্বাচিত কমিউনিস্ট সদস্যকে পুনরায় আটক করা হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করিবার প্রশ্ন রহিয়াছে। জনসাধারণ তাঁহাদিগকে নির্বাচন করিতে পারে এবং তাঁহাদের ভিতর দিয়া আইনসভায় নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ পায় নিশ্চয়ই এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের অনেকেই জনসাধারণের সমর্থনের জোরে বিপুল ভোটাধিক্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া নির্বাচিত হইয়াছেন। নির্বাচিত হইবার পর তাঁহাদিগকে আটক করিয়া রাখিলে লোকসভায় এবং বিধান সভায় জনসাধারণকে প্রতিনিধিত্ব হইতেই কার্যত বঞ্চিত করা হয়। ন্যায় বা নীতি—কোন দিক হইতেই ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। বিশেষত নির্বাচনের পরবর্তী পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষায় যে তাঁহাদের সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এতৎসম্পর্কিত বিবৃতিতে তাহা প্রকাশ পায় নাই। বস্তুত "প্রত্যেকটি আটক বন্দীর বিষয়ে পূর্বেই বিবেচনা করা হইয়াছিল", এই কৈফিয়ৎ আদৌ সন্তোষজনক নয়। জনসাধারণ এমন কথায় নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবে না। বিনা বিচারে কাহাকেও আটক রাখা হয়, আমরা এমন যুক্তি নিঃসংশয়িতভাবে সমর্থন করিতে পারি না, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের মতে নির্বাচিত যে কয়েকজন কমিউনিস্ট সদস্যকে আটক করা হইয়াছে, যদি তাঁহাদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যে সংশ্লিষ্ট থাকার সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণ-পত্রই থাকে, তাঁহাদিগকে বিচারালয়ে উপস্থিত করাই বরং উচিত ছিল। তাহা হইলে লোকের মনে কোন সংশয় থাকিত না। কিন্তু সে নীতি অবলম্বন না করিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে আটক করাতে সমস্যা সরকারের পক্ষেও সমধিক জটিল হইয়াই পড়িবে।

মন্ত্রী ও নীতি

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুত অতুল্য ঘোষ নির্বাচনের পর দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় কংগ্রেস গরিষ্ঠতা লাভ করায় বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি দেশের লোকের আস্থাই প্রকটিত হইয়াছে, সুতরাং ঊর্ধ্বতন সংসদের নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগের কোন প্রশ্ন উঠে না। নীতির দিক হইতে ইহা হয়ত সত্য; কিন্তু পরাজিত মন্ত্রীরা মন্ত্রিরূপে অর্থাৎ বিশেষ বিভাগের মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেইজন্য পরাজিত হন নাই, কংগ্রেসকর্মী হিসাবেই তাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন; প্রত্যুত তাঁহাদের পরাজয়ের ক্ষেত্রে মন্ত্রী হিসাবে তাঁহাদের কাজের বিচার জনগণ-ভোটের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই, শ্রীযুত ঘোষের এই মত আমরা সমর্থন করিতে পারি না। আমাদের মতে বিগত নির্বাচনে দেশের জনসাধারণ দল হিসাবে কংগ্রেসকেই সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন মন্ত্রীর নীতির বিচারও তাহাদের মনে বিশেষ রকমেই কাজ করিয়াছে এবং কয়েকজন মন্ত্রীকে হারাইয়া দিতে হইবেই, এই সংকল্প লইয়া তাহারা যেন ভোটের অধিকার পরিচালনা করিয়াছে। শুধু তত্ত্ব-কথা উত্থাপন করিয়া এই যে সত্য, ইহাকে অস্বীকার করা চলে না। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস সদস্য হিসাবে তাঁহাদের পরাজয় ঘটে নাই, পরন্তু ভারপ্রাপ্ত বিভাগের কার্য পরিচালনায় জনসাধারণের অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়াতেই তাঁহাদের পরাজয় ঘটিয়াছে।

ফাল্গুন। শুক্লা দ্বিতীয়া মহা পুণ্যময় তিথি। এই দিবসের ব্রাহ্ম-মুহূর্তে নরবেশে পরম পুরুষ এদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়া তিথিতে অদ্বিতীয় চন্দ্রের উদয়।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই আবির্ভাব জগতে এক অপূর্ব ব্যাপার। ঠাকুরের দিব্য লীলা বিচিত্র এবং বিস্ময়কর। ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য যুগে যুগে শ্রীভগবানের আবির্ভাব ঘটে, গীতার এই বাণী বাঙলার বুকে এইদিন সত্য হইয়া উঠে। হুগলী জেলার নিভৃত পল্লী কুটীরে ঢেঁকিশালায় নরনারায়ণ আবির্ভূত হন। তাই মঙ্গল লগ্নে বিশ্ব-প্রকৃতি আনন্দ-গীত গাহে। ভারতের হৃদয়-শতদল পরম দেবতার কোমল চরণকমল-স্পর্শে বিকশিত হয়।

হাঁ, এই ভাবে শ্রীভগবানের আবির্ভাব ঘটে। যিনি অশরীরী, তিনিও শরীর ধারণ করিয়া আসেন এখানে। আচার্য শঙ্করও তাঁহার গীতার ভাষ্যে একথা স্বীকার করিয়াছেন। যিনি ভগবান, যিনি শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত-স্বভাব, তিনিও যেন দেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছেন, এইভাবে প্রকট হইয়া লোকানুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। প্রকৃত-পক্ষে ইহা যদি সত্য না হইত, তবে ভারত বাঁচিতে পারিত না। ভারতের সভ্যতা, তাঁহার সংস্কৃতি কিছুই টিঁকিত না। আসুরিক দম্ভ, দর্প এবং অনাচারে ভারতের সনাতন সংস্কৃতি এতদিনে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িত। দেবী দ্রৌপদীর মত ভারতও একই আশায় বুক বাঁধিয়া রহিয়াছে। গোবিন্দ, তোমার ভক্তের কোন দিন নাশ নাই, ইহাই তোমার প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়াই শুধু আমি প্রাণ ধারণ করিতেছি! মহাভারতে এই যে বাণী আমরা দ্রৌপদীর মুখে শুনিতে পাই, ইহা ভারতেরই আত্মার প্রতিধ্বনি। ঠাকুরের আবির্ভাবে ভারত তাহার বহু সাধনা, বহু বেদনার ধনকে নিজের বুকে পাইল। নূতন শক্তিতে সে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।

আসিয়াছিলেন তিনি। "যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে", ইহা তো ঠাকুরেরই শ্রীমুখের বাণী। কিন্তু আসিলেই-বা কয়জনে আমরা তাঁহাকে চিনি, কয়জনে তাঁহাকে জানি। না, জানা-চেনা সম্ভব নয়। কারণ দেহটি যে সাধারণেরই মতো। ঠাকুর নিজেই বলিয়াছেন, "নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করিতে হয়, তাঁহাকে চিনিতে পারা কঠিন।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

কোন কোন ভাগ্যবানই শুদ্ধ নররূপ-ধারী এই নারায়ণকে চিনিতে পারেন। চিনিবার লক্ষণ শুদ্ধ প্রেম; ভাগবতের উক্তি অনুসারে অবতারের লক্ষণ হইল অতুল্য এবং অতিশয় বীর্য বা প্রভাব। বস্তুত এই প্রভাব বলিতে প্রেমই বুঝায়, কারণ ভাবের বিরোধিতার পথে প্রভাব সার্থক হইতে পারে না।

কবি কর্ণপুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, তোমরা অলৌকিক লীলার কথা কি বলিতেছ, নরদেহধারী নারায়ণের যে লীলা, সে লৌকিকী লীলা যে অলৌকিক লীলার চেয়েও লোভনীয়। গঙ্গা যদি শিবের জটাজালে, হর-শিরেই অবস্থান করিতেন, তাহাতে আমাদের কি লাভ হইত? পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াই তিনি আমাদের জীবন-সঞ্চারিণী, আনন্দদায়িনী জননী। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লৌকিক লীলার মাধুরীর বৈশিষ্ট্যও তাঁহার পরম কৃপা বা অনুগ্রহের একান্ত উপলব্ধির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সে কৃপার কণাবিন্দু স্পর্শে জীবন ধন্য হয়, মর্ত্য মানুষ অমৃতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঠাকুরের পুণ্যময় আবির্ভাব তিথিতে আমরা তাঁহার মহিমা কীর্তন করিব। তাঁহাকেই স্মরণ করিব। তাঁহারই দিব্য লীলার মননে অভিনিবিষ্ট হইব। আমাদের সমাজ-জীবন ও রাষ্ট্র-সাধনার ভবিষ্যৎ ইহার উপরই নির্ভর করিতেছে।

টিউনিসিয়া •

টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকে ফরাসীরা পিশে মারতে কৃতসংকল্প হয়েছে। অন্যপক্ষে টিউনিসিয়ানরাও ফরাসী দমন-নীতির কাছে মাথা নোয়াতে চাইছে না। ফরাসীদের ভাবগতিক দেখে মনে হয় যে, তারা কিছুতেই টিউনিসিয়ার জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবী মেনে নিতে প্রস্তুত নয়, এমন কি তারা টিউনিসিয়ানদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পর্যন্ত দিতে চায় না। প্যারিস গভর্নমেন্টের এই নীতির সহজে পরিবর্তন হবে না, কারণ টিউনিসিয়ার থেকে যে ফরাসী ঔপনিবেশিক সমাজ টিউনিসিয়াকে শোষণ কচ্ছে, তারা মরিয়া হয়ে এই নীতির সমর্থন কচ্ছে ও করবে, কারণ তারা ভাবছে যে, টিউনিসিয়াকে অধিকার দিলে সেখানে ফরাসী শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তবে ফরাসী ঔপনিবেশিকদের সুখ-সুবিধা অনেকখানি বজায় রেখে টিউনিসিয়ার জাতীয়তাবাদীদের এক অংশের সঙ্গে একটা আপোষ-বন্দোবস্ত করার পরামর্শ শেষ পর্যন্ত হয়ত ফ্রান্সকে নিতে হবে। এরূপ আপোষ বন্দোবস্তের দ্বারা টিউনিসিয়াকে পুরোপুরি শান্ত করতে না পারলেও আপাতত কাজ চলার মত শান্তি আসতে পারে, কারণ আরব জাতীয়তাবাদের ঐক্য কোথায়ও খুব দৃঢ় নয়। যদি উপরের দিকের একদল লোকের সিধা করে দিয়ে তাদের সঙ্গে আপোষ করা যায়, তবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অন্তত সাময়িকভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বর্তমান যুগে ঔপনিবেশিক শোষণের একটা বড়ো কায়দাই হচ্ছে শোষিত দেশকে "স্বাধীন" রেখে বা "স্বাধীন" করে দিয়ে সেখানে এমন এক শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠিত রাখা, যারা নিজেকে স্বার্থলোপের ভয়ে বিদেশী শক্তির আশ্রয় ত্যাগ করতে সাহস করবে না। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার প্রায় সব দেশের সামাজিক অবস্থাই এই নীতির প্রয়োগের পক্ষে অনুকূল; কারণ সর্বত্রই অতি বিশ্রী রকমের বৈষম্য বর্তমান। সর্বত্রই জনসাধারণ অত্যন্ত দরিদ্র এবং তাহার মাথার উপরে এক শ্রেণীর বড়লোক আছে, যারা বিদেশী শোষণের ভাগীদার হয়ে রয়েছে। এই শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ নেই তা নয়, সাধারণের দ্বারা পুষ্ট জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাথায় চড়ে তারা বিদেশী শক্তির সঙ্গে দরকষাকষিও করে, কিন্তু

শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থনাশের ভয়ে বিদেশী শক্তির কাছে মাথা নোয়াতে দ্বিধা করে না। এর একটা বড়ো দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে মিশরে। মিশরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন টিউনিসিয়ার আন্দোলনের তুলনায় অনেক বেশিদিনের এবং অনেক জোরালো ছিল। তা সত্ত্বেও তাকে এত বড়ো আঘাত ও অপমান সইতে হচ্ছে। এ অবস্থায় টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন যে সহজে সফল হবে, এরূপ আশা করা যায় না। নানাদিকের চাপে ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত একটা আপোষ করতে পারে, এমন কি টিউনিসিয়া নামকেওয়াস্তে "স্বাধীন" বলেও ঘোষিত হতে পারে, কিন্তু তার মূল্য খুব বেশি হবে না। লিবিয়া যতখানি "স্বাধীন" হয়েছে, ততখানি "স্বাধীন" হবার আশাও টিউনিসিয়ার আপাতত নেই। ইন্দোচীন দখলে রাখার আশা যত কমছে, ফ্রান্স তত বেশি করে তার আফ্রিকার রাজ্যগুলি আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য চেষ্টিত হচ্ছে। কম্যুনিস্ট-ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ইন্দোচীনে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য ফ্রান্স, আমেরিকা ও বৃটেনের কাছ থেকে উৎসাহ পাচ্ছে বটে, কিন্তু ইন্দোচীন থেকে লাভের আশা ফ্রান্সের আর নেই। সেইজন্য সে বাড়ির কাছের জায়গাগুলো কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। তাই মরক্কো ও টিউনিসিয়াতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পিষে মারার জন্য ফ্রান্স এত ব্যস্ত হয়েছে। আফ্রিকার ভিতরে ফ্রান্সের যে অন্য ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলি আছে, সেখানেও ফরাসী শক্তি চিরস্থায়ী হয়ে থাকার জন্য বদ্ধপরিকর। ইতিহাসের গতি বড়ো বিচিত্র। ফরাসী বিপ্লব থেকে মানুষ স্বাধীনতার কতো প্রেরণা পেয়েছে, আর সেই বিপ্লবের জন্মস্থান ফ্রান্স আজও কত জাতিকে পদানত করে রাখার জন্য চেষ্টিত। রুশ-বিপ্লব ও রাশিয়ার পরবর্তী ইতিহাস মিলেও একটা অনুরূপ ধারা সৃষ্টি কচ্ছে বলে মাঝে মাঝে মনে হয়। •

কোরিয়ার যুদ্ধ

কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির আলোচনার সংবাদে সম্প্রতি একটা আশার ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, যা থেকে মনে হয় শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির চুক্তিটা হয়ে যেতেও পারে। প্রায় ৪ মাস হতে চল্লো, পান-মুন-জনে কথাবার্তা চলছে। এক একটা সর্ত নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে করতে দুই পক্ষই এখন অনেক ভালো বিষয়ে একমত হতে পেরেছে দেখা যাচ্ছে। তবে না আঁচালে বিশ্বাস নেই। দুই পক্ষের ন্যায়-অন্যায় নিয়ে আলোচনা করতে আর ইচ্ছা করে না। কোরিয়ার মানুষগুলো এখন একটু নিঃশ্বাস ফেলতে পারলেই হোত।

বর্মায় কুমিংটাং উৎপাত

চীন-বর্মা সীমান্ত অঞ্চলে বিচরমান কুমিনটাং চীনা সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র জোগানো এবং তাদের সঙ্গে ফরমোজার যোগাযোগ রক্ষা করতে সাহায্য করার অভিযোগ মার্কিন গভর্নমেন্ট অস্বীকার করেছেন। এই অস্বীকার অক্ষরত ঠিক হতে পারে, অর্থাৎ মার্কিন সরকারের নামে সাক্ষাৎভাবে ঐসব কাজ না হতে পারে, কিন্তু মার্কিন সরকার পরোক্ষভাবে অর্থাৎ বেসরকারী লোকের মারফৎ বর্মায় অনধিকারপ্রবেশকারী কুমিনটাং চীনা সৈন্যদের সাহায্য প্রেরণের সহায়ক ছিলেন ও আছেন, এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই কুমিনটাং সৈন্যরা একদিকে বর্মার ওপর জুলুম কচ্ছে। অন্যদিকে বর্মার ভূমিতে ঘাঁটি করে সেখান থেকে চীনের ভিতর আক্রমণ চালাবার পাঁয়তারা কষছে। চীনের ভিতর আক্রমণ করে তাঁরা কিছু করতে পারবে, সে সম্ভাবনা অল্প, কিন্তু বর্মার বিপদ হচ্ছে যে, কুমিনটাং সৈন্যরা যা কচ্ছে, তাতে চীন যদি তাদের শাস্তি দেবার জন্য অগ্রসর হয়, তবে বর্মার ভিতরে ভালোরকম যুদ্ধ ঘটবে। বর্মার ভিতরে বসে কুমিনটাং সৈন্যরা চীনকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এটাও বর্মা-চীন সম্পর্কের পক্ষে ভালো কথা নয়। নিজের জোরে কুমিনটাং সৈন্যদের বর্মার ভূমি থেকে তাড়িয়ে দেবেন, বর্মা গবর্মেণ্টের সে শক্তি বর্তমানে নেই। সেটা জানে বলেই চীন বর্মার উপরে তত বেশি রুষ্ট হচ্ছে না। একমাত্র আমেরিকা বর্মাকে এই মুশকিল থেকে উদ্ধার করতে পারে, কারণ আমেরিকা যদি জোর করে কিছু বলে, তবে চিয়াং-কাইসেকের সেকথা না শুনে উপায় নেই। কিন্তু আমেরিকা কুমিনটাং সৈন্যদের বর্মা থেকে বহিষ্কার করা বা তাদের নিরস্ত্র করার সম্বন্ধে কোন চেষ্টা করতে যে রাজী নয়, সেটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। উপদ্রুত বর্মার ভাগ্যে আরো কি আছে, কে জানে!

২০-২-৫২।

কামানবাহী শকটযোগে পরলোকগত ইংলণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জের শবাধার কিংস ক্রশ স্টেশন হইতে ওয়েস্টমিনিস্টার হলে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

নীচে

রাজা ষষ্ঠ জর্জের শোকসন্তপ্ত মাতা পত্নী ও কন্যা। রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ রাণী মেরী ও রাজমাতা ওয়েস্টমিনিস্টার হলে শবাধারের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী রাজা ষষ্ঠ জর্জের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে নয়াদিল্লীর 'চার্চ অব্ দি রিডেমশনে' এক প্রার্থনানুষ্ঠান হয়। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রার্থনাস্থল অভিমুখে যাইতেছেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

৩

আপদ কেটে গেলে আমার নজর গিয়ে পড়ল স্টেশনের গায়ে স্টেশনের নামটার ওপর—'পৈলান'। নজরটা যেন আটকেই পড়ল। অদ্ভুত নামটা, কিন্তু বেশ মিষ্টি, কেমন যেন এদিককার সুরটা লেগে রয়েছে গায়ে। নামের ব্যাপারে দেখেছি, এক এক সময় ব্যাকরণ অভিধান দেখে রাখা হয়েছে, ওংরোয় নি, অথচ এমনি হ্যালক্যাশন করে রাখা গোটা কতক অক্ষরের নিরর্থক সমন্বয় হঠাৎ কেমন সার্থক হয়ে উঠেছে।……আমি প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলেছি পৈলানকে। অবশ্য ভালোবাসার মতো তার কোনও অবসর নেই। গ্রাম তো নয়ই, ছোট্ট একটি স্টেশন আর গুনেগেঁথে গুটি পাঁচ ছয় ছাড়া ছাড়া ঘর, তার পরেই চারিদিকে মাঠ। তা কেউ নামেই মজে, কেউ কুন্তলে, কেউ গঠনে, কেউ নয়নে; আমি মজেছি নামটিতে। আর কিছু না পারি অন্তত একটা গল্পেই পৈলান নামটাকে আমার লেখার ধ্যে ধরে রাখব। কি করব? কবিতা তো সে না, ঐ হবে আমার ভালোবাসার ট্রিবিউট।

ইঞ্জিনের কি একটা দোষ হয়ে আরও কটু দেরি হয়ে গেল; রোদ পড়ে এসেছে কটু। ডায়মন্ডহারবার রোডে ওঠবার পর থেকেই রাস্তার দুধারের দৃশ্যে আরও কটু পরিবর্তন এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে শ খানিকটা করে জায়গা নিয়ে এক একটা গান, মাঝখানে একটা করে পুকুর, জায়গা সেবে ছোট, বড় বা মাঝারি গোছের, রিদিকে ছোট ছোট সুপুরি আর নারকেল ছ; এই সবে ফলন আরম্ভ হয়েছে, তুন বয়স, তার সঙ্গে নতুন মাটির টানা, বেশ নধরকান্তি, সুপুষ্ট; লার ঝাড়ও আছে, কিছু কিছু লেও। বাগানের মাঝখানে একটা করে বাড়ি, কোঠা বা রাণীগঞ্জ টালির। এক একটি ছবির মতন; মুক্ত, প্রশস্ত জায়গার মধ্যে বলে আরও মানিয়েছে। একখানি ওরই মধ্যে বেশ আভিজাত্যসম্পন্ন, নামে পর্যন্ত একটা রুচি আর আভিজাত্যের ছাপ আছে—'চিরন্তনী'। আগেই এসেছি ছাড়িয়ে।

কিন্তু ভাবছি—কি 'চিরন্তনী'?—এই অবিরাম চলার পথে মানুষের একটু নীড় বাঁধার ইচ্ছাটুকু? ধরে নেওয়া যাক্, তাই; কিন্তু তাও কত মধুর, কত করুণ,—দুর্বার গতির কাছে দুর্বল স্থিতির এই দুটি ব্যাকুল চোখ তুলে চেয়ে থাকা……

রেল চলেছে ছুটে। রেল নয়তো, যেন রেল-রেল খেলা। সেই জন্যেই লাগছে আরও ভালো—ছোটার সময় বোধহয় যেন ইচ্ছে-মতো নেমে পড়া যায়, এ স্টেশনের ছোট্ট ঘর থেকে ও স্টেশনের ছোট্ট ঘরটি যায় দেখা। 'ভাসা' এসে পড়ল, বোধহয় মাইল দুয়েকও নয়। বেশ মিষ্টি নয় এ নামটাও?

মাঝে মাঝে রাস্তার একেবারে ধারে গ্রামও এসে পড়ছে এক একটা। একটি পাশ দিয়েই চলেছি। রাস্তার পাশেই খাল, তার ওদিকেই। জেলেদের ঘরই বেশি মনে হলো; গায়ে গায়ে বাড়ি, এর উঠানের মাঝখান দিয়ে, ওর ঘরের পেছন দিয়ে রাস্তা; বড় রাস্তার সঙ্গে সংযোগ কোথাও একটা পাকা পুলের ওপর দিয়ে, কোথাও বা শুধু বাঁশ—গোটা দুই বাঁশের ঢ্যারা মাঝখানে, তার ওপর গোটা দুই তিন বাঁশ লম্বাবম্বি করে ফেলা, ধরে যাবে তার জন্যে খানিকটা উঁচুতে লম্বালম্বি আর একখানা বাঁশ; বাবা আদমের যুগের জিনিস। বেশি নয়, এর মাইল দশবারোর মধ্যেই হাওড়ার পুল,

আধুনিক পুতুলশিল্পের জয়জয়কার।......তা বলে যেন ভেব না বাঁশের ঢ্যাড়া-পুলের বংশলোপ চাইছি আমি; আহা ওরাও থাক্, যেমন সবটা কলকাতা না হয়ে গিয়ে ভাসা-পৈলানও থাক বেঁচে। সমস্ত গ্রামখানি নিবিড় ছায়ায় ঢাকা। রোদের তাপে যেন ঝিমিয়ে রয়েছে, হম্দ ঘরের আড়ালে দুটো বলদের অলস রোমন্থন, দুটি নগ্ন শিশুর খেলাঘর পাতা; একটি চাষা বৌয়ের হেঁসেল তুলতে দেরি হয়েছে, বাসনপত্র মেজে এই পাট সারা হোল। বাসনের গোছা হাতে নিয়ে আধ-ঘোমটা টেনে নারকেল-গুঁড়ির পৈঠায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে।...এরা দেখছি এখনও নথ পরে। আমার ভয় ছিল আধুনিকতা বুঝি জিনিসটাকে একেবারেই দেশছাড়া করে দিয়েছে। তবে, আর কতদিনই বা? ওরই পাশকরা ছেলের বৌ বোধহয় শাশুড়ির সেকেলেপনা দেখে ন্যাড়া নাক সিঁটকুবে; একেবারেই ন্যাড়া নাক, আর তো নাকছাবিও তুলে দিলে দেখছি। যাক, After me the Deluge; আমি তো আর দেখতে আসছি না। এর পর এরা অনাধুনিক বলে নাকটাকেই চেঁচে ফেলে মুখ থেকে তো ফেলুক। কার কি বয়ে গেছে?

না, নিতান্ত যে ঝিমিয়েই রয়েছে গ্রামটা তাই বা কি করে বলি?—পার্লামেণ্ট ইন্ সেসন! অবশ্য তাও শুনেছি ঝিমোবারই ব্যাপার, এ কিন্তু তা নয়। গোটা দুই বড় বড় বড় কি গাছ মিলে ঘন ছায়ার একখানি কম্বল দিয়েছে বিছিয়ে, গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈঠক চলেছে তারই ওপর বসে। হাত নাড়ানাড়ি যেমন প্রায় হাতাহাতিতে দাঁড়াবার গোত্র দেখছি তাতে মনে হয় আলোচ্য বিষয়টি খুবই গুরুতর। দল থেকে একটু দূরে এখানে ওখানে উপদল, কোথাও দুই, কোথাও তিন, কোথাও হুঁকো আছে কোথাও নেই; লবি টক্ (Lobby talk) বোধহয়। ওরা মাথা ফাটাফাটি করে মরুক, ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত যা হবার তা হয়ে যাচ্ছে এইখানে, গোপন পরামর্শে।

ভাসার পর ইঞ্জিনটাও চলেছে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আমার আপত্তি নেই, সময় পেয়ে দেখতে পাচ্ছি এরই মধ্যে একটু গুছিয়ে।

একেবারেই সরে একটা ডোবার ধারে একটি যুবা বসে আছে, সাবান দিয়ে কাচা ফরসা কাপড়, গায়ে একটা নীল কামিজ, পায়ে কালো বার্নিশ জুতো, বোধহয় সস্তা রবারের যা বাজারের ফুটপাথে দেখা যায়। বসে আছে মাথা হেঁট ক'রে। মাঝে মাঝে জমায়েৎটার পানে ঘুরে চাইছে, হেঁট মুখেই।

ওর এই একাকীত্ব একটা যেন কাহিনীর আভাস এনে দিয়ে অস্বস্তি জাগিয়েছে মনে। আজকের অধিবেশন যে ওকে নিয়েই তা বেশ বোঝা যায়, কিন্তু কথাটা কি?...বেশ দেখতে দেখতে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম আস্তে আস্তে, মাঝখানে তুমি এসেই সে গোলমাল বাধালে হে লবকাণ্ড; এই আধা-খ্যাচড়া গল্প নিয়ে আধ কপালে ধরতে আমার আর কতক্ষণ?

গাড়িটা একটু এগুতেই পট-পরিবর্তন, একটি যেন রিভলভিং স্টেজই (Revolving stage) গেল ঘুরে। খানকতক বড় বড় ধানের মরাই আর একটা আলোক-লতায় বোঝাই কৃষ্ণচুড়া গাছের আড়ালে সমস্তটা গেল পড়ে—হাতাহাতি, লবি টক্, মায় সেই লবকাণ্ডটি পর্যন্ত; প্রায়, শুধু তার জুতোপরা পায়ের খানিকটা খানিকটা যাচ্ছে দেখা। মরাইয়ের এদিকে সম্পূর্ণ অন্য দৃশ্য। দশ বারোজন মেয়ে, নানা বয়সের, উলঙ্গ শিশু থেকে লোলচর্ম বুড়ি পর্যন্ত মাঝখানে ষোল-সতের বছরের একটি মেয়ে মাটি কামড়ে পড়ে, বুকের কাপড়টা চেপে ধরে মাথা চালছে—না—না—না......কি একটা জিনিস সে কোনমতেই করতে রাজি নয়।

বোঝাচ্ছে পাঁচ-সাতজন, অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে পাঁচ-সাতজন। জন তিনেক একটু আলাদা হয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাথা দোলাচ্ছে, একজনের গালে তর্জনীটা টেপা।......খুবই জটিল আর দুর্ভাবনার কথা। "হ্যাগো, কালে কালে এ হোল কি!!......"

আমি কিন্তু বাঁচলাম, আধ কপালের ভাবটা কেটে গেছে। আমার কাহিনী পুরো হয়ে উঠেছে।

হুড়কো মেয়ে। শ্বশুরবাড়ি থাকতে চায় না।......না—না, কোন মতেই ফিরে যেতে রাজি নয় সে।

আমার কাহিনীর ডায়লগ্ গড়ে উঠেছে বেশ। ঐ যে বুড়ি, মাথায় শনের নুড়ি, পিঠে হাত বুলুচ্ছে—

"নে দিদি, ওঠ, নিতে যখন এসেছে, অ[illegible] কি? মান খুইয়ে মান ভাঙাতে এয়ে[illegible] হোল তো।"

"না, আমি যাবুনি—যাবুনি আমি, ড্যাকরা আমায় মেরে......"

"ছেরকালই কি মারবে গা?...ছেলেপি[illegible] হবে, ঐ মানুষই আবার সমিহ কর[illegible] শিকবে......যা হয়, যা হয়ে আসচে ছে[illegible] কালটা......আমরা খাই নি মার? তোর [illegible] মার খায় নি তোর বাপের হাতে?.... জিগুগে যা......"

—অন্য একজন বলে।

আর একজন মেয়ে জোগান দেয়—[illegible] করা মাগ, অথচ দু'ঘা খেতে হয় নি বরে[illegible] হাতে এমন অনাছিষ্টি হয় নি পিরথিমিতে এখনও......তুই যেগে, নে ওঠ্।"

"আমি যাবুনি, বলুনি আমায়,—আ[illegible] মাকে ছেড়ে থাকতে পারবুনি [illegible] পারবুনি।"

"যাবি নি! অমন বর, পড়ে থাক[illegible] এখন আদিখ্যেতার মাথা-কোটা, তখন [illegible] কোটা কাকে বলে দেখবি।"

এই আমিই চললুম দখল করে নি[illegible] তুই তবে থাকগে আমার বুড়োকে নিয়ে... গেরামও ছাড়তে হবে নি, ঘরও ছাড়[illegible] হবে নি। হুড়কো মেয়ে কি হয় না [illegible] —তা বাপের কালে তোর মতন হুড়কো দেখলুম নি বাছা!......উৎপরিক্কে!"

সত্যি কি আমার মুখের কথাই বললে নাকি বুড়ি?—যেমন মেয়েটার পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

শেষ যা দেখলাম—অনেক দূর থেকে—মেয়েটি বুকে কাপড় চেপে উঠে পড়েছে। হয়তো ক্লান্তি, একটু দম নিয়ে আবার পড়বে কামড়ে। আমার কাহিনী কিন্তু ঐখানেই শেষ করে দিলাম। যাবে বৈকি, যাবে।......বেশ ছেলেটি, গোলগাল, বউ নিয়ে যেতে ভালো করে চুল ছাঁটিয়ে তেল-চুকচুকে হয়ে এসেছে। আজ বিকেলেই কিম্বা কাল, বউয়ের তাত রোদের তাতের মতো যখন বেশ পড়ে এসেছে—চাকা ডুবতে ডুবতে যাতে বাড়ি পেঁছে যাওয়া যায় এই রকম আন্দাজ করে বেরুবে দুটিতে।......এই গ্রাম থেকে নেমে ঐ মাঠ, চওড়া। আলের ওপর দিয়ে রাস্তা, কোন রকমে দুজনে যাওয়া যায় পাশাপাশি। চলেছে দুটিতে, ছেলেটা আগে, বউ পেছনে......ছেলেটা হন হন করে

চলেছে বলে মেয়েটা পড়েছে পেীছিয়ে......কি মতলবখানা—আবার পালাবে নাকি?...দাঁড়িয়ে পড়ল ছেলেটা।......বার দুয়েক এ রকম হবার পর দুজনে পাশাপাশি হয়ে গেল। তখন অনেকটা দূর। দূর বলেই তো হয়েছে পাশাপাশি, মেয়েটা একবার ঘুরে দেখলে, এত তাড়াতাড়ি যে ভাব হয়ে গেল, এরা কেউ দেখছে নাকি?

আমার গল্পটি ফুরাল।

রেলে আর রাস্তায় হাত ধরাধরি করে চলেছে। অদ্ভুত লাগছে। রেল জিনিসটা বরাবরই আভিজাত্য-গর্বিত; খানিকটা উঁচু, অনেকটা আলাদা, খানাখন্দর, আগাছার জঙ্গল, তারের বেড়া এই সব দিয়ে আর সব কিছু থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে চলে নিঃসঙ্গ, নিরালা, নিষ্ঠুরও; ওর সঙ্গে মিতালি করতে গেলে কখন কী যে ঘটাবে কেউ বলতে পারে না। রাস্তা যদি কোন একটা এসেই পড়ল পাশে তো, একটি সসম্ভ্রম দূরত্ব রক্ষা করে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে চলে, একটা গুমটির মুখে যদি নেহাৎ গা-ঠেকাঠেকি হয়ে গেল একবার তো তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে আবার নিজের সাবেক দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড বেগে রেল যাচ্ছে বেরিয়ে, ধূলি-ঝঞ্ঝার ভর্ৎসনা তুলে, দুদিকে লোহার গেট চেপে মুক দিস্ময়ে দাঁড়িয়ে আছে যত সব পথচারী—বাস, লরি, মোটর, সাইকেল, গোরুর গাড়ি; পদচারীও, ছাগলের পাল, রাখালের দল।

এখানে সেই সড়ক যেন শোধ নিচ্ছে। এক এক করে গোটা তিন লরি পেছন থেকে এসে আমাদের ছাড়িয়ে বেরিয়ে গেল, হাত-চারেকের তফাৎ রেখেই— গরম পিচের সঙ্গে নরম চাকার সংঘর্ষে একটা কর্কশ ব্যঙের মতো শব্দ উঠেছে। একটায় ইঁটের গাদা, তার ওপর জনাতিনেক পশ্চিমা কুলি বসে কানে হাত দিয়ে গান ধরেছে (ওরা এ অবস্থাতেও পারে), সুদূরস্থিতা কোনও 'দুলারিয়া'র উদ্দেশে, যে সঙ্কোচবশেই দয়িতের সঙ্গে পা ফেলে চলে আসতে পারলে না বলে ঘরের কোণেই রইল পড়ে।......কার কবেকার দুলারিয়া জানি না, তবে আপাতত গানটা যে আমাদের ফলতা-মেলকেই উদ্দেশ করে তাতে ওরা সন্দেহের কোন অবকাশই রাখে না।......অনেক খানি বেরিয়ে গেল ওরা, ইঞ্জিনের কাছে গিয়ে খানিকটা ঝুঁকে গানটাকে আরও জোর করে দিয়ে তিনটে হাত দিলে বাড়িয়ে—'দুলারিয়া গে!—দুলারিয়া!— দুলারিয়া—দুলারিয়া!!......"

বোধহয় আবক্ষ-শ্মশ্রু ড্রাইভার রহমৎ শেখই। পোড়া কপাল বেচারির!

দু'টো বাসও গেল বেরিয়ে। একটা সাই-কেলও চেষ্টা করলে; অবশ্য এতটা কি হয়? এখনও চন্দ্রসূর্য আকাশে উঠছে।......কিন্তু আমি বলছি ওর অশ্রদ্ধার বহরটার কথা। একটা বিচালির গাড়ির গাড়োয়ান পর্যন্ত বলদের লেজ মলে কি মন্ত্র ঝেড়ে দিলে।... অ্যাং যায়, ব্যাঙ যায়, খলসে-পুঁটিরও কি একটু সাধ হতে নেই?

ফলতা-মেল যাই মনে করুক, আমার কিন্তু লাগছে বড় ভালো—দুটি দ্রুত স্রোতে জীবনের এই গা-ঘেষাঘেঁষি করে বয়ে যাওয়া—পরস্পরকে সঙ্গ দান করে, তা যতই হোক না কেন হাসি-বিদ্রূপ, জয়-পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে।

এক নম্বর হল্ট। স্টেশন ঘর বলে কিছু নেই; পাশে হাট বসেছে, তারই খাতিরে গাড়িটা একটু বেশি করে দাঁড়িয়ে রইল।

নিজের খেয়াল নিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে হাটের কেনাবেচা দেখছি, হঠাৎ একটা সোরগোলে সচকিত হয়ে উঠলাম।

আমার পাশেই যে কামরাটা, দুখানা বেঞ্চ নিয়ে, তাইতে একটি ছোট পরিবার উঠেছে; কর্তা একজন প্রৌঢ়, বৃদ্ধ বললেও ভুল হয় না। রোগাই, একটু কুঁজো, মাথার চুলগুলি পেকে এসেছে, গায়ের রংটা বেশ মাজা, একটু লালচে।

আরও লালচে হয়ে উঠেছে রেগে টং হয়ে রয়েছেন বলে। সঙ্গে যে একটি মহিলা রয়েছেন তাকে স্ত্রী বলেই মনে হোল, তবে যেন দ্বিতীয়পক্ষের; আধা-ঘোমটা দেওয়া পাড়াগেঁয়ে গিন্নিবান্নি গোছের মানুষটি; মুখটি ভার ভার রা নেই তাতে। একটি তের চোদ্দ বছরের মেয়ে আর একটি বছর দশেকের ছেলে; দুটিই ফুটফুটে, বিশেষ করে এ সব পাড়া গাঁ অঞ্চলে অমন একটি মেয়ে চোখে না পড়বারই কথা।

কর্তা যে একটা বকুনি মুখে করে উঠে-ছেন তারই জের টেনে বলছেন—"আমি বলিনি তখুনি সে খরচ করে, মেহনৎ করে যাওয়াই সার হচ্ছে, ঠিক ঐখেনে এসে আটকাবে? ফলল কি ফলল না? সে বন-হাটীর বাচস্পতিদের বংশ, আজ ইংরিজী ঢুকেছে বলে শাস্ত্র জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার মেয়ের চেহারা দেখেই সে হামড়ে পড়বে এতো হয় না। অপদস্তই হোতে হোল তো? আর সেটা হোল তোমার কথা শুনে ছুটে গেলাম বলেই তো?......স্ত্রীবুদ্ধি প্রলঙ্করী, সে কি আর সাধ করে বলেছে? বলেছে অনেক দেখেশুনে অনেক ভেবেচিন্তে এই রকম অনেক ঘা খেয়ে।"

গৃহিণী নিরুত্তর, যেন এ ধরণের ব্যাপার সয়ে সয়ে ঘাটা পড়ে গেছে। চেহারার কথায় মেয়েটির চোখদুটি অবাধ্যভাবেই কয়েকটি মুখের ওপর গিয়ে পড়ল, রেঙে উঠল বেচারি। কর্তা বলেই চলেছেন—"বিয়ে আর হোতে হবে না, থুবড়ি হয়েই থাকবে, এই লিখে রাখো, বলে দিচ্ছি। আর যাতা একটা ঠিকুজী গড়ে আমি তঞ্চকতা করতে যাব এই যদি তোমার বিশ্বাস থাকে মনে তো তোমার বিশ্বাস নিয়ে তুমি থাকো। আমার ঠিক লগ্নটি চাই—একেবারে ঘণ্টা মিনিট পল অনুপল বিপল ধরে—মনে করে দিতে পার, সঙ্গে সঙ্গে তোয়ের করে দিচ্ছি ঠিকুজী, না পার, থাক্, রইল তোমার মেয়ে। একটু সময়ের এদিক ওদিক হোলে কি আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়ে যায় জানো? শেষকালে ভুল ঠিকুজী খাড়া করে একটা অঘটন ঘটাই আর কি!"

"কেউ সাধছে।"

—এতক্ষণ পরে এইটুকু মন্তব্য। কর্তা একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন।

"সাধছে না কেউ! কেন সাধতে যাবে? গরজটা আর কারুর নয়তো, তাই এই ঘাড়ে

করে করে টাঙিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি—কে দয়া করে নেবে গো আমার মেয়ে, কে দয়া করে নেবে? গরজ যদি থাকত কারুর তো একটা হিসেব রাখত! এ রকম বেহিসেবীপনা করে আবার মুখনাড়া দিতে তোমরা মেয়েরাই পার! কই, আমি যার যার বেলায় ছিলাম, এ রকমটি হয় নি তো।......'কেউ সাধছে?' —আটকাল না মুখে কথাটা! কেউ সাধে নি, কিন্তু ভোগান্তিটাও কেউ যে কমাবে সে মুরোদ নেই তো!......"

অনেকটা বুঝতে পারছি, এ ধরণের পারিবারিক আলোচনার মধ্যে বসে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠছে উত্তরোত্তর, কিন্তু উপায় নেই বলেই সয়েও আসছে দেখছি। তবু এরই মধ্যে আরও একটু নির্লিপ্তভাব নিয়ে ভালো করে ঘুরে হাটে মনোনিবেশ করতে যাব, আবার, এমন সময় একটা সুরাহা হোল।

আগেকার মতোই আচম্বিতে আমাদের গাড়িরই পেছন থেকে একটা বাজখেঁয়ে গলা উঠল—"রাঙা দিদি যে গো!......শুনেনু ভেয়ের বাড়ি গেছলে বাচপোতদের ঘরে মেয়ে দেখাতে, তা হোল পছন্দ তেনাদের?"

ঘুরে দেখি গাড়ির একেবারে শেষ কামরায় কখন জনপাঁচেক নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক উঠে পড়েছে। যার গলা তার চেহারা দেখেও সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফেরানো গেল না। যেমন লম্বা, তেমনি আড়ে, তবে ঢিলেঢালা নয়, বেশ আঁটোসাঁটো; মাথায় কদমছাঁট কাঁচাপাকা চুল; তুলসী কাঠির দু ছড়া কণ্ঠীমালা গলায় এঁটে বসে রয়েছে, এদিকে প্রশ্নটা করার সঙ্গে সঙ্গে ওদিকেও আরম্ভ করে দিয়েছে একদফা, দুটি যে পুরুষযাত্রী বসে রয়েছে তাদের সঙ্গে—"তোমাদের এবার উদিকপানে গিয়ে বসলেই হয় না হ্যাঁগা?... কাকে যেন বলচি!"

উত্তর হোল—"কেন, দোষটা কি হয়েচে? জায়গা তো কম নেই।"

ছোট ছোট পুটুলিগুলো ঠিক করে রাখছিল, দুটো কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল—

"অ!......বস!......তাই তো গা, পাঁচটি মেয়েলোক একত্তর হয়েচে, একটু লবনারী হয়ে মাঝখানটিতে বস, না?—তাতে দোষটা হয়েচে কি এমন! ....না, না, উঠতে হবে না, ঐ রকম লউবর হয়ে থাকো বসে—দু নয়ান ভরে দেখি একটু......ওকি, পোঁটলা নিয়ে উঠলে যে, ও শ্যামরায়!......"

ততক্ষণে দুজনে বেঞ্চ টপকে এদিকে এসে মুখ ঘুরিয়ে বসেছে।

গিন্নি বললেন—"পালবউ যাচ্ছে, আমি যাই ওদিকে গিয়ে বসিগে, অবু, তুই যাবি? —তো আয়।"

মেয়েটি তো নিষ্কৃতি পায় তাহলে। দুজনে নেমে আবার ও কামরায় বসার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিলে। ছেলেটি রইল বাপের সঙ্গে।

কর্তা একটু কলহপ্রিয়, অন্তত বকা-রোগ আছেই, একলা পড়ে গিয়ে একটু যেন অস্বস্তির মধ্যে চুপ করে রইলেন, তারপর ঘুরে গলা তুলে বললেন—"পালবউ যে! চলেছ কমনে সবাইকে নিয়ে?......কি যেন মেয়ে দেখাতে নিয়ে যাবার কথা জিগ্যেস করছিলে। তা গিয়ে বসেছে তো ঘেঁষে, দেখোনা কি উত্তরটা পাও।"

পালবউ গিন্নির মুখের পানে চাইতে তিনি মাথাটা নেড়ে অস্ফুট কণ্ঠেই জানালেন—হোল না।

কর্তা এদিক থেকে বললেন—"ঐ নাও, শুনলে তো?—এক কাঁড়ি টাকা রাহাখরচ, মেহনৎ—সব জলে। এখন একবার জিগ্যেস করো না। হোল না'টা কিসের জন্যে। ও'র মুখেই শোন, আমি বললেই তো গায়ে বিষ ছড়াবে, মুখ বুজেই থাকতে চাই।"

ওদিকে নিম্ন কণ্ঠে কি একটু কথা হোল, গাড়ি ফুল স্পীডে, ঝরঝরানির মধ্যে শুনতে পাওয়া গেল না। তারপর পালবউ সবাইকে ডিঙিয়ে সেই সাবেক গলায় প্রশ্ন করলে—"বলি, হ্যাঁ চাটুজোমশাই, একি শুনি আজগুবি কথা,—নাকি মেয়ে খুব চোখে লেগেছিল, সুদু ঠিকুজীর জন্যে সব ভেস্তে গেল!"

"কথাটা আজগুবি?"—কর্তার গলা গাড়ির আওয়াজ ছাপিয়ে পেঁছুল ওদিকে।

"নেও! তাহলে আর আজগুবি কাকে বলে?......বলি লোকে যে সংসার-ধম্মো করবে তা ঠিকুজীর সঙ্গে না মানুষটোর সঙ্গে?......এই যে সোনার চাঁদের মতন মেয়ে, এই কাত্তিকের মতন ছেলে—বলি, এসব তোমার ঠিকুজী দিয়েচে না, এই লক্ষ্মী-প্রিতিমে?"

আমি বেশ ভালো করে ঘুরে বসলাম, পালবউয়ের কথার একটাও বাদ গেলে আফ্সোসের অন্ত থাকবে না। তর্কটা নবদ্বীপের ন্যায়ের টোলে ঘায়েল হতে পারে, কিন্তু আপাতত চুপ করিয়ে দিয়েছে কর্তাকে। অবশ্য যেমন দেখছি কথাবার্তায় কিছু পর্দা থাকবে না। তা না থাক, যেখানকার যা রীত, আমিই বা কেন কানে ঘোমটা দিয়ে বসে থাকি? আর, অতি-পর্দাটা কি একটা রোগ নয়?—অতি-সভ্যতার একটা ন্যাকামি নয়?

থাবা খেয়ে কর্তা একটু অপ্রতিভও হয়ে পড়েছেন, আমার দিকে চেয়ে নিম্ন কণ্ঠে বললেন—"মেয়েছেলের সঙ্গে তর্ক......নিন, কি করে বুঝবেন, বোঝান্।"

অবশ্য চুপ করেই রইলেন না, উত্তরটাতে একটু দেরি হোল, এই যা—

"তা বলে ঠিকুজী চাইবে না? এ যে নতুন ধরণের কথা বলছ তুমি। আবার অতবড় পণ্ডিতের বংশ।"

"তা ভালোই তো, পণ্ডিতের বংশ তো গড়ে নিক ঠিকুজী। কলুর বাড়িতেও তেল পেড়ে দিয়ে এসতে হবে?"

গিন্নির ঠোঁট দুটি ব্যঙ্গের হাসিতে কুঁচকে উঠেছে, লজ্জার মধ্যে মেয়েটিও ফিক্ করে হেসে মুখটা ফিরিয়ে নিলে।

কর্তা আমায় সাক্ষী মানলেন—"দেখলেন তো?"

দুবার সাক্ষী মানলে একটা লোক, কতকটা সে জন্যেও আবার কতকটা তর্কটাকে চালু রাখবার জন্যেও আমি মুখটা আড়াল করে নিয়ে চাপা গলায় বললাম—"তেল পেড়ে না হয় নিলে সে, কিন্তু সরষে জোগান্ দিতে হবে তো?"

কর্তা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, গলাটা আরও একটু তুলে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ, বলি তেল পেড়ে না হয় নিলে, কিন্তু সরষে জুগিয়ে দিতে হবে তো? সেইখানেই যে হয়েছে গলদ, জিগ্যেস করো না। সন্তান যে জন্মাল একটা তার একটা তিথিক্ষণের হিসেব রাখবে তবে তো?"

গিন্নি পালবউকে নিম্ন কণ্ঠে কি বললেন পালবউ বললে—"কেন, তার হিসেব তো রয়েছে, রাঙা দিদি বললে ঐ।"

"শুধু সন আর তারিখ—তাতে ঠিকুজী হয়? একেবারে ঘড়ি ধরে কটার সময় হোল —কত মিনিট, কত সেকেন্ড তা না ধরে দিলে ঠিকুজী করা চলে?—এক পল কি এব অনুপলের এদিক ওদিক হোলে যে

আসমান-জমিন তফাৎ হয়ে যাবে গণনায়। ফিস ফিস করে তো পাশে বসে জোগান দিচ্ছে, জিগ্যেস করো তো, তার একটা হিসেব রেখেছে?"

পালবউ হাঁ করে শুনছিল, যেন এমন উদ্ভট কথা সে বাপের জন্মে শোনে নি; শেষে হোলে গালে আঙুলের চারটে ডগা চেপে বললে—হ্যাঁগা, চাটুজ্যে মশাই, আপনি বলতে পারলে কথাটা?—লোকে বলে গর্ভযন্ত্রণা, একটা পুনর্জন্ম, জগৎ তার কাছে তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, কোন রকম করে খালাস হলে বাঁচে, আর সে কিনা চৌধুরীদের নতুন বউয়ের মতন কব্জিতে ঘড়ি বেঁধে হিসেব করবে কটা বেজে ক' মিনিট হোল......আবার বলচ কত পল, কত হ্যাকো, কত চ্যাকো......"

কানে তোমার নিশ্চয় লাগছে একটু। আমার কিন্তু একেবারেই লাগে নি। সমস্তই তো আপেক্ষিক, ষোল আনাই নির্ভর করে কি পরিবেশের মধ্যে কথাটা পড়ল বা ঘটনাটা ঘটল। তুমি চিঠিটা পড়ছ হয়তো তোমার বৈঠকখানায় বসে, সভ্যতা আর সুরুচির নিদর্শন মেঝে থেকে নিয়ে ছাত পর্যন্ত, দেওয়ালে একটা বিলিতী নগ্ন চিত্র থাকলেও তা আর্টের রক্ষাকবচে আঁটা। এ হেন জায়গায় বসে নীরবে পড়ে গেলেও তোমার কানে লাগবে। অথচ শুনেও আমার কানে এতটুকু লাগে নি—শোনাও কেমন, না একেবারে সাক্ষাৎ, শোনাকথা, শোনা নয়; একেবারে শ্রীমুখ থেকে নির্গত; 'হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস্' নয় যে একটা আড়াল আছে, স্বয়ং হিজ্ মাস্টার। শুধু কি তাই? যাকে উপলক্ষ্য করে বলা সেও হাত কয়েকের মধ্যে, খান কয়েক খর্ব বেঞ্চে এতটুকুও আড়াল সৃষ্টি করতে পারে নি।......ঐ একটি মানুষই মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিয়েছিল—যদিও ওকালতিটা লেগেছিল নিশ্চয় বেই মিষ্টি—বাকি সবাই নির্বিকার—যেন এতবড় সোজা আর ঘরোয়া কথা যেন আর য় না, পালবউ যা বললে, তা যেন একটা নিত্য দিনের সমস্যার চরম মীমাংসা। এ বদ-সুক্তের ছন্দ বদলানো চলবে না, আর শুদ্ধ সংস্কৃত নয় বলে যদি এর ভাষা সংস্কার করতে যাও তো সমস্ত জিনিসটুর মর্যাদাই করা হবে নষ্ট।

গাড়ি এসে উদয়রামপুরে দাঁড়াল।

এইখানেই একটা কথা বলে রাখি। 'পৈলান' নিয়ে সেই গল্পটার কথা। সেটা আর একটু এগুলে; তার নায়িকা পেয়ে গেছি, ঐ পালবউ।

উদয়রামপুরকে ফলতা লাইনের এলাহাবাদ বলতে পার; এ পর্যন্ত যতগুলো জায়গা পার হওয়া গেল তার মধ্যে সবচেয়ে জমকাল। স্টেশনের ধারেই চমৎকার একটি বাগান, মাঝখানে লম্বালম্বি একটা পুকুর, বাঁধানো ঘাট, একটি বেশ শৌখীন বাড়ি। বড় চমৎকার লাগল। একটা দুঃখের কথা তোমায় বলি—বাঙলা দেশে এলে আমি একটা জিনিসের অভাব বোধ করি বড্ড বেশি করে—ফুলের বাগান। যেখানে জায়গার অভাব সেখানে দুটো ভালো ফুলের গাছই থাক্ না হয়, তাই বা কৈ? অথচ গাছ পোতে বাঙালী, বরং বাতিকই আছে গাছ পোতার, কিন্তু শুধু আম-জাম-কাঁঠাল-জামরুল, সুপারি-নারকেল; প্রায় সব বাড়িতে ঢুকেই আলো, রোদ আর অবাধ হাওয়ার অভাবে আমাদের ওদিক'কার লোকের যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। ফুল কৈ?—ক্বচিৎ এক আধটা মল্লিকা কি গন্ধরাজ, কাজের গাছের আওতায় যেন কুঁকড়ে-মুকড়ে আছে—অনেক অভিভাবকের বাড়িতে নূতন বধূর শঙ্কিত গীতের মতো; কোথায় একটু নিরিবিলি কোন জানলার ধারটিতে বসে গুন গুন করে গাওয়ার সাধ মেটাচ্ছে।

বলবে—শখ যে করবে, তার জন্যে মানুষ হওয়া চাই তো,—আঘাতে অভাবে যে সেস্তর থেকে নেমেই আসছে বাঙালী।...... পুরোপুরি সায় দিতে পারলাম না। শখ আছে বৈকি, তবে ধারা গেছে কেমন বদলে—রাস্তায় দুর্ভিক্ষের মড়ার ভিড় ঠেলে যে বাঙালী সিনেমায় ভিড় জমাতে পেরেছে তার শখ নেই বললে তার প্রতি অবিচার করা হয়। একটা মিটিং হোলে আর্টের ঘটায় আসল জিনিস চাপা পড়বার উপক্রম হয়। আর্ট অর্থে অবশ্য আধুনিক সঙ্গীত আর ডাগর মেয়েদের ওরিয়েন্টাল ডান্স; বরং বললে দোষ হবে না, এই আর্টের জন্যেই মিটিং অনেক ক্ষেত্রে, সাহিত্য, সংস্কৃতি একটা উপলক্ষ্য।......এতেও কেমন করে বলি শখ নেই? আসলে ঐ যা বললাম—ধারা গেছে বদলে। এত জায়গায় যাই, কোথাও একটু ফুলের বাহুল্য দেখলাম না, ফুলের উচ্ছ্বসিত আলোচনা একটু কানে গেল না। অথচ আমি আশা করেছিলাম জাতিগত হিসাবেই আমাদের স্থানটা এ বিষয়ে ভারতবর্ষে সবার ওপরেই হবে। ফুল আমাদের শখ না, প্রয়োজন। ভাগ্যিস গোটা কতক ঠাকুর এখনও ভয় দেখিয়ে, চোখ রাঙিয়ে বেঁচে আছে, ভাগ্যিস বিয়ে ফুলশয্যাটা হচ্ছে এখনও, ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে, ভাগ্যিস বছরে দু একটা সভাপতি কি প্রধান অতিথি হবার নিমন্ত্রণ জোটে কপালে তাই ফুল দেখতে পাই একটু, নইলে এও বন্ধ হোত। জাতিচরিত্র প্রকাশ পাবে সব জায়গায়ই। আর একটু উঁচুতে উঠে দেখো না,—ইডেন গার্ডেনের মতো একটা সত্যিকারই নন্দনকানন বাঙালীর হাতে পড়ে মারা গেল, এ হত্যাকাণ্ড অন্য কোন জাতের দ্বারা সম্ভব হোত? কার্জন পার্কটা দেখেছ?—লালদীঘি?—একটা আটতলা বাড়িই হাঁকড়ে ফেললে। অন্য কোন জাত হোলে নিজের বুক পেতে দিত, তবু লালদীঘির ইজ্জত নষ্ট করতে দিত না এভাবে—এক ছটাকও জায়গা দিয়ে নয়। শুধু হেদো-গোলদীঘির তেমন কিছু ইতরবিশেষ হয় নি, ও দুটো তখনও ছিল বাঙালীর, এখন তো আছেই, শুধু স্বাধীনতার পর এখন বেশি করে আছে বলে বেশি করেই গেছে।

ইঞ্জিনটা বোধহয় একটু বেশি রকম জখম হয়ে পড়েছে। গাড়ি ছাড়ে না দেখে গলা বাড়িয়ে দেখি ড্রাইভার-খালাসী নেমে যন্ত্রপাতি নিয়ে খুব ঠোকাঠুকি লাগিয়েছে, গার্ড স্টেশন মাস্টারও জুটেছে, বেশ একটু মোচ্ছব গোছের ব্যাপার পড়ে গেছে। নামলাম। রোদটা অনেকখানি নরম হয়ে এসেছে, একটা লোভ হচ্ছে; দেখি যদি সম্ভব হয়।

গিয়ে উপস্থিত হলাম।

"কি মশাই, বিলম্ব হবে নাকি?"

স্টেশন মাস্টার একবার মুখের পানে চেয়ে দেখলেন, তারপর প্রশ্নটা এগিয়ে দিলেন—"কি ড্রাইভার সাহেব, কি রকম বুঝছেন?"

পূর্ববঙ্গের মুসলমান, বড় রেঞ্চটা খুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে—"হালার ইবলিস্ সেঁদিয়েচে, হয়রাণ করবে একটু।"

"কতক্ষণ—বিশ মিনিট—আধ ঘণ্টা?"—আমিই সোজা প্রশ্নটা করলাম।

"বিশ মিনিট কি আধ ঘণ্টা......?"

প্রশ্নটার শুধু পুনরুক্তি করে যেখানটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল সেইখানটায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পকেট থেকে একটা দোআনি বের করলে, খালাসীটার হাতে দিয়ে বললে—"এক বাণ্ডিল বিড়ি নে' আয়। হালার ইবলিস সেঁদিয়েচে, হয়রাণ করবে একটু।"

বোঝা গেল। ইবলিসকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘুরে দেখা যাক না জায়গাটা একটু বলেও রাখলাম স্টেশন মাস্টারকে—"কাছেই একটু দরকার আছে, মিনিট দশেকের মধ্যে আসছি।"

বললেন—"কাছোপিঠে হয়তো যান, হুইসিল শুনলেই যাতে পৌঁছে যেতে পারেন।"

গার্ডসাহেব একটু বেরিয়ে এসে ঠোঁট কুঁচকে বললেন—"যান আপনি। ইবলিস তাড়াবার জন্যে যেরকম ধোঁয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, আমার তো ভয় খোলসাপুর থেকে অন্য ইঞ্জিন আনতে না হয়।"

জায়গাটি বড় স্নিগ্ধ, ঐ কামারের কারখানার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আমার যেন আরও ভালো লাগছিল। একটু উজিয়ে গেলাম। থানা, পোস্ট আফিস, একটু এগিয়ে এসে সেই বাগানটা; খবর নিয়ে জানলাম এখানকার যে জমিদার তাঁর কাছারি বাড়ি। সমস্ত জায়গাটি বড় বড় গাছের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন; রোদ আছে, কিন্তু মুক্ত হাওয়াটা বড় মিষ্ট। বাঁ দিকে রাস্তা থেকে একটা মেঠো পথ নেমে গেছে কতকগুলো গাছপালার মধ্যে, বোধহয় গ্রামের পূর্বসূচনা। একটি চমৎকার রংকরা দোতলা বাড়িও তার মধ্যে আধ-ঢাকা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এইতেই উদয়রামপুর প্রায় ফুরিয়ে গেল। আরও গোটাকতক ঘর এদিকে ওদিকে ছড়ানো, তারপর, জমিদারী কাছারির পরে স্টেশনটা। এদিকে গোটাকতক দোকান। ডায়মণ্ডহারবার রোডের ওপর সব গ্রাম তাদের দৈর্ঘ্য যদিই-বা একটু আছে, বিস্তার নেই। ডায়মণ্ডহারবার রোড যেন এক ধরণের লতা, একটানা চলে গেছে, মাঝে মাঝে শুধু পল্লব-পুষ্প-কিশলয়ে পরিধিটা গেছে বেড়ে।

স্টেশনের কাছাকাছি আসতে ডান দিকের একটা জায়গা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ইঞ্জিনের মেরামৎ চলছেই তখনও, তবে সবাই ওদিকে, একটা মানুষ যে কাজের নাম করে বোশেখের রোদে অযথাই টো-টো-কোম্পানির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা লক্ষ্য করবার মতো কেউ এদিকে নেই। এগিয়ে চললাম। দুটো থাম-বসানো একটা গেট, তার ভেতর খুব বিস্তীর্ণ একটা জমির ওপর দূরে দূরে কয়েকটা বাড়ি, একটা পুকুর, টানা মাঠ, সব তকতকে ঝকঝকে; হঠাৎ এরকম জায়গায় এ ধরণের জিনিস দেখব আশা করি নি। মাঠে গোলপোস্ট দেখে এটা বোঝা গেল যে স্কুল একটা, তবে সাধারণ পাড়াগেঁয়ে স্কুল নয়; সমস্ত ছবিখানির মধ্যে দিয়ে যে সংগতি আর রুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হোল কোনও মিশন স্কুল, রামকৃষ্ণ মিশনের কথাই আগে উঠল মনে। কিন্তু লোক নেই একেবারেই, কাকে জিগ্যেস করা যায়?

আমার সারথী আবার ওদিকে কখন হুইসিল দিয়ে বসেন। ঘুরে দেখলাম, না, ভিড় জমে রয়েছে, ইবলিস বাগ মানে নি এখনও।

দেখি, ভেতরে গেলে যদি কিছু সন্ধান পাই। গেটের ভেতর প্রথমেই একটা পরিখা গোছের, তার ওপর দিয়ে ছোট একটি পুল, বাঁ দিকে একটা আউট্ হাউস্।

কিন্তু কাকস্যপরিবেদনা; লোক নেই একটাও

তারপর একটু দূরে ডান দিকে একটা বাড়ির সামনে নজর পড়ল। বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা তফাতে একটা গাছের নিচে কতকগুলি ছোট ছোট মেয়ে, একটু নূতন ধরণের আগন্তুক দেখে তারাও বিস্মিত হয়ে গেছে, বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার পানে ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে আছে যেন একপাল হরিণ শিশু। এগিয়ে যেতে শঙ্কিত হয়ে পড়ল, কিন্তু পালাবে কি দেখবেই দাঁড়িয়ে সেটা ঠিক করে ফেলবার আগেই আমি গিয়ে পড়লাম।

ফ্রক-পরা, ফিটফাট, সবচেয়ে যেটি বড় সেটির বয়স বোধহয় বছর নয়েকের বেশি হবে না, সব ছোটটি তার বোনের কোলে, বব-করা চুলে একটা নীল ফিতে বাধা, ভাসা ভাসা শঙ্কিত চোখে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে, নূতন দুটি দাঁত নিচের ঠোঁটের ওপর চিকচিক করছে।

এ অবস্থায় হাতটা আপনি গিয়ে পকেটে সেঁদোয়—দুটো লেবেঞ্চুস কি কিছু।...... হায় পোড়াকপাল! শখেরবাজারে গোটাকতক পেয়ারাও যদি কিনে রাখি!

শুকনো ভাবই করতে হোল। ব্যাধের ভয়ে সম্মোহিত হয়ে হরিণশিশুর পাল আটকে গেছে, আবার বাজারের দিকে পা বাড়ালে কি ফিরে পাওয়া যাবে?

"তোমরা কি এখানেই থাক?"

আধ মিনিটটাক সেই রকমই কাটল—নতুন মানুষ দেখে ভয়ই বল বা সংকোচই বল। বেশি নয়, আধ মিনিট, তারপর সেটা গেল কেটে। সঙ্গে সঙ্গেই উল্টো স্রোত, প্রথমে একটি মেয়ের মুখে হাসি ফুটল, বড় একটির, তার ছোঁয়াচে দুটির, তারপরে পাঁচ-ছ'টির, তারপরেই সবার,—মুখ ঘুরিয়ে, এ ওর ঘাড়ে মুখ গুঁজে, সরে গিয়ে, হেসে পড়ে হাসি—শুধুই হাসি, থামতেই চায় না। গুমটের পর আচমকা হাওয়া উঠে একটা পুষ্পিত করবীর ঝাড়কে যেন দুলিয়ে দিলে।

নির্জন জায়গায় নতুন মানুষকে শিশুরা ভূত বলে ধরে নেয়, তা যদি না হোল তো একেবারেই সং, সত্যিকার, সহজ মানুষে দাঁড়াতে আরও খানিকটা পরিচয়ের দরকার হয়। ওদের মনটা একেবারেই বিরুদ্ধধর্মী, তাকে মাঝামাঝি অবস্থায় এনে ফেলতে সময় লাগে।

একটু অপ্রতিভই করে তুলেছে। প্রশ্নটাই বেখাপ্পা হয়ে গেছে নাকি?—যারা এখানেই রয়েছে তাদের জিগ্যেস করা—'এখানে থাকো?'......কাঁদে গামছা, বুকে তেল ঘষতে ঘষতে পুকুরের দিকে যাচ্ছে দেখেও আমাদের মধ্যে প্রশ্ন করা চলে—'এই যে স্নান করতে নাকি?'—ওদের নতুন কান, ভাষার একটুও অসঙ্গতি ওদের মনে খুব বেশি করে সুড়সুড়ি লাগিয়ে দেয়।

প্রশ্নটা পালটে দিলাম—"এটা ইস্কুল?"

"হ্যাঁ, ইস্কুল।"—বড় মেয়েটি, আরও দু'তিনটি মেয়ে একসঙ্গে উত্তর দিলে। একটু দৃষ্টিবিনিময়ও হোল কয়েকজনে, একটু হাসি উঠল ছলকে।

"কি ইস্কুল?"

চুপচাপ। তবে খুক্ খুক্ করে এখানে ওখানে হাসিটা আছে ঠিক। এখন আমি হয়ত আর সং নই; কিন্তু না হাসা যে আবার বোকার লক্ষণ, ভেবেছ ওরা কেউ তাই নাকি?

বরং বেশি চালাক, বোকা বানাতে জানে, ঠাট্টা করতে জানে, মেয়ে বলেই সে শক্তিটা এখন থেকেই ওদের মধ্যে অঙ্কুরিত হচ্ছে। একটি আর একটির ঘাড়ে মুখ গুঁজে বললে—"কি ইস্কুল আবার? পড়বার স্কুল।"

আবার এক ঝলক হাসি, কিন্তু গিন্নি-পনাও হচ্ছে অঙ্কুরিত পাশে পাশেই। বড়টি ভারিক্কে হয়ে উঠল—

"অত হাসি কিসের? বাঃ!"

চোখে বেশ শাসন। আমার দিকে চেয়ে বললে—"না গো, আমাদের এটা মিশন ইস্কুল।"

সবার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে—আর যেন হাসি না ওঠে ও কী ছ্যাবলামি!

প্রোটেক্‌শন্‌ পেয়ে স্বস্তি বোধ হোল। প্রোটেক্‌শন্‌ই বৈকি, দিব্যি অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল, অত বড় একটা প্রেসের ম্যানেজার, তাকে হাসির পাকনায় উড়িয়েই নিয়ে গিয়েছিল একটু হোলে। আশ্বস্ত হলাম. সেই সঙ্গে সাহস এল ফিরে, নিজের বয়সের গুরুত্বটা অনুভব করলাম, যেমন বলা উচিত, বললাম—"আহা, হাসুক না হাসবে না? তেমারা সবাই ছেলেমানুষ এখন, ওরা হাসবে।"

"আমি তাবলে ছেলেমানুষ নয়"—বড়টি আপত্তি জানিয়ে আরও গম্ভীর হয়ে ঠোঁট দুটো চেপে রইল। "আমারও জন্মতিথি হয়েছিল কাল আট বছরের।"

—গম্ভীর; অথচ এইটিই ছিল এতক্ষণ হাসির পাণ্ডা। এইটির কোলেই সেই খুকীটি. তার মাথাটা কাঁধে চেপে মস্ত বড় দিদির মতো ডাইনে বাঁয়ে আস্তে আস্তে দোলাতে লাগল। ওপাশ থেকে একজন সাক্ষী দিলে—"হাঁ, কেক হয়েছিল, পুডিং হয়েছিল।"

ভয় গিয়েছিল, চপলতাও গেল; বড়র দল যা! ভেতর থেকে একজন এগিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে, এক লহমার একটু সঙ্কোচ. তারপরেই সোজা মুখটা তুলে বললে—"আল্‌মাল বাবা আমাকে বলে বুলি।"

একটু চুপচাপ, সেও মাত্র এক লহমার। ...ড হওয়ায় ওই বুঝি বাজিমাৎ করে নিলে! তারপর সবার বড়টি ঘাড় বেঁকিয়ে একবার ঘৃণার দৃষ্টিতে চেয়ে নিয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে হেসে উঠল, বললে—"বুড়ি বলে ...ই বুড়ি হয়ে গেল! ঠাট্টা বোঝে না।"

কাছে টেনে নিলাম। সাবান দেওয়া নরম চুলে একটি রাঙা ফিতের ফুল, পুরন্ত তুলতুলে গাল, স্পর্শে আমার সমস্ত দিনটি যেন মোলায়েম করে দিলে—বুকে তুলে নিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বুড়ো মানুষকে হঠাৎ অতটা খেলো করা ঠিক হবে কি?—ওদের মন আবার বড় ঠুনকো—বুঝুক না বুঝুক, এই ঠাট্টার টিপ্পুনীটাতে গম্ভীর হয়ে গেছে —কে জানে কি ব্যাপার? কোলে নিতে গেলে বোধ হয় উল্ট উৎপত্তি হয়ে পড়বে; ঠোঁট উঠবে থরথরিয়ে কেঁপে, তারপরেই চোকদুটি ভেসে উঠবে জলে। সামলাবার চেষ্টা করেই বললাম—"বাঃ. বুড়ি না? তোমাদের কারুর আঠ, কারুর নয়, ওর বয়েসের তো হিসেবই নেই, না গা বুড়িমা?" জোরে মাথা দুলে উঠল, বললে—"হ্যাঁ, তাল বচোল!" চারিদিকে একেবারে ছলছলিয়ে উঠল হাসি— "চার!...চার!...ওমা চার বছরের বুড়ি!..."

তাড়াতাড়ি তুলেই নিতে হোল কোলে। কিন্তু না, সুরেই সুর মিশেছে; মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠল..."তাল বচোলের বুলি!"

জাতে উঠে গেলাম। কোলেও উঠেও না— কাঁদা মানে আমি আর অপাঙক্তেয় নই, আমার বয়সের জঞ্জাল থেকে 'শুদ্ধি' ক'রে আমায় আপন ক'রে নেওয়া হোল। এ-সব ব্যাপারে সব ছোটই হোল সমাজপতি, তার হাতেই জাত পাঁতের ফেণি-বাতাসা।

এইবার আনন্দ ভোজে অবাধ মেলামেশা। কিন্তু ফলতা মেল বাদ সাধলে, বাঁশি উঠল বেজে।

পা'টা আপনা হ'তেই এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল, থমকে দাঁড়িয়ে বললাম—'এবার যাই।'

'তাল বচোলের বুলি'—কেও কোল থেকে নামাতে যাব, সে জড়িয়ে ধ'রে মুখের পানে চেয়ে বললে—'তাকো।'

রবটা সবাই তুলে নিলে—'থাকুন—থাকুন— না, যেতে পাবেন না, থাকুন। ...দোহাই না যেতে—কক্ষণই না...'

ঘিরে দাঁড়াল। ওদের দখল অপ্রতিদ্বন্দ্ব. তার মাঝখানে কেউ এসে দাঁড়াবে না. কিছু এসে দাঁড়াবে না।...আর একটা ডাক সঙ্গেই আরও তিনটে। এগিয়েই বললাম—"না, আমায় যেতেই হবে ঐ গাড়িতে. শুনছ না —হুইসিল দিচ্ছে?"

গড়া হ'তে না হ'তেই ভাঙন. সবার মুখে একটা ছায়া নেমে এসেছে—পরস্পরের পানে চাইছে, এবার সত্যিই বড়র মতো কেউ কিছু একটা বলুক না বা করুক না যাতে লোকটা যায় আটকে। না হয় থেকেই যাই? বেড়াতেই তো আসা—যেখানে যা পাই দুটি মুঠোয় ভরতে ভরতে এগিয়ে যাওয়া, তা এর চেয়ে বড় কিছু পাব কি? এ যেন একটি স্বপ্নলোক, চলার পথের পাশেই একটু আড়াল ক'রে রচা,—হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়ে কি ক'রে এসে গেছি, ঘুম ভাঙার মুখে মনটা যেন টনটন করে উঠছে।

আবার বাঁশি, কর্কশ। চলে গেলেই তো পারে, আমিও মনকে একটা জবাবদিহি দিয়ে নিশ্চিন্ত হই, কী এমন অমূল্য সম্পদ আমি যে ফেলে যেতে চাইছে না?

শেষকালে একটা রফা হোল, ওরাও গেট পর্যন্ত চলুক সবাই। যেতে যেতেই পরিচয় পাওয়া গেল আরও খানিকটা। ক্রিস্চানদের মিশন স্কুল, যা জন্মতিথিতে কেক-পুডিঙের ব্যবস্থায় অনেকটা আন্দাজ করেই নিয়েছিলাম। স্কুলে ছেলে পড়ে সব জাতেরই, ছেলেও আবার মেয়েও। না, মাস্টার মশাইরাও সবাই ক্রিস্চান নয়—এই তো সন্ধ্যা, ওরা হিন্দু, রমা, ওরা হিন্দু—ওর নাম জবা—ওর নাম মালা,—'ওগো, আমাল নাম দলি', কোলেরটি আমার মুখটা ঘুরিয়ে নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে বললে।

স্কুলে এখন গরমের ছুটি। হেড মাস্টার মশাই এখানেই আছেন আর আছে এরা সবাই। সন্ধ্যারা চলে যাবে—ওর মাসি রাঁচিতে খুব বড় লোক—সেইখানে যাবে।

"তাই নাকি!"—ফিরে প্রশ্ন করতে সন্ধ্যা ঠোঁটদুটি জড়ো ক'রে একটু গম্ভীর হ'য়ে উঠল, বড় মানুষের বোনঝির যেমনটি হওয়া উচিত। ফ্রকের কোমরের কাছটায় একটু ছেঁড়া, সেইটে মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে বললে—"দুখানা মটোর আছে।"

সবার মুখের ওপর থেকে কতকটা সভয় দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এল,—কোনও হিংসুটী আবার ফ্রকের ছেঁড়ার কথাটা ফাঁস করে দেবে না তো?

গেটের কাছে এসে ফিরে দাঁড়ালাম।

"এবার যাই, কি বল?"

বিহ্বল কতকগুলি চোখ ঠিক একরকম দৃষ্টি নিয়ে মুখের পানে চেয়ে রইল। একী টনটনানি মনের মধ্যে! না এলেই যে ভালো ছিল. অথচ কতটুকুই বা ছিলাম?—সব মিলিয়ে হদ্দ মিনিট পনের।

পেছনে বিদ্যায়তন, প্রশস্ত খেলার মাঠ, তারপর পুকুর তাকে ঘিরে বাড়ি. বাগান; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন. পরন্ত রোদে একটু বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। না, আমারই মনের ছায়া পড়ল?

বড়টি বললে—"আবার আসবেন।"

তারপরেই—"আবার আসবেন ...আবার আসবেন ...আসবেন আবার ...নিশ্চয় আসবেন..."

—ভাষা খুঁজে পেয়ে যেন বাঁচল সবাই, আবার হাসিও ফুটল একটু একটু। ছোটটিকে একটি চুমু খেয়ে নামিয়ে দিলাম; কোল হালকা হ'য়ে কখনও মনটা এত ভারী করে দেয়নি। আর একটি চুমু খেলাম, বললে—"আবাল আছবেন।"

গলাটা টনটন করছে, কথা কইয়ে জবাব দেবার ভরসা হচ্ছে না, আসতে আসতে একবার যে ফিরে দেখব, তারও নয়।

ইঞ্জিনের সে-দোষটা সেরেছে—ড্রাইভার তাই বললে—ইবলিস এখন বাঁশিটা করেছে আশ্রয়। অতগুলো যে শব্দ ওটা আমার ডাক নয়, 'সে হালার পো' কোথায় ঢুকে বসে আছে, তারই অনুসন্ধান চলছিল।

প্রশ্ন করলাম—'দেরি হবে?'

'হালাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিমু।'

গার্ড আর স্টেশন মাস্টার ওদিক থেকে এলেন। স্টেশন মাস্টার বললেন—"খোলসা-পুরে বলেই দিয়ে এলাম মশাই পাঠিয়ে দিতে একটা ইঞ্জিন। পুরো এক বাণ্ডিল বিড়ির ধোঁয়া, তাইতে বড় গেল ওর ইবলিস তো ফু'য়ে যাবে!"

জিগ্যেস করলাম—"কতটা দেরি হবে মনে করেন?"

"এই কোয়ার্টার তিনেক; এক ঘণ্টার মধ্যেই যাবে ছেড়ে।"

পুরো এক ঘণ্টা সময় নিয়ে উদয়রামপুরে কি করতে পারে লোকে মাথায় আসছে না; দেড় গজের শহর, সে তো এমুড়ো ওমুড়ো দেখা হয়ে গেল। মিশন স্কুল? না, মায়ার কাঠি হাতে ক'রে রয়েছে সবাই, পনের মিনিটেই যা অবস্থায় বিদায় হ'তে হয়েছে, একঘণ্টা দিতে সাহস হয় না।...টানছে বৈকি —তবে জীবনে মাঝে মাঝে 'মোহমুদ্গরটা' ভেঁজে নেওয়াই নিরাপদ।

'আমতলার হাট'টা কতদূর হবে এখান থেকে?—যদি এক কাজ করা যায়, হেঁটে চলে গেলাম, তারপর ওখানে গিয়ে আবার ফলতা মেল। রোদ্দুর এসেছে নরম হয়ে, ডায়মণ্ডহারবার রোডকে খানিকটা এইভাবেই পাওয়া যাক না।

বেরিয়ে পড়লাম। মিশন স্কুলের সামনে দিয়েই রাস্তা। না, কেউ নেই। নতুন অভিজ্ঞতাটা বাড়ি বাড়ি পৌঁছুতে গেছে।... "জবা বললে—ভূত। আমি বললাম—কক্ষণও নয়। আর ভূতের কি গা আছে যে, কোলে করবে?—তারা তো শুধু ছায়া—ধোঁয়ার মতন, না গা?"

কিম্বা ছায়ার মতোই মিলিয়ে গেছি মন থেকে। ওদের মন কি ধ'রে রাখতে জানে? —একটাকে মুছে একটা এসে দাঁড়াচ্ছে, এই ক'রে চলেছে নিত্যনূতনের মিছিল।

মিশন স্কুলের গেট দিয়েই একটা লোক বেরিয়ে এল রাস্তার ওপর। কালো, রোগা, খর্ব; চলছে ডান দিকটা ঝুঁকে, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেন; বাঁ কাঁধে বোষ্টমের ঝুলির মতো একটা ঝুলি; বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে; এর চেয়ে বেশি ঠিক ক'রে বলা শক্ত। মাথায় একটা জীর্ণ ছাতা; তালি-আঁটা, একটা শাদা, একটা লাল তালি। এই জিন্ আর সেই পরীর দল—মিশন স্কুলটা কি ক'রে যেন আমার কাছে আরব্য রজনীর বোগদাদ হ'য়ে পড়েছে। তারপর ঘোরটুকু কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে পাশাপাশি হলাম, প্রশ্ন করলাম—"আমতলার হাট কতটা হবে?"

"আজ্ঞে, পোটাক। উই তো দেখা যায়।"

"সত্যি নাকি—ওটাই?—এত কাছে?"

"একই জায়গা তো, উদয়রামপুর হোল থানা, পোস্ট আপিস, আপনার গিয়ে জমিদারী কাচারি নিয়ে; ওটা হোল হাট। জায়গাটা একই।"

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

কি একটা নাম বললে, মনে পড়ছে না।

"আমতলার হাট থেকে কতটা দূর?"

"আমতলার হাট ছেড়ে খানিকটে গিয়ে বড় রাস্তা থেকে নেমে পড়লেন, তারপর মাঠটুকু পেরিয়েই..."

"একটু আস্তে চলো না; এক দিকেই যাচ্ছি, গল্প করতে করতে যেতাম একটু। আমার অত-পা চলে না।"

"রুত্তম কথা, এই যো...আর, আপনাদের ছিচরণ তো চলবার জন্যে নয়, তা কেন যাবে চলতে? আর, এই যে দেখছেন এক জোড়া খুঁটি ওপরের চালাটাকে টাঙোনে রয়েছে, এই দুটোকে ডাইনে চেলে ছেড়ে দিয়েছে কিনা, থামবে একেবারে কবরের সামনে গিয়ে।"

"হাঁটাহাঁটির কাজ বুঝি?"

"রুদয়রস্ত। উপস্তিন এই; আর সমস্ত শরীলটা ঘুমুতেও তো পায় না আজ্ঞে।"

"বুঝলাম না।"

"কাল রেতের কথা। আরফানের মা তাগাদ দিচ্ছে—নাও, ওঠো বেরুতে হবে নি? মন সব যে তোয়ের হয়ে গেল।...বলচি—দাঁড়া, আগে পাদুটো ফিরে আসুক।...ঘুমুচ্চি, তাও মাজাটুকুন পজ্জন্ত, পা দুটো ঝুলি কাঁধে ক'রে ফিরি করতে বেরিয়ে গেছে—হালসা —গোবিন্দপুর —টিমটিমে —ভাসা..."

ফিরে চেয়ে একটু হাসলে। কথাটা বেশ পরিষ্কার হয়নি দেখে বললে—"স্বপন আজ্ঞে। পা দুটো দেখচে হেঁটে বেড়ানোর স্বপন, মাজার ওপরটা দেখচে আরাম করে নিদ্রে দেবার স্বপন। যার যে রকম অভ্যেস আর কি, আর যেটা যে রকম কপাল করে এয়েচে।"

ফিরে একটু হাসলে। জমিয়েছে ভালো, আলাপটা চালাবার জন্যেই আমিও একটু
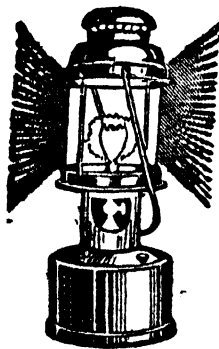
হেসেই বললাম—"কিন্তু কোমরের ওপরটাই বা সর্বদা ঘুমিয়ে কাটাতে পারছে কৈ বলো। তাকেও তো ঘুরে ঘুরেই বেড়াতে হচ্ছে।" "হক্ কথা। কিন্তু সেতো চতুর্দ্দোলায় চড়ে, সেটাও হিসেব ক'রে দেখতে হবে তো। পা দুটোকে উঁদিকে নাগিয়ে দিয়েচে—মর হালারা হেঁটে—নিজে লবাব খাঞ্জাখাঁ হয়ে—এই দেখুন না, আবার তার ওপরে ছত্র।"

আরও একটু স্পষ্ট করেই হাসতে যাচ্ছিল, পেছনে মোটর বাসের হর্ন বেজে ওঠায় একটু সন্ত্রস্ত হয়েই স'রে এসে রাস্তার পাশে দাঁড়ালে, আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাসটা উগ্র বেগেই বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাবার পরও একটু দাঁড়িয়ে রইল, যেন ভেতরে ভেতরে হাঁপাচ্ছে। একটু উৎসুকভাবেই প্রশ্ন করলাম—"হোল কি?"

মুখের প্রসন্ন ভাবটা ফিরে এসেছে, একটু হেসেই বললে—"আজ্ঞে হ'তে আর পেলে কৈ...কথাটা হচ্চে, সেই রুদয়রস্ত ঝুলি-কাঁধে হল দেওয়া। সারা শরীলটা টাল খেতে থাকে অষ্ট পহর। তাই শড়ক দিয়ে চলিও মতো, ওই মিশন ইস্কুল থেকে আমতলার ঘাট, স্রেফ এইটুকু, তাইতেও মটোর যদি এলতো গড় ক'রে একেবারে রাস্তার কেনারে সরে দাঁড়াই। উপস্থিতন্ আপনার সঙ্গে গপ্প করতে করতে একটু আনমনা হয়ে গেলাম না?—অতটা খেয়াল করতে পারিনি, মটোর এসে একটু ইয়ে করে দিলে আর কি।" বললাম—"রাস্তা থেকে সরেই চলো এই ঘাসের ওপর, দিব্যি নরম ঘাসও।"

নিজে নেমে গেলাম। এল স'রে কিন্তু ভাবটা একেবারেই গেছে। হেসে বললে—"তা চলুন, কিন্তু ভয় যা করছেন, তাই কিছু নেই আজ্ঞে। হাজীসায়েব বলেন—যে যেটুকু ধার করে এয়েচে, পিরথিমিতে সেটুকু আদা না ক'রে তো যাবার উপায় নেই। আমার মতন কাগজের প্যাকিটে করে এতগুলি চানাচুর ঘরে ঘরে আদা করে ফিরতে হবে—মরে গিয়ে সব মিলিয়ে এত মণ এত সের এত পোয়া এত ছটাক—খোদাতালা সেটা বেঁধে দিয়েছে—দুরকম প্যাকিট। এক ছটাক কি আদ ছটাক—তা সবটুক আদা না হ'য়ে গেলে তো ছাড় নেই—তা মটোর বাসই বলুন, গাই বলুন, ও আপনার গিয়ে মা শেতলাই বলুন, কি ওলাবিবিই বলুন,—কারুর চড়টি দেবার উপায় নেই তো গায়ে একটু।"

হেসে চেয়ে রইল মুখের পানে, সমস্ত-টুকুর মাত্রা হিসেবে বললে—"আজ্ঞে হ্যা, এই হোল সার কথা। হিঁদুর বেদ বলুন, মোছলমানের কোরাণ বলুন, কেরেস্তানদের যীশু বলুন।"

"তা হলে তুমি চানাচুর ফিরি ক'রে বাড়ি ফিরছ? মেহনৎতো বেশ দেখছি, থাকে কি রকম?"

"খোদাতালার যেদিন যেরকম মর্জি: তিন টাকাও থাকে, চারটে টাকাও হয়েচে, আবার গণ্ডা কয় পয়সা নিয়েও খালি হাতে ফিরে এসেচি।"

"মাস গেলে গড়পড়তা?"

"আজ্ঞে তা গোটা তিরিশে থেকে যায়।"

"মোটে?"

"তার যে হেতু রয়েচে, টান এলে তো বেরুতে পারি না, তা এরকম টান মাসে কোন্‌না দশটা দিন আসচে? তাহলেই হিসেব ক'রে দেখুন না।"

"টান?...হাপানি আছে নাকি?"

"ঐ যে বললুম—গড়ে দশটা দিন, বেশিরটা ভালোই থাকি তানার মর্জিতে।"

"চলে কি করে? সংসার কি?"

"সংসার আরফানের মা, আরফান, ছোট মেয়েটা আর এই অধীন।...চলবার কথা নয়, তবে খোদাতালা কষ্ট বলে জিনিসটা আর হ'তে দেয় না।...টানের কথাটা বাদ দিতে হবে আজ্ঞে, কর্তার ছেলো, ছাওয়ালের হবে এ নিয়ম তো বাবা আদমের সময় থেকে চলে আসচে, কেয়ামৎ পজ্জন্ত থাকবে, এতে খোদাতালাই বা কি করবে, আর পীর-পয়গম্বরই বা কি করবে! তবে যাকে কষ্ট বলে সেটা হ'তে দেন না। যেটি ইদিক দিয়ে কুলুলে না, সেটা আরফানের মা পাঁচ বাড়িতে গতরে খেটে পুষিয়ে নেয়। রতিরিক্ত খাটুনি, কিন্তু সেদিক দিয়ে খোদাতালার মেহেরবানি আচে। আরফানের মা যদি কাৎ হোল তো আমি ঠিক আচি, আমি যদি বুক চেপে পরলুম, আরফানের মা ঠিক আচে।...দুজনেও পড়েচি—এমনটা যে না হয়েচে তা নয়, কিন্তু চালিয়ে দিয়েচেন—পাড়ার কেউ না কেউ এসে সামলে দিয়েচে। খোদাতালা কষ্ট দিলেন এমন অধম্মের কথা বলে যে, গুণোগার হব এটুকু কখনও হ'তে দেননি।...আপনি যাবেন কতদুর?"

"ফলতা।"

"আচ্ছা, সেলাম আলেকম। আমি এই অশথতলাটায় নেওয়াজ সেরে নিই রোজ। তারপর বাজার হয়ে বাড়ি ফিরি। এই সময় বাজারটা বসে কিনা। আচ্ছা আমি রয়ে গেলাম একটু।"

"তোমার নামটা জিগ্যেস করা হোল না তো।"

"আজ্ঞে নবাবজান। ঠিক খাটে না বুঝি, তবে বাপমায়ের দেওয়া নাম..."

"খুব খাটে নবাবজান। জানটা নবাব হোলেই তো হোল, তার মানে দিলটা আর কি।"

"আজ্ঞে, তাও বলি খোদাতালাকে—বলি, পাদুটোর জন্যে ভাবি না, য্যাতো খাটাবে খাটাও, কিন্তু ওপরটাকে সাচ্চা রেখে যেও।"

একলা পড়ে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে অনুভবও করলাম যে, রোদটা এখনও দিব্যি কড়া রয়েছে। তা থাক, হাঁটতে কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে। হয়তো নবাবজানের তত্ত্ব-বাদ কিছু প্রেরণা জুগিয়ে থাকবে, কিন্তু আসল কথা, সামনে রয়েছে একটা নিশ্চিন্ততা—দুপা এগিয়ে গেলেই স্টেশন, পেছন থেকে গাড়ি আসছে আমায় তুলে নিতে—এই দুটোর মাঝখানে একটু এই যে হাঁটা, গাড়ি থেকে যে জীবনটাকে আলগোছে ছুঁয়ে যাচ্ছিলাম, তার সঙ্গে এই যে গলা জড়াজড়ি ক'রে চলা এতে একটা নিবিড় আনন্দ পাচ্ছি; একটা ছেলেমানুষী উল্লাস। এই চিঠিতেই কোথায় এক জায়গায় তোমায় বোধ হয় বলেছি যে, একই সময়ে শৈশব থেকে আর যতটা এগিয়ে এসেছি, তার সমস্তটাই উপস্থিত থাকে আমাদের জীবনে। কথাটা খুব সত্যি। সেটাকে প্রকাশ হতে দেওয়া অসামাজিক, বেমানান, কিন্তু নিজের কাছে মনের নেপথ্যে সেটা সুযোগ পেলেই আত্মপ্রকাশ করছে।...একটা ছেলেমানুষী উল্লাস পাচ্ছি আমি, ছেলেমানুষী বলেই তার আকার নেই, তাকে বিশ্লেষণ করা যায় না। গাড়িতে যাচ্ছি—নামলাম, ঘুরলাম, দেখলাম, শুনলাম, আবার গাড়ি, ইচ্ছে করলেই ওঠা যাবে—একটা যেন খেলা, যা এই খেলাঘরের গাড়ি নিয়েই সম্ভব; এর যা আনন্দ, তার সামনে মাথার ওপর ছটাক খানেক বোশেখী রোদ কি পায়ের নিচে তপ্ত পিচ, এসব তো 'তুশ্চু'। এই দিকে শোনাই একটা কথা ব্যবহার করা গেল। (ক্রমশঃ)

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

(২০)

হায়দরাবাদ সমস্যা ও মাউণ্টব্যাটেন। ব্যক্তিগত আগ্রহের প্রশ্ন। পরবর্তী গবর্ণর-জেনারেল রাজগোপালাচারী ও নিজামের আশা। দিল্লীতে আবার লায়েক আলি। সেই পুরণো কৌশল। হায়দরাবাদ সীমানা অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্য। গাঙ্গপুর ট্রেণ আক্রমণের ঘটনা। ভারতীয় জনমতে প্রতিক্রিয়া। সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনে ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তুতি। মাউণ্টব্যাটেনের কাছে নেহরুর একটি প্রতিশ্রুতি। লায়েক আলির প্রতি মাউণ্টব্যাটেন। হায়দরাবাদের ভাগ্য নিয়ে জুয়াখেলা চলবে না। পরিণাম সম্বন্ধে লায়েক আলির প্রতি সতর্কবাণী। রাষ্ট্রভুক্তির প্রস্তাবে লায়েক আলির অসম্মতি। দীর্ঘমেয়াদী চুক্তির প্রস্তাব।

ভি পি মেননের নতুন উদ্যম। নতুন চুক্তির খসড়া। রাষ্ট্রভুক্তির উল্লেখ বর্জন। গণভোটের প্রস্তাবের পক্ষে প্যাটেল ও মাউণ্টব্যাটেন। মুসৌরী থেকে প্যাটেলের নির্দেশ। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিজামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানতে চাই। লায়েক আলির সঙ্গে আর আলোচনা করা বৃথা। এক সপ্তাহের মধ্যে হায়দরাবাদকে চরমপত্র দেবার সিদ্ধান্ত। নেহরুও লায়েক আলিকে বিশ্বাস করেন না। মংকটন আবার হায়দরাবাদে আসছেন। মাউণ্টব্যাটেনের আশা। বিদায়ের দিন আসন্ন। বিদায় সম্বর্ধনার অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেন পরিবার। টিপু সুলতানের বিষণ্ণ ও উদাস মুখ।

সিমলা, শনিবার, ২২শে মে, ১৯৪৮ সাল। মাউণ্টব্যাটেন এবং তাঁর ষ্টাফের সকলেই এখন সিমলাতে রয়েছেন। আমি হায়দরাবাদে যাত্রা করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাউণ্টব্যাটেনও দিল্লী থেকে এখানে চলে এসেছিলেন। আমার এক সপ্তাহের ব্যস্ততা আজ শেষ অধ্যায়ে এসে পেঁছিলো। ফে ও আমি দিল্লী থেকে রওনা হয়ে আজই সিমলাতে পেঁছিছি।

মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হলো। আজকেই দু'বার আলোচনা হয়েছে। আমার রিপোর্ট আদ্যোপান্ত শুনলেন মাউণ্টব্যাটেন।

মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, আমাকে আরও কিছুদিন আগে হায়দরাবাদে পাঠালেই ভাল হতো। আমার রিপোর্ট শুনে মাউণ্টব্যাটেনের এই ধারণাই হয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনের মতে, আমার প্রদত্ত হায়দরাবাদ রিপোর্টের বিশেষ মূল্য এই যে, এতে সমস্যার বাস্তব পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা নয়, অন্য উপায়ে কিভাবে হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধান হতে পারে, তারই পরিচয় এই রিপোর্ট থেকে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যা সম্পর্কে মাউণ্টব্যাটেন ব্যক্তিগতভাবে নিস্পৃহ থাকতে পারেননি। তার একটা কারণ এই যে, নিজামের উপদেষ্টা মংকটনের সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগতভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। তা ছাড়া, মাউণ্টব্যাটেনের মনে এই আগ্রহও রয়েছে যে, ভারত থেকে চলে যাবার আগেই হায়দরাবাদ সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান করে দিয়ে যেতে হবে। সুতরাং হায়দরাবাদের সমস্যাকে নিছক একটা সরকারী সমস্যা বলে ধারণা করা মাউণ্টব্যাটেনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও আগ্রহ নিয়েই তিনি এই সমস্যার মধ্যে নিজেকে মনে মনে জড়িয়ে ফেলেছেন। সেই জন্য সমাধানের পন্থা নির্ণয়েও তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা থেকে তিনি নিজেকে একেবারে মুক্ত করে রাখতে পারেননি।

এই প্রসংগে আমি মাউণ্টব্যাটেনকে অকপটভাবেই আমার মনের কথা বলে দিলাম—'আমার ধারণা, নিজাম আপনার ব্যক্তিগত প্রভাবের ওপর নির্ভর করতে ইচ্ছে করেন না। নিজাম বরং পরবর্তী গবর্ণর জেনারেল রাজগোপালাচারীর কাছ থেকেই বেশি কিছু আশা করেন। রাজগোপালাচারী স্বয়ং দক্ষিণ ভারতের লোক এবং দক্ষিণ ভারতের বৃহত্তম দেশীয় রাজ্যের অধিপতি নিজাম সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতীয় তথা মাদ্রাজী গবর্ণর জেনারেলের সদিচ্ছার ওপর বেশি নির্ভর করে রয়েছেন।

নিজামের নেতিমূলক মনোভাব দেখে মাউণ্টব্যাটেন অবশ্য কোন দুশ্চিন্তা করছেন না। তিনি খুশি হয়েছেন যে হায়দরাবাদের শাসকগোষ্ঠীর মনে সংকট সম্বন্ধে একটা সচেতনতার ভাব জাগ্রত করতে পারা গেছে। রিপোর্ট থেকে তিনি এইটুকু বুঝতে পেরেছেন যে, আবার আলোচনা আরম্ভ করার জন্য হায়দরাবাদের মনে আগ্রহের ও দায়িত্ববোধের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এইটুকুই আমার হায়দরাবাদ-দৌত্যের সব চেয়ে বড় লাভ। ভারত ও হায়দরাবাদ, দুপক্ষই সম্ভবতঃ এবিষয়ে 'অচল' হয়ে পড়েছিলেন এবং চেষ্টার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন মনে হচ্ছে, দু'পক্ষই নতুন করে আলোচনার জন্য প্রস্তুত হতে রাজী আছেন।

সিমলায় গবর্ণর জেনারেলের ভবনে আজ বৈকালে মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণে পূর্ব পাঞ্জাবের যত সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত সমাজের নরনারী এক প্রীতি সম্মেলনে সমবেত হলেন। কিংখাবের পরিচ্ছদ আর রেশমী শাড়ির এক মনোহর প্রদর্শনী। তার ওপর ব্যাণ্ডের বাজনা। লর্ড ও লেডী মাউণ্টব্যাটেন উদ্যানের আসর ঘুরে ফিরে অতিথিদের সঙ্গে আলাপ করলেন।

নয়াদিল্লী, মঙ্গলবার, ২৫শে মে, ১৯৪৮ সাল। ভের্নন ও আমি সিমলার শীতল আশ্রয় ছেড়ে গত রবিবারেই দিল্লীর উত্তপ্ত চুল্লীর মধ্যে ফিরে এসেছি। পরিবারসহ একটি দিন কাটিয়ে মাউণ্টব্যাটেনও আজ দিল্লীতে ফিরেছেন। মাউণ্টব্যাটেন দিল্লী পেঁছিতেই তাঁকে আমরা খবর দিলাম—লায়েক আলি গত রবিবারেই দিল্লী এসে বসে রয়েছেন।

লায়েক আলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিচয়ও মাউণ্টব্যাটেনকে জানিয়ে দিলাম। এরই মধ্যে লায়েক আলির সঙ্গে আমার আর একবার কথাবার্তা হয়েছিল। আর একবার উপলব্ধি করেছি যে, লায়েক আলি এবারও ভাল মন নিয়ে দিল্লীতে আসেননি। সমস্যা এড়িয়ে যাবার সেই পুরণো কৌশলটিই মনের ভেতর সযত্নে ধারণ করে তিনি দিল্লীতে এসেছেন। সব ঠিক হয়ে গেছে, সংকট পার হওয়া গেছে এবং আর চিন্তা করার কিছু নেই—এই ধরণের ভাব দেখাচ্ছেন লায়েক আলি। সুতরাং মাউণ্টব্যাটেনকে লায়েক আলির এই মনোভাব সম্বন্ধে আগে থেকেই সচেতন করে দিলাম; কারণ, লায়েক আলির সঙ্গেই মাউণ্টব্যাটেনকে এখন শেষবারের মত আলোচনার পর্ব শেষ করে দিতে হবে।

আলোচনা হলো। শনেলাম, লায়েক আলির সঙ্গে মাউণ্টব্যাটেনের আজ প্রায় দুটি ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয়েছে। ভারতে এসে কোন ঘটনায় অথবা কোন কাজের সূত্রে মাউণ্টব্যাটেনকে কখনো কারও সঙ্গে এত দীর্ঘ সময় আলোচনার জন্য ব্যয় করতে হয়নি।

এখানে মাউণ্টব্যাটেন ও লায়েক আলির মধ্যে যখন আলোচনা চলছে তখন হায়দরাবাদের সীমানা অঞ্চলে ঘটনার পর ঘটনায় অশান্তিই বেড়ে চলছে। বিগত কয়েকদিনের মধ্যে সীমানা অঞ্চলে অনেক হাঙ্গামা হয়ে গেছে। ভারতীয় বাহিনীও সীমানা অঞ্চলের সন্নিকটে থেকে কাজ করছে। অশান্তি ও উপদ্রব আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করছে ভারতীয় সৈন্য। সব চেয়ে খারাপ ঘটনা হলো গাঙ্গপুরে ট্রেণ আক্রমণের ঘটনা। এই ঘটনায় দুজন হিন্দু নিহত হয়েছে, কিছু সংখ্যক হিন্দু আহত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক হিন্দুর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। এ ঘটনার সংবাদে ভারতের জনমতও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

...নের হায়দরাবাদ যাত্রার দুদিন আগেই এখানে দেশরক্ষা কমিটির এক বৈঠক হয়েছিল। বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, সীমানা অঞ্চলের অশান্তি দমনের জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলতে থাকবে। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী হঠাৎ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। অশান্তি দমনের জন্য ...হিসাবে কোথাও সৈন্য চালনা ...সামরিক কর্তৃপক্ষ দশ দিন ...নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেবেন। ...টেনও নেহরুর কাছে থেকে এই ...ও অবশ্য আদায় করে রেখেছিলেন ...অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন না হলে ...ও সৈন্য চালনা করা হবে না। ...ভাবে হিন্দু হত্যা অথবা এই ধরণের ...গর্হিত অশান্তিকর ঘটনা যদি ...ও হতে দেখা যায়, তবেই ভারতীয় ...না ব্যবস্থা অবলম্বন করবে, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নেহরু। এ ছাড়া ...কোন কারণে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ ...ইচ্ছা করেন না ভারত গবর্ণমেণ্ট। ...ব্যাটেন বিশ্বাস করেন যে, তিনি ...ত থেকে চলে যাবার আগে অথবা বর্ষা ...দেখা দেবার আগে ভারতীয় বাহিনী ...কভাবে হায়দরাবাদের সীমানা অঞ্চলে ...স্থা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হবে না।

সুতরাং, সময় এখনও আছে, কিন্তু ...ই কম সময়। এই অবস্থায় দু'পক্ষকে ...শান্তিপূর্ণ কোন ব্যবস্থায় সম্মত ...কি সম্ভবপর হবে?

সম্ভবপর হবে, যদি এখনই শক্ত হাতে লায়েক আলিকে সায়েস্তা করে ফেলা যায়। আসন্ন পরিণাম সম্বন্ধে লায়েক আলিকে রূঢ়ভাবেই সচেতন করে দিতে হবে এবং স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে হবে যে, লুকোচুরি খেলা আর চলবে না। হায়দরাবাদ রাজ্যের ভাগ্য নিয়ে বেপরোয়াভাবে এত দিন ধরে যে জুয়া খেলছেন লায়েক আলি, সে খেলা ছাড়তে হবে। আর কোন দ্বিধা না করে লায়েক আলিকে এখন জানিয়ে দিতে হবে যে, এ ধরণের রাজনৈতিক জুয়াবাজির দ্বারা তিনি নিজেরও ভাগ্য কণ্টকিত করে তুলছেন।

সিমলাতেই মাউণ্টব্যাটেনকে আমি একথা না বলে পারিনি যে, লায়েক আলি

যে মনোভাব অবলম্বন করে রয়েছেন, তাতে লোকটিকে একটি বড় রকমের বুদ্ধিমান মূর্খ বলেই মনে করতে হয়। প্রত্যেকটি নিকৃষ্ট কাজের পক্ষে উৎকৃষ্ট যুক্তি, প্রত্যেকটি অন্যায়ের পক্ষে অজস্র ন্যায়সংগত কৈফিয়ৎ দেবার এক অদ্ভুত অভ্যাস আছে এই বুদ্ধিমান ব্যক্তিটির।

মাউণ্টব্যাটেনও লায়েক আলিকে এইবার কঠোরভাবেই ধরেছেন। আলোচনার আরম্ভেই মাউণ্টব্যাটেন লায়েক আলিকে এই রূঢ় ও বাস্তব সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাবে জানিয়ে দিলেন যে, পরিণাম সুবিধার হবে না। লায়েক আলিকে একবার কল্পনা করে দেখতে বললেন মাউণ্টব্যাটেন—"কল্পনা করতে পারেন, কি দশা হবে আপনাদের, যদি হায়দরাবাদে একবার হিন্দুর রক্তপাত আরম্ভ হয়ে যায়? আমি ভারত থেকে চলে যাবার পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যদি সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করেন ভারত গবর্ণমেণ্ট, তবে কি অবস্থা হবে বুঝতে পারেন? আপনার হায়দরা-বাদের ফৌজ কি কিছু করতে পারবে?"

লায়েক আলি বললেন যে, তিনি হায়দরাবাদ ফৌজের শক্তির সীমা সম্বন্ধে সচেতন আছেন। হায়দরাবাদের সামরিক দুর্বলতা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু উপায় কি? এত দিন ধরে অপর রাষ্ট্রের (ব্রিটেনের) অধিরাজক ক্ষমতার অধীন ছিল হায়দরাবাদ। কিন্তু তা'ও ভাল ছিল। ভারতের সংগে একরাষ্ট্রভুক্ত অবস্থা সেই অধিরাজক ক্ষমতার অধীন অবস্থার চেয়ে দশ গুণ বেশী খারাপ।

লায়েক আলি আরও কতকগুলি আপত্তি উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তিনি শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র প্রবর্তনেরই পক্ষে, কিন্তু এখন হায়দরাবাদে গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার তিনি বিরোধী। তিনি মনে করেন, এখন হায়দরাবাদে গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হলে, পরিণামে হায়দরাবাদকে ভারতের সংগে একরাষ্ট্রভুক্ত হতেই হবে।

এই সময় আলোচনা-কক্ষে প্রবেশ করলেন ভি পি মেনন। সংগে সংগে লায়েক আলি প্রস্তাব করলেন যে, ভারতের সংগে একটা দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি করতে তিনি রাজী আছেন। পাঁচ বছর অথবা দশ বছরের জন্য এই চুক্তি কার্যকরী হবে। এই পাঁচ অথবা দশ বছরের জন্য হায়দরাবাদ রাজ্যের ওপর ভারতের তিনটি ক্ষমতার বিষয় (যোগাযোগ, পররাষ্ট্র নীতি ও দেশরক্ষা) কিভাবে এবং কতখানি প্রযোজ্য হবে,
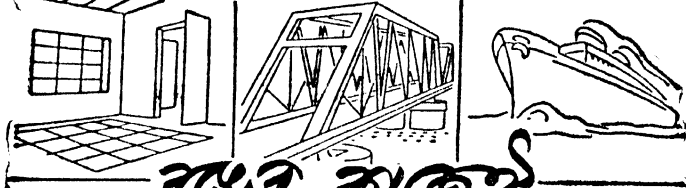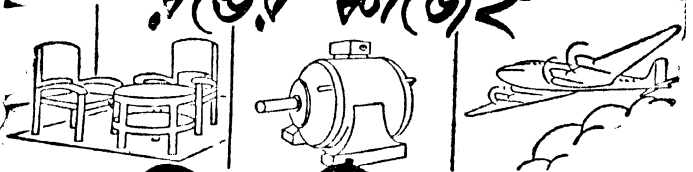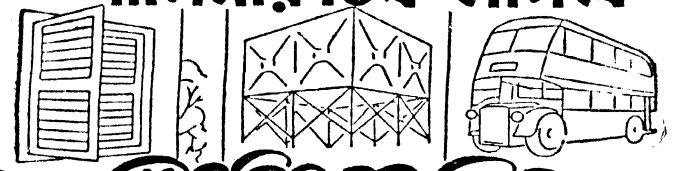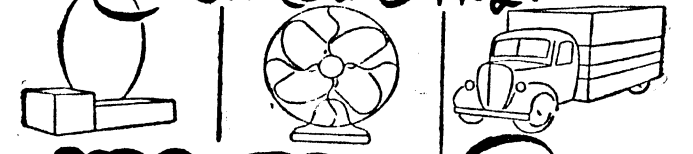
তারই সর্ত এই চুক্তিতে সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

হায়দরাবাদের সীমানা অঞ্চলে ভারতীয় সৈনিকের পদধ্বনি, এখানে লায়েক আলির এই মনোভাব এবং ভারত থেকে বিদায় নেবার জন্য মাউণ্টব্যাটেনকেও ব্যস্তভাবে প্রস্তুত হতে হচ্ছে—এই অবস্থার মধ্যে একটি বাস্তব সত্যই বারবার অনুভব করছি, সময় আর নেই। অথচ শেষ চেষ্টাও যে সফল হবে, এমন কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।

এই অবস্থায় ভি পি কি আর কোন আলোচনার দ্বারা লায়েক আলিকে পথে আনতে পারবেন? নেহরুও কি কোন সাহায্য করতে পারবেন?

নয়াদিল্লী, বুধবার, ২৬শে মে, ১৯৪৮ সাল। ভি পি মেনন ও লায়েক আলি, মাত্র এই দুজন ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি আজকের আলোচনার কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না। অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা চললো। খসড়া ও ফরমুলা রচনার অদ্ভুত প্রতিভা আজ ভি পি'র এবং তার জন্য অফুরন্ত পরিশ্রম করবার শক্তিও তিনি রাখেন। মীমাংসাহীন জটিল হায়দরাবাদ-সমস্যার এই হতাশাকর অধ্যায়ে পৌঁছেও ভি পি নতুন ক'রে এবং বিস্তারিতভাবে চুক্তির কতগুলি সূত্র রচনা ক'রে ফেলেছেন। চুক্তির সূত্রগুলি দুই অংশে বিভক্ত। সবশুদ্ধ এগারটি বিভিন্ন বিষয়ে ও ব্যবস্থায় দুই পক্ষের স্বীকারযোগ্য একটা চুক্তির খসড়া। প্রথম অংশে ভারত ও হায়দরাবাদের রাজনৈতিক সম্পর্কের মূলবিষয়গুলি বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে একটা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যে ব্যবস্থা প্রতিপালিত হলে প্রথম অংশে বর্ণিত ভারত-হায়দরাবাদের সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখা সম্ভবপর হবে।

চুক্তির এই নতুন সূত্রগুলিতে লায়েক আলিরও একটি অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা করা হয়েছে। রাষ্ট্রভুক্তির কথা বাদ দেওয়াই হয়েছে এবং তার বদলে তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া আর একটি ব্যবস্থার বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে—গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা।

মাউণ্টব্যাটেনও এই ধারণা দৃঢ়ভাবেই পোষণ করেন যে, হায়দরাবাদে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থাই সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ পন্থা। চুক্তির এই নতুন সূত্রগুলিতে যেসব ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বিশেষ কিছু উৎসাহ বোধ করছিলেন না মাউণ্টব্যাটেন। আবার দিনের পর দিন এবং দীর্ঘকাল ধরে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে শুধু আলোচনার ব্যাপার আরম্ভ হবে, আবার দর কষাকষির একটা নতুন পর্যায় শুরু হবে, এই সম্ভাবনাই দেখছিলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং তার জন্যই নৈরাশ্য বোধ করছিলেন। তাঁর মতে, এখন গণভোটের দ্বারাই এ সমস্যার হেস্তনেস্ত ক'রে ফেলার চেষ্টা প্রয়োজন এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়।

লায়েক আলির ব্যক্তিগত অভিমতও গণভোট প্রস্তাবের পক্ষেই রয়েছে বলে মনে হলো। তিনি বলেছেন, গণভোটের ব্যবস্থা গৃহীত হ'লে দু'পক্ষেরই মুখ-রক্ষা করা হবে।

ভারতের সাধারণ জনমত এবং সরকারী অভিমতও গণভোটের পক্ষে। বিশেষ ক'রে প্যাটেল গণভোটের ব্যবস্থাই সমর্থন করছেন, যদিও এটা সকলেই উপলব্ধি করছেন যে, গণভোট গৃহীত হলেই হায়দরাবাদকে ভারতের সঙ্গে এক-রাষ্ট্রভুক্ত করবার অভিমতই জয়ী হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া গণ-ভোট গৃহীত হবার পরেও ভারতের সঙ্গে হায়দরাবাদের 'রাষ্ট্রভুক্তি'ও যে আপনা-আপনি হয়ে যাবে, এমন সম্ভাবনার আশাও সকলেই পোষণ করছেন না।

নয়াদিল্লী, শনিবার, ২৯শে মে, ১৯৪৮ সাল। হায়দরাবাদ প্রসঙ্গ এখন পরিণামের সবচেয়ে বেশি কঠিন এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। মুসৌরীতে গিয়ে প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসেছেন ভি পি। শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের অনুকূলেই প্যাটেল তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের ভাব ও ভাষা যেমন স্পষ্ট, তেমনই শক্ত। গণভোটের ব্যবস্থার পক্ষেই মত দান করেছেন প্যাটেল। ভি পি রচিত চুক্তির সূত্রগুলির প্রথম অংশ তিনি সমর্থন করেছেন। ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্কের যে প্রস্তাব এই সূত্রগুলিতে বর্ণিত হয়েছে, সেটা মেনে নিতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এই খসড়া-চুক্তির দ্বিতীয় অংশের সূত্রগুলিতে যেসব অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে প্যাটেল আর একটু শক্ত হবার নীতি পছন্দ করেন। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থায় তিনি এইটুকু স্পষ্ট করে দেখতে চান যে, হায়দরাবাদের শাসন-ব্যাপারে প্রধানতঃ অ-মুসলমান সমাজের হাতেই নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বেশি করে এসে গেছে। এ বিষয়ে প্যাটেল তাঁর বক্তব্য ও নির্দেশ নিজের হাতেই লিখে দিয়েছেন। প্যাটেলের নির্দেশের উপসংহারে এই অভিমতও স্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে যে, যদি কাজের দিক দিয়ে সত্য সত্যই কোন ব্যবস্থা করবার আন্তরিক ইচ্ছা লায়েক আলির মনে থেকে থাকে, তবে তিনি যেন নিজামের কাছ থেকে মত দানের ও সম্মতি দানের ক্ষমতা নিয়ে আসেন। শুধু নিজামের বার্তাবাহক হয়ে আসলেই চলবে না। নিজামের কাছ থেকে লায়েক আলিকে এই ক্ষমতা নিয়ে দিল্লীতে আসতে হবে যে, আলোচনার দ্বারা নির্ণীত ব্যবস্থায় ইচ্ছানুযায়ী চূড়ান্ত সম্মতি তিনি নিজামের হয়েই দিতে পারবেন। প্যাটেল লিখেছেন—'এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করে লাভ নেই, যিনি প্রত্যেক আলোচনার পর একবার করে হায়দরাবাদে যাবেন উপদেশ আর পরামর্শ সংগ্রহের জন্য।'

প্যাটেলের আর একটি নির্দেশ—নিজামের উদ্দেশে এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হোক। এই টেলিগ্রামে স্পষ্ট করে নিজামকে একটা সময়-সীমা জানিয়ে দেওয়া হবে। চব্বিশ ঘণ্টার সময়; তারই মধ্যে নিজামের কাছ থেকে পূর্ণ প্রতিভূ-ক্ষমতা গ্রহণ করে লায়েক আলিকে দিল্লীতে আসতে হবে। যদি এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খসড়া-চুক্তিতে প্রস্তাবিত মৌলিক ব্যবস্থাগুলির সম্পর্কে সম্মতি ও স্বীকৃতি দান না করেন নিজাম এবং লায়েক আলিকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দান করে দিল্লীতে পাঠাতে না পারেন, তবে ভারত গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করবেন যে, হায়দরাবাদ আর আলোচনার পথে মীমাংসা করতে ইচ্ছা করেন না। এই অবস্থায় ভারত গবর্ণমেণ্ট ধারণা করতে বাধ্য হবেন যে, হায়দরাবাদ শুধু সময় কাটিয়ে দেবার খেলা খেলছেন। প্যাটেলের নির্দেশের শেষ কথা হলো—'এক সপ্তাহের মধ্যে এই ব্যবস্থা করে ফেলুন।'

নেহরুও লায়েক আলিকে বিশ্বাস করতে পারছেন না এবং একথা তিনি খোলাখুলিভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন।

লায়েক আলির ক্রিয়াকলাপের নানা তথ্য আমরাও গোপনভাবে সংগ্রহ করতে পেরেছি। যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ধূর্ত লায়েক আলি শুধু নানা কথার অজুহাতে সময় কাটিয়ে দেবার খেলা খেলছেন। কিন্তু এ-খেলা তো আর চলতে দেওয়া যায় না। লায়েক আলি অথবা

নিজাম কাউকেই এখন আর দেরি করার অথবা দেরি করিয়ে দেবার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে না। তাঁদের পক্ষ থেকে যা বলবার আছে, সেটা এখন স্পষ্ট করে, চূড়ান্তভাবে এবং অবিলম্বে বলতে হবে।

অবস্থাটা নৈরাশ্যকর। এর মধ্যে কোন ভাল লক্ষণের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে না। একটা আশার লক্ষণ এই যে, মঙ্কটন আবার হায়দরাবাদে আসবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। সংবাদ শুনে খুশি হয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। মাউণ্টব্যাটেন বলছেন যে, মঙ্কটন না আসা পর্যন্ত তিনি হায়দরাবাদ-সংকটকে এই অবস্থাতেই আটকে রাখার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এভাবে সমস্যাকে সামলে রাখা কতখানি সম্ভবপর হবে, সে বিষয়ে মাউণ্টব্যাটেনের মনে সন্দেহও আছে। তার কারণ এই যে, হায়দরাবাদ সমস্যাকে একটা অবাঞ্ছিত পরিণামের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্য নানা দিক থেকে চাপ পড়ছে এবং এই চাপ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মাউণ্টব্যাটেন ও মঙ্কটন, এই দুজনে সমস্যার যে সমাধান দেখতে ইচ্ছা করেন, সেভাবে সমাধান হবে কি না বলা যায় না।

কিন্তু আগামী ৩রা জুনের আগে মঙ্কটন ভারতে পেঁাছতে পারবেন না। এদিকে আমারও ভারত হতে বিদায়ের দিনটি সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ঐ ৩রা জুনেই আমি সপরিবারে বোম্বাই থেকে দেশের উদ্দেশে সমুদ্রে পাড়ি দেব। সুতরাং এমন হতে পারে যে, ৩রা জুন তারিখের সকাল বেলায় বোম্বাইয়ে আগন্তুক মঙ্কটনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে। সাক্ষাৎ হলে ভালই হবে, তখন আমি বে-সরকারীভাবে মঙ্কটনের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পাব। সরকারী রীতি-নীতির বন্ধন থেকে তখন আমি মুক্ত থাকবো এবং তখন মঙ্কটনের সঙ্গে মন খুলে আলোচনা করলে আমার পক্ষে কোন 'বিশ্বাসভঙ্গের' কাজ করা হবে না। বোম্বাই থেকে বিমানযোগে সোজা হায়দরাবাদে চলে যাবেন মঙ্কটন। সুতরাং তার আগে আমার সঙ্গে আলোচনা করে তিনি লাভবানই হবেন। আমার হায়দরাবাদ থেকে ফিরে আসার পর হায়দরাবাদ-সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও অন্যান্য ঘটনা কি অবস্থায় এসে পেঁাছেছে সে সম্বন্ধে মঙ্কটনের কিছুই জানা নেই। সুতরাং বোম্বাইয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা [illegible] আমি তাঁকে কিছু নতুন তথ্য দিতে পারবো। এই 'দৈব' সুযোগের সম্ভাবনা আছে দেখে মাউণ্টব্যাটেনও আশান্বিত হয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে কোন কথা শুনবার সুযোগ না পেয়েও মঙ্কটন আমার কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য জেনে নিয়ে হায়দরাবাদে যাবেন এবং নিজামকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারবেন। অনুমান করতে পারছি, বোম্বাইয়ে গিয়ে জাহাজে পা দেবার আগের মুহূর্তে পর্যন্ত হায়দরাবাদ-সমস্যা আমাকে ছাড়ছে না।

বিদায়ের দিন প্রায় আগত। মাউণ্টব্যাটেনের আগেই আমি চলে যাব। আজ মাউণ্টব্যাটেনের ষ্টাফ এক সম্মেলন আহ্বান করে আমাকে ও ফে'কে বিদায় সম্বর্ধনাও জ্ঞাপন করবেন। মঙ্গলবার সকাল বেলার আগে অবশ্য আমরা দিল্লী ছাড়ছি না. কিন্তু মাউণ্টব্যাটেন-পরিবার আজকের এই সম্মেলনেই উপস্থিত হলেন আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য। এর কারণ এই যে, আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য আজকের দিনটি ছাড়া আর কোন দিনে সুযোগ এবং সময়ও তাঁরা পাবেন না।

এ সম্মেলন পারিবারিক সম্মেলনের মতই প্রীতিপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান। আমার দুঃখ, যবনিকা পতনের পূর্বেই ভারতের এই রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। হায়দরাবাদ পর্বের উপসংহার পর্যন্ত আমার এখানে থাকবার খুবই ইচ্ছা ছিল। 'শেষ' পর্যন্ত এখানে থেকে এবং হায়দরাবাদ পর্বের সমাপ্তির পর মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গেই ভারত থেকে বিদায় নিয়ে যদি যেতে পারতাম, তবে বিদায় সম্বর্ধনার যে দৃশ্য দেখতাম, সেটা কল্পনা করতে পারি। কিন্তু সে সুযোগ নেই। ভারত থেকে আমার অন্তর্ধানের পরিকল্পনা এবং দিনক্ষণ পূর্বেই নির্দিষ্ট করা হয়ে গিয়েছিল। এখন আর তার পরিবর্তন করা সম্ভবপর নয়।

বিদায় সম্মেলনে আমাকে নিয়ে ষ্টাফের সকলে বেশ একটা আমোদও করে নিলেন। সম্মেলনের কক্ষে বিখ্যাত টিপু সুলতানের একটি প্রতিকৃতি দেয়ালের গায়ে ঝুলছিল। আমার চেহারার সঙ্গে টিপু সুলতানের চেহারার নাকি একটা সাদৃশ্য আছে; সকলেই এই অভিমত প্রকাশ করলেন। টিপুর প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম, অতি বিষণ্ণ এবং উদাস এক ব্যক্তির প্রতিকৃতি। টিপুর ঐ বিষণ্ণ মুখের সঙ্গে যদি আমার মুখের সাদৃশ্য থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, সহকর্মীরা আমাকে আদৌ প্রশংসা করছেন না। আমার মন খুবই বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে এবং তারই ছাপ পড়েছে আমার মুখের ওপর; একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই বিদায়ী ব্যক্তির মনকে উৎসাহিত করা নয়। (ক্রমশ)

ঘুমের বৌদ্ধবিহার ও তিব্বতীদের ধর্মবিশ্বাস

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

'ঘুম' শহর

দার্জিলিঙ্-এর চার মাইল দক্ষিণে এই 'ঘুম' শহর। অবশ্য 'ঘুমকে' বৃহত্তর দার্জিলিঙ্ শহরের একটা অংশও বলা যেতে পারে। দার্জিলিঙ্ হ'তে ঘুম আরো ৫৯৫ ফুট ওপরে অবস্থিত; অর্থাৎ সমুদ্রবক্ষ হতে দার্জিলিঙের উচ্চতা হলো ৬৮১২ ফুট, আর ঘুমের উচ্চতা হলো ৭৪০৭ ফুট। প্রায় ৬০০ ফুট ওপরে হওয়াতে 'ঘুমে' ঠাণ্ডাও দার্জিলিঙ্ হ'তে একটু বেশী (সাধারণত ৫ ডিগ্রী ফার্নহিট)। অনেকের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে 'ঘুম' রেলওয়ে স্টেশন পৃথিবীতে সব চাইতে ওপরে অবস্থিত স্টেশন! অথচ একথা অনেকেই জানে না যে, Peruvian Central Railway সমুদ্রবক্ষ হ'তে ১৫,৮৬০ ফুট ওপরে।

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়েও 'ঘুমের' গুরুত্ব কম নয়। 'ঘুম' একদিকে কালিম্পংএর মধ্য দিয়ে তিব্বত ও ভুটানের প্রবেশদ্বার; আর এক দিকে সুকিয়ার (Sukia) মধ্য দিয়ে নেপালের প্রবেশ তোরণ বলা যেতে পারে।

এই 'ঘুম' শহরে ও তার আশে পাশে এমন কতকগুলো দ্রষ্টব্য স্থান আছে, যারা দার্জিলিঙে বেড়াতে আসেন তারা একবার সে জায়গাগুলো না দেখে ফিরে যান না। এ দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর মধ্যে প্রধান হলো—'ঘুমের' বৌদ্ধ-বিহার (গোম্পা), টাইগার হিল ও সেঞ্চল হ্রদ। এ প্রবন্ধে ঘুমের বৌদ্ধ বিহার ও তিব্বতীদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

ঘুমের বৌদ্ধ-বিহার

'ঘুম' স্টেশন হ'তে 'ঘুম' পোস্ট অফিস পর্যন্ত কয়েক মিনিট হেঁটে, তারপর বাঁদিকে ফিরে খড়্গ বাহাদুর রোড্ ধরে পুরানো ঘুম বাজারের মধ্য দিয়ে আর কয়েক মিনিট হাঁটলেই 'ঘুমে'র এই বৌদ্ধ বিহারে এসে পেঁছানো যায়। বৌদ্ধ-বিহারকে তিব্বতীরা সাধারণত ব'লে থাকে 'গোম্পা' (Gompa)। এ গোম্পাগুলো তিব্বত ও নেপালের সর্বত্রই দেখতে প্রায় একরকম হয়। বিহারের মধ্যে সাধারণত ভিক্ষুদের জন্য কতকগুলো বাসগৃহ থাকে, মধ্যে থাকে মন্দিরটি, এ ছাড়া আর একটি ছোট ঘর থাকে, যার মধ্যে 'মণি' বা 'প্রার্থনাচক্র' (Praying Wheel)গুলো রক্ষিত থাকে। মন্দিরের সামনে থাকে প্রশস্ত বাঁধানো প্রাঙ্গণ, সেখানে বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় উৎসবগুলো অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসবগুলোর মধ্যে অবশ্য Devil dance (দানব নৃত্য বা মুখোস নৃত্য) খুবই উল্লেখযোগ্য। এ মন্দিরগুলো সাধারণত পূবমুখো করে তৈরী করা হয়। দূরের থেকেই ঘুমের বৌদ্ধ-বিহারের সুদৃশ্য গেট ও ভবন দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিম্নের ছবি দেখলে এ আকর্ষণের কারণ কতকটা আন্দাজ করা যাবে।

সাধারণ দর্শক এ বিহারের সুদৃশ্য পরিবেশ দেখে, বিহারের ভেতরকার বিরাট বুদ্ধমূর্তি দেখে ও আশে পাশের গৃহগুলোতে রক্ষিত মূর্তি ও ছবিগুলো দেখেই শুধু চলে আসে। কিন্তু কৌতূহলী দর্শক এ সুন্দর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে, বিরাট বুদ্ধমূর্তি সম্বন্ধে, সেখানকার উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে, মুখোস-নৃত্য সম্বন্ধে, মন্দিরে রক্ষিত পুঁথি সম্পর্কে, ছোট ছোট বুদ্ধমূর্তি সম্পর্কে, দেওয়ালের গায়ে আঁকা জীবন্ত চিত্রগুলো সম্পর্কে—অনেক কথা জানতে চায়। ঘুমের বৌদ্ধমন্দিরের উপরোক্ত জ্ঞাতব্য তথ্যগুলো সম্পর্কে এখানে বলছি।

এ সুদৃশ্য বিহারটি একটি পাহাড়ের ওপর একটু নির্জনস্থানে অবস্থিত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লামা সেরাব গ্যাংসো (Lama Sherab Gyamtso) নামক একজন ভিক্ষু কর্তৃক এ মঠটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ছাম্পা অথবা মৈত্রেয় বুদ্ধের (ভবিষ্যৎ বুদ্ধের) একটি মূর্তি নির্মিত হয় এবং শত সহস্র বৌদ্ধ ভক্তের সামনে মূর্তিটিকে পূত করে এর আবরণ উন্মোচন করা হয়। তিব্বতের চুম্বী

সুদৃশ্য তোরণের পশ্চাতে ঘুমের বৌদ্ধ-বিহার ও অন্যান্য ভবন-সমূহ।

উপত্যকার একজন বড় লামার তত্ত্বাবধানে এ বিরাট বুদ্ধমূর্তিটি তৈরী হয়। মূর্তিটি দৈর্ঘ্যে ১৫ ফুট উঁচু। এ মূর্তি তৈরী করতে কারিগরদের একমাস অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়েছিল এবং এর নির্মাণ-কার্যে ব্যয়িত হয়েছিল ২৫০০০, টাকা। এ বিরাট বুদ্ধমূর্তি সম্বন্ধে একটা মজার জিনিস জানবার হলো এই যে ১৬ খণ্ড বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ এর ভেতর পুরে দেওয়া হয়েছিল। এ ছাড়া এ গুজবও শোনা যায় যে, এ মূর্তিটির ভেতর বহু অমূল্য পাথর ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি ভরে দেওয়া হয়েছিল। মূর্তিটি প্রধানত মাটি দিয়ে তৈরী হলেও এ মাটির সঙ্গে নাকি সোনার ভাগও মিশ্রিত করে দেওয়া হয়েছিল। এ মূর্তিটি নিজের চোখে না দেখলে সেটি যে কতটা বিরাট, সুন্দর ও জীবন্ত তা' ঠিক ধারণা করা যায় না। মন্দিরের ভেতরে গিয়ে ছবি তোলা নিষেধ; তাই পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এ বিরাট মূর্তিটির ছবি দিতে পারা গেল না।

এ বিহারের প্রতিষ্ঠাতা লামা সেরাব গ্যাংসোর মৃত্যুর পর তিনজন লামা পর পর এই বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁদের নাম অম্বু লামা, তুম্ব লামা এবং নামগেই লামা (Namgay Lama)। মঠের বর্তমান অধ্যক্ষ এই নামগেই লামা তিব্বতের দালাই লামার সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম।

এই বৌদ্ধ-বিহারের প্রধান ভবনের পাশে আর একটা ছোট ঘর আছে; তার মধ্যে অতীশ দীপঙ্করের একটি মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। তিব্বতীরা দীপঙ্করকে নিজেদের ভাষায় বলে, "ছোজি পলদেন্‌ অতীশা (Choji Palden Atisha)। সমস্ত তিব্বতে এই দীপঙ্কর অতীশ দেবতার মত পূজো পেয়ে থাকেন।

তিব্বতী ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি

পূর্বেই বলেছি, কৌতূহলী দর্শক ঘুম বৌদ্ধ বিহারে একে ইচ্ছা করলে অনেক তিব্বতী ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন।

যেমন, এই মঠে ঢুকতে দর্শকদের প্রথমত খণ্ড খণ্ড একটি পাথরের স্তূপ, ডাইনে রেখে ঢুকতে হয়। মঠে ঢুকবার পথে ডাইনে থাকে আর একটি ভবন যাকে বলা হয় লাখাং (Lakhang)। এই লাখাং-এর মধ্যে কতগুলো মূর্তি রক্ষিত আছে যাদের নাম হোল ছাঝা (Chaza)। এই ছাঝা হলো মৃত অবতার লামা ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অস্থি ও মাটি দিয়ে তৈরী কতগুলো মূর্তি। তিব্বতীদের বিশ্বাস, এই মূর্তিগুলো জীবিত ব্যক্তিদের দীর্ঘায়ু করবে এবং মৃত ব্যক্তিদের পরলোকে শান্তি বিধান করবে। জীবিত ব্যক্তিদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে মূর্তিগুলো রয়েছে সেগুলো চাউলের গুঁড়ো ও মাটি দিয়ে তৈরী। এই মূর্তিগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে তিনজন

'ছাঝা লাখাং'এর সামনে একটি পাথরের স্তূপ ক্রমে ক্রমে জমে উঠছে।

তিব্বতী দেবতার যাঁরা মানুষকে দীর্ঘজীবী করে থাকেন। এই তিনজন দেবতার নাম হলো— (১) সেপাগমেই (Tsepagmay) —যাঁকে বলা যায় চিরন্তন জীবনের দেবতা; আর একজনের নাম (২) জেটসুন দ্রোলমা (Jetsoon Drolma)—দেবী তারামাই; তৃতীয় জনের নাম (৩) নামগিলমা (Namgylma) অর্থাৎ বিজয়ের দেবী (Gods of victory)। পবিত্র ভাঁড়ার ঘর বা লাখাং-এ রাখবার আগে তাদের ওপরে প্রথমে একটু চুণকাম করে নেওয়া হয় এবং তিব্বতী একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে। এই ছাঝাগুলোকে লাখাং-এর মধ্যে রাখবার একটা উদ্দেশ্যও আছে। কোন ব্যক্তি কঠিন অসুখে পড়লে এই বিজয়ের দেবতা হয়তো বা তাদের ভালো করে দিতে পারেন কিংবা জ্যোতিষীদের মতে যাদের জীবনে কোন আকস্মিক বিপৎপাতের সম্ভাবনা আছে এই দেবতারা তাদের সেই বিপদ দূরও করতে পারেন। শেষোক্ত অবস্থায় একজন মানুষের বয়স যতো ততগুলো 'ছাঝা' 'লাখাং'-এর মধ্যে রাখা প্রয়োজন।

মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে যে ছাঝাগুলো তৈরী হয়, সেগুলোও সাধারণত মড়া-মানুষের মাথার খুলিকে চূর্ণ করে তার সঙ্গে মাটি মিশিয়ে করা হয়। তাদের চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য থাকে সাধারণত 'মেনলা' (Menlah) বা ঔষধের দেবতার সঙ্গে।

তাদের সংখ্যা হলো ১০৮। তিব্বতী মহাযানী বৌদ্ধেরা এ সংখ্যাটিকে সাধারণত অত্যন্ত সৌভাগ্যের চিহ্ন বলে মনে করে। এ মূর্তিগুলোর ওপরে সাধারণত কোন চুণকাম করা হয় না;—অবশ্য চুণকামহীন এই কর্কশ মূর্তিগুলোকে তিব্বতীরা শোকের মূর্তি বলে মনে করে। 'লাখাং'-এ প্রতিষ্ঠা করবার আগে এ মূর্তিগুলোকে নিয়েও তারা পূর্বের মত একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে। এ ধরণের মূর্তি রাখবার উদ্দেশ্য হলো এই এরা নাকি পরলোকে মৃত ব্যক্তির আত্মার কল্যাণ সাধন করে। এ রীতিটাকে হিন্দুদের মৃতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান রীতির সঙ্গে তুলনা করা চলে।

এই 'ছাঝা লাখাং'-এর সামনেই একটি খণ্ড খণ্ড পাথরের স্তূপ ক্রমশ জমে উঠছে; কারণ যখনই কোন তিব্বতী দর্শক এই বিহার দর্শন করতে যায় তখনই এই পাথরের স্তূপের ওপর একখণ্ড পাথর রেখে যায়। এই প্রস্তর-স্তূপের ওপর একখণ্ড পাথর দানকে তারা একটা বড় পুণ্যকর্ম বলে মনে করে। কারণ এভাবে প্রত্যেকের দেওয়া পাথরে মিলে যখন অনেক পাথর জড়ো হবে তখন সে পাথরগুলো দিয়ে আর একটা স্তূপ অন্য কোথাও তৈরী হবে।

বিহারের প্রবেশ-পথের দুধারে সাজানো রয়েছে কতগুলো পেতলের ফাঁপা খোল (Cylender) একটা লোহার রডের সঙ্গে গাথা। তিব্বতী দর্শকেরা বিহারে প্রবেশের পূর্বে সেগুলোকে ঘুরিয়ে দিয়ে যায়। ওদের বিশ্বাস এতে প্রার্থনার কাজ হয়। তিব্বতীরা এই প্রার্থনা-চক্রগুলোকে সাধারণত বলে থাকে 'মণি'। এরকম ২১টি

ঘুমের বৌদ্ধ-বিহার। বিহারের সামনে দরজার একপাশে 'মণি'গুলো দেখা যাচ্ছে।

'মণি' মন্দিরের সামনের দেওয়ালের সামনে ঝুলানো আছে। এর মধ্যে ১০টা ডান দিকে, ১১টা বাঁ দিকে। তিব্বতীদের মতে এই ২১ সংখ্যাটিও শুভ চিহ্নদ্যোতক। এই খোল-গুলোর মধ্যে অসংখ্য কাগজের টুক্‌রোয় তান্ত্রিক মন্ত্র 'ওং মণি পদ্মে হুং' (তিব্বতী উচ্চারণ, 'মণি পেমে হুং')। মণিগুলো ঘোরাবার সময় ভেতরের মন্ত্রলিখিত শত-সহস্র পবিত্র কাগজগুলোও যখন ঘুরতে থাকে তখন তিব্বতীরা মনে করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভগবানের উদ্দেশ্যে অসংখ্য স্তুতিপাঠ করা হলো। ভগবানের নামে মন্ত্র উচ্চারণের এ একটি সহজ অথচ মজার উপায় সন্দেহ নেই। মঠের চারদিকে স্তম্ভ গুলোর সঙ্গে এবং অন্যান্য উঁচু জায়গার সঙ্গে যে সমস্ত পতাকা বাঁধা আছে, তার মধ্যেও বাঁধা রয়েছে একই মন্ত্র—'ওং মণি-পদ্মে হুং'। এই পতাকাগুলোকে তিব্বতী ভাষায় বলা হয়—টংক (Tankas)। বাতাস লেগে পতাকাগুলো যখন আন্দোলিত হয়, তখন তিব্বতীরা মনে করে দেবতার উদ্দেশ্যে তাদের সেই মন্ত্র দিকে দিকে উড়ে যাচ্ছে। এরূপ সহজ উপায়ে দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না।

এই বিহার বা গোম্পা পরিদর্শন করবার উপযুক্ত সময় হলো সন্ধ্যাবেলা—যখন লামা-রা দেবপূজো ও আরতি আরম্ভ হয়। প্রধান প্রবেশ দ্বার দিয়ে মন্দিরে ঢুকতেই প্রথমেই চোখে পড়ে দেওয়ালের গায়ে চিত্রিত চারটি বিরাট উদ্ধত বিদ্রোহীর মূর্তি—এ চারটি মূর্তি হলো চারদিকের রাজার প্রতীক। তিব্বতীদের বিশ্বাস এঁরা স্বর্গ ও মর্ত্যকে বাইরের দানবদের হাত থেকে রক্ষা করে।

মঠের ভেতরকার যে ১৫ ফুট বিরাট বুদ্ধমূর্তি আছে সে মূর্তিকে পূর্বদিকে মুখ করে স্থাপিত করা হয়েছে। তিব্বতীরা এ বুদ্ধমূর্তিকে বলে থাকে 'গিয়ালওয়া ঝম্পা' (Gyalwa Jhampa) যার অর্থ হচ্ছে—প্রেমের দেবতা। এ বিরাট বুদ্ধ মূর্তিকে পূজো করবার উদ্দেশ্য এই যে তিব্বতীরা বিশ্বাস করে—এই বিরাট মূর্তি হলো সত্যযুগের প্রতীক (সত্য যুগ অর্থ তাদের মতে সত্যের ও দীর্ঘজীবনের যুগ)। তারা বিশ্বাস করে এ সত্য যুগের প্রতীককে পূজো করতে পারলে কলিযুগের অবসান ঘটবে। কলিযুগ বলতে ওরা বোঝে, বেঁটে লোকদের যুগ, যে যুগে মানুষের আয়ু হয় খুবই কম এবং জীবন হয় দুঃখময়।

অমিতাভ বুদ্ধের দুপাশে আয়নার আলমারীর মধ্যে অন্যান্য বুদ্ধমূর্তিগুলো সাজানো রয়েছে। এ ছাড়া তাসি লুনফো (Tasi Lunpho) নামক স্থানের তারা-দেবী লামা সেরাব গ্যাংসো, পদ্ম-সম্ভব (তিব্বতীরা অবশ্য তাকে এক কথায় গুরু রিম্পোসি Guru Rimpoche ব'লে থাকে) এবং প্রেমের দেবতা লোকিতেশ্বরের মূর্তিও সেখানে সাজানো রয়েছে। তিব্বতের দালাই লামাকে তারা লোকিতেশ্বরের অবতার বলে মনে করে থাকে।

তিব্বতীদের মধ্যে একটা অদ্ভুত বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে যদি কোন দেবমূর্তির ভেতরটা ফাঁপা থাকে তা'হলে সে মূর্তি পবিত্রও নয়, পূজার যোগ্যও নয়। সেজন্য বিরাটকায় বুদ্ধমূর্তির ভেতরে অনেক পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ও মূল্যবান পাথর ও মণি-মুক্তা ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল তা পূর্বেই বলা হয়েছে। শুধু বুদ্ধমূর্তির ভেতরে নয়, এ মঠের ভেতর যতগুলো মূর্তি পূজিত হয় তাদের সবগুলোর ভেতরই নাকি মূল্যবান মণিমুক্তো ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থে পূর্ণ। এ মূর্তি-গুলোর ভেতর মণিমুক্তো, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি ভরে দেবার আর একটা উদ্দেশ্য এ হতে পারে যে মূর্তির ভেতরটা যেন অন্ধকার আর খালি না থাকে। কারণ তিব্বতীরা বিশ্বাস করে খালি যায়গা পেলেই ভূত, প্রেত, পিশাচ, দৈত্য-দানব প্রভৃতি সেখানে বাসা বাঁধে।

তিব্বতীদের বুদ্ধ পূজার রীতি অনেকটা হিন্দু দেবতা পূজার রীতির মতই। ছোট ছোট পাত্রের মধ্যে পরিষ্কার জল রেখে প্রত্যেক সকালে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। বেদীর সামনে এরূপ সাতটি জলপূর্ণ বাটি রাখা হয়, আর থাকে সেখানে কয়েকটি জ্বলন্ত প্রদীপ। তিব্বতের বৌদ্ধ-মঠগুলোর মত এখানে কিন্তু ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো হয় না। যখন পূজো হয় তখন লামারা বুদ্ধমূর্তির সামনে দুসারি বেদীর ওপর বসেন এবং প্রধান লামা সেই বেদীর একপ্রান্তে একটা উচ্চাসনে বসেন। এই বেদীগুলো মন্দিরের প্রায় একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। এই বেদীর ওপর আছে গিল্টি করা তিনটি লামার ত্রিমূর্তি এবং আরো অনেক দেবতার মূর্তি। মন্দিরের ভেতরেই বড় বড় জয়ঢাক রয়েছে। পূজার সময় লামারা এই বিরাট জয়ঢাকের গায়ে ঘা দিয়ে শব্দ করে।

মঠের ডানদিকের দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো অনেকগুলো তাক রয়েছে। সেই তাক-গুলোর মধ্যে কাঞ্জুর (Kanjyur) নামে ১০৮খানি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ রক্ষিত আছে। অবশ্য প্রত্যেকখানি গ্রন্থ দুখানি কাঠের আবরণের দ্বারা রক্ষিত। বামদিকের দেওয়ালের তাকগুলোর মধ্যে ঠিক তেমনি-ভাবে ২২৪খানি গ্রন্থ রয়েছে। এ গ্রন্থগুলো

হলো বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ কাঞ্জুরের টীকা এবং এদের নাম হলো তাঞ্জুর (Tengyur)। সেই উপাসনা কক্ষের দেওয়ালগুলোতে চমৎকার শিল্পসম্মত চিত্রে পরিপূর্ণ। বলাবাহুল্য, সমস্ত চিত্রগুলোই দেবদেবীর।

মঠের ছাতের ওপর ছোট্ট একটা কক্ষ আছে। এ কক্ষের মধ্যে হাজার জন বুদ্ধের মূর্তি পাওয়া যায়। তাদের সঙ্গে আছে বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সারিপুত্ত ও মোগল্লায়নের মূর্তি। এ ঘরের সমস্ত মূর্তিও পূর্বদিকে করে বসানো হয়েছে।

মঠের বাঁদিকে দুখানা দালান : গিসেই রিম্পোসি (Geshay Rimpoche) বা অবতার লামা যখন 'ঘুমে' আসেন তখন তিনি একখানা ঘর ব্যবহার করেন; আর একখানা ব্যবহৃত হয় প্রার্থনার জন্য। প্রার্থনা গৃহের ভেতরে লোকিতেশ্বরের একটা বিরাট মূর্তি। মঠের পশ্চাদ্দিকে আছে একটি সুদৃশ্য বিশ্রামাগার, তাকে বলা হয় "শান্তির আবাস"। পীত সম্প্রদায়ের লামারা যখন মঠে আসেন তখন তাঁরা এই ঘরটিতে বাস করেন।

কোন বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে লামারা প্রার্থনা ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবার জন্য এই বিহারের মধ্যে সমবেত হয়। অমিতাভ বুদ্ধের মূর্তির সামনে লম্বা করে দুসারিতে তাদের আসনগুলো সাজানো থাকে। বছরের মধ্যে তিব্বতীদের অনেক উৎসব আছে, তার মধ্যে অন্ততঃ পনেরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে সাধারণত "মুখোস নৃত্য" হয়ে থাকে। এই মুখোস-নৃত্যকে সাধারণত বলা হয়ে থাকে প্রেত-নৃত্য বা 'ডেভিল ড্যান্স'। শুধু ঘুমের বৌদ্ধ-বিহারে নয়, তিব্বতের সমস্ত বিহারেও এই দানব সাজবার মুখোস সাজ-সরঞ্জামাদি মজুত থাকে। নৃত্যকারীরা চীন হতে আনীত বহুমূল্য ও সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হয়ে এবং ভীষণ ও অদ্ভুত আকৃতির পোষাক পরে নৃত্য করে। কয়েকজন লামা মিলে অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্রগুলো বাজাতে থাকে; সেই বাদ্যের উদ্দাম সুরের সঙ্গে তাল রেখে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে। মধ্যযুগের উৎসবের চিহ্ন হিসাবে এর সঙ্গে আজকালকার কোন অনুষ্ঠানের তুলনা চলে না।

তিব্বতীদের বিশ্বাস বিহারটি দুজন দেবতার তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত আছে। এঁদের মধ্যে একজন হলেন পুরুষ-দেবতা—নাম দোর্জে সুংদেন; আর একজন স্ত্রী-দেবতা—নাম পলদেন লামো (Palden Lhamo)। বিহারের উত্তর-পূর্ব দিকের ছোট্ট দুখানা ঘরে এই দেবমূর্তিগুলো অধিষ্ঠিত ও পূজিত হয়ে থাকে। দোর্জে সুং দেনের মূর্তিটি সত্যি বিস্ময় উৎপাদন করে। এ মূর্তিটি যে ঘরের মধ্যে স্থাপিত সেই ঘরটি নির্মিত হয়েছিল গেসেই রিম্পোসির (Geshay Rimpoche) চেষ্টায়। তিব্বতীরা যখন এই মঠ দর্শন করতে আসে তখন তারা দোর্জে সুং দেন—দেবতার পুজো দিয়ে যাবেই।

মুখোস-নৃত্য বা প্রেত-নৃত্যের (Devil-dance)এর একটি দৃশ্য।

দোর্জে সুং দেনের জীবন ও মৃত্যুর কাহিনী অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক. দোর্জে সুং দেনকে সাধারণত বলা হয় 'অবতার লামা' এবং তিনি ছিলেন "তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্মে" অতি সুপণ্ডিত। তিব্বতের জনসাধারণ তাঁকে এত শ্রদ্ধা করতো যে অন্যান্য "অবতার লামা" তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তার প্রাণ হরণ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়। পরে দোর্জে সুং দেন যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁর অন্তিম সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে তখন তিনি লাসার সমস্ত উচ্চ কর্মচারীদের ডাকলেন। তারপর একখণ্ড লম্বা কাপড় দিয়ে তিনি তাদের সাহায্যে গলার ভেতরে কাপড় ঢুকিয়ে দম বন্ধ করে প্রাণত্যাগ করলেন। কথিত আছে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা স্বর্গে যেতে পারেনি; কারণ ভক্তেরা তাঁর নিকটে নাকি প্রার্থনা করেছিল, তিনি যেন তাঁদের নিকটে অবস্থান করে সমস্ত বিপদের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করেন এবং তাঁর প্রতি অন্যায়কারীদের যেন প্রতিশোধ নেন। তিব্বতে ও তিব্বতের বাইরের বহু বৌদ্ধ-মঠের রক্ষাকর্তা দেবতা হিসাবে তাঁকে কেন মনে করা হয়, এ কাহিনী পড়লেই তার কারণ বুঝা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, পলদেন লামো (Palden Lhamo) মঠের রক্ষাকর্ত্রী দেবী। তিব্বতী ও নেপালী বৌদ্ধেরা বিপদে পড়লে বহুদূর বা নিকট হতে এসে তাঁর পুজো দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ ও কৃপাভিক্ষা করে।

তিব্বতীদের মধ্যে মৃতদেহ সৎকার করবার চারটি পদ্ধতি দেখা যায়; প্রথমত—শবের দেহে অগ্নিসংযোগ করা, দ্বিতীয়তঃ, শবদেহকে শকুনদের খাদ্য হিসাবে দিয়ে দেওয়া; তৃতীয়ত, শবদেহকে কোন নদীর মধ্যে বিসর্জন দেওয়া; চতুর্থতঃ, শবদেহকে মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলা। ভারতীয় আইনের বিধান মতে মৃতদেহ সৎকারের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতি গ্রাহ্য নয় বলে তিব্বতীরা তাদের মৃতদেহকে হয়ত দাহ করে কিংবা সমাধি দেয়।

তিব্বতে কাঠ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও দামী হওয়ায় মৃতদেহের দাহকার্য সাধারণত অত্যন্ত ধনী এবং অবতার-লামাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মৃতদেহকে শকুনের নিকট উৎসর্গ করা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও বীভৎস অনুষ্ঠান সন্দেহ নেই। উৎসর্গ করার পদ্ধতিটা সাধারণত এরূপ। প্রথমত, মৃতদেহকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করা হয়, তারপর হাড় থেকে মাংস বের করে শকুনদের নিকট দেওয়া হয়। এরপর হাড়গুলোকে চূর্ণ করে মাথার ঘিলুর (Brains) সঙ্গে মিশিয়ে ছোট ছোট পিণ্ড তৈরী করা হয়। তারপর সেই পিণ্ডগুলো শকুনদের সামনে ফেলে দেওয়া হয়। সহজেই বোঝা যায়, এরপরে মৃতদেহের আর কিছুই থাকে না। শকুনদের কাছে মৃতদেহকে এভাবে পিণ্ডাকারে উৎসর্গ করতে করতে তিব্বতীরা সাধারণত "ওং মণিপদ্মে হুং" নামক মন্ত্রটি আওড়াতে থাকে। এ মন্ত্রের অর্থ হলো—"মৃতাত্মার শান্তি হোক।" তিব্বতে

মৃতদেহ সৎকার কার্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এভাবে হয়ে থাকে।

মৃতদেহকে খরস্রোতা নদীজলে বিসর্জন করবার রীতিটাও তিব্বতে খুবই প্রচলিত। বসন্ত, জলবসন্ত, কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগে যারা মারা যায় তাহাদিগকে সাধারণত সমাধি দেওয়া হয়। তিব্বতীরা মনে করে যারা ভগবানের অভিশাপে এসব রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায়, সমাধি শুধু তাদেরই জন্য। মৃতদেহ সৎকারের মধ্যে কবর দেওয়া সেজন্য তিব্বতীদের মতে খুবই ঘৃণিত পন্থা।

বৌদ্ধ ভিক্ষু বা লামাদের মধ্যে সাধারণত দুটো সম্প্রদায় দেখতে পাওয়া যায়; একটা হলো পীত সম্প্রদায়, আর একটা লোহিত সম্প্রদায় (Yellow and Red Sect)। বৌদ্ধ ধর্মানুমোদিত রীতি বা নীতি পালনে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই—যত বৈষম্য দেখা যায় তাদের পোষাক-পরিচ্ছদে। এই উভয় সম্প্রদায়ই একই দেবদেবীর উপাসনা করে থাকে। এক সম্প্রদায়ের লামা অন্য সম্প্রদায়ের বিহারে ঢুকে একই দেব-দেবীর উপাসনা করতে পারে। কিন্তু 'লোহিত সম্প্রদায়ের' লামারা পীত সম্প্রদায়ের মঠের 'শান্তি-নিবাসে' থাকতে পারে না। পোষাক ছাড়াও লোহিত ও পীত সম্প্রদায়ের লামাদের আর একটি বৈষম্য হলো এই যে, লোহিত সম্প্রদায়ের লামারা একবার মাত্র বিয়ে করতে পারে, কিন্তু পীত-সম্প্রদায়ের লামাদের পক্ষে বিয়ে না করে চিরকৌমার্য ব্রত পালন করা অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য 'ঘুমে' এবং দার্জিলিং জেলার অনেক স্থানে এমন অনেক পীত-সম্প্রদায়ের লামা দেখা যায় যারা দাম্পত্য-জীবনের সুখ-ভোগের জন্য কৌমার্যব্রত পালন করবার কঠোর ব্রতকে ভঙ্গ করে। অবশ্য এই ব্রত ভঙ্গের জন্য তারা কৌমার্যব্রতধারী লামাদের নিকট 'পতিত' বলে পরিগণিত হয় এবং 'কুমার' লামারা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধার অধিকারী সে সমস্ত সুযোগ সুবিধা হতে ওরা বঞ্চিত। এ রকম অনেক 'পতিত' লামাকে ঘুমের বৌদ্ধবিহারে ভৃত্যের কাজ করতেও দেখা যায়।

কলকাতার পথে একদিন

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

শহর কলকাতা। বণিক সভ্যতার প্রথম পাদপীঠ। যুগ-যুগান্তের বৈচিত্র্যময় নাগরিক সংস্কৃতির স্মারক এখানকার প্রতিটি প্রাসাদ অট্টালিকা—প্রতিটি রাজপথ। বাঙলাদেশের হৃদপিণ্ড বলা যেতে পারে এই শহরকে। এখানকার জীবন-চাঞ্চল্য, কর্ম-মুখরতা অনুভূত হবে দূরদূরান্তের গ্রামে-গঞ্জে—নিভৃত পল্লীবাসীর কুটীরে। দিন দিন বৃহদকায় সরীসৃপের মতো স্ফীতকায় হয়ে যাচ্ছে কলকাতা—নগর সভ্যতার কেন্দ্রভূমির যা অনিবার্য রূপান্তর। কেউ হিসাবের নিক্তি নিয়ে হয়তো বসে নেই। হিসাব খতিয়ে দেখবার অবকাশও হয়তো নেই এখানকার ব্রস্তব্যস্ত মানুষের। তাই শহরের কলেবরবৃদ্ধি ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে কি করে সংঘটিত হলো তা কালানুক্রমিকভাবে বলতে পারে, এমন লোকের সংখ্যা কম। একদিন যখন জনবৃদ্ধির চাপে জীবিকার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দ্রব্যসামগ্রী উচ্চমূল্যে পৌঁছয়—শহরের লোক তখন অবাক হয়ে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মতো করে চলাফেরা। এমনিই হয় বটে। কালে কালে নিত্য-নতুন কার্যকলাপ, শাসন-বিধান মূর্তমান হতে লাগলো। প্রাসাদ অট্টালিকা রাজপথের ক্রমপ্রসার অবশ্য মন্দীভূত হতে লাগলো একসময়। কিন্তু আশ্চর্য রূপায়ণ নিল জীবন ও জীবিকার বিকাশ। সরকারী সদাগরী অফিস উপচে পড়লো জনপ্লাবনে। গঙ্গার দুই তীরে চিমনির ধোঁয়া সূচনা করলো নগর-সভ্যতার বলিষ্ঠ অঙ্গীকার। কলকাতার বুকে এবার মসীজীবীদের সাথে শ্রমজীবীদের পদধ্বনি গুঞ্জরিত হলো। সৃষ্টি হলো ধনিক সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি—শহর কলকাতা। লক্ষ লক্ষ লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের অবলম্বন এখন এই শহর। অজস্র জটিল গ্রন্থিতে ছককাটা হয়ে গেছে জীবনযাত্রা। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে আজ আর শুধু প্রাপ্ত-বয়স্করাই বিব্রত ব্যতিব্যস্ত নয়। এই জীবনযুদ্ধে তাদের পার্শ্বচর হিসাবে এসে দাঁড়িয়েছে শতসহস্র অপরিণত অনভিজ্ঞ কিশোর বালক। দুঃসহ সব জীবীকায় তাদের সংস্থিতি। তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে জীবনীশক্তি। তবু বাঁচতে হবে বলেই দিনযাপনের পালা অভিনয় করে যাচ্ছে এরা। শহর কলকাতার এ আরেক দৃশ্যপট। সাম্প্রতিক যদিও নয়—তবু আধুনিক। Boy labourer বা infant slaveryর যে অধ্যায় য়ুরোপের বিভিন্ন নগরে রচিত হয়ে গেছে, বিগত শতকে আজকের দিনে এই শহর কলকাতায় ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মধ্যাহ্নলগ্নে তারই ধারাবাহিকতা নেমে এসেছে। তাই সহস্র বালক-কিশোরের bastile আজকের এই শহর কলকাতা।

* * * * *

ইংলণ্ডের কবি রেডউড্ এণ্ডারসন লণ্ডনের রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন একদিন। যেতে যেতে তিনি দেখতে পেলেন রাস্তার উপর এক জায়গায় কতকগুলো প্রায় অর্ধনগ্ন ছেলে লুটোপুটি করছে—হৈ হুল্লোড় করছে। সমস্ত শরীর তাদের কাদায় লেপটানো। হঠাৎ মাটির মানুষ বলেই মনে হয়। এরা হাঁ-ভাতের ঘরের ছেলে বুঝতে পারলেন এণ্ডারসন্। আবেগ-কম্প্র হলো তাঁর মন—

"Now gives them heed, and they
must live their days.
Neglected and despised........"

তবু ওদের মধ্যে প্রাণস্ফূর্তির চাঞ্চল্য রয়েছে নইলে প্রাণখুলে হেসে ওরা লুটো-

পটুটি খাচ্ছে কেন? তাই এন্ডারসন বলতে বলতে পথ পার হয়ে গেলেন—

"................as I go my ways,
Often in sudden deep humility,
Often in gratitude, I pause to bless—
The cheerful puddles of the
public road."

এন্ডারসন যা দেখেছিলেন এই কলকাতার পথে আপনিও তা দেখতে পারেন। একদিন কিংবা সহসা নয়—রোজই প্রায় যখন তখন। যে-কোন রাস্তায় একটু অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে চলতে থাকুন। এন্ডারসনের মতো কবিমন আপনার না থাকলেও চলবে। তবে সময়টা মধ্যাহ্ন হলেই ভালো হয়। কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে অসম্ভব তেতে উঠেছে কলকাতার রাস্তা। কালো পীচ গলে কুঁচকে যাচ্ছে। মহিষের নাল-আটা পায়ের চিহ্ন কিংবা ভারবাহী ট্রাকের চাকার ছাপ গভীর দাগ কেটে বসে যাচ্ছে পীচ-গলানো রাস্তায়। অফিসের ঊর্ধ্বপ্রাণ যাত্রীর ভিড় এখন নগণ্য বলে রাস্তা-ঘাটগুলো একটু ঝিমন্ত অবসাদগ্রস্থ মনে হতে পারে আপনার। এবার লক্ষ্য করুন। রাস্তার উপর এখানে সেখানে ম্যানহোলের গোলাকার লোহার ঢাকনাগুলো খোলা হয়েছে। পূতিগন্ধময় ময়লা তোলা হবে এই সব বিরাট ড্রেন থেকে। একটা দড়িতে বালতি বেঁধে উপর থেকে ঐ খোলামুখ দিয়ে ভেতরে নামিয়ে দেওয়া হলো। এবার আরেকটা দড়ি বেয়ে ঝুলে ঝুলে ভেতরে নেমে গেল একটি ছেলে। ঢাকনার কাছে দড়ি দুটো ধরে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েকজন। এভাবে প্রত্যেকটি মুখ দিয়ে একেকটি ছেলে ড্রেনের ভেতর বয়ে নামলো। সেখান থেকে তারা ময়লা বালতিতে ভরে দেয়। আর উপরে দাঁড়ানো লোকেরা তা টেনে তুলে ফেলে। দেখতে দেখতে রাস্তার উপর স্তূপ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো কলকাতার পুঞ্জীভূত পয়মাল। তারপর ড্রেনের ভেতর থেকে সেই দড়ি ধরে ছেলেগুলো উপরে উঠে এলো। মাথা চোখ মুখ সমস্ত শরীর ওদের ময়লায় আচ্ছন্ন। যেন জীবন্ত পয়মাল ওরা। কি করে যে ওরা এতক্ষণ শ্বাসরোধী ড্রেনের ভেতর ছিল, ভাবতে অবাক লাগছে আপনার। কিন্তু আপনার অবাকলাগাকে আর না-ই লাগুক সেদিকে খেয়াল করবার মতো ওদের অবকাশ নেই। ততক্ষণে ওরা রাস্তার পাশের হোস্ পাইপের মুখ খুলে দিয়ে উচ্ছ্বসিত জলধারায় গা ধুয়ে নিচ্ছে পরম তৃপ্তিতে। প্রাণখুলে চীৎকার করছে। কোন হিন্দী গানের দু এক ছত্র হয়তো অসংলগ্নভাবে বেরিয়ে আসছে কণ্ঠ থেকে। গা ধুয়ে পরনের ল্যাংগট ভালো করে নিঙড়ে কাঁধে ফেললে সবাই। মেহনৎ আজকের মতো শেষ। দিন-মজুরীটাও মিলবে একটু বাদেই। তাই দেখলেন আপনি—খুশীতে ঝলসে উঠলো ওদের চোখমুখ। ঠিক এই ক্ষেত্রে কবি এন্ডারসন এদেরও আশীর্বাদ জানাতেন কিনা হয়তো ভাবছেন আপনি। কিন্তু সে ভাবনা আপাতত স্থগিত রেখে এবার আসুন আরেক জায়গায়।

এ্যাস্প্ল্যানেড্-শিয়ালদহ-শ্যামবাজারের মোড় এমনি কোন বড় রাস্তার চৌহদ্দিতে এসে দাঁড়িয়েছেন আপনি। থমকে-দাঁড়ানো ট্রাম-বাসের জানলার কাছে, ফুটপাতে, পান-বিড়ির দোকানের পাশে চীৎকার করছে কতকগুলো ছেলে, "মাত্র এক আনায় স্ট্রীট ডায়েরী—কলকাতা-হাওড়ার সমস্ত পথের খবর পাবেন। ম্যাপ এঁকে দেখানো আছে। মাত্র এক আনা। নিয়ে যান।" সাথে সাথেই আবার চীৎকার শুনলেন, "টক-মিষ্টি লজেন্স—এক আনা প্যাকেট।" আট হাত সুতো এক আনা, একপাতা সূঁচ এক আনা, একখানা বিশুদ্ধ পকেট পঞ্জিকাও এক আনা—কেউ কেউ শুনিয়ে দিচ্ছে ঠিক আপনার কানের কাছে। চানাচুর আর দাঁতের মাজন এতসব পণ্যের মধ্যে যদি আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় তো তা একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু হঠাৎ আপনার প্রায় মুখের উপরই একজন একটি দাঁতের মাজন এগিয়ে দিয়েছে দেখে আপনি একটু কৌতূহল বোধ করলেন। এর বেশী আর কিছুই নয়। আপনি হয়তো বুঝতে পারেন নি। আপনার ভাবলেশহীন মুখখানা কিন্তু ধরা পড়েছে মাজন-ওলা ছেলেটির চোখে। তাই সে বললে, "নিন না বাবু একটি মাজন। কতো পয়সা তো কতোভাবে খরচ করেন। চারটি পয়সা দিয়ে কিনুন না একটি।" তারপর কেমন ম্লান হেসে বললে, "বুঝতেই পারছেন ও মাজন-ফাজন আসলে নেহাৎ বাজে। কিন্তু ওরকম একটা কিছু দেখাতে তো হবে। নইলে পয়সা দেবে কেন লোকে। কিনে না হয় ফেলে দেবেন। তবু কিনুন একটি আমায় চারটি পয়সা দিন।" কেমন বক্তৃতার মতো মনে হতে পারে কথাটা। আপনার ইচ্ছা হয় কিনবেন না হয় কিনবেন না। রাস্তার মোড়ে যাদের কর্ণ-বিদারী চীৎকার শুনলেন আপনি তাদের পণ্যসম্ভার সবই এমনি ঠুনকো ধারণা হবে আপনার। বিরক্তি লাগবে এই ভেবে যে এই ছেলে ছোকরা বয়সেও কেমন কূট ফন্দি-ফিকিরী রপ্ত করে ফেলেছে ওরা। কিছু দিন আগেও যারা এসব জিনিসের বিক্রেতা ছিল তারা অধিকাংশই ছিল বয়স্ক ঝুনো সব ফেরিওলা।—লক্ষ্য করেছেন আপনি। কিন্তু এখন দেখছেন বেশীর ভাগই এরা উঠতি বয়সের। তাই হয়তো বিরক্তিতে এমন করে মনটা বিঁধছে আপনার। পাশ কেটে দাঁড়ালেন আপনি। কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কেন? প্রাণ-পিপাসায় এরা ফাঁকি আর মেকির বেসাতি অনন্যশরণ জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে—এ কথা ভেবেই আপনার হৃৎপিন্ড থেকে অমন লম্বা নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে এলো। অথচ আপনি টের পেলেন না। এতে আপনিই আবার একটু পরেই কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন।

আপনি চলছেন তবু। চলতে চলতে লক্ষ্য করুন—খোল-করতাল বাজিয়ে একটি মৃত-দেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শ্মশানঘাটের দিকে। শববাহকদের পুরোভাগে একটা ধামা থেকে খই আর খুচরো পয়সা ছড়িয়ে যাচ্ছে দু' একজন। হঠাৎ দেখলেন—মাছরাঙা কিম্বা বাজপাখী যেমন বিদ্যুৎগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শিকারের উপর তেমনি একদল নোংরা ছেলে সেই ছড়ানো পয়সার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। শবযাত্রার সাথেই সাথেই চলছিল ছেলেগুলো। তক্কে তক্কে ছিল কখন পয়সা ছড়ানো হবে রাস্তায়। দেখলেন—হুমড়ি খেয়ে পড়ে পরস্পর টুঁটি টিপে ধরেছে ছেলেগুলো—আঁকড়ে ধরেছে এ ওর চুল। তুমুল টানা-হেঁচড়ার পর একজন হয়তো একটি ফুটো পয়সা তুলে ছুট দিলে একদিকে। আর অমনি সবাই ধাওয়া করলো তাকে।—জোঁকের মতো ছেঁকে ধরলো। এবার ওর রেহাই নেই। সত্যি রাস্তায় অবশ হয়ে পড়ে গেলে ছেলেটা কিছুক্ষণ যুঝবার পর। সারা গা আঁচড়ে গেছে তার। নাকে ঠোঁটে রক্তের ছোপ। শেষ পর্যন্ত কে কয়টা পয়সা পেল

দেখতে পেলেন না আপনি। শববাহকরা এগিয়ে যাচ্ছে। ছেলেগুলোও আবার ছুটছে পিছু পিছু তীর্থের কাকের মতো। কখন আবার পয়সা ছিটোবে ধামা থেকে সেদিকে সতর্ক নজর। এরা কারা? একটা ধিকৃত চেতনায় ভাবছেন আপনি। কিন্তু কে উত্তর দেবে আপনার প্রশ্নের? এরা নিজেরা জানে না এদের পরিচয়, জানে না কোন পথচারী। মাতা পিতার যে স্বাভাবিক পরিচয় মানুষের জীবনের উজ্জ্বল ভিত্তিভূমি তা এদের অনেকেরই জানবার সৌভাগ্য হয়নি। যাদের হয়েছে তাদেরও মন থেকে মুছে গেছে সেই সান্নিধ্য সম্পর্ক। এরা তাই গোত্রহীন, জাতিহীন। নেহাৎ পথের ছেলে ছাড়া কি আর হতে পারে এদের পরিচয়? একমুঠো মুখে গুঁজবার প্রাণান্তিক প্রেরণা শুধু ওদের স্নায়ুশিরায়। শবযাত্রার ওই রাস্তার ধূলিকণার মতোই ওরা নগণ্য, নিষ্পৃষ্ট।

আরেক শ্রেণীর ছেলে দেখছেন আপনি যারা নেশায় পেশায় পুরোদস্তুর ভিখিরী হয়ে গেছে—এরিমধ্যে। কলুটোলা, পার্ক সার্কাস, রাজাবাজার, এণ্টালী অঞ্চলে এসে দাঁড়িয়েছেন আপনি। জুম্মা নামাজের দিন। দেখছেন মসজিদে মসজিদে নামাজ-ফেরৎ লোকের ভিড়। আর ঠিক মসজিদের বাঁদিকে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তেমনি একটি জনতা যারা নিঃস্ব রিক্ত ভিখিরীর দল। এই ভিখিরীদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী ছেলে আট বছর থেকে চোদ্দ পনের বছরের মধ্যে। ওরা সব দাঁড়িয়ে আছে অধীর প্রতীক্ষায়। একবার তাকাচ্ছে মসজিদের দিকে একবার দৃষ্টি মেলে দিচ্ছে সামনে দিয়ে আসার পথের দিকে। কেন জানেন? লক্ষ্য করুন। দেখলেন সমস্ত ভিখিরী দল চঞ্চল হয়ে উঠেছে হঠাৎ। ঠেলাঠেলি তাগুঁতি করে সবাই এগিয়ে আসতে চাচ্ছে একটা রিক্সার দিকে। নামাজের পর রিক্সায় চড়ে যাচ্ছেন দুজন লোক। একজনার হাতে একটি থলিয়া, সেই থলিয়া থেকে একেকটি পয়সা একেকজন ভিখিরীকে দিতে এগিয়ে আসছেন রিক্সাযাত্রী। লুব্ধ হায়েনার মতো তাই রিক্সার কাছে এসে দাঁড়ালো ভিখিরীর দল। পয়সা বিলিয়ে চলে গেলেন রিক্সাযাত্রী দুজন। উৎকট একটা উল্লাসের ধ্বনি তাঁর্দের জন্য শুনলেন আপনি—দৈন্য-পীড়িতের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসধ্বনি। এমনি করে হয়তো আরও কয়েকজন পয়সা বিলিয়ে চলে গেলেন মনে মনে দুঃস্থ সেবার আত্ম-তৃপ্তি নিয়ে। এ দৃশ্যের রকমফের অবতারণা বড়বাজার, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট—এসব অঞ্চলেও দেখতে পাবেন আপনি। এসব জায়গায় কোন সমৃদ্ধশালীর গৃহদ্বারে কিংবা যুগ-যুগান্ত প্রখ্যাত দেব-বিগ্রহের মন্দির-চত্বরে দেখবেন আকস্মিক বন্যার স্রোতের মতো সেই ভিখিরীর দল এসে জুটেছে। সপ্তাহের একটি দিন কাঙাল বিদায়ের দিন বলে প্রতিপালিত করে থাকেন এই সব ধনবান ব্যক্তিরা। মুষ্টি-ভিক্ষা আর তার সাথে কিছু পয়সা-কড়ি ভিখিরীদের হাতে তুলে দেন তাঁরা। কৃতাঞ্জলিপুটে ভিখিরীরা তা গ্রহণ করে চলে যায়। বুকে একটা প্রতীক্ষা-কাতরতা নিয়েই চলে যায়—কখন আবার এই দিনটির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

অন্যমনস্ক হয়ে এবার হয়তো হাঁটতে শুরু করলেন আপনি! হাঁটতে হাঁটতে পায়ের দিকে এক সময় নজর পড়তে মনে হলো আপনার ধূলি-ধূসর জুতোটা একটু পালিস করে নিলে মন্দ হয় না। ফুটপাতের কিনারে দাঁড়িয়ে জুতোর দিকে তাকিয়ে পাটা নাড়াচাড়া করছেন আপনি। হঠাৎ অনুভব করলেন জুতো-সমেত আপনার পা'টা কোলের উপর টেনে নিয়েছে একটি ছেলে। এক হাতে তার জুতোর ব্রুস—কালির কৌটোটা খুলে ধরেছে আরেক হাতে। আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আগ্রহ-আকুল কণ্ঠে বললে ছেলেটি, "বাবু, পালিস। বার্নিসের মতো রঙ খুলে যাবে জুতোর।" আপনার মৌনম্-সম্মতি লক্ষনম্-ভাব দেখে ছেলেটি এবার বেশ জুৎ করে ব্রুস ঘসতে লেগে গেল জুতোয়।

সার বেঁধে আরও কয়েকটি ছেলে বসে আছে জুতো পালিস করবার সরঞ্জাম নিয়ে। ফুটপাতে-চলা প্রতিটি লোকের পায়ের দিকে তাদের দৃষ্টি। থেকে থেকে আউড়ে চলেছে, "বাবু, পালিস—বাবু পালিস।" কখনও বা ব্যস্ত পথচারীর পায়ে হাত দিয়েই বলছে কথাটা। আর আচমকা গতি-ব্যাহত পথচারী একটা বিরক্তিকর মন্তব্য করে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন। পাশে দাঁড়িয়ে আপনি দেখছেন। তাই ব্যাপারটা কেমন বিসদৃশ মনে হতে পারে আপনার। কিন্তু ওই ছেলে-দের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ওরা আশ্চর্যরকম নির্বিকার। নৈরাশ্যের এতোটুকু ছায়াও দেখবেন না ওদের মুখে। এ ওদের প্রত্যেক মুহূর্তের অভিজ্ঞতা। প্রাণ-ধারণের জন্য এই যে জীবিকা ওদের তাতে অমন ব্যবহারই তো নিত্যসহচর। তাই দেখছেন আপনি পথচারীর রূঢ় অবজ্ঞার পরেও ওরা আরও দ্বিগুণ উদ্যমে চেঁচিয়ে উঠছে, 'বাবু, পালিস।' কেননা, জুতো ওদের পালিস করতেই হবে। দিনান্তে অন্ততঃ চারগণ্ডা পয়সা রোজগার না করলে চলবে কেন?

এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে বুঝি ক্লান্তি লাগছে আপনার। চলুন আরকটু দেখে আপাতত বাড়ি ফিরবেন। এবার প্রকাশ্য রাজপথ নয়। অলিতে-গলিতে আসতে হবে আপনাকে। বেশী নয় কয়েকটা গলি শুধু। রামবাগান-সোনাগাছি-হাড়কাটা অঞ্চলের সংকীর্ণ পরিসরে এসে দাঁড়িয়েছেন আপনি। দেখ-ছেন গলির এখানে সেখানে ঘুরছে কতক-গুলো ছেলে। এরা বয়সে একটু বড়—উত্তর-কিশোর। কেউ জটলা করছে—কেউবা মারবেল-লাট্টু ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। আপনি পাশ কাটিয়ে চলে যান। দেখবেন কেউ খেয়ালও করছে না আপনার দিকে। কিন্তু একটু এগিয়েই পকেটে হাত দিয়ে সম্বিৎ হবে আপনার। শূন্য পকেট, রুমাল-বাঁধা সামান্য পুঁজি পকেট থেকে উধাও। এভাবে যদি খোয়া যায় আপনার সামান্য সম্বল তো ভালোই বলতে হবে। কেননা, এর পরিবর্তে যে অন্যবিধ পন্থা অবলম্বিত হতে পারতো তা থেকে রেহাই পেয়ে গেলেন। কি সেই পন্থা শুনুন তাহলে। হঠাৎ দেখতেন ছেলে-গুলো 'চোর-চোর' কিংবা এমনি কোন

চীৎকার শুরু করে ঘিরে ফেলেছে আপনাকে। আর ওদের চীৎকারে কিছু বয়স্ক-যোয়ান লোকও এসে জুটেছে। আপনি কিছু বলবার আগেই বয়স্ক লোক-গুলো জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছে আপনাকে। ওদের কাছে যখন জবাবদিহি হচ্ছেন সেই মুহূর্তে ছেলেগুলো ঠেলাঠেলি করে এসে পড়লো আপনার গায়ের উপর। বয়স্করা তখন ওদের প্রতিনিবৃত্ত করবার অভিনয় করে উঠলো, 'করিস কি, করিস কি! দেখছিস না উনি ভদ্রলোক আছে!' কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। আপনার হাতঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন, মণি ব্যাগ লোপাট। ব্যাপারটা আগাগোড়া অনুধাবন করবার মতো তখন আপনার মনের অবস্থা নয়। ছুটে পালাতে পারলে বাঁচেন আপনি। তাই পা চালিয়ে গলি থেকে বাইরে চলে এলেন তাড়াতাড়ি। গলির সেই লোক-গুলোর আর পাত্তা নেই। কিছুক্ষণের জন্য ওরা গা ঢাকা দিয়েছে কোথায়। খোলা রাস্তায় এসে এখন ভাববার অবকাশ পাবেন। আপনার বেশবাস বিপর্যস্ত। নিজেকে মনে হবে তড়িৎস্পৃষ্টের মতো। এই হলো অন্য-বিধ পন্থা—যা আপনার উপর প্রযুক্ত হতে পারতো। কলকাতার কোন কোন অঞ্চলে দিনে দুপুরে এমন ঘটনা ঘটছে—যদিও আজ কুখ্যাত ঠগের আমল কিংবা মগের মুল্লুক নয়। কিন্তু ঘটছে। ভদ্রপাড়ার বাসিন্দা হয়ে এ সব পঙ্কিল অঞ্চলের এই স্বাভাবিক ব্যাপারটা আপনার পক্ষে কল্পনা করা একটু সময় সাপেক্ষ। আপনার তো জানবার কথা নয়—মহানগরীর বুকে একটা প্রেতায়িত অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে আছে এই রামবাগান, হাড়কাটা, সোনাগাছি অঞ্চলের এক শ্রেণীর মানুষ। পরিচয়ের যে ছাব ওরা আপনার চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে তা একটা জীবন্ত বিভীষিকা। সাম্প্রতিক আদমসুমারীর সময় কেউ কেউ উদ্ঘাটিত করেছেন এই পরিচয়—সংবাদপত্রে হয়তো দেখে থাকবেন। এই অধিবাসীদেরই উত্তরসুরী গলির ছেলেগুলো—যাদের দেখতে পেলেন। এরা উত্তরসুরী। তাই জীবিকাও এদের আরও কদর্যতায় রূপান্তর নিয়েছে। কলকাতার ট্রামে-বাসে কর্মব্যস্ত রাস্তায় পকেটমারের প্রায় একচেটিয়া অধিকার এই সব নামহীন ছেলের। পৃথিবীতে এরা অবাঞ্ছিত যোগসূত্রে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তাই অনেক সুষ্ঠু প্রবৃত্তি থেকে এরা বঞ্চিত। কিন্তু বাঁচবার সহজাত জৈবিক প্রেরণা তো বঞ্চিত করেনি এদের। তাই বাঁচবে এরা। আর বেঁচে থাকছে জঘন্য সব জীবিকার আশ্রয়ে।

* * * * *

শহর কলকাতা। এ যুগের দৃষ্টির—এ যুগের সৃষ্টির পীঠস্থান। বণিকের মানদণ্ড রাত পোহালে যেদিন এখানে রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেদিনের পর থেকে অনেক ইতিহাস রচনা করে গেছে এখানকার বিভিন্ন উপাদান দিয়ে। ইতিহাসের আরেকটি স্মরণীয় মোহানায় আজ আবার এসে দাঁড়িয়েছে কলকাতা—যখন বিভক্ত বাঙলার রাজধানী এই মহানগরী। এটা ইতিহাসের সৃষ্টি-লগ্ন। তাই ভেঙে যাচ্ছে জীবনযাত্রার প্রচলিত স্বাভাবিক কাঠামো। অনেক অস্বাভাবিক, অশোভন জীবিকার মাধ্যমে নেমে এসেছে শত-সহস্র নাগরিক। এটাই তো ইতিহাসের নিয়ম। ভাঙনের পথেই নেমে আসে নতুন সৃষ্টির গঙ্গোত্রী। আর ঠিক এই সন্ধিক্ষণে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে জীবনকে দুর্বিষহ সব জীবিকার পথে এগিয়ে নিচ্ছে বৃহত্তর জনসাধারণ—যারা নীচুতলার অধিবাসী বলে অভিহিত। এদেরই রক্তে গড়া অপারিণত কিশোর-বালকেরাও সে পথের অভিযাত্রী আজ। একদিনের নগর-পরিক্রমায় আপনার আমার মতো লোক কতোটুকু জানতে পারে এই বালক-কিশোরদের বহুবিচিত্র জীবন-যাত্রার কাহিনী! নতুন ইতিহাস গড়ে উঠছে। তাই হয়তো প্রয়োজন অজস্র অপরিণত জীবন-সত্তার বলিদান। কলকাতার বুকে তারি প্রমাণ-পত্র রচিত হচ্ছে আজ। এই দুঃস্থ ক্লিন্ন ছেলেরা হয়তো আজকের দিনে আত্মাহুতির অঙ্গীকার—
—a generation to be sacrificed.

কিন্তু তাই কি? সমাজ-বিপ্লবীর ভূমিকা নিয়ে বিজ্ঞানীর চেতনা নিয়ে কেউ কি এগিয়ে আসবে না এদের স্বাভাবিক জীবনের সুস্থতায় পুনর্বাসন করে দিতে? একটা ভবিষ্যৎ বংশ যদি এভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবে আগত ইতিহাসের ধারাবাহক হবে কারা? প্রশ্ন উঠবে। এমনি অনেক প্রশ্ন। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক নগর সভ্যতায় এসব প্রশ্নের যোগ্য উত্তরদাতার উপস্থিতি আজো স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। তাই শহর কলকাতার পাষাণ-কঠিন রাস্তায়, আকাশ-স্পর্শী প্রাসাদ অট্টালিকার দেওয়ালে দেওয়ালে এখনো আছড়ে পড়ে খান্ খান্ হয়ে যাচ্ছে এই প্রশ্নমালা।

অলক্ষ্যে

বনফুল

ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু কি করে ঘটেছিল তা জানি না। এইটুকু শুধু জানি, বৈজ্ঞানিকরা এ রহস্যের হদিস পাবেন না, রসিকেরা হয়তো পেলেও পেতে পারেন।

পলাশ গাছের তলায় এক বুড়ি কাঠ কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিল একদিন। সঙ্গে ছিল তার কিশোরী নাতনী সুখীয়া। সুখেরই জীবন্ত প্রতিমূর্তি যেন সে। সে কাঠ কুড়োচ্ছিল না। মনের আনন্দে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল শুধু। কখনও কুলগাছের ডালে নাড়া দিয়ে, কখনও নামহীন বন্য-লতার ফুল পেড়ে, কখনও এক ঝাঁক উড়ন্ত প্রজাপতির দিকে চেয়ে চেয়ে সময় কেটে যাচ্ছিল তার। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ সে এসে পলাশ গাছটার তলায় ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। অনেক উঁচুতে ফুল ফুটে আছে। গাছে না উঠলে পাড়া যাবে না। নাগালের মধ্যে যেগুলো রয়েছে সেগুলো কুঁড়ি। গাছেই উঠতে যাচ্ছিল সে কিন্তু বুড়ি মানা করলে।

"কি করছিস"

"ওই ফুলগুলো পাড়ি"

"না, গাছে উঠতে হবে না। পনর দিন পরে বিয়ে, মেয়ে গাছে উঠতে যাচ্ছেন"

"উঠলেই বা"

"পড়ে' গিয়ে হাত পা যদি ভাঙে তাহলে ভিকুর সঙ্গে আর বিয়ে হবে না তোমার। মুংলির বাপ মা ওৎ পেতে আছে"

বলিষ্ঠ গঠন ভিকুর চেহারাটা ফুটে উঠল সুখীয়ার মানস-পটে। গাছে ওঠবার চেষ্টা সে আর করলে না।

"তুমি আবার কবে এদিকে আসবে দিদিমা"

"দিন সাতেক পরে"

"আমি তখন কিন্তু আসব তোমার সঙ্গে"

"আসতেই হবে, অত বড় বোঝা আমি বইতে পারব না"

"আমার বিয়ে হয়ে গেলে তোমার বোঝা বইবে কে"

"তুমি আর ভিকু দুজনে"

হেসে উঠল সুখীয়া।

সমস্ত কথাগুলি মন দিয়ে শুনলে তারা।

২

দখিন হাওয়া এসে খোসামোদ করে' গেল অনেক। আমোলই দিলে না তারা। তার-পর এল একদল ভ্রমর।

"ঘোমটা খুলবে না নাকি তোমরা"

তারা নিরুত্তর। অনেকক্ষণ ধরে' গুঞ্জন করলে ভোমরারা। কিছু ফল না। এক ঝলক রোদ এসে পড়ল তাদের মুখে। সূর্যকিরণের আতপ্ত আহ্বানে আকুল হয়ে উঠল তাদের অন্তর, কিন্তু তবু তারা টলল না। মুখ টিপে চুপ করে' বসে রইল জেদ করে' যেন। প্রতিবেশীরা বলতে লাগল, "তোদের মতলব কি বল দিকি। বসন্ত যে বয়ে গেল—"

সাড়াই দিলে না তারা।

একবার নয়, বারবার চেষ্টা করলে সবাই! আবার এল দখিন হাওয়া, আবার এল ভ্রমরের দল, আবার এল সূর্যকিরণের আহ্বান, প্রতিবেশীদের মিনতি। দেহের শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত হল রসাবেগ। অবরুদ্ধ সৌরভ মথিত করে' তুলতে লাগল উন্মুখ চেতনাকে।

কিন্তু তবু তারা মুখ টিপে বসে রইল চুপ করে'।

সাতদিন পরে।

সুখীয়া ভিকুর দিকে চেয়ে বললে, "দিদিমা আসে নি ভালই হয়েছে, না?"

"দিদিমা এলে কি আমি আসতে পারতাম"

"দিদিমার জন্যে কিন্তু বড় এক বোঝা কাঠ নিয়ে যেতে হবে—"

"ওই গাছটায় উঠে কিছু কাঠ ভাঙি তাহলে"

"সাবধানে উঠো"

ভিকু চলে গেল।

সুখীয়া পলাশ গাছটার দিকে চেয়ে দেখলে একবার।

"ওমা, এ কুঁড়িগুলো ফোটেনি এখনও"

তবু কি মনে করে' সেইগুলোকেই তুলে খোঁপায় সে পরে নিল।

সুখীয়া কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে চলেছিল। তার পিছু পিছু ভিকু চলেছিল বাঁশী বাজাতে বাজাতে। হঠাৎ ভিকু বলে' উঠল—"তোমার খোঁপায় একটা আশ্চর্য কাণ্ড হচ্ছে কিন্তু"

"কি"

"পলাশফুলের কুঁড়িগুলো ফুটে উঠছে!"

"তোমার বাঁশীর সুর শুনে বোধ হয়"

মুচকি হেসে ভিকু ফুঁ দিল আবার বাঁশীতে। ফুল ফোটার আসল কারণটা কিন্তু কেউ জানল না।

চক্রদত্ত

হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ইন্তা জালাভিস্টো গবেষণা করে দেখেছেন যে, অল্প বয়সী অর্থাৎ চব্বিশ বা তার চেয়ে কম বয়সী মায়েদের সন্তানরা চল্লিশ বা তার চেয়ে বেশী বয়সী মায়ের সন্তানের চেয়ে অন্ততঃ ছয় সাত বছর বেশী বাঁচে। তিনি প্রায় ১৮০০ সুইডেনবাসী ও ফিনল্যান্ডবাসী শিশুদের জন্মতত্ত্বের হিসাব রেখে এই সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি আরও বলেন যে, পিতার বয়সের তারতম্য অনুসারে সন্তানের আয়ুর হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। সাধারণতঃ আমরা জানি যে, মানুষের আয়ু বংশগত ভাবেই কমবেশী হয়। এটা খুবই সাধারণ কথা যে, দীর্ঘায়ু মায়ের সন্তানও দীর্ঘায়ু হয়। তাহলে অধিক বয়সী মায়েদের সন্তানরা অল্পায়ু হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? ডাঃ জালাভিস্টো বলেন যে, এই বংশগতি ছাড়াও এমন একটা কারণ আছে যার জন্য বেশী বয়সের মায়েদের সন্তানরা অল্পায়ু হয়।

*

সহসা কোনও রকম আঘাত পেলে কিংবা পড়ে গেলে বা দুর্ঘটনার জন্য যদি মানুষ রক্তহীন হয়ে পড়ে তাহলে অন্য কারো রক্ত নিয়ে শরীরে প্রবেশ করানোর পদ্ধতি বিশেষ প্রচলিত। অবশ্য অনেক সময় ঠিক সময়মত রক্ত পাওয়া যায় না কিংবা খুব বেশী রকম রক্তের অভাব ঘটলে বেশী পরিমাণ রক্ত পাওয়া যায় না ফলে রোগী মারা পড়ে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট্ অব হেলথের এম রোসেনথাল পরীক্ষা করে দেখেছেন কিছুটা নুনজল রক্তহীনতার ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। রক্তশূন্য রোগীকে যদি দিনে বিশ পাইট নুনজল খাওয়ান যায় তাহলে রোগীর শরীরে আর কোনও রকম রক্ত প্রবেশ না করালেও চলে।—দু পাইট জলে চা-চামচের এক চামচ নুন আর দেড় চামচ সোডা মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। বর্তমানে ডাক্তারেরা এই ব্যবস্থার বহুল প্রচার চাইছেন; কিন্তু রক্ত কণিকা সংগ্রহ করার ব্যবস্থাও যেন প্রচলিত থাকে কারণ তারও একটা প্রয়োজন আছে।

*

গতির নেশা মানুষকে পেয়ে বসেছে। কে কত বেশী গতিসম্পন্ন যান তৈরী করতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলেছে। ডি ৫৫৮—২ ডগলাস্ স্কাই রকেট নাম দিয়ে এক নতুন ধরণের উড়ো জাহাজ তৈরী হয়েছে যার গতি সব উড়ো জাহাজের চেয়ে বেশী। শুধু গতিও নয়, এটা আকাশে সবচেয়ে বেশী ওপরেও উঠতে পারবে। এই স্কাই রকেটের গতি ঘণ্টায় ১০০০ মাইলের চেয়ে বেশী আর ১২ মাইলের চেয়েও বেশী আকাশের ওপর দিকে উঠ্তে পারে।

*

আমরা প্রায় সকলেই জানি যে, ফল রীতিমত পেকে গেলেই গাছ থেকে খসে পড়ে—কিন্তু আপেলের ক্ষেত্রে এই নিয়মের কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। আপেল পাকবার আগে কিংবা ঠিকমত রং ধরবার আগেই অনেক সময় গাছ থেকে খসে পড়ে, ফলে আপেলের বাগানের মালিকদের খুব ক্ষতি হয়। বর্তমানে একরকম রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ এর প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই পদার্থটিকে "প্ল্যাণ্টহর্মন" বলা হয়। গাছের ফল যে সময় ঝরে পড়ার মত হয় তখনই এ রাসায়নিক পদার্থের গুঁড়ো উড়োজাহাজে সাহায্যে আকাশের ওপর থেকে গাছে ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে এ ফলগুলি গাছের ডালে শক্ত হয়ে এঁটে থাকে এবং ঠিকমত পাকবার আগে আর ঝরে পড়ে না।

*

মোটর ট্রাকটি হঠাৎ উল্টে যায়নি—একে উল্টোনোই হয়েছে। অনেক সময় খুব ভারী জিনিস ট্রাকে তোলা এবং নামানো এক সমস্যার বিষয় হয়ে পড়ে। এই সমস্যা সমাধানের জন্যেই গাড়ীটা উল্টে ফেলা হয়েছে।—গাড়ীর ওপরের ভারী মালটা একটা শক্ত তার দিয়ে ইঞ্জিনের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধা থাকে যে মালটা নামাবার জন্য গাড়ীটাকে যখন ধীরে ধীরে পেছনের চাকা দুটোর ওপর দাঁড় করানো হয় তখন মালটিও নামতে থাকে। অর্থাৎ গাড়ীটা যখন ধীরে ধীরে পেছন দিকে হেলে তখন মালের সঙ্গে বাঁধা তারটিও আস্তে আস্তে আলগা হয়ে মালটিকে নামতে সাহায্য করে। মালটি যতই পেছন দিকে সরতে থাকে ভারসাম্য রক্ষার জন্য গাড়ীটার সামনের চাকা দুটো আবার সামনের দিকে আস্তে আস্তে নামতে থাকে। আর মালটি মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটি চার চাকার ওপর দাঁড়ায়।

অঘটন বা দুর্ঘটনা নয়—এটি বিজ্ঞানেরই অবদান

'আমার বন্ধু শীলা।' প্রিসিলা আলাপ করিয়ে দিল। রাস্তার তেমাথায় দেখা ওদের সাথে। 'ভীষণ ভাব ওর সঙ্গে আমার, জানো মেজমামা,'—জানায় সে আরো—'হোস্টেলে আমরা এক ঘরে থাকি।'

'একসঙ্গে পড়িস বুঝি?'

'আমার চেয়ে দু ক্লাস নীচে পড়ে—ওর এবার সেকেণ্ড ইয়ার।' প্রিসিলা প্রকাশ করে: 'তেমনি দু বছরের ছোট যে আমার চেয়ে।'

'তাহলে ঠিকই হয়েছে।' আমি বলি—'তোর নাম রাখা সার্থক হয়েছে। অনেক ভেবে চিন্তে রাখা তো।'

'আমার নাম?'

'হ্যাঁ। তোর নাম আমিই রেখেছিলাম তো। নইলে দিদি যা নামকরণ করেছিলেন—আন্নাকালী না কাত্যায়ণী—কী যেন!'

'হ্যাঁ—তা আর করতে হয় না। তাহলে আমি থাকতুম নাকি? আঁতুড়েই মারা যেতাম। নিশ্চয়।'

'আমিও সেই কথাই বলেছিলাম সুশীলাদিকে—বদনাম আমার ভাগ্নির সইবে না। তাছাড়া, পরে কলেজে উঠে শীলার সঙ্গে তোর ভাব হবে—ভীষণ ভাব হবে—এটাও যেন আমি আঁচ পেয়েছিলাম। তাই তো—সেই জন্যেই তো—শীলার আগে এসেছিস্ বলেই তোর নাম হোলো Pre-শীলা।'

শীলা হাসতে থাকে—'এতদিনে একটা মানে পাওয়া গেল আমাদের।'

'কফিহাউসে যাওয়া যেত, কিন্তু রাত তো আটটা প্রায়—' আমি বলি: 'যেতে যেতেই বন্ধ হয়ে যাবে আড্ডা-খানা।'

'তোমাকে আর কষ্ট করে খাওয়াতে হবে না। চাও তো তোমাকেই আজ আমরা খাওয়াতে পারি।'

খাওয়ার কথায় উৎসাহ বোধ করলেও বাইরে ঔদাস্য দেখাই, কথাটা গায় মাখি না। —সিনেমায় গেছলি নাকি তোরা? কোন্ সিনেমায়?'

'কোনো সিনেমায় না।'

'তাহলে অ্যাতো রাত্তির অব্দি বাইরে যে? বড়দিন করে বেড়াচ্ছিস্ বুঝি?'

'সকাল থেকেই। বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি থেকে হাঁড়ি হাঁড়ি খাবার এসেছে হোস্টেলে—তার ওপরে আবার নেমন্তন্ন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফের কাঁড়ি কাঁড়ি খেয়ে এলাম।'

'কী কী খেলি? শোনা যাক্ তো।'

ভোজনের ডোজ্ ঘ্রাণে অর্দ্ধেক হয়ে গেলেও, শুনতে বাড়ে ওজনে। খেলে তো সোনায় সোহাগা, শোনাতেও সোহাগ।

'কেক সন্দেশ,—কেক আর সন্দেশ আলাদা আলাদা, বুঝেচো? কেকসন্দেশ বলে যে আরেকরকমের আছে তা নয়—' প্রিসিলা বিশদ করে দেয়।

'জানি জানি, বেশ জানা আছে আমার। মেঠায়ের খবর তুই আমায় দিসনে।' আমি বাধা দিয়ে বলি—'কেক্সন্দেশ কী বল্ছিস্—সন্দেশের কে-কী-কবে- কেন-কোথায়—নিখিল বার্তা আমার নখদর্পনে। বার্তালা রাখ্—কী খেয়েছিস্ তাই বল্।'

'সন্দেশ কেক্ চকোলেট ট্রফি বিস্কুট পুডিং কতো কী! সব কি আর খেতে পেরেছি? এখনো ঢের আমাদের ঘরে মজুদ। খাবে তুমি? যাবে তুমি আমাদের হোস্টেলে?'

'তা, গেলে হয়—খেলে হয়।' তবু একটু ইতস্তত করি—'কেউ কিছু বলবে না তো?'

'কী বলবে? কার কী বলবার আছে? তুমি আমার ভাগ থেকে খাবে।' প্রিসিলা বলে—'তাতে কেউ কিছু বলতে পারে?'

'আমার ভাগ থেকেও দোবো।' শীলাও ছাড়ে না।

বড়দিন যেমন বড়িয়া দিন—রাতের দিকেও তেমনি বড়ো। শীতকালের সাড়ে আটটাতেই আর্দ্ধেক রাত। বড় রাস্তার ধারে যদি বা একটু জীবনের লক্ষণ দেখা যায়, ওদের হোস্টেলটা পাড়ার নেপথ্যে হয়ে এর মধ্যেই প্রায় নিশুতি।

হোস্টেলের সামনে এসে প্রিসিলা বল্লে—'দাঁড়াও মেজমামা।'

'কেন, দাঁড়াবো কেন? চল্ না।' আমি চঞ্চল হই।

'মেয়েদের হোস্টেলের নিয়ম জানো না? পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত ভিজিটিং হাওয়ার। তারপর কি বাইরের কাউকে যেতে দেয়?'

'সে কি রে! তবে আমায় টেনে আন্লি কেন? সাতটা যে অনেকক্ষণ বেজে গেছে।' স্তম্ভিত হয়ে আমায় দাঁড়াতে হয়। অতো সাত-পাঁচ আমার জানা ছিল না।

'দাঁড়াও—তার ব্যবস্থা করছি।' বলে প্রিসিলা আমাকে হোস্টেলের পেছন দিকে নিয়ে যায়—'পাঁচিল টপ্কাতে পারবে তো'

'উঠবো কি করে পাঁচিলে? কেউ যদি আমাকে তুলে ধরে আর ওধার থেকে নামিয়ে নেয়, তাহলে—তাহলে হয়ত পারি।'

'না নামালেও চলে—' একটু ভেবে বলি তারপরে—'লাফিয়েও নামা যায়। কিন্তু ওঠাটাই যে মুস্কিল। একটা মই পেলে—'

কিন্তু তাহলেও প্রস্তাবটায় আমার উৎসাহ হয় না। পাঁচিলের ওপর দিয়ে এই-ভাবে চলাচল করতে গিয়ে যদি পড়ে যাই—পড়ে গিয়ে পা ভাঙে যদি?

পাঁচিলের একটা সুগম্য স্থান শীলার জানা ছিল—সেখান দিয়ে নাকি অবলীলা-ক্রমে ওঠা যায়। সেধারে সে নিয়ে গেল আমায়। কিন্তু আমি দেখলাম পাঁচিলের সেখানটা পাহাড়ের খাড়াইয়ের মতন উঁচু আর মার্বেলের মতই মসৃণ। একটা মাছি উঠতে গেলেও পিছলে পড়বে।

'না। আমার কম্মো নয়।' আমি ঘাড় নাড়তে থাকি। আহার করতে গিয়ে পাহাড় ডিঙানো কি পায়ের হাড় ভাঙা—তার কোনোটাতেই আমি নেই।

'তাহলে এই দিকে আসুন—তেতলার ঐটে আমাদের ঘর। ভেতরে গিয়ে আমরা জানালা দিয়ে একটা শাড়ি নামিয়ে দিচ্ছি। তাই ধরে উঠে আসবেন। পারবেন না?'

'না।' এমনকি, ওরা যদি আমায় বালতির ন্যায় গলায় কি পায় বেঁধে কূপের থেকে জলতোলার মতন টেনে তোলে তাতেও আমি নারাজ। জলের মত সোজা ঠেকলেও—

আর আমার ওপর টান দেখা গেলেও—এই দোটানার মধ্যে পড়তে আমি ঘাবড়াই। যদি কারো হাত ফসকে হঠাৎ আমার ভরাডুবি হয়? জলযোগ করতে এসে নিজের জলাঞ্জলি দেয়া—একটা উল্‌টো উৎপাত নয় কি?

'কেন, পারবেন না কেন?' শীলা বুঝতে পারে না—'খুব সহজ তো ওঠা। পড়ে যাবার কোনোও ভয় নেই। আমরা দুজনে মিলে খুব কষে ধরে থাকবো—শাড়িটাও বেশ শক্ত।'

'পড়ার ভয় না থাকলেও পাড়ার ভয় তো আছে। যদি এ পাড়ার কেউ এটা দেখতে পায়? তাহলে কি আর আমায় আস্ত রাখবে?'

প্রিসিলা বলে—'তাহলে চলো, সদর দিয়েই যাওয়া যাক্। আমি দারোয়ানকে একধারে ডেকে নিয়ে গল্প জমাবো, তুমি সেই ফাঁকে শীলার আড়ালে গাঢাকা দিয়ে ঢুকে পড়বে।'

'উঁহু।'

শীলার আড়ালকে শীল্‌ডের আড়াল বলে আমার মনে হয় না।

'এই মেদস্বী বপু নিয়ে তোমার তন্বী বন্ধুর আড়াল দিয়ে যেতে হলে—না না, সে হয় না। নিশ্চয় আমি ধরা পড়ে যাবো।'

'বেশ, শীলা না হয় দারোয়ানটাকে জমিয়ে রাখবে। আমিই তোমায় ঢাকাঢুকি দিয়ে নিয়ে যাবো একরকম করে'—তাহলে তো হবে?'

'উহুঁ।......ঢুকলাম না-হয় ঐ রকমে কিন্তু বেরুবো কি করে শুনি?'

'তাহলে এক কাজ করা যাক্—'শীলা আরেক উপায় ঠাওরায়—'আমার বইয়ের বাক্সটা—কাঠের সিন্ধুকের মতই পেল্লায়—ওপর থেকে দড়ি বেঁধে নামিয়ে দিচ্ছি না হয়। প্রিসিদি, তুমি ততক্ষণ দুটো মুটে ডেকে আনোগে। তারপর মুটেদের দিয়ে—'

আমি বাধা দিই—'মুটে দিয়ে কী হবে?'

'আপনি বাক্সটার ভেতর গুটিশুটি হয়ে থাকবেন। বইয়ের গাদা বলে মুটেদের ঘাড়ে চাপিয়ে প্রিসিদি নিয়ে আসবে আপনাকে।' শীলা আমাকে বাৎলায়—'বাক্সটায় গোল গোল দুটো ছাঁদা আছে—ঘাবড়াবেন না।'

বাক্সবন্দী হয়ে মোটের মত মুটের মাথায় চেপে যাওয়াটা কেমন ধারা আমি ভেবে দেখি। ওভাবে কখনো যাইনি জীবনে, তাহলেও মোটামুটি হয়ত মন্দ হবে না। কিন্তু তাহলেও ঘাবড়াবার আছেই। সিন্ধুকের মধ্যে ছিদ্র—সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুর মতই। থাকলেই বা কী? ওই ছোট্ট ছোট্ট ফুটোয় আমার ছিদ্রান্বেষী দৃষ্টি দিয়ে বাক্সের ভেতর থেকে পথঘাটের কী আর হদিশ পাবো?

'আহা, ছাঁদা কি তোমার দেখবার জন্যে হয়েছে মেজমামা? বাতাসের জন্যেই তো!'

'ও, বুঝেচি—! গুমোটের মধ্যে ভেপ্‌সে যাতে মারা না যাই তাই......হাওয়া খেলবার জন্যেই ......বুঝলাম! কিন্তু ঐ ক্ষুদে

গায়ে-পড়া গাছ

ক্ষুদে জানালা দিয়ে কী আর এমন হাওয়া খেলবে!'

'আহা, হাওয়া নয়গো। অক্সিজেন্। অক্সিজেন্ চাই নে? অক্সিজেন্ না হলে কি আমরা বাঁচতে পারি?' প্রিসিলা হাইজিন্ নিয়ে আসে।

'তাই বল্।' তখন আমি বুঝতে পারি। মুটের ওপর শুধু মোট হলেই হয় না, মোটের ওপর অক্সিজেনটাও চাই।

তাহলেও, অক্সিজেনের খাতিরে বাক্সের মধ্যে সেঁধুতে আমার সাধ হয় না। কেক-সন্দেশ—আলাদা-আলাদা এবং একাধারে—তার একটা আকর্ষণ আছেই—বিলিতি পিঠে হলেও স্বদেশী পেটে অসহনীয় নয়—অসহযোগের না—সেজন্যে মুটের পিঠে চাপতে নেহাৎ নারাজ ছিলাম না—কিন্তু সেই লোভে বাক্সের পেটে যাওয়া—অতখানি এগুনো আমার যেন কেমন লাগে! এতখানি পেটুকপনা কি ভালো?

আমি আগুপিছু করি। বইয়ের ছদ্মবেশ ধরতে তেমন আমার বাধা ছিল না, কিন্তু বাক্সর এই বাধ্যতা স্বীকার আমার বিবেকে বাধে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কি কিছু নেই আমার? ফাণ্ডামেণ্টাল্ রাইট্‌স্?

'তাহলে এদিকে আসুন, এই গাছটা দেখুন—' শীলা এনে দেখায়—গাছটাকে নয়, আমাকে। —'এর ডাল বেয়ে ওঠা যায় বেশ। মগ্‌ডালটা আমার জানলা গলে ঘরের ভেতরে উঁকি মারছে, দেখছেন তো?'

দেখি। মেয়ে-হোস্‌টেলের গায়ে-পড়া গাছটার হাবভাব আমি লক্ষ্য করি। কিন্তু গাছটা ওর ঘরে ডাল গলালেও আমি ঐ ডাল ধরে গলতে পারবো বলে মনে হয় না। কেননা, এক লাফে ডাল-বাহাদুর হতে হলে—শাখায় প্রশাখায় কেরামতি দেখাতে হলে কেবল এক গাছ হলেই হয় না, একগাছাও চাই। লেজ। শুধু তেজ থাকলেই হয় না, সেই-প্রিভিলেজ যার নেই, শাখামৃগের তা পক্ষে বিড়ম্বনা। অলস উচ্চাকাঙ্ক্ষা মাত্র। আর, সত্যি বলতে, তেজস্বিতার মত লেজস্বিতারও আমার অভাব। সেকথা গোপন রেখে লাভ নেই। অকপট হওয়াই ভালো।

'মগ্‌ডাল তো দেখলাম'—আমি বলি। 'কিন্তু মগের মুলুকে পা বাড়াতে আমার সাহস হয় না।'

শিলাস্তূপের মতই আমি অনড়। মগের কাণ্ডজ্ঞান আছে, বিশেষতঃ গাছের কাণ্ড সম্বন্ধে, শ্রীময়ী মেয়ের সহস্র প্ররোচনাতেও সহজে তারা ডালায়িত হবে না। গাছের কাছে (এবং শীলার সামনে) আমি গুঁড়ির মতন দাঁড়িয়ে থাকি—শিলীভূত হয়ে।

'তাহলে আর আপনার দ্বারা কী হবে!' শীলা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে।

সেই কথাই। আমিও তাই বলি। আমার দ্বারা কিছু হবার নয়।

ঘটির মত কূপের থেকে দড়ি-বাঁধা হয়ে উঠতে আমি রাজি নই, বাঙালের মত অন্ধকূপের মধ্যে বন্ধ হতেও গররাজি (সহজে কুপিত হওয়া আমার স্বভাব নয়) আবার ছাতুর মতন গাছের ডালে পা

ব্যাপারেতেও নারাজ (ডাল ভেঙেই তো ছাতু হয়, তাই না? না হলেও ওসব বিলাস-ব্যসন আমার পোষায় না।) না, ঘুড়ির ন্যায় মগডালে গিয়ে লটকাবার আমার উৎসাহ নেই। (গোড়াগুড়ির থেকেই ঘোরাঘুরির ব্যাপারে আমি পেছপা)।

'নাঃ। আমি ফিরে চল্লাম।' শেষ পর্যন্ত আমি ওদের ক্ষুণ্ণ করি- করতে বাধ্য হই—নিজেকে অক্ষুণ্ণ রাখার খাতিরেই এখ্যাতি কুড়াই।

'একটু দাঁড়াও' আমি এক্ষুণি আসছি।' বলে প্রিসিলা হোস্টেলের ভেতরে যায়। গিয়ে তিন মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে। —'এসো তুমি। লেডীসুপারের হুকুম নিয়ে এলাম। চলে এসো সটান।'

'পলিস কিরে!' বাক্সয় যেতে হবে না জেনে আমার বাক্‌শক্তি উথলে ওঠে।

'হ্যাঁ। গিয়ে বল্লাম সুপারকে—মেজ-মামাকে ডেকে এনেছি খাবার জন্যে—আনতে পারি ভেতরে? তিনি বল্লেন—স্বচ্ছন্দে। আজকের দিনটি একটি উৎসবের দিন—বিশেষ আনন্দের দিন আজ—আর তোমার মামাকে যখন নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এনেছো তখন নিয়ে এসো তাঁকে।'

'বাঁচিয়েছিস তুই।' হাঁপ ছেড়ে আমি বাঁচলাম।—

আসায় নৈরাশ

কিন্তু শীলাকে তেমন খুসি দেখা গেল না।—'এই জন্যে সুপারের পারমিশন চাইতে গেলে—তুমি কী প্রিসিদি?' আহত স্বরে সে বলে। তাকে কেমন নিরুৎসাহিত দেখা যায়।

'কেন, কী হয়েছে তাতে?' ওর কথায় অবাক হতে হয়—'মন্দটা কী হোলো?'

'সদর গেট দিয়ে? সুপারকে জানিয়ে—এমনি করে আসা? এ কি রকম! ছিঃ!'—শীলা খুঁৎ খুঁৎ করে—'এটা একটা আসাই নয়।'

আসাই নয়? কিন্তু কেন গো? এমন করে আসাটা আশানুরূপ নয় কেন? বাক্সর মধ্যে না হাঁপিয়ে—না লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে—পাঁচিল টপকাতে গিয়ে বেটক্করে হাত পা না ভেঙে—অভঙ্গদশায় এই আসাটা এতই কি বেঠিক হোলো আমি তো ভেবে পাই না। শীলার এতে আশাভঙ্গ হবার কী হয়েছে?

'এমনি করে আসে নাকি কেউ?' না বলে পারে না সে—'এটা কি একটা আসা? আসার মত আসাই নয় এ। ছেলেরা—আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি—কক্ষণো এভাবে আসে না......মেয়েদের হোস্টেলে।'

স্বপ্নবাসবদত্তা

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শুনি বার বার স্বপ্নে তোমার পায়ের ধ্বনি,
তোমারই জন্যে জীবনারণ্যে এনেছি প্রাণ।
তোমারই আকাশে অমেয় বিভাসে তোমাকে খুঁজি—
কেন অকারণ তবু অফুরান দিনাবসান?

এই জীবনেই শুভলগ্নেই এসো না তুমি!
এই জীবনেই, দুরাশা দিয়ে ভরিয়ে দাও।
অন্য জীবন কেন অকারণ বাইবে খেয়া—
বন্য হাওয়ায় তোমাকে পাওয়ায় হবো উধাও।

হৃদয় এখোনো খুঁজে পায় কোন পাগলা ঝোরা?
কেন ইতিহাসে ভাঙা উল্লাসে, সুর ধরো!
কেন ইতিহাসে দীর্ঘশ্বাসে রাত্রি আনো?
ভাবী ইতিহাসে সফল প্রয়াসে হৃদয় ভরো।

তবু দিনান্তে, 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা'?
বাসবদত্তা, আমার সত্তা ধূলি মলিন?
রক্তে আমার প্রাণ নেই আর ঝোড়ো হাওয়ার
এ নদী সাগর পথ প্রান্তর জীবনহীন?

মৃত্যু আমার অমাবস্যার অভিসারিকা
দীপ্ত চক্ষে শুক্লপক্ষে দীপ্যমান।
বাসবদত্তা এখনো মত্তা বিলাসঘুমে
আজো কথা কয় হাজার হৃদয়, কি অম্লান!

আজো বিনিদ্র মহাসমুদ্র ডাক জানায়
চেতনার সোনা করেছে যোত্স্না সে ঝংকার
বাসবদত্তা আমার সত্তা দীর্ণ নয়
সুদূরের টানে স্বপ্নপ্রয়াণে, তুমি আমার।

সাহেব বিবির দেশে

নরেন্দ্র দেব

(ইতালি—ফ্লোরেন্স—ভেনিস)

ইতালির চারিদিকে যে-মধ্যযুগীয় শিল্প-সম্পদের ছড়াছড়ি চোখে পড়ে সেগুলি দেখে বোঝা যায় যে, য়ুরোপীয় প্রাচীন ও আধুনিক রম্যকলার উৎস কোথায় ...সেকথা কিন্তু পম্পাইয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখে একটিবারও মনে হয় না। পম্পাইয়ের কি স্থাপত্য শিল্প, কি কলা সৌন্দর্য,—তার যা-আবেদন, সে সম্পূর্ণই এক পৃথক্ বস্তু। এখানে যেন অতীত রোমের বিগত বিরাট সভ্যতার এক আশ্চর্য নিদর্শন অক্ষত অবস্থায় ছাই-চাপা পড়েছিল। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানীদের সাগ্রহ ফুৎকারে সে ছাই উড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে আজকের পৃথিবীর লোক-লোচনের গোচরে দু'হাজার বছর আগের মানুষের রহস্যাবৃত বসবাস ও কাজকারবার। খৃষ্টজন্মের উনআশী বছর আগে আগ্নেয়গিরি ভীষ্মভীয়স্ তার তরল অনল লালায় লেহন করেছিল যে সুন্দরী নগরী পম্পাইকে, তারই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করলাম আমরা ক্ষুদ্রাকারে—সেই দেবদেবীর ভক্ত বৃহৎ রোমকে, যে রোম পরবর্তীকালে বিলুপ্তির গহ্বরে ডুবে গিয়েছে খৃষ্টধর্মের প্রবল প্লাবনে।

আমরা পম্পাই থেকে ফিরে এলাম আবার ইতালির 'সাইরেন সিটি' সেই কুহকিনী সাগরিকা নাগরিকা ন্যাপল্‌সের বুকে। ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল। শরীর বিশ্রাম চায়। রাতটা এই মায়াবিনীর আশ্রয়েই কাটিয়ে দিলাম। সকালে প্রাতরাশের পর একটু সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে প্রফুল্ল হৃদয়ে আমরা বেলা সাড়ে দশটার এক্সপ্রেস্ ধরে ফ্লোরেন্সে এসে নামলাম। তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। ন্যাপলস্ থেকে ফ্লোরেন্স্ ৩৫৪ মাইল পথ। মাত্র ৯ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের নিয়ে এল। হিসাব করে দেখলাম, ট্রেনখানি গড়ে প্রায় প্রতি ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল চলেছে। এক দমে ১৫৬ মাইল দৌড়ে প্রথম রোমে এসে দাঁড়ালো। বেলা তখন তিনটে কুড়ি। 'চিউসী'তে এসে পৌঁছলাম বেলা সাড়ে পাঁচটা! এখান থেকে ফ্লোরেন্স্ আর ৭৫ মাইল মাত্র! সারাটা দিন ট্রেনে বসে সময় যেন আর কাটে না! কাগজপত্র, বইটই যা ছিল কাছে পড়ে ফেলা গেল। একটি মেয়েকে তার বাপ মা রোম স্টেশনে আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল। সঙ্গে জামাইও আছেন। মেয়েটি বোধ হয় এই প্রথম স্বামীর ঘর করতে চলেছে। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সে ঠিক আমাদের দেশের মেয়ের মতোই কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়তেই তার বাপ মা নেমে গেলেন। প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে রুমাল ও হাত নাড়তে লাগলেন। মেয়েটিও জানালা থেকে ঝুঁকে পড়ে তাঁদের দিকে রুমাল সমেত নিজ মৃণাল বাহু সঞ্চালিত করছিলেন। ট্রেন ছুটেছে। গতি তার এক্সপ্রেস্। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল মেয়েটির বাপ মার মূর্তি মানুষের দৃষ্টির বাইরে। এই চোখের আমরা কত না বড়াই করি। কিন্তু কি অসহায়ের মতো স্বল্প পরিমিত আমাদের দৃষ্টি! কতটুকুই বা দূরবীক্ষণ বিনা দেখতে পাই? মেয়েটি অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে চুপ করলো।

আমাদের কামরায় আর একটি মহিলা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল একটি বছর চার পাঁচের মেয়ে। নাম তার এলিওনোরা। অত বড় মেয়েকে কাঁদতে দেখে সে যেন একটু বিস্ময় ও অস্বস্তি বোধ করছিল। নবনীতা তার সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিলে। কেমন ক'রে জানি না। সম্ভবতঃ তার বাবার সাহায্যে। মেয়েটির বাবা ইংরিজী জানেন। মা যৎসামান্য। পূর্বের দম্পতী সম্পর্কে ইনিই আমাদের দোভাষীর কাজ করছিলেন, কারণ, তাঁরা দুজনের একজনও ইংরাজী জানেন না। গাড়ির ভিতরের খানিকটা সময় এদের নিয়ে কাটলো। মধ্যাহ্ন ভোজন, বিকেলের চা, গাড়িতে ব'সেই হ'ল। রেস্তোঁরা কারে নয়। ন্যাপল্‌স্ থেকে খাদ্য সঙ্গে আনা হয়েছিল ব্যয়বাহুল্য বর্জনের সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে। পূর্বেই বলেছি, ট্রেনে লম্বা পাড়ি দেবার সময় শ্রীমতী বরাবর এই ব্যবস্থাই করে আসছেন। নেহাৎ ভোরের গাড়ি ধরলে 'রেস্তোরাঁ কারে' খেতে হয়। কোনও কোনও স্টেশনেও খাবার, চা, কফি, দুধ, ফলমূল বিক্রী হয়, কিন্তু সে অনিশ্চিতের আশায় না থেকে পত্নী
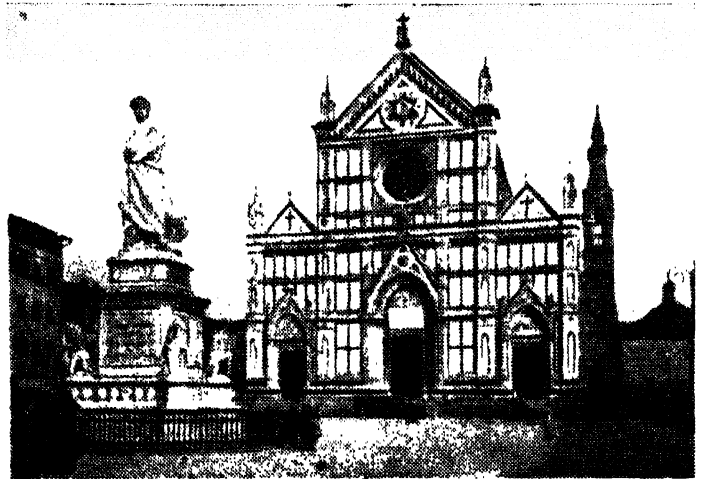
ফ্লোরেন্স—সান্তা ক্রোচে গির্জা—পাশে দান্তের প্রতিমূর্তি
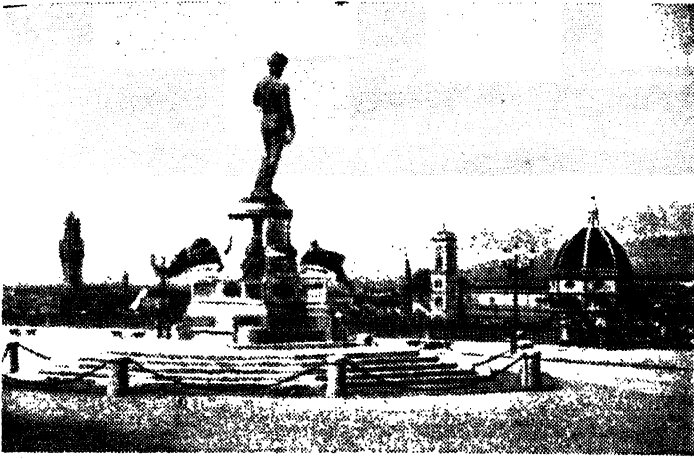
ফ্লোরেন্স—মাইকেল এঞ্জেলোর স্কোয়ার

আমাদের ট্রেনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় সঙ্গেই রাখতেন।

ট্রেন থেকে দু'পাশের একই রকম দৃশ্য ক্রমাগত দেখতে দেখতে একঘেয়ে লাগছিল। তন্দ্রাবেশে দুই চোখে ঢুলে আসে। মাঝে মাঝে আসনে হেলান দিয়ে ঘুমিয়েও পড়ছিলাম। এলিয়োনোরার বাবা এথেকে রক্ষা করলেন,—ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। সজাগ হ'য়ে উঠলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের দেশ সম্বন্ধে আপনাদের কি ধারণা, কি রকম মনে হয় আগে বলুন শুনি। এলিয়োনোরের বাবা বেশ শিক্ষিত লোক; ইতালির একটি বড় বৈদ্যুতিক কারখানার ম্যানেজার। বললেন, "আমরা মহাত্মা গান্ধীর 'অহিংস-সংগ্রাম' সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে আমাদের জানবার কৌতূহল আরও বেড়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রেমের দ্বারা শত্রুতাকে জয় করা যায়। যীশাস ক্রাইস্টও আমাদের এই উপদেশই দিয়েছিলেন।

আমি বললাম, এশিয়ার সকল মহাপুরুষেরাই সে কথা বলে গেছেন। খৃষ্টজন্মের পাঁচ শ বছর আগে গৌতমবুদ্ধ পৃথিবীর লোককে এই কথাই বলেছিলেন/ মহাত্মা গান্ধীর জন্মেরও প্রায় পাঁচশ বছর আগে 'লর্ড গৌরাঙ্গ' বা শ্রীচৈতন্যদেব বলে যে মহাপুরুষ বাঙলা দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনিও এই প্রেমের মন্ত্রেই আমাদের দীক্ষিত করেছিলেন। সুতরাং য়ুরোপের পক্ষে ওটা যতই আশ্চর্য হোক, ভারতের পক্ষে ওটা নূতন কোনও বাণী নয়। আজ যে 'সাম্যবাদ' নিয়ে ইতালির মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসাধারণ এখানে মেতে উঠেছে, দেখছি, ভারতবর্ষে এ সমস্যা কোন দিনই আসেনি। কারণ সেখানে বড় বড় কলকারখানা বা যৌথ কারবার কিছু ছিল না। কুটীরশিল্প প্রচলিত ছিল যার মালিক ও মজুর ছিল অভেদাত্মা। অর্থাৎ তাঁতি তার নিজের তাঁতের নিজেই শ্রমিক, নিজেই মালিক। কুম্ভকার, স্বর্ণকার, লোহকার কামার সবাই ছিল তাই। কাজেই পুঁজিবাদী ও মেহনতির কোনও সমস্যাই ছিল না আমাদের দেশে।

এলিয়োনোরের বাবা বললেন, আপনাদের দেশে কৃষক প্রজাদের সঙ্গে জমিদার শ্রেণীর বিরোধ ছিল না কি? বললাম, বিরোধটা অত্যাচারী নায়েব গোমস্তার সঙ্গে থাকলেও খোদ জমিদারের বিরুদ্ধে তাদের কোনও আক্রোশ ছিল না; কারণ, জমিদারকে কৃষক ও প্রজারা দেবতার ন্যায় ভক্তি করতো এবং পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করতো। এর মধ্যে কোনও ফাঁকি ছিল না সেদিন। জমিদারও তাদের আপন সন্তান বলে মনে করতেন। তাদের উপকারের জন্য গ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, জলাশয়, দেবমন্দির প্রভৃতি স্থাপনা করতেন। পরে অবশ্য এ অবস্থার প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছে। দেশে বড় বড় শিল্পবাণিজ্যের যৌথ কারবার ও বৃহৎ কলকারখানা গড়ে উঠেছে, যার ফলে শ্রমিক মালিক বিরোধের সঙ্গে দানের চেয়ে খাজনা বৃদ্ধি ও আদায়ের কঠোরতা বেড়ে যাওয়ার ফলে জমিদার ও প্রজার মধ্যে অসন্তোষও দেশময় বেড়ে উঠেছে। আপনাদের দেশের চাষীরা তো দেখছি জমিদারের কাছে খাজনা বিলিতে নেওয়া ক্ষেতের জমিজমা আজ জোর করে দখল করে, নিজেদের মালিকানার দাবীতে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিচ্ছে। জমিদার ও সরকার দুইই দেখি কাস্তে হাতুড়ির কাছে নেহাৎ নিরুপায়। আপনাদের সরকার বরং দেশের শান্তিরক্ষার জন্য বুদ্ধিমানের মতো চাষীদের এই জবরদস্ত দখল আইনসিদ্ধ অধিকার বলে ঘোষণা ক'রে কমিউনিজমের বিস্তারকে জব্দ রেখেছেন। ইংল্যাণ্ডেও তাই দেখে এলাম। কমিউনিস্টিদের যা প্রোগ্রাম, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বুদ্ধিমানের মতো সেই প্রোগ্রাম সোভিয়েট বিরোধী হয়েও নিজেদের দেশে কার্যকরী ক'রে কমিউনিজমের প্রসারকে সংযত ক'রতে পেরেছেন।

এলিয়োনোরের বাবা মাঝপথে সপরিবারে নেমে গেলেন। নব দম্পতীরা আগেই একটি জংসনে নেমে গিয়েছিলেন গাড়ী বদল করবার জন্য। কাজেই বাকি পথটুকু গাড়ির কামরাটি আমাদেরই দখলে রইল। আজও ট্রেনের জানালার ধারের 'সীট' উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে রিজার্ভ করিয়ে রেখেছিলাম, তাই বোধ করি গাড়ীতে তেমন ভীড় ছিল না। ঠিক সন্ধ্যে সাতটা ছত্রিশ মিনিটে আমরা 'লিলির দেশ' এই ফ্লোরেন্সে এসে নামলাম। আশ্চর্য হলাম দেখে স্টেশনে একাধিক হোটেলের উর্দিপরা প্রতিনিধিরা অপেক্ষা করছেন যাত্রী ধরবার জন্য। এদেরই একজনের পাল্লায় পড়ে আমরা গিয়ে উঠলাম 'হোটেল ভিলা সান কেমিলো'র তিন তলার উপর একটি সুসজ্জিত পরিচ্ছন্ন ঘরে।

ফ্লোরেন্স শহরের নামের মধ্যেই ফুলের গন্ধ রয়েছে। লাতিন ভাষায় ফুলকে বলে 'ফ্লোরেম'। ইতালির শিল্পসমৃদ্ধ এই নগর। আর্নো নদীর তীরে অবস্থিত এই সুন্দর ফ্লোরেন্স নগরীকে ইতালির কলাকেন্দ্র বললেও অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য ইতালির প্রত্যেক শহরেরই একটা না একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং পরস্পর পৃথক একটি আকর্ষণও আছে। প্রায় সব শহরই তাদের এক একজন যশস্বী স্থানীয় শিল্পীর নাম করে গর্ব করতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

ও দৃশ্য বৈচিত্র্যের বিচারেও ইতালির শহরগুলি কেউ কারুর চেয়ে ন্যূন নয়।

হোটেলের ম্যানেজারের মুখে শোনা গেল, তাঁদেরই নিজস্ব 'এক্সকার্শান বাস' আছে। ফ্লোরেন্সের যেখানে যা কিছু দ্রষ্টব্য আছে, একদিনে দু'বেলায় সমস্ত দেখিয়ে আনবে। দক্ষিণা মাথাপিছু ১৯০০ লীরা। চুক্তি হয়ে গেল। পরদিন সকালে প্রাতরাশের সব ঠিক বেলা ৯টায় বাস এসে আমাদের নিয়ে চললো। প্রথমেই এনে নামালো 'সেণ্ট জনস চার্চে'। সঙ্গে গাইড ছিলেন। বললেন, এখানে ছিল আগে রোম্যানদের প্রাচীন রণদেবতা 'মার্সে'র মন্দির। তাকে ভেঙে এই গির্জা তৈরী হয়েছিল একাদশ শতাব্দীতে। এর ডোমের মধ্যে সমগ্র বাইবেলখানি চিত্রে দেখানো হয়েছে লাল, নীল রঙীন কাঁচের মীনে বা মোজাইকের কারুকার্যময় ছবি ক'রে। এ গির্জার প্রধান দ্রষ্টব্য হ'ল এর তিন দিকের তিনটি সিংহদ্বার। দরজাগুলি ব্রোঞ্জের তৈরী এবং প্রখ্যাতনামা শিল্পীরা এই তিন জোড়া দরজার ছ খানি পাল্লার পাঁচটি ক'রে দশটি প্যানেলে জন দি ব্যাপটিস্ট ও প্রভু যীশুর জীবনের নানা ঘটনার চিত্র উৎকীর্ণ করে রেখেছেন। দক্ষিণের দরজা আন্দ্রে পিসানোর তৈরি। উত্তর দ্বার লোরেঞ্জো ঘিবার্ডের। তাঁর হাতের এই কাজ দেখে শিল্পগুরু মাইকেল এঞ্জেলো নাকি বলেছিলেন 'এ দরজা হয়েছে স্বর্গদ্বারের উপযোগী!' সেই থেকে ঘিবার্ডের তৈরী উত্তর দিকের দরজার নামই হয়ে গেছে 'গেট অফ্ প্যারাডাইজ'। তৃতীয় দ্বার হ'ল পূর্বদিকে। এটিও লরেঞ্জো ঘিবার্ডেকে দিয়ে করানো হয়েছিল। এর গায়ে ওল্ড টেস্টামেণ্টের কতকগুলি বিশেষ কাহিনীর চিত্র উৎকীর্ণ করা আছে। যেমন 'নরনারীর জন্ম' 'আদম ও ঈভের স্বর্গোদ্যান থেকে বিদায়' 'নোয়ার আর্ক', 'আব্রাহাম কর্তৃক আইজাকের বলিদান', 'ডেভিডের দ্বারা গলিয়াথের হত্যা' 'রাজা সলোমনের সঙ্গে রাণী সেবার সাক্ষাৎ' ইত্যাদি। প্যানেলের দু'ধারে দরজার ফ্রেমের গায়ে উৎকীর্ণ করা আছে বাইবেলোক্ত মহাপুরুষদের মূর্তি এবং দিব্যজ্ঞানসম্পন্না মহিলাদের মূর্তি। এখান থেকে আমরা গেলাম, 'সান্তা মারিয়া ক্যাথিড্রাল' দেখতে। এই গির্জাটির স্থাপত্যকলা এত সুন্দর এবং এর মধ্যে এমন একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী ও নূতনত্বের ছাপ আছে যে, দেখে মুগ্ধ হ'তে হয়। এই ক্যাথিড্রাল সংলগ্ন যে 'ক্যাম্পানাইল' বা চতুষ্কোণ ঘণ্টা-স্তম্ভ আছে, সেটি শিল্পিশ্রেষ্ঠ জিওত্তোর পরিকল্পনা অনুসারে তৈরি। সাততলার সমান উঁচু এটি এবং এমন সুকৌশলে নির্মিত যে, সান্তা মারিয়া ক্যাথিড্রালের পাশে এটিকে শুধু যে চমৎকার মানিয়েছে তাই নয়, মনে হয়, এটি না থাকলে বুঝি 'সান্তা মারিয়া' এতটা ভাল কখনই লাগতো না। ক্যাথিড্রালের ভিতরে ঘিবের্তি, গাদ্দা প্রভৃতি বড় বড় শিল্পীদের আঁকা বহু প্রসিদ্ধ প্রাচীন চিত্র রয়েছে। দু' চারটি মূর্তিও আছে। যেমন
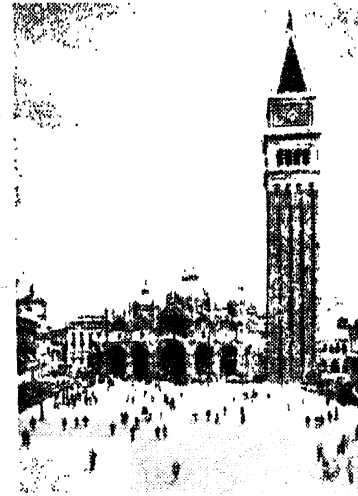
ভেনিস—সেণ্ট মার্কের গির্জা ও ঘণ্টামণ্ডপ

ভাস্করশিল্পী মায়ানোর তৈরি কলাবিদ জিওত্তোর আবক্ষ মূর্তি, দনাতেল্লোর তৈরি 'জোসুয়া'র প্রতিমূর্তি। মাইকেল এঞ্জেলোর হাতের একটি অসম্পূর্ণ মূর্তিশিল্প এখানে সযত্নে রাখা হয়েছে 'প্রভুর ক্রুশ থেকে অবতরণ'। শিল্পীর বয়স যখন অশীতি বৎসর, তখন তিনি এটি তৈরি করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। শিল্পী মিচেলিনোর আঁকা মহাকবি দান্তের একখানি বড় সুন্দর প্রতিকৃতি এই ক্যাথিড্রালের প্রাচীরপত্র শোভা পাচ্ছে। কবির হাতে তাঁর কাব্যপত্রখানি রয়েছে। তিনি নগর প্রাকারের বাইরে দাঁড়িয়ে যেন অঙ্গুলি নির্দেশে নরকের দ্বারের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। এর মধ্যে যে মিউজিয়ম আছে, তার ভিতর আরও বহু উল্লেখযোগ্য চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন রয়েছে, যেগুলির সম্বন্ধে স্থানাভাববশতঃ বিশদভাবে কিছু বলা গেল না।

এখান থেকে বেরিয়ে 'অর্সানমিকেল' গির্জাটি দেখে আমরা 'পশম ব্যবসায়ীদের সমিতি ভবন' হয়ে 'দান্তে সোসাইটির' গ্রন্থালয়ে এলাম। এই যে পশম ব্যবসায়ীদের সমিতি এঁরাই ছিলেন একদিন ফ্লোরেন্সের ভাগ্যবিধাতা। অর্থে ও সামর্থ্যে এদের সমকক্ষ আর কেউ না থাকায় এঁরাই হয়ে উঠেছিলেন ফ্লোরেন্সের রাষ্ট্র, সমাজ ও শিল্প বাণিজ্যের নিয়ামক ও পরিচালক। দান্তে সোসাইটির গ্রন্থশালা থেকে বেরিয়ে আমরা এলাম ফ্লোরেন্সের 'মার্কেট-লগিয়া' বা 'চক বাজার' দেখতে। ইতালিয় ভাষায় 'লগিয়া' বলতে বোঝায় চারপাশ খোলা অথচ মাথায় ছাদযুক্ত একটি দরদালান বা গাড়ীবারান্দা জাতীয় স্থান। এই চক্ বাজারে হরেক রকম জিনিসের কেনা বেচা চলে। বাজারের সামনে রাস্তার উপর গোল একটি পাথরের বেদী আছে। শোনা গেল পুরাকালে জুয়াচোর ও দেউলিয়া ব্যবসায়ীদের এই বেদীর উপর দাঁড় করিয়ে জনসাধারণের সামনে উলঙ্গ ক'রে শাস্তি দেওয়া হ'ত।

'চকবাজার' থেকে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় (পিপ্‌লস য়ুনিভার্সিটি) দেখে আমরা আর্নো নদীর পুরাতন সাঁকোর উপর দিয়ে নদী পার হয়ে এলাম। গাইড বললেন, ফ্লোরেন্সের ছটি সেতুর মধ্যে গত যুদ্ধে জার্মানরা নাকি পাঁচটি সেতু উড়িয়ে দিয়েছে! এদিককার রাস্তাঘাটও সব ভেঙে গিয়েছিল। এখন ধীরে ধীরে সব মেরামত হ'চ্ছে দেখলাম। এই পুরাতন সেতুটি পাথরের তৈরি। কেল্লার মতো এর মাঝখানে ও দুই প্রান্তে রক্ষী চূড়া বা প্রহরীদের উঁচু টুঙি ছিল। তার ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে। সেতুর দুপাশে উঁচু পাঁচিল দেওয়া ছিল। সেতুর নিচে খিলানের দু'ধারে দোকানপাটও নাকি বসতো। এখনও এখানে সোনারূপো ও জড়োয়া গহনার ব্যবসায়ীদের দোকান রয়েছে দেখলাম। শিল্পী বেনভেনুতো সেলিনির একটি আবক্ষ ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্তি এই সেতুর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এ এক অদ্ভুত সাঁকো। সেতু, বিপণি ও নগররক্ষী দুর্গের এমন একত্র সম্মেলন আর কোথাও নেই।

এইবার আমরা এলাম 'পিয়াজা দেল্লা সিগনোরিয়া'র পথে। রোমের যেমন সেণ্ট পীটার্স প্রাঙ্গণ এক আশ্চর্য ঐশ্বর্য, এই পিয়াজা দেল্লা সিগনোরিয়া চকটি তেমনি

ফ্লোরেন্সের গৌরবস্বরূপ! বহু শতাব্দী-ব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ ও জয়-পরাজয়ের ভিতর দিয়ে পরপর তিনটি সভ্যতার উত্থান-পতন তার দুরপনেয় ছাপ রেখে গেছে কলা ও কাহিনীর এই অনুপম ভূমিতে। এ যেন হয়ে উঠেছে খোলা আকাশের নিচেয় গড়ে উঠা এক অদ্ভুত যাদুঘর। এই চকের মধ্যে জড়ো হয়েছে ভাস্করশিল্পী সেলিনির গড়া 'পেরেশ্যুজ মূর্তি'। মাইকেল এঞ্জেলোর 'ডেভিড'। দোনাতেল্লোর গড়া 'জুডিথের' ব্রোঞ্জ মূর্তিপুঞ্জ। গ্র্যান্ড ডিউক প্রথম কসিমোর বিরাট এক ব্রোঞ্জ মূর্তি—জিয়াম্বোলোনার তৈরি এবং এঁরই হাতের 'স্যাবাইন নারী ধর্ষণ' আজ বহু বিদেশী দর্শকের কৌতূহলী দৃষ্টিকে পরিতৃপ্ত করছে। এগুলি আমরা সিগনোরিয়ার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে ঘুরে ঘুরে দেখি।

এই চকের মধ্যে যে 'নেপচুন' ফোয়ারাটি রয়েছে, অদ্ভুত মণ্ডন শিল্পের সেটিও এক আশ্চর্য নিদর্শন। পিয়াজা দেল্লা সিগনোরিয়ার চকের ধারে যে 'পালাজো দেল্লা সিগনোরিয়া' বা সিগনোরিয়া প্রসাদ এটির প্রথম পত্তন হয়েছিল সাতশো বছর আগে। মাঝে মাঝে এর অনেক অদল বদল হয়েছে। এই প্রাসাদে প্রবেশ করবার মুখে ডানদিকে এক বিশাল মূর্তি আছে—'হারকিউলিস ও ক্যাকাস', আর আছে ফ্লোরেন্সের নগর প্রতীকরূপে একটি সিংহদূতের মূর্তি। ফ্লোরেন্সের গণতন্ত্র শাসনকে ধ্বংস করে গ্র্যান্ড ডিউক প্রথম কসিমো যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন, সেই সময় তিনি এই প্রাসাদে বাস করতেন। এই প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ভাস্কর ভেরোশিয়োর বিশ্ববিদিত ফোয়ারা 'মদন ও মিথুন' (কিউপিড এন্ড ডলফিন) রয়েছে। এটি ব্রোঞ্জের তৈরি। ভাস্কর রসীর গড়া একটি 'স্যামসন ও দালিলা'র মর্মর মূর্তি আছে। উপরে উঠবার ঘুরানো সিঁড়ি আছে এবং লিফ্‌টও আছে। উপরের একটা হলের মাপ শুনলে হয়ত কিছুটা ধারণা হ'তে পারে এই 'সিগনোরিয়া প্যালেস' কত বড়। হলটি মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত ৫৫ ফুট উঁচু। চওড়ায় ৬৮ ফুট এবং লম্বায় ১৬২ ফুট! এখন বুঝুন ব্যাপারটা। এ ঘরখানি আবার ইতালির শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ কর্তৃক চিত্রিত অলংকৃত ও সুসজ্জিত হয়েছে।

ফ্লোরেন্সের গ্র্যান্ড ডিউক প্রথম কসিমোর পুত্র ফ্রান্সিসকো মেডিসির গুপ্ত ধনাগার—চিত্র-বিচিত্র করা গৃহের দেওয়ালের মধ্যে এমন-ভাবে মিশিয়ে আছে যে, কারুর পক্ষে সেটি খুঁজে বার করা দুঃসাধ্য। এই মেডিসিরাই ছিল ফ্লোরেন্সের ব্যবসায়ী ধনী মহাজন। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' কথাটা এদের বেলা খেটেছে তো বটেই এবং একটু বেশিই খেটেছে; কারণ শুধু লক্ষ্মী লাভ ত নয়, এদের বংশে রাজলক্ষ্মীও আবির্ভূতা হয়েছিলেন। ফ্লোরেন্সের প্রথম কসিমো এই মেডিসি বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি তদানীন্তন

ভেনিস—সান্তা মারিয়া দেল্লা স্যালিউট গির্জা

ফরাসী সম্রাটের দরবার থেকে 'গ্র্যান্ড ডিউক' উপাধি পেয়েছিলেন।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা ফ্লোরেন্সের টাউন হল দেখে, এলাম 'লগিয়া দায় লানজী' দেখতে। 'দায় লানজী' শব্দটি জার্মান। এর অর্থ নাকি 'দি ল্যানসারস' বা 'বর্শাধারী সৈনিকের দল'—যারা গ্র্যান্ড ডিউক প্রথম কসিমোর দেহরক্ষী ছিল এবং এইখানেই বাস করতো। উপস্থিত এখানে সাজানো রয়েছে যশস্বী শিল্পীদের তৈরি অসংখ্য সুন্দর মর্মর মূর্তি, যা ফ্লোরেন্সের ভাস্কর্য কলাকে বিশ্ববিখ্যাত করে তুলেছে। এ মূর্তিগুলির অধিকাংশই শিল্পীর ধ্যান ও কল্পনার রূপ, যেমন ধৈর্য, ক্ষমা, সংযম, ন্যায়, জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, আশা প্রভৃতি। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মূর্তিগুলির কথা আগেই বলেছি। তারপর এলাম আমরা ফ্লোরেন্সের বিশ্ববিখ্যাত য়ুফিজি চিত্রশালা দেখতে। এখানে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন স্কুলের শিল্পী ও ভাস্করগণের অতুলনীয় প্রতিভার বিবিধ সৃষ্টি সযত্নে সংগৃহীত হয়েছে। বত্রিশখানি বড় বড় হল-ঘর, সিঁড়ি, দালান ও বারান্দা জুড়ে প্রায় দশ হাজার ছবি ও মূর্তি এখানে আছে।

এ বেলার দেখা আমরা এইখানে শেষ করে মধ্যাহ্ন সাড়ে বারোটা নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম। স্নানাহারের পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করতে না করতেই 'এক্সকার্শান বাস' এসে ডাকাডাকি। এরা আপাদমস্তক কাজের লোক, একটুও সময় নষ্ট করতে চায় না। বেলা দুটো না বাজতে বাজতে আবার বেরিয়ে পড়া গেল অপরাহ্নকালীন ফ্লোরেন্স দর্শনে। এবার আমাদের গাড়ী নিয়ে এল ভায়া দেল গন্দির' পথ দিয়ে 'পিয়াজা সান ফাইরেঞ্জ' হয়ে 'পালাজো দেল পোদেস্তা' বা 'পোদেস্তা প্রাসাদ' দেখাতে। পুরাতন প্রাসাদ। ১২৫৫ খৃষ্টাব্দে তৈরি। দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য কঠিন আকৃতি। এক সময়ে এটি 'বন্দীশালা' বা কারাগাররূপে ব্যবহার হ'ত। শোনা গেল, গণতন্ত্রের যুগে এ বাড়ীতে থাকতেন ফ্লোরেন্সের যিনি 'লোক-নায়ক'রূপে নির্বাচিত হ'তেন। উপস্থিত এ প্রাসাদটি বিশেষ করে ভাস্কর্যশিল্পের একটি বিরাট মিউজিয়াম হ'য়ে উঠেছে। অবশ্য এ ছাড়াও আরও অনেক কিছু এখানে আছে, যেমন অস্ত্রশস্ত্র, বর্মচর্ম, পুরানো আসবাব ও তৈজসপত্র। হাতীর দাঁতের কাজ, মৃৎ-শিল্প, ধাতুদ্রব্য ইত্যাদি। সব কিছুর বর্ণনা দেবার স্থানাভাব। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, দু একটি দর্শনীয় বস্তুর উল্লেখ করছি। প্রথমেই বলতে চাই, এ প্রাসাদের সুদৃশ্য সুন্দর সুগঠিত সোপানশ্রেণীর কথা। কলা সমালোচক রাস্কিন এর বর্ণনা দেবার সময় বলেছেন 'দেখলে মনে হয়, একটি সুমধুর সঙ্গীতের সুর যেন এখানে জমাট বেঁধে রয়েছে!' একথা বর্ণে বর্ণে সত্য! শিল্পী ট্রাইবোলোর তৈরী 'সুরসুন্দরী ফাইশোল' সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ফাইশোল' হল ফ্লোরেন্সের উপকণ্ঠে একটি গিরি-শিখরস্থ পল্লী। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি অপূর্ব। শিল্পী সেই দৃশ্যকে রূপায়িত করতে চেয়েছেন এই মূর্তির মধ্যে এছাড়া 'আদম ও ঈভ', 'পৃথিবী' পারা-

বার', 'মুমূর্ষু এ্যাডোনিস' ও 'ধীবর বালক' উল্লেখযোগ্য। মাইকেল এঞ্জেলোর মূর্তি-গুলির জন্য একটি পৃথক ঘর রয়েছে। এর মধ্যে 'প্রমত্ত ব্যাকস', 'ডেভিড,' 'ব্রুটাসের আবক্ষ মূর্তি', 'শিশুযীশু কোলে জননী ম্যাডোনা' প্রভৃতি মূর্তিগুলি বিশ্ববিখ্যাত। মাইকেল এঞ্জেলোর একটি ব্রোঞ্জের তৈরি আবক্ষ মূর্তি এখানে আছে। তাঁর শিষ্য ভলতেরা এটি নির্মাণ করে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন। 'উড়ন্ত দেবদূত' (ফ্লাইং মার্কারী) আর একটি ভুবনবিদিত ব্রোঞ্জ মূর্তি এখানে রয়েছে। নাঃ, আর কোনও মূর্তির কথা বলবো না, কারণ তারা এত অসংখ্য যে বলে শেষ করতে পারবো না।

এখান থেকে বেরিয়ে আমরা মহাকবি দান্তের জন্মস্থান ঘুরে ফ্লোরেন্সের বড় বড় অভিজাত ধনীদের বাড়ির সামনে দিয়ে অলি-গলি মাড়িয়ে এসে উপস্থিত হলাম মাইকেল এঞ্জেলোর মিউজিয়মে। মাইকেল এঞ্জেলোর মিউজিয়াম দেখে আমরা এলাম মহাকবি দান্তের বাড়ী বা স্মৃতিমন্দির দর্শনে। তারপর আমাদের এনে দেখালে একটি ছোট্ট উপাসনা মন্দির—'সান্তা ক্রোচে'। গির্জাটি ক্ষুদ্র হ'লে কি হবে, এর সর্বত্র রয়েছে বড় বড় সব শিল্পী ও ভাস্করদের অপূর্ব অবদান। এর প্রবেশ পথের সামনেই রয়েছে দান্তের বিরাট প্রতিমূর্তি। তা ছাড়া এর মধ্যে রয়েছে মহাকবি দান্তের সমাধি, শিল্পীগুরু মাইকেল এঞ্জেলোর সমাধি; ইতালির চাণক্য তুল্য চতুর মেকিয়াভেলীর সমাধি, শিল্পিশ্রেষ্ঠ রাসিনীর সমাধি—কাজেই 'সান্তা ক্রোচে' মহাপুরুষদের তীর্থ-স্বরূপ হয়ে উঠেছে। এরই কাছাকাছি রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুলেখক 'গ্যালিলিওর সমাধি।' এখান থেকে বেরিয়ে ফ্লোরেন্সের জাতীয় গ্রন্থশালায় গেলাম। দশ লক্ষের উপর বই আছে এখানে। বিশ লক্ষ আছে পত্রিকা, হাতে লেখা পুঁথির সংখ্যা চার লক্ষ শুনলাম! আর আছে প্রায় চার হাজারের কাছাকাছি প্রাচীন প্রথম সংস্করণের গ্রন্থাবলী। এখান থেকে বেরিয়ে আমরা দেখতে এলাম ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত 'পিটি প্যালেস'। এটিকে শিল্প ও সৌন্দর্যের মুকুটমণি বহু মণির খনি বলা যেতে পারে। ১৫৪৯ খৃঃ অব্দে ধনী লুকা পিটি এই প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। গ্র্যান্ড ডিউক প্রথম কসিমোর পত্নী এ বাড়ী কিনে নিয়ে এটিকে সুসম্পূর্ণ করেন। বর্তমানে এটি ফ্লোরেন্সের অফুরন্ত শিল্প ভান্ডারের বোধ করি শ্রেষ্ঠতম সংগ্রহশালা হয়ে উঠেছে। এর চিত্রশালাকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবিঘর বলা যেতে পারে। মেডিসি বংশের দ্বিতীয় ফার্ডিন্যান্ড এই সংগ্রহ শুরু করেন ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে। তারপর গত তিনশ' বছর ধরে এর সঞ্চয় ক্রমে বেড়েই চলেছে। সুতরাং অল্প কথায় তার সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। আমি এখানে শুধু এই শিল্পশালার বিভিন্ন মহল-গুলির নামোল্লেখ করে ক্ষান্ত হচ্ছি। এ থেকেই বোঝা যাবে যে, কি বিরাট এই সংগ্রহশালা। এখানে আছে—'ইলিয়াড মহল', শনিগ্রহ মহল' (হল অব স্যাটার্ন), দেবরাজ মহল (হল অব জুপিটার), মঙ্গল মহল (হল অব মার্স), কাস্তানালি মহল, রূপক মহল, শিল্প মহল, হারকিউলিস মহল, অরোরা মহল, টাইটাস ও বেরেনিস মহল, সাইকীর মহল, মারী লুইসার মহল, প্রমিথিউস মহল, স্তম্ভ মহল, ন্যায়ের মহল, পুষ্প মহল, মদন মহল, যুলাইসিস মহল ইত্যাদি প্রায় কুড়িটি বিভিন্ন মহল বিবিধ চিত্র ও ভাস্কর্যে ভরা। মহলগুলির নাম হয়েছে প্রায়ই সেই মহলের প্রধান চিত্র ও চিত্রকর বা ভাস্কর্য সংগ্রহ থেকে।

দুই চক্ষু শিল্প সৌন্দর্যের মোহাঞ্জনে ভ'রে নিয়ে আমরা পিটি প্যালেস থেকে বেরিয়ে 'মেডিসি চ্যাপেল' দেখতে এলাম। পথে পড়লো ফ্লোরেন্সের প্রত্নশালা। এখানে পরপর চারটি দেশের চারটি বিভিন্ন সভ্যতার অসংখ্য প্রাচীন নিদর্শন সযত্নে সংগৃহীত রয়েছে; মিশরীয়, এট্রুস্কান, গ্রীস ও রোম। আটটি সুবৃহৎ কক্ষে এই চার দেশের সুরক্ষিত অগণিত অতীত ইতিহাস প্রত্যক্ষ ক'রে আমরা বিশ্ববিখ্যাত 'মেডিসি চ্যাপেলে' এসে প্রবেশ করলাম। এর একধারে অদ্ভুত মন্ডনশিল্পে অলংকৃত গ্র্যান্ড ডিউক মেডিসিদের মওসোলিয়ম বা সমাধি মন্দির, অপর দিকে শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর পরিকল্পিত প্রখ্যাত তোসাখানা বা মূল্যবান তৈজসপত্র, আসবাব ও সাজপোষাক ইত্যাদি রাখবার সুরক্ষিত ভান্ডার। এখানেও যথা-রীতি টাইটান প্রভৃতি ইতালির শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মূর্তি ও চিত্রের প্রাচুর্য দেখা গেল। হবারই কথা, কারণ ফ্লোরেন্স গড়ে তুলেছে যে মিডিসিরা এটি তাদেরই নিজস্ব উপাসনা মন্দির। এখানকার একটি মাত্র সমাধির উল্লেখ ক'রে ফ্লোরেন্সপ্রসঙ্গ শেষ করবো। প্রার্থনা বেদীর বামভাগে উর্বিনোর ডিউক লরেঞ্জো এবং তাঁর পুত্র আলেক-জান্দারের সমাধিটি দ্বিতল। উপর তলার মধ্যের খিলানে সেই বিশ্ববিখ্যাত 'ভাবুক' (দি থিংকার) মূর্তি বসানো আছে। নিচের তলায় সমাধি বেদীর উপর দু'ধারে অর্ধশায়িত অবস্থায় দুটি নরনারীর প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে। স্ত্রীলোকটি হ'লেন 'ঊষা'! অর্থাৎ জীবন প্রভাতের প্রতীক, আর পুরুষটি হ'লেন 'প্রদোষ' বা 'গোধূলি' অর্থাৎ জীবনসন্ধ্যার প্রতীক। এর বিপরীত দিকের সমাধির উপরও দুটি মূর্তি আছে 'দিবা ও নিশা'। দিবা পুরুষ আর নিশা নারী, কিন্তু শিল্পীর পরি-কল্পনা এ নারীকে বিশ্বমানবের জননীর রূপ দিয়েছে। ঊষার সঙ্গে এর আকৃতির আশ্চর্য ভেদ শুধু যে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তাই নয়, রীতিমতো ভাবিয়ে তোলে! জীবনমৃত্যুর সনাতন প্রশ্ন তার চিত্তকে আলোড়িত করে তোলে।

এখান থেকে বেরিয়ে ১২৭০ খৃঃ অব্দে স্থাপিত অথচ স্থাপত্য কলার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ এক নূতন ধরণে তৈরি গির্জা 'সান্তা মারিয়া নোভেলা' দেখে ফ্লোরেন্স পর্ব শেষ করে আসার পথে কবিপত্নী এলিজাবেথ্ ব্যারেট ব্রাউনিংয়ের বাসগৃহের ধূলিকণা মস্তকে স্পর্শ করে হোটেলে ফিরে এলাম। রাত্রে পূর্ণ বিশ্রাম। সকালে উঠে টাইম টেবল দেখা হ'ল। 'ফ্লোরেন্স' থেকে 'ভায়া'-'বোলোনা'-'ভেনিস' যাওয়া যাবে। বোলোনা এখান থেকে মাত্র ৬০ মাইল। বোলোনা থেকে আবার ভেনিস ১০৫ মাইল। একুণে ১৬৫ মাইল। মাঝপথে আমরা গাড়ি বদল করতে চাই না। 'থ্রু' ট্রেন পাওয়া গেল। বোলোনায় কেটে জোড়া দেবে। সকালে ব্রেকফাস্ট ও লাঞ্চ ফ্লোরেন্সে সেরে বেলা একটা পঁচিশের গাড়ীতে রওনা হয়ে সেই দিনই বিকেলে চারটে বেজে বাহান্ন মিনিটে 'ভেনিসে' পেঁাছে যাবো। সকালে উঠে ব্রেকফাস্টের পর সকলে মিলে আর্নো নদীর ধারে একটু বেড়াতে যাওয়া গেল। পথে পড়লো ইতালির স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম নায়ক গ্যারিবলডির এক প্রকান্ড 'স্ট্যাচু'। সেখানে একজন ফটোগ্রাফার ছিলেন। ফটো তুলে তখনই ডেভেলাপ করে সঙ্গে সঙ্গে ডেলিভারি দেন। আমরা সেই বীর সংগ্রামী নেতার পাদমূলে শ্রদ্ধাভরে দাঁড়িয়ে আমাদের ছবি নিলাম। আর্নোর তীরে পুরাতন পোল

পর্যন্ত বেড়িয়ে এসে সত্বর লাঞ্চ সেরে আমরা 'ভেনিসে' যাবার জন্য জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনে এসে হাজির হলাম।

ভেনিসে এসে পেঁছিতে আমাদের বেলা পাঁচটা বাজলো। এখানেও স্টেশনেই হোটেল-ওয়ালাদের লোক ছিল। আমরা এদেরই এক জনের অনুসরণ করে স্টেশনের খুব নিকটেই 'হোটেল প্রিন্সিপে'তে এসে উঠলাম। হোটেলটি ভাল। চার্জ একটু বেশী বটে; কিন্তু আরাম খুব। দ্বিতলের বড় ঘর। গ্র্যান্ড ক্যানেলের ধারেই। 'থ্রী বেড'রুম দৈনিক দু হাজার চারশো তিরিশ লীরায় চুক্তি হল। ইতালিতে দরদস্তুর চলে। এ কিন্তু শুধু থাকা। খাওয়ার খরচ আলাদা। ভেনিস নামের সঙ্গে যে স্বপ্ন জড়িয়েছিল আমাদের চোখে; সেই স্বপ্নের কাজলে ভেনিস দেখে মনে হ'ল, এত আমাদের চেনা জানা পরিচিত দেশ। কবে কোন জন্ম-জন্মান্তরে যেন এখানেই বাস করেছি। রাজপথ নেই। সর্বত্র জলপথে গণ্ডোলা নিয়ে যাতায়াত করেছি। মনে মনে ভেবেছি কি মজার দেশ! ভেনিস দেখে বারবার কাশ্মীরকে মনে পড়ছিল। কাশ্মীরও ক্যানেলের দেশ, কিন্তু খালের ধারে ধারে শ্রীনগরে রাজপথ আছে। ভেনিসে এ সুবিধা নেই। একটি ছোট্ট পথ আছে স্টেশন থেকে নেমে বাঁদিকে বড় জোর আধ মাইল পর্যন্ত। এই পথে ছিল আমাদের হোটেল প্রিন্সিপে। এপথও শেষ পর্যন্ত ঘুরে খালের ধারে এসে শেষ হয়েছে।

স্টেশন থেকে নামলেই সামনে 'গ্র্যান্ড ক্যানাল'। এখান থেকে সর্বত্র যাবার ফেরী স্টীমার পাওয়া যায়। 'গণ্ডোলা' নৌকাতো আছেই অসংখ্য। মোটর বোটও চলছে আজকাল। ভেনিসকে বলে 'আদ্রিয়াতিক সাগরের রাণী!' উপযুক্ত নামই দেওয়া হয়েছে এই জলময় নগরীকে। বহু প্রাচীন শহর এই ভেনিস। অজস্র সুন্দর স্থাপত্যকলার বৈচিত্র্য এর একটি বিশেষত্ব। চারিদিকেই শুভ্র মর্মর নির্মিত সোপানের এত বেশি ছড়াছড়ি যে, এক নজরে বোঝা যায়, ভেনিস ছিল একদা সৌখীন বড়লোকদের প্রিয় বাসস্থান। তাঁরা প্রাণপণে শহরটিকে রমণীয় ক'রে তোলবার জন্য কোথাও এতটুকু অর্থ ব্যয়ের কার্পণ্য করেননি। আমরা সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্র্যান্ড ক্যানেলের ধারে, চক বাজারে ও রেস্তোরাঁয় খুব খানিকটা ঘুরে বেড়ালাম।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর একখানি গণ্ডোলা তিন ঘণ্টার জন্য ৯০০ লীরায় ভাড়া ক'রে ভেনিসের অলিতে গলিতে অর্থাৎ কেনালে কেনালে খুব খানিকটা ঘুরে এলাম।

এখানকার বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'ডোজেস্ প্রাসাদের' এবং সেণ্ট্ মার্ক গির্জার অদ্ভুত সুন্দর স্থাপত্যকলা। এর অমূল্য শিল্প সংগ্রহ, এর মিউজিয়ম ও চিত্রশালা। এই চিত্রশালার শিল্পী 'টিশিয়ান' থেকে শুরু করে তদানীন্তন অনেক বড় বড় শিল্পী ও ভাস্করের হাতের কাজ সংগৃহীত আছে। ভেনিসে এসে আমরা কোনও 'এক্সকার্শান্ বোট' নিই নি। য়ুরোপের একাধিক শহর ঘুরে বেড়ানোর ফলে যে অভিজ্ঞতাটুকু সংগৃহীত হয়েছিল তারই উপর নির্ভর করে; ভেনিসের মানচিত্র ও নগর-পরিচয় সম্বল করে আমরা এ শহরের প্রায় সর্বত্রই ঘুরে বেড়িয়েছি। এখানকার 'দীর্ঘশ্বাসের সেতু' আর একটি দর্শনীয় বস্তু!

'সেণ্টমার্ক' গির্জা ও তার সম্মুখস্থ সেণ্ট মার্ক স্কোয়ারকে ভেনিসের সর্ব শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বলা যায়। দান্তে থেকে শুরু করে শীলার, সেক্সপীয়ার, গায়টে প্রভৃতি বিশ্ব-বরেণ্য কবিরা যে ভেনিসের স্তুতিগান করে-ছেন, স্বয়ং নেপলিয়ঁ বোনাপার্তে যে ভেনিস দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই ভেনিস যে আমাদেরও ভাল লাগবে এ আর বিচিত্র কি? তৃতীয় দিন সকালে প্রাতঃ-রাশের পর আমরা ফেরিস্টীমার ধরে 'সেণ্ট মার্ক' দেখতে গেলাম। সেণ্ট মার্ক পর্যন্ত যাবার ভাড়া ৪০ লীরা। এখানে এসে মনে হল যেন ময়দানবের রচিত কোনও স্বর্গ-পুরীর স্বর্ণপ্রাসাদে এসে পড়েছি। এ যেন মানুষের তৈরি নয়। এত বৃহৎ, এত সূক্ষ্ম, এত সুন্দর করে গড়া বুঝি মানুষের সাধ্যাতীত! সেণ্ট মার্ক স্কোয়ার এবং তার আশে পাশের 'সেণ্ট মার্ক ব্যাসিলিকা,' ক্যাম্পানাইল' বা ঘণ্টামণ্ডপ, রাজপ্রাসাদ, ডিউকের অট্টালিকা, ঘড়িঘর ইত্যাদি মিলে এ স্থানটাকে এমন একটা ঐশ্বর্যমণ্ডিত সুদৃশ্য জনপদ করে তুলেছে যে এখানে এসে এসব দেখে মনে হয় জীবন সার্থক হল। ভেনিসের যা কিছু খেলাধুলো, মেলা, সখের বাজার, প্রদর্শনী, সব কিছু এখানেই হয় শোনা গেল।

এক হাজার বছরের পুরানো বাড়ি এ সব। ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে পায়রা বাসা বেঁধেছে এর থামের মাথায়, আলসের গায়ে, কার্ণিশের উপর। এরা বলে এসব সেণ্ট মার্কের পায়রা। আছে তারা নির্বিঘ্নে নিরাপদে, হয়ত হাজার বছর ধরেই করছে বসবাস। চলেছে বংশ বৃদ্ধি হয়ে। সাধু-সন্তর পায়রা, বলে না কেউ কিছু। বৃন্দা-বনের কপিকুলের মতো অবধ্য আর কি!

সেণ্ট মার্ক গির্জার অতুল ঐশ্বর্যের বিবরণে শুধু এইটুকু বলে রাখি যে রামায়ণের স্বর্ণলঙ্কার বর্ণনার সঙ্গে এর অনেক মিল আছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, মর্মর, স্ফটিক, মোজাইক, আলাবাস্তার ও মূল্যবান মণিরত্নের কোনও অভাব নেই এখানেও। স্থাপত্যকলার সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠার সঙ্গে মূর্তিশিল্প, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার সংযোগে অপরূপ ও অদ্বিতীয় হয়ে উঠেছে এই মন্দির। এর ঘণ্টামণ্ডপটিরও অদ্ভুত একটি বিশেষত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর পাশে আবার ডিউকের প্রাসাদতুল্য সুদৃশ্য অট্টালিকার গঠন পারিপাট্য দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ না করে পারে না। ডিউকের এই রাজকীয় প্রাসাদের সঙ্গে খালের ওপারের আঁধার পাষাণ বন্দীশালার সংযোগ স্থাপনের জন্য যে সেতু তৈরি হয়েছিল তারই নাম হয়েছে—'দীর্ঘশ্বাসের সেতু'!

গ্র্যান্ডক্যানেলে যাবার মুখে জলের উপর সেণ্ট্ মারিয়া দেল্লা স্যালুটে' গির্জাটি ভারি চমৎকার। 'রিয়ালেটো সেতুটি'ও বিশেষ দ্রষ্টব্যের মধ্যে। ভেনিসের খালের ধারে ধারে কতকগুলি পুরানো বাড়ি আছে এত সুন্দর যে বার বার দেখেও আশা মেটে না। সুন্দরী তন্বী তরুণীর সুঠাম দেহ বল্লরীর মতো তাদের রূপের দুর্নিবার আকর্ষণ! পরের দিন আমরা স্টীমারে গেলাম মুসোলিনীর তৈরি নূতন শহর—'লিডো' দেখতে। সমুদ্রতীরে এই নবনির্মিত শহরটি স্নানার্থীদের স্বর্গবিশেষ। পরিষ্কার পরি-চ্ছন্ন আধুনিক শহর। পরিপাটি এর রূপ। আমরা সারাদিন এখানে কাটিয়ে আমাদের ভেনিসের তেরাত্রি বাস শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম একেবারে অস্ট্রিয়ার 'ভিয়ানা' শহরের দিকে।

(ক্রমশ)

কৃষি প্রসঙ্গ

চিনা বাদাম

অশ্বিনীকুমার

"মা! দুটো পয়সা দাও না?" মা বললেন "কেন রে? কি হবে?" উত্তর এলো "দাও না শীগ্গির, ছাই, চলে গেল।" বাইরে তখন শিশু রসনাকে প্রলুব্ধ করে, ছোট্ট একটা ডালি মাথায় নিয়ে হাঁকছে "চি-নি-য়া-বা-দা-ম্-ম্" নয়তো তার অন্তর্নিহিত বীজের ওপর রস চাপিয়ে সুর ধরেছে "নকুল দানা—ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না।" শৈশবে জিহ্বার ওপরে ঐ সামান্য দুটি সুরের যে অসামান্য ক্রিয়া তার থেকে রেহাই পেয়েছেন এমন মহামানব বোধহয় আমাদের দেশে মিলবে না। সত্যি বলতে কি জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেও লোক লজ্জার হাত এড়িয়ে পরম সংগোপনে দন্তহীন মুখ বিবরে ঐ সরস পদার্থের দু চারটে দানা ফেলে অতৃপ্ত বাসনাকে তৃপ্ত করতে মন চায় না একথাও জোর করে বলা যায় না।

লোকচক্ষুর অলক্ষ্যে চাদরের নীচে বা পকেটের মধ্যে কর্মচঞ্চল এক হাতের শব্দহীন চাপে দুটি বা তিনটি দানা বার করে ভাবলেশহীন মুখে নিক্ষেপ করবার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাও যে অনেক মহারথীকে করতে না দেখা যায় তাও নয়। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছি এই দিব্য বস্তু আসে কোত্থেকে? শুধু কি এই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সংগে নানাভাবে চিনাবাদাম রয়েছে জড়িয়ে যেমন চিনাবাদামের খইল, তেল, দালদা ইত্যাদি। বাণিজ্যিক আমদানীর সুড়ংগ পথে পশ্চিম বাঙলায় প্রতি বছর যে পরিমাণ চিনাবাদাম এবং এর তেল চালান আসে তা ভাবলে আশ্চর্য লাগে —দালদা বনস্পতির কথা ছেড়েই দিন। ১৯৫০-৫১ সালে পশ্চিম বাঙলায় ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৭ মণ চিনাবাদাম ও ৬ লক্ষ ৩১ হাজার ৮শত ৪০ মণ তেল আমদানী হয়েছে। অথচ খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে এই চাহিদা সত্ত্বেও আমাদের রাজ্যে অতি সামান্য পরিমাণ জমিতে চিনাবাদামের চাষ হয়ে থাকে।

চিনাবাদাম গাছের কাঁচা লতা গরুর খাদ্য হিসাবে খুবই ভাল ও পুষ্টিকর। খড় অথবা বিল ঘাস থেকেও এর লতা বেশী পোষ্টাই। বাদামের নানা স্বাদ আর নানা ব্যবহার। কাঁচা খাও, ভাজা খাও, বেশ চলবে। ভেজে আখের গুড় বা খেজুর গুড়ের সংগে মিশিয়ে তক্তি বা বরফি করে রেখে দাও, চায়ের সংগে বেশ চলবে; সময়ে অসময়ে অতিথ্ অভ্যাগত এলে একে দিয়ে বরণ কর খুশী হবেন। আবার কাঁচা বাদাম সেদ্ধ করে তরকারীতে দাও, খেতে ত ভাল লাগবেই উপকারীও হবে। শুধু কি এই? চিনাবাদামে তেলের ভাগ খুব বেশী থাকায় তেলের জন্য এর খুব চাহিদা রয়েছে।

এই তেল রান্নায়, বনস্পতি ঘি তৈরীর জন্য, সাবান তৈরীর জন্য এবং যন্ত্রাদিতে দেবার জন্য খুব বেশী ব্যবহৃত হয়। ঘানিতে তেল বার করে নিয়ে এর খইল থেকে নানা প্রক্রিয়ায় সুন্দর সাদা ময়দা তৈরী হতে পারে, যাতে প্রোটিনের ভাগ থাকে শতকরা ৫০ ভাগের মত।

বর্তমানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে শতকরা দশ ভাগ থেকে ২০ ভাগ পর্যন্ত চিনাবাদামের ময়দা, গম, বাজরা বা জোয়ারের ময়দার সাথে মিশিয়ে রুটি বানালে বেশী সুগন্ধ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারী হয়। পরীক্ষা করে আরও দেখা গেছে যে আধসের খোসা ছাড়ানো চিনাবাদামের শাঁস থেকে ৩ সের দুধ পাওয়া যেতে পারে। এই দুধ গরুর দুধের সমকক্ষ, শুধু এতে চুন জাতীয় দ্রব্যের ভাগ কিছু কম। এই দুধ থেকে মাখন, ননী ও পনী তৈরী করে খাওয়া যায়। সওয়া মণ গরু দুধ থেকে যদি ৫ সের পনীর তৈরী হ তবে ঐ পরিমাণ চিনাবাদামের দুধ থেকে সাড়ে সতের সের পনীর হতে পারে চিনাবাদামের খইল গরুর পুষ্টিকর খাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয় আবার জমিতে সা হিসাবেও বেশ কার্যকরী। চিনাবাদামের প্রোটিন থেকে আঁশ তৈরী হতে পারে এবং সাধারণ তুলা বা পশমের মত ব্যবহার করা চলে— এই আঁশ থেকে এক রকমের আঠা তৈরী করা যায়! প্লাইউড তৈরীর কাজে এই আঠা ব্যবহার করা হয়। চিনাবাদামের শক্ত খোসা মন্ড করে কাগজ ও কার্ডবোর্ড তৈরীর কাজে লাগানো যায়।

ডাঃ কারভার নামক জনৈক আমেরিকান বৈজ্ঞানিক চিনাবাদাম থেকে ৩০০ রকমের নিত্য ব্যবহার্য জিনিস তৈরী করেছেন। ইউরোপের অনেকানেক স্থানে ও যুক্তরাষ্ট্রে যদিও প্রাণীজ প্রোটিনের অভাব নেই, তবুও চিনাবাদাম মিশ্রিত রুটি চিনাবাদামের মাখন প্রভৃতি মানুষের দৈনন্দিন আহার্যের অন্তর্ভুক্ত। তথাকথিত ফিনিস্ট প্রডাক্টে আমাদের রুচিপ্রবণতার অভাব নেই। তই চিনাবাদামের এই সব বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য বস্তুর কথা আজ অবাস্তব বলে অনেকের মনে সন্দেহ হলেও, বিদেশ থেকে চকচকে আধারে বিদেশী কৌলিন্যের তক্মা এঁটে চালান এলে গ্রহণে কোনো আপত্তি হবে না নিশ্চয়ই। সমস্যা কণ্টকিত দেশে চিনাবাদামের বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমরা চুপ করে বসে আছি—এই দুঃখ।

চিনবাদামের খাদ্যগুণের তুলনামূলক হিসাবঃ—

	প্রোটীন (শতকরা)	শর্করা জাতীয়	চর্বি জাতীয়	প্রতি ১০০ গ্রামে ভিটামিন "এ"	ভিটামিন "বি"১	ভিটামিন "বি"২	নিকোটিনিক এসিড
চিনাবাদাম	২৬·৭	২০·৩	৪০·১	৬৩	৯০০	৩০০	১৪·১
চাল	৬·৯	৭৯·২	০·৪	—	৬০	১২০	৪·০
গম	১২·১	৭২·২	১·৭	—	—	—	—
মাখন	০·৬	০·৪	৮১·০	২৪০০	১১২০	৩৭	—

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের ত্রুটি হল যে, তাতে ভাল প্রোটিনের অভাব। এই প্রোটিন অতি সহজেই এবং সস্তায় আমরা চিনাবাদাম থেকে পেতে পারি। অথচ আশ্চর্য এই যে এই বিষয়ে আমরা আজও নিতান্ত উদাসীন।

খাদ্যগুণ ছাড়াও চিনাবাদামের আরও একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রায় বেশীর ভাগ শস্য উৎপাদনের কিছু না কিছু পরিমাণ খাদ্যোপাদান জমি থেকে নিঃশেষিত হয়ে জমির উর্বরা শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু চিনাবাদামের শেকড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটীর মধ্যে একপ্রকার বীজাণু থাকায় তারা বায়ু থেকে অতিপ্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে জমিকে আরও উর্বরা করে। পর্যায় চাষে তাই চিনাবাদামের পর যে কোন শস্য লাগালে তার একর প্রতি উৎপাদনে যথেষ্ট বৃদ্ধি দেখা যায়। একক বা অন্য কোন ফসলের সঙ্গে মিশ্র শস্য হিসাবেও চিনাবাদামের চাষ করা যায়। সর্বস্ব দান করে জনহিতে সেবা করার এমন দৃষ্টান্ত আজকের দিনে চিনাবাদাম ছাড়া খুব কমই পাওয়া যাবে। চিনাবাদামের অনেক জাত আছে যথা "স্পেনিস চিনাবাদাম," "ছোট জাপান," "একোলা" প্রভৃতি। আশু ও নাবি ফসল হিসেবে এদের ভাগ করা চলে।

বছরে কুড়ি ইঞ্চি থেকে একশত ইঞ্চি পরিমিত বৃষ্টিপাতের মধ্যে চিনাবাদাম চাষ করা যায়। ভারতে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও হায়দরাবাদ রাজ্যেই চিনাবাদামের সর্বাধিক চাষ প্রচলিত। পশ্চিম বাঙলার যে কোন স্থানেই চিনাবাদামের চাষ চলতে পারে, তবে চিনাবাদাম বেশী বৃষ্টির জল সহ্য করতে পারে না। তাই জল নিকাশের সুবিধা যুক্ত উঁচু ডাঙ্গা জমিতে এই শস্যের চাষ করা উচিত। ঝুরঝুরে বেলে অথবা দোয়াঁশ মাটিতে চিনাবাদামের চাষ ভাল হয়। মাটি যদি বেশ আলগা না থাকে, তবে বাদামের শুঁটী শক্ত মাটিতে বাড়বার সুযোগ পায় না বলে উৎপাদন কমে যায়। এই শস্যের জন্য তাই মাটি গভীরভাবে চাষ করা উচিত। রবি খন্দে যে সব জমিতে যথেষ্ট রস থাকে এবং খরিপ খন্দে যে সব জমিতে জল দাঁড়ায় না সেই সব জমি চিনাবাদামের চাষে বেছে নেওয়া দরকার। জমির স্বাভাবিক উর্বরা শক্তির ওপর সার দেওয়া নির্ভর করে। সমস্ত জমির জন্যই গোবর সার উপকারী, কিন্তু পটাস সার এরজন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। আগাছা পোড়ানো ছাই, কচুরীপানার ছাই অথবা কাঠ পোড়ানো ছাই-এ পটাস সমধিক পরিমাণে থাকায় ঐগুলি এই শস্যের পক্ষে বিশেষ হিতকারী। অম্বলরসযুক্ত কোন কোন জমিতে চুণ দেবার প্রয়োজন হতে পারে।

রবি ও খরিপ উভয় খন্দেই চিনাবাদামের চাষ করা যায়। খরিপ খন্দের জন্য বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাসে বীজ অঙ্কুরিত হবার মত জমিতে যথেষ্ট রস থাকলেই চিনাবাদাম লাগানো চলে। রবি খন্দে জমির প্রকৃতি বুঝে অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা চলতে পারে। লাগানোর পূর্বে চিনাবাদামের খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়। নূতন খোসা ছাড়ান বীজ ব্যবহার করা উচিত।

চিনাবাদামের গাছ দু রকমের হয়—সোজা ও লতানে। লতানো গাছের লাইন ২ থেকে ২½ ফুট অন্তর এবং সোজা গাছের লাইন ১৮ ইঞ্চি থেকে ২০ ইঞ্চি অন্তর লাগাতে হয়। প্রথমে ৬ ইঞ্চি অন্তর বীজ বুনে পরে অঙ্কুর বার হলে চারা তুলে মাঝখানে ১২ ইঞ্চি ফাঁক করে দিলে জমিতে ফাঁক থাকবার ভয় থাকে না। জমির প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের চিনাবাদামের বীজ বিঘা প্রতি কম বেশী ৭ থেকে ১০ সের পর্যন্ত লাগতে পারে। মাটির পর্যাপ্ত রস থাকলে ৭।৮ দিনের মধ্যেই অঙ্কুর দেখা দেয়। অঙ্কুর দেখা দেবার ২।৩ সপ্তাহ পরেই গোড়াগুলি খুঁচিয়ে দিতে হয়। গাছ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জমি ২।৩ বার হ্যান্ড হো অথবা কোদাল দিয়ে আলগা করে দিতে হয়। যতদিন পর্যন্ত গাছ বাড়তে থাকবে ততদিন আগাছা তুলে জমি পরিষ্কার ও আলগা করে রাখতে হবে।

চিনাবাদাম ৬।৭ মাসের ফসল। তবে ঠিক কোন্ সময়ে তুলতে হয় সেটা ঠিক করতে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। আগে তুলে ফেললে শাঁস অপূর্ণ থাকায় ফলন কমে যায়। তাই গাছ হলদে হয়ে পাতা কুঁকড়িয়ে গেলে কিছু দিন দেরী করে তোলাই ভাল। তোলবার পর খুব ভাল করে খোসা সহ রৌদ্রে শুকিয়ে রাখতে হয়। বিঘা ভুঁয়ে ৬ মণ থেকে ১০ মণ পর্যন্ত বাদাম পাওয়া যায়। ইন্দুরই চিনাবাদামের প্রধান শত্রু। ক্ষেতে সেচ করে অথবা জমির গর্তে সায়ানোগ্যাস দিয়ে ইন্দুর দমন করতে হয়। এছাড়া এই ফসলের ক্ষতিকারক দুইটি প্রধান রোগ আছে। এরা 'টিক্কা' ও 'গোড়া পচা' রোগ নামে খ্যাত। টিক্কা রোগে পাতায় ঘোর বাদামী রংএর দাগ পড়ে। এই দাগের চার দিকে সোনালী একটা মণ্ডল দেখা যায়। এর প্রকোপে অসময়ে পাতা ঝরে যায় ও গাছ মরে যায় এবং তাতে ফলনের বিশেষ বিঘ্ন ঘটে। গোড়া পচা রোগে শস্যের গোড়ায় জমির ঠিক ওপরে বাদামী রংএর দাগ দেখা দেয় এবং অনেক সময় ঐ জায়গায় শস্যের গোড়ায় সরষের মত সাদা অথবা বাদামী গুটী দেখা দেয়। এতে সমস্ত গাছ মরে যায়। চিনাবাদামের চাষে ফলন বৃদ্ধির জন্য জমিতে যে পটাশ সার দেবার প্রয়োজনের উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া গোড়া পচা রোগ দমন করতেও সাহায্য করে। তাছাড়া গাছ ১০।১২ ইঞ্চি মত বড় হলেই একবার ও পরে ফুল ধরবার প্রাক্কালে একবার রোগনাশক পেরেনক্স অথবা বোর্দো মিক্সচার পিচকারী দিয়ে পাতার ওপরে, নীচে ও ডাঁটায় এবং ভেলীর ওপর দিয়ে দিলে রোগ কম হয় এবং ফলনও বাড়ে।

বলাবাহুল্য চিনাবাদামের চাষ সর্বথা লাভজনক। আমাদের দেশে এর চাষ বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আজকের আর্থিক অনটন ও খাদ্য সমস্যার দিনে পশ্চিম বাঙলার চাষীদের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৭৮

ভাগলপুর ছেড়ে আসবার পূর্বে বিভূতিবাবুর সহিত বিচিত্রা সম্বন্ধে কথাবার্তা পাকা করলাম। বিভূতি-বাবু, অর্থাৎ বাঙলা দেশের স্বনামধন্য কথাশিল্পী, সম্প্রতি পরলোকগত বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সে সময়ে বিভূতিবাবু চাকরি উপলক্ষে ভাগলপুরে বাস করছেন। কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঘোষ বংশের খেলাতচন্দ্র ঘোষ স্টেটের তিনি ছিলেন নায়েব-তহশিলদার (সারকল্ অফিসার)। প্রধানত তিনি ভাগলপুরেই থাকতেন; মাঝে মাঝে ভাগীরথীর উত্তর পারে অবস্থিত দিরা-ইসমাইলপুর নামক জঙ্গম-মহল পরিদর্শন করতে যেতেন।

ভাগলপুর শহরে ও আশপাশে বিভূতি-ভূষণের মনের খোরাকের অভাব ছিল না। নগরের শেষ প্রান্ত লেহন ক'রে সুবিস্তীর্ণ ভাগীরথী নদী প্রবাহিত; তার অপর পারে দিগন্তবিস্তৃত বালুচরের মায়া; দিকে দিকে ঘননিবদ্ধ তালবৃক্ষের কুঞ্জ; চতুর্দিকে উচ্চ পাড় দিয়ে ঘেরা দীর্ঘায়ত জলাশয় শাজঙ্গি ও তার সন্নিহিত আরণ্য শোভা; নগরের পশ্চিম প্রান্ত হ'তে কিছু দূরে মহাবীর কর্ণের রাজধানী চম্পানগর তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মহিমা সহ বর্তমান; চম্পানগরের বাঙালী জমিদার স্বনামখ্যাত মহাশয় তারকনাথ ঘোষের পল্লী হ'তে মাইল আষ্টেক দূরবর্তী পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ বিহারী জমিদার শ্রীমোহন ঠাকুর, উগ্রমোহন ঠাকুর, প্রাণমোহন ঠাকুর প্রভৃতির বিশাল অট্টালিকাসমূহে সমাকীর্ণ বাগ্বারি পল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথ; তার উভয় পার্শ্বে পক্ষি-কলকূজিত বিচিত্র বিটপীশ্রেণী। এ সকল বস্তু বিভূতিভূষণকে আকৃষ্ট করত এবং প্রেরণা জোগাত নিশ্চয়ই; কিন্তু দু-চার দিন ইসমাইলপুরে যাপনের পর তিনি ভাগল-পুরে ফিরতেন নিবিড়তর আনন্দ ও গভীরতর আবেশভরা মন নিয়ে। ভাগল-পুরে ফিরে আসার পর কয়েকদিন ধ'রে ইসমাইলপুরের অরণ্য এবং বালুকাভূমি খচিত যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন, আমাদের মনের মধ্যেও তা সঞ্চারিত না ক'রে ছাড়তেন না।

একদিনের সুমিষ্ট স্মৃতি এত দীর্ঘকাল পরেও সুস্পষ্ট হ'য়ে মনের মধ্যে বিরাজ করছে। সকালবেলা বৈঠকখানায় একা ব'সে কাজ করছি, এমন সময়ে একটি অপরিচিত যুবক ঘরে প্রবেশ করলেন। দেহের রঙ ঈষৎ শ্যামল, মুখে মৃদু সলজ্জ হাসি, চোখ দুটি উৎসুক-উজ্জ্বল, আর সমস্ত মুখাবয়ব জুড়ে অনাবিল সরলতার সুস্পষ্ট পরিচয়। স্নিগ্ধ অমায়িক আকৃতি দেখে মন খুশি হল। বয়স মনে হল ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর।

নিকটে উপস্থিত হ'য়ে স্মিতমুখে যুবক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনিই কি উপেন-বাবু?"

একটা চেয়ার দেখিয়ে বললাম, "বসুন। হ্যাঁ, আমি উপেন। আপনার পরিচয়?"

চেয়ারে উপবেশন ক'রে যুবক বললেন, "আমার নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনি ভাগলপুরে থাকেন তা জানি। অনেকদিন থেকে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে, কিন্তু বাড়ি চিনতাম না বলে এতদিন আসতে পারি নি।"

একে বাঙালী, তার ওপর বগলে কাগজ-পত্রের বাণ্ডিলের প্রতীক নেই, সুতরাং একথা বুঝতে বিলম্ব হ'ল না, আমি যে পুকুরে কারবার করি, সে পুকুরের মাছ নয়,—অর্থাৎ মক্কেল নয়। জিজ্ঞাসা করলাম, "ভাগলপুরে থাকেন?"

বিভূতিবাবু বললেন, "আপাতত ভাগল-পুরেই আছি, কিন্তু আমি এখানকার লোক নই।"

তবে কোথাকার লোক? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আমার কোনও আত্মীয়-স্বজন আছেন বলে মনে পড়ল না। তাহ'লে আমার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা হবা সুত্রটা কোথায়? সাহিত্য? হতেও পারে ভাগলপুরে বেড়াতে এসে ইতিপূর্বে কো কেউ সাহিত্যের সুত্র ধরে আমার সঙ্গে আলাপ করে গেছেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্স কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের সুবিখ্যাত অধ্যাপক তীক্ষ্ন সাহিত্যবোধসম্পন্ন সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র 'শশিনাথ' নামে আমার উপন্যাস পাঠের পর ভাগলপুরে বেড়াতে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলাপ করেছিলেন। ইনিও যদি সেইভাবেই এসে থাকেন ত' বিস্মিত হবার তেমন কিছু থাকে না। কিন্তু খোলাখুলিভাবে সে কথা জিজ্ঞাসা করাও ত যায় না। বললাম, "আমার বাড়ি চিনতেন না, সেকথা বুঝলাম; কিন্তু আমাকে চিনতেন কি সুত্রে?"

উত্তরে বিভূতিবাবু যেকথা বললেন, তাতে বুঝলাম আমার অনুমানে ভুল হয় নি; বললাম, "আপনিও তাহলে একজন সাহিত্যিক?"

বিভূতিবাবু বললেন, "সাহিত্যিক কি না বলতে পারিনে, কিন্তু সাহিত্যকে ভালবাসি, আর তার প্রমাণ দিয়েছি আপনাকে খুঁজে বার করে।" বলে হাসতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে আড্ডা উঠল জমে। প্রথম পরিচয়কালের শিষ্টাচারপ্রসূত সতর্ক কথোপকথন অবিলম্বে অন্তর্হিত হল; খোলা মনের আলগা-হালকা কথায় কথায় একটা নিবিড় সৌহৃদ্য সেই বৈঠকেই সৃষ্টিলাভ করলে। সেইদিনই অপরাহ্নে বিভূতিবাবুকে আমার গৃহে চা-পানের নিমন্ত্রণ করলাম; এবং চা-পানের পর তাঁকে নিয়ে উপস্থিত হলাম অমরেন্দ্রনাথের গৃহে আমাদের দৈনন্দিন সান্ধ্য মিলন-সভায়।

তারপর থেকে প্রতিদিন অপরাহ্নে মাইল খানেক দূরবর্তী মোগশর পল্লীর 'বড়বাসা' থেকে বিভূতিভূষণ আমাদের দলে আড্ডা দেবার আগ্রহে আদমপুরে আমার গৃহে এসে উপস্থিত হতেন; তৎপরে আমরা উভয়ে একত্র হয়ে অমরেন্দ্রনাথের গৃহের বহিঃ-প্রাঙ্গণে ভাগীরথী তীরবর্তী শ্যামশষ্পের হরিৎ আস্তরণের উপর আশ্রয় নিতাম। আমাদের মাথার উপরে থাকত নীল আকাশের বিস্তৃতি; চোখের সম্মুখে সুদূর প্রান্তে আকাশ এবং ধরিত্রীর মিলন-রেখা।

পথের পাঁচালী উপন্যাসের পরিকল্পনা ও সূচনা বিভূতিভূষণ কবে ও কোথায় করেছিলেন, তা আমার ঠিক জানা নেই। পরে

জানতে পেরেছি, পরিকল্পনা যেখানেই করুন, সূচনা তিনি ভাগলপুরেই করেছিলেন। তবে একথা আমার জানা আছে, কলিকাতায় লিখিত শেষের দিকের সামান্য অংশ ব্যতীত বাকি সবটাই তিনি ভাগলপুরে থাকতে লিখেছিলেন। মাঝে মাঝে আমাকে বড়বাসায় নিয়ে গিয়ে পথের পাঁচালীর পাণ্ডুলিপি পাঠ করে শোনাতেন; কখনো-সখনো আমার আদমপুরের বাড়িতে পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেও পড়তেন। মুগ্ধ হয়ে আমি শুনতাম এবং পাঠ শেষ হলে প্রচুরভাবে প্রশংসা করতাম। আমার উচ্ছল অবারিত প্রশংসায় বিভূতিবাবুর মনে প্রতীতির আনন্দ দেখা দিত। উৎসাহের সহিত তিনি রচনার কার্যে ব্যাপৃত হতেন।

একটা মাসিকপত্র বার করবার কল্পনা করছি, সেকথা বিভূতিবাবুকে অনেকদিন থেকেই জানিয়ে আসছিলাম। কিন্তু এমনই অলস আগ্রহের সহিত সেকথা বলতাম যে, তিনি তার উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করতেন না। বোধ হয় মনে করতেন, ওটা আমার নিতান্তই বিনা মাশুলের ইচ্ছাবিলাস। ছাত্রজীবনে যে ব্যাপারে একাধিকবার সখ মিটিয়েছি, তারই একটা জমকালো রূপের স্বপ্ন দেখা।

বিভূতিবাবু সর্বদাই আমাদের পল্লীতে বেড়াতে আসতেন, মাঝে মাঝে আমিও তাঁর বাসায় যেতাম। একদিন তেমনি গেছি, কথাবার্তার মধ্যে এক সময়ে বিভূতিবাবু জানালেন, প্রবাসীর কর্তৃপক্ষ তাঁর পথের পাঁচালী ফেরৎ দিয়েছেন।

বিস্মিত হলাম; কিন্তু মনের একটা গোপন প্রদেশ খুশি হয়েও উঠল। বললাম, "যে জিনিস আমার অদৃষ্টে স্থির হয়ে আছে, তা ফেরৎ না এসে উপায় কি? বেশ মন লাগিয়ে লিখে ফেলুন, শেষ হলেই বিচিত্রায় বার করব।"

হাসিমুখে বিভূতিবাবু বললেন, "অনেক দিন থেকে ত শুনছি, কিন্তু আপনার কাগজ কি সত্যিসত্যিই বেরোবে?"

বললাম, "বেরোবে না কি রকম? রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিশ্রুতি লাভ করলাম, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঝগড়া করে এলাম,—সে-সব কি বৃথা যাবে? তা ছাড়া, যে আগুন একদিন ভাল করে জ্বলবে, তা অনেকদিন থেকেই ধোঁয়া ছাড়ে।"

তেমনি হাসিমুখে বিভূতিবাবু বললেন, "জ্বললেই খুশি হব। কিন্তু বিশ্বাস কেন হয় না, জানেন?"

হাসিমুখে বললাম, "কেন?"

"আপনার দুঃসাহসের কথা মনে ক'রে। সংসার ত' আপনার নিতান্ত ছোট নয়,—আর সে সংসার চালাবার ব্যবস্থাও এখানে অনেকদিন থেকে কায়েম রয়েছে। সে সব ছেড়ে-ছুড়ে একেবারে অন্য পথে যাওয়ার কথা সহজে বিশ্বাস হয় কি?"

বললাম, "পুরুষের ভাগ্য যখন দেবতাদেরও অজ্ঞেয়, তখন অবিশ্বাস করবারই বা কি আছে? বারো বৎসর আগে একদিন কলকাতা থেকে শেকড় উপড়ে ভাগলপুরে এসেছিলাম, আজ আবার ভাগলপুর থেকে শেকড় উপড়ে কলকাতায় চলেছি। হয়ত, যে মাটির গাছ, সেই মাটিতেই ফিরে যাচ্ছি। ভবিষ্যতে সে গাছে ফল ধরবে, অথবা গাছ শুকিয়ে মরবে, সেটা পুরুষস্য ভাগ্যং।"

মাথা নেড়ে বিভূতিবাবু বললেন, "না, না, সে গাছ শুকিয়ে মরবে না, তাতে ফলই ধরবে।"

বিচিত্রায় পথের পাঁচালী প্রকাশিত হবার প্রস্তাবে বিভূতিবাবু অতিশয় খুশি হয়ে উপন্যাস শেষ করতে এবং লিখিত অংশ পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত করতে প্রবৃত্ত হলেন। আষাঢ়, ১৩৩৫ অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা হতে বিচিত্রায় মাসে মাসে ধারাবাহিকভাবে পথের পাঁচালী প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। তৎপূর্বে 'বউচণ্ডীর মাঠ' ও 'নব বৃন্দাবন' নামে তাঁর দুইটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

৭৯

কলিকাতায় এসে লেখা এবং চিত্র সংগ্রহের কার্যে আত্মনিয়োগ করলাম। গল্প, উপন্যাস এবং সাধারণ প্রবন্ধ সংগ্রহ করা তত কঠিন কাজ নয়। সচিত্র পত্র প্রকাশ করবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ, সেই সকল প্রবন্ধ সংগ্রহ করা অথবা ফরমায়েস দিয়ে লেখানো, যেগুলিকে চিত্রিত করা চলবে। উপাদেয় প্রবন্ধের সহিত উৎকৃষ্ট চিত্রের মণিকাঞ্চনের যোগ সাধন বাঙলাদেশে, অসাধ্য যদিই বা না হয়, দুঃসাধ্য ব্যাপার তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সংবাদপত্রের সাধারণ বিজ্ঞাপনের ফলে এবং ব্যক্তিগত চেষ্টা-চরিত্রের সাহায্যে লেখা জমে উঠতে লাগলো আশাতীত পরিমাণে। একথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি, অত বৃহৎ এবং ব্যয়সাধ্য কাগজ পরিচালনার কঠিন কার্য নির্বাহ করতে পারা গিয়েছিল বহুল পরিমাণে বাঙলা দেশের সহৃদয় লেখক এবং চিত্রশিল্পিগণের উদার সহানুভূতি এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতার কল্যাণে। যে বৃক্ষেরই তলায় গিয়ে হাত পেতেছি, নিষ্ফল হইনি; ফল হাতে ক'রে ফিরেছি। অবশ্য শরৎবৃক্ষ প্রথমটা প্রবলভাবে মাথা দুলিয়ে 'না' বলেছিল বটে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন সে বৃক্ষ নিজের ভুল বুঝতে পেরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে বোঁটা আলগা করেছিল।

অচিরকালের মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসের কলেবর দেখে চিন্তিত হলাম; আর কবিতার সংখ্যা দেখে হলাম দুশ্চিন্তিত। টাকা-আনা-পয়সার ক্ষেত্রে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হওয়া যে উল্লাসকর বস্তু, প্রবন্ধ-গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে সব সময়ে তা নয়। টাকা-আনার ব্যাপারে ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক হলে তাগাদার পরিমাণ হ্রাস পায়; প্রবন্ধ-গল্পের ব্যাপারে বাড়ে। এ পথের আমার অগ্রগ-মহাজন 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক জলধর সেন মহাশয়ের এ বিষয়ে অবস্থা অবগত হয়ে, এবং যে উপায়ে তিনি সেই অবস্থা সামলে চলছেন, তা জানতে পেরে যুগপৎ আশ্বস্ত এবং পুলকিত হলাম।

মাত্র তিন-চারদিন হ'ল বাঙলা দেশে বিচিত্রা প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে। সময় তখন অপরাহ্ন চার ঘটিকা। সবেমাত্র কাগজ বেরিয়ে যাওয়ায় কাজের চাপ কিছু কম। পটলডাঙ্গা স্ট্রীটের বিচিত্রা অফিসে আমার ঘরে বসে অলস নিশ্চিন্ততায় এ-কাজ, ও-কাজ, সে-কাজ দেখ্‌ছি;—যতিনাথ এলে চা-পান ক'রে দুজনে পথে বেরিয়ে পড়া যাবে।

যতিনাথ থাকতেন শ্যামবাজারে, আমি বাগবাজারে। হাইকোর্ট থেকে গৃহে পৌঁছে বেশ পরিবর্তন করে চা-খাবার খেয়ে যতিনাথ বেরিয়ে পড়তেন পটলডাঙ্গা স্ট্রীটের বিচিত্রা কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে। সাড়ে পাঁচটা-ছ'টার মধ্যে এসে পৌঁছতেন; হাতের কাজ সেরে, আর এক দফা চা-পান করে দুজনে পথে বেরিয়ে পড়তাম। যানবাহনের আমরা তোয়াক্কা রাখতাম না, রাজপথের জনাকীর্ণ ফুটপাথ ধরে পরম সন্তুষ্টচিত্তে গল্পে মশগুল হয়ে দুজনে পদচালিত করতাম কলিকাতার উত্তরপ্রান্ত অভিমুখে। পার্শ্ববর্তী গতিচঞ্চল পথের কর্কশ নিনাদ, পরস্পরের প্রতি গভীর আগ্রহে নিয়োজিত আমাদের উভয়ের কর্ণপ্রান্তে এসে স্তব্ধ হয়ে যেত; আমাদের মৃদু আলাপনে বিঘ্ন ঘটাত না। দেখতে দেখতে দীর্ঘ পথ শেষ হয়ে যেত, কথা কিন্তু

তখনো শেষ হত না। যতিনাথ বাঁয়ে ভাঙতেন, আমি তখনো এগিয়ে চলতাম সোজা উত্তর দিকে।

অফিস থেকে অন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন না থাকলে, বিশেষত যতিনাথ এসে উপস্থিত হলে নিয়মিত পদব্রজেই গৃহে ফিরতাম। আমি হাঁটতাম এক ফের,—যতদূর মনে পড়ে, যতিনাথ কিন্তু হাঁটতেন উত্তর ফের। গৃহ থেকে বিচিত্রা কার্যালয়ে তিনি আসতেনও পদব্রজেই। যে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম, তা শেষ করি।

হাল্কা নিশ্চিন্ত মনে দুই-একটা লেখা-টেখা পড়ছি, এমন সময়ে হয়ত নিভন্তই মোটা বর্মা চুরুট মুখে কক্ষে প্রবেশ করলেন জলধর সেন।

তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে ব্যগ্রকণ্ঠে বললাম, "আসুন দাদা, আসুন, আসুন! কি ভাগ্য, দয়া করে এসে পড়েছেন। বিচিত্রা পেয়েছেন?

চেয়ারে উপবেশন করে মুখ থেকে চুরুটটা খুলে নিয়ে জলধর বাবু বললেন, "পেয়েছি। ভারতবর্ষের কপি পেয়েছি, আমার নিজস্ব কপিও পেয়েছি। পেয়েই ত ব্যস্ত হয়ে আসছি। কি কাণ্ড করেছ বল ত?"

ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, "কেন বলুন দেখি?"

"আরে, ও-কি একটা মাসিকপত্র হয়েছে? ও ত হয়েছে উপহারের বই।"

"আপনার ভালো লাগে নি?"

"ভাল লাগবে না কেন? অত গুড় ঢেলেছ, মিষ্টি লাগবে না? কিন্তু যে চালে আরম্ভ করলে, সে-চাল শেষ পর্যন্ত রাখতে পারবে কি?"

সহাস্যমুখে বললাম, "পারব কি না, সে ত ভবিষ্যতের কথা, এখন কি করে বলব? তবে চেষ্টা ত করব রাখতে।"

"প্রতি কপি কত করে পড়তা পড়েছে খতিয়ে দেখেছ?"

বললাম, "মোটামুটি দেখেছি। চোদ্দ আনা করে।"

জলধর সেন বললেন, "দু আনা লুকোচ্ছ। আমার ত মনে হয়, পুরোপুরি এক টাকা করেই পড়েছে। আচ্ছা, চোদ্দ আনাই যদি হয়, বেচছ আট আনা করে। তাহলে কি করে চলে বস?"

বললাম, "চোদ্দ আনাকে ক্রমশ চার আনায় নামিয়ে আনতে হবে।"

"লোকে কিনবে কেন? আট আনা দিয়ে যারা একদিন চোদ্দ আনার মাল কিনেছে, আট আনা দিয়ে তারা চার আনার মাল কেন কিনবে বল?"

হাসি মুখে বললাম, "কিনবে দাদা, ভালোবাসা জমে গেলে কিনবে। ফুলশয্যের রাত্রে নতুন বউকে পরাতে হয় দামি রেশমি কাপড়, খাওয়াতে হয় উৎকৃষ্ট খাবার, শোয়াতে হয় মূল্যবান শয্যায়, তার গলায় দিতে হয় ফুলের মালা। কিছুদিন বাদে সে হয়ত পরে মিলের মোটা শাড়ি, খায় শাক দিয়ে মোটা চালের ভাত, শোয় ময়লা ছেঁড়া বিছানায়, অথচ তখনো চলে; হয়ত ফুলশয্যার রাত্রির চেয়েও ভাল ভাবেই চলে, কারণ তখন ভালোবাসা জমে গেছে।"

জলধর সেন বললেন, "তোমার পাঠকদের ভালোবাসা জমুক, তাই কামনা ক
ভাগলপুরে ওকালতি করতে, অবসর স
সাহিত্য সৃষ্টি করতে, সে বেশ
সাহিত্যের কারবারি হওয়ার চেয়ে সাহি
হওয়া অনেক ভাল।"

আমি জানতাম, জলধর দাদার আ
ক্ষোভের বাসা কোথায়। কিছুকাল
আমি ছিলাম একমাত্র ভারতবর্ষের লেখ
আমার লিখিত উপন্যাস একটির পর এ
একমাত্র ভারতবর্ষেই প্রকাশিত
চলেছিল; আর কোথাও হত না। সু
আমার দ্বারা দাদা ছিলেন তাঁর ভারতব
খানিকটা অংশের বিষয়ে একরকম নিশ্চি
এমন সময়ে, যতদূর মনে পড়ে, ১৩
সালের বৈশাখ মাসে প্রবাসীতে আম
ধারাবাহিক উপন্যাস রাজপথ দেখা দি

এ ঘটনায় জলধরবাবু প্রসন্ন হননি, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম। যাই হোক, তবু সে অবস্থায় ভাগাভাগির পথ ছিল। কিন্তু লেখক থেকে হঠাৎ ডবল প্রমোশন পেয়ে সম্পাদক হওয়ায়, যে ছিল এতদিন জোগান-দার, সে একেবারে হয়ে দাঁড়াল ভাগীদার। এখন থেকে জোগান দেওয়া সে ত বন্ধই করলে, উপরন্তু হয়ত-বা ভাগ বসাতে আরম্ভ করবে। এরূপ অবস্থায় দাদা যদি মোটের উপর সন্তুষ্ট হতে না পারেন, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

কথোপকথন মোড় নিয়ে অন্য দিকে বিস্তার লাভ করে চলল। কথায় কথায় এক সময়ে বললাম, "ভারি অসুবিধায় পড়ে গেছি দাদা।"

দাদা তখন মুখে চুরুট পুরেছেন। চুরুটজোড়া-মুখ উপর দিকে নেড়ে সাংকেতিক প্রশ্ন করলেন, কি অসুবিধা?

বললাম, "গ্রহণের উপযুক্ত যে সকল লেখা আসছে, তা ছাড়তেও পারছিনে, অথচ নির্বাচিত হয়ে যে-লেখা জমে গেছে, তা প্রায় মাস দুয়েকের খোরাক।"

মুখ থেকে চুরুট বার করে দাদা বললেন, "দু মাসের মত লেখা জমে যাওয়ায় তুমি ঘাবড়ে গেছ ভায়া, আর আমি যদি দু বছরের কোন লেখা না পাই, কাগজ বার করবার পক্ষে আমার কোন অসুবিধা হয় না।"

শুনে আমার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল। কৌতূহলে ও সবিস্ময়ে বললাম, "বলেন কি দাদা! কি করে লেখকদের থামান?"

প্রশান্ত কণ্ঠে দাদা বললেন, "ঐ ভাই-ভাই বলে পিঠে হাত বুলিয়ে।"

সর্বনাশ! দু বৎসরের লেখকদের তাগাদা দি পিঠে হাত বুলিয়ে ভাই-ভাই বলে মেলাতে হয়, তাহলে একমাত্র সেই কাজই সমস্ত সময় গ্রাস করবার পক্ষে যথেষ্ট! রচনা পরীক্ষণ ত দূরের কথা, বোধ করি, নিশ্চিন্ত হয়ে প্রুফ দেখার কাজও করা চলে না!

কবিতার কথা উঠল।

বললাম, 'কবিতার কি করা যায় বলুন ত দাদা? গল্প যদি দুটো আসে ত কবিতা আসে কুড়িটা।"

নির্বিকারভাবে দাদা বললেন, "ঐ একবার চোখ বুলিয়ে, তেমন বুঝলে লাল পেন্সিল দিয়ে 'আর' লিখে ফাইল করে রাখবে। স্ট্যাম্প থাকলে ফেরৎ পাঠাবে।"

কবিতা সম্পর্কে জলধর দাদার নামে একটি কৌতুকজনক গল্প প্রচলিত আছে। আহার করতে দাদা ভালবাসেন, একথা রাষ্ট্র ছিল। নবীন কবিযশঃপ্রার্থিগণ এই ব্যাপারের সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য দাদাকে আহারের নিমন্ত্রণ দিয়ে চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় করে খাওয়াতেন। আহারান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম গ্রহণের পর দাদা যখন বিদায় গ্রহণ করতে উদ্যত হতেন, অতি সঙ্কোচে সন্তর্পণে একটি কুণ্ঠিত ভীত কবিতা দাদার হাতে এসে আশ্রয় লাভ করত—"দাদা, যদি পছন্দ হয়, তাহলে ভারতবর্ষে—"

দাদা কতকটা প্রস্তুত হয়েই থাকতেন। নির্বিকারভাবে কবিতাটি জামার পকেটে নিক্ষেপ করে শান্তকণ্ঠে বলতেন, "আচ্ছা।" পথে বার হয়ে একটু দূরে গিয়েই দাদা পকেট থেকে কবিতাটি বার করে সরাসরি বিচার করতেন। ক্বচিৎ কখনো কোন কবিতার সৌভাগ্য হত পকেটের বন্দিশালা থেকে কবিতার ফাইলে মুক্তিলাভ করে শেষ পর্যন্ত 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হবার। এইভাবে সংগৃহীত অ-মনোনীত কবিতার দ্বারা দাদা ফাইলের ভার বৃদ্ধি করতেন না: প্রায় সব কবিতাগুলিই জামার পকেটে থেকে যেত। জামা রজক-ভবনে যাবার সময়ে অতর্কিতে সেগুলিকে বার করে নেওয়া হয়ে উঠত না, কয়েকদিন পরে সেগুলি ফিরে আসত নিষ্পাপ শুভ্রতার রূপ পরিগ্রহ করে তাদের কুণ্ঠিত কুঞ্চিত অবয়ব উন্মোচিত করে কবিতার নাম থেকে কবির নাম পর্যন্ত কালিমার কোন রেখাই খুঁজে পাওয়া যেত না।

কবিতার বিষয়ে আমার কিন্তু কিছু দুর্বলতা ছিল। প্রত্যেক কবিতা আমি ভাল করে পড়ে দেখতাম এবং এমন অনেক কবিতা বিচিত্রায় প্রকাশিত করেছিলাম, যার রচয়িতার কিছুমাত্র পূর্বে পরিচয় ছিল না।

কিন্তু তাহলে কি হয়? প্রকাশ করবার মতো কবিতা যদি একটি পেতাম, ফেরৎ পাঠাবার মত পেতাম একশ'টি। সুতরাং মোটের উপর শত্রুতা বৃদ্ধিই হোত অনেক বেশি পরিমাণে। প্রত্যেক হতাশ-কবির মনে অনিবার্যভাবে আমি তার শত্রু বলে বিবেচিত হতাম। পথে, ঘাটে, ট্রামে এ'দের সাক্ষাৎ পেলেই চিনতে পারতাম। ট্রামে হয়ত চলেছি, যখনই দেখতাম, দূরে কোণে বসে কোন যুবক রোষপ্রদীপ্ত নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, তখনই বুঝতাম, তার কবিতা ফেরৎ দিয়েছি, আর সে মনে-মনে বলছে, ঐ চলেছে সেই পাষণ্ড, যে আমার কবিতা ফেরৎ দিয়েছে!

পূর্বজন্মের অনেক পাপ থাকলে সম্পাদক হয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তাই বারো বৎসর পরে বিচিত্রা যখন উঠে গিয়েছিল, মনে-মনে নাক-কান ম'লে সংকল্প করে-ছিলাম, জীবনে আর নয়: এই প্রথম ও এই শেষ।

কিন্তু হায়! তখন কি ভেবেছিলাম, নিয়তি নামে এক পরমা শক্তি আছে, যা আমাদের অনেক সংকল্পকেই চূর্ণ করে। তবে একমাত্র সান্ত্বনা, এবার কাব্যকলা-লক্ষ্মীর সুকুমার দেহে আঘাত হানবার সুযোগ নেই। (ক্রমশ)

সাহিত্যের আসরে খেলার কথা

শ্রীরমেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সম্প্রতি লণ্ডনের একখানা নামকরা খবরের কাগজের পাতায় হোয়াইট হার্টলেনে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল খেলার একটা বিবরণ পড়লুম। খেলাটা চলেছিল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে। লেখক রচনা শুরু করেছেন সেদিনকার আবহাওয়ার নিবিড় পরিচয় দিয়ে। দুর্যোগের পটভূমিকায় খেলার আনন্দ, মাতামাতি; সহজ স্বাভাবিক, সুস্থ, উজ্জ্বল প্রাণলীলা, লেখায় ফুটে উঠেছে সাহিত্যের আবেদন নিয়ে। সেদিনকার আকাশ থেকে আড়ভাবে নেমে-আসা বৃষ্টি জল, ছাই'এর রঙএ ছেয়ে-যাওয়া দিঙমণ্ডল, তাঁর বর্ণনায় পেয়েছে শীর্ষস্থান এবং তাতেই খেলার প্রকৃত রূপ ও মর্মকথা রচনার কলেবরে সরসমূর্তি নিয়ে ফুটে উঠেছে। গোড়াতেই তিনি লিখেছেনঃ

"A cold drizzle slanted across a wind-swollen sky, and the light was never more than ashen."

মনে পড়ে গেল নিজের জীবনের একদিনকার অভিজ্ঞতার কথা। অল্প বয়সেই খেলার আনন্দ ও আদর্শ আমার মনটাকে পেয়ে বসেছিল। এরই কুহক একদা আমার জীবনে অর্থকরী বিদ্যার ছাপ প্রতিহত, অবান্তর করে দিয়েছিল। বিদ্যার কল্যাণ কখনো নিঃস্ব হয় না; কিন্তু সে বিদ্যা আমার ব্যবহারিক জীবনের নির্দেশে প্রযুক্ত হল না। তারই সাহায্যে রোজগারের চেষ্টা, আমার মনে নিরন্তর সৃষ্টি করেছে আদর্শের বিপুল সংঘাত। আমার সত্তা, আদর্শ-বিচ্যুতির অকরুণ স্পর্শে নিজেকে নিরন্তর বোধ করেছে আর্ত, মলিন, পীড়িত, ক্লান্ত। তারপর খেলার আদর্শ একদিন আমার জীবিকার স্বল্পায়তনের সংস্থান করে দিল খবরের কাগজের পাতায় খেলার কথা লেখার কাজে। সেকালে সে পথ ধরে বড় একটা কেউ কুবেরের বাড়ীর সন্ধান পেত না। তাই ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে, চোখে আদর্শের মায়া-কাজল টেনে আমি অনায়াসেই ভুলতুম অভাব অনটনের কষ্ট। নিদারুণ অভিজ্ঞতার সংঘাতে সে আদর্শবাদ আমার মধ্যে বহুবার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে। তবু আদর্শের বিনাশ নাই। অনুরাগী জনকে হয়ত সে কখন কখন কষ্ট দেয়, কিন্তু কখনও ঠকায় না। অফুরন্ত প্রীতি ও গর্বের খোরাক জুগিয়ে সে তাকে অভাব ও উপেক্ষার মধ্যে জিয়িয়ে রাখে।

কর্মী ও তদারককারী

আমি যে কালের কথা বলছি, সেকালে শহরে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজে যা কিছু খেলার কথা প্রকাশিত হত। তারপর দিনের পর দিন খেলার বিবরণ, প্রসঙ্গ আলোচনা ছড়িয়ে পড়ল দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত খবরের কাগজের পাতায়। অদৃষ্টের দুর্জ্ঞেয় নির্দেশে একদিন ইংরেজি কাগজের মায়া কাটিয়ে আমি বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত একখানা খবরের কাগজের পাতায় খেলার আসর পাতলুম। সেখানে বেতনভুকের তালিকায়, স্বভাবের যুক্তিহীন ব্যবস্থায়, আছেন কর্মী ও দুর্ভাষী নিষ্ক্রিয় তদারককারী। শেষোক্ত ব্যক্তি যে উচ্চপদস্থ, তা তিনি ভালমতই জানিয়ে দিতেন কর্মীদের দুর্বিনীত ভাষায় সাবধান করিয়ে দিয়ে। এটাই হল বড়দের আভিজাত্যের পরিচয়, তা যোগ্যতা ও বেতন যাই হ'ক না কেন!

কিছুকাল হ'ল, কাজে লেগেছি। খেলার বিবরণ মনের মতন রচনা করে পাঠকদের জানাই। বেতন যাই হ'ক কাজটা পছন্দসই। এতে কষ্ট আছে প্রচুর, আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাহিত্য সেবার অলক্ষ্য আনন্দ। তারপর কোন এক অপরাহ্ণ বেলায় কাল বৈশাখীর আকস্মিক আবির্ভাব ঘটল শহর জুড়ে। এটা কিছু অভিনব ঘটনা নয়; কিন্তু তা হলেও ঝড় বাদলের খেলার অতি পুরাতন উদ্দাম, প্রচণ্ড আবেগ, মানুষের মনকে মাতায় চিরনূতন স্পর্শের অনুভূতি দিয়ে। কোন দিন বাদলের ধারা যদি বা ধেয়ে চলে আসে, যদি তার আবেগের বিপুল স্পর্শে নবীন ধান্য দুলে দুলে হয় বা সারা, সেত কিছু মানুষের নূতন অভি[illegible] নয়। তা নিয়ে রচনা লেখার কিই বা যু[illegible] যুক্ত কারণ থাকতে পারে? কিন্তু পুরাতন ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার নবতম স্প[illegible] নূতন করে করে তোলে মানুষের অন্ত[illegible] সঘন কল্পনাভারে পীড়িত। খেলার মা[illegible] সেদিনকার চেহারায় ফুটে উঠে নূতন র[illegible] নূতন কৌতুক, নূতন বিস্ময়, নূ[illegible] উদ্দীপনা, নূতন আনন্দ।

এমনি একটা অপরাহ্ণের প্রভাব আ[illegible] অক্ষম লেখনীর সাহায্যে আভাষে প্রক[illegible] পেয়েছিল সংবাদপত্রের খেলার পাতা[illegible] সেদিনকার খেলার বিবরণ প্রসঙ্গে ম[illegible] উচ্ছ্বাস যথাসম্ভব দমন করে, বার্তাজী[illegible] বিধিবন্ধ নিস্পৃহতা বাঁচিয়ে আমি গোড়ায় লিখেছিলুম—

"খেলা সুরু হইবার নিরূপিত সময়ের কি[illegible] পূর্বে প্রবল বারিপাতে চারিদিক ধূসর হই[illegible] গিয়াছিল এবং ইহারই সহিত মিলিয়া উন্মা[illegible] পবন আপনার পরাক্রম কৌতুকে গাছের ডা[illegible] ভাঙ্গিয়া তাঁবুর মধ্যকার লোকের মনে ভী[illegible] সঞ্চার করিয়া তাণ্ডবের সৃষ্টি করিয়াছিল।"

খবরের কাগজের পাতায় সত্যের সুখ[illegible] গম্ভীর চেহারার মর্যাদা যেন না ক্ষুণ্ণ হ[illegible] এই ছিল চেষ্টা। তাই ঠিক যেমনটা বলতে চেয়েছিলুম, তেমন ক'রে হয়নি বলা। কিন্তু দেখা গেল খেলার পাতার ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির মর্যাদা কিছু খেলো করাই হয়েছে। যথা-সময়েই তদারককারীর হুমকি এল—

"আপনারা সাধরণভাবে Report দিবেন। রিপোর্টে কবিত্ব করিবেন না। কারণ দৈনিক পত্রিকা কবিত্ব করিবার স্থান নহে। এবং কবিত্ব করিতে গিয়া যে পরিমাণ ভাষাগত ভুল থাকে, তাহাতে হাস্যোদ্রেক করে। যেমন আজ বারিপাতে ধূসর লেখা হইয়াছে। বারিপাতে ধূসরবর্ণ হয়, না ধূলায় ধূসর হয়। উন্মাদপবন, পরাক্রম-কৌতুকে, অবৈধের আশ্রয় জিনিষটা কি? খুব সাবধানে লিখিবেন—এরূপ বস্তু চলিবে না।"

বে-হিসেবীয়ানার ফল

বুঝলাম এটা আমার অবিমৃষ্যকারিতার পরিণাম। হয়ত অন্য সময় হ'লে এটাকে মোটেই গায়ে মাখতুম না। কিন্তু কি জানি তখন কোন গ্রহের প্রভাব আমার মনটাকে পেয়ে বসেছিল। স্থির করলুম, ভাষার পণ্ডিতদের খুঁজে বের করতে হবে; নিজের ভুল, স্পর্ধা ও বেহিসেবিয়ানার পরিমাপ ঠিকমত জেনে নিতে হবে। খবর নিয়ে জানলুম শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকালিদাস রায় কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষার প্রধান পরীক্ষক। এ'দের সঙ্গে আমার মোটেই আলাপ ছিল না, আজও আমি এ'দের সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমার স্বভাব বড়দের সঙ্গে গায়ে পড়ে প্রয়োজনের অধিক আলাপ জমিয়ে নিজেকে খাটো করতে চাই না। তাতেই শ্রদ্ধা থাকে অম্লান, নিষ্কলুষ। রূপ, রস, বর্ণ ও গন্ধে-ভরা পৃথিবীর অফুরন্ত আনন্দসম্ভার। তা নিয়ে ইচ্ছে করলে মানুষ নিজেকে আনন্দে ভরপুর করে তুলতে পারে। পুরাতন পৃথিবীর নিত্য নব বিবর্তনের পথে অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার; গুণী ও সাহিত্যিক তাই পরিবেষণ করে নিজেদের ও আমাদের জ্ঞান ও প্রীতির প্রসার বাড়িয়ে চলেছেন। তাই হয়ত ভালভাবে বেঁচে থাকবার পক্ষে যথেষ্ট।

কালিদাসবাবু ও সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম। লেখাটা দেখালুম ও বল্লুম, আমাদের মধ্যে তর্ক উঠেছে, একদল বলছেন লেখাটা মন্দ নয়, অপর পক্ষ বলছেন এটার ভাষাগত ভুল এত বেশি যে, তাতে হাস্যোদ্রেক করে। "মার্কামারা" জায়গাগুলো দেখালুম; বল্লুম এসেছি মীমাংসার জন্য; সর্বদিক থেকে বিচার করে লিখিত মত দেবেন। প্রথমেই কালিদাসবাবু। তিনি মুখে খানিকটা আলোচনা করে 'রায়' লিখে দিলেন—

"ধুলায়-ধূসরই প্রচলিত—তাই বলিয়া বারিপাতে ধূসর হয় না তাহা নয়। প্রকৃত রং যদি ধূসরই হয় তবে বলিতে দোষ কি?

"পরাক্রম-কৌতুকে সমাসবন্ধ পদ। ইহাকে ভাঙিয়া বলিলে পরাক্রম প্রকাশের কৌতুকে বলিতে হয়। এইরূপ সমাসবন্ধ পদ মধ্যপদ লোপ করিয়া আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি।

"উন্মাদপবন না বলিয়া উন্মত্ত বলিলেই ভাল হইত। অবৈধের আশ্রয় না বলিয়া অবৈধ উপায়ের আশ্রয় বলিলে আরো ভাল হইত। যে adjectiveকে Noun হিসাবে ব্যবহার করা যে চলে না তাহা নয়। Reportটার ভাষা আমার মন্দ লাগিল না।"

এর পর বালিগঞ্জ, হিন্দুস্থান পার্কে স্টেজ বাড়ীতে ছুটলুম। সুনীতিবাবু আমাকে দেখে ভাবলেন আমি বুঝি দীক্ষার্থী। লেখাটা দেখালুম ও তর্কের কথাটা বলে মীমাংসা চাইলুম। তিনি আমার উধৃত অংশটা হাতে নিয়ে উপরে উঠে গেলেন। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে তিনি নেমে এসে তার লিখিত মতামত আমার হাতে দিলেন। তখনও তাঁর স্নানাহার হয়নি, তাই লজ্জা পেলুম। লেখাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। প্রকাশিত রচনার আলোচ্য অংশ উধৃত করে তিনি লিখেছেন—

"উপরের বর্ণনাটুকুতে আমার মনে হয় কোনও দোষ নাই; মোটের উপর বর্ণনাটুকুকে সুলিখিতই বলিতে হয়। 'প্রবল বারিপাতে চারিদিক ধূসর হইয়া গিয়াছিল'—এই অংশটুকুতে কাহারও আপত্তি উঠিতে পারে। আমরা মেঘের রঙে এবং মেঘের শ্যামলিমায় চারিদিক আঁধার হইয়া যাওয়া সাধারণতঃ লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু জোর বৃষ্টিতে, জলের ধারায় এবং শীকরে চারিদিক যখন ধোঁয়াটে হইয়া যায়, কোয়াসায় ঢাকা বলিয়া মনে হয় তখনকার দিঙ-মণ্ডলের বর্ণনায় 'ধূসর' শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 'ধূলায় ধূসর' হয়—জলের আর কোয়াসার দ্বারা দিঙমণ্ডলে যে রঙের সমাবেশ হয় তাহাকে 'ধূসর' বলা যায়—এই শব্দটি ইংরেজীর 'grey' শব্দের সঙ্গে সমার্থক—'পাণ্ডুবর্ণ, পাংশুবর্ণ' ইত্যাদি শব্দ অপেক্ষা 'ধূসর' শব্দ বোধ হয় অধিক ভাবোদ্যোতক, সরল ত বটেই। প্রকৃতির অনেক মূর্তি আমাদের চোখে ধরা দেয় না—ইংরেজেরা যাহা দেখে আমরা তাহা দেখি না, আবার আমরা যাহা দেখি তাহা ইংরেজেরা দেখে না। বৃষ্টির জলের দ্বারায় দিঙমণ্ডল ধোঁয়াটে হইয়া যখন আমাদের চোখের সামনে দেখা দেয়, তখন ইংরেজীর অনুবাদের মতন শুনাইলেও বাঙলায় 'প্রবল বারিপাতে চারিদিক ধূসর' বলিলে ক্ষতি কি? এইরূপেই তো দেখিবার ও দেখাইবার শক্তি আসে।"

মামলা এর বেশি আর গড়াল না। এখানেই এ ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটল। এ নিয়ে আমার আর আগাবার প্রবৃত্তি হল না। এতকাল এই দুটো মূল্যবান কাগজের টুকরো নানা বাজে ছেঁড়া কাগজের গাদায় ছিল। আজ "সাহিত্যের আসরে খেলার স্থান" প্রসঙ্গে এই দুটোর উল্লেখ প্রথম করছি—উল্লেখ করছি এই দেখে, লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার নামকরা লেখক খেলার বিবরণ প্রসঙ্গে প্রথমেই প্রকৃতির চেহারা বর্ণনা করবার লোভ সামলাতে পারেন নি। সেই বাদলাদিন, আলোর সেই ছাই-এর রঙ আর তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি 'ashen' শব্দ ব্যবহার করেছেন। grey শব্দের চেয়েও যেন এ শব্দটা আরও এক ধাপ আগিয়ে গেছে। Ashen, ছাই রঙ, ধূসর—তফাৎটা কতখানি?

মানব জীবনের মাধুরী

খেলা যদি মানবজীবনের অঙ্গীভূত বস্তু হয়; তারও মধ্যে যদি থাকে জীবন-লীলার বৈচিত্র-সমাবেশ; আশা, নিরাশা, উচ্ছ্বাস, উদ্দীপনার বিবিধ ছন্দ; থাকে দেহ মনের স্ফূর্তি; দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী; সত্যের মহান সুদৃঢ় স্পর্শ; আদর্শের প্রীতি ও প্রেরণা; থাকে মানবজীবনের অপরিসীম মাধুরী, তাহলে সেকি সাহিত্যে উপেক্ষিত হতে পারে?

বিলাতের বিখ্যাত কেমসলি পত্রিকা-সমূহের কর্তৃপক্ষদিগের প্রকাশিত কেতাবে এ যুগের সংবাদপত্র সম্পর্কে সর্ববিধ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ কাল ও সেকাল কিছুই বাদ যায় নি। ছাপাখানার যান্ত্রিক বিবর্তন, আলোকচিত্র মুদ্রণ, রঙ্গীন ছাপা, হরপ নির্বাচন, সংবাদপত্রের প্রসার, দ্রুত মুদ্রণ, বিশেষজ্ঞদের শিক্ষা, এতে সব কিছুই আলোচিত হয়েছে। খেলার বিবরণ লেখাও বাদ যায় নি। প্রবন্ধকার বর্তমান অনুসৃত রীতির আলোচনা করে নানা কথা লিখেছেন। সংবাদপত্রের বিপুল প্রচারের ফলে, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে খেলার কথা স্ফীত, অতিকায় দানবের আকার ধারণ করেছে। খবরের কাগজের শতকরা কুড়ি ভাগ আজ খেলার বিবরণে ঠাসা। আয়তনের সঙ্গে সমান তাল রেখে এর ভাষার মানও আগিয়ে চলেছে।

("Its literary quality has marched forward in equal step.")

সাহিত্যের দিকপাল যাঁরা, খেলাকে কখনও তাঁরা অবজ্ঞার চোখে দেখেননি। একদিনকার একটী মুষ্টিযুদ্ধকে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন হ্যাজলিট আপন প্রতিভার তীব্র আলোকসম্পাতে। 'টম ব্রাউনস' স্কুল ডেজ' পুস্তকে রাগবি খেলার বর্ণনার উপর কতখানি তাঁর প্রসিদ্ধি সংস্থাপিত, তা জানলে হয়ত টমাস হিউজ কলঙ্কের ভয়ে আঁৎকে উঠবেন।

টেলিভিশন ও রেডিও সাধারণ খবরের মূল্য হ্রাস যদি বা ঘটায়, এগুলো খেলার

বিবরণে কখনও কোনরূপ ক্ষতি করতে পারবে না। খেলার বিবরণীর পাঠকের সংখ্যা আজ অগণিত। এই শ্রেণীর পাঠকেরা অনেকেই হয়ত এককালে ছিল খেলোয়াড়; বিশেষজ্ঞের জ্ঞান এদেরও বড় কম নয়। সদ্য-দেখা কোন খেলার বিবরণে, লেখকের মত এরা মনে মনে যাচাই করতে ভালবাসে; খুঁটিনাটি সব কথাই বিচার করে; নৈপুণ্যের ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক, বিচক্ষণ বিশ্লেষণে এরা আনন্দ পায়; বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গীর আবেদন এদের কাছে আনে সাহিত্যের মাধুরী।

সেকালে কাগজের পাতায় যখন স্থানাভাবের ভয় ছিল না তখন খেলার বিবরণ লেখা হ'ত একরাশ তথ্যহীন ঘটনার সমাবেশ করে; বিশেষ কষ্ট করে প্রত্যেকটী বলের গতিবিধি লেখা হত, প্রত্যেকটী দৌড়, খেলার সব কিছু ধারা, ব্যাটস্‌ম্যানের প্রত্যেকটী মার, ঘড়ির সেকেণ্ডের হিসাবে খেলার প্রত্যেকটী চাল, স্কোর বইয়ের উপর ভিত্তিস্থাপন করে রচিত হ'ত খেলার কাহিনী।

চরিত্র বিশ্লেষণ

আজ সে সবের জায়গায় জুড়ে বসেছে খেলায় চরিত্রের সুনিপুণ বিশ্লেষণ, মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, সাহিত্যের সম্ভার। আজ ক্রিকেট, ম্যাচ, বা কাপ ফাইন্যাল নিয়ে সাহিত্য রচনা চলে। বার্নার্ড ডারউন, নেভিল কার্ডাস প্রমুখ খেলার সমালোচকগণ সাহিত্যিকের কলমে জুড়ে দিয়েছেন খেলার প্রকৃত জ্ঞানের অন্তর্নিহিত আবেগ। এ'দের লেখার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে খানিকটা বর্ণনা, খানিকটা জ্ঞানগর্ভ সমালোচনা দিয়ে খেলার বিবরণ লেখা হয়ে থাকে। এই নবরীতির রচনা আজ পাঠকের কাছে সমাদৃত।

(Most of us recall the early sports reporter who, unhampered by considerations of space, labourously chronicled every movement of the play, every run, every ball, every batsman's stroke—reporting by the stop watch, or the score-book, to produce a mass of unrevealing detail. Yet there can be literature in cricket match or the Cup Final. Men like Bernard Darwin, Neville Cardus and others added to writer's pens the enthusiasm of real sporting knowledge; and it was from their example that there grew up the medium of part description, part informed criticism which set a new and acceptable standard of sports reporting.)

"কল্ মি ম্যাডাম"—আমাকে মহিলা বলে ডেকো। ষোল বছর বয়সে মরিন কনোলি আমেরিকার জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় মেয়েদের সিঙ্গলস-এর খেলায় নামকরা খেলোয়াড়দের হারিয়ে প্রাধান্য লাভ করে। ছবিতে রয়েছে মরিন (বাম দিকে) ও শার্লি ফ্লাই। ফাইন্যালের খেলা এই দুজনের মধ্যে হয়। একমাত্র ফ্লাই-ই প্রতিযোগিতায় একটি মাত্র সেট মরিনের কাছ থেকে দখল করতে পারে। ফাইন্যাল খেলায় মরিন জেতে ৬-৩, ১-৬, ৬-৪ মাত্রায়।

মাত্র ষোল বছর বয়স—ফাইন্যাল খেলার পূর্ব রাত্রে ব্রডওয়ের "কল মি ম্যাডাম" দেখতে গিয়েছিল।

"ছোট্ট মো", স্যান ডিয়াগোর গৃহস্থ ঘরের দুলারী মেয়ে ১৬ বছর বয়স, পুরো নাম কুমারী মরিন কনোলি, আমেরিকার জাতীয় মহিলাদের খেলায় প্রধানা, বাড়ীতে বিধবা মায়ের কাজ করে, বাসন মাজে, টেনিস খেলার শিক্ষয়িত্রী এলিনোর টেনান্টের সঙ্গে আলাপ জমায়, পাড়ার ছোটদের জন্য মুখে হাসি লেগেই আছে। "......ছেলে বন্ধু পাকড়ান আমার বিশেষ একটা ঝোঁক......বলে রাখলুম, প্রেমে পড়লে জানাব!" তার এই কথাগুলো টেনিস সম্রাজ্ঞীর চেয়েও বেশি মানায় কৌতুকময়ী কুমারীর মুখে।

"এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ,
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।"
[সু]ইডেনের এক নম্বর খেলোয়াড় লেনার্ট বার্গেলিনের অবস্থাটাও অনেকটা ঐভাবের হয়ে [উ]ঠেছে। গ্রে হাউন্ড কুকুর ছোট মেয়েটির সান্নিধ্য পছন্দ করছে না,—লেনার্ট এদের মিল করিয়ে [দি]চ্ছে। এদের কাঁধে আদর করে হাত রেখে বলছেঃ "ছোটদের আমি ভালবাসি যদি তারা নিজের [নি]জের জায়গায় থাকে—আমার ঝুড়িটা ত তাদের জায়গা নয়।" এই মিল করান'র কথায় মনে পড়ে—
"পশুশিশু, নরশিশু, দিদি মাঝে পড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয় ডোরে॥"

আজ খেলা সম্পর্কিত রচনা লেখা হয় [নূ]তন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। নির্ঝরের [স্বপ্ন]ভঙ্গের মত, তাতে দেখা দিয়েছে নূতন আবেগ, নূতন প্রাণ, নূতন উন্মাদনা। প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য তারই মধ্যে প্রতিফলিত। খেলার কথায় আজ সাহিত্যের পাতা ভরে উঠে; লেখকের সুনিপুণ কলমের ডগায়, টাইপ রাইটারের অক্ষরে অক্ষরে ঝরে পড়ে মানব মনের মর্মকথা; আলো, বাতাস, মেঘ, জড় জগতের অস্ফুট বাণীর রেশ।

'দুলারী' মেয়ে

তাই সান্ ডিয়াগোর গৃহস্থ ঘরের দুলারী মেয়ে, মরিন কনোলি—'ছোট্ট মো' —মাত্র ষোল বছর বয়সে আমেরিকার মহিলাদের জাতীয় টেনিস প্রাধান্য জিতে, গৌরব মুকুট পরে, পরম কৌতুকভরে লেখকের রচনায় বলতে পারে—"আমি টেনিস খেলি; টেনিস আমি ভালবাসি; বাড়ীতে বাসন মাজি। সিনেমা দেখতে যাই, মায়ের কাজ করে দি—আর ছেলে বন্ধু পাকড়াই, ছোট্ট ডায়েরীতে টুকে রাখি, কার সঙ্গে কবে, কোথায় দেখা করবার কথা আছে। যদি আমি কারো প্রেমে পড়ি, বলে রাখলুম, তাও জানাব।"

তাই, হ্যারল্ড য়্যাব্রাহাম দৌড় ঝাঁপ প্রতিযোগিতার কথা লিখতে গিয়ে গোড়াতেই লিখে বসলেন—"আজ মাঝে মাঝে আবহাওয়া যে রকম হোয়ে উঠছিল, তাতে দৌড়ঝাঁপ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে খোলা জায়গায় 'কিংলিয়ারে'র অভিনয়ই ভাল চলত?

("In weather at times much more suited to an outdoor performance of King Lear than to atheletics....")

এই সব রসাত্মক বাক্য থেকেই হয়তো সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভব হয়। এ গুলো যে খেলার 'সাধারণভাবে' লিখিত রিপোর্ট নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে লেখাগুলোও কিছু সাধারণ লোকের নয়। তাই বলা যেতে পারে, "যার কাজ তারে সাজে; অন্য লোকে লাঠি বাজে।" আবার সাহিত্যের সঙ্কটের কথাও ভুললে চলবে না—

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
মম শিরসি, মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ।"

৮

সকালবেলা চা খেয়ে অতুল এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়ছিল, বাসন্তী রেশন-কার্ড আর রেশন-ব্যাগগুলি হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি এসে পথ আগলে দাঁড়ালেন, 'কোথায় যাচ্ছিস অতুল?'

অতুল বলল, 'আমার কাজ আছে মা।'

বাসন্তী কঠিন ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমার কাজের মধ্যে তো সারা শহর টো টো করে ঘুরে বেড়ানো আর সব বদ জায়গায় আড্ডা দেওয়া। সে কাজ পরে করলেও চলবে। আজ রেশন না নিয়ে এলে এবেলা হাঁড়ি চড়বে না।'

অতুল বলল, 'না চড়ে তো আমি কি করব। আমি তো প্রত্যেক সপ্তাহেই রেশন আনি। আজ আর কাউকে বলো না।'

বাসন্তী বললেন, 'আর আবার কাকে বলব। মণীন্দ্র বাজার করে দিয়ে ওঁরই কি একটা দরকারী কাজে বেরিয়েছে। শঙ্কু-বঙ্কু পড়ছে, কে আনবে রেশন।'

অতুল বলল, 'কেন বড়বাবু তো তাঁর ঘরে বসে বসে কাগজ পড়ছেন, আর গল্প করছেন। তাঁকে বলো না।'

বাসন্তী বললেন, 'সে কোনদিন এসব এনেছে যে, আজ আনবে! আর কথায় কথায় তুই নান্তুর সঙ্গে তুলনা করিসনে অতুল। তোর মুখে তুলনাটা শোভা পায় না।'

মা'র দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'শোভা পায় না?'

বাসন্তী কর্কশ কণ্ঠে বললেন, 'পায়ই তো না; হাজারবার পায় না। পায় কি না পায়, তা তুই বুঝিসনে? বেয়াদপ বাঁদর ছেলে কোথাকার, আবার আমাকে চোখ রাঙাচ্ছিস, লজ্জা করে না তোর!'

বাড়ির আর সব ছেলেমেয়েরা অনেকেই ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। অতুলের মনে হলো, সবাই তার এই অপমানে মজা দেখছে।

রাগে সে-ও চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি অমন যখন তখন সকলের সামনে আমাকে যা তা বলে গালাগাল কোরো না মা, করলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।'

বাসন্তী বললেন, 'গালাগাল করব না! একশবার করব। গালাগালের কাজ করলেই গালাগাল খাবি।'

অবনীমোহন নেমে এলেন ওপর থেকে, 'কি ব্যাপার! সকাল থেকেই এমন চেঁচামেচি করছ কেন?'

বাসন্তী বললেন, 'করছি কি আর সাধে? রেশন আনা নিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকে এই হাঙ্গামা পোয়াতে হয়, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ছিঁড়ে ফেলতে হয়। আমি আর পারব না। যেমন করে পারো রেশন আনাও।'

অবনীমোহন ছেলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন, 'অতুল রেশন নিয়ে এসো। এ নিয়ে আর যেন কোনদিন কোন গোলমাল শুনতে না হয়।'

অতুল বলল, 'আমি পারব না, আমার কাজ আছে। দরকারী কাজ আছে।'

অবনীমোহন ছেলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এ কাজ তার চেয়ে অনেক বেশী দরকারী।'

অতুল উদ্ধতভাবে বলল, 'আমার কি দরকার না দরকার, তা আপনি কি করে বুঝবেন?'

এতক্ষণে অবনীমোহনেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বললেন, 'না, তা আমি বুঝিনে, বুঝতে চাইওনে। সংসারের দরকার যে না বুঝবে, এ সংসারে তার জায়গা নেই, এ সংসারে তার খাওয়া-পরা জুটবে না, আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

অবনীমোহন ওপরে চলে গেলেন।

তাঁকে এমন অসহিষ্ণু হ'তে সহজে দেখা যায় নি। কিন্তু ইদানীং তিনিও বড় বিরক্ত হয়ে পড়ছেন। আর্থিক কৃচ্ছ্রতা যত বাড়ছে। সকলেরই তত বেশী করে মেজাজ বিগড়াচ্ছে, অবনীমোহনও বাদ যাচ্ছেন না।

স্বামী চলে গেলে বাসন্তী ছেলের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'দেখছিস তো উনি পর্যন্ত কি রকম রেগে গেছেন। যা ভালোয় ভালোয় রেশনটা এনে দিয়ে যে কাজ থাকে, তুই করগে যা।'

কিন্তু অতুল আর কোন কথা না বলে দোরের দিকে এগুতে লাগল। এতখানি অবজ্ঞা বাসন্তীর সহ্য হোল না, তিনি সদর পর্যন্ত এগিয়ে এসে বললেন, 'এ কিন্তু ভালো হোল না অতুল, মোটেই ভালো হোল না। তোমার বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে। আজ আর খাওয়া জুটবে না এখানে বলে রাখছি।'

যেতে যেতে অতুল ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল, 'আচ্ছা আচ্ছা। না জোটে তো নাই জুটবে। না খেয়ে যদি উপোস করেও মরি, তোমাদের বাড়িতে আর পাত পাততে আসব না। তেমন কুকুর আমি নই।' অতুল উত্তেজিত-ভাবে গলির ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল। পথে নেমে একটা বিড়ি ধরিয়ে মনে মনে বলল, 'দূর শালার সংসার। মা বল, বাবা বল, ভাই বল, বোন বল, কেউ আপন নয় এখানে। সকলের সঙ্গে শুধু টাকার সম্পর্ক। টাকা থাকলে পরও আপন, না থাকলে আপনও পর।'

আজ কিন্তু সত্যিই দরকারী কাজ ছিল অতুলের। আর্মেনিয়ান ঘাটে স্টীমার কোম্পানীতে কাজ করে সুরেন দাস। এক সময় একসঙ্গে পড়ত। কথায় কথায় সেই সেদিন বলেছিল ভোরে উঠে, আসিস আমার শোভাবাজারের বাসায়। সঙ্গে করে মেসো-মশাইর ওখানে নিয়ে যাব।

সুরেনের মেসোমশাই অফিসের হেড ক্লার্ক।

এর আগেও চাকরি দু একবার যে অতুল না করেছে তা নয়, অফিসে কেরাণীর কাজ জোটেনি। কারখানা ফ্যাক্টরীতে কাজ জুটে-

ছিল। কিন্তু জুটলে কি হবে, বেশি দিন কোন জায়গায় মন লাগিয়ে কাজ করতে পারে নি। ওপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করে কোনবার চাকরি ছেড়েছে, কোনবার চাকরি গেছে। এককেবার যে ধরণের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে ফের আর কোন কাজে ওর ইচ্ছে হয় নি। বীতস্পৃহাটা কাটলে যখন ফের চেষ্টা শুরু করেছে, তখন আর শীগ্‌গির কিছু জোটেনি। বাড়িতে ইচ্ছে করেই এবারকার চেষ্টা চরিত্রের কথাটা কাউকে জানায়নি অতুল। তার ধারণা জানালে কেউ বিশ্বাস করবে না। সে যে কোন দিন কোন কিছু করবে কিংবা করতে পারবে এ বিশ্বাস বাড়ির ছেলে বুড়ো কারোরই আর নেই তার ওপর। তাই আগে থেকেই কথাটা ফাঁস করবার ইচ্ছে হয়নি অতুলের। ভেবেছে কোন একটা কাজকর্মে ঢুকে মাইনের টাকাটা মার হাতে তুলে দিয়ে কথাটা বলবে। তার আগে কাউকে কিছু জানাবে না। কিন্তু তার মন্ত্রগুপ্তির ফল একেবারে উল্টো হয়ে গেল। মা বকলেন, বাবা বকলেন, দুজনেই খাওয়ার খোঁটা দিলেন। না, মাসে মাসে রোজগার ক'রে টাকা না দেওয়া পর্যন্ত বাড়িতে আর যাবে না অতুল। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক এই শেষ। ঘুরে ঘুরে শোভাবাজারে আনন্দ খাঁ লেনে সুরেনের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হোল অতুল। সুরেন তখন সবে বেরোচ্ছে। খেয়ে-দেয়ে পান মুখে দিয়েছে একটা। সিগারেটটাও ধরিয়েছে।

অতুলকে দেখে বলল, 'কি রে, কি খবর?'

অতুল বলল, 'খবর তো তোরই কাছে।'

সুরেন বলল, 'হ্যাঁ, চল কিন্তু বড় দেরি করে ফেললি। মেসোমশাইর সঙ্গে এখন আর দেখা হবে না। তা ছাড়া আমাকেও আজ একটু সকাল সকাল বেরুতে হচ্ছে। তুই বেশ আছিস ভাই। চাকরির যা মজা। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি।'

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে ট্রাম লাইন পর্যন্ত এল।

অতুল বলল, 'তোর মেসোমশাইর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি বলেছিল, চল না তাদের অফিসে। সেখানেই দেখা সাক্ষাৎ করব।'

সুরেন একটু এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'না না না। অফিসে এখন গিয়ে লাভ নেই। মোসোমশাইর সঙ্গে আমি তোর সম্বন্ধে আলাপ একটু করেও রেখেছি। কিন্তু এখন তো কিছু খালি নেই। খালি হলে তোকে খবর দেব।'

অতুল অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'তাহলে খেলার মাঠে' তুই সেদিন নেহাৎই একটা বাজে কথা বলেছিলি। চাল মেরেছিলি বল।'

সুরেন মুহূর্তকাল বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তুই বড় অভদ্র হয়েছিস অতুল। তোর সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল। আচ্ছা আসিস আর এক দিন।'

বলতে বলতে একটা চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠল সুরেন তার আর দাঁড়াবার সময় নেই।

বেলা বারটা পর্যন্ত এখানে ওখানে টো টো করে ঘুরে বেড়াল অতুল। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। পকেটে মাত্র আনা দুই পয়সা ছিল সম্বল। চা আর বিড়ি খেয়ে তা শেষ করেছে। বার বার অতুলের ইচ্ছে করতে লাগল বাড়িতে ফিরে যায়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হয় নি। মা নিশ্চয়ই তার জন্যে ভাত বেড়ে রেখেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোল না। যে প্রতিজ্ঞা সে করে এসেছে তা আর সে ভাঙতে পারে না। বিশেষ করে বাবা ও কথা বলবার পর আজই এ বেলা গিয়ে আর খেতে বসা যায় না, রান্নাঘরে। তাহলে কারো কাছেই আর তার মুখ থাকবে না। তার চেয়ে উপোস করা অনেক ভালো।

কিন্তু পেটটা বড় বেয়াড়া। মনের এত কঠোর সংকল্পকে কিছুতেই যেন সে আর রাখতে দেবে না। পা জোড়া নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ির দিকে এগুতো লাগল অতুলের। আরপুলি লেন দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে মোড় ফিরতে গিয়ে সে ফের থমকে দাঁড়াল। আর একবার মনে পড়ল সকালের অপমানের কথা। ঘুরে দাঁড়াল অতুল। না, যাওয়া যায় না কিছুতেই যাওয়া যায় না।

কাছেই মধু গুপ্ত লেনে গোবিন্দ দে'র বাড়ি। অতুল ঠিক করল তাদের বাইরের ঘরে দুপুর বেলায় কোন রকমে শুয়ে কাটিয়ে দেবে। রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে ক্ষিদেটা আরো বাড়ে। তার চেয়ে চুপ চাপ শুয়ে থাকলে খানিকক্ষণ বোধহয় স্থির থাকা যাবে। তারপর বিকেলে যা একটা ব্যবস্থা হয় করে নেবে।

খানিকটা এগিয়ে পাটকেলে রঙের ছোট মত দোতলা একটা পুরোন বাড়ির সামনে এসে কড়া নাড়ল অতুল, সঙ্গে সঙ্গে ডাকল। 'গোবিন্দ, ও গোবিন্দ'। কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ মিলল না। তারপর একটু বাদে দরজার হুড়কো খোলার শব্দ হোল। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের শ্যামবর্ণা স্বাস্থ্যবতী একটি তরুণী এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। পরনে খয়েরী রঙের শাড়ি। সদ্য স্নান সেরে এসেছে। একরাশ ভিজে চুল পিঠময় ছড়ানো। সিঁথির ফাঁকে সিঁদুরের দাগ। গোবিন্দের বড়দি রমা।

অতুলকে দেখে একটু হেসে বলল, 'ও তুমি। তা এই দুপুরের সময় কি মনে করে অতুল। এ কি চেহারা হয়েছে। এখনো বুঝি নাওয়া খাওয়া কিছু হয় নি?'

অতুল এত সব কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'গোবিন্দ অফিসে বেরিয়ে গেছে নাকি রমাদি?'

রমা বলল, 'হ্যাঁ, সে তো সেই সকাল সাড়ে ন'টায় বেরিয়েছে। ভিতরে আসবে?'

অতুল একটু ইতস্তত করে বলল, 'হ্যাঁ, অনেক ঘোরাঘুরি হোল। শরীরটা ভালো লাগছিল না। ভাবলাম একটু জিরিয়ে যাই।'

রমা একটুকাল তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা, ভিতরে এসো।'

বাইরের ঘরে অতুলদের বাড়ির মতই এক খানা তক্তপোষ পাতা। এক ধারে গোবিন্দের বিছানাটা গুটানো রয়েছে। খুব বেশি রাত হয়ে গেলে বন্ধুর সঙ্গে অনেক দিন এই বাড়িতেই চলে আসে অতুল। গোবিন্দের বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দেয়।

আজও কোন কথা না বলে বন্ধুর বিছানাটা পেতে নিতে যাচ্ছে অতুল, রমা বাধা দিয়ে বলল, 'ওকি হচ্ছে।'

অতুল বলল, 'শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নিই রমাদি। তুমি তোমার কাজে যাও।'

গোবিন্দের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই এ বাসায় অতুলের যাতায়াত আছে। শুধু যাতায়াত নয়, বাসার প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গেই বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে অতুলের। এ প্রায় তার নিজেদের বাসার মতই। অতুলের মাকে সে মাসীমা বলে ডাকে, বাবাকে মেসোমশাই।

অতুলের কথার জবাবে রমা বলল, 'আমার কাজের কথা তোমাকে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না অতুল। শুয়ে পড়লে চলবে না, ওঠো। যা বলছি শোন।'

রমার গলায় আদেশের সুর।

অতুল রমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি বলছ।'

রমা বলল, 'এস, চান করে খেয়ে নেবে।'

অতুল বলল, 'বারে, আমার তো কখন খাওয়া হয়ে গেছে।'

রমা বলল, 'হুঁ, খাওয়া যা হয়েছে তা মুখ দেখেই টের পাচ্ছি। আর দিক না করে চলে এসো। যদি ভালোয় ভালোয় না আস, হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাব বলে দিলুম।

'অতুল কৌতুক বোধ করে বলল, 'ঈস, খুব দেখি শক্তির বড়াই করছ। নাও তো হিড় হিড় করে টেনে কেমন গায়ের জোর দেখি তোমার।'

রমা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হোল না, গম্ভীরভাবে বলল, 'হয়েছে। এসো এবার।'

রমার বলবার ভঙ্গিতে ফের আদেশের সুর ফুটে উঠল। অতুল একটুকাল তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়াল। সদর বন্ধ করে ভিতরের দিকে চলে গেল রমা। অতুল গেল পিছনে পিছনে।

তেলের বাটি আর গামছা অতুলকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও। চৌবাচ্চায় জল রয়েছে। তাড়াতাড়ি দু ঘটি ঢেলে দিয়ে চলে এসো। বাড়া ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

অতুল আর বেশি ভদ্রতা করল না। স্নান সেরে শুকিয়ে যাওয়া গোবিন্দের লুঙ্গি পরে রান্না ঘরে পিঁড়ি পেতে বসল। ভ তরকারীর থালাটা ওর সামনে এগিয়ে দি রমা।

অতুল খেতে খেতে বলল, 'আর সবাই হয়ে গেছে? তুমি খেয়েছ? মাসীমা, খে নিয়েছেন?'

রমা বলল, 'মার আজ বারের উপোস সন্ধ্যা টন্ধ্যা করে ওপরে ঘুমুচ্ছেন।'

অতুল বলল, 'আর তুমি?'

রমা বলল, 'আমার খবরে তোমার বি দরকার।' অতুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'ঈশ বড় ভুল হয়ে গেল রমাদি। তোমার নিজে
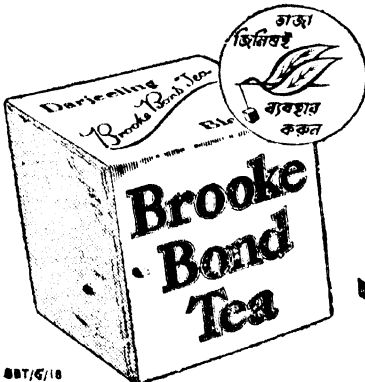
ভাতই বোধহয় আমাকে দিয়ে দিয়েছ। নিশ্চয়ই তাই।'

রমা কোন জবাব দিল না।

অতুল বলল, 'ইয়ে এক কাজ কর। তুমি এই থালা থেকে আলাদা করে তোমার জন্যে কিছু ভাত তুলে নাও। আমার সব লাগবে না। নাও আর একটা থালা এগিয়ে নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি।'

ভারি একটা আন্তরিক ব্যগ্রতা ফুটে উঠল অতুলের গলায়।

তার দিকে তাকিয়ে রমা বলল, 'তোমার স্পর্ধা তো কম নয় অতুল। আমি জাতে বামুন, বয়সে বড়। তুমি আমাকে তোমার পাতের প্রসাদ দিতে চাইছ? আমি কি গোবিন্দ নাকি যে তোমার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খাব?'

বেশ একটু তিরস্কারের সুর রমার গলায়।

অতুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'বড় ভুল হয়ে গেছে রমাদি।'

অতুলের অনুশোচনায় এবার একটু হাসল রমা। কোনটা ভুল হয়েছে অতুল? আমার ভাগের ভাত খাওয়াটা না তোমার সঙ্গে খেতে ডাকাটা?'

অতুল বলল, 'সঙ্গে খেতে তো আমি ভাবিনি।'

রমা বলল, 'প্রসাদ খেতে ডেকেছ। ঈস, কি সম্মান।'

রমা হেঁসেলের কাজ সারতে লাগল।

অতুলের খেতে বেশি সময় লাগে না। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে উঠে মুখ ধুতে গেল। ধুয়ে এসে বলল, 'আমি চললুম। তুমি এবার মন দিয়ে রান্নাঘর গুছাও।'

রমা বলল, 'এখনি যাবে।?'

অতুল বলল, 'আবার কি, খাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক, খাওয়া তো হয়েই গেল।'

বলে অতুল আর দেরি করল না।

মিনিট দশেক বাদে রান্নাঘরের শিকল টেনে রমা বেরিয়ে আসছে অতুল এসে সামনে দাঁড়াল। ওর এক হাতে দইয়ের ভাঁড়। আর এক হাতে মুড়কি আর মিষ্টির ঠোঙা।

রমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও আবার কি, পয়সা পেলে কোথায়?'

অতুল বলল, পয়সা আর কোথায় পাব। পরাণের কাছ থেকে বাকিতে নিয়ে এলুম। বললুম চাকরি বাকরি পেলে শোধ দেব। সে কটা দিন একটু সবুর করে থেক।'

রমা বলল, 'কিন্তু এই দুপুর বেলায় ওসব কে খাবে?'

অতুল বলল, 'কেন, তোমারও কি বারের উপোস নাকি? খেয়ে দেখ, ফলারটা ভাতের চেয়ে নেহাৎ খারাপ হবে না।'

রমা বলল, 'কিন্তু বাকিতে কেন আনতে গেলে। আমার কাছেই তো পয়সা ছিল।'

অতুল একথার কোন জবাব না দিয়ে বাইরের ঘরে চলে এল।

খানিক বাদে রমা এসে ঘরে ঢুকে বলল, 'ওকি, এরই মধ্যে বিছানা টিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'
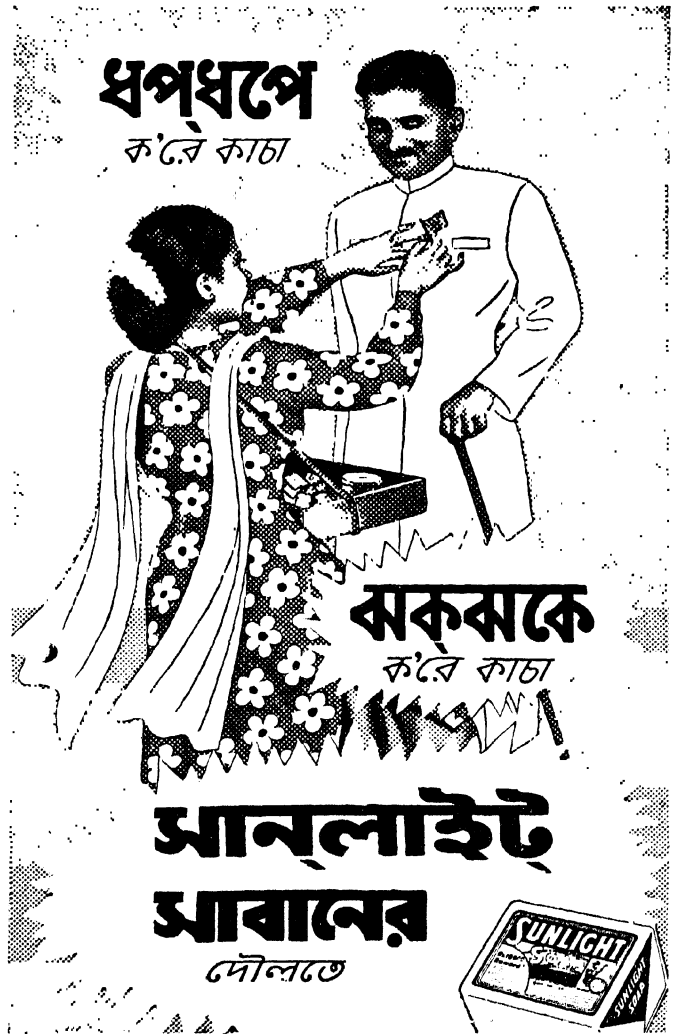
অতুল জবাব দিল, 'না ঘুমোব কেন, ভাবছি।'

রমা বলল, 'ওমা, তোমার আবার ভাবনা চিন্তাও আছে নাকি? কি ভাবছ শুনি?'

অতুল বলল, 'ভাবছি হীরেন জামাই-বাবুটা সত্যিই কি আহাম্মক, তোমার মত লক্ষ্মীমেয়ের মর্ম বুঝল না। ভালো পেলে করতে পারলে কি হবে, ভালো মেয়ে চিনবার তার ক্ষমতা নেই।'

রমা অতুলের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'থাক, ওসব পুরোন ভাবনা তোমার আর না ভাবলেও চলবে। পারো তো নিজের ভাবনাই শুয়ে শুয়ে ভাব আর ভাবতে ভাবতে ঘুমোও। এই রইল তোমার সুপুরি। আমি চললুম।'

অতুল বলল, 'একটু বসবে না?'

রমা যেতে যেতে জবাব দিল, 'না অ... কাজ আছে।'

দোতলার সিঁড়িতে আস্তে আস্তে র... পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

(ক্রম...

জল জঙ্গল—মনোজ বসু; বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক মনোজবাবুর আধুনিকতম উপন্যাস। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালেই ইহা পাঠক শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাঁরা ইতিপূর্বে মনোজবাবুকে 'রোমান্টিক' কাহিনীকার বলে' জানতেন আলোচ্য গ্রন্থ পাঠে তাঁরা লেখকের ক্ষমতার আর একটি দিকের পরিচয় পাবেন—মনোজবাবুর বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা। চোখে দেখা ঘটনার সঙ্গে রোমান্স মিললে যে বাস্তব সৃষ্টি হ'তে পারে, তার প্রমাণ এই উপন্যাস। ভূতত্ত্ববিদরা হয়তো সঠিক বলতে পারেন, এই ইট-কাঠের কলকাতার সঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলের সম্বন্ধ দূরের, না—নিকটের; কতখানি মাটির স্তর এ দুয়ের ব্যবধান। কিন্তু লেখক মনোজবাবুর লিপিকুশলতার গুণে মানব মনের শাশ্বত রহস্যঘন রূপটি ঠিকই উদ্ঘাটিত হয়েছে, স্থান কালের বাধা অতিক্রম ক'রে দূরের মানুষ অভিনব জীবনরীতিতে আমাদের একেবারে কাছে এসে পড়েছে। লোনা জলের ওপারে সেঁদির গাছের ভয়াল ক্রূর ছায়ায় অনুরাগ প্রেম এবং প্রতিহিংসার সার্থক কাহিনী রচনা করেছেন মনোজবাবু। মরমী কাহিনীকার প্রমাণ করেছেন, আবাদ অঞ্চলের অধিবাসীরা আমাদের মতই মানুষ, চিরন্তন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বেদনার প্রতি লেখকের এই মমত্ববোধ তাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদা দেবে। পরিবেশের প্রকার ভেদ হ'লেও এ ক্ষেত্রে গল্প বলার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য মনোজবাবু বজায় রেখেছেন, অরণ্য গাম্ভীর্য তাঁর লেখনীতে অনর্গল হ'য়ে উঠেছে। অনুরাগ এবং প্রতিহিংসার যে ছবি তিনি এ'কেছেন, তা যেমনই বাস্তব অনুযায়ী, তেমনি কাব্যরসে সমুজ্জ্বল। বাঙলা সাহিত্যে এ বই একটি চিরস্থায়ী আসন ক'রে নেবে।

ছাপা, বাঁধাই এবং অঙ্গসজ্জা অত্যুৎকৃষ্ট।

২৯০|৫১

ত্রিস্রোতা—শ্রীমতী সাবিত্রী রায়; ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—পাঁচ টাকা।

লেখিকার দ্বিতীয় উপন্যাস। তথাকথিত সংগ্রামী জনতার জীবনদর্শন। আলোচ্য উপন্যাসের প্রচার্য মতবাদের সহিত যদিও আমরা একমত নহি, তবুও লেখিকার শক্তি স্বীকার করি। চরিত্র সৃষ্টি এবং ঘটনা সমাবেশের গুণে উপন্যাসটি সার্থক হইয়াছে।

ছাপা ও বাঁধাইয়ের প্রতি প্রকাশকের আরও যত্ন লওয়া উচিত ছিল। মূল্য হিসাবে ইহাই বাঞ্ছনীয় মনে করি।

২৪৯|৫১

ছন্দ পতন—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়; নিউ এজ্ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা—১। মূল্য—দু' টাকা আট আনা।

তাঁর আত্মোপলব্ধি থেকে জন্ম কবির, তাই তাঁর বাণী জীবনদর্শনের বাণী। কিন্তু সে-বাণীর বাঙ্ময় রূপ এবং প্রকাশ নিয়ে কবিতে কবিতে যত দ্বন্দ্ব। বাণীর দেউলে জীবনবোধের সত্য উপলব্ধির মাপকাঠিতে কবি হয় স্বীকৃত, নয় ধিকৃত। জীবনদর্শন বা জীবনবোধ যদি সবার পক্ষে সমান সূত্রে ধরা পড়তো, তা'হলে কবিতা নিয়ে মতভেদের প্রয়োজন থাকতো না আজকের দিনে। আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক কবি স্বভাবে নয়, আত্মপীড়নে—সমাজকল্যাণের প্রেরণায়। খ্যাতিমান সর্বজনমান্য কবিকে তার অসহ্য। বড়লোক যে, সে আবার জীবনের কথা কি শোনাবে সাধারণকে!

বিষয়বস্তু অভিনব; কিন্তু উপন্যাসের উপজীব্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। উপন্যাস লেখার নাম ক'রে মানিকবাবু মতবাদ প্রচার করবেন কি না, ভেবে দেখতে হবে। এ উপন্যাসে ঘটনা ব'লে কিছু নেই। সম্প্রতি মানিকবাবুর শক্তিক্ষয়ের এ একটি নজির হ'য়ে থাকবে।

ছাপা, বাঁধাই ভাল।

২৯১|৫১

চিত্তরঞ্জন—(কারখানার উদ্বোধন বার্ষিকী সংখ্যা ১৯৫২)

চিত্তরঞ্জন কারখানার কর্মিবৃন্দ কর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় উদ্বোধন বার্ষিকী সংখ্যাটিতে ১৫টি সচিত্র রচনা মুদ্রিত হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধে কারখানার অগ্রগতির বিবরণ, চিত্তরঞ্জনে শ্রম কল্যাণ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিক্ষা প্রসারের আয়োজন, কর্মীদের জন্য খেল ধুলা, সাধারণ পাঠাগার, সেবায়তন প্রভৃ... নানাবিধ হিতকর ও সমাজ সেবাব্রতী কাজে... বিবরণ পাওয়া যায়। এই বিরাট কারখানা... কাজ কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় যেভাবে অগ্রসর হইতেছে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ইহা ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত হইবে।

প্রাপ্তিস্বীকার

নূতন পৃথিবীর জন্যে—জুলফিকার। পলাশী পাবলিশিং হাউস, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা। মূল্য—২৷৷০ টাকা। ২৬|৫২

মেঘনামতী—বেতালভট্ট; টি কে ব্যানার্জি এণ্ড কোং, ৬-এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৲ টাকা। ২৭|৫২

Thus Spaka Vivekananda—মাদ্রাজ মায়লাপুরস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৷৵০ আনা। ২৮|৫২

আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—প্রকাশক: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৷৷০ টাকা। ২৯|৫২

বিজ্ঞানের রকমারী—শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ; ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩২বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য—৸৵০ আনা। ৩০|৫২

উত্তরকাল—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল; প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৪৲ টাকা। ৩১|৫২

চিত্রপ্রদর্শনী

শিল্পী নীরেন ঘোষ

কোলকাতার শিল্পী মহলে নবাগত শ্রীনীরেন ঘোষের একটি চিত্রপ্রদর্শনী গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী থেকে জনসাধারণের জন্যে উন্মোচিত হয়েছে। তার শিল্পীজীবনের সূত্রপাত হয় দিল্লীতে এবং সেখানকার কলা-রসিকদের সম্মুখে মাঝে মাঝে নিজের শিল্পসাধনা তুলে ধরেছেন। বর্তমানে তিনি কার্সিয়ংএ ভিক্টোরিয়া স্কুলে শিল্প অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন। কোল-কাতায় এই তার প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো।

শিল্পীর প্রায় ষাটটি ছবি এ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। তারমধ্যে অধিকাংশ ছবিই তেল রঙে, কয়েকটি প্যাস্টেলে, দুটি টেম্পেরা এবং মাত্র একটি ছবি জল রঙে। কিন্তু সব ক'টি চিত্র-রচনার মধ্যেই যে বিশেষত্ব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা হচ্ছে শিল্পীর প্রাথমিক শিল্পভিত্তির দৃঢ়তা। অর্থাৎ রূপরচনা (composition) বর্ণ-বিহার অথবা রেখাপাতের মধ্যে কোথাও শিথিলতা কী অসতর্কতা লক্ষ্য করা গেলো না। রচনা পদ্ধতির দিক থেকে শিল্পী নিঃসংশয়েই ক্ল্যাসিক পন্থায় বিশ্বাসী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার দৃষ্টিভঙ্গী পুরাতন-পন্থী নয়। শিল্পে আধুনিকতার নামে যে বীভৎস স্বেচ্ছাচারিতা ও অপটু শিল্পজ্ঞান আজ কাঁটাগাছের মতো দ্রুত বিস্তার লাভ করছে শিল্পী নীরেন ঘোষ যে সে স্রোতের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারেন নি এই মানসিক দৃঢ়তা তার অবশ্যই প্রশংসনীয়।
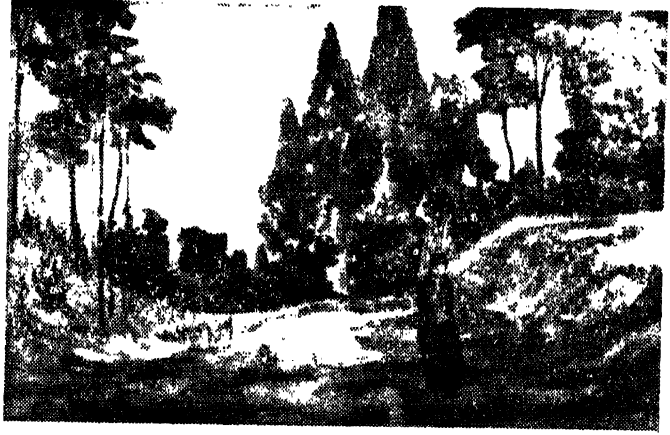
অরণ্যের অহঙ্কার (১৭)

শিল্পী নীরেন ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গী বহিরঙ্গবাদী (impressionistic)। আধুনিক য়ুরোপীয় শিল্পপদ্ধতির মধ্যে যারা বর্ধিত হয়েছেন, তাদের পক্ষে ইম্-প্রেসনিজমের প্রভাবমুক্ত হওয়া সুকঠিন অবশ্য যদি তারা শিল্পমতবাদ সম্বন্ধে চরম-পন্থী না হন। কারণ বাস্তবপন্থী য়ুরোপীয় শিল্পের সর্বশেষ সৌকর্য দেখা গিয়েছে ইম্প্রেসনিজমের মধ্যে। সুতরাং প্রথম থেকেই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা নিয়ে যে শিল্পীজীবনের সূচনা নয়, তার রচনায় অসংশয়িতভাবে ইম্প্রেসনিজমের স্পর্শ থেকে যাবে। শিল্পী নীরেন ঘোষের চিত্রপদ্ধতিও প্রধানত ইম্প্রেসনিজমের ছায়া অনুসারী। কিন্তু ঐ ছায়ামাত্র। কারণ বিশুদ্ধ ইম্প্রেসনিস্ট ছবিতে যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের কঠোরতা লক্ষ্যণীয় শিল্পী-নীরেন তা থেকে অনেকাংশে মুক্ত। তার রচনা বর্ণপরিপ্রেক্ষিত গুণবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বর্ণবিশ্লেষণী নয়। এই কারণেই প্রতিপূরক বর্ণসম্বন্ধে তার নিষ্ঠা কিছুটা শিথিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবহাওয়া বর্ণের প্রতিই তার মনোযোগ

বিশ্লিষ্ট দর্শন না হয়ে সমষ্টি দর্শন এই হলো ইম্প্রেসনিজমের মূলতত্ত্ব। এর থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুতি ইম্প্রেসনিস্ট শিল্পীর দুর্বলতা বলেই গণ্য হয়ে থাকে। সেদিক থেকেও শিল্পী নীরেন ইম্প্রেসনিজমের কিছুটা পাশ কাটিয়েছেন। একই ছবিতে

হেমন্তের ফসল (৪৬)

বিশ্লিষ্ট দর্শনের স্পষ্টতা ও সমষ্টি দর্শনের রূপোভাস প্রত্যক্ষ করা গেছে। 'ভোরের আলো' (২৬) ছবিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বর্ণ ব্যবহারের দিক থেকেও শিল্পী সচেতন। এমন রঙ তিনি কোথাও ব্যবহার করেন নি, যা দর্শকের দৃষ্টির দিক থেকে পীড়াদায়ক। আলোর যে উদ্ভাসিত দীপ্তি তার ছবিকে এক বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে, রঙের সতর্ক ব্যবহার সেই দীপ্তিকে উজ্জ্বলতর করেছে।

ইম্প্রেসনিস্ট চিত্রে কল্পনার স্থান গৌণ। কারণ ছবিতে শিল্পীর কল্পনার প্রয়োগ অর্থে বাস্তব সত্য দৃষ্টি থেকে বিচ্যুতি। শিল্পী নীরেন তার দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধ ক্ষমতা স্মরণ করেই মাঝে মাঝে বর্ণ ব্যবহারের এমন একটি কৌশল অবলম্বন করেছেন, যাতে বাস্তব দৃষ্টির মধ্যেও কল্পনার একটা রঙীন স্পর্শ পাওয়া যায়। শিল্পী মাঝে মাঝে চিত্রপটে এমন একটি অর্থপূর্ণ লাল রঙের সম্পাত করেছেন যা দর্শকের দৃষ্টিকে শুধু কেন্দ্রানুগামী করেনি, দর্শকের মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার করে।

'হেমন্তের ফসল' (৪৬) নামে ছবিটিতে হলুদ রঙের মাত্রাহীন বিস্তৃতি দর্শকের চোখে নিঃসংশয়েই পীড়াদায়ক হতো, যদি-না গাড়ির উপরে স্তূপীকৃত ধান গাছের শীর্ষে মানুষের গায়ে লাল বর্ণের স্পর্শ-টুকু না থাকতো। এই কৌশলে শিল্পী অনেক ক'টি ছবিতে এক বিশিষ্ট গুণ সম্পাত করেছে। ......'ঘরের পানে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে' (২৫) এই পদ্ধতি ব্যবহারের আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

যদিও তেল রঙের ছবিতেই শিল্পীর দক্ষতা বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তবুও প্যাস্টেলের কাজেও শিল্পীর বিশেষত্ব ধরা পড়ে। প্রকৃতির প্রত্যাশা (৫৬) প্যাস্টেলে আঁকা সত্ত্বেও ওয়াসের কোমলতা ও ছায়াভাস এনে দিয়েছে।

এই প্রদর্শনীতে যে ক'টি ছবি শিল্পী দর্শকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন, তার থেকেই শিল্পীর দক্ষতা ও সামর্থ্য সম্বন্ধে মোটা-মুটি একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। প্রকৃতি যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পীকে উল্লসিত করেছে, কিন্তু জীবনের বিচিত্র রূপসম্ভারও তার দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়নি। এই দুয়ের যোগে তার শিল্প সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

এই প্রদর্শনীর আরো একটি আকর্ষণ ছিলো শিশু-শিল্পীদের রচনা সম্ভার। বস্তুজগতের ফর্ম ও বর্ণ সম্বন্ধে শিশু-মনের যে বিচিত্র কৌতূহল রয়েছে, তারই কয়েকটি আশ্চর্য নমুনা এই প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া গেল। সে সুযোগ পাবার জন্যে শিল্পী নীরেন ঘোষ অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। —দ্বিজেন্দ্র মৈত্র
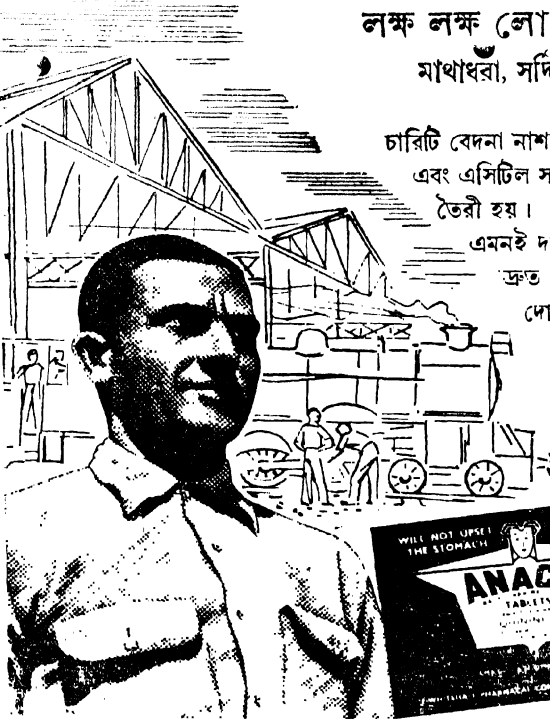
অন্য দশ দিনের মত সেইদিনও আমরা ট্রামে-বাসে চড়িলাম, কিন্তু সীট্ দখলের জন্য ধাক্কাধাক্কি করিলাম না. অতর্কিত আক্রমণের কৌশল অবলম্বন করিলাম না, বরং ডাকিয়া অন্যকে সীটে বসাইয়া দিয়া নিজে দাঁড়াইয়া রহিলাম। মহিলাদের আগমন প্রত্যক্ষ করিয়াও দেখি-নাই ভাব করিয়া জানালার বাইরেব দিকে তাকাইয়া লেডীস্ সীট্ দখল করিয়া বসিয়া থাকিলাম না, ডালহৌসী হইতে চড়িয়া এসপ্ল্যানেড হইতে টিকিট কাটিলাম না, কনডাকটার টিকিট চাহিলে অন্য দিনের মত শুধু মাথা নাড়িলাম না, টিকিট দেখাইলাম, "দাদারা একটু এগিয়ে যান" বলার আগেই আমরা আগাইয়া গিয়া পিছনের যাত্রীদের সুবিধা করিয়া দিলাম। হঠাৎ আমরা সেদিন সুশীল বালক গোলাপ-ফুল বনিয়া গেলাম—দিল আমাদের দরাজ হইয়া গেল, খুশ হইয়া গেল, পঁচিশবার চেষ্টার পর আমরা সরকারী টেস্টে প্রথমবার জয়লাভ করিলাম। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন —টেস্টে যখন জিতেছি, তখন আশা করি, ফাইন্যালেও জিতব—আমরা হাসাহাসি করিলাম না।

* * *

খেলার সংবাদদাতা বলিয়াছেন মাদ্রাজের দর্শক শান্তভাবে মাঠ পরিত্যাগ করিয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আমরা নিশ্চয়ই শান্ত থাকিতে পারতাম না, তবে আমাদের কোলকাতার সম্পাদকগণ শান্ত ছিলেন—দুখানি কাগজ ছাড়া খেলার খবর প্রথম পৃষ্ঠাতেও ছাপা হয়নি এবং সম্পাদকীয়ও কেউ লেখেন নি। দুস্টু লোকেরা বেনাবনে মুক্তো ছড়াবার ইঙ্গিত দিচ্ছে, আমরা অবশ্যি অতদূর যাবো না, তবে হ্যাঁ শান্ত তাঁরা ছিলেন!"

* * *
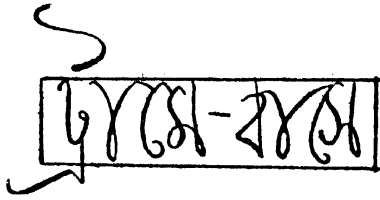
ময়দানে'র এক সংবাদে জানা গেল, কলিকাতায় নাকি রূপো ফুটবল খেলার প্রদর্শনী হইবে। —"ফুটবলে তাহলে হয়ত আমরা হাঁটি-হাঁটি পা-পা ছাড়িয়ে এসেছি"—মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * * *

নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের অনেকেরই পরাজয়ে আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন —"অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-বিচার-পুনর্বসতি, সবই যদি আমাদের গেল, তবে আর রইল কি?"

* * *

আচার্য কৃপালনী নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। —"আচার্যজী নিশ্চয়ই অনুধাবন করতে পারবেন সিভ্যালরির যুগ এখনো যায় নি, কি-ম-প্র বহু দূরে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * * * *

বৃষ্টির জন্য শ্রীযুত নেহরুর ভোট গণনা কয়দিন স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। —"এখন হয়ত নাবালক প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্যে গান ধরা যায়—বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান"—মন্তব্য করে বিশু খুড়ো।

* * * *

মাদ্রাজে নাকি সম্প্রতি জলের দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। —"জলীয় পদার্থের ওপর আইনের খর দৃষ্টিতে প্রকৃতির প্রতিশোধ" —বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

হাওড়ার একদল ভিখারী নাকি পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশ ভিখারীর আস্তানায় হানা দিয়া অনেক ছোরা ও তরবারি উদ্ধার করিয়াছে। শ্যামলাল বলে—"এবার থেকে হয়ত ভিখারী-দের শ্লোগান হবে—একটি ছোরা দাওগো বাবু, একটি ছোরা দাও"!

* * * *

জম্মু-কাশ্মীর সংসদের প্রেসিডেন্ট গোলাম মহম্মদ সাদিক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—কেউ যেন নিরাপত্তা পরিষদের ফাঁদে না পড়েন। বিশু খুড়োও সতর্ক করিয়া দিলেন—"শুধু ঘুঘু দেখলেই চলেব না"

* * * * *

দিল্লীর "মোগল বাগান" দেখিবার সুযোগ নাগরিকদিগকে দুই দিনের জন্য দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাদের উচ্ছৃংখল আচরণের জন্য দুই দিনেই নাকি বাগানটি প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"মোগল বাগানকে তারা রামবাগানে পরিণত করতে চেয়েছিল—সুতরাং কাজে কাজেই — — — —
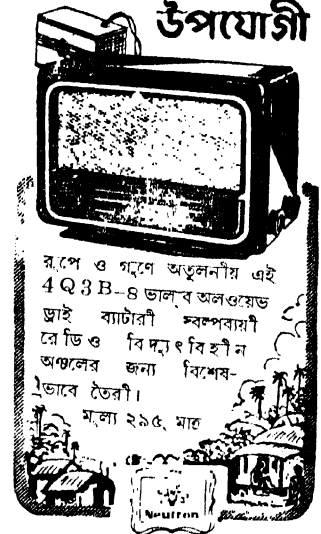
রঙ্গজগৎ
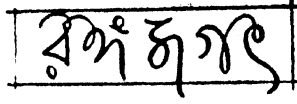
সঞ্জীবনী (এম পি প্রোডাকসন্স—ন্যাশনাল সাউন্ড ষ্টুডিও)—কাহিনী : প্রতিমা দেবী; পরিচালক : সুকুমার দাশগুপ্ত; আলোকচিত্র : বিজয় বসু; শব্দযোজনা : সুনীল বসু; সুরযোজনা : অনুপম ঘটক; শিল্পনির্দেশ : তারক বসু; ভূমিকায় : উত্তমকুমার, জহর গাঙ্গুলী, জীবেন বসু, কানু বন্দ্যোঃ, ধীরাজ দাস, গুরুদাস, সন্ধ্যারাণী, প্রীতিধারা, প্রভা, রেবা প্রভৃতি। ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনে ৮ই ফেব্রুয়ারী উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলায় দেখানো হচ্ছে।

বাঙলা ছবি কেন আজো টিকে রয়েছে এবং কেনই বা টিকে থেকেও বাঁচার মতো বেঁচে চলতে পারছে না এই দুটো প্রশ্নেরই বেশ চমৎকার উত্তর এনে দিয়েছে "সঞ্জীবনী"।

বাঙলা ছবি টিকে রয়েছে বিষয়বস্তুর জোরে। বাঙলার প্রযোজকরা এই সত্যকে ঠিকই আঁকড়ে ধরেছেন যে, ছবির জন্যে সবচেয়ে আগে যা দরকার তা হ'চ্ছে বেশ একটা বক্তব্যসমন্বিত কাহিনী। তাছাড়া বাঙলা ছবির আরও গর্ব হ'চ্ছে প্রমোদের সঙ্গে ছবিকে জনমতি উদ্বুদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টা যা ভারতের অপর চিত্রনির্মাণ কেন্দ্র দু'টি পরিহার করে যায়। আর এই জন্যেই সারা ভারতে মানযুক্ত ছবির কথা উঠলেই সকলেই বাঙলা ছবির কথাই সর্বাগ্রে স্মরণে আনে। বাঙলা ছবির এ বিষয়ে নিজস্বতা আছে, মৌলিকত্ব আছে এবং সেই সঙ্গে সুনাম। "সঞ্জীবনী"ও এ সুনাম বজায় রেখেছে। সমাজের সেবায় ছবির ভূমিকা নির্ণয় করে দেওয়ায় "সঞ্জীবনী" প্রচেষ্টা হিসেবে প্রশংসনীয় অবদান। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

সুবিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্য রুচি ও সুমনোবৃত্তির প্রশংসাটা নেহাৎই অবান্তর হয়ে দাঁড়ায় যদি না সেই সঙ্গে সুবিন্যস্ত কাহিনীও পাওয়া যায়। বাঙলা ছবির এইদিক থেকে, ইদানীং যেনো বেশী-মাত্রায়, মতিভ্রমের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বিষয়বস্তু ভালো হলে কোথায় পরিপুষ্ট কাহিনী গঠনে লোকে অনুপ্রাণিত হবে, তা নয়, সে জায়গায় দেখা যাচ্ছে বিষয়বস্তু ভালো বলে সে ছবিও লোকে ভালো বলে গ্রহণ করবেই এমনি ধারণাটাই কার্যকরী হয়ে উঠেছে। তা না হ'লে "সঞ্জীবনী"র কাহিনী ও ঘটনা বিন্যাস অপুষ্ট থাকতো না কিছুতেই।

"সঞ্জীবনী"র বিষয়বস্তু হচ্ছে মদ্যপান ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে কতোখানি ক্ষতিকর তাই দেখিয়ে দেওয়া নিয়ে। সংসারের বহু অমঙ্গলের মধ্যে এও একটি। কাজেই এ অমঙ্গল বিষয়ে লোকে যাতে সচেতন হয় এবং অব্যাহতি পাওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে দস্তুরমতো যুক্তিতে মেপে মেপে জোরালো কাহিনীর মধ্যে দিয়ে তা না আনতে পারলে বিষয়বস্তুর আবেদন লোকে কোনমতেই গ্রহণ করবে না, বা লোকের মনে তার কোন ছাপও থাকবে না।

"সঞ্জীবনী"র বিষয় হচ্ছে ক্ষতিকর পানাভ্যাস নিয়ে, সুতরাং এর নায়ক একজন মাতালই হওয়া দরকার এবং রাখাও হয়েছে তাই। কিন্তু লোকটি কেন মাতাল হলো তার সেই কারণ এবং মাতাল বলে সে সংসারে কেন অবাঞ্ছনীয় সেদিকে কোন জোরও নেই, বা গ্রহণযোগ্য যুক্তিও নেই। এখানে নায়ক মাতাল এবং মদ্যপান করে সে নিজেরই শুধু কর্মশক্তি হারাচ্ছে। মদ্য-পানের জন্যে এর বেশি কোন ক্ষতিই তাকে স্পর্শ করলে না এবং তার জন্যে সংসারেরই বা কার কি ক্ষতি তারও কোন লক্ষণ নেই।

নায়ক রবি মদ্যপানে আসক্ত হলো দাদা-বৌদির স্নেহের ওপরে অভিমান করে। বাবা মারা যাবার সময় রবিকে তার দাদা-বৌদির হাতে মানুষ করে তোলার ভার দিয়ে যান। দাদা-বৌদি পুত্রাধিক স্নেহের চোখে ওকে দেখতে থাকেন। রবির সাহিত্য-চর্চার দিকে ঝোঁক; প্রথম একখানি কবিতার বই বের হতে ওর নাম হলো। দাদা-বৌদির গর্ব ও আনন্দের সীমা রইলো না। দ্বিতীয় কবিতার বই বের হলো। বিক্রী হয় না দেখে এবং রবি পাছে নিরুৎসাহ হয় এই ভেবে তার দাদা লুকিয়ে লুকিয়ে ওর বইগুলো কিনে বাড়িতে সিন্দুকে লুকিয়ে রাখতে থাকেন। এইভাবে প্রথম সংস্করণ শেষ হতেই রবি গেলো প্রকাশকের কাছে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করাবার জন্যে। কিন্তু প্রকাশক জানালে যে, সংস্করণ আর প্রকাশ করা চলবে না। বাড়িতে এসে রবি সিন্দুকে তার বই আবিষ্কার করে দারুণ বিক্ষুব্ধ হলো। আগে থেকেই বন্ধুরা ওকে লেখায় প্রেরণা পাবার জন্যে মদ ধরার জন্যে পীড়াপীড়ি করতো; এখন দাদা-বৌদি ও প্রকাশকের ওপরে বিক্ষুব্ধ হয়ে রবি মদ খেতে আরম্ভ করলে। দেখলে ফল তার উল্টোই হয়। দাদা-বৌদি জানতে পেরে মর্মাহত হলেন। তাঁরা রবিকে শোধরাবার জন্যে ডেকে আনলেন রবিরই প্রেয়সী রেবাকে। রেবার সান্নিধ্যে রবি পান ত্যাগ করার চেষ্টা করলে। রেবা গেলো রবিদেরই দেশে পুজো উপলক্ষে, যাবার আগে রবিকে সে লুকিয়ে কতকগুলো দশটাকা দিয়ে গেলো ওকে চিঠি লেখার জন্যে। রবি লিখতে বসে কিছুতেই প্রেরণা না পেয়ে সেই টাকায় মদ খেতে আরম্ভ করলে। এরপর আবার রেবার কথায় অভ্যাস ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করলে। দাদা-বৌদি রেবার সঙ্গে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন, অবশ্য রেবা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে, রবিকেই বরণ করার। রেবার নিমন্ত্রণে রবি গেলো ওদের বাড়িতে কিন্তু আড়াল থেকে রেবার মা ও দাদাকে ওর মাতাল স্বভাব ও নিষ্কর্মা জীবনের প্রতি কুৎসিত মন্তব্য করতে শুনে সে স্থান ত্যাগ করে চলে আসে একেবারে সুঁড়িখানায়। দিনের পর দিন সে মদ্যপান করেই চলেছে। কয়েকদিন সে নিরুদ্দিষ্ট হলো। রেবা তার সন্ধান পেলে মাতাল-গারদে। সে গারদের ডাক্তার রেবারই দাদা। রবিকে তিনি ছাড়তে চান না, কিন্তু রেবা

ভারতীয় সংবিধানের ধারামতেই যেন জোর ফলিয়ে তার অধিকার খাটিয়ে রবিকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলো। রবির তখন এক অদ্ভুত রোগে পেয়ে বসেছে। যখন তখন, যেখানে-সেখানে সে সাপ দেখতে থাকে। এমনি একদিন সাপ দেখে সে লক্ষ্য করে চেয়ার ছোঁড়ে, সেটা লেগে কপাল কেটে অজ্ঞান হয়ে পড়লো রেবা। পাড়ার লোক জমা হয়ে রবিকে খুনী বলে চেঁচাতে লাগলো, রবিও ছুটলো ডাক্তার ডাকতে। সেই সময়ে এসে পড়লো ওর দাদা-বৌদি, ওরা রবিকে ধরে বাঁধা দিতেই রবি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলো। জ্ঞান ফিরলো স্বাভাবিক মানুষ হয়েই। রবি জানায় রেবার মাথা কেটে রক্ত গড়াতে দেখেই তার সম্বিৎ ফিরে আসে এবং প্রতিজ্ঞা করে জীবনে আর মদ স্পর্শ করবে না।

গোড়াতেই দেখানো হয়েছে, রবি মদ খাওয়াটা এতোই ঘৃণ্য বলে মনে করতো যে, না খেলে লেখা খুলবে না জেনেও সে মন্তব্য করে যে, বরং লেখাই ছেড়ে দেবে তবু মদ ধরবে না। কিন্তু রবি মদ ধরলো লেখার উন্নতির জন্যে নয়, লেখার ব্যর্থতায় দাদা-বৌদির উপর অভিমান করে। আর খেতে যখন ধরলে তখন আর পর্দা রাখলে না মোটেই, এমন আসক্ত হয়ে উঠলো যে, পয়সার অভাবে সে চতুর্দিকে ধারদেনা করেও খেয়ে যেতে লাগলো। তারপর কর্লি তার মাতলামি একটানা একেবারে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত—যার মধ্যে না আছে কোন টনা আর না কোন পরিপুষ্ট নাটকীয় ঘাত। ফল এই দাঁড়ালো, অমন যে ষয়বস্তু তা সুরাপানের কুফলটাকে তেমন টিয়ে না তুলে তার চেয়ে বড়ো করে লে মাতলামীর রীতিপ্রকৃতিটাকে। ফলে কের চোখ আর ফুটলো না, ফুটলো ত—সমস্ত ব্যাপারটা রঙ্গব্যঙ্গেই দাঁড়িয়ে লো।

ঘটনা বিন্যাসে সাবলীলতার দিকে আরও নজর দেওয়া উচিত ছিলো। রেবাকে তে দেখে রবি চেয়ারের নীচে গ্লাস ল লুকলো। রেবাকে বসানো হলো চেয়ারে এবং তাকে পা দোলাতে দেওয়া যতক্ষণ না গেলাস বোতল ঠোক্কর পড়ে যায়। রবির মদের খরচ য়ে দেবার জন্যে রেবা কর্তৃক চিঠি র খরচ বাবদ খানকয়েক দশটাকার দেওয়ানোও আর এক কৃত্রিম ব্যাপার। তেমনি সাজানো ঘটনা লাগে সিন্দুকে রবির নিজের কবিতার বই আবিষ্কার। এমনি আরও ঘটনা রয়েছে যা গল্প বাঁধবার জন্যেই যেনো ধরে এনে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে মনে হবে।

কলাকৌশলের দিকে আমরা অপর কেন্দ্রের তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের যে সম্পদ রয়েছে—কাহিনী—সেটার সুবিন্যস্ত পরিস্ফুটনে নাট্যানুগ যোগ্যতার অভাব তো নেই! তবুও কেন এমন নিষ্প্রভ অনাটকীয় ছবি হবে?

নায়ক রবির ভূমিকায় উত্তমকুমার অভিনয় করতে পারার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন বেশীর ভাগ অংশেই। নায়িকা রেবার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সন্ধ্যারাণী। আলোকচিত্রের দোষে তাঁকে বড়ো অসুন্দর দেখিয়েছে। দাদা ও বৌদির ভূমিকায় যথাক্রমে জহর গাঙ্গুলী ও পদ্মা স্নেহশীল দম্পতির পুরনো টাইপই এঁকে দিয়েছেন। বার-এর কর্তা ভটচায্ মাতালদের ওপরেও সহানুভূতিশীল এবং কানু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয়েও চরিত্রটিকে সামনে টেনে এনেছেন, কিন্তু তার সুর্মতিটা নিরর্থক দেখায়। প্রভা বা রেবার চরিত্র-চিত্রণ চিরাচরিত।

সঙ্গীতের দিকটায় শ্রী এবং নাটকীয় পরিবেশ স্ফূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মনে দোলা লাগার মতো গানও আছে খান দুই। "সঞ্জীবনী" অত্যন্ত সুউদ্দেশ্য প্রণোদিত ছবি, কিন্তু উপযুক্ত নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত ও পরিবেশ সৃষ্টির অভাবে নিস্তেজ।

সুকুমার দাশগুপ্তের পরবর্তী ছবি

"সঞ্জীবনী"র পর পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত এস এম প্রডাকসন্স নাম দিয়ে নিজস্ব চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেছেন। স্বতন্ত্র প্রযোজকরূপে তাঁর প্রথম ছবি "সাত নম্বর কয়েদী"-র মহরৎ সুসম্পন্ন হয়েছে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ইস্টার্ন টকীজ স্টুডিওতে। এর গল্পটি লিখেছেন, বলতে গেলে বর্তমানে বাঙলার একমাত্র চিত্রনাট্যকার মনি বর্মা। এদের দুজনের সহযোগিতায় প্রগতিশীল এবং উদ্দেশ্যমূলক অনেকগুলি ছবিই পাওয়া গিয়েছে যা বাঙলা ছবির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। "সাত নম্বর কয়েদী"-ও কাহিনী বৈচিত্র্যে এবং নাটকীয় উপাদানে তাদের কৃতিত্বের একটি সুমণ্ডিত অবদান হবে বলে আশা করা যায়।

ছবিখানিতে অভিনয় করার জন্য এ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছেন জহর গাঙ্গুলী ও সন্ধ্যারাণী। সুরযোজনা করবেন অনুপম ঘটক এবং আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণ করবেন যথাক্রমে দিব্যেন্দু ঘোষ ও পরিতোষ বসু; ব্যবস্থাপনায় আছেন কমল মুখোপাধ্যায়।

ক্রিকেট

ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নির্বাচন বিষয়টি লইয়া সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতিদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাতায় আবেদন নিবেদন, অনুরোধ উপরোধ প্রভৃতির বিরাট বিরাট ফিরিস্তি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল তাহাতে আশংকা হইয়াছিল হয়তো বা শেষ পর্যন্ত এক বিরাট খণ্ডযুদ্ধ না পরিলক্ষিত হয়। খুবে সুখের বিষয় যে, ঐ অপ্রীতিকর কিছুই হয় নাই। অধিনায়ক নির্বাচন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও সর্বসম্মতিক্রমে হইয়াছে। ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের নব অধ্যায় রচনাকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিজয় হাজারেই পুনরায় ইংলণ্ড ভ্রমণকারী দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন। তবে ইহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে যে, বিজয় মার্চেণ্টের বোর্ডের নিকট লিখিত পত্রই এই সমস্যা এত সহজ ও সরল করিয়াছে। অধিনায়ক পদের জন্য তাঁহার নাম যে উত্থাপিত হইবে ইহা স্থির নিশ্চিত জানিয়াই তিনি বোর্ডকে লিখিয়াছেন যে, আমার নাম বোর্ডের সভায় যেন উত্থাপন না করা হয়, কারণ আমি মনে করি আমার অপেক্ষা কম বয়সের কাহারও অধিনায়ক হওয়া উচিত। আমার বয়সই আমাকে দলভুক্ত করার অন্তরায়। আমি ভ্রমণকারী দলেও খেলিতে অক্ষম।" এই পত্রের পর তাঁহার নাম বোর্ডের সভায় কেহই উত্থাপন করিতে পারেন নাই. সেই জন্যই পরবর্তী বিজয় হাজারের নাম প্রস্তাবিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। বোর্ডের সভায় খেলোয়াড় নির্বাচন করা হয় নাই। তবে দল গঠনের ভার তিনজন সভ্য লইয়া গঠিত এক উপসমিতির উপর দেওয়া হইয়াছে। অধিনায়ক বিজয় হাজারে ইঁহাদের এই বিষয় সাহায্য করিবেন। এই নির্বাচন ৬ই মার্চ হইবে।

ভ্রমণকারী দল গঠিত হইল না অথচ ম্যানেজার নির্বাচন হইয়া গেল, ইহাতে অনেকেই আশ্চর্য হইয়াছেন। কিন্তু আমরা হই নাই। এই ম্যানেজার নির্বাচিত হইবার জন্য বোর্ডের সভ্যদের মধ্যেই কয়েকজন বেশ উৎসাহিত হইয়াছিলেন ইহা আমরা এম, সি, সি দল যখন কলিকাতায় ছিল, তখনই ক্রিকেট পরিচালকদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হইতে জানিতে পারি। অধিনায়ক নির্বাচনের দিনই যদি ম্যানেজার নির্বাচন পর্ব শেষ না করা হইত, তাহা হইলে পরে বেশ কিছুটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা হইবার সম্ভাবনা ছিল ইহা উপলব্ধি করিয়াই তাড়াহুড়া করিয়া ইহা শেষ করা হইয়াছে। যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কোনই সুযোগ দেওয়া হয় নাই। ইহা এক বিরাট রাজনৈতিক চাল বলিয়া অভিহিত করিলেও কোনরূপ অন্যায় হইবে না। তবে ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, বোর্ডের মধ্যে যতগুলি লোক আছেন, তাহার মধ্যে পি গুপ্তই যোগ্যতর ব্যক্তি। অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের পর ম্যানেজারের কার্যকলাপ লইয়া

নানাপ্রকার আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া বোম্বাইয়ের কয়েকটি পত্রিকা অনেক কিছুই উক্তি করিয়াছিলেন। একটি পত্রিকার উক্তি আজও আমরা বিস্মৃত হইতে পারি নাই। উহাতে লিখিত হইয়াছিল, "যে ম্যানেজার বিবৃতি দানের সময় বলিয়াছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের আর্থিক দিক দিয়া সুবিধা হইয়াছে, তিনি কিরূপে পরে হিসাবপত্রে কয়েক সহস্র টাকা ঘাটতি দেখাইলেন আমরা বুঝিতে পারি না। ইহার অনুসন্ধান হওয়া দরকার।" ইহার পর ধারণা হওয়া উচিত যে, বিষয়টি বহু দূরে গড়াইবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। এই বারেও ঐ প্রকারের কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাহা হইলেই আমরা সুখী হইব। তখন আমাদের বলিবার ছিল "ডিমেলোর উস্কানিতে হইয়াছে, কিন্তু বর্তমানে তাহা বলা চলে না।" এই সম্পর্কে লেসলী স্মিথের উক্তিও স্মরণ হইতেছে। তিনি ম্যানেজার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "পি গুপ্তের সমতুল্য ম্যানেজার আমি এই পর্যন্ত দেখি নাই। ভারতীয় খেলোয়াড়দের সকল সুখ-সুবিধার দিকেই তিনি বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকেন। আমি নিজে ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় লক্ষ্য করিয়াছি। অপর কাহাকেও যদি ম্যানেজার করা হয় ভুল হইবে।" বর্তমানে তিনি পি গুপ্তের নির্বাচনের সংবাদ পাইয়া নিশ্চয়ই সুখী হইবেন।

বোর্ডের আশ্চর্য সিদ্ধান্ত

বোর্ডের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে, সমগ্র ভ্রমণে যে খেলোয়াড় খেলিতে পারিবেন না, তাহাকে দলভুক্ত করা হইবে না। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের কি যে প্রয়োজনীয়তা আছে আমরা চিন্তা করিয়া পাই নাই। খুবই আশ্চর্য বলিয়া মনে হইয়াছে। যদি বিনু মানকড়কে উদ্দেশ্য করিয়াই করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিব খুবই অন্যায় করা হইয়াছে। তাঁহার সমতুল্য চৌখস খেলোয়াড় ভারতে আর নাই। যদি তাঁহার সাহায্যে ভারতীয় দল টেস্ট খেলা গুলিতেও পায়, তাহাও ভারতীয় দলের পক্ষেও ভাল। আমরা বোর্ডের সভ্যদের এই বিষয় একটু চিন্তা করিয়া কার্য করিতে অনুরোধ করি।

মানকড়ের অবসর গ্রহণ

সিংহলের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিনু মানকড় এই বৎসরের শেষে ক্রিকেট খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। তিনি নাকি ইহা একরূপ স্থির করিয়াই ফেলিয়াছেন। অথচ এই সংবাদের মধ্যে আছে যে, তিনি পেশাদার হিসাবে খেলিবেন। তিনি পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন অনেক দিনই এবং তাহার পরেও তিনি ভারতের বিভিন্ন দলের পক্ষে বহু খেলায় খেলিয়াছেন। সুতরাং তিনি পেশাদার হিসাবেই যখন খেলিবেন, তখন তিনি অবসর গ্র[...] কি ভাবে করিতেছেন আমরা বুঝি[...] পারিলাম না। আশা করি, ভারতীয় ক্রি[...] কণ্ট্রোল বোর্ড এই বিষয়ে বিশদ বিবরণ প্রক[...] করিবেন। সম্প্রতি বোর্ডের যে সভা হইয়া গে[...] তাহাতে আশা করিয়াছিলাম বিনু মানক[...] সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যাইবে। তি[...] ভারতীয় দলের হইয়া ইংলণ্ডে খেলিবেন কি[...] অথবা খেলিবার অনুমতি পাইয়াছেন কি না, পাইয়া থাকিলে পাইবার কোন সম্ভাবনা অ[...] কি না প্রভৃতি অনেক কিছুই আমাদের সাধারণের জিজ্ঞাস্য আছে। কিন্তু বোর্ডের স[...] এই বিষয় কোনই আলোচনা হইল না—আশ্চ[...] সিংহলের আরও একটি সংবাদে প্রকাশ যে, [...] মানকড় সিংহলের পেশাদার ক্রিকেট শিক্ষক হই[...] উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি সিং[...] ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক মিঃ ইসনা[...] ঐ সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছেন, "আমি নিশ[...] এই বিষয় সম্পর্কে মানকড়ের সহিত আলো[...] করিব ও বোর্ডকে সকল কিছু জানাইব।[...] ভারতে মানকড়ের কি হইল যে তিনি স্ব[...] ত্যাগ করিয়া সিংহলে চাকুরীর উৎসাহ প্র[...] করিতেছেন। আমরা যতদূর জানি বোর্ড ইং[...] গুজরাটের শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে অনু[...] দিয়াছেন। তাহা যদি ঠিক হইয়া থাকে, বর্তমানে এমন কি হইল যে, মানকড়কে ভা[...] বাহিরে চাকুরীর সন্ধান করিতে হই[...] বুঝিতে পারিলাম না। সকল কিছুই হেঁয়ালীর মত ঠেকিতেছে। বোর্ডের উচিত [...] সম্পর্কে সকল কিছু পরিষ্কারভাবে [...] ইহাতে বোর্ডের মঙ্গল হইবে ও মানক[...] প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ফুটবল

সিংহল ফুটবল এসোসিয়েশন কল[...] এক কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযো[...] আয়োজন করিয়াছেন। এই প্রতিযো[...] খেলা মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহেই অন[...] হইবে। এই প্রতিযোগিতায় ভারতের পক্ষ [...] করিবার জন্য ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন [...] শক্তিশালী দল গঠন করিয়াছেন। এই দল [...] সময় পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে আলোচনা হ[...] মনোনীত দলের মধ্য হইতেই কিছু পরি[...] করিয়া বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ভারত[...] গঠন করা হইবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ [...] যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। কারণ ইহা [...] স্বীকার করিবেন যে, যে সকল খে[...] লইয়া সিংহল ভ্রমণকারী দল গঠন করা হ[...] তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী দল গঠ[...] সম্ভব নহে। তবে আমাদের আপত্তি আছে ম্যানেজার নির্বাচন বিষয় লইয়া। যাঁহাকে ভ্রমণকারী দলের ম্যানেজার করা হইয়াছে, অলিম্পিক দলের ম্যানেজার করিলে ভু[...] হইবে। আশা করি এই বিষয় নির্বাচক[...] চিন্তা করিয়া পরিবর্তন করিবেন। ব্যক্তিগত কারণে নহে, ইনি বিশ্ব অ[...] অনুষ্ঠানে ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়দে[...]

কিছু অভাব-অভিযোগ ঠিক মিটাইতে পারিবেন না। ইহার জন্য প্রয়োজন যাহার অলিম্পিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে এইরূপ লোকের। নিম্নে সিংহল ভ্রমণকারী ভারতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল:—

গোল:—বি, এণ্টনী (বাঙ্গলা), ভরদ্বাজ মহীশূর)।

ব্যাকগণ:—শৈলেন মান্না (বাঙলা) অধিনায়ক, আজিজ (হায়দরাবাদ) ও বি বসু (বাঙলা)।

হাফ ব্যাকগণ:—লতিফ (বাঙলা), চন্দন সিং (বাঙলা) নূর (হায়দরাবাদ), এস সর্বাধিকারী (বাঙলা), এস রায় (বাঙলা)।

ফরোয়ার্ডগণ:—ভেঙ্কটেশ (বাঙলা), আর গুহ ঠাকুরতা (বাঙলা), এস মেওয়ালাল (বাঙলা), সত্তার (বাঙলা), জে এণ্টনী (বাঙলা), লিয়াক (হায়দরাবাদ), পি বি সালে (বাঙলা) ও মৈয়ন (হায়দরাবাদ)।

অতিরিক্ত:—সঞ্জীব (বাঙলা), প্যাপেন (বোম্বাই), টি আও (বাঙলা), সৈয়দ (বাঙলা), আমেদ (বাঙলা), পূরণ বাহাদুর (সার্ভিসেস)।

ম্যানেজার:—শ্রী এস এ নাইডু (মহীশূর)।

শিক্ষক:—শ্রীবি ডি চ্যাটার্জি (বাঙলা)।

রেফারী:—শ্রীঅলোক রায়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১১ই ফেব্রুয়ারী—ভারতের ২২টি রাজ্যের মধ্যে ১৭টি রাজ্যে কংগ্রেসদল অন্য-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। রাজ্যগুলির নাম:—আসাম, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, হায়দরাবাদ, মধ্যভারত, মহীশূর, সৌরাষ্ট্র, আজমীর, ভূপাল, কুর্গ, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ ও বিন্ধ্যপ্রদেশ। লোকসভার নির্বাচনেও কংগ্রেস দল অন্য-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

কৃষক-মজদুর-প্রজা দলের নেতা আচার্য কৃপালনী ফয়জাবাদ উত্তর নির্বাচন কেন্দ্রে লোক-সভার নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর নিকট পরাজিত হইয়াছেন।

অদ্য কলিকাতা চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত একটি পাঁচতলা বাড়িতে বিশ্বনাথ ধনুকা (১৬) নামে জনৈক স্কুলের ছাত্রের রহস্যজনক মৃত্যু হইয়াছে।

১২ই ফেব্রুয়ারী—দুই আসনযুক্ত বোলপুর (বীরভূম) কেন্দ্রের ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সকল কেন্দ্রের ফল প্রকাশ সম্পূর্ণ হইল। বোলপুর কেন্দ্র হইতে দুইজন কংগ্রেসপ্রার্থীই নির্বাচিত হইয়াছেন। এই ফল প্রকাশের পর ২৩৮টি আসনযুক্ত বিধান-সভায় কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা দাঁড়াইল ১৫১ জন।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আলোচনার উত্তরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পুনরায় দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হউক, ইহাই ভারতবর্ষ কামনা করে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে শ্রী বি শিবরাওয়ের ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়া সংসদ আজ ভারত সরকারের পররাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ নীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। সংশোধন প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহৃত বা অগ্রাহ্য হয়।

বসিরহাটে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, গোচাভাঙ্গা (ভোমরা) সীমান্ত অঞ্চলে পাকিস্থান এলাকা হইতে ভারত ইউনিয়নের পশ্চিমবঙ্গ এলাকায় কিছু পরিমাণ মৎস্য পাচার করার ব্যাপার লইয়া পাকিস্থানী পুলিশ ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী পুলিশের মধ্যে গুলী বিনিময় হইয়াছে। প্রকাশ, ইহার ফলে তিন জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং অপর এক ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বহু ভোটাধিক্যে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

পূর্ববঙ্গ জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুসারে ঢাকার ইংরাজী দৈনিকপত্র "পাকিস্থান অবজারভার"-এর প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত দৈনিকের স্বত্বাধিকারী পূর্ববঙ্গের ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী জনাব আমিদুল হক চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিহার বিধানসভার নির্বাচনের সমস্ত ফলই প্রকাশিত হইয়াছে। ৩৩০ জন সদস্যযুক্ত বিধান-সভায় কংগ্রেস ২৪১টি আসন দখল করিয়াছে।

ডায়মণ্ডহারবার লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ হইতে লোকসভা নির্বাচনের পর্ব সমাপ্ত হইল। লোক-সভায় পশ্চিমবঙ্গের ৩৪টি আসন। তন্মধ্যে কংগ্রেস ২৪টি আসন লাভ করিয়াছে।

হায়দরাবাদের রাজস্ব ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রী বি রামকৃষ্ণ রাও সর্বসম্মতিক্রমে হায়দরাবাদ বিধান-সভার কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন।

ইম্ফলে পুলিশ কর্তৃক দুইটি বিক্ষোভ প্রদর্শকদল ছত্রভঙ্গ করার সময় লাঠি ও বন্দুকের কুঁদার আঘাতে ৫০ জন স্কুলের ছাত্র ও ৫ জন মহিলা সহ ৬২ জন নরনারী আহত হইয়াছে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহর-লাল নেহরু কর্তৃক লিখিত একটি বিজ্ঞপ্তিপত্রে আজ বলা হয় যে, ভবিষ্যতে কংগ্রেসকে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক পরিকল্পনা লইয়া একটি সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ করিতে হইবে; কংগ্রেসের মধ্যে কোনও বিরোধ অথবা উপ-দলের অস্তিত্ব বরদাস্ত করা হইবে না।

শ্রী কে শান্তনম্ বিন্ধ্যপ্রদেশের এবং মেজর জেনারেল হিম্মৎসিংজী হিমাচল প্রদেশের লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন।

উড়িষ্যা বিধান সভার নবনির্বাচিত আরও তিনজন স্বতন্ত্র সদস্য কংগ্রেস দলে যোগদান করায় ১৪০ জন সদস্য লইয়া গঠিত বিধান সভায় কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা ৭৪ জনে দাঁড়াইল।

সৌরাষ্ট্র সরকারের এক প্রেস নোটে প্রকাশ, দুর্বৃত্ত ভূপৎ দলের সাহায্যে নিরীহ লোকদিগকে হত্যা করিয়া সরকারকে হেয় প্রতিপন্নের জন্য যে ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল, পুলিশ তাহার সন্ধান পাইয়াছে। এই সম্পর্কে জনৈক নৃপতি ও দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিবারক নিরোধ আইন অনুসারে রাজ্যের বিভিন্ন কারাগারে আটক ২৭১ জন বন্দীর মধ্যে ৪৬ জনকে মুক্তিদানের আদেশ দিয়াছেন। মুক্তিপ্রাপ্ত এই বন্দীর মধ্যে দুইজন সম্প্রতি কম্যুনিস্ট মনোনীত প্রার্থী হিসাবে রাজ্য বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। কম্যুনিস্ট পার্টির মনোনয়নে রাজ্য বিধান সভার নির্বাচনে নির্বাচিত অপর তিনজন সদস্যকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য উত্তর প্রদেশ, বিহার ও রাজস্থান হইতে লোকসভার যে ৬টি আসনের ফল ঘোষিত হইয়াছে, কংগ্রেস দল সেই ৬টি আসনই দখল করিয়াছে। ৪৯৭ আসনযুক্ত লোকসভায় কংগ্রেস দলের সংখ্যা দাঁড়াইল ৩২৪।

ভারতের খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী অদ্য লক্ষ্ণৌয়ে শর্করা ও ইক্ষু গবেষণাগা[রের] ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষি[ক] রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৫০-৫১ সালে ভারত[ীয়] রেলপথসমূহে ১৫ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ন[িট] উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযা[য়ী] রাজ্যের বিভিন্ন জেলে আটক ২৭১ জনের মধ্যে ৪৬ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু গতকল্য নৈনীতাল তরাইয়ের সুদৃশ্য পরিবেশের মধ্যে ১৬ হাজার একর জমির উ[পর] প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় কৃষিশালার উদ্বোধন করে[ন]। সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতে উহাই বৃহত্তম কৃষিশাল[া]।

বিদেশী সংবাদ

১১ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য নিউজার্সির এলিজা[বেথ] শহরের উপর একটি যাত্রীবাহী বিমান ভাঙ্গি[য়া] পড়ায় প্রায় ৩৩ জন হত ও কয়েকজন আ[হত] হইয়াছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং কম্যু[নিস্ট] সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষগণ অদ্য এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, যুদ্ধবির[তি] চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার দুই মাসের মধ্যে কোরি[য়ার] যুদ্ধবন্দি বিনিময়কার্য সম্পূর্ণ হইবে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—গতকল্য রাত্রে দ[ক্ষিণ] তিউনিসিয়ার অন্তর্গত গাফসার খলিফা স্লিম্যান বেন হ্যামড আততায়ীর গুলী[তে] নিহত হইয়াছেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—যথোচিত আড়ম্বর সহ[কারে] রাজা ষষ্ঠ জর্জকে আজ উইণ্ডসর প্রাসাদ[ে] সমাহিত করা হইয়াছে।

চীন-সোভিয়েট চুক্তির ২য় বার্ষিকী দি[বস] উদ্‌যাপন উপলক্ষে আহূত এক সভায় চী[নের] প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী চৌ-এন-[লাই] বলেন, জাপ সাম্রাজ্যবাদের পুনরভ্যুত্থানে ব[াধা] দান এবং অন্য কোন রাষ্ট্রের সহযোগিতায় [জাপান] যাহাতে পররাজ্য আক্রমণে অগ্রসর হইতে না পা[রে] তদ্রূপ ব্যবস্থা করাই চীন-সোভিয়েট চু[ক্তির] উদ্দেশ্য।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—আজ কম্যুনিস্টরা এই [দাবী] করে যে, কোরিয়ার যুদ্ধবিরতির পরিদর্শ[ক] কমিশনে নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে রাশি[য়া,] পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে গ্রহণ কর[িতে] হইবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের স্টাফ অফিসারগণ কমি[শনে] রাশিয়াকে নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে গ্রহণ ক[রার] প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—কোরিয়ায় অস্ত্র সংবর[ণের] পর ঊর্ধ্বতন মহলে শান্তি আলোচনা সম্প[র্কে] কম্যুনিস্ট পক্ষ যে খসড়া বিষয়সূচীর প্র[স্তাব] করেন, রাষ্ট্রপুঞ্জ পক্ষ এই সর্তাধীনে উহা গ্র[হণ] করিয়াছেন যে, এ বিষয়ে কম্যুনিস্টগণকে র[াষ্ট্র]পুঞ্জের ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে হইবে।

ভারতীয় মূল্য: প্রতি সংখ্যা—।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,
পাকিস্থান মূল্য: প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵৹ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১.. বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
[illegible] প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন **সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ**

ঊনবিংশ বর্ষ] শনিবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 1st March, 1952. [১৮শ সংখ্যা

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

কলিকাতা শহরে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সপ্তাহ কালব্যাপী অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীযুত হরেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি এই উৎসবের উদ্বোধন করিয়াছেন। এশিয়ায় এমন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান এই প্রথম। এই অনুষ্ঠানে আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, চীন, রাশিয়া, মিশর প্রভৃতি জগতের বিভিন্ন দেশের ছত্রিশ জনেরও অধিক প্রতিনিধি যোগদান করিতেছেন। আমরা ইঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। বর্তমানে মানব-সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা সর্বজনবিদিত। রসানুভূতি সব সংস্কৃতির মূলে কাজ করিয়া থাকে, কারণ রস বা সৌন্দর্যানুভূতির পথেই মানুষের মনোবৃত্তিসমূহ সঞ্জীবিত এবং সম্প্রসারিত হয়। এইরূপে ভেদ-বিভেদ ও সব রকমের সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে মানুষ একাত্মবোধের সূত্রের সন্ধান লাভ করে। সুতরাং প্রকৃত রসানুভূতি বা সৌন্দর্যের উপলব্ধি হইতে যে সৃষ্টির উদ্ভব, তাহা দেশ-কালের কোন ব্যবধান স্বীকার করে না, তাহার ভাষা সর্বজনীন, বিশ্ববাসী সকলের। এই দিক হইতে চলচ্চিত্র সাধনার সার্থক সৃষ্টি স্বরূপ যে সর্বজনীন হইবে এবং তাহার আন্তর্জাতিক ভিত্তি থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক। চলচ্চিত্রের এই আন্তর্জাতিক উৎসব সেই সত্য সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়া দিতেছে এবং বিশ্ব-

মানবতার ক্ষেত্রে এই সাধনার ভিতর দিয়া আমরা আমাদের বড় একটা অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করিতেছি। আমরা ইহা হইতে পাইতেছি বিশ্ব-মানবতার আহ্বান। কিন্তু চলচ্চিত্র সাধনার এই আন্ত-র্জাতিক বা বিশ্ব-মানবতার ভিত্তির প্রতি লক্ষ্য করিতে গিয়া আমাদের জাতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের দিক উপেক্ষা করিলে চলিবে না। কারণ নিজবোধের প্রতিবেশ ব্যতীত প্রকৃত রস বা সৌন্দর্যানুভূতি নবসৃষ্টির পথে বিকশিত হয় না; প্রত্যুত পরানুকরণের পথে জাতির প্রাণধর্মই আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। ফলত রস-পদার্থ যদি প্রাণধর্মে পরিপুষ্টি পায়, তবেই তাহা পরিব্যাপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়, যাহা মধুর, তাহাই প্রচুর। পরানুকরণের পথ ধরিতে গেলে সৃষ্টির ক্ষেত্র হইতে মাধুর্যের এই বীর্যই উবিয়া যায়; সুতরাং ভারতের চলচ্চিত্র সাধনাকে সার্থক করিতে হইলে দেশ এবং জাতির নিজবোধকে ভিত্তি করিয়া সে পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সেই পথেই তাহা আন্তর্জাতিক পরিব্যাপ্তির উদার ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে এবং সমগ্রভাবে মানব-সভ্যতাকে সমন্বিত ও সংহত করিয়া তুলিবে। সমন্বয়ের এই দিকটা সার্থক সৃষ্টির পক্ষে বড় কথা। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়া গিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। তিনি এই অভিযোগ করেন যে, শুধু এই সব শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রেও আজকাল অনেক ভেজাল আসিয়া ঢুকিতেছে, নিন্দা এবং বিদ্বেষ-প্রচার চলিতেছে। এক জাতিকে অপর জাতির অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিবার জন্য রাজনীতিক প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃত সৌন্দর্যের সাধনায় সত্যই এসব অনাচারের স্থান নাই এবং এগুলি আবর্জনাস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে সুন্দরের সাধনা সংযম ব্যতীত সার্থক হইতে পারে না। সৌষ্ঠবের মূলে সংযম বিশেষভাবে কাজ করে, নহিলে সৃষ্টি নিরর্থক, অধিকন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অনর্থক হইয়া পড়ে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে অনাচার ঘটায়। অবশ্য চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাগৃহ-গুলি ধর্মসভায় পরিণত হয় কিংবা স্কুল-কলেজের ক্লাশ হইয়া দাঁড়ায়, আমরা ইহা চাহি না; কিন্তু সুলভ জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রে এমন সব দৃশ্য এবং সংলাপের অবতারণা করা হইতেছে, যেগুলি রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। অর্থোপার্জনের লালসায় সাধারণের স্থূলে মনোবৃত্তিসমূহকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়া সস্তায় আসর জমাইবার এই যে নীতি, ইহা অত্যন্তই অনিষ্টকর। তরলমতি তরুণ ও তরুণীদের নৈতিক অধঃপতনের ইহাতে উন্মুক্ত হইতেছে, সুতরাং ইহাকে নিরোধ করা দরকার। চলচ্চিত্র সাধকদের আন্ত-র্জাতিক এই ধরণের উৎসবে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের পারস্পরিক সম্বন্ধ দৃঢ়

দিল্লীর 'আকাশ বাণী' ভবনে বেতার যন্ত্রীদের অর্কেস্ট্রা শ্রবণরত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ

করলে ভারতে মেলাটি সম্ভব হতে পারে, তার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। উনেস্কো থেকে এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রযোজক সংঘকে অনুরোধ করা হয়। কারণ সংঘের সিদ্ধান্ত অটুট থাকলে তার সভ্য দেশগুলি যার মধ্যে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি বড়ো বড়ো চিত্র-নির্মাতা দেশগুলিই পড়ে তারা ছবি পাঠাতে পারেন। শেষ পর্যন্ত সংঘ তাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন এবং জানান যে, বিশেষ পাত্র হিসেবে ভারতের মেলাটি তারা আন্তর্জাতিক বলেই স্বীকৃতি দান করবেন, তবে কোন প্রতিযোগিতা হতে পারবে না। কাজেই ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলাটি প্রতিযোগিতা বর্জিত হয়েই অনুষ্ঠিত হওয়া সাব্যস্ত হয়। এইসব গোলমালের জন্যে মেলার তারিখ পিছিয়ে প্রথম উদ্বোধন ২৪শে জানুয়ারী বম্বেতে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির করা হয়।

ঠিক করা হয় যে, মেলাটি ২৪শে জানুয়ারী বম্বেতে উদ্বোধিত হয়ে সেখানে দু' সপ্তাহ থাকবার পরই এক সপ্তাহের জন্যে আসবে কলকাতায় এবং এখান থেকে এক সপ্তাহের জন্যে যাবে মাদ্রাজে। তারপর দিল্লীতে এক সপ্তাই অনুষ্ঠিত হয়ে শেষ হবে। কলকাতায় মাত্র এক সপ্তাহ রাখা হবে জেনে এখানকার পত্র-পত্রিকায় সময় আরও বাড়িয়ে দেবার যুক্তি দেখিয়ে মন্তব্য করা হয়। অক্টোবর মাসে মেলা সম্পর্কে কলকাতায় প্রথম যে সাংবাদিক সম্মেলন হয়, তাতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, কলকাতায় ছবির প্রদর্শনের সময় বাড়িয়ে দু' সপ্তাহ করা হবে এবং দরকার হলে তিন সপ্তাহও থাকবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, উদ্যোক্তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রাখতে রাজী নন। কলকাতায় মাত্র এক সপ্তাহই রাখা হবে।

মেলার জন্যে এক কেন্দ্রীয় ও তিনটি আঞ্চলিক উদ্যোক্তা কমিটি নির্বাচিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য হোচ্ছেন চেয়ারম্যান ক্লিফোর্ড মনোমোহন আগরওয়ালা, সম্পাদক মোহন ভাবনানী, সহ-সম্পাদক জে এন গুপ্ত ও এইচ এ কোলহটকর; সভ্যদের মধ্যে আছেন এস কে পাতিল, এইচ এন কুঞ্জরু, মাননীয় বিচারপতি এইচ এন ভগবতী, চন্ডুলাল শাহ, ভি শান্তারাম, বীরেন্দ্রনাথ

দমদম বিমান ঘাটিতে মার্কিন প্রতিনিধি মিঃ ফ্রাঙ্ক কাপরা এবং স্থানীয় উৎসব সংস্থার সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়

ফ্রান্সের আঁদ্রে ডেভিস—সঙ্গে ওয়াই এ ফজলভাই ও এম এ ফজলভাই

সরকার, মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, কমলা ডোঙগরকেরি, এস এস ভাসান, জগতনারায়ণ, এইচ এম রেড্ডী, পি ভি গ্যাডগিল, কে এম মোদী, জে বি এইচ ওয়াদীয়া, ডবলু এইচ মেসে, এস এ আয়ার, আমোলক চাঁদ, জেমস ম্যাকফারলেন, ফ্রাঙ্ক মোরেজ, রামাইয়া ভি টি ডি হেলি‌য়া, কে শ্রীনিবাসন, আর এম রায়, নার্গিস, বি ডি ভারুচা, এম ডি টাটা। তিনটি আঞ্চলিক কমিটির সভ্যদের মধ্যে আছেন কলকাতা—চেয়ারম্যান মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ও সভ্য বীরেন্দ্রনাথ সরকার, আর এম রায়, দেবকীকুমার বসু, সীতা চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ সরকার, এফ আর ভুরি ও ফণীন্দ্রনাথ বসু। মাদ্রাজ—চেয়ারম্যান এ ামিয়া ও সভ্য—এস এস ভাসান, এইচ এম রেড্ডী, কে শ্রীনিবাসন, মেরী ক্লাবওয়ালা, কে মনাথ ও এল এল প্যাটেল। দিল্লী—য়ারম্যান শঙ্করপ্রসাদ, সভ্য—এইচ এন রু, শ্রীরাম, রামেশ্বরী নেহরু, দুর্গা দাস, া কে সিদ্ধান্ত, ভি কে আর ভি রাও, তিনারায়ণ, পি এন ভাটিয়া, আমোলক , রাজেশ্বর দয়াল, রাজীন্দ্র নারায়ণ, ইউ মেহতা, মহেন্দ্রনাথ, ছটুভাই দেশাই, মোহিনী সেহগল, প্রঃ মোজীব ও কে মহানী।

লার যোগ্য ছবি নির্বাচনের জন্যে নির্বাচন কমিটি গঠিত হয়। ছবি-দেখার জন্যে তিনজন করে নিয়ে ছটি ল তৈরি হয়। প্যানেলদের বিচারে কোন মতানৈক্য হলে চূড়ান্ত বিচারের জন্যে একটি বোর্ড অফ রিভিউ গঠিত হয়। যাদের নিয়ে ঐ ছটি প্যানেল গঠিত হয়, তাদের নাম হচ্ছে—জে বি ওয়াদীয়া, ডি এন নাডকরনী, কে এ আব্বাস, কে এম মুলতানি, আদি মর্জবান, হোমী শেঠনা, শ্রীযুক্তা এম ডি ভাট, মীনাক্ষী বাখলে, মিসেস কেলক, মিসেস আগরওয়ালা, কমলা ডোঙগরকেরি, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী ভাবনানী, শ্রীমতী রমা রাও, রমা চট্টোপাধ্যায়, মেনন, চন্দুলাল শাহ, ডাঃ মনোহর, মুলকরাজ আনন্দ, হাকিন্স ও এজরা মির। বোর্ড অব রিভিউয়ের সভ্য হন—প্রধান বিচারপতি চাগলা, সি এম আগরওয়ালা, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, ভি শান্তারাম ও এস কে পাতিল।

মেলায় যে ২৩টি রাষ্ট্র যোগদান করেছে তারা হচ্ছে—যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইতালি, ফ্রান্স, চীন, জাপান, রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, আর্জেণ্টিনা, স্যুইটজারল্যাণ্ড, কানাডা, মিসর, যুগোশ্লাভিয়া, পাকিস্তান, পূর্ব আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নরওয়ে, নেদারল্যাণ্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও ভারত।

মেলায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্র—ফ্রাঙ্ক কাপরা, হ্যারী স্টোন, ফ্লয়েড ব্রুকার, কে ম্যাকেলডাউনী; রাশিয়া—এম সেমেনভ (চলচ্চিত্র দপ্তরের সহকারি মন্ত্রী), ভারলামেভ, ভি নিকেশা, জি মঙ্গোলভিস্কিয়া, এ সোলোগুভব, এ সোকোলনিকেভ, মির্নভোয়া, এ বোরিশেভ, ভি মারেজকায়া, পি কাদেচনিকভ, এন আরিপেভা ও এন কুলাইগিযাকিন; মিসর—মাননীয় মহম্মদ ফতে বে (শিক্ষা দপ্তরের কণ্ট্রোলার); চীন—যু ইন শিয়েন, শিয়ে লি-উইং, উ ওয়াই-উন, লি চিন ও কাই চাও; চেকোশ্লোভাকিয়া—মার্টিন ফ্রিক ও এফ ভোরাক; ফ্রান্স—জিন ডেভীস ও ফ্রাভেন; ইতালি—ভিনিচিও মেরী নুচি; হাঙ্গেরী—ডি রেভে।

বম্বেতে মেলাটি যথানির্দিষ্ট ২৪শে জানুয়ারী উদ্বোধিত হয় এবং ওখানে দু' সপ্তাহ থাকবার পর চলে যায় মাদ্রাজে। মাদ্রাজে এক সপ্তাহের পর এক ' সপ্তাহ স্থগিদ রাখা হয় মৃত রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য। দিল্লীতে আরম্ভ হওয়ার কথা ছিলো ১৪ই ফেব্রুয়ারী। সে জায়গায় আরম্ভ হয় ২১শে। কাজেই কলকাতায়ও তারিখ এক সপ্তাহ পিছিয়ে গিয়ে ২৮শেতে এসে পড়েছে।

বম্বেতে যখন উদ্বোধন হয়, তখন সবদেশ মিলিয়ে পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবির সংখ্যা ছিলো ৪২ এবং ছোট প্রামাণ্য ছবি ৮০। বম্বের পরে বড়ো ছবির সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করে। পঞ্চাশে দাঁড়ায় এবং কিছু কিছু পরিবর্তনও হয়। কলকাতায় যেসব বড়ো ছবি দেখানো হবে, তার তালিকা বেড়ে বোধ হয় ১০০তে দাঁড়াবে। বড়ো ছবি যেগুলি দেখাবার সম্ভাবনা আছে, সেগুলি হচ্ছেঃ আর্জেণ্টিনাঃ দি লাস্ট স্কোয়াড; চীনঃ হোয়াইট হেয়ারড গার্ল ও দি গ্রেট ইউনিটি

আন্তর্জাতিক মর্যাদা পাবার মতো নিউ থিয়েটার্সের আগামী ছবি, কার্তিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'মহাপ্রস্থানের পথে'-র একটি দৃশ্যে প্রবোধ সান্যাল (বসন্ত চৌধুরী) ও রাণী (অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়)

অব অল নেশনস; চেকোশ্লোভাকিয়াঃ দি ট্র্যাপ ও ভিক্টোরিয়াস উইংগস; মিসরঃ নাইল বয়, লায়লেটে ঘারম; ফ্রান্সঃ লাইফ বিগিনস, ডেজার্ট ওয়েটিং, ফিয়ারলেস জার্নি, টুমরো, রীভস দ্য আমুর, টরেন্ট বিয়ণ্ড দি গেটস, চিলড্রেন অফ প্যারাডাইস, জ্যুর দ্য ফেত, ব্লাইণ্ড ব্লু রিয়ার্ড, দি গ্রেট ম্যান, মারসীলেস, মঁসিয়ে ভিনসেণ্ট, ডিজায়ার, ভিসিট টু প্যারিস; হাঙ্গেরীঃ মিসেস ডেরী, কনোনী আণ্ডার গ্রাউণ্ড; ভারতঃ আওয়ারা অমর ভূপালী, পাতাল ভৈরবী, বাবলা; ইতালিঃ বাইসিকল থীপ, ফরবিডন ক্রাইস্ট, মিরাকল অফ মিলান, পাথ অফ হোপ, দেয়ার ইজ নো পিস এমঙ্গ অলিভ ট্রিজ, ওপন সিটি, মিলিওনিয়ার অফ নেপলস; জাপানঃ যুকিওয়ারিশু ও লাইফ অফ গৌতম বুদ্ধ; রুমানিয়াঃ ভিক্টরী অফ লাইফ; স্যুইটজারল্যাণ্ডঃ ফোর ইন এ জীপ; যুক্তরাজ্যঃ ম্যান ইন দি হোয়াইট স্যুট, ম্যাজিক বক্স, লাইফ ইন হার হ্যাণ্ডস, গার্ল অফ দি মার্স, মার্ডার ইন দি ক্যাথেড্রাল, ক্রাই মাই বিলাভেড কাণ্ট্রি; যুক্তরাষ্ট্রঃ এলিস ইন ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড, এমেরিকান ইন প্যারিস, ম্যাগনিফিসাণ্ট ইয়াঙ্কী, ব্রাইট ভিক্টরী, নো হাইওয়ে অন দি স্কাই; রাশিয়াঃ ফল অফ বার্লিন, ডনবাস মাইনর্স, ক্যাভেলিয়ার অফ দি গোল্ডেন স্টার, লিবারেটেড চায়না, মুসোরোগস্কী, অন দি সার্কাস এরিনা, গ্র্যাণ্ড কনসার্ট, টাইমস অফ পিস, বাউণ্টিফুল সামার; যুগোশ্লাভিয়াঃ ফ্র বার্ন।

প্রত্যহ একখানি করে ছবি একটি চিত্রগৃহে দেখানো হবে। নির্বাচিত চিত্রগৃহ দশটি হচ্ছেঃ এলিট, মিনার্ভা, লাইট হাউস, বসুশ্রী, বীণা, প্রাচী, পূর্ণ, উত্তরা, মেনকা, চিত্রা। প্রত্যহ তিনটি করে প্রদর্শনী হবে এবং টিকিটের চলতি হারই বজায় রাখা হবে।

এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা কেবলমাত্র এশিয়াতেই প্রথম নয়, এতো দেশের এতোগুলি ভাষার এতো ছবি একই সময়ে পৃথিবীর কোথাও কখনও দেখানো হয়নি। সাংস্কৃতিক সম্মেলনের দিক থেকে এটি সমগ্র পৃথিবীরই একটি স্মরণীয় ঘটনা।

স্থানীয় বিশেষ উদ্যোগ

২৮শে ফেব্রুয়ারী চলচ্চিত্র মেলাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হবে ইডেন গার্ডেনসে, সেখানে এখানকার বেঙ্গল মোসা পিকচার্স এসোসিয়েশন এই উপলক্ষে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্র মেলাটি বৃহস্পতিবা উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমা মুখোপাধ্যায়। প্রদর্শনীটি তারপর ১৫ দি সাধারণের জন্য খোলা থাকবে। প্রদর্শনীতে চলচ্চিত্র শিল্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বিবিধ ত এবং সেই সঙ্গে বহুবিধ সাংস্কৃতিক অন ষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একদিন চি তারকাদের নিয়ে একটি ক্রিকেট ম্যাচ এ আর একদিন চলচ্চিত্র শিল্পের ব্যক্তিদে স্পোর্টসেরও আয়োজন করা হয়েছে।

য়েহুদী মেনুহীন—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক

এক নজরে পৃথিবীর চলচ্চিত্র শিল্প

দেশ বিদেশের চিত্রগৃহ সংখ্যা ও দর্শক সমাগম

	জনসংখ্যা ঃ	চিত্রগৃহ সংখ্যা ঃ	মালিক ঃ	মোট আসন সংখ্যা ঃ	বার্ষিক দর্শক সমাগম ঃ	প্রতি হাজার জনে আসন সংখ্যা ঃ	জনপ্রতি বার্ষিক দর্শক সমাগম ঃ
আফ্রিকা ঃ							
মিসর	২,০০,৪৫,০০০	২২৬ (মুক্তপ্রাঙ্গণ প্রদর্শন ক্ষেত্র সমেত)	ব্যক্তিগত	২,০০,০০০	৪,২০,০০,০০০	১০	২
ইথিওপিয়া	১,৬৭,০০,০০০	৭	ব্যক্তিগত	৫,৪০০	...	০.৩	...
নাইবেরিয়া	১৬,৪৮,০০০	৩	ব্যক্তিগত	...	...	...	...
দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন	১,২১,০৮,০০০	৪১৩	ব্যক্তিগত	২,৩০,০০০	৫,৫০,০০,০০০	১৯	৫
বেলজিয়ান কঙ্গো	১,১০,৪৬,০০০	৩৪	ব্যক্তিগত	৬,০০০	...	০.৫	...
ফরাসী এলজিরিয়া	৮৭,৫১,০০০	২২০	ব্যক্তিগত	১,৩০,০০০	২,০০,০০,০০০	১৫	২
ফরাসী বিষুব আফ্রিকা	৪৩,৩২,০০০	৫	ব্যক্তিগত	১,০০০	...	০.২	...
ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড	৪৭,০০০	৩	ব্যক্তিগত	১,৬০০	৫,০০,০০০	৩৪	১১
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা	১,৬৪,৩২,০০০	৩৫ (মুক্তপ্রাঙ্গণ প্রদর্শন ক্ষেত্র সমেত)	ব্যক্তিগত	৪০,০০০	...	২	...
মাদাগাস্কার ও কমরো দ্বীপপুঞ্জ	৪০,৯৬,০০০	২৪	ব্যক্তিগত	১০,০০০	২৫,০০,০০০	২	১
ফরাসী মরক্কো	৮৫,৯৪,০০০	৯৫	ব্যক্তিগত	৬৫,০০০	১,২৫,০০,০০০	৮	২
রিইউনিয়ান	২,৫২,০০০	৯	ব্যক্তিগত	৩,৭০০	৪,৫০,০০০	১৫	২
তিউনিসিয়া	৩৩,৮৭,০০০	৫৬	ব্যক্তিগত	২৮,০০০ (কেবলমাত্র ৩৫ মিঃ মিঃ স্থায়ী গৃহ)	৮৫,০০,০০০	৮	৩
পর্তুগীজ এঙ্গোলা	৪৭,৯৭,০০০	২০	ব্যক্তিগত	৭,৩০০	...	২	...
কেপ ভার্ডে দ্বীপপুঞ্জ	১,৩৯,০০০	৩	ব্যক্তিগত	৭০০	...	৫	...
মোজাম্বিক	৬২,৫১,০০০	১৭	ব্যক্তিগত	৬,৮০০	৯,৪৭,০০০	১	০.২
সাও তোম ও প্রিন্সাইপ	৬২,০০০	১	ব্যক্তিগত	৫০০	...	৮	...
বেচুয়ানাল্যাণ্ড	৩,০০,০০০	৩	ব্যক্তিগত	...	...	...	...
গোল্ডকোষ্ট ও অধীনস্থ রাজ্য	৩৭,৩৯,০০০	১৪	ব্যক্তিগত	১১,৫০০	...	৩	...
কেনিয়া	৫৪,৫৪,০০০	২০	ব্যক্তিগত	...	...	...	...
নাইজিরিয়া	২,৪০,৮১,০০০	২৫	ব্যক্তিগত	১৩,৩০০	...	০.৬	...
উত্তর রোডেসিয়া	১৬,৪৫,০০০	২৪ (কয়েকটি স্থায়ী ১৬ মিঃ মিঃ চিত্রগৃহ সমেত)	ব্যক্তিগত	১৪,০০০	৬,৫০,০০০	৯	০.৪
নিয়াসাল্যাণ্ড	২১,৮২,০০০	৬	ব্যক্তিগত	১,৮০০	...	১	...
সেণ্টহেলেনা ও অধীন রাজ্য	৫,০০০	১	ব্যক্তিগত	...	...	...	...
সিয়েরালিওন	২০,৯৫,০০০	১	ব্যক্তিগত	...	...	...	...
দক্ষিণ রোডেসিয়া	২০,২২,০০০	১৫	ব্যক্তিগত	...	...	...	...
সোয়াজিল্যাণ্ড	১,৯৪,০০০	১	ব্যক্তিগত	৮০০	...	...	...
উগাণ্ডা	৫০,০৮,০০০	১০	ব্যক্তিগত	...	...	...	...
টাঙ্গানাইকা	৭৫,১৪,০০০	২০	ব্যক্তিগত	...	...	...	...
টোগোল্যাণ্ড	৩,৮৮,০০০	২	ব্যক্তিগত	১,৪০০	২,৫০,০০০	১	০.৩
ইরিট্রিয়া	১০,৯০,০০০	১৭ (মুক্তপ্রাঙ্গণ প্রদর্শন ক্ষেত্র সমেত)	ব্যক্তিগত	১৭,০০০	...	১৬	...
সুদান	৮০,৩৮,০০০	১২ (মুক্তপ্রাঙ্গণ প্রদর্শন ক্ষেত্র সমেত)	ব্যক্তিগত	১৩,১০০	...	২	...

দেশ	জনসংখ্যা:	চিত্রগৃহ সংখ্যা :	মালিক :	মোট আসন সংখ্যা :	বার্ষিক দর্শক সমাগম :	প্রতি হাজার জনে আসন সংখ্যা :	জনপ্রতি বার্ষিক দর্শক সমাগম :
তাঞ্জিয়ার	১,৫০,০০০	৮	ব্যক্তিগত	৫,৪০০	…	৩৬	…
উত্তর আমেরিকা :							
কানাডা (নিউফাউন্ডল্যান্ড ও ল্যাবরাডার সংযুক্ত)	১,৩৫,৪৯,০০০	১,৯৫০	ব্যক্তিগত	৯,৩১,০০০	২২,২৪,৫৯,০০০	৬৮	১৭
কোস্টারিকা	৮,৩৭,০০০	১০০	ব্যক্তিগত	৫০,০০০	২,৫০,০০,০০০	৬০	৩০
কিউবা	৫১,৯৯,০০০	৫১৬	ব্যক্তিগত	৩,০০,০০০	৫,৫০,০০,০০০	৫৮	১১
ডোমিনিকান রিপাবলিক	২২,৭৭,০০০	৫৫	ব্যক্তিগত	২২,০০০	১,৫০,০০,০০০	১০	৭
এল সালভেডোর	২১,৫০,০০০	৩২	ব্যক্তিগত ও পৌর	৩৭,৭০০	১,৬০,০০,০০০	১৮	৭
গুয়াটেমালা	৩৭,৮৪,০০০	২৫ (৩৬টি ৩৫ মিঃ ও ১০টি ১৬ মিঃ চিত্রগৃহও আছে)	ব্যক্তিগত	২৮,০০০	৬০,০০,০০০	৭	২
	…						
হাইতী	৩৭,৫০,০০০	২৪	ব্যক্তিগত	…	১০,০০,০০০	…	০.৩
হন্ডুরাস	১৩,২৬,০০০	২৮	ব্যক্তিগত	২৩,৬০০	২৫,০০,০০০	১৮	২
মেক্সিকো	২,৪৪,৪৮,০০০	১,৭২৬	ব্যক্তিগত	১৪,০০,০০০	১০,৪০,০০,০০০	৫৭	৪
নাইকারগুয়া	১১,৪৮,০০০	১৫৩	ব্যক্তিগত	৪৪,০০০	৩৭,৪৭,০০০	৭৪	৩
পানামা	৭,৬৪,০০০	৬০	ব্যক্তিগত	৩৯,০০০	৯০,০০,০০০	৫১	১২
যুক্তরাষ্ট্র	১৫,০৬,৯৭,০০০	২০,২০৯	ব্যক্তিগত	১,১৭,২৩,০০০	৩,৩৬,০০,০০,০০০	৭৪	২২
গ্রীনল্যান্ড	২৩,০০০	৮	…	…	…	…	…
গুয়াদেলুপে ও অধীন রাজ্য	২,৮১,০০০	১৬	ব্যক্তিগত	৬,০০০	…	২১	…
মার্টিনিক	২,৬৮,০০০	৩১	ব্যক্তিগত	১১,০০০	…	৪১	…
কুরাকাও	৯৩,০০০	১৪	ব্যক্তিগত	৮,০০০	৩,৬৫,০০০	৮৬	৪
বারমুডাস	৩৭,০০০	১৫	ব্যক্তিগত	৪,৪০০	৪,২৫,০০০	১১৪	১২
ব্রিটিশ হন্ডুরাস	৬৫,০০০	৫	ব্যক্তিগত	২,২৫০	২,৫০,০০০	৩৫	৪
বাহামা দ্বীপপুঞ্জ	৭৮,০০০	৫	ব্যক্তিগত	২,৫০০	…	৩২	…
বারবাডোস	২,০৪,০০০	৩	…	২,০৫০	…	১০	…
জামাইকা	১৩,৭৩,০০০	৩৪	ব্যক্তিগত	২৪,০০০	৩০,০০,০০০	১৭	২
লিওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ	১,১০,০০০	৬	ব্যক্তিগত	২,৬০০	…	২৪	…
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	৬,০৪,০০০	৪৪	ব্যক্তিগত	২৯,৭০০	…	৪৯	…
উইন্ডওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জ	২,৬৮,০০০	৪	ব্যক্তিগত	২৪,০০০	…	১০	…
পুয়েরতোরিকো	২১,৭১,০০০	১৩০	ব্যক্তিগত	৭০,০০০	…	৩২	…
দক্ষিণ আমেরিকা :	…						
আর্জেন্টিনা	১,৬৫,৫৫,০০০	১৪৮১	ব্যক্তিগত	৯,০০,০০০	১১,০০,০০,০০০	৫৪	৭
বোলিভিয়া	৩৯,৯০,০০০	৬০	ব্যক্তিগত	৩২,০০০	৬০,০০,০০০	৮	২
ব্রাজিল	৪,৯৩,৫০,০০০	১,৭৩৬	ব্যক্তিগত	১০,০০,০০০	১৫,০০,০০,০০০	২০	৩
চিলি	৫৭,০৯,০০০	৩০০	ব্যক্তিগত ও পৌর	২,৬০,০০০	২,৪০,০০,০০০	৪৫	৫
কলোম্বিয়া	১,১০,১৫,০০০	৫০০	ব্যক্তিগত	৩,০০,০০০	৩,৯০,০০,০০০	২৭	৪
ইকোয়েডর	৩৪,০৪,০০০	৭১	ব্যক্তিগত	৭৬,০০০	৭১,০০,০০০	২২	২
প্যারাগোয়ে	১৩,০৪,০০০	৪০ (মুক্তপ্রাঙ্গণ প্রদর্শন ক্ষেত্র সমেত)	ব্যক্তিগত ও পৌর	১১,০০০	১০,০০,০০০	৮	১
পেরু	৮২,০৪,০০০	২৩৫	ব্যক্তিগত	১,৪০,০০০	৫,০০,০০,০০০	২২	৬
উরুগোয়ে	২৩,৫৩,০০০	১৭৭	ব্যক্তিগত	১,১০,০০০	…	৪৭	…
ভেনিজুয়েলা	৪৫,৯৬,০০০	৩৫০	ব্যক্তিগত	১,৫০,০০০ (কেবলমাত্র ৩৫ মিঃ পাকা চিত্রগৃহ)	৩,০০,০০,০০০	৩৩	৭
	…						
ফরাসী গায়ানা	২৯,০০০	৩	ব্যক্তিগত	১,০০০	…	৩৪	…
সুরিনাম	১,৮৮,০০০	৭	ব্যক্তিগত	৫,২০০	১,৪৫,০০০	২৭	১
ব্রিটিশ গায়ানা	৪,০২,০০০	৩৯	ব্যক্তিগত	৩১,০০০	৫০,০০,০০০	৭৭	১২
এশিয়া :							
আফগানিস্তান	১,২০,০০,০০০	৪	পৌর	২,৫০০	৭,০০,০০০	০.২	০.০[illegible]
ব্রহ্মদেশ	১,৮২,০০,০০০	১৫০	ব্যক্তিগত	…	১,০০,০০,০০০	…	১
সিংহল	৭২,৯৭,০০০	৯৫	ব্যক্তিগত	৫০,০০০	৫০,০০,০০০	৭	১

	জনসংখ্যা :	চিত্রগৃহ সংখ্যা :	মালিক :	মোট আসন সংখ্যা :	বার্ষিক দর্শক সমাগম :	প্রতি হাজার জনে আসন সংখ্যা :	জনপ্রতি বার্ষিক দর্শক সমাগম :
চীন	৪৬,৩৫,০০,০০০	৮১৫	ব্যক্তিগত	৫,০০,০০০	...	১	...
ভারতবর্ষ	**৩৪,৬০,০০,০০০**	**২,০৬০** (ইহা ছাড়া ৯০০ অস্থায়ী প্রদর্শন ক্ষেত্র)	**ব্যক্তিগত**	**১৩,৯৪,০০০**	**২৫,০০,০০,০০০**	**৪**	**১**
ইরাক	৪৯,৯০,০০০	৭১ (৩২ মুক্তপ্রাঙ্গণ প্রদর্শন ক্ষেত্র সমেত)	ব্যক্তিগত	৬৫,০০০	২,৫০,০০,০০০	১৩	৫
ইন্দোনেসিয়া	৭,৯২,৬০,০০০	২৬০	ব্যক্তিগত	১,১৭,০০০	৫,০০,০০,০০০	১	১
ইসরায়েল	১০,৫৭,০০০	১০০	ব্যক্তিগত	৬০,০০০	৪,০০,০০,০০০	৫৭	৩৮
জাপান	৮,২১,৫১,০০০	২,২২৫	ব্যক্তিগত	৬,৫৮,০০০	৬১,০০,০০,০০০	৮	৭
জর্ডন	৪,০০,০০০	১৭	ব্যক্তিগত	৮,০০০	১৫,০০,০০০	২০	৪
দক্ষিণ কোরিয়া	২,০১,৪৯,০০০	১১৬	ব্যক্তিগত	৫৫,১০০	১,১৪,৪০,০০০	৩	১
লেবানন	১২,৩৮,০০০	৪৮	ব্যক্তিগত	২৪,০০০	৬০,০০,০০০	১৯	৫
পাকিস্থান	৭,৪৪,৩৭,০০০	২২৮	ব্যক্তিগত	...	...	...	...
পারস্য	১,৮৩,৮৭,০০০	৮০	ব্যক্তিগত	৬৫,০০০	৯০,০০,০০০	৪	১
ফিলিপাইন	১,৯৩,৫৬,০০০	৭০০ (ইহা ছাড়া ৫০ ভ্রাম্যমান চিত্রগৃহ আছে)	...	...	২,৫০,০০,০০০	...	১
সিরিয়া	৩৪,০৭,০০০	৫০	ব্যক্তিগত	২৭,০০০	৫০,০০,০০০	৮	১
থাইল্যাণ্ড	১,৭৯,৮৭,০০০	১২০	ব্যক্তিগত	৩৫,০০০	১,৫০,০০,০০০	২	১
তুরস্ক	১,৯৬,২৩,০০০	২৭৫	ব্যক্তিগত	১,৭৫,০০০	২,৫০,০০,০০০	৯	১
ইন্দোচীন	২,৭৪,৬০,০০০	৬০	ব্যক্তিগত	২৫,০০০	৯০,০০,০০০	১	০.৩
ম্যাকাও	৪,০০,০০০	৬	ব্যক্তিগত	৪,৮০০	...	১২	...
পর্তুগীজ ভারত	৬,৬৭,০০০	৬	ব্যক্তিগত	২,০০০	...	৩	...
এডেন	৭,৩২,০০০	৭	ব্যক্তিগত ও পৌর	৫,০০০	১২,৫০,০০০	৭	২
সাইপ্রাস	৪,৬৭,০০০	৮৬	ব্যক্তিগত	৫৬,০০০	৪০,০০,০০০	১২০	৯
হংকং	১৮,৫৭,০০০	২৭	ব্যক্তিগত	৩৫,৫০০	...	১৯	...
মালয় ও সিংগাপুর	৬০,০০,০০০	১০০ (ইহা ছাড়া বহু ভ্রাম্যমান চিত্রগৃহ)	ব্যক্তিগত	...	...	...	...
ইউরোপ :							
আলবেনিয়া	১১,৮৬,০০০	১৪	পৌর	...	...	...	...
অস্ট্রিয়া	৭০,৯০,০০০	৭৯০	ব্যক্তিগত (কয়েকটি পৌর)	২,৪০,০০০	৯,০০,০০,০০০	৩৪	১৩
বেলজিয়াম	৮৬,১৪,০০০	১,৩৫৫	ব্যক্তিগত	৭,৫৭,০০০	১৩,৪৩,২৪,০০০	৮৮	১৬
বুলগেরিয়া	৭১,৬০,০০০	২৯১	পৌর	৯৬,০০০	...	১৩	...
চেকোশ্লোভাকিয়া	১,২৪,৬৩,০০০	২,২৬৮	পৌর	...	১১,০০,০০,০০০	...	৯
ডেনমার্ক (ফেরোস দ্বীপ সংযুক্ত)	৪২,৬১,০০০	৪৩০	ব্যক্তিগত	১,৩৫,০০০	৫,৪০,১০,০০০	৩২	১৩
ফিনল্যাণ্ড	৪০,১৫,০০০	৪৭১	ব্যক্তিগত	১,৩৩,০০০	৩,০০,০০,০০০	৩৩	৭
ফ্রান্স	৪,১১,৮০,০০০	৫,৩০০ (ইহা ছাড়া ১২২৪টি ১৬ মিঃ স্থায়ী চিত্রগৃহ আছে)	ব্যক্তিগত	২৬,৫০,০০০	৩৭,০০,০০,০০০	৬৪	৯
জার্মানী	৬,৯৩,৮২,০০০	৫,৮৩২	ব্যক্তিগত	২৩,৫০,০০০	...	৩৪	...
গ্রীস (ডোডিকানিজ সংযুক্ত)	৭৮,৫২,০০০	৪০২ (২২৩ গ্রীষ্মকালীন চিত্রগৃহ: ১৭৯ শীতকালীন চিত্রগৃহ)	ব্যক্তিগত	...	৩,৫০,০০,০০০	...	৪
হাঙ্গেরী	৯২,২৪,০০০	৫২৬ (ইহা ছাড়া ২০০ স্থায়ী ১৬ মিঃ ও	পৌর	১,৩৪,৫০০	৫,০০,০০,০০০	১৫	৫

দেশ	জনসংখ্যা :	চিত্রগৃহ সংখ্যা :	মালিক :	মোট আসন সংখ্যা :	বার্ষিক দর্শক সমাগম :	প্রতি হাজার জনে আসন সংখ্যা :	জনপ্রতি বার্ষিক দর্শক সমাগম :
আইসল্যাণ্ড	১,৪০,০০০	৪৩	ব্যক্তিগত	১২,০০০	...	৮৬	...
আয়ারল্যাণ্ড	২৯,৯১,০০০	৩৪৪	ব্যক্তিগত	২,০০,০০০	৪,৪০,০০,০০০	৬৭	১৫
ইতালী	৪,৬০,০১,০০০	৭,৫০০ (ইহা ছাড়া ৪৩৪০ স্থায়ী ১৬ মিঃ চিত্রগৃহ আছে)	ব্যক্তিগত	৪০,০০,০০০	৫৭,৯৫,০০,০০০	৮৭	১৩
লাইকটেনস্টাইন	১৩,০০০	২	ব্যক্তিগত	৩৫০	৩০,০০০	২৭	২
লাক্সেমবুর্গ	২,৯৫,০০০	২৯	ব্যক্তিগত	...	২৭,৫০,০০০	...	৯
মোনাকো	২০,০০০	...	ব্যক্তিগত	...	...	...	...
নেদারল্যাণ্ডস	৯৯,৫৫,০০০	৪৪৮ (২০ ভ্রাম্যমান চিত্রগৃহ আছে)	ব্যক্তিগত	২,৩০,০০০	৭,৫০,০০,০০০	২৩	৮
নরওয়ে	৩২,৩৩,০০০	৪১১	ব্যক্তিগত ও পৌর	১,২০,০০০	২,৯৭,২১,০০০	৩৭	৯
পোল্যাণ্ড	২,৪৫,০০,০০০	৫৭৪	পৌর	২,৩০,০০০	১০,২০,০০,০০০	৯	৪
পর্তুগাল (এজোর্স ও মেডেরা সংযুক্ত)	৮৪,১১,০০০	৪০১	ব্যক্তিগত	২,৪২,০০০	১,৯৯,০৪,০০০	২৮	২
রুমানিয়া	১,৬০,০৭,০০০	৩৫০	পৌর	১,০৪,০০০	...	৭	...
সান মারিনো	১৫,০০০	৩	পৌর	৬০০	৫০,০০০	৪০	৩
স্পেন (বলেরিক ও কানারীজ দ্বীপপুঞ্জ সমেত)	২,৮০,২৩,০০০	৩,৫৮৩	ব্যক্তিগত	১৭,১৫,০০০	৩১,২০,০০,০০০	৬১	১১
সুইডেন	৬৯,৫৬,০০০	২,৪৪৪	ব্যক্তিগত	৭,২০,০০০	৫,০০,০০,০০০	১০৩	৭
সুইটজারল্যাণ্ড	৪৬,৪৫,০০০	৪১০	ব্যক্তিগত	১,৪০,০০০	৩,৫০,০০,০০০	৩০	৮
রাশিয়া	১৯,৩০,০০,০০০	৪৬,৯০০ (প্রক্ষেপণ যন্ত্র)	পৌর	...	১,১০,০০,০০,০০০	...	৬
যুক্তরাজ্য	৫,০৬,৩৩,০০০	৪,৭৫৫	ব্যক্তিগত	৪৩,৩০,০০০	১,৪৫,৬০,০০,০০০	৮৬	২৯
ভ্যাটিকান সিটি	১,০০০	২	পৌর	...	...	...	...
যুগোস্লোভিয়া	১,৬০,৪০,০০০	৯৫৭	পৌর	২,৫৮,৩০০	৬,৬৭,৬৭,০০০	১৬	৪
জিব্রাল্টার	২৪,০০০	৩	ব্যক্তিগত	১,৯০০	...	৭৯	...
মাল্টা ও গোজো	৩,১২,০০০	২৬	ব্যক্তিগত	১৩,৩০০	...	৪৩	...
ট্রিস্ত	৩,৮১,০০০	৩৩	ব্যক্তিগত	১২,৬০০	...	৩৩	...
ওসিয়ানিয়া :							
অস্ট্রেলিয়া	৭৯,১২,০০০	১,৬৭৬ (ইহা ছাড়া ৫৪ ভ্রাম্যমান চিত্রাগার আছে)	ব্যক্তিগত	১৪,৫০,০০০	১১,৫০,০০,০০০	১৮৩	২৫
নিউজিল্যাণ্ড	১৮,৮১,০০০	৫৭০	ব্যক্তিগত	২,৭১,০০০	৩,৪০,৭৮,০০০	১৪৪	১৮
ফরাসী ওসিয়ানিয়া	৫৯,০০০	৭	ব্যক্তিগত	২,৭০০	২,০০,০০০	৪৬	৪
নিউ ক্যালেডোনিয়া	৫০,০০০	৬	ব্যক্তিগত	৩,০০০	৩,০০,০০০	৬০	৬
ফিজি দ্বীপপুঞ্জ	২,৭৬,০০০	১৫	ব্যক্তিগত	৫,৩০০	৪,৭৮,০০০	২০	২

চলচ্চিত্র ও জনসাধারণ

পঙ্কজ দত্ত
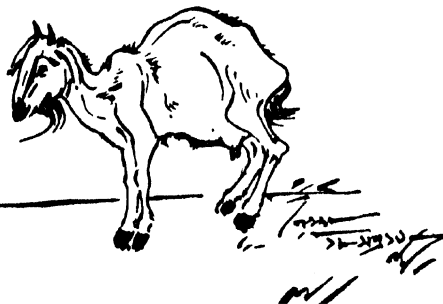
১৯৪৯ সালের ৩০শে জুন ভারতের চলচ্চিত্র শিল্প একটা অভাবনীয় কান্ড করে বসলো। সারা দেশের দু হাজারেরও বেশী সিনেমা একজোট হয়ে সেদিনকার সারাদিনের প্রদর্শনী বন্ধ করে দিলে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানালে সেদিন এই বলে যে গভর্নমেণ্টরা কেবল প্রমোদ-কর বাড়িয়েই চলেছে অথচ চলচ্চিত্র শিল্পের আর্থিক দুর্গতি যে চরমে গিয়ে পে'ৗচচ্ছে সেদিকে কোন হুঁশই দিতে চাইছে না। ধর্মঘটের ব্যাপারটা গভর্নমেণ্টের কাছে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো এই জন্যে যে, যে-চলচ্চিত্র শিল্পের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা কল্পনারও বাইরে ছিলো, ঐ দিনের ধর্মঘটের ব্যাপারে তাদের একতা অবজ্ঞা করার বিষয় নয়। তখন সরকারি মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, চলচ্চিত্র শিল্পের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার ব্যবস্থা করা হবে।

এর আগে ১৯৪৯ সালের ২৬শে মার্চ রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ বিতর্কের সময় খবর ও বেতার মন্ত্রী শ্রী আর আর দিবাকর চলচ্চিত্র শিল্পের অবস্থা বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনার আবশ্যকতার কথা বিধান পরিষদে তুলেছিলেন। সেই মতো ঐ বছরেরই ২৯শে আগস্ট কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট একটি চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটি ঘোষণা করেন যার কাজ দেওয়া হয়—

(ক) ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের উৎপত্তি ও গঠন সম্পর্কে তদন্ত করা এবং উন্নতির উপায় অনুমোদন করা;

(খ) জাতীয় ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সুস্থ প্রমোদ প্রসারের যন্ত্র হিসাবে চলচ্চিত্রকে কিভাবে সক্ষম করে তোলা যায় তার উপায় নির্ধারণ এবং

(গ) এদেশে কাঁচা ফিল্ম ও চলচ্চিত্রের যন্ত্রপাতির উৎপাদন সম্ভাবনা তদন্ত করা এবং কাঁচা ফিল্ম ও যন্ত্রপাতি আমদানী ব্যাপারেও নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনে কি আদর্শ অবলম্বন করা যায় তার নির্দেশ দেওয়া।

কমিটির সভ্য নিযুক্ত হনঃ চেয়ারম্যান—শ্রী এস কে পাতিল এবং সভ্যগণ—শ্রী এম সত্যনারায়ণ, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রী ভি শান্তারাম, শ্রী আর পি ত্রিপাঠী এবং শ্রী ভি শঙ্কর। শ্রী এস গোপালন কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হন।

সেপ্টেম্বর মাস থেকেই কমিটি কাজ আরম্ভ করে দেয়। চলচ্চিত্র শিল্পের প্রকৃত তথ্য অবগত হবার জন্যে কমিটি চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে ৩,৬৩০টি প্রশ্নপত্র পাঠান; তাছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ের জনসাধারণ ও জনপ্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠানো হয় ৩,৫১০ খানি প্রশ্নপত্র। এ ছাড়া কমিটি এলাহাবাদ, দিল্লী, বম্বে, বাঙ্গালোর, কলিকাতা, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, পুণা ও পাটনা মিলে ৪৩ দিন ধরে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বা জনসাধারণের মধ্যে থেকে মোট ৩৩৯জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে।

"চলচ্চিত্র ও জনসাধারণ" এই পর্যায়ে যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার প্রশ্নপত্র পাঠানো হয় তার মধ্যে মাত্র ২২২জন উত্তর পাঠিয়েছিলেন। চলচ্চিত্র শিল্পের বাইরে যাদের

ম্যাজিক বক্স (ব্রিটিশ)—ফ্রিজ গ্রীনের ভূমিকায় রবার্ট ডোনার্ট

এ ভিজিট টু প্যারীস (ফ্রান্স)

কাছে প্রশ্নপত্র পাঠানো হয়েছিলো তাদের মধ্যে ছিলেন—

৩০০ জন পার্লামেণ্ট সদস্য
১২৫০ „ রাজ্য পরিষদের সদস্য
৬০০ „ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের হোতা
৫০ „ ভাইস চ্যান্সেলার ও রেজিস্ট্রার
৭৫০ „ কলেজ অধ্যক্ষ
১০ „ প্রধানশিক্ষক ও শিক্ষক
২৫০ „ লাইসেন্স কর্তৃপক্ষ
১৫০ „ সেন্সর বোর্ডের সদস্য
১৫০ „ সাংবাদিক

পার্লামেণ্ট ও বিভিন্ন রাজ্য পরিষদের প্রায় দেড় হাজার সদস্যের মধ্যে মাত্র দশজন প্রশ্নপত্রের উত্তর পাঠিয়েছিলেন এবং শিক্ষাব্রতীদের কাছে পাঠানো প্রায় ৮০০ খানি প্রশ্নপত্রের মধ্যে মাত্র ৮০ খানির জবাব এসেছিল। চলচ্চিত্রের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক নির্ধারণের জন্যে কমিটি ইউনেস্কো, বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কমিটির তদন্ত বিবরণ ও অনুশীলন কাজে লাগিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে কমিটি জনসাধারণের ওপরে চলচ্চিত্রের প্রভাব এবং চলচ্চিত্রের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক বিষয়ে যে নির্ধারণে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে, এখানে সেই বিবরণী দেওয়া হলো।

সংযোগের উপায় হিসাবে চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্রকে কমিটি বর্ণনা করেছে গতি সমন্বিত ধারাবাহিক কতকগুলো ফটোগ্রাফের সমষ্টি বলে। চলচ্চিত্র এইভাবে এমনি একটা ছাপ দেবার চেষ্টা করে যে যা কিছু ঘটছে তা দর্শকদের সামনেই। এতে চলচ্চিত্রের গতিতে একটা স্পষ্টতা, জীবন ও ভাবাবেগের একটা অনুভূতি এবং অত্যন্ত মানবিক একটা আবেদন সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়। জনসাধারণ বা সমাজের দিক থেকে চলচ্চিত্রের শক্তি ও বিপদ এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে।

কমিটির বিবরণে প্রকাশ যে, বর্তমানে ভারতে প্রতিদিন গড়ে ষোল লক্ষ লোক ছবি দেখে অর্থাৎ প্রভাব বিস্তারে দৈনিক সংবাদপত্রের সঙ্গে তুলনীয়। প্রসারের দিক থেকে চলচ্চিত্র বেতারের প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক গ্রাহক এবং বোধ হয় তার চারগুণ বেশী শ্রোতার কাছে পৌঁছয়। তাছাড়া সংবাদপত্র ও বেতারের সঙ্গে চলচ্চিত্রের পার্থক্যের কতকগুলি কারণ আছে। চলচ্চিত্রের দৈনন্দিন দর্শকের মধ্যে যতো রকমভেদ আছে সংবাদপত্র বা বেতারের তা নেই। সংবাদপত্র ও বেতার একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে যতোটা যোগাযোগ স্থাপন করতে না পারে, চলচ্চিত্র প্রসারের ব্যাপকতায় এবং যুগপৎ চক্ষু ও কর্ণ উভয়েরই সামনে একটা রূপ তুলে ধরে তাতে সক্ষম হয়। এই যুক্ত আবেদন ছাপা চেহারার কাঠিন্য বা অপরটির অশরীরী চেহারাকে স্বতঃই ছাপিয়ে যায়। পাঠকদের কাছে সংবাদপত্রের সরাসরি আবেদন, অথবা পরিবারের মধ্যে বেতারের ঘরোয়া আবেদন, পরিবর্তিত হয় দর্শকদের কাছে চলচ্চিত্রের Polyvalent আবেদনে এবং অন্ধকার ঘরে শত শত লোকের মধ্যে বক্তব্যটা হাজির করা হয় ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক লোকের মধ্যে মানসিক প্রতিক্রিয়াকে স্পষ্টভাবে জাগিয়ে তুলে। এতে একটা জিনিসের সঙ্গে ব্যাপক সংযোগের অনুভূতি জাগে কিন্তু সেই সঙ্গে প্রত্যেকে নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী সূক্ষ্ম দিকগুলো বিশ্লেষণ করতে পারে এবং তার নিজস্ব ব্যক্তিগত ধারা অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তাছাড়া সংবাদপত্র পৌঁছয় শুধু তাদের কাছে যারা কোন একটি বিশেষ ভাষায় খানিকটা ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পেরেছে এবং তাতে সংবাদপত্রের আবেদন সৃষ্টির এবং ছাপ দেবার ক্ষমতা এবং তৎকালীন ভবিষ্যতে এই দুয়ের প্রসার সীমাবদ্ধ করে রাখে। বেতারের জন্যে দরকার যে ব্যক্তি এই সংবাহন সূত্রকে ব্যবহার করতে চায় তার যন্ত্রটি কেনা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খানিকটা মূলধন খাটানো; সংবাদ ও অনুষ্ঠানাদির একছত্র গভীর একটা ছাপও বেতার শ্রোতাদের মনে জেগে ওঠে। চলচ্চিত্র কিন্তু নানারকমের লোকের প্রয়োজ্যে তৈরী হয়ে যে কেউ প্রবেশ মূল্য দিতে পারে তারই কাছে হাজির হয় এবং সামগ্রীটি ব্যবহার করার জন্যে যে মূলধন দরকার হয় সেটা চলচ্চিত্র সিনেমাতে যা করতে পারে, সংশ্লিষ্ট শব্দযুক্ত চলন্ত ছবির সাহায্যে টেলিভিশনও বাড়িতে তা পারে, কিন্তু তবুও তার আবেদন বেতারের মতোই ঘরোয়া ও ব্যক্তিগতই হয়ে থাকবে। ভারতে টেলিভিশন যদিও সুদূরপরাহত, তবে যখন এসে পড়বে তখন সিনেমার মতো পৃথিবীর দিকে মুখ করে উন্মুক্ত বাতায়নের মধ্যে দিয়ে জীবন্ত বাস্তবকে দেখার ছাপ এনে দিতে পারবে না।

শিল্প পর্যায়ে চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বহু জনের দাবী এবং অনেক সমালোচকও মেনে নেন যে, চলচ্চিত্রও একটি শিল্পকলা। শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে, যথা অঙ্কন, খোদাই, সাহিত্য, সঙ্গীত হচ্ছে মাত্র একজনের কাজ। কোন একজনই কবিতা বা উপন্যাস রচনা করে, একটা মূর্তি গড়ে বা সুর রচনা করে। অপরের সহায়তা ব্যতিরেকেই সে তার কাজ

সম্পূর্ণ করতে পারে এবং দেহ আর আত্মাকে ঠিক রেখে দিতে পারলে তার সৃষ্টির জন্যে বেশী মূলধন দরকার হয় না। এটা ঠিক যে বই বা গানের ব্যাপারের জন্যে প্রকাশকদের মূলধনের দরকার, কিন্তু সৃজন-কার্যের ওপর তার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু চলচ্চিত্র হচ্ছে একটা সংবন্ধ প্রচেষ্টার ফল; চলচ্চিত্র যদি নিজের কথা বলতে পারতো তা হলে গভীর মানবিক আবেদনযুক্ত বাধা ও বিজয়ের নাটকীয় অভিযানকাহিনী ব্যক্ত করতো। শিল্প নির্দেশকের তৈরী সাজানো সেটের সামনে অভিনয়শিল্পীরা যে রূপ ও শব্দ সৃষ্টি করেন আলোচিত্রশিল্পী ও শব্দযোজক তা ধরে রাখেন। অভিনেতারা কাজ করেন আর একদল শিল্পী পরিকল্পিত ও সৃষ্ট সাজপোষাক পরে আরও একজন লোকের নির্দেশে যিনি পরিণত বস্তুটিতে নিজেরও কিছু যোগ করে দেন। এইভাবে, একটি সংযুক্ত কাজের সৃষ্টি হয় যাতে সকলেরই হাত থাকে, কিন্তু কোন একজন একার কৃতিত্ব দাবী করতে পারে না। পরিচালনা কাজে খানিকটা একাকীত্ব থাকে, কিন্তু তাও বিভিন্ন মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই-ভাবে চলচ্চিত্র বর্তমান যুগের একটা খাঁটি বস্তু যাতে সমবায় প্রয়াস ক্রমশঃই জন-প্রচেষ্টার আকারে পরিণত হচ্ছে; কার্যত সমগ্র শিল্প জগতেই ঐ রকম সহযোগিতার প্রসার ব্যক্ত করছে।

শিল্পের উৎপাদন হিসাবে চলচ্চিত্র

শিল্পের উৎপাদন রূপে চলচ্চিত্র, উৎপাদন পরিবেশন ও ব্যবহারে সমন্বয় নীতির নিখুঁত উদাহরণ। ছবি তৈরি হয় বহু কর্মীর সংযুক্ত প্রচেষ্টায়। এক তৃতীয় দল লোকের দ্বারা যন্ত্র সন্নিবেশিত গৃহে তা দেখানো হয়। অনেক সময়ে চলচ্চিত্র শিল্পের তিনটি ধাপই একই নিয়ন্ত্রণে চালিত হয়। ছবির প্রকৃতি নির্ভর করে উৎপাদন, পরি-বেশন ও প্রদর্শন অবস্থা অনুযায়ী এবং তার অস্তিত্ব ও আর্থিক সাফল্য নির্ভর করে এই ব্যাপারে যে চলচ্চিত্র হচ্ছে ব্যাপক উৎপাদন ও ব্যবহারের সামগ্রী। একখানি ছবির অনেকগুলি কপি তৈরীর সুযোগ এবং ছোট আকৃতি এবং হালকা ওজন এবং দর্শকদের সামনে প্রতিফলিত করার স্বল্প ব্যয় তৈরির প্রাথমিক খরচটাকে বহু ব্যবহারকারীর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া যায়। ঘুরিয়ে বলা যায় ব্যবহারকারীর বিরাট দলসমূহ বিপুল অর্থ

দী রিভার (কানওয়েলথ)—প্যাট্রিসিয়া ও রাধা শ্রীরাম

নির্মাতার হাতে তুলে দেয় এবং তিনি বহু সংখ্যক বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করেন, যাদের কেউই সম্পূর্ণ কাজটির অংশমাত্রের চেয়ে দায়ী থাকে না। উপরন্তু গ্রন্থ, গ্রামোফোন রেকর্ড, বেতার বা টেলিভিশনের মতো বুদ্ধিজাত শিল্প-গুলির মতো এরও খরিদ্দার লক্ষ লক্ষ এবং সেখানে ব্যক্তি বহুর মধ্যে হারিয়ে যায়। উৎপাদককে কোন প্রযোজকের ব্যক্তিগত ধারণা অনুযায়ী অথবা কোন চিত্রানুরাগীর ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী তৈরী হতে পারে না। যারা ব্যক্তিগত ধারণাকে পর্দায় প্রক্ষিপ্ত করতে চান তারা এই প্রাথমিক তত্ত্বটি যেনো মনে রাখেন।

চলচ্চিত্র বিষয়ে সংস্কার

চলচ্চিত্র শিল্পে যারা নিযুক্ত তারা এটিকে বিক্রী করে লাভ করার সামগ্রী বলে মুখ্যত বিচার করলেও, বাইরে অনেকে আছেন যাদের আশংকা চলচ্চিত্র ঠিক লোকের হাতে না পড়লে সাংঘাতিক প্রভাবশালী হয়ে পড়তে পারে এবং সমাজের ক্ষতি করতে পারে। এ সংস্কারটা অবশ্য কেবল চলচ্চিত্র সম্পর্কেই নয়। মুদ্রন যখন আবিষ্কৃত হয়, তখনকার নীতিবাগীশরা সবাই পড়তে পারে এবং লেখার মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত সবরকম চিন্তার সোপানে উঠতে পারবে এই ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। একথাটা লোকে ভুলে যায় যে, যা আবিষ্কৃত হয়েছে সেটা মুখ্যতই ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবেই। যারা চিন্তার প্রসার অপছন্দ করে তাদের ওপর আমাদের কোন সহানুভূতি নেই; আজকের পৃথিবীতে জ্ঞানার্জিত ফলভোগ কেবল জনকতকের জন্যে হতে পারে না। যা দেওয়া হবে তাই গৃহীত হবে এবং যা পরিবেশন করা হবে তাই রুচিকে তৃপ্ত করবে এবং প্রয়োজনকে মিটিয়ে দেবে এমন ধারণা করা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির পক্ষে অপমানসূচক।

শিল্পানুরাগীরা চলচ্চিত্রকে শিল্পসমন্বয়ের অংশ বলে মত দিলেও, লোকে যারা পয়সা দিয়ে দেখে তাদের অধিকসংখ্যকই মুখ্যত প্রমোদ বলেই গণ্য করে। যারা জনসাধারণের প্রমোদ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিয়ে আছেন, সময় অনুযায়ী তাদের ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের ইতিহাসের হিন্দু যুগে জনসাধারণের প্রমোদ-বিনোদনের দায়িত্ব ছিলো রাজার। প্রমোদ কলাসম্মত হোক আর নাই হোক, যে কোন শিল্পী লোককে প্রমোদ বিতরণ করতে চাইতো রাজা তাদের পৃষ্ঠপোষণা করতেন। রাজার পৃষ্ঠপোষিত এবং জনসাধারণের দেখবার সুযোগ হতে পারে এমন অভিনয় নাচ বা গান ছাড়া কোন উৎসবই সম্পূর্ণ হতো না। পরবর্তীকালে খানিকটা ধর্মের গোঁড়ামির প্রভাবে এবং খানিকটা পরস্পর রাজ্য ও জাতির মধ্যে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের ফলে শিল্পসম্মত বা প্রমোদঅনুসৃত সামাজিক অনুষ্ঠানে

'বাবলা' (ভারত)—শোভা সেন ও নীরেন্দ্র

রাজাদের পৃষ্ঠপোষণা হ্রাস পেতে থাকে। ভারতে, বিদেশী শাসনে এই ঝোঁকটা আরও বেড়ে যায় এবং যে সাংস্কৃতিক প্রমোদ অনুষ্ঠান এককালে পরিবার ও সম্প্রদায়ের অঙ্গ ছিলো তা এমন এক পেশাদারী দলের চর্চা ও সংরক্ষণের মধ্যে আটক পড়ে যায় যারা অভিজাত সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। চলচ্চিত্র নাচ, গান ও অভিনয়ের সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধিত বলে এরাও যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রকোপে পড়েছিলো চলচ্চিত্রও সেই সংস্কারে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে, এদেশে বহুর কাছে জীবন ও শিল্পে উদারতা স্বীকৃত হলেও ছবি দেখার আমোদটা প্রায় পাপেরই ধারঘেঁষা এবং জীবনের প্রয়োজন ও সুন্দরতা চর্চার মাধ্যমের বদলে তারা চলচ্চিত্রকে নৈতিক অবনতির যন্ত্ররূপেই গণ্য করেন।

প্রমোদ কাকে বলে?

চলচ্চিত্র মূলতঃই খারাপ এই ধারণা যতো না ক্ষতিকর হয়েছে, তার চেয়ে বোধ হয় বেশী ক্ষতি করেছে চলচ্চিত্রশিল্প-পোষিত এই ধারণা যে ছবি যেহেতু মুখ্যত প্রেক্ষাগৃহে দেখাবার উদ্দেশ্যে তোলা হয়, তখন ওটাকে সম্পূর্ণরূপে প্রমোদরূপেই ধরে নেওয়া উচিত। ভারতীয় সংবিধানে চিত্রগৃহগুলিকে প্রমোদের শ্রেণীতে ধরা হয়েছে এবং তদন্তকালে প্রযোজক ও পরিবেশকরা এই কথার ওপরেই বেশি করে জোর দিয়েছেন যে, চলচ্চিত্রকে নিছক প্রমোদ উপাদান বলেই যেন স্বীকার করা হয়। আমাদের বিচারে এই ধারণাটা চলচ্চিত্র-শিল্পে শিল্প ও প্রতিভার দৈন্যকে চাপা দেওয়ার দোহাই। যারা কেবল চিত্রানুরাগী-দের নিয়ে বেসাতি করতে চায়, তাদেরই কাছে প্রমোদের অর্থ যা কিছু খেলো এবং তারা মানুষের আদিবৃত্তির তোষণের চেষ্টা করে।

ছবি প্রমোদযুক্ত হওয়ার সঙ্গে যারা দেখে তাদের মনে ভালো, মন্দ বা নির্বিকার ছাপ ধরিয়ে দিতে পারে। ছবির বিষয়বস্তু এমনভাবে পরিকল্পিত ও বিন্যস্ত হয়েছে (এখন যেমন মাঝে মাঝে হয়) যা লোককে চিন্তা ও স্বপ্নে আবিষ্ট করে তুলতে পারে। এতে প্রকৃতি ঠিক করে দিতে পারে, পরিবারের বা সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তির পরস্পরের সম্বন্ধ ঠিক করে দিতে পারে, আদর্শ বা অন্য কোন বাদ পুষ্ট করে তুলতে পারে। এতে ধর্মভাব, ন্যায়, সহনশীলতা এমন কি নিঃস্বার্থপরতা ও ত্যাগের ভাগ মনে জাগিয়ে তুলতে পারে। অপর দিকে, বিষয়বস্তুর একেবারে উল্টো ফলও দিতে পারে। এক ধরণের ভাবসমন্বিত ছবি আর এক ভাবের ছবি তোলার চেয়ে কঠিন নয়। প্রমোদের সঙ্গে ছবি সঞ্জীবিত করে তোলে, আমোদের সঙ্গে শিক্ষা দান করে এবং ভাব ও প্রেরণার এমন একটা জগত সৃষ্টি করে দিতে পারে যাতে হতাশা, অসন্তোষ এবং জীবনের কঠিন বাস্তব থেকে মানুষ একটু রেহাই পেতে পারে।

'বাস্তব' ও 'পলায়নপরতা'

কতক সমালোচক ছবিকে 'পলায়নপর' ও 'অবাস্তব' বলে নিন্দা করেন, অনেকে আবার এইজন্যেই ছবিকে খুঁটিয়ে দেখার খপ্পর থেকে রেহাই দিতে চান। যারা ছবিকে কেবলমাত্র সারাদিনের বোঝা থেকে রেহাই পাবার উপায় বলে মনে করেন, তারা একথা ভুলে যান যে ঐভাবে রেহাই পেতে যাওয়া সময় সময়ে অসন্তোষ এমন কি মারাত্মক হয়ে ওঠে। মাথার ওপরের বর্তমান কতকগুলো সমস্যা যা সহজে সিদ্ধান্ত হবার নয় এমন কতক সংঘাত থেকে মনকে সরিয়ে রাখার মতো একটা রূপকে আপত্তি না থাকলেও আমরা এমন কোন ছবিতে বরদাস্ত করতে পারি না যা পরেও দর্শককে এমন একটা মানসিক অবস্থায় ছেড়ে দেয় যা সংঘাতকে অগ্রাহ্য করে যায় বা ভবিষ্যতকে

ভিক্টোরিয়াস উইন্‌গস্‌ (চেকোশ্লোভাকিয়া)

ঠিক করে নেওয়ায় নিবৃত্ত করে রাখে। 'অবাস্তব' জগতে মনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা নিন্দনীয় হয় যখন সেই জগতটা কেবলমাত্র কল্পনাপূর্তিতেই পর্যবসিত হয় এবং শুধু দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াই নয় দায়িত্ব পালন করার উত্তেজনা পর্যন্ত উপভোগ করিয়ে দেয়। অপর দিকে একটা আদর্শ জগতে প্রবেশ, যেখানে উচ্চতম আদর্শকে সামনে তুলে ধরা হয় সেখানে ঠিকভাবে চলার প্রেরণা আসে এবং সেই জগতের আদর্শকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসে। 'পলায়নপরতা' এমনিতে নিন্দনীয় নয়, কিন্তু পলায়নের স্থান ও উপায় ঠিকমতো বেছে নেওয়া চাই।

প্রমোদের সাহায্যে প্রচার

সুবিধামত যখনই প্রযোজকদের কাছে প্রস্তাব করা হয়েছে যে ছবি যতটা সম্ভব, যারা দেখে, তাদের বিচারশক্তিকে যেন শাণিত করে তোলে, তাতে তারা নির্বিশেষে উত্তর দিয়েছেন যে সে উদ্দেশ্য ছবিকে 'প্রমোদ'-এর বদলে 'প্রচার'-এর মাধ্যমে পরিণত করে তুলবে। আর ছবি যদি প্রচারের জন্যেই তোলা দরকার হয় তো সেটার দায়িত্ব হবে গভর্নমেণ্টের, চলচ্চিত্রশিল্পের নয় কোন মতেই। প্রপাগাণ্ডার মূল অর্থ দাঁড়ায় একটি বিশেষ মতবাদ ছড়িয়ে দেওয়া অথবা মতবাদ ছড়াবার জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা। সম্প্রতি, অবশ্য প্রধানত নাৎসীবাদ জাতীয় কতকগুলি মতবাদ প্রচারিত হওয়ার ফলে প্রপাগাণ্ডা কথাটায় একটা দুর্গন্ধ যুক্ত হয়েছে এবং এখন তার মানে হয়ে দাঁড়িয়েছে যে জনসাধারণকে কোন একটি বিশেষ চিন্তা ও কাজে প্রভাবিত করার জন্যে সত্যের বিকৃতি বা গোপন এবং মিথ্যা বিবৃতির দ্বারা বিভ্রান্ত করে তোলা। কথাটার মৌলিক অর্থ এখন চাপা পড়ে গিয়েছে। কাজেই প্রযোজকরা যখন ছবির মধ্যে স্বাধীনতা, ন্যায়, কর্তব্য বা ত্যাগ প্রচারের উল্লেখ করেন তখন তারা এই ধারণাই পোষণ করেন যে, মতবাদ প্রচার একটা নিন্দনীয় কাজ, তার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য যাই হোক এবং যারা তা করতে চায়, তাদের নিশ্চয়ই কোন 'মতলব' আছে। তারা স্বীকার করেন যে, সংশয়হীন মতবাদ প্রচারের জন্য গভর্নমেণ্টই উদগ্রীব থাকবে, কিন্তু সে কাজে সাহায্য করাটা তারা তাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বলে স্বীকার করেন না। এই মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়েছে লোককে প্রমোদ দান সম্পর্কে অগভীর ধারণার জন্যে এবং যে প্রমোদ তারা বিতরণ করেন, তার প্রতিফলন কি হতে পারে সেটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যাওয়া। লোকের মন ও আবেগকে ছাঁচে ফেলতে বা প্রভাবিত করতে এই মাধ্যমটি সম্পর্কে দায়িত্ব অগ্রাহ্য করে যাওয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশত এ মনোবৃত্তি দেশের বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যেও রয়েছে যে সাধারণের জন্যে যা কিছু কর্তব্য তা কেবল রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব এবং কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সে বিষয়ে কোন দায়িত্ব নেই।

জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে প্রমোদ

কোন ছবির আর্থিক সাফল্য নিঃসন্দেহে তার প্রমোদক্ষমতার ওপর নির্ভর করে, কিন্তু সেইটেই তার প্রধান লক্ষ্যস্থল হওয়া উচিত নয়। প্রযোজক কখনই এ যুক্তি তুলতে পারেন না যে ছবি প্রমোদাত্মক হয়েছে যদি তার সমাজগত প্রভাবটা ক্ষতিকর হয়।

ডনবাস মাইনার্স (রাশিয়া)

ছবিরও সমাজের ওপরে দায়িত্ব সংবাদপত্র বা বেতারের চেয়ে কম নয়। ক্ষতি হতে পারে এমনি সব বিষয়কে দূরে সরিয়ে রাখতে নেতিবাচক পন্থা অবলম্বন করলেই সে দায়িত্ব পালন করা যায় না।

জনসাধারণের মনে ছবির প্রভাব

ছবির দ্বারা দর্শকের ব্যবহার ও মনোবৃত্তি কি পরিমাণ প্রভাবিত হয়, তা নিয়ে অনেক মতবিরোধ আছে। একদল মনে করেন ছবি দর্শকের প্রকৃতিকে সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবিত করলেও সে প্রভাব স্থায়ী হয় না। তাঁরা বলেন, যে কেউ সিনেমায় যায় সে কতকগুলো মূল বিশ্বাস নিয়েই যায় এবং সেই বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ না খেলে তার প্রকৃতিতে সে চট করে একটা পরিবর্তন আনতে রাজি নয়। আর একদল বলেন, চলচ্চিত্র যে ছাপ রেখে যায়, তা গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী যা সম্মোহিত করার মতো অবস্থার মধ্যে দিয়ে দর্শকের সামনে হাজির করা হয়- অন্ধকার গৃহ এবং চিত্রানুরাগীর নিজেকে শব্দ ও দৃশ্যের সাহায্যে টেনে নিয়ে যাবার মতো নিষ্ক্রিয় ভাব, যে অবস্থাটা সহজেই একটা ইশারায় ঝুঁকে পড়ার মতো হয়ে থাকে। এ ছাড়া মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা তাঁদের সাক্ষ্যে বলেছেন তাঁদের দৃঢ় ধারণা যে, স্পর্শকাতর ছোটরা তাদের প্রিয় তারকার অভিব্যক্তি নকল করে বলে জানা থাকলেও সামাজিক নিয়ম-কানুন ও ব্যবহার সম্পর্কে তাদের ভালোমন্দের ধারণাকে, এমন কি বহু বছর ধরে নিয়মিত সিনেমা দেখা সত্ত্বেও বদলাতে বাধ্য করা যায় না। বিশেষজ্ঞরা আরও বলেন যে, ছবিতে দেখে নিজের জীবনে অনুকরণ করার যে ইতস্তত ঘটনা পাওয়া যায়, তা আসলে নিউরসিসের লক্ষণ অথবা অসম মনের পরিচয় এবং অন্য কোন ঘটনা তাদের মনে যে প্রভাব বিস্তার করতে পারতো সিনেমার প্রভাব তার চেয়ে বেশি নয়। অপর দিকে বহু শিক্ষাবিদ্ আজকালকার যুবকদের মধ্যে সিনেমা হানিকর পরিবর্তন এনে দিয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

সিনেমার যাঁরা ঘোর সমালোচক, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হচ্ছেন সিনেমা যাঁদের প্রভাবকে খর্ব করেছে এই বলে অন্যান্য দেশে যাদের দোষ দেওয়া হয় তারা। তার মধ্যে খানিকটা সত্যি আছে। যেসব বাপ-মা ও শিক্ষক মনে করেন যে, আজকালকার যুবকদের ওপর তাদের প্রতিপত্তি হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে, তাঁরা এর জন্যে সিনেমার প্রভাবকেই দোষ দেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তাই যদি হয়, তা হলে যুবকদের মনোবৃত্তি পরিবর্তনে সিনেমা একাই বা কতোখানি দায়ী, আর যুবসম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চিন্তাধারা সম্পর্কে অজ্ঞতাই বা কতদূর দায়ী। উপরন্তু দেখা যায়, এখনকার যুবকরা সিনেমা তারকাদের যেমন তাদের উপাস্য বলে ধরে নেয়, তেমনি তারা খেলাধুলোয় বিজয়ীদেরও পূজা করে। চলচ্চিত্রের সমাজতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া নির্ণয়ে একটির চেয়ে অপরটিকে পরিত্যাজ্য আদর্শের অনুভূতিতে বেশি প্রভাবিত হতে দেওয়া যায় না।

গুরুজনের দায়িত্ব

এ বিষয়ে সকলেই যথেষ্ট একমত যে, সিনেমার প্রভাবে নীতিচ্যুত হবার সম্ভাবনা তাদেরই বেশি, যাদের গৃহজীবন সুখের নয় এবং যাদের ওপর বাপ-মার উপদেশ ও প্রভাব অপরিমিত। এ থেকে এই সূত্রই টানা যায় যে, যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী ব্যাপারগুলি যখন বহু এবং শক্তিশালী, তখন গুরুজনদের উচিত ঘড়ির কাঁটা উল্টে দিয়ে ওদের দৃষ্টি থেকে বই, সামাজিক সংযোগ, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র বা বেতারের প্রভাবের অস্তিত্ব নির্বাসিত না করে আগের চেয়ে যুবকদের বেশি করে বুঝতে চেষ্টা করা তাদের মানুষ করার দিকে বেশি লক্ষ্য দেওয়া।

চলচ্চিত্রের আবেদন

সাধারণত স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, লোকে বই পড়ার চেয়ে চলচ্চিত্র থেকে বেশি তাড়াতাড়ি শিখতে পারে। এই নির্ণয়ে পৌঁছানো গিয়েছে একই বিষয় বই এবং ছবির সাহায্যে শেখাবার চেষ্টা করে এবং সত্যিই দেখা গিয়েছে ছবির মাধ্যমে অন্যান্য মাধ্যমের চেয়ে তাড়াতাড়ি জ্ঞানবিস্তার করা যায়। চলচ্চিত্র মনোজ্ঞভাবে ছবি ও শব্দ দুই-ই এনে হাজির করে এবং সময় ও পরিসরের বাধা অতিক্রম করে এবং এইভাবে প্রতিটি বিষয় এমন আকারে হাজির করে যা সহজে বোধগম্য হয়। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ছবির দ্বারা উপস্থাপিত কোন বিষয় যদি দর্শকের মৌলিক মানসিক-প্রকৃতিতেই গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলেও ছবি অনেক তাড়াতাড়ি এবং অনেক স্থায়ীভাবে দর্শকের মনে যে কোন আইডিয়া গেঁথে দিতে পারে। যে সব ছবি এমন বিষয়বস্তু বহন করে যা দর্শকের পূর্বধার্য জ্ঞানের ব্যতিক্রম সেই সব ছবির দর্শকের ওপর প্রভাব নিয়েই মনস্তত্ত্ববিদদের মধ্যে মতানৈক্য। কেউ বলেন দর্শক কোন মতেই ঐ নতুন আইডিয়া স্বীকার করে নেবে না, আবার কেউ বলেন, অনবরত পুনরাবৃত্তির দ্বারা দর্শককে সত্যি বলে গ্রহণ করিয়ে দেওয়া সম্ভব, এমন কি যে সব আইডিয়া আগেকার জ্ঞানের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় সেগুলির ক্ষেত্রেও। আমাদের নিজেদের মত হচ্ছে আজকালকার অবস্থায় অনবরত উপস্থাপনে ছবি অত্যন্ত দৃঢ়বিশ্বাসকেও মিথ্যা, অসত্য ও অসার বলে প্রতিপন্ন করে দিতে পারে। হতাশ অবস্থায় লোকে কদাচিত সংজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হয়।

চিত্রকাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া

মনস্তত্ত্ববিদদের কথাই যদি ধরে নেওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তিই এমন কিছু গ্রহণ করবে না যা তার ধার্য আদর্শ না পূর্বনির্দিষ্ট জ্ঞানের ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়াবে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে, ছবি বেশ সুপাচ্য করে এমন আইডিয়া সামনে তুলে ধরে কি না যা অভিজ্ঞ মনের কাছে বাতিল হলেও স্পর্শকাতর যুবকদের দ্বারা চট করেই গৃহীত হবে। উদাহরণস্বরূপ বহুসংখ্যক ছবির এই কাহিনীসারটা ধরা যাক যে, শিক্ষিতা মেয়েরা গৃহিণী হিসেবে বাজে হয়ে দাঁড়ায়। বেশির ভাগ ছবিতে শিক্ষিতা বধূকে চিত্রিত করা হয়, এমন চঞ্চল প্রজাপতির মতো গৃহকার্যে বা ঠিকভাবে সন্তান-পালনে মন দেবার কচিৎ সময় পায়। এইরকম অনেকগুলিকে ছবিতে স্মার্টরূপেও দেখানো হয়। প্রারম্ভে গল্প শেষ হয় সেই মেয়েটির চরিত্র সংশোধনে। কিন্তু বেশির ভাগই দেখা যায় গ্রাম্য মেয়েটি যে লেখাপড়া জানে কি না সন্দেহ সে-ই পরিবারকে উদ্ধার করে অথবা নায়ককে অধঃপতন থেকে বাঁচায়। অথচ কোন প্রযোজকই স্পষ্ট করে দেখান না যে উচ্চশিক্ষা পাওয়া মাত্রই প্রত্যেক মেয়ে খর্ব ভুয়ো জীবে পরিণত হয় এবং সুতরাং মেয়েদের পক্ষে শিক্ষা খারাপ। তাঁরা বরং উচ্চশিক্ষার কতকগুলো অসন্তোষজনক দৃষ্টান্তই তাঁরা চিত্রিত করেন এবং লোকে যদি কোন ভ্রান্ত নির্ধারণ করে বসে তো সে দোষ লোকেদের। কিন্তু এই সঙ্গে যখন দেখা যায় যে, মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা উপকারি বলে দেখানো কাহিনীসার সম্পূর্ণ অভাব, তখন সামাজিক জীবন সম্পর্কে সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব

সংখ্যক লোক এবং যারা সত্যিকার শিক্ষিতা নারীর সংস্পর্শে আসে নি তারা যদি এই উপসংহারে পেণছয় যে, শিক্ষা মেয়েদের পক্ষে অনভিপ্রেত, এমন কি বিপজ্জনক, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রযোজকরা অবশ্য অস্বীকার করেন যে ওরকম ছাপ দেওয়া তাঁদের আদপেই অভিপ্রায় ছিল না এমন কি তাঁরা যে ছবি তোলেন, তার দ্বারা তেমন কোন ছাপ সৃষ্টি হতে পারে না বলেও প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু বহু সমাজ-সেবী ও শিক্ষাবিদের সাক্ষ্য রয়েছে যা থেকে দেখা যায় যে, ঐরকম ছবি মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে হানিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টাকে বিদ্রূপ করার সুযোগটা জনকয়েক গোঁড়া ব্যক্তিই তুলে নেয়নি, কিন্তু কোন রকমে পক্ষপাত-দুষ্ট নয় এমন লোকেও যারা নিজেদের অকেজোমির জন্যে সন্তানদের শিক্ষাদানে অবজ্ঞার সহজ পথ বেছে নিয়েছেন, তাঁরাও চিত্র-প্রযোজকদের প্রতিপাদ্য কাহিনী-সারের সুযোগ গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে একটা বিবর্ণ পরিহাসের চেয়ে একটা মিথ্যা অনুজ্ঞাকে বার বার করে জুড়ে দিলে লোকের মন অবশ্যই তাতে বিকৃত হয়ে পড়ে। তাছাড়া চলতি কাহিনী হচ্ছে বরং অতি প্রযুক্ত বলা যায়—স্বাভাবিকতা, নির-পরাধিতা, নম্রতা, প্রেম ও আবেগের নিষ্ঠা ও ভক্তির স্থায়ী আশ্রয় হচ্ছে গ্রাম্য মেয়ের মধ্যে এবং কৃত্রিমতা, অবাঞ্ছিত উদাসিকতা, নেকামী, ভণ্ডামী এবং প্রবঞ্চনার আবাস-স্থল হচ্ছে শহরের শিক্ষিতা মেয়ে। উভয় কাহিনীসারই বাস্তব জীবন থেকে স্থানা-ন্তরিত, কিন্তু তবুও যারা আগে যে ধরণের ছবি আর্থিক সাফল্য অর্জন করেছে তা থেকে নতুন কিছু আবিষ্কারে অসমর্থ না নতুন কিছু করায় অক্ষম, তাদের কাছে এই দুটো দিকই হচ্ছে বাঁধাধরা গল্প। এ ব্যাপারটা অস্বীকার করা যায় না যে, ঐভাবে বিকৃত করে ঐ দুটো কাহিনীসার উপস্থিত হওয়ায় এবং অনবরতই হতে থাকলে sophisticated বা অপেক্ষাকৃত কম sophisticated অথচ আশাহত দর্শকমনে প্রেমের সংক্ষিপ্ত পথ মর্যাদার মূল্য সম্পর্কে ভ্রান্তি, জীবন সম্পর্কে মিথ্যা বা অসত্য ধারণা সৃষ্টি করিয়ে দিতে পারে।

চলচ্চিত্রের সঠিক ভূমিকা

ছবি বাস্তব জীবন চিত্রিতই করুক আর বিরহিতই হোক, কখনও বাস্তব জীবনের 'প্রাণহীন বদলি' হয় না, হতে পারে না; কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রে যেখানে ছবির একমাত্র ভূমিকা হচ্ছে হাসিতে দর্শকের মনের ভার উড়িয়ে দেওয়া, সে ছাড়া ছবি প্রকৃতিগতই হয় প্রেরণা দেবে বা ধারণাকে শক্তিশালী করে তুলবে, আর না হয় নিস্তেজ বা নীতি-মুক্ত করবেই। অন্য দিকের চূড়ান্তটাও মেনে নিয়ে চলচ্চিত্রের শিক্ষক-পদ মেনে নেওয়া যায় না; গৃহের সুস্থ প্রভাব অথবা ক্লাশ বা বক্তৃতা-ঘরের পাঠ্য চরিত্রকে ছবি কখনও অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে পারে না। জীবনের দুঃখ-দুর্দশা—বস্তু ও ব্যক্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, তার স্বরূপ, অথবা ওমর খৈয়াম বা ব্রাউনিংয়ের কাব্যিক পরিকল্পনার সেই 'কুমোরশালা'র স্থান ছবি দখল করতে পারবে না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ছবি ভাবের আদান-প্রদানের বাহনরূপে, শিল্পকলার মাধ্যমে জীবনের রূপায়নে এবং শিল্পিক অভিব্যক্তির বাহন হিসাবে, সহযোগ ও সমন্বয়ের ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা হিসাবে প্রতিচ্ছাপ ও অভিজ্ঞতার রেকর্ড এবং প্রমোদের মতো অত্যন্ত কার্যকরী ও সূক্ষ্ম গঠনশীল প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে একটা প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক ও সামাজিক তথা মূল্যবান গঠনশীল ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এই ভূমিকাকে অবজ্ঞাও করা যায় না বা ছোট করেও ধরা যায় না। অবজ্ঞা করাটা সাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক হবে; আর ছোট জ্ঞান করাটা হবে খোলাখুলিভাবে মূর্খতার পরিচয় দেওয়া। এইগুলোই হচ্ছে ছবির দিক যা রাষ্ট্র ও সমাজকে ছবির প্রতি নিরামর্যতা ও অবজ্ঞা ত্যাগ করে যেসব ছবি দেখাবার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয় বা দেখা যায় সেগুলি যাতে সুস্থ ও সুযোগ্য হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়, সে বিষয়ে কর্তব্য মেনে নিতে বাধ্য করছে।

চিত্র নির্বাচন

লোকে কি উপায়ে ছবি বেছে নেয়, এ প্রশ্নমালার খুব কমই উত্তর পাওয়া গিয়েছে। কাজেই সঠিকভাবে কোন নির্ধারণে পেণছানো সম্ভব নয়। তবে যেসব উত্তর পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে বন্ধুদের সুপারিশের ওপর অতিমাত্রায় বিশ্বাস, সংবাদপত্রের সমালোচনার ওপরে ক্ষীণ নির্ভরতা, চলচ্চিত্র পত্র-পত্রিকার মতামতের ওপর সম্পূর্ণ অবিশ্বাস এবং প্রযোজক-পরিবেশকরা তারকা আকর্ষণের ওপর যে রকম প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সে তুলনায় জনসাধারণ কর্তৃক ওটা ধর্তব্যের নীচু ধাপে গণ্য করা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। লোকের আগে থেকে জানা ভালো গল্পের ওপর অনেক ক্ষেত্রেই জোর দেওয়া হয়েছে, যেমন প্রখ্যাত উপন্যাসের চিত্ররূপ। আধুনিক ভারতীয় ছবির খুব কম সংখ্যক কাহিনীই ঐরকম রচনা থেকে নেওয়া হয়, তাই গল্প ধরে লোকে যে বেশি ছবি বাছাই করতে পারে না, তাতে বোধ হয় বিস্ময়ের কিছু নেই। এই সূত্রে যুক্তরাজ্যের জনমত অনুশীলনের বিবরণ উল্লেখ করা যায়। যে কারণে লোকে ছবি বেছে নেয়, সেই কারণগুলির পাশে শতকরা জনসংখ্যা দেওয়া হয়েছেঃ

কাহিনী	শতকরা	৩৭	জন
তারকা	,,	৩৪	,,
সমালোচনা	,,	১৯	,,
নাম	,,	১৬	,,
চিত্রগৃহ	,,	৯	,,
বন্ধুর সুপারিশ	,,	২	,,
বৃটিশ বলে	,,	১	,,

(যোগসংখ্যা ১০০'র বেশি হচ্ছে, কারণ অনেকে ছবি নির্বাচন করার একাধিক কারণ দিয়েছে।)

চলচ্চিত্র ও দর্শকের সম্পর্ক

লোকের চাহিদা ও প্রমোদ-রূপের মধ্যে একটা সম্পর্ক থাকবে বলে প্রযোজকদের অভিমতের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁদের যুক্তি স্বতঃই ব্যবসা এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব বিষয়ে ক্ষীণ ধারণাকে যেভাবে প্রভাবিত করে, তা হচ্ছে—যদি কোন চিত্রগৃহে একশত টাকা সংগৃহীত হয়, তাহলে প্রমোদ-কর তা থেকে হজম করে নেয় পঁচিশ টাকা। বাকী ৭৫ টাকার মধ্যে প্রদর্শক কেটে নেয় অর্ধেক এবং পরিবেশক পান সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা। তার খরচ এবং লাভের ভাগ বেশ খানিকটা এ থেকে নিয়ে নেয় এবং নির্মাতা পান পঁচিশ টাকার মতো। অর্থাৎ মোট যা বিক্রী, তাতে নির্মাতার অংশ হচ্ছে শতকরা পঁচিশ টাকা। কোন ছবির তৈরিতে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা খরচ করে যদি লাভ করতে হয়, তাহলে টিকিট বিক্রী হওয়া দরকার বার থেকে কুড়ি লক্ষ টাকার। জনপ্রতি গড়পড়তা প্রবেশ-মূল্য আট আনা, সুতরাং নির্মাতাকে তার নিয়োজিত মূলধনের কিছু ফেরত পেতে গেলে পঁচিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ

লোকের ছবিখানি দেখা দরকার। ফলে নির্মাতাকে ছবিখানি এমনভাবে পরিকল্পনা করে তৈরি করতে হয়, যাতে বহু লোকের কাছে আবেদন জানাতে পারে। জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যয়-ক্ষমতার বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী নির্মাতার লক্ষ্য দাঁড়ায় বৃহত্তম শ্রেণীর তুষ্টির ওপরে, যারা হচ্ছে সিনেমার কম দামী আসনে ভীড় করে এবং যাদের বলা যায় সাংস্কৃতিক বিষয়ে হৃত অধিকার। কাজেই ছবির গঠনে নির্মাতার পক্ষে এমন কতকগুলো বস্তু ব্যবহার অনিবার্য হয়ে পড়ে, যা এই শ্রেণীর লোকের ভালো লাগবে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে যারা সুযোগ পেয়েছে তাদের তা যতই অরুচিকর মনে হোক না কেন।

নির্মাণ ব্যয় ও জনপ্রিয়তার অপসিদ্ধান্ত

উপরিউক্ত যুক্তির অপসিদ্ধান্ত স্পষ্ট বোঝা যায়। ওর সূত্র হচ্ছে এই ধরে নিয়ে যে, ছবি নিশ্চয়ই ব্যয়বহুল হবে, যে ধারণাকে স্বীকার করে নেওয়া অসম্ভব। বহু ছবির ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে উৎকর্ষ যা লাভ করা গিয়েছে তার তুলনায় খরচ কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নয়। আর একথাও বলা যায় না যে, আমাদের দেশের চলচ্চিত্র শিল্প এমন দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত যে, অন্যান্য নতুন এবং যথার্থ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে বাজে খরচ কমিয়ে দিতে পেরেছে। উপরন্তু এটা এমন একটা শিল্প যাতে মুখ্য তারকাদের বেতন রূপকের অঙ্কে পড়ে, আর অন্য কর্মীরা একটা মায়ার জগতে থাকতে বাধ্য হয়, যেখানে অঙ্ক, বিশেষ করে খরচের বিরাট একটা জৌলুস এবং নিজস্ব একটা প্রচারের মূল্য থাকে। এদেশের এবং বিদেশের কতকগুলি ছবির বিস্ময়কর লাভ অর্জন এই খরচে-বৃত্তিকে আরও তীব্র করে দিয়েছে। আজ কোন চিত্রনির্মাতা নিজের ছবি তুলতে আর একজনের চেয়ে খরচ কম করেছেন, একথা সাধারণে স্বীকার করতে কুণ্ঠা ও লজ্জা-বোধ করেন। খরচ বাড়িয়ে যাবার এই জঘন্য বৃত্তি যা উন্মূল করার জন্যে দরকার '' হয় বিপুল দর্শক এবং বিপুল সংখ্যক চিত্রামোদী আকর্ষণের জন্যে হিসেব ফুলিয়ে যাওয়া তা থেকে নির্মাতাদের পরিত্রাণের একটা কড়া ব্যবস্থা করা দরকার।

ছবি তোলায় প্রভূত অর্থ নিয়োজিত করতে উদ্যত, এমন প্রযোজক দরকার নেই, দরকার হচ্ছে অন্য প্রকৃতির আরও অনেক প্রযোজক, যাঁরা মিতব্যয়ে ছবি তৈরির সাহস দেখাতে পারবেন। দ্বিতীয়ত যারা হাতের কাজ করে খায় বা যাঁদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হয়নি, তাদের রুচিটা মোটা, এ ধারণাটা দেশের বেশির ভাগ লোক সম্পর্কে একটা অন্যায় অপবাদ। যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, এই শ্রেণীর চিত্রামোদীদের রুচির উন্নতি হচ্ছে এবং প্রদর্শন কালে এই অংশের দর্শকবৃন্দ যদিও-বা খেলো ধরণের প্রমোদ উপভোগ করতে থাকে, কিন্তু যে অবদান তাঁদের দেওয়া হয়েছে, তার গুণাগুণ বিচারে তাঁদেরও নিজস্ব অভিমত আছে। ছবির ভালো অংশের আবেদন তাঁদের কাছে হারিয়ে যায় না এবং তাঁদের ভালো-মন্দের বিচারশক্তি মোটেই ভোঁতা বা অন্ধ নয়।

দর্শকের চাহিদার ফল

এই সব প্রমাণ দেখে আর তর্ক করা চলে না যে, আজকের ছবির গুণাগুণ হচ্ছে দর্শক-রুচি যা চায়, তারই প্রতিফল। জনসাধারণের বিবেকবুদ্ধি জাগরিত হওয়ার সঙ্গে শিক্ষার প্রসারের জন্যে, জনসাধারণের রুচির উন্নয়ন মাধ্যমের প্রসারের সঙ্গে এবং জনসাধাণের মনকে আলোকিত করে তোলার মাধ্যমের সম্প্রসারণে, চলচ্চিত্র দর্শনকারী-দের সাধারণ ও বোধশক্তির ধাপ ওপরের দিকে যাচ্ছে। সুতরাং দর্শকরা যা চাইছে তাঁরা, তাই দিচ্ছেন, প্রযোজকদের এই দাবী যদি সত্যি হয়, তাহলে একথা বোঝা মুশকিল যে, যুদ্ধের আগে যেসব ছবি তোলা হয়েছে এবং আজও যা চলচ্চিত্র শিল্প ও জন-সাধারণ গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করেন, তাদের তুলনায় এখনকার ছবির প্রকৃতি ও মর্যাদায় এতটাই মূলগত পরিবর্তন কি করে আসতে পারে যাতে লোকে 'অ-সফল' ছবির মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে অভ্রান্তরূপে তাদের অপ্রীতি জানিয়ে দিচ্ছে। একথা নিঃসন্দেহে সম্ভব যে, ছবি তৈরির খরচ বৃদ্ধিতে লঘু সংখ্যকের জন্যে ছবি তোলাটা ব্যবসার দিক থেকে সুফলপ্রসূ হবে না। কিন্তু সন্দেহ হয় যে, যে শ্রেণীর দর্শক প্রমোদ ও শিক্ষার সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রেরণাদায়ক ছবির বিষয়ে ঝোঁক দেয়, তাঁরা তাঁদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে প্রযোজককে পয়সা না পাইয়ে দেবার মতো অত নগণ্য সংখ্যক কি না। যেসব প্রযোজক তাঁদের ব্যর্থতার যুক্তিযুক্ততা প্রদর্শনে কষ্ট পান, তাঁদের চেয়ে আমাদের ধারণাই নিরাপদজনক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দেশের লোকের মধ্যে বেশ গ্রাহ্য করার মতো একটা শ্রেণী রয়েছেন, যাঁরা ভালো ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করবেনই এবং যদি তাঁরা বেশি সংখ্যায় ঘন ঘন সিনেমায় না যান, তাহলে তার কারণ আজকাল যেসব ছবি তৈরি হয় সেসবের বেশির ভাগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতাই তাঁদের যেতে বাধা দেয় বলে। আমাদের মতে বৃহৎ সংখ্যক দর্শক কর্তৃক কোন চিত্রগৃহের ধারাবাহিক পৃষ্ঠ-পোষকতার কারণ প্রদর্শিত বস্তুটি পছন্দ হচ্ছে বলে ধরে নেওয়া যায় না। বিরামের প্রয়োজনীয়তা, অন্য উপাদানের অভাব এবং চলচ্চিত্রের জৌলুস মিলিতভাবে এমনি চাপ দেয় যা চিত্রামোদীর পক্ষে প্রতিহত করা কঠিন। এই সব দর্শকদের উচ্চ মর্যাদার ছবির দিকে ঝোঁক ফিরিয়ে দিতে অবশ্যই খানিকটা চেষ্টার দরকার, কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্প কর্তৃক অনুসৃত পন্থায় ছবির প্রচার বা ছবির মধ্যে বিশেষ ধরণের উপাদানের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে তা সম্ভব হবে না। যাই হোক, এটা সুনিশ্চিত যে, যদি উন্নত প্রকারের ছবি তৈরি হয় এবং প্রযোজক পরিবেশকরা যদি জনসাধারণের কাছে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে তাঁদের বর্তমান প্রচার-পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করেন এবং নতুন পথে চলেন, তাহলে তাঁরা সমগ্র চলচ্চিত্র শিল্পে একটা আমূল পরিবর্তন আনতে পারবেন। পুরানো দাঁড়ের ওপর নির্ভর না করে অভিযান ও উৎসাহে প্রণোদিত হয়ে পঙ্কিলতার পরিবর্তে তীরবর্তীদের উৎসুক দৃষ্টির সামনে মনোরম দৃশ্য, মনের সামনে সুপ্রমোদ এবং জ্ঞানের পরিতোষ-জনক শিল্পকলা ও সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে নতুন ও পরিচ্ছন্ন স্রোতে প্রবাহিত হোক। আদি প্রবৃত্তির তোষণ অপেক্ষা মানুষের মহত্তর প্রবৃত্তির সেবায় সচকিত ও সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার মধ্যেই যে চলচ্চিত্র শিল্পের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প

শ্রীপঙ্কজ

ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়াপত্তনকারী বলতে গেলে বম্বের দাদাভাই ফালকের নামই করতে হয় এবং তারিখ হচ্ছে ১৯১২ সালের বড়দিন যেদিন ফালকে ভারতে তোলা প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রমোদ-চিত্র 'হরিশ্চন্দ্র' বম্বের করনেশন থিয়েটারে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হন। কিন্তু ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র গ্রহণের কৃতিত্ব হচ্ছে বাঙলার হীরালাল সেনের।

ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন ফরাসী চলচ্চিত্রের আবিষ্কর্তা বলে প্রখ্যাত লুই ও অগাস্টে লুমিয়ে ভ্রাতৃদ্বয়। তারা ১৮৯৬ সালে এসে ওঠেন বম্বের ওয়াটসন হোটেলে (বর্তমান মহেন্দ্র ম্যানসন) এবং সেইখানেই তাদেরই তৈরী একটা প্রক্ষেপণ যন্ত্রে ৭ই জুলাই থেকে দৈনিক চারবার করে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। হোটেলের ছোট হলে শ'দুয়ের বেশী লোক ধরতো না এককালে, কিন্তু লুমিয়ে ভ্রাতৃদ্বয় জনপিছু দুটাকা করে প্রবেশমূল্য গ্রহণ করে মাস দুয়ের মধ্যে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করেন। এই সময়ে ১৯ই জুলাই থেকে প্রকাশ্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শন আরম্ভ হয় নভেল্টি থিয়েটারে।

হীরালাল সেন বাঙলা দেশে চলচ্চিত্র প্রদর্শনে ব্যাপৃত ছিলেন ১৮৯৮ সাল থেকে। বিলেত থেকে তিনি পলস্ এনিম্যাটোগ্রাফ নামে একটি যন্ত্র নিয়ে আসেন এবং তারই সাহায্যে ছবি দেখানোর ব্যবসা আরম্ভ করেন।

দু'বছর পর ফ্রান্সের প্যাথে কোম্পানী একখানি ছবির বহির্দৃশ্য তোলার জন্য তাদের ক্যামেরাম্যানকে পাঠান। হীরালাল সেন এদের দলে যোগদান করে অল্পদিনের মধ্যেই ছবি তোলার কৌশল আয়ত্ত করে নেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তখন কলকাতার মঞ্চে অভিনীত 'আলিবাবা' নৃত্য-নাট্যটি ছবিতে তুলে নেন। ভারতে ভারতীয় কর্তৃক তোলা এইখানিই প্রথম চিত্র, তবে ছবিখানি অল্প দৈর্ঘ্যের ছিলো আর তাছাড়া ঠিক চলচ্চিত্রের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি দৃশ্য তুলে ছবিখানি হয়নি, তোলা হয়েছিলো সরাসরি মঞ্চের অভিনয়টাই। এই কারণেই হীরালাল সেনের 'আলিবাবা'কে ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র বলে স্বীকার করা হয় না।

ভারতে তোলা দ্বিতীয় ছবিখানি ছিলো সংবাদ-চিত্র। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সংক্রান্ত একটি শোভাযাত্রার ছবি, যাতে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিখানি তোলেন জ্যোতিষ সরকার নামক কলকাতার এক ক্যামেরাম্যান। এ ছবিখানি দেখানো হয় মধ্য কলকাতার পার্শী করিন্থিয়ান থিয়েটারে, এখন যার নাম সেন্ট্রাল।

ম্যাডানের অবদান

করিন্থিয়ান থিয়েটারের মালিক ছিলেন বম্বে থেকে আগত ধনী পার্শী ব্যবসায়ী জামসেদজী ফ্রামজী ম্যাডান। কলকাতায় তিনি এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ নাম দিয়ে (বর্তমান মিনার্ভা থিয়েটার) একটি চিত্রগৃহ স্থাপন করেন। বিদেশ থেকে আমদানী ছবিই শুধু দেখানো হতো সেখানে। ১৯০৯ সালে ম্যাডান ফ্রান্সের প্যাথে কোম্পানীর সমস্ত ছবি এলফিনস্টোনে দেখাবার একটা চুক্তি করেন। এইটেই হলো ম্যাডানের উত্তরকালের সুবিস্তৃত প্রদর্শন ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন। পরে এমন সময় এসেছিলো যখন ম্যাডানের পরিচালনাধীনে ছিলো দেড়শতাধিক চিত্রগৃহ যার মধ্যে ম্যাডান মালিকই ছিলেন প্রায় শতাধিক চিত্রগৃহের। ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, মালয় ও সিঙ্গাপুর ব্যেপে ম্যাডানের চিত্রগৃহ ছড়িয়ে ছিলো এবং এমন দিনও আসে যখন ঐসব দেশের যে কোন চিত্রগৃহে যে কোন ছবিই দেখানো হয়েছে তা হয় ম্যাডানের নিজেরই স্টুডিওতে তোলা আর নয়তো ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেড পরিবেশিত ইওরোপ বা আমেরিকার তোলা কোন বিদেশী ছবি। নির্বাক যুগের শেষের দিকে জামসেদজীর পুত্র ও জামাতা যখন হলিউড
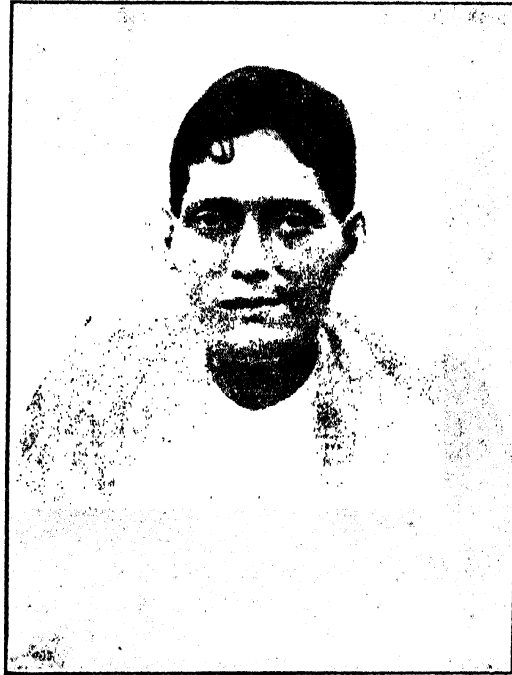
বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পের প্রবর্তকদের অন্যতম অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা অনাদিনাথ বসু

ভারতীয় চিত্রশিল্পের সর্বাধিক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের রচয়িতা নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

পরিভ্রমণে যান তখন সেখানকার পত্র-পত্রিকায় এদের পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক চিত্রগৃহের মালিক বলে পরিচয় প্রকাশ করা হয়।

বাঙলা দেশে চলচ্চিত্রের শিল্প হিসাবে ভিত্তিও ম্যাডান থেকেই। বম্বেতে দাদাভাই ফালকের চিত্রনির্মাণের সফল্যের কথা শুনে জামসেদজীও ছবি তোলার বন্দোবস্থা করে ফেলেন। এর জন্যে তিনি দু'কোটি টাকার মূলধন জারী করে ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা করেন। চিত্র ও সেই-সঙ্গে চিত্রগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়।

ছবি তোলার জন্যে ম্যাডান জ্যোতিষ সরকারকে সঙ্গে নেন। করিন্থিয়ান থিয়েটারের পার্শী শিল্পনির্দেশক ইরাণীকে দিয়ে দৃশ্যপট তৈরী করে নেওয়া হয় এবং যতদূর জানা যায়, ম্যাডানের প্রথম ছবি 'বিল্বমঙ্গল'-এর চিত্রগ্রহণও হয় করিন্থিয়ান মঞ্চের ওপরেই। এটা হলো ১৯১৬ সালের কথা। এরপর ম্যাডান ভারতের প্রথম স্টুডিও নির্মাণ করেন টালিগঞ্জে ম্যাডান থিয়েটার্স নাম দিয়ে, এখন যেটা ভারতের সর্ববৃহৎ স্টুডিও ইন্দ্রপুরী। স্টুডিও হবার পর ম্যাডান পরিমাণে এতো বেশী এবং উৎকর্ষে তখনকার স্টান্ডার্ডে এতো ভালো ছবি প্রস্তুত করতে লাগলেন এবং সেইসঙ্গে তার প্রদর্শনক্ষেত্র প্রসারণ মিলে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই ম্যাডানের ছবি সারা দেশ ছেয়ে ফেললো। ছবি সবাক হবার গোড়ার সময় পর্যন্ত, একাদিক্রমে প্রায় পনেরো বছর ধরে ম্যাডান তার প্রসার টিকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। অবশ্য শেষের ক'বছর ম্যাডান থিয়েটার্সের কর্ণধার ছিলেন তার জামাতা রুস্তমজী ধোতিওয়ালা। এখন এককালে পৃথিবীর বৃহত্তম চিত্রনির্মাণ, পরিবেশন ও প্রদর্শন প্রতিষ্ঠান ম্যাডান থিয়েটার্স বলতে আর কিছুই নেই। কেবল তার অন্যতম পুত্র জাহাঙ্গীর ম্যাডানের হাতে রয়েছে কলকাতার রিগ্যাল টকীজ (ম্যাডানের আমলে এলফিন্‌স্টোন থিয়েটার) আর বাঙ্গালোরের আর একটি চিত্রগৃহ। কেবল বাঙলা দেশেই নয়, সেই ১৯১৬ সালেই ম্যাডান সমগ্র ভারতেই চলচ্চিত্রকে একটি বৃহৎ শিল্পের আকার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাঙালীর প্রচেষ্টা

ম্যাডানের সমসাময়িককালে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকও অলক্ষ্যে থেকে চলচ্চিত্রের ব্যবসা সম্ভাবনাটা লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। তিনি হলেন অনাদিনাথ বসু, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৬ সালে অনাদিনাথ তার সহকর্মী দেবী ঘোষকে নিয়ে ছোট ছোট ছবি তুলে পরীক্ষা চালাতে থাকেন। এইসব ছোট ছবির মধ্যে ছিলো 'বিষবৃক্ষ' নাটকের একটি দৃশ্য, যে ছবিখানি নাটকটি মঞ্চস্থ হবার সময় মাঝের বিরাম-কালে দেখানো হতো।

ম্যাডান থিয়েটার্স সে সময়ে চিত্রশিল্পের তিনটি দিকই এমন নিবিড় করে জড়িয়ে ছিলো যে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া একেবারেই সম্ভব হয়নি। যতদূর শোনা যায় ১৯২২ সালের আগে পর্যন্ত ম্যাডানের ছবিই এক-চেটে ছিলো। এইসময়ে ইন্ডো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন নীতিশ লাহিড়ীর (বর্তমানে হলিউডের কলাম্বিয়া ফিল্মস্ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার) সহযোগিতায় ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় যিনি ডি জি নামে জনপ্রিয়।

ভারতের প্রথম সামাজিক ছবি

ধীরেন্দ্রনাথ ম্যাডানের আদি ক্যামেরাম্যান জ্যোতিষ সরকারকে দলভুক্ত করে নেন। নিজে তিনি নায়কের ভূমিকায় অবতরণ করেন এবং নায়িকারূপে গ্রহণ করেন সুশীলা দেবীকে। এরাই হলেন বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের প্রথম তারকা। ছবির নাম ছিলো 'বিলাত ফেরৎ'; পরিচালনা করেন নীতিশ লাহিড়ী। এর আগে ম্যাডান কর্তৃক কলকাতার স্টুডিও বা বম্বের স্টুডিও

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলার অন্যতম উদ্যোক্তা বি এম পি এ'র সভাপতি শ্রীমুরলীধর চট্টোপাধ্যায়

গুলিতে কেবলমাত্র পৌরাণিক এবং সজ্জা ও দৃশ্যাবিভূষিত রূপক কাহিনীরই ছবি তোলা হতো। 'বিলাত ফেরত'-ই হলো ভারতের প্রথম সামাজিক ছবি এবং সেই-সঙ্গে প্রথম বাঙলা ছবিও। 'বিলাত ফেরত' তখনকার রসা থিয়েটারে (পূর্ণ থিয়েটার) মুক্তিলাভ করে এবং সপ্তাহ কতক ধরে প্রভূত দর্শক আকর্ষণ করে। বাঙলা দেশে ম্যাডানের একচেটিয়া চিত্রনির্মাণ ব্যবসায়ের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী ডি জি প্রবর্তিত প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি—মাত্র খান তিনেক ছবি তোলার পরই দলটি ভেঙে যায় এবং এডভোকেট বি কে ঘোষ কোম্পানীটি কিনে নিয়ে নাম পরিবর্তন করে রাখেন তাজমহল ফিল্ম কোম্পানী। তৎকালেই শ্রেষ্ঠ অভিনয়শিল্পী বলে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন শিশির-কুমার ভাদুড়ী। তাজমহল ফিল্ম তাকে দিয়ে শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' পরিচালনা করিয়ে নেন। 'আঁধারে আলো' সমগ্র ভারতেই কোন সাহিত্যরথীর কাহিনী অবলম্বনে তোলা প্রথম ছবি।

প্রায় একই সময়ে তখনকার নামকরা মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী ঘনশ্যামদাস চৌখানী ইণ্ডিয়ান কিনেমা আর্টস প্রতিষ্ঠা করেন। এখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক নীতিন বসু এদের প্রথম ছবিতে প্রথম ক্যামেরায় কাজ করেন। কিনেমা আর্টসই প্রথম ম্যাডানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করে। এই সময়ে ছোট ছোট আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করেছিলো এবং ছবিও তুলেছিলো কতকগুলি কিন্তু একমাত্র কিনেমা আর্টসই ম্যাডানের উৎ-কর্ষের সঙ্গে পা ফেলে চলার কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি বছর চারেকের বেশী টি'কে থাকতে পারেনি, সবাক ছবি আসার সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কিনেমা আর্টসের প্রায় সমসাময়িক একটি স্মরণীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে—ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম লিমিটেড। বাঙলা তথা সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানটির ছাপ রয়ে গিয়েছে। ডি জি ওরফে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায় ইণ্ডো ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানীর পর অধিকতর উৎসাহ ও সামর্থ্য সংগ্রহ করে ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেন। আর তাঁরই উদ্যোগের ফলে বাঙলা তথা ভারতের চিত্রজগত লাভ করে দেবকী বসু ও প্রমথেশ বড়ুয়াকে। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ ডোমিনিয়নই বলতে গেলে প্রথম ভারতীয় চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠান যাতে শিল্পী ও কুশলীরূপে যোগ দিয়েছিলেন সমাজের উচ্চতম ধাপের লোকেরা। এখানে 'চরিত্রহীন'এর যে চিত্ররূপ তোলা হয় তাতে কলেজের অধ্যক্ষও সস্ত্রীক ভূমিকা পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন। ছবিখানি তোলায় ডি জি তখন যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে-ছিলেন তা ছবির জন্যে নূতনতর এবং মিথ্যা সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রকৃত প্রগতিশীল চিন্তাপুষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি তোলার রাস্তা খুলে দেয়।

প্রথম আন্তর্জাতিক ছবি

১৯২৪ সালে পাঞ্জাবের সার মতি সাগর ও প্রেম সাগর গ্রেট ইস্টার্ন কর্পোরেশন নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন হিমাংশু রায়। এর আগেই অবশ্য হিমাংশু রায় পরিচালনা কাজে হাত দিয়েছিলেন তবে তিনি সুখ্যাত হন এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা থেকে। এদের হয়ে রায় জার্মানীর এমেলকা ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে 'লাইট অফ এসিয়া' তোলার চুক্তি করেন। ভারতের এইখানিই হলো প্রথম আন্তর্জাতিক ছবি। 'লাইট অফ এসিয়া' হিমাংশু রায়ের পরিচালনায় ভারতেই তোলা হয় এবং পরিচালনায় তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ফ্রাঞ্জ অস্টেন এবং আলোকচিত্রগ্রহণ করেছিলেন যোশেফ ওয়ার্শিং। এরা ছাড়া 'লাইট অফ এসিয়া' আরও যেসব কৃতীদের লোকচক্ষের সামনে হাজির করেন তাদের মধ্যে ছিলেন চারু রায়, মধু বসু, প্রফুল্ল রায়, নিরঞ্জন পাল এবং আরও অনেক কৃতী বাঙ্গালী। ১৯২৬ সালে 'লাইট অফ এসিয়া' লণ্ডনের ফিল-হারমোনিক হলে একাদিক্রমে দশ মাস যাবৎ দেখানো হয় এবং ছবিখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষিত হয়। এর পরও হিমাংশু রায় বিদেশী প্রযোজকদের সঙ্গে যুক্তভাবে সবাক যুগ আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত কয়েক-

খানি ছবি তোলেন যার মধ্যে শেষ ছবি ছিলো 'থ্রো অফ এ ডাইস'। এর পর হিমাংশু রায় আর একটি আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় হাত দেন, তার প্রথম সবাক ছবি—'কর্ম'। এ ছবিখানিও ইউরোপ ও এসিয়ার সর্বত্র প্রদর্শিত হয়ে সারা জগতে বাঙালীর প্রযোজনা, পরিচালনা ও শিল্প কৃতিত্বের সুনাম প্রতিষ্ঠা করে দেয়।

এরপর হিমাংশু রায় বম্বে টকীজের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার আগেকার সহকর্মী জার্মান পরিচালক ফ্রাঞ্জ অস্টেন ও ক্যামেরাম্যান ওয়ার্শিংকে এই প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত করেন। প্রথম ছবি 'জওয়ানি কী হাওয়া' ১৯৩৫ সালে মুক্তিলাভ করে, এর পরও আরও দুখানি ছবি শেষ করে হিমাংশু রায় ১৯৩৭ সালে 'অচ্ছুৎ কন্যা' উপহার দেন। সমস্ত ভারতীয় চিত্রশিল্পের মোড়ই ঘুরে যায় এই ছবিখানি থেকে। ছবিখানি একাদিক্রমে ন'মাস ধরে কলকাতায় চলে সারা ভারতে হিন্দী ছবির বিজয় অভিযানকে সূচিত করে দেয়।

বাঙলার নেতৃত্ব

সে সময়ে বাঙলার চিত্রশিল্প সর্ববিষয়েই ভারতকে প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে। বাঙলাতে তখন নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বীরেন্দ্রনাথ সরকারের নেতৃত্বে দেবকী বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া ও নীতিন বসুর যুগ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

সবাক ছবি হবার ঠিক অব্যবহিত আগে আর্য ফিল্মস্ নামে একটি প্রতিষ্ঠান 'বুকের বোঝা' নামে একখানি ছবি তোলেন যার প্রযোজক ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ সরকার। ছবিখানি পরিচালনা ও আলোকচিত্র গ্রহণ করেন নীতিন বসু। এরপর বীরেন্দ্রনাথকে নিয়ে গড়ে ওঠে ইন্টার ন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট। 'চোরকাঁটা' ও 'চাষার মেয়ে' তোলার পর নির্বাক ছবি অচল হয়ে যায়। তখন বীরেন্দ্রনাথ পত্তন করেন নিউ থিয়েটার্স। কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানটি প্রথম থেকেই সাধারণের দৃষ্টিতে পড়ে এবং তাদের গোড়ার দিকের ছবি 'নটির পূজা', 'চিরকুমার সভা', 'পুনর্জন্ম', 'পল্লী সমাজ' প্রভৃতি প্রকৃত কৃতিত্বসম্পন্ন বড়ো কিছু না হলেও তখনকার ম্যাডানের তুলনায় অনেক বেশী মার্জিত শিল্প সৃষ্টির পরিচয় দিতে সক্ষম হয় উত্তরকালে যা সারা ভারতের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়।

বাঙলায় প্রথম সবাক ছবি তোলে ম্যাডান—'জামাই ষষ্ঠী'। সবাক ছবি প্রবর্তিত হওয়ায় ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পক্ষেত্রে ম্যাডানের সবচেয়ে বড়ো দান হচ্ছে গানকে সুপ্রচলিত করে দেওয়া। কজ্জন বাঈ ও মাস্টার নিসারকে নিয়ে ম্যাডান একখানার পর একখানি ছবি তুলে যায় যার কোন কোনখানিতে ষাট-প'য়ষট্টিখানি পর্যন্ত গান থাকতো। তবে গানের দিক থেকে প্রথমে বাঙলায় যুগান্তর নিয়ে আসে দেবকী বসুর 'চণ্ডীদাস' যে ছবিখানি একাদিক্রমে চিত্রায় পাঁচ মাসাধিককাল চলে ভারতে দীর্ঘচলার তখনকার একটি রেকর্ড স্থাপন করে। পরে এই রেকর্ডের পুনরাবৃত্তি হয় ভারতের নানা জায়গায় 'চণ্ডীদাস'-এরই হিন্দী সংস্করণ দিয়ে, যে ছবিখানি পরিচালনা করেছিলেন নীতিন বসু এবং প্রধান ভূমিকায় ছিলেন সায়গল ও উমাশশী।

সঙ্গীতে 'চণ্ডীদাস' দুটো সংস্করণই অনেক কিছু নতুনত্ব নিয়ে হাজির হয়। সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়াল দিশী সুরকে বিদেশী পদ্ধতিতে অর্কেস্ট্রায় ফেলে পরীক্ষা করেন এবং প্রভূত সাফল্যও লাভ করেন। আজও ভারতের সমস্ত সঙ্গীত পরিচালককেই রাইচাঁদকে অনুসরণ করে যেতে হচ্ছে। এ ছবিতে দৃশ্যের সঙ্গে ভারতে প্রথম আবহ-সঙ্গীত ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। যতদূর জানা আছে গেল-

ভারতীয় চলচ্চিত্রকে সাহিত্যে ও শিল্পে সুমণ্ডিত করে নব নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন সেই নির্বাক যুগ থেকে—পরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বসু

কণ্ঠৈশ্বর্যে ভারতীয় চিত্রশিল্পকে সব চেয়ে বেশি ধনী করেছেন বাঙলার দুই শিল্পী সায়গল ও কানন—এখানে নিউ থিয়েটার্সের "স্ট্রীট সিংগার" চিত্রে দেখা যাচ্ছে

বাক পদ্ধতিতে ছবিতে গান সংযোগ করাও হয় এই ছবিতেই ভারতে প্রথম। দেবকী বসু সারা ভারতে বরেণ্য হয়ে ওঠেন তার পরের ছবি 'পুরাণ ভকত'এ। কাব্যের রীতিতে নাটকীয় ভাববিন্যাসে, সংগীতে ও আরো অনেক দিকে 'পুরাণ ভকত'ই বলা যায় প্রথম ছবি যা সারা ভারতের চিত্রামোদী-দের দৃষ্টি বাঙলার চিত্রশিল্পের ওপরে হুমেড়ী খেয়ে পড়তে বাধ্য করে। তখন হচ্ছে ১৯৩৩ সাল।

বাঙলা চিত্রশিল্পের স্বর্ণযুগ

১৯৩৩ সালে নিউ থিয়েটার্সের 'ইহুদী কা লেড়কী'-ও কতকগুলি বিষয়ে ভারতে প্রথম কৃতিত্ব দেখায়। বাঙলা চিত্রশিল্পের স্বর্ণযুগের সূত্রপাত এই সময় থেকেই দেবকীকুমারের অভ্যুত্থান যেমন বাঙলা চিত্র-শিল্পকে ভারতের মধ্যে সর্ববরেণ্য করে তুললো এবং ভারতের মধ্যে সর্ববিষয়ে শীর্ষ-স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে পড়লো প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার আবির্ভাবে।

ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্মসের ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় গৌরীপুরের রাজকুমার প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়াকে তার প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার করেন। সেখানে প্রমথেশ-চন্দ্রের সঙ্গে দেবকী বসুর ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রধানত দেবকী বসুরই উৎসাহ লাভ করে প্রমথেশচন্দ্র ফ্রান্সে গিয়ে চিত্রগ্রহণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে আসেন এবং ফিরে এসেই তার প্রযোজিত প্রথম ছবি নির্বাক 'অপরাধী'-তে ছবি তোলার নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত করলেন। এটাও ১৯৩১ সালেরই কথা। বড়ুয়া প্রবর্তন করলেন কৃত্রিম আলোয় ছবি তোলার পদ্ধতি ভারতে সর্বপ্রথম। ছবি তোলার রীতি পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন এলো। রূপসজ্জার পদ্ধতি, মেক-আপের ব্যবহার, সেট তৈরী, দৃশ্যরচনা সবই বদলে গেলো। এ পরিবর্তনটা তখন তেমন নজরে পড়লো না এই কারণে যে, তখন সবাক ছবি এসেই গিয়েছিলো; তার জন্যেও ছবি তোলার পদ্ধতিকে সবাই বদলে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে কাজেই বড়ুয়ার নব প্রবর্তনটা হিসেবে এলো না।

বড়ুয়া নিজের স্টুডিও স্থাপন করে-ছিলেন এবং খানদুই সবাক ছবি পরীক্ষা-মূলকভাবে তুলেওছিলেন। এরপর তিনি যোগ দেন নিউ থিয়েটার্সে। এখানে তার প্রথম ছবি 'রূপলেখা' অভিনবত্বের খানিকটা আভাসই শুধু দিয়েছিলো, কিন্তু সমগ্র ভারতকে চমকে দিলো তার পরবর্তী ছবি—'দেবদাস'। সমগ্র ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে গৌরবের সঙ্গে বেঁচে থাকার এবং সম্প্র-সারণে উদ্দীপনা সঞ্চারিত করে তোলায় 'দেবদাস'-এর চেয়ে উত্তম সৃষ্টি আজও হয়নি সারা ভারতে।

দেবকী বসু ও প্রমথেশচন্দ্রের সঙ্গে ১৯৩৪ সালে হিন্দী 'চণ্ডীদাস' ও 'ডাকু মনসুর' তুলে যোগ দিলেন নীতিন বসু। এরা তিনজনে মিলে বাঙলার চিত্রশিল্পকে একটার পর একটা কীর্তিতে বিভূষিত করে তুলতে লাগলেন। চলচ্চিত্রের স্থায়িত্ব ও বিরাট শিল্পতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা বিষয়ে এরা প্রযোজক বীরেন্দ্রনাথ সরকারের নেতৃত্বে সব সংশয়ই দূর করে দিলেন।

অন্য প্রদেশে প্রেরণা

বীরেন্দ্রনাথ সরকার নিউ থিয়েটার্সের মাধ্যমে চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে ব্যবসায়ী মহলকেও বড়ো কম আশান্বিত করে তোলেননি।

ম্যাডানের অবস্থা তাদের আভ্যন্তরীণ গোলযোগে পড়ে গিয়েছিলো। ম্যাডানের প্রযোজক পরিচালক প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ওদের ছেড়ে গিয়ে ইণ্ডিয়ান মুভী ইণ্ডাস্ট্রীজ (বর্তমান কালী ফিল্মস্) স্থাপন করেন। নিউ থিয়েটার্স ছাড়া এইটেই একমাত্র বাঙালী প্রতিষ্ঠান তখন। মাঝামাঝি পর্যায়ের ছবি বাঙলা ছবির সংখ্যা বাড়িয়ে বাজার দখল করে নেওয়ায় এবং বাঙলা ছবির দর্শক বৃদ্ধিতে প্রিয় গাঙ্গুলীর প্রতিষ্ঠান বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পকে প্রভূত সাহস দিয়েছে।

ঐ সময়ে শেঠ রাধাকিষণ চামারিয়া ও শেঠ মতিলাল চামারিয়া ভ্রাতৃদ্বয় চালাচ্ছিলেন রাধা ফিল্মস্। রাধা ফিল্মসের 'দক্ষযজ্ঞ'ও

সকলের তরে

ছায়াচিত্রের আবেদনটি যে সার্বজনীন এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবু একথাও সত্যি যে ছবির আখ্যান ভাগ বা তার রূপায়ন উচ্চাঙ্গের না হলে সে ছবি দর্শক-মনে কোন স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে না। আজকের যে-ছবি একটা বিশেষ মুহূর্ত বা পরিবেশে দর্শকসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে দুদিন পরে তাই হয়ে ওঠে নিতান্ত নগণ্য!

কিন্তু চায়ের আবেদনটি সর্বসাধারণের কাছে চিরকালই অপরিম্লান। এই পানীয়টির প্রতি মানুষের আকর্ষণ ক্রমে বেড়েই চলেছে কেননা চা-পায়ীরা এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছেন যে পানীয় হিসেবে চা সত্যিই অতুলনীয়। কোন একটা বিশেষ মুহূর্তে কারু কারু কাছে এই পানীয়টি হয়ত পরিশ্রান্ত দেহ মনের পক্ষে অপূর্ব বলে মনে হয়েছে কিন্তু চায়ের প্রতি আকর্ষণ শুধু সেই একটি মুহূর্ত বা ব্যক্তিবিশেষেই সীমাবদ্ধ নয়; — চা সর্বকালে সর্বসাধারণের কাছেই মধুর।

আনন্দের উৎস

সেণ্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

ভারতীয় চলচ্চিত্রের রূপ নির্ণয়ে যুগপ্রবর্তক প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া

তখনকার দিনে দীর্ঘ চলার একটা রেকর্ড স্থাপন করে। এ প্রতিষ্ঠানটি পৌরাণিক ছবি তোলাতেই ব্যাপৃত থাকতো সারা বছর এবং সেদিক থেকে একটা বৈশিষ্ট্যও এনেছিলো। মতিলাল রাধা ফিল্মস্ থেকে আলাদা হয়ে বঙ্‌্রংলাল খেমকা প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়ান ফিল্মস্ পত্তন করেন। নিউ থিয়েটার্সের পর ছবির উৎকর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়ারই তখন নাম ছিলো। দেবকী বসু এখানে যোগদান করে হিন্দী 'সীতা' তোলেন। ভারতে প্রথম এই ছবিখানিকে ভেনিসের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয়। ছবিখানি পুরস্কারও পেয়েছিলো প্রাচ্যের তোলা ছবির পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বলে। এরপর দেবকী বসুরই 'সোনার সংসার' দীর্ঘচলার সমস্ত রেকর্ড ভেঙে বাঙলা ছবির জনপ্রিয়তাকে প্রায় উত্তুঙ্গ ধাপে তুলে দেন।

সম্প্রতি বছর কয়েক বাঙলা নতুন কিছু করে উঠতে পারেনি; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বাঙ্গে বাঙলার তথা নিউ থিয়েটার্সের প্রভাবই মাখা হয়ে রয়েছে। এখনও চলেছে দেবকী-বড়ুয়া-নীতিনেরই যুগ। বাঙলা চিত্রশিল্পের স্তিমিতি সমগ্র ভারতীয় চিত্রশিল্পেরই প্রগতিকে ধীর করে রেখেছে। সম্পদে বম্বে মাদ্রাজের চিত্রশিল্প এগিয়ে চলেছে বটে, কিন্তু প্রেরণার জন্যে সকলেই চেয়ে রয়েছে বাঙলার চিত্রশিল্পের মুখের দিকে। সাহিত্য ও শিল্পের সৌকুমার্যে বাঙলা ছবির অদ্বিতীয়তা বাইরেও সবাই স্বীকার করতে দ্বিধা করে না। তারা "ছোটাভাই", "বরযাত্রী", "স্বয়ংসিদ্ধা", "পরিবর্তন", "বিদ্যাসাগর", "মাইকেল মধুসূদন", "বাবলা"-র মতো ছবি তোলার জন্যে হা পিত্যেশ করে রয়েছে।

বাঙলা স্টুডিওর কর্মব্যস্ততা

নিউ থিয়েটার্স বাঙলা চিত্রশিল্পকে সারা ভারতে এমন ঘরের-কথাতে পরিণত করে তোলে যে, অন্যান্য প্রদেশ থেকে, বিশেষ করে দাক্ষিণাত্য থেকে দলে দলে প্রযোজকরা আসতে থাকেন ছবি তোলার জন্যে। ভারতের শ্রেষ্ঠ পরিচালক, কলাকুশলী ও শিল্পীরা সকলেই তখন কলকাতায়। মাদ্রাজে তখন স্টুডিও না থাকায় তামিল ও তেলেগু ছবির শতকরা আশীখানাই কলকাতায় তোলা হতে লাগলো যার ফলে কলকাতার স্টুডিওগুলি কাজে ভরে থাকতো দিনরাত।

বাঙলা চিত্রশিল্পের এই বৈভব ও সামর্থ্য ভারতের রাজন্যবর্গকে পর্যন্ত চলচ্চিত্র শিল্পে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করে তুললে। রাজপুতানার মদনগোপাল কাবরার উদ্যোগে জনকতক বড়ো বড়ো রাজা মহারাজা মিলে এক কোটি টাকার মূলধন নিয়ে ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার (বর্তমান ইন্দ্রলোক) পত্তন করলেন ১৯৩৬ সালে। তখনকার দিনের নবতম যন্ত্রপাতি সব আনিয়ে বিরাট জাঁকের সঙ্গে এরা কাজ আরম্ভ করলেন। নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে তারা অবশ্য উৎকর্ষে পাল্লা দিতে পারলেন না, কিন্তু সারা ভারতে শ্রেষ্ঠ স্টুডিও বলে প্রখ্যাত হয়ে ওঠে এই প্রতিষ্ঠানটি।

বাঙলা চিত্রশিল্পের নাম এতদূর ছড়িয়ে পড়ে যে, এমন কি, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, পারস্য, শ্যাম প্রভৃতি দেশ থেকেও প্রযোজকরা এসে ছবি তুলিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

বাঙলা ছবির মাধ্যমে ভারতীয় চিত্রশিল্পে যুগান্তর নিয়ে আসেন এবং আজও নবনব ধারার প্রবর্তনে অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছেন রাইচাঁদ বড়াল, নীতিন বসু ও দেবকী বসু সঙ্গে লতা মঙ্গেশকর।

নিউ থিয়েটার্স তাদের হিন্দী ছবিতে এমন একটা ভাষার সৃষ্টি করেন যা ভারতের যে কোন অঞ্চলের যে কোন ভাষাভাষীরই বোধগম্য ছিলো। আজও কোন হিন্দী ছবিই ভাষার সে মহিমা নিয়ে আসতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আজ যে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হতে পেরেছে তার জন্যে প্রচার কাজে চলচ্চিত্রই হয়েছে সব চেয়ে বড়ো সহায়ক, আর সেই

হৃদয়জয়ী অভিনয়ের কান্তিতে বাঙলা ছবিকে অদ্বিতীয়তার আসন এনে দেন শ্রীমতী উমাশশী—"চণ্ডীদাস" আজও তাই স্মরণীয়।

সর্বভারতীয় ভাষার প্রবর্তক হলো বীরেন্দ্রনাথ সরকারের নিউ থিয়েটার্স তাদের ছবির মধ্যে দিয়ে এবং সে সব হিন্দী ছবির বেশীর ভাগ শিল্পীই ছিলেন বাঙালী, যাদের দেখে প্রাক্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও পরিদর্শন করতে এসে অবাক হয়ে বলেন যে বাঙালী এতো ভালো হিন্দী বলতে পারে তা তাঁর ধারণাতেই ছিলো না।

দেখতে দেখতে ক'বছরে এরপর গড়ে ওঠে ফিল্ম প্রডিউসার্স (অবলুপ্ত), দেবদত্ত ফিল্মস্ (বর্তমান বেঙ্গল ন্যাশনাল স্টুডিও), প্রফুল্ল পিকচার্স (বর্তমান রূপশ্রী স্টুডিও, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন আগেই ছিলো, এসময়ে বেশ কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরও নতুন তিনটি স্টুডিও কাজ আরম্ভ করে —ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিও, ক্যালকাটা মুভিটোন এবং ইস্টার্ন টকীজ স্টুডিও। তাছাড়া আরও দুটি স্টুডিও বর্তমানে নির্মীয়মান অবস্থায় রয়েছে।

যুদ্ধের মাঝে বাঙলার বাইরে বাঙলার চিত্রশিল্পের মান রেখে দেয় দুখানি ছবি—নিউ থিয়েটার্সের "ওয়াপস" তার মধ্যে একখানি। অপরখানি ছিলো এম পি প্রডাকসন্সের "জবাব", বাঙলা "শেষ উত্তর"-এর হিন্দী সংস্করণ। বাঙলা দেশে অবশ্য এম পি প্রডাকসন্স এর অনেক আগেই পরিচিত হয়েছিলো, কিন্তু বাঙলার বাইরে তার সুখ্যাতি "জবাব" থেকে। এম পি'র কর্ণধার মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পেরই অন্যতম কর্ণধার। ম্যাডানের আমল থেকেই তিনি চলচ্চিত্র শিল্পে যুক্ত এবং প্রথম নিজস্ব চিত্র-পরিবেশন প্রতিষ্ঠান রীতেন কোম্পানী নিয়ে তিনি স্বতন্ত্রভাবে কাজ আরম্ভ করেন। ক্রমে চিত্রনির্মাণ ব্যাপারেও তিনি উৎসুক হন যার ফল এম পি প্রডাকসন্স। আজ বাঙলায় সব চেয়ে বেশি সংখ্যক ছবি এদের কাছ থেকেই আসছে।

পৃথিবীর সপ্তম বৃহৎ চিত্রশিল্প

রাজনীতিক এবং তজ্জনিত অর্থনীতিক বিবিধ দুর্যোগের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে চলার ফলে বাঙলা চলচ্চিত্র বর্তমানে মন্দা অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও আজ পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করলে প্রসারে ও উৎপাদন ক্ষমতায় তার স্থান সপ্তম। ১৯১৬ সালের একটি চিত্রগৃহ আজ সব ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও প্রায় তিনশোটিতে পরিণত হয়েছে এবং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

১৯১৬ সালের ম্যাডানের নামমাত্র একটি স্টুডিওর জায়গায় আজ চোদ্দটি স্টুডিও দাঁড়িয়েছে আর তখনকার দুবছরে একখানা ছবির তুলনায় এখন বছরে আশীখানিরও বেশী ছবি তৈরী হচ্ছে।

অভিনয়ে আভিজাত্যের মর্যাদা নিয়ে আসেন শ্রীমতী চন্দ্রাবতী—"সবাকযুগের গোড়া থেকে আজও তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ তারকা।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলায় বিভিন্ন দেশের চিত্র পরিচয়

[২৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে কলকাতায় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা উপলক্ষে যে সব ছবি বিভিন্ন চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হবে তার কাহিনীর চুম্বকটুকু এখানে দেওয়া হোলো]

আর্জেণ্টিনা

দি লাস্ট স্কোয়াড

মধ্য আর্জেণ্টিনায় কারডোভার বিমান-চালনা শিক্ষালয়ের ছেলেদের নিয়ে গল্প। ডারিও হচ্ছে 'মুখেন মারিতং জগত' গোছের ছেলে; আর ভিভেলা হচ্ছে বিখ্যাত বৈমানিকের বিমান-ভীত ছেলে। শিক্ষক ভার্গাস ছেলেদের প্রকৃতি লক্ষ্য করেন এবং ভিভেলাকে সাহস অর্জনে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু ভিভেলা, ওরফে "লাস্ট স্কোয়াড" কারণ আকাশে ওড়াটা ও এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতো, তার ভয় জয় করতে দীর্ঘ সময় নেয়। ওর একটা বিমান দুর্ঘটনার অপরাধ ভার্গাস নিজের ঘাড়ে তুলে নেওয়াতে ভিভেলা জেগে ওঠে এবং শেষ পরীক্ষায় সে তার উড্ডয়নভীতি জয়ের পরিচয় প্রদান করে।

আমেরিকা

ব্রাইট ভিক্টরী

যুদ্ধে হতোদ্যমদের অবস্থা নিয়ে ছবি-খানির কাহিনী নির্মিত হয়েছে। উদ্দেশ্য-মূলক ছবি যা মানুষের কাছে প্রেম ও আশার বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

ম্যাগনিফিসাণ্ট ইয়াঙ্কি

যুক্তরাষ্ট্রের এক মহান ব্যক্তিত্ব, বিচারপতি অলিভার ওয়েন্ডেল হোমস। হোমসের বিখ্যাত সব মন্তব্য, আইন প্রণয়ন, মহত্ব নিয়ে ছবিখানির বিষয়বস্তু গঠিত হয়েছে।

নো হাইওয়ে অন দি স্কাই

এক আত্মভোলা বিমান-বৈজ্ঞানিক। বিমান বায়ুর চাপ কতটা সহ্য করতে পারে সেটা পরীক্ষা করাই তার কাজ। একটি নতুন ধরণের বিমান তৈরী হতে সেটা চালিয়ে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হলো। বৈজ্ঞানিককে নেওয়া হলো যাত্রীরূপে। মাঝপথে বৈজ্ঞানিক জানালে যে বিমানটির অবস্থা বিপজ্জনক। পাইলট বিমান নামিয়ে অন্যকে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে সব ঠিকই আছে। বৈজ্ঞানিকের তখন মাথা খারাপ কি না পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হলো। পরিশেষে দেখা গেলো বৈজ্ঞানিকের অনুমানটাই ঠিক ছিলো। বিমানটিকে চালালে ধ্বংস অনিবার্য হতো।

ইটালী

স্কাই অন দি মার্শেস

নেট্টুনোর কাছে অস্বাস্থ্যকর জলা অঞ্চলে সেরেনেল্লি পরিবারের আওতায় দরিদ্র কৃষক লুইগি গোরেট্টি স্ত্রী ও ছটি সন্তান নিয়ে বাস করে। সেরেনেল্লী পরিবার গোরেট্টিদের স্বতঃই তেমন খাতিরের সঙ্গে গ্রহণ করলে না। লুইগি গোরেট্টি খাটিয়ে লোক ছিলো কিন্তু অল্পদিনেই সে ম্যালেরিয়ায় মারা গেলো। কর্তা মারা যেতে সেরেনেল্লীর অত্যাচারের প্রতিরোধ ক্ষমতা হারালে। দুর্ধর্ষ মাতাল বুড়ো সেরেনেল্লী বিধবাটির পিছু নেয়, বিধবা তার প্রণয় প্রত্যাখ্যান করে; কিন্তু বুড়োর ছেলে আলেসাড্রোর তখনো নাবালিকা গোরেট্টির বড়ো মেয়ে মেরিয়ার প্রতি একটা শয়তানি প্রবৃত্তি প্রকাশ করতে থাকে। প্রথমে আলসাড্রো বৃথাই সামান্য কতকগুলো উপহার দিতে যায়, তারপর সে পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করতে যায়। কিন্তু মেরিয়া আত্মরক্ষা করে পালাতে সক্ষম হয় এবং ওতে শয়তানের পাশব বৃত্তি এমনি উত্তেজিত হয়ে ওঠে যে সে ওকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। জুলাইয়ের এক উত্তপ্ত দুপুরে আলসাড্রো সুযোগ পেয়ে মেরিয়াকে ছুরিকাঘাত করে। মেরিয়া হাস-পাতালে মারা যায় এবং মারা যাবার আগে সে তার ধর্মের ওপর অটল বিশ্বাস রেখে খুনীকে ক্ষমা করে দেয়।

মিমেমড্রী (হাঙ্গেরী)

মিরাকল্ ইন মিলান

ভোরে দরজা খুলে বের হতেই বৃদ্ধা লোলোট্টা বাগানে এক কপি ক্ষেতের মধ্যে নব-জাত শিশুর কান্না শুনলেন। বৃদ্ধা তার নাম দিলেন টোটো। বৃদ্ধা টোটোকে মানুষ করতে লাগলেন, তাকে শেখালেন সবায়ের ওপর সদয় হয়ে চলতে। বৃদ্ধা মারা যেতে শিশু টোটো এক অনাথ আশ্রমে মানুষ হতে

এন আমেরিকান ইন প্যারীস (যুক্ত রাষ্ট্র)—জনো কোল ও লেসলীক্যারন

থাকে। আঠারো বছর বয়সে টোটো সেই দাতব্য প্রতিষ্ঠান ছেড়ে মানুষের বিশেষ করে, দারিদ্রের সেবার ব্রত নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। টোটোর মানবতায় শত শত দরিদ্র আকৃষ্ট হয়ে তার চার পাশে জড়ো হলো। তাদের নিয়ে টোটো মিলানের শহরতলীতে একটা পোড়ো জমিতে আস্তাকুঁড়ের থেকে কুড়নো কাঠকাঠরা দিয়ে কুঁড়ে তৈরী করে এক গ্রাম গড়ে তুললে। সুপরিকল্পিত গ্রাম, টোটোর শিক্ষার আদর্শে উদ্বুদ্ধ অদ্ভুত সব নাম রাস্তাঘাটের। হঠাৎ টোটো মনজু কুমারী এডভিজের প্রেমে পড়লো। একদিন দরিদ্র গ্রামবাসী প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসবে মেতে রয়েছে, হঠাৎ মাটি ফেটে পেট্রোল বেরিয়ে এলো। এক অর্থগৃধ্নু ছুটলো সেই জমির মালিক শিল্পপতি মবির কাছে। মবি গ্রামবাসীদের ভিটে ছাড়া করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র রক্ষীদের পাঠিয়ে দিলে তখনই খনন কাজ আরম্ভ করবার জন্যে। ঠিক যে মুহূর্তে গ্রামবাসীরা উদ্বাস্তু হতে বসেছে স্বর্গ থেকে তখন নেমে এলেন বৃদ্ধা লোলোট্টা এবং টোটোর হাতে এক পারাবত দিয়ে জানালেন যে ঐটির সাহায্যে টোটো যে কোন কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। টোটো কাউকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সন্ধ্যা আসতে টোটো তার প্রিয়া এডভিজের কাছে গেলো। দুটি পরী এসে পারাবতটি নিয়ে গেলো। এই কারণে পরদিন সকালে মবীর লোক এসে আক্রমণ করতে টোটো আর তার লোকেরা প্রতিরোধ করার শক্তি পেলে না। রক্ষীরা জমিটা পরিষ্কার করে প্রতিরোধকারীদের কয়েদগাড়ীতে ভর্তি করলে। বৃদ্ধা লোলোট্টা সেই পরীদের কাছ থেকে পারাবতটি উদ্ধার করলে। কয়েদগাড়ী জেলখানার কাছে পৌঁছতে লোলোট্টা পারাবতটি টোটোর হাতে দিলেন। টোটো তার সাহায্যে নিজেকে ও সঙ্গীদের মুক্ত করলে। তারপর টোটো তার প্রিয়া এডভিজকে ও সঙ্গীদের নিয়ে সম্মার্জনীর ওপর চড়ে উড়ে চলে গেলো অন্য পৃথিবীর দিকে যেখানে কেবল শান্তি আর প্রেম বিরাজ করে।

দি রোড টু হোপ

সিসিলির ছোট এক শহরের গন্ধকখনি বন্ধ হওয়ায় শ্রমিকরা দারুণ অভাবের মধ্যে পড়ে যায়। এক ধড়ীবাজ লোক এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে বেকার কর্মীদের দৃষ্টির সামনে বিদেশে বেশী মাইনে আর সহজতর জীবনযাত্রার রঙীন দৃশ্য বর্ণনা করে অবৈধ উপায়ে দেশান্তরিত হতে প্রলুব্ধ করে। এই মরীচিকায় আকৃষ্ট হয়ে কতকজন কর্মী তাদের স্ত্রী ও প্রণয়িনীদের নিয়ে যথাসর্বস্ব বিক্রী করে সে টাকা তাদের পথনির্দেশকের জিম্মায় রেখে যাত্রা শুরু করে। ইতালি থেকে দুর্বার পথ অতিক্রম করে তারা ফ্রান্সের সীমান্তে পৌঁছয় আর সেই সময়ে তাদের পথনির্দেশক সেই দুর্বৃত্ত যথাসর্বস্ব নিয়ে সরে পড়ে। সীমান্ত অতিক্রমে পুলিশের বাধা পেয়ে কতক ফিরে যায়, কিন্তু আর সকলে তাদের সেই প্রতিশ্রুত দেশে যাবার জন্য অভিযান চালিয়ে যেতে থাকে। রোমাঞ্চ-কর তাদের অভিযান, প্রতিপদে নূতনতর অভিজ্ঞতা। বাস্তুহীনরা অপরদের চিনতে থাকে, তাদের সৌহার্দ্য এবং স্বার্থপরতা, প্রেম ও সংশয়। তারা চলতে থাকে শহরের প্রলোভনের মধ্যে দিয়ে যেখানে দুর্বলের হয় অপঘাত; প্রশস্ত গ্রামাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে যেখানে শান্তি ও স্বস্তির মায়া দেখতে থাকে; শক্ত এসফাল্টের রাস্তার ওপর দিয়ে, অসম পাহাড়ের পথ ধরে। একটা উন্নততর পৃথিবীর আশায় দৃঢ়চিত্ত হয়ে তারা চলতে থাকে। কতক পথের ধারে পড়ে থেকে যায়, সংগ্রামে অক্ষম হয়ে। তাদের কাহিনী শেষ হয় দুটো দেশের মাঝে আলপস্ পর্বতের শাশ্বত তুষারের স্তূপে।

ফরবিডন খ্রাইস্ট

যুদ্ধ-অভিজ্ঞ ব্রুনো সাইবেরিয়ার বন্দী শিবির থেকে বাড়িতে ফিরে জানতে পারে তার ভাই গিউলিও জার্মান কর্তৃক নিহত হয়েছে। ব্রুনোর নিজের শহরে লোকে যুদ্ধের ওপর বিরক্ত হয়ে পড়েছে। গিউলিওকে হত্যা করার জন্যে যে ব্যক্তি জার্মানদের উস্কে দিয়েছিলো লোকে তার নাম জানলেও একজনের নিজের ব্যক্তিগত বিচার ফলের সহায়ক হতে চাইছিলো না। ব্রুনো একা পড়লো। নিজেকে খানিকটা দোষী বুঝে এবং খানিকটা ব্রুনোর ওপর আকর্ষণে একটি হত্যার জন্যে দায়ী সেই শঠ পিনিনের বোন নেলা এগিয়ে এলো। নেলা এক জার্মান কর্তৃক সন্তানের মা। শহরের সবাই নিজেদের দোষী বোধ করে ব্রুনোর সামনে দৃষ্টি লুকিয়ে ফেলে। কেবলমাত্র এক বৃদ্ধ ছুতার মাস্তেরো এণ্টোনিও যাকে দয়ালু বলে সবাই ভালবাসতো, সে এলো ব্রুনোকে সাহায্য করতে। এক সন্ধ্যায় এণ্টোনিও জানায় যে বিশ বছর আগে সেও নিজের বিচারে একজনকে খুন করেছিলো, কিন্তু কাজটা করে তার লাভ হয়নি কিছু, পেয়েছে কেবল বেদনা আর বিমর্ষতা। ব্রুনো তাতে নরম হলো না। তখন এণ্টোনিও জানায় যে সেই ব্রুনোর ভায়ের নামে লাগিয়েছিলো। ব্রুনো তাকে হত্যা করে। মরবার সময় এণ্টোনিও বলে যে সে মিথ্যা বলেছিলো তবে তার মৃত্যু যদি আর একজনের প্রাণ বাঁচায় তাহলে

সে সুখী হবে। শেষে ব্রুনোর মা আসল ব্যক্তির নামটা বলে দেয়। ব্রুনো পিনিনকে গিয়ে ডাকতে পিনিন বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে আসে। একটা নির্জন স্থানে এসে পিনিন বন্দুকটা ব্রুনোর হাতে দিয়ে স্বীকার করে যে হিংসার জন্যেই সে গিডর্ণলিওকে হত্যা করিয়েছে। দোষ স্বীকার করে পিনিন মাথা নীচু করে চলতে থাকে, গুলীটা আশা করে। কিন্তু ব্রুনো অনড় থেকে যায়।

নেপলস এমংগ মিলিওনেয়ার্স

সৎ ট্রাম কন্ডাক্টার জেনাওর স্ত্রী আমালিয়া ও পুত্র আমেডিও তার অজ্ঞাতে কালোবাজারের কারবার করতে থাকে। পুলিশ এসে খানাতল্লাসী করার ফলে জেনাও সে ব্যাপারটা জানতে পারলে। পুলিশকে দেখে পরিবারের সবাই একটা মিথ্যে দৃশ্য সাজিয়ে ফেলে, জেনাও মৃতের ভাণ করে। এরপর জেনাও তার পরিবারকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকে, কিন্তু তখন নাৎসীরা নেপলস থেকে পিছু হটবার সময়ে জেনাওকে বন্দী করে জার্মানীতে নিয়ে যায়। মিত্র বাহিনীর উপস্থিতির সময় বুঝে যারা লুটে নেয় তাদের মুনাফা সহজ করে দিলে। আমালিয়া ও তার ছেলে তাদের কালোবাজারী কারবার বাড়িয়ে দিলে, অনেক পয়সা করলে এবং বাড়ীটাকে সাজালে। হঠাৎ জেনাও ফিরে এসে পরিবারের চরম দুর্নীতি দেখতে পেলে। বড়ো মেয়ে মেরিয়া রোসারিয়া এক আমেরিকানের রক্ষিতা হয়েছে। আর আমালিয়া প্রায় তার স্তাবক সেট্রেবেলেৎজের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে বসেছে। আমেডিও ধরা পড়ে তিন বছর কয়েদের শাস্তি পেলে। তারপর কনিষ্ঠ সন্তান রিটুচিয়ার অসুখ হতে আমালিয়ার হুঁশ ফিরলো। আমেরিকানরা চলে গেলো আর জোভাইনরা ফিরে এলো আবার তাদের সাধারণ পরিচ্ছন্ন জীবনের মধ্যে। দশ বছর পর আমেডিও ছাড়া পেলো। রোসারিয়া তার পুরনো প্রেমিকের সংগে সুখে দাম্পত্য জীবন কাটাচ্ছে। অনেক জিনিস অন্য রকম মনে হয়, কিন্তু সান্তা লুডিয়ার গলিটার কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। লোকে জীবন কাটিয়ে চলে উজ্জ্বলতর আগামী দিনের আশা নিয়ে, দুর্দিনের ভয় বুকে নিয়ে।

দেয়ার্স নো পিস এমংগ অলিভ ট্রিজ

বর্তমান ইতালির একখানি নাম করা ছবি। দুই মেষপালক পরিবারের দ্বন্দ্ব নিয়ে এর কাহিনী গঠিত হয়েছে। ঘটনাস্থল হচ্ছে দক্ষিণ ইতালির পার্বত্য অঞ্চল।

বাইসিক্‌ল থিফ

দীর্ঘকাল বেকার থাকার পর এক দরিদ্র শ্রমিক একটা চাকরী পেলে নিজের সাইকেল থাকার সর্তে। ওর একটা সাইকেল আগে ছিলো যেটা সে স্ত্রীপুত্রের খাওয়া জোটাতে বাঁধা রেখে দিয়েছিলো। অনেক দিন ধরে কষ্ট পেয়ে স্ত্রী বড়ো খিটখিটে হয়ে পড়েছিলো। তবুও তার শেষ সম্পদ একটা পোষাক জমা দিয়ে সে সাইকেলটা ছাড়িয়ে নিলে। কাজটা পেলে পোস্টার লাগাবার। ছেলেকে হ্যান্ডেলে চড়িয়ে কাজে বের হলো। একজায়গায় একটা পোস্টার লাগাবার সময়ে তার সাইকেলটা চুরি হয়ে যায়। চোরের মুখের একটা আভাস মাত্র সে পেয়েছিলো, সেইটেই মনে করে নিয়ে সে ছেলেকে সংগে করে সাইকেলের তল্লাসে বের হলো। ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হলো, সাইকেল পাওয়া গেলো না। শেষে বাড়ীতে ফেরবার সময় একটা সাইকেল পড়ে থাকতে দেখে একটা মতলব ওর মনে আসে। ছেলেকে ট্রামে করে বাড়ী যেতে বলে ও সাইকেলটা নিয়ে পালাতে যায়। কিন্তু ধরা পড়ে গেলো। সেই সাইকেলের শ্রমিক মালিক ওকে ভৎর্সনা করে ছেড়ে দিলে। ছেলেটিও ট্রাম না পেয়ে ফিরে এসে বাপের কাণ্ড দেখছিলো। তারপর লজ্জিত ও বিমর্ষ পিতাপুত্র ফিরে চললো বাড়ীর দিকে।

জাপান

মুকিওয়ারিশু

কাৎসুহিকো আর তার সুন্দরী স্ত্রী সায়কোর সুখী বিবাহিত জীবনে এক দুঃখের বাপার ঘটে গেলো। ছ বছর ধরে তারা বিবাহিত জীবনের সুখ ভোগ করে আসছিলো, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় এক চার বছরের ছেলের রূপ নিয়ে উৎপাত এসে হাজির হলো। কাৎসুহিকো তখন ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে মফঃস্বলে। ছেলেটা একটা চিঠি নিয়ে হাজির, তার মা লিখেছে সায়কোকে। তাতে জানানো হয়েছে ছেলেটা কাৎসুহিকোরই সন্তান এবং কাৎসুহিকোই বলবে কি করে। ছোট নির্দোষ ছেলেটাকে নিয়ে সায়কো দারুণ মানসিক যন্ত্রণায় দিন কাটাতে লাগলো। স্বামী বাড়িতে ফিরে ব্যাপার দেখে ছেলেটি তারই বলে স্বীকার করে—একটা বিমান আক্রমণ নিরোধক আশ্রয়ে ওদের দেখা হয়। আর এক দুর্বল মুহূর্তের এই ফল। স্বামী ও স্ত্রী নিজেদের দুঃখ নিয়ে দিন কাটায়, আর ছেলেটা একা একা কোথায় চলে যায়। হতভাগা পিতা দৌড়ায় তাকে খুঁজতে আর আতঙ্কিতা স্ত্রী তার পিছু নেয়। ছেলেটি খোঁজা নিয়ে ওদে

দি ম্যান ইন দি হোয়াইট স্যুট (ব্রিটিশ)—নায়ক এলেক গিনেস

অমর ভূপালী (ভারত)

দুজনের অন্তরের মাঝখানের প্রাচীর ভেঙে পড়ে।

লাইফ অফ গৌতম বুদ্ধ

অনন্যসাধারণ ছবি এই হিসেবে যে এতে কোন মানুষ অভিনেতা নেই, সবই ছায়াভিনয়। অভিনেতারা হচ্ছে আঁকা কার্টুন। আলোকচিত্রের অদ্ভুত কৃতিত্ব এবং সুরযোজনা মিলে ভগবান বুদ্ধের আদর্শকে জাগিয়ে তোলার এক শক্তিশালী চিত্র।

ফ্রান্স

ব্লু বেয়ার্ড

কাউন্ট এমেডি দে সলফেয়ার, ওরফে ব্লু বেয়ার্ডের স্ত্রী ছিলো সাতটি, তার মধ্যে ছটি রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যায়। তার স্ত্রীর "মৃত্যুতে" রক্ষীরা গ্রামাঞ্চল তল্লাস করে সুন্দরী নারীদের ধরে নিয়ে আসে। ছবার এই ব্যাপার হওয়ায় ব্লু বেয়ার্ডের স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোষিত হলেই গ্রামবাসী তাদের মেয়েদের লুকিয়ে ফেলতে থাকে। ষষ্ঠ স্ত্রীর "মৃত্যুর" পর ব্লু বেয়ার্ড তার প্রাসাদে সমপর্যায়ের লর্ডদের আর তাদের বিবাহযোগ্যা কন্যাদের এক উৎসবে নিমন্ত্রণ করে। উৎসবে সরাইওয়ালার মেয়ে এনী ছদ্মনামে হাজির হয়। ধরা পড়তে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে ব্লু বেয়ার্ড সরাইতে হাজির হয়ে এনীকে স্ত্রী করে নিয়ে আসে, তার প্রেমিক গিগলিওকে চটিয়ে দিয়ে। বিবাহ ভোজে এনী ব্লু বেয়ার্ডের গলায় একটা সোনার চাবি ঝুলতে দেখে। ব্লু বেয়ার্ড জানায় চাবিটা একটা কাবোর্ডের যেটা সেই শুধু খোলে। এনী যদি কথা নাশোনে তাহলে আগেকার দুটির মতো তাকেও সে হত্যা করবে। এনীর ঔৎসুক্য বেড়ে যায়। ব্লু বেয়ার্ড শিকারে যেতে ও চাবিটা নেয়। ও গিয়ে পড়ে এক টাওয়ারে সেখানে ব্লু বেয়ার্ডের আগের ছটি স্ত্রীকে আবিষ্কার করে। এনীর অবাধ্যতা ধরা পড়ে এবং তার মৃত্যুদণ্ড হয়। অবশ্য গিগলিও ও তার সহচরবৃন্দ তাকে উদ্ধার করে এবং সম্রাটের প্রতিনিধি এসে ব্লু বেয়ার্ডকে নির্বাসনে পাঠায়।

আন গ্র্যান্ড পেট্রন

এক ডাক্তার পাকাশয় অস্ত্রোপচারের নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করে। বিজ্ঞানের প্রতি ভক্তি তাকে সুস্থ ও প্রাণবন্ত জীবনকে অনুভব বিষয়ে অন্ধ ও বধির করে তোলে, এমন কি তার স্ত্রীর ওপরেও সব আকর্ষণ ভুলে যায়।

লাইফ বিগিনস্ টুমরো

আধুনিককালের শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে মানুষের পরিচয় করিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে এর বিষয়বস্তু রচিত। পিকাসো, আঁদ্রে জিদ, সারট্রেয়ার প্রভৃতি বর্তমানকালের ফরাসী মনীষীদের সঙ্গে জিন পিয়ারের সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে বিষয়গুলির আলোচনা করা হয়েছে।

লাভার্স অফ ভেরোনা

ভেনিসে এক ক্ষীয়মান নাৎসী পরিবারের কাহিনী এই ছবির বিষয়বস্তু। অত্যন্ত নির্মম, মর্মন্তুদ বিয়োগান্ত কাহিনী, মাঝে মাঝে হাল্কা মুহূর্তেরও সমাবেশ আছে।

জ্যুর দ্য ফেত

গরম কাল। গলির ভেতর দিয়ে একটা শকট চলেছে। সবার শেষের গাড়ীটায় কাঠের

ডিসিশন বিফোর ডন (যুক্তরাষ্ট্র)—রিচার্ড বেসহার্ট ও ডোমিনিক ব্লাণ্ডার

ঘোড়া। একটা ছেলে পিছন পিছন চললো। শকট চলেছে মেলায়। যথাস্থানে শকট থামতে মাল পত্তর নামানো হতে লাগলো। এদিক সেদিক থেকে লোকে দেখতে লাগলো। চালকের সংগী গেলো চুল কাটতে। তারপর এলো তাঁবু খাটাবার পালা. ওদের সাহায্য করতে এলো গ্রামের পিয়ন। সে এক কাজ করতে আর এক কাজ করে বসতে থাকে, এক হুল্লোড়ে কাণ্ড। ক্রমে মেলা জমতে থাকে। গ্রামের সুন্দরীরা আসতে থাকে, ভীড় বেড়ে যায়। পিয়নটির তারপর সাইকেল নিয়ে আরও কাণ্ড। এ'কেবে'কে হুমড়ী খেয়ে চলতে চলতে মৌমাছি তাড়া করলে। সেই সময়ে গ্রামের ব্যাণ্ডপার্টি এসে পড়লো। মৌমাছির খপ্পরে তারাও পড়লো, তাই নিয়ে আর এক হুল্লোড় ব্যাপার। ঘটনা বদলে দেখা গেলো পিয়নটিকে বোকা বানিয়ে মদ পান করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অবস্থায় সে আমেরিকার বিমান ডাক ব্যবস্থা সম্পর্কিত একখানি চলচ্চিত্র দেখতে বসলো। গ্রামের লোকেও ছবিখানি দেখে তাদের নিজেদের পিয়নটির অপারদর্শিতা নিয়ে বিদ্রুপ করতে পিয়ন দ্রুত কাজ করবার তার ক্ষমতার পরিচয় দিতে গিয়ে কেলেংকারির চূড়ান্ত করে বসলো। এইভাবে মেলা শেষ হলো, আবার তাঁবু খোলা হয়ে গেলো, শকট ফিরে চললো সেই আসার পথ ধরে।

বৃটিশ

দি ম্যাজিক বক্স

ব্রিটিশ আলোকচিত্রশিল্পী উইলিয়াম ফ্রিজ গ্রীনই প্রথমে একটি কার্যকরী চলচ্চিত্র ক্যামেরা আবিষ্কার করেন। ১৮৮৯ সালের এক রবিবার সকালে হাইড পার্কে গিয়ে ভিক্টোরিয় যুগের পোষাক শোভার এক ছবি তোলেন। তার সেই ছবি তোলার সাক্ষী হয় এক পুলিশ। ফ্রিজ গ্রীন তার যন্ত্রের পেটেন্ট গ্রহণ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য এবং মন্দা ব্যবসার জন্যে তিনি যখন মারা যান তখন তার পকেটে ছিলো মাত্র এক শিলিং দশ পেন্স। গ্রীনের মৃত্যু হয় নাটকীয়ভাবে, চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের বিতণ্ডা ত্যাগ করে একতা ও প্রগতির পথ গ্রহণ করার জন্যে একটা বক্তৃতা দেবার পরই।

ক্রাই, দি বিলাভেড কান্ট্রি

বর্তমানের যন্ত্রশিল্পের জটিলতায় সরল লোকের কি অবস্থা হয় তারই কাহিনী এটি। নায়ক আফ্রিকার এক জুলু পুরোহিত, উমজিমকুলু উপত্যকার একটি ক্ষীয়মান বান্টু সম্প্রদায়ের কথা। উমজিমকুলু একটা মারাত্মক নদী ড্রাকেনসবার্গ থেকে বেরিয়ে ভারত মহাসাগরে পড়েছে আর সেই সংগে মূর্খতা, অবহেলা জনিত মাটির খানিকটা করে অংশ ধুয়ে নিয়ে চলেছে। ওপরে পাহাড়ে এক মনোরম গোলাবাড়ী, সবুজ মাঠে বাঁধানো, ভালোভাবে চাষ করা এবং সম্পদশালী। দক্ষিণ আফ্রিকার চাষী জেমস জারভীসের বাড়ি সেটা। তার আর দরিদ্র পুরোহিতের একটা বিষয়ে মিল ছিলো। তাদের দুজনেরই ছিলো একটি করে ছেলে। আর্থার জারভীস জোহান্সবার্গের গণ্যমান্য ব্যক্তি; দক্ষিণ আফ্রিকায় অ-ইয়োরোপীয়দের জন্যে সে লড়ে। পুরোহিত পুত্র আবসালেম কুমালো শহরের ঝলকানিতে আকৃষ্ট হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

অসহনশীলতা, ঘৃণা এবং তীব্র বিবাদ হত্যায় পরিসমাপ্ত হয়। ঘোর দুর্দিনে দুই প্রবীণ বুঝতে পারে দয়ার দ্বারা কিভাবে কষ্টকে লাঘব করা যায়।

দি ট্র্যাপ (চেকোশ্লোভাকিয়া)

কম এবং যখন দক্ষ অস্ত্রোপচারের ফলে নিরাপদে প্রসব সম্পন্ন হলো দেখা গেলো শিশুর শ্বাস বাধা পাচ্ছে। এনের সতর্ক দৃষ্টি শ্বাস ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় আর এন তখন বুঝতে পারলে যে নার্সিং জীবনের সে একটা চরম অভিজ্ঞতা লাভ করতে পেরেছে।

চীন

হোয়াইট হেয়ার্ড গার্ল

১৯২৫ সালে কুয়োমিনটাঙের শাসনকালে এক কৃষকের সুন্দরী কন্যার আর এক কর্মঠ চাষী যুবকের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু গ্রামের জমিদারের অন্য মতলব ছিলো। নব বছরের সন্ধ্যায় বৃদ্ধ চাষীকে সে তার মেয়েকে বিক্রী করতে বাধ্য করে এবং অচিরেই মেয়েটির সতীত্ব নষ্ট করে। ব্যর্থ

দি ম্যান ইন দি হোয়াইট স্যুট

এক যুবক রাসায়নিক একটা সাদা পোষাক আবিষ্কার করে যা নোংরা হবে না না ছিঁড়বে না। বৈজ্ঞানিকদের নিষ্কাম দৃষ্টিতে কেবলমাত্র চমৎকার আবিষ্কার, কিন্তু ম্যানুফ্যাকচারারদের কাছে? উভয়েই পরিণাম ভেবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভিন্ন ভিন্ন কারণে মালিক ও শ্রমিক একত্রিত হলো যাতে ঐ মারাত্মক আবিষ্কারটা জনসাধারণ্যে পৌঁছতে না পারে।

লাইফ ইন হার হ্যাণ্ডস

কতক মেয়ে নার্সিং ব্রত নেয় এই কারণে যে, এবিষয়ে তার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে বলে। এন পিটার্সের মতো আবার অনেকে নার্স হয় ঘটনাচক্রে। তার স্বামী মোটর দুর্ঘটনায় মারা যেতে এনকে চাকরীর খোঁজে বেরুতে হলো। কি যেন একটা হয়তো তার স্বামীর শেষ অবস্থায় যে নার্স সেবা করেছিলো তার প্রশান্ত মুখটা স্মরণ হতেই এনের মনে হলো নার্সিংয়েই তার আশা পূরণ হবে। পরিবারের সতর্কতা সত্ত্বেও এন আবেদনপত্র পাঠিয়ে দিতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য তার ডাক পড়লো। যথা সময়ে এন নার্স হলো। তার বান্ধবী মিচেল প্রসব করতে হাসপাতালে আসতে ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়ালো। এন মেটার্নিটি ওয়ার্ডে কাজে রত সেই সময়ে প্রধান সার্জেন ঠিক করেন যে, মিচেলকে বাঁচাতে তখুনই অস্ত্রোপচারের দরকার। এন অস্ত্রোপচার কক্ষে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে

আওয়ারা (ভারত)—অভিনয়ে নার্গিস

প্রেমিক রেড আর্মিতে যোগ দেয়, আর দুঃখে শেতকেশা মেয়েটি এক নির্জন গুহায় বাস করতে থাকে। অষ্টম রুট আর্মি জাপানীদের সঙ্গে লড়ায়ের জন্যে উত্তরাভিমুখে যাবার সময়ে সেই যুবক তার নিজের গ্রামে আসে এবং তার প্রিয়তমাকে দুর্বৃত্ত জমিদারের কবল থেকে রক্ষা করে।

চেক্

দি ট্র্যাপ

রুজেনা নাৎসী অধিকারের সময় লুক্কায়িত রেল কর্মীদের সঙ্গে প্রাগ শহরের লুক্কায়িতদের মধ্যে সংযোগকারিণীর কাজ করতো। গেস্টাপো তাকে ধরে ফেলে এবং তার কাছ থেকে সারম্যাক নামক একজনের পরিচয় জানার চেষ্টা করে। প্রথম ওরা নরম পথ ধরে হার্টা নামক একজনকে দিয়ে। কিন্তু হার্টা একটা মিথ্যা সূত্র পায় যাতে গেস্টাপোরা নাকাল হয়। রুজেনাকে মুক্তি দিয়ে তার ওপর নজর রাখা হলো। প্রাগের গুপ্তদলও রোজেনার ওপর নজর রাখলে এবং গেস্টাপো দালাল হার্টাকে বোকা বানালে। মিথ্যা সূত্র গেস্টাপোদের আলেয়ার পিছনে দৌড় করায় আর তখন বিধ্বংসী কাজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্তও গেস্টাপোরা ধরতে সক্ষম হয় যে, সারমাক কোন লোকের নাম নয়, ওটা নাৎসী প্রতিরোধে চেক গুপ্ত দলের নাম।

ভিকটোরিয়াস উইংগস

বিমান নির্মাণ কারখানার তিনজন কর্মী। প্লাইডার তৈরী এবং প্লাইডার ওড়ানোই এই কর্মীদের খেলা। এই নিয়ে ওদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ছিলো বিশেষ করে বিনয়ী ফ্রান্টা আর প্রবঞ্চক রুডার মধ্যে। লিডার সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারেও ওরা প্রতিদ্বন্দ্বী। অতি উৎসাহ দেখাতে গিয়ে রুডা প্লাইডার নিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে যাতে তার প্লাইডার তৈরীর চাকরী চলে যায়। আর সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্লাইডার রেসের প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য ফ্রান্টা নির্বাচিত হয়। নিজের মতিগতির সংশোধন করে রুডা তার দোষত্রুটির জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে শেষ মুহূর্তে প্লাইডার প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার সুযোগ করে নেয়। পাল্লা দেবার সময় রুডা ধাক্কা লাগিয়ে তার প্লাইডারটা জখম করে ফেলে কিন্তু ফ্রান্টা নিজের প্লাইডারটা দিয়ে দেয় রুডাকে। রুডা উড়ে চললো গৌরব অর্জন করতে, তার নিজের জন্যে নয়, ফ্রান্টা ও আর সবায়ের মতো দলের জন্যে।

ইন্দো-আমেরিকা

দি রীভার

গঙ্গার তীরে এক ইংরাজ পরিবারের বাস। পিতা এক জুট মিলের ফোরম্যান; মা ব্যস্ত থাকেন তার ছটি সন্তানের পরিচর্যায়, সব কটিই মেয়ে, বগি ছাড়া। বড় মেয়ে হ্যারিয়েট চতুর্দশী ছোট থেকে প্রণয়ের দিকে ঝোঁক, বড়ো হয়ে লেখিকা হতে চায়। তার দুই অন্তরঙ্গ—১৮ বৎসরের ভেলেরি যার পিতা জুট মিলের মালিক। পিতার একমাত্র সন্তান এবং সে কি হবে আগে থেকেই তার জানা ছিলো। হ্যারিয়েটের অপর বান্ধবী মেলানী, প্রতিবেশী জনের মেয়ে। জন দীর্ঘকাল ভারতে আছে এবং এক ভারতীয় নারীকেই বিবাহ করে। শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি, কিন্তু সে জানতো যে মিশ্রণের ফলে কন্যা মেলানীর

ডিক্‌টরি অফ লাইফ (রুমানিয়া)

জন্যে তাকে একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এর মধ্যে এসে পড়ে ক্যাপ্টেন জন; আমেরিকান যুবক যুদ্ধে একটা পা হারিয়েছে। সে আসে তার আত্মীয়জনের সঙ্গে দেখা করতে। তিনটি মেয়েই জনের প্রেমে পড়ে—প্রত্যেকে জনের কাছে পৃথক পৃথক আবেদন নিয়ে আসে। মেয়েদের কাছে তাদের এই প্রথম প্রণয়। বাস্তব ও স্বপ্নের অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্ব শুরু হলো। জন আসা থেকেই এই সব চরিত্রগুলির মধ্যে মৃত্যু, হিংসা-দ্বেষ, বিশ্বাস, সুখ-দুঃখ, প্রেম প্রভৃতি দেখা দিতে থাকে। ছোট মেয়েদের প্রত্যেকে বিজ্ঞ হয়ে ওঠে, আর ক্যাপ্টেন বুঝতে পারে যে, "জীবনে যা কিছু ঘটে, -জীবনে প্রয়োজনীয় বলে যাদের মনে হয়—তাদের কাছে তোমার খানিকটা মৃত্যু বা খানিকটা জন্ম অনিবার্য।"

মিশর

দি ফাউণ্ডলিং

গ্রামের রাস্তায় একটি মেয়েকে কুড়িয়ে পাওয়া গেলো। অনাথ আশ্রমে ওর নাম রাখা হলো লয়লা। অনাথ আশ্রমে বড় হতে হতে ও ধর্ম আর সূচী কাজ শিখলে। লয়লা ভাবতো কে তার বাপ-মা। বড়ো হয়ে লয়লা সুন্দরী হলো, অনাথ আশ্রম তাকে ছাড়তে হলো, কিন্তু কি করবে সে? কুড়নো মেয়েকে কেউ চায় না। শেষে লয়লা ডাঃ কেমালের কাছে তার হাসপাতালে কাজ নিলে। কাজ করতে করতে ও নিঃসংগতার মধ্যে পড়ে গেলো। তার সৌন্দর্য, সুনীতি আর বিশ্বাস নির্দয় পারিপার্শ্বিক থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখলে। সে যে কুড়নো এ খবরটা হাসপাতালের সিস্টাররা আবিষ্কার করলে এবং ওর ওপর ঈর্ষার জন্যে ওকে তাড়ালে সেখান থেকে। লয়লা সহায়তা পেলে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক সৈয়দ এম আমিনের কাছ থেকে। সৈয়দ আমিন যে দোষ লয়লার নিজের নয় তার জন্যে তাকে দোষী মনে করলেন না। সৈয়দ আমিন লয়লাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় মোয়াসাট হাসপাতালে কাজ জোগাড় করে দিলেন। সেখানে সার্জন রসদীর সঙ্গে আলাপ হলো। রসদী লয়লাকে ভালো-বাসলে এবং বিয়ে করতে চাইলে। সৈয়দ আমিনের উপদেশে লয়লা ভয়ে ভয়ে রসদীর কাছে তার পরিচয় দিলে। কিন্তু রসদী সেজন্যে তার মত বদলাতে চাইলে না। জন্ম বৃত্তান্ত শুনে রসদী লয়লাকে কায়রোর নিকটবর্তী ফায়োনমে তার বাড়িতে নিয়ে গেলো। তার বাবা অজ্ঞাতকুলশীলের সঙ্গে বিয়েতে মত দিলেন না। এক গোয়ালিনী রসদীর বাবা পাশাকে জানায় যে সে লয়লাকে ডাঃ কেমালের হাসপাতালে দেখেছে এবং সেখানে খবর নিতে ডাঃ কেমাল লয়লা সম্পর্কে অপ্রীতিকর বিবরণ দিলে। এই সময়ে লয়লার মা এপেণ্ডিসের গোলমালে হাসপাতালে এলো চিকিৎসা করাতে। হঠাৎ তার আগেকার কথা মনে পড়ে যায় এবং লয়লা জানতে পারে যে তার জন্মদাতা এক সৈনিক ছিলেন, যিনি যুদ্ধে মারা যান তার মাকে বিয়ে করার আগেই। তার মার যখন অস্ত্রোপচার হচ্ছে সে সময়ে লয়লার আঙুল কেটে যায় আর সেটা বিষাক্ত হয়ে সে মারা যায়। ওদিকে সৈয়দ আমিন যায় পাশার

নো হাইওয়ে ইন দি স্কাই (যুক্তরাষ্ট্র)—গ্লিনিস জোন্স, জেমস স্টুয়ার্ট ও মার্লেন ডিয়েট্রিক

কাছে লয়লা সম্পর্কে তার ভুল ধারণা দূরে করার জন্যে এবং শেষে বিয়েতে তার মত আদায় করে নেয়।

নাইল রয়

এক দরিদ্র গ্রাম্য ছেলে, অনেক আশা অনেক স্বপ্ন তার। শহরে যাবার তার প্রচণ্ড ঝোঁক। এক গুণ্ডাদলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো এবং তারপর দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে তার অন্তর্জ্ঞান ফিরে পেলে।

রুশ

লিবারেটেড চায়না

১৪ই ফেব্রুয়ারী সোভিয়েট-চীন চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং চীনের জনগণ এ নিয়ে দেশব্যাপী উৎসব পালন করে, কারণ চুক্তিতে মূল্যবান সাহায্যের কথা ছিলো। ১৯৫০ সালের ১১ই এপ্রিল এক মৈত্রী চুক্তি চীন ও সোভিয়েটকে আরও নিকট করে দেয়। সুপ্রশস্ত ভূমিতে ট্রাকটর চলতে আরম্ভ করলো, সর্বত্র যন্ত্রের কেন্দ্র গজিয়ে উঠতে লাগলো আর যুবক ও যুবতীরা যন্ত্র-বিষয়ক শিক্ষা পেতে আরম্ভ করলো। জমি ফিরে এলো কৃষকের হাতে, সমগ্র কর্মী অধিবাসীর জন্যে প্রতিষ্ঠিত হলো বিনা-মূল্যের চিকিৎসা কেন্দ্র, আর ছোট বড়োদের শিক্ষার জন্য অভিযান আরম্ভ হলো। স্বাধীন অধিবাসীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

ডি ডনবাস মাইনর্স

খনির শ্রদ্ধেয় কর্মী নেদোল্যার পঞ্চাশ বছরের কর্মমুখর জীবন এবং সেই সময়ে ডনবাস কয়লা শিল্পের উন্নয়ন ছবির কাহিনী। আগের দিনে খনির কর্মীদের দুঃস্থ এবং বিপদসঙ্কুল জীবন, তারপর অক্টোবর বিপ্লবের পর অবস্থার উন্নয়ন, যন্ত্রের প্রবর্তন এবং তার দ্রুত প্রসার, উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে ডনবাস কর্মীদের জীবনযাত্রার ছবি।

ফল অফ বার্লিন

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে জনগণের দৃঢ়তা, সাহস ও ত্যাগের কাহিনী। ছবিখানিতে চার্চিল, রুজভেল্ট, স্ট্যালিন, হিটলার প্রভৃতি ইতিহাসের অনেকগুলি চরিত্র আছে।

মুসোরোগস্কী

ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের স্রষ্টাদের মধ্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলে খ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের জীবনী অবলম্বনে কাহিনী গঠিত হয়েছে। ছবিতে মুসোরোগস্কীকে কেবলমাত্র সঙ্গীতজ্ঞরূপেই দেখানো হয়নি, রাশিয়ার মহা বিপ্লবের সময়ে জনগণের শক্তি ও সাহসের ওপরে তার গভীর বিশ্বাস তার নাটকীয় অপেরা সৃষ্টি "বরিস গুদোনোভ"-এর মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বার্উশ্টফুল সামার

ইউক্রেনের আজকালকার গ্রাম্য জীবন ছবিখানির বিষয়বস্তু। সমবায় প্রথা কিভাবে সোভিয়েট চাষীদের প্রাচুর্যে ভরিয়ে দিয়েছে তাই দেখানো হয়েছে ছবিখানিতে।

ইন পিস টাইম

মহড়ার জন্যে ঘাঁটি ত্যাগ করার পর একটি সাবমেরীনের ফিরে না আসা নিয়ে ছবির কাহিনী। সোভিয়েট নাবিকরা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে কিভাবে সেই সাবমেরিনটি এবং তাদের সহকর্মীদের জীবন রক্ষা করলে নাটকীয়ভাবে তাই দেখানো হয়েছে।

সুইট্জারল্যাণ্ড

ফোর ইন এ জীপ

দু রকম ভাষা মিলিয়ে ছবি তোলায় ইতালির নতুন ধারাটিকে অবলম্বন করা হয়েছে। ভিয়েনার আন্তর্জাতিক অঞ্চল-এর ঘটনাস্থল। নায়ক হচ্ছে চারজন চার দেশের সৈনিক—বিটিশ, আমেরিকান, ফরাসী ও রুশ। ওখানকার নানাবিধ অসুবিধা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগের প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে কাহিনীটির মধ্যে।

যুগোস্লাভিয়া

ফ্রা বার্ন

ফ্রা বার্ন তার ভাইপো আইভোকে মঠে নিয়ে গেলেন ব্রহ্মচারী হবার জন্যে। মঠে বুঝতে পারে যে, সে যাকে ভালোবাসে তাকে পাওয়ার জন্যে সম্মানজনক পন্থার চেয়ে অসম্মানজনক পন্থা অনেক সহজ। শেষে বুঝতে পারে যে, একটা সম্পূর্ণ রীতির সঙ্গে সে লড়াই করতে পারবে না এবং তাই আত্মসমর্পণ করে, পরবর্তী ফ্রা বার্ন হবার জন্যে, ভণ্ড এবং উচ্চপদাভিসিক্ত পাদরী।

ভারতবর্ষের নির্বাচিত ছবিগুলির কাহিনীর চুম্বক এখানে দেওয়া হোলো না। কারণ সে-কাহিনী সর্বজনবিদিত।

শুক্রবার ৭ই মার্চ শুভমুক্তি ! খ্যাতনামা কিশোর সাহুর নবতম অবদান !!

হিন্দ ঃ ভারতী ঃ রূপবাণী ঃ অরুণা ঃ ছায়া

ভবানী ঃ নীলা ঃ বিভা ঃ নারায়ণী — নবভারত ফিল্ম পরিবেশিত

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

(২০)

বিদায়পর্বের সূচনা। জিমখানা ক্লাবে সম্বর্ধনা-সভায় মাউণ্টব্যাটেন। সভার মাঝখানেই বার্তাবাহকের আবির্ভাব। নিজামের প্রেরিত তিনখানি চিঠি। মাউণ্টব্যাটেন, নেহরু ও ভি পি'র ব্যস্ততা। চাপাস্বরে আলাপ ও দুঃসংবাদের লক্ষণ। চুক্তির নতুন প্রস্তাবেও রাজী হননি নিজাম। মাউণ্ট-ব্যাটেনের সব ভরসার সমাপ্তি। নিজামের বিরোধিতাপ্রবণ মনোভাবের শোচনীয় পরিচয়। একটি চিঠির উত্তর দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। লায়েক আলির মিথ্যা-চারিতা। পূর্বের স্বীকৃতি অস্বীকার করার একটি উদাহরণ। মংকটনের হস্তক্ষেপে কি ফল হবে? পুলকিত হায়দরাবাদ-হাউসে কোন ক্ষোভ ও উদ্বেগ নেই। জইন ইয়ার জংগের ডিনার পার্টির সমারোহ। হায়দরাবাদী মহলে শেষ সম্বর্ধনা। জনৈকা হায়দরাবাদী মহিলার দীর্ঘশ্বাস। এ দিল্লী সে দিল্লী নয় এবং সে মোগল বাদশাহও আর নেই!

ভারত হতে বিদায়। কর্মের জগৎ হতে আলস্যের জগতে। ক্যালেডোনিয়া জাহাজের স্টেট-রুম। জনৈক মহারাজার রাগ। সান্তাক্রুজ বিমানঘাটিতে মংকটন। বোম্বাইয়ে পুলিশের আচরণে মংকটনের ক্রোধ। জিনিষপত্র তল্লাসীতে মংকটনের আপত্তি। হায়দরাবাদ যাত্রা বাতিল ক'রে লণ্ডনে ফিরে যাবার সংকল্প। শেষ পর্যন্ত তল্লাসীর বিড়ম্বনা হতে রক্ষা। হায়দরাবাদ সমস্যার সমাধান সম্পর্কে মংকটনের নৈরাশ্য। গণভোটের প্রস্তাব সমর্থন করেন মংকটন। নিজামের মনোভাব সম্বন্ধে মংকটনের উক্তি। 'আরও কিছুটা সময় চাই।' ভারত উপকূলের দ্বীপরেখা। এখন সবই শান্ত। কিন্তু ঝড়ের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

নয়াদিল্লী, রবিবার, ৩০শে মে, ১৯৪৮ সাল। গতকালের বিদায় সম্বর্ধনার অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেন আমাকে একটি সিগারেট-কেস উপহার দিয়েছেন। প্রীতিপূর্ণ ভাষায় কয়েকটি কথা লেখা আছে এই উপহারের গায়ে। বিশ্বস্ততা, কর্মকুশলতা ও সৌহার্দ্যের যে পরিচয় মাউণ্টব্যাটেন পেয়েছেন, তারই স্মৃতির প্রতীক এই উপহার। উপহার পেয়ে খুশি হলাম এবং সংগে সংগে আমার মনও কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লো। মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যে এতদিন থাকবার সুযোগ পেয়ে সব চেয়ে বড় যে পুরস্কার লাভ করেছি, সেটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি ভারতে একটি মহৎ কর্তব্য পালনের জন্যই এসে-ছিলেন এবং আমার সৌভাগ্য এই যে, এহেন ব্যক্তির কাজে সহযোগিতা করবার সুযোগ পেয়েছি। এই তো সব চেয়ে বড় **পুরস্কার।**

আজ দিল্লীর জিমখানা ক্লাবে ভি পি মেনন এক বিরাট সম্বর্ধনা-সভা আহ্বান করেছিলেন। দিল্লীর প্রায় প্রত্যেকটি বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে-ছিলেন। ভারতের শেষ ব্রিটিশ গভর্ণর জেনারেল মাউণ্টব্যাটেনকেই বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এই প্রীতিসভা আহ্বান করা হয়েছে। আগামী তিন সপ্তাহ পরেই মাউণ্টব্যাটেনকে আর ভারতভূমিতে দেখতে পাওয়া যাবে না। সুতরাং, মাউণ্টব্যাটেন-বিদায়ের আয়োজনও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বিদায় সম্বর্ধনার বহু অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে ভারতীয় জীবনের সংগে যে মেলা-মেশার পালা শেষ করে দিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে চলে যেতে হবে, তারই সূচনা করেছেন ভি পি। বিদায়ের পালা আজ থেকেই আরম্ভ হলো।

হঠাৎ, এই সভাস্থলের মাঝপথ দিয়ে এবং গণ্যমান্যদের এই ঠাসাঠাসি ভীড় ঠেলে একজন বার্তাবাহক এগিয়ে এলেন এবং মাউণ্টব্যাটেনের হাতে তিনটি চিঠি দিয়ে চলে গেলেন।

সংগে সংগে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনজন। সভার প্রধান আহ্বায়ক, প্রধান অতিথি এবং প্রধান মন্ত্রী। দেখতে পেলাম—ভি পি, মাউণ্টব্যাটেন এবং নেহরু, তিনজনেই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে চিঠিগুলি পড়ছেন।

ভারতীয় এবং বৈদেশিক সংবাদপত্রের যেসব প্রতিনিধি এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাই সবচেয়ে আগে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বার্তা-তত্ত্বে অভিজ্ঞ ও দক্ষ এইসব সাংবাদিকদেরও বুঝতে বিলম্ব হলো না যে, একটা কিছু ব্যাপার ঘটেছে, এবং ব্যাপারটা ভাল নয়। মাউণ্টব্যাটেন, নেহরু ও ভি পি, তিনজনেই সভার এক কোণে সরে গিয়ে এবং তাঁদের তিন মাথা প্রায় এক ক'রে নিয়ে চাপাস্বরে কথা বলছিলেন। চাপাস্বরের কথা শুনতে না পাওয়া গেলেও, তাঁদের আলোচনার ভংগীতে একটা উদ্বেগের ভাব স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছিল। সুতরাং সাংবাদিকদের পক্ষে অনুমান ক'রে নেওয়া খুবই সহজ যে, একটা খারাপ খবরই এসেছে।

চিঠি এসেছে নিজামের কাছ থেকে। মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশ্যে লেখা তিনটি চিঠি। চিঠির বক্তব্য পড়ে প্রথমেই এ ধারণা না হয়ে পারে না যে, মীমাংসার আর কোন ভরসা নেই। মাউণ্টব্যাটেনের ব্যক্তিগত চেষ্টার দ্বারা সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু করবার সুযোগ আর নেই।

প্রথম চিঠিতে নিজাম ভি পি রচিত খসড়া চুক্তিতে উল্লিখিত নতুন ব্যবস্থা ও মীমাংসার সূত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁর অভি-মত জ্ঞাপন করেছেন। স্পষ্ট ক'রে বলে দিয়েছেন নিজাম, মংকটন না আসা পর্যন্ত এ বিষয়ে তিনি কিছুই বলতে পারবেন না। দ্বিতীয় চিঠিতে রূঢ়ভাবে তাঁর 'না' জানিয়ে দিয়েছেন নিজাম। লায়েক আলির পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে হায়দরাবাদের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করার যে প্রস্তাব ভি পি'র খসড়া-চুক্তিতে করা হয়েছিল, সে প্রস্তাব সমূহ-ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন নিজাম। এই প্রসংগে আমার মনে পড়ছে যে, ভি পি'র সংগে আলোচনার সময় স্বয়ং লায়েক আলিই এ প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে-ছিলেন। লায়েক আলির মনের ভেতরে কি ছিল জানি না, কতটা আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে তিনি এ প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন জানি না, কিন্তু তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, ভারত ও

হায়দরাবাদের মধ্যে শুভেচ্ছার ভাব জাগ্রত করার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে তিনি সানন্দে তাঁর নিজের পদত্যাগের প্রস্তাব সমর্থন ক'রেই নিজামকে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দান করবেন।

তৃতীয় চিঠিতে নিজাম আবার মাউণ্টব্যাটেনকে হায়দরাবাদে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু আমন্ত্রণের ভাষার মধ্যে কোন আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। কেন এবং কিসের জন্য নিজাম মাউণ্টব্যাটেনকে হায়দরাবাদে যেতে আমন্ত্রণ করছেন, সে সম্বন্ধে চিঠিতে কোন উল্লেখ নেই। আমন্ত্রণের ভাষার মধ্যে সৌজন্যের অভাবও বেশ লক্ষ্য করা যায়।

মাউণ্টব্যাটেন সিদ্ধান্ত করলেন যে, নিজামের এই তিন চিঠির মধ্যে মাত্র প্রথমটির উত্তর তিনি দেবেন। আমার ধারণা, মাউণ্টব্যাটেন ঠিক সিদ্ধান্তই করেছেন। এখন আর অন্য কোন কথা নয়, শুধু এই কথাই মাউণ্টব্যাটেন নিজামকে জানিয়ে দিতে চান যে, ভারত-হায়দরাবাদ বিরোধের মীমাংসার জন্য আলোচনার ব্যাপার আরম্ভ করতে আবার দেরী হবে দেখে তিনি খুবই দুঃখিত হয়েছেন। এই সঙ্গে আর একটি কথাও জানিয়ে দেবেন মাউণ্টব্যাটেন। এবার যখন লায়েক আলি দিল্লীতে আসবেন এবং যদি আসেন, তবে তিনি যেন নিজামের কাছ থেকে প্রকৃত প্রতিভূ-ক্ষমতা নিয়ে আসেন, যা'তে মীমাংসার জন্য প্রস্তাবিত কোন ব্যবস্থায় অথবা সিদ্ধান্তে তিনি চূড়ান্ত সম্মতি দান করতে পারেন।

বিরোধিতাপ্রবণ মনোভাবেরই শোচনীয় পরিচয় নিজামের এই চিঠিগুলিতে ফুটে উঠেছে। এর মধ্যে লায়েক আলিরও আর একটি আচরণের পরিচয় জানতে পেরে বিস্মিত হয়েছি। এমন একটি সিদ্ধান্তে সম্মতি দানের কথা নিজামের কাছে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে লায়েক আলি, যে সিদ্ধান্তে তিনি এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় এবং অনেকের সম্মুখেই সম্মতি দান করেছিলেন। গত ২৬শে তারিখে লায়েক আলি মাউণ্টব্যাটেন, ভি পি ও নেহরুর সঙ্গে আলোচনাকালে সম্মত হয়েছিলেন যে, হায়দরাবাদ রাজ্যের অভ্যন্তরেই তিনটি বিষয়ে (যোগাযোগ, বৈদেশিক নীতি ও দেশরক্ষা) হায়দরাবাদের প্রণীত কোন আইন বাতিল ক'রে দেবার ক্ষমতা ভারত গবর্ণমেণ্টের থাকবে, এই তিনটি বিষয়ে ভারতের নীতি, আইন এবং ইচ্ছাই হবে চূড়ান্ত। লায়েক আলি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। আলোচনা-কক্ষে উপস্থিত প্রত্যেকেরই এখনও মনে পড়ে যে, লায়েক আলি এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করেছিলেন। কিন্তু নিজামের চিঠিতে এখন উল্টো কথা শুনতে পাচ্ছি। নিজাম জানিয়েছেন যে, এই প্রস্তাবে লায়েক আলির সম্মতি সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দিয়েছেন ভি পি, সেটা ভুল এবং লায়েক আলি বলছেন যে, ঐরকম কোন কথা তিনি বলেননি।

নিজামের এই চিঠিতে নেহরুর সেই সতর্কবাণীর সত্যতাই সমর্থিত হলো। নেহরু বলেছিলেন, লায়েক আলিকে একেবারেই বিশ্বাস করা উচিত নয়, কথার কৌশলে শুধু সময় কাটিয়ে দেওয়া এবং মীমাংসার সব চেষ্টা দেরী করিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই এই লোকটির মনে।

আমি দেখছি, মঙ্কটনের হস্তক্ষেপই এখন একমাত্র ভরসা। মঙ্কটন না আসা পর্যন্ত অচল অবস্থার উপশম হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

সঙ্কট ডেকে এনেছে হায়দরাবাদ। হায়দরাবাদের সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে সারা ভারতের জনমতে উত্তেজনা প্রবল হ'য়ে উঠছে, এবং হায়দরাবাদের ভেতরেও ক্ষোভ ও উদ্বেগের অভাব নেই। কিন্তু এখানে হায়দরাবাদ হাউসে ক্ষোভ, উদ্বেগ ও উত্তেজনার কোন চিহ্ন নেই। ডিনার পার্টির সমারোহে পুলকিত হায়দরাবাদ হাউসে জইন ইয়ার জঙ্গ এই রাজনৈতিক নৈরাশ্যের মধ্যেও ভরসা সঞ্চার করে চলেছেন। হায়দরাবাদ হাউসের শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন ক্রিয়াকলাপ দেখে মনে হয়, ভরসা আছে।

ভারত থেকে বিদায় নেবার আগে আমি ও ফে হায়দরাবাদ হাউস থেকেই শেষ সম্বর্ধনার আস্বাদ গ্রহণ ক'রে বোম্বাই রওনা হলাম। আমন্ত্রণ করেছিলেন জইন ইয়ার জঙ্গ। জইন ও তাঁর স্টাফ এবং পরিবারের সকলের সঙ্গে এক ভোজ-সভায় যোগদান করলাম। ভোজনের পর হায়দরাবাদ-হাউসের বাগানে বসে কিছুক্ষণ জইন-পরিবারের সঙ্গে গল্পে ও আলাপে কেটে গেল। জনৈকা হায়দরাবাদী মহিলা কথাপ্রসঙ্গে এমন একটি মন্তব্য করলেন যা'তে বুঝা গেল, স্থিতাবস্থা চুক্তি এবং রাষ্ট্রভুক্তি ইত্যাদি বর্তমানের এত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নগুলির মূল্য এ'দের কাছে কতটুকু। এ'দের মন কোথায় রয়েছে এবং এ'রা সত্যি সত্যি কি ভাবেন, একটি কথায় তার পরিচয় পেয়ে গেলাম। হায়দরাবাদী মহিলা আক্ষেপ ক'রে দীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে বললেন—'এ দিল্লী সে দিল্লী নয়। সেই মোগল বাদশাহেরাই যখন আর নেই তখন এ দিল্লীর আর রইল কি?'

ক্যালেডোনিয়া জাহাজ, বৃহস্পতিবার ৩রা জুন, ১৯৪৮ সাল। ভারতভূমিকে পেছনে রেখে অনেকদূর চলে এসেছি। জাহাজের এক কক্ষে বসে আজ আমার দিনলিপি লিখছি।

বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বসে আছি জাহাজের এই সুন্দর কক্ষে। কক্ষটি হলো একটি 'স্টেট-রুম'। জনৈক ভারতীয় মহারাজাও এই জাহাজে চলেছেন। খুবই রাগ করেছেন তিনি। মহারাজার ধারণা জাহাজের এই স্টেট-রুম তাঁরই প্রাপ্য এবং তাঁর মত একজন স্টেটাধিপতিকেই এই কক্ষটি দেওয়া উচিত ছিল।

অ্যাঙ্কর লাইনের বিশ হাজার টনী ক্যালেডোনিয়া ভারত থেকে এই প্রথম ইংলণ্ড-যাত্রার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল আট ঘটিকায়

সময় দিল্লীর গবর্ণমেণ্ট হাউসের ছায়া পার হয়ে রেল-ষ্টেশনে এসে ট্রেণ ধরেছি। দিল্লী থেকে বোম্বাই, আটশত মাইল পথ এবং ট্রেণে আসতে ছাব্বিশ ঘণ্টা সময় লেগেছে। যদিও ট্রেণের একটি 'শীতল' কক্ষে স্থান পেয়েছিলুম, তবুও এই ছাব্বিশ ঘণ্টার ট্রেণ-যাত্রা ক্লান্তিহীন মারাথন দৌড়ের মত ক্লেশকর মনে হয়েছে। এখন আমরা পাঁচজন দেশের মানুষ দেশের দিকে এগিয়ে চলেছি। আমি, ফে ও আমার স্ত্রী এবং, আমার দু'টি বাচ্চা-বয়সের ছেলে ও মেয়ে।

বোম্বাই ছেড়েছি আজই বিকালে। বোম্বাইয়ে এসে প্রথমে এক-গাদা টেলিগ্রাম পাঠাবার দায়িত্বটি সেরে দিলাম। তার পরেই সান্তাক্রুজ বিমান-ময়দানে গিয়ে মংকটনের সঙ্গে দেখা করলাম।

সস্ত্রীক মংকটন লণ্ডন থেকেই বিশেষ একটি চার্টার-করা বিমানে কিছুক্ষণ আগেই সান্তাক্রুজে এসে নেমেছেন। গিয়েই দেখলাম, সস্ত্রীক মংকটন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রয়েছেন। ক্রোধের কারণ, পুলিশ ও শুল্ক-কর্মচারীর দল মংকটনের জিনিষপত্র তল্লাসী করতে চাইছেন। মংকটনের বক্তব্য এই যে, তিনি বিশেষ চার্টার-করা বিমানে ইংলণ্ড থেকে হায়দরাবাদ যাচ্ছেন। বোম্বাইয়ে (সান্তাক্রুজে) তথা ভারতের কোন অংশেও তিনি প্রবেশ করতে যাচ্ছেন না। তাঁর বিমান শুধু সাময়িক বিশ্রামের জন্য সান্তাক্রুজ বিমান ময়দানে নেমেছে। এই অবস্থায় তাঁর জিনিষপত্র তল্লাসী করার অধিকার বোম্বাইয়ের পুলিশ অথবা শুল্ক-কর্মচারীর নেই। মংকটন আশা করেছিলেন যে, অন্যান্য দেশের নিয়মের মত বোম্বাইয়েও শুধু তাঁর বিমানকে একবার পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বোম্বাই কর্তৃপক্ষ এই সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম করছেন। মংকটনের জিনিষপত্র তল্লাসী করবার অধিকার হলো লণ্ডন ও হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষের, অর্থাৎ যেখান থেকে তিনি আসছেন ও যেখানে যাচ্ছেন। 'মাঝপথে' ব্যক্তিবিশেষের চার্টার-করা বিমানের জিনিষপত্র কোন দেশে সাধারণতঃ তল্লাসী করা হয় না।

জানি না, কেন বোম্বাইয়ের পুলিশ ও শুল্ক-বিভাগ এই সাধারণ রীতিকে অগ্রাহ্য করার ভাবই দেখালেন। আমি জানি, এভাবে তল্লাসী করবার 'আইনগত' অধিকার তাঁদের আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য দিকেও একটু চিন্তা করে দেখা কর্তব্য ছিল। কে এই মংকটন, কেন তিনি হায়দরাবাদে যাচ্ছেন, এ সম্বন্ধে কোন চিন্তা বা বিবেচনার প্রমাণ পেলাম না সান্তাক্রুজের পুলিশের আচরণে। তাঁরা অনুমানই করতে পারছিলেন না, মংকটনকে দেরী করিয়ে দিয়ে কত বড় রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁরা বাধা দিচ্ছেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি আমার পরিচয় ব্যক্ত করলাম, যেটা আমি অনেকক্ষণ ধরে গোপনেই রেখেছিলাম। আমার পরিচয় জানবার পর পুলিশ ও শুল্ক-কর্মচারীদের মনোভাব অবশ্য বদলে গেল এবং আমার অনুরোধেও কাজ হলো।

ক্রুদ্ধ মংকটন হায়দরাবাদ যাত্রা বন্ধ করে দিয়ে এখান থেকেই লণ্ডন ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমার চেষ্টাতে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তল্লাসীর বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পেলেন মংকটন।

হায়দরাবাদ-সমস্যা সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য ছিল, সবই মংকটনকে জানালাম। মংকটন হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে হায়দরাবাদ-সমস্যার সম্পর্ক কাজের দিক দিয়ে এতদিনে এবং এইখানে সমাপ্ত হলো। আমিও এইবার মুক্ত হলাম। আমার শেষ সরকারী কর্তব্যও এইখানে শেষ হলো।

একটি টেলিগ্রামে মাউণ্টব্যাটেনকেও এই আলোচনার রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলাম। মংকটনের সঙ্গে প্রথম আলাপে বুঝলাম যে, তিনি সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে কোন আশা পোষণ করছেন না। তাঁর উৎসাহেরও অভাব লক্ষ্য করলাম। তাঁর হস্তক্ষেপে এখন সত্যি সত্যি কোন কাজ হতে পারে এবং তাঁর পরামর্শেই ঘটনার গতি এখন ভালর দিকে ঘুরে যেতে পারে, এটা তিনি অনুমান করতে পারছেন না। মংকটনের ধারণা, নিজামকে কোন প্রস্তাবে ও ব্যবস্থায় সম্মত করার সুযোগ এখন বস্তুতঃ শূন্য হয়েই গেছে। আমি মংকটনকে জানিয়েছি, বর্তমানে রাজনৈতিক উত্তেজনা কি অবস্থায় পৌঁছেছে। এখন কালক্ষেপ করলেই সবচেয়ে বড় ভুল করা হবে, একথাও মংকটনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। যাই হোক আলোচনার শেষে মংকটন তাঁর নৈরাশ্য অনেকখানি বর্জন করেছেন। প্রথমে তাঁর মধ্যে উৎসাহের যতটা অভাব দেখেছিলাম, ততটা এখন বোধ হয় আর নেই। অনেকখানি আশার ভাব নিয়েই তিনি রওনা হয়ে গেছেন।

মংকটন অবশ্য বলেছেন যে, খুব তাড়াতাড়ি তিনি কিছু ক'রে উঠতে পারবেন না। নিজামকে বুঝিয়ে পথে আনতে কিছুটা সময় লাগবে। কারণ, একবার বললে কোন কথারই অর্থ বুঝতে পারেন না নিজাম এবং কোন পরামর্শকেই একবারের বলাতে আমল দিতে তিনি চান না। সুতরাং সময় চাই। মংকটন বলেছেন, কোন একটা সিদ্ধান্তে নিজামের অভিমত স্পষ্ট ক'রে আদায় করতে পারলেই তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লী চলে যাবেন।

গণভোটের কথাও মংকটনকে জানিয়েছি। মাউণ্টব্যাটেন এবং প্যাটেল, উভয়েই গণভোটের ব্যবস্থা সমর্থন করেন, একথাও জানিয়েছি। এই প্রসঙ্গে মংকটনের বক্তব্য জানবার সুযোগ পেয়ে আমার দুশ্চিন্তার ভারও অনেকখানি কমে গেছে। মংকটন বললেন, তিনিও লণ্ডনে থাকতেই সমস্যার সমাধানের উপায় চিন্তা করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেছেন যে, গণভোটের ব্যবস্থাই সমাধানের পথ। লায়েক আলির বদলে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করার প্রস্তাবে নিজাম সুস্পষ্ট ও রূঢ় 'না' জানিয়ে দিয়েছেন, এই কথা শুনে মংকটন বলেছেন যে, সম্ভবতঃ প্রস্তাবের মধ্যে অথবা প্রস্তাব উত্থাপনের রীতির মধ্যেই কোন ত্রুটি হয়েছে। সম্ভবতঃ যথোচিত শোভন ও সুষ্ঠুভাবে এ প্রস্তাব নিজামের কাছে উপস্থাপিত করা হয়নি।

মংকটন বলে গেলেন যে, তিনি তাঁর নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করবেন। তাঁর মতে, লায়েক আলির বদলে এখন জইন ইয়ার জংগকেই প্রধান মন্ত্রীর পদে বসাতে পারলে কাজ হবে এবং জইন ছাড়া এ কাজে সাহায্য করার মত দ্বিতীয় কোন যোগ্য ব্যক্তি আর নেই।

সান্তাক্রুজে শুল্ক-কর্মচারীদের আচরণে কিছুটা বিড়ম্বিত হলেও মংকটনের সংগে আমার আলোচনার দায়িত্ব ভালভাবেই সম্পন্ন করতে পেরেছি। রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি বিষয়ের সার্থকতা আরও ভাল করে উপলব্ধি করবার সুযোগ পেয়েছি। ঠিক সময়ে ঠিক স্থানে উপস্থিত থাকতে পারলে রাজনৈতিক ঘটনার পরিণাম ঠিক দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারা যায়। মংকটনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, লণ্ডন থেকে সোজা হায়দরাবাদে না গিয়ে প্রথমেই দিল্লীতে যাওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হতো না। কিন্তু দিল্লীতে না-যাবার কারণে সমস্যা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যও তাঁর অজ্ঞাত থাকায় তিনি যে অসুবিধায় পড়তেন, আমার সংগে সাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলে সে অসুবিধা থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন। আমার কাছ থেকে ভারত সরকারের বক্তব্য যুক্তি ও মনোভাবের রিপোর্ট পেয়ে তিনি খুবই লাভবান হয়েছেন।

বোম্বাইয়ের বৈকালের আলোক ম্লান হবার আগেই জাহাজে উঠেছি। জাহাজে উঠেই বুঝলাম, মনটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল। অদ্ভুত একটা শূন্যতায় বেদনাতুর হয়ে উঠলো সারা মন। প্রবল এক কর্মের জগৎ থেকে হঠাৎ যেন ছিন্ন হয়ে এক সুপ্রচুর আলস্যের জগতে এসে পড়েছি।

ক্যালেডোনিয়ার কোলে বসে স্বদেশ ভূমির উপকূলের দিকে ক্রমেই এগিয়ে চলেছি। এখনো ভারতভূমিকে দেখতে পাচ্ছি। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, আর সমুদ্রের জলে ক্যালেডোনিয়া মনের সুখে সাঁতার দিয়ে চলেছে। পিছনে দূরে বোম্বাইয়ের সন্ধ্যায় দূরের তারকার মত মিট মিট করে জ্বলছে শত শত দীপ। বোম্বাইয়ের এই নিষ্প্রভ দীপের রেখা ক্রমেই আরও দূরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সবই শান্ত।

কিন্তু মনের ভেতর এ সতর্কবাণী শুনতে পাচ্ছি—এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা এগিয়ে আসছে। জল ও আকাশের এই শান্ত ভাব দেখেও অনুমান করতে পারছি, আসন্ন ঝড়ের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।

ক্রমশঃ

চক্রদত্ত

সূচে সুতা পরিয়ে দেবার জন্য সীবন-রতা ঠাকুমা দিদিমার কাছ থেকে সস্নেহ আহবান পায় না এমন নাতি নাতনী খুবই কম দেখা যায়। তবে এ ডাক যতই স্নেহের হোক না কেন বিরক্তিকরও বটে। বিজ্ঞান এই বিরক্তিকর কাজটি থেকে রেহাই দিতে পেরেছে। আজকাল সেলাই কলের সূচের ওপর দিকে একটি অতসীকাচ লাগান থাকে।

সূচে সুতা পরান কাজটি বেশ সহজ হয়েছে

সুতরাং সূচের গর্তটি বেশ বড়ই দেখায় আর সুতা পরান কাজটিও অনায়াসসাধ্য হয়ে উঠেছে। এটি এমন করে লাগান থাকে যে, প্রয়োজন মত এটি যে কোনও দিকে ঘোরান যায়, কাজে কাজেই সূচের গর্ত ছাড়াও সেলাইটিও আকারে বড় দেখায়।

*

পোলিও মাইলাটিস রোগের কারণ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত অনেক তথ্যই আবিষ্কৃত হয়েছে। একথা নির্ধারিত সত্য যে, অত্যধিক পরিশ্রম করলে বা অত্যন্ত ক্লান্ত হলে এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। ডাক্তাররা বলেন যে, যে সময়ে পোলিও রোগের সম্ভাবনা বেশী হয়, তখন টনসিল কাটানো উচিত নয়। ডাক্তাররা আরও বলেন যে, এই সময় ছেলেদের ডিফ্‌থিরিয়া কিংবা হুপিংকাশির প্রতিষেধক টীকা দেওয়াও উচিত নয়। কারণ দেখা গেছে যে, এই সময়ে ঐ টীকা নেওয়ার ফলে ছেলেদের পোলিও রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, বিশেষত যে হাতে ঐ টীকা দেওয়া হয় ঐ হাতটিই আগে রোগাক্রান্ত হয়। প্রথমে মনে করা হয়েছিল যে, ইনজেক্‌শনের সূচই বুঝি বা রোগের বীজাণু বহনকারী; কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই অনুমান ঠিক নয় মোটের ওপর ডাক্তারদের অভিমত এই যে, যে সময় পোলিও রোগের হিড়িক দেখা দেয়, তখন শিশুদের ডিফ্‌থিরিয়া বা হুপিং-কাশির প্রতিষেধক কোনও টীকা না দেওয়াই ভাল।

*

মানুষকে সম্মোহিত করে অনেকসময় ভাল মন্দ অনেক কাজই করিয়ে নেওয়া যায়। এই সম্মোহিনী শক্তির প্রভাবে এডুইন এল্‌-ব্যারোন নামক জনৈক ভদ্রলোক মানুষের চর্বি হ্রাস করছেন। সাধারণত মেদবহুল লোকেরা স্নেহ পদার্থ জাতীয় খাদ্য, মিষ্টান্ন, মদ এবং ভর্জিত পদার্থ খেতে ভালবাসে। এই জাতীয় খাদ্য মেদবৃদ্ধির সহায়তা করে জেনেও তারা লোভ সামলাতে পারে না। মিঃ ব্যারনের কাছে মেদ-বৃদ্ধি হ্রাসের চিকিৎসার জন্য কোনও রোগী এলে তিনি তাদের সম্মোহিত করে ঐ সব খাদ্য খাওয়ার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করেন। এবং কাঁচা শাক-সব্জি জাতীয় খাদ্য খাওয়ার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করেন। এইভাবে চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ পাউন্ড থেকে আরম্ভ করে ১৯ পাউন্ড পর্যন্ত ওজন কমান সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এইভাবে খাদ্যাখাদ্যের প্রতি যে আসক্তি অনাসক্তি জন্মায় তা চিরস্থায়ী হয় না। কিছুদিন পরে আবার পূর্বের রুচি ফিরে আসে।

*

উদ্ভিদজগতে এমন কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যাদের পতঙ্গভুক্‌ বলা হয়। এদের মধ্যে পানিকলস ও পানে পিক্‌ যথাক্রমে 'পিচার প্ল্যান্ট ও এ্যালড্রোভ্যান্ড্রা' খুব সাধারণ উদ্ভিদ। 'ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ' এই জাতীয় একটি উদ্ভিদ। নামের প্রথম অংশটি এর সৌন্দর্যের পরিচায়ক আর শেষের অংশটি এর প্রকৃতির পরিচয় দেয়। প্রায় দুই শতাব্দী থেকে এই উদ্ভিদটি মানুষের জ্ঞান গোচরে এসেছে কিন্তু উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌ এবং প্রাণিতত্ত্ববিদের কাছে এটি আজও একটি রহস্যজনক বস্তু বলেই মনে হয়। পুরাণে আমরা অনেক সময় অর্ধেক মনুষ্য ও অর্ধেক জানোয়ারের দেহ বিশিষ্ট জীবের কথা পড়েছি। মৎস্য নারীই এই জীবের প্রধান উদাহরণ। উদ্ভিদ জগতে এই 'ভেনাস ফ্ল্যাইট্র্যাপ' একটি সেই জাতীয় উদ্ভিদ্‌। এটিকে অর্ধেক উদ্ভিদ ও অর্ধেক প্রাণী বলা যায়। এই গাছটি লম্বায় ছয় ইঞ্চি এবং এতে ফুল ফোটে। এর গোড়ায় পাতা থাকে আর এই পাতাগুলোর ওপরে অনেক জোড়া কাঁটার মত শীষ্‌ থাকে। কোনও পোকা এই পাতার ওপর বসলেই পাতা বন্ধ হয়ে যায় আর পোকাটি ঐ কাটা জাতীয় শীষে আটকে যায়। পদার্থবিদ্‌ ডাঃ ওটো স্টাহ্‌ল-ম্যান এই উদ্ভিদটি নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন; স্তন্যপায়ী জীবেদের স্নায়ুগুলি যেমন বাইরের কোনও অনুভূতিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপের ওপরও ঠিক এই রকম অনুভূতি কাজ করে। তবে প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই অনুভূতির কাজ যত তাড়াতাড়ি হয়, এই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সেই কাজ খুব ধীরে ধীরে হয়। ডাঃ ওটো লক্ষ্য করেছেন যে, পাতার ওপরে তিনটি অনুভূতিসম্পন্ন শীষ থাকে। কোনও পোকা এসে পাতার ওপর বসলেই ঐ তিনটি শীষের মধ্যে কোনও একটি বেঁকে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, ক্রমে ঐ তরঙ্গ বিস্তার লাভ করে। এই সংকেত ক্রমশ পাতার একটি কোষ থেকে অপর একটি কোষে যেতে থাকে। কোষগুলির গঠনপ্রণালী এমন যে, প্রত্যেক কোষেতেই একটা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করা থাকে। সংকেতটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোষগুলি একটির পর একটি বৈদ্যুতিক শক্তি থেকে মুক্ত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সঙ্কেতটি গাছের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছায় সেখানে একটি কব্জার মত জিনিস থাকে, ঐ সংকেতটি এই স্থানে পৌঁছালেই পাতার মধ্যস্থ জলীয় পদার্থটি পাতার ওপরে চলে আসে আর এটি শুকনো কাঠের মত মুচড়ে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। মানুষ এবং প্রাণীদের স্নায়ুর অনুভূতির গতিবিধি যে, বৈদ্যুতিক শক্তির মতই একটা আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু এই অনুভূতি-রাজ্যে যে, এই রকম সাংকেতিক ব্যবস্থা আছে একথা বড় জানা ছিল না। ডাঃ ওটো বলেন যে, ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপের স্নায়বিক অনুভূতির এই রকম সাংকেতিক আয়োজন মানুষের অনুভূতি-রাজ্যের ওপর গবেষণা করার একটি প্রাথমিক উদাহরণ বলে মনে করা উচিত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪

পাঞ্জাব মেলের সেকেন্ড ক্লাসে নিশ্চিন্ত আরামে বসে আছ, স্টেশনের পর স্টেশন, দৃশ্যের পর দৃশ্য যাচ্ছে ছিটকে বেরিয়ে—সে আনন্দও (অবশ্য, যদি পেয়েই থাক) আমার এ আনন্দের কাছে পারে না দাঁড়াতে। তুমি ওটা করেছ উপভোগ, (আমারও হয়েছে কতক কতক) কিন্তু আমার এটা তো কর নি, করবেও না কখনও; সুতরাং কি করে করাই তোমায় বিশ্বাস?

একটু থাম, তোমার ও উপলব্ধির মধ্যেও যেটুকু আনন্দের অংশ সেটুকু শৈশবেই। প্রমাণ দিই। একবার চড়ে দেখো কোন একটা ওইরকম দ্রুতগামী গাড়ি—অত বড় আনন্দের খোরাক সামনে থাকতেও দেখবে চারিদিকে বুড়োর দল প্যাঁচার মতো মুখ করে আছে বসে; কেউ খবরের কাগজ হাতে, কেউ বই হাতে, কেউ খালি হাতে গাড়ির ছাদের দিকে চেয়ে, তবু বাইরে চাইবে না। ভুল বুঝো না, 'বুড়ো'র অর্থ—এদের সবাই পাকা-চুল নয়। চব্বিশ বছরের যুবাও আছে তার মধ্যে। মন যেমন নেপথ্যে শৈশবের দিকে ছোটে তেমনি ছোটে বার্ধক্যের দিকেও, অবশ্য কৃত্রিম করে কল্পনায়; যে-বার্ধক্য একদিন আসবে, কালো চুলেই তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায়। শাদা চুলে ছাঁদনাতলায় গিয়ে দাঁড়ানোর ঠিক উল্টো আর কি।

এ সব রোগের কি দাবাই বল?

একটু কড়া হয়ে গেল, না?

এদের ওপর আমার একটু রাগ আছে। এদের সামনে বেমানান হবে বলে গাড়িতে রাত বারোটাতেই আমায় জানলা ছেড়ে বিছানা আশ্রয় করতে হয়। তার মানে, অত খরচ করে যে একটা টিকিট করলাম, তার পনের আনাই লোকসান আমার। এক আনা যা লাভ শুধু একটু যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়াটা হোল।

শৈশবো জয়তু! তার সামনে যৌবনও...... ওই তুচ্ছ; তার পরের যা জীবন তার তো কথাই নেই। অবশ্য শৈশবের মধ্যে আমি কৈশোরকেও ধরছি, আসল কথা কৈশোর শৈশবই, শতদলটি শুধু বিকশিত হয়ে উঠেছে। (জয়তু শৈশব, সে হঠাৎ উল্লাসের ওপরও উল্লসিত হয়ে উঠেছে আমার মধ্যে) ......একটা মোটর গাড়ি, খুব দামী বলেই মনে হয়, তেমন পুরাতনও নয়, ধিকিয়ে ধিকিয়ে চলেছে আমার সামনে শ' খানেক গজ দূরে। না, আমার মত উদ্ভট ভ্রমণ-বিলাস নয়, বেচারা কোথায় জখম হয়েছে, চারটি গরুর-গাড়ির হেফাজতে। দূরে থেকে দেখছি একজনকে (ড্রাইভারই নিশ্চয়) ইস্টিয়ারিংটা ধরে নির্লিপ্তভাবে বসে আছে।

করুণ দৃশ্য একটা হাতী কাৎ হয়েছে। আমি কিন্তু সহানুভূতির 'মুড'এ নেই তখন। ওর কৌতুকটাই আমার মনটাকে অভিভূত করে ফেলছে। কৌতুকের কি আছে ধরা শক্ত, চারখানা গাড়ির চার জোড়া বলদ গলা দুলিয়ে দুলিয়ে নির্বিকারভাবে চলেছে, মোটরটা সব পেছনের গাড়িটার সঙ্গে একটা মোটা কাছি দিয়ে বাঁধা, চিত্র-টুকু এই, কিন্তু মনের কোথায় দিচ্ছেই একটু সুড়সুড়ি। আর এর সঙ্গেই একটা সকৌতুক আক্রোশও আছে যেন কোথায়——এরই সগোত্রীয়েরা এই খানিক আগে আমার গাড়ির দিকে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে গিয়েছে বেরিয়ে।

হাঁটছিলাম একটু জোরেই সেদিক দিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই নবাবজাদার সঙ্গে কখন একটা রফা হয়ে গিয়েছিল, একটু পরেই গাড়িটার পাশে এসে পড়লাম। সেডানবডি বেশ একখানি ভালো মোটর, ব্যবস্থার বাড়তির দিকে এই যে দুটো জানলাতেই কাচের পেছনে গোলাপী সিল্কের কোঁচকানো কোঁচকানো পর্দাটা।

কৌতুক গিয়ে কৌতূহল মাথা চাড়া দি উঠলো, কোনরকম এ্যাকসিডেন্ট নাকি মে ছেলে শুদ্ধ? সেই কথাই জিগ্যেস করল ড্রাইভারকে। অবশ্য একটু ভেবে-চিন্তে জিগ্যেস করা উচিত ছিল।

লোকটা একটু রাশভারী, অন্তত প্রথমে তাই মনে হয়, নিচের ঠোঁট দিয়ে ওপরেরট ঠেলে তুলে একটা বিড়ি টানছিল, প্রশ্ন করলে—"সেই রকম মনে হচ্ছে?"

একটু আমতা আমতা করে বললাম—"না, মোটরের কথা বলছি না—তাতে তো ধাক্কাধুক্কির কিছু দেখছি না—অবিশ্যি যদি ওদিকটায় থাকে কিছু........."

"ঘুরে এসে দেখুন"—চোখের কোণ দিয়ে আগাপাস্তলা দেখে নিলে একবার।

বেশ একটু অস্বস্তিতে ফেলেছে, বললাম —"না, পর্দাটানা রয়েছে তাই মনে হোল যদি মেয়েছেলে কেউ থাকেন—আহত অবস্থায়.........আরে মশাই, আঘাত তো কতরকমভাবে লাগতে পারে, আজকাল যা অবস্থা যাচ্ছে।.........না হয় ব্যাপারখানাই কি বলুন না, একটা মোটর চারখানা বলদ-গাড়িতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন,—কিছু একটা হয়েছে তো নিশ্চয়। এতো একটা শখ হতে পারে না।"

বলতে বলতে শেষের দিকটা একটু উল্টে চাপই দিলাম, নৈলে দেখছি ধাতে আসবে না। ড্রাইভার হোলেও ভদ্রঘরেরই ছেলে, অথচ কথাবার্তা এমন বেয়াড়া!

টসকালো না। বললে,—"শখের আপনি কতরকম জানেন?"

আমি আর উত্তর না দিয়ে পা চালিয়ে দিলাম, স্থান ত্যাগেন দুর্জনঃ। মুখ খুলেই ভুল হয়েছিল।

গোরুরগাড়িগুলো প্রায় পেরিয়েছি, গলা বাড়িয়ে ডাকলে—"শুনুন!......হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছি।"

দাঁড়িয়ে পড়লাম।

"কি?"

"এই গাড়িটা সত্তর মাইল পর্যন্ত দৌড়তে পারে ঘণ্টায়। দেখুন না, এই যে। রাস্তায় ট্র্যাফিক বেশি, তবুও জায়গায় জায়গায় পঞ্চাশ ষাঠ মাইল পর্যন্ত তুলতাম; তার জায়গায় এই—চার জোড়া বলদের ন্যাজ ধরে এইভাবে চলেছি, দুপুর একটা থেকে।......

এসেছি আড়াই মাইল।.........উল্টে আমার ওপরই রাগ করছেন?"

"সামান্য একটা প্রশ্ন—একটা ভালো গাড়িকে এ অবস্থায় দেখলে করেই লোকে —ভদ্রলোক দেখেই করেছি—গাড়োয়ানগুলোকে করতে যাইনি...তা আপনি......"

—বেশি নরম হওয়ার দরকার দেখলাম না।

চোখের কোন দিকে চেয়ে দেখছিল, একটু হাসির ভাব ফুটল ঠোঁটে, বললে,—রাগটা এখনও যায়নি।......যাবেন কোথায়?"

"এই আমতলার হাট, ট্রেন ধরব।"

"তা আসুন না, আপত্তি না থাকে তো। রোদে পুড়তে পুড়তে যাওয়ার চেয়ে......"

দোরের হ্যান্ডেলটায় মোচড় দিলে। বললাম—"থাক, এইটুকু তো।"

"একটু গল্প করতে করতে যেতাম, সময়টুকু হয়। একলা এই দুর্দশা দেখুন না।"

একটু হেসে বললে,—"গল্প করবার নমুনা দেখে পেছিয়ে যাচ্ছেন?"

ড্রাইভার হিসাবে একটু বোধ হয় বেশি ফ্রী মনে হচ্ছে তোমার, নয় কি? একটু খাপছাড়া গোছের বটেই, তবে তুমি যে বেশি ফ্রী মনে করছ, সেটা একটা কথা ভুলে যাচ্ছ বলে—আমি অফিসের পোষাকে নেই, এমন কি বাড়ির সাধারণ পোষাকেও নয়; কি পোষাকে রয়েছি তার তালিকাবদ্ধ বর্ণনা দেব না, তবে এমনই একটা হরবোলা পোষাক, যাতে ভদ্র পরিবেশে বসে যেমন নিতান্ত বেমানান হই না তেমনই বদনের দীপ্তি অফার করতেও বাধে না।

ভাবান্তর দেখে আমিও ভাব বদলালাম, একটু হেসেই বললাম,—"তা পেছুচ্ছি বইকি একটু।"

"বলেছি—শখের আপনি কতরকম জানেন?"—সেই রকম হাসির সঙ্গে বললে কথাটা, শুধু আর একটু স্পষ্ট। ক্রমেই ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে লোকটাকে; আমিও কেসটাকে আর একটু স্পষ্ট করে বললাম—"তা বললেন বৈকি।"

"তা সত্যিই দেখছেন কতরকম?......... আসুন, উঠেই বসুন।"—বলে এবার দোরটা খুলেই ধরলে একেবারে।

রসিকতাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল, আর একটু হলে উল্টে রাস্তার ওপর আছড়ে পড়তাম, চাকার নিচেই যে শরীরের খানিকটা সেঁদিয়ে যেত না তা বা কে বলতে পারে?

—গাড়িটা খুব আস্তে চলেছে, তবু চলেছেই তো?—পাদানিতে উঠে যেই ভেতরে ঢুকতে যাব, "এ কী কান্ড!!"—বলে একেবারে টাল খেয়ে পড় পড় হোতেই ড্রাইভার খপ করে হাতটা ধরে ভেতরে টেনে নিলে; কয়েক সেকেন্ড আর কথাই কইতে পারলাম না, তারপর বললাম—"এই তো এ্যাকসিডেন্ট দেখছি—আর আপনি বলছিলেন...... আর এইরকম একটা সিরিয়াস্ কেস্ নিয়ে এইভাবে ধিকুতে ধিকুতে যাওয়া......এত বাস যাচ্ছে, একটাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারতেন তো।"

হাসিতে দুলতে আরম্ভ করেছে লোকটা; তার মধ্যেই সংক্ষেপে বললে—"শখ"।

"শখ"—বলে আবার আমি পেছনের সীটের দিকে চাইলাম।

প্রায় বছর চল্লিশেক বয়স, থলথলে মোটা শরীর, টকটক্ করছে গায়ের রং, একটা লোক চিৎপটাং হয়ে পড়ে রয়েছে, কোমর থেকে ওপরটা গদির ওপর বাকিটা নিচে; সৌখীন ধুতিপাঞ্জাবী, কিন্তু প্রায় অসামাল। অতিরিক্ত বিস্ময়ে আবার ড্রাইভারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম—"শখ কি মশাই! আঘাত-টাঘাত নয়?"

সমস্ত গল্পটা হাসির ভেতর থেকে খানিক খানিক করে যা উদ্ধার করা গেল তা এই—

উত্তর কলকাতার একজন নাম-করা জমিদার ঘরের অপগন্ড। (নামটাও বললে, কিন্তু এক-কান থেকে আর দু'কান করব না, মাফ কোর)। আরও অনেক দূর এগিয়ে, ডাইমন্ডহারবার রোডের ওপরই শ্বশুরের বাগান-বাড়ি, কিছুদিন থেকে সবার 'শৈলবাস' চলেছে। জামাই সেইখানেই চলেছে। একটা ছোট সুটকেস নিয়ে উঠেছিল, গাড়ি খানিকটা এগুতেই সেটা ড্রাইভারের পাশে রেখে দিয়ে বললে ওটা একেবারে নামবার সময় আমার হাতে দেবে, তার আগে কোনমতেই নয়। ড্রাইভারের একটু খটকা লাগল, কিন্তু আর মাথা ঘামাতে গেল না ও নিয়ে, পাশেই পড়ে রইলো সুটকেসটা; শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত এল, কোন কথাবার্তা নেই। মনুমেন্টটা যখন পেরিয়ে গেছে, হুকুম হোল—"ড্রাইভার—ইউ!"

অদ্ভুত আওয়াজ শুনে ড্রাইভার ফিরে দেখে সে মানুষই নয়, মাথাটা একটু একটু দুলছে, চোখদুটো গোলাপী, মুখটা থমথম করছে। অতটা আন্দাজ না করতে পেরে জিগ্যেস করলে—"আপনার অসুখ হোল নাকি?"

"ইয়েস, সুটকেসে ওষুধ আছে, লে আও।"

ব্যাপারটা তখন বোঝা গেল। আপাতত কিন্তু ঐ পর্যন্তই রইল, কথাটা বলেই গদির পিঠে ঢলে পড়তে ড্রাইভার টানা মাঠের ওপর স্পীডটা বাড়িয়ে দিলে। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে, যখন মাঝেরহাটের পুলের ওপর, হঠাৎ পেছন থেকে জামার গলা ধরে এক টান, স্টিয়ারিং নড়ে গিয়ে একটা কান্ড হয় আর কি। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি থামিয়ে জিগ্যেস করলে—"কি বলছেন?"

"তোমায় না এক্ষুণি ওষুধটা এগিয়ে দিতে বললাম?"—কথা আরও এসেছে জড়িয়ে।

ড্রাইভার বললে—"আপনিই তো মানা করেছিলেন ওঠবার সময়?"

"ড্যাম ইউ; তখন অসুখ ছিল? লুক্ হিয়ার—একশ' দশ ডিগ্রি!"

হাতটা বাড়িয়ে দিলে। ড্রাইভার বললে—"ওষুধ খেলে একশ' পনের হয়ে যাবে যে।"

মুখের দিকে একটু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল, একটু হাসি ফুটল, মাতালের হাসি, তারপর 'গুড বয়, গুড বয়' বলে

আবার গদির গায়ে ঢলে পড়ল। এরপরের ঝোঁকটা উঠল বেহালার ট্রাম ডিপোর কাছে।

ড্রাইভার বলে—"মশাই, এমন অদ্ভুত মাতাল দেখি নি, বাড়িতে বেরুবার আগেই কতখানি গিলে নিয়েছে, তা যত এগুচ্ছে তত কমে আসবে নেশাটা, না ততই বে-এক্তিয়ার হয়ে পড়ছে। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুর, রাস্তায় লোক নেই, নইলে ভিড় জমে একটা কাণ্ড হয়ে যেত—ট্রাম ডিপোটার কাছে এসেছি, হঠাৎ তেড়ে-ফুঁড়ে উঠে বলে,—'এই স্টপ, দাঁড়াও, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমায়? হোয়ার?'

না ঘুরে বললাম—'শ্বশুরবাড়ি।'

'কার?'

মনটা বেশ খিঁচিয়ে এসেছে, বললাম—'এ অবস্থায় অন্য কার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গিয়ে তুলব। নিজের শ্বশুরবাড়িতেই খাতিরটা কেমন হয় দেখুন না গিয়ে।'

'আলবৎ হবে।'

'চলুন তাহলে।'

'কোথায়?'

'শ্বশুরবাড়ি।'

'কার?'

না ঘুরেই কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছি, স্পীডও দিয়েছি বাড়িয়ে, তাড়াতাড়ি গিয়ে ডেলিভারী দিয়ে দিতে পারলে বাঁচি পেয়ারের জামাইকে। ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব স্কুল পেরিয়ে গেলাম, বাঁটেশের তেমাথা দেখা যাচ্ছে, আবার উনকে উঠল, এবার আরও সাংঘাতিক, বলে—'চেঁচাব আমি।'

'কেন মশাই চেঁচাবার কি হয়েছে?'

'আমায় কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে, চুরি করে।......ইয়েস কিডন্যাপ করে—চেঁচাব, আই উইল শাউট—নইলে মাল বের করো—আমায় শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে—আমি রায়-বাড়ির জামাই........'

তেমাথায় দোকানপাট, শিখ ড্রাইভারদের আড্ডা, আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম মশাই, মাতালের কাণ্ড, চেঁচালেই হোল, তারপর মেরে আমার পস্তা উড়িয়ে দিয়ে পুলিসে হ্যাণ্ড-ওভার করে দিক সবাই জড়ো হয়ে। স্যুটকেসটা নিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, তুলে দিয়ে দিলাম হাতে, মরগে যা।

একটা তোয়ালেতে জড়ানো দুটো বোতল ছিল, আরম্ভ করে দিলে। ডাঙ্গা ছাড়িয়ে খানিকটা এদিকে এসেছি, মোটরটাকে একবার থামাতে হোল। খানদশেক বিচুলির গরুরগাড়ি কোথাও মাল খালাস দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, কিভাবে তাদের একটা জট পাকিয়ে গেছে রাস্তার মাঝখানে।

তখন ওর একটা বোতল সাফ হয়ে গেছে; একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল, গাড়িটা থেমে যেতে আবার একটু সোজা হয়ে বসল, বললে—'চালাও, রোকা কাহে?'

বললাম—'গাড়িগুলো একপাশে নিচ্ছে, তারপরেই আবার বেরিয়ে যাব'

'কোথায় যাবে? হোয়ার?'

'আপনার শ্বশুরবাড়ি।'

'শ্বশুরবাড়ি!'—ভয়ানক আশ্চর্য চোখ পিট্‌পিটিয়ে আমার দিকে খানি চেয়ে রইল, আবার জিগ্যেস কর
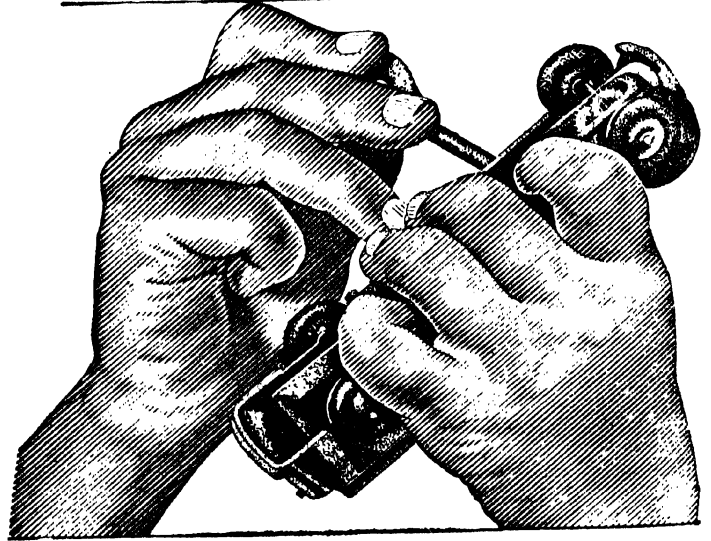
শ্বশুরবাড়ি!' তারপর গলা বাড়িয়ে একটু কি দেখে নিয়ে বললে—'শ্বশুরবাড়ি তো প্রোসেশন কোথায়?'

'প্রোসেশন কি মশাই? মোটরে করে শ্বশুরবাড়ি যাবেন বল্লেন, ড্রাইভ করে নিয়ে যাচ্ছি. প্রোসেশন কোথা থেকে আসবে? এ তো আর নতুন বিয়ে করতে যাচ্ছেন না।'

বেশ রাগ ধরে গেছে মশাই। গাড়িগুলো ততক্ষণে একপাশে করেছে। স্টার্ট দিয়ে দিলাম। তারই ঝাঁকানিতে বোধ হয় গড়িয়ে পড়েছেন, গাড়িগুলোকে ছাড়িয়ে গেছি, টলতে টলতে উঠে আবার আমার জামার কলার চেপে ধরলে।

'আলবাৎ প্রোসেশন, রায়বাড়ির জামাই, ব্যাণ্ড চাই, প্রোসেশন চাই।'

'তা পাব কোথায় ব্যাণ্ড আর প্রোসেশন, এ আঘাটা জায়গায়?—চাই না হয় বুঝলাম।'

থামিয়ে ফেলেছিলাম গাড়িটা, আবার স্টার্ট দিতেই গদি ছেড়ে উঠে পড়ল—ইউ! আই উইল সাউট—চেঁচাব, আমার কিড্ন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছ। ঘড়িতে আংটিতে আমার গায়ে চার হাজার টাকার মাল.........।'

ভয় পেয়েই গেলাম মশাই, অস্বীকার করব না। মাতাল হলেও ফিচলেমি জ্ঞানটা টনটনে, লোক দেখলেই ওই ভয় দেখাচ্ছে, যদি চেঁচিয়েই বসে তো তাদের বোঝাবার আগেই একটা কাণ্ড হয়ে যাবে। গরীবের ছেলে, পেটের দায়ে চাকরি করতে শেষে প্রাণটা বিঘোরে খোয়াব? গলার স্বর আরও জড়িয়ে এসেছে, তার ওপর ইংরেজি বর্নি, নয়তো এতক্ষণ বোধ হয় হয়েই যেত কিছু একটা। নরমই হয়ে গেলাম, বললাম—'তা তো বলছি না, রাজবাড়ির ছেলে, প্রোসেশন করে যান আপনি, সেইটিই তো মানান-সই, কিন্তু এখানে তার ব্যবস্থা হয় কি করে।'

'দ্যাটস্ গুড, আমি রায়বাড়ির জামাই বাবা! ইয়েস!'—একটু শাসিয়ে কথাটা বলেই কিন্তু ও-ও নরম হয়ে গেল। জিগ্যেস করলে—'কটা গাড়ি আছে?'

বললাম—'গাড়ি তো এই একটি'।

'আবার ল্যাজে খেলছ বাবা?' (এতক্ষণ ঠাঁটে জগন্নাথ রেখেছিল)

বললাম—'আজ্ঞে ও তো গোরুর গাড়ি নয়। ওতে তো আর প্রোসেশন হবে না।'

'আলবাৎ হবে। লুক হিয়ার সবগুলোকে বায়না দিয়ে দাও, বেহাত না হয়ে যায়।'

পকেট থেকে ব্যাগটা বের করে এদিকে ছুড়ে ফেললে।.........সেই রায়বাড়ির জামাইকে প্রোসেশন করে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাচ্ছি মশাই। সংক্ষেপে ইতিহাসটা বললাম।'

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, ফিরে দেখলাম জামাতারত্নের আরও খানিকটা নিচে নেমে এসেছে; হতভম্ব হয়ে গেছি কিছু একটা বলবার জন্যেই বললাম—"আমি মনে করেছিলাম বুঝি গাড়িটা জখম হয়েছে।"

উত্তর করলে—"সেই ভেবেই তো ব্যবস্থাটা করেছি মশাই, একটু বুদ্ধি জুগিয়ে গেল। আগে পাঁচটা পেছনে পাঁচটা প্রোসেশন করে যদি এই ঢালু রাস্তা দিয়ে যাই, এই রকম একখানা মোটর নিয়ে তো পাগল বলে লোকে ঢিলিয়ে মারবে না? আর ওদেরই বা বলি কি করে? নেমে একটু সরে গিয়ে ডেকে বললাম—মোটরটা বিগড়ে গেছে হঠাৎ, টেনে নিয়ে যেতে হবে। এই চারখানা গাড়ি ঠিক হোল, তিন টাকা করে রফা হয়েছে। এসে দেখি ঐ রকম কুপোকাৎ হয়ে রয়েছে। পর্দাগুলো টেনে এই স্টীয়ারিং ধরে বসে আছি। গেড়ো আর কাকে বলে?"

জিগ্যেস করলাম—"আর তো সাড় নেই একেবারেই দেখছি; খুলে নিয়ে বেরিয়ে যান না তাড়াতাড়ি।"

সাহস হয় না মশাই। ঐ যে মাথার মধ্যে ঢুকে বসে আছে—কিড্ন্যাপ করছি বলে চেঁচাবে—কে জানে ঝাঁকানির চোটে উঠে পড়ে যদি চেঁচিয়েই বসে......তাই ভাবছি এই কটা জায়গা পেরিয়েই যাক—একেবারে সেই সিরাকোল-শিবানিপুর পর্যন্ত, তারপর যা হয় একটা করা যাবে ভেবে চিন্তে।...... ভদ্রলোকের ছেলে মশাই, ভাবলাম ভালো ঘরে পাওয়া গেল চাকরি, তা দেখুন না নিগ্রহ, প্রোসেশন নিয়ে যাচ্ছি। ......একটু আগে থাকতেই নেমে যান আপনি। দয়া করে আর ফাঁস করবেন না কথাটা, ভিড় জমে যাবে বাজারের মাঝখানে।"

নামতে নামতে দুঃখিতভাবে হেসে বললাম—"ফাঁস করবার কথা একটা?"

"তবুও তো প্রোসেশানের গোড়ার দিকটা দেখেন নি—গাড়োয়ানেরা যখন কোরাসে একটা মেঠো গান ধরে ছিল...ফিরতির মুখে, হঠাৎ ফোকটে তিনটে করে টাকা এসে গেল ট্যাকে তো? আমিও এলে দিলাম, তখন মনটা আরও খিঁচড়ে রয়েছে তো, বললাম—তোর ব্যাণ্ড সুদ্ধুই প্রোসেশান চলুক তাহলে, অঙ্গহানি হয় কেন?......আচ্ছা নমস্কার।" মোটরটা কাটিয়েই দেখি—সর্বনাশ! গাড়ি এসে গেছে ওদিকে। পা চালিয়ে দিলাম, তাতে না কুলোতে ছুটলামও, কিন্তু ততক্ষণ গাড়ি আমায় ছাড়িয়ে স্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, গিয়ে পেঁছুবার আগেই ছেড়ে দিলে। স্পীডও দিয়ে দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে, তবু উঠতে যাচ্ছিলাম, স্টেশন মাস্টার মানা করলেন—'থাক্' এর পরের গাড়িটাও এসে পড়ল বলে; এটা অতিরিক্ত লেট যাচ্ছে কিনা আজ।"

প্রশ্ন করলাম—"কতক্ষণে আসছে পরেরটা?"

"চারটে সতেরো মিনিটে টাইম।"

পাঞ্জাবীর হাতাটা গুটিয়ে দেখলাম প্রায় তিন কোয়ার্টার দেরি।

দেখছি জীবনটা এগিয়ে চলে কনট্রাস্ট-এর মধ্যে দিয়ে, একটু বেশি বাঙলা বাঙলা বাই হয়েছে তোমাদের এই স্বাধীনতা পাবার মুখে, আমি কিন্তু কথাটার ঠিক প্রতিশব্দ হাতড়ে পাচ্ছি না আপাতত। জীবন-শিল্পী যিনি তিনি এই কনট্রাস্টের মধ্যে দিয়ে অনুভূতিগুলোকে বেশি করে ফুটিয়ে তোলেন। অন্তত দেখছি আমার জীবনে এটা একটু বেশি—একটানা একভাব নেই; এই যে থিথিয়ে জিরিয়ে বলদ গাড়ি টানা মোটের নিঝুম প্রোসেশনের গল্প শুনতে শুনতে খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছিলাম, এর-পর আমায় খানিকটা তাড়াহুড়ির মধ্যে ফেলা চাই-ই তাঁর, এ গাড়িও ফেল করতে হোল, তার নিদারুণ লজ্জাটুকু তো বোঝার ওপর শাকের আঁটি।......ছোটা, নৈরাশ্য, লজ্জা সবটুকু মিলিয়ে বুকটা বেশ ধড়ফড় করছে। স্টেশনে গিয়ে বেঞ্চটায় বসলাম।

এখন একটার পিঠে একটি করে সে এই পঁয়তাল্লিশটি মিনিট, একে কাটানো যায় কি করে? আমাদের ওদিকে স্থানীয় হিন্দীতে একটা প্রবাদ আছে—যার গরম দুধে একবার ঠোঁট পুড়ে গেছে, সে ঘোলেও চুমুক দেয় ফুঁ দিয়ে দিয়েই। কতকটা সেইরকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে;—শহর দেখতে যাব কি, স্টেশনের বাইরে পা দিতে সাহস হচ্ছে না।

কিন্তু জীবন তো দোটানার খেলাই; কুষ্টিতে যে উগ্র রকম যোগ চলেছে, নইলে এই বোশেখী রোদে বাড়ি থেকে টেনে

আনে? মিনিট দুয়েক যেতে না যেতে পা সুড় সুড় করতে লাগল, তারপর পেট বললে আমার খিদে পেয়েছে, গলা বললে আমার তেষ্টা। আসল কথা কি জানো? মানুষের নিজের কাছেও একটা চক্ষুলজ্জা আছে, একটা অন্যায়, ভুল বা বেহায়াপনার কাজ করতে হলে মনের কাছে একটা জবাব-দিহি দিয়ে ভদ্রতা রক্ষা করতে হয়।......মন বললে—সত্যি নাকি? খিদে তেষ্টা দুই-ই? আহা, পাবার কথাই তো! তাহলে ওঠ। ছাড়পত্র আদায় হোল। বেরিয়ে পড়লাম স্টেশন থেকে।

বাঁ দিকে হাট, ডান দিকে টানা বাজার, বেশ অনেকগুলি দোকান, ছোটবড়, ভালো-মন্দয় মেশানো। রোদ একটু পড়ে আসার সঙ্গে চাঞ্চল্য জেগে উঠছে আস্তে আস্তে। একটা অদ্ভুত ধরণের কৌতুক জেগে উঠছে মনে—একেবারে ষোল আনা বাঙলাদেশের একটা বাজার, পানবিড়িওলা থেকে নিয়ে একেবারে ওপর পর্যন্ত সব বাঙালী, এ দৃশ্যটা প্রায় চোখে পড়ে না। আমাদের দেশে যাওয়া মানে কলকাতায় কটা দিন কাটিয়ে আসা; সেখানে, বোধহয় খাঁটি বিলেত আছে—চৌরঙ্গীতে; খাঁটি যোধপুর আছে বড়বাজার চিৎপুরে, এমনকি খাঁটি ক্যাণ্টনও আছে চীনেপটিতে; কিন্তু খাঁটি বাঙলা নেই কোনখানেই।

থাক, মেলা খাঁটি কথা বলাও নিরাপদ নয়। আসল ব্যাপার তা নয়। একটা জাত আস্তে আস্তে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য কল্যাণকর নয়, কারুর চোখেই কল্যাণকর বলে প্রতিভাত হওয়া উচিত নয়। জাত না বলে উপজাতিই বলি, কেননা ভারতবাসী একটা জাত এই ধারণাটাই বড় এবং বলিষ্ঠ; অতীত ইতিহাস যাই বলুক, ভবিষ্যৎ ইতিহাস গড়বার পক্ষে এই ধারণাটাই বেশি অনুকূল, বিশেষ করে বর্তমান জগতে। সুতরাং বাঙালীকে উপজাতিই বলি; কিন্তু উপজাতি বলেই যে তার উবে গেলে ক্ষতি নেই একথাও তো বলা যায় না। বাঙালী সেই উবে যেতে বসেছে। একথাটা ইংরিজীতে বলতে গেলে Too true অর্থাৎ মর্মান্তিকভাবে সত্য এবং এর জন্যে যেমন বাঙালীর তেমনি ভারতের অন্য সব উপজাতিরও চিন্তিত হওয়া উচিত। সেই চিন্তাটাই হচ্ছে আমাদের এক জাতিত্ব বোধের নিরিখ, যে পরিমাণে অন্য সব উপজাতিদের মধ্যে সে চিন্তাটার অভাব আছে, সেই পরিমাণে ঐ গালভরা কথাটা ভূয়ো এবং সেই পরিমাণেই আমাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের এমারৎ তোলার মধ্যে মেকি মাল ঢুকে বসে থাকবে।

এই ফাঁকিবাজি একচোট হয়ে গেছে। সুতরাং সাবধান হয়ে এগুনো ভালো। ধর্মের মতো পাকা মশলা—জাতির এমারৎ গড়তে এ পর্যন্ত বোধহয় আর কিছু হয় নি; এক সময় এই মশলা দিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষটাকে এক করবার চেষ্টা হয়েছিলা, একটা ভাষাও তাতে করেছিল সাহায্য যার মতন ব্যাপক ভাষা ইংরিজীর আগে জগতে আর হয় নি। ভারতের ভৌগোলিক সংস্থানও এমন—ঘেরাঘোরা, আঁট-সাঁট, নিরেট যে ষোলআনার ওপর আঠার আনা সফল হওয়ার কথা। কিন্তু হোল না কিছুই? কেন?......ভেবে দেখতে হবে।

এবারে যা পরীক্ষা তা ধর্মের ওপর নয়। একদিক দিয়ে ভালো, কেননা এবারকার পরীক্ষার যা Bed rock অর্থাৎ ভিত্তি-প্রস্তর সেটা বেশি প্রত্যক্ষ—অর্থাৎ সামষ্টিক স্বার্থ। ভালো কথা—দরকার কি ও মন্ত্র-তন্ত্রের হেঁয়ালীর? কিন্তু একটা কথা মনে রাখা তো দরকার। এই বেড্-রকটিকে খানিকটা করে আত্মত্যাগের আগুনে গলিয়ে গলিয়ে একটা তালে পরিণত করতে হবে, ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের Sedimentary rock না অগ্নি-গলিত একপিণ্ড একটা Igneous Rock, Sediment অর্থাৎ স্তরের বালাই থাকলেই আবার সর্বনাশের গোড়া রয়ে গেল, চাপ পড়লেই ভেতরে চিড় খেয়ে যাবে। সে যে একের ছদ্মরূপে বহু-ই—খণ্ডিত, চূর্ণিত বহু-ই।

আমার মনে হয়, ভেতরের গলদের জন্যে এক সময় বড় জিনিসটাই ফেল করে গেছে অর্থাৎ ধর্ম। সুতরাং, হুঁসিয়ার হয়ে এগুনোই ভালো। ধর্মের একটা মস্ত বড় সুবিধা ছিল, তার নিজের ভিত্তিই ত্যাগের ওপর। স্বার্থের সেটা নেই—তা সেটাকে State (রাষ্ট্র), Society (সমাজ), Economy (অর্থনীতি), যে-নামেই অভিহিত করো না কেন।

যাক, যা বলছিলাম—তবু এখানে জাতটাকে সমষ্টিগতভাবে দেখা যায় একটু।

কিন্তু কী করুণ দৃশ্য!—দুর্বল কাঠামো, তার ওপর প্রায় বেশির ভাগই রোগ-জীর্ণ কালো, কটা চামড়া তো প্রায় চোখেই পড়ে না, আর খর্ব। এইটে আমার সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে।—এই খর্বতা, বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীদের মধ্যে, যাদের গায়ে খেটে খেতে হয়। খানিকটা আরও দক্ষিণে পর্যন্ত যাওয়া আছে আমার, খর্বতা যেন ক্রমেই বেড়ে গেছে। যেন ক্রমেই মাটির লেভেলে নেমে আসছে সব এদিককার মাটি যেমন আসছে ক্রমে জলের লেভেলে নেমে। আমার মনে এইটেই অস্বস্তি জাগায় বেশি, সর্বরোগের স্বরাজ পাওয়ার সঙ্গে না হয় আর সব হবে—স্বাস্থ্য আসবে, শক্তি আসবে, কিন্তু মারাত্মক Pacific Gravity-র হাত থেকে এদের বাঁচানো যাবে কি করে?

এটা একটা জাতিগত চিন্তার কথা, কিন্তু লাগছে বেশ—দোকানের সারির নিচেই যেখানে যেখানে ফাঁক পেয়েছে দিন-বেসাতীদের দল বসে গেছে—মেয়ে-পুরুষ, ছোট-বড়, এক জায়গায় মেয়ে, এক জায়গায় পুরুষ; আবার মেশামেশি করেও—আম জাম, শাক, এঁচোড়, বড়ি, দড়ি, চাল, মুড়ি বিড়ি, পাঁপড়, ফলারি—রকমারি কাণ্ড রাস্তার দু সারি চলে গেছে, খদ্দের উঠছে আস্তে আস্তে জমে।..."পয়সা দুটো করে ......না, তার বেশি হবে নি। জামরুল কি রকম দেখতে হবে তো......তোমাদের গেরাসে গোরুতেও খায় না?—তা যাও তাহলে গোরুর চেয়ে খাটো হতে যাবে কেন গো?' —মেয়েছেলে; বেটাছেলেদের মুখে এত চাঁচা ছোলা উত্তর জোগায় না টপ করে। লোকটা চলে যেতে আমি দু'পয়সার নিলাম, তেষ্টা পেয়েছে, আর দিব্যি টলটলে ফলগুলি, এর একটি বড় বড় মুক্তো যেন; তবে দর করতে সাহস হোল না আর। (ক্রমশ

সাহেব বিবির দেশে

নরেন্দ্র দেব

অস্ট্রিয়া-ভিয়েনা-সালজ্‌বার্গ-ইনস্‌ব্রুক

আমরা ভেনিস থেকে ভিয়েনা আসবার আগের দিন ফেরি স্টীমারে গিয়েছিলাম মুসোলিনীর স্থাপিত নতুন 'সাগরপুরী' 'লিডো' দেখতে। একথা আগেই বলেছি। অগণিত পয়ঃপ্রণালীর জালবোনা শহর থেকে এই পথবহুল নগরে এসে বেশ লাগছিল। আমরা ডাঙার জীব, জমি না পেলে হাঁফিয়ে উঠি। লিডো শহর নতুন, পথঘাট নতুন, ঘরবাড়ি নতুন, আদ্রিয়াতিক সমুদ্রের উপসাগর সৈকতের এ স্নান-পীঠও নতুন, সবই নতুন; শুধু নতুনই নয়, এখানে সবকিছুই সুন্দর। মুসোলিনী নিজে এক সময় একজন উঁচুদরের ইমারতী কারিগর ছিলেন, তাই বোধ করি শহরের পত্তন করতে পেরেছিলেন এমন মনোহর করে। সারাদিন লিডোয় কাটিয়ে আমরা বিকেলের স্টীমারে ভেনিসে ফিরলাম এবং একখানি গন্ডোলা ভাড়া নিয়ে ভেনিসের খালে খালে আশা মিটিয়ে বেড়ালাম। পরের দিন 'ভেনিস' ছাড়লাম বেলা দশটা পঁচিশের ট্রেনে। ভেনিস থেকে ভিয়েনা মাত্র একশ' চুয়াল্লিশ মাইল। ট্রেনখানি বোধ হয় 'গাধা-বোট।' ভিয়েনায় এসে পেঁ'ছলাম সন্ধো সাতটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে, অর্থাৎ প্রায় ন' ঘণ্টা লাগলো।

গাড়িতে বেশি ভীড় ছিল না। দুটি খুব ভাল সহযাত্রী সঙ্গী পাওয়া গিয়েছিল। একজন শিল্পী, একজন শিক্ষয়িত্রী। দুজনেই ছুটিতে ভেনিসে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কাল সব অফিস, স্কুল খুলবে। ও'রা তাই শহরে ফিরছেন। শিক্ষয়িত্রীটি খুব ভাল ইংরিজী বলতে পারেন, কিন্তু শিল্পীটি বোবা। ইংরিজী বলেনও না, বোঝেনও না। জার্মান ও ফরাসী ভাষা জানেন। আমাদের কাছে ও দুটোই গ্রীক! শিক্ষয়িত্রীর মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আর্ট ও আর্কিটেক্‌চার নিয়ে কিছু আলাপ করবার চেষ্টা হল মাত্র। কারণ, এটা খুবই সত্য যে, দোভাষী মারফৎ কথা বলে কোনও সুখ নেই। তিনি অবিরাম একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছিলেন, আর আমরা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে

ভিয়েনার পথে পাওয়া বন্ধু মারী

অবিরাম একটার পর একটা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। শিক্ষয়িত্রীটি সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। বয়স অল্প। নাম মারী। একটি বিবাহিত যুবকের সঙ্গে তিনি প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারপর এ'দের বিবাহ হবে। ইনি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করছেন। মেয়েটি ভাল। খুব সরল। তাঁর সমস্ত জীবন কাহিনী আমাদের কাছে অকপটে প্রকাশ করে বলতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করলে না। হয়ত আমরা বিদেশী বলেই।

দুধারের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভারি চমৎকার। তুঙ্গ শৃঙ্গ আল্পসের তুষারাবৃত রূপের পাশে ঘন অরণ্যের শ্যাম সমারোহ। কত বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। মাঝে মাঝে দ্রাক্ষা-কুঞ্জে থোলো থোলো কালো আঙুর ফলে রয়েছে। অলিভ বনের স্নিগ্ধ রূপ দৃষ্টিতে যেন হরিতাঞ্জন বুলিয়ে দিচ্ছিল।

কথায় কথায় কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল, বোঝা গেল না। ট্রেন এসে দাঁড়ালো 'উদাইনে।' আশী মাইল চলে এসেছি। এখানে ভিয়েনা যাবার জন্য গাড়ি বদল করতে হ'ল। আড্ডা এমন জমে উঠেছিল যে, সবাই এক গাড়িতে গিয়ে ঢোকা গেল। এখানি আন্তর্জাতিক ট্রেন। গাড়ি অসংখ্য থাকায় স্থানেরও অভাব নেই। এখানে টিকিট ইন্সপেক্টর টিকিট চেক করতে এল। নবনীতার বয়স বারো বছরের কম বলে তার ছিল 'হাফ্‌ টিকেট'। ইন্সপেক্টর সাহেব বললেন, 'এ লাইনে দশ বছরের কম হলে তবেই হাফ টিকিটে যেতে দেওয়া হয়। আপনার মেয়ের জন্য পুরো টিকিটের দাম দিতে হবে।' দিলাম বার করে। তিনি একখানা রসিদ কেটে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলেন। বুঝলাম, আজকে যাত্রা শুভ নয়।

আরও ষাট মাইল নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে এলাম। গাড়ি এসে দাঁড়ালো ইতালির সীমান্তভূমি 'তারভিশিয়ো' স্টেসনে। আমরা এখানে ইতালির টাকা বদলে অস্ট্রিয়ার টাকা করে নিলাম। অস্ট্রিয়ার টাকাকে বলে 'শিলিং' আর পয়সাকে বলে 'গ্রোশেন।' এক শিলিংয়ের দাম ৬ পেন্স অর্থাৎ আমাদের ছ'আনা মাত্র। অস্ট্রিয়ায় শিলিংয়ের বানান এস্‌-এইচ দিয়ে নয়, এস্‌-সি-এইচ দিয়ে। সেই চিরবিরক্তিকর 'পাসপোর্ট' 'ভিশা' এবং শুল্ক বিভাগের পরীক্ষা শুরু হল। বহুক্ষণ পরে সমস্ত ট্রেনখানি চেক্‌ হবার পর গাড়ি ছাড়লো। আমরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু বিধাতা পুরুষ যে তখন অন্তরালে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন, তা কে জানে? ক্ষণ পরেই আপাদমস্তক লাল উর্দী'পরা যমদূতের মতো দুই সোভিয়েট পুলিশ গাড়িতে এসে হাজির। কামরার আর কোনও যাত্রীকে কিছু না বলে তারা এসে সর্বাগ্রে আমাদের পাস-পোর্ট দেখতে চাইলে। মুখের দিকে তাকালাম। মাথার টুপীর মাঝখানে রক্ত

'শোয়েনব্রুন' প্রাসাদের মধ্যে আমরা

ঝক করছে সোনালী পালিশকরা 'কাস্তে-হাতুড়ী।' আমার প্রত্যেক বোতামটায় 'কাস্তে-হাতুড়ি।' কোমরের বেল্টের মাঝখানে দেখি জ্বল্ জ্বল্ করছে কাস্তে-হাতুড়ি। দুই কাঁধের উপর মোটা ফিতেয় আঁটা ঝক্‌ঝকে কাস্তে-হাতুড়ি!

দেশে এতদিন শুধু ছবিতে আর লাল ঝান্ডার গায়ে সাদা কাপড়ের সেলাই-করা কাস্তে-হাতুড়িই দেখেছিলাম। সেই কাস্তে-হাতুড়ি যে এমন স্বর্ণবর্ণে উজ্জ্বল ও কঠিন এক বিশ্বরূপ নিয়ে সামনে এসে দেখা দেবে, তা ভাবি নি। সত্য কথা বলতে কি, রীতিমতো ভড়কে গেলাম। মারী মৃদুস্বরে বললে, 'পাসপোর্ট' দেখান। বার করে দিলুম। দেখলে তারা উল্টে-পাল্টে সব কটা পাতা। যা খুঁজছে তা নেই পাসপোর্টে। অর্থাৎ, ভেয়ানার রাশিয়ান জোনে প্রবেশের 'মিলিটারী পারমিট' বা 'ট্রান্‌জিট্ ভিসা' দেখতে চায় তারা। আমি জানতুম জার্মানীই শুধু চতুর্শক্তির কবলে পড়ে খাবি খাচ্ছে। অস্ট্রিয়ারও যে সেই দশা, তা জানা ছিল না। সুতরাং প্রয়োজনীয় সামরিক অনুমতি বা তাঁদের অধিকৃত অঞ্চলের ভিতর দিয়ে যাবার 'ট্রানজিট ভিসা' বা ছাড়পত্র নেওয়া হয় নি। রুশ প্রহরীরা প্রশ্ন করতে শুরু করলে আমায়, প্রথমে রাশিয়ান ভাষায়, পরে জার্মান ভাষায়, পরে ফরাসী ভাষায়, পরে ইংরাজী ভাষায়। সোভিয়েট পুলিশের ভাষাজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলেও, উত্তর দিলাম না কিছু। মুখের দিকে হাবার মতো চেয়ে সলজ্জ মৃদু হেসে শুধু এই কথাই বার বার বলতে শুরু করলাম,—'রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া! ইন্ডিয়ান য়ুনিয়ন টুরিস্ট্! স্তালীন গুড্ !"

কি জানি, কেন তারা দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে হেসে কি পরামর্শ করে আমার পাসপোর্টখানা ফেরত দিয়ে চলে গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। মারী বললেন, 'ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন। বিনা পারমিটে ওরা কাউকে ঢুকতে দেয় না। ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে পোরে। তার-পর চলে তার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর। নির্দোষী প্রমাণ হলে তবে অব্যাহতি পায়। তা সে দুদিনেও হতে পারে বা দুমাসও লাগতে পারে। আপনাকে ছেড়ে দিয়ে গেল কেন বুঝতে পারলাম না।

কামরার ভিতরের একজন রসিক সহযাত্রী বললেন—'বোধ করি ওঁর ওই স্ত্যালিন স্টাইলের গোঁফজোড়াটা দেখেই ভড়কে গেল। আপনি কোনও য়ুরোপীয় ভাষা না বোঝার ভাণ করে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন মশে'। আমরা গাড়িশুদ্ধ লোক ভয়ে কাঁটা হয়েছিলাম। প্রতি মুহূর্তে ভাবছিলাম, এই বুঝি আপনাদের ধরে নামিয়ে নিয়ে যায়। একবার নামালে এবারকার দেশ-ভ্রমণ এখানেই শেষ করতে হ'ত।

আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ভেয়ানায় গিয়ে পৌঁছাবো। কোথায় গিয়ে উঠবো, কিছুই ঠিক নেই। মারী বললেন, 'আমার জানা একটি ভাল হোটেল আছে। স্টেশান থেকে নিকটেই। চার্জও মডারেট। চলুন সেইখানে উঠবেন।' তথাস্তু! মেয়েটি খুব ভাল। ভেয়ানায় নেমে আর্টিস্ট চলে গেল বিদায় নিয়ে। আমাদের দুটো জিপ ব্যাগ আর দুটো স্যুটকেস হাতে হাতে নিয়ে আমরা চললাম মারীর পিছু পিছু। মারী নিয়েছিল আমাদের সবচেয়ে ভারি স্যুটকেসটা। কিছুতে শুনলো না আমাদের নিষেধ। বললে তোমরা যে আমার ভেয়ানার অতিথি তোমাদের যাতে কোনও কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, ভেয়ানার মেয়ে হয়ে আমার সেটা দেখা সবচেয়ে বড় কর্তব্য বলে মনে করি।'

ভিয়েনার পথে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল এসেছি আজ অস্ট্রিয়ার সেই প্রাচীন রাজধানীতে, যেখানে রোমের পরই একদিন খৃষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। মধ্য-য়ুরোপে একদা যারা রাজ-ঐশ্বর্যের সঙ্গে শৌর্য, সংস্কৃতি ও শিল্প-কলার নব নব ইতিহাস রচনা করে গিয়েছে, এসেছি আজ সেই অস্ট্রিয়ানদের দেশে, সেই সার্বভৌম সম্রাটসংকুল হ্যাপস্‌বার্গ, রাজবংশের কীর্তি-পরিকীর্তিত ভিয়েনা নগরে। জার্মান ভাষায় এদেশের নাম "হিবয়েন্।" অস্ট্রিয়াবাসীদের ভাষাও জার্মান। এর ইতিহাস উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক, কিন্তু তার মধ্যে গেলে এ প্রবন্ধ আর আগামী সপ্তাহে শেষ করা যাবে না। কাজেই, হ্যাপসবার্গ রাজবংশের অভ্যুদয় থেকেই শুরু করা যাক।

চতুর্দশ শতাব্দীর কথা। হ্যাপস্‌বার্গ রাজবংশের যুবরাজ প্রিন্স চতুর্থ রুডলফ রাজধানীর রূপ পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়ে একে সর্বপ্রথম একটা রাজোচিত আকৃতি দিলেন। পথঘাট বিস্তৃত করলেন। বড় বড় হর্ম ও প্রাসাদ নির্মাণ করালেন। ভিয়েনার সেন্ট স্টীফেন ক্যাথিড্রাল এই সময় ভেঙে বড় করে গড়া হল। স্থাপিত হল ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়। রুডল্ফ পেলেন দেশবাসীর কাছে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার স্বরূপ 'প্রতিষ্ঠাতা'র খ্যাতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিন পর্যন্ত হ্যাপ্‌সবার্গদের রাজধানী-রূপেই ভিয়েনা শাসিত হয়ে এসেছিল। এঁদের উপাধি ছিল 'ধর্মাধিপতি রোমান সম্রাট।' কিন্তু এই সুদীর্ঘ পাঁচশত বৎসর হ্যাপ্‌সবার্গ বংশ যে একটানা শান্তিতে রাজত্ব করতে পেরেছিলেন, তা নয়। ১৪৮৫ থেকে ১৪৯০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত পাঁচ

বছর ভিয়েনা চলে গিয়েছিল হাঙ্গেরীয়ান রাজার অধীনে। তারপর সম্রাট পঞ্চম চার্লসের রাজত্বকালে এর গৌরব আবার সুদূরবিস্তৃত হয়েছিল। তারপর, খৃষ্টানদের চিরশত্রু তুর্কী আক্রমণকারীরা বার বার এসে ভিয়েনার দ্বারে সশস্ত্র হানা দিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ধর্ম সংক্রান্ত বিরোধের ফলে যে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হয়েছিল, নগরবাসীরা তাতে বড় বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তী শতাব্দীতে ভিয়েনার সৌভাগ্য-সূর্য আবার নূতন গৌরবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। নৃপতি ষষ্ঠ চার্লস এবং তাঁর প্রতিভাময়ী নন্দিনী রাজকুমারী মারিয়া থিরেসিয়ার আমলে হ্যাপসবার্গ বংশের সম্মান, মর্যাদা ও রাজশক্তি যশ-গৌরবের চরম শিখরে গিয়ে পৌঁছেছিল।

ভিয়েনাও এই সময় পৃথিবীর বরণীয় রাজধানী হ'য়ে উঠেছিল বলা চলে। শিল্পে, সাহিত্যে, শিক্ষায়, স্থাপত্যকলায়, সংগীতবিদ্যায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশ্বের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল সে। জগৎসভার বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রোত এসে সম্মিলিত হয়েছিল এই ডানিয়ুবের নদীকূলে নবজাত নগরটিতে। দেশ বিদেশ থেকে অনুপম রম্যকলা ও চারুকারু বিষয়ক শিল্প সামগ্রী সংগৃহীত হয়ে এখানে যাদুঘর প্রত্নতত্ত্ব ও শিল্প সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছিল। রাজপরিবারের এবং ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় এই খানেই প্রথম জার্মান নাট্যশালা ও গীতাভিনয় (অপেরা) শুরু হয়।

দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়'র আক্রমণ থেকে ভিয়েনা রক্ষা পায় নি। উপর্যুপরি দু'বার ফরাসী সম্রাটের আধীনতা স্বীকার করতে হয়েছিল বলে ভিয়েনার অধিবাসীদের দুঃখের আর অন্ত ছিল না। মহাবীর নেপোলিয়'র গৌরবরবি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হবার পর ভিয়েনা আবার মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, নির্বাপিত-প্রায় প্রদীপ শেষবারের মতো যেমন জ্বলে ওঠে, হ্যাপ্‌সবার্গ রাজ বংশের গৌরবের সঙ্গে ভিয়েনার মর্যাদাও সেই রকম এই সময়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তারপর এল সেই অশুভ ১৯১৪ সাল। সেরাজেভোয় অস্ট্রিয়ার ক্রাউনপ্রিন্স ও তাঁর পত্নীর হত্যা ভিয়েনার ভাগ্যহীন ললাটে পরিয়ে দিয়ে গেল রাজরক্তে রাঙা সর্বনাশের অগ্নি টিকা।

মারী আমাদের যে হোটেলে নিয়ে এল সেটির নাম উচ্চারণ করা শক্ত। 'হোটেল ফ্যুয়েরস্টেন্ হফ্।' পল্লী ভাল। হোটেল ভাল। ঘরটিও খুব বড় এবং সুসজ্জিত। মারী আমাদের সব গুছিয়ে দিয়ে রাত্রি আটটা নাগাদ বাড়ী গেল। কাল আবার সন্ধ্যার পর আসবে বলে গেল। ভিয়েনার হোটেলে আমাদের একটা ভারি সুবিধা হয়ে গেল, এখানে হোটেলেই খানা পাওয়া যায় এবং অর্ডার দিলে ঘরেই খাবার দিয়ে যায়। তার জন্য অতিরিক্ত কিছু চার্জ করে না। সারাদিন ট্রেনজার্নি ক'রে সে রাত্রে আর আমরা কোথাও গেলাম না। পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর ম্যানেজারকে বলে হোটেলের এক গাইড নিয়ে নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়া গেল।

ভিয়েনার সবচেয়ে পুরানো বাড়ি শোনা গেল 'সেণ্ট রুপরেক্টস চার্চ'। এটি দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তৈরি হয়েছিল। এই সঙ্গে, সেণ্ট মাইকেল এবং সেণ্ট স্টীফেনস্ ক্যাথিড্রালের নাম করা যেতে পারে। এ দুটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইমারত। সেণ্ট মেরীর চার্চও এদেরই সমসাময়িক। রেনেসাঁর পরিচয় এখানে অনেকগুলি বাড়ির আষ্টে পৃষ্ঠে ললাটে আঁকা। এখানকার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ 'স্মৃতি সৌধ' হচ্ছে 'হফবার্গ' প্রাসাদের 'এমিলিয়া মহল', সুইস প্রাঙ্গণের 'তোরণ দ্বার' এবং 'সেণ্ট সালভেটর উপাসনা মন্দির।' এখানকার সংখ্যায় অসংখ্য গির্জাগুলি বিভিন্ন শতাব্দীর স্থাপত্য কৌশলের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করছে। 'অদ্ভুত মণ্ডন শিল্পের' (বারোক্ আর্ট) সূত্রপাত হয়েছিল ভিয়েনার উপাসনা মন্দির নির্মাণে নূতনত্ব আনবার চেষ্টায়। ফ্রান্সিস্‌কান চার্চগুলিকে এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়। ইতালীর কলাপদ্ধতির প্রভাবও অস্বীকার করা চলে না। এখানে দেখবার মতো বহু বড় বড় বাড়ি, রাজপ্রাসাদ ও উপাসনা মন্দির রয়েছে। সবগুলির খুঁটিয়ে বর্ণনা দিতে গেলে সাত আট পৃষ্ঠা লিখতে হয়। সুতরাং বিশেষ বিশেষ স্থানগুলিরই শুধু উল্লেখ মাত্র করবো। যেমন সেণ্ট চার্লসের গির্জা, প্রিন্স ইয়ুজিনের পৌষপ্রাসাদ, (উইণ্টার প্যালেস) কিন্‌স্কী প্রাসাদ, শোয়ার্জেনবার্গ প্রাসাদ ও বেলভেডিয়ার প্রাসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়, টাউনহল, অপেরা হাউস এগুলিও উল্লেখযোগ্য। ভিয়েনার পার্লিয়ামেণ্ট, বার্গনাট্য মন্দির, মিউজিয়ম এবং নূতন প্রাসাদ ভবনটিও দেখবার মতো। ভিয়েনার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য হ'ল মারীয়া থেরেসিয়ার লীলাক্ষেত্র 'শোয়েনব্রুন্ প্যালেস।'

স্থাপত্যকলার পরই ভিয়েনার ভাস্কর্য-

হংক্‌সবার্গ সেতুর উপর

তারে-ঝোলা রেলে

কলা আমাদের মতো বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেণ্ট স্টীফেন উপাসনা মন্দিরের বিরাট সিংহদ্বারে উৎকীর্ণকরা শীলা চিত্র; সেণ্ট স্টীফেন মন্দিরের ভাস্কর্য শিল্পানুসারী বিচিত্র অলংকরণ। এর অদ্ভুত মন্ডন-কলামণ্ডিত ত্রয়ীস্তম্ভ, (ট্রিনিটি কলমস্) এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল নতুনবাজার আর আন্দ্রোমেদার দুটি অপূর্ব ধারাযন্ত্র বা ফোয়ারা। এই সঙ্গে আর্কডিউক চার্লস্ ও প্রিন্স ইয়ুজিনের স্মৃতিসৌধ এবং মারীয়া থেরেসিয়া ও বীঠোফেনের স্মারক সম্ভ না দেখলে ভিয়েনা দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

চিত্রশিল্পের দিক দিয়ে ভিয়েনার সম্পদ য়ুরোপের অন্য যে কোনও পুরাতন শহরের সংগ্রহশালার চেয়ে কম নয়। স্কটেনস্টিথট্ মহিণ্টারের আঁকা 'মিশরে পলায়ন' ও 'দৈব শাসন' ছবি দুখানির তুলনা হয় না। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ছবিগুলির সঙ্গে পরবর্তীকালের চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতির অনেক পার্থক্যই চোখে পড়ে; বিশেষ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মারিয়া থেরেসিয়ার আমলে রমাকলা শিল্পের আঙ্গিক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের একটি পথ বেছে নিয়ে ছিল দেখা যায়। ধর্মভাবমূলক চিত্রাবলী, নিসর্গ দৃশ্যের চিত্রাবলী, মিনিয়েচোরিস্ট, বা যাঁরা হাতীর দাঁত, ধাতুফলক, স্ফটিক খণ্ডের উপর ক্ষুদ্রাকার চিত্র অংকনেই সুদক্ষ ছিলেন আর যাঁরা ছিলেন প্রাণী-চিত্রবিশারদ, তাঁহাদের সকলেরই শিল্পের ধারা গিয়েছিল বদলে। পরিবর্তনের এই প্রথম সূত্রপাত ক্রমে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এসে শিল্পজগতে একটা প্রবল বিপ্লব এনে উপস্থিত করেছে। কিউবিজম, ইম্প্রেশানিজম্, রিয়েলিজম, সাররিয়েলিজম প্রভৃতি ইজমের ছড়াছড়ি আজকাল শিল্পক্ষেত্রে। ভাস্কর্য কলাতেও এর ছোঁয়াচ এসে লেগেছে, রোঁদা এপস্টাইনের ছাত্ররা এখন চতুর্দিকেই গজিয়ে উঠছে। শিল্পীর অক্ষমতা আর ফাঁকি আজ মিস্টিক্ মুখোস প'রে আভাস ইঙ্গিতময় রহস্যকলার মধ্যে চরমগতি লাভ করছে। কলা-নৈপুণ্যের শোচনীয় অবনতি আজকের যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নূতনত্বের মোহগ্রস্ত সমালোচকদের কাছে বিস্ময়কর উৎকর্ষের মর্যাদা পেয়ে ধন্য হচ্ছে। কিমাশ্চর্যম অতঃপরম? নূতন ভাল, কিন্তু বিকৃতিকে নূতনত্বের সম্মান দেওয়া ভাল নয়। তাতে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষতি এসে পৌঁছয়। সুর ও সঙ্গীতের রাজ্যে ভিয়েনার অবদান আজ পর্যন্ত কোনও দেশই অতিক্রম করতে পারে নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুরসাধক মোজার্টের যে সঙ্গীত প্রতিভায় ভিয়েনার আকাশ-বাতাস অনুরণিত হয়ে উঠেছিল, তার উজ্জ্বল দীপ্তিতে সমগ্র য়ুরোপের সুরলোক আলোকিত হতে দেখা গিয়েছে। মোজার্টের পিছু পিছু এলেন বীঠোফেন্, হেদেন, শুবার্ট প্রভৃতি সুরেশ্বরেরা। এ'দের শক্তিমান শিষ্যবর্গ ব্রামস্ ব্রুকনার, মেহ্লার, উলফ্, স্ট্রাউস্ স্মিথ্ প্রভৃতি সুররাজে বিশ্বজয়ী হয়ে উঠেছিলেন। ভিয়েনা ফিলহার্মনিক ও সিম্ফনী অর্কেস্ট্রা বহুদি থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভে ধন হয়েছে। একদিন 'ভিয়েনা কনসার্ট হাউস' ম্যাটিনীর টিকিট কেটে আমরা বাজনা শু এলাম, তার সুর এখনও কানে বাজছে ভিয়েনার 'অপেরা'ও আজও পৃথিবীতে অপরাজেয়।

দুঃখের বিষয়, আমরা ভিয়েনায় গি দেখি বিগত মহাযুদ্ধে ঘন ঘন মিত্রশক্তি বিমান আক্রমণের ফলে ভিয়েনার অধিকাং ঘরবাড়ি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে রয়েছে। অপে হাউসও শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় নি মেরামত শুরু হয়েছে। কবে শেষ হ জানি না। ইতিমধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারে। ভিয়েনার এক ব্যাপার বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষ করেছিল, সেটা হচ্ছে অস্ট্রিয়ার প্রতি মি শক্তি ও সোভিয়েট রাশিয়ার ব্যবহারে তারতম্য। অস্ট্রিয়ার সোভিয়েট অধিকৃ অংশের ভাঙ্গা ঘরবাড়ি মেরামত হয়েছে র চং হয়েছে। সেদিকে ক্ষেতখামার শস সম্পদে সবুজ হয়ে উঠেছে। শুনলা রাশিয়া তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য দি পুনরায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহা করছে। কিন্তু মিত্রশক্তির অধিকৃত অং আজও তেমনিই ভেঙ্গে-চুরে পড়ে রয়েছে একখানি ইটের উপর আর একখানি ই গাঁথা হয় নি আজও। শস্যক্ষেত্রগু মরুভূমির মতো শুষ্ক। জার্মানীর ভিতর আমরা এই একই শোচনীয় দৃশ্য দে এসেছি। অস্ট্রিয়ায় মিত্রশক্তি অধিকৃ অনেক বাড়ির দেওয়ালে আমরা রক্তবর্ণে কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা রয়েছে দেখেছি। শো গেল মিত্রশক্তির রক্ষীবর্গ নাকি সেগু যতবার মুছে দেয়, রক্তবীজের ঝাড়ের মং সেগুলি পরদিন আবার দেখা দেয়। কাস্তে হাতুড়ির দুঃস্বপ্ন সেখানে মিত্রশক্তিকে পাগ করে তুলেছে।

একদিন দুপুরে ভিয়েনার রাজপথে বেড়াতে বেরিয়ে দেখি রাস্তার দুধারে লো লোকারণ্য। অসংখ্য পুলিশ ও সৈন্যবাহিন রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে শান্তি রক্ষা করছে কাউকে রাস্তা পার হতে দিচ্ছে না। প ফাঁকা রাখছে। আমরাও সেই ভীড়ের মধ্যে অপেরা হাউসের মোড়ের কাছে আট পড়লুম। ব্যাপার কি? খবর নিয়ে জা গেল—কোনও মহামান্য রাজা-মহারাজা ব

গভর্নর বাহাদুররা কেউ আসছেন না;—কমিউনিস্টদের মিছিল আসছে। অস্ট্রিয়ার রেলওয়ে ইউনিয়ন কর্তৃক কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবী সমর্থনের জন্য এই মিছিল বেরিয়েছে। বিরাট সে প্রোসেশান। হাজার হাজার সাম্যবাদী স্বেচ্ছাসেবকের দল আপাদমস্তক কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা লাল উর্দী আবৃত-দেহ চলেছে রক্তবর্ণ ধ্বজপতাকা ও বিজ্ঞপ্তিপত্র হাতে নিয়ে—সৈন্যবাহিনীর মতো তালে তালে মার্চ করে সরকারী শাসন পরিষদের গৃহাভিমুখে। মাঝে মাঝে তারা 'স্লোগান' দিচ্ছে—লক্ষ কণ্ঠে তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দুধারের দর্শকের জনতাও সে আওয়াজের সঙ্গে নিজেদের আওয়াজ মেলাচ্ছে। সে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য। দুধারের সমবেত পথিক-জনতার দিকে তারা গোছা গোছা মুদ্রিত প্রচারপত্র ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছিল। নিঃশব্দে তারা সেগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছে। কাড়াকাড়ি নেই, কলকোলাহল নেই। জনতার সেই সুন্দর শৃঙ্খলা দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কমিউনিজম যে কিভাবে এখানে দ্রুত প্রসারলাভ করছে, তার পরিচয় পেয়ে মনে হতে লাগলো—'এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?' মার্কিন ডলারের উচ্চৈঃশ্রবা ও ঐরাবত কি এ গণ-জাহ্নবীর স্রোতবেগ রুখতে পারবে? সৈন্যসামন্ত, পুলিশ, প্রহরী, গুলী, গোলা, কারাগার এ গণ-আন্দোলনকে কি স্তব্ধ করতে পারবে?

এখানে থিয়েটারের খবর নিতে গিয়ে দেখলাম, ভিয়েনার অধিবাসীরা আমার চেয়েও নাট্যপাগল। শহরে অসংখ্য থিয়েটার আছে। জার্মান, ইতালিয়ান ও ফরাসী ভাষায় বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে নাটক প্রহসন, রঙ্গকৌতুক, নৃত্যনাট্য, রেভিয়ু, মূক অভিনয় সব রকমই হয়। আজকাল এখানে গণনাট্য ও লোকনৃত্যের প্রাদুর্ভাব একটু বেশি। বোধ করি রুশরস সংস্পর্শের প্রভাবে এটা এত অতিরিক্ত সজীব হয়ে উঠেছে।

একদিন ভিয়েনার 'ইম্পিরিয়াল' লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢোকা হ'ল। বিরাট এ প্রতিষ্ঠান। তের লক্ষ সত্তর হাজার বই এদের জমেছে। ১৫২৬ খৃঃ অব্দে 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী' প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ এ গ্রন্থাগার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থশালাগুলির অন্যতম। এর নাম হয়েছে এখন 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী'। চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভিয়েনা যে একদিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল, তার জন্য সকল কৃতিত্বই বিশ্ব-বিখ্যাত 'ভিয়েনা স্কুল অফ মেডিসিন'-এরই প্রাপ্য। এই চিকিৎসা বিদ্যালয়কে যাঁরা বড় করে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিলরথ্, হেব্রা, অপোল্‌জার্, সেমেল্‌ওয়াইজ, স্কোডা, আইসেলস্‌বার্গ প্রভৃতি মনীষীরাই প্রধান। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে এ'দের পরিচয় সযত্নে রাখা হয়েছে। আর, রাখা হয়েছে—ভিয়েনার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবির পরিচয়, যাঁরা কাব্যজগতে জার্মান কবিতাকে একটা উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।
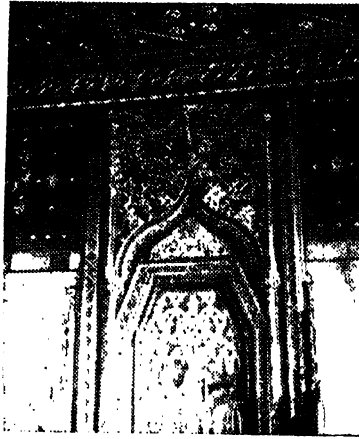
সাল্‌জবার্গ দুর্গাভ্যন্তরের কারুকার্য

এ'দের প্রাচীন 'নাইবেলুংগেন্' গাথাকে জার্মানীর মহাভারত বলা যায়। প্রসিদ্ধ জার্মান কবি ভন্ ডার্ ভোগেল্‌ওয়াইড ভিয়েনায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। ভন রুয়েন্থাল ছিলেন এখানকারই একজন জনপ্রিয় কবি। ভন লিক্‌টেনস্টাইন তাঁর প্রসিদ্ধ 'তান্‌হাউসার' কাব্য এখানেই রচনা করেছিলেন। হ্যাপস্‌বার্গ রাজবংশের সম্রাট প্রথম ম্যাক্সিমিলিয়ান স্বয়ং একজন কবি ছিলেন। ভিয়েনার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রাচীন কবিদের সঙ্গে ক্রমপর্যায়ে একেবারে আধুনিক কবিদের রচনাও এবং তার বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ সংগ্রহ করে রেখেছেন। বার, সোয়েনহার, হফ্‌ম্যানস্থাল, স্পিটজলার, ডাইনহেবার ও ওয়াইল্ডগানস্ ভিয়েনার বিংশ শতাব্দীর কবিদের তালিকায় পড়েছেন। লাইব্রেরিয়ানটি বড় ভাল লোক। আমরা ভারতের এক কবি-দম্পতি শুনে তিনি আমাদের কাছে একেবারে ভিয়েনার কাব্য-ভাণ্ডার খুলে বসলেন। প্রাণ যায় আর কি! বহুকষ্টে তাঁর কবল থেকে মুক্ত হয়ে এসে খানিকক্ষণ টাউন পার্কে ফাঁকায় বসে সুস্থ হয়ে হোটেলে ফিরি। ভিয়েনার পার্কগুলি ভারি চমৎকার। এখানকার সবচেয়ে বড় পার্ক হ'ল 'প্রেটার পার্ক।' এরই এক অংশকে বলে 'উর্স্টেল প্রেটার'। এখানে বারো মাসই যেন মেলা লেগে আছে। নাগরদোলা, মেরী গোরাউন্ড, রেস্তোঁরা, বিয়ার বার, নৃত্য-গীত, অভাব নেই কিছুর।

আমাদের ভিয়েনাবাস মারীর কল্যাণে মধুময় হয়ে উঠেছিল। রোজ সন্ধ্যের পর এসে আমাদের ঘরে সে আড্ডা জমাতো। নবনীতার জন্য একটা না একটা কিছু উপহার হাতে করে আসতোই। নবনীতাকে সে বলতো 'মাই লিট্‌ল ফ্রেণ্ড।' একদিন আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সে তার প্রেমাস্পদকে হোটেলে টেনে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলে। সাহেবটিকে ভালমানুষ বলেই মনে হ'ল। একটু বয়স বেশি হয়েছে। মারীও নেহাৎ নাবালিকা নয়, তবু মারীর সঙ্গে কেমন যেন বেমানান লাগে। ওদের সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করলাম—তোমরা সুখী হও, তোমাদের মিলন সার্থক হোক।

ভিয়েনার 'ভারতীয় লিগেশান' অফিসে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম একদিন। দুঃখের বিষয়, 'অফিসার-ইন-চার্জ' তখন ছিলেন না। লিগেশান অফিসের এ্যাটচী কে ডি রাম-স্বামী আমাদের যথাসাধ্য আদর-অভ্যর্থনা জানালেন এবং আমাদের জন্য তিনি কি করতে পারেন, জিজ্ঞাসা করলেন। ঘণ্টা-খানেক বসে গল্প করে ভিয়েনা সম্বন্ধে অনেকগুলি সচিত্র গ্রন্থ দেখে চলে এলাম।

কাল আমরা সালজবার্গ যাবো। মারীই নাচিয়েছে। সে বলে যে, সালজবার্গ না দেখে গেলে নাকি অস্ট্রিয়া ভ্রমণই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আজ তার স্কুলের ছুটি। ব্রেকফাস্টের পরই এসে হাজির। আমাদের নিয়ে সে আজ 'শোয়েনব্রান' প্রাসাদ দেখাতে নিয়ে চললো। এটি পুরাকালে অস্ট্রিয়ার সম্রাটদের 'পল্লীনিবাস' ছিল। সম্রাট প্রথম লিওপোল্ডের সময়ে, অর্থাৎ ১৬৯৪ খৃঃ

অব্দে এই প্রাসাদ তৈরী হতে শুরু হয়। কিন্তু শেষ হয় ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে মারীয়া থেরেসিয়ার বোলবোলাওয়ের সময়। ভন্ এয়ারলাক্ (বুড়ো) থেকে শুরু করে পেকাদি পর্যন্ত বড় বড় ভিয়েনীজ স্থপতি ছাপ্পান্ন বছর ধরে এর পিছনে খেটেছেন। 'শোয়েনব্রান' প্রাসাদের মধ্যে মোট চৌদ্দশো ঘর আছে। বিরাট এর অঙ্গন। অঙ্গনের দুধারে দুটি মহল আছে; আর এক ধার ফাঁকা। এদিকের অধিকাংশ রাজপ্রাসাদই এই ধরণে তৈরী দেখা যায়। উঠানের পশ্চিমের মহলে রাজকীয় নাট্যশালা। আর পূবের মহলে চুয়াল্লিশখানি সুসজ্জিত কক্ষে রাজবংশের সংগৃহীত শিল্প-সম্পদ রক্ষিত আছে। এ ঘরগুলি সব সেই সপ্তদশ শতাব্দীর 'রেকোকো স্টাইল' বা অতি অলঙ্করণের ভারে যেন সহসা ধনী হয়ে ওঠা মারোয়াড়ী রুচির পরিচয় দিচ্ছে। সমস্ত প্রাসাদ ঘুরে দেখতে এক ঘণ্টার উপর সময় লাগলো। প্রাসাদাভ্যন্তরে সমস্ত দর্শনার্থী যাত্রীদের একখানি ছবি তোলা হল। আমাদের কিন্তু শোয়েনব্রান' প্রাসাদের চেয়ে এর অনুপম সুন্দর উদ্যানটি বড় ভাল লাগলো। খোদার উপর খোদকারীর মতোই তরুলতা, ফল-ফুলের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে উদ্যান-পালক তাঁর শিল্পী-মনের কল্পনা অনুসারে এমনভাবে ছেঁটে-কেটে সাজিয়ে রেখেছেন যে, দেখে মুগ্ধ হতে হয়। প্রাসাদের প্রধান প্রবেশপথের বাঁদিকে একটি চমৎকার ফোয়ারা রয়েছে। এটির নাম 'শোয়েনব্রানেন ফাউন্টেন'। মারী বললেন, এই থেকেই প্রাসাদেরও ডাক-নাম হয়ে গিয়েছে 'শোয়েনব্রান' প্রাসাদ। এখানে সর্বত্র মারিয়া থেরেসিয়ারই জয়জয়কার। বাগানের একেবারে পিছনে একটি বিরাট স্তম্ভমণ্ডপ গাঁথা আছে। বাষট্টি ফুট উঁচু এক একটি থাম। এই স্তম্ভমণ্ডপটি ৩২০ ফুট প্রশস্ত। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণের বারান্দা থেকে এটিকে ভারী চমৎকার দেখায়। এখানেও 'নেপচুনসব্রুনেন' অর্থাৎ 'জল-দেবতার উৎস' বলে একটি সুন্দর ফোয়ারা আছে। অনেকক্ষণ বাগানে ঘুরে আইসক্রীম অরেঞ্জ ইত্যাদির সদ্ব্যবহার করে হোটেলে ফিরে এলাম লাঞ্চ খেতে। মারী বলছিল রাজবাড়ির চিড়িয়াখানাটা নবনীতাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি; কিন্তু শ্রান্তিবশত আর যাওয়া হল না। পরদিন ভিয়েনা ছেড়ে আমাদের সালজবার্গ যাবার কথা। কিন্তু যাওয়া হল না। হোটেলের ম্যানেজার খবরের কাগজ খুলে দেখিয়ে বললেন— 'বিরাট রেলওয়ে স্ট্রাইক।' একখানি ট্রেনও আজ ভিয়েনা ছেড়ে যাবে না। কবে যে গাড়ি চলবে, কিছুই স্থিরতা নেই। আমরা একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। তাইত, কে জানে, কতদিন এখানে আটকে পড়ে থাকতে হবে। সারাদিন নিরুদ্দেশে ভিয়েনার রাজপথে ঘুরে বেড়ালাম। রাত্রে ম্যানেজার খবর দিলে, সুসংবাদ। স্ট্রাইক মিটে গেছে। ইউনিয়নের দাবী সরকার মেনে নিয়েছে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম, সত্যই এটা সুখবর!

পরদিন আমরা ভোর ছ'টা চল্লিশ মিনিটের ট্রেন ধরে ভিয়েনা ছেড়ে চলে এলাম 'সালজ-বার্গে'। ভিয়েনা থেকে সাল্‌জবার্গ দুশো সাতচল্লিশ মাইল দূরে। সারাদিন ট্রেনে কাটলো। পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ছটা ষোল মিনিটে সাল্‌জবার্গ স্টেশনে এসে নামলাম। ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ছে। ভীষণ দুর্যোগ। স্টেশনে একখানি ট্যাক্সী নেই, একটি কুলি নেই। নিজেরাই মালপত্র বয়ে এনে একখানি ফেটনে তুললাম। ঐ একখানি ফেটনই স্টেশনে তখন ছিল। সে ঝোপ বুঝে কোপ মারলে। 'সিডিউল' ভাড়ার চেয়ে অনেক বেশি নিলে। না দিয়ে উপায় ছিল না। বললে—'কোথায় যাবে?' কোন হোটেলের দালালদের স্টেশনে দেখতে পাওয়া গেল না। অগত্যা গাড়োয়ানকেই যে কোনও মাঝারী হোটেলে নিয়ে যেতে বললাম। গাড়োয়ান এনে হাজির করলে 'রুপার্টি-হোফ' হোটেলে। স্টেশন থেকে অনেকদূরে বটে, কিন্তু হোটেলটি বেশ পরিচ্ছন্ন। দেখে পছন্দ হল। দোতলার রাস্তার দিকে একখানি ভাল ঘর দিলে। সঙ্গে বাথরুম আছে। মনটা খুশী হল।

সারারাত সে কি ঝড়-বৃষ্টি। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। টেম্পারেচার বোধ করি কুড়ি ডিগ্রীতে নেমে গিয়েছিল। এয়ার-কণ্ডিশান করা হোটেলের ঘর। আমরা ঘর গরম রাখার সুইচ টিপে দোরতাড়া বন্ধ করে লেপের মধ্যে পড়েছিলুম। পরদিন সকালেও বেরুতে পারা গেল না। দুর্যোগ সমানে চলেছে। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া, লোকজন কেউ নেই। বিকেলের দিকে আকাশ একটু পরিষ্কার হতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পূর্ব আল্পসের উত্তর কোলে এই গিরিনগরী। সালজাক্ নদী বয়ে চলেছে এর চরণ স্পর্শ করে। এখানে দেখবার অনেক কিছুই আছে। পার্বত্য দুর্গ, সেণ্টপীটার্স চার্চ, ফ্রান্সিসকান গীর্জা প্রভৃতি অসংখ্য সুন্দর সুন্দর উপাসনা ও প্রার্থনা মন্দির। সুরকার মোজার্টের জন্মস্থান, পুতুলের দেশ, মীরাবেল উদ্যান ইত্যাদি বহু দ্রষ্টব্য আছে। কিন্তু কিছুই দেখা হল না। নদীর ধার পর্যন্ত যেতে না যেতেই চক্ষের নিমেষে আকাশ ঘোর করে এলো ও মুষলধারায় বৃষ্টি নামলো। ভাগ্যে আমরা তখন 'মংকসবার্গ ব্রীজের' কাছে এসে

পড়েছিলাম। সেতুর নিকটস্থ একটি রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়া গেল। সঙ্গে ছাতা, ওয়াটারপ্রুফ সবই ছিল; কিন্তু সে এমন পাহাড়ী জলের ঝাপটা আর এমন হাড়-কাঁপানো কনকনে হাওয়া—শানায় না কিছুতে। বৃষ্টি কমতে একখানি চলন্ত ফেটন ধরে হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন সকালে রোদ উঠলো। ভগবানকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে চট্‌পট ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম 'সাল্‌জবার্গ' দেখতে। ভাগ্যে এখানকার হোটেলটিতে খাবার ব্যবস্থা ছিল। নইলে ঝড়-বৃষ্টিতে বাইরে খেতে যাবার কী অসুবিধাই না হ'ত।

প্রথমেই আমরা গেলাম 'ফেস্‌টুং' দুর্গটি দেখতে। চারশো ফুট উঁচু পাহাড়ের উপর এই দুর্গ। তারে ঝোলা রেলে চড়ে উপরে গেলাম। এ'রা বলেন যে, এ দুর্গটি নাকি অজেয়। খৃষ্টান মোহন্তদের বিরুদ্ধে একবার এখানকার ইতর-ভদ্র সকল অধিবাসীই একজোট হয়ে বিদ্রোহ করেছিল। সেই সময় তদানীন্তন 'আর্ক বিশপ' এই দুর্গের মধ্যে পালিয়ে এসে প্রাণরক্ষা করেছিলেন। এর ভিতরে একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথ আছে, যেখান দিয়ে লুকিয়ে শহরে যাতায়াত করা যায়। এখান থেকে নেমে আমরা গেলাম ফ্রান্সিস্‌কান চার্চ দেখতে। অসামান্য এর স্থাপত্য ও কারুকার্য। ভিতরে অনেক-গুলি ভারি সুন্দর প্রতিমূর্তি আছে। 'আমাদের দেবী', 'শাশ্বত শিশু', সেণ্ট জর্জ, সেণ্ট ফ্লোরিয়ান প্রভৃতি মূর্তিগুলি যেন জীবন্ত বলে মনে হয়। প্রার্থনা-বেদীর সূক্ষ্ম কারুকার্য আশ্চর্য সুন্দর। এখানে যেসব প্রাচীর-চিত্র ও বড় বড় শিল্পীর আঁকা প্রতিকৃতি আছে, তা যথার্থই অপূর্ব! ফ্রান্সিস্‌কান চার্চের দক্ষিণেই প্রসিদ্ধ ফ্রান্সিসকান মঠ। খৃষ্টান সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনীরা এখানে ত্যাগপূত নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। এর মধ্যে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। এখান থেকে বেরিয়ে পথে মধ্যাহ্নভোজ সেরে আমরা গেলাম 'মোজার্ট' ও 'শুবার্টের' জন্মস্থানে তাঁদের স্মৃতি-মন্দির' ও প্রতিমূর্তি দেখে আমরা ফিরে এলাম মিউজিয়মে। মিউজিয়মের ছোট্ট বাগানটির মধ্যে জার্মান কবি ও নাট্যকার শিলারের একটি ব্রোঞ্জের প্রতিমূর্তি দেখে বেশ আনন্দ হল। 'ম্যাক্স-রাইনহার্ট থিয়েটারে' ম্যাটিনী অভিনয় ছিল 'ভন হফ্‌ম্যানস্থালের' নাটক—'জেডার-ম্যান' (প্রত্যেক লোক) যাবামাত্র টিকিট পাওয়া গেল। ভাগ্য ভাল। সাল্‌জবার্গ অস্ট্রিয়ার একটা ছোট শহর, কিন্তু এর নাট্যশালা দেখে মনে হ'ল যেন রাজবাড়ি! কি চমৎকার সব প্রাচীর চিত্র; দেখে মুগ্ধ হতে হয়। আর অভিনয়? তার তুলনা হয় না। দু'ঘণ্টায় অভিনয় শেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যের একটু পরেই আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। ভীষণ ঠান্ডা। রাত্রে আবার বৃষ্টি নামলো। হোটেলের ম্যানেজার বার বার বলতে লাগলেন, বড় ফাইন ওয়েদার যাচ্ছিল। তোমরা বৃষ্টি সঙ্গে করে নিয়ে এলে। এ সময় এখানে কখনো বৃষ্টি হয় না। 'দিস্ ইজ্ ভেরি আন্‌য়ুজুয়াল!' অর্থাৎ অস্বাভাবিক ব্যাপার! পরদিন সকালে স্ত্রী ও কন্যা বেরুলেন না। তাঁরা প্যাকিং নিয়ে রইলেন। আমি কিছু সওদা করে আনতে গেলাম। সেইদিনই দুপুরে মধ্যাহ্নভোজন সেরে হোটেল রুপোর্টের বিল চুকিয়ে বেলা একটা ছ'মিনিটের ট্রেনে আমরা 'ইন্সব্রুক' চলে গেলাম। সালজবার্গ থেকে ইন্সব্রুক মাত্র ৯০ মাইল। কিন্তু এই নব্বুই মাইল পথকে প্রকৃতি এমন করে সাজিয়ে রেখেছেন যে, জানালা থেকে একবার চোখ ফেরাতে পারিনি।

বেলা পাঁচটায় ইন্‌সব্রুকে এসে নামলাম। প্রথম দর্শনেই ইন্‌সব্রুক আমাদের এমন একটা চমক দিলে যে, আমরা বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। ক্ষুদ্র ইন্‌সব্রুকের চারিদিক ঘিরে আছে তুষারাবৃত গগনভেদী পর্বতশৃঙ্গ। বিদায়োন্মুখ সূর্যের অস্তরাগ সেই দিগন্ত পরিবেষ্টিত অসংখ্য তুষার কিরীটের শিরে শিরে যে বর্ণ-বৈচিত্র্যের অপরূপ সৌন্দর্য লীলা প্রতিফলিত করছিল, আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টিপথে তা মেলে ধরেছিল এক স্বর্গীয় দৃশ্য!

ইন্‌সব্রুক স্টেশনে খুব ভীড় দেখা গেল। বোধ করি এটা জার্মানী ও অস্ট্রিয়ার যোগাযোগ পথ বলেই বহু যাত্রী এ পথে যাতায়াত করে। এখানেও আমরা এক কুলির ঠ্যালাগাড়িতে মাল চাপিয়ে নিকটস্থ যে কোনও হোটেলে নিয়ে যেতে বলে দিলাম। প্রথম হোটেলে স্থান পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় হোটেলে স্থান মিললো। এটির নাম 'হোটেল নিউপোস্ট', বিশেষ ভাল বলতে পারলাম না। গ্রাম্য হোটেল যেমন হয়। তবে ঘরখানি বেশ বড় ও দ্বিতলের উপর, জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল যেন কৈলাস ও মানসসরোবরের দৃশ্য! রয়ে গেলাম সেইখানেই। অস্ট্রিয়ায় টাইরোল অঞ্চলের প্রধান জনপদ এই ছবির মতো পার্বত্য নগরটি। ইন্ নদীর তীরে প্রথম যে ছোট্ট বসতিটুকু কোন্ এক বিস্মৃত যুগে স্থাপিত হয়েছিল, সেই গ্রাম ক্রমে বেড়ে উঠে আজ লক্ষ লোকের বাস এক সুন্দর শহর হয়ে উঠেছে। এর সবচেয়ে বড় রাস্তাটির নাম 'মারীয়া থেরেসিয়া স্ট্রীট' (স্ট্রাসে) সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর যত সব পুরাতন সুদৃশ্য বাড়ি। বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিকতা এখনও এর চারিদিকের পাহাড় ডিঙিয়ে ইন্‌সব্রুকে প্রবেশ করতে পারেনি। মারীয়া থেরেসিয়া স্ট্রীটের দক্ষিণ প্রান্তে আছে একটি 'ট্রায়াম্ফোর্ট' বা বিজয়-তোরণ। এখানে একদিনেই আমরা ইন্‌সব্রুক পরিদর্শন শেষ করে তার পরদিন দুপুরের বাস ধরে চলে গেলাম জার্মানীর 'ওবারামারগাও' গ্রামে বিশ্ববিখ্যাত 'প্যাশান প্লে' দেখতে। সেখান থেকে 'মিউনিক' বেড়িয়ে এসে আমরা রওনা হয়ে গেলাম সুইজারল্যাণ্ডের দিকে।

(ক্রমশঃ)

(পূর্বানুবৃত্তি)

(১)

দোতলার ঘরে ঢুকে রমা দেখল মা মেঝেয় বসে বালিশের ওয়ার সেলাই করছেন।

রমা একটুকাল মার ক্ষয়ে যাওয়া নখগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা মা, উপোস-টুপোসের দিন একটু বিশ্রাম করলেও তো পারো' আমাকে বললে ওয়ারটা কি আমি সেলাই করতাম না? করিনে কোন দিন?'

কল্যাণী মেয়ের দিকে তাকালেন, 'আমি কি বলি যে তুই করিসনে? তুই তো সবই করিস। নীচে কে এসেছে রে, অতুল বুঝি? তার গলা শুনলাম যেন।'

রমা একটু হাসল, 'হ্যাঁ অতুলই। বাড়ি থেকে আজও বুঝি রাগারাগি করে এসেছে। এখানে খেল।'

এমন আরো দু'একদিন হয়েছে। বাড়িতে ঝগড়া করে এ বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে অতুল। ছেলের এই বন্ধুটির আবদার উৎপাত কল্যাণীকে প্রায়ই সহ্য করতে হয়। মেয়ের দিকে চেয়ে কল্যাণী বললেন, 'নিজের ভাত বুঝি ধরে দিলি তাকে। আর নিজে রইলি উপোস ক'রে? দেখ কেমন লাগে। ব্রত-পার্বণের উপোস তো কোন দিন করিসনে—'

রমা বলল, 'ওসব ধর্ম-কর্ম আমার সহ্য হয় না মা, তোমার সয় তুমিই কর।'

কল্যাণী চটে উঠলেন, 'দেখ্ কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো না। ধম্ম-কম্ম বাদ দিয়ে ম্লেচ্ছপনার ফল তো এই হোল। সব থাকতেও কিছু ভোগে এল না। সব দেখে-শুনেই তো দিয়েছিলাম। বি এ পাশ। দেখতে রাজপুত্রের মত চেহারা। ভালো চাকরি-বাকরি করত। কিন্তু সে যে এমন হবে তা কে জানত। সব আমার কপাল। নইলে এই বয়সে স্বামী-পুত্র নিয়ে নিজের ঘর-সংসার করবি, তা নয় এখানে পড়ে আছিস। দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলছিস। হ্যাঁরে, চিঠিপত্র লিখে দেখবি নাকি আর একবার।'

রমা বিরক্ত হয়ে বলল, ' না মা। লেখালেখির আর কিছু নেই। তুমি চুপ কর। যা করছিলে তাই কর বসে বসে। বলে নিজের ঘরে চলে এল রমা।'

ছোট একটু ঘর। দেয়াল ঘেঁষে একখানা তক্তাপোশ। তার উপর বিছানাটা গুটানো মাথার কাছে একটি তাক। তার ওপর মোটা মোটা কয়েকখানা বই। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ, চৈতন্য চরিতামৃত। আর একখানা পকেট সংস্করণ গীতা। রমার বাবা কেশব মুখুজ্যেই মেয়েকে বেছে বেছে এসব বই কিনে দিয়েছেন। বলেছেন অবসর পেলেই এগুলি পড়বি। মন ভালো থাকবে, সব দুঃখের সান্ত্বনা পাবি।'

রমা বার দুই করে সব বই-ই শেষ করেছে। কিন্তু সান্ত্বনা কই। এখন আর পড়তে তার ইচ্ছা করে না। তার চেয়ে ঘরের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই তার ভালো লাগে। সংসারের প্রায় সমস্ত ভার তার হাতে ক্রমে ক্রমে ছেড়ে দিয়েছেন বাবা-মা। সংসারে কখন কি লাগবে, কোন্ জিনিস কখন আনতে হবে সব রমার কাছ থেকে শোনেন কেশববাবু। মাইনের টাকা এনে মেয়ের হাতেই তুলে দেন তিনি। স্ত্রীকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন, 'তোমার চেয়ে হিসেব-নিকেশ রমা অনেক ভালো বোঝে। ও সংসারের ভার নেওয়ার পর থেকে আমি নিশ্চিন্ত আছি।'

কেবল বাবাই নয় এমন যে উড়নচণ্ডী গোবিন্দ সেও হাতখরচ বাদ দিয়ে মাইনের বেশির ভাগ টাকা তার কাছে জমা রাখে। এতদিন বেকার ছিল গোবিন্দ। মাসকেয়ক হোল পোর্টকমিশনে চাকরি পেয়েছে। সংসারের অবস্থাটা স্বচ্ছল না হোক, আগের চেয়ে বেশ একটু ভালো হয়েছে। খরচের টাকা সব রমার হাতে। বাপ-ভাইয়ের সংসারে সেই এখন সর্বময়ী কর্ত্রী। তবু কেমন যেন এক এক সময় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বিশেষ করে, অসহ্য লাগে বাপ-মার দীর্ঘশ্বাস আর মাঝে মাঝে সেই পুরোন ঘটনার উল্লেখ। সেসব কথা কেন ও'রা তোলেন। তুলে আর লাভ কি।

দু' একদিনের কথা নয় আট বছর আগে শ্যামবাজারের চাটুজ্যে বাড়িতে রমার বিয়ে হয়েছিল। হীরেন সবে বি এ পাশ ক'রে এম এতে ভর্তি হয়েছে; তার ঠাকুরমা জোর ক'রে বিয়ে দিয়েছিলেন। বললেন, 'কবে আছি, কবে নেই। তোর বউয়ের মুখ আমি দেখে যাব।'

দেখে শুনে রমাকেই পছন্দ হোল হীরেনের কাকার। তেমন সুন্দরী নয়, কিন্তু লক্ষ্মীশ্রী আছে চেহারায়। তেমন লেখাপড়া জানা পাশটাশ করা নয়, স্কুলের সেকেন্ড ক্লাস অবধি পড়েছে, কিন্তু কথায় বার্তায় বেশ বুদ্ধিমতী বলে মনে হয়। ঘর-সংসারের সব কাজকর্ম জানে। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের পক্ষে এইরকম মেয়েই ভালো। দেখে হীরেনেরও তখন অপছন্দ হয়নি। বিয়ের পরে বছর দুই দাম্পত্য-জীবন বেশ ভালোই কেটেছিল রমার। তার পরেই কপাল পুড়ল। তখন হীরেন সবে পাশ করে বেরিয়ে একটি মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি নিয়েছে। মাইনেটা মনের মত নয়, তাই নিয়ে খুঁতখুঁতি আছে। রমা তাকে আশা ভরসা দেওয়ার ত্রুটি করছে না।

এই সময় এক কাণ্ড ঘটল। নতুন জায়গা থেকে নতুন আশ্বাস পেল হীরেন। পাড়ার ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে থিয়েটারের আয়োজন চলছে। ছেলেরা ধরে পড়ল 'হীরুদা, আপনাকে হিরোর পার্ট নিতে হবে।'

চেহারায় চলন-বলনে হীরেনকে নায়কের ভূমিকায় সবচেয়ে বেশি মানায়। কলেজের সোস্যালে অভিনয় করার অভ্যাসও যে এক-আধটু না ছিল তা নয়।

কিন্তু হীরেন ইতস্তত করতে লাগল, 'দূর, এই বয়সে কি রঙ কালি মেখে থিয়েটার করা সাজে।'

রমা বলল, 'একেবারে ঠাকুরদার বয়সী হয়ে গেছ না? ওরা যখন এত ক'রে বলছে প্লেতে তোমাকে নামতেই হবে। তোমার অভিনয় তো কোনদিন দেখিনি। এবার একটু দেখাও।'

দু' একটা মহড়া হীরেনদের বাড়িতেই হোল। রমার উৎসাহের অন্ত নেই। অন্দর থেকে চা পান জোগায়। কথা হোল রমার দু' একখানা ভালো শাড়িও দিতে হবে শম্ভুকে। শম্ভু নাটকের নায়িকা। রমা তাতেও রাজী। হীরেন বলল, 'হ্যাঁ, তাই দাও, তবু যদি ওকে দেখে খানিকটা তোমার আদল মনে আনতে পারি। ওই দাড়ি গোঁফ চাঁছা মুখের দিকে তাকিয়ে কি গলা দিয়ে প্রেমালাপ বেরোয়?' রমা বলল, 'কি সর্বনাশ। প্রেমালাপ করবার জন্যে তুমি কি সত্যি সত্যি একজন মেয়ে চাও নাকি?'

প্রথমে অবশ্য সত্যিকারের মেয়ের দরকার হোল না। মেয়ের বেশী শম্ভুর দিকে চেয়ে চেয়েই হীরেন দৃশ্যের পর দৃশ্যে এমন চমৎকার প্রণয় নিবেদন করল যে, রমার মনে হোল তেমন ভালোবাসার আকুলতা হীরেন তার কাছেও কোন জায়গায় দেখায়নি। শ্রোতারা বহুবার হাত-তালি দিল। প্রবীণ সিনেমা ডিরেক্টর শচী-রঞ্জন চক্রবর্তীও তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি শুধু হাততালিই দিলেন না হীরেনের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে একটি সোনার মেডেল ঘোষণা করলেন আর হীরেনকে বললেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

দেখা করে এসে সুখবরটা স্ত্রীর কাছেই সবচেয়ে আগে বলল হীরেন। তার অভিনয় শচীরঞ্জনের খুবই পছন্দ হয়েছে। তিনি তাকে তাঁর নতুন ছবিতে উপনায়কের ভূমিকায় মনোনীত করেছেন।

রমা খুশি হয়ে বলল, 'সত্যি!'

মাস কয়েকের মধ্যেই ছবি রিলিজও হোল। বক্সে স্বামীর পাশে বসে তার অভিনয়ের চিত্ররূপ উপভোগ করল রমা। এবার আর শম্ভু-বেশী হিরোইন নয়, সত্যিকারের সুন্দরী তরুণী নায়িকা পেয়েছে হীরেন। হয়তো সেইজন্যেই তার অভিনয়-দক্ষতা আরো বেশি দেখাতে পেরেছে। সে ছবিতে নায়কের চেয়েও উপনায়কের নাম হোল বেশি। আর পরের ছবিতে নায়কের ভূমিকায় উত্তীর্ণ হোল হীরেন। শমিতাই রয়ে গেল নায়িকা। শুধু পর্দায় নয়, জীবনেও। স্টুডিওর কাজ ছাড়া অন্য সময়েও হীরেন তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে লাগল, তার বাড়িতে যাতায়াত চলল ঘন ঘন। কোন কোন রাত্রে এমনও হোল যে হীরেন আর বাড়ি ফিরল না। রমা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাল কোথায় ছিলে?' হীরেন বলল, 'স্টুডিওতে, স্যুটিং ছিল।'

রমা প্রতিবাদ করে বলল, 'মিথ্যে কথা। কাল কোন সুটিং ছিল না তোমার। আমি খবর নিয়েছি।'

হীরেন অম্লান মুখে বলল, 'তা হ'লে আর মিছামিছি জিজ্ঞেস করছ কেন।'

রমা বলল, 'তোমার কপাল যে এমন করে পুড়বে তা কোনদিন ভাবিনি। তুমি সিনেমা ছেড়ে দাও।'

হীরেন বলল, 'অসম্ভব। একমাত্র অভি-নয়ের মধ্যেই যা কিছু দেওয়ার আমি দিতে পারব। এতদিনে নিজের পথ আমি খুঁজে পেয়েছি।'

কিন্তু সে পথের সঙ্গী রমা নয়, শমিতা। হীরেন অফিসের চাকরি আগেই ছেড়ে দিয়েছিল, এবার বাড়ি আসাও প্রায় ছাড়ল। মাসে দু' একদিন যখন তার দেখা পাওয়া যায় তাকে সুস্থ অবস্থায় পাওয়া যায় না, রমা বলল, 'তুমি মদও ধরেছ?'

হীরেন বলল, 'একে ঠিক ধরা বলে না, বলে ছোঁয়া। স্টুডিওতে কাজ করতে হলে এসব একটু-আধটু ছুঁয়ে দেখতে হয়।'

দিদিশাশুড়ী এসব দেখবার জন্যে বেঁচে ছিলেন না। শাশুড়ী, খুড়শ্বশুর রমাকেই গঞ্জনা দিতে লাগলেন। পুরুষের মন তেমন করে বেঁধে রাখবার ক্ষমতা রমার নেই বলেই হীরেনের মন অন্য দিকে গেছে। নইলে সে তো এর আগে এমন ছিল না।

রমা চুপ করে এই খোঁটা সহ্য করল। তারপর হীরেন যখন বাড়ি আসা একেবারে ছেড়েই দিল, খবর পাওয়া গেল শমিতাকে নিয়ে সে ভিন্ন সংসার পেতেছে তখন আর তার সহ্য হোল না, বাবাকে খবর দিয়ে আনিয়ে বলল, 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও বাবা। আমি আর টিঁকতে পারছিনে।'

কেশববাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'চল, তুই আমার কাছেই থাকবি।'

রমার শাশুড়ী বাধা দিয়েছিলেন, 'এই কি ভালো হোল বেয়াই। তবু এখানে থাকলে আমরা চেষ্টাচরিত্র করে দেখতে পারতাম।'

কেশববাবু বললেন, 'চেষ্টা আপনারা তো যথেষ্টই করেছেন। আর কিছু করবার নেই।'

রমাও বলল, 'তুমি আমাকে নিয়ে যাও বাবা। নামমাত্র শ্বশুর বাড়িতে আমি আর থাকতে চাইনে।'

কেশববাবু বললেন, 'তাই চল। আমার যদি দু'মুঠো জোটে, তোরও জুটবে।'

বাড়িতে এনে সংসারের ভার কেশববাবু বড় মেয়ের ওপর ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'আজ থেকে মনে করব আমি তোর বিয়ে দেইনি। মনে করব, আমার জামাই মরে গেছে। ওই দুশ্চরিত্র লোকটার হাতে আমি আর তোকে ছেড়ে দেব না। সে যদি পায়ে ধ'রে এসে সাধে তবুও না।'

কিন্তু সাধাসাধির কোন লক্ষণ হীরেন-দের পক্ষ থেকে দেখা গেল না। কুশলী অভিনেতা হিসাবে তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি ক্রমে বাড়তেই লাগল।

রমার মা কল্যাণী আক্ষেপ করে বললেন, 'সংসারে ধর্মাধর্ম কিছু নেই, নাহলে এমন পাপীর নামও লোকের মুখে মুখে ঘোরে। তারও এত শ্রীবৃদ্ধি হয়।'

রমা একটু হাসল, 'অনর্থক পরকে হিংসে ক'রে লাভ কি মা। শুধু কি শাপ দিয়ে তুমি কারো উন্নতি আটকাতে পারবে।'

শাশুড়ীর অসুখের সময় আরও একবার শ্বশুর বাড়িতে গিয়েছিল রমা। কল্যাণীই জোর ক'রে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু রমা বেশি দিন সেখানে থাকেনি। যেখানে আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই সেখানে কে ক'দিন টিঁকতে পারে।

ফিরে এসে বাপের সংসারের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছে রমা। ছোট বোন ইলাকে বিয়ে দিয়েছে। আরো যারা ছোট ছোট বেণু, মনু, রুচি, রীতি তাদের সেবা, যত্ন, পড়া-শুনোর ভার নিয়েছে। বাকি জীবন এইভাবে এদের নিয়েই কাটিয়ে দেবে রমা। আগে বড় অসহ্য লাগত। এখন ক্রমে ক্রমে সবই সয়ে যাচ্ছে। বিবাহিত জীবনের কথা, স্বামী সংসারের কথা এখন আর রমার মনেও পড়ে না। মনে করতেও সে চায় না। কিন্তু মনে করিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব নেই। নিজের মা-বাবা আছেন, পাড়াপড়শীরা আছে। তারা মাঝে

মাঝে আফসোস করে, 'আহা এমন মেয়ের এমন পোড়া ভাগ্য।'

সামনে থাকলে রমা প্রতিবাদ করে, 'ভাগ্য আমার খারাপ দেখলেন কোথায় মাসীমা। আমি তো বেশ আছি।' প্রতিবেশিনী মাসীমা আর কোন জবাব দেন না।

আশ্চর্য, এটা শুধু মুখের কথা নয় রমার। তার চাল-চলন আচার আচরণেও কোন রকম দুঃখ ক্ষোভ নৈরাশ্যের অভিব্যক্তি চোখে পড়ে না। সে সংসারের কাজকর্ম করে। পাড়াপড়শীর আনন্দে, আহ্লাদে বিয়ে চূড়োয় যোগ দেয়, অসুখ বিসুখে সময় পেলে সেবা-শুশ্রূষা করে।

পড়শীরা বলে, 'ধন্যি মেয়ে বাবা। আর কেউ হলে দুঃখে মরে যেত, ঘর থেকে বেরুত না।'

এসব মন্তব্য কানে গেলে রমা স্পষ্ট জবাব দেয়, 'কেন, না বেরোবার কি হয়েছে। আমার লজ্জা কিসের যে আমি ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে থাকব। স্বামী তো আমাকে ত্যাগ করেনি, আমিই দুশ্চরিত্র স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছি। আমি কেন লজ্জা করতে যাব।'

কথাটা ঠিক। তবু এত তেজ, এত স্পর্ধা সকলের কানে ভালো শোনায় না। এমন কি কল্যাণীর কানে মাঝে মাঝে বড় খারাপ লাগে। নিজের দুর্ভাগ্যে মেয়েটা যদি মুখ বুজে মৃতপ্রায় হয়ে থাকত, ওকে দিনের মধ্যে কয়েকবার করে সান্ত্বনা দিয়ে ওকে সবল ক'রে তুলতে হোত এ অবস্থায় তাই যেন স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রমা একেবারে উল্টো। বড় শক্ত ওর দেহের গড়ন, নিষ্ঠুর ওর প্রাণ। মেয়ে হয়েও ও যেন মেয়ে নয়, কিংবা আজকালকার মেয়েরা এইরকমই হয়। কল্যাণী মাঝে মাঝে ভাবেন ওর এই অতিরিক্ত তেজ আর সাহস, চড়া মেজাজ আর কড়া কথাই কি হীরেনকে বিমুখ করেছে। কিন্তু তাইবা বলেন কি করে। গোড়ায় এমন রুক্ষ, রূঠা প্রকৃতির মেয়ে তো ছিল না রমা। না কি ঘা খেয়ে খেয়েই ও এমন পাষাণ শক্ত হয়ে গেছে।

বিচিত্র নয়! নিজের ভাগ্যের সঙ্গে মোটামুটি একটা রফা করতে গিয়ে রমার মধ্যে এতটা কাঠিন্য এসেছে। কিংবা যতখানি কঠিন সে নয়, তার চেয়ে বেশি কাঠিন্যের ভাব দেখাতে তার ভালো লাগে। ছোট ভাইবোনগুলিকে সে স্নেহ যেমন
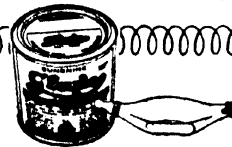
করে দুষ্টামি করলে শাসনও কম করে না। শুধু মুখে নয়, মাঝে মাঝে কড়া রকমের চড়-চাপড়ও দেয়। তবু ভাইবোনগুলি ওর কাছ ছাড়া নড়তে চায় না। গোবিন্দ পর্যন্ত ওকে ভয় করে। আড়ালে আবডালে যাই করুক, সামনে একেবারে পোষা বেড়ালের মত থাকে। গোবিন্দের অন্যান্য বন্ধুরাও তাই। কেবল অতুলের ধরণ ধারণ একটু আলাদা। গোবিন্দের এই গোঁয়ার বন্ধুটিকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারেনি রমা। ওর ভয় ডর নেই। বয়স বাড়ার সংগে সংগে সাহস আর দুষ্টামি বুদ্ধিও বেড়েছে। এক আধটু ঠাট্টা তামাসাও রমার সংগে ও করতে চায়। যখন তখন এসে খাওয়ার আবদার করে, মাঝে মাঝে দু' এক টাকা ধারও নিয়ে যায়। ওর ওপর এক ধরণের সস্নেহ প্রশ্রয়ের ভাব আছে রমার।

'তোমার ভাগের ভাত কেড়ে খেলাম বলে রাগ ক'রে আর নীচেই গেলে না বুঝি। কি করছ বসে বসে। পান খাচ্ছ নাকি। আমাকে দাও একটা।' মেঝেয় বসে সত্যিই পান সাজছিল রমা, অতুলের গলার শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'ঘুম হয়ে গেল?'

অতুল বলল, 'দুরে দিনে আমার কোনদিন ঘুম হয় না। চুপচাপ কতক্ষণ আর পড়ে থাকা যায়।'

রমা বলল, 'তাই বুঝি জ্বালাতে এলে?'

অতুল বলল, 'উঁহু, জ্বালাবার মত সময়ও নেই আমার। পানটা পেলেই চলে যাব।'

রমা বলল, 'পুরুষ ছেলের পান খেতে নেই। আচ্ছা, অতুল তুমি কি এমনি করেই বখাটে ছেলের মত বেড়াবে? চাকরি বাকরি করবে না?'

অতুল বলল, 'চাকরি আমাকে কে দেবে যে করব। তুমি কিছু টাকা আমাকে ধার দাওনা, ব্যবসা করি।'

রমা একটু হাসল, 'হুঁ টাকার গাছ গজিয়েছে কি না, আমার কাছে। তাছাড়া ধার দেওয়ার আর লোক পেলাম না।'

অতুল বলল, 'দাওনা। আমি কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেব। ফাঁকি দেব না।'

রমা বলল, 'আচ্ছা দেখি, বিবেচনা করে। কিন্তু তার আগে তুমি আমার একটা কাজ করোতো।'

অতুল বলল, 'কি কাজ?'

রমা বলল, 'রেশনটা এনে দাও। গোবিন্দ কখন ফেরে তার ঠিক নেই। পোস্ট অফিস থেকে বাবার ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে। তাছাড়া তাঁকে দিয়ে তো এসব কাজ হয় না। স্কুল থেকে মনু বেণু অবশ্য আসবে। কিন্তু ওদের খেলার সময়টা কাজ দিয়ে আটকে রাখতে ইচ্ছে করে না। তুমি যদি এনে দিতে—'

রমার গলায় একটু অনুনয়ের সুর ফুটে উঠল।

অতুল বলল, 'আমি আনব?'

'কেন তাতে তোমার মান যাবে নাকি?

'না মান যাওয়া-টাওয়া কিছু নয়, কিন্তু জানো, আজ সকালে এই রেশন আনা নিয়েই বাড়িতে সকলের সংগে ঝগড়া ক'রে বেরিয়েছি।'

রমা বলল, 'ওমা তাই নাকি। ব্যাপারটা কি বলতো।'

অতুল সবিস্তারে সকালের ঘটনাটা বলতে লাগল। রমা সব শুনে বলল, 'তাহলে তো তোমাকে দিয়েই রেশনটা আনাতে হবে আমার। যেমন বেয়াদব অবাধ্য ছেলে, তেমনি তার শাস্তি হবে।'

অতুল বলল, 'আমাকে শাস্তি দিতে তোমার বুঝি খুব ভালো লাগে?'

'লাগেই তো।'

বলে উঠে গিয়ে রমা সত্যিই পাশের ঘর থেকে কার্ড আর ব্যাগগুলি নিয়ে এসে অতুলের সামনে ধরল।

অতুল রমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কি দেখল তারপর বাধ্য ছেলের মত তার হাত থেকে ব্যাগ আর কার্ডগুলি গুছিয়ে নিয়ে তরতর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

রমা মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু অতুল। পারো তো পথে আবার কোন আড্ডায়-টাড্ডায় ভিড়ে যেয়ো।'

অতুল হাসিমুখে জবাব দিল, 'তাতো ভিড়বই, সেকথা কি তোমাকে বলে দিতে হবে।'

পকেট থেকে একটা বিড়ি বার ক'রে ধরিয়ে নিল অতুল, তারপর ব্যাগগুলি হাতে নিয়ে চলল রেশনের দোকানে। কাজ করতে তার কোন আলস্য নেই, অনিচ্ছা নেই, একটু মুখের মিষ্টি পেলে সে সব করতে পারে। কিন্তু নিজের বাড়িতে কারো কাছ থেকে একটা মিষ্টি কথার প্রত্যাশা যেন নেই অতুলের। রমাদিও তাকে হুকুম দেয়, তাকে দিয়ে নানা রকম কাজ করিয়ে নেয়। কিন্তু যা বলে হাসিমুখে বলে, মিষ্টি বলে। সবাই বলে রমার রস কস নেই। কিন্তু অতুল মনে মনে জানে সেকথা সত্য নয়। এমন অনেক কাজ আছে যা অতুলকে দিয়ে রমার না করালেও চলে। তবু তার জন্যে বেছে বেছে সে অতুলকেই অনুরোধ-উপরোধ করবে। অতুল বুঝতে পেরেছে তাকে অনুরোধ করতে রমার ভালো লাগে। রমা তাকে আর কিছু দিতে পারে না, তাই কাজ দেয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৮০

সাহিত্যের প্রতি সুতীব্র অনুরাগ এবং রুচির ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ একতা এই উভয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিচিত্রা পরিচালনা বিষয়ে একটি কর্মিসঙ্ঘ, অর্থাৎ ওয়ার্কিং ইউনিট গড়ে উঠেছিল, সে কথা পূর্বে বলেছি। এর জন্য বিশেষ কোনো বিচার-পদ্ধতি অথবা নির্বাচননীতি অনুসরণ করবার প্রয়োজন হয়নি। সরস আশ্রয়ের অভ্যন্তরে একটিমাত্র দানাকে অবলম্বন করে অপরাপর দানা যেমন সহজ আগ্রহে আপনা-আপনি বেঁধে ওঠে, ঠিক সেই প্রক্রিয়া অনুযায়ী আমাদের ইউনিটও স্বতঃসৃষ্ট হয়েছিল।

এই ইউনিটের আমরা সদস্য ছিলাম চারজন,—কান্তিচন্দ্র ঘোষ, অমল হোম, যতিনাথ ঘোষ ও আমি। কিন্তু এই চারজনের মধ্যে একমাত্র আমি ভিন্ন বাকি তিনজনের সাহিত্যের নেশা থাকলেও অর্থোপার্জনের জন্য এক-একটা স্বতন্ত্র পেশাও থাকায়, ছুটির দিন ও অবসরকাল ব্যতীত তাঁদের নিকট হতে সাহায্য পাবার উপায় ছিল না। অথচ কাজের পরিমাণ এত বেশি যে, একজন পূর্ণকালিক কর্মীর সহায়তা ভিন্ন সহজে সব কাজ সামলে ওঠা সম্ভব নয়। একজন উপযুক্ত ও মনের মতো কর্মীর জন্য মনে মনে চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করতে লাগলাম।

মনে পড়ল সবুজপত্র গোষ্ঠীর খ্যাতনামা লেখক বন্ধুবর সতীশচন্দ্র ঘটকের কথা। তখন তিনি এম-এ ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করছেন। কিন্তু গোলদীঘি সম্মুখবর্তিনী সরস্বতীর দরবারে যতটা সুবিধা করতে পেরেছিলেন, ভাগীরথী পার্শ্ববর্তিনী লক্ষ্মীর দরবারে তার কিছুই করে উঠতে পারছেন না। ভাবলাম, শাল-দোশালা পোলাও-কালিয়ার মরীচিকা-প্রান্তর থেকে বন্ধুকে ফিরিয়ে আনা যাক্ সহজ অশন-বসনের বাস্তব ভূমিতে। সেখানে বাক্স হয়ত ভরবে না, কিন্তু চিত্তও খালি পড়ে থাকবে না। পাকড়াও করবার অভিপ্রায়ে একদিন চুপে-চুপে উপস্থিত হলাম ভবানীপুরে সতীশচন্দ্রের বলরাম বসু ঘাট রোডের গৃহে।

বলরাম বসু ঘাট রোড আমার মনে সুমধুর স্মৃতির স্বপ্ন বিস্তার করে আছে। বাল্যের ও যৌবনের অনেকগুলি দিনের অনেক মধুময় স্মৃতি এই পথের তিনটি গৃহের সহিত জড়িত।

তিনটি গৃহের মধ্যে আমার প্রথম পরিচিত গৃহ বন্ধুবর নলিনীমোহন শাস্ত্রীর গৃহ। রাজপথ হতে নিরাপদ নিরালায় অবস্থিত এই গৃহটি মহানগরীর ধ্যান-ধারণা হতে একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত। রাজপথ থেকে প্রথমে এক সঙ্কীর্ণ পথে খানিকটা অগ্রসর হতে হয়। তারপর এক-স্থানে সেই সঙ্কীর্ণ পথ অকস্মাৎ এক-তৃতীয়াংশ হয়ে এমন আকার ধারণ করে দুই পার্শ্ববর্তী দুই কক্ষের সু-উচ্চ দেওয়ালের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে যে, দু-পাশের দেওয়াল দুটি যদি কক্ষের দেওয়াল না হয়ে পর্বতগাত্র হত, তা হলে ভৌগোলিক ভাষা অনুসারে পথটির নাম করতে হত গিরিসঙ্কট। তবে গিরিসঙ্কটের ঊর্ধ্বদেশ অনাবৃত; এ পথের কিন্তু আবরিত, মাথার উপরে অবস্থিত দ্বিতলের কক্ষের দ্বারা। ফলে দিনমানে পথের ভিতর গোধূলির আবছায়া; রাত্রে বর্ষা-অমানিশার তমসা। আলোকের সাহায্য ব্যতিরেকে শুধু এই ভরসায় এগিয়ে চলা যায় যে, শেষ পর্যন্ত মুক্তস্থানে না গিয়ে পড়ে উপায় নেই। দাঙ্গার সময়ে বাড়িটি যৎপরোনাস্তি নিরাপদ। একটু গা-ঢাকা দিয়ে একটা রাইফেল হাতে সুড়ঙ্গের ভিতরপ্রান্তে বসতে পারলে, শুধু দাঙ্গাকারী দলকেই নয়, দাঙ্গাদমন-কারী পুলিশের ফৌজকেও বেশ কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা যায়।

নলিনী আমার বাল্যবন্ধু, সাউথ সুবার্বন স্কুলের এবং কলেজের সে সহপাঠী। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি-ছেড়ে-পালানো স্তব্ধ-ঝাঁঝাঁ মধ্যাহ্নে, পূজার ছুটিতে শিশিরভেজা শিউলিফোটা প্রভাতে, কতদিন কত সময়ে নলিনীর গৃহে নিবিড় বিশ্রম্ভালাপে কাটিয়েছি। নলিনী ছিল কবি, আমি ছিলাম তার ধৈর্যশীল শ্রোতা। ধৈর্যশীল শ্রোতা অথবা পাঠক অবশ্য চিরদিনই কবিতার সর্বোচ্চ মূল্য; কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি তখনকার দিনে তাই বোধ করি ছিল তার একমাত্র মূল্য। কবিতার অর্থ যত অপরূপ, যত ঐশ্বর্যশালীই হোক না কেন, সে অর্থের সহিত বাজার-চলতি অর্থের তেমন কোনো যোগাযোগ দেখা যেত না। সাধারণ ক্রেতা দোকানে এসে বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে দৈবাৎ কাব্যগ্রন্থ হাতে পেলে অনাবশ্যক মাল বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করত। যে বই পাঠ না করলে সময়ের সাশ্রয় হয়, অর্থ দিয়ে সে বই কেনার কোনো অর্থই হয় না। কবিতার প্রতি এই অনাদর প্রাচীনকালেও বোধ করি দেখা যেত। তাই সে সময়ের জনৈক কবি সম্ভবতঃ নিজেকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন,

কবিতে, কোরো না দুঃখ
দুর্জনের নিন্দা শুনে,
সুন্দরীর মন্দ গতি
সন্তোষে কি অন্ধজনে?

আমরা যখন স্কুল-কলেজে পড়তাম, তখন বাঙলাদেশে এইরকম দুর্জনের ভিড়ের অভাব ছিল না।

অন্যে পরে কা কথা, রবীন্দ্র-কাব্যকেও মাঝে মাঝে এ কথার সপক্ষে সাক্ষ্য দিতে দেখা যেত। কখনো-সখনো সংবাদ পেতাম শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী' নামক পুস্তকালয়ে সিকি মূল্যে রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থ বিক্রীত হচ্ছে। উপস্থিত হয়ে দেখতাম, (অন্তত একবার দেখেছিলাম, সে কথা স্পষ্ট মনে আছে) দোকানের ভিতরে প্রবেশ করবার প্রয়োজন নেই, ফুটপাথের ধারেই টাল করা রয়েছে মানসী, সোনার তরী, কড়ি ও কোমল। দ্বারপার্শ্বে চেয়ারের উপর পাখা হাতে বসে আছেন পিরান-গায়ে স্থূলদেহ বৃদ্ধ চাটুজ্জে মশায়।

বই দেখে মনের একটা দিক হোত আনন্দিত, একটা দিক বিষণ্ণ। নিজের ক্রয়-সামর্থ্যের মধ্যে বইগুলিকে পাওয়া গেছে বলে আনন্দিত হতাম; বিষণ্ণ হতাম দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসম্পদের অনাদর দেখে। সিকি

মূল্যেই বা কিরূপ বিক্রয় হচ্ছে জানবার জন্য বই বাছতে বাছতে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে থাকতাম। দেখতাম, তা-ও এমন কিছুই নয়। একটা লোক যদি কেনে তো দশটা লোক বই তুলে তুলে রেখে দেয়। তখনকার দিনে চার আনায় এক সের পাকা রুই মাছ পাওয়া যেত। সংসার-রুচির দরবারে চার আনার রুই মাছের নিকট চার আনার 'মানসী' পরাজিত হোত। মুখের জিহ্বার লোভ দেখে মনের জিহ্বা শুকিয়ে উঠত।

চাটুজ্জে মশায়ের নিকট অনুযোগ করলাম।

ঝানু লোক চাটুজ্জে মশায়, লজ্জা দিতে ছাড়লেন না। বললেন, "বাবা, পোকায় কাটবার আগে তোমরা যদি দয়া করে পুরো দাম দিয়ে কিনতে আসতে, তাহলে এ লজ্জা পেতে হোত না।"

যত কঠোরই হোক, এত বড় সত্য কথার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারলাম না; অপ্রতিভ স্মিতমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অবস্থা দেখে, বোধ করি দয়াপরবশ হয়েই গুরুদাসবাবু বললেন, "টাট্‌কা বই-ই কেউ সহজে কিনতে চায় না, পুরো দাম দিয়ে এ পোকায়-কাটা বই কে কিনবে বলো? এ কখানা বই বিক্রী হয়ে যাক্, তারপর আবার নতুন সংস্করণ বার হবে।"

তবু ভাল!

বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি সজ্জা পরিবর্তন করে জল খেয়ে 'মানসী' খুলে নিশ্চিন্ত মনে পড়তে বসি,—

> **কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,**
> **এসেছি ভুলে।**
> **তবু একবার চাও মুখ পানে**
> **নয়ন তুলে।**

সরস কাব্যরসের অমৃতস্পর্শ লাভ করে মনের গ্লানি অপসৃত হয়ে যায়।

আজ কিন্তু চাকা বেশ খানিকটা ঘুরেছে। পরিপূর্ণ না হলেও, আজ কাব্য তার প্রাপ্য মহিমার অনেকখানি অংশ অর্জন করেছে। উচ্চমূল্যের রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থ এখন দুই হাজার আড়াই হাজার খন্ডর সংস্করণে মুদ্রিত হয়ে দেখতে দেখতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। নূতন পুস্তকের মূল্যে হ্রাসের তো কথাই নেই এখন; পুরাতন পুস্তকের দোকানেও রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থ বড় আর দেখতে পাওয়া যায় না। কদাচিৎ এক-আধখানা দেখতে পাওয়া গেলেও, তার অবনমিত মূল্যের উচ্চতার দাবী দেখে সিকি-মূল্যে-দিনের দুঃখ কতকটা বিস্মৃত হওয়া যায়।

বলরাম বসু ঘাট রোডের দ্বিতীয় গৃহ হচ্ছে তদানীন্তন সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র 'হিতবাদীর' সুযোগ্য সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়ের গৃহ। এই গৃহের সহিত আমার দুই বিভিন্ন সময়ে দু'রকমের যোগ ছিল। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র পুত্র মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাস ও দাবার সান্ধ্য বৈঠকে প্রায়ই গিয়ে বসতাম। রবিবারে ও ছুটির দিনে সে বৈঠক অপরাহ্নকালে আরম্ভ হয়ে রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলত। আমি ছিলাম সে বৈঠকে তাস খেলার দর্শক ও দাবা খেলার সরিক। সুবিস্তৃত ফরাসের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে বসত তাসের আসর। তাদের খেলোয়াড়ও চারজন, দর্শক সংখ্যাও বেশি। অদূরে ফরাসের এক নিভৃত কোণে বসত আমাদের দাবার শীর্ণ বৈঠক। তাসের আসরে চলত কাগজের সাহেব-বিবি-গোলামের দুরন্ত যুদ্ধ; আমাদের দাবার বৈঠকে চলত কাঠের রাজা-মন্ত্রী-গজের নিঃশব্দ সংগ্রাম। সাফল্য-নৈষ্ফল্যের উদ্দীপনায় জয়-পরাজয়ের উত্তেজনায় তাসের আসরে উঠত উদ্দাম কোলাহল, দাবার বৈঠকে সামান্য ভ্রূকুঞ্চন। উভয় রণক্ষেত্রের তন্ত্রই আলাদা।

কাব্যবিশারদ মহাশয়ের জীবদ্দশায় তাঁর গৃহে আমার প্রবেশ ছিল একজন গায়করূপে। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সারা বাঙলাদেশ জীবনপণ করে বসেছে। সে পণের মন্ত্র তখন 'করব অথবা মরব' ভাষা গ্রহণ করেনি; তার ভাষা তখন আরও কঠোর আরও নির্মম,—'মারব অথবা মরব'। গীতার নিষ্কাম ধর্মকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করে বাঙলার যুবক জীবন-মরণকে একই দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছে; —তা সে-জীবন নিজেরই হোক, অথবা পরের। শিকল ভাঙার ঝন্‌ঝনানি শোনবার জন্য সে তখন উৎকর্ণ। বাধা-বিঘ্ন চূর্ণ করবার জন্য তার দুই হস্ত উদ্যত। আনন্দমঠ থেকে সে শুধু 'বন্দে মাতরম্' বীজমন্ত্র গ্রহণ করেই নিরস্ত হয়নি, সন্তান-ধর্মের সমগ্রতা দিয়ে সে তার হৃদয়কে পরিপূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করেছে।

অগ্নিযুগের এই দীপ্ত মুহূর্তে যে-বস্তু সর্বাধিক দ্রুত এবং দুর্বারগতিতে বাঙলার জনমনকে স্বদেশ-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করত, তা বোধ করি স্বদেশী গান। রবীন্দ্রনাথ নিত্য-নূতন গান রচিত করে বাঙালীকে দেশপ্রেমে দীক্ষিত করতে লাগলেন। অপরাপর কবিদের লেখনীও এ বিষয়ে অলস রইল না। দেখতে দেখতে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ স্বদেশী গানের যুগ হয়ে দাঁড়াল। বাঙলাদেশের আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল স্বদেশপ্রেমের অপরূপ গানে।

এইরূপ গানের দ্বারা স্বদেশপ্রেম বিকীর্ণ করবার দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রচার-কেন্দ্র ছিল কাব্যবিশারদ মহাশয়ের গৃহ। সম্ভবত বেতন দিয়ে কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁর গৃহে দুটি সুগায়ককে নিযুক্ত রেখেছিলেন। সভা-সমিতিতে তাঁদের গান করতে হোত; তা ছাড়া, নগর-সংগীতেও তাঁরা করতেন। নগর-সংগীতের সময়ে তাঁরা হতেন মূল গায়ন, আমরা বিশ-পঁচিশ জন মিলে পিছন থেকে সমস্বরে দোহারকি করতাম। অতগুলি মিলিত কন্ঠের সুর-সমষ্টি কলিকাতার রাজপথের আকাশ-বাতাসকে একটা গভীর উদ্দীপনায় কাঁপাতে থাকত। তার ছোঁয়াচ পেয়ে পথপার্শ্বের দুর্বলতম হৃদয়ও দেশোদ্ধারের দুষ্কর আহবে ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রেরণা বোধ করত।

গান আমরা কয়েকটিই গাইতাম, তার মধ্যে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের রচিত একটি গান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বলে সর্বদাই গাইতে হত। গানটির মুখপাত এইরূপ,—

> **আমার যায় যেন জীবন চলে,**
> **জগৎ মাঝে তোমার কাজে**
> **বন্দে মাতরম্ বলে।**

যতদূর মনে পড়ছে, বলরাম বসু ঘাট রোডে সতীশদের পাঁচ নম্বরের বাড়ি। বিস্তৃত জমি, সাবেক-কেলে বৃহৎ বাড়ি, বৃহৎ পরিবার। তবে সবটাই একান্নবর্তী নয়,—কয়েক দলে বিভক্ত। সে সময়ে এ বাড়ির সকলের কাছেই আমি পরিচিত, কর্তাদের থেকে আরম্ভ করে ছোট ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত সকলেরই নিকট। কত শীত-গ্রীষ্ম, কত সন্ধ্যা-সকাল গল্পে, গানে, সাহিত্য আলোচনায় সতীশের সংগে এ বাড়িতে আমার অতিবাহিত হয়েছিল, তার ইয়ত্তা নেই।

বেলা তখন নটা হবে। সতীশদের বাইরের অঙ্গনে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, "সতীশ আছ?"

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে হর্ষোজ্জ্বল মুখে সতীশ বললে, "উপেন? কি সৌভাগ্য! এস, এস। ঘরের মধ্যে এস।"

ঘরের ভিতর গিয়ে উপবেশন করে বললাম, "তোমার সংগে একটা কথা আছে।"

সতীশ ললে, "একটা কেন, অনেক কথা আছে। কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা কথা আছে তোমার সংগে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কি কথা?"

সতীশ বললে, "আজ এবেলা এখানে আহার করবে তুমি।"

বললাম, "রাজি।"

"আজ দুপুরে এখানে থাকবে।"

"রাজি।"

"আজ বিকেলে চা খেয়ে তারপর এখান থেকে যাবে।"

"রাজি।"

সতীশ বললে, "আচ্ছা, এবার তাহলে তোমার কথা বল।"

সবিস্তারে সকল কথা বললাম। শুনে সতীশের মুখ-চক্ষু আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; বললে, "তিনবার রাজি!"

ছিলাম আমরা চারজন, সতীশ যোগ দেওয়ায় হলাম পাঁচজন। পাঁচ সংখ্যা লক্ষ্য করে কেউ কেউ আমাদের নাম দিতে লাগল পঞ্চ পাণ্ডব; আর বিচিত্রার দ্রৌপদী।

পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে ভীম আর অর্জুন কে ছিল, সে গবেষণা এখন নিষ্প্রয়োজন। তবে একান্তই যদি পঞ্চ পাণ্ডবের উপমা মানতে হয় ত', কান্তিচন্দ্র ছিলেন যুধিষ্ঠির, তার প্রমাণ একদিন পাওয়া গিয়েছিল।

(ক্রমশ)

সোস্যালিস্ট পার্টির বিপর্যয়

শ্রীসম্পূর্ণানন্দ
শিক্ষামন্ত্রী, উত্তর প্রদেশ

সাধারণ নির্বাচন যে সোস্যালিস্ট পার্টির পক্ষে বিপর্যয় স্বরূপ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। জনকয়েক সোস্যালিস্ট হয়ত আইনসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন, কিন্তু তবু এই সত্য বর্তমানে থাকে যে, আইনসভায়, গণতন্ত্রে নিশ্চিতভাবে যাহা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, পার্টি হিসাবে তাহার কোন অস্তিত্বই নাই।

এই বিপর্যয়ের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া নানা কৈফিয়ৎ উপস্থাপিত এবং আলোচিত হইয়াছে। হয়ত তাহাদের সবগুলিই অল্প-বিস্তর যুক্তিসহ। নির্বাচনে কংগ্রেসই সোস্যালিস্টদের বিশেষভাবে পরাজিত করিয়াছে, কিন্তু এই জয়ে উল্লসিত হওয়া কংগ্রেসকর্মীদের পক্ষে অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক হইবে। সোস্যালিস্ট পার্টির ভাগ্যবিপর্যয় আমাদের সকলের নিকটই উল্লেখযোগ্য নির্দেশক হওয়া উচিত এবং এই বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের চিন্তা করা দরকার।

পার্টির ভুল-ভ্রান্তি

প্রথম হইতেই পার্টি ট্যাকটিক্যাল ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভুল করিয়া আসিতেছিল। যেসব শক্তি নিশ্চিতরূপেই সাম্প্রদায়িক এবং সমাজবিরোধী, যাহাদের একটি শ্লোগান হইতেছে 'কংগ্রেসকে পরাজিত করো', সেই সব শক্তিকেই পার্টি তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা ও প্রভাব দ্বারা সাহায্য করিতেছিল। কোন সাংগঠনিক চুক্তি হয়ত হয় নাই, কিন্তু ঐসব তথাকথিত বিদ্রোহী, নীতিবর্জিত মানুষ-গুলির কাছে সোস্যালিস্ট পার্টির নৈতিক সমর্থন যথেষ্টই ছিল। ফলে স্বাভাবিক যাহা, তাহাই ঘটিয়াছে। বহু স্থানে, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে, নির্বাচকরা বিদ্রোহী ও স্বার্থান্বেষীদের সঙ্গে সোস্যালিস্টদের এক করিয়া দেখিয়াছে এবং নীতিহীন মানুষ বলিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছে। জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং ডাঃ লোহিয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া পার্টিকে আরও দুর্বল করিয়া দিয়াছে। যে দল শাসন-ক্ষমতা গ্রহণের জন্য নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়, তাহাদের ভোট দিবার পূর্বে ভাবী প্রধান মন্ত্রীর নাম জানিবার ন্যায়সংগত অধিকার ভোটারদের রহিয়াছে। পার্টির প্রধান প্রধান নেতারা যদি লোকসভার নির্বাচনে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা না করেন, তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, শাসন পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে তাঁহারা কিছু সতর্ক। ঐ পথ গ্রহণের পক্ষে যে কারণ উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা সন্দেহ নিবারক নহে। অভ্যন্তরীণ নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যতই গুরুত্ব থাকুক না কেন, ঐ ব্যাপারের পর কংগ্রেসের স্থান গ্রহণে পার্টির ক্ষমতা ও ইচ্ছার দাবীকে দেশ যথোচিত গুরুত্ব দিতে রাজী নয়।

অকীর্তিকর মৈত্রীবন্ধন

তপশীলী জাতি ফেডারেশনের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কে এত আলোচনা হইয়াছে যে, সে সম্পর্কে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। ইহা স্বতই খারাপ, তাহার উপর পার্টির নেতারা ঐ ঐক্যের স্থায়িত্বের উপর যেভাবে জোর দিয়াছেন, তাহাতে অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। পার্টির বোম্বাই শাখাকে সুবিধা-বাদের দায় হইতে রক্ষা করিবার প্রচেষ্টার ফল মারাত্মক হইয়াছে। আম্বেদকরের অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইয়াছে। দুর্নাম ছাড়া পার্টি ঐ অখ্যাত ঐক্যের ফলে আর কিছুই লাভ করে নাই। পার্টির মৈত্রীবন্ধন মধ্যে ইহা প্রধান এবং ইহা ছাড়া আরও রহিয়াছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া নির্বাচন মৈত্রীতে, পার্টির দুঃসাহসিকতা সাধারণত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া অসমর্থনীয়ের রক্ষার্থে নেতারা পার্টির জন্য দ্ব্যর্থক ও সন্দেহাত্মক লজিকের আশ্রয় নিয়াছেন।

ত্রুটিপূর্ণ নেতৃত্ব

স্বীকার করা হইয়াছে যে, পার্টির নেতৃত্ব ত্রুটিপূর্ণ ছিল। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এবং আচার্য নরেন্দ্র দেও অতি সজ্জন ব্যক্তি দেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁহারা অন্যতম, কিন্তু যে গুণ থাকিলে নেতা হওয়া যায়, তাহা তাঁহাদের নাই। জয়প্রকাশ এমন সব কাজে তাঁহার শক্তি ব্যয় করেন, যাহা সহজেই সাধারণ গুণসম্পন্ন অন্য লোক দ্বারা করান যায়। তাঁহার কার্য-নীতি (technique) গান্ধী ও মার্ক্সীয় নীতির মধ্যে দোদুল্যমান, ফলে কোন নীতিতেই সে সম্পূর্ণ সফল হইতে পারে না। আচার্যজী এত ভাল লোক যে, কোন বিষয় সম্পর্কে নিজে নিশ্চিত হইলেও এবং উহা নির্ভুল হইলেও তাঁহার মাথাগরম অনুচরদের বিরুদ্ধে জোর করিতে পারেন না। ডাঃ লোহিয়া অপ্রতিহত গতিতে সারা দেশময় স্বীয় অভিমত ছড়াইয়া চলিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সহকর্মীদের যে অসুবিধা হয়, সে সম্পর্কে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। চরম মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ দ্বারা প্রভাবিত পুরাতন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি উত্তরাধিকার স্বত্বে অর্জন করিয়াছে। শ্রীমতী অরুণা আসফ আলীর জিদের ফলেই পার্টির বহু প্রধান সদস্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গণপরিষদ বয়কট করিবার সিদ্ধান্ত যে গৃহীত হইয়াছিল, আজ আর তাহা গোপন নাই। কিন্তু শ্রীমতী আসফ আলী পার্টির কার্যপরিষদেরও সদস্যা নহেন। পার্টি হইতে পদত্যাগ করিবার ব্যাপারে তিনি তৎকালে দলের শাসনকর্তা মিঃ আহমদ ও মিঃ আশ্রফ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি হইতে পাওয়া বর্তমান পার্টির অপর একটি দুর্বলতা হইতেছে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে ব্যতিব্যস্ত না করিবার জন্য প্রধান নেতাদের অফুরন্ত প্রয়াস। অতীতে ঐ ধরণের ব্যবহারের ফলে সকলেই সন্দেহ করিতেছিল যে, পার্টি জওহরলালজীরই সৃষ্টি। পার্টি জওহরলালজীর জন্য যাহা বিবেচনা করিতেন, তিনি কিন্তু কখনও তাহার প্রতিদান দেন নাই। বরঞ্চ তাঁহার নিকট হইতেই কঠিন আঘাত পার্টি পাইয়াছে। ঐ ধরণের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা

নিঃসন্দেহে চিত্তদ্রাবক, কিন্তু তাহা সামঞ্জস্য-পূর্ণ ও দৃঢ় গণনীতি গঠনের সহায়ক নহে।

অদ্ভুত মিশ্রণ

পার্টির নীতি ও কর্মপদ্ধতি অনেকের নিকট অস্থির বলিয়া যে প্রতীয়মান হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। পার্টির প্রচারকেরা যে ছবি আঁকেন, তাহার অন্তরালে যাহা আছে, তাহা বুঝিবার মত শক্তি গ্রামের নিরক্ষর নির্বাচকদেরও আছে। পার্টি রামরাজ্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে কিনা, জানি না, কিন্তু ইহা যে সর্বোদয় গ্রহণ করিয়াছে, ইহা সত্য; অথচ ইহা এখনও কার্ল মার্ক্স-এর নামে শপথ গ্রহণ করে। ইহা স্বাভাবিক ভাবেই জনগণের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করে, কারণ গান্ধীবাদ ও মার্ক্সবাদের ঐ সংমিশ্রণ প্রচেষ্টাকে তাঁহারা হয় পার্টির ভোট আদায়ের হীন কৌশল অথবা ইহার অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় বলিয়া মনে করে। পার্টির কর্মসূচীর যে অংশ গান্ধীবাদপ্রভাবিত, অনেকের মতে ইহাই শ্রেষ্ঠ অংশ, তাহা কেবলমাত্র কংগ্রেসই কার্যকর করিতে পারে বলিয়া অনেকে মনে করেন। আবার অনেকে ভিন্ন-মত পোষণ করেন। তাঁহারা কর্মসূচীর মার্ক্সীয় নীতির প্রতি বেশি আস্থাশীল। তাঁহাদের মতে উহা প্রকৃতই কম্যুনিস্টদের আওতার বিষয়। সোস্যালিস্ট পার্টির নিজস্ব সুস্পষ্ট কোন নীতি আছে বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ মনে হয়, কংগ্রেস ত্যাগ করিবার পর কতিপয় অসন্তুষ্ট ব্যক্তি একত্রিত হইয়াছেন। ইঁহারা কেবলমাত্র তীব্র-ভাবে কংগ্রেসের সমালোচনা করিয়া আপনাদের জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। অন্যান্য কংগ্রেসবিরোধী দলকে অতিক্রম করিবার প্রয়াসে পার্টি তাহার মর্যাদাবিরোধী কাজ-কর্ম করে। যে-দলে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও আচার্য নরেন্দ্র দেবের মত বহুজ্ঞানসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন, সে-দলের পক্ষে বাধাহীন নির্বাচনের জন্য মন্ত্রিসভার পদত্যাগের মত বোকামিপূর্ণ দাবীতে জনসঙ্ঘের সঙ্গে হাত মিলান ভুল হইয়া-ছিল। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিতেন যে, নির্বাচনের পূর্বে অন্য কোন দেশের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন না। তবু যদি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতেন, তবে ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত ব্যাপারের জনাই ইহা দৃষ্টান্তস্থল হইয়া থাকিত এবং ভারতীয়েরা জগতের সম্মুখে নিজেদের একটি অসৎ জাতি বলিয়া প্রচারিত করিত, কারণ তাহারা প্রতিপন্ন করিত যে, তাহার দায়িত্বশীল নেতাদিগকে (তাঁহারা যে দলেরই হোক না কেন) নিরপেক্ষ ও ভদ্রভাবে কাজ করিবার জন্য বিশ্বাস করা যায় না। আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, জাতির বিরুদ্ধে এমন একটি হীন চাতুরীতে অং গ্রহণ করিতে সোস্যালিস্ট নেতৃবৃন্দ ইচ্ছাকৃত ভাবে রাজী হইতে পারে না, কিন্তু কংগ্রেসে বিরুদ্ধে উত্থাপিত এই শ্লোগানে সে নিজে বিবেচনা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। যে-দ ও দলের কর্মীরা এইভাবে কাজ করে এব সকল ক্ষেত্রে এইভাবে তবলার বাঁয়া হই

থাকিতে চায়, তাহাদের পক্ষে গৌরবপূর্ণ কোন কাজ নিষ্পন্ন করা সম্ভব নহে। তাছাড়া, যে-দলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বক্তারা একথা পর্যন্ত বলিতেও দ্বিধা করে না যে, চার বৎসরের কংগ্রেসী রাজত্ব শতবর্ষব্যাপী বৃটিশ রাজত্ব হইতেও খারাপ, তাহারা দায়িত্বপূর্ণ রাজনীতিজ্ঞের প্রমাণ বা বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে না।

গভীরতর কারণসমূহ

সোস্যালিস্ট পার্টির কার্যত বিলোপ একান্তভাবে আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে। বৃহত্তর ঐতিহাসিক শক্তিসমূহ তাহাদের অন্তর্নিহিত অনিবার্য পথে অগ্রসর হয়, তাহার কথাই মানুষকে স্মরণ করাইয়া দেয়। মুখ্য কারণ যাহার কতকগুলি পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে বৃহত্তর মূল সম্বন্ধীয় শক্তিবর্গের পারস্পরিক ক্রিয়ার সহজ ফল এবং ঝড়ের মুখে কুটোর মত পার্টি নেতারা কেবল হাওয়ার দিকই নির্দেশ করিতেছেন।

মনে হয়, ইতিহাস ভারতে শীঘ্রই বৃহত্তর পরিবর্তন ঘটাইয়া তুলিতেছে। কম্যুনিস্ট পার্টি রঙ্গমঞ্চ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল এবং যে সোস্যালিস্ট পার্টি 'বাফার' ও 'আঘাতনিবারক' হিসাবে বেশ ভাল কাজ করিতে পারিত, তাহাও পড়িয়া গেল। যে কম্যুনিস্ট পার্টি সম্পর্কে ভারতীয় জনগণের বিরূপ ধারণা ছিল, সেই পার্টিই কংগ্রেসের বিশেষ শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে আবার আসরে স্থান পাইল। কোন বিশেষ রাষ্ট্রে ইহার কোন সরকার গঠন করিতে পারা বা না-পারা তাৎপর্যপূর্ণ হইবে। কারণ সে যদি সরকার গঠন করিতে পারে, তবে তাহাই হইবে কংগ্রেসকে আক্রমণ করিবার ভিত্তিভূমি। কারণ সরকার গঠন করিয়া সে ভূমি সংক্রান্ত ও অন্যান্য পরিবর্তন সাধন করিবে এবং তাহা দ্বারা তাঁহাদের র‍্যাডিক্যাল এবং সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি তাঁহাদের আপোষহীন আনুগত্য প্রকাশ করিবে। ইহাতে কেন্দ্রের সহিত তীব্র বিরোধ দেখা দিবে। যাহা হউক, ইহার অগ্রগতির পথে পার্লামেণ্টারী ফ্রন্ট যদিও একটি দিক, তবু তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নহে। ইহা মিলিটারী ও পুলিশ বাহিনীর আনুগত্য নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে ও শিল্প ও বাণিজ্যের মূল স্থানগুলি দখল করিতে চেষ্টা করিবে এবং ইহা করিবার তাহার একটিমাত্র উদ্দেশ্য থাকিবে, তাহা হইতেছে, অবস্থামত রুশিয়াকে সাহায্য করা এবং এইভাবেই তাহারা ভারতকে কম্যুনিস্ট করিয়া গড়িয়া তোলার সহায়ক হইবে ও পৃথিবীতে কম্যুনিস্ট স্বর্গ স্থাপনের বৃহত্তর প্রচেষ্টা চালাইবে।

নৈরাশ্যের ফল

সোস্যালিস্ট পার্টির পক্ষে যদি কংগ্রেসে থাকা সম্ভবপর হইত অথবা এখনও যদি দুই দলে একটা বোঝাপড়া করা যাইত, তবে তাহাতে দেশেরই পরম উপকার হইত। কংগ্রেসের ভিতরে এমন একদল মানুষ থাকিত, যাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদের ধারায় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বলিতে পারিত। ফলে শ্রমিকদের দাবী ও মধ্যবিত্তদের অবস্থা উন্নয়নের প্রচেষ্টা প্রখরতর হইত, আয়ের বৈষম্য বিদূরণে আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত এবং শিল্প সামাজিককরণের পথ সহজতর হইত। ঐসব নিষ্পন্ন হইলে ভারতীয়গণের পরিপূর্ণভাবে এবং বিনা বাধায় কাজ করার পক্ষে কোন বিঘ্ন থাকিত না এবং ভারতের সংস্কৃতির সর্বোত্তম উপাদান রক্ষিত ও উন্নত হইত এবং ইহাই হইবে কম্যুনিজম্ প্রসারের শ্রেষ্ঠতম প্রতিবন্ধক। এই ধরণের কংগ্রেস-সোস্যালিস্ট পুনর্মিলন অথবা মৈত্রী যদি না হয়, তবে অত্যন্ত খারাপ ফল দেখা দিবে বলিয়া আমি আশঙ্কা করি। নৈরাশ্য হইতে হয়ত অনেক উৎসাহী সোস্যালিস্ট কর্মী কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদানে প্রলুব্ধ হইবে, অন্যেরা কংগ্রেসে চলিয়া যাইবে অথবা অনুল্লেখযোগ্য নিষ্ফল আন্দোলনে নিজেদের শক্তির অপচয় করিবে এবং যাহা না করা উচিত, তাহাই করিবে।

আজিকার কংগ্রেস

ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, কংগ্রেস আজ আর প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান নয়। আইন পরিষদের নব নির্বাচিত অনেক সদস্যেরই, তাঁহাদের অন্তঃকরণের ও অন্যান্য সদ্‌গুণ ছাড়া কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদের পূজারী ভিন্ন কোন দৃঢ় আদর্শগত পটভূমি আছে বলিয়া কোন সনাম নাই। কংগ্রেসেরও দিবার মত বিশেষ কোন আইডিওলজি নাই এবং এখানেই ভয়ের কারণ রহিয়াছে। সোস্যালিস্টদের পরাজিত করায় এবং কম্যুনিজমের বিরুদ্ধবাদী হওয়ায় ইহা হয়ত কালক্রমে প্রতিক্রিয়াশীল ও অতি আধুনিক দক্ষিণপন্থীদের আশ্রয়কেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারে। সেদিন না আসুক, ইহাই আমি আশা করিব। যাহোক, ইহার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক হইতে হইবে। আমাদের চারিদিকে যে শক্তিসমূহ ক্রিয়া করিতেছে, তাহা মানিতে হইবে।

আমরা যদি বুদ্ধিমানের মত এবং ত্বরিৎগতিতে কাজ করিতে পারি, তবে আমরা ভারতের আত্মাকে এবং জগতকেও রক্ষা করিতে পারিব; কিন্তু তাহা করিতে যদি অপারগ হই তবে সমস্ত জগতকে কম্যুনিজম দ্বারা প্লাবিত হইতে সাহায্য করিব। এজন্য আমাদের রুশবিরোধী শক্তি-ব্লকে যোগদানের প্রয়োজনীয়তা নাই। নিজেদের রক্ষা করিবার মত শক্তিই কেবলমাত্র যে আমাদের আছে তাহা নহে, মানসিক সুস্থতা বজায় রাখিতে পারিলে আমরা বিশ্বের স্থায়িত্বও রক্ষা করিতে পারি। ঘটনাচক্র আমাদের একটি বিশ্ব-সমস্যার সম্মুখীন করিয়া দিয়াছে। এবার আমাদিগকে সুচিন্তিত মনে, শান্ত দৃঢ়তায় এবং দক্ষতার সঙ্গে ঐ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।

পার্টি ভাঙ্গিয়া দিন

এই বিপর্যয় কাটাইয়া সোস্যালিস্ট পার্টি যে আরও শক্তিশালী ও খাঁটি দল হিসাবে আর দাঁড়াইতে পারিবে না, তাহা বলা যায় না। আমি কিন্তু এই রকম পূর্ণতার জন্যে প্রার্থনা করিব। পার্টি যদি উঠিয়া যায়, অথবা কার্যকর সংগঠন হিসাবে কাজ করা হইতে বিরত হয়, তবে উহা দেশের পক্ষে অমঙ্গলকর হইবে। কিন্তু পার্টিকে বুঝিতে হইবে যে, কংগ্রেসকে অনবরত গালি দিবার মধ্যেই তাহার ঐতিহাসিক ভূমিকা শেষ হইয়া যায় না। উহা করিতে গেলে কম্যুনিস্টদের শক্তিশালী এবং পার্টি দেউলিয়া হইবার পথ প্রশস্ত করা হইবে। সোস্যালিস্ট পার্টির উচিত, কর্মের পথে কংগ্রেসের ইনটেলেকচুয়াল ও আইডিওলজিক্যাল সেনামুখ হিসাবে কংগ্রেসের সন্নিকট হইতে চেষ্টা করা। অপর দিকে কংগ্রেকর্মীদেরও সমস্ত তিক্ত স্মৃতি ভুলিয়া পূর্বোক্তভাবে সোস্যালিস্ট পার্টির পুনর্গঠনের জন্য পার্টিকে সাহায্য করা উচিত। ইহাতেই আমার মনে হয়, দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে।

নির্বাচনে পরাজিত মন্ত্রীরা রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অনেকেরই কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আলোচনা হয়ত Consolation Prize সম্বন্ধেই হয়েছে।"

* * *

রেলওয়ের আয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া একটি সরকারী বিবৃতি আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম।—"রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শান্তনমের ভোটের ঘাটতির খবরও আমরা ক'দিন আগেই পাঠ করেছি" স্মরণ করাইয়া দিল আমাদের শ্যামলাল।

* * *

"Whip issued to Congress M. Ps"—একটি সংবাদের শিরোনামা। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এবারে জমবে ভালো; ঘোড়দৌড়ে দেখেছি whip ছাড়া বাজিমাৎ করা খুবই শক্ত"!

* * *

শুনিলাম বিদেশ হইতে নাকি ভারতে দুগ্ধ আমদানী হইতেছে।—"হরিণঘাটা থেকে মৃগনাভি রপ্তানির
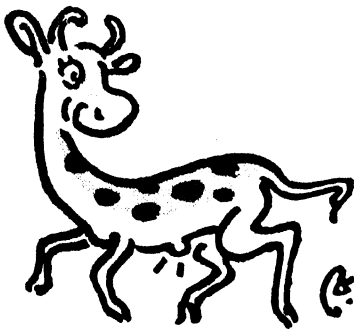
সংবাদ অবশ্যি আমরা এখনো পাইনি"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * *

ডিভনশায়ারের কোন একটি মেয়ে তন্বী হওয়ার জন্য ধীরে ধীরে আহার ত্যাগ করার অভ্যাস করিতে থাকেন, ফলে ক্রমে এমন হইল যে তিনি নাকি আহারের কৌশলই একবারে ভুলিয়া গেলেন। শ্যামলাল বলিল—"না খেতে খেতে খাওয়ার অভ্যেস যদি সত্যিই একদিন চলে যায় তাহলে অধিক খাদ্য ফলাওর ঝামেলা আর পোয়াতে হয় না"!
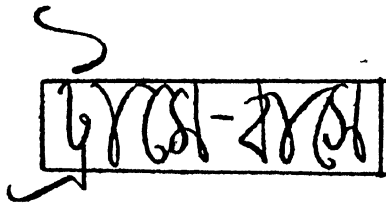
* * *

লালবাজার থানায় কয়েকটি মৃত ইঁদুর নাকি সম্প্রতি পুলিশ মহলে খুব আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিল। অবস্থা

বর্তমানে আয়ত্তে আসিয়াছে শুনিয়া আমরা আশ্বস্ত। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আগামী পুলিশ প্যারেডে বীরত্বের পদকটি কার গলায় ঝুলে তা দেখবার জন্যে আমরা উদগ্রীব হয়ে আছি।"

* * *

কলিকাতা সরকারী পরিবহন বিভাগের একটি বিবৃতিতে চলন্ত বাসে একটি জন্ম ও একটি মৃত্যুর কাহিনী আমরা অবগত হইলাম। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"ঐ সঙ্গে ঠ্যাং ভাঙার কাহিনীটা জুড়ে দিলে বিবৃতিটা পূর্ণাঙ্গ হতো"।

মনের ভুলে যাত্রীরা কী কী জিনিস বাসে ফেলিয়া যান তারও একটা সচিত্র তালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু বাসে চড়বার আগে যাত্রীরা মনের ভুলে কী পেছনে ফেলে আসেন তা হয়ত অনেকেই জানেন না,—সেটি হলো মানুষের সহজ সৌজন্য-বোধ"—বলিতে বলিতে খুড়োর মুখের রেখা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

* * *

কলিকাতা ট্রাম-কোম্পানীর নবনিযুক্ত এজেন্ট সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তিনি একজন সদাশয় ব্যক্তি এবং কোম্পানীর কর্মীদের আনন্দ বৃদ্ধির জন্য তিনি অনেক-কিছু করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—খুবই আনন্দের কথা। তবে এখন আনন্দের চেয়ে গাড়ি বৃদ্ধির জন্যে যদি তিনি কিছু করেন তাহলেই যাত্রীদের তরফ থেকে তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাবো"।

* * *

আফ্রিকাতে জনৈক ব্যক্তি শুনিলাম একটি সিংহকে কামড়াইয়া দিয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু আজকাল এর

আর কোন সংবাদ-মূল্য নেই। সিংহকে কামড়ে দেওয়ার সংবাদ আমরা প্রায় নিত্যি তিরিশ দিনই পাচ্ছি"!

রবারে জিনীভার লেকের পাড় আরও চমৎকার।

বিস্তর নরনারী জাহাজ চড়ে বেরিয়েছে ফূর্তি করতে। এসব জাহাজ 'ইস্পিশাল'—লম্বালম্বি লেকের এপার ওপার হয়। সমস্ত দিন জাহাজে কাটিয়ে, উত্তম আহারাদি করে (হে বাঙালী, লেকের মাছ খেতে চমৎকার

বাপরে সে কি বিরাট মাছ উদর আন্ডাময় মুখে দিলে মাখম যেন জঠর ঠান্ডা হয়),

জাহাজের ব্যান্ডের সঙ্গে টাঙ্গোর ধাগিনাতি নাক ধিন আর ওয়াল্ট্সের ধাধিন না, ধা তিন না নেচে, কিম্বা মাউথ-হারমনিয়াম বাজিয়ে, ছোঁড়াছুঁড়িদের সঙ্গে দু'দন্ড রসালাপ করে, কিম্বা জাহাজের এক কোণে আপন মনে বসে খুদাতালার আসমান-পানি, পাহাড়-পর্বত দেখে দেখে সমস্ত দিনটা দিব্য কেটে যায়।

সুইসরা ইংরেজের মত গেরেমভারী লোক নয়। যদি দেখে, আপনি বিদেশী, এক কোণে একা বসে আছেন তবে কোনো একটা ছুতো ধরে আপনার সঙ্গে আলাপ করে নেবেই নেবে। অবশ্য আপনি যদি খেঁকিয়ে ওঠেন তবে আলাদা কথা, কিন্তু আপনি তো বদরসিক নন—পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনি 'পঞ্চতন্ত্র' পড়েন—আপনি খুশী হয়েই সাড়া দেবেন।

কিন্তু সুশীল পাঠক, এই বেলা তোমাকে বলে রাখি। দেশ ভ্রমণের ষোলআনা আনন্দই বরবাদ-পয়মাল যদি তুমি সে দেশের ভাষায় কথা কইতে না পারো। ভুল বললুম, বলা উচিত ছিল, যদি বুঝতে না পারো। কথা কইবার প্রয়োজন অত বেশী নয়, সুইশ যদি দেখে যে তুমি তার ভ্যাচর ভ্যাচর বুঝতে পারছো, মাঝে মাঝে মোকা-মাফিক 'হুঁ' 'হুঁ' করছো, কিম্বা বুড়া রাজা প্রতাপ রায়ের মত সমে সমে মাথা নাড়ছো তা হলেই সে খুশী।

সুইশ কেন পৃথিবীর প্রায় সব জাতের লোকই বিদেশী সম্বন্ধে কৌতূহলী। বিশেষ করে মেয়েদের উৎসাহ এ বাবদে পুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী। অথচ মেয়েরা লাজুক তাই তারা পুরুষকে অগ্রদূত হিসেবে পাঠায় কলেকৌশলে আলাপ জমাবার জন্য। তার পর

'দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে
রাজেন্দ্র সঙ্গমে,—'

কিম্বা কালিদাসের বজ্র মণি সমুৎকীর্ণ হওয়ার পর সূত্র যে রকম সুড়ুৎ করে উৎরে যায় (সংস্কৃতটা আর ফলালুম না, ভুল হয়ে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা) মেয়েটি আপনার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেবে।

সাবধানী পথিক, ভয় পেয়ো না। যে মেয়েটি আপনার সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্য ছোঁড়াটাকে পাঠিয়েছিল সে ফালতো। তার বোন ছোকরাটির ফিয়াঁসে। বোন সঙ্গে আছে, সে বেচারী একা একা কি করে!'

চামড়া আর চুলের রঙ তাজ্জব জিনিস।

আমরা ফর্সা রঙের জন্য আকুল, যার চুল একটুখানি বাদামী তার তো দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। আর বেশীর ভাগ উত্তর এবং মধ্য ইয়োরোপীয় বাদামী চামড়া আর কালো চুলের জন্য জান্ কোরবাণী দিতে কবুল।

চট করে একটা ঘটনার উল্লেখ করে নি। এ ঘটনা অধমের জীবনে একাধিকবার হয়েছে।

এরকম এক জাহাজে এক কোণে একা বসে আছি। আমার থেকে একটু দূরে এক পাল ইস্কুলের মেয়ে মাস্টারনীর সঙ্গে ফূর্তি করতে জাহাজে চেপেছে। সবাই আপন আপন স্যান্ডউইচ বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। স্যান্ডউইচগুলো টেবিলের মাধ্যিখানে বারোয়ারি করে রাখা হয়েছে, আর জাহাজ থেকে তারা অর্ডার করেছে লেমনেড।

কী চেচামেচি। 'দেখ দেখ, ফ্রিডির মা কি রকম খাসা বেকন্-স্যান্ডউইচ পাঠিয়েছে' ফ্রিডি লজ্জায় টমাটো হয়ে বলছে, 'না, না মাস্টার্ড ছিল না বলে স্যান্ডউইচ ভালো হয় নি' 'ক্লারার মা'র পাঠানো স্যালাডটা খা ভাই, জানিস ও'র বাগানে যা লেটিস আর টমাটো হয়!' আর টীচার শুধু বলছেন, 'চুপ চুপ অত করে চ্যাঁচাতে নেই। লোকে কি ভাববে?'

ধর্ম সাক্ষী লোকে কিছু ভাবে না। বরঞ্চ ওরা না চ্যাঁচালে পাঁচজন অস্বস্তি অনুভব করত; ভাবত কালা-বোবাদের ইস্কুল পিক্নিকে বেরিয়েছে।

সব কটা মেয়ে—ইস্তেক টীচার আড়নয়নে ভদ্রতা বজায় রেখে আপনার কালো চুল আর বাদামী রঙের দিকে তাকাবে।

পরের স্টেশনে হুড়মুড়ি করে সবাই নেমে গেল। আমার মনটা উদাস হয়ে গেল।

তখন দেখি একটি আট ন' বছরের মেয়ে টেবিলের তলায় লুকিয়ে ছিলে। গুড়ি গুড়ি আমার কাছে এসে কার্টসি করে (অর্থাৎ দুহাতে ফ্রক একটুখানি তুলে হাঁটু ভেঙে) বললে 'গুটেন্ টাখ্' (সুপ্রভাত)!'

আমি চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বললুম, 'গুটেন টাখ মাইন জুন্যৎসষেণ (সুপ্রভাত মিষ্টি মেয়ে)।'

লজ্জায় কাঁচুমাচু হয়ে, চুলের ডগা পর্যন্ত লাল করে বললে, 'আপনি রাগ করবেন না।' আমি বললুম, 'নিশ্চয় না'। 'তবে বলুন তো, আপনি কি রঙ দিয়ে চুল কালো করেছেন। আমি কাউকে বলবো না, তিন সত্যি।'

আমি তখন তার সোনালি চুলের দিকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে। বললুম, 'ডার্লিং, তোমার কী সুন্দর সোনালি চুল।'

গাল ফুলিয়ে বললে, 'রাবিশ, আমি কালো চুল চাই।'

কিছুতেই বোঝাতে পারিনে, আমি চুলে রঙ মাখাই নি।

শেষটায় হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলল। কোটের আস্তিন সরিয়ে দেখালুম, আমার লোমও কালো। বললুম, 'ওগুলো তো আর বসে বসে কালো করি নি।'

বিশ্বাস তখন তার হল। মুখে গভীর বিষাদ মেখে, মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে জাহাজ থেকে নেমে গেল।

বিজ্ঞানের চিঠি—শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় ও শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার; প্রকাশক—বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স লিমিটেড; স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ৩৬৬। মূল্য—আট টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি পত্রচ্ছলে লিখিত পদার্থ-বিজ্ঞানের কতিপয় মূল সূত্র ও তত্ত্বের মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ। 'কতিপয়' বিশেষণটি সভয়ে ব্যবহার করিতেছি। কেন না, এই কতিপয়েরই মধ্যে রহিয়াছে আলোক, বিদ্যুৎ ও চুম্বকশক্তির সাধারণ ও অসাধারণ ইতিবৃত্ত, পরমাণু ও পরিমাণবাদ, বিদ্যুতিন-বিদ্যা, সৌর-বিকীরণ তত্ত্ব, আপেক্ষিকতাবাদ, চতুরায়-তনিক জ্যামিতি এবং আরও বহুতরো কাহিনী। পদার্থ-বিজ্ঞানটি যে প্রকৃতপক্ষে কি বিজ্ঞান তাহা ক্রমেই মনোবুদ্ধির অগোচর হইয়া উঠিতেছে, দর্শন ও অঙ্ক শাস্ত্রকে আপন কুক্ষিগত করিয়া ইহা 'আব্রহ্ম স্তম্ব' পর্যন্ত বিলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার সাধক ও সাধনা সাধারণ জগতের কেহ বা কিছু বলিয়া ধারণা করা সময়ে সময়ে কঠিন বলিয়া বোধ হয়, আর ইহার সিদ্ধি যে লোকে বিষর্পিত তাহা অবাঙমনসগোচর। আধুনিক পদার্থবিদ্যা প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যারই সগোত্র,—ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীত, জ্ঞান ও ধ্যান, মননা ও অপরোক্ষানুভূতি সহসা একাকার হইয়া গিয়াছে। এই সীমাহীন বিরাটত্বের পট-ভূমিতেই আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে 'কতিপয়' বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে; নচেত ৩৬৬ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বৃহৎ গ্রন্থের উদ্দিষ্টা 'শমিতা' নাম্নী বালিকাটি তেইশটি পত্র পঠনান্তে অনায়াসেই এই গরবে গরবিণী হইতে পারে যে, পদার্থ বিজ্ঞানের রহস্যালোকের চাবিকাঠি তাহার আঁচলে শক্ত করিয়াই বাঁধা পড়িয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে এ চিঠি কয়খানির পরিধি ও মূল্য ব্যাপক ও প্রচুর—কেবল শমিতাদের নিকটেই নহে, তাহাদের ঊর্ধ্বতন দু'এক পুরুষের নিকটেও। এ চিঠিগুলি স্বভাবতই কিশোরী কন্যাকে লিখিত নেহেরুজীর বিশ্ব-কাহিনী বিষয়ক পত্রগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তথাপি বিদগ্ধ পাঠক বিষয়বস্তুর বিচারে বর্তমান লেখককে অধিকতর দুঃসাহসী বলিয়া মানিয়া লইতে প্রলুব্ধ হইবেন।

ইংরাজের কারাগারের নিকট বাংলা সাহিত্যের ঋণ সামান্য নহে। বাংলা সাহিত্যের বেশ একটা সমৃদ্ধ অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কারাগারের সহিত জড়িত। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকারকে অতঃপর অবশ্যই এই অনালোকিত অধ্যায়ে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। আলোচ্য গ্রন্থেরও কারাগৃহেই জন্ম। "বিজ্ঞানের চিঠি" কারা-সাহিত্যের একটি বিশেষ অবদান, কেননা বাংলা ভাষায় এই রীতি ও পর্যায়ের পুস্তক এই প্রথম। শ্রীজোয়ারদার কথিত ও শ্রীরক্ষিত রায় রচিত এই গ্রন্থের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—ইহার মধ্যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অনন্যসাধারণ সমন্বয়। এতো অধিক তত্ত্ব ও তথ্যকে এতো আবেগমধুর কাব্যধর্মী ভাষায় পরিবেশিত হইতে ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। বিজ্ঞানকে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান বিকীরণ নূতন নহে। অক্ষয়কুমার, রামেন্দ্রসুন্দর, জগদীশচন্দ্র, জগদানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ পূর্বাচার্যগণ এবিষয়ে অপরিসীম নিষ্ঠায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি একাধিক বিজ্ঞানবিদ অধ্যাপক ছাত্রদের জন্য সহজ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সাময়িকপত্রেও বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ধারাবাহিক আন্দোলনের ইতিহাসে আলোচ্য গ্রন্থ যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ভূপেন্দ্রকিশোরের লিপিকুশলতা সম্বন্ধে বাংলার সাহিত্যিক সমাজ বহু পূর্ব হইতেই তাঁহার স্বপক্ষে রায় দিয়া আসিয়াছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক নহেন, অথচ তাঁহার সেই কুশলতা আপন পরিচিত গণ্ডী ছাড়াইয়া যেরূপ আশ্চর্যভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনায়াসে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা গ্রন্থখানি পাঠ না করিলে বিশ্বাস করা কঠিন। আপন সীমাকে উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াই প্রতিভার ধর্ম। ভূপেন্দ্রকিশোর যে প্রতিভাবান লেখক, তাহা বর্তমান গ্রন্থে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের বৃহত্তম বিস্ময়টির উল্লেখ এখনও আমরা করি নাই,—সেটি হইতেছে ইহার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথ ও রাজশেখরের অধমর্ণ হিসাবে কয়েকটি পারিভাষিক শব্দ লেখক কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রায় চারিশত পারিভাষিক শব্দের অধিকাংশই তাঁহার কপোলপ্রসূত। তাঁহার সৃষ্ট বহু শব্দই বাংলা বৈজ্ঞানিক অভিধানে স্থায়ী স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। 'পর্ণশ্যাম' (Chlorophyl), 'উপপাদান' (Induction), 'উদীচী ঊষা' (Aurora Borialis), 'নৈরক্ষেক দেশ' (Equatorial region), 'দিশারী ঢেউ' (Pilot Wave), 'যোগাকর্ষণ' (Cohesion) এবং অজস্র এরূপ সুন্দর শক্তিশালী ও ব্যঞ্জনাময় শব্দ সমগ্র পুস্তকটিতে পরিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

সাধারণভাবে শিক্ষিত শমিতাদের মুখের দিকে চাহিয়া গ্রন্থে দেড়শতের উপর চিত্র সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়—চিত্রগুলি বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন না করিয়া উন্মোধিত করিয়াই তোলে—এক কথায়, চিত্রগুলির উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে। গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রসাধন সম্বন্ধে অভিযোগের কিছু নাই।

গ্রন্থখানার মুখবন্ধে অধ্যাপক কর যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। প্রত্যেকটি পত্রেরই সিদ্ধান্ত পাঠ করিলে তাঁহার মন্তব্য সম্পর্কে একমত হইতে হয়। তিনি বলিয়াছেন,—"নব্য বিজ্ঞানের বহু গবেষণা নিশ্চয় করে জানিয়ে দিয়েছে যে, তাদের বহু সিদ্ধান্ত আজ আর যান্ত্রিক কলকব্জার উপর নির্ভরশীল নয়—তাদের ভিত্তি এ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরই ভাবঘন কল্পলোকে, দার্শনিকের মানস-চেতন রাজ্যে।......আধুনিক বিজ্ঞানীরাই দেখিয়েছেন যে, এই মহাবিশ্বের আপাতবিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন বৈচিত্র্যের মাঝে বিরাজিত কি অপূর্ব পরিকল্পনা; কি অপূর্ব গঠন-সৌষ্ঠব দানাদার বস্তুর পরমাণু-সংস্থানে; কি অপরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য-সুষমা বিচ্ছুরিত নিস্রবনলের বৈদ্যুতিক প্রবাহে; দৃশ্যমান এই জড় বস্তুর মর্মকোষে বেগবান বিদ্যুতিনের কি ছন্দোময় গতিউচ্ছলতা; মহাকাশপটে নীহারিকা আর নক্ষত্রপুঞ্জের কি নৃত্যচঞ্চলতা; সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন যেন সদা অনুরণিত হচ্ছে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম পরমাণুলোকে, স্বতঃবিচ্ছুরিত বিকীরণ-লীলার ধর্মে, মহাকাশ বক্ষে সহস্র নক্ষত্রের সংকোচনে ও প্রসারণে।......আদি অন্তহীন এই যে লীলা, প্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই যে গোপন কাহিনী—এ সবের যে শুধু গণিতের সূত্রে ও গণিতের মাধ্যমে প্রকাশেই সার্থকতা এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায়—যেমন 'লিপিকা', 'বৃক্ষবন্দনা' ইত্যাদি কবিতায়—বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব ছন্দের বন্ধনে এসে অপরূপ কাব্যরস সৃষ্টি করেছে। এ দিক দিয়ে 'বিজ্ঞানের চিঠি' প্রকাশ-ভঙ্গিমায় বাংলা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থমালার মধ্যে অভিনবত্বের দাবী নিয়ে সর্বাগ্রগণ্য হবার স্পর্ধা রাখে।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকা-পত্র গ্রন্থখানার মূল্য নিশ্চয়ই বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহার ভাষায়ই আমরাও বলিবঃ "সহজবোধ্য ক'রে লেখা জটিলতম নানা পদার্থবিজ্ঞান-তত্ত্ব পরিবেশিত এ গ্রন্থখানা বাঙলা-ভাষী প্রত্যেককেই ভাল করে পড়বার জন্য অনুরোধ করছি।"

এ গ্রন্থের বহুল প্রচার অনিবার্য। ১৮।১।৫১

শাশ্বত বঙ্গ—লেখক কাজী আব্দুল ওদুদ। প্রকাশক—কাজী খুরশীদ বখ্ত্, ৮বি, তারক দত্ত রোড, কলিকাতা ১৯। মূল্য ৫৲ ও বাঁধাই ৬৷৹ আনা। প্রবন্ধ সংগ্রহ। কোনো কোনো অংশ পূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত।

এই বইখানি প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর পড়া উচিত। বইখানি পড়ে আমাদের ধারণা হল, কাজী সাহেব প্রথমতঃ বাঙালী বা ভারতীয় (বা বলা উচিত, মানুষ), পরে মুসলমান। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' চণ্ডীদাসের এ কথাটা আমরা সম্পূর্ণই মানি আর লেখকও যে মানেন তা এই গ্রন্থের অধিকাংশ রচনায় পরিস্ফুট হয়েছে। আর কিছু না হোক, লেখক প্রবন্ধ সাহিত্যিক আর "সাহিত্যিক হিন্দু অথবা মুসলমান অন্তরে অন্তরে জানে, সে আগে মানুষ তারপর হিন্দু অথবা মুসলমান।" (পৃ ৩৩০) লেখক অকুণ্ঠিত-স্বরে এ কথা বলেছেন, "হিন্দু ও মুসলমান মানুষকে এই দুই দলে ভাগ করে দেখা অসত্য —এ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ণভাবেই জাগ্রত হতে হবে।...আমরা মানুষ। সেই মানুষের অনন্ত দুঃখ, অনন্ত সুখ, অনন্ত রূপ। সে আজ আমাদের সামনে অস্পৃশ্য অন্ত্যজরূপে এসেছে, মহাপ্রেমিকরূপে এসেছে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান-রূপে এসেছে। কিন্তু শুধু এই-ই তার চরম অভিব্যক্তি নয়, মানুষের ইতিহাসের ধারা এইখানে এসেই থেমে যায়নি। মানুষের নব নব দুঃখ, নব নব সুখ, নব নব রূপ, কালের পর্যায়ে পর্যায়ে আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে।" (৩২০-২১) ফলতঃ homo sum ; humani nihil a me alienum puto, আমি মানুষ আর মানুষ সম্পর্কে যা কিছু তার কোথাও আমার বিরাগ বা ঔদাসীন্য নেই, এ মনোভংগী কাজী সাহেবের সম্পূর্ণই আছে। রামমোহন, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ গান্ধী এ'রা সকলেই লেখকের আত্মার আত্মীয়; এ'দের বাণীতে শুনেছেন এবং তাঁর এই রচনায় লোককে শোনবার জন্যে ডেকেছেন, চিরযুগের চিরমানুষের বাণী। ইসলামকে তিনি বুঝেছেন ও বোঝাতে চেয়েছেন পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনার দিক থেকে, বিশেষ আচার অনুষ্ঠান ও মুখস্থ বুলির দিক থেকে নয়। "যা সত্য নয় তা ইসলাম নয়" (পৃ ১৮৬) ভারতীয় মুসলিম জাগরণের এই মন্ত্র কানে নিয়ে লেখক যে নিজের সমাজ এবং সেই সমাজের সংস্কৃতিকে যুক্তি দিয়ে বিচারবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, কোনো রকম মানসিক জড়ত্ব বা পৌত্তলিকতা (হয়তো ভালো করে ভেবে দেখলে দেখা যাবে, বিগ্রহ পূজা সব রকম পৌত্তলিকতার মধ্যে সবচেয়ে নির্দোষ ও নির্বৈর ব্যাপার) এর প্রশ্রয় দিতে চান নি নিজের চিন্তায় ও বাক্যে, এজন্য এই গ্রন্থেই জানতে পারছি, স্বসমাজের গোঁড়া ও আবেগ প্রবণ অধিকাংশের কাছ থেকে গঞ্জনা কম পান নি। বাঙালী মুসলমানের ভাবনা বেদনা ও জীবন মহাপ্রতিভাধর কবি বা সাহিত্যিকের লেখনী মুখে অনশ্বর সত্যে ও সৌন্দর্যে আজও রূপ পায়নি বলে সাম্প্রদায়িক সন্দেহ ও নিষেধ ডিঙিয়ে পরস্পরের পরিচয় নেওয়ার শক্তি বা সুযোগ হয় না বলে আজও ইসলামকে আর মুসলমানকে আমরা বাঙালী হিন্দুরা অতি অল্পই জানি। জানিনে ব'লেই অপরিণামদর্শী স্বার্থবুদ্ধির, বিকৃত বুদ্ধির প্রেরণায় মতলববাজ শ্রেণী বা ব্যক্তির উস্কানিতে, সময়ে সময়ে পরস্পরের রক্তপাত করবার মতো অসুস্থ উন্মত্ততায়ও মত্ত হয়ে উঠি। ঈশ্বর প্রেরিত হজরৎ মহম্মদকেই হোক আর স্যার সৈয়দ ইকবাল, কামাল পাশা, ওমর, সাদী, ইমাম গাজ্জালীকেই হোক—যে আলোয় উদ্ভাসিত করে কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেব আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন তা অভিনব, অপ্রত্যাশিত, সাধারণ হিন্দুর কাছেই নয়, সাধারণ মুসলমানের কাছেও। কারণ কাজী সাহেবের একান্ত বেদনা এই যে, ইসলাম কী তা মুসলমানও ভুলে বসেছে। "যা সত্য নয় তা ইসলাম নয়"। ইসলাম শব্দের অর্থ কেউ বলেন শান্তি, কেউ বলেন আত্মসমর্পণ। ইসলামের স্বরূপ কত কম জানি বা ভুলভাবে জানি আমরা, লেখক বলছেন, কোরানের নিম্ন-সংকলিত বাণীগুলি থেকে তা জানা যাবে—

"ধর্মে বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ।

"আল্লাহ* ভিন্ন তারা অন্যান্য যাদের উপাসনা করে তাদের গালি দিও না, পাছে তারা অজ্ঞানতাবশত সীমা অতিক্রম ক'রে আল্লাহ্‌কে গালি দেয়।

"যারা...ভালোর দ্বারা মন্দ বিদূরিত করে, তারা সুখকর আশ্রয় লাভ করবে।

"তারাই পরম কারুণিকের দাস যারা বিনম্র হয়ে ধরণী বক্ষে বিচরণ করে, আর অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম' (শান্তি)।" (পৃঃ ১৫৭-৫৮)

গ্রন্থকারের সমুদয় বক্তব্যের পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়, তাঁর সব উক্তির সমর্থনও সকলে করতে পারবেন না, তাতে আর সন্দেহ কী। তাঁর দৃষ্টিভংগী কেমন, আর সেটি যে সত্য মঙ্গল ও সৌন্দর্যের অভিমুখী, মনুষ্যত্বের বর্ধানুসারী, এইটুকু বলাই আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তক পরিচিতির লক্ষ্য। প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে একদিকে আছে যেমন কালিদাস রবীন্দ্রনাথ গ্যেটে নজরুল জসীমউদ্দিন প্রভৃতি বড়ো-ছোটো বহু সাহিত্য প্রতিভার বহু দরদী আলোচনা—অন্য দিকে তেমনি মুসলমানের জীবন সমস্যা, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, তার হেতু ও মীমাংসা, ইসলামের মর্ম, মানবতার তাৎপর্য এ সব বিষয়ে ধীর শান্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত ভাবনা। লেখাগুলি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে, কতকগুলি আবার সাময়িক বাদ-প্রতিবাদের ক্ষুব্ধ আবহাওয়ায় লেখা হয়েছে ব'লে গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবনার ও ভাবনা প্রকাশের একটা সোপানের পর সোপান উত্তরণশীল সুষ্ঠু ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় না, এইটিই আমাদের বিশেষ অনুযোগের কারণ। কাজী সাহেবের চিত্তের যেরূপ ঔদার্য চিন্তার যেরূপ পরিচ্ছন্ন গতি এবং ভাবপ্রকাশের যেরূপ ললিত সাচ্ছন্দ্য দেখা যায় তাতে এই খণ্ড খণ্ড লেখার সংকলনে আমাদের সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। আশা ও আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। মনে হয় লেখক আমাদের বঞ্চিত করলেন বা। জানি না আমাদের এই প্রধান অভিযোগের বা অনুযোগের কী উত্তর লেখক দেবেন। গ্রন্থের মুদ্রণাদি সুন্দর। ছাপার ভুল কম থাকা উচিত ছিল। ১০।৫২

*এ কথায়ও কোনো সন্দেহ নেই, 'আল্লাহ্‌' শব্দটি উচ্চারণ করে না বা অন্য শব্দ ব্যবহার করে, তারাও অনেকে আল্লারই উপাসক।

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

অশ্রু অর্ঘ্য—শ্রীসত্যেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—শ্রীশরদিন্দু ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫১, কৈলাস বসু স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸৹। ৩২।৫২

ওপারের কথা—শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ—প্রাপ্তিস্থান শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। মূল্য ১৷৹। ৩৩।৫২

পদধ্বনি—অনিল বিশ্বাস—শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস কর্তৃক জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিঃ ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। ৩৫।৫২

ছড়া ছবিতে জানোয়ার—শ্রীসুনির্মল বসু, শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক শিশু সাহিত্য সংসদ লিঃ ৩২এ, আপার সার্কুলার রোড হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲। ৩৪।৫২

মনের কথা—ডাঃ হরপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, ১১এ, কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট, শ্যামবাজার। মূল্য ২৲। ৩৬।৫২

স্বপ্ন ও সংগ্রাম—শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায় সাধনা মন্দির, ৫৫, নারায়ণ রায় রোড, বড়িষা। মূল্য ২৲। ৩৭।৫২

ভ্রম সংশোধন

গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখের দেশ পত্রিকায় ভক্তিধারা পুস্তকের সমালোচনায় প্রাপ্তিস্থান—১৫।১, শশিভূষণ রো প্রকাশিত হইয়াছে। উহা ১৫।১ শশিশেখর বসু রো হইবে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৮ই ফেব্রুয়ারী—লালকোর্তা দলের বিশিষ্ট নেতা কাজী আতাউল্লা গতকল্য পরলোকগমন করিয়াছেন।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু গতকল্য তাঁহার আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী নির্বাচনী সফর শেষ করিয়াছেন।

ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, লোকসভার উচ্চতর পরিষদ (রাষ্ট্র সভার) জন্য ২০০ জন সদস্য নির্বাচনের কাজ মার্চ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে।

আমেদাবাদের সংবাদে প্রকাশ, সৌরাষ্ট্রের নামজাদা ডাকাত ভূপতকে আশ্রয়দানের অভিযোগে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির গ্রেপ্তারের পর ব্যাপক তল্লাসীর ফলে ধ্রোল ও লিম্বদীর রাজপ্রাসাদ হইতে গাড়ী বোঝাই কার্তুজ, রিভলবার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে এ পর্যন্ত ৮০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—উড়িষ্যার রাজ্যপাল কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরীর নেতৃত্বে উড়িষ্যায় নূতন মন্ত্রিসভা নিয়োগ করিয়াছেন। সাধারণ নির্বাচনের পর উড়িষ্যায়ই সর্বপ্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

নয়াদিল্লীতে খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেন, "বাহির হইতে খাদ্য আমদানীর কথা চিন্তা না করিয়া আজ আমাদের এ ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া ওঠা প্রয়োজন।"

মাদ্রাজ হইতে আগত ডেকান এয়ারওয়েজের একখানি নৈশ ডাকবাহী বিমান অদ্য নাগপুর বিমান ঘাটিতে অবতরণ করিবার সময় বিধ্বস্ত হয় এবং তাহার ফলে তিন ব্যক্তি নিহত ও চৌদ্দজন আহত হয়।

লাহোর সেন্ট্রাল জেলে আটক সীমান্তের লালকোর্তা দলের নেতা খান আব্দুল গফুর খান গুরুতররূপে পীড়িত আছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

২০শে ফেব্রুয়ারী—শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত উড়িষ্যার নূতন কংগ্রেসী মন্ত্রি-সভার সদস্যগণ অদ্য শপথ গ্রহণ করেন।

অদ্য সাধারণ খাতে অতিরিক্ত মোট ৮৯ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়-বরাদ্দের দাবী সংসদে গৃহীত হয়।

দেশের অন্নভোজী অঞ্চলসমূহ বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহ যাহাতে প্রচুর পরিমাণে চাউল পাইতে পারে, তজ্জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা যায় তৎসম্পর্কে সুপারিশ করিবার পর অদ্য নয়াদিল্লীতে রাজ্য খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনের দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন শেষ হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে বিক্ষোভকারী এক ছাত্রদলকে ছত্রভংগ করার জন্য পুলিশে ১০ রাউন্ড গুলী বর্ষণ করে। ফলে একজন নিহত ও ১৬ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ৮ জনের অবস্থা গুরুতর। অদ্য হইতে ঢাকায় ১৪৪ ধারা বলবৎ করা হইয়াছে।

২২শে ফেব্রুয়ারী—আজ রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রী এন গোপালস্বামী আয়েংগার সংসদে ১৯৫২-৫৩ সালের রেলওয়ে বাজেট পেশ করেন। বাজেটে দেখা যায় যে, ১৯৫২-৫৩ সালে রেলওয়ে পরিচালনার দরুণ ২৫ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে।

অদ্য ঢাকা শহরে পুলিশ পুনরায় ছাত্র শোভাযাত্রাকারীদের উপর গুলী বর্ষণ করে। মোট ৫ জন নিহত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটি ৮ বৎসর বয়স্ক বালক আছে। গতকল্যকার গুলী বর্ষণের ফলে ৪ ব্যক্তি নিহত হয়। গতকল্য ও অদ্য পুলিশের গুলীতে মোট ৯ জন নিহত হইয়াছে।

অদ্য পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন কর্তৃক উত্থাপিত একটি বিশেষ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে বাঙলাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য পাক গণ-পরিষদের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে।

ভারত গভর্নমেন্টের বর্তমান প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীশ্রীপ্রকাশকে মাদ্রাজের রাজ্যপাল নিযুক্ত করা হইয়াছে।

পণ্ডিত রবিশংকর শুক্লের নেতৃত্বে ১০ জন সদস্য লইয়া মধ্যপ্রদেশের নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। মন্ত্রিসভায় ৬ জন সহকারী মন্ত্রীও থাকিবেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—বাঙলাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবীতে যে ছাত্র আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, অদ্য তাহার তৃতীয় দিবসেও ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হয়। অদ্য পুনরায় ঢাকায় রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে ভোর ৫টা পর্যন্ত কারফিউ জারী করা হইয়াছে।

শুক্রবার রাত্রি প্রায় আড়াই ঘটিকার সময় কলিকাতার শেরিফ কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি গত একমাস যাবৎ হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৫৫ বৎসর হইয়াছিল।

অদ্য সয়ম্সা রাজ্যের রাণী এবং উক্ত রাজ্যের বিখ্যাত কবি শ্রীশংকরদাস গাধাবীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সৌরাষ্ট্রে ডাকাতি সম্পর্কিত ব্যাপারে নিবারক-নিরোধ আইন অনুযায়ী তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য কানপুরে এক বিপুল শ্রমিক সমাবেশে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু শ্রমিক বীমা পরিকল্পনার উদ্বোধন করেন।

ভারত সরকারের টেক্সটাইল কমিশনারের নির্দেশে বোম্বাই-এর পুলিশ বোম্বাই শহরে পাঁচটি কাপড়ের কল হইতে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র আটক করিয়াছে।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অদ্য বোম্বাইয়ে শিশু সংস্কৃতি কেন্দ্র বালভবনের উদ্বোধন করেন।

আসাম বিধান সভার কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী রাজ্যপালের নিকট নূতন মন্ত্রীদের নামের তালিকা পেশ করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৮ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য কোরিয়া রণাঙ্গনে রাষ্ট্রপুঞ্জ ও কম্যুনিস্ট সৈন্যদল আক্রমণোদ্যোগ হস্তগত করিবার জন্য সংগ্রামে ব্যাপৃত হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের ট্যাংক ও পদাতিক সৈন্যরা কম্যুনিস্ট ব্যূহে আক্রমণ চালায় এবং কম্যুনিস্টরা পাল্টা জবাব দেয়।

পারস্যের প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ মোসাদেক অদ্য আন্তর্জাতিক ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ রবার্ট গার্নারের নিকট বলেন যে, বৃটিশ তৈল বিশেষজ্ঞদের পারস্যে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নই আর উঠে না।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য পানমুনজনে যুদ্ধ-বিরতি কমিশনের রাষ্ট্রপুঞ্জ ও কম্যুনিস্ট প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ গভর্নমেন্টের নিকট কোরিয়ায় চূড়ান্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করা সম্পর্কে একমত হওয়ায় আলোচনা সাফল্যের দিকে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে।

নরওয়ের বিখ্যাত লেখক নাট হামসুন গতকল্য ৯২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, জর্মানী দখল করিয়া থাকার সময় উত্তীর্ণ হইলে পর পশ্চিম জার্মানী কি কি অস্ত্র উৎপাদন করিতে পারিবে, সেই সম্পর্কে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রিত্রয় একমত হইতে পারেন নাই।

২১শে ফেব্রুয়ারী—মিশরের প্রধান মন্ত্রী আলী মেহের পাশা অদ্য বলেন যে, মিশরকে অবিলম্বে বৃটেনের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের সহিত নিরাপত্তা চুক্তি করার তিনি পক্ষপাতী।

২৩শে ফেব্রুয়ারী—গতকল্য অতলান্তিক পরিষদের সদস্য ১৪টি রাষ্ট্রের সম্মেলনে ৬টি রাষ্ট্রের ৫ লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া একটি ইউরোপীয় বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা অনুমোদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত ইউরোপীয় বাহিনীতে এক-চতুর্থাংশেরও বেশী থাকিবে জার্মান সৈন্য।

ভারতীয় মুদ্রাঃ প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষাণ্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থান মুদ্রাঃ প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষাণ্মাসিক— ১০৲ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

ঊনবিংশ বর্ষ] শনিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 8th March, 1952. [১৯শ সংখ্যা

পশ্চিমবঙ্গের অন্নসমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের বহু সমস্যার মধ্যে খাদ্য-সমস্যাই প্রধান। নির্বাচন-পর্ব শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের এই বিশেষ সমস্যাটির সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বঙ্গীয় বিধান সভায় পূর্ব এবং নবনির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই কাজ সম্পূর্ণ সময়োচিত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অন্নসমস্যা শুধু দলগত ব্যাপার নয়, রাষ্ট্রহিসাবেই ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা প্রয়োজন; সুতরাং বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও ডাক্তার রায়ের পরামর্শ করা উচিত এবং তাঁহাদের সকলেরই সহযোগিতা এক্ষেত্রে দরকার বলিয়া আমরা মনে করি। ডাক্তার রায় এই প্রসঙ্গে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের অন্ন-সমস্যা ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ প্রদেশ বলা যায়। লোকসংখ্যার অনুযায়ী এখানে চাউল উৎপন্ন হইয়াছে অনেক কম। সুতরাং রেশনিং এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখাতেও সমস্যা মিটিবে না। ঘাট্‌তি পূরণের জন্য ভারত সরকারের নিকট হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিতে হইবে। সে সাহায্য পাইলেও সমস্যা আছে। কারণ ভারত সরকারের হাতে চাউলের পরিমাণ খুবই কম। কেন্দ্র হইতে যে খাদ্যশস্য পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে চাউলের পরিমাণ কতটা ডাঃ রায় তাহা উল্লেখ করেন নাই। ইতঃপূর্বেই চাউলের অভাবের জন্য চাউলভোজী পশ্চিমবঙ্গবাসী-দিগকে কিছুটা আটা খাইতে অভ্যস্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু চাউল হ্রাসের মাত্রা শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। ইহার পর পশ্চিমবঙ্গে চাউলের বরাদ্দ কোনক্রমেই হ্রাস করা চলিতে পারে না। কিছুদিন পূর্বে ভারতের প্রধান মন্ত্রী চাউলভোজী প্রদেশগুলির দিকে তাকাইয়া আটাভোজী প্রদেশগুলিকে চাউল ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। নয়াদিল্লীতে আহূত খাদ্য-সম্মেলনে আটাভোজী কোন কোন রাজ্যের মুখপাত্রগণ জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা আদৌ চাউল গ্রহণ করিবেন না। এই ঘোষণা অনুযায়ী কাজ হয় এবং আটা খাইতে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ যদি চাউলের ভাগিদার না হন, তাহা হইলে ভাত খাইতে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের চাউলের অভাব অনেকটা অবশ্য মিটিতে পারে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকতর দৃঢ়তা দেখানো দরকার এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য চাউল বেশী পরিমাণে কেন্দ্র সরকারের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্যও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধিক করিয়া চাপ দেওয়া উচিত। ডাঃ রায় নবনির্বাচিত সদস্যগণকে খাদ্য-পরিস্থিতি নিজদিগকে উপলব্ধি করিতে এবং নিয়ন্ত্রণ প্রথা ও রেশনিং চালু রাখা যে প্রদেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য প্রয়োজন তাহা স্ব স্ব এলাকার জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে বলিয়াছেন। গোপন চালান এবং চোরা-বাজার বন্ধ করিবার জন্য জনমত সৃষ্টির গুরুত্বের উপরও তিনি জোর দিয়াছেন। এ সবই ভালো কথা; কিন্তু যে সরিষায় ভূত ছাড়াইতে হইবে সেই সরিষাতেই যে অনেক ক্ষেত্রে ভূত থাকিয়া যাইতেছে। খাদ্য-সম্পর্কিত সরকারী ব্যবস্থা এই সব দিক হইতে সার্থক করিতে হইলে সরকারী কর্মচারীদের সর্বপ্রকার দুর্নীতিমুক্ত হওয়া আগে দরকার এবং যাহারা লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া স্বার্থের ব্যাপার চালাইতে ব্যস্ত আছে, তাহাদিগকে আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করিবার জন্য শাসন-বিভাগের দৃষ্টি জাগ্রত থাকা প্রয়োজন। এই কর্তব্য যথাযথ হিসাবে প্রতিপালিত হইতেছে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পূর্ববঙ্গের ভাষা-আন্দোলন

মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষাস্বরূপে ধার্য করিবার দাবী কিছু অযৌক্তিক নয় এবং পূর্ববঙ্গবাসীদের এমন দাবী করিবার সঙ্গত অধিকার নিশ্চয়ই রহিয়াছে। কিন্তু এই দাবী সম্পর্কে অনর্থকর উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং আইন-বিরোধী বিশৃঙ্খলা ঘটে, ইহা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় নহে। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ আমাদের যথেষ্টই আছে এবং পূর্ববঙ্গবাসীরা আমাদের মাতৃভাষা বাঙলাকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, তৎপ্রতি আমাদের সহানুভূতি থাকিবে, ইহাও স্বাভাবিক। কারণ, পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম-বঙ্গ রাষ্ট্র হিসাবে দুই ভাগে বিভক্ত হইলেও সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সূত্রে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সংযোগ রহিয়াছে এবং সেজন্য পূর্ববঙ্গের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং সমগ্রভাবে তাহার রাষ্ট্র-নৈতিক উন্নতি আমরা একান্তভাবে কামনা করি। কারণ, জাতি হিসাবে আমাদের স্বার্থ তাহাতে রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায়

পূর্ববঙ্গবাসীদের ভাষা-সম্পর্কিত এই আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ হইতে সেখানে অনর্থ সৃষ্টির জন্য প্ররোচনা দেওয়া হইবে, এ যুক্তি একেবারেই ভিত্তিহীন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও অনেকে এই যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই ব্যাপার লইয়া পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে, তথাকার শাসন-বিভাগ কর্তৃপক্ষই প্রধানত এজন্য দায়ী। তাঁহারা যদি জনমতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া চলিতেন, তবে ব্যাপার এতটা গুরুতর আকার ধারণ করিত না বলিয়াই মনে হয়। ছাত্র ও তরুণের দল স্বভাবতঃই আবেগপ্রবণ এবং উচ্চ আদর্শের প্রেরণায় তাহাদের অন্তর স্পর্শ করিলে তাহারা সহজেই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। এরূপ অবস্থায় দলন-নীতি অবলম্বনের দ্বারা তাহাদের আন্দোলনকে পিষ্ট করিতে চেষ্টা না করিয়া সেই উদ্দীপনাকে সুষ্ঠুপথে পরিচালিত করিবার জন্য সরকারের নীতি প্রযুক্ত হওয়াই সমীচীন। ছাত্র ও তরুণদের মনোভাবকে রাষ্ট্রের কল্যাণ অভিমুখে যাহাতে সম্প্রসারিত হয়, ইহা করাই দরকার। দুঃখের বিষয়, পূর্ববঙ্গ সরকারের নীতি সে পথে পরিচালিত হইতেছে না। বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার এই সঙ্গত আন্দোলনের মধ্যে রাষ্ট্রবিরোধী বিভীষিকা জাগাইয়া তাঁহারা অকারণ ইহার মধ্যে একটা অবাঞ্ছনীয় সাম্প্রদায়িকতার ভাব আনিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছেন। বাস্তবিকপক্ষে রাষ্ট্র-হিসাবে পূর্ববঙ্গের পক্ষেও তাঁহাদের এই নীতি অনিষ্টকর; অধিকন্তু গণতান্ত্রিক চেতনা জাগরণের পক্ষে এমন নীতি প্রতিকূল। ফলত প্রগতি বিরোধী এ পথে উন্নত রাষ্ট্র-জীবন গঠিত হইতে পারে না। নিজেদের রাষ্ট্রের প্রতি দরদ বোধ পূর্ববঙ্গবাসীদের ক্ষুণ্ণ হোক, ইহা বাস্তবিকই কাহারো কাম্য নয়। প্রত্যুত সেই দরদের সূত্রে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সভ্যতা ও সংস্কৃতিগত সৌহার্দ্য দৃঢ় হইয়া উঠুক, আমরা শুধু এইটুকুই চাহি এবং ইহাতে আপত্তির কোন কারণও থাকিতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্যের সূত্রে এই দুই রাষ্ট্রের ভিতরকার সৌহার্দ্য কোন রাষ্ট্রেরই স্বাতন্ত্র্য মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গে তরুণদল বর্তমানে তাহাদের মাতৃভাষাকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, তথাকার কর্তৃপক্ষ যদি তৎপ্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন, তবে নিজেদের রাষ্ট্রের প্রতি তরুণদের দরদ আরও বাড়িবে এবং সভ্য রাষ্ট্রোচিত গণতান্ত্রিক রীতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে উভয় বঙ্গ পারস্পরিক উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হইতে সুযোগ লাভ করিবে; অধিকন্তু সেইভাবে বঙ্গ বিভাগজনিত অনেক সমস্যার স্বাভাবিক সমাধানের উপায়ও উন্মুক্ত হইবার আশা রহিয়াছে।

চারি মাসের বাজেট

ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীযুত চিন্তামন দেশমুখ সম্প্রতি ভারতীয় সংসদে ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট উত্থাপন করিয়াছেন। অর্থমন্ত্রী আপাততঃ করবৃদ্ধির কোন প্রস্তাব করেন নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে সে সম্ভাবনা যে না আছে, এমন ভরসাও তিনি দিতে পারেন না। কারণ, মাত্র চার মাসের সরকারী খরচ সঙ্কুলান করিবার উদ্দেশ্যেই সাময়িকভাবে এই বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে। নূতন মন্ত্রিসভা যখন নির্বাচিত সদস্যাদিগকে লইয়া গঠিত নূতন সংসদে সম্পূর্ণ বাজেট উপস্থিত করিবেন বাজেটের তখন প্রয়োজন মত পরিবর্তন বা সংশোধন হইবে। সুতরাং বর্তমান বাজেট অনেকটা বিশেষত্বহীন এবং নিয়ম রক্ষার ব্যবস্থা মাত্র। অর্থসচিবের হিসাব অনুসারে সরকারী আবশ্যক ব্যয় বাদেও বাজেটে ৯২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। কিন্তু বাজেটে কেবল উদ্বৃত্ত দেখাইলেই দেশবাসী সর্বসাধারণের আশা মিটিবে না। অর্থসচিব আমাদিগকে অনেক আশার কথা শুনাইয়াছেন। তাঁহার মতে গত জুলাই মাস হইতে দ্রব্যমূল্য ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে এবং শিল্পের উৎপাদন বাড়িয়াছে। সেই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতিজনিত সমস্যাও অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, অর্থসচিবের এসব আশ্বাস অনেকটা সরকারী হিসাবের খাতাপত্রেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা অদ্যাপি কিছুই কমে নাই। বস্তুত অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমানই রহিয়া গিয়াছে। এ সমস্যা যে কতদিনে মিটিবে, কিছুই বলা যাইতেছে না। বস্ত্রের সমস্যা যে আপাতত মিটিবে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব এমন আশ্বাস আমাদিগকে আজও দিতে পারেন নাই। খাদ্য-সরবরাহের ব্যবস্থা জটিল ও কঠিন। অর্থসচিব স্বয়ং সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় সরকারী বাজেটে কয়েক কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হওয়াতে আমাদের ভরসা কোথায়? পাব্লিক একাউণ্টস্ কমিটির রিপোর্টে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে সাধারণের অর্থের নানাভাবে অপচয়ের যে তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে মনে হয়, যেন সর্বাদিকে লুঠের কারবার শুরু হইয়াছে। এমন ব্যাপার যদি না চলিত তবে উদ্বৃত্ত আরও বাড়িত। যাহারা সাধারণের অর্থ লইয়া এমনভাবে ছিনিমিনি খেলিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইতেছে? এই সব তো আছেই; ইহার উপর সাধারণভাবে এই কথা বলা যায় যে খাদ্য-সম্পর্কে ভারত যতদিন পর্যন্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে না পারিবে এবং খাদ্যশস্যের জন্য তাহাকে পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে, ততদিন পর্যন্ত অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতি স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

রাজবন্দী-সমস্যা

নিরাপত্তামূলক নিরোধ আইনের [illegible] বর্তমান মাসেই শেষ হইবার কথা [illegible] ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব [illegible] সংসদে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া [illegible] আইনের মেয়াদ আরও ৬ মাসের [illegible] বাড়াইয়া লইয়াছেন। কিন্তু সত্যই [illegible] প্রয়োজন ছিল কি? স্বরাষ্ট্র-সচিব এই সম্পর্কে যে হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় সমগ্র ভারতে [illegible] প্রায় পনেরো শত ব্যক্তিকে এই আইনে আটক রাখা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ [illegible] বিগত নির্বাচনে জনসাধারণের [illegible] জোরে প্রাদেশিক বিধানসভা কিংবা [illegible] সংসদে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। [illegible] দরাবাদের পরেই এইরূপ রাজবন্দীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে বেশী। পশ্চিমবঙ্গে ৪৬ জন রাজবন্দীকে সম্প্রতি মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বিধানসভার নির্বাচিত ৩ জন সদস্য এবং সংসদের প্রতিনিধিস্বরূপ

নির্বাচিত একজন ● এখনও আটক আছেন। স্বরাষ্ট্র সচিব ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজবন্দীদের সম্বন্ধে যত দূর বিবেচনা করা দরকার তাহা শেষ করিয়াছেন। যাহাদিগকে এখনও আটক রাখা হইয়াছে, রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে হইলে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া যায় না। ভারতের স্বরাষ্ট্র-সচিব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবলম্বিত নীতির কথা নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু ৪৬ জন রাজবন্দীকে মুক্তি দান করিবার পরও আমরা এমন কথা শুনিয়াছিলাম যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজবন্দীদের সম্বন্ধে পুনরায় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সে বিবেচনা কি শেষ হইয়া গিয়াছে? বিনা বিচারে আটক রাখিবার পক্ষে যুক্তি উপস্থিত করিতে গিয়া স্বরাষ্ট্র-সচিব কম্যুনিস্টদের অবলম্বিত নীতি সম্বন্ধে দিকটাই বিশেষভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে কম্যুনিস্টদের মধ্যে কেহই হিংসাত্মক নীতি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। বস্তুত যুক্তি এখানে দলগত নীতির দিক দিয়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। এদিক হইতে বিচার করিতে গেলে কম্যুনিস্ট মাত্রেই রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু কম্যুনিস্টদের মধ্যে যাঁহারা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁহারাও অনেকেই স্বাধীন নাগরিকতা উপভোগ করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে হিংসাত্মক নীতিতে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস বিশেষ একটি মত-সম্পর্কিত ব্যাপার; ফলত তদ্দ্বারা হিংসাত্মক কার্য ছাড়া যে কম্যুনিস্টদের পক্ষে অন্য কিছু কৃত্য থাকিতে পারে তাহা বুঝায় না। সম্পূর্ণ শান্তির সঙ্গে যেভাবে বিগত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে দেশের লোক যে অশান্তি বা উপদ্রব চাহে না, ইহা স্পষ্ট হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় জনমতকে মর্যাদা দেওয়াই সরকার পক্ষে উচিত ছিল। কম্যুনিস্টরা যদি অনর্থক অশান্তি এবং উপদ্রব সৃষ্টির উপরই জোর দিতেন, তাহা হইলে দেশবাসীর আস্থা হইতেই তাঁহারা বিচ্যুত হইতেন এবং সরকারের পক্ষেই জনমত প্রবল আকার ধারণ করিত। বাস্তবিকপক্ষে সেরূপ ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে শান্তি এবং নিরাপত্তা বিধানের মত ক্ষমতা সাধারণ আইনেই কর্তৃপক্ষের হাতে যথেষ্ট রহিয়াছে। পরন্তু প্রয়োজন হইলে সরকার বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারী করিতেও পারিতেন। প্রত্যুত জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের ভাব যেভাবে দেখা দেয়, কম্যুনিস্টরা সেখানেই জোর পায়। সুতরাং কম্যুনিস্টবাদের অনিষ্টকারিতা হইতে দেশ ও জাতিকে যদি সত্যই মুক্ত করিতে হয়, তবে সরকারী নীতি সম্বন্ধে জনসাধারণের মন হইতে অসন্তোষের ভাব দূর করিয়া সহযোগিতার প্রবৃত্তি সাধারণভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলাই প্রথমে প্রয়োজন। বস্তুত বিনা বিচারে আটক রাখিবার সরকারী নীতিকে কম্যুনিস্টরা নিজেদের মতবাদের জোর বাড়াইবার পক্ষে অন্যতম সুযোগ-স্বরূপেই গ্রহণ করিবে; পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত এবং কৃষক শ্রেণীর মধ্যে তাহারা যে কিছুটা সুবিধা করিয়া লইয়াছে, বিগত নির্বাচনেই সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের ভাব সৃষ্টি করিবার পক্ষে কম্যুনিস্ট দলকে আরও সুযোগ না দেওয়াই কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল। ফলত জনসাধারণের সহযোগিতায় বিশ্বাস ও জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধির ভিতর দিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি গড়িয়া উঠে এবং সে পথ ধরিলে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় কার্যত অন্তরায় ঘটে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

সবার উপর মানুষ সত্য

চিৎনদ্রীয় সম্পদ সোনা-রূপার পরিমাণে নির্ণীত হয় না, বস্তুত কারখানা ও শস্য ক্ষেত্রের উৎপাদনই দেশকে সমৃদ্ধ করে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গত ২রা মার্চ চিত্তরঞ্জনে শ্রমিকদের এক বিরাট সমাবেশে এই অভিমত ব্যক্ত করেন। শ্রমিকদিগকে সম্বোধন করিয়া পণ্ডিতজী বলেন, আপনারা নিজেদিগকে একটি বৃহৎ কারখানার শ্রমিক মাত্র মনে করিবেন না, আপনারা নিজেদিগকে ইহার অংশীদার বলিয়াও মনে করিবেন। আপনাদের কাজ যত নিম্নস্তরের হোক না কেন, নব ভারত গঠনে এক একজন সাহায্যকারী বলিয়াও অবশ্যই গর্বানুভব করিবেন।" আদর্শের দিক হইতে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর উপদেশ খুবই উচ্চাঙ্গের সন্দেহ নাই; কিন্তু জাতির বৃহত্তর স্বার্থের এই উচ্চাদর্শ তাহারা কতটা উপলব্ধি করিতে পারিবে, এই বিষয়েই আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়। কারণ, সাধারণ মানুষের মন, অপেক্ষাকৃত জড় জিনিস। ব্যক্তিগত জীবনের পরিপ্রেক্ষা বা অবস্থার উপরই তাহা সাধারণত নির্ভর করে। যাহারা উচ্চপদস্থ তাহারা নিজেরা জীবনের যে সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেন, তাহার তুলনায় নিজেদের অবস্থার সম্বন্ধে শ্রমিকদের মনন বিবেচনা করিতে গেলে বাস্তবের আঘাতে আদর্শের স্বপ্ন ভাঙিয়া যাইবে, ইহা স্বাভাবিক। শ্রমিকদের কাজ নিম্নস্তরের বলিতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, আমরা ঠিক ধরিতে পারিলাম না; প্রকৃতপক্ষে যে কাজের সঙ্গে বৃহৎ জীবনের সম্পর্ক রহিয়াছে, তেমন কোন কাজই আমরা নিম্নস্তরের বলিয়া মনে করি না। শ্রমের মর্যাদা সকল ক্ষেত্রেই সমান, গতানুগতিক সংস্কারগত কতকগুলি ধারণাই আমাদের মধ্যে বৈষম্যবোধ সৃষ্টি করিয়া থাকে। ফলতঃ আমরা ছোট কাজ ও বড় কাজের গণ্ডী বাঁধিয়া নিজেদেরই অহঙ্কৃত মনোবৃত্তিকে তুষ্ট ও পুষ্ট করিয়া থাকি। দুঃখের বিষয় এই যে, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আমরা প্রকৃত সেবার আদর্শ বিস্মৃত হইয়াছি, রাজনীতিক নেতাগিরি না হইলে আমাদের মনের স্ফূর্তি জাগে না। কংগ্রেসের আদর্শে এইখানেই দুর্বলতা ঢুকিয়াছে এবং এইভাবে আমরা মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বস্তুত, এই পথ উন্নতির পথ নয়। এই ভ্রান্ত-নেতৃত্বাভিমান হইতে যদি আমরা নিজেরা মুক্ত হইতে সমর্থ না হই এবং জনসাধারণের সুখে দুঃখে তাহাদের সঙ্গে সমমর্যাদার ভিত্তিতে কাজ করিতে অগ্রসর না হই, তবে বড় বড় উপদেশে কোনই কাজ হইবে না, অধিকন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহও অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। সেদিন বিশ্বভারতীর আচার্যস্বরূপে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর আদর্শ জাতির সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। অনাড়ম্বর মানবসেবার পথে জাতির সংগঠনই নবভারতের স্রষ্টা এই মহামানবদ্বয়ের জীবনের আদর্শ। সে আদর্শের নৈতিক ভিত্তিকে যদি আমরা আশ্রয় করিতে না পারি, তবে শুধু যন্ত্র-বিজ্ঞানের সাধনায় আমাদের দুঃখ দূর হইবে না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

বসন্তবাহার

সুশীল রায়

শরতের কোনো গান যদি জানা থাকে
এই দীর্ঘ অবসরে একবার শোনাও আমাকে।
বর্ষার রোদন দিয়ে গান শুরু কখনো ক'রো না,
সে বড় বিস্বাদ, স্বাদ ঠেকে বড় লোনা।

হেমন্তের কোনো গান শিখে থাক যদি
সে গানের শ্রোতা আমি, জেনে রেখো, একান্ত দরদী।
শ্রাবণের গান দিয়ে ক্রন্দনের ক'রো না রেওয়াজ
বহু তিক্ততার পরে চরিতার্থ করো তুমি আজ।

যদি শিখে থাক কোনো শীতার্ত সংগীত
তার দু'টি কলি বলো, দাও তার সামান্য ইঙ্গিত।
বিষণ্ণ আষাঢ় দিয়ে অকারণে ক'রো না বঞ্চনা—
সে বড় বিস্বাদ ঠেকে, ঠেকে বড় লোনা।

যদি পার একবার বাজাও বৈশাখ
বর্ষণ রোদন কান্না সেই সুরে ধুয়ে-মুছে যাক।
শোকের বিলাস ব'লে ভালো যাকে আদপে বাসি না—
পরিতৃপ্ত হব, যদি গান দিয়ে করো তাকে ঘৃণা।

চোখ বুজে এক-মনে তারে-তারে বাজিয়ে ঝংকার
কত কী খুঁজল যেন উদারার মুদারা-তারার;
তানপুরা ছুঁড়ে ফেলে বলল সে, 'কিছু জানা নেই—
তোমাকে শোনাব ব'লে খুঁজি শুধু বসন্তের খেই।'

মেঘডম্বরু

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নেই তার রাত্রি। নেই দিন। প্রাণবীণার ঝঙ্কারে
সুরের সহস্র পদ্ম ফুটে ওঠে অতল অশ্রুর
সরোবরে, যন্ত্রণার ঢেউয়ের আঘাতে। সেই সুর
খুঁজে ফিরি রাত্রিদিন। হৃদয়ের বৃন্তে নিরবধি
মুদ্রিতনয়ন পদ্মে যদি না সে শতলক্ষধারে
মন্ত্রবারি ঢালে, তার পাপড়িতে পাপড়িতে যদি না সে
জেগে থাকে নিষ্পলক তবে সে নিষ্ফল, না-ই যদি
ঝড়ের ঝঙ্কার তোলে এই মেঘডম্বরু আকাশে।

আকাশ স্তম্ভিত। মন গম্ভীর। কখন গুরু গুরু
গানের উদ্দাম ঢেউ সমবেত কণ্ঠের আওয়াজে
ভেঙে পড়ে। পুঞ্জীভূত মেঘের মৃদঙ্গে পাখোয়াজে
বাজে তার সঙ্গতের বিলম্বিত ধ্বনি। বারে বারে
জীবন লুণ্ঠিত যার, গানে তার উজ্জীবন শুরু;
প্রাণ তার পরিপূর্ণ মন্ত্রময় গানের ঝঙ্কারে।

ঔপন্যাসিক ন্যুট-হামসুন

গোপাল ভৌমিক

সম্প্রতি **৯২** বৎসর বয়সে নরওয়ের বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক ন্যুট্ হামসুনের মৃত্যু সংবাদ ঘোষিত হয়েছে। পরিণত বয়সে তাঁর এ মৃত্যু শোকাবহ না হলেও বিশ্বের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর এ মৃত্যু শোকের বার্তাই বহন করে এনেছে। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বের উপন্যাস-সাহিত্যে যে স্থান শূন্য হল তা আর কোন দিন পূর্ণ হবে কিনা সন্দেহ। নরওয়ে ইউরোপ মহাদেশের উত্তর দিকবর্তী ক্ষুদ্র একটি দেশ। সে দেশের ভাষা দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে বড় একটা পরিচিত নয়। দেশ ক্ষুদ্র হলেও সে দেশের সাহিত্যিক সমৃদ্ধি কিন্তু মোটেই নগণ্য নয়। গত এক শতাব্দীর মধ্যে মধ্যে হলেও এ দেশের অন্তত চারজন সাহিত্যিক আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন এবং নানাভাবে বিশ্বের সাহিত্য জগৎকে প্রভাবিত করেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে যুগান্তকারী নাট্যকার হেনরিক্ ইবসেনের নাম। তিনি তাঁর নাট্যসাহিত্যের মাধ্যমে সারা ইউরোপের নাট্যজগতে রেনেশাঁর প্রবর্তন করেছিলেন। এর পরেই যে তিনজন সাহিত্যিকের নাম মনে পড়ে তাঁরা তিনজনেই ঔপন্যাসিক—ন্যুট্ হামসুন্ যোয়ান বোয়েরের ও সিগ্রিড্ উন্ডসেট্। এঁদের মধ্যে আবার ন্যুট্ হামসুন্ ও সিগ্রিড্ উন্ডসেট্ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। যে দেশে একশ' বছরের মধ্যে চারজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্বজয়ী সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে সে দেশের ভাষা ও সাহিত্য যে আদৌ নগণ্য নয় সেকথা না বললেও চলে। উপরে উল্লেখ করে যে চারজন সাহিত্যিকের নাম করলাম তাঁদের প্রত্যেকের বই পৃথিবীর সব ভাষায় অনূদিত ও সমাদৃত হয়েছে।

পারিবারিক পটভূমিকা

যে পরিবারে ন্যুট্ হামসুন্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও যে সামাজিক পরিবেশে তিনি মানুষ হয়েছিলেন তার যথাযথ পর্যালোচনা করলে ন্যুট্ হামসুনের বিশ্ববিজয়ী সাহিত্যিক প্রতিভার মূল সূত্র বড় একটা আবিষ্কার করা যায় না। বরং এ পটভূমিকায় আলোচনা করলে তাঁর প্রতিভাকে মনে হয় বিস্ময়কর সর্বজয়ী। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের প্রতি পৃষ্ঠায় অবশ্য তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের ছবি ছড়িয়ে আছে। কিন্তু নরওয়ের সামান্য একটি কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং জীবনে শিক্ষা-দীক্ষার কোন সুযোগ না পেয়েও তিনি যে কি করে এত বড় সাহিত্যিক হলেন তা ভেবে পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রথম জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে নানা ক্ষেত্রে তাঁর লড়াই করতে হয়েছে বলে তাঁর জীবনে অভিজ্ঞতা ছিল বহু-বিচিত্র এবং এই বহু-বিচিত্র অভিজ্ঞতার তীব্র অনুভূতিই তাঁকে করে তুলেছিল সাহিত্যিক। ভাগ্যের হাতে একটির পর একটি নির্মম আঘাত খেয়েছেন তিনি—কিন্তু সে আঘাতে তিনি ভেঙে পড়েননি—বরং ভাগ্যকে জয় করার দুর্দমনীয় স্পৃহা জেগেছে তাঁর মনে। একাগ্র নিষ্ঠার ফলে তাঁর সে স্পৃহা ফলপ্রসূ হতেও বিলম্ব হয়নি। তাঁর ধমনীতে কৃষকের রক্ত ছিল বলেই শত বাধা-বিপত্তিতেও তিনি ভেঙে পড়েননি। প্রকৃতির বিরুদ্ধে নির্মম লড়াই করে যে কৃষককে দিনের পর দিন বাঁচতে হয় তার চরিত্রে থাকে এমনই দুর্দমনীয় তেজ ও জিগীষা। এরূপ বহু কৃষকের চরিত্র আছে হামসুনেরই উপন্যাসে।

হামসুনের পিতার নাম ছিল পিডার পিডারসেন মাতার নাম টোরা ওলস ডেটার। তাঁর পিতা ছিলেন খাঁটি কৃষক। পাড়াগাঁয়ে দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মেছিলেন বলে জীবনে হামসুন্ শিক্ষা-দীক্ষারও সুযোগ পান নি। যে শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন সে শুধু তাঁর নিজের চেষ্টায়—স্কুল কলেজের বাইরে। কিন্তু ছোট বয়েস থেকেই বড় হবার একটা দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মনে এবং সেই আকাঙ্ক্ষার টানে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন—দেশ ও বিদেশে। নিছক বেঁচে থাকবার তাগিদে জীবনে তিনি কাজও করেছেন নানা ধরণের। স্টোরে ও ডাকঘরে কেরাণীগিরি করেছেন তিনি, কৃষিকার্য করারও চেষ্টা করেছিলেন কিছুদিন, গ্রামের স্কুলে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মাস্টারীও করেছিলেন এবং আমেরিকায় গিয়ে জীবিকা বিপন্ন হওয়ায় সাধারণ বাসের কণ্ডাক্টরও তাঁকে হতে হয়েছিল। লেখায় আত্মনিয়োগ করেন তিনি **১৮৮৯** খৃষ্টাব্দে প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে। আগে বলতে ভুলে গেছি যে ন্যুট্ হামসুন্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা আগস্ট তারিখে। লেখায় আত্মনিয়োগ করার পর প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তিনি নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য সাধনা করেছিলেন। কিন্তু তথাকথিত অন্য দশজন সাহিত্যিকের মত খ্যাতি ও প্রগতির মোহ তাঁকে নগরবাসী করে তুলতে পারে নি। প্রথম জীবনে আত্মরক্ষার তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নগর ও সভ্যতার যে নিষ্ঠুর রূপের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন তা তাঁকে করে তুলেছিল নাগরিক সভ্যতা-বিদ্বেষী। তা ছাড়া তাঁর ধমনীতে যে কৃষক রক্ত ছিল তারও টান ছিল মৃত্তিকামুখী। এই কারণে শেষের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর আমরা আবার দেখি হামসুনের কৃষক রূপ। তিনি নরওয়ের গ্রিমস্টাড্ নামক স্থানে একটি কৃষি ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সপরিবারে এখানেই বস-

মধ্য বয়সে নুট হামসুন

বাস করতেন। এই গ্রিমস্টাডেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি ম্যারী অ্যান্ডারসেন্ নাম্নী একটি ভদ্রমহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রেখে গেছেন। গ্রিমস্টাডে কৃষিকার্যের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য রচনাও হামসুন্ করতেন। বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জনের পর এইভাবে লোকচক্ষুর আড়ালে গ্রামে গিয়ে বাস করার নিদর্শন সাহিত্য জগতে বড় একটা পাওয়া যায় না। নাগরিক সভ্যতার প্রতি হামসুনের বিদ্বেষ যে অকপট ছিল এবং গ্রামীণ সংস্কৃতি ও প্রকৃতির প্রতি দরদ যে ছিল অকৃত্রিম এর থেকে সে কথাই প্রমাণিত হয়। হামসুনের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'দি রোড্ লীড্স্ অন্' (The Road Leads on) ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত। সাহিত্য সৃষ্টির দিক থেকে তাঁর জীবনের শেষ ১৫।২০ বৎসর অনেকটা বন্ধ্যা। একেবারে শেষ দিকে তিনি অনেকটা অকর্মণ্য ও স্থবির হয়ে পড়েছিলেন।

হামসুনের মৌলিকত্ব

উপরে হামসুনের ব্যক্তিগত জীবনের যে মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হল তা চোখের সামনে রাখলে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মূল্য যাচাই করা সহজ হয়। কেননা হামসুনের উপন্যাস সাহিত্য অনেকাংশে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতাকে তীব্র অনুভূতির সাহায্যে নানারূপে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর উপন্যাস সাহিত্যের মাধ্যমে। অনুভূতি-রঙীন এই ব্যক্তিক স্পর্শ আমরা পাই ইংরেজ ঔপন্যাসিক ডি এইচ লরেন্সের মধ্যেও। আর একটি ক্ষেত্রেও উভয়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ডি এইচ লরেন্সের উপন্যাস-গুলিতে গ্রন্থকার স্বয়ং নানারূপে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছেন একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। হামসুনের উপন্যাস সাহিত্যও কার্যত সেইরূপ। হামসুন নিজের বহু বিচিত্র ব্যক্তিত্বকেই টুকরো টুকরো করে ভেঙে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। তাই হামসুনের ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়ে আমরা তাঁর উপন্যাসের বিচার করতে পারি না।

আর একটি বিষয়েও হামসুনের সঙ্গে লরেন্সের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। হামসুন তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে যে বাণী প্রচার করতে চেয়েছেন তা হল প্রকৃতি ও মৃত্তিকার ক্রোড়ে ফিরে যাবার বাণী। সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ যেন তাঁর সহজাত। নাগরিক সভ্যতাকে বাদ দিয়ে মানুষের আদিম প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির বন্দনাই তিনি গেয়ে গেছেন। লরেন্সের কণ্ঠ হামসুনের মত স্পষ্ট না হলেও তিনিও ছিলেন অনেকটা এই মতবাদে বিশ্বাসী এবং নানাভাবে আমাদের কৃত্রিম সভ্যতাকে তিনি কশাঘাত করে গেছেন। পৃথিবীর প্রগতিবাদে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা হয়তো হামসুনকে প্রতি-ক্রিয়াশীল আখ্যা দেবেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছুই আসে যায় না। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের গায়ে প্রগতি বা প্রতিক্রিয়ার লেবেল না এঁটেও স্বচ্ছন্দে একথা বলা চলে যে বিশ্বের উপন্যাস সাহিত্যে যে সমৃদ্ধি সাধন তিনি করে গেছেন তা দীর্ঘদিন বিশ্ব-বাসীদের মনে থাকবে।

হামসুনের বই পড়লে প্রথমেই দুটি পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে মৃত্তিকাস্পর্শী মানুষের সজীবতা ও সতেজতার সন্ধান তো আমরা পাইই—সেই সঙ্গে দেখতে পাই দ্বিধা দ্বন্দ্বে প্রপীড়িত আত্মানুসন্ধানে নিরত একটি অন্তর্মুখী মনের পরিচয়। এই দুটি পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ একত্রে দেখে হামসুনেরই বিচিত্র ব্যক্তিত্বের ছবি ফুটে ওঠে আমাদের চোখের উপর। আধুনিক সভ্যতা ও যান্ত্রিক জীবনের সংস্পর্শে এসে মানসিক দ্বিধা দ্বন্দ্বের অধিকারী তিনি যেমন হয়েছিলেন, তেমনি প্রকৃতির প্রতি, মাটির আকর্ষণও তাঁর ছিল পূর্ণ মাত্রায়। স্কান্ডি-নেভিয়া ও আমেরিকার শহরে শহরে যত মধুর যত অভিজ্ঞতাই তাঁর জীবনে এসে থাকুক, যৌবনের এই চঞ্চল পরিক্রমার মধ্যে মুহূর্তের জন্যেও তিনি ভুলতে পারেননি তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত কৃষক-রক্তের কথা। তাই খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েও তিনি বিনা দ্বিধায় চির

যেতে পেরেছিলেন আপাতদৃষ্টিতে অনাড়ম্বর ও বৈচিত্র্যহীন পল্লীজীবনে। প্রকৃতির প্রতি, মাটির প্রতি কত বড় আকর্ষণ থাকলে এ প্রত্যাবর্তন সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। তথাকথিত সভ্য মানুষ ও নাগরিক জীবনের স্বরূপ তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন বলেই এমনভাবে তাদের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিতে পেরেছিলেন। হয়তো এক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি খানিকটা একপেশে, বিচার খানিকটা একরোখা—কিন্তু নাগরিক সভ্যতার মোহে পড়ে তিনি যে তাঁর আদি ও অকৃত্রিম রূপকে অস্বীকার করেন নি—এ কৃতিত্ব কি বড় কম? সেদিন একখানি বহু প্রসিদ্ধ ও দীর্ঘকাল ধরে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক জীবনী গ্রন্থে নুট হামসুনের সংক্ষিপ্ত জীবনী পড়তে গিয়ে দেখি যে তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথমেই লেখা হয়েছে কৃষিজীবী। এ দেখে রসবোধসম্পন্ন যে কোন লোকের পক্ষেই ধৈর্য সংবরণ করা কঠিন। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে সাহিত্যিক হিসাবে নুট হামসুন আজ বিশ্বপ্রসিদ্ধ হলেও তাঁর আদি ও অকৃত্রিম রূপ হল কৃষকের। তাই তিনি এমন দ্বিধাহীন চিত্তে মানুষকে ডেকে বলেছেন: তোমরা শান্তি ও মোক্ষ লাভের আশায় শহরের কৃত্রিম সভ্যতার জালে জড়িয়ে পড়ো না। সত্যই যদি এ দুটি জিনিস চাও তবে ফিরে যাও প্রকৃতির কোলে ধরিত্রী মাতার বুকে। প্রাচ্যের কাছে এ আহ্বান নতুন না হলেও পাশ্চাত্য সাহিত্যে এমন করে এ আহ্বান তাঁর আগে আর কেউ জানায় নি। তাই হামসুনের মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব তাই সেদিন পাশ্চাত্য জগৎকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

দুটি মূল সুর

হামসুনের সমগ্র উপন্যাস সাহিত্য পর্যালোচনা করলে মোটামুটি দুটি মূল সুরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। তার একটি হল হামসুনের দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও অপরটি হল হামসুনের দৃষ্টিতে প্রেম। আর এ দুটি দিয়েই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সমুজ্জ্বল। তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাসগুলি যেমন 'হাঙ্গার' 'শ্যালো সয়েল', 'মিস্টিজ' ও 'প্যান' পড়লে দেখা যায় যে একদল ঘরছাড়া দিকহারা নায়ক নিয়ে তিনি [illegible] রচনা করেছেন। তারা যেন পথের সন্ধানে চঞ্চল হয়ে ফিরছে। পথের সন্ধানে তারা কখনও ছুটে চলেছে নগরীতে, ফিরে আসছে নিবিড় বনানীর স্নেহচ্ছায়ায়, আবার সান্ত্বনা পেতে চাইছে কোমল নারীদেহের মাদকতা সৃষ্টিকারী উষ্ণতার মধ্যে। কিন্তু পথের সন্ধান তারা বড় একটা পাচ্ছে না। তার কারণ বোধ হয় হামসুন নিজেও তখনও তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ খুঁজে পাননি।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত 'হাঙ্গার' নামক উপন্যাস একদা ইউরোপীয় সাহিত্যে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আজকের দিনে হামসুনের মহত্তর অন্যান্য সৃষ্টির কাছে 'হাঙ্গার'কে মনে হয় ম্লান ও নিষ্প্রভ। যৌবনের উচ্ছ্বাস ও আবেগ এ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য—এর আঙ্গিকও ত্রুটিপূর্ণ। ক্ষুধার তাড়নায় প্রতিভাবান একটি যুবক কি করে কর্মব্যস্ত এক মহান নগরীতে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে তাই হল 'হাঙ্গারে'র মূল উপজীব্য। গল্পের গাঁথুনি অত্যন্ত শিথিল, চরিত্র সৃষ্টিও উল্লেখযোগ্য নয়। তবে আত্মবিশ্লেষণের দিক থেকে এ বইখানি চমৎকার। মাঝে মাঝে বই পড়তে পড়তে মনে হয় যেন বুভুক্ষু নিপীড়িত মানবতার অসংলগ্ন প্রলাপোক্তি শুনছি অথবা এমন কোন স্বপ্নলোকের কাহিনী যেখানে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের সীমারেখা গেছে বিলুপ্ত হয়ে। কিন্তু বইখানি হামসুনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ ফল বলে উপন্যাস হিসাবে এর মধ্যে যত ত্রুটিই থাক কৃত্রিমতার সুর বড় একটা কানে বাজে না। 'হাঙ্গারে'র পর আরও কয়েকটি উপন্যাসে আমরা এমনই ধরনের চরিত্রেরই সন্ধান পাই পর পর। এই ঘরছাড়া দিকহারার দল সামাজিক কোন বন্ধন মানে না, স্বীকার করতে চায় না পারিপার্শ্বিককে অথচ তারা যে কি চায় তাও স্পষ্ট করে বোঝা যায় না। 'হাঙ্গারে'র পরই হামসুনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বই হল 'মিস্টিজ'।

'মিস্টিজ' বইখানি অনেকটা 'হাঙ্গারে'রই সমগোত্র। এ বইয়ের নায়ক আধুনিক বুদ্ধিবাদী ন্যাগেল নানাবিধ দ্বিধাদ্বন্দ্বে প্রপীড়িত। নিজের মন নিয়েই তার নাড়াচাড়া বলে অবচেতন মনের অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এ গ্রন্থে। সেইসঙ্গে আছে ড্যাগনি বলে একটি মেয়ের প্রতি তার আকস্মিক ও অহেতুক প্রেম। নায়ক ন্যাগেল যে কি চায় স্পষ্ট করে বলা দুষ্কর। সে যেমন প্রতিভাও হতে পারে তেমনি আত্মকেন্দ্রিক ও বিকৃত মস্তিষ্কও হতে পারে। এ উপন্যাসটির গঠনও অদ্ভুত ধরনের—সেই শিথিল গাঁথুনি, যোগাযোগহীন ঘটনাপ্রবাহ ও দীর্ঘ স্বগতোক্তি। সারা বই-এ ঘটনা সংঘাত নেই বললেই চলে। এ যেন জীবনের কতকগুলি সংযোগহীন স্থির মুহূর্তের সমাবেশ, জীবনের অনেকগুলি খণ্ডকে একসঙ্গে গাঁথবার চেষ্টা। বই পড়লে বোঝা যায় যে বাস্তব পারিপার্শ্বিক বর্ণনা করা অপেক্ষা আত্মসমীক্ষার দিকেই হামসুনের ঝোঁক বেশী। কিন্তু হামসুনের সাহিত্যিক জীবন বিবর্তনে এ গ্রন্থখানির একটা বিশেষ মূল্য আছে। হামসুনের যে প্রকৃতিপ্রবণতা আছে তার প্রথম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই এই 'মিস্টিজ' গ্রন্থের মধ্যে। এই প্রকৃতিপ্রবণতা অবশ্য আরও ভালভাবে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'প্যান'-এর মধ্যে। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে 'প্যান' তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাসগুলির মধ্যে সব চেয়ে বেশী পরিচিত।

'প্যানে'র নায়ক লেফটেন্যাণ্ট গ্লানও 'হাঙ্গার' ও 'মিস্টিজ' গ্রন্থের নায়কদের মতই অশান্ত, বিক্ষুব্ধ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে আচ্ছন্ন। কিন্তু লেঃ গ্লান শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির কোলে প্রত্যাবর্তনের পথে জীবনের সঙ্গে একটা আপোষ রক্ষা করে শান্তি খুঁজে পায়। এ গ্রন্থের 'প্যান' নামও তাই সার্থক। 'প্যান' হলেন গ্রীক পুরাণের শস্য দেবতা। এই কথাটি থেকে ইংরেজীতে প্যানথিজম্ (pantheism) বলে একটা কথার সৃষ্টি হয়েছে যার অন্তর্গূঢ় অর্থ হল প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মীভূত ভাব—প্রকৃতির মধ্যে জীবনের সব কিছু আবিষ্কার করা। এই প্যানথিজম্ হামসুনের

সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রধান সুর। তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসের মধ্যেই এর স্পষ্ট প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। 'গ্রোথ অব দি সয়েল' নামক তাঁর পরবর্তী ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে এই মতবাদ আরও সুন্দর ও শিল্প-সম্মতরূপে পেয়ে ফুটে উঠেছে। 'প্যান্' উপন্যাসে প্রকৃতির সঙ্গে লেঃ গ্লানের একাত্মীভবনের এমন এক একটি বর্ণনা আছে যা হৃদয়ানুভূতি ও সাবলীলতার দিক থেকে কবিতার পর্যায়ে উঠেছে। ইংরেজী তর্জমার মাধ্যমে হামসুনের সাহিত্যের যেটুকু রস আমরা উপভোগ করতে পারি তাতেই যখন এই অবস্থা তখন মূল ভাষায় তাঁর সাহিত্যে কাব্যরস না জানি কতই উপভোগ্য!

'প্যান্' বইটি আর একটি দিক থেকেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রেম ও যৌনজীবন সম্বন্ধে হামসুনের যে স্বতন্ত্র ও অভিনব মতবাদ ছিল তারও প্রথম সার্থক প্রকাশ দেখি আমরা 'প্যান'-এ। তাঁর রচিত চরিত্র-গুলির মধ্যে আমরা সাধারণত প্রেমের দ্বিবিধ প্রকাশ দেখতে পাই। হামসুনের গ্রন্থগুলিতে এক ধরণের চরিত্র আমরা পাই যারা আধুনিক সভ্যতা-সঞ্জাত কোন প্রকার বাধের ধার ধারে না। তাদের কাছে প্রেম যৌনতারই নামান্তর মাত্র স্পষ্টই মনে হয় তারা যেন সামাজেলের প্যান্-এর প্রভাবে সমাচ্ছন্ন। তাদের সে যৌনজীবন অনেকটা 'পশু ও পাখীর মত' অবারিত ও বাধ-বিহীন। হামসুনের গ্রন্থে এ ধরণের যৌনতা প্রধান চরিত্রের অভাব নেই। 'প্যান'-এর নায়িকা 'এডোয়ার্ডা' বেনোনি ও রোজা এবং আরও অসংখ্য চরিত্র আছে এই ধরণের। আর শুধু পুরুষ চরিত্রই নয় অসংখ্য নারীচরিত্রও আছে এই জাতের। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 'বিফোর দি গেট অব কিংডম' নামক নাটকের থ্যু কারেনো, 'রোজা'র নায়িকা এডোয়ার্ডা, 'গ্রোথ অব দি সয়েলে'র বারব্রো ও অংশত ইঙ্গার, 'উইমেন অ্যাট দি পাম্প' এর অলিভারের স্ত্রী ও 'ভ্যাগাবন্ডস'এর আন্ মেরিয়া। এই ধরণের যৌনতা-প্রধান প্রেমিক চরিত্রের একটা সার্থক রূপায়ন আমরা দেখতে পাই তাঁর 'দি ওয়েস অব লাইফ' নামক একটি গল্পে। এ গল্পে দেখা যায় যে একটি তরুণী বধূর বৃদ্ধ স্বামী মারা গেছে এবং তার বৃদ্ধ স্বামীর মৃতদেহ ঘরে রেখে সেই তরুণী পাশের ঘরে এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে নিবিড় যৌনপ্রেমে মধুর রজনী যাপন করেছে।

হামসুনের আর এক ধরণের প্রেমিক চরিত্র হল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরা মূলত অন্তর্মুখী—নিজেদের মনের অতল রহস্য নিয়ে নাড়াচাড়া করাই এদের অভ্যাস। এরা প্রেমে পড়ে অথচ সাহস করে সে প্রেমের কথা ব্যক্ত করতে পারে না। অকারণে প্রেমিক বা প্রেমিকাকে দূরে ঠেলে দিয়ে এরা তাদেরও যেমন কষ্ট দেয় নিজেরাও তেমনি তীব্র অনুশোচনায় পুড়ে মরে। এই সব চরিত্রের মধ্যে মর্ষণ কাম অত্যন্ত প্রবল। আবার এমন প্রেমিক প্রেমিকার চরিত্রও হামসুনের গ্রন্থে আছে যাদের মধ্যে যৌনতা ও মর্ষণ কামের একত্র সমাবেশে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। আর এই সব চরিত্রের ক্ষেত্রেই হামসুন তাঁর মনঃ-সমীক্ষণের সকল শক্তি নিয়োগ করে তাদের অন্তর্জীবনের গূঢ় রহস্য ফুটিয়ে তোলেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায়। প্রেমের সম্বন্ধে হামসুন মোটামুটি যা বলতে চেয়েছেন তা অনুধাবন করলে দেখা যায় যে এখানেও তাঁর শহর ও সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল। প্রেমের মধ্যে যৌনতার উপাদান যত বেশীই থাকুক না কেন, সে প্রেম যতক্ষণ স্বচ্ছ বাধাবন্ধহীন উদ্দাম আবেগ-রূপে থাকে, হামসুনের মতে ততক্ষণ তার মধ্যে দোষের কিছু থাকে না। সে প্রেম দূষিত ও বিষাক্ত হয়ে ওঠে শহর ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে। 'গ্রোথ অব দি সয়েল'এ ইঙ্গার চরিত্রের মধ্যে এই সত্যই আমরা প্রতিফলিত দেখি। বিবাহের প্রথম কয়েক বছর পল্লীর সুনিভৃত বনচ্ছায়ায় আইজাক ও ইঙ্গারের প্রেম ছিল 'পশু ও পাখীর মত' বাধাবন্ধনহীন। তার মধ্যে উদ্দামতা ছিল, যৌনতার আধিক্য ছিল কিন্তু সে প্রেমে মালিন্য ছিল না। কিন্তু ইঙ্গার শহর জীবনের অভিজ্ঞতার পর যখন ফিরে এল তখন আমরা দেখি যে সে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে—হারিয়ে ফেলেছে তার প্রেমের সজীবতা। দাসী বারব্রো-র চরিত্রে শহর জীবনের কুফল আরও বেশী প্রকট। শহর জীবনের কুপ্রভাবে পড়ে সে তার দুটি অবৈধ সন্তানকে নিজের হাতে খুন করল।

'গ্রোথ্ অব দি সয়েল'

এইবার হামসুনের ঔপন্যাসিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'গ্রোথ্ অব দি সয়েল' নামক উপন্যাসের আলোচনা করব। এই উপন্যাস-খানির জন্যেই তিনি ১৯২০ সালে বিশ্ব-বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। শুধু নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্যেই নয়—নানা দিক থেকে এইটিই হল তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং এই গ্রন্থের মধ্যে আমরা তাঁর সমগ্র জীবন-বেদ প্রতিফলিত দেখতে পাই। এই গ্রন্থখানি যেমন তাঁর শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তেমনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হামসুনের জীবন-বাণীরও শ্রেষ্ঠ বাহক। এর পরেও তিনি আরও কয়েকখানি বই লিখেছিলেন যেমন 'ভ্যাগাবন্ডস্', 'চ্যাপটার দি লাস্ট', 'আগস্ট' ও 'দি রোড লীডস্ অন্'। কিন্তু সকল দিক থেকে 'গ্রোথ্ অব দি সয়েল'-এর মত পরিপূর্ণ কৃতিত্ব তিনি আর কোথাও দেখাতে পারেন নি। মানুষের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক—এই হল 'গ্রোথ্ অব দি সয়েল'-এর বিষয়বস্তু আর এই বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি যে উপন্যাস লিখেছেন তা নানাদিক থেকে একখানি মহাকাব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গভীর বনভূমির একক অধিবাসী কৃষক আইজাক হল এ গ্রন্থের মুখ্য চরিত্র। সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে বহু দূরে ধরিত্রী মাতার সঙ্গে এক হয়ে মিশে রয়েছে সে। নিজের হাতে জমি চাষ করে, বনজঙ্গল কেটে ফসল ফলিয়েছে সে, মাটির অকৃপণ প্রতিদানে সে আর্থিক সমৃদ্ধিও অর্জন করেছে। কিন্তু নিছক ধনলাভের কোন স্পৃহা তার নেই। সে এগিয়ে চলেছে আপন আনন্দে জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিকে শস্য-শ্যামল করে তোলার গর্বে। স্ত্রী ইঙ্গার ও দুটি ছেলে সিভার্ট ও এলিসিয়াসকে নিয়ে তার জীবন ভালই কাটছিল। কিন্তু এমন সময় তার জীবনবেদী কেমনো বাজতে শুরু করল যখন তার ছোট ছেলে এলিসিয়াস শিক্ষালাভের জন্যে গেল শহরে, সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রীর জীবনেও এল নাগরিক সভ্যতার সংস্পর্শ। ইঙ্গার নাগরিক সভ্যতার কুপ্রভাবে পড়ে নিজের মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলল। নিভৃত পল্লীবাসে দীর্ঘদিন কাটাবার পর সে তার মানসিক স্থৈর্য পুনরুদ্ধার করল বটে, কিন্তু ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেল আইজাকের ছোট ছেলে এলিসিয়াস্। শহরে শিক্ষা লাভ তার কতটা হল কে জানে, কিন্তু মাটির সঙ্গে তার পরিচয়ের সূত্র গেল ছিঁড়ে অশান্তি ও বিক্ষোভে ভরে উঠল তার জীবন—শহরের

মিথ্যা আকর্ষণ তাকে ভ্রান্তির পর ভ্রান্তি, বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে নিয়ে গেল। নানাভাবে পিতার অর্থ ধ্বংস করল সে কিন্তু জীবনে শিকড় গাড়তে সে আর পারল না। নানা দিক থেকে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হয়ে অবশেষে সে একদিন পাড়ি জমাল সুদূর আমেরিকার উদ্দেশ্যে এবং ঝড়ের মুখে ঝরা পাতার মত চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেল সে।

সমস্ত বাধা বিপত্তির ঊর্ধ্বে উঠে দাঁড়িয়ে রইল যে সে হল কৃষক আইজাক—মাটির সংগে যার পরিচয়ের সূত্র অতি ঘনিষ্ঠ। বৎসরের পর বৎসর চলে গেল, যুগ পালটাল, পল্লীকে গ্রাস করতে ছুটে এল যান্ত্রিক সভ্যতা—কৃষক আইজাক কিন্তু পাহাড়ের মত দৃঢ় হয়ে রইল দাঁড়িয়ে। আইজাকের মত পরিপূর্ণ, সুমহান ও জীবনী শক্তিপূর্ণ চরিত্র হামসুনের উপন্যাস গুলিতেও সহজলভ্য নয়। হামসুন-সাহিত্যে যে গ্রীক পৌরাণিক দেবতা প্যানের উল্লেখ আগে করেছি, আইজাক্ যেন তারই রূপান্তর। সমস্ত উচ্ছৃংখলতা ও উদ্দামতা ত্যাগ করে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে সদাকর্মরত, সতত সৃষ্টিশীল কৃষক। মাঝে মাঝে আবেগের উদ্দামতা তার জীবনেও আসে বটে কিন্তু সে আবেগ তার আত্মাবিলুপ্তি ঘটাতে পারে না—নিজের আভ্যন্তরীণ শক্তির জোরে তার পারিপার্শ্বিককে করে সে জয়। এই জাতীয় কৃষক চরিত্রের মধ্যেই হামসুন্ খুঁজে পেয়েছেন ভাবী পৃথিবীর মুক্তি-পথের ইঙ্গিত। একাধিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে একথা তিনি স্পষ্টভাবে খুলেও বলেছেন। 'গ্রোথ অব দি সয়েল'-এ গেইস্লার আই-জাকের বড় ছেলে সিভার্টকে বলছে: 'দেশ আর টাকা চায় না; টাকা দেশের প্রয়োজনের চেয়ে বেশীই আছে—দেশে তোমার বাবার মত লোকের সংখ্যা বেশী নয়—এই যা দুঃখ।' হামসুনের বহু উপন্যাসে আই-জাকের মত চরিত্র ছড়িয়ে আছে, কিন্তু শিল্পকলা ও চরিত্রাঙ্কনের দিক থেকে আইজাকের তুলনা নেই। বিশ্বসাহিত্যে এ জাতীয় আর কোন সার্থক চরিত্র আছে কিনা তা-ও সন্দেহের বিষয়।

শিল্পী হামসুন্

নুট্ হামসুন, বোধ হয় এ যুগের সাহিত্য-শিল্পে 'প্রকৃতির কোলে ও মাটির বুকে' ফিরে যাবার আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক। যন্ত্র ও যন্ত্রযুগের বিরুদ্ধে তাঁর যে প্রতিক্রিয়া তা প্রায় সহজাত। অবশ্য বিচারে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে ভুল করেন নি এমন নয়। প্রায়ই দেখা যায় যে তিনি খাঁটি সংস্কৃতি ও তথাকথিত সংস্কৃতির মধ্যে যথাযথ বিভিন্নতা দেখতে পান নি। সভ্যতার প্রতীক শহর অতীতের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক পল্লীজীবনে ভাঙন ধরায় বটে, কিন্তু সে ভাঙন যে ধরায় ভবিষ্যতে একটা বৃহত্তর গঠন-পরিকল্পনা নিয়েই। মানুষকে বৃহত্তর ও মহত্তর নতুন ঐতিহ্যের অধিকারী করে তোলা, জড়জীবনের নতুন নতুন ক্ষেত্রে মানুষকে নিত্য নতুন বিজয়ের অধিকার দেওয়াও যে আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার অন্যতম উদ্দেশ্য একথা নাট্ হামসুন প্রায়ই বেমালুম এড়িয়ে গেছেন। ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই হামসুন বিভ্রান্তিকর প্রতিপাদ্যের সম্মুখীন হয়েছেন। প্রথম জীবনের হৃদয় বিদারক তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নগর ও সভ্যতা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন, পর জীবনে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর সর্ব-প্রকার ধ্যান ধারণার নিয়ামক। স্বীয় অভিজ্ঞতার নিরিখে বিচার করতে গিয়ে তিনি সভ্যতা ও নগরজীবন সম্বন্ধে হয়তো অবিচার করেছেন—কিন্তু প্রকৃতির ও মাটির যে মুক্তকণ্ঠ বন্দনা গান তিনি করেছেন, তার মধ্যে কোথাও কোন ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। এ ছিল তাঁর অন্তরের কথা—হৃদয়ানুভূতির মাধ্যমে উপলব্ধ পরম সত্য। চার পাশে যে সব মানুষ তিনি দেখেছেন সহজাত শিল্পীর প্রতিভা নিয়ে তিনি তাদের ছবি এঁকেছেন অজস্র উপন্যাসে। তাই তারা এত জীবন্ত, এত মূর্ত। শিল্পী হামসুনের মতবাদ আলোচনার বিষয়বস্তু হলেও মত-বাদের আলোচনায় বিশেষ কিছুই যাবে আসবে না। তার কারণ সাহিত্যসৃষ্টিতে মতবাদ বেঁচে থাকে না—যা বেঁচে থাকে তা শিল্পরূপ। এমন একদিন হয়তো পৃথিবীতে আসবে যে দিন গোটা প্রকৃতিকে পরাজিত করে যান্ত্রিক সভ্যতাই হবে জয়ী। পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতা সংস্কৃতির গতিতে অন্তত তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে সেদিন হামসুনের সাহিত্য-শিল্পের কদর কমে যাবে এমন কথা মনে করার কোন কারণ নেই। সাহিত্যশিল্পের মূল সূত্র যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তবে সার্থক শিল্পস্রষ্টা হামসুনের কদর সেদিনও অক্ষুণ্ণ থাকবে এই আমার বিশ্বাস।
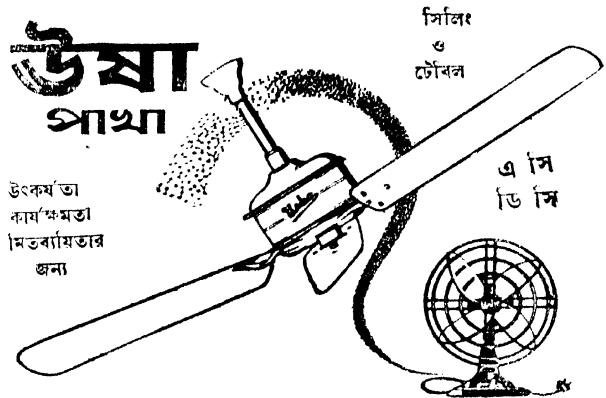
রথীন্দ্রনাথের শিল্প প্রদর্শনী

এ সপ্তাহে কোলকাতার শিল্পজগতে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা হলো রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পপ্রদর্শনী। কিছুদিন আগে পর্যন্তও শান্তিনিকেতনের অন্তরঙ্গ পরিবেশ ব্যতীত এ তথ্য একান্ত অজানিত ছিলো যে রথীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতে পারেন। গত একাডেমীর প্রদর্শনীতেই জনসাধারণের কাছে শিল্পী হিসেবে রথীন্দ্রনাথের প্রথম আত্মপ্রকাশ বলা যেতে পারে এবং তার পূর্ণতর পরিচয় পাওয়া গেলো শিল্পীর সাম্প্রতিক একক চিত্র ও কারুকলার প্রদর্শনী থেকে।

জনসাধারণের কাছে এ ঘটনা বিস্ময়কর মনে হওয়া স্বাভাবিক। কারণ যে কোন শিল্পীর শিল্পসাধনার মধ্যে একটা ক্রমবিকাশের স্তর পর্যায় থাকে যা হচ্ছে তার মানসিক ও দৃষ্টিগত বিশিষ্ট উন্মীলনের ইতিহাস। রথীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনার ক্রমিক পরিচয় অজ্ঞাত থাকার দরুণ এই বিকশিত পরিপূর্ণতাই জনসাধারণের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। দিগ্বিদিত বিশ্বভারতীর প্রসারের কাজে এতোদিন সাধারণে তাকে অক্লান্ত কর্মী হিসেবে জেনে এসেছে, আজ তার একান্ত সঙ্গোপন ও নিভৃত শিল্পসাধনার উপহারের আকস্মিকতায় আশ্চর্যান্বিত হওয়া বিচিত্র নয়।

মোটামুটি এ প্রদর্শনীকে দুভাগে ভাগ করা চলতে পারে। এক দিকে রয়েছে চিত্রশিল্প, আর এক দিকে কারুশিল্পপর্যায়ী দারুশিল্পের বিচিত্র সমারোহ। অর্থাৎ তার শিল্পমানসিকতা শুধু কারুশিল্পের কারুতার (craftmanship) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই, তাকে অতিক্রান্ত করে চারুতার (fine arts) অভিমুখী। বস্তুত এই যুগ্ম গুণশীলতেই এর সমগ্র প্রদর্শিত শিল্পরচনার মূলসূত্র বলা যেতে পারে।

চিত্র শিল্প বিভাগে প্রায় সত্তরটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি দৃশ্যচিত্র এবং অধিকাংশ পুষ্প ও বৃক্ষের চিত্র পাই। দৃষ্টিকোণের দিক থেকে রথীন্দ্রনাথ বাস্তববাদী (realist) কিন্তু যথাস্থিতবাদী (naturalist) নন। অর্থাৎ এই বস্তুজগতের দৃশ্যগত স্বরূপের মধ্যেই তিনি চিত্র সৃষ্টির রস খুঁজে পেয়েছেন, তার নিছক যথাযথ সাদৃশ্যকে দেখানোর উদ্দেশ্যেই চিত্ররচনা করেন নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কালিমপঙ্ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য' (৩৫) নামে ছবিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ ছবিটিতে প্রকৃতির যথার্থরূপের একটা প্রতিভাস আছে, কিন্তু কোথাও নিছক বাস্তব দৃষ্টির দিক থেকে যথার্থ করে দেখানোর প্রচেষ্টা নেই। তা হলে এ ধরণের দৃশ্যচিত্র নিঃসংশয়েই স্থানিক দৃশ্যচিত্রের (topo-graphic landscape) গুণসম্পন্ন হতে পারতো। রঙ ও বর্ণপ্রয়োগের বিশিষ্ট কৌশল যথাস্থিততার পরিবর্তে এক আশ্চর্য কোমলতার ও সুন্দর বর্ণকুহেলি সৃষ্টি করেছে। তারই পশ্চাতে কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্র শৃঙ্গমালা একটা অনৈসর্গিক লোক রচনা করেছে। ঠিক এই উচ্চতালের দৃশ্যচিত্র প্রদর্শনীতে বিরল হলে আরো কয়েকটি দৃশ্যচিত্র রূপ রচনা (composition) ও বর্ণপ্রয়োগের সামর্থ্যে অপূর্ব পরিমণ্ডল রচনা করেছে। শুধু শিল্পদৃষ্টির অভিনব
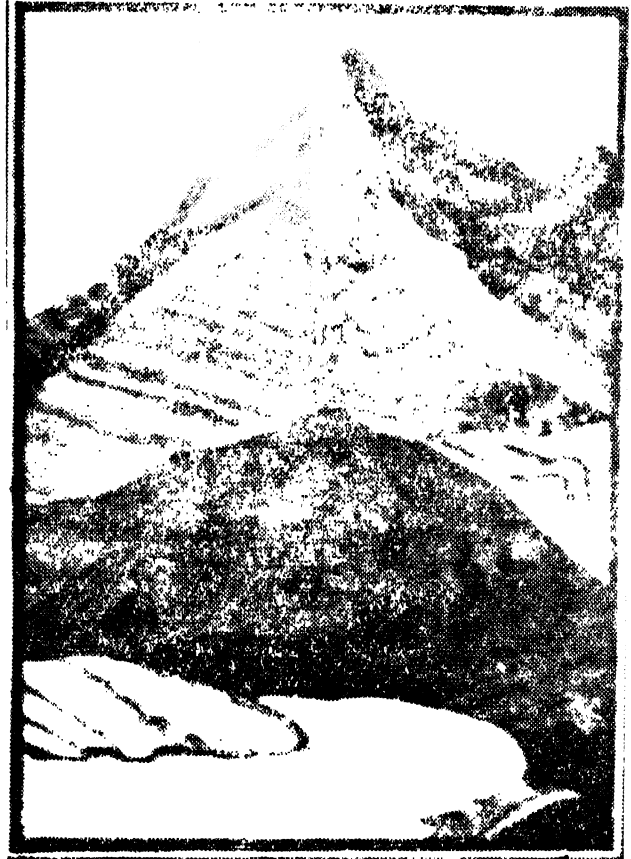
কাঠের প্রাকৃত বর্ণ নির্বাচন করে তার থেকে ফর্ম খোদাই করে সেই টুকরো অংশের সম্মেলনে পাহাড়ের দৃশ্য

কাঠের বর্ণে রচিত চিত্র 'মা ও ছেলে'

[illegible] তার আঙ্গিকগত দক্ষতাও যে কোন [illegible]শিল্পীর মতোই অব্যর্থ। দৃষ্টান্ত-[illegible]প 'আলমোড়া পাহাড়ের উপর বর্ষার [illegible]মন' (৪০), কালিমপঙের দৃশ্য (৪২) ও কালিমপঙ্ (৪১) প্রভৃতি চিত্রগুলির [illegible]খ করা যেতে পারে। দৃষ্টিভঙ্গীর [illegible]নবত্ব ব্যতীতও আঙ্গিকগত আধুনিকতা [illegible]শ পেয়েছে বিশেষ করে দুটি রচনায়ঃ [illegible]টি 'উত্তরায়ণের বাগানের কোণ' (৪৫) ও 'কালিমপঙে রাত্রির প্রশান্তি' (৪৪) [illegible] ছবি দুটি। একটা অদ্ভুত বর্ণসহুলতা [illegible] সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে [illegible]রায়ণের বাগানের কোণ' ছবিটিতে। সমগ্র [illegible]পটে সূক্ষ্ম বর্ণবিন্দুর প্রয়োগ শুধু [illegible]গকগত কুশলতা ব্যক্ত করেনি, বর্ণের [illegible]জালিক ক্ষমতা সম্বন্ধেও শিল্পীর [illegible]তনতা লক্ষণীয় করে তুলেছে। 'কালিম-[illegible]ঙে রাত্রির প্রশান্তি' নামে ছবিটিতে বর্ণের effect সৃষ্টির দিকেই শিল্পীর মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। রাত্রির সুদূর স্তব্ধতা, পশ্চাৎপটে ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের বিবর্ণ ও মৃত জ্যোৎস্নালোক সমগ্র পরিবেশের মধ্যে একটা স্পর্শহীন সুদূর প্রশান্তির সৃষ্টি করেছে। বর্ণের মাধ্যমে আবহাওয়া সৃষ্টির দক্ষতা 'A group of Pear trees of Kalimpong' ছবিটিতেও অদ্ভুতভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্র রচনায় আর একটি বিভাগ হলো ফুলের ছবি। এতোক্ষণ দৃশ্য-চিত্রের মধ্যে প্রতিভার যে বিশিষ্টতা আমরা লক্ষ্য করেছি তার থেকে একান্ত স্বতন্ত্র এক নূতন দৃষ্টিকোণ এই সব পুষ্প চিত্র-রনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। একটা বৈজ্ঞানিক ও যথাস্থিতবাদী (naturalistic) দৃষ্টি-ভঙ্গী যেন শিল্পীর দৃষ্টিকোণকে প্রভাবিত করেছে। তাই বর্ণপ্রয়োগের যথাস্থিত নৈপুণ্যে চিত্রগুলি বাস্তব স্পর্শময় হয়ে উঠেছে। পুষ্পের বর্ণবিস্তারের যে বৈচিত্র্য তাকে বিশিষ্টতা মণ্ডিত করেছে সেই বিশিষ্টতার সার্থক প্রতিফলন এই সব ছবিতে পাওয়া যাবে। বর্ণের সেই সূক্ষ্ম সমারোহকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করতে গিয়ে শিল্পীর পদ্ধতি ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই মিনিয়েচার ধর্মী হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্যাসন ফ্লাওয়ার (২১) এই রচনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। আবার পুষ্পের বর্ণ তার সামগ্রিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যে অনুভূতির মোহ সৃজন করে তারও

কালিমপঙ্ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য
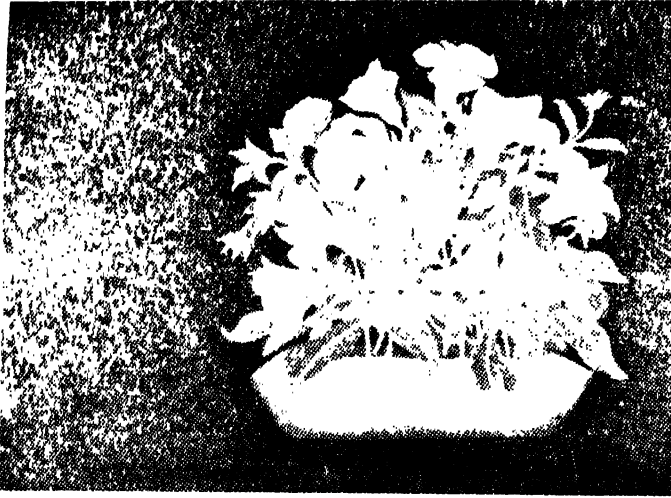
পুষ্প-চিত্র রচনার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন

বাঁশের উপর বাটিকের কাজ করা দীপাধার

পরিচয় আছে কয়টি রচনায়। যেমন লিলি (৪৯), ক্যানা (৫০) ও ম্যাগ্নোলিয়া (৫১) নামে ছবি তিনটিতে। পুষ্পের এই বর্ণ-বিহারের আর একটি ছবি তার বর্ণ ও রূপ-রচনার বিশিষ্টতায় একটি বিশেষ মর্যাদা পাবে তাহলো allamanda (৪৮) নামে রচনাটি। পুষ্পস্তবকে বর্ণের সূক্ষ্ম মাত্রা-জ্ঞান পাতার সবুজ দ্যুতিময় মসৃণতা বিচিত্র পশ্চাৎপটের উপরে জীবন্ত ও স্পর্শময় মনে হয়। সমগ্র পুষ্প চিত্ররচনার মধ্যে এটিকে সার্থকতম বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।

চিত্রশিল্পের পরই প্রদর্শনীতে আমাদের চোখ ফেরাতে হবে শিল্পীর দারুশিল্প সৃষ্টির দিকে। কিন্তু এই দুটির মধ্যেও আর একটি স্তর আছে যা চিত্রশিল্প ও দারুশিল্পের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ কাঠের প্রাকৃত বর্ণ নির্বাচন করে তার থেকে ফর্ম খোদাই করে সেই টুকরো টুকরো অংশের সম্মেলনে ও সমাবেশে এক একটি চিত্ররচনা সমাপ্ত হয়েছে। চিত্রের পরিপূর্ণ গুণ আনতে গিয়ে কোন বাইরের রঙেরই সাহায্য নেয়া হয়নি। বৈজ্ঞানিকের বিচারশীল মনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এখানে শিল্পীর সৃষ্টিশীল মনের। বস্তুত কাঠের মধ্যে এই বিচিত্রবর্ণের সম্ভাবনা অসম্ভবই লাগে যদি না রথীন্দ্রনাথের এই চিত্রমালা-গুলি প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য হতো। এদের মধ্যে পাহাড়ের 'দৃশ্য চিত্র' (১৪২) 'শান্তি-নিকেতনের দৃশ্য' (১৪৩) এবং 'মা ও ছেলে' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'পাহাড়ের দৃশ্যচিত্রের' মধ্যে পাহাড়ের textureটি নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং শান্তিনিকেতনের দৃশ্যের মধ্যে সূর্যাস্তের রক্ত আভায় মণ্ডিত পথ ও প্রান্তর এবং শালবৃক্ষের তলদেশ দিয়ে দুটি সাঁওতালের ব্যস্ত পদচালনার গতিময়তা অতি আশ্চর্য প্রাণাবেশে উদ্ভাসিত। রক্তিম-বর্ণের অনুভূতি দর্শকের মনেও যেন সঞ্চারিত করে। 'মা ও ছেলে' রচনাটিতে শিল্পীর কারুকলার সূক্ষ্মতায় অভিভূত
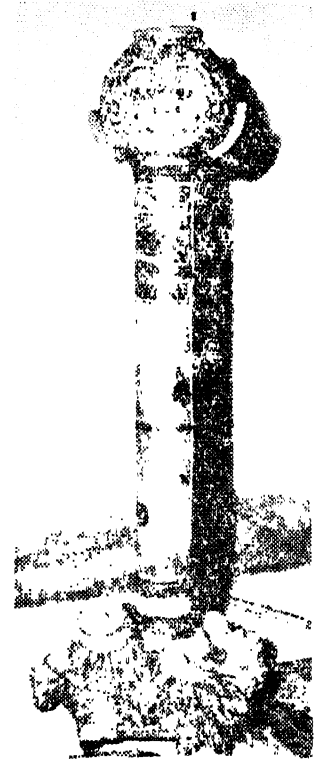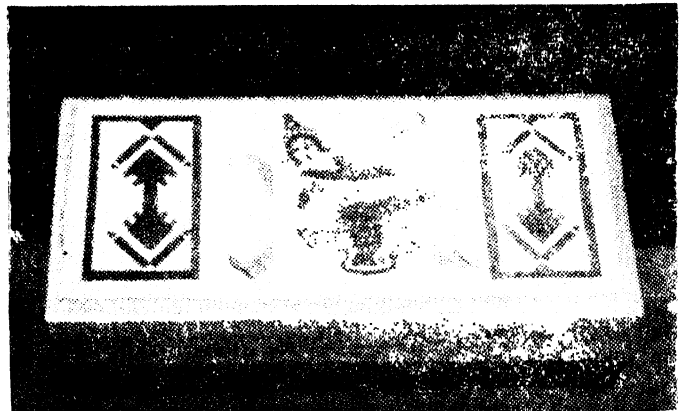
স্বাভাবিক রঙযুক্ত নানারকম কাঠের সাহায্যে চিত্র-খচিত কৌটা
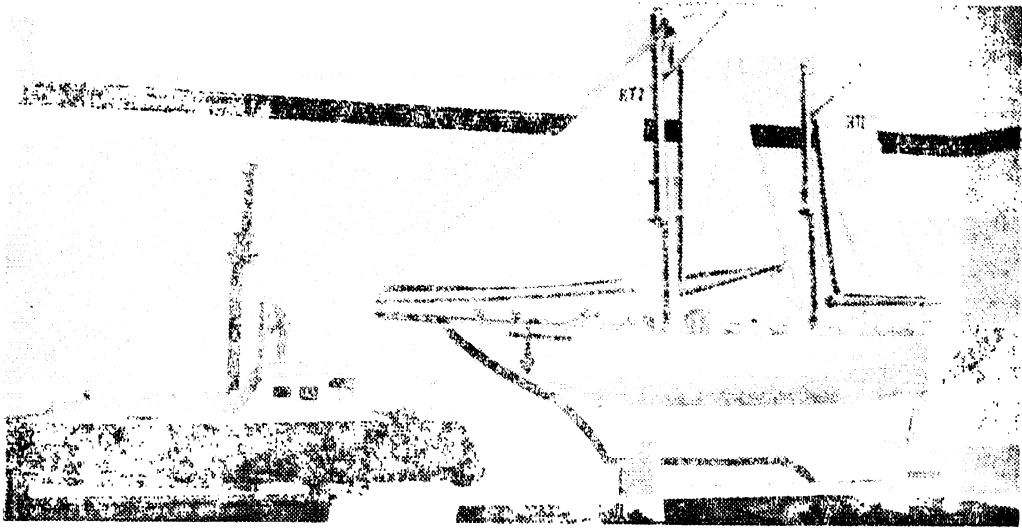
বিভিন্ন রঙের কাঠ দিয়ে তৈরি মডেল মোটর বোট ও জাহাজ

হয়ে হয়। অজস্র শিল্পীর হাতে অঙ্কিত এই চিরন্তন অনুভূতি এখানেও নবতর রচনায় এক নতুন রূপলোক সৃষ্টি করেছে।

বস্তুত কাঠের এই কাজগুলি আমাদের নবীন শিল্পীদের সম্মুখে এক নতুন শিল্পসৃষ্টির পথ রচনা করেছে বলা যেতে পারে। এই আঙ্গিকে কাজের মধ্যে যে বিচিত্র সম্ভাবনা রয়েছে তারই পথ নির্দেশ হিসেবে এই রচনাগুলি চিরন্তন মর্যাদা লাভ করবে।

এর পরই উল্লেখযোগ্য কাঠের অন্যান্য কাজগুলি। সেগুলিতে ফর্ম সৃষ্টির উদ্ভাবনী ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুত এই সব কাঠের কাজের প্রাথমিক চাহিদা তার প্রয়োজনীয়তা এবং তার ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক থেকে। কিন্তু ব্যবহারিক উপযোগী দ্রব্যকেও যে রুচির উৎকর্ষে মণ্ডিত করা চলতে পারে তারই প্রমাণ পাওয়া যায় এই সব অতিসাধারণ সৃষ্টি থেকে। আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহার্য জিনিসেরই এরা অন্তর্গত। চেয়ার-টেবিল, দীপাবরণ, সিগারেটের কেস, টুকিটাকি রাখবার বিভিন্ন মাপ ও আকারের বাক্স প্রভৃতি। কিন্তু প্রত্যেকটি সৃষ্টি প্রয়োজনীয়তা ও রুচির মধ্যে এমন অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছে যা নিঃসংশয়েই শিল্পপর্যায়ভুক্ত হয়েছে।

অন্তত এই সব সৃষ্টি থেকে শিল্পীর মনের গঠনটি অনুভব করা যায়। সেখানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও শিল্পীজনোচিত বৃত্তির আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটেছে। তারই সার্থক পরিচয় লক্ষ্য করা গেলো এই প্রদর্শনী থেকে। জনসাধারণকে এমন একটি প্রদর্শনী দেখবার সুযোগ দেবার জন্যে উদ্যোক্তারা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

শিল্পী গোপাল ঘোষ

বাঙলাদেশের আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে গোপাল ঘোষ দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিকতায় ও রূপরচনার সামর্থ্যে ইতিমধ্যেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তার সাম্প্রতিক চিত্রপ্রদর্শনী সেই সামর্থ্যের আর একটি সুদৃঢ় স্বীকৃতি হয়ে রইলো।

প্রায় সত্তরটি ছবি ও রেখারচনার সমবায়ে এই একক প্রদর্শনীটি সজ্জিত করা হয়েছিলো। মাত্র কয়েকটি প্যাস্টেলের রচনা ব্যতীত অধিকাংশ ছবিই জলরঙের এবং তার মধ্যে দিয়েই শিল্পীর প্রতিভা আর একটি বিশিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে।

শিল্পী গোপালের চিত্রকলার সঙ্গে যারা পরিচিত তারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে, একটা প্রবল মানসিক চঞ্চলতা শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্পরচনায় এক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। বারংবার বিভিন্ন আঙ্গিক গ্রহণ ও বর্জনের এই অস্থিরতা প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ কোন পদ্ধতি ও আঙ্গিকের মধ্যে দিয়ে শিল্পীর পরিপূর্ণ মুক্তি আসবে সেই এষণাই এই অস্থিরতার মূলে কাজ করছে।

শিল্পী নিজের এই মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে নিঃসংশয়েই সচেতন। অন্ততপক্ষে এই প্রদর্শনীতে ১৯৩২ সালের অঙ্কিত রাজকন্যার (৬৫) উপস্থিতি সেই সত্যকেই ব্যক্ত করছে। সেদিনকার চিরাচরিত (conventional) প্রাচ্য শিল্পপদ্ধতিতে রচিত শিল্পের সঙ্গে ১৯৫২ সালের শিল্পীর রচনায় যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে সেই কথাই হয়তো শিল্পী রহস্যচ্ছলে বলতে চেয়েছেন। এই দুই যুগের মধ্যবর্তী রচনায় শিল্পীর সেই বিবর্তনশীল মনের স্বাক্ষর ছড়ানো আছে, শিল্পী গোপাল ঘোষের রচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা অবশ্যই একথা স্বীকার করবেন।

এতো যে রেখা ছিলো শিল্পীর মূলে আশ্রয় সেই রেখার বিলীয়মান পদচিহ্নের উপরে এই নতুন জোয়ার এসেছে রঙের মাধ্যমে। রঙের প্রতি মানুষের একটা আদিম

আসন্ন বর্ষা

আকর্ষণ এবং তার নির্বিশেষ মোহবিস্তার—রঙে এই আশ্চর্য ও বিচিত্র ক্ষমতাকে কোন যুগের শিল্পীরা পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারেন নি। ছবিতে বর্ণ ব্যবহারের প্রথম লক্ষ্য করা যায়। সেই উপলব্ধিতেই শিল্পীদের স্বরূপের ধারণা উৎপাদন করা। কিন্তু বর্ণের এই প্রাকৃত ব্যবহার শিল্পীদের মধ্যে একান্ত-ভাবেই বিরল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বর্ণের প্রতীকী ব্যবহারের ধারা শিল্পীদের প্রভাবিত করেছে। অর্থাৎ গাছকে সবুজ, আকাশকে নীল করে অংকন করাকেই শিল্পীরা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু দৃষ্টির দিক থেকে এর বিপরীত বর্ণও বস্তুজগত ও প্রকৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সেই উপলব্ধিতেই শিল্পীদের নতুন করে বর্ণ বিন্যাসের ধারা সৃষ্টি করতে হয়েছিলো। য়ুরোপীয় শিল্পে বর্ণ ব্যবহার ও পরীক্ষণের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। কিন্তু প্রাচ্যশিল্পে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের শিল্পকলায় এ ধরণের অনুসন্ধিৎসা লক্ষ্য করা যায় নি। সুতরাং গোপাল ঘোষ যখন শিল্পের মধ্যে রঙের বিচিত্র কুহক সৃষ্টি করলেন তখন তা আমাদের কাছে অভিনব ও দুঃসাহসিক মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রবল মনোবেগ সৃষ্টির মূলেই গোপাল ঘোষের এই চিত্রগুলি নিঃসংশয়ে আধুনিক সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত হয়েছে।

বর্ণ ব্যবহারের অদ্ভুত দক্ষতা দেখা যাবে প্রদর্শিত প্রায় সকল ছবিতেই। কিন্তু উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করা যাবে ঘাটশীলায় সন্ধ্যা (৯) ছবিটিতে। শুধু রঙের আবেগ সৃষ্টির ক্ষমতায় এ ছবিটিতে উৎকর্ষ এসেছে তা নয়, আঙ্গিকগত দক্ষতার একটি আশ্চর্য নমুনা হিসেবে এই ছবিটিকে নেয়া যেতে পারে। রঙ এমনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে তার আপেক্ষিক গুরু ও লঘু বর্ণ-লেপে বস্তু ও প্রকৃতির গঠন সুস্পষ্ট হয়েছে। আঙ্গিক ব্যবহারের এমন অপূর্ব কুশলতা এ পর্যন্ত কোন ভারতীয় শিল্পীর মধ্যে দেখা যায় নি। এই বিশিষ্টতার ঐশ্বর্যে শিল্পী গোপাল ঘোষ আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়ে থাকবেন।

এ প্রদর্শনীতে সার্থক শিল্পরচনার নমুনা প্রচুর পাওয়া যাবে। 'সাত হাজার ফুট উচ্চতা', (১) 'কাছে ও দূরে' (২) 'বর্ষা' (২৯) 'প্রদোষচ্ছায়ায় গ্রাম,' (৩৭) 'আসন্ন বর্ষা', (৫৩) 'গালগল্প' (৪৭) 'লালবাতি' (৪১) প্রভৃতি রচনা রঙ ও রেখার সংক্ষিপ্ত অথচ কুশলী প্রয়োগে দ্যুতিমান হয়ে উঠেছে।

বিচিত্র বর্ণের পরিপূর্ণ ও চড়া ব্যবহার এই প্রদর্শনী থেকেই পাওয়া যাবে। কিন্তু মনে হয় শিল্পীর মন সেই আবেষ্টনীর মধ্যে শান্তি পাচ্ছে না। তাই মাঝে মাঝে কালো রঙের নির্বিশেষ ব্যবহার ও প্যাস্টেলের রচনা সেই শান্তি হীন মনেরই পরিচয় দিচ্ছে। তারপরে যে নতুন যুগের সূত্রপাত হবে তার জন্য সাগ্রহে আমরা প্রতীক্ষা করে থাক্‌বো।

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

(২০)

মাউণ্টব্যাটেনের প্রত্যাবর্তন। নর্থহল্ট বিমান ক্ষেত্রে ডিউক অব এডিনবরা ও এটলী। একজন গবর্ণর-জেনারেলের প্রতি কত বড় অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের আয়োজন। এটলীর ঐতিহাসিক ভূমিকা। মর্লি ও মিণ্টো, মণ্টেগু ও চেম্‌স্‌-ফোর্ড এবং এটলী ও মাউণ্টব্যাটেন। হায়দরাবাদ সম্পর্কে রিপোর্ট শুনলেন এটলী। এটলীর মন্তব্য—মানুষের যা করা সাধ্য, নিজামের সঙ্গে মীমাংসার জন্য তাই করা হয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনের ষ্টাফ বিদায়ের পালা। দিল্লীতে তিন সপ্তাহের নাটকীয় ঘটনাবলী। মঙ্কটন ও লায়েক আলির দিল্লী আগমন। বাদ-প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ আলোচনা। লায়েক আলির সঙ্গে কথা বলতে নেহরুর অনিচ্ছা। ক্ষুব্ধ মঙ্কটন ভয় দেখালেন—তাহ'লে এখনই ইংলণ্ডে ফিরে যাব। নেহরুর কাছে মাউণ্টব্যাটেনের টেলিফোন—'এখনো মীমাংসার আশা আছে।' নেহরুর একটি বক্তা। কেন হায়দরাবাদে সৈন্য প্রেরণ করা হচ্ছে না? 'অস্ত্র-শক্তির প্রয়োগে সমস্যা বৃদ্ধি পায়।' মুসৌরী হতে প্যাটেলের পত্র—হায়দরাবাদের পক্ষে বিনা সর্তে রাষ্ট্রভুক্তি স্বীকার করাই সমাধানের পথ।

মঙ্কটনের উদ্যোগ। মীমাংসার জন্য হায়দরাবাদের পক্ষ থেকে প্রস্তাবের খসড়া রচনা। নিজামের ফারমান রচনায় মঙ্কটন। হায়দরাবাদে পাকিস্থানী প্রতিনিধির আগমন। প্রস্তাবের দুটি বিষয়ে নিজামের আপত্তি। মুসৌরীতে প্যাটেলের কাছে মাউণ্টব্যাটেন ও মন্ত্রিবর্গ। নিজামের আপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা। নিজাম কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধনে সম্মত হলেন ভারত গবর্ণ-মেণ্ট। লায়েক আলির প্রতি মঙ্কটন—চূড়ান্ত 'না' অথবা চূড়ান্ত 'হাঁ' জানাতে হবে। লায়েক আলির নতুন দাবী—আরও চারিটি সংশোধনের প্রস্তাব। আশা ছেড়ে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। নেহরুর সম্মতিতে বিস্ময়। আবার দুটি নতুন দাবী। আবার ভারত সরকারের সম্মতি। নিজামের কথা থেকে চূড়ান্ত উত্তরের আশায় দিল্লী। খসড়া-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন নিজাম। নিজাম সকাশে মঙ্কটন। মাউণ্টব্যাটেনের কাছে টেলিফোনে মঙ্কটনের একটি কথা—'ব্যর্থ'।

লণ্ডন, বুধবার, ২৩শে জুন, ১৯৪৮ সাল। বিশটি দিন সমুদ্রে কাটিয়ে দিয়ে গত কাল আমরা লিভারপুলে এসে পৌঁছেছি। সমুদ্রপথে সত্যি সত্যিই ঝড় দেখা দিয়েছিল। বোম্বাই থেকে প্রায় দেড় শত মাইল দূরে প্রথম দেখা হলো এই ঝড়ের সঙ্গে। এডেন পর্যন্ত প্রায় সমস্তটা পথই আমাদের জাহাজকে ঝড়ের আঘাত সহ্য করতে হয়েছে।

ঠিক সময়মত ইংলণ্ডে পৌঁছেছি। ভারত থেকে সমুদ্রপথে আমাদের ইংলণ্ডে পৌঁছতে লেগেছে বিশটি দিন, ওদিকে মাউণ্টব্যাটেন সপরিবারে এবং সদলে ভারত থেকে যাত্রা করে আকাশপথে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই ইংলণ্ডে পৌঁছে গেছেন। মাউণ্টব্যাটেনের বিমান নর্থ-হল্টে নামবার আগেই আমি তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিমানক্ষেত্রে উপস্থিত হতে পেরেছি।

নর্থহল্টের বিমান ময়দানে উপস্থিত ছিলেন ডিউক অব এডিনবরা এবং প্রধান মন্ত্রী এটলী। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন মাউণ্টব্যাটেন, জনৈক ব্রিটিশ গবর্ণর জেনারেল ভারতে তাঁর কার্যকালের সমাপ্তির পর দেশে ফিরে এসেছেন। এই তো ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনাকেই যে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনার দ্বারা সম্মানিত করা হচ্ছে, তার অভিনবত্ব বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। একথা আমি কখনো শুনিনি যে, একজন ভাইসরয় অথবা গবর্ণর-জেনারেলকে তাঁর প্রত্যাবর্তনের দিনে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একজন রাজকীয় ডিউক এবং এক প্রধান মন্ত্রী কোনদিন সশরীরে বিমান-ময়দানে অথবা জাহাজ-ঘাটায় উপস্থিত হয়েছেন। মাউণ্টব্যাটেন ছাড়া কোন গবর্ণর-জেনারেলের এ সম্মান লাভের সৌভাগ্য হয়নি। নর্থহল্টের বিমান ময়দানে অন্যান্য মন্ত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া, উচ্চপদের রাজ-কর্মচারীর দলও ছিলেন। বি বি সি'র, সংবাদপত্রের এবং সংবাদ-চিত্র প্রতিষ্ঠানের বহু প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ফটো-গ্রাফারদের ভীড়ের কথা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় ক্রুজার 'দিল্লী' এখন পোর্টস্‌-মাউথে বিশ্রাম করছে, কিন্তু 'দিল্লী'র এক শত জন নৌ-সৈনিক গার্ড-অব-অনার প্রদর্শনের জন্য যথাসময়ে নর্থহল্টে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

এর মধ্যে এটলীর উপস্থিতিই আমার সব চেয়ে বেশি শোভন বলে মনে হয়েছে। ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনা এটলীরই এক অসাধারণ সুকীর্তি বলে মনে করা যেতে পারে। এ ঘটনা তাঁরই প্রধান মন্ত্রিত্বে পরিচালিত ইংলণ্ডের এক ঐতিহাসিক নীতি ও সিদ্ধান্তের ফল। এই নীতির উদ্ভাবনে, রচনায় ও সাফল্যকরণে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী এটলীই বিশেষ দায়িত্বের ভার বহন করেছেন। কোনই সন্দেহ নেই যে, যেমন মর্লি ও মিণ্টোর নাম এবং মণ্টেগু ও চেম্‌স্‌-ফোর্ডের নাম ইতিহাসে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, তেমনি এটলী ও মাউণ্ট-ব্যাটেনের নাম ভবিষ্যতের ইতিহাসে একই কৃতিত্বের পরিচয়-সূত্রে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকবে।

নর্থহল্টের মাটিতে নেমে এল মাউণ্ট-ব্যাটেনের বিমান। আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনার পর মাউণ্টব্যাটেন বিমানক্ষেত্রের অফিস-গৃহের এক কক্ষে চা-পানের জন্য প্রবেশ করলেন। আমরাও সকলেই এই চায়ের আসরে এসে ঠাঁই নিলাম। কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পেলাম, এটলীর সঙ্গে হায়দরা-বাদ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করছেন মাউণ্টব্যাটেন। তার পরেই আমাকে কাছে ডাকলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং হায়দরাবাদ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত ধারণা ও অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে এটলীকে শুনিয়ে দেবার জন্য আমাকে বললেন। হায়দরাবাদে গিয়ে এবং নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করে আমার কি

ধারণা হয়েছে, সেই সম্বন্ধেই কিছু শুনতে চান এটলী।

সাগ্রেহেই বললাম এবং এটলীও খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। এর পর মন্তব্য করলেন এটলী "আমার মনে এখন আর কোনই সন্দেহ নেই যে, মানুষের পক্ষে যতটা করা সাধ্য, নিজামের সঙ্গে একটা সম্মানজনক মীমাংসার জন্য তার সবই করা হয়েছে।"

এটলীর মতে, এবিষয়ে আমাদের কর্তব্য আমরা করেছি। কর্তব্য পালনে কোন ত্রুটিও করিনি। সুতরাং হায়দরাবাদের ব্যাপার নিয়ে আমাদের পক্ষে মনের ভেতরে কোন আক্ষেপ পুষে রাখবার কারণ নেই। সঙ্গতভাবে ও ন্যায়োচিত পন্থায় যা করা সম্ভবপর, তা করা হয়েছে। সুতরাং আমরা এখন গ্লানিমুক্ত মন নিয়েই যে যার ঘরে ফিরে যেতে পারি।

মাউণ্টব্যাটেন এসে জানিয়েছেন, হায়দরাবাদের সঙ্গে মীমাংসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কেন ব্যর্থ হলো এবং কিভাবে ব্যর্থ হলো, তার বিশদ বিবরণ এখনো আমি শুনিনি, জানিও না। ভারত থেকে আসবার পথে জাহাজের রেডিও থেকে মাঝে মাঝে এই সংবাদটুকু মাত্র শুনবার সুযোগ পেয়েছি যে, ভারত-হায়দরাবাদ বিরোধের মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

মাউণ্টব্যাটেনের গত পনর মাসের সর্বক্ষণের কাজের সঙ্গী আমরা আজ তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেব। মাউণ্টব্যাটেনের 'ষ্টাফ', তাঁর এই অন্তরঙ্গ কর্মসহচরের দল আজ শেষবারের মত তাঁর সান্নিধ্য ছেড়ে দূরে চলে যাবেন, এটা ভাবতেও অদ্ভুত লাগছে। অতি বৃহৎ এক ঘটনার কেন্দ্রস্থল থেকে অস্বাভাবিক কর্মপ্রাবল্যের মধ্যে দিনের পর দিন অতিবাহিত করার পর যদি হঠাৎ আবার স্বাভাবিক শান্ত কর্মধারার মধ্যে ফিরে আসতে হয়, তবে এই স্বাভাবিকতাকেই অস্বাভাবিক বলে মনে না হয়ে পারে না। এমন অবস্থার সঙ্গে মনের অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করাও দুরূহ।

আজকের এই গ্রীষ্মের শান্তকোমল সন্ধ্যায় আমাদের প্রায় সকলেই 'ছুটি' নিয়ে ঘরে ফিরে যাব। ফিরে আসবার পরেও আমাদের এতদিনের অভ্যাসের দোষে একটা অসুবিধায় পড়তে হবে। মাত্রা ছাড়া কাজের ভীড় থেকে সরে এসে এখন আবার রুটিনমাফিক প্রাত্যহিক কাজের রীতি গ্রহণ করতে হবে। অভ্যাসে বাধবে ঠিক। হয়তো সে রীতি নতুন করেই শিখতে হবে।

লণ্ডন, সোমবার, ২৮শে জুন, ১৯৪৮ সাল। লর্ডসের টেস্ট ম্যাচে ব্র্যাডম্যানের খেলার আকর্ষণে এবং জয়-পরাজয়ের দুশ্চিন্তায় এই ক'দিনের সময় অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেলেও তার মধ্যে ভারতে মাউণ্টব্যাটেনের শেষ তিন সপ্তাহের নাটকীয় ঘটনাবলীর কিছু কিছু বিবরণ সংগ্রহ করেছি। জাহাজের রেডিও থেকে সামান্যই তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। হায়দরাবাদ সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এই ঘটনার যৎসামান্য বিবরণ রেডিওতে ঘোষিত হয়েছিল। ভারতে মাউণ্টব্যাটেনের শেষ বেতার ভাষণের একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্টও জাহাজের রেডিও থেকে পেয়েছিলাম। তা ছাড়া, মাউণ্টব্যাটেনের বিদায় অনুষ্ঠানের কিছু বিবরণ শুনতে পেয়েছিলাম এবং তাতেই বুঝতে পেরেছি যে, দিল্লীতে মাউণ্টব্যাটেন-বিদায়ের দিনে ১৫ই আগষ্টের মতই শত শত ব্যাকুল হৃদয়ের এক বিরাট প্রীতির উৎসব দেখা দিয়েছিল। ১৫ই আগষ্ট অনুষ্ঠিত দিল্লীর সেই আগ্রহ ও আন্তরিকতার উৎসবের তুলনায় মাউণ্টব্যাটেনের এই বিদায়-অনুষ্ঠানের দৃশ্য এক দিক দিয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পনরই আগষ্ট ছিল ভারতীয় জাতির স্বাধীনতা প্রাপ্তির উৎসব, আর এই অনুষ্ঠান হলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতভাবে মাউণ্টব্যাটেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুষ্ঠান।

রোনি এবং ভের্ণনের সঙ্গে কয়েকবার আলোচনা করে শেষ তিন সপ্তাহের বিবরণ সংগ্রহ করেছি। তাছাড়া মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে দুবার সাক্ষাতে আলোচনা করে আরও তথ্য জানবার সুযোগ পেয়েছি। এই ভাবে সংগৃহীত আমার তথ্যগুলিকে সাজিয়ে শেষ তিন সপ্তাহের ঘটনাবলীর একটা পূর্ণ পরিচয় দাঁড় করাতে পেরেছি। আমি ভারত থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার পর সেখানে ঘটনার ধারা কিভাবে কোনদিকে চলে গিয়েছে এবং কোন পর্যন্ত এসেছে, তার পরিচয় এখন আমি সংক্ষেপে দিতে পারি।

তিন দিন হায়দরাবাদে থেকে মঙ্কটন লায়েক আলিকে সঙ্গে করে দিল্লীতে এলেন। কয়েকদিন ধরে ভারত সরকারের সঙ্গে মঙ্কটনের আলোচনাও হলো। সমস্ত আলোচনার ব্যাপারটাই বাদ-প্রতিবাদে ও তর্কে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো এবং বুঝা গেল যে এ আলোচনা ব্যর্থ হয়ে মীমাংসাহীন অবস্থাতেই শেষ হয়ে যাবে। নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলেন লায়েক আলি, কিন্তু নেহরু এ প্রস্তাব সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করলেন। লায়েক আলির সঙ্গে কথা বলতেই রাজী হলেন না নেহরু। মঙ্কটনও এই ভয় দেখালেন যে, এরকম ব্যাপার হলে তিনিও আর কোন আলোচনার ব্যাপারে থাকবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাবার জন্যেই প্রস্তুত হলেন মঙ্কটন। কিন্তু মাউণ্টব্যাটেনই চেষ্টা করে ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার ব্যাপারকে সম্পূর্ণ ভাঙ্গন থেকে সেদিন রক্ষা করলেন। নেহরুকে টেলিফোন করে মাউণ্টব্যাটেন বললেন যে, তাঁর মনে এখনো যথেষ্ট আশা ও বিশ্বাস আছে যে, সন্তোষজনকভাবে একটা মীমাংসা এখনো হতে পারে। মাউণ্টব্যাটেন এইভাবে তাঁর একটা বিশ্বাস ও আশার কথা বললেন বটে, কিন্তু টেলিফোন করার সময়ও তিনি জানতেন না যে, কিভাবে অথবা কোথায় গিয়ে চেষ্টা করলে সন্তোষজনক মীমাংসার সূত্র পাওয়া যেতে পারে। যাই হোক, নেহরুকে টেলিফোন করে মাউণ্টব্যাটেন অন্ততঃ তখনকার মত তরী ভাসিয়ে রাখলেন, তখুনি ডুবে যেতে দিলেন না।

৮ই জুন তারিখে নেহরু এক বক্তৃতা দিলেন। হায়দরাবাদ সমস্যা সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন জনসাধারণের মন আন্দোলিত করছে, এই বক্তৃতায় সেই সব প্রশ্নের উল্লেখ করলেন নেহরু। প্রশ্নের উত্তরও তিনি এই বক্তৃতায় উল্লেখ করলেন। ভারত সরকার কেন এখনো হায়দরাবাদে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছেন না, এই প্রশ্ন তুলে অনেকেই ভারত সরকারের আচরণের সমালোচনা করছেন। নেহরু তাঁর বক্তৃতায় বললেন, অস্ত্রবলে কোন সমস্যার সমাধান করতে গেলে সমস্যার সমাধান যতটা হয়, তার চেয়ে বেশি করে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সমস্যা। নেহরুর এই বক্তৃতার ফল ভালই হলো। ঝড় শান্ত হলো। মঙ্কটনও শান্ত হলেন। আর একবার ভাল করে চেষ্টা করার সুযোগ পেলেন মাউণ্টব্যাটেন।

মঙ্কটন স্বীকার করলেন যে, ভবিষ্যতে হায়দরাবাদে গণভোট গৃহীত হবে, শুধু এই প্রস্তাবের দ্বারা অবশ্যই বর্তমানের অশান্তিকর অবস্থা ও বিরোধের সমাপ্তি ঘটানো সম্ভবপর হবে না। ঐ প্রস্তাব ছাড়া আরও কিছু করা দরকার। ওদিকে মুসৌরী থেকে রোগশয্যায় শায়িত প্যাটেল স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, হায়দরাবাদকে এখন দ্বিধাহীনভাবে এবং কোন সর্তের দাবী না করে রাষ্ট্রভুক্তি স্বীকার করে নিতে হবে। এ ছাড়া সমাধানের অন্য কোন পথ আর নেই।

মুসৌরী থেকে প্যাটেল জানিয়েছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট আর কোন

ফরমুলো বা নিষ্পত্তির সূত্র উদ্ভাবন করতে পারবেন না। ভারতের পক্ষ থেকে নতুন করে আর কোন প্রস্তাব উত্থাপন করাও এখন আর সম্ভবপর নয়। এ বিষয়ে ভারতের যা করবার ছিল তার সবই করা হয়ে গেছে। হায়দরাবাদের মনে যদি নিষ্পত্তি করবার ইচ্ছা থাকে, তবে এখন হায়দরবাদকেই বলতে হবে কিভাবে নিষ্পত্তি হতে পারে। এখন নতুন ফরমুলো তথা নিষ্পত্তির সূত্র উদ্ভাবন ও উত্থাপন করার দায়িত্ব হলো হায়দরাবাদের, ভারতের নয়।

প্যাটেলের এই অভিমত সমর্থন করলেন মঙ্কটন। তিনি স্বীকার করলেন, এখন হায়দরাবাদের কাছ থেকেই নিষ্পত্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে ফরমুলো ও প্রস্তাব আসা উচিত।

স্বয়ং মঙ্কটনই নিষ্পত্তির সূত্র রচনা করলেন। সবশুদ্ধ দু'টি দলিল তৈরী করলেন মঙ্কটন। একটি হলো, নিজামের এক ফারমানের খসড়া। এই ফারমানে নিজাম ঘোষণা করবেন যে, তিনি হায়দরাবাদে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বসম্পন্ন দায়িত্বশীল গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করবেন, ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকেই গণপরিষদ গঠন করে ফেলবেন, এবং অবিলম্বে বর্তমান গবর্ণমেণ্টকে পুনর্গঠিত করবেন।

দ্বিতীয় দলিলটা সত্যি সত্যি নতুন করে রচিত কোন দলিল নয়। ভি পি মেননের রচিত নতুন খসড়া-চুক্তির প্রথম অংশটা পুরোপুরি গ্রহণ করলেন মঙ্কটন। যার মধ্যে প্রস্তাবিত ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্কের মূল বিষয়গুলি বর্ণিত হয়েছে।

মঙ্কটন তো দলিল রচনা করলেন। হায়দরাবাদের পক্ষ থেকে এইভাবে নিষ্পত্তির একটা সূত্র উপস্থাপিত করলেন, কিন্তু লায়েক আলি যা বললেন, তাতে বুঝা গেল যে তিনি আবার নতুন করে কালক্ষেপ করার খেলা খেলতে চাইছেন। লায়েক আলি বললেন, তাঁকে অবশ্যই একবার হায়দরাবাদে গিয়ে নিজামের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

৯ই জুন তারিখে দিল্লীতে এই সংবাদ রটে গেল যে, পাকিস্থানের এক প্রতিনিধি হায়দরাবাদে এসেছেন। লায়েক আলি শপথ করে বললেন যে, এ সংবাদের মূলে কোন সত্যতা নেই। যাই হোক্, মনে বহু সন্দেহ ও উদ্বেগ সত্ত্বেও দিল্লী এবারও লায়েক আলিকে কোন বাধা দিল না। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার সম্মত হলেন, এবং ঠিক হলো যে লায়েক আলি এ বিষয়ে নিজামের সঙ্গে পরামর্শ করে ফিরে আসবেন। মঙ্কটন রইলেন দিল্লীতে, এবং লায়েক আলি চলে গেলেন হায়দরাবাদে।

১২ই জুন তারিখে নিজামের উপদেষ্টা মঙ্কটন জানালেন যে, তাঁর রচিত নতুন খসড়া-প্রস্তাবে উল্লিখিত সকল বিষয়ই নিজাম এবং নিজামের কাউন্সিল অনুমোদন করেছেন, মাত্র দুটি বিষয় ছাড়া। হায়দরাবাদ রাজ্যে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ভারত গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা এবং প্রস্তাবিত গণপরিষদে সদস্যদের সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাত সম্বন্ধে মঙ্কটনের প্রস্তাবে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তার সঙ্গে একমত হতে পারেননি নিজাম এবং তাঁর কাউন্সিল। এই দুই বিষয়ে প্রস্তাবের বক্তব্যে কিছুটা পরিবর্তন করেছেন নিজাম।

নিজামের এই আপত্তির সংবাদ পাওয়া মাত্র মাউণ্টব্যাটেন, মঙ্কটন ও নেহরু এক বৈঠকে মিলিত হয়ে আলোচনা করলেন। আর একটি আলোচনার বৈঠক হয়ে গেল মুসৌরীতে। মাউণ্টব্যাটেন এবং মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য মুসৌরীতে গিয়ে প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা করলেন।

প্রস্তাবে যে পরিবর্তন করেছেন নিজাম, সেটা মেনে নেবারই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কিন্তু দুই বৈঠকেই সকলে এ বিষয়ে একমত হলেন যে, নিজামকেও তাঁর বক্তব্যের একটি বিষয় সংশোধন করতে হবে। গণ-পরিষদে দুই সম্প্রদায়ের সমানসংখ্যক সদস্য থাকবে, এভাবে সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ এই প্রস্তাবে রাখতে পারবেন না নিজাম। এই উল্লেখ বাদ দিতে হবে, এবং তার পরিবর্তে ফারমানে এই ক'টি কথা যোগ করে দিতে হবে যে, হায়দরাবাদের 'সকল বিশিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে' গণপরিষদ গঠন করা হবে।

১৩ই জুন তারিখে মঙ্কটন খুব জোর দিয়ে এই অনুরোধ জানিয়ে লায়েক আলিকে পত্র দিলেন যে, এইবার নিজামের কাছ থেকে যথার্থ প্রতিভূ-ক্ষমতা নিয়েই তিনি যেন দিল্লীতে আসেন, যাতে দিল্লীতে গৃহীত যে কোন সিদ্ধান্তে বা প্রস্তাবে তিনি নিজামের হয়েই চূড়ান্ত হাঁ বা না জানাতে পারেন।

দিল্লীতে ফিরে এলেন লায়েক আলি। কিন্তু নিজামের কাছ থেকে প্রতিভূ-ক্ষমতা নিয়ে তিনি আসেননি। স্বয়ং নিজাম এবং নিজামের কাউন্সিল, উভয়েই লায়েক আলিকে এরকম পূর্ণ ক্ষমতা দিতে রাজী হননি। যেমন বরাবর দেখা গিয়েছে, তেমনি এবারও লায়েক আলি হায়দরাবাদের মাত্র একজন আলোচনাকারী প্রতিনিধি হিসাবে দিল্লীতে উপস্থিত হলেন। কোন প্রস্তাবে মাত্র সমর্থন বা আপত্তি জানাবার মনোভাব প্রকাশের জন্য মামুলী ক্ষমতা ছাড়া আর কোন ক্ষমতা নিয়ে তিনি আসেননি।

১৪ই জুন তারিখে লায়েক আলিই হঠাৎ চুক্তির খসড়া-প্রস্তাবের চারটি নতুন সংশোধন দাবী করে বসলেন। প্রথম, ভারত গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদ গবর্ণমেণ্টকে রাজ্যের অভ্যন্তরে সেই ধরণেরই আইন প্রবর্তনে মাত্র 'অনুরোধ' করতে পারবেন, যে ধরণের আইন ভারতের অন্যান্য অংশে প্রবর্তিত করা হয়েছে বা করা হবে। বিশেষভাবে এবং একমাত্র হায়দরাবাদের জন্যই কোন আইন প্রবর্তনে হায়দরাবাদকে অনুরোধ করতে পারবেন না ভারত গবর্ণমেণ্ট। দ্বিতীয়, হায়দরাবাদ আট সহস্র অ-রেগুলার সৈন্য রাখতে পারবে, যার ওপর ভারতীয় সমর বিভাগের কোন প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থাকবে না। তৃতীয়, রাজাকর দলকে হঠাৎ এবং একেবারেই ভেঙেগ দেওয়া উচিত হবে না। ক্রমে ক্রমে এবং দফায় দফায় রাজাকর দলকে ভেঙেগ দেবার ব্যবস্থা করা হবে। চতুর্থ, যে 'জরুরী অবস্থায়' ভারত গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদের অভ্যন্তরে ভারতীয় সৈন্য রাখতে পারবেন, সেই 'জরুরী অবস্থা' বলতে কি অবস্থা বুঝায়? এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও বিশদ উল্লেখ প্রয়োজন। ভারত শাসন আইনের নীতি ও নির্দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই 'জরুরী অবস্থা'র সংজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করতে হবে।

আশা ছেড়ে দিলেন মাউণ্টব্যাটেন। লায়েক আলির প্রস্তাবিত এই চারটি নতুন ও অতিরিক্ত দাবী ভারত গবর্ণমেণ্ট কখনই স্বীকার করতে রাজী হবেন না। কিন্তু অত্যন্ত বিস্মিত হলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং খুশিও হলেন, লায়েক আলির প্রস্তাবিত এই অতিরিক্ত চারটি দাবীও মেনে নিতে আপত্তি করলেন না নেহরু। নেহরু বললেন যে, তিনি এই দাবীও মেনে নিতে রাজী হতে পারেন।

১৫ই জুন তারিখে হায়দরাবাদ ডেলিগেশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মাউণ্টব্যাটেন এবং অভাবিত সফলতার কথা জ্ঞাপন করলেন। লায়েক আলি

তৎক্ষণাৎ দু'টি নতুন দাবী উত্থাপন করলেন। লায়েক আলি বললেন, প্রস্তাবে আরও দুটি বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ চাই। রাজ্যের অর্থনীতি এবং রাজস্বের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সকল নীতি সম্বন্ধে হায়দরাবাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

আবার রাজী হলেন ভারত গবর্ণমেণ্ট। লায়েক আলির এই দুইটি দাবীও মেনে নিতে আপত্তি করলেন না। ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে শুধু এই প্রস্তাব করা হলো যে, চুক্তি-প্রস্তাবে এ বিষয়ে কোন নির্দেশ বা ঘোষণার উল্লেখ না রেখে, আনুষঙ্গিক এক সম্মতিপত্রে হায়দরাবাদের এই দাবীর স্বীকৃতি উল্লিখিত হতে পারে।

মাউণ্টব্যাটেনের কাছ থেকে কথা-প্রসঙ্গে এ তথ্যও জানতে পেরেছি যে, নেহরু আরও উদার প্রতিশ্রুতি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। নেহরু এ পর্যন্ত বলেছিলেন যে, হায়দরাবাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অবলম্বিত সকল উদ্যোগে হায়দরাবাদকে সুবিধার অধিকার দিতে রাজী আছেন ভারত গবর্ণমেণ্ট, এবং সেই সব 'সুবিধা'র কথা এই আনুষঙ্গিক সম্মতিপত্রে উল্লেখও করা হবে।

লায়েক আলি বোধ হয় নেহরুর এই প্রতিশ্রুতির অর্থ উপলব্ধি করতে পারলেন না। লায়েক আলি সত্য সত্যই প্রস্তাব করলেন যে, এ সব প্রতিশ্রুতির উল্লেখ বাদ দেওয়াই ভাল এবং বাদ দিতে হবে।

প্রতিবাদ করলেন মঙ্কটন। লায়েক আলির প্রস্তাবে আপত্তি করে মঙ্কটন বললেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের এই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করলে হায়দরাবাদের পক্ষে চরম বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় দেওয়া হবে। মাউণ্টব্যাটেন বললেন, নেহরুর এই প্রস্তাব বস্তুতঃ হায়দরাবাদের প্রতি বিশেষ উদারতা ও সৌহার্দ্যের প্রস্তাব। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই ধরণের প্রতিশ্রুতি মাত্র সেই সব দেশীয় রাজ্যকেই দিয়েছেন যারা রাষ্ট্র-ভুক্তির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের মত 'রাষ্ট্রভুক্ত' না হয়েও হায়দরাবাদ রাজ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছ থেকে সুবিধা ও সহযোগিতা লাভের প্রতিশ্রুতি পেয়ে যাচ্ছেন। নেহরুর এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে লাভবান হবে না হায়দরাবাদ।

মঙ্কটন এবং মাউণ্টব্যাটেন, উভয়েই এইভাবে যুক্তি দিয়ে বুঝাবার পর লায়েক আলি মত পরিবর্তন করলেন। আনুষঙ্গিক সম্মতিপত্রে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি উল্লেখ না করবার জন্য তিনি যে অনুরোধ করেছিলেন, এইবার সে অনুরোধ প্রত্যাহার করে নিলেন। মাউণ্টব্যাটেনের মতে, এ ঘটনা নতুন কোন বিরোধের সূত্রপাত না করে তখনই একরকম মিটে গেল সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই বাস্তব সত্যটিও আর একবার স্মরণ করিয়ে দিল যে, লায়েক আলি তখনো কতখানি এক-রোখা মনোভাব নিয়ে সর্বপ্রকার আপোষের পথ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। এত আলোচনার পর এবং বিশেষ বিশেষ সংশোধনের পর খসড়া-প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ালো, তাই নিয়ে হায়দরাবাদ রওনা হয়ে গেলেন লায়েক আলি। মঙ্কটনও লায়েক আলিকে এই বিশেষ অনুরোধ করতে ভুললেন না যে, এইবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সঙ্গে নিয়েই তিনি যেন ফিরে আসেন। আবার নতুন করে কোন সংশোধন বা রদবদলের দাবী যেন না উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাব হয় সম্পূর্ণ-ভাবে স্বীকার, নয় সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির মাঝামাঝি অবস্থায় আর ঝুলিয়ে রাখা চলবে না।

লায়েক আলি রওনা হয়ে যাবার পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত মাউণ্টব্যাটেন হায়দরাবাদ থেকে উত্তরের অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু কোন উত্তর এল না। রাত্রি ন'টা চল্লিশ মিনিটের সময় নিজামের কাছ থেকে টেলিগ্রাম এল, তিনি এখনো চূড়ান্তভাবে কিছু বলতে পারছেন না। নিজাম জানালেন, কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ না করা পর্যন্ত চূড়ান্ত বক্তব্য জ্ঞাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়।

নিজাম তাঁর কাউন্সিল তথা শাসন-পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করবেন, এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উত্তর দিতে নিজামের আর একটা দিন সময় লাগবে এবং ততক্ষণ দিল্লীকে শুধু প্রতীক্ষায় চুপ করে বসে থাকতে হবে। যাই হোক, এই প্রতীক্ষা এবং বিলম্বও সহ্য করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন দিল্লী।

১৬ই জুন তারিখের বৈকালে মাউণ্ট-ব্যাটেন এবং মঙ্কটন উভয়কেই হায়দরা-বাদ থেকে জানানো হলো যে, নিজামের কাউন্সিল এই খসড়া-প্রস্তাব অনুমোদন করেননি এবং এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্যই কাউন্সিল নিজামকে পরামর্শ দিয়েছেন। প্রত্যাখ্যানের চারটি নতুন যুক্তি দেখিয়েছেন কাউন্সিল।

শুধু মাউণ্টব্যাটেন নয়, মঙ্কটনও এই চারটি নতুন যুক্তির স্বরূপ দেখে বিস্মিত হলেন। অত্যন্ত অসঙ্গত এবং বস্তুতঃ হাস্যকর চারটি যুক্তি। মাউণ্ট-ব্যাটেন এত বিচলিত হলেন যে, তিনি মঙ্কটনকে তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রিতেই হায়-দরাবাদ চলে যাবার অনুরোধ করলেন। হায়দরাবাদে গিয়ে একেবারে নিজামের কাছে উপস্থিত হয়ে মাউণ্টব্যাটেনের সব বক্তব্য মঙ্কটনই বলবেন। নিজাম কোন প্রশ্ন উত্থাপন করলে মঙ্কটনই মাউণ্ট-ব্যাটেনের হয়ে সে প্রশ্নের উত্তর দেবেন, কারণ মাউণ্টব্যাটের উত্তর কি হতে পারে, সেটা মঙ্কটন ভালভাবেই বুঝে নিতে পেরেছেন।

গণপরিষদ গঠনের ব্যবস্থা সম্পর্কে নিজাম তাঁর ফারমানের মধ্যে কয়েকটা কথা এর আগে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। "ভবিষ্যতে আমি ভেবে দেখবো, কোন ভিত্তিতে গণপরিষদ গঠিত হতে পারে, এবং সেই ভিত্তি নির্ধারণের পর"—এই উল্লেখের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষ থেকে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল। নিজামের ডেলিগেশনের সঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে আলোচনাও হয়েছিল এবং ডেলিগেশন এই কথাগুলি বাদ দিতে তখুনি রাজী হয়েছিলেন। ডেলিগেশনের মতেও, এই কথাগুলির মধ্যে এমন কিছু রাজনৈতিক তাৎপর্য নেই যার জন্যে কথা-গুলিকে ফারমানের বক্তব্যের মধ্যে রাখতেই হবে। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়াতেই কথাগুলি বাদ দিতে রাজী হয়েছিলেন ডেলিগেশন এবং সংশোধিত খসড়া-প্রস্তাবে কথাগুলি বাদ দেওয়াও হয়েছিল। এখন নিজাম ঘোর আপত্তি তুলেছেন, ঐ কথাগুলিরই বাদ দেওয়ার বিরুদ্ধে। কথাগুলির যে কি গুরুত্ব আছে, সেটা মানুষের কল্পনাও মাথা খুঁড়ে বের করতে পারবে না। তবু নিজাম আপত্তি তুলেছেন এবং অতি তীব্র আপত্তি। আর একটি আপত্তি হলো অর্থনৈতিক চুক্তির বিরুদ্ধে। কোন্ প্রস্তাবকে অর্থনৈতিক চুক্তির প্রস্তাব বলছেন নিজাম? ভারত নিজের থেকেই এবং নিজের আগ্রহে শুধু এই প্রস্তাব করেছেন যে, হায়দরাবাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারত হায়দরাবাদকে সুবিধা ও সাহায্য দান করবেন। এই প্রতিশ্রুতি আনুষঙ্গিক সম্মতিপত্রে উল্লিখিত থাকবে। নিজামের পক্ষ থেকে

এ বিষয়ে কোন পাল্টা কর্তব্যের প্রতিশ্রুতি দাবী করা হয়নি এবং কোন সর্তও আরোপ করা হয়নি। সুতরাং, 'অর্থনৈতিক চুক্তি'র কথা এর মধ্যে কেমন করে আসে? তবু নিজাম আপত্তি তুলেছেন যে, আনুষঙ্গিক সম্মতিপত্রে উল্লেখ করে নয়, আসল রাজনৈতিক চুক্তিপত্রের মধ্যেই এই অর্থনৈতিক চুক্তির বিষয় উল্লেখ করতে হবে।

১৭ই জুন তারিখে মধ্যাহ্নকালে হায়দরাবাদ থেকে মাউণ্টব্যাটেনের কাছে টেলিফোন করলেন মঙ্কটন, এবং একটি মাত্র কথা উচ্চারণ করে তাঁর বক্তব্য শেষ করে দিলেন। মঙ্কটন বললেন—'ব্যর্থ'।

সন্ধ্যা হতেই নিজামের কাছ থেকে তাঁর আর একটি সম্পূর্ণ নতুন আপত্তির সংবাদ দিল্লীতে এসে পৌঁছলো, যে আপত্তি তিনি এর আগে কোন প্রসঙ্গে কখনও উত্থাপন করেননি। নিজাম জানিয়েছেন, জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে হায়দরাবাদে ভারতীয় সৈন্য সন্নিবেশ করার অধিকার ভারত গবর্ণমেণ্টের থাকতে পারে না। এই আপত্তি ছাড়া আর একটি ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন নিজাম—আরও আলোচনা চলতে থাকুক, আলোচনা বন্ধ করতে চাই না।

(ক্রমশঃ)

সুকুমার বসু

পনের ষোল বছর আগেকার ঘটনা। হাতে একটা টর্চলাইট নিয়ে খনির ভিতর কাজের তদারকে ব্যাপৃত ছিলাম। সদর সুড়ঙ্গপথ থেকে যেখানে নতুন একটা শাখা সুড়ঙ্গ আরম্ভ হয়ে আট নয় হাত পর্যন্ত ডান দিকে অগ্রসর হয়েছে সেই মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। এখানে মাথার উপর দুই হাত ফাঁক আছে তার পর আছে পাথরের ছাদ বা চাল। আর এখান থেকে শাখা সুড়ঙ্গের চাল ক্রমে নীচু হয়ে শেষ প্রান্তে খাড়াই হয়েছে মাত্র পাঁচ ফুট, তাই ভিতরে যে লোকটি গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটছে সেখানে তার সোজা হয়ে দাঁড়াবার জায়গা নেই। সেই ঘোর অন্ধকারে তার কাছে আলো আছে মাত্র একটা কেরোসিনের ডিবে। আমার হাতের টর্চের আলো ফেলতেই দেখতে পেলাম যে লোকটির মাথার উপরে চাল থেকে খানিকটা কয়লা আর পাথর সামনের দিকে খসে এসে ঝুলছে, ভেঙে পড়বার উপক্রম করছে। দেখামাত্র তাকে বেরিয়ে আসতে বলায় সে সদর সুড়ঙ্গ পথে আমার পাশে এসে দাঁড়াল—আর তার একটু পরেই ভীষণ শব্দে উপর থেকে সেই কয়লা আর পাথর ভেঙে পড়ে সমস্তটা জায়গা কয়লার গুঁড়োয় ধোঁয়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিল। খানিক পরে জায়গাটা পরিষ্কার হলে দেখা গেল চালে একটা বৃহৎ গহ্বর হয়েছে আর নীচে পড়ে আছে কয়লা আর পাথরের একটা বৃহৎ স্তূপ।

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুজনের দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেল। লোকটি স্পষ্টই বুঝে নিল আমার চোখের ভাষা—"দেখলে হে কাণ্ডখানা? আর একটু দেরি হলেই তুমি গুঁড়ো হয়ে যেতে!" বুঝল বলেই লোকটা আস্তে আস্তে আঙুল দিয়ে কপালের ঘামটা ঝরিয়ে ফেলে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। তার পর শান্ত অথচ বিরস স্বরে তার দেহাতী ভাষায় যে কথা কয়টি বলেছিল, তা আমি কখনও ভুলবো না। বললে—"হামারা কিয়া যাতা? জীউ পরমাত্মাকা হ্যায়।"

লোকটি কয়লা খাদের সাধারণ মজুর, আসলে কৃষিকর্ম তার পেশা। বিলাসপুর অঞ্চলের অধিবাসী, বছরে ছ মাস এসে কয়লাখাদে দিনমজুরি করে কিছু উপার্জন করে নিয়ে যায়। গীতাপড়া শিক্ষিত লোক এই ধরণের কথা কখন কখনও কপ্‌চিয়ে থাকেন তা জ্ঞাত আছি। কিন্তু মজুর শ্রেণীর 'শিক্ষালেশহীন' লোকের কাছেও এমন কথা এক ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোন দেশে কস্মিনকালেও শোনা সম্ভবপর বলে আমি বিশ্বাস করি না। লোকটির সহজ সরল নিরাভরণ ভাষায় মনুষ্যজন্মের প্রতি, জীবনের প্রতি তার যে মনোভাবের প্রকাশ রয়েছে ভারতবর্ষ আমাদের চিরদিন সেই শিক্ষাই দিয়ে এসেছে, আর এ শিক্ষা ভারতের মজ্জায় কিভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে এই লোকটির উক্তিই তার প্রমাণ। প্রাণ যদি যায় তো প্রাণীর কোন লোকসানের ভয় নেই, তার কিছুই যায় আসে না। কারণ প্রাণ তো তার নয়—প্রাণ ঈশ্বরের। যে জিনিস তার নয় তা সে হারাতেই পারে না, তাছাড়া জিনিস যার দায় তারই—অন্য কারও দায় নয়।

এমন বিশ্বাসকে অদৃষ্টবাদ মনে করলে ভুল করা হবে। এ শুধু বৈরাগ্য আর ঈশ্বরে সরলমনে সম্পূর্ণ নির্ভর—যা মানুষমাত্রেরই কাম্য। কারণ আসক্তিই ভয়ের মূল আর যিনি অনাসক্ত তাঁর জীবন জয়-যুক্ত হয়েই আছে। বৈরাগ্যমেবাভয়ং—বৈরাগ্যই শুধু অভয়।

(২)

ঐ সময়েরই আর একটি ঘটনা।

একটা হাঁস প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে রোয়াকের উপর উঠে আসছিল দেখে লাঠি নিয়ে তাকে তাড়া করেছিলাম। তাই দেখে আমার শিশুকন্যা বলে উঠ্‌ল—"বাবা, ওকে মের না, ও বেচারি মরে গেছে, আমরা ওর মাংস খেয়েছি।"

উক্তিটি ভাষার দিক থেকে নির্ভুল, ব্যাকরণেও শুদ্ধ—কিন্তু এর তাৎপর্যটা কী সেইটুকু বিবেচ্য। শিশুমনে মৃত্যু সম্বন্ধে আইডিয়াটা কি? মৃত্যু হলেও যদি প্যাঁক্ প্যাঁক্ করা যায় তো 'বেচারি' কেন? দেহের মাংস খেয়ে ফেললেও যদি রোয়াকে ওঠা যায় তো আফ্‌সোস কিসের?

কন্যা বড় হয়েছে, এখন তার কথার মানে বোঝা যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করেছি তার বক্তব্যের অভিপ্রায় সম্বন্ধে—কিন্তু সে কিছু জবাব দিতে পারে না। শিশুমনস্তত্ত্ব যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের কাছে এই রহস্যটি উপঢৌকন দিলাম, এ বিষয়ের উপর যদি কিছু আলোকসম্পাত করতে পারেন তো বিশেষ আনন্দ লাভ করব।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জাহাজের স্টোক্‌হোল্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাজের তদারক করছি সেদিন। আমার ডাইনে-বাঁয়ে দুটো প্রকাণ্ড বয়লার, তাদের মুখোমুখি আরও দুটো। এর মধ্যে তিনটা বয়লার নির্বাপিত, তারই ভিতরে ঢুকে আমার লোকেরা কাজ করছে। চতুর্থ বয়লারটি জ্বলছে, তার সামনে জাহাজের খালাসীরা দাঁড়িয়ে।

ঘড়িতে সময় দেখছি আড়াইটা, একটা সিগারেট ধরালাম। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। মাথার আর দোষ কী, কদিন ধরে যে উৎকণ্ঠা, যে বিচিত্র চিন্তায় কণ্টকিত হয়ে আছি! এই জাহাজের ঠিকা কাজটা পাওয়ার জন্য কদিন ধরে টেন্ডার নিয়ে ছুটাছুটি, নানাবিধ পরিশ্রম, সর্বোপরি তীব্র প্রতিযোগিতা!

অবশ্য সফল হলাম অবশেষে, কাজটা পেলাম আমি। মালিককে সুসংবাদ জানিয়ে কেন্দ্রে পত্র দিয়েছি, আমার সুদক্ষ ম্যানেজারির প্রশংসা করে তিনি শীঘ্রই তার উত্তর দেবেন নিশ্চয়।

কিন্তু কাজ পাওয়াই সমস্যার শেষতম সমাধান নয়, কাজ চালানো এবং কাজ চালিয়ে লাভ রাখাটাও কম কৃতিত্ব নয় এ বাজারে, সে যাঁরা ব্যবসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন, তাঁরাই বুঝবেন। আর লাভ না রাখতে পারলে মালিকের মুখ কালো।

শীতকাল, কিন্তু স্টোকহোল্ডে কখনও শীত নামে না, এখানে চির গ্রীষ্ম। আজ স্নান হয় নি, সকাল থেকে জাহাজে আছি, চা ও কয়েক টুকরো পাউরুটির সংস্থান অবশ্য হয়েছিল বন্দর-সংলগ্ন ক্যানটিনের দাক্ষিণ্যে।

বেলা আরও গড়িয়ে সাড়ে তিন। দুই বয়লারের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ স্থানটুকুর মধ্যে পায়চারী করছি, মাঝে মাঝে নির্বাপিত ফারনেসের মুখ সরিয়ে ভিতরে লোকগুলির কাজের তদারক করে নিচ্ছি। কাজ ওরা ঠিকই করছে সারা গায়ে কালি মেখে।

কালি আমিও মেখেছি। সর্বাঙ্গে। মনেও। মুখের সিগারেটটা উদ্যমের অভাবে লক্ষ্য করলাম, নিভে গেছে মধ্যপথে।

কিন্তু সিগারেট আর জ্বালিনি, নীরবে পায়চারি করছি একমনে। বাড়িতে আমার সওয়া দুই বছরের শিশুপুত্র হাবলু এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠেছে বোধহয়। ছেলেটা আমাকে বড্ড খোঁজে, হয়ত খুঁজছে এখন। অফিস ঘরে, শোবার ঘরে সর্বত্র খুঁজে এসে হয়ত মাকে প্রশ্ন করছে, বাবা কোথায়?'

জ্বলন্ত বয়লারের একটা ফার্নেসের মুখ হঠাৎ এই সময় খুলে দিলো খালাসী, কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, উত্তাপে ঝলসে গেলাম যেন মুহূর্তে! অগ্নিগোলক ফার্নেসে দুরন্ত আক্রোশে ফুলছে, ক্ষুধা ওর মেটেনি, আরও চাই; খালাসী অতিকায় হাতাটায় কয়লা উঠিয়ে নিবেদন করছে অগ্নিদেবতাকে! কিন্তু কতক্ষণ? কিছুক্ষণের মধ্যেই ও কয়লা জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে যাবে।

সরে দাঁড়ালাম। হাতে একটা আঙুলে একটা বড়ো ফোস্কা পড়েছে, বয়লারের স্মোকটিউবে কাজ করতে গিয়ে এটি লাভ হয়েছে; ভেবে লাভ নেই, লেখায় যখন টাকা আসে না, তখন হাতে হাতুড়ি ধরতেই হবে। হঠাৎ মনে পড়ল, লিখি না কদিন? মাস তিনেক। ওঃ! এতদিন না লিখে বেঁচে আছি!

ভারী বুটের শব্দ পাওয়া গেল, চীফ ইঞ্জিনিয়ার বয়লার-সুট পরে ভিতরে ঢুকেছে। হ্যালো?

হ্যালো, বাড়ি যাওনি?

না।

একটু হেসে বললে, খুব কাজ করছ, অ্যাঁ?

তা' করছি।

বলল, দেখ, কাল বয়লার শেষ করছ ত, পরশু সার্ভেয়ার আসছে।

নিশ্চয়ই। দরকার হলে দিনরাত ক[illegible] করব।

খুশীতে ঝলমল করে উঠল ইঞ্জিনিয়া[illegible] মুখ—দ্যাট্‌স্‌ গুড। আচ্ছা, চিয়ারিও।

চিয়ারিও!

চলে গেল। বেলা চারটে। উমা এতক্ষ[illegible] কী করছে? জানালার কাছে দাঁড়ি[illegible] মেয়েটা এত ভালবাসে কেন আমাকে?

আমার বুড়ো ফোরম্যানটা ওপরের সিঁ[illegible] দিয়ে নীচে নেমে এলো, উৎকণ্ঠিত হ[illegible] বললাম, কেয়া খবর?

সব ঠিক হ্যায় সাব, আচ্ছা কাম চল[illegible]

সে আমি জানি। আমি থাকলে কা[illegible] ভালই চলে। বললাম, আচ্ছা যাও, আ[illegible] উধার, দেখো ফার্নেসমে।

যেতে যেতেও সে থমকে দাঁড়ালো বললাম, কেয়া?

সাব, থোড়া-কুছ্‌ অ্যাডভান্স্‌।

বললাম, আচ্ছা, হোগা। আজ নেই, কাল। রেপু!

ফোরম্যান চলে গেল আর আধ ঘণ্টা সময়, আজকের মতো কাজ শেষ।

বন্ধুবর তাঁর লেখা পাঠিয়েছেন পড়ে মতামত জানাতে হবে। সময়ের অভাবে সে সব ছোঁয়াও হয় নি। কলকাতা থেকে মায়ের চিঠি পেয়েছি, সেখানে নানারূপে সমস্যা। জনৈক ভগ্নীদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক আমার ছোট ভাইয়ের জন্য আমাকে ধরেছেন, পর পর পত্র পেয়েছি দুখানা, উত্তর দেওয়া হয় নি। ছোট বোন পত্র দিয়েছে গানের স্কুলে ভর্তি হবে, গান শিখে সে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবে সর্বোপরি—সে গান-পাগল; এই গান গাওয়ার বিলাসিতার জন্য রূঢ় সংসারে যথেষ্ট মূল্য দিতে হচ্ছে তাকে। ছোট ভাই জরুরী পত্র দিয়েছে, ওখানে যেন একমাত্র কংগ্রেসকেই ভোট দেই। কারণ, কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার......ইত্যাদি ইত্যাদি।

মনে পড়ল আমি ত ভোটারই নই। আমি কাজে আছি বাড়ির বাইরে; ভারপ্রাপ্ত সরকারী মানুষ কোনও মধ্যাহ্নে হয়ত এসে আমার খোঁজ করে গেছে পায় নি;—আমারও এ বিষয়ে তদ্বির করার অবকাশ নেই।

এক বন্ধু লিখেছেন এখানে ম্যাঙ্গানীজ-এর রপ্তানির বাজার কী রকম; সুবিধা হলে সে এ ব্যবসায়ে নামতে রাজী। আমি যদি সমস্ত খোঁজ খবর নিয়ে তাকে জানাই ত সে খুব উপকৃত হয়। আরেক বন্ধু লিখেছেন,—কবিতা লিখুন অদ্ভুত হয় আপনার কবিতা!

আজ হয়ত লিখব কিছু। অনেক দিন পরে লেখা নিয়ে বসতে ইচ্ছা করছে। ঐ ঘণ্টা পড়ল, এবার ছুটি। উমা কী করছে? চুল বাঁধতে বসেছে? বোধহয় না। বোধহয় ভাবছে, সেই সকালে বেরিয়েছে, এখনও এলো না, কী হলো লোকটার? বাবলু তার 'ঘুড়ি' নিয়ে এঘর ওঘর করছে, তার ঘুড়ি ওড়াবার সঙ্গী তার বাবা গেল কোথায়? না না, এখন সে 'দুদু' খাবে না, 'উতি'ও খাবে না, তার বাবা কই?

ঊর্ধ্বশ্বাসে ইঞ্জিন রুমের সঙ্কীর্ণ লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছি। মনের মধ্যে অদ্ভুত সুর গুনগুনিয়ে উঠছে, কেমন আবেশ আসছে ভিতরে, লিখতেই হবে আজ কিছু!

আঃ: ঐ আকাশ, ঐ সূর্যের স্নিগ্ধ আলোকরশ্মি। স্টোকহোল্ডের বদ্ধ কারা থেকে ডেকে এসে প্রাণভরে নিশ্বাস নিলাম। এবার বাড়ি। স্নান, আহার, তারপরে কিছু কাগজ আর কলম। যেন সেতারের তারের মতো বাজছে আমার প্রাণমন!

গ্যাঙওয়ে বেয়ে নীচে নামব, হঠাৎ থার্ড ইঞ্জিনিয়ার কেশব পেন্ধারকর এসে ধরল আমাকে।

কী মশাই, আপনাকে সারা জাহাজ খুঁজে খুঁজে হয়রাণ, কোথা ছিলেন আপনে?

হেসে বললাম,—স্টোকহোল্ডে!

গুলী মারো স্টোকহোল্ডকো,—কেশব বললে,—আপ্ চোলেন হামার সাথে।

কোথায়?

কেশব আমাকে টেনে নামিয়েছে ততক্ষণে, বললে,—পহিলে আপনার বাড়ি ত চলেন। পোষাক-আশাক করিয়ে চা-উ খেয়ে তার-পরে চলুন—একসাথ যাই।

কেশবের সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিনয় করতে হয়েছিল, ব্যবসার খাতিরে। নূতন ব্যাপার কিছু নয়, সবাইকে সন্তুষ্ট না করে বেড়ালে যে চাকরী আমি করি, তা রাখা চলে না। কিন্তু আজ? বললাম, ভাই, আজ আমাকে ছেড়ে দাও, বড্ড শ্রান্ত আমি।

আরে আপ্‌পেন কেয়া বোলে,—কেশব হাস্যতরল কণ্ঠে বলে উঠল,—আপনার শ্রান্তি বিলকুল দূর হয়ে যাবে, চলেন না। আপনাকে কী কোনও কাজ করতে বলছি আমি?

সাইকেল রিক্সায় দুজনে উঠে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু কোথায়?

বহুৎ জব্বর খেল হচ্ছে আজ সিনেমায়, কেশব বলল,—মধুবালা আউর......

বললাম, থাক। বুঝেছি। চলুন।

এড়ানোর উপায় নেই। এড়ালে কী মনে করবে? আর, দোষও আমারই? আজ সকালেই ত ওকে খুশী করবার জন্য সিনেমা যাবার প্রস্তাব করেছিলাম আমি। অবশ্য আজই যেতে হবে এমন কথা বলি নি। কিন্তু, ওভাবে অন্তরঙ্গতা না দেখালেই হতো! হায়, না দেখিয়ে উপায়ও নেই। ওর সাহায্যের ওপর আমার কাজের লাভ-ক্ষতি বেশ খানিকটা নির্ভর করছে। বয়লারের কাজ পরীক্ষা করবে কিন্তু ও-ই। ওরই রিপোর্টের ওপর চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সন্তুষ্টি নির্ভর করছে।

বাড়ি এলাম। ওকে অফিস ঘরে বসিয়ে বাথরুমে এলাম। উমাকে বললাম চায়ের ব্যবস্থা করতে। বাবলু 'ঘুয়ি' নিয়ে এখনো ঘুরছে।

চা খেতে খেতে ডাক এলো। আরও পত্র। একখানিতে মায়ের টাকা চাই। অন্য-খানিতে ইন্‌সুয়োরেন্সের প্রিমিয়াম পাঠানোর বিজ্ঞপ্তি। দুটি পত্রিকা। সম্পাদক বিনা পয়সায় পত্রিকা পাঠিয়ে যাচ্ছেন, লেখা চাই। অগ্রজস্থানীয় সাহিত্যিকের বড়ো চিঠি। নিজের লেখা সম্পর্কে সচেতনতা নেই, কিন্তু আমার লেখা সম্বন্ধে যত্ন ও আগ্রহ অপরিসীম। দীর্ঘ পত্রের পরে মন্তব্য, পরপর দুখানি চিঠি দিলাম, উত্তর কই?

কেশব তার কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল,—উঠুন, সময় হয়ে গেছে।

ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছি। উমা গলার টাইটা ঠিক করে দিতে দিতে করুণ কণ্ঠে বলল,—সারাদিন খাওয়া হলো না ত?

বললাম,—এসে খাব। তাছাড়া, খিদে কই? সারাদিন যা চা খেয়েছি, খিদে মরে গেছে!

বলল,—ওই করে করে কঠিন রোগ বাধাও আর কী!

রোগ, বললাম,—মনের রোগ ত আছেই! কাল্লারোগঃ এই দেখ না, আজ ভেবে-ছিলাম......

বাইরে থেকে কেশবের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো,—এ মিস্টার, আপ্‌পেন জলদি করো!

যাতা ভাই!

উমাকে বললাম,—শীগ্‌গির রুমাল দাও আর টাকা দাও।

আমার তাড়ায় বেচারী দিশাহারা হয়ে গেল, এটা খোলে ওটা ধরে, এটা করতে গিয়ে ওটা করে।

বললাম,—আঃ, তাড়াতাড়ি করো।

পেলাম টাকা ও রুমাল। বললাম,—বাবলু কই?

নিজেই ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলে বায়না ধরেছিল, শান্তি আবার নিয়ে গেছে দোকানে।

ঘুড়ি নিয়ে এসে আমায় খুঁজবে ত?

গৃহিণীর চোখ কেমন যেন ছলছল করে এলো, বলল,—তা ত খুঁজবেই। খুঁজে খুঁজে শেষে ঘুমিয়ে পড়বে।

বললাম, সিনেমার পর আর দেরী করব

না শীগ্গিরই আসব। রান্না তৈরী রেখো। কি রাঁধছ?

ডিম।

দ্যাটস্ গুড্।

কেশবের চীৎকার,—আপ্‌পেন কেয়া ভাই, আ যাও।

সিনেমা যেতে যেতে শুরু হয়ে গেছে। প্রধান মন্ত্রী কীসের যেন ভিৎপত্তন করছিলেন তখন, আমরা অন্ধকারে টর্চের আলোয় আমাদের আসন খুঁজে নিলাম। দেখতে দেখতে কেশব নিমগ্ন হয়ে গেল মধুবালার রঙ্গভঙ্গীতে। ক্লান্তিতে মাথা এলিয়ে দিয়েছি ততক্ষণে। কী অবাস্তব এই গল্পগুলি, আর কী হালকা!

আমার গল্প নিয়ে এক বন্ধু বলেছেন, আরও গভীর গল্প চাই! হ্যাঁ, গভীর ছোট গল্প! হাতের আঙুলগুলো আড়ষ্ট, মাথাটা ভারী, পীড়িত চোখের সামনে মধুবালা নয়, বন্ধুর মুখখানাই ফুটে উঠছে। গভীর গল্পই দিয়েছি বন্ধু, তবে আমার বলার ভঙ্গী আমার নিজস্ব, সেই ভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হতে তোমাদের সময় লাগবে, তখন বুঝবে, গভীর না হলে তা গল্পই হয় না। সত্যের চেয়ে গভীর আর কী আছে? আর, সত্যই ত সত্যিকার গল্পের প্রাণ!

চোখ ধাঁধিয়ে আলো জ্বলে উঠল। বিরাম। কেশব উচ্ছ্বাসে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরেছে, অহা হা, কেৎনা আচ্ছা খেল। কী মিস্টার ভালো লাগছে?

হেসে বললাম,—হ্যাঁ।

কেইসা গানাঃ কেশব বলল,—আরে আপনারা ত বিজনেস ম্যান, কাঠখোট্টা আদমী, আপনাদের খালি পয়সা আর পয়সা —কাজ আর কাজ!

চুপ করে রইলাম। থার্ড ইঞ্জিনিয়ার কেশব পেন্ধারকর, তুমি কী বুঝবে কোন বেদনায় আমার প্রাণ অনুরণিত? তবু তোমরা ভালো। তোমরা নাসা কুঞ্চিত করে আমাকে পাতি বুর্জোয়াও বলবে না, অথবা কবিগুরুর বর্ণিত কৌলিক হংস-সমালোচকদের মধ্যে কিছু হয় নি, কিছু হয়নি বলে গ্রীবা উত্তোলনও করবে না! তবুও তোমাদের কাছে এক ব্যবসায়ী ছাড়া আর কোন পরিচয় দিতে পারি না। দিলে অসুবিধাই আছে।

আবার আলো নিভে ছবি শুরু হলো। তারপর কখন যে ছবি শেষ হলো কে জানে, হয়ত তন্দ্রা এসেছিল, কেশব সবিস্ময়ে আমাকে ঠেলছে,—আরে এ কেয়া, আপ্‌পেন নিদ্ আ গিয়া?

অপ্রতিভ হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সিনেমার বাইরে এসে কেশব বিদায় নিলে; সে যাবে জাহাজে, আমি বাড়ি।

আচ্ছা, নমস্কার, কাল দেখা হবে সকালে।

নমস্কার।

বাড়ি এলাম। খোলা দরজার কাছে ঝিটা ঢুলছে। শোবার ঘরে এসে দেখি, মাতাপুত্রে ঘুমিয়ে পড়েছে খুব ভোরে ওরা ওঠে, সেই জন্য রাতে সকাল-সকালই ওদের ঘুম পায়। বাবলুর মাথার কাছে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি ছোট হাতের মুঠোয় তখনও সুতোর প্রান্ত।

এতক্ষণে অনুভব করছি বেশ খিদে পেয়েছে। ঝিকে বাড়ি যাবার অনুমতি দিয়ে দরজাগুলি একে একে বন্ধ করে পোষাক বদলে ঘরে এলাম। উমার খোঁপা বাঁধা, খোঁপায় একগাছি চাঁপা ফুলের মালা জড়ানো। হঠাৎ আজ ও সখ করে ফুলের মালা প'রেছিল নাকি? কেন?

ডাকলাম। ধড়মড় করে উঠে পড়ল। অপ্রতিভ হয়ে বলল, ঈস! ঘুমিয়ে পড়েছি? কতক্ষণ হলো ফিরেছ?

হেসে বললাম এখনি। ভাত দাও।

উঠল। বললাম, হঠাৎ ও সাড়ীটা পড়েছ যে?

লজ্জা পেলো আমার কথায়। সাড়ীটা ওর বড়ো সখের, কখনো-সখনো পড়ে। বলল, দেখছ, ওটা পড়েই শুয়ে গেছি।

আমি বাবলুর ঘুমন্ত মুখে চুমু খেলাম, ও ছোট দেহটা একটু আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে পাশ ফিরে শুলো।

পাশের ঘর থেকে উমা ডাক দিলো—এসো।

গিয়ে বসলাম। ক্লান্তিতে পা-ও যেন টলছে, চোখের পাতা ভারী। উমা ভাত বাড়তে বাড়তে হঠাৎ থমকে গেল। বলল, ঐ যাঃ!

কী?

একটাই তরকারী করেছিলাম, কয়েকটা আলু প'ড়ে আছে, ডিমটা নেই। তোমার জন্য ডিম করেছিলাম। ইঁদুরে নিয়ে গেছে নিশ্চয়! যে গেছো ইঁদুর এখানকার!

আমার চোখে তখন ঘুম জড়িয়ে আসছে, নীরবে কিছু খেয়ে উঠে পড়লাম। উমা আড়ষ্ট হয়ে ভাতের কাছে বসে রইল। হয়ত ভেবেছিল আমি রাগ করেছি।

আমি বিছানায় এলিয়ে পড়েছি ততক্ষণে। একটুক্ষণ পরে উমাও এলো অনুভব করলাম। আমার সারাদেহ শ্রান্ত অথচ ঘুম যেন এসেও আসছে না। মনের অস্থিরতা! ও! কতদিন লিখি না। ক্রমশ এই বেদনাবোধই চরম হয়ে দাঁড়ালো। বোধ হয় ঘণ্টা দুয়ের তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। তারপরে সম্পূর্ণ কেটে গেল ঘুমের ঘোর। বড্ড গরম লাগছে, জানালাগুলি খুলে দেবো?

চুড়ির ঝন্ ঝন্ শুনলাম, নিশীথ রাতে একে আমার চুড়ির কান্না বলতে বেশ লাগে। উমা এখনো ঘুমোয় নি? বিস্ময় বোধ করলাম। ওর এই অস্থিরতার কারণ কী? পাশের ঘরে বাসনকোসনের ওপরও শব্দ হচ্ছে; সে শব্দে তন্দ্রার ঘোর একেবারেই কেটে গেল। উঠে এগিয়ে গেলাম জানালার কাছে। খুললাম জানালা। সমুদ্র সমানে তার গান গেয়ে চলেছে। তারারা তেমনি দীপ্তিমগ্ন! শুধু আমারই হচ্ছে না কাজ করা! কোন্ সে রাক্ষস আমার সোনার মুহূর্তগুলিকে এমনভাবে গ্রাস করছে।

উমা কখন উঠেছে টের পাই নি। হঠাৎ কানে গেল একটা ঝন্ ঝন্ শব্দ পাশের ঘরে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখি হাতে কাষ্ঠখণ্ড উমা দাঁড়িয়ে কাঁপছে রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে। আর বাসনপত্র ছড়িয়ে যে পালিয়ে যাবার, সে ছুটে গেছে তার নিশ্চিন্ত কোটরে, তাকে আদৌ আঘাত করা যায় নি।

উমাকে কাছে টেনে নিলাম, ও কান্নাভরা কণ্ঠে বললে,—তোমার সারাদিন খাওয়া হলো না আজ!

বললাম,—এই কথা? কিন্তু ও রাক্ষসকে আঘাত করা তোমার আমার কর্ম নয় উমা, দুঃখ ক'রে আর কী করবে? এসো।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

মুখের দিকে একবার চাইলে, প্রশ্ন করলে—"বামুন ?"

"হ্যাঁ।"

বেশ বড় দেখে বেছে বেছে পাঁচটি তুললে, কপালে ঠেকিয়ে বাড়িয়ে ধরে বললে—"গড় করি, বামুনের হাতে বৌনি, বিকুবেই —তা তোরা যতই বৌনি ভেঙে যা না কেন ?—যত সব অযাত্রা ! বলুন কেন বাবাঠাকুর, এ জামরুল চারটে করে দেওয়া চলে ? ...নাও, আর একটা বাবাঠাকুর—পায়ের-ধুলো দিয়েছ গাদার সামনে......"

"থাক, আর আমার দরকার হবে না, একটু চেখে দেখে নেওয়া শুধু, একলা তো মানুষ।"

"তুমি ন্যাও, হাত তুলেচি বামুনের দিকে। না হয় গোরু-ছাগলের মুখে ফেলে দিও।"

হেসে বললাম—"নোকসান করব কেন ? মনে করো, নিলামই, আবার আশীর্বাদ বলে ফিরিয়ে দিলাম।"

"তা যদি বলছ তো থাক্। ও বাবা ! বামুনের আশীর্বাদ—শিরোধার্য।"

কপালে ফলটি ঠেকিয়ে আলাদা করে রেখে দিলে। ক'পা গিয়ে কি মনে হতে ঘুরে দেখি দুটি খদ্দের এসে দাঁড়িয়েছে, এক আঁজলা ফল তুলে ধরেছে মেয়েলোকটি। চোখাচোখি হয়ে গেল, একটু কৃতজ্ঞতার হাসি, ব্রাহ্মণ এসে সদ্য ফল দিয়ে গেল কিনা।

যত ফাঁকিই থাক না, সদ্য সদ্য তখনকার মতো ঐটুকু যে তখন একটা পরম সত্য; ওর পক্ষে তো বটেই, আমার মনেও একটা অদ্ভুত ধরণের আত্মচেতনা জেগে উঠেছে,—কে জানে, আমি কলির ব্রাহ্মণ কিছুই না হই, কিন্তু গোত্রপিতা ভরদ্বাজ ঋষি তো বটেই।

অন্তত মনটি বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। ছোট, একটি ঘটনা, কিন্তু হঠাৎ দার্শনিক করে তুলেছে কেমন যেন; ভাবছি—যদি ঠিক এমনিটি হয়ে যেত বরাবর—ভবের হাটে শেষ বেচা-কেনাটুকু সারার সঙ্গে এই প্রীতি, এই রকম একটি কৃতজ্ঞ হাসি নিয়ে যেতে পারতাম সঙ্গে ক'রে !......

ভগবান, অন্তত দেওয়ার সঙ্গে যেন থাকে এই রকম একটি প্রণাম, আর তা আশীর্বাদের সঙ্গেই ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়ার এই ক্ষমতাটুকু থাকে যেন অটুট।

জামরুল কটা বড় মিষ্টি, মনে পড়ে না এত মিষ্টি জামরুল খেয়েছি কখনও।

ডানদিকে "রয়াল সেলুনে" চুল ছাঁটা হচ্ছে। একটা লিকলিকে ঘাড়, কান থেকে নিয়ে কান পর্যন্ত নিচের দিকে সমস্তটা ক্ষুর বুলিয়ে দিয়েছে, এবার মিলুবে, কাঁচি হাতে দুলে দুলে তারই পাঁয়তাড়া ভাঁজছে। একবার এদিকে ঝুঁকে দেখে, একবার ওদিকে ঝুঁকে দেখে। মাথার স্বত্বাধিকারী অসীম ধৈর্যে সামনের দিকে মাথাটা হেঁট করে বসে আছে। একেবারে পনের আনা এক আনা ছাঁটের ব্যবস্থা। আশ্চর্য দই, কুৎসিৎ হবার জন্যেও মানুষের কি অনন্ত তপস্যা !

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম হুঁস নেই যে দাঁড়িয়ে পড়েছি, এক ছোকরা দোকানের ভেতর থেকে দরজায় এসে দাঁড়াল; হাতে কাঁচি, খচ-খচ করে দু'বার হাওয়ায় চালিয়ে প্রশ্ন করলে—"ছাঁটাবেন ? আসুন না ভেতরে।"

হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়েছি, বললাম—"না......এমনি দাঁড়িয়ে আছি।"

"আসুন, খালি আছে একটা চেয়ার।"

বললাম—"না, চুল ছাঁটাবার ইচ্ছে নেই।"

একটু হেসে বললে—"সন্দেহ হচ্ছে ? একটা টেরায়েলই দিয়ে দেখুন না।"

কি মতিচ্ছন্ন ধরল, ফ্যাশানের ওপর আক্রোশবশেই মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—"ট্রায়েল তো ঐ দেখছিই বাপু চোখের সামনে।"

ফিরে একবার চাঁচা ঘাড়টার দিকে চেয়ে নিয়ে চৌকাঠের এদিকে এসে দাঁড়াল, হাসি মুখেই; বললে—"আজ্ঞে, ওতো এই আরম্ভ হোল মোটে, ফিনিসটা দেখে আপনিই তাখন সার্টিফিটি দিয়ে দেবেন, নিজের হাতে; অসুন দয়া করে।......কাদারতাল চটকানো দেখে, পিতিমেটা কি দাঁড়াবে বলতে পারেন না তো।"—বিজ্ঞভাবে হাসল।

গুটিতিনেক লোক দাঁড়িয়ে গেছে।

বললাম "না বাপু, ট্রায়েল—ও একটা কথার কথা বলছিলাম—সদরবাজারে দোকান ফেঁদেছ, খারাপ ছাঁটতে যাবে কেন ? তবে আমার ছাঁটবার দরকার নেই, এমনি এসে-ছিলাম একটু বাজারে......অন্য একটা দরকারে।"

"তা একটা দরকারে এসে কি আর একটা কাজ করে না লোকে ?......জুতো, কিনতে এসে তো পাঁপড়টাও নিয়ে যাচ্ছে হাতে করে।......দিনই না পায়ের ধুলো। লতুন সেলুনটা খুললুম—আপনাদের পাঁচজনের ভরসায়"......

উত্তর না দিয়ে ঘুরে পা বাড়াতে যাব, একটি লোকের সঙ্গে প্রায় ঠোকাঠুকি হবার দাখিল, বাঁ হাতে নিজের চিবুকটা ঘষতে ঘষতে হন্তদন্ত হয়ে আসছে, বললে—"নাও তো, একবার চেঁচে দাও তো দাড়িটুকুন, দোকান খুলে ছেলেটাকে বসো এসেছি, একটু চট করে......"

"একটু ঘুরে আসুন দাদা, হাতে খদ্দের এই যে এই বাবু।"

লোকটা আমার মুখের দিকে চাইলে, তারপর আমার প্রায় সমান করে ছাঁটা বড় বড় চুলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে—"ও আপনি ছাঁটবেন ? তা যান। আমি ঘুরে আসচি গো, আর লোক নিউনি।"

আমি তাকেই বললাম—"না, তুমি কামিয়ে নাও, আমি চুল কাটাতে আসিনি।"

"খেউরি হবেন ?"

"না।"

"তবে ?"—আমার মুখের দিকেও চাইলে, ছোকবার মুখের দিকেও চাইলে। সে বললে—

"আসছিলেন ছাঁটাতেই, কেমন করে সন্দো লেগে গেছে আমরা ছাঁটতে জানি না—আনাড়ি, তাই বলছিনু, একবার দেখুনেই দয়া করে"......

লোকটা প্যাংলা ডিগডিগে, মুখটা সরু, আমসির মতো, আমার দিকে চেয়ে একহাত জিভ বের করে মাথাটা দুলিয়ে বললে—"আরে না না, ও কি কথা! এখেনকোর লোক নয় বুঝি আপনি? এস্‌পার্ট ছেলে,—দুই ভাই ই......নিভভরসায় যান আপনি ......আমরা জানি কিনা......দিন গেলে এমন বোধ হয় ত্রিরিশখানা মাথা সাবড়ে দিচ্ছে দুই ভেয়ে, নিভ্‌ভরসায় সেঁদিয়ে যান।

খড়ম পরে এসেছিল, খটখট করতে করতে চলে গেল।

কিছুই নয়, অথচ ব্যাপারটা এমন ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে কি করে যে পরিত্রাণ পাব যেন হদিস পাচ্ছি না। স্রোতের মুখে দুটো কুটো একত্র হলেই তার গায়ে আর পাঁচটা এসে লাগে; প্রায় সাত আটজন লোক জমা হয়ে উঠেছে, প্রশ্ন-মন্তব্য আরম্ভ হয়েছে একটু একটু, বেশিভাগই ওদের সপক্ষে। একজন তবু আমার হয়ে বললে—"তা ওঁর যাখন রুচেচ্ছে না খুঁৎখুঁতুনি তাখন যেতে দেও না।"

চোবরা চৌকাঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, খিঁচিয়ে উঠল তার দিকে চেয়ে "আরে,—'যেতে দেও না'! ওঁকে ধরে রেখেছেটা কে? ......তবে, সচোক্ষে তো দেখলেন একটা খদ্দের হাতছাড়া করলাম ওঁনার খাতিরে ......বলে 'যেতে দাও না!' কে যেন পাকড়ে রেখেছে!"

তুমি ভাবছ বোধহয় বেরিয়েই এলাম না কেন, সত্যিই তো কেউ পাকড়ে রাখে নি। এখন আমিও তাই ভাবি, কিন্তু তখন সত্যিই যেন কিম্ভূতকিমাকার হয়ে গিয়েছিলাম—ঠিক এ ধরনের অবস্থায় তো পড়া অভ্যেস নেই, তায় বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, যে ব্যাপারটা অযথাই এতটা জটিল হয়ে উঠল, সেটা আরও কতটা হয়ে যেতে পারে কে জানে? এখন তো একটা কেসও খাড়া করে ফেলেছে, নিজের স্বপক্ষে—ঢুকছিলাম—সন্দেহের বশে দাঁড়িয়ে গেছি—ওর খদ্দেরও লোকসান করেছি একটা।

আর একটা গেল, চুল ছাঁটাবার খদ্দের ওই ভাগিয়ে দিলে—বললে—"না, এখানে চুল ছাঁটা হয় না, দুটো আনাড়ি জোচ্চোরে সেলুন ফেঁদে বসেচে। যাও।"—মুখটা থম-থমে হয়ে এসেছে।

সেলুনটা লম্বালম্বি ভেতরের দিকে চলে গিয়েছে খানিকটা। যে চুল ছাঁটছিল, সে এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি, এমন কি ফিরেও দেখেনি, নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য হয়তো সেলুনের আভিজাত্য রক্ষা করা—কাজের সময় কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে খেয়াল করে না, কিম্বা হয়তো ফিনিস করেই একটা নমুনা আমার সামনে দাঁড় করাবে; দ্বিতীয় খদ্দেরটা চলে যেতে কিন্তু কাঁচিটা আঙ্গুলে করেই বেরিয়ে

এল। এই বড়, মুখটা খুব গম্ভীর, তার মানে প্রত্যেকটি কথা শুনেছে, যখন আর ধৈর্য রাখা সম্ভব হোল না বলেই বেরিয়ে এসেছে।

কিন্তু অন্যরকম ভাব, অন্তত বাইরে বাইরে তো নিশ্চয়। কাঁচিশুদ্ধ হাত তুলে একটা প্রণাম করলে আমায়, প্রশ্ন করলে—"কি দরকার স্যার, বলুন দয়া করে।"

ভাই-ই উত্তর দিলে—"চুল ছাঁটাবেন, তা হঠাৎ সন্দো হতে..."

ক'ষে এক ধমক—"তুই চুপ দে রাস্কেল! খদ্দেরের সঙ্গে কথা কইতে জানিস না। ভদ্র ইতর চেনবার খ্যামতা নেই, হাটের মাঝে দোকান ফে'দেচে! তুই যা ভেতরে, ফিনিস দিয়ে দিগে; গেলি?"

একেবারে খাদে গলা নামিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললে—"কি বলুন।" বিপদ একেবারে নম্রমূর্তিতে, বললাম—"বলবার তো কিছুই নেই ভাই, এই দিক দিয়ে যেতে যেতে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, তোমার ভাই ভাবলে..."

শেষ করতে না দিয়েই বিনীতভাবে হেসে বললে—"ওটার কথা বাদ দিন।...কি জানেন?—রেধো-মেধো তারা যায় যাক, একজন ভদ্দরলোক যদি এগিয়ে এসে সন্দোর বশে আবার ফিরে যান তো দোকান উট্রে দিতে হয়। একটা বদনামের কথা হয়ে গেল কিনা। আপনারা হচ্ছেন এ্যাড্‌ভারটাইজমেণ্ট আমাদের—এই তো দেখছেন কি ধরণের খদ্দের সব, পাই ক'টা আপনাদের মতন কন্‌না—হপ্তায় দুটো কি তিনটে বড়...আসুন দয়া করে। আমি নিজে ধরছি—ওকে ওদিকে দিয়ে দিলাম, দেখতেই পেলেন।"

এ লোকটিকে আরও ত্যাঁদড় বলে মনে হচ্ছে। বেশ গরম মেজাজটাকে ঠাণ্ডা করে নিয়ে গোড়া বে'ধে কাজ করছে। মনে হোল ঢুকেই পড়ি। কেমন একটা বিরক্তিও ধরে এসেছে, আর ভালোও লাগে না পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই জটলা। না হয় বললেই যে একটু ভদ্রভাবে ছে'টে দাও।

ঢুকেই পড়তাম, বিঘোরে পড়ে উজবুক হয়ে ফিরতেই হোত বাড়ি (ও ক্যারদানি ছাড়ত না কোনমতেই, এ্যাডভারটাইজমেণ্ট যে), কিন্তু এই সময় ভেতরে হঠাৎ একটা গোলমাল উঠল—

"তার মানে? সে কখনও হতে দেব না।"

"আলবৎ দেবে; তোমার কাজ নিয়ে কাজ, ফিনিস খারাপ হয় ত্যাখন বোলো।"

"'ত্যাখন বোলো'—আবদার!"

—উঠে এগিয়ে এসেছে খদ্দেরটা; মাথার পেছনটা খানিকটা মেলানো, খানিকটা আভাংগা, সামনেটা একেবারে কাঁচি ছোঁয়ানো হয়নি, চুলগুলো কপাল কান সব ঢেকে ফেলেছে, ঝাড়নটা বুক পিঠ ঢেকে গলায় আটকানো, কোমর পর্যন্ত এসেছে নেমে। রোগামানুষ, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বড়টাকে উদ্দেশ্য করে বললে—"আবদার পেয়েছ? এক ভাই ক্ষুর চালাবে, এক ভাই কাঁচি—নেউঁকিদের সম্পত্তি ভাগ—খুড়ো নিলে দুধেল গাই, ভাইপো নিলে বাছুর—চলবোন এ ব্যাবোস্তা—যার সঙ্গে ফুরণ হয়েচে, যে মোয়াড়া ধরেচে তাকেই ফিনিস্‌ করে দিতে হবে—ও চলবোন, যে খদ্দেরের সঙ্গে সখ করে বিতণ্ডা নাগাতে গেছে সে নিজে এসে রফা করুক; তুমি এস, ফিনিস ক'রে দিতে হবে—ঘাড়ে সুড়সুড়ি লেগে চুল এয়েচে একটু মশাই!—হঠাৎ খালি কেন?—ওমা, চোখ মেলে দেখি আলাদা এক মূর্তি—কাঁচি নে ধিনিকাত্তিকের মতন দাঁইড়ে রয়েচেন...নাও, এস—ফিনিস করো ভালো মানুষটির মতন...

ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম, বড়টা ওপরেই অমনি, ভেতরে রগচটা। শান্তদৃষ্টিতে একঠায় চেয়ে চেয়ে শুনছিল, হঠাৎ লাফিয়ে ছুটে গিয়ে খদ্দেরের ঘাড়টা ধ'রে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল—

"নেকালো!—আভি নেকালো আমার সেলুন থেকে—আরাম করে ঢোলবার জায়গা পেয়েছ? এক রদ্দায় সাতপুরুষ পজ্জন্ত ঘুম ছাড়িয়ে দোব—ফুরণ দেখাতে এয়েচে! —নেই ফিনিস করেঙ্গা—নেকালো এখান থেকে!"

বেশ ভিড় জমে গেছে। ব্যাপারটা একটু অতর্কিতে বলে খদ্দেরটা বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলো, ঠেলে নামিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু থমকে ঘুরে দাঁড়াল, তারপরেই একটা লাফ দিয়েই উঠে পড়ে এক ছুটে গিয়ে হাতল ধরে চেয়ারটায় চেপে বসল।'

একটা তুমুল হট্টগোল পড়ে গেল—দুই ভাইয়ে ভেতরে সে'দিয়ে গেছে—"নেকালো! ...কোভি নেহি!...নেই মাংতা!...আলবৎ ফিনিস করতে হবে!..."

শ্রাদ্ধটা কতদূর গড়ালো জানি না। দরজার মুখে চাপ ভিড়, হাঙ্গামাটার গোড়াপত্তনে যারা ছিল, আমায় দেখেছিল, তারা সব ওদিকেই; আমি আর দেরি না করে ছাতাটা আড়াল দিয়ে পা চালিয়ে দিলাম। পাশেই মেছোহাটার গলিটা; আর সদর রাস্তার দিকে না গিয়ে তার মধ্যেই ঢুকে পড়লাম। মনে হোল একটু দেখে নি; কিন্তু আর লোভ করলাম না; একটা শরু রাস্তা ধরে, কারুর ডোবার ধার দিয়ে, কারুর উঠোনের ওপর দিয়ে, সব শেষে একটা বাঁশের নড়বড়ে পুল পেরিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় এসে উঠলাম। আর স্টেশনের দিকেও না, একটা বাস আসছিল ডায়মণ্ডহারবারের দিকের, তাইতে উঠে পড়লাম।

সামান্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়ানো—তাইতেই কোথা থেকে কি হয়ে গেল! বিচিত্র এই জগতে আত্মসমাহিত আর সাবধান হয়ে থাকতে পারেই বা কতক্ষণ লোকে? মনটা খি'চড়ে রয়েছে। বেশ খিদেও পেয়েছে ঘোরাঘুরি করে। যাবার সময় তেমাথার ওপরই ময়রার দোকানে রসগোল্লা তয়ের হচ্ছিল—বড় একটা কড়ায় ঝাঁঝা দিয়ে রসের মধ্যে চেপে ধরছে, থাকে কখনও?—চারিদিক দিয়ে ঠেলে ঠেলে দুলে দুলে ভেসে উঠছে মাল—সাদা ধবধবে, নধরকান্তি—লোভ সংবরণ করে ঠিক করেছিলাম একটু দেখে-শুনে বেড়িয়ে আরও খিদেটা চনমনে করে নিয়ে আসি।

আশাতীত চনমনে হয়েছে খিদে—আশাতীত ঘোরাঘুরিও হোল তো?—তার ওপর উৎকণ্ঠা; কিন্তু হা রসগোল্লা! তুমি কোথায়?

আসল কথা কি জান?—লোভ সংবরণ করাটাও একটা পাপ অনেক সময়। সেই শেয়ালটার গল্প মনে আছে? মানুষের লাস, হরিণ, শুয়োর, নিদেন মড়া সাপটাই না হয় খেয়ে ফেল; হতভাগা হঠাৎ মিতাচারী আর সংযমী হয়ে ঠিক করলে—'অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ'। বিঘোরে প্রাণটা দিলে; পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাতে হাতে।

নাড়ি জ্বলছে অনুশোচনায় আরও বেশি করেই,—ধনুকের ছিলেও যদি পাওয়া যায় খানিকটা!

কিন্তু চলা পথে মলা জমতে পায় না। বসে বসে রোমন্থন করলেই আইডিয়াগুলো মনের গাঁটে গাঁটে জমা হয়ে 'রিউম্যাটিজম্' ঘটায় (আমি যে ভদ্রলোকের কথাটা ভুলতে

পারছি না। আমতলাটা পেরিয়ে যেতে রয়াল বেঙ্গল ঘাড় থেকে আস্তে আস্তে নেমে গেল। আগেই বলেছি, রাস্তা ছিল ডায়মণ্ড-হারবার মুখো, (অবশ্য কলকাতামুখো হলেও আপত্তি ছিল না) এগিয়েই চলেছি। আবার সেই মিষ্টি পথ, দুদিকের নিঃসীম শ্যামলতার গা চিরে। অভদ্র রকমের ভিড় নেই, জানলার ধারে একটি ভালো জায়গা পেয়েছি, পুব দিকটাতেই। আমার সেই কনট্রাস্ট,—বিধাতা একটা উৎকট ঝাঁকানি দিয়ে গায়ে আবার মিষ্টি করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।...রোদের তাত কমে এসেছে, সেই অনুপাতে হাওয়াটাও হয়ে এসেছে মোলায়েম, পালিসকরা রাস্তার ওপর দিয়ে বাসটা ছুটে চলেছে, একটু দোলা লাগে না গায়ে। আর কিছু দরকার নেই আমার, শুধু এইরকম করে এগিয়ে যেতে দাও দাও এইরকম একটা গতিহীন সচলতা, তাইতেই সব গ্লানি ধুয়ে মুছে যাবে'খন।

কণ্ডাক্টার এসে দাঁড়াল। আবার অন্য-মনস্ক হয়ে গেছি, এবার একটি নিশ্চিন্ত তৃপ্তির মধ্যে, জিগেস করলাম "কি চাই?"

অর্থাৎ 'বরং ব্রুহি'।...আমি যে চাওয়ার বেশি পেয়েছি, তাই মনটা দেওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

পাসের দুটি লোক ফিরে তাকালে আমার মুখের দিকে, ততক্ষণে হুঁশও হয়েছে, জিগ্যেস করলাম—"ও কণ্ডক্টার বুঝি?"...

—শুধু একটু সামলে নেবার চেষ্টা, কেননা লোকটার কণ্ডাক্টারত্ব সম্বন্ধে এতটুকু কোথাও সন্দেহের অবকাশ নেই।

পকেটে হাতটা দেওয়াই ছিল, একটা আটআনি বের করে বললাম 'সিরাকোল।'

সেটা কতদূর স্পষ্ট ধারণা নেই। মাঝের হাটে টাইম টেবিলে চোখ বুলিয়ে যাবার সময় পোলানের পর ওই নামটাই নতুন ঠেকেছিল কয়েকবার জড়িয়ে গিয়েছিল জিভে, খপ করে মনে পড়ে গেল।

বিধি এখন সদয়। সিরাকোল সেই স্টেশন যার পরেই কলতা লাইন ডায়মণ্ডহারবার রোড ডিঙিয়ে একেবারে পশ্চিমমুখো হোল, তার মানে এ রাস্তার সঙ্গে আর যতটুকু সম্বন্ধ প্রায় ততটুকুরই টিকিট নিয়েছি, স্টেশনের কাছে গিয়ে নেমে পড়লাম।

একটা কথা ছেড়ে গেল, আমতলা হাট থেকে খানিকটা এসেই সেই রায়বাড়ীর জামাইয়ের প্রসেশনটা রাস্তায় পড়ল—সেই চারটি নিরুদ্বেগ গোরুর গাড়ি, শফার নির্লিপ্তভাবে স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে। বাস আমাদের সসম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে গেল।

ঘুরে একটু গলা বাড়িয়ে দেখলাম—জামাইবাবু গদি থেকে আরও যেন খানিকটা ঝুলে পড়েছেন। এক ধরণের তুরীয় অবস্থা।

(ক্রমশ)

দেশ বিদেশের স্টুডিও ও নির্মিত চিত্র সংখ্যা

	চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সংখ্যাঃ	স্টুডিও সংখ্যাঃ	শব্দমঞ্চ সংখ্যাঃ	প্রস্ফুটনাগার সংখ্যা	মালিক	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র সংখ্যাঃ	পরিবেশিত চিত্র সংখ্যাঃ	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র প্রাপ্তির প্রধান সূত্রঃ
মিসর—	৪০	৮	১৫	৮	ব্যক্তিগত	৪০-৫০	৪০০	মিসর ঃ ৫০% যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৩৫% যুক্তরাজ্য ঃ ৯% (অর্থাগমের ভিত্তিতে)
ইথিওপিয়া—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৯০% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন—	৩	৩	৩	৩	ব্যক্তিগত	৩	৩৫০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৮০% যুক্তরাজ্য ঃ ১৫% ভারত ঃ ৩% ফ্রান্স, ইতালী (চিত্রসংখ্যা ভিত্তিতে)
বেলজিয়ান কঙ্গো—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৫০% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
এলজিরিয়া—	...	...	...	...	...	...	২৬০	ফ্রান্স ঃ ৪৫% যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৩৫% মিসর ঃ ৯% (চিত্রসংখ্যা ভিত্তিতে)
ফরাসী বিষুব আফ্রিকা—	...	...	...	...	...	...	...	ফ্রান্স
ফরাসী সোমালিল্যান্ড—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৫০% ফ্রান্স ঃ ৪৫% মিসর ঃ ৫% (চিত্রসংখ্যা ভিত্তিতে)
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৪০% ফ্রান্স (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
মাদাগাস্কার—	...	...	...	...	...	...	...	ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্র ভারত চীন
ফরাসী মরক্কো—	১৫	১	১	১	ব্যক্তিগত	৬	...	ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্র মিসর ইতালী যুক্তরাজ্য
টিউনিসিয়া—	১	১	১	১	ব্যক্তিগত	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৬০% ফ্রান্স ঃ ১৭% মিসর ঃ ১৩% (অর্থাগমের ভিত্তিতে)
এঙ্গোলা—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৯০% (প্রদর্শনকালের ভিত্তিতে)
মোজাম্বিক—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৭০% (প্রদর্শনকালের ভিত্তিতে)
বেচুয়ানাল্যান্ড—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য
গোল্ড কোস্ট ও অধীন রাজ্য—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৫০% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)

	চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ঃ	স্টুডিও সংখ্যা ঃ	শব্দযন্ত্র সংখ্যা ঃ	প্রস্ফুটনাগার সংখ্যা	মালিক	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র সংখ্যা ঃ	পরিবেশিত চিত্র সংখ্যা ঃ	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র প্রাপ্তির প্রধান সূত্র ঃ
কেনিয়া—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৬০% ভারত ঃ ২৫% যুক্তরাজ্য ঃ ১৫% (চিত্রসংখ্যা ভিত্তিতে)
নাইজিরিয়া—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৬৬% যুক্তরাজ্য
উত্তর রোডেসিয়া—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য
নিয়াসাল্যান্ড—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ভারত
সিয়েরালিওঁ—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য
দক্ষিণ রোডেসিয়া—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য
উগান্ডা—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৬০% ভারত ঃ ২৫% যুক্তরাজ্য ঃ ১৫% (চিত্রসংখ্যা ভিত্তিতে)
টাঙ্গানিকা—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৬০% ভারত ঃ ২৫% যুক্তরাজ্য ঃ ১৫% (চিত্রসংখ্যা ভিত্তিতে)
টোগোল্যান্ড—	...	...	...	...	...	...	...	ফ্রান্স
ইরিট্রিয়া—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৯০% (চিত্রসংখ্যা ভিত্তিতে)
সুদান—	...	...	...	...	...	...	...	মিসর যুক্তরাজ্য ভারত যুক্তরাষ্ট্র
ত্যাঞ্জিয়ার—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৫৫% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
উত্তর আমেরিকা ঃ								
কানাডা—	৪	৬	৬	৮	ব্যক্তিগত	১	৯৫৫	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৭৭% যুক্তরাজ্য ঃ ৫% ফরাসী, ইতালী (চিত্রসংখ্যা ভিত্তিতে)
কোস্টারিকা—	...	...	...	...	...	...	৫৫০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৭০-৮০% মেক্সিকো ঃ ১০-১৫% আর্জেন্টিনা ৫-১০% (চিত্রসংখ্যা ভিত্তিতে)
কিউবা—	১	১	১	১	ব্যক্তিগত	...	৫০০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৭৫% আর্জেন্টিনা ১০% মেক্সিকো ঃ ৮% (সংখ্যা ভিত্তিতে)
ডোমিনিয়ান রিপাব্লিক—	...	...	...	...	...	...	৩০০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৭০% মেক্সিকো ঃ ২০% আর্জেন্টিনা ১০% (সংখ্যা ভিত্তিতে)
এল সালভেডর—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৬৫-৭৫% মেক্সিকো ঃ ১৫-২০% আর্জেন্টিনা ৮-১০% (সংখ্যা ভিত্তিতে)

	চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সংখ্যাঃ	স্টুডিও সংখ্যাঃ	শব্দযন্ত্র সংখ্যাঃ	প্রস্ফুটনাগার সংখ্যা	মালিক	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র সংখ্যাঃ	পরিবেশিত চিত্র সংখ্যাঃ	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র প্রাপ্তির প্রধান সূত্রঃ
গুয়েটেমালা—	১	...	...	...	ব্যক্তিগত	১	৪১৫	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৭০-৮০% মেক্সিকো ঃ ১৫-২০% আর্জেণ্টিনা ৬-১০% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
হাইতী—	...	...	...	...	...	...	৩০০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৭০% ফ্রান্স, মেক্সিকো ইতালী (সংখ্যা ভিত্তিতে)
হণ্ডুরাস—	...	...	...	...	...	...	৩০০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৮০% মেক্সিকো ঃ ১০% আর্জেণ্টিনা ঃ ৫% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
মেক্সিকো—	৫৫-৭৫	৮	৪০-৫০	৬	ব্যক্তিগত	৮৪	...	মেক্সিকো ঃ ৬০% যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৩৫% যুক্তরাজ্য ঃ ৪% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
নাইকারগুয়া—	...	...	...	...	...	...	৪০০-৫০০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৬৮% মেক্সিকো ঃ ১২% আর্জেণ্টিনা ঃ ১০%
পানামা—	১	...	...	...	...	১	২৯৪	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৬৩% মেক্সিকো ঃ ২৭% আর্জেণ্টিনা ঃ ৭% (সংখ্যা ভিত্তিতে)
যুক্তরাষ্ট্র—	৯৮	...	...	...	ব্যক্তিগত	৪৫৯	৫৫০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৮৮% বিদেশী ঃ ১২% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
গুয়াদেলুপে—	...	...	...	...	...	...	১২০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৫০% ফ্রান্স ঃ ৫০% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
মার্টিনিক—	...	...	...	...	...	...	১০০	ফ্রান্স ঃ ৭০% যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ ঃ ৩০% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
কুরাকাও—	...	...	...	...	...	...	৩০০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৯৫% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
বারমুডাস—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৯৫% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
বৃটিশ হণ্ডুরাস	...	...	...	...	...	...	১৭৫	যুক্ত রাষ্ট্র ঃ ৯৮% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
বাহামা দ্বীপপুঞ্জ—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৯০% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
বারবাডোস—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৮০% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
জামাইকা—	১	১	...	...	ব্যক্তিগত	...	৪২৫	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৮৮% যুক্তরাজ্য ঃ ১২% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
লিওয়ার্ড দ্বীঃ—	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৯৭% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
ত্রিনিদাদ ও টোবাগো—	...	...	...	...	...	...	৮০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৭৭% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
উইণ্ডওয়ার্ড দ্বীঃ	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৯৫% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
পুওর্তোরিকো	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৯৫% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)

দেশ	চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা :	স্টুডিও সংখ্যা :	শব্দমঞ্চ সংখ্যা :	প্রস্ফুটনাগার সংখ্যা	মালিক	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র সংখ্যা :	পরিবেশিত চিত্র সংখ্যা :	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র প্রাপ্তির প্রধান সূত্র :
দক্ষিণ আমেরিকা :								
আর্জেন্টিনা	২৫	৯	২৭	৮	ব্যক্তিগত	৪৪	...	যুক্তরাষ্ট্র : ৫০% আর্জেন্টিনা : ৩৫% মেক্সিকো : ৫% (অর্থাগম ভিত্তিতে)
বলিভিয়া	...	...	...	...	...	...	৪০৬	যুক্তরাষ্ট্র : ৬৫—৭০% মেক্সিকো : ১৫—২০% আর্জেন্টিনা : ১০—১৫% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
ব্রাজিল	১৫-২০	৬	৯	৮	ব্যক্তিগত	১৪	৪৬৫	যুক্ত রাষ্ট্র : ৭০% ব্রাজিল : ১০% আর্জেন্টিনা : ৬% ইতালি : ৪% (দর্শকাগম ভিত্তিতে)
চিলি	৫	১	২	২	নির্মাণ স্বত্ব সরকারী; প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিগত	৪	৩৫০	যুক্তরাষ্ট্র : ৫০% যুক্তরাজ্য : ১২% আর্জেন্টিনা : ১০% মেক্সিকো : ১০% (অর্থাগম ভিত্তিতে)
কলোম্বিয়া	...	...	...	...	...	...	৫০০	যুক্তরাষ্ট্র : ৫০% মেক্সিকো : ১৫% আর্জেন্টিনা : ১৫% যুক্তরাজ্য : ১৫% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
ইকোয়েডর	...	...	...	...	...	...	৪২০	যুক্তরাষ্ট্র : ৭০% মেক্সিকো : ১৫% আর্জেন্টিনা : ১০% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
প্যারাগোয়ে	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র : ৭০% আর্জেন্টিনা : ২০% মেক্সিকো : ৫% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
পেরু	৩	০	৩	৫	ব্যক্তিগত	...	৪৫০	যুক্তরাষ্ট্র : ৭২% মেক্সিকো : ১৮% আর্জেন্টিনা : ৬% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
উরুগোয়ে	২	১	১	৩	ব্যক্তিগত	২	৩০৬	যুক্তরাষ্ট্র : ৫৮% মেক্সিকো : ১২% আর্জেন্টিনা : ১১% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
ভেনিজুয়েলা	২	২	২	২	ব্যক্তিগত	১	২৫৪	যুক্তরাষ্ট্র : ৭০% মেক্সিকো : ১৫% আর্জেন্টিনা : ৮% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
ফরাসী গায়ানা	...	...	...	...	...	...	২০০	ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ
সুরিনাম	...	...	...	...	...	...	৪৫০—৫০০	যুক্তরাষ্ট্র : ৭০% যুক্তরাজ্য : ৩০% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
ব্রিটিশ গায়ানা	...	...	...	...	...	...	৩৫০	যুক্তরাষ্ট্র : ৮০-৯০% যুক্তরাজ্য : ১০-২০% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
এসিয়া :								
আফগানিস্থান	...	...	...	...	...	...	১৫০	ভারত : ৬০% ফ্রান্স : ১৫% যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্য : ২৫%

	চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সংখ্যাঃ	স্টুডিও সংখ্যাঃ	শব্দমঞ্চ সংখ্যাঃ	প্রস্ফুটনাগার সংখ্যা	মালিক	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র সংখ্যাঃ	পরিবেশিত চিত্র সংখ্যাঃ	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র প্রাপ্তির প্রধান সূত্রঃ
ব্রহ্মদেশ	২২	৬	২৫	৩	ব্যক্তিগত	৪৬ (৬খানি সবাক)	৫০০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৪২% ভারত ঃ ৩১% ব্রহ্মদেশ ঃ ২০% (অর্থাগম ভিত্তিতে)
সিংহল	১	...	...	...	ব্যক্তিগত	২	৪০০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৫৭% ভারত ঃ ২০% যুক্তরাজ্য ঃ ১৯% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
চীন	...	১০	...	৪	ব্যক্তিগত সরকারী	২৬	১০০	রাশিয়া ঃ ৭০% চীন ঃ ২৫% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
ভারতবর্ষ—	৪০০	৬০	১৩৮	৩৮	ব্যক্তিগত	২৮৯	৫৫০	ভারত ঃ ৯০% যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৫% যুক্তরাজ্য ৫% রাশিয়া (দর্শকাগম ভিত্তিতে)
ইরাক	...	...	...	...	...	...	৪০০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৬০% মিসর ঃ ৩০% যুক্তরাজ্য ঃ ১০% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
ইসরায়েল	১	...	...	১	ব্যক্তিগত	১	৩০০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৭০% যুক্তরাজ্য ঃ ৭% রাশিয়া ঃ ১৮% ফ্রান্স (সংখ্যার ভিত্তিতে)
জাপান	২০	৯	...	...	ব্যক্তিগত	১৫৬	৩০৭	জাপান ঃ ৫০% যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৩০% যুক্তরাজ্য-ফ্রান্স ঃ ১৫% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
জর্ডন	...	...	...	...	...	...	৭০০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৪৫% মিসর ঃ ৩০% যুক্তরাজ্য ঃ ১৫% ফ্রান্স (সংখ্যার ভিত্তিতে)
কাশ্মীর	...	...	...	...	...	...	...	ভারতবর্ষ
দক্ষিণ কোরিয়া	১৫	২	...	...	ব্যক্তিগত	১৪	১০৩	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৯৫% যুক্তরাজ্য ঃ ৫% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
লেবানন	...	...	...	...	...	...	...	মিসর ঃ ৫০% যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৪০% ফ্রান্স ঃ ৫%
পাকিস্থান	১৫	২	৫	১	ব্যক্তিগত	৬	১১০	ভারত ঃ ৮০% যুক্তরাষ্ট্র ঃ ১৫% যুক্তরাজ্য ঃ ৫% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
পারস্য	৩	১	..	২	ব্যক্তিগত	১	৪৫০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৮৫% রাশিয়া ঃ ৫% ফ্রান্স ঃ ৫% ভারত-যুক্তরাজ্য ঃ ৫% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
ফিলিপাইন	১৪	৫	১২	২	ব্যক্তিগত	৮৪	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৫০% ফিলিপাইন ঃ ৪০% চীন ও অন্যান্য ঃ ১০% (দর্শকাগম ভিত্তিতে)

	চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সংখ্যাঃ	স্টুডিও সংখ্যাঃ	শব্দমঞ্চ সংখ্যাঃ	প্রস্ফুটনাগার সংখ্যা	মালিক	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র সংখ্যাঃ	পরিবেশিত চিত্র সংখ্যাঃ	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র প্রাপ্তির প্রধান সূত্রঃ
সৌদি আরব	...	...		...	...	...	...	মিসর
সিরিয়া	১	১	...	...	ব্যক্তিগত	১	৩০০	যুক্তরাষ্ট্রঃ ৬০% মিসর ঃ ২০% যুক্তরাজ্য ঃ ১৫% ফ্রান্স ইতালি (সংখ্যার ভিত্তিতে)
থাইল্যান্ড	৪	...	...	১	ব্যক্তিগত	১০	২৪০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৬৫% চীন ঃ ৬% যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স (সংখ্যার ভিত্তিতে)
তুরস্ক	১৫	৭	...	৩	ব্যক্তিগত	১৫	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৭০% তুরস্ক ঃ ১০% মিশর ঃ ৫% (অর্থাগম ভিত্তিতে)
ইন্দোচীন	...	...	...	...	...	...	৬১	ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য, ভারত
এডেন ও উপনিবেশ	...	...	...	...	...	...	৪০০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৩৫% ভারত ঃ ৩০% যুক্তরাজ্য ঃ ২৫% মিসর ঃ ১০% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
সাইপ্রাস	...	...	...	...	...	...	৬৪০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৭০% যুক্তরাজ্য ঃ ২০% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
হংকং	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৩০% যুক্তরাজ্য ঃ চীন
মালয় ও সিঙ্গাপুর	১	১	১	১	ব্যক্তিগত	৮	৫০০—৬০০	যুক্তরাষ্ট্র, চীন রাশিয়া, ভারত যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ফ্রান্স
ইন্দোনেসিয়া	১	২	১	২	সরকারী	৪	২০৪	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৬৫% যুক্তরাজ্য ঃ ২০% চীন, ভারত
ইওরোপ ঃ								
অস্ট্রিয়া	১৫	৩	৭	...	সরকারী ব্যক্তিগত	২৫	১৮০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৩০% ফ্রান্স ঃ ২৫% রাশিয়া ঃ ২০% যুক্তরাজ্য ঃ ১০% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
বেলজিয়াম	২	২	৩	৬	ব্যক্তিগত	২	...	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৮০% ফ্রান্স ঃ ১২% যুক্তরাজ্য ঃ ৪% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
বুলগেরিয়া	১	...	...	...	সরকারী	...	...	রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া
চেকোশ্লোভাকিয়া	১	৩	১২	৬	সরকারী	২০	৫১৫	রাশিয়া ঃ ২৩% যুক্তরাজ্য ঃ ১৯% যুক্তরাষ্ট্র ঃ ১৮% ফ্রান্স ঃ ১১% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
ডেনমার্ক (ফায়রোজ দ্বীপ সমেত)	৪	৪	...	২	ব্যক্তিগত	১০-১২	২৭০	যুক্তরাষ্ট্র ঃ ৭৬% যুক্তরাজ্য ঃ ৮% ফ্রান্স ঃ ৭% ডেনমার্ক ঃ ৩·৫% (সংখ্যার ভিত্তিতে)

	চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সংখ্যাঃ	স্টুডিও সংখ্যাঃ	শব্দমঞ্চ সংখ্যাঃ	প্রস্ফুটনাগার সংখ্যা	মালিক	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র সংখ্যাঃ	পরিবেশিত চিত্র সংখ্যাঃ	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র প্রাপ্তির প্রধান সূত্রঃ
ফিনল্যান্ড	৫	৩	…	২	ব্যক্তিগত	১৬	৩৪৪	যুক্তরাষ্ট্র : ৫৭% যুক্তরাজ্য : ১০% ফ্রান্স : ৯% রাশিয়া : ৯% সুইডেন : ৭% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
ফ্রান্স	২১৩	১৩	৫৬	১৫	ব্যক্তিগত সরকারী	১১০	৪০০	যুক্তরাষ্ট্র : ৪০% ফ্রান্স : ২৪% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
জার্মানী	…	১০ (পশ্চিম জার্মানী)	…	…	ব্যক্তিগত	৮৯	৪০৭	যুক্তরাষ্ট্র : ৩৭% জার্মানি : ২২% যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স অস্ট্রিয়া (সংখ্যার ভিত্তিতে)
গ্রীস (ডোডিকানীজ সমেত)	৭	…	…	৪	ব্যক্তিগত	৮	…	যুক্তরাষ্ট্র : ৭০% যুক্তরাজ্য : ১৩% ফ্রান্স : ৮% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
হাঙ্গেরী	১	২	৩	২	সরকারী	১০	১৫০	রাশিয়া : ৩০% যুক্তরাষ্ট্র : ২৫% ফ্রান্স : ১৫% যুক্তরাজ্য : ১৫% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
আইসল্যান্ড	…	…	…	…	…	…	…	যুক্তরাষ্ট্র : ৭০%
ইতালি	১২০	১৪	৪৫	…	সরকারী ব্যক্তিগত	১২০	৪৫০	যুক্তরাষ্ট্র : ৬৪% ইতালি : ১১% যুক্তরাজ্য : ৯% ফ্রান্স : ৭% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
লাক্সেমবুর্গ	…	…	…	…	…	…	…	যুক্তরাষ্ট্র : ৭০% ফ্রান্স : ১০%
নেদারল্যান্ডস	৪	২	৩	৫	ব্যক্তিগত	২	৪০৮	যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স যুক্তরাজ্য, অস্ট্রিয়া জার্মানি
নরওয়ে	১	১	১	১	সরকারী	৩	৩৬২	যুক্তরাষ্ট্র : ৪৯% যুক্তরাজ্য : ১৭% ফ্রান্স : ১৩% সুইডেন : ১২% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
পোল্যান্ড	১	১	২	২	সরকারী	২০	…	…
পর্তুগাল (আজোর ও মাদেরা সমেত)	৯	৩	…	৩	ব্যক্তিগত	৫	…	যুক্তরাষ্ট্র : ৮০% ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
রুমানিয়া	১	…	…	…	সরকারী	…	…	…
সান মেরিনো	…	…	…	…	…	…	…	ইতালি : ৯০%
স্পেন (বলেরিক ও ক্যানেরী দ্বীপ সমেত	৮৯	১·১	…	…	ব্যক্তিগত	৪০	৩০০	যুক্তরাষ্ট্র : ৬৭% স্পেন : ১৩% মেক্সিকো : ৯% যুক্তরাজ্য : ৯% (সংখ্যার ভিত্তিতে)

	চিত্র নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা :	স্টুডিও সংখ্যা :	শব্দমঞ্চ সংখ্যা :	প্রস্ফুটনাগার সংখ্যা	মালিক	পূর্ণ দৈর্ঘ্য চিত্র সংখ্যা :	পরিবেশিত চিত্র সংখ্যা :	পূর্ণ দৈর্ঘ্য•চিত্র প্রাপ্তির প্রধান সূত্র :
সুইডেন	১৩	৬	...	৮	ব্যক্তিগত	৩৪	৩১০	যুক্তরাষ্ট্র : ৫০% যুক্তরাজ্য : ১০% ফ্রান্স : ১০%
সুইটজারল্যান্ড	৩	৪	৭	৫	ব্যক্তিগত	১	৫০৭	যুক্তরাষ্ট্র : ৫৫% ফ্রান্স : ১৯% যুক্তরাজ্য : ৯% ইতালি : ৬% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
রাশিয়া	১৪	২৯	...	...	সরকারী	১২	...	রাশিয়া : ৯০%
যুক্তরাজ্য	৭৫-১০০	৩১	৭২	২০	ব্যক্তিগত	৮৭	৩৬৪	যুক্তরাষ্ট্র : ৬৫% যুক্তরাজ্য : ২৫% ফ্রান্স : ৪% ইতালি : ২%
যুগোশ্লাভিয়া	৭	...	...	...	সরকারী	৫	৪০০	বিদেশী : ৯৩% যুগোশ্লাভিয়া : ৭% (প্রদর্শনকাল ভিত্তিতে)
জিব্রালটার	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র : ২৫% যুক্তরাজ্য
মাল্টা ও গোজো	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র : ৩৫% যুক্তরাজ্য
প্রিন্স	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র : ৬৫% যুক্তরাজ্য
ওসিয়ানিয়া :								
অস্ট্রেলিয়া	১২	২	২	১০	ব্যক্তিগত	৪	৪০০	যুক্তরাষ্ট্র : ৭১% যুক্তরাজ্য : ২৪% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
নিউজীল্যান্ড	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র : ৭৪% যুক্তরাজ্য ২৫% (সংখ্যার ভিত্তিতে)
ফরাসী ওসিয়ানিয়া	...	...	...	...	...	...	...	ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র
নিউ ক্যালেডোনিয়া	...	...	...	...	...	...	...	ফ্রান্স : ৫২% যুক্তরাষ্ট্র : ৪৮%
ফিজি দ্বীপপুঞ্জ	...	...	...	...	...	...	...	যুক্তরাষ্ট্র : ৭০% ভারত : ২৫% যুক্তরাজ্য : ৫%

সংবাদ চিত্র

আফ্রিকা :

	নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	বার্ষিক সংখ্যা	আমদানী সূত্র
মিসর	১	২৪	যুক্তরাষ্ট্র ২; যুক্তরাজ্য ১; ফ্রান্স ১
দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন	১	৫২	যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র
এলজিরিয়া	...	...	ফ্রান্স : ৩; ফ্রাঙ্কো-আমেরিকা : ১, যুক্তরাষ্ট্র : ১
ফরাসী বিষুব আফ্রিকা	...	...	ফ্রান্স
ফরাসী সোমালিল্যান্ড	...	...	ফ্রান্স : ২
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা	...	...	ফ্রান্স; যুক্তরাষ্ট্র
ফরাসী মরক্কো	...	...	ফ্রান্স; যুক্তরাষ্ট্র
তিউনিসিয়া	...	...	ফ্রান্স; যুক্তরাষ্ট্র
বেচুয়ানা ল্যান্ড	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
ব্রিঃ সোমালী ল্যান্ড	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ভারত মিশর
কেনিয়া	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
মরিসিয়াস	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
নাইজিরিয়া	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
উত্তর রোডেসিয়া	১	৮	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
নিয়াসাল্যান্ড	...	...	যুক্তরাজ্য : ২
সেন্ট হেলেনা	...	...	যুক্তরাজ্য
সিয়েরা লিওন	...	...	যুক্তরাজ্য
দক্ষিণ রোডেসিয়া	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
উগান্ডা	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
ক্যামেরুন	...	...	ফ্রান্স

	নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	বার্ষিক সংখ্যা	আমদানী সূত্র
...নিকা	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
...ল্যান্ড	১ (সরকারি)	অনিয়মিত	ফ্রান্স
...ন	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মিশর
...র আমেরিকা :			
...ডা	২ (১ সরকারি)	৪২ (সরকারি)	যুক্তরাষ্ট্র : ৩১২; যুক্তরাজ্য : বছরে কয়েকখানি
...বা	২	২০৮	যুক্তরাষ্ট্র
...মিনিকান রিপাবলিক	...	...	যুক্তরাষ্ট্র
...সালভাডোর	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
...তি	১	অনিয়মিত	যুক্তরাষ্ট্র ২; ফ্রান্স
...রাস	...	...	যুক্তরাষ্ট্র : ৫ যুক্তরাজ্য : ১
...ক্সিকো	২	১০৪	যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স
...মা	১	১	যুক্তরাষ্ট্র
...রাষ্ট্র	৮	৭৮৮	...
...দেলুপে	...	...	ফ্রান্স
...নিক	...	...	ফ্রান্স
...হণ্ডুরাস	...	...	যুক্তরাষ্ট্র
...ইকা	...	...	যুক্তরাষ্ট্র : ৩, যুক্তরাজ্য : ১
...ক্ষণ আমেরিকা :			
...র্জেন্টিনা	৮	৪১৬	যুক্তরাষ্ট্র : ৫; যুক্তরাজ্য : ১ ফ্রান্স : ১
...ভিয়া	...	...	যুক্তরাষ্ট্র
...জিল	৪	...	যুক্তরাষ্ট্র : ৩, যুক্তরাজ্য : ১ ফ্রান্স : ১
...	২	...	যুক্তরাষ্ট্র : ৪, ফ্রান্স : ১
...ম্বিয়া	১	৫২	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
...য়েডর	...	...	যুক্তরাষ্ট্র
...গুয়ে	১	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
...	৫	৩০	যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স
...গুয়ে	২	১০৪	স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
...জুয়েলা	১	৫২	যুক্তরাষ্ট্র
...য়ানা	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
...সিয়া :			
...গানিস্তান	...	...	যুক্তরাষ্ট্র
...ল	১ (সরকারি)	২৮	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
	...	...	রাশিয়া
...রতবর্ষ	১ (সরকারি)	৫৫-৫৫	**যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য**
...	...	...	যুক্তরাজ্য
ইসরায়েল	১	২৪	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ফ্রান্স, রাশিয়া
জাপান	৫	২২২	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
জর্ডন	...	...	যুক্তরাষ্ট্র : ১, যুক্তরাজ্য : ১
দক্ষিণ কোরিয়া	১ (সরকারি)	অনিয়মিত	যুক্তরাষ্ট্র, চীন
লেবানন	...	...	যুক্তরাষ্ট্র : ১; ফ্রান্স : ৩
পাকিস্থান	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
পারস্য	১	৪	যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স
সিরিয়া	১	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স
থাইল্যান্ড	১ (সরকারী)	অনিয়মিত	যুক্তরাষ্ট্র
তুরস্ক	১ (সরকারি)	অনিয়মিত	যুক্তরাষ্ট্র : ২, যুক্তরাজ্য : ১
ইন্দোনেশিয়া	১	৫২	নেদারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
ইন্দোচীন	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স
এডেন	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স
সাইপ্রাস	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স
মালয়	১ (সরকারি)	অনিয়মিত	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
ইউরোপ :			
অস্ট্রিয়া	১	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
বেলজিয়াম	১	৫২	যুক্তরাষ্ট্র : ২; যুক্তরাজ্য : ১; ফ্রান্স : ২
বুলগেরিয়া	১	৫২	......
চেকোশ্লোভাকিয়া	১	১৮০	......
ডেনমার্ক	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, যু[illegible]জ্য,
ফ্রান্স	৫	২৬০	......
পঃ জার্মানী	৪	...	......
গ্রীস	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স
হাঙ্গেরী	১	৬৪	রাশিয়া, ফ্রান্স
আয়ার্ল্যান্ড	১	অনিয়মিত	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
ইটালি	১	২৬০	যুক্তরাষ্ট্র
নেদারল্যান্ড	১	১০৪	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
নরওয়ে	১	অনিয়মিত	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ফ্রান্স, রাশিয়া
পোল্যান্ড	১	৭৩	......
সান মেরিনো	...	...	ইটালী
সুইডেন	১	৫২	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া
সুইটজারল্যান্ড	১	৫২	যুক্তরাষ্ট্র : ১; ফ্রান্স : ২
রাশিয়া	...	১১০০	......
যুক্তরাজ্য	৫	১২০	......
যুগোশ্লাভিয়া	১	৫২	......
অস্ট্রেলিয়া	৩	১১৬	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য
নিউজিল্যান্ড	...	...	যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য অস্ট্রেলিয়া

খাদ্য হিসাবে গো-মাংস অপেক্ষা শূকরের মাংসের প্রচলন বেশি। যেসব দেশের অধিবাসীরা শূকরের মাংস খায়, সে দেশে শূকরের ব্যবসা বেশ লাভজনক। শূকর ব্যবসায়ীরা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি শূকরগুলিকে পরিপুষ্ট এবং বড়সড় করে তুলতে চেষ্টা করে। এজন্য এদের ভাল খাদ্যের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রসিদ্ধ ওষুধ প্রস্তুতকারক 'চার্লস কাইজার এন্ড কোং' শূকরদের দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য একটি কৃত্রিম খাদ্য বার করেছে। এই কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ালে শূকরগুলি মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে ওজনে প্রায় ৩৫ থেকে ৩৮ পাউন্ড পর্যন্ত হয়। অথচ প্রায় সাধারণভাবে প্রতিপালন করলে আট সপ্তাহের মধ্যে এরা ওজনে ৩০ থেকে ৩৫ পাউন্ড পর্যন্ত হয়। এদের এই কৃত্রিম খাদ্যটি আর কিছু নয়—খানিকটা মাঠা-তোলা শুকনো দুধ, কিছুটা চর্বি, শুকনো গাছের গুঁড়ো, কিছু ভিটামিন, কিছুটা খনিজ পদার্থের সঙ্গে এক চিমটে টেরামাইশিন। এই সমস্ত খাদ্যবস্তুগুলির একত্র সংমিশ্রণের নাম দেওয়া হয়েছে 'টেরাল্যাক'। লক্ষ্য করে দেখা হয়েছে যে, বাচ্চা অবস্থার যে সংখ্যক শূকরের মৃত্যু হতো টেরাল্যাক খাওয়ানোর ফলে মৃত্যুর হার কিছুটা কমেছে। সাধারণ অবস্থায় প্রায় শতকরা ১৮ থেকে ৩৫টি পর্যন্ত শূকর বাচ্চা অবস্থায় মরে যেতো, কিন্তু 'টেরাল্যাক' খাওয়ানোর পর থেকে এই শিশু শূকরের মৃত্যুর হার শতকরা পাঁচটি হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যেতো যে, শূকরের বাচ্চাগুলি মায়ের দেহের চাপেই মরে যেতো। সেই কারণে আজকাল মাত্র দুদিনের বাচ্চাকেই মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে এনে এই কৃত্রিম উপায়ে খাইয়ে পুষ্ট করা হয়। শূকরগুলির তাড়াতাড়ি পুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা করায় এবং শিশু শূকরের মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য শূকর ব্যবসায়ীদের প্রতি শূকর পিছু ছয় ডলার করে বেশি লাভ হচ্ছে।

*

মাটির নীচে প্রকৃতির কত সম্পদই না লুকোন আছে। মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই, এই সব সম্পদ খুঁজে বার করবার জন্য। অবশ্য বেশির ভাগ সম্পদ—যেমন কয়লা, তেল, সোনা, বিভিন্ন ধরণের খনিজ পদার্থ মানুষের সব সময় কাজে লাগছে।

চক্রদত্ত

এছাড়াও মাটির নীচে আর এক ধরণের সম্পদ থাকে, সে সম্পদ মানুষের জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা জ্ঞান-সম্পদ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছেন। বর্তমানে আমেরিকার একদল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা ইরাকের নিপ্পার বলে এক জায়গা খুঁড়ে মাটির তলা থেকে প্রায় ৪০০০ বছর আগেকার সুমেরিয়ানদের দেবী ইনানার এক মন্দির বার করেছে। এই সুমেরিয়ানরা বহুকাল আগে টাইগ্রীস এবং ইউফ্রেটিস নদীর নিম্ন উপত্যকা প্রদেশে বসবাস করত, আর এরা প্রায় ১৫০০ বছর ধরে এই স্থানে তাদের সভ্যতা বিস্তার করে ছিল। অবশ্য এদের উৎপত্তি এবং আগের ইতিহাস এখনো কিছু জানা যায়নি। এই মন্দির থেকে অনেক সুমেরিয়ান ভাষায় লেখা শিলালিপি আর তিনটে খুব বড় বড় শিলা-মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিগুলি প্রায় ২৩০০ খৃঃ পূঃ সময়কার। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই শিলালিপিগুলি উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন, কারণ তাহলে এই সুমেরিয়ানদের সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারা যাবে আশা করা যাচ্ছে। মন্দিরটি একটি দুশ ফুট চওড়া দেয়াল দিয়ে ঘেরা আছে। অবশ্য এখনো এটা সম্পূর্ণভাবে খুঁড়ে বার করা সম্ভব হয়নি, তবে আশা করা যাচ্ছে, যখন এটা সম্পূর্ণভাবে খুঁড়ে বার করা হবে, তখন এর ভেতর থেকে এমন সব জিনিস পাওয়া যাবে যার সাহায্যে এই সুমেরিয়ানদের সভ্যতার পুরো ইতিহাস পাওয়া যাবে।

*

যন্ত্রটি দেখতে যে রকম বিরাটাকার মনে হচ্ছে আসলে সেরকম কিছু নয়। সাধারণ যন্ত্রের তুলনায় এর ওজন কম বলা যায়। এটি ওজনে দেড় টন। এটি কয়লা খনির কয়লা কাটার যন্ত্র। যন্ত্রটি সর্বপ্রথম জার্মাণীতে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের খনির তত্ত্বাবধায়কগণ এটিকে তাঁদের দেশে ব্যবহার করে পরীক্ষা করছেন। এরা অবশ্য এই যন্ত্রটির অনেক একটু উন্নতি সাধন করেছেন। যন্ত্রটি সহজে নড়ানর সুবিধার জন্য এর নীচের দিকে একটি ছোট ট্রাক্‌টর লাগান হয়েছে। তাছাড়া কয়লার গুঁড়োগুলো চারিদিকে যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তারও একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। সব চেয়ে বেশী সুবিধা এই যে আগে এটি বৈদ্যুতিক-শক্তিচালিত ছিল বলে অনেক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছিল এখন এটা বায়ুর চাপের সাহায্যে চালনা করা হয়।

এটি একটি কয়লা কাটা যন্ত্র

সাহেব বিবির দেশে

নরেন্দ্র দেব

(সুইজারল্যাণ্ড — জুরিখ-লুজার্ন-বার্ন-ইণ্টারল্যাকেন্‌ য্যুঙফাউ)
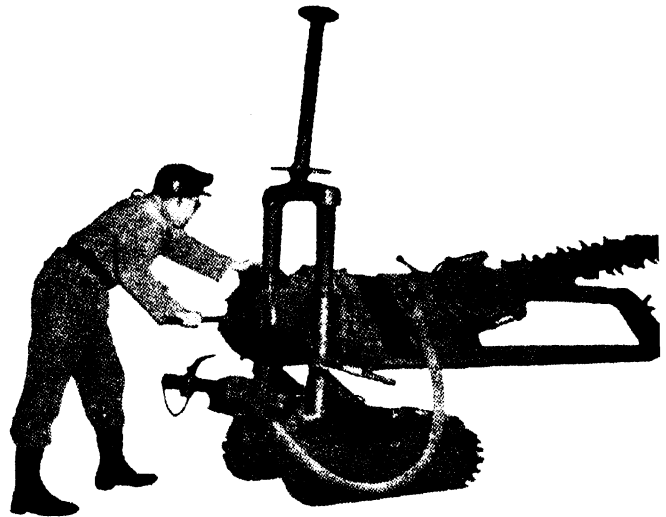
ামরা জার্মানি থেকে আবার অস্ট্রিয়ায় া এলাম। সুইজারল্যাণ্ডে যাবার জন্য সব্রুক' থেকে 'কণ্টিনেণ্ট্যাল ট্রেন' ধরে জারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়-প্রধান নগর রিখে' এসে হাজির হলাম। ইনস্‌ব্রুক ে জুরিখ ১৭৮ মাইল পথ। ইনস্‌ব্রুকে হ্নভোজ সেরে নিয়ে বেলা ১-৫১ মিঃটে ধরে আমরা জুরিখে এসে পেঁছালাম সাড়ে আটটায়। ইন্‌সব্রুক থেকে মাত্র মাইল পরেই 'বুকস' স্টেশনে সীমান্ত ক্রমের ছাড়পত্র ইত্যাদি পরীক্ষা হল। ড়ের দেশ। ঘণ্টায় পঁচিশ তিরিশ লর বেশি বেগে ট্রেন চলা এখানে ভব। ইলেকট্রিক ট্রেন পাহাড়ের উপর লগে যায় স্টীম এঞ্জিন তা পারে না। ণ্টাল ট্রেন পথের বড় বড় শহর এবং া দেশের যোগাযোগ কেন্দ্র ছাড়া থামে তাই পেঁাছে দিতে পারে যাত্রীদের ন স্থানে যথাসম্ভব শীঘ্র।

থের দু'ধারের দৃশ্য দেখে আমরা বুঝতে লাম যে, চলেছি আমরা এক অরণ্য সংকুল হ্রদবহুল অঞ্চলে, যেখানে লিহ আল্পস তার তুষার কিরীটমণ্ডিত ি বিশ্ববিজয়ী মানুষের পায়ে নত ে বাধ্য হয়েছে। জুরিখ্‌ হল সুইজার-ডের সবচেয়ে বড় শহর। বিপুল সের কোলে বিশাল 'জুরিখ সায়র' বা ের ধারে সুন্দর সুপরিচ্ছন্ন ছবির শহরটি। এরই মাধ্যমে পার্বত্য রূপসী রল্যাণ্ডের সঙ্গে হল আমাদের প্রথম য়। এবং সেই প্রথম পরিচয়ই হয়ে লো প্রথম সন্দর্শনে সঞ্জাত প্রেমের মতো গ মধুর ও সৌন্দর্য বিধুর।

'সুইস্‌ হোটেলস্‌' নামে সুইজারল্যাণ্ডের সমস্ত অঞ্চলের প্রত্যেক হোটেলের নাম ঠিকানা, কোনটায় কতগুলো ঘর, বাথরুম আছে কিনা, শুধু রাত্রিবাস না প্রাতরাশ ও অন্য খানাও মেলে, ঘরপিছু ভাড়া ও মাথা-পিছু ভাড়া কত সমস্ত খবর দেওয়া একখানি বই সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়ায় সুইজারল্যাণ্ডে কোথাও আমাদের হোটেল সমস্যায় পড়তে হয়নি। আমরা জুরিখে 'হোটেল গার্নী ওয়াল্‌শে'তে গিয়ে আস্তানা নিলাম। ঘর ভাড়া ভদ্রগৃহস্থের উপযোগী। হোটেলটিও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শুধু থাকা দৈনিক মাথা পিছু পাঁচ ফ্রাঙ্ক। খাওয়া বাইরে। সুইজারল্যাণ্ড হ'ল হার্ড কারেন্সির অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ সুইস টাকার দাম ব্রিটিশ স্টার্লিং মুদ্রার চেয়ে বেশি। এখানেও টাকাকে ফ্রাঙ্ক বলে কিন্তু ফরাসী 'ফ্রাঙ্কের' দাম ছিল এক পয়সা আর সুইস ফ্রাঙ্কের দাম—এক টাকা চার আনা। এখানে চারটি ভাষা চলে। জার্মান, ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ এই তিনটি ভাষাই প্রধানত সুইজার-ল্যাণ্ডের মাতৃভাষা, কিন্তু ইংরাজী ভাষাও তাঁরা অনেকে শেখেন।

সুইজারল্যাণ্ডের জন্মকাহিনী আশা করি সকলেরই জানা। যদি কারুর না জানা থাকে, তাদের বোঝার সুবিধার জন্য সংক্ষেপে ইতি-হাসটা বলি। জুলিয়াস সীজারের শাসনকালে 'হেলভেশীয়া' থেকে একদল লোক এসে 'গলে' প্রবেশ করে। তারা আসে 'জুরা' গিরিসংকটের ভিতর দিয়ে আল্পস্‌ উত্তীর্ণ হয়ে। আক্রমণকারী হিসাবে নয়, দেশান্তরীর মতো নিজেদের দেশ ছেড়ে এদেশে বসবাসের জন্য। কিন্তু লিঁয়োর কাছে তারা রোম্যান সৈনিকদের কাছে সশস্ত্র বাধা পেয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু রোম্যানরা ছাড়ে না। তাদের অনুসরণ করে এবং যুদ্ধে তাদের পরাস্ত করে তাদের দেশ দখল করে। হেল-ভেশিয়ায় রোম্যান শাসন প্রবর্তিত হয়। সাড়ে চারশো বছর রোম্যান শাসনাধীনে থাকবার পর রোমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ও বার্গাণ্ডীয়ানরা দেশটা নিজেদের মধ্যে ভাগা-ভাগি করে নেয়। জার্মানদের ভাগে পড়ে পূর্বাঞ্চলটা এবং পশ্চিমাঞ্চল থাকে বার্গাণ্ডীদের। কিন্তু এদের উভয়ের চরিত্র ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত বলে এদের মধ্যে একতা সম্ভব হয়নি। না ভাষার দিক থেকে না নীতির দিক থেকে। জার্মানরা তখনও

জুরিখ্‌

লুসার্ন

ছিল অসভ্য বর্বর জাত। তারা হেল্‌ভেশিয়ার লাতিন ভাষা বন্ধ করে দিয়ে জার্মান ভাষা চালাতে শুরু করে দিলে, কিন্তু বার্গান্ডিয়ানরা রোমান সভ্যতার আলো পেয়েছিল। তারা সে সভ্যতার ঐতিহ্য বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করেছিল। যার ফলে, সুইজারল্যান্ডের পশ্চিম অংশের ভাষা ফরাসী হয়ে ওঠে। এরা তখন খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। বিশপ পেয়েছে এবং উপাসনাও আরম্ভ করেছে। কিন্তু সুইজারল্যান্ডের জার্মান অধিবাসীরা তখনও পর্যন্ত মূর্তি পূজা করে, দেবদেবী মানে। ক্রমে অবশ্য পৌত্তলিক জার্মানও শেষ পর্যন্ত খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর শুরু হয় এখানে মধ্যযুগীয় অরাজকতা। মেরো ও কার্লোভিঞ্জিয়ান রাজাদের পর্যায়ক্রমে এটা একটা উপনিবেশ হয়ে ওঠে। হাঙ্গেরীয়ান ও স্যারাসান্সরাও এদের আক্রমণ করতে ছাড়েনি। সুইজারল্যান্ড কখনও বা 'হোলি রোম্যান এম্পায়ারের' গর্বের ধন হয়ে দাঁড়ায়, কখনো বা, জার্মান সাম্রাজ্যেরই একটা অংশ বলে পরিচিতি লাভ করে। সামন্ত রাজাদের হাতেই শাসনভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু রাজারা ছিলেন সম্রাটের অধীন। ভারতবর্ষেও মোগল সম্রাটদের আমলে বহু প্রদেশে এই ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিঃশব্দে ঘনিয়ে উঠেছিল। কয়েকটি জনপদের মাতব্বরেরা একতাবদ্ধ হয়ে দেশকে বিদেশী শাসকদের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করলেন। কারণ, এইসব শাসকদের নির্মম অত্যাচার ক্রমে অসহ্য রকম বেড়ে উঠেছিল। প্রসিদ্ধ জার্মান কবি শিলারের বিশ্ববিখ্যাত মুক্তিনাট্য 'উইলিয়াম টেলের' গল্প এই সময়কে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকেরা বলেন বটে যে ও কাহিনীটি সত্য নয়, কিন্তু তা হলেও সুইস প্রজাতন্ত্র যে ওই ধরণের ঘটনার ফলেই গড়ে উঠেছিল এ সত্য অস্বীকার করা চলে না। উরি, সোয়াইজ, উন্টারওয়াল্ডেন এ'রা যখন হ্যাপস্‌বার্গ রাজবংশের অধীনতা পাশ ছিন্ন করলেন, ডিউক অফ্ অস্ট্রিয়া পরাজিত ও লাঞ্ছিত হলেন দেখে সাহসে ভর করে লুজার্নও এই বিদ্রোহে যোগ দিলে। আগুন ক্রমে ছড়িয়ে পড়লো—এল জুরিখ, গ্লারুস, জুগ। একে একে এদের দলে সমস্ত টুকরো টুকরো 'ক্যান্টন' বা প্রদেশগুলিই যোগ দিলে। জেনিভা, ভালাই ও নিউশ্যাটেল্ সবশেষে এদের মধ্যে আসায় স্বাধীন, স্বতন্ত্র, অথচ একত্র সম্মিলিত এক গণতান্ত্রিক মিত্ররাজ্য (সুইস কর্নাফডারেস) গড়ে উঠেছিল। এরই নাম সুইজারল্যান্ড। প্রত্যেকটি ছোট ছোট প্রদেশ বা 'ক্যান্টন' স্বাধীন ও স্বতন্ত্র; কিন্তু রাষ্ট্রীয় মিত্রতাসূত্রে একতাবদ্ধ। একটি নিঃক্ষত্রিয় রাজ্যস্বরূপ এরা য়ুরোপে রয়েছে দীর্ঘকাল, য়ুরোপের সকল বিপদে নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ হয়ে। উপস্থিত সর্বসমেত ছোট বড় বাইশটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বা 'ক্যান্টন' এ[...] আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আজ এই অপরূ[...] সুইস্ মহারাষ্ট্র গড়ে তুলেছে। ১২[...] খৃ অব্দ থেকে ১৫১৩ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত প্র[...] সওয়া দু'শো বছর লেগেছে য়ুরোপের এ[...] আদর্শ মিত্ররাজ্যটি সুসম্পূর্ণ হয়ে গ[...] উঠতে।

এ না করলে, সুইজারল্যান্ডের অস্তি[...] বহু দিন আগেই বিলুপ্ত হত। কারণ এ[...] চারদিকে ঘিরে রয়েছে য়ুরোপের সব [...] ভাল্লুক রাষ্ট্রগুলি। উত্তরে বসে [...] জার্মানি, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম [...] আছে ফ্রান্স, দক্ষিণ-পূর্বে দাঁড়িয়ে র[...] ইতালি এবং পূর্ব প্রান্তে ছিল পরাক্র[...] অস্ট্রিয়া।

সুইজারল্যান্ড শুধু যে হ্রদবহুল [...] তাই নয়, এর মধ্যে নদীও অনেক[...] আছে। জুরিখ নদীই জুরিখ লে[...] স্রষ্টা। শিল্প-বাণিজ্য এবং আন্তর্জা[...] ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারেও জুরি[...] সুইজারল্যান্ডের মধ্যে সব চেয়ে [...] অগ্রসর। কলাবিদ্যা ও বিশ্ববিদ্যার সর্ব[...] সুন্দর প্রতিষ্ঠানের জন্যও জুরি[...] পৃথিবীজোড়া খ্যাতি আছে। আমরা [...] করে এসেছিলাম যে, দুদিন এক[...] করে থেকে সুইজারল্যান্ডের [...] বিশেষ প্রদেশগুলি পরিদর্শন [...] দিন দশেকের মধ্যেই পালাবো; কারণ [...] টাকা তখন ক্রমেই কমে আসছিল। কিন্তু ইংরাজিতে একটা প্রবাদ আছে মানুষ প্র[...] করে বটে কিন্তু সেটা সম্পন্ন করার [...] বিধাতার। মায়াবিনী এই সুইজারল[...] তার ফুলে ফলে স্থলে জলে পাহাড়ে [...] এমন একটা যাদু সৃষ্টি করে রেখেছে [...] আমরা বাঁধা পড়ে গেলাম। দশ দি[...] পরিবর্তে পুরো একটি মাস আ[...] সুইজারল্যান্ডের নানা প্রদেশের ন[...] স্বপ্নময় রূপের নেশায় কেটে গেল।

যথারীতি আমরা সর্বাগ্রে জু[...] মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। এখানে এ[...] একটা নতুন খবর জানা গে[...] সুইজারল্যান্ডে ল্যান্ডের চেয়ে পাহাড় [...] জলের ভাগই বেশি, জমি খুবই ক[...] তাজেই পুরাকালে সুইস্ অধিবাসী নিরুপায় হয়ে নদী ও হ্রদের জলের উপ[...] মাচা বেঁধে বসবাস করতেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের সেই 'সরসী-নীড়' এখা[...]

সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। আরও বহু প্রাচীন ও বিলুপ্ত জিনিস আছে যা সকল মিউজিয়মই সংগ্রহ করে রাখে। কোন অতীত যুগের ভেঙেপড়া দুর্গের খানিকটা, বিলুপ্ত প্রাচীন খৃস্টান মঠ ও আশ্রমের অংশ বিশেষ, সচিত্র রঙীন কাঁচের সার্শি, বসন-ভূষণ, অস্ত্রশস্ত্র, আরও কত কি। এখানে এসে প্রথম জানতে পারলাম যে সুইজারল্যাণ্ডে প্রথম খৃস্টান ধর্মমন্দির স্থাপন করেন আইরিশ রোমান ক্যাথলিক মিশনারী সন্ন্যাসীরা এসে।

একটি বড় সুন্দর উপাসনা মন্দির আছে এখানে। বহু পুরাতন। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে তৈরী। বিশেষজ্ঞদের মতে এর স্থাপত্যকলার মধ্যে রোমান প্রভাবই নাকি বেশি। এই প্রথম এখানে গির্জার চূড়ার উপর 'সেন্ট পল' 'সেন্ট পিটার'দের পরিবর্তে দিগ্বিজয়ী বীর সম্রাট শার্লেমেনের এক বিরাট প্রতিমূর্তি স্থাপিত রয়েছে দেখলাম। দেখে যথেষ্ট বিস্মিত হলাম। 'শার্লেমেন' বা চর্লস দি গ্রেট, যিনি ফ্রান্সের যশস্বী রাজা ও রোমের সম্রাটরূপে খ্যাত ছিলেন, তাঁর অগণিত বীরত্বগাথা ও কীর্তিকলাপ সবই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি সারাটা জীবন যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে থাকলে কি হবে, দেশের কৃষিশিল্প ও শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের দ্বারা দেশবাসীর আর্থিক উন্নতিসাধনের জন্যও বিশেষ সচেষ্টা ছিলেন। তাঁর রাজসভায় পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষ সমাদর ছিল। তিনি নিজে ফরাসী, লাতিন গ্রীক এই কটি ভাষা ভাল রকমই জানতেন। খৃস্টান সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য তিনি বহু কাজ করেছিলেন বটে, কিন্তু, ধর্মপ্রচারে নামেননি কখনো! সুতরাং গির্জার চূড়ায় তাঁর মূর্তি চিন্তার কারণ নিশ্চয়ই। তবে হ্যাঁ, তিনি একাধিকবার ধর্মগুরু পোপেদের আহ্বানে দুর্লঙ্ঘ্য আল্পস গিরি অতিক্রম করে রোমে ছুটে এসেছেন তাঁদের অধিকার খর্ব করতে উদ্যত শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য। প্রতিবারই তাদের পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করে তিনি পোপের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। একি সেই কৃতজ্ঞতার প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি? রোমের ঋণ কি তবে জুরিখ পরিশোধ করেছিল?

'আর্টগ্যালারি' দেখতে গেলাম। চমৎকার সংগ্রহ। সুইস্ চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের একটা ক্রমাভিব্যক্তির পরিচয় পাই এখানে। একেবারে অতি আধুনিক চিত্র ও ভাস্কর্যও এখানে রয়েছে। এগুলি বর্তমান শিল্পীদের বিকৃত রুচি ও ভাবধারাকে অতি নগ্নভাবে প্রকাশ করেছে। এখান থেকে গেলাম লাইব্রেরী ও বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিখ্যাত। এখানকার শিক্ষার মধ্যে ফাঁকি নেই। ১৪০০ ছাত্র এখানে নানা বিদ্যা শিক্ষা করছে। বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন একটি প্রত্নশালা, একটি নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান মন্দির এবং একটি প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণাগার রয়েছে। এই মিউজিয়মের চূড়াটি ২১৫ ফুট উঁচু। এর উপর উঠিলে সমস্ত জুরিখ প্রদেশ একনজরে দেখা যায়। জুরিখের প্রধান রাস্তাটির নাম 'বানহফস্ট্রাস্'। বেশ চওড়া রাস্তা। 'বানহফস্ট্রাস' জার্মান নাম। বাঙলা করলে হবে 'স্টেশনের পথ'। এ পথে সব বড় বড় দোকান, ব্যাঙ্ক, অফিস, হোটেল ইত্যাদি। লেকের ধারে বাগানের ভিতর দিয়ে যে পথটি গেছে তার 'কোয়ে গার্ডনস' নামটা রাখা সার্থক হয়েছে মনে হ'ল। বিকেলটা আমরা এইখানে বসেই কাটিয়ে দিলাম। গরম গরম চীনের বাদাম ভাজা খেতে খেতে আমাদের য়ুরোপ ভ্রমণের গল্পগুলোরই রোমন্থন চলছিল। শহরকে বারো মাস সাজিয়ে রেখেছে এরা যেন প্রমোদ-উদ্যান করে! প্রকৃতির সৌন্দর্যের অকৃপণ দানকে এরা এতটুকু অবহেলা করেনি। দু'হাজার তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের উপরও এরা রমণীয় জনপদ সৃষ্টি করেছে। বৈদ্যুতিক ট্রেন ও 'তারে ঝোলা' রেলে ওঠা-নামার অতি সুব্যবস্থা আছে। আকাশ ছোঁয়া পাহাড় এদেশের মানুষের জয়যাত্রাকে কোথাও রুখতে পারে নি।

পরের দিন সকালে আমরা 'জুরিখ' ছেড়ে 'লুজার্ন' চলে এলাম। এখানে এসে 'সেন্ট্রাল হোটেলে' আশ্রয় নিলাম। 'লুজার্ন' সুইজারল্যাণ্ডের একটি সুদৃশ্য মনোরম স্থান। 'চারদেশী সাগর কূলের' মাথার উপর এই

বার্ন

নগরটি দেখে দুই চোখ আমাদের এর রূপে মুগ্ধ হয়ে গেল। আমাদের সেন্ট্রাল হোটেলের অধ্যক্ষ বললেন 'দুদিন এখানে থেকে যান। এখানে অনেক কিছু দেখবার আছে। সেই কোন পুরাকালের নগর প্রাচীর, মধ্যযুগের পৌরাণিক কাঠের সেতু, প্রাগৈতিহাসিক তুষার কানন, সিংহমূর্তি, ঘড়িঘর বলতে বলতে তিনি একখানি ছোট ছবির বই বার করে দিলেন আমাদের। তিনি এতক্ষণ যে সব দ্রষ্টব্য বস্তুর নাম করছিলেন তার সবগুলির ছবি রয়েছে এই বইখানিতে। বুঝলাম, এটি ওদের যাত্রী ভোলাবার 'চার' ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধরণের সব বইয়ে এরা অনেক তুচ্ছ ও সামান্য কিছুকেও অসামান্যরূপে প্রচার করতে অভ্যস্ত। এটা ওদের ব্যবসা। সুতরাং ক্ষমার্হ। লুজার্ন প্রধানতঃ আবাদী দেশ বলেই মনে হল। বড় বড় কৃষি ক্ষেত্র ও চাষবাস চোখে পড়ে। তবে এরা ঠিক আমাদের দেশের চাষী নয়। সম্পন্ন কৃষক পরিবার। শিক্ষায় ও সভ্যতায় বেশ অগ্রসর।

'গ্লেশিয়ার গার্ডেন' বা হিমঘন কাননের নামটা শুনে কৌতূহল হওয়ায় সর্বাগ্রে আমরা গেলাম লুজার্নের সেই 'চিরতুষার-কানন' সন্দর্শনে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। পৃথিবী তখন চিরস্থায়ী হিমাচ্ছন্ন। বিশেষ করে সুইজারল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চল ও আল্পস পর্বতের চারিদিকে ছিল নিরবচ্ছিন্ন বরফের স্তূপ ঢাকা। ভূতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করেছেন যে সেই হৈমযুগেও হিমশিলাবৃত ভূমির মাঝে মাঝে মরুকান্তারের ন্যায় রক্ত-মাংসের প্রাণী বাস করবার উপযুক্ত বনভূমিও ছিল। সেখানে বাস করতো সেদিন সেই সব জীবজন্তু আজকের সভ্যতার পাপ-তাপে দগ্ধ পৃথিবী থেকে যারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল থেকে যেমন আমরা তাদের অস্তিত্বের প্রমাণ পাই, তেমনি এই হিম-কাননের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছিল সর্বপ্রথম ১৮৭২ খৃঃ অব্দে। শ্রীযুক্ত ডবলিউ আমরাইন মৌলার ভূগর্ভ খনন করতে গিয়ে মাটির নীচেয় হঠাৎ এই তুষারযুগের প্রস্তরীভূত বৃক্ষপত্রের সন্ধান পেয়েছিলেন। সামুদ্রিক শঙ্খ শামুকাদির অস্তিত্বও সঙ্গে সঙ্গে একথা প্রমাণ করেছে যে গগনস্পর্শী গিরিশিখর চ্যুত গ্লেশিয়ার বা বিপুল তুষার প্রপাত ও নিরবচ্ছিন্ন হিম প্রবাহ নেমে এসে শুধু ভূমিকেই আচ্ছন্ন করতো না সমুদ্রকেও ঢেকে ফেলতো। সেদিন জলময় জড় জগৎও ছিল এরই অধীন। আমরা এই বরফের চাপে পাথর হয়ে যাওয়া অহল্যা পাষাণের মতো শিলীভূত পাতা, লতা, শঙ্খ, শামুক, নুড়ি-নোড়া, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি দেখতে দেখতে গিরিকন্দরবাসী মানুষের অতীত পৃথিবীর বিলুপ্ত রহস্যের মধ্যে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ঘুরে এলাম খানিকটা। এখানকার মিউজিয়মও এই হিমসমাধি-লব্ধ বহু বিচিত্র সম্ভারে সজ্জিত। এছাড়াও এমন আরও কয়েকটি দ্রষ্টব্য বস্তু এখানে আছে যা এই বরফে ঢাকা পাহাড়ে ঘেরা ও নদনদী সরোবরে পরিবৃত দেশেই দেখতে পাওয়া যায়, অন্যত্র বিরল। আমি শিলীভূত জীবজন্তু ও লতাপুষ্পের কথাই বলছি। (ফ্লোরা ও ফনা) এখানে পর্বত গুহাবাসী আদিম মানুষের কঙ্কালের সঙ্গে পরিচয় হল। দেখলাম সভ্যযুগের পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া সেই বর্বরযুগের ম্যামথ, ম্যাস্তোদন ও রোমশ গণ্ডারের প্রেতাত্মা। আল্পস পর্বতের অন্দরে কন্দরে একদা যারা বিচরণ করতো, আজ যাদুঘরে দেখা গেল তাদের ভুলে যাওয়া স্মৃতির চিহ্নবিশেষ।

এখানকার এই মিউজিয়মের মধ্যেই চিত্রশালা ও গ্রন্থশালাও রয়েছে। তারফলে, দর্শকদের পক্ষে এদেশের সর্বাঙ্গীন রূপটি একসঙ্গে এক জায়গায় দেখবার সুবিধা হয়। আমরা মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে টাউন হল ও পুরাতন দপ্তরখানাটিকে পাশ কাটিয়ে চলে এলাম একেবারে লুজার্নের বিশ্ব-বিখ্যাত সিংহ মূর্তিটি দেখতে। এর বিশেষত্ব হচ্ছে, একটি আস্ত পাহাড়ের গায়ে শিল্পী থরওয়াল্ডসেনের পরিকল্পনা অনুসারে এক বিরাট সিংহ মূর্তি খোদিত করা হয়েছে—দুঃসাহসী সুইস দেহরক্ষী

ইণ্টারল্যাকেন —(কুরসাল)

দলের অদ্ভুত শৌর্যের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূ এই বীর সৈনিকেরা ১৭৯২ খৃঃ অ ফরাসী বিদ্রোহের সময় টুইলারীর য ফরাসী রাষ্ট্রশক্তির সম্মান রক্ষার জন্য প্র দিয়েছিল। সেই জীবন উৎসর্গ ক বীরেন্দ্রবৃন্দের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত বর্ম অসি ভগ্নের উপর শোকবিহ্বল পশুরাজ গিরিগহ্বরাভ্যন্তরে তন্দ্রাচ্ছন্ন মূর্তি—দর্শ মনে বেশ একটা সহানুভূতিসূচক করু উদ্রেক করে। মুখ দিয়ে অজ্ঞাতসা বেরিয়ে আসে নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাসের স একটা ক্ষুদ্র—'আহা'! গুহার শীর্ষদেশে কথা কটি লেখা আছে 'সুইসদের বীরত্ব বিশ্বস্ততার স্মরণেই' পাদদেশে আছে জন যুদ্ধহত যোদ্ধার নাম।

পাহাড়ী দেশের পাহাড়ী মানুষগ যেমন সবাই কমবেশ অনেকটা

রকমের বেঁটে খাটো দেখতে হয়, সুইজারল্যান্ডের গির্জা বা উপাসনা মন্দিরগুলিও সেই রকম প্রায়ই এক ধরণের। অধিকাংশই বেঁটে খাটো, তবে মাঝে মাঝে এক একটির চূড়া মাথা তুলে আকাশ ছোঁবার চেষ্টা করছে দেখা যায়। সেই ফ্রান্স ও ইটালি থেকে শুরু করে দেখে আসছি। গির্জার সংখ্যা এদিকে এত বেশি যে সে ভীড়ের মধ্যে বেচারা খৃস্টধর্ম আর দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছে না। লেক ও কেনালের যোগাযোগের মাঝে মাঝে সুদৃশ্য সুন্দর কাঠের সেতু আছে অনেকগুলি। সেতুগুলি সবই সেকালের পুরাতন সাঁকো। একটি সেতু আবার তার মধ্যে ছাদ ঢাকা ঘরের মতো। এর ভিতর প্রাচীর গাত্রে শিল্পী হোডলিংগারের শক্তিশালী তুলিকায় আঁকা 'মৃত্যুর নৃত্য' চিত্রখানি রয়েছে। এই থেকে সেতুটিরও নাম হয়ে গেছে "ডান্স অফ্ ডেথ্ ব্রীজ!" বিকেলটা লেকের ধারেই কাটলো।

পরদিন সকালে আমরা 'লুজার্ন' ছেড়ে বার্নে চলে এলাম। বার্ন হল সুইজারল্যান্ডের 'রাজধানী' বলবোনা, সুইস্ গণতন্ত্রের প্রধান রাষ্ট্রপীঠ বলবো। আয়ার নদীর বাঁকে একটি পার্বত্য উপদ্বীপের উপর এই সুন্দর নগর। আয়ার নদীর উপর অনেকগুলি সেতু আছে ওপারে যাতায়াতের। রাস্তার উপর অধিকাংশ বাড়ীতেই গাড়ী-বারান্দা বার করা। প্রথম দর্শনে মনে হয় যেন ফুটপাথের উপর রাস্তার দুধারে সারি সারি থাম বসানো রয়েছে। মধ্যযুগীয় স্থাপত্যও অনেক বাড়ীতে চোখে পড়লো। পথেঘাটে জলের সুদৃশ্য ফোয়ারা আর ফুলের রঙীন কেয়ারী। তরিতরকারি ফুলফল নিয়ে রাস্তার ধারেই বেচতে বসে ফেরীওয়ালারা। রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়ে বেশ বাজার করে আসা যায়। সুইজারল্যান্ডে বোধ করি এইটেই প্রচলিত প্রথা। কাঁচা জিনিসের হয়ত আলাদা কোনও বাজার নেই। আমরা হোটেলে গিয়ে উঠি, রেস্তোরাঁয় খাই, আমাদের সঙ্গে বাজারের সম্পর্কই বা কি? গেলাম এখানকার 'ঐতিহাসিক যাদুঘরটি' দেখতে। ভুল করবেন না যেন কেউ। এ যাদুঘরের কোন ইতিহাস নেই, এটি ইতিহাসের যাদুঘর! সেই প্রত্নতত্ত্ব আর নৃতত্ত্ব! সেই অস্ত্রশস্ত্র বর্ম চর্ম। নূতনের মধ্যে এখানে দেখা গেল গির্জার অনুষ্ঠান ও যাজক সম্প্রদায়ের কাজে ব্যবহৃত সেকালের বিবিধ খৃষ্টধর্মানুমোদিত দ্রব্যাদি। চিত্রশালায় সেই গতানুগতিক ছবি ও ভাস্কর্য সংগ্রহ। নূতনত্ব কিছু নেই।

এখানকার ফেডারেল প্যালেস ও পার্লিয়ামেন্টভবন দেখে খুশী হওয়া গেল। দিব্যি কারুকার্যকরা স্থাপত্যকলা, অনেকটা

য়্যুঙফ্রাউ
(বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায় মানমন্দির)

ফ্লোরেন্সের সুদৃশ্য বাড়ীগুলির মতো দেখতে। সোপান শ্রেণীও চমৎকার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন বহন করছে। প্রতি কক্ষাভ্যন্তরেও চারু কারুর সুষমামণ্ডিত প্রাচুর্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডেপুটিদের ঘরে বার্নের প্রকাণ্ড এক তৈল চিত্র ঝুলেছে, শিল্পী ভিরোঁর আঁকা। নাম—"সংযুক্ত মিত্ররাজ্যের দোলা" (দি ক্রেডল্ অফ্ দি কনফেডারেশন) এখান থেকে বেরিয়ে টাউনহল আর ন্যাশনাল লাইব্রেরী দেখে হোটেলে ফিরে এলাম। এখানে আমরা 'হোটেল ন্যাশানালে' উঠেছিলাম।

দুপুরে বৃষ্টি এল। বেলা তিনটে নাগাদ একটু আকাশ ধরতে আমরা একখানা ট্যাক্সী নিয়ে গেলাম বার্নের 'ভারতীয় লিগেশন' অফিসে। স্বর্গগত ডাঃ ধীরুভাই দেশাই তখন ভারতীয় দূতের পদে ছিলেন। তিনি আমাদের অপ্রত্যাশিত রকম খাতির-অভ্যর্থনা করলেন। চা কফি বিস্কুট অরেঞ্জ ইত্যাদি খাওয়ালেন। ডাঃ তারাচাঁদ আমাদের দেশের বন্ধুবান্ধব অনেকের বিষয় প্রশ্ন করলেন, তার মধ্যে বন্ধুবর ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। এখানে স্বর্গত সুহৃদ ডাঃ বিনয়কুমার সরকারের সুযোগ্যা কন্যা কুমারী ইন্দিরার সঙ্গে দেখা হল। মিসেস্ সরকার এখানেই আছেন জেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো বললাম। কিন্তু তখন আবার বৃষ্টি নেমেছে। শ্রীযুক্ত ধীরু ভাই তাঁর নিজের মোটরে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন। চালককে আদেশ করলেন ওখানে গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করতে। আমরা মিসেস সরকারের সঙ্গে দেখা করে ফেরবার পর আমাদের যেন সে ন্যাশনাল হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসে। বিমুগ্ধ হলাম তাঁর সৌজন্যতায়, তাঁর বিনম্র ভদ্রতায়, তাঁর আত্মীয়ের মতো ব্যবহারে।

মিসেস সরকার কাঁদিতে লাগলেন। বললেন 'সে যে আমায় বলেছিল আমি চলে গেলেও আমার দেশবাসী তোমাকে দেখবে। কিন্তু, কেউ তো আমার মুখের দিকে তাকালে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পাওনা তাঁর মাইনের টাকাটাও আজ ছ' মাস ধরে লেখালেখি করে পাচ্ছিনে।' আমায় মিনতি করে বললেন,—'তুমি কলকাতায় ফিরে ওদের একটু তাগাদা দিও। আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তোমরা জানো তো ডাঃ সরকার যা উপার্জন করতেন, সব তার দেশের জন্য খরচ করতেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় মৃত্যুকালে তিনি ঠাকুরদেবতার নাম করেন নি। বলেছেন শুধু—'বন্দে মাতরম্'। ৬০খানা ভাল ভাল বইয়ের ম্যানুস্ক্রিপ্ট রেখে গেছে আমার কাছে। ৪০খানা ইংরাজি এবং ২০খানা বাঙলা। কিন্তু দেশে এমন কোনও প্রকাশক নেই যে ডাঃ সরকারের বইগুলি ছেপে বার করে। এরও যদি কোনও কিছু ব্যবস্থা করতে পারো চেষ্টা দেখো।'

আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো বলে চোখ মুছতে মুছতে চলে এলাম। হোটেলে ফিরে সেই রাত্রেই তাঁর অনুজ অধ্যাপক বিজয়কুমার সরকার মহাশয়কে সব কথা জানিয়ে একখানি পত্র দিলাম।

বার্নেও আমরা রাশিয়া যাওয়ার ছাড়পত্রের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেছিলাম। কারণ, লণ্ডনে শুনেছিলাম, সুইজারল্যান্ড থেকে

সহজেই ছাড়পত্র এবং ভিসা পাওয়া যায়। ডাঃ তারাচাঁদ এবং দুটি মাদ্রাজী যুবক (লীগেশনের কর্মচারী) নাম মনে পড়ছে না, বার্ন লীগেশনে এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত ধীরুভাইয়ের আদেশে আমাদের বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ওঁরা দিল্লী থেকে ভারত গভর্নমেণ্টের অনুমতি এবং অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা করে ছাড়পত্র দিতে অন্তত এক মাস সময় লাগবে বললেন। কোরিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতেই নাকি রাশিয়ার ছাড়পত্র সম্বন্ধে নূতন করে বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে বললেন। তবে তাঁরা আমাকে অনেক কিছু দেখিয়ে এবং বুঝিয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করে দিয়েছিলেন যে, এ বিষয়ে আমাকে সত্বর সাহায্য করার তাঁদের নিজেদের উপায় নেই। এক মাস অপেক্ষা করলেও ছাড়পত্র যে নিশ্চিত পাওয়া যাবে, তারও স্থিরতা নেই, একথাও বলেছিলেন। সেজন্য প্যারিসের পর বার্নেও ব্যর্থ হয়ে আমরা রাশিয়া যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হতাশার সঙ্গে পরিত্যাগ করে 'বার্ন' ছেড়ে 'ইণ্টারল্যাকেনে' চলে এলাম।

'ইণ্টারল্যাকেন' একেবারে পাহাড়ের উপর বললেই হয়। সমুদ্র সমতল থেকে ১৮০০ ফুট উঁচুতে। আল্পসের ঠিক বুকে, যেখানে মনে হবে বরফে ঢাকা পাথরের মাঝখানে কে যেন একখানি কাঁচ ঘাসের রংয়ের বিশাল সবুজ কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে—তারই কোলে এই ইণ্টারল্যাকেন। এখান থেকে দেখা যায় অদূরে ১১৩৩৩ ফুট উঁচু তুষার-শুভ্র কিরীট 'যুঙ্‌ফ্রাউ' পাহাড়। সুইজারল্যাণ্ডের মানুষেরা বোধ করি একটু রোম্যাণ্টিক, নইলে এই 'নন্দপাহাড়' বা 'কৈলাস' পর্বততুল্য তুষারাবৃত তুঙ্গ গিরি-শিখরের নাম রাখে 'যুবতী মেয়ে!' যুঙ-ফ্রাউ জার্মান শব্দ 'যু-ইয়ং যুবতী! আর 'ফ্রাউ'-নারী বা শ্রীমতী বোঝায়। 'থুন' আর 'ব্রায়াঞ্জ' নামে সুইজারল্যাণ্ডের দুটি প্রসিদ্ধ লেকের সন্ধিস্থলে এই 'ইণ্টারল্যাকেন', এটাও জার্মান শব্দ; এর মানে করলে দাঁড়াবে 'লেকের মধ্যে' এখান থেকে যাত্রী নিয়ে নিত্য একাধিক স্টীমার যাতায়াত করে এই লেকের ভিতর দিয়ে। এখান থেকে জলপথে উত্তরে লুজার্ণ পর্যন্ত যাওয়া যায়, আবার দক্ষিণে 'মন্ট্রো' হয়ে নাকি জেনিভা পর্যন্ত যাওয়া যায়। ইণ্টারল্যাকেনেরই একান্ত নিকটে আল্পসের প্রসিদ্ধ উপত্যকা গ্রীন্দেলওয়াল্দ,
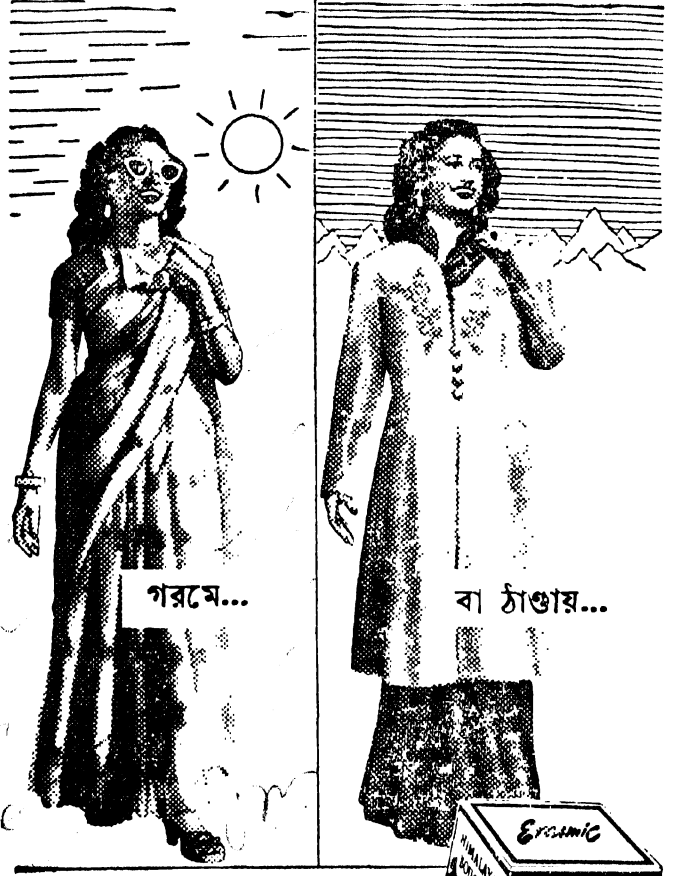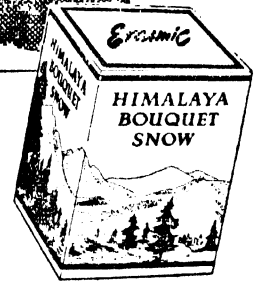
এবং ল্যাটারব্রুনে ওদের অনুপম প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে ইণ্টারল্যাকেনকে এক অভিনব সৌন্দর্য দান করেছে।

ইণ্টারল্যাকেনে আমরা যে হোটেলে এসে উঠেছিলাম সেও একখানি ছবি। নাম তার 'হোটেল ব্যাভেরিয়া'। গোল বারান্দা ঘেরা সুন্দর চূড়া সমন্বিত সুদৃশ্য ত্রিতল খোদাই করা উৎকৃষ্ট কাঠের বাড়ী। বাড়ীখানি মধ্যযুগের অলঙ্কার-সমৃদ্ধ গির্জার ছাঁচে গঠিত। ভিতরে এবং বাহিরে মধ্যযুগীয় প্রসাধন রুচি এবং আবহাওয়া পরিবেশ রক্ষা করা হয়েছে। পুষ্পিত লতার ভারে বারান্দা ও থামগুলি মনোরম হয়ে উঠেছে। সামনের কম্পাউণ্ডে ল্যান ও ফুলের বাগান। বাগানের মধ্যে একটি সতেজ জলের ফোয়ারা নিঃশব্দে একতলার সমান ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পেঁজা তুলোর মতো উড়ে উড়ে ঝরে পড়ছে। বাগানে গাছপালার মধ্যে বা ল্যানের ধারে বসে লাইট রিফ্রেশমেণ্টের অবকাশে বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে খোস্ গল্প করবার আরামপ্রদ ব্যবস্থা আছে। একটি সুন্দরী সুইস তরুণীর উপর এই হোটেল পরিচালনার গুরুভার ন্যস্ত হয়েছে দেখলাম। কি আশ্চর্য যোগ্যতার সঙ্গেই না সে একাজ নিপুণভাবে সুসম্পন্ন করছে। তরুণীর মধুর স্বভাবে, তার সদাহাস্যময় প্রফুল্ল মুখের মধুর সম্ভাষণে, তার এই সরাইখানার দিনের যাত্রীদল সবাই বেশ পরিতুষ্ট। আমরা এখান থেকে য়ুঙ্ক্রাউ যেতে চাই, সেই বারো হাজার ফুট উঁচু হিমাদ্রির উপর যে চিরস্থায়ী তুষার মরু বিরাজ করছে আমাদের তা দেখে আসবার ইচ্ছা শুনে মেয়েটি তার সব ব্যবস্থা করে দেবেন বললেন। ইণ্টারল্যাকেনে পৌঁছেছিলাম আমরা অপরাহ্নে। এখানে ভারি সুন্দর ঘোড়ার টমটম পাওয়া যায়। ট্যাক্সিও আছে, কিন্তু খুব কম। মেয়েটি বললে—"কাল সকালের ট্রেনে প্রাতরাশ সেরেই আপনারা বেরিয়ে পড়বেন। য়ুঙ্-ফ্রাউয়ের মাথার উপর গিয়ে পেঁছিতে বেলা দুটো বেজে যাবে। দেখেশুনে হোটেলে ফিরে আসতে প্রায় রাত্রি আটটা হবে। সারাটি দিনই পাহাড়ে কাটবে, বুঝলেন? সুতরাং, আজ বরং বিশ্রামান্তে একটি ফেটন নিয়ে আমাদের 'যুগ্ম সরোবরের' দিকটা একটু ঘুরে আসুন। কেমন?"

বৈকালীন চা-পানে তৃপ্ত হয়ে আমরা মহা উৎসাহে বেরিয়ে পড়লাম। দুটি হ্রদের মাঝখানে সবুজ অরণ্যাবৃত পর্বতের পটভূমিকায় এ স্থানটিকে বড় মনোরম লাগছিল। মাঠে মাঠে ঘাসফুল ফুটে রয়েছে। বাতাসের সঙ্গে যেন একটা বনের সৌরভ ভেসে আসছিল। পাহাড় ভাঙ্গা ছোট ছোট স্রোতস্বতী এখানে ওখানে এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তাদের মৃদু কুলু কুলু স্বর যেন কানে কানে কথা কয়। কত পায়ে চলা পথ মাঠ পার হয়ে পাহাড়তলি অতিক্রম করে শৈল চূড়াভিমুখে চলেছে। লেকের দেশ এটা। একপাশে যার 'থুন' সরোবর, অপর পাশে যার 'ব্রায়াঞ্জ' সায়র, সেখানেও দেখি একটি 'সুইমিং পুল'! অবশ্য লেকের ধারে সমুদ্রস্নানের সখ মেটাবার জন্য 'বাথ'ও আছে। আমরা 'খুরসাল' নৃত্যশালা ও 'ক্যাসিনো' সংলগ্ন বাগানে এসে ঢুকলাম। এরই কাছে 'রুজেন উভে' সুপ্রসিদ্ধ জার্মান কবি ও নাট্যকার শিলারের রচিত মঞ্চ নাটক 'উইলহেলম্ টেল' খোলা আকাশের নীচের, স্বাভাবিক পার্বত্য দৃশ্যের পটভূমিকায় অভিনয় হচ্ছে শুনলাম। এই নাটকখানি নাকি এসময়ে এখানে প্রায়ই মাঝে মাঝে অভিনয় হয়। আজ হচ্ছে, আবার নাকি সাতদিন পরে হবে। হতাশ হয়ে পড়লাম। আমাদের দেখা হবে না। আমরা তো পরশু এখান থেকে 'জোয়াইসিমেন' হয়ে 'মন্ট্রো' চলে যাব ঠিক করে রেখেছি। আমার অবশ্য আরও দু একদিন থেকে যেতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু পত্নী ধমক দিলেন। অর্থকোষ নাকি 'ক্ষীণ' হয়ে আসছে।

এখানকার আবহাওয়াটা বেশ ভাল। পাহাড়ের ওপর এসেছি, কিন্তু শীত নেই বেশি। স্টেশনের গায়ে আঁটা একখানি বিজ্ঞাপনপত্রে দেখে এসেছিলাম এখন ৬০ ডিগ্রী চলেছে। আকাশ মেঘলেশহীন। প্রায় সাতটা নাগাদ সন্ধ্যার অন্ধকার এসে নামলো পাহাড়ের কোলে। আলো জ্বলে উঠলো চারিদিকে। আমরাও গুটি গুটি হোটেলের দিকে ফিরলাম। এখানে যে ফেটনগুলোর এত বেশি ভাড়া তা আগে জানলে উঠতাম না। ঠিক করলাম, কাল থেকে পদরজেই ঘুরবো। হোটেলের সেই তরুণী পরিচালিকার কাছে ঘোড়ার গাড়ীর বড় বেশি ভাড়ার জন্য অভিযোগ করলাম। তিনি মধুর হেসে বললেন 'আপনি ঠিক বলেছেন, ভাড়াটা ওরা বড্ড বেশি নেয়। বলে, পাহাড়ের পথে গাড়ী নিয়ে ঘোড়ার টানতে বড় কষ্ট হয়। জানেন, এখানে কি মজা? 'ট্যাক্সী' ঘোড়ার গাড়ীর চেয়ে সস্তা! ওকে তৈল-পায়ী যন্ত্র টানে কিনা! আর, এ টানে দানা-পানি খাওয়া একটি উত্তম প্রাণী। ফেটন-ওয়ালাদের মাটি করেছে আমাদের এই অভিজাত ঘরের বিশেষ ভদ্র যাঁরা। তাঁরা 'ট্যাক্সী' চড়াটা অমর্যাদাকর বলে মনে করেন! যত সম্ভ্রম তাঁদের সসম্মানে রক্ষিত হয় নাকি ওই ঘোড়ার গাড়ী চড়লে!' বললাম, 'আমরা বিদেশী। এ খবরটা আগে পেলে আপনাদের দেশের ট্যাক্সীকে আভিজাত্যে উন্নীত করে দিয়ে যেতে পারতুম!'

মেয়েটি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো—যেন জ্যোৎস্নার ঝরণা!

হোটেল ব্যাভেরিয়া'য় রাত্রে বেশ খাওয়ালে। সুইজারল্যাণ্ডে কোথাও খাওয়ার কষ্ট নেই। সবই প্রচুর ও পর্যাপ্ত। দুধ, মাখন, মাছ মাংস, কেক বিস্কুট,. কিছুরই অভাব নেই। তবে, দাম একটু বেশি। পরদিন প্রাতরাশেও পরিতৃপ্ত হওয়া গেল। হোটেল ব্যাভেরিয়ার তরুণী পরিচালিকা বললেন,—"আপনারা য়ুঙ্ফ্রাউ' যাচ্ছেন। আপনাদের সঙ্গে আমি 'প্যাক্‌ড লাঞ্চ' দিয়ে দিই। য়ুঙ্ফ্রাউয়ের উপর 'হোটেল বার্গ' আছে বটে, কিন্তু সেখানে পেঁছিবেন ল্যাঞ্চের পর।" এখানে শিখলাম ফুড সহ হোটেল নিলে প্রাপ্যখানা ছাঁদা বেঁধে নেওয়া যায়। লণ্ডনে আমরা ইয়র্ক হোটেলে ছিলাম দিনে চারবার খাওয়া সমেত, কিন্তু, 'লাঞ্চ' ও 'আফ্‌টারনুন টি' অধিকাংশ দিনই বাইরেই খাওয়া হত। হোটেলে ফিরে এসে খেয়ে যাবার সময় হত না। কিন্তু, এরকম 'প্যাকড্ ল্যাঞ্চ' সঙ্গে দেবার কথা তো তারা কোনোদিন মুখেও আনেনি! স্থির করলাম এবার লণ্ডনে ফিরে গিয়ে ওটা উশুল করতে হবে।

য়ুঙ্ফ্রাউ যাবার ট্রেন ধরলাম আমরা দশটা পাঁচে। এ গাড়ী আমাদের ১৮৬০ ফুট থেকে টেনে ২৬১২ ফুট উঁচুতে ল্যাটারব্রুনেনে এনে ছেড়ে দিলে। এখানে গাড়ী বদল করতে হল। বড় লাইন ছেড়ে আমরা এবার ওয়েংগার্ন্যাল্প্ রেলে ছোট গাড়ীতে উঠলাম। এ গাড়ী নিয়ে চললো

আমাদের ল্যাটারব্রুনেন উপত্যকার অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতর দিয়ে। দক্ষিণে একেবারে আমাদের সামনে এসে পড়ল যেন সুদীর্ঘ 'স্টাটবাক্ জলপ্রপাত'। চলেছে আমাদের দুধারে পর পর মালার মত গাঁথা তুষার-শিখর শৈল শ্রেণী। এরাও আমাদেরই মতো পাহাড়ের চূড়াকে বলে 'হর্ন' বা 'শৃঙ্গ', যেমন 'গ্রোস হর্ন', 'ব্রাইট্ হর্ন' ইত্যাদি। চললো আমাদের ট্রেন ডাইনে বেঁকে ওয়েংগেনের খাড়া পথের উপর। কত যে পার্বত্য সুড়ঙ্গ পথের তিমিরগর্ভ ভেদ করে ছুটেছে আমাদের ট্রেন, অসংখ্য গিরি নির্ঝরের উপরস্থ সেতুবন্ধ পার হয়ে তার হিসাব রাখা যায় না। এখানকার রেলের সুড়ঙ্গ পথগুলি বৈদ্যুতিক আলোকে প্রদীপ্ত করে রাখা হয়েছে দেখে খুশী হলাম।

ওয়েংগেনে এসে গাড়ী থামলো। আমরা ৪১৮০ ফুট উপরে এসেছি। চমৎকার দৃশ্য এখানকার। আমাদের ট্রেন রেল লাইন ধরে পাহাড়ের তরুতৃণাচ্ছাদিত শ্যামল অঙ্গ বেয়ে উপর দিকে উঠছিল। পাইন বনের ভিতর থেকে অদূরবর্তী 'রজতগিরিশৃঙ্গ' (সিলভার হর্ন) দেখা যাচ্ছিল। অপরূপ তার শোভা! এর পরের স্টেশান 'ওয়েং-গার্নাল্প'। ৬১৪৫ ফুট উঁচু। আমরা এখানে থেকেই 'য়ুঙফ্রাউ' পাহাড়ের তুষার-শুভ্র রূপে দেখতে পাচ্ছিলাম। পরের স্টেশনে আমাদের আবার গাড়ী বদল করতে হবে বলে গেল। শাইডেগ স্টেশনে এল গাড়ী। দেখি ৬৭৬২ ফুট উপরে এসেছি। এখান থেকে আমরা 'ওয়েংগার্নাল্প রেল' লাইন ছেড়ে 'য়ুঙফ্রাউ রেলওয়ে'র আরও ছোট গাড়ীতে উঠলাম। এখানেও পাহাড়ের উপর চলেছে অফুরন্ত শ্যামসমারোহ। দেখা যাচ্ছে 'আইগার' 'য়ুঙফ্রাউ' আর 'উত্তম শৃঙ্গ (বেটার হর্ন)' এবং দূর থেকে গ্রীন্ডেলওয়াল্ডের ছবিও চোখে পড়ছে।

একটি ছোট পার্বত্য সুড়ঙ্গ ভেদ করে আমাদের ট্রেন এসে থামল এবার আইগার গ্লেশিয়ারের ভিতর। ৭৬১২ ফুট উপরে উঠেছি তখন। এখানে পাহাড়ের গায়ে বারান্দার মধ্যে সুন্দর একটি রেস্তোরাঁ রয়েছে। যাত্রীরা অনেকেই আকৃষ্ট হয়ে নেমে গেলেন সেখানে। স্টেশনের কাছেই পোস্ট-অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস ও পাবলিক টেলিফোঁ রয়েছে। এখানে 'মেরু-কুকুরেরা' (পোলার ডগ) বরফের উপর দিয়ে গাড়ী টেনে নিয়ে চলেছে। ছোট বড় গিরি-মূষিকরা (মারমট) কাঠবিড়ালীর মতো ছুটোছুটি করছে। বেলা ১টা বাজে। আমাদের 'প্যাকড লাঞ্চ' খুলে সদ্ব্যবহার করা গেল। একটি কাগজের ব্যাগের ভিতর কেমন সব জিনিস গুছিয়ে দিয়েছে! ডিম, মাংস, রুটি, কেক, তার সঙ্গে ফলও ছিল, আপেল, পিয়ার্স। বোতলে ভরে আমরা জল এনেছিলাম। সুতরাং কোনও অসুবিধাই হয়নি। শুধু, বারো হাজার ফুট উঁচুতে ঠাণ্ডা বরফের দেশে যাচ্ছি বলে একগাদা গরম কাপড় সঙ্গে এনেছিলাম, কিন্তু, সেগুলো তখনও পর্যন্ত কাজে লাগলো না বলে মনে হচ্ছিল—মিছে বওয়াই সার হ'ল!

কিন্তু, এ আক্ষেপ ক্ষণিকের। আইগার-ওয়াল্ড স্টেশনে আসতেই ওভারকোট চড়াতে হল। ৯৪০০ ফুট উপরে এসেছি তখন। উপর দিকে তাকালে আকাশের সাদা মেঘের সঙ্গে পাহাড়ের শুভ্র তুষার যেন এক হয়ে গেছে মনে হয়। নিচের দিকে তাকালে দেখা যায় গ্রাইন্ডেলওয়াল্ড আর থুন লেকের গিরিচ্ছায়াচ্ছন্ন জলরাশি টলমল করছে। সহ-যাত্রীরা কেউ কেউ বললেন ঐ দেখুন আল্পসের 'জুরা গিরিবর্ত্ম' দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, সত্যকথা বলতে কি তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়েও কিছুই চখে পড়ে না! এবার গাড়ী এসে থামলো 'আইসমিয়ার' অর্থাৎ 'বরফের স্তূপে'। এ স্থানটি ১০৩৬৮ ফুট উঁচুতে। এখানে ডাইনে বাঁয়ে যে দিকেই চাই, সামনে পিছনে সর্বত্র শুধু তুষার শুভ্র গিরিশৃঙ্গ।

এখানে ফেরবার গাড়ী কখন ধরতে হবে, শেষ গাড়ী কটায় ছাড়বে সব বলে দিলে। অবশ্য এ সবই মাইক্রোফোনের সাহা[...] লাউড স্পীকারে জানানো হয়েছিল। এখ[...] ট্রেনের পিছন দিকে আর একখানি ট্রা[...] জুড়ে দেওয়া হল। কারণ পথ এ[...] একেবারে খাড়াই। ট্রেনের গতিও [...] মন্থর। এসে পড়লাম য়ুঙফ্রাউ গি[...] শৃঙ্গে। ১১৩৩৩ ফুট উপরে এসে[...] চারিদিকে শুধু বিস্তীর্ণ তুষাররাশি। বরফ কোনও দিন গলে না। টুপি, কম্ফ[...] দস্তানা, শেষে ওভার কোটের উ[...] আলোয়ান জড়িয়েও শীতে কাঁপুনী ধ[...] যাচ্ছিল। হাতপা সব ঠাণ্ডা। স্টেশনে নে[...] যেন বাঁচলুম। দিব্যি কাচ আঁটা কৌ[...] মতো হীটারে গরম করা ঘর। প্রশ[...] ওয়েটিংরুম। ওয়েটিংরুমের একপাশে এক[...] দোকানে ছবি, সুভেনীর, পিকচার পো[...] কার্ড প্রভৃতি বিক্রয় হচ্ছে। ওপর তল[...] 'বার্গ হাউস্' রেস্তোরাঁ। সারা য়ুরোপে[...] মধ্যে সব চেয়ে উঁচু এই হোটে[...] লিফ্টে চড়ে যেতে হয়। ধারে বারা[...] আছে—তুষারময়ী প্রকৃতির শুভ্র রূ[...] দেখবার জন্য। উপর নিচে দুতলাতে[...] ল্যাভেটোরি, বাথরুম প্রভৃতি সুন্দর বন্দো[...]বস্ত আছে। এই বাড়ীর তলায় বরফের মা[...] আছে 'তুষার প্রাসাদ' (আইস-প্যালেস[...] এখানে বরফের সিঁড়ি, বরফের মেঝ, বরফে[...] থাম, বরফের দেওয়াল, বরফের ছাদ দেও[...] বরফের ঘরে বরফেরই সব আসবাব [...] টেবিল চেয়ার, ফুলদান, ঘড়ি, টবে গা[...] পিয়ানো, মোটর গাড়ী ইত্যাদি সব কিছ[...] বরফের। এখান থেকে একটু দূরে পাহাড়[...] আর একপাশের উঁচু মাথার উপর [...] আবহাওয়া অফিসও জিনিভা বিশ[...] বিদ্যালয়ের তৈরি মানমন্দির বা অবজার[...]টির। অবজারভেটরিতে উঠে, বরফের উপ[...] বেড়িয়ে, ছবি তুলে আমরা তিনটের ট্রে[...] ফিরে এলেম। এইটেই 'য়ুঙফ্রাউ' থেকে কে[...] বার শেষ ট্রেন!

(আগামী বারে সমাপ্য)

...বাদে প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া ...য়া হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"ঠিক্ ...র্দিষ্টকাল বলা চলে না, ছেলেদের মুখে ...র বদলে জবান ফুট্লেই আবার ...লয় খোলা হবে।"

• • •

...ই প্রসঙ্গেই আবার জানা গেল যে প্রায় ...শত ছাত্রকে হস্টেল ত্যাগের নির্দেশ ...ওয়া হইয়াছে।—"গোটা ছাত্র সমাজকে ...খা-পড়া ত্যাগের নির্দেশ দিলেই ল্যাঠা ...ে যেতো"—বলে শ্যামলাল।

• • •

...যুক্ত নেহরু সম্প্রতি তাঁর এক ভাষণে ...দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে দিল্লীতে ...টো ভাল জাদুঘর নাই।—"তা হতে পারে, ...র এ দুঃখ দিল্লী পুষিয়ে নিয়েছে ভালো ...ড়িয়াখানা দিয়ে; এদিক থেকে দিল্লীর ...ড়ি নেই"—মন্তব্য বলাবাহুল্য খুড়োর।

• • •

ভারতের পরিকল্পনাগুলি সত্যই সুন্দর ... বলিয়াছেন মিঃ ব্ল্যাক্।—"মিঃ ব্ল্যাক ...কোটিয়ার বলেন তা সত্যি, কিন্তু (অ) ...কর্মে যে শতেক বাধা"—মন্তব্য করেন ...েক সহযাত্রী।

• • •

বলিংস নামে এক ইংরেজ মহিলা নাকি বলিয়াছেন যে পুরুষের স্থান হওয়া ...ত অন্দর মহলে।—"অতঃপর মিঃ চার্চিল

...প ছেড়ে পান-দোক্তা মুখে পুরে হাঁড়ি ...তে হেঁসেলে ঢুকবেন কিনা তা জানতে ...তূহল হচ্ছে"—বলে শ্যামলাল।
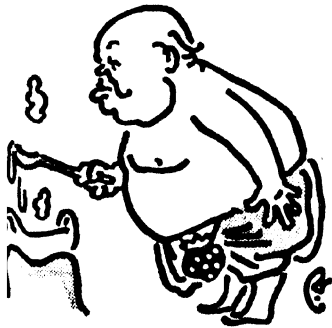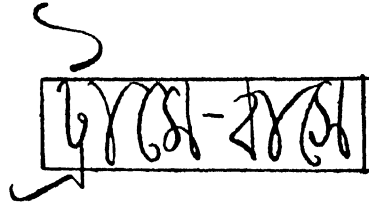
লণ্ডনে অবস্থিত ভারতের হাইকমিশনার হুইস্কি ক্রয়ের জন্য কত টাকা খরচ করিয়াছেন তার হিসাব পরীক্ষার জন্য নাকি

সরকারী মহল হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। "আমরাও শুনে খুশী হবো হাইকমিশনারের wish—কি?" বলেন বিশু খুড়ো।

• • •

শিশু সমাজে অপরাধপ্রবণতা ভয়াবহরূপে প্রকট হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আশ্চর্য হবার কিছু নেই, শিশুকে পূর্ণবয়স্ক মানুষের পিতা বলা হয় কিনা?" তাই সেপাইকা ঘোড়ার মতো বেটা-কা-বাপ তো থোড়া-কুছ হবেই"!

• • •

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে যেসব টেলিফোন কর্মীদের কাজে বহাল করা হইয়াছিল তাদের খাবার এবং চা দেওয়া হইত। স্থির করা হইয়াছে তারা এখন হইতে খাবার বা চা পাইবেন না। খুড়ো বলিলেন—"নম্বরের গুড়ে বালি দিতে যদি না চান তবে অন্তত চা-টা দিন। মন মেজাজ ভালো রাখতে চায়ের জুড়ি নেই একথা কি কর্তারা জানেন না?"

• • •

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নাকি স্বীকার করিয়াছেন যে পাকিস্তান ভারতের কাছে কত ধারে তার হিসাব তিনি জানেন না। শ্যামলাল বলিল—"না জানাই ভালো; খোদ পাকিস্তান যেখানে বলছে কার কড়ি কে ধারে সেখানে ভারতের পক্ষে যা যাবে তা যাক্ ছেড়ে বলাই ঠিক নয় কি?"

• • •

কলিকাতায় চলচ্চিত্র উৎসব সপ্তাহে চিত্রতারকাদের মধ্যে একটি ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা হইয়াছে।—"বিলাতে টেস্ট্ খেলার খেলোয়াড় বাছাই এর পরেই হবে বলে শুনলাম। Hit করার দিকে তারকারা কম যান না তবে "Leg before" তাদের বেশী। সুতরাং ভাবছি—খুড়ো বক্তব্য শেষ করতে পারিলেন না, ট্রাম ডাঁলহৌসী পৌঁছিয়া গিয়াছে। ফেরিওয়ালারা বিচিত্র ভাষায় সংবাদটি ঘোষণা করিতেছে—যাত্রীরা বিচিত্র ভাষায় গুঞ্জন করিতেছেন—সত্যই বিচিত্র!!!

• • •

শুনিলাম পাকিস্তান নাকি হেল্-সিঙ্কিতে একটি বক্সিং টিম প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছেন। করাচীতে একটি অনুশীলন প্রতিযোগিতার পর টিম মনোনয়ন হইবে এবং যথাসময়ে তাদের নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—
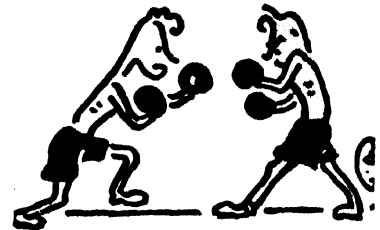
"নাম অবশ্য আমরা জানি—বাংলা আর উর্দু, তবে শেষ নির্বাচনের ফলাফল এখনো জানার বাকী!"

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার বাণী— শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। চক্রবর্তী-চ্যাটার্জী এন্ড কোং লিঃ, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এই লীলা-চরিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শত বার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তৎকালে ইহা জনসমাজের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। সতরো বৎসর পর ঠাকুরের এই দিব্যলীলা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়াতে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। ঠাকুরের লীলা-কথা স্বভাবতই মধুময়, তাহা যেমন ভাষায়, যে আকারে, যিনি যেমন ভাব অন্তরে লইয়াই লিখুন না, মাধুর্যের-হানি ঘটে না। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শাস্ত্রনিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি, ঠাকুরের কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছে। তিনি সুসাহিত্যিক, সুতরাং তাঁহার রচিত ঠাকুরের জীবনলীলা যে মধুর হইবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ঠাকুর যুগাবতারস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার দেহ প্রাকৃত দেহ নয়; সুতরাং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাঁহার বিচার করা চলে না। ভগবৎ-তত্ত্বের সমগ্র ভাবার্থ যাঁহার দিব্য-জীবনে প্রমূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, ভাষায় তাঁহার পরিচয় দেওয়া অত্যন্তই সুকঠিন। ইঁহাদের বীর্য অতুল্য এবং অতিশয়। ইঁহাদের অনুধ্যানে জড়-মনের বিচার বিলীন হইয়া যায়। এদেশের তত্ত্বদর্শী সাধকগণ বলিয়াছেন মন যখন আত্মোপলব্ধির সেই ঊর্ধ স্তরে উন্নীত হয়, তখন লীলাবতার-স্বরূপে শ্রীভগবানের অদীন লাবণ্য, তাঁহার হাসি-মাখা চোখের চাহনী এবং ভ্রূভঙ্গির ভিতর দিয়া ভূরি অনুগ্রহ মানস-রাজ্যে ফুটিয়া উঠে। সেই অবস্থাতেই এমন লীলা ভাষায় বিস্তার করিবার উপযোগী রস অন্তরে উপচিত হইয়া থাকে। সুতরাং সাহিত্যিকের আলঙ্কারিক দৃষ্টির ইহা অনেক উপরের কথা; বস্তুতঃ ঝঙ্কারটি যদি ভিতর হইতে বাজে, তবেই এমন লীলাকথা বলা সহজ। শুধু ব্যাকরণ-সম্মত অলঙ্কার সাজাইয়া এ ধরণের লীলাকে পরিস্ফুট করা যায় না। এ ক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে মনের সুনিবিড় সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন, প্রত্যুতঃ সে একটা আবিষ্টের মত অবস্থা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কথা বলিতে গেলেই বেশী কথা আসিয়া পড়ে এবং সেগুলি আমাদেরই সংস্কার হইতে উপজাত হয়, পরন্তু সত্যের সঙ্গে সেগুলির ঘেষাঘেষি মেলামিশি থাকে না। ইহার ফলে প্রকৃত রসটি উবিয়া যায় এবং সূক্ষ্ম সংবেদনের পথে অভিব্যক্তির স্বাভাবিক প্রেরণার ধারাটি ছিন্ন হইয়া পড়ে। বাস্তবিকপক্ষে এমন লীলার বিস্তার সূত্রে নিজেদের ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্য এবং দার্শনিক বিচার আরোপ করিতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। প্রত্যুত সাহিত্যসুলভ প্রাকৃতিক কবিত্বের পারিপার্শ্বিক সূত্র ধরিয়া রসের উন্মেষ সাধন করিতে গেলে

তাহাও খেলো হইয়া দাঁড়ায়। লীলার অন্তর্নিহিত ভাবটির সঙ্গে সে জিনিস খাপ খায় না। সুতরাং এমন মহৎকার্যে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে লীলানুধ্যান-সঞ্জাত অন্তরের উপলব্ধি, একান্ত শ্রদ্ধা এবং সংযমের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় সেইরূপ শ্রদ্ধা এবং সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। বাগাড়ম্বর কিংবা উচ্ছ্বাসে তিনি রসধর্মকে বিপর্যস্ত করেন নাই। তিনি সমগ্র মন চালাইয়া ঠাকুরের দিব্য-লীলা বর্ণনা করিয়াছেন এবং সবক্ষেত্রে নিজেকে সরাইয়া রাখিয়া ঠাকুরকেই আগে আনিয়া ধরিয়াছেন। নিজের দার্শনিক বিচার এবং সিদ্ধান্ত ঢুকাইয়া দিয়া তিনি লীলারস ক্ষুণ্ণ করেন নাই; অধিকন্তু ভাষাকে সাজাইবার জন্য অনাবশ্যক কৃত্রিম কারিগরীও দেখান নাই। সহজ সরল এবং স্বাভাবিক সৌষ্ঠবের অনাবিল প্রতিবেশে ঠাকুরের বাণীর ভিতর দিয়া ভাবকে তিনি রাঙ্গাইয়া তুলিয়াছেন। সে বাণী মনকে সাক্ষাৎ-সম্পর্কেই স্পর্শ করে এবং মাত্রা, স্বরে, বর্ণে ভাবকে অন্তরে নিগাঢ় করিয়া তোলে—লীলাটি আমাদের কাছে জীবন্ত হয়। এইখানেই লেখকের সৃষ্টির সার্থকতা। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই মধুর লীলা কথা সর্বত্র সমাদৃত হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর। কয়েকখানি রঞ্জিত হাফটোন চিত্রে পুস্তকখানির সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

৩৮।৫২

যে গল্পের শেষ নেই (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পরিবেষক—দি ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিঃ, ৮৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। দাম—প্রথম খণ্ড এক টাকা চার আনা; দ্বিতীয় খণ্ড দু' টাকা।

যে গল্পের শেষ নেই, সে গল্প পৃথিবীর। পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত, তার রূপ-পরিণতির এবং মানব সভ্যতার কথা এ-দুখানি বইয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে লিখিত হয়েছে।

বিষয়বস্তু, বলাই বাহুল্য, ঈষৎ দুরূহ। অথচ এমনই বিষয় যে তা না জানলেও নয়। কি করে এই পৃথিবীর জন্ম হলো, জন্মকালে তার চেহারা ছিল কেমনতরো, তারপর কেমন করে তার অবয়ব ঠান্ডা হয়ে এল ধীরে ধীরে, কবেই বা সেখানে প্রাণীর আবির্ভাব হলো, তারপর সেই আদি-প্রাণী চেহারা পালটাতে পালটাতে কেমন করে এই আজকের মানুষে এসে রূপান্তরিত হয়েছে এবং মানবসভ্যতা ও তার সমাজব্যবস্থাই বা কি করে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করলো, সে কথা কার না তা জানতে ইচ্ছে হয়?

ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। বাঙলা ভাষায় আজ পর্যন্ত এই বিষয়বস্তু নিয়ে যতো বইপত্র লেখা হয়েছে তার প্রায় সব ক'খানিরই ভাষা এমন দাঁতভাঙা এবং ভঙ্গী এমন ভীতিপ্রদ যে শিশুদের তো কথাই ওঠে না, বড়োরাও সে-সব বইয়ের কয়পাতা পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছেন বলা দুষ্কর। সে-বই বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা লিখিত। এবং পড়ে মনে হয়, বৈজ্ঞানিকদের জন্যেই লিখিত।

শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক সময়ে কিছু বিশুদ্ধ সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সাহিত্যের ক্ষমতা যে কতো ব্যাপক তা তিনি জানেন এবং এই কারণেই বর্তমান গ্রন্থরচনায় তিনি সাহিত্যসরস আঙ্গিকের আশ্রয় গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। বিষয়বস্তুর কাঠিন্যের খোলস তাতে খসে পড়েছে; সাহিত্যের যাদু-স্পর্শে বিজ্ঞানকথাও মনোহারী হয়ে উঠেছে। শুধু ছোটদেরই নয়, বড়োদেরও আমরা এ-দুখানি বই পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। তাঁরাও এখানে সমান তৃপ্তি পাবেন।

২৯৬।৫২

সপ্ত সাগর—শ্রীমতী বাণী রায়। কমলা বুক ডিপো, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৫্।

ইতিমধ্যেই শ্রীমতী বাণী রায় বাঙলা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকটি তাঁহার বিবিধ রচনার—ছোট গল্প, উপন্যাস, সমালোচনা, গীতি কবিতা, ব্যঙ্গ রচনা প্রভৃতি—একটি সংকলন, কৌতূহলী পাঠক এই একখানি সংকলন গ্রন্থের মাধ্যমে শ্রীমতী রায়ের সাহিত্য সাধনার বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের সম্যক পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার রচনায় কোথাও নারীসুলভ সংস্কার এবং ভাবাতিশয্য কোমলতার চিহ্নমাত্র নাই, মনীষার ক্ষুরধার বিশ্লেষণ শক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতা তাঁহার রচনায় সুস্পষ্ট। সাহিত্যের নানা বিভাগে তাঁহার অনায়াস পটুত্ব এবং স্বাচ্ছন্দ্য সাবলীল ভঙ্গী সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

ছোট গল্পগুলির মধ্যে 'খেলা নয়', 'ইন্দু...' এবং 'ফরাসী শিক্ষক' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতাগুচ্ছের মধ্যে প্রেমের কবিতাগুলি কাব্য-সম্পদে সমুজ্জ্বল। 'অরণ্য মর্মর', অভি... সনেটগুলি ভাবনিবিড়তায় এবং আঙ্গিকের দৃঢ়বদ্ধ সংহতিতে আশ্চর্যরূপে রসোত্তীর্ণ। উপসংহারে উপন্যাসটি অভিনব এবং লেখিকার পরিণত প্রজ্ঞার এবং বুদ্ধিদীপ্তির পরিচায়ক।

সংকলনটি সব দিক দিয়া সার্থক হইলেও পরিশেষে এইটুকু বলা বোধ করি প্রয়োজন যে, মুদ্রণ ব্যাপারে ছাপার কালীর অযথা বর্ণবৈচিত্র্য (কাল, নীল, হলদে, সবুজ, গোলাপী, লাল) বিশেষভাবে দৃষ্টিকটু এবং ছেলেমানুষী। আর গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস প্রভৃতি লেখিকার মৌলিক রচনার শুরুতেই তাঁহারই টিকাটিপ্পনী এবং বক্তব্য পাঠকের অনাবিল রসাস্বাদের পক্ষে বিশেষ অন্তরায়। যথা, কাব্য সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য: এক একটি mood বা সর্বাঙ্গীণ ভাবধারাকে প্রকাশ করা কবিতা মাত্রের ধর্ম...... কাব্যের ভাষা আবেগের ভাষা ইত্যাদি......" তাহার পরই—

"আমার আকাশে এখনো চাঁদের ছোঁয়া
একফালি চাঁদ,
পূর্ণিমার নহে স্বপ্ন, নয় মায়া ফাঁদ,
শুধু এতটুকু এই তৃতীয়ার শশী
এখনো মাথার আড়ে প্রহরাতে বসি।"

(প্রেম)

চমৎকার! কিন্তু আগে নোট পড়ে' পরে বই পড়ার মত নয় কি? মানে করে পড়ার মধ্যে রস কোথায়? ১৫০।৫১

সিন্ধবাক—মিহির সেন: মহাবীর দীপজ্যোতি প্রকাশনী, ৪৪।১, শাঁখারিতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—চার আনা।

পাতার সংখ্যা ষোল। উপন্যাসের ছকে ফেলে পাঠকদের চোখে ধুলো দেওয়ার কারসাজি নয়, সোজাসুজি ছোট গল্প বলেই স্বীকার করা, লেখক খ্যাতনামা কেউ নন, প্রতিশ্রুতিবান এই পর্যন্ত। এমন একটা প্রচেষ্টার বাণিজ্যিক সফলতা সম্বন্ধে বলতে যাওয়ার বোধ হয় কোন প্রয়োজন নেই, আর সে দায়িত্ব সমালোচকেরও না। কিন্তু তবু এ প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। বাঙলাসাহিত্যের ছোট গল্পের মান খুব দ্রুত উঁচু হয়েছে — একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। মাত্র গত দশ বছরে বাঙলাসাহিত্যে অসংখ্য প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন অনেক ছোট গল্প চোখে পড়েছে, যেগুলো প্রদেশান্তরের সাহিত্যে তো বটেই, বিশ্বসাহিত্যের ছোট গল্পের দরবারেও মোটেই বেমানান হবে না। আরও আশ্চর্যের কথা, এইসব ছোট গল্পের সবকটাই যে প্রথিতযশা গল্পকারের লেখনীনিঃসৃত এমন নয়, অপেক্ষাকৃত কম বিখ্যাত লেখকদের কাছ থেকে আশাতীত ভালো ছোট গল্পের সন্ধান মিলেছে। এ দেশে একমাত্র মাসিকপত্রের পাতা ভরানো ছাড়া ছোট গল্পের আর যে কোন সার্থকতা আছে, এ মনে করবার সুযোগ প্রায় কোন প্রকাশকই দেন না। নামী লেখকদের গল্প সঙ্কলন তাঁদেরই উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে যা-ও বা কদাচ-ভদ্রে দেখা যায়, স্বল্পখ্যাতদের বেলায় প্রকাশকমন্ডলী শুধু নিশ্চেষ্ট নন, দস্তুরমত উদাসীন। ফলে ভালো গল্পও মাসিক পত্রের পাতাতেই সমাধি লাভ করে। সেই কারণেই মহাবীর দীপজ্যোতি প্রকাশনীর এ প্রচেষ্টা সাধু সন্দেহ নেই। নামমাত্র মূল্যে ঝকঝকে ছাপায় সাহিত্য ক্ষেত্রে মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশ করার জন্য সাহিত্যামোদীদের কাছে তাঁরা চিরদিন ধন্যবাদার্হ থাকবেন। ৯।৫২

প্রাচীন কথা ও কাহিনী—শ্রীসন্ধ্যা ভাদুড়ী। দি বিহার সাহিত্য ভবন লিমিটেড, ২৫।২, মোহন বাগান রো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল এণ্ড কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা সন্ধ্যা ভাদুড়ী বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপরিচিতা নহেন। উচ্চ শ্রেণীর কবিতা এবং প্রবন্ধ-লেখিকা হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। উপনিষদ, পুরাণের কাহিনী এবং কতকগুলি ঐতিহাসিক কিম্বদন্তী লইয়া আলোচ্য পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি লেখায় পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখাগুলি কিশোর-কিশোরীদের মনে কৌতূহলের প্রবৃত্তি জাগ্রত করিবে এবং তাহাদের কল্পনা সুষ্ঠুভাবে সম্প্রসারিত করিবে। নয়খানি রিলিফ চিত্রে পুস্তকখানি সংযুক্ত হওয়াতে ইহা খুবই আকর্ষণীয় হইয়াছে। ছাপা, কাগজ সুন্দর। ৩৯।৫২

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

ছোটদের কবিতা শেখা—সুনির্মল বসু। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷৹। ৪০।৫২

নূতন ও পুরাতন—শম্বুক। ভারতেন্দু-চক্রবর্তী, ৬, ক্লার্ক স্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷৹। ৪১।৫২

The Task of Peace Making—৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন হইতে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৫্। ৪২।৫২

ডাঃ ফণিভূষণ প্রণীত—(১) **গীতি ও গাথা**, মূল্য ১৷৷৹। (২) **কি করা যাবে**—মূল্য ২৷৷৹। শ্যামবাবুর ঘাট রোড, চুঁচুড়া। ৪৩।৫২

শ্রীশ্রীসারদামঙ্গল—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য। মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷৹। ৪৫।৫২

১০

আজ নিয়ে এ বাসায় অতুলের তিন দিন তিন রাত কাটল। এক পাড়ায় হলেও পরেরই ত বাসা। কিন্তু অত সংকোচের বালাই নেই অতুলের। পর মনে করলেই পর। ভোর বেলা ঘুম ভেঙে একটা কথা মনে পড়ায় অতুলের হঠাৎ হাসি পেল. আচ্ছা ওর অবস্থায় দাদা পড়লে কেমন হত? অবশ্য পরের বাসায় এমনভাবে অরুণের কোন দিন রাত কাটাবার কথাই ওঠে না. কিন্তু তবু যদি কোন দিন কোন কারণ ঘটত কি হত তাহলে? তার সেই বাড়ীর পরিপাটি করা বিছানার শোকে ঘুম ত দূরের কথা শোয়াই হয়ে উঠত না। অতুলের সে বালাই নেই। পর মনে করলেই পর। একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে অতুলের মনে হয় সবই এক. একই আকাঠার তক্তাপোষ এবাড়ীতে ওবাড়ীতে। সাবেক কালের কেনা রং ওঠা সুতো ঝোলানো সতরঞ্চ পাতা। তাতে তক্তাপোষের সবটা ঢাকা পড়ে না কোন বাড়ীরই। সকালে চায়ের বৈঠক. তার আয়োজন যতটা আড়ম্বর তার চেয়ে তিন গুণ। দু বাড়ীতেই পাকা বাজার করিয়ের হুটপাট করে বাজারে ছোটা তারপর সাড়ে নটা একবার বাজলে হয় কে কোন দিক দিয়ে অফিসে ছুটবে দিশে পায় না। সময় ত এইটুকু, অথচ এরই মধ্যে সোরগোল কত। এ কাজ হ'ল না. সেটা পড়ে রইল. অবশ্য তাদের বাড়ীর তুলনায় এ বাড়ীতে সোরগোলটা অনেকখানি কম। চারদিকে চোখ আছে রমাদির। কাজের একটা সিজিল মিছিল আছে। টুক টাক কাজ কিছু কিছু অতুল করছে বৈকি। কাল রমাদির কাছে কে বলে গেল এর মধ্যে কণ্ট্রোলের দোকানে কাপড় আসার কথা. অতুল দুপুরে গিয়ে খবর নিয়ে এসেছে আসেনি এখনও. কিন্তু এলে আর পড়তে পাবে না। না হয় রোজই গিয়ে একবার করে খবর নিয়ে এসে দেবে। সে ভাবনা কাউকে ভাবতে হবে না।

হাত মুখ ধুয়ে এসে দেয়ালে ঝোলান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অতুল চুলটা ঠিক করে নিল। ছোট আয়না তা আবার নীচুতে টাঙান. কুঁজো হয়ে না দাঁড়ালে মুখ দেখা যায় না। গোবিন্দর ওজনে টাঙান. গোবিন্দটা বেশ একটু বেঁটে। ভাই-বোন সবাই ওরা একটু বেঁটে ধরণের এমন কি রমাদিও। কিন্তু আশ্চর্য হঠাৎ দেখলে কিন্তু তা মনে হয় না। মাথায় চিরুণী চালাতে চালাতে অতুল আড় চোখে চেয়ে দেখল গোবিন্দ এখনও ঘুমুচ্ছে। বেশ ভারি নিঃশ্বাস পড়ছে ওর। চিরুণি দিয়েই অতুল ওকে একটা খোঁচা মারল।

'নে ওঠ এবার, কত ঘুমুবি ?'

খোঁচা খেয়ে ঘুম চটে গেল গোবিন্দর। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'তুই দেখি বাবুর ওপর দিয়ে গেলি। সাতটাও ত বাজেনি বোধ হয়, এই ব্রাহ্মমুহূর্তে টেনে তুলে গঙ্গাস্নান করিয়ে আনার মতলবে আছিস নাকি ?'

'গঙ্গাজল নয় গরম জল যে ওদিকে ঠাণ্ডা হয়ে গেল' অতুল রান্নাঘরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

চা তৈরী করে রমা একবার ওদের ডেকে গেছে। অতুলের ইচ্ছা ছিল ওদের দুজনের চা এ ঘরে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু গোবিন্দ উঠতে দেরী করেই সব মাটি করল। অতুলকে রান্নাঘরেই যেতে হল। একটু উঁচু একটা মোড়ার ওপর বসে কেশববাবু চা খাচ্ছিলেন অতুল ঘরে ঢুকতেই মুখের কাপ না নামিয়ে বললেন, 'এস অতুল এস'।

মুখে অতুলকে অভ্যর্থনা করলেন বটে কিন্তু তাঁর চোখ রয়েছে ছোট মেয়ে ... মুড়ির বাটির দিকে। কারো বাটি ... একটা মুড়ি মাটিতে পড়ছে কি ...

উঠলেন। কি জানি কেন লোকটিকে অতুলের মোটেই ভাল লাগে না। অতি সামান্য খ‍ুঁটি-নাটি ব্যাপার নিয়ে অনর্থক চেঁচামেচি করেন। এদিকে দেখি সব ব্যবস্থাই রমাদির হাতে. অথচ মাঝখান থেকে কুট করে কি একটু বলেন আর অমনি গোলমাল লেগে যায়। লাগান অবশ্য মাসীমা, থামায় রমাদি। ঝগড়াতে তার ব‍ুঝি জ‍ুড়ি নেই। কোথায় লাগে অর‍ুণের গলা, বাবা মার মধ্যে কথা কাটাকাটি যখন হয় তখন অর‍ুণও ত থামায়। কিন্তু রমাদির গলার তার আলাদা। চায়ের পেয়ালা অতুল হাতের তেলোর ওপর তুলে নিল।

একটু পরে কেশববাবুই ফের কথা তুললেন, 'শ‍ুনলাম কাল নাকি তোমাদের মণীন্দ্র এসেছিল তোমার খবর নিতে, গেলেই ত পারতে। বাপ মার ওপর বেশী দিন রাগ করা কি ভাল?'

অতুল চট করে কোন জবাব দিল না। একবার রমার দিকে আবার মাসীমার দিকে চেয়ে দেখল শ‍ুধু। জবাব দিলেন মাসীমা, 'যাবেই বা কেন? মণীন্দ্রকে পাঠিয়েছে, কেন আর লোক ছিল না বাড়ীতে? নাকি অন্য কেউ এলে মান যেত?'

কেশববাবু বললেন, 'তুমি চুপ কর, মান-অপমানের কথা হচ্ছে না। বাড়ীর ছেলে বাড়ী যাবে তার আবার মান অপমান কি? তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি।'

অতুল হেসে বলল, 'আপনি থাম‍ুন মাসীমা, যেই আস‍ুক বাড়ী আমি যেতাম না। বাড়ী আমি যাবও না।'

'তবে কোথায় যাবে ঠিক করেছ শ‍ুনি।' রমাও হেসেই বলল, কিন্তু ঢংটা অতুলের ভাল লাগল না।

অতুল যখনই গম্ভীরভাবে কোন কথা বলতে যায়, রমা তা হেসে উড়িয়ে দেয়। ওর কথা যেন কথাই নয়। রমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে অতুল বলল, 'গেলেই হল এক জায়গায়'।

'না হল না, তার চেয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত বাড়ীই যাও গিয়ে আজ।'

অতুল গ‍ুম হয়ে রইল।

কেশববাবু একবার ওর দিকে তাকালেন তারপর বললেন, 'আরে আজ না যায় নাই গেল, এও তো নিজের বাড়ীর মত। থাক না দিন কতক খ‍ুসী। তবে হ্যাঁ কাজকর্ম একটা দেখতে হবে বই কি।' লোকটার কথাই এমনি উল্টো-পাল্টা অতুল ভাবল। এককথা বলে পরক্ষণেই সেটা সামলানর চেষ্টা। অতুলের আর সহ্য হল না। 'দিন না একটা জ‍ুটিয়ে। আপনারও ত কত অফিস টফিসে জানাশ‍ুনা আছে।

কেশববাব‍ু ম‍ুখ নীচু করে হাসলেন। চেষ্টা চরিত্র করলে কোথাও কি আর দেয়া যায় না। কিন্তু তারপর সে ঝক্কি সামলাবে কে? যা মেজাজ কোন দিন কাকে দ‍ু ঘা বসিয়ে দেবে তার ঠিক কি? ম‍ুখে বললেন, 'দেব বই কি, খোঁজ পেলে কি আর এমন বসে থাকতে হবে? আমার কাছে গোবিন্দও যা তুমিও তাই।'

এতদিন অতুলেরও সেই ধারণা ছিল। কিন্তু দ‍ুপ‍ুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর অতুলের মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগল। একটু আগে বাপের পিঠে পিঠে গোবিন্দও অফিসে বেরিয়ে গেছে। রমার রান্নাঘরের কাজ এখনও শেষ হয়নি, থালা-বাসন নাড়ার শব্দ আসছে। তক্তাপোষের ওপর উঠে বসে অতুল একটা বিড়ি ধরাল। তবে কি ওর সকাল বেলার ভাবনা ভুল? মেসোমশায় তা হলে খরচের দিকটা ভাবছে না ত? ভাবলেও ত দোষ দেয়া যায় না। সে বাজার নেই বোঝার ওপর শাকের আটিও আজকাল সয় না কোন সংসারে।

আঁচলে হাত ম‍ুছতে ম‍ুছতে রমা এসে সামনে দাঁড়াল। এতক্ষণে ওর খাওয়া শেষ হল, যে কাপড়ের আঁচলে হাত ম‍ুছছে রমা তার পাড়ের রং উঠে গেছে। কাপড়টা বেশ প‍ুরান হয়েছে বোঝা যায়। অতুল ওর হাতের দিকে চেয়ে রইল। নাঃ সংসারের পিছনে খাট‍ুনি আছে রমাদির। অতুল সঙ্গে

সঙ্গে ওঠে দাঁড়াল। আবার কোন ফরমায়েস করে বসবে কে জানে। কাজ করে দেয়, করে দিতে পারে বলে কি কেবল ফুট-ফরমাস খাটা যায়, না তা খাটতে ভাল লাগে? মেয়েলি কাজ অতুলের আসে না। গলির মুখে বেরিয়েই আবার পকেটে হাত পড়ল, বিড়ি নেই। বিড়ির আর দোষ কি? দু' আনার বিড়ি আর কতক্ষণ থাকে পকেটে। অতুলের ঐ আরেক রোগ, মন মেজাজ বিগড়ে গেলে ঝোঁক পড়ে বিড়ির ওপর। তখন হয়ত পাঁচ মিনিটেই দুটো চলল। মোড়েই গোলক দাসের বিড়ির দোকান। চেনা দোকানদার বিড়ি বাকিতেই কেনে। হিসেব সে-ই রাখে। ওর নিজের রাখতে হয় না। বেশ কয়েক আনা জমলে দু'চার আনা দিলেই আবার চুপ করে থাকে কিছুদিন।

গোলোকের দোকানে এসে অতুল বিড়ি চাইল। 'গোলোকদা বিড়ি দাও চার পয়সার।'

বিড়ি দিল গোলোক, বলল, 'এই চার পয়সা নিয়ে কিন্তু টাকা পুরল।'

ব্যাটা যেন হিসেব কষেই রেখেছে।

'পুরল তো কি হয়েছে। নিও কিন্তু দু' একদিন বাদে।'

কিন্তু ধমকে আজ আর দমল না গোলোক, বলল, 'বাদে বাদে করেই ত দু' হপ্তা চালালে; তবু যদি আগের ছ' আনা পড়ে না থাকত।'

অতুল জবাব দিল না। এর জবাব তো মুখে নয়, হাতে দিতে হয়। ওর দোকানের দড়ি থেকে অতুলের আর বিড়ি ধরানোর প্রবৃত্তি হল না। আরেকটু এগোতেই আমহার্স্ট স্ট্রীটে গিয়ে পড়ল। সামনের দোকান থেকে বাঁ হাতে দড়ি তুলতেই সরিক দাঁড়াল আরেকজন, মাথায় অতুলের চেয়ে খাটই হবে। বয়সও অনেক কম। রেডি মেড ফ্রক, প্যান্ট, ইজেরের দোকান নিয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোকরাকে অতুল চিনতে পারল না। বোধ হয় নতুন এসেছে। কথায় কথায় আলাপ করল ওর সাথে। এ ব্যবসা মন্দ না, সম্বল বললে বিশেষ কিছুই নেই। তবু করে তো খাচ্ছে! দমদমে ফুরণ করা দর্জি আছে। বড়বাজার থেকে থান যায় সেখানে; আর রেডি মেড হাফ প্যান্ট, ইজের তৈরী হয়ে আসে। থান পৌঁছে দিয়ে তৈরী মাল নিয়ে আসার লোক অবশ্য আলাদা।

অতুল বলল, 'সে তো বুঝলাম কিন্তু কাপড় কেনার তো টাকা চাই।'

ছেলেটি বলল, 'দু' একটা কিস্তি চালিয়ে নিতে পারলে তারপর বাকিও পাবেন। শেষে ত মাছের তেলে মাছ ভাজা।'

'কিন্তু রেডিমেড কটাই বা বিক্রী হবে'

'কি যে বলেন,' ছেলেটি হেসে বলল, 'ছাট কাট যদি ভাল হয় দোকানে টেনে নেবে না আপনার মাল?'

ছাটকাট ভালই হবে, হ্যাঁ অনেক পাকা দর্জির চেয়েই ভাল হবে। অতুল ভাবল, রমার হাতের কাট সে দেখেছে। ওদের সব ফ্রক প্যান্ট কাটে রমাদি। অতুল মনে মনে প্লান ঠিক করে ফেলল। তাই করবে সে। চাকরীর চেষ্টা তার দ্বারা হবে না। সুরেনের সেদিনকার ব্যবহারের কথা অতুলের মনে পড়ল। ঐ তো চাকরী তার ডাঁট দেখলে গায়ে জ্বালা ধরে। এতক্ষণে অতুলের মনটা যেন বেশ হাল্কা হয়ে উঠল। কাছে পিঠের দু' একজন বন্ধুর খোঁজ খবর নিয়ে বিকেল হওয়ার আগেই অতুল বাসায় ফিরে এল। দোর খুলে দিয়ে রমা আবার ওপরে গিয়ে শোয়ার আয়োজন করল। মনে হল একটু আগেও সে শুয়েই ছিল। পিছনে পিছনে অতুলও উপরে উঠে এসেছে। দোরের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে অতুল বলল, 'ঠিক করে এলাম।'

রমা ফিরে তাকাল, বলল, 'কি চাকরী নাকি?'

'না তার চেয়ে ঢের ভাল জিনিস।'

জিনিসটা কি শুনিই না আগে।

'কিন্তু তাতে তোমাকে চাই' অতুল হেসে বলল,

'আমাকে?' ভ্রু কুঁচকে রমা জিজ্ঞাসা করল।

অতুল তার প্লান সমস্ত খুলে বলল। রমার বিছানার শিয়রের দিকে ওদের হাতে চালানো সেলাইর কলটা ঢাকনি মোড়া রয়েছে। শীগগীর কোন কিছু করাও হয়নি ওতে হাতও পড়েনি। সেদিকে চেয়ে রমা বলল, 'হ্যাঁ এখন বসে বসে তোমার অর্ডারে প্যান্ট সেলাই করি। আর ত কোন কাজ নেই।'

অতুল বলল, 'আরম্ভ করেই দেখ না, দেখবে এ কাজ তোমার ঐ পাঠ টাটের চেয়ে খারাপ নয়।'

রমা হেসে বলল, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে, এক্ষুণি তো আর কিছু হচ্ছে না। যাও নীচে যাও। একটু ঘুমুতে দাও দেখি।'

'যাচ্ছি, কিন্তু আমার কথাটা ভেবে দেখ' বলে অতুল আর দাঁড়াল না। (ক্রমশ)

মিশর —

মিশরে আর একবার মন্ত্রিসভা বদল হোল। ঠিক কী কারণে আলি মেহের পাশা পদত্যাগ করলেন, সেটা এখনও সুস্পষ্ট নয়, তবে নাগিব হিলালি পাশা, যিনি নূতন প্রধান মন্ত্রী হলেন তাঁর সঙ্গে কারবার করতে ইংরেজদের বোধহয় আরো সুবিধা হবে। ইংরেজদের সঙ্গে আপোষ আলোচনা করার কালে মিশরের পার্লামেণ্ট বন্ধ রাখা হবে বলে মেহের পাশা ঘোষণা করেন। এই সিদ্ধান্ত ইংজেরদের ইঙ্গিত অনুসারেই হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। পার্লামেণ্টে ওয়াফদ্-ই দলে ভারী এবং যদিও ওয়াফদ্ দলপতিরা কাইরোর দাঙ্গার পড়ে ভয় খেয়ে রাজা ও ইংরেজ-ঘেঁষাদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন, কিন্তু ওয়াফ্‌দ্‌এর উপর ইংরেজের বিশ্বাস নেই এবং ওয়াফ্‌দ্‌এর ভয় খাওয়া ভাবটা ক্রমশ কেটে আসছিল। এ অবস্থায় পার্লামেণ্ট যদি খোলা থাকে, তবে ওয়াফ্‌দ্‌এর সাহস আরো তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে এবং ইংরেজদের বাঞ্ছিত রকম আপোষ-আলোচনার গতি হয়ত [illegible] হবে। ওয়াফ্‌দ্‌এর মুখ বন্ধ করে [illegible] হলে পার্লামেণ্ট বন্ধ করে রাখা দরকার। আলি মেহের পাশা কিন্তু পরে পার্লামেণ্ট বন্ধ করে রাখতে সিদ্ধান্ত [illegible] চেয়েছিলেন। সেইজন্যই তাঁর [illegible] গেল কি না বুঝা যাচ্ছে না। গত [illegible] মিশর পার্লামেণ্টের সঙ্গে বৃটিশ [illegible] আলোচনা আরম্ভ হবার কথা [illegible] কিন্তু ঠিক তার পূর্বক্ষণে তিনি জানান [illegible] সর্দি হয়েছে বলে তিনি আসতে [illegible] না। পার্লামেণ্ট বন্ধ করার প্রশ্ন [illegible] ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যদান সম্পর্কিত [illegible] বিলের সহিত জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল [illegible] কিন্তু পার্লামেণ্ট বন্ধ করার সিদ্ধান্ত [illegible] করার কথা হওয়ামাত্র বৃটিশ রাজদূত [illegible] রালফ্ স্টিভেনসনের সর্দি হোল, [illegible] পরেই মেহের পাশা পদত্যাগ করলেন [illegible] হিলালি পাশার নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই [illegible] মাসের জন্য পার্লামেণ্ট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা—এই ঘটনাপরম্পরা থেকে [illegible] মনে হয় যে, মিশরের রাজশক্তি আবার [illegible] ইঙ্গিত অনুসারে চালিত হতে [illegible] করেছে। নূতন প্রধান মন্ত্রী অবশ্য [illegible] করেছেন যে, তাঁর গভর্নমেণ্টের [illegible] হবে—শাসনব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি [illegible] করা, মিশর থেকে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণ এবং মিশর ও সুদানের ঐক্য সম্পাদন। আলি মেহের পাশার গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য বর্ণনাও অনুরূপ ছিল। কিন্তু উদ্দেশ্যবর্ণনায় কিছু আসে যায় না। ইংরেজরাও এগুলিকে আলোচনার "উদ্দেশ্য" বলে মুখে মেনে নিতে পারে। যে চুক্তি ভাঙ্গা নিয়ে বর্তমান বিবাদের শুরু, ইংরেজরা বলতে পারে তারও উদ্দেশ্য ছিল মিশর থেকে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের কার্যক্রম ঠিক করা। সুতরাং এই ধরণের উদ্দেশ্যবর্ণনার কোনো অর্থ নেই, এর দ্বারা কেবল সাধারণ লোককে ধোকা দেয়া যেতে পারে। আসলে মিশরের বর্তমান শাসক শ্রেণী ইতিমধ্যেই ইংরেজের কাছে হার মেনে নিয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবিত মধ্যপ্রাচ্য সামরিক কমাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হতে মিশর রাজী হয়েছে। সেই ভিত্তির উপরে ইঙ্গ-মিশর সম্বন্ধের নব রূপদান করাই হচ্ছে আপোষ-আলোচনার আসল উদ্দেশ্য। ফলে মিশরে বিদেশী শক্তির প্রভাব বাড়বে বই কমবে না, অদূর ভবিষ্যতে বিদেশী সৈন্য মিশরভূমি থেকে সব চলে যাবে সে সম্ভাবনাও নেই। বিদেশী সৈন্যের বর্তমান অধিকারের নাম এবং কিছুটা রূপেরও অদলবদল হতে পারে, কিন্তু আসল বস্তুর পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। তবে এর পর বৃটিশ প্রভাবের সঙ্গে মার্কিন প্রভাবও যুক্ত হবে। কেবল মুশকিল এই যে, যে আপোষ হবে সেটাতে জনসাধারণ খুশী হবে এ ভরসা অল্প, কারণ জনসাধারণের ধারণা হবে যে, শাসকশ্রেণী তাদের বঞ্চনা করেছে। এই অবস্থায় ওয়াফ্‌দ্ ধীরে ধীরে জাতির বিশ্বাস ও নেতৃত্ব আবার ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করবে, কিন্তু সে কাজ সহজ হবে না।

সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতি

কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির আলোচনার সংবাদ আবার একটু বেশী রকম বেসুরো লাগছে। দুই পক্ষই যেন হঠাৎ গরম হয়ে উঠেছে। মার্কিন সেনাপতিরা বলছেন যে, সামরিক যে সুবিধা তাঁদের পূর্বে ছিল, তা এখন আর নেই, বরঞ্চ কম্যুনিস্ট পক্ষ ইতিমধ্যে তাদের নিজের দিকটা বেশ করে গুছিয়ে নিয়েছে—এখন আর ভালো কথায় কাজ হবার সম্ভাবনা নেই। একথার তাৎপর্য কী বলা কঠিন। আবার কি পুরোমাত্রায় যুদ্ধ আরম্ভ হবার উপক্রম হয়েছে? এবং সে যুদ্ধ কি কোরিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে? রকম সকম দেখে তো সেরূপ মনে হয় না। সম্প্রতি ফরমোজায় চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে মার্কিন সামরিক বড়কর্তা কয়েকজনের পরামর্শের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ফরমোজা থেকে চিয়াং কাইশেকের দল কিছুদিন থেকে ঘোষণা করছে যে, অদূর ভবিষ্যতে তারা চীনভূমি আক্রমণ করবে। অন্যপক্ষে পিকিং রেডিও থেকে বলা হচ্ছে যে, ফরমোজার পরিত্রাণের আর বেশি বিলম্ব নেই। পিকিং যদি সত্যই ফরমোজা দখল করার আয়োজন করে থাকে, তবে আমেরিকা আগেভাগে চিয়াং কাইশেককে দিয়ে চীনভূমি আক্রমণ করবার জন্য চেষ্টিত হবে সন্দেহ নেই। বর্তমান মার্কিন নৌবহর ফরমোজা ও চীনের মধ্যে রয়েছে। যদি পিকিং ফরমোজা আক্রমণ করতে যায়, তবে তার সঙ্গে মার্কিন নৌবহরের সংঘর্ষ হবে, যদি না অবশ্য তার পূর্বে আমেরিকা তার নৌবহর সরিয়ে নেয়। শেষোক্ত সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং পিকিং সরকার ফরমোজার দিকে অগ্রসর হলে চীনের সহিত ব্যাপক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এরূপ যুদ্ধ আমেরিকা বর্তমানে কতখানি চায় এবং কতখানি চায় না বলা মুশকিল। ফরমোজা আক্রমণ সম্বন্ধে পিকিং এবং চীন আক্রমণ সম্বন্ধে চিয়াং কাইশেকের গর্জনই বা কতকখানি সত্য এবং কতখানি ধাপ্পা সেটাও নিশ্চিত বুঝা মুশকিল। ইন্দো-চীনে ফরাসীদের সম্প্রতি বেশ একটা বড়ো রকমের হার হয়েছে। কোরিয়ায় শান্তি স্থাপিত হলে চীনাদের পক্ষে সেদিকে অনেকটা হাল্কা হয়ে ভিয়েৎমিনকে সাহায্য করার সুবিধা হবে—এই জন্যেও আবার কোরিয়ায় শান্তি স্থাপন করতে একদল ভয় পায়, কারণ তাহলে যে ইন্দো-চীন কম্যুনিস্টদের হাতে পড়ে সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। ওদিকে ইন্দো-চীনে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে ফ্রান্স নিজে দেউলিয়া হবার জোগাড়। এ বছরে ফ্রান্সের সামরিক ব্যয়ের বরাদ্দ হচ্ছে মোট ৩২৩৫ কোটি টাকা, তার মধ্যে ইন্দো-চীনের যুদ্ধের জন্য ধরা হয়েছে প্রায় ২০০০ কোটি। আমেরিকার কাছ থেকে ফ্রান্স ২৬৩ কোটি টাকার সাহায্য পাবে—বাকীটা নিজেকেই জোগাতে হবে। ডলার যত গর্জে তত বর্ষে না। ৩।৩।৫২

আত্মনির্ভরতা-লাভের পথে ভারতের অগ্রগতি

গত ২রা মার্চ সিন্দ্রি সারোৎপাদন কারখানার উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু 'লিভার' টিপিয়া 'নিরাপত্তাজ্ঞাপক' সংকেত করিলে কারখানায় উৎপন্ন 'এমোনিয়াম সালফেট' বহন করিয়া প্রথম ট্রেনটি যাত্রা করিতেছে।
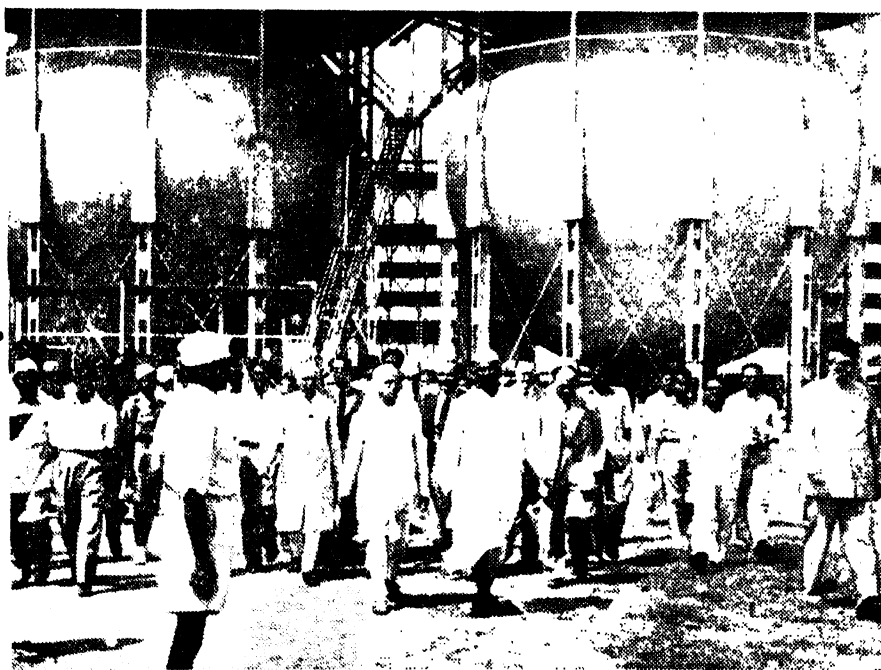
শ্রীনেহরু সিন্দ্রি সারোৎপাদন কারখানা পরিদর্শন করিতেছেন।

ভারত সরকারের পূর্ত, বিদ্যুৎশক্তি এবং সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী এন ভি গ্যাডগিল সিন্ধ্রি কারখানার উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুকে স্বাগত জানাইয়া অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন।

শেখ আবদুল্লাকে লইয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু সিন্ধ্রি কারখানার কলকব্জা পরিদর্শন করিতেছেন
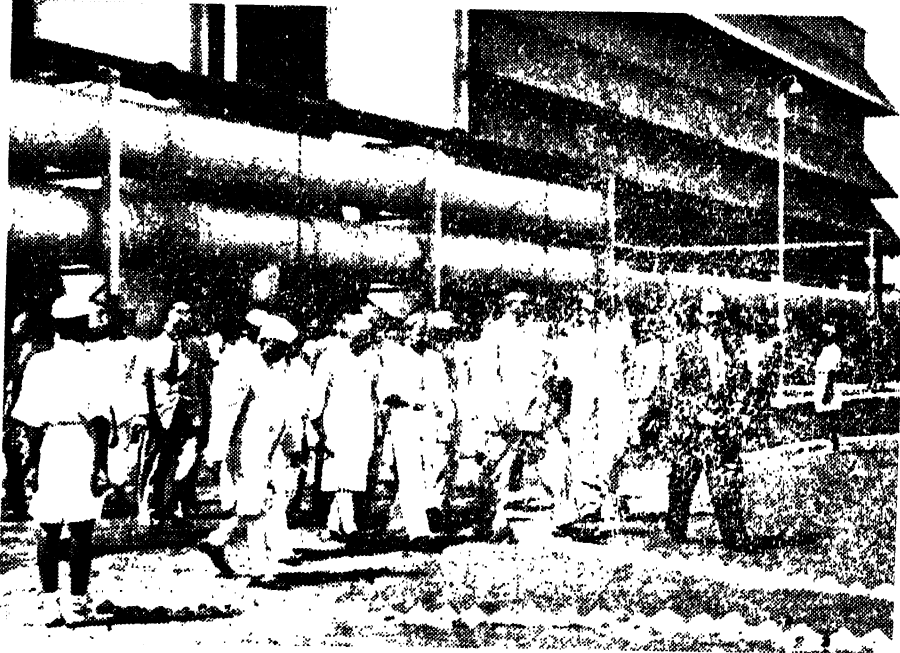
সিন্ধ্রি সারোৎপাদন কারখানা পরিদর্শনকালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অন্যান্যদের সহিত 'গ্যাস' প্রস্তুত করিবার যন্ত্রাগারটি দেখিতেছেন।

চলচ্চিত্র মেলার পর যোগবিয়োগ

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে বেশ আড়ম্বরের সঙ্গেই ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা কলকাতায় এক সপ্তাহ থাকবার পর উদ্‌যাপিত হয়ে গেলো। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনাই শুধু নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যেও চলচ্চিত্রের ব্যাপার নিয়ে এমন জমকালো আন্তর্জাতিক জমায়েত আর কোথাও হয়নি কখনো।

পৃথিবীর মুখ্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তেইশটি এই মেলায় যোগদান করে এবং ছবি দেখানো হয় ছাব্বিশটি বিভিন্ন ভাষায়। একই সময়ে একই সহরে এতো ভাষার এতো জাতির, এতো ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ছবির প্রদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে হয়নি এর আগে।

মেলাতে পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবির সংখ্যা ছিলো পঞ্চাশখানি এবং ছোট ছবি ছিলো প্রায় শতখানেক। বড়ো ছবিগুলি দেখাবার জন্যে উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার দশটি চিত্রগৃহ নির্বাচন করা হয়। ছোট ছবিও ঐ সঙ্গে দেখানো হয় দু' একখানি করে, তবে বেশীর ভাগ ছোট ছবি দেখানো হয় ইডেন গার্ডেনসে খোলা-ময়দান প্রদর্শনীর ভিতরে। মেলার ব্যাপার দেখে বোঝা গেলো, যেসব চিত্রগৃহ মেলার ছবি দেখানোয় বঞ্চিত হয়েছেন বা মেলা সম্পর্কে আগে কোন ধারণা করতে অক্ষম ছিলেন বলে মেলার ছবি দেখাতে কোন উৎসাহ পাননি, তাদের এখন নিশ্চয়ই আফসোস করতে হচ্ছে। তার কারণ কলকাতার লোকের মধ্যে যে উদ্দীপনা ও উৎসাহ দেখা গেলো, তারও কোন তুলনা পাওয়া যায় না। অনেকে দিনে তিনখানি করেও ছবি দেখেছেন; ছবি দেখার জন্যে কাজকর্মে কামাইও দিয়েছেন অনেকে, টিকিটের জন্যে কদিন আগে থেকে দৌড়াদৌড়ি করেছেন। ছবি দেখার জন্যে লোকের ঝোঁক যে কি প্রচণ্ড হতে পারে, তার প্রমাণ বহু চিত্রগৃহে ভোর চারটে থেকে টিকিটের জন্যে লোককে আসতে দেখা গিয়েছে, একটি চিত্রগৃহ দর্শকদের সামলাতে না পেরে রাত দুটোর সময় একটি বিশেষ প্রদর্শনী দিতে বাধ্য হয় এবং সে প্রদর্শনীতেও দর্শক উপচে পড়েছিলো।

ছবি দেখানোর ব্যবস্থা কিন্তু সন্তোষজনক হয়নি মোটেই। ছবিগুলি এসেছিলো প্রধানতঃ চলচ্চিত্রের কর্মী কলাকুশলী শিল্পী, পরিচালক, প্রযোজক ও ব্যবসায়ীদের জন্যে। কিন্তু কার্যতঃ তাদের খুব কম জনই কয়েকখানি মাত্র ছবি দেখে উঠতে পেরেছেন। এদের মধ্যে ছবি দেখার উৎসাহ যে ছিলো না তা নয়, এদের ছবি দেখাবার তেমন ব্যবস্থাই করে দেওয়া হয়নি। মেলাটি উদ্বোধিত হবার পরদিন আঞ্চলিক উদ্যোগ কমিটি সাংবাদিক, সমালোচক, কলাকুশলী ও শিল্পীদের দেখাবার জন্যে প্রতিদিন সকালে একটি চিত্রগৃহে একখানি ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু এসব প্রদর্শনীর ছবির নির্বাচনটা প্রথমতঃ এমন হলো না যাতে সব দেশেরই কিছু কিছু কী

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিবসে রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিকট ভাষণ দিতেছেন
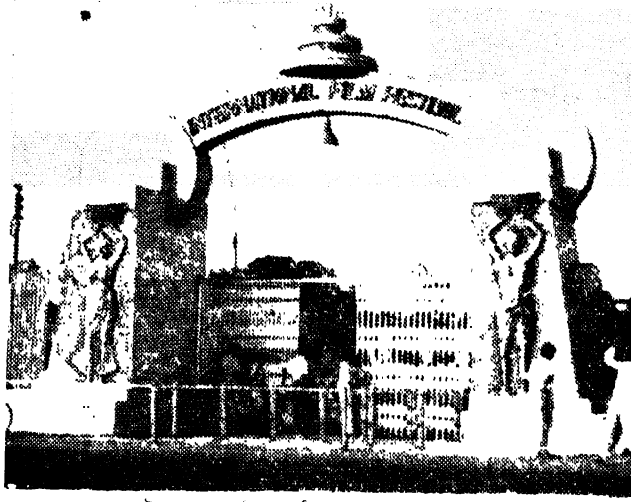
ইডেন গার্ডেনে চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধান তোরণ

আভাস পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ প্রবেশপত্রও দেখা গেলো এমনভাবে বিতরণ করা হয়েছে, যাতে দর্শকদের মধ্যে বেশীর ভাগই হয়ে দাঁড়ালো অকলাকুশলী। ব্যবসাদারদের মধ্যে তো বলতে গেলে কাউকেই দেখা গেলো না একখানিও ছবি দেখতে। অর্থাৎ এতো করে যে জন্যে ছবি আনা হলো, সেসব উদ্দেশ্য সার্থক হবার বিশেষ সুযোগ লাভ করলে না।

ছবি দেখানোর ব্যাপারে তলে তলে বেশ কতকগুলো ব্যাপার লক্ষ্য করা গেলো। কোন কোন দেশ এখানকার লোককে তাদের ছবিগুলো দেখবার জন্যে বেশ ব্যাপক প্রপাগাণ্ডার আশ্রয় গ্রহণ করে। ছবি আসবার আগে থেকেই কানাকানি প্রচারের সাহায্যে বিশেষ কোন কোন ছবির ওপরে লোকের অত্যন্ত তীব্র ঝোঁক সৃষ্টি করে তোলার ফলে এমন অবস্থা এনে ফেলা হয় যে, ঐ ছবিগুলি দেখাবার জন্য চিত্রগৃহগুলিকে বাধ্য হয়ে বেশী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে রাত দুটো তিনটের সময়ে পর্যন্ত অতিরিক্ত প্রদর্শনী চালাতে হয়। বৃটিশ ও আমেরিকান ছবিগুলি স্বাভাবিকভাবেই অদূর ভবিষ্যতেই কোন না কোন দিন আসবেই বলে ওছবিগুলির দিকে লোকে ঝোঁকেনি তেমনি। তবে সাধারণভাবে সিনেমাতে যাবার একটা অভূতপূর্ব 'চার' সহরময় লোকেদের মধ্যে কদিন দেখতে পাওয়া গেলো। ছবি দেখার এমন ব্যাপক উৎসাহ আর কখনও দেখা যায়নি।

চলচ্চিত্রের ওপরে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আরও নানাবিধ ব্যবস্থা করা হয়। বহু প্রদর্শক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তাদের চিত্রগৃহ আলোকমালায় সজ্জিত করেন। ময়দানে দুদিন ধরে, একদিন দৌড়-ঝাঁপ এবং আর একদিন ক্রিকেট খেলার আয়োজন করে চলচ্চিত্র সংশিলষ্ট ব্যক্তিদের ওপরে সাধারণ লোকের হুঁশ জাগিয়ে তোলা হয়। ইডেন গার্ডেনসে বেঙ্গল মোসান পিকচার্স এসোসিয়েশন এই উপলক্ষ্যে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, সামগ্রী ও প্রচার দ্রষ্টব্য নিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রদর্শনীর ভিতর একটা ভালো জিনিস হচ্ছে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নৃত্য, সংগীতাদির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আর দেশ-বিদেশের ছোট ছবিগুলির প্রদর্শন।

বিদেশ থেকে যেসব প্রতিনিধি মেলায় যোগদান করেন, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লেগে গিয়েছিলো এদেশকে প্রশংসা করা নিয়ে। তাদের কথাবার্তায় তারা এদেশ ও এদেশের লোকজনকে তো বটেই, সেই সঙ্গে এদেশের চলচ্চিত্রেরও প্রভূত তারিফ করেন।

প্রমোদের দিক থেকে লোকের মধ্যে এমন সাড়া আর কখনও দেখা যায়নি এবং অনেক দিনের অনেক রকমের ত্রুটিবিচ্যুতি ও গাফিলতী সত্ত্বেও সপ্তাহব্যাপী উৎসবটা সত্যিই চলচ্চিত্র শিল্পের প্রচারে সার্থক হয়েছে বলে স্বীকার করা যায়। যারা এর আগে বম্বে, মাদ্রাজ ও দিল্লীর অনুষ্ঠান দেখে এসেছেন, তারা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেই জানিয়েছেন যে, কলকাতার চলচ্চিত্র উৎসবে যে সাড়া তারা দেখেছেন, তা অন্যসব জায়গাকেই ছাপিয়ে গিয়েছে।

বাংলাগতপ্রাণ এরিক এলিয়ট

চারুদর্শী

বিদ্যাসাগর আবরণে বাঙালী ছিলেন বটে, কিন্তু আচরণে দুঁদে জনবুল। এবার জনবুলের দেশের এক শিল্পীকে দেখলাম। যিনি নিজেকে বাঙালী বলতে পারলে গর্ববোধ করেন। ব্যক্তিটি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত এরিক এলিয়ট। সম্প্রতি ইনি তাঁর নাট্যসম্প্রদায় নিয়ে কলকাতায় এসেছেন। আর নিউ এম্পায়ার মঞ্চে গত ১লা মার্চ থেকে অভিনয় করতে শুরু করেছেন। সেক্সপীয়রের তিনটি নাটক—মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস্, ওথেলো আর হ্যামলেট এবং বার্নার্ড শ'এর ক্যাপ্টেন ব্র্যাসবাউণ্ডস্ কনভার্সন এর অভিনয়ই যথাক্রমে প্রদর্শন করবেন। এছাড়া সোফোক্লিসের নাটকও অভিনয় করবার কথা ছিল, কিন্তু কেন জানিনে তাঁর বিষয়সূচী থেকে সোফোক্লিসকে তালাক দিয়েছেন।

শ্রীযুক্ত এলিয়ট তন্ময়চিত্তে বললেন, বাঙলার দর্শকদের সামনে সেক্সপীয়রকে পরিবেশন করা ছিল তাঁর জীবনের মস্ত অভিলাষ। এবারে তা চরিতার্থ করতে পেরে তিনি ধন্য হয়েছেন। কথাটা সাংবাদিক বৈঠকে প্রথম বলেছেন, তারপর প্রথম

নিউ এম্পায়ারে সাংবাদিকদের বৈঠকে মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান মিঃ এরিক এলিয়ট।

অভিনয় শেষে সমাগত দর্শকদের উদ্দেশে গদগদভাবে তার পুনরাবৃত্তি করেছেন।

এই উত্তর চল্লিশ ভাবাবিভোর, প্রতিভা-উজ্জ্বল অভিনেতাটির সঙ্গে প্রায় দুঘণ্টা-কাল নানাবিষয়ে আলোচনা হল। আলোচনার মধ্যে যতবার বাঙলা দেশের কথা উঠেছে, যেখানেই বাঙালীদের সম্পর্ক এসেছে, ততবারই তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন।

১৯২৭ সালের কথা। অস্ট্রেলিয়া থেকে ভায়া কলম্বো, তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছালেন। বাঙলার মাটিতে সেই তাঁর প্রথম পদপাত। তখন তাঁর বয়স সাতাশ বছর। শ্রীযুক্ত এলিয়ট বলে যেতে লাগলেন, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে এলোমেলো হাঁটিতে হাঁটিতে নবনাট্যম থিয়েটারের সামনে এসে হাজির হলাম। একজনকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম থিয়েটার হচ্ছে। কৌতূহল হল ঢুকে পড়লুম। আঃ ভাগ্যি ঢুকেছিলাম। তখন সেখানে শিশির ভাদুড়ী সীতা করছিলেন। দেখলাম। সে কী অভিনয়! কী অপূর্ব অভিনয়! দেখুন আমি নিজে অভিনয় ব্যবসায়ী, দুনিয়ার অভিনয় দেখেছি। কিন্তু শিশিরের তুল্য রোমাণ্টিক অভিনেতা দুসরো দেখিনি।

কথার কথা নয়। পকেট থেকে টেনে বের করলেন দুটো খবরের কাগজের কাটিং। ১৯৩০ সালে শিশির সম্প্রদায় আমেরিকায় গিয়েছিলেন। সেখানকার সমালোচক এই 'হিন্দু অভিনেতা'র অভিনয়কুশলতার কী ভূয়সী প্রশংসাই না করেছেন। কাল-কবলিত জীর্ণ সেই খবরের কাগজের টুকরো দেখিয়ে গর্বের সঙ্গে বললেন, দেখুন, নিউ ইয়র্ক সান কি বলেছে শিশিরকে। বলে, নিজেই পড়ে শোনালেনঃ মস্কো আর্ট থিয়েটারের পর আর কোনও বিদেশী অভিনেতার এত প্রতিভাময় অভিনয় নিউ ইয়র্কে হয়নি। শ্রীযুক্ত এলিয়ট মন্তব্য করলেন, শিশির ইজ গ্রেট্।

ধীরে ধীরে তিনি প্রকাশ করলেন, তাঁর আর একটি বাসনার কথা। ভারতীয়দের নিয়ে গড়ে তুলবেন এক সেক্সপীয়র সম্প্রদায়। নেহরুর সঙ্গে এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করতে দিল্লী যাবেন। শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গেও পরামর্শ করবেন। সাংবাদিকদের একজন জিজ্ঞাসা করলেন, উচ্চারণ নিয়ে গোলমাল বাধবে না?

শ্রীযুক্ত এলিয়ট জবাব দিলেন, অভিনয়ে উচ্চারণের ভঙ্গী খুব একটা মুখ্য কিছু নয়। ইংরেজদের উচ্চারণের সঙ্গে আমেরিকানদের যথেষ্ট ফারাক। তাবলে কি আমেরিকানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেক্সপীয়রীয় অভিনেতা নেই। বৃটেনেও উচ্চারণ বৈষম্য প্রচুর। আমি নিজে স্কচ্। ইয়র্কশায়ারী উচ্চারণের সঙ্গে আমারটা মেলে না। আবার ওয়েলসে ইয়র্কশায়ারী টান অচল। ইংরাজী এখন পৃথিবীর ভাষা, সবাই নিজের মতো করে এটাকে অবাধে ব্যবহার করবে। ইংরাজীর উপর কারো একচেটিয়া অধিকারের দিন চলে গেছে।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার মতে কার উচ্চারণ ভাল? বললেন, যে সব ইংরেজ বেশ কিছুদিন ধরে আমেরিকায় হাঁড়ি হেঁসেল অব্দি পেতে ফেলেছেন, তাঁদের। যেমন রোনাল্ড কোলম্যান।

কথায় কথায় আবার বাঙলার কথা উঠল। বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথায় এলিয়ট বললেন, এমন স্নেহ প্রবণতা সচরাচর নজরে পড়ে না। এমনি এটা আর্মির মধ্যেও দেখেছি। অধস্তন কোনও লোক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে
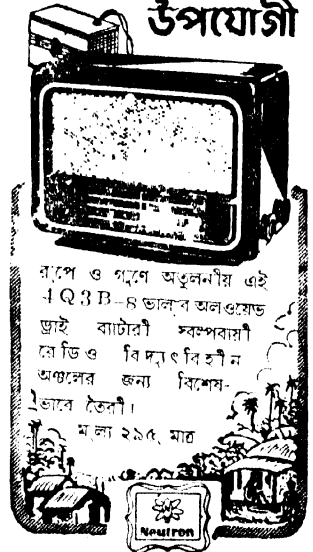
রূপালী, বসুশ্রী, বীণাতে
১৪ই মার্চ হইতে
আরম্ভ হইবে
নবতম
জেমিনীর
অবদান
পাতাল
ভৈরবী
রহস্যময় রোমাঞ্চকর প্রেম কাহিনী
বিজয়া প্রডাকসন্

গেলে তার সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করা একমাত্র বাঙালী অফিসারকেই সম্ভবে। বাঙালী চরিত্রের আর একটা দিক তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। বাঙালীর ইণ্ডিভিজুয়ালিটি। বললেন, এটা লক্ষ্য করেছি এয়ারফোর্সে। যেখানে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রকাশের মওকা, সেখানে বাঙালীর মহড়া নেবে কে? লক্ষ্য করে দেখবেন বাঙালীরা ভাল ফাইটার-পাইলট হয়। বোম্বার অপেক্ষা ফাইটারেতেই বাঙালীরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বেশী। এখানে ইংরেজদের সঙ্গে বাঙালী-চরিত্রের বেশ মিল।

নাট্যকলা সম্পর্কে তাঁর অভিমত কী? এলিয়ট জবাব দিলেন আমি আর নতুন কি বলব। ১৯২৭ সালে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম, তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। আমি তাঁর কথাই বলি: Art is not an illusion, it is not a conjuring trick, it is a convention.

বললেন, রবীন্দ্রনাথের গোরার মধ্যে অভূতপূর্ব সম্ভাবনা নিহিত আছে। বললাম, গোরাকে এখানে ছায়াছবিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। হয়েছে নাকি? উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, বিদেশে এই বইটি যে প্রভূত সমাদর পাবে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। বললেন, বাইরে শরৎচন্দ্র অপেক্ষাকৃত অনেক অপরিচিত। তবে আমি শরৎচন্দ্রের একটা উপন্যাসের নাট্যরূপে শিশিরকে অভিনয় করতে দেখেছি। অদ্ভুত, অদ্ভুত ভাল লেগেছে। নাম মনে নেই নাটকটির। বেশ অনেকদিন পেছনের কথা। থিমটা মনে আছে জ্বলজ্বলে। শুনে মনে হল বিপ্রদাস।

কি ধরণের নাটক অভিনয় করতে ভালবাসেন?—জিজ্ঞেস করলাম। ক্লাসিক। অনেকেই অনুরোধ করেছেন, কিছু মডার্ন নাটক অভিনয় করতে। কিন্তু অস্কার ওয়াইল্ড টোয়াইল্ড আমার ভাল লাগে না।

কলকাতার দর্শকদের উপর তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। এটা নর্মান মার্শালের মুখেও গতবার শুনেছিলাম। তিনিও বলেছিলেন যে বৃটেনের পর কলকাতার মতো এত সেকস্‌পীয়র ভক্ত আর কোথাও দেখিনি। সেবারে ভেবেছিলাম, এ তোষামোদ বোধ হয় স্বাভাবিক সৌজন্যবোধে। এবারে মনে হল, কথাটার অনেকটাই সত্যি। সেকস্‌পীয়রের গল্পগুলোও আমাদের দেশে ডালভাতের মতো। বিদ্যের কুদরতে যাদের ক্ষমতা দ্বিতীয় ভাগ ছাড়িয়েছে, আর পাঁচটা গল্পের সঙ্গে সেকস্‌পীয়রের হ্যামলেট, ওথেলো, মার্চেণ্ট অব্ ভেনিস্, রোমিও জুলিয়েটের গল্প তাদের মগজের ঢালা ফরাসে তাকিয়া ঠেস জায়গা করে নিয়েছে।

সে খবর তাঁকে দিলাম। বললাম, অনেককাল আগেই সেকস্‌পীয়রের নাটকের তর্জমা বাংলার পেশাদার মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। রোমিও জুলিয়েট, হ্যামলেট, ওথেলো গিরিশ ঘোষ এবং তাঁর পূর্বসূরীরা অভিনয় করেছেন। আর এমেচাররা তো ইংরেজী নাটক হামেশাই করছেন।

কথায় কথায় আবার বললেন, এদেশেই একটা দল গড়বেন সেকস্‌পীয়র আর

...দের নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্য।

... আলাপচারী হয়েছিলাম। সত্য ... কি আমার অবিশ্বাসী ইহুদী মন ... আন্তরিকতা প্রথমটা প্রচারচাতুর্য ... করেছিল। তাঁর মন্তব্যগুলোকে ... বলে ধরে নিয়ে মন সাড়া দিচ্ছিল ... আন্তরিকতা অ্যাসা ছোঁয়াচে চীজ্ ... পাল্লার বাইরে থাকবে, এমন শক্তি ... কোথায়? শেষ বেশ যখন উঠে আসি, ... দেখলাম এলিয়ট অতর্কিতে বন্ধুত্বের ...ড়ায় মনকে গেরেফ্তার করে ...ছেন।

...টের অভিনয়ধারার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ... করবার মতো। তাঁর উচ্চারণের Sটি ...। কণ্ঠস্বর মাঝামাঝি। তাঁর অভিনয় ... প্রধান ও উচ্চ স্বরগ্রামে বাঁধা। ... চরিত্রের প্রতিই তাঁর পক্ষপাত। ...টে হ্যামলেট, ওথেলোয় ওথেলো ... মার্চেণ্ট অব্ ভেনিসে সাইলক ইহুদীর ... নিয়েছেন। শয়ের নাটকেরও প্রধান ... তাঁর।

... অভিনয় অপূর্ব তাতে সন্দেহ না ... আমার মনে হয়েছে, বিশেষ করে ...র চরিত্ররূপ দেখেই মনে হয়েছে ...রপ্রেটেশনের গভীরত্ব কিঞ্চিৎ কম। ...স অলিভিয়ার হ্যামলেটকে যেভাবে ... সামনে ধরেছেন, তাতে হ্যামলেটকে ... নিজেকে ব্যক্ত করতে। এলিয়টের ... তা অনুপস্থিত। কিন্তু আমার ... অলিভিয়রই গ্রাহ্য। কারণ সেখানে ...টের ক্রিয়াকলাপের অসংগতির একটা ... মেলে। অবশ্য এ বিষয়ে মুনিদের ...ষ্ট মতভেদ।

... মধ্যে আরও কয়েকটি প্রতিভার ... মেলে। এলিয়টের পরেই ইউজিন ...সলী উল্লেখযোগ্য এবং চার্লস ...। অভিনেত্রীদের মতে শ্রীমতী ...লা ব্যারেটের অভিনয় সবচেয়ে ... ভাল লেগেছে। ইনি ওথেলোতে ...না এবং হ্যামলেটে ওফিলিয়ার ...প দিয়েছেন। হ্যামলেট-জননী গার্ট- ... ভূমিকায় শ্রীমতী মার্গার্টফিল্ডের ...ও সুন্দর। ইনি মার্চেণ্ট অব ভেনিসে ...র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

... শেষ করবার আগে একটা কথা ... করে নিই। বাঙলার প্রতি তাঁর এত ...কেন? এলিয়ট একটু হেসে বললেন, আমি যখন খুব ছোট, মায়ের কোলে, তখন মায়ের এক বন্ধু, ডাঃ এস সি মহলানবীশ আমাকে একবার কোলে নিয়েছিলেন, সেই স্পর্শই আমাকে হয়ত বাংলাগত প্রাণ করে তুলেছে। কি বলেন?

ডানলপের তথ্যমূলক চিত্র

চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে ইডেন গার্ডেনে যে প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে, সেখানে ডানলোপিলো মিনিয়েচার থিয়েটারে কয়েকটি মনোরম তথ্যমূলক চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন হয়েছে। গত মঙ্গলবার সাংবাদিক-দের কাছে উড়িষ্যার কোণারকের সূর্য-মন্দিরের চিত্র ও 'দি ডান্সিং ফিস' দেখানো হয়। কোণারকের চিত্রাবলী তুলেছেন 'রিভার' ছবির ক্যামেরাম্যান ক্লড রেনোয়া। ১৬০০ ফুটের এই ছবিটিতে ভারতের এই বিখ্যাত মন্দিরের কারুকার্যখচিত স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

ক্রিকেট—

ভারত ভ্রমণকারী এম সি সি দল ভ্রমণের শেষ খেলায় পঞ্চম টেস্ট ম্যাচে শোচনীয়ভাবে ইনিংসে ভারতের নিকট পরাজিত হইলে কোন একজন বিশিষ্ট ক্রীড়া সমালোচক উক্তি করেন, "এইরূপ পরাজয় পূর্বেই বহু খেলায় হওয়া উচিত ছিল। কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অধিনায়কদের বিচক্ষণতার অভাবের জন্যই ইহারা রেহাই পাইয়াছেন।" এইরূপ কঠোর কটূক্তি শ্রবণে একটু বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ইনি যে একেবারেই ভুল করেন নাই, তাহার প্রমাণ সিংহলের খেলায় পাওয়া গিয়াছে। এম সি সি দল শক্তিশালী কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া পুনরায় ইনিংসে পরাজিত হইয়াছে। ভারতীয় চৌকস খেলোয়াড় বিনু মানকড়, পাকিস্থানের ফাস্ট বোলার ফজল মামুদ ও অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার মিলারের মারাত্মক বোলিংয়ের বিরুদ্ধে এম সি সির ব্যাটসম্যানগণ একেবারেই সুবিধা করিতে পারেন নাই। ফলে ইহাদের প্রথম ইনিংস ১০৩ রাণে ও দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৫ রাণে শেষ হইয়াছে। চারিদিনব্যাপী খেলা তিন দিনেই শেষ হইয়াছে।

কমনওয়েলথ দল প্রথম খেলিয়া ৫১৭ রাণে ইনিংস শেষ করেন। মিলার ও গুণশেখর শতাধিক রাণ করেন। এম সি সির বোলারগণ চেষ্টা করিয়াও রাণ তুলিবার পথ রোধ করিতে পারেন নাই। পরে এই বিরাট রাণ সংখ্যার বিরুদ্ধে খেলিয়া পর পর দুই ইনিংসেই ব্যাটিংয়ের ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। ভ্রমণ আরম্ভ হইবার পূর্বেই অধ্যাপক দেওধর বলিয়াছেন, "এই দল অন্ততঃপক্ষে টেস্ট খেলায় ভারতকে পরাজিত করিতে পারিবে না।" অধ্যাপক দেওধরের সেই উক্তির মূল্য তখন কেহ দেন নাই। কিন্তু বর্তমানে তাঁহারা কি বলিবেন, সেই কথাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। নিম্নে কমনওয়েলথ ও এম সি সি দলের খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল—

খেলার ফলাফল

কমনওয়েলথ প্রথম ইনিংস—৫১৭ রাণ (মানকড় ২৪, ইমতিয়াজ আমেদ ৪২, নীল হার্ভে ৭৪, মিলার ১০৬, গুণশেখর ১৩৪, হোল ২৭, ডিসারাম ৪৩, নবরঙ ৩২, ফজল মামুদ নট আউট ২১, রিজওয়ে ৮৫ রাণে ২টি, স্যাকলটন ১১১ রাণে ২টি, গ্রেভনী ৬৭ রাণে ৪টি উইকেট পান।)

এম সি সি প্রথম ইনিংস—১০৩ রাণ (কার ১৭, লোসন ১৫, মিলার ২০ রাণে ৪টি, ফজল মামুদ ৪৬ রাণে ৪টি ও মানকড় ১৬ রাণে ২টি উইকেট পান।)

এম সি সি দ্বিতীয় ইনিংস—১৫৫ রাণ (লোসন ২৮, গ্রেভনী ৪৬, কেনিয়ান ৩১, ওয়াটকিন্স ২৯, মিলার ৯ রাণে ২টি, ফজল মামুদ ৯৮ রাণে ২টি, মানকড় ৬৯ রাণে ৪টি উইকেট পান।)

ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় দল

ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় দলের অধিনায়ক ও ম্যানেজার নির্বাচন বহু পূর্বেই হইয়াছে। কিন্তু দলের খেলোয়াড়দের মনোনয়ন হয় নাই। শোনা যাইতেছে, শীঘ্রই খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর এক অধিবেশন বোম্বাইতে হইবে ও তাহার পর খেলোয়াড়দের নামের তালিকা প্রকাশ করা হইবে। কোন কোন খেলোয়াড় এই দলে স্থান পাইবেন বলা খুবই কঠিন। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, বাঙলার নির্মল চ্যাটার্জি ও এন চৌধুরীকে দলভুক্ত করিবার জন্য ভীষণ প্রচেষ্টা নাকি হইতেছে। কে বা কাহারা এই প্রচেষ্টার পশ্চাতে আছেন জানা যায় নাই, তবে ইহাদের বুদ্ধির 'তারিফ' না করিয়া পারা যায় না। ইহাদের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ বহু ভারতীয় তরুণ খেলোয়াড় বর্তমান থাকিতে ইহাদের দলভুক্তির কথা কিরূপে যে উঠিতে পারে, তাহাই আমরা কল্পনা করিতে পারি না। যে দলের উপর ভারতের ক্রিকেট খেলার সকল মান সম্মান নির্ভর করিতেছে, তাহার গঠন বিষয়টি লইয়া এইরূপ 'ছিনিমিনি' খেলার কোনই মানে হয় না। এইরূপ দল নির্বাচনের সময় প্রাদেশিকতার বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কোনই স্থান থাকা উচিত নহে।

বিনু মানকড় ভারতীয় দলে খেলিবেন না?

বিনু মানকড় ল্যাঙ্কাসায়ার লীগের এক ক্রিকেট ক্লাবের সহিত চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হওয়ায় তাঁহাকে নাকি ভারতীয় দলে খেলান সম্ভব হইবে না, এইরূপ আলাপ-আলোচনা শোনা যাইতেছে। ল্যাঙ্কাসায়ার লীগ ক্রিকেটের যে দল মানকড়ের সহিত চুক্তি করিয়াছেন, কেন তাঁহারা মানকড়কে খেলিতে দিবেন না, ইহা আমাদের কিছুতেই বোধগম্য হয় না। চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে কেবল অর্থকরী বিষয় লইয়া। সুতরাং সেই অর্থ যদি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড উক্ত ক্লা[illegible] প্রদান করে, তাহা হইলে মানকড়কে অব্যাহ[illegible] দিতে বাধ্য। তাহা ছাড়া মানকড় ভার[illegible] খেলোয়াড় এবং তাঁহাকে যদি ভারত সর[illegible] বিলাতে যাইবার অনুমতি না দেন, তাহা হই[illegible] মানকড় কিরূপে পূর্ব চুক্তি পূরণ করি[illegible] পারেন? এই জন্যই আমাদের মনে হয়, ভা[illegible] সরকার এই বিষয় হস্তক্ষেপ করিলেই সব সমস্যা সমাধান হইতে এতটুকুও দেরী হই[illegible] না। মানকড় সম্পর্কীয় আলাপ-আলোচ[illegible] একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে।

অলিম্পিক—

ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের [illegible] গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সম্প্রতি মাদ্রাজে বিপু[illegible] উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে হইয়াছে। [illegible] সিডনির বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ভারত[illegible] প্রতিনিধিদের নির্বাচন মাদ্রাজ অলিম্পিক অনু[illegible]ষ্ঠানের পরই করা হইবে বলিয়া পূর্বে হই[illegible] ঘোষিত হওয়ায় ভারতের সকল রাজ্যের নিখি[illegible] এ্যাথলীট, সাঁতারু, মল্লবীর, [illegible] খেলোয়াড় প্রভৃতি সমবেত হন। অধি[illegible] বিষয়েই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হ[illegible] কয়েকটি বিষয় নূতন ভারতীয় [illegible] প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের বিশিষ্ট এ্যাথলী[illegible] সাঁতারু, মল্লবীর, ভারোত্তোলনকারী, [illegible]গণ যে নীরবে বসিয়া ছিলেন না, তাহার [illegible] পরিচয় এই অনুষ্ঠানে পাওয়া গিয়াছে। [illegible] অতিরিক্ত গরমের জন্যই বোধ হয় সব [illegible] আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। এ[illegible] অনুষ্ঠানের প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা [illegible] বিভাগে নূতন রেকর্ড পরিদর্শন করি[illegible] ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন [illegible] সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া বিশ্ব অলিম্[illegible] অনুষ্ঠানের অধিকাংশ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বি[illegible] করিবার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন ব[illegible]
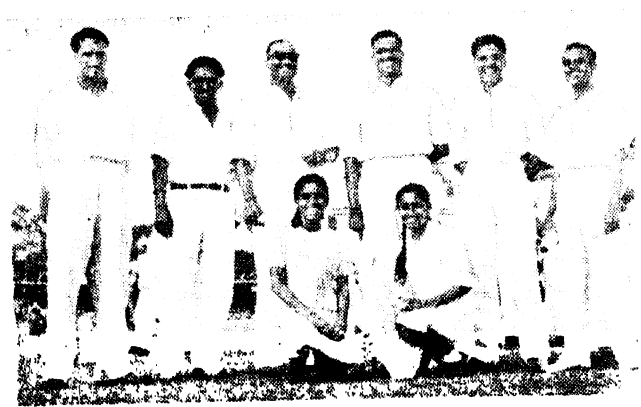
মাদ্রাজ অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সাফল্যমণ্ডিত বাঙলার সাঁতারুগণ। (বাম দিক হইতে দণ্ডায়মান):—প্রফুল্ল মল্লিক, ব্রজেন দাস, শচীন নাগ, বিমল চন্দ্র, ভুবনেশ্বর পাণ্ডে, নিরঞ্জন দাস। উপবিষ্ট:—কুমারী ভারতী সাহা ও কুমারী আরতি সাহা।
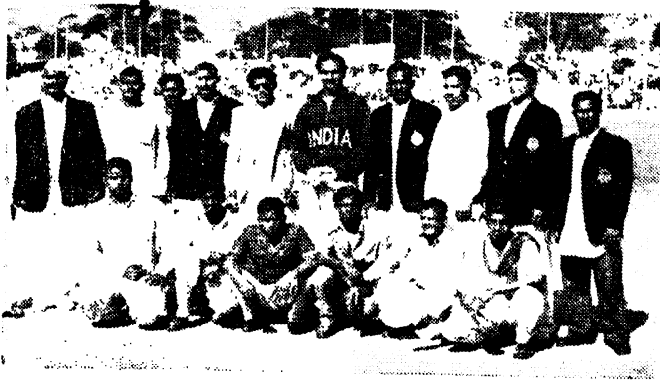
মাদ্রাজ অলিম্পিক অনুষ্ঠানে মল্লযুদ্ধের দলগত চ্যাম্পিয়নসিপ লাভকারী বাঙলার মল্লবীরগণ।

...করেন। ইহার ফলেই এ্যাথলীট দল, ...দল, জিমন্যাস্ট দল, ভারোত্তোলনকারী ...দল এই অনুষ্ঠানের সময়েই গঠিত ...। তবে সকল নির্বাচকমণ্ডলীই ঐ একই ...সিদ্ধান্তের শেষে লিখিয়া রাখিয়াছেন, ...প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত না হয়, তাহা ...মনোনীত দলের সংখ্যা হ্রাস করা হইবে।" ...সরকার নাকি ১৯৪৮ সালের বিশ্ব ...অনুষ্ঠানের সময় যে পরিমাণ অর্থ ...করিয়াছিলেন, এইবারে তাহা অপেক্ষা ...দিবেন। এই সংবাদ অনেক মনোনীত ...নির্বাচিত করিয়াছে। অর্থাভাবের ...প্রতিনিধিই যাইতে পারিবেন না বলিয়া ...হইতেছে। এই সম্পর্কে আমরা দেশ-...উদারতা প্রদর্শন করিয়া সামর্থ্য ...সাহায্য করিতে অনুরোধ করি। এই ...জনসাধারণেরই দায়িত্ব অধিক। ...অধিকাংশ বিভাগেই বাঙলার প্রতিনিধি-...কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ভারতের ...হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন।

বাঙলার কৃতিত্ব

...সাঁতারু ও মল্লবীরগণ দলগত ...সিপ লাভ করিয়াছে। এ্যাথলেটিকসেও ...নীলিমা ঘোষ ৮০ মিটার হার্ডল দৌড়ে ...ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ...বাঙলার প্রতিনিধি প্রথম স্থান ...করিয়াছে। সন্তরণে বাঙলার প্রতিনিধি ...মল্লিক ...সাঁতারে নূতন ভারতীয় ...প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। বাঙলার জিমন্যাস্ট ...কাঞ্জি ও অনিল কুণ্ডু প্রতিযোগিতায় ...বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ...সাঁতারু বিমলচন্দ্র সন্তরণের তিনটি বিষয়ে ...স্থান অধিকার করিয়াছে। এমন কি ...সাঁতারু ভারতী সাহা ৪০০ মিটারে ...স্থান অধিকার করিয়াছে। সাইকেল প্রতি-...বাঙলার প্রতিনিধি দল সাফল্যলাভ ...ছে। কপাটী ও বাস্কেট বল খেলায় ...বাঙলার দল দুর্ভাগ্যক্রমেই পরাজিত হইয়াছে। ভলিবল খেলায় কেবল শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। শ্রেষ্ঠ দেহশ্রী প্রতিযোগিতায় বাঙলার পরিমল রায় 'ভারতশ্রী' উপাধি লাভ করিয়াছে। এইরূপে বাঙলা মাদ্রাজ অলিম্পিকের সর্ব বিভাগেই কিছু না কিছু কৃতিত্ব ও গৌরব অর্জন করিয়াছে। ইহা খুবই সুখের ও আনন্দের বিষয়।

টেবিল টেনিস—

পূর্ব ভারত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় বৈদেশিক কৃতী খেলোয়াড়গণ যোগদান করায় প্রতিযোগিতাটি সত্যই দর্শনযোগ্য হয়। তবে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, জাপানী খেলোয়াড়গণ সকলে শেষ পর্যন্ত খেলেন নাই। একমাত্র জাপানের ২নং খেলোয়াড় হায়াসী প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত খেলিয়া সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। জাপান টেবিল টেনিস খেলায় কতখানি উন্নতি করিয়াছে তাহার পরিচয়ও ইনি ফাইন্যালে দিয়াছেন। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিশ্বের খ্যাতনামা খেলোয়াড় রিচার্ড বার্জম্যান। কিন্তু হায়াসী তাঁর মারের সহিত দ্রুত খেলা পরিচালনা করায় রিচার্ড বার্জম্যান কোন সময়েই খেলায় প্রাধান্যলাভ করিতে পারেন নাই। ফলে স্ট্রেট গেমে খেলায় পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে। বাঙলার কৃতী খেলোয়াড় কল্যাণ জয়ন্ত বোম্বাইর বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় সুবিধা করিতে না পারিলে কোন কোন সাংবাদিক মন্তব্য করেন, বিলাতে গিয়া ইহার অধঃপতন হইয়াছে। আমরা ঐ উক্তি তখন সমর্থন করিতে পারি নাই। কিন্তু পূর্ব ভারত টেবিল টেনিসের সময় কল্যাণ জয়ন্তের খেলা অবলোকন করিয়া আমাদের মনে মনে বলিতে হইয়াছে বোম্বাইর ঐ উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। ক্রীড়া কৌশলের উন্নতি না হইয়া চালচলন বেশ বাড়িয়াছে ইহা না বলিয়া পারি না। অদূর ভবিষ্যতে ইনি ক্রীড়াকৌশলের দিকে বিশেষ মনোনিবেশ করিলে আমরা সুখী হইব। ইহার অপেক্ষা রণবীর ভাণ্ডারীর খেলায় যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল—

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

টি হায়াসী (জাপান) ২১-১৯, ২১-১৮, ২১-১৭ গেমে রিচার্ড বার্জম্যানকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল

মিস সৈয়দ সুলতানা (হায়দরাবাদ) ২১-৯, ২১-১১, ২১-৮ গেমে মিস ই মোজেসকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল

আর বার্জম্যান ও তিরুভেঙ্গদম ১৮-২১, ২১-১৫, ১২-২১, ২১-১৫, ২১-১৮ গেমে রণবীর ভাণ্ডারী ও কল্যাণ জয়ন্তকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল

আর ভাণ্ডারী ও মিস সুলতানা ২১-১৪, ২১-১৭, ১৬-২১, ২১-১৪ গেমে আর বার্জম্যান ও মিস মোজেসকে পরাজিত করেন।

দেশী সংবাদ

২৫শে ফেব্রুয়ারী—ঢাকায় পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন ধর, কংগ্রেস পরিষদ দলের চীফ হুইপ শ্রীগোবিন্দলাল ব্যানার্জি, জনাব আব্দুর রসীদ তর্কবাগীশ এবং আওয়ামী লীগের পরিষদ দলের সদস্য জনাব খয়রাত হোসেনকে পূর্ববঙ্গ জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আজ ঢাকা শহরে সাধারণ ধর্মঘটের পঞ্চম দিবসে পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়।

শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীর নেতৃত্বে গঠিত আসামের নূতন মন্ত্রিসভা আজ কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—ঢাকায় পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক ডাঃ পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক মুজঃফর আহমেদ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীঅজিত গুহ ও আরও কয়েক ব্যক্তিকে পূর্ববঙ্গ জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী আজ সকালে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অদ্য সংসদে রেলওয়ে খাতে মোট ৯৪ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়।

উড়িষ্যা হাইকোর্ট অদ্য তিনজন বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট শ্রীগোবিন্দ প্রধান, শ্রীহরিহর দাস ও শ্রীরামচন্দ্র মিশ্রকে মুক্তি দিয়াছেন। হাইকোর্ট এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, আটকাদেশ অবৈধ ও অসিদ্ধ।

কলিকাতায় আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধির সহিত এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তুর্কী সংবাদপত্র প্রতিনিধি দলের সদস্য ডাঃ আহমেত শুক্রু এসমার বলেন যে, তাঁহারা ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের মতবাদে বিশ্বাস করেন না।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অদ্য কলিকাতায় রাজ্যের বিধানসভার কংগ্রেস দলের বর্তমান সদস্যগণ এবং নবনির্বাচিত সদস্যগণের এক সম্মিলিত সভায় বক্তৃতাকালে দেশের বর্তমান খাদ্য-পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণ প্রথা ও রেশনিং চালু রাখিবার গুরুত্ব বিবৃত করেন এবং খাদ্য-সমস্যার সমাধানে সরকারী প্রচেষ্টার সহিত সকলকে সহযোগিতা করিবার আহ্বান জানান।

অদ্য হইতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ঢাকাস্থ ছাত্র-বিক্ষোভে ৮ জন নিহত হইবার পর হইতে মঙ্গলবার পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের ৫ জন সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ৪ জন অধ্যাপক ও ২৮ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতা গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজ ভবনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্রশিল্প ও কারুকলার এক বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

স্বামী সীতারাম অপর কয়েক ব্যক্তির সহিত দ্রুত অন্ধ্র প্রদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২৮শে ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি অদ্য কলিকাতার ইডেন উদ্যানে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে গণচিত্তের উপর চলচ্চিত্রের বিপুল প্রভাবের উল্লেখ করিয়া ভারতে এতৎ-শিল্পের অধিনায়কদের অধিক সংখ্যায় শিক্ষা-মূলক চিত্র উৎপাদনে ব্রতী হইতে আহ্বান জানান।

নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান-মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন যে, মাদ্রাজে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন অসম্ভব নহে।

আসন্ন কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য যে ৫৪৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৮২ জনের মনোনয়নপত্র পরীক্ষাকালে বাতিল হইয়াছে।

ভারতের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী ঘোষণা করেন যে, আগামী ১লা মার্চ হইতে ৪ মাসের জন্য রাজ্য সরকারসমূহের চিনির বরাদ্দ শতকরা দশ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে।

সৌরাষ্ট্রে শ্রী ইউ এন ধেবরের নেতৃত্বে আটজন মন্ত্রী লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

২৯শে ফেব্রুয়ারী—অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ অদ্য সংসদে একটি হোয়াইট পেপার আকারে ভারত সরকারের ১৯৫২—৫৩ সালের বাজেট পেশ করেন। এই বাজেটে দেখা যায় যে, ১৯৫২—৫৩ সালে ১৮ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। বর্তমান বৎসরে (১৯৫১—৫২) সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ভারত সরকারের ১২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

অর্থমন্ত্রী শ্রী দেশমুখ অদ্য সংসদে ঘোষণা করেন যে, বর্তমান কর ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে না।

অদ্য সংসদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিবারক নিরোধ আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিলটি গৃহীত হইয়াছে। আগামী ৩১শে মার্চ উক্ত আইনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার কথা ছিল। আইনের মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

১লা মার্চ—চিত্তরঞ্জনে এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন যে, প্রত্যেক শ্রমিকেরই নিজেকে জাতি-গঠনমূলক সমস্ত কার্যের অংশীদার বলিয়া মনে করা উচিত।

অদ্য ভারতীয় সংসদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত আঞ্চলিক বাহিনী (সংশোধন) বিল গৃহীত হইয়াছে। উহাতে আঞ্চলিক বাহিনীর লোকদের অসামরিক চাকরী বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভূ... **কংগ্রেস মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী এবং** খা... গফ্ফর খানের জামাতা মহম্মদ ইয়া... অদ্য এক বিবৃতিতে বলেন যে, প্রায় ... যাবৎ খান আব্দুল গফ্ফর খানকে ... নির্জন কক্ষে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

২রা মার্চ—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলা... অদ্য বিহারের সিন্ধ্রিতে ২৩ কোটি টা... নির্মিত এশিয়ার সর্ববৃহৎ সার উৎসাদন ... উদ্বোধন করেন। দেশের খাদ্য ... সমাধানের জন্য ইহাতে প্রত্যহ এক হা... এমোনিয়াম সালফেট প্রস্তুত হইবে।

বিদেশী সংবাদ

২৫শে ফেব্রুয়ারী—ভিয়েৎমিন বেতারে ... দাবী করা হইয়াছে যে, ভিয়িৎমিনবাহিনী ... ব্যাট্যালিয়ন ফরাসী সৈন্যকে ধ্বংস করিয়া...

২৬শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য কমন্স ... মিঃ চার্চিল জানান যে, বৃটেন একটি ... বোমা প্রস্তুত করিয়াছে এবং নিয়মি... আণবিক বোমা উৎপাদনের উপযোগী ... বৃটেনে রহিয়াছে।

লিসবনে উত্তর অতলান্তিক চুক্তি ... পরিষদের ৯ম অধিবেশন গত রাত্রিতে ... হইয়াছে। একটি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া ... করা হইয়াছে যে, অধিবেশনে কয়েকটি ... পূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—ভিয়েৎমিন সেনা... অধিনায়ক জেঃ ড়ুয়ে গিয়াপ ঘোষণা করিয়... টংকিং প্রদেশের হোয়াবিনস্থ সামরিক ... পূর্ণ অগ্রবর্তী ঘাটীটি অধিকারের জন্য ... সৈন্যদের বিরুদ্ধে তিন মাসব্যাপী সংগ্রামে ... (ভিয়েৎমিন সেনাদল) বিপুল সাফল্য ... করিয়াছে।

১লা মার্চ—অদ্য মিশরের আলী মেহের ... মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। প্রকাশ ... পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিত রাখা ... শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট দেখা দেওয়ায় প্রধান ... আলী মেহের পাশা পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ... করেন।

২রা মার্চ—মিশরের নবনিযুক্ত প্রধান ... নাগুইব হিলালি পাশা মিশরে নূতন মন্ত্রি... গঠন করিয়াছেন। নূতন প্রধান মন্ত্রী ... করেন যে, মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্য অ... এবং মিশর ও সুদানের মধ্যে ঐক্য বিধান ... মন্ত্রিসভার লক্ষ্য হইবে।

ভারতীয় মুদ্রাঃ প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক— ১০,
পাকিস্থান মুদ্রাঃ প্রতি সংখ্যা (পাক) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক— ১০, (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ঊনবিংশ বর্ষ] শনিবার, ২রা চৈত্র, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 15th March, 1952 [২০শ সংখ্যা

বাজার দরের সমস্যা

কিছুদিন হইতে ভারতের সর্বত্র পণ্যমূল্য হ্রাস পাইতেছে। গত কয়েক বৎসর হইতে দ্রব্যমূল্য বরাবরই উচ্চস্তরে উঠিতেছিল। উৎপাদনকারী, ক্রেতা এবং বিক্রেতা এই অবস্থাতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন দ্রব্যমূল্য হ্রাসের ফলে ইহারা কেহ কেহ বিস্মিত এবং বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বিগত মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কাটিয়া গিয়া ইহার পূর্বেই দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাওয়া উচিত ছিল; কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধের হিড়িকে বাজার স্বাভাবিক আকার ধারণ করিতে পারে নাই। সুতরাং মূল্য হ্রাসের ব্যাপার অস্বাভাবিক কিছু নয়; তবে কতকটা আকস্মিকভাবেই যেন এই মন্দার ভাবটা আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই ব্যবসায়ী মহলে কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এতটা চাঞ্চল্যের বাস্তবিক কোন কারণ ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। অল্প দিনের মধ্যে এই হুজুগ থামিয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, পণ্যমূল্য হ্রাসের রবটাই বেশী উঠিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে সাধারণ ক্রেতাদের এ পর্যন্ত বিশেষ কোন সুবিধাই হয় নাই। চিনি, তেল, মসলার দর কিছুটা হ্রাস পাওয়া ভিন্ন খুচরা বাজারে পণ্যের মূল্য প্রায় পূর্ববৎ রহিয়াছে। কাপড়ের দাম কিছুই কমে নাই। সোনার দাম অস্বাভাবিক গতিতে হ্রাস পাইয়াছে সত্য। এজন্য মধ্য অবস্থার স্বর্ণ-ব্যবসায়ী কয়েকজনের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কাও ঘটিয়াছে। কিন্তু সোনার দাম যখন অস্বাভাবিকভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন এ সম্বন্ধে এত হৈ-চৈ তো হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান মন্দার কারণ উৎপাদনের আধিক্য নয়, জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাসই প্রধানত ইহার মূলে রহিয়াছে। সরকারের অবলম্বিত কয়েকটি ব্যবস্থাও এ ক্ষেত্রে কিছুটা কাজ করিয়াছে। ফলত কোরিয়ায় যুদ্ধারম্ভের পর হইতে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী অতি লাভের আশায় মাল মজুত রাখিতে আরম্ভ করেন এবং নিছক টাকার জোরে কৃত্রিমভাবে দ্রব্যমূল্য অত্যধিক চড়াইয়া রাখেন। দ্রব্যমূল্য হ্রাসের ঝোঁকটা এখন একটু জমিয়া উঠিবামাত্র ইঁহাদের মাথায় টনক নড়িয়াছে। নিজেদের অসদুপায়ে অর্জিত অর্থের কিছুটা ক্ষতি হইবার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় তাহারা আর্তনাদ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহাদের লাভের অঙ্কে যাহাতে হাত না পড়ে, তজ্জন্য সরকারকে সেই পথে আনাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। বস্তুত দ্রব্যমূল্য হ্রাসের গতি অব্যাহত থাকা একান্তই প্রয়োজন। দেশের মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র সম্প্রদায় নহিলে উৎসন্ন যাইবে। কিন্তু যাহাতে ব্যবসা-বাণিজ্য ইহার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেইদিকে মনোযোগ দেওয়াও দরকার। রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করিয়া বিদেশে রপ্তানির বাজার বাড়ানোই এ পক্ষে প্রয়োজন। বিদেশে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা এখনও প্রচুর রহিয়াছে। সুতরাং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কলরবে পড়িয়া দ্রব্যমূল্য চড়া রাখিবার নীতি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া সরকারের পক্ষে সমীচীন হইতে পারে না।

সরকারের কর্তব্য

দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু ইহাতে আতঙ্কের কি আছে? প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৯ সালেই দ্রব্যমূল্যের গতি নিম্নাভিমুখী হওয়া স্বাভাবিক ছিল। বিশ্বযুদ্ধের নূতন একটা আতঙ্কে সে অবস্থা আসিতে পারে নাই। যুদ্ধের আশঙ্কা এখন কাটিয়া গিয়াছে। জনসাধারণের মনেও সমধিক আশ্বস্তির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা মূল্য-হ্রাসের সম্ভাবনা বুঝিতেছে এবং তাড়া-হুড়া করিয়া জিনিসপত্র কিনিতেছে না। দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইবার ফলে ব্যবসায়ী সমাজের আর্তনাদ উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। দেশের লোকের প্রতি দরদের পরিচয় কোনদিন ইঁহারা দেন নাই। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ যখন ক্ষুধায় কাতর হইয়া অন্ন চাহিতেছে, তখন সেই ক্রন্দন মুনাফা-শিকারী এই শ্রেণীর ব্যবসাদারদের কর্ণে পেঁছে নাই। বস্ত্রাভাবে সমগ্র দেশ যখন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, মুনাফা-শিকারীরা তখন বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাইবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। এমনকি, ঔষধের ব্যাপারেও ইহারা কিছুমাত্র সহৃদয়তার পরিচয় দেয় নাই। অবস্থার সুযোগে দীর্ঘকাল জনসাধারণকে শোষণ করিয়াই ইহারা নিজেদের ধনভাণ্ডার পরিস্ফীত করিয়াছেন। আজ প্রকৃতির অপরিহার্য নিয়মে যদি ইহাদের উপর

আঘাত আসিয়া পড়ে, তাহাতে **জন-প্রতিনিধিদের** দ্বারা **পরিচালিত সরকারের** চিন্তিত হইবার কি কারণ **থাকিতে পারে ?** পরন্তু এই স্বাভাবিক আবর্তে পড়িয়া কালো-বাজারের সমাধি রচিত হয়, তবে **সমাজের** পক্ষে সুখেরই বিষয় হইবে। সুতরাং দ্রব্য-মূল্য হ্রাসের গতি রোধ করিবার জন্য সরকারী হস্তক্ষেপের কোন **প্রশ্নই** উঠে না। অবশ্য ব্যবসায়ীরাও ফিকিরবাজ **কম** নহেন। তাঁহারা **কল-কারখানা বন্ধ** করিয়া দিবেন, **উৎপাদন হ্রাস** করিবেন, শ্রমিকদিগকে বরখাস্ত করিয়া বেকার অবস্থায় ফেলিয়া নিজেদের সুবিধার দিকে অবস্থার মোড় ঘুরাইতে চেষ্টা করিবেন। ফলতঃ দ্রব্যমূল্য হ্রাসের **যখনই** কোন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, তখনই তাহারা এই সব কৌশল অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব **শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব** নাগপুরে বক্তৃতায় সম্প্রতি এই সম্প্রদায়ের অপকৌশলের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনিও ইহা বলিয়াছেন যে, **সরকার যখনই এই** শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের উপদেশ শুনিয়াছেন, তখনই একটা **কিছু অনর্থ ঘটিয়াছে।** সুতরাং সরকারকে এজন্য ইঁহাদের সব যুক্তিতে কান দিলে চলিবে না। প্রধানত উৎপাদন যাহাতে হ্রাস না হয় এবং বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকদের মধ্যে বেকার অবস্থার সৃষ্টি না ঘটে, এই সব দিকে সরকারকে এখন সমধিক লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রত্যুত মুষ্টিমেয় লোকের গোষ্ঠী-স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য অবিচলিতভাবে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে উদাত হওয়া এক্ষেত্রে বিশেষভাবেই বিপজ্জনক হইবে। কারণ তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে নিদারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিবে। এদেশের শাসন-নীতিতে আদর্শের তেমন অপহ্নব যেন আর না দেখিতে হয়।

ভ্রান্তপথ

পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত আন্দোলনে হিন্দুদের যোগ দেওয়া যে অনুচিত, আমরা এমন কথা বলি না; পূর্ব-বঙ্গ তাঁহাদের জন্মভূমি, সুতরাং মাতৃ-ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদাদানের অধিকার তাঁহাদের সঙ্গতভাবেই রহিয়াছে। রাষ্ট্র-ভাষা সম্পর্কিত প্রশ্নটি আদৌ গুরুতর প্রশ্ন নয়, এই যুক্তি নিতান্ত অকেজো। **বস্তুতঃ** এ প্রশ্ন খুবই গুরুতর **প্রশ্ন;** কারণ, ভাষা ও সাহিত্যের উপর জাতির সমগ্র সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। বহু যুগের মনীষার অবদানে **উদ্ভূত** ভাষা ও সাহিত্যের **শক্তি হইতে** একটি জাতি যদি বঞ্চিত হয়, তবে তাহার অবনতি এমনকি, উৎসাদনের **পথই** উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ভাষা ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে, রাজনীতিক কৌশলেই সে অভাব পূর্ণ করা **সম্ভব হইতে** পারে না। পূর্ববঙ্গের প্রধান **মন্ত্রী** জনাব নূরুল আমীন এ সব কথা খুবই জানেন। বস্তুতঃ "রাষ্ট্রভাষা সমস্যাকে সরকার কিছুদিন বিশেষ গুরুত্ব দেন নাই," তাঁহার এই যে যুক্তি, ইহা ভিত্তিহীন। ফলতঃ পাকিস্থানের বর্তমান নীতির নিয়ামকগণ রাষ্ট্রভাষা সমস্যাকে খুবই গুরুত্ব দিয়াছেন এবং এখনও দিতেছেন বলিয়াই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষার মর্যাদা দানে দাবী উঠিবামাত্র তাঁহারা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। করাচীতে কলরব উঠিয়াছে। চৌধুরী খালিকুজ্জমান সাহেব হুমকি দেখাইয়াছেন। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষে মিঃ জিন্নার দোহাই দেওয়া **হইতেছে।** রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দানের প্রয়োজনীয়তা যদি কিছুমাত্র উপলব্ধি না করিতেন, তবে উর্দু ভাষাকেই পাকি-স্থানের রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে, তাঁহারা এমন ওকালতি করিতে আগাইয়া আসিতেছেন কেন? **গণ-পরিষদের উপর** ভার দিয়া রাখিলেই চলিত। খাজা নাজিমুদ্দিনের মুখে উর্দু প্রীতি যুক্তি আমরা শুনিতে পাইতাম না। বাস্তবিক-পক্ষে এসব কথাও অনেকটা অবান্তর। পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় নীতির নিয়ামকগণ নিজেদের মনের কোণে যেরূপ মতলবই আটিয়া থাকুন না কেন, পূর্ববঙ্গ বাসীদের দাবীর জোর তাহাতে কিছুই কমে না। গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারেই পূর্ববঙ্গের ভাষা যে পাকিস্থানের অন্য-তম রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত সে দাবী তাহারা করিতে পারে এবং মাতৃভাষার প্রতি মর্যাদা বৃদ্ধির দিক হইতে এই প্রশ্ন তাহাদের পক্ষে গুরুত্ব লাভ করিলেও দোষের **কিছু হয় না।** **প্রকৃতপক্ষে গণ-তান্ত্রিক শাসন-নীতির** সম্বন্ধে সচেতন হইয়া পূর্ববঙ্গবাসীদের এই দাবীর প্রতি **সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া কর্তৃপক্ষের উচিত।** **বস্তুতঃ ভাষা-সম্পর্কিত** ● এই আন্দো[illegible] যাঁহারা **পরিচালনা** করিতেছেন, আদ[illegible] অভাব **তাঁহাদের** মধ্যে ঘটে [illegible] **কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের** মনোভাবকে বিকৃত[illegible] বুঝিয়া **এবং** বুঝাইয়া এই আন্দো[illegible] **দলনে পীড়ন নীতি** অবলম্বনে প্র[illegible] হওয়াতেই **যত সমস্যা** দেখা দিয়াছে। [illegible] মতকে **এইভাবে অবজ্ঞা** করিয়া নিজে[illegible] মর্জিতে যদি **তাঁহারা** গোঁ ধরিয়াই চলে[illegible] **তবে পথের বাধা তাঁহাদের** পক্ষে উত্তরো[illegible] **গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে।** ফলতঃ বাহি[illegible] শত্রুর **ভ্রান্ত বিভীষিকার** জিগীর তু[illegible] **দীর্ঘ দিন জনসাধারণকে** বিভ্রান্ত [illegible] **সম্ভব নয়। মানুষের** একটা সংস্[illegible] আছে এবং স্বাভাবিক সেই সংস্কৃতি সত্ত্[illegible] **ধরিয়া ফেলিবেই।**

ইতিহাসের জিজ্ঞাসা—

সম্প্রতি ভারতীয় সংসদে শ্রী[illegible] কামাথের প্রশ্নের উত্তরে প্রধান ম[illegible] পণ্ডিত নেহরু নেতাজীর পূর্বতন স[illegible] কর্মী শ্রীযুত এস এ আয়ার কর্তৃক প্র[illegible] বিবরণ সংসদে উপস্থাপিত ক[illegible] শ্রীযুত আয়ার তাঁহার রিপোর্টে ন[illegible] কোন কথাই বলেন নাই। ফর[illegible] দ্বীপে তাইহোতে বিমান দু[illegible] সম্বন্ধে কর্নেল হবিবুর রহমান ক[illegible] প্রদত্ত বিবরণের উপরই উক্ত রিপো[illegible] সবটুকু জোর দেওয়া হইয়াছে। [illegible] বাহুল্য, এ বিবরণ আগেই জানা ছি[illegible] কর্নেল রহমান নেতাজীর অনুগত এ[illegible] বিশ্বস্ত ব্যক্তি। বিশেষতঃ তিনি এ[illegible] সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে নিজকে [illegible] দিন বিশেষ রকমে জড়াইতে চেষ্টা ক[illegible] নাই, বরং নিজের বিবৃতিটি দিবার [illegible] তিনি এ সম্বন্ধে সকল প্রশ্নই যথাস[illegible] এড়াইয়া যাইতেই চেষ্টা করে[illegible] স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু পর্যন্ত কর্নে[illegible] রহমানের মনের কথা ষোল আনা বা[illegible] করিতে পারেন নাই, এমনই বো[illegible] গিয়াছে। কর্নেল রহমান বর্তমানে সুইজা[illegible] ল্যাণ্ডেই এক রকম স্থায়ীভাবে বসবা[illegible] করিতেছেন, সুতরাং এই সম্পর্কে তাঁহা[illegible] আনিয়া জড়ানোও সম্ভব ন[illegible] বস্তুত নেতাজীর বিশেষ নির্দে[illegible] কিংবা তাঁহার কোন গূঢ় প্রয়ো[illegible] সাধনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া কর্নে[illegible] রহমান যে তাঁহার বিবৃতিটি প্রদ[illegible] করেন নাই, একথা কে বলিবে? ব[illegible] **বাহুল্য,, সত্য-মিথ্যার নৈতিক প্রশ্ন** এখা[illegible]

পন করা নিরর্থক। বৃহত্তর প্রয়োজন নের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন ী অবলম্বন করা দরকার হয়। ব্রিটিশ নের সদা জাগ্রত সহস্র চক্ষুতে ধূলো নেতাজী যেভাবে ভারতবর্ষ হইতে র্ধান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ক এমন রহস্যের আশ্রয় লওয়া কিছু- বিদিত নয়। জাপানের পতন ও সমর্পণের পর এইরূপ রহস্য-মরণের য় লওয়া ছাড়া তাঁহার গত্যন্তর ছিল এরূপ সম্ভাবনা যে ঘটিতে পারে, াও তিনি পূর্ব হইতে অনুমান রয়াছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ন তিনি অভিযান চালনা করিতে- লেন সেই সময়ে জনৈক সহকর্মী রতবর্ষ হইতে তাঁহার অন্তর্ধান- লীর রহস্য জানিতে চাহিয়াছিলেন, শ, নেতাজী তাঁহার উত্তরে বলিয়া- লেন,—"সে কথা আমি প্রকাশ করিতে রি না। আমাকে আমার সে উপায় বলম্বন করিতে হইতে পারে।" বলা হুল্য, জাপানে নেতাজীর চিতাভস্ম ক্ত হওয়ার উপর শ্রীযুত আয়ার তাঁহার পোর্টে যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, হাও পরোক্ষ প্রমাণ মাত্র এবং আত্ম- পনের রহস্য জাল বিস্তার করিবার ক্ষে তাহা পরিকল্পিত হওয়া কিছুমাত্রই চিত্র নয়। ফলতঃ নেতাজীর দেহ-সংকারের নয় কেহ উপস্থিত ছিলেন, এমন কোন মাণই নাই। হাসপাতালে মৃত্যুকালে হার কাছে ছিলেন, এক কর্নেল রহমান তীত দ্বিতীয় এমন কোন ব্যক্তিরই খোঁজ পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে হাস- তালের ছবি বা শুশ্রূষাকারিণী নার্সদের টা এক্ষেত্রে একেবারেই অবান্তর। যাঁহাদের টো দেখানো হইয়াছে, তাঁহারা শ্চয়ই রক্ত-মাংসের শরীরে জীবিত ছেন। তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির রাও অসম্ভব নয়। নেতাজীর অনু- গীদের মধ্যে যাঁহারা জাপানে আছেন, াঁহারা স্বচ্ছন্দেই এ কাজ করিতে রিতেন, কিন্তু চিতা ভস্ম দেখাইয়াই াঁহারা নিরস্ত। মৃত্যুকালীন প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিতির প্রশ্ন তাঁহারা একে- বারেই এড়াইয়া গিয়াছেন। সুতরাং কর্নেল হবিবুর রহমানের বিবৃতি সত্ত্বেও নেতাজী-সম্পর্কিত রহস্য থাকিয়া গিয়াছিল, শ্রীযুত আয়ারের প্রদত্ত বিবরণীর পরও রহস্য তেমনই রহিয়া যাইতেছে। ভারত স্বাধীনতা লাভ করি- বার পর অর্থাৎ তাঁহার আত্মপ্রকাশের অনুকূল প্রতিবেশ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও নেতাজী কি জন্য আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছেন, ইহা একটি প্রশ্ন হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা ইহা নিশ্চয়ই প্রমাণিত হয় না যে, তিনি জীবিত নাই। বস্তুতঃ ১৯৪৫ সালের ১৭ই আগস্টের পরবর্তী নেতাজীর জীবন-কাহিনী বিগত যুদ্ধের এক উল্লেখ- যোগ্য অমীমাংসিত রহস্য এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহা একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসার মতই থাকিয়া যাইতেছে।

উৎসবের শিক্ষা

গত ৭ই মার্চ কলিকাতায় সপ্তাহকাল অনুষ্ঠানের পর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। ভারত সরকারের তথ্য এবং বেতার বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত দিবাকর উৎসবের উপসংহার- কালীন অভিভাষণে আন্তর্জাতিক দিক হইতে এমন অনুষ্ঠানের গুরুত্বের কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সূত্রে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার মহদুদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এই ধরণের উৎসব বিশেষ- ভাবে সহায়ক; ইহা ছাড়া চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ এবং সমুন্নতির পক্ষেও এমন অনুষ্ঠানের যে সার্থকতা আছে, একথা সকলেই সমর্থন করিবেন। কিন্তু আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় বিষয় হইল এই যে, এই অনুষ্ঠানের ফলে ভারতের, বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা এবং শিল্পিগণ একটি প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে সমর্থ হইলেন এবং সেই অভিজ্ঞতা যদি তাঁহারা সাধনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশ ও জাতির সমধিক সেবা করিতে সমর্থ হইবেন। চলচ্চিত্রের সাধনার ক্ষেত্রে ব্যবসায়-গত স্বার্থ ও সমাজ- জীবনের নৈতিক সমুন্নতি—এই দুইয়ের মধ্যে এদেশে বেশ কিছু অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছে এবং এতদুভয়ের সমন্বয় সাধনের পক্ষে এই শিল্প এখনও সহজ এবং স্বাভাবিক ধারাটি যেন কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছে না। ফলতঃ নৈতিক দিকটায় জোর দিতে গেলে রস জমে না, আবার রস জমাইবার প্রয়োজনের উপর জোর দিতে গেলে তরল মনোবৃত্তিকে প্ররোচনার খাতের মধ্যে গিয়া শিল্পের গতি গিয়া পড়ে। এই দ্বন্দ্বের সংঘাতে জনসাধারণের তরল মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়ার দিকটার উপরই কার্যত জোর গিয়া দাঁড়ায়; কারণ আর্থিক প্রয়োজন তাহাতে পুষ্ট করা সহজে সম্ভব হয়। ইহার ফলে কৃত্রিমভাবে রসের পরিবর্তে রসাভাস সৃষ্টি বা রসের বিকৃত অনু- কৃতিই এ দেশের চলচ্চিত্র সাধনাকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। প্রকৃত রসকে যৌন প্ররোচনার প্রয়োজনে বিকৃত না করিয়া জন- সাধারণের মধ্যে নৈতিক চেতনাকে চলচ্চিত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করা কিভাবে সম্ভব হইতে পারে, বৈদেশিক কয়েকখানি চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী হইতে আমরা এই উৎসব উপলক্ষে সে শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই সব চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে এই সত্য স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, রসের বিপর্যয় না ঘটাইয়াও জনমনকে আকৃষ্ট করিবার মত উৎকৃষ্ট চিত্র সৃষ্টি করা যায় এবং ব্যবসায়গত স্বার্থের পক্ষেও তাহাতে কোন ক্ষতি ঘটে না। এই শিক্ষাটি যদি আমরা বুঝিয়া চলিতে পারি এবং কলা-কৌশল প্রয়োগের এই নৈপুণ্যের ধারাটি যদি আমরা ঠিকভাবে ধরিয়া ফেলিতে সমর্থ হই, তবে এদেশের চলচ্চিত্র-সাধনায় স্থায়ী লাভের পথ উন্মুক্ত হইবে এবং সমাজ-জীবনে সুরুচিকে জাগ্রত করিয়া আমরা আর্থিক এবং নৈতিক প্রয়োজন একই সঙ্গে মিটাইতে পারিব। যাঁহারা প্রকৃত রসের সমজদার ব্যক্তি, তাঁহারাও মর্মপীড়া হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

১

সৈয়দ মুজতবা আলী

দু টাকা জোর ন' সিকে দিয়ে টিকিট কেটে বসেছেন। এমন আর কি আক্রা হল? সমস্ত দিন কাটাতে গেলে বায়স্কোপেও তো তার চেয়ে বেশি খরচা হত।

হুবহু গোয়ালন্দী জাহাজ। কেবিনের বালাই নেই—সব খোলা ডেক। রেলিঙের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চারজনের বসবার মত ছোট ছোট টেবিল সাজানো। নীল সাদায় ডোরা কাটা করকরে টেবিল ক্লথ। ক্লিপ দিয়ে টেবিলের সঙ্গে সাঁটা, পাছে হাওয়াতে ভর করে পক্ষীরাজের মত ডানা মেলে লেকের 'হে-পারে' চলে যায়।

'হে-পারে?' চট করে মনটা পদ্মার দিকে ধাওয়া করলো তো?

আমারও মনে পড়েছিল পদ্মার কথা। জীবনে কতবার প্রদোষের আধা-আলো-অন্ধকারে চাঁদপুর থেকে জাহাজে করে গোয়ালন্দের দিকে রওয়ানা হয়েছি। বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তিতে সর্বদেহমন অবসন্ন—বাড়ি ছাড়ার সময় মা অমঙ্গলের চোখের জল ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি, সে কথা বার বার বুকের ভিতর কাঁটার মত খোঁচা দিচ্ছে, বহু চেষ্টা করেও মন থেকে সেটাকে সরাতে পারছি নে।

পদ্মার সূর্যোদয় মনের অনেকখানি বেদনা প্রতিবারই কমিয়ে দিয়েছে। রেলিঙের পাশে বসে, তারই উপর মাথা কাৎ করে তাকিয়ে আছি আকাশের দিকে, যেখানে কালো-সাদার মাঝখানে আস্তে আস্তে গোলাপি আভা ফুটে উঠছে। পদ্মার জল রাঙা হয়ে গেল, মহাজনী নৌকোর পাল ফুলে উঠে মাঝখানটায় গোলাপি মেখে নিয়েছে, দূরের পাখী আর এ-পৃথিবীর পাখী বলে মনে হচ্ছে না, কোন নন্দন-কাননের মেহদি পাতার রস দিয়ে যেন ডানা দুটি লাল করে নিয়েছে।

ঐ তো সূর্য, ঐ তো সবিতা!

জাহাজ জোর ফালতো স্টীম ছাড়ছে। তারই উপর ক্ষণে ক্ষণে রামধনুর রঙ খেলে যাচ্ছে। মাঝি মাল্লাদের চেঁচামেচি কেমন যেন আর কর্কশ বলে মনে হচ্ছে না। পাশে মোল্লাজীর নমাজ পড়া শেষ হয়েছে। সুর করে কোরান পড়তে আরম্ভ করেছেন। হাওয়াতে তাঁর দাড়ি দুলছে, পাগড়ীর ন্যাজ দুলছে। বরযাত্রীর দল যাচ্ছে, না কনে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, কে জানে—একমাথা সিঁদুর-মাখা একটি মেয়ে ঘন ঘন শাঁখ বাজাচ্ছে। হিঁদু বাড়িতে তো শাঁখ শুনেছি সন্ধ্যে বেলায়, ভোরেও বাজায় নাকি? কে জানে?

উত্তমার্ধ নগ্ন, জাহাজের রশির মত মোটা ধবধবে পৈতে-ঝোলানো এক ব্রাহ্মণ বললেন, 'দেখো ত, মিয়া, ঠিক ঠিক রাজবাড়ির টিকিট দিয়েছে তো? যা ভিড় ছিল, কি দিতে কি দিয়ে বসেছে কে জানে? চশমাটাও হারিয়ে গিয়েছে।'

রসভঙ্গ হল অস্বীকার করিনে, কিন্তু কাতর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ; অবহেলা অবিনয় করলে মর্শীদ-মুরুব্বীর মারাত্মক অভিসম্পাৎ লাগবে। বেশ করে দেখে নিয়ে বললুম, 'আজ্ঞে (আগে হলে একথা বলার প্রয়োজন হত না যে, মুরুব্বীরাই ছেলে-বেলায়ই আমাদের পই-পই করে শিখিয়ে-ছিলেন, হিন্দু গুরুজনদের সঙ্গে কথা কইতে হরদম 'আজ্ঞে'—বাঙলা ভাষায় 'আইগা' বলতে হয়), ঠিকই দিয়েছে; আপনাকে ঠকাতে যাবে কোন্ পাষণ্ড?'

ব্রাহ্মণ ভারি খুশি। আমার পাতা-বিছানাতে পরম পরিতৃপ্ত ভরে গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ একটা গল্প মনে পড়ে গেল।

তরকারি বেচনে-ওলা গেছে জাহাজ-ইস্টিশানে টিকিট কাটতে—

'বাবু —অ—অ—অ, অ— বাবু, নারানজোর (নারায়ণগঞ্জ) এ্যাখ্খান টিকস দিবাইন নি?'

বাবু বললেন, 'ছ' আনা।

তরকারি-ওলা বললে, 'বাবু অ—অ—অ, চারি আনায় অইব না?'

বাবু পশ্চিম বাঙলার লোক, ওনাদের মেজাজ আমাদের দ্যাশে এলে একটুখানি মিলিটারি হয়ে যায়। খেঁকিয়ে বললেন, 'দে ব্যাটা দে, ছ' আনা দে।'

গভীর বেদনা সহকারে তরকারি-ওলা বললে, 'বাবু অ—অ; তুমি অ—অ; তুমি আমার দোকানে রোজ রোজ আও। কদ্দুর মুলাডা কিনো। দরদাম করো। আর আমি আইলাম তোমার দোকানে এগ্ দিন। দরদাম করতা গেলাম—তুমি অমন খাটাশের মতন মুখডা করলায় ক্যান্?'

মনে আমার সন্দেহ জাগছে, চতুর পাঠক বিশ্বাস করতে চান না, জিনিভার জাহাজে বসে আমার এ 'নারানজী' (নারায়ণগঞ্জী) গল্প সত্যই মনে পড়েছিল কি না।

কেন পড়েছিল বলছি।

ইয়োরোপের সব দেশের ভিতর সুইজার-ল্যান্ডই সবচেয়ে 'এক দরে বিক্রি।' সেখানে দরদস্তুর করতে গেলে (আমি বাঙাল, তাই করেছিলুম) সুইস এমনই বোকার মত তাকায়, কিংবা খেঁকিয়ে ওঠে যেন তাকে আমি ড্যাম্ মিথ্যেবাদী বলে সন্দ করছি।

অথচ দেখুন, ইয়োরোপীয়রা আমার দেশে হামেশাই দরদস্তুর করে। আমি যদি তরকারি-ওলার মত ওদেশে একবার গিয়ে দরদস্তুর করি, তবে ওরা 'খাটাশের মত মুখ করবে ক্যান্?'

ইতিমধ্যে মধ্য দিনের তপ্ত হাওয়া আমার মন উদাস করে দিয়েছে। মেঘের ডাকে, নব বরষণে বাঙালীর মন কেমন যেন গভীর বেদনায় ভরে যায়, আর সে মনটা উদাস হয়ে যায় দুপুর বেলার আকাশের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন বুকে বেজে উঠে, আমি এ সংসারে নেই, এখানকার সুখ-দুঃখের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু ওরকম ধারা মন খারাপের দাওয়াই জাহাজে মজুদ। হঠাৎ অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল:

'গোলাপ বাগানে, সান্সুসির,
গোলাপ বাগানে—

কি হয়েছিল?

'সেই গোলাপবাগানে আমি মেরিকে চুমো খেয়েছিলুম—

প্রথম চুম্বন তো মানুষ কখনো ভুলতে পারে না।'

ব্রিটিশ লেবার পার্টীর অন্তর্কলহ

এ্যাটলি মন্ত্রিসভা থেকে মিঃ বিভ্যানের পদত্যাগের আগে থেকে বৃটিশ লেবার পার্টির মধ্যে যে ঝগড়া চলছিল, সম্প্রতি সেটা একটু বেশ তীব্রভাবে ফুটে বেরিয়েছে। পার্লামেণ্টে দেশরক্ষা বিষয়ক বিতর্ক প্রসঙ্গে লেবার পার্টির পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব পেশ করা হয়, তার উপর ভোটাভুটির সময়ে পার্টির ৫৭ জন সদস্য ভোট দিতে বিরত থাকেন, যদিও ভোট দেবার জন্যে পার্টির কড়া হুইপ ছিল। কোনো পার্টির পক্ষে এরূপ "বিদ্রোহ" অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়, তাহলে পার্টির ডিসিপ্লিন থাকে না, কিন্তু এক্ষেত্রে ডিসিপ্লিন রাখতে গিয়ে পার্টি কতটা ঘায়েল হবে তাও একটু আশঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ দু'পাঁচজন তো নয়, ৫৭ জন সদস্যকে দোরস্ত করার প্রশ্ন এবং কেবল পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্যে নয় পার্লামেণ্টের বাইরেও পার্টির মধ্যে এবং ট্রেড য়ুনিয়নগুলির মধ্যেও মিঃ বিভ্যানের সমর্থকদের সংখ্যাও যে নিতান্ত কম নয় সেটা পার্টির গত কর্মকর্তা নির্বাচনের সময়ে দেখা গিয়েছিল।

গত অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচনের সময়ে লেবার পার্টি নিজের ভিতরকার মত-বিরোধ যতদূর সম্ভব চেপে রাখতে সমর্থ হয় যদিও তাই নিয়ে লেবারকে খাটো করতে কনজারভেটিবরা প্রোপাগান্ডা করতে কিছু কসুর করে নি, তাতে নির্বাচনে লেবারের যে কিছু ক্ষতি হয় নি তা নয়, তবে মোটের উপর তখন লেবার পার্টি একগাট্টা হয়েই ছিল। কিন্তু পার্টির ভিতরে যে মতবিরোধ জমে উঠ্‌ছিল, সেটা তাতে দূর হয় নি, এখন দেখা যাচ্ছে সেই মতবিরোধ পার্টির পক্ষে একটা সংকটের আকার ধারণ করেছে।

পার্লামেণ্টে যাঁরা পার্টির তরফে-আনা প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদানে বিরত থাকেন, তাঁরা মনে করেন যে, পার্টির বর্তমান নেতারা বড়ো বেশি চার্চিল গভর্ণমেণ্ট বা কনজার-ভেটিভ নীতির কাছাকাছি এসে পড়েছেন। এ্যাটলি গভর্মেণ্ট গত বৎসর যে বিরাট পুনরস্ত্রীকরণের প্রোগ্রাম গ্রহণ করেন, তাতে সায় দিতে না পেরেই মিঃ বিভ্যান মন্ত্রিপদ ত্যাগ করেন। মিঃ বিভ্যানের আপত্তির প্রধান কারণ ছিল যে, অতবড়ো পুনরস্ত্রী-করণের প্রোগ্রামের ভার বৃটেনের সইবে না, বইতে গেলে লেবার গভর্ণমেণ্টের আমলে জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে যে-সব জনহিতকর ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে, সেগুলো খাটো করতে হবে, সাধারণের জীবন-যাত্রার মান নিচু হয়ে যাবে। আমেরিকার চাপে বৃটেনের অত বড়ো পুনরস্ত্রীকরণের বোঝা নিতে স্বীকার করা মিঃ বিভ্যান সমর্থন করতে পারেন নি। এই রকম সর্তে মার্কিন সাহায্য নেওয়া বৃটেনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়া মিঃ বিভ্যান বলেছিলেন যে, পুনরস্ত্রীকরণের প্রোগ্রামে প্রথম বছরে যত টাকা খরচের বরাদ্দ করা হয়েছে, প্রথম বছরে তত টাকার কাজ করাই সম্ভব হবে না, কারণ সেটা বৃটেনের তদানীন্তন শিল্প ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে কোনো-রকমেই খাপ খাওয়ানো যাবে না। এবিষয়ে মিঃ বিভ্যানের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ ফলেছে, এমনকি মিঃ বিভ্যান যতটা আশঙ্কা করেছিলেন, তার চেয়েও বেশি করে ফলেছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, এ্যাটলি গভর্ণমেণ্ট যে গতিতে পুনরস্ত্রীকরণের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি, চার্চিল গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও তা পারা সম্ভব নয়। পুনরস্ত্রীকরণের পূর্বপরিকল্পিত গতির অন্তত তিনভাগের একভাগ কমিয়ে দিতে হয়েছে।

কিন্তু মিঃ এ্যাটলি ও মিঃ মরিসনের সঙ্গে তথা মিঃ চার্চিলের সঙ্গে মিঃ বিভ্যানের ঝগড়া কেবল পুনরস্ত্রীকরণের পরিমাণ বা গতি নিয়ে নয়। আসলে মিঃ বিভ্যানের আপত্তি হচ্ছে বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেবার পার্টির মধ্যে একদল বরাবরই অনুভব করেছে যে, লেবার গভর্মেণ্টের পররাষ্ট্রনীতি বড্ড বেশি কনজারভেটিবদের লাইনে চলেছে, পরলোক-গত মিঃ বেভিনের পররাষ্ট্রনীতিচালনা কনজারভেটিবরা পছন্দই করত। মিঃ বেভিনের পররাষ্ট্রনীতিচালনা সম্পর্কে লেবার পার্টির বাম-অংশে একটা বিরুদ্ধভাব বরাবরই ছিল। কখনো কখনো সেটা এমন-ভাবেও প্রকাশ পেয়েছে, যার জন্য ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশন নিয়ে দুএকজনকে পার্টি থেকে বার করে দেয়াও হয়েছে। মোটের উপর এরা চায় বৃটেন যেন আমেরিকার তাঁবেদার হয়ে না পড়ে। আমেরিকার চোখ দিয়ে এরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দেখতে চায় না। ভালো হোক, মন্দ হোক, আমেরিকা যে দিকে ছুটবে বৃটেনকেও তার পিছন পিছন সেদিকে ছুটতে হবে, এটা এরা কাম্য বলে মনে করে না। যুদ্ধের সম্ভাবনাও এরা কেবল মার্কিন মাপকাঠি দিয়ে মাপতে নারাজ। সুদূর প্রাচ্যে আমেরিকার নীতি সম্বন্ধে এরা অত্যন্ত সন্দিহান। বিশেষ করে, আমেরিকা চীনের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে তাতে ইংরেজদের জড়িয়ে ফেলতে পারে এই আশঙ্কার দরুণ এরা সর্বদা আমেরিকার উপর সতর্কদৃষ্টি রাখার পক্ষপাতী। কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতির চুক্তি করে পরে যদি তার সর্ত ভঙ্গ করা হয়, তবে যুদ্ধ কোরিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকবে না, চীনের উপরও সাক্ষাৎভাবে আক্রমণ হবে, এই রকম একটা শাসানি মার্কিন কর্তৃপক্ষদের মুখ থেকে কিছুদিন পূর্বে শুনা যায়। মার্কিন কংগ্রেসের সম্মুখে মিঃ চার্চিলের বক্তৃতার একটি উক্তি থেকে মনে হয় যে, তিনি মার্কিন গভর্মেণ্টকে বলেছেন যে, এবিষয়ে বৃটিশ গভর্মেণ্ট তাঁদের সঙ্গে আছেন। এই নিয়ে বৃটেনে খুব হৈ চৈ হয়। মিঃ চার্চিল মিঃ ট্রুম্যানকে ঠিক কী বলেছেন, সেটা জানতে চায় লোকে। পার্লামেণ্টে দেশরক্ষা বিষয়ক বিতর্কের সময়ে মিঃ চার্চিল বলেন যে, লেবার গভর্মেণ্টের সময়ে যে নীতি ছিল সেটার কোনো পরিবর্তন হয় নি। তিনি আরো বলেন যে, লেবার গভর্মেণ্টের আমলে মিঃ মরিসন যখন পররাষ্ট্রসচিব ছিলেন, তখন তিনি মার্কিন গভর্মেণ্টকে স্পষ্ট জানিয়ে-ছিলেন যে, কোরিয়ার বাইরে থেকে যদি কম্যুনিস্ট এরোপ্লেন আক্রমণ চালায়, তবে এপক্ষ থেকেও কোরিয়ার বাইরে আক্রমণ করা চলবে এটা বৃটিশ গভর্মেণ্ট মানছেন। মিঃ চার্চিলের এই জবাবে লেবার পার্টি একটু বেকায়দায় পড়েছে, বিশেষ করে পার্টির দক্ষিণপন্থী নেতারা। মিঃ বিভ্যানের দল জানতে চাইছে মিঃ মরিসন যদি মার্কিন গভর্মেণ্টকে পূর্বোক্ত কথা বলে থাকেন, তবে তা ইতিপূর্বে তাদের জানানো হয় নি কেন? মিঃ বিভ্যান লেবার পার্টির একজিকিউটিভ-

এর সভা ডাকবার অনুরোধ জানিয়েছেন। অন্যদিকে পার্লামেণ্টে পার্টির হুইপ অমান্য করে ভোটদানে বিরত থাকার জন্য মিঃ বিভ্যান ও তাঁর সাথীদের সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির করার জন্য পার্লামেণ্টারী লেবার পার্টির সভা বসছে।

বৃটিশ লেবার পার্টির ইতিহাসে একটা নূতন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছে বলে মনে হয়। ১৯৩১ সালে র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের দক্ষিণপন্থী নীতির ফলে লেবার পার্টি যেমন একবার ভেঙে ছিল, এবারও দক্ষিণ-পন্থী নেতাদের কর্মফলে সেই রকম কিছু হবে বলে কেউ কেউ আশংকা, কেউ কেউ বা আশা করছে। কিন্তু ১৯৩১ সালের নাটকের পুনরভিনয় আর সম্ভব নয়। তার প্রধান কারণ, বৃটেনের জনসাধারণের মধ্যে লেবার পার্টির ভিত্তি কুড়ি বছর আগেকার তুলনায় এখন অনেক বেশি প্রশস্ত ও দৃঢ়। নিচের ঐক্যই উপরকে রক্ষা করবে। পার্টিতে মিঃ বিভ্যান ও তাঁর সাথীদের শক্তি বাড়বে বলেই মনে হয়। ৯।৩।৫২

বিজ্ঞান কৌতুক

চক্রদত্ত

খুব ঠাণ্ডায় চুপ করে বসে থাকলে কাঁপুনী ধরে না, ঘুরে বেড়ালে কাঁপুনী বেশী হয় সেই নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা মাথা ঘামাচ্ছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই-জন বৈজ্ঞানিকের মতে ঠাণ্ডায় বসে থাকলে কাঁপুনী কম হয় বরং তারপর ঘুরে বেড়ালেই কাঁপুনী ধরে। পরীক্ষার জন্য ২০ থেকে ৩৭ বছর বয়স্ক নয়জন লোক এরা ঠিক করলেন। ৪৫ থেকে ৫৫ ডিগ্রী পর্যন্ত ঠাণ্ডা জলে এদের পা ১৫" ইঞ্চি পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হলো। এইভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত চুপচাপ বসে থাকার পরও তাদের মধ্যে কাঁপুনী দেখা যায় নি। কিন্তু ঠাণ্ডা জল থেকে পা তুলে চল্‌তে আরম্ভ করার পর ৪ থেকে ১৭ মিনিটের মধ্যেই তাদের কাঁপুনী আরম্ভ হলো। বৈজ্ঞানিক দু জনের মত হচ্ছে, যতক্ষণ পা ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল ততক্ষণ পর্যন্ত ঠাণ্ডা রক্ত খুব কম পরিমাণে শরীরের ওপর দিকে উঠছিল কিন্তু জল থেকে পা তুলে নিয়ে চলা ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই পেশী সমূহ সচল হয়ে যায় এবং রক্ত চলাচল বেড়ে গেল সুতরাং ঠাণ্ডা রক্ত তখন শরীরের ওপর দিকে উঠতে আরম্ভ করে এবং সারা দেহে কাঁপুনী আরম্ভ হয়।

*

কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। বেশী পরিমাণে এই গ্যাস যদি ফুসফুসের ভেতর যায় তাহলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায় পরে মারাও পড়তে পারে। এই গ্যাস অল্প পরিমাণে কোন স্থানে থাকলে এর অস্তিত্ব বোঝার অসুবিধা হয়—বিশেষতঃ উড়ো জাহাজ, মোটর তৈরীর কারখানায়, খনি ইত্যাদিতে। এক নতুন উপায়ে এই গ্যাস আছে কিনা সেটা বোঝবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যন্ত্রটি হচ্ছে দুদিক মুখ বন্ধ একটা কাঁচের তৈরী নল। নলটার ভেতরে খানিকটা হলদে রংয়ের রাসায়নিক বস্তু দেওয়া থাকে। এ ছাড়া একটা রবারের থলিও নলটার সঙ্গে থাকে। কোথাও পরীক্ষা করে দেখবার সময় নলটার দুদিককার মুখ ভেঙে ফেলে একটা মুখ রবারের থলিটার ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তার পর

যন্ত্রটির সাহায্যে গ্যাস আছে কিনা দেখা হচ্ছে

রবারের থলিটার উপর চাপ দেওয়া মাত্র বাতাস নলের খোলা মুখটা দিয়ে থলের ভেতর ঢোকে। বাতাস নলের ভেতর দিয়ে আসার দরুণ যদি দেখা যায় যে, নলের ভেতরকার হলদে রং-এর বস্তুটার রং বদলে সবুজ হয়ে গেছে তাহলে বুঝতে হবে যে, সেখানে মনোক্সাইড গ্যাস আছে। সবুজ রংটা যত বেশী ঘোর হবে বুঝতে হবে যে, সেখানে তত বেশী পরিমাণে গ্যাস আছে। রং-এর তারতম্য থেকে গ্যাসের পরিমাণ বোঝবার জন্য এর সঙ্গে একটা ছাপান চার্ট থাকে।

*

যক্ষ্মার ওষুধ স্ট্রেপ্টোমাইসিন ও প্যারা-অ্যামিনো স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের বিস্ময় কাটতে না কাটতে নতুন আর একটি সংশোধিত ওষুধের কথা শোনা যাচ্ছে। ওষুধটির নাম হল নাইড্রাজিড। এ ওষুধটি আবিষ্কার করেছে বিখ্যাত মার্কিন প্রতিষ্ঠান ই আর স্কুইব অ্যান্ড সনস্। উ প্রতিষ্ঠানের যে গবেষণা বিভাগ আছে স্কুইব ইনস্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চ তার অধ্যক্ষ ডক্‌টর জিওফ্রে রেক এই ওষুধ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে যেয়ে বলেন যে বাজার-চলতি যে দুটি ওষুধ আছে সেগুলি রোগ আরোগ্য করতে পারলেও তাদের কিছু কিছু অসুবিধাও আছে, সেইজন্য রোগের প্রথম অবস্থায় অনেক সময় ওষুধ দুটি ব্যবহার করা যায় না, কিন্তু নতুন ওষুধে এইরকম কোন অসুবিধা নেই। তাছাড়া দুটি চলতি ওষুধের সঙ্গে এই নতুন ওষুধটিকেও একত্রে ব্যহার করা চলবে।

স্কুইব প্রতিষ্ঠান কিছুদিন যাবৎ যক্ষ্মার একটি ভাল ওষুধের জন্য গবেষণা করছেন এজন্য তাঁরা বহু লোক নিয়োগ করেছেন এবং প্রচুর অর্থব্যয় করছেন। তাঁরা থায়োসেমিকার্বাজোন নামে একটি যৌগিক রসায়ন থেকে এই নতুন ওষুধটি তৈরী করেছেন যতদূর পরীক্ষা করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, নাইড্রাজিড প্যারা-অ্যামিনো স্যালিসাইলিক অ্যাসিড অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী এবং এর অন্যতম সুবিধা এই যে, একে মুখ দিয়ে খাওয়ানো চলে এবং এর কোন প্রতিক্রিয়া নেই বললেই চলে।

ভারতবর্ষে স্কুইবের ওষুধ প্রস্তুতকারক সরাভাই কেমিক্যালস্ মারফৎ ওষুধটি পাওয়া যাবে।

জব্বলপুরের স্মৃতি

শ্রীসরলাবালা সরকার

জব্বলপুরের সঙ্গে আমার সোনাদাদার স্মৃতিও অঙ্গাঙ্গীভাবে যেন এক হইয়া আছে, তাই সে স্মৃতি আজিও এত উজ্জ্বল।

আমার সোনাদাদা (স্বর্গীয় প্রফেসার তড়িৎকান্তি বখ্সী) অতি অল্প বয়সেই জব্বলপুরে কলেজের প্রফেসার হইয়া যান এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেইখানেই ছিলেন। তাঁহার জব্বলপুর এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার সকল আত্মীয়কেই জব্বলপুরে যাইবার জন্য বার বার আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই আমন্ত্রণেই আমার নর্মদা-প্রপাত দর্শন করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল।

'জব্বলপুর' কথার বাঙলা অর্থ প্রস্তরপুর বা পাহাড়পুরী। ছোট ছোট পাহাড় জব্বলপুরে অনেক আছে, কিন্তু তুষারশুভ্র মর্মর পাথরের পাহাড়ের জন্যই স্থানটি বিখ্যাত।

সোনাদাদা অতি অল্প দিনের ভিতরেই জব্বলপুরে সর্বজন পরিচিত এবং অতিশয় জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। 'বখ্সী সাহেব' বলিলে তাঁহাকে চিনিত না, এমন কেহ ছিল না; এমনকি টাঙ্গাওয়ালা অর্থাৎ টাঙ্গাগাড়ির চালকেরাও এমনভাবে তাঁহাকে চিনিয়া লইয়াছিল যে, স্টেশনে কোন নূতন আগন্তুক বাঙালী যদি ধর্মশালার খোঁজ করিতেন, তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে ধর্মশালার পরিবর্তে বখ্সী সাহেবের বাড়ি আনিয়া উপস্থিত করিত এবং দুয়ারে দাঁড়াইয়া হাঁক দিত, "বাহারওয়া, এ রামনাথ, আম্মাজীকো খবর দেও, নয়া বাঙালীবাবু আ গিয়া।" জব্বলপুরে বাড়ির চাকরকে বাহারওয়া ও চাকরাণীকে বাহারওয়ানী বলে। 'বাহার' কথার অর্থ ঝাড়ু দেওয়া, অর্থাৎ ঘরদুয়ার পরিষ্কার করা।

হিন্দী ভাষায় আমার জ্ঞান খুবই অল্প, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের নানা দেশে মাঝে মাঝে থাকিতে হইয়াছিল বলিয়া দু-একটা কথা মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, তবে কথাগুলির ভাবার্থ বুঝিতে বাধা হয় না।

সময়ে বা অসময়ে যখনই যে কোন অতিথি আসিতেন এ বাড়িতে, তিনি যেন বাড়িরই লোক, এইরূপ ব্যবহার পাইতেন, কোন সঙ্কোচ করিবার সুবিধাই পাইতেন না। বাঙালী অভ্যাগতের কথা দূরে থাকুক, ভিন্ন দেশীয় অতিথিও মাঝে মাঝে বখ্সী সাহেবের নামে আকৃষ্ট হইয়া সোনাদাদার বাড়িতে পদার্পণ করিতেন। একবার এক অঘোরপন্থী সাধু আসিয়াছিলেন। সোনাদাদা এমন তৎপরতার সহিত তাঁহার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিলেন যে, আমি আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলাম। বৈঠকখানার একদিক ঘিরিয়া তাঁহার ছোট একটি আস্তানা করিয়া দেওয়া হইল, রামনাথ ছুটিল গাঁজা কিনিতে। সোনাদাদা কলেজে যাইবার সময় সকলকেই সতর্ক করিয়া গেলেন, যাহাতে সাধুটির কোন অসুবিধা না হয়। বালানন্দ স্বামীও একবার সদলবলে সোনাদাদার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি মাঘ মাসে নর্মদা তীরে কল্পবাস করিবার জন্য দেওঘর হইতে জব্বলপুরে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন দশ-বারোজন শিষ্য, দুই গাড়ি বাসন-পত্র এবং আরও দুই গাড়ি অন্যান্য মাল তাঁহার সঙ্গে ছিল। মাসীমা সন্ন্যাসীর এই গৃহস্থালী দেখিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, আপনার ভ্রমণকালীন গৃহস্থালীর সামগ্রী তো আমাদের গৃহের সামগ্রীর দশগুণ দেখিতেছি।" স্বামীজীও হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "মাঈজী, হামারা গৃহ তো বহুৎ বড়া, উসিকো ওয়াস্তে চিজ্ বাজও বড়া বড়া হ্যায়" এই বলিয়া তিনি প্রকাণ্ড রন্ধন পাত্রগুলিকে নির্দেশ করিয়াছিলেন। একবার স্যার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার মহাশয়ও সপরিবারে আসিয়াছিলেন।

দেশের অধিবাসী। এখানে একত্রে এমনভাবে বসবাস করিতেন, যেন তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। নানা দেশের নানা ভাষা, আচার-অনুষ্ঠানও বিভিন্ন, জীবনযাত্রার মানও বিভিন্ন স্তরের, তবুও সকলের সহিত সকলের যেন অদৃশ্য একটি মিলন-সূত্র ছিল। প্রায়ই নানা স্থান হইতে আমাদের নিমন্ত্রণ আসিত। কাহারও বাড়িতে ঝুলনায় ডালা হইবে, অর্থাৎ ছয় দিনের একটি শিশুকে দোলনার উপর স্থাপন করা হইবে। নিমন্ত্রিতগণ একটি বরদরী অর্থাৎ সতরঞ্চিতে পাশাপাশি গিয়া বসিতেন। সকলেই শিশু ও শিশুর জননীর জন্য কিছু কিছু উপহার লইয়া যাইতেন। এই নিমন্ত্রণ কেবল মেয়েদের জন্য। প্রকাণ্ড এক গামলায় ভিজা ছোলা আছে, কাঠের হাতা ভরিয়া সেই ছোলা প্রত্যেকের বস্ত্রাঞ্চলে দেওয়া হইল, সেই সঙ্গে দেওয়া হইল একটি করিয়া কলা বা ছোট একটি শুষ্ক নারিকেল। এইভাবে আমন্ত্রিতগণের সম্বর্ধনা করা হইল। হয়তো কিছু গীত-বাদ্যও হইল।

আবার সোনাদাদার বন্ধু প্রফেসার শ্রোতের বাড়ি শ্রোতের প্রথম পুত্র 'গবাইয়ের' মৌঞ্জি-বন্ধন বা উপনয়ন উপলক্ষ্যে পাঁচ-ছয় দিন ধরিয়াই উৎসব চলিল। নানা দেশ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। প্রকাণ্ড উঠানে যজ্ঞীয় বেদী নির্মিত হইল, সেখানে সমবেত কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের যে ধ্বনি উঠিল তাহা যেন বহুযুগের অতীতকালের আরণ্য আশ্রমের স্বপনলোকে মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

মারাঠী ও মাদ্রাজী পরিবারের মেয়েরা পর্দানশীন নয়। সোহাগিন অর্থাৎ সধবা মেয়েরা মাথায় অবগুণ্ঠন দেন না, কেননা, তাঁহাদের মস্তকের উপর ছত্রস্বরূপ স্বামী রহিয়াছেন। কাজেই তাহাদের অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আত্মগোপন করিবার কোন প্রয়োজনই নাই, বরং যদি কেহ অবগুণ্ঠন দেন, তবে তাঁহার স্বামীর তাহাতে অকল্যাণ ও অপমান করা হয়। এজন্য বৃষ্টির সময় তাঁহারা মাথায় ছাতাও দেন না। তবে যাঁহারা 'বেবা' অর্থাৎ বিধবা তাঁহারাই মাথায় কাপড় দিয়া থাকেন। সোহাগিনদের মর্যাদা খুবই বেশি; প্রত্যেক শুভকার্যে সধবার অর্চনা একটি বিশেষ

কল্যাণ অনুষ্ঠান। সধবার অর্চনার সময় তাঁহার স্বামীকেও সেই সঙ্গে অর্চনা করিতে হয়, অর্থাৎ দম্পতি যুগলভাবে অর্চিত হইবেন, ইহাই মহারাষ্ট্রীয় প্রথা। স্রৌতের ছেলের উপনয়নে বেচারা গবাই অস্পৃশ্য হইয়া গৃহের ভিতর বন্ধ রহিয়াছে; এদিকে তাহার মা ও বাবা এবং পিসিমা ও পিসা-মহাশয়কে লইয়া অর্চনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাদের হলুদ মাখানো হইতেছে, আমাদের দেশে বর ও কন্যাকে যেমন গায়ে হলুদ দেওয়া হয়, ঠিক সেই রকম। স্রৌতেকে হলুদ মাখাইতেছেন সিনিয়ার প্রফেসার ডোলের স্ত্রী। স্রৌতে বেশ হাসিমুখে কাঠের পিঁড়ির উপর বসিয়া সর্বাঙ্গে হলুদ মাখিতেছেন। যে সম্মানিতা মহিলাটি হলুদ মাখাইতেছেন এবং যে ভদ্রলোক মাখিতেছেন, তাঁহাদের কাহারও কোন আড়ষ্ট ভাব নাই।

হলুদ মাখানোর পর স্নান, নববস্ত্র, পুষ্পমাল্য প্রভৃতি পরিধান এবং তাহার পর ভোজগ্রহণ। দম্পতি একই কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয়ে উভয়কে আহার করাইয়া দিলেন, সেই সময় শঙ্খধ্বনিও করা হইল। এই মাঙ্গলিক ক্রিয়া দেখিবার জন্য বাড়ির সকলের সহিত নিমন্ত্রিতগণও সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন, মাসিমাও সেখানে উপস্থিত। বৃদ্ধ বলবন্ত স্রৌতে ও তাঁহার পত্নী গঙ্গাবাঈ (ইঁহারা স্রৌতের পিতা ও মাতা) সম্মুখে থাকিয়া সস্মিত-মুখে এই মঙ্গল অনুষ্ঠান দেখিতেছিলেন। বলবন্তজী মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আম্মাজী, আপ্‌কা বাংলা মুলুক্‌মে এইসিন চাল হ্যায়?" মাসিমা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "নেহি নেহি আপ্পাজী, হামারা মুলুক্‌মে ইয়েতো শরমকি বাত হ্যায়।" সম্মানিত গুরুজনদের সম্মুখে বধূর এইরকম সংকোচহীনতা ও স্বামীকে এ-ভাবে আহার করানো মাসিমা মোটেই পছন্দ করেন নাই। কিন্তু তিনিই আবার যখন পরিবেশন কার্যে অপর দুই বধূকে নিযুক্তা দেখিলেন তখন বেশ খুসী হইলেন। এই দুই বধূ স্রৌতের দুই কনিষ্ঠা ভ্রাতৃ-বধূ, ইঁহাদের নাম জানকীবাঈ ও লক্ষ্মী-বাঈ। আঠারো হাত রেশমী কাপড় এমনভাবে কাছা ও কোঁচা দিয়া আটসাঁট করিয়া পরা হইয়াছে যে, আঁচল খুলিয়া পড়িবার কোন সম্ভাবনাই নাই। গৌরবর্ণ সুন্দর মুখশ্রী, ললাটে গোল একটি সিঁদুরের ফোঁটা। কপালের উপর চূর্ণকুন্তল আসিয়া পড়িয়াছে। সেগুলি পরিশ্রমজনিত ঘর্মবিন্দু-সিক্ত। দুই হাতে প্রকাণ্ড ভোজ্য পরিপূর্ণ থালা, থালার উপর একখানি দর্বি অর্থাৎ বড় পিত্তলের গোল হাতাও রহিয়াছে। উভয় সারির ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্য দিয়া বধূরা যে-ভাবে অতি দ্রুত ও নিপুণ হস্তে পরিবেশন করিয়া চলিয়াছেন দেখিলে আশ্চর্য ও মুগ্ধ হইতে হয়। মাসিমা মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মৃদু স্বরে বলিলেন, "কাশীর অন্নপূর্ণাই যেন মূর্তি ধরেছেন।"

এই ব্রাহ্মণ ভোজন, এ এক বিরাট ব্যাপার। প্রথমে বড় বড় ঠোঙ্গায় প্রত্যেক ভোজনপাত্রের কাছে গাওয়া ঘি পরিবেশন করা হয়, তাহার পর পরিবেশন করা হয় পুরাণ্‌পুরী অর্থাৎ ভিতরে পুর দেওয়া তাওয়ায় সেঁকা রুটি, ভাজি ও বড়া প্রভৃতি। এই রুটি ঘিয়ে ভিজাইয়া খাইতে হয় এবং ঘি যদি ফুরাইয়া যায় দ্বিতীয়বার লোটায় ভরিয়া ঘি আনিয়া পরিবেশন করা হয়। তাহার পর লাড্ডু ও পিষ্টক পরিবেশন করা হয়। লাড্ডু প্রভৃতি সমস্ত বাড়িতেই মেয়েরা প্রস্তুত করিয়াছেন। গাওয়া ঘি ও গোধূমচূর্ণ এবং শর্করা এইগুলি লাড্ডুর উপকরণ; লাড্ডুগুলি বেশ বড় বড়, প্রথম বারেই আটটি করিয়া লাড্ডু প্রত্যেক পাতে দেওয়া হয়। তাহার পর সুগন্ধি আতপান্ন গোল হাতায় চাপিয়া গোল বাটীর মত আকারে পরিবেশন করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে কাঢ়ি অর্থাৎ শবজি দিয়া ঘোলের অম্ল এবং ডালের বড়াও দেওয়া হয়। ইহার পর আবার লাড্ডু, যে যতটি খাইতে পারেন। পরিশেষে দধি ও অন্ন এবং সর্বশেষে ক্ষীর ছানা ও মেওয়া দ্বারা প্রস্তুত শর্করা-মিশ্রিত অমৃতখণ্ড নামে একপ্রকার পরমান্নের মত দ্রব্য পরিবেশন করা হয়। ভোজনের সময় ভোজনের স্থানের পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক ভোজন-স্থানের চারিধারে আলিপনার রেখা অঙ্কন করা হয়। এই রেখা-অঙ্কনের পদ্ধতি এইরূপ যে, শ্বেতচূর্ণপূর্ণ একটি সচ্ছিদ্র কারু-কার্যময় পিচ্‌কারীর মত ফাঁপা নল প্রত্যেক ভোজন-স্থানের পাশে পাশে গড়াইয়া লইয়া গেলেই ভিতরের শ্বেতচূর্ণ ঝরিয়া পড়িয়া সুন্দর একটি রেখা অঙ্কিত হইয়া যায় এবং অতি দ্রুত আলপনা দিবার কার্যটি সমাধা হইয়া যায়।

রন্ধন-গৃহের অর্থাৎ চৌকার পবিত্রতা রক্ষার সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম আছে। স্নান করিয়া, পবিত্র বস্ত্র পরিয়া রন্ধন ঘরে প্রবেশ করিতে হয়; যদি কোন কারণে বাহিরে আসিবার প্রয়োজন হয় তবে আবার স্নান করিয়া তাহার পর রন্ধন-গৃহে প্রবেশ করিতে হইবে এইরূপ নিয়ম।

স্রৌতের বাড়ি আমাদের বাড়ির একেবারে পাশেই। তাই মারাঠী ব্রাহ্মণের বাড়ির নিয়মগুলি জানিবার খুবই সুবিধা হইয়াছিল; স্রৌতের মার কাছে মাদ্রাজী ব্রাহ্মণদের বাড়ির আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছিলাম।

স্রৌতের মা অবসর পাইলেই সোনাদাদার বাড়ি আসিতেন, সোনাদাদাকে তিনি নিজের ছেলের মতই স্নেহ করিতেন। মাসিমা নির্জলা একাদশী করেন এজন্য তিনি তাঁহাকে মাঝে মাঝে অনুযোগ করিয়া বলিতেন, বখ্‌সীর মা, তুমি এক সন্তানের জননী, কি করে এমনভাবে নির্জলা অনশনে থেকে সন্তানের অকল্যাণ কর? বরং নারায়ণের প্রসাদ 'ফলাহারের চিজ' তো কিছু খেতে পার তাতে অনশনের হানি হয় না। 'ফলাহারের চিজ' বলিতে পাণিফলের পালো বা তিখুরের পালো দিয়া প্রস্তুত ঘিয়ে ভাজা মিষ্ট দ্রব্য বুঝায়। এই সব মিষ্টান্ন নারায়ণের ভোগে দেওয়া হয়।

স্রৌতেও সর্বদা এ বাড়িতে আসিতেন, আমাকে কখনও বহিন্‌ কখনও বা বৌদী বাঈ বলিতেন। শিবরাত্রির পরদিন তাঁহাকে যখন আমি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলাম তখন তিনি হাত বাড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'বহিন্‌, দখ্‌ষিণা দেও,' সেই কথাটি আজিও মনে পড়ে।

স্রৌতের পিতা বলবন্তজীর অবস্থা আগে খুবই খারাপ ছিল, সেই সব দিনের গল্প মাঝে মাঝে স্রৌতের মা মাসিমার কাছে বলিতেন। ছেলেদের তিনি ঘৃতহীন শুখা রোটি' খাইতে দিতেন সে দুঃখ এখনও তাঁহার মন হইতে যায় নাই। 'বহিন্‌, ছোট পাঁচ লেড়্‌কা। খানেকা আটা ভি মিলতা নেহি, ঘিউ কাঁহাসে মিলি?' এই কথা বলিয়া অন্য সব বাড়ির ছেলেরা ঘিয়ে ভিজাইয়া রুটি খাইতেছে দেখিয়া নিজের ছেলেরা আসিয়া যখন তাঁহার কাছে 'অম্মা ঘিউ দেও' বলিয়া ঘি চাহিয়াছিল আর তিনি নিরুপায় হইয়া পম্পা অর্থাৎ জলের কল

হইতে বাটি ভরিয়া জল আনিয়া 'বাচ্চা, দিউ লেও' বলিয়া সেই জল দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সুবোধ ছেলেরা সেই জলে ভিজাইয়া সন্তুষ্ট মনে রুটি খাইয়াছিল এই কাহিনীটি যখন বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার চোখে জল আসিয়া গিয়াছিল।

মাদ্রাজী ভদ্রলোক নাগভূষণবাবুর বাড়ি তাঁহার ছেলে ও মেয়ে দুই জনেরই এক-সঙ্গে বিবাহ হইল। তাঁহার দুই বোনের ছেলে ও মেয়ের সঙ্গে এই বিবাহ অনেক-দিন আগে হইতেই স্থির হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে পিসতুতো ও মামাতো ভাই বোনে বিবাহ প্রচলিত আছে, এমন কি কোন কোন স্থানে মামার সঙ্গেও নাকি ভাগ্নীর বিবাহ হয়।

মাদ্রাজী মেয়েরা পোষাক পরিচ্ছদের বিষয়ে বেশ সৌখীন। প্রতি বৃহস্পতিবারে ঘরবাড়ি খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করা হয়। সেই দিনটিই সাপ্তাহিক স্নানের দিন। মেয়েরা সেদিন সমস্ত দেওয়ালে নানারকম আলপনার ছবি আঁকে, চিত্রবিদ্যায় তাহারা অনেকেই সুনিপুণা। খুব সরু সরু বিনুনী করিয়া নানা ভঙ্গীর বাঁধা চুল সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ স্নানের দিনে খোলা হয়। স্নান সারা হইলে তাহারা খাটের উপর শুইয়া ভিজা চুল এলাইয়া দিয়া মালসায় কাঠের কয়লার আগুনে সুগন্ধি ধূপের গুঁড়োর মৃদু উত্তাপে চুল শুকাইয়া লয়। ইহাতে চুলে চন্দনের ও ধূপের গন্ধ হয়। চুল শুকাইলে আবার সাতদিনের মত চুল বাঁধা হয়।

ছোট ছোট মেয়েরা ঘাগরা পরে, কোমরে একটি সোনার কোমর বন্ধ থাকে। মাথার চুলে একটি মাত্র বেণী গাঁথিয়া তাহাতে সোনার ঝালর বা রেশমী খোপ বাঁধিয়া পিঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং বিনুনীর গোড়ার দিকে একটি জমকালো সোনার অথবা ক্লিপে করিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয়। মেয়েদের যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে পোষাক ও অলঙ্কার প্রভৃতিও পরি-বর্তিত হয়। রেশমী কাপড় অতি শোভন ভঙ্গীতে পরা, কোমরে সোনার পেটী, কানে বড় বড় হীরামুক্তা খচিত ফুল। বিচিত্র বেণী ও হীরামুক্তা এবং সোনার ফুলে সুসজ্জিত মাদ্রাজী মেয়েরা অনেকেই শ্যামাঙ্গী কিন্তু বেশ শ্রীমতী।

নাগভূষণ ছিলেন মিলিটারী বিভাগে সাপ্লাই কন্ট্রাক্টার, ছেলেমেয়ের বিবাহে তিনি কেবল দেশীয় পল্লীতে নয়, সাহেব পাড়াতেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং পার্টি দিয়া-ছিলেন। মাদ্রাজীগণ বিশেষত পার্শীরা একটু বেশী সাহেবীয়ানার ভক্ত।

বিবাহের সময় মাদ্রাজী মেয়েদের কুমারী কালের নাম বদলাইয়া নূতন নাম রাখা হয়। যে মেয়েটির নাম ছিল সেশুবাঈ তাহার নাম হইল লছমীকান্তি। সরস্বতীবাঈ হইয়া গেলেন পুষ্প মঞ্জরী। অবশ্য এই সব নাম রাখায় বেশ একটু কবিত্ব আছে।

টালেই আর একটি বাড়ির বিবাহে প্রায় দিন পনেরো ধরিয়া উৎসব চলিয়াছিল। বর-পক্ষ রাত্রিকালে মেয়ে চুরি করিবার জন্য প্রত্যহ মশাল জ্বালিয়া সশস্ত্র হইয়া কন্যার বাড়ি আক্রমণ করিতে আসে, আর কন্যাপক্ষ লাঠি ও তরবারী লইয়া বাহির হয় এবং মার্ মার্ শব্দে বরপক্ষকে হটাইয়া দেয়, পরে অবশ্য সরবৎ ও লাড্ডু দিয়া তাহাদের আতিথ্যও করা হয়। এইভাবে একদিকে যুদ্ধ চলিল অপর দিকে রঙিন কাগজের ফুল এবং সত্যকার ফুলের মালা দিয়া বিবাহের আসর খুবই জমকালো করিয়া সাজানো হইতে লাগিল। এদিকে আবার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের ধুম পড়িয়া গেল।

আসর সাজানো সমাধা হইলে গণক জন্মপত্রি মিলাইয়া লগ্ন নির্ণয় করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে বর বিবাহ মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া যেখানে কন্যা এক পুষ্পসজ্জিত-সিংহাসনে বসিয়াছিল সেখানে গিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি ফুলের তোড়া ছুঁড়িয়া মারিল। কন্যাও তৎক্ষণাৎ সেই তোড়াটি বরকে ছুঁড়িয়া মারিল। এইরূপ ফুলের যুদ্ধ প্রায় ঘণ্টাখানেক চলিল, ইহার নাম 'গেঁদ খেলা'। খেলায় অবশেষে বরই হারিয়া গেল এবং সিংহাসনের কাছে জানু পাতিয়া বসিল। কন্যা তখন তাহার কপালে দধি ও চন্দনের ফোঁটা দিয়া গলায় ফুলের মালা পরাইয়া দিল, বর সেই মালাই আবার কন্যার গলায় পরাইল। ইহার পর পুরোহিত আসিলেন ও শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সমাধা করিলেন।

এই সব নানা দেশের লোকের বিচিত্র সামাজিক পরিবেশের বর্ণনা করিতে গেলে আরও এত কথা বলিতে হয় যে, প্রকৃত বর্ণনার বিষয়বস্তুগুলিই পিছনে পড়িয়া যায়।

জব্বলপুরের নিশীথ সৌন্দর্যের একটি মোহনীয় আকর্ষণ ছিল। সোনাদাদা এক একদিন সে সৌন্দর্য দেখাইবার জন্য জ্যোৎস্না রাত্রে আমাকে সঙ্গে নিয়া পথে বাহির হইতেন। মাসিমার অবশ্য ইহাতে আপত্তি ছিল, রাত্রে এভাবে বাহির হইলে বিপদও তো হইতে পারে। কিন্তু গভীর রাত্রে নিদ্রিত জব্বলপুরের সে যে কি সৌন্দর্য বর্ণনায় তাহা বুঝানো যায় না। গ্রীষ্মকালের রাত্রে জব্বলপুরে কেহ ঘরের ভিতর ঘুমাইতে পারে না। সারি সারি খাটিয়া পাতিয়া লোকেরা রাস্তায় ও খোলা মাঠে ঘুমায়। ইহাতে বুঝা যায় চোর ডাকাতের ভয় সেখানে বিশেষ নাই।

জব্বলপুর ক্যান্টনমেন্টের শহর, গোরা-বারিক ও গোলাবারুদের কারখানা আছে। আর আছে গোকুলদাস বল্লভদাসের কাপড়ের কল ও পটারী ওয়ার্ক। এগুলি সমস্তই দ্রষ্টব্য বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর কাছে ইহার মূল্য নিতান্তই সামান্য। প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনেক গুলি ফটোগ্রাফ সোনাদাদা আমাকে দিয়া-ছিলেন, কিন্তু আজ তাহার একখানিও নাই।

গুপ্তেশ্বরের পাহাড় ও মন্দির, হালুয়াইয়ের মন্দির, মদনমহল পাহাড়ে রাণী দুর্গাবতীর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং পিসনোরীর মন্দির এ সমস্তই জব্বলপুরের দর্শনীয় স্থান। শহরের জল সরবরাহের জন্য সেখানে অনেকগুলি ঝরণাকে পাথরের চওড়া প্রাচীর দিয়া আবদ্ধ করিয়া একটি কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করা হইয়াছে সেখান-কার দৃশ্যও অতি মনোরম। হালুয়াইএর

মন্দিরে এক শ্বেত প্রস্তরময়ী মাতৃমূর্তি আছেন, অপরূপ সেই মূর্তির সৌন্দর্য! এক মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী হালুইকর তাহার সামান্য আয় হইতে চিরজীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়া এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিল। এই মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহাই। পিস্-নারীর মন্দির একজন গমপেষাইকারের সঞ্চিত অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রায় তিন চারিশত সিঁড়ি ভাঙিয়া এই মন্দিরে উঠিতে হয়, মন্দিরে কোন মূর্তি নাই। এই মন্দিরটি একটি মূর্তিবিরোধী জৈন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত জৈনসাধুর পরিকল্পনায় নির্মিত। মনে হয় যে গমপেষাইকর এই মন্দির নির্মাণের ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। তিনি জৈন ছিলেন। দরিদ্র শ্রমিকের এই যে দান, ইহাতে ত্যাগ ও আদর্শনিষ্ঠাই যেন মন্দির-রূপে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং তাহাই মন্দির এবং তাহাই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

এবার নর্মদা প্রপাতের কথায় আসিতেছি, কেননা মধুরেণ সমাপয়েৎ। নর্মদা প্রপাতের স্থানটিকে ভেড়াঘাট বলা হয়। জব্বলপুর হইতে ভেড়াঘাট কয়েক মাইল দূরে, টাঙ্গা করিয়া যাইতে হয়। যে পাহাড়ের উপর হইতে এই প্রপাত পতিত হইতেছে সেই পাহাড় ও তাহার উপরের জঙ্গলকে বশিষ্ঠা-শ্রম ও ভৃগুক্ষেত্র বলা হয়। পাহাড়ের উপর একটি ডাকবাংলো এবং তাহার কাছে ঠিক নদীর উপরেই আর একটি ছোট যাত্রী-নিবাস আছে। যাঁহারা পূর্ণিমা রাত্রে নদীর বক্ষে চন্দ্রোদয় দেখিতে চান তাঁহারা প্রায় সকলেই সমস্ত দিন এধার ওধার ঘুরিবার জন্য ও দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের জন্য এই দুটি আশ্রয় স্থানের কোন একটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দর্শনার্থী যাত্রীদের নর্মদায় জলপথে ভ্রমণের জন্য নৌকাও ভাড়া পাওয়া যায়।

জব্বলপুরে গিয়া আমি অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলাম, তাহার কতকগুলি আমার প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই 'প্রবাহে' বাহির হইয়াছিল। সেই সব কবিতার ভিতর 'নর্মদা প্রপাতে' বলিয়া একটি কবিতা ছিল। 'প্রবাহ' বইটি যদি এখন আমার কাছে থাকিত, তবে ঐ কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলে প্রপাতের সৌন্দর্যের আভাস দেওয়া কতকটা সহজ হইত। কিন্তু বই খানি পাইলাম না, তাই স্মৃতি হইতেই কিছু কিছু উদ্ধার করিয়া দিতেছি। কবিতার ভাবটি ছিল এই রকম:—উচ্চ এক গিরিশিখর, তাহার চারিদিক জলকণার কুয়াশায় আচ্ছন্ন, বালিকা নর্মদা এই পাহাড়ের উপর যেন স্রোতের রূপ ধারণ করিয়া ছোট ছোট নুড়ি সরাইয়া খেলা করিতেছে।

"নিরজন গিরির শিখরে নিশিদিন বসিয়া একেলা,
বালিকা নর্মদা যেথা এখনও করিতেছে খেলা;
বন্ধুর, পিচ্ছিল শিলা, বিকীর্ণ বিক্ষিপ্ত
রাশি রাশি,
নৃত্যচ্ছন্দে ছুটোছুটি নর্মদা করিছে সেথা আসি।
কখনো বা শিলাসনে অলস আবেশে আনমনে
কখনো বা ছুটে চলে স্রোতোবেগে আপনি অধীর,
গোপনে ললাটে তার চুমা দেয় প্রভাত সমীর,
কি কথা বলিয়া যায় কানে কানে মৃদুল স্বপনে;
* * *
খেলিতে খেলিতে তাই কার কথা পড়ে তার মনে,
বায়ু এসে দিয়ে যায় বুঝি তারে সংবাদ কাহার,
উতলা পাগল প্রাণ বুঝি তার কাহার আহ্বানে,
শৈশবের নিকেতন, সুখময় পিতৃগৃহ তার—
শৈল-জননীর ক্রোড় কিছুই লাগে না ভাল আর,
উন্মাদিনী ঝাঁপাইয়া পড়ে গিরি শিখর হইতে
কি কল্লোল কলধ্বনি, গতি তার কি
উদ্দাম স্রোতে!
* * *

আমি প্রপাতের কাছে দাঁড়াইয়া সেই ঝাঁপাইয়া পড়ার দৃশ্য দেখিয়াছিলাম। চারি ধার হইতে আসিতেছে শত শত নির্ঝরস্রোত, সেগুলি পাহাড়ের কিনারায় আসিয়া যেন এক হইয়া গিয়া এক প্রবল স্রোতের আকার ধারণ করিতেছে, আর সেই সম্মিলিত স্রোত অতি উচ্চ স্থান হইতে যেন পাগলের মতই ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।

"শিলাতলে আছাড়িয়া চূর্ণ চূর্ণ তনুখানি তার,
চূর্ণ-হীরকের সম ঝলকিত দীপ্তি চারিধারে,
রবিচ্ছবি ফলি' তায় সাজায়েছে ইন্দ্রধনু-হারে।"

চূর্ণ জলকণাগুলি বাতাসে ভর দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে চারিদিক যেন ধূমময় বলিয়া মনে হইতেছে। এইজন্য বোধহয় এই স্থানটির একটি নাম হইয়াছিল 'ধূমাধার'। প্রত্যেকটি জলকণার উপর সূর্যের আলোক প্রতিফলিত হইয়া সপ্তবর্ণেরঞ্জিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রামধনু সৃষ্টি করিতেছে।

"উচ্ছলিত, উচ্ছ্বসিত শুভ্রফেন-শ্বেত পুষ্পরাশি,
বায়ুসনে জলকণা কুয়াসা সৃজিছে চারিপাশে,
কি দারুণ হতাশার হাহাধ্বনি সদা কানে আসে,
সে ধ্বনিরে প্রতিধ্বনি অঙ্কে তুলি লয় ভালবাসি।
প্রতিধ্বনি-প্রতিঘাতে ধ্বনিময় নীরব অচল,
শব্দহীন স্তব্ধ দিক শুনি সেই গর্জনের রোল।

নর্মদার বারিপ্রবাহ প্রপাতরূপে পতিত হইয়া এবার প্রবল বেগে ছুটিয়াছে। এমনই সে বেগ যে তাহার পথের সম্মুখে যেন কোন বাধারই বাধাদানের শক্তি নাই।

নর্মদা ছুটিয়া চলে, পথ রুদ্ধ অচল প্রাচীরে,
স্রোতোবেগে দীর্ণ হয়, দ্বিধা হ'য়ে পথ দেয় তার,
গরবিনী রাণী যেন কারও পানে নাহি চাহে ফিরে,
তেমতি কি ভঙ্গীময় কি গর্বিত গতি নর্মদার।
* * *
"মর্মর প্রস্তর শৈল মেঘমালা পরি উষ্ণীশিরে
পাষাণ-প্রাচীর সম শোভে নর্মদার দুই তীরে।

এই পাহাড় যেন একটি স্ফটিকের দর্পণ।

সে স্ফটিক দর্পণেতে কত চাঁদ দেখিয়াছে মুখ,
কতদিন জ্যোৎস্না আসি খেলা করিয়াছে তার সনে
কত ঘন কুজ্ঝটিকা ঘুমায়েছে পাষাণ শয়নে
হেমন্ত-প্রভাতে কত পরেছে সুবর্ণহার শিরে,
আজিও তেমনি আছে অচল দাঁড়ায়ে দুই তীরে
* * *
কে জানে এ শৈলমালা দাঁড়াইয়া কত যুগ হতে
কত বরষার জলে স্নান করিয়াছে কতবার,
অবিশ্রাম-জলস্রোতে ক্ষয়িত প্রস্তর রাশি তার—
ভাস্কর-অঙ্কন যেন শুভ্র এই তুষার-পর্বতে।
দুই পাশে অতি উচ্চ হিম-শুভ্র মর্মর অচল,
মধ্যস্থলে প্রবাহিতা স্বচ্ছ নীল নর্মদার জল,
শুভ্র সৌধরাজি দুই পার্শ্বে দেখে অনুমানি,
মধ্যস্থল দিয়া তার চলিয়াছে রাজপথ খানি।

এই নর্মদায় নৌকাপথে যাঁহারা যাত্রী হন, তাঁহারা উপরে নীল আকাশ, দুই পাশে মর্মর পর্বত ভিন্ন আর কোন দৃশ্যই দেখিতে পান না। পূর্ণিমার মধ্যরাত্রে যখন চাঁদ মধ্য-গগনে উদিত হয়, তখনই কেবল নর্মদার নীলজলে পূর্ণচন্দ্রের ছায়া প্রতি-বিম্বিত হয়, সেইজন্য অনেক নৌকাযাত্রী মধ্যরাত্রির জন্য অপেক্ষা করিয়া ডাকবাংলোয় আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমরা ডাকবাংলোয় না থাকিয়া নদীর ধারে ছোট ঘরটিতে আশ্রয় লইয়াছিলাম। খিচুড়ী রাঁধিয়া আহারপর্ব সমাধা করিয়া বারান্ডায় মাদুর পাতিয়া বিশ্রাম করিয়াছি, আর চোখ বুজিয়া নদীর কুলু কুলু ধ্বনি সারাদিন ধরিয়া শুনিয়াছি। গভীর রাত্রে অথবা দিনেও নর্মদায় নৌকা ভাসাইয়া চলিলে মনে হয় যেন পৃথিবীর অতীত এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি যেখানে, পাখীর কূজন পর্যন্ত শোনা যায় না।

"শব্দ সেথা ভীত হয়ে স্তব্ধ হইয়াছে একেবারে
সৌন্দর্য করিছে বাস এ কোন্ মায়ার অন্তঃপুরে"

জীবিত প্রাণীর ভিতর আছে পাহাড় ফাটলে অসংখ্য মৌমাছির চাক, এই মৌমাছির দংশনে একবার দুটি ইংরেজ সৈনিকের শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের সমাধি যেখানে নদীর তীরে সাদা সাদা

একরূপ শৈবাল শ্বারা আচ্ছন্ন কতকটা জমির মত স্থান আছে সেইখানেই দেওয়া হইয়াছে। সমাধি প্রস্তরে সমস্ত বিবরণ খোদাই করা আছে।

দেখিলাম একটি সাধু এই নির্জন স্থানে বাস করিতেছেন, নৌকার মাঝিরা তাঁহার জন্য শহর হইতে খাবার জিনিস কিনিয়া মাঝে মাঝে দিয়া আসে। যেখানে তাঁহার আস্তানা সে স্থানটিতে সাদা সাদা নরম শৈবাল খানিকটা সমতল প্রস্তরকে আচ্ছাদিত করিয়াছে, ঠিক যেন একখানি নরম সাদা গালিচা পাতা রহিয়াছে।

নর্মদা নদী যেন এক চিরন্তন প্রাণ প্রবাহ, নর্মদা প্রপাতে গিয়া সে সময় ঠিক এই-রূপ অনুভব হইয়াছিল।

নিত্য নব জন্ম তার,
নিত্য তার নবীন যৌবন,
নিতি প্রাণ দেয় ঢালি,
নিতি নব প্রাণ ফিরে পায়,
অবিশ্রাম বহি চলে
জীবনের প্রবাহ তাহার,
জন্ম, আর মৃত্যু মিশি
জীবনে মরণে একাকার,
ঠিকানা থাকে না কিছু,
কত আসে কত চলে যায়।

* * *

পর্বতের বিজন শিখরে শিলা মাঝে একেলা একেলা
বালিকা নর্মদা সেথা এখনও করিতেছে খেলা,
এখনো আপনাহারা প্রবল মিলন-মদে মাতি,
সিন্ধুর উদ্দেশ্যে ছুটে যুবতী নর্মদা দিনরাতি।
এখনো আপনাহারা ভকতির উচ্ছ্বাসে মগন
করিতেছে সিন্ধু মাঝে অবিরত আত্মসমর্পণ।
শেষ নাই, ইহার আর শেষ নাই।

প্রপাতের সেই অপূর্ব চিত্র ভাষার তুলিকায় আঁকিবার মত নৈপুণ্য আমার নাই। মনে যাহা ছবি হইয়া চির জাগ্রতভাবে রহিয়াছে ভাষায় সে ছবি প্রতিফলিত করা কত যে দুঃসাধ্য তাহা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিতেছি, তাই বার বার মনে হইতেছে, 'হয় নাই, হয় নাই, এতো ঠিক হইতেছে না।'

জব্বলপুরের আরও অনেক ছবি মনে আসিয়া ভিড় করিতেছে, যেমন, গুপ্তেশ্বর পাহাড়ের সেই অতি প্রকাণ্ড পাথরের ছত্রটি, যেটি একটি প্রস্তরের দণ্ডের উপর এমনভাবে রহিয়াছে যে মনে হয় যেন হুড়মুড় করিয়া এখনই পড়িয়া যাইবে। ঠিক যেন শ্রীকৃষ্ণ বাঁ হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে গোবর্ধন ধারণ করিয়াছেন। যেমন সোনা-দাদার বাড়ির সেই গরুটিকে, যাঁর নাম পিলুবাঈ, অর্থাৎ তিনি একজন সম্মানিতা গোমাতা। যেমন, সেই চন্দনা পাখীটি, মাসিমা যাহার নাম দিয়াছিলেন গৌরদাস, প্রথমে পাখী খাঁচায় পুষিতে মাসিমার বিশেষ আপত্তি ছিল, কিন্তু একদিন যখন পাখী তাঁহাকে 'মা, মা' বলিয়া ডাকিল এবং সেই সঙ্গে তিনি যেন আপনার অজানিতেই উত্তর দিলেন, 'কি চাও গোপাল?' তখন সোনাদাদা হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, 'আমি তো ছিলাম মার কাছে হাঁদুগোপাল, এখন দেখছি পাখীও 'গোপাল' হয়েছে। দাও না, খাঁচার দুয়ার খুলে, এবার ছেড়ে দাও দেখি?' উত্তরে মাসিমা যেন ভিজে গলায় বলিলেন, 'ছেড়ে তো দিতামই, কিন্তু ও তো আর উড়তে পারবে না।' আবার সেদিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন সোনাদাদা ভীতু ছেলের মত ভয়ে ভয়ে মাসিমার কাছে বলিতেছিলেন, 'মা এ মাসের সংসার থেকে দশটা টাকা কি বাঁচাতে পারবে? কুড়ি টাকা না হলে যে দাশুবাবুর ছেলেটির ওষুধ কেনা হবে না! তবু তো মোহনলাল ডাক্তার ভিজিট নিচ্ছে না।' মাসিমা উত্তরে বলিলেন, 'এমাস আর সে মাস কি, এতো সব মাসেরই ব্যাপার।'

মোহনলাল ডাক্তারের কথাও মনে পড়ে। মাদ্রাজী চিকিৎসক এবং অতি বিজ্ঞ চিকিৎসক। আমাদের বাড়ি ঢুকিয়াই তিনি প্রথমে 'নমস্তে মাতাজী' বলিয়াই জোড় হাতে মাসিমাকে অভিবাদন জানাইতেন।

একদিনের অগ্নিকাণ্ডের কথাও মনে পড়ে, আমরা সকলে বাংলোর ভিতর ঘুমাইতেছি, এদিকে গোয়ালঘরে ঘুঁটের স্তূপে কি জানি কি করিয়া আগুন লাগিয়া গিয়াছে। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা, গোল-মালে জাগিয়া দেখি, বালতী হাতে পাড়ার ছেলেরা উঠানে ছুটাছুটি করিয়া কলের জলে বালতি ভরিতেছে। ইহারা সকলেই পাড়ার রক্ষী দল; ডাকাডাকি করিয়া আমা-দের সাড়া পায় নাই, তাই মই লাগাইয়া জ্বলন্ত চালের উপর উঠিয়া উঠানে লাফাইয়া পড়িয়াছে। সেদিন অল্পের জন্য গোমাতা পিলুবাঈ প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন এবং আর একটু দেরী হইলে বাংলোর চালে আর পাশাপাশি সকল বাড়ির চালেই আগুন ধরিয়া যাইত, এবং তাহা হইলে বালতি করিয়া জল ঢালিয়া আগুন নিভানো কিছুতেই সম্ভবপর হইত না।

এই রক্ষী দলের প্রতিষ্ঠা জব্বলপুরে আসিয়াই সোনাদাদা করিয়াছিলেন।

হরিকথার কথক মাদ্রাজী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন লীলা একদিন গান করিয়াছিলেন, সেই গানের কয়েকটি ছত্র মনে পড়ে—

তাণ্ডবগতি মণ্ডলোপরি নেরত তু বনমালী,
আরে হাঁ, নেরত তু বনমালী॥
কম্ কম্ কম্ করপদতটে
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনন মধুর
রিম্ রিম্ রিম্ রিনীত করে
নাগ বনমালী।
আরে হাঁ নেরত তু বনমালী॥

সে গান যেন এমন এক শব্দ-ঝঙ্কার, যে ঝঙ্কারে নৃত্যরত গোপালের ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে মৃত্যুরূপী কালীয় নাগের মাথায়।

সেই গোরা সৈনিকের কথাও এক একবার মনে পড়ে। স্কটল্যাণ্ডে তাহার বাড়ি, বাড়িতে আছেন মা আর এক বোন। রাত্রে একদিন যখন আমরা জব্বলপুরের নৈশ-শোভা দেখিবার জন্য এক পাহাড়ে গিয়া উঠিয়াছিলাম, তখন ক্যান্টনমেণ্ট হইতে দূরবীণে আমাদের দেখিতে পাইয়া ব্যারাক-রক্ষী এই সৈনিকটি আসিয়াছিল খোঁজ নিতে। পাহাড়ে উঠিয়া সে সোনাদাদার সহিত অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন ভাব জমাইয়া ফেলিল যে, তাহার বাড়িতে যে একটি প্রিয় কুকুর আছে, তাহার সম্বন্ধেও অনেক কথা আমরা জানিতে পারিলাম। জব্বলপুরে ভীষণ মশা, মাছি ও পিঁপড়ার উৎপাতও খুব বেশী। তাহার কাছে শুনিলাম মশার কামড়ে তাহার রাত্রে ঘুম হয় না, কেননা এই গরমে তো কম্বল চাপা দিয়া ঘুমাইবার উপায় নাই। সোনাদাদা মশারি খাটাইবার কথা বলিলে সে প্রথমে মশারি জিনিসটি যে কি তাহা বুঝিতে পারে নাই। পরে যখন শুনিল মশারি টাঙ্গাইতে হইলে দেওয়ালে প্রেক পুঁতিতে হইবে, তখন সে 'ও মাই গড্' বলিয়া চমকাইয়া উঠিল। ব্যারাকের দেওয়ালে গর্ত করা? এ যে ভয়ানক অপরাধ!

এই একটি কথার মধ্য দিয়া সৈনিক জীবন যে কি কষ্টকর তাহা আমার মনে যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

জব্বলপুরের কথায় প্রবন্ধ অশোভন দীর্ঘ হইবার আশঙ্কায় এইখানেই কলম থামাইলাম।

ভানু চাটুয্যের নির্বুদ্ধিতা

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

আমাদের সেদিনকার শনিবারের বৈঠকে গিয়ে দেখি—ভানু চাটুয্যে সভায় উপস্থিত নেই। ভানু চাটুয্যে আমাদের শনিবারের বৈঠকে আসা বড় সহজে বাদ দেয় না, সর্বদাই দেখি, হাজির থাকে। আর তাকে না হলে আমাদের আসরও জমে না। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বোকা ঐ ভানু চাটুয্যে। বোকা লোককে নাচাতে সবারই বেশ কেমন একটু মজা লাগে।

ভানু চাটুয্যেকে না দেখতে পেয়ে আমরা সবাই একটু উসখুস করে এর-ওর মুখ চাওয়াচায়ি করছি, এমন সময় সবজান্তা সুবোধ বরাট বললে,—জান না বুঝি? ভানু চাটুয্যে কোন এক সাধুবাবার আশ্রমে গিয়েছে। বলে গেছে,—স্বাধীনতার পর এদেশে থাকতে গেলে, গেরুয়া না পরতে জানলে সাধু হওয়া যায় না, ঘন ঘন সমাধিস্থ হতে না পারলে মহাত্মা হওয়া যায় না, আর স্বপাকে খেতে না শিখলে ত' ধর্মই হোল না।

শুনলে একবার আহাম্মুকী কথাটা? আরে, তাই যদি না-ই হোল, তাবলে পয়সা খরচ করে কোথাও যাবার দরকার কি? এখান থেকেই ত ওসব দিব্যি করা যেতে পারে। সেখানে সাধুবাবাজীরা আবার কত পয়সা খসিয়ে নেয়, দেখ। বিধাতা ওকে দুটো পয়সাই দিয়েছেন, ঘটে এক ফোঁটা বুদ্ধি দেননি। এমন সময় চা এসে পড়াতে সুবোধ বরাটের মুখটা কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ হোল। ভানু চাটুয্যের প্রসঙ্গটা আপাতত চাপা পড়ে রইল।

বেশ আরাম করে ধোঁয়া-ওঠা গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে রসিয়ে রসিয়ে সেটাকে শেষ করে, একটা আস্ত একখান সিগ্রেট পুড়িয়ে, সুবোধ বরাট বললে, আজ তোমাদের ভানু চাটুয্যের এক বড়রকমের আহাম্মুকীর কথা শোনাব। শুনলেই বুঝতে পারবে কত বড় নির্বোধ সে। তার পিছনেই বলছি। সামনে বল্লে তার নাকের ডগা থেকে কানের তলা পর্যন্ত লালে লাল হয়ে উঠত। তবে কথাটা সত্যি। একবর্ণও মিথ্যে নেই এর মধ্যে। মিথ্যে আমি কারর সুমুখেও বলিনে, আড়ালেও বলতে পারিনে।

সবজান্তা সুবোধ বরাট বেশ গুছিয়ে-গুছিয়ে কথা বাঁটতে পারে। সে কি বলে শোনবার জন্যে আমরা বেশ উদ্‌গ্রীব হয়ে চাগিয়ে বসলুম। সুবোধ আরম্ভ করলে।—

ভানু চাটুয্যেকে তোমরা সকলেই বেশ চেন। লেখাপড়া শিখে, দুনিয়াদারীর হাল-চাল সম্বন্ধে এমন বেয়াক্কেলে আর কোনো এক ব্যক্তি আমার চোখে পড়েনি। লোকটা এখনও একটা প্রিন্সিপল ধরে চলে। এর চেয়ে বোকামী আর কি আছে বল ত? যেখানে সকলে অন্যের গলা কাটবার জন্যে সদাসর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে, একটু অন্যমনস্ক হলেই গলায় ছুরি বসিয়ে দেয়, সেখানে ভাল-মানুষ হয়ে চুপ করে বসে থাকলে নিজের গলাটাই যে কাটা যায়। যেখানে স্বাধীনতার পর যত সব নীচু স্তরের লোক উঁচু শ্রেণীতে উঠে গেল সেখানে ধর্ম-কথা শোনালে, তাতে কি ফলটা হবে?—এই সোজা কথাটা ঐ আহাম্মক ভানু চাটুয্যেকে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না। সে নিজের খেয়ালেই নিজে বিভোর।

একদিন ভানু চাটুয্যে এক চূড়ান্ত আহাম্মুকীর কাজ করে ফেলল। এক মন্ত্রী বাহাদুরের ভাঁওতায় ভুলে সে এক সরকারী চাকরী নিয়ে বসল। বেশ করে খাচ্ছিল নিজের কাজ নিয়ে। তাতে দু'পয়সার আমদানীও ছিল। কিন্তু তা বাবুর সহ্য হোল না। ভানু চাটুয্যে আবার বল্লে কি না —এখন দিশি সরকারের রাজত্ব। সরকার একবার ডাকলেই প্রিন্সিপলওয়ালা লোকদের সব ছেড়ে ছুড়ে গভরমেন্টের কাজে লেগে যাওয়া উচিত।

মুখখুমী আর বলে কাকে? ভানু চাটুয্যের কর্ম সরকারী চাকরী করা? সরকারী চাকরীর হাড়-হদ্দ আমি জানিনে? তিরিশ বছর ঐ কাজে হাত পাকিয়ে ঐ সেদিন না রিটায়ার করলুম? দিশি বিদিশি সব সরকারই এক ধারা। সব শেয়ালেরই এক রা। আমি জানিনে?

যা বলেছিলুম তাই। চাকুরীতে ঢোকবার মুখেই ভানু চাটুয্যে বোকামীর পরিচয় দিয়ে বসল। ভানু চাটুয্যে যে কাজ নিয়েছিল, তার মাইনে ছিল তিন হাজার টাকা। ভানু চাটুয্যে বারশ টাকার বেশী মাইনে নিতে কিছুতেই রাজী হোল না। বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বল্লে—এ গরীব দেশে কোনো সরকারী চাকুরেরই পনের শ টাকার বেশী মাইনে নেওয়া উচিত হবে না, ঢের হয়েছে বলে,—আমরা তাকে জোর করে সেইখানেই চুপ করিয়ে দিলুম। মুখ বাঁকিয়ে করে যে গান্ধী মহারাজের না ঐরকম কি একটা কি বচন কোট্ করে আওড়াবার চেষ্টা করছিল। আমরা সকলে একসঙ্গে ধমক দিয়ে উঠলুম—মহাত্মাজী মরে গিয়ে তোমাদের হাত থেকে বেঁচে গেছেন, তাঁকে নিয়ে আর টানাটানি কোরো না।

ভানু চাটুয্যের মনে মনে আশা ছিল যে তার দৃষ্টান্তে বড় বড় সরকারী চাকুরেরা তাঁদেরও মাইনে কমাবেন। এই ত! তা না হলে আমরা তাকে মুখখু বলি কেন! আমি ত এই দু'মাস আগে সেক্রেটারিয়েট থেকেই পেন্সন নিয়ে বেরিয়েছি। আমি জানিনে সেখানকার হাল-চাল, নাড়ী-নক্ষত্র? আমি জানিনে যার হাজার টাকা মাইনে, সে কি করে সেটাকে পনেরোশতে দাঁড় করাবে তারই ফন্দী আঁটছে? যার পনেরশ' মাইনে, কাকে ধরলে সেটা দুহাজার হতে পারে— তারই ফিকিরে সে ঘুরছে না? যার দু'হাজার টাকা মাইনে, সে আর দুটো কাজ তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কি করে তিন হাজার টাকা

...নে করবে,—তার জন্যে কোলকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত দৌড়তে দৌড়তে জুতোর সুকতলা পর্যন্ত ক্ষইয়ে ফেল্‌ছে না? তুই সেদিনকার ছেলে—তুই কিনা যাস্‌ তাদের শিক্ষা দিতে? মুখ্‌খু কোথাকার! সেক্রেটারিয়াটের পেয়াদাগুলোও যে-টুকু বুদ্ধি ধরে, তাতে তোর মতন দশটাকে তারা পোষমানা করে রাখ্‌তে পারে। জানিনে আমি—সুবোধ বরাট?

সেক্রেটারিয়াটে ভানু চাটুয্যের আগেকার আমলের জানাশুনো দু'চারজন শুভার্থী বন্ধু ছিলেন। কিন্তু ভানু চাটুয্যে বোকামী করে প্রথমেই দিল তাঁদেরই চটিয়ে। বন্ধুত্ব সব গেল ভেঙে। যমদূতের মতন খাটবার কি দরকার ছিল? অত ঘণ্টায় ঘণ্টায় গভরমেণ্টকে অফিসের কাজের সম্বন্ধে অত ঘন ঘন চিঠি লেখবারই কি আবশ্যক ছিল? সেক্রেটারিয়াটে ভানু চাটুয্যের হিতার্থী-দের মধ্যে একজন একদিন তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে বল্লেন,—দেখ ভায়া, সরকারী কাজে অত খেটো না; আর উপরওয়ালাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে অত চিঠি লিখ না। যেটুকু না করলে আফিস একেবারে অচল হয়ে পড়ে সেটুকু করতে পারলেই যথেষ্ট। সেইটেই ঢের হোল। তার পর মাসের পয়লা তারিখে মাইনের চেকটা পকেটে পুরে বাড়ী গিয়ে চুপচাপ বসে থাকো। দেখবে, কোনো গণ্ডগোল হবে না। সকলে তারিফ করে বলবে, ভাল অফিসার।

খুব ভাল উপদেশ। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী! ভানু চাটুয্যে বল্লে কি সে যখন সরকারী নিমক খাচ্ছে, তখন নিমকের ওজনে কাজ না করে দিলে মাইনেটা পকেটে পুরি কোন লজ্জায়? এরকমটা দেখে আমি শেষে গায়ে পড়ে গিয়ে ভানু চাটুয্যেকে বলি,—দেখ ভানু, সরকারী চাকরীর নিয়ম-কানুনগুলো আমি দু'চারটে জানি। সেগুলো যদি মেনে চল ত আখেরে ভাল বই মন্দ হবে না। যে চাকরে বেশী খেটে মরে, তার কস্মিন কালে কোনো উন্নতি হয় না। একই জায়গায় তাকে পড়ে থাক্‌তে হয়। উৎপাতের ভয়ে গভরমেণ্ট বলেন, লোকটা তার কাজে এমনই অভিজ্ঞ যে, অন্য কোথাও তাকে সরালে সে কাজ একেবারে অচল হয়ে পড়বে।

এই শুনে পাবলিকের কাজ, না ঐরকম একটা কিছু বলবার উপক্রম করতেই, আমি ভানু চাটুয্যেকে প্রায় থাবড়া মেয়ে বল্লাম—কি পাগলামি করছ? পাবলিকের কাজ আবার কি? নিজের কাজ গোছাতে পারলেই ত পাবলিকের কাজ হোল। তুমি নিজেই ত পাবলিকের একজন। শোননি কোনদিন—আত্ম তুষ্টে জগৎ তুষ্ট? শোননি? আচ্ছা, জিওমেট্রির অ্যাকশিমটাত মনে আছে? —কোন দুটো জিনিস যদি আর এক জিনিসের সমান হয়, তাহলে তারা পরস্পরের সঙ্গে সমান। কিন্তু কে কার কথা শোনে? মুখখুর ওষুধ, মৌখিক উপদেশ নয়—এমনি কি একটা কথা চাণক্য কয়ে গেছেন বলে মনে হচ্ছে।

প্রথম দিন কাজ করতে গিয়ে ভানু চাটুয্যের আগেই দৃষ্টি পড়ল যে, আগন্তুক লোকেদের কোথাও সুস্থির হয়ে বসে অপেক্ষা করার মত তার অফিসে কোন বন্দোবস্তই নেই। তাই যতক্ষণ না ডাক পড়ে, ভদ্রলোকেরা বারান্দাতেই পায়চারি করতে থাকেন। আছে বটে, একটা মান্ধাতার আমলের কাঠের বেঞ্চি এক কোণে পাতা। কিন্তু সেটা লোক বসাবার জন্যে নয়, লোক তাড়াবার জন্যে তৈরি। এত উঁচু যে, তাতে বসলে মাটিতে পা ঠেকে না, আর তার পিঠটা এত শক্ত যে, তাতে খাড়া হয়ে বসলে, পিঠে খিল ধরে যায়।

এই না দেখে তার পরদিনই ভানু চাটুয্যে গভরমেণ্টকে এক চিঠি ঝেড়ে দিলে—সে ভদ্রগোছের কিছু আসবাব-পত্র কিনে একটা ওয়েটিংরুম সাজিয়ে ফেলেছে। আশা করে যে, গভরমেণ্ট এর টাকাটা মঞ্জুর করবেন। জিনিস-পত্র এল, ঘরও সাজান হোল, কিন্তু টাকা আর আসে না। ভানু চাটুয্যে লাল, নীল, পাঁশুটে—যত রকম নিশেন আছে,—তাই লাগিয়ে, গভর-মেণ্টকে অন্তত দশখানা চিঠি লিখলে। কিন্তু গভর্নমেণ্ট নট্‌ নড়ন-চড়ন, নট্‌ কিচ্ছু।

ছ' ছ' মাস কেটে যায়। কোন জবাব নেই; কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে ভানু চাটুয্যের কানে কানে আমি এক মন্ত্র ঝেড়ে দিলুম। সে গভরমেণ্টকে লিখে দিলে—সে নিজের পকেট থেকে দাম ফেলে দিয়ে আসবাব-পত্তর গুটিয়ে ফেলে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। তখন ওসব জিনিসের প্রায় ডবল দাম হয়ে গিয়েছে। এবার গভরমেণ্টের মাথায় টনক নড়ল। তাঁরা টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু প্রসন্নচিত্তে নয়। লিখে জানালেন—এবারকার মতন টাকাটা দেওয়া হোল বটে, কিন্তু আবার এই রকম করলে ফের সে টাকা দেওয়া হবে—একথাটা কেউ যেন মনে না করে।

সকলে মনে করেছিল, ভানু চাটুজ্যের এবার বুঝি খুব শিক্ষা হোল। কিন্তু ওঃ হরি! দুদিন না যেতে যেতেই সে আবার এক কাণ্ড করে বসল। বুড়ো খোকার বুদ্ধি খুলতে অনেক সময় লাগে। চাটুয্যের আফিসে এক বিধবা স্ত্রীলোকের সাড়ে তিন টাকা সুদের পাঁচিশ টাকার এক কোম্পানীর কাগজ জমা ছিল। গভরমেণ্ট যখন জোর করে সাড়ে তিন টাকা সুদকে

তিন টাকা করে ছেড়ে দিলেন, তখন ভানু চাটুয্যের পূর্ববর্তী অফিসার ভুলক্রমে সেই পাঁচশো টাকার কাগজকে আর বদলে যান নি। ব্যাপারটা যখন ভানু চাটুয্যের নজরে এল, তখন অনেক সময় চলে গেছে। অনেক লেখালেখি করে জানা গেল, আদালতের হুকুম ছাড়া কাগজটা আর বদলানো যাবে না।

ভানু চাটুয্যে ত মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। সোজাসুজি আদালতে দরখাস্ত করবার জন্যে কাগজপত্র উকিল বাড়ি পাঠিয়ে না দিয়ে, সে ভাবতে বসল। হিসেব করে দেখলে, দরখাস্ত করতে গেলে প্রায় আড়াইশ' টাকার মতন খরচ পড়বে। তাহলে ত পাঁচশ টাকার থেকে আড়াইশো টাকা বাদ দিলে মাত্র আড়াইশো টাকা থাকে। তা থাকে যদি ত থাকলই-বা। এই নিয়ে এত মাথা-ঘামাবার দরকার কি? ভানু চাটুয্যে বললে—তাহলে ত আমরাই রক্ষক হয়ে ভক্ষক হই। কথাটা বোধ হয় সে নতুন শিখেছিল, তাই একচোট তাক্ বুঝে আমাদের উপর সেটা ঝেড়ে দিল।

শেষে ভানু চাটুয্যে করলে কি না—নিজেই এক দরখাস্ত লিখে, তার উপর পঁচিশ টাকার স্ট্যাম্প চড়িয়ে দিয়ে, নিজেই জজের কাছে গিয়ে অর্ডার বের করে নিয়ে এল। সেই অর্ডার দেখাতে বাকী সুদও বেরিয়ে এল, কাগজও বদলানো হোল—দুদিনে সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। বেশ একটা কাজের মতন কাজ করতে পেরেছে বলে ভানু চাটুয্যে মনে মনে বেশ একটু আরাম বোধ করতে লাগল। কিন্তু জিনিসটা এইখানেই শেষ হোল না। এর পর কি হোল—তাই বলি।

ছ' মাস হয়ে গেছে। একদিন ভানু চাটুয্যের আফিসের অডিটার হন্তদন্ত হয়ে এসে বললে—পঁচিশ টাকা স্ট্যাম্প বাবদে খরচ করা হয়েছে বলে লেখা আছে, দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু তার ভাউচার না পেলে ত টাকাটার খরচ পাশ করতে পারছিনে। সেই শুনে ভানু চাটুয্যে জবাব দিলে,—ভাউচার পাব কোত্থেকে? স্ট্যাম্প-মারা দরখাস্তটা ত আদালতে ফাইল হয়ে গেছে। তারা ত সেটা আর ফেরৎ দেবে না। কিন্তু অডিটার সেকথা শুনতে চায় না—গ্যাঁইগুঁই করতে থাকে।

এমন সময় বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতন ভানু চাটুয্যে একবার একটু সু-বুদ্ধির পরিচয় দিলে। সে অডিটারের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক না করে, তাঁকে ভাল করে বসিয়ে একটা গল্প শোনাল। বেশ মজার গল্পটা। এক সরকারি চাকুরে রিটায়ার করে পেন্সন পেত। এখন পেন্সনের টাকা পাবার নিয়ম হচ্ছে যে, পেন্সনের বিলের সঙ্গে একটা মান্যগণ্য লোকের সার্টিফিকেট দিতে হয়। এর থেকে ধরা যায়—যে ব্যক্তি পেন্সন নিচ্ছে, সে লোকটা তখনও বেঁচে আছে। এরকম সার্টিফিকেট না পেলে কোনক্রমেই পেন্সনের টাকা কাউকে দেওয়া হয় না।

এখন আমাদের এই সরকারি চাকুরে বরাবরই সার্টিফিকেট দিয়ে আসছে যে, সে জীবিত আছে। তার দুর্ভাগ্যক্রমে একবার দু' মাসের সার্টিফিকেট কি রকম করে জানিনে কোথায় গুলিয়ে গিয়ে আর পাওয়া যাচ্ছিল না। সরকারি অডিটার আর তার বিল পাশ করে না। দেখা গেল, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারীর সার্টিফিকেট ঠিক আছে, মার্চ-এপ্রেলেরটা নেই, আবার মে-জুনেরটা আছে। অডিটার সাহেব ভাল করে স্থির হয়ে বিচার করে বললেন—হ্যাঁ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের সার্টি-ফিকেট দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, ঐ দু মাস লোকটি বেঁচে ছিল; আবার মে-জুনের সার্টিফিকেট দেখে জানতে পারছি, ও দু মাসও সে জীবিত ছিল; কিন্তু তাই বলে মার্চ-এপ্রেল মাসে যে সে ব্যক্তি জ্যান্ত ছিল—সেটা কি করে প্রমাণ হচ্ছে?

গল্পটা শুনে ভানু চাটুয্যের দপ্তরের অডিটার ত হো-হো করে হেসে উঠল। এমন খুশি হয়ে গেল যে, আর দ্বিধা না করে পঁচিশ টাকার খরচটা তৎক্ষণাৎ পাশ করে দিল। যাক্ সে যাত্রা ভানু চাটুয্যে বেঁচে গেল। তার মাইনের থেকে ও ক'টা টাকা আর কাটা গেল না।

কিন্তু এত কাণ্ড হবার পরও ভানু চাটুয্যের কিছুমাত্র বুদ্ধি খুলল না। বলা নেই, কওয়া নেই—আমাদের কাউকে জিজ্ঞাস করা নেই, সে চার-পাঁচটা স্কীমের খসড়া করে গভরমেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিল। বললে, এসব স্কীম এমনভাবে করা যে, গভরমেন্টের এতে এক পয়সা খরচ নেই, অথচ পাবলিকের এতে অনেক উপকার। শুনতেই আমি বলে উঠলুম—করেছ কি? জাননা কি, যে স্কীমে পয়সা খরচ নেই, সেই স্কীম গভরমেন্ট ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে পত্রপাঠ ফেলে দেন—দুবার পড়েও দেখেন না? আমি সুবোধ বরাট—গভরমেন্টের কাজে মাথার চুল পাকালুম—আমি জানিনে?—যেসব স্কীমে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ—যেসব স্কীম কোনটা অর্ধেক, কোন্‌টা সিকির বেশি এগোবে না—সেই সব স্কীম এক নম্বরের প্রায়োরিটি পায়? মুখখু ভানু চাটুয্যে গেল কিনা সেখানে তার চোঁতা স্কীম নিয়ে হাত বাড়াতে? হোলও তাই। ভানু চাটুয্যের স্কীমগুলো কোন ফাইলের তলায় কোন্‌-খানে গিয়ে চাপা পড়ল, দু' বছর ধরে দশ-বিশখানা চিঠি লিখেও তার কোন হদিস পাওয়া গেল না।

শেষে আর না পেরে তিতিবিরক্ত হয়ে ভানু চাটুয্যে গভরমেণ্টকে চিঠি লিখে জানতে চাইলে,—গভরমেণ্ট কি তাকে বেশি মাইনের এক হেড ক্লার্ক করে রাখতে চান নাকি? তার কাজ কি শুধু কতকগুলো বদ-ইংরিজি শুদ্ধ করা? আর ক'টা চেক সই করা? গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে কোন জবাব এল না। তাঁরা অটল মৌন অবলম্বন করে রইলেন। বোধ হয় ইঙ্গিতে বলতে চাইলেন—এতদিনে ব্যাপারটা ভানু চাটুয্যে ঠিকই অনুমান করতে পেরেছে।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে, দম নিয়ে সুবোধ বরাট আবার শুরু করলে—তোমরা সবাই জান, সরকারি কাজে ইস্তফা দিয়ে ভানু চাটুয্যে আবার পুনর্মূষিক হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু খুলল বলে মনে হয় কি? কিছু না! এই সেদিনই শুনলুম, সে কাকে বলছে—গভরমেণ্ট তাকে কিছু দিনের জন্যে লোকসেবা করবার সুযোগ দিয়ে তাকে কৃতার্থ করেছেন! এমনি আহাম্মক!

ভারতে মাউণ্টব্যাটেন

অ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন

(২১)

নিজামের কাছে প্রেরিত এক টেলিগ্রামে মাউণ্টব্যাটেনের শেষ অনুরোধ। লায়েক আলি ও কাশিম রেজভির রহস্যপূর্ণ পরামর্শ। ইত্তেহাদী অভিসন্ধির কাছে দুর্বল নিজামের আত্মসমর্পণ। মাউণ্টব্যাটেনের কর্মপ্রচেষ্টার অধ্যায় সমাপ্ত। বিদায়ের পালা। ভারতবাসীর প্রীতি ও সৌহার্দ্যে অভিনন্দিত মাউণ্টব্যাটেন। চাঁদনী চকের পথ দিয়ে শেষ বৃটিশ গবর্ণর-জেনারেল। গান্ধী ময়দানে পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশে সম্বর্ধিত মাউণ্টব্যাটেন। একটি স্বর্ণ-পাত্র—ভারতের জন্য রাজা ষষ্ঠ জর্জের প্রেরিত উপহার। বিদায় অনুষ্ঠানে নেহরুর বক্তৃতা। শরণার্থী শিবিরে লেডী মাউণ্টব্যাটেন। বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত-বর্গের আহূত সভায় মাউণ্টব্যাটেন। শেষ বিদায় সম্ভাষণে চীনা কবিতার কয়েকটি পংক্তি।

লণ্ডন, সোমবার, ২৮শে জুন, ১৯৪৮ সাল। নিজাম জানিয়েছেন—আলোচনা চলতে থাকুক, এই তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু এমন ইচ্ছার সার্থকতা এবং গুরুত্বই বা এখন আর কি আছে?

নেহরু এবং ভি পি মেনন মঙ্কটনের অপেক্ষা করছিলেন এবং মঙ্কটন দিল্লী এসে পৌঁছতেই এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করলেন নেহরু। ভারত-হায়দরাবাদ চুক্তি সম্বন্ধে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যেসব নীতি, বিষয় ও ব্যবস্থার কথা নিজামের কাছে শেষ ও চূড়ান্ত প্রস্তাবরূপে উত্থাপন করা হয়েছিল, এই সাংবাদিক সম্মেলনে সেসব প্রকাশ করে দিলেন নেহরু।

এ সত্ত্বেও এবং এখনও নেহরু ভারত-হায়দরাবাদ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শেষ চেষ্টা ও সুযোগের পথ একেবারে বন্ধ করে দিতে চাইছিলেন না। নেহরু এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, হায়দরাবাদের কাছে ভারতের এই শেষ প্রস্তাব ভারত প্রত্যাহার করছে না। হায়দরাবাদের সম্মুখেই এই প্রস্তাব রইল। ইচ্ছে করলে হায়দরাবাদ এখনও এ প্রস্তাব গ্রহণ ও স্বীকার করতে পারেন। নেহরু বললেন যে, ভারত সরকার এখনও সময় বেঁধে দিয়ে হায়দরাবাদকে এমন চাপ দিতে চান না যে, অমুক তারিখের মধ্যে এ প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে স্বীকার বা অস্বীকার করতেই হবে।

হায়দরাবাদ থেকে দিল্লীতে এসে মঙ্কটন মাউণ্টব্যাটেনের কাছে তাঁর হতাশার বিশেষ হেতু সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা বলেছেন। লায়েক আলিরই একটি রহস্যপূর্ণ আচরণের কথা। মঙ্কটন বললেন যে, দিল্লী থেকে খসড়া-চুক্তির দলিল-পত্র সঙ্গে নিয়ে হায়দরাবাদে পৌঁছেই লায়েক আলি সবার আগে দেখা করেছেন কাশিম রেজভির সঙ্গে। নিজামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পূর্বেই লায়েক আলি রেজভির সঙ্গে পুরো তিন ঘণ্টা আলোচনা করেছেন। এ ব্যাপার দেখেই মঙ্কটন সব আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মঙ্কটনও হায়দরাবাদ-সমস্যার বিষয় আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি হায়দরাবাদের 'অর্থনৈতিক অবরোধ' সম্বন্ধেও মন্তব্য করেছেন। মঙ্কটন বলেছেন, তথাকথিত এই অবরোধ ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দেশে প্রয়োগ করা হয়নি। এমন নির্দেশই দেননি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট। সম্ভবতঃ কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টও (মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ অথবা বোম্বাই) হায়দরাবাদকে 'অবরোধ' করবার কোন নির্দেশ দান করেন নি। মঙ্কটন বলেছেন—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধস্তন কর্মচারীরাই তাঁদের ব্যক্তিগত বিবেচনা অনুযায়ী একটা ব্যবস্থা করতে গিয়ে এই কাজটি করেছেন।

আলোচনার ব্যাপার থেকে এইবার এবং এতদিনে সরকারীভাবে নিজেকে সরিয়ে নিলেন মাউণ্টব্যাটেন। এ ব্যাপারের মধ্যে আর তিনি আসতে পারেন না, আসতে পারবেন না এবং সুযোগও নেই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে শেষবারের মত একটা চেষ্টা করলেন। এক দীর্ঘ টেলিগ্রামে নিজামের কাছে মাউণ্টব্যাটেন তাঁর 'শেষ অনুরোধ' জানিয়ে দিলেন। এই সঙ্গে মঙ্কটনও তাঁর একটি অনুরোধের বার্তা নিজামকে জানালেন। উভয়েই নিজামকে জানিয়েছেন—'আপনি আপনার নিজের ধারণা, বিবেচনা ও বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য সাহসের সঙ্গে দাঁড়াবেন, এই আশা করি। অনুরোধ করি, আপনি আপনার নিজের এবং রাজ্যের কল্যাণ ইত্তেহাদী অভিসন্ধির কাছে কখনই বিকিয়ে দিতে ও বিলিয়ে দিতে রাজি হবেন না।'

ইত্তেহাদী গোষ্ঠীর আচরণে এটা সুস্পষ্টই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, তারা ভারতের সঙ্গে এমন কোন ব্যবস্থার মধ্যেই হায়দরাবাদকে আসতে দিতে রাজী নয়, যে ব্যবস্থায় হায়দরাবাদের ওপর ইত্তেহাদী দলের প্রভুত্ব বিন্দুমাত্রও লঘু হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইত্তেহাদের ক্ষমতা নিজামেরই প্রভুত্ব-ক্ষমতাকে চেপে দিয়ে বড় হয়ে উঠতে চাইছে। এই সঙ্কট এক দিক দিয়ে নিজামেরই প্রভুত্বের সঙ্কট। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ব্যক্তিগতভাবে নিজামকে যতটা বলিষ্ঠ মনোভাবের মানুষ মনে করা গিয়েছিল, সঙ্কটকালে তাঁর আচরণে সে চারিত্রিক দৃঢ়তার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। বরং দেখা গেল যে, নিজাম আজ ইত্তেহাদী গোষ্ঠীর চাপে অসহায়ের মতই আত্ম-সমর্পণ করছেন। ইত্তেহাদী ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছাশক্তির কোনই প্রমাণ তিনি দিতে পারলেন না।

বিগত এগার মাস ধরে ভারত ও হায়দরাবাদের মধ্যে এই আলোচনার পালা চলেছে, তবু ব্যর্থ হলো সব আলোচনা। মাউণ্টব্যাটেনের ধারণা, এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ এই যে, হায়দরাবাদের প্রধান ব্যক্তি এবং ভারত সরকারের পক্ষের প্রধান ব্যক্তি কোনদিনই পরস্পরের সাক্ষাতে এসে এবং সান্নিধ্যে বসে আলোচনা করতে পারলেন না। মাউণ্টব্যাটেনের মনে এখনও এই বিশ্বাস রয়েছে যে, যদি নিজাম একবার দিল্লী আসতেন এবং স্বয়ং মাউণ্টব্যাটেন একবার মধ্যস্থ হিসাবে চেষ্টা করবার সুযোগ পেতেন, তবে এই বিরোধের

মীমাংসা সহজেই হয়ে যেত। ব্যর্থতার আর একটি কারণ, হায়দরাবাদ ডেলিগেশনই মঙ্কটনকে ততটা বিশ্বাস করেনি, যতটা করা উচিত ছিল। আলোচনার ব্যাপারে মঙ্কটনের অসাধারণ দক্ষতা এবং নিজামের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে মঙ্কটনের অকুণ্ঠ আনুগত্য, এই দুই বিষয়েও ডেলিগেশনের মনে পূর্ণ আস্থার অভাব ছিল। তা ছাড়া, আলোচনার ব্যাপারে ডেলিগেশনের ক্ষমতাও আর একটু বেশী থাকা উচিত ছিল। ডেলিগেশনের আচরণে, মনোভাবে ও ক্ষমতায় এই কয়টি ত্রুটি না থাকলে এত দিনের চেষ্টার ফল ভালই হতো বলে মাউণ্টব্যাটেন মনে করেন।

ভারতে মাউণ্টব্যাটেনের কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাসে হায়দরাবাদ অধ্যায় এইখানে সমাপ্ত। 'ব্যর্থতা'ই এই অধ্যায়ের শেষ কথা। ওদিকে কাশ্মীরের ঘটনাবলীও যে সঙ্কটের সূত্রপাত করেছে, তার সমাধানের চেষ্টাও মাউণ্টব্যাটেনকে এখানেই সমাপ্ত করে দিতে হলো। মাউণ্টব্যাটেন আশা করেছিলেন যে, পাক প্রধান মন্ত্রী লিয়াকৎ আলিকে তিনি আর একবার দিল্লীতে দেখতে পাবেন এবং নেহরু ও লিয়াকৎ কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে আর একবার আলোচনায় বসবেন। কিন্তু লিয়াকৎ আলিকে দিল্লীতে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দেবার জন্য নেহরুকে আর অনুরোধ করতে পারলেন না মাউণ্টব্যাটেন। ভারত-হায়দরাবাদ আলোচনার ব্যর্থতা এবং লিয়াকতের অসুস্থতা, এই দুই কারণেই মাউণ্টব্যাটেন আর কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে ভারত-পাকিস্থান আলোচনার জন্য চেষ্টা ও ব্যবস্থা করতে উৎসাহবোধ করলেন না।

কাশ্মীর এবং হায়দরাবাদের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতাই উপহার পেলেন মাউণ্টব্যাটেন। কিন্তু তিনি ভারত থেকে যাবার আগে এমন আর একটি উপহার লাভ করে গেলেন, যার মূল্য ও আনন্দ ঐ দুই ব্যর্থতার দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। ভারতবাসীর সৌহার্দ্যের উপহার লাভ করেছেন, ভারতবাসীর হৃদয় জয় করেছেন মাউণ্টব্যাটেন। ভারতবাসী এবং ভারত সরকার তাঁদের জাতীয় মুক্তির এবং জাতির বন্ধু হিসাবেই মাউণ্টব্যাটেনকে সহস্র শুভেচ্ছার দ্বারা অভিনন্দিত করে বিদায় দিয়েছেন। বিদায়ের দিনে ভারত থেকে যে সম্বর্ধনা পেয়ে চলে গেলেন মাউণ্টব্যাটেন সেটা আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিল।

প্রথমে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন দিল্লীর মিউনিসিপ্যালিটি। নয়াদিল্লী ও পুরাতন দিল্লীর রাজপথে হাজার হাজার ভারতীয়ের ভীড় ও জয়ধ্বনির ভেতর দিয়ে এবং চাঁদনী চক্ পার হয়ে সম্বর্ধনা-সভায় উপস্থিত হলেন মাউণ্টব্যাটেন। এই সেই চাঁদনী চক ও সেই সড়ক, ১৯১১ সালের হার্ডিঞ্জ-হত্যা প্রয়াসের সেই ঘটনার পর যে পথ দিয়ে আর কোন ভাইসরয়কে কখনো যেতে দেখা যায়নি। গান্ধী ময়দানে প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের সমাবেশে চঞ্চল ও ব্যাকুল এক সম্বর্ধনা-সভায় উপস্থিত হলেন মাউণ্টব্যাটেন। সারা পথে জনতার কাছ থেকে জয়ধ্বনি ও পুষ্পমাল্যের উপহার পেয়েছেন মাউণ্টব্যাটেন। গান্ধী-ময়দানের জনসভায় আরও আড়াই লক্ষ লোকের ভীড় প্রবেশ করার জন্য চেষ্টা করছিল, কিন্তু সভায় আর জায়গা ছিল না।

সন্ধ্যায় ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আহূত ভোজসভায় মাউণ্টব্যাটেন পরিবারকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। বক্তৃতা করলেন নেহরু।

মাউণ্টব্যাটেনকে লক্ষ্য করে নেহরু বললেন—'মহাশয়, আপনি আপনার অসামান্য খ্যাতি ও প্রতিভা নিয়ে এই ভারতে

ভূমিতে এক ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনের জন্য এসেছিলেন। কিন্তু এ ভারত-ভূমিতে আপনার পূর্বে আগত বহু ভাইসরয় ও গবর্ণর-জেনারেলের খ্যাতি ও প্রতিভা মিথ্যা হয়ে গেছে। আপনি ভারতের এক অতি কঠিন রাজনৈতিক দুর্যোগ এবং সঙ্কটের কালে এসেছিলেন এবং অতি দুরূহ অবস্থার মধ্যেই আপনাকে এখানে থাকতে ও কাজ করতে হয়েছে। তবুও, ভারতের শেষ বৃটিশ গবর্ণর-জেনারেল মাউণ্টব্যাটেন, আপনি আপনার প্রতিভা ও খ্যাতি অক্ষুন্ন রেখেই আজ বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। একমাত্র আপনিই এই কৃতিত্বের গৌরব অর্জন করতে পেরেছেন।'

লেডি মাউণ্টব্যাটেনের উদ্দেশে নেহরু বললেন—'সেবিকার মমতা দিয়ে আপনি স্পর্শ করেছেন ভারতের হৃদয়। আপনি ভারতের দুঃখাক্রান্ত মানুষের কাছে যেখানেই যখন গিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে শান্তি, সান্ত্বনা ও আশার উপহার নিয়ে গিয়েছেন। তাই আজ আর বিস্মিত হবার কিছু নেই যে, ভারতবাসী আপনাকে বিদায় দেবার সময় এক আপন-জনকে বিদায় দেবার দুঃখ অনুভব করছে।'

প্যামেলার কথাও ভুলতে পারলেন না নেহরু। 'শান্তশীলা বালিকা প্যামেলা, ইংলণ্ডের স্কুল-জীবন থেকে যাকে এখানে এসে বহু অশান্তি ও ঘটনায় ক্ষুব্ধ ভারতের এক সংকটকালে পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির মতই বহু দুরূহ দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়েছে', তার উদ্দেশও বিদায়-বাণী জানালেন নেহরু।

সেদিনই বিকালে, মাত্র চার ঘণ্টা আগে, দিল্লীর রাজপথে জনতার কাছ থেকে মাউণ্টব্যাটেন যে প্রীতি ও অভিনন্দনের বিস্ময়কর উপহার লাভ করেছেন, সে ঘটনারও উল্লেখ করে নেহরু বললেন—'আমি জানি না, ভারতীয় জনতার কাছ থেকে এই বিরাট প্রীতির পরিচয় পেয়ে লর্ড ও লেডি মাউণ্টব্যাটেন কি ভাবছেন। কিন্তু আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছি, ভারতে এসে এত অল্পকালের মধ্যে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ও এক ইংরেজ মহিলা কেমন করে এত বড় আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করতে পারলেন? এই অল্পকালের অধ্যায়টি ভারত-জীবনের এক সাফল্য অর্জনের অধ্যায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও সত্য যে, এই অধ্যায়টি বহু দুঃখ এবং বিপর্যয়েরও অধ্যায়। তাই মনে হয়, দুঃখ এবং বিপর্যয়ের স্মৃতি সরিয়ে রেখে ভারতবাসী আজ ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের দু'জনের প্রতি তাদের প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিচয় দান করেছে। আপনারা প্রীতি ও শ্রদ্ধার আরও অনেক উপহার-সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ভারতীয় জনতার এই প্রীতির চেয়ে বেশী সত্য ও মূল্যবান কোন উপহার অবশ্যই নিয়ে যাচ্ছেন না।'

বক্তৃতার উপসংহারে নেহরু বলেন—'স্যার ও মাদাম মাউণ্টব্যাটেন, আপনারা আজ অবশ্যই অনুভব করতে পেরেছেন, মানুষের প্রীতি ও সৌহার্দ্য কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করে।'

মাউণ্টব্যাটেন ও লেডি মাউণ্টব্যাটেন, উভয়েরই মন এ বিদায়-অনুষ্ঠানের অজস্র প্রীতির স্পর্শে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। উভয়েই বক্তৃতা দিলেন, সে বক্তৃতাকে হৃদয়ের ভাষা দিয়ে রচিত বক্তৃতা বলা যায়।

শেষবারের মত আনুষ্ঠানিকভাবে উপহার বিনিময়ের পালাও শেষ হলো। ভারত সরকার মাউণ্টব্যাটেনকে একটি ট্রে উপহার দিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের সকল মন্ত্রী এবং সকল প্রাদেশিক গবর্ণরের স্বাক্ষর চিহ্নের দ্বারা খচিত একটি ট্রে।

মাউণ্টব্যাটেন ভারত সরকারকে উপহার দিলেন একটি স্বর্ণনির্মিত প্লেট। এই প্লেট রাজা পঞ্চম জর্জকে উপহার দিয়েছিলেন ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত 'গোল্ড-স্মিথ এণ্ড সিলভারস্মিথ' প্রতিষ্ঠান। রাজা ষষ্ঠ জর্জের ইচ্ছা অনুসারেই এই স্বর্ণপাত্রটি ভারত সরকারকে উপহার দেওয়া হলো। রাজা ষষ্ঠ জর্জ জানিয়েছেন—'ভারতের জনসাধারণের প্রতি সকল ইংরাজ নরনারীর, তথা যুক্তরাজ্যের প্রত্যেক নরনারীর সৌহার্দ্যের প্রতীকরূপে' এই বস্তুটি ভারতকে উপহার দেওয়া হলো।

বিদায়-অনুষ্ঠানের এই ভোজ-সভায় কম করেও ছয় হাজার ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ভারত থেকে বিদায় নেবার আগে লেডি মাউণ্টব্যাটেনও তাঁর সেবাব্রতের শেষ অনুষ্ঠান সেরে নিলেন। কুরুক্ষেত্র এবং পাণিপথের শরণার্থীদের শিবিরে উপস্থিত হলেন লেডি মাউণ্টব্যাটেন। এই দুই শিবিরে তখনো তিন লক্ষ শরণার্থী ছিল। হাজারে হাজারে শরণার্থী নরনারী লেডি মাউণ্টব্যাটেনকে ঘিরে দাঁড়ালো। জলভরা চোখে বিদায় সম্ভাষণ জানালো শরণার্থী নরনারী। শরণার্থীরা যে সব সামগ্রী লেডি মাউণ্টব্যাটেনকে উপহার দিল, সেই সামগ্রী এক ব্যক্তি দিল্লীতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে, তারই জন্য রেলভাড়া সংগ্রহ করলো শরণার্থীরা, নিজেদের মধ্যেই এক-পয়সা ও এক-আনা করে চাঁদা তুলে।

আর একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। দিল্লীর সকল বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের পক্ষ থেকে আহূত সম্বর্ধনার সভা। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বর্তমানে চীনা রাষ্ট্রদূতই হলেন দিল্লীতে অবস্থিত বৈদেশিক দূতগোষ্ঠীর আচার্য। তিনি সুধী ও কৃতবিদ্য, মানুষের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেদন নিজের মন দিয়ে উপলব্ধি করবার শক্তি তাঁর আছে। মাউণ্টব্যাটেনের এই ঐতিহাসিক বিদায়-পর্বের অনুষ্ঠান সকলের মনের গভীরে হর্ষ ও বেদনায় মিশ্রিত যে ভাবনার আবেগ জাগিয়ে তুলেছে, তার পরিচয় ও রূপ তিনিই প্রায় ঠিক-ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। মাউণ্টব্যাটেনকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে এক বিখ্যাত চীনা কবির রচিত কবিতার কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন চীনা রাষ্ট্রদূতঃ

"পুষ্পিত পীচতরুর ছায়ায়
শীতল ঝরণার জল খুবই গভীর।
তার চেয়েও বেশি গভীর
হৃদয়ের প্রীতি আবেগ ও বেদনা,
সুহৃদ্ যখন বিদায় নিয়ে
চলে যায়।"

ক্রমশঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)

বড় স্টেশন সিরাকোল, ঘোলসাপুরের পরেই। বেশ খানিকটা ইয়ার্ড, লাইনটাও রাস্তা ছেড়ে খানিকটা ভেতর দিকে চলে গেছে; ইঞ্জিন জল নেবে তার জন্যে একটা জলস্তম্ভ। একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, স্টেশন বলে শ্রদ্ধা হয়।

ঘরের মধ্যে গিয়ে মাস্টারমশাইকে প্রশ্ন করলাম, গাড়িটার আর কত দেরি। একটা লম্বা খাতায় টাকা-আনা-পাইয়ের ঠিক দিচ্ছিলেন—বহর দেখে মনে হোল ষান্মাষিক বা সাল-তামামি। তর্জনীটা একটা সংখ্যার সামনে, টিপে রেখে, ঘুরে একটু অন্যমনস্ক-ভাবে বললেন—'বেরিয়ে গেল যে।'

"বেরিয়ে গেছে! কতক্ষণ?"

"এ-ই আপনার গিয়ে..."

ঘড়ির দিকে চেয়ে নিয়ে শেষ করলেন—"মিনি—ট দশ; ঠিক দশ মিনিট হোল।"

"এর পরেরটা?"—

না ফিরে বাঁ হাতটা একটু উঁচু করে অপেক্ষা করতে ইশারা করলেন ও তর্জনীটা আবার ওপরে উঠে গেছে, আঁকে যেমন চটপটে, নেমে আসতে দেরি হবে। যদি গুলিয়ে যান তো চটতেও পারেন। আমতলা-হাটের পর আর অযথা কথা কাটাকাটি করার উৎসাহ নেই; বেরিয়ে এলাম।

এত দ'মে গেছি যে, হিসেব করে দেখবারও অবকাশ হোল না। আস্তে আস্তে গিয়ে বাইরের বেঞ্চটায় বসে পড়লাম। এ যে দেখছি, গাড়ি ফেল করবার মরশুমে পড়ে গেছে। এখন করা যায় কি?

করার মধ্যে এটা ঠিক যে, ফলতা আজকের মত বাতিল করতে হোল। দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা অন্তর গাড়ি, পরেরটা এখানে এসে পৌঁছুতেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

ফেরাই সাব্যস্ত। নিরুদ্দেশের যাত্রা, টিকিট কিনেছি বলেই যে ফলতার হাতে মাথা বিকিয়ে দিয়েছি এমন কথা নয়। বাসে ডায়মণ্ডহারবারের দিকেও খানিকটা চলে যাওয়া যায়, কিন্তু কেমন যেন উৎসাহ পাচ্ছি না। রেলের লাইনটা সেখানে রাস্তার ওপর যুগ্ম রেখা টেনে ডাইনের দিকে ঘুরে গেছে, সেইখানেই আমার আজকের গতিপথেরও পূর্ণচ্ছেদ টানা হয়ে গেছে যেন।

এও এক অদ্ভুত খেয়াল মনের। আগে এক জায়গায় তোমায় বলে থাকব, আমার এই অভিযানের যে মুক্তি তা অন্য ধরণের—বাধা হয়ে যা মনে উদয় হবে, তাকে যে সব সময় কাটিয়েই ওঠবার জন্যে প্রাণপণ করব তা নয়। যখন খুশি তখন করব প্রাণপণ, যখন খুশি, তখন করব না—এই যেমন খুশি তেমনি করার মুক্তিই তো আসল মুক্তি; একটু যদি নিয়মই বেঁধে ফেললাম যে না ভয়, না মোহ—কোনটার হাতেই আত্মসমর্পণ করব না তো সে নিয়মই তো একটা নিগড়।

আর বৈচিত্র্যও তো এই মুক্তিতেই—সে বৈচিত্র্যের অপর নাম জীবন—Variety is life...মাঝে মাঝে কখনও রাঙা চোখ কষায়িত ক'রে বধূর অশ্রু বের করে আনতে হবে, আবার নিজের অশ্রু দিয়েও শ্রীচরণের রাঙা আলতা দিতে হবে ধুয়ে।

বাধার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ।

বলবে, তুলনাটা ঠিক হোল না,—বধূ তো বাধা নয়। নয় কেমন করে?—

বন্ধনইতো।

ঐ পূর্ণচ্ছেদটা রূপান্তরে একটা মায়া। মায়া পড়ে গেছে আজ আমার ফলতা রেলের ঐ এক জোড়া লাইনের ওপর। আজ আমার ওর সঙ্গে মন বাঁধা হয়ে গেছে কেমন ক'রে, ও মুখটা ঘুরিয়ে চলে যাবে ডাইনে, আমি ওকেই অতিক্রম করে বেরিয়ে যাব সোজা, এ চলবে না। আজ ফিরি, আবার একদিন আসা যাবে।

ফিরতে কিন্তু বাস, আর রেল নয়। রেলের বোধ হয় বিলম্ব আছে, তা ভিন্ন রেলে বিলম্বও। বাড়ি ফেরাটা বেড়ানো নয়, সেটা নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, সুতরাং তাতে সময়েরও করা চাই সঙ্কোচ; বেড়ানোটা হচ্ছে নিজেকে প্রসারিত করে দেওয়া, তার সামনে রয়েছে অনন্ত, সুতরাং সময়েরও একটা অন্ত বেঁধে নিয়ে এগুলে চলে না।

কিন্তু বাসেই যদি ফিরিতো তাড়াতাড়িটা কিসের এখন?—ঘুরে ফিরে জায়গাটা একটু দেখে আসা যাক না। একটা কিছু ঠিক করে ফেলার পর আর সে অবসাদটা নেই।

উঠে বারন্দার ধারে এসে একবার চোখ তুলে চারিদিকটা দেখে নিলাম। জায়গাটা একটু নতুন ধরণের—যা এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। রাস্তার উল্টো দিকটায় স্টেশন থেকে পো'টাক তফাতে একটা নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। একেবারে নতুন বলে গাছপালার ভিড় লাগেনি—বড় বা আগাছা, কোন-রকমেরই। সখের বাজার ঠাকুরপুকুর থেকে আলাদা তো বটে, উদয়রামপুর—আমতলার-হাট থেকেও অন্য ধরণের। অনেকটা আমাদের ওদিককার মতো—খোলা, খটখটে, একটু এগুতে না এগুতেই দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে হচ্ছে না, এখান থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত সমস্তটুকু স্বচ্ছ আকাশের নিচে ঝলমল করছে। আকাশের গায়ে একখানি যেন ছবি টাঙানো রয়েছে।

আবার টানছে আমায়, নেমে পড়লাম। আমতলার হাটের 'রয়াল সেলুন' ভুলে গেছি; সারা দুনিয়া কি 'রয়াল সেলুনেই' থাকবে ভয়াল হয়ে? উজিয়ে যেতে হোল খানিকটা; তার পরেই ডাইনে রাস্তাটা গেছে বেরিয়ে।

বেশ চওড়া নতুন রাস্তা, পাকা; বড় রাস্তার মত পিচ নেই, তবে বেশ ভালো করে রোল করা। খানিকটা গিয়েই দুধারে সে দোকানের সারি আরম্ভ হয়েছে, সেটা অনেক দূর পর্যন্ত গেছে চলে, আর রাস্তাটা গেছে সেসব ছাড়িয়ে টানা ওদিক পানে বেরিয়ে, দেখলেই মনে হয়, বহু দূরের পাল্লা।

কেমন একটা নতুন-নতুন ভাব এসেছে জায়গাটার মধ্যে, একটা freshness, যার জন্যে একটু অভিভূত হয়ে পড়েছি। নব-জন্মের একটা বিস্ময় আছে, নতুন একটা শিল্পই হোক, নতুন ছবি বা নতুন একটা

নগরীই। তার নতুন রূপ নিয়ে ধরাপৃষ্ঠে সে যে একটা রূপান্তর ঘটালে শুধু তাই নয়, তার হয়ে-ওঠা এখনও পূর্ণ হয়নি, সুতরাং তার চারিদিকে কল্পনার থাকে পূর্ণ অবকাশ। দেখতে দেখতে আর সেই দেখার ওপর গড়তে গড়তে এগিয়ে চললাম। আমার অবসরও প্রচুর এখন, এমন নয় যে, উদয়রামপুরের মতো ফলতা মেল হুইসিল মারলেই ছুটতে হবে, কি আমতলার হাটের মতো সেই ফলতা মেল পেছনে আসছে ছুটে—তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হতে হবে। আধ ঘণ্টা বাস, অন্তত দুটো আধ ঘণ্টা তো অনায়াসেই হাতে রাখা যায়।

যেখানে নতুন রাস্তাটা ডায়মণ্ডহারবার রোড থেকে বেরিয়েছে, সেখানে বাঁদিকে ছোট একটি পুল আর তার পাশেই গুটি তিন-চার দোকান, প্রথমটি মুদিখানা। এখানে এসে আমার গতিটা একটু মন্থর করতে হোল। হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্র-সংগীত হচ্ছে, সেও আবার এ জায়গার পক্ষে একটু নতুন ধরণেরঃ 'খর বায়ু বয় বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে'...... রাস্তাটা যে ভেঙে বেরিয়েছে, ঠিক তার বাঁ কোণটিতে একটা ছোট্ট ঘর, দোতলা। ঘরও বলতে হোল, দোতলাও বলতে হোল, কিন্তু নিয়মমতো ধরতে গেলে তার কিছুই নয়। নীচের ঘরের সামনের দিকটা রাস্তার সমতলে, বাকি মেঝেটা পিল্পের আর খুঁটির ওপর বসানো, রাস্তাটা যে আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে গেছে, সেইখান থেকে তোলা, মেঝের নীচে ফাঁকা জায়গাটায় আগাছার জঙ্গল। সমস্ত ঘরটিই ওপর পর্যন্ত ইট আর কাঠ-কাটরা দিয়ে তৈরি।—লম্বে-প্রস্থে চার-পাঁচ হাত হবে। একটা যেন খেলাঘরই। ওপর-নীচে মিলিয়েও একটা মাপিকসই একতলার মতো উঁচু নয়।

নীচেটা বিড়ির দোকান, পাশ দিয়ে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে কাঠের, তাই দিয়ে মাথা নীচু করে দোতলায় গিয়ে পৌঁছতে হবে।

সেই দোতলা থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বেরিয়ে আসছে।

নতুন ধরণের এইজন্যে বলছি যে, ঠিক এক গলায় একটানা সঙ্গীত নয়, সংগীতের শিক্ষকতা, একজন বেটাছেলে—গলাটা দিব্যি চাঁচা, ভরাট—একটি ছোট মেয়েকে শেখাচ্ছে।

জিগ্যেস করতে দোকানী বললে—গানের ইস্কুল, কেন সাইনবোর্ড তো টাঙানো রয়েছে, একটু উঁদিকপানে গেলেই ঠাওর হবে।'

কাছের গ্রামেরই একটি ছেলে, বাইরে থেকে শিখে এসে স্কুলটি ফেঁদেছে।

বড় অদ্ভুত লাগছে; এখানে মিউজিক স্কুল! সিরাকোল জঙ্গাল তো একেবারেই আধুনিক হয়ে জঙ্গাল! আরও একটা কথা, যে জন্যে আমি হয়ে পড়েছি বেশি অভিভূত—এইখানে রাস্তার এই কোণটিতে দুটি বাংলা একটি গানের সেতুতে যেন এক হয়ে গেছে—নোবেল-লরিয়েট রবীন্দ্রনাথের বাংলা, কালচারের উত্তুঙ্গ শীর্ষে অধিষ্ঠিত, আর পল্লী মায়ের অঞ্চলাশ্রিত মেঠো বাংলা। এ সমন্বয় স্বপ্নেই আছে, সাহিত্যিক-সাংবাদিক-রাজনীতিকের একটা pious hope—নিয়তই জাতির কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে, প্রচারে হচ্ছে রূপায়িত— একে যে এমনভাবে, এমন একটা জায়গায়, এমন একটা সমাবেশের মধ্যে উপলব্ধি করবার সৌভাগ্য হবে আমার, তা কখনও কি ভাবতে পেরেছি?

গান শুনছি বলেই 'রয়াল সেলুনের' পদ্ধতিতে সাকরেদ করে নেবার জন্যে টানা-হিঁচড়া লাগাবে এমন ভয় নেই, সুতরাং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শেষ করা গেল। তারপর এগিয়ে চললাম আবার।

আগে জঠরাগ্নিকে শান্ত করা যাক। একটা ঘর বা জায়গা বনেদী কি ভুঁই-ফোঁড় তা টের পাওয়া যায়, সে খায় কিরকম, এই থেকে। সেদিক দিয়ে আমতলার হাটের কাছে সিরাকোলকে মাথা নোয়াতে হয়। জানি না এখন কি রকম হয়েছে, কিন্তু আমার যেদিন শুভাগমন হয়,—সেই প্রায় আজ থেকে বছর সাত আগে, সেদিন সমস্ত বাজারটা ঘুরে এসেও একটা ভালো দোকান পাইনি। শেষে হার মেনে, যেটার দিকে নাক সিঁটকে চলে গিয়েছিলাম, সেটারই দ্বারস্থ হতে হোল।

মুড়ি আর মেঠাই—দুটো ডিপার্টমেণ্ট। মুড়িরটায় মা-লক্ষ্মী যেন উছলে পড়ছেন—মুড়ি, চিড়ে, মুড়কি; মুড়ি আর চিড়ের মোয়া, কাঠিভাজা, ফুলুড়ি, বেগুনি—কি খাবে, কত চাই?

এইটেই বড়রাস্তার ওপর, বাহার দিয়ে। দোকানের বাঁদিক দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা নেমে গেছে, তাই দিয়ে মেঠাই বিভাগে ঢুকতে হয়, কতকটা যেন আত্মগোপন করে আছে।

"টাট্‌কা কিছু পাওয়া যাবে?" —প্রশ্নটা করবার সময় চক্ষুলজ্জার খাতিরেও উনুনটা থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না, কবে যে আগুন পড়েছিল, ভিয়ান চড়েছিল, সেটা গবেষণার বিষয়।

ডান হাতে পাখা, বাঁ-হাতে হুঁকো নিয়ে দোকানী চৌকির ওপর বসেছিল, নেমে উঠে দাঁড়াল খাতির করে, একটু সংকোচের সঙ্গে হেসে বললে—"আজ্ঞে, একেবারে যে সদ্য তৈরি, টাট্‌কা, তা বলতে পারব না, তবে পানতুয়াটা আপনি দেখতে পারেন, বোধ হয় চলতে পারে......বলেন তো......"

আমতলা হাটের সদ্যজাত রসগোল্লাগুলো রসের কড়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে......একটু বিমর্ষ কণ্ঠে বললাম—"দেখি।"

আলমারিটা বড় পুরনোও, সেটা খুলে একটা সালপাতায় করে দুটি বের করে নিয়ে এসে সামনে ধরলে। বললাম—"রসগোল্লা?"

"আজ্ঞে, সেটা আর দেখালুম-না......"

একটু ম্লান হেসে, ফরমাস মতো গোটা আস্টেক পানতুয়া একটা পদ্মপাতায় করে

বের করতে করতে দঃখের কাহিনী বলতে লাগল—নতুন একটা জায়গার পত্তন হোল দেখে গ্রাম থেকে উঠে এসে ফে'দেছে দোকানটুকু—মিলিটারীরাই রাস্তাটা বের করলে কিনা—একটু ফলাও করে টেবিল-বেঞ্চিও পেতেছে এই, কিন্তু কৈ? —ছানার মালের বিক্রী নেই, ঐ মড়ি-মোয়া, কাঠি ভাজা......"

লোকটি ভালো। শেষের দুটো পানতুয়া যে গলার নীচে নামাতে পারলাম না, তার জন্যে আরও কুণ্ঠিত হয়ে উঠল। দামটা নেবার সময় কাঁচুমাচু করে বললে—"না হয় অর্ধেক দামই দিলেন......অবিশ্যি বলতে ভরসা পাচ্ছি নে......"

বড় মিষ্টি লাগল। একটা খারাপ হবে, তবে তো আর একটা হবে ভালো, এই করেই তো জীবনের ভারসাম্য রক্ষা হয়ে চলে; পানতুয়ার রস একটু টকে না গেলে, মনের রসটুকু এত মধুর হয়ে কি বেরিয়ে আসতে পারত?......অবশ্য থাকবে আর ক'দিন? —সদর বাজারে দোকান ফে'দেছে, নানা স্বার্থের সংঘাতে ও-রসটুকু হয়তো যাবেই উবে, তবে আমি যে তার আগেই একদিন পে'ৗছে গিয়ে পেলাম আস্বাদ এইটুকুর, আমার কাছে তো সেইটিই বড় কথা।

বললাম—"না, সে কি কথা, তুমি তো ঠকতা করো নি......রসগোল্লা তো বেরও করলে না—পাতে দেবার মতন নয় বলেই তো?"

জিভ্ কামড়ালে।

"আজ্ঞে, তা কখনও পারি বের করতে? ......আবার দেখুন, ঐগুণি তো বিক্রীও করব, দরের দরেই করব বিক্রি, ফেলে দোব না তো। ......তাহলেই দেখুন, গলদটা কত দূর। গ্রামের মধ্যে এসব চলত না, সমাজ রয়েছে যে; কিন্তু পেট যে আর চলে না গ্রামে—অমন গ্রাম......শ্মশান হয়ে গেছে আজ্ঞে, দিনের বেলা বাঘ ডাকে...চৌধুরী-দের, রায়েদের, চাটুজ্জ্যেদের, পালেদের, এক-একখানা যে বাড়ি পড়ে আছে—তাইতে জোগান দিয়েই এক-একটা ময়রার দোকান দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো—ছেলও তাই, ময়রা পাড়ারই এপারে শাঁখ বাজালে, ওপারে আওয়াজ পে'ৗছতো না। এখন দুটি ঘরে দাঁড়িয়েছে, আজ্ঞে......বলুন।"

কি আর বলব? কণ্ঠও হয়ে আসে রুদ্ধ।

"ব্রাহ্মণ?"

"হ্যাঁ।"

"পাতঃ পেন্নাম হই। তামাক......"

"তা একটু হলে মন্দ হোত না।"

সামনে যে ছেলেটি খদ্দের সামলাচ্ছিল, তাকে ডেকে তামাকটা সেজে দিতে আদেশ করে বললে—"তা ভেবেছেন আমি আর বেশিদিন এর মধ্যে জড়িয়ে থাকব? রামো-চন্দ্র! ঐটি নাতি। ওর বাপকে সেখানকার দোকানে বসিয়ে এসে একটু ট্রেনিং দিচ্চি উটিকে; একটু সড়গড় হয়ে এলেই তাকে সুদ্দু এনে বাপ-বেটাকে এইখেনে বসিয়ে আমি আমার সাবেক আস্তানায় গিয়ে উঠব আবার।......আমার সোজা কথা আজ্ঞে—তোরা এই অখদ্যে কালে জন্মেচিস—দুটো মিথ্যে কথা না বললে, তঞ্চকতা না করলে যে কালে পেট চলে না; তা তোরা ঐ পাঠ-শালায় গিয়ে পড়—আমায় নিয়ে টানাটানি করা কেন?

আজ্ঞে এই বেলা পড়ে এল তো?—এর পরেই সন্ধ্যে—এদানি নয়, ঐ ওর মতন যখনটা—চাটুজ্জেদের শিব তথায় নিত্যি আড়াই সের করে বাতাসা আর পো তিনেক সন্দেশ সের বাটখারা শুদ্দু নিয়ে গিয়ে তোল করে উঠোনা দিয়ে আসতে হোত। বহুকালের কথা...এখন বাতাসা খাবার মতন একটি শিবই আছেন, বাণেশ্বর, বাকি চারটি ইঁটের গাদার মধ্যে—কোন ব্যবস্থা নেই—চাটুজ্জেরাই লোপাট হয়ে গেল তো তার ব্যবস্থা—তবুও স্বভাবের দোষেই আধ-পোটাক করে বাতাসা—পুরুত মশাইয়ের নেংটো নাতিটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে বাবার মাথায় চইড়ে না দিয়ে এলে সোয়াস্তি হোত না আজ্ঞে।......সেটুকুও গেছে......এখন কি রকম করে পচা রসগোল্লা আর বাসি মুড়ি খদ্দেরের হাতে গচিয়ে দিতে হবে—তার হক্কের কড়ি আদায় করে নিয়ে, তার ট্রেনিং দিচ্চি।......তা দিচ্চিই, উপায় কি?......তবে সন্দেটুকু এগিয়ে আসার সঙ্গে মনটা যে আইঢাই করে উঠতে থাকে—হিসেবে ভুল হয়—কেবলই মনে হয় ছোঁড়াটা বনের মধ্যে গিয়ে, পোড়ো মন্দিরে পিদিমটুকু জেবলে, সেই ছটাকখানেক বাতাসা বাবার সামনে ধরে দিয়ে এলো কি না......"

বেশ বলছিল, হঠাৎ—"ও কর্তাবাবু, একি সাজা দিলেন তিনি আমায় বুড়ো বয়সে!" —বলে খাটো কোঁচার খুঁটটা চোখে রেখে হুহু করে কেঁদে উঠল।

কিছু না বললে, চলে না, মানুষকে ফাঁকা সান্ত্বনা দিতেই তো মানুষের জন্ম, বললাম—"তা আর করছ কি কর্তা? আড়াই সের করে বাতাসাটা হচ্ছিল—তা তাঁরই যখন ইচ্ছে এই রকমটা হোক, ঐ আধপোটুকুও বন্ধ পড়ুক—তো তুমি-আমি করতে পারি কি?"

খানিকটা নীরবে কাটল; আমাকেও ছোঁয়াচ লেগেছে, আর বলতে গেলে সামলাতে পারব না নিজেকে—

মনটা হালকা হ'লে চোখ দুটো মুছে নিয়ে দোকানী বললে—"আজ্ঞে, আম্মো সেই কথাই বলি—বলি, তাঁরই যখন ইচ্ছে, তখন তুই কি করবি বল মোদকের পো?......তবে উপলক্ষিটা আবার আমাকেই করেছেন কিনা, তাই......বামুন, কড়ি-বাঁধাটা।"

ছেলেটি তামাক সেজে এনেছিল, হুঁকোটা পালটে নিয়ে এসে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতটা স্পর্শ ক'রে এগিয়ে ধরলে। এতক্ষণ ঐ দিকে ছিল, ভালো করে দেখা হয় নি, সামনে এসে দাঁড়াতে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। একেবারে এইরকম ষোল আনা একটি বাঙালীর ছেলে কতদিন যে দেখা হয় নি! —চোখ যেন ফেরাতে পারা যাচ্ছে না। বছর পনর-ষোল বয়স, এদিককার হিসেবে একটু লম্বা, কালো, নধর-কান্তি, চোখ দুটি ঢুল-ঢুলে, বুদ্ধির দীপ্তিতে একটা অন্যধরণের বাহার এসে পড়েছে তারই মধ্যে; এদিকে একটু সলজ্জ। মাথায় একমাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। এই রূপটা কেমন করে যেন আমার বাঙলাদেশের ধ্যান-মূর্তির সঙ্গে বহুদিন থেকে রয়েছে জড়িয়ে। প্রতিপদেই এর ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু আমার মনে হয় এই যেন আদর্শ, এই যেন হওয়া উচিত, এই মায়ের এ-ই যেন সন্তান।

'ষোল আনা' বলেছি অন্য কারণে। বাঙলার বাইরে কোথায় কি ফ্যাশান উঠছে—কেশে, বেশে, তার একটি আঁচড় এসে লাগেনি গায়ে। একটি লালপেড়ে আধময়লা ধুতি, আলগা কোমর বেঁধে পরা, কাঁধে একটা রাঙা গামছা, হাত মোছবার জন্যে, ডান ওপর হাতে সোনার তারে একটা সোনার তাবিজ বাঁধা; ব্যাস, শেষ; গায়ে একটা গেঞ্জি পর্যন্ত নেই যে ষোল আনা থেকে এক পাই পয়সাও কম পড়বে।

চুলে এতটুকু ইতর-বিশেষ নেই ঘাড় আর কপালের মধ্যে। বুঝছি, তুমি সন্তুষ্ট হতে পারছ না, এই অধনগ্ন প্রকৃতি-শাবকটিকে জগৎ-সভায় কি করে দাঁড় করাবে? তার জন্যে আমার কিন্তু কোন মাথাব্যথাই নেই; আপাতত এইটুকুই মনে হচ্ছে যে জগৎ এক-বার উঠে এসে তার নয়ন দুটো সার্থক করে যাক।

আমরা তো এর কাঁধেই একটা পীত-ধরা তুলে দিয়ে রূপের চরমোৎকর্ষ—একেবারে মদন-মোহন রূপের স্বপ্ন দেখে এসেছি।

দোকানী চুপ করে কি একটা যেন লক্ষ্য করছিল, হঠাৎ একটু উষ্ণ হয়ে উঠল—"ঐ দেখুন, সাধ করে কি বলছিলাম এ-কাল আর সেকাল?......শুনলি বামুন, তা পায়ের ধুলো নিতে হবে না?—সেটুকুও বলে দিতে হবে?"

কাল প্রবাসী-অফিসে যথেচ্ছা তর্কের যে এলোমেলো ঝড়টা উঠেছিল তাতে এটাও ছিল—এই জাতপাঁত, ব্রাহ্মণ-হরিজন। আমিই ছিলাম বলতে গেলে বিপক্ষের নেতা। মলিন শতগ্রন্থি একগাছা পৈতা শরীরের কোথায় পড়ে আছে—ঢোঁড়াসাপ—সে নিয়ে আর দাপট কেন?...বিষ থাকলেও যে এক সময় করেছিলাম দাপট তারই তো পরিণতি—বিষের অক্ষরে ঐ লেখা রয়েছে পূর্ববঙ্গে, মাদ্রাজে, কোথায়ই বা নয়?—হাজার বছরের গ্লানির ইতিহাসের পাতায় পাতায় একেবারে......

—আমার তর্ক; chapter-verse উদ্ধার করে করে দেখিয়ে গিয়েছি কাল; শুধু মুখের কথা নয়, অন্তরের বিশ্বাসও। তবু আজ কি হয়েছে—কোন্ প্রবাস থেকে যেন ঘরে ফিরে এসেছি, সেখানে তর্ক নেই, নেই দ্বন্দ্ব। সহজ অধিকারে আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রতি কারুর নেই ঈর্ষা, কারুর প্রতি আমার নেই অবজ্ঞা......আমার ডাক পড়েছে গরীবমেয়েটির জামরুলের দোকানের শুভ-যাত্রা করে দিতে হবে, এখানে বৃদ্ধের নাতির জীবনেরও জয়যাত্রার দুটো মন্ত্র চাই।...... কী সে সৌভাগ্য! কী করে করে যে হারাল! কেন যে!......নতুন যুগের নতুন তথ্য—প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আত্ম-জিজ্ঞাসার। ব্রাহ্মণ বলেই আমি যেন সবচেয়ে বড় ত্যাগটা করে যেতে পারি, সবচেয়ে বড় স্বার্থটাকে জগতের কল্যাণ-যজ্ঞে আহুতি দিয়ে যেতে পারি হে ভগবান......

আবার গিয়ে তর্কে মাতব, কাগজে লিখব,

সাহিত্যে করব প্রচার,—কেন এই তিন গাছা সুতো নিয়ে এত মাতামাতি!

তার আগে কিন্তু আজকের এই দিনটাকে পেয়ে নিই ভালো করে। কবেকার একটি হারাণো দিন আচম্বিতে পথভুলে এসে যখন পড়েছেই।

আর পায়ের ধুলো কাউকে নিতে দিই না, ধুলোই তো, অপমানই তো। আজ কিন্তু আর ছন্দপতন হতে দিলাম না, পা দুটো বের করে নিয়ে জুতোর ওপর রাখলাম। মাথায় হাতটা চেপে ব্রাহ্মণেরই ভাষায় ব্রাহ্মণের সৃষ্ট মন্ত্রে আশীর্বাদ করলাম—'কল্যাণমস্তু'।

আশা রইল শক্তিতে না কাজ হোক, অপচয়িত শক্তির যে অনুতাপ তাতেও যদি ফল হয় একটু।

পারছ পড়ে যেতে?—আমার অভিযানে সৌধ নেই, শিখর নেই, ঝরণা নেই, সমাধি নেই, স্মৃতিস্তম্ভ নেই। কি করব? এই ঘুটে ঘুটে বেড়াই, রোদে বর্ষায়, সকালে, সন্ধ্যায়; চিঠিতেও তাই এই দিচ্ছি, ধরছে কি মনে তোমার?

Eureka! প্রাপ্তোস্মি! সেই কথাই এবার বলি তোমায়ঃ— (ক্রমশ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

৮১

বৈশাখ মাস হ'তে ধীরে ধীরে বিচিত্রার মুদ্রণকার্য আরম্ভ হ'ল। মুদ্রণকার্যের প্রধান ভার পড়ল শ্রীযুক্ত অমল হোমের উপর। অমলবাবু তখন ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটের সম্পাদক। ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটের বিশেষ সংখ্যাগুলিতে মুদ্রণ বিষয়ে তাঁর উন্নত জ্ঞান এবং সুরুচির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যেত।

সর্বপ্রথমে অমলবাবু বিচিত্রার একটি ডামি (Dummy) প্রস্তুত করাতে মনোযোগী হলেন। ডামি অর্থে বিচিত্রা যেমন হবে, আকারে এবং প্রকারে তার অবিকল প্রতিকৃতি। বিচিত্রার আকার ছিল ডবল ক্রাউন আট পেজি; আয়তন ছিল বিষয়বস্তু একুশ ফর্মা এবং পাঁচ ফর্মা বিজ্ঞাপন, মোট ছাব্বিশ ফর্মার। ডামিরও করা হল সেই একই আকার ও আয়তন। কভারে বৃহৎ অক্ষরের ব্লকে বিচিত্রা নাম। তার নিম্নে যথাস্থানে মুদ্রিত—প্রথম বর্ষ প্রথম খণ্ড—আষাঢ়, ১৩৩৪—প্রথম সংখ্যা। তার নিম্নে বড় বড় অক্ষরে সম্পাদকের নাম। বিষয়-বস্তুর প্রথম পৃষ্ঠার সম্মুখে ত্রিবর্ণ ব্লকে মুদ্রিত রঙিন চিত্র, বিষয়বস্তুর মাঝামাঝি স্থানে আর একখানি রঙিন চিত্র। তা ছাড়া, একখানি পূর্ণপৃষ্ঠ দুই-রঙা ছবি। দক্ষিণ দিকের পাতার শীর্ষদেশে প্রবন্ধ ও লেখকের নাম, বামদিকের পাতায় ব্লকে ছাপা বিচিত্রার নাম। পাতাগুলি সবই প্রায় সাদা; তবে কোনো কোনো প্রবন্ধ অথবা কবিতার খানিকটা ক'রে অংশ ছাপা। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাগুলিরও অধিকাংশই খালি। শুধু যে-বিজ্ঞাপনদাতাদের সহিত বিজ্ঞাপনের চুক্তি হয়ে গিয়েছে, অথবা হ'য়ে এসেছে, তাদের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত করা হয়েছে। ডামি দেখিয়ে বিজ্ঞাপন আদায় করা এবং বিজ্ঞাপনের দর নির্ণয় করা ডামি প্রস্তুত করাবার প্রধান উদ্দেশ্য।

দফ্তরির বাড়ি থেকে দু শ' আড়াই শ' কপি বাঁধিয়ে এলে ডামির নীলরেখাঙ্কিত দুগ্ধশুভ্র মূর্তি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল! বোবারই এত মহিমা,—এ যখন মুখর হবে, তখন না-জানি কি কাণ্ডই উৎপন্ন করবে! আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে আবির্ভূত হবার জন্য যে চারুরূপিণী বিচিত্রা তার গোপন কক্ষে উপস্থিত প্রসাধনরতা,—এ যেন তার পূর্বাভাস, তার ছায়া। উৎকৃষ্ট পুরু শুভ্র আর্ট পেপারের উপর পীকক্ ব্লু কালিতে ছাপা প্রচ্ছদ। তার অপূর্ব শ্রীর মধ্যে এমন অনাড়ম্বর আভিজাত্যের প্রকাশ যে, সত্য কথা যদি বলতে হয়, আসল বিচিত্রার জমকালো প্রচ্ছদের মধ্যে সে আভিজাত্যের ততটা সন্ধান পাইনি।

মাসিক পত্রের ডামি আমার অভিজ্ঞতায় ইতিপূর্বে আমি কখনো দেখিনি, পরেও না। দেখলাম, আমার মতো অনেকেই দেখেনি। যাকে দেখাই সে-ই চমকে ওঠে। বড় চমকানির কাহিনীটা এবার বলি।

ডামি যখন প্রকাশিত হ'ল তখন হয় বৈশাখ মাসের শেষ, নয় জ্যৈষ্ঠ মাসের আরম্ভ। এক খণ্ড ডামি নিয়ে জোড়াসাঁকোয় ৬নং দ্বারিকানাথ ঠাকুর লেনে আমরা উপস্থিত হলাম। রবীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায় অবস্থান করছেন। বিচিত্রার প্রথম সংখ্যায় চৌষট্টি পাতা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা প্রকাশিত হবে। তার প্রত্যেকটি পাতা শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত অলংকারচিত্রের দ্বারা সজ্জিত। কাব্যের মধ্যস্থলে অনুপ্রবিষ্ট নন্দলাল-অঙ্কিত ঋতুরাজ বসন্তের বহুবর্ণ চিত্র,—যে বসন্তকে রবীন্দ্রনাথ আবাহনের প্রথম মন্ত্রে বলেছেন,

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন!
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্তে মূর্তি ধরো ভুবন-মোহন
নব বরবেশে।
তারি লাগি' তপস্বিনী কি তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে॥

নন্দলাল বসুর দ্বারা অলঙ্কৃত রবীন্দ্রনাথের কাব্য! সাময়িক পত্রের সাহিত্যে এমন মণিকাঞ্চনের যোগ এ পর্যন্ত কখনো হয়নি ব'লেই আমার বিশ্বাস, আর অদূর ভবিষ্যতে হ'তে পারবে না ব'লে আশঙ্কা। তবে কাল নিরবধি, সুতরাং, কোনো দিন হ'তে পারবে না, সে কথাই বা কি ক'রে বলতে পারি?

আমরা যখন রবীন্দ্রনাথের কাজ করবার ঘরে টেবিলের সামনে উপস্থিত হলাম, তখন রবীন্দ্রনাথ টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে ব'সে নটরাজেরই প্রুফ্ দেখছেন। নটরাজ বিচিত্রার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হবে এবং সে প্রথম সংখ্যা বাজারে প্রকাশিত হবে পয়লা আষাঢ় অর্থাৎ অন্ততঃ মাসাবধি কাল পরে, এ চেতনা আমাদের অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের কিছুমাত্র কম ছিল না। কিন্তু চেতনা যতই স্পষ্ট এবং পর্যাপ্ত হোক্ না কেন, চোখের সম্মুখে দেদীপ্যমান কাগজের তৈয়ারি বৃহৎ একখণ্ড ডামির মতো তার ত আকার আয়তন এবং ওজন নেই; তাই সহসা যখন রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে টেবিলের উপর নিঃশব্দে একখানা ডামি স্থাপন করলাম, উৎকট বিস্ময়ে চমকিত হ'য়ে তিনি ব'লে উঠলেন, "এই! বেরিয়ে গেল না-কি!" অত বড় স্থূল প্রত্যক্ষর কাছে বেরিয়ে যাবার পক্ষে সকল অসম্ভাব্যতা পরাস্ত হ'ল। তিনি যে সে সময়ে প্রথম সংখ্যায় প্রকাশনীয় লেখার প্রুফ দেখার কার্যে রত রয়েছেন, সে কথাও সাময়িকভাবে বিস্মৃত হলেন।

সকৌতুক বিস্ময়ের পরবর্তী উচ্ছ্বাস উপভোগ করবার প্রলোভনে আমরা কষ্টে হাস্যরোধ ক'রে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রত্যাশা ব্যর্থ হল না। ডামি খুলে পাতার পর পাতা ফর্ ফর্ ক'রে উল্টে শাদা পাতা দেখে রবীন্দ্রনাথ সমুচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠলেন। সে হাসি শুধু কৌতুকেরই হাসি নয়, সে হাসির মধ্যে নিশ্চিন্ততার একটা উন্মুক্ত আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার সেই প্রাণ-খোলা হাসির ধ্বনি এখনো আমার কানে লেগে আছে।

'তিন পুরুষ' উপন্যাস (পরে যোগাযোগ) রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনুরোধক্রমে লিখেছিলেন। 'নটরাজ' কিন্তু তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে লিখছিলেন। একটি সমসাময়িক মাসিক পত্রিকার কর্তৃপক্ষ সেটি অধিকার করবার জন্য চেষ্টা করছিলেন। ছ' শ টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক দেবার প্রস্তাব

ক'রে তাঁরা ইতস্ততঃ করছিলেন অবগত হ'য়ে আমরা একেবারে এক সহস্র টাকার একখানি চেক নিয়ে গিয়ে 'নটরাজ' হস্তগত করি।

'যোগাযোগ' উপন্যাস বিচিত্রায় প্রকাশ করবার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথকে তিন সহস্র টাকা দক্ষিণা দিয়েছিলাম। এই দক্ষিণার প্রসঙ্গে একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, "তোমাদের দেওয়া এ দক্ষিণা আমাদের দেশের পক্ষে ত কথাই নেই, পৃথিবীর যে-কোনো দেশের পক্ষে সুষ্ঠু (Decent)"। আমার বেশ মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথার মধ্যে ইংরাজি Decent কথাটি ব্যবহার করেছিলেন।

তিন হাজার টাকার দক্ষিণান্ত করবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নাম ছিল 'তিন পুরুষ।' অবশ্য এই 'তিন হাজার' এবং 'তিন পুরুষ'-এর মধ্যে আসলে অর্থগত কোনো যোগাযোগ ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য। ওটা দাঁড়িয়েছিল নিতান্তই দৈব-যোগের ব্যাপার। ১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাসের বিচিত্রায় 'তিন পুরুষের' প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হ'ল; কার্তিক মাসে দ্বিতীয় কিস্তি। অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয় কিস্তি থেকে তিন পুরুষের নাম পরিবর্তিত হ'য়ে হ'ল 'যোগাযোগ'। ৪ঠা অক্টোবর ১৯২৭ শ্যামের পথে "কিন্তা" জাহাজে ব'সে রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তন করেন।

নামান্তরের কৈফিয়ৎস্বরূপ অগ্রহায়ণের বিচিত্রায় যোগাযোগের কিস্তি আরম্ভ করবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে ভূমিকাটুকু যোগ করে-ছিলেন, নাম রহস্য সম্বন্ধে সেটিকে একটি ক্ষুদ্র উপাদেয় সন্দর্ভ বলা চলে। উক্ত ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—

......ব্যক্তিগত নাম ডাকবার জন্যে, বিষয়-গত নাম স্বভাব নির্দেশের জন্যে। মানুষকেও যখন ব্যক্তি ব'লে দেখিনে, বিষয় ব'লে দেখি, তখন তার গুণ বা অবস্থা মিলিয়ে তার উপাধি দিই, কাউকে বলি বড় বউ, কাউকে বলি মাস্টার মশায়।

'সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে, দ্বিধার মধ্যে পড়ি। সাহিত্য রচনার স্বভাবটা বিষয়গত না ব্যক্তিগত এইটে হ'ল গোড়াকার তর্ক। বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিষয়টাই সর্বেসর্বা, সেখানে গুণধর্মের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। ...... বিষয়ের কাছ থেকে সংবাদ পাই, ব্যক্তির কাছ থেকে তার আত্ম-প্রকাশজনিত রস পাই। বিষয়কে বিশেষণের দ্বারা মনে বাঁধি। ব্যক্তিকে সম্বোধনের দ্বারা মনে রাখি।

'......রসশাস্ত্রে মূর্তিটা মাটির চেয়ে বেশি, গল্পটাও বিষয়ের চেয়ে বড়। এইজন্য বিষয়টাকেই শিরোধার্য ক'রে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন যায় না।......
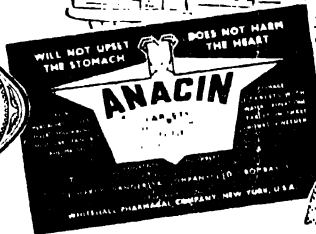
'এদিকে সম্পাদক এসে বলেন, সংসারে নাম রূপ দুটোই অত্যাবশ্যক। আমি ভেবে দেখলুম, রূপের আমরা নাম দিই, বস্তুর দিই সংজ্ঞা। সন্দেশ যেখানে রূপ, সেখানে তাকে বলি 'অবাক চাকি', যেখানে বস্তু, সেখানে তাকে বলি মিষ্টান্ন।......

'সম্পাদক মশায় যখন গল্পের নামের জন্যে পেয়াদা পাঠালেন তাড়াতাড়ি, তখন "তিন পুরুষ" নামটা দিয়ে তাকে বিদায় করা গেল। তার পরক্ষণেই নামটা কাহিনীর আঁচলের সঙ্গে তার গ্রন্থিবন্ধন ক'রে নিয়ে কানে কানে মুহূর্তে মুহূর্তে বলতে লাগল, "যদেতৎ অর্থাৎ মম তদস্তু রূপং তব।" আমার সঙ্গে তোমাকে সম্পূর্ণ মিলে চলতে হবে। কাহিনী বলে, "তার মানে কি হল?" নাম বলে, " বাক্যে ভাবে আজ থেকে আমাকে সপ্রমাণ ক'রে চলাই তোমার ধর্ম।" কাহিনী বলে, "রেজিস্টার বইয়ে কর্তার তাড়ায় সম্মতি সই করেছি বটে, কিন্তু আজ আমি হাজার হাজার পাঠকের সামনে দাঁড়িয়েই সেটা বেকবুল যেতে চাই।"

'কর্তা বলেন, তিন পুরুষের তিন তোরণ-ওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে এই আমার একটা খেয়াল মাত্র ছিল। এই রাস্তা কিছুই প্রমাণ করবার জন্যে নয়, কেবল ভ্রমণ করবার জন্যেই। সুতরাং এই নামটা ত্যাগ করলে আমার গল্পের কোনো স্বত্বের দলিল কাঁচবে না।

'অতএব সর্বসমক্ষে আমার গল্প আজ তার নাম খোয়াতে বসেছে। আমরা তিন সত্যের জোর মানি। 'বিচিত্রার' পাতায় নাম সম্বন্ধে দুইবার সত্য পাঠ হয়ে গেছে। তিন-বারের বেলায় মুখ চাপা দেওয়া গেল।

'আর একটা নাম ঠাউরেছি। সেটা এতই নির্বিশেষ যে, গল্পমাত্রেই নির্বিচারে খাটতে পারে। ..গল্প নিজেই নিজের পরিচয় দেবার সাহস রাখে যেন, নামটাকে যেন জোর গলায় আগে আগে নকীবগিরি করতে না পাঠায়।

'তিন পুরুষ নাম ঘুচিয়ে আমার গল্পের নাম দেওয়া গেল—যোগাযোগ।'

তিন পুরুষ নাম বজায় রেখেও কাহিনীকে নামের তাঁবেদারি না করিয়েও সার্থক উপন্যাস রচনা করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কঠিন ছিল না। নাম পরিবর্তনের সপক্ষে তাঁকে অতটা ওকালতি করতে হয়েছিল, বোধ করি তাঁর প্রদর্শিত কারণটাই নাম পরিবর্তনের প্রকৃত, অন্ততঃ প্রধান কারণ ছিল না ব'লে। একটা অন্য কারণের কথা আমাদের কর্ণগোচর হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর নামান্তরের ভূমিকায় তার উল্লেখ করেননি, তখন সে বিষয়ে কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য না করাই সমীচীন।

(৮২)

১৩৩৪ সালের ১লা আষাঢ় আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। বহুকাল হ'তে মনে মনে যে স্বপ্ন দেখে এসেছিলাম, সেদিন তা সুমধুর বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। কি রকম সুমধুর, বিচিত্রার প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র থেকে তার একটু ইঙ্গিত দিলে অন্যায় হবে না।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বিচিত্রার জন্য বিশেষভাবে রচিত 'বিচিত্রা' নামক চার পৃষ্ঠা-ব্যাপী কবিতা—কবির হস্তলিপিতে মুদ্রিত; তারপরে প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী নন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রভূষণে অলঙ্কৃত রবীন্দ্রনাথের ৬৪ পৃষ্ঠাব্যাপী অপরূপ খণ্ডকাব্য 'নটরাজ—ঋতুরঙ্গশালা' এবং তৎপরে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত প্রবন্ধ 'নতুন ও পুরানোর ছন্দ'; স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক অতুলচন্দ্র গুপ্ত রচিত প্রবন্ধ 'ইতিহাস'; সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী রচিত প্রবন্ধ 'পূর্ব ও পশ্চিম'; ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী লিখিত সচিত্র প্রবন্ধ 'ইন্দো-চীন ভ্রমণ'; রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছোট গল্প 'ভৌতিক প্রেম'; ডক্টর শিশির-কুমার মিত্রের সচিত্র প্রবন্ধ 'বেতারবার্তা'; ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের উপন্যাস 'সতী'; দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নটরাজ স্বরলিপি; এবং আরও অনেক।

চিত্র-তালিকার মধ্যে বলা যেতে পারে, খ্যাতনামা শিল্পী চারুচন্দ্র রায় অঙ্কিত বহুবর্ণ প্রচ্ছদ; শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত বহুবর্ণ চিত্র 'কুমারী'; নটরাজ কাব্যের সূচনা-চিত্র নটরাজ রচনা নিরত রবীন্দ্রনাথ; নন্দলাল বসু অঙ্কিত বহুবর্ণ চিত্র 'বসন্ত'; গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত দ্বিবর্ণ চিত্র 'ভোরের আলো'; তদ্ভিন্ন কয়েকটি সচিত্র প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত বহু তথ্য-সম্বলিত কৌতূহলোদ্দীপক চিত্রাবলি।

এই বস্তুনিচয়কে যদি সুমধুর বাস্তব ব'লে থাকি, আশা করি, অন্যায় করিনি।

বেলা এগারোটা আন্দাজ দফতরি বাড়ি থেকে বাঁধাই হ'য়ে হ'য়ে হাজার হাজার বিচিত্রা আসতে আরম্ভ করলে। আফিসের কর্মচারী, দারোয়ান, চাকর-বাকরদের মধ্যে একটা আনন্দময় কর্মব্যস্ততার সাড়া জেগে উঠল। কর্তাদের সংযত মুখের অধর প্রান্তে অবরুদ্ধ হাসি। মাস চারেকের কঠিন দাঁড়-বাওয়ার পরে আজ তরী প্রথম ঘাটে ভিড়ে মাল ছাড়তে আরম্ভ করেছে। পণ্যের কমনীয় শ্রীর দ্বারা আফিস উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

শহরের বড় বড় চৌরাস্তার বাঙালী ও বিহারী দোকানদারেরা দাম চুকিয়ে দিয়ে ক্যাস মেমো কাটিয়ে হাতে নিয়ে উদ্গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করছিল। বই পৌঁছতেই তারা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। ক্যাস মেমোটা এগিয়ে ধরে একজন বললে, "মাল এসে গেছে বাবু। আমার সোজা হিসেব,—দুশ'। আমাকে ছেড়ে দিন।"

গম্ভীর মুখে কর্মচারী বললেন, "ব্যস্ত কোরো না বাপু, আগে মাল ঘরে উঠুক, থাকবন্দি হ'য়ে গোণাগুণতি হোক, তারপর একে একে সবাই পাবে।"

এস্‌প্ল্যানেডের বড় খদ্দের পাতিরাম পাঁচ শ' কপির ক্যাশ মেমো কাটিয়ে এক পাশে ব'সেছিল; সে বললে, "বে-ইনসাফ করবেন না বাবু, খরিদ যতই হোক না কেন, ক্যাস মেমোর নম্বর মোতাবিক মাল ছাড়বেন।"

পুস্তকের প্রতি মাল শব্দের প্রয়োগে এখন অভ্যস্ত হ'য়ে গেছি; সেদিন কিন্তু ব্যাপারটা কানে পীড়া দিয়েছিল, কারণ তার পূর্বে আর কখনো ওরূপ ব্যবহার শুনিনি।

ঘরে প্রবেশ ক'রে দেখি, ইতাবসরে কে পাঁচ খণ্ড 'মাল' আমার টেবিলের উপর স্থাপন ক'রে গেছে। সাগ্রহে একখানা তুলে নিয়ে খুলতে প্রথমেই চোখে পড়ল,—

ছিলাম যবে মায়ের কোলে
বাঁশি বাজানো শিখাবে ব'লে
চোরাই ক'রে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।

আশ্চর্যঃ ব্লক করতে পাঠাবার পূর্বে অন্ততঃ বার পাঁচেক কবিতাটি পড়েছিলাম। কিন্তু এখনকার মতো তখন মনে হয়নি। এর মধ্যে কবি যেন আমার মনের সুরের সন্ধানটিও খুঁজে বার করেছেন।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য প্রসঙ্গ

শৃঙ্গার ও রবীন্দ্রনাথ

হরপ্রসাদ মিত্র

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছাপা বই 'কবি কাহিনী' ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নবেম্বর প্রকাশিত হয়। এই বইখানির মূল্য ঐতিহাসিক কারণেই গণনীয়,—রস-পরিণতির বিচারে এর দাম নগণ্য। ভালোবাসার প্রসঙ্গে এই রচনার এক জায়গায় বলা হয়েছেঃ

স্বাধীন বিহঙ্গ সম কবিদের তরে দেবি
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।
অমন সমুদ্র সম, আছে যাহাদের মন
তাহাদের তরে দেবি নহে এ পৃথিবী।
তাদের উদার মন, আকাশে উড়িতে যায়
পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিম্নে পড়ে পুনঃ
নিরাশায় অবশেষে ভেঙ্গে চুরে যায় মন,
জগৎ পূরায় তার আকুল বিলাপে।

এই উদ্ধৃতির প্রথম চরণে 'কবিদের' কথাটি কবি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর ঐ কাব্যের বিষয়বস্তুর প্রভাবে। তার বদলে 'প্রেমিকের' শব্দটি প্রয়োগ করলেও বক্তব্য বিষয়ের মর্যাদাহানি ঘটত না। কারণ প্রণয়ের বিশেষ এক উৎকর্ষ সম্পর্কে সংকেত করাই এই অংশের লক্ষ্য—তা সে প্রণয় কবির হৃদয়েই আবির্ভূত হোক, আর অ-কবির চিত্তেই উদ্গত হোক। 'কবি কাহিনী'র কবি বলেছেনঃ

ওই হৃদয়ের সাথে, মিশাতে চাই এ হৃদি
দেহের আড়াল তবে রহিল গো কেন?

'কবি কাহিনী'র পরে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'বনফুল'—১৮৮১-তে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', ১৮৮২-তে 'সন্ধ্যা-সংগীত,' 'কাল-মৃগয়া' এবং ১৮৮৩-তে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'—কবিতার বই 'প্রভাত-সংগীত' এবং প্রবন্ধের বই বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত বইখানি হলো কবির প্রথম প্রবন্ধ সংগ্রহ। রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে এই বইখানি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। নানা কারণে এ-বইয়ের অন্তর্ভুক্ত রচনাবলী সতর্ক পাঠকের মনোযোগ দাবী করে। অচলিত সংগ্রহে প্রকাশিত রচনাবলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের মনে সলজ্জ একটি প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত অনির্বাপিত ছিল। তিনি এই সব রচনা সম্পর্কে গদ্যে বলেছিলেনঃ

অতীতের ঘষে-যাওয়া-তামার ফলকে তার বাণী যে অক্ষরে চিহ্নিত, তাকে গুপ্ত-যুগের লিপি বলা যেতে পারে। সেই লিপির অস্পষ্টতা থেকে অর্থ উদ্ধার করবে বলে বিজ্ঞানী, কিন্তু সৃষ্টিকর্তা তাকে স্বীকার করতে চায় না।

পদ্যে বলেছিলেন,

বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা;—
আবর্জনারে বর্জন করি যদি
চারিদিক হতে গর্জন করি উঠে
ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে
যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি।

রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার-চেতনার ক্রম-পরিণতির ধারাটি অনুসরণ করে যেতে যেতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত তাঁর এই 'বিবিধ প্রসঙ্গের' ঘাটে এসে তরী বাঁধতে হলো। ইতিমধ্যে, কবি-মানসের নির্ঝর হয়েছে বেগবতী স্রোতস্বিনী। উপল-বন্ধুরতার পরে দেখা দিয়েছে সাবলীল মসৃণতা। 'সন্ধ্যা সংগীতে'র বিষণ্ণতার পরে 'প্রভাত সংগীতে'র অজস্র উন্মেষ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম য়ুরোপ-ভ্রমণ তার আগেই ঘটে গেছে, প্রকাশ্য অভিনয়ে প্রথম যোগদান, প্রথম উপন্যাস-রচনা, বৃহৎ মানব-সংসার সম্পর্কে কবিচেতনার প্রথম উন্মেষ ১৮৮৩-র আগেই তাঁর জীবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

১৮৮৩-র ৯ই ডিসেম্বর তারিখে যশোহরের বেণী রায়চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং বিবাহের মাস-তিনেক আগে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন বাইশ বছরের নব-যুবক। এই নব-যুবকের বিবিধ মন্তব্য পড়তে পড়তে Plato-র Dialogue-এর কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। 'কবি কাহিনী'র ভাবালুতা থেকে বেরিয়ে এসে আশ্চর্য ভাবঘন এক স্ফটিক-দ্যুতি-তে পাঠকের যেন চমক লেগে যায়! পরবর্তী জীবনের নানা রচনায় রবীন্দ্রনাথ আদি-রসের আলাপ জমিয়েছেন। ভালোবাসার উদ্গতি, অধোগতি, অধিকার অত্যাচার, শাসন, ব্যসন, প্রসাধন, সন্ন্যাস—নানা অবস্থার কথা তাঁর লেখায়-লেখায় ছড়িয়ে আছে। কিন্তু পরবর্তী রচনায় যা শুধু বিচিত্র প্রয়োগ,—'বিবিধ প্রসঙ্গে' দেখা যায় তারই সংহততম উৎসমূর্তি। প্রথমে ধ্যান, পরে মূর্তি,—আদিতে সন্ধান, অন্তে ঘোষণা। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার-চেতনার বীজ,—পরবর্তী রচনাবলীতে সেই বীজেরই পরিণতি। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' তিনি বলেছিলেনঃ

'ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে। ভালবাসা অর্থে, নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা।

...প্রেম হৃদয়ের সারভাগ মাত্র। হৃদয়-মন্থন করিয়া যে অমৃতটুকু উঠে তাহাই। ইহা দেবতা-দিগের ভোগ্য। অসুর আসিয়া খায়, কিন্তু তাহাকে দেবতার ছদ্মবেশে খাইতে হয়।

...একে ত যাহাকে ভালবাসি তাহাকে ভাল জিনিষ দিতে ইচ্ছা করে, দ্বিতীয়তঃ তাহাকে মন্দ জিনিষ দিলে মন্দ জিনিষের দর অত্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়। তা ছাড়া বিষ দেওয়া, রোগ দেওয়া প্রহার দেওয়াকে কি দাতাবৃত্তি বলে?

সত্যকার আদর্শ লোক সংসারে পাওয়া দুঃসাধ্য ভালবাসার একটি মহান্ গুণ এই যে, সে প্রত্যেককে নিদেন একজনের নিকটেও আদর্শ করিয়া তুলে। এইরূপে সংসারে আদর্শ ভাবের চর্চা হইতে থাকে।...ভালবাসা অর্থে ভাল-বাসা অর্থাৎ অন্যকে ভাল বাসস্থান দেওয়া, অন্যকে মনের সর্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপন করা।

—মনের বাগান বাড়ি

এই উক্তির অনেকদিন পরে 'কুমারসম্ভব' এবং 'শকুন্তলা'র তুলনা করতে বসে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেনঃ

'দুটিরই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে এক। দুই কাব্যেই মদন যে মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে, সে মিলন অসম্পন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া আপনার বিচিত্র কারুখচিত পালঙ্ক-সুন্দর বাসরশয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। তাহার পরে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত দ্বারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ, তাহা সৌন্দর্যের সমস্ত বাহ্যাভরণ পরিত্যাগ করিয়া বিরলনির্মল বেশে কল্যাণের শুভ দীপ্তিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।'

—প্রাচীন সাহিত্য

রচনাকালের হিসেবে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' থেকে 'প্রাচীন সাহিত্য' হলো—অনেক দূর ব্যবধান। প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৩-তে তাঁর প্রথমোক্ত বইখানির মধ্যে যে-কথা বলেছিলেন, ১৯০৭-এ প্রকাশিত তাঁর শেষোক্ত গ্রন্থের যে-অংশটুকু

ওপরে তুলে দেওয়া হয়েছে সেখানেও তাঁর সেই মূল বিশ্বাস অপরিবর্তিত। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' থেকেই আরও দু'একটি উদ্ধৃতি এই সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু সে প্রচেষ্টায় উদ্যত হবার আগে বৈষ্ণব-কাব্যের 'পীরিতি'-উপলব্ধির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বহুশ্রুত, বহু-আলোচিত মন্তব্যটি একবার ভেবে দেখা দরকার। প্রেমের 'কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত' সম্পর্কে বৈষ্ণব সাধকদের ধারণাটি কি রকম ছিল,—রাধাকৃষ্ণ প্রেমের আদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই বা কি ধারণা পোষণ করতেন, সেই তথ্যগুলি স্মর্তব্যঃ রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলে গেছেন,

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল।... বিদ্যাপতির দুর্বোধ্য বিকৃত মৈথিলী পদগুলি অস্পষ্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত' গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের বেদ-তুল্য মহাগ্রন্থ! কবিরাজ গোস্বামী সেই বইয়ে লিখে গেছেনঃ

হ্লাদিনীর সার—প্রেম, প্রেম-সার ভাব,
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম—মহাভাব।
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী
সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি।

রক্ত মাংসের যোগ থেকে সরিয়ে রাধা-কৃষ্ণতত্ত্বকথাটিকে পবিত্র স্বাতন্ত্র্যে অধিষ্ঠিত রাখবার আদর্শ স্বীকার করে নিয়ে তিনি আরও স্পষ্ট করে বলে গেছেনঃ

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণ শক্তিমান;
দুই বস্তু ভেদ নাহি—শাস্ত্র পরমাণ॥

বৈষ্ণব মহাজনরা এই তত্ত্বের উপলব্ধি বরণ করে নিয়ে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার কাব্য লিখে গেছেন,—এই হলো ভক্তমণ্ডলীর কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী'র 'বৈষ্ণব-কবিতা'য় লিখলেনঃ

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?
পূর্বরাগ অনুরাগ মান অভিমান,
অভিসার প্রেমলীলা বিরহ মিলন,
বৃন্দাবন গাথা;...
এ সংগীত-রসধারা নহে মিটাবার
দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের
প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের
তপ্ত প্রেম-তৃষা?

এ-প্রশ্নের জবাবে ঐ কবিতাতেই তিনি লিখেছেনঃ

এই প্রেম-গীতি হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা
দেবতারে প্রিয় করি' প্রিয়েরে দেবতা...

বৈষ্ণবদের শাস্ত্রে রাধাকৃষ্ণের দৈবী মহিমা হলো পবিত্র একটি তত্ত্বজ্ঞান; বৈষ্ণব কবিদের রচনায় সেই জ্ঞান হয়েছে রসের সামগ্রী।* জ্ঞানের সঙ্গে রসের এই সেতুবন্ধনের আর একটি দৃষ্টান্ত আছে প্রাচীন গ্রীকদের শৃঙ্গার-জিজ্ঞাসায়।

Plato-র Symposium-গ্রন্থে প্রণয়-দেবী আফ্রোদিতির দ্বিমূর্তির কথা বলা হয়েছে। অযোনিসম্ভূতা Uranian হলেন আফ্রোদিতির স্বর্গীয় সংস্করণ, আর, Zeus ও Dione-র কন্যা Pandemus হলেন আফ্রোদিতির পার্থিব প্রতিমা। প্রথমার অধিষ্ঠান মানুষের আত্মায়,—দ্বিতীয়ার অধিষ্ঠান মানুষের ইন্দ্রিয়-বাসনায়। প্রণয় সম্বন্ধে বিচিত্র উক্তি-প্রত্যুক্তির ধারায় সক্রেটিসের সঙ্গে ডিওটিমার এই সংলাপ রবীন্দ্রনাথের 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যের নিকটতম সাদৃশ্যের স্মারক। Diotima বলেছিলেনঃ

..wisdom is concerned with the loveliest of things; and love is the love of what is lovely..

ডিওটিমাকে সক্রেটিস বলেছিলেন ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মানুষ কল্যাণের অধিকারী হয়, সৌন্দর্যের অধিকার পায়—তাহাতেই সুখ। আর ডিওটিমা নিজেই সক্রেটিসকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, ভালোবাসা হলো কল্যাণ ও সৌন্দর্যের অমৃতলোকে জীবনের উজ্জীবন। সুতরাং প্রেম মানুষের অমরত্ব সন্ধানেরই নামান্তর। জৈব-সাধারণ্যে কামকলার অনুষ্ঠান হলো জীবমাত্রের এই অস্ফুট অমরত্ব-কামনারই স্বতঃস্ফূর্ত আঙ্গিক।

বস্তুলোকে দেখা যায় নিত্য পরিবর্তন,—নিত্য নব নব সৃজন-গঠন,—মুহূর্তে মুহূর্তে ধ্বংস—বিচিত্র ধ্বংসের অনুবর্তী বিচিত্র নব বোধন! জন্ম-মৃত্যুর এই প্রবাহ অনন্ত। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছেঃ

শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তেঃ পুনঃ॥

অর্থাৎ

মর পদার্থ শস্যের মতো জীর্ণ হয়, আবার শস্যের মতো পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। —কঠোপনিষৎ

ডিওটিমা সক্রেটিসকে বলেছিলেনঃ

..the mortal does all it can to put on immortality: and how can it do that except by breeding, and thus ensuring that there will always be a younger generation to take the place of the old?

সাধারণ অমার্জিত মানুষ সহজ প্রবৃত্তির তাগিদে সন্তান-সন্ততির মধ্য দিয়ে অমরত্ব পেতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়। অপেক্ষাকৃত উঁচু দরের লোকে শৃঙ্গারের উর্ধ্বায়নসূত্রে (sublimation) সুকৃতির সাধনায় অমরত্ব খোঁজে। কিন্তু সকলের মনেই সৌন্দর্যের প্রতি একটি সহজাত আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। নীচ কামুকতার কথা আলাদা। কিন্তু কামোত্তেজনার সুস্থ অভিব্যক্তিতে সুন্দর দেহের প্রতিই আগ্রহ দেখা যায়—অসুন্দরের প্রতি বিমুখতাই স্বাভাবিক। সাধারণ জৈব কামকলার মধ্যেও সৌন্দর্যস্পৃহা এবং অমরত্ব-কামনা অল্পবিস্তর হলেও অচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িয়ে আছে। কামুক ব্যক্তি বিশেষ একটি সুন্দর শরীর ভালোবাসে, তারপর আর-একটি, আবার আর-একটি! এমনি ভাবে বিচ্ছিন্ন পৃথক্ পৃথক্ শরীরগত সৌন্দর্যের আস্বাদন থেকে বস্তুর অতিশায়ী সূক্ষ্মতর সৌন্দর্যের প্রতি চেতনার উন্মেষ ঘটতেও পারে। ডিওটিমা সেই সূক্ষ্ম ভাব-সৌন্দর্যকে বলেছিলেন, spiritual loveliness। সেখানে পৌঁছলে বস্তুগত সৌন্দর্যের প্রতি লালসা উবে যায়। তখন থাকে একটিমাত্র পরম উপলব্ধিঃ

পরাচঃ কামাননুযন্তি বালা—
স্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে।

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহিরের কাম্যবস্তুর অনুসরণ করে এই জন্যই তাহারা সর্বতঃ ব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়। কিন্তু জ্ঞানীরা নিত্য অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারে অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না।

—কঠোপনিষৎঃ সীতানাথ তত্ত্বভূষণকৃত অনুবাদ

Diotima বলেছিলেন,—

It is an everlasting loveliness which neither comes nor goes, which neither flows nor fades;..

---

* 'প্রাণবান কাব্যে তত্ত্ব থাকিতে পারে কিন্তু সেই তত্ত্ব বিশেষভাবে কাব্যেরই তত্ত্ব, কারণ কাব্য কাহারও দাসত্ব করে না।'—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

Pandemus-এর সাম্রাজ্য পেরিয়ে Uranian-এর উপলব্ধিতে পৌঁছোলেই সেই ভালোবাসার স্বাদ পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের বাইশ বছর বয়সের রচনায় এই মৃত্যুহীন, মোহহীন, চিরন্তন ভালোবাসার উপলব্ধিটি ধরা পড়েছে।

ডিওটিমা-সক্রেটিস ঘটিত প্রশ্নোত্তরিকায় possession বা অধিকারের কথা একাধিকবার এসে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথও অধিকারের কথা বলেছেনঃ

'প্রকৃত ভালবাসা দাস নহে, সে ভক্ত; সে ভিক্ষুক নহে, সে ক্রেতা। আদর্শ প্রণয়ী প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালবাসেন, মহত্ত্বকে ভালবাসেন: তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে আদর্শ ভাব জাগিতেছে, তাহারই প্রতিমাকে ভালবাসেন। প্রণয়ের পাত্র যেমনই হউক, অন্ধভাবে তাহার চরণ আশ্রয় করিয়া থাকা তাঁহার কর্ম নহে। তাহাকে ত ভালবাসা বলে না, তাহাকে কর্দমবৃত্তি বলে। কর্দমে একবার পা জড়াইলে আর ছাড়িতে চায় না, তা সে যাহারই পা হউক না কেন, দেবতারই হউক আর নরাধমেরই হউক! প্রকৃত ভালবাসা যোগ্যপাত্র দেখিলেই আপনাকে তাহার চরণধূলি করিয়া ফেলে। এই নিমিত্ত ধূলিবৃত্তি করাকেই অনেকে ভালবাসা বলিয়া ভুল করেন। তাঁহারা জানেন না যে, দাসের সহিত ভক্তের বাহ্য আচরণে অনেক সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু একটি প্রধান প্রভেদ আছে, ভক্তের দাসত্বে স্বাধীনতা আছে, ভক্তের স্বাধীন দাসত্ব। তেমনি প্রকৃত প্রণয় স্বাধীন প্রণয়। সে দাসত্ব করে কেন না দাসত্ব বিশেষের মহত্ত্ব সে বুঝিয়াছে। যেখানে দাসত্ব করিয়া গৌরব আছে, সেইখানেই সে দাস, যেখানে হীনতা স্বীকার করাই মর্যাদা, সেইখানেই সে হীন। **ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা নহে, ভাল ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা।** তা যদি না হয়, যদি ভালবাসা হীনের কাছে হীন হইতে শিক্ষা দেয়, যদি অসৌন্দর্যের কাছে রুচিকে বদ্ধ করিয়া রাখে, তবে ভালবাসা নিপাত যাক।

—আদর্শ প্রেম

এই মন্তব্যের বিশেষ অক্ষরে মুদ্রিত অংশটি পূর্বোদ্ধৃত Diotima-র উক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে প্রশ্ন জাগেঃ—রবীন্দ্রনাথ কি এই সময়ে Plato-র রচনায় আবিষ্ট ছিলেন?

উপনিষদের প্রভাব তাঁর রচনার বহু ক্ষেত্রে বিদ্যমান। প্রণয়তত্ত্ব ব্যাখ্যানের মধ্যেও ভূমাবোধ এবং ত্যাগ-সাধনার উপনিষদ-বাহিত আদর্শ তিনি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করেছেন। সেই সঙ্গে, ওপরের উদ্ধৃতিটিতে Symposium-এর অন্তর্ভুক্ত Diotima-র মন্তব্যের অতি স্পষ্ট প্রতিধ্বনিও যে শোনা যাচ্ছে, সে-সম্পর্কেও তিল মাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে সে-প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের সজ্ঞান স্বীকৃতিজনিত কি না, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রজীবনীর সর্বতথ্যাধিকারী প্রাজ্ঞজনেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রথম খণ্ডে 'সন্ধ্যাসংগীতের যুগ' ও 'প্রভাত সংগীতের যুগ' নামে পরস্পর অব্যবহিত দুটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কুড়ি থেকে বাইশ বছর অবধি বয়সের কথা লিখেছেন। সেই আলোচনা থেকে কবির জীবনের এই পর্বের অবস্থা কতকটা অনুমান করা যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে (১২৮৮ সালের প্রথম দিকে) বিলাত যাত্রা করে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসেন;—ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ মুসুরি পাহাড়ে মহর্ষির সঙ্গে দেখা করলেন এবং সেখান থেকে ফিরে এলেন চন্দননগরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে। চন্দননগরের এই বাড়িতেই তাঁর সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি লেখা শুরু হয়। তারপর, ১৮৮২-র মাঝামাঝি সময়ে রমেশচন্দ্র দত্তের বাড়িতে এক বিবাহ-সভায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। সে-সব কথা কবি স্বয়ং তাঁর 'জীবনস্মৃতিতে' বলে গেছেন। তার কিছু আগে, বাংলা ১২৮৮-র জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁর 'সংগীত ও ভাব', 'যথার্থ দোসর', 'জুতা ব্যবস্থা' ইত্যাদি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একদিকে সন্ধ্যাসংগীতের আত্ম-অবরুদ্ধ অন্ধকার, অন্যদিকে, এই সব প্রবন্ধে তাঁর সর্বতোমুখী সতর্কতার পরিচয় একই সঙ্গে বিদ্যমান থাকতে দেখে প্রভাতকুমার রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকদের সাবধান হবার পরামর্শ দিয়ে গেছেনঃ

রবীন্দ্রনাথের সেই জটিল মন আমাদিগকে বার বার পরিভ্রান্ত করে,—আমরা তাঁহাকে খণ্ডভাবে আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে অসংবদ্ধভাবে পাই।

'যথার্থ দোসর' প্রবন্ধে Shelley, Christiania Rossetti প্রভৃতি কবির বিশদ উল্লেখ-আলোচনা আছে। পূর্বোক্ত 'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধটি লেখবার পরে রবীন্দ্রনাথ Herbert Spencer-এর The Origin and Function of Music নামক প্রবন্ধের গুণপনায় বিশেষ আকৃষ্ট হন। ১২৮৮-তে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর বিখ্যাত 'মরণ-রে তুঁহু মম শ্যাম সমান' কবিতাটিও প্রকাশিত হয়। বিদ্যাপতির কাব্য উপলক্ষ করে শ্রাবণের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ছাপা হয়,—আশ্বিনে তিনি টেনিসনের De Profundis-এর পর্যালোচনা করেন, কার্তিকে তাঁর উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' শুরু হয়। চন্দননগর থেকে দশ নম্বর সদর স্ট্রীটের বাড়িতে উঠে আসার পরে একদিন লেখা হলোঃ

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি,—

এই দুই ছত্রের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলে গেছেন,

ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুত যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সময় বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলনী' নামে এক সভা স্থাপনের উদ্যোগ করেন এবং এই উপলক্ষে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অন্যান্য কয়েকজনের সান্নিধ্যের সুযোগ পেয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে অন্তর্মুখিতার অতিরেক বহু পরিমাণে অন্তর্হিত হলো। ১২৮৯-এর আষাঢ়-শ্রাবণের 'ভারতী'তে তিনি 'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, সেই প্রবন্ধটিতে বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন শৃঙ্গারাতিশয্যের বিরুদ্ধে তাঁর তিরস্কার সংরক্ষিত আছে। বিরক্তিবশে তিনি লিখেছিলেন,

সকল নাটক, কাব্য ও উপন্যাসে ভাল-বাসাবাসির ছড়াছড়ি দেখিতে পাইবই পাইব।

এই প্রবন্ধের ছ'মাস আগে ১২৮৮-র ফাল্গুনের 'ভারতী'তে তাঁর আদর্শ প্রেম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

কবির জীবনে এই কয়েক বছরের যে-ঘটনাবলীর এখানে উল্লেখ করা হলো তা থেকে অনুমান করা অসংগত হবে না যে, কবির ব্যক্তিগত পঠনসূত্রে,—ব্যাপকভাবে জীবনোপলব্ধির অভিজ্ঞতাসূত্রে—এবং বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন শৃঙ্গারাতিরেক প্রভাবে ভালোবাসা সম্পর্কে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র রচনাগুলি তিনি লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই সময়ে কবির হৃদয়ে 'জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি' ক্রমব্যাপমান আত্মীয়তাবোধের আকর্ষণে সমস্ত পৃথিবী তাঁর আত্মীয় হয়ে উঠেছে স্বার্থপরতা তাঁর ধাতে সয় না। মানুষ মানুষকে সম্পত্তির মতো অধিকার করবে অথবা ভোগ করবে,—এ ধারণা তাঁর কল্পনাতীত। উত্তর-জীবনে শৃঙ্গার-সম্পর্কিত তাঁর যাবতীয় রচনায় এই স্থূ

অধিকারে বিশ্বাসী প্রণয়ের বিরুদ্ধে অভিমানটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। 'শান্তি-নিকেতন'—প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এই সিদ্ধান্তের অজস্র নজির আছে। তাছাড়া এই আলোচনায় 'আদর্শ প্রেম' থেকে যে উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেটিও স্মরণীয় এবং তার সঙ্গে নিচের উক্তিটিও দ্রষ্টব্য :

আমরা ষষ্ঠীকে যে সম্বন্ধ কারক বলি, তাহা অতি যথার্থ, কিন্তু ইংরাজেরা যে তাহাকে Possessive case বলে তাহা অতি ভুল। প্রণয়ের ব্যাকরণে সম্বন্ধ কারক আছে, কিন্তু Possessive case নাই। একটি পরমাণুও আমরা সম্পূর্ণ ভোগ করিতে পারি না, সম্পূর্ণ জানিতে পারি না, ধ্বংস করিতে পারি না, নিয়মিত কালের অধিক রাখিতে পারি না।

—অনধিকার

এও 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র উক্তি। ১২৮৮-৮৯ (ইং ১৮৮২-৮৩)-র এই মন্তব্যের সঙ্গে প্রেমের বিশ্লেষণমূলক পরবর্তী যুগীয় রচনার ফলশ্রুতির ঐক্য সত্যিই আনন্দপ্রদ। চিত্রাঙ্গদা (১৮৯২), ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯), মহুয়া (১৯২৯)—এই সমস্ত রচনাতেই ভালোবাসার এই 'অনধিকার'-তত্ত্বটি ফুটে উঠেছে। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র

প্রেমের চক্ষে দেখার অর্থই সর্বাপেক্ষা অধিক করিয়া দেখা —বেশী দেখা ও কম দেখার

—এই উক্তিটিই 'মহুয়া'-র অধুনালভ্য সংস্করণের সূচনারূপে ব্যবহৃত চিঠি-খানিতে সবিস্তারে পুনরালোচিত হয়েছে :

প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম আবেগে মানুষকে অসাধারণ ক'রে রচনা করে, নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান, গন্ধ, নানা আভাস। এমনি ক'রে অন্তরে বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে।

'ঘরে-বাইরে'র অন্তর্দাহে Ibsen-এর প্রভাব অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। নিখিলেশ এবং সন্দীপের মধ্যে বিমলার স্বত্ব-স্বামিত্ব নিয়ে এই উপন্যাসে যে ঘূর্ণি ঘুলিয়ে উঠেছিল, সেই দুর্যোগের ছবিতে স্থায়ী ভাব হয়ে ফুটেছে—রতি এবং উৎসাহ;—নানা সঞ্চারীর মধ্যে প্রণয়-জনিত ঈর্ষ্যা হয়েছে মুখ্য ভাব। ঈর্ষ্যা সন্দীপের মনে; —নিখিলেশের বীরত্বের প্রশান্তির মধ্যেও দু'এক জায়গায় সেই ঢেউ এসে ছুঁয়ে গেছে. এমনি একটি তীব্র ভাব-সন্ধিতে মথিত অবস্থায় নিখিলেশ তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন—

এমন সময়ে হঠাৎ পিছন থেকে বিমল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেলফের দিকে যেতে যেতে বললুম, Amiel's Journal বইখানা নিতে এসেছি।'

রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার-চেতনার বিশ্লেষণের পক্ষে এই উল্লেখটিও তুচ্ছ নয়। উপনিষদ, বৈষ্ণব-কাব্য মধ্যযুগের ভারতীয় মরমীয়া সাহিত্য, Plato-র রচনা—ইত্যাদির রস-ধারায় তাঁর মন যেমন পুষ্ট হয়েছে,—Amiel-এর এই স্মৃতিপঞ্জীও তেমনি। Amiel-এর এই স্মৃতিপঞ্জী গ্রন্থলেখকের মৃত্যুর পরে ১৮৮২-র ডিসেম্বর মাসে জেনেভায় প্রকাশিত হয়। ১৮৮৪-তে এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হয়। ১৮৮০-র ডিসেম্বর মাসে এই রোজনামচায় এমিয়েল লিখেছিলেন :

Jealousy is a terrible thing. It resembles love, only it is precisely love's contrary. Instead of wishing for the welfare of the object loved, it desires the dependence of that object upon itself, and its own triumph. Love is the forgetfulness of self; jealousy is the most passionate form of egotism, the glorification of a despotic, exacting and vain ego, which can neither forget
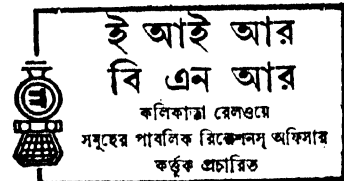
nor subordinate itself. The contrast is perfect. (December, 1880.)

'ঘরে বাইরে' থেকে যে অংশটুকু ওপরে তুলে দেওয়া হয়েছে, তার কয়েক লাইন পরেই নিখিলেশ আরও লিখেছেন:

Amiel's Journal পড়ে আজ আমার কোন ফল হোত না—কিন্তু পঞ্চুর এই এক-কথায় আমার মন খোলসা হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখদুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন; তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসি-কান্নার পরিমাপ করি।

আবার লিখেছেন—

বাস্তবকে যত একান্ত ক'রে দেখি ততই সে আমাদের পেয়ে বসে—আভাসমাত্রে সত্যকে যখন দেখি তখনই মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগে। বিমল আজ আমার জীবনে সেই বাস্তবকেই এত বেশি তীব্র করে তুলেছে যে সত্য আমার পক্ষে আজ আচ্ছন্ন হবার জো হয়েছে।

এইসব মন্তব্যের সঙ্গে Amiel-এর পূর্বোদ্ধৃত উক্তিটি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। নিখিলেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে ভাব-টিকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন সে হলো আত্মবিলোপী প্রেমের সন্ন্যাস;—বিমলার জন্যও যেমন, দেশের জন্যও তেমনি, এই সর্বদাতা ভালোবাসা স্বার্থের সংকীর্ণ অবরোধকে ভয় করে, ঘৃণা করে, পরিহার করে। সন্দীপ এর উল্টো পথের পথিক। তার মুখে অন্য দৃষ্টি, তার কণ্ঠে অন্য গান:

এসো পাপ, এসো সুন্দরী
তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে ফিরুক সঞ্চারি।
অকল্যাণের বাজুক শঙ্খ
ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক,
নির্লাজ কালো কলুষ পঙ্ক
বুকে দাও প্রলয়ঙ্করী।

'ঘরে-বাইরে' এবং 'চতুরঙ্গ' ছাপা হয় একই সালে (১৯১৬)। 'চতুরঙ্গে' শচীশের ডায়ারিতে এক জায়গায় আছে—

ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি;—অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলি ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে শিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।

নারী-র এই দ্বি-মূর্তির ধ্যান রবীন্দ্র-নাথের গদ্যে-পদ্যে বহু জায়গায় ছড়িয়ে আছে,—আছে উর্বশী ও লক্ষ্মীর বিভেদে,—'দুই নারী', 'উর্বশী', প্রভৃতি কবিতায়,—'শেষের কবিতা', 'দুই বোন' প্রভৃতি শেষ পর্বের নব্য রোম্যান্সে,—'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে' প্রভৃতি মধ্য-পর্বের উপন্যাসে,—এবং তারও আগে ভ্রূণরূপে বিদ্যমান আছে 'কড়ি ও কোমলে'র কয়েকটি কবিতায়। এই সব কবিতায় তিনি স্পষ্টভাবে নারীর যুগল সত্যের অস্তিত্ব ঘোষণা করেননি বটে, কিন্তু নারীর যুগল সত্তার উপলব্ধির সংকেত এখানে বিরল নয়।

'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থাকারে ছাপা হবার অনেক কাল পরে,—পরিণত জীবনের খ্যাতি-প্রত্যয়-অভিজ্ঞতায় সমাসীন রবীন্দ্র-নাথ ১৯২৪-এর ১১ই নভেম্বর বুয়েনোস এয়ারিসে 'কিশোর প্রেম' নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন (বর্তমানে পূরবী-তে সংকলিত), তাতে তিনি 'পুরানো সেই কিশোর-প্রেমের করুণ, ব্যাকুলতা' স্মরণ করে, অতীতের দিকে তাকিয়ে বলেছেন,—'এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাল্গুন মাস'। সেই দূরবিলীন ফাল্গুনের সৌরভ গেল কোথায়?

ঝরে-পড়া সেই মুকুলের শেষ-না-করা কথা
আজকে আমার সুরে গানে
পায় খুঁজে তার গোপন মানে,
আজ বেদনায় উঠল ফুটে তার সেদিনের ব্যথা
সেই শেষ-না-করা কথা

ভালোবাসা সম্পর্কে 'বিবিধ-প্রসঙ্গে'-র 'শেষ-না-করা কথা' তাঁর পরিণত জীবনের পরিণত কাব্য-কথায় পূর্ণ অভিব্যক্তি পেয়েছে। বর্তমান আলোচনার ধারায় 'বিবিধ-প্রসঙ্গের' পরে 'কড়ি ও কোমলে (১৮৮৬)-র ঘাটে পৌঁছে আর একবার তরী বাঁধা দরকার। 'কড়ি ও কোমলের আগে-ছাপা বইগুলির মধ্যে আছে 'রুদ্রচণ্ড' (প্রথম নাটক), 'য়ুরোপ-প্রবাসীর-পত্র' 'সন্ধ্যা সংগীত', 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' (প্রথম গ্রন্থভুক্ত উপন্যাস), 'প্রভাত সংগীত' 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'ছবি ও গান', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'নলিনী', 'শৈশব সংগীত' 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' এবং 'রাম মোহন রায়' নামে ছোটো একখানি পুস্তিকা। এই বইগুলির মধ্যে বর্তমান প্রসঙ্গে দু' একখানির সম্পর্কে সামান্য কথা উঠতে পারে মাত্র,—রবীন্দ্র-সাহিত্যে শৃঙ্গারের ধ্যান 'কড়ি ও কোমল' থেকে পরিণত প্রকাশ পেয়েছে। এ-বিষয়ে তাঁর আত্মানুসন্ধানের প্রথম অধ্যায় শেষ হয়েছে 'কবি-কাহিনী' থেকে 'আলোচনা' (১৮৮৫) মধ্যে। তারপর—দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরু। (ক্রমশঃ

নষ্টচাঁদ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

দোষ কারুর নয়। বরাত। কিন্তু বরাতকে তো আর কোমরে কাছি বেঁধে থানায় চালান দেওয়া যায় না, কাঠগড়ায় পুরে চোখা চোখা সওয়ালও করা যায় না। মানুষটাকেই যেতে হয় সঙ্গে।

ফিসফাস চাপা গুলতানি কদিন ধ'রেই চলছিল। মোটা ভারি তিন নম্বর লেজারটা আনাগোনা করলো বার কতক জেনারেল ম্যানেজারের কামরায়, তারপর অসীম মিত্তিরের ডাক পড়লো।

চাকরীর বয়স বারো, মানুষটা চল্লিশের চৌকাঠ সবে পেরিয়েছে। কালো চুলের ধারে ধারে রুপোলী চেকনাই, কপালে গালে সময়ের হিজিবিজি নক্সা। সাত চড়ে কেন, সাতাশ চড়েও মুখ খোলে না। পঁচিশ টাকায় শুরু, বারো বছরে ঠেক খেয়ে একশ দশে পৌঁছেছে। শুধু মাইনে আর বয়সই বাড়ে নি, সংসারও বেড়েছে। আয়ের অনুপাতে একটু বেশীই। ভরাট সংসারের ওপর ফাউ হিসেবে এসেছেন পাকিস্থান-ফেরৎ পিসীমা।

যাক, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। দিচ্ছিলেনও এতদিন। পুরো গ্রাস হয়তো নয়, তবে একেবারে আধপেটাও নয়।

কিন্তু জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে আবার কেন? বাইরের জারুল কাঠের চেয়ারই তো বেশ ছিলো। নিঃশ্বাস ফেলে অসীম মিত্তির ঘোরানো দরজায় গলিয়ে দিলো নিজেকে।

শীত পড়ো পড়ো। হাওয়ায় শীতের মিশেল। কিন্তু অসীম মিত্তিরের কপালে ঘামের ফোঁটা জমে উঠলো। দুটো হাঁটুতে সজোরে ঠেকাঠেকি। জেনারেল ম্যানেজার ঘরের মানুষ। তিনশ পয়ষট্টি দিন আসতে যেতে দেখা। সে জন্য নয়, তাঁর পাশেই পাকানো গোঁফ একটি ভদ্রলোক। রুপোলী বোতামে আর কোটের কাঁধে পুলিশী-সংকেত চিহ্ন। টেবিলের ওপর রাখা ধবধবে সাদা টুপিতেও একই ব্যাপার। এক পা এগোতে অসীম মিত্তির তিন পা পিছিয়ে গেলো।

'বসুন' গলা জেনারেল ম্যানেজারের, কিন্তু বেশ থমথমে।

সাবধানে চেয়ার সরিয়ে মিত্তির চুপ করে বসে পড়লো। গদি আঁটা চেয়ার, তবু কি যেন ফুটছে সর্বাঙ্গে। আচ্ছা, অস্বস্তিকর অবস্থা।

'দেখুন তো চেকটা, আপনিই 'পাশ' করে ছিলেন না?' পেপার ওয়েট চাপা চেকটা সরে এলো সামনে। দু'হাজার তিনশ দশ টাকা। তুলেছেন জে বাসু। তারিখ ছাব্বিশে নভেম্বর। এ সবের ওপরে অবশ্য গাঢ় লাল রংয়ের পেন্সিলে কোণাকুণি মিত্তিরের সই। এ, মিটার। জ্বল জ্বল করছে যেন।

কিন্তু এ আবার কি কথা! শুধু এ চেকটা কেন, দিনের মধ্যে কারেণ্ট একাউণ্টের সব চেকই তো তার হাত দিয়ে যায়। তার ছোঁয়া না পাওয়া পর্যন্ত চেক তো শুধু কাগজের টুকরো। টাকা হ'তে পাচ্ছে কোথায়!

তবু চেকটা হাতে করে উল্টে পাল্টে দেখে মিত্তির ঘাড় নাড়লো। হ্যাঁ, সেই পাশ করেছে। হয়েছে কি তাতে। টাকার সংখ্যা আর লেখা ঠিকই আছে। সাল তারিখ নির্ভুল। চেক নম্বরেও কোন গোলমাল নেই। লেজারকিপারের লাল কালির আঁচড়ই তার প্রমাণ।

'পাশ' করার আগে সইটা মিলিয়ে দেখেছিলেন, না সেটা আর দরকার মনে করেন নি? পুলিশের টিপ্পনী। ভুরু কুঁচকে, ঠোঁটের কুৎসিত একটা ভঙ্গী করে। কথা তো নয়, লঙ্কা-বাটার ছিটে। সারা গা রি রি করে ওঠে। কিন্তু সই না দেখে বুঝি চেক 'পাশ' করা যায়। এই না হ'লে আর পুলিশের বুদ্ধি! তা হ'লে তো ব্যাঙ্কের নাম পালটে রাখা হতো কল্পতরু ভাণ্ডার। চেকে কোন একটা সংখ্যা লিখে কাউণ্টারে দিলেই মুঠো মুঠো টাকা দেওয়া হতো। ব্যবসার বদলে দান খয়রাতির কারবার।

অসীম মিত্তির মুখ তুললো। জেনারেল ম্যানেজারের দিকে নয়, পুলিশ অফিসারের

দিকে তো নয়ই, কোণাকুণি চাইলো বার্নিশ চকচকে আলমারির দিকে। ঢোক গিলে বললো, 'তা কি হয়, স্পেসিমেন সই না মিলিয়ে চেক ছাড়া যায় কখনো?'

'আগে থেকে বন্দোবস্ত থাকলে যায় বই কি। ওসব মিঠে মিঠে বুলি ছাড়ুন দিকি নি। এ লাইনে বাইশ বছর হ'য়ে গেলো। ধুলো দেওয়া খুব সহজ হবে না।' মানুষের নয়, যেন নেকড়ের চীৎকার। তেমনি দাঁত দেখানোর কায়দা, খুদে চোখ দুটোয় লালচে আভাষ।

বছর তিনেক আগে এমনি একবার হয়েছিলো। রাস্তার দুপাশের ল্যাম্প-পোস্টগুলো দুলে উঠেছিলো, সামনের মসৃণ অ্যাসফাল্ট ঢাকা শড়কটাও। মানুষজন গাড়ি-ঘোড়া সব পাক খেয়ে উঠেছিলো দৃষ্টির সামনে। পরে অবশ্য মিত্তির বুঝতে পেরেছিলো। ভূমিকম্প। টাল সামলাবার আগেই পৃথিবীর দোলন থেমে গিয়েছিলো। আজও ঠিক তেমনি অবস্থা। নাগরদোলার মতন ঘুরপাক খেয়ে গেলো জেনারেল ম্যানেজারের গোটা চেম্বার। চেয়ার, আলমারি এমন কি পুলিশ-অফিসারের নেকড়ে-প্যাটার্ন মুখটা পর্যন্ত সব হাওয়ায় দুলতে লাগলো। টেবিলের ওপর মাথাটা রেখে মিত্তির নিঃঝুম হয়ে পড়লো। পায়ের তলায় মোজেইক মেঝেটাও কাঁপছে থর থর ক'রে।

'কি মিইয়ে গেলেন যে' পুলিশী হুঙ্কার। ভদ্র খোলসটা খসে পড়েছে আস্তে আস্তে, 'দেখুন না সইটা মিলিয়ে।'

স্পেসিমেন কার্ডের ফাইল সামনে সরে এলো। লাল কালির আঁচড়ে জে বাসুর সইয়ের নমুনার তলায়। জেনারেল ম্যানেজার চেকটা তুলে পাশে রাখলেন।

কপালের দপ দপ করে ওঠা রগ দুটো চেপে ধ'রে অসীম মিত্তির চেয়ে চেয়ে দেখলো। দুটো চোখ কুঁচকে। না, তফাৎ তো বিশেষ নেই। একই সই, অন্ততঃ একই লোকের।

সে কথা বলতেই আবার পুলিশী গর্জন, 'এ্যাঁ, দুনিয়া শুদ্ধ যে এক দেখছেন আপনি? সর্বভূতে ভগবান!'

জেনারেল ম্যানেজার বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বেশ নরম সুরে 'জে বাসুর সই এটা নয়। তিনি চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন দু'হাজার তিনশ দশ টাকা তিনি তোলেন নি, যদিও এ চেক তাঁরই চেক বইয়ের।'

'কিন্তু', অসীম মিত্তির খাবি খাওয়ার মতন ভঙ্গীতে বললো, 'দুটো সই তো হুবহু এক?'

'এক নাকি?' পুলিশ অফিসর ভেংচি কেটে উঠলেন, 'স্পেসিমেন কার্ডে 'জে'র শুঁড়টা দেখেছেন, চেকে সেটা কোথায় দেখান!'

চেকের দিকে নয়, শুঁড় খুঁজতে অসীম মিত্তির অফিসরের দিকে মুখ তুললো, সত্যি একটা শুঁড়েরই অভাব। ওটা থাকলেই মানানসই হতো।

'থাক ওসব বাজে কথা' অফিসরটি টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, 'দলে আর কে কে আছে বলুন। এসব একার কাজ নয় তা জানি। ভালোয় ভালোয় নামগুলো বলে দিন, আপনাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবো। নয় তো—' কথা আর শেষ করলেন না কিন্তু তাতেই কাজ হলো। অসীম মিত্তিরের গলার ভেতরটা পর্যন্ত চোত মাসের মাটির মতন শুকনো খটখটে।

পুলিশ অফিসারের দিক থেকে জেনারেল ম্যানেজারের দিকে চোখ ফিরিয়েই অসীম মিত্তির আরো ঘাবড়ে গেলো। এ মুখের ছায়া পড়েছে ও-মুখেও। স্বভাব কোমল মুখে থমথমে আমেজ। কোঁচকানো ভুরুতে, তীক্ষ্ন দুটি চোখে, দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁটে সন্দেহের আভাষ। শেষআশ্রয়ও সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। চারপাশে শুধু অথৈ জল। আঁকড়ে ধরার মতন এক গাছা কুটোও নেই।

পুলিশ অফিসর এবারে চাইলেন জেনারেল ম্যানেজারের দিকে। ভাবটা যেন, অনুমতি দিন, আমাদের কাজ আমরা শুরু করি।

'অসীমবাবু' জেনারেল ম্যানেজার খুব নরম গলায় বললেন। উত্তর দেবার চেষ্টা হ'লো এদিক থেকে। কিন্তু কথা নয় কেবল থর থর করে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো।

'সব ব্যাপারটা খুলে বলুন, আসল ব্যাপারটা আমার জানা দরকার। এবার অসীম মিত্তির একেবারে হাঁউ মাঁউ ক'রে কেঁদে ফেললো, 'বিশ্বাস করুন স্যার, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না। সরল মনে সই মিলিয়ে চেক 'পাশ' করে দিয়েছি।

'সরল মনে' অফিসরটি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হেসে উঠলেন, 'বিন্দুবিসর্গও জানেন না? একেবারে নিঃস্বার্থভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন টাকাটা? নতুন কোন কথা ছাড়ুন অসীমবাবু, এ বাঁধা গৎ আমাদের জানা।'

'দুটো সই তো ঠিক একরকম নয়। তফাৎ হয়তো সামান্য, কিন্তু সে তফাৎ আপনার চোখে পড়া উচিত। বেয়ারার চেক, সেই জন্য আপনার আরো সাবধান হওয়া দরকার ছিলো।' জেনারেল ম্যানেজারের গলা।

হয়তো ছিলো, কিন্তু হাজার কাজের ঝামেলার মধ্যে সব দিকে নজর রাখা সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া, এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না অসীম মিত্তির সই দুটো একরকম নয়ই বা কেন?

'যদি কিছু হয়ে থাকে তো অসাবধানতার জন্যই হয়েছে স্যার, অন্য কোন কারণে নয়' অসীম মিত্তিরের গলার আওয়াজ ক্রমেই চুপসে আসছে।

'কিন্তু আপনার এই অসাবধানতার খেসারৎ কে দেবে অসীমবাবু? পাবলিকের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য কে দায়ী হবে?' জেনারেল ম্যানেজারের গলা বেশ উত্তপ্ত। এলেবেলে কথা আর নয়, এবার কাজের কথার শুরু। দু'দশ টাকা নয় যে পাশ কাটিয়ে যাবে মানুষ। এক গোছা টাকা। ছেলেখেলা নয়।

'এ টাকাটা আপনি কতদিনের মধ্যে যোগাড় ক'রে দিতে পারবেন?' জেনারেল ম্যানেজার শেষ চেষ্টা করলেন।

দু'হাজার তিনশ দশ টাকা! বার কয়েক শুধু ঢোক গিললো মিত্তির। নাকানি চোবানি খাচ্ছে অথৈ জলে এমনি ভাব মুখ চোখের। পরিবারের শীর্ণ শিরাবহুল হাত দুটো ভেসে উঠলো চোখের সামনে নিরাভরণ কণ্ঠ। সারা গায়ে সোনার একটা আঁচড়ও নেই। সোনাদানা যা একটু ছিলো গতবারে খালাস হবার সময় হাসপাতালে আর ডাক্তারকে দিয়ে আসতে হয়েছে। ব্যাঙ্কের খাতায় জমা তিপ্পান্ন টাকা ন' আনা। এই ব্যাঙ্কেরই খাতায় হাত পেতে দাঁড়াবার মতন আত্মীয়স্বজন নেই কেউ কোথাও। অসীম মিত্তির হাত দিয়ে কপালটা চাপড়ালো। হঠাৎ এক

মতলব এলো মাথায়। একেবারে আচমকা। হ্যাঁ, তা করলেও তো হয়। মাইনে থেকে মাসে মাসে কিছু ক'রে কেটে নেওয়া। গোটা দশেক টাকার মতন। অসাবধানতার খেসারৎ!

কথাটা মুখ ফুটে বলতেই অফিসারটি চীৎকার ক'রে হেসে উঠলেন। কালোয়াতী গানের মতন রীতিমত পর্দায় পর্দায় চড়ানো হাসির গমক। এক হাত দিয়ে টেবিল চাপড়ে বললেন, 'মশাই, কেন আপনি এ লাইনে এলেন বলুন তো? সিনেমায় কমিক রোলে নামলে দশ বিশ হাজার টাকার মালিক হ'য়ে যেতে পারতেন। হাজার দুয়েক টাকার জন্য পরের হিসেব হাতড়াতে হতো না।'

জেনারেল ম্যানেজারও বেশ বিরক্ত হ'য়ে উঠলেন, 'ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। তিন দিনের মধ্যে যদি টাকাটা যোগাড় করে দিতে পারেন ভালো, আমি না হয় পুলিশকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে দেবো, না হ'লে আমার আর কিছু করবার নেই জানবেন।'

ঘোরানো চেয়ারে মোচড় দিয়ে মোড় ফিরলেন জেনারেল ম্যানেজার। সাফ কথা, মারপ্যাঁচ নেই। টাকা পাওয়া যায় ভালোই, নয় তো অদৃষ্ট! আইন আছে, আদালত আছে তারাই দেখাশোনা করবে।

জেনারেল ম্যানেজারের কথা শেষ হ'য়েছিলো, কিন্তু পুলিশ অফিসার তখনো বাকি। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে কমপক্ষে আটান্ন। হাজত থেকে জামিনে খালাস পেতে রাত আটটা। জামিন দাঁড়ালেন অসীম মিত্তিরের খুড়শ্বশুর। কিছু জমিজমা আছে ভদ্রলোকের, রায়সাহেব খেতাবটাও সম্পদেরই সামিল। খাস নন, খুড়শ্বশুর সম্পর্কে। নিরুপায় হ'য়েই তাঁকে স্মরণ করতে হ'য়েছিলো, লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে।

ফিরতি পথেই খুড়শ্বশুরের জেরা চললো। পুলিশ অফিসরকে হারমানানো। এতগুলো টাকা অসীমের হাত পিছলে বেরুলো কি করে। বরাত তিনি মানেন না, সমস্ত পুরুষকার। না হলে চল্লিশ টাকায় ঢুকে ছ'শো টাকায় রিটায়ার করতে পারতেন না। অসাবধান? সে কি, পয়ত্রিশ বছরের চাকরীজীবনে একটি মুহূর্তে তিনি কাজে গাফিলতি করেন নি। অবশ্য টাকা নাড়াচাড়া তাঁকে করতে হয় নি, কিন্তু গোপনীয় সব ফাইল, সেক্রেটারীর নিজস্ব, একটু এদিক ওদিক হলে সরকারই বানচাল হ'য়ে যেতো। পুরুষমানুষকে সাবধান হয়ে কাজকর্ম করতে হবে বৈকি।

উত্তরে অসীম মিত্তির একটি কথাও বলে নি। বলার ছিলোই বা কি। নিঃশব্দে ঘাড় নিচু ক'রে শুধু কথামৃত পান করা, মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে খুড়শ্বশুরের বিগত কর্মজীবনের তারিফ করা। ব্যস।

কথা বললো একেবারে বাড়ির কাছ বরাবর এসে।

'উকীল আছে কোন সন্ধানে? জানা-শোনা ভালো উকীল।'

তা আর নেই। খুড়শ্বশুর একগাদা উকীলের নাম করলেন। জাঁদরেল সিনিয়রের দল। পাঁচশো একের একটি পাই কম হ'লে ঠোঁট ফাঁক করেন না।

নিঃশ্বাস ফেলে অসীম মিত্তির বাড়ির দরজায় নামলো।

দশচক্রে ভগবান ভূত হন, মানুষ বোধ হয় চেপ্টে চিঁড়ের রূপ নেয়।

আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের দরজায় ঘুরে যা যোগাড় হলো তা তো শুধু উকীলের মুহুরীর খোরাক। বিয়ের আংটি, ঘড়ি আর বাসনপত্তরও ঠাঁই বদল করলো। নিজের গরম জামাকাপড় আর পরিবারের কিছু দামী শাড়ী ব্লাউজও। সব এক সঙ্গে জড়ো করে অসীম মিত্তির পাড়ার উকীল পরেশনাথ মাইতির পায়ে উপুড় হ'য়ে পড়লো। বয়স খুব বেশী নয়, কিন্তু দুঁদে উকীল। জালজুয়াচ্চুরিতেই নাম বেশী। মানে জালজুয়াচ্চুরির কেসে।

কান্নায় তিনি গললেন না, ডবলখুনের আসামীকেও কাঁদতে দেখেছেন এর চেয়ে বেশী। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আগাগোড়া শুনলেন। আখরোট কাঠের পাইপে কড়া তামাক ভরতে ভরতে চেক 'পাশ' করার পন্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার চেষ্টা করলেন, খুঁচিয়ে জানলেন 'সই' মেলানোর রহস্য। মুখে বললেন, 'কেস খুব ভাল নয়,' তবে 'ব্রিফ' নিলেন, অর্ধেক নজরানায়। কড়ার শুধু একদিন কোর্টে যাবেন, আর্গুমেন্টের দিন। বাকি দিনগুলোয় হাজির থাকবেন তাঁর জুনিয়র পশুপতি হাজরা।

খুব বড়ো রকমের ব্যামোয় টানাটানি চলে যমে মানুষে—একপক্ষ জেতে, কিন্তু বড়ো মামলায় টানাহেঁচড়া চলে দুপক্ষের উকীলে। যেই জিতুক মানুষটা আধমরা হ'য়ে যায়। প্রাণ কণ্ঠলগ্ন। হাঁপানী রোগীর মতন ধুকপুকুনি সার। উকীলের দাঁতখিঁচুনি তো আছেই তার ওপর পুলিশের থাবা। সাদাকে বেমালুম কালো করার প্রয়াস, দিনকে রাত।

ব্যাঙ্কের তরফ থেকে জেনারেল ম্যানেজার এলেন সাক্ষ্য দিতে। মোটামুটি ভালো কথাই বললেন। অসীম মিত্তির চোর ছ্যাঁচোড় নয়, ছাপোষা মধ্যবিত্ত লোক। অফিসের রেকর্ড খারাপ নয়। এমন একটা কাজ এর দ্বারা সম্ভব কি না একথা হলফ ক'রে বলতে পারবেন না। মানুষ বনে গেলেই বনমানুষ। অভাবে স্বভাব নষ্ট হ'তে আর কতক্ষণ। তারপর এলেন পিলে-চমকানো ডিগ্রির বহর নিয়ে হস্তলিপি বিশারদ। রিপোর্ট দাখিল করলেন, নকল চেকের হাতের লেখা আসল জে বাসুরও নয়, অসীম মিত্তিরেরও নয়। অন্য কোন নেপোয় দইয়ের ভাঁড় চেটেপুটে খেয়েছে। শেষের দুদিন একেবারে কামড়া-কামড়ি ব্যাপার। পাবলিক প্রসিকিউটর আর পরেশ মাইতির প্রায় হাতাহাতি। চাপড়ানির চোটে পুরোনো কাঁঠাল-কাঠের টেবিলের সঙ্গীন অবস্থা। বুকনির তোড়ে তহবিল তছরুপের আসামী অসীম মিত্তির কুশবিদ্ধ অবধূত হ'য়ে দাঁড়ালো। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শিখণ্ডী। আসামীর যদি শাস্তি হয়, তাহলে বিচারের মর্মান্তিক প্রহসনই অনুষ্ঠিত হবে, ন্যায়বিচার নয়। পরেশ মাইতি আসন নিলেন।

হাকিম সমান মনোযোগ দিয়ে দুপক্ষের কূট তর্কই শুনলেন, তারপর উঠে পড়লেন এজলাস ছেড়ে। জুরীদের মন্তব্য শুনবেন পরের দিন। রায় মুলতুবী রইলো।

সারাটি রাত অসীম মিত্তির বিছানায় ছটফট করলো। সান্ত্বনা দিতে এসে ব্যাপার দেখে সকলেই সরে গেলো আস্তে আস্তে। স্ত্রী মায়া ঠাকুরঘরে দরজা দিয়ে উপুড় হ'য়ে পড়ে রইল। পাকিস্থান-ফেরৎ পিসীমা ভিটে ছেড়ে আসবার সময় কেঁদেছিলেন একবার, আর একবার

চৌকাঠে বসে হাপুসনয়নে কাঁদতে শুরু করলেন।

বেলা বারোটা নাগাদ জুরীরা মত দিলেন 'আসামী নির্দোষ'। মিনিট পনেরোর মধ্যেই হাকিম রায় দিলেন তাই। স্থির প্রমাণাভাবে সন্দেহের অবকাশে আসামী খালাস পেলো। আইনের ভাষায় 'বেনিফিট অব ডাউট'।

মিনিট দশেক অসীম মিত্তির চুপচাপ বসে রইলো। কাঠগড়ার কাঠে হেলান দিয়ে নির্বিকার। তারপর পরেশ মাইতি কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝাতেই এক ঘর লোকের সামনে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেললো।

মাইতি সায়েব গাড়ী ক'রেই বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেলেন। নামাবার মুখে উপদেশও দিলেন কিছুটা, 'বেঁচে গেলেন এযাত্রা। ভবিষ্যতে খুব সাবধান, এসবের মধ্যে যাবেন না।' একবার ব'লে। খালি মাথায় বেলতলায় কেউ দুবার যায়।

চৌকাঠে পা দিয়েই অসীম মিত্তির হকচকিয়ে গেলো। আট ফুট বাই বারো বসবার ঘর; কিন্তু পোস্ত রাখার জায়গা নেই। কানায় কানায় ভর্তি। বেশীর ভাগই অপরিচিত। ঘরে ঢোকবার মুখেই বুড়োগোছের একটি ভদ্রলোক বাধা দিলেন, 'উঁ হুঁ হুঁ, বাবাজী, একবার ও দিকটা ঘুরে এসো। পুনর্জন্ম বলতে গেলে। আগে ঘট প্রণাম ক'রে, তারপর চৌকাঠ ডিংগোবে।'

মিত্তির খেয়াল করেনি। ঠিক উঠোনের এক কোণে ঘটের মাথায় আমের পল্লব। তেল সিঁদুর ছোঁয়ানো। মিত্তির সাষ্টাংগে প্রণাম করলো। ঠাকুরই বাঁচিয়েছেন, মানুষ তো উপলক্ষ্য মাত্র। সাতটি বছর পর্যন্ত জেলে পস্তাবার হাত থেকে রেহাই পাওয়া কম কথা!

প্রণাম সেরে ভেতরে ঢুকতেই কোলাহল শুরু।

'ফাঁড়া কাটলো, ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে দাও একটা।'

'কেন দাদা, অব্রাহ্মণরাই বা দোষ করলো কি?'

'ওসব থাক, বেশ ক'রে বাবা তারকেশ্বরের পুজো দিয়ে এসো একবার।'

ঘর যখন খালি হ'লো, অসীম মিত্তিরের তখন নাড়ি ছাড়ো-ছাড়ো অবস্থা। মুখে মাথায় জল দিয়ে বাইরের ঘরের মেঝেতেই শুয়ে পড়লো টান হ'য়ে। জ্ঞান হ'লো ফোঁসফোঁসানী কান্নায়। আবছা অন্ধকার। চট ক'রে কিছু ঠাওর হয় না। হাতপাখার খস খস শব্দের সংগে জড়ানো চাপা কান্নার আওয়াজ।

হাত বাড়িয়ে মিত্তির স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলো। কোন কথা নয়। শুধু কান্নার তালে ফুলে ফুলে ওঠা দেহের নিবিড় অনুভূতি।

কথাটা উঠলো তারপরের দিনই। ভোরবেলা সবে চায়ের কাপটা শেষ ক'রে অসীম মিত্তির নামিয়ে রেখেছে, বৌ এসে দাঁড়ালো সামনে। মুখ তুলতেই দেখলো বেদনাকাতর দুটি চোখ। আবেদন দুর্বোধ্য নয়।

'এইবার!' মায়া নয়, মিত্তিরই বললো কথাটা।

মায়া চুপচাপ।

'কাল একবার ব্যাঙ্কের দিকে যাবো। জেনারেল ম্যানেজারের সংগে দেখা ক'রে আসবো', মিত্তির থেমে থেমে বললো। ভয় ভরা গলায়।

'যা ক'রে এ ক মাস চালিয়েছি,' মায়া আঁচল চাপা দিলো চোখে।

এ আবার মুখ ফুটে বলতে হয় মানুষকে। জোড়াতালি দেওয়া সংসারের অবস্থা বুঝি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। তিন মাসের ওপর ঘর ভাড়া বাকি, মোড়ের মুদিখানার বিলও নিন্দের নয়, বড় ছেলেমেয়ে দুটোকে স্কুল ছাড়িয়ে ঘরে বসিয়ে রাখা হ'য়েছে। কিছুই নজর এড়ায় নি অসীম মিত্তিরের। আর ভয় নেই মেঘ কেটে গেছে। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

কিন্তু সব যে ঠিক হবে না, তার প্রথম আঁচ পেলো মিত্তির পরের দিনই। জেনারেল ম্যানেজারের কামরায় স্লিপ পাঠিয়ে বাইরের বেঞ্চে বসে রইলো দেড় ঘণ্টারও ওপর। যাদের পাশে ব'সে এতগুলো বছর কাজ করেছে একসংগে, তারা সবাই পাশ কাটিয়ে গেলো। কেবল দু একজন এদিক ওদিক চেয়ে, কর্তাদের নজর বাঁচিয়ে দু একবার চোরা চাউনি হানলো। ওই পর্যন্ত।

ভেতরে ডাক আসলো। টিফিনের পর। দেয়ালের রং পালটানো হয়েছে শাদা থেকে ফিকে সবুজ। মানুষটার মুখের রঙও পালটেছে। অন্ততঃ অসীম মিত্তিরকে দেখেই বুঝি পালটালো।

'আমি সামনের মাস থেকেই তাহ'লে কাজে জয়েন করবো। আজ হ'লো গিয়ে ছাব্বিশে—' মুখের চেহারা দেখে মিত্তির বাকি কথাগুলো বেমালুম গিলে ফেললো। মানুষ মুখে এমন করে থাকলে কখনও মনের কথা বলা যায়।

'আপনাকে কাজে নেবার আর আমাদের উপায় নেই।' জেনারেল ম্যানেজার ভাউচারের গোছা থেকে মুখ তুললেন না।

অসীম মিত্তির চেয়ারের হাতল ধ'রে টাল সামলালো। এত বছরের চাকরিটা এত সহজে খসে পড়বে। কিন্তু কেন? দোষের কালো রংটাতো গা থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে। খালাস পেয়ে গেছে আইনের কবল থেকে। হাকিমের হুকুমের কপি আছে ওর পকেটে।

সে কথা বলতেই জেনারেল ম্যানেজার মুখ তুললেন। সোজাসুজি চাইলেন মিত্তিরের দিকে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত তারপর দুটো হাত টেবিলের ওপর জড়ো করে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'বেনিফি[illegible] অফ ডাউটে খালাস পাওয়া আসামীকে আর ফিরে নেওয়া যায় না। এ ব্যাঙ্কে তে[illegible] নয়ই, আর কোন ব্যাঙ্ক যে আপনাকে নেবে এমন মনে হয় না।'

'তা হ'লে' মিত্তির টেবিলে ভর দি[illegible] দাঁড়ালো। ভর দেওয়ার সবচেয়ে শ[illegible] আশ্রয়টাই যখন সরে গেলো, তখন কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে হবে বই কি। শূ[illegible] তো আর দাঁড়াতে পারে না মানুষ।

তাহ'লে উত্তর অবশ্য জেনারে[illegible] ম্যানেজারের দেবার নয়। তিনি টেবি[illegible] আটকোনো কলিং বেলে হাত রাখলে[illegible] উদ্দেশ্য পরিষ্কার। বেয়ারাকে ডে[illegible] মিত্তিরকে বাইরে পথ দেখাবার নির্দেশ। কিন্তু মিত্তির শেষ চেষ্টা করলো একবার আমতা আমতা ক'রে ভিজে গলায় বললে[illegible] 'তা হ'লে এ ক মাসের বাকি মাইনেটা চার পাঁচ মাসের ওপর মাইনে পাইনি।'

এবার ভাউচারের গোছা সরিয়ে জেনারে[illegible] ম্যানেজার সোজা হ'য়ে বসলেন। হা[illegible] পাওয়ারের চশমায় আলোর ঝিলিক। দু[illegible] ভুরুর মাঝখানে সরু খাঁজ। চড়া গল[illegible] আওয়াজ, 'আপনাকে সাসপেন্ড ক'রে [illegible] চিঠি দেওয়া হ'য়েছিলো, তা নিশ্চয় আপ[illegible] পেয়েছেন। ডেসপ্যাচ বইয়ে আপনার স[illegible] আছে।' কথার সংগে সংগে বিজলী বেলে[illegible] ঝঙ্কার। বেয়ারা ঢুকতেই মিত্তির বেরি[illegible] এলো।

বাইরে কড়া রোদ। ক্রোমিয়াম কাউণ[illegible] গুলো জ্বলে জ্বলে উঠছে, কিন্তু মিত্তিরে[illegible] চোখে যেন কুয়াশার আস্তরণ। সব আবা[illegible] নিষ্প্রভ।

ুটিন বাঁধা জীবন শুরু হ'লো তারপরে। ে কিছু নাকে মুখে গ'ুজে ব্যাঙ্কে ক টহল। সব জায়গাতেই এক গৎ। ধে হবে না। সন্ধ্যের ঝোঁকে খ'ুজে জ এক চিলতে পার্কে চুপচাপ চিৎ হয়ে থাকা। রাত ঘন হ'লে বাড়ী মুখো চালানো। একঘেয়ে, একটানা। ক্রমে র সেয়ানা হ'য়ে উঠলো। ব্যাঙ্ক বাতিল ছোটখাটো দোকানে ঘোরাঘুরি শুরু লা। খাতা লেখার কাজ নিদেন পক্ষে বহার। মাস দুয়েকের মুখে বরাত ে ফিরলো। বিরাজমোহন আঢ্য এণ্ড স্যানিটারি পাইপ আর লোহালক্কড়ের খাটো দোকান। খাতা লেখার কাজ। কি। সোনারুপো থেকে লোহার হিসেব। ক্কর চাল আবার কাড়া আকাড়া। যা ন তাতে একটা পেটও পুরো চলে না, ু উপায় নেই। ওতেই সবাই মিলে ক পেটা খেয়ে দিন চালাতে হবে। শনির ি ছাড়া আর কি। নইলে এমন পয়মন্ত রিটা। অসীম মিত্তির ছেঁড়া জামার য় কপালের ঘাম মুছলো। ঘাম তো রক্ত চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে যেন।

কনার মত শাদা মেঘ আর সোনা নো রোদ দেখে কিছু খেয়াল হয়নি রের, খেয়াল হ'লো দূর থেকে ভেসে সানাইয়ের সুরে। পুজোর আর দিন ক বাকি। ব্যাঙ্কে বাড়তি বোনাস ছিলো া, বিরাজ আঢ্যের দোকানে গোটা ন পেলে হয়। এই সময় বাবুরা আবার য় বেরোন। বাড়তি টাকার দরকার রই বেশী।

থাসময়ে পাড়ার ছেলেরা চাঁদার খাতা ে দরজায় কাতার দিয়ে দাঁড়ালো। প্রথমে ার করলো মিত্তিরের বড় ছেলে পালকে।

ঁ, হ'ু, গত বছরের মতন এবার আর টাকা দিলে চলছে না, এ বছর পাঁচ দিতে হবে।'

কেন' গোপাল সত্যিই অবাক হ'য়ে া। তার মানে! গত বছরে তবু কাপড় ছিলো একটা আনকোরা, এবারে তিকে মনে হ'চ্ছে বোধ হয় রুমালও ে না বরাতে।

আরে আমরা সব জানি। তোর বাবাকে পাঁচ টাকা না নিয়ে আমরা নড়ছি না।'

দেড় ইঞ্চি ই'টের গাঁথুনী। এমন কিছু পুরু নয়। এপাশের কথা দিব্যি শোনা যায় ওপাশে। তক্তাপোশে বসে অসীম মিত্তির সবই শুনলো। খুব অসুবিধে হ'লো না বুঝতে। পথ চলতে পড়শীদের কাছ থেকে এ ধরণেরই কথাবার্তা শুনেওছে দু এক-বার। ইচ্ছে ক'রেই কান দেয়নি।

"আর চাকরি করবার দরকার কি! দিব্যি পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকবে। টকাটা তো কম নয়।'

'কার মনে কি আছে বোঝা মুশকিল। না, সৎপথে থেকে কোন লাভ নেই।' আফসোসের টুকরো।

শুধু পাশ কাটিয়ে ফিসফিসানি নয়, আরো হিতৈষী যারা তারা সামনাসামনি সৎ উপদেশও দিয়েছে।

'ভালো দেখে ধান জমি কিনে ফেলো পৈলানের দিকে। বছরের খোরাক পাবে, বাঁধা উপরি আয়ও থাকবে।'

'উ হুঃ' অন্য একজন মুরুব্বি ঘাড় নেড়েছে 'ও সব নয়, শেয়ার মার্কেটে ছাড়ো, ডবল হয়ে ফিরে আসবে।'

মিত্তির কারুর কথার উত্তর দেয় নি। ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়ে থেকেছে। এদের চোখ নেই নাকি! দেখতে পায় না গলার কণ্ঠা আর চোয়ালের উ'চু হাড় দুটো। নজরে আসে না জামা জুতোর সেলাইয়ের বহর।

মিত্তির দরজার কাছে বরাবর গিয়ে ছেলেকে ডাকলো 'গোপাল'।

গোপাল কাছে এসে দাঁড়াতে বাইরের ছেলেদের কান বাঁচিয়ে বললো, 'ওদের আজ যেতে বলো। পুজোর তো দেরী আছে এখনও। পরে আসতে বলে দাও।'

ছেলেরা অবশ্য বিদায় হলো কিন্তু চৌকাঠে পিসীমা এসে দাঁড়ালেন। কদিন ধরে কি একটা কথা বলি বলি করছেন কিন্তু সুযোগ পাচ্ছেন না—এ ভাবটা বাড়ীর অন্য লোকের নজর এড়ায় নি।

'মণ্টু ব্যস্ত আছিস নাকি?' পিসীমা একেবারে নাড়ীর সম্পর্ক ধরে টান দিলেন।

'না, ব্যস্ত আর কি' অসীম মিত্তির চট করে একবার বাইরে চোখ বুলিয়ে নিলো। রোদ ঘোষালদের পাঁচীলের গা বরাবর। মানে সাড়ে আটটার আর দেরী নেই। হাজিরা সাড়ে নটায়। ইতিমধ্যে স্নান খাওয়া দুটোই সেরে নিতে হবে। তারপর সার্টের ওপর চাদরটা চাপিয়ে জোর পায়ে অফিস-মুখো। তবু মাথার তালুতে তেল চাপড়াতে চাপড়াতে পিসীর কথাটা শুনতে আর দোষ কি!

'বড়োবাড়ীর সবাই কাশী যাচ্ছে সামনের মঙ্গলবার, ভাবছি ওদের সঙ্গেই বাবা বিশ্বনাথ বলে বেরিয়ে পড়বো।'

তা মন্দ কি। তবু একটা মুখ কমবে। কিন্তু সেকথা কি মুখে বলা যায়।

'তা বেশ তো, তীর্থধম্মো করতে চাও, আমার আপত্তি নেই। তার ওপর এমন একটা সুযোগ যখন পাচ্ছো' অসীম মিত্তির মুখটা হাসি হাসি করে তুললো।

'তাই তো বলছিলাম বাবা' পিসীমা এক গাল হাসলেন। বয়স হলে হবে কি এখনও মজবুত দাঁতের সার। মজবুত না হলে আর দু বছরের মধ্যে স্বামীপুত্র চিবিয়ে শেষ করতে পারেন। কথার সঙ্গে পিসীমা আরো এক পা এগোলেন। আঁচলের খ'ুট খুলে দুটো দশ টাকার মোচড়ানো নোট বের করে বললেন, 'আট টাকা কম পড়েছে বাবা, ওটা হলেই ওনাদের কথা দিয়ে দিই। যাবার বড়ো ইচ্ছে, বিশ্ব-নাথ না টানলে এমনটি হয় না।'

তা হয়তো হয় না, কিন্তু এ টানাটানির মধ্যে ছাপোষা অসীম মিত্তিরকে আর জড়ানো কেন। সময় যা পড়েছে আটটা টাকা আটটি মোহরের সামিল। উত্তর দিতে গিয়েই অসীম মিত্তির থেমে গেলো। রোদ উঠোন পার হয়ে সি'ড়ির চাতাল ছু'ই ছু'ই। মানে পৌনে নয়। তেল চিটচিটে গামছাটা কাঁধে ফেলে আরও এক মিনিটও দাঁড়ালো না।

বিশ্বনাথের টানে পিসী কাশী গেলেন, হয়তো সেই টানেই মিত্তিরের পরিবারের বহুকষ্টে সরিয়ে রাখা তাবিজ পোদ্দারের দোকানে গিয়ে উঠলো। ভাগ্য ভালো তাবিজের, পুণ্যার্থী লোকের রাহা খরচ।

তালে গোলে পুজোটা কাটলো কিন্তু ঠিক দ্বাদশীর দিন থেকে গোপাল বিছানা নিলো।

প্রথমে সামান্য গা গরম, একটু মাথার যন্ত্রণা, পেটের গোলমাল তারপর আস্তে আস্তে বেদিকে মোড় নিলো ব্যায়রাম। জ্বরের ওঠানামার বহর আর রোগীর অবস্থা দেখে সন্দেহের সামান্য অবকাশও রইলো না। দৌড়ের দু টাকা ভিজিটের ভূধর ডাক্তারও রোগ চিনে ফেললো। স্টেথিস্কোপ পকেটে রেখে ঠোঁট কোঁচকালেন। বললেন, 'যা ভয় করছিলাম

তাই হলো। রক্তটা একবার পরীক্ষা করাতে পারলে হতো।'

ডাক্তার বলে খালাস কিন্তু অন্তত আট টাকার খেলা। এর কমে কোন ডাক্তার ছোঁবেই না রক্ত। ছেলের রক্ত ছোঁয়া তো নয়, বাপের হাড় মাস টেনে টেনে বের করা। অসীম মিত্তিরের নিজের রক্ত মাথায় উঠে গেলো।

পড়শীদের কাছে হাত পেতে নয় হাত-জোড় করে যে টাকা যোগাড় হলো তা রক্তের রিপোর্টেই শুষে নিলো। তবে সন্দেহ মিটলো। খাস টাইফয়েড, অন্য কিছু মিশেল নেই। ঢালাও চিকিৎসা চালালেই রোগী উঠে বসবে বিছানার ওপর। চমৎকার ওষুধ বেরিয়েছে। দাম একটু চড়া, তা হোক মানুষের প্রাণের দামের চেয়ে তো আর চড়া নয়।

বিরাজমোহন আঢ্যের সেজছেলে দোকানে বসেন। চেয়ার টেবিল নয় একে-বারে সাবেকী ধরণ। ফরাসে বসে তাকিয়ায় হেলান। অসীম মিত্তির ছুটি হবার মুখে তাঁর সামনে উপুড় হয়ে পড়লো। একটানা দুঃখের বিবরণে সেজছেলে কিছুটা টললেন। এক মাসের মাইনে আগাম আর পাঁচ দিনের ছুটি।

ইনজেকশন মিললো কিন্তু তাইতেই আগাম মাইনে কাবার। ডাক্তারের সঙ্গে রফা হলো দিন দশেক পরে সবশুদ্ধ মিটিয়ে দেওয়া যাবে। পাড়ার ডাক্তার নিমরাজি হয়ে শরীর ফুঁড়তে শুরু করলেন। দিন সাতেক। রোগের উনিশ বিশ হলো না। বিড় বিড় করে প্রলাপ। দাঁতের চাপে ঠোঁট কেটে রক্ত ছুটলো। জবাকুসুম সংকাশং চোখের রং। সন্ধ্যের ঝোঁকে ডাক্তার এসে চৌকাঠে দাঁড়িয়েই মুখ বেঁকালেন। খরচের খাতায় লিখে রাখবার ইঙ্গিত। রোগীর নাড়ী টিপে, জ্বরের চার্ট আর মুখের চেহারা দেখে নিজের মুখের চেহারা পালটে ফেললেন। বারান্দার কোনে অসীম মিত্তিরকে ডেকে প্রায় যমরাজের কান বাঁচিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, 'অবস্থা ভালো বুঝছি না। আপনারা অন্য কাউকে ডাকুন।'

'অন্য কাউকে' অসীম মিত্তির বারান্দার রেলিং ধরে সামলে নিলো নিজেকে।

'হ্যাঁ, বড়ো কাউকে। এ রোগী আমি হাতে রাখতে সাহস করছি না' এখনি হাত সরিয়ে রোগীকে টুপ করে ফেলে দিয়ে যাবেন ডাক্তার মুখচোখের এমনি ভাব করলেন।

'উপায়! কাকে ডাকা যায়?' মিত্তির ডাক্তারের দিকে চোখ তুললো।

প্যান্টের পকেটে দুটো হাত ঢুকিয়ে ডাক্তার দু চার মিনিট ভাবলেন, তারপর বল্লেন, 'আমার মনে হয় এসব কেসে ডাক্তার চৌধুরীর খুব নাম। আমি দু চারটা কেসে জানি অদ্ভুতভাবে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন।'

'বেশ তাহলে তাঁকে কল দেওয়ারই ব্যবস্থা করুন।' কথাটা বলেই অসীম মিত্তির জিভ কামড়ে ফেললো। কল না হয় দেওয়া হবে। সেটা শক্ত কিছু নয়। টেলিফোনে বললেই এসে পড়বেন, আসার কোন হাঙ্গামা নেই কেবল পেট্রোল খরচের ওয়াস্তা। কিন্তু যাবার সময় তো খালি হাতে যাবেন না। পাড়ার ডাক্তার নয় যে হাতে-পায়ে ধরে সময় চাইলেই হবে। যমকে ঠেকাতে যমের শত্রুর হাতে রেহাই পাওয়া মুশকিল।

'কত ভিজিট তাঁর?' ডাক্তার সিঁড়িতে পা দেওয়ার মুখে মিত্তির মরিয়া হয়ে বলে ফেললো।

'এখন বোধ হয় চৌষট্টি হয়েছে।'

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত মিত্তির চাতালেই দাঁ রইলো। একবার মনে হলো ছুটে বারণ করে ডাক্তারকে। চৌষট্টি কেন, অর্ধেক টাকাও সারা ঘর তন্ন তন্ন খুঁজলেও পাওয়া যাবে না, কিন্তু দ পা-ই যেন অবশ। এগোন তো সম্ভবই পিছিয়ে ঘরের অন্ধকারে মুখ লুবে তাও পারলো না।

পিছন ফিরেই অবাক হয়ে গেলো। এসে কখন পিছনে দাঁড়িয়েছে। তা দাঁড় ছেলে তো শুধু অসীম মিত্তিরের এ নয়। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে মায় ছেলের চোখের রং মার চোখে লেগে আলু থালু চুলের রাশ কান্না চেপে গ নীল শিরাগুলো কেঁপে উঠছে।

'কি হবে গো? গোপালকে কি বাঁচাবো' মিত্তিরের একটা হাত মায়া সজো চেপে ধরলো।

গোপালের আয়ু যেন মিত্তিরের হা মুঠোয়। খুব জোরে একবার হেসে উ ইচ্ছা হলো। বহুদিন আগের সেই প অফিসরের ছাদকাঁপানো হাসির ম কিন্তু মিত্তির নিজেকে সামলে নি

। আস্তে বললো, 'ডাক্তার চৌধুরীকে
বার কথা বলে গেলো।'
তাঁকেই ডাকো তবে। যেমন করে হোক
পালকে বাঁচিয়ে তোলো।'
মিত্তির ঘরের দিকে যেতে যেতে ঘুরে
গেলো। না, এমনভাবে বেইজ্জত হতে
বে না। ডাক্তার চৌধুরীর প্রসারিত
তের ওপর কি তুলে দেবে? নিজের
পিন্ড। তা ছাড়া দেওয়ার মতন সারা
তে কি আছে? ছি, ছি, তা সম্ভব
। তার চেয়ে সময় থাকতে বারণ করে
াই ভালো। যার তামা নেই, তার
সী আছে। ঠাকুর দেখবেন গোপালকে।
ভাবতে পারে না মিত্তির।
ডাকতে যাচ্ছো' মায়া আঁচল দিয়ে দুটো
মুছে নিলো।
ডাকতে বলেছিলাম, বারণ করাত
ছ।' মিত্তির পিছনে চোখ ফেরালো না:
সে কি।' মায়া সিঁড়ি আগলে দাঁড়ালো।
এবারে, এতক্ষণ পরে অসীম মিত্তির
র দাঁড়ালো।

'চৌষট্টি টাকা ভিজিট। চৌষট্টি পয়সা সম্বল করে তাঁকে ডাকা চলে না।' মিনিটখানেক। দুজনেই চুপ। তারপর মায়া আরো এগিয়ে এলো। একেবারে অসীম মিত্তিরের গায়ের ওপর।

অবিচলিত চাউনি দুটো চোখের। ভয় নয়, অনুকম্পা নয়, বিজাতীয় ঘৃণা উপচে পড়ছে নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

দম নিয়ে কাঁপা গলায় বললো, 'কিন্তু যেমন করেই হোক গোপালকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। যে করেই হোক। দরকার হলে তোমায় সে টাকাতেই হাত দিতে হবে।'

আর একবার বিবর্ণ পৃথিবীটা মিত্তিরের চোখের সামনে পাক খেয়ে দুলে উঠলো। সিঁড়ি, ইঁটের পাঁজর মার্কা দেয়ালের টুকরো, কাঠের তেপায়া সব কিছু। শক্ত গুঁড়ির ওপর দ্রুত করাত চালানোর শব্দ। কোন টাকা! কোন টাকা!

হদিস মিললো মায়ার কঠোর চাউনিতে। কোন টাকা জানে না অসীম মিত্তির। আশে পাশের সবাই যে জানে, ঘরের লোক পর্যন্ত। এমন কি সব চেয়ে কাছের লোক।

সিঁড়ি দিয়ে অসীম মিত্তির দ্রুত নেমে গেলো। প্রায় মুখস্থ। একত্রিশটা ধাপ। তারপরেই সদর দরজা। বৃন্দাবন পালিত লেন। একুশ ফুট সড়ক।

কিন্তু সোজা নয়, মিত্তির বাঁ দিকে ঘুরলো। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে একটুও ভুল হলো না। বারোয়ারী কামরা। সারা ফ্ল্যাট বাড়ীর ভাঙ্গা টেবিল, চেয়ার, আলনা অব্যবহৃত জিনিসপত্রে ঠাস বোঝাই। পা রাখাই দুষ্কর। কিন্তু পা রাখতে তো আর আসে নি মিত্তির। স্পষ্ট মনে পড়ছে ঘরের ছাদের মাঝখানে শক্ত মোটা লোহার হুক আছে একটা। তেতলার কোনের বাড়ীর ভাঙা দোলনাটা লটকানো ছিলো। দড়িও একটা আছে। আর নাই যদি থাকলো, পরনের কাপড় রয়েছে তো মিত্তিরের। আনকোরা নতুন অবশ্য নয়, সুতোর চেয়ে সেলাই বেশী। তা হোক, এক মণ হাড়-আর মাংসের ভার খুব সইতে পারবে।

ভাঙ্গা মন্দিরের ছায়া

শামসুর রাহমান

চোখে লাগে রোদ, ঝিকিমিকি রোদ ঃ তাই না মেয়ে?
একটুও ছায়া নেই কি কোথাও, নরম ছায়া?
যেখানে এখন অন্তত কিছু নির্জনতা
অথবা ছায়ার আভাস রয়েছে, সেখানে চলো।

আহা দ্যাখো ওই মন্দির চূড়া, তাই না মেয়ে?
ঘণ্টা বাজে না, পুরোহিত নেই ঃ ভালোই হলো!
বাঁচিয়ে এড়িয়ে মানুষের চোখ, ধারালো জিভ
এবার দুজন পবিত্র কতো পৃথিবী আর

গভীর আকাশ গড়বো সেখানে অনেক আরো।
ভাঙ্গা মন্দির। নাম কী যে তার জানিনে সে তো,
ভুলে গেছে তারে সবাই এখন, ভূতের মতো
দাঁড়িয়ে রয়েছে নির্জন মাঠে, কী অদ্ভুত!

চোখে লাগে রোদ, ঝিকিমিকি রোদ ঃ তাই না মেয়ে?
তোমার কানের সোনালি দুলের হরিণ-ছায়া
নড়ছে, কাঁপছে, খেলছে শুভ্র ঘাড়ের বাঁকে,
শিশু সাপগুলো ফুঁসছে বাতাসে, দুরন্ত!

আহা দ্যাখো ওই মসৃণ ছায়া, তাই না মেয়ে?
রোদের আড়ালে কি আশ্চর্য ছায়া-আঁচল
আমাদের মনে বিছাবে আরাম, মৃদু আরাম,
তোমার নরম দুরন্ত শাড়ী ছুঁয়েছে মন!
শরীরে অনেক প্রাচীন বাতাস আর কতো না
বুনো গাছ নিয়ে মন্দির এই ঃ প্রবেশদ্বার
যদিও বন্ধ, যদিও ভিতরে অন্ধকার
সাপের মতন রয়েছে ঘুমিয়েঃ তবুও ভালো!

আকাশের নীচে হৃদয় অনেক, অনেক বড়ো
হয়ে যায় ক্রমে, এখন হে মেয়ে করোনা ভয়!
চাঁদ নেই যদি ছায়া আছে ভাঙ্গা মন্দিরের,
ঘন হয়ে বসো, এখন হে মেয়ে করো না ভয়!

নির্জন মাঠে একটি দুপুর ঝরেছে মনে,
কথার আড়ালে হৃদয়ের ঢেউ ভুলবে না তো?
তোমার চোখের পক্ষ ছায়ায় সূর্য কতো
জ্বলেছে, নিভেছে নিঝুম দুপুরে, তাই না মেয়ে?
পৃথিবীর দিন, নির্মম দিন অহর্নিশ ঃ
খুঁজেছে অনেক শিকারীর চোখে মন আমার,
তোমার হৃদয় বনের ধোঁয়ায়, দগ্ধ মাঠে—
শোনো, মেয়ে শোনো, আমরা তবুও লোকোত্তর!

উত্তরায়ণে বিদায়কালে শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সহিত শ্রীনেহরু। দক্ষিণে ঃ শান্তিনিকেতনের [illegible] বাহিনী পরিদর্শনরত শ্রীনেহরু

শ্রীনিকেতন শিল্পভবনে শ্রীনেহরু।

সাহেব বিবির দেশে

নরেন্দ্র দেব
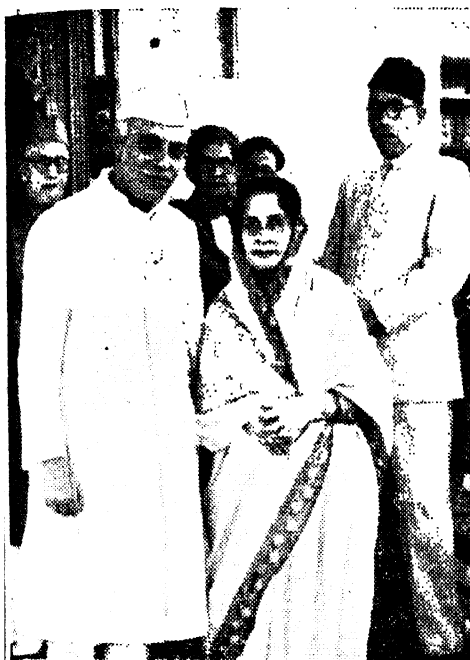
(সুইজারল্যাণ্ড—মন্ত্রো, গিলোঁ, ক্যো, ল্যুশার্নি, জেনিভা)

ইণ্টারল্যাকেন ছেড়ে আসতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। যদিও সেই পাহাড়, বরফ, লেক, বন-জঙ্গল, ঘরবাড়ী, কুটীর, গির্জা, ফুলেরবাগান, সুদৃশ্য সেতু, ছবি, মূর্তি সর্বত্র যা দেখে আসছি, এখানেও তাই। তবু, এখানকার কেমন যেন একটা বিশেষত্ব ছিল, যার ফলে ইণ্টারল্যাকেনের প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের কাছে বেশ একটু চিত্তাকর্ষক আবেদন নিয়েই উপস্থিত হয়েছিল। ঠিক যেমন এই একই রকম হাত, পা, চোখ, নাক, মুখ ও কেশ, বেশ নিয়ে এক একটি মানুষ আসে আমাদের কাছে, তাদের চোখের চাউনীতে, মুখের হাসিতে, কণ্ঠস্বরের সঙ্গীতে ও কথা বলার ভঙ্গীতে এমন একটি বিশেষত্ব নিয়ে যে সেই মানুষটিকে আর সকলের চেয়ে আমাদের বেশী ভাল লাগে।

হোটেল ব্যাভেরিয়ার সুন্দরী তরুণী পরিচালিকা প্রস্তাব করলেন—আপনারা সকালের ট্রেনে না গিয়ে দুপুরের ট্রেনে মন্তরো যান। সকালে গিয়ে আপনারা মোটর-বোটে একটু 'থুন লেক' ঘুরে 'সেণ্ট বিয়েটাস' কেভটি দেখে আসুন। এ দুটো না দেখে ইণ্টারল্যাকেন ছেড়ে গেলে পরে আফসোস করতে হবে। আমরা এ প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হয়ে তাঁর কাছে সব হদিশ জেনে নিয়ে প্রাতরাশের পর বেরিয়ে পড়লাম। থুন লেকের অথৈ জলে মোটর তরণী নিয়ে বিহারে অবশ্য নূতনত্ব কিছু নেই, কিন্তু, সেই প্রভাতের তরুণ অরুণ আলোয় থুন সরোবরের পাতলা কুহেলিকায় স্বচ্ছ অবগুণ্ঠনে ঢাকা আধো তন্দ্রাচ্ছন্ন রূপটি বাসরশয্যায় সজ্জিতা নব-বধূর রাত্রি শেষের ঘুমন্ত রূপের মতোই মধুর লাগছিল। আমরা সেই অপার সৌন্দর্যসাগরে ডুবে যেন স্তব্ধ ও সমাহিত চিত্ত হয়ে পড়েছিলাম।

মোটরবোটের কর্ণধার নিজের মনেই আমাদের উদ্দেশ করে বলে যাচ্ছিলেন, বোধ করি তিনি আমাদের নীরব নিঃসঙ্গতার ভারি আবহাওয়াটাকে হালকা করবার সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই কথা কইছিলেন। এখানকার সব বিদেশী অতিথিরাই প্রায় এই বিস্ময়কর প্রাচীন গুহাগুলি দেখতে আসেন। প্রকৃতির এ এক আশ্চর্যলীলা! দেখে আপনারা অবাক হবেন। পাহাড়ের তলায় গভীর পাতাল-পুরের সেইসব পর্বত কন্দর যার ছাদের উপর থেকে ঝুলচে অসংখ্য জমাট বেঁধে যাওয়া লম্বমান তুষার জটের ন্যায় শুভ্র পাষাণঝুরি! সে গহ্বর আপনার ইঁদুরের গর্ত নয়। পেল্লায় বড় বড় রাজবাড়ীর হলকামরা যেন! কত সুড়ঙ্গবৎ গিরিবর্ত্ম, ভূগর্ভস্থ কত অন্তঃসলিলা ফল্গু প্রবাহিনী ও পাতাল-পুরীর জলপ্রপাত! তা' আপনাদের এসব দেখে আসতে কোনো অসুবিধা হবে না। সুইস গভর্নমেণ্ট সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দিবারাত্র ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে। পাতালের তিমির গর্ভে যেন দিনের আলো ফুটিয়ে রেখেছে!

লোকটির কথা এক বর্ণও মিথ্যা নয়। সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে এই ইণ্টারল্যাকেন হচ্ছে 'বারনীজ ও বারল্যাণ্ড' প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত শ্রেষ্ঠ অঞ্চল। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, এ অঞ্চলের মধ্যে এমন চিত্তাকর্ষক প্রাগৈতিহাসিক দুর্লভ প্রাকৃতিক সম্পদ আর কোথাও নেই। সত্যই প্রকৃতির এই পরমাশ্চর্য লীলা দর্শনীয় সামগ্রী সন্দেহ নেই। ভারতে অজন্তা, এলোরা, ঐরাবত ও ব্যাঘ্রগুহা আমরা দেখেছি। মানুষের শিল্প-প্রতিভার সোনার কাঠির পরশ তার মধ্যে স্বর্গের সৌন্দর্য সমাবেশ করে তাকে দেবনিকেতন করে তুলেছে। কিন্তু এ গুহায় মানুষের হাত পড়লেও এর স্বাভাবিকতা অনেকটাই অক্ষুণ্ণ আছে। হাজার হাজার বছর আগে সদ্যসম্ভূত পৃথিবীর যেসব নবজাত গুহা-মানব অতীতে একদিন এখানে বসবাস করতো, তাদের জীবনযাত্রার একটু নমুনা দর্শকদের দেখাবার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেরা মিলে তৈরী করে রেখেছেন। সর্বশেষ এখানে এসে বাস করেছিলেন একজন ইংরাজ ধর্মপ্রচারক সন্ন্যাসী। তাঁর নাম 'সেণ্ট বিয়েটাস'। কর্তৃপক্ষেরা এই গুহাবাসী সন্ন্যাসীর একটি মোমের প্রতিমূর্তি করে রেখেছেন এখানে। এঁরই নামে এ গুহার নামকরণ হয়েছে 'সেণ্ট বিয়েটাস'। মধ্যযুগে তীর্থযাত্রীদের উপাসনার জন্য এখানে একটি প্রার্থনাগৃহ নির্মি
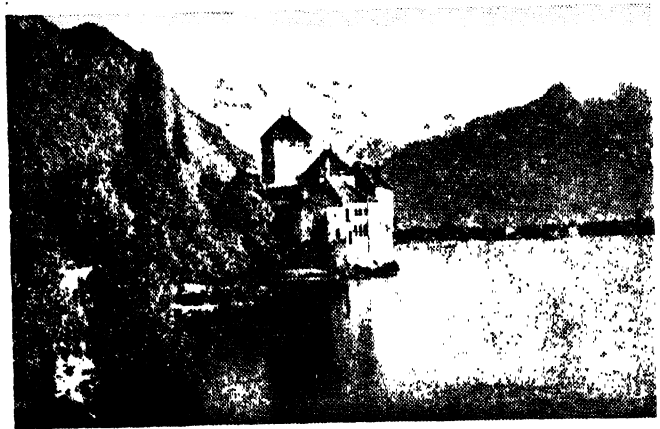
মন্তরো—শিলোনগড়
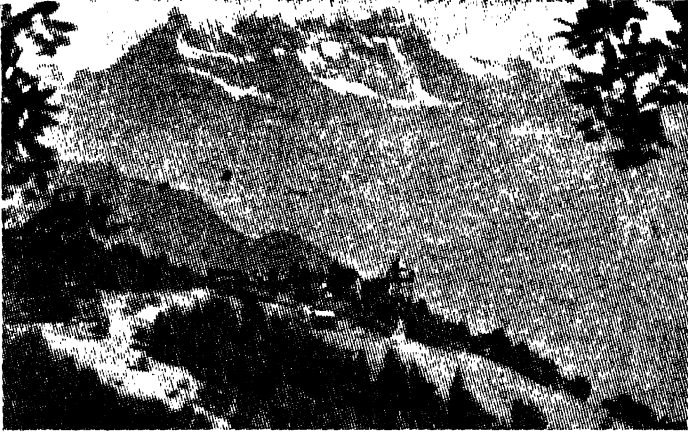
'ক্যো'—মাউণ্টেন হাউস এফ আর এ

হয়েছিল; কিন্তু আজ তার ধ্বংসাবশেষ মাত্র দেখা যায়। এ গিরিগহ্বর দেখে ইণ্টার-লাকেন আসা সার্থক মনে হল।

হোটেল ব্যাভেরিয়ায় বিদায় লাঞ্চ খেয়ে বেলা ১-৩৪ মিনিটের গাড়ীতে ইণ্টারল্যাকেন ছেড়ে আমরা ৫-১৭ মিনিটে 'মন্তরো' এসে পৌছলাম। পথে 'জোয়াইসিমেনে' কয়েক মিনিট ট্রেন থেমেছিল। রেল গাড়ীর জানলা থেকে 'জোয়াইসিমেনের' আশ্চর্য প্রাকৃতিক রূপ দেখে সেখানে নেমে যাবার লোভ হচ্ছিল! কিন্তু আমরা তখন বাড়ীমুখো। 'জোয়াইসিমেন' উপেক্ষিতা যোষিৎ হয়ে পথ-পার্শ্বে পড়ে রইল। আমরা চলে এলাম 'মন্তরো'। ইণ্টারল্যাকেন থেকে মন্তরো ১১১ মাইল দূরে। পাঁচ ঘণ্টারও কম সময়ে গতিশীল সুইস রেলওয়ে আমাদের গন্তব্য স্থানে নামিয়ে দিলে।

স্টেশনে স্যুটকেস দুটি ও নবনীতাকে রেখে আমরা দুজনে হোটেল খুঁজতে বেরিয়ে-ছিলাম, পথে দেখা হয়ে গেল শ্রীমতী দত্তর সঙ্গে। ইনি ডাঃ এস সি দত্তর স্ত্রী। ডাঃ দত্তর শরীর ভাল নয় বলে এঁরা সুইজার-ল্যাণ্ড চেঞ্জে এসেছেন। মাস দুই এখানে থাকবেন। ওঁরা যে হোটেলে আছেন তার ঠিকানা দিলেন। শ্রীমতী দত্তের সঙ্গে ওঁদের একটি পাঞ্জাবী বন্ধু ছিলেন। যুবকটি পরোপকারী। আমাদের একটি ভাল হোটেল ঠিক করে দেবেন বলে সঙ্গে এলেন। মিসেস দত্তর মুখে শুনলাম ডাঃ দত্ত নিজের মোটরে য়ুরোপে ঘুরে বেড়াবেন শুনে এই পাঞ্জাবী যুবকটি লণ্ডন থেকেই ডাক্তারের স্কন্ধে চেপেছেন! এঁরা আর কিছুতে 'সিন্ধবাদের বৃদ্ধকে' ঘাড় থেকে নামাতে পারছেন না। শুনে ভয় হল। দূর বিদেশে অনেক সময়ে পরোপকারী অপরিচিতকে এড়িয়ে চলতে হয়। আমাদের ভ্রমণে যদিও বহু অপরিচিত পরোপকারীর সাহায্য আমরা পেয়েছি, সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের সকলের কাছে আমরা ঋণী হয়েই এসেছি।

এ ভদ্রলোক অনেক দূরে তাঁর জানা একটি হোটেলে টেনে নিয়ে গেলেন। গিয়ে শোনা গেল ঘরখালি নেই। বাঁচা গেল। কিন্তু তখন এতদূর চলে গেছি যে আর হেঁটে ফিরে আসার সামর্থ্য নেই। আমাদের ইচ্ছা স্টেশনের কাছে লেকের ধারে একটি হোটেল পেলে ভাল হয়। অগত্যা, সেখান থেকে ট্রামে চেপে আবার স্টেশনের ধারে ফিরে আসা গেল। পাঞ্জাবী ছেলেটি লাঞ্চের পর বেলা একটা নাগাদ মিসেস দত্তকে নিয়ে কোথায় যেতে হবে বলে বিদায় নিলেন। আমরা সানন্দে তাকে বিদায় দিলাম এবং তার অল্পক্ষণ পরেই হোটেল রীচমণ্টে একখানি বাথরুম সংলগ্ন সুন্দর থ্রী বেডরুম পেয়ে মনটা বেশ খুশী হয়ে উঠলো। পত্নী হোটেলের পোর্টার নিয়ে গিয়ে স্টেশন থেকে জিনিষপত্র ও অপেক্ষমানা কন্যাকে আনলেন। স্নান করে মধ্যাহ্ন-ভোজ সেরে নিলাম। রীচমণ্ট হোটেলেই আহার বাসস্থান দুই ব্যবস্থাই ছিল। সুইজারল্যাণ্ডের অধিকাংশ হোটেলেই এই সুবিধাটা আছে। এক জায়গায় থাকা, আর এক জায়গায় খেতে যাওয়া আমাদের ভাল লাগতো না! কিন্তু উপায় কি? যস্মিন দেশে যদাচার। কোথাও অর্থ বাঁচাবার জন্য, কোথাও বা নাচার হয়েই এই 'ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হোটেল মন্দিরে' করতে হয়েছে।

দুপুরে একটু বিশ্রাম করে বিকেলের
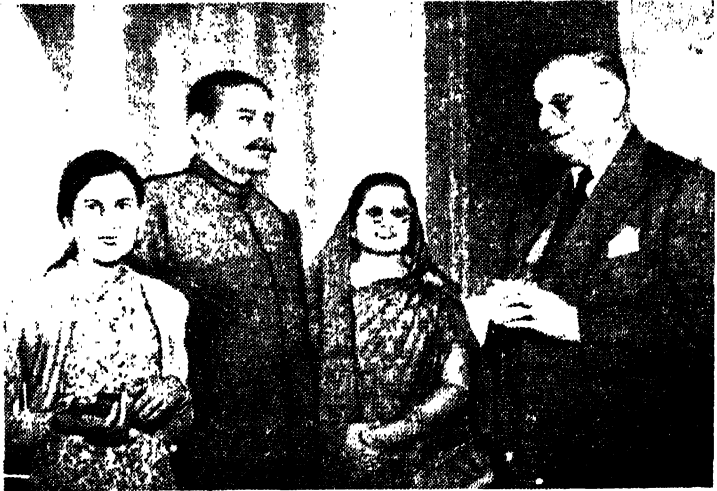
ডাঃ ফ্রাঙ্ক ব্যুকম্যান ও আমরা

জেনিভা—'রিফর্মে' শান স্মারক

দিকে লেকের ধারে বেড়াতে গেলাম। রীচমন্ট হোটেলের পিছনে একটা রাস্তার পরেই বিশাল 'লেক লেমান' বা জেনিভা লেক। এই লেকটির ধারে সুইজারল্যাণ্ডের তিনটি প্রধান সহর মন্তরো, লুশানী, জেনিভা! লেকের ধারে ধারে পায়ে হেঁটে বেড়াবার সুন্দর রাস্তা, ফুলগাছ দিয়ে সাজানো, রেলিং দিয়ে ঘেরা। মাঝে মাঝে বাগান-বেঞ্চ পাতা আছে, বিশ্রাম ও আরামের জন্য। কিছুক্ষণ একটি বেঞ্চে বসে লেমান সরোবরের সৌন্দর্য উপভোগ করা গেল। একটি বাঙালী ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হল এখানে। নাম ভুলে গেছি। সে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। তার কাঁধে ক্যামেরা ঝুলছিল। লেকের ওপারে পাহাড়ের কোলে সূর্যাস্তের রমণীয় দৃশ্যটি ধরে রাখতে চায়। আমাদের পরিচয় পেয়ে তিনজনেরই একটা ছবি নিলে। আমরা সন্ধ্যার পর এখান থেকে উঠে গেলাম ডাঃ দত্তর হোটেল খুঁজতে। মিসেস দত্ত আমাদের এমন সুন্দর পথনির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁদের 'হোটেল পার্ক এণ্ড ল্যাক' খুঁজে বার করতে একটুও অসুবিধা হল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের সঙ্গে দেখা হল না। ম্যানেজারকে আমাদের হোটেলের ঠিকানা দিয়ে তাঁদের জন্য কার্ড রেখে চলে এলাম।

খানিকটা দোকানে দোকানে ঘুরে রাত্রি আটটা নাগাদ হোটেলে ফিরলাম। লেকের ধারে ধারে রেলিং দেওয়া। তারপর পায়ে হেঁটে বেড়াবার সুন্দর পথ, তারপর ফুলের-বাগান। এরই নাম 'পার্ক-ল্যাক'। তারপর চওড়া পাথর বাঁধানো পথ, নাম 'গ্র্যাণ্ড রো।' গাড়ী ঘোড়া মোটর ট্রাম বাস লরী সব এই পথে চলে। এই পথের ধারেই যত সব বড় বড় বাড়ী হোটেল আর দোকান। লেকের ধারটি যেন নন্দন কানন করে রেখেছে! তার পরেই উঠেছে আকাশের দিকে পাহাড়ের পর পাহাড়। কিন্তু পাহাড় মানুষকে নিরুৎসাহ করতে পারেনি, তার গতিপথেও বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। তারা বিদ্যুৎশক্তিচালিত ফানিকুলার ট্রেন আর ঝোলা রেলে চড়ে পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে বসতি বেঁধেছে। মন্তরোর উপকণ্ঠে 'গিলো' আর 'ক্যো' হল পাহাড়ের উপর এমনিতরই দুটি মনোরম জনপদ।

আমরা হোটেলে ফিরে নৈশভোজন সেরে শয়নের পূর্বে 'লাউঞ্জে' জমায়েৎ হয়ে কালকের ভ্রমণসূচী সম্বন্ধে আলোচনা করছি, এমন সময় ডাঃ ও মিসেস দত্ত এসে হাজির। "দেখুন! সঙ্গে সঙ্গেই রিটার্ণ ভিজিট দিতে এসেছি!" বলে সদাপ্রফুল্লা মিসেস দত্ত ঢুকলেন। পিছু পিছু এলেন ধীর শান্ত ডাঃ দত্ত। শ্রীমতী দত্তের প্রাণ-প্রাচুর্য, উৎসাহ ও আনন্দ চঞ্চলতা বাঙালীর ঘরের মেয়েদের অনুকরণ যোগ্য। ডাঃ দত্ত শিশুদের সঙ্গে শীঘ্র ভাব জমাতে পারেন। নবনীতার সঙ্গে খুব সত্বর ও'র জমে গেল। অনেকক্ষণ বসে ও'রা গল্প করে গেলেন। ডাঃ দত্ত আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক করে দিলেন। কালকে চলুন আমার মোটরে 'শিলোন দুর্গ (শিয়োঁ ক্যাসল)' দেখিয়ে নিয়ে আসি, বেশী দূর নয়, খুব কাছেই, একেবারে লেকের ধারে। তারপর যাবেন একদিন আপনার ফানিকুলার ট্রেনে 'গিলো' আর 'ক্যো' বেড়িয়ে আসতে। 'ক্যো'তে 'মাউণ্টেন হাউসে' 'ময়্যাল রি-আর্মামেণ্ট' বা 'এম-আর এ' দেখে আসবার জন্য তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। শুনে আমাদেরও খুব কৌতূহল হল। 'ময়্যাল রি-আর্মামেণ্ট' আবার কি? 'ময়্যাল কারেজ' শুনেছি—নৈতিক সৎসাহস, কিন্তু এটা কি? "নৈতিক পুনরস্ত্রসজ্জা?" না 'পুনর্নৈতিক অস্ত্রসজ্জা?' কাল 'শিলোন দুর্গ' দেখে এসে পরদিনই পাহাড়ে ওঠা স্থির করা গেল।

'শিলোন ক্যাস্‌ল' নামটা অবশ্য আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। লর্ড বাইরন তাঁর "শিলোনের বন্দী" কাব্যে (দি প্রিজনার অব শিলোন) এবং ভিক্টর হিউগো তাঁর প... বলীতে সুইজারল্যাণ্ডের এই সুন্দর সরোবর তীরস্থ দুর্গটিকে অমর করে দিয়ে গেছেন। মাতাসহ নবনীতা ডাঃ দত্তদের ... গেলেন—আমি একাই গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখা গেল—মহাশিল্পী যে সৃষ্টি কর্তা—তিনি যেন পৃথিবীর সমস্ত ... পটুয়াদের পরিহাস করবার জন্য বা ... শিল্প-সৃষ্টির দর্প চূর্ণ করবার ... প্রাকৃতিক দৃশ্যে, নিসর্গ সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা যে কতদূর হতে পারে, তাই নিপুণ ... দেখিয়েছেন এইখানটিতে। শিলোন দুর্গের সঙ্গে বন্দী বীর 'বনিভার্দে'র করুণ ... জড়িয়ে রয়েছে। জেনিভার মুক্তির ... এই বিংশতিবর্ষীয় ধর্মপ্রাণ যুবক জীবন ... করেছিল। তখন এই ল্যাক-লেমান অঞ্চলে ডিউক অফ্ স্যাভয় বীর যুবকের এ স্পর্ধা সহ্য করতে পারেন নি। তিনি এই নির্ভীক দুঃসাহসী স্বাধীনতার সৈনিককে একদিন অতর্কিতে পথ থেকে ধরে এনে এই দুর্গের মধ্যে দীর্ঘ ছ'বছর বন্দী করে রেখেছিলেন। তারপর একদিন শুভক্ষণে এই দুর্গের ভান্তরস্থ কারাগারের লৌহকবাট ... গেল। বন্দী বনির্ভাদকে রক্ষীরা বললে "যাও বনির্ভাদ—স্বাধীনতার সাধক! ... আজ মুক্ত।" বনির্ভাদ গেলেন না। ... করলেন—"আগে বলো—আমার জেনিভার খবর কি?" রক্ষীরা উল্লসিত কণ্ঠে বললে "তোমারই জয় হয়েছে। যাও বীর! জেনিভা আজ ফ্রান্স, রোম, অস্ট্রিয়া—সবার অধীন

পাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সুইজারল্যাণ্ডের যুক্ত-গণতন্ত্রে যোগ দিয়েছে!"

পাহাড়ের কঠিন পাথর কেটে কেটে এনে এই দুর্ভেদ্য পাষাণ দুর্গ তৈরী হয়েছিল। এখনও মনে হয় যেন এর বিশাল কক্ষে কক্ষে অলিন্দপথে—ভারী ভারী পায়ে চলার শব্দ এবং অস্ত্রের ঝনৎকার মাঝে মাঝে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে। এর ভূগর্ভস্থ গুপ্ত বন্দীগৃহ ও পীড়নশালা (টরচার চেম্বার) থেকে আজও যেন অতীতের উৎপীড়িতগণের সকরুণ আর্তনাদ সুস্পষ্ট কানে ভেসে আসছে। এর প্রশস্ত প্রমোদ-ভবনের জলসাঘর থেকে যেন অভিজাত নরনারীর লঘু চপল কলহাস্য, সুরাপানে অসংযতগণের স্খলিত কণ্ঠ, অসংবৃত নৃত্যগীত এবং পেশাদার বাদকদলের বাদ্যধ্বনির অনুরণন একেবারে নিঃশেষে মিলিয়ে যায় নি। সে যুগের সে মানুষেরা আজ আর কেউ নেই বটে, কিন্তু শিলোন গড় আজও অক্ষত আছে। নীলাকাশের কোলে অদূরবর্তী 'ডেণ্টস দ্য মিদি' গিরিশিখরের পটভূমিকায় এর চিত্তাকর্ষক রূপ পথিক মাত্রকেই মুগ্ধ করে।

পরের দিন প্রাতরাশ সেরেই বেরিয়ে পড়লাম পাহাড়ে ওঠবার জন্য ফানিক্যুলার রেলস্টেশনের দিকে। এই সোজা পাহাড়ের চূড়ায় তুলে নিয়ে যাওয়া ফানিক্যুলার ট্রেন সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বিশদভাবে বলেছি। এ ট্রেন আমাদের পাহাড়ের উপর 'টেরিয়েট' স্টেশনে নামিয়ে দিলে। অদূরে চিত্রবৎ সুদৃশ্য পার্বত্য জনপদ গিলোঁ দেখা যাচ্ছে। ঝোলা ট্রেনে যেতে হয়। 'ক্যো'র মাউণ্টেন হাউসে' যেতে হলে এখানে গাড়ি বদল করতে হবে। এ ট্রেন ফানিক্যুলার নয়, দার্জিলিঙ-সিমলায় যাবার মতো ছোট ট্রেন। 'মাউণ্টেন হাউস' বাড়িটি একেবারে পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায়। ট্রেন আসার এক ঘণ্টা দেরী আছে জেনে আমরা একটু গিলোঁর পার্বত্য রূপ উপভোগ করতে বেরুলাম। সারি সারি দ্রাক্ষাকুঞ্জ আর নার্সিসাস ফুলের ক্ষেত পাহাড়ের বুকে যেন ফুলশয্যা বিছিয়ে রেখেছে। পাহাড়কে এত সুন্দর করে সাজিয়ে নিয়ে তার উপর পুতুলের মতো ঘরবাড়ী করে এমন পরিপাটি জীবন উপভোগ করতে আর কোথাও দেখি নি। দার্জিলিঙ, মুসৌরী, সিমলা, নৈনিতাল, আলমোড়া, উটি, কোথাও এমনটি নেই! তার কারণ, এগুলি 'গিলোঁ' বা 'ক্যো'র তুলনায় অনেক বড় জায়গা, কাজেই এগুলিকে এমন খেলাঘরের মতো সুচারুরূপে সাজিয়ে তোলা ও সুন্দর রাখা সম্ভব হয় নি। ট্রেন আসার ঘণ্টা শুনে আমরা টেরিয়েট স্টেশনে ফিরে এলাম।

'ক্যো' স্টেশনে এসে নামবামাত্র স্বেচ্ছাসেবকেরা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কি 'মাউণ্টেন হাউসে' যাবেন? আমরা সম্মতিসূচক উত্তর দিতেই তাঁরা আমাদের বহু সমাদরে একখানি মোটরে তুলে নিয়ে চললেন। মাউণ্টেন হাউসে যে আমাদের জন্য এক বিরাট বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল, তা অনুমান করতে পারি নি। নামলাম গিয়ে মাউণ্টেন হাউসের গাড়ি বারান্দার সামনে। মনে হল এক রাজসূয় যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছি। লোকে লোকারণ্য। আমাদের 'রিসেপসান-রুমে' বসিয়ে তাঁরা ছুটে গেলেন কাকে ডাকতে। ক্ষণ পরেই আমাদের অভ্যর্থনা করলেন এসে সিংহলের সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরীয় সেনা ও তাঁর পত্নী নেলন দেবী এবং আমাদের পূর্ব পরিচিত কলিকাতার ছাত্র কংগ্রেসের ভূতপূর্ব পাণ্ডা শ্রীমান চিত্ত সেন। তাঁরা আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। পাহাড়ের উপর সে এক বিরাট প্রাসাদ। 'মাউণ্টেন হাউস' নাম তার সার্থক বলে মনে হল। এটি ছিল আগে সুইজারল্যাণ্ডের এ্যালপাইনা হোটেলের চেয়েও উঁচুদরের একটি বিশ্ববিখ্যাত অতিথিশালা—"দি প্যালেস হোটেল"। যেখানে পৃথিবীর রাজা-মহারাজা, নবাব-বাদশা, সুলতান এবং প্রধান মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিরা সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে এসে অবস্থান করতেন। অন্যত্র ওঠা তাঁদের পক্ষে হ'ত মর্যাদাহানিকর। এখানে একটি মহলের নাম আজও 'মহারাজা মহল' আছে। যেমনি বড় বড় ঘর তেমনি আগাগোড়া কার্পেট মোড়া ও মূল্যবান আসবাবে সাজানো। শোনা গেল, এই বাড়ি তৈরীর সময় 'মুসোলিনী' এখানে সামান্য একজন মিস্ত্রীর কাজ করে গেছেন। প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে বাথরুম সংলগ্ন, সে বাথরুম অনেক বড় হোটেলের বেডরুমের চেয়ে ভালো। বাড়ির অনেকগুলি মহল। প্রত্যেক মহলেই ওঠা-নামার লিফ্‌ট আছে আবার চওড়া মার্বেল পাথরের সিঁড়িও আছে। সুদীর্ঘ করিডর বা বারান্দা। মাঝে মাঝে বসবার আসন আছে। পাশে ফুলদানিতে সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুল সাজানো এবং দেওয়ালের গায়ে বিশেষ কোনও নামকরা শিল্পীর আঁকা এক একখানি ছবি ঝুলচে। এ ইন্দ্রভুবন বাড়িখানি এম আর এ'র জনৈক ভক্ত বহু লক্ষ ডলারে খরিদ করে প্রতিষ্ঠানকে দান করেছেন শুনলাম।

চিত্ত আমাদের নিয়ে গেল একেবারে সভাকক্ষে। বিরাট হল। লোকে লোকারণ্য। যতবা পুরুষ ততবা মেয়ে। শোনা গেল এখানে "মরাল রি-আর্মামেণ্ট্‌" প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক কনফারেন্স্‌ হচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিনিধিরাই এসেছেন। আমাদেরও তার মধ্যে ভারতের
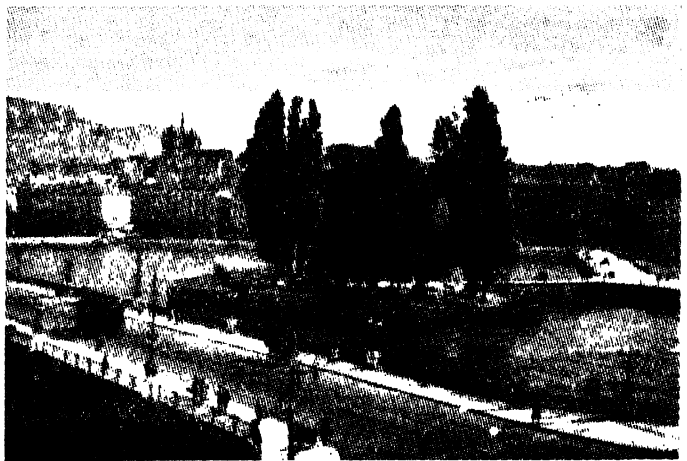
মন্ত্রো সেতু ও রুশো দ্বীপ—জেনিভা

প্রতিনিধি হিসাবে বসিয়ে দেওয়া হল। পৃথিবীর নানা দেশের নানা অবস্থার ও নানা পেশার লোক সে সভায় উঠে বক্তৃতা দিচ্ছেন তাঁদের নিজ নিজ মাতৃ-ভাষায়। বিস্ময়বস্তু এম-আর-এ কি এবং তাঁরা এর কাছে কত ঋণী! ওখানে বিনা মূল্যে সকলকে এক-একটি 'হেড ফোন' ও তৎসংলগ্ন একটি ক'রে ভাষার সুইচ্ বোর্ড দেওয়া হয়। হেডফোনটি মাথায় দিয়ে যিনি যে ভাষা বোঝেন সেই ভাষার চাবিটি টিপে দিলেই বক্তার ভাষণ শ্রোতার কানে সেই ভাষায় গিয়ে পেণছবে। আমরা যখন গেলাম তখন ইত্যালিয়ান ভাষায় বক্তৃতা হচ্ছিল। আমরা হেডফোন নিয়ে ইংরাজীর সুইচ টিপে দিতেই বক্তার কথা আমাদের কানে ইংরাজীতেই আসতে লাগলো। এটা কোনও ভেল্কী নয়। বিজ্ঞানের অমূল্য দান! খুবই সহজ ও সাধারণ। বিভিন্ন ভাষাভাষী অভিজ্ঞ লোকেরা অন্তরাল থেকে বক্তার ভাষণ সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে রেডিওতে ব্রডকাস্ট করছিলেন।

চিত্ত সেন, সুরেশীয় সেনা, নেলন দেবী এবং এম-আর-এর কর্ণধার ডাঃ ডেভিড ওয়াটসন সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমাদের সেখানেই থেকে যেতে হল। রাত্রে সেথানে "গুড রোড" নাটক অভিনয় হবে। আমাদের হোটেলে আর ফেরা হল না। এঁরা এখান থেকে টেলিফোন করে দিলেন রীচমেণ্ট হোটেলে যে আমরা 'মাউণ্টেন হাউসে' আছি। কারণ, হোটেল কর্তৃপক্ষ একটা সম্ভাব্য সময় পর্যন্ত আমাদের ফেরার অপেক্ষা ক'রে তারপর স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে খবর পাঠাতে আইন অনুসারে বাধ্য। মাউণ্টেন হাউসের আব-হাওয়া ও পারিপার্শ্বিক আমাদের এত ভালো লাগলো যে, আমরা এঁদের অতিথি-স্বরূপ এখানে প্রায় এক সপ্তাহ থেকে গেলাম। আমাদের ঘরখানি ছিল তিন তলায় একেবারে লেকের ধারে। রাত্রে যখন ঘরে শুতে আসতাম প্রমত্ত অবস্থায় নয়!—প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই মনে হ'ত আকাশটা কি তার সমস্ত তারাগুলোকে নিয়ে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসেছে? পাহাড়ের ঢালুর উপর বিস্তৃত মন্ত্রো জনপদের ঘরে ঘরে যে বিজলি বাতি জ্বলে- লেকের জলে তার ছায়া এসে পড়ে। সেই ছায়া আর কায়া মিলে এমন একটা মায়ার সৃষ্টি করে যে, মনে হয়, আমরা যেন আকাশের বহু ঊর্ধ্বে কোন্ এক ত্রিদিব লোকে রয়েছি! ডাঃ ফ্রাঙ্ক বুকম্যান এই এম-আর-এ প্রতি-ষ্ঠানের স্রষ্টা। ইনি এমন কতকগুলি অকপট কর্মী পেয়েছেন যাঁরা বুকম্যানের আদর্শকে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করছেন। আমাদের তরুণ বন্ধু শ্রীমান চিত্ত সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। চিত্ত পরদিন সকালেই রীচমণ্ট হোটেলের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে আমাদের জিনিসপত্র সব 'ক্যো'তে টেনে এনে হাজির করলে।

শ্রীমতী জার্ডিন ও তাঁর কন্যা কুমারী জার্ডিন আমাদের পরিচর্যার ভার নিয়ে-ছিলেন। সর্বপ্রকার প্রসাধন ও অলংকরণ-বিবর্জিতা মূর্তিমতী তপশ্চারিণী এরা দুটিতে আদর্শ মা ও মেয়ে। মিঃ জার্ডিন এ সময় বিশেষ কাজে লণ্ডনে গিয়ে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। শুনলাম তিনি ভারতে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কাজে দীর্ঘকাল ছিলেন। ভারতকে এঁরা সপরিবারে খুবই ভালবাসেন। চিত্ত বলে তিনি দেবতুল্য আর, চিত্ত? তার কথা কি বলবো? বিনয় ও সেবার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি এই তরুণ ছেলেটি। এখানে তখন সমবেত হয়েছেন সারা পৃথিবীর নানাদেশের মানুষ! সাত-আটশো প্রতিনিধি। একেবারে দিয়তাং ভুজ্যতাং চলেছে। প্রাতরাশের পরই বেলা ৯টা থেকে বারোটা পর্যন্ত কনফারেন্স্। কেবলমাত্র শুষ্ক-নীরস বক্তৃতা নয়, মাঝে মাঝে সকল দেশেরই গীতবাদ্যও শোনানো হ'ত। অপরাহ্ণে আবার বেলা ২টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কনফারেন্স্, তারপর চায়ের অবকাশ। তারপর সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা সিনেমা, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন শো ইত্যাদি। ৭টা থেকে ৮টা ডিনার। তারপর নাটক অভিনয়—রাত্রি দশটা পর্যন্ত। একেবারে আনন্দময় নিরবধি কর্মসূচী। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেতো বোঝা যেত না। আমাদের সাত দিন যেন সাত ঘণ্টায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এম-আর-এর মূলে উদ্দেশ্য হ'ল নীতিভ্রষ্ট মানুষকে আবার উচ্চ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করে পুনরায় সৎ ও সাধু চরিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। অতি মহৎ এই উদ্দেশ্য। 'এম-আর-এ'র প্রতিষ্ঠাতা সাধু ও কর্মীপুরুষ ডাঃ ফ্রাঙ্ক বুকম্যান বললেন, "কেবল চারটি-মাত্র নীতি যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে মেনে চলি তা'হলে এই পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠবে, মানুষ হয়ে উঠবে দেবতা। সে চারটি আদর্শ অবশ্য ভারতবর্ষের কাছে নূতন নয়, যেমন, প্রথমঃ অবিমিশ্র সততা, দ্বিতীয়ঃ অবিমিশ্র পবিত্রতা, তৃতীয়ঃ অবিমিশ্র নিঃস্বার্থপরতা এবং চতুর্থঃ অবিমিশ্র প্রেম। দেখে আনন্দ হল যে, বুকম্যানের শিষ্যদের মধ্যে কয়েক-জন এই দেবত্ব অর্জন করতে পেরেছেন। তাঁরা যথার্থই সাধু চরিত্রের দেবতুল্য নরনারী। আদর্শবাদকে তাঁরা নিজ নিজ জীবনে রূপায়িত করে তুলেছেন।

ভিন্ন মতাবলম্বীও কেউ কেউ এর মধ্যে মজা লোটবার জন্য কপট ভক্ত সেজে ঢুকে পড়েছেন। তাঁদের কাছে গোপনে শোনা গেল, 'এই যে চার মাস ধ'রে এখানে দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর রাজসূয় যজ্ঞ চলেছে; লক্ষ লক্ষ ডলার রোজ খরচ হচ্ছে, এ সমস্তই যোগাচ্ছে নাকি ধনকুবের মার্কিন গভর্নমেণ্ট। ব্যাপারটা আগাগোড়াই 'প্রোফেশন্যাল প্রোপাগ্যাণ্ডা!' 'এম-আর-এ'র প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ বিক্ষোভ ও বিরোধ দূর করে, দ্রুত প্রসারিত গতি কমিউনিজমের চরম নীতিকে উচ্ছেদ করা।'

কিন্তু উদ্দেশ্য যাই হোক, যে চারটি উচ্চ আদর্শের উপর 'এম-আর-এ' প্রতিষ্ঠিত তা যে মানুষকে উচ্চতর লোকে উন্নীত করতে পারে, এ বিষয়ে আমাদের কোনও সংশয় ছিল না। 'এম-আর-এ' সম্বন্ধে বেশ ভাল ধারণা নিয়েই আমরা 'ক্যো' থেকে ফিরলাম। ফেরবার দিন সকালে ডাঃ ফ্রাঙ্ক বুকম্যানকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে এলাম—অপনি দলবল নিয়ে একবার ভারতবর্ষে আসুন। ভারতবর্ষ আজ নীতি-ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। তাকে পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে যান। তিনি বললেন—ভারতবর্ষ আমাকে ডাকলেই যাবো। আমি গিয়েছিলাম, টেগোরের কাছে, গান্ধীজীর কাছে। ভারতবর্ষে বহুদিন ছিলাম।

মন্তরো থেকে আমরা গ্যাকলেম্যানের উপর দিয়ে জলপথে এসে লুশানীর উশী হ্রদের তীরে অবতরণ করলাম। উশী হ্রদের রূপ দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল। তখন পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। আকাশে ও জলে সেই অস্তরাগের রঙীন ঐশ্বর্য ছড়িয়ে পড়েছে। একজন প্রৌঢ় শিল্পীকে

ঝোলা ট্রেন—সালিভ্

দেখলাম হ্রদের তীরে বসে সেই অস্তগামী সূর্যের আশ্চর্য শোভাকে রংয়ে রেখায় পটের উপর ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন। তাঁর পত্নী যথার্থ সহধর্মিণীর মতো পাশে থেকে তুলি রং বদলে বদলে এগিয়ে দিচ্ছিলেন এবং শ্রান্ত শিল্পীর ললাট থেকে শ্রমজল আপন অঞ্চলে নয় রুমালে মুছিয়ে দিচ্ছিলেন! মালপত্র নিয়ে হ্রদের ধারে একখানি বেঞ্চের উপর যাযাবরের মতো সপরিবারে বসেছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এই দূর বিদেশ। কোনও আশ্রয় নির্ধারিত হয়নি এখনো—কে তা ভাবে? রূপসী উশীর প্রেমে আমরা তখন মশগুল। কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে খেলাঘরের বোট নিয়ে জলে ভাসাচ্ছিল। নবনীতা ভিড়ে গেল তাদের দলে।

অনেকক্ষণ পরে উঠলাম। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু গোধূলির আলোয় তখনও চারিদিক উজ্জ্বল। বাসে উঠে রেল স্টেশনে এসে নামলাম। জিনিসপত্র লেফ্ট লাগেজ করে' হোটেল খুঁজতে বেরুলাম। এ সব অঞ্চলে হোটেল খোঁজা মানে বাড়ির নম্বর খুঁজে বার করবার মতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার কিছু নয়। স্টেশনের ধার থেকে শুরু হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বহু বাড়িতে বড় বড় সাইনবোর্ড চোখে পড়ে, গ্র্যান্ড হোটেল, কন্টিনেন্ট হোটেল, ইডেন হোটেল, সেন্ট্রাল হোটেল—ইত্যাদি। এখানে আবার এক একজন হোটেলওয়ালার হয়ত জেনিভা থেকে জুরিখ পর্যন্ত সব জায়গায় একই নামের 'চেইন অব হোটেলস্' আছে। কয়েকটাতে ঘুরলাম। কোথাও ঘর পছন্দ হয় না, কোথাও দরে বনে না। শেষে আমরা 'হোটেল মডার্ন জুরা-সিম্‌প্লনে' গিয়ে উঠলাম। এখানে দর ও ঘর দুটিই মনের মতো পাওয়া গেল। স্টেশনের কাছে হোটেলেই খাওয়া। স্নানকক্ষ-সংলগ্ন ঘর। ব্যস্। আর কি চাই!

উশী হ্রদের তীরে এই ছোট্ট 'লুশানী' হ'ল একটি পার্বত্য জনপদ। আল্পসেরই বংশধর মণ্ট্ জোরাটের কোলে এ গড়ে উঠেছে অপূর্ব রূপের পসরা নিয়ে। এখান থেকে ভেনিভা লেক খুব কাছে। ফরাসী শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাবে লুশানী হ'য়ে উঠেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই একটি আন্তর্জাতিক সুধী সম্মেলনের বিশেষ ক্ষেত্র। দেশ বিদেশের বহু বিশিষ্ট নরনারী প্রতি বৎসর এখানে বেড়াতে এসে বেশ কিছুদিন অবস্থান করতেন, ফলে এখানে গড়ে উঠেছিল একটি মনোজ্ঞ বিবুধ সমাজ, যেখানে ভল্‌টেয়ার তাঁর 'জেয়ার' নাটক রচনা ক'রে অভিনয় করিয়েছিলেন, সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফ্ এখানকার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ টিসটের সঙ্গে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরামর্শ করতে এসেছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গীবন এইখানে বসেই লিখে-ছিলেন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ইতিকথা—'রাইজ এণ্ড ফল অফ দি রোম্যান এম্পায়ার' গ্রন্থখানি। লর্ড বাইরন এখানেই রচনা করেছিলেন তাঁর করুণ কাব্য "প্রিজ্‌নার অফ শিলোন" ষোড়শ লুইয়ের মন্ত্রী মঁশ্যো ও মাদাম নেকার এবং তাঁদের বিদুষী কন্যা মাদাম দ্য' স্তাল, প্রুশিয়ার যুবরাজ হেনরী বেঞ্জামিন কনস্ট্যাণ্ট, জোসেফ দ্য মাইস্তার, মার্কুইস দ্য সেলস্, সম্রাজ্ঞী জোসেফাইন মারিয়া লুইসা, প্রাশিয়ার রাজা, এমন কি নেপলিয়ঁ বোনাপার্তও নাকি এখানে পদার্পণ করেছেন। লুশানী যেন লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলির মতো এই সব মাননীয় অতিথিদের আগমনের বিবরণ বহু যত্নে সংগ্রহ করে রেখেছে। এখান-কার প্রধান ব্যবসা বাণিজ্য ও দোকান-পসার অঞ্চল হ'ল—প্লেস সেণ্ট্ ফ্র্যাংকোয়া এবং রু দ্যু' বুর্গ। পথঘাটের নাম শুনেই বোঝা যায়, আমরা কিছু আগে থেকেই ফরাসী প্রভাবিত সুইজারল্যাণ্ডে প্রবেশ করেছি। উশীর তীরই হল লুশানীর বসবাসের পাড়া। এদিকে ফুলের বাগান, গাছপালা, সুন্দর পথঘাট। লুশানী সুইজারল্যাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা-কেন্দ্র বলেও প্রসিদ্ধ।

আমাদের হোটেল জুরার ম্যানে-জার একটি ছোকরা। খুব স্ফূর্তি-বাজ এবং রসিক। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের এখানে দ্রষ্টব্য কি কি আছে? সে জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা সুইজার-ল্যাণ্ডের কোথায় কোথায় গেছলে? বললাম। শুনে বললে, তাহলে ফিরে যাও, যা দেখবার সবই দেখা হ'য়ে গেছে। এখানে আছে একটি গির্জে। প্যারিসের গির্জার অনুকরণ—যেটির নামও 'নতারদাম্'। বিশ্ব-বিদ্যালয় একটি আছে। আর 'প্যালে দ্য রুমাঁই' কিন্তু ওসব থাক। তোমরা কাল সকালে যাও 'টাওয়ার বেলেয়ারে' বেড়িয়ে এস। নিউইয়র্কের স্কাই স্ক্রাপারের কিছুটা আইডিয়া হবে। আর বিকেলে যাও ফানিক্যুলার ট্রেনে চড়ে 'সিগন্যাল দ্য লুশানীতে। তার উপর থেকে এই লেক আর পাহাড় ঘেরা দেশটাকে জীবন্ত ছবি বলে মনে হবে।

এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন, সাহিত্য, ধর্ম, বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। এ ছাড়া কমার্স, সমাজ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রীয় কূটনীতি, ভেষজবিদ্যা, পুলিশের অপরাধ বিজ্ঞান, শিল্প ও স্থাপত্যকলা, বাস্তুবিজ্ঞান এবং কারিগরী বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষারও সুব্যবস্থা আছে।

দেশবিদেশের ছাত্রছাত্রী আসে এখানে নানা বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য। লুশানী নাকি এই সব তরুণ তরুণীদের কৃপায় 'যৌবননগরী' নামে আখ্যাত হয়।

যদিও ম্যানেজারের কথাগুলো শুনে বিশেষ কিছু উৎসাহ বোধ করলাম না, তবু আর কিছু করবার নেই বলে পরদিন সকালে বিকেলে লুশানীময় ট্রামে বাসে ঘুরে বেড়ালাম। লুশানীর মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগলো তার এই উশীলেকটি। বিকেলেই আমরা লুশানী ছেড়ে জেনিভায় এসে হাজির হলাম। জেনিভা কর্নাভিন্ স্টেশনে নেমে 'স্টেশনের কাছাকাছি একটি কোনো ভাল হোটেলে নিয়ে চলো' বলাতে ট্যাক্সী ড্রাইভার আমাদের 'হোটেল দ্য' লা নুভেল গারে'তে এনে নামিয়ে দিলে। মাঝারী রকমের হোটেল। তিনতলার উপরে একখানি বড় ঘর পাওয়া গেল। বেশ ঘর। সঙ্গে এটাচড্ বাথরুম। সুইজারল্যান্ডে সর্বত্র এই সুখটি পাওয়া গেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে কোথাও যেতে হ'ত না। ম্যানেজার সুন্দর ইংরজী বলেন, কিন্তু মুশকিল হল মেইড্-দের নিয়ে। এদের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেউ ইংরিজী বোঝে না। কাজেই, ঘন ঘন আমরা তাকেই ডেকে পাঠাতাম, কারণ অনেক ইশারা ইঙ্গিত করে হাত মুখ নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেও এরা কিছুই বোঝে না, এবং সবচেয়ে বিপদ হল, বোঝে না যে সেটা স্বীকার করে না! একমুখ হেসে ঘাড় নেড়ে চলে যায়। তারপর নিয়ে আসে গরম দুধের বদলে ঠান্ডা লেমনেড্!

'লুশানী' থেকে জেনিভায় আসবারও ইচ্ছা হয়েছিল জলপথে মোটর ল্যাঞ্চে ক'রে ল্যাক্ লেমানের উপর দিয়ে। কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হল না। কারণ লুশানী থেকে জেনিভা প্রায় ৩৮ মাইল। সপ্তাহে মাত্র দুদিন এখন লুশানী থেকে জেনিভায় স্টীমার চলে। বুধবার আর শনিবার। বুধবার স্টীমার ধরতে হলে আমাদের এই রবিবার এবং সোম মঙ্গল আরও দুদিন লুশানীতে অপেক্ষা করতে হবে। তার চেয়ে, ট্রেনে গেলে আজই আমরা জেনিভায় পৌঁছে যাবো এবং সোম মঙ্গল দুদিনে জেনিভা সেরে সোজা প্যারিসের ভিতর দিয়ে লণ্ডনে ফিরে যেতে পারবো। তাই ট্রেনেই চলে এলাম জেনিভায়।

জেনিভা দেখে মনে হল এটি বেশ একটি বড় এবং সমৃদ্ধ শহর। প্রশস্ত পথঘাট। ঘন ঘন ট্রাম, বাস চলেছে। প্রাসাদতুল্য সব বাড়ি। সামনে বিশাল জেনিভা লেক। পাশ দিয়ে রোন নদী বয়ে চলেছে। দূরে গৌরীশৃঙ্গের মতো আল্পসের এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ চূড়া 'মন্ত্ ব্লাঁ' তুষারাবৃত শুভ্ররূপ! সুইজার ল্যান্ডের একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ফরাসী সীমান্তের ধার ঘেঁষে এই শহর। এ শহরটিতে য়ুরোপের নানা জটিল বিষয় নিয়ে বিভিন্ন শক্তির বারবার এতগুলি সম্মিলিত অধিবেশন হয়ে গেছে যে জেনিভা আজ একটি আন্তর্জাতিক শহরে পরিণত হয়েছে। যে কখনো ভূগোল পড়েনি সে-ও সম্ভবতঃ জেনিভার নাম শুনেছে। এখানে ভূতপূর্ব 'লীগ অফ্ নেশনসের সদর অফিস ছিল। এখনও আছে ইণ্টারন্যাশনাল রেড্ ক্রসের এবং 'ইণ্টারন্যাশনাল লেবার' ব... আন্তর্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের প্রধা... কার্যালয়। আমরা সমস্ত জেনিভা ঘুরে দেখবার জন্য এক্সকার্সানবাস' ঠিক কর... ফেললাম। কাল ল্যাঞ্চের পর আমাদের নি... বেরুবে।

জেনিভার গৌরবময় ইতিহাস বহু প... পদানত হতাশ দেশের বুকে আশার সঞ্চা... করতে পারে। সপ্তরথী পরিবেষ্টিত অভি... মন্যুর মতো বেচারার চারপাশে সব বড়... ভাল্লুক য়ুরোপীয় শক্তি ঘিরে রয়েছে। যু... যুগ ধরে এরা করে এসেছে মুক্তির তপস্যা স্বাধীনতার সাধনা। খৃষ্টপূর্ব ৫৮ বছর আগেও দেখা যায় জেনিভা রোমের কর্তৃত্বাধীনে। এই সময় জুলিয়াস সীজার এর নাম উল্লেখ করতে দেখা যায়। ...

রোমের অধীনে, কখনও বা ফ্রান্সের অধীনে কখনও বা জার্মান সম্রাটদের অধীন থাকলেও, স্বাধীনতার জন্য এর সে কোনও দিনই বন্ধ ছিল না এবং সেই-জন্যই সুইজারল্যান্ডকে বা তার কোনও 'ক্যান্টন' বা অংশকে কেউ এ পর্যন্ত একেবারে গ্রাস করে ফেলতে পারে নি। বিদেশী বিদেশীদের ভাষা এসেছে, সভ্যতা এসেছে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিও এসেছে, কিন্তু সুইস-দের চিত্তকে তারা বৈদেশিক দাসত্বের বন্ধনে শৃঙ্খলিত করতে পারে নি। সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে মনে হল স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পরই এই সুইজারল্যান্ডের মানুষগুলি অতি ভদ্র বিনয়ী এবং সৎলোক। এদেশের স্ত্রী-পুরুষদের খুবই ভাল লেগেছিল। ভারি মিষ্টি, ভারি নরম এদের ব্যবহার। অধিকার তারই সুযোগ নিয়ে খৃষ্টান গুরু-পুরোহিতের দলও কিছুকাল জেনিভার পর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তার-পর এল 'রিফর্মেসান' যুগ! জেনিভার অধিনায় ক্যালভিনের প্রভাবে সে রোম্যান ক্যাথলিকের পথ ও মত ছেড়ে প্রোটেস্ট্যান্ট-দের দলে যোগ দিলে। দোর্দণ্ড প্রতাপ ডিউক অফ স্যাভয়কে হার মানতে হল এদের কাছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে দেখা দিল বিপ্লব। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদশকের পরই জেনিভাও যুক্ত হল সুইজারল্যান্ডের স্বাধীন গণতন্ত্র পরিষদের মধ্যে।

এক্সকার্সান বাস ঠিক করতে গিয়ে আলাপ হল সেখানে শ্রীযুক্ত মুখার্জি বলে একটি বাঙালী ছেলের সঙ্গে। 'রোল্যাক্স' ঘড়ির কারখানায় ইনি কাজ শিখছেন। আগে নাকি কলকাতার কুক্ কেল্‌ভির ঘড়ির কারখানায় কাজ করতেন। মাইনের টাকা জমিয়ে নিজের খরচে সুইজারল্যান্ডে এসেছেন ঘড়ির কাজ শিখতে। শিক্ষা প্রায় সমাপ্ত। আর মাস তিনেকের মধ্যেই দেশে ফিরবেন। একটি সুইস-জার্মান মেয়ের সঙ্গে এঁর বিবাহও ঠিক হয়ে গেছে বললেন। তিনি আমাদের সঙ্গে করে তাঁর হোটেলে নিয়ে গেলেন। তাঁর ঘরে দেখি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্করের বই রয়েছে। মুখার্জির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন সিংহলের একটি বাঙলা ভাষায় অভিজ্ঞ পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। তাঁর সঙ্গেও আলাপ হল। তিনি এসেছিলেন তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের জন্যে কেনা একাধিক ঘড়ি মুখার্জিকে দেখাতে, সেগুলি কেনা ঠকা হয়েছে, না জেতা হয়েছে? শ্রীযুত মুখার্জি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে সুইস সীমান্তে ফরাসী আল্পসের অন্তর্ভুক্ত 'সালেভের' চূড়ায় ঝোলা রেলে তুলে বেড়িয়ে নিয়ে এসেছিলেন। আরও নানা-ভাবে এঁর কাছ থেকে জেনিভা উপভোগে সাহায্য পেয়েছি বলে এঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

পরদিন যথাসময়ে এক্সকার্সান বাস আমাদের নিয়ে সারা জেনিভা শহরটা ঘুরিয়ে যাকিছু দ্রষ্টব্য ছিল, সমস্ত দেখিয়ে এনে ছেড়ে দিলে সন্ধ্যার আগেই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'ক্যাথিড্রাল', ১১৬০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল। আজও অক্ষত আছে। আমাদের এই কণ্টিনেণ্ট ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে গির্জা এত দেখেছি যে, গির্জা দর্শনে যদি কোন পুণ্য থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমাদের আর পুনর্জন্ম হবে না। সবচেয়ে ভাল লাগলো আমাদের 'রিফর্মেশন' মনুমেণ্ট।' একটি সুন্দর বাগান বা পার্কের মধ্যে বিরাট এই রিফর্মেশান স্মৃতি-প্রাচীর। শহরের নানা পথ দিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের নিয়ে এল টাউন হলে। পথের দুধারের বাড়িগুলি যেমনি বড় বড়, তেমনি এদের ভিতর দিয়ে প্রাচীন স্থাপত্য-কলা থেকে আধুনিক স্থাপত্যকলা পর্যন্ত একটা সুন্দর ধারা বজায় আছে। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প-কলা, চিত্র ও ভাস্কর্যের একাধিক স্থায়ী ও অস্থায়ী প্রদর্শনী দেখে নেবার সুযোগ পাওয়া গেল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'এথানি মিউজিয়ম' এবং সীনা আন্তর্জাতিক লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম। ভলটেয়ার স্মৃতি শিল্পশালাটিও উপভোগ্য। এখানে এই বিশ্ববিশ্রুত কবি ও সাহিত্যরথীর বহু স্মরণচিহ্ন সযত্নে রাখা হয়েছে। এক্সকার্সান থেকে ফিরে আমরা 'মন্তব্লাঁ' সেতুর উপর কিছুক্ষণ বেড়িয়ে জেনিভা হ্রদের প্রসিদ্ধ ফোয়ারাটি দেখে 'রুশো' দ্বীপে এসে বসে রইলাম সন্ধ্যা পর্যন্ত। এত ভাল লাগছিল জলের উপর এই কৃত্রিম দ্বীপটিতে বসে চারিদিকের অনুপম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে। এই দ্বীপের ধারে জলের উপর সাদা কালো কতকগুলি রাজহাঁস আছে, তারা যেন এই সুন্দর ছবিখানিকে সুসম্পূর্ণ করে তুলেছিল।

পরদিন সকালে মুখার্জি এসে ধরে নিয়ে গেল আমাদের হোটেল থেকে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক শ্রীযুত এ, সি, ব্যানার্জি ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে তাঁদের হোটেল ফ্যামিলিয়ারে। এঁরা স্বামী-স্ত্রী গিয়ে-ছিলেন আমেরিকায় একটা কি কনফারেন্সে। ফেরবার পথে য়ুরোপ বেড়িয়ে যাচ্ছেন। এঁরা উভয়েই আকারে সুন্দর উন্নত বলে এঁদের নাম দিয়েছিলাম আমরা 'দীর্ঘ দম্পতি'। লন্ডনে ফিরেও এঁদের সঙ্গে নানা স্থানে একাধিকবার আমাদের দেখা হয়েছিল। বড় চমৎকার মানুষ এঁরা দুটিতেই। এঁদের সঙ্গে আবার আজ 'স্যালেভ' বেড়িয়ে এসে খুব আনন্দ পাওয়া গেল। আমার লাঠি হারিয়ে গেছে শুনে প্রোঃ ব্যানার্জি তাঁর নিজের লাঠিটি আমাকে উপহার দিলেন। আমি সহম্মানে সেটি নিয়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিলাম। জেনিভা ছেড়ে আসবার দিন ওঁরা আমাদের হোটেলে এসে আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। পুরো তিনটি মাস সারা য়ুরোপ ঘুরে আবার প্যারিসের ভিতর দিয়ে লন্ডনে ফিরে এলাম ভারতগামী জাহাজ ধরবার জন্যে।

সমাপ্ত

দেশের দুর্দিন সম্বন্ধে আমরা অল্প-বিস্তর সবাই সচেতন। কিন্তু সে দিন এই নিদারুণ সত্যটা আরো রূঢ়রূপে আমাদের কাছে প্রকট হইয়া উঠিল। বিশুখুড়ো ও তাঁর অন্তরঙ্গরা জানাইলেন যে সিনেমা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ক্রিকেট খেলার পাঁচ টাকা মূল্যের টিকিট পর্যন্ত তিন দিন আগে হইতে চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করা গেল না। একটা সকরুণ দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া ট্রামে-বাসের যাত্রীদের মর্মন্তুদ আর্তনাদ মুখর হইয়া উঠিল—"তাই তো দুর্দিন আর কাকে বলে"!!

* * *

খেলা দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে খেলা সম্বন্ধে একটি সুন্দর টীকা আমরা লোক পরম্পরায় শুনিলাম

এবং তা প্রকাশের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। টীকাকার বলিলেন—"বাঃ চমৎকার ড্রাইভ, শ্রীমতীর পোজটিও উপভোগ্য,—অবশ্যি বলটি ব্যাটের ধারে-কাছেও নাই।"

* * *

কলিকাতার কোন একটি প্রেক্ষাগৃহে দিনের মধ্যে চারটি শো'র ব্যবস্থার পরেও নাকি জনমতের একাংশ রাত এগারোটার পর আবার "ফল অব বার্লিন" ছবিটি দেখাইবার জন্য কর্তৃপক্ষকে চাপ দিতে থাকেন, ফলে আসিল পুলিশ, ফলে চলিল ইট্‌পাটকেল, ফলে পিঠে পড়িল লাঠি (অবশ্যি মৃদু) এবং অতঃপর ফলং ছত্রভঙ্গং! বিশুখুড়ো বলিলেন—কোন উদ্যোগী প্রযোজক এই "ফল অব কোলকাতার" ছবিখানি অদূরভবিষ্যতে দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন কিনা, তা অবশ্যি জানা যায় নি।"
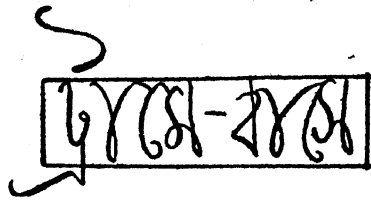
* * *

বিশেষজ্ঞরা জানাইতেছেন যে, বর্তমান বৎসরে সমস্ত পৃথিবীতে চাউলের উৎপাদন হ্রাস হইবে। শ্যামলাল বলিল—"চাউলের কথা জানিনে, কিন্তু চালের উৎপাদন সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের খবর অন্যরকম"।

* * *

সোভিয়েট রাশ্যাতে জন্মের হার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। —"কিন্তু তাহলে যে খাদ্যের পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গেই কমে যাবে, একথা বুঝবার মাথা এদের নেই, অঙ্কটা বোধ হয় কম আসে—বলেন এক সহযাত্রী।

* * * *

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের নামকরণ নিয়া শুনিলাম, একটু গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। স্কটল্যাণ্ড-বাসীরা নাকি প্রতিবাদ জানাইয়াছেন যে, তাঁর নাম "দ্বিতীয় এলিজাবেথ" হইতে পারে না। জনৈক যাত্রী বলিলেন—"আমরা অবশ্যি অতশত বুঝিনে, তবে একথা ঠিক যে, স্কচকে যে নামেই ডাকা হোক, গন্ধ তার কখনো ধেনোর মতো হবে না"!
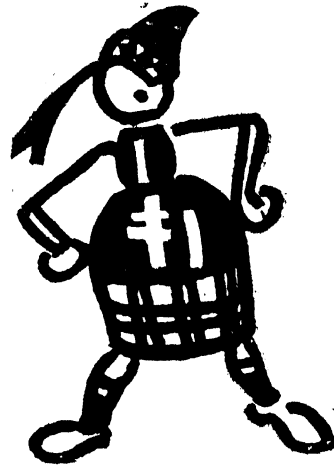
* * * * *

কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুন্সী তুলা কমিটির এক বৈঠকে তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির আবশ্যকতা সম্বন্ধে

উপদেশ দিয়াছেন। বিশুখুড়ো মন্তব্য করিলেন—"পুরনো হলেও উপদেশটি সত্যিই সারগর্ভ,—কানে দিয়েছি তুলো নীতির তুলনা কোনকালেই মেলেনি!!

* * *

চারটি উটপাখীর ডিমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তা দিয়া বম্বেতে চারটি বাচ্চা উৎপাদন করা হইয়াছে।—"বালির ভেতর মাথা গুঁজে রেখে বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে উদাসীন থাকা উটপাখীর সহজাত সংস্কার, সুতরাং বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই এই আদর্শটি বম্বের অধিবাসীরা উটপাখীর নবজাত বাচ্চাদের থেকেই শিখে নিতে পারবেন"—শ্যামলাল তার মন্তব্য শেষ করিয়া বিড়ি ধরাইল (ট্রামে-বাসে আবার বিড়ি-সিগ্রেট চলিতেছে)।

* * * * *

কলম্বোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভেজাল দুগ্ধ বিক্রয়ের অপরাধে ধৃত জনৈক গয়লার উকীল কোর্টে তাঁর মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, সে এই দুধ এক মন্দিরে নিবেদনের জন্য নিয়া যাইতেছিল, মানুষের কাছে বিক্রয়ের জন্য নহে। —"বেচারী ভগবান, একটা উকীল নেই বলে কি তাঁর ওপরই যত জুলুম"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাম্যবাদ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৭তম জন্ম-তিথি উপলক্ষে কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে যে বিচিত্র অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়, তাহার প্রধান আকর্ষণ ছিল সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত-র একটি সারগর্ভ বক্তৃতা। অচিন্ত্যকুমার এই বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'শরৎচন্দ্র বক্তৃতা' দানের জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তৃতার বিষয় হইবে 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাজীবন-কাহিনী লইয়া সম্প্রতি তিনি "পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" নামে যে মহাকাব্যোচিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন বাঙলাদেশের সাহিত্য-রসিক মহলে ঐ-বই এ-যুগের একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি বলিয়া সম্মানিত হইয়াছে। অচিন্ত্যকুমারের বেতার-বক্তৃতাটি নিম্নে মুদ্রিত হইল ঃ

বাঙলা দেশে তখন ঘোর-কুটিল দুর্দিন। ইংরেজ শুধু তার পোষাক-আসাক বা ভাবে-ভাষায়ই নয়, ধর্মেও মাতিয়ে দিয়েছে দেশকে। আসল ধর্ম নয়, ধর্মের নামে শুরু হয়েছে উন্মার্গগামিতা। অমিতচারিতা। দিগ্বিদিকে উড়ছে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতার ধুলো।

কি করে ঠেকানো যায়, এই অধঃপাতকে? রামমোহন রায় বেদান্তের বাণী নিয়ে এলেন, দেবেন ঠাকুর তাকে সংহত করলেন ব্রাহ্ম ধর্মে। আর কেশব সেন লাগলেন তার প্রচারণায়। আর কেন তবে পাদরিদের ফাঁদে পড়ছ? হিন্দুধর্মের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের একটা আপোষ ঘটিয়ে দিচ্ছি। মূর্তি দূর করে দাও, নিয়ে থাকো ভক্তির ভাবটি। নিরাকার সাধনাও করো আবার ভজন-কীর্তনও করো। দুয়ে মিলে তৈরি এই ব্রাহ্মধর্ম।

বিপথগামীরা থমকে দাঁড়াল খানিকক্ষণ। কিন্তু পুরোপুরি ফিরল না। বরং হিন্দু-সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ শুরু হল নতুন করে।

তা ছাড়া তখন আরেক দল উঠেছে, যারা ঠাকুরদেবতাও মানে না, নিরাকার ব্রহ্মও বোঝে না। তারা নাস্তিক, নৈতিবাদী। সংশয়সংকুল। কোনটা যে ধরবে ঠিক করতে পারছে না, নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মত দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর একদল এল যারা প্রত্যক্ষবাদী, ধর্মের ধার ধারে না, স্থূল ইন্দ্রিয়ের বাইরে মানতে চায় না অন্য কোনো চেতনার অস্তিত্ব।

চারদিকে গোলমাল, বিশৃঙ্খলা। একটা এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি।

এমন সময় শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন। এলেন শান্তির মত, সুষমার মত, স্নিগ্ধতার মত। এলেন ধ্রুব ধর্মের শাশ্বত জ্যোতি নিয়ে, অদিগন্ত আকাশের উদার উন্মুক্তি নিয়ে। নিয়ে এলেন সাম্য, সন্তোষ, সামঞ্জস্য। নিয়ে এলেন সঙ্গতি, সংহতি, সমন্বয়। সবাইকে এক করে দিলেন, মিলিয়ে দিলেন হাতে-হাতে। বললেন, যত মত তত পথ। যেমন ভাব তেমন লাভ। শীর্ণ হয়ে সংকীর্ণ হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলেন না, ছড়িয়ে পড়লেন বিশ্ব-বিস্তীর্ণ হয়ে। খণ্ডের ঘরে ক্ষুদ্রের ঘরে অল্পের ঘরে রইলেন না, ভুবনজোড়া আসন মেলে বসলেন।

যে কোনো রকমে ছাদে ওঠা নিয়ে কথা। পাকা সিঁড়ি হোক, কাঠের সিঁড়ি হোক, মই-দড়ি হোক, আছোলা বাঁশ হোক একটা না একটা অবলম্বন করে ছাদে উঠতে পারলেই হল। কালীঘাটে যাবার অনেক রাস্তা, অনেক বাহন। কেউ যাচ্ছে নৌকোয়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা পায়ে হেঁটে। যে করে হোক পেঁছুতে পারলেই হল। নদীরা নানা দিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদীই পড়ে গিয়ে সমুদ্রে। সমুদ্রে গিয়ে সব এক। সব একাকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই একাকারের প্রতিমূর্তি। একাধারে একাকার।

শুধু প্রচার নয় আচরণ করেছেন রামকৃষ্ণ। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়। শাক্ত হয়েছেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে সাধন করেছেন চৌষট্টি রকম তন্ত্র। বৈষ্ণব হয়েছেন, কখনো ধরেছেন হনুমানের দাস্য, কখনো বা শ্রীমতীর মধুরতা। কখনো বা কৌশল্যার বাৎসল্য। বৈদান্তিক হয়েছেন, নির্বিকল্প হয়ে বিলীন হয়েছেন ব্রহ্মে। তারপর সুফী গোবিন্দ রায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে মুসলমান হয়েছেন। জপেছেন আল্লামন্ত্র, নমাজ পড়েছেন পাঁচবেলা। যীশুখৃষ্টকে বন্দনা করেছেন, গির্জায় গিয়ে দেখে এসেছেন যা খৃষ্ট তাই কৃষ্ণ।

সা থেকে নি-তে উঠেছেন, আবার এসেছেন নি থেকে মা-তে। সমস্ত ঘর ঘুরলেই তবে ঘুঁটি পাকে। আর এই পরিপক্ক অবস্থাটির নামই প্রেম। রামকৃষ্ণ অমেয় প্রেমমূর্তি।

সব কিছুকে মিলিয়ে-মিশিয়ে সহজ করে দিলেন রামকৃষ্ণ। সমস্ত কিছু তরল করে সরল হয়ে রইলেন। বুদ্ধিজীবীরা কোমর বেঁধে তর্ক করতে এল। প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে এল সংশয়বাদীরা। অবিবেকী অবিশ্বাসীর দল এল তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে।

এসে কী দেখল তারা? দেখল বিরাট এক উপলব্ধি সহজে একটি উচ্চারণ হয়ে বসে আছে। সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর, সমস্ত সমস্যার মীমাংসা, সমস্ত তর্কের নিষ্পত্তি। দেখে কি করল তারা? প্রণামে লুটিয়ে পড়ল।

রামকৃষ্ণের মাঝে দেখতে পেল মহান্ এক প্রাপ্তি, গভীর এক তৃপ্তি, অপূর্ব এক উদ্ঘাটন। এই উদ্ঘাটনের নামই প্রেম।

সর্বজীবে শিব দেখলেন রামকৃষ্ণ। জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব পূজন—এই ছিল বৈষ্ণব ধর্মের মর্মকথা। রামকৃষ্ণ 'জীবে দয়া' বলতে পারলেন না। বললেন, 'জীবে দয়া করবি তোর এমন স্পর্ধা কি? দয়া করবার তুই কে? জীবে দয়া নয়, বল জীবে সেবা—জীবে শ্রদ্ধা, জীবে প্রেম।'

এই হল শ্রীরামকৃষ্ণের সাম্যবাদ। কোনো ভেদ নেই কোনো বৈষম্য নেই। কোনো স্তর নেই, শ্রেণী-পঙক্তি নেই। উচ্চ-নীচ বা অগ্রপশ্চাৎ নেই। সর্বত্র সমবুদ্ধি। সর্বত্র

সমদর্শী। সর্বত্র সমাশ্রয়ী। জীবমাত্রই ব্রহ্মের প্রতিভাস, ব্রহ্মের প্রতিকায়। 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণস্ফুরে।' যা আমি তাই তুমি। যা সোহং তাই তত্ত্বমসি। আমার তোমার যার যা কাজ সব ব্রহ্মের কাজ। তাই কাজ মাত্রই পূজা, উপাসনা।

রামকৃষ্ণ সাকার থেকে চলে গিয়েছিলেন নিরাকারে। তাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। কিন্তু তিনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত অজগরবৃত্তি নিলেন না। ব্রহ্মভূমি থেকে নেমে এলেন জীবভূমিতে। নিরাকার থেকে আবার সাকারে, এবার সত্যিকার সাকারে। সর্বজীবে একভূতান্তরাত্মা শিবকে দেখলেন, শিবানুভব করলেন। প্রত্যেক নরকে নিয়ে এলেন নারায়ণের পদবীতে। এমন কি ডাকাতকেও বললেন, ডাকাতরূপী নারায়ণ।

এই হল রামকৃষ্ণের সাধনার সম্পূর্ণতা। **সনাতন, নবীনতন সাম্যবাদ।**

শুধু অন্ন হলেই জীবনের ক্ষুধা মেটে না। **পরম ক্ষুধা মেটাবার জন্য** চাই পরমান্ন। **সেই অমৃত-আস্বাদ পরমান্নেরই** আরেক নাম **রামকৃষ্ণ পরমহংস।**

ধীরে বহে ডন—অনুবাদক : প্রফুল্ল চক্রবর্তী; বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—চার টাকা।

রুশ বিপ্লবের পটভূমিকায় নির্যাতিত কসাক সমাজ-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া যুগান্তকারী সোভিয়েট ঔপন্যাসিক মিখাইল শলোখফের অপূর্ব রচনা 'তিখি দন' বিশ্বসাহিত্যের আসরে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থটি 'তিখি দনের' ইংরাজী অনুবাদের স্বচ্ছন্দ ভাষান্তর। কসাক সমাজজীবনের সহিত আমাদের বাস্তব পরিচয় থাকার কথা নয়, রুশ নরনারীর জীবনযাত্রা প্রণালীও আমরা অবগত নহি; কিন্তু তীক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও দরদের গুণে দূরের মানুষ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া ঘরের মানুষে পরিণত হইয়াছে। তাহাদের দুঃখ দরদ আশানিরাশা আমাদের ব্যথাবেদনার অন্তর্গত হইয়া উঠিয়াছে। রচনার এই সার্বভৌম সংবেদনশীলতাই শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড। আনন্দের বিষয়, ভাষান্তরিত অবস্থাতেও রচনার প্রসাদগুণে প্রাক্‌বিপ্লবযুগের কসাক জীবনের ছবি পূর্ণ মাত্রায় সমুজ্জ্বল। স্বচ্ছ সরস অনুবাদের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে সন্দেহ নাই। রচনাসৌকর্যে ও বিষয়বস্তুর যথাযথ রূপদানে এই বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসটির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাঠকদের যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দ দিতে পারিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপটসজ্জা প্রথম শ্রেণীর।

১|৫২

এরোপ্লেনের গল্প—অশোককুমার মিত্র; আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

অনুসন্ধিৎসা জ্ঞানের প্রাণ। বাল্য ও কৈশোরের সন্ধিস্থলে হৃদয় সহস্র জিজ্ঞাসায় মুখরিত হইয়া উঠে। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর প্রত্যেকটি ঘটনা প্রশ্নের রূপ ধরিয়া কিশোর-মনকে আলোড়িত করিয়া তোলে। বিজ্ঞানের কূট সমস্যার অবতারণা না করিয়া সহজ সরল ভাষায় কিশোরদের এই জ্ঞানস্পৃহার তৃপ্তিসাধন করা উচিত। আলোচ্য পুস্তকটি 'এরোপ্লেন' সম্বন্ধে সহজ সরল ভাষায় কিশোরকিশোরীদের কৌতূহলের নিবৃত্তি। গল্পচ্ছলে বিমানবিজ্ঞানের সাধারণ তথ্য চিত্তাকর্ষকরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফানুসের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম আকাশপোতের বিবর্তন রহস্য লেখকের প্রাঞ্জল ভাষায় অপূর্ব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই জাতীয় পুস্তকের বহুল প্রচার একান্ত কর্তব্য।

৫|৫২

আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের উদ্‌গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বাঙালীর রাজনৈতিক গীতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশের প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীর ইহা অবশ্য পাঠ্য। মূল ভাষা কোনরূপ পরিবর্তিত না করিয়া গ্রন্থটির সামগ্রিক ভাব ও রস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহাকে কিশোরোপযোগী করিয়া তোলা দুরূহ কার্য সন্দেহ নাই। আলোচ্য পুস্তকটি এই দুরূহতার সোপান অতিক্রম করিয়া সহজেই পাঠকপাঠিকাদের চিত্ত জয়ে কৃতকার্য হইবে—এই বিষয়ে আমরা স্থিরনিশ্চয়। গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী পুস্তকটির মর্যাদা বহুগুণে বর্ধিত করিবে। মুদ্রণে, প্রচ্ছদপট-অলংকরণে ও মূল্যে পুস্তকটি সকলেরই মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে।

৪|৫২

শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী—তারুণ্যামৃত ধারা, দ্বিতীয় লহরী, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড। গোপীবন্ধু দাস ব্রহ্মচারী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা। প্রতি খণ্ডের মূল্য আড়াই টাকা।

ব্রহ্মচারী গোপীবন্ধু দাস প্রণীত শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনীর প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত, সর্বোপরি তিনি ভক্ত—পরম বৈষ্ণব। তাঁহার লিখিত প্রভু জগদ্বন্ধুর এই লীলা গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভক্তিরসে মন-প্রাণ আপ্লুত হয়। শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিনী আদ্যোপান্ত মধুর। গোপীবন্ধু দাসের লিখিত এই "ভাগবৎ প্রসঙ্গ ভক্তমনে আনন্দের প্রবাহ বহাইবে", তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় অধ্যাপক শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন আমরাও তাহা সমর্থন করি। ভক্ত এবং রসিক সমাজে এমন গ্রন্থ সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

জলসা—মোহাম্মদ ইব্রাহিম। প্রাপ্তিস্থান—মোঃ ইব্রাহিম, ২৮, ব্রাইট স্ট্রীট, কলিকাতা—১৭। মূল্য ১৷৷০।

ছোটদের জন্য লেখা ছড়ার বই। ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য লেখক শুধু ছড়াই লেখেন নি, নিজ হাতে ছবি এঁকেও তাদের মনোরঞ্জনের প্রয়াস পেয়েছেন। লেখকের শ্রম সার্থক হয়েছে। প্রচ্ছদপটটি সুন্দর। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

৩০১|৫১

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

বৈষ্ণব সাহিত্য প্রবেশিকা—হিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী। জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৫্। ৪৬|৫২

শিলাসন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৷৷০ ৪৭|৫২

রাশিফল—জ্যোতি বাচস্পতি। মূল্য ২্। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩|১|১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ৪৮|৫২

নিষ্কৃতি—দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাট্যাকারে রূপান্তরিত। মূল্য ১৷৷০। ৪৯|৫২

যারবেদা মন্দির হইতে—মহাত্মা গান্ধী। অনুবাদক বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। মূল্য ১৷০। ৫০|৫২

সন্নাতুরা—সুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৮|৩৩, ফার্ন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১্। ৫১|৫২

শমন দূত—তারাপদ ঘোষ। শ্রীরাম ট্যাং লেন শালিখা, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১্। ৫২|৫২

১১

খাবার সময় রমাকে মোটেই দিল না অতুল। পরদিনই এক থান সিট কাপড় এনে রমার সামনে ফেলে দিয়ে বলল, 'নাও। গোটা কয়েক সার্ট তৈরি করো তো বসে বসে। কিছু প্রমাণ সাইজের আর কিছু আট-দশ বছরের ছেলেদের গায়ের মাপের।'

রমা অবাক হয়ে বলল, 'কাপড় কেনার টাকা কোথায় পেলে?'

অতুল বলল, 'ডাকাতি করেছি। কেন, এক থান কাপড়ের টাকা দেবার বন্ধুও কি আমার সারা শহরে নেই?'

তারপরে ব্যাপারটা খুলেই বলল অতুল। বৌবাজার স্ট্রীটে রেডিমেড জামা আর ফ্রক-প্যান্টের দোকান আছে নিশানাথ নন্দীর, তার সঙ্গে অতুলের বহু দিনের বন্ধুত্ব। সেই এক থান কাপড় অতুলকে জোগাড় করে দিয়েছে। ভালো কাট-ছাঁট হলে বিক্রির ব্যবস্থাও সেই করবে।

রমা বলল, 'আর যদি ভালো না হয়?'

অতুল বলল, 'তাহলে আমি ঘাড়ে করে সেগুলিকে শহরের পথে পথে বিক্রি করে বেড়াব। কিন্তু ভালো হবেই-বা না কেন। তোমার হাত তো খারাপ নয়।'

রমা বলল, 'যত তোষামোদই কর, আমার দ্বারা ওসব হবে না। তুমি অন্য লোক দেখ। আমার আর খেয়ে না খেয়ে কাজ নেই, বসে বসে তোমার খামখেয়াল মেটাই। 'নিয়ে যাও তোমার থান কাপড়। যার জিনিস, তাকে ফেরৎ দিয়ে এসো গিয়ে।'

কিন্তু অতুল সেকথা কানেই নিল না। যেন শুনতেই পায়নি, তেমনি ভঙ্গীতে বেরিয়ে গেল।

পুরো একটা দিন পড়ে রইল সে কাপড়। রমা হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখল না। কিন্তু অতুল নির্বিকার। ওর ভঙ্গী দেখে রমা চটে উঠে বলল, 'তোমার জিনিস আমার ঘর থেকে সরিয়ে নেবে তো নাও, নাহলে আমি জানালা দিয়ে ফেলে দেব বলে দিচ্ছি।'

অতুল বলল, 'বেশ! দিতে যদি পারো দাও।'

রমা বলল, 'আমি যেন হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি। সংসারের কোন কাজকর্ম নেই। ওঁর মত বেকার হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। উনি আমাকে কাজ জুটিয়ে দিলেন।'

অতুল বলল, 'দিলামই তো। আমি রাস্তায় বেকার। তুমি ঘরে বেকার। তোমারই বা নিজের বলে কোন্ কাজ আছে। কিন্তু যদি কাজটা করতে পারো, তাহলে এক-একটা সার্টে এক-একটি করে টাকা। তোমার আট আনা থাকবে, আমার আট আনা।'

রমা এবার ঠোঁট টিপে হাসল, 'ঈস, ভাগাভাগির বেলায় তো জ্ঞানের নাড়ী খুব টনটনে দেখছি। আমি খাটব, আমি তৈরি করব, আর তুমি বুঝি আট আনা ভাগ পাবে?'

অতুলও হাসল, 'বেশ কত দিতে চাও বল?'

রমা বলল, 'কত আবার। কিছুই না।'

অতুল বলল, 'সর্বনাশ। একেবারেই বঞ্চনা করতে চাও নাকি।'

রমা অতুলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে রইল। তারপর ধমকের সুরে বলল, 'এর আবার বঞ্চনা-অবঞ্চনার কি আছে। নেহাৎই যদি দিতে হয়, মুটে ভাড়ার এক আনা তুমি পাবে।'

অতুল বলল, 'বেশ তাই দিয়ো। যা দিয়ে তুমি খুশি থাক, তাই ভালো।'

রমা ভ্রু কুঞ্চিত করে বলল, 'তাছাড়া আবার কি, কিন্তু তুমি যা ভেবেছ, তা হবে না। ওসব সেলাই-ফোঁড়াই কিছুতেই পারব না আমি।'

বলে রমা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এসে ও অন্য দিনের মত বই নিয়ে শুয়ে পড়ল না। কাঁচি আর সেই ছিট কাপড়ের থান নিয়ে এসে বসল হ্যাণ্ড মেসিনের কাছে।

মেশিনের শব্দে বিরক্ত হয়ে কল্যাণী উঠে দোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন, 'বলি তুই নিজেও একটুকাল ঘুমুবিনে, আর মানুষকেও ঘুমুতে দিবিনে, ভাবলি কি তুই।'

মেশিন চালাতে চালাতে রমা বলল, 'কেন, ঘুমোও গিয়ে। ঘুমোতে তো তোমাকে কেউ বাধা দিচ্ছে না।'

কল্যাণী মেয়ের শেষ কথাটির পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'বাধা দিচ্ছে না। পাশের ঘরে কানের কাছে কেউ অমন ঘট ঘট করতে থাকলে অন্য লোকে ঘুমোতে পারে! ছোট মেয়েটাকে অত করে ঘুম পাড়িয়েছি। সেও উঠে পড়ল বলে। তা পড়ুক। কিন্তু রমা, তোর নিজেরও তো দেহ বলে একটা বস্তু আছে। এত যদি দিনরাত খাটিস, এক মুহূর্তও একটু বিশ্রাম না দিস, দেহ টিঁকবে কি করে।'

রমা মার দিকে না তাকিয়ে মেশিন চালাতে চালাতে জবাব দিল, 'এ-দেহ টিঁকিয়েই বা আর কি হবে মা।'

কল্যাণী একটু কাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই রুক্ষ, কঠোর স্বভাবের মেয়েটির গলা থেকে অমন করুণ আর কোমল সুর শুনে তাঁর মনটা অনেক-দিন বাদে আবার যেন কেমন করে উঠল। সত্যি, কোন সুখ আছে ওর মনে যে, ও দেহের দিকে নজর দেবে, দেহের যত্ন নেবে। দিন ভর খাটে। কাজ-কর্মের ভিতর দিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যকে ভুলে থাকতে চায়। এই বয়সে কোন সাধ নেই, আহ্লাদ নেই; সব থেকেও কিছু নেই মেয়েটার। আস্তে আস্তে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন কল্যাণী। করুক ওর যা খুশি, ও যেভাবে থেকে শান্তি পায়, থাকুক।

কল্যাণী নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

খানিক বাদে পা টিপে টিপে অতুল এসে

দাঁড়াল; হেসে বলল, 'কি হচ্ছে। তবে নাকি কাপড়ে হাত দেবে না।'

রমা ফিরে তাকাল, 'তুমি যা ভেবেছে তা নয়। নিজের জন্য একটা সেমিজ করে নিচ্ছি।'

অতুল বলল, 'তোমার জন্যে একটা সেমিজ কর, আমার আর গোবিন্দের জন্যে গোটা কয়েক সার্ট। ব্যস। ওসব বেচাকেনার হাঙ্গামায় আর কাজ নেই রমাদি।'

রমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'এরই মধ্যে সখ মিটল। ব্যবসা-বাণিজ্য করবার লোকই তুমি বটে। আজ এ-বুদ্ধি, কাল সে-বুদ্ধি, দুনিয়ার কোন কাজ যদি তোমাকে দিয়ে হয়। যাও আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও তুমি। যা দেখতে পারিনে তাই। বলে রমা ফের নিজের কাজে মন দিল।

অতুল সকৌতুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ রমার রাগ আর বিরক্তিটা উপভোগ করল, তারপর এক সময় নীচে নেমে গেল। কাজের সময় ওকে বাধা দিলে ও ভারি চটবে। কিন্তু এখন ওকে চটাতে চায় না অতুল। কাজটি এগোক, তাই চায়। তাতে তারও দু পয়সা হবে।

দিন কয়েকের মধ্যে গোটা কয়েক ছোট-বড় জামা তৈরি করে ফেলল রমা। অতুল সেগুলি নিয়ে তার সেই বন্ধুর দোকানে জমা রেখে এল।

রমা বলল, 'টাকা কই।'

অতুল বলল, 'বিক্রি হোক, তবে তো টাকা।'

টাকা যেদিনই পাক, রমা কিন্তু কাজে বেশ উৎসাহ পেয়ে যাচ্ছে। অবসর পেলেই ও মেশিনের কাছে গিয়ে বসে। সেখান থেকে নড়তে চায় না। এক থান কাপড় শেষ হোল তো এল আরো এক থান। এ থানের রঙ আর ছিটের নমুনা ভালো করে বুঝিয়ে দিল অতুলকে। একটানা একঘেয়ে জীবনে যেন একটু বৈচিত্র্য এসেছে। বেঁচে থাকায় হঠাৎ যেন নতুন স্বাদ পেয়েছে রমা। কাটা কাপড়ের ব্যবসা চালান নিয়ে অতুলের সঙ্গে তার পরামর্শ চলে। দেখা যায়, অনেক বিষয়েই অতুলের চেয়ে তার বুদ্ধি বেশি। নিশাকান্ত পর্যন্ত তার হাতের কাজের তারিফ করে। মজুরী হিসাবে সপ্তাহে সপ্তাহে চার-পাঁচ টাকা করে দেয়ও।

টাকার অঙ্ক সামান্য। কিন্তু রমা যা স্ফূর্তি পেল, যা উৎসাহ জোগাতে লাগল অতুলকে, তা খুব সামান্য নয়। ক্রমে গোবিন্দ এসেও দলে ভিড়ল। বলল 'এরকম ছেলেখেলা করে লাভ কি। ব্যবসা যদি করতে হয়, ভালো করে কর। বাইরের ঘরটা তো পড়েই আছে। ওটিকে ব্যবহার কর তোরা। তুই নিজেও ছাঁটকাটের কাজটা শিখে নে। একটা ফুট মেসিন আনা, বসতে হলে ভালো করে জাঁকিয়ে বস।'

কিন্তু গোবিন্দ উৎসাহ দিলে কি হবে, তার বাবা কেশববাবু আপত্তি করতে লাগলেন। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'হ্যাঁ বাকি আছে এখন ওই। বাড়ির মধ্যে কত কিইতো ঢুকিয়েছ, এবার একটা দোকান এনে ঢোকাও।'

কল্যাণী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার কথাবার্তার ধরণই আলাদা। তোমার বাড়িতে আমি আবার কি ঢোকালাম। যা করবার তোমার ছেলেমেয়েরাই করছে। আমাকে কেন দোষ দিচ্ছ।'

কেশববাবু বললেন, 'ভিতরে ভিতরে তোমার সায় না থাকলে কি কেবল ওরা কিছু করতে পারে। দিন নেই, রাত নেই, মেশিনের ঘট-ঘটানিতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। খেটে-খুটে এসে বাড়িতে যে একটু সুস্থমত থাকব, তার জো নেই। আর ওই অতুলটাই বা ভেবেছে কি। ওকি চির-কালের জন্যে এসে বাসা বাঁধল এখানে?'

কল্যাণী বললেন, 'পরের ছেলেকে দোষ দিচ্ছ কেন। ওতো কবে থেকেই যাই-যাই করছে। বলছে কোন হোটেলে-মেসে গিয়ে থাকবে। কিন্তু গোবিন্দই তো ওকে যেতে দিচ্ছে না।'

কেশববাবু বললেন, 'কেবল গোবিন্দ কেন, তলে তলে তোমার মেয়েরও আস্কারা আছে।'

রমা কি একটা জিনিস নেওয়ার জন্যে ঘরে এসেছিল, বাবা-মার কথাবার্তা কানে যেতেই দোরের আড়ালে সরে দাঁড়িয়েছিল। সব কথাই ওর কানে গেল। একটু বাদে গম্ভীর মুখে এসে ঘরে ঢুকে বলল, 'কি হয়েছে বাবা।'

কেশববাবুর অমনিই সুর পাল্টে গেল, 'না না কিছু হয়নি। কি আবার হবে। আজ কি কি রান্না হচ্ছে মা।'

কল্যাণী মনে মনে হাসলেন। ছেলেমেয়ে দুজনকেই ভারি ভয় করেন উনি। আড়ালে যতই হৈ-চৈ করেন। সামনে কিছুই বলতে চান না।'

রমা বলল, 'অন্য দিন যা হয় তাই হচ্ছে।' তারপর নিজের কাজ সেরে সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কেশববাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'শুনতে পেয়েছে নাকি?'

কল্যাণী হেসে বললেন, 'কি জানি।'

কেশববাবু বললেন, 'শুনতে পেলে আর রক্ষা রাখবে না। যা একখানা মা মনসা তোমার মেয়ে, তবে যাই বল, অতুলের কিন্তু চলে যাওয়াই ভালো। শত হলেও বয়সের ছেলে। ঘরের মধ্যে সব সময় নড়া চড়াটা আর যেন ভালো দেখায় না। লোকেই বা কি বলে।'

কল্যাণী বললেন, 'চুপ কর।'

তারপর ইশারায় সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন। রমা যায় নি। বারান্দায় পিণ্টু মিণ্টুর ভিজে ফ্রক প্যাণ্টগুলি মেলে দিচ্ছে।

কেশববাবু তাড়াতাড়ি কথা পাল্টে বললেন, ঈস, কত বেলা হয়ে গেল। আজ লেট্ হতে হবে অফিসে, যাও তেল গামছা নিয়ে এসো।

দুপুরের সময় অতুল খেতে এলে রমা মুখ গম্ভীর করে রইল। ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনাটা অন্যদিনের মত আর জমল না।

অতুল খেতে খেতে বার দুই জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি হয়েছে রমাদি। আজ সেলাই করতে করতে ঠোঁট দুটোও সেলাই করে রেখেছ নাকি, মোটেই কথাবার্তা নেই যে। নাকি খুব ক্ষিদে পেয়ে গেছে।'

রমা ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'চুপ করে খেয়ে নাও তো। সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না মানুষের।'

অতুল আর কোন কথা বলল না।

খাওয়া দাওয়ার পর অতুল রমার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, রমা বলল, 'আমাকে জ্বালাতন কোরো না অতুল। আজ আমার শরীর ভালো না। আমি এখন ঘুমবো। নিচের ঘরে সুপুরি রেখে এসেছি যাও খাও গিয়ে।'

অতুল মনে মনে হাসল। এই বদরাগী মেয়েটির মেজাজ দিনের মধ্যে কতবার যে বিগড়ায় তার হিসেব রাখা মুশকিল। হয়তো মা বাবার সঙ্গে কথান্তর হয়েছে। তার শোধ নিচ্ছে অতুলের ওপর। কিন্তু এ সময়

ওকে বেশি না চটানোই বুদ্ধিমানের কাজ। অতুল আর কোন কথা না বলে রমার সামনে থেকে সরে গেল। কিন্তু মেয়ের ঘরে দোর দেওয়ার শব্দ শুনে কল্যাণী এসে দাঁড়ালেন, 'ওকি না খেয়েই তুই শুয়ে পড়লি যে।' রমা ঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল, 'আমি খাব না মা।'

কল্যাণী বললেন, 'কেন, এই দুপুর বেলায় না খেয়ে থাকার কি হয়েছে।'

রমা বিরক্তির ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'খাওয়ার ইচ্ছে নেই তাই খাব না। তুমি যাও, খেয়ে নাও গিয়ে।'

কল্যাণী বললেন, 'তোদের ধরণ দেখলে আমার গা জ্বলে যায় বাপু। পান থেকে চুণ খসলে আর কথা নেই। অমনিই রাগ। কেন তোকে কে কি বলেছে যে তুই রাগ করে না খেয়ে থাকবি। কথাটা অন্যায় হয়েছে কি। সত্যিই তো পরের ছেলের দায়িত্ব তো কতদিন মানুষ নিতে পারে। সেজন্যে গোবিন্দকেই উনি দোষ দিচ্ছিলেন, তোকে তো কিচ্ছু বলেন নি। আয় উঠে আয় বলছি।'

রমা বলল, 'না আমি খাব না।'

'বেশ করো তোমাদের যা ইচ্ছে। যন্ত্রণা আমার আর সয় না।'

বলে কল্যাণী নিজের ঘরে গিয়ে দোর ভেজিয়ে দিলেন। রমা যদি না খেয়ে রাগ করে থাকে তিনিও খেতে যাবেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে দোর খুলে বেরিয়ে এল রমা, তারপর রান্না ঘরে গিয়ে নিজের ভাত বেড়ে নিল।

কল্যাণী খেতে বসে বললেন, 'কেন কথায় কথায় অত রাগ করিস বল তো, উনি যদি কিছু বলে থাকেন, তোর ভালোর জন্যেই বলেছেন।'

রমা গম্ভীরভাবে বলল, 'হুঁ।'

খাওয়া দাওয়া সেরে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল রমা। খানিকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল। কিন্তু স্থির থাকতে পারল না। বাবার ওই ধরণের কথাবার্তার পর অতুলকে স্পষ্ট করে তারই যেতে বলা উচিত। কিন্তু সেই বা কেন বলতে যাবে। বাবা নিজে বলতে পারেন না? অতুলের থাকা তিনি অপছন্দ করছেন সে কথা ওকে তিনি বলে দিলেই তো পারেন। সে সাহস বাবার নেই। গোবিন্দকে তিনি ভয় করেন। এই নিয়ে কোন কথা তুললেই গোবিন্দ হৈ চৈ করবে সংসারে হঠাৎ খরচপত্র দেওয়া বন্ধ করে দেবে। সেই ভয় আছে ও'র মনে। কিন্তু রমাকে তাঁর কোন ভয় নেই। কারণ তিনি জানেন রমাকে যত দোষারোপই করা হোক সে ঘর সংসারের কাজ বন্ধ করে থাকতে পারবে না। কারণ বাপ ভাইর ভাতই তাকে খেতে হবে। তার আর কোথাও নড়বাব উপায় নেই সে কথা তিনি জানেন বলেই মেয়ের ওপর মিছামিছি দোষারোপ করতে তাঁর বাধে না, কিন্তু রমাও এসব আর সহ্য করবে না, সেও এবার থেকে স্বাধীনভাবে থাকবার চেষ্টা করবে। খোঁটা শুনেই যদি ভাত খেতে হয় সে তো শ্বশুর বাড়িতে থেকেও তা খেতে পারত। দু বেলা খাটলে শাশুড়ীর, খুড় শ্বশুরের যত্ন পরিচর্যা করলে সেখানেও তো ভাত কাপড়ের তার অভাব হোত না। কিন্তু তেমনভাবে থাকতে তার প্রবৃত্তি হয়নি বলেই সে বাপের বাড়িতে চলে এসেছে। বাপ-মা অবশ্য ঘর-সংসারের সব ভারই তার উপর তুলে দিয়েছে। কিন্তু একেক সময় রমার মনে হয় এ দান যেন বড়ই অনুগ্রহের দান। কোথায় যেন একটা লোক দেখান ভদ্রতার ভাব আছে এর মধ্যে। সন্তান স্নেহের চেয়ে সেইটাই বড়। কিন্তু সারাজীবন অন্যের এই সৌজন্যের বোঝা রমা বয়ে বেড়াবে কি করে? এখন বাপ মা সৌজন্য দেখাচ্ছেন, পরে ভাই সৌজন্য দেখাবে। কিন্তু একটু ত্রুটি বিচ্যুতি হলেই সেই সৌজন্যের মুখোস মুখ থেকে খসে পড়বে সকলের। তখন এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে স্বামী পরিত্যক্তা রমা এ বাড়ির আশ্রিত ছাড়া আর কেউ নয়। সে যতই খাটুক সংসারের জন্যে যতই দিন রাত পরিশ্রম করুক, এ বাড়িতে তার সত্যিকারের কোন স্থান নেই। একবার যখন গোত্রান্তরিত হয়ে গেছে এ কুলে সে আর ফিরে আসতে পারে না।

হঠাৎ সেলাইর কল আর স্তূপীকৃত কাটা কাপড়গুলির ওপর ভারি রাগ হোল রমার। বাবা তার মুখের সামনে কিছু বলেন নি, কিন্তু আড়ালে এই নিয়ে রোজই বিরক্তি প্রকাশ করছেন। অথচ দু চার টাকা যদি এর

থেকে হয়ই রমা তো আর তা সঙ্গে করে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে না। তা এই সংসারের কাজেই লাগবে। কিন্তু দরকার নেই তা দিয়ে। দরকার নেই রমার কোন সাধ আহ্লাদে। নিজের পায়ে না দাঁড়ান পর্যন্ত নিজের ব্যবস্থা নিজে না করা পর্যন্ত সে এদের মর্জি মতই চলবে। নিজের পছন্দ থেকে নিজের ইচ্ছা থেকে কিছুই করবে না।

জামার জন্যে কেটে রাখা কাপড়গুলি গুছিয়ে নিয়ে নিচে নেমে এল রমা। অতুল শুয়ে শুয়ে বিড়ি টানছিল, তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'নাও, আমি আর পারব না, তোমার জিনিস তুমি নিয়ে চলে যাও।'

অতুল বিস্মিত হয়ে বলল, 'সেকি কোনটা আধখানা সেলাই করে রেখেছ, কোনটায় হাতই দাও নি। এগুলি নিয়ে কি করব, ওতো বিক্রি হবে না।'

রমা বলল, 'না হয় রাস্তায় ফেলে দিয়ো। আমি আর কিছু করতে পারব না। তাছাড়া এ বাড়িতে তোমার আর থাকা হবে না। তুমি অন্য ব্যবস্থা করো।'

অতুল খানিকক্ষণ রমার দিকে তাকিয়ে কি দেখল তারপর বলল, ব্যবস্থা তো আমি কবেই করতাম। গোবিন্দই তো যেতে দিচ্ছে না।'

রমা কঠিন স্বরে বলল, 'না যেতে দিচ্ছে না। ও'কে কেউ জোর করে ধরে রেখেছে এখানে। হাত পা বেঁধে রেখেছে। দিনের পর দিন অন্যের বাড়িতে পড়ে রয়েছ তোমার নিজেরই তো লজ্জা করা উচিত ছিল।'

অতুল বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল, 'না লজ্জার কিছু নেই। আমি বিনা পয়সায় তোমাদের এখানে খাচ্ছিনে! যে কদিন খাবো খোরাকী দিয়ে খাব। মাস অন্তে পাই ফার্দিং পর্যন্ত হিসেব করে দেব। সে বোঝা-পড়া আমার গোবিন্দের সঙ্গে হয়ে রয়েছে।' রমা জবাব দিল, 'কিন্তু গোবিন্দের সঙ্গে হলেই তো হবে না। গোবিন্দই তো এ বাড়ির কর্তা নয়। তা ছাড়া খোরাকী দিয়ে খেতে হয় হোটেলে গেলেই তো পারো। এখানে কেন।'

অতুল বলল, 'বেশ তাই যাচ্ছি।'

গোবিন্দের একখানা লুঙ্গি পরা ছিল সেখানা ছেড়ে নিজের কাপড় পরে নিল, অতুল। আলনা থেকে পেড়ে জামাটা গায়ে দিল। সবগুলি বোতাম লাগাবার সবুর সইল না, বলল, 'আমি চললুম। গোবিন্দ এলে তাকে বলো। আর খোরাকীর টাকা আমি যেভাবেই পারি দু একদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব।'

অতুল বেরিয়ে যাচ্ছে রমা পিছন থেকে ডেকে বলল, 'জামার কাপড়গুলি রেখে যাচ্ছ কার জন্যে? এগুলি নিয়ে যাও। এগুলি দিয়ে কি করব?'

অতুল বলল, 'নর্দমায় ফেলে দিয়ো।'

তারপর সদর দরজার হুড়কো খুলে হন হন করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

এই অহেতুক অপমানে তার সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে যেতে লাগল। নেহাতই গোবিন্দের বড়দিদি। জাতে মেয়েমানুষ। অন্য কেউ হলে এমন কি গোবিন্দ হলেও অতুল কিছুতেই এসব সহ্য করত না। দু চার ঘা লাগিয়ে দিত। কিন্তু রমা নেহাৎ মেয়ে বলেই বেঁচে গেল।

গলির ভিতর দিয়ে হন হন করে ছুটে চলল অতুল। না, তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কিছু নেই। কারোরই সাহায্যে দরকার নেই তার। সবাইকে ছেড়েই সে চলতে পারে কিনা অতুল দেখে নেবে।

'এই যে কালাচাঁদ, এবার তো দেখা পেয়েছি তোমার। এবার কোথায় তুমি পালাও তাই দেখব।'

দিদিমা ভুবনময়ী। দু হাত দু দিকে বাড়িয়ে তিনি পথ আটকে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর এক বাল্য সখী আছেন ছুতোর পাড়া লেনে। তাঁর অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছিলেন। সঙ্গে আছে সাত বছরের নাতনী টুলু।

ভুবনময়ী বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস, আয় বাড়ি আয়।'

অতুল বলল, 'তুমি যাও দিদা, আমি যাব না। তোমাদের বাড়ি আমি জন্মের মত ছেড়ে এসেছি। আর ঢুকব না ওখানে। হাত ছাড় যেতে দাও আমাকে।'

ভুবনময়ী হাসলেন, ঈস্, যেতে দাও বললেই যেন যেতে দিলাম। যেতে হয় একা যেতে পারবিনে আমাকে নিয়ে যা। লক্ষ্মী ছেলের মত কথা শুনবি তো শোন নইলে আমি কিন্তু চেঁচিয়ে রাস্তার লোক জড়ো করব।'

অতুল বলল, 'জড়ো করে কি বলবে।'

ভুবনময়ী বললেন, 'কি আবার বলব। লোককে ডেকে ডেকে শোনাব আমার মানুষ আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসে এ পথে ফেলে যাচ্ছে। তোমরা সবাই বি কর। এই বলে যদি চেঁচাতে সুরু ক মজাটা টের পাবি। রাস্তার লোকের কিল কি রকম পড়ে পিঠের ওপর দেখবি একব

পরিচিত দু চারটি ছেলে এরই ম ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। প্রকাশ্য পথের ও দিদিমার এই অসঙ্কোচ প্রণয় নিবেদনে স হাসছে মুখ টিপে।

অতুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'চল যা হাত ছেড়ে দাও।'

ভুবনময়ী বললেন, 'আর কি তোম ছাড়ি কালামাণিক। ছাড়া তো ভালো এ একেবারে আঁচলে বেঁধে রাখব।'

নাতির হাত ধরে ভুবনময়ী বাড়ির দি এগুতে এগুতে বললেন, 'গোবিন্দের বাড় তো আমার যাতায়াত নেই। হুট করে গি উঠতে লজ্জা করে, কিন্তু সবাইকে বল ছেলেটা রাগ করে পরের বাড়িতে রয় তোমরা ওকে ডেকে আন। তা যেমন ব তেমনি মা। এত বয়স হোল কিন্তু মান অ মানের পালাই ফুরলো না তাদের। ত তোকেও বলি অতুল। বাপ মা কি এক ব এক সময় বলে না? তাই বলে অ বাড়িতে থাকে নাকি গিয়ে বাড়ির ছে এমন সৃষ্টি ছাড়া কথা শুনেছিস কোথা

দিদিমার এই পুরনো স্নেহ আদর যে সম্পূর্ণ নূতন লাগতে লাগল অতু কাছে। খানিক আগেও রমার নিষ্ঠ অপমানে তার মনে হয়েছিল পৃথিবী তার কেউ নেই। সে এ বারে নির্বান্ধব আত্মীয়স্বজনহী কিন্তু দিদিমার এই স্নেহ স্পর্ একমুহূর্তের মধ্যে সে যেন আবার পেয়েছে। অতুলের মনে হোল স্নেহময়ী এ বৃদ্ধার মুখ যে কোন তরুণীর মুখের চে সুন্দর, এই রগ জাগা লোল চর্ম হাতে স্পর্শ যে কোন তরুণীর স্পর্শের চে মধুর, রোমাঞ্চকর।

এই কয়েকদিন যে অতুল রাগ করে অ জায়গায় গিয়ে ছিল তার জন্যে লজ্জা বে করবার অবসর দিলেন না ভুবনময়ী। হা ঠাট্টায় সব ভাসিয়ে দিলেন, ভুলিয়ে দিলে বাড়ির অন্য কেউও তেমন কোন মন্তব্য ক বার সুযোগ পেল না। মার কান্ড দে বাসন্তীও মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

ভুবনময়ী বললেন, 'আজ থেকে তোম

কে আমার ঘরে থাকতে দিয়ো বাসন্তী, বরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব।'

রে গোবিন্দের সঙ্গে দেখা হোল লের। গোবিন্দ এগিয়ে এসে বলল, 'কি তুই নাকি রাগারাগি করে চলে ছিস ?'

তুল এবার সত্যিই রাগ করল, 'আমি রাগ করেছি ? কে বলেছে বল তো ? র বড়দি নিশ্চয়ই। নাহক সেই তো কতক-ল কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিল আমাকে। টা আমার নামেই নালিশ ?'

গোবিন্দ বলল, 'বড়দির কথা আর সনে। মাঝে মাঝে ওর মাথার ঠিক থাকে সামান্য কিছু হলেই মেজাজ বিগড়ে আমাকেই কি এক এক কম গালাগাল করে নাকি ? তু আমি কিচ্ছু মনে করিনে, জবাব পর্যন্ত দেইনে। ওর মুখের দিকে চেয়ে সব সহ্য করে যাই। তুইও সহ্য করিস। আহা বড় দুঃখের জীবন ওর।'

অতুল বলল, 'দুঃখের আছে তো আছে। তাই বলে সময় নেই অসময় নেই, যাকে যা মুখে আসে বলে যাবে ?'

গোবিন্দ অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'ওর কথায় রাগ করিসেনে অতুল, জানিস তো ও ওই রকমই।'

অতুল বলল, 'তা যে রকমই হোক আমার কিছু এসে যায় না। তোর বড়দির দুঃখ তুই-ই বোঝ। আমার কিছু বুঝে শুনে দরকার নেই।'

কিন্তু একেবারে অতখানি নির্লিপ্ত থাকা অতুলের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। দিন কয়েক বাদে পিণ্টু এক বাণ্ডিল সেলাই করা জামা নিয়ে এসে অতুলের দিকে এগিয়ে দিল।

অতুল বলল, 'এ কি।'

পিণ্টু বলল, 'বড়দি পাঠিয়ে দিল। আর এই নিন।' বলে পেনসিলে লেখা একটুকরো কাগজ অতুলের হাতে দিল পিণ্টু।

না চিঠিপত্রি কিছু নয়। সুঁচ সুতো কি কি লাগবে তার ফর্দ। গোট গোট সুন্দর অক্ষরে লেখা। একটু আগেও জিনিসগুলি ফিরিয়ে দেবে ভেবেছিল অতুল। কিন্তু সেই অক্ষরগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে বলল, 'আচ্ছা তুই যা।'

পিণ্টু তখনকার মত চলে গেল। কিন্তু ওর যাতায়াত একেবারে বন্ধ হোল না। জামা ফ্রকের ব্যবসাটা পিণ্টুর মারফতই চলতে লাগল অতুলদের।

(ক্রমশ)

আন্তর্জাতিক ছবির কথা

শিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র টি অনেক বিষয়েই ভারতের রে আসবার পথ দেখিয়েছে। একটা বড়ো বিষয় হলো বর্তমান বীর বিদ্যমান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদেরও মঞ্চের ওপরে পাশাপাশি এনে বসিয়ে র কৃতিত্ব ইউনেস্কোকেও হারিয়ে ছে। তাঁরা সবাই ভারত, বিশেষ করে া দেশের ওপরে যে উচ্ছ্বসিত সম্ভ্রম ণ করে গেলেন তাও আগে জানতে যায়নি। সোভিয়েট প্রতিনিধিরা আর সব্বাই তো বাঙলা দেশকে তাদের য় মাতৃভূমি বলে ঘোষণা করার জন্যে পরের মধ্যে বাক্যের প্রতিযোগিতাই য় দিয়েছিলেন। আরও বিস্ময়কর র হলো, অনেকে বাঙলা ছবির এমন খুলিভাবে প্রশংসা করে গিয়েছেন যা া ছবির সমালোচকদের নতুন দৃষ্টি করবে।

রা নিছক তারিফই করে যান নি, দের ছবির দোষত্রুটির দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন। যেমন, কারুর কারুর মতে দের ছবির অতো গান কাহিনীর দিয়া হানির কারণ বলে মনে হয়েছে। র মিসরের প্রতিনিধি ডাঃ ফাতা বের আমাদের ছবিতে গানের সমন্বয় য় হয় বলেই তার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা পৃথিবীর আর কোন দেশের ছবিতে পাওয়া যায় না। তবে একথাও ঠিক দেখা গেলো, নানা দেশের নানা রকমের ছবি আমাদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়ে গেলো যে, আমাদের দেশের ছবি সম্পর্কে আমাদের নিজেদের যে ধারণা তা এখন বদলে ফেলা দরকার। আমরা অনেকের চেয়ে সর্বদিক থেকেই ভালো ছবি তুলি এবং আমাদের ছবি মানবিক আবেদনে যতো সম্পৃক্ত তা খুব কম দেশের ছবিতেই পাওয়া গেলো।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে ছবির ধারা বিন্যাস পদ্ধতির মধ্যে। প্রাচ্যের মধ্যে চীন, জাপান, মিসর ও ভারতের ছবি দেখা গেলো এক সঙ্গে। দেখা গেলো, জীবনকে মধুময় করে তোলার দিকে প্রাচ্যের যতোটা দরদ, পাশ্চাত্যের ছবিগুলি টেকনিকের কসরতে পরম বিক্রম প্রকাশ করে গেলেও ততোটা দরদ ফুটিয়ে তুলতে পারে না। ওদের ছবিতে জীবনের আর মনের চেহারার দাপটটাই হয় বড়ো কথা, কিন্তু প্রাচ্যের ছবিতে চেষ্টা হয় জীবনের মিষ্টি দিকটাকেই হাজির করে দেবার। তাই মেলাতে ২৩টি দেশের যে ৫০খানি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি দেখতে পাওয়া গেলো তার মধ্যে মানবিক আবেদনে জাপানী ছবি "যুসিওয়ারিসু"র আর তুলনা পাওয়া গেলো না।

পুরোপুরিই জাপানী ভাষার ছবি, বুঝিয়ে দেবার জন্যে শব্দে বা লেখায় অন্য কোন ভাষার একটি বর্ণও ব্যবহার করা হয়নি, এবং দরকারও হয়নি তার। কয়েকটি মাত্র চরিত্রকে নিয়ে গল্প, বলতে গেলে তিনটি মাত্র চরিত্র। একটি চার বছরের শিশু, এক তরুণী এবং তার স্বামী। খুঁটিনাটিও বুঝতে অসুবিধে হয় না কারুরই। ছবির ত্রিচতুর্থাংশ ঐ শিশু আর তরুণীটিকে নিয়ে। ছবির আরম্ভ হলো শিশুটিকে নিয়ে। রেল লাইন ধরে এগিয়ে চলেছে, হাতে একটা ব্যাগ। এসে সে দাঁড়ালো একটি বাড়ির দরজায়। দরজা খোলার চেষ্টা করতে লাগলো। তখন নিয়ে আসা হলো বাড়ির ভিতরের দৃশ্য। খানতিনেক ঘরে ঘুরে ঘুরে কাজ করে যাচ্ছে এক তরুণী। তার কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হলো তার স্বামীর প্রতীক্ষায় রয়েছে সে। স্বামী ট্রাকটারের সেলসম্যান, দিন পনেরো হলো মফঃস্বলে গিয়েছে। তরুণীর পরিচয় জানা হয়ে যেতেই সদরে 'বাজার' বেজে উঠলো। তরুণী গিয়ে দেখলে একটি শিশু একটা

টবের ওপর দাঁড়িয়ে "বাজারের" সুইচ টিপছে। ছেলেটি ভিতরে এসে দাঁড়ালো বেশ কেতাদুরস্ত ভাবে এবং নিজের পরিচয় দেবার জন্যে পকেট থেকে একখানি চিঠি বের করে দিলে তরুণীর হাতে। চিঠি পড়ে তরুণী স্তম্ভিতা। ছেলেটি তারই স্বামীর সন্তান। ছেলেটির মা ওকে ওখানে আসবার নির্দেশ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চলে গিয়েছে। ছেলেটি আস্তে আস্তে নিজেকেই সে বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করে নিলে। তরুণী তাকে নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে পারলো না। কটা দিন কেটে গেলো। স্বামী ফিরলো বাড়িতে। তরুণী প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার হাতে তুলে দিলে ছেলেটির দেওয়া সেই চিঠিখানা। চিঠিখানা পড়াতে পড়াতেই ঘটনাটা জানিয়ে দেওয়া হলো—একবার বিমান আক্রমণের সময়ে এক তরুণীর সঙ্গে উক্ত যুবক রাত কাটাতে বাধ্য হয়, আর সেই নৈশ-মিলনের ফল এই ছেলেটি। জীবনে ব্যর্থ হয়ে তার মা আত্ম-হত্যা করেছে। ছেলেটির সম্পর্ক নিয়ে স্বামী আর স্ত্রীর মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে উঠলো। ব্যাপারটা ভয়ানক হয়ে ওঠবার আগেই সবিস্ময়ে ওরা আবিষ্কার করলে ছেলেটি নেই। ছোট্ট ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে রেল লাইন ধরে চলেছে সে। পিছন থেকে দ্রুতবেগে ট্রেন আসছে। আর ছুটে আসছে সেই দম্পতী। দারুণ মুহূর্তে ওরা হুমড়ী খেয়ে ছেলেটিকে নিয়ে গড়িয়ে পড়লো লাইনের পাশে। ট্রেন পার হয়ে গেলো। দারুণ আশঙ্কার হাত থেকে সবাই রেহাই পেলো। তখনও কিন্তু স্বামী-স্ত্রীতে কথা নেই। তিনজনে বাড়ির দিকে ফিরছে, স্বামীর পিঠে ছেলেটি। খানিক দূর এসে স্ত্রী পিঠে তুলে নিলে ছেলেটিকে। তরুণী ছেলেটিকে নিয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছলো দ্রুত। বললে ছেলেটিকে, বাড়ির সব আলো কটা জেলে দাও। ঝটপট করে ঘরগুলো গুছিয়ে নিলে সে। উৎসবের ঝলমলানি ছেয়ে পড়লো বাড়িময়। স্টোভের উপরে জলের কেটলি গরম হতে লাগলো—নিবিড় মিলনের উষ্ণতা। টেবিলের পাশাপাশি পড়লো দুটো নয়, তিনটে ডিস। দরজায় "বাজারের" শব্দ হলো। তরুণী হাতমুখ মুছে ছেলেটিকে নিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালো, মুখে তাদের হাসি। স্বামীর মুখেও হাসি ফুটলো। দুজনের সঙ্গে সংসারের তৃতীয় সভ্যটি স্বীকৃত হয়ে গেলো।

শোনবার চেয়ে দেখার অংশই বেশী। তাও ছবির তিন চতুর্থাংশেই দেখতে ঐ শিশুটিকে আর তরুণীকে। মধ্যে ক সেকেন্ডের জন্যে এক পিরানের মন, আর তা ছাড়া কয়েকটা মাত্র নাচের জন্য মেলার একটা টুকরো দৃশ্য। কিছু ঘটনা তরুণীর গৃহস্থালীর মধ্যেই শিশুটিকে নিয়ে। কিন্তু তরুণীটি ই মধ্যে একটু একটু করে ছেলেটির ভূত মায়ার বশীভূতা হয়ে পড়লো, ই সঙ্গে দর্শকমণ্ডলীও। আর ছেলেটিরও সৃষ্টি করার সে কি অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। ছেলেটির ওপরে সবায়ের টান ধরে যায় কে দেখামাত্র থেকেই। পরিচালকও তাকে নিভাবে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছেন যে, তুতেই আর দৃষ্টি ফেরানো যায় না তার র থেকে। তরুণীর স্বাভাবিক স্থালীর কাজের মধ্যে দিয়ে ঘটনা-সের জাল ঘনীভূত হতে থাকে। শেষে নযুদ্ধের দুর্ঘটনাকে ভুলে গিয়ে ভাবে জীবন যাপনের ইঙ্গিত দ্ধোত্তরকালে পৃথিবীর মত মানুষকেই রে শান্তির পথ বেছে নেবার শ দিয়েছে। যুদ্ধের জন্যে লক্ষ লক্ষ জীবনের পরস্পরের মধ্যে যে সব সন্দেহ ও দ্বেষ এসে আশ্রয় ছে সে সব ভুলে গিয়ে নতুনভাবে যাপনের এমন বলিষ্ঠ আবেদন আর ছবিতে দেখা দেয়নি। সম্পূর্ণরূপেই খানি দাঁড়িয়েছে পরিচালনা কৃতিত্বে। লোকচিত্র এবং আবহ সঙ্গীত পরি-কে প্রভূত সহায়তা দান করেছে। লোকচিত্রে দৃশ্যরচনা ব্যাপারে একটা দত্ত আছে; আলোকের এমন একটা শ সমানভাবে সৃষ্টি করে যাওয়া যা মোহ সৃষ্টি করে তোলায় সফল। সুরটা একেবারেই পাশ্চাত্য ঘেঁষা।

উল্লেখযোগ্য আর সব ছবি

আক্ষেপের বিষয়, জাপান থেকে ঐ মাত্র খানি ছবিই এসে পেঁচিছে; এবং ঐটে দেশের সাধারণ স্ট্যান্ডার্ড হয় তাহলে থিবীর ছবির বাজারে জাপানকে ঠেকিয়ে মুশকিল হবে। গত সেপ্টেম্বর মাসে নিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জাপান সব দেশকে বিস্মিত করে "রসোমোন" নামক একখানি ছবির য়ে প্রথম পুরস্কারটি দখল করে নিয়ে। দ্ধের আগে জাপানই পৃথিবীর মধ্যে চেয়ে বেশী ছবি তুলতো—কোন কোন বছরে সংখ্যা ৪৫০।৫০০ পর্যন্তও হয়ে দাঁড়াতো—হলিউডের চেয়েও বেশী। এখন বেশ দ্রুতগতিতেই যুদ্ধপূর্বকালের সংখ্যায় এসে পেঁচিছে। এখন ওদের ছবি উৎপাদন পরিমাণে পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকারী ভারতের প্রায় কাছে এসে পেঁচিছে।

যুদ্ধের পর সারা পৃথিবীর চলচ্চিত্র শিল্পকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এনে দিয়েছে ইতালি। উৎপাদন পরিমাণে তার স্থান তৃতীয় বা চতুর্থ কিন্তু উৎকর্ষে বর্তমানে সর্বত্রই, এমন কি হলিউডেও ইতালির ছবি আদর্শ বলে অনুসৃত হচ্ছে। ইউরোপ ও আমেরিকার সব দেশের চিত্রশিল্পকেই ইতালিয় ছবি এমন প্রভাবিত করেছে যে, বহু দেশের প্রযোজক আজ ইতালিতে গিয়ে সমবায় নীতিতে ইতালিয়ানদের সঙ্গে মিলেমিশে ছবি তুলতে আরম্ভ করেছে।

ইতালির সব ছবিরই ঘটনা দেখা গেলো যুদ্ধের জের নিয়ে। ধনলোলুপ স্বার্থান্বেষীদের সমাজবিরোধী কাজ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, কালোবাজার ইত্যাদি। অধিকাংশ দেশের ছবিরই এই বিষয়বস্তু আজকাল, কিন্তু ইতালিয় ছবি চমকে দিতে পেরেছে সুস্পষ্ট বাস্তব চেহারাটা ফুটিয়ে তুলে, আর সেটা ওরা সম্ভব করে তুলতে পেরেছে কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করে।

ইতালির যে সব ছবি দেখা গেলো সেসব ছবির বেশীর ভাগ অংশই তোলা রাস্তায়-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে খোলা জায়গায়। অভিনয়ের জন্যেও তেমনি ওরা নিযুক্ত করেছে সত্যিকারের বাস্তব চরিত্রকেই। যেমন, যদি কোন স্টেশনের ঘটনা থাকে এবং তার নায়ক হয় স্টেশন কুলি তো ওরা ছবি তোলে সত্যিকারের স্টেশনে গিয়ে এবং একজন সত্যিকারের কুলিকেই নায়ক সাজিয়ে। এই অকৃত্রিমতা ঘটনা ও চরিত্রকে সহজেই অন্তরস্পর্শী করে তোলে। উপরন্তু ছবি তোলার অনেক ঝামেলা, বিশেষ করে খরচের অনেক বালাই থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

যুদ্ধের ঠিক পর থেকেই যে সব ইতালিয় ছবি সমগ্র চলচ্চিত্র জগতেই যুগান্তর এনে দিয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র "পয়জা" ছাড়া আর সব কখানিই এখানকার মেলাতে নিয়ে আসা হয়েছে। যুদ্ধোত্তর ইতালির সবচেয়ে নামকরা ছবি "বাইসিকল থিফ" এবং ইতালির নবভাব-ধারার যথার্থ প্রতিনিধিমূলক অবদান বলে ধরে নেওয়া যায়। শাশ্বত ও সর্বজনীন মানবিক আবেদনের দিক থেকে এই ছবি-খানিকেই জাপানী "যুকিওয়ারিসু"-র পর উল্লেখ করতে হয়।

যুদ্ধোত্তর কালের অবস্থার ওপরেই যদিও এর ঘটনা তবে এতে মানুষের যে জীবনের ও মনোবৃত্তির চেহারা এঁকে দেওয়া হয়েছে তা স্থানকালধর্মের সীমার সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ নয়। গল্প এক বেকার শ্রমিককে নিয়ে। বাস্তব জীবনেও এই চরিত্রাভিনেতাটি এক বেকার শ্রমিকই ছিলো, এবং এখনও আবার তা-ই আছে। অনেক চেষ্টায় দেয়ালে প্রাচীরপত্র লাগাবার একটা চাকরী পায় সে এই সর্তে যে তার নিজের সাইকেল থাকতে হবে। সাইকেল একটা তার ছিলো, কিন্তু স্ত্রী আর শিশু-পুত্রটির খাবার জোগাতে সেটা বাঁধা পড়েছে। চাকরীর আশায়, সংসারের শেষ মহার্ঘ্য সম্বল বিছানার চাদরজোড়াটি বিক্রী করে সে সাইকেলটি ছাড়িয়ে নিলে। প্রথম দিনে কাজে বের হলো, দেয়ালে পোস্টার লাগাতে সে ব্যস্ত, হঠাৎ দেখলে, একটি লোক তার সাইকেলটি চেপে দৌড় দিচ্ছে। তার পিছু ধাওয়া করলো অনেক-ক্ষণ। এখানে ওখানে অনেক ঘুরলো, কিন্তু চোরকে ধরতে পারলে না। সাইকেল তার চা-ই, নইলে সে স্ত্রীপুত্রকে খাওয়াবে কি করে। পরদিন সকালে বের হলো বছর

চারেকের ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে। সম্ভাব্য স্থানে অস্থানে কতো ঘুরলো সারাদিন ধরে। খুঁজতে খুঁজতে সেই চোরের পাত্তাও বের করলো এক বেশ্যা পল্লীতে, কিন্তু সঠিক প্রমাণ না দাঁড় করিয়ে দিতে পারায় নিজেকেই অপমানিত হয়ে ফিরতে হলো তাকে। হোটেলে ঢুকে বেশ দামী ভোজ খাওয়ালে ছেলেকে শেষ সম্বল খরচ করে। ফেরার পথে নজরে পড়তে লাগলো শত শত সাইকেল, সাইকেলের যতো শোভাযাত্রা। সাইকেল, কেবল সাইকেল, তার মধ্যে তারই সাইকেল নেই। কিন্তু সাইকেল যে তার চা-ই, না হ'লে কাল থেকেই আবার বেকার। হঠাৎ নজরে পড়লো দেয়ালে হেলান দেওয়া একখানা সাইকেল। কাছাকাছি কেউ নেই। ছেলেকে পাঠিয়ে দিলে ট্রামে করে বাড়ি চলে যেতে। তারপর চট করে এক লহমায় সাইকেলখানা নিয়ে দৌড়। দৌড়লো তার পিছু পিছু সাইকেলের মালিক আর জনতা। জনতার হাতে নিগ্রহের অন্ত রইলো না। তবে সাইকেল মালিক পুলিশ পর্যন্ত গেলো না, ওকে ভর্ৎসনা করেই ছেড়ে দিলে। ফিরে দাঁড়াতেই নজরে পড়লো তার ছেলের ওপরে, ট্রাম ফেল করে বাপের নিগ্রহ লক্ষ্য করছিলো এতোক্ষণ। ছেলের সামনেই এই ব্যাপার, ওর সমস্ত চেতনাকে মুষড়ে দিলে একেবারে। আস্তে আস্তে ছেলের হাত ধরে ফিরে চললো বাড়ির দিকে।

ছবিখানার পনেরো আনা ভাগই খোলা জায়গায়, রাস্তায়, বাজারে তোলা। এর অভিনেতারা সবই সত্যিকারের আসল চরিত্র। বাইরের প্রশস্ত জায়গা পাওয়ায় ক্যামেরাও চলেছে তেমনি অবাধে। দৃশ্যগুলি তাই যেমন কৃত্রিমতাবর্জিত হতে পেরেছে তেমনি হয়েছে প্রাকৃতিক প্রাণপ্রাচুর্যে জীবন্ত। আর তাই পরিচালকের পক্ষেও মানবতার প্রতি দরদ এবং মনের আবেগকে স্বতঃস্ফূর্ত এনে দেওয়া সম্ভব হতে পেরেছে। ইতালির ছবিগুলির এই হচ্ছে আসল দান আর এই বৈশিষ্টটাই ইতালির ছবির প্রতি পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে দিয়েছে।

ফরাসী ছবির মৌলিকত্ব

এই মেলার অপর উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট চিত্র হচ্ছে ফরাসী দেশের "আফাঁত দ্যু প্যারাডীস" অর্থাৎ "ভগবানের ছেলেমেয়েরা"।

গল্প হচ্ছে থিয়েটার পাড়ার লোকদের নিয়ে। কেউ নাট্যকে, কেউ শিল্পী, কেউ গাইয়ে, কেউ নাচিয়ে, কেউ মূকাভিনেতা, কেউ ডাকাত, কেউ পকেটমার এমনি অজস্র চরিত্র নিয়ে গল্প। এরা সবাই একই পল্লীর অধিবাসী। একই তারে বাঁধা সবায়ের দুখসুখ। কেউ সৎ, কেউ অসৎ। কেউ প্রেম নিয়ে খেলা করে, কেউ মনের প্রেম মনেই চেপে রাখতে বাধ্য হয়। হাজার হাজার লোককে যে ব্যক্তি দিনের পর দিন আনন্দ বিতরণ করে যায়, তার নিজের অন্তরে অহরহ যে বেদনা সে পরিচয় অনুক্তই থেকে যায়। এমনিই নানা রকমের সব চরিত্র। হুগোর মতো বিশাল পটের ওপরে শত শত চরিত্রের সমাবেশে ঘটনা। সবায়েরই বলবার কথা প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যে যার জীবনের কাহিনী শুনিয়েও দিয়েছে শেষে মিলিয়ে গিয়েছে অবারিত জনস্রোতের মধ্যে। এদের মধ্যে দর্শকদেরও স্থান রয়েছে। এরাই সব ভগবানের ছেলেমেয়েরা।

দীর্ঘ তিন ঘণ্টার ছবি। চরিত্রপ্রধান কাহিনী বলে অভিনয়ের উৎকর্ষের ওপরেই বেশী নির্ভর করতে হয়েছে এবং প্রত্যেকটি চরিত্র যে অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা আর কোন ছবিতেই পাওয়া গেলো না। এ ছবিখানিও বাস্তবকেই নিয়ে, সর্বদেশের সর্বকালের মনের মতো আবেদন সম্পৃক্ত। কীর্তি ও খ্যাতির ভিতরেও যে জীবনের ব্যর্থতা কিভাবে আত্মগোপন করে থাকে তারই ছবি এই "আঁফাত দ্যু প্যারাডীস"।

অন্যান্য দেশের ছবি

বৃটিশ ও আমেরিকার ছবিও মেলাতে এসেছিলো, তবে লোকে সেগুলির ওপরে বেশী নজর দেয়নি, কারণ সকলেই জানে, ও দু'দেশের সব ছবি ক'খানিই স্বাভাবিকভাবেই পরেও দেখতে পাওয়া যাবে, এক সোভিয়েট ছাড়া আর সব দেশের ছবির ক্ষেত্রে ত হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে। তাছাড়া বৃটিশ ও আমেরিকার ছবির ধারা প্রগতি এদেশের সবায়েরই জানা আছে। তবুও হলিউডের "গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ"-এর কথা উল্লেখ করতে হয়। এ ছবিখানি সাধারণ্যে দেখানো হয়নি, দেখানো হয়েছিলো দুটি বিশেষ প্রদর্শনীতে নির্বাচিত দর্শক সমক্ষে। এ ছবিখানাকে সিসিল ডি মিলির জীবনের বিরাটতম কৃতিত্ব, আর সিসিল ডি মিলির সব বিরাট ছবি বলতে কি বুঝায় তা রসিকরা অনুমান করে নিতে পারে। আমেরিকার বৃহত্তম সার্কাস দলকে নি[illegible] এই ছবি। ফরাসী ছবি "আঁফাত"-[illegible] মতোই খেলোয়াড়দের জীবনের ব্যক্তি[illegible] কাহিনী এর বিষয়বস্তু এবং সেই স[illegible] তাদের খেলা, তাদের সামনের শত স[illegible] দর্শক। ছবিখানি তোলার মধ্যে ক[illegible] কৌশল ব্যাপারের যে কৃতিত্ব দেখতে পা[illegible] যায় তা আর সব দেশকেই স্তম্ভিত ক[illegible] দেবে। সোভিয়েটের তোলা সার্কা[illegible] ছবি "সার্কাস অন দি এরিনা" দেখা গে[illegible] কিন্তু "গ্রেটেস্ট শো"-র তুলনায় ও ছবিখ[illegible] কিছুই নয়। তবে একথা বলা যায় খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত কসরতে সোভি[illegible] ছবির আকর্ষণ বেশী।

সোভিয়েট ছবি সম্পর্কে লক্ষ্য ক[illegible] বিষয় হচ্ছে, ওরা যুদ্ধের আগে য[illegible] ছিলো, যুদ্ধের পরে তার চেয়ে [illegible] বিষয়েই কোন মৌলিক উন্নতি তো কর[illegible] পারেই নি, উল্টে আগের চেয়ে ওদের ছ[illegible] আবেদনের সর্বজনীনত্ব গিয়ে এখন [illegible] একপেশে আত্মম্ভরিতার প্রপাগ[illegible] দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এর সবচেয়ে বড়ো প্র[illegible] হলো ওদের "ফল অফ বার্লিন"-[illegible] ছবিখানিকে কাণাকাণি প্রচারের দ্ব[illegible] এতো বেশী ভীড় জমিয়ে দেওয়া হয় [illegible] একদিনে সাতটি প্রদর্শনী এবং [illegible] প্রদর্শনী ভোর তিনটে এবং টিকি[illegible] কালোবাজার সৃষ্টি করিয়ে এক[illegible] টিকিটের দাম বিশ টাকাতে চড়িয়ে [illegible] দমন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। ছ[illegible] খানিতে হিটলারী জার্মান এবং [illegible] আমেরিকা ও বৃটিশকে অত্যন্ত নিচ[illegible] মিথ্যুক ও শঠরূপে দেখানো ছাড়া [illegible] কিছু নেই। যুদ্ধের সময়ে ক[illegible] যুদ্ধের আগেকার তোলা সোভিয়েট [illegible] দেখতে পাওয়া যায় এবং তারপর [illegible] খানকয়েক করে সোভিয়েট ছবি বছর [illegible] নিয়মিতভাবেই দেখতে পাওয়া [illegible] আগে সোভিয়েট ছবির কলাকৌশল[illegible] দিকে যে চমৎকারিত্ব লোকের [illegible] বিস্ময়কর প্রতিভাত হয়েছিলো এখন [illegible] অনেক দেশের ছবির পাশে ফেলে [illegible] গেলো, সোভিয়েট ছবির ওপর সে [illegible] পোষণ করার এখন আর কোন কারণ [illegible] উপরন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে সোভি[illegible] ছবির অনেক অধঃপতনই দেখা [illegible]

১৪ই মার্চ
হইতে চলিতেছে
রুক্সী
বসুশ্রী
বীণা
জেমিনীর
নবতম অবদান
পাতাল
ভৈরবী
বিজয়া প্রোডাকসন
রহস্যময় রোমাঞ্চকর প্রেমকাহিনী

ক্রিকেট

ভারতের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বলিয়া অভিহিত রণজি ক্রিকেট কাপ প্রতিযোগিতার সকল খেলা সুষ্ঠুভাবে ও নির্বিঘ্নে শেষ হইয়াছে। অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত বোম্বাই দল ফাইন্যালে শক্তিশালী ও গত বৎসরের বিজয়ী হোলকার দলকে ৫৩১ রাণে পরাজিত করিয়া এইবারের কাপ বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। বোম্বাই দল এইবার লইয়া ষষ্ঠবার উক্ত কাপ বিজয়ীর গৌরব অর্জন করিল। বোম্বাই দলের এই কৃতিত্ব ও সাফল্য প্রশংসনীয়।

বোম্বাই দলের সাফল্য

বোম্বাই দল প্রতিযোগিতার প্রথম হইতেই বিজয়ী দলের ন্যায় খেলা আরম্ভ করে এমন কি ফাইন্যালে হোলকারের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ লাভ করিয়া ৫৯৬ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। এই বিরাট রাণ সংখ্যার জন্য ওপনিং ব্যাটসম্যানদ্বয় বা প্রথম খেলোয়াড়দ্বয় এম কে মন্ত্রী ও এম এল আপ্তের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংই বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। ইহারা দুইজনেই অতি অল্প রানের জন্য শতরানে বঞ্চিত হন। ইহার পরে শেষ সময়ে বিনু মানকড় ও জি এস রামচাঁদ বেপরোয়া ব্যাটিংয়ের সাহায্যে উভয়ে শতাধিক রান করেন। হোলকারের ধুরন্ধর বোলারগণকে ইহারা যেভাবে মারিয়া দ্রুত রান তুলিয়াছেন তাহা সহজে বিস্মৃত হওয়া উপস্থিত দর্শকগণের পক্ষে অসম্ভব। হোলকার দলও পরে খেলিয়া প্রশংসনীয় ব্যাটিং করেন যাহার ফলে প্রথম ইনিংস ৪১০ রানে শেষ হয়। এই প্রসঙ্গে এক ক্রীড়া সাংবাদিক বহু দিনের পূর্বের রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র দলের খেলার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "ইহা সত্যই আনন্দের বিষয় যে, ভারতে এখনও এই শ্রেণীর ব্যাটসম্যান আছেন, যাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের বিরাট রান সংখ্যা উপেক্ষা করিতে পারেন। বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রের সেই খেলার ইহা যে পুনরাবৃত্তি ইহা বলিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না। হোলকার দলের প্রথম ইনিংসে বোম্বাই দলের ফাদকার ও বিনু মানকড় কার্যকরী হন। ফাদকার একটি দলের ৭টি উইকেট দখল করেন।

এম কে মন্ত্রীর অসাধারণ ব্যাটিং নৈপুণ্য

বোম্বাই দলের অধিনায়ক এম কে মন্ত্রী প্রথম ইনিংসে মাত্র ৬ রাণের জন্য শতরান পূরণ করিতে না পারিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫২ রান করিয়া ব্যাটিংয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। প্রথম বা ওপনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে এইরূপভাবে পর পর দুইটি ইনিংসে ব্যাটিংয়ে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে দীর্ঘদিন কোন ভারতীয় খেলোয়াড়কে দেখা যায় নাই। এই প্রসঙ্গে একজন ক্রীড়া সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত না করিয়া পারি না। তিনি বলিয়াছেন, "এইরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শনের পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কি উপায়ে যে মন্ত্রীকে ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় দল হইতে বাদ দিবেন বুঝিতে পারি না।" এই প্রসঙ্গে স্কুলের ছাত্র এম এল আপ্তের খেলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে হয়। এই তরুণ খেলোয়াড়টি প্রথম ইনিংসে মাত্র ২ রানের জন্য শতরানে বঞ্চিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ইনিংসেও মন্ত্রীকে দৃঢ়তার সহিত সাহায্য করায় মন্ত্রী শতাধিক রান করিতে পারিয়াছেন। বোম্বাই দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ৪৪২ রান করিয়া ডিক্লেয়ার্ড করে।

হোলকারের শোচনীয় ব্যর্থতা

দ্বিতীয় ইনিংসে হোলকার দলের শোচনীয় ব্যর্থতার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। মাত্র ৯৭ রান করিয়া সকলে আউট হইয়াছেন। দলের অধিনায়ক প্রবীণ খেলোয়াড় কর্ণেল সি কে নাইডু দলের ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় এতই মর্মাহত হন যে, শেষ পর্যন্ত খেলায় যোগদান করেন নাই। শারীরিক অসুস্থতার কথা কোন কোন সংবাদপত্রে উল্লেখ থাকিলেও ইহা যে সম্পূর্ণ মানসিক চরম হতাশাপ্রসূত ইহা অন্য কেহ বিশ্বাস না করিলেও আমরা করি।

খেলার ফলাফলঃ—

বোম্বাই প্রথম ইনিংস—৫৯৬ রান (জি এস রামচাঁদ ১৪৯, বিনু মানকড় ১৪১, এম এল আপ্তে ৯৮, এম কে মন্ত্রী ৯৪, অর্জুন নাইডু ১২০ রানে ২টি, সারভাতে ১৬২ রানে ২টি, সি কে নাইডু ৭২ রানে ২টি, বি নিম্বলকার ৭৪ রানে ২টি উইকেট পান।)

হোলকার প্রথম ইনিংস—৪১০ রান (নিভ সরকার ৪৮, মুস্তাক আলী ৪৩, সারভাতে ৭১, বি বি নিম্বলকার ৩৮, সি কে নাইডু ৬৬, এম জাগদেল ৫৯, ফাদকার ১০৯ রানে ৭টি ও বিনু মানকড় ৭২ রানে ২টি উইকেট পান।)

বোম্বাই দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৫ উইঃ ৪৪২ রান (এম কে মন্ত্রী ১৫২, এম আপ্তে ২০, এম) আমলাদি ২৫, আর এস মোদী ৮২, ভি মাঞ্জরেকার ৭৬, জি রামচাঁদ নট আউট ৫৩, এস সোহনী নট আউট ৩২, এইচ গাইকোয়াড় ১২৯ রানে ২টি, সি সারভাতে ১০৬ রানে ২টি উইকেট পান)।

হোলকারের দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৯৭ রান (নিভসরকার ২০, মুস্তাক আলী ৩০, বি বি নিম্বলকার ২৫, এস পি গুপ্তে ৪১ রানে ৪টি, বিনু মানকড় ২১ রানে ৪টি, সোহনী ২২ রানে ১টি উইকেট পান)।

পূর্ববর্তী বিজয়ীগণ

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা ১৯৩৪ সাল হইতে পরিচালিত হইতেছে। এই প্রতিযোগিতায় কোন্ বৎসর কে চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স আপ হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

১৯৩৪-৩৫ সাল—বিজয়ী—বোম্বাই
রানার্স আপ— উত্তর ভারত

১৯৩৫-৩৬ সাল—বিজয়ী—বোম্বাই
রাণার্স আপ—মাদ্রাজ

১৯৩৬-৩৭ সাল—বিজয়ী—নবনগর
রাণার্স আপ—বাঙলা

১৯৩৭-৩৮ সাল—বিজয়ী—হায়দরাবাদ
রাণার্স আপ—নবনগর

১৯৩৮-৩৯ সাল—বিজয়ী—বাঙলা
রাণার্স আপ—দক্ষিণ পাঞ্জাব

১৯৩৯-৪০ সাল—বিজয়ী—মহারাষ্ট্র
রাণার্স আপ—উত্তর প্রদেশ

১৯৪০-৪১ সাল—বিজয়ী—মহারাষ্ট্র
রাণার্স আপ—মাদ্রাজ

১৯৪১-৪২ সাল—বিজয়ী—বোম্বাই
রাণার্স আপ—মহীশূর

১৯৪২-৪৩ সাল—বিজয়ী—বরোদা
রাণার্স আপ—হায়দরাবাদ

১৯৪৩-৪৪ সাল—বিজয়ী—পশ্চিম ভারত
রাণার্স আপ—বাঙলা

১৯৪৪-৪৫ সাল—বিজয়ী—বোম্বাই
রাণার্স আপ—হোলকার

১৯৪৫-৪৬ সাল—বিজয়ী—হোলকার
রাণার্স আপ—বরোদা

১৯৪৬-৪৭ সাল—বিজয়ী—বরোদা
রাণার্স আপ—হোলকার

১৯৪৭-৪৮ সাল—বিজয়ী—হোলকার
রাণার্স আপ—বোম্বাই

১৯৪৮-৪৯ সাল—বিজয়ী—বোম্বাই
রাণার্স আপ—বরোদা

১৯৪৯-৫০ সাল—বিজয়ী—বরোদা
রাণার্স আপ—হোলকার

১৯৫০-৫১ সাল—বিজয়ী—হোলকার
রাণার্স আপ—গুজরাট

সিংহলে ইণ্ডোর ক্রিকেট শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠা

সিংহল একটা ছোট দ্বীপ। তাহার অধিবাসী সংখ্যাও খুব অল্প। অথচ তথায় ক্রিকেট খেলার জন্য একটি ইণ্ডোর ক্রিকেট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল দেখিয়া সত্যই আশ্চর্য হইলাম। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের পরিচালকগণ এইরূপ স্থায়ী ক্রিকেট শিক্ষা কেন্দ্র কবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উৎসাহী হইবেন জানিতে ইচ্ছা করে।

এম সি সি অধিনায়কের প্রশংসা

ভারত ভ্রমণকারী এম সি সি দলের অধিনায়ক নাইজেল হাইওয়ার্ড স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা প্রাক্কালে বোম্বাই বন্দরে ভারতীয় ক্রিকেট খেলার প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল ভাল ফলাফল প্রদর্শন করিবে।" তাঁহার মতে এইবারের এম সি সি ও ভারতীয় দলের খেলার শক্তি প্রায় সমান সমান ছিল। ভারত ব্যাটিং বিষয়ে কিছুটা শক্তিশালী বলা চলে। তরুণ খেলোয়াড়গণ বিশেষ করিয়া পঙ্কজ রায়, ভি এন মাঞ্জরেকার, সি ডি গোপীনাথ প্রভৃতির ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল এই বিষয় তিনি নিঃসন্দেহ।

অলিম্পিক—

আগামী জুলাই মাসে হেলসিঙ্কিতে বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান হইবে। এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিদল যে প্রেরিত হইবে সে

...র আর কোন সন্দেহ নাই। তবে কোন কোন ...য় কতৃকগুলি ভারতীয় প্রতিনিধি যাইবেন ... এখনও স্থির হয় নাই। এমন কি অনেক- ...লি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এইরূপ কর্মতৎপর যে ...নও পর্যন্ত প্রতিনিধির নাম পর্যন্ত ঘোষণা ...রন নাই। এ্যাথলেটিকস, সন্তরণ, ...ন্যাস্টিকস, কুস্তি, সাইক্লিং প্রভৃতি বিষয়ের ...নিধি নির্বাচন পর্ব শেষ হইয়াছে। এই ...র নির্বাচন মাদ্রাজের অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ...ষ্ট হয় ও সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। ঐ ...শ স্পষ্টই বলা হয় যে, আর্থিক অবস্থার ...র মনোনীত সংখ্যার হ্রাস করা হইতে পারে।

...ষ্টিযুদ্ধ—

মুষ্টিযুদ্ধ দল প্রেরণে বিপত্তি

...বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশন বোম্বাইর ...ত নিখিল ভারত বক্সিং ফেডারেশনের ...নীতি লইয়া নিখিল ভারত মুষ্টিযুদ্ধ প্রতি-...যোগিতার অনুষ্ঠান কলিকাতায় করেন। ঐ ...র সারাভারতের মুষ্টিযোদ্ধাগণ এই ধারণা ...সেই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে যে সাফল্য-...ভ করিলে হেলসিঙ্কির বিশ্ব অনুষ্ঠানে ...যোগদান করিতে পারিবে। কিন্তু সম্প্রতি ...এক সংবাদে জানা যায় যে, বোম্বাই ...র নিখিল ভারত বক্সিং ফেডারেশন বলিয়া ...আছে, তাহা ভারতীয় অলিম্পিক এসো-...সিয়েশনের মতে ঠিক আইনসংগতভাবে গঠিত ...র ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশন ...র অনুমোদন ব্যতীত কোন ভারতীয় ...বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগদান ...তে পারে না তাহারা বোম্বাইর প্রতিষ্ঠানকে ...ভারতের জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিষ্ঠান ...করিতে পারে না। ফলে দাঁড়াইল ...কলিকাতায় নিখিল ভারত মুষ্টিযুদ্ধ ...প্রতিযোগিতা বলিয়া যাহা অনুষ্ঠিত হইল তাহার ...মূল্য রহিল না। শোনা যাইতেছে ...বেঙ্গল এমেচার বক্সিং ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষ-...অলিম্পিক আইন অনুযায়ী এক ...ভারত মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া ...অলিম্পিকে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণের চেষ্টা ...করিতেছেন। জুন মাসের প্রথমেই ভারতীয় ...প্রতিনিধিগণ হেলসিঙ্কি অভিমুখে যাত্রা ...করিবেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে একটি নিখিল ...ভারতীয় প্রতিষ্ঠান কিভাবে যে গঠিত হইবে ...তাহা বুঝিতে পারি না।

সাঁতারু দল গঠিত

ভারতীয় সুইমিং ফেডারেশন হেলসিঙ্কির ...প্রথমে কেবল মাত্র ওয়াটার পোলো দল ...প্রেরণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; ...উহা বর্তমানে পরিবর্তন করিয়া কয়েকজন ...তারকেও প্রেরণ করিতেছেন। নিম্নে মনোনীত ...টার পোলো খেলোয়াড় সাঁতারুদের নাম ...হইল—

ওয়াটার পোলো দলঃ—বি বসাক (বাঙলা) ...অধিনায়ক, শচীন নাগ (বাঙলা), কেদার সাউ ...(বাঙলা), মানু চ্যাটার্জি (বাঙলা), শম্ভু সাহা ...(বাঙলা), বিজয় বর্মণ (বাঙলা), কান্তি সাহা ...(বোম্বাই), আইজ্যাক মনসুর (বোম্বাই) ও বরুচা (বোম্বাই), জে লাইগমওয়ালা (বোম্বাই), আর চন্দ্রালী (বোম্বাই), ডি সোণ্ডার (বোম্বাই)।

[আন্তর্জাতিক নিয়মানুসারে ১০ জন সাঁতারু লইয়া ওয়াটার পোলো দল গঠন করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে ১২ জন মনোনীত হইয়াছে। মনে হয় পরে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বাদ পড়িবেন।]

সাঁতারুগণ—(১) প্রফুল্ল মল্লিক (বাঙলা), (২) কে পি ঠক্কর (বোম্বাই), (৩) মিস ডলি নাজির।

শ্রীযুত পি এন আহির দলের ম্যানেজার ও মিঃ কে এফ গোলওয়ালা দলের শিক্ষক মনোনীত হইয়াছেন।

এ্যাথলীটগণ মনোনীত

ভারতীয় এমেচার এ্যাথলেটিক ফেডারেশন পূর্বে স্থির করেন মাত্র ২ জন এ্যাথলীটকে প্রেরণ করিবেন; কিন্তু বর্তমানে উহা পরিবর্তন করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকজনকে মনোনীত করিয়াছেনঃ

পুরুষ এ্যাথলীটগণ

(১) লেভী পিণ্টো (বোম্বাই) ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়।

(২) সুরথ সিং (দিল্লী) ম্যারাথন দৌড়।

(৩) মেহেঙ্গা সিং (পেপসু) উচ্চ লম্ফণ।

(৪) মোহন সিং (সার্ভিসেস) ৮০০ মিটার দৌড়।

(৫) গুলজার সিং (পেপসু) ৩০০০ মিটার ষ্টিপল চেজ দৌড়।

(৬) বলবন্ত সিং (সার্ভিসেস) ১০০ মিটার দৌড়।

মহিলাগণ

(১) মেরী ডিসুজা (বোম্বাই) ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়।

(২) কুমারী নীলিমা ঘোষ (বাঙলা) ১০০ মিটার ও ৮০ মিটার হার্ডল।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৩রা মার্চ—হিজলীতে ভারতীয় কারিগরী শিক্ষায়তনের (ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির) নূতন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিতে গিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁহার মানসপটে ভবিষ্যৎ ভারতের যে মহিমোজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা উদ্ঘাটিত করেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বিশ্বভারতীর আচার্য-রূপে অদ্য প্রথম শান্তিনিকেতনে গমন করেন। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে ধ্যানগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

রাজস্থান ও মধ্যভারত এই দুইটি রাজ্যে নবগঠিত দুইটি মন্ত্রিসভার সদস্যগণ অদ্য শপথ গ্রহণ করিয়া কার্যভার গ্রহণ করেন।

পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও রাজসাহী মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান জনাব মাদারবক্স ও অপর ১৫ জন লোককে পুলিশ পূর্ববঙ্গ জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

৪ঠা মার্চ—বোম্বাই সোনা ও রূপা ব্যবসায়ী সঙ্ঘের বোর্ডের অধিবেশনে সোনার বাজারে সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। অদ্য বোম্বাইয়ের সোনা-রূপার বাজার বন্ধ ছিল।

আর্থিক বৎসরের প্রথম চার মাসকাল ভারত সরকারের ব্যয় নির্বাহকল্পে অদ্য সংসদে প্রায় ২৭১ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের দাবী মঞ্জুর করা হয়।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ সংসদে নেপাল সম্পর্কে ভারতের নীতির উল্লেখ করেন এবং বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি বলেন, "ভারতের নিরাপত্তার প্রশ্ন যে ক্ষেত্রে জড়িত, সেক্ষেত্রে আমরা হিমালয় পর্বতকে আমাদের সীমারেখা বলিয়া মনে করি।"

রাষ্ট্রীয় পরিষদ নির্বাচনে ভারতের সমস্ত নির্বাচন কেন্দ্রেই ২৭শে মার্চ ভোট গ্রহণ আরম্ভ হইবে এবং ১লা এপ্রিল নির্বাচন সমাপ্ত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

৫ই মার্চ—ভারতের বর্তমান সংসদের পঞ্চম ও শেষ অধিবেশন অদ্য অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট তাইহকুর (ফরমোজা) নিকট নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া যে কাহিনী প্রচলিত তাহার সত্যতা নির্ধারণের জন্য গত বৎসর মে মাসের শেষভাগে শ্রী এস এ আয়ার স্বল্পকালের জন্য জাপান পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। শ্রী আয়ার প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুকে জানাইয়াছেন যে, টোকিওর রেঙ্কোজী মন্দিরে যে ভস্ম রক্ষিত আছে তাহা যে নেতাজীর তদ্বিষয়ে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অদ্য সংসদে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু এই রিপোর্ট দাখিল করেন।

শ্রীভীমসেন সাচার সর্বসম্মতিক্রমে পাঞ্জাব বিধানসভার কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন।

৬ই মার্চ—হায়দরাবাদের প্রথম লোকায়ত্ত মন্ত্রিসভার সদস্যগণ অদ্য শপথ গ্রহণ করেন। ১৩ জন সদস্য লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত এবং শ্রী বি রামকৃষ্ণ রাও ইহার মুখ্যমন্ত্রী।

ভারতের নানাস্থান হইতে পণ্যমূল্য হ্রাসের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বোম্বাই সোনা-রূপার বাজার আজ তৃতীয় দিনও বন্ধ রহিয়াছে।

কলিকাতায় এই মর্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত শনিবার পূর্ববঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ পাট ব্যবসায় কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের কালীবাজার এলাকায় এক গুলী চালনার ঘটনার পর উক্ত এলাকায় ব্যাপক ত্রাসের সঞ্চার হয়। গুলী চালনার উক্ত ঘটনায় একজন পুলিশ কনেস্টবল এবং একজন আন্সার নিহত হয়। কালীবাজার এলাকায় বহু গৃহে পুলিশ হানা দেয় এবং মোট ১১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেন।

৭ই মার্চ—ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ব্যাপক বাণিজ্য মন্দা ও পণ্যমূল্য হ্রাসের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আকস্মিকভাবে পণ্যমূল্য হ্রাসের দরুণ বোম্বাইয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শেয়ার বাজারে গত প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, বণিক সম্প্রদায়ের ক্রমান্বয়ে চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা অতিক্রম করা যায় নাই।

আমদাবাদের একটি সংবাদে প্রকাশ, স্থানীয় পাইকারদের নিকট প্রায় ৪ কোটি টাকা মূল্যের ২০ হাজার গাইট কাপড় মজুত পড়িয়া রহিয়াছে। কাপড়ের দর নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা শতকরা ৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

৮ই মার্চ—কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি রাজ্য পরিষদের জন্য এ পর্যন্ত ১৩৭ জন সদস্যকে মনোনীত করিয়াছেন। যাহারা মনোনীত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার শ্রী সি সি বিশ্বাস, শ্রী আর আর দিবাকর, সংসদের সদস্য ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া, সংসদের সদস্য শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণও আছেন।

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই অধিবেশনে কলিকাতায় নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে, তৎসমুদয়ের মোটামুটি রূপ সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

৯ই মার্চ—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নেহরুর সহিত বিহার, মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, আজমীর ও বিন্ধ্য প্রদেশের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উক্ত রাজ্যসমূহে মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে আলোচনা হয়। ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের কংগ্রেস নেতা মিঃ এ জে জন ত্রিবান্দ্রামে প্রত্যাবর্তন করিবার পরেই উক্ত রাজ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিদেশী সংবাদ

৩রা মার্চ—মিশরের নবগঠিত হিলালি মন্ত্রিসভা রাজা ফারুকের নিকট শপথ গ্রহণের পর এক মাসের জন্য পার্লামেন্টের অধিবেশন মুলতুবী রাখেন।

৪ঠা মার্চ—আজ ভোরে উত্তর জাপানের বিভিন্ন স্থানে প্রচণ্ড ভূমিকম্প ও জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। ইহার ফলে উত্তর জাপানস্থিত উপকূল ভাগের এবং হোক্কাইডু দ্বীপের অনেকাংশ নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এ পর্যন্ত প্রায় একশত লোক নিহত ও সহস্রাধিক লোক আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৬ই মার্চ—মহাত্মা গান্ধীর পুত্র শ্রীমণিলাল গান্ধী আজ জোহান্সবার্গে এক ঘোষণায় বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য আইনের প্রতিবাদে তিনি আগামীকল্য হইতে ২১ দিন পর্যন্ত অনশন করিবেন।

৭ই মার্চ—পিকিং বেতারে অদ্য এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, ২৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই মার্চ পর্যন্ত প্রত্যহ ৪৪৮টি মার্কিন বিমান মাঞ্চুরিয়ার বিভিন্ন শহরে বোমাবর্ষণ করে এবং ব্যাপকভাবে রোগ-বীজানুবাহী কীট ছড়াইয়া দেয়।

৮ই মার্চ—রক্ষণশীল সদস্য মঁ এন্টনি পিনের নেতৃত্বে ফ্রান্সে নূতন কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় মুদ্রাঃ প্রতি সংখ্যা—।৶০ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষান্মাসিক— ১০৲
পাকিস্থান মুদ্রাঃ প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৶০ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষান্মাসিক— ১০৲ (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

ম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ংশ বর্ষ] শনিবার, ৯ই চৈত্র, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 22nd March, 1952 [২১শ সংখ্যা

ল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠক

দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পর কাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বেশন হইতেছে। ১৯৩৯ সালের বেশনের কথা আমাদের মনে পড়ে। র পর ভারতের উপর দিয়া বিপুল বনের স্রোত বহিয়া গিয়াছে। ীর সংগ্রামের গতির বহুবিধ ত্রের ভিতর দিয়া ভারত বর্তমানে নতা লাভ করিয়াছে। বিগত অধিবেশনে রা নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কজন বিশিষ্ট পুরুষকে আমরা ইয়াছি। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী দের মধ্যে আজ নাই; শ্রীযুক্তা সরোজিনী ত জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া লোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। সুভাষ- র বিরাট এবং বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাব তে আমরা এখন বঞ্চিত। ত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় তির বিগত অধিবেশন হইতেই সুভাষ- র রাজনীতিক জীবনের কার্যত নূতন য়ের সূত্রপাত হয়। খান আবদুল ফর খাঁর সাধু জীবনের পবিত্র প্রভাবও মান অধিবেশনের গুরুত্ব বর্ধিত করিবে পাকিস্থানের কারাকক্ষে বন্দী অবস্থায় ন্তের সেই মহাপ্রাণ পুরুষ বর্তমানে শয্যায় শায়িত আছেন। প্রকৃতপক্ষে ত অধিবেশনের পর ভারতের রাষ্ট্র- র অভিনব অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। গ্রেস তখন ভারতের একমাত্র জাতীয় তিষ্ঠানস্বরূপে বৈদেশিক প্রভুত্ব উচ্ছেদ নের জন্য ব্রতী ছিল, বর্তমান নূতন রত গঠনের দায়িত্ব তাহারাই উপর সিয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষার মধ্যে প্রতিষ্ঠানস্বরূপে কংগ্রেসের আদর্শে যে ত্যাগ, তপস্যা এবং আত্মদানের নৈতিক দীপ্তি তৎকালে পরিলক্ষিত হইত, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর সেই দীপ্তি, দ্যুতির তেমন চমক এখন নাই। ফলতঃ মহাত্মার আত্মদান এবং সুভাষচন্দ্রের অগ্নিময় তপঃ-প্রভাব ও ত্যাগ-বীর্যও জাতির অন্তরকে তেমনভাবে প্রাণধর্মে জীবন্ত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইতেছে না। আগুন স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি নিরাশ হইলে চলিবে না। কারণ স্বাধীনতা লাভ হইলেও জাতির দুর্গতি এখনও ঘোচে নাই। বরং সমস্যা সমধিক জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রত্যুত স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে যে প্রাণবল বা নৈতিক শক্তির প্রয়োজন ছিল, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর সে প্রয়োজন আরও বাড়িয়াছে এবং এতৎসম্পর্কিত দায়িত্বও রহিয়াছে কংগ্রেসের উপর। কংগ্রেসে সাধনার ঐতিহ্য, মহাত্মা গান্ধীর সুমহান্ আত্মদান এবং শত সহস্র স্বদেশসেবক ও কর্মীর অজস্র শোণিতোৎসর্গের স্মৃতি তো মুছিয়া ফেলিবার নয়। যদি সেই ঐতিহ্য এবং সে-স্মৃতি কংগ্রেসকে আজ দায়িত্ববোধে সচেতন রাখিতে না পারে, তবে বুঝিতে হইবে, ভবিষ্যৎ আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন। কারণ নৈতিক শক্তি জাতির অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করে, কর্মসাধনার মূলে বলিষ্ঠ প্রেরণা যোগায়। প্রত্যুত যদি সেই শক্তি এবং তেমন কর্মসাধনার বলিষ্ঠ প্রেরণা জাতির মধ্যে না জাগে, তবে বিদেশীর প্রভুত্বের উচ্ছেদ ও জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং কংগ্রেসের উপর যে দায়িত্ব আপতিত হইয়াছে, সে দায়িত্ব তাহাকে প্রতিপালন করিতেই হইবে। বস্তুত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ঠিক এই কাজটি সম্পন্ন হওয়া সহজ নয়; কারণ, জাতির সর্বজনীন আদর্শগত ঐতিহ্য সুদীর্ঘ সাধনার ফলেই গড়িয়া উঠে অধিকন্তু সেই পটভূমিকা দুই-এক বৎসরের মধ্যে গড়িয়া তোলা সম্ভব নহে। বাস্তবিকপক্ষে কংগ্রেসের আদর্শের অপহ্নব কিছু ঘটিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা চলে না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেশ ও জাতি কংগ্রেসের উপরই এখনও আস্থা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। বিগত সাধারণ নির্বাচনে এই সত্যই মোটামুটিভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির বর্তমান অধিবেশন এই দিক হইতে বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষায় কংগ্রেসের সমগ্র কার্যক্রমের বিচার করা আজ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেসের সাধনায় নৈতিক শক্তিকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়া জনমনের সেবার সূত্রে জনচিত্তের সঙ্গে তাহার সংযোগ সুদৃঢ় করিবার কর্তব্য আজ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে শুধু অতীতের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় আর নাই। বর্তমানের উপযোগিভাবে কংগ্রেসের আদর্শকে জীবন্ত করিয়া তোলাই দরকার। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির

অধিবেশনে নব ভারত সংগঠনের অভিনব অধ্যায় উন্মুক্ত হইবে এবং দুর্নীতির যেসব জাল-জঞ্জাল কংগ্রেসের ভিতর আসিয়া জমিয়াছে, সেগুলি নিঃশেষে নিরাকৃত হইবে, আমরা এই আশা অন্তরে লইয়া পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে সর্বভারতীয় নেতৃবর্গকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং বর্তমান অধিবেশনের সাফল্য কামনা করিতেছি।

পূর্ববঙ্গে ফ্যাসিস্ট নীতি

জনসাধারণের দাবীকে ভিত্তি করিয়া কোন আন্দোলন দেখা দিলেই তাহাকে পিষ্ট করিবার পক্ষে পাকিস্থানের শাসকবর্গের একটি প্রধান অস্ত্র আছে। এ সত্য বহু-ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সে ক্ষেত্রে হিন্দুরা সেই আন্দোলন প্ররোচিত করিতেছে এবং ভারত হইতে পাকিস্থানকে ধ্বংস করিবার ভয়াবহ ষড়যন্ত্র তাহার মূলে রহিয়াছে, এই যুক্তি তাঁহারা উপস্থিত করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য মধ্যযুগীয় সাম্প্রদায়িকতায় প্রভাবিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করিবার পক্ষে এই অস্ত্র অমোঘ এবং অতি সহজেই এইভাবে তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়। দেখা যাইতেছে, বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষাস্বরূপে ধার্য করিবার জন্য পূর্ববঙ্গের সর্বত্র যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহাকে দমন করিবার উদ্দেশ্যেও এই অস্ত্রই প্রযুক্ত হইতেছে। পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে যে, হিন্দুরা ঐ আন্দোলনের মূলে রহিয়াছে এবং পাকি-স্থানকে ধ্বংস করিবার জন্য এইভাবে প্রকাণ্ড একটা চক্রান্ত সুরু হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে সরকার সময়মত ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে পাকিস্থান রক্ষা পাইয়াছে ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই কথার মূলে যে কোন ভিত্তিই নাই, পূর্ব পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র গুপ্ত একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন এবং সে সত্য নানাভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। তবু মিথ্যা প্রচারের জোরে বদ্ধসংস্কারের পাকে পড়িয়া সত্য হইয়া দাঁড়ায়। সাম্প্রদায়িক নীতির এই প্রয়োগ-নৈপুণ্যই পাকিস্থান রাষ্ট্রের নিয়ামকগণ সার বুঝিয়া লইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন সম্প্রতি একটি বেতার বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঢাকায় ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের যখন সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল এবং তরুণদের রক্তে মাটি ভিজিয়াছিল, তখন 'জয় হিন্দ', 'যুক্ত ভারত' এই সব ধ্বনি শোনা গিয়াছিল। বস্তুত চিত্ত-বিভ্রমের ফলে সবই সম্ভব। জনাব নুরুল আমীনের এই উক্তি চিত্ত-বিভ্রম হইতে উদ্ভূত মনের বিকার মাত্র। কারণ, ঢাকার ছাত্র আন্দোলনে হিন্দু ছেলেরা যোগ দেয় নাই। ছাত্র আন্দোলনের যাহারা উদ্যোক্তা সেই সব ছেলেরাই একথা দৃঢ়তার সঙ্গে জানাইয়া দিয়াছে। কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে এই সম্পর্কে ছাত্রদের যে আন্দোলন ঘটে, হিন্দুদের কোন সম্পর্ক তাহাতে ছিল না। একথা মুসলমান নেতারা পর্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি হিন্দুদিগকে এই আন্দোলনের মধ্যে টানিয়া আনা দরকার, কারণ তাহা হইলে সরকারের মর্জি মিটাইবার পথ পরিষ্কার হইয়া যায়! পূর্ববঙ্গ সরকারের এই নীতির একজন জাঁদরেল গোছের সমর্থক জুটিয়াছে। আনসার দলের ইনি অধিনায়ক। ইনি মিঃ দোহা। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান' আন্দো-লনের শোণিতসিক্ত অধ্যায়ে মধ্যযুগীয় অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনা সৃষ্টি করিতে পুলিশ কর্মচারীস্বরূপে ইঁহার কৃতিত্ব কলিকাতাবাসী অবগত আছেন। বিবেকের বালাই বলিতে এ ব্যক্তির কিছুই নাই, শুধু আছে সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা। পূর্ববঙ্গের জেলায় জেলায় ঘুরিয়া ইনি প্রচারকার্য চালাইতেছেন। রাষ্ট্র-ভাষা আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া হিন্দুরা কিরূপে দুরভিসন্ধি চালাইতেছে, ইহাই প্রতিপন্ন করা ইঁহার প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য। দোহা সাহেব দিব্য-দৃষ্টি প্রভাবে দেখিয়াছেন যে হিন্দুরা মুসলমানের পোষাক পরিয়া মুসলমান ছাত্রদের উস্কাইয়াছে। তাঁহার মতে পাকি-স্থানীরা এই আন্দোলনের মধ্যে নাই, গোটা ব্যাপারটাই হিন্দুদের কারসাজী। অধিকন্তু পশ্চিমবঙ্গ হইতে ইহার প্রেরণা আসিতেছে। কিন্তু এই আন্দোলন সম্পর্কে যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাঁহারা কয়জন ভারতের লোক দোহা সাহেব নাম করিতে পারেন কি? বস্তুত আন্দোলনের নেতৃ-স্বরূপে যে সব মুসলমান নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাঁহারা যে পাকিস্থানী সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নাই। হিন্দুদের মধ্যে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, দোহা সাহেব তাহাদিগকে পাকি-স্থানী বলিয়া মানিয়া না লইতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা নিজদিগকে পাকিস্থানী বলিয়াই গণ্য করেন এবং সেই গবর্ণ... প্রতিই আনুগত্য পোষণ করিয়া থা... সতীন সেন, মনোরঞ্জন ... গোবিন্দ বাড়ুজ্যে, ইঁহারা স্ব... প্রেমিক এবং কর্মী পুরুষ। ইঁহ... আন্তরিকতার সম্বন্ধে কেহই সন্দেহ... পোষণ করিবেন না। বাস্তবিকপক্ষে, পূ... বঙ্গ সরকার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত আ... লন সম্পর্কে যে নীতি অবলম্বন ক... ছেন, তাহার ভুল উপলব্ধি করা তাঁহ... পক্ষে অনেক আগেই উচিত ছিল। ক... ভাষাকে অবাঙালীর পক্ষে অবশ্য বি... স্বরূপে ধার্য করিয়া এই পথে তাঁ... অগ্রসরও হইয়াছিলেন। এইভাবে জন... অনুকূলতার পথে চলিলে সমস্যা জ... হইয়া উঠিত না। কিন্তু চাকা উপর হ... ঘুরিতেছে, পূর্ববঙ্গ সরকারকেও ... পাকেই নিজেদের গতি নিরূপণ কর... হইতেছে। প্রত্যুত বাঙলা ভাষাকে রা... ভাষার মর্যাদা দানে পাকিস্থানের কেন্দ্... সরকারকে রাজী করানো দুঃসাধ্য ব্যপা... পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ইহা বুঝি... লইয়াছেন, তাই এই আন্দোলনকে সমূ... উৎখাত করিবার জন্য তাঁহাকে সাম্প্রদা... প্রবৃত্তিকে প্ররোচিত করিতে হইতেছে এ... হিন্দুদের এবং ভারতকে এই ব্যাপারে দো... স্বরূপে দাঁড় করাইতে হইতেছে। কি... পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন মুসলীম লীগ কর্... দাবীটি সমর্থিত হওয়াতে কেন্দ্রীয় সরকা... সম্ভবত সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে... ফলত গণতান্ত্রিক চেতনা রাষ্ট্রের মধ্যে ... যদি জাগে, তবে পদে পদে সাম্প্রদা... জিগীরে দেশের লোককে দীর্ঘ ... বিভ্রান্ত করা যায় না এবং এই ... দীর্ঘদিন লোকে ভুলেও না। ... পূর্ববঙ্গের উন্নতি এবং ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রি... এমন জাগরণের উপরই নির্ভর করিতেছে... সেই জাগরণ যদি না ঘটে, ... পাকিস্থানের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া... পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য মর্যা... হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যলিপি

গত ১লা চৈত্র শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকা... বর্তমান বিধানসভার শেষ অধিবেশনে আগামী বৎসরের বাজেট উপস্থিত করিয়া... ছেন। এই বাজেটে আগামী বৎসরে ৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকার মত ঘাটতি হইবে এ...

...মান করা হইয়াছে। নূতন বাজেট ...ম্বন্ধে নবগঠিত বিধানসভাই বিশেষভাবে ...বেচনা করিবেন। ৩১শে মার্চ পূর্ব ...জেটে গৃহীত ব্যয় মঞ্জুরী মেয়াদ শেষ ...ইয়া যাইবে। এই মধ্যবর্তী সময়ের জন্য ...রকারী ব্যয় মঞ্জুর করাইয়া লওয়াই এখন ...জেট উপস্থিত করার উদ্দেশ্য। কিন্তু ...র্থসচিব বাজেট যেভাবে উপস্থিত ...রিয়াছেন, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ...বস্থা স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে। অর্থ-...চিবের বিবৃতিতে বুঝা গিয়াছে যে, ...শ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা ক্রমেই ...বনতির দিকে যাইতেছে। দেশ বিভাগের ...লে পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা বিপর্যস্ত। উদ্বাস্তুদের সংস্থান এবং ...নর্বসতি বিধান একটা বিরাট ব্যাপার। ...হার উপর পূর্ববঙ্গে যে সব ব্যাপার ...টিতেছে, তাহার প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গে ...মস্যার উপর নূতন সমস্যার ...টিলতা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। অবস্থার ...স্থিরতা কিছুই বুঝিয়া উঠা যাইতেছে না। ...ধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৈনন্দিন জীবনধারণের উপযোগী সংস্থান বিধান করা একান্তই প্রয়োজন, নতুবা পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবনের কাঠামো একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এমন আশঙ্কার কারণ যথেষ্টই রহিয়াছে। পণ্য মূল্য হ্রাসের একটা ঝোঁক দেখা দিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহা এখনও উল্লেখযোগ্য স্তরে নামে নাই। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে অর্থের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী; অথচ ভারত সরকার এই সঙ্কটকালে পশ্চিমবঙ্গকে উপেক্ষা করিয়াই চলিতেছেন। অর্থসচিব সে উপেক্ষার অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্ত যুক্তিসংগত দাবীগুলিও ভারত সরকারের নিকট মর্যাদা পায় নাই। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে তাঁহারা অবিচারের উপর অবিচারের বোঝাই চাপাইতে প্রবৃত্ত আছেন। অবিভক্ত বাঙলায় ভারত সরকার হইতে বাঙলা দেশ আয়-করের শতকরা ২০ ভাগ পাইত, দেশ বিভাগের পর সে স্থলে তাহার জন্য ১২ ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছে। অবিভক্ত বাঙলা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পাট রপ্তানি শুল্কের শতকরা ৬২৷৷ ভাগ পাইত, বর্তমানে তাহার অদৃষ্টে জুটিতেছে মাত্র ২০ ভাগ। ভারত সরকার শ্রীযুত চিন্তামণ দেশমুখের উপর আয়কর এবং পাট শুল্কের পুনর্বণ্টন সম্পর্কে একটা যুক্তিসংগত ব্যবস্থা নির্দেশের ভার দিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই। অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি এইখানেই নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কার্য-ভার গ্রহণ করিবার কিছুকাল পরেই ভারত সরকার এই ভরসা দিয়াছিলেন' যে, উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের জন্য তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গকে আবশ্যকমত অর্থ সাহায্য করিবেন। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসেই দেখা গেল যে, ঐ আশ্বাসের কোন মূল্য নাই। ফলে সে আশ্বাসের উপর ভরসা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সকল পরিকল্পনায় হাত দিয়াছিলেন, তাহার অনেক কিছু পরিত্যাগ করিতে হইল। সাধারণের অর্থের কিছু অপব্যয় ঘটিল মাত্র। এরূপ অবস্থায় উপায় কি? বলা বাহুল্য পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের অবস্থা যে পর্যায়ে আসিয়া পড়িয়াছে এবং এত সব গুরুতর সমস্যা লইয়া এই রাজ্যের অধিবাসীরা বিব্রত যে, নূতন কর স্থাপন বা কর বৃদ্ধির দ্বারা আর্থিক প্রয়োজন মিটানো এখানে অসম্ভব। ফলত আয়ের সূত্রগুলি হইতে ন্যায্য অংশ পাইবার অধিকার হইতে পশ্চিমবঙ্গ যদি বঞ্চিত হয় এবং তাহার ফলে গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলির কার্য ব্যাহত হইতে থাকে, তাহা হইলে অর্থনৈতিক কোন ভেল্কী খেলিয়াই অবস্থার উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার হইতে অর্থ সাহায্য দাবী যাহাতে রক্ষিত হয় সেই দিকেই দৃষ্টি দেওয়া সর্বপ্রথমে প্রয়োজন।

বাঙলার সাহিত্য-সাধনার বৈশিষ্ট্য

বাঙলার সাহিত্য-সাধনার বিশিষ্টতা কি? বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই কিছু আছে; কিন্তু তাহা প্রাদেশিকতা নয়, জামসেদপুরে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে ডক্টর প্রবোধকুমার বাগচী তাঁহার অভিভাষণে এই কথাটা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন। তিনি প্রাদেশিকতাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি স্পষ্ট ভাষাতেই এ কথাটা বলিয়াছেন যে, জাতির সভ্যতার অগ্রগতি লাভ করে তখনই যখন তাহাতে প্রাদেশিকতার ছাপ পড়ে। এই হিসাবে চিত্রে, কলা-ভাস্কর্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাঙলার বৈশিষ্ট্য স্পষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু বাঙলার সংস্কৃতির প্রাদেশিক এই বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতার স্থান নাই। বাঙালীর সূক্ষ্ম রস-সংবেদনে দেশ ও জাতির মনোমূলে ভাবের ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়াছে; কিন্তু তাহার ফলে সর্বভারতীয় উদার দৃষ্টিকেই সে সম্প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। দেশপ্রেমে বাঙালী এত ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে এবং এমন অবদান দিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহা সর্বভারতীয়। বাঙলার সংস্কৃতি এবং তাহার সাহিত্য-সাধনার গতি ব্যাপ্তি-চেতনার এই বলিষ্ঠ রীতিই ধরিয়া চলিয়াছে। ডক্টর প্রবোধকুমার সত্যই বলিয়াছেন, বাঙালীর নিজস্ব এই সাধনার গতি বৈপ্লবিক। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য সব ক্ষেত্রেই বাঙালী তাহার প্রাণধারাকে বৈপ্লবিক প্রেরণায় ছড়াইয়া দিয়াছে এবং সমগ্র ভারতকে আত্মোপলব্ধির পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে বাঙালীকে যাঁহারা প্রাদেশিকতার দোষে দুষ্ট বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারা বাঙালীর সংস্কৃতির প্রাণধর্মের এই প্রাচুর্যের দিকটা গভীরভাবে তলাইয়া দেখেন না। তাঁহারা বিচার করিতে ভুলিয়া যান যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে প্রাণশক্তির খেলা পরবর্তী যুগে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বাঙলার সংস্কৃতি ও সাধনাই তাহার উৎসস্বরূপে কাজ করিয়াছে এবং বাঙলার মনীষাই ভারতে নব সৃষ্টির উদার দৃষ্টিকে প্রথমে উন্মুক্ত করিয়া দেয়। সুতরাং প্রাদেশিকতার অপবাদ বাঙালীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ক্ষুণ্ণ করিতে উদ্যত হইলে ভারতের পক্ষে তাহা আত্মঘাতী পন্থায় পরিণত হইবে। বাস্তবিকপক্ষে বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূলীভূত ব্যাপ্তি চেতনাকে ভিত্তি করিয়া সর্বভারতীয় অখণ্ড ভাবনা উজ্জীবিত করিয়া তুলিবার উপরই ভারতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে এবং বাঙলা সাহিত্যের প্রকৃত মর্যাদাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই তাহা সম্ভব।

ধ্বংস ও গঠন

মিসেস ইলিনর রুজভেল্ট বর্তমানে ভারত-ভ্রমণে ব্যাপৃত আছেন। ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এই মনস্বিনী মহিলাকে গৌরবজনক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে মিসেস রুজভেল্ট বর্তমান সভ্যতার পরিপ্রেক্ষায় জগতের ভবিষ্যৎ গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথ

উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে গণ-তান্ত্রিকতার পথে ভারতের সমস্যাগুলির সমাধানের উপরও জোর দিয়াছেন। মিসেস রুজভেল্ট একটি মৌলিক প্রশ্ন উঠাইয়াছেন। তিনি বলেন, আধুনিক সভ্যতার বিকাশের পথে আমরা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি এবং যেসব নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ফলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলনের একটা ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। মানব-সংস্কৃতির স্বাভাবিক অভিব্যক্তির এই গতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আমরা যদি ইচ্ছা করি, তাহা হইলেও কি আমরা পরস্পরকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইব? প্রশ্নটি খুবই জটিল। বস্তুত সমষ্টিগত চেতনায় ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত, কিংবা জাতিগত স্বার্থ-ভাবনার সংকীর্ণ দৃষ্টি যদি দূর হয়, তবেই এই প্রশ্নের সমাধানের পথ প্রকৃতপক্ষে প্রশস্ত হইতে পারে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। মিসেস রুজভেল্টকে অভিনন্দন করিতে গিয়া রাষ্ট্রপতি বলেন, আমরা জড় প্রকৃতির উপর যথেষ্ট কর্তৃত্বই লাভ করিয়াছি। অতীতে এতটা কাহারো কল্পনায়ও আসে নাই; কিন্তু সেই তুলনায় নিজেদের উপর আমরা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হই নাই। আমাদের মনের উপর কর্তৃত্ব লাভ করাই বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে; নতুবা বাহিরের কর্তৃত্ব আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। রাষ্ট্রপতি বলেন, অহিংসা-মন্ত্রের উদ্যোগ-স্বরূপে গান্ধীজী এই কর্তৃত্ব লাভের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে শান্তির সম্বন্ধে নীতিগত উপদেশ প্রদানই বর্তমান অবস্থায় যথেষ্ট নয়, সমষ্টি-সাধনায় মনের গতিকে সেই উদ্দেশ্য সাধনে কার্যকর করিয়া তোলাই এখন দরকার। গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামের কথা উল্লেখ করিয়া রাষ্ট্রপতি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারত অহিংস নীতির পথে অপর দেশের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, জগতের সর্বত্র সেই নীতি অনুসৃত হোক, ভারত ইহাই চায়। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি এক্ষেত্রে রাজ-নীতির বাহ্যান্তর অতিক্রম করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির মূলীভূত সত্যকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। ফলত সে সত্যের ভিত্তিতেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্ভব, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের পথে নয়। দেখিতেছি, বৃটিশ শ্রমিক দলের নেতা মিঃ মাইকেল ইয়ং ভারতের পরিস্থিতির বিচার করিতে গিয়া সম্প্রতি সেই কথাই বলিয়াছেন। তাঁহার মতে পাশ্চাত্য জগৎ নূতন এক রকম দারিদ্র্য গড়িয়া তুলিয়াছে। এ-দারিদ্র্য হইল ভিতরের, বাহিরের নয়। ধনী যাহারা, তাহাদের নিজ-দিগকে দরিদ্র বলিয়া মনে করিতেছে এবং তাহাদের মধ্যে স্বার্থ-পিপাসা বড় হইয়া উঠিতেছে। এই রাক্ষসী বৃত্তি হইতে মুক্ত থাকিয়া ভারতকে নিজের দারিদ্র্য দূর করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী সেই পথই দেখাইয়াছেন। ভারত যদি সেই পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়, তবে নিজের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য-সমাজের আধুনিক অনেক দুষ্কর সমস্যার সমাধানের পথ প্রদর্শন করিয়া মানব-সভ্যতাকে সে সমৃদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। মিঃ ইয়ংয়ের এই উক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করা বর্তমানে আমাদের পক্ষে বিশেষভাবেই প্রয়োজন। নতুবা বর্তমান সভ্যতার অবদানের অশেষ মহিমাও আমাদিগকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

ফাটকাবাজদের সংকট

দ্রব্যমূল্য একটু হ্রাস পাওয়ার ঝোঁক দেখা দেওয়া মাত্রই ব্যবসায়ী সমাজ হইতে কলরব উত্থিত হইয়াছে এবং বাজারে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টাও কিছু কিছু আরম্ভ হইয়াছে। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, ভারতের প্রধান মন্ত্রী সার্থবাহ দলের এই আর্তনাদে বিচলিত হন নাই, বরং দ্রব্যমূল্য হ্রাসের এই ঝোঁককে স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেজন্য সন্তোষ বোধ করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলাল স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন, কৃত্রিমভাবে দ্রব্যমূল্যের হার বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, এখন সেই কৃত্রিম অবস্থা এলাইয়া পড়িতেছে, ইহা সুখেরই বিষয়। ইহার ফলে ফাটকাবাজেরা অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, হওয়াই উচিত। মন্দার ফলে বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী মহলে নাকি ইহার মধ্যেই ছয় কোটি টাকা লোকসান ঘটিয়াছে, কিন্তু ইহারা কৃত্রিমভাবে দর বাড়াইয়া লাভ করিয়াছিল কত টাকা? পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, একজনের হয়তো লোকসান হইয়াছে, কিন্তু অপর সকলে তাহা দ্বারা উপকৃত হইবে। বাস্তবিক পক্ষে কৃত্রিমভাবে দ্রব্যমূল্যের এইভাবে বৃদ্ধির পথে বাধা দেওয়াই কর্তৃপক্ষের আগে উচিত ছিল; তাঁহারা সোজাসুজি এতদিন সে কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ ছিলেন। আজ জগতের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে লাভখোরদের সব অভিসন্ধি পণ্ড হইতে বসিয়াছে, ইহা সুখেরই বিষয়। এই মন্দার ফলে উৎপাদন যাহাতে হ্রাস না পায়, কর্তৃপক্ষকে সেজন্য কড়া নজর রাখিতে হইবে। লোভী ব্যবসায়ীর দল কারবার বন্ধ করিয়া উৎপাদন হ্রাস করিবার ফিকিরে আবার দর বাড়াইবার মতলব বাঁধিতে পারে। বহু শ্রমিককে বেকার অবস্থায় ফেলিয়া একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে পারে। তাহাদের সে সব উদ্যম যাহাতে ব্যর্থ হয়, সেজন্য কর্তৃপক্ষের পূর্ব হইতেই প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন এবং দরকার হইলে কতকগুলি কারবার চালু রাখিতেই হইবে এবং উৎপাদন হ্রাস করাও চলিবে না, এমন জরুরী ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, লাভখোর এই সব মুনাফা শিকারীদের প্রতি দেশবাসীর বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নাই। দুর্দিনে গরীবের রক্ত শোষণ করিয়া ইহারা পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যতে ইহারা ইহাদের নখদংষ্ট্রা আর বাড়াইয়া দিতে না পারে, ইহা করা আবশ্যক। বস্তুত ভারতের জনমত এই বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে এবং কর্তৃপক্ষ বর্তমান অবস্থায় যদি জনসাধারণের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে তাঁহাদের কর্তব্য পালনে দৃঢ়তা অবলম্বন না করেন, তবে সমগ্র ভারতে দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হইবে, পরন্তু কংগ্রেসের আদর্শের উপরও দেশের লোকের কোন আস্থা থাকিবে না এবং নানাভাবে অশান্তির উদ্বেজক উপাদানসমূহ রাষ্ট্র-জীবনে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

আগামী ৬ই এপ্রিল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যালান গবর্নমেণ্টের বর্ণবিদ্বেষ-প্রসূত নীতি ও আইনের বিরুদ্ধে একটি অহিংস প্রতিরোধ সংগ্রাম আরম্ভ করার কথা আছে। এই সংগ্রামের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এটা হবে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত অশ্বেত অধিবাসীদের যুক্ত সংগ্রাম। এতে আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বংশজাত ও অন্যান্য অশ্বেত অধিবাসীরা যোগ দেবেন। তিনশো বছর আগে ৬ই এপ্রিল তারিখে হল্যাণ্ডের জ্যান ভ্যান রাইবেক (Jan Van Reibeck) কেপএ অবতরণ করেন। ঐ তারিখটি দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেত উপনিবেশ পতনের তারিখ বলে ধরা যায়। ডক্টর ম্যালানের ন্যাশনালিস্ট পার্টি খুব ধুমধাম করে জ্যান ভ্যান রাইবেকের দক্ষিণ আফ্রিকায় অবতরণের ত্রিশতবার্ষিকী পালন করছে। তাদের এই একমাসব্যাপী সমারোহ ৬ই এপ্রিল তারিখে উদ্‌যাপিত হবে। দক্ষিণ আফ্রিকা যে সাদাদেরই সম্পত্তি এটা যতটুকু সম্ভব উৎকর্ষভাবে জাহির করাই হোল এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য। এদিকে আবার অশ্বেতরাও ৬ই এপ্রিল তারিখটিকে তাঁদের আত্মরক্ষা সংগ্রামের প্রারম্ভ দিবস হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এটা তাঁদের পক্ষে মোটেই অযৌক্তিযুক্ত কাজ হয় নি। তাঁরা সাদাদের কোনো ন্যায্য অধিকার কেড়ে নিতে চান না, কিন্তু সাদাদের গভর্নমেণ্ট যে ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে অশ্বেতদের এক শ্রেণীর ন্যুযোতর জীব করে রাখতে উদ্যত হয়েছে তার বিরুদ্ধে তো দাঁড়াতেই হবে। ৬ই এপ্রিল যখন ন্যাশনালিস্টদের বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণাত্মক মনোভাবের প্রতীক হয়ে উঠেছে তখন অশ্বেতদের পক্ষেও ঐদিনে অহিংস আত্মরক্ষার আহ্বানে একত্রে দাঁড়ানো উচিত। এটা অবশ্য ম্যালান গভর্নমেণ্ট ও ন্যাশনালিস্টদের কাছে অশ্বেতদের একটা নূতন ঔদ্ধত্যের লক্ষণ বলে বোধ হবে এবং এটাকে সংঘর্ষ বাধাবার সুযোগ হিসাবেও ব্যবহার করার চেষ্টাও হয়ত হবে।

এই আশঙ্কার কথা ভেবেই আত্মশুদ্ধির উপবাসরত শ্রীযুক্ত মণিলাল গান্ধী আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে ৬ই এপ্রিল তারিখে কোনোরকম জনসভা বা বিক্ষোভ প্রদর্শনের অনুষ্ঠান না করতে অনুরোধ করেছেন। তাঁর ভয় এই যে তা নাহলে দুই পক্ষের উগ্রপন্থীদের মধ্যে মারামারি হবে এবং তার ফল খারাপ হবে। সাদাদের তরফ থেকে মারামারি লাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা হওয়া খুবই স্বাভাবিক সন্দেহ নেই, কারণ তাহলে সৈন্য পুলিশ দিয়ে আন্দোলনকারীদের শায়েস্তা করার একটা সুযোগ মিলবে। অশ্বেত নেতারা অহিংস প্রতিরোধের পন্থা অবলম্বনে কৃতসংকল্প। তবে অপর পক্ষের আঘাত খেয়ে সকলে অহিংস থাকতে পারবে কিনা তার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু এরকম ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করা যায় না, কিছুটা অনিশ্চয়তা সব সময়েই থাকবে। এমনকি মহাত্মা গান্ধী যখন অহিংস সংগ্রামের নেতৃত্ব করেছেন তখন তাঁকেও অল্পবিস্তর এই অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়েই কাজ করতে হয়েছে। অন্যান্য কারণে যখন সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠেছে অথবা সংগ্রামের সময় অনুকূল বলে বুঝেছেন তখন গান্ধীজী প্রস্তুতির সম্পূর্ণতার জন্য অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতেন না। বর্তমান ক্ষেত্রে কী করা উচিত হবে নিশ্চিত হয়ে বলা কঠিন।

৬ই এপ্রিল থেকে অহিংস প্রতিরোধ সংগ্রাম আরম্ভ করার সংকল্প হঠাৎ বা সম্প্রতি নেয়া হয় নি। গত জুলাই মাসে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস, সাউথ আফ্রিকান ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস এবং ফ্রানচাইজ এ্যাকসন কাউন্সিল (Franchise Action Council)—এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সমিতির একটি সম্মেলন হয়। তাতে আলোচনা হয় কীভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত অশ্বেতগণ একযোগে আত্মরক্ষা করতে পারেন। এই সম্মেলনে একটি জয়েণ্ট প্ল্যানিং কাউন্সিল (Joint Planning Council) নিযুক্ত হয়, তার কাজ হোল কিভাবে উপরোক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠান অশ্বেতনিপীড়নের বিরুদ্ধে এক-যোগে সংগ্রাম চালাতে পারে তার উপায় নির্দেশ করা। এই জয়েণ্ট প্ল্যানিং কাউন্সিল একটি দীর্ঘ ও বিশদ রিপোর্ট দেন। গত ১৭ই ডিসেম্বর আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই রিপোর্টটি আলোচিত হয় এবং তার সুপারিশগুলি সমর্থিত ও গৃহীত হয়। রিপোর্টের মূল বক্তব্য ছিল এই যে বিভিন্ন অশ্বেত প্রতিষ্ঠান-গুলি এই দাবী জানাবে যে ২৯এ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে গভর্নমেণ্টকে যাবতীয় অশ্বেতবিরোধী আইন প্রত্যাহার করতে হবে। অন্যথায় অশ্বেত প্রতিষ্ঠানগুলি অহিংস প্রতিরোধ আরম্ভ করবে। ১৭ই ডিসেম্বর আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস স্থির করেন যে ৬ই এপ্রিল তারিখ থেকে অহিংস প্রতিরোধ সংগ্রাম আরম্ভ হবে। অন্যায়, গণতন্ত্র-বিরোধী, বর্ণবিদ্বেষমূলক ও মানুষের সাধারণ অধিকারের পরিপন্থী এমন কয়েকটি নির্দিষ্ট আইনের অমান্য করাই হবে এই অহিংস প্রতিরোধ সংগ্রামের রূপ। কোনো বিশেষ জাতি, সমাজ বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম নয়, সংগ্রাম অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে যে আইনের উদ্দেশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যার এক বিরাট অংশকে চিরদিন দুর্দশা ও দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা।

এই সংগ্রাম যত দেরী করে আরম্ভ করা হবে ততই সেটা কঠিনতর হবে। যত দিন যাচ্ছে অশ্বেতবিরোধী আইন কানুনের সংখ্যা এবং ন্যাশনালিস্ট পার্টির বর্ণবিদ্বেষের উগ্রতা ততই বাড়ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আগামী বছর সাধারণ নির্বাচন হবে। তাতে ন্যাশনালিস্ট পার্টিই জয়ী হয়ে আসবে এটা একরকম নিশ্চিত। অশ্বেতরা যদি এখন কিছু না করে বসে থাকে তবে বর্তমানে তাদের যে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে ন্যাশনালিস্টরা সেগুলিও ভেঙে দিতে পারে, তখন আত্ম-রক্ষার কোনো উপায়ই থাকবে না। সুতরাং অহিংস প্রতিরোধ সংগ্রাম বেশিদিন মুলতুবী রাখা বিপজ্জনক।

৬ই এপ্রিল তারিখে কিছু না করার জন্য শ্রীযুক্ত মণিলাল গান্ধীর অনুরোধের ফল কী হয় বলা কঠিন। বহুদিন পূর্ব থেকে এই তারিখটি নির্দিষ্ট হয়ে আছে, এখন এটি বাতিল করলে অশ্বেত জনসাধারণের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলা যায় না। তারা নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে পারে। শ্রীযুক্ত মণিলালজী ৭ই মার্চ থেকে আত্মশুদ্ধির উপবাস আরম্ভ করেছেন, তিনি ২১ দিন উপবাস করবেন। এই সময়ে তিনি যে মত-প্রকাশ করেছেন সেটা দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য অশ্বেত নেতারা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন কিন্তু এখন পিছনোও কঠিন।

১৬।৩।৫২

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

আম্র মুকুল

ভ'রে গেছে মঞ্জরীতে হিয়ার রসাল কুঞ্জবন।
ক'রে গেছে মধূৎসবে মধুব্রত গুঞ্জরণ।
ঝ'রে গেছে সে মঞ্জরী চৈৎ ফাগুনের তপ্ত বায়
হ'রে নেছে সেই বায়ু তার ফল ফলাবার সব ব্যথায়।

ফুলের বেশি চাইনি কিছু কি লাভ বল' তার চেয়ে?
মকর কেতু তুষ্ট হ'লেন শ্রেষ্ঠ মুকুল শর পেয়ে।
কবিমনের অম্বপালীর ফলে কভু নেইক লোভ,
মহাথেরী হয়নি ব'লে তাহার প্রাণে রয়নি ক্ষোভ।

বেনুবনে

উতল হাওয়ায় বেণুবনে শুনছ তুমি কোন বাণী?
ও-নয় উহার হর্ষ-গীতি ওযে ব্যথার কাতরানি।
বেণুর তনুর স্তরে স্তরে সুপ্ত যে গীত মৌন ভরে,
কে তাহারে জাগিয়ে দিবে। কে আনিবে তায় টানি?
"হাজার গীতি পুষছি প্রাণে" কয় বেণু বন খেদ করি'
কে তারে হায় বাইরে আনে আমার হৃদয় ভেদ করি'!
কোথায় কবি-রাখালেরা,
কোথায় সুরের শিল্পী সেরা।
পরাণ আমার গুমরে মরে, ঠিক ঠিকানা না জানি'॥"

উর্বশী ও পুরূরবা

মানুষের ঘরে নেমে এসেছিল স্বর্গের অপসরী
প্রেমে নেমেছিল মানবীর রূপ ধরি'।
একদা সহসা মিলাইয়া গেল কোন সে অশুভ খনে,
কোন রূপ আর ধরেনি সে ত্রিভুবনে।
সেই অপসরী উর্বশী যার ছিল লীলা সহচরী
সেই পুরুরবা আজো খ'জে তায় নিখিল বিশ্ব ভরি।
যুগে যুগে সে যে নবীন জন্ম লভি
দেশে দেশে হ'ল কবি।
ভুলিতে পারে নি স্বর্গের প্রেয়সীরে,
সারাটি জীবন খ'জে খ'জে তাই ফিরে।
খ'জে সে গগনে ভূধরে গহনে তটিনীর কূলে কূলে
খ'জে তরংগে মৃগ বিহংগে কাননের ফুলে ফুলে।
সন্ধ্যা তারায় জ্যোৎস্নাধারায় শরতের ছায়া পথে,
দামিনীছটায় মেঘের ঘটায় ইন্দ্রের মায়া রথে।
খুজেছে নিখিল ললনাকুলের লাবণ্য সুষমায়
ক্ষণে ক্ষণে চমকায়।

কোথাও দেখে সে সেই কটাক্ষ কোথাও দেখে সে হাসি
কোথাও দেখেছে ঘন কুন্তল রাশি।
কোথাও দেখে সে বসনপ্রান্ত কোথাও রক্তাধর,
কোথাও শোনে সে পদপল্লব তুলে যায় মর্মর।
কোথাও শোনে সে কণ্ঠের বাণী; পায় অংগের ঘ্রাণ
কোথাও ক্ষণিক পরশ লভিয়া শিহরি মুহ্যমান।
কোথাও দেখে সে গুরু নিতম্ব। চারু পয়োধর চূড়া।
কোথাও দেখে না পুরা।
প্রকৃতির মাঝে বিলীন হইয়া দেহবিমুক্তি লভি,
দিবা ললনা করিছে ছলনা হায়রে জানে না কবি।
ফিরে পেতে তারে খ'জিতেছে নিতিনিতি
এই সন্ধানই বাণীরূপ ধরে হইয়া কাব্যগীতি।
যুগে যুগে তাই এক কাব্যই হইতেছে ভাসমান
নাম বুঝি তার উর্বশী সন্ধান।
কবি পুরুরবা ক্লান্ত হইয়া নবীন জন্ম লভে,
সে ভাবে এবার উর্বশী তার ঘরের প্রেয়সী হবে।

ভারত ইতিহাসে কংগ্রেস

সুবোধ ঘোষ

ভারতের বিগত ছেষট্টি বৎসরের ইতিহাস হলো কংগ্রেসেরই ইতিহাস"। —একথা বলেছেন কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি পণ্ডিত জওহারলাল নেহরু। একথা বলেছেন বিদেশের সুধী মনীষী এবং ইতিহাসপ্রণেতা রাজনীতিবিৎ। এশিয়া মহাদেশের যেসব জাতি পরশাসনের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, তাঁদের নেতা এবং সাধারণ মানুষ উভয়েই একটি ঐতিহাসিক উপলব্ধির কথা অকুণ্ঠভাবেই ঘোষণা ক'রে থাকেন—ভারতের কংগ্রেসের ইতিহাস হলো এশিয়ারই মুক্তিসাধনার ইতিহাস। মহাত্মা গান্ধী তাঁর মহামৃত্যু বরণের তিনদিন আগে হরিজন পত্রিকায় 'কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও চিন্তার যে পরিচয় লিখে রেখে গেছেন, তার মধ্যে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য, মূল্য, গুরুত্ব এবং প্রয়োজনের তত্ত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

> "ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বহু অহিংস সংগ্রামের ভিতর দিয়া কংগ্রেস মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে, আজ তাহার মরণ ঘটিতে দেওয়া যায় না। জাতির যখন মৃত্যু ঘটিবে, শুধু তখনই কংগ্রেসের অবসান ঘটিতে পারে।

জাতির মৃত্যু হ'লে তবেই কংগ্রেসের মৃত্যু হবে, মহাত্মার এই উক্তির মধ্যেই কংগ্রেসের ঐতিহাসিক পরিচয়ের মর্মকথাটিই অভি-ব্যক্ত হয়েছে। কংগ্রেস এমনই এক প্রতিষ্ঠান যা আজ জাতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। জাতীয় সত্তার মধ্যেই কংগ্রেসের সত্তা নিহিত। জাতির ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা হর্ষ ও বেদনার তন্তু দিয়ে কংগ্রেসের অবয়ব রচিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রাণে আঘাত পড়লে জাতির প্রাণেই আঘাত পড়ে। এ প্রতিষ্ঠান যদি বিভ্রান্ত হয়, তবে জাতি বিভ্রান্ত না হয়ে পারে না। কংগ্রেস জীর্ণ হলে জাতি জীর্ণ হয়। কংগ্রেস ভুল করলে সারা জাতি সে ভুলের প্রকোপে পীড়িত হয়।

বিগত ছেষট্টি বৎসরের ঘটনা দিয়ে রচিত হয়েছে কংগ্রেসের এই ঐতিহাসিক সত্তা। এ প্রতিষ্ঠা প্রপেগ্যাণ্ডার কীর্তি নয়। কংগ্রেস ভারতীয় জীবনের স্বভাবজ তথা প্রাকৃতিক সৃষ্টি। জাতিদেহ হতে কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, অন্ততঃ এখনো তো করা যায় না। যদি কোন অতিরূঢ় আঘাতে এমন বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভবপরও হয়, তবে সেটা সমগ্র জাতির প্রাণশক্তিকেই দীর্ণ করা

হবে এবং তার ফলে হবে জাতির মৃত্যু। ভারতের নদনদী ও পর্বতমালা যেমন ভারতীয় ভূমির যুগব্যাপী আগ্রহের সৃষ্টি, কংগ্রেসও তেমনি ভারতীয় মনোভূমির শতাব্দীব্যাপী আগ্রহের সৃষ্টি। জাতির আত্মপ্রকাশের ইচ্ছার যজ্ঞ থেকে আবির্ভূত কংগ্রেস। এ প্রতিষ্ঠানের প্রাণপদার্থ বাইরে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসা ঐশ্বর্য নয়, কোন প্রবল নরপতির রাজসূয় আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টিও নয়। সারা ভারত নিজেকে প্রকাশ করেছে কংগ্রেসরূপে, আপন বেদনায় এবং আপন আগ্রহে। কংগ্রেসের আবির্ভাব এবং অভ্যুদয়ের ঘটনাকে বলা যায় ভারতীয় জীবনের পুনরাবিষ্কার, পুর্ণসৃষ্টি বা নব-জন্ম। ভারত ইতিহাসের ১৮৫৭ সন স্মরণ করলেই বুঝা যায়, কি অবস্থায় এবং কিভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের জীবনে কংগ্রেস নামে এক অভিনব সংঘশক্তির অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশশক্তিকে পরাভূত ও বিতাড়িত করবার সশস্ত্র উদ্যোগ ব্যর্থ হলো। পেশোয়ার থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত ভারতের সেদিনের জীবন ব্রিটিশের প্রচণ্ড প্রতিশোধের আঘাতে রক্তাক্ত ও অশ্রুসিক্ত। তার পরের অধ্যায় হলো, ভারতে ব্রিটিশ-প্রতাপের বনিয়াদ অতি কঠিন শাসনের গাঁথুনি দিয়ে সুদৃঢ় করার অধ্যায়। প্রতিবাদহীন, রুদ্ধকণ্ঠ ও নিরস্ত্র ভারত। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী সেসময় ব্রিটিশশাসনকে ভগবানের অনুগ্রহ ব'লে স্তুতি করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। রাজা-রাণীর স্তবগানে এবং ব্রিটিশ রাজপুরুষের প্রশংসাতে দেশের সাহিত্য ভারাক্রান্ত। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল, এর মধ্যে ভারতের এখানে-ওখানে শিক্ষিত সমাজে ধর্ম সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটা নতুন আকাঙ্ক্ষার আন্দোলন কিছু কিছু জেগে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আন্দোলন সংঘবদ্ধভাবে কোথাও আত্মপ্রকাশ করেনি।

১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল—ঊনবিংশ শতাব্দীর এই অধ্যায়টি ভারতীয় জীবনের আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতারও অধ্যায়। এই ব্যাকুলতারই সৃষ্টি জাতীয় কংগ্রেস। নবজন্মলাভের জন্য ভারতের প্রাণ নিজের বেদনায় ও আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তারই প্রকাশ কংগ্রেস। এ আবির্ভাব ভারতেরই বহু আগ্রহে মন্থিত চিত্তসাগর হতে উদ্ভূত এক শক্তির

আবির্ভাব। কংগ্রেসই ভারতের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেসই ভারতের প্রথম প্রতিবাদ ও প্রথম সমালোচনা। ভারত রাষ্ট্রের শাসনকার্যে ভারতীয়ের আত্মাধিকার লাভের প্রথম দাবী কংগ্রেস।

কংগ্রেস ভারতের প্রকৃতি থেকে আবির্ভূত। পরাধীনতার অবমাননায় পীড়িত ভারতের মনোভূমিতে মুক্তিকামনার প্রথম অংকুর কংগ্রেস। এর পরিণতিও দেবদারু মহীরুহের মত সহজ ও স্বাভাবিক। ভারতে আরও অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু এই সব রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি ও পরিণতি বস্তুতঃ প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। এই সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন না কোন আক্ষেপ অভিযোগ বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের ঘটনা থেকে উদ্ভূত। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনায় অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির গুণে ধর্মে ও স্বভাবে এখানেই একটি ঐতিহাসিক পার্থক্য রয়েছে।

বহুদিন আগে বাঙ্গলাদেশের এক পরিহাসনিপুণ কবি কংগ্রেসকে 'কঙ্গরস' আখ্যা দিয়ে রসিকতা করেছিলেন। কিন্তু সে-সময়েই বাঙ্গলাদেশের আর এক কবি প্রতিবাদ করে যে-কথা বলেছিলেন তা'তে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক তাৎপর্যেরই একটি ভাবময় ব্যাখ্যা পাই। শুধু তাই নয়, কবির ভাবনায় ভবিষ্যতের রূপ কতখানি নির্ভুল হয়ে দেখা দিতে পারে, তারও একটি সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মাত্র বার বৎসর বয়স্ক সেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং ভবিষ্যৎ উপলব্ধি ক'রে কবি গোবিন্দদাস সেই সময় কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন :

"এ মহান্ প্রজাহোমে
কবোষ্ণ শোণিত সোমে
সদা প্রীত প্রজাপতি সহস্র শিরস্ !"

অর্ধশত বৎসরেরও আগে বাঙ্গলারই এক কবি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতের জনতাজীবনের এক বিরাট অভ্যুত্থানের সংকেত নিয়ে দেখা দিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের বাণীতে ভারতে প্রজাতন্ত্রেরই 'আওন কি আওয়াজ' সেদিন শুনতে পেয়েছিলেন যে কবি, ধন্য তাঁর অনুভব, দিব্য তাঁর কল্পনা। আজ দেখা যায়, অর্ধশত বৎসর পূর্বের বিদ্রূপই ব্যর্থ হয়ে গেছে, সত্য হয়েছে শুধু কবির উপলব্ধি—ভারতের প্রজাহোম। কংগ্রেস স্বয়ং ভারতের প্রজা-সাধারণের সঙ্ঘে পরিণত হয়েছে এবং সেই সঙ্ঘই ভারতকে প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

কংগ্রেস নামে যে সঙ্ঘ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার গঠনপদ্ধতি অবশ্যই পশ্চিমের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের অতীত ইতিহাসে ঠিক এধরণের সঙ্ঘ কখনো ছিল না। বৌদ্ধ যুগে অবশ্য কয়েকবার 'মহা সঙ্গীতি' আহূত হয়েছিল। দেশের সর্বপ্রান্ত এবং এমন কি বিদেশ হতে আগত বৌদ্ধ সুধীদের সেই সব সম্মেলন ভারতীয় জীবনে সঙ্ঘ গঠনের একটি ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সেই মহা সঙ্গীতি ধর্মশাস্ত্রের রচনা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান-পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠ করবার সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার নিদর্শন। ভারতের ইতিহাসে জনসাধারণের রাজনৈতিক উদ্যমের প্রথম সঙ্ঘ স্থাপনার উদাহরণ কংগ্রেস। এর আগে ভারতের ইতিহাসে রাজা নামে এক ব্যক্তির ইচ্ছা আগ্রহ ও উদ্যমেই সকল রাজনৈতিকতার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে। ভারতের রাজনীতিকে রাজার নেতৃত্ব থেকে প্রজার নেতৃত্বে প্রথম এনেছে জাতীয় কংগ্রেস। ভারতের রাষ্ট্রজীবনে রাজসূয় অধ্যায় সমাপ্তির পর, কবিবর্ণিত 'প্রজাহোমের' প্রথম অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছে কংগ্রেস।

আধুনিক পশ্চিমের কাছ থেকে রাজনৈতিক তত্ত্বের শিক্ষা গ্রহণ ক'রেই কংগ্রেসের সঙ্ঘগত জীবনের যাত্রা সুরু হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, কংগ্রেস বিগত অর্ধশত বৎসরের ঘটনায় ও পরীক্ষায় এমন রূপান্তর লাভ করেছে যেটা এখন সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় প্রতিভারই একটি নূতন এবং বিশিষ্ট সৃষ্টি ব'লে মনে হয় এবং বস্তুতঃ তাই। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অনুরূপ কোন সঙ্ঘ পৃথিবীর কোন দেশে নেই। এত বড় সঙ্ঘ এবং এত প্রাচীন সঙ্ঘ পৃথিবীর কোন দেশে নেই। পৃথিবীর কোন রাজনৈতিক সঙ্ঘকে ভারতের কংগ্রেসের মত এত বিবিধ ও ব্যাপক সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়নি। এ ভারতভূমি জীবনের ও সমস্যার বৈচিত্র্যে একটি পৃথিবীর মতই। নানা ভাষা, নানা মত নানা পরিধান—এই বিবিধের মধ্যেই এক মহান্ মিলন রচনার যে প্রয়াসে কংগ্রেসের জীবন কেটেছে সে প্রয়াস পৃথিবীর কোন রাজনৈতি[ক] সঙ্ঘকে গ্রহণ করতে হয়নি। এদিক[ে] কংগ্রেস পৃথিবীর রাজনৈতিক সঙ্ঘসমূহে[র] মধ্যেই প্রকৃতিতে, রূপে, গঠনে এবং কৃতি[ত্বে] অভিনব এবং অতুলনীয়। এ কা[জ] ভারতকেই পুনর্গঠন করার কাজ। এ কা[জে] ভারতের কোন শ্রেণী সমাজকে অনাহূ[ত] ক'রে রাখেনি কংগ্রেস। বিরাট ভারতভূমি[র] সকল সমাজের জীবনের দাবীকে একত্রি[ত] ক'রে, সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে দ্বারাই পরিপূর্ণ মঙ্গলের ঘট প্রথম স্থাপ[ন] করেছে কংগ্রেস। ভাবের ক্ষেত্রে পৌরাণি[ক] কবি যে ভারত কল্পনা করে গিয়েছিলে[ন] কর্মের ক্ষেত্রে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে[ছে] ভারতের জনশক্তির প্রথম প্রতিষ্ঠান কংগ্রে[স।] শেষ পর্যন্ত ভারতের কংগ্রেসই সঙ্ঘশক্তি[র] নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, যাকে বর্তমা[ন] সভ্যতার ক্ষেত্রেই ভারতীয় প্রতিভার এ[ক] নতুন দান বলা যায়। আফ্রিকা এবং এশি[য়া] মহাদেশের প্রত্যেক পরশাসনপীড়িত জা[তি] ভারতের কংগ্রেসের মধ্যেই সঙ্ঘগঠনের এ[ক] নতুন ও সার্থক্ আদর্শের সন্ধান পেয়ে[ছে।] বিংশ শতাব্দীর জাতিমুক্তির ই[তি]... লিখবেন ভবিষ্যতের যে ঐতিহাসিক, ত[াঁর] কাছে এ সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েই দে[খা] দেবে যে, পরশাসিত জাতির মুক্তিসংগ্রা[মের] প্রেরণাদাতা ও পদ্ধতিপ্রদর্শক হলো ভার[তের] কংগ্রেস।

কংগ্রেসের সংগ্রামপদ্ধতিতে বিশ্বসভ্যতা[র] ক্ষেত্রে একটি মানবীয় নীতির ও সং[...] প্রথম পরীক্ষা হয়েছে। নিরস্ত্র [...] স্বাধীনতা লাভের জন্য সশস্ত্র বৈদে[শিক] শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে প[ারে] এবং সে সংগ্রাম সফল হয়—এই আশ্বা[স...] ঐশ্বর্য লাভ করেছে বিশ্বের মান[ুষ।] সংগ্রামের পদ্ধতি শান্তিপূর্ণ হ'তে পা[রে,] প্রবলের হিংসার বিরুদ্ধে একটি জ[াতি] অহিংস পন্থায় বিদ্রোহ করতে পারে, [এ] শিক্ষা ভারতের কংগ্রেসের কর্মপদ্ধ[তির] মধ্যেই প্রথম লক্ষ্য করেছে পৃথিবী।

চল্লিশ কোটি মানুষের দেশ নি[...] সংগ্রামে স্বাধীনতা লাভ করেছে, এ ঘ[টনা] ভারতের রাজনৈতিক জীবনেই প্রথম [...] হয়েছে এবং ভারতের সে রাজনৈ[তিক] জীবনের অধিনায়ক হয়েছে কংগ্রেস।

কংগ্রেস ভারতের অতীত ও বর্তমা[নের] সেতুবন্ধ। অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে দে[...] দিয়ে অনেক জাতি একেবারে নতুন [...]

াধুনিক হয়েছে। এর অর্থ এই যে, দ-জাতি তার জাতীয় সংস্কৃতিকেই বর্জন রতে বাধ্য হয়েছে। কংগ্রেসের গৌরব এই য, ভারতের সকল জ্ঞান ও মনীষা এবং াংস্কৃতিক জীবনের সকল ঐতিহ্যকে রক্ষা রে বিজ্ঞান-প্রসন্ন বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান, র্ম ও চেতনাকে ভারতীয় জীবনে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছে। রাজনৈতিক সংঘ গঠনে পাশ্চাত্যের রীতি গ্রহণ করেও কংগ্রেস রাজনৈতিক সংগ্রামে পাশ্চাত্যের রীতি গ্রহণ করেনি। এবিষয়ে কংগ্রেস একেবারে নির্ভুলভাবে ভারতীয় মানসের মর্যাদা রক্ষা করেছে এবং এর ফলেই কংগ্রেস যথার্থ ঐতিহাসিক শক্তি লাভ করেছে। সমন্বয়ের পথে চলা, বহুর মধ্যে ঐক্যের সূত্র সন্ধান করা, প্রভেদকে বৈচিত্র্যবাদে পরিণত করা —ভারতীয় মনীষার আবিষ্কৃত এই সূচির নীতিগুলিকেই আশ্রয় ক'রে কংগ্রেস তার রাজনৈতিক কর্মবাদের রূপ ও পদ্ধতি গঠন করেছে। এ সত্ত্বেও কংগ্রেস নিতান্তই অতীতের পোষক নহে, ভারত-জীবনের বহু ঐতিহ্যগত অন্যায়কেও ধ্বংস করতে কংগ্রেস কুণ্ঠিত হয়নি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সামাজিক বৈষম্যের বিলোপসাধনের অনেক প্রয়াস অত্যন্ত রূঢ় পন্থায় অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। সমাজবিপ্লবের সে পন্থা হত্যার বীভৎসতায় এবং মানুষের রুধিরে সিক্ত হয়েছে এবং এত বড় সংহারপর্বের পরেও দেখা গেছে যে, বৈষম্যের বিনাশ হয়নি। ভারতের কংগ্রেসও সমাজবিপ্লবের অনুষ্ঠাতা। 'অস্পৃশ্যতা' নামক ভারতীয় জীবনের এক বহুব্যাপক এবং বহুযুগপ্রচলিত অমানবীয় সংস্কারকে উচ্ছেদের সংগ্রাম গান্ধী-নেতৃত্বে চালিত কংগ্রেসই করেছে। শুধু অস্পৃশ্যতা নামে ভারতীয় জীবনের এক অতি পুরাতন বৈষম্যবাদের পাপকেই নয়, অন্যান্য প্রত্যেকটি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে কংগ্রেস।

নারী-পুরুষের সমানাধিকার, চাষী-শ্রমিকের মর্যাদার অধিকার, আরণ্য আদি-বাসীর নাগরিক অধিকার—এই সব সামাজিক সাম্যের নীতিগুলি বহু ভারতীয় সুধী ও মনস্বীদের চিন্তায় দেখা দিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এই নীতিকে আইডিয়ার ক্ষেত্র থেকে কর্মের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সারা দেশে সক্রিয় উদ্যমের সূচনা করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে জাতির সামাজিক আত্মসংস্কারের এক বৃহৎ কর্ম-সূচীও সর্বদা প্রতিপালিত হয়েছে। সেই কারণে কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতি তার রাজনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে এক মহান্ সমাজবিপ্লবেরও অনুষ্ঠান সুসম্পূর্ণ করতে পেরেছে। ধর্মমত এবং 'জাতে'র পার্থক্য ভারতীয় ঐক্যের এক প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। ভারতের অতি প্রাচীন যুগের ঋষি থেকে সুরু করে রামকৃষ্ণ পরমহংস পর্যন্ত, ভারতীয় সাধক সমাজের চিন্তায় কর্মে ও বাণীতে সমন্বয়ের এবং মিলনের ধর্মই প্রচারিত হয়েছে। অথচ, এই ভারতেই 'জাত' এবং ধর্মমতের প্রভেদে ভারতীয় জীবনের শান্তি ও সৌষ্ঠব বহুকাল ধ'রে ক্ষুণ্ণ হয়েই এসেছে। এই প্রভেদবাদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রত্যক্ষ আঘাত দিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতির আত্মসংস্কারের এই আন্দোলনও ভারতব্যাপী আন্দোলনরূপে জেগে উঠেছে। ভারতীয় সাধকের সমন্বয়বাদের আদর্শকে জাতীয় জীবনে প্রথম মর্যাদা দিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের এ সংগ্রাম অবশ্য আজিও ক্ষান্ত হয়নি।

ভারত ইতিহাসে অবনতির এক একটি অধ্যায়ের কারণ অনুসন্ধান করলে দুটি ভ্রান্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যে যে কালে ভারত বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করেছে এবং যে যে কালে ভারত সামাজিক ভেদবাদে নিজেকে অসংহত করেছে, সেই সেই কালেই ভারত বৈদেশিক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই দুটি ভ্রান্তিই ভারতীয় জীবনকে দুর্বল ও অভিশপ্ত করেছে। অথচ ভেদবিরোধী সমন্বয়ের নীতি এবং 'বিশ্বতোমুখী' ভাবনাই হলো ভারতীয় মনীষার বৈশিষ্ট্য। সাধারণ ভারতীয়ের প্রাত্যহিক প্রার্থনার জন্য বিশ্বকল্যাণ মন্ত্র রচনা করে গিয়েছেন ভারতের কোবিদ ও সাধক। বিস্ময়ের বিষয় যে, সে ভারতবাসীও এক এক সময় বিশ্বের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ক্ষুদ্র আত্মশ্লাঘা অথবা সংস্কারগত ভীরুতার মধ্যে কমঠবৃত্তি অবলম্বন করেছে। ভারতের কংগ্রেস জাতির এই কমঠ সংস্কার ভেঙে দিয়ে বিশ্বের সুখদুঃখের সঙ্গে ভারতীয় মানুষের হৃদয়ের যোগ স্থাপনে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। ভারতীয় জাতির মর্যাদা অভ্যুত্থানের এই ব্রত আরম্ভ করেছে কংগ্রেস তার সূচনাকাল থেকেই। ১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে দেখা যায় যে, তিব্বতে ব্রিটিশের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছে। এশিয়াতে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের বিরুদ্ধে এই বোধ হয় এশিয়ার প্রথম প্রতিবাদ এবং সেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে কংগ্রেসের কণ্ঠে। বহির্বিশ্বের ভারতীয় জাতির হৃদয়ের সঙ্গে প্রীতির সূত্রে সংযুক্ত করবার প্রয়াস চিরকালই করেছে কংগ্রেস এবং আজকের স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতি' কংগ্রেসের সেই ঐতিহ্যগত প্রয়াসেরই পরিণত রূপ।

ভারতের জাতীয় সত্তার সঙ্গে কিভাবে কংগ্রেস নিজেকে একেবারে মিশিয়ে দিতে পেরেছিল, তার প্রমাণ কংগ্রেসেরই এক একটি সংগ্রামের মধ্যে দেখা গিয়েছে। কংগ্রেসের আহ্বানে ভারতের গ্রামে ও সহরে, বন্দরে ও গঞ্জে, মরু-জনপদে এবং উপত্যকায় সহস্র সহস্র মানুষ সাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছে। অকুণ্ঠভাবে কারাগার, শাস্তি ও মৃত্যু বরণ করেছে। কংগ্রেসের এই সব সৈনিক কিন্তু প্রতিষ্ঠানের শিবিরে পালিত সৈনিক নয়। এরা তালিকাভুক্ত সদস্য নয়, তবু এরা কংগ্রেসের কথায় প্রাণ দিয়েছে। জনসাধারণের ওপর প্রভাব বিস্তারের এমন শক্তি পৃথিবীর কোন রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে দেখা যায় না। এর কারণ এই যে, গান্ধী-নেতৃত্বে চালিত কংগ্রেস ভারতের সাধারণ মানুষকে এমন একটি ধর্মের দীক্ষা দান করেছিল যা অতীতের ভারতে বা ভারতের বাইরে অন্য কোথাও হতে দেখা যায়নি। সে ধর্ম হলো নির্ভয়ের ধর্ম। ভারতীয় জনতার জীবনে বস্তুতঃ ভয়-ভাঙার উৎসব এনেছিল কংগ্রেস। ভারতের নিরস্ত্র মানুষ যেভাবে প্রভুশক্তির অস্ত্রকে তুচ্ছ করেছে, সে ঘটনা সভ্যতারই ইতিহাসে অভিনব। ভারতের নারী এবং শিশু রাইফেল ও মেশিনগানের সম্মুখে অকুণ্ঠভাবে বুক পেতে দিয়েছে। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিলেও, গরু-বাছুর নীলাম ক'রে দিলেও ভারতীয় পল্লীর দীনতম চাষী বৈদেশিক সরকারের আজ্ঞা পালনে সম্মত হয়নি। এই নির্ভয়ের জাগরণে ভারতীয় জাতির সত্তাই নতুন হয়ে গেছে। ভারতের সাধারণ মানুষের চেতনার এই বিপ্লব ঘটিয়েছে কংগ্রেস।

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের ইতিহাসও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইতিহাস। জাতির চেতনাকে এক একটি নতুন স্তরে উন্নীত করেছে কংগ্রেস এবং পরিবর্তিত জাতীয়

চেতনার উপযোগী হয়ে কংগ্রেস নিজেই আবার পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতের ইংরাজীশিক্ষিত সমাজের এক অংশের প্রতিনিধিত্বে শোভিত প্রথম কংগ্রেস আর আজকের কংগ্রেসে মিল খ‍ুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ যোগ খ‍ুঁজে পাওয়া যায়। ব্যারিস্টারদের কংগ্রেস, বাবু কংগ্রেস এবং আবেদন-নিবেদনের সেই কংগ্রেসই ভারতের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্বে গঠিত এক জনশক্তিপীঠে পরিণত হয়েছে।

কংগ্রেসের ছেষট্টি বৎসরের জীবন স্বচ্ছন্দযাত্রার জীবন নয়। প্রতি পদ-ক্ষেপে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে কংগ্রেসকে। শুধু বৈদেশিক শক্তির বৈরিতা নয়, কংগ্রেসকে তার দেশবাসীর একাংশের কাছ থেকেও বাধা পেতে হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, দেশ ও সমাজের একাংশের এই বৈরিতাই কংগ্রেসকে যতটা বিব্রত করেছে, বৈদেশিক শক্তির আঘাত ততটা করতে পারেনি। কংগ্রেসের ছেষট্টি বৎসরের ইতিহাসে এমন কোন দিন যায়নি, যখন দেশের কোন না কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজ কংগ্রেসকে বিড়ম্বিত করেনি। কালক্রমে দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের কংগ্রেসবিরোধী সংকল্পও নানাপ্রকার ছোট-বড় সঙ্ঘবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে। কংগ্রেসের ব্যাপ্তি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিরোধিতাও ব্যাপ্তি লাভ করেছে, বস্তুর আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ছায়াও যেমন বৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু ভারতের অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসে এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, কংগ্রেস বিচলিত হয়নি। ছায়া ছায়াই আছে এবং কায়া কায়াই আছে। জাতির প্রয়োজনে কংগ্রেস নতুন হয়ে যেতে পারে, বহুবার নতুন হয়েছে। অভ্যান্তরীণ বাধা, নিজের দেশের লোকের বাধাও কংগ্রেসের যাত্রাপথের চিরকালের সাথী। বর্তমানের নানারকম কংগ্রেস-বিরোধী সঙ্ঘবদ্ধতা কিছু একটা অভিনব ব্যাপার নয়। দেশের অভ্যান্তরে এক অংশের এই বাধার ইতিহাসও কংগ্রেসের পক্ষে শক্তিলাভের ইতিহাস, দুর্বলতালাভের ইতিহাস নয়। আজ পর্যন্ত কোন বিরুদ্ধ শক্তির আঘাতে কংগ্রেস দুর্বল হয়নি বরং সে আঘাতে বার বার আরও বলিষ্ঠ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছে কংগ্রেস। মহাত্মা গান্ধী তাঁর লিখিত শেষ প্রবন্ধে এই কথাই বলে গিয়েছেন যে, বর্তমানে কংগ্রেসবিরোধীদের প্রতিযোগিতা কংগ্রেসের পক্ষে আশীর্বাদ-স্বরূপ।

কংগ্রেস যখন অগ্রসর হয়, তখন মনে হয় এ সঙ্ঘের প্রকৃতিতে যেন গঙ্গাপ্রবাহের শক্তি রয়েছে। কংগ্রেস যখন বাধা সহ্য করে, তখন মনে হয় এ সঙ্ঘের কায়া যেন হিমাদ্রিসদৃশ দৃঢ়তার দ্বারা গঠিত। সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে আর একবার নতুন ক'রে প্রমাণিত হয়েছে যে, কংগ্রেসকে প্রপেগ্যাণ্ডার আঘাতে দীর্ণ করা যায় না, কারণ কংগ্রেস কোন ধ্বনির সৃষ্টি নয়। কংগ্রেস জাতির নিজের সৃষ্টি। সাধারণ নির্বাচনে ভারতের কয়েক কোটি গরীবের ভোট কংগ্রেসকেই বিজয়ী করেছে। কংগ্রেসের জয়লাভ কংগ্রেসের পক্ষে যতটা গৌরবের বিষয়, তার চেয়ে বেশি গৌরবের বিষয় হলো জাতির পক্ষে। কংগ্রেসের জয় জাতির সুবিচারের ফল। ভারতের জাতীয় জীবনের এক পরিণামপ্রবণ মুহূর্তে, বহু সংকটে অভিভূত এক অবস্থার মধ্যে জনসাধারণ যে সঙ্ঘের হাতে দেশের শাসনভার অর্পণ করেছে, তাতে বুঝা গেল যে জাতি তার নিজের ইতিহাসকেই বিশ্বাস করে। সে ইতিহাসের পথের ধূলি ভারতের কংগ্রেসেরই শত কর্মের পুণ্যে শুচিতা লাভ করেছে। এই বিশ্বাসের সম্পদ শূন্য করে দিতে জাতি কখনো চাইবে না। কংগ্রেস ইচ্ছে করলেও আজ নিজেকে ভেঙ্গে দিতে পারে না। জাতির বিশ্বাসই কংগ্রেসকে উত্তরোত্তর বৃহত্তর কর্মসাধনার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য করবে।

জাতীয় আশা এবং বিশ্বাসের এই অনুপ্রেরণাই কংগ্রেসকে আজ এমন এক দায়িত্বের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করিয়েছে, যেখান থেকে সরে যাবার সাধ্য নেই কংগ্রেসের। জাতীয় স্বাধীনতার পর জাতীয় ঋদ্ধির নতুন অধ্যায় আরম্ভ হলো। ছেষট্টি বৎসরের কর্মধারা সার্থক্ পরিণাম লাভের পর আজ আবার নতুন এক লক্ষ্যের অভিমুখী হয়েছে। সমৃদ্ধ ভারত গঠনের লক্ষ্য। কংগ্রেসেরই শক্তির নতুন পরীক্ষার দিন সমাগত। জাতির জীবনে সহযোগিতার এক নতুন স্বরাজ্য গঠনের সংকল্প গ্রহণ করেছে কংগ্রেস। ভারতীয় জাতির সম্মুখেই এক নতুন ব্রতের পরিকল্পনা উপস্থিত করেছে। মাত্র বর্তমানের প্রয়োজনের জন্যে নয়, সন্তানরূপী ভবিষ্যতের মানুষের জন্য সমৃদ্ধির পরিকল্পনা। ভবিষ্যতের ভারতের মানুষ, আজিকার ভারতীয়ের সন্ততি কেমন ক'রে সুখীজীবনের অধিকার ও প্রসন্নতা লাভ করবে, এই জিজ্ঞাসার প্রেরণা থেকে পঞ্চবার্ষিকী উদ্যোগের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে কংগ্রেস। অতি দুরূহ ব্রতে অঙ্গীকার। এ ব্রতেও জাতির আত্মত্যাগে প্রয়োজন আছে। সারা জাতির পরিশ্রমে সমবায়ে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির ভিত্তি রচনা করতে হবে। আজকের প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলাই এ কর্মব্রতের উদ্দেশ্য নয়, ভবিষ্যতে প্রয়োজনকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে দেবার ব্রত। তাই এই ব্রত দুরূহতর।

আজ পৌরাণিক ভগীরথের সাধন কথাই স্মরণ করতে হয়। ভগীরথের তপস্যায় মর্তভূমিতে সরিদ্বরা গঙ্গা অবতরণ করেছিলেন। লোকপাবনী গঙ্গা ঋদ্ধিদায়ী পুণ্যোদকে ধরণী সুতৃপ্তা সরসা হয়েছিল। ভবিষ্যৎ ভারতের ঋদ্ধি আবাহন করছে যে কংগ্রেস, তার কাজ ভগীরথের তপস্যার মতই দুরূহ ও দুশ্চর

কোতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন

পশ্চিম বাঙলার কংগ্রেস দলের অধিনায়ক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করবেন, মণ্ডপ বানালেন ময়দানব। ময়দানব মানব নন, ই ন্‌সমন্তরে রাতারাতি যজ্ঞস্থান তৈরি র অবাক কাণ্ড করেছিলেন বলে শুনেছি। ই শীঘ্র না পারলেও লেক ময়দানে রের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ধিবেশনের জন্য যে অতিকায় মণ্ডপ শণ বারো দিনে সমাধা করা হল, এ-ও কম তাজ্জব নয়।

একদিকে সাদার্ন অ্যাভিনু, অন্যদিকে লেক, একদিকে ল্যান্সডাউন রোড হুমড়ি খেয়ে লেকের জলে পড়ো-পড়ো, অন্যদিকে ডাঃ শরৎ চ্যাটার্জি রোড পাশ কেটে সাদার্ন অ্যাভিনুয়ের পেটে গিয়ে গুঁতো খায়-খায়, এরই মাঝখানে লেক ময়দান গভীর আরামে এলানো। শীতের মরশুমে ক্রিকেট, গরম পড়তে শুরু করলে ফুটবল। এ অঞ্চলের ছেলে-যুবা সকলেরই বে-সরকারী এক্তিয়ার। সদ্য শুরু ফুটবল প্র্যাকটিশ থেকে বঞ্চিত হয়ে এখানকার ওয়ারিশদের মনে যে বিরক্তি জমা হয়েছিল, বিরাট এক উঠতি তিমি-পিঠ মণ্ডপ দেখে সে বিরক্তি কবে ঝরে গেছে।

বাঁশ, শালগুঁড়ি, কাঠ আর দড়ি-দড়ার ছড়াছড়ি দেখে আশপাশ থেকে এরই মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি শুরু হয়ে গেছে। ডেকরেটার-দের তাড়াহুড়ায় প্যাণ্ডেলটা ক্রমে ক্রমে খাড়া হচ্ছে। প্রথমে জমিনের উপর আঁকি-বুকি। মাপজোপ, দড়ি-দড়ার টানাটানি। তার পর বাঁশ-খুঁটি পোতাপুতি, বাঁধা-বাঁধি, একটা ক্রমশ ফুটে-ওঠা অবয়ব। প্রকাণ্ড লেক ময়দান থেকে আশি বিঘে জমি খামচা মেরে ভাগ করে নিয়ে করোগেট টিন দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। তার মধ্যে সাত বিঘে ভুঁই ফুঁড়ে উঠছে বিশাল মণ্ডপ। লম্বায় ৪২০ ফুট, চওড়ায় ২৫০, আর উঁচুদিকে তিরিশ ফুট। সচরাচর সাধারণ বাঙালীর পাঁচ ছয় মানুষ উঁচু। মণ্ডপটিকে ২৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সদস্য, অতিথি-অভ্যাগত, সাংবাদিক, কংগ্রেসকর্মী, শ্রমিক

পশ্চিম বাঙলার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি
শ্রীঅতুল্য ঘোষ

লেক ময়দানে সভামণ্ডপ নির্মাণের কাজ চলিতেছে

মণ্ডপ পরিকল্পনা লইয়া আলোচনারত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ
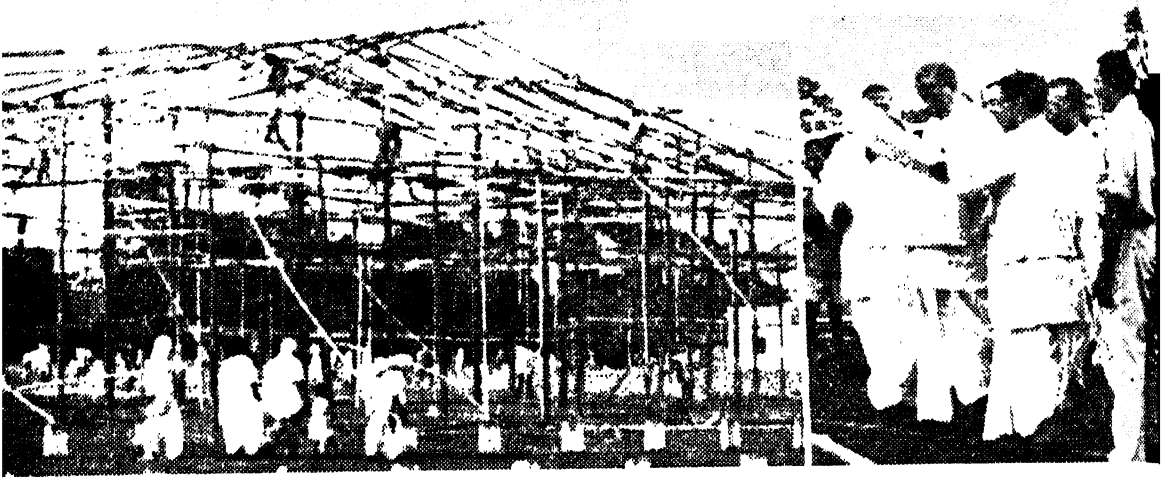
প্রভৃতি তিরিশ হাজার দর্শকের বসবার মতো জায়গা করা হয়েছে।

যেদিকে লেক, সেই দিকে সভাপতির মঞ্চ। মঞ্চের দুটো ভাগ। সম্মুখভাগে অধিবেশন-কালে সভাপতি ও বিশিষ্ট নায়ক-নেতারা বসবেন, আর পশ্চাদভাগে প্রয়োজন হলে তাঁরা বিশ্রাম করবেন। মঞ্চটা সামনের দিকে ষাট ফিট, পেছনে আশি ফিট, আড়ের দিকে তিরিশ, আর উঁচুতে চার ফিট।

সব মিলিয়ে তোরণ হয়েছে ছয়টা। প্রধান তোরণ সাদার্ন অ্যাভিনুমুখী। এই ৫২ ফুট তোরণটা বড় না হ'লেও প্রধান। এর চেয়ে বড় একটি আছে ৬৮ ফুট, তবে তা রোয়িং ক্লাবের দিকে। আর ডাঃ শরৎ চাটুজ্জ্যে রোডের বারো ফুট তোরণটি আকারে ছোট হলেও প্রকারে বিশিষ্ট। এইটিই নেতাদের যাতায়াতের পথ।

সাজসজ্জার ভার পড়েছে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর পরিকল্পনায় শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যক্ষ সুরেন কর মশায়ের উপর। খুঁজে খুঁজে দেখা করলাম ওঁর আস্তানায় গিয়ে। মহাব্যস্ত। ১২ই তারিখে ২৩ জন ছাত্র এসেছে কলাভবন থেকে। ২০শে তারিখে কাজ শেষ করতে হবে। সময় বড্ড কম। ছেলেরা ঘাড় গঁুজে, মুখ বঁুজে কাজ করে চলেছে। ফুরসৎ নেই কারো। কাছাকাছি আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি, তাও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। সুরেনবাবু বললেন, বাইরে বেরুনো বন্ধ করে দিয়েছি ওদের। দেখুন না, একেবারে ফ্যাক্টরী বসে গেছে।

সব সমেত ছবি হবে পনেরোখানা। প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ছবিগুলোকে। কৃষি, শিল্প ও সংস্কৃতি। আমাদের দেশ তো কৃষিপ্রধান। কৃষি আমাদের প্রাণ। এর উপর ভিত্তি করেই তো শিল্প, সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে। তাই সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে মাটি আর লাঙ্গল। মাটি লাঙ্গলের সঙ্গমেই ফসলের জন্ম। তাই প্রধান ছবিটি হচ্ছে হলচালনা। এই ছবিটিকে ঘিরে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের ছবি বসানো হয়েছে। তারপরেই আসে শিল্পের কথা। পেটের প্র[illegible] মিটল এবার আচ্ছাদন। মূল শিল্প [illegible] কারখানা। তাকে ঘিরে বিভিন্ন কুটীরশি[illegible] ধমনী থেকে শিরা-উপশিরা। খাওয়া[illegible] মানুষের প্রথম প্রয়োজন। কিন্তু [illegible] খাওয়া-পরার জন্যেই তো আর মানু[illegible] সংস্কৃতিও মানুষের মনুষ্যত্বের প[illegible] শিক্ষা, সঙ্গীত, সাহিত্য, এই তো স[illegible] বাহন! গ্রাস, আচ্ছাদন আর সংস্কৃতির [illegible] যোগাযোগেই হয় পরিপূর্ণতা। পরিপূর্ণতারই প্রতীক হল পদ্ম।

সুরেন বাবু বললেন, এই পদ্ম[illegible]

মণ্ডপ-সজ্জার জন্য শান্তিনিকেতন হইতে আগত কলাভবনের শিল্পিবৃন্দ।

আলপনা অঙ্কনরত শান্তিনিকেতনের শিল্পিবৃন্দ

...ক ভারতবাসীর কাম্য। তাই একে ... দিয়েছি সবার উপরে। ছবি সম্পর্কে ...লন, ঘোরপ্যাঁচের আশ্রয় না নিয়ে ...সোজি এঁকে যাওয়া হচ্ছে। তবে ...টি বাদ দিয়ে ভাব-রূপের প্রতিষ্ঠা ...হয়, সেদিকেই নজর দেওয়া হয়েছে। ...রো বছর পরে আবার কলকাতায় ...ল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ...ছে। এর আগে ১৯৩৯ সালে ওয়েলিংটন ...রে শেষ অধিবেশন হয়েছিল। তার সঙ্গে বর্তমান অধিবেশনের ফারাক আকাশ-মাটি। তখন সমস্ত পৃথিবী থমথমো। মহাযুদ্ধ সমাগত। নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে সবাই অগ্রসর হচ্ছে। সর্বত্রই অশান্তি। সেই অধিবেশনটিও শেষ হয় এক অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে। বর্তমানে ধ্বংসের হুমকি খতম হয়েছে। এসেছে পুনর্গঠনের তাগিদ।

কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের মধ্যে ৩০০ জন উপস্থিত থাকবেন বলে জানা যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত এবং আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট-পত্নী শ্রীমতী এলিনর রুজভেল্টও বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারেন। এছাড়া মোট ৩০,০০০ হাজার দর্শককে সংকুলান করবার মতো স্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে শ্রমিকদের সংখ্যাই হবে দশ হাজার।

সভামণ্ডপের কাছেই ফায়ার ব্রিগেড, অ্যাম্বুলেন্স, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস ছাড়া, সংবাদপত্রের জন্য টেলিফোন ও টেলি-প্রিন্টার, রেল ও বিমানপথের অনুসন্ধান অফিসও বসান হয়েছে। খাবার দাবারের জন্য স্টল, সেণ্ট্রাল চা ও কফি বোর্ডের দুটো স্টলও খোলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য, এবং কৃষি শিল্প বিভাগও নিজেদের স্টল খুলেছেন।

এবারকার একটা বিশেষ ব্যবস্থা হচ্ছে, ২৪শে মার্চ একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধিবেশন। এই অধিবেশনে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য, শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী নাট্যকলা, শ্রীসুরেশ চক্রবর্তী সংগীতকলা ও শ্রীদেবকীকুমার বসু চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করবেন। পল্লী-গীতি ও পল্লীনৃত্যের আয়োজন করা হয়েছে এবং ছোট ছেলেমেয়েরাও এই অনুষ্ঠানে দর্শকদের চিত্তবিনোদনের আয়োজন করছে বলে শোনা গেল।

এবারকার মূল অধিবেশনে কয়েকটি প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা হবার সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেসের অধীনে
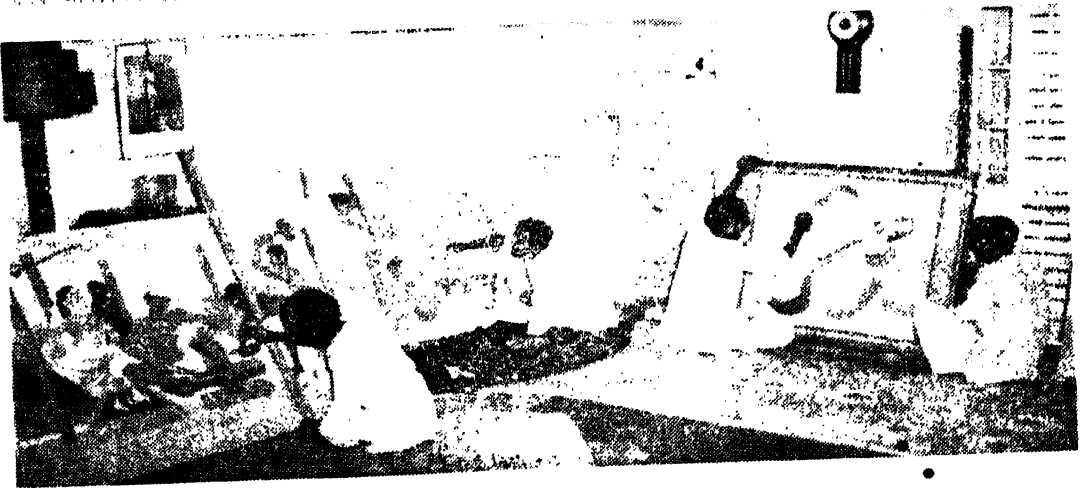
পল্লীজীবনের বিভিন্ন রূপ অঙ্কনে নিরত শান্তিনিকেতনের রূপকারগণ

কংগ্রেসের যে চারটি স্তর আছে, সেই জেলা, মহকুমা, থানা ও পঞ্চায়েৎ কমিটির বদলে জেলা কমিটি এবং তার পরেই নির্বাচনকালে বিভক্ত নির্বাচনকেন্দ্রগুলিতে এক-একটি প্রাথমিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হবে বলে আশা করা যায়। কংগ্রেসের সক্রিয় সভ্য হবার জন্য চাঁদার হার এক টাকার বদলে আট আনা কিম্বা চার আনা করবারও একটা প্রস্তাব উঠতে পারে। এছাড়া নির্বাচনের পর যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তারও একটা হিসাব-নিকাশ এই অধিবেশনে হবে।

ঘুরে ঘুরে প্যান্ডেল তৈরি দেখছিলাম। এমন সময় জনকয়েককে প্যান্ডেলের একটু দূরে গোল করে মাটি চাঁছতে দেখে কৌতূহল হল। জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই এখানে কি হবে? সে চটপট উত্তর দিলে, বাবু ফিলাট উঠবে। আশ্চর্য হলুম। ফিলাট কিরে।

খোঁজ করে কৌতূহল মেটালাম। আট ফুট উঁচু মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। ষাট ফুট উঁচু দণ্ডে ফিলাট নয় ফ্ল্যাগ ওড়ানো হবে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নেহরু নিজের হাতে পতাকা উত্তোলন করবেন। তাঁর হাতের টানের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা ধীরে ধীরে উঠতে থাকবে ষাট ফুট দণ্ড বেয়ে—দু ফুট, দশ ফুট, বিশ ফুট ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, তারপর লক্ষ্যে—ষাট ফুট উচ্চে গিয়ে পতপত করে উড়তে থাকবে। আমার কাছে হঠাং কাজটাকে এক প্রতীক বলে মনে হল। যে অজ্ঞ লোকটি ষাট ফুট দণ্ডের নী[illegible] বসে আছে, সে ভাবছে ওই পতাকার ক[illegible] এই অধিবেশন সম্পর্কে তার মনে কত প্র[illegible] চোখে কত স্বপ্ন। কবে এমন দিন হবে, যে[illegible] ওই পতাকাটির মতো এরাও ধীরে ধী[illegible] দণ্ডের গা বেয়ে শীর্ষে উঠে সার্থক হ[illegible] চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, সবই উর্ধ্ব[illegible] ক্রিয়া। মণ্ডপটি মাথা তুলছে, মঞ্চটি মা[illegible] তুলছে, পতাকা দণ্ডটি মাথা তুলছে। ধী[illegible] ধীরে একটা জাতি এইভাবেই শীর্ষে গি[illegible] পৌঁছবে।

ভা র ত ব র্ষ

কি আর অধিক কব? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অংগ তুল্য আদরের—
নয়নে অমৃত দৃষ্টি, কণ্ঠে মধু বাণী,
হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়,
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ।
তেমতি জানিয়ো, বৎস, ভারতভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ
পুণ্যময় মহাতীর্থ: আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণু মাঝে এর প্রতি জলকণে
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত।
—সামান্য এ দেশ নহে। বহু পুণ্যফলে
জন্মে নর এ ভারতে। কিন্তু চিরদিন
রাখিয়ো স্মরণ, বৎস, কর্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ
বৃথায় জনম তব। কি বলিব আর,
ভারত-সন্তান তুমি, আর্য বংশধর
ভুলিয়ো না কোনোদিন। করি আশীর্বাদ—
ভদ্র হও, ধন্য হও, ভারতমাতার
হও উপযুক্ত পুত্র। স্বদেশের হিত
ধ্রুবতারা সম নিত্য রাখি লক্ষ্যপথে
হও, বৎস, অগ্রসর। ভা র ত জ ন নী
করুন মঙ্গল তব শুভ আশীর্বাদে॥

[যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'ভারতবর্ষের মানচিত্র' হইতে]

কল্যানকৃৎ জওহরলাল

সুশীল রায়

কিছুদিন আগে ভারতের লোকসভায় উপস্থিত হয়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রী সদস্যবর্গকে সম্বোধন করে বললেন, "একটি গৌরবের কথা জানাবার আছে। ভারতের এক তরুণ বৈমানিক অসীম ধৈর্য, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সাহস প্রদর্শনের জন্যে দিল্লির শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছেন।"—ঘটনাটি এইঃ এই তরুণ বৈমানিক একটি বিমান চালনা করে রাজধানী অভিমুখে আসছিলেন, সেই বিমানে আরোহী ছিলেন ভারতের সেনাবাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ বিশিষ্ট কর্মী। পথিমধ্যে বিমানের একটি ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায়, দ্বিতীয় ইঞ্জিনটিও বিকল হয়; তখন এই তরুণ বৈমানিক তাঁর সাহস বিচক্ষণতা ও ধৈর্যের চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হন; মধ্য আকাশে তিনি এই দুর্যোগের মধ্যেও স্থিরতা রক্ষা করে বিমানটিকে একটি উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে নামাতে সক্ষম হন, এবং তার দরুন কয়েকটি মূল্যবান জীবন রক্ষা পায়। আকাশের মাঝখানে বিমান এভাবে বিকল হয়ে গেলে মাথা ঠিক রাখা সহজ কথা নয়। যে পারে, সে কেবল সাহসী নয়, সে বিচক্ষণ, ধীর ও কুশলীও বটে। এই তরুণ বৈমানিকের সাহসিকতা ও ধৈর্যের কথা ভারতের ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হয়ে রইল। শ্রেষ্ঠ সম্মানের দ্বারা তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে। পণ্ডিত নেহরু ভারতীয় লোকসভায় এই সংবাদটি যখন ঘোষণা করলেন, তখন সদস্যবর্গের মনও গৌরবের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল অবশ্যই।

কেবল জন-কয়েক সদস্যের নয়, ভারতের কোটি কোটি অধিবাসীর মনও আজ আলোকোজ্জ্বল, গৌরবের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। লোকসভার সদস্যদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা এটা নয়, পৃথিবীবাসীর উদ্দেশে ভারতবাসীর ঘোষণা এটা। ভারত আজ সগর্বে ঘোষণা করছে, এক দুঃসাহসিক কর্তব্যনিষ্ঠ ত্যাগী ধৈর্যবান পুরুষ, একটি বিমানকে নয়, একটি মহাদেশকে রক্ষা করেছেন এক মহা সঙ্কটের হাত থেকে। যখন নানারূপ রাজনৈতিক মতবাদের ঝঞ্ঝায় ভারত বিপর্যস্ত, লোভের মাস্তুল যখন এর উন্নত হয়ে উঠেছে, ক্রোধের হাল যখন একে দিগ্বিদিকে নিক্ষেপ করে চলেছে, হীনতার বাতাসে যখন ফুলে উঠেছে এর পাল, যখন কাছে-ভিতে দেখা যাচ্ছে না কোনো নিরাপদ বন্দর, তখন এক মহাতেজস্বী পুরুষ এই বিপন্ন জাহাজকে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এলেন যোদ্ধার বেশে, সব বাধাবিপত্তি ঝড়ঝঞ্ঝা আলোড়ন-উৎপীড়নের হাত থেকে নিষ্কৃতি এনে দিলেন একে। তাঁর এই ঐকান্তিকতার জন্যে সামান্য কয়েকটি অমূল্য জীবন নয়, পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মূল্যবান জীবন রক্ষা পেয়েছে, তারা এবার পেয়েছে একটি পথনির্দেশ। এই জন্যে কেবল পুরস্কারের দ্বারা নয়, ভারত আজ শ্রেষ্ঠ স্নেহ, প্রীতি ও সম্মানের দ্বারা ভূষিত করেছে এই সৈনিককে।

এই সৈনিক হচ্ছেন জওহরলাল নেহরু।

প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন তখন আসন্ন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে প্রত্যহ নূতন নূতন দল গড়ে উঠেছে সারা ভারতে; পুরাতন যে দু-চারিটি দল ছিল, তারাও নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতরণের জন্যে উদ্যোগ-আয়োজন আরম্ভ করেছে। চারদিকে প্রার্থী মনোনয়নের তাড়াহুড়ো পড়ে গিয়েছে। কংগ্রেসও নিজ প্রার্থী মনোনীত করার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। সমগ্র ভারত একটি বিরাট যজ্ঞের জন্যে যেন নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছে, চারদিকের আবহাওয়ায় এমনি একটা প্রস্তুতির ভাব। কিন্তু এ-ভাবের মধ্যে তেমন শুচি-শুভ্রতা দেখা যায় না। শোনা গিয়েছে, সারা ভারতে মোট যতগুলি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, তাদের মোট সংখ্যা নাকি ষাটের ওপর। এই ষাটটি দল তাদের ষাট রকমের মতবাদ প্রচার করে সাধারণ লোকের

মনের ধারণা উলটে-পালটে দেবার জন্যে ব্যস্ত। কেউ প্রচার করছে প্রাদেশিকতা, কেউ সাম্প্রদায়িকতা, কেউ বা গোঁড়া হিন্দুত্ব। আরও মারাত্মক কথা এই যে, এই সব দলের মধ্যে একটি দল ভারতকে বিদেশের তাঁবেদার এক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যও ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা নিজ নিজ মতবাদ প্রচার করেই যদি ক্ষান্ত থাকত, তাহলেও আবহাওয়া এতটা বিষময় হয়ে উঠত না হয়তো। কিন্তু এই সব দল এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, কংগ্রেসের প্রতি দেশবাসীর যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে আছে, সেই শ্রদ্ধা-বিশ্বাসকে সমূলে নির্মূল না করলে তাদের প্রচারিত মতবাদের দ্বারা আকৃষ্ট কেউ হবে না। সুতরাং তারা দল বেঁধে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার আরম্ভ করে দিল। দেশবাসীকে ডেকে ডেকে তারা বলতে লাগল, যদি বাঁচতে চাও, তাহলে কংগ্রেসকে ত্যাগ কর। এদের মধ্যের অনেকে আবার একথাও বলেছেন যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এককালে ছিল বটে, কিন্তু কংগ্রেস বলে আর কেউ নেই।

প্রতিশ্রুতিও দেশবাসীকে দেওয়া হয়েছে অনেক রকম। তাদের বিভ্রান্ত করে বিপথে আনবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। চার বছরে কংগ্রেস কতটা কি করেছে, তার কথা উহ্য রেখে কংগ্রেস কি কি করতে পারে নি, তার লম্বা তালিকা মেলে ধরা হয়েছে দেশবাসীর চোখের সামনে। প্রতিশ্রুতি বাবদ বিভিন্ন দল, নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করে বলে গেছে যে, সেই দলকে ভোট দিলে অচিরে দেশবাসীর সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে; তাদের টাকায় আট মণ চাল এবং মাসে একজোড়া কাপড় দেওয়া হবে।

এই সব কথা শুনে আমাদের নানা রকম কথা তখন মনে হয়েছে; কিন্তু আবহাওয়া তখন এমন বিষাক্ত এবং লোকের মন এমন বিভ্রান্ত যে, তখন কোনো যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝাতে যাওয়াই একটা মস্ত সমস্যা।

একদিন এক অশিক্ষিত রিক্সাওয়ালার একটা কথা শুনে মনে হল, দেশবাসীকে আমরা যতটা অজ্ঞ মনে করি, ততটা অজ্ঞ তারা নয়। সে বলল, 'এটা কি বাবু ম্যাজিক। ভোট দিলেই আট মণ চাল।'

আমাদেরও তাই মনে হত, দেশের সব সমস্যার সমাধান যদি একদিনে চট করে সমাধান করতে হয়, তাহলে তো কোনো মন্ত্রীর বা প্রধানমন্ত্রীর দরকার পৃথিবীর কোথাও থাকার কথা নয়। জনকয়েক ম্যাজিশিয়ানকে ডেকে এনে তক্তে বসিয়ে দিলেই হল। আর তাছাড়া এত ভোটাভুটিরই দরকার কি।

সে যাই হোক। ভারতের সম্মুখে তখন এক মস্ত সমস্যা সমুপস্থিত। সংকট তার চেয়েও বড়।

দেশ যদি প্রাদেশিকতার পথ নেয়, তাহলে খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হতে বেশি দেরী এর হবে না; যদি সাম্প্রদায়িকতা হয় দেশের লক্ষ্য, তাহলে তার পরিণামে ভারত একটি শ্মশানভূমিতে পরিণত হবে; যদি সে নেয় তথাকথিত 'সাম্যবাদে'র পথ, তাহলে বিদেশী রাষ্ট্রের তাঁবেদার হয়ে তার জীবন ধারণ করতে হবে। কংগ্রেসের দুর্নামে বাতাস আচ্ছন্ন, তার অপবাদের রব শুনে দেশের লোক বিভ্রান্ত। এর মধ্যে সত্য কতটা, মিথ্যা কতটা তা হিসাব করে দেখা সম্ভবপর তখন নয়।

এদিকে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেও দুর্বলতা ঢুকেছে। অনেক অসৎ ও অযোগ্য লোকও এর মধ্যে ঢুকে এই প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্বলতর করার জন্য ব্যস্ত।

চারদিকে এই দুর্যোগের কালো মেঘ। ভারতকে, তথা এই দেশের পঁয়ত্রিশ কোটি লোককে এই বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্যে এই সময় এগিয়ে এলেন পণ্ডিত নেহরু। তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করে নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে তাঁর প্রতিবাদ জানালেন। বাঙ্গালোরের নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার অধিবেশনে তিনি সুস্পষ্টরূপে জানতে চাইলেন, দেশবাসী কোন্ পথে যেতে চায় এ-ই তাঁর জানার ইচ্ছে।

বলা বাহুল্য, দেশবাসী সৎপথে যাবার জন্যেই আগ্রহশীল, কিন্তু দেশ চায় সেই পথের উপযোগী একজন সৎ নেতা।—যিনি পথ নির্দেশ করতে পারবেন।

এর পরের ঘটনা সকলের জানা আছে। বাঙ্গালোরের পরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল দিল্লীতে এবং এখানেই নেহরুকে কংগ্রেস পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হল। দেশকে রক্ষা করার জন্যে তিনি ব্যগ্র ছিলেন, এই অনুরোধ গ্রহণ করতে তাই তিনি দ্বিধা করলেন না।

আক্ষেপ ও দুঃখের অনেক ঘটনা ঘটেছে। যাঁরা ছিলেন কংগ্রেসের পুরাতন কর্মী ও নেহরুর সহকর্মী তাঁরা কংগ্রেসকে ত্যাগ করে এই প্রতিষ্ঠানকে দুর্বলতর করে তুলতে লাগলেন এবং নুতন দল গঠন করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নানা রকমের উক্তি [illegible] চললেন। নেহরু প্রথমে চাইলেন, এঁদের কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না।

কংগ্রেস সভাপতিরূপে ভারতের প্রধান মন্ত্রী কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে তথা ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্যে যোদ্ধার বেশে দাঁড়ালেন। শতসহস্র বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ ক'রে, সর্বপ্রকারের প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে তিনি বহির্গত হলেন ভারত-পরিক্রমায়। দেশবাসীর সম্মুখে সশরীরে এসে তিনি দাঁড়ালেন।

তিনি প্রথমেই বললেন, কংগ্রেসকে ভোট দাও, এমন নির্দেশ দিতে তিনি চান না। কিন্তু দেশবাসী যেন চারদিক বিচার-বিবেচনা করে দেখে সৎ লোককে ভোট দেয়,—ভোট সম্বন্ধে এই হচ্ছে তাঁর পরামর্শ। তা'ছাড়া কংগ্রেস যে কিছুই করে নি বলে বাইরে এত কলরব, এ কলরব কেন। কংগ্রেস কতটা কি করেছে তার বিচার করা দরকার, যা করতে সে পারে নি, তার কারণ কি, এ হিসাবও ক'রে দেখতে হবে।

কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচন-ব্যাপারে নেহরুর পরিষ্কার নির্দেশ ছিল যে, সৎ প্রার্থী নির্বাচনই হবে কংগ্রেসের লক্ষ্য, যদি সে প্রার্থী যোগ্যতার দিক থেকে কিছুটা ন্যূন হন, তাহলে ক্ষতি নেই; কেননা, কমযোগ্য সৎ লোকের থেকে যোগ্য অসৎ লোক দেশের ও দশের পক্ষে অনেক হানিকর।

নেহরুর এই নির্দেশ পুরোপুরিভাবে পালিত হলে আনন্দের কথা হত। কিন্তু নেহরু নিজেই বলেছেন যে, তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী প্রার্থীদের সকলেই যে মনোনীত হয়েছেন, এমন নয়। দু'চারজন অনভিপ্রেত প্রার্থী মনোনয়ন পেয়ে গেছেন। এ বিরাট ভূখণ্ডে এই সামান্য ত্রুটি না হয়ে পারে না, একথা আমরা জানি। কিন্তু সামান্য দু'চারজন লোক এই বিরাট দেশের যে কোন ক্ষতি করতে পারবে না, একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে।

নেহরু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, যে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান নিয়ে তিনি দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন; সেই প্রতিষ্ঠানেই অনেক গলদ ঢুকেছে। এই গলদ ঢুকেছে বলেই নানারকমের স্বার্থান্বেষীর দল নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে সুবিধা পেয়ে গেছে

...গত স্বার্থের চেয়ে দেশের সর্বাঙ্গীণ ...র্থের যে মূল্য বেশি, এই সামান্য ...দৃষ্টিটুকু যদি সকলের থাকত, তাহলে ...পরিচালনার এই গুরুদায়িত্বের মধ্যেও ...কে এই নূতন গুরুভার গ্রহণ করতে ... না।

কিন্তু তিনি যোদ্ধা। সংগ্রামের ক্ষেত্রই ... তাঁকে আকর্ষণ করে বেশি। তিনি ...ধ অবতীর্ণ হলেন।

মহাভারতের অভিমন্যুর কাহিনী এই ...ঙ্গে মনে পড়ে। সপ্তরথী তাকে ...ও করে নিজেদের বীরত্বের পরিচয় ...ছেন বলেই হয়তো তাঁদের ধারণা। ... বালক যোদ্ধা সপ্তরথীর বাহিনীর ... একাকী সমানে সংগ্রাম করেছেন; ...ধ জয়ী হতে না পারলেও অভিমন্যুই ... বলে ঘোষিত ও অদ্যাবধি পূজিত। ... সঙ্গে আর একটি কাহিনীও মনে ... রঘুবংশের অজ কাহিনী। স্বয়ম্বর-...য় ভোজরাজপুত্রী ইন্দুমতীকে অর্জন ... যখন অজ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, ... স্বয়ম্বর-সভায় ভগ্নমনোরথ ভূপালগণ ...মধ্যে সদলবলে অজের পথরোধ করে। ...লে সংগ্রাম হয়, অজ একাকী, ভূপালেরা ...শজন। সেই ভূপালদের সম্মিলিত ...কে পরাস্ত করে জয়ী হয়েছিলেন ... ভারতে সম্ভবত অনুরূপ আর ...টি অসম সংগ্রাম হয়ে গেল। একা ..., তাঁর বিপক্ষে ষাটটি দল। এতগুলি ...র সম্মিলিত আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে ...র পরাজিত ক'রে বিজয় গৌরবে ... হয়েছেন নেহরু।

দেশের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নিয়ে সহসা ... ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের এই ...তার হেতু কি—এই প্রশ্ন জাগা ...ভাবিক। যাঁরা দেশের কর্ণধার, অনেক ...ন ও প্লাবন থেকে দেশকে রক্ষা ক'রে ... এতটা দূর পর্যন্ত এনে পোঁছে ...ছেন, দেশবাসীর বিশ্বাস ও আস্থা ...র উপর থাকাই স্বাভাবিক। নেহরু জয়ী হয়েছেন, এ তার একটা কারণ। ...র প্রথম কারণ এই—এমন অকপট সদাচারী কর্তব্যনিষ্ঠ দেশপ্রাণ সৈনিক সহজে চোখে পড়ে না।

অনেকে নেহরুকে স্বপ্নবিলাসী বলে নিন্দা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু স্বপ্ন-বিলাসটাই নেহরুকে এত বড় কর্মী ক'রে তুলেছে। তিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন এবং সেই স্বপ্নকে কিভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায়, তার পথ আবিষ্কার করার জন্যেও তাঁর আগ্রহ কম নয়।

দিন কয়েক আগে তিনি যখন শান্তি-নিকেতন, চিত্তরঞ্জন ও সিন্ধি পরিক্রমায় এসেছিলেন, তখন চিত্তরঞ্জনের কর্মীদের উদ্দেশ ক'রে বললেন, "আজ এখানে আসার সময় রাস্তার দুপাশে দেখলাম গাছে গাছে রক্তবর্ণ পলাশ ফুল; আমার মনে হল ওরা আমার মনের আগুনের প্রতীক। আমার মনে অমনি আগুন জ্বলছে; ভারতকে কিভাবে সমৃদ্ধিশালী করে তোলা যায়,—সেই চিন্তার আগুন।"

জওহরলাল যে এমন কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন তার কারণ এই আগুন। মনের এই অগ্নির তাপ তাঁকে প্রেরণা দান করে চলেছে; দিনে কয় ঘণ্টা তিনি কাজ করেন তার হিসাব কিছুদিন আগে একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল; তা'তে দেখা গেল দৈনিক তিনি তিন ঘণ্টা ঘুমান, বাকি একুশ ঘণ্টা লিপ্ত থাকেন কাজে। এ রকমের কর্মপ্রাণ যে ব্যক্তি, সে ব্যক্তির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হলে তার আগে কাজের দ্বারা নিজেদের শোধন ও সক্ষম ক'রে নেওয়া দরকার, কেবল কথার দ্বারা ও ফাঁকা প্রতিশ্রুতির দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা শোভা পায় না।

সংগ্রামের একটি পর্ব শেষ হয়েছে। ভারত আজ একটি নির্দিষ্ট পথের সন্ধান পেয়েছে। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে, ভারত চায় কংগ্রেসের পথ—ন্যায়, নীতি ও নিয়মের পথ। এই পথে অগ্রসর হলে ভারত যে পাঁচশালা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সেই পরিকল্পনা সফল হবে; এবং সমৃদ্ধিশালী শান্তি-কামী দেশরূপে গড়ে উঠবে এই ভূখন্ড।

কথার দ্বারা নয়, নিজের কাজের দ্বারা তিনি দেশবাসীকে বলে চলেছেন—'কাজ কর; যদি দেশকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণে সাহায্য করতে চাও, তাহলে কাজই একমাত্র পথ। তাহলেই দেশ গ'ড়ে উঠবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, উদ্বৃত্ত দেশ বলে পরিগণিত হবে এই ভারতবর্ষ।'

জওহরলাল ভারতের কল্যাণকৃৎ নেতা। তিনি এই মহাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান। এ পথ দুরূহ পথ, তবু সফলকাম তিনি হবেনই,—এ বিশ্বাস কেবল তাঁর না, চিন্তাশীল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রত্যেক ভারতবাসীই একথা বিশ্বাস করেন। যাঁর উদ্দেশ্যের মধ্যে এই মহত্ত্ব আছে, তাঁর প্রচেষ্টা কখনো বিফলে যেতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে গীতার সেই উৎসাহ-বাণী—

> ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিত্তাত
> দুর্গতিং গচ্ছতি।

যত বাধা বা বিপত্তি এসেই পথরোধ ক'রে দাঁড়াক, সে সব প্রতিবন্ধক এই কল্যাণব্রতীকে পরাস্ত করতে পারবে না।

প্রচন্ড এক ঝড় বয়ে গিয়েছে ভারতের উপর দিয়ে। ঝড়ের শেষে নেমে এসেছে প্রশান্তি। বাইরে এখন আর তেমন আলোড়ন—আন্দোলন নেই। মনে হচ্ছে, নিরাপদ আশ্রয়-বন্দরে এসে যেন, ভিড়েছে এই মহাদেশের জাহাজটি।

এই বন্দরে কে এনে পোঁছে দিল একে; কে রক্ষা করল প'য়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ, কে তার নিজের মনের আগুন দিয়ে ভারতবাসীর মনে ফুটিয়ে তুলতে চায় রক্তপলাশের ন্যায় জীবন্ত আশা। আমরা এখন তাঁর কথা স্মরণ করতে যেন ভুল না করি।

তাঁকে পুরস্কার দিতে গিয়ে যেন ভুল না করি; স্নেহ দিয়ে, প্রীতি দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে তাঁকে যেন ভূষিত করে তুলতে পারি। দেশবাসীর কাছে তাঁর দাবিও মাত্র এইটুকু।

রুট নাম্বার ফোর

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

ইউনিভার্সিটি লনে কাঁঠাল গাছ কেন? কার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গার পরিকল্পনা নিয়ে তোমরা এ গাছগুলো লাগিয়েছ মণিদা?

ইউনিভার্সিটি প্যাভিলিয়ন ও গেটের মাঝখানের উন্মুক্ত উদ্যানের নব বিকশিত বন মহোৎসবের একটা অঙ্গ লক্ষ্য করেই রমার প্রশ্ন—

বললাম, 'কাঁঠাল হবার আগেই কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিবাহিতা অধ্যাপিকাদের মাথায় তা প্রায় ভাঙতে বসেছিলেন। প্রশ্ন উঠেছিল বিবাহিতা অধ্যাপিকাদের চাকরীর স্থায়ীত্বের প্রয়োজন কি? ভাগ্যিস শিক্ষা মন্ত্রী এলেন তাঁদের নিস্তারে।

বৌদি হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে বললেন, যাক্ বাবা! তবু রক্ষে যে তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে চাকরী নিয়ে আসি নি। হ্যা মণি, মাঝখানে এ ফোয়ারাটা কেন? পরিপার্শ্বটা বুঝি জোর জবরদস্তি 'আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী' ধরণের না করে নিলে তোমাদের রাজধানীর ছেলেদের পড়াশুনো জমে না?

—শেষেরটুকু বাদ দিলে, তোমাকে একজন 'প্রফেট' বলতাম বৌদি। দিল্লীর ছেলেরা কাছের কথা ভাবার অবসর পায় না—সুদূরের পিয়াসী তো তার পরের স্টেজ। এ ফোয়ারাটার জন্ম আমাদের ইউনিভার্সিটির অনেক আগে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বিদেশী শাসকের টনক উঠেছিল নড়ে। শীর্ণকায় বাঙালীর শিরে তখন জ্বলছে আগুন। তাই পরিবর্তন হল রাজধানী। কলকাতার কনভোকেশনে বাঙালী মেয়ের গুলীর কথা তখনও হার্ডিঞ্জের মন থেকে যায় নি মুছে। সাহেব এসে বাসা বাঁধলেন এই হলদে রঙের বিরাট প্রাসাদে। তাকে অনুসরণ করলেন লর্ড চেমসফোর্ড, লর্ড রিডিং, লর্ড আরুইন, যাদের প্রত্যেকের নামে এক একটা রাজপথ—হার্ডিঞ্জ এ্যাভিনিউ, চেমস্ফোর্ড রোড, রিডিং রোড, আরুইন রোড—নয়াদিল্লীর রাস্তা-জগতে এরাও এক একটি লর্ড। জানো বৌদি, এদের নামে কোন স্কোয়ার নেই।

আজকের এই ইউনিভার্সিটি বিল্ডিংটাই পুরনো লাটভবন। যেখানে লাইব্রেরীটা দেখলে সেটাই ছিল সাহেবদের নাচ ঘর।

—মণিদা, লাইব্রেরীর সামনে বুসশার্ট আর মোটা ফ্রেমের চশমা পরা কাকে আমরা অভিবাদন করলাম।

—ও বলি নি বুঝি? উনি ডক্টর বি এন গাঙ্গুলী। ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে একজন অথরিটি। শুধু তাই নয়, একজন সাহিত্যসেবীও। প্রায় সাতাশ বছর আগে এ'দের প্রচেষ্টাতেই প্রকাশিত হয় 'সংহতি'। কবিগুরু ও'র লেখা পড়ে আশীর্বাদ করেছেন। এই 'সংহতিতে'ই ধরা পড়েন কল্লোল যুগের শ্রেষ্ঠ সারথিবৃন্দ।

কফি হাউসে প্রবেশ করলাম। ইউনিভার্সিটির মিলন তীর্থ। এক পেয়ালা কফির সাথে গরম গরম তর্ক জুড়ে ওদের মতন বেহেস্ত গুলজার কে করতে পারে?

ধরমতলায় ছাত্রদের উপর গুলী চালাবার সময়ে মিরান্ডা হাউসের মেয়েদের কানে সে খবর পৌঁছেছিল কি না জানি না, কিন্তু ছেলেদের সাথে কফি হাউসে এক টেবিলে বসার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অপরাধে প্রিন্সিপ্যাল ঠাকুরদাসকে যে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল তা নিজের চোখে দেখেছি। জিন্দাবাদের ঝাণ্ডা নিয়ে প্রথমবারের মত তারা বেরুলেন—প্রথম যুদ্ধে তারা কিন্তু জয়ীই হয়েছেন—আজ অবাধে ছেলেদের সাথে সমান তালে পা ফেলে কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে গভীর গাম্ভীর্যের সাথে আলোচনা শুরু করেন—ডার্লিং পল্, তোমার কালকের ক্রিকেটের স্ট্রোকটা কিন্তু মাইরি বলছি ফাইন্ হয়েছিল। লাস্টের ওটা কিন্তু ক্যাচ্ ছিল না—ওটা ছিল বাম্পার!

ভেন্টিলেটারের কাঁচের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছিল স্বচ্ছ সূর্যের কিরণখণ্ড। ঝলমলে আকাশ থেকে খররৌদ্র ঝরে পড়ছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত অনাবিল অনুভূতি সবই যেন ক্ষুদ্র এই কফি হাউসে বারংবার হুমড়ি খে[illegible] আছড়ে পড়ছে। জীবনের শাশ্বত অনুভূ[illegible] তরুণ প্রাণের স্পন্দন, ঐশ্বর্যের গরি[illegible] যৌবনের মাদকতাই যেন তার এক[illegible] ইঙ্গিত।

—তোমাদের এখানে ছাত্র কোথায়? স[illegible] তো দেখছি অধ্যাপকের পোষাক মণিদা!

রমা চারিদিকে অবাক্ চোখে তাকা[illegible] থাকে। অধীর আগ্রহে বলে উঠলো—স[illegible] তো দেখছি কোট, প্যাণ্ট, টাই—পুরোপু[illegible] সাহেব। সবই প্রফেসার নাকি?

জবাব আমাকে দিতে হল না। বৌদি বলে উঠলেন একটা দিক একদম ফাঁকা হ[illegible] তাকে পূরণ করতে হবে তো? প্রতি[illegible] বিকাশ বলে কোন জিনিস দিল্লীর [illegible] ছেলের ভিতর অনুভব করলাম না। [illegible] হচ্ছে সেইটেকে বাইরের চাকচিক্যে প্রতি প[illegible] ক্ষেপে ঢেকে রাখার তাই এ ব্যর্থ প্রয়া[illegible] তাই না?

বললাম, রুট নাম্বার ফোর মি[illegible] পাঁচেকের ভিতর এসে পড়বে। চলো [illegible] করে লাভ নেই বৌদি।

দিল্লীর ছেলে আমি। ওদের এ অ[illegible] চনাকে এগুতে দিলে বিশ্বাসঘাতক[illegible] না?

—ইউনিভার্সিটির পিছন দিকের [illegible] বাইরে যে ছোট্ট ছোট্ট শক্ত কতকগুলো [illegible] রুমের মতন দেখলাম, বললে না তো [illegible] সেগুলো কি?

বাঙলার ছেলের অনুসন্ধিৎসা প্র[illegible] তার দৃষ্টিশক্তি প্রখর। পুরনো [illegible] পোড়ো ঘরগুলোর পাশ দিয়ে অন্তত প[illegible] বার করেও যারা পাশ কাটিয়ে রোজ ইউ[illegible] ভার্সিটির ক্লাস করতে যায়, তাদের ক[illegible] কি কারুর মনে এ প্রশ্ন জেগেছে?

বললাম, জানো শান্তনু, মুসল[illegible] বাদশারা শিকারে খুব পারদর্শী ছি[illegible] তাঁরা শিকারকে বীর্যের একটা অঙ্গ [illegible] করতেন। শহরের বাইরে এ অংশটা [illegible] ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। ক্ষুদে দৈত্যের [illegible] এ ছোট্ট শক্ত ঘরগুলো ছিল তাঁদের [illegible] আস্তানা। এগুলো আজ প্রায় পাঁচশে[illegible] ধরে এখানে প্রহরীর মতন দাঁড়িয়ে [illegible]

শান্তনু, ডলি, রমা, বৌদি আমরা [illegible] কফি হাউস ছেড়ে উঠলাম। এবার গ[illegible] **স্থল রুট নাম্বার ফোর।**

গৃহ প্রত্যাবর্তী ছাত্রছাত্রীরা বেশ একটা কলরব মুখর জীবনপূর্ণ আবেষ্টনী সৃষ্টি করেছে। শৃঙ্খলা মেনে দাঁড়িয়েছে সকলে এটেনশনের ভঙ্গীতে বাস আসলেই শুরু হবে হাঁটি হাঁটি পা পা করে ফরওয়ার্ড মার্চ।

ন স্থান তিল ধারণে অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে দেখা দিল রুট নাম্বার ফোর। সে শুধু ক্ষণিকের দেখা। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী—বলতে বলতে সামনে দিয়ে চলে গেল। ছেলেমেয়েরা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়েই রইল। এতে ওরা অভ্যস্ত।

রমা বলে উঠল, 'কি দেমাক রে বাবা। ড্রাইভারটা হাত নেড়ে নেড়ে চলে গেল। একেবারে পরোয়াই করল না এতগুলো লোকের। রাজধানী না হাতী—

বললাম—'ঠিকই ধরেছ রমা। হাতীই যে দিল্লীর সাঙ্কেতিক নিদর্শন। দাঁড়িয়ে আর কি হবে? চলো কাশ্মীরী গেট পর্যন্ত হেঁটে। সেখান থেকে ট্যাক্সি ধরা যাবে।'

আজ আট বছর ধরে প্রতিদিন এই রুট নম্বর চারে যাতায়াত করছি। সে কি আজকের কথা? দিল্লী ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস যেনও গোয়ালিয়র নর্দান ইন্ডিয়ান ট্রান্স-পোর্টকে গ্রাস করে নি। এই রুটে চড়ে আসছি সেই জি এন আই টি'র যুগ থেকে। লাস্ নেভার ইন্ টাইম্—যাত্রীদের দেওয়া আদরের নাম। সেই বাস্। তার অপমান?

বললাম, 'জানো বৌদি এই রুট নাম্বার ফোরের সাথে কত বড় একটা ঐতিহাসিক গ্রন্থি বাঁধা রয়েছে। পুরনো প্রাসাদগুলোর পাশ দিয়ে আসতে আসতে প্রাণহীন বাসটাও জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই রাস্তার ধুলো উড়িয়ে কোন বাস ভূধর হইতে ভূধরে লুটিত' গতিতে ছুটতে পারে না। সংযত সম্ভ্রমে তাই এ মন্থর গতি। এই রুট নাম্বার ফোর প্রতিদিন তোমাদের দেখিয়ে চলেছে দারা-শিকোর বাসভবন, সুলতানা রাজিয়ার কবর, হায়দরাবাদের প্রথম নিজাম গাজী খাঁর সমাধি, বুলবুলি খাঁর নিস্তব্ধ মহল; সাজাহানাবাদের প্রশস্ত রাজপথ, লালকেল্লা, জুম্মা মসজিদ তো আছেই। তোমরা কোন দিন ক্ষণিকের জন্যও দাঁড়িয়ে এর একটা জায়গারও ধুলো স্পর্শ করেছো?

নির্বাক্ ডলি, রমা, শান্তনু, বৌদি রীজ বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ থেমে পড়লো।

—এটা কি মণিদা? রীজের মাঝখানে কথা নেই বার্তা নেই এক টাওয়ার?

বললাম—ও হ্যাঁ, এটা একটা পুরনো অস্ত্রাগার। সিপাহী আন্দোলনের সময়ে ত্রস্ত বিদেশী বণিকদল পাহাড়ের গায়ে এই অস্ত্রাগারে চল্লিশ মাইল দূর মীরাট থেকে এক সেনাবাহিনীর অপেক্ষায় দিন গুনেছেন। সে বাহিনী ফিরে আসে নি। না আসা সে বাহিনীর শোকের ঝড় মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে এই টাওয়ার। এরই নামে ঐ ফ্ল্যাগ-স্টাফ্ রোড। ঐ যে কোণে মসজিদটা দেখছো ওটা তৈরী করেছেন শাহ্ আলম। সম্রাট শাহ আলম নয়—পীর শাহ্ আলম।

স্লোপ দিয়ে শান্তনু, ডলি, রমা ছোট্ট শিশুর মতন ছুটতে ছুটতে নামছিল। স্লোপের সাথে ওদের পরিচয় নতুন। নতুন পরিচয় বড় মধুর।

বৌদি বললেন, 'ছুটো না। দড়াম করে নীচে পড়লে তোমাদের স্মৃতিতে কিন্তু কেউ কোন টাওয়ার তৈরী করতে বসে নেই।

দুদিকের সারিবদ্ধ ইউক্যালিপটাসের পাশ দিয়ে এসে পড়লাম রাজপুর রোডে।

(দুই)

কোথায় যাবেন?

সামনে এসে দাঁড়াল একখানা বুইক।

বললাম, আপাতত যাচ্ছি দারাশিকোর বাড়ি, সেখান থেকে রুট নাম্বার ফোর।

বৌদি বললেন, 'মণির কথার ভঙ্গিমা দেখো। যেন দারাশিকোর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে চলেছেন। আসল কথাটা কি তাই? বললেই হয় রুট নাম্বার ফোর মিস করেছি।

প্রত্যাখ্যান করলাম না। তাছাড়া ভদ্রলোক নিজেও দারাশিকোর বাড়ি দেখেন নি যখন। ভদ্রলোক গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। ভদ্রলোকের নাম বুবু সেন।

বুবু জিজ্ঞেস করলেন—আপনি স্টিফ্যা-নিয়ান? গৌরীকে নিশ্চয়ই চেনেন—ভাল গান গায়—ইউনিভার্সিটিতে রেকর্ড করে-ছিল বি এ তে।

বললাম, 'হাসালেন মশাই! গৌরীকে চিনবো না? এক সাথে খেলেছি, পড়েছি, বেড়িয়েছি। ওর গান না শুনলে আমার তো ঘুমই হত না—আর ওকে চিনবো না?

—আমি তাদের বাড়িতেই থাকি। আসবেন একদিন। হরিপদদাও এসেছেন কলকাতা থেকে।

বৌদি, রমা, ডলি, শান্তনু, বুবুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। গৌরী-চান্দ্রিকায় ফুলস্টপ পড়লো। গাড়ি এসে থামলো স্টুডেন্টস পার্কের কোণে—নীলাভ প্রস্তর নির্মিত হর্ম্যদ্বারের ডান দিকে।

প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। হলঘরের দরজাটা আজ কত শত বছর ধরে ঐ প্রাচীন ভজনাগারকে স্নেহমাখা বুকে আগলে রেখেছে। ডান দিকে উপরে যাবার সিঁড়ি।

ফাউণ্ডেশন স্টেশনটা দেখে রমা চেঁচিয়ে উঠলো। ওমা! এ দেখি সেণ্ট্ স্টিফেন্স কলেজ। এই জানুয়ারী মাসে তুমি আমাদের এপ্রিল ফুল করছো মণিদা? দেখ্ দেখ্ ডলি কি লেখা রয়েছে—ওমা তোর আবার কি হল? মুখ ভার করে দাঁড়িয়েছিস্ কেন?

ডলি বৌদির ছোট বোন। আমার বান্ধবী।

বললাম, 'রহস্যময় এ প্রাসাদই দারাশিকোর বাসভবন। বৃটিশ রেসিডেন্সী এখানে সিপাহী আন্দোলনের আগে বাসা বেঁধে-ছিল। বৃটিশ রেসিডেন্ট লর্ড মেটকাফ এই ঘরে বাস করেছেন। সার ডেভিড অক্টার-লনী,—হ্যাঁ যার নামে কলকাতার অক্টার-লনী মনুমেণ্ট এই ঘরে বাস করেছেন। কিন্তু নিছক বিলাসিতার জায়গা এ প্রাসাদে হল না। তাই এখানে এলো দিল্লী কলেজ। দিল্লী কলেজ হয়ে গেল বন্ধ। এলো সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজ। সেণ্ট স্টিফেন্স গেল ইউনিভার্সিটির পাশে, এলো গভর্নমেণ্ট হাই স্কুল। লক্ষ্য করে দেখেছো কি শতাব্দীর পর শতাব্দী এই প্রাসাদে শুধু জ্ঞানের আরাধনাই চলে আসছে? শিক্ষার ক্ষুধিত পাষাণ!

কোণের ঐ ব্রাকেট আর উপরের গম্বুজ-গুলোই মোগল স্থাপত্যের জীবন্ত সাক্ষী। মোগল যুগে সৃষ্টি হলেও এর কাঠামোটা মাত্র বাঁচিয়ে বাকী সব আজ দাঁড়িয়েছে বিলিতি ভঙ্গিমায়।

জানো রমা, এই হল ঘরে বসেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত দর্শন আলোচনা। বিভিন্ন-তার মাঝেও সমন্বয়ের মূলমন্ত্র রাজর্ষি দারা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই কোর-আন্-শরীফের আল্লা এক এবং অদ্বিতীয়ের সাথে সুর মিলিয়ে উপনিষদের ছন্দে গাইলেন এক ভগবান সর্বদেহে অধিষ্ঠান সর্বময় এক অদ্বিতীয়। দারা-

কার উপনিষদের সার সংগ্রহ—সর্-ই-

সুধী সমাজের কে না পড়েছে?

আ শর্নিক দারা সেদিন গেয়েছিলেন

কল্পক বত মহান্ সুর।

গুলীর

যায় নি য়ের কাহিনী ইতিহাসের

এই হলর্তমান অলীকের জীবন্ত

অনুসরণ ঃ যুদ্ধে দারারই জয় হয়ে-

রিডিং লর্ড হাসন হঠাৎ শূন্য দেখে

এক একটা সনাদল বিপর্যস্ত হয়ে

চেমস্‌ফোর্ড সেনাবাহিনী সাজাদাকে

রোড—নয়াদিল্লজাদার প্রভুহীন প্রিয়

হস্তী ফতে জঙ দাঁড়িয়ে ভাবছিল মানুষ-গুলো কি মূঢ়! সসাগরা মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রাজর্ষি দারার ছিন্নমুণ্ড বিস্ময়ে বিহ্বল কারারুদ্ধ স্নেহময় পিতার পদতলে লুটিয়ে পড়লো। ভগ্নী জাহানারা মূর্ছা গেলেন। সেদিনের সলজ্জ আকাশে উঠেছিল কি সন্ধ্যাতারা?

দারার সাথে মোগল অন্তঃপুরের মধ্য-মণি জাহানারার ছিল সংস্কারগত গভীর যোগসূত্র। দারার মৃত্যুর সাথে সাথে জাহানারার জীবনে আশার আলো গেল নিভে। প্রিয়তম দুলেরাকে গ্রহণ করার কোন পথই আর খোলা রইল না। সম্রাট আকবরের নির্দেশে মোগল সাজাদী বরমাল্যের অধি-কার থেকে হয়েছিল বঞ্চিত। সম্রাট হয়ে উদার দারা তাকে প্রিয়তম গ্রহণের অনুমতি
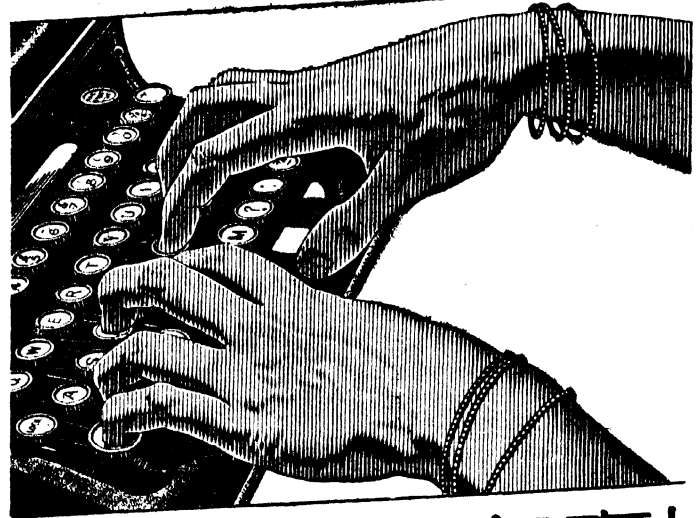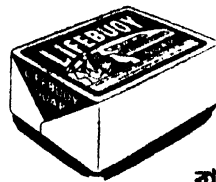
দেবে তাই তো সে এতদিন অধীর আগ্রহে শবরীর প্রতীক্ষায় ছিল রত।

যে প্রিয় রক্তকরবীগুচ্ছে জাহানারা দারার বাসরঘর সাজিয়েছিল, যে নীল সবুজ অতসী প্রদীপের মৃদু কম্পনের তালে তালে নেচেছিল সেদিন, চিরতরে তারা তার জীবন থেকে গেল মুছে। জাহানারার বাসর প্রদীপ জ্বললো না। হায় জাহানারা তুমিই না বলেছিলে পতিবিহীনা নারী আর সূর্যবিহীন দিবস উভয়ই নিরর্থক?

(তিন)

ঐ যে কোণে হলদে প্রাসাদটা দেখছো, জানো বৌদি, ঐটে আমাদের হিন্দু কলেজ। ওটা আসলে ছিল কর্নেল স্কিনারের বাসস্থান। অনেকে এটাকে বেগম সমরুর প্রাসাদ বলেন। সেটা সম্পূর্ণ ভুল। গ্রীক ভঙ্গিমায় গড়া সে প্রাসাদ আসলে রয়েছে চাঁদনী চকে। পাশের ঐ মসজিদটা তৈরী হয়েছে আজ প্রায় আড়াই শো বছর আগে। ঐ দেখো ফার্শীতে লেখা রয়েছে নির্মেতা ফকরুউদ্দিন খানের নাম।

--আচ্ছা, বল দেখি রমা, বিপদে পড়লে আমরা কি করি?

—ওমা সে কি? বিপদ আবার কিসের? নোই, যাট্!

—না, না, সাধারণত কি করে থাকি তাই বল না। শান্তনু তুমিই বল।

—সেটা মণিদা অবস্থা বুঝে। পরীক্ষার বিপদ হলে ছোটতর বিপদ আলিঙ্গন করি। বাঁধাই জ্বর। চাকরীর বিপদ হলে সন্ধ্যের আঁধারে গা ঢেকে অফিসার দেবতার মন্দিরে মাথা ঠুকে মন্ত্র আওড়াই—এসেন্সো চর্চিত কালো কলেবর শ্বেত বসনমালী! প্রেম সম্বন্ধে হলে পটাশিয়াম্ সাইনাইড্, ছেলেমেয়ের অসুখ হলে মাকালীকে জোড়া পাঁঠা—

—ঐ শেষেরটাই টু দি পয়েন্ট শান্তনু। মারাঠা অধিপতি দৌলতরাও সিন্ধিয়ার ভৃত্য কর্নেল স্কিনার বৃটিশ বাহিনী যোগদানের পূর্বে রণক্ষেত্রে একবার ক্ষতবিক্ষত-ভবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে বসেছিল। মরণাপন্ন সেনাধিনায়ক আবেগপূর্ণ ক্রন্দনে সেদিন ভগবান যীশুর কাছে জানাল নিরাময়তার আকুল প্রার্থনা। সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। ঐ যে রুট নাম্বার ফোর-স্ট্যাণ্ডের পাশে মুক্ত আকাশের পূত নীলিমায় অঙ্গুলী সঙ্কেত করে গীর্জাটা দাঁড়িয়ে আছে—এটা তারই সাক্ষী। প্রতিশ্রুতি মত কর্নেল এ গীর্জা তৈরী করে। এর গড়ন ভঙ্গিমা অনেকটা লণ্ডনের সেণ্টপলস্ ক্যাথেড্রালের মত।

লোথীয়ান্ ব্রীজ পেরিয়ে গাড়ি দাঁড়াল লালকেল্লার সামনে। লালকেল্লা আগেই দেখা হয়েছে—ডান দিকে চাঁদনী চক। পুরনো কলরবমুখর রাজপথগুলোর ভিতর আজ একমাত্র এই চাঁদনী চকই প্রাণবান। কে তাকে বলবে বিগত যৌবনা?

কেল্লার সামনে তৃণ শ্যামল ভূমিখণ্ডে বসে পড়লাম। সম্মুখে কলরব মুখর চাঁদনীচক। কোথায় আজ সেই সৈন্যদল যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল—রাজরক্তে রঞ্জিত এই পথের বায়ুতেই তো তাদের স্মৃতি আজ হয়ে রয়েছে বিলীন।

বললাম, 'জানো রমা, এই চাঁদনী চকের সাথে জাহানারার জীবন কত সাদৃশ্যপূর্ণ। —দিল্লীর রাস্তা-জগতে চাঁদনী চক সম্রাজ্ঞী। ডে লাইটের ঝলমলে আলোর অলঙ্কারেই ছিল চাঁদনী চকের রূপচ্ছটা। নির্বাক জাহানারার মত এই চাঁদনী চক নিজের বুকের উপরের হত্যা লুণ্ঠন অরাজকতার নীরব সাক্ষী। এই রাজপথেই অনাবৃত রুগ্ন হস্তীপৃষ্ঠে নিরাভরণ ছিন্নবস্ত্র পরিহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ শাহ্ বুলন্দ্ একবালকে করানো হয়েছিল শহর পরিভ্রমণ। শাহ্ বুলন্দ্ একবাল—ভাগ্যবান শাজাদা— দারা উপাধি। কি বেদনাবিদুর পরিহাস! বিচলিত অলিন্দে অসহায় পুরনারীরা অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সেদিন শুধু ফেলেছিল ঝর ঝর অশ্রু অর্ঘ্য। ভীরু কাপুরুষ পুরবাসীরা জানাতে পারে নি তাদের স্পষ্ট প্রতিবাদ।

ঐ যে কোণে বটগাছটা দেখছো, তিন তিন দিন ঐ গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল বাহাদুর শাহের পুত্রপৌত্রের মৃতদেহ। বিশ্বাসঘাতক বিদেশী। আত্মসমর্পণের পর তোমরা না দিয়েছিলে সম্রাটপুত্রদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি? ভীতি বিহ্বল জনতা সেদিন শুধু প্রণতি জানিয়েছে বিশ্বস্রষ্টাকে আর ভূমি চুম্বন করে মৃত রাজপুত্রদের জানিয়েছে সেলাম।

এই পথেই চলেছিল প্রেম-পাগলিনী জাহানারা প্রিয়তম দুলেরার সাথে মাত্র একটি সন্ধ্যা। সেদিন এ দৃশ্য দেখতে সজ্জিত করীযূথে তাদের মন্থর গতিকে আরও সংযত করেছিল। বিটপী বীথির চারিদিক থেকে সেদিন ভেসে এসেছিল কি কস্তুরী জাফরান অগুরু চন্দনের স্নিগ্ধ সুবাস?

এই চাঁদনীচকই তো মহামানবের মিলন-তীর্থ। এখানকার বিসর্পিল বিপণিতে সমবেত হয়েছে জাঞ্জিবার, ইংলণ্ড, সিরিয়া, তুরস্ক, হল্যাণ্ড, খোরাসান, জাবুলীস্থান, চীন, কাবুল, তুর্কীস্থান আরও কত দেশের লোক। তাদের পদচিহ্ন আজ কোথায় গেছে মিলিয়ে?

এই পথেই নাদির শা বাজিয়েছিল জয়ডঙ্কা। এই পথেই বিজয় পতাকা উড়িয়ে টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়েছিল আহমদ শা আবদালী। এই পথে রণবিষাণ বাজিয়েছিল মারাঠা নায়ক মাধোরাও সিন্ধিয়া। এই পথে দামামা নিনাদে এসেছিল গোলাম খাদির। মোগল যুগে এই চাঁদনীচকের মাঝখানে দিয়ে বয়ে যেত একটা ক্যানাল। তার জীর্ণতা সংস্কার করেন আলী মর্দান, প্রায় একশো তিরিশ বছর আগে। বছর চল্লিশ হল সেটা ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। জানো ডলি আজও সে ক্যানাল বয়ে চলেছে নিঃশব্দ ভূমিতলে। পৃথিবীতে এত পুরোনো, এত ঘটনাসঙ্কুল প্রাণবান্ রাজপথ খুবই কম আছে।

--কাকে বলছো তুমি মণিদা? ডলি কিছু শুনছে নাকি? ওর 'দিল' উদাস হয়ে গেছে।

রমা হাসির ফোয়ারায় ফেটে পড়ে।

গাড়ি চলছিল সংযত গতিতে। দরিয়াগঞ্জে এসে পড়লাম—সাজাহানাবাদের দক্ষিণার্ধে। বাঁদিকে গান্ধী সমাধি রেখে গাড়ি টার্ন নিল সার্কুলার রোডে। ওখানে দেখবো সুলতানা রাজিয়ার কবর।

আজ কত যুগ কেটে গেছে। ভারতের সিংহাসনে মহিলা সম্রাজ্ঞী। বুলবুলি থাঁর নিস্তব্ধ মহলে পাষাণ সমাধি। সমাধির গড়নভঙ্গীমা আড়ম্বরবিহীন। হায় রাজিয়া, হৃদয়ের বিনিময়েও তুমি পেলে না শৃঙ্খলমুক্তি! কুসংস্কারাচ্ছন্ন অমাত্যবর্গ নারীর অধীনতা স্বীকার করল না। অন্তঃপুরের নূপুর নিক্কণের পরিবর্তে সুলতানা বরণ করলেন শৃঙ্খল ঝঙ্কার। মহীয়সী রাজিয়া।

সমাধির দক্ষিণ কোণে এক উত্তর ভারতীয় কিশোর সমাধির উপর আঘাত করে বোধ হয় নতুন হকি স্টিকের শক্তি পরীক্ষা চালাচ্ছিল।

হঠাৎ রমা গিয়ে তার হাতের স্টিকটা কেড়ে নিল।

হতবাক্ ছেলেটা আমাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ব্যাপারটা কি, তখনও সে বুঝে উঠতে পারেনি।

বল্লাম দিয়ে দাও রমা ও স্টিক। শ্রদ্ধা, ভক্তি ইঞ্জেকশন করে কারুর ভিতর ঢুকিয়ে দিতে পারবে না। শ্রদ্ধা জানানোও একটা আর্ট। সেটা আয়ত্ত করার পিছনে আছে সাধনা।

দেরি হয়ে যাচ্ছিল। বুবুকে নিজামের কবরের দিকে যাবার নির্দেশ দিলাম।

বর্তমান দিল্লী কলেজ। মোগল যুগের মাদ্রাসা। হায়দরাবাদের প্রথম নিজাম গাজী খাঁকে অর্পণ করা হয় এই মাদ্রাসা পরিচালনার গুরুভার। আমরণ গাজী অর্পিত কর্তব্য আগলে গেছেন। আজও কলেজের পিছনে তাঁর সমাধিতে জ্বলে সান্ধ্য প্রদীপ। মোগল মাদ্রাসাগুলোর ভিতর আজ মাত্র এই প্রাণবান্ মাদ্রাসাগুহই শিক্ষার দীপশিখায় রয়েছে উজ্জ্বল।

টমসন রোড দিয়ে বুবু কনটপ্লেসে গাড়ি এনে বল্লে, 'একটা রাউণ্ড দেব কি? শনিবারে কনটপ্লেস তো রাজধানী।'

বৌদি বল্লেন, 'না থাক। কনটপ্লেস তো রয়েছেই, আমরাও আছি। অন্য দিন দেখা যাবে। আসল কথাটা কি জানেন? নবীনার উজ্জ্বলতায় চোখ অনেক সময় ঝলসে যায়। আসল সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে তার মডার্নত্বে। যা-যা দেখে এলাম এক দিনের পক্ষে তা যথেষ্ট নয় কি?

লেডী হার্ডিঞ্জ কলেজের সামনে দিয়ে এসে পড়লাম বেয়ার্ড রোড পেরিয়ে গোল মার্কেটে। ওদের ওখানে একদিন যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বুবুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

স্ট্যাণ্ডে দেখি দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তিমান সলজ্জ রুট নাম্বার ফোর। বল্লাম, 'ডলি উঠবে নাকি? ঐ দেখো একদম ফাঁকা। ঠিক ইউনিভার্সিটির সামনের ভরা বাসের মতন দারাশিকোর প্রাসাদ, বুলবুলি খাঁর মহল, বেগম সমরুর প্রাসাদ সাজাহানাবাদ—এসবই একদিন ছিল কর্মব্যস্ততায় সজীব। আর আজ? দিনের শেষে কর্মক্লান্ত বাসটা কিন্তু এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক তাদেরই মতন ফাঁকা।

—রাখো মণিদা তোমার দর্শন। আগে শোনো কি বলছে ডলি—দাও ওর প্রশ্নের জবাব। বল ওকে গৌরী কে? —তুমি যার সাথে খেলতে, পড়তে, দৌড়তে। যার গান না শুনলে তোমার ঘুম আসত না?

বল্লাম, 'আচ্ছা ডলি, সেই থেকে এই প্রশ্নই কি তোমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে? অতীতের সামনে এই যে এতক্ষণ বকে মরলাম, এর একটা কথাও কি তোমার কানে যায় নি?'

দেবদাস পাঠক

প্রণতিদি, ও প্রণতিদি—বাঁশের কেয়ারি ঠেলে পাশের বাড়ির রেখা উঠোনে ঢুকল।

লণ্ঠনের আলোয় বসে উল বুনছিল প্রণতি। চোখ না তুলেই বলল, কী হলো?

—কী হলো? আচ্ছা লোক তুমি বাপু, গোটা কলোনির লোক জেনে গেল, আর তোমার কানেই পেঁছুলো না খবরটা।

—কী খবর রেখা? প্রণতির কণ্ঠে আশানুরূপ কৌতূহল প্রকাশ পেল না যেন।

সুরেন রায়ের দল হেরে গেছে। সবাই মিলে সোমেনদাকে কলোনির সেক্রেটারী করেছে। সোমেনদা নাকি কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না। সবাই মিলে একরকম জোর করেই করেছে। এখন কী খাওয়াবে বলতো?

কিন্তু তবুও প্রণতির চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক খেলল না। আরও একটু থমথমে হলো।

বিস্মিত হলো রেখা। এতদিন পাশাপাশি থেকেও এই মেয়েটিকে চেনা গেল না। যেটুকু ওর বাইরে, সেটুকু নম্র, শিষ্ট। কিন্তু তার ওদিকে, মনের রাজ্যে, কারও প্রবেশের অধিকার নেই। সে রাজ্য গভীর, অন্ধকার।

প্রণতি ততক্ষণে আবার উল আর কাঁটায় মন দিয়েছে। যেন কিছুই হয় নি। এই সব মুহূর্তে প্রণতির অস্তিত্ব বড় অস্বস্তিকর লাগে রেখার কাছে। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। আর প্রণতিকে নির্মম।

—আচ্ছা এখন যাই, ছেলেটা হয়তো আবার কান্নাকাটি শুরু করেছে।

রেখা চলে গেল। অস্বস্তির হাত এড়াতেই হয়তো। আর রেখা চলে যেতে দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল প্রণতির। সোমেন কলোনির সেক্রেটারী হয়েছে, অথচ তাঁর স্ত্রী হয়ে প্রণতি খুশি হতে পারছে না। ছোট-বড় শ-পাঁচেক ঘর নিয়ে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের এই কলোনির যে কোন বধূই আজ প্রণতিকে ঈর্ষা করতে পারে। এই ক্ষুদ্র উপনিবেশের ভাগ্যবিধাতাই বলা চলে সোমেনকে। সবাই তাঁকে বিশ্বাস করে, ভালবাসে। আর তাইতো জোচ্চোর সুরেন রায়কে তাড়িয়ে সোমেনকে সেক্রেটারী করেছে।

কিন্তু প্রণতি তবু খুশি হতে পারল না। সোমেন যে শেষে এদেরই একজন হবে একথা জানলে এখানে সে কিছুতেই আসত না। সোমেন এদের মধ্যে থাকুক, এদের দেখুক, চিনুক, জানুক এদের আশা-আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখের কথা, তাঁর সামনে নতুন অভিজ্ঞতার দরজা খুলে যাক, আর নতুন আলোয় বেঁচে উঠুক শিল্পী সোমেন এইটুকুই শুধু চেয়েছিল প্রণতি। তাইতো আনন্দনগর কলোনির বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী হয়ে এখানে আসা। মানে সোমেনকে নিয়ে আসা। নাহলে ঠিক উদ্বাস্তু বলতে যা বোঝায়, প্রণতিরা তা নয়। পূর্ববঙ্গে বাড়ি ছিল এই পর্যন্ত। কালেভদ্রে যেত। আর বিশেষ কিছু ছিলও না সেখানে। সরকারী চাকরী নিয়ে মফঃস্বলে ঘুরেছে অনেকদিন। প্রণতিই চেষ্টা করে বলে-কয়ে সোমেনকে দিয়ে কলকাতায় বদলির চেষ্টা করিয়েছে। প্রণতির আশা ছিল পুরনো বন্ধুদের সাহচর্যের উত্তাপে নিজের মনের স্থবির মেদ গলিয়ে নিতে পারবে সোমেন। হয়তো আবার লিখতে শুরু করবে। প্রণতির আশা ছিল। এই আশা নিয়েই বেঁচে ছিল প্রণতি। কিন্তু সে বিশ্বাসের নটে গাছ এবার বুঝি মুড়োল। কেউ যেন ভেংচে কাটল প্রণতির আকাঙ্ক্ষাকে।

সোমেন প্রথম কথা বলল বিছানায় শুয়ে।

আজ একটা কাণ্ড হয়েছে।

প্রণতি পাশ ফিরে বলল, হুঁ।

যতীশবাবুরা সবাই মিলে একরকম জোর করেই আমাকে কলোনি কমিটির সেক্রেটারী করে দিলেন। আমার একদম ইচ্ছে ছিল না এই ঝামেলায় জড়াবার। কিন্তু ওরা—একি, কী হলো তোমার, এরই মধ্যে ঘুমুলে নাকি? সোমেন, প্রণতির গায়ে হাত রাখল।

—হ্যাঁ, বড্ড ঘুম পাচ্ছে। হাই তুলল প্রণতি।

অথচ সোমেনই আগে ঘুমুল। প্রণতির চোখে ঘুম এলো না। ভীড় করে এলো পুরনো ছবি। একের পরে আর। জানালার কাচে রোদ লাগল যেন।

বছর দশেক আগে ছোট বোন মিনতির প্রাইভেট টিউটররূপে যে সোমেনকে সে প্রথম দেখেছিল, তার সঙ্গে এখন, তার পাশে ঘুমিয়ে-পড়া খুশি-মুখ লোকটির কোন সাদৃশ্য নেই। তবু কখনও কখনও সেই দুটি আশ্চর্য চোখে আলো জ্বলে। কিন্তু সে কেবল দু'এক মুহূর্তের প্রজ্বলন। তারপর আবার শান্তি। আবার নির্বাপণ। কেন এমন হলো! প্রণতি নিজের মনে উত্তর হাতড়ায়।

ম্যাট্রিকুলেশনের সার্টিফিকেট আঁচলে বেঁধে বসেছিল প্রণতি। বিবাহলোকের প্রাথমিক ছাড়পত্র। ঘরে-বাইরে প্রস্তুতি চলছে। এমন রবিবার বাদ যায় নি, যেদিন দু-চারজন লোক ধরে আনেন নি বাবা। তাদের হাজারো প্রশ্নের জবাব। মিনুনি দেখে বরের জ্যাঠা মুখ কোঁচকালে পরের দিন লোটন খোঁপা। প্রণতি চৌধুরী নাম শুনে ছেলের পিসেমশাই আধুনিকতার উপর কটাক্ষ করলে পরের দিন শ্রীমতী প্রণতি দেবী। সেদিন হয়তো আপত্তি করেছে ছেলের বন্ধু। প্রণতি মনে মনে প্রার্থনা করেছে শনিবারের রাত্রি দীর্ঘতর হোক। কিন্তু এক সময় রাত কেটেছে। সকাল গড়িয়ে সেই বিকেল। কিন্তু সেদিন বিকেলে আর তাকে কেউ দেখতে এলো না। বরং তাদের বাড়িতে যে এলো এক সময় দরজার ফাঁক দিয়ে তাকেই এক নজর দেখে এলো প্রণতি। কালো, হ্যাঁ তা কালো বৈকি গায়ের রঙ। মাথায় একরাশ চুল উল্টো করে আঁচড়ান। আর মায়াবী কালো দুটি চোখ। তীক্ষ্ম, উজ্জ্বল। এই হলো সোমেন রায়। প্রণতির ছোটবোন মিনতির গৃহশিক্ষক হবার আর্জি নিয়ে এসেছে। বাবার এক বন্ধুর চিঠি নিয়ে এসেছিল। বাবা আলাপ করে খুশি হলেন।

কাজে বহাল হলো সোমেন।

প্রণতির মনে হলো নামটা যেন তার চেনা। কিন্তু কোথায় আর কেমন করে এটুকুই মনে পড়ছে না।

মনে পড়ল আরও কয়েকদিন পরে। কোন বন্ধুর কাছ থেকে একখানা মাসিক পত্র পড়তে এনে। নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে সে কাগজের কৌলীন্য সম্বন্ধে তখনকার দিনে দ্বিমত ছিল না। সূচীপত্রে সাক্ষাৎ মিলল সোমেন রায়ের। একটা গল্প ছিল। প্রণতির মনে পড়ল এঁর গল্প সে তো আরও পড়েছে। আর তাই মিনতির মাস্টারমশাইএর নাম চেনা মনে হচ্ছিল। প্রথমেই সোমেনের গল্প পড়ল প্রণতি। সে গল্পও আজ আর মনে নেই। তবে আর এক গল্পের সূত্রপাত সেই থেকে। আর এর লেখক সোমেন নয়। প্রণতি চৌধুরী। এখন তো রায়। সে গল্প তার ভালো লেগেছিল। আর ভালো লেগেছিল কালো লাজুক একটি মানুষের উজ্জ্বল দুটি চোখ। অবশ্য প্রণতি তখনও জানেনি মিনতির মাস্টার মশাই এই সোমেন রায়। কিন্তু মন বলছিল না হয়েই যায় না। প্রণতির তখন বয়স কম। কৈশোর ছল ছল চোখে পিছনে দাঁড়িয়ে। যৌবন দেহমনে স্পর্শ দিয়েছে। ষোলর দরজা বন্ধ, সতেরর সিঁড়ি ভাঙছে। হিসেবী আঠারো তখনও আটঘাট বাঁধে নি। ও বয়েসটাই এমনি। সোমেনের আর কোন পরিচয় নেই প্রণতির কাছে। সে শিল্পী। যে রোজ সন্ধ্যায় তাদের বাইরের ঘরে বসে মিনতিকে বাড়ের চাপমাত্রা থেকে শুরু করে ভিটামিন 'সি'র প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ঝাড়া দু-ঘণ্টা জ্ঞান দান করে। প্রণতির জানতে ইচ্ছে করে এরকম আরও কজন ছাত্র-ছাত্রী আছে সোমেনের। আর তাদের সবারই কি মিনতির মত নিরেট মাথা। আচ্ছা লোকগুলো টুইশান করে কী করে? মাথা গরম হয়ে ওঠে না, মেজাজ খিঁচড়ে যায় না?

মাস তিনেক আরও কাটল। সোমেন আসে মিনতিকে পড়ায়। আর প্রণতি মাঝে মাঝে দেখে সেই আশ্চর্য দুটি চোখ। স্বচ্ছ, স্বপ্নিল। আচ্ছা, প্রণতি ভেবেছে, যদি কখনও এ স্বপ্ন ভাঙে, তাহলেও কি ওর চোখ তেমনি উজ্জ্বল থাকবে? কে জানে!

সেদিন সোমেনের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ জুটে গেল আশাতীতভাবে। শিলং থেকে বড় মাসীমা এসেছিলেন কলকাতায়। দুপুরে মাকে ধরে নিয়ে গেলেন বেলেঘাটা। তাঁর শ্বশুরবাড়ি। মিনতিও সঙ্গ নিল। প্রণতির যাওয়া হলো না বাবার জন্য। বাবা অফিস থেকে ফিরলে তাঁকে খাবার দিতে হবে। চা করতে হবে।

সোমেন এলো ছ'টার সময়। বাবা তখনও ফেরেন নি। ঝি-টা গিয়েছে বাইরে। প্রণতিকেই দরজা খুলে দিতে হলো। বলল, বসুন, মিনতি মার সঙ্গে বাইরে গেছে, ফিরতে হয়তো দেরী হবে।

একটু পরে চা নিয়ে এলো প্রণতি। ভীষণ লজ্জা করছিল সোমেনের। মুখ তুলতে পারছিল না। প্রণতি বলল, নিন চা খান। বাবা বোধ হয় এক্ষুণি এসে পড়বেন। কেন যে বাবার আসবার কথাটা বলল, তা নিজেই বুঝতে পারছিল না।

প্রণতির হাত থেকে চায়ের কাপ নিল সোমেন। হাত কেঁপে গিয়ে খানিকটা চা চলকে পড়ল ডিসে। মুখ নীচু করে চুমুক দিল কাপে। আর প্রণতি দেখছিল তার সেই চোখ। স্বচ্ছ আর স্বপ্নালু। এমন সময় দরজায় কড়া নড়ল। বাবা এলেন। আর সেই পরিস্থিতিটা প্রথম অনুভব করল প্রণতি। লজ্জা হলো তার। ভীষণ লজ্জা। নিজের আদেখলেপনার জন্য। কী দরকার ছিল তার সোমেনকে নিজে হাতে চা করে খাওয়াবার।

প্রণতি দরজা খুলে দিল। বাবা ঘরে ঢুকলেন। সোমেনকে দেখে বললেন, এ যে মাস্টারমশাই এসে গেছেন। তা আপনার ছাত্রী কোথায়?

মাস্টারমশাইএর হয়ে উত্তর দিল প্রণতি। মা আর মিনতিকে বড় মাসীমা বেলেঘাটা নিয়ে গেছেন।

'ও, তা বেশ, ভালই হলো। আসুন একটা সন্ধ্যা গল্প করে কাটাই। ছাত্রী তো রোজই আছে। আর বুঝি তো মশাই সবই প্রয়োজনের জন্যে। রোজ রোজ কি আর পড়াতে ভালো লাগে। আমাকে একবার মাস তিনেক ছাত্র পড়াতে হয়েছিল ও সে অভিজ্ঞতার কথা আর ভুলব না। যাক, যা তো মা, আমার চা'টাও এখানে নিয়ে আয়। আমি হাত মুখটা ধুয়ে আসি।

মিনতিরা ফিরল রাত সাড়ে নটায়। তখনও পর্যন্ত সোমেনকে ধরে রেখেছিলেন বাবা। গল্প আর গল্প। প্রণতি নীরব শ্রোতা। কথার মাঝে হঠাৎ হয়তো প্রণতিকে জিজ্ঞাসা করেছে সোমেন, আপনি কী বলেন? প্রণতি বিব্রত হয়েছে। ভালোও লেগেছে তার। সোমেনের প্রতিটি কথা গিলেছে প্রণতি।

এরপর থেকে সন্ধ্যার দিকে সোমেনের চা-টা প্রণতিই নিয়ে আসত। কী করে যে ব্যবস্থাটা চালু হয়ে গেল কে জানে। বলা বাহুল্য, চায়ের কাপ নিয়ে ফিরতে প্রায়ই

রী হতো। আর হাঁফ ছেড়ে সে সময়টা চত মিনতি। দেখা গেল, আগ্রহটা ছাত্রীর র তার দিদিরই বেশী। আর সোমেনেও নতিকে পড়িয়ে যেন তেমন আনন্দ পাচ্ছে।

বন্দোবস্তটাকে পাকা করে দিলেন বাবা। ণতির বিবাহ-প্রচেষ্টার ভরা জোয়ারে তখন টা পড়েছে। এদিকে কলেজে ভর্তি হবার য়েও নেই আর। অথচ পড়াশ‌ুনোয় ঝোঁক ল প্রণতির। বাবা বললেন, বরং বাড়িতে সেই পড়াশ‌ুনো কর। আমি না হয় সোমেনকে বলে দেব, তোকেও একট‌ু দেখিয়ে শ‌ুনিয়ে দেবে।

কথাটা ঠিক মনঃপ‌ুত হলো না প্রণতির। বলল, কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—ওঁর সঙ্গে তো কথা ছিল কেবল মিনতিকে পড়াবার। এখন আবার—

তাকে বাধা দিয়ে বাবা বললেন, সে কথা র আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। আর কিছ‌ু টাকা বাড়িয়ে দেব।

কিন্তু ম‌ুশকিল হলো সোমেনকে নিয়ে। তিনি দায়িত্ব নিতে সাগ্রহে রাজী হলো। পেছিও দেখা গেল বাড়তি টাকা নিতে। বলল, এতো ভাল কথা, মিনতির সঙ্গে বসে তবে ওতে আমার আর তেমন বেশী খাটুনি তো হচ্ছে না কিছ‌ু।

এর মাস ছয়েক পরে সোমেনের চাহিদা বাইরে বয়ে আনা পানীয় থেকে পাণিতে দাঁড়ালো। আর প্রণতির বাবার তাতে মত হয়নি। শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোক হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তিনি সম্রাট। একটি রাজ্যের দণ্ডম‌ুণ্ডের কর্তা। সোমেনকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে পিছনে দরজা বন্ধ করলেন। সম্রাট হিসেবে একট‌ু ভুল হয়েছিল তাঁর। বাইরে থেকে ভিতরে আসবার রাস্তা বন্ধ করলেন কিন্তু ভিতর থেকে বাইরে যাওয়া যে তাতে আটকায় না সে কথা মাথায় আসেনি তাঁর। সেই পথেই বাইরে এলো প্রণতি। দিন চারেক পরে বাবাকে চিঠি দিল রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছে সে আর সোমেন। আত্মীয় স্বজন ব‌ুদ্ধি দিয়েছিল, মামলা করতে। প্রণতির বয়েস একুশ হয়নি। অতএব এ বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়। কিন্তু বাবা রাজী হননি।

সোমেনের জীবিকা ছিল গোটা দ‌ুয়েক ট্যুইশান। তারও একটা গেল। বিয়ের আসামী। এবার চাকরি চাই। আরও একটা ট্যুইশান। ট্যুইশান মিলল, কিন্তু চাকরি দ‌ুর্লভ। প্রেমের চেয়েও। অবশেষে অনেক হেঁটে, অনেক খেটে চাকরি মিলল। কিন্তু মাইনে যা তাতে ট্যুইশানও একটা রাখতে হবে। এই করে চলল এক বছর। আর এক বছরেই দেখা গেল সোমেনের চোখের লাল জমিন কেমন ফিকে হয়েছে। স্বপ্নিল চোখে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। আর এক বছরে একদিনও সোমেন কাগজ-কলম ছ‌ুঁতে পারেনি। সে যে কোনদিন লিখত একথাও ব‌ুঝি তাকে মনে করিয়ে দিতে হয়।

সোমেন ভুলেছে। কিন্তু প্রণতি ভুলতে পারছে না। সূর্য ডুবলে যে-মেঘে রঙ জড়িয়ে থাকে প্রণতি সেই মেঘ। সোমেনের অতীতের শিলালিপি। সোমেন যে আর লিখছে না, লিখতে পারছে না এ যেন প্রণতিরই লজ্জা। তারই পরাজয়। যে ছিল শিল্পী সে হলো সংসারী। অথচ উল্টোটি চেয়েছিল প্রণতি। সংসারের সব দায়িত্ব নিয়ে সোমেনকে অবকাশ দেবে প্রণতি। শিল্পী সোমেনকে। কিন্তু হলো না। আশা ছাড়েনি প্রণতি। প্রথম প্রথম বলত, তুমি আর লিখছ না কেন বলতো? সোমেন বলত, লিখব, লিখব, দাঁড়াও না। এখন তো কেবল জানবার সময়। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের। এতদিন যা লিখেছি সে সব তো মেকি, বাসন। এবার আবার নতুন করে লিখতে শ‌ুরু করব। নতুন কথা।

সোমেনের চোখে তখনও আলো ছিল। সেই আলো।

এর পরে মফঃস্বলে বদলি হলো সোমেন। এ শহর থেকে সে শহরে। কাটল বছর সাতেক। দ‌ুজনের সংসারে আরও তিন-জনের জায়গা করে দিতে হয়েছে। সোমেনকে দেখে মনে হবে না এতট‌ুকু অভিযোগ আছে তাঁর জীবনের বির‌ুদ্ধে। সব কিছ‌ুকেই সহজভাবে মেনে নিতে পারছে। স্বচ্ছন্দে। কিন্তু মেনে নিতে পারেনি প্রণতি। সোমেনের তিনটি সন্তানের জননী প্রণতি। সোমেন যে কোনদিন লিখত, লিখতে পারত সোমেন ভুললেও প্রণতি তা ভুলতে পারেনি। সোমেনের জন্য নয়, নিজের জন্যই পারেনি। তাই নিজের স্বাস্থ্যের অজ‌ুহাতে সোমেনকে যখন কলকাতা বদলির চেষ্টা করতে অন‌ুরোধ করল, মনে তার ছিল অন্য আশা। প্রণতির আশা ছিল কলকাতা এলে প‌ুরনো সাহিত্যিক বন্ধ‌ুদের সঙ্গে আবার দেখা হবে। সোমেনের সঙ্গে একই সময়ে লিখতে শ‌ুরু করেছিল তাঁরা। আজ তাঁদের অনেকেই মোটাম‌ুটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সোমেনই শ‌ুধ‌ু হারিয়ে গেছে। খারিজ খাতায় অঙ্ক বাড়িয়েছে। আর প্রণতির ধারণা ব‌ুঝি সে-ই দায়ী এজন্য।

অনেক চেষ্টায় বদলির আবেদন মঞ্জ‌ুর হলো। কিন্তু বাসা কোথায় কলকাতায়?

প্রণতি বলল, এখন বাবার ওখানেই উঠব। পরে খ‌ুঁজে নেওয়া যাবে। বাবার সঙ্গে সম্পর্কের খাঁড়িতে ততদিনে পলি পড়েছে।

কিন্তু শ‌ুধ‌ু চাকরির টাকায় কলাকাতায় সংসার চলে না। অন্ততঃ স্বচ্ছন্দে নয়। অতএব আবার সেই ট্যুইশান। প্রমাদ গণল প্রণতি। একটা অভাবের অক্টোপাস তাঁর ক্লেদাক্ত বাহ‌ু দিয়ে সোমেনকে জড়িয়ে ধরেছে। না সোমেনকে না, প্রণতির সেই কল্পনার শিল্পীকে। প্রণতির বিশ্বাস, আজও, এতদিন পরেও, তাঁকে বাঁচান যায়। আর এ বিশ্বাস নষ্ট হলে প্রণতির নিজের বাঁচাও ব‌ুঝি নিরর্থক। এখনও প্রণতি সোমেনের কালিপড়া ম্লান দ‌ুটো চোখের তারায় সাত বছর আগের আলো খ‌ুঁজে বেড়ায়।

হঠাৎ স‌ুযোগ এলো। শহর কলকাতার আশেপাশে অসংখ্য বসতি গড়ে তুলেছে প‌ূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা। বানচাল জীবন-তরী মেরামত করে আবার ভাসাবার চেষ্টা চলছে। এরই এক কলোনিতে মেয়েদের এম ই স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর চাকরি জ‌ুটে গেল প্রণতির। যোগাড় করল। শ‌ুধ‌ু চাকরি নয়, কলোনিতে জায়গাও পাবে তারা। ঘর তুলে নিতে হবে নিজেদের। কলোনির কর্তৃপক্ষদের বলেছিল প্রণতি, কিন্তু আমরা তো আর আপনাদের মত সব খ‌ুইয়ে আসিনি। আমাদের জায়গা দিলে হয়তো আপনাদের মধ্যেই অনেক কথা হবে।

—কিন্তু খ‌ুইয়ে যেমন আসেননি, তেমনি ফিরে গিয়ে ভোগদখলও তো আর করতে পারবেন না। প্রণতিকে বোঝালেন কলোনির সেক্রেটারী। এরকম লোক তো আরও আছে আমাদের কলোনিতে। তাছাড়া আপনাদের সঙ্গে তো আলাদা কথা। আপনি যাচ্ছেন শিক্ষয়িত্রী হয়ে।

রাজী হলো প্রণতি। সোমেনকে জানাল একেবারে সব কিছ‌ু ঠিক করে। একট‌ু আপত্তি ছিল সোমেনের। প্রণতির চাকরি করায়। সংসারের খাট‌ুনির পরে আবার চাকরি।

কিন্তু চাকরির পরে টুইশান করে না সোমেন। সোমেনকে বুঝিয়েছে প্রণতি। সেই বা তাহলে পারবে না কেন? সংসারের দায়িত্ব কি কেবল সোমেনের একার! তাছাড়া ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। তাদের ভবিষ্যৎটাও তো দেখতে হবে।

আসলে প্রণতির মনে ছিল অন্য কথা। কলোনিতে নতুন প্রস্তুতি। অভিনব জীবন। ঘর-পোড়া মানুষগুলো আবার ঘর তুলছে। বাস্তু ছেড়েছে কিন্তু নিয়ে এসেছে তার মাটি। সেই মাটি আবার নতুন করে ছড়িয়েছে এইখানে। আবার ঘর তুলবে। বাঁচবে, গান গাইবে। এদের ছবি যদি ছায়া ফেলে তার মনের ফিল্মে, শিল্পী মনের। প্রণতি ভেবেছিল।

কিন্তু হলো না। সোমেন এলো। এলো না প্রণতির সেই শিল্পী। ওর স্বভাব চিরকালই মিশুকে এদের সঙ্গে মিলল, মিশল। ভালোবাসল। শুধু ফিরে পেল না শিল্পীর সেই নৈর্ব্যক্তিকতা। দশজনের সেও একজন। হয়তো প্রধান জন। কিন্তু স্বতন্ত্র নয়। তবু প্রণতি হাল ছাড়েনি। দিন গুণেছে। কিন্তু কে জানত সোমেনের শেষ গতি আনন্দনগর কলোনির সেক্রেটারির তক্ত। বিয়ের আট বছর পর, সোমেনের তিনটি সন্তানের জননী, প্রণতির মনে হলো সে ঠকেছে। সোমেন তাকে ভীষণ-ভাবে ঠকিয়েছে।

পরদিন ছিল শনিবার। স্কুলের ছুটির পর ছেলেমেয়েদের রেখার জিম্মা করে দিয়ে কলকাতা চলে গেল প্রণতি। সে বলে গেল, তোমার সোমেন দা ফিরলে বলো, আমার আসতে বেশী দেরী হবে না। আটটার ট্রেনেই ফিরবো।

কলকাতা এসে সোমেনের সাহিত্যিক বন্ধু অনিরুদ্ধ সেনের সঙ্গে দেখা করল প্রণতি। রবিবার আনন্দনগরে সে নিমন্ত্রণ করে এলো অনিরুদ্ধকে। বলল, একটু সকালেই যাবেন। না হয় একটা দিন থেকে দেখেই এলেন নতুন জীবন। আর কিছু না হোক একটা নতুন গল্পের খোরাক তো জুটবে।

—আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা তো খুব উদার বলে মনে হচ্ছে না। যদি যাই তো গল্পের প্রলোভনে নয়, আপনার আমন্ত্রণেই। হাসল অনিরুদ্ধ সেন।

একটু বা লাল হলো প্রণতি। বলল, বেশ তাহলে তাই। মোট কথা যাবেনই।

রাত্তিরে সোমেনকে বলল, কাল কোথাও যেয়ো না কিন্তু। অনিরুদ্ধবাবুকে নেমন্তন্ন করে এসেছি। কাল সকালেই আসবেন। তুমি একটু সকাল সকাল বাজারটা করে দিও।

সোমেন অবাক হলো। বলল, সে কি, আমাকে তো কিছুই বলনি।

বলবার আবার কি আছে। বন্ধুবান্ধব। এককালে তো দেখি ওকে ছাড়া চলতই না তোমার। আর আজকাল তো লৌকিকতার পাট তুলে দিয়েই বসে আছ। আছে ছাই-এর অফিস আর সেক্রেটারিগিরি। দু'একজন বন্ধুবান্ধবকে মাঝে মাঝে ডাকলেও তো পার।

—তাতো বুঝলাম, কিন্তু কাল সকালেই যে আবার—

—কমিটির মিটিং তো? সে একদিন তুমি না হলেও চলবে।

হয়তো চলবে। হয়তো না। কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বাড়ান উচিত হবে না। সোমেন তাই যতি টানে।

অনিরুদ্ধ এলো নটার ট্রেনে। ছেলেদের জন্য একরাশ খেলনা আর মিষ্টি।

—এ আপনি কি করেছেন বলুন তো? অনুযোগ করল প্রণতি। মিছিমিছি এতগুলি টাকা নষ্ট যা দস্যি এক একটি, এক্ষুণি দেখে সব নষ্ট করে।

—ওইখানেই তো ছোটদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ। ওঁরা নষ্ট করবেই আর তা জেনেও আমরা কিনব। হয়তো সেই জন্যেই কিনব। আর খেলনা যদি না ভাঙবে তাহলে আর কিনবার আনন্দ থাকবে কী করে? আর শুধু কি খেলনা এই ধরুন যে চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি আপনি পরে আছেন, চমৎকার মানিয়েছে। কিন্তু মনে করুন, দিনের পর দিন একই শাড়ি পরে আছেন আপনি সে শাড়ি ছিঁড়ল না, পুড়ল না আগুনে সোমেনের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে তাহলে? একদিন দেখবেন নিজে হাতেই ওর দফা নিকেশ করে বাজার থেকে অন্য রঙের নতুন শাড়ি নিয়ে এসেছে। তাই না রে সোমেন?

—ওঃ তোর সেই বক্তৃতার রোগ এখনো গেল না। আচ্ছা তুই না হয় ততক্ষণ বক্তৃতা দে। আমি চট করে একবার অফিসটা ঘুরে আসি। বেশীক্ষণ লাগবে না।

অনিরুদ্ধকে চা দিয়ে তরকারির ঝুড়ি নিয়ে বসল প্রণতি।

—তারপর নতুন আর কী লিখলেন আপনি? গত মাসের পত্রপুটে গল্প পড়লাম আপনার। চমৎকার লাগল।

একটু বিব্রত বোধ করল অনিরুদ্ধ। ওই কি এক স্বভাব। লেখার প্রশংসা শুনলেই বিব্রত বোধ করে। হেসে উড়িয়ে দিলে লোকে বলে বিনয়। আর বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলে বলে দেমাক।
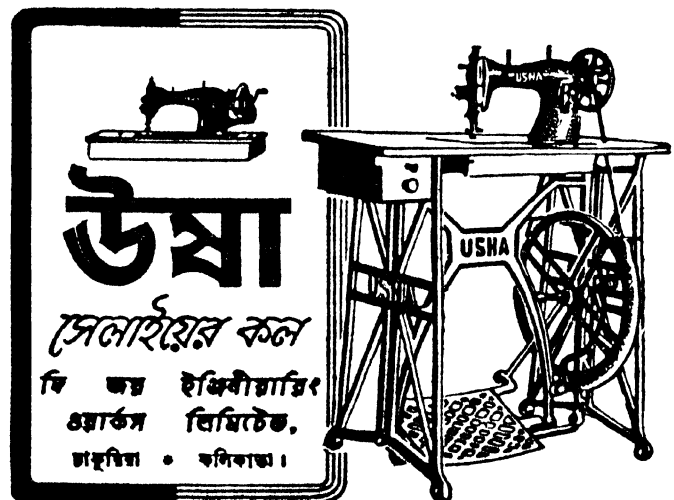
–গল্প ভালো হয়েছে, বলল প্রণতি, তু আপনার বক্তব্য ভালো লাগেনি ার। আপনার গল্পের নায়ক প্রভাকর পী। অথচ অর্থের জন্যে নিজেকে ী করে দিতে তার একটুও বাধল না। তো এ অসম্ভব নয়। কিন্তু সম্ভব ই কি তা সুন্দর। প্রথমে যাকে অত দর করে এঁকেছেন শিল্পীর মহিমা য়েছেন অন্ততঃ তাঁর কাছ থেকে এই লালসা আশা করিনি।

অনিরুদ্ধ শুনছিল আর অবাক হচ্ছিল। ক হিসেবে সাধারণত মেয়েদের ওপর তার শ্ব আস্থা কোনকালেই ছিল না। তার ণা ছিল ওঁরা কেবল গল্প পেলেই খুশি। । সে-গল্প যদি হয় মিলনান্তক। প্রণতির মেয়ের সঙ্গে তার আগে পরিচয় হয়নি। শুধু গল্প পড়ে না, তা নিয়ে ভাবে।

অনিরুদ্ধ বলল, আপনি যা বললেন, হচ্ছে আদর্শের কথা। অথবা সেণ্টি-ণ্টর। কিন্তু যা হয়, হতে পারে তাই য়ই তো সাহিত্য।

হতে পারে, কিন্তু নাও হতে পারে। া লিখতে না পারলে অথবা লেখা ছেড়ে াই কিছু শিল্পীর মৃত্যু হয় না। ভূতির রাজ্যে তার সৃষ্টির কামাই নেই। অনুভূতি যদি বেঁচে থাকে তাহলে কোনদিনই আবার সে সৃষ্টিশীল হতে র। কথাটা নিজের কানেই কেমন াপ্পা শোনাল প্রণতির। অসংলগ্ন, ন্তর। অথচ এই অবান্তর কথাগুলোই জোর দিয়ে বলল, যেন নিজের দ্ধে কোন মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন ছে।

অনিরুদ্ধ অবাক। বলল, দেখুন, হত্য তো অঙ্ক নয়। দুয়ে আর দুয়ে এখানে নাও হতে পারে। এই না-হতে-ার রাজ্যই শিল্প আর সাহিত্যের। কেই হ্যাঁ করে তোলা, অথবা হ্যাঁ-কে না। ক দিয়ে নয়, অনুভূতি দিয়ে। রং-তুলি া ভাষার মাধ্যমে।

–কিন্তু তাই বলে—

না এ নিয়ে আর কথা নয়। প্রণতির র কথার হাত চাপা দিল অনিরুদ্ধ। প মরুক, মরুক সাহিত্য, ও নিয়ে মর বেঁধে ঘোট পাকাক ডক্টরেট সমা-চকরা। আমাদের ছুটির দিনটা এমনি করে নাইবা নষ্ট করলাম। আর সোমেনের কাণ্ডটাও দেখুন একবার। ওকি মিটিং-এ যাবার আর দিন পেল না?

—ওই তো করছে দিনরাত। কমিটি আর মিটিং। কী যে আনন্দ আছে ওর মধ্যে জানি না। বরং একটু সময় করে যদি লিখতে বসত।

হোঁচট খেল অনিরুদ্ধ। প্রণতির গলায় আক্ষেপের সুর।

দিন কাটল গানের একটা কলির মত। গল্প করে আড্ডা দিয়ে। যেন আগের সেই দিনগুলো। সোমেনের বিয়ের পরের। অনিরুদ্ধ যখন তাদের নিত্যসাথী। স্বপ্ন আর উদ্দামতার দিন। ক্যালেণ্ডারের পাতায় সবগুলো লাল তারিখ। বহুদিন পরে সোমেনের চোখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল প্রণতি। সেই সোমেন, যে আট বছর আগে তাঁর চোখে মোহ এনেছিল। তাঁর চোখের কোণের লাল দাগগুলো, যা প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে এসেছিল, আবার যেন রঙ ফিরে পেয়েছে। ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রণতির বুক উত্তাল হয়ে উঠল। বহুদিন পরে।

বিকেলে অনিরুদ্ধকে নিয়ে বেরোল সোমেন। কলোনিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাল। পুকুরপারের ঘাটলায় বসে কাটিয়ে দিল নির্বাক সময়।

রাত্তিরে খাবার পরে আবার ট্রেন। প্রণতি অনুরোধ করল, আবার আসবেন। ছুটি পেলেই আসবেন। প্রত্যেকবারেই নিমন্ত্রণ করে আনতে হবে এমন কোন কথা নেই।

প্রণতির কথায় আন্তরিকতার গভীর সুরটুকু অনিরুদ্ধকে স্পর্শ করল।

অনিরুদ্ধকে ট্রেনে তুলে দিয়ে প্রায় ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরল সোমেন। ততক্ষণে হেঁসেলের কাজ চুকিয়ে ফেলেছে প্রণতি। ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়েছে। তেল-হলুদ-মাখা ময়লা কাপড়টা ছেড়ে ফেলে পরেছে একখানা ফর্সা শাড়ি। এরই মধ্যে মাথায় একবার চিরুণী বুলিয়েছে। টেবিলের ওপর স্টীলের ফ্রেমে দুটো ফটো। সোমেন আর প্রণতির। বিয়ের আগে তোলা। প্রণতির মনে আছে সবচেয়ে ভালো হয়েছিল বলে এই ফটোরই কপি পাত্রপক্ষের কাছে পাঠান হতো। ছেলেরা যেমন আগের দিন ভালো ভালো ঢিলগুলি কুড়িয়ে নিয়ে কাঁচামিঠে আমের গাছে ছুঁড়ে মারে। কিন্তু ফল হয়নি। এই প্রিণ্ট থেকেই একখানা চুরি করে সোমেনকে দিয়েছিল প্রণতি। ফটোখানা আঁচল দিয়ে মুছল। সস্নেহে। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সোমেনের ফটোর দিকে, তাঁর নাতিদীর্ঘ উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে। কি মোহ ছিল সেই চোখে।

পিছনে শব্দ হলো। দুয়োরে দাঁড়িয়ে সোমেন। প্রণতির দিকে চেয়ে হাসছে। আর তার চোখে, এতদিন পরে, আবার সেই হাসি। সেই আলো। প্রণতির বুকে হাজার ঢেউ উত্তাল হলো। এবার বুঝি সে নিজেও ভেঙে পড়বে।

কিন্তু তার আগেই সোমেন তাকে ঘিরে ফেলেছে। তাঁর বাহু দিয়ে। তাঁর চোখ দিয়ে।

কয়েকটি নির্বাক মুহূর্ত। প্রণতিকে খাটের ওপর বসিয়ে দিল সোমেন। জান, সোমেন বলল, ভাবছি আবার লিখতে শুরু করব। একেবারে ছেড়ে দেবার কোন মানেই হয় না।

কলার পাতায় যেন বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনছে প্রণতি। কুয়াশায় ঢাকা অপরিচিত আবছা মুখ আবার স্পষ্ট হচ্ছে।

তাছাড়া, একটু থেমে সোমেন বলতে আরম্ভ করলে, অনিরুদ্ধের কাছে শুনলাম এখন অবস্থা অনেক বদলেছে। মানে আমরা যখন প্রথম লিখতে আরম্ভ করি সে সময় থেকে। মাসে একটা গল্পও যদি লিখতে পারি, আর কিছু না হোক, কুড়িটা টাকার আর ভুল নেই। গয়লার এক মাসের বিল, কী বলো?

কে যেন চাবুক মারল প্রণতিকে। সোমেনের বুকের মধ্যে প্রণতির মমতানরম দেহটা হঠাৎ যেন নাড়া খেয়ে কাঠ হয়ে গেল। সোমেনকে আঁকড়ে ধরা হাত দুখানা শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ল। একবার শুধু তাকাল সোমেনের মুখের দিকে। কী নিরক্ত, কুৎসিত আর লোভাতুর তার দুটো চোখ।

কী হলো তোমার? সোমেনের কণ্ঠে উদ্বেগ।

—কিছু না, মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। দাঁড়াও একটু জল খেয়ে আসি। আর জল খেয়ে পাশের খাটে ছেলেমেয়েদের কাছে এসে শুয়ে পড়ল প্রণতি। বলল, মশারিটা ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(৭)

দোকানের বাঁয়েই কাঁচা রাস্তা, তারপরেই একটা খাল, আগে বলেছি তোমায় সেকথা।

খালটা হাতচারেক চওড়া, আসপাশের সমতল থেকে বেশি নিচেও নয় যে বেশ খানিকটা নেমে গিয়ে তবে জল পাওয়া যাবে। বেশ একটি খেলাঘর-খেলাঘর ভাব আছে, যা—বোধহয় আগেই বলেছি—এ প্রান্তের অনেক জিনিসের মধ্যেই পাওয়া যায়, আর যার জন্যে মনে হয় ফলতা মেলে চড়ে ঠিক এই রকমই একটি দেশে এসে পড়বার কথা। এই খেলাঘরের খালে দিব্যি নৌকা চলাচলও আছে। নৌকোগুলিও নতুন ধরণের কতকটা ওদিককার নৌকোর যেমন মোচার খোলার আকারে গড়া তেমন নয়।

বোধহয় হাত দুয়েক চওড়া হবে, তাও কেঁদে-কঁকিয়ে, বরাবর এক রকমই, লম্বায় শুধু বোধহয় একটু বেশি, কিম্বা হয়তো সরু আর একভাব বলে মনে হয় বেশি লম্বা।

একটা বড় যানবাহন এদিককার; মানুষও যাচ্ছে, মালও যাচ্ছে; বিচালির আমদানী-রপ্তানিই দেখেছি বেশি।

আমি যখন আসি একটিতে জন দুয়েক লোক চুপটি করে বসে ছিল, নৌকো বোধ হয় আরও লোক নিয়ে ছাড়বে। একজন তার মধ্যে ছোকরা, বেশ ফিটফাট, শ্বশুর-বাড়ি যাচ্ছে কল্পনা করতে করতে আমি দোকানে ঢুকেছিলাম মনে আছে। দোকান থেকে যায় দেখা খালটা, তবে অতটা খেয়াল করি নি, একবার ঘুরে দেখি নৌকোটা নেই কখন ছেড়ে দিয়েছে।

তবে আমার দেখতাই আর একটা নৌকো এসে ঘাটে লাগল ওদিক থেকে। তামাকটা শেষ করে এনেছি, দুজনে হাত ফের করে; উঠতে যাব, দোকানী বললে—"আজ্ঞে আর একটু বসে যান—ক্ষৌত হবে?"

"ক্ষৌত...মানে, যেতে হবে অনেকটা, সেই হাওড়া-শিবপুর, জানো কিনা বলতে পারি না......"

ততক্ষণে নৌকোর যাত্রী দুজন উঠে এসেছে—দোকানের দিকেই পা, দুজনের মধ্যে একজন আবার স্ত্রীলোক, তায় যুবতীই দেখে আমি উঠে পড়ে বললাম—"তোমারই খদ্দের, মেয়েছেলে রয়েছে আমি উঠিই না হয়।"

দোকানীর হাতেই হুঁকোটা, মুখে লাগিয়ে একটু চোখ টিপে গোঁফ আর ধুঁয়ার মাঝে অল্প একটু হেসে বলল—"একটু বসেই যান না, রহস্য আছে।"

পুরুষটির বয়স......পঞ্চাশ হলেও, আশ্চর্য হব না; তবে দিব্যি বলিষ্ঠ আর mascular। দুজনের বয়সের তারতম্য দেখে দোকানীর মুখে 'রহস্য' কথাটা বড় খাপছাড়া লাগল কানে; বেশ একটু কটুও—এখনি যার মুখে অমন একটি পবিত্র, ভক্তি-অশ্রু-পূত কাহিনী শুনে আমার নিজের চোখও সজল হয়ে আসছিল।

তা যাই বলুক ও, দুজনের মুখে একটি বেশ সরলতা আছে কিন্তু। সময় থাকলে ঐ ছাপটুকুই মনে নিয়ে উঠে পড়তাম দোকানের মিষ্টি অভিজ্ঞতাটুকুকে আর তেতো হতে না দিয়ে, কিন্তু তার আগেই দুজনে রাস্তায় এসে উঠেছে। পুরুষটির হাতে একটা মোটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ; নৌকোর ছইয়ের মধ্যে ছিল, কড়া রোদের জন্যেই বোধহয় দুজনে মাথাটা একটু নিচু করে আসছিল, দোকানের ছেঁচের নিচে এসে মুখ তুলতেই আমায় দেখে যেন একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে—দুজনেই। দোকানী বললে—"চলে এসো ভেতরে; উনি আমাদের মুখুজ্জে মশাই—তোমার গিয়ে ঘরের মানুষই এক রকম বলতে গেলে।"

পাড়াগাঁয়ে এই রকম পরিচয়েই চলে; একজনের ঘরের মানুষ তো সবারই ঘরের মানুষ; এক রকম সামাজিক জ্যামিতির নিয়মেই; বেশ সপ্রতিভভাবেই উঠে এ[...] দুজনে। মেয়েটিই বেশি যেন একটু। এ[...] দাঁড়িয়েছে, আড়ে পুরুষটির পানে অ[...] একটু তিরস্কারের দৃষ্টি হেনে খুব সূক্ষ্ম-ভাবে আমার পায়ের দিকে চেয়ে ভ্রু দুটো একটু চেপে দিলে; সে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা ভুঁয়ে রেখে একটু সলজ্জভাবে হেসে বলল—মুখুজ্জে মশাই?—বামুন—তাহলে [...] পায়ের ধুলো পাব একটু।"

ওর হয়ে গেলে মেয়েটি ধীরে সু[...] বেশ করে গলায় আঁচল জড়িয়ে হাত[...] পায়ের নিচে পর্যন্ত চালিয়ে যা পাওয়া গে[...] সত্যি ধুলোই নিলে একটু।

কেমন যেন গুরু-চণ্ডালি দোষ [...] যাচ্ছে, প্রণামের মধ্যে ঘটা রয়েছে, কিন্তু দোকানী ঐ যে পোড়া এক 'রহস্যের' ক[...] গেয়ে রেখেছে, তেমন অন্তর [...] আশীর্বাদটুকু বের হোল না মুখ [...] এবার।

টেবিলের দুদিকেই বেঞ্চ, দোকানী [...] —"তা বোস' গুপী ওদিকপানটায়, [...] কতক্ষণ থাকবে?......গাঁয়ের খবর [...] আমাদের গাঁয়েরও।"

গুপী বেঞ্চটায় বসল, আমার জন্যে [...] হয় একটু সঙ্কুচিতভাবেই; বললে—"[...] খবর......তা এক রকম ভালোই......[...] উঁদিকেও হয়েছেল যাবার বরাৎ এক[...] ছেলের সঙ্গে চণ্ডীতলায় দেখা......[...] সব।"

"ভালো হলেই ভালো—যা করে [...] মানুষের।......তা, নাতনীও বোস; [...] দেখো!"

মেয়েটি একটি খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, নিচের ঠোঁট দিয়ে ওপরেরটা একটু ঠেলে অস্পষ্টস্বরে বললে—"বেশ আছি।"

"তা থাকবিনি কেন?......আমি [...] ছিলাম পাশাপাশি বসলে পরে একটু [...] রূপটুকু দেখতুম কদ্দিন পরে,—এই [...] কি।"

—আমার পানে চেয়ে একটু হেসে [...] করলে—"আজ্ঞে, নাতনী।"

মেয়েটি আবার ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট [...] দৃষ্টিতে একটু হাসি আর রাগ ফুটিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিলে।

ঠোঁট থেকেই করি বর্ণনা: একটু প[...] কপালটি একটু উঁচু, নাকটি একটু চাপা;

হলেও বেশ একটা শ্রী আছে, তার অনেকখানিই অবশ্য বয়স আর অনবদ্য স্বাস্থ্যের জন্যই। পুরুষটির কথা বলেছি। পরিচ্ছদটা দুজনেরই সাদা মাটা, বেশ সম্পন্ন কৃষক-পরিবার বলে মনে হয়।

আমার বুকের কোথায় যেন একটা চাপা নিঃশ্বাস আটকে ছিল, দোকানীর ঠাট্টা-বিদ্রূপে আর নাতনী বলে পরিচয়ে সেটা বেরিয়ে বুকটাকে হালকা আর পরিস্কার করে দিলে।

অসমবিবাহ সমাজের একটা উৎকট ব্যাধি। পাণিগ্রহণ—কিন্তু পঞ্চাশ আর আঠার—বয়সের এই দীর্ঘ ব্যবধান ডিঙিয়ে কি করে হবে হাত? কি করে হবে মিল?

আজ কিন্তু আমি ক্ষমা করতে পারছি দম্পতীকে।

আসল কথা ওই দৃষ্টিকোণ, যা অনেকখানিই নির্ভর করে অবস্থা আর পরিবেশের ওপর।

যদি মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও এগোও তো বলতে হয় ঐ যে 'রহস্য'র একটা কুৎসিত দিক ছিল—তাই থেকে চিত্তের একটা গ্লানি, সেটা থেকে মুক্ত হয়ে আমার মনটা একটা শান্তির দৃষ্টিতে সমস্তটুকুকে পাচ্ছে দেখতে—ইংরাজীতে যাকে বলা হবে একটা রিলিফ।

বেশ সহজমনেই ক্ষমা করতে পারছি দম্পতীকে। সুস্থ সবল পুরুষ, সে যদি সমবয়সী এক কামিনীকে চায় তো এর মধ্যে অশোভনটাই বা কোথায়, অশোভনটাই বা কি? অশোভন তো বয়সের জন্যে নয় সব সময়, অশোভন অযোগ্যতায় আর বিকৃতি বাভিচারে। আমার বেশ লাগছে এই অসমদম্পতি, এর মধ্যে চমৎকার একটা কাব্য রয়েছে—সাকীর পাশে জীবন্ত ওমরখৈয়াম—শুভ্র শ্মশ্রুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তল।...আমরা যে ভুল করি সেখানেই—কেনই বা জোর দেব শুধু অসুন্দর দিকটাই—এর মধ্যে যে রয়েছে যৌবন-সুষমার একটা মস্ত বড় অভিনন্দন অসুন্দর পুরুষের দিক থেকে—পুরুষ বলেই সে অসুন্দর।

থাক ভাই, তুমি আর তর্ক এনে ফেল না এর মধ্যে। সিরাকোলের এই মধুর অপরাহ্ন, এই দোকান, এই দোকানী, এই করারক্ত-অধরা ষোড়শী, এই-মুগ্ধ-বিমূঢ়-প্রৌঢ়-ভর্তা—এসব থেকে যখন দূরে—তোমার ড্রয়িং-রুমে—তখন আবার নিজমূর্ত্তি ধরব—আজ গোপীকেষ্টকে ক্ষমা করলাম ব'লে উগ্রমূর্ত্তিই ধরব'খন তখন পৃথিবীর যত গোপীকৃষ্টদের ওপর।

এখন কিন্তু করই ক্ষমা আমাকে। কি করব?—হঠাৎ কে কি অঞ্জন বুলিয়ে দিলে চোখে, সরমে-পরিহাসে, শোভনে-অশোভনে, বেদনায়-তৃপ্তিতে—সবই যে এখন আমার কাছে মধুরং মধুরং মধুরে মধুরং.....

ঘরের লোক হয়ে গেছি। একটি ক্ষণরচিত পরিবার, একজন দোকানে বিকি-কিনি করতে করতে একটু মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে, একজন কি করে সুদূর সেহার থেকে এসে জুটে গেছে, দুজন কোথা থেকে নৌকো বেয়ে এল উঠে। এখনই আবার যাবে সংসার ভেঙে, যতটুকু পারি টেনে নিই রস।

নাতি তামাক দিয়ে গেল সেজে আবার। চেনা-লোক, এক গ্রামের, এক বয়সী, হয়তো সাথীও অনেক খেলার,—মেয়েটি সরে গেল ছেলেটার হাত ধরে বড় আলমারিটার একটু ওধারে। জমে উঠল গল্প—"অনেকদিন যাস্‌নি গাঁয়ে—কেন র‍্যা?.....হ্যাঃ দোকান! তাই ব'লে গাঁ ছেড়ে বসে থাকবে লোকে!... আর এই তো দোকানের ছিরি!.....হ্যাঁ, তাও বুঝতুম শরীলে দেছে ভালো আছিস...আর আমায় দেখ্‌.....ওমা; হই নি মোটা! কী যে বলে!.....বিয়ের জল?.....তা তুইও না হয় করগে যানা বিয়ে একটা, হিংসে কিসের?.....বলগে না ঠাকুদ্দাকে.....খিল্‌-খিল্‌-খিল্‌-খিল্‌" সব কথা হাসিতে তরল হয়ে উঠল। নিচু গলারই গল্প, কিন্তু যথেষ্ট নিচু হচ্ছে কিনা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই বিশেষ।

এদিকে আমাদেরও জমে উঠেছে; কলকেটা তিনটে হুঁকোর মাথায় টহল দিয়ে ফিরছে।

"তা এবার আবার কোথায়, হ্যা সামন্ত?...কাঁচপোকাটি যে আরসোলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে.....তা যাচ্ছেটা কোথায় শুনতে বাধা আছে নাকি?"

রহস্যটার একটু একটু যেন পাচ্ছি আঁচ, বাল্দধসা তরুণী ভার্য্যা!.....প্রশ্ন করে পরিস্কার করে নোব নাকি? কি ভেবে লোভটা সংবরণ করে হুঁকোই টানতে লাগলাম ফড়ুক্‌ ফড়ুক্‌ করে; তবে আঁচ যে পাচ্ছি তার একটু চটুল হাসি লেগেই রয়েছে ঠোঁটে।

"যাচ্ছি—তোমার গিয়ে......"

—একটা টান দিয়ে না শেষ করেই সামন্ত দোকানীর মুখের ওপর চোখ তুলে একটু সলজ্জভাবে হাসলে।

"বায়স্কোপ, না, ঠিয়েটার এবার?......... কোন্‌ দিক পানের দৌড়—কলকাতা, না, দক্ষিণে?"

"ন্যাও! বাস্কোপ-ঠিয়েটারই দেখছে লোকে রোজ রোজ!"

"বলেই ফেলো না, লজ্জাটা কিসের? মুকুজ্জে মশাইয়ের কাছে?.....তাহলে, যার আসল লজ্জার কথা তার কাছ থেকেই যে আদায় করতে পারি আমি......হুঁকোটা একটু কাৎ করবেন মুকুজ্জে মশাই?"

কি একটু চাপা কথার পর ওদিকে একটা হাসি উঠল—সেই খিল্‌-খিল্‌-খিল্‌-খিল্‌......

দোকানীর ultimatum-এ সামন্ত হেসে একটু নড়েচড়ে বসল—আর যখন উপায়ই নেই; বললে—"উঃ, লজ্জায় তো কুলোকামিনী নাতনী তোমার, ঐ শোননা।... তা মুকুজ্জে মশাইয়ের কাছে বলব তা ভয়টাই বা কি আর ইয়েটাই বা কি?—কন্‌ কেন মুকুজ্জে মশাই?......বুড়ো বয়সে ঘ্যাখন ঘাড়ে চেপে বসেইচে, ত্যাখন ভোগাবেনি একটু?"......

ওদিকে গল্পটা হঠাৎ থেমে গেছে, তার-পরেই শিউরে ওঠা চাপা গলায়—"শোন্‌ কথা! শুনেলি?—নাকি ঘাড়ে চেপে বসেচি......!"

হাসিটা আরও কলকলিয়ে উঠে আলমারির ও-কোণটায় সরে গেল।

নেমে পড়লাম, ডেকেই যখন নামালে তখন আর দোষটা কি? আর......দোষ বলে একটা জিনিসও আছে নাকি সিরাকোলের ওদিকে কোথাও?...বললাম—"না, সায় দিতে পারলাম না তো সামন্ত, চেপে বসা কি বলচগো?—ঘাড়ে তুলে নেবার জিনিস যে আমাদের নাতনী......আর ভোগান্তি—তা মোদক মশাইয়ের বুড়ো বয়সেও যদি অমন-ধারা ভোগান্তি হোত তো বর্তে যেতেন... আর তুমি সে জায়গায় তো......"

তিনজনের প্রাণখোলা হাসিতে দোকানটা গমগম করে উঠল। ওদিক থেকে অর্দ্ধস্ফুট বিস্মিত মন্তব্য—"দেখ্‌, দেখলি? কেউ কসুর নয়!......কে র‍্যা উনি?"

সামন্ত কলকেটা তুলে নিয়ে বললে—"না, ওসব নয়। ছেরকালই কি ওসবের থাকে সখ? কেটেচে। এবার তোমার গিয়ে গঙ্গাস্তান—ঝোঁক হয়েচে।"

ওদিকে আবার একটা হাসি উঠে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। দোকানী গলা তুলে প্রশ্ন করলে—"নাতনী হঠাৎ হেসে উঠলি কেন গো কথাটার ওপর? খটকা লাগিয়ে দিলি যে!......বলি হ্যাঁ সামন্ত, আবার সেই রকম গঙ্গাস্তান নয়তো—নাতনী যেবার প্রেথম গেল—সেই গঙ্গাস্নান,—কালীঘাট—তারপর...ওঃ, পালগিন্নির মুখে যে শোনাতে পারলাম না গল্পটা মুকুজ্জে মশাইকে......!"

দোকানী হেসে লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু কতকটা একাই এবার। সামন্ত যোগ দিলে, কিন্তু একটু অপ্রতিভভাবেই। আলমারির ওদিকটায় শুধু ধিক্-ধিক্ করে চাপা আওয়াজ একটু, আর—"করে দিলে বুঝি ফাঁস্ রে বুড়ো......!"

—আমি একটু কাছে, আছিও কান পেতে, এরা অনেকটা এদিকে; শুনতে বোধ-হয় আমি একলাই পেলাম।

দোকানী বললে—"তা বড় নাতনী এল না যে? আর সবাইও তো আসে অন্য অন্য বার।"

"তার বাত।"

"নাও! বড় গিন্নির বাত, ছোট গিন্নির তিথি—দুজনে মিলে এবার সামন্তের যৈবনটাকে আর দিলে না বজায় থাকতে।"

সামন্ত আবার উল্লাসে উঠল—"সে কি কও! তেমন দেখি তো তার—ছোট গিন্নি কাড়ব না তাহলে আমি আবার!"

আবার তিনজনের হাসি উচ্চকিত হয়ে উঠল।

ওদিক থেকে একটু হাসির শেষেই আবার চাপা মন্তব্য—"শুনে রাখিস, বুকের পাটাটা একবার দেখে থো!......বলে আর একটা গিন্নি কাড়বে, আমি ইদিকে জ্যান্ত জ্যান্ত বেচে!"

উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না; কিন্তু ফিরতেই যখন হবে তখন তো সময়ের সীমানা বাঁধা, হাওড়া স্টেশনের শেষ ট্রাম সাড়ে দশটায়, শেষ বাস এগারোটায়।

বললাম—"এবার আমায় যে উঠতে হয় মোদক মশাই।"

হঠাৎ রসভঙ্গে দোকানী বলে উঠল—"সেকি! ইরি মধ্যেই?"

"তোমায় তো বললামই, অনেক দূর এখান থেকে......"

"তাও তো বটে। তা একটু অপেক্ষা করতে হবেই।......আমার ঘরে আজ নাতনি নাতজামাই......যদি পেলাম আপনা হেন একজন মানুষকে......কেউ তো ডেকে সুদোয় না একবার......অমন গিন্নিকে নাতনী আমার আর আপনি কিনা..."

বলি ও নারাণ, ভাই-বোনের মস্করাই চলবে? —আর ইদিকে মুকুজ্জে মশাই যে গোটা-কতক পচা পানতুয়া পেটে পুরে শাপমন্যি দিতে দিতে......"

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে হাতটা চেপে বললাম—"এই তো নয় মোদক মশাই—সব ঠিক রেখে শেষ-রক্ষাটুকু করতে পারছ না।......তা বসছি, আমারই লোভ নেই নাতনীর হাতে সেবার? তবে তাড়াতাড়ি—বড় শীগ্গির পার ছেড়ে দিতে।"

নাতনীর হাতের অমৃত হালুয়া খেয়ে যখন বেরুলাম তখন ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। প্রায় মিনিট চল্লিশেক কাটলো; এও অমৃত চল্লিশটি মিনিট, আমার জীবনে এর মৃত্যু নেই।

কাজের মেয়ে নারাণী। আলমারির ওদিক থেকে বেরিয়ে এসে কাজের মধ্যে ওর পূর্ণ সত্তাটি বিকশিত হয়ে উঠল। দাদু, স্বামী, সাথী—কারুর কাছেই সঙ্কোচের বালাই নেই, তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছি আমিও মুকুজ্জে-দাদু। আয়োজনের মধ্যে সবলীল চলা-ফেরা, কথাবার্তা—একটা জিনিস তো ভালো করেই বুঝিয়ে দিলে নারাণী—ওরাই জীবনের কেন্দ্র—ওরাই চেতনা......

"আমাদের ওখানে একবার আসতে হবে মুকুজ্জে দাদু, নিশ্চয়ই......তুমি একবার বল না গো—ছেরকালই হাঁদা রয়ে গেলেন!—কথা বলচি ময়রা-দাদু?"

একটা হাসি ওঠে উৎকট; সামন্ত বলে—"তা তোরা আর হতে দিলি কই চালাক? কলেখ্যার ডাইন সব......!"

আবার ওঠে হাসি।

বিদায়ে সেই রকম ঘটা করা প্রণাম। সত্যি আবার আসতে হবে মুকুজ্জে দাদু... আমরা গরীব চাষা-ভূষো বলে......"

চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠেছে। একটু ত্বরা করে না বললে আমিও আর সামলাতে পারি না নিজেকে। বললাম—"আসব না!... হালুয়ার লোভ লাগিয়ে দিলি তুই (ঐ-ই বেরুল, বড় মিষ্টি)......আর গরীব বলে শত্রুতে,—ওই হালুয়ারই হাত যা তুই খালি......"

সামন্ত হেসে বললে—"তা হলেই আর সচেন দাঠাকুর—ও যা হালুয়া তা পরের ন পোদ্দারি বলেই......"

হাসিমুখে বিদায় দেবার যশটুকু সামন্তই নিলে। হোক ম্লান তবু সবার মুখেই একটু হাসি দেখে বেরুলাম, নারাণীর হাসি তার চোখের জলটুকু দিয়েছে ঝরিয়ে।

পিছু-টান, পা উঠতে চাইছে না যেন; সেইজন্যেই জোর করে পা দুটোকে তাড়াতাড়ি চালিয়ে মায়ার এলাকাটুকু খানিকটা ছাড়িয়ে এসে গতি মন্থর করে' দিয়েছি, হঠাৎ ডান দিকে টানা হুইসিল-এর শব্দ। থান'-চার দোকানের আড়াল কাটিয়ে এসে দেখি সত্যিই একখানা গাড়ি। অনেকটা দূরে, মাল গাড়িও তো হতে পারে, তারপর খেয়াল হোল এ লাইনে সবকিছুই তো সম্ভব; তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিলাম।

না পাসেঞ্জার গাড়িই, আমি স্টেশনে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সেও গেল পৌঁছে। জানতে পারা গেল আমতলার হাটে আমার যে গাড়িটা ধরবার কথা সেটাই এটা। হিসাব করে দেখা গেল তাই ত হবে। রয়াল সেলুনের কাঁচির ভয়ে আমি অন্তত মিনিট পঁচিশ আগে ওখান থেকে সরে পড়েছি, তারপর দ্রুত বাস পনর মিনিটের বেশিই বরং বাঁচিয়েছে একটা স্টেশনে আসতে—এই প্রায় চাল্লিশ মিনিট। স্টেশন মাস্টার যদি তখন আঁকে ডুবে না থাকে অমন করে, কিম্বা আমি তখন যদি একটু স্থির হয়ে ভেবে জিগেস করি—বেরিয়ে যে গেল সেটা কোন্ গাড়ি তাহলে আর এ নিগ্রহটুকু হয় না—

কিন্তু নিগ্রহই কি? তাও আবার ভাবি, আর বঞ্চনার মধ্যে দিয়েও যাঁর দান নামে সহস্র ধারায় তাঁকে মনে মনে করি প্রণাম। একটু যে বিরক্তি, একটু যে ভুল, যার জন্যে হল না ভালো করে জিগেস করা, ওইটুকু যে নৈরাশ্য; ওর মধ্যে দিয়েই তো আমার আজকের পরম প্রাপ্তিটুকুর পথ হচ্ছিল রচিত।

আবার ঐ নগদ যা পেলাম তার অতিরিক্তও গেছি পেয়ে। তাই তখন বলছিলাম—ইউরেকা! প্রাপ্তোস্মি!

—একটি চমৎকার গল্পের প্লট, যা আরম্ভ হয়েছিল 'পৈলান' নামটা থেকে, পালবৌ যার মধ্যে আবছা-আবছা এসে দাঁড়িয়েছিল, গোপী-নারায়ণী যেন সেটাকে পূর্ণ করে তুলেছে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছি—সৃষ্টির আনন্দে আমার অন্তর উঠেছে কেঁপে কেঁপে—দোকানী যেটুকু রহস্যে ঢেকে ছেড়েছিল আমি সেইটুকুই নিই তুলে—বেশ স্কোপ আছে......সেই যে বললে—"সেই রকম গঙ্গাস্নান নয়তো?—নাতনী সেবার প্রেথম গেল —সেই গঙ্গাস্নান—কালীঘাট—তারপর......"

তারপর কি?......কোন্ পালগিন্নি?—তা যে পালগিন্নিই হোক, আমার পাল-বৌই সে; সিরাকোলও তো 'পৈলান' নয়।

টিকেট নিয়েছি থার্ডক্লাসেরই, কিন্তু দেখছি ভুল হয়ে গেছে। গাড়িতে বেশ ভিড়, তাতে মোটামুটি, খসড়াটা এক রকম দাঁড়ালেও প্লট আমার সংলাপে পরিস্থিতিতে বেশ দানা বাঁধতে পাচ্ছে না। একটু নিরিবিলি হলেই ভালো হোত, কিন্তু শেষ গাড়ি, নেমে আর টিকিট বদলাতে যেতে সাহস হচ্ছে না।—বিশেষ করে স্টেশন মাস্টারের যা লম্বা হিসেবের নমুনো পেয়েছি। যাক, বিধি অনুকূল, টিকিট চেকার এসে উপস্থিত। আর ইন্টারও নয়, যতটা নিরিবিলি পাওয়া যায়, থার্ডটা একেবারেই সেকেন্ডে বদলি করে নিয়ে নেমে গেলাম। আর থার্ডক্লাসের ভ্যাজাল নয়। ইণ্টারও নয়, একেবারে নিরিবিলি সেকেণ্ড ক্লাসটিতে উঠে বসলাম। সিরাকোলে ইঞ্জিন জল নেয়, আমার গল্প আরম্ভ হয়ে গেছে এদিকে—সম্বন্ধটুকু যা দাঁড়িয়েছিল তার সঙ্গে খাপ খাইয়েই চলেছে গল্প, নাতনী—আমার নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গুপীকে। শুনেই যাও না—এই রকম দাঁড়াল—

লড়াইয়ের বাজারে গুপী সামন্ত, যাকে বলে ফেঁপে উঠেছে। উপরোউপরি কটা বছর যেমন ধান হোল, তেমনই পাট, বিক্রিও হোল সোনার দরে, চলতি বলে ফেঁপে ওঠা কথাটাই ব্যবহার করছি, আসলে গুপী নিরেট হয়ে ফুলে উঠল।

একটা পুকুর খোঁড়ালে, গ্রামের দুটো পুকুর নিজের টাকায় ঝালিয়ে দিলে, বারোয়ারিতলায় একটা নলকূপ গালিয়ে দিলে, আটচালাটার ওপরেও টিন বসিয়ে দিলে। এইভাবে আগে খানিকটা পুণ্য সঞ্চয় করে নিয়ে কাশীনাথের ছোটমেয়ে নারাণীকে বিয়ে করে ঘরে তুললে।

কাশীনাথের মেয়েগুলি হয় ভালো। গুপীর ইচ্ছে ছিল বড়টিকেই নেয়। সেটি গেলে মেজটির ওপর নজর পরে, কিন্তু তখন টানাটানির সময়, কাশীনাথের খাইও বেশি, কথাটা যে তুলবে সে হেস্তনেস্ত পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। অনেক দিন থেকে ওই একটা সাধ, চারশ টাকা নগদ গুণে দিয়ে নারায়ণীকেই ঘরে আনলে গুপী। ডাগোর

ডোগরটি আছে, কাশী বলে বয়স কিছু কম আঠার বছর। গুপীর আন্দাজ, কিছু বেশিই হবে।

গুপীর নিজের বয়স এখন আড়াই কুড়ি হয়ে এক বছর চলছে।

এই নারাণী এখন আবদার ধরেছে তাকে কলকাতা শহর দেখাতে হবে। গুপী বলেছে —"তা দেখাব, এ আর বড় কথা কি?"

কলকাতার ফ্যাসাদটা আসলে ভুল করে গুপীই তুলেছে। ভুল করে বলাও চলে আবার শখ করে বলাও চলে। কলকাতা শহর যে কি বস্তু, গুপী এই সেদিন পর্যন্তও নিজেও জানত না। তারপর দাঁয়েদের কাছ থেকে পনর বিঘে বন্ধকী চাকলাটা উদ্ধার করতে যেয়ে হাইকোর্ট পর্যন্ত দৌড়ুতে হোল, তাইতেই কলকাতার অভিজ্ঞতা গুপীর। এই মামলাটা জেতার পরই নারায়ণীকে ঘরে নিয়ে এল। বয়সকালে সাবেক বৌ রতনের-মার সঙ্গে যে সব আলাপ হোত, সে সব ঠিক জোগায় না মুখে, মানায়ও না, গুপী কলকাতার গল্প দিয়েই নতুন বৌয়ের মন আকর্ষণ করতে লাগল—

"দাঁয়েদের বালাখানা দেখেছিস?—একা হাইকোর্টের মধ্যে তার লাখোখানা এ'টে গিয়ে একটা গোটা ধান মাড়াইয়ের উঠোন থাকবে পড়ে। এই রকম এই রকম কোটা অলিতে গলিতে। রাস্তা দেখলে তোর মনে হবে বিছানা ছেড়ে আঁচল বিছিয়ে রাস্তাতেই পড়ে থাকি—যেমন কালো পাথরের মতন রং তেমনই পালিশ। দেখলে যা মনে হবে তাই বললুম, ইদিকে আবার যে একটু পা দেবে নোকে তার জো নেই—যেমন মোটর, তেমনই বাস, তেমনই টেরাম। টেরাম বুঝলি?"

নারাণী বললে—"কই, না তো।"

"ইঞ্জিন নেই, দুখানা রেল গাড়ি, রাস্তার মধ্যি দিয়ে বন বন করে ছুটেচে; সরো চাই, কাটা পড়ো।"

বধূর বিস্ময়-বিমূঢ় মুখের দিকে চেয়ে অল্প হাসির সঙ্গে মাথা দোলাতে লাগল। নারাণী প্রশ্ন করলে—"তবে চলে কি করে —হ্যাঁ গা?"

গুপীর হাসি একটু স্তিমিত হয়ে গেল কেননা চলার রহস্যটা তার আয়ত্ত নেই। বললে—"চলে......এত বড় রাজত্বটা চলছে কি করে সরকার বাহাদুরের?......তারপর গঙ্গার পুল দেখ্‌, চিড়িয়াখানা দেখ্‌, মরা সোসাইটি দেখ্‌—দেখে কি মানুষ ভুলতে পারে? আজব শহর কলকাতা—কথাটা যে চলে আসছে সেই মান্ধাতার আমল থেকে তা কি মিথ্যে?......একবার লয়, কবার দেখলুম লোকে একবার দেখলেই বলে জীবন সাথক হোল—তা একবার লয়, কবার দেখলুম।"

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য প্রসঙ্গ

শৃঙ্গার ও রবীন্দ্রনাথ

হরপ্রসাদ মিত্র

(২)
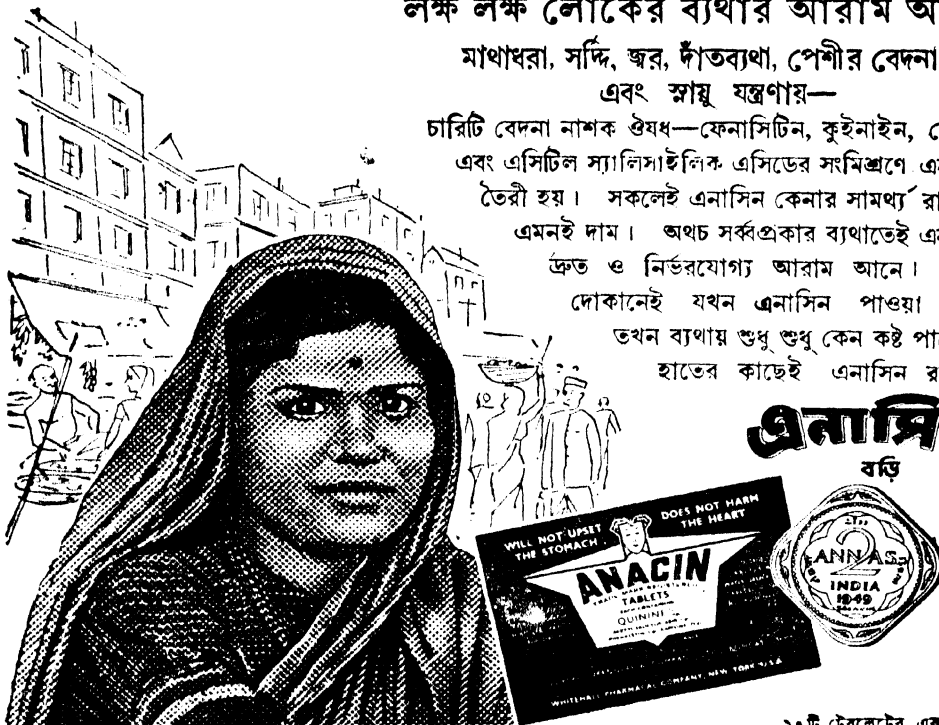
'আত্ম-পরিচয়ে' (১৩৫০) তিনি বলেছেন ঃ

প্রকৃতি তাহার রূপরসবর্ণগন্ধ লইয়া মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্ত করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে।

১৯৩৩এর জানুয়ারী মাসে কমলা বক্তৃতায় বলেছিলেন ঃ

মানুষের সাধনাও এক স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা।...অহংকারকে ভোগাসক্তিকে উত্তীর্ণ হবে তার প্রেম, তবেই বিশ্বগত আত্মীয়তায় মানুষ হবে মহাত্মা। মানুষের একটা স্বভাবে আবরণ অন্য স্বভাবে মুক্তি।

প্রবীণ রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের পূর্বাভাস লক্ষ্য করা যায় 'কড়ি ও কোমলে'র অনেক রচনায়। এই বইয়ের কয়েকটি কবিতার কয়েক চরণ তুলে দেখলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট বোঝা যাবে ঃ

দাও খুলে দাও সখি, ওই বাহুপাশ।
চুম্বনমদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ।
—বন্দী

বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলন শ্মশানে,
নির্বাপিত সূর্যালোক লুপ্ত চরাচর—
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।

এ কী দুরাশার স্বপ্ন, হায় গো ঈশ্বর—
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে!
—পূর্ণ মিলন

আমি গাঁথি আপনার চারি দিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।
কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি!
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।
—স্বপ্নরুদ্ধ

নয়ন খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতি প্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতেই না হয় অবসান।
—চিরদিন

'কড়ি ও কোমলে'-র আগে থেকেই রবীন্দ্র-সাহিত্যের স্থায়ী প্রবণতা দেখা দিয়েছে ভোগাসক্তির ঊর্ধ্বায়নের দিকে। তথাপি প্রথিতযশা, সুপ্রতিষ্ঠিত সমঝদারেরা অদ্যাবধি বলে আসছেন যে, 'বাসনার ফাঁদ'-কে তিনি তখনো নাকি নিঃসংশয়ে উপেক্ষা করতে পারেন নি। এই ধারণার সমর্থনে কবির নিজেরই অনেক কবিতার নজির তুলে দেখানো হয়েছে। 'বিজন বিশ্বের মাঝে' প্রণয়ী-প্রণয়িনীর একান্ত মিলনকে তিনি নিজেই বলেছেন 'মিলন শ্মশান', বুঝেছেন 'এ মোহ ক'দিন থাকে! এ মায়া মিলায়।' তাঁর বেদনার্ত হৃদয় বলেছে ঃ

আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ—
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ—

শারীর মিলনের দৈন্য-চেতনা এবং বৈফল্যবোধের স্বীকৃতি-সত্ত্বেও 'কড়ি ও কোমলে'রই কয়েকটি কবিতায় কবির অন্য এক স্তরের বাসনা বলেছে ঃ

ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা—
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা। —তনু

আমার এ দেহ মন চিররাত্রি দিন
তোমার সর্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।
—দেহের মিলন

লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন—
ছিঁড়ো না, ছিঁড়ো না দুটি বাহুর বন্ধন।
—বাহু

ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহে পরস্পরে,
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।
—চুম্বন

একদিকে মর্ত্য প্রেমের ঊর্ধ্বায়নের সাধনা, —অন্যদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরমাশ্চর্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি,—এই দুই আকর্ষণের সন্ধিতে দাঁড়িয়ে কবি বলেছেন,

বাসনার বোঝা নিয়ে ডোবে ডোবে তরী—
ফেলিতে সরে না মন, উপায় কী করি!
—বাসনার ফাঁদ

কিন্তু আর একটু তলিয়ে দেখলে 'কড়ি ও কোমলে'র তথাকথিত সম্ভোগাত্মক কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত বিপরীত সুরটিরই প্রাধান্য হৃদয়ঙ্গম হবে। সমঝদারেরা যাই বলুন না কেন, রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখাগুলিই রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রামাণ্যতম টীকা। ধূর্জটিপ্রসাদ ঠিকই বলেছেন—Tagore is the indispensable and the surest guide to himself. (Tagore—A study)

শ্রীযুত নীহাররঞ্জন রায় 'কড়ি ও কোমলে'র এই সংশয়োদ্বেল কবিতাগুলির আলোচনায় সমগ্রভাবে কবির মানস-প্রকৃতির রোমাণ্টিক প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। প্রভাতকুমার কবির সামগ্রিক মনোবিবর্তনটি লক্ষ্য করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জটিল মনটিকে খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যে উচিত নয়, সে কথা অবশ্য স্বীকার্য,—কিন্তু কবি মানসের বিশেষ বিশেষ আস্থা ও অনুভূতি, আগ্রহ ও এষণার সমন্বয়েই তো তার সমগ্রতার উদ্ভব ঘটে থাকে! রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার-চেতনা, দেশাত্মবোধ, নিসর্গপ্রীতি, অধ্যাত্ম-সন্ধান—ইত্যাদি মানস প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ও লক্ষ্যের সমন্বয়েই তো রবীন্দ্র-মানসের সমগ্রতা? তাই যদি হয়, তাহলে সমগ্রভাবে তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতাই যে পর্যবেক্ষনীয়, সে লক্ষ্যটি বিস্মৃত না হয়েও সেই সমগ্রের অন্তর্ভুক্ত কবির খণ্ড ও আংশিক বিচিত্র চিৎ-প্রকৃতির বিশ্লেষণের চেষ্টা নিশ্চয় নিন্দাভাজন হবে না! অতএব 'কড়ি ও কোমলে'র ভোগবাসনাত্মক কবিতাগুলির সম্পর্কে নীহাররঞ্জনের নিচের মন্তব্যটি মোটামুটি সঙ্গত বলতে আপত্তি না থাকলেও সে মন্তব্যের পুনর্বিচার অযৌক্তিক হবে না। নীহাররঞ্জন বলেছেন ঃ

কিন্তু এটিও লক্ষ্য করিবার যে এই ভোগাকাঙ্ক্ষাও কতকটা রোমাণ্টিক, যৌনাকর্ষণ হইতে ভাবগত আকর্ষণই প্রবল।

অবশ্যই। তারপর, পূর্বোক্ত সংশয়োদ্বেল কবিতাগুলির সম্পর্কে বলেছেন,

এই রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গিরই আর একটা দিক 'কড়ি ও কোমলের' অন্য কয়েকটি কবিতাতেই দেখা যায়। কবির চিরবিরহী চিত্ত বাহুলতার বন্ধনে, পূর্ণমিলনের মধ্যেও যেন অতৃপ্ত থাকিয়া যায়, একটা ঔদাস্য যেন কবিচিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখে, দেহ সম্ভোগের মধ্যে যেন তৃপ্তি নাই, বাসনার ফাঁদ হইতে কবিচিত্ত মুক্তি পাইতে চায়।

কিন্তু এ দুটিকে পৃথক দুই দিক মনে করবার অনিবার্য হেতু আছে কি? 'বিবসনা', 'স্তন', 'দেহের মিলন' প্রভৃতি কবিতায়

আছে নৈকট্যের তৃপ্তি; 'পূর্ণ মিলন', 'বন্দী' প্রভৃতি কবিতায় আছে প্রেমের ঊর্ধ্বতর লোকে ভোগের বৈফল্যবোধ;—নীহাররঞ্জন এই দুই সুর আবিষ্কার করে এই দুটি দিকের মূলে দেখেছেন একই রোমাণ্টিক প্রকৃতির অদ্বৈত শাসন। কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে'র ভোগবাসনামূলক কোনো কবিতাতেই দেহ-মদিরার প্রতি অবিমিশ্র আসক্তি যে ফোটে নি, সে কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। দেহের মাধুর্যে কবি যদি সর্বতোভাবে আত্মাহুতি না দিয়েই থাকেন,—দেহের পূর্ণ আলিঙ্গনেও যদি তাঁর ঊর্ধ্বায়ন প্রয়াসী আত্মার তৃপ্তি না ঘটে থাকে, তাহলে সম্ভোগতৃপ্তি এবং ভোগ-বৈফল্য—এই দুই ভাবের পার্থক্য কল্পনা করে পৃথক দুই নামে 'কড়ি ও কোমলে'র শৃঙ্গারাত্মক কবিতাগুলির দ্বি-শাখা বিভাগের যুক্তি কোথায়? 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' রচনার সময়ে অথবা তার কিছু আগেই প্রণয়বোধের ঊর্ধ্বগামিতা তাঁর ধ্যান-ধারণার মধ্যে এক অবধারিত সত্যে পরিণত হয়েছিল। 'কড়ি ও কোমলে' সংশয় ফুটে উঠেছে বটে,—কিন্তু সংশয় ভেদ করে কবির সমগ্র চিৎপ্রকৃতি যে কোন্ লক্ষ্যের সন্ধানী হবে, এই কাব্যে তারও অবধারিত ইঙ্গিত আছে। তিনি যে সম্ভোগের কবি ন'ন—বিপ্রলম্ভের,—তাঁর আগ্রহ যে 'ঋতুসংহারের' মিলনে নয়,—'মেঘদূতের' বিরহে,—সে কথা 'কড়ি ও কোমলে'র পাঠক অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারেন। কালিদাসের এই দুই কাব্যই রোমাণ্টিক। রবীন্দ্রনাথও রোমাণ্টিক কবি। কিন্তু 'ঋতুসংহার' এবং 'মেঘদূতে'র মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রেরণায় তিনি 'কড়ি ও কোমল' রচনা করেছেন, একথা মনে করা কোনো মতেই সমীচীন হবে না। তিনি 'মেঘদূতে'রই ভক্ত—এ সম্পর্কে 'কড়ি ও কোমলের' আগেই তিনি বলেছিলেন :

বর্ষাকালে বিরহিণীর সমস্ত "আমি" একত্র হয়, মর্মের "আমি" জাগিয়া উঠে, দেখে যে বিচ্ছিন্ন "আমি" একক "আমি" অসম্পূর্ণ।... বসন্তকালে বিরহিণীর জগৎ অসম্পূর্ণ, বর্ষা-কালে বিরহিণীর "স্বয়ং" অসম্পূর্ণ। বর্ষাকালে আমি আত্মা চাই, বসন্তকালে আমি সুখ চাই। ...ঋতুসংহারে কালিদাসের কাঁচা হাত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি তিনি এই কাব্যে বর্ষা ও বসন্তের যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কালিদাস বলিয়া চিনা যায়।—বসন্ত ও বর্ষা: বিবিধ প্রসঙ্গ।

আবার 'কড়ি ও কোমলের' অনেক পরে ১৩৩২-এ রচিত 'শেষ বর্ষণ' গীতিনাট্যে বলেছিলেন :

বসন্ত পূর্ণিমাই ত অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্লরাতে হাসি বলচে আমার জিৎ, কান্না বলচে আমার।

ভালোবাসার সাধনায় 'কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত' উদ্‌যাপনের আবশ্যিকতা তিনি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করেছেন। 'কুমারসম্ভব' ও শকুন্তলা'র আলোচনায় তিনি যে কথা বলেছিলেন, 'বিবিধ প্রসঙ্গে'ও তাই বলেছিলেন—'শেষ বর্ষণে'ও তাই বলেছেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর সকল রচনার প্রধান লক্ষ্য হলো ঐ একই বাণী ত্যাগের স্বীকৃতি,—দুঃখের বন্দনা। প্রণয়ের শারীর সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র, স্থূল সম্ভোগে তিনি ছিলেন চিরবিমুখ। 'কড়ি ও কোমলে'র বছর দুয়েক আগে প্রকাশিত 'ছবি ও গান' (১৮৮৪)-এ তাঁর 'রাহুর প্রেম' কবিতাটি সংকলিত হয়। সে কবিতায় তিনি লিখেছেন—

যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া
এই তো নিয়ম ভবে,
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই
এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে।

'ছবি ও গানের'—'জাগ্রত স্বপ্নে' স্বপ্ন-দর্শক বলেছেন—

কেহ কি আমারে চাহিবে না?
আমার যৌবন-কুসুম-কাননে
ললিত চরণে বেড়াবে না?
আমার প্রাণের লতিকা-বাঁধন
চরণে তাহার জড়াবে না?

'প্রাণের লতিকা-বাঁধন' চিরচলমান মানবাত্মার চরণে জড়ালে ক্ষতি নেই—যদি তাতে প্রাণ-মন-আত্মার চলচ্ছক্তি না ক্ষুণ্ণ হয়! কিন্তু সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতার প্রশ্রয়ে সংসারে লতিকা-বাঁধন ক্রমশঃ হয়ে ওঠে লৌহরজ্জুপাশ;—স্থূল রূপাসক্তি আত্মাকে করে বঞ্চনা—ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-অতৃপ্তি-চাঞ্চল্য হয়ে দাঁড়ায় অসীমের অন্তরাল। রাহুর ক্ষুধায় বিশ্বের স্বচ্ছতা হয় তিমিরান্ধ। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যে সংশয়ী নন—কোনো-দিনই ছিলেন না। তাই সম্ভোগের মনোময় আস্বাদনই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট—সেই মনোময়-তার জন্যই বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যথেষ্ট আবেগ এবং উষ্ণতা দেখতে পাননি ('জয়ন্তী-উৎসর্গ' দ্রষ্টব্য)। ধূর্জটিপ্রসাদ সেই একই কারণে বলেছেন :

Truth to tell, Tagore's love-poems were seldom 'pure'. It may have been his decency or his idealism, but the fact has to be admitted that his love-poems usually suffered from the double entendre, one to the glow of the body and the other to the spirit divine. (Tagore—A study.)

'বিবিধ প্রসঙ্গ' এবং 'কড়ি ও কোমলের' মধ্যবর্তী প্রবন্ধের বই 'আলোচনা'য় (১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৫) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:

যেমন শরীরের দ্বারা শরীরকেই আয়ত্ত করা যায় তেমনি জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যবস্তুর উপরেই ক্ষমতা জন্মে, মর্মের মধ্যে তাহার প্রবেশ নিষেধ।

একজন ইংরাজ স্ত্রীকবি এই সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার মর্ম এই যে, যদি অংশ চাও তবে জ্ঞান বা শরীরের দ্বারা পাইবে, তাও ভাল করিয়া পাইবে না; যদি সমস্ত চাও তবে মন বা প্রেমের দ্বারা পাইবে। —সৌন্দর্য ও প্রেম

—এই বলে তিনি শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর Inclusions কবিতাটি তুলে দিয়েছেন। কবিতাটি সুপরিচিত,—অতএব এখানে সবটুকু না তুলে কেবল অন্ত্য স্তবকটি স্মরণ করা যেতে পারে :

Oh, must thou have my soul, Dear,
commingled with thy soul?—
Red grows the cheek, and warm the
hand,..the part is in the whole!..
Nor hands nor cheeks keep separate,
when soul is joined to soul.

প্রেমের অধিকার—সম্পত্তির দখল নয়। প্রেমে সৌন্দর্য, প্রেমে ব্যাপ্তি, প্রেমে সামঞ্জস্য। 'আলোচনা'র 'ধর্ম'-প্রবন্ধে ভালোবাসার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য সাধনের শক্তির বিষয়ে বলা হয়েছে :

একেবারেই প্রেমের যোগ্য নহে এমন জীব কোথায়! যত বড়ই পাপী অসাধু কুশ্রী সে হউক না কেন, তাহার মা ত তাহাকে ভালবাসে। অতএব দেখিতেছি, তাহাকেও ভালবাসা যায়, তবে আমি ভালবাসিতে না পারি সে আমার অসম্পূর্ণতা।

'সৌন্দর্য ও প্রেমে' বলা হয়েছে :

যে সুন্দর, কেবল যে তাহার নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাহা নয়—সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য সমস্ত জগতের সঙ্গে সৌন্দর্য জগতের অনুকূল। কদর্যতা সয়তানের দলভুক্ত।

* * *

যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ। ... প্রেমের প্রভাবেই সুন্দর হইয়াছে; তাহা আদ্যন্তমধ্য প্রেমের সূত্রে গাঁথা; তাহার কোন-খানে বিরোধ বিদ্বেষ নাই। —সৌন্দর্য ও প্রেম

'কড়ি ও কোমল' প্রকাশিত হবার আগেই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' এবং 'আলোচনা'র লেখা-গুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও সৌন্দর্যের

অবিচ্ছেদ্য সংযোগের সত্য স্বীকার করেছিলেন এবং প্রেমের সর্বব্যাপকতার প্রেরণায় তাঁর ধর্মবোধের সঙ্গে দেশাত্মবোধ, দেশাত্মবোধের সঙ্গে বিশ্বানুভূতি, বিশ্বানুভূতির সঙ্গে শিল্পচেতনা এবং শিল্পচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনা একই পুটপাকে পাক হয়ে পরস্পর সংশ্লিষ্ট, পরস্পর অবিচ্ছেদ্য, অখন্ড একটি সত্যবোধে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্র-মানসের এই বিশিষ্ট প্রকৃতিটি পর্যালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবিমিশ্র 'প্রেমের কবিতা' বলতে যা বোঝায়, সে পদার্থ রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিরল। তাঁর অনুভূতিতে প্রেম একটি ধাতুসঙ্কর (alloy) মাত্র। দেশ, সমাজ, বিশ্ব, ঈশ্বর—ইত্যাদি বিষয়ের চিন্তা তাঁর শৃঙ্গারচেতনার চৌহদ্দীর বাইরে অবান্তর-বোধে বহিষ্কৃত হয়নি। 'কড়ি ও কোমলে'র পূর্বে রবীন্দ্রনাথের মনে প্রেমের ধারণার সঙ্গে এই সব ধারণার পরমাণবিক অন্তরঙ্গতার (affinity) প্রমাণ স্বরূপ নিচে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' এবং 'আলোচনা' থেকে কয়েকটি উক্তি তুলে দেওয়া হলো ঃ

জগতের একটি প্রধান ধর্ম পরার্থপরতা। স্বার্থপরতা জগতের ধর্ম-বিরুদ্ধ।...জগতের প্রত্যেক পরমাণু তাহার পরবর্তী ও তাহার নিকটবর্তীর জন্য, তাহার নিজের মধ্যে তাহার বিরাম নাই।

—ধর্ম ঃ 'আলোচনা'

প্রকৃত কথা এই যে, প্রেম একটি সাধনা।... স্বদেশের শরীর ক্ষুদ্র, স্বদেশের হৃদয় বৃহৎ। স্বদেশের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি। স্বদেশের প্রত্যেক গাছপালা আমাদের চোখে ঠেকে না, আমরা একেবারেই তাহার ভিতরকার ভাব তাহার সম্পূর্ণ মাধুরী দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য এই স্বাধীনতা সকল দেশের সকল লোকেই সমান উপভোগ করিতে পারেন।

—'ডুব দেওয়া'—কেন ঃ 'আলোচনা'

বিশ্ব সর্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম প্রশস্ত। অতএব বিশ্বের এক কাঠা জমিকে যথার্থ ভালবাসিতে গেলে বিশ্বজনীনতা থাকা চাই। —ঐ—এক কাঠা জমি ঃ 'আলোচনা'

সৌন্দর্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছু নয়—হৃদয়ের অসাড়তা অবচেতনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া।

অতএব কবিদিগকে আর কিছু করিতে হইবে না, তাঁহারা কেবল সৌন্দর্য ফুটাইতে থাকুন—জগতের সর্বত্র যে সৌন্দর্য আছে, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের আলোকে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে থাকুক, তবে আমাদের প্রেম জাগিয়া উঠিবে, প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে।

—'সৌন্দর্য ও প্রেম'; কবির কাজ ঃ 'আলোচনা'

বিজ্ঞানবিৎ কি কেবল দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণের সাহায্যেই বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার করেন, তাঁহার কাছে যে অনুরাগবীক্ষণ আছে, তাহা কি কেহ হিসাবের মধ্যে আনিবেন না?

—বেশী দেখা ও কম দেখা ঃ 'বিবিধ প্রসঙ্গ'

অনন্ত জ্ঞানের ক্ষুধা লইয়া যে রহস্য দন্তস্ফুট করিতে পারিব না তাহাকেই অনবরত আক্রমণ করা, অনন্ত আসঙ্গের ক্ষুধা লইয়া যে সহচর মিলিবে না তাহাকেই অবিরত অন্বেষণ করা, অনন্ত সৌন্দর্যের ক্ষুধা লইয়া যে সৌন্দর্য ধরিয়া রাখিতে পারিব না তাহাকেই চির উপভোগ করিতে চেষ্টা করা, এক কথায় অনন্ত মন অর্থাৎ, সমষ্টিবদ্ধ কতকগুলি অনন্ত ক্ষুধা লইয়া জগতের পশ্চাতে অনন্ত ধাবমান হওয়াই মনুষ্য জীবন। —আত্ম সংসর্গ ঃ ঐ

এই সব উক্তির সারার্থ হলো—প্রেমেই মনুষ্যত্বের সার্থকতা—কবির কাব্যের প্রেরণায়, বৈজ্ঞানিকের সত্যানুসন্ধানে, ধার্মিকের ধর্মবোধে, দেশ-সেবকের লক্ষ্যে—সর্বত্র প্রেমের অনির্বাণ দীপ্তি! ভালোবাসার সার্থকতা লোভে নয় দানে; ক্ষুদ্রতায় নয় ভূমায়; —অধিকারে নয়, অনধিকারে! এই হলো রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গারচেতনার আবাল্যলালিত বিশেষত্ব। তাঁর ধ্যানে ভালোবাসার দেবতা হয়েছেন স্বভাব-সন্ন্যাসী। রবীন্দ্র-মানসের চিরলালিত ভূমাবোধেই তাঁর শৃঙ্গার-চেতনার রহস্যটি নিহিত।

'বিবিধ প্রসঙ্গ' যখন ছাপা হয়, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বাইশ বছর। তার আগে তাঁর জীবনে অনেক অভিজ্ঞতাই ঘটেছিলো বটে, কিন্তু একটি বড়ো অভিজ্ঞতার স্বাদে তিনি তখনো ছিলেন বঞ্চিত। সেই প্রাপ্তিটি ঘটলো ১৮৮৪-র মে মাসে—'নলিনী' আর 'শৈশব সঙ্গীত' এই দুই গ্রন্থ প্রকাশের সন্ধিকালে। ১২৮১-র ফাল্গুন মাসে যখন তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে, তখন তাঁর বয়স ছিলো তের বছর দশ মাস। তার কিছু আগে তিনি মহর্ষির সঙ্গে প্রথমে শান্তিনিকেতন,—তৎপরে উত্তর ভারতে ভ্রমণ করে এসেছেন। মাতৃবিয়োগের আঘাত তাঁর অন্তর্লোকে পৌঁছেছিল বটে, কিন্তু তাতে কবির হৃদয়তন্ত্রীতে কতো তীব্র স্পন্দন উঠেছিলো, সে কথা বোঝবার কোনো উপায় নেই। 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর নিজের লেখা একটি বিবৃতি আছে বটে, কিন্তু 'জীবনস্মৃতি' লেখা হয় এই ঘটনার দীর্ঘকাল পরে,—ছাপা হয় ১৩১৯ সালে (২৫শে জুলাই, ১৯১২)। সুতরাং সে বিবৃতি সদ্য মাতৃবিয়োগে শোকগ্রস্ত কিশোরের উক্তি নয়,—প্রৌঢ়-রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা। তবে মাতৃবিয়োগের ফলে তাঁর মনে গভীর কোনো আলোড়ন—তীব্র কোনো বিদারণ যে ঘটেনি,—তার ইঙ্গিত 'জীবন স্মৃতি'র ঐ বিবৃতিটির মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে।

প্রভাতে উঠিয়া যখন মার মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তখনো সে-কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দেখিলাম তাঁহার সুসজ্জিত দেহ প্রাঙ্গণে খাটের উপর শয়ান। কিন্তু মৃত্যু যে ভয়ঙ্কর, সে-দেহে তাহার কোন প্রমাণ ছিল না; সে-দিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম তাহা সুখ-তৃপ্তির মতই প্রশান্ত ও মনোহর। জীবন হইতে জীবনান্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোখে পড়িল না। —জীবনস্মৃতি

'নলিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪-র ১০ই মে; 'শৈশব সঙ্গীতে'র তারিখ—২৯-এ মে। এই দুই তারিখের মাঝে ২০-এ মে,—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-চর্চার নিত্যসঙ্গিনী বৌঠাকুরাণী (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী)-র মৃত্যু ঘটলো আকস্মিকভাবে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে বৌঠাকুরাণী কতো গভীর শ্রদ্ধার—কতো প্রীতিনিষ্ঠ সৌহার্দ্যের আসনে যে অধিষ্ঠিতা ছিলেন, 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক মাত্রেই সে কথা জানেন। বৌঠাকুরাণীর মৃত্যুর আগে প্রকাশিত শৈশব সঙ্গীত' এবং পরে ছাপা ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১লা জুলাই ১৮৮৪)—দুখানি বই-ই তাঁর নামে উৎসর্গ করা হয়েছিলো। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

এই মৃত্যুর পর কবির মনে যে চিন্তাগুলি আসিয়াছিল, সেগুলি 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর চল্লিশ বৎসর পরে কবির একষট্টি বৎসর বয়সের সময় লিখিত 'লিপিকা'র কয়েকটি রচনার ভাষা ও ভাবের সহিত ইহাদের আশ্চর্য মিল রহিয়াছে; বোধ হয় পুরাতন পান্ডুলিপি হাতে পাইয়া কবি তাহার নূতন ভঙ্গীতে কয়েকটি পুরাতন ভাবকে ব্যক্ত করেন।

'কড়ি ও কোমলের' 'কোথায়'-কবিতাটিতে প্রিয়-বিয়োগ-বেদনাহত রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুলতা স্পষ্ট শোনা যায়। অন্যান্য আরো কয়েকটি কবিতায় (যোগিয়া, ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি, শান্তি, পাষাণী মা ইত্যাদি) এই বিচ্ছেদ-বেদনার স্পর্শ লেগে আছে। তা' ছাড়া এই সময়েই 'তত্ত্ববোধিনী'-পত্রিকায় এবং অন্যান্য পত্রে তাঁর 'ব্রহ্ম সঙ্গীতে'র স্রোত সুরু হলো।

১৩৪৬-এ 'রচনাবলী' সংস্করণে 'কড়ি ও কোমলের' মন্তব্য অংশে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৌঠাকুরাণীর মৃত্যুর ঘটনাটি স্মরণ করে লিখেছিলেন—

কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে

অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব।

'কড়ি ও কোমলে'র অন্তর্ভুক্ত 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' নামে অনুবাদ-কবিতাগুলির মধ্যেও মৃত্যু এবং অবসানের সুরটিই প্রধান হয়ে উঠেছে। তা' ছাড়া মৌলিক কবিতাগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটিতে রবীন্দ্র-মানসের মৃত্যু-দর্শনের একটি সুস্পষ্ট সূত্র পাওয়া গেল :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'-র (১৮৯০, বাঙলা ১২৯৭, পৌষ) মাঝে প্রকাশিত হয়—'রাজর্ষি' 'চিঠিপত্র' (১৮৮৭), —সমালোচনা' 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮),—'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯),—'বিসর্জন' (১৮৯০)। 'চিঠিপত্র' এবং 'সমালোচনা'-বাদে বাকী চারটির মধ্যে তিনটিতেই কোনো-না-কোনো প্রধান ভূমিকায় মৃত্যুকে কাব্যের দৃশ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করানো হয়েছে। 'রাজর্ষি' এবং 'বিসর্জন' অবশ্য একই তরুর দুই শাখার মতো পরস্পরের নিকট-আত্মীয়—'বিসর্জন'-নাটক লেখা হয় 'রাজর্ষি'-উপন্যাসের প্রথমাংশ ভেঙে। ১৩৩৬-এ 'তপতী' নামে 'রাজা ও রাণী' পুনর্লিখিত হয়। 'রাজর্ষি'তে', 'বিসর্জনে' এবং 'রাজা ও রাণী'তে' মৃত্যুর অন্ধকার পটে দেখা দিয়েছে প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী শিখা। এই পর্বের অন্যতম রচনা 'মায়ার খেলায় (নলিনী'র পরিবর্তিতরূপ) রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর পুনঃ প্রবেশ না ঘটিয়েই প্রেমের দ্বন্দ্ব-সংশয়-বেদনার দৃশ্য দেখাতে পেরেছেন।

'কড়ি ও কোমলে'র মন্তব্য-অংশে তিনি স্বীকার করেছেন যে, এই সময়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী রচনাবলী যে মৃত্যুর ছায়ালেশহীন ছিলো, তা নয়। তাঁর প্রথম ছাপা-বই 'কবিকাহিনী'তে,—তারও আগে লেখা "বনফুল'-এ, (১২৮২-৮৩র 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রে ছাপা হয়) ১৮৮১-তে ছাপা 'ভগ্নহৃদয়'-গীতিকাব্যে এবং 'রুদ্রচণ্ড'-নাটিকায়—পরবর্তী নাট্যরচনা 'নলিনী'-তে (১৮৮৪; বাঙলা ১২৯১) মৃত্যুর যবনিকা বারে বারে নেমে এসে জীবনের রঙ্গমঞ্চ স্তব্ধ করে দিয়ে গেছে।

'বনফুলে' নায়িকা কমলার শৈশবে মাতৃ-বিয়োগ, কৈশোরে পিতৃবিয়োগ এবং কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে ঈর্ষান্বিত পতির ছুরিকাঘাতে বাঞ্ছিত-বিয়োগ ঘটেছে। 'কবি কাহিনী'র কবি-নায়ক নায়িকা নলিনীকে ভালোবাসলেন, কিন্তু পরিতৃপ্ত হলেন না। অতএব তাঁকে দেশ ভ্রমণে যেতে হলো,—তবু নলিনীকে ভোলা সম্ভব হলো না,—ফিরতে হলো তাঁর পরিচিত প্রিয়-সান্নিধ্যের লোভে। ফিরে এসে নলিনীর দেখা পেলেন বটে, কিন্তু তখন,

না নড়ে হৃদয় তার, না পড়ে নিশ্বাস

শোক-সন্তপ্ত কবি-নায়ক চলে গেলেন দূরদেশে। তারপর,

একদিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া।

'বনফুল' এবং 'কবি কাহিনীর' মতো 'ভগ্ন হৃদয়'-ও বেদনান্ত কাব্য। মুরলার অন্তিম শয্যায় পৌঁছে 'ভগ্ন হৃদয়' স্তব্ধ হয়েছে। 'রুদ্রচণ্ডে' পৃথ্বীরাজ এবং রুদ্রচণ্ড উভয়েই মৃত্যু বরণ করেছেন। 'নলিনী'-নাট্যে নীরজা নীরদ-নলিনীর মিলন ঘটিয়ে দিয়ে পরলোকের পথে পা বাড়িয়েছেন।

এই সব দৃষ্টান্ত থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো যায় যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রীর পরলোক-প্রাপ্তির পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের মৃত্যুর পৌনঃপুনিক আবির্ভাব ঘটে গেছে। শুধু কি তাই? 'কড়ি ও কোমলে'র পূর্ববর্তী পর্বটিকেই বলা যায়, মৃত্যুভূয়িষ্ঠ রচনাবলীর পর্ব। কিন্তু কবির অন্তর্লোকের স্পর্শকাতর সৃজনী-ক্ষেত্রে মৃত্যুর আবির্ভাব এই প্রথম। মৃত্যুর সঙ্গে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের এবার অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎ ঘটলো। ভানুসিংহ ঠাকুরের 'মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান'-অভিবাদনে মৃত্যু ছিলো গীতিকবিতার একতানে সুখস্বপ্নের নিবিড়তায় সমাধিস্থ; 'কড়িও কোমলে'র 'প্রাণ', 'পুরাতন,' 'যোগিয়া, 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি' 'নূতন', 'কোথায়'—ইত্যাদি কবিতায় কবি-কিশোরের সুখস্বপ্নের অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়ে মৃত্যু দেখা দিয়েছে সংশয়ে-সন্দেহে-প্রত্যয়ে-বেদনায় অপরূপ হয়ে। এখন থেকে মৃত্যু আর সর্ববিপত্তির সুশান্ত পরিত্রাতা নয়,—ভাবপ্রবণের প্রিয় সুহৃৎ নয়,—নিরাপদ কৈশোরের স্বপ্নাচ্ছন্ন মেঘলোক থেকে দেখা সূর্যাস্তের দূরে দিগ্-বলয় নয়। 'রাজা ও রাণী'তে দেখা দিলো 'মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা'—বিসর্জনে' জয়-সিংহের মৃত্যু রঘুপতি-গুণবতীর চির-পোষিত মোহান্ধতা ঘুচিয়ে দিয়ে গেল,—গোবিন্দ মাণিক্য বলতে পারলেন,

গেছে পাপ। দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া
আমার দেবীর মাঝে।

রঘুপতি বললেন,

পাষাণ ভাঙিয়া গেল,—জননী আমার
এবারে দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা।
জননী অমৃতময়ী

প্রিয়-বিয়োগের গভীর বেদনায় মূর্ছিত হয়ে অপর্ণা লাভ করলো প্রেমের দেহাতীত অধিকার,—এতোদিন পরে সে রঘুপতিকে প্রথম পিতৃসম্বোধন করতে পারলো।

রবীন্দ্রনাথের প্রণয়-বোধের উপাদান বিশ্লেষণে 'কড়ি ও কোমলে'র পূর্ববর্তী পর্বে দেশাত্মবোধ, বিশ্বানুভূতি, শিল্প-চেতনা, সমাজচেতনা ও শৃঙ্গারচেতনার ওতপ্রোত ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করা গেছে। 'কড়ি ও কোমলে'র পরবর্তী পর্বে মৃত্যুশোকের প্রত্যক্ষ ভূমিকায় ভালোবাসার সত্যকে তিনি নতুন চোখে দেখলেন।

ভালোবাসার ব্যাখ্যানে গ্রীক দার্শনিকের 'everlasting loveliness'—জ্ঞানের ব্যাখ্যানে উপনিষদবিশ্রুত নিত্য অমৃত—বৈষ্ণব কবির 'পিরীতি' উপলব্ধিতে প্রেমের অমরত্ব,—চণ্ডিদাসের পদে

পরাণ সমান পিরীতি রতন
জুকিলু হৃদয়ে-তুলে
পিরীতি রতন অধিক হইল,
পরাণ উঠিল চুলে।*

—প্রেমের অবিনশ্বরতা, পরার্থপরতা, সূক্ষ্ম ধ্যানলোকে প্রেমের অনুত্তম উর্ধ্বায়নের তত্ত্বকথা রবীন্দ্রনাথ ইতঃপূর্বেই আহরণ করেছিলেন। মৃত্যু সম্পর্কে কিশোর বয়সের সেই অর্ধস্বপ্নময় তথ্য জ্ঞান এবার গভীরতর অনুভূতির সত্যে পরিণত হলো। 'জীবনস্মৃতি'তে এই সত্যেরই স্বীকৃতি আছে :

জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘুচাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড়ো মনোহর। —জীবনস্মৃতি

মোহিতচন্দ্র সেন-সম্পাদিত 'কাব্য-গ্রন্থের' প্রথম ভাগের (ক) অংশে 'যাত্রা', 'হৃদয়-অরণ্য, 'নিষ্ক্রমণ ও বিশ্ব'—এই চারটি শাখ বিভাগের কবিতাগুলি সাজানো হয়েছিল। বর্তমান আলোচনায়—রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার চেতনার ক্রমাভিব্যক্তির চারটি অধ্যায়ে

* দ্রষ্টব্য :—'সমালোচনা' (চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি)—রবীন্দ্রনাথ

শিরোনামা হিসেবে সেই নামগুলিই ব্যবহার করা যেতে পারে। *বনফুল', 'কবিকাহিনী' প্রভৃতি কৈশোরের কাব্যমালায় এই চেতনার অর্ধস্ফুট সঞ্চার,—প্রথম যাত্রারম্ভ; 'বিবিধ প্রসঙ্গে' এবং 'আলোচনা'য় শোনা গেল অন্তরালের বিচিত্র মর্মর,—কিশোর রবীন্দ্রনাথ তখন ভালোবাসার তত্ত্বকথায় অভিনিবিষ্ট,—তিনি পড়লেন পূর্ববর্তী নানা যুগের বাণী,—নানা কবির শৃঙ্গারোপলব্ধির কাব্য—কালিদাস, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, বসন্ত রায়, শেলি, বার্ডসার্থ, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, টেনিসন, ম্যাথ্যু আর্নল্ড ইত্যাদি ইত্যাদি; —তারপর তাঁর জীবনে এলো প্রিয়বিয়োগের শোক—মৃত্যুর গভীর উপলব্ধি! অর্জিত বিদ্যার সঙ্গে আপন অভিজ্ঞতার সমবায়ে, জ্ঞানের সঙ্গে ধ্যানের যোগে এইবার তিনি আবিষ্কার করলেন স্বকীয় শৃঙ্গার-দর্শন। 'কড়ি ও কোমল' রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার-দর্শনের,—ভালোবাসার তত্ত্বসূত্রের প্রথম সুনিশ্চিত ঘোষণা। বহুমান্য পর্যালোচকেরা এই কাব্যে যে সংশয়োদ্বেলতা লক্ষ্য করেছেন, সেইটিই এ কাব্যের মুখ্য বস্তু নয়। এ কাব্যে সংশয়ের অবসান—প্রত্যয়ের সূচনা। যেমন স্পষ্ট করে বলেছেন: 'মরিতে চাহি না আমি',—তেমনি স্পষ্ট করে, বলেছেন:

গীত খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে
প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অসীমের ঋণ
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
—চিরদিন।

'কড়ি ও কোমলে' রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার-চেতনার ক্রমাভিব্যক্তির তৃতীয় অধ্যায় শেষ হলো। প্রেমের সর্বব্যাপকতায় গভীর প্রত্যয় নিয়ে,—সংশয়ের কুহেলিকা কাটিয়ে কবিচিত্তের 'নিষ্ক্রমণ' ঘটলো—বিশ্বানুভূতির অসীমতায়!

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শ সম্পর্কে হ্রস্ব-দীর্ঘ—সর্বশ্রেণীর আলোচনায় 'বিশ্বানুভূতি' কথাটির প্রয়োগ যদিও অপ্রতুল নয়,—তথাপি এই কথাটির যথাযথ ব্যাখ্যান—এর অর্থ সম্পর্কে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত এখনও স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়নি। উপনিষদের 'ভূমা'-তত্ত্বের উল্লেখ রবীন্দ্র-রচনাবলীর নানা অংশে পরিকীর্ণ। প্রথম দিকের রচনাবলীর মধ্যে 'বিবিধ প্রসঙ্গ,' 'আলোচনায়,' 'সমালোচনা'য় এবং নানান্ চিঠিপত্রে 'অখণ্ডতা,' 'পূর্ণতা,' 'ব্যাপ্তি,' প্রভৃতি বিস্তার-বাচক শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে। 'অনন্ত জ্ঞান,' 'অনন্ত আনন্দ,' 'অনন্ত সৌন্দর্য' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বর্তমান আলোচনার পূর্ববর্তী অংশে উদ্ধৃত হয়েছে। 'প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে',—'বিশ্ব সর্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম, প্রশস্ত'—'সৌন্দর্য জগতের অনুকূল',—'আদর্শ প্রণয়ী প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালবাসেন',—ইত্যাদি খণ্ড-বচনগুলি একসূত্রে পর পর গ্রথিত করলে শৃঙ্গার বিষয়ে রবীন্দ্র-মানসের বিশ্বমুখিতার ধারণা সমর্থিত হয়। কড়ি ও কোমলের' অনেকগুলি কবিতায় এই বিশ্বমুখিতার নিদর্শন যে পাওয়া যাচ্ছে—সে তো ইতঃপূর্বেই বলা হয়েছে। 'মানসী' (১৮৯০) থেকে আরম্ভ করে তাঁর পরবর্তী কাব্যরচনাবলীর ক্ষেত্রে 'বিশ্ব' শব্দটির ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনাবলীর কালানুক্রমিক আলোচনা করলেও এই ব্যাপারের সমর্থন চোখে পড়ে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ-সংগ্রহ 'বিবিধ প্রসঙ্গে,' 'বিশ্ব'-কথাটির পৌনঃপুনিক ব্যবহার দেখা যায় বটে, কিন্তু 'হিতবাদী'-'সাধনা' পর্বে * লেখা 'ছিন্নপত্রে'র (৩০-এ অক্টোবর ১৮৮৫ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫ এর মধ্যে লেখা পত্র-সংগ্রহ) নানান্ চিঠিতে, 'সাধনা'র 'নিত্য-নৈমিত্তিক' লেখাগুলির মধ্যে চন্দ্রনাথ বসুর প্রবন্ধের প্রতিবাদসূত্রে, ১৮৯৩-এ 'সাধনায়' প্রথম সূচিত এবং ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'পঞ্চভূতের ডায়ারীতে' 'বিশ্ব' শব্দটি যে কতো ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়েছে, তার হিসেব রাখলে এই শব্দটির দিকে কবির ক্রম-বর্ধমান ঝোঁক সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। অবিশ্যি, 'বিশ্ব' শব্দের প্রয়োগ ছাড়া ব্যাপ্তিসূচক অন্যান্য প্রতিশব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব গদ্য রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর বিশ্বানুভূতি বা বিশ্ববোধের স্বরূপ নির্দেশ করে গেছেন। 'পঞ্চভূত' থেকে এইরকম একটি অংশ এখনই বেছে নেওয়া দুঃসাধ্য নয়। 'পঞ্চভূতে'র 'সৌন্দর্যের সম্বন্ধ' নামক আলোচনায় সমীর বলেছেন,—

'আহারে বিহারে আদানে প্রদানে আত্মা আপনার সৌন্দর্যবিভা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। সে আপনার আবশ্যকের সহিত আপনার মহত্ত্বের সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লইতে চায়।'

ঐ একই আলোচনায় দার্শনিক ব্যোম বলেছেন, 'মাকড়সা যেমন মাঝখানে থাকিয়া চারিদিকে জাল প্রসারিত করিতে থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ চারিদিকের সহিত আত্মীয়তা-বন্ধন স্থাপনের জন্য ব্যস্ত আছে; সে ক্রমাগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে।'

এই জাতীয় উক্তি-প্রত্যুক্তিমালার শ্রোতা পঞ্চভূতের ভূতনাথ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাক সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে, তবেই সে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ মাত্রায় মথিত হইয়া উঠে। একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার ঠিক পরেই।......... ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যাত্মিকতা অধিক।'

'পঞ্চভূতে'র কাব্যের তাৎপর্য প্রবন্ধে ব্যোম মহাভারতের কচ ও দেবযানীর আখ্যান স্মরণ করে ঐ কাহিনীর প্রতীক ব্যাখ্যানে দেহ ও আত্মার সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কচ আত্মার প্রতীক, দেবযানী দেহের প্রতীক। শুক্রাচার্যের কাছে সঞ্জীবনী বিদ্যা শেখবার জন্য বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেবতারা পাঠিয়েছিলেন। সেখানে হাজার বছর ধরে নাচ-গানে দেবযানীকে মুগ্ধ করে কচ সঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করলেন। বিদায়ের সময়ে প্রণয়াসক্তা দেবযানীর নিষেধ সত্ত্বেও কচ দেবলোকে ফিরে গেলেন। ব্যোম বলেছেন:

'জীব স্বর্গ হইতে এই সংসারাশ্রমে আসিয়াছে। সে এখানকার সুখ, দুঃখ, বিপদ-সম্পদ হইতে শিক্ষালাভ করে। যতদিন ছাত্র অবস্থায় থাকে, ততদিন তাহাকে এই আশ্রম-কন্যা দেহটার মন জোগাইয়া চলিতে হয়। মন জোগাইবার অপূর্ব বিদ্যা সে জানে।'

ব্যোম তাঁর শ্রোতাদের বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,

'যদি এমনভাবে দেখো, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা অনন্তকালীন প্রেমাভিনয় দেখিতে পাইবে। জীব তাহার মূঢ় অবোধ নির্ভরপরায়ণা সঙ্গিণীটিকে কেমন করিয়া পাগল করিতেছে দেখো।

---

* ১২৯৮ (১৮৯১)-এ 'হিতবাদী' এবং 'সাধনা' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রভাতকুমার লিখেছেন, 'হিতবাদী'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ মাস দেড়েকের অধিক ছিল না।' 'সাধনা' সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় ১৮৯১-এর অগ্রহায়ণে প্রথম প্রকাশিত হয়।

দেহের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এমন একটি আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়া দিতেছে, দেহ-ধর্মের দ্বারা যে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই। তাহার চক্ষে যে সৌন্দর্য আনিয়া দিতেছে, দৃষ্টিশক্তির দ্বারা তাহার সীমা পাওয়া যায় না—তাই সে বলিতেছে, 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল':—তাহার কর্ণে যে সংগীত আনিয়া দিতেছে, শ্রবণশক্তির দ্বারা তাহার আয়ত্ত হইতে পারে না, তাই সে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে,—'সেই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু শ্রুতিপথে পরশ না গেল'! ......এত ভালোবাসার পরে তবু একদিন জীব এই চিরানুগতা অনন্যসক্তা দেহলতাকে ধূলিশায়িনী করিয়া দিয়া চলিয়া যায়!...প্রেম নামক এক অনির্বচনীয়, আনন্দময়, বেদনাময় ইচ্ছাশক্তি পঙ্কের মধ্য হইতে পঙ্কজ-বন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন।—'

ব্যোমের এই কচ-দেবযানী কাহিনীর প্রতীক ব্যাখ্যানের সূত্রে রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গারবোধের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তাতে মানবজগতের কামনা ও আসক্তির ঊর্ধ্বায়ন (sublimation) তত্ত্বটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ক্রমগতির মধ্য দিয়ে স্বার্থময় কামনা বিশ্বময় প্রেমে উন্নীত হয়।

'পঞ্চভূতের' 'অখণ্ডতা' নামক রচনায় ব্যোম আবার বলেছেন,

'(আত্মার) ধর্মই এই, সে পাঁচটা বস্তুকে আপনার চারিদিকে টানিয়া আনিয়া একটা গঠন দিয়া গড়িয়া তোলে; আর......মন...... পাঁচটা বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে এবং তাহাদিগকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ফেলে। সেইজন্য আত্মযোগের প্রধান সোপান হইতেছে মনটাকে অবরুদ্ধ করা।'

মনের আহরণী শক্তি এবং আত্মার সৃজনী শক্তি—এই দুই তত্ত্বের ব্যাখ্যানসূত্রে ব্যোম যে সিদ্ধান্তটি প্রকাশ করেছেন, সেটি এখানে স্মরণ করা আবশ্যক:—

'প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য, মহৎ ও গুণী লোকে তাহাই প্রতিভা এবং নারীতে তাহাই শ্রী, তাহাই নারীত্ব। ইহা কেবল পাত্রভেদে ভিন্ন বিকাশ।'

নারীর এই 'শ্রী'র উৎস কোথায়?—উপাদান কি কি? রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ব্যোম বলেছেন,

'ইহা তো বুদ্ধির কাজ নহে, অনির্দেশ্য প্রতিভার কাজ, মনের শক্তি নহে, আত্মার অভ্রান্ত নিগূঢ় শক্তি। ইহা একটি মহা-রহস্যময় নিখিল জগৎকেন্দ্রভূমি হইতে স্বাভাবিক স্ফটিকধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত উৎস। সেই কেন্দ্রভূমিটিকে অচেতন না বলিয়া অতিচেতন নাম দেওয়া উচিত।'

১৮৯৭-এর ১২ই মে 'পঞ্চভূত' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তারপর প্রায় বত্রিশ বছর পরে ১৯২৯-এ প্রকাশিত হয় 'মহুয়া' (আশ্বিন, '১৩৩৬)। রবীন্দ্রনাথ নিজে 'মহুয়ার' কবিতাবলীর বিষয়ে বলেছিলেন,

"আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতি-কাব্য, ছন্দ ও ভাঙ্গার ভঙ্গীতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধন-বেগই প্রবল।"

'মহুয়ার' 'মায়া'-কবিতাটিতে প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় ফুটে উঠেছে। প্রসাধনের বৈচিত্র্য এবং উপলব্ধির নিবিড়ত্ব—এই দুইয়ের পরম সমন্বয়ে 'মহুয়ার' যে মায়া-লোক সৃষ্ট হয়েছে, সেখানকার মর্মবাণী নতুন নয়,—'কড়ি ও কোমল,' এবং তারও পূর্ববর্তী রচনাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রমানসের যে উপলব্ধি উচ্চারিত হয়েছিল, 'মহুয়ার' তারই পুনরুল্লেখ ঘটলো। রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গার-বিষয়ক পরবর্তী রচনাবলীতেও সেই একই কথা পুনরায় বলা হয়েছে:—

বস্তু হতে সেই মায়া তো
সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি রচে
আপন করো।

অবশ্য, 'ল্যাবরেটোরি' প্রভৃতি শেষ পর্বের রচনায় কবির মনের পুনর্জা... কিছু চাঞ্চল্য সঞ্চার করেছে। কিন্তু ... অন্তর্লোকের গভীর কোন আলোড়নের চিহ্ন নেই।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

পরীক্ষায় বেশী ফেল হয় কেন ?

শ্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদে প্রকাশ, এবার কলিকাতায় লক্ষাধিক সরস্বতী পূজা হয়েছিল। সরস্বতী পূজায় ছাত্রছাত্রীরাই বেশীর ভাগ উদ্যোক্তা। এবং পূজায় তাদের উৎসাহ যেন ক্রমে বেড়েই চলেছে। পরীক্ষার ফলাফল যতই নিরাশাজনক হতে চলেছে, পূজার ধূমধামের মধ্যে দিয়ে কৃত্রিম ভক্তির মাত্রা ততই যেন বাড়ছে তাদের।

এদিকে বসন্ত সমাগম। কোকিলের কুহুতান ভাবুকের ভাবের তন্ত্রী যেমন স্পন্দিত করছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিগণের হৃদয়তন্ত্রীর স্পন্দন বেড়েই চলেছে অনাগত এক আশংকায়। কেননা, মাত্র শতকরা ৩০।৩৫ জনই পরীক্ষা-বৈতরণী উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়।

পরীক্ষায় এরূপ বিপর্যয়ের কারণ নিয়ে অনেকে অনেক মতামত প্রকাশ করে থাকেন। কেহ বলেন, পাঠ্যতালিকার গুরু চাপে অপরিণত মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত, তাই বিষয়বস্তু সম্যক মনে রাখা তাদের পক্ষে দুরূহ ব্যপার। কারও মতে দারিদ্র্যাক্লিষ্ট শিক্ষকদের শিক্ষাপনায় যথেষ্ট ত্রুটিবিচ্যুতি বিদ্যমান। কেহ পরীক্ষার অহেতুক মান বৃদ্ধির অভিযোগ করেন। অনেকেই ছাত্রছাত্রীর উপরেই দোষ দেন বেশী তাদের 'একস্ট্রা একাডেমিক অ্যাকটিভিটি'-তে বেশী মনোযোগ দেওয়ায়। ক্রমবর্ধমান সিনেমা ভবন কাহারও কাহারও মতে বিশিষ্ট কারণ।

সভ্যতার ক্রম-বিবর্তনে এ সবের হাত থেকে বেঁচে চলতে পারে কজন ? কিন্তু এসব দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সত্ত্বেও সাধারণ মেধাবিশিষ্ট বহু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় ভালই করে। তাহলে স্বভাবত মনে আসে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার এসব কারণ ছাড়াও আরও কোন কারণ বিদ্যমান। সে কারণ চোখের সঙ্গে তাদের মনের অসহযোগিতা। চোখ চায় অনেক কিছু দেখতে, শিখতে আর বুঝতে। কিন্তু উচ্ছৃংখল মন পূরণ কর্তে পারে না তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা। এই চাওয়া আর না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব মনকে বিভ্রান্ত করে দেয়। ফলে তাদের মানসিক অবসাদ আসে বেশী। এই মানসিক অবসাদ দৃষ্টিকেন্দ্রের স্নায়ুমূলে রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে দেয় বলে পাঠের রেখা স্মৃতিকেন্দ্রে স্পষ্টভাবে দাগ রাখতে পারে না। তাই কার্যকালে স্মৃতিভ্রংশ হয়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া বিচিত্র নয়।

চোখের অসহযোগিতার ক্ষেত্র এইখানেই সীমাবদ্ধ নয়। তার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। আমাদের চক্ষু-যন্ত্রের গঠনপ্রণালী পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, বাইরের দৃশ্যের আলোকরশ্মি চোখের মধ্যেকার 'লেন্সের' ভিতর দিয়ে চোখের পেছনের স্নায়ু-পর্দায় (রেটিনা) একটি ক্ষুদ্র বিন্দুপ্রমাণ জায়গায় কেন্দ্রীভূত হলেই আমরা তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। ঐ বিন্দুটিকে Bright spot বলে। ঐ বিন্দুর চতুষ্পার্শ্বের জায়গায় দৃষ্টি তত স্পষ্ট নয়। দূরে বা কাছে কোন জিনিসের বা লেখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমরা সেই জিনিসের বা লেখার কতকটা অংশ ভাল দেখি। তার চারিপাশের—প্রায় আমাদের কানবরাবর—যদিও আমরা অনেক কিছু দেখতে পাই, কিন্তু সে সব ক্রমে অস্পষ্ট হতে অস্পষ্টতর হয়ে যায়। এই কেন্দ্রগত দৃষ্টি ও প্রান্তিক দৃষ্টির উপরে নির্ভর করছে পরীক্ষায় পাশ-ফেল বহুলাংশে।

এই Bright spot-এর অনুভূতিপ্রবণ স্নায়ুগুচ্ছ মগজের স্মৃতিকেন্দ্রকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে বলেই সেখানে দাগ পড়ে ভাল। তাই যে জিনিস আমরা দেখি খুব ভাল স্পষ্টভাবে, সেটা বড় সহজে মন থেকে মুছে যায় না। আর দৃষ্টি যেখানে ম্লান, সে জিনিসের ছাপ স্মৃতি-কেন্দ্রে সমুচিত পড়ে
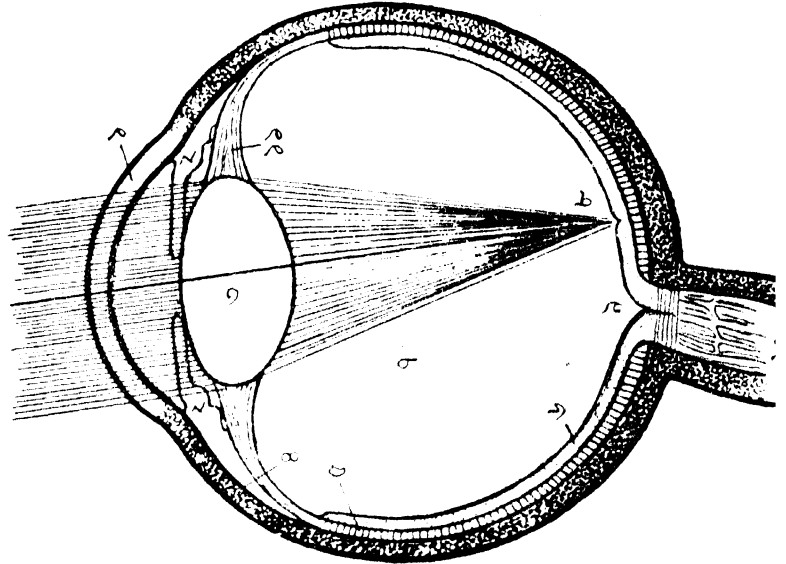
৬—চোখের পেছনের স্নায়ু পর্দা (রেটিনা) যেখানে বাইরের জিনিষের ছবি পড়ে ১০—রেটিনার স্নায়ুপুঞ্জ, গুচ্ছবদ্ধ হয়ে অপ্‌টিক নার্ভরূপে মগজে গিয়েছে। ৯—অপটিক নার্ভের এই অংশে আলোকের কোন অনুভূতি নেই (Blind spot)। ৪—রেটিনার যেখানে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয় (Bright spot)।

না বলেই আমরা অচিরেই ভুলে যাই। এটা একটা লক্ষ্যের বিষয় যে, যখন আমরা কোন ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বিশিষ্টভাবে পরিচিত হই, যদিও খুব অল্প সময়ের জন্য, কিন্তু বহুদিন পরেও পুনরায় তাকে দেখলে চিনতে পারা বিশেষ কষ্টকর হয় না। অথচ একাধিকবার সাধারণভাবে দেখা-সাক্ষাতের পরেও কিছুদিন অন্তে তাকে চিনতে না পারার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে।

পরীক্ষার্থীদের মনোনিবেশ সহকারে পড়তে গেলেই কেন্দ্রগত দৃষ্টির ব্যবহার করতে হয় বেশী। প্রত্যেকটি লাইনের অন্তর্নিহিত মানে উপলব্ধি করতে হলে ধীরে ধীরে ভাল করে দেখে পড়া দরকার। তা হলেই স্মৃতি-কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে উত্তেজিত হবে। আর তাড়াতাড়ি বই পড়া যায় প্রান্তিক দৃষ্টির ব্যবহারে। যে ক্ষেত্রে তার ছাপ মনে ভাল করে পড়ে না বলেই জ্ঞান হয় ভাসা ভাসা আর ক্ষণস্থায়ী।

কলিকাতার মত বড় শহরে ছেলেমেয়েরা প্রান্তিক দৃষ্টির ব্যবহার করে বেশী। দ্রুত গতিশীল যানবাহন ও বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাস্তায় যাতায়াত করবার অভ্যাসের ফলে প্রান্তিক দৃষ্টির চর্চা হয় বেশী। ফলে প্রান্তিক দৃষ্টিই কেবল হয় প্রবল। আর অল্প-পরিসর জায়গায় উঁচু উঁচু বাড়ি দিয়ে দূরের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করে দেয় বলে Bright spot-এর ব্যবহার হয় কম। সেইজন্য কেন্দ্রগত দৃষ্টির প্রখরতা লাভে বাধা পায় অনেক।

কেন্দ্রীভূত দৃষ্টির দুর্বলতার জন্য বেশীক্ষণ মন দিয়ে বই পড়তে গেলেই দৃষ্টিক্লান্তি দেখা দেয়। চোখে কপালে এক অস্বস্তিকর ভাবের আবির্ভাব হয়। অথচ পড়ার চাপ বা আগ্রহ দুর্বল স্নায়ুপুঞ্জকে আহত করতেই থাকে বেশী। স্নায়ুর আহত অবস্থায় বেদনায় রূপান্তরিত হয়ে মাথা ধরার সৃষ্টি করে। ছেলেমেয়েদের পড়তে গেলেই মাথা ব্যথার অভিযোগ অভিভাবকমাত্রেই ভুক্তভোগী। আর এই মাথা-ধরার প্রতিকার হিসাবে চশমার ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ হিসাবমত দেখতে গেলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে চোখ দুটোর কোন দোষ নেই। কেননা দেখতে তাদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। কেবল দৃষ্টির সুষ্ঠু ব্যবহারের অজ্ঞতাই তাদের এই অবস্থায় নিয়ে আসে। এর প্রমাণ আমরা হাতে হাতেই পাই; চশমা নেয়া সত্ত্বেও মাথা-ধরা আবার
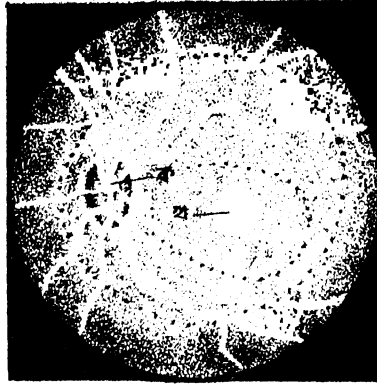
চোখের পেছনের স্নায়ুপর্দা। ক—অপ্‌টিক্ নার্ভ ও চোখের ভিতরের রক্তবাহী শিরা। এই জায়গাটাই Blind spot। খ—Bright spot, যেখানে দৃষ্টি সব চেয়ে প্রখর (কেন্দ্রগত দৃষ্টি)। এই জায়গা থেকে যতদূরে আলো পড়ে দৃষ্টি ততই ম্লান হয়ে যায় (প্রান্তিক দৃষ্টি)।

ফিরে আসে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বেশী পড়াশুনা করলে।

গ্রামের ছেলেদের পাশের হার কলকাতার ছেলেদের অপেক্ষা ভাল। তার কারণ তাদের কেন্দ্রগত দৃষ্টি প্রখর। তারা সর্বদাই দূরের, অতি দূরের জিনিস দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর পরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে যাওয়া আসাতে তাদের প্রান্তিক দৃষ্টির ব্যবহার হয় কম। তাই তাদের দৃষ্টি বিভ্রান্ত হয়ও কম। সেইজন্য তারা পাঠে মনোনিবেশ করতে পারে বেশী। দৃষ্টিক্লান্তিতে ভোগেও কম। রাত্রে প্রদীপের বা লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোক বই-এর অল্প পরিসর জায়গা আলোকিত করে বলেই দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হতে সাহায্য করে বেশী। এদিকে শহরের উজ্জ্বল ইলেকট্রিক আলো দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্তে বিক্ষিপ্তই করে বেশী।

দৃষ্টি-কেন্দ্রের সুষ্ঠু ব্যবহারের অক্ষমতার জন্যই বেশীর ভাগ পরীক্ষার্থী অভিনিবেশ সহকারে পাঠে মন দিতে পারে না। সেই জন্য সহজ পন্থা হিসাবে 'একজামিনেশন মেড্ ইজি' সিরিজের সাহায্য নিতে হয় পরীক্ষা-সাগরে পাড়ি দেবার সহায়ক হিসাবে। এই একই কারণে গৃহ-শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও বহু পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হতে পারে না। অথচ তারা যে বোকা, সে কথা বলা যায় না; কেননা যেখানে চোখের প্রশ্ন বড় নয়, এমন সব বিষয়ে তাদের প্রতিভা বেশ দেখা যায়। যারা কেন্দ্রগত দৃষ্টির ব্যবহারের অক্ষমতা হেতু স্মৃতি-কেন্দ্রকে সজাগ রাখতে পারে না, তারা অনেকেই শুনে শুনে পড়া তৈরী করে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তারা স্মৃতি-কেন্দ্র সজাগ রাখে।

এখন স্বভাবত এই প্রশ্নই আসবে, কি করে শহরের ছেলেদের কেন্দ্রগত দৃষ্টি উন্নত করা যায়। প্রকৃতির নিয়মে স্বাভাবিকভাবে প্রচলিত হয়েছে কতকগুলি খেলা, শহরে ও গ্রামে যা দ্বারা কেন্দ্রীভূত ও প্রান্তিক দৃষ্টির সংরক্ষণ সম্ভবপর হয়। যেমন শহরে—টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, পিং-পং, ক্রিকেট, ক্যারম, ডার্ট, মার্বল প্রভৃতি খেলার প্রাদুর্ভাব হয়ে পড়েছে বেশী কেন্দ্রগত দৃষ্টির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য। তেমনি গ্রামে—ফুটবল, ভলিবল, হা-ডুডুডু, লুকোচুরি প্রভৃতি খেলার প্রসার হয়েছে বেশী প্রান্তিক দৃষ্টির প্রখরতা বাড়াবার জন্য। ঘরে বসে অবসর সময়ে ম্যাপ খুলে কোন একটা নাম খুঁজে বার করবার প্রতিযোগিতার মধ্যে হবে কেন্দ্রগত দৃষ্টির ব্যবহার। ড্রয়িং এবং মেয়েদের এম্ব্রয়ডারীও উপযুক্ত পন্থা। প্রেসের প্রুফ সংশোধন করাও একটি উৎকৃষ্ট উপায়। এখানে প্রত্যেকটি অক্ষরের প্রতি দৃষ্টি না দিলে অনেক ভুল থেকে যাবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়মিত দৃষ্টি চর্চা দ্বারা কেন্দ্রগত দৃষ্টি বহুলাংশে উন্নত হয়। দূরে দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার রেখে দেখলে প্রথমে মনে হবে সব তারিখগুলোই যেন একই রকম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু দৃষ্টি যখন কোন একটা তারিখের প্রতি নিবদ্ধ করা যায়, তখন সেইটার কালি বেশী কাল বলে মনে হবে। আর তার দুই পাশের তারিখ দুটি অপেক্ষাকৃত ম্লান দেখা যাবে। এই রকমে চোখ ঘুরিয়ে যখনই যে তারিখটা দেখা যাবে, তখন সেইটাই বেশী কাল বলে মনে হবে। কাছে বই পড়বার সময়েও প্রথমে একটা লাইনের সবটাই যেন সমান স্পষ্ট বলে মনে হবে। কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই দেখা যাবে একটি শব্দ তার দুই পাশের শব্দের চেয়ে বেশী কাল। এমন কি একটি অক্ষর তার পাশের দুই অক্ষর অপেক্ষা কাল বেশী। এমনি করে নিয়মিত দুচার বার পাঁচ সাত মিনিট চক্ষু চর্চা করলে কেন্দ্রগত দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হবে, দৃষ্টিশক্তি উন্নততর হবে এবং পাঠে মনোযোগ আকৃষ্ট হবে বেশী।

আমরা যে বিন্দুপ্রমাণ Bright spot দিয়ে একটি মাত্র অক্ষর দেখি তার প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায়। বইএর বা খবরের কাগজের পাতা সামনে ধরে সকালে সূর্যের দিকে এক মিনিট চেয়ে যখনই লেখার অক্ষরের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করা যাবে, তখনই সেই অক্ষরটা যেন রঙিন কালিতে লেখা বলে মনে হবে। চোখ নাড়িয়ে যখনই যে অক্ষরটা দেখা যাবে সেই অক্ষরটাই রঙিন বলে মনে হবে। ক্ষানিকক্ষণ পরে অবশ্য রংটা মিলিয়ে যাবে। তখন সবই কাল দেখা যাবে। এর কারণ সূর্যের তীব্র আলোকের আঘাতে অতীব অনুভূতি প্রবণ Bright spot-এর স্নায়ুপুঞ্জ অত্যধিক উত্তেজিত হওয়ায় কেন্দ্রগত দৃষ্টিতে ধাঁধা লেগে যায়। তখনই রং দেখা দেয়। উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেলে আর সে ভাবটা থাকে না।

বড়বাজারে একদিন

রূপদর্শী

শুধু যে বিলাক্‌মার্কেট দেশে ঢুকল আর লেনদেনের ইষ্ট ঠাকরুণ অন্ধকারের অন্দরে বাসা বাঁধলেন; ঘটনাটা এমন নয়। অন্ধকারের সঙ্গে ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর অনেক দিনের। নিজে কেন, সাঙ্গোপাঙ্গো, নোকর নফর অব্দি আলোর কাছে কাঁচুমাচু। অর্থরূপে, গয়নারূপে চোখ বুজে তাঁর যত রূপেরই ধ্যান কর সবেরই দেখবে আখেরী আবাস পাল্লাবন্ধ গোদরেজের সিন্ধুকে। অন্ধকারের বিছানায় হাত পা মেলে খুশী খুশী অধিষ্ঠান। পেয়ারের বাহন পেচকটিও আলোহীন কালোয়াতীতে পাকা পোক্ত।

কাজেই বড়বাজার দুপুর দিবসে মনের হরষে যে রাত রাত হয়ে থাকবে এ আর বেশী কথা কি?

বড়বাজার আর ব্যবসা, টাকার এ পিঠ আর ও পিঠ। হাঁসের মুখে মোর্গা ডাক হলেও সম্ভব। কিন্তু বড়বাজার ঠাঁই-হদ্দ, অথচ তার মুখে ক্যায়া ভাও ক্যায়া ভাও শোনা যায় নি, এ কভু সম্ভবে না। ব্যবসাতে দেবী লক্ষ্মীর মনোপলি এক্তিয়ার। বড় বাজারের অলিগলিতে অব্দি তাঁর দৌড়া-দৌড়। আলোর সঙ্গে তাঁর জন্মআড়ি। তাই বড়বাজারের বাড়িগুলো হাজার মাথা উপরে তুলে, নাকে নাক ঠেকিয়ে আলোকে খসিয়ে দিয়েছে, কেটে পড় ব্রাদার, ওপর দিকে নজরটি দিয়েছ কি সমুদয় তেজ নজরবন্দী হয়ে তেজপাতার পোস্তায় ওজনে উঠবে। আলো ব্যাচারা আর করে কি, নাজার হয়ে তেজ কমালে। আর সেই ফুরসতে ঘাপটি মারা অন্ধকার উঁচু বাড়ির আঁচল ঢাকা গলিপথগুলোয় গুটি গুটি হতে বেরুল।

বড়বাজারের গলিগুলোর ছিরি ছাঁদ বড় চমৎকার। সব রাস্তা বানিয়ে ফেলার পর ঝড়তি পড়তি মসলাপাতি নিয়েই বোধকরি কর্তারা এদিকে নজর দিয়েছিলেন। পথের মধ্যিখানে প্রমাণ সাইজ একটা লোককে দাঁড় করিয়ে তার দুটো কান যাতে ঠেকাঠেকি না করে অনায়াসে চলতে পারে সে বন্দোবস্তটুকু করতে অবশ্যি তাঁদের ভুল হয় নি। কিন্তু তার বেশী আর এক ছটাকও নয়। তোড়জোড় করে আবৃত্তি শুরু করে মাঝখানে কথা ভুলে গিয়ে ছেলেরা যেমন হঠাৎ বসে পড়ে, এখানের অনেকগুলো গলিরই হাল প্রায় সেই রকম। তোজজোড় করে গলি শুরু হল, পথ ধরে এগিয়েও চললেন, হঠাৎ দেখলেন নাক ঠেকেছে কারো খিড়কীর দরজায়।

গল্প শুনেছিলুম। এক অধ্যাপক বাসা নিয়েছিলেন গলির গলি এক অন্ধগলির মধ্যে। তার বাসাতেই গলির মুখে দাঁড়ি পড়েছে। গরমকাল। গুমোট গরমে প্রাণ-ছাড়ি প্রাণছাড়ি অবস্থা। ভদ্রলোকের একেবারে পাগলের অবস্থা। খালি বিড়বিড় বকে চলেছেন, হাওয়া আসছে না কেন, অ্যাঁ। হাওয়াটার আজ হল কি? অধ্যাপকের ভাইপো মফস্বলের ছেলে। পরীক্ষার পড়া করতে কাকার বাড়ি আগমন। একে গরমে পুরো শিক্ষে তারপর কাকার ভ্যাজর ভ্যাজর। আর কাঁহাতক সহ্য হয়। ভাইপো খেঁখিয়ে উঠলে, থামো থামো। বাসা তো নিয়েছ, হোমিওপ্যাথিকের পুরিয়ার মতো। আঠাশটে মোড়ক খুললে তবে চারটে গুলি, তাও চোখে মালুম হয় কি না হয়। গলির গলি তস্য গলির মধ্যে তো বাসা একখানা জোগাড় করেছ, তাও আবার ব্লাইন্ড লেনে, আবার হাওয়া চাইছ? বলি ওদেরও তো লজ্জা সরম আছে? কাকা বললেন, গর্দভ কাঁহে কা। সায়েন্স পড়িস নি? বলি হাওয়াটা বড় রাস্তা দিয়ে যাবে তো? যেতে যেতে গলি পেলে ঢুকবে না? তবে? ও গলিতে ঢুকে সে গলিতে ঢুকবে। সে গলির থেকে এ গলিতে ঢুকবে। আর এগলিতে ঢুকে বাছাধন যাবেন কোথায়? পথ তো বন্ধ। দেয়ালে এসে ঠেস খাবে। তারপর যাবে কোথায়? দেয়ালটা তো আর হাওয়াটাকে চুমুক দিয়ে শুষে ফেলবে না? তা হলে? তা হলে সে হাওয়া যাবে কোথায়? এ দেয়াল থেকে ঠেক খেয়ে ও দেয়ালে যাবে। তারপর ওখান থেকে ঠেক খেয়ে সেই দেয়ালে যাবে। (এমনি করে ঠেক খাওয়াতে খাওয়াতে ভদ্রলোক
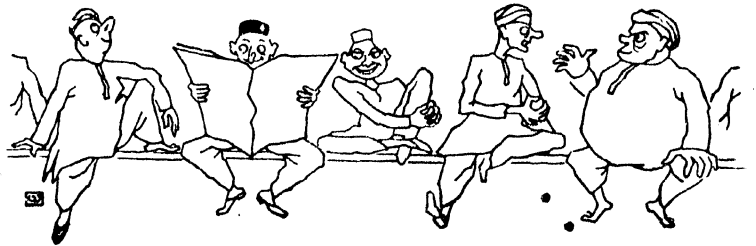
বম্বে বুলিয়নের খবরে চক্ষু এটেনশন

হাওয়াটাকে নাস্তানাবুদ করে নিজের জানলার উল্টো দিকের দেওয়ালে নিয়ে ঠেক খাইয়েছেন।) সেই দেয়াল থেকে হাওয়াটা যাবে কোথায়? জানালাটা খোলা পেলে হুড়মুড় করে আসবে না?

বড়বাজারে পা দিয়েই মনে হল অধ্যাপকের বাড়িটার একটা হদিশ পেলুম। পরে ঠাহর সই করে বুঝলুম, ভুল। অধ্যাপকের ছিল হাওয়া পাবার আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু এদের হল হাওয়া পাবার শঙ্কা। আঁকে মোচড় দিয়ে দিয়ে যেমন সব রসটুকু নিংড়ে নেয়, এরা তেমনি গলিতে মোচড় দিয়ে দিয়ে হাওয়া বার করে ফেলে দিয়েছে বাইরে। তাতেও পুরো ভরসা পায় নি, বাড়ির মাথায় ঝরোকার ঘোমটা তুলে দিয়েছে, পাছে ছিটে ফোঁটাও হাওয়া ঢোকে। সাবধানের বিনাশ নেই। লক্ষ্মীও তো কর্পূরের মতোই অচলা, বাতাস লাগলে পাছে উবে যায়। ফাঁক-ফোকর বিহীন বাড়িগুলো দেখে মনে হল, এগুলো যেন এয়ারকন্ডিশন করা ইনকুবিটার। লক্ষ্মীর ডিম ফুটিয়ে ছা বানাবার কতকগুলো কল।

হ্যারিসন রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, মহর্ষি দেবেন ঠাকুর রোড আর চীৎপুর নিয়ে এক চত্বর। তামামটাই বড়বাজার। এই তল্লাটে ঢুকে পড়লেই বাঙলামুলুকের সঙ্গে সম্পর্ক কাট হয়ে গেল। বেশভুষা, চলন বলন, ঠাট ঠমক, জাঁক জমক সব ভিন্‌মুলুকী। পুরুষ লোকেরা ধুতি পরেন। এক পায়ের গোছ পর্যন্ত কাপড়ের ঝুল নামল তো হিসাব সই সই রাখতে কাপড় উঠল অন্য পায়ের হাঁটুর উপর। মহিলারা মাথার ঘোমটার বিপুল বহর জোগাতেই এ্যাসা কাপড় খর্চা করেছেন যে, টান পড়ল অন্য দিকে।

চারটে সদর রাস্তা হাত ধরাধরি করে ঘিরে আছে বড়বাজারকে। বড়বাজারের তাই চারটে মুখ। চারটে মুখই দর্শনধারী। দিনের বেলায় মহাব্যস্ত। খালি দাঁড়ি-পাল্লার গজকাঠির মেহন্নৎ। পোস্তা আর রাজাকাটরা, লোহাপট্টি আর তুলাপট্টি, আর মেওয়া বাজার। হাজার হাজার লোকের নিত্য হাজিরা। আজকের দর কী? ক্যায়া ভাউ? আলু ছাড় আর মসলা বেঁধে রাখ। সোনার বাজারে তেজ নেই। লোহার মন্দা কাটছে। নগদ আর চেক আর হুন্ডি।

যা লিবে তা ছ' আনা...

কিন্তু খাসদুপুরেও, বাইরেটা বড়বাজারের যতই কেনাবেচার কচকচি দিয়ে ভরা থাক না কেন, অন্দরটা আশ্চর্য শান্ত। সেখানে গেরস্তিয়ানারই দরবার। পোস্তা ছেড়ে একটু এগিয়ে এসো হ্যারিসন রোড বরাবর, অথবা শিকদারপাড়ার উঠোন মাড়িয়ে ঢুকে পড়ো বড়তলা স্ট্রীট কি বাঁশতলা লেনে।

আতরওয়ালা

কি দেখবে? চলমান জনস্রোতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যা-লিবে-তাই-ছ-আনার পরিত্রাহি চীৎকার? কানে এক হাত চাপা দিয়ে তেসুরো আওয়াজে অন্যের কানে লাঙল চষা? না। পর্বতপ্রমাণ এক পাঞ্জাবী খাটুম মেরে বসে ফাউন্টেন পেন সারাচ্ছে? তাও না। এসব বড়বাজারের বাইরের ব্যাপার। ভেতরের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্য।

আজ কি তিথি? আমলা একাদশী। বটে বটে? চলল এক মাড়োয়ারী মেয়ের স্পেশাল দল বেঁধে। ইট কাঠ আর কংক্রীটের কড়া চৌকীর চোখ এড়িয়ে একটা সবুজ পার্ক কি করে যেন টিঁকে গেছে। গন্তব্য সেইখানেই। লাল আর হলদের বুটিদার চুমকী বসানো সাড়ি পরনে, আচিবুক ঘোমটা, হাতে থালা, থালায় সাজানো নানাবিধ ফল। আজ যে আমলা পুজার দিন। পার্কটাতে নানাবিধ গাছগাছালি পোষা। একটা আমলকী গাছও। পার্কের মালীর সেটা চক্ষের মণি, সাতরাজার ধন। তোয়াজে রেখেছে আমলকী চারাটাকে। কারণ ওর পয়েই তো জুটছে কিছু। শুধু কলাটা মুলোটাই নয়, টাকা সিকিও হাজরে দেয়। বছরে বছর আমলা পুজো। মেয়েরা আসেন, লাল হলদেয় ছোপানো সুতোর কলাবা গাছে বাঁধেন, যখনকার যা ফল ফুলুরী গাছের গোড়ায় ঢেলে দেন, সিকি, আধুলী, টাকাও ধীরে ধীরে জমে ওঠে। মনে মনে মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে আমলকী চারা প্রদক্ষিণ করেন। প্রার্থনার কুলকিনারা নেই।

লম্বা আর সরু রকে সার সার রকের মতো পা ঝুলিয়ে বসা একদল পুরুষ পরম আলস্যে বসে বসে দিবা স্বপন দেখছে। একজনের হাতে হয়ত একখানা খবরের কাগজ। বোম্বে বুলিয়নের খবরে চক্ষু এটেনশন।

রাস্তায় রাস্তায় ফলের বেসাতি। আর সব্‌জির দোকান। দোকানে যত্ন করে সাজানো বেগুন আর বাঁধাকপি, আলু আর আমলকী, পেঁয়াজ আর পুদিনাপাতা, আর কত। এক পাশে বসে আছে দোকানী। আসছে খরিদ্দার। মেয়েরাই বেশী। এরা ঘোমটানশীন কিন্তু পর্দানশীন নয়। ঘোমটার আড়াল থেকে নিঃসঙ্কোচে কাজকর্ম গালগল্প সবই চালিয়ে নিচ্ছে।

আজ দেখলে কে বলবে, একদিন এই চত্বরটায় বাঙালী নামক একপ্রকার জীব বাস করত। ব্যবসা বাণিজ্যপ্রধান এই তল্লাটে

ঘোমটানশীন কিন্তু পর্দানশীন নয়

তখনো কলকাতার পত্তন হয় নি, সুতোনুটি গোবিন্দপুর মৌজার মধ্যে। শিকদারদের তখন বড়ই দপদপা। ধনে জনে ঘর সংসার উথলে উঠছে। স্বপ্ন পেয়ে বাড়ির কর্তা মাটি খুঁড়ে বের করলেন দেবী মূর্তি। মন্দির নাটমন্দির তৈরী হল। মায়ের নাম তারাসুন্দরী। অমাবস্যায় অমবস্যায় নিয়ম পূজো। কি ধুমধাম ছিল। পাঁঠা বলি মোষ বলির রক্তে পথ অবধি পিছল হয়ে থাকত। তারপর একদিন অচলা লক্ষ্মী সচলা হলেন। শিকদারদের অবস্থা পড়তে লাগল। বাড়িঘর বিক্রি হতে শুরু হল। যাঁরা ছিলেন তারাসুন্দরীর পুরোহিত, তাঁরাই ধীরে ধীরে সেবাইত হয়ে উঠলেন। হাত ফেরতা দেবী তারাসুন্দরী নিজের স্থাধন সহ এখন তাঁদেরই কব্জায়। তারাসুন্দরী পুরানো মন্দির আর কর্পোরেশনের তারাসুন্দরী পার্কটুকু টিমটিম করে এখনো টিঁকে রয়েছে। মিনমিন করে তাই এখনো জানিয়ে দেয় তার অতীত ঐতিহ্যের কথা।

এ-গলি সে-গলি ঘুরপাক খাচ্ছিলুম। নানা জিনিস নজরে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল ধারে-কাছে হাজার মাইলের মধ্যেও কোথা বাঙলা মুলুকের সুলুক-সন্ধান পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। এমন সরু গলিগুলো তো বাণারসীর। জর্দা-সুর্তির গন্ধে ম ম। বিশ্বেশ্বরের পেয়ারের ষণ্ডের মতোই এখানেও গণ্ডা-কয়েক বিচরণ করে। একটা বৃহৎ বাড়ির ভেতরে গেঞ্জির কল। ইণ্টারলকে ফটাস্ ফটাস্ গেঞ্জি তৈরী হচ্ছে। বাইরের দিকটায় আরো কেরামত। ইস্কুল বসেছে বারান্দায়। লম্বায় হাত পাঁচেশেক, চওড়ায় কুল্লে বিঘৎখানেক হল তো বড় ভাসা-ভাসি। ছাত্রছাত্রী একুনে শতেকখান। ঠাসাঠাসি বসে পাঠ তৈরী করছে। চেল্লানীর চোটে কানের পোকা বৃন্দাবনে এই যায় তো সেই যায়। নির্বিকার মাস্টার দিব্যি বাগিয়ে বসেছেন জলের ড্রামের উপর। যার তেষ্টা পাচ্ছে, নিচু হয়ে কল টিপে জল খেয়ে নিচ্ছে। মাঝে মাঝে মাস্টারজী হাঁক পাড়ছেন নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দেবার জন্য।

ঘুরতে ঘুরতে হদ্দ হয়ে বসে পড়লুম এক বেঞ্চে। উপরের বারান্দায় বুড়ী বসে বাদাম বাটছিল। কথায় কথায় জমে গেলুম। তিরিশ বছর আগে বুড়ীর মরদ বিকানীর থেকে কলকাতায় এসেছিল লোটা-কম্বল সম্বল করে। তার চোখে দৌলতের স্বপ্ন। ক্ষেত-খামারে আর রোজগার কী? কলকাতায় চল, সেখানে পথে-ঘাটে পয়সা। সেখানে ধুলো ধরলে সোনা। বুড়ি তখন নতুন বৌ। কি আর করে। দু-কানি জমি ছিল, বেচে দিয়ে কলকাতার টিকিট কিনল। বড়বাজারে এসে বাসা বাঁধল। সেও তো তিরিশ সালের কথা। তারপর থেকে দশ বছর তার মরদ বড়বাজারে ঘুরে ঘুরে হয়রাণ হয়েছে। যা

বিশ্বেশ্বরের ষণ্ডের মতো এখানেও বিচরণ করে

ছিল জেওর-উওর সব বেচে-কিনেও পেট চলেনি। তারপর অভাবের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে। এক বেটা ছিল সেও মরেছে। তারপর বিশ বছর ধরে শুধু বাটনা বাটছে বুড়ি। বাদাম বাটছে বর্ফি হবে। কলাই বেটেছে, বড়ি হবে। আলু, মুগ আরো হরেক চিজ বেটেছে পাঁপর হবে। বুড়ি বাটনা বাটতে বাটতে একটু থামল। উপর দিকে একবার চাইল। সারি সারি উঁচু বাড়িগুলোর দিকেই নজর দিলে হয়ত। এমন একটা বাড়ির স্বপ্ন তিরিশ বছর আগেকার ছেলেমানুষ চোখে হয়ত উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছিল। ফিকে হতে হতে আজো তা এক কোণে লেগে রয়েছে ছেঁড়া সুতোর আঁশের মতো। হঠাৎ মনে হ'ল বড়বাজারের সবটাই দুধ-ভাতের থৈ-থৈ সরোবর নয়, এরকম নিষ্ফল বুদ্বুদও অজস্র।

ট্রেনে বসে আছেন; চট করে আপনার সঙ্গে কেউ আলাপ জমাতে যাবে না—আপনি হয়ত চুপ করে বসে থাকাটাই পছন্দ করেন। কিন্তু ফুর্তির জাহাজে যখন বসেছেন, তখন নিশ্চয়ই ফুর্তি করতে চান—বাঙলা কথা। একা বসে বসে ফুর্তি হয় না তাই কেউ যদি আপনার সঙ্গে পরিচয় করে সুখদুঃখের গল্প জুড়তে চায়, তা হলে আপনার আপত্তি না থাকারই কথা এবং আশ্চর্য, মানুষ অনেক সময় পরদেশীর সঙ্গে যতখানি প্রাণখুলে কথা কইতে পারে, স্বদেশবাসীর সঙ্গে ততটা পারে না। প্রাণের কোণে বছরের পর বছরের জমানো কোনো এক গভীর বেদনা আপনি লজ্জায় কখনো কাউকে স্বদেশে প্রকাশ করেন নি; হঠাৎ একদিন দেখতে পাবেন, অজানা-অচেনা বিদেশ-বিভূঁইয়ে এক ভিন দেশীর সামনে আপনি আপনার সব দুঃখ কাহিনী উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। তার সঙ্গে জীবনে আপনার আর কখনো দেখা হবে না—সেই কারণেই হয়ত আপনার হৃদয়ের আকুবাকু তার বুকের উপর চেপে-বসা জগদ্দল পাথর সরিয়ে ফেলে নিষ্কৃতির গভীর আরাম পায়। ইয়োরোপের লোক তাই কোনো এক গোপন বেদনা নিয়ে যখন হন্যে হবার উপক্রম করে, তখন সাইকায়াট্রিস্টের কাছে যায়—সেখানে বেদনার বোঝা নামিয়ে দিয়ে সে আবার সুস্থ মানুষ হয়ে সংসারের দুঃখ-কষ্টের সামনাসামনি হয়।

বোধ হয়, ঐ একই কারণে কখনো কখনো মানুষ বিদেশে স্বদেশবাসীর কাছেও তার বেদনার দ্বার খুলে দেয়।

একদা প্রাগ শহরে দেখি, এক ভারতীয় বৃদ্ধ—খুব সম্ভব দাক্ষিণাত্যের—রাস্তায় বেকুবের মতন দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের ফ্যাল-ফ্যাল ভাব দেখে অনুমান করলুম, হয়ত রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন, কিম্বা হয়ত পার্সটাও গেছে। কাছে গিয়ে শুধালুম, 'ব্যাপার কি?'

ভদ্রলোক তো আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন আর কি। শুধু যে হোটেল হারিয়ে বসেছেন তাই নয়, হোটেলের নামটা পর্যন্ত বেবাক ভুলে গিয়েছেন।

কি করে তার হোটেল খুঁজে পেলুম, সে এক—না, এক নয়, পাঁচ—মহাভারত। দ্বিজেন্দ্রলাল তো আর মিছে বলেন নি, 'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়।' লঙ্কা রাক্ষসের দেশ, প্রাগে ভদ্র-সন্তানের বসবাস। আমার মত লেখাপড়ায় পাঁঠা বঙ্গ সন্তানের মাথায় এসব ফন্দি-ফিকির বিস্তর খেলে—সাক্ষাৎ শার্লক হোমস আর কি—সে কথা 'দেশের' পাঠককে হাইজাম্প-লঙজাম্প দিয়ে বোঝাতে হবে না।

কিন্তু আমি মনে মনে পাঁচশবার তাজ্জব মানলুম, এই নিরীহ তামিল ব্রাহ্মণের প্রাগে আসার কি প্রয়োজন? তখনকার দিনে প্রতি শহরে মেলা ইণ্টার-ন্যাশনাল কনফারেন্স বসত না যে, তিনি ভেটেরানারির 'রিন্ডারপেস্ট' কিংবা ভারত বিদেশে 'ক শ' সব গাঁজাগুলি চালান করতে পারবে, তাই নিয়ে পান্ডববর্জিত প্রাগে ভারতের প্রতিভূ হয়ে আলোচনা করতে আসবেন।

হোটেলে পৌঁছতে দেখি, সেখানেও আরেক কুরুক্ষেত্র। এরকম নিরীহ বিদেশী প্রাণী হোটেলের লোকও কখনো দেখেনি—প্রাগ তো প্যারিস নয়—তাই তারা ব্যাকুল হয়ে পড়েছে দশটায় বেরিয়ে লোকটা আটটা অবধি ফেরেনি কেন? তাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য আমি শার্লক হোমসেরই কদর পেলুম।

ভদ্রলোক চেপে ধরলেন, তার সঙ্গে খানা খেয়ে যেতে হবে।

অপেরার টিকিট আমার কাটা ছিল—প্রাগের অপেরা ডাকসাইটে—কিন্তু আমার মনে হল, 'প্রাগে তামিল ব্রাহ্মণ' যে কোনো অপেরার টাইটেলকে হার মানাতে পারে।

বললেন, 'খানাটা কিন্তু আমার ঘরেই হবে—ডাইনিংরুমে না।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

ঘরে ঢুকেই তিনি তড়িঘড়ি স্যুট খুলে ফেলে ধুতি বের করে মাদ্রাজী কায়দায় সেটাকে লুঙ্গি বানিয়ে পরলেন, গায়ে চাপালেন শার্ট, আর কাঁধে ঝোলালেন তোয়ালে।

চেয়ারে বসে খাটে দু-পা তুলে দিয়ে বললেন, 'আঃ!'

এরকম দরাজ-দিল লোক আমি জীবনে আর কখনো দেখিনি।

ওয়েটার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যখন বলে, এটা আনবো কি, সেটা আনবো কি, তিনি মাথা দুলিয়ে বলেন, 'ইয়েস, ইয়েস, ব্রিং, ব্রিং।'

বড় হোটেল। সেখানে 'আ লা কার্তে' অন্তত একশ' পদ রান্না হয়, তিনশ' রকমের মদ মজুত আছে। আমি বাধা দিতে গেলে তিনি বলেন, 'কি জ্বালাতন, ভালো করে খেতে দেবে না নাকি?'

অথচ তিনি খেলেন, আলু-কপি-মটর-সেদ্ধ, রুটি-মাখন, স্যালাড্ আর চা। বললেন, 'বুড়ো বয়সে আর মাছ-মাংসটা ধরে কি হবে?'

তবে তিনি নিশ্চয়ই এই প্রথম ইউরোপে এসেছেন। যে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বৃদ্ধবয়সে অন্যকে মাংস খাওয়ায় সে যৌবনে এলে নিজেও চেখে নিত।

ক্রমে ক্রমে পরিচয় হোল। আই সি-এস থেকে পেন্সন নিয়েছেন। ওদিকে শাস্ত্রী ঘরের ছেলে—এন্তার সংস্কৃত সুভাষিত মুখস্থ। একটানা নানা রকমের গল্প বলে যেতে লাগলেন—প্রধানত শঙ্কর রামানুজের জীবনের চুটকিলা ঘটনা নিয়ে। ইংরেজিতে যাকে বলে, 'লাইটার সাইড'। আমি মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতে লাগলুম।

তবে কি রাতের অন্ধকার যেমন যেমন ঘনাতে লাগে, মানুষের মনের অন্ধকার ঘর তার দরজা আস্তে আস্তে খুলে দেয়? আমরা আহারাদির পর বেলকনিতে ডেক-চেয়ারে লম্বা হয়ে শুয়েছি, চোখ আকাশের দিকে। চতুর্দিকের ফ্লেটের আলো আর রাস্তার বাতি নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারা জ্বল জ্বল করে ফুটে উঠছে। চেনা ঘরদোরের তুলনায় মানুষ তেমন কিছু ক্ষুদ্র জীব নয়, কিন্তু বিরাট গম্ভীর আকাশের মূর্তি যখন তারায় তারায় ফুটে ওঠে, তখন তার ক্ষুদ্র হৃদয় আর তার ক্ষুদ্রতর লৌকিকতা, সংকীর্ণতা কেমন যেন আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যায়।

কোনো ভূমিকা না দিয়ে বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন, 'যার সঙ্গে আলাপচারি হয়, সেই ভাবে, এ-বুড়ো ইয়োরোপ এসেছে কি করতে। কি যে বলব, ভেবে পাইনে।'

এতো তিনি আমাকে বলছেন না; আপন-মনে ভাবছেন এবং হয়ত তাঁর অজানাতেই গলা দিয়ে সে ভাবনা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। আমি যে শুধু চুপ করলুম, তাই নয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসও প্রায় বন্ধ করে আনলুম, যাতে তাঁর চিন্তাধারা কোনো প্রকারের টক্কর না খায়।

না, ভুল বুঝেছি। তিনি আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন।

বললেন, 'দেশের অনেকেই জানে, কিন্তু কেউ আমাকে কখনো জিগ্যেস করেনি। এদেশে জিগ্যেস করলেও উত্তর দিই নে। কিন্তু তোমাকে বলি। এতে অসাধারণ কিংবা কেলেঙ্কারির কিছুই নেই- থাকলে মনুষ চুপ করে থাকে না, সব সময়েই ফলিয়ে বর্ণনা করে আপন সাফাই গায়।

'আমি বড় সুখী ছিলুম। স্ত্রী, দুটি ছেলে আর একটি মেয়ে। দুটি ছেলেই ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে এম এ-তে, সংস্কৃতে আর ইকনমিক্সে। মেয়েটির বিয়ে ঠিক— জামাইয়ের চেহারা কন্দর্পের মত।

'চাকরী জীবনে মাদুরা, কাঞ্চী, তাঞ্জোর, বহু জায়গায় ঘুরেছি, কিন্তু পৈতৃক ভিটাতে যাবার কখনো সুযোগ হয়নি; আমিও গ্রাম ছেড়েছি, ষোল বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পরেই।

'হঠাৎ গৃহিণী চেপে ধরলেন—আমি তখন সবেমাত্র পেন্সন নিয়েছি—তিনি তাঁর শ্বশুরের ভিটে দেখতে যাবেন। ছেলেরাও বলে যাবে, মেয়েটার তো কথাই নেই। আমি অনেক করে বোঝালুম, সেখানে এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই; সাপ আছে, খবরের কাগজ নেই, মশা আছে, পাইখানার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, তারা যাবেই যাবে। আমারও যে সামান্য দুর্বলতা হয়নি, সে কথা হলফ করে বলতে পারব না।

'বিশ্বেস করবে না, বাবা, তারা গ্রাম দেখে মুগ্ধ। আমি তো ট্রেনে পই পই করে গ্রামটাকে যতদূর সম্ভব কালো করে এঁকে-ছিলুম, তাদের শক্‌টা যেন বড্ড বেশি কঠোর কঠিন না হয়। তারা গাইলে উল্টো গান। ই'দারা থেকে জল তুললো হৈ-হৈ করে—মাদ্রাজে কলের জল বন্ধ হলে এরাই 'দি হিন্দু' কাগজে কড়া কড়া চিঠি লিখত—, মেয়েটা দেখি, ছোট ছোট ইট নিয়ে বাস্তুভিটের গর্তগুলো বন্ধ করছে, গৃহিণী শুকনো তুলসীতলায় অনবরত জল ঢালছেন।

বড় আরাম পেলুম। গৃহিণীর কথা বাদ দাও, তিনি সতী-সাধ্বী, কিন্তু আমার 'মডার্ন' ছেলেমেয়েরাও যে আমার চতুর্দশ পুরুষের ভিটেকে তাচ্ছিল্য করল না, তাই দেখে আমার চোখে জল ভরে এল।

'আমার ছেলেবেলায় যারাই গ্রাম থেকে চলে যেত, তারা আর ফিরে আসত না। আমার বাবা তাই আমাকে কতবার বলেছেন, তার ঠিক নেই, 'বেনুগোপাল, দেশের ভিটে-মাটি অবহেলা করিস নি, আর যা কর, কর।'

'চাকরীর ধান্দায় আমি তাঁর সে আদেশ পালন করতে পারিনি। এখন দেখি, আমার ছেলেমেয়েরা তাঁর সে আদেশ পালন করছে। বসে বসে প্ল্যান কষছে, কোথায় রজনীগন্ধা ফোটাবে, কোথায় পাঁচিল তুলবে, কোথায় নাইট স্কুল খুলবে। আমার গৃহিণী সার্থক গর্ভধারিণী।'

বৃদ্ধ অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলেন। আমি আরো বেশি চুপ। বললেন, 'এর পর আর বলার কিছু নেই, তাই সংক্ষেপে বলি। মাত্র দুদিন কেটেছে; তিন দিনের দিন সকাল বেলা মেয়েটার কলেরা হল, ঘণ্টা-খানেকের ভিতর ছেলে দুটোরোও। লোক ছুটিয়ে মাদ্রাজে তার করলুম। আরো লোক ছুটলো এখানে-সেখানে ডাক্তার-বদ্যির সন্ধানে। দশ ঘণ্টার ভিতরে তিনজনই চলে গেল। গৃহিণীর চোখের সামনে।

'তিনি গেলেন তার পর দিন। কলেরায় না অন্য কিছুতে বলতে পারিনে। আমি তখন সম্বিতে ছিলুম না।'

আমি ক্ষীণকণ্ঠে বললুম, 'থাক আর না।'

আমার আপত্তি যেন শুনতে পাননি। বললেন, 'মাদ্রাজে ফিরে আসার কয়েকদিন পরে আমার ব্যাঙ্কার আমার স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা কইতে চাইলে—সে জানতো আমাদের টাকা-পয়সার বিষয় আমি কিছুই জানিনে। তার কাছ থেকে শুনলুম, গৃহিণী ভালো ভালো শেয়ার কিনে লাখ তিনেকের মত জমিয়েছিলেন।

তাই বেরিয়ে পড়েছি। টমাস কুক যেখানে নিয়ে যায়, সেখানেই যাই।

'ওদের ছবি দেখবে? চলো, ঘরের ভিতর যাই।'

সেঁজুতি

বটকৃষ্ণ দে

সেঁজুতি, তোমার নামে কোনোখানে রাত্রি ভোর হয়
ভৈরবীর সুরে; আহা, পাখীদের ডাকার সময়
কার কথা মনে হয়, জানো কার?—বলো না, সেঁজুতি,
কার সে-চোখের স্বপ্নে আমার সমস্ত অনুভূতি
সমুদ্রের মত ব্যস্ত, উন্মুখর আকুল আকূতি
তোলে! সূর্য-ঝিকিমিকি সে-ভোরের বিভোর বিস্ময়ঃ
কুয়াশার কাশবন শিশুরে খেয়ালে ঝাঁকি দিলে,
ঝুরু-ঝুরু যুঁই ফুলে তোমারি মতোন মুখ মিলে।

সেঁজুতি, তোমার দীপে দিনান্তের সন্ধ্যার সন্ধান
শুরু হয় জীবনের। সারাদিন কাজের সাগরে
মনের মুক্তোর কথা ভুলে গিয়ে বিকেলে যখুনি
ঝিনুকের সংখ্যা গুণি, তখনই তোমার নামে গান
সূর্যাস্ত-গগন ভরে, সমুদ্র-ঢেউএর কলস্বরে
একটি তারার চোখ মনে পড়ে, তারই সুর শুনি।

চক্রদত্ত

১৯৫১ সালে জগতে যে সব নূতন নূতন আবিষ্কার হয়েছে ন্যাশন্যাল জিও-গ্রাফিক সোসাইটী" তার একটা হিসার দিয়েছে। ইরাণের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রস্তর যুগের তিনটি মানুষের হাড় মাটীর নীচ থেকে পাওয়া গেছে। এঁরা আন্দাজ করেন যে, প্রায় ৭৫ হাজার বছর আগে এ গুলির অস্তিত্ব ছিল। আজ পর্যন্ত পুরাকালের যে সব মানুষের হিসাব-নিকাশ পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে এই তিনটিই বোধহয় প্রাচীনতম। ইরাকের কোনও এক স্থানে "জার্ম্মো" নামে সাত হাজার বছরের পুরাতন একটি শহর খুঁড়ে বার করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত যত পুরান শহরের তল্লাস পাওয়া গেছে তার মধ্যে এইটিই সবচেয়ে পুরান। সুমেরু এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে বৈজ্ঞানিকরা সমুদ্রের তলদেশে ১১০০০ ফিট উঁচু একটি পাহাড়ের সন্ধান পেয়েছেন। পৃথিবী পর্যটনকারী ড্যানিশ জাহাজ "গ্যালাটীয়া" সমুদ্রের ছয় মাইল তলায় প্রাণীর অস্তিত্বের খবর পেয়েছে। একদল ফরাসী আবি-ষ্কারক মাটীর তলদেশে নামবার রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। এরা স্পেনের কাছে ১৫২০ ফুট নীচু একটি গুহার মধ্যে নেমেছেন। এর তলায় এরা এতবড় একটী ঘর দেখতে পান যে, তাদের মনে হয় প্যারী নগরীর নোটেরড্যাম চার্চের মত দুটি গীর্জা অনায়াসে ধরে যেতে পারে। নীল নদের ধারে কয়েকটি কবরের সন্ধান পেয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদরা আশান্বিত হয়েছেন যে, তারা হয়তো রাণী ক্লিয়োপেট্রা, যিনি খৃষ্টপূর্ব ৩০ শতাব্দীতে রাজত্ব করেছেন তার কবর আবিষ্কার করতে পারবেন। আফ্রিকার ট্যাঙ্গানিকা অঞ্চলে ডাইনোসরের একজোড়া প্রস্তরীভূত ডিম পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলে সর্ব প্রথম এই ধরণের ডিম পাওয়া গেল।

*

ভারত সরকার একটি ইংরাজ কোম্পানীর কাছে জোয়ার-ভাঁটা নির্ণয় করবার একটি যন্ত্র তৈরী করতে দিয়েছেন। এই যন্ত্রটিতে সবশুদ্ধ ৪২টি ডায়াল আছে। এটি তৈরী করতে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে সুয়েজ থেকে সিঙ্গাপুর, পাকিস্থানের বন্দর, সিংহল বর্মা, হুগলী-নদীর মোহানার সাগরদ্বীপ, খিদিরপুর, ডায়মন্ডহারবার ইত্যাদি বন্দর এবং পৃথিবীর অন্যান্য অনেক বন্দরের জোয়ার-ভাঁটার সময় নির্ণয় করা যায়। বর্তমানে এই যন্ত্রটি উইলিয়ম টমসন তৈরী করেছেন। এর আগে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের জন্য এই জাতীয় একটি যন্ত্র তৈরী করা হয়েছিল। একথা অবশ্য প্রায় সকলেরই জানা আছে যে, সমুদ্রে দিনের মধ্যে দুবার জোয়ার-ভাটা হয়। তবে এই জোয়ার-ভাঁটার সময়টা ঠিক-মত না জানা থাকায় অনেক সময় বড় বড় জাহাজগুলি ভাঁটার সময় চড়া বা নদীর মোহানা অঞ্চলে এসে পড়লে আটকে যায়। এই যন্ত্রটি ঐ জোয়ার-ভাঁটার যথাযথ সময় নির্দেশ করে এবং জোয়ার-ভাঁটার সময় জলের ওঠা নামার পরিমাপ করতে পারে।

*

তেলের খনি বা তেলের ট্যাঙ্কে আগুন লাগলে সহজে নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয় না। এখন একটি নতুন উপায়ে এই আগুনকে কয়েক মিনিট এমন কি কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়। ট্যাঙ্কের নীচের দিকে মৃদু বায়ুর চাপ দিয়ে তেলের মধ্যে প্রথমে একটু আলোড়ন আনা হয় ফলে নীচের দিকের ঠান্ডা তেল ওপরের দিকে উঠে আসে তখন ওপরের যে গরম বাষ্পটি আগুনটা জ্বালিয়ে রাখতে সাহায্য করে সেটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঠিক সেই সময় আগুন নেভাবার যন্ত্রের সাহায্যে কোনও ফেনা জাতীয় জিনিস এর ওপর ছড়িয়ে দিলেই আগুন নিভে যায়। এই ব্যবস্থায় অবশ্য কোনও রকম জটিল অথবা মূল্যবান যন্ত্রপাতির দরকার হয় না। ট্যাঙ্কের কাছে অন্যান্য কাজের জন্য বায়ুর আধ থাকে, সেই থেকেই পাইপ দিয়ে বা চালনা করা হয়। সেই সময় এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গার জন্য মাত্র ছয় পাউণ্ড পরিমাণ বাতাস পাঠান হয়। প্রায় এক লক্ষ গ্যালন কেরোসিনের ট্যাঙ্কে আগুন লাগিয়ে দিয়ে এই ব্যবস্থাটি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে যে, ঠিক পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে। পরে একটা অপরিস্রুত তেলের ট্যাঙ্কে আগুন দিয়ে দেখা গেছে যে ৪৫ সেকেণ্ডের মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে।

*

"ক্রেবিওজেন" ক্যান্সার রোগের একটি নূতন ওষুধ। ডাঃ ষ্টিভেন নামে একজন যুগোশ্লাভ বৈজ্ঞানিক এই ওষুধটি আবিষ্কার করেন। যেসব ক্যান্সার রোগীর রোগ খুব বেশি রকম বেড়ে গেছে, তাদের ওপরও এই ওষুধ প্রয়োগ করার পর বেশ সুফল পাওয়া গেছে। পরীক্ষামূলক-ভাবে বাইশটি রোগীকে এই ওষুধ প্রয়োগ করা হয় এবং আঠার মাস পরেও দেখা গেছে, এদের মধ্যে চৌদ্দটি বেঁচে আছে। আর দুজনের রোগের কোনও চিহ্নমাত্র নেই, আরও দুজনের রোগের বৃদ্ধিটা চাপা পড়ে যায়। অবশ্য ডাক্তারদের মতে এই ওষুধে ক্যান্সার রোগ যে সম্পূর্ণ নিরাময় হতে পারে, একথা এখনও নিশ্চিত করে বলা যায় না। এই ওষুধটি ঘোড়ার রক্তের সেরাম থেকে তৈরি হয়, এটি দেখতে সাদা পাউডারের মত। ক্রেবিওজেনের আবিষ্কারক, এর প্রস্তুতপ্রণালী ডাক্তারদের কাছে প্রকাশ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

১২
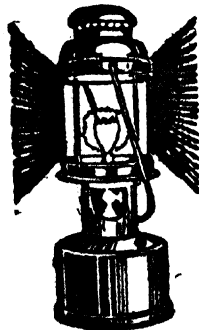
উনানে ডাল চড়িয়ে দিয়ে বঁটি পেতে আলু কুটতে বসেছিলেন বাসন্তী, ছোট মত একটা ইস্ত্রী হাতে প্রীতি এসে ঘরে ঢুকল, 'মা কড়াটা একটু নামাবে? আমি ইস্ত্রীটা একবার গরম করে নিয়েই চলে যাব।'

বাসন্তী বিরক্তির ভঙ্গিতে বললেন, 'ইস্ত্রী গরম করার তোমাদের আর সময় অসময় নেই বাপু। এখন তোমাদের ইস্ত্রী গরম করতে বসলে আমি অফিসের রান্না নামাব কখন? রান্না-টান্না হয়ে গেলে তারপরে এসো।'

প্রীতি কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাসন্তী আবার বললেন, 'কেন, কার জামা ইস্ত্রী করবি, অরুণের? কাল না লণ্ড্রী থেকে তার জামা-কাপড় এসেছে?'

প্রীতি বলল, 'না, তার না, বিজুদার জামাটা একটু টেনে দিতে হবে মা। সে আবার এই প'রে কলেজে বেরোবে। তাদের কি একটা ফাংসনও নাকি আছে বিকেলে।'

পশ্চিম দিকের উননের কাছে কনকলতাও রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, নিজের বড় ছেলের নামের উল্লেখে মুখ তুলে বললেন, 'তার ফাংসন তো মাসের মধ্যে তের দিন লেগে আছে। নবাব! নিজের জামাটা নিজে ইস্ত্রী করে নিতে পারে না বুঝি। আবার তোকে পাঠিয়েছে। আয় আমার এখান থেকে গরম করে নিয়ে যা তোর ইস্ত্রী।'

বলে নিজের কড়াটা কনকলতা নামাতে যাচ্ছিলেন, বাসন্তী বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক থাক, এখান থেকে নিয়েই যা। ওর বিজুদা যখন বলেছে তখন কি আর জামা ইস্ত্রী না করে দিয়ে রক্ষে আছে প্রীতির?'

হেসে এবার ডালের কড়াটা নামিয়ে ইস্ত্রীটা মেয়েকে গরম করতে দিলেন বাসন্তী।

কনকলতাও হাসলেন, 'যা বলেছ, বিজুর মুখের কথাটি ফেলবার জো নেই। বোন একটি পেয়েছে বটে।'

বাসন্তী বললেন, 'দাদার দাদা, মাস্টারে মাস্টার। হুকুম মানবে না কেন।'

প্রীতিও মার দিকে চেয়ে হাসল, 'আহা।'

তারপর ইস্ত্রী গরম করে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাসন্তী কড়াটা উনানের ওপর তুলে দিয়ে ফের তরকারী কুটতে লাগলেন।

দুটিতে খুব ভাব। তাঁর মেয়ে আর দাদার ছেলের এই ঘনিষ্ঠতা দেখে নিজেদের কৈশোর যৌবনের কথা মনে পড়ে যায় বাসন্তীর। তখন তিনিও ছিলেন দাদা-অন্ত প্রাণ। মায়ের হাতের পরিচর্যার চেয়ে বোনের পরিচর্যায় বৈদ্যনাথ প্রসন্ন হতেন বেশি, বাসন্তীও এমনি দাদার জামায় বোতাম পরিয়ে দিতেন, বেরোবার সময় রুমাল দিতেন পকেটে গুঁজে। বইয়ের সেলফ্, টেবিলের দেরাজ গুছাবার ভার ছিল বাসন্তীর ওপর। বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে কতদিন যে দুই ভাই-বোনে একজোট হয়েছেন তার ঠিক নেই। এখন সেই অন্তরঙ্গতার কথা ভাবাই যায় না। শুধু বিজু আর প্রীতিকে দেখলে তাঁর সেই সব দিনগুলির কথা মনে পড়ে। বিজুও নিজের ভাই-বোনের চেয়ে প্রীতিকে বেশি ভালোবাসে, বেশি পছন্দ করে। ওর পছন্দমত টুক-টাক সৌখীন জিনিসপত্র কিনে দেয়, পাড়ার লাইব্রেরী থেকে, কলেজের লাইব্রেরী থেকে ওর জন্যে গল্পের বই জোগাড় করে আনে। বিজু ভারী ভালোবাসে প্রীতিকে। প্রীতিও তেমনি নিজের দাদাদের চেয়ে মামাত ভাই বিজুর ওপরই তার পক্ষপাতিত্ব বেশি। বিজুর জামাটা কোথায় ছিঁড়ে গেল, গেঞ্জিটা কখন ময়লা হোল সেদিকে প্রীতির যেমন নজর বাড়ির আর কারোর তেমন নয়। ওদের ব্যবহার, ওদের ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় না তাঁরা আলাদা হয়ে আছেন। দাদার সঙ্গে বাসন্তীর যখন ঝগড়া লাগে, তখন বিজু আর প্রীতির মুখের দিকে যেন তাকানো যায় না। বেশ বোঝা যায়, ওরা বিব্রত বোধ করছে, ভারী কষ্ট পাচ্ছে। ওরা এসব ঝগড়া-ঝাটি বিবাদ-বিরোধ চায় না। ঝগড়া লাগলেই প্রীতি এসে মাকে বুঝায়। বিজু নিজের মাকে থামাতে চেষ্টা করে। ঝগড়ার সময় ওদের এই শালিসীপণায় বাসন্তী খুবই বিরক্ত হন। কিন্তু অন্য সময় ওদের এই স্নেহ-ভালোবাসা তিনি খুব উপভোগ করেন। দুজনেরই স্বভাবের মধ্যে মিল আছে। দুজনেই শান্ত, শান্তিপ্রিয়। বইপত্র ভালোবাসে, গান-বাজনার দিকে ঝোঁক আছে।

বিজু অনেকদিন বলেছে, 'পিসিমা, প্রীতিকে একটা গানের স্কুলে ভর্তি করে দিন। ওর চমৎকার গলা।'

বাসন্তী বলেছেন, 'তোমাদের বোন তোমরা দিলেই পারো।'

প্রীতি প্রতিবাদ করেছে, 'হুঁ, গানের স্কুল না আরো কিছু। আসলে নিজেরই ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা, বুঝলে মা। মামার ভয়ে পেরে ওঠে না। আমি তোমার হয়ে মামার কাছে একটু ওকালতি করব নাকি বিজুদা।'

বিজু বলেছিল, 'ওরে বাবা, তাহলে কি রক্ষা আছে?'

বাবাকে ভারী ভয় করে বিজু। তাঁর পছন্দ অপছন্দ সব সময় মেনে চলে। ওর নিজের ইচ্ছা ছিল আর্টস পড়ার। কিন্তু বৈদ্যনাথ ওকে জোর করে কমার্স ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর এক ব্যাংকার বন্ধু ভরসা দিয়ে বলেছেন, বি-কম পাশ করলেই তিনি ভালো মাইনেয় বিজুকে তাঁর ব্যাংকে নিয়ে নেবেন। আর্টস পড়ে কি হবে। তাতে কি আজকাল কোন চাকরি-বাকরি মেলে। কমার্সটা বিজুর কাছে ভারি নীরস লাগছে। তবু বাবার কথা অমান্য করতে পারেনি। আড়ালে আবডালে পিসীমা আর পিসতুত বোনের কাছে তাই নিয়ে বিজু আক্ষেপ-অভিযোগ করে।

বাসন্তী তাকে ভরসা দিয়ে বলেন, 'মন দিয়ে পড়লেই পাস করে যাবি। অত ভয় পাচ্ছিস কেন।'

বিজু বলে, 'উৎসাহই পাচ্ছিনে পিসীমা, সেইটাই আসল কথা। না হলে ভয় আমি পাইনে।'

প্রীতি ঠাট্টার সুরে বলে, 'না ভয় আবার পান না। বিজুদার মত এমন জন্মভীরু মানুষ আমি আর দুটি দেখিনি মা।'

কি ভেবে প্রীতি যে এমন ঠাট্টা করে, বোঝা যায় না। বাসন্তী তা বুঝতে চেষ্টাও করেন না। দু'জনের এই ছদ্ম কলহ বেশ উপভোগ করেন। তাঁর আর বৈদ্যনাথের মধ্যেও আগেকার দিনে এমন লোক দেখানো ঝগড়া হোত। আজকালকার ঝগড়াগুলি লোক দেখানো নয়, তবু লোকে দেখে। সেই দিন আর নেই। কিন্তু বিজু আর প্রীতির দিকে তাকালে সেই সব দিনের যেন খানিকটা আভাস মেলে। মামা মামী আর মামাত ভাই-বোনের ওপর প্রীতির পক্ষপাতিত্ব তাই বাসন্তী উপভোগ করেন। কারণ তাঁদের দিকে বিজুর পক্ষপাতও তো কম নয়। নিজের ছেলেদের হাজার অনুরোধ করলেও যা না করাতে পারেন, মুখের কথাটি বললে বিজু তৎক্ষণাৎ তা করে দেয়। এমন ধীর, স্থির, ভদ্রস্বভাবের ছেলে আজকাল বড় একটা হয় না।

সার্টটা কড়া ইস্ত্রী করে প্রীতি বিজুদের দোতলার ঘরে গিয়ে বলল, 'দেখ পছন্দমত হয়েছে নাকি? তোমাদের ফ্রেন্ডস লন্ড্রীর চেয়ে ভালো ছাড়া খারাপ হয়নি, এটুকু বাজি রেখে বলতে পারি।'

বিজু মেঝের ওপর আয়নার সামনে বসে সেফ্‌টি রেজরে দাড়ি কামাচ্ছিল, প্রীতির কথায় তার দিকে ফিরে তাকাল, 'খুব যে আত্মবিশ্বাস দেখছি।'

প্রীতি বলল, 'বাঃ রে এটুকু বিশ্বাসও থাকবে না।'

বিজয় বলল, 'থাকলেই ভালো। কিন্তু ক' জায়গায় পুড়িয়েছ তাই বলো।'

প্রীতি ছদ্ম কোপের ভঙ্গিতে বলল, 'অমন করলে কিন্তু সত্যি সত্যিই একদিন পোড়াব। বুঝবে মজা।'

বিজু ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'এই ওসব কি হচ্ছে। আমি কেবল গুরুজন না, গুরুও। আমার কৃপায় সেবার ম্যাট্রিকুলেশনটা তরে গেছ। মন দিয়ে পড়াশুনো করলে ইণ্টারমিডিয়েটটাও আমিই তরাব। আমাকে অমন অশ্রদ্ধা করলে নিজেই পস্তাবে।'

কিছুদিন চুপ-চাপ থেকে বিজুর উদ্যোগেই ফের পড়াশুনো আরম্ভ করেছে প্রীতি। বাবার অমতে কলেজে ভর্তি হতে পারেনি। বাড়িতে থেকেই প্রাইভেটে আই এ দেওয়ার জন্যে তৈরী হচ্ছে। কিছু জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করতে হলে বিজুর কাছে এসেই করে। বিজু প্রীতির নিজের দাদা অরুণের মত কথায় কথায় মুখ-ঝামটা দেয় না। খুব ধৈর্যের সঙ্গে পড়ায়, পড়া বুঝিয়ে দেয়।

এই অধ্যয়ন অধ্যাপনাটা বৈদ্যনাথ বেশি পছন্দ করেন না। চোখে পড়লেই ছেলেকে ধমক দিয়ে বলেন, 'তুই তোর নিজের পড়া পড় বিজু। পরীক্ষার কয়েকটা মাস তোর আর পণ্ডিতী না করলেও চলবে।'

বাপের মুখের ওপর বিজু কোন জবাব দেয় না। প্রীতির মুখের দিকে তাকিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মিট-মিট করে হাসে। কিন্তু মামার ভয়ে প্রীতি আর বেশি দেরি করে না। সঙ্গে সঙ্গে বইপত্র নিয়ে উঠে যায়। পারতপক্ষে মামার সাক্ষাতে বিজুর কাছে পড়া জিজ্ঞাসা করতে আসে না। বৈদ্যনাথ যখন বাড়ি থাকেন না, যখন তাঁর হঠাৎ এসে পড়বার আশংকা থাকে না, তখন যায়। বিজুও এই গোপনীয়তাটুকু পছন্দ করে। সাধ্যমত বাবাকে এড়িয়েই চলতে চায়।

গালে সেফ্‌টি রেজর বুলাতে বুলাতে বিজু বলল, 'আজকের ফাংসনটা সত্যিই কিন্তু খুব ভালো হবে। নাম-করা আর্টিস্টরা আসবেন। চমৎকার সব গান-বাজনার আয়োজন হবে।'

প্রীতি মুখ-ভার করে বলল, 'ভালো হলেই বা আমার কি। বেল পাকলে কাকের কি লাভ।'

বিজু হেসে বলল, 'ঈস্, খুব যে আফসোস দেখছি। চেহারার দিক থেকে অবশ্য পাকা বেল বললে লোকে তোমাকেই বলবে, আর আমাকে দাঁড়কাক।'

প্রীতি বিজুর দিকে তাকাল, 'থাক থাক, আর ফাজলামো করতে হবে না। আমাকে দিয়ে জুতো পালিশ আর জামা ইস্ত্রীই করিয়ে নিলে। একদিন যে গান-টান শোনাতে নেবে, তার নামে দেখা নেই।'

বিজু চুপ করে রইল। প্রীতির আবদারটি বড় সহজ নয়। মেয়েদের সম্বন্ধে তাদের বাড়িতে রক্ষণশীলতা বড় বেশি। এ বাড়ির মেয়েরা বাড়ির ছাদে কিংবা উঠানে দাঁড়িয়ে চন্দ্র-সূর্যের মুখ হয়তো দেখে, কিন্তু বাড়ির বাইরে যাওয়ার নিয়ম কারোরই নেই। তাতে অন্য পুরুষের মুখ দেখবার আশংকা আছে। বিজুর কিংবা অরুণ-অতুলের বন্ধুরা কেউ ভিতরে ঢুকতে পায় না। বাইরের বসবার ঘর পর্যন্ত তাদের গণ্ডী। সিনেমা-থিয়েটার সম্বন্ধেও খুব কড়া বিধি-নিষেধ। বছরে একবার কি দু'বার বাবা-কাকার সঙ্গে তারা সিনেমা দেখে আসতে পারে। এ সম্বন্ধে ভুবনময়ীর কড়াকড়ি সবচেয়ে বেশি। মেয়েদের কোন রকম প্রগলভতা তিনি সহ্য করতে পারেন না। একটু বেচাল দেখলেই রাগ করেন, গালমন্দ করেন। আর তার পরেই বৈদ্যনাথ। এসব ব্যাপারে মায়ের বিধি-নিষেধ, আদেশ-নির্দেশ পালনে বৈদ্যনাথের উৎসাহ বেশি। যে সব মেয়েলি আচার-আচরণের সঙ্গত কারণ ভুবনময়ী বলতে পারেন না, শুধু 'ওটা দোষ', 'ওতে গেরস্থের অমঙ্গল হয়' বলে নাতিনাতনীদের নিরস্ত করার চেষ্টা করেন, বৈদ্যনাথ সেগুলিকে যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠা না করে ছাড়েন না। তাঁর মতে আগেকার আচার-আচরণ ছড়া-প্রবচনের কিছুই নিরর্থক নয়। প্রায় প্রত্যেকটির পিছনে সমাজ রক্ষার গভীর উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলির প্রয়োজন এখনো শেষ হয়নি। অল্প-স্বল্প সংস্কার করে নিয়ে সেগুলিকে আজও কাজে লাগানো যায়, কাজে লাগাতে হয়। কারণ ভারতীয় সমাজের কাঠামো আসলে বদলায়নি। জীবনযাত্রার আদর্শ মূলতঃ ঠিকই আছে। এ সম্বন্ধে সময় পেলেই কোন রকম কোন উপলক্ষ পেলেই ছেলে মেয়ে ভাগ্নে ভাগ্নীদের ডেকে বৈদ্যনাথ উপদেশ দেন। তিনি বলেন, 'গোড়া থেকেই সংযম দিয়ে জীবনকে বাঁধতে হয়। যে নিয়মই মান না কেন, নীতি-নিয়মের বন্ধন তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। একটু শিথিল হলে আর রক্ষা নেই। প্রকৃতি কোন শৈথিল্যকে ক্ষমা করে না, অনিয়মকে সহ্য করে না। সে একদিন না একদিন শোধ নেয়।'

সব সময় যে বৈদ্যনাথ নিজের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে বলতে পারেন তা নয়। অনেক পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করেন। মনে হয় যেন মুখস্থ বলছেন। অরুণ মামার এই দার্শনিকতায় আড়ালে গিয়ে হাসে। কিন্তু বিজু হাসে না। পুরনোই হোক আর যাই হোক, মতের সঙ্গে মিলুক আর না মিলুক, বৈদ্যনাথের জীবন-দর্শন স্পষ্ট। বিশ্বাসের

জিং খুব দৃঢ়। সব বিষয়েই তাঁর একটা স্পষ্ট মতামত আছে। ভালো-মন্দ কোন-কিছু সম্বন্ধেই সংশয়-সন্দেহের ধার ধারেন না বৈদ্যনাথ।

বিজুকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রীতি বলল, 'তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বলছিনে। তোমাদের ফাংসনে তুমি একাই যেয়ো।'

বিজু বলল, 'দেখা যাক।'

সন্ধ্যার দিকে বাসন্তীর কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করে বসল বিজু, 'প্রীতি আমার সঙ্গে একটু যাবে পিসীমা?'

বাসন্তী বললেন, 'ওমা, ও আবার কোথায় যাবে এই রাত্রে।'

বিজু বলল, 'রাত বেশি হবে না। সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যেই আমরা ফিবে আসব।'

বাসন্তী বললেন, 'বিষয়টা কি?'

বিষয়টা আর কিছুই নয়, রঙমহলে তাদের মিলনী সঙ্ঘের উদ্যোগে একটা চ্যারিটি শো'এর ব্যবস্থা হয়েছে। সেই উপলক্ষে গান-বাজনার অনুষ্ঠান হবে। প্রীতি তো এসব খুব ভালোবাসে। তাই তাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চায় বিজু।

বাসন্তী বললেন, 'আমার তো কোন আপত্তি নেই। তোর পিসেমশাইও হয়তো তেমন কিছু বলবেন না। কিন্তু মা আর দাদার খুঁৎ-খুঁতির কথা তো জানিস।'

বিজু বলল, 'ওঁদের খুঁৎ-খুঁতির কি কোন মানে হয় পিসীমা? কত বাড়ির মেয়েরা আসবে সেখানে, ও তো আর একা যাচ্ছে না; এ সব জিনিস ও ভালোবাসে বলেই ওকে যেতে বলছি। আর কাউকে তো নিতে চাইছিনে।'

বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে অনিমাকে তার শ্বশুর এসে নিয়ে গেছেন। কিন্তু প্রীতির আরো দুই বোন আছে—ইলা নীলা, বিজুরও দুই বোন আছে—টুনু রুণু, তারাও এসে ঘিরে ধরল। প্রীতি যদি যায়, তারাই বা যেতে পারবে না কেন।

বিজু একটু বিরক্ত বোধ করে বলল, 'কিন্তু টিকেট যে মাত্র দু'খানা। আচ্ছা, তোদের আর একদিন নিয়ে যাব, তোরা আর একদিন যাস।'

প্রীতি বলল, 'তার দরকার নেই, তুমি টুনুকেই নিয়ে যাও বিজুদা।'

টুনু ষোল উৎরে সতেরয় পড়ছে। সে এই প্রস্তাবে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'ঈস আমি কেন যাব, যার জন্যে টিকিট আগে থেকেই কেটে রাখা হয়েছে, সেই যেতে পারবে।'

কনকলতা আর বাসন্তী দুজনে এসে ছেলেমেয়েদের বিবাদ মিটিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল বিজু সবাইকে একদিন সিনেমা দেখাবে। টিকেটের দাম দেবেন বাসন্তী।

মীমাংসার পর প্রীতি আর বিজু বেরুতে যাচ্ছে ভুবনময়ী দোরের পাশ থেকে বললেন, 'সেজেগুজে কোথায় যাওয়া হচ্ছে এই সন্ধ্যার সময়?'

প্রীতি বলল, 'এই একটু ঘুরে আসি দিদিমা।'

ভুবনময়ী রুক্ষকণ্ঠে বললেন, 'ঘুরে আসবার আর সময় পেলে না। এই সন্ধ্যার সময় ঘরের মেয়ে বেরুচ্ছেন হাওয়া খেতে। যা কোন জন্মে দেখিনি তাই। কেন ঘরে বসে দু'খানা বই পড়, কি সংসারের কাজ কর দু'খানা।'

বাসন্তী এগিয়ে এলেন, 'তুমি যদি সব সময় ওদের সঙ্গে খিট খিট কর তাহলে ওরা কি ভাবে বলতো মা। ওদেরও তো একটু সাধ আহ্লাদ আছে, ওদেরও তো দেখতে শুনতে ইচ্ছা করে। এই তো দেখবার শুনবার বয়স। তোমার মত তো ওরা বুড়ো হয়ে যায়নি।'

ভুবনময়ী রুষ্ট ভঙ্গিতে বললেন, 'বুঝতে পারছি। তোমাদের আস্কারাতেই এসব হচ্ছে। বেশ যেভাবে খুশি সেইভাবেই নিজেদের ছেলেমেয়েকে তোমরা গঠন কর? আমার কি, আমার কিছু বলতে আসাই অন্যায়।'

বাসন্তী আর কিছু বললেন না। কথায় কথা বাড়বে। মার আর দাদার এই অতিরিক্ত কড়াকড়ি তিনি পছন্দ করেন না। আজকাল-কার ছেলেমেয়েদের একটু স্বাধীনতা দেওয়া ভালো। আহা তাঁদের তুলনায় ওরা কতটুকুই বা দেখেশুনে, কতটুকুই বা আনন্দ আহ্লাদ করে? অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল বাসন্তীর। কিন্তু বিয়ের পর বহুদিন বাপমার কাছেই কেটেছে। খুব বড়লোক না হোক অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন বাবা। মেয়ের সাধ আকাঙ্ক্ষা মেটাতে তিনি কার্পণ্য করতেন না। সার্কাস, থিয়েটার সব সঙ্গে করে করে দেখাতেন। সেই তুলনায় তাঁর মেয়েরা তো কিছুই দেখতে শুনতে পায় না, কোন রকম আমোদ স্ফূর্তি করে না। অথচ এইতো সখ আহ্লাদের সময়। এর পর কোথায় কোন ঘরে পড়বে, রান্নাঘরে হাতাবেড়ী নিয়ে আটকে থাকবে সকাল থেকে রাত বারটা পর্যন্ত আর বেরুবার ফুরসুৎ পাবে না। তাঁদের মত খাঁচায় বন্দী হয়ে থাকবার দিন তো ওদের পড়েই আছে। সেই জেল হাজত ওদের কপালে এখনই কেন।

এই চার দেয়াল ঘেরা ছোট বাড়িটুকুর মধ্যে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন একভাবে কাটাতে বাসন্তীর নিজেরই যেন এক এক সময় দম বন্ধ হয়ে আসে। আর তাঁর মেয়েদের আসবে না? বাসন্তীর নিজেরই তো এক এক সময় সব ফেলে বেরুতে ইচ্ছা করে। কিন্তু পারেন কই। একটা না একটা বাধা লেগেই থাকে। বাপের বাড়ি যদি দূরে হোত, দু'দিন গিয়ে সেখানেও থাকতে পারতেন। কিন্তু নিজেদের বাড়ির মধ্যেই বাপের বাড়ি হওয়ায় তাঁর সে সুখও গেছে। কনকলতা বছরে একমাস দেড় মাস করে বাপের বাড়িতে কাটিয়ে আসে, জা সুরমা আরো বেশি থাকে কিন্তু বাসন্তীর আর কোথাও নড়া হয় না। তাঁর ছুটি নেই। ঝগড়া ঝাঁটি না থাকলে জামাই ষষ্ঠীর দিনে কি পুজোর মধ্যে একটি দিন দাদা তাঁদের খেতে বলেন, কিন্তু তাতে কি বাপের বাড়ি যাওয়ার সাধ মেটে? তাতে কি একদিনের জন্যেও আরাম বিশ্রাম পাওয়া যায়? বিশ্রাম তো দূরের কথা কনকলতা যখন বাপের বাড়ি যান দুটি সংসারের ভারই বাসন্তীর উপর পড়ে। কিন্তু ভার বহনে কষ্টই হয়, আগের মত আনন্দ আর মেলে না। রোজকার হিসাব রোজ বৈদ্যনাথকে বুঝিয়ে দিতে হয়, সব সময় আশঙ্কা থাকে কনকলতা ফিরে এসে তাঁর কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হবে, কি রকম জবাবদিহি করতে হবে তাঁর কাছে। তাই ভার নিয়েও শান্তি থাকে না বাসন্তীর মনে। অথচ চোখের ওপর মাকে খাটতে দেখে দাদাকে মেয়েলি কাজে হাত দিতে দেখে, ছেলেমেয়েগুলির অসুবিধা দেখে ভার না নিয়েও বাসন্তী পারেন না। ফলে মেজাজ আরও খিটখিটে হয়, কথাবার্তায় ঝাঁজ বাড়ে। বাসন্তীর মনে হয় এই সংসারের ভিতর থেকে একটু বেরুতে পারলে হোত। কিন্তু বেরুতে পারেন না। তাই মেয়েরা যখন এক আধ দিন বাইরে যাবার আবদার করে বাসন্তী বাধা দেন না, বরং সাহায্য করেন। ওদের আমোদ আহ্লাদের ভিতর দিয়ে নিজেও যেন খানিকটা আনন্দ বোধ করেন। ওদের বেরুনো যেন নিজেরই বেরুনো।

রাস্তায় নেমে প্রীতি বলল, 'দূর, আমার না আসাই ভালো ছিল। জনে জনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আসা। এভাবে আসতে কি ভালো লাগে?'

বিজু বলল, 'কেন, এইতো ভালো। এক আধটু বাধা বিপত্তি না ঠেলে আসতে পারলে মজা কিসের।'

প্রীতি বলল, 'তুমি আছ তোমার মজা নিয়ে। কেউ চোখ রাঙাবে, কারো চোখ টাটাবে আমার ভারি খারাপ লাগে। টুনিটা কি রকম বিশ্রী বিশ্রী সব কথা বললে শুনলে তো?'

বিজু বলল, 'বললই বা, ওদের কথায় কি এসে যায়। ওদের ফাঁকি দিয়ে তুমি একা একা বেড়াতে বেরোবে, গান শুনে নেবে আর ওরা টুঁ শব্দটি করবে না, তাই বা কি করে হয়?'

প্রীতি প্রতিবাদ করে বলল, 'ফাঁকি তো আমি ওদের দিতে চাইনি, দিলে তুমিই দিয়েছ। আর মিছামিছি বদনাম দিচ্ছ আমাকে।'

বিজু বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা, যত দোষ আমার। হোল তো। এবার সাবধানে বাসে ওঠো। দেখ দয়া করে এ্যাকসিডেণ্ট-টেণ্ট ঘটিয়ে বস না যেন।'

প্রীতি হেসে বলল, 'আহাহা, অতই আনাড়ি পেয়েছ বুঝি আমাকে।'

শ্যামবাজারগামী একটা বাস থামিয়ে প্রীতিকে নিয়ে ওঠে পড়ল বিজু। লেডীজ মার্কা একটা ছোট বেঞ্চে এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন। প্রীতিদের দেখে অপ্রসন্ন মুখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বিজু তাঁর জায়গা দখল করে প্রীতির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'ভদ্রলোকের মুখখানার ওপর একবার তাকিয়ে দেখ। যেন বিশ্ব সংসারের ওপর হাড়ে হাড়ে চটে গেছেন।'

প্রীতি লক্ষ্য করেছে বিজু অমনিতে বেশ একটু গম্ভীর আর শান্তশিষ্ট ধরণের ছেলে। কিন্তু দুজনে এক জায়গায় হলে তার স্বভাব যেন বদলে যায়। কথাবার্তায় কেমন একটু প্রগলভ চাপল্য আসে বিজুদার। এই তরলতা অবশ্য ভালোই লাগে প্রীতির। বিজু তার কাছে যা, টুনুদের কাছে ঠিক তা নয়, গুরুজনদের কাছে আবার ঠিক অন্যরকম। একজন মানুষেরই ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। একজন মানুষ ঠিক একজন নয়, অনেকজন ভেবে ভারি অদ্ভুত লাগল প্রীতির।

বিজুর কথার জবাবে গলা নামিয়ে বলল, 'তুমি তো ভারি নিষ্ঠুর বিজুদা। ভদ্রলোককে একে তো উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করেছ, তার ওপর ওঁকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা শুরু করলে? তোমার মনে মোটে মায়া মমতা নেই।'

বিজু বলল, 'তাই নাকি। আর তোমার মনে যত রাজ্যের মমতা এসে বাসা বেঁধেছে। ভদ্রলোক তোমার জন্যেই উঠতে বাধ্য হয়েছেন আমার জন্যে নয়। বেশ আমি উঠে যাচ্ছি। ভদ্রলোক এসে বসুন এখানে।'

বলে বিজু ছদ্ম রাগে উঠতে যাচ্ছিল, প্রীতি তাড়াতাড়ি ওর হাত চেপে ধরল, 'কি যা তা করছ। লোকে কি ভাবছে বলতো।'

সত্যি সে যে এক বাস লোকের মধ্যে বসে আছে তা যেন বিজুর খেয়াল ছিল না। নিজের চাপল্যে এবার একটু লজ্জিত হোল বিজু। তারপর শান্ত গভীরভাবে সামনের দিকে তাকাল।

বিডন স্ট্রীটের মোড় ছাড়িয়ে বাস দ্রুত শ্যামবাজারের দিকে এগিয়ে চলেছে।

(ক্রমশ)

অখিল বিশ্ব সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় "মিস্ ইণ্ডিয়া" নির্বাচন প্রসঙ্গে উদ্যোক্তারা ঘোষণা করিয়াছেন, যোগদানকারিণীদের পোষাক যেন জাতীয় হয়। খুড়ো বলিলেন—"তাতে হয়ত অনেকেরই আপত্তি হবে না, কিন্তু বিলিতি ধরণের হাসি আর ফরাসী ধরণের কাশি চলবে তো?"

* * *

পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনে সম্প্রতি বসন্ত-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্যামলাল মন্তব্য করিল—"ব্যবস্থা নিশ্চয়ই উত্তম, কিন্তু ভাবছি শেষ পর্যন্ত গাজন-

উৎসবের ব্যবস্থার জন্য রাজভবনটি কেউ চেয়ে বসলে আমাদের ভোলানাথ রাজ্যপালের পক্ষে সেটা বড়ই প্যাঁচে পড়ে যাওয়ার মতো হবে না কি?"

* * *

কলিকাতার শহরতলীতে অচিরেই কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল।—"তাই আমরা প্রভাতে মেঘ-ডম্বরু শুনছি"—মন্তব্য বলা বাহুল্য বিশু খুড়োর।

* * *

ফিলাডেল্‌ফিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে নাকি "কৃত্রিম হৃদয়" নির্মাণের পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"সত্য-মিথ্যা জানিনে. আমরা শুনেছি—এ কৃত্রিমতায় পাকিস্থান নাকি অনেক আগেই কারিগরী দেখিয়েছেন।"
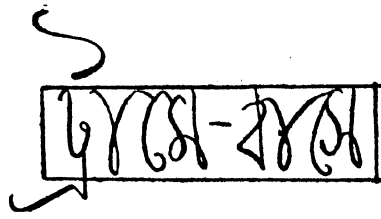
* * *

ভারতে পরিভ্রমণরত জার্মান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুইটি ছাত্র শ্রী নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া বলিয়াছেন—নেহরুর চোখ দুটি অতি চমৎকার। শ্যামলাল বলিল—"তবু ভালো যে তারিফ করেই তাঁরা থেমেছেন, গান ধরেন নি—একে ঐ সুর্মা-আঁকা, চাউনি বাঁকা, তায় ডাগর আঁখি............"

* * *

ম্যাডাগাস্কারে শুনিলাম, এক শ্রেণীর নরখাদক বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"সর্বসাধারণের নিরাপত্তার জন্য শ্রীযুক্ত মুন্সীর দপ্তর অতঃপর সচেতন থাকবেন বলেই আমরা আশা করি।"

* * *

ভূগোল-প্রখ্যাত মিঃ দোহা তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে আনসার বাহিনীকে এক সারগর্ভ (সিন্ধুর সঙ্গে এ

সারের যোগাযোগ নাই) উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন, তারা শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য যেন সর্বদা চক্ষু উন্মীলন করিয়া থাকে। —"দোহার আনসাররা তাই দোহা ধরেছেন—নয়ন যদিন রইবে বেঁচে তোমার পানে চাইবো গো"—বলেন সহযাত্রীদের একজন।

* * *

কলিকাতায় তৈলের দর আশাতীত-রূপে হ্রাস পাইয়াছে। —"সুতরাং অতঃপর নাসিকা প্রদেশের ঢক্কানিনাদে আর

কোন প্রতিবন্ধক রইল না"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

রাশ্যাতে "টারজান্" নাকি খুব জনপ্রিয় হইয়াছে। —"আমাদের কাছে 'মেরি জান্'-ই ভালো"—মন্তব্য করিয়া একটি ষোল সতের বছরের ছেলে ট্রাম হইতে নামিয়া গেল।

* * *

এবার হোলিতে পুলিশ কমিশনার বড় বড় রাস্তায় রঙ্ খেলিতে নিষেধ করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"আগামী বৎসরে আশা করি পচা টমাটো আর কালি-ঝুলি খেলাটাও নিষিদ্ধ হবে।"

* * *

একটি সংবাদে জানা গেল, নিউ-দিল্লীতে নাকি সম্প্রতি খুব শিয়ালের উৎপাত চলিতেছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"তাদের মধ্যে লাঙ্গুলহীন শেয়াল ক'টি তা নিশ্চয়ই সংবাদে বলা হয়নি!!"

চিত্রপ্রদর্শনী

শিল্পী অবনী সেন

শিল্পী অবনী সেন বাঙলার শিল্প-জগতে সুপরিচিত। প্রায় তিরাশিটি রচনা নিয়ে তাঁর, শিল্পের একটি একক প্রদর্শনী গত ১১ই মার্চ থেকে কোলকাতায় শুরু হয়েছে।

অবনী সেনের শিল্পী-জীবনের প্রথম যুগের রচনার সঙ্গে যারা পরিচিত তারা এই প্রদর্শনী দেখে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী ও আঙ্গিকগত রূপান্তরে নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন। সেদিনের অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি; রেখার পরিমিত ও সযত্ন প্রয়োগ ও অনুগ্র বর্ণের কোমল ব্যবহারের কোন চিহ্নই এই আধুনিক সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করা গেলো না। একান্ত বিভিন্ন একটা চঞ্চল ও ধাবমান দৃষ্টিভঙ্গী শুধু যে দ্রুত তুলি চালনার মধ্যেই স্পষ্ট হয়েছে তা নয়, অধিকাংশ চিত্রই অপরিমিত বর্ণ ব্যবহারের বাহুল্যে বিহ্বল, মাত্রাহীন রেখার প্রাচুর্যে কোলাহল-মুখর।

এই আধুনিক রচনার দৃষ্টান্তের পর একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শিল্পীর মন স্থাণু নয়, তা জীবন্ত ও গতিশীল। অনেক শিল্পীই তাদের শিল্পীজীবনের শুরুতে দৃষ্টিকোণের বিশিষ্টতায় একটা নতুন রূপ রহস্যের সৃষ্টি করেন এবং সেই সূত্র ধরে কাজ করতে করতে মানসিক সচলতার অভাবে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই সেই একদা আবিষ্কৃত কেন্দ্র ধরে অবিরত পরিক্রমা করতে থাকেন। সেই গণ্ডি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে নতুন পথ নির্বাচনের সামর্থ্য ও প্রতিভা যে সব শিল্পীর থাকে তাদের মন যে নিঃসংশয়েই জাগ্রত একথা স্বীকার করতে হবে। এই দিক থেকে অবনী সেনের মন জাগ্রত ও দৃষ্টিভঙ্গী বিবর্তনশীল একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু আমাদের দেশের আধুনিক শিল্পে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, বিবর্তনশীলতাও অনেক সময়ে প্রতারণামূলক ছদ্মবেশী অনুকরণশীলতা মাত্র। অর্থাৎ অনেক শিল্পীই আধুনিক বলে পরিচিত হবার দুর্জয় মোহ ও প্রলোভনে স্বধর্মত্যাগী হতে দ্বিধাগ্রস্ত হন। সুতরাং তাদের রচনায় বিভিন্ন অবস্থায় ও সময়ে যে রূপান্তর দেখা যায়, তা স্বকীয় উপলব্ধি থেকে উৎসারিত নতুন রূপবিকাশ নয়, তা একান্তভাবেই অপরের ধনে মরুব্বিয়ানা মাত্র।

অতি আধুনিকতার এই সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে যে অবনী সেন মুক্ত একথা আমাদের প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে। এবং সেই দিক থেকেই তার দৃষ্টিভ[ঙ্গীর] রূপান্তর আশাজনক। রেখা রচনার চারুতা তার প্রথম জীবনের রচনায় এ[...] স্পর্শাতুর আবেদন দিয়েছিলো তার পরি[...] আজ চিত্রপট চঞ্চল তুলির বলিষ্ঠ সম্প[...] উদ্ভাসিত। বস্তুত এ প্রদর্শনীর অধিক[...] রচনাতেই তার তুলি চালনার আশ্চর্য দ[...]

মন্ত্রণা সভা

...নীয়। তার ফলে চিত্রবস্তুতে পেলব ...র পরিবর্তে একটা দৃঢ় কাঠিন্য, ... কোমলতার পরিবর্তে এক রুক্ষ ... মূর্ত হয়ে উঠেছে। কয়েকটি ... যেমন ঘোড়া (৩১) মহিষ (৫৭) ... ছবিতে তুলি সম্পাত প্রচ্ছন্ন চীনা ...লী আশ্রয়ী কিন্তু তা সত্ত্বেও চীনা ...পীর মতো সুদূর স্পর্শাতীত মোহ ...নের পরিবর্তে একটা দুরন্ত ও দুর্মর ...তা এই শিল্পে একটা স্বতন্ত্র আব...ওয়া ও আবেদনের স্পর্শ এনেছে। এই ...তু জগতকে শিল্পী একটা চঞ্চল ও দ্রুত দৃষ্টির আলোকে দেখেছেন, সেই চলমান দৃষ্টির সম্মুখে অনেক অনাবশ্যক সূক্ষ্মতাই ...র্হিত হয়েছে। সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখা শিল্পীর এই রূপজগত তাই অনেক ...কের কাছেই অসম্পূর্ণ ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ...লে মনে হবে। কিন্তু শিল্পের মধ্যে আমরা ... তথাকথিত সৌন্দর্যের প্রত্যাশা করি, যা রেখার সূক্ষ্মতায় রঙের যথাযথ সন্নিবেশে ...নে শিল্পী সেই সৌন্দর্য প্রত্যাশী নন। ... প্রকৃতি ও বস্তুজগতের মধ্যে বলিষ্ঠ প্রাণের আবিষ্কারই শিল্পীর চরমতম লক্ষ্য ...ং শিল্পীর কাছে সেই প্রাণই সৌন্দর্য-নিয়ামক।

তুলির দক্ষতা শিল্পীর অবিসংবাদিত ...ও রঙের ব্যবহার অধিকাংশস্থলেই ...থিল এবং সময়ে সময়ে একান্ত দৃষ্টি-...কটু মনে হয়েছে। যে দক্ষতা শিল্পীর তুলি চালনায় লক্ষ্য করা গিয়েছে সেই সামর্থ্য বর্ণপ্রয়োগের মধ্যে লক্ষ্য করা গেলো না। ছবিতে প্রাণসঞ্চারের ও বস্তুর রূপকে প্রকাশ্য ও স্পষ্টতর করে তোলবার অন্যতম উপাদান হলো রঙ। এ ছাড়াও রঙ ব্যবহারের আর একটা গভীরতর উদ্দেশ্য হ'লো দর্শকের মনে রঙের নিজস্ব গুণে মোহ বিস্তার করা। শিল্পী রঙ ব্যবহারের মধ্যে এমন কোন বিশিষ্ট কৌশল অবলম্বন করতে পারেননি যা দর্শকের চোখকে একটা বিশিষ্ট রসে আবিষ্ট করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণ ব্যবহার একান্ত প্রাথমিক যা বস্তুর বর্ণবিন্যাসের অত্যন্ত প্রাথমিক রূপ-পরিচয় উদ্ঘাটিত করে। তারপর কয়েকটি চিত্রে শিল্পী পশ্চাৎপটে অথবা সম্মুখপটে মাঝে মাঝে এমন একটি রঙের নিরঙ্কুশ বিস্তার করেছেন যা শুধু ছবির কম্পো-জিসনকে ভারাক্রান্ত করেনি দৃষ্টিতেও একটা অসহ অস্বস্তির সৃষ্টি করেছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে 'উইথ হার বেবী (৬) এবং ডারলিং (৩৮)' নামে ছবি দুইটির উল্লেখ করা যেতে পারে। দুটি ছবিতেই সবুজ রঙের অনাবশ্যক ব্যবহার দৃষ্টির দিক থেকে কী অস্বস্তিকর! সে (২৭) নামে ছবিটি নিঃসংশয়েই হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু পশ্চাৎপটের রঙের ব্যবহার ছবির সে মাধুর্য একান্তভাবেই নষ্ট করেছে।

বস্তুতঃ একটা অপরিণত বর্ণাধিক্য অধিকাংশ ছবিকেই আবেদনের দিক থেকে দুর্বল করেছে। একটা জটিলতাহীন ও সরল বর্ণব্যবহারের মধ্যে দিয়ে শিল্পী তার রচনায় যে সহজ দীপ্তি ও মর্যাদা দিতে চেয়েছিলেন সেই সরলতাই তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। সময়ে সময়ে বর্ণাধিক্যের প্রাবল্যে ছবি এতো ভারাক্রান্ত হয়েছে যে অবকাশের (relief) অভাবেই তার ভারসাম্য হারিয়েছে। দর্শকের চোখকে কোথাও একটুও বিশ্রাম দেয় না। রঙের একটা উচ্ছ্বলিত আবর্তের মধ্যে দর্শকের চোখ পীড়িত ও ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

এই দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকার দরুণ 'হেয়ার কাটার' (১০) নামে ছবিটি নিঃসংশয়েই একটি সার্থক রচনা বলে পরিগণিত হবে। এতে রেখার সামর্থ্য যেমন অবিসংবাদিত, বর্ণব্যবহারের পরিমিত মাত্রাজ্ঞান তেমনি লক্ষণীয়। বর্ণের এই মোলায়েম ও সংক্ষিপ্ত ব্যবহার ছবিতে একটা আশ্চর্য কোমলতার সৃষ্টি করেছে।

যে প্রাণীরূপের পরিচয় (animal study) দেবার জন্যে একদিন অবনী সেন বিখ্যাত ছিলেন, সেই অতীত সৌরভের পরিচয় স্বতন্ত্র শৈলী সত্ত্বেও এ প্রদর্শনীতেও রয়েছে। ১৬, ২৯, ৩১ ও ৫৭ নম্বরের ছবিগুলি এই বিভাগের উৎকৃষ্ট রচনা বলে স্বীকৃত হবে।

কিন্তু শিল্পীর সম্বন্ধে সব চেয়ে আশার কথা হলো যে তার মন ও দৃষ্টি এখনো বিবর্তনশীল। সেই মনের যোগ্যতম সৃষ্টির জন্যে আমরা অবশ্যই অপেক্ষা করে থাকবো।

পুস্তক পরিচয়

হিসেব-নিকেশ—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; দি বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ; ২৫।২, মোহন-বাগান রো, কলিকাতা—৪। দাম—তিন টাকা চার আনা।

বাঙলা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই আজ এক বন্ধ্যা যুগ চলছে, এমন কথা কেউ কেউ বলে থাকেন। সর্বথা এ কথা গ্রাহ্য কিনা, তা নিয়ে তর্ক ওঠা স্বাভাবিক। তবে সরস সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে আজ এক বন্ধ্যাযুগ চলছে, কেউই বোধ হয় তা অস্বীকার করবেন না। দু-একজন অবশ্য এখনো আছেন, হাস্যরসের স্নিগ্ধ ছটায় পাঠকের সমস্ত হৃদয়কে যাঁরা উদ্ভাসিত করে তুলতে পারেন। নিঃসংশয়ে তাঁরা শক্তিধর; তবে সংখ্যায় তাঁরা মুষ্টিমেয়। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এখন এক গুরুগাম্ভীর্যের সাধনা চলছে; সেই গাম্ভীর্যের পটভূমিকায় তাঁদের তাই বড়োই নিঃসঙ্গ, বড়োই অসহায় মনে হয়।

কথাটা সুখের নয়। হাস্যরসের এই নির্বাসন নিতান্তই দুঃখের। হাসির থেকে কল্যাণকর আর অন্যকিছু আছে কিনা জানি না। ঊনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিশ শতকের প্রথম যুগেও প্রতিটি লেখকের রচনায় যে বলিষ্ঠ রসপ্রবণতার সন্ধান পাওয়া যেত, যতো শীঘ্র এই দম-আটকা ছদ্ম-গাম্ভীর্যের অবসান ঘটিয়ে আমরা তার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে পারি, ততোই মঙ্গল।

কেদারনাথ সেই স্বর্ণযুগের শেষ প্রতিনিধি। শেষের দিকে, পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়েই কিনা জানি না, তাঁর শক্তি ঈষৎ স্তিমিত হয়ে এসেছিল সন্দেহ নেই; তবে তাঁর আজীবন সাহিত্য-সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে সে প্রসঙ্গের আলোচনা নিতান্তই অবান্তর। বাঙালী পাঠকের দৈন্য-করুণ মুখে তিনি হাসির তুফান ছুটিয়েছেন, তাকে তিনি হাস্যরসের আনন্দ-বন্যায় নিরন্তর অবগাহন করিয়েছেন। এর থেকে বড়ো দান, বড়ো উপঢৌকন আর কি হতে পারে! সে দান, সে উপহারের জন্যে তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

হিসেব-নিকেশ তাঁর শেষ বয়সের রচনা। যে হাসির অবতারণা তিনি এখানে করেছেন তার আবেদন ঈষৎ বেদনারসাশ্রিত। সে আবেদন মস্তিষ্কের কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে। বাক্য-বিন্যাসের সুবর্ণচ্ছটায় নয়, ঘটনাবিন্যাসের অপরূপ আয়োজনে। কখনো কখনো তা সরস পরিহাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কখনো বা বেদনায় ম্লান হয়ে এসেছে। হাসি এবং অশ্রুর এই অপূর্ব সমন্বয় বড়ো দুর্লভ এবং এই কারণেই দুর্মূল্যও বটে। ২৬৪।৫১

বৈষ্ণব সাহিত্য-প্রবেশিকা—শ্রীহিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি এল প্রণীত। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম এ কর্তৃক জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ টাকা।

গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় বৈষ্ণব সাহিত্যের নিছক রসতত্ত্বের আলোচনার অভাব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেই অভাব পূরণের জন্য প্রয়োজন-বোধ তাঁহাকে প্রণোদিত করিয়াছে, এই কথা বলিয়াছেন। রসতত্ত্বের আলোচনাও তিনি করিয়াছেন। প্রধানত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বল নীলমণি হইতেই তিনি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় হইতেই সাক্ষাৎ সম্পর্কে তিনি রসতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আলোচনাও সুন্দরই হইয়াছে; বিশেষত বৈষ্ণব মহাজনগণের রচনা হইতে ভাব এবং দশার অবস্থার উপযোগী পদসমূহ উদ্ধৃত করাতে সাধারণের পক্ষে রসানুভূতির পথ প্রশস্ত হইয়াছে এবং আলোচনার মাধুর্যও বাড়িয়াছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁহার আলোচনা প্রধানত বিশ্লেষণমূলক; তজ্জন্য এই আলোচনার ভাব এবং রস তেমন নিবিড়, বিগাঢ় বা উজ্জ্বল হইয়া ফোটে নাই। পরন্তু পাণ্ডিত্যমূলক বিচারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ বাঙলার বৈষ্ণব সাহিত্যের মর্মটি সোজাসুজি ধরিবার পক্ষে কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক গবেষণার অবতারণা একান্ত আবশ্যক ছিল বলিয়া মনে হয় না। বেদমন্ত্রের উদ্গাতা কৃষ্ণ নামে ঋষি, যে বৈষ্ণবের কৃষ্ণ নহেন, কিংবা মহাভারতের কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের কৃষ্ণ নহেন; পরন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের কৃষ্ণ উপনিষদের পূর্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব এবং তিনি রসময় এবং আনন্দময় পরব্রহ্মস্বরূপ। এই সত্যটি নিতান্তই সহজ ও সরল। সুতরাং সোজাসুজি সেই পথেই গ্রন্থকারের অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। মহাপ্রভুর জীবন-লীলাংশ অবশ্য তেমন অনাবশ্যক বলা চলে না। সে প্রসঙ্গের অবতারণা ঠিকই হইয়াছে; কিন্তু মহাপ্রভুর এই জীবন-লীলাতেও ঐতিহাসিক তথ্যগত বিচারকেই গ্রন্থকার বড় করিয়া তুলিয়াছেন, বৈষ্ণব সাহিত্যিকগণ মহাপ্রভুর প্রেমের লীলার রস মাধুরীর যে চাতুরী উপলব্ধি করিয়াছেন, গ্রন্থকার সেই সূত্রটি সমুজ্জ্বল করিয়া তোলেন নাই। মহাপ্রভুকে অবলম্বন করিয়া বাঙলায় যে বিপুল রস-সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি তাহা এড়াইয়া গিয়াছেন। অথচ সে পথে গেলে বৈষ্ণব সাহিত্যের রসতত্ত্ব উপলব্ধির পথ সহজ এবং সরল হইত। বস্তুত মহাপ্রভু ভগবানের সত্যই অবতার, না ভক্তগণ তাঁহার জীবন-লীলায় অবতারত্ব আরোপ করিয়াছেন, এ প্রশ্ন একান্তই অবান্তর। অবতার যাঁহারা সাধারণ মানুষের মতই তাঁহাদিগকে দেখা যায় তাঁহাদের মননে নিত্য সত্যের পরিস্ফূর্তি বা অভিব্যক্তিতেই তাঁহাদের অবতারত্ব। মহাপ্রভুর প্রেম-লীলায় সেই নিত্য সত্য বা রসতত্ত্বের অনুভূতির আলোকেই বৈষ্ণব সাহিত্য উজ্জ্বল হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষতার বলে মাধুর্য-বীর্য লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার মহাপ্রভুর জীবনলীলার এই দিকটা গৌণ করিয়াছেন, এজন্য রস তেমন জমে নাই। পরিশিষ্টাংশে রসতত্ত্ব বিচারেও এইরূপ ত্রুটির পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু এসব ত্রুটি সত্ত্বেও বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চার প্রবেশার্থীদের পক্ষে পুস্তকখানি যে বিশেষ মূল্যবান হইয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। পুস্তকখানি পাঠ করিলে বৈষ্ণব সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস এতৎসম্পর্কিত বহুবিধ তথ্য অবগত হওয়া যায় এবং রসতত্ত্ব সম্বন্ধেও মোটামুটি ধারণা জন্মে। বাঙলার চিন্তাশীল সমাজে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ জাগাইবার পক্ষে পুস্তকখানি বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। ৪৬।৫২

শ্রীশ্রীসারদামঙ্গলঃ—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য প্রণীত। মণ্ডল পাবলিশিং হাউস, ২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

গ্রন্থকার বাঙলার সাহিত্যিক সমাজে অপরিচিত নহেন। তাঁহার লিখিত 'শ্রীশ্রীসারদা-দেবী" 'দেশে' ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়া চিন্তাশীল সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গিনী শ্রীশ্রীমায়ের এই জীবনী সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে। ব্রহ্মচারীজীর লিখিত 'বাঙলার দুই ঠাকুর'—শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মধুর লীলা-রস-প্রসঙ্গও বাঙলা সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। তাঁহার শ্রীশ্রীসারদামঙ্গল পাঠ করিয়াও আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। কাব্যছন্দে শ্রীশ্রীমায়ের এই জীবন-লীলা। লেখক পরম ভক্ত। সমগ্র অন্তর দিয়া তিনি মায়ের কথা লিখিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের অজস্র করুণার অমৃতধারা পুস্তকখানির পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ছড়াইয়াছেন। প্রাচীন রীতির পয়ার ছন্দে লীলা-কথা লিখিত হইয়াছে। ভাষা সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অন্তরকে স্পর্শ এবং লীলা জীবন্ত করিয়া তোলে। শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-লীলায় মাতৃভাবের অপূর্ব মহিমা এবং নারী-জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্ত-সাধকের লেখনী বিনির্গত এই মাতৃগীতি পাঠ করিয়া সকলেই প্রীত এবং অনুপ্রাণিত হইবেন। ৪৫।৫২

স্বপ্নাতুরা:—শ্রীসুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীদীনেশচন্দ্র গাঙ্গুলী, ৮।৫৩ ফার্ন রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

'কয়েক বৎসর পূর্বে কর্মব্যস্ত জীবনে দুর্লভ অবসর মুহূর্তে নিতান্ত খেয়াল বশেই লিখিত কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। লেখকের বন্ধু-বান্ধবদের উৎসাহে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ হইয়াছে। লেখক 'নিবেদনে' এই সংবাদ জানাইয়াছেন। ইহাতে এগারোটি গল্প সংকলিত হইয়াছে। সব কটি গল্প পড়িবার উৎসাহ পাওয়া গেল না। যে কয়টি পড়িয়া দেখিলাম, তাহাতে বুঝা গেল, লেখক গল্পকার নহেন। গল্প লিখনের জন্যে যে ক্ষমতার প্রয়োজন তা লেখকের নাই। কেবল 'খেয়ালবশে' লিখিত হইয়াছে এবং 'উৎসাহবশে' ছাপা হইয়াছে। ছাপানো কয়েকটি পাতা একত্রে বাঁধাইলে যদি তাহা গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে ইহা গ্রন্থ এই মাত্র। ৫১।।

ছোটদের কবিতা লেখা :—সুনির্মল বসু। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য দেড় টাকা।

বইটির নাম দেওয়া উচিত ছিল 'ছোটদের ছন্দ শেখা'। কবিতা লেখা শেখানো যায় বলিয়া আমাদের ধারণা নাই, লেখকও একথা স্বীকার করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন যে, কবিতা সম্বন্ধে যাহা শিখানো যাইতে পারে তাহা হইতেছে উদীয়মান কবিদের ছন্দ মিল যতি মাত্রা অলঙ্কার ইত্যাদি। এই কারণে প্রথমেই বলিয়াছি বইটির নাম ঠিক হয় নাই। এই বইতে লেখক বিভিন্ন প্রকার ছন্দের উদাহরণ দিয়া তাহার বিচার করিয়াছেন। মিল কি ভাবে দেওয়া উচিত তাহার নির্দেশ দিয়াছেন—

সন্দেশের থালা লয়ে আসে নন্দলাল
থাবা দিয়ে নিয়ে গেল এক বেটা চিল

এখানে ল-য়ে ল-য়ে মিল চোখে দেখা যাইতেছে; কিন্তু কানে শুনিয়া বোঝা যাইতেছে উহা মিল নহে। এ ধরণের বিভিন্ন উদাহরণ লেখক দিয়াছেন। উহার দ্বারা পাঠকদের ছন্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা হইবে।

কিন্তু বইটি কি ছোটদের জন্যে লেখা? ভাষা দেখিয়া তাহা মনে হয় না। যেমন বাঙলা দেশ যে কবিতার দেশ তাহার প্রমাণস্বরূপ লেখক বলিয়াছেন, 'এখানে নিদাঘ আনে নিবিড় তন্ময় আলো'—এ ভাষা কি ছোটদের পক্ষে কিঞ্চিৎ ভারী নয়? ৪০।৫২

রূপমঞ্চ (বড়ুয়া স্মৃতি সংখ্যা)—সম্পাদক শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়। মূল্য ৩্।

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত পত্রিকাগুলির মধ্যে রূপমঞ্চ যে আসন লাভ করেছে, বর্তমান সংখ্যাখানি তার গৌরব অনেক বাড়িয়ে দেবে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে পরলোকগত পরিচালক প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া যে উদ্দীপনা নিয়ে এসেছিলেন, বহু প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সেইদিকটা সুন্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তা ছাড়া বড়ুয়ার ব্যক্তিগত জীবনেরও বহু তথ্য ও সেইসঙ্গে অসংখ্য অপ্রকাশিত ছবি সংখ্যাখানিকে চিত্রামোদীদের পাঠাগারে স্থায়ী স্থান করে নেবার যোগ্যতা দেখিয়েছে। সংখ্যাখানির প্রস্তুতিতে বিপুল পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ছাপ স্পষ্ট।

জেলখানা-কারাগার—শ্রীনিকুঞ্জ সেন; প্রকাশক গণদীপায়ন পাবলিশার্স; পরিবেশক—এম সি সরকার এণ্ড সন্স, ১৪, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—তিন টাকা।

বিপ্লবী বাঙলার ইতিহাস কম করিয়াও অর্ধ শতাব্দীর এক ইতিহাস। ১৯১৫ সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ত্রিশটি বৎসর বাঙলার বিপ্লবীগণ একটানা কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। আজ হইতে কুড়ি বৎসর আগে প্রায় চার হাজার বিপ্লবীকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া প্রথমে একশত জনকে রাজপুতনার মরুভূমিতে দেউলী নামক বন্দি-নিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে আরও চার শত জনকে সেখানে পাঠানো হয়। আলোচ্য গ্রন্থে সেই দেউলীর বন্দিজীবনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গিয়াছে, রাজপুতনার মরুভূমিতে বাঙলার বিপ্লবীকে জীবনযাপন করিতে হইয়াছে, জগৎ-সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন সে এক জীবন। সেই দুঃখের জীবনের ব্যথা ও বেদনা, দুর্ভোগ ও দুর্ভাগ্য, কষ্ট ও কৃচ্ছ্রতা ইত্যাদির উপরেও বন্দীর যে উদ্দৃপ্ত মন অপরাজিত হইয়া জাগিয়া ছিল, সেই মন লইয়াই গ্রন্থকার 'জেলখানা-কারাগার' নামক স্মৃতিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাজেই রসিক, দার্শনিক ও সহজ মানুষটিই এই স্মৃতিগ্রন্থে লেখকের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, বন্দিজীবনের ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর দিকটিকে আড়ালে রাখিয়া হাস্যমুখর সহজ ও সরল দিকটিকেই গ্রন্থকার পুরোভাগে আনয়ন করিয়াছেন। তবু দুই একটি কাহিনী গ্রন্থে রহিয়াছে, যাহার বিদ্যুতালোকে বন্দি-জীবনের ভয়াবহ ও ভীষণ দিকটি পলকের জন্য চমক দিয়া গিয়াছে। স্বদেশী, স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিপ্লব ইত্যাদি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে নিছক সাহিত্যের রসবিচারেই গ্রন্থখানির স্বকীয় বিশেষ মূল্য ও মর্যাদা রহিয়াছে। হাসি, ব্যঙ্গ, কৌতুক, আনন্দ ইত্যাদির ভূরিভোজের আয়োজন এই গ্রন্থে পাঠকদের জন্য রহিয়াছে। লেখকের বলার ভঙ্গীটি সহজ ও সংযত এবং দৃষ্টিভঙ্গীটি দার্শনিক ও রসিক। "রাজবন্দী ও সাধারণ কয়েদীদের মিলিত পদক্ষেপে দেউলীর যে দিনগুলি ব্যথা-বেদনার হাসি-উল্লাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার আংশিক চিত্র" বলিয়া ভূমিকায় লেখক গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। বন্দিজীবনের যে চিত্র এবং চরিত্রগুলি গ্রন্থে অঙ্কিত ও বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আংশিক হইলেও রসের বিচারে সার্থক ও পূর্ণ বলিয়াই তাহারা স্বীকৃত হইবে। বাঙলার কারা-সাহিত্যে নিকুঞ্জবাবুর 'জেলখানা-কারাগার' বিশেষ একটি স্থান নিশ্চয় দাবী করিবে। ৫৩।৫২

রাশিফল :—জ্যোতি বাচস্পতি। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

এই লেখকের 'মাসফল' গ্রন্থ অনেকে পাঠ করিয়া থাকিবেন। সেই বইয়ের সাফল্য লেখককে এই গ্রন্থ-রচনায় উৎসাহী করিয়া থাকিবে। বিভিন্ন রাশির ব্যক্তির অর্থভাগ্য, কর্মজীবন, পারিবারিক অবস্থা, বিবাহ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কিরূপ হইবার কথা এই গ্রন্থে তাহার আভাস আছে। যাঁহাদের রাশি জানা নাই, তাঁহারা কি ভাবে রাশি বাহির করিতে পারিবেন তাহারও নির্দেশ গ্রন্থ শেষে দেওয়া হইয়াছে। ৪৮।৫২

স্বপ্ন ও সংগ্রাম—শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়; সাধনা মন্দির, ৫৫, নারায়ণ রোড, কলিকাতা—৮। দাম—দুই টাকা।

'বাস্তব জীবনটা কবিতা থেকে মনে হয় অনেকটা দূরে সরে গেছে।' আলোচ্য গ্রন্থের মুখবন্ধে কবির উপর্যুক্ত বেদনা থেকে 'স্বপ্ন ও সংগ্রামের' জন্ম। এ বেদনার স্রোত কবির মানসমনিনার থেকে শুরু করে দেশমাতৃকার শিকড়ে শিকড়ে বয়ে গেছে। আন্তরিকতার দরুণ পরীক্ষার প্রায় সবক'টি কবিতাই উত্তীর্ণ। বিশেষ ক'রে 'কবিতার মৃত্যু', 'রূপকথা', 'স্বদেশপুরুষ' ও 'হীরামন'—এদের সম্বন্ধে কুণ্ঠাহীন প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। ৩৭।৫২

অশ্রু-অর্ঘ্য—শ্রীসত্যেশচন্দ্র ভট্টাচার্য; ৫১বি, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা—৩। **দাম**—বারো আনা।

সারল্যের মাধুর্যে কবিতা কয়েকটি মনকে স্পর্শ করে। ৩৩।৫২

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থ-কারের নিকট প্রেরিত হইবে।

ভজনমালা—কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদার। সংগীত প্রচারণী, ৬১ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০। ৫৪।৫২

গদাধর—অতুলানন্দ রায়। প্রকাশক—আশালতা রায়, ১২৪, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৷০। ৫৫।৫২

যুগ ঝঙ্কার—হরিচন্দন মুখোপাধ্যায়। দি নিউ ওরিয়েণ্টাল প্রেস, ঝরিয়া। মূল্য ২৷৷০। ৫৬।৫২

অন্য ইতিহাস—সিদ্ধার্থ রায়। ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩্। ৫৭।৫২

সত্য ভ্রমণ কাহিনী—সতীনাথ ভাদুড়ী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৷৷০। ৫৮।৫২

কলিকাতায় নিগ্রো নাচ ও গানের আসর

গত শনিবার থেকে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে একটা নতুন চেহারার প্রমোদ এসে আবির্ভূত হয়েছে। খাস নিগ্রোদের নাচ আর গান। পরিবেশনকারী দলটির নাম "হারলেম ব্ল্যাকবার্ডস ১৯৫২"—পুরোপুরি নিগ্রো শিল্পীদের নিয়ে গঠিত দল। নারী ও পুরুষ মিলিয়ে দলে আছেন সবশুদ্ধ ছাব্বিশ জন শিল্পী। বিশেষ বিশেষ নাচের বা গানের জন্যে আলাদা আলাদা শিল্পী যদিও নির্দিষ্ট করা আছে, তবে দলের প্রায় সকলেই নাচ বা গান উভয়েতেই বেশ পারদর্শী। দলের সংগঠক এবং প্রধান হোতা হলেন ম্যানহাটন পল।

হারলেম বলে নিউইয়র্কের নিগ্রো পল্লীকে। কেবলমাত্র নিগ্রো শিল্পীদের নিয়ে গঠিত বলে দলটির নাম "হারলেম ব্ল্যাকবার্ডস"। তবে দলটি একমাত্র নিউইয়র্কের শিল্পীদের নিয়েই গঠিত নয়, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নাম-করা নাচিয়ে এবং গাইয়ে নিয়েই এই দল। এ দলটি কয়েক বছর ধরেই আমেরিকায় তাদের আসর বসিয়ে আসছে এবং ওখানকার সমালোচক ও রসিকরা এটিকে সম্পূর্ণভাবে নিগ্রোদের নিয়ে গঠিত শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয় বলে অভিহিত করেন। দলেতে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সকলেই কেউ চলচ্চিত্র, কেউ বেতার বা কেউ টেলিভিশনের নামকরা শিল্পী।

অধিনায়ক ম্যানহাটন পল নাচে গানে ও কৌতুককণা পরিবেশনে কৃতবিদ্য। তার ওপরে তার এমন একটা ব্যক্তিত্ব রয়েছে যা চট করেই দর্শককে একেবারে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে। দলের প্রধানা আকর্ষণ মেরী ব্রায়ান্ট নিগ্রো নাচে শ্রেষ্ঠকুশলা বলে প্রখ্যাত। ওদেশে বলে নিগ্রো নাচ সম্পর্কে মেরী ব্রায়ান্ট যা জানেন না, তা জানবার দরকার করে না। ব্রায়ান্ট ছবিতে নাচের পরিকল্পনা করার জন্য বড়ো বড়ো প্রযোজকদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পান এবং আভা গার্ডনার, ভেরা এলেন প্রভৃতি শিল্পীকে নাচ শেখান। ফ্রান্সাইন ও ট্রিসডেল জুড়ী আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ার আদিবাসীর উদ্দাম নৃত্যশৃঙ্গারে যুক্তরাষ্ট্রে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। রোর্ট ও সিহিয়া ট্যাপ নাচের জুড়ী। লাল বীচাস আর একজন নৃত্যবিশারদ। গানেতে আছেন ভেলভেটিয়ার্স চতুষ্টয়। এরা ছাড়া দলের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর আকর্ষণ হচ্ছেন "লক জ" জ্যাকসন। দাঁতের জোরে ইনি চারখানি টেবিল একসঙ্গে তুলতে পারেন, একটা টেবিলের ওপরে একটি তরুণীকে বসিয়ে সবশুদ্ধ দাঁতে করে টেনে তোলেন; নিজের ওজন ১৪৫ পাউন্ড হলেও ১৯২ পাউন্ডের এক জোয়ানকে দাঁতে করে টেনে রেখে দেন—অত্যন্ত বিস্ময়কর শক্তির পরিচয়। "লক জ"-র পিতা ছিলেন "কংক্রিট" জ্যাকসন—আমেরিকার বৃহত্তম সার্কাস দল রিংলিং ব্রাদার্সের সঙ্গে ছিলেন এবং এই রকমই দন্তশক্তির পরিচয় দিতেন। "লক জ" বারো বছর বয়স থেকেই পিতার সঙ্গে এই খেলা দেখাতে আরম্ভ করেন। আজ আমেরিকায় মাত্র জন বারো লোক দাঁতের এইরকম অত্যদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিতে পারেন এবং এঁরা সকলেই নিগ্রো।

এদের সূচীতে আছে নাচ, গান এবং জ্যাকসনের খেলা মিলিয়ে আঠারো দফা। সবই মূল নিগ্রো নাচ ও গান। নাচগুলি লাস্যময় এবং আদিরসাত্মক আর গানগুলি গুমরে ওঠা মনের ভাববিন্যাসক। হলিউডের ছবিতে নিগ্রো নাচ ও গানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও একেবারে সামনা-সামনি মঞ্চের ওপরে নিগ্রোদের নাচ-গান ভারতে এই প্রথম। বস্তুত কোন নিগ্রো দলের যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ভ্রমণ এই প্রথম। হারলেম ব্ল্যাকবার্ডরাও নিউইয়র্ক ত্যাগ করে মাত্র কলম্বোতে আসর বসিয়েছিলেন, তারপরই তাঁরা এসেছেন কলকাতায়।

এঁদের কৃতিত্ব ও কুশলতার মধ্যে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে অত্যন্ত সাবলীলভাবে দর্শকদের মাতিয়ে তোলার ক্ষমতা। নাচ, গান ও কৌতুকের মধ্যে দিয়ে এঁরা এমনভাবে দর্শককে নিজেদেরই দলের একজন করে তোলেন যে, কারুর পক্ষেই তখন আর আমোদ উপভোগে বঞ্চিত হয়ে থাকতে হয় না। সব শিল্পীরই, বিশেষ করে ম্যানহাটন পল ও মেরী ব্রায়ান্টের দর্শকদের একেবারে নিজের মতো করে তোলার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। আরও দেখা গেলো মনের প্রমত্ততা ব্যক্ত করতে এঁরা সাজ-পোষাকে বা অঙ্গভঙ্গীতে কোন রকমেরই আটঘাটের বালাই রাখে না। দু ঘণ্টার একটানা স্রেফ আমোদ যেমনভাবেই হোক ওঁরা তা দর্শককে পাইয়ে দেবেই।

নিগ্রোদের নাচ বা গানের মধ্যে প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ততাটাই লক্ষ্য করা যায়, তাই এর মধ্যে আর্টের মহিমা ততোটা পাওয়া যায় না। একেবারে মাটি ও প্রাকৃতিক আবহাওয়া থেকে সদ্য গজিয়ে ওঠা জিনিস মনে হয়। পেছনে কোন ব্যাকরণের সূত্র বেঁধে দেওয়া নেই; যেমন করেই হোক একটা তাল সৃষ্টি করাই হচ্ছে কাজ এবং সে তালটা দর্শকদের মধ্যেও এমনি সংক্রামিত

সমবেত নৃত্যে হার্লেম ব্ল্যাকবার্ডস্ সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট নিগ্রো শিল্পী

জেমিনী পরিবেশিত বিজয় পিকচার্সের রূপকথা "পাতাল ভৈরবী"-র একটি নৃত্য দৃশ্য

হয়ে পড়ে যে, ওদের সঙ্গে দর্শকরাও হাত-তালি দিয়ে, ঘাড় নেড়ে বা পা নেড়ে তাল রেখে যেতে একরকম বাধ্যই হয়। নিগ্রো নাচ-গানের এইটেই বৈশিষ্ট্য। তাই পৃথিবীর মধ্যে সিনেমা বা বেতার বা গ্রামোফোন যেখানেই আছে, নিগ্রো সংগীতের প্রচলনও সেখানে দেখা যায়। ওঁদের সংগীত-ধারাকে 'জাজ' বলে আখ্যাত করা হয়েছে—উদ্দামতায় এ সংগীতের তুলনা হয় না। হারলেম ব্ল্যাকবার্ডের নাচগানেও সেই উদ্দামতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পাশের বাড়ী (প্রডাকসন্স সিণ্ডিকেট)—

কাহিনীঃ অরুণ চৌধুরী; চিত্রনাট্য ও পরিচালনা ঃ সুধীর মুখোপাধ্যায়; সুরযোজনাঃ সলিল চৌধুরী। ভূমিকায়ঃ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ চৌধুরী, সুধীর মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

নারায়ণ পিকচার্সের পরিবেশনে ছবিখানি ৭ই মার্চ মুক্তিলাভ করেছে চিত্রা, পূর্ণ ও প্রাচীতে।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মুখে যেই জবাব তুলে ধরার জন্যেই যেন প্রডাকসন্স সিণ্ডিকেট তাদের প্রথম ছবি "পাশের বাড়ী" এনে হাজির করলেন বাংলার পর্দায়। চলচ্চিত্র উৎসব দেখিয়ে দিয়ে গেলো যে ছবি ভালো করার সবচেয়ে প্রধান অবলম্বন হচ্ছে কাহিনীকে অকৃত্রিম বাস্তবতামে'বা করে তোলা। ঠিক তারই দৃষ্টান্ত হলো "পাশের বাড়ী"। নতুন লোকের লেখা গল্প, নতুন পরিচালক, আর শিল্পীও প্রায় সকলেই আনকোরা নতুন। কিন্তু পুরো আড়াই ঘণ্টার অনাবিল হাস্য-প্রস্রবণ ছুটিয়ে তোলায় ছবিখানি যে কৃতিত্ব প্রকাশ করেছে, তা বাংলা ছবির ক্ষেত্রে প্রায় অতুলনীয় ঘটনাই বলা যেতে পারে।

পাড়ার, পল্লীর সাধারন সমাজ জীবনের আটপৌরে ব্যাপার নিয়ে ছবির গল্প। যে বয়সের যাদের নিয়ে যে ধরণের ঘটনা, তা সব বয়সের সবায়ের মনেই রসের খোরাক জুগিয়ে আসছে চিরকাল ধরেই। পাশা-পাশি বাড়ীর ছেলে আর মেয়ের প্রেম—তবে সরাসরিভাবে প্রেম করা নয়, দস্তুরমতো আক্কেল-সেলামী দিয়ে ঠেক খেয়ে খেয়ে প্রেমের পথে এগিয়ে যাওয়া আর সেই নিয়েই যতো কৌতুককর ঘটনা। ধরণে কিছুটা "বরযাত্রী"র সঙ্গে মেলে বটে, কিন্তু এরও ঘটনার মৌলিকত্ব আছে ঢের। একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে থাকে পাশাপাশি বাড়ীতে, তারপর তাদের প্রেম আর তাই নিয়ে রেষা-রেষি, রাগ-অভিমান, দ্বেষ-বিদ্বেষ, অবশ্য প্রহসনের মাত্রায়। সমাজ-জীবনের একটা অত্যন্ত রসাল দিকের ছবি এখানি, যা উল্লাসের প্রমত্ততায় লোককে মাতিয়ে তোলে।

ক্যাবলাকান্তর সঙ্গে লীলার দেখা মাসীর বাড়ী থেকে ফেরবার সময় ট্রেনেতে। ক্যাবলা ভাবতে পারেনি সেই মেয়েটিই এসে উঠবে তারই পাশের বাড়ীতে একেবারে জানালার পাশ ঘেঁষে। ক্যাবলা লীলার প্রেমে পড়লো। ওদিকে গানের মাস্টার শ্যামসুন্দর লীলার কাছে প্রেম নিবেদন করে, ক্যাবলার তা অসহ্য। লীলা একদিন বাড়ী থেকে সাহস করে বের হতেই ক্যাবলা তার পিছু নিলে, কিন্তু লাভ হলো লীলার হাতের চড়। ক্যাবলা গিয়ে তার আড্ডার বন্ধুদের সাহায্য

এস বি পিকচার্স চিত্রায়িত শরৎচন্দ্রের "পল্লীসমাজ"-এর একটি দৃশ্যে জহর গাঙ্গুলী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তুলসী চক্রবর্তী

চাইলে। ওরা একটা মতলব ঠিক করলে—ক্যাবলাকে গায়করূপে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। ডেকে আনা হলো ধনঞ্জয়কে—ক্যাবলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁট নাড়তে থাকে আর পিছনে অন্ধকারের আড়ালে ধনঞ্জয় তার হয়ে গান গেয়ে যায়। ক্রমে লীলার দৃষ্টি পড়লো ক্যাবলার ওপরে। বাধা কিন্তু গানের মাস্টার শ্যামসুন্দর। লীলার মন তখন ক্যাবলার ওপর পড়েছে, দু'জনে আলাপ হয়েছে, একসঙ্গে বেড়াতেও বের হয়, এই সময়ে গানের ব্যাপারে ক্যাবলার জালিয়াতী লীলার কাছে ধরা পড়ে গেলো। লীলা বেঁকে দাঁড়ালো এবং শ্যামসুন্দরের কথায় রাজি হয়ে ক্যাবলাকে গুন্ডার হাতে মার খাওয়ালে। লীলা ঘাবড়ে গেলো, তার-পর মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে অচৈতন্য ক্যাবলা বাড়ীতে এসে যেভাবে কাতরাতে লাগলো, তা দেখে ও শুনে লীলার পক্ষে স্থির হয়ে থাকা অসম্ভব হলো। লীলা মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাবলার সেবার জন্যে এলো। দিনরাত লীলা সেবা করে যেতে লাগলো। ক্রমে ক্যাবলা সুস্থ হয়ে উঠলো। কথায় কথায় একদিন আবার বিরোধ বাধলো। লীলার বাপ-মা তখন ওর বিয়ের জন্য পাত্র

য়েছেন প্রথমে লীলা জানিয়ে দিলো যে, ক্যাবলাকেই বিয়ে করবে, কিন্তু বিরোধ পেয়ে সে এক দোজবরে বুড়োকেই বিয়ে করবে ঠিক করলে। বুড়ো আর কেউ নয়, ক্যাবলারই মামা। শেষে অবশ্য লীলা ক্যাবলারই হাতে আত্মসমর্পণ করতে হলো।

গোড়া থেকে লীলাকে ঘিরে ক্যাবলার কলোমি আর তার ইয়ারদের ফন্দী-ফিকির এমন রঙ্গরসের অবতারণা করে দেয় যে, মুহূর্তের জন্যেও আসনে স্থির হয়ে বসে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে। জোর করে গুঁতো মেরে হাসানো নয়, ঘটনার বিন্যাস এবং অভিনয়েই এমনি যে হাসি আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে।

বিন্যাস, অভিনয় এবং সুরযোজনা—এই তিনটি দিকের অসাধারণ কৃতিত্বই ছবিখানিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে। আপাতদৃষ্টিতে গল্প সামান্যই; কিন্তু প্রত্যেকটি ঘটনার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াকে স্পষ্ট করে সামনে তুলে ধরায় পরিচালক বিন্যাস-চাতুর্যের অসাধারণ পরিচয়ই দান করেছেন। বাক্যের চেয়ে দৃষ্ট ঘটনার ওপরেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তাঁর প্রয়াসকে মূর্ত করে তুলেছেন অভিনয়শিল্পীর দল এবং সুরযোজক।

অভিনয়ে দু-একজন ছাড়া সকলেই নতুন। প্রধান চরিত্র ক্যাবলার ভূমিকায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রথম অবতরণ। প্রেম-পাগল বোকা গোছের এই চরিত্রটির তিনি যে রূপ দিয়েছেন, তা অভিনয় বলেই মনে হয় না—একেবারে সত্যিকারের এমনি একটা চরিত্র যেন। নায়িকার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে নতুন বললেই চলে, তিনিও ক্যাবলার সঙ্গে তাল ফেলে চলার মতো ক্ষমতা দেখিয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিক গানের মাস্টার শ্যামসুন্দরের ভূমিকায় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় লোকের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলেন। তারপর যখন তাঁর প্রেম নিবেদন শুরু হয় এবং যখন প্রেমিকা হাতছাড়া হবার আশঙ্কা ও উদ্বেগ তাঁর মনে বাসা বাঁধতে থাকে, তখন সেসব দৃশ্যে তাঁর যে অভিব্যক্তি, তারপরে আসন থেকে গড়িয়ে খেয়ে পড়া সামলাতে হয় অনেক চেষ্টায়। এ'রা ছাড়া ক্যাবলার তিন বন্ধুর ভূমিকায় অরুণ চৌধুরী, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনুপকুমার ক্যাবলার হয়ে ফন্দী-ফিকির আঁটার ব্যাপারে লোককে এক মুহূর্তও স্থির হয়ে বসে থাকতে দেয় না। এদের ওপরে রয়েছে ক্যাবলার মামার কনে-দেখা; ঐ ভূমিকার পরিচালক স্বয়ংও ও-পর্বটিতে দম ফেলার অবকাশটিকে কেড়ে নেন। এইভাবে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত শিল্পীরা সবাই কখনো একজোট হয়ে, আবার কখনও ভাগাভাগি করে একের পর একজনে রঙ্গকৌতুকের একটানা একটা ঢেউ তুলে হাসির এমন দারুণ হুল্লোড় সৃষ্টি করেন, যা ইতিপূর্বে কোন ছবিতে দেখা যায়নি।

ছবিখানিতে সঙ্গীতের একটা ভূমিকা রয়েছে। ক্যাবলাকে গাইয়েরূপে দেখাবার জন্যে পিছন থেকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ধনঞ্জয়ের গান—অনেকটা ছবির 'প্লে-ব্যাক' গানের মতো; তারপর রয়েছে শ্যামসুন্দর আর ক্যাবলার গানের দ্বন্দ্ব; সেটাও এক হুল্লোড়ে কাণ্ড। সর্বোপরি আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গীত রেখে যাওয়ার মতো আবহ-সুর, যা ঘটনাকে রসাল করে তুলতে প্রভূত সহায়তা দান করেছে এবং এ বিষয়ে সুর-পরিচালক সলিল চৌধুরী খানিকটা মৌলিকত্বও দেখিয়েছেন।

'পাশের বাড়ি' সবারেরই আশপাশের চরিত্র ও ঘটনার চেহারার ছবি। প্রাণখোলা অনাবিল হাসবার যে আনন্দ ছবিখানি এনে দিয়েছে, তা আমাদের দেশে অতি দুর্লভ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা পাইয়ে দেবার জন্যে প্রডাকসন্স সিণ্ডিকেট সবারের অভিনন্দন লাভ করবেন।

'বসন্ত-উৎসব'

'মৈত্রী'র প্রযোজনায় গত রবিবার সন্ধ্যায় রামমোহন লাইব্রেরী হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান ও তরুণ কবি বটকৃষ্ণ দে'র সংলাপসমৃদ্ধ 'বসন্ত-উৎসব' ডক্টর প্রমথনাথ ব্যানার্জির সভাপতিত্বে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। বটকৃষ্ণ দে'র সংলাপ রচনা, সুনীল রায়ের ধারাবন্ধনা, মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্তার নৃত্য পরিচালনা ও দীপক চৌধুরীর গীত নির্দেশনা বহু গণ্যমান্য অতিথির অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। নৃত্যে যূথী, বীথি, রেণু গুপ্তা ও শিবানী সেন প্রভৃতি এবং সঙ্গীতে ইলা সান্যাল, সুনীত ধর, অশেষ চট্টোপাধ্যায় ও দীপক চৌধুরীর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। কিশোরী দে ও সুনীল ধরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পেরেছে।

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট পরিচালকদের বিশেষ করিয়া খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর কোন দিনই সুনাম নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ, দলীয় প্রভাব প্রভৃতি হইতে ইহারা নাকি কোনদিনই মুক্ত হইতে পারেন নাই। এইবারের নবগঠিত পরিচালকমণ্ডলী যেরূপভাবে কার্যকলাপ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে আশা হইয়াছিল তাহারা সেই দুর্নামের ঊর্ধ্বে উঠিবেন। কিন্তু সম্প্রতি ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল গঠন ব্যাপারটি লইয়া ইহারা যেরূপভাবে অগ্রসর হইতেছেন তাহাতে আশংকা হইতেছে আমাদের সেই ধারণা বোধ হয় টিকিবে না। যে খেলোয়াড় দলভুক্ত হইবে বলিয়া কেহই কল্পনাও করিতে পারে না তাহাকেও ইহারা দলভুক্ত করিতেছেন। বিনু মানকড় যাহার সমতুল্য খেলোয়াড় ভারতীয় ক্রিকেট দলে একজনও নাই তাহাকে ল্যাংকাসায়ার ক্রিকেট লীগ হইতে মুক্ত করিবার কোন প্রচেষ্টাই ইঁহারা করিতেছেন না। কয়েক সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে একজন কৃতি খেলোয়াড়কে যদি ভারতীয় দলে পাওয়া যায় তাহা করিতে ইঁহারা যে কেন দ্বিধা বোধ করিতেছেন তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। ইহারা নাকি অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় লইয়া দল গঠনের জন্য বিশেষ উৎসাহী কিন্তু কার্যকলাপ দেখিয়া সেইরূপ কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। একটা দেশের মান সম্মান যে দলের উপর নির্ভর করিতেছে সেই দল গঠনের সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ বা দলীয় প্রভাব থাকা কোনরূপেই বাঞ্ছনীয় নহে ইহা অতি সাধারণ ক্রীড়ামোদী পর্যন্ত উপলব্ধি করেন কিন্তু পরিচালকমণ্ডলী কেন যে করেন না ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। অধিকার লাভ করিয়া তাহার অপব্যবহার করিলে তাহা যে সাধারণের মনকে কতখানি তিক্ত ও বিষাক্ত করিয়া দিবে ইহা কি একবারও ইহাদের স্মরণ পথে জাগিতেছে না?

ক্রিকেট দল গঠনের সময় ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং এই তিনটা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তবেই দল গঠন করিতে হয়। ইহার পরেই চিন্তা করিতে হয় ওপনিং ব্যাটসম্যান ও ওপনিং বোলারদের কথা। উইকেটরক্ষকও দলের একটি বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নির্বাচক-মণ্ডলী এই সকল কথা না চিন্তা করিয়া দল গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই পর্যন্ত যে যে খেলোয়াড় নিশ্চিত দলভুক্ত হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে তাহা কিভাবে হইল তাহা আমাদের বোধগম্য হয় না। এই দশজন খেলোয়াড়ের মধ্যে এমন খেলোয়াড় আছেন যিনি সম্প্রতি ভ্রমণকারী এম সি সি দলের বিরুদ্ধে কোন টেস্ট বা প্রতিনিধিমূলক খেলায় যোগদান করেন নাই। ইহা ছাড়াও এমন খেলোয়াড় আছেন যিনি টেস্ট খেলায় যোগদান করিলেও কি ব্যাটিং, কি বোলিং, কি ফিল্ডিং কোন বিষয়েই চরম উৎকর্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। এইরূপ অবস্থায় এই সকল খেলোয়াড়কে কেন দলভুক্ত করা হইল যদি কেহ প্রশ্ন করেন তাহার জবাবে কি বলা হইবে তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। ইহার উপর অবশিষ্ট যে সকল খেলোয়াড়দের মধ্য হইতে দলভুক্ত করা হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে তাহার সংখ্যা এত অধিক ও এত কৃতি খেলোয়াড় ইহাদের মধ্যে আছেন যে কাহাকে রাখিয়া কাহাকে গ্রহণ করা হইবে উপলব্ধি করাই কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে ধারণা করা বোধ হয় কোনরূপ অন্যায় হইবে না যে, নির্বাচকগণ একরূপ ইচ্ছা করিয়াই বহু কৃতি খেলোয়াড়কে বাতিল করিবার উদ্দেশ্যেই উহা করিয়াছেন। এত আলোচনা করিবার আমাদের কোনই প্রয়োজন হইত না যদি না আমরা দেখিতে পাইতাম যে, দলভুক্ত হইতে পারে না এইরূপ সকল খেলোয়াড়কে দলে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহা খুবই দুঃখের ও পরি-তাপের বিষয় যে, নবগঠিত পরিচালকমণ্ডলী পূর্বের চিরস্থায়ী দুর্নাম হইতে অব্যাহতি পাইলেন না।

নির্বাচিত খেলোয়াড়গণ

ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলে নিম্নলিখিত ১০ জন খেলোয়াড় নিশ্চিত যাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে:—

(১) বিজয় হাজারে (বরোদা)—অধিনায়ক
(২) ডি জি ফাদকার (বোম্বাই)
(৩) পি আর উমরিগর (গুজরাট)
(৪) পি রায় (বাঙলা)
(৫) পি সেন (বাঙলা)
(৬) এইচ আর অধিকারী (সার্ভিসেস)
(৭) এন চৌধুরী (বাঙলা)
(৮) গোলাম আমেদ (হায়দরাবাদ)
(৯) জি এস রামচাঁদ (বোম্বাই)
(১০) সি ডি গোপীনাথ (মাদ্রাজ)

দলের অবশিষ্ট ছয়জন খেলোয়াড় যাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবে তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) লালা অমরনাথ (পাঞ্জাব)
(২) এম কে মন্ত্রী (বোম্বাই)
(৩) এস জি সিন্ধে (বোম্বাই)
(৪) রমেশ ডিভেচা (বোম্বাই)
(৫) এম আর রেগে (মহারাষ্ট্র)
(৬) এইচ এল গাইকোয়াড় (হোলকার)
(৭) ভি এল মঞ্জরেকার (বোম্বাই)
(৮) জি কিষেণচাঁদ (গুজরাট)
(৯) পি জি যোশী (মহারাষ্ট্র)
(১০) এস পি গুপ্তে (বোম্বাই)
(১১) ডি কে গোধন (বরোদা)
(১২) এন চ্যাটার্জি (বাঙলা)
(১৩) ডি গাইকোয়াড় (বোম্বাই)
(১৪) সি টি সারভাতে (হোলকার)
(১৫) এস কে গিরিধারী (বাঙলা)

ইহা ছাড়াও বিজয় মার্চেন্টকে দলভুক্ত করিবার নাকি চেষ্টা হইতেছে। যে খেলোয়াড় নিজে বোর্ডকে জানাইয়া দিয়াছেন যে শারীরিক অক্ষমতার জন্য দলভুক্ত হইতে চাহেন না তাহাকে কেন পুনরায় টানা হেঁচড়া করা হইতেছে বোঝা ভার। ইহার মধ্যেও অনেক কিছু চাল আছে বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ আছে।

লালা অমরনাথ যদি দলভুক্ত হন তাহা হইলে তিনি দলের সহ-অধিনায়ক হইবেন কি না এই প্রশ্নও কাহারও কাহারও মনে দেখা দিয়াছে। এই বিষয়ে সঠিক কোন উত্তর দেওয়া যায় না। তবে এইটুকু বলা চলে যিনি অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ-কারী ভারতীয় দলের অধিনায়কতা করিয়া শক্তিহীন দলকে বহু বিপদজনক অবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তিনি দলের সহ-অধিনায়ক হইলে দল পরিচালনায় বিশেষ সুবিধা হইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

পাকিস্থান দলের ভারত ভ্রমণ

এই বৎসরের শীতের সময় পাকিস্থান ক্রিকেট দল ভারত ভ্রমণ করিবেন ইহা স্থির হইয়াছে। এমন কি দলের ভ্রমণ তালিকা পর্যন্ত গঠিত হইয়াছে। এই ভ্রমণ তালিকায় একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে যে শেষ বা পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ কলিকাতায় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইতিপূর্বে যতগুলি বৈদেশিক দল ভারত ভ্রমণ করিয়াছে তাহারা কখনই শেষ টেস্ট ম্যাচ কলিকাতায় খেলে নাই। এই ব্যতিক্রম বাঙলার ক্রিকেট উৎসাহীদের সৌভাগ্যের কারণ হইল বলিলে বোধ হয় কোন অন্যায় করা হইবে না। নিম্নে পাকিস্থান ক্রিকেট দলের ভ্রমণ-তালিকা প্রদত্ত হইল:—

১৬ই অক্টোবর পাকিস্থান ক্রিকেট দল অমৃতসহরে পৌঁছিবে।

১৭ই, ১৮ই, ১৯শে অক্টোবর:—অমৃতসহরে পূর্ব পাঞ্জাব এসোসিয়েশন দলের সহিত খেলিবে।

২৩শে, ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে অক্টোবর:—দিল্লীতে প্রথম টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইবে।

২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে অক্টোবর:—কাণপুরে অথবা লক্ষ্ণৌতে সম্মিলিত বিশ্ব-বিদ্যালয় দলের সহিত খেলিবে।

১লা, ২রা, ৩রা ও ৪ঠা নভেম্বর:—কাণপুরে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ।

৭ই, ৮ই ও ৯ই নভেম্বর—ইন্দোরে হোলকার ক্রিকেট এসোসিয়েশন দলের সহিত খেলিবে।

১১ই, ১২ই, ১৩ই নভেম্বর:—বরোদায় বরোদা ক্রিকেট এসোসিয়েশন দলের সহিত খেলিবে।

১৫ই, ১৬ই, ১৭ই নভেম্বর:—আমেদাবাদে গুজরাট ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহিত খেলিবে।

২১শে, ২২শে, ২৩শে, ২৪শে নভেম্বর:—বোম্বাইতে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ।

২৮শে, ২৯শে, ৩০শে নভেম্বর:—হায়দরাবাদে, হায়দরাবাদ ক্রিকেট এসোসিয়েশন দলের সহিত খেলিবে।

৫ই, ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর:—মাদ্রাজে দক্ষিণাঞ্চল দলের সহিত খেলিবে।

১১ই, ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই ডিসেম্বর:—মাদ্রাজে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ হইবে।

১৯শে, ২০শে ও ২১শে ডিসেম্বর:—নাগপুরে মধ্য অঞ্চল দলের সহিত খেলিবে।

২৫শে, ২৬শে, ২৭শে ডিসেম্বর:—কলিকাতায় পূর্বাঞ্চল দলের সহিত খেলিবে।

২৯শে, ৩০শে, ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী:—কলিকাতায় পঞ্চম টেস্ট ম্যাচ হইবে।

হকি

হেলসিংকির বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ভারতীয় হকি দল এখনও গঠিত হয় নাই। তবে দলের অধিনায়ক ও ম্যানেজার নির্বাচন পর্ব শেষ হইয়াছে। অধিনায়ক হইয়াছেন উত্তর প্রদেশের কে, ডি, সিং বা বাবু। ইনি ১৯৪৮ সালের লণ্ডনের বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের সহ-অধিনায়ক ছিলেন। দলের ম্যানেজার পূর্বে একজনই হইতেন, কিন্তু এইবার তাহার পরিবর্তে দুইজনকে করা হইয়াছে। এই দুইজনের নাম হইতেছে যথাক্রমে এম এন মিত্র (বাংগলা) ও এম জে ভাকিল (বোম্বাই)। এইরূপ দুইজন ম্যানেজার নির্বাচনের পক্ষে কি যে যুক্তি আছে তাহা ভারতীয় হকি ফেডারেশনের পরিচালকগণই জানেন। ইহাদের মধ্যে একজনের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও বলিবার কোনই উপায় নাই। কোচ বা শিক্ষক হইয়াছেন পাতিয়ালার হরধন সিং।

আলিপুরের নূতন মুদ্রালয়ের উদ্বোধন

গত ১৯শে মার্চ, বুধবার ভারতের অর্থ সচিব মাননীয় শ্রী সি ডি দেশমুখ আনুষ্ঠানিকভাবে আলিপুরে মুদ্রালয়ের উদ্বোধন করেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে এই মুদ্রালয় স্থাপনের যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল, আজ তাহা কার্যে পরিণত হইল। ১৯০১ সালে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হইলেও ১৯৪১ সালে নূতন মুদ্রালয় স্থাপনের কাজ আরম্ভ করা হয়। সে সময় কলিকাতায় পোর্ট কমিশনারদের নিকট হইতে জায়গাটি লওয়া হয়।

১৯৪২ সালে জাপানী যুদ্ধের ফলে মুদ্রালয় স্থাপনের কাজকর্ম বিপর্যস্ত হইয়া যায়। ১৯৪৭ সালে পুনরায় কাজকর্ম আরম্ভ করা হয় এবং মুদ্রালয়ের জন্য নূতন যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হয়।

নূতন মুদ্রালয়টি ২৬ একর ভূমির উপর অবস্থিত। সেখানে প্রতিদিন আট ঘণ্টায় ১২ লক্ষটি মুদ্রা প্রস্তুতির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতে বরাবরই ছোট ছোট মুদ্রার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। ১৯৪৪ সালে কলিকাতার স্ট্র্যাণ্ড রোডস্থিত পুরাতন মুদ্রালয়ে প্রায় ১০৪ কোটি ৮০ লক্ষ মুদ্রা তৈয়ারী হইয়াছিল। তখন কলিকাতায় ছোট ছোট ভাংগানি পাওয়ার খুব অসুবিধা ছিল।

এই মুদ্রালয়ে নিকেলের মুদ্রা প্রস্তুতের বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে। নিকেলের চুম্বকাকর্ষক শক্তি থাকায় উহা মুদ্রা প্রস্তুতির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কারণ, নিকেলের মুদ্রা জাল হওয়ার প্রায়ই সম্ভাবনা থাকে না।

এই নূতন মুদ্রালয়ে মুদ্রা প্রস্তুতের যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে বোম্বাই ও হায়দরাবাদের মুদ্রালয় দুইটির সহযোগিতায় ভারতের শান্তিকালীন প্রয়োজন মিটাইয়া বিদেশেরও মুদ্রা প্রস্তুতের অর্ডার গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১৯১৪ সাল হইতে বিভিন্ন সময়ে কলিকাতা মুদ্রালয়ে অস্ট্রেলিয়া, সিংহল, মিশর, সৌদি আরব, স্ট্রেটস সেটেলমেণ্ট, ভুটান ও পাকিস্তানের মুদ্রা তৈয়ারী করা হইয়াছে। নূতন মুদ্রালয় স্থাপনের ফলে আরও অধিক বিদেশী মুদ্রা প্রস্তুতের অর্ডার গ্রহণ করা যাইতে পারে।
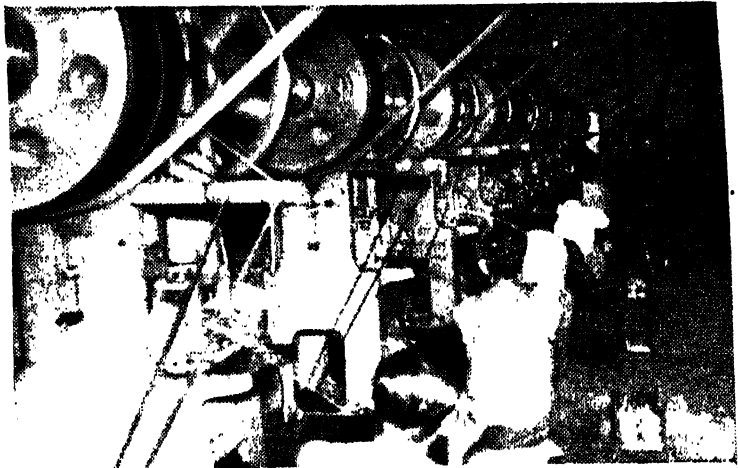
আলিপুরে নবনির্মিত টাকশালে আনি দুআনি সিকি প্রভৃতি মুদ্রা কাটার যন্ত্রসমূহ

নূতন মুদ্রালয়ের কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকিলে স্ট্র্যাণ্ড রোডস্থিত মুদ্রালয়টি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। স্ট্র্যাণ্ড রোডের মুদ্রালয়টি গত ১২৭ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। ১৮২৯ সালের ১লা আগস্ট প্রথম এই মুদ্রালয় হইতে মুদ্রা বাহির হয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১০ই মার্চ—ওয়ার্ধায় এক জনসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব বলেন, বর্তমান মন্দা অবস্থা যদি চলিতে থাকে, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রণের আর প্রয়োজন হইবে না। শ্রীযুত মহতাব ব্যবসায়ী সমাজকে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের লোভ সংবরণ করিতে আহ্বান জানান।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থিগণের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দক্ষিণে বজবজ ও উত্তর কাঁচড়াপাড়া পর্যন্ত বৃহত্তর কলিকাতা এলাকার জন্য একটি মাত্র বিরাট মিউনিসিপ্যাল সংস্থা গড়িয়া তুলিবার এক বিরাট পরিকল্পনা বিবৃত করেন।

লক্ষ্ণৌয়ে উত্তর প্রদেশ আইন সভার বিশিষ্ট কংগ্রেসী সদস্যদের সভায় 'ভূমিদান যজ্ঞে' প্রথম কিস্তিতে ৫ লক্ষ একর জমি শ্রীবিনোবা ভাবেকে প্রদান করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

আসামের অর্থমন্ত্রী শ্রীমতিরাম বোরা অদ্য রাজ্য বিধান সভায় ১৯৫২—৫৩ সালের জন্য যে বাজেট পেশ করেন, উহাতে মোট ২,৫৪,৬৫,০০০৲ টাকা ঘাটতি প্রকাশ পাইয়াছে।

কোম্পানী আইন কমিটি সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। কমিটির রিপোর্টের মূলকথা এই যে, ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোম্পানী বা যৌথ প্রতিষ্ঠান-গুলি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

শ্রীসুনির্মল দত্ত আই সি এস যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রী জার্মাণীতে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন।

১১ই মার্চ—পূর্ববঙ্গের আন্সার বাহিনীর ডিরেক্টর জেনারেল মিঃ দোহা গতকল্য ময়মনসিংহে এক বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে আন্সারদিগকে পাকিস্থানের শত্রুদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তৎপর হইতে নির্দেশ দেন। মিঃ দোহা বলেন যে, পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীরাই পাকিস্থানের বৃহত্তম শত্রু।

পাকিস্থান শিল্প ও বণিক সমিতি সঙ্ঘের অবৈতনিক সম্পাদক মিঃ এম এ জোয়াদ, এক বিবৃতিতে বলেন যে, বে-সরকারী বাজারে পাকিস্থানী টাকার মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে এক শত পাকিস্থানী টাকার পরিবর্তে ৯৩ হইতে ৯৫টি ভারতীয় টাকা পাওয়া যাইতেছে।

১২ই মার্চ—ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে মিঃ এ জে জনের নেতৃত্বে গঠিত কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আজ শপথ গ্রহণ করেন।

ভারতের খাদ্যমন্ত্রী শ্রী কে এম মুন্সী এক বিবৃতিতে বলেন যে, বর্তমান বৎসরে চাউলের অবস্থা খারাপ হইবে না বলিয়াই তিনি আশা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান বৎসরে ব্রহ্মদেশ হইতে প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন এবং থাইল্যাণ্ড হইতে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন চাউল আনিবার জন্য চুক্তি করা হইয়াছে। কিছু অসুবিধা হইলেও এই চাউল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বিধান সভার শেষ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি এই অধিবেশনে এক ভাষণ দেন।

১৩ই মার্চ—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অদ্যকার অধিবেশনে রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে বিতর্ককালে সরকার বিরোধী পক্ষ হইতে রাজ্য সরকারের বিনা বিচারে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে আটক রাখিবার নীতি, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টন-নীতি উদ্বাস্তু ও বাস্তুত্যাগী পুনর্বাসন নীতি এবং সরকারী বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করা হয়।

দেশব্যাপী পণ্যমূল্য হ্রাস এবং মন্দা অবস্থার কোন উন্নতি এ যাবৎ পরিলক্ষিত না হওয়ায় কলিকাতা পাটের বাজারে ও শেয়ার বাজারে উদ্বেগের ভাব এখনও বিদ্যমান।

১৪ই মার্চ—পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্য সরকারের ১৯৫২-৫৩ সালের বাজেট পেশ করেন। এই বাজেট হইতে দেখা যায় যে, আগামী বৎসরে রাজস্ব খাতে রাজ্য সরকারের মোট ৩৫ কোটি ৯১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা আয় এবং মোট ৪১ কোটি ১১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। ফলে ঐ বৎসর মোট ৫ কোটি ২০ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

নিয়ন্ত্রণ আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে কোন কাপড় বিক্রয় করা হইবে না এই সর্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যবসায়ী কর্তৃক ব্যবসায়ীর নিকট এবং খুচরা ব্যবসায়ী কর্তৃক সাধারণ ক্রেতার নিকট বস্ত্র বিক্রয়ের উপর হইতে অবিলম্বে সমস্ত বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, কাপড় কিনিবার সময়ে সাধারণ ক্রেতাদের পক্ষে আর রেশন কার্ড দাখিল করার কিংবা কুপন দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

১৫ই মার্চ—ভারত সরকার একটি মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী ভূপতি মজুমদার অদ্য হুগলী জেলার অন্তর্গত ইটাচুণায় দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের বাঁধ ও সেচ পরিকল্পনার অন্তর্গত ২নং খাল খননের উদ্বোধন করেন।

পাটনায় বিহার বিধান সভার নবনির্বাচিত কংগ্রেসী সদস্যদের এক সভায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিং সর্বসম্মতিক্রমে বিধানসভায় কংগ্রেসী দলের নেতা ও অর্থমন্ত্রী ডাঃ অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ সহকারী নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৬ই মার্চ—পাকিস্থান জাতীয় কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রদেশের সমস্ত কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস সদস্যকে শ্রীমনোরঞ্জন ধর, শ্রীগোবিন্দলাল ব্যানার্জি এবং শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন কংগ্রেস দলের এই তিনজন বিশিষ্ট পরিষদ সদস্যের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার নির্দেশ দিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১০ই মার্চ—অদ্য আমেরিকা জাপানকে এ বলিয়া আশ্বাস দিয়াছে যে, দখল করিয়া থাকা সময় উত্তীর্ণ হইলে পর নিরাপত্তা বাহিনী সৈন্যদলগুলিকে জাপানের প্রধান প্রধান শহরাঞ্চল হইতে দূরে সরাইয়া রাখা হইবে।

১১ই মার্চ—কিউবার বিদ্রোহী নেতা জেনারেল ফুল জেনকিও অদ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি কিউবা সরকারের শাসন ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন।

বৃটিশ অর্থমন্ত্রী মিঃ রিচার্ড বাটলার অদ্য পার্লামেণ্টে বাজেট পেশ করেন। ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে যে সকল প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহার ফলে সমাজের সর্বশ্রেণীর অধিবাসিগণকে কিছুটা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। খাদ্য বাবদ এতদিন যে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইত অর্থমন্ত্রী উহা প্রায় এক তৃতীয়াংশ হ্রাস করিয়াছেন এবং বিদেশ হইতে আমদানী পরিমাণ আরও হ্রাস করিয়াছেন।

১২ই মার্চ—সোভিয়েট রাশিয়া এবং অন্যান্য কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের কূটনৈতিক কর্মচারীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ইউরোপের বিভিন্ন অ-কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সরকারসমূহ আদেশ জারী করিয়াছেন।

১৩ই মার্চ—জাপ পার্লামেণ্টের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ কমিটির বৈঠকে অদ্য আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কিত জাপ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হিকোমাৎসু কামিকাওয়া বলেন যে, জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে।

১৫ই মার্চ—মিঃ থাকিন নু পুনরায় ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৬ই মার্চ—অদ্য পানমুনজনে যুদ্ধবন্দী বিনিময় আলোচনায় কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধিগণ দক্ষিণ কোরিয়ার কোন বন্দিশিবিরে কম্যুনিস্ট বন্দী হত্যার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান।

ভারতীয় মুদ্রাঃ প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষাণ্মাসিক— ১০৲

পাকিস্থান মুদ্রাঃ প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲ ষাণ্মাসিক— ১০৲ (পাক্)

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালকঃ আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ঐক্য

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন   সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

ঊনবিংশ বর্ষ]   শনিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৩৫৮ সাল।   Saturday, 29th March, 1952.   [২২শ সংখ্যা

কংগ্রেসের নির্দেশ

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্র বিধানানুযায়ী সর্বপ্রথম নির্বাচনের পরবর্তী এই অধিবেশনের বিশেষ গুরুত্ব আছে এবং সেই হিসাবে ইহা ঐতিহাসিক, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। নির্বাচনের লব্ধ অভিজ্ঞতা হইতে কংগ্রেস-নেতৃবর্গ তাঁহাদের কর্মপদ্ধতি প্রয়োজনানুরূপভাবে সংশোধন করিবার সুযোগ এই অধিবেশনে পাইয়াছেন। অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি হইতে এ পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যাইবে। গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে জনজীবনের সহিত সর্মাধিক সংযোগ স্থাপন এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির মান উন্নয়নের প্রস্তাবটি আমরা সর্মাধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। প্রকৃতপক্ষে এই উদ্দেশ্য কার্যকরভাবে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে সমাজের মধ্যে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক অসাম্য রহিয়াছে, তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই কাজটি করিতে গেলেই যে সব কায়েমী স্বার্থ জাতীয়তার অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে, সেগুলি অপসারণ করাও একান্তভাবে দরকার। বাস্তবিকপক্ষে কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তির বৈধ-নীতির পথে সমাজ-জীবনে অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপনের এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। সত্য কথা বলিতে গেলে, এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বন করিয়া এই পথে অগ্রসর হইতে অনেকটা সঙ্কোচবোধই করিয়াছে এবং বিপর্যয়ের ভয়ে বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করিতে সাহস পায় নাই। বিগত অধিবেশনেও এই সম্বন্ধে শুধু সদিচ্ছা প্রকাশ ছাড়া সুস্পষ্টভাবে কার্যত কোন নীতি নির্দেশিত হয় নাই। কিন্তু দীর্ঘ পরাধীনতার পর একটা জাতিকে নূতন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে বৈপ্লবিক প্রতিবেশ সৃষ্টি করিতেই হয়, নতুবা সমগ্র জাতির প্রাণধারা অতীতের অবসাদ ও গ্লানি কাটিয়া সাড়া দেয় না। বৃহৎ সৃষ্টি-প্রেরণাতেই জাতির মধ্যে প্রাণের ধর্ম জীবন্ত হইয়া উঠে। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত অধিবেশনে এই সত্যটি বাস্তব রূপ দিবার জন্য বিশেষ নির্দেশ প্রদত্ত হওয়াই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সমিতি উৎপাদন শিল্পের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে জমিদারী, জায়গীরদারী প্রভৃতি প্রগতি-বিরোধী কয়েকটি প্রথার বিলোপ সাধনের বিশেষ নির্দেশ দিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের স্বার্থই কংগ্রেসের স্বার্থ এবং কংগ্রেসের শক্তি সেইখানেই নিহিত রহিয়াছে। রাষ্ট্রীয় সমিতির জনজীবনের সঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনের উপর জোর দিয়াছেন এবং বিভিন্ন আইনসভার প্রতিনিধিস্বরূপে যে সব কংগ্রেসকর্মী নির্বাচিত হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্তব্য নির্দেশ করিয়াছেন। সবই ভালো, কিন্তু এ সব নির্দেশ কাজে কতটা সার্থকতা লাভ করিবে, ইহাই বিবেচ্য। প্রকৃতপক্ষে আইনসভায় গিয়া রাজনীতিক পাণ্ডিত্য ফলানো এবং নেতৃত্বাভিমান চরিতার্থ করাই কংগ্রেস কর্মীদের একমাত্র কর্তব্য নয়; পরন্তু দেশের জনসাধারণের সেবা এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হইয়া আইন-সভাসমূহে তাহাদের অভিমতের যথাযোগ্যভাবে প্রতিনিধিত্ব করার উপরই নেতা হিসাবেও তাঁহাদের মান-মর্যাদা নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা যদি সেবা ও ত্যাগমূলক সাধনার পথে দেশের নৈতিক শক্তিকে উজ্জীবিত করিয়া আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদের স্থান থাকা উচিত নয়; কারণ, তাঁহাদের তেমন কর্তব্যবিমুখতা সুস্পষ্টভাবে সমষ্টি চেতনার পথে জাতির অগ্রগতিকে ব্যাহত করিবে। বিভিন্ন আইন-সভার প্রতিনিধিস্বরূপে যে সব কংগ্রেসকর্মী নির্বাচিত হইয়াছেন, জনসেবার এই দায়িত্ব প্রতিপালনে তাঁহাদের প্রত্যেককে সমীহ থাকিতে হইবে। বিগত সাধারণ নির্বাচনে এই প্রয়োজন বিশেষভাবেই উপলব্ধি হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় সমিতি এ সম্বন্ধে প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মীকে সচেতন করিয়া দিয়া সঙ্গত কাজই করিয়াছেন; কিন্তু শুধু উপদেশ বা বিধান প্রণয়নই যথেষ্ট নয়; সেই সব উপদেশ বা নির্দেশ এবং বিধান অনুসারে যাহাতে কাজ হয়, প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসকে তৎসম্বন্ধে সচেতন থাকা প্রয়োজন। প্রত্যুত, আদর্শের অনুযায়ী যাঁহারা চলিতে পরাঙ্মুখ হইবেন, পদ মান এবং

প্রতিষ্ঠার [illegible] না তাকাইয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে দৃঢ়তা প্রদর্শিত হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়। বস্তুত কংগ্রেসের আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে এমন দৃঢ়তা অবলম্বন করাই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে গৃহীত প্রস্তাবগুলি শূন্যগর্ভ বাক্যমাত্রে পর্যবসিত না হয়, এইদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

বাঙলার তরুণদল ও রাজনীতি

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির বিগত অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল দেশের তরুণদলের মধ্যে অসন্তোষের ভাবের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কংগ্রেস-সভাপতি প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উত্থাপন করিয়া বলেন, তরুণদের ভিতরকার এই অসন্তোষের ভাবটি সব সময় যে সুস্পষ্ট এমন নয়; কিন্তু তাহাদের মনে অসন্তোষের ভাব যে একটা রহিয়াছে, ইহা বেশই বোঝা যায়। স্বাধীন ভারতে এতটা অসন্তোষের ভাব ইহাদের মনে দেখা দিবার কারণ কি, সময় সময় ইহা তাঁহার মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনকালে রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া কলিকাতার স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েরা যে আন্দোলন করে, এই মন্তব্য-কালে কংগ্রেস-সভাপতির মনের উপর তাহা সাক্ষাৎ সম্পর্কে কাজ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বিনা বিচারে আটক রাখিবার বিরুদ্ধে বাঙলা দেশের জনমত অত্যন্তই প্রবল, এ কথাটা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কারণ অতীতের অনেক দুঃখদায়ক স্মৃতি এই ব্যবস্থার সঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে এবং সেই সংস্কারের ধারা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ, বিশেষভাবে তরুণদের মনের উপর কাজ করিতেছে। ইহা ছাড়া, মোটামুটিভাবে তরুণদের মনে সব ক্ষেত্রেই আবেগপূর্ণ, আদর্শের প্রাণপূর্ণ একটা উদ্দীপনা তাহারা অন্তরে লাভ করিতে চায়। স্বাধীনতা লাভ করার পর উচ্চ আদর্শের প্রাণপূর্ণ এমন প্রতিবেশ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। জাতি গঠনের যত কথা তাহারা শুনিতেছে, কিছুই তাহাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেছে না। কারণ, তাহারা দেখিতেছে, যাহারা সমাজ এবং জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, একদিন দেশসেবার জন্য ত্যাগ তপস্যার প্রভাবে যাঁহারা জাতির অন্তরকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারাই আইন সভার সভ্য হইবার জন্য আড়াআড়ি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন এবং শাসন বিভাগের উচ্চ পদাধিকার পাইবার দিকেই তাঁহাদের লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। পরন্তু জাতি ও সমাজ গঠনের নিভৃত সাধনার জন্য আগ্রহ তাঁহাদের নাই, তখন স্বভাবতঃই তৎসম্পর্কিত সব উপদেশ তাঁহাদের কাছে ফাঁকা হইয়া পড়ে। শুধু ইহাই নয়, এই সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ যদি উক্তরূপ পদ, মান কিংবা প্রতিষ্ঠার সুযোগ সুবিধা না পান, তবেই তিনি বাঁকিয়া বসেন, এই সব ব্যাপার দেখিয়া গঠনমূলক কাজের প্রতি তরুণদের উৎসাহ উদ্যম স্বভাবতঃই শিথিল হইয়া যায়। অশান্তি এবং উত্তেজনা দেশের গঠনমূলক কাজগুলির অগ্রগতিতে অন্তরায় সৃষ্টি করে কংগ্রেস-সভাপতির এই উক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই; কিন্তু এসিয়ার সর্বত্র নব-জাগরণের একটা বৈপ্লবিক আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নিজেও এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেদিকে কংগ্রেসকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, যদি তাঁহারা জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ না হন, তবে অপরে আসিয়া তাহা অধিকার করিবে। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক প্রতিবেশ পুনর্গঠনের বৈপ্লবিক সংবেদনই তরুণদের মনে মুখ্যভাবে সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তরুণ মনের এই সংবেদন-শীলতাকে সার্থকভাবে প্রযুক্ত করিতে হইলে কংগ্রেসের আদর্শকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথেই প্রাণবন্ত করিয়া তোলা দরকার। নতুবা তরুণদের অন্তরের আবেগ এবং উদ্দীপনা বিপথে পরিচালিত হইবে, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে সে আশঙ্কার বিশেষ কারণ রহিয়াছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

জাতীয় পতাকার প্রতি মর্যাদা

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন উপলক্ষে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন করিতে গিয়া কংগ্রেসের সভাপতি স্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল সেদিন জাতির কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উপস্থিত করেন। ভারতবাসী হইয়া কিংবা ভারতের দলবিশেষের পক্ষ লইয়া বৈদেশিক পতাকা এখানে উত্তোলন করা, ইহা সত্যই সমগ্র জাতির পক্ষে অবমাননার বিষয়। পণ্ডিত[illegible] এজন্য স্বতঃই বেদনা বোধ করিয়াছে[illegible] দেশ এবং জাতির প্রতি মমত্ববোধ যাঁহা[illegible] বিন্দুমাত্র আছে, তাঁহারা সকলেই এ[illegible] বেদনাবোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু আ[illegible] তিতিক্ষা, পরমতসহিষ্ণুতা, বিশ্বমানবতে[illegible] এইগুলি বড় বলিয়া বুঝিয়া থাকি [illegible] অনেকটা সেইজন্যই বোধ হয়, দেশ[illegible] জাতির পক্ষে অবমাননাকর এই ধর[illegible] কাজ আমাদের বিবেকে বাঁধে না[illegible] বিদেশীর পতাকা উড়াইবার মত প্রতি[illegible] পাওয়া এখনও দেশে সম্ভব হয়। [illegible] সমগ্র জাতির রাষ্ট্রীয় সাধনার মূলে যাহা[illegible] বেদনা এবং আত্মদান প্রাণসঞ্চার করিয়[illegible] তাহাদের স্মৃতির অবমাননা নি[illegible] মানবতার দিক হইতে বড় [illegible] নয়; প্রকৃতপক্ষে ইহা অন্ধতা, ইহা দুর্ব[illegible] এবং এমন কাজে প্রাণধর্মবিহীন [illegible] বশ্যতারই পরিচয় পাওয়া যায়। জা[illegible] সমগ্র ইতিহাসকে ইহাতে অস্বীকার [illegible] হয়। নীতির দিক হইতে বিদেশী [illegible] জাতির বিশেষ মতবাদ প্রশংসনীয় হ[illegible] পারে, কিন্তু সমগ্র জাতির ঐতিহ্য [illegible] রাষ্ট্রীয় সাধনাকে অবমাননা করিবার [illegible] হৃদয়হীনতা নিশ্চয়ই মানুষোচিত হ[illegible] পারে না। জাতির স্বাধীনতায়, ত[illegible] অধিকারের প্রতি মর্যাদাবুদ্ধি [illegible] থাকিবে, তিনি জাতীয় পতাকার [illegible] মর্যাদাবোধ পোষণ না করিয়া পারেন[illegible] ব্রিটিশ পতাকা ভারত হইতে অপস[illegible] করিতে সমগ্র জাতিকে কি সুদীর্ঘ স[illegible] করিতে হইয়াছে, দেশের স্বদেশপ্রে[illegible] সন্তানদিগকে কিভাবে তাজা রক্ত ঢা[illegible] হইয়াছে, সে সব কি আমরা ভুলিয়া য[illegible] আমরা এমনই নরাধম হইয়া পড়িয়[illegible] প্রকৃতপক্ষে রাজনীতিক দাসত্ব [illegible] সাংস্কৃতিক দাসত্ব জাতির উন্নতির [illegible] সমধিক অনিষ্টকর। বৈদেশিক মত[illegible] মহিমা যতই থাকুক না কেন, সেই [illegible] বাদের ভিতর দিয়া সাংস্কৃতিক দাসত্ব [illegible] জাতির আত্মাকে অভিভূত করিয়া [illegible] তবে সে জাতির উন্নতি সুদূরপ[illegible] বুঝিতে হইবে। ফলত কোন বিদেশী র[illegible] পতাকার প্রতি অমর্যাদা-বোধ আমরা [illegible] করিতে চাহি না, এবং সে প্রয়ো[illegible] আমাদের নাই; কিন্তু সেই মর্যাদা [illegible] আমরা দেশ ও জাতির প্রতি মর্যাদা হা[illegible] বৈদেশিক পতাকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া আস্[illegible] করিব, এমন দৈন্যও যেন এদেশে দে[illegible]

হয়। ভগবান আমাদিগকে সেই গ্লানি হইতে রক্ষা করুন।

নমতের মর্যাদা

পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মিল্লার অধিবেশনে বাঙলা ভাষাকে পাকি-থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষাস্বরূপে স্বীকার রিবার দাবীকে সমর্থন করা হইয়াছে। লা বাহুল্য পূর্ববঙ্গ সরকার সম্মেলনের ই প্রস্তাবের মধ্যে রাষ্ট্র-বিরোধী ষড়-ন্ত্রের সন্ধান পাইবেন কি না, বলা যায় না; রণ বিচিত্র কিছুই নাই। কিন্তু সম্মেলন ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের জনমতেরই সমর্থন রিয়াছেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি তাঁহাদের র্তব্যই প্রতিপালন করিয়াছেন। বস্তুত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেখানে রাজনীতিক মর্যাদাবোধে জাগ্রত, সেখানে রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক উন্নতির প্রতি তাঁহারা অবহিত হইবেন ইহা স্বাভাবিক। দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্ববঙ্গের সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক মর্যাদাকে পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করিতে উদ্যত এবং চেষ্টিত হইবার ফলেই পূর্ববঙ্গের ভাষা-সম্পর্কিত এই সংকট দেখা দিয়াছে। অথচ এই সাংস্কৃতিক উন্নতির উপরই রাষ্ট্রের মর্যাদা বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। বস্তুত শিক্ষা সম্প্রসারণ যদি ব্যাহত হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সমাজ-জীবন যদি আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, তবে কোন রাষ্ট্রনৈতিক সূত্র ধরিয়াই রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করা সম্ভব হইতে পারে না। সংস্কৃতির বলেই মানুষের মধ্যে মানুষের মিলনের পথ প্রশস্ত হয় এবং সুসংহত সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠে। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সম্প্রতি পাকিস্থান গণ পরিষদে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি পূর্ববঙ্গের ভাষা সম্পর্কিত এই আন্দোলনে বিদ্রোহের পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহার মতে আন্দোলনের নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলাতে বড় সংকট কাটিয়া গিয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রীও বিদ্রোহের চেষ্টা এবং বাহিরের প্ররোচনার বিভীষিকার কথা তুলিতেছেন। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত এই আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দুদের যে কোন সম্পর্ক নাই, পূর্ববঙ্গের সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ একথা সুস্পষ্ট ভাষাতেই প্রকাশ করিতেছেন। তথাপি এই আন্দোলনের সম্পর্কে বিশিষ্ট হিন্দু নেতাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে। কিন্তু দাবীর জোর তাহাতে একটুকুও কমে নাই। পাকিস্থান গণপরিষদের প্রতিনিধি মিঃ হামিদ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন যে, ভাষা সম্পর্কিত এই আন্দোলনের পশ্চাতে পূর্ববঙ্গের জনমতের প্রবল সমর্থন রহি-য়াছে। কর্তৃপক্ষও জনমতের জোর যে এই আন্দোলনের পিছনে আছে তাহা বুঝিতেছেন না, এমন নয়; কিন্তু পূর্ব-বঙ্গের জনমত এই সম্পর্কে যতই প্রবল হোক না কেন, পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষাস্বরূপে গণ্য না করিতেই যে কৃতসংকল্প আছেন, আমরা ইহা অনুমান করিয়া লইতে পারি। কারণ, এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রশ্নটি তাহাদের কাছে প্রধান নয়। প্রত্যুত দ্বিজাতি তত্ত্বের নীতিটি পরিস্ফুট রাখিবার দিকেই তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য। বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষাস্বরূপে স্বীকার করিলে সেই ভাষার অন্তর্নিহিত উদার সংস্কৃতি তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে অন্তরায় ঘটাইবে, বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, অন্য কথায় সমগ্রভাবে পশ্চিম-বঙ্গের সহিত পূর্ববঙ্গের বন্ধন সমধিক পাকা হইয়া পড়িবে এবং এই পথে ইসলামের দোহাই দেওয়ার মামুলী নীতির জোর কমিবে, ইহাই তাঁহাদের আশঙ্কা। পাকি-স্থানের কর্তৃপক্ষ এইটি চাহেন না। খাজা নাজিমুদ্দীনের সাম্প্রতিক বক্তৃতাই সে পক্ষে প্রমাণ। ভারতই যত অনর্থের মূলে রহিয়াছে, তিনি এই ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে হুমকীও কিছু দেখাইয়াছেন। তাঁহারা নাকি আগাগোড়া ভারতের সঙ্গে শান্তি ও প্রীতির সম্পর্কই স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু ভারতই অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। খাজা নাজিমুদ্দিন প্রভৃতি পাকি-স্থানের নীতির নিয়ামকগণ যদি সত্যই ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে মৈত্রী এবং সদ্ভাব কামনা করিতেন, তবে পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জনমতকে মর্যাদা দানে অগ্রসর হইতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হইতেন না। প্রকৃত-প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্থান সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে কোন সমস্যাই নাই, কেবল সমস্যা রহিয়াছে শুধু পূর্ববঙ্গে। পূর্ববঙ্গে এই প্রশ্নের যদি সমাধান হইয়া যায় এবং সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সাংস্কৃতিক প্রতিবেশের মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তা উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে ভারত ও পাকিস্থানের ভিতরকার গোলযোগ কাটিতে বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বারাণসী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের জয়ন্তী

বেনারস রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উত্তর ভারতে এত বড় সেবা প্রতিষ্ঠান নাই বলিলেও চলে। অর্ধ শতাব্দী কাল এই প্রতিষ্ঠান স্বামী বিবেকানন্দের সমুন্নত আদর্শের অনুসরণ করিয়া শত শত আর্ত এবং পীড়িত নরনারীকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিয়া আসিতেছেন। গত ৬ই হইতে ৯ই মার্চ এই তিন দিন এই সেবাশ্রমের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বেনারসের মহারাজা শ্রীবিভূতিনারায়ণ সিংহ, ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজী এবং ভারত সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর কে সি রাজা যথাক্রমে এই কয়েক দিনের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। এতদুপলক্ষে সেবাশ্রমের হাসপাতালের রঞ্জন-রশ্মি বিভাগের উদ্বোধনটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ব্যাপার। বহুদিন হইতে আশ্রমের এই ব্যবস্থার বিশেষ অভাব অনুভূত হইতেছিল। ভারত সরকার এই বিভাগটি প্রতিষ্ঠার জন্য সেবাশ্রমকে ৬ শত টাকা সাহায্য করেন, কিন্তু স্বনামধন্য মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য মহেশ ভট্টাচার্য এণ্ড কোম্পানী ২০ হাজার টাকা প্রদান করাতেই প্রধানতঃ সেবাশ্রমের এতৎ-সম্পর্কিত অভাবটি পরিপূরিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। স্বর্গীয় মহেশ ভট্টাচার্য মহাশয় পুণ্যশ্লোক ব্যক্তি। আর্তসেবায় এবং জন-হিতব্রতে তাঁহার বদান্যতা সর্বজনবিদিত। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণও মানব-সেবার সেই ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছেন ইহা খুবই সুখের বিষয়। সেবাকার্যের রঞ্জনরশ্মি বিভাগে এই দানের জন্য তাঁহারা জাতির ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কিন্তু আশ্রমের অনেক কাজে অর্থের অভাব এখনও রহিয়াছে। বিগত সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে সেবাশ্রমের সম্পাদক যে কার্য-বিবরণী দিয়াছেন তাহাতে আশ্রমের আর্থিক সংকটের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আশা করি, বেনারস রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের দরিদ্রনারায়ণ-সেবাব্রতের সম্প্রসারণকল্পে পুণ্যশীল ব্যক্তিবর্গ মুক্তহস্তে অগ্রসর হইবেন।

স্মৃতিকথা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

৮৩

১৩৩৪ সালের ১লা আষাঢ় আমার জীবনের একটি সুবর্ণরেখাঙ্কিত দিন সে কথা পূর্বেই বলেছি। ট্রামে, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের গৃহে, যেখানেই যাই বিচিত্রার কথা শুনি। বাঙলা দেশ জুড়ে একটা সাড়া পড়ে গেছে!

একটা নেশা লেগে গেছে আমার। বিক্রয়ের বহর ও গতি দেখবার জন্য কলিকাতার মোড়ে মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি; কখনো হ্যারিসন রোড—কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে, কোনোদিন শিয়ালদা স্টেশনের চৌরাস্তায়, কখনো এসপ্ল্যানেডে ট্রাম কোম্পানীর চত্বরে, কখনো বা বৌবাজার-ওয়েলিংটনের চৌমাথায়। রেলের হুইলার কোম্পানী আমাদের বড় খদ্দের। হাওড়া স্টেশনে হুইলারের বুক-স্টলের অদূরে দাঁড়িয়ে ক্রয়-বিক্রয় লক্ষ্য করি। থাকবন্দি হয়ে স্তূপাকারে বিচিত্রা সজ্জিত। খদ্দের এসে সকলের ওপরকার বিচিত্রাখানা তুলে দেখতে আরম্ভ করে। প্রথমে ছবি দেখে, তারপর লেখা। স্তূপের উপর এলোমেলোভাবে কাগজখানা রাখলেই বুঝি সুরাহা। পরবর্তী কাজ বুকপকেট থেকে মনিব্যাগ বার করে আট আনা পয়সা বার করা। খুশিতে মন ভরে ওঠে। কিন্তু স্তূপের উপর সযত্নে সমান করে সাজিয়ে রাখলেই বুঝি বেগতিক। সে যত্ন প্রত্যাখ্যানের যত্ন, ফেলে রেখে যাবার উদ্যোগ। মনে মনে সিদ্ধান্ত করি, উল্টে-পাল্টে দেখে যে ব্যক্তি কেনে না, সে হয় কৃপণ, নয় অরসিক।

একদিনের একটি কৌতুকজনক ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে। দক্ষিণগামী ট্রামের অপেক্ষায় হ্যারিসন রোড-কলেজ স্ট্রীট সংযোগের উত্তর-পূর্ব কোণে দাঁড়িয়ে আছি। পিছনেই ফুটপাথের উপর দুটি বাঙালী যুবকের খাতাপত্র, দৈনিক খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রাদির দোকান। যুবক দুটির আকৃতি দেখে মনে হয় দুজনে সহোদর ভাই।

দোকানের কাঠের তাকের ওপর দুই থাক বিচিত্রা; মোট সংখ্যা শ' দেড়েকের কম হবে না। দোকান থেকে এক-একখানা করে বিক্রয় হচ্ছে; তা ছাড়া পশ্চিমা হকাররা সেই দোকান থেকে নিয়ে নিয়ে দৌড়োদৌড়ি হাঁকাহাঁকি করে ট্রামের আরোহী ও পথ-চারীদের বিক্রয় করছে। আমি পরিতোষ সহকারে নিরীক্ষণ করছি। এমন কি দুই একটা ট্রাম ছেড়েও দিচ্ছি।

এমন সময়ে এক ব্যক্তি এসে দোকানদার দুজনের সঙ্গে গল্প লাগালে। খরিদ্দার নয়; কথোপকথন থেকে মনে হল দোকানদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠত্ব আছে; হয় ত' তার নিজের

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত এই সপ্তাহে 'চেনা মহল' উপন্যাস প্রকাশিত হইল না। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠকবর্গের নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

—সম্পাদক দেশ

স্টলও কোথাও থাকতে পারে। এক সময়ে আগন্তুক বললে, "বইটা কিন্তু বেশ বিক্রী হচ্ছে।"

দোকানদারদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্ বই? বিচিত্রা?"

"হ্যাঁ?"

এতক্ষণ কানে যা আলগাভাবে প্রবেশ করছিল, কিছু কিছু তার শুনছিলাম; বিচিত্রার কথা শুনে কান খাড়া করলাম, বিশেষ করে বাম কান। দৃষ্টি কিন্তু চৌমাথার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত অদূরবর্তী ওয়াই.এম সি-এর ইমারতের উপর এমন প্রগাঢ়-ভাবে নিবদ্ধ রাখলাম যে, মন যে তখন বিষয়ান্তরে লিপ্ত থাকতে পারে, তা বোঝবার কোনো লক্ষণই প্রকাশ রইল না।

দোকানদার বললে, "নতুন বই, কিছু বিক্রী হবে বই কি। তবে বেশি দিন নয়। ভাদ্র মাসে আর ও বই বেরোবে না।"

সর্বনাশ! বলে কি! দৈবজ্ঞ না কি? ওয়াই এম সি-এর উপর হতে অপসারিত হয়ে দৃষ্টি নিমেষের মধ্যে এসে দাঁড়াল কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির উপর।

কৌতূহলী হয়ে আগন্তুক জিজ্ঞাসা করলে, "কেন বল দেখি, ভাদ্র মাসে বই বেরোবে না কেন?"

দোকানদার বললে, "আড়াই হাজার টাকা নিয়ে নেবেছে, তার মধ্যে দু'হাজার খরচ হয়ে গেছে। বাকি পাঁচ শ'তে ধার-ধোর করে কোনো রকমে শ্রাবণের কাগজটা বেরোবে। তারপর ভাদ্রের কাগজ আর বেরোবে না।"

একেবারে পরিচ্ছন্ন হিসেব!

বিক্রয়লব্ধ অর্থ, বিজ্ঞাপনের আয়, এ সকল জটিলতার বালাই নেই, শুধু মূলধনের নিকাশ! একটু রহস্য করবরার ইচ্ছা হল, ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, "আড়াই হাজার টাকা কি করে তুমি জানলে? বিচিত্রা-নিকেতনের ক্যাশবাবুর সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বুঝি?"

একটু সবজান্তা মুরুব্বিয়ানা চালে দোকানদার বললে, "আমাদের সঙ্গে কারবার, আমরা আর জানিনে?"

বললাম, "কিন্তু আমি যদি বলি, এর মধ্যে তাদের দশ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে, তা হ'লে?"

আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অল্প একটু হেসে দোকানদার বললে, "হুঁ! দশ হাজার টাকা! কি যে বলেন আপনি!"

"কিন্তু আমার সঙ্গেও যে ওদের কারবার আছে।"

'কি কারবার?"

"আমি ওখানে সম্পাদকি করি।"

"আপনি বিচিত্রার সম্পাদক?"

"সেই রকমই ত' জানি।"

বক্রকটাক্ষে বিচিত্রার কভারের উপর ত্বরিত দৃষ্টিপাত করে দোকানদার বললে, "সম্পাদক ত' উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।"

বললাম, "আমার উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় হবার পক্ষে কোনো আপত্তি আছে কি?"

কূট প্রশ্ন! 'আছে' বললে জেরায় পড়বার আশংকা, 'নেই' বললে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা। প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে দোকানদার বললে, "আপনাকে ত অপিসে দেখতে পাইনে?"

বললাম, "তার কারণ, তোমার কারবার আমার সঙ্গে নয়, তোমার কারবার বিক্রয়-বাবুর সঙ্গে। তা ছাড়া, এই ত' ক'দিন মাত্র কাগজ বেরিয়েছে, এর মধ্যে ক'বারই বা বিচিত্রা অফিসে গেছ যে, আমাকে দেখতে পাবেই। এবার যেদিন যাবে, সম্পাদকের ঘ

...া করে নিয়ে উঁকি মেরো, দেখতে এখনো কি বলতে চাও, কারবার শুধু ...র সঙ্গেই আছে, আর ভাদ্র মাসে কাগজ ...ে না?"

...কানদার বোধহয় এ কথার কোনও উত্তর পেলে না। চুপ করে রইল। তার ...তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ঈষৎ ...কারের সুরে বললে, "এসব কথায় ...র দরকার কি?" তারপর আমাকে ...ধন করে বললে, "যেতে দিন বাবু, ...দিন, ও কিছু জানে না।"

...লাম, "সেইটেই ত' গুরুতর অপরাধ। ...জানে না, অথচ সবজান্তামি করবে। ...ড়া, কত বড় অধর্মের কথা দেখ! ...র হাজার টাকা ফেলে তারা কারবার ... যার কল্যাণে তুমিই দু পয়সা উপায় ... আর তার বদলে এত বড় চৌমাথায় ...য়ে তাদের বিরুদ্ধেই অপপ্রচার ...য়েছ। একথা জানতে পেরে তারা যদি ...ষ্ট করবার অভিযোগে তোমার বিরুদ্ধে ...দফা ফৌজদারি চালায়, তা হলে ত বিশ ...জলের তলায় পড়বে।"

... ঢং করে ট্রাম আসছিল, প্রস্থানোদ্যত ...ম।

...বাবু!"

...পিছন ফিরে দেখি এক দফা ফৌজদারির ...ম দোকানদার ও বন্ধু, উভয়েরই মুখ ...কিয়েছে। বললাম, "কি?"

"অপরাধ হয়েছে,—মাপ করুন!"

"আচ্ছা,—আর যেন এমন অপরাধ না ...।" ট্রাম এসে দাঁড়িয়েছিল, তাড়াতাড়ি ...য়ে উঠে বসলাম।

আমি আসল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ...থবা ওদের কথোপকথন শুনে ফেলার ...যোগ নিয়ে এক চাল তামাসা করে গেলাম, ...ন বিষয়ে ওদের মনে কোনও সংশয় জাগ্রত ...য়েছিল কিনা বলতে পারিনে; কিন্তু এর ...র যখনই ঐ স্থানে এসে দাঁড়িয়েছি, ...দাকানদার যুবক মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছে। ...বোধ হয় কোনো দিন বিচিত্রা অফিসে গিয়ে ...সম্পাদকের ঘরে উঁকি মেরে থাকবে।

৮৪

শ্রাবণ সংখ্যার লেখা প্রায় সমস্তই ঠিক হয়েছিল। এমন কি কতক লেখা জ্যৈষ্ঠ মাসের দু-চার দিন বাকি থাকতে ছাপাখানায় পাঠিয়ে দেওয়াও হয়েছে। বাকি লেখা স্থির হয়ে যাওয়ার পর আমি একদিন হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হয়ে ভাগলপুরের টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসলাম। একটা ছোটখাটো ভ্রমণ প্রস্তাব (Tour-programme) ঠিক করে নিয়ে চলেছি প্রস্তাবের প্রথম স্থান ভাগলপুরে। আমার ভ্রমণ-প্রস্তাবের পরিক্রম-রেখা কতকটা এই ধরণের ছিল, কলিকাতা-ভাগলপুর-পাটনা-মজঃফরপুর-ছাপরা-কাশী-গয়া-মুঙ্গের-ভাগলপুর-কলিকাতা। সঙ্গে কয়েক খণ্ড বিচিত্রাও নিয়েছি বিতরণের এবং নমুনার জন্য।

পরিক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিহারের কয়েকটি বাঙালী-প্রধান শহরে উপস্থিত হয়ে তথাকার সাধারণ ও উচ্চশ্রেণীর পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচিত্রা কিভাবে গৃহীত হয়েছে, তা উপলব্ধি করা। আমরা বহুদিন হতে বিহারের অধিবাসী; উপরের যে শহরগুলির উল্লেখ করেছি, সেগুলিতে আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা যথেষ্ট; সুতরাং বিচিত্রা সম্বন্ধে ঐ শহরগুলির বাঙালী সম্প্রদায়ের যথার্থ অভিমত সহজেই সংগ্রহ করতে পারা যাবে। তা ছাড়া, আমার ব্যক্তিগত উপস্থিতির সাহায্যে ঐ সকল স্থানে বিচিত্রার জনপ্রিয়তা যথাসম্ভব বর্ধিত করা এবং প্রচারকার্য সামান্য কিছু চালানোও উদ্দেশ্যের মুখ্য না হোক, গৌণ অংশ ছিল।

শয্যার উপর সমগ্র দেহটাকে আনন্দ ও আরামের স্বচ্ছন্দ বিস্তারে ছড়িয়ে দিয়ে গতিশীল ট্রেনের মৃদুমন্দ দোল খেতে খেতে অগ্রপশ্চাৎ নানা কথার চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে ভাগলপুরের পথে এগিয়ে চলেছিলাম। চিন্তা, কিন্তু দুশ্চিন্তা নয়। কলিকাতায় দেখে এসেছি আশাতীত সাফল্য, সম্মুখে যে প্রত্যাশা অপেক্ষা করছে, তারও চতুর্দিক সুবর্ণ রেখায় মণ্ডিত। একটা সুমিষ্ট তৃপ্তির তরল আনন্দে সমস্ত অন্তর নিষিক্ত বোধ করছিলাম।

কিন্তু কে তখন জানত, এমন এক নিরতিশয় বেদনাদায়ক সংঘাত আসন্ন হয়ে উঠেছে, যার ফলে আমার ভ্রমণ প্রস্তাব অর্ধ-সমাপ্ত রেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হৃদয় নিয়ে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় ফিরতে হবে। হয়ত আমার কলিকাতায় অবস্থানকালেই বহিমান হবার পূর্বে যে অবস্থা ধূমায়িত হচ্ছিল, তার কোনো আভাস পূর্বে পাইনি। তা যদি পেতাম, আমার পরিক্রম-রেখার উপর একটি পাও অর্পণ করতাম না।

প্রত্যূষে ভাগলপুর পৌঁছে বিচিত্রা কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণের দ্বারা চা ও খাবারের মজলিশ সরগরম করে তুললাম। আষাঢ় মাসের বিচিত্রা অবশ্য এ মজলিশে নূতন জিনিস নয়, প্রকাশিত হওয়া মাত্র এক কপি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, যেমন পাঠিয়েছিলাম কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকেও।

যে ভদ্রমহিলা নিজের ব্যক্তিগত রিক্ততা-তিক্ততাকে গৌণ স্থান দিয়ে একান্ত নিষ্ঠার সহিত আমার পুত্রকন্যাগণের রক্ষণাবেক্ষণের কার্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। আশ্বাসও দিলাম, লক্ষণ যেরূপ উৎসাহোদ্দীপক, সম্ভবতঃ খুব বেশি দিন দূরবর্তিনী হয়ে থাকতে হবে না। তবে যে

পক্ষী দুই শত পঁয়ষট্টি মাইল দূরবর্তী একটি নূতন গাছের শাখায় উড়ে গিয়ে নীড় রচনায় চেষ্টিত হয়েছে, তার নীড় বাঁধা বেশ-খানিকটা কায়েম হবার পূর্বে পক্ষিণীর পুরাতন নীড় আগলে থাকাই সমীচীন, সে উপদেশ দিতেও ভুললাম না।

সকালেই বন্ধু-মহলে খানিকটা ঘুরে এলাম। যাঁরা বিচিত্রা পেয়েছিলেন অথবা দেখেছিলেন, তাঁদের প্রশংসাবাণীর দ্বারা শ্রবণ এবং মন উভয়ই পরিপূর্ণ হল।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে একটু বিশ্রামের পর আদালতের অভিমুখে রওয়ানা হলাম। উভয় পার্শ্বে সুদীর্ঘ বিটপীনিবন্ধ ছায়াশীতল ক্লাইভল্যান্ড রোড দিয়ে যেতে যেতে মনের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব চেতনা উপলব্ধি করতে লাগলাম। বহুদিন এই পথে গতায়াত করেছি ব্যবহারজীবী রূপে; আজ চলেছি সাহিত্যজীবী হয়ে। চোগা-চাপকান-প্যান্টের পরিবর্তে আজ পরিধানে ধূতি-পাঞ্জাবী। হাতে আর্জি-বিয়ানতহরির-এজাহার সমন্বিত ব্রীফের পরিবর্তে কাগজে মোড়া একখণ্ড বিচিত্রা। এ যেন চলেছি মথুরার পথ ধরে বৃন্দাবনের পথে। এ পথের প্রত্যেকটি তরু, পাদপ লতা-গুল্ম আমার পরিচিত। বায়ু-হিল্লোলিত হয়ে তারা যেন আমাকে অভিবাদন করতে করতে বলছে, বন্ধু, এই হয়ত' শেষ দেখা! আর কোনোদিন তুমি হয়ত' এ পথে পদার্পণ করবে না। নূতন পথ তোমাকে জয়যুক্ত করুক।

আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হতে কে যেন বলতে লাগল, নববর্ষার সুবৃষ্টি-ধারায় স্নাত হয়ে তোমরা সজীব হও, পুষ্পিত হও! আকাশের জল-বায়ু-আলোক তোমাদের মঙ্গল করুক।

বার-লাইব্রেরী কক্ষে প্রবেশ করতেই একটা সশব্দ অভ্যর্থনার দ্বারা অভিনন্দিত হলাম। আমার পেশাবিগর্হিত বেশ দেখে সকলেই বুঝতে পারলে ফিরে না আসবার সপক্ষে সেটা যথেষ্ট নোটিশ। অন্তর না বদলালে কেউ ভেকও বদলায় না, ভোলও ফেরায় না। তবু যেটুকু সন্দেহ ছিল, মোড়ক খুলে বিচিত্রাখানা টেবিলে স্থাপন করতেই তা নিঃশেষে অপসৃত হল। অমন সবল এবং সুষ্ঠু লক্ষণ দেখতে পাওয়ার পর প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করতে বিলম্ব হয় না। সকলেই যে কথা বলতে লাগল তার সারমর্ম হচ্ছে, নোনা জল ছেড়ে মিষ্টি জলের মাছ এবার মিষ্টি জলে গেছে। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি এমনই অদ্ভুত জিনিস, মিষ্টি জলে ফিরে যাওয়ার জন্যে কয়েকজন মুরুব্বি শ্রেণীর উকিল আমাকে যখন অভিনন্দিত করছিলেন, তখন এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে নোনা জলের জন্যে আমার মনের একটা দিক হায় হায় করছিল। এই নোনা জলে দীর্ঘ বারো বৎসর সন্তরণ দিয়েছি, সে কি এত শীঘ্র ভোলা যায়?

বিচিত্রাখানা হাতে হাতে টেবিলের চতুর্দিকে ঘুরতে ঘুরতে প্রশংসা অর্জন করতে লাগল। যারা মর্ম বুঝলে না তারা রূপ দেখে মুগ্ধ হল। যারা রূপও দেখলে মর্মও বুঝলে তাদের অধিকাংশ লোক ভি পি করবার অনুরোধ জানিয়ে নাম লেখাতে লাগল।

এসেছিলাম রথ দেখতে, কিন্তু কলা বেচার কলে দৈব এমন সজোরে দম লাগিয়ে দিলে যে, পাটনা হয়ে মজঃফরপুরে পৌঁছবার দিন তিনেক পরে খতিয়ে দেখি, ভাগলপুর পাটনা ও মজঃফরপুর এই তিনটি শহরের অযাচিত নূতন গ্রাহকের সংখ্যা এক শত অতিক্রম করে গেছে। এ এক শ' গ্রাহকের এক শ'টিকেই স্বয়মাগত বলা যেতে পারে। আমার উপস্থিতি পরোক্ষভাবে কিছু কাজ হয়ত করেছিল, কিন্তু আমি নিজে একটি লোককেও গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধ করিনি।

গ্রাহক হবার এই স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ দেখে উল্লসিত হলাম। আশা হল দৈবের কলে দম যদি না ফুরোয়, আমার ভ্রমণ-প্রস্তাব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ শ' তিনেক নূতন গ্রাহক লাভ করার কৃতিত্ব দাবী করতে পারব। কিন্তু সহসা একদিন অনাশঙ্কিতভাবে দম ফুরোল। বোধ করি একই ডাকে কলিকাতা থেকে এক সঙ্গে দুখানি চিঠি পেলাম, যে চিঠি দুটির মধ্যে বিরোধের তীব্র অভিযোগ বর্তমান। অবিলম্বে কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের জন্য দুখানি চিঠিতেই আমার প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ। একটি চিঠি যতিনাথের, অপরটি সতীশ ঘটকের। পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে মতান্তর দেখা দিয়েছে, কিন্তু মতান্তরের পাশে পাশে মনান্তরের উষ্ণ হল্কা। আশঙ্কা হল, বিচিত্রার ভাগ্য-আকাশের বায়ু কোণে ঝটিকার মেঘ সঞ্চার হয়েছে।

সেই দিনই তল্পি-তল্পা বেঁধে কলিকাতা রওয়ানা হলাম। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে যে পথে আশার সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতে এসেছিলাম, প্রত্যাবর্তনকালে সেই পথ দুশ্চিন্তায় নিদ্রাহীন হয়ে উঠল।

পরদিন কলিকাতায় পৌঁছেই উভয় পক্ষের মনান্তর অপনীত করে পূর্ণাবস্থা ফিরিয়ে আনবার কার্যে আত্মনিয়োগ করলাম। কিন্তু আমার এবং কান্তিবাবুর মিলিত চেষ্টা নিষ্ফল হল, বিচিত্রার সহিত যতিনাথ এবং অমলবাবুর যোগ ছিন্ন হয়ে গেল।

এই বিপর্যয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। বিচিত্রা পরিচালনায় যতিনাথ এবং অমলবাবু উভয়ের সহায়তাই বিশেষ মূল্যবান ছিল। অমলবাবুর ত কথাই নেই। প্রবন্ধ ও চিত্র সংগ্রহ, বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা, মুদ্রণ কার্য সকল বিষয়েই তাঁর দক্ষতা লোভনীয় বস্তু ছিল।

সঙ্কট দেখা দিলে!

কিন্তু সঙ্কটের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কটকে অতিক্রম করবার একটা দুর্বার শক্তিও মনের মধ্যে দেখা দিতে আরম্ভ করলে। সেই শক্তিকে সর্বতোভাবে সংহত করে নিয়ে বিচিত্রা পরিচালনার কার্যে মনপ্রাণ নিয়োগ করলাম। (ক্রমশ

কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন

গত শনিবার ২২এ মার্চ সকালবেলা উঠে লেক ময়দান অভিমুখে রওনা হলাম। জওহরলাল ৮টার সময় পতাকা উত্তোলন করবেন। কত লোক সেখানে জমায়েত হবে আগে আন্দাজ করা যায়নি। কিন্তু লেকের কাছ-বরাবর এসে দেখি, রাস্তা থেকে লোকারণ্য।

বাঙলার কুটীরের ধাঁচে তোরণের ওপর খড়ের চালা তৈরী। প্রথমেই এ তোরণের ওপর চোখ পড়ায় মনে হল, অভিজাত পল্লী বলে আখ্যাত লেক-অঞ্চল সত্যিই আজ বাঙলারই এক পল্লী। অভিজাত বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি তাঁদেরই যাঁরা বিশেষ-কোনো দেশের আচার-আচরণ দ্বারা আচ্ছাদিত নন; বিশেষ ক'রে যাঁরা বাঙালী হলেও চালে-চলনে কথায়-বার্তায় তাঁরা বাঙালী নন্। সেই অভিজাত-অঞ্চল আজ বাঙলার পোষাকেই যেন সেজে ব'সে আছে। তাই এই অঞ্চলটাকে আজ সত্যিই আপনার বলে মনে হল।

দমদম বিমানঘাটিতে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নেহরু—গত ২১শে মার্চ বিমানঘাটিতে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নেহরুকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন

হয়তো এমনি আপনার বলে মনে হয়েছে আরও অনেকের। তা না হলে সকালের দিকেই এত ভীড় হল কেন? কে তাঁদের এভাবে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে এসেছে? জওহরলালজী? এ-ও খানিকটা সত্যিই—কারণ তাঁকেও দূরে ব'লে মনে হয় না। তাঁকেও মনে হয় আপনার।

উন্মুক্ত মাঠ। লোকে লোকারণ্য। মায়েরা এসেছেন, মেয়েরা এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে এসেছে কেবল বালকরা নয়, শিশুরাও। সকল স্তরের লোক, প্রাসাদবাসী থেকে শুরু ক'রে দীনতম কুটীরবাসী। দীনতমদের মধ্যেই উৎসাহটা দেখা গেল বেশি, এটা ভাবাবেগের কথা নয়, চাক্ষুষ দেখা। চোখে-মুখে চেহারায় পরিচ্ছদে দারিদ্র্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেই জীর্ণ জীবনের মধ্য থেকেও প্রকাশিত হচ্ছে আশা আর উৎসাহ। তারা অভিবাদন করতে এসেছে পতাকা।

বিমানঘাটিতে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী—সামরিক কায়দায় কংগ্রেস সভাপতিকে অভিনন্দন জানানো হয়

স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। সেবকদের পরনে নীল হাফপ্যাণ্ট আর গায়ে সাদা হাফ শার্ট, সেবিকাদের পরনে টুকটুকে লাল পাড়ের খদ্দরের শাড়ি। পতাকা দণ্ডের সম্মুখে তারা দাঁড়িয়ে, কংগ্রেস-সভাপতির আগমন প্রতীক্ষায়। দণ্ডটি আকাশে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথার দিকে একটি ফুটন্ত ফুল যেন বাঁধা। কিন্তু ওটি ফুল নয়, চরকা-চিহ্নিত ত্রিবর্ণ পতাকা কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখা আছে, নীচ থেকে সুতো ধ'রে টানলেই খুলে যাবে ভাঁজ। দণ্ডের মূলে গোল্যাকৃতি সোপান, সোপানের পার্শ্বদেশ কারুকার্যের দ্বারা চিহ্নিত—শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা এঁকেছেন।

পরিবেশটি মনোরম বলে ঠেকল। রোদ্দুর উঠেছে। লেকের নিভৃত অঞ্চলটি উৎসুক

কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের জন্য যে মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল তাহাকে রূপসজ্জায় শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলেন বিশ্বভারতী কলাভবনের ৪০ জন ছাত্রছাত্রী। মণ্ডপের পটভূমিকায় অঙ্কিত এই চিত্রাবলী তিন ভাগে বিভক্ত। বাম দিকে ভারতের জীবনধারার প্রধান অংগ কৃষিকার্যের পূর্ণ চিত্রাবলী রহিয়াছে, দক্ষিণে রহিয়াছে বৃহৎ কারখানার সহিত নানাবিধ কুটীরশিল্পের চিত্রাবলী এবং মধ্যস্থলে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মকে প্রতীক রাখিয়া কৃষি ও কারখানার সমন্বয় রূপ দেখানো হইয়াছে। পদ্মের চতুষ্পার্শ্বে কলাশিল্প, সংগীত ও শিক্ষার চিত্রাবলীর দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির রূপ ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে

জনতায় পূর্ণ, কিন্তু কলরব-কোলাহল নেই। পতাকা দণ্ডের পশ্চাতে বিরাট মণ্ডপ। এইখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে দুপুরে। ৮টার একটু আগে নেহরু এলেন। উৎকণ্ঠ-জনতা উঠে দাঁড়াল, নেহরুকে দেখার আগ্রহে। কিন্তু ক্রমশঃ তারা শান্ত হয়ে বসল। শুরু হল বন্দেমাতরম গান। চারদিকে লাউড স্পীকারের ব্যবস্থা ছিল--এই গানের দ্বারা মুখরিত হয়ে উঠল
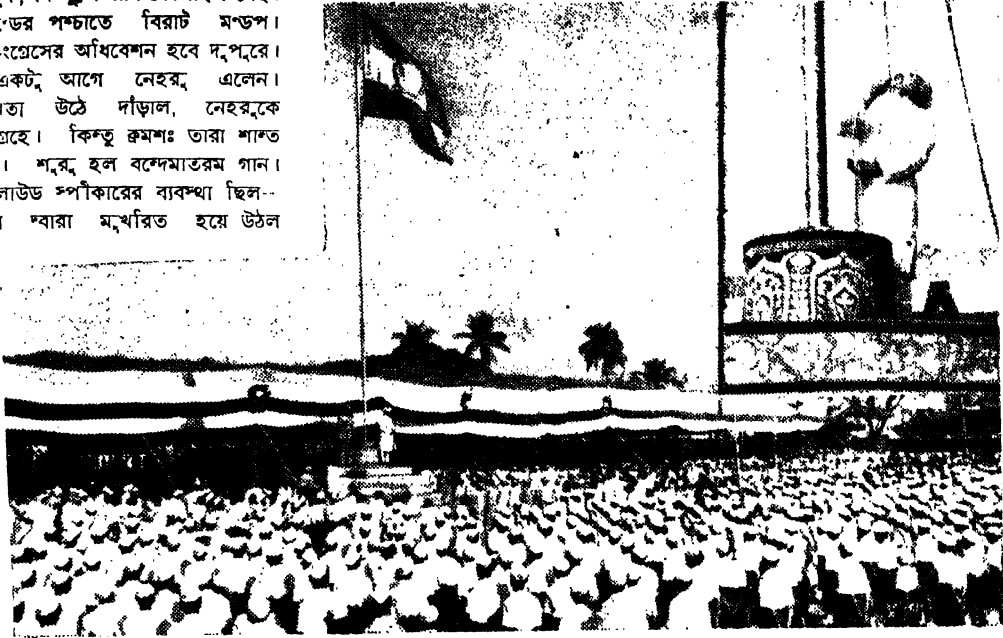
গত শনিবার প্রাতে লেক ময়দানে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন করিয়া শ্রী নেহরু কংগ্রেস অধিবেশনের সূচনা করিতেছেন

নীরবতা। তার পর নেহরু সুতো ধ'রে টানতেই খুলে গেল ভাঁজ, উড্ডীন হল পতাকা। প্রসন্ন বাতাসে উড়তে লাগল নিশান।

জওহরলাল পতাকার কথা বললেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় কথা যেটা বললেন সেটির সম্বন্ধে আমাদের সকলের সত্যই সজাগ হওয়া দরকার। কংগ্রেসপতাকা প্রসঙ্গে তিনি ভারতের জাতীয় পতাকার কথা তুলে বললেন, নিজ নিজ জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষা করার জন্যে প্রত্যেক জাতি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ভারতের অধিবাসীর একাংশ জাতীয় পতাকার মূল্য ও মর্যাদা এখনো সঠিক বুঝতে পারেনি—এটি দুঃখের কথা। এখানে বিভিন্ন পার্টি আছে, তাদের নীতিও বিভিন্ন। এর সম্বন্ধে কিছু বলার নেই। কিন্তু এইসব দলের মধ্যে বিশেষ একটি দল বিদেশের পতাকা নিয়ে ভারতভূমিতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে চায় এবং আশ্চর্যের বিষয় এই, ভারতবাসী তা বরদাস্ত করে। বিদেশের পতাকার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতে ভারত চায় না, বিদেশী পতাকার যেটুকু প্রাপ্য সম্মান সেটুকুই সে পাবে, তার বেশি না।
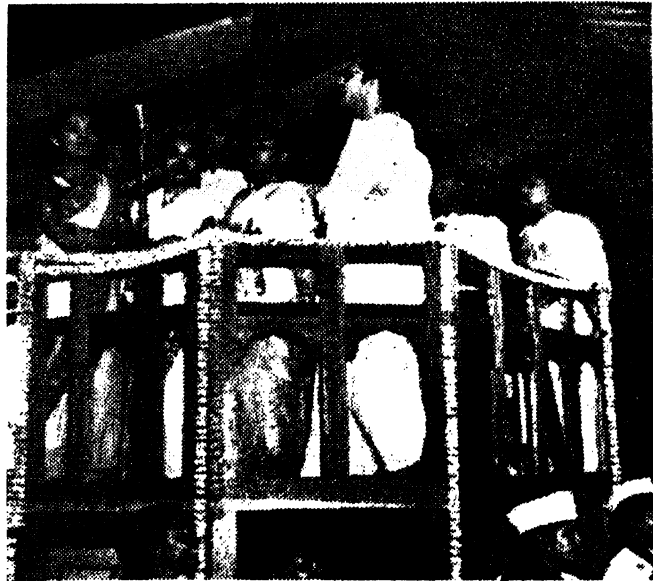
কংগ্রেস অধিবেশনে জাতীয় সংগীত 'বন্দেমাতরম্' ও 'জনগণমন অধিনায়কের' গায়কবৃন্দ

লাল পাড়ের শাদা খদ্দরের শাড়ি পরিহিতা স্বেচ্ছাসেবিকাদল

কিন্তু ভারতের জাতীয় পতাকার প্রতিদ্বন্দ্বী করে তাকে যেন ব্যবহার করা না হয়। ইউনিয়ন জ্যাক্ ব্রিটিশের জাতীয় নিশান, সেই নিশানের ঔদ্ধত্য এই দেশ থেকে দূর করার জন্যে যে-জাতি আত্মবিসর্জন দিতে কুণ্ঠা করেনি, সেই জাতির একাংশ আজ অন্য-একটি দেশের নিশানকে এই দেশের ভূমিতে গাড়বার এ-ষড়যন্ত্র করছে কেন, নেহরুর এই জিজ্ঞাসা। এবং তাঁর আরো জিজ্ঞাস্য এই, এইরূপ মানসিক দাসত্ব যারা বরণ করেছে সেই ক্রীতদাসদের বরদাস্ত করা হয় কেন। এই কথাটির ইংরেজি তর্জমা করে নেহরু বললেন, এর নাম intellectual slavery; এর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে, এর জন্যে দেশবাসীকে উদ্যোগী হতে হবে।

নেহরুর এই উক্তি শুনে জনতা করতালি দিয়ে উঠল, তারা যেন জানিয়ে দিল তাদের সম্মতি, তাদের মনের ইচ্ছা। তারা এই দাসত্ব থেকে দেশকে মুক্ত দেখতে চায়।

এই প্রসঙ্গে নেহরুর আর একটি উক্তিও সেরে নিই। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন সমাপ্তির সময় যখন 'জনগণমন' গান গীত হয়, তখন জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য ও বিশৃঙ্খলা দেখে জওহরলাল বিরক্ত হন। জাতীয় পতাকাই কেবল নয়, জাতীয়-সংগীতের প্রতিও আমাদের যথোচিত শ্রদ্ধা থাকা কর্তব্য। এই গান গাওয়ার সময় সকলকে উঠে দাঁড়িয়ে সৈনিকের মতন অটল ও অচল হয়ে থাকতে হবে। পৃথিবীর সর্বত্র এই নিয়ম পালিত হচ্ছেঃ জাতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার এই তো রীতি। কিন্তু এখানে তা হবে না কেন। মঞ্চের উপর অন্যান্য জননেতার সঙ্গে জওহরলাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, জনতা সংযত হয়ে দাঁড়াল।
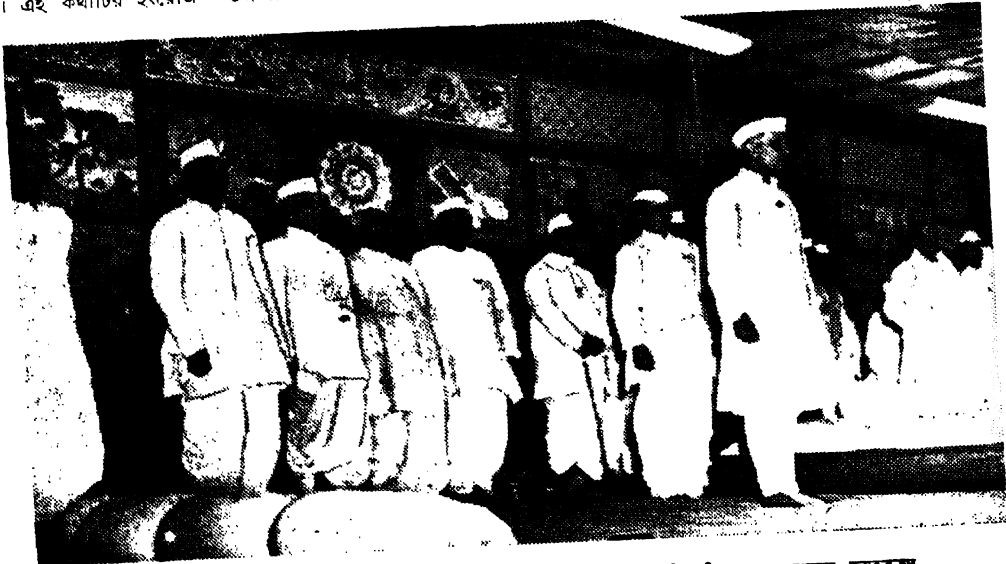
জাতীয় সংগীত 'বন্দেমাতরম্' গানের সময় মঞ্চের উপর ধ্যানসমাহিতচিত্তে দণ্ডায়মান নেতৃবৃন্দ
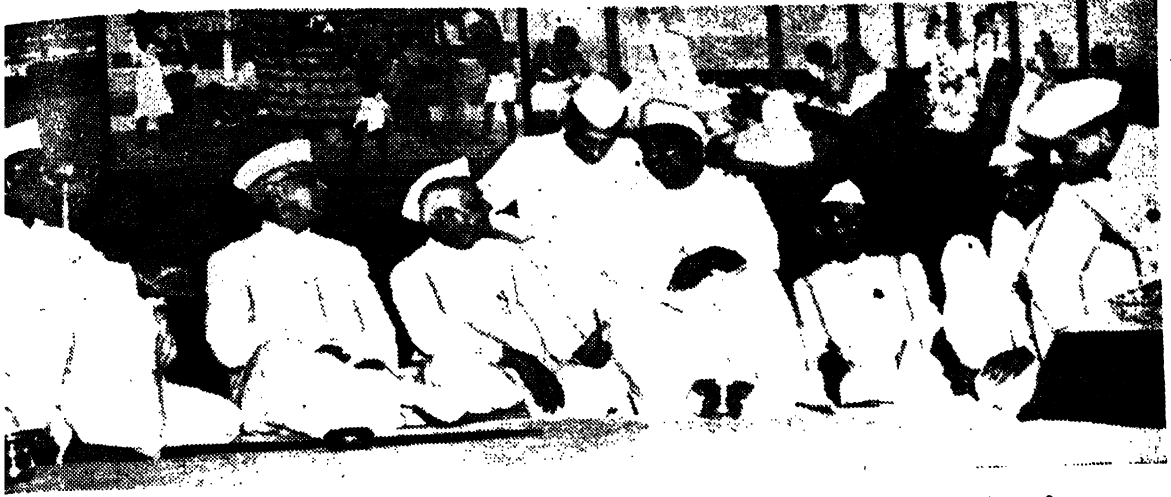
মঞ্চোপরি উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দঃ বাম হইতে দক্ষিণে—শ্রী এস কে পাতিল, শ্রী এন্ ভি গ্যাডগিল, শ্রী আর আর দিবাকর, শ্রীজগজীবন রাম, শ্রীগুলজারিলাল নন্দ, শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি

সকালের রোদ সোজাসুজি এসে পড়েছে নেহরুর মুখে। সাদা খদ্দরের চুস্ত ও শেরওয়ানি, শাদা গান্ধীটুপি পরিহিত শুচিশুভ্র জওহরলাল পতাকার ভাঁজ খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। সম্মুখের ময়দান পূর্ণ করে দাঁড়িয়ে জনতা তাঁর কথা শুনছে। এমন সময় দেখি, দু-চারজন স্বেচ্ছাসেবক ছুটাছুটি করছে; তারপর দেখি স্ট্রেচারে ক'রে একজন স্বেচ্ছাসেবককে নিয়ে যাওয়া হল। রোদে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে সংজ্ঞাহীন হয়েছে। জওহরলাল এটি লক্ষ্য করেছেন। তখন তিনি তাঁর পার্শ্বে দণ্ডায়মান স্বেচ্ছাসেবকের অধিনায়ককে ইসারায় বললেন, স্বেচ্ছাসেবকদের বসিয়ে দিতে; অধিনায়ক এই নির্দেশ দিতে যাবেন তখনই জওহরলাল স্বয়ং নির্দেশ দিয়ে দিলেন, বসতে বললেন। সেই নির্দেশ পাওয়া মাত্র তারা তো বসে পড়লই, সঙ্গে সঙ্গে জনতার মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে গেল বসবার। স্বেচ্ছাসেবকরা বসে পড়া মাত্র দেখা গেল বিধানচন্দ্র রায় কালো চশমা চোখে দিয়ে রোদের দিকে মুখ দিয়ে বসে আছেন, পতাকা স্তম্ভের নীচের একটা সিঁড়ির ওপর। অদূরে দাঁড়িয়ে পণ্ডিত পন্থ ও ট্যাণ্ডনজী।

নিয়মানুবর্তিতার একটা দৃষ্টান্ত আমরা পেলাম। নেহরু অধিনায়কের অনুমতি না নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের কোনো নির্দেশ দিলেন না। অধিনায়ককে জানিয়ে তবে তিনি তাদের বসতে বললেন। জনতার মধ্যে
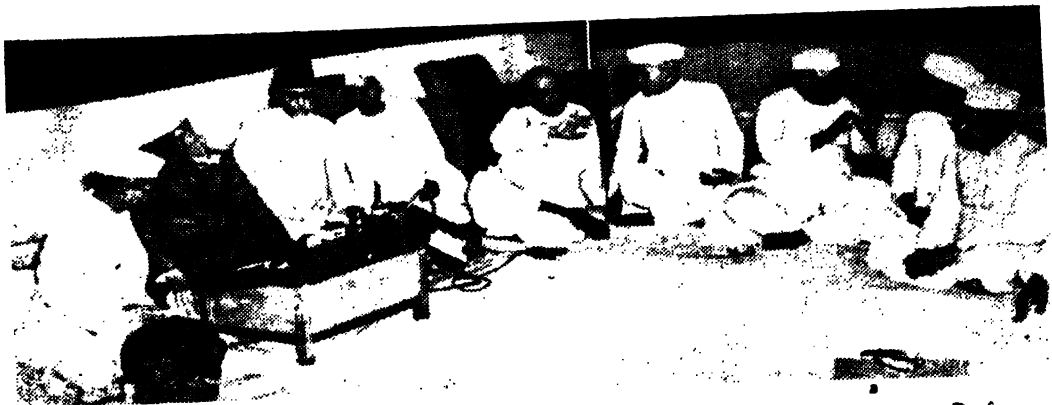
ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে নেতৃবৃন্দঃ (বাম দিক হইতে) শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, শ্রী নেহরু, মৌলানা আজাদ, শ্রীমাণিকলাল বর্মা, ডাঃ বি সি রায়, ডাঃ কে এন কাটজু, জনাব রফি আমেদ কিদওয়াই, ডাঃ সৈয়দ মামুদ ও শেঠ গোবিন্দ দাস
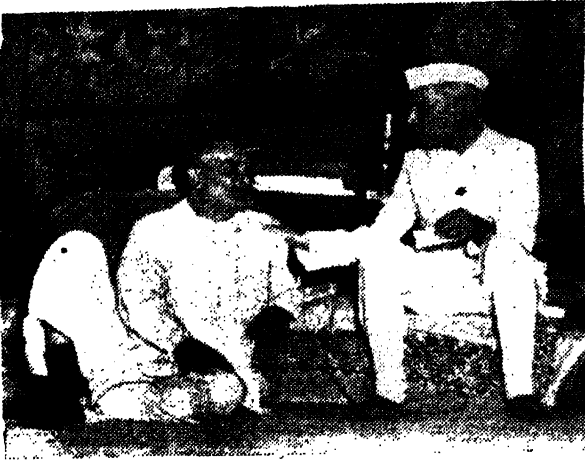
মঞ্চের উপর হর্ষোৎফুল্লচিত্তে আলোচনারত ডাঃ রায় ও শ্রী নেহরু

গুঞ্জন শুরু হল, তারা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

দুপুরের অধিবেশনে সেদিন যখন এলাম, তখন বেলা প্রায় দুটো। ভেতরে যাবার রাস্তা খুঁজে পাইনে। বিরাট এই ময়দান। তার তিনদিকেই রাস্তা। মনে হল, সমস্ত কলকাতা শহরটাই যেন ভেঙে পড়েছে এখানে। প্রাণহীন জাতির জীবনে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়ে গেল নাকি? কংগ্রেসকে নূতনভাবে গঠন করার জন্যে এই অধিবেশন, নূতন প্রাণরক্ত কংগ্রেসে সঞ্চারিত করার জন্যেই এই আয়োজন। ভারতের প্রত্যেক রাজ্য থেকে এসেছেন নেতারা এবং কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ। কিন্তু অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগেই বুঝি জেগে উঠেছে দেশ। সকালে জনতার মধ্যে ছিল ধীরতা ও মন্থরতা; এখন তারা যেন উৎসাহে সজীব হয়ে উঠেছে। পুলিশ আর স্বেচ্ছা-সেবকদের ব্যস্ততা চারদিকে। চারদিকে মোটরের হর্ন। একটার পর একটা গাড়ি আসছে। একটার পর একটা বাস্ আসছে লোক-ভরতি হয়ে এবং সে-বাস্ একেবারে খালি হয়ে যাচ্ছে এখানে। কংগ্রেস কি সত্যিই একটা রাজনৈতিক দল, না, তার চেয়ে বেশি কিছু। নিছক রাজনৈতিক দলের প্রতি এতটা টান সাধারণের থাকে না। কংগ্রেস কেবল রাজনৈতিক দলই যে নয়, তার প্রমাণ এই জনসমাবেশ। এখানে ঢুকতে হবে টিকিট কেটে, এখানে ঢুকতে হলে পুড়তে হবে টা টা রোদে।

টা টা রোদে দাঁড়িয়ে পুড়ছে লম্বা একটা লাইন। কেউ ছাতা, কেউ খবরের কাগজ দিয়ে কান আর মাথা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। ফটক থেকে শুরু ক'রে সাদার্ন অ্যাভিনিউ ডিঙিয়ে লাইন চলে গেছে শরৎ চাটুজ্জে রোডের মেনকা সিনেমা পর্যন্ত। এই লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন সকলে নীরবে। এর মধ্যে দেখলাম কত চেনা মুখ, কত সম্ভ্রান্ত প্রবীণদের, কত উৎসাহী তরুণদের। রুজ-লিপস্টিক মাখা মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি চলেছেন শাঁখা-সিঁদুর পরা ময়লা-পেড়ে শাড়ী পরনে সাধারণ মহিলারা। তাঁরা খুঁজছেন ফটক, হাতে কার্ড। এই কার্ডে কোন গেট দিয়ে ঢুকতে পারা যাবে, হাতের কাছে পুলিশ পেলে পুলিশকে, স্বেচ্ছাসেবক পেলে স্বেচ্ছা-সেবককে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করছেন। এমন সময় পিছন থেকে হর্ন দিচ্ছে মোটর, রাস্তা ছেড়ে দিতে হবে তার যাবার জন্যে। সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই কারো। মোটর গাড়ীরা বন্দী হয়ে পড়ছে জনতার মধ্যে।

চিনে বাদাম, পানবিড়ি-সিগরেট, কাঁচ ক্ষিরা, কমলালেবু, আকনিগুড়ানো কল বসে গেছে রাস্তার ধারে ধারে। তাদেরও আজ মরশুম। জাতির এই জাগ্রত জীবনের ভাগ নিতে এসেছে তারা।

লম্বা লাইনের শেষে গিয়ে দাঁড়ালাম। দু টাকা দামের কর্মীর টিকিট হাতে নিয়ে দেখি, লাইন এগোয় না। মনে হল, হয়তো আর ঢুকতেই পারব না। কিন্তু লাইন এগোতে আরম্ভ করার আধঘণ্টার মধ্যেই ভিতরে এসে পৌঁছে গেলাম। হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল।

আয়োজনের ত্রুটি নেই। একটি মানুষের জীবনে যা-কিছু দরকার হতে পারে তার

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে গভীর আলোচনারত শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

রকমের ব্যবস্থাই আছে ভিতরে। স্টল
হ, ...সোয়ে বুকিংয়ের, এয়ার বুকিংএর
স্থা আছে, সবই আছেঃ কিন্তু ত্রুটি
লাম একটি বিষয়ে। সেটি হচ্ছে স্বেচ্ছা-
বকবাহিনী। এরা চটপটে, উৎসাহী,
য়মানুবর্তী—সবই, কিন্তু কোনো খোঁজ-
র দিতে পারে না। কিছু জানতে চাইলে
তে পারে না। অমুক টিকিটে কোন গেট
য়ে ঢুকতে হবে—এ খবর তাদের জানা
ই। এর জন্যে অনেককে হয়রাণ হতে
য়েছে। ভুল নির্দেশ পেয়ে ভুল রাস্তায়
তে হয়েছে অনেককে।

প্যাণ্ডালটি দেখে ভালো লাগল। মনোরম
রে সাজানো। ত্রিবর্ণ কাপড় দিয়ে ভিতরটা
াওয়া। আলোর আর পাখার ব্যবস্থা
ালো। বাইরে যে লোকের অরণ্য দেখে-
ছলাম, এখানে এসে তারা সবাই তৃণ সেজে
সেছে। কাতারে কাতারে দেখা যায় মাথা—
নগণ্য, অগুন্তি। তার সুদূরে সম্মুখে মঞ্চ।
ঞ্চের উপরে নেতৃবর্গ বসে। তাঁদের পিছন
নবদ্য শোভায় ভূষিত। বাঙলার গ্রাম-
জীবনের চিত্রের দ্বারা শোভিত। আলপনার
দ্বারা মণ্ডিত। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা
সত্যই এক মনোহর পরিবেশ রচনা করেছেন।

আবার গান। সেই আরম্ভ-সংগীত—বন্দে-
মাতরম্। গান শুরু হবার সংগে সংগে
সকলে উঠে দাঁড়াল। গান শেষ হলে
বসল। এখানে শৃঙ্খলা দেখে ভালো লাগল।
তারপর আরম্ভ হল অধিবেশন। সভাপতি-
রূপে পণ্ডিত নেহরু দেশের সামগ্রিক
অবস্থার পর্যালোচনা করলেন, দেশের নূতন
পরিস্থিতিতে কংগ্রেসকে নূতনভাবে গড়বার
প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। জনতার সংগে
কংগ্রেসের সংযোগ-সাধনের বিষয় উল্লেখ
করলেন। বললেন, কংগ্রেসের যন্ত্র যদি বিগড়ে
গিয়ে থাকে তা হলে তা মেরামত করে নিতে
হবে। খুব সরেস মোটর গাড়িও তো বিকল
হয়, তখন তাকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না,
তাকে সারিয়ে নিতে হয়, পালটে নিতে হয়
দু-চারটি স্ক্রু বা বল্টু। তাহলেই সে সচল
হয়ে ওঠে। কংগ্রেসকেও দরকার হলে তা-ই
করতে হবে। আর তা ছাড়া, পুরানো নিয়ম
মতে কংগ্রেস এখন আর চলতে পারে না—
এটা অনেকটা কমজোরী ইঞ্জিন আর খুব
তেজী ব্রেক-ওলা গাড়ির মতন। ইঞ্জিনের
তেজ বাড়িয়ে ব্রেক একটু আল্‌গা করে
দিতে হবে। দেশের বিভিন্ন সমস্যার কথা
এবং সমস্যা সমাধানের উপায়ের বিষয়ও
আলোচনা করলেন তিনি। রাজনৈতিক
অবস্থার বিষয়ও উল্লেখ করলেন।

নেহরুর পরে এই প্রস্তাব নিয়ে আলো-
চনা করলেন বিভিন্ন নেতা। বোম্বাইয়ের
খের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে
আলোচনা করলেন এবং ভারতের কোন্
কোন রাজ্যে কংগ্রেস শতকরা কত ভোট
পেয়েছে তার হিসাব দাখিল করলেন।
উপস্থিত জনমণ্ডলী মাঝে-মাঝে হর্ষধ্বনি
করে উঠতে লাগলেন। কংগ্রেসের প্রতি
সাধারণের যে অন্তরের টান আছে, এই
আনন্দধ্বনি থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা
যাচ্ছিল।

দ্বিতীয়দিনের অধিবেশনের উল্লেখযোগ্য
বিষয় হচ্ছে ট্যাণ্ডনজীর প্রস্তাব। সাম্প্র-

মণ্ডপের বাহিরেও অগণিত জনতা উদ্‌গ্রীবচিত্তে কংগ্রেস সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ শুনিতেছে

দায়িকতা সম্বন্ধে। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষ কোনো কালেই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেয় নি, এখনো দেওয়া হবে না। ভারতের ঋষিরা যখন শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তখনো ধর্মের ভিত্তিতে কোনো সম্প্রদায় তাঁরা স্বীকার করেন নি। ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি নূতন, এবং অঙ্কুরেই একে বিনষ্ট করিবার জন্য কংগ্রেস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ট্যাণ্ডনজীর প্রস্তাব সমর্থন করেন সর্দার প্রতাপ সিং কাইরন।

এই দিন মঞ্চে একটা মজার দৃশ্য দেখা যায়। নেহরু আসনে বসে কাগজপত্র দেখছেন। একজন স্বেচ্ছাসেবিকা ট্রেতে করে এক গ্লাস কমলালেবুর রস এনে ধরল নেহরুর সামনে। ইশারা করে নেহরু সেটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এটি লক্ষ্য করলেন। তিনি উঠে গিয়ে গেলাসটি নিয়ে ধরলেন নেহরুর সামনে। মাথা না তুলেই নেহরু তা গ্রহণ করতে চাইলেন না। তখন বিধানবাবু এক হাতে নেহরুর মাথাটি ধরে আর এক হাতে গেলাসটি ধরলেন তাঁর মুখে। হাসতে হাসতে এক চুমুকে নেহরু তা নিঃশেষে পান করলেন। এই ঘটনা দেখেই অপর একজন এক গেলাস রস এনে ধরলেন বিধানবাবুর কাছে। বিধানবাবু হেসে ফেললেন।

দৃশ্যটি সবাই উপভোগ করল। কংগ্রেস যাঁরা পরিচালনা করছেন, ভারত রাষ্ট্রের শাসনভার যাঁদের উপর ন্যস্ত তাঁরা যে পরস্পর ভ্রাতৃভাবাপন্ন এবং সুহৃদ, তাঁরা যে একটি পরিবারের লোকের মত একটি দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন—এটি আশা ও আশ্বাসের কথা।

এই অধিবেশনে কংগ্রেস ছয়টি সরকারী ও তিনটি বে-সরকারী প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধন করে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যের চাঁদার পরিমাণ হ্রাস করে চার আনা এবং সক্রিয় সদস্যের অতিরিক্ত এক টাকা চার্জ করা হয়েছে। ত্রিশটি করে গ্রাম নিয়ে এক একটি মণ্ডলী গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

অধিবেশন শেষ হয়েছে নূতন আশার মধ্যে। জনতার সঙ্গে কংগ্রেসের সংযোগসাধনের উপায় নির্ধারিত হয়েছে। কলিকাতার অধিবেশন কংগ্রেসের ও জাতির প্রাণে নূতন প্রেরণা যে দিতে পেরেছে—এইটেই বড় কথা এবং এইখানেই এই অধিবেশনের সার্থকতা।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা মনে হয়েছে। কংগ্রেস-বিরোধী বলে যাঁরা পরিচিত ও বিখ্যাত এখানে তাঁদের দেখে আনন্দ পেলাম। তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গেই সদলে এসে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন এই, তাঁরা অতিরিক্ত সুবিধা পেলেন কি করে? কংগ্রেসের যাঁরা চিরদিনের সহচর, যাঁরা দুর্দিনেও কংগ্রেসকে ত্যাগ না করে এরই জন্যে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করেছে, এমন কি গত নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের মধ্যেও যারা নির্যাতিত হয়েছে, তারা কোনো রকমে ভিড় ঠেলে এসে যোগ দিল এখানে, এবং যাদের কাছে তারা নির্যাতিত হয়েছে তারাই সুবিধা সংগ্রহ করে নিল কী করে? এই প্রশ্ন আমাকে বহুলোক করেছেন। উত্তর দিতে পারিনি। মনে হয়, এটা রাজ কংগ্রেসের একটা বড় ত্রুটি।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপনরত শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন

পরিশেষে দুটো কথা বলি। বন্দে মাতরম গান শনিবার সকালে পতাকা উত্তোলনের সময় যে সুরে গাওয়া হোল সে সুর আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন ও অপরিচিত ঠেকল। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া এবং কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত সুর ব্যবহার না করার হেতু বুঝতে পারা গেল না। কোনো জলসায় বা বৈঠকে যে-কোনো সুরে এ গান গাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এই সব অধিবেশনে এমন বিকৃত সুরের প্রশ্রয় দেওয়া কখনই উচিত নয়। কেবল রুচিবিরুদ্ধ বলেই নয়, এটা নিয়মবিরুদ্ধ।

সংস্কৃতি বৈঠকে নেহরু এসেছিলেন কিছুক্ষণের জন্যে। কালচার কথাটির তাৎপর্য বর্ণনা করে তিনি শেষে বললেন, বাঙলা ভারতবর্ষকে দান করেছে অনেক, তার মধ্যে সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে এই দুটি গান—বন্দে মাতরম্ ও জনগণ-মন।

সেই বাঙলা দেশ যেন সুরের মৌলিকতা দেখাতে গিয়ে দুর্নাম ক্রয় না করে—একজন সাধারণ শ্রোতা হিসাবে এই কথা আমার মনে হল।
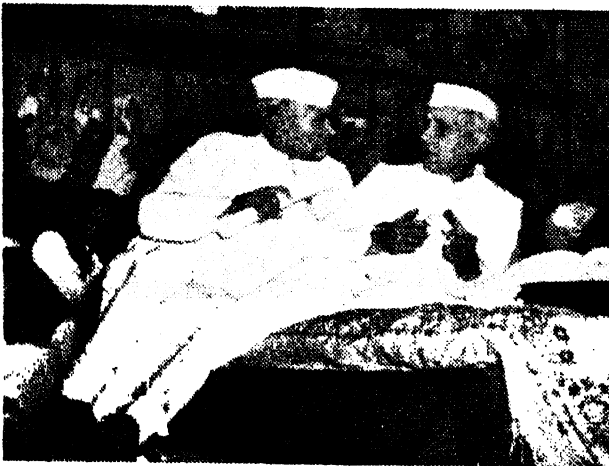
কংগ্রেস সভাপতির সহিত ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কে এন কাটজু একটি জটিল বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন

ংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

জীবনানন্দ দাশ

পূর্ব পাকিস্থান তৈরি হবার পর বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের কি —কি হতে পারে—ভেবে দেখেছি মাঝে ঝে। দেশ খন্ডন ছাড়া আরো কয়েকটি স্যায় বাঙলা ভাষার ভবিষ্যৎ জড়িয়ে ড়ছে। এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা; বিশেষ নো মীমাংসার পথ এখনও খুঁজে পাওয়া চ্ছ না।

নবাবী আমলে ও পরে বৃটিশ যুগ থেকে জকের তিন-চার দশক অবধি বাঙলা ষা ও সাহিত্যের উঠতি-পড়তির ভেতর য় বেশ একটা এক-টানা যুগ চলে য়েছে; ভাষা ক্রমে ক্রমে তৈরি হচ্ছিল, দ্ধ হল, ভারতবর্ষের একটা বড় ভাষা য় দাঁড়াল; রবীন্দ্র-কালের বাঙলা হিত্যিই প্রায় যে কোনো বড় ভাষার ন হয়ে উঠল; এমন কি ইংরেজি ষার কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়েছে য় এমন কথাও ভাষাবিদ্ পণ্ডিত কদের বলতে শুনেছি। খুব বেশি কাছা- ছি না পোঁছলেও আশা ছিল যে, এ ষার ভবিষ্যতে আরো দু-একজন রবীন্দ্র- থ না জন্মালেও বড় সাহিত্যিকদের ভাব হবে না। তা যদি না হয়, তাহলে ঙলা কালক্রমে ফরাসী বা ইংরেজীর সম- ক্ষ হয়ে উঠতে পারবে না কি—মনে মনে কথা আলোচনা করার উৎসাহ বোধ রেছি। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের, আলালী হুতোমের বাঙলা, ঈশ্বর গুপ্ত, মধু- দন, বিহারীলালের (ও আরো অনেকের) ঙলা আমাদের ভাষাকে গড়েছে; অধিগত রে রবীন্দ্রনাথ গড়লেন তারপর—এবং ধুনিক লেখকেরা। মোটামুটি বাঙলা ভাষা হয়ে দাঁড়াল, তাতে খুব সম্ভব লোক- মাজের ও সাহিত্যের প্রায় সব রকম থাই খুব ভালো করে প্রকাশ করা যায়। ংরেজী অবশ্য আরও ভালো করে বলতে রে; ইংরেজীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রিভাষাও ঢের বেশী। কিন্তু বুও ইংরেজী বা ফরাসীর কে বাঙলা বস্তুত খুব বেশি পিছে পড়ে নেই ভেবে আসছিলাম। রবীন্দ্রনাথের চলে যাওয়ার পর থেকেও আমাদের ভাষার অগ্রসর ব্যাহত হয় নি, গদ্য ও কবিতা লেখকদের হাতে পরিধি আরো বেড়েছে, বাড়ছে।

কিন্তু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অন্তত তিনটি কারণ দেখা দিয়েছে, যাতে এর আসছে পঁচিশ ত্রিশ বছর (তারপরে এ ভাষা ক্ষয় পাবে, না হয় এগিয়ে চলবে) সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগের হেতু রয়েছে:

প্রথম কারণটির কথা ইতিপূর্বে আভাসে উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন, এ সাহিত্যের সে সময়কার অন্যান্য বড় লেখকদের দান (শরৎচন্দ্র ছাড়া) অনেকটা চাপা পড়ে গিয়েছিল; এ লেখকরা সংখ্যায় খুব কম ছিলেন না; তাঁদের লেখার শ্রেষ্ঠতা ও তাৎপর্য অনেক সময়ই সহজেই বোঝা যেত; নতুন নতুন প্রতিশ্রুতিশীল লেখকের উদ্ভব হচ্ছিল; রবীন্দ্রনাথের যুগেরই এক একটা সাহিত্যিক কালকে ভারতীয় সবুজ-পত্রের ও আরো পরে কল্লোল-কালিকলমের যুগ বলা হয়েছে। 'কল্লোল যুগের' সঙ্গে সঙ্গে বা কিছু আগে পরে আরো দু' একটা সজীব উপযুগ তখনকার বাঙলা সাহিত্যে বিশেষ উঠতির যুগকে সক্রিয়ভাবে গড়ছিল। আজকের বাঙলা সাহিত্যে যে ক'জন বড় লেখক লিখছেন বা সম্প্রতি চুপ-চাপ আছেন, তাঁদের প্রায় সকলেই সে সব দিনের লেখক। এ শতাব্দীর দুয়ের ও তিনের দশকের গোড়ার দিকেই বা আরো আগে তাঁরা সাহিত্যের কাজে নেমেছিলেন; চারের দশক থেকে খানিকটা ভাঁটা পড়েছে মনে হচ্ছে। চলতিকালে বড়, নতুন লেখক নেই যে তা নয়, কিন্তু উল্লেখনীয় যুগ উপযুগ রচনা করবার মতন লেখক সঙ্ঘ আছে বলে মনে হয় না; যদি থেকে থাকে, এখন পর্যন্ত তাদের সাহিত্যিক কর্ম, আমার মনে হয়, ঠিকভাবে আরম্ভ হয় নি। নতুন লেখক রয়েছেন সাহিত্যের এ-শাখায় ও-শাখায় যাঁদের লেখা (এক-আধটি ব্যতিক্রম ছাড়া) মহৎ হয়ে উঠতে না পারলেও অনেক লেখাই সৎ।

এঁরা মাথা-গুণতিতে কি রকম হবে; কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, পরিচয় ও কবিতা-যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মত এঁরা যতদূর আমি জানি, সংখ্যায় হয়তো ভারী নয়। কেবলমাত্র সংখ্যার হিসেবে প্রায়ই কিছু ঠিক করা যায় না; কিন্তু গুণের সঙ্গে সংখ্যা জুড়লে সাহিত্যে বড় সাফল্য পাওয়া যেতে পারে; তার অভাবে ক্ষয় দেখা দিতে পারে। কেউ কেউ অনেক দিন থেকে বলছেন, বাঙলা-সাহিত্যে অবক্ষয় চলেছে। আমার মনে হয়, এইবারে অবক্ষয়ের ছায়া এসে পড়েছে আমাদের সাহিত্যে। দু' তিন দশক আগের প্রায় সব বড় পুরোনো সাহিত্যিকই বেঁচে আছেন, কিন্তু তাঁদের সাহিত্য-কাজের সময় ফুরিয়ে এল প্রায়; কারো কারো ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গেছে; দু' একজন বড় জোর আর দেড় দু' দশক চালিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তাঁদের যা দেবার প্রায় সবই দেওয়া হয়েছে, হয়তো। আশ্চর্যসাধন হয় অবিশ্যি; হেতু-অহেতুর স্পষ্টতা ডিঙিয়ে ইতিহাস কালকের ভূমিকায় কি ঠিক করে রেখেছে, আজকের বিষয় ও আভাস আলোচনা করে সে সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে পোঁছানো সব সময়ই সহজ নয়; বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে লেখক যে কোনো মুহূর্তে দেখা দিতে পারে—হয়তো দল পাকিয়েও—একটা বড় নতুন উপযুগ সৃষ্টি করে, যা প্রধান সাহিত্য যুগে গিয়ে অবধি দাঁড়াতে পারে। কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে সেরকম কোনো বড় সাহিত্যের স্থিতি ভিত্তি গড়া হচ্ছে বলে টের পাই নি। পুরনো লেখকেরা আরো কিছু সার্থক সাহিত্য তৈরি করেছেন নিজ কাল ও ব্যক্তিমনের জের টেনে। নতুন লেখকদের কারো কারো কোনো কোনো লেখা খুব ভালো হলেও নতুন সাহিত্যসিদ্ধির দেশ-কালের ভেতর এসে পড়েছি মনে হচ্ছে না। লেখকেরা দল বেঁধে সাহিত্য-আন্দোলন সৃষ্টি করবেন কিংবা সঙ্কল্প এঁটে সাহিত্য রচনা করবেন, এমন কোনো উদ্দেশ্য সৎ লেখকদের মনে প্রায়ই থাকে না। তবুও একই সময় একই দেশে কয়েকজন বড় লেখকের সাহিত্য-কাজের নানা স্বাতন্ত্র্যের ভেতরেও সমগোত্রীয় চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এঁরা সাহিত্যের যুগ বা শাখাযুগ সৃষ্টি করতে পারেন; শুধু একজন লেখকও স্বকালীন সাহিত্য-যুগের মুখপাত্র হয়ে দাঁড়াতে পারেন—যেমন

ওয়ার্ডসওয়র্থ হয়েছিলেন; কিংবা এর চেয়েও বেশি কিছু : গোটা যুগের মোটামুটি সমস্ত বড় তাৎপর্যেরই শিল্পফল নিজের সাহিত্যে লাভ করে যুগকে বহন করতে পারেন—যেমন রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন।

চারের দশক কিংবা আরো কিছু আগের থেকে আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রেতর দু' চারটে যুগ (এ যুগগুলোর নাম এখনও তেমন কিছু ঠিক হয়নি, সেকালের কোনো আন্দোলন বা ব্যক্তির নামে পরে হয়তো নির্ধারিত হবে) ছাড়া আরো আধুনিক একটি সাহিত্যযুগ বা যুগাংশের সূচনার অন্তত প্রয়োজন ছিল, যার নতুন লক্ষণগুলো কয়েকজন বড় লেখকের হাতে এতদিনে বিশেষ সংস্থা লাভ করতে পারত। তেমন কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না। আমার পাঠ ভুল হতে পারে। আরো ভালো করে দেখা প্রয়োজন; হয়তো আরো কিছু অপেক্ষা করা দরকার। কিন্তু যতদূর ধারণা করতে পারছি, পুরোনো শ্রেষ্ঠ লেখকদের কাজ শেষ হলে বাঙলা সাহিত্যের অনেক দিনকার বড় ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়বার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে।

খণ্ডনের আগে বাঙলাদেশ বড় ছিল; প্রায় তার এক-তৃতীয়াংশে এখন দাঁড়িয়েছে পশ্চিম বাঙলা। পূর্ব বাঙলায় যে সব হিন্দু-মুসলমান আছেন, তাঁরা এতদিন বাঙালী বলে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা নিজেদের খুব সম্ভব বাঙালী বলতে পারেন না। তাঁরা পাকিস্থানী। পশ্চিম বাঙলার দেশীয় অধিবাসীরা অবশ্য বাঙালী। বিভাগের আগে দেশে যত বাঙালী ছিল, এখনকার নতুন বাঙলায় (পশ্চিম বাঙলায়) পূর্ব পাকিস্থান থেকে অনেক উদ্বাস্তু এসে পড়া সত্ত্বেও তার চেয়ে ঢের কম বাঙালী আছে। পশ্চিম বাঙলা এত ছোট যে চোখে দেখে ও নজির নেড়ে-চেড়ে মনে হয়, লোকের চাপে তা উপচে পড়ছে, আর ঠাসাঠাসি চলে না। কিন্তু আসল কথা বাঙলা দেশে বাঙালী ঢের কমে গেছে। মন্বন্তরে গিয়েছিল, কিন্তু এবারে সমস্ত পূর্ব পাকিস্থানের বাঙালীদের আমরা হারিয়েছি। দেশ ছোট, লোকজন কম। কিন্তু জায়গা ছোট হলেও তার ভাষা ও সাহিত্য যে মুষড়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই; ছোট দেশে বড় সাহিত্য ফলতে পারে। ইতিহাসে নানা রকম সাহিত্য ও ভাষা ছোট ছোট দেশে সক্রিয় হয়ে উঠে পৃথিবীর বড় বড় অংশের কাছ থেকে প্রায় ভূমার মর্যাদা পেয়ে গেছে। ইংলণ্ড—এমন কি গ্রেট বৃটেন বড় দেশ নয়। চসারের সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্য ঐ ছোট দ্বীপে শ্রেষ্ঠ হয়ে পৃথিবী জুড়ে স্থিতি ও শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে। এথেনস্ ছোট নগর ছিল, গ্রীস ছোট জায়গা, কিন্তু গ্রীক ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইউরোপ ও বাইরেও অনেকদিন পর্যন্ত মানুষের প্রায় একমাত্র শাশ্বত ভাষা, সাহিত্য বলে গ্রাহ্য হয়ে এসেছে; আজো নানারকম নতুন ও সনাতন ভাষার প্রতিপত্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিনে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ আবেদন সকল দেশের সুধীদের কাছেই একান্ত স্বীকার্য। পশ্চিম বাঙলা ছোট দেশ বা ভিড়ে কম বলে বাঙলা-সাহিত্য ও ভাষা, ওপরের সব নজিরের প্রামাণ্য স্বীকার করলে (অস্বীকার করবার কিছু নেই), ক্রমে ক্রমে যে ক্ষয় পেয়ে নষ্ট হয়ে যাবে, সেরকম আশঙ্কা করবার কোনো কারণ আছে মনে হয় না। তবে কথা হচ্ছে তখনকার গ্রীস, এলিজাবেথী এমন কি ঊনিশ ও বিশ শতকের (গোড়ার দিকের) ইংলণ্ডের থেকে পশ্চিম বাঙলা আজ এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেশ-কালের জিনিস, তার অবস্থার বিপর্যয় ঢের, বিপদ অনেক রকম। তার ঊনিশ বিশ শতকের ইতিহাসের গর্ভে আজকের দশকগুলো জন্মেছে মনে করাও কঠিন; ভিতরের সার কম, বাইরের স্বত্ব-সম্পদ তেমন নেই; এথেনস্ ও বৃটেন—এমন কি ঊনিশ ও বিশ শতাব্দীর গোড়ায় বাঙলাদেশেই যা হয়েছিল, সে সবের দৃষ্টান্ত আজকের পতিত বাঙলার পক্ষে অনেক পরিমাণে অবাস্তব। দশ বারো বছর আগে বাঙলাকে ছেদ করা হয় নি, কিন্তু তখন থেকেই আমাদের দেশে যে ক্ষয়, ক্ষুণ্ণতা দেখা দিয়েছে দেশ বিচ্ছিন্ন হবার পর সেই সব কারণেই বাঙলার লোকজন ও পরিধির ক্ষুদ্রত্ব এত বেশি বিপজ্জনক মনে হচ্ছে। গ্রীস বা বৃটেন বা আমাদের পঁচিশ ত্রিশ বছর আগের বাঙলাদেশের সমপর্যায়ে উঠতে হলেও বাইরের ও ভেতরের যে সব স্বত্বসংস্থানের দরকার বাঙলার হাতে এখন তা নেই। আস্তে আস্তে সঞ্চয় করতে পারা যাবে হয়তো। কত সময় লাগবে বলা কঠিন। হয়তো এ শতার্ধের সমস্তই লাগবে। এ সময়টা হয়তো প্রস্তুতির কাল বলে গণ্য হয়ে দেশ-সমাজের ভাঙা-গড়া গড়া-পেটার কাজে কেটে যাবে।

আগেকার তুলনায় পশ্চিম বাঙলায় বাঙালী ঢের কম, অথচ দেশ এত ছোট বলে মনে হয় এখানে বাঙালীরাও ঢের বেশি, বাসিন্দা ও উদ্বাস্তু বাঙালীদের কুলিয়ে উঠতে পারা যাচ্ছে না। আরো খানিকটা পরিসরের দরকার। বাঙলার উত্তর-পশ্চিমে—বিশেষত এখনকার বেহারের যে সব অংশ এক সময় বাঙলাদেশ ছিল এখনও যেখানে বাঙালী ও বাঙলার চল অবাঙালীর চেয়ে বেশি সে সব জায়গা বাঙলা তার আজকের এই বিপন্নতায় ফিরে পেলে খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারত। এ নিয়ে বাঙালীদের নানারকম আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু কিছু ফল হয় নি আজ পর্যন্ত; হতে পারবে বলে মনে হয় না। বেহারের ও-সব জায়গায় বাঙলা ভাষা পর্যন্ত চলল না—যা এতদিন স্বাভাবিক অধিকারে যুক্তির আশ্রয়ে চলছিল।

এ ভাষা একদিন অ-বাঙালীদে[illegible] বলয়ব্যাপ্তির ভেতর ক্রমেই বেশী ছড়িয়ে পড়ছিল। ঊনিশ শতকের বাঙলা মনন সব দিক দিয়েই বিশেষ ক্ষমতা নি[illegible] এসেছিল; সেই জন্যেই হয়তো বাঙ[illegible] সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা মর্যাদাও বেড়ে গিয়েছিল ঢের। অবাঙালী[illegible] এদেশে কাজকর্মে বিদেশেও বাঙালীদে[illegible] সঙ্গ-সান্নিধ্যে এসে বাঙলা ভাষার শ[illegible] সাফল্যের কথা মনে রেখে বাঙলা শি[illegible] নিচ্ছিল। শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিতেরা তখনকার দিনের প্রায় সমস্ত ভারতী[illegible] ব্যাপারের একক বাঙালী অধিনায়ক[illegible] মুখের ও বইয়ের ভাষার মর্যাদা মেনে নি[illegible] বাঙলা জানা দরকার মনে করেছিলেন তখনকার দিনের বাঙলা জানা শিক্ষি[illegible] মানুষদের খুব সম্ভব প্রায় শেষ প্রতিনি[illegible] রাজেন্দ্র প্রসাদের ধরণের লোক। হয়[illegible] রাজেন্দ্র প্রসাদদের পরেও কিছুকাল বাঙ[illegible] শেখার জের চলেছিল। তারপর মন্দা পড়[illegible] কেন পড়ল আন্দাজ করা যায়, কিন্তু [illegible] আলোচনায় এখন হাত দেব না। রবীন্দ্র[illegible] ও বড় বড় অনুজ সাহিত্যিকেরা ভাষা[illegible] যখন স্তরের থেকে ওপরের স্তরে নি[illegible] যাচ্ছেন, এ ভাষা যখন পরিশ্রম ও প্রতি[illegible] শ্রেষ্ঠ ফল পেয়ে দেশের সব চেয়ে বড় ভ[illegible] হ'ল, তখন বাঙলা সাহিত্য ও ভাষার জ[illegible] অবাঙালীদের উৎসাহ কমে গেল। বাঙ[illegible] বাইরে বেশী লোক আজকাল আর বা[illegible] শিখতে চায় না; অবচৈতন্যে যদি বা কো[illegible] আগ্রহ থাকে চেতনায় পৌঁছুতে [illegible]

াগদ ফুরিয়ে আসে; বাঙলা ভাষা ও হিত্যের নিকট পরিচয়ে আসবার জন্যে থাও তেমন ঝোঁক আছে মনে হয় না। ে বাঙলা ভারতের চলতি ভাষাগুলোর য় আজো শ্রেষ্ঠ—খুব সম্ভব অনেকখানি থক্য রেখে শ্রেষ্ঠ। উনিশ-বিশ শতকে ঙলায় যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে সে সময়ের ানো ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে যতদূর মার জানা আছে—তার তুলনা চলে ব'লে ন হয় না।

কিন্তু তবুও বাঙলা ভারতের রাষ্ট্রভাষা । বাঙলা ভাষার সংখ্যা হিন্দী ভাষীদের য়ে কম। বেশির ভাগ লোকের সুখ-বিধা দেখা যদি রাষ্ট্রের কাজ হয় রাষ্ট্র হলে ঠিক কাজই করেছে। এখনকার রতবর্ষের মত একটি এত বড় ও কাঁচা ষ্ট্রে প্রজাদের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য না রেখে অন্য কোনো উপায় নেই বাঙলার বদলে ন্দীকে রাষ্ট্রভাষা ক'রে নেতারা সেটা ীকার করেছেন। যুক্তির বদলে আরো ছু কিছু সংস্কারেরও প্রমাণ দিয়েছেন। ষ্ট্রভাষা লোক গুনতিতে ঠিক হল—কোনো যোগ্যুক্ত কমিশনের বিশেষ পরীক্ষা ও লোচনার ফলে নয়। সে রকম যদি হত হ'লে আজকের হিন্দী তার নিজের জোর স্পষ্টতায় রাষ্ট্রভাষা হতে পারত বোধ য় না। রাষ্ট্রভাষাও একটি মাত্র হ'ল—শী নয়। বাঙালী একদিন—এমন কি ড়ি বাইশ বছর আগেও মনে করেছিল যে, ঙলা যে রকম ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে ধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষার স্থান ভাবতই তার প্রাপ্য। তার আশা ভরসার ে ক্রমে ক্রমে সে বুঝে আসতে পারছিল। ে শেষ পর্যন্ত অনুমান—হয়তো প্রত্যাশা রা যাচ্ছিল যে, ক্যানাডা সুইটজারল্যান্ড ভিয়েট রাশিয়া বা ইউরোপে যেমন কোনো একটি মাত্র প্রধান ভাষা ও সাহিত্য নেই—রতের মতন এত ভাষার এত বড়সড় দেশেও য়েকটি উঁচুদরের ভাষা সমানে রাষ্ট্রভাষার বীকৃতি পাবে হয়তো; সে রকম হ'লে াঙলাও একটি রাষ্ট্রভাষা হতে পারত। কন্তু সে রকম কিছু হয়নি। হিন্দীকেই একমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ভারত রাষ্ট্রের ভাষা হওয়া দূরে থাকুক, বাঙলা এখন সমস্ত বাঙলাদেশেরও ভাষা নয়। এ ভাষা মোটামুটি পশ্চিম বাঙলার ত ছোট রাষ্ট্রের বাঙালীদের। পূর্ব বাঙলার লোকদের আগে বাঙালী বলা হত; তাদের দেশের নাম বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা এখন স্বভাবতই পাকিস্থানী। শুধু নাম বা অন্য দু চারটে ছোট বড় জিনিসেরও পরিবর্তনে অনেকদিনকার রক্তমাংস আত্মার পরিবর্তন হওয়া কঠিন। বাঙলা পূর্ব বাঙলার লোকদের অনেক শত বৎসরের সাহিত্য ও সমাজ সংসারের ভাষা। পূর্ব বাঙলার মুশিলমেরা কয়েক শো বছর ধ'রে ওদিককার নানা উপভাষায় লিখে ও বলে যে বিশেষ সার্থকতা দেখিয়েছেন ভাষার সে সুস্থ অপর্যাপ্ত প্রকাশ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহ'লে তার এখনকার আপাতসুস্থতা এদিককার বাঙলা (সাধু ও চলতি) কতদিন টিঁকিয়ে রাখতে পারবে ভাবনার বিষয়। বড় উপভাষাগুলো যদি ক্ষয় পায় তাহলে বাঙলা ভাষার ভবিষ্যৎই বা কেমন হয়ে দাঁড়াবে। আমার মনে হয় বাঙলার শ্রেষ্ঠ উপভাষাগুলোর বেশীর ভাগ পূর্ব (ও উত্তর) বাঙলায় এবং সেখানে কয়েক শো বছর ধ'রে সিদ্ধি লাভ করেছে। পূর্ব বাঙলার প্রবাদে বচনে ছড়ায় গীতিকায় ও মুখের ভাষার বিশদ ও ক্রান্তিগভীর তাৎপর্যে তার প্রমাণ রয়েছে। উপভাষাগুলো মাতৃভাষার থেকে উৎপন্ন হয়ে মাতৃভাষাকে নিয়ন্ত্রিত ও নতুন নতুন সূচনা নিয়ে উৎপন্ন হতে সাহায্য করে। উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্য ও মুখের ভাষা (অন্তত শিক্ষিত সমাজে যা সব চেয়ে বেশী প্রসার পেয়েছিল) প্রায় পুরোপুরি পশ্চিম বাঙলা ঘেঁষা ছিল। পূর্ব বাঙলায় তখনও ও তার অনেক আগের থেকেও উপভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছিল, মুখের ভাষা বিকাশ পাচ্ছিল; কিন্তু এদিককার সুধী সাহিত্যিক বা চলতি সমাজের খেয়ালে তা বড় একটা আসে নি; কচিৎ এলেও উপহসনীয় হিসেবে ছাড়া বিশেষ উল্লেখ্য কিছু মনে হয়নি। বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই এ সব উপভাষায় রচিত সাহিত্যের বিশেষত্ব বাঙালী বোধ করতে পেরেছে। আরো পরে পূর্ব বাঙলার বড় বড় শাখা ভাষা বা উপভাষাগুলো মাতৃভাষার সঙ্গে নতুন নতুন শব্দ প্রকাশরীতি ভাষাভঙ্গী ইত্যাদির প্রায় টানা পোড়েনে কম বেশী জড়িয়ে গিয়ে যে মূল্যময় পরীক্ষা চলেছিল—যার অনুবৃত্তি আরো কিছুকাল চলবে হয়তো—বিশেষ ফল পাওয়া যেত তাতে,—পূর্ব বাঙলার উপভাষাগুলো প্রাণের কাজে এত খাঁটি ব'লে। কিন্তু দেশ খণ্ডনের সঙ্গে এটা আগেকার ক্রিয়াশীলতার ফলে আরো কয়েক বছর চল্লেও মোটামুটি হয়তো শেষ হল। পশ্চিম বাঙলায় অনেক ভিটেছাড়া এসে পড়েছেন গত কয়েক বছরের ভেতর। কুড়ি পঁচিশ বছর বা তারো আগে পূর্ব বাঙলার অনেক গৃহস্থ এসে এদিককার বাসিন্দা হয়েছেন। পূর্ব বাঙলার বড় উপভাষাগুলো তাঁদের মুখে মুখে কিছুকাল শোনা যাবে, কিন্তু চিরকাল নয়। এঁরা না হোক, সন্ততিরা ক্রমে ক্রমে কলকাতার বা এদিককার নানা উপভাষায় কথা বলে কথা লিখে পশ্চিম বাঙলা ভাষী হয়ে যাবে। পূর্ব পাকিস্থানে উর্দু যদি রাষ্ট্রভাষা ও জনভাষা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে এমন এক সময় আসবে যে পূর্ব বাঙলার উপভাষাগুলো কারো মুখে কোথাও শুনতে পাওয়া যাবে না। এত ভালো —এত বড় বড় উপভাষা এরকমভাবে যদি ফুরিয়ে যায় তাও যেতে পারে; কারণ মানুষের বুদ্ধিবিচার প্রায়ই মূল্য সংরক্ষণ করতে চাইলেও ইতিহাস সাদা চোখে দেখে সব।

পূর্ব পাকিস্থানে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কিছুকাল থেকে আলোড়ন চলছে। পূর্ব পাকিস্থানের প্রায় সমস্ত লোকই বরাবর বাঙলা ব্যবহার করে আসছে। শিক্ষিতেরা ইংরেজি জানেন। কিন্তু ইংরেজি যত মহৎই হোক, বিদেশী ভাষা। রাষ্ট্রের ভাষা দেশী হওয়া দরকার। বাঙলা পূর্ব পাকিস্থানের দেশজ ভাষা; এ ভাষার যে স্বরূপ মুখে ও সাহিত্যে পূর্ব বাঙলা এতদিন বসে গড়ে তুলেছে তা বিশেষভাবে সেখানকার মুশিলমদের মুখে ও মননে গড়া জিনিষ; সমস্ত বাঙলাদেশ সে সব উপভাষা ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। আজকের চলতি বাঙলা বা সাহিত্যের বাঙলার সঙ্গে সে ভাষার পার্থক্য রয়েছে বটে, কিন্তু একই ভাষা নানা অঞ্চল-বিভিন্নতায় যে রকম পৃথক; সেটা এত কম যে ইংরেজির মত একটি বিদেশী ভাষা তো দূরের কথা হিন্দী বা উর্দুর চেয়েও যে কোনো নিরক্ষর বাঙলা উপভাষী অনেক সহজে—প্রায় নিজেরই উপভাষার মত সহজে সাধু ও চলতি বাঙলা বলতে পারবে; লক্ষ লক্ষ লোক শত শত বৎসর থেকে বলেও আসছে। এরকম অবস্থায় পূর্ব পাকিস্থান তার দেশজ ভাষা ও সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে উর্দু গ্রহণ করা সহজ ও স্বাভাবিক মনে করতে পারবে কিনা—কিংবা উর্দুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাকেও পাকিস্থানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে লাভ করতে চাইবে ও পারবে

কিনা—পূর্ব পাকিস্থানে ভাষা নিয়ে এইসব সমস্যা দেখা দিয়েছে। মীমাংসা এখনও কিছু হয়নি। কোন্ পথে হবে বলা কঠিন। কাগজে যেসব খবর পাওয়া যায় তা কতদূর সঠিক ও সম্পূর্ণ বলতে পারছি না; সংবাদ পড়ে মনে হয় খুব সম্ভব বেশী সংখ্যক পাকিস্থানীই বাঙলাকে পূর্ব পাকিস্থানের একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্থিত দেখতে চান। এ'দের ইচ্ছা ও চেষ্টা সফল হলে পশ্চিম বাঙলার ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষেও খুব বড় লাভ।

কিন্তু বাঙলা যদি পূর্ব পাকিস্থান থেকে ক্রমে ক্রমে উঠে যায় তাহলে এ ভাষার এর সাহিত্যের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হবে পশ্চিম বাঙলা। পূর্ব পাকিস্থানের নতুন নিয়মোৎসারিত ভাষা উর্দুর থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে না—সেখানে বাঙলা সাহিত্যেরও বিশেষ কোনো চাহিদা থাকবে না। দেশ বিচ্ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই টান কমে গেছে, কিন্তু সেটা হয়তো সাময়িক বিশৃঙ্খলার জন্যে, অনেকটা টাকাকড়ির অব্যবস্থার জন্যে। কিন্তু উর্দু পূর্ব পাকিস্থানের ভাষা হলে বাঙলা সাহিত্যের তেমন কোনো দরকার থাকবে না সেখানে। পূর্ব পাকিস্থান বা কোনো দেশের পক্ষেই দু তিনটে ভাষা একসঙ্গে বরদাস্ত করা সহজ নয়। ইংরেজিকে অনেক দিন পর্যন্ত বিশেষ দায়িত্ব-দরকারে চালিয়ে রাখতেই হবে। ইংরেজি, উর্দু শিখে ও রাষ্ট্রে সমাজে ব্যবহার করে পাকিস্থানের লোকজনের পক্ষে বাঙলার তেমন কোনো সার্থক ব্যবহার সম্ভব হবে মনে হয় না। পূর্ব পাকিস্থানের নিজ ভাষা হলেও বাঙলা সেখানে ক্ষয় পেয়ে পশ্চিম বাঙলার সক্রিয় ভাষার থেকে এত বেশি বিভিন্ন হয়ে পড়বে যে তখন তাকে চেনা কঠিন হবে।

অনুপাতে কম হলেও ভাষার (ও সাহিত্যের) ওপর এরকম একটা অবক্ষয়ের চাপ পশ্চিম বাঙলায়ও ক্রমে ক্রমে দেখা দেবে মনে হয়। এখনই দেখা দিচ্ছে। বাঙলা একদিন কোটি কোটি লোকের ভাষা ছিল, বাঙলার বাইরে নানা দিকে তার পরিব্যাপ্তি ছিল, মর্যাদা ছিল; কয়েক বছর আগেও দেশের পরিধি প্রায় তিন গুণ বড় ছিল। মননের ও কাজের নানা বিভিন্ন দিকে বাঙালীর ভারতীয় খ্যাতি ছিল। সব কিছুই এত বেশি সংকুচিত হয়ে গেছে, বিপর্যয় এত বেশি, টাকাকড়ির কুশৃঙ্খলা এত কঠিন যে ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে চিন্তা করবার সময় খুব সম্ভব দেশের নেই আজকাল। ভাষা লোকের মুখে ভেঙ্গে গড়ে সাহিত্যিকদের হাতেই বিশেষভাবে অগ্রসর হয়। বাঙলার লোকদের অনেকেই আজ উৎখাত। এবং প্রায় সব বাঙালীই আজ টাকা ও অন্নের সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছে; বেকার, আধ-বেকার, আধপেটা খাওয়া লোক প্রায় ঘরে ঘরে আজ। চাকরি নেই, ঘর নেই, ভাত নেই—এরকম দুঃখকষ্ট বাঙালী শীগগির বোধ করেনি। এই সমস্যাই আজ সব চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে; বাঙলার লোকের হাড় মাংস চিত্তের থেকে মুখের ভাষা উপভাষার নতুন নতুন বিকাশের পথ আজ আশা করা কঠিন। যে বাঙলা একদিন ভাত কাপড়ে ঘরে তৃপ্তি পেয়ে গল্প রূপকথা বচন ছড়া ইত্যাদি তৈরি করেছিল বাঙলার সে হৃদয় নেই এখন, সে সব লোক নেই, সে প্রবাদ ছড়া লেখ লেখন নতুন যুগে কোনো যুক্তিঘন ক্রমবিকাশ লাভ করল না, মরেই গেল—মানুষই মরে যাচ্ছে বলে।

বাঙলার সাধারণ জনতাপট আজ এরকম। এদের সাহিত্য আজ নিস্তব্ধ। সাহিত্যিকদের সাহিত্য বেঁচে আছে অবশ্য; তারই থেকে সাধারণজনও কিছুটা তৃপ্তি সংগ্রহ করে নিজেদের রুচি বুদ্ধি অনুসারে। বাঙলা-দেশে এখনও বড়, মাঝারি অনেক সাহিত্যিক আছেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা সকলেই প্রায় প্রবীণ, প্রৌঢ়। সাহিত্যে তেমন কোনো নতুন বড় সূচনার লক্ষণ শীগগির দেখা গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। গল্প উপন্যাস কবিতার একটা বড় বিভিন্ন বিস্তারে (প্রায় চতুর্থ বিস্তারের মত)—যেমন ইংলণ্ডে এলিজাবেথীয়দের বা ফ্রান্সে ইমপ্রেশনিস্টদের উদয়ে বা বোদেলেয়রের কবিতায় প্রুস্‌ৎএর উপন্যাসে—প্রবেশলাভ স্বতন্ত্র কথা, কবিতা বা গদ্য সাহিত্যে কোনো নতুন বৃহৎ তাৎপর্যের স্পষ্টতা পাওয়া যাচ্ছে? কুড়ি পঁচিশ বছর আগে গদ্য ও কাব্য সাহিত্য যেসব সম্ভাব্য সার্থকতা পাবে আশা করেছিল তারই অনেক কিছু এই বিশ তিরিশ বছরের ভেতর সিদ্ধিতে পৌঁছল—শেষ হতে চল্ল। নতুন লেখকেরা খুব সম্ভব সে সমাপ্ত অসমাপ্ত দায়ভাগের কম বেশি সদ্ব্যবহার করে সেই সব সার্থকতাই বহন করে চলেছেন। ব্যাপারটা সত্য হলে ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হতে হয়।

কিছু ঔপন্যাসিকদের বাদ দিলে বাঙলা দেশের সাহিত্যিকেরা শুধু নানা সময়পত্রে গদ্য বা কবিতা ছাপিয়ে বা বই লিখে প্রায় কোনো সময়ই ভাত কাপড়ের যোগাড় করতে পারেন নি; নিজেদের জায়গাজমি বা গচ্ছিত টাকা না থাকলে—খুব কম লেখকেরই আছে—তাঁদের সকলকেই প্রায় চাকরি ব্যবসা ইত্যাদি করতে হয়েছে, এখনও করতে হচ্ছে। চাকরি পাওয়া আগের চেয়ে ঢের কঠিন এখন, লেখকদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা আগের চেয়ে বেশি; আরো বেড়ে যাচ্ছে মনে হয়। লিখেও—এমন কি আপ্রাণ লিখেও কবিতায়, সমালোচনায় টাকা নেইই একরকম—গল্পে উপন্যাসেও আগের চেয়ে কম। পূর্ব পাকিস্থানের অবস্থাও প্রায় পশ্চিম বাঙলার মত, পাকিস্থানীরাও আমাদের মত সংসারের কঠিন সমস্যা নিয়ে উদ্ব্যস্ত, সাহিত্য পরি-পোষণ করবার মতন টাকাকড়ি বা মনের স্থৈর্য স্থিতি নেই এখন তাঁদের। এর ওপর উর্দু যদি পূর্ব পাকিস্থানের একমাত্র ভাষা হয় তাহলে বাঙালী সাহিত্যিকদের বই পাকিস্থানে ক্রমেই কম বিকোবে—শেষে অচল হয়ে পড়বে। দেশের পশ্চিম দিক এখনও বাঙলা বলছে, লিখছে বটে, কিন্তু সাহিত্যের থেকে মন সরে যাচ্ছে তার, নিজেই সে প্রাণে বেঁচে থাকবার জন্যে নিরত সাহিত্যিকদের বাঁচিয়ে রাখবার ক্ষমতা ক্রমেই হারিয়ে ফেলছে। এরকম অবস্থায় যে লেখকদের বেশি টাকা ও অবসর আছে (বিশেষ কারো আছে বলে জানি না) রুচি ও শক্তি থাকলে তাঁরাই সাহিত্যকর্মে স্থির লক্ষ্যের পরিচয় দিতে পারবেন। অন্যদের চাকরি বাকরি—না জুটলে পরের ওপর নির্ভর (যেটা সব দিক দিয়েই অপ্রিয় ও অসম্ভব) করে অসুস্থ ও অনিশ্চিত মনে মাঝে মাঝে লেখার কাজে হাত দেওয়া চলতে পারে। আর্থিক দুরবস্থার জন্যেই লেখায় হাত দেওয়া ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠবে মনে হচ্ছে।

ইংরেজি চলে যাচ্ছে। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা। ভারতীয়দের তা শিখতে হবে। ইংরেজির তুলনায় হিন্দী ঢের অশক্ত ভাষা—গরীব সাহিত্যের। কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের ছোট বড় ব্যাপারে হিন্দীকে অনর্গল সাচ্ছল্যে চলতে হবে বলে এ ভাষা এখন থেকে হয়তো সমস্ত দেশেরই বোধবুদ্ধি ও কর্মতৎপরতার আশ্রয়ে তৈরি হতে থাকবে। এ ভাষার সম্ভাবনা কতদূর আমি এখনই ঠিক কিছু বলতে পারছি না। তবে হিন্দীও সংস্কৃতের মত বড় ভাষার থেকে জন্মেছে, ফার্সীর কাছেও ঋণী। বাঙলা নানা কারণে অনেক

এগিয়ে গেছে। ইংরেজি, ফরাসি দি ভাষা, সাহিত্য ও স্বদেশীয় পণ্ডিত সাহিত্যিকদের কাছ থেকে বাঙলা প্রায় শো দেড়শো বছর ধরে যা পেয়েছে তার প্রায় হিন্দী তেমন কিছু পায়নি। এখন কি রকম জিনিষ পাবে—হিন্দীকে নামে নয় সত্যি সত্যিই যোগ্য রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্যে দাঁড় করাতে কাদের সাহায্য ও দিন সময় লাগবে বলা শক্ত। তবে রাষ্ট্র- া হওয়ার জন্যে হিন্দীভাষী দেশ ও কেদের চেষ্টা উৎসাহ স্বভাবতই বেশি ড় যাওয়ার ফলে এ ভাষার দ্রুত অগ্রসর চব হতে পারে। হিন্দী একরকম মুখের লেখার ভাষা হয়ে সমস্ত দেশের কাছ থেকে শষ শক্তি সহায়তা পাবে মনে হয়। স্কৃত ও প্রাকৃতের চল বন্ধ হওয়ার পর রতীয় ভাষা বা সাহিত্য বলে কিছু নেই, ভিন্ন রাষ্ট্রের সাহিত্য ও ভাষা রয়েছে। ন্দী রাষ্ট্রভাষা হলেও সংস্কৃতের মতন ক ভারতীয় ভাষা হয়ে উঠতে পারবে না তো—সে উদ্দেশ্যও খুব সম্ভব তার নেই। ন্তু বলে লিখে কাজে অকাজে ব্যবহার র হিন্দীর দিকে বিশেষভাবে মন দিতে র বলে রাষ্ট্রগুলোর নিজ নিজ ভাষা ও হিত্যের প্রতি যে ঢিলেমি স্বভাবতই এসে ড়বে তার পরিণাম হিন্দীর কতখানি গল করবে জানি না, কিন্তু অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের) যথেষ্ট অমঙ্গল করতে পারে। অবিশ্যি ইংরেজিও একদিন রাষ্ট্রভাষা ল কিন্তু ইংরেজির প্রভাবে বাঙলার কোনো ক্ষতি হয়নি, উপকার অনেক হয়েছে। সেদিনকার (প্রায় দেড়শো বছর আগের) বাঙলার চেয়ে ইংরেজি অনেক বেশি মহত্তর ভাষা ছিল, তার সাহিত্যেও সেই অনুপাতে বিভিন্ন সিদ্ধি ছিল। উঠতি বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে ইংরেজি অকাতরে দান করেছে; দরকার মতো ভাষাকে ঢেলে সাজিয়েছে পর্যন্ত; চিন্তা ভাবনায় যুক্তির মর্যাদা বেড়ে গিয়েছে—যদিও সাহিত্য যুক্তিমাত্র নয়। ইংরেজির কাছ থেকে বাঙলা যা পেয়েছে খুব সম্ভব তার স্বভাবনির্মিতি ও ক্ষমতার ফলে এবং প্রায় একশো বছর ধরে একটানা বড় সাহিত্যিকদের জন্ম দিয়ে সহজে ও সুস্থতায় তা সে আত্মসাৎ করতে পেরেছে। কিন্তু হিন্দীর কাছ থেকে বাঙলার আজ নেবার মত প্রায় কিছুই নেই; রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাকরি-বাকরি লেনদেনের ব্যাপারে ব্যবহার করা চলে শুধু। রাষ্ট্রভাষা করে যে বিশেষত্ব হিন্দীর ওপর আরোপ করা হয়েছে খুবই সজাগ মনে বাঙালী সাহিত্যিক ও বাঙালীর সেটা বুঝে চলা দরকার। ইংরেজি শিখতে শিখতে বাঙালী বাংলাকে মহৎ ও বিশদ করে তুলতে পেরেছে, কিন্তু কাজকর্মের সুবিধার জন্যে হিন্দীর বিশেষ চর্চা করতে গিয়ে এবারে বাঙলা ভাষার লাভবান হবার কোনো অবসর নেই—ক্ষতি ও ক্ষয়ের পথই খিরেছে এসে—মনে হচ্ছে।

হিন্দী শিখে হিন্দীতে লিখলে কিংবা নিজেদের বইয়ের হিন্দী অনুবাদের (ও লক্ষ লক্ষ পাঠকদের) দিকে তাকিয়ে বাঙলা বই রচনায় নিযুক্ত হলে গরীব সাহিত্যিকদের অর্থস্বাচ্ছন্দ্য ঢের বেড়ে যেতে পারে হয়তো কিন্তু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের কাজ বেশির ভাগই ফুরিয়ে যাবে। সমস্ত ভারতকে এক করতে হলে একটা একক ভাষার দরকার, ইংরেজি বিদেশী ভাষা বলে সে স্থান নিতে পারে না, কিন্তু দেশী হিন্দী তা পারে—একথা ভেবে বাঙালী পণ্ডিত ও সাহিত্যিক একদিন হিন্দীকে আরো নিকটভাবে গ্রহণ করবেন কিনা জানি না। যতদূর মনে হয় বাঙলা ভাষার জন্যেই বাঙালীর সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। দেশকে এক করতে হলেও পৃথিবীকেও এক করতে হয়; যা তা করতে পারে সে রকম কোনো সহজ, অন্বয় ভাষা নেই, ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। মানুষ মাত্রেরই জন্যে সে রকম একটি ভাষার দরকার আছে কিনা তাও ভাবনার বিষয়। সকলের সঙ্গে লেনদেন ইত্যাদির জন্যে সে রকম একটি ভাষা একদিন দাঁড় করাতে পারলেও মানুষের বিভিন্ন মনোস্বভাব নিজেদের জ্ঞান ও রুচি বিকাশের পথে সে ভাষা ও সাহিত্যকে বিপত্তি বলে বুঝতে পারবে। ক্যানাডা বা সুইট-জারল্যান্ডের মত ছোট দেশে কোনো একটি প্রধান ভাষা নেই, সোভিয়েট রাশিয়ায়ও নেই, আমাদের দেশেও থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। আগামী দু এক দশকে হিন্দীর প্রতিপত্তি খুব বেশি বেড়ে যেতে পারে। শুধু রাষ্ট্র ও সমাজ চালাবার—টাকাপয়সা বেঁটে দেবার দোষ-দুর্বলতার জন্যেই নয় অন্য নানা কারণেও প্রায় একশো সোয়াশো বছর পরে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সব চেয়ে বিপদের সময় এসে পড়েছে এবার। যে বিশেষ সাহিত্যিকদের আগামী পঁচিশ ত্রিশ বছর নিয়ে কাজ তাঁরা সংখ্যায় (যে রকম আশঙ্কা করা যাচ্ছে) খুব কম হয়ে পড়লেও বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে যথাসম্ভব তার বড় ধারাবাহিকতায় বাঁচিয়ে রাখবার মত প্রাণ ও মনের বিশেষ শক্তি দেখাতে পারলে—দেখাতে পারা যাবে কি?—ভবিষ্যৎ যতটা খারাপ মনে হচ্ছে তা না-ও হতে পারে।

বন্ধ্যা

(প্যাট্রিক্ কোলাম্)

অমিয় ভট্টাচার্য

গভীর রাত্রে পাতার বাসায় কপোতের কলরব,
—শুনলাম কান পেতে।
বড়ই কোমল বুনো কপোতের মুখর সঞ্চরণ!
মনে হোলো, যেন মার স্তনযুগে
শিশুর হাতের সশব্দ পরশন।

গলা ছেড়ে বলি: 'নড়িস্ নি তোরা!'
গলা হয়ে ওঠে ভারী।
(বঞ্চিত স্তন অশ্রুতে ভিজে ওঠে!)
—'ওরে বাছা, তোরা নড়িস্ নি, থাম্, থাম্,
শুনছে বন্ধ্যা নারী।'

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(৮)

ছেলেমানুষ, গল্প শুনে শুনে ঔৎসুক্যটা বেড়েই চলেছে; এদিকে আবার আদর পেয়ে পেয়ে আবদারেরও অন্ত নেই, নারাণী এক-দিন ধরে বসল তাকেও দেখাতে হবে কলকাতা। গল্প করে নিজের গুরুত্বটাই বাড়ানো উদ্দেশ্য ছিল গুপীর, মেয়েছেলে হয়ে এমন অসম্ভব আবদারটা যে করে বসবে নারাণী, বিশেষ করে কনে-বৌ হয়ে—এটা ভাবতে পারে নি। উল্ট গাইতে আরম্ভ করে দিলে দুদিন—জায়গা অবশ্য বড়ই কলকাতা, তবে সেখানে কি ভদ্রলোকের মেয়েছেলেরা থাকে? যারা আছে কোন রকমে নাক-কান বুজে আছে। বাড়ি থেকে এক পা বার হবার জো নেই, হলেই হয় ট্রামে চাপা পড়ো, না হয় গুণ্ডার হাতে, না হয় মিলিটারি। মেয়েদের মধ্যে খালি মেমসায়েব, না ঘোমটার বালাই, না কাপড়ের বালাই, ঠ্যাং-ঠেঙে ঘাঘরা পরে ধিঙ্গি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'ধিঙ্গি' কথাটার ওপর একটু জোর দিয়েই বললে গুপী, ফিরে ফিরে কয়েকবার ঐ কথাটার ওপরই এসে পড়ল, যদিই একটু সাড় হয় নারাণীর। কি হোল বোঝা গেল না, তবে নারাণীর কথা হঠাৎ অল্প হয়ে গেল, পরদিন আরও অল্প, তারপর দিন একেবারে চুপ চাপ।

গুপী মুশকিলে পড়ল। একা নারাণী নয়তো, তার জ্বলন্ত জ্বলে সংসার, সাবেক বৌ রতনের-মা, চার ছেলে, তিন পুত্রবধূ, তিনটি নাতি, চারটি নাতনী। বড় মেয়েটিও শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে, সঙ্গে দুটি ছেলে। এদের মধ্যে থেকে একা নারাণীকে নিয়ে গেলে তো চলবে না। রতনের-মা ওপরে ওপরে কিছু বলে না, নতুন বৌয়ের আদরযত্নেরও কোন ঘাটতি নেই তার কাছে, তবু মেয়েছেলেরই মন তো, বরং ওপরে ওপরে নারাণীর চেয়ে তাকেই খাতির দেখাতে হয় বেশি আজকাল গুপীকে। ছেলে, পুত্রবধূ, মেয়ে—এদের মুখও একটু ভারই থাকে; চলে এ অবস্থায় শুধু নূতন বৌটিকে নিয়ে কলকাতা দেখাতে যাওয়া?

চলে না তো, কিন্তু তার চেয়েও অচল অবস্থা যে এদিকে। অবশ্য কলকাতা যাবার কথা থেকেই যে এভাব নারাণী তা বলে না, কাজের অছিলায় গা-নাড়া দেয়, ঘুমের অছিলায় মুখ ফিরিয়ে নেয়; কিছু না বলেও মনের কথাটা বেশ স্পষ্ট করে দেয়।

তৃতীয় দিন গুপী বললে—"কই, তুই কলকাতা যাবি বলছিলি, আর শুনি না যে সে-কথা?"

"আমি তো মেমসায়েব লয়।"

"ন্যাও ঠ্যালা। মেমসায়েব ভেন্ন কেউ আর কলকাতা যাবে না?"

"গেরস্তর বৌয়েরা তো সবাই মটোর—টেরাম চাপা যাচ্ছে, গুণ্ডোর হাতে পড়চে।"

"না পড়চে যে এমন লয়, তা তুই থাকবি আমার সেথে। গুপী সামন্ত পাশে আর গুণ্ডো এসে গুণ্ডোমি করবে, এমন গুণ্ডোকে একবার দেখতে পেলে হোত যে!"

"একলা তো যাওয়া যায় না গো, আক্কেল আছে তো মানষের? দিদি আছে, ছেলেরা আচে, বৌয়েরা আচে, মেয়ে এলো শ্বশুর-বাড়ি থেকে, এক-কাঁড়ি ট্যাকা......"

"তুই আমায় ট্যাকার খোঁটা দিসনে নারাণী, করকরে চারটিশো ট্যাকা গুণে দিয়ে তোকে ঘরে নে'লুম। তুই যখন বের করেচিস মুখ দিয়ে—যাবে সবাই। তার খরচের ভয়টা কি দেখাস গুপী সামন্তকে?"

পরের দিন সাবেক বৌ রতনের-মাকে বললে—"কালীঘাট কালীঘাট করিস, একবার না হয় চল সবাই, এখন একটু ফুরসৎ রয়েচে......"

ঘাঘি মেয়েছেলে, সবই খোঁজ রাখে, সবই বোঝে, ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে রেখে মুখটা ঘুরিয়ে রতনের-মা বললে—"তা চলো না নিয়ে, আর তো বুড়োও হয়ে এনু, মানষের কত সাধ মেটে, আমার না একটাও মিটুক জীবনে।"

ঠিক হোল পাল-বৌকেও যেতে অনু[illegible] করা হবে। পাল-বৌ বিধবা, নেড়া, [illegible] প্রায় সামন্তেরই মতো। এদিকে খুব ড[illegible] অনেক দেখেছে, অনেক ঘুরেছে, মেয়ে[illegible] অর্থারিটি, পুরুষদের তোয়াক্কা রাখে না

কি রকম লাগছে? তেরস্পর্শ তো ঘট[illegible] গেল—গুপী, নারাণী, আর পাল-বৌ[illegible] নিয়ে।

ইঞ্জিনের জল নেওয়া হয়ে গেছে; ছে[illegible] দিয়েছে। হণ্টন আর মোটর বাসের পরিবর্তনটুকু আরও লাগছে ভা[illegible] রাস্তার ধারেই ডান দিকে একটি ঝুরি[illegible] মাঝারি গোছের বটগাছের নিচে গ্রাম্য দে[illegible] —মনে হোল যেন শীতলা। গাড়ি এ[illegible] গেলেও মনটা রইল আটকে। এই ঠাকুর[illegible] দেখলেই আমার মন কাছ-ঘেষে দাঁড়িয়ে প[illegible] একটু। কারণ আছে—ইনিই আম[illegible] চাতরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কিন্তু কা[illegible] শুধু তাই নয়, শীতলা আমার ছেলে[illegible] একটা অংশের সঙ্গে আছেন ওতপ্রোত [illegible] জড়িয়ে—আমার তখন মাত্র এক ঠাকু[illegible] অভিভাবকত্বে মুক্ত জীবন—কোথা[illegible] শীতলামূর্তি দেখলেই সেই সব দিন[illegible] ভিড় করে এসে পড়ে তাদের বি[illegible] অভিজ্ঞতা নিয়ে—পূজো, বলিদান, রা[illegible] কে দণ্ডী কাটতে কাটতে গঙ্গা থেকে [illegible] আসছে—কে অজ্ঞাত বলে থামের আ[illegible] থেকে মূর্তির দিকে করুণ নয়নে অ[illegible] চেয়ে। যাত্রা হবে, আসর সাজাতে র[illegible] কাগজের শেকল তুলে ধরছি—শেষ রা[illegible] ভাড়াটে বৌয়েদের জনশূন্য ভুতুড়ে বাড়ি[illegible] পাশ দিয়ে একা শিশু যাত্রা দেখে ফি[illegible] বাড়ি...আমি জীবনে বাঙলাকে নিবিড়ভ[illegible] পেয়েছি সেই একবার; এই যে আজ [illegible] ছেড়ে বেড়াচ্ছি ঘুরে—তাকেই আ[illegible] পাবার জন্যে; কিন্তু মনের সে মু[illegible] কোথায়? কোথায় দৃষ্টির সে স্বপন? য[illegible] দুঃখ করে হবে কি? যা করছিলাম ব[illegible] যাক।

তিন নম্বর হল্ট গেল বেরিয়ে, তার[illegible] গাড়ি এখন শিবানীপুরে। গল্প বোনা এক[illegible] স্থগিত রইল, এ নামটিও বেশ, ন[illegible] জায়গাটা একটু যেন পুরনো বলে বে[illegible] হচ্ছে; অনেকগুলি যাত্রী নামল এখা[illegible]

শনের পরেই একটু নাবাল জমি, শুকনো ই বোধহয়, তার মধ্যে নেমে আবার উঠে কেরা চলেছে, জনস্রোতে যেন একটা উয়ের দোলা। জায়গাটার এক দিকে মণ্ডহারবার রোড, একদিকে এই রেলের ইন, সেইজন্যে বেশ জমজমাট মনে হচ্ছে; ন্তত এখন মনে হচ্ছে, যখন ওদিকেও ছুটে লছে লরি-বাস, এদিকেও স্টেশনে গাড়ি ড়িয়ে, আর তাই থেকে সদ্য নেমেছে ত্রীর স্রোত। ছোট জায়গা হলেও অনেক-লি ভালো ভালো বাড়ি স্টেশন থেকে চোখে পড়ে। বাঁ দিকে একটানা লম্বা ওটা বাধহয় ইস্কুল। তিন নম্বর হল্ট থেকে নিকটা বেরিয়ে একটু এসেই একটা অর্ধ-ন্দ্রাকার বাঁকের মধ্যে গাড়িটা ডায়মণ্ডহার-বার রোড পার হয়ে এল, তারপর একটু ফাঁকা মাঠ ভেঙেই এই শিবানীপুর। এপাড়া, ওপাড়া, শিবানীপুরে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়লে তিন নম্বর হল্ট থেকে উত্তর পাওয়া যায়। এ লাইনে এটাও বেশ লাগে। লাইনের যা দৌড়—মোট মাইল পঁচিশেক, তার সঙ্গে বেশ মানানসই করে স্টেশনগুলি কাছে কাছে বসানো। খেলাঘরই তো।

একটা শাখা রাস্তা বেরুলে আবার ডায়মণ্ডহারবার রোড থেকে; নতুন হয়েছে মনে হয়, সম্ভবত ফলতা পর্যন্তই গেছে কিম্বা যাবে। চলেছে রেলের সমান্তরালেই, তবে খানিকটা তফাতে থেকে। এরপর এক-দিন ওর ওপর দিয়েও বাস যাবে, লরি যাবে; তার মানে ফলতা রেলের শনিগ্রহ এদিকেও নতুন পথ কেটে ঢুকল। ভগবানকে ধন্যবাদ; গাড়ি ছাড়ল, কেউ লোক ওঠে নি, আমি একটু নিরিবিলিই চাই! অথ পুনঃ 'গুপী-নারাণী-পালবধূ কথা ঃ

রাত তিনটের সময় গোরুর গাড়িতে চেপে বেলা দশটার সময় সবাই ফলতা-কালীঘাট রেলের পৈলান স্টেশনে পোঁছাল। প্রায় সকলেই এসেছে, বাড়িতে আছে বড় ছেলে, মেজ ছেলে, বড় বৌ আর নিতান্ত যে কয়টি কুঁচোকাচা ছেলেমেয়ে। ওরা তিনজন এর-পরে একদিন আসবে। ছেলে দুটির কলকাতা দেখা আছে, আরও কম বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে। বড় বৌয়ের বাড়ি ডায়মণ্ডহার-বারের কাছে, কলকাতা না দেখুক, শহর কাকে বলে জানা আছে বলে একটু দেমাক আছে, এবারে বাড়ি আগলাবার জন্যে রইল।

গুপী আর পাল-বৌয়ের কথা বাদ দিলে জানে, একবার এমনি দেখেছে, দুবার এক শুধু রতনের মা রেল গাড়ি কি তা চেপেছেও; বাকি সবাই একেবারে খাজা ঃ কৌতূহলে, উল্লাসে, মন্তব্যে, আবার কতকটা ভয়েও নিজেদের কামরাটা সরগরম করে তুললে। চাষা-ভূষো মানুষ, চাপা গলায় কথা কইবার শিক্ষা কারও নেই, অল্প সময়ের মধ্যেই একটা তামাসার ব্যাপার হয়ে উঠল। সবাইকে তোলবার মধ্যেই গাড়িটা ছেড়ে দেওয়ায় গুপীকে কামরাটার শেষ দিকে উঠতে হোল; সেখান থেকেই প্রশ্ন-মন্তব্য চলতে লাগল—'সবাই উঠল?—গুনে মিলিয়ে?—বলি ও রতনের-মা?'

ছোট ছেলে জবাব দিলে—'উঠল সব। ছোট মা জিগুচ্চে তাঁর বোঁচকাটা হাতে ঠিক আচে তো তোমার?...মা জিগোচ্চে, নাগলো নাকি তোমার তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে?'

পাল-বৌ বাইরের দিকে মুখ করে বসে-ছিল, কি ভেবে একটু মুচকে হাসলে।

গোটা দুই স্টেশন গিয়ে গাড়ি প্রায় খালি হয়ে এল। কি ভেবে ছেলেগুলো সব উঠে গুপীর কাছে চলে গেল। খানিকক্ষণ উত্তর-প্রত্যুত্তরটা নাতনীদের মধ্যস্থতায় চলল, তারপর রতনের-মার গলা একটু একটু করে খুলল, আর মধ্যস্থতার দরকার রইল না। সকলে যখন শাড়ি আর কাপড়ের খুঁট ধরা-ধরি করে মাঝেরহাট স্টেশনে নামল, তখন নারাণীর গলাও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। গ্রামের মেয়ে, লজ্জার ভাগটা কখনই বেশি ছিল না, যেটুকু বা ছিল, আহ্লাদের চোটে, চারিদিকের বাক্যস্রোতের তোড়ে সেটুকুও ভেসে গেল। দলের একটা হুল্লোড় আছে তো?

তা ভিন্ন সে না বাড়ির গিন্নি—রতনের-মায়ের পরই? তার না রতনের মতন সমর্থ ছেলে, অনঙ্গর মতন মেয়ে, তিলির মতন সমর্থ নাতনী?

শেকলের মতন হয়েই সকলে ট্রামে উঠল। খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়, তার পরেই মুখর হয়ে ওঠে, কর্তা হিসাবে গুপী ধমকায়, ভয় দেখায়, বোঝায়। কথা কয় না শুধু পাল-বৌ, সে যেন শক্তিসঞ্চয় করছে—একেবারে চরম প্রয়োজন না হলে মুখ খুলবে না। এইভাবেই কালীঘাটের ট্রামে বদলি হয়ে শেষে ট্রাম-ডিপোয় এসে নামল।

সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডার হাতে পড়ল, আদি গঙ্গায় স্নান হোল, দর্শন হোল, আহার হোল, তারপর গুপীকে একটু আড়ালে পেয়ে নারাণী বললে—"এইবার আসল, যার জন্যে আসা, তার ব্যবস্থা করো।"

গুপী জিভ কেটে, যাতে কথাটা মন্দির পর্যন্ত না পোঁছায়, এইভাবে বললে—"ও কথাটা আর এখানে দাঁড়িয়ে বলিস নে। আসলে তো এই তিথ্থি করতেই আসা, তিথ্থির চেয়ে আর বড় কি আচে এই ছাই সংসারে?"

মা-কালীর এলাকার মধ্যে নারাণী আর প্রতিবাদ করলে না বটে, কিন্তু আসল কথা তো তা নয়; এমনকি, শুধু কলকাতা দেখাও নয়, কলকাতার মধ্যে যেটুকু আসল কথার অংশ ছিল, সেটুকু উবেও এসেছে এর মধ্যে—ভিড়ে, চেঁচামেচিতে, নানান রকম গাড়ির হিড়িকে প্রতিপদেই মোড় ফিরতে ফিরতে। ......একেবারে আসল কথা বায়স্কোপ। সে নাকি এক আজব জিনিস, কলকাতা শহরের চেয়ে আরও আজব—ছবির লোকেরা হাসে, কাঁদে, নাচে, গান গায়, গাড়ি হাঁকায়, দাড়ি কামায়—হেন জিনিস নেই, যা করে না। বাড়ির মধ্যে দেখেছে এক গুপী, বড়ছেলে আর মেজ-ছেলে। বড়বৌও বলে দেখেছে, শহরের কাছের মেয়ে কিনা, কিন্তু ওর দেমাকের জন্যে ওর কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না কারুর।

জিনিসটা সেদিন এসেছিল ওদের মীরগঞ্জে—দায়েদের বড়কর্তার মেয়ের বিয়েতে, তা সামন্তদের সঙ্গে তো ওদের জমি নিয়ে ঝগড়া তখন, কারও দেখা হয়নি।

কলকাতা দেখাব কথাটা পাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারাণী বায়স্কোপের কথাটাও পাকা করে নিয়েছিল; শেষে আলোচনায় আলোচনায় ঐটেই আসল কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারাণী বলে—"শুনতেই সামন্তের পরিবার—অনেকের আবার চোখ টাটায়, বলে আদুরী, তা আদর তো কত! তুশ্চু একটা বয়েস্কোপ নিয়ে মীরগঞ্জের এতটুকু মেয়ে পর্যন্ত য্যাখন বড়াই করে, লজ্জায় মাথা তুলতে পারি নে, বড়বৌমার দেমাকের কথা বাদই দিনু।"

গুপী ভাবে, না হয় আর একটা আবদার, বায়স্কোপের ওপর তো আর উঠবে না, এই তো শেষ, বললে—"তা এবার তুইও বলবি—একেবারে কলকাতার বায়স্কোপের কথা;

মীরগঞ্জের কে তোর সামনে দাঁড়ায় দেখিস না।"

কিছু কেনাকেটা করে, চিড়িয়াখানাটা সেরে সন্ধ্যার একটু পরে সামন্ত পরিবার ভবানীপুরের একটা সিনেমার সামনে ট্রাম থেকে নামল। গুপী থেকে আরম্ভ করে ছোট নাতিটি পর্যন্ত তেরজন। বেটা-ছেলেদের গায়ে একটা করে পিরান, কাপড়-জামার খুব বেশি মিল নেই, হাতে এক-জোড়া করে নতুন জুতো, সেজ ছেলেটি পায়ে দিয়ে মুখ কুঁচকে খোঁড়াচ্ছে। গুপীর গায়ে একটা নতুন ফতুয়া, এখানেই রাস্তার ধারে কিনলে। পরনে ক্ষারে-কাচা কাপড়। বাড়ি থেকে পুরনো জুতোটাই পরে এসেছিল, অনেক জায়গায় তালি পড়েছে বলে কালীঘাটের বাসাতেই চাবি বন্ধ করে এসেছে; ঠিক করেছিল একজোড়া কিনবে, তা পায়ের মাপের পাওয়াই গেল না ক'টা দোকান ঘুরে। খালি পায়েই আছে।

বৌ আর মেয়েদের পরনে নীল, সবুজ বা ময়ূরকণ্ঠী সিল্কের শাড়ি, বোধ হয় বেশি তোলা থাকার জন্যে একটু করে রং-চটা, গায়ে মোটা মোটা রুপোর গয়না, ক্বচিৎ ছোটখাট এক-আধটা সোনার, ভ্রূর মাঝখান থেকে মাথার ব্রহ্মতল পর্যন্ত টানা তেলে-গোলা সিঁদুর। নারাণীর চাকচিক্যটা ওরই মধ্যে একটু বেশি।

সিনেমা আরম্ভ হয়ে গেছে, টিকিট-ঘরে ভিড় না থাকলেও কিছু লোক আছে। কয়েকজন পরের শো'র টিকিট কিনছে, কয়েকজন এমনি ঘুরে-ফিরে দেয়ালের ছবিগুলো দেখে বেড়াচ্ছে।

সেই রকম শাড়ি-ধুতির খুঁট ধরাধরি করে সকলে টিকিট-ঘরের একপাশে গিয়ে দাঁড়াল। যা দেখে, তাই নতুন, উৎসুক প্রশ্ন-মন্তব্যে ছোটদের মধ্যে একটু সোর-গোল পড়ে গেল। রতনের মা প্রভৃতি সঙ্কুচিত হয়ে রইল, তবে পাল-বৌ সবাইকে ধমকে, শহর জায়গায় কি করে চলতে হয় উপদেশ দিয়ে গোলমালটা আরও বাড়িয়ে তুললে। কলকাতায় পা দেওয়ার পর থেকে তার মুখ খুলেছে।

গুপী কাউন্টারে গিয়ে বললে—"টিকিস দেন বাবু—তেরজনের।"

ঘুরে মোটা গলায় জিগ্যেস করলে—"তেরজনই তো বটে গো? আর একবার গুণে দেখবেনি, বলি ও পাল-বৌ?"

পাল-বৌ ঘরের ও প্রান্ত থেকে সেই রকম গলাতেই উত্তর দিলে—"বালাই, ষাট, থেকে থেকে মানুষ গোণে কখনও? যত অলুক্ষুণে কান্ড তোমাদের বাপু! বলি গাড়িতে ক'খানা টিকিস নেছলে?"

সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল, পাশের ভদ্রলোকটি গুপীকে বললে—"একটু সরে দাঁড়াও, একি এ?"

কারুর কাছে নীচু হওয়া গুপীর ধাতে নেই, তার ওপর আবার নারাণী রয়েছে কাছে, সমস্যায় ফেলে পাল-বৌও মনটা দিয়েছে খিঁচড়ে; ঘুরে বললে—"সরে দাঁড়াব কেন মশাই? আপনিও পয়সা দে টিকিস কিনচ, আমিও পয়সা দে......"

বুকিংক্লার্কের এতক্ষণে বাক্‌স্ফূর্তি হোল, বললে—"কিন্তু টিকিস যে আর নেই হে কর্তা।"

গুপী ঘুরে হাঁকলে—"বলি ও পাল-বৌ, টিকিসবাবু যে কয় আর টিকিস নেই, সব ফুইরে গেল, তার কি করচ?"

বুকিংক্লার্ক একটু তামাসা দেখবার জন্যেই বললে—"পাল-বৌকে বলো নীচু ক্লাসের টিকিস ফুরিয়ে গেছে, উঁচু ক্লাসের আছে—একেবারে উঁচু ক্লাসের।"

গুপী ঘুরে শুনে নিয়ে হাঁকলে—"বলি, শুনলে কি কয় টিকিসবাবু—কয়—নীচু ক্লাসের টিকিস ফুইরে গেচে, একেবারে উঁচু কেলাসের আচে। রতনের মা কি কয়? একবার নোতুন বৌকেও সুদোবেনি?"

কাউকেও সুধানো পাল-বৌয়ের কোষ্ঠীতে লেখা নেই, সঙ্গে সঙ্গে সেই রকম গলায় ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে উত্তর দিলে—"বলি, নীচের ডালে ফল না পেলে মগডালের ফলটা তুলে নেবেনি?"

গুপী একটু অপ্রতিভ হয়ে বললে—"তা নোবনি? এ কেমনধারা কথা বলতেচ? নীচের ডালে না পেলে মগডালের ফলটা নিতে হবে বৈকি।"

ঘুরে বললে—"তবে দেন বাবু, উঁচু কেলাসের টিকিসই দেন।"

কৌতুকের সঙ্গে অবাক হয়ে যাবার ভাবটা চারিদিকেই বেড়ে গেছে, বুকিংক্লার্ক একটু হেসে বললে—"কিন্তু এদিকে সিনেমা আরম্ভ হয়ে গেছে বাপু, পাল-বৌ, নতুন-বৌ সবাইকে জিগ্যেস করে দেখো একবার বরং।"

গুপী আবার ঘুরল—"বলি, অ-পাল-বৌ, বাবু যে কয় উদিকে শুরু হয়ে গেচে, তার কি করচ?"

পাল-বৌ এবার একটু রেগেই বললে—"তোমরা শহর জায়গায় এসব ফ্যাসাদ ঘাড়ে করে এসে আর নোক হাসিওনি বাপু। বলি, নেমন্তন্নটা শুরু হয়ে গেলে ফিরে এস, না........"

'তা কি ফিরে এসি? বলি, তাকি ফিরে এসি?'—বলে অপ্রতিভভাবে আবার ঘুরে গুপী বললে—'তাহলে দেন, ঐ শুনলেন তো?'

জটলা বেশ জমেছে! মন্তব্যও শুরু হয়ে গেছে নানা রকম—'পাটের টাকা মশাই! দিন কত উঁচু ক্লাসের আছে আপনার, কত্তাকে মটকায় বসিয়ে দিন একেবারে।......বাড়িটাই কিনে নাওনা হে কত্তা, টিকিট কেনবার ল্যাটাই চুকে যাক।......গোটা কতক বস্ত্র গছিয়ে দিন না, আছে খালি?...পাল-বৌয়ের সিমিলি-মেটাফোরগুলো জোরালো দেখছ! আর হাঁ করতে দিলে না কত্তাকে!'

সামন্তের ভ্রূক্ষেপ নেই।

বুকিং ক্লার্ক সেই রকম অল্প হাসতে হাসতেই বললে—'তাহ'লে ঠিক ক'রে গুণে বলো কতগুলো দিতে হবে; আন্দাজে তো আর দেওয়া যায় না।'

গুপীর বোধহয় সাহস কমে আসছিল পাল-বৌকে ঘাঁটাতে, তবু নিরুপায় হয়ে জিগ্যেস করলে—'ঐ শুনলে টিকিস-বাবু কি জিগ্যেস করচেন তোমায়, বলি অ পাল-বৌ? একবার না গুণলে চলবে না যে, তার কি করচ?'

গুপীর সেজ ছেলে ভগীরথ খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, বললে—'আমি গুণে দেব বাবা?'

'তোদের ঠানদিদিকে সুদো।'

পাল-বৌ বললে—'তবে এক গরু, দু গরু করে গোণ্; খবরদার 'জন' বলবি নি। জানি নে বাপু, যেমন বড় মুখ করে নিয়ে এনু, তেমনি ভালয় ভালয় ফিরিয়ে নে যেতে পারি সবগুলোকে, তবেই'......

প্রবেশ পর্ব আরম্ভ হোল। (ক্রমশ)

ভগ্নাংশে

নৃপেন্দ্র সান্যাল

আজ আর কোনো কথার উত্তর করে না মাধুরী। জবাব দেবার আছেই বা কি! বু বাড়ির আর সকলকে অবাক করে য়েও যখন সে চুপচাপ থাকে, তখন ান্নাঘরে এসে দু'একজন খোঁজ নিয়ে গেল। াধুরী কি বাড়িতে না অন্য কোথাও, দির এত কথাতেও আজ সে চুপ?

তোলা উনুনে অন্য ভাড়াটের সংগে ভাগ রা রান্নাঘরে রান্না করতে হয় মাধুরীকে। রখানা এখন সে একাই ভোগ করছে। ার একটা উনুনে আঁচ পড়ে না আজ য়েকদিন। ও উনুনের বৌ হাসপাতালে গছে। ছেলে হবে ওর। নিজের নির্ধারিত কোয় বসে আছে মাধুরী। মাঝে মাঝে ধে কড়ার তরকারীর ছুক ছুক আর খুন্তি ভার শব্দ। নটার মধ্যে রান্না শেষ হওয়া ই। আপিসের তাড়া। আর এখন মাধুরী লখাপড়া যখন কিছুই করছে না তখন শুক না অন্ততঃ সংসারের কাজ। আটটার য় বাজার নিয়ে এলেও ন'টার মধ্যে মাছের ঝল তরকারী রান্না করে দিতে হয়। কেউ ত আর তাকে পটের বিবি করে রাখবে না। রমাই ইতিমধ্যে কথাটা একদিন মাধুরীকে লেছে।

মাস দুই হয় এখানে এসেছে মাধুরী। র মধ্যে এমন বহু কথা অনেকবার তাকে নতে হয়েছে। আগে হলে হয়ত কান্নায় াসিয়ে দিত। সকলের দৃষ্টির বাইরে নজেকে নিয়ে গিয়ে মুখ ঢাকতো। কিন্তু খন আর সে-সব নেই। সেও বড় একটা ড় কথা বলে না। সমান তালেই মুখিয়ে ঠেছে। কে যে পটের বিবি তাতো বোঝাই চ্ছে। ওপর থেকে হুকুম করতে তো আর াধা নেই। সুরমার অসুখের কথা একবারও ার মনে আসে না তখন। প্রথম যেদিন রমা মাধুরীর এমন কথা শুনল, তখন রমা তার সব কথা থেমে গিয়েছিল। াবতেও পারেনি এমন মুখে মুখে জবাব বে মাধুরী। আর যাই হোক, সুরমা ানে মাধুরীর মত মেয়ে কথায় জবাব দের না। তাই আচমকা এমন কথা শুনে সে কেঁদে ফেলল। সেইদিনই বোধহয় প্রথম। তারপর আর নয়।
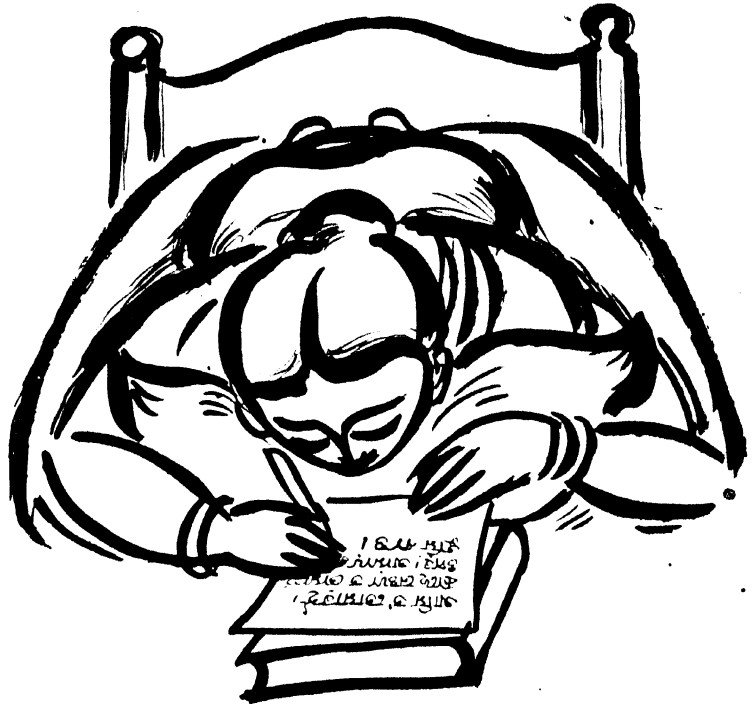
কান্নায় ভিজে উঠেছিল গলার স্বর। 'তুই-ও আমায় এমন কথা বললি মাধু। না হয় তুই কাজই করিস। তাই বলে আমার দিকে একটু তাকাবি না। আর যাই হোক আমি তো তোর দিদি।'

অন্যদিন হলে, আগে হলে মাধুরী নুয়ে পড়ত অনুশোচনায়। এখন অবশ্য সেই সব বোধ তার ভোঁতা হয়ে গেছে। আগে দিদির কথাই মেনে নিত। এখন ভাবে তার কি আর মুখ নেই। কথা সে জানে না নাকি? তাই মনে মনে ভাবে, বছর বছর ছেলে বিয়োলে এমন কাঁদতেই হয়।

কিন্তু তার আগে দিদিই তাকে কোনো কাজে হাত দিতে দেয়নি। তখন সে দিদির কাছেই থাকত। তবু যদি জোর করে মাধুরী কোনো কাজ করতে যেত সুরমাই বাধা দিয়েছে। সে-সময় এক একদিন গলা ভারী করে মাধুরী বলেছেঃ 'আমার কি একটু কাজ করলেও দোষ!' সুরমা তখন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। বলেছে,—'তোর কাজ শিখে দরকার নেই। যেমন করেই হোক মাধুরীকে তেমন ঘরে সুরমা দেবে না, যেখানে দু' বেলা হাড়ী ঠেলতে হয়।'

এও তো মাত্র কিছুদিন আগের কথা। কিন্তু তারও আগে। মাধুরীর বয়স যখন আরো কম। মাধুরীর মনে পড়ে। অনেক কথা ঢেউ হয়ে ভেংগে ভেংগে পড়ে তার মনে। তখন, তখন সুরমা কেমন ছিল?

সুরমার ওপরেই তখন সমস্ত সংসার। মার অসুখ। মাঝে মাঝে এক আধদিন উঠে হয়ত কাজ করেন। কিন্তু তারপরেই পড়ে থাকবেন বিছানায় অন্তত সাতদিনের নামে। তখন থেকেই সুরমাকে সামলাতে হয়েছে সব। রাজেন বাবুর আর কি। তিনি তো মাসান্তে মাইনের টাকাটা দিয়েই খালাস। বয়স আর তার তখন কত? বড় জোর তেরো কি চোদ্দ! তবু সেই বয়সেই তার সজাগ দৃষ্টির পাহাড়া বসানো ছিল চারিদিকে। সংসারের কাজে মাধুরীর অযত্ন হয়নি কোনোদিন। মাঝে মাঝে মনে হত, মাধুরীকে দিয়েই সে তার সময়ের বাকী

ফাঁক ভরিয়ে তোলে। সকাল থেকে বিকেল, তারপর রাত—এই সারাক্ষণ সংসারের নানান কাজের ফাঁকে তার পরিচর্যা করেছে সুরমা। এত বাড়াবাড়ি দেখে যদি কেউ আপত্তি তুলেছে তো সুরমার মুখ ভার। ভাব দেখে মনে হয় না তার বয়স এত কম। আর কাজে কোনো কষ্ট আছে। তবু যদি রাজেনবাবু কোনো কিছু বলতেন চোখ ছল ছল করে উঠেছে তার। থেমে থেমে বলেছে,—

'আর কারো জন্য তো কিছুই করি না বাবা। এমন কি তোমার জন্যও কিছু করতে পাই না। মাধুর জন্যও কি কিছু করতে দেবে না আমায়?'

তাড়াতাড়ি অন্য কথায় ফিরতেন রাজেনবাবু। এসব কথা না বাড়ানোই ভাল। চশমাটা হাতে নিয়ে কাঁচ মুছতে মুছতে তিনি বলতেন, 'না তার জন্য নয়। রান্না তো তুই-ই করিস্। বাকী কাজও যদি তোকেই দেখতে হয় তবে লোক রেখে আর কি কাজ। ঝি চাকরকে কাজে কাজেই রাখতে হয়, তাই বলছিলাম।

এবার সুরমা হাসে। নীচের ঠোঁট উল্টে বলে, 'ইস্, পারবে নাকি আর কেউ আমার মত গুছিয়ে কাজ করতে?' লেখাপড়া শিখছে না বলে তার দুঃখ নেই। কাজের গর্বে আরো বেশী ভরপুর সে। এমন কি বিয়ের পর পর্যন্ত সুরমা মাধুরীকে কাছ ছাড়া করেনি। নিজের কাছে নিয়ে এসেছে তাকে। এ-নিয়ে কম কথা শুনতে হয়নি। তবু তা' অনায়াসে উপেক্ষা করেছে। মনে মনে ভেবেছে, কে বুঝবে মাধু তার কে, তার কাছে কত বড় মাধুরী!

তারপর একদিন সুরমার বিয়ে হ'ল। একটু বেশী বয়সে। ছোট ভাইয়ের বিয়ের সঙ্গেই। বাড়িতে বউ না এনে কি পরের ঘরে মেয়ে পাঠানো যায়? শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় সুরমা মাধুরীকেও নিয়ে গেল। তারপর থেকে এতকাল সে দিদির কাছেই ছিল। এই মাত্র কয়েকদিন আগে নিজেদের বাড়ি গেছে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে আর এ-বাড়িতে তাকে আসতে দেয়নি বিমল। তার নাকি এতে অসম্মান হয়। বলেছে, লোকে ভাবে আমি বোনকে খেতে দিই না বলেই সে দিদির কাছে থাকে। আর তাছাড়া এ-সংসারেরও তো কিছু কিছু কাজ আছে। বোন থাকতে বৌকেই সংসারের সব কাজ করতে হবে, এ কেমন কথা। আর সে তো লাটসাহেব না যে, ঝি রাখবে একটা! বাবার মৃত্যুর পর দুটো বাড়ি যেন দুটো দ্বীপে পরিণত হলো। হঠাৎ প্রয়োজনে সেই দুই দ্বীপে সেতু বাঁধে। সুরমার আবার ছেলে হবে। আবারো এবাড়িতে মাধুরীর ডাক পড়ল। তাছাড়া কিছুদিন হয় সুরমাও তাকে আনতে চায়নি। ও এলে নানারকম অশান্তি বাড়ে। ভাড়া বাড়িতে হুজ্জুত তো লেগেই আছে। নতুন কোনো হাঙ্গামায় আর সায় নেই।

প্রথম প্রথম মাধুরীকে নিয়ে তেমন অসুবিধা হয়নি। সুরমার তখন ঝি ছিল। কাজ বেশী না থাকায় মাধুরী এ-ও ঘরের ফরমাস খাটত। কারো ঘরে তখন যাওয়ার তার বাধা নেই। কিন্তু বয়সটা তার সব সময়ে আর ফ্রকে আটকে থেমে থাকেনি। বাড়ন্ত, আঁটোসাঁটো শাড়ী ধর ধর চেহারায় তাই এ-ঘর ও-ঘর অভ্যাসমত যখন যায়, তখন কেলেঙ্কারির ভয়ে নাকি সকলের বুক হিম হয়ে যায়। তাদের সবার ঘরেই ছেলে। অমন গুণধরদের যদি মাথা খারাপ হয় মাধুরীর বেলেল্লাপনায় তবে অবাক হবার আছে কি? তবে মাধুরী জানে, সুরমাও লক্ষ্য করেছে অন্য ঘরের ছেলেদের চাল-চলন। দূরে দাঁড়িয়ে লুব্ধ কুকুরের মত জিভ চাটবে। সামনে আসার সাহস নেই। আর মাধুরীর আসা যাওয়া নিয়ে আপত্তিটাও তাদেরই বেশী। সুরমা তখন বুক বাজিয়ে ঝগড়া করেছে। একে তো টায় টায় চালানো সংসার তার ওপর বাড়তি লোকেই দুর্ভাবনা। তবু মাধুরীর বেলায় কষ্ট সহ্য করার নয় যুক্তি-ই আছে। কিন্তু ও আসে যেন ঝগড়া করার উপায় নিয়ে। সুরমাও এই একই কথায় সমর্থন খোঁজে। ক্রমেই তার তেজ কমে এল। সংসারের চাপ বাড়লো। সব সময়ের ঝি এসে ঠেকলো ঠিকেতে। সেও-তো কতদিনের কথা। সুরমার দু'টি মেয়ে হয়েছে তারপর। মাধুরীর কাপড় পড়া আর নতুন না।

রেশম-পোকার মত পুরনো কথার গুটি বোনে মাধুরী। দিদির প্রতি তার করুণাই হয়। মনের কাছে সায় চায়, দিদির শরীর বড় খারাপ। অতটুকু কচি ছেলে নিয়ে বুঝি পেরে ওঠে না। নইলে হাসপাতালে যাবার দিনও তো বাড়ির কাজ সব শেষ করে গেছে। আর অসুখের তো শেষ নেই। কেমন রোগা হয়ে গেছে। মেজাজটা তাই যদি একটু খিটখিটে হয়ে থাকে তবে তা নিয়ে বলবার আছে কি? আর কি এমন কাজ করে মাধুরী! দু'বেলা রান্না। অন্য হাল্কা কাজগুলি তো এখনো দিদিই করে। ডাক্তারের নিষেধ না শুনেও উঠে দাঁড়ায়। আগে কি সে দেখেনি দিদির কাজ! অথবা এমনও হতে পারে, দিদির মত গুছিয়ে সে কাজ করতে পারে না বলে দিদির এত রাগ। আজ রোজকার মত সকালে ঘুম থেকে উঠলেও নিজেকে অপরাধী মনে করে মাধুরী। মনে মনে ভাবে এত বেলা করে ঘুম থেকে উঠলে কি সংসারের কাজ চলে। এসব কারণে সুরমা যদি কিছু বলেই তাকে তবে তার তো লজ্জা হওয়া উচিত। কথার আবার জবাব দেবে কি? হাতা দিয়ে ডাল নাড়তে নাড়তে কেমন যেন হঠাৎ কান্না পায় তার। যেন খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগে তার বুকটা।

চারদিকে তাকিয়ে জামার নীচে বুকে হাত দেয় মাধুরী। মনের উত্তাপে ঘামে ভিজে গেছে চিঠিটা। কাল বিকেল থেকে জামার নীচে রেখে দিয়েছে চিঠিখানা। অবনীর চিঠি। বুকের নরম মসৃণ মাংসে চিঠির শক্ত কাগজে কেমন যেন খোঁচা লাগে। বুকটা টন টন করে ওঠে তার।

অবনীর কথা মনে হয় মাধুরীর। শঙ্করের মেজদার শালা। তাদের চিনত না সে এতকাল। দেখেওনি। এই মাত্র মাস দুই হ'ল কলকাতায় এসেছে। চাকুরীর খোঁজে। এ-বাড়িতেই প্রথম তাকে মাধুরী দেখে। সেদিন এসেছিল এমনি-ই কি কাজে দিদিকে নিয়ে। এখন আসে একা কি কাজে। কথা ছিল না তাদের মধ্যে। এখনও নেই। তবে এখন যেন কথার চেয়ে বেশী অনেক কিছু বলে। প্রথম দিন—মাধুরী মনটা সির সির করে উঠল পুরনো আমেজে প্রথম যেদিন কথা বলল অবনী, মাধুরী মেজেয় মাদুরে আড় হয়ে বসে বসে কি বই পড়ছিল। সুরমাকে অবনী বলেছিল বাঃ আপনার বোনের পড়ায় খুব মনোযোগ দেখছি। কান দুটো গরমে লাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আচমকা সে কিছু করে বসেনি না। হঠাৎ উঠে গেল না সেখান থেকে এরকম কথা তো আর নতুন না। সে আ... অনেকবার শুনেছে। আস্তে আস্তে বইখানা মুড়ে তাকে রেখে ঘর থেকে বেড়িয়ে গে... যাবার পথে শুনল অবনী বলছে।

'আপনার বোন তো ভারী লাজুক সুরমাদি।'

জবাবে ভ্রূ কুঁচকে কথাটা ... নিয়েছিল।

'হ্যাঁ, বড় লাজুক ও।'

সেদিনও কিছু ভাবেনি মাধুরী। দাদার র আর বন্ধুদের মতই তাকে মনে হয়েছে। রা মাঝে মধ্যে তাদের বাড়িতে আসে। নো অবকাশে রসিকতা করে হয়ত সবে। বড় জোর সিনেমায় নিয়ে যেতে হবে একদিন। এর চেয়ে একটু আলাদা রা, তারা হয়ত কবিতা লিখে বই উপহার রে। অন্ধকার বাড়ির পথটুকু এগিয়ে বার জন্য বলে সচেতনভাবে গায়ে হয়ত াৎ গা ঠেকাবে। এর বেশী আর যেন ছু করবার নেই। সাহসও নেই। ওপর ভেই তারা খুসী। আসল না দিলে ল যাবে। প্রশ্রয় পেলেও ওইটুকুই। কিন্তু নীর চিঠি যেন দূরত্বের সমস্ত সংশয় চিয়ে তাকে কাছে টেনে নিল। অবনী খেছে, 'দূরেই যদি থাকবে, তবে হঠাৎ ছে এলে কেন?' তারপর আরো, অনেক। স্পষ্ট কুয়াসার মত।

কান্নাটা মাধুরীর থেমে গেছে। কেমন ন বসে থেকে থেকে থমথমে ভাব এসেছে রীরের রেখায়। নীচে রান্নাঘরের পাশে রমের গঙ্গাজলের কলটা অনেকক্ষণ র খোলা। অশ্রান্ত জল পড়ে কেমন যেন ীত শীত লাগে। এলোমেলো কাপড়ের পে নিজেকে শৈথিল্যে ছড়িয়ে দিয়ে সে আছে মাধুরী। বর্ষণক্লান্ত শ্রাবণদীঘির ত থম থম করছে তার মুখ।

অনেকক্ষণ ধরে বক বক করে এবার রমা থামে। আজ সে-ও অবাক। বাকী তের কাজ দু' একটা সেরে রান্নাঘরে সে। মাধুরী তখনো বসে, নেতানো নের সামনে। কাপড়টা তার বড় ময়লা য় গেছে। বয়সের মেয়েকে ময়লা কাপড়ে হ্য করতে পারে না সুরমা। নিজের দিকে কিয়ে কেমন যেন লাগে তার। মাধুরীর ছে সরে আসে। একেবারে পাশে। কে যাওয়া মাধুরীকে তার চমক ভাঙতেই ঝ জিজ্ঞাসা করে:

'কি এমন করে বসে আছিস?'

এমন হঠাৎ প্রশ্নে চোখ বড় বড় করে কায় মাধুরী সুরমার দিকে। হাসপাতাল কে ফেরার পর এই প্রথম সে নীচে নামল। দিনের লাগসই জবাবটা আর তার খে আসে না। তাহলে অনায়াসেই বলে তে পাতে সুরমার কি? আজ যেন কেমন য় পায়।

'সব কাজ তো হয়ে গেছে দিদি। রান্নারও কিছু বাকী নেই। আর কিছু করতে হবে?'—

কথার সবটা শেষ করতে পায় না সে। মুখটা তার চাপা দিয়ে দেয় সুরমা।

'তোকে বড় খাটাই আমি, নারে মাধু?'

'না না,' তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে মাধুরী। 'তোমার অসুখে পার না, তাইতো আমি করি। আর—'

'থাক। আজ থেকে মাধু আমিই রান্না করব।'

কেমন যেন লাগে। আজকেই কি চলে যেতে হবে তাকে। অবনীর চিঠির উত্তর তাহলে দেবে কেমন করে। ওবাড়িতে তো সে যায় না। মাধুরী আর কিছু না ভেবেই বলে, হঠাৎ কান্নায় ভেঙ্গে বলে,—

'আমি আজ কি করলাম যে, তুমি আজকেই আমাকে চলে যেতে বলবে।'

সুরমার বড় খারাপ লাগে। মাধুরী যেন কিছুই বুঝতে চায় না। ঠিক ছোটবেলার মত তাকে কাছে টেনে এনে, বলে,—

'না তোকে পাঠিয়েও দেব না। আর তোর কাজও করতে হবে না। আমার কাছেই তুই থাকবি মাধু। আগে যেমন থাকতিস্। আমাদের খাওয়া জুটলে তোরও জুটবে।'

তারপর যেন নিজের কাছেই জবাবদিহি করে সুরমা। 'থাকার তো আর অন্য অসুবিধে নেই। না হয় একঘরেই সকলে থাকলাম। এক এই একটা মানুষের সামান্য দেড়শ টাকা আয়ে চলে না বলেই তো তোকে রাখতে পারি না।'

রাত্রে সবাই ঘুমুলে বইয়ের ফাঁকে কাগজ রেখে চিঠি লেখে মাধুরী। বইখানা কাল অবনী দিয়ে গিয়েছে। বুকের নীচেয় বালিস চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে লিখছে। লিখতে লিখতে কেমন যেন তার গলা আটকে যায়। বেশী লিখতে পারে না। ছোট চিঠি:

'আমি তো তোমারই। কাছে নেওয়া তো তোমারই ওপর। আমায় এবার তুমি নাও।'

চিঠিখানা শেষ করে খামে ভরে রেখে দেয় বইয়ের মধ্যে। কাল আবার অবনী আসবে বইখানা নিয়ে যেতে। বালিসের নীচে বইখানা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে মাধুরী।

চিঠিখানা পাবার পর দু'তিন দিন আর অবনী আসে না। এমনি নতুন না। কিন্তু এখন যে তা বড় বেশী। ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে মাধুরীর। মনে সান্ত্বনা খোঁজে, রাত্রে একটা ট্যুসন খোঁজে তাই বুঝি আসতে পারে না।

তারপর একদিন বিকেলে অবনী এল। মাধুরী ঠিক করেছিল কথা বলবে না। আসতেই ঘর থেকে বাইরে চলে যাচ্ছিল। সুরমা ঘরে নেই। অবনী হাত টেনে বলে, 'চলে যাচ্ছ যে।'

মাধুরী: 'তবে কি করব?'

জবাব পেয়ে একটু থামে অবনী। মনে মনে ভাবে কি করে বোঝাবে সে এ ক'দিন কেমন ক'রে কেটেছে তার। আজ সব ঠিক করে জানাতে এসেছে। এক সওদাগরী অফিসে কাজ করে। মাইনে মাত্র প'চাত্তর টাকা। তা থেকে বাড়িতে পাঠাতে হয়। এখানে খরচ আছে। আর যে টাকা থাকে তাতে দুজনের চলবে কি করে? মাধুরীর চিঠি পেয়েও তাই থমকে দাঁড়াতে হয় তার। প্রথম কত রঙীন লেগেছিল। কিন্তু ভাবনার অতলে সব রঙ উবে যেতে চায়। অনেক ভেবে চিন্তে আজ ঠিক করেছে শেষপর্যন্ত, সর্টহ্যান্ড শিখবে। শুনেছে এখনও নাকি ওদিকে তত ভীড় জমেনি। চাকুরী পাওয়া যায়। মন দিয়ে পরিশ্রম করলে এক বছরেই কোর্স শেষ করা যাবে। এখন একটা কিনারা পেয়ে মন ভরে উঠেছে তার। আজ কি-না মাধুরী কিছুই শুনতে চায় না?

অবনীঃ 'রাগ করো না মাধ্ব, আসতে দেরী হ'ল বলে। আজ সব ঠিক করেই তোমার কাছে এসেছি। জানতো আমার আয়। আমাদের বিয়েই সব নয়। পরের ভাবনাও তো আছে। অন্ততঃ সাধারণভাবে চালানোও তো চাই। কিন্তু আমার যা আয় তাতে,—'

মাধ্বরীর আরো ঘনিষ্ট হয় অবনী।

'তোমাকে আরো অন্ততঃ একবছর অপেক্ষা করতে হবে মাধ্ব। সর্টহ্যান্ড টাইপ স্কুলে এডমিশন নিয়েছি। শিখতে পারলে মাইনে বাড়বে। এ ক'টা দিন পারবে না?'

আস্তে ঘাড় কাত করে মাধ্বরী। যেন এমন করা ছাড়া তার উপায় নেই। আরো কত কথা বলল অবনী। কিছ্ব তার কানে যায়নি। শ্বধ্ব মনে হয়েছে সর্টহ্যান্ড টাইপ কি আরো কম সময়ে শেখা যায় না। আর সত্যিই কি ভাল চাকুরী হয় তা শিখলে। আর সে ভাবতে পারে না। কোনক্রমে আশা বাঁচিয়ে রাখে।

স্বরমা ঘরে আসতে নীচে চলে এল সে। অবনীও স্বরমার সংগে দ্ব' এক কথা বলে চলে যায়। রান্নাঘরে এসে বঁটি পেতে কুটনো কুটতে বসেছে মাধ্বরী। উন্বনে ডালের কড়া। সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

সদর দিয়ে আসতে আসতে যেন বাড়িটা মাথায় করে তুলেছে শংকর। হাতে তার একখানা রঙীন তাঁতের কাপড়। রান্নাঘরে উ'কি দিয়ে মাধ্বরীকে দেখে বলে,

'দেখ মাধ্ব, তোমার কাপড় দেখ। পছন্দ হয় কি না'।

চোখের কোণায় কোণায় হাসি ছড়িয়ে দিয়ে মাধ্বরী উঠে আসে।

'তোমার দিদি বলেছিল তোমার নাকি কাপড় নেই। তাই আজ নিয়ে এলাম। তোমার দিদির আবার যেমন। ম্বখ দিয়ে কথা বার করার পর আর তর সইবে না। দেখ বাপ্ব ভাল করে পছন্দ হয় কি না।'

সাদাসিধে ভালমান্বষ শংকর। সত্যিই ঘেমে গেছে এত কথা বলতে।

'আপনি তো একেবারে ঘেমে গেছেন।'

'ঘামার আর অপরাধ কি। তোমাদের কাপড় কেনাও তো এক ঝকমারি। খোল ভাল হয় তো পাড় পছন্দ হয় না। আবার পাড় পছন্দ হয়তো খোল খারাপ। তারপর আবার রঙ। প্রায় পঞ্চাশটা দোকান ঘ্বরে কিনে আনলাম এখানা।'

শংকরের ব্যস্ততা তখনো কাটেনি। ভাব দেখে মাধ্বরীর হাসি পায়। হাসি চেপে বলে,

'যান, ওপরে দিদিকে দেখান গিয়ে।'

কোলের কাছে কাপড়খানা টেনে এনে নেড়েচেড়ে দেখে স্বরমা। প্রথমে একটু খ্বঁত খ্বঁত করে। কিন্তু পরে মত দেয়—

'বেশ হয়েছে। কিন্তু দাম কত?'

রসিকতা করে শংকর জিজ্ঞাসা করে। 'তুমিই বল। দেখি ঠকেছি না জিতেছি।'

নিজের শরীর নিয়েই ব্যস্ত স্বরমা। অত কথা ভাল লাগে না তার।

'কি জানি কত। অত শত বলতে পারি না বাপ্ব। তবে বেশী না হওয়াই ভাল। এ মাসে খরচ অনেক।'

এতক্ষণে সম্বিৎ ফেরে শংকরের। রসিকতা ফিরিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে, 'না বেশী কিছ্ব না। পনের টাকা নিয়েছে মাত্র।'

শংকরের কথা শ্বনে স্বরমার কোটরাগত চোখদ্বটো কপালে ওঠার যোগাড়। 'এাঁ, পনের টাকা! আর এই তোমার কম। এক-খানা সাধারণ আটপৌরে শাড়ী আনতে বলেছিলাম। আর তুমি খরচ করে এলে পনের টাকা!'

হিসেবে শংকরও ব্বঝি কম যায় না। চোখ কু'চকে হিসেবী হওয়ার চেষ্টা। স্বরমার খ্বব কাছে সরে আসে। প্রায় কানের কাছে ম্বখ নিয়ে বলে, 'আমাকে তুমি এতই বেহিসেবী মনে কর। তারপর একটু থেমে, আরে একটা ঝি রাখলেও তো এর চেয়ে বেশী খরচ পড়ত তোমার।'

আলোচনা

"পুরানো দিনের দানাপুর"

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার
সমীপেষু

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

৩রা ফাল্গুনের দেশ পত্রিকায় আপনার লিখিত "পুরানো দিনের দানাপুর" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা দানাপুরের বাঙালী ও অবাঙালী অধিবাসীরা অতীব প্রীতি লাভ করিয়াছি। ৬১ বৎসর পূর্বেকার কথাগুলি পড়িয়া পুরাতন দিনের আরও বিবরণ জানিবার জন্য আমার মনে কৌতূহল হইল। আমার প্রতিবেশী বৃদ্ধ বাবু পদারথলালের (যাঁহার বয়স এখন ৭৫ বৎসর) নিকট পত্রিকাখানি লইয়া গেলাম ও খানিকটা অনুবাদ করিয়া শুনাইয়া দিতেই তিনি রঞ্জনবাবুর নাম শুনিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার ছেলেকে দিয়া স্বর্গীয় করমচাঁদবাবুর পুত্র বাবু মোহনলালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পদারথবাবু বলিতে লাগিলেন, ঐ চাকলা মহল্লার নিকটে এককালে তাঁহার বসতবাটি ছিল। যে বাড়ীতে আপনারা থাকিতেন, এখন তাহার পাশে আর গঙ্গা নাই—গঙ্গা সরিয়া দীঘার দিকে চলিয়া গিয়াছে। শোণের একটি সরু শাখা তির্ তির্ করিয়া ঐ বাড়ীর পাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। উপরের কয়েক ধাপ সিঁড়ি ছাড়া বাকিগুলি মৃত্তিকাগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কুমোর বুড়ির নাম ছিল, লুলহাইয়ের মা। আপনি ঐ বাড়ীটির আশে-পাশের যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন, পদারথবাবু তাঁহার বাল্যকালে ঐ সমস্ত হুবহু দেখিয়াছেন। লুলহাইয়ের মাকে চুক্কর অর্থাৎ মদ খাইবার গেলাস তৈয়ারী করিতে তিনিও দেখিয়াছিলেন। রঞ্জনবাবুর পূর্বে ঐ বাড়ীতে কে ছিল, তাহা তাঁহার মনে নাই, কিন্তু জয়দয়াল যে তড়িৎবাবুর বন্ধু ছিলেন, সে কথা তাঁহার স্পষ্ট মনে আছে।

এমন সময় স্বর্গীয় করমচাঁদের পুত্র মোহনলাল (বয়স এখন ৬০-এর ঊর্ধ্বে) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই বৃদ্ধের আগ্রহে আমি আপনার প্রবন্ধটি আগাগোড়া অনুবাদ করিয়া শুনাইয়া দিলাম। বৃদ্ধ মোহনলাল ভাবে গদগদ হইয়া পড়িলেন। ছাপার অক্ষরে বাঙলা পত্রিকায় তাঁহার পূর্বপুরুষদের কাহিনী প্রকাশিত হইতে পারে, ইহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আমি বৃদ্ধ মোহনলালের একটি ফটো নিলাম এবং বাড়ীটি দেখিতে চাহিলাম। বলা বাহুল্য,

মোহনলাল

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ রাজী হইলেন ও আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পথে তাঁহার কনিষ্ঠ ভাই বনোয়ারীলালের সহিত দেখা হইল। বনোয়ারী এখন কাশীতে থাকেন। কর্ম উপলক্ষে দুই চারি দিনের জন্য দানাপুরে আসিয়াছেন। বাড়ীটি এখন হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অমরচাঁদ ও করমচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি ভাগ হইয়া যায় এবং ঐ বাড়ীটি তাঁহাদের একজন জ্ঞাতি কিনিয়া লয়েন।

দুই ভাই মিলিয়া যখন সেই বাড়ীতে আমাকে লইয়া গেলেন, তখন সেখানে তাহার বর্তমান মালিকের সহিতও দেখা হইয়া গেল। মাটির নীচের ঘরখানির এখন আর অস্তিত্ব নাই। সমস্ত ভরাট করিয়া দিয়া তাহার উপর পাকা মেজে করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইটুকু সময়ের ভিতর সমস্ত মহল্লাটায় কি জানি কেমন করিয়া একটি সাড়া পড়িয়া গেল এবং আমরা যখন আপনার বর্ণিত সিঁড়ির উপর চাতালটিতে দাঁড়াইয়া বাড়ীটার একটা ফটো লইবার বন্দোবস্ত করিতেছি, এমন সময়ে কৌতূহলী জনতা আসিয়া আমাদের ঘিরিয়া ফেলিল। এই বাড়ীটাকে কেন্দ্র করিয়া ৬১ বৎসর পূর্বের ইতিহাস শুনিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ভিড় ঠেলিয়া কাদামাখা হাতে এক বৃদ্ধ কুমোর আসিয়া আমাকে সেলাম করিল এবং একগাল হাসিয়া কহিল, তাহার নাম ধানুক পণ্ডিত। এদেশে কুমোরদের পদবী পণ্ডিত হইয়া থাকে। পূর্ব হইতেই আমাদের কথা-বার্তায় সে কিছুটা আঁচ করিতে পারিয়াছিল। সেই কুমোর বুড়ির পৌত্র বলিয়া সে নিজের পরিচয় দিল। বুড়ির ৭।৮ বৎসরের এক নাতি লাঠি হাতে নিয়া গেলাস পাহারা দিত, সে ছিল ধানুক পণ্ডিতের বড় ভাই, নাম যোগা—আজ প্রায় বিশ বৎসর হইল মারা গিয়াছে। বৃদ্ধ ধানুক পণ্ডিত বলিল, সে রঞ্জনবিলাসবাবুকে খুব ভাল করিয়াই চিনিত। তিনি ছিলেন, পাতলা গোরা লম্বা ও চশমাপরা বাঙালীবাবু। কুমোর বুড়ি যেখানে বসিয়া চাক ঘুরাইত, সেই স্থানটি

মেসোমশায়ের পুরাতন বাড়ী

মণি বোসের পুরাতন দোকানকুঠী ও ক্লাবঘর

কুমোর

জয়দয়ালের পুরাতন ভিটা

আমাকে দেখাইয়া দিল। ভিড় ঠেলিয়া একটু জায়গা করিয়া বৃদ্ধকে চাকে বসাইয়া একটি ফটো তুলিয়া লইলাম। আমি পূর্বেও ঐ স্থানে এক বুড়িকে চাক ঘুরাইতে দেখিয়াছি, তাহার কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, ঐ বুড়ি ছিল তাহারই স্ত্রী। গত বৎসর মারা গিয়াছে।

স্বর্গীয় করমচাঁদবাবুর পুত্র মোহনলাল বলিলেন, তাঁহাদের পূর্বপুরুষ গোকুলচাঁদ বারাণসী হইতে সর্বপ্রথমে দানাপুরে আসিয়াছিলেন। তিনি কমিসেরিয়েটে কণ্ট্রাক্টরী করিতেন। গঙ্গার উপর চাতাল, ঘাট ও সিঁড়ি তিনিই বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। পূর্বে এই বাড়ীটি তাঁহাদের অতিথিশালা ছিল। তখন ইহাকে আনন্দকুটির বলা হইত। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের আত্মীয়েরা কখন কখন এ বাড়ীতে আসিয়া থাকিতেন।

গোকুলচাঁদের পুত্র ঝমকলাল চাঁদ বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। তাহার পুত্রদ্বয় অমরচাঁদ ও করমচাঁদের আমলে আপনারা এ বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। অমরচাঁদের গোষ্ঠীর কেহ আর এখানে থাকেন না। তাঁহার বর্তমান বংশধরেরা এখন গয়ার বাসিন্দা হইয়া গিয়াছেন।

করমচাঁদের দ্বিতীয় পুত্র বনোয়ারীলাল, যাঁহার বয়স এখন পঞ্চাশের উপর, নিজের ভাগের যাহা কিছু সম্পত্তি আত্মীয়দের নিকট বিক্রয় করিয়া বারাণসীতে চলিয়া গিয়াছেন এবং তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। ঘটনাচক্রে তাঁহার সহিতও আজ দেখা হইয়া গেল, সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি।

তারপর আমরা চাকলা মহল্লার দিকে গেলাম। পেছনে পেছনে একটি ক্ষুদ্র দলও আমাদের সঙ্গে চলিল। মোহনলাল ও বনোয়ারীলাল বলিয়া যাইতে লাগিলেন, পূর্বেকার চাকলা মহল্লা এখন ধোবীটোলা ও কাগজী মহল্লায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। কবে নাকি ক্যাণ্টনমেণ্টে একবার কোন্ কর্নেল মিত্র আসিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় জনসাধারণের হিতার্থে চাকলা মহল্লার যাবতীয় রূপোপজীবিনীদের সরাইয়া দিয়াছিলেন। সেই অবধি এখানে গোরা সৈন্যদের উৎপাত বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং মহল্লার অধিবাসীরা নিরুপদ্রবে বসবাস করিতেছে। তদানীন্তন চাকলা মহল্লার একটি অংশের ছবি লইয়া আমরা স্থানীয় ক্ষেত্রী মহাশয় বাবু সীতারামের বাটীতে গেলাম। বলা বাহুল্য, তাহাকেও একবার "পুরানো দিনের দানাপুর" শুনাইয়া দিতে হইল। তিনি বলিলেন, জয়দয়াল, শ্যামলালিয়া ও তাহাদের ছোট ভাই রামলালিয়া তাঁহাদের স্বজাতি ছিলেন বটে, কিন্তু আত্মীয় ছিলেন না। জয়দয়াল ও শ্যামলালিয়া উভয়ে বহুদিন হইল অপুত্রক অবস্থায় গত হইয়াছেন। তাঁহাদের ছোট ভাই রামলালিয়া এলাহাবাদে থাকিতেন। সম্প্রতি তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে।

জয়দয়ালের বাড়ীটি ভাগিগয়াচুরিয়া গিয়া এখন শুধু ভিটেটুকুই আছে। তাহাও স্থানীয় মাড়োয়ারী ভদ্রলোক চণ্ডী আগরওয়ালা খরিদ করিয়া লইয়াছেন। থানার নিকট বর্তমান বিবেক আশ্রমের সম্মুখে পরিত্যক্ত জমিটিই হইল সেই ভিটা।

প্রবোধ বসু ও তাঁহার বাড়ী

আপনার প্রবন্ধে যে মণি বোসের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার আসল নাম ছিল মহেন্দ্র বসু, সংক্ষেপে সকলের নিকট তিনি মণি বোস নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ক্যাণ্টনমেণ্টের ভিতর গোরা ব্যারাকে তাঁহার দোকান ও ক্লাবঘর যেখানে ছিল, তাহারও একটি ফটো পাঠাইয়া ছিলাম। আপনার অশীতিপরা শুচি পরায়ণা নেড়ীদিদিকে আমরাও দেখিয়াছি। শুনিয়া সুখী হইবেন, আপনার নেড়ীদিদির পুত্র রায় সাহেব শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বসু বি এল মহাশয় হইলেন এখনকার উকিলদের অগ্রগণ্য। তাঁহার বয়স হইয়াছে, কিন্তু তিনি এখনও যুবকের ন্যায় কর্মঠ ও সমর্থ আছেন। নিজের বিষয়কর্ম ছাড়াও দানাপুরের যাবতীয় জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত আছেন এবং আমরা যে কয়েকঘর প্রবাসী বাঙালী অর্থাৎ বৃহত্তর বঙ্গের অধিবাসী এখানে অবস্থান করিতেছি (স্বরাজ লাভের পর এখন প্রবাসী বলিলে ভুল হইবে), তাহাদের অভিভাবক স্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি নিজে যে বাড়ী করিয়াছেন, তাহার বিশাল কম্পাউণ্ডের একপাশে দাঁড় করাইয়া তাঁহার একখানি ফটো আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

বোসবাবুর কাছে শুনিলাম, আপনার মেসোমহাশয় মতিলাল বক্সী ছিলেন এখানকার ডেপুটী পোস্ট মাস্টার জেনারেলের অফিসের বড়বাবু এবং তাঁহার পুত্র তড়িৎকান্তবাবু অর্থাৎ আপনার সোনাদাদা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। পরে তিনি কলেজের প্রফেসর হন। রঞ্জনবাবু ছিলেন পোস্ট মাস্টার।

শিববাবুর বড় কম্পাউণ্ডওয়ালা গঙ্গার ধারের বাড়ীটি এখনও আছে। অবশ্য গঙ্গা সরিয়া আরও দূরে চলিয়া গিয়াছে এবং সে বাড়ীরও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন উহা আর ক্যাণ্টনমেণ্টের অধীনে নহে এবং স্থানীয় কাঠ কোম্পানীর বাবুরা উহাতে থাকেন।

পুরাতন বাড়ীর পশ্চিম দিকে কুমোর বুড়ীর বংশধরগণ

চাক্‌লা মহল্লার একাংশ

শিববাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র মথুরানাথ সিংহ মহাশয় পাটনার একজন প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন এবং সে যুগের বাঙালী ও অবাঙালী উভয় সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ এবং তিনি ছিলেন বেহারের বাঙালী এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা। "বৃহত্তর বঙ্গ" কথাটি তাঁহার মুখেই সর্বপ্রথম আমরা শুনিয়াছিলাম। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বহুদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং মাঝে মাঝে দানাপুরে আসিয়া থাকিতেন। সে সময়ে প্রায় প্রত্যহ তিনি আমার বাসায় পদধূলি দিতেন এবং তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া আমরাও গর্ব অনুভব করিতাম। মথুরবাবু দানাপুরে যে বাড়ী করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি একটি প্রেসও করিয়াছিলেন। পরে বাড়ীটি তিনি বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। এখন কয়েক হাত বদলাইয়া উহা "সনাতন হিন্দু সমাজের" অধীনে আসিয়াছে।

মথুরবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবিনাশবাবু দানাপুরের একজন লোকপ্রিয় স্বনামধন্য উকীল ছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি মথুরবাবুর বহু পূর্বেই গতাসু হইয়াছেন। তিনিও দানাপুরে নিজের বাড়ী করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার বংশধরগণ বসবাস করিতেছেন।

হতভাগ্য পুরোহিত ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণের বংশধরদের কোনও সন্ধান পাইলাম না। পরিশেষে একটি কথা এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। আপনার প্রবন্ধটি এখানকার ক্ষুদ্র বাঙালী সমাজ ও ক্ষুদ্র প্রাচীন বেহারী সমাজ, উভয়কেই সমভাবে আলোড়িত করিয়াছে। বাবু মোহনলাল ও বানোয়ারীলাল আপনাকে বহুৎ বহুৎ সেলাম জানাইয়াছেন। বাবু পদারথ আপনাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন। শঙ্করবাবু (ঐ বাটীর নূতন মালিক) আপনাকে নমস্তে জানাইতেছেন। মোহনলালের পুত্র (যিনি যাদবপুর হইতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া সরকারী কাজে বহাল হইয়াছেন) আপনার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন। আর আমরা, আপনার নেড়িদিদির খোকাকে (যাঁহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর) মুখপাত্র করিয়া, ৬১ বৎসর পরে আজ স্বাধীন ভারতে নূতন দিনের দানাপুর একবার স্বচক্ষে দেখিয়া যাইবার জন্য আপনাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাইতেছি। ইতি—

নিবেদক
শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত।

স্বীকৃতি

দীপ সেন

কোনো কোনো রাতে নিজেকেই আমি হারিয়ে ফেলি
পচা রাস্তার কুগন্ধ-চাপা অন্ধকারে,
ক্লিন্ন ক্ষুধায় কুকুরের মত নোংরা ঠেলি
মাংসের খোঁজে,—লালসা যখন চাবুক মারে।

তখন তোমার আকাশ-গভীর চোখের চাওয়া
মনের মধ্যে বওয়ায় না কোনো বনের ঝড়,
নীল দিগন্তে উড়ে উড়ে আর হয় না যাওয়া,
চেপে বেঁধে রাখে মাংস-লোভের ক্ষয়-নিগড়;

সরীসৃপের মতই, হিংস্র মন তখন
সমস্ত দেহে শিরশির ক'রে পিছলে পড়ে,—
অন্ধ-ক্ষুধার বুক-চাপা ক্রুর দুঃস্বপন
সাপের মতন আস্তে—আস্তে—আস্তে নড়ে।

প্রমত্ত হ'য়ে ঘুরে ঘুরে ফিরি—'মাংস চাই',
খুঁজে মরি যত কুশ্রী মনের গর্তে, ফাঁকে—
ধ'রে ফেলি যদি কখনো তোমার জানলাটাই
পদাঘাত ক'রে দূর করে দিও কুকুরটাকে।

সাম্প্রতিক জীবন ও চিন্তাধারা

ডক্টর বিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কঠিন সংগ্রামে মানুষের সবটুকু সময় ও প্রয়াস আজ নিয়োজিত। অবসরের সুযোগ আর নেই। বেশীর ভাগ মানুষের কাছেই অবসর আজ বিলাসমাত্র। মুষ্টিমেয় লোক আজও প্রচুর অবসর ও আলস্যের মধ্যে ডুবে আছে সত্য, কিন্তু তাদের ছাড়া অন্য সকলের কাছেই অবসর আজ স্বপ্নবিলাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের সমস্ত ক্ষমতা আজ জীবন ধারণের রসদ জোগাতেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। জীবনের নাগপাশে তার জটিল আবর্তের পাকে পাকে আজ আমরা জড়িয়ে পড়েছি।

জীবনের তাল আজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেই তালে পা ফেলবার শক্তি আমাদের গেছে হারিয়ে। জীবন আজ আমাদের কাছে বিস্বাদ। জীবনকে উপভোগ করবার সুস্থ পরিবেশ আর নেই। তাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করবার উজ্জ্বল স্বাস্থ্যও আজ নেই। জীবনের সুষ্ঠু ভারসাম্য আজ সকলে হারিয়েছে তার ফলে এসেছে নানা অসংগতি, হতাশা, নিরাশা; নিজের পরে বিশ্বাসের অভাব আজ চারিদিকে।

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ধাক্কা খেতে খেতে আজ আমরা হাল ছেড়ে দিয়েছি। বর্তমান অন্ধকার—ভবিষ্যতও তমসাবৃত। দারিদ্র্য, অভাব অনটন—অক্লান্ত পরিশ্রম করেও সে অভাব দূর হয় না। ভবিষ্যতের অতল অন্ধকারের দিকে কে যেন আমাদের প্রতি মুহূর্তে ঠেলে দিচ্ছে। "The Four freedom, freedom from want অভাব হতে মুক্তির আশ্বাস freedom from insecurity স্থায়ী সংস্থানের আশ্বাস—সবই আমাদের কাছে কথার কথা। জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন একথাও আমাদের কাছে হাস্যকর। যুদ্ধোত্তরকালে জীবন-মান যে ক্রমাবনতির দিকে যাচ্ছে একথা আমরা সকলেই জানি। মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ সত্যই নিঃস্ব proletarianised নিজের মানসিক অশান্তি, অভাবজনিত পারিবারিক অশান্তি পরিবেশের মধ্যেও অশান্তি আজ শুধু জীবনের প্রতি হতাশাই এনে দেয় নি—পরস্পরের প্রতি এনেছে অবিশ্বাস। নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে তাই আমরা অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছি। সকল রকম ক্ষুদ্রতাই আজ আমাদের দৃষ্টিকে ঘিরে ধরেছে।

জীবন আজ আমাদের কাছে ব্যঙ্গ ছলনা-মাত্র। জীবনের প্রতি ধিক্কার আজ আমাদের সকলের মনে। এই মনোভাব যে শুধু আমাদের দেশেই দেখা দিয়েছে তা নয়—পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সকল দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই ভাবই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জীবনের কোন মহত্তর বা বৃহত্তর আদর্শ আজ সেখানেও নেই। তাই সাম্প্রতিক ফরাসী সাহিত্যের মধ্যে দেখতে পাই এই হতাশারই সুর। জাঁ পল সার্ত্রের লেখার মধ্যে এই ভাব সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সার্ত্রে আজ ফরাসী দেশের সব-চেয়ে জনপ্রিয় লেখক। তাঁর মতবাদ Existentialism বা অস্তিত্ববাদ আজ সেখানকার যুবকদের মনে প্রবল আলোড়ন এনেছে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এমন কি কাফে, রেস্তোরাঁতেও তাঁর জীবন দর্শন প্রত্যহ আলোচিত হচ্ছে। অথচ সেই জীবন দৃষ্টির মধ্যে কোথাও এতটুকু আশার আলো নেই। বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর সেখানে একান্ত অভাব। সার্ত্রের কাছে জীবনের সুরই হল Despair বা হতাশার মধ্যে। Anguish বা বেদনার মধ্যেই তার প্রকাশ ও পরিসমাপ্তি। জীবনে প্রতি একটা ন্যক্কারজনক (nausea) ভাব তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে। স্বাধীনভাবে, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে জীবনকে গ্রহণ করতে না পারার ফলে জীবন ও স্বাধীনতা তাঁর কাছে ভার মাত্র। তাঁর কথায় "man is condemned to be free." স্বাধীনতা জীবনের একটা বোঝা—মানুষকে তা বহন করতেই হবে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র-গুলির মধ্যে কোথাও সেই মনের দৃঢ়তা মেলে না। নিজের নিজের কাজ করেই তারা মুক্তি পেতে চায়। মানুষ তার লুপ্ত মর্যাদা ফিরে পাক—একথা সার্ত্রে বলেছেন। কোন

দাসত্বের শৃঙ্খলেই যেন তারা বাঁধা না থাকে। তাঁর The Flies নাটকে তাই দেখতে পাই যে নায়ক Orestess দেবতা Zeus দেবতার কবলিত Argos দেশবাসীর স্বাধীনতার জন্য Orestes তার জীবন পণ করতেও রাজী। তার অনমনীয় সাহস ও সংগ্রামের ফলেই আর্গসবাসীরা দেবতার অধীনতা পাশ হতে মুক্ত হল। কিন্তু তার পরেই দেখি Orestes বলছে "I am now free and I pass the burden of freedom on to their shoulders." আর্গসবাসীই এবার স্বাধীনতার বোঝা বহন করুক। এই বিজয়ের জন্য নায়কের মনে কোন উৎসাহ বা উৎফুল্লের ভাব নেই। কেবল কর্তব্য সম্পাদনের প্রেরণাই দেখতে পাই। স্বাধীনতার কোন মূল্যবোধ বা স্বীকৃতি এখানে নেই। সার্ত্রে আরও বলেন, 'প্রত্যেক মানুষকেই সর্বদা কাজ করতে হচ্ছে বা হবে। আর এ কাজের মধ্যে কোন উচিত অনুচিতের প্রশ্ন নেই—কেননা আমাদের absolute good বা evil সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। আর আমাদের কাজের এই সংশয়ের মধ্যে আসে মনের বেদনা বা Anguish. সার্ত্রের জীবন দর্শনের জন-প্রিয়তার মূলে রয়েছে সাম্প্রতিক ফরাসী জীবনের সর্বব্যাপী ব্যর্থতা। তাঁর জীবন দর্শন সেখানকার শিক্ষিত মনেরই প্রতিচ্ছবি যে হতাশার mood আজ সকলের মনে তাই রূপায়িত হয়েছে তাঁর দর্শনে ও সাহিত্যে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফ্রান্সের দেহে ও মনে কঠিনভাবে আঘাত করেছে। যুদ্ধের প্রথমদিকে পরাজের লাঞ্ছনা, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিরোধ আন্দোলন ও পরে যুদ্ধ জয় এ সবের জনাই তাকে কম ক্ষতি স্বীকার করতে হয়নি। ফ্রান্সের যুবশক্তি কঠিন ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যেও তার অদম্য স্বাধীনতা স্পৃহা হারায় নি। অপূর্ব ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে আবার চতুর্থ রিপাবলিক জন্ম নিয়েছে। ফাশিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যারা প্রাণ দিয়েছে বা যুদ্ধ করেছে তারা ফ্রান্সে আবার যুদ্ধপূর্ব অবস্থা ফিরে আসুক তা চায়নি। ফাশিস্ত শক্তির পরাজয়ের পর স্বতন্ত্রবাদী সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে এই আশা নিয়েই সকলে যুদ্ধ করে-ছিল। ধনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন আর সম্ভব নয়। যুদ্ধোত্তরকালে যুদ্ধপূর্ব

রাজের অরাজকতা ঘুচে গিয়ে নূতন সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হবে এটা অনেকেই স্থিরভাবে বিশ্বাস করেছিল। যুদ্ধ শেষ হল, কিন্তু নূতন কোন যুগের সূচনা দেখা গেল না। সেই অরাজকতা, রাজনৈতিক জীবনে পুরাতন অন্তর্দ্বন্দ্ব ফরাসী চিন্তাধারার মধ্যে বিভ্রান্তি ও নৈরাশ্য এনে দিল। একটা সর্বব্যাপী হতাশার সুর চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। ফরাসী কৃষ্টি আজ পুনরায় বিপন্ন হয়ে পড়েছে। পূর্ব যুদ্ধের ক্ষত আজও মিলিয়ে যাই নি—অথচ আবার একটা বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি সেখানে দেখা দিয়েছে।

এই মানসিক পরিবেশের মধ্যে সার্ত্রের জীবন দর্শনকে তাই অনেকেই আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করতে চাইছে। সার্ত্রের নীতি শাস্ত্রে কোন সার্বভৌম নৈতিক আদর্শ নেই (no universal moral standard)। কোন কাজ ভাল, কোন কাজ মন্দ, কোনটা পাপ কোনটা পুণ্য এর কোন মাপকাঠি নেই। প্রত্যেক মানুষকেই তা প্রতি মুহূর্তে ঠিক করতে হবে। আমি আজ যেমন আছি ও ভাবছি কাল সেরূপ থাকব না বা ভাবব না। প্রতি মুহূর্তেই আমাকে কাজে রত (engaged) হতে হচ্ছে। আর এই কাজ ও তার প্রতিক্রিয়ার (engagement and action) মধ্য দিয়েই আমাকে ন্যায়নীতি ঠিক করে নিতে হবে। এর জন্য কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারে না। কোন বাঁধাধরা নীতিশাস্ত্রের নজির নেই এর জন্য। এই ক্ষণবাদী জীবন দৃষ্টি সার্ত্রের দর্শনের পাতায় পাতায়। এ শুধু অন্যায় নীতিই নয় এ নীতিহীনতা (Immoral and amoral), কিন্তু এই নৈরাশ্যময় যুগে ফরাসী মেজাজের সহিত এই জীবন দৃষ্টির সঙ্গতি রয়েছে বলেই তা জনপ্রিয়।

সার্ত্রের জীবন দৃষ্টি যেমন ফরাসী ও পশ্চিম ইউরোপের চিন্তাধারার এক বিশিষ্ট অংশকে আচ্ছন্ন করেছে, কমিউনিস্ট জীবনাদর্শও সেইরূপ অপর এক শক্তিশালী অংশকে প্রভাবিত করেছে। শুধু ইউরোপেই নয় প্রাচ্যের আজ সমস্ত দেশেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঢেউ লেগেছে। পূর্ব প্রাচ্যের এক বিরাট ভূখণ্ডে আজ কমিউনিজমের অপ্রতিহত রাজত্ব। একক রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আজ কমিউনিজম সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। যুদ্ধের প্রথম পর্বে প্রতি দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন গত যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিল ও এর বিরোধিতা করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে লেনিনের শ্লোগানকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও কার্যকরী করার চেষ্টা তারা করেছিল। তাই ফ্রান্সের চরম দুর্দিনে (১৯৪০) কমিউনিস্টরা কেবল নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিল তাই নয়—ফ্রান্সের পরাজয়ের পথই প্রস্তুত করেছিল। ১৯৪০ সালের মে মাস হতে ১৯৪১ সালের জুন মাসের মধ্যে ফ্রান্সে যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সে আন্দোলনে কমিউনিস্টরা কোন অংশই গ্রহণ করেনি। তাদের এই রাজনৈতিক পথকে ফ্রান্সের লোক দেশদ্রোহিতার নামান্তর বলেই ঘৃণা করেছিল। হিটলারের সোভিয়েট দেশ আক্রমণের কিছুদিন পরেই কমিউনিস্টরা তাদের রাজনৈতিক মত সম্পূর্ণ পরিবর্তন করল—এ যুদ্ধ তাদের চোখে রাতারাতি গণযুদ্ধ বলে পরিগণিত হল। এর পরের প্রতিরোধ আন্দোলনে তারা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করল সত্যি, কিন্তু পূর্বের রাজনৈতিক মতকে দেশের লোক ক্ষমার চোখে দেখল না। কমিউনিস্টরা দেশপ্রেমিক নয়—এই ধারণায় দেশের লোক যাতে চালিত না হয় এর জন্য কিন্তু কমিউনিস্টরা কম চেষ্টা করে নি। কমিউনিস্ট সাহিত্যিক লুই এরাগঁ লিখিত "La Homme Communiste" পুস্তকে ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলনের কমিউনিস্ট শহীদদের অনেক ছবি আছে। কিন্তু ফ্রান্সের ঐ ভাগ্য বিপর্যয়ের সময়ে কমিউনিস্ট কার্যকলাপের কোনও উল্লেখ নেই। এই বইয়ের মধ্যে ফ্রান্সের কমিউনিস্টদের দেশপ্রেমের কাহিনী বর্ণনা করাই লেখকের উদ্দেশ্য। কমিউনিস্টরা যে অন্যান্য সকলের চেয়ে বেশী দেশপ্রেমিক একথা প্রমাণই এই বইয়ের বক্তব্য। এর মধ্যে আছে কমিউনিজম ও জাতীয় দেশপ্রেমের পূর্ণ সংমিশ্রণ। কমিউনিজম ও জাতীয় দেশপ্রেমের মিলনে এক নূতন রাজনৈতিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচ্যের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারায় এই দুই স্রোতের মিলনই দেখা যায়। কমিউনিজম ছিল জাতীয়তাবাদের ঘোর শত্রু। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে এই দুই পরস্পর-বিরোধী আদর্শ ওতপ্রোতভাবে মিলে গেছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় কমিউনিজমের আদর্শ অনেকের মনেই আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। চারিদিকের নৈরাশ্যের মধ্যে কমিউনিজমের মধ্যেই অনেকে মুক্তির আশা দেখছে। এই বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আশা চিরকালই নিপীড়িত মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে। কমিউনিজমের সাফল্যের উপর স্থির বিশ্বাস মানুষকে তার লুপ্ত আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে দেয়। পাশের এক শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক দেশের উদাহরণ তার উজ্জ্বল চিত্র সর্বদাই চোখের সামনে ভাসতে থাকে। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই বর্তমানে এই কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার ও বিস্তৃতি আরও এক নূতন শক্তি মনের মধ্যে জোগায়। সমস্ত দেশের সভ্য মানুষের একটা বিরাট অংশ যখন একই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়, একই চিন্তাধারা ও জীবনাদর্শ গ্রহণ করে, তখন নিজের মতবাদের সত্যতা (Correctness) সম্বন্ধে মনে কোনও প্রশ্ন বা দ্বন্দ্ব জাগে না। ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় একটা প্রবল বিশ্বাসে সমস্ত চিন্তাধারা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আর এর থেকেই কমিউনিস্ট উগ্রতার (fanaticism) উৎপত্তি। মতবাদের গোঁড়ামি, ধর্মবিশ্বাসের গোঁড়ামির মত মানুষের যুক্তি ও চিন্তাকেই শুধু আচ্ছন্ন করে না অপর মতবাদের সম্বন্ধেও একটা অসহিষ্ণুতার ভাব (intolerant attitude) এনে দেয়। যে কোন দেশের কমিউনিস্ট চিন্তাধারা অনুসরণ করলেই সর্বাগ্রে এ সবই চোখে পড়ে। অনেক মানুষের মনেই কমিউনিজম আজ একটা faith বা বিশ্বাস এনে দিয়েছে। আর Eric Fromm যেমন বলেছেন "man cannot live without faith." মানুষ কোন কিছুতে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া বাঁচতে পারে না। তা সে ধর্মবিশ্বাসই হোক আর রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসই হোক। এই দৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ই কমিউনিস্ট কার্য প্রেরণার মূলে। মানুষের মনের শূন্যতা, আদর্শের জন্য ছোটো এ সব কামনাই কমিউনিজম পূর্ণ করেছে।

বর্তমান ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ও উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে একক মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। কারখানার অসংখ্য শ্রমিকের মধ্যে সে সামান্য একজন শ্রমিক মাত্র—বিরাট রাষ্ট্রযন্ত্রের বহুধা বিভক্ত কার্যক্রমের সামান্যতম অংশও তার কর্তৃত্বাধীন নয়। Hobbes Leviathem যেন আজ রাষ্ট্রের মধ্যে মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। মানুষ অতি নির্মমভাবে অতিবড় বেদনার

মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করছে যে তার নিজের কোন শক্তি নেই। মানুষের এই অসহায়তার ভাব থেকেই আত্মবিশ্বাসের উদ্ভব। তার এই হীনতাবোধের জন্য মানুষ তার সমস্ত শক্তি জীবন সংগ্রামে ভালভাবে নিয়োগ করতে পারছে না। নিজেকে প্রকাশ করতে সংকোচ হওয়ার ফলে সে শম্বুকধর্মী হয়ে পড়ছে; নিজের সমস্ত ক্ষমতাকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকার প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে পড়ছে।' সমাজে থেকেও কারও সংগে কোন যোগ-সূত্র সে অনুভব করছে না তার অন্তরে; বিরাট জগতের মাঝখানে থেকেও সে নিঃসংগ, সে একাকী।

কিন্তু তার সমস্ত শক্তিকে সংসার বা সমাজ থেকে গুটিয়ে নিলেও সুপ্ত বা নিশ্চেতন অবস্থায় পড়ে থাকা সম্ভব নয় তার পক্ষে; যার ধর্মই হচ্ছে নিজেকে নিরন্তর প্রকাশ করা। তাই বাইরে কোন প্রকাশের ক্ষেত্র না পাওয়ায় নিজেকে কেন্দ্র করে সে পরিচালিত হয়। আত্মকেন্দ্রিক চিন্তায় মানুষের মন আচ্ছন্ন হয়, আর এরও অবনতি দেখা দেয় আত্মরতিতে। জেমস জয়েসের Ulysses উপন্যাসের নায়ক স্টিফানের চরিত্র এই মনোভাবের পরিচায়ক। অতিরিক্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় আত্মকেন্দ্রিক স্টিফান নিজেকে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সমাজ সকলের কাছ হতেই দূরে সরিয়ে রেখেছে। এই সমাজ চেতনার অভাবেই তার মন আত্ম-চিন্তায় মগ্ন। তাই তার জীবনে এনেছে ট্রাজেডি।

এই নৈঃসংগবোধ এড়াবার প্রচেষ্টা দেখা যায় গোষ্ঠিসত্তার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে। ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে গোষ্ঠি-সত্তার সংগে একীভূত হওয়ার ইচ্ছাও মানুষের মধ্যে প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে। সেই সমষ্টিসত্তা (Collective ego) গণ-দেবতা (Masses), রাষ্ট্র (State), শ্রেণী (Class), জাতি (Nation) সবই হতে পারে। সোসালিস্ট বা কমিউনিস্ট সমষ্টিসত্তা হল জনতা, শ্রেণী ও রাষ্ট্র—আর ফাশিস্ত সমষ্টিসত্তাও সেই জাতি ও রাষ্ট্র। কমিউনিজম ও ফাশিজম, উভয় ক্ষেত্রেই নেতার জয়গান ধ্বনিত হয়। বীরপূজা দুয়েরই রাজনৈতিক আচার অনুষ্ঠানের অংগ (Ritual)। এই আত্মনিপীড়ন ((masochism) নিজেকে হারিয়ে ফেলা ও বিনষ্ট করার মধ্যে লুকিয়ে আছে স্বাধীনতার ভীতি। কথাটা আপাত-বিরোধী হলেও সত্যি। স্বাধীনতার জন্য আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন, জীবনের প্রতি পদে পদে দায়িত্ব গ্রহণ, জ্ঞান, যুক্তি, বিচার, বিবেচনা ও বিবেকের দ্বারা নিজের পথকে বেছে নেবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অনেকেরই নেই। এক্ষেত্রে একটিমাত্র সহজ পথই খোলা আছে। আর সেটা হল অপরে যা করছে বা ভাবছে তাই করা ভাবা। স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া। জননেতা যা বলছেন ও জনতা যা করছে, তাই আমিও বলছি ও করছি। আমার সমস্ত ভাবনার ভারই নেতা নিজেই নিয়েছেন। নেতা যা বলবেন ও জনতা যা করছে তাই ঠিক। লক্ষ লক্ষ লোকের একই ভাবনা বা চিন্তা কখনও ভুল হতে পারে না। সুতরাং নিশ্চিন্ত আরামে ও আশ্বাসে নেতা ও জনতার পথই অনুসরণ কর। সাম্প্রতিক চিন্তাধারার এই শৃঙ্খলতা (Regimentation) সর্বত্রই চোখে পড়ে। জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে বা কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে কোথাও এর ব্যতিক্রম চোখে পড়ে না। বর্তমানে ইংলণ্ডের সমাজজীবনে অর্থনৈতিক বৈষম্য বহু পরিমাণে দূর হয়েছে। শ্রমিক-দলের হাতে শাসন ক্ষমতা যাওয়ার পর ব্রিটেন আজ কল্যাণকামী রাষ্ট্রে (Welfare State) রূপান্তরিত হয়েছে। দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার ভয় আজ সেখানে নেই। সামাজিক সংস্থানমূলক ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী হওয়ার ফলে আজ প্রতিটি মানুষের ভয় ভাবনা অনেক কেটেছে। কিন্তু কোন নূতন জীবনাদর্শ সেখানে গড়ে উঠেনি। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র ও 'Welfare State'-এর মধ্য দিয়ে অর্থ-নৈতিক সমস্যা হয়ত অনেক মিটেছে। কিন্তু মানসিক ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট জীবনাদর্শ সেখানে দেখা দেয় নি। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমা-ধানের উপর যেমন জোর দেওয়া হয়, সংগে সংগে প্রতিটি মানুষের মনে সম্পূর্ণ নূতন সমাজ চেতনা, রাষ্ট্র চেতনা যাতে দেখা দেয়, সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থাও প্রথম হতেই করা হয়। স্কুল, কলেজ ও পারিবারিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে, কলকারখানার ও কৃষিক্ষেত্রে কাজের মধ্য দিয়ে কম্যুনিস্ট সমাজনীতি ও জীবনদৃষ্টি যাতে প্রত্যেকের মনে দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা এই প্রচারের মধ্যে নিয়োজিত থাকে। সিনেমা, রেডিও, নাটক অভিনয়, সাহিত্য, শিল্পকলা এ সমস্তের মধ্য দিয়ে কম্যুনিজমের আদর্শ মানুষের মনের আকাশকে ঢেকে রাখে। অন্য কিছুই প্রবেশ করবার পথ আর সেখানে থাকে না।

সুখের বিষয়, ইংলণ্ডের শিল্পকলা সাহিত্য, রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তা ধারা এমনভাবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত নয় ইংলণ্ডের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে যে উদারনৈতিক ঐতিহ্য চলে এসেছে, তা আজও ব্যাহত হয়নি। তবে ভিক্টোরীয় যুগের মধ্য বিত্ত শ্রেণীর সে আত্মপ্রত্যয় আর নেই প্রচলিত ধর্ম ও নীতি বিষয়ে যে দৃ বিশ্বাস পিউরিট্যান মনে ছিল, তাতে শিথিলতা এসেছে। অনেকের মনেই তখনকা দিনের ধর্ম ও নীতিবোধের উপর সংশয় ও অবিশ্বাস দেখা দিয়েছে। সাম্রাজ্যবাদে সম্প্রসারণের যুগের একান্ত নির্ভরতা আজ আর নেই। এছাড়া গত তিরিশ বছরের মধ্যে দুটো ভয়াবহ বিশ্ব সংগ্রামের সম্মুখী হয়ে তাকে লড়াই করতে হয়েছে। দ্বিতী মহাযুদ্ধের শেষে তাই ইংলণ্ডের রাজ নৈতিক চিন্তাধারায় একটা আমূল পরি বর্তন দেখা গেল। যুদ্ধপূর্ব সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে নূত সমাজের গোড়াপত্তনের কাজে ইংলণ্ডে লোক বদ্ধপরিকর হল। কিন্তু এ রাজনৈতিক বামপন্থী আন্দোলনের ম সুষ্ঠু দার্শনিক মতবাদের রয়েছে অভাব সেখানকার রাজনীতি অর্থনৈতিক পরি কল্পনা ও ব্যবস্থার উপর যেমন জো দিয়েছে, জীবনদর্শনের প্রতি সেরূপ দৃ দেয় নাই। তাই চিন্তার অন্যান্য ক্ষেত্রে ম মতবাদই চোখে পড়ে। বামপন্থী রাজনৈত আন্দোলনও দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষে বহুধা বিভক্ত। যুদ্ধোত্তর কালের ফ্রান্স ইতালীর ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ন্যায় ইংলণ্ডের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে মধ্যেও ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের প্রভাব দেখা যা ধর্মের কোন গোঁড়ামি নেই। তবুও কি সভ্যতার এই সংকট হতে বাঁচতে হ ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের চিরন্তন বাণীকে জাগি তুলতে হবে; মানুষের মনে ধর্মে ও চা বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে, একথ

দের মূলে বক্তব্য। শুধু রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেই এই চিন্তাধারা সীমাবদ্ধ তা নয়, T. S. Eliot, Auden প্রভৃতি কবির মনেও আজ অনুরূপ চিন্তা জেগেছে। T. S. Eliot রোমান ক্যাথলিক ধর্মের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে বর্তমান সংকটের হাত হতে উদ্ধারের পথ দেখেছেন।

* * * * *

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষের মনে নব-চেতনা ও আত্মপ্রত্যয় নূতন করে দেখা দিয়েছিল। ধর্ম বিশ্বাসের মূলে চরম আঘাত লাগলেও মানুষ নিজের উপর বিশ্বাস হারায়নি। নিজের নবলব্ধ জ্ঞান তাকে যে অসীম ক্ষমতার অধিকারী করেছিল, তাই সে বিস্ময়ে উপভোগ করেছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের এই মঙ্গলময় যুগ বেশী দিন স্থায়ী হল না। নবলব্ধ জ্ঞানের ব্যবহার লাগল চূড়ান্ত ধ্বংসের কাজে। বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি চরমভাবে আঘাত খেল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে চরম অরাজকতা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট এনে দিল। বিজ্ঞানের এত আবিষ্কারের পরেও মানুষ সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত হল। কোন মানুষের মুখেই এক মুঠো বেশী অন্ন জুটল না বা কেউ গায়ে একখানা বেশী কাপড় পরতে পেল না। বিশ্ব মহাযুদ্ধের বিষময় ফল ও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। নৈতিক ও মানসিক অরাজকতায় বিজ্ঞানের কল্যাণকর রূপেই শুধু ঢাকা পড়ল না, বিজ্ঞানের জ্ঞান যে মানুষকে ঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে না, এই বিশ্বাসই আবার অনেকের মধ্যে ফিরে এল। ফলে যে ধর্ম বিশ্বাসের মূলে বিজ্ঞান কুঠারাঘাত করেছিল, মানুষ আবার সেদিকেই দৃষ্টি ফেরাল। ধর্মের ভগ্ন দেউলের মেরামত আজও চলেছে। নিয়ত পরিবর্তনশীল বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সাধারণের অসাধ্য—তাই শাশ্বত ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে মানুষ আবার তার আত্মিক সংকটের (Spiritual crisis) সমাধান খুঁজল। অথচ বিজ্ঞানের অমোঘ প্রভাব অস্বীকার করবার বা এড়িয়ে যাবার কোন উপায়ই আজ নেই। জ্ঞানান্বেষণের সমস্ত পথই আজ বিজ্ঞান উন্মুক্ত করেছে। জ্ঞান যে আজ তথ্যসমৃদ্ধ হয়েছে তাই নয়, জ্ঞানানুশীলনের নূতন নূতন পথও আজ বিজ্ঞান দেখিয়েছে। বিজ্ঞান আজ দর্শনের রাজ্যে প্রবেশ করেছে। এতদিন যা তার সীমার বাইরে ছিল, তাই আজ বিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবান্বিত। অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস আজ দাঁড়াবার কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না। বিশ্ব প্রকৃতির অনুসন্ধান করে বিজ্ঞানের জ্ঞান আজ ধর্মলব্ধ জ্ঞানকে কক্ষচ্যুত করেছে। ধর্মের সেই pristine glory'তে ফিরে যাওয়ার আর কোন রাস্তা নেই। জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রাণী জগতের বিবর্তন সম্বন্ধে ধর্ম পুস্তকে লেখা ব্যাখ্যা বিজ্ঞান-শিক্ষিত লোকের মনে স্থান পেল না। মানুষ যে ভগবানের সৃষ্ট বিশেষ জীব নয়, নিম্ন শ্রেণীর প্রাণিজগত হতেই লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার ধর্ম বিশ্বাসে প্রবল আঘাত দিয়েছিল। অথচ দিনের পর দিন আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ এই মতকেই পরে আরও দৃঢ়ভাবে আসন দিয়েছে। কিন্তু মানুষের বিশ্বাস সহজে মরে না। তাই পূর্বের অন্ধ বিশ্বাস নূতনরূপ নিয়ে আবার দেখা দিয়েছে। ধর্মপুস্তকে বর্ণিত সেই অসার ও অন্ধ বিশ্বাসের স্থলে আবার এক রহস্যময় মতবাদ তার স্থান দখল করেছে। কোন বিশেষ প্রাণী অথবা মানুষকে ভগবান হয়ত সৃষ্টি করেননি, কিন্তু প্রাণিজগতের এই যে বিবর্তন, নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী হতে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীর উদ্ভব, প্রাণীর এই ক্রমবিকাশের পেছনে নিশ্চয়ই কোন প্রবল ইচ্ছাশক্তি কাজ করছে (Will) কোন এক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য। এ নিশ্চয়ই কোন মহাজাগতিক শক্তি (cosmic power)? বের্গসঁ'র (Bergson) মত প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে এক সর্জনশীল শক্তি (creative force) কাজ করছে। আর এই শক্তিই সেই প্রাণীকে নিয়ত উন্নততর জীবন পথে নিয়ে যাচ্ছে। এই elan vital'-এর ফলেই জীব-বিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে।

বস্তুতঃপক্ষে বের্গসঁ'র এই সকল ধারণার সপক্ষে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নেই। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আশ্রয় নিয়ে কতকগুলি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছেন। চিন্তা ও যুক্তিরাজ্যের ফাটল দিয়ে ধর্ম প্রবর্তিত মতবাদ আবার নিঃশব্দে পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে প্রবেশ লাভ করেছে। স্যার জেমস্ জীনসের মতবাদে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা অনুরূপ চিন্তাধারার পরিচয় পাই। রহস্যবাদ (mysticism) আবার নব্য বিজ্ঞানের পোষাক পরে নূতন আকারে দেখা দিয়েছে। ধর্মের এই নূতন বৈজ্ঞানিক সংস্করণ কিন্তু শিক্ষিত সমাজের অনেকের কাছেই খুব মনঃপূত হয়েছে। ধর্ম বিশ্বাসের মূল বজায় রইল, পূর্ব প্রচলিত ধর্মের সহজ, সরল, শাদা বদলে নব্য বিজ্ঞানের গুরুগম্ভীর যুক্তি তার স্থান দখল করল। নব্য বিজ্ঞানের অনির্দেশ্যবাদ রহস্যবাদের নামান্তর। কিন্তু তাতে শিক্ষিত মানুষের বিবেক কিছু শান্তি পেলে।

আমাদের চিন্তা আজ দ্বিধাবিভক্ত—intellect আমাদের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। অথচ যুগ যুগ সঞ্চিত অন্ধ বিশ্বাস ও হৃদয়াবেগ আবার আমাদের কু-সংস্কারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শত শত যুগের রীতি-নীতি ও সংস্কারের ঐতিহ্য আমাদের অবচেতন মনে তার অমোঘ ছাপ রেখেছে। Jung'এর এই Racial subconscious'এর হাত হ'তে উদ্ধার না পেলে আমাদের চিন্তাশক্তির স্বচ্ছ বলিষ্ঠতা কখনও আসবে না। আমাদের দেশের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মনের শেকল আমরা নিজের মনেই তৈরী করি। জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা চালিত চিন্তাশক্তিই কেবল এই শেকল ছিঁড়তে পারে। প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব (ceaseless efforts). Eternal vigilence is the price of freedom. বর্তমানের এই ক্লেদাক্ত জীবন হ'তে মুক্তি পেতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বলিষ্ঠ চিন্তাশক্তির। জীবনের রূপ ও রসকে উপলব্ধি করতে হলে যেমন চাই সুস্থ অনুভূতি, তেমনি জীবনকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে স্বচ্ছ কাণ্ডজ্ঞানের (Rationality) প্রয়োজন প্রতি পদে পদে।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

বাংলা যাত্রাগান

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলা যাত্রাগানের গভীর যোগ থাকা সত্ত্বেও প্রাচীন যাত্রা-পালার নিদর্শনাভাবে ইহার উৎস এবং ক্রমপরিণতির বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনার সার্থক চেষ্টা পর্যন্ত হয় নাই। বাঙলা যাত্রাগানের ইতিহাস নয়, একটা মূল্যবান আস্বাদনাত্মক appreciative প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। উহাই বোধ হয় যাত্রা সম্বন্ধে প্রাচীনতম আলোচনা। সঞ্জীবচন্দ্রের প্রবন্ধে কৃষ্ণযাত্রা এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রার একটি চমৎকার তুলনা-মূলক আলোচনা আছে। কিন্তু যাত্রার উৎস আবিষ্কার করিবার এবং ইহার ক্রম-বিবর্তনের সূক্ষ্ম স্তর পরম্পরাগুলি বিশ্লেষণ করিবার কোন চেষ্টা সে প্রবন্ধে নাই। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের বহু অন্ধকারাবৃত বিষয়ের উপর আলোকপাত করিয়াছেন; কিন্তু যাত্রা-পালাগুলির ইতিহাস আলোচনায় এবং বিচার-বিশ্লেষণে তিনি অকৃপণ নন। তিনি প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ের যাত্রাগানের বিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও সত্যিকারের অভাব পূর্ণ হইল না। যাত্রার ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনায় এবং ইহার উৎস-সন্ধানে কিছুদূরে অগ্রসর হইয়াছিলেন ডাঃ সুশীলকুমার দে এবং ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়। কিন্তু নিদর্শনের অভাবে যাত্রার উৎস এবং প্রাচীন যাত্রার শৈলী সম্বন্ধে স্থির কোন সিদ্ধান্তে তাঁহারাও পৌঁছাইতে পারেন নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে অপ্রত্যক্ষ যুক্তি ও অনুমানের উপরই তাঁহাদের বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইয়াছে।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল, বর্তমান আলোচনা বহু-অনুভূত অভাববোধ নিরাকরণের চেষ্টা নয়, নানা শ্রেণীর সাহিত্য-ঐতিহাসিক এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভিত্তি করিয়া যাত্রা সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক আভাস দেবার চেষ্টা মাত্র।

যাত্রার উৎস কোথায়, প্রমাণাভাবে সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় নাই, ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের ধারণা, বাঙলা যাত্রাগান বৈদিক গীতিনাট্যেরই বংশধর। বেদের মধ্যে কতকগুলি ক্রিয়া-কলাপ আছে, যাহা অভিনয়াত্মক; যজ্ঞের ঋত্বিক অধ্বর্যুগণ যজ্ঞবেদীর চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে সংগীত ও মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিতেন, আবার যম-যামী, ইন্দ্র-বরুণ, উর্বশী-পুরুরবা প্রভৃতি কতকগুলি উপাখ্যানের মধ্যে সংলাপও আছে। এইখানে বৈদিক গীতিনাট্যের আভাস সূচিত হইয়াছে; ইউরোপীয় পণ্ডিত-গোষ্ঠীর ধারণা, জয়দেবের গীতগোবিন্দে (দ্বাদশ শতক) এই গীতিনাট্যের অন্তিম পরিণতি।

"The hymn therefore...may be compared with the form of Gita-Govinda." (Sanskrit Drama, A. B. Keith. P. 17)

এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে যাত্রার উৎপত্তি। কিথ সাহেব জয়দেবের কাব্যের রচনাশৈলী বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন,

"It reveals a lightly developed out-come of the simple yatras of the Krishna-religion." (Sanskrit Drama. P. 272)

কিন্তু গীতগোবিন্দ হইতে যাত্রার উদ্ভব, এ সিদ্ধান্ত সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। গীত-গোবিন্দ এবং যাত্রার শৈলীর তুলনামূলক বিচার করিলেও গীতগোবিন্দকে যাত্রার পূর্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে যথেষ্ট আপত্তি থাকিবে। গীতগোবিন্দ অনেকখানি পাঁচালিঘেঁষা—পাঁচালিতে যেমন ছড়া ও গানের সমন্বয়—গীতগোবিন্দেও তাই। কিন্তু যাত্রাকে কিছুতেই ছড়া ও গানের পারস্পরিক সমন্বয় বলা চলে না। যাত্রায় ছড়ার সংখ্যা খুবই কম।

ডাঃ সুকুমার সেন মনে করেন বাংলা কীর্তন গান থেকে ঢপ কীর্তন এবং ঢপ কীর্তন হইতে যাত্রার উৎপত্তি। ডাঃ সেন বৈষ্ণবপূর্বযুগের যাত্রার ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়াছেন কারণ সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য তিনি করেন নাই। ডাঃ সুশীলকুমার দে মহাশয় বৈষ্ণবপূর্ববর্তী যুগের যাত্রার কোন নিদর্শন না পাইয়া সে সম্বন্ধে দৃঢ় কোন মন্তব্য করিতে ইতস্তত করিয়াছেন, তবে প্রাচীন যাত্রার অস্তিত্ব বৈষ্ণবযুগ হইতে প্রমাণিত হইলেও তিনি ভারতের নাট্যশাস্ত্রে (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয়—চতুর্থ শতাব্দী) এবং অন্যান্য সংস্কৃত নাটকেও যাত্রার উল্লেখ দেখিয়া প্রাচীন যাত্রার ঐতিহ্যে বিশ্বাসপরায়ণ। তবে তাহা কি অবস্থায় ছিল, তাহার শৈলীই বা কেমন, সে সম্বন্ধে কোন দৃঢ় ধারণা পোষণ করেন না এবং যাত্রার উৎস-স্থল সম্বন্ধেও স্থির কোন মন্তব্য করেন নাই।

ডাঃ সেনের মতে কীর্তন (পালাকীর্তন) থেকে যাত্রার উদ্ভব। কীর্তনগানের প্রচলন হয় নরোত্তমদাসের অনুষ্ঠিত খেতরী মহোৎসবে; অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষের দিকে, চৈতন্য তিরোধানের পরে,—তাহা হইলে একথা মানিয়া লইতে হয়, যাত্রা চৈতন্য পরবর্তী যুগে সৃষ্ট। কিন্তু এ বিষয় নিয়া অন্যান্য পণ্ডিতদের সহিত গুরুতর মতভেদ দেখা যায়।

ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় এবং সঞ্জীব-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগেও যাত্রার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন চৈতন্যদেবের আগে চণ্ডীযাত্রা ছিল—কৃষ্ণযাত্রা পরবর্তী যুগের। ডাঃ দে বলেন চৈতন্যপূর্বযুগে শৈব ও শাক্ত বিষয়ক কাব্য ছিল এবং সম্ভবত শিব-যাত্রা ও চণ্ডী-যাত্রাও ছিল এবং পরে অষ্টাদশ শতকে ইহারই পুনরাবৃত্তি দেখি—পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন,

"It is extremely difficult in the absence of data to speak confidently on the subject."

প্রাক্-চৈতন্যযুগে চণ্ডীযাত্রা শিবযাত্রা থাকিতে পারে, থাকা এমন কিছু আশ্চর্য নয়, কিন্তু সে সম্বন্ধে সুষ্ঠু নিদর্শন কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে মিলিতেছে না। চৈতন্যদেব অভিনয় করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা কোন্ ভাষায় কিসের অভিনয় তাহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ বা নিদর্শন নাই। ইহা যাত্রা বা

নন সংস্কৃত নাটক (জগন্নাথবল্লভ বা নকেলিকৌমুদী) সে সম্বন্ধে স্থির শ্চয়তা নাই। অভিনয়েরও যে বর্ণনা আছে হাতেও যাত্রার পূর্বশৈলী আবিষ্কার করা ক। "আজি করিবাঙ্ নৃত্য অঙ্কের ধানে"—তিনি ইহাকে নৃত্যের পর্যায়ভুক্ত রিয়াছেন এবং নৃত্যই ছিল ইহার প্রধান অঙ্গ। আবার চৈতন্যপূর্বযুগে বা চৈতন্য-সমসাময়িক কালেও যদি যাত্রার অস্তিত্ব রীকৃত, তাহা হইলে খেতরী মহোৎসবে কি হার অনুষ্ঠান হইত না? কিন্তু খেতরী মহোৎসবে যাত্রার অভিনয় হইয়াছিল কোথায়ও তাহার প্রমাণ নাই। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া অনুমান করা যায় যাত্রা চৈতন্যপরবর্তী যুগের। যাত্রার উৎস বৈদিক গীতিনাট্যই হউক আর গীতগোবিন্দই হউক, প্রাক্-চৈতন্যযুগে চণ্ডীযাত্রা-রামযাত্রা থাক বা না থাক নিদর্শন না পাওয়া পর্যন্ত যাত্রার উৎপত্তিস্থল আবিষ্কারে চৈতন্যযুগের পূর্বে যাওয়া ঐতিহাসিকের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা।

যাত্রার মৌলিক অর্থ—দেবতার উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও উৎসব। তাহার পর অর্থ হইল দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে নাট-গীতি। তাহা হইতে দেবলীলাত্মক অথবা অন্য কাহিনী আশ্রিত নাটগীতির উদ্ভব। যাত্রার আদিমরূপে ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি সবটুই হইত গানে গানে; এই পুরাতন শৈলীর অনেকখানি অনুবর্তন করিয়াছেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০ খ্রীঃ)। তাহার পর গানের ব্যাখ্যাস্বরূপে কিছু কিছু সংলাপ প্রবেশ করিতে লাগিল, কিন্তু প্রথমদিকে সংলাপ খুবই কম। গোবিন্দ অধিকারীর (১৮১০) যাত্রায় সংলাপ এবং সঙ্গীত প্রায় সমান-সমান; অর্থাৎ সংলাপ বাদ দিয়া গানগুলিকে একত্র করিলে পুরাতন যাত্রার রূপ পরিগ্রহ করে, আবার গানগুলি বাদ দিয়া সংলাপগুলি একত্র সংকলিত করিলে আধুনিক যাত্রার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের যাত্রার শৈলী অনেকখানি থিয়েটার ঘেঁষা হইয়া পড়িয়াছে নাটকের প্রভাবে, তবে সঙ্গীতের প্রাধান্য প্রায় সমানই অব্যাহত আছে।

যাত্রার আদিম যুগে বৈষ্ণবপ্রভাব ছিল অপ্রতিহত। যাত্রার পারিভাষিক নাম ছিল 'কালিয়দমন যাত্রা',—কিন্তু কেবল কালিয়-দমন নয় দান-মান-বিরহ বিষয়ক যাত্রাও কালীয়-দমন নামে চলিয়া যাইত। এ যুগের যাত্রাওয়ালাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

বৈষ্ণবযুগের পর বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা পরমানন্দ অধিকারী (অষ্টাদশ শতাব্দী) যাত্রাকে অনেকখানি নাটকের স্বাধর্ম্যের দিকে আগাইয়া লইয়া গেলেন, সঙ্গীতের প্রাধান্য প্রায় সমানই রহিল তবে সংলাপও বেশ অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই রীতিই অনুসরণ করিয়াছেন সুদাম অধিকারী, লোচন অধিকারী (অক্রুর সংবাদ ও নিমাই সন্ন্যাসে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন) কৃষ্ণনগরের গোবিন্দ অধিকারী, কাটোয়ার পীতাম্বর অধিকারী, বিক্রমপুরের কালাচাঁদ পাল প্রভৃতি।

রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা ও মনসার ভাসান যাত্রায়ও ভাটা পড়ে নাই, ফরিদপুরের গুরু-প্রসাদ বল্লভ, বর্ধমানের লাউসেন বাদল, চণ্ডীযাত্রা এবং মনসার যাত্রায় অপেক্ষাকৃত সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত যাত্রাগানের ইহাই ইতিহাস, কতকগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত ছাড়া প্রাচীন যাত্রা-ওয়ালাদের রচনার অন্য কোন নিদর্শন এ-যুগে পর্যন্ত পৌঁছায় নাই।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকে অনেক সখের দলের যাত্রার উদ্ভব হয়। প্রচুর যন্ত্র এবং কণ্ঠসঙ্গীত থাকা সত্ত্বেও এই যাত্রা-গুলিতে যথেষ্ট নাটকীয় সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। বেলতলার যাত্রা, এঁড়েদাড় যাত্রা গোপাল উড়ের যাত্রা এগুলির নিদর্শন। কালুয়া-ভলুয়া, মেথর-মেথরাণী প্রভৃতি চরিত্র দ্বারা শ্রোতা মাতাইবার মত হাস্যরস অবতারণা করিবার রীতি যাত্রার মধ্যে এই সময় থেকে প্রবর্তিত হয়।

এ যুগের যাত্রা কৃষ্ণলীলা বা কালিয়দমন যাত্রা নয়, রামযাত্রা ও চণ্ডীযাত্রাও নয়; বিবিধ পৌরাণিক আখ্যায়িকা যেমন 'নল-দময়ন্তী' অথবা লৌকিক প্রণয় কাহিনীকে আশ্রয় করিয়াই যাত্রাপালাগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আদিরসের বন্যায় অন্য স্রোতগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম অধ্যায়ের যাত্রা-ওয়ালাদের সমস্ত নাম জানা যায় না, তবে কৃষ্ণকমল গোস্বামী, গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে (১৮১৯) প্রভৃতি বিশেষ কৃতিত্ব ও সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ছিলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী, ইঁহার রচিত আট নয়টি পালার মধ্যে স্বপ্নবিলাস, রাই-উন্মাদিনী ও বিচিত্র-বিলাস সমধিক প্রসিদ্ধ। বিরহী গৌরচন্দ্রের অপরূপ রূপ-মাধুরী অমর তুলিকাস্পর্শে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে রাইউন্মাদিনী পালায়। কৃষ্ণকমলের রাধিকা চৈতন্যের ছায়ায় অঙ্কিত। কৃষ্ণ-কমলের গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে যাত্রার সুর নামিয়া যাইতে লাগিল, আদি রসের জোবড়া রং ইহার সর্বাঙ্গে বেশ ভালভাবেই লাগিয়াছিল এবং বহুকাল যাবৎ তাহা প্রাকৃত এবং নাগরিক জনসাধারণের কর্ণ ও চক্ষু সার্থক করিয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবলব্ধধন বিকৃতরুচি নাগরিক সংস্কৃতি যখন কলিকাতায় আসর জমাইয়াছে এবং খেউর ও কবিগানের ভিতর দিয়া আদিরসের উষ্ণ স্রোত যখন স্ফীত হইয়া বহিয়া চলিয়াছে তখন তাহা যাত্রার উপরও প্রভাব বিস্তার করিল, যাত্রার ভক্তিরসের স্থান আদি রস দখল করিল এবং যাত্রার কাহিনী হইল আদিরসের গঙ্গোত্রী বিদ্যাসুন্দর কাহিনী। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত যাত্রার অধ্যাত্মভাব-বিশুদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রমুখ কয়েকজন যাত্রাওয়ালার মধ্যে; কিন্তু ইহার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যাত্রার সুর একেবারে নামিয়া যায়। অবশ্য প্রথমার্ধ থেকে এই পরিবর্তনের সুর কোথায়ও কোথায়ও বেশ উগ্রভাবেই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় হইতে যাত্রার মধ্যে নাচ-গানের বাহুল্য এবং সঙের ও ভাঁড়ামীর প্রাচুর্যও দেখা দিয়াছিল। গোবিন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী ও রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী প্রভৃতি প্রাচীন যাত্রাপদ্ধতি অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন; কিন্তু মহেশ চক্রবর্তী, বৌ মাস্টার, ঝোড়ো, উমেশ মিত্র, মদন মাস্টার, লোকো ধোপা ইত্যাদির দলে যাত্রার রূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাতে শিল্পকৌলিন্য ত ছিলই না, রুচির দিক দিয়াও ছিল তাহা বিকৃত। এই যুগের যাত্রাগানের একটা চমৎকার আস্বাদনাত্মক আলোচনা করিয়াছেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সে যুগের অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের যাত্রাগান সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—এক্ষণকার প্রচলিত যাত্রা বিদ্যাসুন্দর, নায়ক-নায়িকাদের প্রেমালাপ, বিচ্ছেদ, মিলন ইত্যাদির অভিনয় করিয়া শ্রোতাদের চিত্তরঞ্জন করা প্রায় সকল যাত্রার উদ্দেশ্য। প্রেমের কাহিনী বলিয়া যাত্রা হেয় নয়, বাঙ্লা সাহিত্য ত প্রেমেরই সাহিত্য, কিন্তু যাত্রার মধ্যে প্রেমের যে

আদর্শ প্রকাশ পায় তাহাতে সে যুগের বিকৃত রুচির পরিচয়ই পাওয়া যায় বেশী করিয়া।

সঞ্জীবচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর যাত্রার সঙ্গে কৃষ্ণ-যাত্রার তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কি প্রেমের আদর্শে, কি নাটকীয়ত্বে, বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা কৃষ্ণযাত্রা শ্রেষ্ঠ। এ যাত্রায় রহস্যের ভাগ অধিক, মালিনী-সুন্দরের কথাবার্তা এবং বিদ্যাসুন্দরের কথাবার্তার মধ্য দিয়া রহস্যই বেশী প্রকাশ পাইয়াছে, এ যাত্রায় মালিনীই প্রধানা, তাহার রঙ্গ-রস লইয়াই যাত্রা, নায়ক-নায়িকা উপলক্ষ্য মাত্র। ইহা ছাড়া ভাষার কসরৎও এ যাত্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এক চক্র শব্দ লইয়া রথচক্র, রমণীচক্র, নয়নচক্র, প্রেমচক্র, চক্রীর চক্র প্রভৃতি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

এ যাত্রার মধ্য অংশ নৃত্য-মেহতর, ভিস্তী, মালিনী, বিদ্যা সকলেই নৃত্য করে; এ নৃত্য 'খেমটা নাচ', সে অতি ঘৃণিত দেহান্দোলন। সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়াছেন—পূর্বে বাঙলায় 'খেমটা নাচ' ছিল না, পূর্বপদ্ধতি অনুসারে অদ্যাপি যে সকল 'কালিয়-দমন' যাত্রা আছে তাহাতে এই নৃত্য প্রচলিত নাই। আধুনিক যাত্রায় কৃষ্ণ-রাধাকে গোয়ালা-গোয়ালিনী বলিয়া মনে হয়, পূর্বে তাহা-দিগকে দেবতা বলিয়া বোধ হইত, ইহাই আধুনিক যাত্রার পরিচয়।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর শক্তিশালী কবি ছিলেন সন্দেহ নাই। বাঙলা সাহিত্যকে তিনি কিভাবে শক্তি ও সুষমামণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন তাহা যে কোন বাঙলা সাহিত্য-রসিকের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু আর একদিক দিয়া তিনি বাঙলা সাহিত্যের প্রভূত ক্ষতিও যে করিয়া গিয়াছেন সে কথাও কেহ অস্বীকার করিবেন না। প্রথমতঃ আদিরসের উপরিভাগের ঈষৎ আবরণটিকে সরাইয়া দিয়া, গুপ্ত-প্রণয়ের গুহ্যত্বটুকু পরিহার করিয়া, তিনি নিজের যুগের এবং পরবর্তী যুগের সাহিত্য-রথী ও সাহিত্য-রসিকের রুচি-বিকৃতি দোষ ঘটাইয়াছেন। আদি রসের তীব্র মাদকতায় জনসাধারণ এমনই বিভোর, যে ইহার পর যে কবিই কোন কিছু শোনাইবার জন্য শ্রোতার আকর্ষণের চেষ্টা করিলেন তাহাকেই ভারতচন্দ্রের আর এক ধাপ উপরে না উঠিয়া আর উপায় রহিল না; সাধারণ প্রেম লীলাকে তাহারা 'এহো বাহ্য' বলিয়া উপহাস করিল; বিদ্যাসুন্দরের গুপ্ত
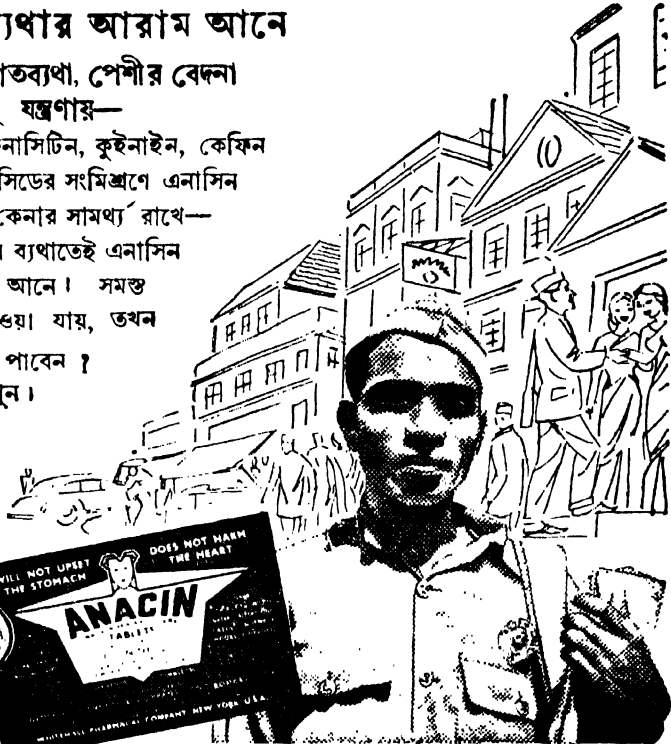
প্রণয়ের সার্থক-চিত্র তাহাদের চক্ষু ভরিয়া দিয়াছে। রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ইহাতে ইন্ধন জোগাইল। যে সময় জনসাধারণের রুচির রাশ টানিয়া ধরিবার প্রয়োজন ছিল সেই সময় রাশ আলগা করিয়া দিলেন ভারতচন্দ্র, ইহাতে প্রার্থিত ফলই ফলিল—পরবর্তী যুগের কবিগান, আখড়াই, হাফ আখড়াই, যাত্রা, খেউর-তরজা প্রভৃতি সাহিত্যই তাহার নিদর্শন।

দ্বিতীয়তঃ ভারতচন্দ্রের কাব্যের বহিরঙ্গ সৌকর্যসাধনপ্রিয়তা। ভারতচন্দ্রের কবিশক্তি অপরিসীম, কথার তুলিকায় ছবি আঁকিতে এবং শব্দঝঙ্কারে সঙ্গীত শুনাইতে এই দুই কাজেই তিনি সিদ্ধহস্ত। তাহার পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাঁহার কাব্যে। ভারতচন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের কাছে ভারতচন্দ্রই আদর্শ হইলেন, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত কবিশক্তি তাঁহাদের মধ্যে সকলে পাইলেন না—তাই শুধু কথা লইয়া লোফালুফি চলিল; কথা চিত্রও আঁকিল না, সঙ্গীতও শুনাইল না। ভারতোত্তর যুগের সাহিত্যগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ভারতচন্দ্রের অক্ষম অনুকরণের কলঙ্ক বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহারা আদিরসের পঙ্কিলস্রোতে হাবুডুবু খাইয়াছে। আলোচ্য যুগের যাত্রাগুলিও ইহার আংশিক পরিচয় দিতেছে; যাহা হউক পরবর্তীযুগে যাত্রাপালাগুলি এই প্রভাব দুইটি কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছিল।

যাত্রা ক্রমশঃ গ্রাম্য হইয়া উঠিতে লাগিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে কলিকাতায় এবং উহার নিকটস্থ প্রদেশে যাত্রার এই অশ্লীলতাকে আর কেহই আমল দিল না, যথার্থ ভদ্রলোকের বাড়িতে আর খেমটা নাচ স্থান পাইল না, ইহা মাঝে মাঝে আসর জাঁকাইত গ্রামের বারোয়ারী-তলায়। কারণ এই সময় বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে, পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা এবং শিক্ষাকে স্বীকরণ করিয়া বাঙ্গালী কিছু পরিমাণে আত্মস্থ হইতে পারিয়াছে।

এই অশ্লীলপ্রধান যাত্রাপালাগুলি সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবর্জনাস্বরূপ, কালের সম্মার্জনী কাব্যের পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনা হইতে তাহা বহুকাল পূর্বেই বিদায় করিয়া দিয়াছে কিন্তু ইহা একেবারে বিদূরিত হয় নাই; পরবর্তী সাহিত্যের উপর ইহার বেশ খানিকটা প্রভাব আছে এবং ইহার মূল ধারাটি খুব জীবন্ত না হইলেও অল্পায়ু হইয়া সাহিত্যের দরবারে সমাসীন। রূপ এবং বেশ পরিবর্তন করিয়া ইহাতে পূর্ব-যাত্রার ফর্ম কিছুটা হয়ত অব্যাহত আছে স্পিরিট একেবারেই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

অনেকের ধারণা যাত্রার সার্থক পরিণতি বাঙ্গলা নাটকে; কিন্তু তাহা একান্তই ভ্রান্ত; বাঙ্গলা নাটকের উপর যাত্রার প্রভাব থাকিতে পারে কিন্তু বাঙ্গলা নাটকের উৎপত্তি যাত্রা হইতে নয়। তারাচরণ শিকদার তাঁহার ভদ্রার্জুন নাটকের ভূমিকায় সে সময়কার বাঙ্গলা যাত্রাগানের কদর্যরূপের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সঙ্গীতের দ্বারা ব্যক্ত করেন, মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনেই ভক্তগণ আসিয়া ভণ্ডামি করে, তিনি স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থ অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত এবং তাহা ইউরোপীয় নাটকের প্রায় হইয়াছে। শিকদার মহাশয় বাঙ্গলা নাটক ও বাঙ্গলা যাত্রা যে দুইটি ভিন্ন বিষয় সে সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন।

বাঙ্গলা নাটকের পাশাপাশি বাঙ্গলা যাত্রার ধারা প্রবহমান ছিল ক্ষীণভাবে। কখনও কখনও এই দুইটি ধারা পরস্পরের খুব নিকটে আসিয়াছে, ইহাতে একে অপরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে বিশেষভাবে।

নাটকের অভিনয় শহরবাসী জনসাধারণের চক্ষু ধাঁধাইয়া দিয়াছিল এবং তাহাতে পাড়ায় পাড়ায় অনেক সখের থিয়েটার রাতারাতি গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু থিয়েটার ব্যয়সাপেক্ষ, রঙ্গমঞ্চনির্মাণের ব্যয়বাহুল্য অনেক সখের দলের সাধ্যায়ত্ত ছিল না, তাই রঙ্গমঞ্চের পাট উঠিয়া গেল, যাত্রার পদ্ধতিতে অভিনীত হইতে লাগিল নাটক। রঙ্গমঞ্চে যে সকল নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছে সেইগুলিই আবার যাত্রার মত করিয়া অভিনীত হইতে লাগিল, তবে এই ধরণের পালায় অনেকগুলি অতিরিক্ত গান সংযোজন করিয়া দেওয়া হইত। এইভাবে যাত্রা পরিণতি লাভ করিল গীতিনাট্যে-ইহার পিছনে বাঙ্গলা নাটকেরও খানিকটা প্রভাব বর্তমান রহিল। অবশ্য এ প্রভাব কেবল একতরফা রহিল না, নাটকের প্রভাব যেমন যাত্রায় পড়িল, যাত্রার প্রভাবও নাটকের উপর পড়িয়া বস্তুপ্রধান (objective) নাটককে অনেকখানি নবরূপ দান করিল।

বাঙ্গলা নাটকের উপর যাত্রার প্রভাব অপরিসীম, সে বিষয় স্বতন্ত্র, এখানে শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, বাঙ্গলা যাত্রাগান যে কেবল নাটকের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াই অস্তিত্ব বিসর্জন দিল তাহা নয়, গীতাভিনয়ের আদর্শে না হউক তাহার কিছু পরিবর্তিত রূপ পাওয়া যায় আধুনিক যুগের রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলিতে। সাহিত্যিক উৎকর্ষে এবং কবিত্বের মানদণ্ডে পূর্ববর্তী গীতাভিনয়গুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলির নাম একত্র করা সঙ্গত নয় তবু এটুকুও স্মরণীয় যে, এই গীতিনাট্যগুলির ভিতর দিয়া প্রাচীন যাত্রাগানের ধারা অব্যাহত রহিয়াছে।

আধুনিক যুগে যাত্রার প্রচলন একেবারেই কমিয়া গিয়াছে, নাই বলিলেও চলে, যাহাও আছে তাহা রঙ্গমঞ্চহীন, সঙ্গীতবহুল থিয়েটার—যাত্রা ঠিক নয়। থিয়েটার ইহাকে আমূলে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে।

চক্রদত্ত
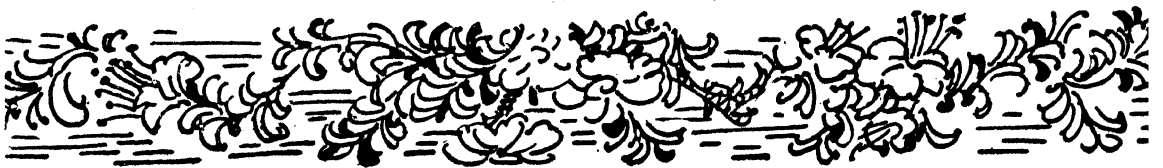
উত্তর ইংলণ্ডের ডার্লিংটন সহরের একটি ভেষজ ব্যবসায়ী "ডেক্সট্র্যাম" একটি ওষুধ প্রস্তুত করেছেন। আশা করা যাচ্ছে যে এই নতুন ওষুধ থ্রম্বসিস নামে রোগ সারিয়ে তুলতে পারবে। থ্রম্বসিস হল সেই রোগ যে রোগে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে রক্তের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা দান করে। ইক্ষুরস যখন গেঁজে যেতে আরম্ভ করে সেই সময় সেই সঙ্গে বিশেষ কোনো রসায়ন নিঃসৃত হয়, যা থেকে ঐ ওষুধটি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। বলতে গেলে ডেক্সট্র্যাম হল রক্তের প্লাজ্মা নামক অংশের বিকল্প এবং মানুষ হঠাৎ আঘাত পাবার পর এবং পুড়ে গেলে যখন পূর্ণ রক্তের পরিবর্তে রক্তের প্লাজ্মা দেবার আবশ্যক হয় তখন ডেক্সট্র্যাম দেওয়া চলতে পারে।

বার্মিংহ্যামের হাসপাতালে ডেক্সট্র্যাম ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে এবং রক্তের জমাট বাঁধবার কারণগুলি দূরীভূত করবার ক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। ওষুধটি যদিও প্রস্তুত করা হচ্ছে কিন্তু কখন বাজারে দেওয়া হবে তা এখনও জানা যায়নি।

*

দেখা গেছে যে, শুকনো দুধ কিংবা খুব ঘন করে জ্বাল দেওয়া দুধের চেয়ে টাটকা প্যাস্তুরাইজড্ দুধে বেশী প্রোটীন থাকে। ডাঃ কুক প্রায় ১৬ মাস ধরে এই রকম বিভিন্ন ধরণের দুধ ইঁদুরকে খাইয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, যে সব ইঁদুরকে ঐ প্যাস্তুরাইজড্ টাটকা দুধ খাওয়ান হয়েছে সেগুলো অন্যান্য দুধ খাওয়া ইঁদুরের চেয়ে ওজনে বেড়ে থাকে। অবশ্য ডাঃ কুকের মতে দুধটা যদি খুব সাবধানে ঘন করা যায় কিংবা শুকনো করা যায় তাহলে প্যাস্তুরাইজড্ দুধের সঙ্গে এ দুধের প্রোটীনের তারতম্য খুব বেশী হয় না।

*

অনেক কাপুড়ে বাবু আছেন যাদের পোষাকে একটু আধটু দাগ লাগলে রীতি-মত মুসড়ে পড়েন। বিশেষতঃ যে দাগ সহজে ওঠানো যায় না সে রকম কোনও কিছু ঘটলে তাদের তো সমূহ বিপদ মনে হয়। বিজ্ঞান জগত এর একটা সুরাহা করেছে। কাপড়-জামা পরিষ্কার করবার একটা নতুন পাউডার বার হয়েছে। এই পাউডারটা কাপড়জামার দাগগুলো সম্পূর্ণভাবে উঠিয়ে দেয়। এটি এনজাইম জাতীয় জিনিস দিয়ে তৈরী। সাধারণতঃ এনজাইম জাতীয় পদার্থের সঙ্গে প্রোটীন জাতীয় পদার্থের এমন একটা বিশেষ ধরণের সম্পর্ক আছে যে, এনজাইম প্রোটীন জাতীয় পদার্থটি নিজের মধ্যে লোপ করে দেয়। এই কারণে কাপড়ে দুধ, আইসক্রিম, কফি, চকলেট, ডিম, রক্ত কিংবা কোনও রকম আঠা এবং বীয়ার প্রভৃতি প্রোটীনবহুল জিনিসের দাগ লাগলে এই গুঁড়ো দিয়ে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে ফেলা যায়। অবশ্য, সুতা, উল, নাইলন, রেয়ন ইত্যাদি জাতীয় কাপড়ের পক্ষেই এই পাউডার কার্যকরী হয়। কিন্তু কৃত্রিম সুতার কাপড় অর্থাৎ যেগুলো প্রোটীন জাতীয় পদার্থ থেকে তৈরী হয় সেগুলোর পক্ষে এটি বিশেষ ক্ষতিকর। কারণ এনজাইম প্রোটীনকে নিজের মধ্যে লয় করে ফেলে; সুতরাং ঐ জাতীয় এই গুঁড়োতে কাপড় খেয়ে যাবে।

*

সবুজ গাছপালার মধ্যে সবুজ রংএর ফড়িংটির নাচ দেখে একটুখানি তাকিয়ে দেখে না এমন লোক খুব কমই আছে তবে ফড়িংগুলো সবুজ কেন একথাটা একটুও ভেবে দেখেনা প্রায় সকলেই। বিজ্ঞান পিপাসু অবশ্য এবিষয়ে উদাসীন নয়। প্রাণিতত্ত্ব-বিদেরা পরীক্ষা করে দেখতে চেষ্টা করছেন কেন এরা চির তরুণ মানে চিরসবুজ। তারা অবশ্য এখনও কোনও কিছু স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। দুই উপায়ে এঁরা ব্যাপারটি পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমে তারা কচি কচি তাজা সবুজ ঘাস ফড়িংদের খাইয়ে দেখেছেন যে, দশটি ফড়িংএর মধ্যে সাতটি সবুজ হয়েছে। আবার যখন কাচা ঘাস একদিন অন্তর খাওয়ানো হয়েছে তখন দশটির মধ্যে একটি সবুজ হয়েছে, এবং যখন একেবারে সম্পূর্ণ শুকনো ঘাস খাওয়ানো হয় তখন একটিও সবুজ হলোনা। আর একভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সবুজ ফড়িংকে সবুজ খাঁচার মধ্যে রাখলে শুকনো ঘাস খাওয়ান সত্ত্বেও পাঁচটির মধ্যে একটি সবুজ থাকে। ঐভাবে আবার যদি কচি তাজা সবুজ ঘাস খাওয়ানো হয় তাহলে চারটির মধ্যে তিনটি সবুজ থাকে। এর থেকে মনে হয় যে, ঘাসের মধ্যে সবুজ ক্লোরোফিল থাকার দরুণই খুব সম্ভবতঃ ফড়িংএর শরীরের সবুজ পিগমেণ্ট জন্মাতে সুবিধে হয়।

*

মোটর গাড়ী থাকলেই হলোনা, মোটর রাখবার একটা জায়গাও থাকা চাই। আজকাল এটা একটা বড় সমস্যা। মোটর গাড়ী যত ছোট হয় রাখবার ততই সুবিধা। গাড়ীটা খুব হাল্কা হলে আরও সুবিধা হয়। তাহলে গাড়ীখানাকে অনায়াসেই হাতে করে তুলে বাড়ীর মধ্যে রাখা যায়। নতুন ধরণের একটা বিলাতী মোটরগাড়ী বার হয়েছে। এটির ওজন আড়াই মণের চেয়েও কম তাই দরকার হলে দুজনে মিলে ধরাধরি করে সহজেই বাড়ীর ভেতরে রেখে দেওয়া যায়। গাড়ীখানা তিন চাকার, এক গ্যালন তেলে প্রায় একশত মাইল যেতে পারে। এর গতি ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল। দুজন পূর্ণ বয়স্ক এবং একজন বাচ্চা অনায়াসেই যেতে পারে। গাড়ীখানির মূল্য ৮০০০ ডলার।
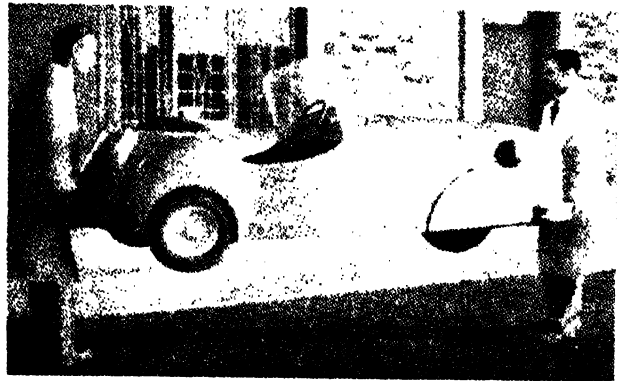
আড়াই মণী গাড়ি, কিন্তু খেলার জন্য নয়—সত্যি মানুষ চড়ার জন্য

কলিকাতার গ্রন্থাগার

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো জায়গার সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় স্থানীয় গ্রন্থাগার দেখলেই জানা যায়। এই মানদণ্ডে বিচার করলে কলিকাতার সংস্কৃতি ভারতবর্ষে শীর্ষস্থান অধিকার করবার দাবী সহজেই করতে পারে। কলিকাতার গ্রন্থাগারগুলির সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য থেকে নাগরিকদের বহুমুখী সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির আয়তন প্রায় ৩৩ বর্গ-মাইল এবং লোকসংখ্যা ২৬ লক্ষের কিছু কম। এখানকার নাগরিকদের ব্যবহারের জন্য ছোট-বড় প্রায় ৪০০ গ্রন্থাগার রয়েছে। বৃহত্তর কলিকাতার গ্রন্থাগারগুলি নিয়ে এই সংখ্যা সাড়ে পাঁচশ দাঁড়াবে। লণ্ডনে লাইব্রেরি আছে প্রায় ৬৫০। অবশ্য কলিকাতার সংগে তুলনাটা শুধু সংখ্যার দিক থেকে হতে পারে, গুণের দিক থেকে নয়।

এই গ্রন্থাগারগুলির বৈচিত্র্যও কম নয়। সরকারী দপ্তর, বিশ্বরঞ্জন সভা, শিক্ষায়তন, ক্লাব, হাসপাতাল প্রভৃতির গ্রন্থাগার রয়েছে। তাছাড়া আছে সাধারণের জন্য লাইব্রেরি; কতকগুলি লাইব্রেরি আবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, চাঁদা দিয়ে বই নেওয়া যায়। কোন কোনটা গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের আধুনিকতম রীতি অনুযায়ী সুপরিচালিত; আবার অনেক ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ভিন্ন এবং এই বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে তাদের বিশিষ্ট সংগ্রহ গড়ে উঠেছে। কলিকাতার সবগুলো গ্রন্থাগারে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অমূল্য সম্পদ ছড়িয়ে আছে। কোন কোন বিষয়ে যে-সব পুঁথিপত্র কলিকাতায় পাওয়া যায়, তা অন্যত্র নেই; তাই ভারতবর্ষের সব জায়গা থেকে এবং বিদেশ থেকেও অনুসন্ধিৎসু পাঠককে কলিকাতা আসতে হয়।

প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতি

কলিকাতার এই গ্রন্থ-সম্পদ বিগত পৌনে দু-শ' বছর ধরে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে কলিকাতার সাংস্কৃতিক জীবন শুরু হয় বলা যেতে পারে। এই সংস্কৃতি চর্চার মূলে রয়েছে ইংরেজ ও ভারতবাসীর পরস্পরকে জানবার আগ্রহ। এই আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠার মধ্যে। প্রাচ্যবিদ্যা আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স এশিয়াটিক সোসাইটির গোড়াপত্তন করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের জন্য হিন্দু কলেজ (১৮১৭), ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী (১৮২৩) প্রভৃতি
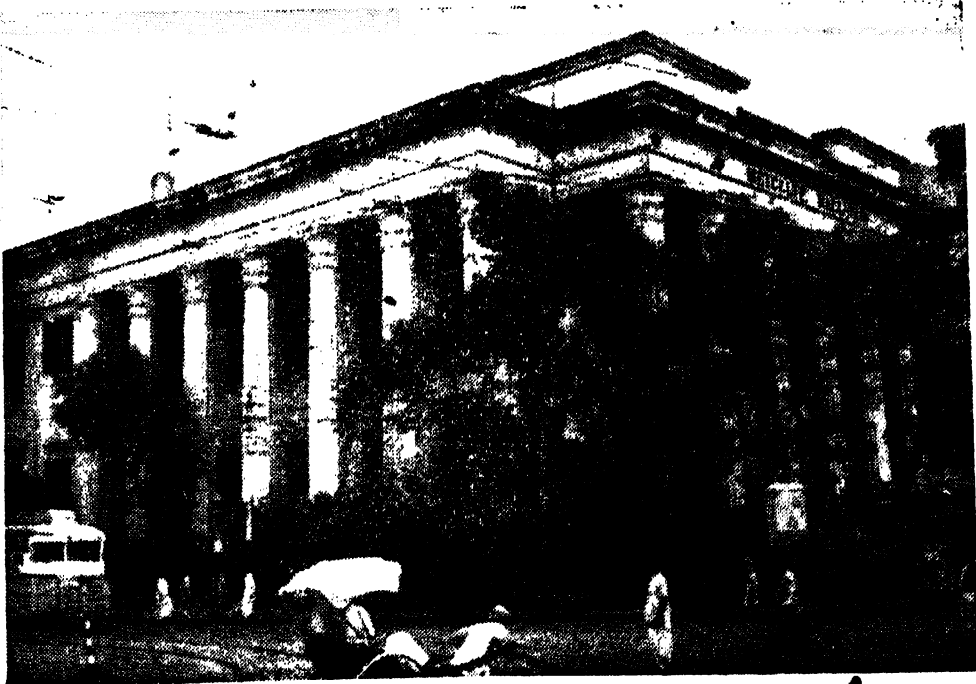
মেটকাফ হল

বিদ্যালয় স্থাপিত হলো। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) আরো আগে থেকেই ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেবার জন্য ভারতীয় পণ্ডিত নিযুক্ত করেছে। এমনি করে শিক্ষা বিস্তারের সংগে সংগে কলিকাতার নাগরিকদের মনে দেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে বই পড়বার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। য়ুরোপ থেকে আসতে লাগল মুদ্রিত পুস্তক। হাতে লেখা পুঁথি সংগ্রহ হতে লাগল এদেশে,—বিশেষ করে বাঙলা দেশে। এ ব্যাপারে বাঙলা দেশে এমন বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ ১৭৯৪ সালের এক পাবলিক লেটারে প্রশংসার সহিত তার উল্লেখ করেছেন। এমনি এলোমেলো ধরণের পুঁথি-পুস্তক সংগ্রহ দ্বারা অলক্ষ্যে এবং অজানিতে কলিকাতার ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগারগুলির গোড়াপত্তন আরম্ভ হয়েছিল। বাঙলা হরফের আবিষ্কার এবং শ্রীরামপুর পাদ্রীদের পুস্তক প্রকাশনায় অপূর্ব সাধনা এদেশে পুস্তক প্রচার ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রভূত সহায়তা করেছে।

কলিকাতার গ্রন্থাগারের ইতিহাসে ১৮৩৫ সালের আগস্ট মাস স্মরণীয় হয়ে আছে। তদানীন্তন অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেল স্যার চার্লস মেটকাফ কুখ্যাত প্রেস আইন প্রত্যাহার করায় কলিকাতার নাগরিকরা ২০শে আগস্ট (১৮৩৫) টাউনহলে এক সভায় মিলিত হয়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য "মেটকাফ লাইব্রেরি বিল্ডিং" নামে একটি ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত করেন। আগে বাড়ি তৈরী করাটাই প্রধান উদ্দেশ্য হলো; পরে বাড়ি তৈরী হলে তাকে কাজে লাগাবার জন্য লাইব্রেরি খোলা হবে। এর মাত্র দশদিন পরে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ স্টকোয়েলারের উদ্যোগে কলিকাতার নাগরিকদের আর একটি সভা হয়। এই সভার সংগে "মেটকাফ লাইব্রেরি বিল্ডিং কমিটি"র কোন যোগ ছিল না। ৩১শে আগস্টের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, কলিকাতায় সাধারণের জন্য একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। সমাজের সকল স্তরের লোক যাতে উপকৃত হতে পারে, সেজন্য সকল বিষয়ের বই রাখা হবে এবং গ্রন্থাগারের সভ্য হওয়া সম্বন্ধে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ থাকবে না।

এই সিদ্ধান্তের ফলে ১৮৩৬ সালের মার্চ মাসে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির উদ্বোধন হয়। "মেটকাফ লাইব্রেরি বিল্ডিং কমিটি" শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার সংকল্প ত্যাগ করে পাবলিক লাইব্রেরিকে মেটকাফ ভবনে উঠে আসবার আমন্ত্রণ জানালেন। পাবলিক লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হন, কারণ তাঁদের উপযুক্ত জায়গার অভাব ছিল। অবশ্য মেটকাফ হল নির্মাণের ব্যয়স্বরূপ তাঁদের প্রায় ১৬,০০০ টাকা সাহায্য করতে হয়েছিল। এমনি করেই গ্রন্থাগার স্থাপনের দুটো সমসাময়িক কিন্তু বিভিন্ন প্রচেষ্টা মিলিত হয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠল।
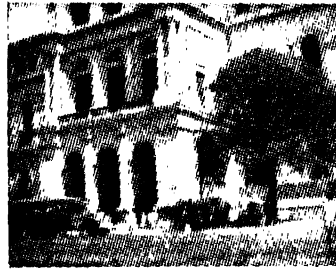
মিউজিয়াম ভবন

আজ কলিকাতার অনেক নাগরিকই হয়তো মেটকাফ হলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। কিন্তু ১৮৪৪ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ আশী বৎসরকাল কলিকাতার বিদ্যোৎসাহী নাগরিকদের নিকট মেটকাফ হল ও জ্ঞান-চর্চা অভিন্নরূপে যুক্ত ছিল। ১৮৪৪ সালে পাবলিক লাইব্রেরি মেটকাফ হলে উঠে আসে; ১৯০৩ সালে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি এই বাড়িতেই জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত হয় এবং ১৯২৩ সাল পর্যন্ত মেটকাফ ভবনে গ্রন্থাগারিক হরিনাথ দে প্রভৃতিকে কেন্দ্র ক'রে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি তার ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে।

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন মাত্রই নয়; বহুদিন যাবৎ নগরীর প্রধান সংস্কৃতি কেন্দ্র ছিল এই গ্রন্থাগার। বাঙলা উপন্যাসের প্রবর্তক প্যারীচাঁদ মিত্র এই গ্রন্থাগার পরিচালনার সংগে প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি শুধু বাঙলা দেশে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে প্রথম সফল গ্রন্থাগারের গৌরব দাবী করতে পারে। এর কার্যাবলীতে মুগ্ধ হয়ে বিদেশী পরিচালকবর্গ বলেছেন যে, ইংল্যান্ডেও তখন সাধারণের জন্য এমন সুন্দর গ্রন্থাগার ছিল না। ১৮৫০ সালে লাইব্রেরি আইন পাশ হবার পর থেকে ইংল্যান্ডে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রসারলাভ করতে থাকে।

কলিকাতার গ্রন্থাগারগুলির ক্রমোন্নতির ইতিহাসে আরও কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা হলো ১৮৭০-৭৫ সালের মধ্যে মিউজিয়াম ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৩ সালে সর্বসাধারণের জন্য ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির দ্বার মুক্ত করে দেওয়া। ১৮৯৪ সালে বংগীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নিয়মিতরূপে বাঙলা বই সংগ্রহ আরম্ভ হয়।

কলিকাতার লাইব্রেরিগুলির উন্নতির মূলে বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রভাবও যথেষ্ট রয়েছে। এই দুটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় স্থাপিত হয়েছে যথাক্রমে ১৯২৫ ও ১৯৩৩ সালে। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শেখাবার জন্য ১৯৩৫ সালে 'ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরিতে' ক্লাশ আরম্ভ হয়। কলিকাতা এর পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে। এখানকার গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশ সুযোগ্য কর্মী এই ক্লাশে শিক্ষালাভ করেছেন। এখন গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। এই সব পরিষদ ও শিক্ষাকেন্দ্রের প্রভাব কলিকাতা কিংবা পশ্চিমবংগেই সীমাবদ্ধ নেই, ভারতবর্ষের অন্যত্রও তা ছড়িয়ে পড়েছে।

বর্তমান সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সবগুলি লাইব্রেরির নাম উল্লেখ পর্যন্ত সম্ভব নয়। মূল বৈশিষ্ট্য অনুসারে গ্রন্থাগারগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রধান প্রধান লাইব্রেরির সামান্য পরিচয় দেওয়া হবে। অবশ্য সবগুলিই আলোচনার যোগ্য, কারণ প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই উল্লেখযোগ্য কিছু বইপত্র থাকে।

গবেষণা গ্রন্থাগার

ন্যাশনাল লাইব্রেরি: যে-সব গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার সুযোগ আছে, তাদের মধ্যে ন্যাশনাল লাইব্রেরি অন্যতম। এর ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যে-সব বই ধীরে ধীরে জমে উঠেছিল, তাদের একত্র সংগ্রহ করে ১৮৯১
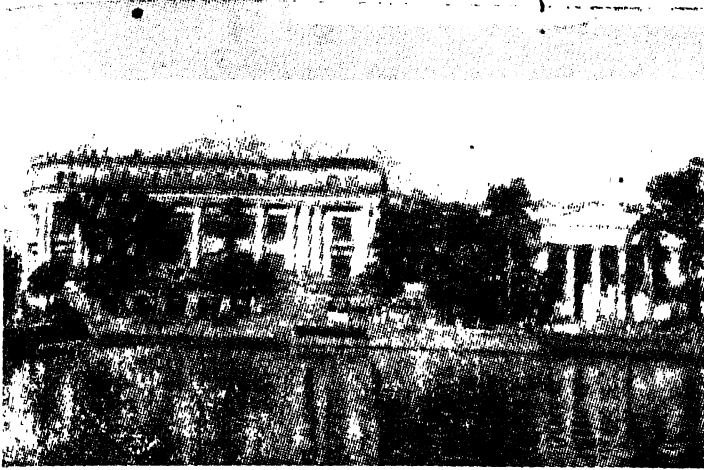
সেনেট হল ও আশুতোষ ভবন

সালে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি স্থাপিত হয়। অবশ্য তখন এই গ্রন্থাগার মুখ্যত সরকারের ব্যবহারের জন্য ছিল। অনেক আবেদন-নিবেদন করে সাধারণ পাঠক কখনো দু-একখানা বই হয়তো পড়তে পেত।

লর্ড কার্জন বড়লাট হয়ে এসে দেখলেন ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য সত্যিকারের ভালো গ্রন্থাগার নেই। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে লাইব্রেরি গড়ে ওঠায় এবং অন্যান্য কারণে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির গৌরব অস্তমিত হয়ে গিয়েছিল। লর্ড কার্জন এই গ্রথাগার পরিদর্শনে গিয়ে দেখলেন, বইগুলি অযত্নে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কবুতরের উৎপাতে পাঠকদের নিশ্চিন্তে পড়াও অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবহেলার মধ্যেও মূল্যবান গ্রন্থ-সংগ্রহ কার্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁর চেষ্টায় কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি সরকার কিনে নিয়ে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির সঙ্গে যোগ করে দেন। এই নূতন ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি ১৯০৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লর্ড কার্জন বলেন:

"It is intended that it should be a library of reference, a working place for students and repository of materials for the future historians of India, in which as far as possible, every work written about India at any time can be seen and read."

লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা হয় মেটকাফ হলে, কিন্তু ক্রমশ প্রশস্ততর স্থানের প্রয়োজন হওয়ায় ১৯২৩ সালে ৫নং এসপ্লানেড ভবনে স্থানান্তরিত হয়। সম্প্রতি আলিপুরে প্রাক্তন বড়লাট প্রাসাদ বেলভেডিয়ার লাইব্রেরির নিজস্ব ভবনরূপে পাওয়া গেছে। জনসাধারণের সুবিধার জন্য লাইব্রেরির পাঠাগার এবং পুস্তক লেন-দেন বিভাগটি এখনো এস্‌প্লানেডের বাড়িতেই আছে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরির বর্তমান পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ এবং এটাই ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ গ্রথাগার। নিম্নলিখিত শ্রেণীর পুস্তকে এই লাইব্রেরি বিশেষ সমৃদ্ধ: (১) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বই; (২) কেন্দ্রীয় ও অঙ্গ রাষ্ট্রসমূহের প্রকাশিত বইপত্র; (৩) যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা) এবং গ্রেট ব্রিটেনের সরকারী দলিল; (৪) রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট, পুঁথিপত্র; (৫) পুরানো সংবাদ-পত্র।

এখানকার কয়েকটি মূল্যবান বিশেষ সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: (ক) বুহার লাইব্রেরি—বর্ধমান জেলার বুহার গ্রামের জমিদার সৈয়দ সদরুদ্দীন ১৯০৪ সালে প্রায় এক হাজার আরবী ফারসী বই উপহার দেন। বুহার গ্রামের নাম থেকে এই সংগ্রহের নামকরণ হয়েছে। বর্তমানে ন্যাশনাল লাইব্রেরির আরবী, ফারসী ও উর্দু বই এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। (খ) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ: স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহের প্রায় ৮০,০০০ হাজার পুস্তক তাঁর পরিবারবর্গ ১৯৪৯ সালে ন্যাশনাল লাইব্রেরিকে দান করেছেন। শিল্প,
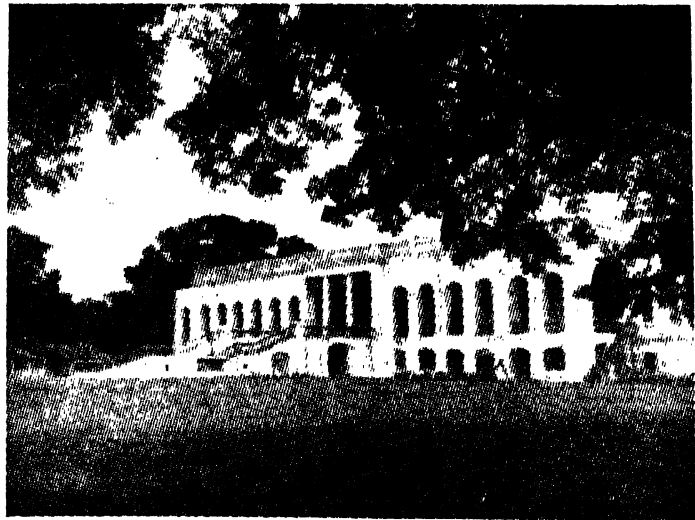
ন্যাশনাল লাইব্রেরি, বেলভেডিয়ার

সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, আইন, প্রভৃতি সকল বিষয়েরই মূল্যবান বই এই সংগ্রহে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আশুতোষ সংগ্রহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার। (গ) হায়দরাবাদের প্রাক্তন দূতাবাসের গ্রন্থাগারটি ন্যাশনাল লাইব্রেরি পেয়েছে। মোট ৪,২৯৫ খানা পুস্তকের মধ্যে অধিকাংশই সরকারী দলিলপত্র। (ঘ) বহরমপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামদাস সেনের গ্রন্থাগারটি তাঁর উত্তরাধিকারীরা ন্যাশনাল লাইব্রেরিকে দান করেছেন। এই সংগ্রহের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বইয়ের প্রত্যেকটি মূল্যবান। ভারতবর্ষ এবং বাঙলার সংস্কৃতি আলোচনায় রামদাস সেন সংগ্রহ বিশেষ সাহায্য করবে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি ভারত সরকার পরিচালনা করেন এবং এটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। ভারতের যে কোন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক এর সভ্য হতে পারেন। কলিকাতার বাইরে সর্বত্র সভ্যদের নিকট ডাকে বই পাঠানো হয়।

১৯৪৮ সালে লাইব্রেরির নাম "ইম্পিরিয়েল" থেকে পরিবর্তিত করে 'ন্যাশনাল' করা হয়। তার পর থেকে গ্রন্থাগারটি বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গত তিন বছরের মধ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে দান হিসেবে পাওয়া গেছে প্রায় এক লক্ষ বই।

যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এই গ্রন্থাগারের পরিচালক, তথাপি বাঙালীরা একে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে। বাঙালীর চোখে পাণ্ডিত্য এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরি অভিন্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে অনেক লেখক এই গ্রন্থাগারকে সাহিত্যের আসরে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাঙলা দেশে যে সব পুঁথিপত্র প্রকাশিত হয়, তার এক খণ্ড ন্যাশনাল লাইব্রেরি পেতে পারে বলে, গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ এই রাষ্ট্রে যত বই বেরিয়েছে, এখানে তাদের একটি সুনির্বাচিত সংগ্রহ পাওয়া যাবে। বাঙালীর সংস্কৃতি আলোচনায় এরূপ সংগ্রহ অপরিহার্য।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বৃহত্তম। বর্তমানে এখানে হাতে-লেখা পুঁথি ছাড়া প্রায় দু' লক্ষ বই আছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনেকদিন পরে গ্রন্থাগারের সূচনা হয়। কারণ তখন বিশ্ববিদ্যাল..র কাজ ছিল শুধু পরীক্ষা লওয়া; তাই বই-এর প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। ১৮৬৯ সালে উত্তরপাড়ার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরি স্থাপনের জন্য ৫০০০ টাকা দান করেন; এবং প্রায় ঐ সময়েই ঈশানচন্দ্র ঘোষের উইল অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কতকগুলি বই পান। এই দুটি দানকে কেন্দ্র করে লাইব্রেরির গোড়াপত্তন হলো। কিন্তু ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব টাকা থেকে বই কেনার অধিকার ছিল না। অবশ্য আইন পাশ হবার পরও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নি, কারণ গ্রন্থাগারের জন্য খুব কম টাকাই ব্যয় করা হতো। লাইব্রেরির প্রকৃত কাজ শুরু হয় ১৯১২ সালে, ভারত সরকারের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা সাহায্য পেয়ে। তারপর স্নাতকোত্তর বিভাগ (১৯১৭) খোলবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার প্রসারের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি শীঘ্রই সর্বপ্রকার গবেষণার উপযোগী কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

নিম্নলিখিত শাখাগুলি নিয়ে বর্তমান গ্রন্থাগার গঠিত: (ক) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার,—ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, শিক্ষা এবং রেফারেন্স সম্বন্ধীয় বইগুলো এখানে রাখা হয়; (খ) বিভিন্ন বিজ্ঞান বিভাগীয় গ্রন্থাগার; (গ) বিশেষ সংগ্রহ এবং প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত সেমিনারগুলির লাইব্রেরি। বিভাগীয় লাইব্রেরির দায়িত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের, কিন্তু বই, পত্রিকা, প্রভৃতি সংগ্রহের ভার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপর। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আশুতোষ ভবনের সর্বোচ্চতলে অবস্থিত; বিজ্ঞান বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি সার্কুলার রোড ও বালিগঞ্জে ছড়িয়ে আছে।

বিশেষ সংগ্রহগুলির মধ্যে দাশগুপ্ত, বাগচি, পি সি ঘোষ, পিশেল, ডান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এদের প্রত্যেকটির কোন-না-কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানকার চারুকলা বিভাগটিও সমৃদ্ধ।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পুরানো বাঙলা পুঁথির সংখ্যা প্রায় ৬,২০০; এর মধ্যে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য। সংস্কৃত এবং তিব্বতী পুঁথির সংখ্যা যথাক্রমে ১,০৫৪ ও ৪,৮৫৯। সবগুলি পুঁথির এখনো যথাযথ বিচার এবং তালিকাভুক্তি হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপক ছাড়া রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটরাও এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার: প্রাচ্যবিদ্যা সম্বন্ধে এমন সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এশিয়ায় আর নেই, অন্যত্র আছে কিনা সন্দেহ। ১৭৮৪ সালে সোসাইটি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই লাইব্রেরির কাজ আরম্ভ হয়। সোসাইটি প্রথম কাজ আরম্ভ করার অল্প সময়ের মধ্যেই বহুসংখ্যক বই ও পুঁথি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ এবং পুঁথির সংখ্যা তেত্রিশ হাজারের কম নয়। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ মোটামুটি চার
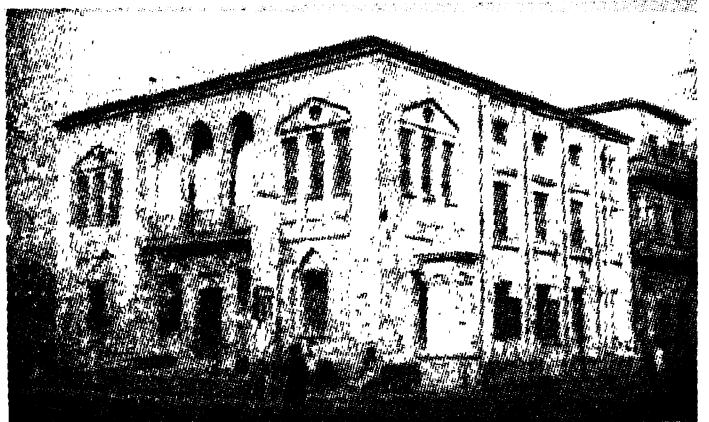
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ
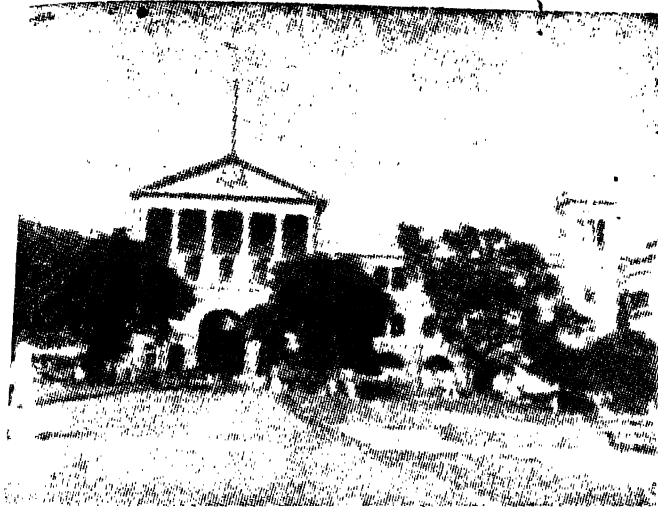
এসপ্ল্যানেড ভবন

...তে ভাগ করা যায়ঃ (১) সাধারণ; (২) ...ত গোষ্ঠীর ভাষা ও সাহিত্য ...ধীয়; (৩) ইস্‌লাম বিষয়ক; এবং (৪) ... ও তিব্বত বিষয়ক। এ ছাড়া বিজ্ঞান ... ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সাময়িক পত্র-...কা নিয়মিতভাবে আসে।

...শতম থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর পুঁথি ...সাইটির গ্রন্থাগারে দেখা যায়। দেড়শ' ...রের অধিককাল যাবৎ এই পুঁথিগুলির ...হায্যে ভারতের সংস্কৃতির উপর নূতন ...লোকপাত সম্ভব হয়েছে। পুঁথিগুলি ...সাইটির সভ্যদের নিকট থেকে দান ...সেবে এবং গভর্নমেন্টের অর্থানুকূল্যে ...লিকদের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ...স্কৃত ভাষা-গোষ্ঠীর পুঁথির সংখ্যা ...৫,০০০ এবং আরবী ফারসী পুঁথি আছে ...,০০০। শেষোক্ত শ্রেণীর অনেকগুলি পুঁথি ...যে মোগল সম্রাটদের সংগ্রহভুক্ত ছিল তার ...প্রমাণ পাওয়া যায়। বিখ্যাত পণ্ডিত হর-প্রসাদ শাস্ত্রী সংস্কৃত পুঁথিগুলির তালিকা তৈরীর কাজ আরম্ভ করে গিয়েছেন, এখনো তা শেষ হয় নি।

...গ্রন্থাগারের বিশেষ সংগ্রহগুলির মধ্যে ...লাহা, ঘোষ এবং চন্দ সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। এই লাইব্রেরির সুযোগ প্রধানতঃ সোসাইটির সভ্যরাই ভোগ করতে পারেন।

পরিষদ গ্রন্থাগারঃ বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৯৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই উদ্দেশ্য কেন্দ্র করেই পরিষদের গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক এমন অনেক দুষ্প্রাপ্য পুঁথি-পুস্তক এখানে পড়বার সুযোগ পাওয়া যায় যা অন্যত্র নেই। বর্তমানে গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা হবে পঞ্চাশ হাজারের অধিক এবং পুঁথির সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। এর মধ্যে বান্ধব সমাজ ও সাহিত্য সভার লাইব্রেরি এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির ব্যক্তিগত সংগ্রহও মিলিত হয়েছে। পরিষদের সদস্যরা গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পান। সাধারণের জন্য একটি পাঠাগার আছে।

বিজ্ঞান গ্রন্থাগার

অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থাগারের চেয়ে সাধারণত কলিকাতার বিজ্ঞান গ্রন্থাগারগুলি অধিক-তর সুপরিচালিত এবং সুসজ্জিত। মিউজিয়াম ভবনে অবস্থিত বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে ভূবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদ-বিদ্যা সমীক্ষার এবং নৃতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থাগার রয়েছে। এর সবগুলিই ভারত সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগার।

ভূবিদ্যা সমীক্ষার গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে ১৮৫৬ সালে। এখন এই লাইব্রেরির পুস্তক সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। ভারতের বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের মধ্যে এটাই সর্ববৃহৎ। সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ডিরেক্টরের অনুমতি নিয়ে জনসাধারণ এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে। ভারতীয় ভূবিদ্যা সম্বন্ধে যত বই এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাদের বার্ষিক সূচী প্রস্তুত করা এই গ্রন্থাগারের একটি প্রধান কাজ।

পুরানো মিউজিয়াম লাইব্রেরির প্রাণী-বিদ্যাবিষয়ক বইগুলি নিয়ে ১৯১৬ সালে ভারতীয় প্রাণীবিদ্যা সমীক্ষার গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখ্যা প্রায় ২৮,৫০০। প্রাণীবিদ্যার উপর এত বড় সংগ্রহ সমগ্র এশিয়ায় আর নেই। বিভাগীয় গ্রন্থাগার হলেও ডিরেক্টরের অনুমতি নিয়ে গবেষকরা এখানে পড়াশোনা করতে পারেন।

ভারতীয় উদ্ভিদবিদ্যা সমীক্ষার গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে ১৮৯৬ সালে এবং এখন এর পুস্তক সংখ্যা ৩৫,০০০ হাজারের বেশি। এই সংগ্রহের মধ্যে উদ্ভিদবিদ্যা, ফলিত রসায়ন, ভ্রমণ, গো-বিজ্ঞান, শ্রম-শিল্প প্রভৃতির উপর বই আছে।

ভারত সরকারের নৃতত্ত্ব বিভাগের গ্রন্থাগার কাজ আরম্ভ করেছে মাত্র ১৯৪৬ সালে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই প্রভূত উন্নতি হয়েছে। লাইব্রেরিতে বর্তমানে ১৭,০০০ বই ছাড়াও নৃতত্ত্ববিষয়ক বহু পুস্তিকা এবং মূল্যবান প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ আছে। গবেষকদের সহায়তার জন্য সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির বিষয়সূচী সঙ্কলন করা হয়। ভারতের নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য এই গ্রন্থাগারের সাহায্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় উদ্ভিদ্ উদ্যান (শিবপুর) এর লাইব্রেরি স্থাপিত হয়েছে ১৭৮৭ সালে। এশিয়ায় এটি উদ্ভিদবিদ্যাবিষয়ক সর্ব-প্রাচীন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারে বই ও পত্রিকার সংখ্যা ২৫,০০০ হাজারেরও বেশি। শুষ্ক উদ্ভিদশালা (Herbarium) এবং গ্রন্থাগার এক স্থানে থাকায় পুঁথিগত এবং ব্যবহারিক এই উভয় প্রকার বিদ্যা-লাভের সুযোগ পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সের লাইব্রেরি (১৮৭৬) সম্প্রতি বৌবাজার থেকে যাদবপুরে নূতন বাড়িতে উঠে গিয়েছে। গ্রন্থাগারে হাজার দশেক সুনির্বাচিত পুস্তক ও পত্রিকা আছে। পদার্থ-বিদ্যা

সম্বন্ধীয় ; পুস্তকের সংগ্রহ অধিকতর সমৃদ্ধ।

উপরোক্ত গ্রন্থাগারগুলি ছাড়া কলিকাতায় আরো অনেক বিজ্ঞান গ্রন্থাগার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, দপ্তর, সরকারি বিভাগ প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে এক মূল্যবান বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের উপাদান বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। অন্যান্য লাইব্রেরির মধ্যে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার-গুলি উল্লেখযোগ্য : বসু বিজ্ঞান মন্দির, মেডিকেল কলেজ; সার্ভে অব ইন্ডিয়া, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, আবহাওয়া অফিস, গভর্নমেণ্ট টেস্ট হাউস, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ এন্ড হাইজিন, ইত্যাদি।

বিশেষ বিষয়ক ও বৃত্তি সম্বন্ধীয় গ্রন্থাগার

ভারতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠানের (Indian Statistical Institute) গ্রন্থাগার কলিকাতার আধুনিক প্রথায় পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম। ১৯৩২ সালে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত এখানে পঁচিশ হাজারের অধিক বই সংগৃহীত হয়েছে। লাইব্রেরিতে ৭১০ খানা পত্র-পত্রিকা আসে; কলিকাতার আর কোন গ্রন্থাগারই বোধ হয় এত অধিক সংখ্যক সাময়িক পত্রিকার গৌরব দাবী করতে পারে না। বই ছাড়া পরিসংখ্যান জরিপের মূল দলিলগুলিও বর্গীকৃত করে রাখা হয়। এখানে মাইক্রোফিলম ও ফটো-স্টাটের ব্যবস্থা রয়েছে; অনুরোধ জানালে এদের সাহায্য অন্য লাইব্রেরিও পেতে পারে। গ্রন্থাগারটি প্রেসিডেন্সী কলেজের ভবন থেকে শীঘ্রই ইনস্টিটিউটের ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে নিজের বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে যাঁরা পড়তে চান, তাঁদের পক্ষে ১নং কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে অবস্থিত কমার্শিয়েল লাইব্রেরির সহায়তা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই গ্রন্থাগার ভারত সরকারের পরিচালনাধীন। ১৯১৯ সালে এর দ্বার জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়। বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় পঁচিশ হাজার।

বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ (শিবপুর) কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং এন্ড টেকনলজি (যাদবপুর) এবং ইনস্টিটিউশান অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাঙলা শাখার লাইব্রেরিগুলি বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থাগার হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের গ্রন্থাগার প্রাচীনতম —স্থাপিত হয়েছে ১৮৮০ সালে; এবং বইয়ের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় বিশ হাজার। সম্প্রতি এই গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেষ্টা চলছে। ১৯০৬ সালের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ লাইব্রেরির ক্রমোন্নতি অব্যাহত আছে। এর পঁচিশ হাজার বইয়ের মধ্যে সাহিত্য বিষয়ক অনেক পুঁথিপত্র দেখা যায়। ভূতপূর্ব জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গ্রন্থাগার থেকে এগুলো পাওয়া গেছে।

এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারের মধ্যে নিম্ন-লিখিত প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরির নাম-করা যেতে পারে : বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগ, সেণ্ট্রাল জুট কমিটি, টেলিগ্রাফ স্টোর ইয়ার্ড, পেটেণ্ট অফিস, ইত্যাদি।

কলেজ লাইব্রেরি

কলিকাতায় ত্রিশটিরও অধিক কলেজ-লাইব্রেরি আছে। এর মধ্যে প্রেসিডেন্সী, সংস্কৃত, স্কটিশ চার্চ এবং সেণ্ট জেভিয়ার্সের ন্যায় পুরানো কলেজ-লাইব্রেরিগুলিতে অনেক মূল্যবান পুঁথিপত্র পাওয়া যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজ লাইব্রেরিতে প্রায় ষাট হাজার বই আছে এবং ভারতের কলেজ লাইব্রেরির মধ্যে এটাই সর্ববৃহৎ। সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে (১৮২৪) এমন সব মূল্যবান পুঁথি-পত্র রয়েছে যা অন্যত্র সহজে পাওয়া যায় না। এর প্রথম গ্রন্থাগারিক লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়রত্ন অনেক সংস্কৃত পুঁথি নকল করে অথবা সংগ্রহ করে লাইব্রেরিকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ লাইব্রেরিতে প্রায় ত্রিশ হাজার বই আছে, তার মধ্যে গোয়েথেলস্ সংগ্রহ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। কলিকাতার আর্চ বিশপ ডাঃ গোয়েথেলস্ তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বহু দুষ্প্রাপ্য বই, ছবি, ইত্যাদি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ লাইব্রেরিতে দান করে গেছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় ল' কলেজের লাইব্রেরির মতো সমৃদ্ধ আইন গ্রন্থাগার এদেশে খুব কম আছে। ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ লাইব্রেরি শিক্ষানীতি সম্বন্ধীয় সুনির্বাচিত পুস্তক সংগ্রহ করেছে। শিল্পকলা বিষয়ক বই-এর জন্য স্বভাবতঃই আমাদের সরকারী আর্ট কলেজের কথা মনে পড়ে।

সাধারণ গ্রন্থাগার

কলিকাতায় ছোট বড় প্রায় ২৫ সাধারণ গ্রন্থাগার আছে এবং বৈচিত্র্যেরও শেষ নেই। এসব লাইব্রে পুস্তকসংখ্যা সাধারণতঃ পাঁচশ' থেকে হাজারের মধ্যে। কোন কোনটি হয় পঁচাত্তর বছর ধরে নাগরিকদের সেবা আসছে; কিন্তু এদের আশানুরূপ উন্ন একেবারেই হয় নি। অথচ সাধারণ নাগরি পক্ষে এই গ্রন্থাগারগুলিই নির্ভরস্থ সরকারী দপ্তরের এবং নানাবিধ প্র ষ্ঠানের সহিত যুক্ত গ্রন্থাগারগুলির কয়েক বৎসরে বহুমুখী উন্নতি হয়ে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির প্র অন্তরায় অর্থাভাব। পাশ্চাত্যের প্রগ শীল দেশগুলির মতো এখানে লাই কর নেই। তাই পাঠকদের সা চাঁদার উপর বহুলাংশে নির্ভর ক হয়। অবশ্য কর্পোরেশন থেকে সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু তা খুব অ ১৯৫১—'৫২ সালে কর্পোরেশনের বা এই বাবদ মোট বরাদ্দ ছিল মাত্র ৪২,০ টাকা, বিশেষ করে এই গ্রন্থাগারগুলির বাঙলা বই-এর পাঠক সৃষ্টি করবার বাঙলা সাহিত্যকে জনপ্রিয় করবার দা রয়েছে। সুতরাং সাধারণ গ্রন্থাগা অবস্থার যাতে উন্নতি হয় প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা উচিত।

অধিকাংশ গ্রন্থাগারের নিজের বাড়ি নানা অসুবিধা নিয়ে ভাড়াটে বা থাকতে হয়। এ সব গ্রন্থাগার সকা বিকালে ঘণ্টা তিনেক করে খোলা থা কর্পোরেশনের সাহায্য যারা পায় একটা সাধারণ পাঠাগার রাখতে হয়; অ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা নামে মাত্র। দশ বছরে সাধারণ লাইব্রেরির শিশু-বি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। স্বভা এ সব গ্রন্থাগারে গল্প-উপন্যাস প্র হাল্‌কা বাঙলা বই-এর সংখ্যা বেশী; অনেক সময় পুরানো লাইব্রেরিগু বাঙলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বি মূল্যবান পুঁথি-পত্রের সন্ধান পাওয়া কলিকাতার কয়েকটি সাধারণ গ্রন্থাগা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাদের ইতি আলোচনায় যোগ্য। কিন্তু স্থানাভাব শুধু সুপরিচিত লাইব্রেরিগুলির উল্লেখ করেই এই প্রসঙ্গ শেষ করতে হ

আশুতোষ মেমোরিয়েল লাইব্রেরি; বাগব
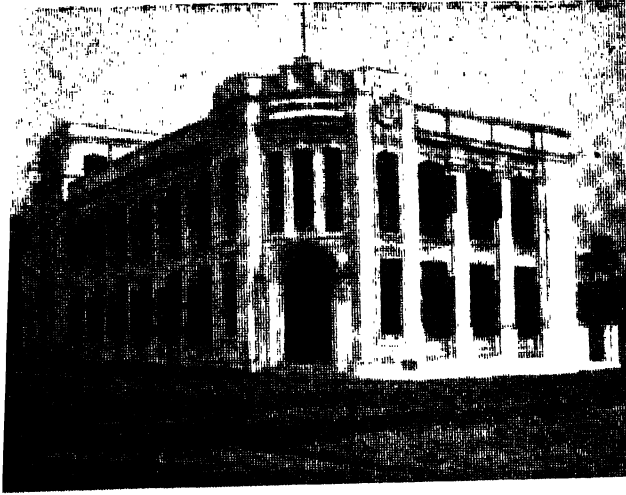
রামমোহন লাইব্রেরি

লাইব্রেরি; বেলিয়াঘাটা লাইব্রেরি; পরিষদ; চৈতন্য লাইব্রেরি; কাশীপুর টিউট; হেমচন্দ্র লাইব্রেরি; কুমারটুলী টিউট; মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরি; ল ঘোষ লাইব্রেরি; শান্তি ইনস্টি- ; শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট; সুহৃদ র; তালতলা পাবলিক লাইব্রেরি; কান্ত গুপ্ত মেমোরিয়েল লাইব্রেরি; হন লাইব্রেরি; ইউনাইটেড রীডিং ; বালীগঞ্জ ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি; এম সি এ লাইব্রেরি ইত্যাদি।

বিবিধ গ্রন্থাগার

শ্চিমবঙ্গ মহাকরণ এবং বিধান দের গ্রন্থাগার দুটি সম্পূর্ণরূপে গীয়। এখানে বাঙলা দেশ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান সরকারী দলিলপত্র আছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারের মধ্যে মহাবোধি সোসাইটি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, হাইকোর্ট জাজেস্ লাইব্রেরি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ কলিকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের লাইব্রেরি শহরের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার। এখানে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় এক লক্ষ বই আছে। ক্লাব লাইব্রেরির মধ্যে বেঙ্গল ক্লাব ও ক্যালকাটা ক্লাবের লাইব্রেরি দুটি সবচেয়ে সুপরিচালিত এবং সমৃদ্ধিশালী। মিউজিয়ামের কলা বিভাগের গ্রন্থাগারটি শিল্প-কলা বিষয়ক সংগ্রহের মূল্যবান নিদর্শন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল লাইব্রেরি সম্প্রতি নূতন উদ্যমে ভারতীয় শিল্প-কলা সম্বন্ধে বই সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয়েছে। ব্রিটিশ কাউন্সিল ও ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশানের লাইব্রেরি দুটি আধুনিকতম রেফারেন্স সংগ্রহের জন্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

কলিকাতার গ্রন্থাগারগুলির যে বিবরণ দেওয়া হলো তা থেকে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ভালো লাইব্রেরি হয় কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, নয়তো সরকারী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। একমাত্র ন্যাশনাল লাইব্রেরি ছাড়া প্রথম শ্রেণীর সাধারণ গ্রন্থাগার কলিকাতায় নেই বললেও চলে। কিন্তু সেজন্য পাঠকদের বড় একটা অসুবিধায় পড়তে হয় না। কারণ সব গ্রন্থাগারই সত্যিকার অনুসন্ধিৎসু পাঠককে সাগ্রহে সাহায্য করে। প্রকৃত অসুবিধা অন্যত্র। গবেষণার উপাদানগুলি কয়েক শ' লাইব্রেরির মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে কলিকাতার গ্রন্থাগারগুলিতে মোট কি বই-পত্র পাওয়া যেতে পারে তার সম্পূর্ণ ধারণা করা একজন পাঠকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। অনেক গ্রন্থাগারে যথোপযুক্ত গ্রন্থসূচী নেই। বড় বড় লাইব্রেরিতে কোন্ বিষয়ে কি বই আছে তার যৌথ গ্রন্থ-সূচী সংকলন করলে পাঠকরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে। এ ব্যাপারে একবার মাত্র চেষ্টা হয়েছিল। ১৯১৮ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে মিঃ কেম্প প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারে প্রাপ্তব্য বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক পত্র-পত্রিকার এক যৌথ-সূচী প্রকাশ করেছিলেন। যৌথ গ্রন্থ-সূচী প্রণয়নের কাজ যদি আবার আরম্ভ করা হয় এবং গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যদি পারস্পরিক সহযোগিতা নিবিড়তর হয় তাহ'লে কলিকাতা সহজেই গবেষণার তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে।

গায়ের চামড়া

ডাক্তার কালিদাস লাহিড়ী

'দেশ কাল পাত্র' বিশেষে আমাদের গায়ের চামড়ারও প্রভেদ দেখা যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকেদের গায়ের চামড়া সাধারণত শ্যামবর্ণ হয় এবং শীতপ্রধান দেশের লোকেদের গায়ের চামড়া হয় সাদা। শীতকালেই অযত্নের দরুণ গায়ের চামড়ায় বেশী খড়ি ওঠা ভাব দেখা যায়। বয়স অনুযায়ী আবার গায়ের চামড়াও বদলায়। ছোট নবজাত শিশুর হাতের ও পায়ের তলা নরম মসৃণ এবং লাল হয়। সেই জন্য সকলেরই আদর করতে এবং হাত দিতে ভাল লাগে। বয়স বাড়ার সঙ্গে হাঁটাহাঁটি ও দৌড়াদৌড়ি করার জন্য পায়ের তলার চামড়া শিশুকালের মতো পাতলা ও মসৃণ থাকা সম্ভব নয়, কারণ চামড়ার নীচের ধমনী, শিরা ইত্যাদি শক্ত জিনিসের উপর চলে বেড়ালে জখম হতে পারে। ক্রমে পায়ের তলার চামড়া যখন পুরু হতে আরম্ভ হয় তখন লাল ও মসৃণ থাকে না। অযত্ন করলে এবং খালি পায়ে বেড়ালে পায়ের তলার অবস্থা খুবই খারাপ হয়। খুব বেশী জলে পা ভিজলে আঙ্গুলের মধ্যকার চামড়া ভিজে থেকে থেকে ক্রমে দুর্গন্ধ হয়ে ওঠে এবং দুটি আঙ্গুলের মাঝখানে থাকায় জায়গাটি অপেক্ষাকৃত গরম। অপরিষ্কার পায়ে পায়ের আঙ্গুলের মধ্যে পচা ভেজা চামড়া প্রায়ই দেখা যায়। এই পচা চামড়ায় নানারকমের কীড়া নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে বংশ-বৃদ্ধি করতে থাকে। পায়ে ও আঙ্গুলে নানান্ ধরণের ঘা, আঙ্গুলহাড়া, আঙ্গুলের পাশে নখের নীচে পুঁজ এবং পায়ে হাজা হয়। উপযুক্ত রকম ধোয়া-মোছার ব্যবস্থা করলে পায়ের তলায় চর্মরোগ হয় না।

গায়ের চামড়া খুব পাতলা পদার্থ এবং তা চাদরের মত সমস্ত শরীর ঢেকে রেখেছে। চামড়ার নীচের কোমল পদার্থগুলি—যেমন ধমনী, শিরা ও মাংসপেশী ইত্যাদিকে বাইরের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে বাঁচানোই তার সব চেয়ে বড় কাজ। এ ছাড়া গ্রীষ্মে যখন শরীর ভীষণ গরম হয়ে উঠে তখন গায়ের চামড়ার লোমকূপগুলি দিয়ে ঘাম বেরিয়ে আসে এবং চামড়ার ও ধমনীগুলির আয়তনের পরিবর্তনের ফলে শরীরের উত্তাপ দূর হয়। পাখার হাওয়ায় সাহায্য করে মাত্র গায়ের চামড়ার এই সব ক্রীয়া ফল

শরীরের দূষিত বাষ্প গায়ের চ নির্গত হয় এবং এই উপায়ে ১: ওজনের কার্বন বাষ্পাকারে শরী যায়। শরীরের আবর্জনা যেমন সঙ্গে বেরিয়ে যায় ঠিক একই ঘামের সঙ্গে শরীরের অনেক বেরিয়ে আসে। প্রত্যহ প্রায় এক আবর্জনা শরীর থেকে গায়ে দিয়েই নিষ্ক্রান্ত হয়। শিরাগু গায়ের চামড়া তীক্ষ্ণ অনুভূতি ক্ষ করে। এ সব ছাড়াও গায়ের চাম রৌদ্র তাপে ভিটামিন ডি-এর স আমাদের উষ্ণপ্রধান দেশে রোদের হওয়ায় গায়ের চামড়া ময়লা হয় স ভিটামিন ডি প্রস্তুত বেশী হয়। ডি বেশী তৈরী না হলে হয়তো রোগ আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দিত। অবশ্য রিকেট্ রোগ যে এ তা নয়, তবে ঠাণ্ডা দেশের তুলন কম।

গায়ের চামড়ার কয়েকটি ভাগ

পায়ের তলায় মোটা চামড়ার সবচেয়ে পুরু উচ্চতম স্তর

মাথার চামড়ার নিম্নতম স্তরে চুলের গোড়া
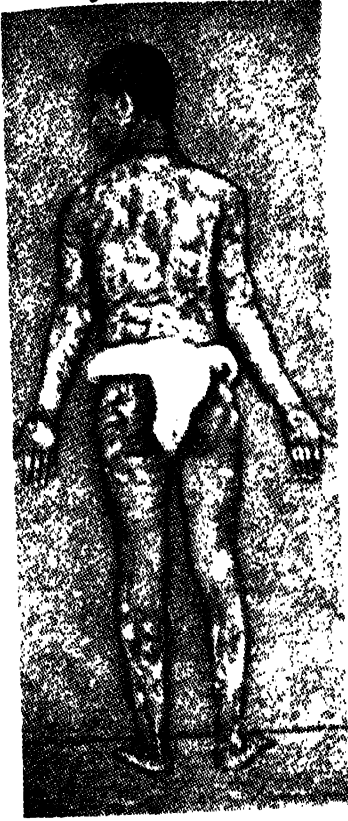
দেহের পশ্চাৎ ও সম্মুখভাগে সোরিয়াসিস্ চর্মরোগ

...টি আসল চামড়া (True skin) তাকে বলা হয় ডার্মিস (Dermis) এবং ডার্মিসের উপর আছে এপিডার্মিস (Epidermis) এবং নীচে আছে হাইপোডার্ম (Hypoderm)।

ডার্মিসে আছে ধমনী, শিরা, চুলের গোড়া, sweat gland ইত্যাদি। এপিডার্মিসে আছে কয়েকটি স্তর। এপিডার্মিসের সব চেয়ে নীচের যে স্তরটি, যাতে লেগে আছে ডার্মিস, সেটিকে বলা হয় রঞ্জনস্তর (Basal layer or Germinal layer)। সব চেয়ে উপরের স্তরের নাম কর্নিয়াম (Corneum)। জার্মিনাল স্তর ক্রমে যখন পুরোনো হয় তখন তার নীচে নূতন স্তর জন্মায় এবং পুরোনো স্তরকে উপরে ঠেলে দেয়। ঠেলতে ঠেলতে এই স্তর যখন একেবারে উপরে উঠে আসে তখন তার জীবনীশক্তি থাকে না এবং মরা চামড়া খোসার মতই দেহ থেকে ঝরে পড়ে।

কর্নিয়ামের দেহচর্ম থেকে খসে পড়া আমরা দেখতে পাই না কিন্তু নানান রকম চর্মরোগে সেটা দেখা যায় যেমন 'এক্‌জিমায়'। আঁশের মত ছাল দেখা যায় অনেক রকমের চর্মরোগে। রূপার মত সাদা এবং প্রচুর আঁশ হয় শোরাইশিসে (Psoriasis) এবং চর্মের সিফিলিসে। ময়লা রঙের এবং তেলা ধরণের আঁশ হয় গায়ের ও মাথার চামড়ায়—যাকে আমরা বলে থাকি খুস্‌কি রোগ (Dandruff)।

এপিডার্মিসের জার্মিনাল লেয়ারকে রঞ্জন-স্তর বলা হয়, কারণ এই স্তরে রঞ্জন অথবা শরীরের রঙ্ (Melanin)এর জন্ম। জার্মিনাল লেয়ারের কয়েকটি কোষ (cell) রঙ্ প্রস্তুতের কাজ করে। ঠান্ডা দেশে এই কাজ করে মাত্র কয়েকটি কোষ কিন্তু গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে রৌদ্রাতপ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের গায়ের চামড়ার জার্মিনাল লেয়ারের প্রায় সবগুলি কোষই রঙ্ প্রস্তুতের কাজে লেগে আছে। আমাদের দেশেও পাহাড়ের উপরে ঠান্ডায় যারা থাকে যেমন দার্জিলিং ও সিমলায় তাদের গায়ের রঙ্ সাদা। কিন্তু যারা দারুণ রৌদ্রাতপেরই মধ্যে সমতলভূমিতে থাকে তাদের গায়ের রঙ্ ময়লা হয়।

রঞ্জনস্তরে রঙ্ উৎপন্ন হয় কিন্তু নানান কারণে এই রঙ্ উৎপাদনের বাধা-বিপত্তি দেখা যায়। ফলে শ্বেতি কিম্বা গায়ের চামড়া অত্যধিক কালো হয়ে ওঠে। অনেক রকম রোগে এবং ভিটামিনের দৈন্য কিম্বা প্রাচুর্যে বেশী রঙের সৃষ্টি সমস্ত শরীরে কিম্বা জায়গায় জায়গায় দেখা যায়। এডিশন রোগে (Addison's Disease) সমস্ত গায়ের চামড়া ময়লা এবং কালো হয়ে যায়। পুষ্টির দৈন্যেও মুখে ও গায়ে কালো কালো দাগ অনেক সময় দেখা যায় অনেকের শরীরে। অনেক সময় কুষ্ঠ, সিফিলিজ, পুষ্টির দৈন্য এবং আজন্ম রঞ্জনস্তরের ক্রিয়াকলাপের গোলযোগ হবার ফলে শ্বেতি হয় (Leucoderma)। শ্বেতিরোগীর মানসিক অশান্তি সব সময়। কারণ সাধারণের মধ্যে এখনও শ্বেতি-রোগকে একটা খারাপ রোগের তালিকার মধ্যেই ফেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে শ্বেতি কোন খারাপ রোগ নয় এবং রঞ্জনস্তরের রঙ প্রস্তুতের গোলযোগেই শ্বেতি হয়। শ্বেতি বংশগত রোগ নয়। পৃথিবীর বহু চর্মরোগ চিকিৎসকরা গবেষণা করেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। দেহের চর্মের কতকাংশের সৌন্দর্য নষ্ট করা ছাড়া শ্বেতিরোগ হানিকর নয় একেবারেই। এই শ্বেতিরোগের চিকিৎসা ব্যবস্থায় আজ পৃথিবীর চর্মরোগ-বিদ্‌রা যথেষ্ট মাথা ঘামাচ্ছেন। আশা করা যায় বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার সুফল একদিন ফলবে এবং শ্বেতি রোগ পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্য নির্বাসিত হবে।

চর্মরোগ সম্বন্ধে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেই ক্রমে নানান রকম চর্মরোগের চিকিৎসা ঠিক সময়ে হওয়া সম্ভব হবে এবং লোক চর্মরোগ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে।

প্রথমে দুধ' ঘোলা। দরিয়ার প্রথম নিশানা তাই। আর লম্বা হাতের কারিগর কেউ পোঁচে পোঁচে যখন দুদিকের পাড় মুছে ফেলেছে, পানির রঙ বদলাতে সুরু করেছে, ঘোলা কেটে সবুজ আর সবুজ থেকে কালো অবতার, তখন বুঝলে তুমি নিশ্চিত বার-দরিয়ার কোলের মধ্যে। বদর বদর বল মিঞা। খোদার ফজলে যাত্রা যেন ভাল হয়। জরু গরুর কথা থাক, পড়ে

তক্তাঘাটের সামনে

থাক নারিকেল সুপারির হাতছানি। পীরের দোয়া শিরে বেঁধেছে। এখন হুঁশিয়ার হয়ে কালাপানি পাড়ি দাও।

এতো গেল তাদের কথা, যারা জাহাজে উঠতে পেরেছে। বাপদাদার পয় ভাল, আসতে না আসতেই নোকরী মিলে গেছে। বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে, কালাপানি পাড়ি মেরে ভালয় ভালয় ডাঙায় ফিরে আসা আর কতখানি মেহনৎ? তার চেয়েও ঢের শক্ত ডাঙার থেকে জাহাজে চাপা। কলকাতার বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে তামাম মুলুক ঘুরে আসতে বড় জোর দেড় বছর লাগুক, সে তো কত হাজার হাজার মাইলের ধাক্কা। কিন্তু খিদিরপুরের এই ওয়াটগঞ্জ থেকে গঙ্গার কিনারে তক্তাঘাটের দূরত্ব আর কত হবে, বড় জোর হয়ত আধ মাইল, কিন্তু এইটুকু পথ পাড়ি জমানোর তাম্বির তদারকেই শরীরের ঘাম ঝরে লুঙ্গির গিঁটে পাকি

রূপদর্শী

আধপো নিমক জমে যায়, আর বছরের পঞ্জিকা থেকে যায় চার পাঁচটা মাস বেমালুম গরচা।

তক্তাঘাটে যে বিরাট বিল্ডিং—মেরিন হাউস, ওইখানেই নাবিকদের জীয়নকাঠি মরণকাঠি। এই বাড়িটায় ঢুকতে ওদের বক্ষ দোলে দুরু দুরু। এখানে শিপিং অফিস, দেশী ভাষায় 'চাইন অফিস'। চাইন অর্থ সাইন অর্থাৎ কিনা সই। তামাম হিন্দুস্তানে এই 'চাইন অফিস' মাত্র তিনটে। কলকাতা, মাদ্রাজ আর বোম্বাই বন্দরে। এই দপ্তরের যিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সেই সিপিং মাস্টার মহোদয়ের স্থান এই নাবিকদের কাছে আল্লার একধাপ নীচেই। দুজন ডেপুটি, একজন অ্যাসিস্টাণ্ট এবং আরো গাদাখানেক লোক নিয়ে ইনি সমস্ত কাজ ম্যানেজ করেন। আর কাজও খুব সোজা নয়, ঝামেলা বিস্তর।

জাহাজে লস্কর নেওয়া হবে, সাইন হবে মাল্লাদের, মারফৎ শিপিং মাস্টার। জাহাজ এসে ঘাটে ভিড়ল তো এক ঝামেলা সতের মামলায় দাঁড়াল। চুক্তি ছিল ন' মাসের, কাজ মেটাতে পারেনি, আসতে দেরী হয়েছে জাহাজের, হয়েছে এক বছর কি পনের মাস। ব্যস্, হিসেব করো কত পাওনা হয়েছে, চুক্তি অনুসারে। কত বৃদ্ধি হয়েছে, কত অ্যাডভান্স নিয়েছে, মোট পাওনা কত? হিসেব একেবারে পায়ে পায়ে সুকুমার রায়ের হযবরল-এর কাকের নিয়ম ফলো করে। সাতদুগুণে সব সময়েই চোদ্দ হয় না। চুক্তিমতো প্রথম ন' মাসের মাস মাইনে আর চুক্তির বাইরের মাসিক বেতন একরকম নয়। কিছু বৃদ্ধি হয়। ন' মাস থেকে বার মাসে যা বৃদ্ধি, বার থেকে পনের মাসের বৃদ্ধি তার চাইতে বেশী। সে সব ফয়শালা করবে কে? শিপিং মাস্টার। পাওনাগণ্ডা পয়সা-পাইটি অবধি মিটলে, ছিম্যান (অর্থাৎ সিম্যান মানে নাবিক) যদি সন্তুষ্ট চিত্তে ঘাড় নেড়ে কোম্পানীর খাতায় টিপ ছাপ দেয় তবেই কোম্পানীর স্বস্তি। আর যতক্ষণ তা না হচ্ছে, খুঁতখুঁতুনি না মিটছে ছিম্যানের, হিসাব বুঝ হচ্ছে না, খাতায় টিপ ছাপ দিতে গাইগুঁই করছে, 'চাইনপু' (সাইন-অফ্) না হচ্ছে, ততক্ষণ কোম্পানীর পলাইবার পথ নাই, শিপিং মাস্টার আছে পিছে।

শিপিং অফিস সরকারী অফিস, শিপিং মাস্টার সরকারের লোক। সন উনিশশো সাঁইত্রিশে যে ইণ্ডিয়ান সিমেন্স অ্যাক্ট তৈরী হয়েছে তার প্রতিটি দফা মেনে চলা হচ্ছে কিনা, কে দেখবেন? শিপিং মাস্টার।

সাইন অফিসের সামনে কিউ

জাহাজে লোক ভর্তি করলেই হল না। কতদিনের জন্য নিচ্ছে এদের, যে বন্দর থেকে নিয়ে গেলে, এদের সেখানেই আবার বহাল তবিয়তে ফেরৎ দিয়ে যাবে, জাহাজে যতদিন থাকবে এদের খানাপিনার ভাবনা তোমার, চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের বেতন দিতে হবে। এরও আবার রীতি প্রকৃতি আছে। এক বিরাট খাতা আছে কাপ্তানের কাছে—লগ্ বুক। প্রতি খুঁটিনাটি সেই লগবুকে তুলে রাখে কাপ্তান। তাই কোনো জাহাজ বাইরে যাবে, সিম্যান নেবার সাব্যস্ত হল, কাপ্তান গুটি গুটি হাজির হলেন শিপিং অফিসে। লোকজন বাছা হল তাদের রেকর্ড দেখে। ডাক্তারী হয়ে গেল। টাকা-পয়সা এ্যাডভান্স দিয়ে এবার সেরেফ 'চাইন' করা। লগ বুকে পয়লা আদমী সাইন করবেন জাহাজের কাপ্তান। তিনিই তামাম জাহাজ-

খানার মালিক। মুস্তার। কোম্পানী সব্বার আগে তার সঙ্গে লেখাপড়া করে নেন। তিনি ঠিক হলেই আর সবাই আপ্‌সে-আপ্‌ জুটবেন। আগে কাপ্তানই ছিলেন জাহাজীদের পুরস্কার পয়জারের মালিক। সিম্যানদের বেতন থেকে সাজা অবধি সব কিছু বিলি বন্দোবস্ত তিনিই করতেন। কোম্পানীর ঘর থেকে টাকা নিয়ে, যা মাইনে তার চেয়ে কম দিয়ে বাকী টাকা কাপ্তানের ট্যাঁকস্থ হয়নি যে তা নয়, হয়েছে এককালে। তবে কিনা এখন বেজায় কড়াকড়ি' কাপ্তানের সরাসরি ক্ষমতা অনেক কমে গেছে। মাইনেপত্রের রেট্‌ কোম্পানীই বেঁধে দেয়, আর জাহাজীদের উপর কর্তৃত্ব চালালেও গুণা-ঘাটের জন্য হাতে মাথা কাটবার দিন 'গন্‌'। রুল উঁচিয়ে ডাঙগায় বসে আছেন শিপিং মাস্টার। তার কাছে নালিশ কর, ব্যবস্থা তিনিই করবেন। ছোটখাট অপরাধের জন্য অবশ্যি তুমি সাজা দিতে পার। ডিসিপ্লিন ভাঙগলে, ডিউটিতে গাফিলাতি করলে, মাতোয়ালা হয়ে হাঙগামা বাধালে, একদিন কি বড় জোর দুদিনের বেতন কাটতে পার। তবে এর বেশী আর তোমার কাপ্তেনি চলবে না।

প্যাসেঞ্জার জাহাজে যেমন কেলাস ভাগ, ফার্স্ট কেলাস, সেকেন্‌ কেলাস, ডেক, জাহাজীদের মধ্যেও তেমনি, তবে তিনটে নয় দুটো। অফ্‌সর আর সিম্যান, ইংলিশে বলে অফিসার আর রেটিংস্‌। জাহাজে আবার এক দো তিন ডিপার্ট। ডেক, ইঞ্জিন আর সেলুন। কাপ্তান তো সবার উপর। তারপরে ডেক ডিপার্টে থাকে-থাক নেমে গেছেন ফার্স্ট অফিসার, সেকেন্ড অফিসার, থার্ড অফিসার, ফোর্থ অফিসার। সিম্যানদের হেড্‌ সারেঙ্‌। এর অধীনে ফার্স্ট টিন্ডাল, সেকেন্ড টিন্ডাল, তারপরেই লস্কররা। সারেঙ কাপ্তানের কাছ থেকে হুকুম আনবে, পত্রপাঠ চালান করবে টিন্ডালকে, টিন্ডাল কাজ আদায় করে নেবে। জাহাজ বাঁধতে হবে, জেটিতে এসেছে, হুকুম গেল। মোটা কাছি জাহাজ থেকে নেমে জেটির খুঁটোয় সোহাগের পাক দিতে লাগল। এক পাক, দু' পাক, পাঁচ পাক, সাত পাক। জাহাজ ভেড়ানো কঠিন কাজ মিঞা। হুঁসিয়ার হুঁশিয়ার। কাছির পাক ছিঁড়বে তো নাও আর এ পারে নাই, ভিড়বে গে জীবনের হে-ই পারে, একেবারে জাহান্নমের সদর ঘাটে। তাই বলি হুঁশিয়ার। একটা করে পাক দাও, একটু করে জাহাজ হাফিজ করো, আলগা দাও, আলগোছে বেঁধে ফেল জেটির লোহার খুঁটোয়।

শুধু কি জাহাজ বাঁধা, জাহাজ খোলা কাজ ডেক-লস্করদের? জাহাজের ডেক ধোবে কে? জাহাজ রঙ করবে কে? ঢেউ-এর চাবুকে ছিটছাট টুটা-ফুটা রিফু-মেরামতী কাজ কার? এ সবই ডেক ডিপার্টের।

টেম্পোরারি আর্নাফট্‌

মাল জাহাজে ঝামেলা তবু কিছু কম, কিন্তু প্যাসেঞ্জার জাহাজে তাল সামলাতে নিজের গতর ডকে তুলতে হয়। নিজের হাল নিতান্ত বেহাল হলেও জাহাজের হালে কড়ামুঠির বাঁধন যেন শিথিল না হয়, নচেৎ আচরে বানচাল। তিনটি লোক পালা করে হালটি ধরে বসে থাকে, সকাল দুপুর রাত্রি। এর আর রবিবার শনিবার নেই। এই হালধরা যে নাবিক, এদের বলে কোয়াটার মাস্টার, শাদা বাঙলায় সুখানি। আরেকটা ডিউটি আছে এ ছাড়া, পহরী-ডিউটি। মাস্তুলে বসে পাহারা দেওয়া। চোখে শানিয়ে রাখা অক্লান্ত সতর্কতা। দূরে কি কোনো জাহাজ দেখলে? ছোট ডিঙি মতোন কী ভাসছে ওটা? নড়ছে চড়ছে যেন কে? আ-হোই। দরিয়ার বুকে আর্ত মানুষ। সাহায্য দাও, তুলে নাও। সঙ্কেত গেল মাস্তুল-পহরীর কাছ থেকে। সড় সড় নামল জালিবোট একখানা। বেঁচে গেল গোটা কয় মানুষের জীবন। দু'ঘণ্টা দু'ঘণ্টা এদের ডিউটি। বার জন যদি লোক থাকে তো ছ'জন ছ'জন ভাগ হয়। ছ'জন যাবার পথের পহরী, বাকী ছয় ফিরতি পথের। এই ছ'জন আবার রাতকে কেটে ছ'টুকরো করে, টুকরো প্রতি দু ঘণ্টা, প্রতিজনের পাহারা দেবার পালা।

ডেক-ডিপার্ট, তারপর ইঞ্জিনঘর। বড়-কর্তা চিফ্‌ ইঞ্জিনিয়র, তারপর ধাপের ধাপ সেকেন্‌, থার্ড, ফোর্থ, ফিফ্‌থ্‌ ইঞ্জিনিয়র, কোনো কোনো জাহাজে সিক্‌থ সেভেনথ্‌ও থাকে। এরা হলেন অফ্‌সর। লস্কর হল, ফায়ারম্যান, ডঙ্কি ম্যান, অয়েলার, আইস-ম্যানরা। বয়লারে কয়লা মারো। ইঞ্জিন চালু রাখো, তেল লাগাও কব্জায়, মাল তোলবার ডঙ্কি ইঞ্জিন চালাও, বরফ মেসিন ঠিক রাখো। কাজের কি আদি অন্ত আছে। মানুষের খোদকারী যেমন তাজ্জব, তার খেদমত করতে করতে তেমনি আবার প্রাণান্ত।

সেলুন ডিপার্টে শুধু খানাপিনার ব্যাপার। অবশ্য ডেক আর ইঞ্জিনের ডিপার্টমেন্টেরই রসুইঘর, ভান্ডার ভান্ডারী সব আলাদা আছে। তবে আবার সেলুন কেন? বাঃ, প্যাসেঞ্জারদের খানাপিনা নেই নাকি! আর প্যাসেঞ্জার জাহাজ যদি নাই হয়, মালজাহাজ কি মানোয়ারে অফ্‌সরদের খানা কোথায় পাকায়? সেলুনে। এখানে সবার উপরে বাটলার, তার নীচে স্টুয়ার্ড, তারপর ভান্ডারীরা। ভান্ডারী হোলো জাহাজীভাষা, ইংলিশে বলে কুক্‌ আর মায়ের ভাষায় রসুইকর। এ ছাড়া কাপ্তেনের জন্য কাপ্তেন-বয় আছে। সে কাপ্তেনের খাস খিদমদগার। লস্কর মহলে এ আদমীর পজিশন ওর নতুন উর্দীর মতোই টাইট। সবার সঙ্গে কথা বললে প্রেস্টিজকে তো আর সব সময় টঙে রাখা যায় না, তাই যারতার সঙ্গে কথা বলে না। আছে দু'চারজন দিল জানের ইয়ার, তাদের কাছেই যা কিছু ঠোঁট-ফাঁক, চোখ-রসকও তাদের সঙ্গেই কাপ্তানের সঙ্গে সেপটে আছে, তাই তা

চুক্তি খতম

অভিজ্ঞতাই জাহাজকে অকুল থেকে কুলে নিয়ে যায়। নিরাপদ আশ্রয়ে পেৌঁছে দেয় মাল আর জান।

অফিসারদের অবস্থা তবুও ভাল। কিছু-দিন আগে পর্যন্তও চাকুরীর স্থায়িত্ব ছিল না, এখন তবু খানিকটা আশা হয়েছে। আর হয়েছে ইউনিয়নের দৌলতে। অফিসারদের সকলেই টেকনিক্যাল স্টাফ। বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারলে বিশেষ বিশেষ পোস্টে ভর্তি হতে পারে। ভারত সরকারের পরিবহন দপ্তরের অধীনে এইসব পরীক্ষার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত আছে। যিনি মেট হবেন, তাকে পরীক্ষা পাশ করে ফার্স্ট মেটের সার্টিফিকেট নিতে হবে। ফার্স্ট অফিসারকেই মেট বলে। তেমনি সেকেন, থার্ড, ফোর্থ মেটের টিকিট না থাকলে চাকরীর বেলা ঢুঁ ঢুঁ হয়ে যাবে। ইঞ্জিনিয়ারদের বেলা ইস্তক কাপ্তানের বেলাতেও সেই একই রুল। এর আর ভুল-চুক নেই।

জাহাজের কাজ কারোরই স্থায়ী নয়। যত-ক্ষণ তুমি জাহাজে ততক্ষণ তুমি সুয়োরাণীর বেটা। কোম্পানী তোমার খাওয়াপরার জিম্মাদার। জাহাজ বন্দরে ফিরলে সিম্যান-দের 'সাইন অফ্' করতে যা দেরী। ব্যস্ আর তোমার দিকে নজর নেই। কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি খতম। এবার সিধে পথ দেখ কোম্পানীর সঙ্গে বাধ্যবাধকতা চুকে গেছে এখন তুমি বাড়ি গিয়ে হালই চাষ আর মালই বও তাতে কোম্পানীর কি? তবে হ্যাঁ, ঘুরে ফিরে যদি আস, দেখা হয় যদি এই শিপিং অফিসের সারবন্দী লাইনে, যদি ফিট্ থাক আর যদি আমার মর্জি হয় তো নিতে পারি সেও আমার ইচ্ছা, তোমার জোর নেই কিছু।

জাহাজীদের নসিবে এই অনিশ্চিত খোদাই হয়ে বসে গেছে। ভারতীয় লস্করদের 'গুড্ সেলর' বলে নামডাক আছে। তা সত্ত্বেও এরা শয়ে শয়ে বেকার। কতজন আসছে আর কত যে যাচ্ছে তা হিসাব গাঁথা নেই। তবে অনুমান, বন্দর কলকাতাতেই দুলক্ষ সেলর আছে। এদের মধ্যে দেশী বিদেশী জাহাজ মিলিয়ে মেরে কেটে ষাট হাজার জনের চাকরী দেয়া যেতে পারে। কিন্তু বাদবাকী আর কজন? তারা তো শংকরা। নিজেদের শোবার জায়গা হলে তবে তো তাদের ডাকা। আর দেশ

ঘর-বারের অনেক খবর জানে। ঠোঁট খুলেছে কি রঙদার সব খবর দাঁতের বাসা ছেড়ে পাখা মেলে পিলপিল বেরুতে শুরু করবে। কাপ্তানের কোন্ খবর তার অজানা? সে তাঁর বিবিকে অব্দি দেখেছে। আর কাপ্তানের বিবি কি একটা যে হিসেব রাখবে? বন্দরে বন্দরে হরেক বিবি জিয়োনো। যাগ্গে যাক, কেচ্ছা-কথা ফালতু বাত ছেড়ে দাও। নাও, এই আনকোরা নতুন বোতলটি, ঝেড়ে দিয়ে এসো দিকিন। আসল মাল, তায় কোনো সন্দেহ নেই, আল্লার কিরে। দামটা বেরাদর বেশ চড়িয়ে নিও। হালফিল লেন দেনে যা কিছু এক আধ পোসা, তা এই সেলুন ডিপার্টে। যুদ্ধের সময় অবশ্য চোরাগোপ্তা সব মিঞাই কিছু কিছু উপরি কামান কামিয়ে নিয়েছে, কিন্তু এখন সেলুনই যা ফোলা ফোলা আর সবই চোবসা বেলুন।

আর আছেন একজন কি বড় জোর দুজন রেডিও অফিসার, প্যাসেঞ্জারবাহী হলে একজন ডাক্তার আর প্রতি জাহাজেই একজন করে রাইটার মানে কেরাণী। এই নিয়েই জাহাজের স্বজন পরিজন। এদের মেহনত, নিয়মানুবর্তিতা, দক্ষতা,

আবদুল কাদের

হয়তোই বা ক'টা? পঁয়ত্রিশটে হয় তো র বেশী।

দিনের পর দিন, এরা তাই ভিড় করে জাহাজের সাইন অফিসে। হাজার গন্ডা ড়ালের মুখের সামনে একটা মাত্র শিকে লছে। তক্কাঘাটে আমিও ঘুরেছি। লাইন ধে ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি রে শ-রে। শতছিন্ন কামিজ, ছেঁড়া লুঙ্গি, নিধুসরিত দেহ, ক্ষুধার্ত দৃষ্টি। কিছুই ল নেই। তবু দাঁড়িয়ে আছে আকুল গ্রহে, হাতে তাদের একটা চিরকুট— ডি সি (কণ্টিনিউয়াস ডিস্চার্জ সার্টিফিকেট)। যাকে ওরা বলে নলি। এই লিটিই এদের সব। নাবিকদের দক্ষতার, অভিজ্ঞতার স্মারক। কাপ্তান আসবেন। এই সার্টিফিকেট তখন মূক্ ভাষায় ব্যক্ত করবে নাবিকটির গুনগেরামের সংবাদ।

মনে হোল গোহাটায় এসেছি। মানুষ-গুলোকে মনে হল খুটোয় বাঁধা বিক্রীর গরু। গা টিপে, গর্দান চাপড়ে, দাঁত দেখে পছন্দ হবে, তখন পাবে জাহাজে ওঠবার আশ্বাস। কিন্তু আশ্বাস পেলেই তো আর জাহাজে ওঠা যায় না। ডাক্তারী করাতে হবে না? ডাক্তার বুঝি ইবলিশেরই দোসর। ঝুঁকিয়ে বসে আছেন শুধু আন্‌ফিট করবার জন্য। ছুতো একটা পেতে না পেতেই খস্-খস্ লেখা হয়ে গেল টিকিটের উপর টেম্পোরারী আন্‌ফিট। চোখের ওপর ঝড়াক করে কালো পর্দা পড়ে গেল। কালো 'আন্ধার' জাঁতা দিয়ে চেপে বসল বুকে। নয় মাস যাবৎ চাকরী নাই। দেশ থেকে এসেছে মাস ছয়েক। সেখানে বেটি বেটা বিবি হাঁ করে পথ চেয়ে আছে। সাইন হলে অ্যাড্-ভান্স মিলবে, টাকা কিছু পাঠাবে কারো হাতে দিয়ে। কিন্তু ছয়মাস কাঁধের ঘাম গঙ্গার বাঁধে ফেলে ফেলে যদিও বা ডাক্তারীতে পোঁচেছিল, কলমের এক খোঁচায় দিলে পেছিয়ে আরো দুমাস। ডাক্তার অন্যের বুকে কল বসাও। তাই বুঝি তোমার কলজেয় দরদ নাই। কোথায় থাকে? কি খায়? যা ছিল পুঁজিপাটা সব তো খতম।

জিজ্ঞেস করেছিলুম, এতই যদি কষ্ট তবে আসেন কেন এই কাজে? অন্য কাজ করলেই তো পারেন।

জবাব দিয়েছিল, পারি কই? দরিয়ার মায়ায় যারা পড়েছে গোরে যাবার আগে সে কী পারে তার টান কাটাতে? আমার সার্ভিস সাতাশ বছরের। চারবার চেষ্টা করেছি চাকরী ছেড়ে দেবার, কিন্তু পারছি কই? বার দরিয়া পাড়ি দিয়ে দুনিয়ার তসবির যে দেখেছে একবার, সে কী করে মুঠোভোর গ্রামের উঠোনে কলজে ভ'রে বাতাস নেবে! রাশিয়া যাইনি। কিন্তু আর বেবাক জায়গা ঘুরেছি। দেশে দেশে আমার দোস্ত ছড়ানো, অন্তত তিন বচ্ছরে একবার তাদের মুখ না দেখলে যে হাফ ধরে বুকে।

আর তা ছাড়া, আব্দুল কাদের বললে, ঝগড়াটে বিবি দেখেননি? রাতদিন কিলো-কিলি চুলোচুলিতে লবেজান করে ছাড়ে, কিন্তু সেই বিবির মহাব্বৎও বড় কড়া। এড়ানো শক্ত। কালাপানিও সেই জাতের। জাহাজে ওঠবার আগেই যা কষ্ট, বিষম কষ্ট, কিন্তু জাহাজে একবার উঠতে পারলে, আর কথা কি। লোনা বাতাসে তাকত বেড়ে দুনো হয়। পানিতে মাছের আর জাহাজের ছিম্যানের অবস্থা হল এক।

কলিকাতা রোটারি ক্লাবের এক বিতর্ক সভায় সম্প্রতি বালকবালিকারা ভাষণ দান করিয়াছেন।—"সভ্যরা সমস্বরে বলেছেন অমৃতম্, অমৃতম্ আর অ-সভ্যরা বলেছেন তথাপি চোংড়া"—মন্তব্য করেন খুড়ো।

* * *

আলিপুরে সম্প্রতি একটি টাঁকশাল নির্মাণ করা হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, ইহা নাকি এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম। শ্যামলাল নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল—"হতে পারি দীন তবু নাহি মোরা হীন"।

* * *

সজ্জন সিং নামক কলিকাতার এক ট্যাক্সিচালক 'রিভার' ছবিতে অভিনয় করার সুযোগ পাইয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন। কাগজে কাগজে তার ছবির দিকে তাকাইয়া আমরা শুধু বলিতেছি—অহো, ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা......

* * * *

শ্রীযুক্ত নেহরু বলিয়াছেন, বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে তিনি তত উৎসাহ বোধ করেন না কেন না তাঁর মতে ইহা

নিতান্তই নগণ্য ব্যাপার। খুড়োকে এ সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন—"নগ্ন সত্যের টীকা নিষ্প্রয়োজন!"

* * * *

শ্রীযুক্ত নেহরু আরো বলিয়াছেন যে, বন্য জন্তু জানোয়াররা প্রতি বৎসর যত শস্য ক্ষতি করে তা প্রতিরোধ করিতে পারিলে আমাদের সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়। শ্যামলাল বলিল—"সমস্যার বাকী যে সামান্য অংশটুকু থাকে তার সমাধান বোধহয় লোকালয়ের জন্তু-জানোয়ারদের রুখতে পারলেই হয়"।
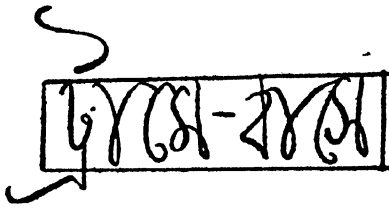
* * *

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় খানিকটা আলোচনা হইয়াছে বাঙলায়। শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ বসুর সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদে অর্থ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন—বাঁশের কঞ্চিতে ছড়ি হয়, বাঁশী হয় না। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"বসু মশাইর বাঙলায় দখল থাকলে তিনি বলতে পারতেন—বংশে শুধু বংশী যদি বাজে, বংশ তবে ধ্বংস হতো লাজে"।

* * *

খাদ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেন জানাইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের

ভবিষ্যৎ তত উজ্জ্বল নয়।—"জনসাধারণের ভাগ্যে প্রফুল্লতারও অভাব"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * * * *

চন্দ্রলোকে গমনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি দুইটি বানর লইয়া একটি পরীক্ষামূলক অভিযান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষকগণ মনে করেন যে, আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই নাকি চন্দ্র-লোকে এবং অন্যান্য গ্রহলোকে গমনাগমন সম্ভব হইবে।—"খুব ভালো কথা, তবে সম্ভাবনাটা আমাদের জীবিতকালের মধ্যে না হলেই ভালো"—মন্তব্য করেন আমাদে পরিচিত জনৈক উদ্বাস্তু।

* * *

শ্রীযুক্ত দিবাকর নাকি মনে করেন চলচ্চিত্র উৎসব জনসাধারণকে জাগাই তুলিয়াছে।—"জন জাগরণ এতো সহ অথচ এর জন্যে লঘু লাঠি থেকে গ নির্যাতন কতই না মানুষ সহ্য করে —মন্তব্য করেন এক সহযাত্রী।

* * *

বিহারে সিংহ মহাশয়দের মধ্যে মীমাং হইয়াছে শুনিয়া আমরা আশ্ব হইয়াছি।—"শুধু হিংসা ভুলে যাও

জন্যে রাজহংসের আশ্বাস তাঁদের কে দিলে সে সংবাদটাই পাইনি"—বলে আমাদে শ্যামলাল।

* * * * *

ভারতীয় ক্রিকেট টিমের নির্বাচন প সমাধা হইয়াছে। জনৈক সহযা বলিলেন—"কিন্তু মিস্ ইন্ডিয়া নির্বাচনে আগে তো আর ভারতের জগৎসভায় শ্রে আসন লাভের আশা নেই"।

* * *

হলিউডের এক সংবাদে প্রকাশ ক কর্তৃপক্ষ নাকি একটি নির্বাক ছ তুলিতে মনস্থ করিয়াছেন।—"টালিউডে বাক্‌তাল্লা শুনেই বোধহয় তারা নির্বা হয়ে গেছেন"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

রের পরিস্থিতি

্রটিশ কূটনীতি (ও অস্ত্রবল) মিশরীয়-কাবু করে এনেছে। যে জাতীয় শক্তি দশীদের হটাবার জন্য জাগ্রত হয়েছিল া এখন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষয় হচ্ছে। মিশর থেকে বৃটিশ সৈন্য সরাবার জাতীয় ী ওয়াফ্‌দ্‌ পার্টির মারফৎই সক্রিয় হয়েছিল। ওয়াফ্‌দ্‌ই মিশরের জাতীয় ন্দোলনের ধারক। সুতরাং ওয়াফ্‌দ্‌কে রেজরা বরাবরই শত্রু বলে মনে করেছে। া ফারুকও ওয়াফ্‌দ্‌কে বিষদৃষ্টিতে খেন এবং ওয়াফ্‌দ্‌এর প্রভাব খর্ব হলে শী হন। ২৬শে জানুয়ারীর কায়রোর হাঙ্গামার পরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় র সুযোগ নিয়ে রাজা ফারুক ওয়াফ্‌দ্‌ ন্ত্রিমণ্ডলীকে বরখাস্ত করে আলি মেহের শাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন, যদিও শরীয় পার্লামেন্টের উভয় পরিষদেই য়াফ্‌দ্‌ পার্টির মেজরিটি বর্তমান। ২৬শে নুয়ারীর দাঙ্গাহাঙ্গামার পরে ওয়াফ্‌দ্‌ বড়ে গিয়েছিল, সুতরাং রাজা ফারুকের কুম তাঁরা এককমর মাথা হেঁট করেই মেনে ন। আলি মেহের পাশাও সম্পূর্ণভাবে য়াফ্‌দ্‌এর বিরুদ্ধে যেতে চান নি, কিছুটা ঙ্গে রাখতে চেয়েছিলেন। পার্লামেন্ট বন্ধ রে দেবার প্রস্তাবও তিনি শেষ পর্যন্ত ধাগত রাখতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ আলি মেহের পাশার দ্বারা ওয়াফ্‌দ্‌কে পুরোপুরি মরার কাজ চলত না। এটা যখন রাজা ফারুক ও ইংরেজরা বুঝতে পারল তখন আলি মেহেরকে পদত্যাগ করতে হোল এবং তাঁর জায়গায় বর্তমান প্রধান মন্ত্রী হিলালী পাশা নিযুক্ত হলেন। তিনি প্রধান মন্ত্রী হয়েই ওয়াফ্‌দ্‌এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছেন। প্রথম নম্বর—এক মাসের জন্য পার্লামেন্ট বন্ধ করে দেয়া হোল। খুব সম্ভবতঃ এই এক মাস পূর্ণ হলে বর্তমান পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং নূতন নির্বাচন হবার আগেই ওয়াফ্‌দ্‌ পার্টির বিরুদ্ধে এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যাতে নির্বাচনে ওয়াফ্‌দ্‌ দল জিততে না পারে।

প্রধান মন্ত্রী হয়েই হিলালী পাশা ঘোষণা করেন যে তাঁর গভর্নমেন্টের প্রথম কর্তব্য হবে যারা অশান্তি সৃষ্টির উস্কানি দিয়েছে তাদের দমন করা এবং দুর্নীতি দূর করা। দুর্নীতি দূর করার অর্থ হচ্ছে ওয়াফ্‌দ্‌ দলের যাঁরা এতদিন সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তাদের শায়েস্তা করা। ওয়াফ্‌দ্‌ দলীয় শাসনের মধ্যে দুর্নীতি অবশ্যই ছিল কিন্তু সে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানের উপযুক্ত নায়ক রাজা ফারুকের (অথবা বৃটিশের) আজ্ঞাবাহী ওয়াফ্‌দ্‌ থেকে বিতাড়িত হিলালী পাশা হতে পারেন না। প্রকৃত অবস্থা হোল এই যে, যে-শক্তি বিদেশীদের অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হতে পারত সেটার মুখ ঘুরিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লাগানোর চেষ্টা হচ্ছে যারা দল হিসাবে বরাবর মিশরের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব করেছে। ওয়াফ্‌দ্‌এর শক্তি চূর্ণ করতে না পারলে মিশরে বৃটিশ নীতি শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারবে না। মিশরে ওয়াফ্‌দ্‌ই একমাত্র সংহত পার্টি যার দ্বারা দেশময় কোনো একটা ব্যাপক জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন সম্ভব। সুতরাং ওয়াফ্‌দ্‌ চায় না এমন কোনো আপোষ ব্যবস্থা যা মিশরকে দিয়ে মানিয়ে নিতে হলে আগে ওয়াফ্‌দ্‌এর প্রভাব নষ্ট করা চাই। কেবল ওয়াফ্‌দ্‌ গভর্নমেন্টকে সরালেই হবে না, ভবিষ্যৎ পার্লামেন্টেও যাতে ওয়াফ্‌দ্‌ দলের সংখ্যাধিক্য না হতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। নূতন নির্বাচনের পূর্বেই হিলালী পাশার গভর্নমেন্টের সঙ্গে বৃটিশদের একটা চুক্তি হয়ে যাবে বলে মনে হয়। ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃক প্রস্তাবিত মধ্য-প্রাচ্য সামরিক কমাণ্ডের পরিকল্পনার ভিত্তিতেই সেই আপোষ হবে দেখা যাচ্ছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে সুয়েজ খাল অঞ্চলের রক্ষায় আর কেবল বৃটিশের 'দায়িত্ব' থাকবে না। এই পরিকল্পনায় মিশরকে যোগ দেবার জন্য বৃটিশ, মার্কিন, ফরাসী ও তুর্কির তরফ থেকে কয়েক মাস পূর্বে একটি যুক্ত প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। নাহাস পাশার গভর্নমেন্ট তখন স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন যে মিশর এ প্রস্তাবে রাজী নয়। মিশর মধ্যপ্রাচ্য সামরিক কমাণ্ডের পরিকল্পনায় যোগ দেবে না। মিশরকে এই পরিকল্পনায় যোগ দেওয়াতে হলে ওয়াফ্‌দ্‌ গভর্নমেন্টকে দূর করা আবশ্যক, সেটা করা হয়েছে, তাছাড়া পার্লামেন্টে এবং দেশের মধ্যেও ওয়াফ্‌দ্‌ দলকে দুর্বল করা আবশ্যক। সে চেষ্টাও সাধ্যমত করা হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক কমাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হলে সুয়েজ খাল অঞ্চলের সুরক্ষায় কেবল বৃটিশের 'দায়িত্ব' থাকবে না, তখন সেটা হবে একটা 'আন্তর্জাতিক (অবশ্য ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের ভিতরের) দায়িত্ব'। মধ্যপ্রাচ্য সামরিক কমাণ্ডের পরিকল্পনায় যদি মিশর যোগ দেয় তবে সুয়েজ খাল অঞ্চলের ঘাটির চেহারাটা হয়ত বদলে যাবে, অর্থাৎ তখন সেখানে গাদা গাদা বৃটিশ সৈন্য রাখার দরকার হবে না, উপযুক্ত সংখ্যক "টেক্‌নিক্যাল পারসোনেল" রেখে বৃটিশ সৈন্য আস্তে আস্তে সরিয়ে নেয়া যেতে পারবে, কারণ তখন সমস্ত মধ্য-প্রাচ্য এলাকার সামরিক সুরক্ষার ব্যবস্থাই এক নূতন ভিত্তিতে সংহত হবে এবং মিশরের সৈন্য সামন্ত প্রভৃতিও সেই সংহতির অন্তর্বর্তী হবে। অর্থাৎ সুয়েজ খাল অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের নামে মিশরকে খোলাখুলিভাবে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের উদরের মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে, ভবিষ্যতে নিরপেক্ষতার হুমকি দেবার সুযোগটুকু পর্যন্ত থাকবে না। বৃটিশ ও হিলালী পাশার গভর্নমেন্টের ভিতর কথা-বার্তা নাকি ইতিমধ্যেই অনেকদূর এগিয়ে গেছে, সম্ভবত এ সকলের মধ্যে কাইরোস্থ মার্কিন রাজদূতের ভূমিকাটিও সামান্য নয়।

যে তিমিরে··

দক্ষিণ আফ্রিকার সুপ্রীম কোর্ট ম্যালান গভর্নমেন্টের বর্ণবৈষম্যমূলক আইনগুলির মধ্যে একটাকে দক্ষিণ আফ্রিকার কনষ্টিটুশেন অনুসারে অবৈধ বলে রায় দিয়েছেন। সে আইনটি হোল Segregation of Voters Act যার দ্বারা মিশ্র জাতির ভোটারদের আলাদা করে নিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার সংকুচিত করা হয়েছিল। বৃটিশ পার্লামেন্টের যে এ্যাক্টের উপর দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তার কতক-গুলি ধারা আছে যেগুলিতে উল্লিখিত বিষয়ের পরিবর্তন করতে হলে দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট আবশ্যক। Segregation of Voters Act-এর বিষয়টি বৃটিশ পার্লামেন্টের এ্যাক্টের

উপরোক্ত ধারাগুলির একটির আমলে পড়ে। তৎসত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেণ্টে Segregation of Voters Act দুই-তৃতীয়াংশের কম ভোটেই পাশ করিয়ে নেয়া হয় এবং গভর্নমেণ্টের পক্ষে বলা হয় যে, Statute of Westminster—(যার দ্বারা বৃটেন এবং ডোমিনিয়নগুলির স্ব-স্ব প্রাধান্য স্বীকৃত হয়) ঘোষিত হবার পরে কতকগুলি বিষয়ে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বৃটিশ পার্লামেণ্টের এ্যাক্টের যে নির্দেশ আছে সেটা দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে মানার দরকার নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার সুপ্রীম কোর্ট এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে Segregation of Voters Act অবৈধ হয়েছে বলে রায় দিয়েছেন। তাতে ডক্টর ম্যালান সুপ্রীম কোর্টের উপর ভীষণ চটে গিয়েছেন এবং বলেছেন যে, সুপ্রীম কোর্ট দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্বের উপর হাত দিয়েছে, এতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে, আজ এক কোর্ট এক কথা বলবে, কাল আর এক কোর্ট আর এক কথা বলবে, ইত্যাদি। সুপ্রীম কোর্ট আর ভবিষ্যতে যাতে এরকম বেয়াদপি করতে না পারে তার জন্য তিনি নূতন আইন করে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা খর্ব করার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন, Segregation of Voters Act যাতে বাতিল না হয় তার ব্যবস্থা তো করবেনই। সাদাদের মধ্যেও এই ব্যাপারে ডক্টর ম্যালানকে যথেষ্ট বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে কিন্তু সে ঝগড়া Segregation of Voters Act-এর মূল বিষয় যে বর্ণ-বৈষম্য তা নিয়ে হবে না, হবে বৃটিশ পার্লামেণ্টের পূর্বোক্ত এ্যাক্টের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি বজায় থাকা ভালো কি মন্দ, সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা হ্রাস করা উচিত কি উচিত না, এইসব নিয়ে। সুতরাং সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ের ফলে অশ্বেত, বিশেষ করে আফ্রিকান ও ভারতীয় বংশজাত দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদের অবস্থার ইতরবিশেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা এখনো উপস্থিত হয় নি, তবে এর দ্বারা তাদের পরোক্ষ লাভ এইটুকু হবে যে ম্যালান গভর্নমেণ্ট যে কতদূর একগুঁয়ে এবং অনুদার পৃথিবীর সামনে তার আর একটা নজির বাড়ল। এর দ্বারা কিন্তু অশ্বেতদের পরিকল্পিত অহিংস সংগ্রামের প্রয়োজন ও গুরুত্ব একটুও কমেনি।

ম নোজ বসুর ভাষায় জাহাজে বসে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে চলে গিয়েছিলুম, ং হুঁশ হল আমি পদ্মায় নই, প্রাগে আমি বসে আছি জিনীভা লেকের হাজে।

জাহাজের অর্কেস্ট্রা গানের পর গান জিয়ে যাচ্ছে আর ডেকের মাঝখানে স্তর লোক টাঙ্গো, ওয়াল্‌ট্‌স ফক্স ট্রট চ্ছে। আর সে কত জাত-বেজাতের লোক, বড় বড় চেক কাটা কোট পাতলুন পরা র্কিন (আমাদের মাড়োয়ারী ভাইয়ারা যে ম 'বড়া বড়া বুট্টাদার' নক্সা পছন্দ রেন), নিখুঁৎ নিপুণ লিপ-স্টিক রুজ খা তন্বঙ্গী ফরাসিনী, গাদা-গোদা ন্দা-হোৎকা জর্মন আর ডাচ্, গায়ে কালো ট আর লেসের ওড়না জড়ানো বিদ্যুৎ-য়নী হিস্পানী রমণী, আপন হাম্বরাইয়ের ভে ভরা একটুখানি আলগোছে-থাকা রেজ আর তাদের উঁচু-নিচুর-টক্করহীন কর বাঘিনী, টেনিস-পাগলিনী স্পোর্টস মণী।

এই ধরতন রুইতন সায়েব বিবির তাসের দেশে নিরীহ ভারতসন্তান কল্কে পাবে কি?

তা পায়—আকসারই পায়।

তার প্রধান কারণ, আর পাঁচটা ইয়োরোপীয় এবং মার্কিন জাত সুইটজারল্যাণ্ডে এসেছে স্ফূর্তি করতে, এদেশের মেয়েদের সঙ্গে ভাবসাব জমিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে, তার কলকৌশল—নাচের ভিতর দিয়ে, ভাষার অজ্ঞতার ভাণ করে, দামী দামী মদ খাইয়ে—এরা বিলক্ষণ জানে এবং কাজে খাটাতে কিছুমাত্র কসুর করে না। এদের সম্বন্ধে তাই সুইস বাপ, ভাই, মা দিদি এমন কি মেয়েরাও একটুখানি সাবধান।

ভারতীয় মাত্রই যে এদের তুলনায় 'ধম্মপুত্তুর' যুধিষ্ঠির এ-কথা আমি বলব না। কিন্তু ইয়োরোপ বাসের প্রথম অবস্থায় ভারতীয় মদ খেতে কিম্বা খাওয়াতে জানে না, নাচতে পারে না এবং সবচেয়ে বড় কথা তার ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে সে কণামাত্র তালিম পায়নি বিদেশীর সঙ্গে কি করে দোস্তী-ইয়ার্কি জমাতে হয়।

আমি "ৎসুরিশ সংবাদ" পড়ছিলুম। পড়া শেষ হতে কাগজখানা টেবিলের উপর রাখামাত্রই আমার পাশের টেবিলের এক ছোকড়া এসে আমাকে 'বাও' করে বললে 'আমার "বাজেল সংবাদে"র বদলে আপনার

"ৎসুরিশ সংবাদ"খানা এক মিনিটের জন্য পেতে পারি কি?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়।'—এ ছাড়া আপনি আর কি বলবেন?

কিন্তু পষ্ট বোঝা গেল আলাপ জমাবার জন্য সরকারি রাস্তা ধরেই সে যাত্রা শুরু করেছে। কারণ এতক্ষণ ধরে সে তার সঙ্গের দুটি মেয়ের সঙ্গেই গল্পগুজব বা নাচ-গান করছিল—কাগজ পড়ার ফুর্সৎ কই?

তবু কাগজখানা যখন নিয়ে গিয়েছে তখন দু' মিনিট পড়ার ভাণ করতে হয়। তাই করল। ফেরৎ দেবার সময় ধন্যবাদ জানিয়ে হেসে বলল, 'আজকাল কিসসু নূতন খবর মেলে না।'

আমি বললুম, 'একদম না; সব যেন দড়কচ্চা মেরে নিয়েছে।'

মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললো, 'যা বলেছেন।'

এরপর আপনাকে অবশ্যই বলতে হয়, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন; বসুন।'

কিন্তু কিন্তু করে বসবে, তারপর আরো দু' মিনিট না যেতেই বললে, 'তার চেয়ে চলুন না আমাদের টেবিলে। আমার সঙ্গে দুটি বান্ধবী রয়েছেন। তাঁরা বড্ড একলা পড়ে গেলেন।'

আপনি বলবেন, 'রাম, রাম! বড্ড ভুল হয়ে গেল আপনাকে ঠেকিয়ে রেখে।'

ছোকরা বলবে, 'সে কি কথা, সে কি কথা।'

এই হল প্রধান সরকারি পন্থা, আলাপ পরিচয় করার—অবশ্য আরো বহু গলি-ঘুঁচিও আছে।

বড়টির নাম এরিকা, ছোটটি গ্রেটে। ছেলেটার নাম পিট্। পিট্ বলবে তা 'কিছু একটা পান করুন।'

আমি বললুম, 'এইমাত্র কফি খেয়েছি; এখন আর থাক—অনেক ধন্যবাদ।'

এইবারে যে আলাপচারি আরম্ভ হবে তার চৌহদ্দী বাতানো সরল কর্ম নয়। সাধু সন্ন্যাসীরা সত্যি পেরেকের বিছানায় দিনের পর দিন কাটাতে পারেন কি না, গোখরোর বিষ ওঝা নামাতে পারে কিনা, কিম্বা যোগাভ্যাস করে মাটি থেকে তিন ইঞ্চি উঠে যেতে কাউকে কখনো আমি দেখেছি কিনা?

ছেলেটা যদি দর্শনের ছাত্র হয় তবে হয়ত ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বসবে, মেয়েটির যদি বাজনায় শখ থাকে তবে আপনাকে শুধিয়ে বসবে, ভারতীয় সঙ্গীতে ক' রকমের তাল হয়।

এসব তাবৎ প্রশ্নের সদুত্তর কে দেবে? রজেন শীল, সুনীতি চাটুয্যে, বিশ্বকোষ, সুকুমার রায়ের 'নোটবুক', গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা সব মিলিয়ে কক্‌টেল্ বানালেও ঐ মরু-বালুকা-প্রশ্ন তাকে বেমালুম শুষে নেবে।

বিদেশী একথা বোঝে না যে, তার ঠিক যে জিনিসে কৌতূহল আপনার তাতে মহব্বৎ নাও থাকতে পারে। তার উপর আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আমরা ইস্কুল কলেজে যে তালিম পাই তাতে ক্রুসেডের তারিখ মুখস্থ করানো হয়—অজন্তা, ধ্রুপদ শেখানো হয় না।

তবে অতি অবশ্য স্বীকার করবো, একটি প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিষ্ঠান আমি চিনি যিনি এসব প্রশ্নের উত্তম উত্তম উত্তর দিতে পারেন।

হেদোর উত্তর-পুব কোণের 'বসন্ত-রেস্টুরেন্ট'! সেখানে আমরা সুবো-শাম রাজা-উজীর কতল করি, হেন সমস্যা, হেন বখেড়া নেই যার ফৈসালা আমরা পত্রপাঠ করে দিতে পারিনে।

'বসন্ত রেস্টুরেণ্টের' আমি আদি ও অকৃত্রিম সভ্য। তস্য প্রসাদাৎ আমি হর-মুল্লুকে হর-সওয়ালের জবাব দিতে পারি।

জওহরলাল নেহর্, বাপ্তি ও ব্যক্তিত্ব—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। প্রকাশক ঃ শ্রীকানাইলাল সরকার, ১৭৭এ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহর্র ষষ্টিপূর্তি উপলক্ষে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। সেই সময়, বছর দুই আগে, দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে যখন ইহা প্রকাশিত হয়, তখনই শ্রীযুক্ত বিশীর এই নেহর্-চরিত্র বিশ্লেষণের নৈপুণ্য সুধী-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্প্রতি ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা সকলেই জানি এবং শ্রীযুত বিশীও বলিয়াছেন যে, নেহর্র জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান গান্ধীজির প্রভাব এবং গান্ধীজিও বলিয়া গিয়াছেন যে, নেহর্ই তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী; গান্ধীজি বলিয়াছিলেন—Patel is my son and Jawahar my heir, এই কথার তাৎপর্য এই যে, প্যাটেলকে তিনি পুত্রের ন্যায় স্থান ও স্নেহ করেন, কিন্তু দেশ পরিচালনায় নেহর্ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি গান্ধীর আদর্শকে কর্মে পরিণত করার উপযুক্ত। নেহর্ এতটা গান্ধী-অনুরক্ত থাকা সত্বেও গান্ধীজির সমালোচনা করিতে কখনো কুণ্ঠিত হন নাই, গান্ধীজির অনুসৃত নীতির সংগে যেখানে তাঁহার মতের মিল হয় নাই, সেইখানেই তিনি অসংকোচে এবং সশ্রদ্ধভাবে তাহা অকপটে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মতের অমিল এবং মনের অমিল পৃথক বস্তু। গান্ধীজি এবং নেহর্র মধ্যে মনের অমিল কখনো হয় নাই—এই কারণেই নেহর্ গান্ধীজির উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত ও নন্দিত হইতেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটিকেও অনুরূপ সমালোচনা বলা যাইতে পারে।—সশ্রদ্ধ, অসংকোচ ও অকপট। শ্রীযুত বিশী নেহর্র-চরিত্র সমালোচনা করিয়াছেন। এ সমালোচনার বাহাদুরি এইখানে যে, এই বিশ্লেষণে কোথাও এতটুকু তিক্ততা রূঢ়তা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই। বরঞ্চ শ্রদ্ধার ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে অধিক। নেহর্ যেমন জাতির বাপু গান্ধীজিকে সমালোচনা করিতেন, অনেকটা সেই রকম। সমালোচনা করিবার সময় এতটা সংযম ও শ্রদ্ধা বজায় রাখা সাধারণ লেখকের সাধ্য নয়। শ্রীযুত বিশী সেই দক্ষতা দেখাইতে পারিয়াছেন।

ভারতীয় দর্শন মানুষকে ও ভগবানকে এক করিয়া দেখিয়াছে, বলিয়াছেন তত্ত্বমসি সোহহম্। ইহাই হইতেছে ভারতের অধ্যাত্ম-চেতনা। গান্ধীজির এ চেতনা ছিল এবং পূর্ণমাত্রায় ছিল, তিনি ভারতের আত্মা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন, মানুষে ও ভগবানে ভেদ নাই। কিন্তু পণ্ডিত নেহর্ মানুষকে ও ভগবানকে এক করিয়া দেখেন না, অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা নেহর্র মধ্যে নাই। শ্রীযুত বিশী এইখানে নেহর্-চরিত্রে ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এই কারণেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভারত-আবিষ্কার গ্রন্থের নাম হওয়া উচিত ছিল ভারত-প্রত্যাবর্তন। নেহর্

পুস্তক পরিচয়

ইউরোপীয় সভ্যতার দ্বারা মানুষ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাড়ীর টান ছিল ভারতে। সেই আকর্ষণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নেহর্ ভারতে ফিরিয়াছেন। ইহা অনেকটা মাইকেল মধুসূদনের প্রত্যাবর্তনের মতই যেন।

যা ফিরি অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে—

আদেশের মতই ভারতের কণ্ঠধ্বনি তিনি

শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং এ কণ্ঠধ্বনি মাতৃ-আহ্বানের মতই নিশ্চয় তাঁহার কানে বাজিয়াছে।

অনেকে নেহর্কে কল্পনাবিলাসী ও কবি বলিয়া অপবাদ দেন। কিন্তু সে অপবাদ ভ্রান্ত। শ্রীযুত বিশী যুক্তির দ্বারা তথ্যের দ্বারা সে অপবাদ স্খালন করিয়াছেন, বলিয়াছেন, "নেহর্র মানসভ্রমণকে বাস্তববিমুখতা মনে করিলে চলিবে না।" শ্রীযুত বিশীর একথা অকাট্য সত্য। আমরাও মনে করি নেহর্ একাধারে কবি ও কর্মী। কর্মের সংগে কল্পনার এমন যোগ কদাচ হয়। নেহর্ লিখিয়াছেন এবং শ্রীযুত বিশী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ক্ষণকালের জন্য আমি অতীতের অধিবাসী হইয়া পড়িতাম, বোধিসত্ত্ব ও অজন্তা-চিত্রাবলীর সুন্দরী রমণীরা আমার কল্পনা অধিকার করিয়া বসিত। কিছুদিন পরে মাঠে কাজ করিতেছে এমন কোনো নারীকে দেখিয়া কিংবা গ্রামের কূয়া হইতে জল তুলিতেছে এমন কোনো নারীকে দেখিয়া হঠাৎ আমি চমকিয়া উঠি, সে আমাকে অজন্তার নারীদের স্মরণ করাইয়া দেয়।"

কল্পনার সংগে বাস্তবের এমন স্বচ্ছন্দভাবে যোগ স্থাপনা যিনি করিতে পারেন সেই নেহর্কে কেবল স্বপ্নবিলাসী বলা সত্যই ভুল। এই নেহর্কে যদি কোনো কৌশলে অশোকের আবাসে লইয়া বসানো যায় কিংবা মহেঞ্জোদারোর কালে লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে সহজেই তিনি নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিবেন। ইহাই শ্রীযুত বিশীর অভিমত এবং আশা করি, ইহা সকলেই সমর্থন করিবেন।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ও অতীত কাল—এই ত্রিকাল একত্রিত করিয়া দেখিবার শক্তি নেহর্র আছে। নেহর্কে তাই একটি মহাকাব্য বলা যাইতে পারে, যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের উপর সমান প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। মহাকাব্যেও ত্রুটি থাকে, বিরাম ও যতি স্থাপনার শ্রুতিদুষ্টতা ধরা পড়িতে পারে। তাহাতে মহাকাব্যত্ব নষ্ট হয় না।

শ্রীযুত বিশী নেহর্-চরিত্রের কাব্যগুণের বিচার করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ত্রুটির দিকটাও দেখাইয়াছেন। সমগ্রভাবে গ্রন্থটি তাই উপভোগ্য হইয়াছে।

নেহর্-চরিত অদ্যাবধি লেখা হয় নাই। সেই দিক হইতে আলোচ্য গ্রন্থটিকে পথপ্রদর্শক বলা যায়। যাঁহারা নেহর্কে অন্ধভাবে না, সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে চান তাঁহাদের এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখা কর্তব্য।

স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ ও নেহর্ পৃথিবীর নিকট পরিচিত করিয়াছেন ভারতকে। বিবেকানন্দ জীবনের মধ্যাহ্নেই গত হইয়াছেন। শেষোক্ত তিনজন ছিলেন অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ। এই গ্রন্থে গান্ধী ও নেহর্ এবং রবীন্দ্রনাথ ও নেহর্র চিত্র দিয়া প্রকাশক একটি যুগের ইতিহাসকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। ইহা ছাড়া নেহর্র অন্যান্য চিত্রও দেওয়া হইয়াছে।

আশা করা যায় বইটি নেহর্-অনুরক্ত ও নেহর্-সমালোচকদের নিকট সমভাবে আদরণীয় হইবে। ৬৫।৫২

মনে পড়ে—এলীনর রুজভেল্ট। এম, সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃঃ ১৬৬। মূল্য বারো আনা।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্ট পৃথিবীখ্যাত রাজনীতিজ্ঞরূপে প্রমাণিত হইয়াছেন গত দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় নাৎসী দৌরাত্ম্যের হাত হইতে পৃথিবী সে সময় যদি কেহ রক্ষা করিয়া থাকেন, তবে হইলে প্রথমেই নাম করিতে হয় ফ্র্যাঙ্কলিনের তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী এলীনর আ পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া রোজনামচা লিখিতেছেন। সর্বত্র সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের

ত করিবার জন্যই এলীনরের এই পর্যটন। কালে অনেকের ধারণা ছিল যে, ফ্র্যাঙ্কলিনের র এলীনরের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল প্রচুর; এমনকি সরকারী নীতি-নির্ধারণেও নর ফ্র্যাঙ্কলিনের উপর প্রভাব বিস্তার তেন বলিয়া অনেকে মনে করিত। নরের This I remember পুস্তিকা করিলে এই ভ্রম দূর হয়। আলোচ্য কটি উক্ত ইংরেজি পুস্তকের অনুবাদ। তে এলীনর তাঁহাদের ঘরোয়া কথা য়াছেন, পুত্রদের শিক্ষাদান ও কর্মসংস্থানের বলিয়াছেন—কিভাবে পুত্রদের মানুষ করিয়া লিবার জন্য স্বামী-স্ত্রীর উদ্যোগ ছিল তাহা ঠ করিলে আনন্দবোধ হয়। কিন্তু ইহাই বড় থা নয়, এলীনর তাঁহার স্বামীর ও মার্কিন জনীতির মর্ম কথা এই গ্রন্থে সহজ ও নাড়ম্বরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই স্তক পাঠে অনেক ভ্রম দূর হইবে এবং দেশের দেশের জন্য রুজভেল্ট-পরিবারের যে আন্তরিক ম ছিল তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। হারা দ্বিতীয় যুদ্ধের ইতিহাস রচনা করিবেন, হারা ইহাতে প্রচুর উপকরণ পাইবেন। কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের হতাশ হইতে হইয়াছে, হা হইতেছে অনুবাদ। অনুবাদ যথেষ্ট স্পষ্ট ও াঞ্জল নয় এবং মনে হইল, অনুবাদকার্যে আন্তরিকতার অভাবেই এরূপ হইয়াছে। সুঅনূদিত হইলে বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর বলা যাইত। ৫৯।৫২

শ্রীরামদাস প্রশস্তি—(ডক্টর কালিদাস নাগের ভূমিকা সম্বলিত)। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত এবং শ্রীসুশীলকুমার সেন কর্তৃক ২৯।এ, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—দুই টাকা আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—সম্পাদক, নিখিল বৈষ্ণব সম্মিলনী, ৬৬, মণ্ডলপাড়া লেন, পোঃ কাশীপুর, কলিকাতা।

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের ষটসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ৪ঠা চৈত্র গ্রন্থখানি তাঁহাকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। বাঙলাদেশের ভক্ত, পণ্ডিত, সাহিত্যিক, কবি এবং বহু মনীষিবর্গের রচনায় গ্রন্থখানি অপূর্ব সংগ্রহ। রচনাগুলিতে বিভিন্ন দিক হইতে বাবাজী মহাশয়ের অবদানের প্রশস্তিপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। অসাম্প্রদায়িক একটি উদার মানবতার উজ্জ্বল আদর্শের ভাবে আলোচনাগুলি মনকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করে। বাঙলার আধ্যাত্ম সংস্কৃতির মর্মকথাটি প্রবন্ধ ও কবিতাগুলির ভিতর দিয়া সতেজ অথচ সরসভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রাজনীতিক জীবনও উপেক্ষিত হয় নাই। মোটামুটিভাবে শ্রীমৎ রামদাস বাবাজীর প্রশস্তি কীর্তনের সূত্রে সুষ্ঠুভাবে বিগত অর্ধ শতাব্দীকালের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি এবং ঐতিহ্যের একটা প্রজ্ঞানময় পরিচয় গ্রন্থখানির আলোচনাগুলি অনুধাবন করিলে দেখিই পাওয়া যায়। যাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ এবং কবিতায় গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই বাঙলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। ৪০টি প্রবন্ধ এবং ১৬টি কবিতায় ২২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। সবই পাকা হাতের লেখা; কোনটি ছাড়িয়া আমরা কোনটির আলোচনা করিব? গ্রন্থখানি পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন, মোটের উপর একথা স্বচ্ছন্দেই বলিয়া দেওয়া যায় মাত্র। ছাপা, কাগজ সুন্দর। কয়েকখানি সুন্দর হাফটোন চিত্রে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ।

জপসূত্রম্—শ্রীমৎ স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী বিরচিত এবং বাংলা ভাষায় বিস্তারিত ব্যাখ্যানুবাদ সহ দ্বিতীয় খণ্ড। প্রাপ্তিস্থান—মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

অধ্যাপক শ্রীযুত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় বাঙলার সুধিজন-সমাজে সুপরিচিত। জাতীয় শিক্ষাপরিষদে শ্রীঅরবিন্দের এবং পরে রিপন কলেজে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের সহকর্মিরূপে ইনি বাঙলা দেশে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে প্রখ্যাতি লাভ করেন। তন্ত্র শাস্ত্রের অনুশীলনে এবং তন্ত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ইঁহার মনীষা সর্বজনবিদিত। এই ক্ষেত্রে বিচারপতি স্যার জন উডরফের সঙ্গে তাঁহার সহযোগিতার কথা অনেকে তখনও বিস্মৃত হন নাই। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ইনি স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ নামে বর্তমানে পরিচিত। বেদ, বেদান্ত এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্র

সম্বন্ধে ইঁহার লিখিত অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু "জপ সূত্রম্" অন্য ধরণের বস্তু। স্বামীজী তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনার প্রভাবে অধ্যাত্ম রাজ্যের যে সব নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিয়াছেন, এই গ্রন্থে তাহাই সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্রচ্ছন্দে সূত্রাকারে পরিস্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছ। জপই সব সাধনার মূল। সর্বত্র ইহা স্বীকৃত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ অধ্যাত্ম সাধনা হারা-উদ্দেশে ঢিল ছোড়ার ব্যাপার নয়। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের মত তাহারও একটা বৈজ্ঞানিক ধারা আছে এবং সাধনার পথে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে সেই বৈজ্ঞানিক ধারাটি ধরিয়াই চলিতে হয়। সাধনার পথে প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বার উন্মুক্ত হইলে জপের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক ধারাটির পরিচয় পাওয়া যায় এবং কাজ অনেকটা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠে। স্বামীজী তাঁহার জপ-সূত্রে এই বৈজ্ঞানিক ধারাটিকে ফুটাইয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সমগ্রের অনুভূতি ভিন্ন এ তত্ত্বের স্ফূর্তি ঘটে না এবং ভাষার ভিতর দিয়া এই সব দুরধিগম্য, জটিল তত্ত্বকে ব্যক্ত করাও সম্ভব নহে। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজীর জপসূত্রে তাঁহার তত্ত্বানুপ্রবেশের তীক্ষ্ণতা, অন্য কথায় প্রজ্ঞানময় দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। জপের পথে কিভাবে অর্থভাবনা প্রাণধর্মে জীবন্ত হইয়া উঠে, বিশেষের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া অশেষের উন্মেষ হয় এবং যে বস্তু অনুচ্চার্য তাহার বীর্যের সংস্পর্শে মনোবুদ্ধির মল অপসারিত হয়, স্বামীজীর জপসূত্রে তাহার রীতি এবং কৌশলটি আমাদিগকে ধরাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ এ সব বিষয় গভীরভাবে অনুধ্যান করিবার বস্তু। দুই এক কথায় সমালোচনা করা চলে না। প্রকৃতপক্ষে বাঙলা দেশের মনীষা-ক্ষেত্রে স্বামীজীর এই অবদান মৌলিক। বহুদিন বাঙলার মনীষা-ক্ষেত্রে এমন ভাবগর্ভ এবং প্রজ্ঞানময় মৌলিক সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় নাই, এ বিষয়টি বিশেষভাবেই উল্লেখ-যোগ্য। জপসূত্রের প্রথম খণ্ড এক বৎসর পূর্বে যখন প্রকাশিত হয়, তখন চিন্তাশীল পাঠকদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং অনেকেই পরবর্তী খণ্ড প্রকাশিত হয়, এজন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হওয়াতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে খণ্ডে খণ্ডে সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশিত হইলে অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ একটি ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিবে এবং বঙ্গ-মনীষার একটি স্থায়ী সম্পদরূপে গণ্য হইবে। অধ্যাত্ম-রস-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই এমন গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। সাধনার পথের অনেক জটিল গ্রন্থি-উন্মোচনে এই আলোচনা বিশেষভাবে সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই।

প্রাপ্ত স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

শিক্ষায় মনস্তত্ত্ব—মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৬।।০ ৬০।৫২

Two New Pal Records—মনোরঞ্জন গুপ্ত, ২০৯সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা। মূল্য দেওয়া নাই। ৬১।৫২

অন্য পথ—মণীন্দ্র রায়, ২৬, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। মূল্য—১।।০ ৬২।৫২

রক্ত লেখা—নিত্যনন্দ কর্মকার। স্বর্ণময়ী শিল্পালয়, স্টেশন রোড, কাঁচড়াপাড়া। মূল্য—১৲ ৬৩।৫২

পথিক—তুলসীদাস লাহিড়ী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২।০ ৬৪।৫২

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদান

শ্রীআশুতোষ মিত্র

অধুনা শ্রীঠাকুরের এক আধুনিক ভক্ত লেখককে জিজ্ঞাসা করেন, "স্বামীজী আপনাদিগকে মঠে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে এবং মঠে সাহায্য জোগাড় করিতে শিখাইয়াছিলেন কি? উত্তরে সে তাহার মনে যে দুইটি বিষয় তখন জাগিয়াছিল, তাহাই তাঁহাকে বলে, সে দুইটি বিষয় এখানে লেখা হইতেছে।

মঠের জমি কেনা হইলে বুড়া গোপালদার (স্বামী সদ্বোতানন্দের) উদ্যোগে গঙ্গার পলি মাটি দ্বারা ভরাট করা হয় এবং ফল ও ফুলের গাছ রোপিত হয়। ফলে ঐ জমির এক প্রান্তে ভাল ভাল কলা গাছের ঝাড় হইয়া যেন জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে আর মর্তমান কলার বড় বড় কাঁদি ঝুলিতেছে—এরূপ বড় কলা কখনও আমরা ত দেখি নাই। একদিন স্বামীজী সখ করিয়া সেই কলা গাছের জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া উহার প্রশংসা করিতে করিতে নিকটস্থ কানাই মহারাজ (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) ও লেখককে বলিতে থাকেন—দেখেছিস কি সুন্দর কলা! আমরা এত খেয়েও শেষ করতে পাচ্ছি না। ওদেশে (পাশ্চাত্ত্যে) কি করে জানিস্? রোমান ক্যাথলিকদের মঠে মঠে সাধুরা আছেন, তাঁরা নিজেরা চাষবাস করে নিজেদের খরচের উপযুক্ত রেখে বাকি সব নিয়ে বাজারে বেচে আসেন আর সে বিক্রীত টাকা দিয়ে কাপড়চোপড় যেটির অভাব, সেইটি কিনে আনেন। আর আমাদের সাধুরা যদি বেচতে যায়, তাদের অপমান হবে! সে সাধু হয়ে বেচতে যাবে? তোদের ভেতর কে এমন বীর আছিস্ যে, ঐ কলার কাঁদি নিয়ে মান অপমানের ধার না ধেরে বাজারে গিয়ে বেচে আসতে পারিস্?—ইত্যাদি। স্বামীজীর ঐ প্রকার কথাগুলি শুনিয়া আমরা উৎসাহিত হইলাম এবং পরদিন প্রাতে দুইজনে দুই কাঁদি কলা বাজারে বেচিয়া আসিব বলিলাম। তিনি আমাদের কথা শুনিয়া প্রশংসা করিলেন। পরদিন সকালে দুইজনে দুইটি কাঁদি কাটিয়া লইয়া গঙ্গার পরপারে গিয়া বরাহনগরের বাজারে যাইবা মাত্র দুইটি কাঁদি দুইজনকে পাঁচ পাঁচ হিসাবে মোট দশ টাকায় বেচিয়া লইয়া আসিয়া স্বামীজীর সম্মুখে রাখিলে তিনি আমাদের শত প্রশংসা করিয়া সে রাত্রে আমাদের ঐ কার্যের জন্য লুচি, হালুয়া ইত্যাদির আদেশ দিলেন, সকলে ভরপুর ভোজন করিলেন!

আর একদিন রাত্রিকালীন ভোজন করিতে করিতে স্বামীজী নিজ গুরুভ্রাতা বাবুরাম মহারাজকে (স্বামী প্রেমানন্দকে) উদ্দেশ করিয়া বলিতে থাকেন, "মঠ কি একা কারুর? মঠ তোদের সকলের। সকলেরই উচিত মঠের দিকে নজর দেওয়া—সকলেরই উচিত মঠে সাহায্য করা। সকলেই যে যা পারে তা ত করলেই মঠ সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে। যে টাকা পয়সা পারে আর যে জিনিসপত্র পারে, তাই জোগাড় করে আনলেই ত মঠের খরচ হাসতে খেলতে চলতে থাকে। তোরা সকলেই বেরো, যে যা পারিস্ তাই এনে দিয়ে মঠে সাহায্য করতে থাক—একথা কি আমাকে বলতে হবে? তোরা নিজেরা করবি না?" ইত্যাদি ইত্যাদি ঐ রকমের নানা কথা বলতে থাকেন।

ঐ সব কথা শুনে পরদিন বাবুরাম মহারাজ বেরিয়ে কিছু টাকা জোগাড় করিয়া আনিলেন। সুবোধ মহারাজও (স্বামী সুবোধানন্দ) ঐ প্রকার কিছু করিলেন, আর আমাদের ভিতর হইতে হরিপদ মহারাজ (স্বামী বোধানন্দ) এবং লেখক মঠ হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে চলিতে চলিতে হাওড়ায় এক কয়লার ডিপো হইতে স্বত্বাধিকারী জনৈক হিন্দুস্থানীর নিকট ভিক্ষা করিয়া এক গাড়ি কয়লা মঠের এক মাসের খরচের জন্য আনিল। স্বামীজী উহা দেখিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলেন এবং উহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।
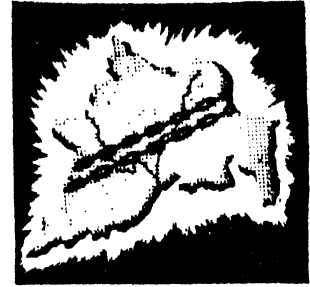
হকি

বাঙলা হকি দল এইবারের জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করিয়াছে। প্রায় ১৩ বৎসর পরে বাঙলা হকি দল পুনরায় ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরবলাভ করিল, ইহা পরম আনন্দের ও সুখের বিষয়। ১৯৩৬ সালে বাঙলা হকি দল সর্বপ্রথম এই গৌরবলাভ করে। দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে পুনরায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইলে বাঙলা পূর্ব অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাহার পর হইতে বাঙলা হকি দলের দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। বাঙলা হকি দল প্রতিবারেই যোগদান করিয়া ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। উপর্যুপরি এই ভাবে বাঙলা হকি দলকে পরাজিত হইতে দেখিয়া সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ এইরূপ হতাশ হইয়া পড়েন যে, বাঙলা কখনও যে চ্যাম্পিয়ান হইবে, ইহা যেন তাঁহাদের কল্পনাতীত হইয়া পড়ে। দীর্ঘ ১১ বৎসর এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর ১৯৪৯ সালে বাঙলা হকি দল ফাইন্যালে পাঞ্জাবের সহিত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর পরাজয়বরণ করিলে সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ কিছুটা আশান্বিত হন। বাঙলা হকি দল ভারতীয় চ্যাম্পিয়ান হউক এই কামনা সকলেই করিতে আরম্ভ করেন। মাত্র দুই বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতে তাঁহাদের সেই আন্তরিক কামনা সাফল্যমণ্ডিত হইল দেখিয়া তাঁহারা কতখানি যে উৎসাহিত ও আনন্দলাভ করিয়াছেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এইবারের ফাইন্যালের শেষ নিষ্পত্তির দিনে যাঁহারা মাঠে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণের আনন্দের চরম অভিব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা কেবল যে মাঠ আনন্দরোলে মুখরিত করেন তাহা নহে, সাফল্যমণ্ডিত হকি খেলোয়াড়গণকে পর্যন্ত জড়াইয়া ধরিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। ইহাদের এই আন্তরিক সম্বর্ধনার নিকট আমাদের ব্যক্তিগত অভিনন্দের মূল্য খুবই কম তাহা হইলেও আমরা গৌরবোজ্জ্বলকারী বাঙলার হকি খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করি ও প্রার্থনা করি, যেন ইহারা এই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার মত শক্তিলাভ করেন।

বাঙলা দল কিভাবে বিজয়ী হইয়াছেন

বাঙলা রাজপুতনাকে ২—০ গোলে পরাজিত করেন।

বাঙলা বরোদাকে ৭—০ গোলে পরাজিত করেন।

বাঙলা উত্তরপ্রদেশকে ১—০ গোলে পরাজিত করেন।

বাঙলা সেমি-ফাইন্যালে সার্ভিসেস দলকে ২—১ গোলে পরাজিত করেন।

বাঙলা ফাইন্যালে পাঞ্জাব দলের সহিত এক দিন ১—১ গোলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করিয়া দ্বিতীয় দিনে ২—১ গোলে পাঞ্জাবকে পরাজিত করিয়াছেন।

ভারতীয় অলিম্পিক দল নির্বাচন

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার পরেই হেলসিঙ্কির বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ভারতীয় হকি দল গঠিত হইবে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহা করা হয় নাই। ২৭ জন খেলোয়াড়কে প্রাথমিকভাবে মনোনীত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতে দল গঠন করা হইবে। প্রকৃত দল গঠনের বিলম্ব করিবার যুক্তি কি নির্বাচকগণই জানেন। নিম্নে মনোনীত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইলঃ—

গোলঃ—ফ্রান্সিস (মাদ্রাজ), দেশমাধু (মহীশূর) ও মেণ্ডিজ (বাঙলা)।

ব্যাকঃ—স্বরূপ সিং (সার্ভিসেস), আর এস জেণ্টল (বোম্বাই), ধরম সিং (পাঞ্জাব), বালকিষেণ (পেপসু), ওয়াহেদুল্লা (রেলওয়ে) ও ডি পাল (বাঙলা)।

হাফঃ—ক্লডিয়াস (বাঙলা), কেশব দত্ত (বাঙলা), ভালুজ (বাঙলা), যশোবন্ত (বাঙলা), পেরুমল (বোম্বাই), বক্সী (সার্ভিসেস), সাহেব সিং (পাঞ্জাব) ও মলহোত্র (উত্তর প্রদেশ)।

ফরোয়ার্ডঃ—কিষেণ (রেলওয়ে), বাবু (উত্তর প্রদেশ) অধিনায়ক, বলবীর সিং (পাঞ্জাব), উধম সিং (পাঞ্জাব), রাজগোপাল (মহীশূর), রঘুবীর লাল (পাঞ্জাব), সি এস দুবে (বাঙলা), সি এস গুরুং (বাঙলা), জি সিং (সার্ভিসেস), ডি এস শেঠী (সার্ভিসেস) ও ভাঙ্করণ (মহীশূর)।

উপরোক্ত মনোনীত ২৭ জন খেলোয়াড় লক্ষ্ণৌর এন এন মুখার্জি, বাঙলার ফ্রাঙ্ক ওয়েলস ও পাঞ্জাবের হরবেল সিংহের শিক্ষাধীনে থাকিবেন ও প্রকৃত হেলসিঙ্কিগামী দল শিক্ষকগণ ও অধিনায়কের সহিত আলাপ-আলোচনার পর গঠন করা হইবে।

অলিম্পিকের প্রকৃত দল

হেলসিঙ্কি অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রকৃত দল কোন কোন খেলোয়াড়দের লইয়া গঠিত হইবে, তাহা যে নির্বাচকমণ্ডলী স্থির করিয়া রাখেন নাই তাহা নহে। তবে কিনা তাঁহারা হঠাৎ দল নির্বাচন লইয়া কোন গণ্ডগোল হয় তাহা চাহেন না। সেইজন্য প্রকৃত দলের তালিকা গোপন রাখিয়াছেন। ১৮ জন খেলোয়াড় লইয়া হেলসিঙ্কির ভারতীয় হকি দল গঠিত হইবে। মনোনীত খেলোয়াড়গণের মধ্য হইতে ৯জন বাদ পড়িবেন ইহা নিশ্চিত। এই ৯ জনের মধ্যে বাঙলার কয়েকজন খেলোয়াড় যে আছেন, এই বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্যগণ প্রকৃত দলের তালিকা গোপন রাখিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও আলাপ-আলোচনা মধ্য হইতে যেটুকু সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি নিম্নলিখিত ১৮জন খেলোয়াড় লইয়াই ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল গঠিত হইবে—

গোলঃ—ফ্রান্সিস (মাদ্রাজ), দেশমাধু (মহীশূর)।

ব্যাকঃ—স্বরূপ সিং (সার্ভিসেস), আর এস জেণ্টল (বোম্বাই), ধরম সিং (পাঞ্জাব)।

হাফ ব্যাকঃ—ক্লডিয়াস (বাঙলা), কেশব দত্ত (বাঙলা), ভালুজ (বাঙলা), যশবন্ত (বাঙলা), পেরুমল (বোম্বাই), বক্সী সিং (সার্ভিসেস) অথবা সাহেব সিং (পাঞ্জাব)।

ফরোয়ার্ড—কিষেণ (রেলওয়ে), বাবু (উত্তর প্রদেশ) অধিনায়ক, (বলবীর সিং (পাঞ্জাব), উধম সিং (পাঞ্জাব), রাজগোপাল (মহীশূর), রঘুবীর লাল (পাঞ্জাব) ও সি এস গুরুং (বাঙলা)।

হকি দলের জন্য অর্থ সংগ্রহ

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় হকি দল উপর্যুপরি চারিবার সাফল্য অর্জন করিয়াছে। এইবারেও করিবে ইহা সকলেই আশা করি। সুতরাং এই দল প্রেরণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা হইবে তাহাতে তার আশ্চর্য কি? এই দলের অর্থ সংগ্রহেরও ব্যবস্থাও হইয়াছে এবং হওয়াও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা বলিয়া অপর সকল বিষয়ের জন্য মনোনীত ভারতীয় প্রতিনিধিদের বিরাট ব্যয়ভার ব্যক্তিগতভাবে মনোনীত প্রতিনিধিদের উপর ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনরূপেই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। সার্ভিসেস বা সামরিক বিভাগের যে সকল প্রতিনিধি আছেন, তাহাদের অর্থ সংগ্রহের বিশেষ কোন বাধা হইবে না। তাঁহারা অনায়াসেই সামরিক বিভাগের কোন না কোন তহবিলের সাহায্যলাভ করিবেন। সমস্যা হইয়াছে সেই সকল প্রতিনিধির যাঁহারা অর্থহীন অথবা তহবিলশূন্য প্রতিষ্ঠানের সভ্য। এই সমস্যা প্রতিবারই বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময় দেখা দেয় অথচ তাহার সমাধানের জন্য কেন যে ব্যবস্থা এই পর্যন্ত হয় নাই বুঝিতে পারি না। জাতীয় সরকারের উচিত সকল প্রতিনিধিকে সাহায্য করা। তাঁহারা যদি তাহা নাই করেন, তাই বলিয়া জনসাধারণ চেষ্টা করিলে বৈদেশিক ভ্রমণ তহবিল স্থায়ীভাবে গঠিত হইতে পারে না ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। বাঙলার সকল ব্যায়াম ও খেলাধুলা পরিচালনার প্রতিষ্ঠান এইবারে নাকি একত্র হইয়া এই আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি যে, ইহারা সাফল্যমণ্ডিত হউন এবং ভারতের খেলাধুলা মহলে এক নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করুন।

ক্রিকেট

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়গণের নাম ঘোষণা করিয়াছেন। ইতঃপূর্বে আমরা যে ১০জন খেলোয়াড়ের নাম প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাঁহারা এই মনোনীত দলে আছেন। সুতরাং আমাদের সংগৃহীত সংবাদ একেবারেই ভুল নহে জানিয়া সুখী হইলাম। তবে অবশিষ্ট খেলোয়াড়গণের মধ্যে অমর নাথ, মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলী প্রভৃতির নাম না দেখিয়া একটু আশ্চর্য হইলাম। তবে পরে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, অমরনাথ নাকি ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কাহারও উপর নানারূপ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়াই নির্বাচিত দলে স্থান পান নাই। বিজয় মার্চেণ্টের সহিত নাকি বোঝাপড়া হইয়াছে যে, তিনি বিশেষ তার পাইলে লণ্ডনে গিয়া ভারতীয় দলে যোগদান করিবেন। বোম্বাইর প্রতিনিধি নির্বাচন সময় উপস্থিত না থাকায় হোলকার বাঙলার মধ্যে এক চুক্তি হয়, যাহার ফলেই এইরূপ অপ্রত্যাশিত দল নির্বাচন হইয়াছে। এই সকল

...দ কতখানি সত্য বলা কঠিন, তবে নির্বাচক-
যে দলগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া দল
...চন করেন নাই, ইহা নিশ্চিত করিয়া বলা
...। দীর্ঘকালের স্থায়ী প্রতিনিধিগণ যতদিন
...ট্রাল বোর্ডে আধিপত্য করিবেন, ততদিন
...বিচার ও সুনির্বাচন আশা করাই ভুল, ইহা
...লিয়া আমরা পারি না।

বিনু মানকড়কে দলভুক্ত করিবার প্রচেষ্টা

বিনু মানকড় নির্বাচিত ভারতীয় দলে
...কিলে দলের শক্তিবৃদ্ধি পাইত, ইহা সকলেই
...কার করেন অথচ তাঁহাকে দলভুক্ত করিবার
...নই যে প্রচেষ্টা হয় নাই, তাহা ডাকওয়ার্থের
...বৃতি হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি
...লিয়াছেন, 'মানকড়কে ছাড়িয়া দিবার আবেদন
...দি ফেব্রুয়ারী মাসে না করিয়া নবেম্বর মাসে
...রা হইত, তাহা হইলে কোনই অসুবিধা হইত
...।' মানকড় যে ল্যাংকাশায়ার লীগ ক্রিকেটের
...কান এক ক্লাবের সহিত চুক্তি করিয়াছেন ইহা
...তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার পরেই সকলেই
...জানিতে পারিল। অথচ তখন হইতেই তাহাকে
...ভুক্ত করিবার চেষ্টা হইল না ইহাই আশ্চর্যের
...বিষয়। এমনকি ডিসেম্বর মাসে লেসলী স্মিথের
...বিবৃতিতে যখন মানকড়ের চুক্তির কথা প্রকাশিত
...হইল, তখনও বোর্ডের পরিচালকগণ কি
...করিতেছিলেন, সেই কথাই আজ আমাদের
...জিজ্ঞাসা? কর্মকুশলতার ইহা যে চরম ব্যর্থতার
...নিদর্শন যদি আমরা বলি, তাহা হইলে বোর্ডের
...পরিচালকগণ কি কিছু বলিতে পারেন? ইহা
...খুবই পরিতাপের বিষয় যে, ভারতীয় ক্রিকেট
...দল মানকড়ের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইল।
...ভারতীয় সরকার এই বিষয় হস্তক্ষেপ করিলে
...কিছু যে না হইতে পারে, ইহা এখনও আমরা
...বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

মনোনীত খেলোয়াড়দের প্রশংসা

ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল সম্পর্কে
...বিশেষজ্ঞ কয়েকজন প্রশংসা করিয়াছেন এবং
...কয়েকজন তাহার মধ্যেও উল্লেখ করিয়াছেন যে,
...নির্বাচন ঠিক হয় নাই। দলের ভারত ত্যাগ
...করিতে এখনও দেরী আছে। ইহার মধ্যে কিছু
...অদলবদল করিলে যদি দলের শক্তিবৃদ্ধি পায়,
...তাহা বোর্ডের অবশ্য করা কর্তব্য। যদি না
...করেন, তাহা হইলে আর কিছুই বলিবার নাই।
...তবে এটা ঠিক ভারতীয় দল শোচনীয় ফলাফল
...করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে তখন
...বোর্ডকে সারা দেশব্যাপী এক বিরাট বিক্ষোভের
...সম্মুখীন হইতে হইবে, এই বিষয় কোনই
...সন্দেহ নাই।

মনোনীত খেলোয়াড়গণ

(১) ভি এস হাজারে (বরোদা) অধিনায়ক
(২) এইচ আর অধিকারী (সার্ভিসেস) সহ-অধিনায়ক
(৩) পি সেন (বাঙলা)
(৪) এম কে মন্ত্রী (বোম্বাই)
(৫) ডি জি ফাদকার (বোম্বাই)
(৬) পি আর উমরিগর (গুজরাট)
(৭) সি ডি গোপীনাথ (মাদ্রাজ)
(৮) পি রায় (বাঙলা)
(৯) এন চৌধুরী (বাঙলা)
(১০) জি এস রামচাঁদ (বোম্বাই)
(১১) ডি কে গাইকোয়াড় (বরোদা)
(১২) হীরালাল গাইকোয়াড় (হোলকার)
(১৩) এস জি সিন্ধে (বোম্বাই)
(১৪) আর এম ডিভেচা (বোম্বাই)
(১৫) সি টি সারভাতে (হোলকার)
(১৬) ভি এল মাঞ্জরেকার (বোম্বাই)
(১৭) গোলাম আমেদ (হায়দরাবাদ)

অতিরিক্ত

(১) এস কে গিরিধারী (বাঙলা)
(২) ডিপক সোধন (বরোদা)
(৩) এম আর রেগে (মহারাষ্ট্র)
(৪) পি জি যোশী (মহারাষ্ট্র)

দেশী সংবাদ

১৭ই মার্চ—অদ্য দিল্লীর প্রথম লোকায়ত্ত সরকারের মন্ত্রী শ্রীব্রহ্মপ্রকাশ (মুখ্যমন্ত্রী), জনাব শফিক-উর-রহমান কিদোয়াই ও ডাঃ সুশীলা নায়ারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া দিল্লীর রাজনৈতিক ইতিহাসে গণতন্ত্রের সূচনা দেখা দিল। দিল্লীর চীফ কমিশনার শ্রীশঙ্করপ্রসাদ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

কুর্গের প্রথম লোকায়ত্ত মন্ত্রিসভার সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রী সি এম পুণাচা (মুখ্যমন্ত্রী) এবং শ্রী কে মাল্লাপ্পাকে লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য বুলসর হইতে ৭ মাইল দূরে পারনীড় নামক স্থানে ভারতের প্রথম বৃহদায়তন রং ও ঔষধ প্রস্তুত কারখানার উদ্বোধন করেন। ভারত-মার্কিন যুক্ত প্রচেষ্টায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে এই কারখানা নির্মিত হইয়াছে।

গতকল্য রাত্রে দিল্লী হইতে ১২ মাইল উত্তরে এক শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনায় বিখ্যাত বিমান-চালক এয়ার কমোডোর শ্রীমেহের সিং এবং অপর দুই আরোহী নিহত হইয়াছেন।

১৮ই মার্চ—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্য সরকারের চলতি বৎসরের অতিরিক্ত বাজেটের আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সীমান্ত রক্ষা এবং পাকিস্থানী হানাদার প্রতিরোধকল্পে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে সুদীর্ঘ ৬০০ মাইলব্যাপী ভারত-পাকিস্থান সীমান্ত বরাবর দৃঢ়তর রক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বিবৃত করেন।

অদ্য সুপ্রীম কোর্ট বোম্বাইএর সাপ্তাহিক পত্র "ব্লিৎস"-এর সহযোগী সম্পাদক শ্রী হোমি দীনশা মিস্ত্রীকে অবিলম্বে মুক্তিদানের নির্দেশ দিয়াছেন। উত্তর প্রদেশ বিধানসভার অধ্যক্ষের পরোয়ানাবলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বর্তমানে লক্ষ্ণৌ-এ আটক রাখা হইয়াছে।

১৯শে মার্চ—ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ অদ্য কলিকাতার উপকণ্ঠে আলীপুর এলাকায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ভারত সরকারের সুবিশাল টাকশাল ভবনের উদ্বোধন করেন। ইহা প্রাচ্যের বৃহত্তম টাকশাল।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শেষ অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়।

২০শে মার্চ—কলিকাতা কর্পোরেশনের বাজেটে আগামী বৎসরে (১৯৫২—৫৩) কর্পোরেশনের রাজস্ব খাতে আয় ৫,৮৫,৯৩,০০০ টাকা ও ব্যয় ৫,৮৯,৮১,০০০ টাকা হইবে এবং ফলে ৩,৮৮,০০০ টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মিঃ এ ডি খান অদ্য কর্পোরেশন ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বাজেট প্রকাশ করেন।

জলপাইগুড়ির এক সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্থানের রংপুর জেলার অন্তর্গত পাটগ্রাম হইতে গত ১৫ই মার্চ হইতে ১৭ই মার্চের মধ্যে ৫০টি হিন্দু পরিবারের প্রায় ৩০০ লোক জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে চলিয়া আসিয়াছে। তাহারা বলে যে, পাটগ্রামের মুসলমানেরা আনসার ও পুলিসের সহযোগিতায় বলপূর্বক তাহাদের গৃহাদি দখল করে এবং তাহাদের উপর অত্যাচার করে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

২১শে মার্চ—অদ্য অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় কলিকাতায় লেক ময়দানের একাংশে এক সুসজ্জিত মণ্ডপে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ঐতিহাসিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ওয়ার্কিং কমিটি এইদিন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ, ভারতের বৈদেশিক নীতি এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের অবস্থা সম্বন্ধে চারিটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

রেলমন্ত্রী শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার অদ্য নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, রেলওয়ে পুনর্বিন্যাসের কার্য আগামী ১৪ই এপ্রিলের মধ্যে সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। রেলমন্ত্রী বলেন যে, পুনর্বিন্যাসের ফলে কোন কর্মচারীকে ছাটাই করা হইবে না।

অদ্য কলিকাতায় রাজভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রায় ৩০টি মহিলা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মিসেস রুজভেল্টকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে মিসেস রুজভেল্ট বলেন যে, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক শক্তি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ঐ শক্তি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক বলিয়া তিনি মনে করেন।

২২শে মার্চ—কলিকাতায় লেক ময়দানে এক সুসজ্জিত সুরম্য মণ্ডপ মধ্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন আরম্ভ হয়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীজওহরলাল নেহরু উহাতে সভাপতিত্ব করেন। এ আই সি সি'র সদস্যগণ ব্যতীত অধিবেশন মণ্ডপে প্রায় ৩০ হাজার দর্শকের সমাগম হয়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নেহরু প্রায় ৭৫ মিনিট স্থায়ী আবেগময়ী ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন, কংগ্রেস সেবীদের সম্মুখে আজ দুইটি কর্তব্য রহিয়াছে, একটি হইতেছে কংগ্রেসকে এক সুশৃঙ্খল গতিশীল দল হিসাবে পরিচালিত করা, দ্বিতীয়টি হইতেছে দেশকে প্রকৃত পথের সন্ধান দেওয়া। কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ভারতের বিরাট জনমণ্ডলীর অধিকাংশই কৃষিজীবী। স্বভাবতঃই তাঁহাদের সমস্যার প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। জমিদারী, জায়গীরদারী ও অনুরূপ ভূমিস্বত্ব প্রথার অবশ্যই উচ্ছেদ করিতে হইবে। কংগ্রেস সভাপতির বক্তৃতার পর প্রায় তিন ঘণ্টাকাল আলোচনান্তে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারী প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। কংগ্রেস সভাপতির নিজ মুখের উক্তি অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস কিভাবে চলি[illegible] তাহাই এই প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

২৩শে মার্চ—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি[illegible] স্মরণীয় অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়। [illegible] দিবস কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নেহরু প্র[illegible] ৪৫ মিনিটকাল তাঁহার ভাষণে দেশবাসী[illegible] বিশেষ করিয়া কংগ্রেস সেবিগণকে সর্বপ্রকা[illegible] মানসিক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া দেশ [illegible] জাতি গঠনমূলক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিব[illegible] উদাত্ত আহ্বান জানান। শ্রী নেহরু বিনা বিচা[illegible] আটক রাখা সম্বন্ধে সরকারী নীতি ব্যা[illegible] করিয়াও এক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দে[illegible] এইদিন নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটি ৫টি সরকা[illegible] প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং কংগ্রেস গঠনতন্ত্রে[illegible] কয়েকটি ধারার সংশোধন করেন। (১) সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ সমস্যা, (২) বৈদেশি[illegible] নীতি, (৩) দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থি[illegible] (৪) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং (৫) কংগ্রেস আশু কর্মসূচী।

কংগ্রেস গঠনতন্ত্র সংশোধন করিয়া কমি[illegible] অন্যান্যের মধ্যে কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্[illegible] চাঁদার পরিমাণ হ্রাস করিয়া চারি আনা [illegible] সক্রিয় সদস্যদের জন্য অতিরিক্ত এক টাকা ধা[illegible] করেন। এতদ্ব্যতীত কমিটি প্রদেশ ও জে[illegible] কংগ্রেস কমিটিগুলির পুনর্গঠন করিয়া কংগ্রে[illegible] নূতন যুবশক্তি আকৃষ্ট করিবার এবং অধিক[illegible] গণ-সংযোগের জন্য জেলা কমিটির নী[illegible] সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্রগুলির ভিত্তিতে অন[illegible] ৩০টি গ্রাম লইয়া একটি করিয়া 'মণ্ডলী' গ[illegible] করিবার সিদ্ধান্ত করেন।

বিদেশী সংবাদ

১৮ই মার্চ—মিশরের ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্র মন্[illegible] সিরাগ এলদীন পাশা এবং সমাজকল্যাণ ম[illegible] আবেদল ফতে হাসান পাশাকে রাষ্ট্রের নিরাপত্[illegible] জন্য স্বগৃহে অন্তরীণ করা হইয়াছে।

২০শে মার্চ—কৃষ্ণাঙ্গ ভোটদাতাদের [illegible] স্বতন্ত্র তালিকায় সন্নিবিষ্ট করার জন্য দক্ষি[illegible] আফ্রিকা সরকার যে আইন প্রণয়ন করিয়াছিলে[illegible] দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রী[illegible] কোর্টের আপীল বিভাগ অদ্য তাহা অ[illegible] বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

২১শে মার্চ—অদ্য মিশরের প্রধান মন্[illegible] হিলালী পাশা ঘোষণা করেন যে, তাঁহ[illegible] গভর্নমেণ্ট বৃটিশ সৈন্য অপসারণ ও নীল[illegible] উপত্যকার সহিত মিশরের জাতীয় দাব[illegible] কোনরূপ পরিবর্তন করিবে না।

২২শে মার্চ—অদ্য সিংহলের প্রধান ম[illegible] ডন স্টিফেন সেনানায়ক ৬৮ বৎসর বয়[illegible] পরলোকগমন করিয়াছেন।

ভারতীয় মুদ্রা: প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক— ১০,
পাকিস্থান মুদ্রা: প্রতি সংখ্যা (পাক্) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক— ১০, (পাক্)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

নবিংশ বর্ষ] শনিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৩৫৮ সাল। Saturday, 5th April, 1952. [২৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গ্রেসী দলের নেতৃত্ব

পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত বিধান সভার গ্রেস সদস্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে ডাক্তার ানচন্দ্র রায় নূতন বিধান সভায় কংগ্রেস নর নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেসী নর সিদ্ধান্ত যে এইরূপ দাঁড়াইবে, ইহা র্ব হইতেই ধরিয়া লওয়া গিয়াছিল। তরাং অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে নাই। ধিকন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন প্রতিবেশই ানে সৃষ্টি হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের গ্রেস দল তাঁহাদের মধ্যে যোগ্যতম ক্তির উপরেই নেতৃত্বের দায়িত্ব এবং াঁদা অর্পণ করিয়াছেন। বস্তুত ক্তার রায়ের ন্যায় শাসনকুশল ূদর্শী ব্যক্তি কংগ্রেস দলে আর বতীয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-রিচালিত শাসনকার্যের উন্নতি বা অবনতি, ফলতা-বিফলতা, সব কিছুর জন্য প্রধান ায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে ডাক্তার রায়ের উপরেই র্বত আসিয়া বর্তিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ম্মুখে সমস্যা এখনও জটিল। এই সমস্যা-র্ণ প্রদেশের জন-জীবনে কল্যাণ সৃষ্টির ৃহৎ দায়িত্ব এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস লকেও দেশসেবার কার্যে যোগ্য করিয়া ুলিবার কর্তব্য ডাক্তার রায় কিভাবে নির্বাহ রেন, তাহার উপরেই আগামী পাঁচ ৎসরের পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য নির্ভর রিতেছে। নেতা নির্বাচিত হইবার পর াক্তার রায় সাংবাদিকগণের অনুরোধের ত্তরে বিভিন্ন উৎপাদন পরি-ল্পনা কার্যে পরিণত করিবার ায়িত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বিধান ভা এবং বিধান পরিষদের সদস্যগণ এই কাজে তাঁহার সহযোগিতা করিবেন, ইহাই তিনি আশা করেন। রাজনীতির খেলার গতি জটিল এবং কুটিল; বিশেষভাবে পদ, মান ও প্রতিষ্ঠার লালসার দ্বন্দ্ব এবং বিক্ষোভ ঘটনার গতি কোন্ দিকে লইয়া যাইবে বলা যায় না। এই দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রি-সভা গঠনের সংকটজনক পর্ব এখনও সম্মুখে রহিয়াছে। সতীর্থগণের লোলুপতার দ্বন্দ্ব সংযত করিয়া ডাক্তার রায় কিভাবে এবং কি ধরণের যোগ্য ব্যক্তিদিগকে লইয়া মন্ত্রি-সভা গঠন করেন এবং দেশসেবার বৃহত্তর আদর্শ বিধান সভার কাজে উজ্জীবিত, পরন্তু সকলের সহযোগিতায় সংহত করিয়া তুলিতে সমর্থ হন, তাঁহার উপরেই ডাক্তার রায়ের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। প্রত্যুত অতীতের অপেক্ষা আসন্ন ভবিষ্যতে এই সফলতা জটিলতর হইয়া উঠিবে, এমন আশঙ্কার কারণ আছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গের একদল কংগ্রেসকর্মীর মধ্যে অসন্তোষের ভাব ইহার মধ্যেই জমিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে কাজ না করিয়া কথার বিতণ্ডা বাড়াইয়া তুলিলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের কার্যে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে বলিয়াই মনে হয়। দেশের লোকে আজ কাজ চায়, নেতাদের মধ্যে ঝগড়ার ব্যাপারে তাহারা সত্যই বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ব্যক্তি ও জাতির স্বার্থ

ভারতীয় বণিক-সভার রজত-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করিতে গিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু শিল্পপতিদিগকে সেদিন কয়েকটি স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। বণিক-সভার সভাপতি-স্বরূপে শ্রীযুত সি এস কোঠারী এক অদ্ভুত দাবী উপস্থিত করেন। তাঁহার মতে শিল্পপতিগণের ব্যক্তিগত বিবেচনা এবং তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিবার অধিকারে হস্তক্ষেপ করিলে গণতান্ত্রিক অধিকারকেই ব্যাহত করা হয়। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, যে যাহা খুশি তাহাই করিতে পারিবে, ইহাতেই গণ-তন্ত্রের মর্যাদা। বস্তুত কোঠারী মহাশয় ব্যক্তিগত বিবেকের মোড়কে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রবৃত্তিকেই প্রশ্রয় দিতে হইবে, এই অসঙ্গত আবদার উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু এমন ধাপ্পাবাজী চালাইবার দিন যে আর নাই, এ-সত্য কোঠারী মহাশয়ের উপলব্ধি করা উচিত ছিল। জাতির স্বার্থ যখন বিপন্ন হয়, তখন শিল্পপতিদের বিবেক কোন্ গতি অবলম্বন করে, আমাদের তাহা বুঝিতে বাকী নাই। ফলত দেশের দুর্দশাকে সুযোগস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তখন অন্যায়ের দ্বারা অর্থ সঞ্চয়কেই বড় বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। বিবেক বস্তুটি তাঁহাদের এমনই বিচিত্র যে, তাহা সর্বদাই জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে চলে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শিল্পপতিদের এই ধরণের আবদার মানিয়া লইতে অস্বীকৃত

হইয়াছেন। তিনি সোজা কথায় বলিয়া দিয়াছেন যে, দেশের জনসাধারণের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করিয়া ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার অধিকারের স্থান বর্তমানে ভারতে হইবে না। অধিকন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ামকগণ যখন এ পথে তাঁহাদের নীতি পরিচালিত করিবার ফিকির অবলম্বন করিতে উদ্যত হইবেন, তখনই তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টাকে সমূলে উৎখাত করা হইবে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন, ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার অধিকারের পবিত্রতা তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। কারণ সে অধিকার দেশের উন্নতি সাধনের পথেই যে সব সময় প্রযুক্ত হইয়াছে, এমন কথা কেহই বলিবে না। অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়ের পথে জনসাধারণের স্বার্থশোষণের উদ্দেশ্যে এই অধিকার প্রযুক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল কানপুরের শ্রমিক বসতিগুলির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কানপুরের এই সব বসতিগুলি প্রথমে পোড়াইয়া দেওয়া উচিত। কানপুরের মিলগুলি যদি বন্ধ হইয়া যায়, তাহাও ভাল; কিন্তু মানুষকে যাহারা এইরূপ জঘন্য অবস্থার মধ্যে রাখে, তাহাদের হৃদয়হীনতা বরদাস্ত করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। পণ্ডিত জওহরলালের বেদনার গভীরত্ব অনেকেই উপলব্ধি করিবেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভারতেও অর্থনৈতিক এমন বৈষম্য সমানভাবেই চলিতেছে এবং শিল্পপতিরা নিজেদের স্বার্থকেই বড় বলিয়া বুঝিতেছেন। সম্প্রতি জিনিসপত্রের দর কমিবার দিকে একটু ঝোঁক দেখা দেওয়া মাত্র তাঁহারা আর্তনাদ উপস্থিত করেন এবং বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহাদের এই আর্তনাদে ইহার মধ্যেই ভারত সরকারের মতিগতি কিছুটা টলিয়াও পড়ে। বস্ত্রের রপ্তানি শুল্ক রহিত করা হয় এবং কণ্ট্রোলও অনেকটা তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু শিল্পপতিরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা দ্রব্যমূল্য হ্রাসের গতি রোধ করিবার জন্য ক্রমাগত জিগীর তুলিতেছেন এবং সে কার্য যদি সরকার না করেন তবে সর্বনাশ ঘটিবে, ইহা বুঝাইতে প্রবৃত্ত আছেন। জনসাধারণের মনে নূতন আশা এবং উদ্যম জাগাইবার জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী শিল্পপতিদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু সেজন্য গরজ শিল্পপতিদের থাকিতে পারে না এবং সে বস্তু তাঁহাদের নিকট হইতে আশা করাও উচিত নয়। কই, কালাবাজারী এবং মুনাফাশিকারীদের বিরুদ্ধে বণিকসভার সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে একটা কথাও তো বলেন নাই। বস্তুত সুদীর্ঘকাল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন প্রগতিবিরোধীভাবে ব্যক্তি-স্বার্থকে তুষ্ট এবং পুষ্ট করিয়া এখানে নিজেদের ঘাটি কায়েম করিয়াছে। ইহার ফলে শিল্পপতিদের দ্বারা জনসাধারণ নির্মমভাবে শোষিত হইয়াছে। জোড়াতালি দিয়া এই অবস্থার প্রতিকার সাধন করা সম্ভব হইবে না। স্বাধীন ভারতে জনগণের স্বার্থকে যদি অক্ষুণ্ন রাখিতে হয়, তাহা হইলে জাতির আর্থিক এবং সমাজ-জীবন হইতে স্বার্থকেন্দ্রিক এই সব ঘাটিগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে এবং সেজন্য সরকার পক্ষ হইতে সঙ্কল্পশীলতার সঙ্গে বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বিত হওয়াই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ববঙ্গে পারমিট প্রথা

বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষাস্বরূপে গণ্য করিবার আন্দোলনকে পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ কেন আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এই আন্দোলন যাহাতে সমূলে উৎখাত হয়, তাঁহারা অন্তরে অন্তরে ইহাই কামনা করেন। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের ভাষা বাঙলা এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বাঙলা ভাষায় কথা বলে, এই অপরাধে বাঙলা ভাষাকে বরবাদ করিতেই হইবে। নতুবা দ্বিজাতি-তত্ত্বের নীতিকে চাঙ্গা করিয়া রাখা যায় না, এবং ঐশ্লামিক রাষ্ট্রের ঘোঁটও পাকা হয় না। সুতরাং বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষাস্বরূপে গণ্য করিবার জন্য যাঁহারা দাবী করিতেছেন, পাকিস্থানকে ধ্বংস করিবার অভিসন্ধি তাঁহাদের মনের কোণে রহিয়াছে। এই সব পাকিস্থানের কর্তাদের যুক্তি! এ-কাজে পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রেরণা আসিতেছে এমন কথাও আমরা শুনিয়াছি। এখন আবার নূতন ধুয়া তোলা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গে কম্যুনিস্ট দল অনুপ্রবেশ করিতেছে, এই কথা তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং এই অনুপ্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য পূর্ববঙ্গে প্রবেশে পারমিট প্রথা প্রবর্তনের বিধান করিবার সম্বন্ধে বিবেচনা করার কথা উঠিয়াছে। গত ২৬শে মার্চ করাচীর পার্লামেণ্টে পাকিস্থানের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ এম গুরমানী এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের সঙ্গে যাঁহাদের সংস্রব নাই, প্রস্তাবিত পারমিট-ব্যবস্থায় তাঁহাদের কোনই অসুবিধা হইবে না। কিন্তু পারমিট প্রথা প্রবর্তনের ফলে পশ্চিম পাকিস্থানের গতিবিধি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে কি দুর্ভোগ পোহাইতে হইতেছে; তাহা সকলেই জানেন। বাস্তবিক-পক্ষে পারমিট প্রথা প্রবর্তিত হইলে সরকারী কাজ কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে যাঁহাদিগকে উভয় বঙ্গের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতে হয়, তাঁহারা এই বিষম সঙ্কটের মধ্যে পড়িবেন। হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করিতে গেলেই পাকিস্থানের কর্তাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইবে এবং তাঁহারা তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহীস্বরূপে গণ্য করিতে উদ্যত হইবেন। পূর্ববঙ্গে যাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন আছেন তাঁহারা নিতান্ত প্রয়োজনেও সেখানে যাইতে পারিবেন না। তাঁহাদের সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত করিবার সব চেষ্টাকেও সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হইবে। প্রত্যুত উভয় বঙ্গের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ উদ্যম দিল্লী চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী এবং পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভেদ-বিভেদের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে সর্বপ্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকারের ক্ষেত্রে ত্যজ্য করিয়া তুলিবারই কৌশল। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থার এইরূপ গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সেদিন পাকিস্থান পার্লামেণ্টে পূর্ববঙ্গের সদস্য শ্রীযুত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এই প্রশ্ন করেন যে, "পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক কোটি লোককে সব সময় নিরাপত্তা-হীনতা, অনিশ্চয়তা এবং অসহায়ত্বের উদ্বেগের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া সার্থকতা কি? ইসলামিক রাষ্ট্রে হিন্দুরা অবাঞ্ছিত সোজাসুজি এই কথাটাই বলিয়া দিলেই হয়।" শ্রীযুক্ত দত্ত আদর্শনিষ্ঠ এবং মনোবলসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার উক্তির গুরুত্ব ব্রিটিশ সরকার একদিন ভালভাবেই বুঝিতেন। সেই সূত্রে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেবও নিশ্চয়ই কিছুটা অবগত আছেন। কিন্তু পাকিস্থানের নায়কগণ কথায় যাহা বলেন, কাজে অন্যরকম আচরণ করেন, এই সত্যটি শ্রীযুত দত্তের এতদিনে উপলব্ধি করা উচিত ছিল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত প্রশ্নেই এ সত্যটি সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী বাংলা ভাষার দাবীকে কথায় মানিয়াই

াছেন; কিন্তু কাজে সেই দাবীকে : করিবার নীতিই তিনি অবলম্বন য়াছেন। পূর্ববঙ্গের জন-জীবনে ান্ত্রিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার না, যত দিন পর্যন্ত মধ্যযুগীয় কার হইতে মুক্ত হইয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, তত দিন এই অবস্থাই চলিবে : পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্থানের ত্ব এবং আভিজাত্যের চাপে অভিভূত তে হইবে।

মানের আস্পর্ধা

পূর্ববঙ্গের এগারজন বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রতি বাঙলা ভাষাকে পাকিস্থানের ্যতম রাষ্ট্রভাষাস্বরূপে গণ্য করিবার দাবী র্থন করিয়া একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া-ন। পশ্চিম পাকিস্থানের কয়েকখানি াদপত্র পূর্ববঙ্গে যাঁহারা এই আন্দোলন রিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে রাষ্ট্র-রোধী এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতি শ্বাসহন্তা বলিয়া আক্রমণ করিতেছেন, াহাদের উক্তির প্রতিবাদ করাই পূর্ববঙ্গের াংবাদিকদের বিবৃতির প্রধান উদ্দেশ্য। াংবাদিকগণ এই অভিমত প্রকাশ করিয়া-ছন যে, পশ্চিম পাকিস্থানের ঐ সব ংবাদপত্রের সম্পাদকেরা বাঙলা ভাষা ম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ বলিয়াই তাঁহাদের ুখে এই ধরণের কথা শোনা যাইতেছে; কন্তু নিজেদের অজ্ঞতার জন্য পূর্ববঙ্গের জনসাধারণকে অপমান করিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। বস্তুতঃ পশ্চিম পাকিস্থানের সম্পাদকেরা অনেকেই যে বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। বাঙলা ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা, ইহাই নাকি তাঁহাদের বাঙলা ভাষার বিরুদ্ধে উত্তেজনার প্রধান কারণ! বঙ্কিমচন্দ্র পশ্চিম পাকিস্থানের এই সব ভদ্রলোকের কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, আমরা জানি না; তবে একথা সত্য যে, বিদেশীর পরাধীনতাকে উৎখাত করিবার অগ্নিময় প্রেরণা তিনি বাঙলা ভাষার ভিতর দিয়া এদেশের সংস্কৃতিতে সঞ্চার করিয়াছেন। পাকিস্থানের সংস্কৃতিতে এমন প্রেরণার মর্যাদার হয়ত কোন প্রয়োজন নাই; কারণ, পরমুখাপেক্ষিতার প্রবৃত্তির পথেই পাকিস্থান সংগঠিত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্থানের এই শ্রেণীর সম্পাদকগণের বোঝা উচিত ছিল যে, বাঙলা ভাষা শুধু হিন্দুরাই গড়িয়া তোলে নাই। এই ভাষার সমৃদ্ধির মূলে মুসলমান সমাজের সাধক, কবি, সাহিত্যিক এবং মনীষীদের অবদান অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। পরন্তু উর্দুর সঙ্গে বাঙলা ভাষার মৌলিক কোন বিরোধ নাই, বস্তুত উর্দু ভাষার অনেক শব্দ বাঙলা শব্দকোষকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু আমরা ব্যাপারটি ঠিক এইভাবে দেখিতেছি না। আমাদের মতে পশ্চিম পাকিস্থানের সম্পাদকদের এক্ষেত্রে প্রধানত দোষী করা যায় না। ফলত পূর্ব-পাকিস্থানের শাসন-নীতির নিয়ন্তৃগণ এজন্য দায়ী এবং তাঁহারাই পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের উপর অপমানের ভার আনিয়া চাপাইতেছেন। বাঙলা ভাষার জন্য আন্দোলন, রাষ্ট্রবিরোধী প্রচেষ্টা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহই পশ্চিম পাকিস্থানের সম্পাদকগণের মনে উত্তেজনার কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। এই সম্পর্কে হিন্দু সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে নিতান্ত অকারণে আটক করিবার ফলে পশ্চিম পাকিস্থানীদের মনে অন্ধ উত্তেজনার আবেগ এমন করিয়া চাড়া দিয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ যদি নিজেদের মর্যাদা নিজেরা ক্ষুণ্ন না করেন, তবে কেহ যে তাঁহাদিগকে অপমান করিতে পারিবে, আমাদের ইহা মনে হয় না। বস্তুত সাম্প্রদায়িকতার একটা মস্ত আকর্ষণ আছে এবং সে সংস্কার বিচারবুদ্ধিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকার এই সত্যটি সার বুঝিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদেরই চাপে পূর্ববঙ্গের শাসকদের নীতি নিয়ন্ত্রিত হইতে চলিয়াছে। এ অবস্থায় পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ যদি সাম্প্রদায়িক মোহে কিছুতেই বিভ্রান্ত না হন, তবেই তাঁহাদের দাবী জয়যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু আত্মমর্যাদার বুদ্ধিটিকে সাম্প্রদায়িক নীতির কূটচক্রের আবর্তের মধ্যে স্বচ্ছ রাখা সহজ ব্যাপার নয়; পরন্তু যাঁহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাদেরও যে মত ঘুরিতে বিলম্ব ঘটে না, এ সম্বন্ধে অতীতের অভিজ্ঞতা যথেষ্টই আমাদের আছে। বাস্তবিকপক্ষে পূর্ব-বঙ্গের জনমতকে যদি সত্যই প্রতিষ্ঠা দিতে হয়, তবে পথের অনেক বাধা এখনও অতিক্রম করিতে হইবে।

শান্তি ও সংস্কৃতি

কলিকাতা শহরে নিখিল ভারত শান্তি ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রাশিয়া, চীন, তুরস্ক এবং পূর্ব পাকিস্থানের কয়েকজন প্রতি-নিধিও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সংস্কৃতির পথে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে প্রচেষ্টা চালানোই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল। সম্মেলনের ফলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ কতটা প্রশস্ত হইবে আমরা বলিতে পারি না। কারণ, রাষ্ট্র-নৈতিক গতির কূটপথে বিশ্বের সর্বত্র হিংসা ও বিদ্বেষের বিষ যেমন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে, তাহাতে সংস্কৃতির মূলীভূত রস উপলব্ধির আগ্রহ মানুষের মন হইতে উবিয়া যাইতেছে। সংস্কৃতির দিকটা অনেকটা বাহ্য বস্তু হইয়া দাঁড়াইতেছে। ফলত বাহিরের প্রয়োজনের বিচার এতটা বড় হইয়া পড়িতেছে যে, মনের দিকে তাকাইবার অবসর মানুষের আর নাই। মনের মূলের রসের ব্যাপ্তি অনুভূতিই প্রকৃত সংস্কৃতির ভিত্তি। দেশ এবং জাতির ভৌগোলিক ব্যবধানকে বিলুপ্ত করিয়া পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার একটি বৃহত্তর প্রতিবেশ গড়িয়া তোলাই সংস্কৃতির উদ্দেশ্য। কিন্তু সে বস্তু জমিয়া উঠিতেছে না। আমাদের নিজেদের দেশের কথাই এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। গণতান্ত্রিকতার তত্ত্বকথা শুনিতে আমরা এখন অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু অর্থ-নীতিক একটা বাহ্য বিচারের সাড়া ছাড়া জন-জীবনের সঙ্গে একান্ত আত্মীয়তার বোধ বর্তমান সমাজ-সাধনায় ধরা পড়িতেছে না। বাস্তবিক পক্ষে সংস্কৃতি জনকয়েকের সৌখীন মনের বিলাসমাত্রেই পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে। দেশের লোকের মনের সঙ্গে তথাকথিত সংস্কৃতি অন্তরের যোগ ঘটাইতে সমর্থ হইতেছে না। সংস্কৃতির সঙ্গে শান্তির সম্পর্ক স্বভাবতঃই অবিচ্ছেদ্য; কিন্তু নৈতিক শক্তির উদ্বোধন সাধনে সংস্কৃতি যদি প্রেরণা সঞ্চার করিতে না পারে, তবে সংস্কৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত চেতনা কোনক্রমেই বর্তে না এবং শান্তির উপযোগী প্রতিবেশটিও বাড়ে না। নৈতিক শক্তি বলিতে আমরা এক্ষেত্রে সমাজ-জীবনে একটি সংযত সৌষ্ঠব এবং সমন্বয় সাধনের উপযোগী রসবস্তুর উন্মেষই বুঝাইতেছি। বস্তুতঃ এই বস্তুটি বাহির হইতে আনিয়া আরোপ করা যায় না; কিংবা পরানুকরণের পথে তাজা করিয়া তোলাও সম্ভব নয়।

দুটি শূন্য কাপ

গোবিন্দ চক্রবর্তী

যখন ছুটেছে ট্রেন একটানা আর্তনাদ ক'রে—
চাকায় চাকায় ঝড়
চূর্ণিত প্রহর ঃ
দূরের পাহাড়ে বুনো জ্যোৎস্না গেছে মরে;
তুমি এলে স'রে—
অকস্মাৎ
হাতে রেখে হাত
একটি অবাক স্বর্গ দিলে মুঠি ভ'রে।

যাত্রীরা গিয়েছে নেমে।
মৃদু মৃদু ঘেমে
হাতের পাখাটা তুমি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
জ'মে-ওঠা নির্জনতা একটু গুঁড়িয়ে
দিতেছিলে; সব গল্প নিঃশেষে ফুরিয়ে
চায়ের আসর শেষে, আমি ত' ছিলাম চুপচাপ
তোমার কাপের পাশে রেখে শূন্য কাপ।

দুই কুচি মেঘে
কি ক'রে যে ছোঁয়া লেগে
এল গ'লে অকস্মাৎ এক ফোঁটা জল ঃ
একটি বিদ্যুৎ নীল, অস্থির-চঞ্চল
ছট্‌ফটে গেল এঁকেবেঁকে—
জীবনের সীমাহীন অন্ধকার থেকে
হৃদয়ের দুই প্রান্ত কি-যাদুতে হ'লো কাছাকাছি—
যেন দু'টি সোনালী মৌমাছি।

তারপর শেষরাতে থেমে গেলে ট্রেন—
ঃ আপনি এখানে নামবেন ?
দু'পারে দাঁড়িয়ে দরজার
বিনিময় নমস্কার
আমি নিই বিস্মিত বিদায়।
তুমি যাবে আরেকটু বা দূরেই কোথায়!

ভোরের দিগন্ত বেয়ে
তারও পরে যাবে ট্রেন আরো দূরে চ'লে—
দু'টি শূন্য কাপ শুধু
মুখোমুখি রবে চেয়ে মূক কুতূহলে।

নিসিয়া

ফরাসীরা সহজে টিউনিসিয়ায় ফরাসী পনিবেশিক রাজত্বের অবসান ঘটতে দেবে । ফরাসী গভর্নমেণ্ট টিউনিসিয়ার ধীনতা আন্দোলনের টুঁটি চেপে রাখার রদস্ত নীতি চালিয়ে যেতেই কৃতসঙ্কল্প য়েছেন দেখা যাচ্ছে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে টিউনিসিয়ার ফরাসী "Protectorate" তিষ্ঠিত হয়। নামে একজন আরবজাতীয় জা আছেন, তাঁর উপাধি হচ্ছে "বে"। ন্তু আসলে সমস্ত ক্ষমতা হোল ফরাসী রসিডেণ্ট জেনারেলের" হাতে। "বে"র কটি মন্ত্রিমণ্ডলী আছে, একজন "প্রধান ন্ত্রী"ও আছেন। গত যুদ্ধের পর থেকে টিউনিসিয়ায় জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোনের শক্তি বিশেষভাবে বাড়তে থাকে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ক্তিরাও কেউ কেউ মন্ত্রিমণ্ডলীতে স্থান ন। কিন্তু ফরাসী গভর্নমেণ্ট টিউনিসিয়ার স্বাধীনতার দাবী কিছুতেই মানতে চান না। লে দেশের মধ্যে গণআন্দোলন ফরাসী সেনের বিরুদ্ধে ক্রমশ সক্রিয় বিরোধের রূপ নতে আরম্ভ করে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ পুলিশ ও সৈন্য দিয়ে সেটা নৃশংসভাবে মন করার চেষ্টা করতে থাকেন। টিউনিসিয়ানদের পক্ষ থেকে ফরাসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইউনোতে অভিযোগ উপস্থিত করার চেষ্টা হয়। ফরাসী গভর্নমেণ্ট সে চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন এবং সঙ্গে সঙ্গে টিউনিসিয়াতে দমননীতি আরো জোরে চালাতে থাকেন।

সম্প্রতি ফরাসী জবরদস্তি চরমে উঠেছে। প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ চেনিক ও অপর দুজন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে তাদের এক অজ্ঞাত কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং "বে"কে দিয়ে একজন নূতন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করানো হয়েছে। বর্তমান "বে"র পরে টিউনিসিয়ার প্রথা অনুযায়ী যিনি "বে"র গদির অধিকারী হবেন, তাঁর পুত্র প্যারিসে ছিলেন। ফরাসীরা তাঁকে হঠাৎ টিউনিস এ নিয়ে আসে এবং "[illegible] সমঝিয়ে দেয় যে, যদি তিনি ফরাসী [illegible] মেণ্টের নির্দেশমত কাজ না করেন, [illegible] গদিচ্যুত পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা [illegible] "বে" ভয়ে ভয়ে ফরাসী রেসিডেণ্ট [illegible] যে হুকুম করছেন তাই পালন [illegible] ফরাসী গভর্নমেণ্টের বক্তব্য যে [illegible] মন্ত্রিমণ্ডলী অশান্তি দমনের [illegible] ছিলেন না। পূর্ববর্তী [illegible] জাতীয় স্বাধীনতা দাবী [illegible] ছিলেন,

তাছাড়া তাঁরা ইউনোতে টিউনিসিয়ায় ফরাসী অত্যাচার সম্বন্ধে অভিযোগ উত্থাপন করানোর চেষ্টা করছিলেন, সেটা ফরাসীচক্ষে একটা মস্তবড় অপরাধ হয়েছে। ফরাসীরা টিউনিসিয়াতে এই রকম একটি মন্ত্রিমণ্ডলী চায় যাঁরা ফরাসীদের সঙ্গে ফরাসীদের ইচ্ছানুযায়ী আপোষের কথাবার্তা চালাতে রাজী হবেন, অর্থাৎ যাঁরা স্বাধীনতার দাবী ত্যাগ করে আপাতত এক কিস্তি "স্বায়ত্তশাসন" নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন। ফরাসী গভর্নমেণ্ট টিউনিসিয়াতে স্বাধীনতার পরিবর্তে কতকগুলি শাসনসংস্কারের প্রস্তাব করেছেন। ফরাসী-ইচ্ছানুযায়ী নিযুক্ত টিউনিসিয়ার নূতন মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা সেইগুলির অনুমোদন করিয়ে নিতে ফরাসীদের বেশি বেগ পেতে হবে না। ইতিমধ্যে জনসাধারণ ও জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঠাণ্ডা করার জন্য সামরিক আইন বলবৎ থাকবে। এই হোল মোটামুটি ফরাসী গভর্নমেণ্টের কার্যসূচী। ফ্রান্সের সকল দলই যে এই কার্যসূচী সমান পছন্দ করছে তা নয়, কিন্তু টিউনিসিয়ার ফরাসী ঔপনিবেশিক সমাজের চাপ অগ্রাহ্য করার শক্তি কারো হচ্ছে না। টিউনিসিয়াবাসী ফরাসী সমাজের ইচ্ছা ও জিদের বিরুদ্ধে প্যারিস গভর্নমেণ্ট যেতে পারছেন না, যেতে চানও না। টিউনিসিয়াকে স্বাধীনতা দিলে সেখানে ফরাসী ঔপনিবেশিক শোষণের পথে বাধা সৃষ্টি হবে। সুতরাং কিছুতেই টিউনিসিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে না—এই হোল ফরাসী ঔপনিবেশিকদের পণ এবং এই পণ রক্ষার জন্য প্যারিস গভর্নমেণ্ট বন্দুক, কামান, বোমা সমস্তই ব্যবহার করতে রাজী আছেন এবং করছেন।

ফরাসীরা যখন আপোষের কথা বলে সেটা সত্যকারের স্বাধীনতার ভিত্তিতে আপোষের কথা নয়। এই সম্পর্কে ইন্দোচীনে ফরাসীদের ব্যবহারের কথা স্বতই মনে পড়ে যায়। অবশ্য ইন্দোচীনের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্তির সঙ্গে টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের বর্তমান শক্তির ঠিক তুলনা হয় না। দুই দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও ভিন্ন রকমের। তবে সেখানেও ভিয়েৎমিনএর সঙ্গে আপোষ না করে বাও দাইকে খাড়া করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পিছনে প্রধানত ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থগোষ্ঠীর প্রেরণা ও চাপ। পরে অবশ্য বিশ্বব্যাপী কম্যুনিস্ট প্রতিরোধের অঙ্গীভূত বলে ইন্দোচীনের যুদ্ধের গুরুত্ব প্রচারিত হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ফ্রান্সকে যে অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় স্বীকার করতে হচ্ছে সেটা কিরূপ দুঃসহ হয়ে উঠছে তা বৈদেশিকীর স্তম্ভে পূর্বে দু একবার আলোচিত হয়েছে। কিন্তু ভার যতই দুর্বহ হোক, ফ্রান্স সেটা নামাতে পারছে না। টিউনিসিয়া তো আরও ঘরের কাছে, টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা হলে যাদের স্বার্থ বিপন্ন হবে, তাদের চাপ আরও বেশি। সুতরাং ইন্দোচীনের চেয়ে টিউনিসিয়ার অবস্থা বেশি নৈরাশ্যজনক, বিশেষত ফরাসীরা জানে যে ইন্দোচীনের মতো লড়াই করার শক্তি বর্তমান টিউনিসিয়ার নেই, সুতরাং টিউনিসিয়াকে দাবিয়ে রাখার ব্যয় সেই তুলনায় খুবই কম হবে। চীন ঘরের কাছে থাকায় ভিয়েৎমিনএর পক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সহজ হয়েছে। টিউনিসিয়ার কাছাকাছি তেমন কেউ নেই এবং টিউনিসিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থাও এমন নয় যাতে টিউনিসিয়ান জাতীয়তাবাদীরা ভিয়েৎমিনের মতো একটা লড়াইয়ের আয়োজন করতে পারে। অন্যপক্ষে আবার ভিয়েৎমিন কম্যুনিস্ট সাহায্যপুষ্ট বলে তার বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের যে বিশেষভাব রয়েছে, টিউনিসিয়ার ক্ষেত্রে সেটা নেই, যদিও ফরাসী কর্তৃপক্ষ টিউনিসিয়ার সাম্প্রতিক গোলমালের সঙ্গে কম্যুনিস্ট যোগাযোগের কথাও প্রচার করছেন। যাই হোক, কম্যুনিস্ট শক্তি বৃদ্ধির ভয় দেখিয়ে টিউনিসিয়ার স্বাধীনতার দাবীর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য আমেরিকার কাছেও বোধহয় খুব সফল হবে না।

তবে ফ্রান্সও যে সহজে তার হাতের মুঠো খুলবে তা মনে হয় না। টিউনিসিয়ার লাগাও দেশ লিবিয়াতে বৃটিশ অভিভাবকত্ব ও রক্ষাব্যবস্থার আড়ালে যেমন স্বাধীনতা স্থগিত হয়েছে দু পাঁচ বছর টানাহেঁচড়া করে ফরাসী অভিভাবকত্ব ও রক্ষাব্যবস্থার আড়ালে টিউনিসিয়াকেও সেই রকমের স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব হয়ত ভবিষ্যতে শুনা যাবে। ইতিমধ্যে ফ্রান্সকে জোর করে বৃটেন বা আমেরিকা কিছু বলবে না। ফ্রান্স বলতে পারে যে, সম্প্রতি বৃটেন মিশরে যে ধরণের কর্ম ও কূটনীতি অনুসরণ করেছে, ফ্রান্স টিউনিসিয়াতে তারই অনুকরণ মাত্র করেন।

৩০।৩।৫২

বিদেশীদের সম্বন্ধে ভারতীয়ের কৌতূহল কম। কলকাতায় বিস্তর চীনা থাকে; আমি আজ পর্যন্ত একজন বাঙালীকেও দেখিনি, যিনি উৎসাহী হয়ে চীনাদের সঙ্গে আলাপচারি করেছেন। মাত্র একটি বাঙালী চিনি, যিনি ছেলেবেলা থেকে কাবুলীওয়ালাদের সঙ্গে ভাব করে দোস্ত জমিয়েছিলেন—কাবুলীরা এখন এদেশে দুর্লভ হয়ে যাওয়াতে তাঁর আর শোকের অন্ত নেই।

য়ুরোপীয়রা সংস্কৃত যে রকম পড়ে, আরবী চীনা ভাষারও তেমনি চর্চা করে। তাই আমার মনে সব সময়েই আশ্চর্য বোধ হয়েছে যে, ভারতীয় সম্বন্ধে তাদের কৌতূহল সবচেয়ে বেশি কেন?

পিটকে জিজ্ঞেস করাতে সে বললে, 'পণ্ডিতেরা কেন ভারতপ্রেমী হন, সে কথা আমরা বলতে পারবো না, তবে আমার মত পাঁচজন সাধারণ লোকের কথা কিছু বলতে পারি।

'প্রাচ্যের তিন ভূখণ্ডের সঙ্গে আমাদের কিছুটা পরিচয় হয়েছে। ভারত, আরবভূমি আর চীন। তুর্কদেরও আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, কিন্তু তারা অনেকখানি ইউরোপীয় হয়ে গিয়েছে, আর তিব্বত সম্বন্ধে কৌতূহল পুষে আর লাভ কি? তারা তো এদেশে আসে না।

'আরবরা সেমিটি, চীনারা মঙ্গোলীয়। এদের ধরনধারন এত বেশি আলাদা যে, এরা যেন অন্য লোকের প্রাণী বলে মনে হয়। অথচ ভারতীয়রা আর্য—অর্থাৎ আমাদেরই মত পাঁচ-জাতে মেশানো আর্য—তাই তারা চেনা হয়েও অচেনা। এই ধরুন না, যখন চীনা বা আরব ফরাসী-জর্মন বলে, তখন কেমন যেন মনে হয় ভিন্ন যন্ত্র বাজছে। অথচ ভারতীয়রা যখন ঐ ভাষাগুলোই বলে তখন মনে হয় একই যন্ত্র বাজছে, শুধু ঠিকমত বাঁধা হয়নি।

'আরেকটা কারণ বোধ হয়, খৃষ্টের পরই মহাপুরুষ বলতে আমরা বুদ্ধদেবের কথাই ভাবি। এখন অবশ্য অনেকখানি মন্দা পড়েছে, কিন্তু এককালে এখানে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে প্রচুর বই বেরিয়েছিল। তার কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক ভগবানে বিশ্বাস হারায়, অথচ একথা জানত না যে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও শুধু যে ধার্মিক জীবনযাপন

করা যায় তাই নয়, ধর্মপত্তনও করা চলে। তাই যখন বুদ্ধের বাণী এদেশে প্রথম প্রথম প্রচার হল, তখন বহু লোক সে বাণীতে যেন হারানো মাণিক ফিরে পেল। কেউ কেউ তো আদমশুমারীর সময় নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে জাহির করল।

'এযুগে গান্ধী পরম বিস্ময়ের বস্তু। অস্ত্রধারণ না করে বিদেশী ডাকুকে তাড়ানো যায় কিনা জানি নে। কিন্তু গান্ধীর প্রচেষ্টাটাই বিশ্বজগৎকে একদম আহাম্মুখ বানিয়ে দিয়েছে। আমি অনেক ধার্মিক ক্রীশ্চানকে চিনি, যাঁরা গান্ধীর নাম শুনলেই ভক্তিতে গদগদ হন। একজন তো বলেন, খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন খৃষ্ট এবং মাত্র একটি লোক সে ধর্ম স্বীকার করেছেন, তিনি গান্ধী।'

ট্রুডে বলেন, 'টেগোরের নাম করলে না।'

পিট বলেন, 'টেগোরকে চেনে এদেশের শিক্ষিত লোক। তার কারণও রয়েছে। এযুগে সাধারণ লোক পড়ে প্রধানত খবরের কাগজ। খবরের কাগজে গান্ধীর কথা দুদিন অন্তর অন্তর বেরয়, কিন্তু টেগোরের কথা বেরয় তিনি যখন এদেশে আসেন।'

ট্রুডে বললে, 'আর বুদ্ধদেবের কথা বুঝি খবরের কাগজে নিত্যি নিত্যি বেরয় না তিনি প্রতি বৎসর এখানে স্কেট করতে আসেন।'

গ্রেটে বলেন, 'ছিঃ, বুদ্ধদেবকে নিয়ে ওরকম হাল্কা কথা কইলে বুদ্ধদেবের দেশের লোক হয়ত ক্ষুণ্ণ হবেন।'

আমি বললুম, 'আদপেই না। আমাদের দেশে দেবতাদের নিয়ে মজার মজার গল্প আছে।'

পিট বললে, 'বুদ্ধদেব যে একশ' বছরের স্টার্ট পেয়ে বসে আছেন।'

ট্রুডে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনাদের ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে যে মজার গল্প আছে, তারই একটা বলুন না।'

আমি 'শিব বেজায়গায় একবার বর দিয়ে যে কি বিপদে পড়েছিলেন, আর শেষটায় বিচক্ষণ নারদ তাকে কি কৌশলে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, সেই গল্পটি বললুম।'

তিনজনই হেসে কুটিকুটি।

ট্রুডে জিজ্ঞেস করলে, 'শিব কি ডাঙর দেবতা?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। তবে কি না তিনি শ্মশানে থাকেন, ভূতের নৃত্য দেখেন, কাপড়-চোপড়ও সব সময় ঠিক থাকে না। দেবতাদের পার্লিমেন্টে সচরাচর যান না।'

সবাই অবাক হয়ে শুধায়, 'তবে তিনি ডাঙর হলেন কি করে?'

এইখানে আমি হামেশাই একটু বিপদে পড়ে যাই। নীলকণ্ঠের বৈরাগ্য যে এদেশের ঘোর সংসারী মনকেও মাঝে মাঝে ব্যাকুল করে তোলে, সেটা ইউরোপীয়রা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। 'আরো চাই', 'আরো চাইয়ের' দেশে 'কিছু না', 'কিছু না'র তত্ত্ব বোঝাই কি প্রকারে? আমি যে বুঝেছি তা-ও নয়।

তবে ইউরোপের সর্বত্রই মেয়েরা হর-পার্বতীর বিয়ের বর্ণনা শুনতে বড় ভালোবাসে। বিশেষ করে যখন বরযাত্রায় বলদের পিঠে শিবকে দেখে সেনা চিৎকার করে তাঁকে খেদিয়ে দেবার জন্যে আদেশ দিলেন, আর যখন শুনলেন তিনিই বর এবং ভিরমি গেলেন—তখন মেয়েরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

আমি তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে উত্তেজনাটা বাড়ানোর জন্যে ধীরে ধীরে একটি সিগ্রেট ধরাই।

'তারপর, তারপর?' সবাই চেঁচায়।

জানি অসম্ভব। তবু তখন একটি ছত্র অনুবাদ করার চেষ্টা করি।

ভৈরব সেদিন তব প্রেতস [illegible] াঁদল রক্ত-আঁখি
দেখে, তব শুভ্রতনু রক্ত [illegible] ুকে রহিয়াছে ঢাকি
প্রাতঃসূ [illegible] চি।
অস্থিমালা গেছে খুলে [illegible] মাধবীবল্লরী মূলে
ভালে মাখা পুষ্পরেণ [illegible] তাভস্ম কোথা
গেছে মুছি।
কৌতুকে হাসেন উমা [illegible] ক লক্ষিয়া
কবি-পানে—
হে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁ [illegible] দরের জয়ধ্বনি গানে
কী [illegible] ন॥

দক্ষিণ ভারতে

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য

(১)

এতদিনকার ভ্রমণ উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এইবার দক্ষিণের ডাক আসিল। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আসনপীঠে সর্বজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিবার জন্য যে সম্মেলন আহূত হইয়াছিল সেই সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ, বিশেষ করিয়া সম্মেলনের সভাপতি বন্ধুবর ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ, অনুরোধ করিলেন আমাকে যোগ দিতে হইবে। প্রতিবন্ধক ছিল; সংবাদপত্রে যাহারা কাজ করে তাহাদের প্রতিবন্ধক থাকাটাই স্বাভাবিক; তথাপি সম্মত হইলাম। শ্রীঅরবিন্দের মানবদেহে অবস্থানকালে তাঁহাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া উঠে নাই, দেখিতে যাইবার উদ্যোগ করিয়াও ঠেকিয়া গিয়াছে; এইবার অন্ততঃ তাঁহার সাধনক্ষেত্র দেখিয়া আসিবার সুযোগ ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না। তাহা ছাড়া দক্ষিণ দেশ দেখিবার আকর্ষণ তো ছিলই। যাওয়া স্থির করিবার পূর্বে জননীকে সমস্ত জানাইয়া অনুমতি লইলাম, বলিলাম এই যাত্রাপ্রসঙ্গে এবার কাবেরীস্নান ও রামেশ্বর-সেতুবন্ধ-দর্শন সারিয়া লইব; আসিবার সময় কাবেরীর জল লইয়া আসিব; মা বলিলেন, 'সেতুবন্ধের মাটি আনিতে ভুলিও না, উহাতে শ্রীরামচন্দ্রের ও সীতাদেবীর পদধূলি রহিয়াছে।' এ তো আমার পক্ষে আনন্দের কথাই।

যাত্রার লক্ষ্য

কাবেরী-স্নান এবং সেতুবন্ধ-রামেশ্বর-দর্শন—এই দুইটি লক্ষ্যে রাখিয়াই যাত্রার প্রারম্ভ। যে পুণ্যতোয়া নদী-সপ্তকের স্মরণ আমাদের সকল ধর্মকার্যের প্রারম্ভিক অঙ্গ তাহাদের মধ্যে গঙ্গা প্রথম এবং কাবেরী সর্বশেষ—সর্বোত্তর হইতে সর্বদক্ষিণ। গঙ্গা গৃহদ্বারে, কাবেরী বহু দূরে। তীর্থযাত্রী হিসাবে প্রত্যেক ভারত-সন্তানের যে চারি ধাম অবশ্য দর্শনীয় তাহাদের মধ্যে সেতুবন্ধ-রামেশ্বরও সর্বদক্ষিণ এবং বহু দূরে। সম্ভবতঃ এইজন্যই এই দুইটির কথা বিশেষভাবে মনে উঠিয়া থাকিবে। ইহার সঙ্গে কন্যাকুমারীর কথাও মনে হইয়াছিল। তবে তাহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল না। দক্ষিণে যাইতেছি। সর্বপ্রান্ত-ভূমিতে যেখানে তিন সমুদ্র সম্মিলিত হইয়া এই পুণ্যভূমির পদমূলে নিত্য অঞ্জলি দিতেছে তাহা দেখিয়া আসিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল বটে। এই উদ্দেশ্য লক্ষ্যে রাখিয়াই দ্রুত ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে; অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ ক্রমশঃ তালিকার সহিত যুক্ত হইয়াছে। পথ চলিতে চলিতে যেমন পথ ফুরায়, তেমন চলিবার আকাঙ্ক্ষাও বাড়ে; ভ্রমণের সাথে সাথে নূতন নূতন ভ্রমণ-কল্পনাও দেখা দেয়।

দ্রুত ঘুরিয়া আসিতে হইবে, বিমান-ভ্রমণ ছাড়া উপায় নাই। নদীয়া সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধনে আহূত হইয়া শনিবার ২১শে এপ্রিল কৃষ্ণনগরে যাইতে হইয়াছিল। ২২শে রবিবার অপরাহ্নে ফিরিয়াই নৈশ-বিমানযোগে দক্ষিণে রওয়ানা হইলাম। বিমানে মাদ্রাজ, তাহার পর মোটরে পণ্ডিচারী। নৈশ-বিমান ভ্রমণে বর্ণনীয় বিশেষ কিছু নাই। আধ-ঘুম, আধ-জাগরণ অবস্থায় ঈষৎ শায়িত অথচ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। অবরুদ্ধ অথচ স্বচ্ছ গবাক্ষ পথে মধ্যে মধ্যে আকাশ দর্শন। নিবিড় অন্ধকারে তারার ঝিকমিকি। মধ্যে মধ্যে উঠিয়া বসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম। পথে নাগপুরে নামিয়া জাহাজ বদল করিতে হইল। নাগপুর নৈশ-বিমান ভ্রমণে কলিকাতা, দিল্লী, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিমানপথের সংযোগ-কেন্দ্র। এই কয়টি স্থান হইতে জাহাজ নাগপুরে আসিয়া একত্র হয় এবং যাত্রীদিগকে জাহাজ বদল করিতে হয়।

বিমান হইতে সূর্যোদয় দর্শন

নাগপুর হইতে মাদ্রাজের জাহাজ ছাড়িল রাত্রি ৩টা—৩॥টায়। তখন হইতে একটু উদগ্রীব হইয়াই বসিয়া রহিলাম। মাদ্রাজ যাইতে সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে হইবে এবং সমুদ্র-সীমায় পৌঁছিতে পৌঁছিতেই ভোর হইয়া আসিবে। সমুদ্রে সূর্যোদয় মনোরম দৃশ্য এবং বহুকাম্য দৃশ্য। বিমান হইতে সমুদ্রে সূর্যোদয় দর্শন অধিকতর কাম্য। বিমান দক্ষিণমুখে চলিতেছে। বামদিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু রাত্রি ভোর হইয়া আসিলেও অরুণোদয়ের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। বরং মনে হইতে লাগিল অন্ধকাররাশি যেন পূর্ব দিক-সীমায় জমাট বাঁধিয়া এক অনন্ত-প্রসারিত বিশাল ও উচ্চ প্রাচীর রচনা করিয়াছে এবং তাহারই ছায়া যেন সমতল ভূমির উপর অনেক দূর প্রসারিত হইয়া আসিয়াছে। ঠিক করিয়া কিছু উপলব্ধি হইতেছিল না ইহা কি। কখনও মনে হইল গিরিমালা, কখনও মনে হইল ঘনসন্নিবদ্ধ তরুশ্রেণী। পরক্ষণেই ভাবিলাম এমন নিবিড় ও সুদূর-প্রসারিত গিরিমালা বা তরুরাজীই বা এখানে কোথা হইতে আসিবে? যাহাই হউক, সমুদ্রবক্ষ হইতে সূর্যোদয় দেখা অদৃষ্টে ঘটিল না। পুঞ্জীভূত অন্ধকার-স্তূপের অন্তরাল হইতে ক্রমশঃ প্রভাতের আলো ছড়াইয়া পড়িল। দেখিলাম, সমুদ্রের উপর দিয়া চলিয়াছি; পূর্ব-দিগন্তে যত দূর দৃষ্টি যায় স্তূপীকৃত কৃষ্ণ মেঘ দিক-সীমায় নামিয়া আসিয়াছে এবং তাহারই ছায়া সমুদ্রবক্ষের উপর প্রসারিত হইয়া তাহাকেও যেন আপনার সহিত এক করিয়া লইয়াছে। আকাশে মেঘের স্তূপ এবং সমুদ্রের জলে প্রসারিত মেঘের ছায়া অন্ধকারের সহিত মিশিয়া এতক্ষণ এমন এক বিচিত্র ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করিয়াছিল—যাহার রহস্য ভেদ করা মানব-দৃষ্টি বা মানব-বুদ্ধির সাধ্য ছিল না। মেঘ-প্রাচীরের অন্তরাল ছাড়াইয়া সূর্যদেব যখন দেখা দিলেন তখন রক্তিমাভা কাটিয়া গিয়াছে।

মাদ্রাজ বিমানঘাটিতে যখন পৌঁছিলাম তখন বেশ একটু বেলা। যাঁহারা লইতে আসিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্থানীয় একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, আর ছিলেন কলিকাতার পূর্বপরিচিত জনৈক বন্ধু। প্রথম

আলাপেই তাঁহাদিগকে জানাইলাম দক্ষিণ ভ্রমণে আমার মনোগত অভিপ্রায় এবং জননীর নির্দেশ; তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম পণ্ডিচেরী হইতে কাবেরী-স্নানে ও সেতুবন্ধ-দর্শনে যাইবার পথের সহিত তাঁহাদের পরিচয় আছে কিনা। সৌভাগ্য-ক্রমে উভয়েরই জানা ছিল। বন্ধুটি স্থানীয় ভদ্রলোকটির সহিত আলোচনা করিয়া বলিলেন,—পণ্ডিচেরী হইতে কাবেরী প্রায় শতখানেক মাইল দূরে; সর্বাপেক্ষা সন্নিকটে কাবেরীতে পৌঁছানো যায় মায়াভরমে। কিন্তু সেখানে নদীর অবস্থা যেরূপ তাহাতে স্নান হইবে না, স্পর্শ মাত্রই সম্ভব হইবে। ক্রমাগত বাঁধ বাঁধিয়া বাঁধিয়া কাবেরীর জল আটক করার ফলে শেষের দিকটাতে আসিয়া নদীতে কয়েকটি সংকীর্ণ খাল ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট নাই। সুতরাং কিঞ্চিৎ দূরবর্তী হইলেও ত্রিচী অর্থাৎ ত্রিচিনপল্লীতে যাইতে হইবে। তথায় নদীতে তবু স্নানের উপযুক্ত কিছু জল আছে। সেতুবন্ধ যাইবার পথের পরামর্শ এখানে হইল না। পণ্ডিচেরী আশ্রমে গিয়াই সে পরামর্শ করা ভালো বলিয়া সাব্যস্ত হইল। চাই কি তথা হইতে কোনো সঙ্গীও মিলিয়া যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষে তথায় নানা স্থান হইতে লোকের সমাগম হইবে। তাহাদের মধ্য হইতে সাথী মিলিয়া যাওয়াই সম্ভব।

মাদ্রাজ

বিমানঘাটি হইতে মোটরে শহরের দিকে রওয়ানা হইলাম। শহরে পৌঁছিতে অনেকটা পথ যাইতে হয়, উঠিবার স্থানটি আরও কিছু দূরে। পথে মাদ্রাজ শহরটা মোটামুটি দেখিয়া লইবার সুযোগ মিলিল। ভারতের প্রায় দক্ষিণ সীমায় সমুদ্র কূলে আসিয়া পড়িয়াছি। কেবলি মনে হইতেছিল—"তমালতালীবনরাজীনীলা।" আগ্রহাকুল দৃষ্টি স্বভাবতঃই নিযুক্ত হইল সেই দৃশ্যের সন্ধানে। উদ্ভিদের সমারোহ প্রচুর, তাহার মধ্যে তালীবৃক্ষের সংখ্যাও যথেষ্ট। কিন্তু তমালের চিহ্নমাত্র নাই। তাহার পরিবর্তে আছে "Rain tree" অর্থাৎ "বর্ষণ বৃক্ষ" নামে পরিচিত ঘন-পল্লবময় বৃক্ষের প্রাচুর্য। শহরের একটি-মাত্র বৃহৎ রাজপথ মাউণ্ট রোড হইয়া, যে mount বা পাহাড় হইতে উহার নামকরণ তাহা দেখিয়া, নগর-প্রণালী অতিক্রম করিয়া, ডাঃ বেশান্তের আদিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ও নগরের অন্যান্য বিশিষ্ট স্থান ও ভবনসমূহ বাহির হইতে দেখিয়া লইয়া উপস্থিত হইলাম সুবিখ্যাত কনেমারা হোটেলে। তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন গৌরীপুরের কুমার বীরেন্দ্রকিশোর। এই যাত্রায় তিনিই আমাদের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত। হোটেলে আলাপ সারিয়া আমাদের গন্তব্য স্থলে উক্ত বন্ধুটির বাসায় গিয়া পৌঁছিলাম। দ্বিপ্রহরের বিমানে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ সদলে কলিকাতা হইতে পৌঁছিবেন। কথা রহিল তাঁহার সহিত একত্রে পণ্ডিচেরী রওয়ানা হইব।

দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সারিয়া পুনরায় বিমানঘাটির দিকে রওনা হইলাম। পথে "হিন্দু" পত্রিকার আফিস দেখিয়া ও উহার পরিচালক শ্রীকস্তুরী শ্রীনিবাসনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিমানঘাটিতে পৌঁছিলাম। অল্প পরেই বিমানে করিয়া পৌঁছিলেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ এবং তাঁহার সহিত ডাঃ কালিদাস নাগ, টিসলার নামে জনৈক মার্কিনী এবং টিসলারের সহিত শ্যাম দেশের এক মিলিটারী অফিসারের বালক পুত্র। বিমান-ঘাটি হইতেই আমরা সোজা পণ্ডিচেরী রওনা হইলাম, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সহিত এক গাড়ীতে টিসলার ও আমি, অপর একটি বৃহত্তর গাড়িতে বীরেন্দ্রকিশোর ও ডাঃ নাগের সহিত রহিল আমাদের মালপত্র; মালপত্র সামান্য, আমার সহিত মাত্র একটি মাঝারি সুটকেশ, তাহার মধ্যেই আচ্ছাদন ও যৎসামান্য বিছানা। আমাদের গাড়ী অগ্রে, বৃহত্তর গাড়ীটা পশ্চাতে।

পণ্ডিচেরী অভিমুখে

মাদ্রাজ হইতে পণ্ডিচেরী ১০০ মাইল। রেলে যাইতে বড় লাইনের ভেলুপুরম স্টেশনে নামিয়া শাখা লাইনে যাইতে হয়। মোটরের পথ অতি চমৎকার, মোটর চলেও ঊর্ধ্ববেগে, স্থানে স্থানে ঘণ্টায় ৬০ মাইল। ভ্রমণের প্রথম অংশে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চলিতেছে, তাহারই মধ্যে যতটুকু সম্ভব চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইতে লাগিলাম। বামে সমুদ্র এবং দক্ষিণে পূর্ব ঘাট গিরি-মালা তাহারই মধ্য দিয়া চলিয়াছি; স্থানে স্থানে সমুদ্র সন্নিকটে আসিয়া পড়ে। পথের দুই দিকেই প্রশস্ত প্রান্তর ও শস্য-ক্ষেত্র; প্রান্তরের মৃত্তিকা দেখিতে ঘোর রক্ত-বর্ণ, বর্ধমানের রাঙ্গা মাটীও হার মানিবে। তরুশোভা একই প্রকার—তালীবৃক্ষই প্রধান। মাদ্রাজ শহরের দক্ষিণ হইতে তামিল রাজ্যের প্রারম্ভ। ইহারই উপকূল ভাগের বর্ণনায় কালিদাস দূরদর্শনে বলিয়াছেন—— "তমালতালীবনরাজীনীলা" এবং নিকট-দর্শনে বলিয়াছেন—"কূলং ফলা-বর্জিত পূগমালম্"—ফলভরে অবনত সুপারী গাছে পরিপূর্ণ। তালীবৃক্ষ অনেক দেখিলাম, কিন্তু তমাল দেখি নাই, সুপারী গাছ একটিও চোখে পড়িল না। প্রশ্ন উঠিতে লাগিল—কালিদাসের ন্যায় প্রকৃতির নিপুণ দ্রষ্টা কবি কি ভুল করিয়াছেন?

প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যখন বসতির মধ্যে প্রবেশ করিলাম তখন আমাদের পিছনের গাড়ি দেখা যাইতেছে না। রওনা হইবার সময়েই স্থির হইয়াছিল, একটা নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে—দুই গাড়ি একত্র হইয়া পুনরায় রওনা হইবে। স্থানটিতে আসিয়া আমরা থামিলাম এবং গাড়ি হইতে নামিয়া দেখিয়া শুনিয়া লইতে লাগিলাম। স্থানটি ছোট খাটো বাজার। বিক্রীর দ্রব্যের মধ্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল—ফুল, পান, ও কাঁঠাল ভাঙিয়া কোয়া ভাগা দিয়া বিক্রয় হইতেছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও কাঁঠালের স্থানীয় নামটি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরেও যখন দ্বিতীয় গাড়ি আসিয়া পৌঁছিল না তখন পুনরায় রওয়ানা হওয়াই স্থির হইল। রওয়ানা হইয়া আসিয়া ঠেকিলাম ভারত ও ফরাসী ভারতের সীমান্তে। এখানে ফরাসী ভারতের শুল্কবিভাগ আমাদের আটক করিলেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ শুল্ক কর্মচারীদের সহিত আলাপ করিতে গেলেন, সেই অবসরে উত্তপ্ত মোটর হইতে নামিয়া পথপার্শ্বে এক বিশাল তিন্তিড়ী বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইলাম। স্থানীয় লোকজনের সহিত আলাপেরও একটা সুযোগ পাওয়া গেল।

শুল্ক সীমায়

ভারত ও ফরাসী ভারতের মধ্যে সংযোগের একটা বিশেষত্ব আছে যাহা সাধারণের জ্ঞাত নহে। আমাদের ধারণা ভারত হইতে আমরা সরাসরি পণ্ডিচেরীতে ফরাসী ভারতে প্রবেশ করি এবং পণ্ডিচেরীর সীমা ছাড়াইলেই ভারতে আসিয়া পড়া যায়। কিন্তু কার্যতঃ দেখিলাম তাহা নহে। পণ্ডিচেরীর পূর্বেও ভারতের মধ্যে এক ফালি ফরাসী ভারত আছে। পণ্ডিচেরী যাইতে প্রথমে ভারত

ত ফরাসী রাজ্যের এই ফালি অংশে শ করিতে হয়। ইহার পর পুনরায় ত, তাহার পর প্রবেশ করিতে হয় ন্ডচেরীতে। উত্তর বা দক্ষিণ যে দিক রাই পাণ্ডিচেরীতে আসা যাক এই অবস্থা। ই দফায় ফরাসী রাজ্যে প্রবেশ করিতে হয় লয়া শুল্ক-পরীক্ষা হয় দুইবার। ইহা চ ঝঞ্ঝাট-বিশেষ, কিন্তু ইহা হইতে ব্যাহতি নাই।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ রাস্তার অপরদিকে ল্ক আফিসে গিয়াছেন, সঙ্গে গিয়াছেন সলার প্রভৃতি। একা তিন্তিড়ী বৃক্ষের য়ায় দাঁড়াইয়া স্থানীয় লোকজনের কাজ-র্ম লক্ষ্য করিতেছিলাম। একটি কিশোর এক কিশোরী মুখোস লাগাইয়া নৃত্য রিতেছিল—মনে হইল সন্নিহিত গ্রামে কানো পূজাপার্বনের উৎসবের ব্যাপার। অপরিচিত দর্শক পাইয়া তাহারা অধিকতর উৎসাহের সহিত নৃত্য দেখাইতে লাগিল, কিছু পুরস্কার লইয়া থামিল। ইতিমধ্যে টিসলার আসিয়া পৌঁছিলেন; রাস্তার ওপার হইতে তিনি ইহাদের নৃত্য দেখিয়া-ছিলেন, আসিয়া বলিলেন আমি এই পল্লী-নৃত্য দেখিতে চাই। তুমি উহাদের আবার নাচিতে বল। বলিলাম, কিন্তু তাহারা বুঝিল না। এ রাজ্যে রাষ্ট্রভাষা অচল; সাধারণ লোকের মধ্যে ইংরাজীও অচল, সুতরাং হাতের ফাঁকি ও মুখের ভঙ্গীই একমাত্র অবলম্বন। তাহাও যখন ব্যর্থ হইল সেই সময়ে সৌভাগ্যবশে একজন লোক আসিয়া পৌঁছিল যাহার ২।১টি ইংরাজী শব্দ জানা ছিল। তাহাকে বলিলাম 'Dance'। কথাটি তাহার বোধগম্য হইল এবং তাহার নির্দেশে কিশোর-কিশোরী পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। নৃত্যশেষে টিসলার তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন জনপ্রতি এক টাকা। পুরস্কারটা বোধ হয় আশার অতিরিক্ত হইয়াছিল—তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনি করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ক্ষণকালের মধ্যেই গ্রাম হইতে দলবদ্ধ নর্তক ও নর্তকী ছুটিয়া আসিয়া উদ্দাম নৃত্য জুড়িয়া দিল, মুখে তাহাদের রাম রাবণ প্রভৃতির মুখোস। নৃত্য চলিতে চলিতে শুল্ক পরীক্ষা মিটাইয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ আসিয়া পৌঁছিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া নর্তক-নর্তকীর দল টিসলারকে ছাড়িয়া তাঁহাকেই ঘেরাও করিল—ভাবটা এই রকম—আপনাকেই দলপতির মতো দেখাইতেছে, পূর্বের নৃত্যশিল্পীরা যে পুরস্কার পাইয়াছে আমাদের তাহা অপেক্ষা বেশী দিতে হইবে কারণ আমরা বেশী নৃত্য দেখাইয়াছি। পুরস্কার তাহাদের দেওয়া হইল কিন্তু মুখের ভাব ও কলরব হইতে মনে হইল তাহারা সন্তুষ্ট নহে, যোগ্যতা ও প্রদর্শনীর উপযুক্ত পুরস্কার, তাহাদের মেলে নাই।

এখানে বেশ কিছুক্ষণ থামিতে হইয়া-ছিল। পশ্চাতের গাড়ী এখনও আসিয়া পৌঁছিল না। বেলা পড়িয়া আসিতেছে। সকলের মনে একটা উৎকণ্ঠার ভাব। সেই উৎকণ্ঠা লইয়াই আমরা রওয়ানা হইলাম। ফরাসী রাজ্য হইতে পুনরায় ভারত এবং পুনরায় শুল্কসীমানারক্ষকদিগের পরীক্ষা পার হইয়া পাণ্ডিচেরীতে প্রবেশ করিলাম। প্রত্যেক শুল্ক অফিসেই বলিয়া রাখা হইল আমাদের মালপত্র লইয়া গাড়ী পশ্চাতে আসিতেছে। তাহা যেন ছাড়িয়া দেওয়া হয়। শুল্ক-পরীক্ষকেরা রাজী হইল। অরবিন্দ-আশ্রম ভবনে যখন উপস্থিত হইলাম তখন অপরাহ্ণ ৫॥টা। তখনও আমাদের দ্বিতীয় গাড়ী আসিয়া পৌঁছে নাই। আশ্রম-ভবনের দ্বার হইতেই শ্রীচারুব্রত ভট্টাচার্য আমাদিগকে লইয়া শ্রীমায়ের সহিত সাক্ষাতের জন্য সোজাসুজি ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে চলিয়া আসিলেন।

পাণ্ডিচেরী আশ্রমে

ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াই মন ভরিয়া উঠিল। পাণ্ডিচেরী আশ্রমের বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; আমি কেবল ভ্রমণের সূত্র অনুবর্তন করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও ক্রীড়া-প্রাঙ্গনটির বিশেষত্ব উল্লেখ করিতে হইবে। সমুদ্রের বেলাভূমির উপর হইতে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণটি অর্ধচন্দ্রাকারে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। প্রাঙ্গণে বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া খেলিতেছে আর সম্মুখে অনন্ত-বিস্তৃত সমুদ্রের নীল জলরাশি অবিরাম তরঙ্গভঙ্গে প্রাঙ্গণভিত্তির পাদ-মূলে আসিয়া পড়িতেছে। অপূর্ব দৃশ্য, অবিস্মরণীয় দৃশ্য। একদিকে সমুদ্রের ক্রীড়া, অপরদিকে জীবনের ক্রীড়া—উভয়েরই বিকাশ অবিরাম, তরঙ্গময় এবং নিত্য-নূতন। মনে হইল এই পটভূমিকায় যাহারা মানুষ হইবে তাহাদের শরীর-মন আপনিই একটা বিরাটের অনুভূতিতে দিব্যভাবে ভরিয়া উঠিবে। মনে হইল নূতন মানুষ যদি গড়িতে হয় তবে সে গঠনের জন্য এই পরিবেশই গ্রহণীয়।

ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াই প্রাঙ্গণের শেষ প্রান্তে ক্রীড়ারত এক প্রবীণার মূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল। বয়স বার্ধক্যের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে কিন্তু শরীরের গতি বা ভঙ্গী তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই —সামান্য একটু অবনত হইয়া পড়িয়াছে মাত্র—মুখে একটা অপূর্বশ্রী—চতুর্দিকে এমন একটা জৌলুস যাহা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিচয় না পাইলেও মনে মনে বুঝিয়া লইলাম ইনিই শ্রীমা—শ্রীঅরবিন্দের শক্তি। সামান্য আলাপের পর ফিরিলাম। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ শ্রীদিলীপ রায়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, আমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল আশ্রমের অতিথি-শালায় গোলকুণ্ডা ভবনে। ভবনটির গঠনবৈচিত্র্য এবং পরিচালনের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সেকথা স্বতন্ত্র।

বাসা পাইলাম বটে, কিন্তু বিপদ হইল, মালপত্র লইয়া দ্বিতীয় গাড়ী তখনও পৌঁছে নাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অগত্যা চারুবাবুর নিকট হইতে বস্ত্রাদি লইয়াই স্নান সারিতে হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আশ্রম হইতে শ্রীনলিনীকান্ত সরকার প্যারেড গ্রাউণ্ডে সান্ধ্য অনুষ্ঠানের জন্য লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। অপেক্ষা করিয়া সময় গিয়াছিল বলিয়া যাইতে বিলম্ব হইল। প্যারেড গ্রাউণ্ডে যখন পৌঁছিলাম তখন প্রার্থনা ও ধ্যানের জন্য দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রার্থনা সমাপ্তির পর দ্বার উন্মুক্ত হইল। আমরা শ্রীমাকে দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রার্থনান্তিক প্রসাদ লাভ করিয়া অনুগৃহীত হইলাম। প্যারেড গ্রাউণ্ডের এই অনুষ্ঠান আশ্রমজীবনযাত্রার একটি বিশেষ অঙ্গ এবং বিশেষভাবে বর্ণনীয় কিন্তু তাহারও স্থান এখানে নাই।

শুল্ক-বিভ্রাট

প্যারেড গ্রাউণ্ড হইতে গোলকুণ্ডা ভবন—তথা হইতে ভোজনশালা এবং ভোজন সমাপ্ত করিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য শ্রীযুত দিলীপ রায়ের গৃহে—ইহাই সংক্ষেপে পরবর্তী ঘটনা। এই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য পরদিন সর্বজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার উদ্বোধন-সভার কর্মসূচী নির্ধারণ ও প্রস্তাব রচনা। অন্যান্য অনেকেও আসিয়াছিলেন। কাজ মিটাইতে প্রায় রাত্রি ৯॥টা ১০টা হইল। তখনও ডাঃ নাগ এবং বীরেন্দ্রকিশোরকে লইয়া দ্বিতীয় গাড়ী আসিয়া পৌঁছে নাই। উৎকণ্ঠা গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। সন্ধান লইবার ব্যবস্থা করা হইল। গোলকুণ্ডাভবনে ফিরিয়া

উৎকণ্ঠার সহিত শয্যা গ্রহণ করিলাম। অধিক রাত্রে দ্বারে আঘাতের শব্দে উঠিয়া শুনিলাম নীচে আমাদের মালপত্র আসিয়াছে, দেখিয়া লইতে হইবে। নীচে গিয়া দেখিলাম ফরাসী পুলিশ মালপত্রগুলির সঙ্গে আসিয়াছে। বুঝিলাম মালপত্রের জন্যই দ্বিতীয় গাড়ীর দুর্ভোগ হইয়াছে। আমাদের বাক্সগুলি ছিল চাবিবন্ধ অথচ শুল্ক পরীক্ষকেরা ভিতরে কি আছে তাহা না দেখিয়া এবং তৎসম্বন্ধে মালিকের স্বীকৃতি না লইয়া ছাড়িবে না। ইহাতেই গাড়ী আটক হইয়া রহিয়াছে। আমরা যে পথে শুল্ক আফিসে স্বীকৃতি দিয়া আসিয়াছিলাম দ্বিতীয় গাড়ী সে পথে না আসিয়া অন্যপথে আসিয়াছে, দুর্ভোগের মূল কারণ ইহাই। পথে যেখানে উভয় গাড়ী একত্র হইবার জন্য আমরা প্রথমে থামিয়াছিলাম—সেইখান হইতেই দ্বিতীয় গাড়ী অন্য পথে গিয়াছে। শেষপর্যন্ত পুলিশের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ সমস্ত জানিয়া ও ব্যক্তিদের পরিচয় পাইয়া এই পর্যন্ত অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তাঁহারা গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে পুলিশ দিয়াছেন—বাক্স খোলাইয়া দেখিয়া এবং মালিকের স্বীকৃতি লইয়া তবে মাল ছাড়িবে। তাহাই করা হইল। বাক্স খুলিলাম—পরীক্ষার বা দেখিবার বিশেষ কিছু ছিল না—একটা বড় শিশিতে ছিল গঙ্গাজল। তাহা মুহূর্তের জন্য সন্দেহ উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু তাহা তৎক্ষণাৎ নিরসিত হইল। পুলিশ ছাড়িল। আপনার মাল বুঝিয়া পাইয়া পুনরায় শয়ন করিতে গেলাম।

দৈববাণী

রবিবার রাত্রি হইতে সোমবার পর্যন্ত প্রায় পাণ্ডিচেরী পেঁাছিতেই কাটিয়া গেল। মঙ্গলবার ও বুধবার বৈকাল পর্যন্ত পাণ্ডিচেরীতে অবস্থান। এই দুই দিনে পাণ্ডিচেরীর বিবরণ সংক্ষেপে শেষ করিয়াই আমার বক্তব্যের মূলধারা অনুসরণ করিতে হইবে। যাঁহাদের সহিত গিয়াছিলাম তাঁহারা জানিতেন যে, পাণ্ডিচেরী হইতে আমার দক্ষিণে যাইবার ইচ্ছা। পাণ্ডিচেরীতে পেঁাছিয়া আশ্রমের কর্মীদিগকেও জানাইয়াছিলাম; বিশেষ উদ্দেশ্য, যাইবার পথটা যথাসম্ভব জানিয়া লওয়া এবং পূর্বে এইদিকে গিয়াছেন এমন কোন সঙ্গী সংগ্রহ করা। যা হয়, কোনোরূপ একজন সঙ্গী পাইলেই হয়। যাইব স্থিরই করিয়াছিলাম, তথাপি এই দূরদেশে একা সম্পূর্ণ অপরিচিত পথযাত্রায় বাহির হইয়া পড়িতে কেমন ইতস্ততঃ বোধ হইতেছিল।

মঙ্গলবার পণ্ডিচেরীতে যুগ্ম অনুষ্ঠান। ২৪শে এপ্রিল। আশ্রমে শ্রীশ্রীমার প্রথম আগমন দিবসের বার্ষিক অনুষ্ঠান। তাহার সহিত মিলিয়াছে সর্বজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার উদ্বোধন। প্রাতে শ্রীমায়ের অলিন্দ হইতে দর্শন দান; তৎপর প্রথমে আশ্রমবাসীদের এবং পরে উপস্থিত সকলের শ্রীঅরবিন্দের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন। আশ্রমবাসীদের শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানটি অনেকটা সামরিক ধরণের। ইহার সম্বন্ধে জানিবার এবং বলিবার কথা আছে। সমাধির সু-উচ্চ বেদীর উপর নিবিড় তরুচ্ছায়া—শান্ত, স্নিগ্ধ ও গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ পরিবেশ। সন্ধান লইয়া জানিলাম সমাধিগর্ভে শ্রীঅরবিন্দ উত্তরশিরে শায়িত। সমাধিতে শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের পর দ্বিতলে উঠিয়া শ্রীঅরবিন্দের বাসকক্ষ দর্শন ও শ্রীমায়ের আশীর্বাদ লাভ, আশীর্বাদের সহিত দিলেন একটি মুদ্রিত পত্র, তাহাতে শ্রীঅরবিন্দের অপ্রকাশিত গ্রন্থ মহাকাব্য 'সাবিত্রী' হইতে উদ্ধৃত অংশবিশেষ—

"A day may come when she must stand unhelped
On a dangerous brink of the world's doom and hers
Carrying the world's future on her lonely breast,
Carrying the human hope in a heart left sole
To conquer or fail on a last desperate verge
Alone with death and close to extinction's edge
Her single greatness in that last dire scene,
She must cross alone a perilous bridge in Time
And reach an apex of world-destiny
Where all is won or all is lost for man.
In that tremendous silence lone and lost
Of a deciding hour in the world's fate,
In her soul's climbing beyond mortal time
When she stands sole with Death or sole with God
Apart upon a silent desperate brink,
Alone with her self and death and destiny
As on some verge between Time and Timelessness
When being must end or life rebuild its base,
Alone she must conquer or alone must fall.
No human aid can reach her in that hour,
No armoured God stand shining at her side.
Cry not to heaven, for she alone can save.
For this the silent Force came missioned down;
In her the conscious Will took human shape,
She only can save herself and save the world."

Savitri Book VI Canto 2

উদ্ধৃতাংশটি পড়িয়া মনে হইল যেন ভারতের বর্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া দৈববাণী। সাবিত্রীর জীবনের সংকটই যেন আজ ভারতের সংকটের মধ্যে রূপ লইয়াছে এবং এই মহাপ্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছে—তপস্যালব্ধ যে অপ্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে সাবিত্রী আপনাকে সংকটমুক্ত করিয়াছিল সে শক্তি ভারতের আছে কিনা? শ্রীঅরবিন্দের বরোদায় অবস্থানের সময়ে 'সাবিত্রী' রচিত। ঋষির দৃষ্টি যে দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে উদ্ধৃতাংশের মধ্যে তাহারই পরিচয় সুস্পষ্ট।

সাথীর সন্ধান

ইহার পর আশ্রমের বিভিন্ন কর্মবিভাগ পরিদর্শন, সম্মেলনের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা, সমুদ্রকূলবর্তী ভোজনশালায় ভোজন। ক্রীড়াপ্রাঙ্গণের ন্যায় ভোজনশালাটিও সমুদ্রকূল হইতে গাঁথিয়া তোলা। আহার করিতেছি—সম্মুখে সমুদ্রতরঙ্গ ভোজনগৃহের ভিত্তিমূলে আসিয়া পড়িতেছে। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সম্মেলনে যোগদান। আমার দিক হইতে সর্বক্ষণ

আছে পথের সন্ধান ও সাথীর সন্ধান তু কোনোটাতেই বিশেষ কোনো সুবিধা হল না। সম্মেলনে গৌরীপুর-রাজ ষ্টের ম্যানেজার ক্ষিতীশবাবু জিজ্ঞাসা রলেন—'আপনি নাকি কাল দক্ষিণে য়া যাইতেছেন? আপনার কি পূর্ব তে কোনো বন্দোবস্ত করা আছে?'

বলিলাম—'না; যাইব, ইহাই জানি; পথ নি না। সঙ্গী এখন পর্যন্ত পাই নাই। ন্দাবস্তও কিছু নাই।'

তিনি বলিলেন—তবে কিসের ভরসায় আপনি একা একা এই দুঃসাহস করিতেছেন?

বলিলাম ভরসা একটা আছে—'যোগক্ষেমং হামাহম্' বলিয়া গীতায় একটা কথা আছে। কথাটা যে সত্য আমি তাহার সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি। আমার কাছে উহা পরীক্ষিত সত্য। এই একটি কথার উপরে ভরসা করিয়াই বাহির হইব। একটি স্যুটকেস আমার সম্বল। তাহা লইয়া নিকটস্থ রেলস্টেশনে গিয়া গন্তব্যস্থানের জন্য টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিব। তাহার পর যা ঘটে। আমার জীবনে ঘটনা এইভাবেই ঘটিয়াছে।

ক্ষিতীশবাবু বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। সম্মেলনের কাজ মিটিলে প্যারেড গ্রাউণ্ডে উপস্থিত হইলাম। কাল প্যারেড গ্রাউণ্ডের অনুষ্ঠান দেখিতে পাই নাই। আজ না হইলে আর দেখা হইবে না। তাহা ছাড়া শ্রীমায়ের আগমনবার্ষিক উপলক্ষে আজ বিশেষ প্যারেড। প্যারেড গ্রাউণ্ডের অনুষ্ঠান এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। মানুষকে নূতনভাবে গড়িবার জন্য পণ্ডিচেরী আশ্রম কি গুরুত্বপূর্ণ এক্সপেরিমেণ্ট করিয়াছেন প্যারেড গ্রাউণ্ডের অনুষ্ঠানে তাহার পরিচয়। মনে হইল, সমাজে ও ধর্মে পূর্বগুরুগণ নূতন জীবন গঠন সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে সকল এক্সপেরিমেণ্ট করিয়া গিয়াছেন, পণ্ডিচেরীর এক্সপেরিমেণ্ট তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক। কিন্তু সকল কথা বলিবার স্থান এখানে নাই। প্যারেড দর্শনের পর সাধারণ ভোজনশালা হইয়া শ্রীদিলীপ রায়ের গৃহে আগামীকল্যকার সম্মেলনের কার্যসূচীর আলোচনা ও প্রস্তাব-রচনার পর গোলকুণ্ডা ভবনে গিয়া বিশ্রাম লইলাম।

বুধবার সকাল হইতেই মন কি রকম আনচান করিতে লাগিল—আজ যাইতে হইবে। যাহাদের সহিত একসাথে আসিয়াছিলাম তাহারা দিব্য আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে নিশ্চিত পথে চলিয়া যাইবে। আমাকে যাত্রা করিতে হইবে একা অচেনা পথে। অথচ যাইব না বলিয়া মনকে নিবৃত্ত করিতেও পারিতেছিলাম না। কারণ, জানিতাম, এ সুযোগ আর নাও আসিতে পারে। এই যাত্রায় দক্ষিণের শেষ কন্যাকুমারী পর্যন্ত দেখিয়া যাইতেই হইবে। মনে যাহা চলিতেছিল বাহিরে তাহা প্রকাশ পাইল না; শান্তভাবেই সঙ্গীদের জানাইয়া দিলাম, তাঁহাদের ছাড়িয়া আমার পথে আমি যাত্রা করিব। পণ্ডিচেরীর সমুদ্রে স্নান করিয়া লইবার ইচ্ছা ছিল—চারুবাবুর সহিত যাইয়া প্রাতঃকালীন স্নান তথায় সমাধান করিয়া আসিলাম। পণ্ডিচেরীর সমুদ্র প্রায় পুরীর সমুদ্রের মতো। Undercurrent আছে, সেজন্য ঘাটে পাহারা থাকে, সাবধানে নামিতে হয়। পাহারাদার সতর্ক করিয়া দিল, সেদিন under-current বেশী। দেখিলামও বটে, ঘাটে স্নানার্থী অপর কেহ নাই। স্নান সারিয়া গোলকুণ্ডায়। তথা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে। আজ প্রস্তাব গ্রহণ এবং সম্মেলনের সমাপ্তি এবং সম্মেলন শেষ হইবার পর শ্রীদিলীপ রায়ের গৃহে প্রীতি সম্মেলন। প্রীতি সম্মেলনের উপহার লাভ দিলীপবাবুর গান এবং আমাদের অনুরোধে সাহানা দেবীর গান। এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবুর সহিত যাহা আলাপ হইল তাহাতে আলোচনার কথা আছে। কিন্তু তাহা এখন তুলিব না। মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা আজও সমুদ্রকূলের ভোজনশালায়। তথায় আমার আজ দক্ষিণে চলিয়া যাওয়ার কথাপ্রসঙ্গে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বলিলেন—পণ্ডিচেরীতে ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতেন শ্রীযুত আয়েঙ্গার। তাঁহার বাস ত্রিচিনপল্লী। তিনি এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে আসিয়াছেন। মোটরে ফিরিবেন। তাঁহাকে বলিয়া দিলে তিনি একেবারে মোটরে ত্রিচী পর্যন্ত লইয়া যাইবেন। শুনিয়া মনে হইল হাতে চাঁদ পাইলাম। খাওয়ার সময়ে আমার খাওয়া লক্ষ্য করিয়া শ্যামাপ্রসাদ বলিলেন—

তুমি আজ বেশী খাইতেছ মনে হইতেছে। বলিলাম—কথাটা হয়তো ঠিক, কারণ ইহার পর কি জুটিবে জানি না। আজ সন্ধ্যায় তো নয়, কাল দুপুরেও সন্দেহস্থল।

শ্যামাপ্রসাদ—কাল কি করিবে?

বলিলাম—কিছু যদি না জুটাইতে পারি পৈতাটি বাহির করিয়া রঙ্গনাথের মন্দিরের চত্বরে বসিয়া থাকিব। তাহাতে যা জোটে।

শ্যামাপ্রসাদ—তাহা যদি করিতে পারো তবে নিশ্চিত জুটিয়া যাইবে।

একলা চলরে

আহারের পর আয়েঙ্গারের সন্ধান লইবার জন্য এবং তাঁহার সহিত আমার যাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য চারুবাবুকে বলা হইল। আমরা গোলকুণ্ডায় গেলাম। চারুবাবু তথায় সংবাদ দিবেন। উদগ্রীব অপেক্ষায় থাকিবার পর ৩টার সময়ে চারুবাবু সংবাদ লইয়া আসিলেন আয়েঙ্গার গতকল্য চলিয়া গিয়াছেন। মনটা দমিয়া গেল, কিন্তু বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ব্যগ্রতা বাড়িল। একা চলিতে হইবে ইহাই যখন ভাগ্যদেবতার অভিপ্রায় তখন বসিয়া থাকিয়া লাভ কি? পণ্ডিচেরীর কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। আজই বৈকালে শ্যামাপ্রসাদ সদলে মাদ্রাজ হইয়া কলিকাতার দিকে রওনা হইয়া যাইবেন। আমার আর বিলম্ব করা নিরর্থক; বরং রাত্রির মধ্যে যদি পথটা অতিক্রম করিতে পারি দিনটা শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনে কাটাইতে পারিব। যত শীঘ্র সম্ভব ভ্রমণ সারিতে হইলে ইহাই উপায়। ভ্রমণের এই পদ্ধতি আকস্মিকভাবে স্থির হইয়াছিল বটে। কিন্তু পরে ইহাই রীতি করিয়া লইয়াছিলাম। ব্যবস্থা এমনভাবে করিয়া লইতাম যাহাতে রাত্রিটি গাড়িতে কাটানো যায়। ইহার বিশেষ সুবিধা এই, রাত্রির জন্য আশ্রয় খুঁজিতে হয় না। গাড়িতেই প্রাতঃশৌচাদি সারিয়া একেবারে ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া নামিতাম এবং নামিয়াই স্টেশন-মাস্টারের কাছে বা সন্ধান বিভাগে যাইয়া জিজ্ঞাসাপত্র করিয়া পরবর্তী গন্তব্য স্থানে রওনা হইবার গাড়ি এমনভাবে ঠিক করিয়া লইতাম যাহাতে দিনটা ভ্রমণ ও দর্শনে কাটাইয়া রাত্রিতে আসিয়া গাড়িতে আশ্রয় লইতে এবং রাত্রি শেষে পরবর্তী স্থানে পৌঁছিতে পারি

(ক্রমশঃ)

বিশ্বশান্তি কোন পথে

কাশীকান্ত মৈত্র

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধবিধ্বস্ত দুনিয়া তার ভয়াবহ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে না উঠতেই শক্তিমদমত্ত রাষ্ট্রের ধুরন্ধর কর্ণধাররা আবার রণোন্মাদনার বিকট নেশায় মেতে উঠেছেন। ধীরে ধীরে অথচ যেন অনিবার্যভাবেই এক বিশ্বজোড়া নরমেধ-যজ্ঞের নগ্ন আয়োজন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। শান্তিপ্রিয় লোকেদের মনে প্রশ্ন জেগেছেঃ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি তবে অনিবার্য—একে রোখবার কি কোন রাস্তা নেই? আজকের বিরুদ্ধ শক্তিজোটদ্বয়ের রাজনীতিবিদরা যুদ্ধবাজদের শাসাচ্ছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর অপর রাষ্ট্রের অধিবাসীদেরও সচেতন করছেন। তাঁরা শান্তি, সম্প্রীতি, মৈত্রী ও সহযোগিতার কথার খরচে কোন কার্পণ্য করছেন না; কিন্তু তাঁদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ বিশ্বশান্তি বা মৈত্রীবিরোধী। এ কালের রাষ্ট্রনায়কদের একটা বৈশিষ্ট্য হল তাঁদের কথা ও কাজের মধ্যে বিপুল অসঙ্গতি। মুখে বলা হয় এক আর কাজে করা হয় আর এক। মিথ্যা-হিংসা, শঠতা, গৃধ্নুতার বিষাক্ত আবহাওয়ায় পড়ে শান্তিপ্রিয় লোকেরা নিজেদের আজ অসহায় মনে ভাবছে।

যুদ্ধ জয় ও বিশ্বশান্তি

একথা অনস্বীকার্য যে বিশ্বশান্তি মূলত নির্ভর করছে রুশ ও মার্কিন—এই দুই বিবদমান শক্তি শিবিরের সদিচ্ছার ওপর। বিশ্বরাজনীতি বহুলাংশে এই দুই রাষ্ট্রের কার্যকলাপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এরা যদি তরবারির সাহায্যেই বিশ্বসমস্যাগুলির সমাধান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য ছোট বড় রাষ্ট্রের পক্ষে কিছুই করার থাকবে না। তাই উপরোক্ত দুই রাষ্ট্রনায়করা যদি সত্যি বিশ্বশান্তি চান তাহলে লড়াই করে এক পক্ষকে ঘায়েল করে অপর পক্ষের নিরঙ্কুশ বিশ্ব-নেতৃত্ব কায়েম করার ঘৃণ্য সংকল্প বা নীতি চূড়ান্ত ভাবে পরিত্যাগ করতে হবে। একথাই জোর দিয়ে এই জন্যেই বলতে হচ্ছে যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন উভয় পক্ষ থেকেই শোনা যায় যে কম্যুনিজম্ ও ক্যাপিটালিজম এই দুটো ব্যবস্থা পাশাপাশি থাকতে পারে না; দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অপরিহার্য। একে ইংরাজীতে বলা হয়, "theory of inevitable collision।" সেইজন্যেই উভয়পক্ষই 'Complete Victory'র কথা বলছেন। শান্তিরক্ষা সম্বন্ধে যদি রুশ-মার্কিনীদের সত্যি আন্তরিকতা থাকে তাহলে তাদের এই থিয়োরী অনুযায়ী কাজ করা চলবে না এবং victory-র স্লোগানও ছাড়তে হবে। যুদ্ধজয়ের মধ্যে দিয়ে বিশ্বশান্তি আসতে পারে না। এই সম্বন্ধে আমেরিকার ভূতপূর্ব সভাপতি উইলসন যা বলেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেনঃ

"Victory would mean peace forced upon the looser—a Victor's term imposed upon the vanquished. It will be accepted in humiliation, under duress, at an intolerable sacrifice and would leave a sting, a bitter memory upon which the terms of peace would rest not permanently but as upon the quick-sand" (war Addresses).

গত মহাযুদ্ধ এই উক্তির সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে। যুদ্ধ দিয়ে যুদ্ধ শেষ করার নীতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রত্যেক যুদ্ধই অনাগত যুদ্ধের এবং আরও ভয়াবহ যুদ্ধের জনক। কেননা পরাজিত বিধ্বস্ত যারা তাদের মনে অসন্তোষ ও প্রতিহিংসার আগুন প্রধূমিত হয় এবং সুযোগ ও সময়ে সেটাই লেলিহান শিখা লাভ করে। তাই "যুদ্ধ জয় নয়—শান্তি" এই হওয়া উচিত রাষ্ট্রনায়কদের শ্লোগান।

নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি

বিশ্বশান্তি মূলত নির্ভর করছে রাষ্ট্রসমূহের নিরস্ত্রীকরণের ওপর। দুই একটি রাষ্ট্রের নয়—পৃথিবীর ছোট বড় সকল রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন। কিন্তু অতীতের 'লীগ অব নেশনস্' যে ভুল করেছিল—খেয়াল রাখা দরকার যেন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়। অর্থাৎ লীগও নিরস্ত্রীকরণকে লক্ষ্য হিসাবে স্বীকার করেছিল; কিন্তু লীগকে শক্তিশালী ও সক্রিয় করার দিকে দৃষ্টি মোটেই দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ একদিকে যেমন বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ চাই অন্যদিকে আবার বিশ্বরাষ্ট্রসংঘকে (বর্তমানে 'উনো) সস্ত্রীকরণ করা বিশেষ প্রয়োজন। 'World Security Force'কে খুব শক্তিশালী করা প্রয়োজন—নচেৎ বিশ্বশান্তির কোনই সম্ভাবনা নেই। তাই দুটো কার্যক্রমের কোনটাকেই বাদ দেওয়া চলতে পারে না। শুধু জার্মানী বা জাপানকে নিরস্ত্র করে নির্বীর্য করে সমস্যার সমাধান হবে না। এই ধরণের একতরফা নিরস্ত্রীকরণ নীতি শান্তির সহায়ক তো নয় বরং পরাজিত বিধ্বস্ত রাষ্ট্রগুলির ওপর বড় বড় রাষ্ট্রগুলির নির্দয় শোষণ অব্যাহত রাখার বা তাদের নিয়ে রাজনৈতিক দাবা খেলারই নামান্তর মাত্র।

শান্তির দ্বিমুখী নীতি

বিশ্বরাজনীতির আগামী রূপ যে আসলে দুই বিবদমান রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করছে এবং বিশ্বশান্তি যে তারই ওপর দোদুল্যমান তা' অনস্বীকার্য। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই দুই বৃহৎ রাষ্ট্রই বেপরোয়াভাবে স্ব স্ব সামরিক শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। শান্তিবাদে এদের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। সুতরাং শান্তি সম্বন্ধে অপরাপর ছোটবড় রাষ্ট্রগুলিকে এইসব রাষ্ট্রের নীতি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হতে হবে এবং নিজ নিজ এলাকায় শান্তি বজায় রাখবার জন্যে সচেষ্ট হতে হবে। তার জন্যে এক দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করা দরকার। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সংঘর্ষ ব্যতিরেকেও সদস্য রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যে দিয়েও বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকা রচিত হয়ে থাকে। আর্থিক বৈষম্য শোষণ ও অত্যাচারের ফলে সমাজ শোষক-শোষিতের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং শ্রেণী সংঘাত প্রকট হয়ে ওঠে। এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যখন এই শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে তখন গোটা দুনিয়ার শোষক ও শোষিতের মধ্যে সংগ্রাম সুরু হয়ে যায়। এবং তার পরিণামও

ভয়াবহ নয়। [illegible]র ধ্বংসের পরিমাণও নয়। শান্তি যারা চান তাঁদের এই শ্রেণী-[দ্ব]ন্দ্বের মূলে যেতে হবে এবং তার কারণ-[গু]লি দূর করতে হবে চিরদিনের মত। সকল [সাম]্য সমাজের আদর্শই হল তাকে সাম্য-[স্বা]ধীনতা-মৈত্রীর ওপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং [সক]ল প্রকার সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বকে বিদূরিত [করা]। সুতরাং সকল শান্তিবাদী রাষ্ট্রের [লক্ষ]্য হবে দেশে রাজনৈতিক ও আর্থিক [গণ]তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। এবং দ্বিতীয়ত [সা]ম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত করার [সা]থে সাথে তাকে সামরিক শক্তিতে সমৃদ্ধ [ক]রতে হবে। তা না হলে তারা বিশ্ব-[শ]ক্তিজোটদ্বয়ের হামলা ও উৎপীড়ন এড়াতে কছুতেই পারবে না। সমাজতান্ত্রিক-[গ]ণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের অভাব ও সামরিক শক্তিহীনতার জন্যেই আজ বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্বিরোধকে রুশ ও মার্কিন শক্তি তাদের [উস্]কে দিয়ে তীব্রতর করে তুলে তাকে নিজ নিজ স্বার্থের কাজে লাগাচ্ছে।

তৃতীয় শক্তি, নিরপেক্ষতা ও শান্তি

কোরিয়ার যুদ্ধ যখন পুরাদমে চলেছিল তখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী কোরিয়ায় ভারতের নীতি এবং বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ ভারতের লক্ষ্য হচ্ছে 'to limit the area of Conflict' অর্থাৎ যুদ্ধকে ক্ষুদ্রতম পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা। ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি কি পরিমাণে এই কাজে সফল হয়েছে সে নিয়ে আলোচনা এখানে করবো না। তবে বর্তমান বিশ্বরাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বশান্তির অর্থই হচ্ছে যত অধিক পরিমাণ ভৌগোলিক এলাকাকে এবং জন-সাধারণকে যুদ্ধের আগুনের দহনের ছোঁওয়া থেকে বাঁচান। যুদ্ধটা সে গরমই হোক আর ঠান্ডাই হোক—বেধেছে রুশ ও মার্কিন ব্লকের মধ্যে। গরমযুদ্ধটা আপাতত কোরিয়ায় চলেছে। অন্যত্র চলেছে ঠান্ডা স্নায়বিক যুদ্ধ। সুতরাং ঠান্ডা বা গরম যুদ্ধ থেকে যেসব রাষ্ট্র বাঁচতে চায় তাদের এই দুটো 'পাওয়ার ব্লক' থেকে দূরে থাকা দরকার—কেননা বিশ্বযুদ্ধ বাধলে দুটো ব্লকের মধ্যে বাধবে—শুধু রুশ দেশ ও আমেরিকার মধ্যে নয়। তাই নিরপেক্ষ থাকা ছাড়া পাওয়ার ব্লক প্রতিদ্বন্দ্বিতাজনিত সংঘর্ষের হাত থেকে বাঁচার পথ নেই আর। নিরপেক্ষ থাকা আরো এইজন্যে দরকার যে কোন ব্লকের সাথে গাটছড়া বাঁধলে সেই রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা অনিবার্যরূপেই ক্ষুণ্ণ হবে। রুশ ব্লক অথবা মার্কিন ব্লকের সঙ্গে যেসব দেশ তাদের ভাগ্য জড়িত করেছে—তাদের দিকে দৃষ্টি ফেরালেই বোঝা যাবে যে তারা সত্যিকার স্বাধীন নয়। তাদের "বড়দাদাদের" হুকুম মেনে চলতে হয় সব সময়ই। প্রোপাগান্ডার ঢক্কা-নিনাদে যারা বিভ্রান্ত নন তারাই এ উক্তির সত্যতা স্বীকার করবেন। কিন্তু 'নিরপেক্ষ' থাকার অর্থ নিষ্ক্রিয় থাকা নয়। সক্রিয় নিরপেক্ষতা আজ প্রয়োজন। ক্ষুদ্র ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে নিজেদের চোখ নিবদ্ধ রাখলে এযুগে আর চলবে না। বিপদ আজ দুনিয়া জুড়ে দেখা দিয়েছে। আর বিপদ যখন বিশ্বজোড়া তখন আত্মরক্ষাটা কোনমতেই শুধুমাত্র স্থানীয় হতে পারে না। তাই নিরপেক্ষ পরস্পর-সংলগ্ন কাছাকাছি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের সমঝোতা হওয়া দরকার। এবং এই সমঝোতাই বিশ্বরাজনীতিতে তৃতীয় শক্তির উদ্ভবকে সাহায্য করবে। বিশ্বরাজনীতি দুটো দলে ক্রমেই বিভক্ত হয়ে পড়ছে—ইংরাজীতে থাকে বলে Polarisation of world forces। এটাকে রোখা দরকার। কিন্তু দুটো ব্লকের কোনটাই 'নিরপেক্ষতা'কে ভাল চোখে দেখছে না। প্রত্যেকেই চাপ— অর্থনৈতিক ও সামরিক— দুই-ই—দিচ্ছে—কোন-না-কোন ব্লকে যোগ দেবার জন্যে। ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো বাধ্য হয়ে কোন-না-কোন ব্লকে যোগ দিচ্ছে। অর্থনীতি ও সামরিক ব্যাপারে যেসব রাষ্ট্র পররাষ্ট্রে নির্ভরশীল (বিশেষ করে কোন ব্লকের) তাদের পক্ষে 'নিরপেক্ষ' থাকা সম্ভব নয়। সেইজন্যেই নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে একতাবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের কোন বিশেষ ব্লকের ওপর নির্ভরশীলতা—যা পরিশেষে বশ্যতায় গিয়ে দাঁড়ায়—ক্রমে ক্রমে ঘোচান দরকার। এইসব নিরপেক্ষ শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলিই ক্রমবর্ধমান Polarisation রোধ করতে পারে। এবং যে পরিমাণে বিশ্বরাজনীতির দ্বিধাবিভক্তিকরণ রদ করা যাবে ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা শান্তিমৈত্রীর এলাকা বাড়াতে পারব। দুই যুযুধান শক্তিজোটের মধ্যে লড়াইয়ের যে মহড়া চলেছে তাকে কৌলিন্য দান করার জন্যে 'আদর্শবাদ' বা Ideology-র দোহাই পাড়া হয়ে থাকে। বলা হয় এ কম্যুনিজম ও ক্যাপিট্যালিজমের লড়াই। সোভিয়েট ব্লক কম্যুনিজমের এবং মার্কিন শক্তি ক্যাপিট্যালিজমের প্রতিনিধিত্ব করছে। এক দিকে সাম্য-গণতন্ত্র-স্বাধীনতা-ন্যায় অন্যদিকে বৈষম্য-দাসত্ব-শোষণ ও অবিচারের—এই দুয়ের মধ্যেকার এ লড়াই নাকি। ব্যাপারটা কিন্তু যদি এত সহজ ও সত্য হত তাহলে অবশ্য এই Polorisation-এর সহায়তা করাই শান্তি স্থাপনের প্রধান সোপান হত। সে অবস্থায় নিরপেক্ষতা শুধু ভ্রান্ত নীতিই নয়—দুষ্ট নীতি বলেও প্রমাণিত হত। ঘটনা কিন্তু আসলে তা নয়। এক হাতে তালি বাজে না। আর আদর্শের লড়াই ততটা নয়—যতটা বিশ্ব-শাসনের ও নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্থাপনের লড়াই। বেচারা আদর্শবাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা হচ্ছে মাত্র। নিরপেক্ষ তৃতীয় শক্তিই আজ দুই শক্তিজোটের সংঘাতকে তার অনিবার্যতা থেকে মুক্ত করতে পারে। সেই হবে একমাত্র নির্ভরযোগ্য Balancing Factor।

কম্যুনিজম ও বিশ্বশান্তি

একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশ্বরাজনীতি ভীষণভাবে আবর্তিত হচ্ছে এবং সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্লকের অযৌক্তিক বাস্তবতা-শূন্য মনোভাব বিশ্বশান্তির পথে বাধা সৃষ্টি করছে। সমস্যাটা হচ্ছে কম্যুনিজম সম্বন্ধে রুশ ও মার্কিনীদের মনোভাব। আমরা আগেই বলেছি যে, শোষণ বৈষম্যের ফলে সমাজে অসন্তোষ ও সংঘর্ষের আগুন জ্বলে ওঠে। সেই থেকে রাষ্ট্রে সমাজে বিপ্লব বা বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু যখনই সোভিয়েট ব্লক-বহির্ভুক্ত কোন দেশে বিদ্রোহের সূচনা হয়—তখনই ইঙ্গ-মার্কিনী ব্লক মনে করে যে এর পেছনে রুশিয়ার উস্কানী ও সহযোগিতা আছে। এবং সেইসব এলাকার সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনগুলোকে 'কম্যুনিস্ট' আখ্যা দিয়ে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে। অকম্যুনিস্ট গণতন্ত্রীরা বাধ্য হয়ে 'কম্যুনিস্ট' দলে ভিড়ে গিয়ে সোভিয়েট শক্তির সাহায্য নিয়ে থাকে। এইভাবে এইসব দেশে দুই ব্লকের সাহায্য নিয়ে লড়াই অন্তর্বিদ্রোহ সুরু হয়। মার্কিনীরা সব কিছু বরদাস্ত করতে রাজী, শুধু কম্যুনিজমকে নয়। পুঁজিবাদী সমাধানে যাঁরা আস্থা রাখেন না তাঁদের 'কম্যুনিস্ট' আখ্যা দিয়ে ধোলাই দেবার ব্যবস্থা করলেই তো সমস্যাটা চিরদিনের মত চেপে রাখা যাবে না। [আবার] তেমনি আবার সোভিয়েট

নীতি ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাঁরাই কিছু সংশয় প্রকাশ করে থাকেন তাঁদের 'পুঁজিবাদী' প্রতিক্রিয়াশীল বলে তার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করলেও কিছু হবে না। কম্যুনিস্টরা কিন্তু সমাজতন্ত্র ও সর্বঅবস্থায় সোভিয়েট নেতৃত্ব স্বীকার করাকে একই গোত্রভুক্ত করে থাকেন। তাঁরা বলেন, যারাই সমাজতন্ত্রী হবে তাদেরই রুশ দেশের সার্বিক প্রাধান্য ও নেতৃত্ব নিঃসঙ্কোচে মেনে নিতেই হবে। অর্থাৎ রুশ-নিষ্ঠ না হলে সমাজতন্ত্রী হওয়া যায় না। তা না হলে সমাজতন্ত্র ফ্যাসীবাদে পর্যবসিত হতে বাধ্য। এর মধ্যে কোনই যুক্তি যে নেই তা সকলেই বোঝেন। 'পুঁজিবাদ' ও সমাজতন্ত্রবাদকে কেন্দ্র করে দুই ব্লকের মধ্যে তীব্র বাক্‌বিতণ্ডা চলেছে। প্রোপাগাণ্ডার বিষবাষ্পে দুনিয়ার হাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। এই অভিযোগ-প্রত্যাভিযোগ ও মিথ্যার লড়াই রণোন্মাদনায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। কোন আদর্শ কোন্ দেশের উপযোগী তার বিচার সেই সেই দেশের জনসাধারণই করবে। কোন্‌টা উপযোগী, প্রতিক্রিয়াশীল অথবা প্রগতিশীল তার বিচার করার দায়িত্ব রুশ বা ইঙ্গ-মার্কিনদের নয়।

জাতীয়তাবাদ ও শান্তি

এযুগের রাজনীতির অন্যতম বড় চালক-শক্তি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রীয় মতবাদের ভিত্তিভূমি হল এই জাতীয়তাবোধ। জাতীয়তাবাদ একটা বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল। যখনই কোন দেশ জাতীয়তাবাদের সেই অলিখিত মাত্রা লঙ্ঘন করেছে—তখন বিশ্বের শান্তি ব্যাহত হয়েছে। উন্মত্ত জাতীয়তাবাদ পৃথিবীতে যে কতবার রক্তস্রোত বইয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বাধাহীন সার্বভৌমত্বকে ইতিহাস অচল বলেই রায় দিয়েছে। এ যুগের রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে দার্শনিকরা বলছেন 'Subhuman in ethics but super human in power'। প্রত্যেক রাষ্ট্রই যদি স্বেচ্ছায় তাদের স্বাজাত্যাভিমান ও সার্বভৌমত্ব কিছুটা পরিহার করে বিশ্বরাষ্ট্র-সংঘকে গড়ে তোলার চেষ্টা না করে তাহলে বিশ্বে শান্তি আসতেই পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রের এই আত্মসঙ্কোচনের ওপর নির্ভর করছে বিশ্ব রাষ্ট্রপরিষদের ভবিষ্যৎ। যতদিন 'Unlimited National Sovereignty বিশ্বরাজনীতির ভারকেন্দ্র স্বরূপ থাকবে ততদিন পৃথিবী থেকে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে চিরদিনের মত নির্বাসন দেওয়া সম্ভব হবে না। কোন কোন মহল থেকে বলা হয় যে, পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই যুদ্ধ চিরদিনের মত নির্বাসিত হবে। একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র কায়েম হবার পরও যুদ্ধ বাধতে পারে যদি না সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও সার্বভৌমত্ব নীতিগতভাবে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পরিহার করে। যদি ইঙ্গ-মার্কিন ও রুশ জননায়করা বিশ্ব বিধান রচনার আদর্শকে তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদের মূল স্তম্ভ-রূপে গ্রহণ না করেন এবং বিশ্বরাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণ ত্বরান্বিত করাই তাঁদের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য রূপে স্বীকার করে সেই অনুযায়ী কাজ না করেন, যদি অপর দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে যে-কোন প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিরত না হন, যদি জাতি-ব্যক্তিত্বকে স্বেচ্ছায় সংকুচিত করা না হয়, যদি সকল সদস্য রাষ্ট্রগুলির নিরস্ত্রীকরণ এবং শক্তিশালী আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ফৌজ গঠন করার দিকে মনোযোগ না দেওয়া হয়, যদি প্রত্যেক রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও অসন্তোষের কারণগুলি দূরীভূত না হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও মৈত্রীর উদার মনোভাব নিয়ে বিশ্বসমস্যার সমাধানে সকল দেশের রাষ্ট্রনেতারা এগিয়ে না আসেন তাহলে বিশ্বপরিস্থিতি অতীব ভয়াবহ হয়ে থাকবে এবং যে-কোন ছোটখাটো স্ফুলিঙ্গই বিশ্বব্যাপী বিস্ফোরণের সূচনা করতে পারবে।

বাসন্তিকা

সোমেন্দ্রনাথ রায়

তোমার চোখের ভাষা কি সঙ্কেত বয়ে নিয়ে আসে
এলোমেলো ফাগুনে-বাতাসে ?
ঝরা সজনের ফুলে ভরেছে আঙন,
আমের মুকুলে মাতে সঞ্চয়ী মৌমাছি মন,
একটি দোয়েল ডাকে সাদা-কালো বুকে তুলে ঢেউ,
তোমার আঁখির ভাষা বুঝেছে কি কেউ ?

তোমার চোখের ভাষা বয়ে আনে কিসের ইশারা ?
রাঙা পলাশের ডালে ফাগুনের সাড়া।
মটরশুঁটির ক্ষেতে মোলায়েম পাখা দুটি নাড়ে,
চোর প্রজাপতি চুপিসাড়ে।
দখিনা বাতাস এসে নেড়ে দেয় মালতীর বুকের আঁচল,
মুছে ফেলেছ কি তুমি চোখের কাজল ?

উধাও মাঠের শেষে ভেসে আসে
কোথা হতে বুকফাটা কোকিলের গান,
পাপিয়ার মত কাঁদে প্রাণ।
তোমার কবরী ঘিরে ফুটে আছে থরে থরে অশোক রঙন,
রিম ঝিম তন্দ্রার স্বরোদ বাজায় আজ বেতসের বন।
সোনা-রোদ্দুরে কাঁপে করবীর বুক,
তোমার কাজল-কালো চোখ দুটি তন্দ্রায় জড়িয়ে আসুক!!

শিশিরকুমার লাহিড়ী

ক্ষচূড়া গাছের তলায় এক চিল্তে
সবুজ ঘাসের মখমল,—সারা কার-
র ধুলো-ধোঁওয়া, কয়লা-ছাই, লোহা-
ড়ের মাঝে একটুখানি সবুজ সতেজ
ঃ মরুভূমির বুকে হঠাৎ পাওয়া আকাশ-
মা মেঘাঞ্জন।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাউনটাকে পেছনে ফেলে
মা তিন মাইল সোজা উত্তরে
ওয়ে মাড়িয়ে গেলে পড়বে বেনু
সের কুঞ্জ,—তারপর ধু ধু শুধু
লকি আর হর্তুকি বন।

ম্যানেজার সাহেবের বুইকখানা প্রায়ই
লে ওদিক দিয়ে ঘুরে যায়—হরিয়াল
র বন-মোরগের মৃত্যুমহোৎসব শুরু হয়।
র্থ লক্ষ্য—দোনলা বন্দুকের মাছির
পর তির্যক্ দৃষ্টি হানেন, ট্রিগারে আপনা
কে সেট হয়ে বসে আঙ্গুলটা—তারপর
র। পেঁজা তুলোর মত টুকরো
রো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে উড়ন্ত ডানা-
লো, পলায়নপর ভীতু প্রাণকণিকা।
রাদিন কাজের শেষে অভিমন্যুর ভাল
গে না—হৈ হৈ! কারখানার পিছনে কুলি
ইন ছাড়িয়ে, 'মার্কাস' টিলাটার বেনাঘাস
র বালিয়াড়ী উজিয়ে, কড়াইশুটির ক্ষেত
রে, সরু সিঁথির মত পায়ে চলা পথটা
য় শেষ হয়েছে—অনাবাদী বন্ধুর বুনো
গা ভেঙ্গে আমলকী আর হর্তুকী বনে,
—অভিমন্যু সেই পথেই পায়ে হেঁটে চলতে
ভালবাসে। ভালো লাগে চতুর্দিকের
রুদ্ধ আবহাওয়া থেকে পালিয়ে একান্ত
নির্জনে নিজেকে আবিষ্কার, উপলব্ধি
করতে অন্তর-সত্তাকে।

আজ কিন্তু ভাল লাগে না আর।
আকাশের কোণে কোণে জমে উঠেছে মেঘের
চাপ। 'কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ কেশ',—
রূপকথার গল্পের মত শোনায় উপমা—
বড়ো ভালো লাগে অভিমন্যুর। 'কেশবরণ
মেঘ' চুলের সাথে মেঘের তুলনা করতে
কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটে।

কৃষ্ণচূড়া তলে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।
ঘাসের ডগগুলো ভস্মমাখা সন্ন্যাসীর
উত্তরীয়ের মত হাওয়ায় ওড়ে। হাজারিবাগ
ডিস্ট্রিক্টের সীমানা ছাড়িয়ে, ধূলে
পাহাড়ের শির ছাড়িয়ে মন হারিয়ে ফেলে
অভিমন্যু মধুমতী নদীর তীরে ছোট্ট
একটি গাঁয়ে—পলাসপুরে!

মফস্বল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে উঠে-
ছিলো অভিমন্যু। গোবিন্দ অধিকারীর
মেয়ে, খুকী, মনে পড়ে—মিলিয়ে মিলিয়ে
কবিতা লিখতো অভিমন্যু। নেবু ফুলের
গন্ধমাখা, ঘুঘুডাকা শান্ত নির্জন দ্বিপ্রহরে
পালিয়ে আসা মেয়েটা ওর কোলের কাছে
জড়ো হয়ে,—ফ্যালফেলে চোখে, বোবা মুখে,
অবাক বিস্ময়ে শুনতো বিংশ শতকের
গেঁয়ো উত্তরা-অভিমন্যুর রোমাঞ্চিত স্বপ্ন-
সাধ, মধুমতীর তীরে ছোট্ট একটি কুঁড়ে—
দিনের বেলা ফুল সহেলি, রাতের বেলা
পরী নামে চাঁদের কিরণ মাখা! চাপা দীর্ঘ-
শ্বাস পড়ে অভিমন্যুর। আকাশের মেঘ ঘন
হয়ে আসে—ঘন হয়ে আসে চোখের কোলে
অতীত স্মৃতির মোহমেদুর স্বপ্নাভ
নীলাঞ্জন। আঙ্গুল দিয়ে বিলি কাটতে
থাকে চুলে পেটের দায়ে, সংসারের চাপে
ছিটকে পড়েছে আজ, বাঁশের বেড়া ডিঙ্গিয়ে,
গোবর নিকুনো ঝক্ঝকে আয়নার মতো
উঠোন পেরিয়ে, জীরের মত সরু সরু
চাল রূপশালীর ভাতের থাল ছেড়ে, নয়া
সভ্যতার উঠতি যৌবনের বর্বর আকাঙ্ক্ষা-
লুব্ধ সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় গড়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল
টাউন—ওয়াটকিন্সগঞ্জে।

উত্তরা! ছোটছেলের মতো নামটাকে
চুষতে থাকে অভিমন্যু! ফুরিয়ে যাবে
বুঝি! ভোমরার পাখার মতো ফুরফুরে
এলো হাসি খেলে অভিমন্যুর ঠোঁটে—'সে
যে আজ হো'ল কতকাল।'

কৃষ্ণচূড়ার পাতায় পাতায় মসীকৃষ্ণ
অন্ধকার—বাদুড়ের ডানার মত ঝোলে,
টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ে ফোঁটা দুই—
এখনি ঝমঝমিয়ে নামবে বুঝি। তবু উঠতে
ইচ্ছে করে না অভিমন্যুর, কেমন যেন মুগ্ধ-

লোকাশ্রিত জীবনের স্বাদ পেয়েছে রোমন্থনে—রবীন্দ্রনাথের সুরে সুরে আবৃত্তি করে অভিমন্যুঃ 'ঘরেতে এলো না সে'ত—মনে তার নিত্য আসা যাওয়া—পরনে ঢাকাই সাড়ী কপালে সিঁদুর।'

সরকার বাবু! সরকার বাবু! খৈনী টিপ্‌তে টিপ্‌তে দারওয়ান রামখেলাওয়ান হাঁক দিয়ে ওঠেঃ তানি পানি আ গৈল বা, আপ কাঁহা হো জী! রামখেলাওয়ানের মোটা গম্ভীর গলার ডাকটা রেলের সিটি যেন, সমস্ত কারখানার অন্ধকার চিড়ে অভিমন্যুর কানে ঝট্‌কা মারে—স্বপ্নভঙ্গ হয় রোমাঞ্চিত রসমাধুরীর। অভিমন্যু উঠে দাঁড়ায়, এবার গিয়ে বন্ধ হতে হবে দেশলায়ের খোলের মত টিনের ঘরে—বেবাক নিশ্চুপ! কাঠের চৌকিতে শুয়ে শুয়ে তন্দ্রালস, শুনবে শিউলালের রামচন্দ্র জী' কা কাহানী, তারপর পড়বে ঘুমিয়ে। শুধু অতন্দ্র প্রহরী থাকবে জেগে, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঘণ্টা বাজবে প্রহরে প্রহরে। নিশাচর ফেউ'র সর্বনাশা চৌকিদার—হুঁশিয়ার!

শেঠ্ হরগোবিনদ্ স্টীল এ্যান্ড স্ট্রাক্‌-চারাল ওয়ার্কস্—এঞ্জিনিয়ার্স এন্ড বিরো-লার্স। ম্যানেজার বিকাশ দত্ত যেদিন ওকে কাজে বহাল করলেন সেদিন হকচকিয়ে গেল অভিমন্যু। কলেজের উঠতি যৌবনের স্বপ্নালু কাব্যের প্রাঙ্গণ ছেড়ে একেবারে ফ্রাইংপ্যান নয় ফায়ারে। মুহ্যমান অভিমন্যু ভাবে কেমন করে বজায় রাখবে চাকরী। দত্তসাহেবের কথাগুলো মনে পড়েঃ আশা করি নার্ভাস্ হলেও কাজে স্টিক করবে তুমি, এ্যান্ড ওয়ান থিং মাই বয়, ট্রাই টু বি ফেথ্‌ফুল, ডোন্ট ফরগেট।

দত্তসাহেবের কথা রেখেছে অভিমন্যু। দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল—প্রিভিলেজ বোনাস পেয়েছে সে, মুখ থেকে ক্ষণকাল চুরুট নামিয়ে দত্তসাহেব বলেছেনঃ

কনগ্রাচুলেশন! উই আর ডামড্ স্যাটিসফায়েড।—আধো অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে চুরুটের নীল ধোঁয়ায় দত্তসাহেবের মুখটা আবছা দেখায়—রেখাঙ্কণ বোঝা যায় না, শুধু কথাগুলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় —ভয়ানক। আসল মার্কাস সাহেবের শিষ্য বিকাশ দত্ত। উপমাটা মনে এলে হাসি পায় অভিমন্যুর—বিদিশি বোতলে বিলিতি মদ।—রক্তের মত রাঙা, যেমন তেজী, তেমনি উচ্ছৃঙ্খল!

ওয়ার্নিং বেল পড়ে গেছে আর দশ-মিনিট। তারপর ভোঁ বাজবে আটটার। অভিমন্যুর মনে হয় দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাসে আটটার ভোঁ জন্মতিলক, পাঁচটার মহাপ্রস্থানের তূর্যধ্বনি। আর মাঝের ঘণ্টাগুলো জীবন সংগ্রামের ইতিহাস।—দিনের পর দিন জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম, কর্মের বিচারে মূল্য, একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি। রাবণের সিঁড়ি উঠে গেছে স্বর্গে। সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে দাঁড়িয়ে আছে সে, উঠতে হবে ধীরে ধীরে, এগিয়ে যেতে হবে শক্তপায়ে, ওয়ান বাই ওয়ান।

ভাঁটির গণগণে আঁচে লাল হয়ে ওঠে পূবের আকাশটা। কালো ধোঁওয়া একজস্ট

বকাসুরের যুদ্ধ বেধে ওঠে

চেম্বার ছেড়ে, ফ্লু নালীতে হামাগুড়ি দিয়ে সত্তর ফুট চিমনি বেয়ে গল্ গল্ করে উঠে যাচ্ছে উপরে, ভলকে ভলকে আঁকাবাঁকা কুণ্ডলি পাকিয়ে বেরিয়ে আসছে আলাদিনের জীন্। মনে হয় আকাশকে কে যেন নোংরা ন্যাতার পোঁছ বুলিয়ে কালি করার চেষ্টা করছে—নিশ্বসবায়ুতে মিশিয়ে দিচ্ছে কার্বন পার্টিকেল্‌স। তবু গ্রীষ্মকালের পার আছে, শীতকালে বড়ো কষ্ট হয় অভি-মন্যুর, টিনের সেড ছাড়িয়ে দৃষ্টি চলে না আর ধূলে পাহাড়ের চূড়া যায়না দেখা—কুয়াশার সাথে মিশে চাপ বেঁধে জমে ওঠে আষাঢ়ের কালো মেঘের মতো—নিরন্ধ্র নিশ্ছিদ্র! শুধু ভাঁটির গণগণে আঁচে মানুষ-গুলোকে দেখায় ছালছাড়ান পশুর মতো। দাঁতের ওপর দাঁত চেপে বসেছে, দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে কপালে, আগুনের সঙ্গে মরীয়া হয়ে যুদ্ধ করছে ওরা—ডু অর ডাই।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ইলেক্‌ট্রিশিয়ান এস ভি নরসিংহম অয়েল সুইচটা অন্ করে দেয়—শেলাক্, লিকুইড স্টার্টারের নবটা ঘুরোয় নরসিংহম। ঘুমন্ত কুম্ভ-কর্ণের ঘুম ভাঙছে, ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইছে ক্ষুধিত দৈত্য। ঝড়ের মত সোঁ সোঁ আওয়াজ ওঠে টু হান্ড্রেড্ ফিফ্‌টি হর্স পাওয়ার...সিক্স থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড ভোল্টস্...টু টোয়েন্টি রিভলুাইসন পার মিনিট। নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ জেগে উঠেছে সজোরে চীৎকার করে ম্যায় ভুঁখা হুঁ! দুরন্ত গতিবেগ সংযত করা দুঃসাধ্য। রোপ পুলিগুলোকে তান্ডব নাচ নাচিয়ে উদ্দাম শক্তি ছুটে চলেছে মেন স্যাফ্‌টে। আট টনের ফ্লাই হুইলটা লাটিমের মত বোঁও করে ঘুরে ওঠে। হাউসিং স্ট্যান্ডে, রেল স্টেশনে ঘুমিয়ে থাকা যাত্রীদের মত, আচম্‌কা ধাক্কা খেয়ে রোলারগুলো কল কল শুরু করে দেয়। —ওয়ান, টু...ঘড়ি মেলায় নরসিংহমঃ রেডি ফর ইউস। একটা সিগার ধরিয়ে রিং করতে থাকে নরসিংহম, হাতে নোট বুক, অ্যাম্‌মিটারের চঞ্চলা কাঁটার ওপর দৃঢ় নিবন্ধ দৃষ্টি—ভাগ্যবিধাতা নরসিংহম ওর ভাগ্যের খতিয়ান করে চিত্রগুপ্তের খাতায়।

ফোরম্যান ইব্রাহিমের আওয়াজ বোমার মত ফেটে পড়েঃ এ শালা কুত্তাকা বাচ্চা, ঠিকসে লাগানা।—পাঞ্জাবী মুসলমান ইব্রাহিম। অভিমন্যুর মনে হয় সিনেমা দেখা কিং কং যেন। তেলকালি মাখা মিশ্ কালো দাড়ির অরণ্যে জেগে আছে রক্তজবার মতো দুটো চোখ, হাতের পেশিদুটো ময়দানবের সৃষ্টি নতুন লোহপাশ। আগুনের আভায় লালচে কপালটা রক্তরাঙা ইস্পাত! নাল লাগান জঙ্গী জুতো মস্‌মসিয়ে 'সানসী দিয়ে ঘাটে ঘাটে জোগান দিচ্ছে হোয়াইট হট বিলেটগুলো—ফোর বাই ফোর বা থ্রি এফ টি। বকাসুরের যুদ্ধ বেধে ওঠে ঢালাই করা স্পিনডিল আর কাপলিনগুলো কলে পড়া ইঁদুরের মত চিঁ চিঁ করে দাঁতাল বরাহ সতের টিথের গিয়ার তিনটে কড় কড় মড় মড় করে—চাপের চোটে গুঁড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে বুঝি তবু মোটর চলে, ফ্লাই হুইল ঘোরে, রো

র নাচতে থাকে—চৌকো বিলেটগুলো নরাঙা সাপের মত এ'কে বে'কে কিল- করে বেরিয়ে আসে, ফার্স্ট রাফার, কন্ড রাফার, সেমি ফিনিস্, ফিনিসে। ওয়ার সিং সাঁড়াশী দিয়ে টেনে নেয় র পর এক, বাঁ হাতের আঙ্গুলে দিয়ে রয়ে ঘুরিয়ে পরীক্ষা করে গোলাই, গেজ য় মাপে সেকসান। অভিমন্যু নোট করে ার্স্ট হাফ এন্ আওয়ার...ফিপ্‌টি পিস াফ্ এন ইণ্ড...মোস্ট অফ দেম আপ টু ার সেকশন...প্রোডাকশন...সেকশন রোল্ড কোয়ালিটি।

রাম রাম বাবুজী! দেখিয়ে ত ইয়ে রমিটসে ই'হা সমান মিলেঙ্গে! আগন্তুক রমিট এগিয়ে ধরে।

জী হাঁ! পহলে রুপেয়া জমা কর জিয়ে, ডেলিভারী অর্ডার ইস্ু দেতা হ্যায়, পিছলা রোজ কেয় লেজানা। মর জায়েগা অত শত ঝে না বৃদ্ধ, বহুত দূরে সে আরহা হু', দিজিয়ে বাবুজী। ঠান্ডা নিস্পৃহ সুরে াঝাতে চেষ্টা করে অভিমন্যু। বকে বকে য়াল ধরে যায়, তবু এক কথা ঃ দে জিয়ে বাবুজী, মর জায়েগা।

বিরক্ত মুখে অভিমন্যু চে'চিয়ে ওঠে ঃ ইয়ে, নেহি হোগা। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চপে শক্ত হয়ে বসে। ছিনে জোঁকের মত াছোড়বান্দা, বোঝালেও বোঝে না। পয়সা দচ্ছে মাল পাবে না কেন এখনই? শুধু ঘনঘনে ন্যাকা কান্না কাঁদে অনেক কাঠ- ড় পুড়িয়ে পারমিট পেয়েছে একটা।

গোড় লাগি মহারাজ, অভিমন্যুর হাত- চেপে ধরে; কর দিজিয়ে, আপকে পান খানেকো......কথা শেষ না করেই ফোকলা দাঁতে হেসে ওঠে বীভৎস। চমকে উঠে হাত ছাড়িয়ে নেয় অভিমন্যু। সীসের ম্যাড়মেড়ে মরা হাসি চকচকে টাকাটায়। ঘুস দিয়ে কিনতে চায় অভিমন্যুর নিয়ম- ভঙ্গ বৃত্তির চোরা মানুষটাকে ঃ যাইয়ে, নিকালিয়ে, অভিমন্যু গর্জন করে ওঠে বাজ ফাটা।

এমনই দুনিয়ার জীবনদারী। মনুষ্যত্বের মূল্য আধুলি সিকিতে এসে ঠেকেছে আজ। বিচিত্র জীব!

বিচিত্র জীব! কত লোক আসে, যায়। কেউ আবেদন জানায়, কেউবা চোখ রাঙায়, কেউবা ঘুষ। সেদিনের ঘটনাটা মনে পড়লে হাসি পায় অভিমন্যুর। ভদ্রলোক চেকখানা রেখে বলেন মাল দিতে। চেক ক্যাশ না হলে মাল দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ, অভিমন্যু প্রতিবাদ জানায়।

হোয়াট, ভদ্রলোক ফেটে পড়েন, ডু ইউ নো, হুম ইউ আর টকিং টু?—জানবার প্রয়োজন নেই অভিমন্যুর, তবু বলেঃ ভেরী সরি। নন্‌সেন্স ঃ ভদ্রলোক মুখিয়ে ওঠেন, জানিয়ে দেন এখানের পুলিশ সুপার ওঁর শালার বেয়াই অভিমন্যুর মত লোকেদের কেমন করে শায়েস্তা করতে হয় জানা আছে ওঁর। রাগতে পারে না অভিমন্যু শুধু হাসে। আজব দুনিয়া।

সোলার হ্যাটটা খুলে ডান হাতে চুল- গুলো ফিরিয়ে দেয় অভিমন্যু। চুনরিয়া কয়লা চুইছে ভাঁটির ধারে। কানড় ছান্দে কবরী বান্ধে, বহু দিনের পুরানো রোমান্টিক মনটা বৈষ্ণব পদাবলীর পদে রভসাতুর হয়ে আসে। চোখ ফেরাতে পারে না অভিমন্যু। খাটো কাপড়ে আঁটো- সাঁটো জড়ানো ওর পাথরে কোঁদা শরীর দেহবল্লরী ফুল্ল আনন্দে। মাথায় আঠারো ইঞ্চি কয়লার ঝুড়ি, পা পড়ছে নৃত্যের তালে তালে, হাত দুটো দোলে ছন্দ মিলিয়ে, দ্রুত নিশ্বাসে বুকটা ওঠে আর নামে, বে'কা ঘাড়ে তেরছা নয়ন হানে— বিলাসপুরী চুনরিয়া বিলাসিয়া বহু ভোগ্যা। অভিমন্যু জানে ওর ইতিহাস। দিনের কয়লা-কালো চুনরিয়া রাতের আলোয় ঝলকে ওঠে। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই আভাঙ্গ করে স্নান করে সাবান মেখে, ফুলেল তেল মাখে চুলে, চোখে সুর্মা টানে, গাওনার লাল টকটকে ওলঙ্গ বাহার সাড়ীখানা পরে দাঁড়িয়ে থাকে রাত- শিকারী! আলেয়ার মত কাঁচপোকার টিপটা জ্বলে জ্বলে করে কপালে—দেহ- দিশারীদের হাতছানি দেয় অপাঙ্গে, কামনার বহ্ন্যুৎসবে।

চমক ভেঙ্গে যায় অভিমন্যুর। বাবুজী! —খাটো কাপড় পরা, গায়ে চিটচিটে ময়লা জামা, মাথার চুল ধুতরো ফুল, কাদামাখা পা, সঙ্গে ছোটখাট একটি পুতুলের মত মেয়ে নাকে নোলক, হাতে বাজু, পায়ে খাড়ু—ঘোমটা টানা কলাবৌ।

দরওয়ানের ওপর ঝাঁঝিয়ে ওঠে অভিমন্যু ঃ কাহে ঘুসনে দিয়া, ইয়ে কৈ ধরমশালা হ্যায়! মুখ ফিরিয়ে বলে ঃ যাও ভাগো!

হতভম্ব হয়ে তাকায় বৃদ্ধ ঃ বাবুজী! সঙ্গের মেয়েটি ভয়ে এলিয়ে পড়ে ন্যাতার মত, ফোঁচ ফোঁচ করে কান্না জুড়ে দেয়।

দরওয়ান জানায় ঃ ভিখারী নেহী বাবু কৈ পারমিটবালে।

অনেক দূর থেকে এসেছে বৃদ্ধ। হাসতে হাসতে বলে কি করবে। তৃতীয়পক্ষের বউ, মেয়েটি। শহরে যাচ্ছে শুনে ছাড়লে না কিছুতে—শহর দেখেনি কখনও যেখানে হুস করে হাওয়া গাড়ি চলে, ভক ভক করে ধোঁওয়া বেরোয় লোহার কলের, কেমন করে রেখে আসে ঘরে? কে'দে কেটে বুক ভাসিয়ে দিলে, সারা রাত দু চোখের পাত এক করেনি। দেখুন না, হাত তুলে দেখালে বৃদ্ধ, রাগের মাথায় কামড়ে দিয়েছে। অভিমন্যু তাকিয়ে দেখে— ইঁদুরের মত ছোট ছোট দুপাটি দাঁতের ছাপ। হাসতে গিয়ে সজল হয়ে আসে অভিমন্যুর চোখ। একটি ছোট মানুষকে একান্ত নিজের করে পাবার কি দুরূহ চেষ্টা। কি আছে ওর? নখদন্ত শূন্য স্খলিত গলিত বৃদ্ধ। কামনার বিষদন্ত কবে ভেঙ্গে গেছে। অভিমন্যু উদাস হয়ে ওঠে, তবু শিবের মত বৃদ্ধ স্বামী সেজে সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে উমার সংসার। অভিমন্যুর চোখ জ্বলে জ্বলে করে ওঠে। তারপর একদিন যৌবনবতী হবে ও, বাঁশি বাজিয়ে নতুন প্রিয়তম আসবে, নতুন করে হবে সাগাই—হয়ত মুমূর্ষু বৃদ্ধ শুষবে ছেঁড়া কাথায় শুয়ে শুয়ে। কাঁদবে বুক চাপড়ে—হায়! রাম! হায় রাম!

অভিমন্যু চুপ করে থাকে, তবু এমনি করেও যদি পেত উত্তরাকে। এমনি কান্না হাসির মাঝে, অমনি দুষ্টু অমনি চপল দিনের বেলা ঘর সংসার, কারখানা। রাতে বেলা ঘন হয়ে উঠত ওদের জীবন। দিনে পর দিন, বুকের ওপর নেতিয়ে পড়া বিবশ উত্তরা!—চুমো খেতে খেতে রাত পুই যেত। অভিমন্যু দীর্ঘশ্বাস ফেলে চম তাকায়।—চোখের সামনে জেগে ওঠে কা খানার ধুলো ধোঁওয়া, কয়লা ছাই, লো লক্কড় ভরা মরুভূমির মাঝে একটুখা ওয়েশিস—কৃষ্ণচূড়া তলে সবুজ ঘা মখমল। অভিমন্যু উঠে আসে। বাই দুপুরের রোদে ঝলসে গেছে কৃষ্ণচূ নেতিয়ে পড়া ঘাসের নধর কচি শীষগু ধুলো ধোঁয়ায় কালি। বুকটা জ্বালা ক অভিমন্যুর, শ্রান্তি হীন জ্বালা।—অ পিপাসায় শুকিয়ে আসে গলা, রৌদ্রদগ্ধ ম চর যেন।

চমক ভেঙে যায় অভিমন্যুর, শিউ এসে জানায়—ম্যানেজার সাব সেলাম দি

চোখে মুখে জল দিয়ে মুখটা পুছে নেয় অভিমন্যু—ডেকেছিলেন স্যার।

ইয়েসঃ দত্ত সাহেবের ভ্রূর কোণটা কুঁচকে আসে। পাইপে চাপা ঠোঁটের ভেতর অস্পষ্ট কথাগুলো ধোঁয়ার সঙ্গে ভেসে আসেঃ মাহাতোর খবর জানো?

হ্যাঁ স্যারঃ অভিমন্যু গলাটা পরিষ্কার করে নেয় কেসে।—পরশু বিকালে জরুরী মিটিং কল করেছিলো কুলি লাইনে, টংসম্যানরা যোগ দেয় নি কেউ, ইব্রাহিমের মানা। গ্যাংম্যান বৈজুনাথ গেছিলো, মতে মেলেনি, মাহাতো এখন নতুন করে চেষ্টা করছে যাতে ইউনিয়নটা রিফর্ম করা যায়।

দ্যাটস ইট! ভেরী গুড! আই উইল হাউন্ড দ্যাট ডেভিল আউট!—দত্ত সাহেবের চোখ দুটো ভাঁটির আগুনের মত ঝলসে ওঠে। ভাঁটির সরদার মাহাতো, অভিমন্যু মনে মনে ভাবে—সাবধান। আসল মার্কাস সাহেবের শিষ্য দত্ত সাহেব, দিশি বোতলে বিলিতি মদ—রক্তের মত রাঙা, যেমন তেজী, তেমনি উচ্ছৃংখল। আজ আর হাসি পেল না অভিমন্যুর।

দত্ত সাহেবের মুখে ফুটে উঠছে হাসি, একটু একটু, যেন নতুন সূর্যোদয়। অভিমন্যু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ইয়েস সেন,—ড্যু ইউ নো চুনরিয়ার অসুখ সেরেছে কিনা?

আপাত অর্থ ধরতে পারে না অভিমন্যু, বলেঃ ভালই ত দেখলাম।

নো, নো, আই মীন! আচ্ছা থাক, ডক্টর রয়ের কাছে জেনে নেব'খন। লাভা স্রোতের মত প্রসারিত হয় হাসি—হো, হো করে উচ্চকণ্ঠে অট্টহাস হেসে ওঠেন দত্ত সাহেবঃ গো, গো মাই বয়, লুক এ্যাট ইয়োর ওয়ার্ক।

সুইং ডোরটা পেরিয়ে এসে ভয়ানক চমকে ওঠে অভিমন্যু। চোখ দুটো বেরিয়ে আসবে বুঝি। গলা টিপে বিস্ময়টাকে স্তব্ধ করে দেয়ঃ হাউ ডেভিলিস্।—জলের মত স্বচ্ছ হয়ে আসে প্ল্যানটা মাহাতোর সঙ্গে চুনরিয়ার মাখামাখি বেড়েছে আজকাল। ডাক্তার সাহেবের মতের অপেক্ষায় আছে—কিয়োর্ড। তারপর! অভিমন্যুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিকাশ দত্তের সই করা রিজিওন্যাল লেবার কমিশনারের কাছে লেখা চিঠিঃ ভিরুল্যান্ট টাইপের সিফিলিটিক পেসেন্ট মাহাতো, আমার কারখানায় ফিমেল ওয়ার্কার আছে, আমাদের সেফটি, আই মীন তাদের সেফটির জন্যে ও লোকটাকে কাজে বহাল রাখা অনুচিত—তা ছাড়া ফিরিস্তি যাবে লম্বা, কাজ ও কনডাক্ট সম্বন্ধে। এক গেলাসের ইয়ার ওঁরা। পাস হয়ে যাবে চিঠি। দত্ত সাহেবের উচ্চ হাসি কানের ওপর ভেসে ওঠে। চট্‌চটে জেলীর মত আঠালো বীভৎস অক্টোপাস এগিয়ে আসছে, আবছা অন্ধকারে, রক্ষা নেই! অভিমন্যু ঠিক করে সাবধান করে দেবে মাহাতোকে, এ সর্বনাশ হতে দেবে না চুনরিয়ার। চোখের সামনে খাড়া হয়ে ওঠে রাবণের সিঁড়িটা। দ্বিতীয় ধাপে দাঁড়িয়ে আছে সে—উঠতে হবে ধীরে ধীরে, এগিয়ে যেতে হবে শক্ত পায়ে—ওয়ান বাই ওয়ান। শুষ্ক মানবিকতার খোলসটা খসে যায়, ম্লান হাসি হাসে অভিমন্যুঃ গুডবাই মাহাতো! গুডবাই চুনরিয়া!

দুপুরের ডাক বিলি হয়ে গেল, অভিমন্যু তাকিয়ে দেখে, মধুমতীর দেশ থেকে, ওর নামে আঁকা বাঁকা হাতে লেখা চিঠি আসে না কখনও! শ্রান্ত অভিমন্যু চুপ করে বসে থাকে। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ঘণ্টা বাজে। ডিউটিতে ডিউটিতে বদল হয় দারোয়ান, পর্যায়ক্রমে সেট বদল হয় টংসম্যানের, ভাঁটিদারের। দুপুরের রোদ নিঝুম হয়ে আসে, পড়ন্ত বৈকালে ছুটির ঘণ্টা বাজতে কত দেরী? কত? কুলিরা মাল টেনে চলে, শ্রমশ্রান্ত শ্লথগতি ঘোড়া ওরা, ফেনা ঝরে মুখে, লরীর পর লরী আসে আর যায়—মালের পর মাল।

উজান পানে স্রোত বইছে—স্থির, নিস্তরঙ্গ। অভিমন্যু চুপ করে বসে থাকে। এ জীবনে কোন দিন পূর্ণ হবে না স্বপ্নসাধ, কোন দিন জাগবে না উত্তরা—অভিমন্যুর দেশে। কোন দিন উত্তরার উষ্ণ আতুর অধরে এঁকে দিতে পারবে না বাঞ্ছিত চুম্বন, উত্তরার বুকে মাথা রেখে গ্রহণ করা হবে না তৃপ্তির স্বাদ! হাতের আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলে অভিমন্যু।

মিলের বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টা আচমকা বেজে ওঠে—ঢং—ঢং! লাফিয়ে ওঠে অভিমন্যু। দত্ত সাহেব চিৎকার করে ওঠেনঃ সেন, গো এন্ড সী, কুইক!

নিত্যনৈমিত্তিক দুর্ঘটনা লেগে আছে জীবনে—যেন দুর্ঘটনাটাই স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক তার অঘটন। বিস্ময়াহত অভিমন্যু ককিয়ে ওঠে। ক্রুদ্ধ আক্রোশে গর্জন করতে করতে লোভী যন্ত্রটা লৌহ পেষণে টেনে নিয়েছে ইব্রাহিমের হাতখানা। থেঁতলে পিষে থক থকে কিমা হয়ে গেছে মাংস আর হাড়ের স্তূপ। ইয়া আল্লা!—আকাশ ফাটান চীৎকার করে উল্টে পড়ছে ইব্রাহিম। অতবড় মোষের মত মানুষটা কলে পড়া ইঁদুরের মত নির্জীব। রক্তস্নানে খল্‌ খল্‌ করে হাসে যন্ত্রদানবের নিপীড়িত আত্মা—বহুদিন পরে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে পাশবদ্ধ অজগর।

বিকালের পড়ন্ত রোদ ক্লান্ত বিষণ্ণ। মার্কাস টিলাটার বেনা ঘাস আর বালিয়াড়ি উজিয়ে হনহনিয়ে এগিয়ে চলে অভিমন্যু। ক্লান্ত, রিক্ত, হৃতসর্বস্ব—বাজের মত শক্ত নখে ছোঁ মেরেছে ভাগ্য।—সামনে কড়াইশুঁটির ক্ষেত চিরে সিঁথির মত সরু পথ। ক্রন্দসী হৃদয়টাকে হাতের থাবায় চেপে ধরে অভিমন্যু। মনে হয় দুপায়ে মাড়িয়ে চলেছে উত্তরার ধবল-সিঁথি সীমন্ত। বুঝেছে অভিমন্যু, কলেপড়া ইব্রাহিমের মত চিরকাল বোবা হয়ে থাকবে উত্তরা। আর দিনের পর দিন, দত্ত সাহেবের গুলি খাওয়া হরিয়াল, বন-মোরগের মত আমলকি আর হর্তুকি বনে, চুনির চুমকি জাগাবে অভিমন্যুর বুকের রক্ত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৯

এদিকটা, অর্থাৎ শিবানীপুরের পর থেকে আবার অন্য রকম। হোক অল্পটুকু তার মধ্যে কিন্তু ফলতা লাইনের দৃশ্য-বৈচিত্র্য আছে, খোলসাপুর-ঠাকুরপুকুর অর্থাৎ বেহালা-বড়িশের খিড়কি দিয়ে যেখানে পথ কেটে এসেছে সেখানটা জঙ্গুলে,—সবুজের সঙ্গে যেন মাখামাখি করতে করতে বেরিয়ে এল শাড়িটা; তার পরেই ডায়মণ্ডহারবার রোডের মুক্ত প্রাঙ্গণ, নবীন এসে এই সবে নব উৎসাহে পা ফেলেছে;—বাড়ি বাগান, শহর উঠেছে গড়ে, গাঁয়ের বৌ সেজেগুজে চলেছে কলকাতায়। শিবানীপুর থেকে ভাবটা বদলাল। ডান দিকটা প্রায় ফাঁকা, বাঁ দিকে দূরে কাছে একটার পর একটা গ্রাম। কাছের গুলো দেখে স্বরূপ যাচ্ছে বোঝা,—বাঙলার পুরনো গ্রাম, ভদ্রপল্লীর সংখ্যা বেড়েছে—বড় বড় নানা রকম গাছ, ডোবা মজা পুকুর, ইটের পুরনো বাড়ি—দোতালাও আছে তার মধ্যে, ঘন গাছপালার মধ্যে খানিকটা আত্ম-গোপন করে—পতিত অভিজাত কোঁচার খুঁটে ছেঁড়া লুকুবার চেষ্টা করছে।

গ্রামের বাইরে একটা ইঁটের পাঁজা, জীর্ণ হয়ে গলে গলে পড়েছে জায়গায় জায়গায়। মাথায় একটা অশত্থ, নিতান্ত ছোট নয়।… একটা আনন্দ-মুখর-গৃহ গড়ে ওঠবার কথা ছিল কোন্ দূর অতীতে; তারপর পায়নি গড়ে উঠতে; কে জানে কত আশা-নিরাশার কাহিনী সে।

পুরনো বাঙলার গ্রাম ইতিহাসের ছেঁড়া বই, একটু ইঙ্গিত দিয়ে খেই হারিয়ে চলেছে…তাই তো আরও টানে—আলো-আঁধারিতে আলেয়া, ক্রমাগতই খুঁজে চলো, ক্রমাগতই খুঁজে চলো।

স্টেশন এল দীঘির-পাড়। এই আবার আলেয়ার আলো ঝলকে উঠেছে। কার দীঘি? কি তার কাহিনী? খুঁজে দেখো—মজা দীঘির দামের নিচে, পাড়ের জঙ্গলে পুরনো বাঙলার রূপ-কথা আছে চাপা দেওয়া-রায়েদের প্রতাপ, মুর্শিদাবাদের অর্ধসুপ্ত নবাবের হুংকারের এক আধটা আওয়াজ এসে পৌঁছুচ্ছে মাঝে মাঝে, ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের এক আধটা কাহিনীর টুকরা।……ঐ মজা খালটা—এখন ওটা মজা খালই- হয়তো ছিল গঙ্গার শাখা, ওলন্দাজ-পর্তুগীজদের বোম্বেটে ওরই ওপর দিয়ে এসে দিত হানা, কচিৎ আরাকানী মগ, দীঘিরপাড়ের রায়েদের ছিপ থাকত অতন্দ্র প্রহরায় তাদের জন্যে ওৎপেতে……

জীবনও বাঙলার রোমান্স, তার কায়া নেই, আছে ছায়া। মন্দ কি?—ছায়াতে মায়া জাগায় আরও বেশি করে, তারই টানে আসে বঙ্কিমের দল—মাটির রোমান্সকে বইয়ের পাতায় অমরত্ব দেয়—দুর্গেশনন্দিনী—সীতারাম—এই রোমান্সই রূপান্তরিত হয়ে ওঠে নববেদ-এ আনন্দমঠের নব-সূক্ত 'বন্দে মাতরম্'ঃ রনাহূত হয়ে জেগে ওঠে অরবিন্দ-সুভাষেরা। বটমূলেদীর্ণ-বাঙলার পল্লীগুলোকে অবহেলার চোখে দেখো না।

এক ধরণের মৌন বেদনায় মনটা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে, দিনের আলোটাও আসছে আস্তে আস্তে মলিন হয়ে। নাঃ, এ সময় পুরনো বাঙলার পুরনীকে প্রশ্রয় দিলে আমার অমন গল্পটাকে আর মাথা তুলতে দেবে না। থাক্ এখন, গুপী-নারাণীদের টিকিস্ কেনা হয়ে গেছে ওদিকে, আমার মাথার মধ্যে কোথায় সিনেমার দরজার সামনে উদ্গ্রীব হয়ে আছে দাঁড়িয়ে—

বলছিলাম—প্রবেশপর্ব আরম্ভ হোল। প্রথমে সবার হাতে হাতে টিকিট থাকবে কি একটা সামন্তের হাতেই থাকবে সেই নিয়ে একটা সমস্যা উঠল। সেটা পাল-বৌয়ের একটা উপমায় সমাহিত হয়ে গেলে সবাই দরজার গোড়ায় গিয়ে জমা হোল। গুপী টিকিটগুলো দিয়ে একপা ভেতরে সেঁদ বরিয়েই সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে এল। পুর্বে যে দুবার গেছে আলোয়—আলোয় গেছে, মুখটা অন্ধকার করে বললে—'ভেতরে যে আমাবস্যের আঁধার, তার কি করচ, বলি হ্যাঁ পাল-বৌ?'

টিকিট-চেকার বুকিং-ক্লার্কের পানে চেয়ে একটু ঘাড়টা নাড়লে—অর্থাৎ বাধিয়েছেন ভ্যালা এক ফ্যাসাদ। গুপীকে বললে—'কিছু ভাবনা নেই গো কর্তা, ভেতরে আলো দেখিয়ে নিয়ে যাবে, চেঁচামেচি কোরনা কিন্তু। এস, এক একজন করে ঢোক।'

ভেতরের গাইডকে বলে দিলে—'একটু কেয়ারফুলি নিয়ে যান।'

পাল-বৌ লাইনটা ঠিক করে দিলে। প্রথমে থাকবে সামন্ত, তারপর নিচের দিক থেকে বয়স হিসাবে ছেলেরা, তারপর বয়স হিসাবে ছোট মেয়েরা, তারপর নারাণী, অনঙ্গ, রতনের-মা; সবশেষে পাল-বৌ, পাকা রক্ষী হিসাবে। খুব সাবধান করে দিলে—'কেউ কাউকে ছাড়বি নি, খবরদার! এ মীরগঞ্জের কার্তিক পুজোর মেলা নয়।'

টর্চ জেবলে গাইড সামনে চলেছে, জন-চারেক যখন ভেতরে গিয়েছে গুপী সাড়া পাবার জন্যে হাঁক দিলে—'ভগা আছিস? তিলি আছিস? লক্ষ্মী আছিস? ন্যাংটা আছিস?'

'সাইলেন্স! সাইলেন্স! চুপ করুন! চুপ কর!'- করে সমস্ত ঘরের মধ্যে একটা কলরব উঠল। এদিকে ভয়ে কচি ছেলেমেয়ে-গুলো গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দিয়েছে; এক মুহূর্তেই অন্ধকার ঘরটা আবার উৎকট হয়ে উঠল। একে অন্ধকার, তায় এই ব্যাপার, সামন্ত ঘাবড়ে গিয়ে আরও গলা তুলে হাঁকলে—'পাল-বৌ আছ?—বলি, অ পাল-বৌ, লোতুন-বৌ আচে?—বলি, রতনের মা……!'

কলরব উঠল যেন ছাদ ভেঙে পড়বে—'চুপ কর!……ঘাড় ধরে বের করে দাও!……স্টপ, স্টপ্!……বন্ধ করে দাও!……আলো……জ্বালো!……লাইট! লাইট……!'

সবার ওপর পাল-বৌয়ের কণ্ঠস্বরের ভগ্নাংশ শোনা গেল—'ঠিক আচি, আমার জন্যে ভেব নি……!'

এমন সময় আলো জ্বলে উঠল। এরা সবাই ততক্ষণে ভেতরে এসে গেছে আর কোঁচার খুঁট না ছেড়ে গুপীর চারিদিকে মাঝখানে রাস্তাটির ওপর জটলা করে

দাঁড়িয়েছে। ছেলেমেয়েগুলোর কান্না গেছে থেমে, সবাই হাঁ করে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে, মুখে কারও প্রশ্ন-মন্তব্য কিছু নেই, সবাই হতভম্ব হয়ে গেছে।

এদিকে প্রায় হাজারখানেক লোকের প্রত্যেকের দৃষ্টি তাদের ওপর নিবদ্ধ। নির্বাক, একটা সুচ ফেললে তার আওয়াজটি যায় শোনা। কিন্তু মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই আবার কলরবটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, যেন আরও উগ্ররূপে। 'বের করে দাও!......থার্ডক্লাসের দিকে নিয়ে যাও!...... কে ওদের ঢুকতে দিলে?......ম্যানেজার কোথায়?......গেট্‌আউট!'

প্রায় সব গাইডগুলোই একত্র হয়ে টানা-ছেঁড়া করবার উদ্যোগ করেছে—'এদিকে, এদিকে এস......না, ওদের থার্ডক্লাসে আসতে দিন......টিকিট আছে তোমাদের?......কি করে ঢুকে পড়ল দলবল সুদ্দু—চলো বাইরে......'

চারিদিক থেকে থাবা খেয়ে সামন্ত একেবারে মরিয়া হয়ে উঠল। দলের সবাইকে ঠেলে সামনে এসে গলাটা একটু বাড়িয়ে মুখ খিঁচিয়ে বললে—'বাইরে যেতে হবে! গুণে দু-কুড়ি নোট দিয়ে টিকিস কিনেচি, তার আধখানা এখনও এই মুঠোর মধ্যে রয়েছে!......বলে কি করে ঢুকলে—বাইরে চলো!—ভারি আমার বাইরে নে'যাবার গোঁসাইরে!'

ঘাড় ফিরিয়ে বললে—'একবার আহ্লাদের কথাটা শুনে থুয়ো পাল-বৌ,—বলে বাইরে যাও!'

পাল-বৌ থতমত খেয়ে গিয়েছিল, কি রাগ জমাচ্ছিল, বলা যায় না, সামন্তর কথায় কোমরে দুটো হাত দিয়ে সামন্তের চেয়েও একপা এগিয়ে একটু ঝুঁকে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে—'কী আমার সাতপুরুষের কুটুমরে, ওনার কথায় বাইরে যেতে হবে! কলকেতা দেখতে এসেচে! আইন নেই? আদালত নেই? হাইকোর্ট নেই? এই পাল-বৌ এসে সামনে দাঁড়াল, দেখি একবার অবলা মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে কে......'

এমন সময় ম্যানেজার এসে উপস্থিত হোল। এতক্ষণ টিকিট ঘরে গেটে আদ্যোপান্ত তথ্য সংগ্রহ করছিল, সম্ভবত এ অবস্থায় জবরদস্তি বাইরে বের করে দেওয়া চলে কিনা সে সন্ধানও নিচ্ছিল। শান্ত কণ্ঠে বললে—'ওগো বুড়ো, থামো। বের করতে যাবে কেন? তার দরকারই বা কি? চলো দিকিন, তোমাদের জন্যে আলোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে, যাও এবার নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে বসো। তাড়াবার কথা কি আছে?'

একজন গাইডকে বললে—'যাও, কত্তাকে, পালবৌকে আর সবাইকে যত্ন করে নিজের নিজের জায়গা দেখিয়ে দাও।'

এতক্ষণ দর্শকদের সবাই নির্বাক ছিল একেবারে, এরা এগুতেই প্রথম শ্রেণীর যারা একেবারে কাছের তাদের মধ্যে অতি-সৌখীন গোছের কয়েকজন প্রবল আপত্তি করে উঠল —'এখানে নয়!......এদিকে নয়!......নিচের দিকে নিয়ে যাও......!'

কিন্তু পাল-বৌয়ের অবলা-নারীত্ব তখন সম্পূর্ণ জেগে উঠেছে। 'মেনী মুখোদের কম্ম নয়, তুমি পেছনে যাও।'—বলে সামন্তকে ঠেলে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আবার এগুতে এগুতে দুলে দুলে আরম্ভ করলে —'উঁচুর ট্যাকা গুণে দিয়ে নিচুতে গিয়ে না বসলে সুখ হবে কেন বাবুদের! ইস্, বাবু! নিফাইন্ ধুতি-চাদর! ফুরফুরে গন্ধ!......এই আমি বসনু, তোরাও সব বোস্ গাঁট্ হয়ে, কোন্ বাবু ওটার একবার দেখি ভালো করে......'

ম্যানেজার চলে গিয়েছিল, আলো নিভে আবার সিনেমা শুরু হয়ে গেল।

গল্পটা আমার এখানেই একরকম শেষ হোল। কিন্তু নারাণী এখনও মনটা দখল করে রয়েছে। নাতনীকে যে ভালোবেসে ফেলেছি শুধু তাই নয়, মনে যা ছাপ রেখে গেছে তাতে কেমন একটা অস্বস্তি লেগে রয়েছে যে গল্পের নায়িকা হিসেবে বেশ ভালোভাবে ফোটে নি এখনও—কি যেন বাকি রয়েছে—ও যা মেয়ে, এত সহজে সামন্তকে রেহাই দেবার পাত্রী নয়।......বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেছি; তারপর ওদের দুজনের সাজগোজের কথা মনে পড়ে গেল—গল্পটা আরও একটু টেনে নিয়ে গিয়ে সামন্তকে আরও একটু নাকাল করিয়ে ছাড়া গেল।......বাঃ, মাত্র চারটি শ' টাকা দিয়ে খালাস হবে,—নারাণী আমাদের এতই খেলো নাকি?

বেশ খানিকটা হিড়িক গেল। টাকাও একচোট বের হয়ে গেছে জলের মতোই। তা যাক্, সামন্তর বিশেষ খেদ নেই, আবদারের হাত থেকে রক্ষা পাবে অন্তত। একটু সুখ হয়েছে, বুড়ো বয়সে শখ করে একটা বিবাহ করলে, তা আবদারে-অভিমানে একেবারে যেন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। আর কি, রেল গাড়ি হোল, টেরাম হোল, বাস হোল, কালীঘাট হোল, সিনেমা হোল—সারা কলকাতাটাই গেল হয়ে, বাকিটা কি রইল?

প্রথম দেখাতেই কিন্তু আবার সেই মুখ-ভার, কথা-বন্ধ। গুপী প্রথমটা তো হাঁ করেই রইল, কথা বের হবার মতো অবস্থা হলে বললে—'ব্যাপারখানা কি রে নারাণী? সবই তো হোল—ট্যাকাকে তো ট্যাকাই বললুম নি।'

'ট্যাকা নিয়েই থাকো গিয়ে।'

'না হয় বলই কথাটা কি।'

অনেক সাধাসাধির পর নারাণী মুখ খুললে—'একখানা বনলতা শাড়ি আর এক জোড়া বনলতা ঝুমকো......'

'সে আবার কি? বাপের কালে তো নামও শুনিনি।'

ঐ যে বায়স্কোপে মেয়েটা পরেছেল—এই রকম নাক, টানাটানা চোখ...বাজারে ঐ নাম বললে পাওয়া যায়, অবিশ্যি কলকাতার বাজারে......'

'তুই নাম টের পেলি কার কাছে তাই সুদোই। ঝগড়ায় আর অন্ধকারেই তো কেটে গেল!'

মাসখানেক পরে অনেক চেষ্টায় এবং প্রচুর ব্যয়ে হোল সংগ্রহ। খুব গোপনে সরবরাহ করে সামন্ত বললে—তেমনি কোন কিছু হলে পরবি, লুকিয়ে থো। এবার হোল তো?'

দুটো দিন কিছু নয়, আবার তৃতীয় দিনে মুখভার, অভিমান, কথা-বন্ধ। আবার খানিকটা হাঁ করে থাকবার পর যখন কথা কইবার একটু সামর্থ্য হোল, সামন্ত প্রশ্ন করলে—'আবার কি হোল রে নারাণী? সব দিলুম তো এনে, ট্যাকাকে তো খোলাম-কুঁচি করে থুলুম।'

'ট্যাকা নিয়ে থাকো তুমি।'

না হয় শুনিই ভেতরের কথাটা কি।'

'তুমি অমন হেঁটু পজ্জন্ত কাপড় পরে, গায়ে ময়লা গামছা দিয়ে আর বেইরো নি।'

'তবে?'

'তবে কি?—একটা পিরাণ তোয়ের করাও। গলার এখানটা বন্ধ, এই রকম বেঁকা পটির ওপর বোতাম, কনুইয়ের কাছটা খোলা, কব্জির ওপর কড়াক্কর করে চাপা,

পজ্জন্ত ঝড়। বায়স্কোপে সেই যে ছেলেটার গায়ে ছেল, মেয়েটার বরের। দরজির কম্ম নয়, সেই কলকাতা থেকে তে হবে। কে জানে, বিরুয়া পাঞ্জাবী না একটা নাম শুনেনুন যেন......'

এবার যা হাঁ হোল সামন্তের, সহজে আর হোল না।

সমাপ্ত।

গল্প সমাপ্ত হলেও নারাণী কিন্তু সমাপ্ত ত চাইছে না। একটি অনির্বচনীয় মাধুর্যে টা যেন আচ্ছন্ন করে আছে। এ যেন তারে মিশ্রতারের ঝঙ্কারটা থেমে যাওয়ার ও একটা তারের রণরণানি আর যেতে ছে না।

ভাবছি কেন এমনটা হয়। নারাণী তো কলা ছিল না, আরও যারা ছিল—দোকানী, পী, দোকানীর নাতি, কেউ তো নিজের জের জায়গায় কম মধুর ছিল না, বিশেষ রে ঐ কিশোরটি,—যদি মাধুর্য আর মনীয়তার কথাই ধরা যায় তো নারাণী তো র কড়ে আঙ্গুলের কাছেও লাগে না। সবাইকে ছায়ায় ঠেলে নারাণীই রইল জ্জ্বল হয়ে; কেন?

Sex?......গোড়াতেই বলে রাখি Freud নয়ে তোমাদের অত বাড়াবাড়িতে আমার ন সায় দেয় না। কোন কোন তত্ত্ব গড়ে ওঠবার মুখেই তাদের অভিনবত্বে ফ্যাশান হয়ে ওঠে, তাইতে তাদের পরিণতি আপাতত যায় রুদ্ধ হয়ে। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বেরও হয়েছে তাই। আমার মনে হয় এ ঝোঁকটা কেটে গেলে তখন ওর যথার্থ বিশ্লেষণ হবে আরম্ভ, তখনই সত্যের সত্যতর রূপের পাওয়া যাবে সন্ধান, Libido-র এ একচ্ছত্রত্ব আর থাকবে না। যাক্ সে কথা, আমার চিন্তাটা ঠিক তত্ত্বের পথ ধরে যাচ্ছেও না। আমি ভাবছি একটা অদ্ভুত কথা—প্রশ্নগুলো অনেক সময় অদ্ভুত আকারেই ওঠে আমার মনে।—ধরো এই যে দ্বৈত ব্যবস্থা, স্ত্রী আর পুরুষ, এর পাটই নেই সৃষ্টিতে—শুধু পুরুষ আছে; কিরকম হয় সেটা? সন্তান-কোলে নতদৃষ্টিতে মা নেই বসে, স্ত্রী নেই স্বামীর পথ চেয়ে, সেবা-সুন্দর হাতে বোন নেই ভায়ের পাশে, দেহে-মনে উদ্গত প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়ে তরুণী নেই তরুণের জন্যে বরমাল্য হাতে করে। আকাশ রুক্ষ, তাতে বিরহের হাহুতাশের বাষ্প জমে ওঠে না, মিলনের আনন্দ ওঠে না নক্ষত্র হয়ে ফুটে। বর্ষা ব্যর্থ, বসন্ত নিষ্প্রয়োজন। ফুলের নেই কমঅঙ্গের উপমা হয়ে ফুটে ওঠবার সার্থকতা, কুঁড়ির নেই না ফুটে ওঠবার গৌরব। সীতা নেই, দ্রৌপদী নেই, তাই বাল্মীকি নেই, ব্যাস নেই; হেলেন নেই, তাই হোমর নেই, বিয়াট্রিচে নেই তাই দান্তে নেই; জননী-মেরী নেই, তাই জন্মাল না র‍্যাফেল, মমতাজ নেই, তাই স্বচ্ছ মর্মর পর্বত-কারাতেই রয়ে গেল চিরমৃত্যুর কোলে, কালের কপোলে দুই বিন্দু অশ্রুর অমরত্বলাভ করতে পারলে না।

বৃন্দাবনে রাধাহীন শ্রীকৃষ্ণ; গাঙ্গিনীর তীরে কার রূপ নিয়ে ঐশীশক্তি হবেন আবির্ভাব যাতে পাটনীর কাঠের সেঁউতি যাবে সোণা হয়ে?

ওরাই কেন্দ্র, ওরাই নানারূপ সৃষ্টির সংহতি, ওরাই সৃষ্টির স্রষ্টা। এক নারাণীই পারে গৃহ হতে দূরে, পথপ্রান্তের একটি দোকানে, মাত্র একটি ঘণ্টার অবসরে এমন করে সেবা-প্রীতি স্নেহ-প্রেমে পূর্ণাঙ্গ একটি সংসার গড়ে তুলতে—একাধারে সখী, ভগ্নী, জননী, কন্যা, প্রেয়সী। একই শক্তির দশভুজা; প্রহরণ নয়, প্রসাদময়ী।

হরিণডাঙ্গায় গাড়ি বদল করলাম। একলা একলা আর ভালো লাগছে না, তবে এক-দিকে যেমন সঙ্গীর অভাব অনুভব করছি অন্য দিকে তেমনি আবার ভিড়ের আইডিয়াতেও মনটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে। অবস্থার মধ্যে যতটুকু সাধ্য অভিনবত্ব সৃষ্টি করে চলতেই আমার ভালো লাগে—তাতে ভালোও আছে মন্দও আছে, কিম্বা ভালো-মন্দের প্রভেদই নেই,

আমার মনে হয় অভিনবত্ব দিয়ে এই অল্পাদিনের আয়ুটাকে অনেকখানি বাড়িয়ে নেওয়া যায়, মহাকালকে দেওয়া যায় ফাঁকি। সময়ের দীর্ঘতার দিক দিয়ে আয়ুর পক্ষপাতী নই আমি মোটেই, একটা ভদ্র-গোছের মাপিকসই আয়ু পেলেই সন্তুষ্ট থাকব—অর্থাৎ যতদিন পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের—এই আজন্ম পাঁচটা সঙ্গীর আয়ু আছে অটুট। তারপরেও যে বেঁচে থাকা (থাকার আকাঙ্ক্ষা বলাই ভালো) সেটাকে হ্যাংলামি ছাড়া অন্য আখ্যা দেওয়া যায় না। অবশ্য প্রকৃতির

চক্রান্ত, উপায় নেই, তবে আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা এই হ্যাংলামির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার বের করেছিলেন একটা উপায়,—পঞ্চাশের পর বাণপ্রস্থ, তদূর্ধ্বে যতি। যারা ষোড়শোপচারে জীবনটাকে ভোগ করতে পারছে, তাদের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থেকে আর কি হবে? মান-সম্ভ্রম নিয়ে সরে পড়ো; বরং একটু নিরিবিলিতে ব'সে দেখো, এই বিরাট বঞ্চনার কিছু রহস্য ভেদ করতে পার কিনা। মহামায়ার মুখোসটা পার কিনা টেনে নামিয়ে ফেলতে।

যা বলছিলাম,—নিত্য অভিনবত্ব। সময় জিনিসটাকে বাড়ানো যায় না, একঘণ্টাটাকে দুঘণ্টা করা যায় না, একটা দিনকে দুটো দিন নয়, কিন্তু কালের স্থিতি-স্থাপকতা রবারের চেয়েও সহস্রগুণ বেশি, একটা দিনের থলিতে কত বৈচিত্র্য যে তুমি ভ'রে দিতে পার তার লেখা জোখা নেই, আর যত বৈচিত্র্য ততই নিজেকে পেয়ে নেওয়া বেশি করে।...আয়ু আর কাকে বলবে?—তার তো দুটো লেজ নেই, এই জিনিসই। আমার এই আজকের দিনটাই দেখো না, কতখানি চে'চে, কতখানি এগিয়ে গেছি। আর ছ-মাস ধ'রে সেই যে ছটায় ওঠা, আটটায় স্নান, ন'টায় খাওয়া, দশটায় আফিস; আবার দিনগত সবরকম পাপক্ষয় সেরে রাত এগারটায় শয্যাবলম্বন—এটাকে কি মাত্র একটি দিনেরই পুনরাবৃত্তি বলব না—অনন্ত ১ × ১-এর গুণ টেনে যাওয়া।

আমার লেখার ঘরটা মন্দ নয়, আলো-বাতাস প্রচুর, খানিকটা শ্রী-ও আছে, কিন্তু বরাবর তার মধ্যে ব'সে লিখতে পারি না, বাগানে গিয়ে বসতে হয়। বলবে সেতো আরও ভালো—'শান্তিনিকেতন'; তাহ'লে যাত্রার ভাষায় আর একটু 'প্রকাশ ক'রে' বলি —ফুলের বাগান ছেড়ে বেগুনের ক্ষেতের ধারেও বসি মাঝে মাঝে, খালি গ্যারাজেও কখনও কখনও।

রাজসিংহাসনে বসিয়ে আমার মাথায় মুকুট দিয়ে ঘেরেঘুরে ব'সে থাকবার যদি কারুর কারুর অভিসন্ধি থাকে তো বলে দিও প্রথম পুরস্কার তারা যা পাবে আমার কাছ থেকে তার নাম শূল-দণ্ড। বাঃ, ওরাও আমায় আয়ুহীন করছে যে, আমার একটা দিনকে মাত্র একটা দিনের গণ্ডীতেই আটকে রেখে।
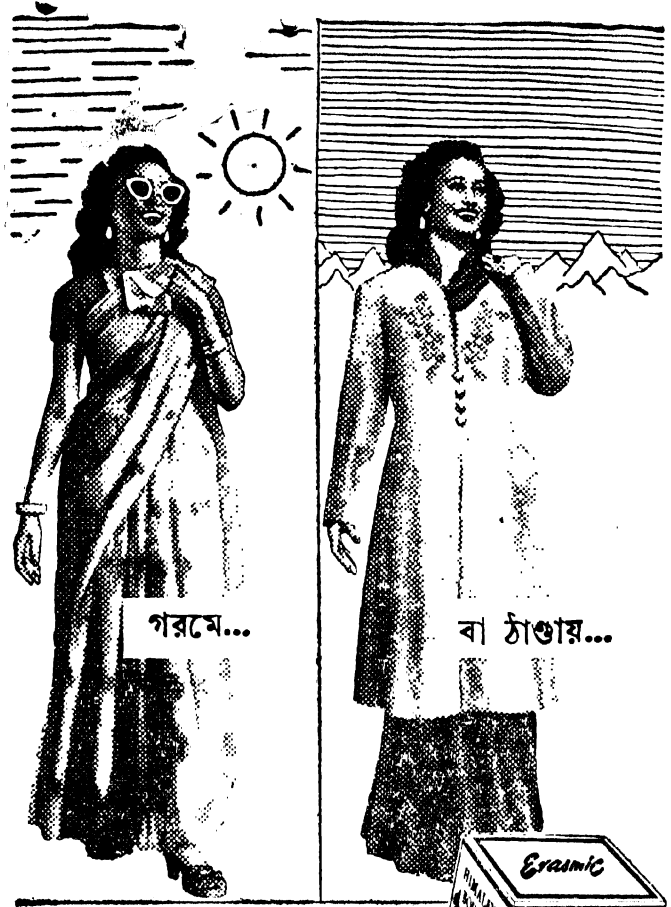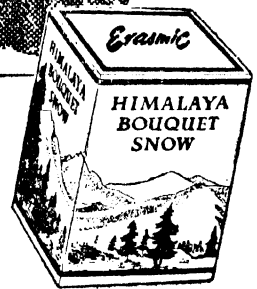
(ক্রমশ)

১৩

গেটের কাছে বিজুরই বয়সী একটি যুবক সম্মুখে তাদের অভিনন্দন জানাল, 'এই বিজু এসো এসো আমরা ভাবলাম তুমি ঝি আর এলেই না, বই ছেড়ে তুমি উঠে আসতে পারবে কিনা আমরা সকলেই সন্দেহ রছিলাম।'

বিজু বলল, 'হুঁ, তোমরা তো ওই রকমই র। পড়াশুনো যেন কেবল আমিই করি, তোমরা তো কেউ আর বই ছোঁও না।'

তারপর প্রীতির দিকে তাকিয়ে বলল, এসো পরিচয় করিয়ে দিই। আমার বন্ধু সতীশ সেন। একসঙ্গে আমরা পড়ি। আর প্রীতি চন্দ্র, আমার'—

কিন্তু সতীশ বিজুকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মৃদু হেসে আর একজন আগন্তুকের প্রবেশপত্র দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

প্রীতি যেতে যেতে বলল, 'তোমার বন্ধুটি তো ভারি অসভ্য বিজুদা।'

বিজু বলল, 'কেন অসভ্যতার কি দেখলে।'

প্রীতি আর কোন কথা বলল না।

মেয়েদের জন্যে আলাদা বসবার ব্যবস্থা। প্রীতি এগিয়ে যেতে একটু ইতস্তত করছিল বিজু বলল, 'ভয় নেই, নিশ্চিন্তে বস গিয়ে ওখানে। হারিয়ে যাবে না, যাওয়ার সময় আমি ডেকে নিয়ে যাব।'

প্রীতি লজ্জিত হয়ে বলল, 'আহাহা।'

একদল অপরিচিত সুসজ্জিত তরুণীদের মধ্যে গিয়ে বসল প্রীতি। মুহূর্তের মধ্যে তার মনের সমস্ত দ্বিধা সংকোচ উদ্বেগ ভাবনা মন থেকে মুছে গেল।

একটু বাদেই অনুষ্ঠান আরম্ভ হোল। কণ্ঠ সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত ছাড়াও ছোট একটি গীতিনাট্যের অভিনয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। একখানা ছাপান প্রোগ্রাম হাতে ছিল প্রীতির। তার সঙ্গে প্রত্যেকটি বিষয় মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগল। এমন আনন্দ যেন আর সে পায় নি। গান বাজনা আবৃত্তি অভিনয় সবই প্রীতির অদ্ভুত ভালো লাগল। আর আনন্দের এই সুযোগ দেওয়ার জন্যে বিজুর ওপর অপূর্ব কৃতজ্ঞতায় ওর মন ভরে উঠল।'

অনুষ্ঠান শেষ হোল সাড়ে বারটায়। প্রীতি ভিড়ের মধ্যে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল বিজু এসে বলল, 'এই যে এসো। ঈস কত রাত করে ফেললে।'

রাত্রি বেশি হওয়ায় প্রীতির মন শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বিজুর কথার প্রতিবাদ করে বলল, 'আমি বুঝি রাত করলাম, তুমি আমাকে ডাকলে না কেন।'

রাস্তায় নেমে এসে বিজু হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তুমি এত মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলে যে তোমাকে ডাকতে কষ্ট হোল। সত্যি, গান বাজনা তুমি খুবই ভালোবাস প্রীতি। যদি সুযোগ সুবিধা পেতে তুমিও এ সব ফাংশনে গাইতে টাইতে পারতে।'

প্রীতি বলল, 'থাক ওসব কথা আর বলো না। বলে পড়াটাই হোল না আর গান, কিছুই হবে না, কিছুই হোল না। মাঝে মাঝে মনে হয়, সমস্ত জীবনটাই এমনি করে ব্যর্থ যাবে বিজুদা।'

বিজু বলল, 'দূর, জীবনের এই তো কেবল শুরু। এরই মধ্যে সমস্ত জীবনের কথা ভাববার কি হয়েছে।'

হাতের ইশারা করে বিজু একটা রিক্সা ডাকল।

প্রীতি বলল, 'আবার রিক্সা কেন। বাসে গেলেই তো তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। শেষ বাস এখনও পাওয়া যেতে পারে।'

বিজু বলল, 'না না রিক্সাই ভালো। বাসে বড় ভিড়। রিক্সায় দুজনে কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে।'

রিক্সায় দুজনে উঠে বসল। নির্জন পথ। আকাশে চাঁদ। এত রাত্রে এমনভাবে একসঙ্গে দুজনে আর চলাফেরা করেনি। ভারি অদ্ভুত, ভারি বিচিত্র আর নতুন মনে হতে লাগল সব কিছু।

বিজু বলল, 'বেশ লাগছে না?'

প্রীতি ঘাড় নেড়ে বলল, 'হুঁ'।

বিজু বলল, 'এই একটু আগে তুমি সারা জীবন ব্যর্থ হোল বলে আক্ষেপ করছিলে। এখন কি অন্য রকম মনে হয় না? এখন কি আর কোন রকম আফসোসের কথা মনে পড়ে?'

প্রীতি বলল, 'আহা কিসে আর কিসে। সত্যি, পুরুষ ছেলে হওয়ায় অনেক সুবিধে।'

বিজু বলল, 'কেন হঠাৎ একথাটা তোমার মনে হোল কিসে, মেয়ে হওয়াতেই বা অসুবিধে কি।'

প্রীতি বলল, 'অসুবিধে নেই? তুমি কত স্বাধীন। ইচ্ছা মত পড়াশুনা করছ। যখন খুশী তখন বাইরে বেরুচ্ছো। তোমার কত বন্ধুবান্ধব, আর আমি! আমি কি পাচ্ছি?'

বিজু সহানুভূতির স্বরে বলল, 'সত্যি। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, তাহলে আমি নিজে যা পাচ্ছি তোমাকেও তাই দিতাম। লেখাপড়া গান বাজনা শিখবার সব রকম সুযোগ দিতাম তোমাকে। স্বাধীনভাবে চলতে ফিরতে দিতাম।'

প্রীতি বলল, 'হুঁ, তুমি কর্তা হলে ঠিক হয়ত আমার মতই হতে, গোড়ায় সবাই ওই রকম বলে।'

বিজু বলল, 'মোটেই না। আমি সম্পূর্ণ অন্য রকম হতাম। আমি কিছুতেই স্বার্থপরের মত সব একা ভোগ করতাম না। এরা ভোগ করলে ভোগ বলেই মনে হয় না। আর একজনকে ভাগ না দিলে, আর একজনের সঙ্গে ভোগ না করলে মনে হয় যেন আধখানা হোল। পুরোপুরি পেলাম না। চ্যারিটি শোয়ের পাসটা যখন পেলাম, তখন তোমার

কথা মনে পড়ল। ভাবলাম, তুমি তো আমার চেয়েও বেশি গান বাজনা ভালোবাস, তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাই নিজে চেয়ে চিন্তে জোগাড় করলাম আর একখানা। সাধারণত আমি এরকম করিনে। কিন্তু তোমার জন্যে'—

প্রীতি বলল, 'সত্যি, তোমার জন্যেই সুযোগটা পেলাম।'

রিক্সা এসে বাড়ির সামনে থামল। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দুজনে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। বিজু কড়া নাড়তেই বৈদ্যনাথ এসে দোর খুলে দিলেন। তিনি বাইরের ঘরেই ছিলেন। কঠিন গম্ভীর তাঁর মুখ।

বিজু আর প্রীতি মাথা নিচু করে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু বৈদ্যনাথ পথ আগলে দাঁড়ালেন: ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দাঁড়া, কোথায় ছিলি এতক্ষণ পর্যন্ত।'

বিজু ক্ষীণ স্বরে বলল, 'একটা চ্যারিটি শো'—

বৈদ্যনাথ ধমক দিয়ে বললেন, 'চ্যারিটি শো। রাত একটা পর্যন্ত চ্যারিটি শো। পরীক্ষার আর ক' মাস বাকি শুনি? পড়াশুনো সব গেছে। উনি চ্যারিটি শো করে বেড়াচ্ছেন। তা আবার একা নয়। একটা ধাড়ী মেয়েকে আবার সঙ্গে জুটিয়ে নেওয়া হয়েছে নইলে তো আড্ডা জমে না। আস্কারা পেয়ে পেয়ে সব একেবারে মাথায় উঠেছ, না?'

বাসন্তী ঘুমোননি। রান্নাঘরের কাজ মিটিয়ে কেবল নিজের ঘরে গিয়ে বসেছিলেন চেচামেচি শুনে নিচে নেমে এলেন। ফিরতে এত বেশি দেরি করবার জন্যে তিনিও বকলেন দুজনকে। তারপর দাদার দিকে তাকিয়ে বললেন, আহা থাম। না হয় গান শুনতে গিয়ে একটু দেরিই করে ফেলেছে। রোজ তো আর এমন হয় না। তার জন্যে অত শাসন কিসের?'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'না শাসন করবে কিসের আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে আস্কারা দিয়ে দিয়ে তোর মত মাথায় চড়িয়ে রাখবে। নিজের ছেলেমেয়েগুলি তো গেছেই, যতদূর বকাটে হবার হয় হয়েছে এখন বাড়ির আর সব ছেলেমেয়েগুলি যে একটু ভালো থাকবে, তার জো নেই। তা তুই আর থাকতে দিবিনে। বাড়ির সবগুলি ছেলেমেয়ে নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তুই থামবিনে'

বাসন্তী বললেন, 'দাদা, এই কথা তুমি বলতে পারলে? আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে তোমার ছেলেমেয়েরা নষ্ট হচ্ছে? এই কথা বললে তুমি?'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'বলবই তো। হাজার বার বলব। একটা পচা আপেলে থলির সবগুলি আপেল নষ্ট করে তা জানিস? আমি সব সময় একটা প্রিন্সিপল্ নিয়ে চলি। পাড়ার কোন বাজে সংসর্গে ছেলেদে মিশতে দিইনে। কিন্তু আমার বাড়ির মধ্যে অসৎ সঙ্গের বাসা, পাড়া সম্বন্ধে সাবধা হয়ে আমি কি করব, 'নইলে বিজুর সাহ কি পড়াশুনো ছেড়ে রাত একটা পর্যন্ত বাইরে বাইরে কাটায়?'
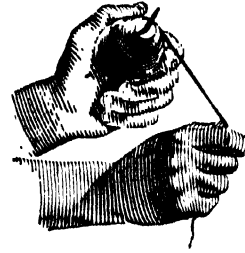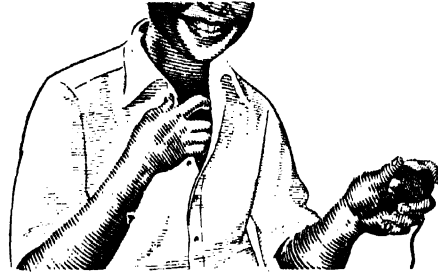
সন্তী স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে লেন। বিজু চলে যাচ্ছিল তাকে বাধা দিয়ে লেন, 'শোন বিজু, তোমাকে আমি এই রাখলুম, আমার ছেলেমেয়েদের সংগে পর তোমরা আর মিশতে এসো না। াদের সংগে কোন কথাবার্তা পর্যন্ত তে এসো না তোমরা। আমার ছেলেমেয়েরা াপ আছে সেই ভালো। তোমাদের আর াপ হয়ে দরকার নেই। খারাপ সংসর্গে য় কাজ নেই তোমাদের।'

ভুবনময়ী শুয়ে পড়েছিলেন। তিনি উঠে স ভাইবোনের ঝগড়া থামাতে চেষ্টা ক'রে লেন, 'তোরা কি হয়েছিস বল তো, ড়িতে ডাকাত পড়েছে যে এত চেঁচামেচি রু করেছিস তোরা, ছেলেবেলায়ও তো ত ঝগড়া বিবাদ তোরা করিসনি। আর ই বুড়ো বয়সে—'

মার কথার কোন জবাব না দিয়ে বাসন্তী য়েকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। রপর কঠিন স্বরে মেয়েকে শাসন ক'রে ললেন, 'খবরদার, ফের যদি ওদের ঘরে া বাড়াতে দেখি, আমি তোমাকে আস্ত খব না, বিজুদা, বিজুদা, বিজুদার জামা, বজুদার কাপড়, বিজুদার জুতো, দিনরাত তা বিজুদার জিনিসপত্রের তদারকি নিয়েই াছিস। আজ হোল তো শিক্ষা? ুনলি তো সব? যদি বিন্দুমাত্র মান-অপমান বোধ থাকে তা'হলে ভুলেও আর ওমুখো হবিনে। কানে যাচ্ছে কথা?'

প্রীতি বলল, 'যাচ্ছে মা।'

বাসন্তী আবার বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাকে আমি স্পষ্ট নিষেধ করে দিলাম, ওদের ছেলেমেয়ে কারো সংগেই মিশতে পারবে না তোমরা। পড়াশুনো গল্প গুজব যা করবার নিজেদের ঘরে বসে নিজেদের ভাই বোনের সংগে করবে, ওদের সংগে মেলামেশার মোটেই দরকার নেই আর।'

অবনীমোহন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। স্ত্রীর চেঁচামেচির শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার। রাত দুপুরে আবার কি হোল তোমার।'

বাসন্তী বললেন, 'যা হবার হয়েছে। তুমি ঘুমুচ্ছ ঘুমোও, তুমি তো সংসারের সাতেও নেই পাঁচেও নেই। তোমার আর কি। কারো মান-অপমানের ধার তো তোমাকে ধারতে হয় না।'

প্রীতির মন এক অদ্ভুত বিতৃষ্ণা আর বিস্বাদে ভরে উঠল। এই খানিকক্ষণ আগে জলসায় গান বাজনা শুনতে শুনতে কি আনন্দই না পেয়েছিল। আর তার পরিণতি হোল এই কুশ্রী ঝগড়ায়। বিজুর ওপরও তার ভয়ংকর রাগ হোল। জানাই তো আছে যে, তার বাবা এসব পছন্দ করেন না। তবু কেন জলসায় প্রীতিকে বিজু সংগে নিয়ে গিয়েছিল। সে না বললে তো আর প্রীতি যেত না। প্রীতি জানতেও পারত না। বিজুর জন্যেই প্রীতির মাকে এমন অপমান সহ্য করতে হোল।

দিন কয়েক মায়ের নির্দেশ প্রীতি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলল। বিজুর সংগে কোন কথা বলল না। কোন পড়া বুঝবার জন্যে গেল না তার কাছে। শুধু বিজুর সংগেই না, মামাত ভাই বোন সকলের সংগেই সে কথা বন্ধ করল। বিজুও ক'দিন খুব গম্ভীর হয়ে রইল। এমন ভাব করল যেন প্রীতিকে সে চেনেই না। যেন সামান্য আলাপ পরিচয়ও নেই পরস্পরের সংগে।

কিন্তু দুজনেরই মনটা খারাপ হয়ে রইল। যেন সমস্ত পৃথিবী শুষ্ক আর শূন্য হয়ে গেছে।

একদিন বিকেলে চিলাকোঠার আড়ালে প্রীতি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে কেবল বাড়ি আর বাড়ি। প্রাচীর আর প্রাচীর। এই নিষেধের বেড়া পার হয়ে আর বেরোবার জো নেই। সারাজীবন যেন এই বন্দীদশার মধ্যে কাটবে। কিসের এই হতাশা, কিসের এই শূন্যতা প্রীতি বুঝে উঠতে পারে না। আর সব ভাইবোন তো এর মধ্যেই সন্তুষ্ট। যা পাচ্ছে তাই নিয়েই খুশি। কিন্তু প্রীতি কি চায়। সে কেন খুশি হ'তে পারে না, কি হ'লে কি পেলে মনের এই শূন্যতা কাটে।

হঠাৎ প্রীতি চমকে উঠল। পিছন থেকে কে যেন আস্তে আলগোছে তার কাঁধে হাত রেখেছে।

প্রীতি মুখ ফিরিয়ে দু' পা পিছিয়ে গেল, বলল, 'যাও এখান থেকে। তোমাদের সংগে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।'

বিজু প্রীতির রাগ দেখে একটু হেসে বলল, 'তাই নাকি।'

প্রীতি বলল, 'তাই নাকি মানে। সেদিন তোমার বাবা মাকে কি অপমানটাই না করলেন আর তুমি একটা কথা পর্যন্ত বললে না, অথচ তোমার জন্যেই তো এমন হোল। কিন্তু আশ্চর্য, একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত তোমার মুখ থেকে বেরোল না।'

বিজু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'মুখে প্রতিবাদ করে লাভ কি হোত, তাতে ঝগড়া ঝাঁটি বাড়ত ছাড়া কমত না। প্রতিবাদ করি তো আমরা কাজের ভিতর দিয়েই করব। এখন যেমন করছি।'

প্রীতি আর কোন কথা বলল না। কিন্তু বিজুর কথা, কথা বলার ভংগি ওর ভারি ভালো লাগতে লাগল। মুহূর্তপূর্বের নীরবতা যেন আর নেই। সব শূন্যতা ফের ভরে উঠেছে।

একটু বাদে এদিকে কার পায়ের সাড়া পেয়ে বিজু চলে গেল। ঝগড়ার পরিসমাপ্তিতে দুজনের মনেই শান্তি এসেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ঝগড়ার সম্পর্ক যে আর নেই একথা বাইরে অন্য কাউকে তারা বুঝতে দিল না। আর সকলের সামনে তারা আগের মত মুখ ভার ক'রেই চলে। পরস্পরের আত্মীয়তাকে স্বীকার করে না। কিন্তু রোজ দু' একবার ক'রে বাড়ির অন্য সকলের চোখের আড়ালে তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। বিনিময় হয় মাত্র দু' একটা কথার। কিন্তু সেই দু' একটা কথা যেন শুধু দু' একটা কথাই নয়, সেই দু' এক মিনিটের ব্যাপ্তিও অনেকখানি।

দুই পরিবারের ঝগড়া ফের মিটে গেল। বাসন্তী বৈদ্যনাথের সঙ্গে আবার কথাবার্তা বলতে লাগলেন। কিন্তু বিজু আর প্রীতির লোকদেখানো মনোমালিন্য সহজে মিটল না। বাড়ির অন্য সকলের সামনে পরস্পর সম্বন্ধে তাদের ঔদাসীন্য অবজ্ঞার যেন আর সীমা নেই। কিন্তু সকলের চোখের আড়ালে মনের অবস্থাটা অন্যরকম। এই লুকোচুরির মধ্যে যেন তারা এক নতুন রহস্যের আভাস পেয়েছে। স্বাদ পেয়েছে এক বিচিত্র সম্পর্কের।

(ক্রমশ)

চিত্রপ্রদর্শনী

শিল্পী শ্রীসুধী

গত বছরের মতো এবারেও কাফে এভারেস্ট স্টুডিয়োতে শিল্পী শ্রীসুধী তার আঠাশটি রচনা নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। এইভাবে জনসাধারণের ভোজনাগারে শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করার মধ্যে শিল্পীর যে আধুনিক ও বিদ্রোহী মনোভাব ব্যক্ত হোক্ না কেন, দর্শকের দিক থেকে বিশেষ করে যারা

পুষ্পগুচ্ছ

শিল্পকলাকে একটা শান্ত পরিবেশের মধ্যে অনুধাবন করতে চান তাঁদের পক্ষে এই পরিবেশ একান্তভাবে অস্বস্তিকর। অন্ততঃপক্ষে সুগন্ধিত ভোজনাগারের জৈবতৃপ্তি-মুখর কোলাহল যে শিল্পরস আস্বাদনের অনুকূল নয় এই সত্য শিল্পীর স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

যদিও চিত্রসংখ্যার দিক থেকে প্রদর্শনীটি ছোট তবু গতবারের থেকে শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কিছুটা অনুভব করা গেলো। আধুনিক বলে পরিচিত হবার যে একটা উদগ্র বাসনা গত প্রদর্শনীতে লক্ষ্য করা গিয়েছিলো সেই মনোভাব থেকে শিল্পী এবার অনেকাংশে মুক্ত। বিশেষ করে গতবারে কয়েকটি রচনা ছিলো একান্তভাবে বিকৃত আদি রসাশ্রয়ী। তার মধ্যে একমাত্র বিকৃত যৌন উল্লাস ব্যতীত এমন কোন শিল্পসৌকর্যের পরিচয় পাওয়া যায়নি যা সৃষ্টির দিক থেকে মূল্যবান। যে কারণেই হোক্ সে ধরণের ছবি এবারের প্রদর্শনীতে স্থান পায়নি। দ্বিতীয়ত আধুনিক কর্ম-বিলাসী শিল্পীদের কাছে বস্তুজগতের যে অতিবিকৃত রূপায়ণ আধুনিকতা নামে সুপরিচিত তার কিছুটা পরিচয় শিল্পী শ্রীসুধীর গতবারের প্রদর্শনীতেও পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এবারে শিল্পীর মানসিকতা অনেকটা আত্মস্থ, দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও এসেছে একটা কোমলতার আভাষ। কিন্তু তবুও মনে হয় শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী, কী আঙ্গিকগত দক্ষতা এমন কোন মৌলিক বিশিষ্টতা অর্জন করেনি যার জন্যে বারংবার দর্শকের সম্মুখে আত্মপরিচয়ের প্রয়োজন আছে। তার এবারের প্রদর্শনী দেখেও এই কথাই মনে হয়েছে, যে সম্ভাবনা তার শিল্পরচনায় অংকুরিত হতে চলেছে তাকে যেন একান্ত অপরিণত অবস্থায় দর্শকের সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে। যে কোন শিল্পীর পক্ষেই একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, শিল্পরচনায় শিল্পীর উৎসাহ ও প্রেরণা যতো মৌলিক ও বিশুদ্ধ হোক্ না কেন, দর্শকের কাছে শিল্পীর মানসিক, আঙ্গিক ও শৈলীগত পূর্ণতা ব্যতীত তা অর্থহীন। দর্শক যেমন শিল্পীর দৃষ্টি-কোণকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে, তেমনি সেই দৃষ্টিকোণের একটা বিশিষ্ট পরিণতির আস্বাদও সে পেতে চায়। নচেৎ সে শিল্প একান্তভাবে শিশুশিল্পের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। শিশুরা যখন ছবি আঁকে তখন তাদের মৌলিক প্রেরণাই তাদের শিল্পের প্রথম ও শেষ আকর্ষণ এবং এই মৌলিক প্রেরণার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের আঙ্গিকগত বিফলতা মার্জনীয়। কারণ আঙ্গিকগত সফলতা সময় ও সাধনার অধীন এবং সেই সফলতা শিল্পীর দৃষ্টি-কোণের বিশিষ্টতার অনিবার্য পরিণাম।

শিল্পী শ্রীসুধীর রচনা য়ুরোপীয় ইমপ্রেসনিস্ট প্রভাব আশ্রয়ী। কিন্তু ও প্রভাবমাত্রই, অন্ততঃপক্ষে শ্রীসুধীর দৃষ্টি কোণ ইন্প্রেসনিস্টদের বিশ্লেষিত দৃষ্টি অনুকূল নয়। কারণ যে বৈজ্ঞানি দৃষ্টিভঙ্গী ইম্প্রেসনিস্ট শিল্পরচন একটা কঠোরতা এনেছে, তারই অভা ইম্প্রেসনিস্ট প্রভাবাশ্রয়ী শ্রীসুধীর রচ একান্ত শিথিল ও আকর্ষণহীন হয়ো

হাজারীবাগের পথ

বিশেষ করে ছবিতে একটা এফেক্ট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অধিকাংশ ছবিতে ঘন নীল বর্ণের প্রয়োগ শুধু অবান্তর নয় সময়ে সময়ে অস্বস্তিকর লাগে।

তা সত্ত্বেও শিল্পীর মানসিকতা যে একটি পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার একটা আভাষ এই প্রদর্শনী থেকে পাওয়া যায়। বিশেষ করে কয়েকটি দৃশ্য চিত্রের মধ্যে পরিণত শিল্পদৃষ্টির একটা সুস্থিতা লক্ষ্য করা যায়। দৃশ্যচিত্রের মধ্যে ৫নং ছবিটি একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। ভালো রচনা হিসেবে পুষ্পগুচ্ছ (৩), কালো চশমা পরিহিতা রমণী (১০), হাজারীবাগের রাস্তা (১২), মেস ঘর (২২) প্রভৃতি উল্লেখ করা যেতে

। তেল রঙে আঁচিত শিল্পীর নিজের প্রতিকৃতি সুন্দর রচনা। এই নীর আর একটি ভালো ছবি "আলো-(১৩)। তুলি ব্যবহারের দক্ষতা ও মাধ্যমে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি এই টর বিশিষ্টতা।

স্পগ্রুজব' (৯) ছবিটির এফেক্ট ভালো সত্ত্বেও বর্ণপ্রয়োগের মধ্যে গভীরতার য় পাওয়া যায় না—তাই ছবিটির কোন্ অংশ অসম্পূর্ণ ও ফ্ল্যাট বলে মনে

সব ত্রুটী সত্ত্বেও শিল্পীর ক্ষমতার চয় এ প্রদর্শনী থেকেই পাওয়া যাবে। ক্ষমতারই পরিপূর্ণ বিকাশ শিল্পীর থেকে আগামীকালে প্রত্যাশা করা য়ই অনুচিত হবে না।

চিত্রাংশু

চিত্রাংশু শিল্পীদলের একটি চিত্রপ্রদর্শনী ং চৌরঙ্গী টেরেসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নবীন শিল্পীগোষ্ঠীর বৎসরান্তের প্রদর্শনী বেশ একটা সুরুচির পরিচয় । এদের শিল্পসৃষ্টি দেখলে আরেকটি আশা হয়ঃ যে উগ্র ' অতি-আধুনিকতা আজকাল সকল দেশের শিল্পকেই অল্প-বিস্তর আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করছে, এই দলটি অনেকাংশে তা থেকে মুক্ত। এদের সকলের মধ্যেই একটা সুস্থ ও বলিষ্ঠ শিল্পরীতির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যদি বা কেউ অতি-আধুনিকতা দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে মোহগ্রস্ত, তাহলেও মনে হয়, তিনি এই প্রভাব কাটিয়ে উঠছেন।

যে কয়জন শিল্পীর ছবি এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে নিঃসংশয়ে শ্রীদেবনাথ মুখার্জির কাজ সবচেয়ে পরিণত। বর্ণবিন্যাস (colour scheme) ও বস্তু-সংস্থানে (composition) তাঁর বেশ দখল লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ Ups and downs (৩৩), Dance (৩০), Whispering melody (৩২) ইত্যাদি। স্বভাবতঃ তাঁর সব ক'টি কাজেই বলিষ্ঠ তুলির টান কোথাও দ্বিধাসঙ্কুল নয়। তাঁর প্রায় প্রতিটি স্কেচেও এই সৌকর্য দেখা যায়।

শ্রীসুধীর বৈরাগী মনে হয় এখনো অনুশীলনের উপান্তে এসে পৌঁছন নি। সব ক'টি ছবিতে তাঁর চেষ্টা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে বর্ণবিন্যাস ও বস্তুসংস্থানের দিকে ঝোঁকটা একটু বেশী বলে মনে হয়, তিনি এককালে সার্থক শিল্পী হবেন। They are three (১৪) ছবিটি থেকে পরিণতির বেশ একটা আভাস পাওয়া যায়।

শ্রীঅমরনাথ ব্যানার্জির ছবিগুলি একটু বেশী finished। Towards sweet Home (১১) ও A corner from Shillong (১২) ছবিটির কম্পোজিসন ভাল হলেও, রং-এর প্রয়োগ কাঁচা হাতের বলে মনে হয়। মনে হয়, এখনো তাঁর অনুশীলন চলেছে।

আর যে তিনজন শিল্পীর চিত্র এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে, তাঁদের কাজ অপেক্ষাকৃত অপরিণত। শ্রীশুভাচারী দাশগুপ্ত অধিকাংশ জায়গায় চড়া রং ব্যবহার করে ছবিকে মাটি করেছেন। কিন্তু তাঁর Study hours (৪) ছবিটির আবেদন বেশ ভাল। শ্রীশ্যামল দত্তের ছবিতেও একই ধরণের ত্রুটিঃ হয় চড়া রং নয় অবকাশের অভাব। শ্রীনিখিল বিশ্বাসের অনেকগুলি ছবিই এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে, কিন্তু কোনটিকেই রসোত্তীর্ণ বলে মনে হয় না। চড়া রং অথবা অবকাশহীনতার জন্য প্রায় প্রতিটি ছবিই চক্ষুকে পীড়া দেয়। কিন্তু মনে হয়, শিল্পী এক পুরোদস্তুর পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে পথের সন্ধানে চলেছেন, এই পরীক্ষণের শেষে তাঁর শিল্প এক বিশিষ্ট পরিণতি পাবে।

একটি অরণ্য স্বপ্ন

বটকৃষ্ণ দাস

আমার অরণ্য-স্বপ্ন পূর্ণ করো। অন্ধকার টবে
শীর্ণ জীবনের চারা ইন্দ্রনীল দিগন্ত-বিস্তারে
সবুজের সমারোহে,—সহস্র শাখায় চারিধারে
সাম্রাজ্য ছড়িয়ে দিক্ অরণ্যের অমিত গৌরবে।
আলো দাও; দাও নীল নীলিমার উষ্ণ-অনুভবে
শক্তির শোণিতবিন্দু; মৃত্তিকার সম্পদ-সম্ভারে
বিদ্রোহী আত্মার তৃষ্ণা; প্রতিটি ঋতুর অভিসারে
পানপাত্র পূর্ণ করো আদিগন্ত প্রাণের উৎসবে।

অন্ধকার মানচিত্র। তারও চেয়ে অন্ধকার স্বরে
নদী এক কথা কয়; বড়ো ক্লান্তি, বড়ো বেদনার
মূর্ছনা তরঙ্গে তার! কী নিবিড় ধূসর মলাট
সময়ের, জীবনের! হে অনন্য, তবু এইবার
মৃত্যুর শীতল হাত ব্যর্থ ক'রে,—সূর্য-স্বয়ম্বরে
আমাকে অরণ্য করো; করো দৃপ্ত প্রাণের সম্রাট।

নাম

শ্রীপঙ্কজকুমার ভট্টাচার্য

আকাশের নীল আছে নাম আছে তাই—
নীলাভ মায়াকে টানে সেই ঘন নীল;
ধুলো-ঢাকা গাছে সেই নীলের আবিল—
আবার কখনো দেখি ঝড়ের ছোঁয়ায়
ঝোড়ো কাল-বোশেখীর হুতাশী মিছিল—
ধূসরিমা সরে যায় রূপে সাবলীল
রং ধরে—মন ছোঁয় সে মায়ায় তাই—
নাম নিয়ে ধ'রে রাখি জানার নিখিল।

আমি যে দেখেছি ঢের সমুদ্র আকাশ,
আকাশের ঝড় আর সাগরে তুফান,
অনুভূতি জানে তারে, নাম জানি তার।
ধ্যানের ধরিত্রী পায় কিছু অবকাশ,
প্রজ্ঞার তপন হয় অণোরণীয়ান;
অতীন্দ্রিয় তুমি যদি কী নাম তোমার?

সেচ পরিকল্পনার রূপায়নে কামাখ্যাগুড়ি

শ্রীশিবজেন্দ্রনাথ মৈত্র

নদনদীর দেশ এই বাংলা, খালে বিলে ভরা, বর্ষার সমাগমে যাহা কানায় কানায় ভরিয়া উঠে; বাঙলার চাষী সেই সুমিষ্ট জলে ক্ষেত-খামার ভরিয়া তোলে আর ধানের ছোট ছোট চারায় বাঙলা মায়ের আঁচল সবুজ হইয়া উঠে। চাষীর মনে রঙীন কল্পনা, সোনার ফসলে গোলা ভরিয়া তুলিবে—দেশবাসীর অন্নের সমাধান এই চাষীর হাতে। এই যে রঙ্গীন কল্পনার বাঙলাদেশ, এদেশ আজ আর নাই, আজ আমরা দেখিতেছি ইহার বিপরীত ছবি। উপযুক্ত সেচের অভাবে জমি ক্রমশ তাহার উর্বরাশক্তি হারাইতেছে। চাষীকে আজ আর সময়মত লাঙ্গল লইয়া মাঠে যাইতে দেখা যায় না, অসময়ে ধানের চারাগুলি রোপণ করায় যে জমিতে তাহার পূর্বপুরুষ ধান পাইত পনের মণ, এখন সেখানে সে পায় না পাঁচ মণও। ফলে সারা দেশ আজ হা অন্ন! হা অন্ন!! করিয়া পরের দুয়ারে ধন্না দিয়া মরিতেছে।

এই যে জীবন-মরণের কঠিন সমস্যা, এই সমস্যা সমাধানের বোধহয় প্রধানতম উপায় হইতেছে জমিতে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা। সুখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আজ এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। সরকারী তত্ত্বাবধানে কয়েকটি সেচ পরিকল্পনা ইহার মধ্যেই কার্যকরী হইয়াছে। ইহার মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলায় কয়েকটি পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে চলিয়াছে।

এই জেলায় জলাধারের উৎস প্রধানত পাহাড়ীয়া ঝর্ণাগুলি, যাহাদের উৎস মুখে রহিয়াছে সুবিশাল অরণ্যভূমি। এই অরণ্যভূমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও কেন্দ্রীয় সরকারে সুরক্ষিত বনাঞ্চল। একমাত্র সিংহ ছাড়া অন্য প্রায় সমস্ত হিংস্র জন্তুদের ইহা হইতেছে আবাসস্থল। মাইলের পর মাইল চলিয়াছে এই বনভূমি; লোকালয়ের দর্শন মিলিবে না। ক্বচিৎ যাহাদের দর্শন মিলিবে, তাহাদেরও একমাত্র হিংস্রতা ছাড়া অন্য সমস্তই এই বন্য জন্তুদের সহিত মিলিবে। ইহারা যে এই বঙ্গদেশের অধিবাসী, তাহা বিশ্বাস করাই কঠিন। এই সমস্ত বনাঞ্চল হইতে মাইলের পর মাইল খাল কাটিয়াঃ যাহা স্থানীয় ভাষায় 'জাম্পাই' নামে অভিহিতঃ প্রায় পাঁচ হাজার বিঘা জমি[illegible] জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এইরূ[illegible] একটি পরিকল্পনা 'রায়ডাক' জঙ্গলে (Raidak Range) নারারথলি হইতে আর[illegible] করিয়া কামাখ্যাগুড়ির শেষপ্রান্তে যাইয়া শে[illegible] হইয়াছে। কিরূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করি[illegible] উক্ত পরিকল্পনাটি কার্যকরী করি[illegible] হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচ[illegible] করিব।

হাতি-বাঘের আবাসস্থলের ভিতর দি[illegible] সেচ খাল

যে স্থান হইতে খালে জল তো[illegible] হইতেছে, উহা সরকারের সংরক্ষিত বনাঞ্চ[illegible] বনবিভাগের জঙ্গল কাটিয়া প্রথমতঃ লা[illegible] বসানই এক দুরূহ সমস্যা হইয়া উঠে। যা[illegible] হউক, বাঘ, হাতী ও বন্যমহিষের আবা[illegible] ভূমিকে নষ্ট করিয়া জঙ্গল কাটিয়া খালে[illegible] লাইন দেওয়া হইল। স্থানীয় বাসিন্দাগ[illegible] অবশ্য বলে যে বাঘ কোনও ক্ষতি ক[illegible] না। বুঝিলাম তো বাঘ কোনও ক্ষতি ক[illegible] না ও হাতী মশালের আগুন দেখি[illegible] পলাইয়া যায়, কিন্তু ঐরূপ একটি সচ[illegible]

সেচ খালের 'রেগুলেটর'
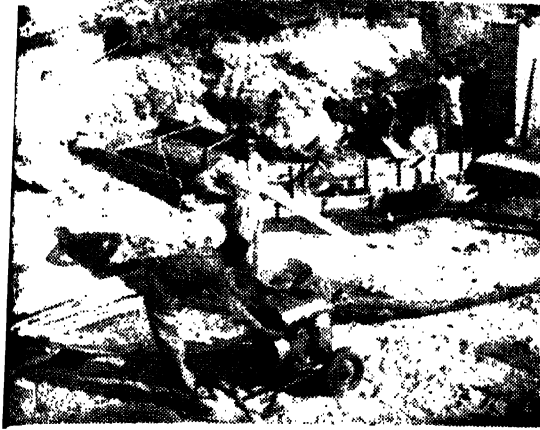
ইঞ্জিন দ্বারা জল পাম্প করিয়া ঢালাইয়ের কাজ চলিতেছে

পূর্ববংগীয় বাস্তুহারা শ্রমিক

...বের সহিত চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিলে যে ঐ ...র নীতিবাক্য সমস্তই গোলমাল হইয়া যায়! ...হা হউক কঠোর অধ্যবসায় সহকারে কাজে অগ্রসর হওয়া গেল। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে আজকাল অনেকের মুখেই শোনা যায় সরকারী কর্মচারিগণ কর্তব্যপরায়ণ নহেন। এই সমস্ত নীতিবাগীশদের প্রতি নিবেদন এই যে, এই দুর্নীতির যুগেও কর্তব্যপরায়ণ ও নীতিশীল সরকারী কর্মচারীর অভাব নাই, না হইলে এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হইত না। তাহার ফলে পাঁচ হাজার বিঘা জমি ধানের শীষে হাসিয়া উঠিত না। এই সমস্ত কর্মচারী দিনের পর দিন বাঘের সহিত ঘর করিয়া এই সমস্ত পরিকল্পনার নিখুঁতভাবে কাজ দিতে নিস্বার্থরূপে পরিশ্রম করিয়াছেন, নাম বা পদের উল্লেখ না করিয়াও স্থানীয় অধিবাসীরা ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ইহা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন যে এখানে স্থানীয় শ্রমিক কাজের জন্য পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সুতরাং মাটি কাটা প্রভৃতি কাজের জন্য বিহারী শ্রমিক আমদানী করিতে হইল। মাটি কাটার কাজ আরম্ভ হইল। কিন্তু মাটি ত নয়, সম্পূর্ণ পাথর, সেই পাথর কাটিয়া কাজ আরম্ভ হইল। তাহার পর অন্য বিপদ! বিহারী শ্রমিকগণ এইরূপ আবহাওয়া সহিতে সম্পূর্ণরূপে অনভ্যস্ত. সুতরাং কিছুদিনেই তাহারা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। দেখা গেল একবার জ্বরে পড়ার পর সে দল আর থাকিতেছে না। সুতরাং আবার নূতন দল আনিয়া কাজ আরম্ভ হইল। কিন্তু পুনরায় সেই একই অবস্থা। নূতন দলও যঃ পলায়তি নীতি গ্রহণ করিল। এদিকে বর্ষা আসিয়া যাইতেছে, কিন্তু কাজের গতি অতি মন্থর। কর্মচারিগণ ভাবনায় পড়িয়া গেলেন কাজ কিরূপে শেষ করা যায়। 'রেগুলেটার' যাহা জলকে নিয়ন্ত্রিত করিবে, তাহারই নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ বাকী। অথচ স্থানটির নামডাক এত ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, নূতন শ্রমিক পাওয়া প্রায় দুষ্কর।

পাঁচ মাইল দূরবর্তী কামাখ্যাগুড়িতে কিছু পূর্ববংগীয় উদ্বাস্তু আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন, শোনা গেল, তাঁহারা

রায়ডাকে ত' আর জলের অভাব নাই!

আসাম রেলওয়ে লিংক প্রোজেক্টে (Assam Railway Link Project) মজুরএর কাজ করিয়াছেন, লিংকের কাজ শেষ হওয়ায় তাঁহারা সম্প্রতি বেকার. তাঁহাদেরই স্মরণ লওয়া হইল। তাঁহারা দিন মজুরীতে কাজ করিতে রাজী হইলেন। সকলেই তথাকথিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের, দেশে(?) নিজের একটি বাড়ি, দুচারখানা টিনের ঘর, দুচার বিঘা চাষের জমি, এ প্রায় সকলেরই ছিল। আজ তাঁহারা আসিয়াছেন দিন মজুরীর কাজ করিতে। সুতরাং এ কাজ কি তাঁহাদের দ্বারা সম্ভব? তাঁহারা যে আজ 'রিফিউজী' কেবলমাত্র বসিয়া খাওয়ার জন্যই যে তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন, আত্মসম্মান বলিয়া কি তাঁহাদের কিছুই নাই? এই ত ইঁহাদের সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা। কিন্তু এই ধারণা যে কতখানি ভুলে ভরা তাহা যাঁহারা ইঁহাদের প্রকৃত সংস্পর্শে না আসিয়াছেন, তাঁহাদের বুঝানর চেষ্টা বৃথা। প্রকৃত দরদ লইয়া তাঁহাদের সহিত মিশিলে, তাঁহাদের নিজেরই ভাই বলিয়া মনে করিলে তাঁহারা যে কোনও কাজ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। এ জাতির সম্পর্কে যিনি যতই হতাশ হউন না কেন, অত দুর্ভাবনার কারণ নাই, প্রাণ ভরা অফুরন্ত সম্পদের অধিকারী এই জাতি একদিন সমস্ত দুর্যোগ কাটাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে।

এই বাস্তুহারা ভাইদের লইয়াই কাজে অগ্রসর হওয়া গেল। দুই একদিনেই দেখা গেল, তাঁহারা অন্যান্য শ্রমিক হইতে কা...

কম করিতেছেন না। বিশেষতঃ জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া সারাদিন কাজ করিতে হইলে, আমার এই পূর্ববঙ্গীয় ভাইদের সহিত অন্য দেশীয়দের আঁটিয়া উঠা মুশকিল। নিপুণ নিষ্ঠার সহিত তাঁহারা কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

অতি ভোরে উঠিয়া অল্পকিছু জলযোগ করিয়া, সাথে কিছু দুপুরের জন্য ভাত তরকারী লইয়া আসেন সেই পাঁচ মাইল দূরের কামাখ্যাগুড়ি হইতে। দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম, গাছের তলায় বসিয়া সেই ভাত তরকারী আহার করিয়া আবার কাজে লাগিয়া পড়েন। তারপর সন্ধ্যায় কাজের শেষ—আবার সেই পাঁচ মইল দূরের ঘরে যাত্রা।

খাল কাটার কাজ প্রায় শেষ হইল, ইহার পর 'রেগুলেটার' লাগানোর কাজ আরম্ভ হইল। এগার ফুট মাটির নিচ হইতে রেগুলেটারের ভিৎ গাঁথিয়া উঠাইতে হইবে। সাত ফুট মাটির নিচে জল পাওয়া গেল। জলের মধ্যে মাটি কাটা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। যেটুকু কাটা হয়, তাহা পর মুহূর্তেই পাড় ধ্বসিয়া ভরিয়া যায়। অগত্যা কাঠের বাক্স তৈয়ারী করিয়া সেইগুলিকে মাটির ভিতর ধীরে ধীরে বসাইয়া দেওয়া হইল। ইঞ্জিনের সাহায্যে বাক্সগুলির মধ্যে কংক্রীট ঢালাই এর কাজ চলিতে লাগিল। যত সংক্ষেপে এই অংশটুকু লিখা হইল কাজের বেলা পরিশ্রম করিতে হইয়াছে ইহার বহুগুণ। এক বুক জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া সারাদিন ধরিয়া অল্প অল্প করিয়া মাটি তুলিতে হইয়াছে আর প্রতিদিন ইঞ্চি ইঞ্চি করিয়া ঐ বাক্স বসাইতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় প্রত্যহই অল্প বৃষ্টি মাথার উপর দিয়া গিয়াছে। তাহার পর একপ্রকার পোকা আছে, বনেই ইহাদের দর্শন মিলে, ইহারাও নির্মমভাবে দংশন করিতে থাকে, ইহাদের আকৃতি ক্ষুদ্র হইলেও দংশনে ইহারা বড় কম যায় না। ইহাদের একমাত্র ঔষধ হইল গায়ে কেরোসিন তৈল মাখিয়া কাজে নামা। এইরূপে কঠোর পরিশ্রম করিয়া রেগুলেটারটিকে সমাপ্তির পথে আনা হইল।

একক কর্মপ্রচেষ্টায় এইরূপ মহৎ কার্য সাধিত হইতে পারে না; প্রয়োজন সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার। দক্ষ শ্রমিক ও কুশলী কর্মীর অভাব এদেশে নাই, অভাব শুধু সম্মিলিতভাবে ঐকান্তিক কর্মপ্রচেষ্টার। ইহার সার্থক প্রমাণ এই সেচ পরিকল্পনার আত্মপ্রকাশ। এই খালের জলে আজ পাঁচ হাজার বিঘা জমি উপকৃত হইতেছে। চাষী আজ নবীন উৎসাহে লাঙ্গল লইয়া মাঠের দিকে চলিয়াছে। এবার আর বৃষ্টির অভাবে তাহার ক্ষেতের চারাগুলি শুকাইয়া যাইবে না। রায়ডাক নদীর জল সারা বৎসরই প্রচুর থাকে, প্রয়োজন মত চাষী তাহার ক্ষেতে জল পাইবে। অন্তত কয়েকশত কৃষক পরিবারের সেচ সমস্যার সমাধান হইয়াছে, ইহাই এই পরিকল্পনার সার্থক রূপ। বহুশত ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনার মধ্যে ইহা একটি। সর্বদা : রাখিতে হইবে ইহা একটি ক্ষেতের ক যানবাহনের সাহায্য খুব কমই পা যাইবে—বাধাবিঘ্ন যথেষ্টই আসিবে, কি তাই বলিয়া পিছাইয়া থাকিলে চলিবে পশ্চিমবঙ্গের অন্ন সমস্যা সমাধানের ই প্রথম সোপান।
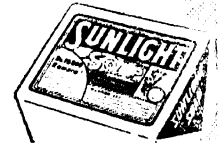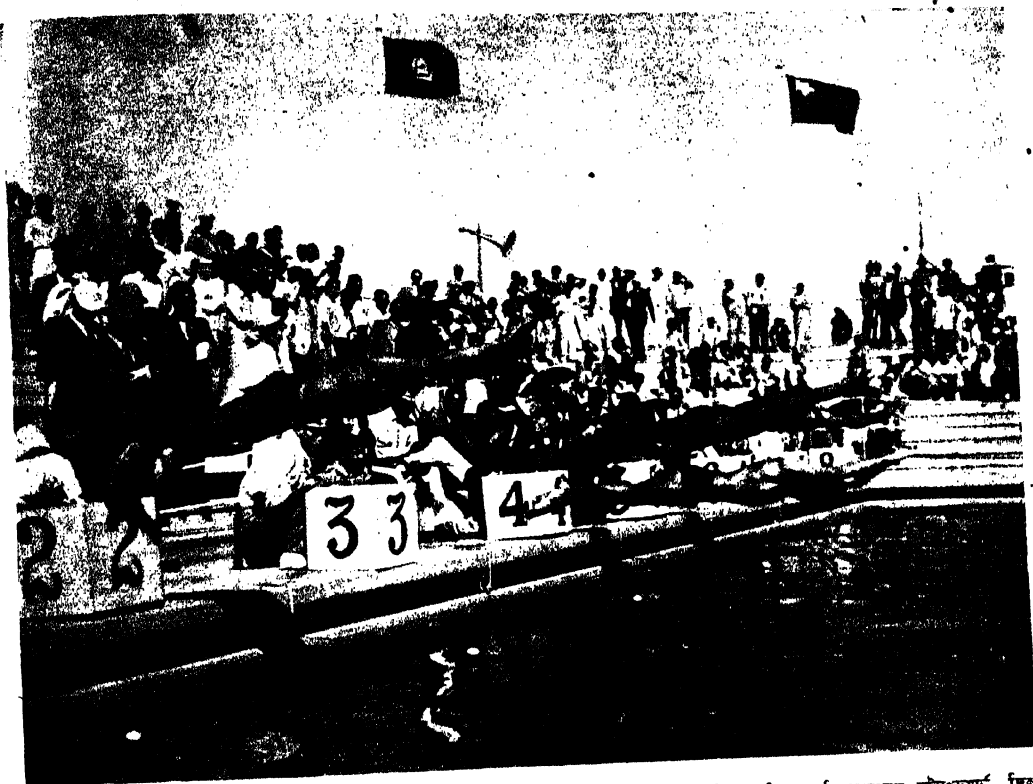
ফটো: হীরেন সিংহ, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, দিল্লী

"স্টার্ট" (নং ৭৭)

এশিয়ার দ্বিতীয় সংবাদ-চিত্র প্রদর্শনী

পঙ্কজ দত্ত

দেশের লোকের সঙ্গে জাতির বিভিন্ন অঞ্চলের, জাতির বহুবিধ মহিমা এবং জাতির আশা-ভরসার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ব্যাপারে আলোকচিত্রের ভাষা যে কতো মনোজ্ঞ হতে পারে সেই পরিচয়ই পাওয়া গেলো অখিল ভারত সংবাদচিত্রের দ্বিতীয় প্রদর্শনী থেকে। প্রদর্শনীটি গত ২৯শে মার্চ চৌরঙ্গীর ওয়াই এম সি এ হলে কলকাতার শেরিফ স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় উদ্বোধন করেছেন।

প্রেস ফটোগ্রাফার্স অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে সংগঠিত এই প্রদর্শনী সমগ্র এশিয়ার মধ্যেই এই ধরণের একমাত্র অনুষ্ঠান। ১৯৫০ সালের ১৭ই জুলাই প্রথম এই প্রদর্শনী হয় ঐ ওয়াই এম সি এ হলেতেই। উদ্যোক্তাদের অভিপ্রায় প্রতি বছরেই প্রদর্শনীর আয়োজন করা, কিন্তু কাগজের ফটোগ্রাফাররা সারা বছর ধরে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হন, তার ওপর আলোক-চিত্র সংক্রান্ত জিনিষপত্তরের অভাব, ইত্যাদি মিলে প্রথম প্রদর্শনীর ঠিক পরের বছরেই বর্তমানের এই দ্বিতীয় প্রদর্শনীটি খোলা সম্ভব হতে পারে নি।

প্রথম প্রদর্শনী যাঁরা ঘুরে গিয়েছেন তাঁদের কাছে দ্বিতীয় প্রদর্শনীর সঙ্গে তার স্পষ্ট তফাৎ চকিত দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে এমন কি সংখ্যার দিকেও। প্রথমবার যখন প্রদর্শনী হয়, তখন তাতে ছবি পাঠাবার জন্যে সময়ের কোন বাধানিষেধ ছিল না। আজীবন ধরে যে যা তুলেছিলেন, প্রদর্শন যোগ্যতার দিক থেকে তাঁদের সেসব ছবির যেগুলি একটা মোটামুটি ধাপে পৌঁছতে পেরেছিল, তার সবই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল। আলোকচিত্রকরদের সংখ্যা যেমন ছিল অনেক, তেমনি ছবির সংখ্যাও হয়ে পড়েছিল এত বেশি যে, কারুর পক্ষেই একদিন বা দুদিন প্রদর্শনী ঘুরেই ভালো-ভাবে সব দেখে কুলিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।

এ বছরের প্রদর্শনীতে আগেকার মতো ছবির ঘিঞ্জী অবস্থাটা অতটা নেই, তবে

ভারতীয় পুতুল ও খেলনা (নং ১৮৫—১৯২)　　ফটোঃ হীরেন সিংহ, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, দিল্লী

বৃষ্টির অপরাহ্ণ (নং ৮..)　　ফটোঃ অজিত ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকা

উচ্চগ্রামের রাজনীতি (নং ৪৬) ফটো: বি রক্ষিত, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, দিল্লী

এবারও ছবির ভীড় যথেষ্টই। গতবার সংবাদ-চিত্র (News) ছিল ১৭০ এবং চিত্র-প্রবন্ধের (Features) সব ছবি যোগ করে আরও ছিল ৭৬ খানি ছবি। এ বছর সে জায়গায় দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮৯ এবং ১১৯। এসব ছাড়া আরও ৫১ খানি ছবি এসেছে বিভিন্ন রাজ্য সরকার থেকে, যে শ্রেণীতে গতবারে ছবির সংখ্যা ছিল ৮৬। অর্থাৎ সব যোগ করে গতবারের ৩৩২ খানি ছবির জায়গায় এবারে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫৯। মোটামুটি কোন রকমে ছবিগুলি দেখে নিতেও ছবি পিছু মিনিটখানেক করে সময় ধরলে সবগুলো দেখে শেষ করতে একদিনে পেরে ওঠা যায় না। অথচ এবারে ছবির যে স্ট্যান্ডার্ড তাতে বেশির ভাগ ছবিগুলিকেই নামমাত্র চোখ বুলিয়ে যাওয়ার চেয়েও বেশিক্ষণ ধরে দৃষ্টি এমনিই আটক পড়তে বাধ্য হয়।

শ্রীনিকেতন (নং ৩২—৪৩) ফটো: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ

এবারের নিয়মে গতবার প্রদর্শনী হবার পর যেসব ছবি তোলা হয়েছে, কেবলমাত্র সেইগুলিই প্রদর্শনীর জন্যে রাখা হয়েছে। সময়ের এই বাধকতা ছবির প্রকৃতির মধ্যেই শুধু নয়, সমগ্র প্রদর্শনীর মর্মের দিক থেকেও লক্ষ্য করার মতো পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

গতবার দেশ স্বাধীন হবার পর প্রথম প্রদর্শনী বলে অর্ধেকেরও বেশী ছবির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্র ছিলো রাজনীতি। রাজনীতির ক্ষেত্রে বহু ঐতিহাসিক ঘটনার আলেখ্যবন্ধ যতো সব প্রমাণ তুলে ধরার দিকেই ফটোগ্রাফাররা ঝোঁক দিয়েছিলেন বেশী করে। জাতীয় নেতাদের এবং জাতীয় সংগ্রামের অজস্র সব ঘটনার দলিলে ভীড় হয়ে পড়েছিলো। জাতির জীবনের অনেক স্মৃতি এক জায়গায় এনে জড়ো করার এমন আর কোন সুযোগ আগে কখনও পাওয়া যায় নি। গতবারে মোট যতো ছবি ছিলো, তার মধ্যে অর্ধেকই ছিলো সংবাদচিত্র এবং সংবাদচিত্রের মধ্যে কয়েকখানি ছাড়া সবই ছিলো রাজনীতিক ঘটনাকে নিয়ে।

আর বেশী নয় (নং ৩৩) ফটো: তারক দাস, অমৃতবাজার পত্রিকা

এবারে সংবাদচিত্রের সংখ্যা গতবারের অর্ধেক এবং রাজনীতির বাইরেকার সাধারণ বিষয় নিয়েই ছবির সংখ্যা বেশী। এবং সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের নতুন অধ্যায়ের চেহারাটা ফুটে উঠেছে চমৎকারভাবে। চিত্র প্রবন্ধের মধ্যে দেশকে—দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে, দেশের সম্পদকে, সর্বসাধারণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা যেমন দেখা গিয়েছে, তেমনি দেশকে গড়ে তোলায় বিভিন্ন দিকের প্রচেষ্টা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করিয়ে দেবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

কাশ্মীর (নং ১২৮—১৩৫) ফটো: অসিত মুখার্জি, কলকাতা

সম্মুখ সমরে (নং ১৯ ও ২০)

ফটো : ভারত সরকারের প্রচার বিভাগ

এবারে সবশ্রেণী মিলিয়ে অর্থাৎ সমগ্র র্শনীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হিসেবে পালের পদক পুরস্কার লাভ করেছে কুমার সিংহের চিত্র-প্রবন্ধ "মনোরম আদি-" (নম্বর ১৬১-১৬৬) ভারতের ছটি ভিন্ন অঞ্চলের মাঠে ময়দানে কর্মনিরত দিবাসীদের ছবি। এই ছ'খানি ছবি হচ্ছে টি সাঁওতাল তরুণীর, এক মুন্ডা তীর, জলপাইগুড়ীর এক আদিবাসী তী, ওরাঁও দম্পতী, কোল শ্রমিক এবং জারিবাগের আদিবাসী। ছটি জায়গায় দিবাসীর মধ্যে চেহারা, বেশভূষা এবং দের দৃষ্টির মধ্যে পার্থক্যের রেখাগুলো ন দেওয়া হয়েছে। সাধারণ সংবাদচিত্রের ও চিত্র-মাধুর্য ফুটে উঠেছে এবং বেশ কটা কাব্যিক সৌন্দর্যও রয়েছে এর মধ্যে। নি ধারা আরও ছ'খানি ছবির সাহায্যে সিংহ বিভিন্ন স্থানে গঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন রূপের একটা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ড়োল, লছমনঝোলা, হৃষীকেশ, হরি-দ্বার, বারাণসী থেকে একেবারে ব্যারাকপুর র্যন্ত ধাপে ধাপে নামতে নামতে গঙ্গার চেহারা ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনগুলো ক্যামেরার সাহায্যে সুন্দর করে তুলে ধরে-ছেন। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একসঙ্গে গঙ্গার এতো রকমের চেহারা দেখার এ এক মনোরম অভিজ্ঞতা। এইখানেই ক্যামেরার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং সার্থকতা।

প্রদর্শনীতে এমনি ধরণের সার্থক আলোকচিত্র আরও রয়েছে, যেগুলি লোকের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তোলার সুযোগ এনে দিয়েছে। বীরেন সিংহের তোলা "তীর্থ-স্থান নেপাল" (নং ১৪৩-১৫০) ওদেশের ধর্মমন্দিরগুলোকে দেখবার সুযোগ এনে দিয়েছে। অন্যান্য জায়গায় হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির এবং তৎসংযুক্ত কারুকার্যের সঙ্গে নেপালের মন্দির মঠ ও কারুকার্যের তুলনা করার সুযোগ পাওয়া যায়। চিত্র-প্রবন্ধটি পুরস্কার লাভ করেছে। বীরেন সিংহের "কুতব ও পারিপার্শ্বিক" নিয়ে অপর ছ'খানি ছবি (নং ১৫১-১৫৬) ভারতীয় স্থপতির শিল্প প্রতিভার আর একদিককার নিদর্শন। কুতব মিনারকে নতুন করে দেখতে পাওয়া যায় এই ছবিগুলির মধ্যে দিয়ে। সাতখানি ছবি নিয়ে (নং ১১২-১১৮) ইন্দোরের আর কে গুপ্ত "চিতোরগড়"-এর স্থপতিদের প্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ধাত্রী পান্নার অধুনা ভগ্ন প্রাসাদ, রাণা প্রতাপের জন্ম-প্রাসাদ, চিতোরগড়, মীরার ভজনাগার, রাণাকুম্ভের প্রাসাদ প্রভৃতি ঐতি-হাসিক কতকগুলি মন্দির ও প্রাসাদ সামনে এনে দিয়ে রাজস্থানের অতীত শৌর্যের সঙ্গে শিল্প প্রতিভার অনেক কথা দর্শকের মনে জাগিয়ে তোলে।

আসামের পার্বত্য জাতিদের কতকের পরিচয় পাওয়া যায় আসাম গভর্নমেণ্টের এগারোখানি ছবি থেকে (আমন্ত্রিত চিত্র পর্যায়ে নম্বর ২১-৩১)। মুন্ড শিকারী কোন্যাক নাগা, অংগামী নাগা, মিকির প্রভৃতি নাগাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়কে তাদের জাতীয় পোষাকে দেখতে পাওয়া যায়। ওদের শিল্প-কাজেরও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব ভারত সীমান্তের আর এক পার্বত্য উপজাতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন শম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায়। তার "ভূকম্প বিধ্বস্ত মিসমী এলাকা" পর্যায়ের সাতখানি ছবি (নং ১৯৩-১৯৯) আসামের গত ভূমিকম্পে উক্ত অঞ্চলের ভূমির বিপর্যয়ের সঙ্গে মিস্মীদের নানাভাবের চেহারা দেখানো হয়েছে। মিস্মীরা অবলুপ্তপ্রায় উপজাতি, মাত্র জনকতক এখন জীবিত আছে এবং হয়তো এই ছবিগুলিই ওদের অস্তিত্বের শেষ প্রামাণ্য নিদর্শন হয়ে থাকবে—কে বলতে পারে!

ভূস্বর্গ কাশ্মীরে না গিয়েও তার শোভা

উপভোগ করার এবং ওখানকার কতক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন অসিত মুখোপাধ্যায় তার "কাশ্মীর" পর্যায়ের আটখানি ছবির মধ্যে দিয়ে (নং ১২৮-১৩৫), ওখানকার প্রাকৃতিক শোভার পাশে ওদেশের ভিন্ন ভিন্ন কারিগর ও তাদের কারিগরী দেখবার সুযোগ পাওয়া যায়। ছবিগুলি তোলার মধ্যেও শিল্পী-জনোচিত কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্র-প্রবন্ধ বিভাগে এটি দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছে।

ভারতের নানা অঞ্চল ও অধিবাসীদের সঠিকভাবে চিনে নেবার সুযোগ ওপরের ছবিগুলির মধ্যে যেমন পাওয়া গিয়েছে তেমনি চিত্র-প্রবন্ধ পর্যায়ে আরও বহুবিধ তথ্য সুন্দরভাবে হাজির করে দিয়েছে আরও অনেকগুলি ছবি। মানুষের মনকে আশায় উজ্জ্বল করে তুলবে চিত্র-প্রবন্ধ পর্যায়ের প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্ষীরোদ রায়ের "ধানকাটা" (নং ১৩৬-১৪২) শীর্ষক ছবি সাতখানি। মাঠভরা সোনার ফসল, চাষীর হাসিভরা মুখ, ফসল বোঝাই করে ঘরের দিকে যাওয়া, বড়ো আনন্দোচ্ছলভাবে দর্শকদের মন ভরিয়ে দেয়। তেমনি নীরোদ রায়ের "শাকসব্জী" (নং ২০১-২০৮) চিত্র প্রবন্ধটিতে কুমড়ো, কপি, টোম্যাটো প্রভৃতির ললিত রূপ সব্জীর ওপরে লোকের লোলুপ দৃষ্টি টেনে ধরে রাখে।

গঠনমূলক কাজের ওপরে লোককে উদ্বুদ্ধ করার দিক থেকে দর্শনীয় আমন্ত্রিত শ্রেণীতে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টের "শ্রীনিকেতন" (নং ৩২-৪৩) এবং "ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা"র (নং ৪৪-৫১) ছবিগুলি। শ্রীনিকেতনে শিক্ষাদানের পদ্ধতির একটি সম্যক্ ও সুললিত ছাপ যেমন মনে এ'কে নিতে পারা যায় তেমনি অপর চিত্র-প্রবন্ধটির দ্বারা ভারতের সমৃদ্ধি সাধনে বৃহৎ পরিকল্পনার অন্যতম শিউড়ীর অন্তর্গত ময়ূরাক্ষী বাঁধের কাজের প্রগতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে নেবার অবকাশ পাওয়া গিয়েছে। এই পর্যায়ে বীরেন সিংহের "দেরাদুনের সামরিক শিক্ষালয়"-এর কার্যধারার (নং ১৫১-১৫৬) সংযুক্ত ছবিগুলিও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

ভারতীয় ললিতশিল্পের চমৎকার নিদর্শন উপস্থিত করেছেন হীরেন সিংহ তার "ভারতীয় পুতুল ও খেলনা" (নং ১৮৫-১৯২) শীর্ষক চিত্র-প্রবন্ধে এবং অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় তার "সিকিমের মুখোস" (নং ৯০-৯৬) শীর্ষক চিত্র-প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে। হীরেন সিংহের পুরস্কারপ্রাপ্ত এই চিত্র-প্রবন্ধটি পুতুল তৈরী শিল্প ললিতের যে উঁচু ধাপে পৌঁচেছে তার পরিচয় এনে দিয়েছে। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখোসের ছবিগুলি সিকিমের লোকশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পুরস্কারপ্রাপ্ত না হলেও আলোক-চিত্রের উৎকর্ষে এবং বৈচিত্র্যের দিক থেকে এই চিত্র-প্রবন্ধটি প্রদর্শনীটিকে সমৃদ্ধ করেছে। চিত্র-প্রবন্ধ শ্রেণীতে আর পুরস্কার লাভ করেছে মনো মিত্রের "দেহসৌষ্ঠব" (নং ১২২-১২৭) শীর্ষক ছবিগুলি। পেশীর বোঝা দেহের যে চেহারা এনে দেয় মনো মিত্র বেশ খুঁটিয়ে তা তুলে ধরেছেন।

গতবারের প্রদর্শনীতে চিত্র-প্রবন্ধ শ্রেণীতে অধিকাংশই ছিলো দুর্যোগ, দুর্বিপাক ও দুর্ঘটনার বিষয় নিয়ে তোলা ছবি। এবার এ শ্রেণীতে মাত্র বারোখানি ছবি দেখা যায়। এ থেকে বলা যেতে পারে এখন আলোক-চিত্রকররা জনসাধারণের মনকে দুঃখ, করুণা ও অনুকম্পায় পীড়িত করে তোলার চাইতে আশা, ভরসায় উৎফুল্ল করে দেওয়ার দিকেই মনোনিবেশ করেছেন। এবারের উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দার্জিলিংয়ের ধস নামার দুখানি ছবি (নং ১০৩-১০৪)—উপহার দিয়েছেন তারক দাস। তাছাড়া শ্রীদাস আসাম ভূকম্পেরও চারিখানি ছবির (নং ১০৫-১০৮) একটি চিত্র-প্রবন্ধ রচনা করে দিয়েছেন।

ধান কাটা (নং ১৩৬—১৪২) ক্ষিরোদ রায়, কলিকাতা

আসামের পার্বত্য উপজাতি (নং ২১—৩১)

ফটো: আসাম গভর্নমেণ্ট

সংবাদ-চিত্র শ্রেণীতে গতবারের মতো ভারও যেমন নেই তেমনি সমগ্রভাবে দেখ জুড়ে ধরলে সম্পদেও অসাধারণত্বের দর্শন অপেক্ষাকৃত কম। এই বিভাগে থম পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিখানি হচ্ছে হীরেন সিংহের "স্টার্ট" (নং ৭৭)। গত এশিয়াড মেসে সাঁতারুদের দৌড় আরম্ভ করার কটি দৃশ্য। চকিত ক্ষণের মধ্যে গতিশীল কটা অস্বাভাবিক ভঙ্গীকে ধরে নেওয়ার হাদুরীতে ছবিখানি সংবাদ-চিত্র গ্রহণের ব গুণগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছে। এ ছবি-নি গত নভেম্বর মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত য়্যাল ফটোগ্রাফিক সোসাইটির প্রদর্শনীতে দাদরের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় রস্কার পেয়েছেন অজিত সোম "বৃষ্টির পরমর্শ" (নং ৬২) ছবিখানির জন্যে। দারুণ বৃষ্টির ফলে দার্জিলিং-শিলিগুড়ি পথের এক জায়গায় পাহাড়ের একটা টল এই ছবিখানির বিষয়বস্তু। তৃতীয় ান পেয়েছে এস রায়ের তোলা "পরিত্রাণ" নং ৫৯)। ফুটবল খেলায় গোল বাঁচানোর কটি চমকপ্রদ দৃশ্য। চতুর্থ স্থান নিয়ে-ন উইলিয়াম ওয়াকার তার "দুদলের ন্দ্ব" (নং ৮০) ছবিখানিতে। গত সাধারণ বাচন ব্যাপারে হাজরা পার্কের সভায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ছবি। ঘটনার আকস্মিকতা, ঝগড়ায় যোগদানকারী এবং আশপাশের লোকের কৌতূহল, বিহ্বলতা ও অসতর্কতা ধরা পড়েছে ছবিখানিতে। এর পরের পুরস্কার-প্রাপ্ত ছবি দুখানি হচ্ছে বিশ্বরঞ্জন রক্ষিতের "উচ্চগ্রামের রাজনীতি" (নং ৪৬) এবং তারক দাসের "আর বেশী নয়" (নং ৩৩)। প্রথম-খানি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে রাজাজীর সঙ্গে আজাদজীর আলাপের এক অসতর্ক মুহূর্তের ছবি। দ্বিতীয়খানি প্লাবিতকূল ব্রহ্মপুত্রের কিনারায় পণ্ডিত নেহরু আর তার হাত পাকড়ে তাকে রুখে ধরেছেন কন্যা ইন্দিরা। সর্বাগ্রগণ্য নেতাকে এক অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পাওয়ার দিক থেকে ছবিখানি স্থান পেয়েছে।

পুরস্কারের বাইরেও উল্লেখ করার মতো কুশলতা কতকগুলি ছবির মধ্যে দেখা যায়। এস রায়ের "চৌরঙ্গীতে ধূলিবাত্যা" (নং ৪৮) ছবিখানি পুরস্কার পাবার যোগ্য; ঘটনাটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু ছবিখানি অসাধারণত্বের পরিচয় বহন করছে। উই-লিয়াম ওয়াকারের "কুপিতা মাতা" (নং ৮৫) ছবিখানি আকস্মিক অথচ স্বাভাবিক ঘটনা চিত্রণে সুন্দর নিদর্শন। একটি বাছুরকে রক্ষা করার জন্য গাভী-মাতা কর্তৃক জনতাকে তাড়া করার ছবি এখানি। অজিত সোমের "অরাজনীতিক উপহার" (নং ৬৫) একটি মামুলী ঘটনাকেও স্মরণীয় করে রাখতে পেরেছে। মাসখানেক আগে শ্রীরামপুরে নির্বাচনী বক্তৃতা দেবার সময় নেহরু খেলাচ্ছলে গলার মালা খুলে জনতার মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছেন তারই ছবি।

হাল্কা ভাবের ছবির দিকে সংবাদ-চিত্রের ফটোগ্রাফারদের ঝোঁক বিশেষ দেখা গেল না। এ বিষয় নিয়ে ছবির সংখ্যা নগণ্য এবং মাত্র দুখানি ছবির কথা উল্লেখ করা যায়—'প্রাকৃতিক মঞ্চ' (নং ৫১) এবং ট্রামে আষ্টে-পৃষ্ঠে চড়ে যাওয়ার একটি দৃশ্য। প্রাকৃতিক মঞ্চ হচ্ছে ময়দানের বিরাট গাছ, যার ওপর চড়ে শত শত ব্যক্তি খেলা দেখে।

গতবারের যোগদানকারীদের অনেকেরই ছবি এবারে পাওয়া গেলো না। গতবার সবচেয়ে কৃতিত্বপ্রদর্শনকারী শম্ভুদাস চট্টোপাধ্যায় 'প্রতিযোগিতার জন্য নয়' এই বিভাগে মাত্র একটি চিত্র-প্রবন্ধ (ভূকম্প-বিধ্বস্ত মিসমীস অঞ্চল) ছাড়া আর কিছু দিতে পারেন নি, কারণ এবারের প্রদর্শনী কমিটির সম্পাদক বলে প্রতিযোগিতায় তাঁর যোগদান করা নিষিদ্ধ। গতবারের অন্যান্য
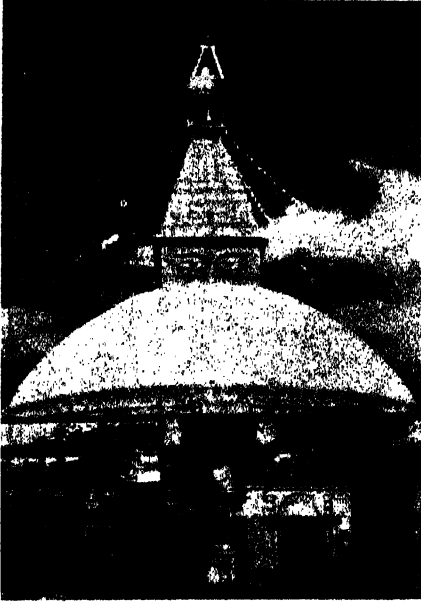
নেপাল তীর্থ (নং ১৪৩—১৫০)
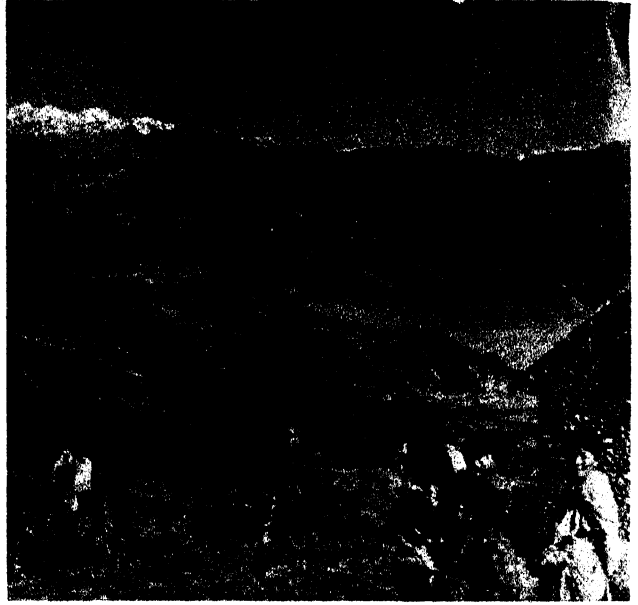
ফটো: বীরেন সিংহ, আনন্দবাজার পত্রিকা

পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে রাজ্যপাল পদক-প্রাপ্ত এফ ই পামার, কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়, কে রায়, সুনীল জানা, জে আর সেন প্রভৃতি এবারে কেন যোগদান করেন নি, বোঝা গেল না। তাছাড়া সাধারণ প্রতিযোগীর সংখ্যাও এবারে অনেক কম। তবে একটা লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, এবারে যে এগারোজন বিজয়ী প্রতিযোগী মোট বারোটি পদক ভাগ করে নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ন-জনই হচ্ছেন ছোটদের দলের। এ'রা সবাই বেশ একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে হাজির হয়েছেন, আর সেইজন্যেই প্রবীণদের টপকে যেতে পেরেছেন। সবচেয়ে কৃতিত্ব হীরেন সিংহের। সংবাদ-চিত্র বিভাগে তিনি প্রথম হয়েছেন, চিত্র-প্রবন্ধ বিভাগেও একটি স্থান অধিকার করেছেন। অজিত সোম, অসিত মুখোপাধ্যায়, ক্ষীরোদ রায়ও এদেশের সংবাদপত্রের ছবিকে সুন্দরতর করে তোলার সম্ভাবনা এনে দিতে পেরেছেন।

সংবাদপত্রের ছবির অনেক বৈশিষ্ট্য থাকে। স্টুডিওতে দাঁড়িয়ে, আগে থেকে ইচ্ছেমত সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে ছবি তোলার অবকাশ এক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। হঠাৎ যেমন কোন ঘটনা অতর্কিতে ঘটে যায়, সেটাকে ঠিকমতো তোলাতেই এর বাহাদুরী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেসব ছবি ললিতকলার পর্যায়ে হয়তো অযোগ্য হয়ে পড়ে, কিন্তু প্রামাণ্য দলিল হিসেবে এসব ছবি যে কতো কাজের হয়, লোকের মধ্যে যে কি পরিমাণ কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে পারে, তারই প্রমাণ এই প্রদর্শনী। এসব ছবিতে একটা সাবলীল নাটকীয় রেশ প্রবাহিত হয় যা স্টুডিওতে অনেক ভেবে-চিন্তে ধীরভাবে তোলা তথাকথিত অনেক ললিত-চিত্রের মধ্যেও পাওয়া যায় না। সংবাদচিত্র কল্পনা খাটিয়ে তৈরি করে নেওয়া ছবি নয়, হঠাৎ যা ঘটে, তারই আকস্মিক আলেখ্য। এশিয়ার এই একমাত্র সংবাদচিত্র প্রদর্শনীটি, অকস্মাৎ তোলা সেই সব ছবিও যে লোকের জ্ঞান-বুদ্ধিতে কতকটা সাহায্য করতে পারে, তারই চমৎকার পরিচয়।
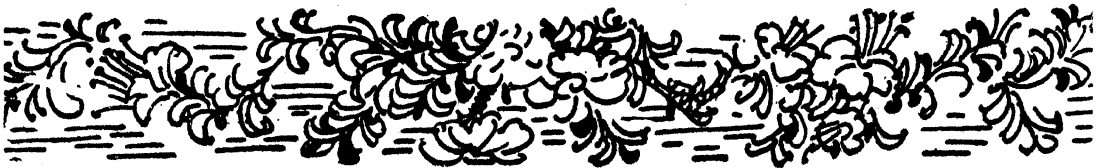
চিন্তানায়ক এইচ জি ওয়েলস্

নির্মল চট্টোপাধ্যায়

ওয়েলস্ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আমার ভয় **ছিল**। যিনি নিজে এত লিখিয়াছেন, **তাঁহার সম্বন্ধে** অন্যের রচনা পড়ার চেয়ে **তাঁহার রচনার সঙ্গে** সাক্ষাৎ পরিচয়ের **চেষ্টাই পাঠকের পক্ষে** শুভ। **সমালোচকের মতামতের আবর্তে** কত সহজে যে পাঠকের মন বিভ্রান্ত হইয়া যায় তাহা আমি জানিতাম। নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম আমি কে যে ওয়েলস্ এবং পাঠকের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া আমার মন্তব্যের ঘূর্ণি রচনা করিব? কিন্তু হায়! আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, কোন লেখক যখন খ্যাতির ঊর্ধ্ব শিখরে আরোহণ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত ক্ল্যাসিকে পরিণত হইয়া যান, তখন আর তাঁহাকে কেহ পড়ে না। তরুণ পাঠক মহলে তাই যখন এইচ জি ওয়েলসের নাম উঠিলে শুনিতে পাইতাম—'ওঃ, ওয়েলস্!', তখন বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবিতাম এই নিরুত্তাপ সহজভঙ্গি কি অতি পরিচয়ের ফল, না অপরিচয়ের অবজ্ঞা? এখন আর বিস্মিত হই না। বুঝিয়াছি ওয়েলস্ এখন ক্ল্যাসিক লেখক এবং সেই কারণে অতি দ্রুত তাঁহার পাঠকসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। এখন ভাবিতেছি, একবার এইচ জি ওয়েলসের প্রসঙ্গটা তুলিলে কেমন হয়? নিজেকে উল্টা প্রশ্ন করিতেছি—আমি কে যে ওয়েলসের কাছে এত ঋণী থাকিয়াও তাঁহার সম্বন্ধে দুইটি কথা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া বলিব না?

কিন্তু ভয়ের আরও কারণ আছে। ওয়েলস্ প্রসঙ্গে কি কথা কোনদিক হইতে বলিতে আরম্ভ করিব? আর যদি তাহা আরম্ভও করি, তবে কিভাবে এবং কবে তাহা শেষ করিব? আমার স্থান সাময়িক পত্রের কয়েকটি পৃষ্ঠা এবং এইচ জি ওয়েলস্ স্বয়ং একটি জগৎ। সেই জগৎ এত সংক্ষিপ্ত ও সুমিত, সুবিন্যস্ত নয় যে তাহার এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাকাইলে অন্যপ্রান্তে দৃষ্টি পৌঁছিয়া যাইবে। অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল এক শ্রেষ্ঠ মনীষী বর্তমান যুগের প্রায় সকল প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়া চিন্তা-ভাবনা করিয়াছেন, নিজের চিন্তারাজি নিজেই বারবার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া সাজাইয়াছেন; চিন্তাভাবনার ভাঙ্গা-গড়ার চিহ্ন ইঙ্গিত লইয়া সেই বিস্তীর্ণ ভাবজগৎ পড়িয়া রহিয়াছে; সেই জগতের কোন খণ্ডাংশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমি দেখাইয়া দিব—এই হইতেছে এইচ জি ওয়েলস্?

ওয়েলসের জীবনী আলোচনার কথা কেহ তুলিতে পারেন। সুতরাং প্রথমেই বলিয়া

রাখা ভাল যে সৃষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন কোন জীবনচরিত ওয়েলসের নাই—অর্থাৎ তাহা তাঁহার শিল্পখ্যাতির উপযুক্ত স্তরের নহে। সাহিত্য, সমাজনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, প্রাণীতত্ত্ব দর্শন প্রভৃতি বিষয় নিয়া তর্ক-বিতর্ক, লেখালেখি করিতে করিতেই তাঁহার প্রতিভা ও সামর্থ্য নিঃশেষ হইয়াছে; ব্যক্তিগত জীবনকে ঘষিয়া মাজিয়া সুসজ্জিত করিয়া তুলিবার অবকাশ তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি জীবন-শিল্পী নহেন। জীবনীকারগণ তাঁহার যে চরিত্র উপস্থিত করিয়াছেন তাহা চিত্তাকর্ষক নয়, অনুসরণীয় ত' নয়ই। ওয়েলস্ অত্যন্ত মেজাজী লোক ছিলেন। পছন্দ না হইলে কোন ব্যক্তিকে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, মতান্তরকে অনবরত মনান্তরের দিকে টানিয়া নিবার এক হিংস্র-প্রবণতা তাঁহার মধ্যে ছিল, ক্ষুব্ধ হইলে অতি নিকট বন্ধুকেও নির্মমভাবে আক্রমণ করিতে তিনি দ্বিধা করিতেন না। প্রতিকূল আবেষ্টনীর ভিতর কি করিয়া মন ও মেজাজ শান্ত রাখিতে হয় সে-শিক্ষা তিনি জীবনে লাভ করেন নাই। তাঁহার প্রেম-জীবন আরও তরঙ্গসংকুল; প্রথম যৌবনে মোহাবিষ্ট হইয়া এক আত্মীয়াকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছু-দিন পর যখন বুঝিতে পারিলেন যে স্ত্রী তাঁহার আবেগ ও প্রতিভার উপযুক্ত সহচরী নয়, তখন তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং নিজেরই এক ছাত্রীকে বিবাহ করেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় বিবাহেও তিনি পরিতৃপ্ত হন নাই। জীবনে বহুবার তিনি বিচিত্র নারীদের প্রেমে পড়িয়াছেন এবং সেই প্রেম প্রতিবারই তাহাকে অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ রাখিয়া গিয়াছে। সদ্য প্রকাশিত তাঁহার এক জীবনচরিতে জীবনীকার লিখিতেছেন—

'He had several mistresses and a number of passades.' এক নারীর প্রেমের উষ্ণতা প্রশমিত হইতে না হইতেই অন্য নারীর প্রতি যিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন, সেই ওয়েলস্ই যখন শুনিতেন যে তাঁহার পূর্বতন প্রেমিকাদের ভিতর কেহ অন্যত্র বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার পাতিয়াছে, তখন ঈর্ষায় ক্রোধে তিনি জ্বলিয়া উঠিতেন। অদ্ভুত মানুষ সন্দেহ নাই। এবং এ ধরণের চরিত্র যে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষেই সর্বনাশের কারণ হইত। কিন্তু এইচ জি ওয়েলস সাধারণ মানুষ নহেন।

মেজাজ ও খেয়ালের বশে যাহাই তিনি করুন না কেন, কর্ম হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন নাই। সৃষ্টির প্রেরণা কখনো তাঁহার কাছে আসিয়া ফিরিয়া যায় নাই। ওয়েলসের রচনাবলীর বৈচিত্র্য ও বিশালতা তাহার সাক্ষী। অনন্যসাধারণ মানসিক শক্তি নিয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শক্তির

সবখানিই তিনি ব্যয় করিয়াছেন বর্তমান শতাব্দীর চিন্তাধারাকে গড়িয়া তুলিতে। ব্যক্তিগত জীবনের স্বপ্নসাধগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া তুলিবার জন্য যেটুকু মাত্র অবশিষ্ট ছিল তাহা তলানি মাত্র। সেই ক্ষীণ, অপরিচ্ছন্ন প্রাণশক্তির অসংযত লীলা দেখিয়া ওয়েলসের পরিচয় লাভ করা যায় না। তাঁহার মনের ক্রমবিকাশের মধ্যেই তাঁহার জীবনেতিহাস লিখিত রহিয়াছে। তাঁহার জীবনই তাঁহার বাণী নয়, তাঁহার বাণীই তাঁহার জীবন।

ওয়েলস্ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে লিখিয়াছেন অনেক, চিন্তা করিয়াছেন আরও বেশী। উক্তিটি যথেষ্ট সচেতনভাবেই করিলাম। অধিক লেখেন, অথচ চিন্তা করেন কম, অথবা মোটেই করেন না—এমন লেখক-দের বিপুল সংখ্যাধিক্যের মধ্যে ওয়েলসের মত দুই একজন চিন্তানায়ক মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ওয়েলস যাহা লিখিয়াছেন তাহা সবই যে যুক্তিসিদ্ধ, অথবা একান্তই তাঁহার নিজস্ব, এমন কোন ইঙ্গিত করিতেছি না। ওয়েলসের মন ক্রমাগত এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উত্তরণ করিয়াছে, নিজের চিন্তার ভুল-ভ্রান্তি নিজেই তিনি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। অন্যের চিন্তা গ্রহণ করিতেও তিনি দ্বিধা করেন নাই। অন্যের দ্বারস্থ তাঁহাকে হইতে হইয়াছে এই জন্য যে অনন্ত পরমায়ু নিয়া তিনি পৃথিবীতে আসেন নাই। তাহা যদি আসিতেন তবে আমার মনে হয় ওয়েলস্ সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে পৌঁছিয়া নূতন করিয়া সব গড়িয়া তুলিতেন। বিশ্বা-মিত্রের মত নূতন বিশ্ব সৃষ্টির সেই ক্ষাত্র তেজ তাঁহার মধ্যে ছিল।

এইচ জি ওয়েলসের মন-জগতের তিনটি বিষয়ের দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। এই তিনটি বিষয় সকল শ্রেষ্ঠ আলোচনারই উপজীব্য। ইহাদের সজীবতা কখনও শেষ হইবার নয়। ইহারা হইতেছে, ঈশ্বর, সমাজ এবং প্রেম। প্রেমের কথাই প্রথমে ধরা যাক। তাহার কারণ কিন্তু এই নয় যে এই বিষয় ত্রিপুটির মধ্যে প্রেমের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী; বরং প্রেমের মূল্য তুলনায় কম বলিয়াই প্রাথমিক স্তরে আলোচনার যোগ্য। [illegible] সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে ওয়েলস্ আসিতে পারেন নাই। কেই বা পারিয়াছে? আর [illegible]রিলেও অন্যে তাহা গ্রহণ করিবে কেন? প্রেম হইতেছে জীবনেরই মত; প্রত্যেককেই ভি[illegible] ভিন্নভাবে তাহা যাপন করিতে হয়। ঔপন্যাসিক হিসাবে ওয়েলস্ প্রেমের বিচিত্র রূপ নিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে প্রেমকে যুক্ত করিয়া তাহার গতি ও প্রকৃতি তিনি অবলোকন করিয়াছেন। বদ্ধমূল সংস্কার বা সঙ্কোচ তাঁহার স্বচ্ছ দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। প্রেম যে দেহ হইতে স্বতন্ত্র কেবল মনোময় কোন বস্তু এই ধারণার তীব্র প্রতিবাদী তিনি। বোধ হয় তাঁহার প্রাণীতত্ত্ববিষয়ক শিক্ষা তাঁহাকে জীবের সহজাত বৃত্তি হইতে প্রেমকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিতে বাধা দিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের দাবীকে সানন্দে স্বীকার করেন তিনি। ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে পৃথিবীর রূপরস গন্ধ স্পর্শ হইতে আনন্দলাভ করিতে হইবে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ প্রদীপে আগুন জ্বালাইয়া জীবনের আরতি করিতে হইবে। কিন্তু কেহ যেন ওয়েলসকে দেহসর্বস্ববাদী বলিয়া ভুল না করেন। একদা শুনা যাইত যে আমাদের জীবনে যৌনবোধের কোন স্থান নাই; এখন উল্টা শুনা যাইতেছে যে জীবনে যৌনবোধ ছাড়া আর কিছুরই স্থান নাই। দুইটি ধারণাই মারাত্মকরকমে ভুল। ওয়েলস্ কখনো এই দুই প্রান্তস্থিত ভুলে জড়াইয়া পড়েন নাই। দেহ অথবা মন ইহার একটিকেই সর্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এমত অদ্বৈতবাদী তিনি নহেন। প্রেম আছে, তাহার সঙ্গে দেহমন দুই-ই যুক্ত হইয়া আছে, দুইটিকেই স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু স্বীকার করিলেই সমস্যার সমাধান হয় না। বরং আরও শতসহস্র সমস্যা গজাইয়া উঠে। ওয়েলস্ একবার বলিয়া-ছিলেন যে, তিনি ঘটনাকে জানিতে চান, নির্মোহ দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া তাহার স্বরূপটি দেখিতে চান। প্রেম একটি ঘটনা। অসংখ্য জীবনে এই ঘটনা ঘটিতেছে—ওয়েলস্ তাঁহার উপন্যাসের ল্যাবরেটরীতে ইহার বিচারবিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মজা এই যে, যতবারই তিনি ইহাকে সন্ধানী দৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ততবারই এই অবাধ্য প্রেম অনুবীক্ষণযন্ত্রের নীচ হইতে ফসকাইয়া গিয়া তাঁহার চোখে আসিয়া আঁটিয়া গিয়াছে। এবং প্রেমের সেই মায়াঞ্জন চোখে পড়িয়া তিনি যখন পৃথিবীর দিকে তাকাইয়াছেন, তখন তাহার অন্যরূপ। 'কিপস্' উপন্যাসের নায়ক কিপস্ প্রেমে পড়িল। নূতন এক অভিজ্ঞতার আলোকে তাহার সকল মন ঝলসিয়া উঠিল। ওয়েলস লিখিতেছেন—

'He felt as a praying hermit might have felt, snatched from his quiet devotions, his modest sack cloth and ashes, and hurled back neck and crop over the glittering gates of Paradise, smack among the iridescent wings, the bright-eyed cherubim.'

কিন্তু ইহা বর্ণনা হইল, মূল জিনিসের সজ্ঞা নির্দেশ হইল না। এই রকম জোরাল গতিশীল বর্ণনা তিনি বহু গল্প উপন্যাসে ছড়াইয়া দিয়াছেন। 'নিউ মেকিয়াভেলি' লিখিবার সময় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই প্রবল ও প্রাথমিক আবেগের বর্ণনাও সম্ভবপর নয়।

'There is no describing the reality of love. The shapes of things are nothing, the actual happenings are nothing, except that somehow there falls a light upon them and a wonder.'

প্রেমকে জীবনের অন্যান্য বৃত্তির সঙ্গে সুসমঞ্জস্যভাবে মিলাইবার আপ্রাণ চেষ্টা ওয়েলসীয় নায়ক-নায়িকারা করিতেছে; কিন্তু সেই দুরন্ত প্রেম তাহাদের জীবনে নামিয়া আসিয়া বারবার সবকিছু লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতেছে। 'টোনোবাঙ্গে' উপন্যাসের পণ্ডেরেভোর বৈজ্ঞানিক স্থৈর্য প্রেমের জোয়ারের মুখে পড়িয়া তৃণ খণ্ডের মত ভাসিয়া গেল, 'নিউ মেকিয়াভেলি'র রেমিংটনকে বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য নারীর প্রেমে আসক্ত হইবার জন্য রাজনৈতিক জীবন হইতে বিদায় নিতে হইল, আর ক্রিসওল্ড (ওয়ালর্ড অব উইলিয়ম ক্রিসওল্ড) প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়াও নারীর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না।

কিন্তু খেয়াল রাখিতে হইবে যে, ওয়েলস-সৃষ্ট নরনারীরা সানন্দে বা বিনা দ্বিধায় ভালবাসার যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দেয় নাই। তাহা যদি দিত, তবে তাহাদের স্রষ্ঠা পঞ্চম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিতেন না। প্রেমের যাহারা মূল্য বুঝে, তাহারা অতি সহজে সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়া প্রেমকে ছোট করিয়া দেয় না। প্রেমের সঙ্গে অন্যান্য চিত্তবৃত্তির সংঘর্ষের

ছবি ওয়েলস আঁকিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার শিল্পীমন হয়ত তুষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দার্শনিক মন প্রতিবাদ জানাইয়াছে। প্রেমের এই অত্যাচার হইতে মুক্তি চাই। বৈজ্ঞানিক ভঙ্গিতে যখন ইহার বিশ্লেষণ ও সমাধান হইল না, তখন অন্যপথ ধরিতে হইবে; প্রেমের পথে গিয়াই প্রেমকে জয় করিতে হইবে। যে প্রেম আছে নিতান্ত ব্যক্তিগত, জৈব প্রয়োজনের সঙ্গে যে জড়িত, তাহাকে রূপান্তরিত করিতে হইবে : প্রেম নৈর্ব্যক্তিক না হউক, বৃহৎ হইতে পারিবে, জৈব বন্ধন অতিক্রম করিয়া বহুজনের ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িবে। প্রেমের টানাপোড়েন ছাড়াও মানুষ যে উদার ও প্রাণবন্ত দৃষ্টি লাভ করিতে পারে, তাহা ওয়েলস কখন বুঝেন নাই। তাঁহার জীবন দর্শনে প্রেমের গভীর মূল্য রহিয়াছে, কেননা—

'it breaks down the boundaries of wall. Believer must also be a lover, he will love as much as he can and as many people as he can, and in as many moods and ways.'

সমগ্র সমাজ-জীবন ওয়েলসের মনকে সর্বদাই আকর্ষণ করিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল তিনি চিন্তা করিয়াছেন, কি করিয়া এই পৃথিবীটাকে সুস্থ ও সুন্দর করিয়া তোলা যায়। মনে হইত, বিধাতা যেন এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর নরনারীর দায়িত্ব তাঁহার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এত উৎসাহ নিয়া আর কোন লেখক আর কোন বিষয় সম্পর্কে এত চিন্তা ভাবনা করেন নাই। এই অপরিসীম উৎসাহ যেমন তাঁহাকে একের পর এক নূতন পৃথিবী গড়িবার পরিকল্পনা তৈরি করিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তেমনি এই অত্যধিক উৎসাহেই তাঁহার মন মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে। যে কোন একটা বড় সামাজিক বা রাষ্ট্রিক আন্দোলনই ওয়েলসের মনকে নাড়া দিত। আলেয়া দেখিলেই তিনি আলো ভাবিয়া উল্লসিত হইতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের বিরাট উদ্যোগপর্ব দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, বোধ হয় এই ভাঙ্গাচোরার মধ্য দিয়াই নূতন জগৎ সৃষ্টি করা হইবে। সুতরাং যুদ্ধ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়ান তাঁহার কাছে দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হইল। ওয়েলসের মনের অবস্থা ছিল এইরূপ—

'The thing that occupied most of my mind was the problem of getting whatever was to be 'got for constructive world Revolution out of the confusion of war.'

তিনি ভাবিয়াছিলেন যুদ্ধকে তিনি তাঁহার কাজে লাগাইবেন, কিন্তু হায়, যুদ্ধই তাঁহাকে তাহার কাজে লাগাইয়াছিল। ওয়েলস্ অবশ্য পরে তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন—

'We, who lent ourselves to propaganda, were made fools of and ultimately let down, by the traditional tricks of the Foreign Office.

মহাযুদ্ধের কাছ হইতে এই শিক্ষা ওয়েলস্ লাভ করিলেন—এমন ব্যাপার সমসাময়িক ইতিহাসে কমই ঘটিয়াছে যাহার কাছ হইতে তিনি কিছু শিক্ষা লাভ করেন নাই—যে আন্তর্জাতিক হিংসাদ্বেষের মূলে রহিয়াছে জাত্যাভিমান, অর্থাৎ উগ্র জাতীয়তাবাদ। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিতে হইলে এই জাতীয়তাবাদকে দূর করিতে হইবে। মানুষ সমস্ত পৃথিবীর অধিবাসী, কোন দেশের ভৌগোলিক সীমায় সে খণ্ডিত নয়—এক কথায় ইহাই ওয়েলসের বীজমন্ত্র। 'Nationalism is the purest artificiality.' এই artificiality বা কৃত্রিম মনোবৃত্তি দূর করিবার উপায় সম্বন্ধেও তিনি চিন্তা করিয়াছেন। যে বিপ্লবীরা কেবল প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আক্রমণ করিতেই পারে, কিন্তু নূতন কোন পথের হদিশ দিতে পারে না, ওয়েলস্ তাহাদের দলের কেহ নহেন। তাঁহার মতে জাতীয়তাবাদ এবং মনুষ্য-সমাজকে খণ্ড করিয়া দেখিবার কুদৃষ্টিকে দূর করিতে পারে শিক্ষা। 'Education can wipe them out completely. শিক্ষার উপর এক নিশ্ছিদ্র বিশ্বাস জীবনের শেষ অধ্যায়ে তাঁহার সমস্ত মন পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার দুঃখ দুর্গতি যখন তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছে তখনও তিনি এই বিশ্বাসের মধ্যেই সান্ত্বনা ও সমাধান খুঁজিয়াছেন—

'I believe that through a vast, sustained educational campaign the existing capitalistic system can be civilised into a collectivist world-system.'

অতি উচ্চ বিশ্বাস এবং শুভ পন্থা সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্ভব কি? দেশ-বিদেশের জনসাধারণের মধ্যে এক পৃথিবী এবং শ্রেণীহীন সমাজের আদর্শকে প্রচার করিবার মত বিপুল ক্ষমতার অধিকারী যাহারা তাহারাই ত' ইহার চরম বিরোধী? ওয়েলস্ কি বুঝেন নাই যে, কর্তারা কখনও স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত স্বার্থকে বিপন্ন হইতে দিতে পারে না, কোনদিন দেয় নাই? এই প্রশ্ন ওয়েলসীয় চিন্তার সমালোচনা হিসাবে জ্বলন্ত প্রশ্নের আকারেই থাকিয়া যাইবে; ওয়েলসের পক্ষ হইতে আমি ইহার কোন জবাব দিতে পারিব না। তীক্ষ্ম অস্ত্র নিক্ষেপ করিবার মত আরও অরক্ষিত স্থান সমালোচককে আমি দেখাইয়া দিতে পারি। ওয়েলস্ সমাজ-রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন চান। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, জনগণের দ্বারাই এই পরিবর্তন সাধিত হইবে। জনগণের প্রতি তাঁহার দরদ ছিল, কিন্তু আস্থা ছিল না। 'ওয়ার্লড্ অব উইলিয়ম ক্লিসোল্ড' উপন্যাসের ক্লিসোল্ড ওয়েলসীয় মতবাদের মুখপাত্র; ক্লিসোল্ড বলিতেছে—

'Realisation of a new stage of civilised society will be the work of an intelligent minority. I am thinking of an aristocratic and not a democratic revolution.'

কিন্তু কাহারা এই অভিজাত শ্রেণী? কি তাহাদের রূপ? কেনই বা তাহারা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিবে? আর যদি তোলেও তবে কি তাহা শেষ পর্যন্ত এক-নায়কত্বে পর্যবসিত হইবে না? সমাজতন্ত্র-বাদী ও গণতন্ত্রবাদীদের পক্ষে ওয়েলসের সঙ্গে বিবাদ করিবার ইহার চেয়ে ভাল সুযোগ আর মিলিবে না। কিন্তু বিতর্কে নামিবার আগে ওয়েলস্-বিরোধীদের সবিনয়ে সতর্ক করিয়া দিব যে, ওয়েলস্ কখন একনায়কত্ব সমর্থন করেন নাই। ইউরোপের ডিক্টেটরদের বিপক্ষে তাঁহার চেয়ে নির্মমতর উক্তি আর কোনও সমাজ-বিজ্ঞানী করেন নাই। হিটলার এবং মুসোলিনী যখন শিল্পী, সাহিত্যিক এবং বৈজ্ঞানিকদের স্বাধীন চিন্তার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন ওয়েলস্ তাঁহার মেজাজের সকল উষ্ণতা এবং [illegible]ভঙ্গির সকল কৌশল [illegible] যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছেন। তাঁহার [illegible]গর্ব উক্তি মনে রাখিবার মত—

'the only spirit in which we can meet the attack upon us is to assert

boldly and aggressively the pride of original thought and creative work.'

মুসোলিনী ইটালীতে ভল্টেয়ারের রচনা নিষিদ্ধ করিয়া দিলে ওয়েলস্ তাঁহার তুলাদণ্ডে মুসোলিনী এবং ভল্টেয়ারকে স্থাপন করিয়া দুইজনের মান নির্ণয় করিলেন এবং বিচারান্তে আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—

'Cannot you see the dry and kindly smile of the dear old giant, as this midget condemns him to extinction?' মুসোলিনীর কাণেও এই জিজ্ঞাসা পৌঁছিয়াছিল কিনা জানি না, যদি পৌঁছিয়া থাকে তবে তাঁহার ভারী চোয়াল দুইটি হিংস্র ক্রোধে আরও দুই ইঞ্চি ভারী হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ওয়েলস্ বেপরোয়া। তাঁহার হাতের বল্লম
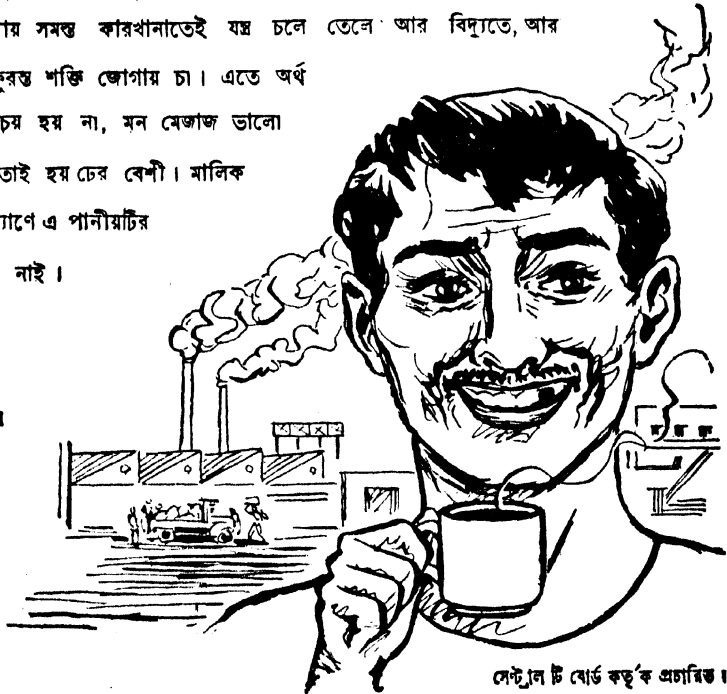
কখন কাহাকে গিয়া বিদ্ধ করিবে তাহা যেন তিনি নিজেই জানেন না। কার্ল মার্ক্সের উপর তাঁহার একটি উক্তি এইরূপ—

'Indeed from first to last the influence of Karl Marx has been an unqualified drag upon the reorganisation of human soceity.'

সমাজতান্ত্রিক ওয়েলসের মতে মার্ক্স হইলেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি! শুধু কি তাই? রাগের মাথায় মার্ক্সের শুভ্র শ্মশ্রু-গুম্ফের উপর পর্যন্ত তিনি বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন। আশ্চর্য কি যে এহেন যুদ্ধার্থীকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য বিরুদ্ধ সমালোচকগণ চক্রব্যূহ রচনা করিবেন? কিন্তু দেখা গিয়াছে, যতবারই মহারথীরা গদার আঘাতে ওয়েলস্‌কে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়া হৃষ্টমনে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, ততবারই কি এক অলৌকিক কৌশলে কোথা হইতে নূতন প্রাণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ওয়েলস্‌ তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

মার্ক্স বনাম ওয়েলস্‌ বিবাদের মূল কারণ হইতেছে শ্রেণীদ্বন্দ্বের মতবাদ। ওয়েলসও সমাজতান্ত্রিক। সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে প্রচার তিনি কাহারও চেয়ে কম করেন নাই। কিন্তু মার্ক্সীয় শ্রেণীদ্বন্দ্বের ধারণা তাহাকে রুষ্ট করিয়াছে।

'This class war idea is one diametrically opposed to that religious spirited socialism which supplies the form of my general activities.'

সমাজে শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে এবং ধনবণ্টনের এই অসম ব্যবস্থা যে সমস্ত দুর্গতির মূল তাহা ওয়েলসও স্বীকার করেন। তবে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘর্ষে তাঁহার আপত্তি কেন? তিনি নিশ্চয়ই অহিংস প্রতিরোধের সমর্থক নহেন—

'Non-resistance is for the non-constructive man....the builder and maker of the first stroke of his foundation spade uses force and opens war against the anti-builder.'

তবে? ইহার উত্তর ওয়েলস্‌ স্পষ্ট করিয়া কিছু দেন নাই, কিন্তু তাঁহার আপত্তির একটা কারণ আমি অনুমান করিতে পারি। কেবলমাত্র শ্রেণীদ্বন্দ্বের নিরিখে মানবজাতির ইতিহাসের যে ব্যাখ্যা মার্ক্স করিয়াছেন তাহাই ওয়েলস্‌কে বিমুখ করিয়া দিয়াছে। ওয়েলস্‌ নিজেও একজন ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা। ইতিহাসের ভিতর যে দ্বন্দ্ব তিনি দেখিয়াছেন তাহা দুইটিমাত্র শ্রেণীতে আবদ্ধ নয়, থিসিস-এ্যান্টি-থিসিসের যান্ত্রিক বিবর্তনমাত্র নয়, সেই দ্বন্দ্ব অসংখ্য এবং বিভিন্ন যুগে তাহার বিভিন্ন রূপ। দ্বন্দ্ব রহিয়াছে জ্ঞানের সঙ্গে অজ্ঞানের, প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রগতির, ধর্মান্ধতার সঙ্গে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার, এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর এবং একই শ্রেণীর মধ্যে এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের; সব মিলিয়া মানুষের মহাভিযান চলিয়াছে। এবং সেই অভিযানের অন্যতম দ্রষ্টা এইচ, জি, ওয়েলস্‌ কোন আংশিক অথবা খণ্ডিত দৃষ্টিকে বরদাস্ত করিতে পারেন নাই।

ওয়েলস্‌ প্রসঙ্গে ধর্ম ও ঈশ্বরের কথা তুলিলে হয়ত কেহ কেহ সচকিত হইতে পারেন—নাস্তিক-শিরোমণি ওয়েলসের সঙ্গে আবার ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি? কিন্তু সম্বন্ধ আছে, এবং তাহা অতি গভীর। ওয়েলস্‌ নাস্তিক সত্য কথা; কিন্তু তিনি আবার ঈশ্বর-বিশ্বাসীও। এই আপাত-বিরোধী বাক্যের গ্রন্থিমোচন করিতে হইলে একটু স্থানের প্রয়োজন।

ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে যে-সব সংস্কার, যেমন আত্মার অবিনশ্বরতা, স্বর্গ-নরক, পাপপুণ্য, অপ্রাকৃত ঘটনা—তাহার সব কিছুই ওয়েলস্‌ তাঁহার দর্শনের এলাকা হইতে ঝাটাইয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন। মৃত্যুর পরেও এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক আত্মা কোথায়ও বিরাজ করিবে এই কল্পনার বিরুদ্ধে ওয়েলসের সবল সন্ধানী মন বিদ্রোহ না করিয়া পারে নাই। জীবনের মর্মমূলে যাহারা ভীরু তাহারাই ইহ-জীবনের শেষেও এক বিদেহী অস্তিত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়। বিজ্ঞান অথবা সুস্থ জীবন-দর্শন, কোনদিক দিয়াই এই দুর্বল আকুতিকে সমর্থন করা চলে না। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, আর এক ধরণের অমরত্ব আছে। তাহা পৃথক্‌ পৃথক্‌ভাবে কাহারও একার নয়, নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু আমাদের প্রাণের অতি নিকটে। যুগের পর যুগ পার হইয়া মনুষ্যজীবন চলিয়াছে—তাহার বিরাম নাই, মৃত্যু নাই। এই মহা-জীবনের সঙ্গে একীভূত হইয়া আমরা একপ্রকার অবিনশ্বরতার আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারি। ওয়েলস্‌ ঘোষণা করিতে-ছেন—

'I believe in the great and growing Being of the species from which I rise and to which I return.'

জড়বস্তুর রাজ্যে ওয়েলস্‌ কার্যকারণের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বিশ্বাসী। একটি ঘটনা অন্য ঘটনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, বস্তুর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন প্রশ্ন সেখানে নাই। বিজ্ঞানের ইমারত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এই অলঙ্ঘনীয় নিয়তিবাদের উপর। এই ভিত্তি কোথায়ও এতটুকুও নরম হইলে সব কিছু ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। এবং হাক্সলির মন্ত্রশিষ্য ওয়েলস্‌ তাহা সহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু এই ওয়েলস্‌ই নিজের মনের দিকে যখন ভাল করিয়া তাকাইয়াছেন তখন বুঝিয়াছেন যে, মনের স্বাধীনতাকে স্বীকার করিতে হয়, সেখানে determinism বা নিয়তিবাদকে ঘেঁষিতে দেওয়া যায় না, কারণ মনের স্বাধীন সত্তা নষ্ট হইয়া গেলে তাঁহার জীবনদর্শনও অসার হইয়া পড়ে। তাই ওয়েলস্‌কে উচ্চকণ্ঠে বলিতে হইয়াছে—

'I am free, and freely and responsibly making the future.'

খণ্ড খণ্ড করিয়া নিলে কোন একটি বিষয় বা বস্তুর ব্যাখ্যা করা যায় বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই বিশ্বব্যাপারের কি তাৎপর্য তাহা কে বলিতে পারে? এবং কেহ পারে না বলিয়াই শেষ পর্যন্ত ওয়েলস্‌কেও অজ্ঞেয় রহস্যবাদের সুরে কথা বলিতে হইয়াছে—

'What the scheme as a whole is I donot clearly know. There I become a mystic.'

টমাস হাক্সলির ছাত্র, প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌, বিজ্ঞান-বিশ্বাসী ওয়েলসের দুই হাতের মুঠার মধ্য দিয়া বিজ্ঞানের সকল গর্ব ও উদ্ধত ধূলার মত ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে। এবং শূন্যে মুঠা নিয়া জীবন কাটাইবার মানুষ যেহেতু তিনি নন, সেহেতু সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে এক ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ওয়েলসের সকল পরিকল্পনার মত তাঁহার ঈশ্বরও অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। কিন্তু [illegible] ধর্মরাজ্যের ছোট, বড়, সুন্দর, অসুন্দর, শান্ত, প্রমত্ত নানা ঈশ্বরমূর্তির মধ্যে কোন একটিকে আমার বাছিয়া লইতেই হয়, তবে আমি ওয়েলসের ঈশ্বরকেই নিব। তাঁহার ঈশ্বরের নাম 'God the Invisible King.

মান বস্তুরাজির অন্তরালে তিনি হন; কিন্তু তিনি নিরাকার শক্তিমাত্র আমার আশংকা হয়, ওয়েলসের -কাব্যিক, আধা-দার্শনিক ঈশ্বরকল্পনার চয় দিতে গেলে পদে পদে ন্যায়শাস্ত্রের তনিয়মগুলিকে লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর ত হইবে। তাহাতে যুক্তিবাদীরা হয়ত হইবেনঃ কিন্তু লজিকের বেড়াজাল ক্রম করিয়াই না মিস্টিসিজমের রহস্য-ক প্রবেশ করিতে হয়? 'হয় সাদা, কালো' বুদ্ধির এই জাতীয় সরল, , উদগ্র দাবীর হাত হইতে মুক্তি লে তবে দেখা যায় যে, অতি প্রত্যক্ষ ব এবং অতি অগোচর অতীন্দ্রিয় ত যাহা আছে তাহা প্রায়ই সাদা এবং ার মাঝামাঝি অর্থাৎ ধূসর। ওয়েলসের র মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। নও কর্ম করিতেছেন, এবং তাঁহার র উদ্দেশ্য রহিয়াছে। মানুষের মত নও শান্ত; তিনিও দেশ ও কালের ন।

কন্তু ঈশ্বর কর্ম করেন কেন? কি তাঁহার ব এবং উদ্দেশ্য? তিনিও যদি দেশ কালের অধীন হন তবে দেশ ও কাল ট করিল কে? এবং অনাদি অনন্ত হইলে অমরও হওয়া যায় না। সুতরাং রও মৃত্যু আছে। তাই যদি হয় তবে রের মৃত্যুর পর কি হইবে? ওয়েলসীয় র সম্বন্ধে এই প্রশ্নগুলি জাগরিত া স্বাভাবিক। কিন্তু ওয়েলস্ এমন ইহাদের পথের দুই পার্শ্বে সরাইয়া য়া চলিয়া গিয়াছেন যে মনে হয় যেন রা তর্কশাস্ত্রের অনাবশ্যক ও অর্থহীন াসা। ভাবুক ব্যক্তিরা হয়ত প্রথমে ওয়েলসের দর্শনকে অযৌক্তিক, অসিদ্ধ এবং অপরিণত মনের যদৃচ্ছা কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবেন; কিন্তু হঠাৎ যদি তাঁহারা এইরকম একটা উক্তির সম্মুখে আসিয়া পড়েন—

'He (God) will be with you as you face death. He will come so close to you that at last you will not know whether it is you or he who dies, and the present death will be swallowed in his Victory.'

তখন বুঝিবেন যে, এই স্তরের উক্তি যে ব্যক্তি করিতে পারে তাঁহার দৃষ্টি পাঠশালার ন্যায়নীতির কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া জীবন-মৃত্যুর মহালীলাকে স্পর্শ করিয়াছে। ওয়েলসের ঈশ্বর মানুষ হইতে কখন বিচ্ছিন্ন নন। মানুষের সঙ্গেই তিনি জন্মিতেছেন, লয় পাইতেছেন। নব নব জন্মের মধ্য দিয়া তিনিও ক্রমাগত রূপান্তর লাভ করিতেছেন। ধর্মবিশ্বাসীদের ঈশ্বরের মত বহু ঊর্ধ্বে থাকিয়া তিনি পাপ-পুণ্যের বিচার করেন না। সভ্যতার ঊষাকালে ইহুদিধর্মের ঈশ্বর সরোষে বলিয়াছিলেন—'Vengeance is mine', আর ওয়েলস্ তাঁহার ঈশ্বরের পরিচয়ে বলিতেছেন—'He does not punish.' হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতার কাদামাটি দিয়া পুরাকালের ঈশ্বরের সৃষ্টি, আর এইচ, জি, ওয়েলস্ বর্তমান সভ্যতার সূক্ষ্মতম মানবিক গুণাবলী সঞ্চারিত করিয়া ঈশ্বরকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন। এক ঈশ্বর-কল্পনা হইতে আর এক ঈশ্বর-কল্পনার মধ্যে এই যে প্রকাণ্ড পার্থক্য তাহা মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগমনের অন্যতম দ্যোতক।

ওয়েলসীয় ঈশ্বরকে পূজা, বা প্রার্থনা দ্বারা ভজনা করা যায় না। একমাত্র কাজের দ্বারাই তাঁহার নিকটে আমরা পৌঁছিতে পারি। যাহা কিছু আমরা সমাজ ও সভ্যতার জন্য গড়িয়া তুলিতেছি তাহাই ঈশ্বরের কাজ এবং ঈশ্বরের এই কাজের জন্যই আমরা এখানে আছি।—

'The service of God is not to achieve a delicate consistency of statement; it is to do as much as one can of God's work.'

একবার পরিহাসচ্ছলে ওয়েলস্ তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধু জি, কে, চেস্টারটনকে লিখিয়াছিলেন—

'I feel I shall always be able to pass into Heaven as a friend of G. K. C's.'

স্বর্গ যদি সত্য হয়, তবে আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, ওয়েলস্ স্বীয় প্রতিভার পরিচয়েই সেইখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহার জন্য স্বর্গের সকল দুয়ার খোলা ছিল। কে জানে, হয়ত' আজ স্বর্গলোকে স্বর্গের অধিবাসীদের উন্নতির জন্য নূতন কোন পরিকল্পনা নিয়া স্বয়ং ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি তর্ক জুড়িয়া দিয়াছেন। সে কথা ভাবিতেও আমার সকল মন কৌতূহলে চঞ্চল হইয়া উঠে। যদি মৃত্যুর পর কোন-রকমে আমি স্বর্গের আশেপাশে আসিয়া পড়ি, তবে এই মরজগতে তাঁহার রচনা পড়িয়া আলো ও আনন্দ পাইয়াছিলাম অন্ততঃ এই কারণে এইচ, জি, ওয়েলস্ কি আমার জন্য স্বর্গদ্বারের রুদ্ধ কঠিন কবাট দুইটি একটু ফাঁক করিয়া ধরিবেন?

বাসন্তী

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

অজন্তা-অযোধ্যা হল ছলোছলো এ বিকেলে ফাগুনের গানে—
অনেক রুপোলী রং উর্বশীর শিহরিত কেশে-বেশে হারা—
অনেক গানের সুর সোনামোড়া বাসন্তীর মাধবী-বিতানে—
তবুও তোমার মন খুঁজে খুঁজে, অনমিতা, আলোর প্রয়াণে।

এই ত নক্ষত্র এল আকাশেতে হিজিবিজি দাগ দিয়ে দিয়ে,
ধূমল দিগন্ত-দূরে পাখিদের শিসধ্বনি, বাতাস-আভাস—
মৃদুল মুখর মনে হে বাসন্তী কথা দাও, কথা আনো আরো
আকাশ-উদাস্ত-শান্তি সব ছেড়ে ব্যথা আনো, বীণায় বিভাস!

ফাল্গুন ব্যথা আনে, কানে কানে ফিসফিস আলতো হাওয়ার;
সবই মুছে যাক তবু এই রাত্রিঘন কাজল কপালে
তোমার মুখের টিপ কিছুক্ষণ গান হক, সুরেলা সুস্বরঃ
এখনো অনেক দূর চৈত্র ধূধূ-ধূসরিত ঊষর সকালে।

চক্রদত্ত

লণ্ডন নগরী থেকে একটি "বিশ্বাস করুন আর নাই করুন" অর্থাৎ "বিলিভ ইট অর নট" জাতীয় সংবাদ এসেছে। তবে সংবাদটি যে নির্ভরযোগ্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কারণ সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে বৃটিশ মেডিক্যাল জর্নালে, যাতে বাজে খবর ছাপা হয়না।

কোনো একটি মেয়ে "আরথ্রাইটিক সোরিয়াসিস" নামে একপ্রকার জটিল চর্মরোগে ভুগছিল। চিকিৎসকদের অভিমত ছিল যে মেয়েটি চিরজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যাবে, কিন্তু মেয়েটির বাবা বলেছিলেন যে, প্রয়োজন হলে তিনি তার ডান হাতখানি দিয়ে দেবেন যদি তাতে তাঁর মেয়ে সেরে ওঠে। অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, পিতার ডান হাতটি গেছে, মেয়েটিও সেরে উঠেছে।

কন্যাটি তার বাবা ও মার সঙ্গে একটি মোটর গাড়ী করে বেড়াতে যাচ্ছিল। সেই গাড়ীতে পঙ্গু কন্যার চাকা দ্বারা চালিত একটি চেয়ার তুলে নেবার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত একটি দরজা ছিল। সেই গাড়ীতেই তাঁরা সকলে ভ্রমণ করছিলেন কিন্তু এমন ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটল যার ফলে পিতার ডান বাহুটি কাঁধ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, কিন্তু কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! মেয়েটি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করল। তার এই আরোগ্যের মূলে আছে কি কোনো মানসিক কারণ? অথবা দুর্ঘটনায় চমক লাগার ফলে তার অ্যাড্রিন্যাল নামে গ্রন্থি থেকে কর্টিসোল নামে রসায়নটি নিঃসৃত হল যার দ্বারা সে সেরে উঠল? এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কর্টিসোন হল নবাবিষ্কৃত হর্মোণজাতীয় ওষুধ, যার আবিষ্কারকগণ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই ওষুধ আরথ্রাইটিস নামে যন্ত্রণাদায়ক বাতব্যাধি সারাতে সিদ্ধহস্ত। দুর্মূল্য হলেও ভারতে এই ওষুধ এখন পাওয়া যাচ্ছে। এই গল্প পাঠ করে সেই বিখ্যাত লাইনটি মনে পড়ছে "দেয়ার আর মোর থিংস.........."।

*

দেশ ভ্রমণের শখ যাদের আছে তারা শুধু যে, রেল কোম্পানীর ভাড়া দেন তা নয়, তাদের হোটেল খরচও প্রচুর করতে হয়। অবশ্য যারা মোটরে ভ্রমণ করেন তারা রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দিতে পারেন, কিন্তু রাত্রি যাপনের জন্য হোটেলের শরণাপন্ন হতেই হয়। এরজন্য অনেকেই অনেক রকম ব্যবস্থা করে নিয়ে থাকেন। কেউবা সঙ্গে ছোট তাঁবু কিংবা মোটরের পেছনে ট্রেলার লাগিয়ে শোবার ব্যবস্থা রাখেন কেউবা মোটরের সীটটা এমন একটা বন্দোবস্ত করে রাখেন যাতে রাতে শোওয়া যায়। বর্তমানের নতুন উপায়টি চমকপ্রদ। মোটরের মাথার ওপর একটি প্লাই উডের ভাঁজ করা বাক্স লাগান থাকে। এটি দৈঘ্যে প্রস্থে ৬ ফুট×৪ ফুট। এর মধ্যে তুলার অথবা বাতাস ভরা গদি থাকে আর তাছাড়া বাক্সটি যখন খোলা হয় তখন প্লাস্টিকের পর্দায় এর চারদিক ঘেরা হয়ে যায়। মোটরের ব্যাটারি থেকে এর মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থাও করা যায়। মোটর থেকে এই ঘরে ওঠবার জন্য একটা ভাঁজ করা সিঁড়িও সঙ্গে থাকে।

ভ্রাম্যমান ঘর

*

নাইড্রাজিড নামে যে নতুন ওষুধটি বার হয়েছে সেটি—যক্ষ্মা রোগের পক্ষে ধন্বন্তরী বলা যায়। এই ওষুধটির আবিষ্কারকের নাম "ডাঃ জিওফ্রী রেক।" ডাঃ রেক বলেন, যক্ষ্মা রোগের ওষুধ হিসাবে স্ট্রেপটোমাইশিন এবং প্যাশই (প্যারা এ্যামিনো স্যালিসিলিক এসিড্) আপাতত প্রচলিত কিন্তু এগুলি প্রয়োগে অনেক অসুবিধাও আছে। এই ওষুধ দুইটি খুব বেশী পরিমাণে অথবা বেশীদিন ব্যবহার করলে খুব বিষাক্ত হতে পারে। নাই-ড্রাজাইড্ এই রকম প্রতিক্রিয়াবহুল নয়। রোগের প্রথম অবস্থা থেকেই নাইড্রাজাইডের চিকিৎসা করা যায়, কিন্তু স্ট্রেপটোমাইশিন প্রভৃতি ওষুধগুলি ঠিক এই রকম প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবহার করতে সাহস পাওয়া যায় না। এই ওষুধ প্রয়োগ করে বহুদিন ধরে রোগীর চিকিৎসা করা চলে এবং রোগীকে নিরাপদ ও কর্মক্ষম রাখা যায়। ডাঃ রেক টেষ্ট টিউবে যক্ষ্মার জীবাণু নিয়ে এবং ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, প্যাশ এবং স্ট্রেপটোমাইশিনের চেয়ে এ ওষুধ একশত বেশি গুণ কার্যকরী। এই ওষুধের সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, যে পরিমাণ ওষুধ প্রয়োগে শরীর বিষাক্ত হতে পারে তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ ওষুধেই রোগ নাশের পক্ষে যথেষ্ট। এই ওষুধটি কোনও একটি হাসপাতালে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে দেখা গেছে যে, এটি ইনজেকশন ও খাইয়ে দুভাবেই প্রয়োগ করা যায়। তাছাড়া দেখা গেছে যে, ফুসফুসের রোগ ছাড়াও এটির সাহায্যে টিউববারকুলার ম্যানেঞ্জাইটিস-এর চিকিৎসাও চলে। এই ওষুধটি এখনও বাজারে চালু হয়নি। কারণ যে কোম্পানী এটি আবিষ্কার করেছেন তাদের মতে এটি প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরী না হলে বাজারে ছাড়া সম্ভব হবে না এবং এর দামও নির্ধারণ করা যায় না। এই কোম্পানী বহু বৎসর ধরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই ওষুধ সম্বন্ধে গবেষণা চালাচ্ছেন। এই পরীক্ষাতে তাঁরা প্রায় পাঁচ হাজার যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন।

*

আলফালফা থেকে নিষ্কাষিত ক্লোরোফিল থেকেই ক্লোরেসিয়াম তৈরী হয়। যেসব রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা ক্ষত সারে এটি তার মধ্যে সর্বপ্রধান। পেনিসিলিন, সালফা জাতীয় ওষুধ এবং ক্লোরেসিয়াম নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ক্লোরেসিয়াম সবচেয়ে বেশী কার্যকরী। [illegible] উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের মলম [illegible]তীয় জিনিস। এই ওষুধটি ক্ষতস্থানে লাগালে খুব তাড়াতাড়ি নূতন কোষ গঠন করতে পারে। ফলে ক্ষত ঘা খুব তাড়াতাড়ি সেরে যায়।

রূপদর্শী

আমাদের কথা, যেন তপ্তখোলার খৈ। মশগুল হয়ে তর্ক করছিলুম বন্ধুর বেডে বসে। আশপাশ দেখব ফুরসৎ কই? হঠাৎ পাশের বেডের রোগীটি জিগ্যেস করলে বাবুজী কেনালের কোনদিকটায় লড়াই চলেছে?

এতক্ষণ সমান সমান চলছিলুম। সবে বন্ধুটিকে কাম্নি মেরেছি, এবার ফাঁকা পেয়ে

আব্দুল সুখানি তার কাহিনী বলতে শুরু করল

জোর ছোটাবো তর্কের হাওয়াগাড়ী। হোঁচট খেয়ে ব্রেক কসলুম। পাশের বিছানায় চেয়ে একখান মেজাজ আমার ফেটে সাতখান হয় আর কি? বিরক্তি চেপে বললুম, সুয়েজখালে লড়াই হচ্ছে। বললে, সেটা তো জানি। কিন্তু স্থানটা কোথায়?

লম্বা ঢ্যাঙাপানা লোকটা। কথাবার্তায় গইগেরামের স্পষ্ট টান। হাইকোর্ট দেখাতে চাইলে যে দেশের লোক খচে ব্যোম হয়, মালুম হল সেই দিশী। ওর বাপদাদার চোদ্দ-পুরুষের কেউ কেতাবের মলাটে হাত ঠেকিয়েছে যদি তো আমার নামে কুত্তা পুষতে রাজী আছি। আর সেই লোক কিনা এমন-ভাবে জিগ্যেস করছে সুয়েজের কথা—'স্থানটা কোথায়'—যেন সুয়েজটা ওর বড়দির শ্বশুরবাড়ী।

আমি কিছু বলবার আগেই আমতা আমতা করে বললে, মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, ঠিক আন্দাজ পাচ্ছিনে, জায়গাটা কোথায়। অথচ দেখুন, সাত সাতবার সুয়েজ পার হয়েছি।

রান্না-রসুই করেন কি? তাহলে আমার তখনকার হাল বুঝতে পারবেন। যেন কড়াই-ভর্তি পালংপাতা—তেলে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুবসে হল এটটুসখানি। আমরা পড়ালিখা লোক, আমাদের হাম্বড়াই সব সময় মহেন্দ্র দত্তর ছাতার মতো চিতিয়ে থাকে, বিপাকে না পড়লে বড় একটা গুটোয় না। আব্দুল হানিফের এক টিপুনিতে গুটোনো তো ভারী কাজ, ছাতা একেবারে পাকিয়ে পাকিয়ে মুড়ে উপরে রবারের আংটা পরিয়ে দিলুম।

কৌতূহলী হলুম। একটু একটু করে ওর দিকে এগুতে লাগলুম তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে দুজনে চা সিগারেট খেলুম। ফিরে যখন আসি তখন দেখি কোন অজান্তে দোস্তির দস্তানা এঁটে ফেলেছি।

আব্দুল নিজের জীবনকথাই বলছিল। কলকাতায় এসে আর দিশে-বিশে পাইনে। এযে একেবারে ইমারতের অকূল দরিয়া। খোঁজ করে করে তো খিদিরপুরে পৌঁছালাম। দেশ গ্রামের নানা জনা তো থাকে সেখানে। দশে মিলে চেষ্টা করলে হিল্লে একটা লেগে যাবে। কিন্তু ভরসার গিঁট আর টাইট রইল না। দিন কতকের মধ্যেই রশি হল ঢিল। আন্ধার দেখলাম চোখে। শেষকালে জানখান যখন নীলামে উঠব উঠব, আল্লার দোয়ায় নোকরী মিলল এক হোটেলে। মশলাপেষার কাজ। খাওয়া দাওয়া আর বচ্ছরে এক লুঙ্গী। বিসমিল্লা, কী তকলিফ গেছে একদিন! ফুরসৎ নাই। মসলা বাটা শেষ হল তো বর্তনবাটি ধোও, সেটা যদি শেষ করলে তো ময়দা শানতে লাগো, তো তন্দুরে আগুন লাগাও, তো দস্তরখান বিছাও, তো খানা দাও। তামাম রাত দিনে, রাতে শুধু চার ঘণ্টা ঘুম। এমন চলেছে দু বছর। এ কাম আর ভাল লাগল না। হোটেলে খানা খেতে আসত এক সারেঙ। একটা ইস্টিম লঞ্চে মাল বয়, গুদাড়া পারও করে। তার হাতে পায়ে ধরে কাম জোটালাম। ডাঙ্গার মানুষ সেই যে পানিতে নামলাম, আর আজ ইস্তক কামের জন্যে ডাঙ্গায় উঠি নাই। বত্রিশ সন পানিতেই কাটালাম, মাঝখানে খালি আট সন

. বাপজান যদি ফৌত হল তো গার্জেয়ান গেল। চাচা কি আর যারা, তারা তো ভাত-পানির কেউ নয়, লাথ মারবার পয়গম্বর। উঠতে হাত চলে তাদের, বসতে লাথ। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়। বাপ মরেছে এক মাসও হয়নি, চাচার মেহেরবানিতে গা-গতর ঢিলে ঢলঢলে হল, মাথায় আমার বাবরি ছিল, তাবৎ চুল গেল চাচার বার-বাড়ির উঠোনে। জান-প্রাণের মমতা করলে আর একদিনও এখানে থাকা নয়। তাই একদিন ফজের-নেমাজের শেষে, তিতবিরক্ত মনটার 'হাত্তেরি দুনিয়া খোদা তেরা ভালা করে' বলে পিঠ চাপড়ে সটকান দিলুম। আর রেল কোম্পানীকে কুটুম বানিয়ে সিধে বন্দর কলকাতা।

বয়েস আর কত হবে তখন? আব্দুল সুখানি একটু থেমে হিসেব করতে লাগল। এখন আমার বয়েস ছয়চল্লিশ, বত্রিশ সন দরিয়ার সার্ভিস, মাঝখানের আট বছর অবশ্যি বাদ, কামকাজ করি নাই কিছু।

সুখানি আব্দুল হানিফের সঙ্গে পরিচয়টা আমার পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। বন্ধুর অসুখ। দেখতে গিয়েছিলুম। তখনো লেক হাসপাতালের দিব্যি দবদবা। সরকারী নেক-নজর এড়িয়ে লেক হাসপাতাল দিব্যি চেকনাই ছাড়ছে। খুব বেশী দিনের কথা নয়। তখনো বেলাতে লেবর সরকার গদী আঁকড়ে। এটলী সাহেব হিমসিম খাচ্ছেন টোরী দলের তেড়িমেড়িতে। জেনারেল ইলেকসন হবো হবো হচ্ছে। আর ইরাণের তেলের মামলার হ্যাপা সামলাতে এটলী আর তার ভাই বেরাদরেরা প্রায় খেপে যাবার দাখিল। ঠিক এমন সময় মিশর দিলে গোদের উপর বিষ-ফোঁড়া চাগিয়ে। জনমত ইংরেজদের নুটিশ দিলে, বাপের সুপুত্তুর হও তো নিজ জন্ম-ভূমে পাড়ি জমাও। আমরা আর নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকতে চাইনে। কিন্তু চাঁট ছুঁড়লে ছুট লাগাবে ইংরেজ এমন বান্দা নয়। পেটের ধান্দায় এককালে তাকে তিভোবন চষে বেড়াতে হয়েছে। সাত সাতে উনপঞ্চাশ ঘাটের পানির ময়লায় তার পেটে চড়া পড়েছে। কারো ভড়পানিতে ভড়কে মুক্ত-টাই হবার [illegible] কিনা? বাধল লড়াই, ছড়িয়ে পড়ল সুয়েজের [illegible]। খবুরে-কাগুজে উত্তেজনা গরম জিলিপি[illegible] হাতে হাতে পাতে পাতে ফিরতে লাগল।

হাতে আমাদের ইংরেজী [illegible]নিক আর মুখে

বাদ। পরথমে কাজ আমার টোয়েন-বয়ের। রশির নিচে লোহা বান্ধা। খাড়ির মধ্যে পানি মাপ করি। একে বাঁও মেলে না, দুইয়ে বাঁও মেলে না, তিনে বাঁও মেলে না, চারে বাঁও মেলে। তো চারের পথে লঞ্চ চলবে বে-আফৎ। তিন সন আমার লঞ্চে কাটল। না বেতন না কিছু। তখন কিন্তু আমি হাল ধরাও শিখেছি। সারেঙ দুষমণি সুরু করল। রুপেয়া পয়সা একটাও দেয় না। বেতন যে মেলে তা আমি জানতাম না। আমরা পাঁচ জন ছিলাম। একদিন সারেঙ একখানা খাতা এনে বললে, টিপ ছাপ দাও। কিসের টিপ? সারেঙ বললে, নোকরী
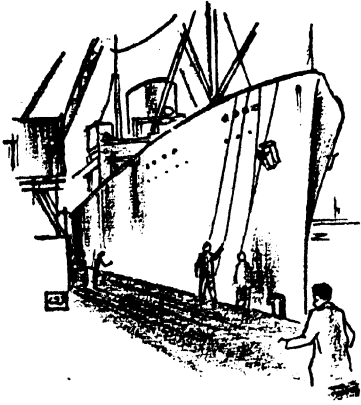
বড় জাহাজে কাজ না পেলে জিন্দগী বরবাদ

পোক্তের। দিয়ে দিলাম টিপ ছাপ। সারেঙ তিনটে রুপেয়া দিলে। বেতন। সেই পরথম কামাই করলাম আমি। সারেঙকে ঠাউরালাম পীর। রহমান আমার পেয়ারের দোস্ত, লেখাপড়া জানে। সে আমার বেওকুফি-খুশী দেখে হাসতে লাগল। বললে, তোর মাইনে হয়েছে পনের রুপেয়া, তুই শালা তিন রুপেয়া পেয়েই ফুর্তিতে লাফাচ্ছিস? কি! আশ্চর্য হয়ে গেলাম। পনের রুপেয়া! শোভান্ আল্লা, সে যে অনেক! কই? আর রুপেয়া কই? রহমান চোখ টিপে বললে, সারেঙের জেবে। কেন, সারেঙের জেবে কেন? এই তো দস্তুর। খালাসীর বেতন প্রথম মাসে সারেঙ ইচ্ছে করে যা দেবে তাই, দ্বিতীয় মাসে হাফ, পরের মাস থেকে সিকি-ভাগ কেটে নেবে সারেঙ কমিশন। তার উপর কথা বলবার কেউ নেই। সারেঙের বিচারে আপীল হয় না। ট্যান্ডাইম্যান্ডাই করেছ কি লঞ্চ থেকে 'নিকাল শালা' বলে তাড়িয়ে দেবে। নালিশ করলে কোম্পানী তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া পুরো টাকা নিয়েছ বলে টিপছাপ দিয়েছ, যে। খাতা কলমে আইনের ফাঁক সেরে রেখেছে সারেঙ মিঞা। এসবের উপর গাইগুই করলেই জুতির ঠোক্কর। তার চেয়ে যদি চাকরী রাখবার মোনাসিব হয় তো হজম কর জুলুম, আর 'সালাম বড়মিঞা' বলে ছিলুমে তামুক সেজে সারেঙকে এগিয়ে দাও।

যতদিন নোকরী ততদিনই সারেঙ মিঞাকে বকরী জোগালাম। লঞ্চে বাস করে সারেঙের সংগে বিবাদ সাজে না। আমরা খালখাড়ি পারাপার করি। মাঝে মাঝে আশপাশ দিয়ে বড় বড় জাহাজ ভোঁপা বাজিয়ে যায় আসে। খাল নদীর জলের ঢেউ দিলে গিয়ে আথাল-পাথাল লাগায়। যদি ওই জাহাজে না ভাসলাম, যদি কালাপানি পাড়ি না দিলাম তো এ জিন্দগী বরবাদ। কাম কি আর বৃথা খাড়ির জলে টোয়েন নামিয়ে।

মনের কথা মনে রাখি, আর ছুটিছাটা মিললে খিদিরপুরে গিয়ে বড় জাহাজের সারেঙ টিণ্ডালদের খোসামোদ খিদমত করি। জাহাজে ওঠা বিষম ঝকমারী। বহু মেহন্নতের পর একবার সুযোগ মিলল। রেংগুন যায় যে জাহাজ, তিন রোজের রাস্তা, সেই জাহাজের টোপার হতে যদি রাজী থাকো তো, দ্যাখ, বললে সেই জাহাজের হেড টিণ্ডাল, বলে কয়ে সারেঙকে রাজী করাতে পারি। তবে দু'মাসের বেতন সারেঙকে আর এক মাসের দিতে হবে টিণ্ডালকে। সাতাশ আঠাশ সন আগের কথা। তখন চাইন অফিস টফিসের হাংগামা ছিল না। সারেঙ টিণ্ডালই ছিল পুরস্কার পয়জারের রিস্তাদার। ইচ্ছা করলে লস্করদের মাথা হাতে কাটতে পারত। এখন আর সেদিন নাই কারো। সব সরকারী অফিসের হাওলা।

দু'পাঁচ কথা ভাবলাম। টোপারের কাজ জাহাজের সব চাইতে নীচু কাজ। টোপার মানে মেথর। তবু চিন্তা ভাবনা অনেক করে হাঁ দিলাম। ছয় মাস করলাম সেই কাম। তিন মাসের বেতন ওদের দিলাম আর বাকী তিন মাসের পেলাম আমি। আল্লা জানে ঠিক ঠিক ন্যায্য টাকা পেয়েছি কিনা।

আমাদের কাজে জানটা বড় কথা নয়। জান তো এগিয়েই আছে দুকদম কবরের দিকে, যেদিন মাটি ছেড়েছি। তুফান উঠল তো জান গেল, কলকব্জার ব্যাপার, তলফুটো হল তো জান গেল। জান যে যাবেই তা নয়, তবে এত যাব-যাব হয় যে সেদিকে আর নজর দেওয়া বেকার মনে করি আমরা। তাই জাহাজীদের জানটা বড় নয়, মান হল সব। কেউ আমাকে ভীরু বলবে কি কেউ বলবে আকামা, সেটা বড় শরমের।

কতবার জাহাজ বদল করলাম, কতবার ডিপার্ট বদল করলাম, কিন্তু জাহাজের কাজ আর ছাড়তে পারলাম না। বত্রিশ সন সার্ভিস আমার পানিতে। মাঝে আট সন কাম করি নাই।

টোপারের কাজ নীচ কাজ

এতক্ষণে ফুরসৎ মিলল। জিগ্যেস করলুম, যুদ্ধের সময় কি কাজ করতেন? আব্দুল সুখানি বললে, এখনো যা করি। এই কোয়াটার মাস্টারের। জাহাজের হাল ধরে বসে থাকি। কাপ্তান হুকুম দেয়। চার্টমতো জাহাজের মুখ ফেরাই। লড়াই-এর সময় আমি এক মানোয়ারে ছিলাম। বে অফ বেঙ্গলে টহল দিতাম। আরাকানের কাছে জাপানীরা টর্পিডো করল। জাহাজে কি যে একটা হল ওলোটপালোট বোঝাতে পারব না। যখন খেয়াল হল, দেখি জালি-বোটে দরিয়ায় ভাসছি। উঠলাম আরেক মানোয়ারে, সেটাও টর্পিডো হল। একদিনেই দু-দুবার। জান থাকলে তো মারাই [illegible]। এত সব দেখেই তো [illegible] হয়েছে আমাদের জান নেই। লড়াই [illegible] থামল, তখন আমি হংকংএ। চীনা মুলুকের যা দুর্দশা একটা দেখলাম কহতব্য নয়। খাবার নাই, পোষাক

নাই। আমরা লুকিয়ে চুরিয়ে কাপড় তফন নিয়ে যেতাম। দুপয়সা যা কামাই তখনই ফুরেছি।

বিদেশের কথা বলতে বড় ভাল লাগে। দুনিয়াটা যেন বড় একখানা গাঁও, আর বেবাক দেশগুলো পাড়া। এক এক দেশ এক এক রকম। আমার সব চাইতে ভাল লাগে অস্ট্রেলিয়া। এমন খাবার সুখ আর কোনো দেশে নাই। আঙ্গুরের পাউন্ড ছয় পেনি, ছয় আনা আমাদের। আপেল ডজন এক আনা। কলা আনারস বেবাকই সস্তা। দুধ, মাখনের আর হিস্‌টিস্ নাই। আর দেখতে ভাল ফ্রান্স। আওরৎ মরদ খুবেই খুবসুরৎ।
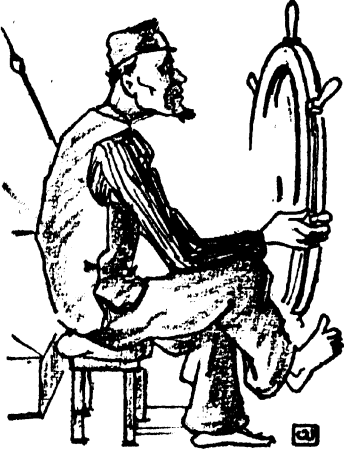
জাহাজের মুখ ফেরাই

আর নিয়মকানুন ভাল বেলাতের। স্কটল্যান্ডে একবার গিয়েছিলাম। গ্ল্যাসগোয় জাহাজ ভিড়লে আমরা দুজন ছুটি নিয়ে ঘুরতে গেলাম ভেতরে। দেশটা দেখব বেশ করে। অনেক দূরে চলে গেলাম। অনেক রাত পর্যন্ত ফূর্তিফার্তি করলাম। ফেরবার সময় দেখি গাড়ী নাই। এখন এই বিদেশে কোথায় যাই? সাঙাৎ আমার বীজ ঘাঘু। বললে, আরে পরোয়া কী? চল এই রাস্তার ধারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকি, যা করবার পুলিশে করবে। করলাম তাই। পুলিশ এল। ওই দেশের পু... সুন্দর মানুষ। বিদেশী দেখলে খাতিরযত্নে ...স্থির করে তোলে। আমাদের দুজনকে থা...নিয়ে গেল। বললাম, দূরে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছি, জাহাজে ফিরতে চাই। জাহাজ আছে গ্লাসগোয়। শুনে সে রাত্রে আমাদের লক্-আপে রেখে দিলে। সে কী চমৎকার বন্দোবস্ত। সিঙ্গিল খাট। কম্বল গদী। এক কাপ কফি, দুটুকরো মাখন রুটি আর দশটা সিগারেট দিয়ে তালা আটকে চলে গেল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ঘুম ভাঙলে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। চা এল আর দুটুকরো মাখন রুটি, আর দশটা সিগারেট। তারপর নামপাত্তা লিখে নিয়ে গ্লাসগোর ভাড়া দিয়ে আমাদের দুজনকে গুডবাই করলে। একবার সিডনীর বাইরে বেড়াতে গেছি। ঝমঝম বৃষ্টি সুরু হল। দৌড়ে গিয়ে উঠলাম এক বাড়ীর বারান্দায়। মস্ত কাচের জানালা। ভেতরে এক বুড়ো কাগজ পড়ছিলেন। আমাকে ইশারায় ডাকলেন। ভেতরে ঢুকতেই বললেন, বস। কোথাকার লোক তুমি? বললাম, ইন্ডিয়ার। বললেন, ইন্ডিয়া তো আর নাই। এখন তো হিন্দুস্থান পাকিস্থান। খুব লড়াই হচ্ছে সেখানে, তা মামলাটা কি? তুমি কোনপিঠের—হিন্দুস্থানের না পাকিস্থানের? মরমে মরে গেলাম। জবাব জোগাল না মুখে। কি কেচ্ছা বলুন তো?

হিন্দুস্থান পাকিস্থানের ফয়শালা পাঁচিল তুলে করতে গিয়ে জান প্রাণ নীলামে উঠল যে। বন্দর কলকাতার বেশীর ভাগ সেলর পাকিস্তানী। এমন গরীব আর কেউ নেই আমাদের মতো। ছয় মাস নয় মাস কাম তো ছয় মাস নয় মাস বেকার। আমরা নোকরীর খাতিরে কলকাতায় আসি। বিবি বেটা দেশে শুকোয়। এখন নোকরী জুটলেও বিবি বেটার উপাস ঘুচাবো কেমন করে? টাকা তো পাঠান যাবে না। মনি অর্ডার চলে না। টাকা নিয়ে দেশে যাওয়া যায় না। কি অবস্থা বলুন তো?

জিগ্যেস করলাম, ছ'মাস এক বছর বেকার, তো থাকেন কোথায়, খান কোথায়? বললে, সে কথা শুনলে পাথরের চোখে পানি আসবে? কতকগুলো বোর্ডিং হাউস আছে। সেখানেই থাকি। একখান বিছানা পাতা যায়, এমন জায়গার ভাড়া মাসে দু টাকা। খাওয়া? যদি মেহেরবান কোনো হোটেলওয়ালা থাকে তো বাকীতে জোগায়, পরে ডবল দাম কেটে নেয় বেতন পেলে। আর নয়তো নিজেই পাকসাক করে খাই। বেশীরভাগ সময়েই খেতে পাইনে। জাহাজে তো সে ভাবনা নেই। খানা পোষাক মিলবেই। সেখানে আমার পজিশনও আছে একটু। কিন্তু এখানে, এই ডাঙায় আমি কে? পানিতে আমি সুখানি সেখানে আমি সুখ খাই। আর ডাঙায় আমি শুকানি, ভুখে আর বেকারীতে শুকাই। অনেকবার ভেবেছি এ কাম ছেড়ে দেব। একবার দিয়েও ছিলাম। আট বছর আসি নাই। কিন্তু আর পারলাম না। দুনিয়ার টানে আসতেই হল ফের।

আব্দুল সুখানি চুপ করল। একটু থেমে বললে, আমরা এই ছিম্যানরা বাত্তির পোকা। পুড়ব, তবু উড়ে বাত্তিতেই পড়ব। এর আর কাটছাড় নাই।

বহু কথা শুনেছিলুম আব্দুল সুখানির কাছ থেকে। সব লিখলে মহাভারত। যা

ছয় মাস নয় মাস বেকার

বলেছি, সবটুকু ওর মুখে শোনা, আমার মাথায় তা দিয়ে বেরুত না একটুও। আরো শোনবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে দেখি তার ছুটি হয়ে গেছে। কোথায় আছে জানিনে। ওর সন্ধানে খিদিরপুর, মোমিনপুর, তালতলা তোলপাড় করেছি। ওকে আর পাইনি। হয়ত জাহাজের স্টিয়ারিং ধরে কাপ্তানের নির্দেশে পারাপার করছে, অতলান্ত, কি প্রশান্ত মহাসাগর। হয়ত এখনো হন্যে হয়ে ঘুরছে তক্তঘাটের শিপিং অফিসে চাকরীর সন্ধানে। হয়ত বা ছেলে মেয়ে বৌ-এর মুখ্যে ভগ্নমনোরথ এই সুখানি অনাহার আর ব্যাধির কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পুরানো স্মৃতির কৌটো খুলে উপে যাওয়া সুগন্ধটুকুর ঘ্রাণ নিচ্ছে, জানিনে।

দর কমল

কানাইলাল বসু

সকলেই জানেন যে, গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে জিনিসপত্রের দাম একটানা বাড়তে থাকে। কিন্তু আজ কাল দেখা যাচ্ছে দাম কমতে শুরু করেছে। তবে কি সত্যিই মন্দা (depression) আরম্ভ হলো? সকলের মনেই আজ এই একই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অর্থনীতিবিদরা সকলেই জানেন যে, জিনিসের দাম যখন খুব বেড়ে যায়, তার পরেই একটা দাম কমার ঢেউ আসে। অর্থনীতির "বুম" আর "স্লাম্পে"র ব্যাপার এই-ই। বর্তমানের এই মূল্য হ্রাসকে সম্পূর্ণভাবে "স্লাম্প" না বল্লেও এইটুকু বলা চলে যে "স্লাম্পের" পূর্বাভাষ এটা। একসময় দিনের পর দিন দাম বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে তাই তারই চরম পরিণতি আজকের এই মূল্যহ্রাসের শুরু। দিনের পর রাত্রি আসবেই। ঠিক সেই রকম চড়া দামের পর এক সময় না একসময় দাম কমবেই তা যতদিন পরেই হোক না কেন। বাজারে সব জিনিসের দাম বেড়ে রয়েছে, এখন দাম যখন কমবে; নিশ্চয়ই এক জায়গা না এক জায়গা থেকে কোন সূত্রে সেটা আরম্ভ হবে। বর্তমানে এই যে পৃথিবীব্যাপী মূল্যহ্রাস দেখা যাচ্ছে এটাও এক জায়গা থেকে আরম্ভ হয়েছে নিশ্চয়ই; আর সেটা আরম্ভ হয়েছে আমেরিকা মারফৎ। যখন থেকে আমেরিকা যুদ্ধের আশঙ্কায় মাল মজুত করা কমিয়ে দিল, তখন থেকেই দামের গতি নীচের দিকে নামতে শুরু করলো। অনেকে বলছেন, কিছুদিন থেকে দাম আবার একটু একটু চড়ছে। হয়তো তাই, তবে একথা ঠিক দাম আবার যতই চড়ুক, ঠিক দাম কমবার আগে যে দাম ছিল অতটা দাম আর বাড়বে না। ধরুন একটা রেলগাড়ি কোন জায়গা থেকে যখন ছাড়ে, তখন রেল কামরায় উঠবার জন্য যাত্রীরা ধাক্কাধাক্কি করে ভিড় করে। সকলেই মনে করে আমি বুঝি জায়গা পাবো না, অন্যে আমার জায়গা দখল করে নেবে। কিন্তু উঠা হয়ে গেলে আর জায়গা না পাওয়ার ভয় থাকে না। এও ঠিক তাই। যেই দাম এক জায়গায় কমলো ব্যবসায়ী মনে করলো আরও বুঝি দাম কমবে, সুতরাং এখনই মাল বেচে দি যে দামে হোক। ফলে বাজারে ক্রেতার চেয়ে বেশী মাল এসে পড়ায় দাম আপনা থেকেই কমে গেল। কিছু দিন যাবার পর অবস্থাটা যখন একটু গা সওয়া হয়ে গেল, তখন দাম একটা স্থির জায়গায় (stable) এসে দাঁড়ালো। দাম কমাটা যদি একটানা চলতেই থাকে তো দিন আসবে যখন কোন না কোন কারণে দাম আবার বাড়তে থাকবে। অর্থনীতির এই-ই নিয়ম।

এখন দেখা যাক্ আমাদের দেশে মূল্যহ্রাস কেন হলো, কি তার কারণ? আর তার প্রতিকারও বা কি হতে পারে?

কিছু দিন যাবৎ ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মন্দা দেখা যাচ্ছে—মানে জিনিসপত্রের দাম ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। ফলে স্বভাবতঃই ব্যবসায়িক মহলে একটা আতঙ্কের ভাব এসে গেছে। এই মন্দার গতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে সে বিষয় এখন থেকেই কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু তবুও হঠাৎ জিনিসের দাম কমলো কেন? কি কারণ আছে, এই মূল্যহ্রাসের পেছনে, ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করলে হয়তো কতকগুলো কারণ নির্ণয় করা হতে পারে। আর এই পরিস্থিতির পরিণাম কি হবে, সে বিষয়ে একটা অনুসন্ধান মাত্র করা যেতে পারে। মূল্যহ্রাসের পেছনে দুটো কারণ থাকতে পারে, যেমন 'সাধারণ কারণ' আর 'বিশেষ কারণ'। সাধারণ কারণ বলতে বোঝাবে, যেমন অনেক মালের আন্তর্জাতিক চাহিদা কমে গেছে, পৃথিবীব্যাপী হাওলাতের পরিমাণ কমে গেছে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আশঙ্কায় আমেরিকা মাল মজুত করবার পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছে, যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ হ্রাস পেয়েছে—ফলে যে সকল জিনিসের প্রয়োজন ছিল, তাদের চাহিদাও কমে গেছে, আর তার ফলে সেই সব জিনিসের দামও কমে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ১৯৫১ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের দাম যখন খুব বেড়ে যায়, সেই সময়কার দামের তুলনায় আমেরিকার তুলোর দাম শতকরা ২১ ভাগ, পশম শতকরা ৫৯, রবার শতকরা ৫৩, কিউবার চিনি শতকরা ৪৫, চামড়া শতকরা ৫৩, পাট শতকরা ৩৯, টিন শতকরা ৩৯, ছোবড়া শতকরা ৫১ ভাগ কমে গেছে।

সুতরাং এদেশে যে মালের দাম কমে যাচ্ছে এটা একটা বিক্ষিপ্ত একক ঘটনা নয়, সারা দুনিয়াব্যাপী এই ব্যাপার হচ্ছে। আমাদের দেশের মন্দা বাজারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারের যোগাযোগ আছে। এখানে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার যে ১৯৫১ সালে যখন বিভিন্ন জিনিসের ও মালের দাম বাড়ে তার পেছনে কতকগুলো বিশেষ কারণ ছিল। সেই সব কারণ আজ নেই, কাজেই সেই চড়া দামও যে থাকবে তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আমাদের দেশের এই বর্তমান মূল্যহ্রাসের ব্যাপার যদি ভালভাবে লক্ষ্য করা যায়, তো একটা বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে যে, যে সব মালের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে আমাদের বিদেশের বাজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে, মূল্যহ্রাস সেই সব ক্ষেত্রেই প্রথমে দেখা দেয়। যেমন তৈলবীজ, পাট, তুলো, চা ইত্যাদি। এই সমস্ত জিনিসের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক কারণ ছাড়াও কতকগুলো বিশেষ কারণ আছে। যেমন তৈলবীজের ব্যাপারে বলা যেতে পারে যে এদেশে তৈলবীজের উৎপাদন কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী হয়েছে যেমন: তিসী, রাই, ইত্যাদি। আর এই সব জিনিসের দামই প্রথমে পড়তে শুরু করে। তার পরেই আসে চিনি। চিনির ব্যাপারে বলা যেতে পারে, আখ ও গুড়ের বেশী উৎপাদন, গুড়ের চাহিদা কমে যাওয়া, রপ্তানি ও ভবিষ্যৎ বাণিজ্যের ওপর বাধানিষেধ, অর্থাভাব, উৎপাদকদের পক্ষে সরকার ভবিষ্যতে যে মাল নেবে সেটা মজুত করে রাখবার অসুবিধে, নিয়ন্ত্রিত মাল তুলে নেবার

ব্যাপারে সরকারের অক্ষমতা, খোলাবাজারে বাড়তি মাল চালান ইত্যাদি কারণের জন্যেই চিনির দাম কমে গেছে। বর্তমানে যা অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে সরকার যদি চিনি বিনিয়ন্ত্রিত করতে বাধ্য হন, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

এখন তুলোর ব্যাপার দেখা যাক্। এই বছর পৃথিবীব্যাপী তুলোর উৎপাদন বেড়েছে তার সংগে আমাদের দেশের উৎপাদনও বেড়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র আজ তুলোর দাম প'ড়ে গেছে। আমেরিকার তুলোর দাম গত ফেব্রুয়ারী মাসেই শতকরা ২১ ভাগ কমে যায়, তার পর থেকেই দাম কমার মুখে। মিশরের অবস্থা ঐ একই। সেখানেও গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী সরকার যখন তুলোর সর্বনিম্ন নির্দিষ্ট বিক্রয় দর বাতিল করে দেন, তখন থেকেই মিশরের তুলোর দাম কমতে শুরু করে। তুলোর দাম কমার সংগে সংগে কাপড়ের দামও যে কমবে সেটা খুবই স্বাভাবিক। আমেদাবাদের খবরে দেখা যায় যে, সেখানে কাপড়ের দাম ইতিমধ্যেই শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ কমেছে। পাটের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, পাটজাত জিনিসের চাহিদা কমে যাওয়ার দরুণ বিভিন্ন মিলের কাঁচা মালের ক্রয়ের পরিমাণ কমে যায়, উপরন্তু পাটের উৎপাদনও কিছু বেশী হওয়ায় পাট বা পাটজাত জিনিসের দাম কমতে থাকে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দামের যথেষ্ট তফাৎ হয়েছে—যেমন কাঁচা পাটের দাম ৫৪ টাকা থেকে ৩০ টাকায় নেমে এসেছে—হেসিয়ান হয়েছে ৭২ টাকা থেকে ৫৩ টাকা, থলের দর ২০৮ টাকা থেকে এসে দাঁড়িয়েছে ১৫০ টাকাতে। আরও একটা কারণ আছে, যার জন্য পাটের দাম কমেছে। গত জানুয়ারী মাসে ১০,০০০ বেল পাটের জিনিস সরকার কেনেন, কিন্তু পরে তা বাতিল করে দেন বলে দাম আরও কমে গেছে।

চায়ের বিষয় বলা যেতে পারে যে, আপাততঃ যা অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তাতে চায়ের ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ নয় বলেই মনে হয়। গত বছরেই চায়ের রপ্তানি কিছু কমে যা[illegible] তাতে ধারণা করা যেতে পারে পৃথিবী ব্যাপী চায়ের [illegible]দন হয়তো কিছু বেড়ে থাকতে পারে এবং [illegible]ষ্যতে হয়তো বিক্রীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার দরুণ দাম হয়তো আরও কিছু কমবে। প্রকৃত পক্ষে গত বছরের শেষে দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক চা বাগানেই মজুত মালের পরিমাণ একটু বেশী। দেশের মধ্যে ও বাইরে চায়ের দাম দেখলে মনে হয় যে, চায়ের চড়া দামের দিন চলে গেছে, এবার বোধহয় কমতির মুখে শুরু হলো। প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রেলিয়া ও নিউ-জিল্যাণ্ডে চায়ের রপ্তানি কমে গেছে। এটা সাময়িক নাও হতে পারে, কারণ অস্ট্রেলিয়া-বাসীদের সিংহল ও ইন্দোনেশীয়ার চায়ের দিকে ঝোঁক বেশী। কানাডা ও আমেরিকায় ভারতীয় চায়ের বিক্রীও কিছুটা কমে গেছে। ডলারের বাজারগুলিতে ভবিষ্যত যুদ্ধের আশঙ্কায় ১৯৫০ সালের শেষে যথেষ্ট পরিমাণ চা জমায়েত হয়, এখন এই সব মজুত মাল যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহার করা না হয়ে যাবে, ততক্ষণ নতুন মালের কাটতি তেমন না হওয়াই স্বাভাবিক। আরও একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক যে উত্তর আমেরিকায় ভারতীয় চায়ের ভাল বাজারই আছে, তবে যখন কফির আমদানী কিছু কম থাকে।

বাজারের সুর যদি কোন জায়গায় একবার খারাপ হয়ে পড়ে, তো আর প্রতিক্রিয়া অল্পবিস্তর অন্য জায়গাতেও দেখা যায়। বর্তমানে তাই-ই হয়েছে। এমন কি সোণা বা শেয়ার বাজারও এই প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রেহাই পায় নি। গত্যন্তর না পেয়ে ব্যবসায়ীরা তাদের সোণা বা শেয়ার বিক্রী করতে বাধ্য হয়েছে। এইভাবে আশাতিরিক্ত সোণা বাজারে এসে পড়ে। ক্রেতা না থাকায় দামও স্বাভাবিকভাবেই প'ড়ে যায়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এত সোনার আমদানী কি করে হতে পারে? ২।১টা কারণ অবশ্যই আছে। যেমন প্রথমত যাদের কাছে লুকোনো সোণা ছিল, লুকোনো আয় প্রকাশ করতে বাধ্য হওয়ায় ও আয় করের চাপে প'ড়ে তারা সোণা বিক্রী করতে বাধ্য হয়, দ্বিতীয়ত সাধারণ দুঃস্থ লোক, যারা এই ক্রম-বর্ধমান চড়া দামের জন্য কোন পথ না পেয়ে বাধ্য হয়ে তাদের মেয়েদের যৎসামান্য গয়নাগাটি বিক্রী করে কোন রকমে দিন-গুজরাণ করছে, আর তৃতীয়ত বিদেশ থেকে চোরাই সোণার আমদানী। এই সব কারণে সোণার আমদানী বিক্রীর চেয়ে বেড়ে যায় ফলে সোণার দাম কমতে থাকে। এখন এই দামের হয়তো কিছু উন্নতি হয়েছে, তবে সেটা কতটা স্থায়ী হবে সেইটাই বিবেচ্য।

মন্দা বাজারের ভবিষ্যৎ কি হবে সেটা যদিও অনিশ্চিত, তবু সে সম্বন্ধে একটা আন্দাজ করা যেতে পারে। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে এই মূল্যহ্রাস কত দিন চলবে? উত্তর একটিই হতে পারে যে, সেটা বলা অনিশ্চিত। তবে মনে হয় যে, অন্তত ৩০।৪০ কোটি টাকার মত 'ক্রেডিট' যদি 'লিকুইডেট্' হয় তো এই মন্দার অবস্থা কিছুটা নামবে—মূল্যের একটা সাম্য আসবে। দাম কতটা পরিমাণ কমবে সেটা নির্ভর করছে দাম কমবার কারণগুলোর বৈশিষ্ট্যের ওপর। কারণগুলো যদি স্থায়ী প্রকৃতির হয় তো দামও স্থায়ীভাবে কমবে। যেমন তুলো ও তৈলবীজের দাম কমার কারণ পূর্বে যা বলা হয়েছে।—বর্তমানের মত এত বেশী দর নেমে যাবে না, তবে আগের চেয়ে দর কিছুটা কম থাকবে বলে আশা করা যায়। যে সব ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিদেশের সংগে আমাদের ভাগ্য বিশেষভাবে জড়িত, সেই সব ব্যবসায়ের মালের দাম সরকারের আমদানী রপ্তানি নীতির প্রতি-ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। পাটের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে, সরকারের নীতির জন্যই আজ পাটের দাম এত কমে গেছে। যখন দেখা গেল যে, পাটের রপ্তানি শুল্ক বাড়ানোর দরুণ বিদেশী চাহিদা কমে গেল, বিদেশে পাটের অন্য পরিবর্ত তৈরী হতে লাগলো পাটের অত্যধিক চড়া দামের দরুণ, তখনও সরকার চুপচাপ বসে রইলেন। কোন ব্যবস্থাই করলেন না।

মূল্যহ্রাস বন্ধ করবার উপায়ের লক্ষ্য আজকের অবস্থা বদলিয়ে শুধু চড়া দাম ফিরিয়ে আনা হলে চলবে না, উপরন্তু বিদেশে ভারতীয় মালের বাজার যাতে ঠিক থাকে, আর পূর্বের অগ্নিমূল্য যাতে কিছু কমে একটা স্থায়ী মূল্য হয় সেইটাই আসল। এর জন্য দুটো জিনিস প্রয়োজন—প্রথমত রপ্তানি শুল্ক কিছু কমিয়ে বিদেশের বাজার ঠিক রাখা আর দ্বিতীয়ত বিভিন্ন শিল্পকে অর্ডিন্যান্স দ্বারা 'প্রয়োজনীয় শিল্পে' (essential industries) পরিণত করা যাতে মালিক কৌশলে মালের অভাব সৃষ্টি করতে না পারে দাম বাড়বার উদ্দেশ্যে।

শিল্পসাধনায় রাষ্ট্রানুকূল্য

ইচ্ছাপূরণের যদি কোনও দেবতা থাকেন এবং প্রাচীনযুগীয় শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে কাল-বিনিময়ের প্রস্তাব নিয়ে তিনি যদি আজ আমাদের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ান তবে, বলাই বাহুল্য, তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাবে আমরা সম্মত হয়ে যাব। তার কারণ শুধু এই নয় যে, ধারাযন্ত্রে স্নান সমাপনান্তে সে-কালের তন্বীশ্যামা তরুণীরা যখন প্রিয় অভিসারে যাত্রা করতেন, তখন কথায় কথায় তাঁদের কোমল পদস্পর্শে অশোককুঞ্জ মুঞ্জরিত হয়ে উঠতো; কিংবা এ-ও একমাত্র কারণ নয় যে, আষাঢ়-সমাগমে প্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় ব্যাকুলচিত্তে তাঁরা পুজার পুষ্পে দিবস গণনা করতেন। এ যা বললাম শুধুমাত্র এরই আকর্ষণ অবশ্য কিছুমাত্র কম নয়; তবে গুণীজন বুঝতে পারবেন, কালবিনিময়ে সম্মত হবার আরও একটা কারণ আছে। বলতে দ্বিধা নেই, এই শেষোক্ত কারণটির আকর্ষণই সর্বাধিক। সেটি হলো এই যে, সেকালে যদি জন্মাতাম, তবে 'একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে রাজার কাছে নিতাম চেয়ে উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কানন-ঘেরা বাড়ি'।

স্তুতি গাইবার কথাটা রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ পরিহাসচ্ছলেই ব্যক্ত করেছিলেন। স্তুতি না গাইলেও যে রাজানুগ্রহ পাওয়া যেত, রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। 'পুরস্কার' কবিতাটির মধ্যে যে আত্মভোলা কবির কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন, রাজার কিছুমাত্র স্তুতিগান তিনি করেননি, রাজ-সভায় উপস্থিত হয়ে অতঃপর উত্তম কয়েকটি শ্লোক নিবেদন করেছিলেন মাত্র। এবং তাইতেই রাজা তাঁর সিংহাসন থেকে নীচে নেমে এসে—

> "কহিলা, 'ধন্য, কবি গো, ধন্য,
> আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
> তোমারে কী আমি কহিব অন্য,
> চিরদিন থাকো সুখে'।"

কবিকে শুধুমাত্র সুখে থাকতে বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, আরও বলেছেন:

> "ভাবিয়া না পাই কী দিব তোমারে,
> করি পরিতোষ কোন্ উপহারে,
> যাহা কিছু আছে রাজভাণ্ডারে
> সব দিতে পারি আনি।"

এর থেকেই উপলব্ধি করা যাবে, শিল্পী-সাহিত্যিক-কলাবিদ্‌দের প্রতি রাষ্ট্রের সেকালে যথার্থই একটা আনুকূল্য ছিল। রাজা ছিলেন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতীক। সুতরাং গুণীজনের প্রতি রাজার এই যে অনুগ্রহ, রাষ্ট্রানুকূল্যই এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এ-মতের সমর্থনে কবি-গুরুরই কাব্যগ্রন্থাদি থেকে আরও অনেক উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করা যায়, তবে সন্দেহ হয় যে, তত্ত্বান্বেষীরা তাতে সন্তুষ্ট হলেও তথ্যান্বেষীরা হবেন না। তথ্যান্বেষীদের প্রতি নিবেদন, প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস-গ্রন্থ তাঁরা পাঠ করুন। বিভিন্ন যুগের শিল্পকলার প্রতি তৎকালীন রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের প্রচুর তথ্য-প্রমাণাদি সেখানে বর্তমান। সর্বকালেই অবশ্য এই আনুকূল্য ছিল না। যখন যখন ছিল, ভারতীয় ইতিহাসের সে এক-একটা স্বর্ণযুগ। গুপ্ত-সম্রাটদের রাজত্বকালে এই পৃষ্ঠপোষকতা যে তার শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই—তবে অন্যান্য বহু সময়েও, দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বে মুঘল সম্রাটদের আমলেও, তা বর্তমান ছিল।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বাঞ্ছনীয় কিনা, তা নিয়ে তর্ক তোলা বৃথা। শিল্পীকে, সর্বসময়েই কারুর না কারুর পৃষ্ঠ-পোষকতার উপরে নির্ভর করতেই হয়। আগে তাঁরা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যের উপরে নির্ভরশীল ছিলেন; একালে জনসাধারণের আনুকূল্যের উপরে।

জনসাধারণের উপরে নির্ভরশীল হবার একটা বিপদ আছে। যে শিল্প সমকালোত্তর এবং শাশ্বত, সমকালীন জনসাধারণ সহজে তার প্রতি আকৃষ্ট হতে চান না। সমকালীন সমাজে আদৃত হননি, অথচ উত্তরকালে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করেছেন, বিভিন্ন যুগের এমন বহু শিল্পীরই এখানে নামোল্লেখ করা যেতে পারে। নিজ নিজ সময়ের জনসাধারণের দাবী মেটাবার জন্যে যদি তাঁরা ব্যগ্রতা প্রকাশ করতেন, নগদ-বিদায়ে তাঁরা লাভবান হতেন হয়তো, তবে কালোত্তর শিল্পসৃষ্টির সৌভাগ্য লাভ করতেন কিনা সন্দেহ। এবং শিল্পীহিসেবে নিজেদের আচরণনিষ্ঠা রক্ষা করাও তাঁদের পক্ষে হয়তো সম্ভবপর হতো না। জন-

রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ তাঁর সম্মান-পুরস্কার গ্রহণ করছেন
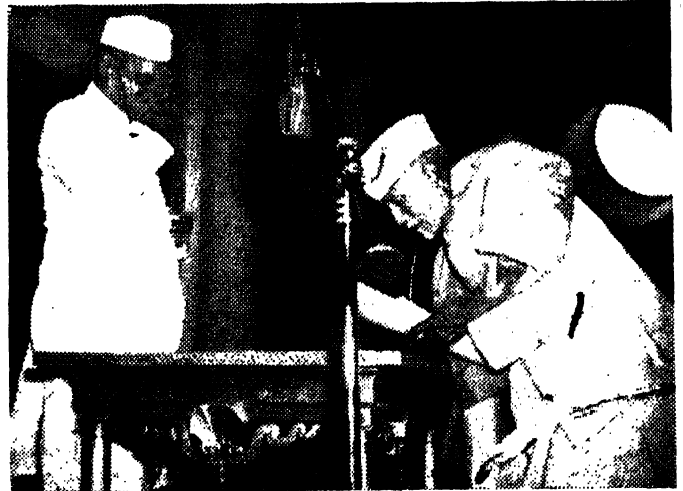
শ্রীআর্যকুড়ি রামানুজ আয়েঙ্গার, শ্রীকারাইকুড়ি শাম্বশিবম আয়ার, ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খাঁ ও ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ

সাধারণের পৃষ্ঠপোষকতার উপরে নির্ভর-শীল হবার এই যে বিপদ, একালের শিল্পী-সাহিত্যিক-কলাবিদদেরও প্রায়শঃই তার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

একমাত্র রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যই এই বিপদের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করতে পারে। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যলাভ সম্ভব হলে, একমাত্র তবেই তাঁরা সমকালীন যুগের যেসমস্ত দাবীদাওয়া অযৌক্তিক—তাকে অগ্রাহ্য করে সর্বকালীন শিল্পসৃষ্টির সাধনায় নিমগ্ন হতে পারেন। এ সম্পর্কে আর আজ দ্বিমতের অবকাশ নেই।

দুঃখের কথা, রাষ্ট্রীয় যে-আনুকূল্যের কথা এখানে বলা হলো, গত কয়েক শো বছরে তার সর্বচিহ্নই এদেশে লোপ পেতে বসেছিল। সুখের কথা, আবারো যেন তার চিহ্ন ফুটে উঠ্‌ছে। ভারতবর্ষের চারজন শ্রেষ্ঠ সংগীতবিদ্—ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খাঁ, শ্রীকারাইকুড়ি শাম্বশিবম আয়ার এবং শ্রীআর্যকুড়ি রামানুজ আয়েঙ্গারের প্রতি সম্প্রতি ভারত-সর[illegible] শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন তাতে আশা হয়, শিল্প[illegible] ক্ষেত্রে শীঘ্রই হয়তো রাষ্ট্রানুকূল্যের এক[illegible] নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হবে। ভারতীয় সংগীতে এই চার-জন শিল্পীর যে বিরাট অবদান, তার প্রতি সম্মানের প্রতীক হিসেবে এ'দের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা এবং বহুমূল্য এক-একখানি শাল উপহার দেওয়া হয়েছে। সংগীতামোদীমাত্রেই এই চারজন শিল্পীর জীবনী এবং কর্মসাধনার সঙ্গে পরিচিত। যাঁরা নন, তাঁদের জ্ঞাতার্থে সংক্ষেপে এ'দের পরিচয় নিবেদন করি।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ

বয়সে ইনি এ'দের মধ্যে প্রাচীনতম। সম্প্রতি ৮২ বৎসরে পদার্পণ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই ইনি সগীতগতপ্রাণ। কলকাতার নানুবাবুকে ইনি এ'র প্রথম গুরু হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষাসমাপনের পর ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ শাহেলীর কাছে ইনি শিক্ষা শুরু করেন। ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ শাহেলী সংগীতগুরু তানসেনের বংশধর। আলাউদ্দীন খাঁ সুদীর্ঘ ত্রিরিশ বৎসরকাল এ'র কাছে থেকে সংগীত-সাধনা করেছেন। এখন ইনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতবিদ্ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্বরোদী হিসেবে পরিগণিত। স্বরোদ, সুর-শৃঙ্গার, রবাব, বেহালা, তবলা, পাখোয়াজ এবং খোল—সব যন্ত্রের উপরেই এ'র অসামান্য দখল রয়েছে। উদয়শঙ্করের দলের সঙ্গে ইনি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ পরি-ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন। সেখানেও তাঁর প্রতিভার যথেষ্টই সমাদর হয়েছে। 'দেশ' পত্রিকাতেই মাত্র কয়েক মাস পূর্বে সবিস্তারে তাঁর কর্মসাধনা সম্পর্কে আলো-চনা করা হয়েছিল; আগ্রহী পাঠকবৃন্দ সেটি পাঠ করতে পারেন।

ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খাঁ

বয়স এখন এ'র ৭০ বৎসরের ওপর। বাসস্থান রামপুর। গোয়ালিয়রের বিখ্যাত খাঁ-ভ্রাতৃদ্বয় হাদ্দু খাঁ এবং হাসসু খাঁর শিষ্য ওস্তাদ ইনায়েৎ হোসেনের কাছে ইনি সংগীতসাধনা শুরু করেন। খেয়াল-গায়ক হিসেবে সারা দেশে আজ এ'র নাম ছড়িয়ে পড়েছে। কণ্ঠের মাধুর্য এবং সুরবিস্তারের নৈপুণ্যে খুব কম শিল্পীই এ'র সঙ্গে সমকক্ষতার দাবী করতে পারেন।

শ্রীকারাইকুড়ি শাম্বশিব আয়ার

দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ বীণাবাদক শ্রীকারাই-কুড়ি শাম্বশিব আয়ার সম্প্রতি ৬৫ বৎসর অতিক্রম করেছেন। শৈশবাবস্থাতেই ইনি বীণাবাদন শিক্ষা করতে শুরু করেন। অতঃপর খ্যাতির জয়মাল্য লাভে এ'র বিলম্ব ঘটে নি। পরলোকগত যন্ত্রশিল্পী শ্রীসুব্বারাম আয়ার এ'র ভাই। সুব্বারামের মৃত্যুর পর ইনিই এখন দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ বীণাবাদকের সম্মান লাভ করেছেন। শ্রী আয়ার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। এবং অত্যন্তই বলিষ্ঠমনা। সাধনার ক্ষেত্রে বহুসময়েই বহু

বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছে; আজ পর্যন্ত তার কাছে ইনি পরাজয় স্বীকার করেন নি।

শ্রীআর্যকুড়ি রামানুজ আয়েংগার

শ্রী আয়েঙ্গারের বয়স এখন ৬০ বৎসরের কিছু বেশীই হবে। বিখ্যাত সুরসাধক রামনাদ শ্রীনিবাস আয়েংগারের ইনি শিষ্য। বিগত ২৫ বৎসরকাল যাবৎ শুদ্ধসংগীতের ক্ষেত্রে ইনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে সমাদৃত হয়ে আসছেন। ১৯৩৯ সালে ইনি 'সংগীত কলানিধি' উপাধিলাভ করেন।

শ্রেষ্ঠ শিল্পীচতুষ্টয়ের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন উপলক্ষ্যে সম্প্রতি দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, বিশ্ববিখ্যাত বেহালাবাদক এহুদী মেনুহিনও তাতে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানান্তে শিল্পীচতুষ্টয়ের যে যন্ত্র এবং কণ্ঠসংগীতের আয়োজন করা হয়েছিল, মেনুহিন তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ এই অনুষ্ঠানে তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ইতিমধ্যেই যাঁরা জনসমাদর লাভ করেছেন, এবারে শুধুমাত্র তাঁদেরকেই এই পুরস্কার দেওয়া হলো। তবে এখন থেকে প্রতিটি বৎসরেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে সঙ্গীতশিল্পীদের আমন্ত্রণ করে এনে হোলী উৎসবের ঠিক আগে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সংগীতবিদ্‌দের নিয়ে গঠিত কমিটির বিচারে যাঁরা উপযুক্ত বিবেচিত হবেন, এখন থেকে তাঁদের প্রত্যেককেই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই সম্মান প্রদর্শন করা হবে। তিনি আরও বলেছেন, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বহু শতাব্দীর পর শিল্প এবং সংগীতের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন করা হলো। এ কারণে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদও এই অনুষ্ঠানে আশা ব্যক্ত করেছেন যে, শিল্পসাধনাকে উৎসাহিত করবার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে আনুকূল্য দেখাবার প্রয়োজন রয়েছে এখন থেকে সেই আনুকূল্য প্রদর্শনের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করা হবে।

তা যদি হয় তো অত্যন্তই আশার কথা। শিল্পীর নিরলস কর্মসাধনাকে অব্যাহত রাখবার জন্যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যদি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, তাঁর সৃষ্টিও সেক্ষেত্রে অধিকতর উৎকর্ষমণ্ডিত হবে। প্রাচীন ভারতবর্ষে তা হয়েছে, আজকের দিনেও তা না-হবার কথা নয়।

এবং আমরা আশা করবো, রাষ্ট্রের এই আনুকূল্য ধীরে ধীরে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সঞ্চারলাভ করবে। কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক, অনেককেই আজ অনন্যোপায় হয়ে আচরণ-নিষ্ঠা বিসর্জন দিতে হচ্ছে; বাজারের প্রসাদলাভের জন্য এমন শিল্প তাঁদের সৃষ্টি করতে হচ্ছে আপাত-প্রশংসার হাততালিকে উত্তীর্ণ হয়ে উত্তরকালের দ্বারপ্রান্তে গিয়েও যা পৌঁছুতে পারবে না। অথচ তাঁরা জানেন, বাজারের রুচি অনুযায়ী শিল্পসৃষ্টি করবার জন্য তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন নি; সে-রুচিকে উন্নত করে তুলতেই তাঁদের জন্ম। সে-কথা জেনেও তাঁরা নিরুপায়। রাষ্ট্র যদি আজ তাঁদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে, একমাত্র তবেই এই নিরুপায় অবস্থার অবসান ঘটবে।

চিরবহ

নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য

আমি বুঝি পৃথিবীর প্রান্তবহ সমুদ্রের তীরে
বৃক্ষরূপে যুক্তশাখে সবিতারে করেছি প্রণাম,
হয়ত বা লোনাজলে মগ্নতনু শৈবালের দাম—
কিংবা কোন সুপ্ত শুক্তি তটলগ্ন ধূলির কিনারে।

পক্ষমেলি' মহাশূন্যে অষ্টদিকে করেছি প্রয়াণ—
তিব্বতের গিরিচূড়ে, হিমালয়ে কৈলাস-শিখরে,
কিংবা বুঝি মালয়ের ঘন নীল অরণ্যের ঝড়ে
লুব্ধ ক্রূর শক্তিদ্বন্দ্বে বারবার কত আত্মদান!

মুগ্ধচিত্তে মন্ত্র পড়ি' অন্ধকারে অগ্নি-আবাহন,
শস্যশীর্ষ শ্যামক্ষেত্রে আমি সেই আনন্দিত প্রাণ—
জ্ঞানাকর তপঃব্রতী দৃষ্টিতলে অসীমের লীলায়িত ধ্যান,
সুপ্তিমৌন শুক্লরাতে প্রেয়সীর কণ্ঠলগ্ন আমি মুগ্ধমন!

আমি যেন চুপে চুপে যুগে যুগে রূপ হতে রূপে
অনাদি অনন্ত এক চিরবহ প্রাণের বন্যায়—
কুরুক্ষেত্র মহারণে, যমুনাপুলিনে আর পাঞ্চালসভায়
ঘুরে ঘুরে ক্লান্তিভরে শান্তি মাগি সারনাথ স্তূপে!

পশ্চিমে উদ্দাম ঝঞ্ঝা—খরবেগে তপ্তধূলি উড়ে—
সামগীতি স্তব্ধ বুঝি তীক্ষ্ন হ্রেষা ক্ষুব্ধ কোলাহলে,
ত্রিশরণ মন্ত্ররব মুছে যায় লোভ আর হিংসার কল্লোলে,
ছারখার রাজ্য রাজধানী, নালন্দা ও সংঘসত্র পুড়ে!

তারপরে কত জন্ম কত মৃত্যু পার হয়ে এসে—
আশা ও আশ্বাসে বুঝি এবারেও বালুচরে বাস,
বাসা ভাঙ্গে আশা টুটে মুছে যায় অন্তিম আশ্বাস,
অঙ্গন পশ্চাতে ফেলি' খুঁজি নীড় যাযাবর বেশে!

যুগে যুগে মৃত্যু হ'তে মৃত্যু আর প্রাণ হ'তে প্রাণে,
রক্তাক্ত ধ্বংসের মাঝে তপঃলব্ধ সৃষ্টি আর মৈত্রীর আহ্বানে
বিচিত্র বন্ধন আর মুক্তমনে সংগোপন [illegible] ভ্রমণে
অমিতায়ু প্রাণ আমি—চিরযাত্রী [illegible] সন্ধানে।

পুস্তক পরিচয়

The Meghaduta of Kalidas— The commentary of Bharata Mallika with copious extracts from many other un-published commentaries of the Meghaduta, by Jatindra Bimal Chaudhuri published by Pracya Vani Mandir, 3, Fedaration Street Calcutta.

প্রাচ্য বাণী মন্দির হইতে প্রকাশিত ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী সম্পাদিত মহাকবি কালিদাসের মেঘদূতের আলোচ্য সংস্করণটি পাঠ করিয়া আমরা পরম উপকৃত হইয়াছি। মেঘদূতের মল্লিনাথ-কৃত টীকাই সর্বাধিক প্রচলিত। ডক্টর যতীন্দ্রবিমল এই সংস্করণে ভরত মল্লিকের সুবোধ নাম্নী টীকা সংযোজিত করিয়া সংস্কৃত সাহিত্য--সাধনায় বাঙালীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগে বর্ধমান জেলার ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরসুটে প্রাদুর্ভূত হইয়া পরম পণ্ডিত ভরত সেন বা ভরত মল্লিক মেঘদূতের যে টীকা প্রণয়ন করেন, প্রকৃতপক্ষে মেঘদূতের যাবতীয় টীকার মধ্যে তাহা যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, একথা স্বচ্ছন্দেই বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ মেঘদূত মহাকাব্যের প্রভাব তৎকালীন বাঙলার পণ্ডিত সমাজের উপর যথেষ্টই ছিল। এই কাব্যের অনুকরণে বাঙলা দেশে সংস্কৃত ভাষায় বহু দূত কাব্য প্রণীত হয় এবং মেঘদূতেরও বারখানি টীকা বাঙলা দেশে রচিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থের সুপণ্ডিত সম্পাদক কল্যাণমল্লের মালতী টীকা, রামনাথ তর্কালঙ্কারের মুক্তাবলী, হরগোবিন্দ বাচস্পতির টীকা এবং সনাতন গোস্বামীপাদের তাৎপর্য দীপিকা নাম্নী টীকার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া বিভিন্ন টীকাগুলির বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

বাঙলার পণ্ডিত-সমাজ দূতকাব্যের মধ্যে ধোয়ীয় পবনদূত, বিষ্ণুদাসের মনোদূত, কৃষ্ণনাথ সার্বভৌমের পদাঙ্কদূত এবং রূপগোস্বামী পাদের হংসদূতের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। এগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের রত্নস্বরূপ। সে সাহিত্যে বাঙলার পণ্ডিত সমাজের কাব্য-প্রতিভা এবং মনীষার এগুলি উজ্জ্বল নিদর্শন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা সহচর সনাতন গোস্বামীপাদের মেঘদূতের তাৎপর্য-দীপিকার পরিচয় অনেকেই অবগত নহেন। অধ্যাপক যতীন্দ্রবিমল আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গোস্বামীপাদের টীকার পরিচয় দিয়া আমাদের কৌতূহল বর্ধিত করিয়াছেন। তিনি এই টীকা সমগ্রভাবে প্রকাশ করিবেন, এই ভরসাও আমাদিগকে দিয়াছেন। আমরা আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষায় থাকিলাম।

মেঘদূতের বিশিষ্টতা কোথায়, প্রকৃতপক্ষে মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ, এমনকি তাঁহার অভিজ্ঞান-শকুন্তলমের ন্যায় মধুর সৃষ্টি হইতেও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে মেঘদূতের আদর ও প্রতিষ্ঠা কেন এত বেশী অপেক্ষাকৃত আলঙ্কারিক [illegible] ফ্যারের অবতারণা করা আমাদের পক্ষে অপ্রা[illegible]গক। বস্তুত রসানুভূতির সুনিবিড় ছন্দ[illegible] মেঘদূতকে এই শক্তি দিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্লীন উদার অনাবিল এবং উজ্জ্বল[illegible] রস-লীলার সঙ্গে মহাকবি মানুষের মনের খেলার গূঢ় গতির সঙ্গতি সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। এজন্যই তাঁহার সৃষ্টি এমন সার্থক হইয়াছে। বস্তুত রসের উজ্জীবন পরিমাণের অপেক্ষা করে না; মনের মূলে সাক্ষাৎ-সম্পর্কে সুন্দরের ইঙ্গিত বা সংকেতই সে পক্ষে যথেষ্ট।

এই দিক হইতে কাব্য হিসাবে মেঘদূতের শ্রেষ্ঠত্ব। মেঘদূতের কবি প্রাকৃত দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বসৃষ্টির মূলে রসের যে রহস্য-লীলা চলিতেছে, তাহাই ধরিয়া ফেলিয়াছেন। ভরত মল্লিকের সুবোধ টীকার বিশেষত্বও এইখানে। ভরত মল্লিক তাঁহার টীকায় শব্দার্থের বৈয়াকরণ বিচারের দ্বারা জটিলতা বৃদ্ধি করেন নাই, পক্ষান্তরে মহাকবির সাধনার অন্তর্নিহিত রস রহস্যকেই তিনি উন্মুক্ত করিয়াছেন এবং রসের গতি ও রীতির সবিশেষ বিস্তার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে খুঁটিনাটি কোন বিষয়ই তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। রসের বিস্তার এবং বিশ্লেষণে বাঙলার এই পরম পণ্ডিতের প্রতিভা এবং মনস্বিতা সত্যই বিস্ময় উৎপাদন করে। মল্লিনাথের পাণ্ডিত্য অসাধারণ তাঁহার মনস্বিতাও যথেষ্ট; কিন্তু তিনি তাঁহার টীকায় মেঘদূতের রসমাধুর্য এমন নানাভাবে বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। বাঙালীর পক্ষে ইহা কম গর্বের বিষয় নয়। দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙলার এত বড় একজন প্রতিভাবান্ পণ্ডিতের সমগ্র অবদান এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তাঁহার চন্দ্রপ্রভা, রক্তপ্রভা, ভট্টিকাব্য টীকাই এ পর্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের সংস্কৃত সাহিত্যসাধনার নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় অতুলনীয়। মেঘদূতের আলোচ্য সংস্করণে সে পরিচয় বিশেষভাবেই পাওয়া যায়। মেঘদূতে উল্লিখিত স্থান, নদী, পর্বত প্রভৃতির ভৌগোলিক বিবরণ; দুরূহ শব্দসমূহের অর্থ সমগ্র মূলের বঙ্গানুবাদ, পাঠান্তর প্রভৃতি সবই দিয়া তিনি তাঁহার সম্পাদনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। উইলসন সাহেবের কৃত সুবিখ্যাত ইংরেজী অনুবাদটি সংযুক্ত হওয়াতে ইংরেজী ভাষাবিদ্ সমাজে মহাকবির কাব্যরস উপলব্ধির পথ সুগম হইবে।

ভূমিকা। শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ১৪৬। মূল্য ২॥ টাকা। আটটি ছোট গল্প নিয়ে এই বইখানি। "পূর্ব ভাষণে" লেখক বলছেন, "গল্প লেখা আমি বোধ হয় ছেড়েই দিতাম। কিন্তু এই সময়ে দুটো ছোটখাট প্রতিযোগিতায় আমার দুটো গল্প প্রথম বলে ঘোষিত হ'ল।" তবু লেখকের গল্প লেখার অভ্যাস বা উৎসাহে অনেক বাধা রয়ে গেল। প্রথমতঃ, কাগজে লেখা ছাপানোটা 'সহজ নয়'; দ্বিতীয়তঃ 'ছোট গল্প আজকাল চলে না।' কবিতার যুগও লেখকের মতে বিদায় নিয়েছে, 'এবার সম্ভবতঃ উপন্যাসের যুগও যাবে। মানুষের সম্বন্ধে বানানো গল্প করেই বা কাঁহাতক এত ভাল লাগে। তখন শুধু খবরের কাগজ হলেই মানুষের চলে যাবে, সে অবশ্যই ভালই।"—এই রকম নিস্পৃহ মনোভাব নিয়ে 'মানুষের সম্বন্ধে বানানো গল্প' লিখেছেন এবং দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, গল্পগুলি মানুষের সম্বন্ধে হলেও ঠিক মানবিক নয়, বানানো হলেও গল্প হয়েছে কদাচিৎ। ২২২।৫১

দ্যুতি (নব পর্যায়) প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক—ওবায়েদ আসকার। ছয় আনা।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাখানি পেয়ে আমরা অত্যন্তই প্রীত হয়েছি। পত্রিকাটির সর্বত্র একটি মার্জিতরুচি মনের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্প কবিতা এবং প্রবন্ধ সুনির্বাচিত। বিশেষ করে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'নতুন অধ্যায়' এবং মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'অসূয়া'—এ দুটি প্রবন্ধ আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। শ্রীযুক্ত রায় তাঁর প্রবন্ধ মারফৎ যে-বক্তব্য এখানে পেশ করেছেন, ভারত এবং পাকিস্থান—এ দুই রাষ্ট্রের সংস্কৃতিশীল প্রতিটি ব্যক্তির আজ তার প্রতি দৃষ্টি পড়া দরকার।

পত্রিকাটির ভূমিকায় বলা হয়েছে, "পূর্ব পাকিস্থানে আদর্শভিত্তিক বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিয়েই 'দ্যুতি'র যাত্রা শুরু হল।" অত্যন্তই আশার কথা।

সচিত্র কেদার-বদরিকা ভ্রমণ রহস্য—শ্রীগৌরহরি ঘোষ। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থকার, "বিদ্যাশ্রম", ৩, নারিকেল বাগান লেন, গড়পাড়, কলিকাতা—৯ অথবা কিশোর লাইব্রেরী, ২৭, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ৩৲ টাকা।

হিমালয় ভ্রমণ সম্বন্ধে কয়েকখানি পুস্তক আছে; কিন্তু ভ্রমণকারী ও তীর্থযাত্রীদের একাধারে পরিচালিত করিতে পারে এরূপ পুস্তকের অভাব ছিল। আলোচ্য পুস্তকখানি বহুলাংশে সেই অভাব দূর করিবে। তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, পুস্তকটি একটি নিছক ভ্রমণকাহিনী অথবা তীর্থযাত্রীর বিবরণ নহে। পড়িতে পড়িতে মনে হয় আমরাও লেখকের সহিত হিমালয়ের পর্বতবেষ্টিত দেওদারের ছায়াযুক্ত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছি। পুস্তকখানি তীর্থযাত্রী এবং সাহিত্যরসিক উভয়েরই মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কেদার-বদরিকার একাধিক আলোক চিত্র এই গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। ৭৩।৫২

গদাধর—সচিত্র শিশুপাঠ্য। শ্রীঅতুলানন্দ রায় বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-ভারতী প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। মূল্য—বারো আনা।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্য-জীবনী অবলম্বন করিয়া কিশোর-কিশোরীদের জন্য পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনের মত করিয়া কথা বলিবার কৃতিত্ব লেখকের আছে। লেখকের বলিবার ভঙ্গীটি বড়ই সুন্দর। শিশুদের মনে উন্নত আদর্শের অংকুরোদ্গমে পুস্তকখানি বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। ৫৫।৫২

কয়েকটি কবিতা—চিত্রভানু; ৮৬, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড, কলিকাতা থেকে অনুপমা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত। দাম—বারো আনা।

ভালো গদ্যকবিতা লেখার জন্যে ছন্দোবদ্ধ কবিতার ঐতিহ্য থাকা চাই। এই কাব্যগ্রন্থের কিছু কিছু কবিতায় সাম্প্রতিক কোন কোন কবির গদ্যকবিতার নিরীক্ষাজনিত ব্যর্থতার মতই সে-ঐতিহ্যের অভাব চোখে পড়ে। বরং বইটির যেসব কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস আছে, সেগুলি ভালো লেগেছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

শিশু মন—রমেশ দাস। সায়েণ্টিফিক বুক এজেন্সী, ১০৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। মূল্য—২৷৹ আনা। ৬৬।৫২

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত **প্রাণকুমার**—প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়। মূল্য—৬॥৹ টাকা। **গল্প আর গল্প**—সুখলতা রাও। মূল্য—৪৲ টাকা। ৬৭, ৬৮।৫২

ছোটদের রামায়ণ—পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। ওরিয়েন্ট-লংম্যানস্ লিঃ, ১৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য—১॥৹ টাকা। ৭৬।৫২

শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ সঙ্গ—নিশাকর চৌধুরী। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য—৩॥৹ টাকা। ৬৯।৫২

মহাবীর-দীপ-জ্যোতি প্রকাশনী, ৪৪।১, শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত **মোমিনপুরের চাঁদমারী**—শচীন ভৌমিক। **অকাল সেরা গল্প**—**ভেজাবচ্ছর**—অমলেন্দু চক্রবর্তী। **বৃষ্টি**—সমরেশ বসু। প্রতিটির মূল্য—১৹ আনা। ৭০-৭২।৫২

স্বাধীন চিন্তা ও নয়া সমাজের গোড়াপত্তন—প্রমোদকুমার ঘোষ, পুরুলিয়া। মূল্য—১৹ আনা। ৭৪।৫২

ছেলেদের বিবেকানন্দ—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা। মূল্য—১৹ আনা। ৭৫।৫২

ঋগ্বেদীয় মন্ত্র-সংকলন—শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১॥৹ টাকা। ৭৭।৫২

বন্দেমাতরম্ বা জন-গণ-মন সঙ্গীত গীত হওয়ার সময় শ্রোতাদের অশ্রদ্ধা-সূচক চঞ্চলতা লক্ষ্য করিয়া কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত নেহরু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এরূপ গর্হিত আচরণের পুনরাবৃত্তি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে সত্যের খাতিরে একথাও বলতে হয় যে, গান দুটি গাওয়ার ঢঙও অনেককে চঞ্চল করে তুলেছিল, এদিক থেকেও জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা রক্ষা হয়নি বলেই আমরা মনে করি।

* * * *

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সংস্কৃতি সম্মেলনে শ্রীযুক্ত নেহরু মন্তব্য করিয়াছেন যে, যাঁরা সংস্কৃতিবান, তাঁরা

সংস্কৃতি সম্বন্ধে বেশি কথা বলেন না। তাঁহার বক্তৃতার পর (নেহাৎ সংক্ষিপ্ত নয়) পবরতী বক্তাগণ সুদীর্ঘ বক্তৃতাদানে সম্মেলন সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন!!

* * *

অনেকেই বলিতেছেন, এইবারের অধিবেশনে তর্ক-বিতর্ক কখনই তুমুল হইয়া উঠে নাই। কিন্তু তা উঠিবার কথাও নয়। কালিকাতার লেক অঞ্চল কখনই রাজনীতির পক্ষে প্রশস্ত ছিল না, তার উপর কালটা বসন্ত এবং তার আবেদন সর্বজনীন।

* * *

"মিস্ ক্যালকাটা" নির্বাচনের পরই "মাস্টার ক্যালকাটা" নির্বাচনের অনুষ্ঠান, অর্থাৎ কর্পোরেশনের নির্বাচন সমাপ্ত হইয়াছে। 'মিস্ ক্যালকাটা' অতঃপর হাওয়াই জাহাজে চড়িয়া "মিস্ ইণ্ডিয়া" নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করিতে যাইবেন।
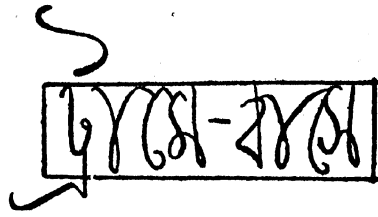
"মাস্টার ক্যালকাটা" অতঃপর Gone with the winds-এর অভিনয়ে হয়ত অংশ গ্রহণ করিবেন!

* * * * *

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, সেখানে নাকি "মিস্ দিল্লী" এবং "মিস্ ইণ্ডিয়ার" কৃত্রিম অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছে। —"অতঃপর পিণ্ডি চটকানোও হয়ত বাকী থাকবে না"—বলেন বিশু খুড়ো।

* * * * *

বিহার বিধান সভার মহিলা সদস্যেরা নাকি দাবী জানাইয়াছেন যে, মন্ত্রিসভায় অন্তত একজন মহিলা মন্ত্রী গ্রহণ করিতে হইবে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"দাবী গৃহীত না হলে তাঁরা ফিরে আসুন, গৃহিণীকে শুধু মিত্র নয়, সচিবের পদও স্বেচ্ছায় আমরা বহু আগেই দিয়ে রেখেছি। কিন্তু তাঁরা কি......

* * *

টেলিভিসন যন্ত্রের সাহায্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ মৎস্য ধরিবার ব্যবস্থা শুনিলাম বিলাতে হইয়াছে। —"কোলকাতায় আমরা কোন যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া শুধু ফুস্ মন্ত্রে মাছ ধরার ব্যবস্থা করছি, মনে রাখতে হবে, এ সেই Rope trick-এর

দেশ ভারত,—কর নমস্কার"—মন্তব্য করেন এক সহযাত্রী!

* * *

একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-সংবাদে প্রকাশ, লতা-পাতা, গাছ-গাছড়াও নাকি অনেক সময় আত্মহত্যা করে। —"আত্মহত্যার প্রতি এই ঝোঁক সরকারী পরিপূরক খাদ্য তালিকা নির্মাণের পর থেকে হয়েছে কি না, সে সংবাদ হয়ত বৈজ্ঞানিক দিতে পারেন নি"—বলে আমাদের শ্যামলাল!

* * *

অন্য এক সংবাদে জানা গেল, এ বছর চীন নাকি এক টন খাদ্য দিয়াও ভারতকে সাহায্য করিতে পারিবে না। বিশু

খুড়ো বলিলেন—"ব্যাপারটা Agriculture সংক্রান্ত তাই, culture-এর ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে মিশনের যাতায়াতে কোন বাধাই উপস্থিত হবে না।"

* * * * * *

এই প্রসঙ্গেই অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, রাশ্যার চাউল আমদানীর পক্ষেও অন্তরায় আছে, কেননা, সেই চাউলের মূল্য নাকি অত্যন্ত উচ্চ। বিশু খুড়ো বলেন—"বুঝলাম, চাউলের ব্যাপারে রাশ্যাও বুর্জোয়া, বোধ হয়, গোবিন্দভোগের নীচে নাবেন না"!!

* * *

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, চৌদ্দ বছরের কম বয়সের কোন গরু হত্যা করা চলিবে না। প্রতিবাদে কশাইরা ধর্মঘট করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"প্রতিবাদটা ঠিক বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে নয়, গরুর ঠিকুজী-কোষ্ঠী সংগ্রহের বিরুদ্ধে।"

দেশের প্রমোদ শিল্পকে প্রোৎসাহিত করার জন্যে ভারত সরকার যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মতো কার্যকরী একটি ব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হয়েছেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেলো সেদিন, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক ভারতের চারজন শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞকে সম্মানিত করার ঘটনা থেকে। তাছাড়া কলকাতায় সেদিন কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়ে গেলো তার মধ্যে একটি অধ্যায় ছিলো প্রমোদ অনুষ্ঠান। এই সব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, দেশের ও জাতির বহুবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে দেশনায়কবৃন্দ এখন থেকে সাংস্কৃতিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নয়নের বিষয়েও দৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করেছেন। এমন কি যে চলচ্চিত্রকে ঘৃণা করাই ছিলো নেতাদের চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ, এখন সেই নেতৃবৃন্দেই চলচ্চিত্র শিল্পেরও উন্নতির জন্যে বিবিধ পরিকল্পনা করছেন। আমাদের দেশের চলচ্চিত্রশিল্পকে উদ্বোধিত করার জন্যে সরকার থেকে দুমাস ধরে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা বসিয়ে দেওয়া হলো। তাছাড়া কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি প্রকাশ্যভাবে জানিয়েও দিলেন যে, চলচ্চিত্র সমেতই দেশের বিবিধ প্রমোদ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্যে কংগ্রেস কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। কিছুদিন পর সরকারী উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীতে সারা এশিয়ার একটি নাট্য সম্মেলনের ব্যবস্থা হয়েছে।

এ পর্যন্ত বরাবরই দেশের সাংস্কৃতিক ব্যাপার রাষ্ট্রের কাছ থেকে অবহেলা পেয়ে এসেছে। চলচ্চিত্রাদি প্রমোদ ব্যবস্থা তো ঘৃণিতই হয়ে এসেছে। এখন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষণা এই সব প্রমোদকে নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলবে। দেশের সাংস্কৃতিক রূপ নতুনভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

ভারতে তৈরী মার্কিণ ছবি

আমেরিকার প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম কর্পোরেশনের তৈরী "দী রীভার" ছবিখানি প্রায় মাসখানেক ধরে দিল্লী থেকে আরম্ভ করে সারা ভারতে এতো হৈ চৈ করে যাচ্ছে যা এর আগে কোন ইংরেজী ছবির ক্ষেত্রে হয় নি। ভারতের নিজের তোলা ইংরেজীতে ভারতীয় ছবি "কোর্ট ডান্সার" বা "ডাঃ কোটনীস" নিয়েও

রঙ্গজগৎ

ভারতে এতো হৈ চৈ তোলা হয়নি। অবশ্য এই আলোড়নের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন "রীভারের"ই প্রযোজক কেনেথ ম্যাকেলডাউনী—ছবিখানির এদেশে মুক্তি উপলক্ষ্যে তিনি এসে রয়েছেন মাসখানেক আগে থেকে।

ম্যাকেলডাউনী "রীভার"-এর ওপর এদেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন এই বলে যে, ছবিখানি ভারতেরই নিজের ছবি, তার কারণ ছবিখানি পুরোপুরি ভারতে তোলা হয়েছে। ব্যবসায়ী মহলে তিনি বলে বেড়াচ্ছেন যে ছবিখানি বাইরে থেকে ভারতকে অনেক টাকা পাইয়ে দেবে এবং এমনি ধারা ছবি যতো তোলা হয় ভারতের পক্ষে ততোই ভালো।

ম্যাকেলডাউনীর কথাগুলো কিন্তু সোজা নয়। প্রথমত, তিনি "রীভার"কে ভারতীয় ছবি বলছেন কি হিসেবে? ভারতের ভূমিতে এসে ইংরাজ পরিবারকে নিয়ে ছবি তুললে এবং তোলার কাজে জনকয়েক সহকারী কলাকুশলী ও শিল্পী নিয়োগ করে নিলেই কি সে ছবিখানি ভারতের নিজের ছবি হয়ে যায়? সম্পূর্ণরূপে ভারতকে পটভূমি করে এর আগে জনকতক আমেরিকার প্রযোজক ছবি তুলেছেন অবশ্য, আংশিকভাবে। "কিম"-এর পটভূমি ভারত; তার কতকাংশ ভারতে এসেই ওরা তুলে নিয়ে যান এবং এখানে ছবি তোলার সময় তারাও সহকারী হিসেবে কাজ করার জন্যে এদেশের কলাকুশলীই নিযুক্ত করেছিলেন। "কিম-"এর নির্মাতা মেট্রো গোল্ডুইন যেমন আমেরিকান কোম্পানি তেমনি "রীভার"-এর নির্মাতা ওরিয়েণ্টাল ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্মসও। কিন্তু "কিম"কে কেউ ভারতীয় ছবি বলে দাবী করেনি, অথচ "রীভার"-এর বেলা সে দাবী কি করে খাটে?

"রীভার" শুধু তোলাই হয়েছে এখানে এবং তোলা হয়েছে এইজন্যে যে "রীভার"-এর গল্পের পটভূমি ভারত এবং ভারতের এমনি সব জায়গা নিয়ে যে ভারতে না এসে তোলা ছাড়া উপায় ছিলো না, "কিম"-এর মতো কতকাংশ তুলে পরে হলিউডের স্টুডিওতে বসে কার্য সমাধা করার সুযোগই ছিলো না। "রীভার"-এর রসায়নাগার ছিলো লণ্ডনে এবং সম্পাদনা প্রিণ্ট তৈরী করা হয় হলিউডে। ছবি তৈরী সম্পূর্ণ করতে—চিত্রনাট্য লেখা থেকে প্রিণ্ট বের করা পর্যন্ত সবই হলো বিদেশে, বিদেশীদের উদ্যোগে ও তাদেরই হাত দিয়ে—সেক্ষেত্রে ওখানাকে ভারতীয় ছবি বলা যায় তাহলে কোন্ বিচারে?

ওর কোম্পানিও আমেরিকান, এখানে যা

এম পি প্রডাকসন্সের "বসু পরিবার" চিত্রে নেপাল নাগ ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

আয় হবে, তার বেশীর ভাগই চলে যাবে বিলেত মারফৎ আমেরিকাতেই মিঃ ম্যাকেলডাউনীরই হাতে—অথচ ম্যাকেলডাউনীই বলে বেড়াচ্ছেন এই ছবির দরুণ ভারতেরই আর্থিক লাভ। অদ্ভুত কথা! ম্যাকেলডাউনীর এই সব কথা ব্যবসাদারী প্রচারবুদ্ধি প্রণোদিত ছাড়া কিছু নয়। মনে হয় এদেশে জমানো ডলার উসুল করে নিয়ে যাবার জন্যেই "রীভার" তোলার পরিকল্পনা হয়েছিলো, যেমন অন্যান্য আমেরিকান চিত্রপ্রযোজকরাও আসতে চাইছেন ছবি তুলে নিয়ে যাবার জন্যে।

"রীভার" ছবিখানি তোলার ব্যাপারে ভারতীয় কলাকুশলীর যোগ রয়েছে বলে,

এ কে ডি প্রোডাকসন্সের 'সিরাজদ্দৌলা' চিত্রে দানসা ফয়িরের ভূমিকায় প্রীতি মজুমদার

বিশেষ করে বাঙলা দেশের কলাকুশলী ও শিল্পীর এবং ছবিখানি বাঙলা দেশেই তোলা হয় বলেই ইংরেজী হলেও ছবিখানি নিয়ে আলোচনার অবতারণা করতে হলো।

"রীভার"-এর কাহিনী হচ্ছে লেখিকা রুমার গডেনেরই কৈশোরকালের আত্মজীবনী। গঙ্গার ধারে চটকল অঞ্চলে লেখিকা তার কৈশোর অতিবাহিত করেন। বয়োঃসন্ধিক্ষণে তার জীবনে প্রেমের প্রথম উন্মেষ যেভাবে হয় এবং যেভাবে তার পরিসমাপ্তি ঘটে তাই নিয়েই গল্প। কিন্তু ছবিখানা তুলতে গিয়ে পরিচালক জাঁ রেনোয়া পটভূমির শোভা, এখানকার আচার বিচার, জীবনধারণ, এখানকার শিল্পকলা ও সামাজিক পরিবেশের মায়ায় পড়ে একটা আলাদা জিনিসই গড়ে তুলেছেন। রেনোয়া মূল গল্পের চেয়ে ভারতকে, অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে ভারতের সব বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বরূপকে এঁকে যাওয়ার দিকেই আসল নজর দিয়েছেন। ভারতের একেবারে বাস্তব রূপ, অন্ততঃ একটা অঞ্চলের—ভারতের লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত, নৃত্য, সামাজিক অনুষ্ঠানাদির চেহারা শিল্পীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বেশ একটা কাব্যিক ধাঁচে রূপায়িত করে গিয়েছেন। এই সব দিকে রেনোয়া যতো বেশী নজর দিয়েছেন; কাহিনীর নাটকীয় দিকটাকে ততোখানিই অবহেলা করে গিয়েছেন। ছবিখানি তাই ভারতের বিবিধ বিবরণই শুধু হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা নাট্যরস সম্পৃক্ট অবদান হয়ে উঠতে পারে নি। উপরন্তু রেনোয়া যা চিত্রিত করেছেন, তা এতো নিছক বাস্তব এবং ভারতীয় দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এমনি জড়িত যে ভারতীয় দর্শকদের কাছে তা নিয়ে কোন কৌতূহল সৃষ্টি করে দেওয়া সম্ভব হতে পারে না। এখানকার লোকের ছবিখানির প্রতি যে কৌতূহল দেখা দিয়েছিলো সেটা হচ্ছে অভারতীয়দের হাতে ভারতের চেহারাটা কেমন দাঁড়ায় সেটা দেখবার জন্যে এবং আমেরিকান ছবিতে ভারতীয় কলাকুশলী ও শিল্পীরা যুক্ত থাকার জন্যে। তবে এ ছবিখানি ভারতের বাইরেকার লোকের অনেক দিকের কৌতূহল মিটিয়ে দিতে সক্ষম হবে বিশেষ করে যারা ভারতকে কখনও দেখেনি তাদের; আর ভালো লাগবে প্রবাসী ভারতীয়দের যারা ছবিখানি মারফৎ বর্ণে বর্ণে দেশকে এক ঝলক দেখে নেবার সুযোগ পাবে। এই দিক থেকেই "রীভার"-এর যা কিছু সার্থকতা। ভারতের বাইরে ভারতকে দেখিয়ে বেড়ানোয় ছবিখানি নিঃসন্দেহে একটি অতি-মনোজ্ঞ শিল্পসৃষ্টি।

গল্পটি হচ্ছে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কিশোরীর বয়োঃসন্ধিক্ষণে প্রেমের প্রথম উন্মেষের ব্যাপার নিয়ে—হ্যারিয়েট, মেলানী ও ভেলারী। হ্যারিয়েটের জবানীতেই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হ্যারিয়েটের বাবা চটকলের সাহেব—তারা ছটি বোন আর এক ভাই, বোগি। হ্যারিয়েটই বড়ো। ওদের প্রতিবেশী জন বিয়ে করেছিলো এক ভারতীয় নারীকে, ভারতের সবই তার ভালো লাগে, তারই একমাত্র সন্তান মেলানী। ভ্যালেরীও প্রতিবেশী বড়লোক সাহেবের মেয়ে। একদিন জনের বাড়িতে উপস্থিত হলো তারই এক সম্পর্কিত ভাই ক্যাপ্টেন জন। যুদ্ধের ফলে সে খোঁড়া হয়ে গিয়েছে; এই দুর্বলতা মনের দিক থেকেও তাকে কাবু করে দিয়েছে। যুবক ক্যাপ্টেন আসা থেকেই ওখানকার আবহাওয়া বদলে গেলো। তিনটি অনূঢ়া কিশোরীর মন সম্পূর্ণভাবে ক্যাপ্টেনকে নিয়ে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো, মন ছেয়ে গেলো ক্যাপ্টেনের বিষয় নিয়ে। ওরা চঞ্চল হয়ে উঠলো, অভিসারের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলো; প্রত্যেকেই চাইলে ক্যাপ্টেনকে দখল করে রাখতে। এই নিয়ে ওদের মন এতোই ডুবে রইলো যে ওদেরই অন্যমনস্কতার ফলে বোগি সাপের

মেহবুবের "আন" চিত্রে দিলীপকুমার ও নার্গিস

কামড়ে মারা গেলো। ক্যাপ্টেন জনও ফিরে গেলো নিজের দেশে। বোগির জায়গায় হ্যারিয়েটদের বাড়িতে আবার জন্ম নিলো একটি শিশু। স্থিতি, বিনাশ ও সৃষ্টি এই নিয়েই জগত চলে অবিরাম গতিতে নদীর স্রোতের একটানা প্রবাহে।

গল্পটা কিছুই নয়, কিন্তু এর মাধুর্য হচ্ছে পরিবেশ সৃষ্টির বাহাদুরীতে। বিন্যাসের ব্যাপারে পরিচালক রেনোয়া অবশ্যই অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন। অনেক কিছু উপস্থাপন করেছেন, যার মধ্যে তার শিল্পীমনের অনেকখানি দুঃসাহসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়। সবকিছুই তিনি নির্ভেজাল রেখে দিতে চেয়েছেন। ভারতীয়দের বিয়ের অনুষ্ঠান, হোলির হররা কালীপুজা ঠিক যেমনটি হয় রেনোয়া তা-ই হুবহু রেখে দিয়েছেন। মাঝিদের ভাটিয়ালী, নৌকায় তাদের সংসারের রূপ, শিল-নোড়ায় সেই রকমটি বাটনা বাটার দৃশ্য, বুড়ো বটতলায় নুড়ীর মাথায় দুধ ঢালা, গঙ্গার বুকে নেমে বন্ধ্যানারীর সন্তানের জন্য বর প্রার্থনা, বাজার, সাপুড়ে, বাঁদর-নাচ যেটির যেমন রূপ আমাদের চোখে রেনোয়াও সেটির ঠিক সেই রূপই রেখে দিয়েছেন। আবহের জন্যে আগাগোড়া তিনি ভারতীয় লোকসঙ্গীত ব্যবহার করে গিয়েছেন—একতারা, পূজার ঢাক, সাপুড়ের বাঁশী, তবলা লহরা, সেতারের ঝঙ্কার, হোলির ঢোল-খঞ্জনীর কর্কশতা, নিদাঘ দুপুরে বাঁশের বাঁশী, মেয়েদের ব্রতগান—সবই পরিচালক জুড়ে রেখেছেন ঠিক তাদের জায়গাতেই এবং তাদের পরিপাটি বিহীন অবস্থাতেই। —কোন ব্যাপারকেই, দেখবারই হোক আর শোনারই হোক, রেনোয়া ঘষে মেজে পালিস চড়িয়ে অন্য রকম চটকদার কিছু দেখিয়ে দেবার বাহাদুরী নিতে যাননি। সত্যিই যা আছে, তা-ই তিনি হুবহু রেখে দিয়েছেন। কৃত্রিম কিছু সৃষ্টি করতে যাননি বা বাইরে থেকেও কিছু আমদানী করে যোগ করে দেননি। প্রকৃতির ওপরেই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করেছেন, এমনি ঘটনার নাটকীয়তাকে তীব্র করে তোলায় যেখানে সব্বাই বাজনার শব্দ ব্যবহার করেন রেনোয়া সেক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন কাকের কর্কশ রব—আর তাতেই আবহাওয়াটাকে অদ্ভুত নাটকীয় রেশে ভরিয়ে তুলতে পেরেছেন। এতো স্বাভাবিকতা এবং প্রাকৃতিকতাই কিন্তু আবার ভারতীয় দর্শকদের কাছে ছবিখানি অনাকর্ষণীয় হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে সব ভারতীয় শিল্পী ও কলাকুশলী ছবিখানির উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বসমূহের জন্য প্রশংসার অংশ দাবী করতে পারেন, তারা হচ্ছেন অভিনয়ে সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, প্যাট্রিসিয়া ওয়াল্টার্স, রাধা শ্রীরাম, রিচার্ড ফস্টার, এড্রিয়েন কোরি, নিমাই বারিক; সহকারী পরিচালকরূপে হরিসাধন গুপ্ত, সুখময় সেন, বংশী আশ; আলোকচিত্র গ্রহণে রামানন্দ সেনগুপ্ত, সেট পরিকল্পনায় বংশীচন্দ্র গুপ্ত এবং ব্যবস্থাপনায় কল্যাণ দাশগুপ্ত।

মহাজাতি ফিল্মসের "বিবর্ত"

শৈলেন নিয়োগী রচিত এবং পরিচালিত মহাজাতি ফিল্মসের 'বিবর্ত' মুক্তি প্রতীক্ষায়। এর ভূমিকালিপিটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়, রয়েছেন নবাগত নির্মলকুমার, ছবি বিশ্বাস, বিকাশ, চন্দ্রাবতী, মীরা সরকার, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, শ্যামলী, তুলসী চক্রবর্তী, গৌরীশঙ্কর, মণি চট্টোপাধ্যায়, মাস্টার সতু, বাদল প্রভৃতি।

এ সপ্তাহের আকর্ষণ

এ সপ্তাহে এ কে ডি প্রোডাকসন্সের 'সিরাজদ্দৌলা' চিত্রখানি মুক্তিলাভ করেছে। পরিচালক অমর দত্ত এই ঐতিহাসিক ঘটনাশ্রয়ী চিত্রের মধ্যে বাঙলার এক কলঙ্কময় যুগের ইতিহাসকে তুলে ধরে দেখিয়েছেন যে, নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বার্থের সঙ্গে স্বার্থের সংগ্রামের জন্য বাঙলা দেশকে সেদিন পরদাসত্ব মেনে নিতে হয়েছিল। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন সমীর মজুমদার, নীতিশ, বিকাশ রায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিরি মিত্র, বেচু, উৎপল দত্ত, কৃষ্ণধন, শিশির বটব্যাল, প্রীতি মজুমদার, রাণী ব্যানার্জি, অনুভা, মঞ্জু দে, পদ্মা, জয়শ্রী, মিরিয়াম স্টার্ক প্রভৃতি।

ফুটবল

দীর্ঘকাল আলাপ-আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন হেলসিংকির বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ভারতীয় ফুটবল দলের নাম ঘোষণা করিয়াছেন। এই দল মোট ১৮ জন খেলোয়াড়কে লইয়া গঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক বাঙলা দেশের ১৪ জন খেলোয়াড় আছেন। ইহাতে অনেকেই নাকি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ফেডারেশনের সভাপতি বাঙলার প্রতিনিধি হওয়ায় ও নির্বাচন ক্ষেত্র বাঙলায় করায় অধিকাংশ বাঙলার খেলোয়াড় দলে স্থান পাইয়াছেন। এই উক্তির প্রতিবাদে সাধারণে কি বলিবেন বলা কঠিন তবে আমাদের মতে ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। নির্বাচনের সময় ফেডারেশনের সভায় বাঙলার প্রতিনিধি ছাড়াও মহীশূর, হায়দরাবাদ, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী, আসাম, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, পশ্চিম ভারত প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এতগুলি রাজ্যের প্রতিনিধি যেখানে উপস্থিত সেখানে কোন এক রাজ্যের প্রতিনিধির পক্ষে যাহা খুশী করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। সুতরাং যুক্তির দিক হইতে উপরোক্ত উক্তির কোনই মূল্য থাকে না। তবে যদি কার্যতঃ উহা হইয়া থাকে তাহা হইলে বাঙলার প্রতিনিধির বুদ্ধির ও শক্তির "তারিফ" না করিয়া পারা যায় না। যাহা হউক, বাঙলার ফুটবল খেলোয়াড়গণ ইহাতে গৌরব অনুভব করিলেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

অতিরিক্ত পরিচালক দল

ভারতীয় মনোনীত ফুটবল দলের পরিচালনার জন্য চারিজনকে নির্বাচিত করা হইয়াছে। এই পরিচালকদের মধ্যে দুইজন ম্যানেজার, একজন হিসাব রক্ষক ও একজন শিক্ষক।

ইতিপূর্বে কোন বিদেশগামী ভারতীয় দলে হিসাব রক্ষক বলিয়া কাহারও নাম শুনিতে পাওয়া যায় নাই। হেলসিংকি অলিম্পিক ভারতীয় দল সেই হিসাবে এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করিলেন। ইহা কেন করিতে হইয়াছে, তাহা জানিবার অনেকেরই ঔৎসুক্য থাকা স্বাভাবিক। আমরা বহু অনুসন্ধানের পরও সঠিক কিছুই জানিতে পারি নাই। তবে কোন কোন ক্রীড়া সমালোচক বলেন, "ইহা না করিয়া উপায় ছিল না। মিঃ ট্যাণ্ডন নাকি দলভুক্ত হইবার জন্য ভীষণ পীড়াপীড়ি করিয়াছেন। অনশন ধর্মঘট পর্যন্ত করিবার হুমকি দিয়াছেন।" যাহার জন্যই হউক এই নির্বাচন খুবই অন্যায় হইয়াছে ইহা না বলিয়া পারি না। ইহার পরিবর্তে দলে [illegible]ন শারীর শিক্ষাবিদকে গ্রহণ করিলে যথেষ্ট উপ[illegible] হইত। ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের দীর্ঘ পাঁচমাস ভ্রমণের জন্য যদি একজন ম্যানেজার যথেষ্ট হয় ফুটবল দল যাহা মাত্র একমাস ইউরোপে অবস্থান করিবে তাহার জন্য দুইজন ম্যানেজারের কোনই

প্রয়োজন ছিল না। এই প্রসঙ্গে একজন ক্রীড়া সমালোচক বলেন—"হকি দলের দুইজন ম্যানেজার যখন মনোনয়ন করা হইয়াছে তখন ফুটবল দল কিভাবে একজন ম্যানেজার লইয়া যাইবে।" অপর একদল ক্রীড়া সমালোচক বলেন—"ইহা কেবল দল ঠিক রাখিবার জন্যই করা হইয়াছে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম" এত বড় উপদেশ কেন ভুলে যাও।" আমরা কেবল বলিতে পারি "ইহারা সর্বশক্তিমান, ইহাদের কার্যকলাপ কোনই যুক্তিতর্কের আওতায় পড়ে না।

শিক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতায় হইবে

হেলসিংকির মনোনীত ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়দের হেলসিংকির পথে যাত্রার পূর্বে কিছুদিন একত্র রাখিয়া কলিকাতায় শিক্ষা দেওয়া হইবে এই ব্যবস্থা ফেডারেশনের সভায় হইয়াছে। কলিকাতায় কোথায় দেওয়া হইবে বলা হয় নাই। ভীষণ গরমের সময় বাঙলায় কোন শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হইতে পারে ইহা আমাদের ধারণাতীত। হেলসিংকির আবহাওয়া অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময়েও ভীষণ ঠাণ্ডা থাকিবে। সুতরাং ঐ আবহাওয়ার সমতুল্য কোন স্থানে রাখিয়া শিক্ষা দিলে ভালই হইত। ভারতে ঐরূপ স্থানের অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। স্থির হইয়াছে হেলসিংকির নিকটবর্তী কোন স্থানে এক সপ্তাহের উপর রাখিয়া আবহাওয়ার সহিত পরিচিত করা হইবে। উহা সুইডেন এই বিষয় আমাদের কোন সন্দেহ নাই। তবে ঐ স্থানেই একমাস পূর্বে ভারতীয় ফুটবল দলকে প্রেরণ করিলে শিক্ষার ও আবহাওয়ায় পরিচিত খুব ভালভাবেই হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। কিন্তু ইহা উল্লেখ করা অরণ্যে রোদন করা একই কথা। ভারতীয় ফুটবল দল নির্বাচনের সময় কলিকাতার বিভিন্ন দলের স্বার্থের কথাও যে নির্বাচকগণের অন্তরে ছিল তাহাও উক্ত ব্যবস্থা হইতে উপলব্ধি করা যায়।

হেলসিংকি অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ভারতীয় দল

হেলসিঙ্কি অলিম্পিক অনুষ্ঠানের মনোনীত ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়গণ :—

গোলরক্ষকগণ :—বি এণ্টনী (বাঙলা) ও **কে ভরদ্বাজ (মহীশূর)।**

ব্যাকগণ :—এস মান্না (বাঙলা) অধিনায়ক, বি বসু (বাঙলা) ও আজিজ (হায়দরাবাদ)।

হাফব্যাকগণ :—এ লতিফ (বাঙলা), **চন্দন সিংহ** (বাঙলা), **নুরমহম্মদ** (হায়দরাবাদ), **এস রায়** (বাঙলা), **এস সর্বাধিকারী** (বাঙলা)।

ফরোয়ার্ডগণ :—ভেংকটেশ (বাঙলা), আর গুহঠাকুরতা (বাঙলা), এস মেওয়ালাল (বাঙলা), এ সাত্তার (বাঙলা), জে এণ্টনী (বাঙলা), কে মইন (হায়দরাবাদ), পি বি শালে (বাঙলা) ও আমেদ (বাঙলা)।

উপরোক্ত মনোনীত খেলোয়াড়গণের মধ্য হইতে যদি কেহ শেষ সময় যাইতে না পারেন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণের মধ্য হইতে স্থান পূরণ করা হইবে :—

গোলরক্ষক :—সঞ্জীব (বোম্বাই)।

ব্যাক :—প্যাপেন (বোম্বাই)।

হাফব্যাকগণ :—টি আও (বাঙলা) ও সম্মুখম (মহীশূর)।

ফরোয়ার্ডগণ :—লাইক (হায়দরাবাদ), ধনরাজ (বাঙলা), কে বারদোলি (আসাম) ও বি ঘোষ (উত্তর প্রদেশ)।

ম্যানেজারদ্বয় :—শ্রী এম দত্ত রায় (বাঙলা) ও মেজর লছমণ সিং (সার্ভিসেস)।

হিসাব রক্ষক :—রায় সাহেব বি কে ট্যাণ্ডন।

শিক্ষক :—এস এ রহিম (হায়দরাবাদ)।

বর্মা দলের ফুটবল খেলা

হেলসিংকি অলিম্পিক অনুষ্ঠানের ভারতীয় হকি দলের অর্থ সংগ্রহের মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া সম্প্রতি বর্মা ও আই এফ এ দলের এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই খেলায় আই এফ এ দল সহজেই ৪—১ গোলে বর্মা দলকে পরাজিত করিয়াছে। বাঙলা দলের এই সাফল্য আনন্দদায়ক হইলেও অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য যে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই ইহা লক্ষ্য করিয়া খুবই দুঃখিত হইতে হইয়াছে। এই দিনে খুব অল্প সংখ্যক দর্শকই মাঠে সমবেত হন। ইহার জন্য দর্শকগণকে দায়ী করা যায় না। কারণ তাঁহারা ইহার পূর্বেই বর্মা ফুটবল দলের শক্তিহীনতা সম্পর্কে সিংহলের কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতার ফলাফল হইতে ধারণা করিতে পারেন। সেই জন্য অধিকাংশ ফুটবল উৎসাহীই জানিতেন বর্মা দল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইবেন। ইহার পরিবর্তে পাকিস্থান ফুটবল দলকে কলিকাতার মাঠে আনিলে বেশ ভাল অর্থই সংগৃহীত হইত। পরিচালকগণের অদূরদর্শিতার জন্যই যে অনুষ্ঠান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে ইহা বলিতে আমাদের এতটুকুও দ্বিধাবোধ হইতেছে না।

ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচন

ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সাধারণ বার্ষিক সভায় পূর্ব বৎসরের কর্মকর্তাগণই পুনরায় নির্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্বাচন অনেককে আশ্চর্য করিলেও আমাদের করে নাই। কারণ আমরা ইহার সংবাদ মাদ্রাজ অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সময়েই জানিতে পারি। গদি আঁকড়াইয়া রাখা যাহাদের পেশা তাহারা বহু পূর্ব হইতেই সব কিছু ঠিক করিয়া রাখেন। কার্যতঃ সভায় যাহা হয় তাহা কেবল "লোক দেখানো" বলিলে অন্যায় হইবে না।

খেলোয়াড়দের ছাড়পত্র গ্রহণ

কলিকাতার ফুটবল মাঠের ছাড়পত্র গ্রহণের শেষ দিনের সংখ্যা ছিল ৪৩২। ইহার মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়দের নাম ছিল না। এই ছাড়পত্র তালিকায় লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল ভবানীপুর ও কালীঘাট ক্লাবের তালিকা। এই দুই ক্লাব এতগুলি খেলোয়াড় লইয়া কি করিবেন? ইহা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ইহার একমাত্র উত্তর দেওয়া চলে এই বলিয়া যে, পূর্ব পূর্ব বৎসর যাহা করিয়াছেন এইবারেও তাহাই করিবেন। খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করিয়া না খেলিবার সুযোগ দিবার মধ্যেও যে যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। ইহার পূর্বে বহু বড় বড় ক্লাবই এই পন্থা অবলম্বন করিতেন। সুতরাং তাঁহারা যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন তাহা না অনুসরণ করিলে "বড় ক্লাব" হওয়া যাইবে না যে?

কোন দল শক্তিশালী হইবে?

ফুটবল মরশুমে এইবারে কোন্ দলকে বিশেষ শক্তিশালী মনে হয় ইহা অনেকেই প্রশ্ন করিয়াছেন। খেলোয়াড়দের ছাড়পত্র গ্রহণের তালিকা দেখিয়া যদি দলের শক্তি সম্পর্কে কোন অভিমত দেওয়া হয় ভুল হইবে। অনেক বাহিরের খেলোয়াড়ের দলভুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। ঐ ব্যবস্থা বহু পূর্ব হইতেই বিশিষ্ট ক্লাবের পরিচালকগণ করিয়া রাখিয়াছেন যাহার সংবাদ সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ রাখেন না। ঐ সকল ব্যবস্থা বহু অর্থের বিনিময়ে হইয়া থাকে যাহা প্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই।

ফুটবল ফেডারেশনে অযৌক্তিক কার্যকলাপ

এইবারের ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভায় নাকি অযৌক্তিক কার্যকলাপ হইয়াছে। আই এফ এর সম্পাদক পূর্বে সংবাদপত্রে প্রতিনিধিদের নিকট ফেডারেশনের সভায় প্রতিনিধিত্ব করিবেন বলিয়া যে দুইজনের নাম ঘোষণা করেন কার্যক্ষেত্রে নাকি তাহা হয় নাই। অপর একজন লোককে আই এফ এর প্রতিনিধি হিসাবে ফেডারেশনের সভায় যোগদান করিতে দেখা যায়। যাহার নাম পূর্বে ঘোষিত হয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "আমি এই বিষয় কিছুই জানি না।" ইহার পর যিনি ঐ পূর্বে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, "ঐরূপ কিছু বলিয়াছি বলিয়া মনে নাই।" ঠিক প্রয়োজন মত ব্যবস্থা যে আই এফ এর পরিচালকগণ করিয়া থাকেন ইহা দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হন, কিন্তু আমরা হই নাই। এইরূপ নিদর্শন আমরা ইতিপূর্বে বহু পাইয়াছি। আইনী বা বে-আইনী বলিতে ইহাদের নিকট কিছুই নাই ইহা দেশবাসী যদি এখনও উপলব্ধি না করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাদের আর কিছুই বলিবার নাই।

হকি

বাঙলার হকি মরশুম শেষ হইতে চলিয়াছে অথচ এখনও পর্যন্ত লীগ প্রতিযোগিতারই সকল খেলা শেষ হয় নাই। ফুটবল মরশুমের সংগে সংগে হকি প্রতিযোগিতাসমূহের খেলা পরিচালিত হইতে দেখিলে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। এই বিলম্বের কারণ জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান। তাহা হইলেও প্রথম ডিভিশন হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ কোন দলের ভাগ্যে জুটিবে তাহা জানিবার ও দেখিবার লোকের অভাব নাই। মোহনবাগান গত বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান এইবারেও হইবে ইহাই সকলের ধারণা। এই ধারণা যে খুবই অমূলক ও যুক্তিহীন তাহা বলা যায় না। তবে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা চলে না। কাস্টমসেরও এই গৌরব লাভের সম্ভাবনা আছে। আর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইলেই সকল সমস্যার ও আলোচনার অবসান হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। যে দলই চ্যাম্পিয়ান হউক না কেন বাঙলার হকি স্ট্যান্ডার্ড যে খুবই নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে ইহা বলিতে আমাদের এতটুকু দ্বিধাবোধ হইতেছে না। ১৯৩৮ সালের খেলোয়াড়কে পুনরায় ১৪ বৎসর পরে মাঠে নামিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে দেখিলে এই কথাই মনে হয় এদের অন্ধ চক্ষুতে কোনদিনই আলো দেখা দেবে না। কিসে ভাল হয়, কিসে উন্নতির পথ রচিত হয় ইহারা চিন্তা করে না, করে কেবল খেলার জয়-পরাজয়ের কথা। চিন্তা করে বিভিন্ন দল হইতে খেলোয়াড় ভাঙগাইয়া দল পুষ্টির কথা। শৈশব হইতে খেলোয়াড়দের বিজ্ঞান পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়া ভবিষ্যৎ খেলোয়াড় তৈয়ারীর কথা ইহারা কোনদিনই চিন্তা করে না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৪শে মার্চ—কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের এক যুক্ত অধিবেশনে প্রজাতন্ত্রী ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থিরূপে দাঁড়াইবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে কংগ্রেস প্রার্থিরূপে মনোনীত করা হইয়াছে।

অদ্য কলিকাতায় লেক ময়দানে কংগ্রেসমণ্ডপে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নেহরু সম্মেলনে ভাষণকালে বলেন, "প্রকৃত সংস্কৃতি যাহা, তাহার মধ্যে শুধু জাতীয় সংস্কৃতিও নিহিত থাকে। বস্তুতঃ বিশ্বের ইতিহাস মানব মনের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস, উহা সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতির ইতিহাস।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু অদ্য পশ্চিমবঙ্গের রাজভবনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একখানি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন প্রসঙ্গে নেতাজীর প্রতি তাঁহার গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

২৫শে মার্চ—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল "রাজ্যের নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং শিল্প ও ব্যবসায়ের স্বার্থ রক্ষার্থ" কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অপরাধ সম্পর্কে দ্রুত বিচারের জন্য একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু কলিকাতায় চারিদিন অবস্থানের পর অদ্য বিমানযোগে দিল্লী রওনা হইয়া যান।

২৬শে মার্চ—কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের নব-নির্বাচিত বিধান সভার কংগ্রেস সদস্যগণের এক সভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সর্বসম্মতিক্রমে নূতন বিধান সভার নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। এই নির্বাচনের ফলে ডাঃ রায়ই পুনরায় নবগঠিত গবর্ণমেণ্ট তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হইতেছেন।

পাকিস্থানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ এস গুরমানী অদ্য পার্লামেণ্টে ঘোষণা করেন যে, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পারমিট প্রথা প্রবর্তনের প্রশ্নটি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বলেন যে, পূর্ববঙ্গে কম্যুনিস্টদের ক্রম-বর্ধমান তৎপরতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

২৭শে মার্চ—কলিকাতা কর্পোরেশনের বহু প্রতীক্ষিত সাধারণ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের কাজ আজ সম্পন্ন হয়।

পশ্চিমবঙ্গের নব-নির্বাচিত বিধান সভার সদস্যগণ কর্তৃক রাজ্য পরিষদে এতৎরাজ্য হইতে ১৪ জন সদস্যের নির্বাচন আজ সম্পন্ন হয়। রাজ্য পরিষদে নির্বাচিত উক্ত ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জন কংগ্রেস মনোনীত, ২ জন কম্যুনিস্ট, ১ জন মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, ১ জন কৃষক-প্রজা- এবং ১ জন জনসংঘ মনোনীত সদস্য। কম্যুনিস্ট সদস্যদ্বয় কারাগারে আছেন।

ভারত-মার্কিন কারিগরী সহযোগিতা চুক্তি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি হিসাবে পরিকল্পনা কমিশন সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত ৪৬টি পরিকল্পনা অঞ্চল এবং ১৯টি উন্নয়ন ব্লক অনুমোদন করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগণ অবিলম্বে এইগুলি রূপায়নের কাজে হাত দিবেন।

২৮শে মার্চ—অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন এলাকার ৪৯টি কেন্দ্রের ভোট গণনা হয়। এই দিনের ভোট গণনার ফলাফল সম্পর্কে বে-সরকারীসূত্রে জানা যায় যে, উপরোক্ত ৪৯টি কেন্দ্রে সমসংখ্যক আসনের মধ্যে কংগ্রেস দল ৩০টি, বিভিন্ন বামপন্থী দলের সমন্বয়ে গঠিত সংযুক্ত নাগরিক কমিটি (ইউ সি সি) ১২টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থিগণ ৭টি আসন লাভ করিয়াছেন।

ভারতীয় সংসদের ঊর্ধ্বতন পরিষদ রাষ্ট্র পরিষদের নির্বাচনে এ পর্যন্ত ১৯টি রাজ্যের ফল ঘোষিত হইয়াছে। ১৯টি রাজ্য হইতে নির্বাচিত ১৩০ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৮৬ জন কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী।

বোম্বাইয়ের অসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীদিনকর রাও দেশাই অদ্য সমগ্র রাজ্যে খাদ্য-শস্যের মূল্য শতকরা প্রায় ৫০ টাকা বৃদ্ধি করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

২৯শে মার্চ—কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনের ফল সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে। নির্বাচনের ফলাফল হইতে দেখা যায়, কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া কর্পোরেশন পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হইয়াছে। কর্পোরেশনে মোট ৭৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ৪৫টি, ইউ সি সি ১৯টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থিগণ ১১টি আসন দখল করিয়াছে।

নয়াদিল্লীতে ভারতীয় বণিক-সভা সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, শিল্পপতিরা বা সরকার যাহাই করুন না কেন, তাঁহাদের কার্যকলাপের দ্বারা জনসাধারণ কতখানি উপকৃত হইলেন ইহা বিচার করিয়াই তাঁহাদের কার্যকলাপের গুণাগুণ নির্ণীত হইবে।

অদ্য মাদ্রাজ বিধান সভার কংগ্রেসী দলের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে শ্রীরাজগোপালাচারীকে বিধান সভার কংগ্রেসী দলের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

৩০শে মার্চ—ভারত সরকার ভারতের ৪ জন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের প্রত্যেককে তাঁহাদের সঙ্গীত সাধনার জন্য নগদ এক হাজার টাকা ও একখানি করিয়া শাল উপহার দিয়াছেন। নিম্নলিখিত ৪ জন সঙ্গীতজ্ঞকে এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে : ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান, ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খান, শ্রীকরাইকুড়ি শাম্বশিবম আয়ার এবং আর্যকুড়ি রামানুজ আয়েঙ্গার।

অদ্য শ্রী কে হনুন্তিয়া মহীশূরের মুখ্য-মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৪শে মার্চ—অদ্য রাত্রে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় বিভিন্ন জনসভায় প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ডেনিয়েল মালানের পদত্যাগ দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল আছেন যে, পার্লামেণ্টে যে আইন পাশ হইয়াছে তাহার বৈধতা সম্পর্কে বিচারের অধিকার আদালতের নাই এবং এই মর্মে তিনি আইন সভায় বিল আনিবেন।

হিন্দু বৈদান্তিক স্বামী শিবানন্দ বর্তমানে কানাডার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছেন। বহিরাগতদের বিষয় সংক্রান্ত বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে তাঁহার ছাড়পত্রের নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই কানাডা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার নির্দেশ দিয়াছেন।

২৫শে মার্চ—অখণ্ড জার্মানীর নিজস্ব স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী গঠনের জন্য রাশিয়া যে প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছে, বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অদ্য উহা অগ্রাহ্য করে।

২৬শে মার্চ—ফরাসী কর্তৃপক্ষ গতকল্য রাত্রে তিউনিসিয়ার প্রধান মন্ত্রী এম মহম্মদ চেনিক ও অন্য তিনজন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তিউনিসিয়ায় সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে।

২৭শে মার্চ—অদ্য মালয়ের হাই-কমিশনার জেনারেল স্যার জেরাল্ড টেম্পলার সেলাংগর-পেরাক সীমান্তবর্তী শহর তানজং মালিমের পাঁচ হাজার অধিবাসীর "শাস্তিবিধানের" নির্দেশ দিয়াছেন। কম্যুনিস্টগণ গত মঙ্গলবার ১২জন লোককে পূর্বোক্ত শহরে খুন করিয়াছে।

ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ নু অদ্য ঘোষণা করেন যে, ব্রহ্মের পূর্ব-সীমান্তে চীনা জাতীয়তাবাদী সৈন্যদের বিরুদ্ধে বড় রকমের অভিযান আরম্ভ হইয়াছে।

২৮শে মার্চ—শ্রীমণিলাল গান্ধী ডারবানে তাঁহার ২১ দিনের অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন।

তিউনিসের বে অদ্য সালে এদিন ব্রাকাউচি নামক তিউনিসিয়ার জনৈক প্রবীণ রাজনীতি-বিদকে নূতন প্রধান মন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করিয়াছেন।

৩০শে মার্চ—প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে প্রার্থী হইবেন না।

ভারতীয় মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০ ষাণ্মাসিক— ১০
পাকিস্থান মুদ্রা : প্রতি সংখ্যা (পাক) ।৵০ আনা, বার্ষিক—২০ ষাণ্মাসিক— ১০ (পাক)
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

ঊনবিংশ বর্ষ] শনিবার, ৩০শে চৈত্র, ১৩৫৮ সাল Saturday, 12th April, 1952. [২৪শ সংখ্যা

স্মরণে

বাঙালীর নববর্ষ—আমাদের মনে দুর্বিসহ বেদনার স্মৃতি জাগাইয়া তোলে। ৮ বৎসর পূর্বে ৩১শে চৈত্র বর্ষশেষে আমরা আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ পরিচালক প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়কে হারাইয়াছি। প্রফুল্লকুমার শুধু আমাদের পরিচালক ছিলেন না, তিনি আমাদের সুহৃৎ, গুরু ও উপদেষ্টা ছিলেন। 'দেশে'র তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং জাতীয়-সংগ্রামের তৎকালীন প্রতিকূল প্রতিবেশের ভিতর দিয়া 'দেশ' একমাত্র তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা এবং সহযোগিতাতেই দেশ ও জাতির সেবার পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 'দেশে'র বর্তমান যে উন্নতি এবং বাঙলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সর্বত্র তাহার প্রতিষ্ঠা, ইহার মূলে প্রত্যক্ষভাবে প্রফুল্লকুমারের সাধনা এবং তাঁহার জীবনাদর্শের প্রেরণাই কাজ করিয়াছে। জাতির স্বাধীনতাই প্রফুল্ল-কুমারের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ছিল এবং বাঙলা দেশের ভাবনাই তাঁহার সমগ্র কর্ম-সাধনার মূলে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিত। তিনি ছিলেন একান্তভাবে বঙ্গ-সংস্কৃতির ধারক, বাহক এবং পরি-পোষক। তাঁহার নিরহঙ্কৃত জীবনের অনবদ্য চরিত্র-মাধুর্য দেশ এবং জাতির সংস্কৃতির জন্য তাঁহার সমগ্র সাধনাকে বৈষ্ণবতার আদর্শে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। নৈরাশ্য তিনি জানিতেন না, আঘাতে তিনি অভিভূত হন নাই। ফলত গীতার নিষ্কাম কর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রফুল্লকুমার নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া গিয়াছেন। সকল রকমের অবস্থার মধ্যে সর্বজনীন উদারতা এবং সকলের প্রতি শ্রদ্ধার একটি ভাব তাঁহার জীবনের মহিমাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ভাগবত-জীবনের এইখানেই ভিত্তি এবং ইহাতেই শক্তি। প্রফুল্লকুমারের প্রাণধর্মের এই প্রাচুর্য এবং বৈষ্ণবাদর্শের পরম বীর্য আমাদের সাধনায় শক্তি সঞ্চার করুক, এই প্রার্থনা নিবেদন করিয়া আমরা তাঁহার অমর স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বাঙলার নববর্ষ

দেখিতে দেখিতে বর্ষচক্র অতিক্রান্ত হইল। ১৩৫৮ সাল কাটিয়া গিয়া ১৩৫৯ সালের কালের শাসন-অধ্যায় উন্মুক্ত হইল। বিগত বৎসরের স্মৃতিকে ভিত্তি করিয়া বাঙলার সমাজ-জীবনের অভিনব সংস্থানের উদ্দেশে গতিমুখের এই সন্ধিক্ষণে মানুষ উদারতার প্রতিবেশের মধ্যে স্বভাবতই আপনাকে অনুসন্ধান করিতে চায়। এই যে একটু অবকাশ, ইহার মধ্যে প্রাণের বিলাস উপলব্ধির ভিতর দিয়া ভবিষ্যতের সম্বল সংগ্রহ করিবার জন্য মানুষ উদ্দীপনা বোধ করে। নববর্ষের ইহাই আকর্ষণ। এই উপলব্ধিকে অবলম্বন করিয়াই উৎসব এবং আনন্দ। ইহার বাহ্য রূপ বাঙলার সমাজ-জীবন হইতে বহুদিনই একপ্রকার অন্ত-র্হিত হইয়াছে বলা যায়; কারণ বৃহত্তর আদর্শের প্রেরণা তাহার সমাজ-জীবনে নূতনকে বরণ করিয়া লইবার তেমন আগ্রহ এখন আর সঞ্চার করে না এবং গতির পথে প্রাণধর্মের স্পর্শ-ছন্দ জাগায় না। কিন্তু

গতি তবু রহিয়াছে এবং সম্মুখে যতই অন্ধকার থাকুক না কেন, আদর্শের বাতিটিও আমাদিগকে জ্বালাইয়া তুলিতে হইবে। অসত্য হইতে সত্যে এবং অন্ধকার হইতে জ্যোতির অভিমুখে অগ্রসর হইবার আনিমর ঐতিহ্য বাঙালী জাতির রহিয়াছে। সাধক, মনীষী এবং আত্মদাতা সন্তানগণের সাধনায় বাঙলার সংস্কৃতিতে এ পক্ষে একটি শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এইখানেই বাঙালীর স্বধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীকে যদি বাঁচিতে হয়, এই ঐতিহ্যের ধারা ধরিয়াই তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত বৃহদাদর্শের সাধনায় ফলাফলে দ্রূক্ষেপ-বিহীন বৈপ্লবিক সেই বীর্যকেই তাহাকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে। বাঙালী যুগে যুগে এইভাবেই কাজ করিয়াছে। হিসাবের খাতা কষিয়া বাঙালী চলে নাই। পরন্তু প্রাণরসের প্রভাবে সে স্বভাবধর্ম ধরিয়া অভাবের মধ্যে ভাবের ভিত্তি গড়িয়াছে। বাঙালী অন্ধকারের মধ্যেই ঊষার আলোকের উদ্বোধন করিয়াছে এবং নৈরাশ্যের ভিতরই সে আশার সন্ধান লাভ করিয়াছে। বাঙালী নিজের দিকে তাকায় নাই, পরন্তু সমগ্রের জন্য তপস্যার একটা জ্বালাই যেন তাহাদের জীবন লইয়া খেলা করিয়াছে। অখণ্ডের জন্য তপস্যাই তাহার স্বধর্ম এবং এই স্বধর্মের পথেই প্রকৃত সুখ নিহিত থাকে। সুতরাং আজ অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের আকর্ষণের তথ্য বিশ্লেষণ একান্তই পরোক্ষ ব্যাপার। বাস্তবিক পক্ষে এই দুইয়ের সন্ধিক্ষণে সমগ্রের জন্য তপস্যার প্রেরণাটি অন্তরে সংগ্রহ করাই আমাদের পক্ষে পরম প্রয়োজন। ফলত এই তপস্যার প্রেরণাটি যদি অন্তরে আমরা পাই, তবেই আমাদের একান্ত লাভ এবং সমগ্র জাতির মনের মূলের ধর্মটি ধরিয়া স্থায়ী-ভাবে ভিত্তিতে আমাদের শক্তির স্ফূর্তি। তপঃ-প্রবন্ধ প্রাণের মহিমায় সে অবস্থায় আমাদের অভিক্রমের কিছুতেই নাশ ঘটিবে না। প্রকৃতপক্ষে "সমগ্রাণাং তপঃ-সুখং"— ভগবান বুদ্ধের এই বাণীকেই বাঙালী তাহার জীবন-সাধনায় মন্ত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে; প্রত্যুত এইটিই আমাদের নিজ ... বীজমন্ত্র। এই মন্ত্রের সাধনায় যুগে যুগে বাঙালী শক্তিলাভ করিয়াছে এবং এই মন্ত্রের ধ্বনিই বাঙালীর গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। আজ সেই মন্ত্রের অগ্নিময় আবর্ত আমাদের মনের অবসাদ ভাঙিয়া দিক্। নববর্ষ সমগ্রের জন্য তপস্যার আগুন অন্তরে অন্তরে উদ্দীপ্ত করিয়া বাঙলার জাতীয় জীবনে অমৃতত্বের উদ্বোধন করুক।

জাতীয় সপ্তাহ

জাতীয় সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হইতে চলিল। এই সপ্তাহের স্মৃতি ভারতের ইতিহাসের এক অগ্নিময় অধ্যায় আমাদের দৃষ্টিকে উন্মুক্ত করে। হিংসা ও অহিংসার বিচার রাজনীতির দিক হইতে অনেকটা পরোক্ষ এবং তাহা সাধনার প্রণালী বা প্রকরণগত ব্যাপার। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, রক্তদানের ভিতর দিয়াই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়। ত্রিশ বৎসর পূর্বে জালিয়ানওয়ালাবাগে নির্দোষ নরনারী এবং শিশুর রক্তদানের ভিতর দিয়াই ভারতের স্বাধীনতার দুর্জয় বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এবং সাধনায় সেই বেদনা পরিব্যাপ্তি লাভ করিয়া এদেশের পরাধীনতার উৎখাত সাধন করে। আত্মদানের পথে জাতির প্রতিষ্ঠা লাভের পথ উন্মুক্ত হয়। প্রকৃত পশুবল স্বতঃই দুর্বল এবং এই বল নিজের পতনের পথ নিজেই প্রশস্ত করিয়া থাকে। জেনারেল ডায়ারের গুলী এবং তৎকালীন সামরিক শাসন ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী-দের পতনই অনিবার্য করিয়া তোলে। সে সবই বিস্মৃতির গর্ভে আজ বিলীন হইয়াছে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পশুশক্তির ভিত্তিও বিধ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু রক্ত যাহারা দিয়াছিল, শক্তি তাহাদের ক্ষুণ্ণ হয় নাই। মানব-সংস্কৃতির নৈতিক অভিব্যক্তির মূলে তাঁহাদের সেই শক্তি সনাতনস্বরূপে রহিয়া গিয়াছে এবং চিরদিন তাহা কাজও করিবে। জাতীয় সপ্তাহে এই সত্যটি আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মদাতা বীর-গণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া নৈতিক শক্তিতে আমরা কতটা সজাগ রহিয়াছি, একথা ভাবিয়া দেখা দরকার। এই সপ্তাহে এজন্য গঠনমূলক কাজের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। কারণ নৈতিক শক্তির নিরিখ এইখানেই। বহুজনের বাহবা পাইবার জন্য কাজের আড়ম্বর অনেকেই করিতে পারে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই শ্রেণীর কাজের মধ্যে নৈতিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না এবং শ্রদ্ধাবুদ্ধিরও তাহাতে অভাব থাকে। বস্তুত এপথে কোন জাতিই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, দুই দিনের আড়ম্বর প্রাণধর্মকে ক্ষুণ্ণ করিয়া জাতিকে দৈন্যের মধ্যেই লইয়া ফেলে। আমরা মান, যশ এবং প্রতিপত্তির এই মোহ হইতে কতটা মুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছি, জাতীয় সপ্তাহ যদি সে সম্বন্ধে আমাদের আত্মানুসন্ধান জাগায় এবং জাতির প্রতি কর্তব্যবোধ আমাদের চিত্তকে সমাহিত করে, তবেই ইহার সার্থকতা আছে; নতুবা সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তিই মাত্র সার এবং সৌখীনভাবে অনুষ্ঠিত সূত্রযজ্ঞ, এসব আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। প্রত্যুত এই সব কাজের মধ্যে যদি আমাদের আন্তরিকতা না থাকে এবং সমগ্র জাতির সেবার কোন সূত্র এগুলির মধ্যে আমরা না পাই, তবে এসব একান্তই নিরর্থক। অধিকন্তু এইভাবে আদর্শকেই ক্ষুণ্ণ করা হয় এবং দেশ ও জাতির জন্য যাঁহারা কোন মান এবং কোন যশের দিকে না তাকাইয়া আত্মদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি তদ্দ্বারা অশ্রদ্ধা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। জাতীয় সপ্তাহের কৃত্য এই অপরাধ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিবে, আমরা ইহা আশা করি।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিপূজা

বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁঠালপাড়াস্থিত পৈতৃক বাসভবনটিকে জাতীয় মিউজিয়ামরূপে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের যে সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন, তা দেশবাসীরা সর্বতোভাবে সমর্থন করিবে। এই বাসভবনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব মর্যাদা জাতির নিকট অপরিসীম, কার এই গৃহে বসিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহ অধিকাংশ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও একটি সিদ্ধা গ্রহণ করিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃ রক্ষার জন্য প্রতি বৎসর একটি বঙ্কিমচ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হইবে। ব বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃ এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহাতে আম বিশেষভাবেই আনন্দিত হইয়াছি। বহু হইতেই আমাদের একটি অভিযোগ এই এদেশের রাজনীতির ধারা ক্রমেই জা সংস্কৃতির প্রাণসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হ

পড়িতেছে এবং ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ রাজনীতির সাধনার মধ্যে অন্তরের বলিষ্ঠ অনুপ্রেরণা উপলব্ধি করিতেছে না। বাস্তবিক পক্ষে শুধু রাজনীতিই একটা জাতিকে গড়িয়া তুলিতে পারে না। জাতির সংস্কৃতির যাঁহারা ধারক, বাহক এবং পরিপোষক, তাঁহারাই জাতির প্রাণধর্মকে সঞ্জীবিত রাখেন এবং সেই প্রাণধর্মেরই প্রভাবে নব সৃষ্টি সব পরিপরিকল্পনা সর্বজনীন সহযোগিতার সাফল্য লাভ করিতে পারে। ভারতীয় এবং প্রাদেশিক বিধান পরিষদ বা উর্ধতন আইনসভার সরকারী মনোনয়নের ভিতর দিয়া এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার পথ কতকটা উন্মুক্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পরিষদে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এবং ডক্টর কালিদাস নাগের মনোনয়নে যোগ্যের প্রতিই সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের পরিষদে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্তা শান্তি দাস, শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত, ইঁহাদের মনোনয়নও জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিবে। কিন্তু শুধু এইরূপ মনোনয়নের পথেই রাষ্ট্রের কর্তব্য শেষ হয় না; সাংস্কৃতিক একটি প্রতিবেশ গড়িয়া তোলার দিকেও এই সঙ্গে রাষ্ট্র-নিয়ামকদের দৃষ্টি রাখা দরকার। নতুবা সাংস্কৃতিক মর্যাদা স্বীকার করিয়া যাঁহাদিগকে পরিষদের সদস্যরূপে মনোনয়ন করা হইল, তাঁহাদের কাজকে বাস্তব করিয়া তুলিবার কোন ভিত্তি থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির আয়োজনের ভিতর দিয়া পশ্চিমবঙ্গ সেই পথে অগ্রসর হইতেছেন। আমরা তাঁহাদের সদ্যোগৃহীত সিদ্ধান্তটির জন্য যথোচিত অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

এ বৎসরের রবীন্দ্র পুরস্কার

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বৎসর (১৯৫১-৫২) পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার পাইয়াছেন। ব্রজেন্দ্রবাবু আধুনিক বাঙলার ইতিহাসের যে-বিভাগ লইয়া যে-ধারায় যে-প্রণালীতে তথ্যাহরণ ও গবেষণায় রত আছেন তাহাতে তাঁহাকে পথিকৃৎ বলিয়া বিবেচনা করিলে অসঙ্গত হইবে না; এখন ঐ বিভাগে আরও কিছু কিছু কর্মীর উদ্ভব হইলেও, অদ্যাপি তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ব্রজেন্দ্রবাবুর জ্ঞানান্বেষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ ধরিয়া চলে নাই;

সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ও সেইজন্য তাঁহাকে তেমনভাবে স্বীকার করিতে পারেন নাই। দারিদ্র্যবশত বিদ্যালয়ে উপাধিলাভের সুযোগ তিনি পান নাই; গুরুনির্দেশ অনুসরণ ও ভরসা করিয়া প্রথম যৌবন হইতেই যেভাবে তিনি অক্লান্ত অনন্যমনা হইয়া জ্ঞানসাধনায় প্রবৃত্ত আছেন তাহা সমব্যবসায়ীদেরও সকলের নিকট সুপরিজ্ঞাত নহে; আমরা সে সংবাদ রাখি বলিয়াই সুধীমণ্ডলী কর্তৃক তাঁহার এই স্বীকৃতিতে আনন্দিত হইয়াছি।

গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের ঐকান্তিক পরিশ্রমে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধে এযাবৎ যে সকল রত্ন সমাহরণ ও অবলুপ্তি হইতে রক্ষা করিয়া বিরাট ভাণ্ডার রচনা করিয়াছেন তাহা হইতে উপকরণ আহরণ না করিয়া পরবর্তী কাহারও পক্ষে এ সকল বিষয়ে গবেষণা করা সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। পুরস্কার-প্রদান উপলক্ষে নূতন করিয়া সেগুলি উল্লিখিত হইয়াছে—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (১৮১০-৪০) দুই খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙলা সাময়িকপত্র পর্যন্ত গ্রন্থমালা—'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' (১৭৯৫-১৮৭৬)ও এই গ্রন্থমালার অন্তর্গত—এবং সাহিত্য-সাধকচরিতমালা।

এই সকল গ্রন্থমালা রচনা ব্যতীতও ব্রজেন্দ্রবাবু বাঙলা সাহিত্যের যে সেবা করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাহিত্য-সাধকচরিতমালায় যে-সকল পূর্বসূরীদের জীবন-তথ্য বিবৃত ও রচনা-নিদর্শন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকের রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য ও সুমুদ্রিত সংস্করণও প্রধানতঃ ব্রজেন্দ্রবাবুর উদ্যোগেই পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। রামমোহন, মৃত্যুঞ্জয়, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের অনেক দিক্‌পালের, নির্ভরযোগ্য সংস্করণ দূরে থাকুক যে-কোনরূপ সংস্করণের গ্রন্থই সাধারণের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কেবল এই কাজটির জন্যও ব্রজেন্দ্রবাবু ও তাঁহার সহযোগিগণ আমাদের কৃতজ্ঞতার দাবী করিতে পারেন।

দ্রব্যমূল্য বাড়াইবার ফন্দি

ভারত সরকার ২৫ হাজার টন গুড় বিদেশে রপ্তানির জন্য অনুমতি দিয়াছেন। এই সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বাড়তি গুড় বিদেশে রপ্তানি দ্বারা কাটানো উচিত কিনা, সে সম্বন্ধেও তাঁহারা বিবেচনা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, চিনির ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট শিল্পপতিদের যুক্তিই সরকারের এই সিদ্ধান্তের মূলে কাজ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন এই যে, চিনির উৎপাদনে সত্যই বাড়তি দাঁড়াইয়াছে কি? বেশি দিনের কথা নয়, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারতের খাদ্য এবং কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী স্বয়ং এই কথা ঘোষণা করেন যে, চিনি, গুড় রপ্তানি নিষেধের ব্যবস্থার বর্তমানে কোন সংকোচ সাধনের প্রয়োজন তাঁহারা বোধ করেন না। প্রকৃতপক্ষে দর কমাইবার দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য রহিয়াছে। সরকারী এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন ইহার মধ্যেই কিসে দেখা দিল, বুঝা কঠিন। পরিবর্তনে তো শুধু ইহা দেখিতেছি যে, চিনির দর গত জানুয়ারী এবং মার্চ মাসে হ্রাস পাইবার দিকে যে ঝোঁক দেখা দেয় বর্তমানে তাহার গতি কতকটা রুদ্ধ হইয়াছে। চিনির দর কিছুদিন হইল এক টাকা সেরে দাঁড়াইয়াছে। সরকারী নীতি যদি পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ রপ্তানির পথ উন্মুক্ত হয়, তবে জনসাধারণের পক্ষে সামান্য যে একটু সুবিধা দেখা দিয়াছে, তাহাও নষ্ট হইবে। বাস্তবিক পক্ষে চিনির দর যখন ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছিল, সরকার তখন রপ্তানির সুবিধা দিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেন না, অথচ মূল্য হ্রাসের গতি রুদ্ধ হইবার অবস্থায় তাঁহারা তাহা প্রয়োজন বুঝিলেন, ইহা সত্যই

বিস্ময়ের বিষয়। কাপড়ের সম্বন্ধেও ইহার মধ্যেই এই ধরণের সমস্যা দেখা দিয়াছে। আমেদাবাদ মিলের মালিকেরা বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস করিবার জন্য শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছেন। এই-ভাবে জোট বাঁধিয়া তাঁহারা কৃত্রিম উপায়ে বস্ত্রাভাব সৃষ্টি করিতে চাহেন এবং মুনাফা লুটিবার দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মূল্য হ্রাসের ফলে শিল্পপতিদের সাময়িক ক্ষতি যদিও হয়, এতদিন ধরিয়া তাঁহারা যে মুনাফা লুটিয়াছেন, তাহার তুলনায় সে-ক্ষতি অত্যন্তই নগণ্য। বলা বাহুল্য, শিল্পপতিদের এই চেষ্টা দেশ ও জাতির স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং বাজারের স্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য বস্ত্রমূল্য হ্রাস করাই তাঁহাদের উচিত; কিন্তু তাঁহারা এই সব যুক্তি শুনিবার মত বান্দা নহেন, ইহা আমরা বিশেষভাবে জানি। কোটি কোটি টাকার কাপড় মিলগুলিতে মজুত হইয়াছে, সুতরাং সঙ্কট অতি গুরুতর, ব্যবসায়ী মহল হইতে ক্রমাগত এই আর্তনাদই উঠিতেছে: অথচ সাধারণ ক্রেতা কাপড় কিনিতে গেলে দরে বিশেষ সুবিধা এখনও তেমন কিছু পাইতেছে না। কার্যত মজুতের এই যে হিসাব তাঁহারা উপস্থিত করিতেছেন, ইহার মধ্যে কারসাজী অনেক কিছু আছে। বলা বাহুল্য দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকাইয়া চিনি বা বস্ত্রের শিল্পপতিদের এমন সব ফন্দির কাছে সরকারের নতি-স্বীকার করা কোনক্রমেই উচিত নয়। বহু বৎসর ধরিয়া শিল্পপতিগণ প্রচুর মুনাফা লুটিয়াছেন, আজ যদি জনসাধারণের পক্ষে সুযোগ-সুবিধা কিছু দেখা দিয়া থাকে, দ্রব্যমূল্যে মন্দার ভাব সৃষ্টি হয়, তবে শিল্প-পতিদিগকে ক্ষতি স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহারা যদি লোভের বশে তাহাতে রাজী না হইতে পারেন এবং সরকার তাঁহাদের হাঁক-ডাকে সাড়া দিয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সাধনের উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যত হন, তবে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে, এ বিষয়ে আমাদের মনে সন্দেহ মাত্র নাই।

আত্মতুষ্টির কারণ

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্মকর্তারা সম্প্রতি এক বৈঠকে কংগ্রেসের কাজের জন্য আত্মতুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান এবং সুদক্ষ পরিচালনার ফলেই বিগত সাধারণ নির্বাচনে ও কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে কংগ্রেস সাফল্য লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের সাফল্য বলিতে ইঁহারা কি বুঝিয়াছেন জানি না এবং সে সাফল্যের মূলে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের অক্লান্ত চেষ্টার পরিমাণের প্রমাণও আমরা ধরিতে পারিতেছি না। বাঙলা দেশের জন-জীবনে একদিন কংগ্রেসের প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠা কতটা ছিল তাহা অবগত আছি। সেই হিসাবে বিগত নির্বাচনে কংগ্রেসের যে সাফল্য ঘটিয়াছে, তাহাতে আমরা উল্লাস বোধ করিতে পারি না। ইতঃপূর্বে যেসব নির্বাচন ঘটিয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিয়াছি, যাঁহারা যত বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষই হোন না কেন, কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহা-দিগকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিগত নির্বাচনে রাষ্ট্রে কংগ্রেস-নীতির যাঁহারা নিয়ামক, সেই মন্ত্রীদের বেশির ভাগকেই পরাজিত হইতে হইয়াছে। কংগ্রেস বাছিয়া বাছিয়া ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং যোগ্য বুঝিয়া যাঁহাদিগকে দাঁড় করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরাজয়ও বিরল নহে। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসের সাফল্যের জন্য উল্লসিত হইবার কারণ সত্যই কিছু আছে কি? পক্ষান্তরে বিগত নির্বাচনে এই সত্যও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কম্যুনিস্ট দলও একটা স্থান দস্তুরমত গাড়িয়া লইয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গের কংগ্রেসের নিয়ামকগণ যদি সত্যই অক্লান্ত চেষ্টার দ্বারা জনসাধারণের সহানুভূতির সূত্রটি সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে পারিতেন, তবে নিশ্চয়ই ইহা সম্ভব হইত না। বস্তুত এদেশের জনসাধারণ নিরক্ষর হইলেও বুদ্ধিহীন নয়, নিজেদের স্বার্থ বিচার করিয়া চলিতে তাহারাও জানে, সুতরাং দুষ্টলোকেরা কংগ্রেসের সম্বন্ধে ভুল বুঝাইলেই যে তাহারা বুঝিয়া বসিবে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। সুতরাং বুঝিতে হয়, মেদিনীপুর এবং ২৪ পরগণায় কংগ্রেস সদস্যদের পরাজয় কংগ্রেসের কাজে ত্রুটির জন্যই ঘটিয়াছে। কংগ্রেসের সভাপতিস্বরূপে পণ্ডিত জওহরলাল একথাটা স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন। কর্পোরেশনের নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যের বিচারও একটু ধীর-ভাবেই করা দরকার। ফলত কর্পোরেশনের ভোটদানের অধিকার তেমন ব্যাপক নয়, ইহা ছাড়া ভোটদানের অধিকার যাঁহাদের আছে, এমন অনেকের নামই ভোটের তালিকায় বাদ পড়িয়াছে। বিশেষত, ভোটের অধিকার প্রয়োগ করিবার দিকে নিতান্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই সমধিক সচেতন ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে বেশির ভাগই বর্তমান ব্যবস্থার কোনরূপ বৈপ্লবিক পরি-বর্তনের পক্ষপাতী নহেন। প্রত্যুত নিজেদের স্বার্থের দায়ে তাঁহারা সংরক্ষণশীল। এরূপ অবস্থায় কর্পোরেশনের নির্বাচনে পৌর জনসাধারণের প্রকৃত মত কতটা প্রতি-ফলিত হইয়াছে, এ বিষয়ে যথেষ্টই কারণ রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিগত এই দুইটি নির্বাচনে জনসাধারণের মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে পশ্চিম-বঙ্গের কংগ্রেসকর্মীদের উল্লাসে আত্মহারা হইবার মত কিছু ঘটে নাই; পক্ষান্তরে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে তাঁহাদের সচেতন হইবারই সমধিক কারণ দেখা দিয়াছে। ফলত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বর্তমানে সংকটময় একটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি এবং কংগ্রেসকর্মিগণ আত্মানুসন্ধানের দ্বারা যদি জনগণের সহিত তাঁহাদের সংযোগের সূত্রটি এখনও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে না পারেন, তবে ভবিষ্যতে বিপর্যয়ের বিশেষ আশঙ্কা রহিয়াছে।
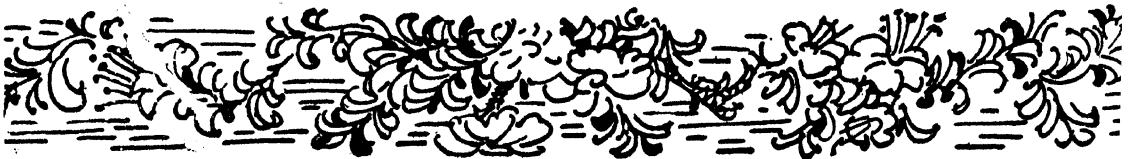
প্রভাতী তারা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

দিবসের শেষে পথের ক্লান্তি কিছুত হোল না শেষ,
দেহে নামে অপরাহ্নের অবসাদ
রাত্রির মোহ দু'নয়ন হ'তে মুছিয়া নির্বেশেষ
শ্রান্ত মনের কাতরতা যেন করিছে আর্তনাদ।

পথ চলিয়াছি পথের নেশায় নিকট হয়েছে দূর
কত অজানিতে দু'পাশে জমেছে ভীড়,
প্রশ্নের পর নূতন প্রশ্ন—বাঁশীতে বাজে কী সুর
কেবা সাথী মোর, মহাশ্বেতা কে, আমি কি চন্দ্রাপীড়?

আমার ভাষায় কখন জ্বলেছে বজ্রদহন জ্বালা
বিদ্যুৎদামে ছন্দের লীলাখেলা
গানের কুসুমে রচিয়া তুলেছি বাসরে মিলন-মালা
মোর আঙিনায় নব বসন্তের বসেছে সুখের মেলা।

ফাগুনের বনে লেগেছে আগুন, আগুন লেগেছে মনে
নব কিশলয়ে কামনার শিখা জ্বলে,
হঠাৎ হাওয়ায় চকিত হইয়া শুধায়েছি জনে জনে,
কারো দেখা পেলে? নূতন মানুষ—মাধবীকুঞ্জতলে?

বৈশাখী ঝড়ে আথাল পাথাল আমার কুঞ্জবনে
রুদ্রবীণারে বুকে লইয়াছি টানি
হৃদয়ের জ্বালা জ্বালায়ে তুলেছি অঙ্গুলি পরশনে,
শত ঝঙ্কারে সুরের আগুনে ফুটেছে মর্মবাণী।

দূরু দূরু বুক, আঁধার ধরণী গুরু গুরু দেয়া ডাকে
নির্জন পথে চলেছি অন্যমনে,
বুকের কান্না ফেটে বাহিরায়—নাজানি চেয়েছি কা'কে
অপরিচিতারে সঁপিয়াছি মন,—ফিরাইয়া প্রিয়জনে!

অনেক দিয়েছি পেয়েছি অনেক, তবুও পিছনে দেখি
মনের মাণিক ফেলিয়া এসেছি দূরে,
ছিন্ন মালার বাসি ফুলে রচি বাসর-শয্যা একি
হারানো দিনের স্মৃতি কেঁদে মরে নিরালা অন্তঃপুরে!

আমার বীণায় আজও সুর আছে, কণ্ঠে রয়েছে গান
আমার ছন্দো আনন্দ-রসে ভরা,
দেহ ও মনের অবসাদে আজ জাগুক নূতন প্রাণ
বিদায়ের বেলা পূরবীর সুর—তার লাগি কেন ত্বরা?

ত্বরা নাহি মোর এখনই যাবার, গান খুঁজে মরে সুর
ছন্দে ও সুরে মিলন ঘটাতে হবে,
স্বপ্ন ভাঙেনি নির্ঝরিণীর, আকাশ-গঙ্গা দূর
এ পথের শেষে প্রভাতী তারার সন্ধান পাব কবে?

টুমে-ক্রামে

এ কটি সাম্প্রতিক খবরে জানা গেল খাজা নাজিমুদ্দীন সাহেব নাকি বলিয়াছেন যে ভারত যদি পাকিস্থানের "শান্তির ভাষা" বুঝিতে না পারে তাহা

হইলে অন্য ভাষায় কথা বলিতে হইবে।—বিশু খুড়ো বলিলেন—"সেই ভালো; শুনেছি রাম নামটা কোন কোন মুখে নাকি বড্ড বেখাপ্পা লাগে"!

* * *

করাচীতে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বদেশীয় সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। কিন্তু সম্মেলনের কী উদ্দেশ্য তা প্রকাশ না থাকায় আরব লীগ জানাইয়াছেন যে, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণী না পাইলে তাঁদের পক্ষে সম্মেলনে যোগদান সম্ভব হইবে না। খুড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন—"করাচীর রেসে 'আরব' আমদানী করা যায় কি না সম্মেলনে তাই আলোচনা হবে।"

* * *

পাঁচ বছরের মধ্যে আমেরিকায় যে এ্যাটম বোমা প্রস্তুত হইবে তাহাতে নাকি পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণীকে ধ্বংস করা সম্ভব হইবে।—"ট্রুম্যানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনীতে কেন উৎসাহ নেই তা বোঝা গেল"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

আমাদের সহযাত্রী আমাদিগকে একটি সংবাদ পাঠ করিয়া শুনাইলেন—ফোর্ড মোটর গাড়ীর মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। বিশু খুড়ো একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"সত্যই বড় দুঃসংবাদ দাদা"!
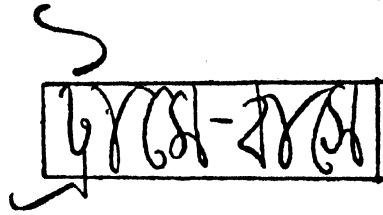
শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ বলিয়াছেন মাদ্রাজের কোন এক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ সত্যই ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। শ্যাম বলিল—"আমরা ধরে নিচ্ছি সেটা অন্তত পল্লী অঞ্চল নয় কেননা ক'দিন আগে শ্রীপ্রকাশই প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি গেঁয়ো লোক বলেই লপসীটা তাঁর বেশ ভালো লেগেছিল"!

* * *

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত দেশমুখ কলম্বো হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে আমাদের পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার ষষ্ঠ বার্ষিকী হওয়ার

সম্ভাবনা আছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"ভালো কথা নয়, লালরেৎ পঞ্চ বর্ষিণী ছেড়ে তাড়রেৎ-এর স্তরে যাওয়া সুলক্ষণ নয়!"

* * *

কলিকাতা পৌর নির্বাচনে এক মহিলা প্রার্থিনীর পরাজয় হইয়াছে শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। শ্যামলাল বলিল—"পৌরজন হয়ত মনে করেন যে 'না জাগিলে সব ভারত ললনা' গানটা সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতাতেই প্রযোজ্য।"

কানপুরের বস্তি এলাকাগুলি পরিদর্শন করিয়া নেহরুজী বলিয়াছেন যে, অবিলম্বে এগুলিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া উচিত; বস্তিবাসীদের দুর্দশা

দেখিয়া আমার গায়ে জ্বর আসিয়া গিয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—নেহরুজীর এই মানব-প্রীতিতে আমরা সত্যিই প্রীত এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ কিন্তু কথাগুলি তিনি জ্বরের তাড়সে বলেন নি তো?"

* * *

"মিস দিল্লী" নির্বাচিতা হইয়াও পরবর্তী সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতায় যোগদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।—"তিনি দিল্লীর বলেই হয়ত লাড্ডুর স্বাদটা সবার আগে বুঝে নিয়েছেন"—বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

বিজন বিপিনে বিমলকুমার

এ আমার নিজের জীবনের গল্প। লেখক জীবনের একেবারে গোড়ার কথা। একটা দু'টো গল্প লিখি। কিছু ছাপা হয়, কিছু হয় না। গল্পের মাল-মশলার জন্যে রাস্তায়, চায়ের দোকানে, পার্কে ঘুরে বেড়াই। হাজার রকমের চরিত্র দেখি। তাদের সঙ্গে আলাপ করি, ভাব জমাই। গাঁটের পয়সা খরচ করে তাদের খাওয়াই আর গল্প শুনি। কত মর্মন্তুদ সে সব কাহিনী। সকলকে নিয়ে গল্প হয়ত হয়নি সেদিন—কিন্তু মন থেকে তো তারা হারায়নি। নতুন কোনও গল্প লিখতে বসলে তারা এসে আবার ভীড় করে চোখের সামনে। সেদিন সকলকে যে আমার গল্পে স্থান দিতে পারিনি, সে আমার অক্ষমতা। তাদের কোনও দোষ নেই তা বলে।

কিন্তু যে গল্প আমি কোনওদিন লিখবো না—সেই গল্পটাই আজ বলি। না বললে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্যের জীবনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আপনারা নিশ্চয়ই বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক রসিক ভট্টাচার্যের নাম শুনেছেন! "বিনা মেঘে বজ্রাঘাত" প্রণেতা রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য বি-এ। তা' ছাড়া 'হারেম-সুন্দরী', 'কনে-বউ' 'পসারিনী' 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী' প্রভৃতি উপন্যাস সে যুগে যুগান্তর এনেছিল পাঠক সমাজে। সে প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর আগেকার কথা। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের পরে জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্য-সম্রাট। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কত বার কত চেষ্টা করেছি। যাক্ সে সব কথা।

সেদিন সকালবেলা একটা গল্প শেষ করে বিকেলবেলা আর একটা আরম্ভ করবার জন্যে তোড়জোড় করলাম। কিন্তু কী নিয়ে লিখি? সমস্ত মাথাটা ফেঁপানো রবারের বেলুনের মত ফাঁপা ঠেকল। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

তখনকার দিনে রাস্তায় বা ট্রামে এত ভীড় হতো না। মানুষ দেখতে হলে যেতে হতো চায়ের দোকানে বা পার্কে। তারপর কারো সঙ্গে আলাপ জমিয়ে একবার জমে যেতে পারলে আর গল্পের কাঁচা মাল-মশলার অভাব হবার কথা নয়। শেষকালে তা থেকে গল্প লেখা—সে আপনার কপাল আর হাতযশ!

সে পার্কটায় বড় অদ্ভুত ধরণের লোকেদের আনাগোনা। তারই ভেতর একটা বেঞ্চিতে

শ্রীবিমল মিত্র

গিয়ে বসলাম। বেঞ্চের একধারে আর একজন লোক তখন বসে ছিল।

বেশ সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পার্কের মধ্যে ঘাসের ওপর কয়েকজন লোক গোল হয়ে বসেছে। মাঝে মাঝে আলেয়ার মত দপ্ দপ্ করে একটা আগুন জ্বলে উঠছে তাদের মাথার ওপর। বুঝলাম ওটা গাঁজা খাওয়ার আড্ডা। পাশ দিয়ে 'মালিশ' 'মালিশ' বলে একজন হেঁকে গেল। একজন স্ত্রীলোক সন্দেহজনকভাবে ঘোমটা দিয়ে একলা একলা পার্কে বেড়াচ্ছে। আর পার্কের বাইরে ঠিক কোণাকুনি জায়গাটায় একটা মাংসের দোকান। একটা লোহার চাটুর ওপর মাংসের বড়া ভাজছে একজন মেয়ে মানুষ। ওটা চাট। মাংসের চাট। অভিজ্ঞ লোকেরা এসে চাইলে গোপনে দিশী মদের বোতলও বেরিয়ে আসে আড়াল থেকে। ওটাই ওদের আসল ব্যবসা। তা' রাত বারোটাই হোক আর একটাই হোক রসিক খদ্দেরকে ওরা বিফল মনোরথ করে ফেরায় না। বেশী রাতেই এ পাড়ার কারবার বুঝি জমে। বেঞ্চিটার কিছু দূরেই ওদিকে মালীর ঘর। রান্না বান্না করছে। ছেলে-বউ নিয়ে সংসার। চারদিকে 'মর্নিং গ্লোরি' ঘেরা আব্রু। ভেতর থেকে গানের শব্দ আসছে—হায় সখি কালো ভালোবেসে ফেলেছি—

—চার আনা পয়সা দেখি স্যার—

পাশের লোকটির দিকে চেয়ে দেখলাম। আধময়লা পাঞ্জাবী। পেতলের বোতাম, ব্রাউন কেডসের জুতো পায়ে। বেশ প্রৌঢ় বয়েস। হাতে একটা ছাতি। আমার দিকে চেয়ে তর্জনী দেখিয়ে খানিকটা আদেশের ভঙ্গীতে বলছে—চার আনা পয়সা দেখি স্যার—

আমি কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম।

আমার বিস্ময়-বিমূঢ় ভাব দেখে বললে—ধার চাইছিনে, দান, দান—দাতব্য...

জিজ্ঞেস করলাম—কী হবে।

লোকটি বললে—সে খবরে আপনার কাজ কী—যত সব সাত সতেরো—দিতে পারবেন কিনা তাই বলুন—

আবার ভালো করে লোকটার দিকে চেয়ে দেখলাম। অভাবগ্রস্ত ছা-পোষা মানুষ। সংসারের তাড়ায় হয়ত বাড়িতে তিষ্ঠোতে পারে না। সাত-আটটা ছেলেমেয়ের ভিড়ে হয়ত একটা ঘরে কুলোয় না। হয়ত ইস্কুল-মাস্টার, হয়ত কেরাণী, হয়ত বেকার। সবই সম্ভব। দারিদ্র্যের চাপে শেষ পর্যন্ত হয়ত এই নির্লজ্জ ভিক্ষাবৃত্তিতে নেমেছে। হয়ত

স্ত্রী সুন্দরী। কুলীনের ঘরে বিয়ে দিয়েছিল বাপ বি-এ পাশ দেখে। হয়ত চেতলা স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। সব টুইশানিগুলো হেড পণ্ডিত নিজেই নিয়ে নেয়—একটাও সেকেণ্ড পণ্ডিতকে দেয় না। বাড়িতে থাকলেই—হেজলীন দাও, পমেটম দাও, সাড়ী দাও করে স্ত্রী। তার চেয়ে এই ভালো। দোকানে এক কাপ্‌ চা খেয়ে এসে বসেছে পার্কে...। গল্প লেখক মন—এক নিমেষে গল্পের সব সম্ভাবনাগুলো ভেবে নিলাম।

হঠাৎ প্রশ্ন এল—কী করেন আপনি?

বললাম—ব্যবসা—

আবার বললে—কিছু হয় টয়?

বললাম—তেমন হয় না কিছু—

লোকটা সহানুভূতি দেখিয়ে বললে—তা' তো বুঝতেই পারছি—চার আনা পয়সা দিতেই...

খানিক করে লোকটা বললে—তা' কীসের ব্যবসা আপনার—

খুলে বললাম এবার। বললাম—ঠিক ব্যবসা নয়—এই মানে—লিখি-টিখি,—

—কী লেখেন? লোকটা এবার রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

বললাম—এই গল্প-টল্প আর কী—

হায়রে সেকেণ্ড পণ্ডিত! হিতোপদেশের গল্প ছাড়া তুমি আর কী পড়েছো। বামন-খপনক কথা, বানর-কীলক কথা, অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু পর্যন্ত তোমার দৌড়। ওদিকে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী কুমারী বয়েসে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছে রসিক ভট্টাচায্যির 'কলঙ্কিনী-কঙ্কাবতী' 'কণেবউ' 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত' আরো কত কী! স্বপ্ন দেখেছে রূপকুমারের। ঝড়ের রাত্রে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে বাদল-কুমার। ভাঙা মন্দিরে চারি চক্ষের মিলন। তারপর একদিন ঘটনাচক্রে কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। সেই থেকে নুন, তেল হলুদের সংসার। ময়লা মোটা বঙ্গলক্ষ্মী মিলের লাল কস্তা পাড় সাড়ি। ঘোড়া সুদ্ধু বাদলকুমার ভাঙা মন্দিরের ভেতর কড়িকাঠ চাপা পড়েছে। সেকেণ্ড পণ্ডিতের নস্যির দাগ লাগা ধুতি সাবান দিয়ে কেচে কেচে আঙুল হেজে গেছে তার।

সেকেণ্ড পণ্ডিত এবার প্রশ্ন করলে—কীসের গপ্‌পো লেখেন?

বললাম—এই যেমন রসিক ভট্টাচার্য্যির 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত'—

সেকেণ্ড পণ্ডিত রসিক ভট্টাচায্যির নাম শুনেছে বলে তো মনে হলো না।

বললে—হ্যাঁ বই একখানা পড়েছিলাম বটে, কার লেখা মনে নেই—'বিজয়-বসন্ত'—আহা, কাঁদিয়ে দেয় একেবারে মশাই, যখন বসন্ত মারা গেলু, শ্মশানে নিয়ে গেছে তার বাপ, বাপ তো এক মনে মা কালীকে ডাকছে আর ঝর ঝর করে কাঁদছে, হঠাৎ এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সামনে এসে আবির্ভাব হলো, সন্ন্যাসী বললেন—এই কমণ্ডলুর জল নিয়ে ছেলের গায়ে ছিটিয়ে দে, বেঁচে উঠবে। তা তাই সত্যি সত্যি বেঁচে উঠলো, তারপর এমনি মা-কালীর দয়া, সেই গরীব ব্রাহ্মণ পুকুর থেকে সাত ঘড়া সোনার মোহর মশাই—সত্যি-কারের সোনার মোহর...পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে—

সেকেণ্ড পণ্ডিত বললে—আচ্ছা কী করে গল্প লেখেন আপনি?

বললাম—বানাই—দশ রকম জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখে শুনে বানাই—

সেকেণ্ড পণ্ডিত বললে—টাকা-ফাকা পান কিছু?

বললাম—এই গল্প পিছু পাঁচ সাত টাকা পাই আর কী,—

সেকেণ্ড পণ্ডিত কী যেন ভাবতে লাগলো। বললে—তা' এক কাজ করুন না,

বললাম—বলুন—

—তা মিছিমিছি বানিয়ে লাভ কী, বানাতেও তো কষ্ট, তার চেয়ে আমাকে নিয়ে লিখুন না, একেবারে খাঁটি সত্যি গল্প—একটা টাকা কিন্তু দিতে হবে তা হলে স্যার—

এত সহজে গল্প আদায় হবে ভাবা যায়নি। সেকেণ্ড পণ্ডিতের তৃতীয় পক্ষের বিয়ের গল্প। তা' হোক—একটা সংসারের দুঃখ দারিদ্র্যের মামুলি গল্পই বলবে হয়ত সেকেণ্ড পণ্ডিত! কিন্তু গল্প যে কোথায় কেমনভাবে লুকিয়ে থাকে তা কে বলতে পারে। তারপর আমার কপাল আর হাতযশ।

—তা' আমার গল্প আজ থাক মশাই, আমি বরং খিদিরপুরের মনোহর সরকারের গল্পটাই বলি—মনোহর সরকারকে চেনেন তো?

নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করতে হলো। বললাম—না—

—সে কি মশাই, মনোহর সরকারকে চেনেন না, কোলকাতা ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট, অমন বড়লোক, চেনেন না। তা নাইবা চিনলেন, না চিনলে কি আর গল্প লেখা যায় না—

বললাম—আমি না-ই বা চিনলাম—আপনি তো চেনেন?

—চিনিনে মশাই? বলেন কি। বড়লোক হলে হবে কি, বন্ধুবান্ধবের আর আত্মীয়-স্বজনের জ্বালায় কি আর টিঁকতে পারে?

—কেন? জিজ্ঞেস করলাম।

—কেবল ধার চায় মশাই। দেখা হলেই সবাই কেবল টাকা ধার চায়। অত টাকার মালিক, সংসারে কেউ আপনার বলতে নেই, তার টাকা খায় কে? সবাই জানে ইচ্ছে হলে দু' দশ হাজার দিতে মনোহর সরকারের আটকায় না। শেষে বন্ধুবান্ধব সকলের সঙ্গে দেখা করাই ছেড়ে দিলে ওই জন্যে। টাকা থাকাও এক মহাপাপ কিনা? মন খুলে কারো সঙ্গে মিশতে পারে না, কারো বাড়ি যেতে পারে না, বেশি দয়া মায়া দেখাতে পারে না কাউকে। কেবল ভয়—ওই বুঝি কেউ তার কাছে টাকা চেয়ে বসলো—ওই বুঝি কেউ তাকে টাকার জন্যে বিষ খাইয়ে দিলে,—কারো দেওয়া সিগারেট বিড়ি কি চা সাদা মনে খেতে পারে না—সেই সংস্কৃত একটা কী শ্লোক আছে...মনে পড়ছে না ঠিক...দাঁড়ান শ্লোকটা ভাবি—

বললাম—ভাবতে হবে না, সংক্ষেপে বলুন—ও আমি ঠিক করে নেব—

সেকেণ্ড পণ্ডিত বললে—তা তো বটেই আপনারা হলেন লেখক মানুষ—আমি কি আর আপনাদের মতন গুছিয়ে বলতে পারবো। তা যা' হোক, সিগারেট নয় পান নয় চা নয়—ধরুন না কেন অত বড়লোক, ইচ্ছে করলে সব নেশাগুলোই করতে পারে মনোহর, কিন্তু পাঁচজন ভদ্র সন্তানদের জ্বালায় কিছু করবার যো নেই—কী জ্বালাতনের জীবন বলুন তো! অনেকদিন রাস্তায় ট্রামে দেখা হয়েছে। কত বড় লোকের সঙ্গে গুনী লোকের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার কথা বলেছি। মনোহর বলে—না মশাই, শেষে যদি টাকা ধার চেয়ে বসে—লোকে ঠকিয়ে ঠকিয়ে এমন করে দিয়েছিল তাকে যে, শেষে ওটা প্রায় রোগের মতন হয়ে দাঁড়ালো। বিয়ে পর্যন্ত করলে না মশাই ওই জন্যে পাছে বউ-শালা-শ্বশুর-শাশুড়ী সবাই মিলে তার সব টাকা উড়িয়ে দেয়—

বললাম—সংক্ষেপে বলুন, এবার ঘটনা কিছু বলুন—শেষ পর্যন্ত হলো কি?

—আহা, একটু গুছিয়ে বলতে দিন, গুছিয়ে না বললে আপনি লিখবেন কী করে! আপনি তো আর তাকে চেনেন না, এই দেখুন একটা ভুল হয়ে গেছে—তার চহারাটা কেমন বলা হয়নি তো—

বললাম—তার দরকার হবে না—আমি বুঝে নিয়েছি—বঙ্কিমবাবুর যুগে ও-সব চহারার কথাই একপাতা লেখা হতো—এখন আমরা চরিত্র দেখেই চেহারাটা কল্পনা করে নই—তা ছাড়া ছোট গল্প, ও-সব নিয়ে মাথা ঘামানোর জায়গা কোথায়—

—তা সে আপনারা ভালো বোঝেন,—যাক্‌গে তাঁ সেবার হঠাৎ মনোহরবাবুর মা মারা গেল। তা মা'র সম্বন্ধে কিছু বলবো ক?

বললাম—না, যে মরে গেল তাকে নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই, তা' মারা গেল বাঁচাই গল—কিন্তু হলো কী? গল্প লিখতে গেলে কিছু হওয়া চাই—

সেকেন্ড পন্ডিত এবার একটু নড়ে বসলো। বললে—আহা, আপনি অত অধৈর্য হচ্ছেন কেন স্যার—মা মারা গেলে মানুষের মনে কেমন লাগে তা বলবো না! বিশেষ করে মনোহরের মতন লোকের! যার মা-ই ছিল পৃথিবীতে সর্বস্ব; সব লোকের মা'রা তো একদিন মরেই, কিন্তু মনোহরের মা মারা যাওয়া মানে যে সব শেষ হওয়া—সমস্ত বাড়িটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল। মা মারা যাবার পর কেউ একটা তার খবর পর্যন্ত নিলে না। খবর নেবেই বা কে! কেউ কি তার বন্ধু আছে! সে-ও কাউকে খবর দিলে না। নম নম করে শ্রাদ্ধশান্তি করলে। মাথা নেড়া করলে। সবই করলেন, কিন্তু বড় একলা-একলা মনে হলো তার নিজেকে। ক'দিন ধরে বাড়ি থেকেও বেরুলো না, কোথায়ই বা বেরুবে! অফিসেও যেতে হয় না তাকে, চাকরিও করতে হয় না ভগবানের দয়ায়—গাদা গাদা শেয়ার কেনা আছে, তারই সুদ খায় বসে বসে, বাপের আমলের কেনা সব শেয়ার—এমনি করে কাটতে লাগলো দিন—হঠাৎ—

বললাম—থামলেন কেন, বলুন—হঠাৎ......?

—আপনি অত অধৈর্য হচ্ছেন কেন স্যার, মা'র শোকটা ভালো করে থিতিয়ে বসতে দিন, এইখানটায় খুব মন দিয়ে লিখবেন স্যার বুঝলেন, যেন পড়তে পড়তে বেশ কান্না পায়—যত কান্না পাবে, তত ভালো হবে—'বিজয়-বসন্ত'র মতন বেশ রসিয়ে রসিয়ে—

বললাম—মনোহরবাবু মা মরার পর শেষ পর্যন্ত প্রেমে পড়লেন কিনা, তাই বলুন আগে—

সেকেন্ড পন্ডিত চমকে উঠলেন—প্রেম? বলেন কি মশাই? প্রেমের চেয়ে আরো ভীষণ কান্ড!—মানুষ খুন করে বসলো মনোহর—বললে বিশ্বেস করবেন না......

বললাম— খুন-খারাপির গল্প নাকি?

—কেন? খুন-খারাপির গল্প কি খারাপ? খুন-খারাপি না হলে কাঁদাবেন কী দিয়ে শুনি? প্রেম তো আকছার হচ্ছে আজ-কাল। খুন-খারাপি ক'টা হচ্ছে বলুন তো? খুন দিলেই তো জমবে বেশি—

বললাম—তবে কি ডিটেক্‌টিভ্‌ গল্প—আমি তো ডিটেক্‌টিভ গল্প লিখি না—

—আঃ, আপনি বড় তাড়াহুড়ো করেন, দেবেন তো একটা টাকা, শেষ পর্যন্ত শুনুন তো, আপনার পছন্দ যদি না হয় তো তখন বলবেন।—শুধু কি একটা খুন? দু' দুটো খুন—একজোড়া—

মনে হলো আজ সমস্ত পরিশ্রমটাই পন্ড। সমস্ত পার্কে তখন আরো অন্ধকার ঘন হয়ে নেমেছে। গাঁজার আড্ডায় আরো ঘন ঘন আলেয়ার আলো জ্বলে জ্বলে উঠছে। কোণের মাংসের দোকানে তখন কয়েক জনের রহস্যজনক গতিবিধি শুরু হয়েছে। এক-একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াচ্ছে, আর মাংসের বড়া আর আড়াল থেকে বোতল বেরিয়ে উঠছে গাড়িতে। ঘোমটা দেওয়া নারীমূর্তিটা আরো সলজ্জভাবে পায়চারি শুরু করেছে। রাত বুঝি বাড়তে থাকে।

বললাম—তারপর—

—তারপর হঠাৎ একটা চিঠি এসে হাজির। লিখেছে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের ভুবন মজুমদার। ভুবন লিখেছে—পিসীমার মৃত্যুর খবরটা তুমি আমাদের একবার জানাওনি মনোহর। অথচ বেঁচে থাকতে পিসীমার মত আপনজন আর আমাদের কে ছিল! তোমার বৌদি খবরটা শোনার পর থেকেই শোকে একেবারে মুহ্যমান।—তোমার বাড়িতে গিয়েও দেখা পাওয়া যায় না। পিসীমার মৃত্যুর পর কেমনভাবে তোমার দিন কাটছে—তাই জানতেই তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম এক-দিন। তুমি আমাদের পর করে দিতে পারো,

কিন্তু আমরা তোমাকে তেমনি চোখেই দেখি ভাই—

অন্ধকারের মধ্যেই একজন ফেরিওয়ালা চীৎকার করে গেল—বি কে পালের গুলে গুলে—গুলে গুলে—গুলে গুলে ভাজা—

সেকেন্ড পণ্ডিত বললে—রাখ্ তোর গুল্ গুল্ ভাজা—আমাদের কাছে কেন বাপু—ওই ওপাশে যা না—রাস্তার কোণে যা, ওখানে রসিক লোক পাবি—কী বলেন, অন্যায় বলেছি কিছু?

বললাম—তারপর বলুন—

—হ্যাঁ বলি, ধীরে সুস্থে বলতে কি দেয় ব্যাটারা, দেখুন না—এত রকমের ঝামেলা —তারপর একদিন ভোর পাঁচটার সময় ভুবন এসে হাজির। মনোহর তখন বিছানায় শুয়ে। বললে—তোমায় আমাদের বাড়ি যেতে হবে মনোহর, বৌদির হুকুম।—এরকম বাউণ্ডুলে হয়ে আর কদিন বেড়াবে। তারপর অনেক কথা হলো। ভুবন কাঁদলে বেশ খানিকক্ষণ। কী অসুখ হয়েছিল পিসীমার, কোন্ ডাক্তার দেখেছিল—ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা! মনোহর ভাবলে—এমন শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তার রয়েছে, অথচ সে কি না মন খারাপ করে মরছে!

বললাম—ও বুঝেছি, বৌদির বোনের সঙ্গে মনোহরের বিয়ে দেবার মতলব—

সেকেন্ড পণ্ডিত বললে—ঠিক ধরেছেন আপনি—প্রেমের গল্প হলে ওইটে করলেই ভালো হতো। কিন্তু তা হলে খুন হয় কী করে? মনোহরকে দিয়ে যে জোড়া খুন করাতে হবে—

—খুন করিয়ে আপনার লাভ?

—যা ঘটেছিল তাই তো বলতে হবে আমায়, না আপনার মতলব মতন বলবো। তা না হলে মনোহরের আর দুঃখু কিসের বলুন, অত টাকা থেকেও যে সুখ নেই—সেইটেই যে ওর কপালের গেরো।—আর তা যদি না করেন তো বৌদির বোনের সঙ্গে মনোহরের বিয়ে দিয়ে দিন, ওরা সুখে ঘরকন্না করতে থাকুক—আর আপনি এই বেঞ্চিতে বসে ভেরেণ্ডা ভাজুন—আমি চলি—

সেকেন্ড পণ্ডিত সোজা ছাতা নিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। বললাম—শেষটা কী হলো বলুন—

—চাই পান, খিলি পান চাই—

সেকেন্ড পণ্ডিত সোজা হয়ে বসলো এবার —এই যে পানওয়ালা—এসো তো ইদিকে—পান খাওয়ান দিকি স্যার, পয়সা আছে পকেটে—

পান খাওয়া হলো। আলাদা করে চুন নিলে, সুপুরি নিলে।

তারপর শুরু করলো—তা মনোহর যখন ভুবন মজুমদারের বাড়ি পেঁছিল, তখন ধরুন বেলা দশটা। বৌদি এলো। বৌদিকে আপনি যত সুন্দরী করতে পারেন; করে দিন। পাতা কাটা চুল, খয়েরের টিপ, নাকে নোলক দিয়ে দিন। কিন্তু স্যার মোটা আট-পৌরে একটা মিলের সাড়ি পরিয়ে দেবেন বৌদিকে। মোদ্দা কথা গরীব গেরস্ত যেমন হয় আর কি! কিন্তু খবরদার যেন গয়না পরাবেন না গায়ে—

বললাম—কেন?

—সেটা পরে জানতে পারবেন। আগে থেকে হাঁক পাঁক করলে চলবে কেন। তা মনোহরকে দেখে বৌদিও চোখে আঁচল দিলে বৈকি। বললে—একবার একটা খবর দিতে হয়, শেষ সময়ে একবার পিসীমার পায়ের ধুলো নিতাম মাথায়। মনোহর চুপ করে রইল। এমন একজন বন্ধু রয়েছে তার আগে জানা ছিল না। শেষে পীড়াপিড়ী করলে ওরা—খাওয়া দাওয়া করতে হবে ওখানেই।—গরীবের বাড়ি যা জোটে।—কিন্তু বলে রাখছি আপনি খাওয়ার ব্যবস্থাটা করবেন একেবারে রাজসিক। যত টাকাই লাগুক। এই ধরুন রুই মাছের কালিয়া, মাংসের চপ, পোলাও, ডিমের কারি, তারপর রাজভোগ, দই, আবার-খাবো সন্দেশ—

—চাই চিনেবাদাম, কবুলি মটর—

সেকেন্ড পণ্ডিত খেঁকিয়ে উঠলো—পালা এখান থেকে, আমরা এখন রাবড়ি সন্দেশ খাচ্ছি এখন নিয়ে এল চিনেবাদাম—যত সব বেরসিক লোক এ পার্কে—তা' যাক,—যে কথা বলছিলাম—খেতে বসে মনোহর এত সব দেখে অবাক হলো খুব। অনেক দিন বাড়ির রান্না খাওয়া হয়নি—খেলেও খুব মনোহর—একেবারে চেটেপুটে, বুঝলেন। পাশে বৌদি বসে পাখা নিয়ে তদারক করছে —এটা খাও—ওটা আরেকটু দি, ফেললে চলবে না—এই সব। ভুবনও দাঁড়িয়ে আছে কাছে। এক সময় বৌদি ভুবনকে বললে—এইবার ঠাকুরপোকে তুমি সেই কথাটা বলো না—

ভুবন বলে—আমি বলতে পারবো না, তুমি বলো না—

ভুবন বলে—আমি বলতে পারবো না, তুমি বলো বরং—

মনোহর খেতে খেতে মুখ তুলে বলে—কীসের কী কথা?—

—সে তোমায় উনিই বলবেন ভাই—বলে বৌদি স্বামীর দিকে চায়। বলে—বলেই ফেলো না কথাটা—লজ্জা কিসের—ঠাকুরপো কি আর পর—

তা এমনি করে করে কথাটা আর শেষ পর্যন্ত বলা হলো না। বৌদি বললে—এখনি বেরিও না যেন ঠাকুরপো, একটু গড়িয়ে নাও বিছানায়—তারপর রোদ পড়লে যেও—

খাওয়াও হয়েছিল প্রচুর। ভুবন মজুমদারের শোবার খাটে গিয়ে মনোহর সরকারকে শুইয়ে দিন। আর ওদিকে ততক্ষণে ভুবন মজুমদারকে পাঠিয়ে দিন বাইরে। কী একটা কাজের ছুতোয় সে এক ঘণ্টার জন্যে বাইরে ঘুরে আসুক। আর ইতিমধ্যে বৌদি খেয়ে দেয়ে পান চিবুতে চিবুতে এসে হাজির হবে ঘরে। এসে খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসবে—ভিজে চুল এলিয়ে দিন, পায়ে পরিয়ে দিন আলতা—সেই দুপুর বেলা বৌদির সঙ্গে ঠাকুরপোর মুখোমুখি......

—চাই বেলফুল, বেলফুল নেবেন বাবু —সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা।

সেকেন্ড পণ্ডিত আবার খেঁকিয়ে উঠলো—দূর বেটা, দুপুরবেলা বেলফুল কী হবে রে—কেমন বেরসিক দেখেছেন—আরে বিছানায় অমনি শুলেই হলো, আগে রাত্তির হোক, আলো নিভুক—তখন বেলফুল আনিস—কী বলেন—যাক্ গে বাজে কথা সেই বিছানায় বসে আধশোয়া মনোহরের দিকে চেয়ে বৌদির মুখ দিয়ে সেই কথাটা একবার বলিয়ে দিন—

—কোন্ কথাটা? জিজ্ঞেস করলাম।

—আজ্ঞে যে-কথাটা খাবার সময় দুজনে স্বামী-স্ত্রীতে বলি বলি করে বলা হয়নি —সেই কথাটা! সেই আঁতের কথাটা!

—আঁতের কথা?

—আঁতের কথা নয় তো কি রসের কথা রস-কস্ যে সব শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে ওদিকে! ছ'মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি, মুদি দু' বেলা তাগাদা দিচ্ছে, ধোপা কাপড় নিয়ে আসছে না, অফিসের ক্যাশ ভেঙে সাতশো টাকা নিয়েছিল ভুবন, তা-ই এখন জানাজানি হয়ে গেছে—অন্য অফিস হলে তো জেল হয়ে যেত—সে-টাকা শোধ করতে হবে—চালাকি নাকি! রসের কথা কোত্থেকে আসবে শুনি গরীব লোকের দুঃখুটা আপনি কী বুঝবেন স্যার! প্রাণে যা'র জ্বালা সে-ই বোঝে ঠ্যালাটা।

তারপর চীৎকার করে ডাকতে লাগলো এই পানওয়ালা, আয় বাবা ইদিকে—

বকাচ্ছেন আপনি—দেবেন তো একটা টাকা তার ওপর আপনার জেরার ঠেলায় অস্থির—

পান মুখে পুরে বললে—এ মাসে তোর কত পাওনা হয়েছে রে—সাড়ে তের পয়সা? পয়সা তো সঙ্গে আনি নি—সাড়ে তের পয়সা দিয়ে দিন তো স্যার—তা হলে তোর আজ পর্যন্ত সব শোধ হয়ে গেল—বুঝলি?

আরো ঘন হয়ে এল রাত। রাস্তার কোণে মাংসর দোকানে আরো ভীড় বাড়তে শুরু হয়েছে। ঘোমটা দেওয়া নারীমূর্তির এখনও পায়চারি শেষ হয় নি। কিম্বা একবার আধ-ঘণ্টার জন্যে বাড়ি গিয়ে আবার বুঝি ঘোরা শুরু করেছে। পার্কের ভেতর গোলাকার দলটির মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে চীৎকার উঠছে—ব্যোম্ কালী।—এবার পাশের ঘরটা থেকে মালী সিংগলরীডের হারমোনিয়ামে নতুন গান ধরেছে—বন্ কি চিঁড়িয়া বন্ কি বন্ বন্ বো-লুরে—

বললাম—তারপর—

পানের পিচ্ লম্বা করে ফেলে সেকেন্ড পন্ডিত বললে—মনোহর তো শুনে অবাক্! সাত শো টাকা ধার দিতে হবে! বলে কী! শেষে এই ছিল মতলব। বৌদি বললে—একটা পয়সা বাড়িতে নেই আমাদের ঠাকুর-পো যে চাল কিনি, এই, আমার হাতের দিকে চেয়ে দেখ ঠাকুরপো, এক হাতে একগাছি চুড়ি, আর একহাতে শুধু শাঁখা—আর সব গেছে—বাঁ-হাতের চুড়িগাছা আজই সকালে বেচে ওই মাছ মাংস দই রাবড়ি আনিয়েছি—তোমায় যা খাওয়ালাম ঠাকুরপো ও এই আমার চুড়ি বেচা টাকায়—

চাই পাঁঠার ঘুগনি, আলুর দম, মোচার চপ্—

আবার খেঁকিয়ে উঠলো সেকেন্ড পন্ডিত—আরে রাখ্ বাবা তোর পাঁঠার ঘুগ্‌নি—আগে পেটভরে যা গিলেছি তাই-ই বমি করে ফেলতে পারলে বাঁচি, কী বলেন! মনোহরের মনে হলো এ নেমন্তন্ন খাওয়া নয় তো যেন বিষ খাওয়া—বরং বিষ খেলেও ছিল ভালো—এমন জানলে কে এমন খাওয়া খেত। কিন্তু তখন আর তো উপায় নেই। বৌদি বলতে লাগলো—টাকাটা দু' চার দিনের মধ্যে দিতে না পারলে, তোমার দাদার জেল হয়ে যাবে—এখন তুমিই ভরসা ঠাকুরপো—

খানিক পরেই ভুবন এসে হাজির। এসে স্ত্রীকে বললে—তুমি বলেছ নাকি?

বৌদি বললে—বলেছি তো—

—তা মনোহর কী বলছে?

মনোহর এই অবস্থার মধ্যে পড়ে একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। বিছানা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে—আজ আমি উঠি বৌদি—

—সে কী, বোস—বোস—আর একটু বিশ্রাম কর, তোমার জন্যে ডাবের জল রেখে দিয়েছি—বেলা পড়লে খাবে—সে হচ্ছে না ঠাকুরপো, আমার মাথা খাও—

তা তখন মশাই মনোহর সেই কথাই ভাবছিল। শুধু বৌদির মাথা নয়, ভুবনের মাথাটাও চিবিয়ে খেতে পারলে যেন ভালো হতো। শেষ পর্যন্ত কারোর কথাই শুনলে না। জামা-জুতো পরে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। ভুবন আর বৌদি এল পেছন পেছন। ভুবন বললে—তা' হলে কাল সকালে তোমার ওখানে যাচ্ছি মনোহর, টাকাটা জোগাড় করে রেখে দিও—

মনোহর শুধু বললে—না, কাল নয় পরশু—

বলে যেমন করে বলির পাঁঠা ছাড়া পেলে পালিয়ে যায়, তেমনি করে যেদিকে দু চোখ যায় সেদিকে......

—মালিশ, মালিশ—তেলের শিশি বোতল হাতে একটা মালিশওয়ালা সামনে এসে দাঁড়াল—

সেকেন্ড পন্ডিত বললে—এখন ভাগো বাবা এখান থেকে, এখন বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, এ তোমার মালিশের কর্ম নয়—বরং বিষ এনে দাও খাই, মনের জ্বালা জুড়োক—কী বলেন?

বললাম—তারপর?

সেকেন্ড পন্ডিত বললেন—কেমন? জমছে না?

বললাম—তবে যে বললেন—একজোড়া খুন করবে মনোহর—

—করবে মশাই করবে! অত ব্যস্ত হলে চলে! খুন অমনি করলেই হলো! আদালত আছে পুলিশ আছে, ছোরাছুরি না হোক, বিষটাও তো কিনতে হবে—এ তো আর গল্প লেখা নয়, কাব্যও নয়—

বললাম—সে যা' হোক, পরশু সকালে ভুবন মনোহরের বাড়ি গেল কিনা তাই আগে বলুন—

হাসতে লাগলো খ্যা খ্যা করে সেকেন্ড পন্ডিত। বললে—মনোহরকে তেমনি কাঁচা ছেলে পেলেন নাকি স্যার, ও হরি, এতক্ষণে আপনি তাই বুঝলেন?

বাক্য ব্যয় অনাবশ্যক বোধে চুপ করে রইলাম।

—মনোহর, যে তখন নাগপুরের রেস্ট হাউসে বসে দাড়ি কামাচ্ছে স্যার—

—কেন? জিজ্ঞেস করলাম।

—বলেন কী? দাড়িটা পর্যন্ত কামাবে না বলতে চান? মনে শান্তি নেই, তা' না-ই বা থাকলো। বৌদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা হাওড়া স্টেশন, তারপর হাওড়া স্টেশন থেকে বম্বে মেল-এ সমস্ত রাত সমস্ত দিন কাটানো চাট্টিখানি কথা নাকি—তারপর ভোর বেলা উঠে দাড়িটা কামাতে বসেছে—কী এমন অপরাধ করেছে, শুনি?

বললাম—না, আমি তা' বলিনি—

—তা আপনি যা-ই বলুন, দাড়ি কামিয়ে এমন অন্যায় কিছু করেনি মনোহর—শুধু দাড়ি কেন, পারলে ওই ক্ষুরটা দিয়ে মনোহর বৌদির আর ভুবনের গলা দু'টো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটে তবে না শান্তি পেত—

বললাম—থামলেন কেন, বলুন—

সেকেণ্ড পণ্ডিত বললেন—দাঁড়ান রাগটা একটু পড়ুক স্যার—নইলে লঙ্কাকাণ্ড বেধে যাবে যে—

পায়চারী করতে করতে হঠাৎ নারী-মূর্তিটা এবার সামনে এসে দাঁড়াতেই দেখলাম ঘোমটার ভেতর যেন চমকে উঠলো একটা কটাক্ষ। সেকেণ্ড পণ্ডিতও লক্ষ্য করেছিলো বোধ হয়। বললে—আহা, হেঁটে হেঁটে পা ধরে গেল মা-লক্ষ্মীর—মায়ের জাত—রাগ করে সন্তানকে ভস্ম করে দিও না মা—

ওধারে রাস্তার কোণে ভীষণ জটলা বেধেছে। ট্যাক্সির ভেতর কা'কে ঘিরে বহু কণ্ঠের কলরোল। এত ভীড় হৈ চৈ—অথচ কোথাও পুলিশের অস্তিত্বের প্রমাণ নেই।

মাঝখানের আড্ডা থেকে চীৎকার উঠছে—ব্যোম্ কালী—কলকাত্তাওয়ালী—

বললাম—তারপর বলুন গল্পটা—

সেকেণ্ড পণ্ডিত বললে—দাঁড়ান স্যার ওই রেস্ট হাউসে আগে সাতটা দিন কাটুক মনোহরের। কলকাতায় এলেই তো তাগাদা হবে টাকার। অথচ কতদিনই বা বসে বসে থাকতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভগবান সহায় হলো বুঝি মনোহরের। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজ পড়তে পড়তে নজরে পড়লো—বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের ভুবন মজুমদার আর তার স্ত্রী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে—হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে তাদের...অবস্থা সঙ্গীন—

বললাম—তারপর—

—খবরটা পড়ে মনোহর যা কখনও করে না তাই করে বসলো সেদিন। সোজা হোটেলে গিয়ে অর্ডার দিয়ে বসলো দামী মদের...তা ধরুন, আনন্দ হয়েছে, মনে ফুর্তি হয়েছে, থাক্ না, দোষ কী—কী বলেন—

—তারপর?

তারপর আর কি, সেই রাত্রেই ট্রেন ধরে সোজা কলকাতায়। আর দেরি করতে আছে? যে ভয় ছিল, সে তো আর নেই, কা'র জন্যে চক্ষুলজ্জা—কিন্তু বাড়িতে এসে সবে একটা রাত কাটিয়েছে, আর ঠিক তার পরদিন সকাল-বেলাই ডাকাডাকি—মনোহর আছো—মনোহর আছো—

বললাম—ডাকলো কে?

—আর কে? ভুবন, ভুবন মজুমদার। মনোহর দরজা খুলেই দেখলে ভূত নয়, সশরীরে একেবারে ভুবন মজুমদার হাজির—বিষ খাওয়ার কোনও লক্ষণ...

বললাম—বলেন কী?

—এইবার দিন টাকাটা অনেক রাত হয়ে গেল, চলি স্যার—সেকেণ্ড পণ্ডিত সত্যি সত্যিই উঠলো।

বললাম—সেকি? তারপর বলুন?

—তারপর আবার কী। গল্প তো হয়ে গেল—এবার আপনি লিখে ফেলুন—দিন, অনেক বকিয়েছেন, এবার টাকাটা ছাড়ুন—

—গল্প শেষ করলেন না—টাকা! তারপর মনোহর টাকা দিলে কিনা...তা' ছাড়া ভুবন মজুমদার বেঁচে উঠলো কী করে... কিছুই যে—

—আপনাকে আমি সবই বলে দিলাম যদি তাহ'লে আপনি আছেন কী করতে—দেবেন তো ভারি একটা টাকা। চাইনে আমার অমন—

বলে ছাতা নিয়ে হন্ হন্ করে সত্যি সত্যিই সেকেণ্ড পণ্ডিত উঠে গেল। আমার যেন কেমন মনে হলো এতক্ষণ লোকটা নিজের কাহিনীই বলে গেল। ততক্ষণে ভদ্রলোক অনেকখানি চলেও গেছে।

ডাকলাম—ভুবনবাবু, শুনুন একবার, শুনে যান—

দূর থেকে ভদ্রলোক বললে—যা' ভেবেছেন তা ঠিক নয়, আমি ভুবনবাবু নই—আমি মনোহর সরকার—

তারপর ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল মনোহর সরকার। সমস্ত কাহিনীটা আদ্যোপান্ত আলোচনা করে দেখলাম। এতক্ষণ তবে কি মনোহর সরকারের সঙ্গে কথা বলেছি!

পাশের ঘরের মালী ততক্ষণে গান বন্ধ করেছে। বাইরে বোধ হয় হাওয়া খেতে এসেছিল। আমাদের কথাবার্তা শুনে কাছে এগিয়ে এল।

বললে—ঠাকুর মশাই কী বলছিলেন এতক্ষণ?

—ঠাকুর মশাই কে? জিজ্ঞেস করলাম

—কেন, ওই যে চলে গেলেন!

—ও তো মনোহরবাবু।

—সেই নাম বললেন নাকি? বড় মজার মানুষ বটে—

—ওকে চেন নাকি? কী করেন উনি? এখানে রোজ আসেন?

—সন্ধ্যে-বেলাটা আসেন রোজ আর দিনের বেলা বই-টই লেখেন—'হারেম-সুন্দরী' পড়েননি? ও'রই তো লেখা—

—ওরই নাম কি রসিক ভট্টাচার্যি? আমি যেন আকাশ থেকে পড়েছি।

—তা জানিনে বাবু, তবে আমার পরিবারের গল্পটা নিয়ে লিখেছেন ও'র 'হারেম-সুন্দরী', আর ওই যে দেখছেন ঘাসে বসে লোকগুলো গাঁজা খাচ্ছে, ওদের নিয়ে লিখেছেন 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাত',—

'আশ্চর্য!

—আর ওই যে মেয়েলোকটা ঘোমটা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্ধকারে, ওকে নিয়ে লিখেছেন 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী', আর রাস্তার কোণে ওই যে হিন্দুস্থানী মেয়ে মানুষটা মাংসের বড়া ভাজছে, ওকে নিয়েও লিখেছেন। সেখানার নাম 'পসারিণী'!

আশ্চর্যই বটে। গল্প শীকার করতে এসে শেষ কালে কি নিজেই অন্যের শীকার হয়ে গেলাম।

অনেক দিন পরে কিন্তু সত্যি যা' ভয় করেছিলাম তাই ঘটলো। আপনারা পড়েছেন কিনা জানিনা, রসিক ভট্টাচার্যি শেষ জীবনে যে গল্পটা লিখেছিলেন 'বিজন বিপিনে বিমলকুমার' নামে (লজ্জা ত্যাগ করে বলেই ফেলি)—ওটা আমাকে নিয়েই।

টিউনিসিয়ার ভাগ্য

দেখা যাচ্ছে টিউনিসিয়াকে ইউনো'র সিকিউরিটি কাউন্সিলের আলোচ্য বিষয়ের পর্যায়ে তোলা অবধি সম্ভব হচ্ছে না। ইউনো'র ১১টি আরব ও এশিয় সদস্য-দেশের প্রতিনিধি টিউনিসিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বর্ণনা করে সিকিউরিটি কাউন্সিলের নিকট একটি অনুরোধপত্র পাঠান যাতে সিকিউরিটি কাউন্সিলে বিষয়টি আলোচিত হতে পারে। ফ্রান্সের পক্ষ থেকে সিকিউরিটি কাউন্সিলে বলা হয়েছে যে, টিউনিসিয়া সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করার আবশ্যকতা নেই, টিউনিসিয়ার সব ঠিক আছে; ফরাসীদের সঙ্গে 'বে'র আর কোনো মতানৈক্য নেই, আগেকার অনর্থ সৃষ্টিকারী মন্ত্রীদের বরখাস্ত করে যাঁকে নূতন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে তিনি ফরাসীদের সঙ্গে আপোষমীমাংসার নীতি অনুসরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুত, ফরাসী গভর্নমেণ্ট যে শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন 'বে' এবং নূতন প্রধানমন্ত্রী সেগুলি গ্রহণ করতে প্রস্তুত—অতএব টিউনিসিয়ার শান্তির জন্য এখন আর কোনো উদ্বেগের কারণ নেই, টিউনিসিয়ার বিষয় এখন সিকিউরিটি কাউন্সিলে আলোচনা করলেই বরঞ্চ আবার গোলমাল হবার সম্ভাবনা আছে। আলোচনা করার জন্য যাঁরা সিকিউরিটি কাউন্সিলকে অনুরোধ করেছেন ফ্রান্সের প্রতিনিধি তাঁদেরকেই এক হাত নিয়েছেন এই বলে যে, তাঁরা অযথা ফ্রান্সের বদনাম করেছেন।

বলা বাহুল্য ফরাসী প্রতিনিধির বক্তৃতা আগাগোড়া বিকৃতিপূর্ণ। ফরাসীরা টিউনিসিয়ায় পুরোমাত্রায় সন্ত্রাসনীতি চালিয়েছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তারা টিউনিসিয়ার মনোভাব পরিবর্তন করতে পারেনি, সহজে পারবে বলেও মনে হচ্ছে না। 'বে'কে দিয়ে তারা আগের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিয়ে জাতীয়তাবাদী মন্ত্রীদের বন্দী করে; তারপর 'বে'-কে দিয়ে এক বিবৃতি দেওয়ায় যাতে তিনি বলেন যে, ফরাসী রেসিডেণ্ট জেনারেলের সঙ্গে তাঁর কোনো মতদ্বৈধ নেই। লোকেরা বুঝেছিল যে, 'বে'-কে দিয়ে জোড় করিয়ে এসব করানো হচ্ছে, তা সত্ত্বেও তারা 'বে'র এই আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। যাঁকে নূতন প্রধানমন্ত্রী করা হোল তিনি অবশ্য ফরাসীদেরও মনোনীত ব্যক্তি। তাঁর পিছনে যে জনমতের বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই সেটা বুঝা যায় এই থেকে যে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবার সাত দিনের মধ্যে তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারলেন না, কারণ কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এ অবস্থায় এই ফরাসী হুকুমে গঠিত মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে সম্মত নন। জনমতের অবস্থা বুঝে 'বে'ও এখন যতটা সম্ভব আলগা থাকবার চেষ্টা করছেন, তিনি রাজধানী ছেড়ে তাঁর গ্রীষ্মাবাসে চলে গেছেন, সাধারণতঃ আরো একমাস পরে সেখানে যাবার কথা। এদিকে নূতন প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারছেন না দেখে ফরাসীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল কারণ যাহোক একটা মন্ত্রিসভা খাড়া করতে পারলে সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাছে ধাপ্পাবাজি করা সহজ হবে। শেষ-পর্যন্ত একটা মন্ত্রিসভার নামের তালিকা নাকি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন বলে ফরাসী কর্তৃপক্ষ বলেছেন। যাই হোক সকলেই জানে এবং ফরাসীরাও জানে যে, এই মন্ত্রিসভার পিছনে কোনো জাতীয় সমর্থন নেই। সুতরাং টিউনিসিয়াকে দাবিয়ে রাখতে হলে ফরাসীদের সন্ত্রাস নীতি অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, তাই-ই তারা করছে। নিও-দস্তুর (ন্যাশনালিস্ট) পার্টিই হোল টিউনিসিয়ার একমাত্র উল্লেখযোগ্য জনগণ সমর্থিত রাজনীতিক দল। এই দল যে ভীষণ উগ্রপন্থী তা কিছু নয়, তবে তারা স্বাধীনতা চায়। পূর্বতন মন্ত্রীরা, যাদের আটক করা হয়েছে তাঁরা এই দলভুক্ত। এই দলকে পিষে মারার যাবতীয় আয়োজন ফরাসীরা করছে। বেপরোয়া গুলীগোলা চালানো ছাড়া হাজার হাজার লোককে বন্দী করা হয়েছে। যাদের সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক নেই এমনও শত শত লোক গ্রেপ্তার হয়েছে, লেখাপড়া-জানা টিউনিসিয়ান মাত্রকেই ফরাসীরা সন্দেহের চক্ষে দেখছে। বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মধ্যে অনেক ডাক্তারও আছেন। যদিও ফরাসীরা নিও-দস্তুর পার্টির যাকে পেয়েছে তাকেই ধরেছে এবং পার্টির মুখ বন্ধ করার সমস্তরকম চেষ্টাই করা হচ্ছে, তা সত্ত্বেও পার্টির পক্ষ থেকে এই ঘোষণা ফরাসীরা আটকাতে পারে নি যে, ফরাসী-প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনা টিউনিসিয়ান-দের গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তাতে আসল ক্ষমতা ফরাসী রেসিডেণ্ট জেনারেলের হাতেই থেকে যাবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, টিউনিসিয়ার শান্তির সমস্যার সমাধান হয়নি, হতে অনেক বাকী, ফরাসীরা যাই বলুক। ইংরেজ ও আমেরিকা সবই জানে, তা সত্ত্বেও তারা সিকিউরিটি কাউন্সিলে টিউনিসিয়ার বিষয়ে আলোচনা হতে না দেবার পক্ষপাতী। গত সপ্তাহেই আমরা বলেছিলাম যে, এ বিষয়ে বৃটেন বা আমেরিকা ফ্রান্সকে জোর করে কিছু বলবে না, তবে এখানে কম্যুনিজম্-এর প্রশ্ন নেই বলে আমেরিকার মনোভাব টিউনিসিয়ানদের প্রতি কিঞ্চিৎ দয়ার্দ্র হতেও পারে, এইরকম একটা ক্ষীণ আশা হয়ত ছিল। ফরাসী-মরক্কোর বেলাতেও এইরকম আশা যাঁরা করেছিলেন তাঁরা পরে নিরাশ হয়েছেন। মিশরে ইংরেজরা যা চায় তাই করতে পারছে, আমেরিকা বাধা দেয়নি এবং দিচ্ছে না। টিউনিসিয়াতেও ফরাসীদের সংযত করতে আমেরিকা রাজী হোল না। কী করেই বা হবে? ইন্দোচীনে ফরাসীদের দিয়ে লড়াতে হচ্ছে; খাস য়ুরোপের 'রক্ষাব্যবস্থা'র ভিতরেও ফ্রান্সের উপর অনেক ভার চাপাতে হচ্ছে, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের কয়েকটি প্রধান মার্কিন বিমানঘাঁটি উত্তর-আফ্রিকাস্থ ফরাসী ঔপনিবেশিক রাজ্যে অবস্থিত—সুতরাং ফ্রান্সকে সমর্থন আমেরিকার করতেই হবে।

একদা মনে হয়েছিল, আমেরিকা মধ্য-প্রাচ্যের নবজাগ্রত ন্যাশনালিজ্‌ম্-এর সঙ্গে সহযোগমূলক একটা নূতন সম্পর্ক স্থাপন করতে উৎসুক হবে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, আমেরিকা, বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পুরাতন কৌশলের প্রাধান্য মেনে নিয়ে মিশরে এবং মরক্কো ও টিউনিসিয়াতে ফরাসী নীতির পুরোমাত্রায় পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিশরে যেভাবে নাহাস পাশাকে সরিয়ে আলি মেহের পাশাকে এবং পরে তাঁকেও সরিয়ে হিলালী পাশাকে বসিয়ে শান্তি আনা হয়েছে, তারপরে বৃটেনের পক্ষে ফ্রান্সকে বলা কি সম্ভব?

দক্ষিণ আফ্রিকা

বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার যাবতীয় অয়ুরোপীয়দের যুক্ত অহিংস সংগ্রাম আসন্ন। ৬ই এপ্রিল দক্ষিণ আফ্রিকার যাবতীয় অ-য়ুরোপীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকার বড়ো বড়ো শহরে বর্ণ-বৈষম্যের প্রতিবাদে আদিম আফ্রিকাবাসী এবং ভারতীয় ও অন্যান্য অ-য়ুরোপীয় জাতীয়দের জনসভা হবে। আইন অমান্য আন্দোলন কার্যত কবে থেকে আরম্ভ হবে সেটা নেতারা পরে ঘোষণা করবেন। ৬।৪।৫২

চক্রদত্ত

ডাঃ পল রোমান বলেন যে, সিফিলিস রোগ রোগীর জীবনীশক্তি কমিয়ে দেয়। তিনি ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পোঁছেছেন। প্রায় ৭০ জোড়া পুরুষ ও ৭০ জোড়া মেয়ে ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এক একটি খাঁচায় মধ্যে এক জাতীয় এক জোড়া করে ইঁদুর রাখতে লাগলেন। তার মধ্যে একটি সুস্থ ও একটি সিফিলিস্‌গ্রস্ত। স্ত্রী ইঁদুরের খাঁচাতে দেখা গেল যে, যেখানে সুস্থ ইঁদুরটি ৬৯৪ দিন বাঁচে সেখানে রোগগ্রস্তটি ৬১৪ দিন বাঁচে। পুরুষ ইঁদুরের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, সুস্থটি ৫৯১ দিন ও অসুস্থটি ৫০২ দিন বাঁচে।

*

জ্যোতির্বিদগণের মতে সৌরজগতে এখনও এমন শত শত তারা আছে যেগুলো সূর্যের চেয়ে ৬০০০ গুণ বেশী গরম। এদের আলোটা ধূলিসমাচ্ছন্ন মেঘের মধ্যে দিয়ে আসে বলে এর ঔজ্জ্বল্য কিছু ম্লান ও আলোটি লাল দেখায়। জ্যোতির্বিদগণের মত হচ্ছে যে, এইসব তারাগুলি এতদূরে যে, এর যে আলো আমরা আজ দেখতে পাই তা বোধ হয় ৫০০০ বছর আগে তারা থেকে বিকীর্ণ হয়ে পৃথিবীর দিকে আসতে আরম্ভ করেছে।

*

ডাঃ জোসেফ উলফি বিনা অস্ত্র-চিকিৎসায় গ্যাংরিন অর্থাৎ গলিত ক্ষত সারাবার ব্যবস্থা করেছেন। ডাঃ জোসেফের পদ্ধতি অনুসারে গ্যাংরিনের চিকিৎসার্থে গরুর প্যাংক্রিয়াসের নির্যাস বার করে সেইটে অন্তঃশিরা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। এই নির্যাসটি শরীরের ভেতরের চর্বি গলিয়ে দেয় এবং ধমনীগুলিকে সংকোচন মুক্ত করে। ফলে শরীরের রক্ত-চলাচল স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে এবং ক্ষতস্থানটি ক্রমশ সুস্থ হয়।

*

আজকার দিনে প্যারাসুট বাহিনী যুদ্ধের অন্যতম সজ্জা বিশেষ। তবে এর অসুবিধা অনেক। এরোপ্লেন থেকে প্যারাসুট সহ লাফিয়ে পড়ার পর মাটি থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে এসে প্যারাসুটটি খুলতে হয়। এই দূরত্ব নির্ণয় করা খুবই দুরূহ কাজ তাছাড়া অনেক সময় প্যারাসুট খুলতে গিয়ে দেখা যায় দড়ি আটকে গেছে খোলা যাচ্ছে না। ফলে প্যারাসুটবাহীর অবস্থা রীতিমত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। একটি সুইস কোম্পানী একরকম ঘড়ি তৈরী করেছে। এই ঘড়িটি প্যারাসুটের সঙ্গে আটকান থাকে। এরোপ্লেন থেকে লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি ফাঁস টেনে দিলেই ঘড়িটি চলতে থাকে। ঘড়ির ডায়ালে শূন্য থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত সংখ্যা দেওয়া
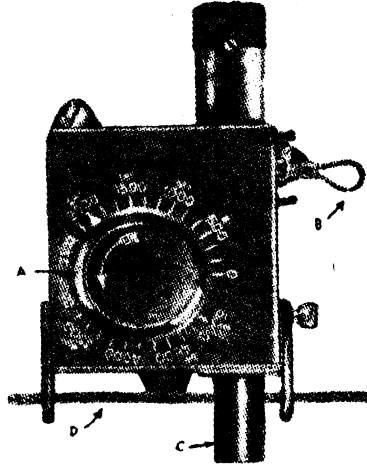
A—ঘড়ির ডায়াল নির্দেশ করছে।
B—ঘড়িটি চালু করার ফাঁস।
C—ঘড়ির সংলগ্ন ছুরির ফলাসহ টিউব।
D—প্যারাসুটের দড়ি।

আছে এই সংখ্যাগুলি মাটি থেকে শূন্যের দূরত্ব নির্দেশ করে। যে সংখ্যায় এসে প্যারাসুটটি খোলা দরকার সেটি আগে থেকে ঠিক করে নিতে হয়। প্যারাসুটের দড়িটা ঘড়ির সংলগ্ন একটা টিউবের মধ্য দিয়ে যেতে থাকে এবং নির্ধারিত দূরত্বে পোঁছালে টিউবের মধ্যে একটি ছোট্ট ছুরির ফলা থাকে সেইটি দড়িটা কেটে দেয়। তখন প্যারাসুটটা খুলে যায়।

*

নতুন ধরণের এক প্লাস্টিক বার হয়েছে, একে এক কথায় অভেদ্য প্লাস্টিক বলা যেতে পারে। দশ গজ দূর থেকে রিভলবারের গুলী ছুঁড়ে মারলেও এটাকে ভেদ করা যায় না। আঘাত প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা সাধারণ প্লাস্টিকের চেয়ে বেশি থাকায় এই নতুন প্লাস্টিকের তাপ ও বৈদ্যুতিক শক্তি প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাও বেশি হয়। 'ফাইবার গ্লাস' ও প্লাস্টিকের রেজিন জাতীয় পদার্থের সংমিশ্রণে এইটি তৈরি হয়। এই সব জিনিস দিয়ে আগেও প্লাস্টিক তৈরি হত, তবে বর্তমানে তাপ ও চাপের সাহায্যে এই নতুন জিনিসটি তৈরি করা হয়েছে। এই প্লাস্টিককে এখন 'প্লাস্কন' বলা হয়। প্লাস্কন সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহারে লাগে কি না, পরীক্ষা করা হচ্ছে। অ-সামরিক কাজ হিসাবে রেফ্রিজারেটারে, মোটর গাড়ির বিভিন্ন অংশে ও বৈদ্যুতিক কাজে এই প্লাস্কন ব্যবহার করা যেতে পারে।

*

পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে জ্বালানি বস্তুর অভাব হয়, হেনরি হোলম্যান নামক একজন রসায়নবিদ্ এই অভাব দূরীকরণে মনস্থ করেছেন। তিনি যে নতুন জ্বালানি পদার্থ আবিষ্কার করেছেন, তার নাম দিয়েছেন 'হোলম্যানাইট'। লিগনাইট বা খুব খারাপ জাতীয় কয়লা বা কাদার সঙ্গে কোনও রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে জ্বালানি শক্তিটা খুব বৃদ্ধি করা হয় এবং তারই নামকরণ হয়েছে হোলম্যানাইট। যে কোনও উৎকৃষ্ট জাতীয় কয়লার চেয়ে হোলম্যানইটের জ্বালানি শক্তি বেশি। হোলম্যানাইট কয়লার সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করে যদি এই কয়লার পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে পৃথিবীতে জ্বালানির অভাব না ঘটতে পারে। কোন্ রাসায়নিক পদার্থটি ব্যবহার করা হয় সেটা এর প্রস্তুতকারক কোম্পানি সাধারণের গোচরীভূত করতে চান না, তবে তাঁদের মতে এই রাসায়নিক পদার্থটির কোনও দিন অভাব হবে না।

*

এক নতুন প্রণালীতে রবার তৈরি করে আমেরিকার রবার উৎপাদন শতকরা ছাব্বিশ ভাগ বেড়ে গেছে। চিনি এবং অন্যান্য কতকগুলি বস্তুর সংমিশ্রণে এই নতুন প্রণালীতে রবার তৈরি হচ্ছে। আগে ৪১ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপে ঠাণ্ডা রবার তৈরি হতো, এখন ১২২ ডিগ্রী ফারেনহাইটে গরম রবার তৈরি হচ্ছে। এই রবারটি এখন কলকব্জা তৈরির ব্যাপারে, কিংবা জুতো তৈরির কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কাশ্মীরে তপস্বিনী

ক্ষিতিমোহন সেন

সবারই মুখে ছেলেবেলা থেকে ক্রমাগত শুনে আসছি—"কাশ্মীর ভূস্বর্গ।" আসল স্বর্গটাকে প্রত্যক্ষ করে' ফিরে আসবার তো উপায় নেই, তা সে স্বর্গ যতই লোভনীয় হোক। তাই আসল স্বর্গের সঙ্গে মোলাকাত করবার ইচ্ছে আমরা প্রাণপণে সংযত করে' রাখি। কিন্তু ভূস্বর্গ কাশ্মীরকে তো প্রত্যক্ষ করে, সেখানকার আনন্দ আস্বাদ করে ফিরে আসা যায়। তাই কাশ্মীরের পরিচয় পাবার জন্য ইচ্ছে থাকাটা কিছু অন্যায় নয়। তবু দু'চারজন তীর্থযাত্রী সাধারণ লোক বা "টুরিস্ট" বা ভ্রমণকারী পয়সাওয়ালা লোক ছাড়া কাশ্মীরের সঙ্গে পরিচয় অল্প লোকেরই আছে। সেই পরিচয়টুকুও যাঁদের আছে তাঁরাও কাশ্মীরের দু'চারটে প্রখ্যাত স্থানেরই খবর রাখেন। কাশ্মীরের অন্তরের পরিচয় তেমন কিছু রাখেন না।

ইদানীং রাজনীতিগত কারণে কাশ্মীরের কথাটা চরমে গিয়ে উঠেছে। তাই এখন ঘন ঘন কাশ্মীর ও তার রাজনীতিওয়ালাদের খবরাখবর আসাযাওয়া করবে। কিন্তু সে সব কি কাশ্মীরের মরমের খবর? হয়তো কাশ্মীরের সেই অন্তর্গূঢ় পরিচয় নেবার চেষ্টা রাজনীতিওয়ালারাও কখনো করেন নি, করতে পারেনও না।

এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ "ডকটর" উপাধি পাবার জন্য কাশ্মীরের "রাজতরঙ্গিনী" বা কাশ্মীরের পাশুপত দর্শনের কিছু আলোচনা করেছেন। প্রাচীন যুগেও আমাদের পণ্ডিতেরা কাশ্মীরের শৈবাগমের ও অলংকার শাস্ত্রের ও প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের খবর কিছু কিছু রাখতেন। বারেন্দ্রকুলসম্ভব আচার্য লক্ষণ দেশিক তো কাশ্মীরের উৎপলাচার্যের ধারায় দীক্ষিত। তবু সর্বসাধারণে কাশ্মীরের মর্মকথা জানতেন না, সেখানকার প্রাকৃত লোক বা তাঁদের অন্তরের পরিচয়ের কিছু মাত্র সুযোগ পেতেন না।

কী সৌজন্যে এই সুযোগ কিছুকালের জন্য আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু হায় তখন বয়স অল্প ছিল। তাই সেই সুযোগের যেরূপ সদ্ব্যবহার করা উচিত ছিল, সেরূপ কিছুই করতে পারি নি। জীবনের শেষ-ভাগে বারবার সেজন্য অনুতাপ হয়। "কল্পনা" কাব্য গ্রন্থে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'ভ্রষ্টলগ্ন' নামে কবিতার কথা সবাই জানেন। সেখানে জীবনের সুযোগের যে লগ্নভ্রষ্ট হয়েছে, তার জন্য কবিগুরুর দারুণ বেদনা। কিন্তু যাদের জীবনে ক্রমাগতই সুযোগগুলি ভ্রষ্ট হয়েছে তাদের কথা কি করে বোঝা যায়? সেই বেদনার কথাই আজ বলতে চাই।

"চিত্রা" কাব্যেও কবিগুরু বেদনার সঙ্গে জানিয়েছেন, জীবনে অনেক সুযোগ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তবু এখনো সময় যদি থাকে, তবে এখনো জীবনের গতি ফিরিয়ে নিতে হবে। তাই তাঁর কবিতা "এবার ফিরাও মোরে।" কারণ তখনও আশা আছে। কিন্তু ফিরে গিয়েও যখন কিছু লাভ হয় না, তখনকার বেদনাই দুঃসহ। সেই বেদনার কথা দেখতে পাই "চিত্রা" কাব্যের "পরশ পাথর" কবিতায়।

এক সন্ন্যাসী বাহির হয়েছেন পরশ পাথরের খোঁজে। কোমরে লোহার শিকল। সিন্ধু-তীরে অসংখ্য শিলা। একটির পর একটি শিলা সেই শিকলে ছুঁইয়ে পরখ করে-করে সন্ন্যাসী চলেছেন। ক্রমে তাঁর মাথায় জটা জমলো, কটিবাস ছিন্ন হয়ে এলো। দারুণ দুর্গতি। তার চেয়েও দুর্গতি এই খোঁজাটাও আর খোঁজা রইল না, হয়ে দাঁড়ালো একটি প্রাণহীন অভ্যস্ত আচার মাত্র। হায়-হায়, তারই মধ্যে একদিন খাঁটি পরশ পাথরের পরশ মিললো। লোহার শিকল হঠাৎ সোনা হয়ে গেল। সন্ন্যাসী তখন খবরও পেলেন না। অগণিত পাথরের মধ্যে পরশ পাথরকে না জেনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সব পাথরের সঙ্গে সেই পরশমণিও মিশে গেল।

সন্ন্যাসী হেঁটেই বলেছেন। হঠাৎ গ্রাম-বাসী ছেলে শুধাল—

"সন্ন্যাসী ঠাকুর এ কি! কাঁকালে ও কি ও দেখি!
সোনার শিকল তুমি কোথা হতে পেলে?"

সন্ন্যাসী তখন চমকে ওঠেন।

"সন্ন্যাসী চমকি ওঠে, শিকল সোনার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।
এ কি কাণ্ড চমৎকার, তুলে দেখে বার বার
আঁখি কচালিয়া দেখে, এ নহে স্বপন।
কপালে হানিয়া কর বসে পড়ে ভূমি পর
নিজেরে করিতে চায় নির্দয় লাঞ্ছনা,—
পাগলের মত চায়— কোথা গেল হায় হায়
ধরা দিয়ে পলাইল সকল বাঞ্ছনা।
কেবল অভ্যাস মত নুড়ি ছড়াইত কত
ঠন্ করে ঠেকাইত শিকলের পর,—
চেয়ে দেখিত না, নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশ পাথর।"

(পরশ পাথর, চিত্রা)

হায় হায় অভ্যাসের দুর্গতিতে পরশ রতনকে পেয়েও হারাতে হোল। সন্ন্যাসী খবরও পান নি সচেতন সাধনা কখন অচেতন অভ্যাসে কর্মকাণ্ড বা আচারে পরিণত হয়েছে। তাই ঘটেছে এই দুর্গতি। এখন উপায়? আবার শুরু থেকে কি সেই খোঁজাটাই চালাতে হবে? কিন্তু হায় তখন সে জীবন শেষ হয়ে এসেছে! আর কি জীবনব্যাপী সাধনার সময় বা শক্তি আছে? কবির ভাষাতেই বলা যাক সেই বেদনার কথা—

"তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন
আকাশ সোনার বর্ণ সমুদ্র গলিত স্বর্ণ
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন।
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্ব পথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন করে হারানো রতন।
সে শকতি নাহি আর নুয়ে পড়ে দেহভার
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে চক্ষু বুজি'
স্পর্শ লভেছিল যায় এক পল ভয়—
বাকি অর্ধভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর।"

(পরশ পাথর, চিত্রা)

এমন করে জীবনে কত মহাপুরুষ-সঙ্গের সুযোগ পেয়েও চৈতন্যের অভাবে তা হারিয়েছি। কবিগুরুর এই বেদনাকে জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি বলেই এই কবিতাটির মর্ম বুঝতে পেরেছি।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বেকার কথা। আমি তখন কাশ্মীরের কাছে হিমালয় প্রদেশে বাস করি। বিদ্যা সাধনা নিয়েই আমার সেখানে বাস। আমি বাঙলা দেশের মানুষ। প্রথমেই চোখে পড়তো কাশ্মীর ও বাঙলা দেশের প্রভেদ। বাঙলা দেশ একেবারে

সমুদ্রের সমতল নিম্নভূমিতে অবস্থিত, আর কাশ্মীর হোলো সমুদ্রতল হতে বহু হাজার ফুট উর্ধ্বে তুষারসীমা পর্যন্ত উচ্চ। বাঙলা দেশ গরম, তার ফসল গাছপালা ফলমূল সবই গরমের দেশের যোগ্য। আর কাশ্মীর শীতপ্রধান, তার সবই শীতদেশের উপযোগী।

তবু বাঙলা দেশ ও কাশ্মীরের মধ্যে কী যেন একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ অনুভব করতাম। দুই দেশেরই নদী, নৌকা, নেয়ে, নেয়েদের গান সুর ও জীবনযাত্রার যোগ দেখি। দুই দেশেই লোকে খায় ভাত, নিরামিষের বাধা কেউ মানে না। দুই দেশেই হিন্দুর চেয়ে মুসলমান বেশী। দুই দেশেরই পণ্ডিতেরা অতিশয় তীক্ষ্ন বুদ্ধি, বুদ্ধিজীবী, কিন্তু দুর্বল। বুদ্ধির একটু গর্বও তাদের প্রত্যেকের আছে। তাই তাদের মধ্যে ঐক্য কম, দলাদলি বেশি। বাঙলা দেশ ও কাশ্মীর এই দুই দেশেই দেখা যায় শৈবশাস্ত্র ও তন্ত্র-শাস্ত্রের আদর। উভয় দেশেই একই কৌল-আচার সমাদৃত। আয়ুর্বেদের রস-পাক বিধানে ও জ্যোতিষ গণনার পদ্ধতিতেও উভয় দেশের অনেকটা মিল আছে। উভয় দেশেই ব্যাকরণে পাণিনির বদলে চলে কলাপ বা কৃতিন্দ্র ব্যাকরণ। কাব্যে সাহিত্যে শৈবাগমে কাশ্মীরের অভিনবগুপ্তপাদের তুলনা নেই। বাঙলা দেশেও মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতির সমকক্ষও কাউকে দেখা যায় না। বারেন্দ্র লক্ষণ দেশিক তো সগর্বে কাশ্মীরগুরু উৎপলাচার্যের ধারায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন।।

এত বুদ্ধি সত্ত্বেও বাঙলা দেশে লোক ধর্মাচরণে চলে প্রধানত প্রেম ও ভক্তির আবেগে। বাঙলার বৈরাগী আছে বৈষ্ণব আছে বাউল আছে। তাতো কাশ্মীরে প্রথমে দেখিনি। কাশ্মীরে ভাল ভাল পণ্ডিতগুরু পেয়েছিলাম। তন্ত্রও দৈবালগুরুর দেখাও পেয়েছিলাম। কাজেই কাশ্মীরের শাস্ত্র-জ্ঞানের কিছু পরিচয় পেয়েছিলাম। কিন্তু কাশ্মীরের প্রাকৃত জনচিত্তের প্রেমভক্তির খোঁজ আগে পাইনি। তাও একদিন হঠাৎ পেয়ে গেলাম। কিন্তু সেই সুযোগটাকে জীবনে ভাল করে গ্রহণ করতে পারলাম না। দুঃখ সেখানেই। সেই কথাই বলা যাক।

পাকিস্থান হবার পূর্ব পর্যন্ত ভারত হতে কাশ্মীরে যেতে প্রধান দুটো পথই ছিল। একটা রাওলপিণ্ডী (Rowalpindi) হয়ে মরী পর্বতের উপর দিয়ে। আর একটা পথ (Jammu) জম্মু দিয়ে। তার চেয়ে অনেক সুন্দর পথও আছে, কিন্তু সে সব পথ তখন ছিল বড়ই দুর্গম। যদিও এখন হয়তো সেই সব দিক দিয়েই কাশ্মীরের পথ বের করতে হচ্ছে। ইরাবতী নদীর উপত্যকা হতে ভদ্রওয়ার কিস্তওয়ার (Bhadrawar Kishtwar) দিয়ে যে পথ তার সৌন্দর্যের তুলনা নেই। সেই পথের সঙ্গে আমার অনেক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে আছে। সে সব কথা বলবার দিন আজ নয়।

কাশ্মীরের শাস্ত্রজ্ঞানের কিছু পরিচয় পেয়ে ভাবছি এতো বাঙলা দেশেরই মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি-বিচারের দেশ। শুধু এখানে নেই বাঙলা দেশের মত প্রেমভক্তি। ক্রমে প্রসিদ্ধ কবি ইকবালের সঙ্গে আমার পরিচয় হোলো। মুসলমান হলেও তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ। সে গর্ব তিনি নিজেই আমার কাছে এক দিন করেছেন। তিনি বলেছিলেন, "কাশ্মীরে মুসলমানধর্ম প্রচার করেছিলেন সুফী প্রেমিক ও ভক্তদের দল। তাঁদের ষোলটি গদি বা আখড়া কাশ্মীরে ছিল। তাই কাশ্মীরে হিন্দু মুসল-মানে এমন প্রেমভক্তির যোগ। বাঙলায় বাউলদের মতো বহু ভক্ত কাশ্মীরে আছেন। তার মধ্যে লালদেদ একজন।"

লালদেদ কে ছিলেন? খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি ছিলেন নারী। অস্পৃশ্য জাতির ঘরে তাঁর জন্ম। কারও কারও মতে তাঁর জাতি ছিল ঢেড় (Dhedh) বা অস্পৃশ্য। চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন ভারতে দর্জি নামদেব ও কসাই সদনার সাধনা দীপ্ত হয়ে উঠেছে, তখন অস্পৃশ্য ঢেড়ের ঘরে এই মহীয়সী নারীর জন্ম। সাধক শ্রীকান্ত তাঁর গুরু।

যদিও শিবভক্তির পথ দিয়েই তাঁর জীবন অগ্রসর হয় তবু তিনি একটুও সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। কেউ কেউ বলেন, মুসলমান সাধক শেখ নুরদীন ও সৈয়দ আলী হমদানীর সঙ্গে তাঁর সাধনাগত যোগ ছিল। (১৩৮০-৮৫ খৃষ্টাব্দ)। এই সব খবর আবার পরে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণায়ও পেয়েছি। লালদেদ শৈব হলেও সম্প্রদায়-সীমায় বদ্ধ ছিলেন না। তিনি অতি গভীর ভাবের সাধিকা ছিলেন। তাঁর অনেক বাণীর প্রভাব কবীরের মধ্যেও দেখতে পাই। কাশ্মীরে বাউল ভাবের প্রবর্তক ও সাধিকাদের মধ্যে লালদেদ একজন। এই লালদেদের নাম কানে শুনলেও তাঁর সাধনায় দীপ্ত কোন সাধককে বহু দিন চক্ষে দেখিনি।

১৯০৭ সাল। কাশ্মীরের অপূর্ব গ্রাম-পথে চলেছি। একদিন একটি ছোটো মেয়ে দৌড়ে এসে পথ আটকালো। বরফের মেঘ উঠেছে। মাঝে মাঝে বরফ পড়বে। একটু বিশেষ রকমের বরফ পড়বার আশঙ্কা দেখে গ্রামের গৃহস্থেরা রাস্তায় মেয়েটাকে বসিয়ে রেখেছে। কেউ যেন দুর্যোগে এগিয়ে না যায়। বরফ পড়া শুরু হবে, সম্মুখে আশ্রয় নেই। আশ্রয় না পেলে যাত্রীকে মরতে হবে। তখন সেই দেশে এরূপ আতিথ্য খুবই ছিল।

গ্রামে আশ্রয় নেওয়া গেল। যে গৃহস্থের ঘরে আমার স্থান হলো তিনি ধনী নন, তবে খাদ্যের অভাব নেই। ঘরে শস্য আছে। মোটা রকমের অন্নবস্ত্র আছে। গরুবাছুর অনেক। দুধ ঘী প্রচুর। মাখন সকালে বিস্তর হয়, ঘোলেরও তাই অভাব নেই। অভাব শুধু গুড় বা চিনির। অত শীতে ইক্ষু হয় না। মধু প্রচুর হয়। ঘরে ঘরে মৌমাছি পালবার ব্যবস্থা আছে। যত ইচ্ছা মধু খেতে পায়। তবে টাকা পয়সা নেই।

সাদাসিধা রকমের আতিথ্য সেই পথে তখনকার দিনে সর্বদাই মিলতো। যদিও "সেই দিন" এখন প্রায় অর্ধশতাব্দী আগেকার কথা। সেই আতিথ্যে হৃদ্যতা তখন ছিল অথচ কোন বাহ্য আড়ম্বর বা কৃত্রিমতা ছিল না।

বরফের ঝড় এলো। কয়দিন সেখানে আটকে রইলাম। তাঁদের সাদাসিধা যত্ন ও সঙ্কোচে মনে হোলো যেন ঘরেই আছি। কাছাকাছি কয়েকখানা বাড়ীতে আরও অনেকে আশ্রয় পেয়েছেন। তার মধ্যে এমন একজন আশ্রয় নিয়েছেন যাঁর কথা অনেক দিন মনে থাকবার মতো। তিনি একটি বৃদ্ধা সাধনারতা নারী। তাঁর বস্ত্র শতচ্ছিন্ন। অতি দরিদ্র তাঁর বেশভূষা। অথচ তাঁর দৃষ্টি কী শান্ত ও গভীর। ঐ গ্রামে গৃহস্থেরা এই সাধ্বীকে দেখা গেল বেশ জানেন ও অতিশয় সম্মান করেন। তাঁকে সকলে ভাল বস্ত্র দিতে চাইলেন। তিনিই নিলেন না। বল্লেন, আমার তো কোন দরকার নেই। বরং যাঁর দরকার তাঁকে দিও।"

কয়টা দিন তাঁর বাড়ীতে ওখানে আমরা মশগুল ছিলাম।

ভাবছি, তার কাছে ভাল করে বসে কিছু সংগ্রহ করবো। এমন সময় এক দিন শেষ-রাত্রে দুর্যোগের একটু অবসান হয়ে আসতেই বরফের মধ্যেই হঠাৎ সেই বৃদ্ধা

কোথায় প্রস্থান করেছেন। তখনও রাস্তায় বরফ রয়েছে, তখনো কেউ বাইরেও যেতে আরম্ভ করেন নি। এমন দুর্যোগে সেই সম্মান-ভীতা তাপসী কোথায় চলে গেছেন। কত খোঁজাখুঁজি করলাম। আর তাঁর দেখা পেলাম না। এমন সুযোগ পেয়েও হারাতে হোলো এমনই দুর্ভাগ্য। যখন ভাবছি, ভাল করে কাজে লাগা যাবে, তখন দেখছি সবই শেষ হয়ে গেল।

গৃহস্থেরাও আপসোস করতে লাগলেন। তাঁরাও ভাবেন নি যে এই তাপসী এমন করে সবাইকে ফাঁকি দেবেন। তাঁরা বল্লেন, ইনি এক সময়ে সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। সব সন্তান মারা গেলে ইনি সাধনার পথে নামেন। তাঁর সাধনার কথায় যা তাঁরা বল্লেন, তাতে মনে হোলো ঐ নারীর ভাবগতিক কতকটা বাউলের মত। তাঁর কণ্ঠে এই কয়দিন যাঁদের বাণী ও গান শুনেছি তার মধ্যে একজনের কথা একটু বলতে চাই। তিনি হলেন সেই অস্পৃশ্য জাতীয় সাধিকা লালদেদ। এতদিন লালদেদের নামই শুনে আসছি, এবার তাঁর বাণী আপন কানে শুনলাম। এমন একজনের কাছে শুনলাম যাঁর জীবনে ঐ বাণীগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। লালদেদ সম্বন্ধে অনেক কথা জানবো ভেবেছিলাম, কিন্তু সবই ভেস্তে গেল। সম্মান-ভীতা বৃদ্ধা সাধিকা দেখা দিয়েও সরে পড়লেন।

এই ঘটনার পরে নানা স্থানে লালদেদের বাণী খুঁজতে আরম্ভ করলাম। অনেকদিন পরে দেখলাম, য়ুরোপীয় পণ্ডিতদেরও কেউ কেউ লালদেদের সন্ধান করছেন। কাশ্মীরের বন্ধুরা পরে আমাকে সাধিকা লালদেদের একটি বাণী সংগ্রহ দিলেন। তাতে তাঁর ষাটটি বাণী আছে। বাণীগুলির সংগ্রহকারের নাম হোলো ভাস্করাচার্য। তিনি ছিলেন ২০০ বৎসর পূর্বে "রাজানক" বা ছোটো একজন কাশ্মীরী রাজা। কাশ্মীরী ভাষায় রচিত বাণীগুলির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের সংস্কৃত অনুবাদও দিয়েছেন। সংগ্রহটির নাম হোলো "লল্লেশ্বরী-বাক্যানি"। কাশ্মীরী পদগুলির সংস্কৃতে রূপান্তর করতে গিয়ে তিনি আরম্ভ করেছেন, "সুরপতি গণপতিকে প্রণাম করে শ্রীগুরুর পাদুকা চিত্তে স্মরণ করে লল্লেশ্বরীর এই বাণীগুলি ভাস্কর সংগ্রহ করে পদ্যে রচনা করেছেন।"

নুত্বা দেবং শ্রীগণেশং সুরেশং
স্মৃত্বা চিত্তে শ্রীগুরোঃ পাদুকাং চ।
লল্লাদেবীপ্রোদিতং বাক্যজাতং
পদ্যৈর্বদ্ধং রচ্যতে ভাস্করেণ।

উপসংহারে তিনি লিখছেন, শ্রীলল্লা যোগিনীর ষাটটি বাণী আমি (সংস্কৃত অনুবাদ সহ) প্রকাশ করছি। ভাস্করের সংগৃহীত এই বাণীগুলি শিবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিতে চাই।

শ্রীলল্লাযোগিনীবাক্যজাতং ষষ্ট্যা ময়া স্ফুটম্।
শ্লোকানাং ভাস্করেণেহদ্‌ধমস্তু শিবার্পণম্॥

লল্লা দেবীর বাণীগুলির মধ্যে তাঁর সাধনা-জীবনের কিছু ইতিহাস মেলে। লল্লা ছিলেন অন্ত্যজ কন্যা। তবে কাশ্মীরের অন্ত্যজরাও অপরূপ সুন্দর। লল্লাও পরমা রূপবতী ছিলেন। কিন্তু সাংসারিক ভোগ-সুখে তিনি রূপের ব্যবহার করেন নি। তাঁর বাণী হতেই সে পরিচয় মেলে। সব ক্ষেত্রে মূল কাশ্মীরী পদ উদ্ধৃত করে লাভ নেই। হয়তো সেখানে সে সংস্কৃতটুকুই সকলে বুঝবে—

জরাগতা ক্ষীণতরোদ্য দেহো,
গন্তব্যমেবেহ দৃঢ়ং ন কিঞ্চিৎ॥ (পদ ১৯)

"জরা এসেছে, দেহ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এখন যেতে হবে এখান থেকে। কিছুই তো স্থায়ী নয়। ওরে যাত্রী, পথ দ্যাখ্।"

"কোন্ পথে বা এলাম, কোন্ পথে বা যেতে হবে।" এই কথাই আজ জানতে হবে —(এখানে কাশ্মীরী বাণীটিও চলতে পারে)

আয়স্ কমি দিশিশ্বত্ত কমি বতে,
গচ্ছ কমি বৃতি কব্জান বথ্॥ (পদ ৪১)

সূর্য অস্ত গেলে চন্দ্রের আলো প্রকাশ পায়। তা অস্ত গেলেও শুধু চিত্তের আলোই দীপ্ত হতে থাকে।

ভান্ গলু, তায়, প্রকাশ আব্ জূনে,
চন্দ্র গলু তায় মূবুতু চিৎ॥ (পদ ৯)

চিত্ত লয় হলে শূন্যে হতে শূন্যে হয় সব লীন। তখন শুধু দীপ্ত দীপ্ত থাকে চিৎস্বরূপ (পদ ১১)।

ভুলপথে গেলে এ সাধনা চলবে না। এ পথে কৃত্রিম বা ঝুটায় (কৈতবের) প্রবেশ নেই।

অস্তিহ সকলু কপট চর্যথ্॥ (৩৮ পদ)

সাধনা চাই। তবে সাধনে প্রবৃত্ত হতে হলেও দেখতে হবে সাধ্য কতখানি আছে। বৃথা চেষ্টায় ফল কি?

হাতের জোরে বায়ুকে স্তব্ধ কে করবে? সুতো দিয়ে কে হাতী বাঁধবে?

হস্তু য়ুস্ মস্তবাল গ'ড়ে,
তিহয়স্ তগি সুহ্ অদ ন্যহালু॥ (পদ ২৪)

*এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ব্‌ অক্ষরটি ইংরাজি অক্ষর W-র মতো পড়িতে হইবে।

চাই চৈতন্য। তাই সচেতন হও। সত্যি সত্যি জাগো। সাধক যে জন সে ঘুমের মধ্যেও জাগে। কেহ বা আবার জেগেও ঘুমিয়ে থাকে (পদ ৩২)

এই সাধনায় যে পূজা, তার ফুল-মালী কে? কে বা তার মালিনী? কি বা তার ফুল? কেমন বা পূজা? কি তার জল-পাত্র গাড়ু? কিবা তার মন্ত্র? এইতো প্রশ্ন।

কুসু পুশু তায় কস্‌সে পুশাঞ্জী
কম্ কুসুম্ লাগিজাস্ পূজে।
কমি সর গড়ু দিজাস্ জলধানী—
কব্‌সন মন্ত্র শংকর বুজে॥ (৩৯)

এই তো প্রশ্ন। তার উত্তর হোলো—
এই পূজায় দেখা গেল মনই মালী, ইচ্ছাই মালিনী। ভাব-কুসুমেই তাঁর পূজা। স্বানন্দামৃতরসই তার জলপাত্র। মৌনমন্ত্রেই তাঁর পূজা। (৪০)

লল্লা বলেন, হে দেবতা, আমাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছো বলেই তো তবু উপকরণে তোমার পূজা করি? (৪২)।

তাই পূজায় ফুল তিল প্রভৃতি উপকরণ কিছুই চলবে না। মানস ভক্তিতে যদি পূজা করতে পারি, তবেই অন্তরাত্মার সহজ শুদ্ধি হবে। (৪৫)

ভগবৎপূজা যদি করতে চাও, তবে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ কর। তিনি অন্তরাত্মা। সস্তা বাহ্য-পথ ছাড়। অন্তরে প্রবেশ কর। যিনি স্বর্গত, সর্বরূপ, যিনি মাতৃরূপে জন্ম দিয়েছেন, পয়ঃপান করিয়েছেন, ভার্যারূপে প্রেম বিলাস দিয়েছেন, তাঁকে শিব-উপদেশ ছাড়া সহজ লাভ করতে পারবে না।

সয় মাতারূপি পয় দিয়ে
সয় ভার্যা রূপি করি বিলাস্।
শিব্ ছয় ক্রুঠু তায় চেন উপদেশ॥
(৫১—৫৪ পদ)

মন হোলো দুর্দম্য তুরঙ্গ। বিবেক বল্গায় তাকে সংযত করতে হবে। ক্ষণমাত্রে সে লক্ষ যোজন ধেয়ে বেড়ায় (২৬, ২৮)।

মনকে দগ্ধ না করতে পারলে শিবধাম পাবে কেমন করে?

মনশ্চ দগ্ধ্বা শিবধাম লব্ধম্॥
(২৫ সংস্কৃত)

সাধনায় নাববে? অপরের স্তুতিতে বা নিন্দায় যদি বিচলিত হলে তবেই মরলে। তোমাকে যদি কেও পূজাও করে তবেই বা কি? বিশুদ্ধ বোধামৃত পান করে হর্ষ-লোকের অতীত হতে হবে (২১)। মানুষের কথায় টলমল করলে চলবে না।

লল্লা বলেন, তাঁর কৃপায় আমি সেই সব

ক্ষুদ্রতাকে জয় করেছি। এখন আত্মপর ভেদ আমার ঘুচে গেছে। আপনার মধ্যে আনন্দে মত্ত হয়েছি। (৫৯)

"তাঁকে আত্মার মধ্যে পেয়েছি যিনি অনাহত, স্বস্বরূপ, শূন্যময়। যাঁর নাই নাম নাই বর্ণ নাই রূপ নাই গোত্র।"

অনাহত স্বস্বরূপ শূন্যালয়
যস্ নাব্ না বর্ণ না রূপ না গোত্র্॥ (১৫)

তার জন্য চাই সমদৃষ্টি (৫)

তবেই চিদানন্দ-জ্ঞান-প্রকাশে জীবন্মুক্তি হতে পারে।

চিদানন্দস্ জ্ঞানপ্রকাশস্
......জীবন্তী মুক্তী॥ (৬)

"তোমার চিত্তাদর্শ নির্মল হলেই দীপ্ত হবেন তিনি স্বস্বরূপ। তখন 'তুমি-আমি' বলে ভেদ থাকবে না। প্রপঞ্চের দৃষ্টি থাকবে না। ভেদবুদ্ধি যাবে, সমদৃষ্টি হবে।

চিন্তাদর্শে নির্মলত্বং প্রয়াতে
দৃষ্টো দেবঃ স্বস্বরূপো ময়াসৌ
নাহং ন ত্বং নৈব চায়ং প্রপঞ্চঃ॥ (৩১)

সেই দৃষ্টি আমি লাভ করেছি। এখন জীবনমরণ আমার কাছে সমান হয়ে গেছে।

মৃতামৃতে মাং প্রতি তুল্যরূপে (৩৪)

পরম দেবতাকে খুঁজতে দূরে দূরে ভ্রমণ করছিলাম। তারপর দেখা পেলেম আমার এই আপন দেহে তাঁরই মন্দিরে (৩)

দেখলাম, জীব-ধামই ব্রহ্মাকে দেখি ধারণ করেছে। গঙ্গার মধ্যেই সমুদ্র প্রবেশ করেছে। (২২)।

এতে মনে হয় কবীরের সেই বাণী—

উলটি গংগ সমুদ্রহি শোটষে।

দেখা যায়, তখন সর্বঘটেই তিনি। সর্বরূপে তাঁরই স্বরূপ এবং সর্বাতীতরূপে তাঁরই সত্তা। এইসব কথাই তো বাউলদের ও সন্তদের সার বাণী। এইসব সত্যই কবীর বাণীর সার। কাজেই বুঝিতে পারা যায় কবীর এইসব পদের মূল ভাব কোথায় পেয়েছিলেন। এক এক জায়গায় তো একেবারে এইসব বাণী হুবহু সন্তগণ ব্যবহার করেছেন লল্লাযোগিনী বলেন—

শিব্ বা কেশব্ বা জিন বা,
কমলজনাথ নাম দারিন্ যুস্।
ম্য অব্লি কাসিতন্ ভব্রুজ্
সুহ্ বা সুহ্ বা সুহ্ বা সুহ্॥ (পদ ৮)

অর্থাৎ "তিনি শিবই হোন বা কেশবই হোন বা জিনই (বুদ্ধ) হোন বা কমলজন্মা ব্রহ্মাই হোন্ যে নামই তিনি ধরুন না কেন তিনি সংসার রোগাকবলিতা অবলা আমার ভব রোগ দূর করুন। তিনিই তো তিনি বা তিনিই তো তিনি, বা তিনিই তো তিনি।"

তখনই মনে পড়ে কবীরের—

"কোই রহীম কোই রাম বখানৈ"

প্রভৃতি বিখ্যাত বহু বাণী। দাদূরও বিখ্যাত গান—

অলহ কহো ভাবে রাম কহো॥ (ভৈঁরূ, ৩৯৫)

খৃষ্টাব্দ ১৫৪৪—১৬০৩ হইল দাদূর সময়।

জৈন সাধক আনন্দ ঘন আরও কাছ ঘেঁসে বললেন,

রাম কহো রহিমান কহো কোউ
কান্ কহো মহাদেবরী।
পরেশনাথ কহে কোউ ব্রহ্মা
সকল ব্রহ্ম স্বয়মেবরী॥ (পাদ্ ১০৭ খৃঃ)

রাম, রহিম, কৃষ্ণ, মহাদেব, পরেশনাথ, ব্রহ্মা সবই তিনি।

আনন্দঘন হলেন দাদূরও পরবর্তী।

বাঙলা দেশে বাউলদের মধ্যে তো এইরূপ বাণী অসংখ্যই দেখা যায়। শ'খানেক বছর আগে সাধক দেওয়ান রামদুলাল নন্দী মহাশয়ের একটি গান বাঙলা দেশে খুবই প্রচলিত ছিল।

জানি গো জানি গো তারা
তোমায় কেমন ভোজের বাজি
যেভাবে যে ডাকে তোমায়
তাতেই তুমি হওমা রাজি।
মগে বলে ফরাতরা
গড বলে ফিরিঙ্গি যারা
খোদা বলে ডাকে তোমায়
মোগল পাঠান সৈয়দ কাজি।

বৃদ্ধা সাধিকার কথায় বোঝা গেল তিনি সাধনার বাণীগুলি শুধু মুখে মুখেই উচ্চারণ করেন নি। তাঁর জীবনও এই সব বাণীর সাক্ষী। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের বিষয়ে তাঁর কথাগুলি যেমনি সরল তেমনি সহজ ও যুক্তিযুক্ত। সেই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আর কিছু কথা বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মানের ভয়ে তিনি যে এমনভাবে চলে যাবেন তাতো তখন বুঝি নি।

যাবার পূর্বে রাত্রিতে তিনি গুণ গুণ করে লল্লার সহজ সাধনার সব বাণী গাইছিলেন। এই বাণীটির কাশ্মীরী হোলো এইরূপ—

য়িহ য়িহ কর সুয় অর্চুন্,
য়িহ রস্ঞি উচ্চর্যম্ তিয় মন্থর্। ইত্যাদি

এই পদটির সংস্কৃতটা আরও সুবোধ্য। তাই সেটাই দেওয়া যাক—

করোমি যৎকর্ম তদেব পূজা
বদামি যচ্চাপি তদেব মন্ত্রঃ। ইত্যাদি, ৫৮

অর্থাৎ যা কিছু করি তাই তোমার পূজা, যা কিছু বলি তাই তোমার স্তবমন্ত্র।

এই বাণীটির মত বাণী তো সন্তমতে ও বাউলমতে অজস্র রয়েছে। সকলের আগে মনে পড়বে কবীরের বাণী।

সংতো সহজ সমাধ ভলী।.........
আঁখ ন মূদূঁ কান ন
রূঁধূ কায়াকষ্টন ধারূঁ......
কহূঁসো নাম সুনূঁ সোই সুমিরন
যো করূঁ সো পূজা।......
জহঁ জহঁ জাউঁ সোই পরিকরমা
জো কুছ্ছ করূঁ সো সেবা।

অর্থাৎ এই সহজ সমাধিই ভাল।

আজ আর চোখও বুজি না, কানও রুদ্ধ করি না, দেহকেও কষ্ট দেই না। যা কিছু বলি তাই আমার কীর্তন। যা কিছু শুনি তাই আমার নামজপ, যা কিছু করি তাই আমার পূজা। যেখানেই যাই করি তাঁর প্রদক্ষিণ যা কিছু কর্ম তাতেই তাঁর চলে সেবা।

কবীরের বহু পূর্বেই ভারতে এই সহজ ভাব সাধকদের জানা ছিল। লল্লাদেদ তাঁদেরই একজন। একজন মানুষের জীবনে সেই সাধনা প্রত্যক্ষ দেখলাম। কিন্তু পাছে তাঁকে কেও মানা করে বা পাকড়ে ধরে তাই রাতারাতি কোথায় গেলেন তিনি উধাও হয়ে। হাতে পেয়েও এমন সুযোগ হারালাম।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১০

নির্জনতাও লাগছে না ভালো, ভিড়েরও ভয়—মাঝামাঝি একটা রফা ক'রে ইণ্টারে গিয়ে উঠলাম। সঙ্গী পরিবর্তনও হবে একটু। 'ইণ্টার' কথাটিও বেশ, মধ্যম, অর্থাৎ মাঝামাঝি।

দেখলাম বঞ্চিত হয়েছি: আমি যখন গুপী-নারাণী-পালবৌদের নিয়ে, ততক্ষণ এখানে চমৎকার খোসগল্প চলেছে। একটি বেশ মোটাসোটা গোছের ভদ্রলোক, কাঁচা-পাকা দাড়ি, তবে পাকাই বেশি, আসনপিঁড় হ'য়ে বসেছেন; তাঁকে ঘেরে পাঁচ ছ'জন, মনে হোল যেন ডেলী প্যাসেঞ্জারই।

মজলিসী লোক আসর জমিয়ে ব'সে গল্প বলছে—এ দৃশ্য একেবারেই বিরল আজকাল। তার ভগ্নাংশ কখনও কখনও লোক্যাল প্যাসেঞ্জারগুলোয় নজরে পড়ে—যেখানে ঘর আর আফিসের মাঝখানে এই নিরাতঙ্ক কয়েকটি মুহূর্ত থেকে কেরাণীবৃন্দ একটু নিশ্চিন্ততার রস নেয় নিঙড়ে—নেবার চেষ্টা করে অন্তত। তাও আবার লোক পাওয়া চাই তো,—সেরকম মজলিসী গোল্পে আর কোথায়? কেজোযুগ,—এখন গল্প পড়ো ছাপার পাতায়, গান শোনো গ্রামোফোন-রেডিওয়, নাচ দেখো সিনেমায়, টেলি-ভিজনও এসে পড়ল বলে; লেকচার শুনবে তাও মাইক,—মিনমিনে গলাকে বজ্র-নির্ঘোষে পরিণত করার ফাঁকিবাজি।

আফসোস হচ্ছে। কটা হয়ে গেল কে জানে, আবার যেটার মধ্যে এসে বসলাম সেটারও মুড়োটা বাদই আমার ভাগ্যে। তবে সেটাও আমারই দোষে, একটা চান্স্ পেয়েছিলাম, কিন্তু একটু সপ্রতিভ হয়ে যে সেটা কাজে লাগাব তা আর হয়ে উঠল না।

আমি যে সেকেণ্ড ক্লাসে ছিলাম, সেখান থেকেই নেমে এসেছি এটা অনেকেই জানে। ভদ্রলোক বোধহয় গল্পে কিছু এলাকাড়ি দিয়ে থাকবেন—মাঝে মাঝে তাগাদা আদায় করাও একটা মজলিসী স্টাইল—আমি আসতেই একটি যুবা বললে—"ঐ দেখুন, উনি সেকেণ্ড ক্লাস থেকে উঠে এলেন আপনার গল্প শুনতে।"

ভদ্রলোক আমার পানে চেয়ে একটু হাসলেন, যেটাকে প্রশ্নে রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়—"তাই নাকি?"

—সবাই একটু দরের শ্রোতা চায় তো?

তালের মাথায় ব'লে দিলেই হয়—"আজ্ঞে হ্যাঁ, এলাম বৈ কি, গোড়া থেকেই আরম্ভ করুন, একটু শোনা যাক্।" সে-সব কিছু না বলে আমিও সামান্য একটু হেসে একটা জায়গায় বসে পড়লাম। এটাকে উত্তরে রূপান্তরিত করলে দাঁড়ায়—"শোনেন কেন ছেলেমানুষদের কথা!"

তার মানে আমিই গেছি রূপান্তরিত হ'য়ে—সেই বদনের সাথী কি নবাবজানের সাথী আমি আর নেই, আমার সেকেণ্ড ক্লাসের ছোঁয়াচ লেগেছে যুবকটির মুখে উল্লেখটুকুর জন্যে আরও বেশি করেই।... আমি লোকটা হবো খোসগল্প শোনবার জন্যে লালায়িত?—সেকেণ্ড ক্লাসে করি যাতায়াত!......

আমরা কি রকম বহুরূপী দেখো, আর অন্তরে বাইরে কত গরমিল রেখে চলাফেরা আমাদের!

এগুনোও জীবনের বৈচিত্র্য, তা ব'লে এগুনোকেও আয়ুবৃদ্ধির সঙ্গে গোলমাল কোর না যেন। এগুনো ঠিক উল্ট; এগুনো হচ্ছে জীবনের অপমৃত্যু।

মজলিসী গল্পে রাজাকেও বাদ দেয় না, সেকেণ্ড ক্লাস তো কোন ছার; শুধু একটু ফাঁক পাওয়া দরকার। সেটুকু আমি তো দিয়েছিই আমার হঠাৎ আভিজাত্যের দেমাকে।...কথাটা হচ্ছে—এলাম যে ওপর থেকে নেমে, তার একটা কারণ থাকা চাই তো।

"বাগের ভয়?...সন্ধ্যে হয়ে এল কিনা, তাই জিগ্যেস করছি, মাফ করবেন।"

—সঙ্গে সঙ্গে 'উঃ!'-করে উঠে ঘ্যাস ঘ্যাস করে নিজের পিঠটা চুলকাতে আরম্ভ করে দিলেন।

বুঝতেই পাচ্ছ, বাগ=Bug=ছারপোকা। কাঠ রসিকতাই, কিন্তু জমাট আড্ডায় কাজ হয়। ছারপোকা যাঁদের কাঁদাচ্ছে না, তাদের হাসায়ই; ভদ্রতা রক্ষার চেষ্টার মধ্যেও 'খুক্-খুক্' করে সবার মুখে একটু হাসি উঠল। বোধহয় আমার নিজের আচরণে মনের সায় ছিল না বলেই মুখ দিয়ে একটা ভালোরকম উত্তরও বেরুল না, একটু অপ্রস্তুতভাবেই মুখটা ঘুরিয়ে ইণ্টার-ক্লাসেরটি হ'য়েই বসলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই পাপ আর প্রায়শ্চিত্ত—দুই-ই হ'য়ে গেল। যাক্, মুড়ো-কাটা গল্পটা যা শুনলাম—"দমকলওয়ালারা না এলে লোকটা বেঁচে যায়, কিন্তু কপালের লেখন, তা আর হতে পেল কৈ? পাড়ার মধ্যে দিনদুপুরে পোড়ো বাড়ির দোতলার একটা ঘর থেকে একটু ধোঁয়া বেরুচ্ছে—ব্যাপারটা কি জানবার হাজার রকম উপায় ছিল, কিন্তু তাহ'লে নিবারণ আচার্যি মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হয়েছে কি করতে, আর খরচ করে দমকলটা আনানোই বা হয়েছে কেন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে? তার ওপর আবার সামনেই ইলেক্শন, ভোটের জন্যে বাড়ি বাড়ি ছুটতে হবে নিবারণকে, একটা চিঠি লিখে মিউনিসিপ্যাল আফিস থেকে ফায়ার ব্রিগেড তলব করে পাঠালে। আর্জেণ্ট একেবারে।...মানে, ঐ তো এক ছিটে ধোঁয়া, ওটুকুও মিলিয়ে গেলে নিবারণের ইলেক্-শনের চান্স একটা নষ্ট হয়ে যায় কিনা। কমিশনার হ'য়ে তাহ'লে ও করছিল কি?

ঠিক কুড়িটি মিনিট লাগল, কাঁসরঘণ্টা বাজিয়ে ফায়ার ব্রিগেড এসে পেঁছিল; ওরা সাজগোজ করে 'লাগুক—লাগুক' জপ করতে থাকে কিনা। ওদের শাস্ত্রও আলাদা; যেমন পুড়ে কাউকে মরতে দেবে না, তেমনি আবার পারতপক্ষে এদিকে যারা না-পোড়া তাদের বাঁচতেও দেবে না কাউকে, পথের মাঝখানে একবার পেলে হোল। গোটা পাঁচেক ছাগলকে সাবড়ে, একটা উচ্ছুগ্গু করা ষাঁড়কে ঘায়েল করে, একটা সাইকেল-ওলাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে গন গন করে এসে পেঁছুল। পোড়ো-বাড়িতে ধোঁয়ার হাল্লা শুনে যারা আসেনি দমকলের কার-সাজি দেখবার জন্যে ছুটে এল। রীতিমতো একটা মেলা লেগে গেল।

আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা কুচকাওয়াজ শুরু করে দিলে। এক[illegible] ঘুরেঘারে বাড়ির চারিদিকটা দেখে [illegible] মরচেধরা তালাটা ভেঙে কাউকে [illegible]রে একবার উঠিয়ে দিলে ব্যাপারখানা পরিষ্কার হয়ে যায় কিসের

আগুন, কি বৃত্তান্ত—কমিশনার নিবারণ আচার্য না থাকলে পাড়ার লোকেরা করতও তাই—কিন্তু তাহলে আর ওরা ফায়ার ব্রিগেড হয়ে জন্ম নিয়েছে কেন? বাড়ির সদরটা রাস্তার উল্ট দিকে, এদিকে দোতলাটা রাস্তার পাশ থেকেই খাড়া উঠে গেছে, মায় টিলের-ছাত পর্যন্ত। সিঁড়িতে সিঁড়িতে মুড়ে, একেবারে ওপরটা আবার যেখানটা কাঠের সিঁড়িতে কুলুল না সেখানটা দড়ির সিঁড়ি লাগিয়ে একজন তরতর করে ওপরে উঠে গেল জানলা পর্যন্ত।"

একটি ছোকরা আর সবার চেয়ে বেশি হাঁ ক'রে শুনছিল, জিগ্যেস করে উঠল—"আর আগুন ঠাকুর্দা...ততক্ষণে...?"

"আরে আগুনের কথা ভাবছে কে তখন? ফায়ার ব্রিগেডের কারসাজি, দেখে তাক লেগে গেছে।...আর আগুন ছিল কোথায় তোমার? ধোঁয়া যেটুকু ছিল সেটুকুও পাতলা হয়ে এসেছে।...লোকটা জানলার গরাদ ধরে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেতরটা দেখে নিয়ে নিচুপানে চেয়ে বললে—"একঠো আদমি হ্যায়!"

লোকে নায়ক-নায়িকায় একটা সর্বাঙ্গ-সুন্দর গল্পই চায়, নৈলে জুৎ হয় না; নিচে থেকে এক সঙ্গে জন কুড়ি চেঁচিয়ে উঠল—"আর আওরৎ নেই হ্যায়?"

ততক্ষণে ভেতরের লোকটা জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যোদো-পাগলা; কোনও দিক দিয়ে উঠে গিয়ে একটা মকাই ঝলসে খাবার ব্যবস্থা করছিল, সেটা হাতে নিয়েই উঠে এসেছে, জষ্ঠি মাসেও গায়ে খানদুয়েক ছেঁড়া কম্বল, এদিকে হাত পা নেড়ে নেড়ে কাঁপছে; মকাইয়ে একটা কামড় দিয়ে নিচের দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলে দার্জিলিঙের নিচে এত ভিড়টা কিসের?

পাগল বলে টের পেতেই বিগ্রেডের সেপাইটা ভয়ে তর তর করে হাত চারেক নেমে এসেছে, নিবারণ আচার্য নিচু থেকে বললে—"যদু যে, তুই ওখানে করছিস কি?"

"চেঞ্জে এসেছি।"

"আগুন লাগাবি যে বাড়িটায়।"

"বরফ, লাগবে না।"

উগ্র পাগল নয়, ঠাণ্ডাই, একটু সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারলেই কাজ হয়, নিবারণ আচার্য বললে—"ত, আছিস কবে থেকে দার্জিলিঙে?"

"আজ ভোর থেকে।"

"তোর ওয়েট যেন বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে. নেমে এসে একবার সিভিল সার্জনকে দেখিয়ে নে; বলে, আবার যাবি, শীতে কষ্ট পাচ্ছিস মিছিমিছি।"

যদু মকাইয়ে তাড়াতাড়ি দুটো কামড় দিয়ে কম্বল দুটো ভালো ক'রে সাপটে নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে—"মন্দ বলনি, তাহলে খানাটা শেষ করে নিই। সিঁড়ি কিসের?"

একটা ছোকরা নিচে থেকে চেঁচিয়ে বললে—"সিঁড়ি নয়, দার্জিলিঙের রেল লাইন যদু!"

যদু গরাদে কপালটা চেপে নিচু পর্যন্ত দেখে নিলে, তারপর মাথাটা দুলিয়ে বললে—"ঠিক; দাঁড়াও, খেয়ে নিই।"

সিঁড়ি নামিয়ে নিলেই হোত; ঐ রকম সুরে সুর মিলিয়ে বললে যদু পাকা সিঁড়ি বেয়েই দিব্যি নেমে আসত; কিন্তু ফায়ার ব্রিগেড শহরে এসে পর্যন্ত কিছু পায়নি, ঝুটো হোক, সাচ্চা হোক একটা কেস্ পেয়ে আর ছাড়তে চাইলে না—ওরা ওদের পদ্ধতি মতোই নামিয়ে আনবে।

লোকগুলোরও একটা ইয়ে ছিল ফায়ার ব্রিগেড কি জিনিস বলে তার ওপর নিবারণ আচার্যিরও সামনেই ইলেক্শন. মিউনিসিপ্যালিটিকে কি দাঁড় করিয়েছে একবার পরখ করিয়ে দেখাতেই চায়—কেউ আর বাধা দিলে না, সোজাপথ ছেড়ে অযথা বাঁকা পথ ধরা হচ্ছে বলে। জানলার গরাদগুলো জং ধরে ক্ষয়েই এসেছে লোকটা ওপরে যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে কেটে কুটে খানিকটা জায়গা করে নিয়ে ভেতরে চলে গেল। যদুর মকাই ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে, ধোঁয়াটাও মিনিট দশেক দমকলের তোড় দিয়ে ভালো করে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে; লোকটা যদুকে ওদের শাস্ত্রমতো ভালো করে দড়ি দিয়ে নিজের পিঠের সঙ্গে বেঁধে বেরিয়ে এল। যদুও গাড়ি চড়ার শখেই হোক বা কালে ধরার জন্যেই হোক, আপত্তি করলে না......"

হাঁ-করা ছেলেটি বলে উঠল—"কালে ধরা মানে!—মরে গেল যদু?"

তা আড়াই তলা থেকে একবার লাফিয়েই দেখ্ না।"

"আর লোকটা...ব্রিগেডের সেপাইটা...?"

"তার বালাই মরুক। সে হাড়গোড়ভাঙা একটা মানুষের নরম তালের ওপর নেমে এসে বসেছে, কি দায়টা পড়ে গেছে তার মরবার? আর সে মরলে অমন ভালো কাজের জন্যে তকমা ঝোলাবে কার গলায় মুনিসিপ্যালিটি?"

কেসটা তখন অন্য হাতে গিয়ে পড়ল; দমকলওলারা ফিরে যেতে না যেতে পুলিস এসে হাজির হোল। বললে—'পোস্টমর্টেম করতে হবে।'

কতকগুলো গাঁজাখোরে মিলে পাড়ায় শ্মশান বন্ধু বলে একটা দল খাড়া করেছিল, সৎকার করবার নেই এমন কেউ মলে কিছু চাঁদাটাঁদা তুলে নেবার ব্যবস্থাটা মাঝখান থেকে করে নিত। তাদেরও কয়েকজন জুটেছিল, তারপর যোদোকে পপাত ধরণীতলে হতে দেখে ব্যবস্থা করতে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাঁশ, খড়, দড়ি, কলসী সব জোগাড় করে দলের আর সবাইকে ডেকে নিয়ে এসে দেখে পুলিস লাস আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্যাপার কি, না, মড়া-ময়না করা হবে।

শ্যাম ঘটক ওদের সর্দার গোছের, এগিয়ে গিয়ে দারোগাকেই বললে—'হুজুর, শুনছি যোদো পাগলাকে নাকি পোস্টমর্টেম করবার হুকুম হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে, আপত্তি আছে তোমার?'

শ্যাম ঘটক জিভ কামড়ে কানে হাত দিলে, বললে—'কি যে বলেন হুজুর! হুজুর হচ্ছেন জেলার মালিক, হুজুরের হুকুমের ওপরে কার কথা বলবার এক্তিয়ার, মেলার তাবৎ লোকগুলোকে পোস্টমর্টেম করিয়ে দিতে পারেন এক্ষুণি। তবে অভয় দেন তো একটা কথা বলি।'

দারোগা গোঁফের একটা দিক পাকাতে পাকাতে কানের দিকে তুলে দিয়ে বললে—'ফেলই ব'লে।'

'আজ্ঞা কথাটা হচ্ছে পোস্টমর্টেম করা কিসে মোল সেইটে দেখবার জন্যে, তা যোদা পাগলা সে সন্দেহ তো একেবারে মিটিয়েই মরেছে। শরীরের মধ্যে একখানি হাড় আস্ত থাকতে দেয় নি, তার ওপর চোখের সামনে ঐ তেতলা, ভাঙা জানলা, আর ফায়ার ব্রিগেডের দলও হুজুরের চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল যোদোকে তালগোল পাকিয়ে রেখে। আর হুজুর সন্দেহটা থাকতে পেলে কৈ যে যোদো আছাড় খেয়ে মরেছে?"

পড়ে মরেনি যে তাই বা কে বলবে? এখানে তো একটা অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেছে।'

'আজ বছর খানেকের মধ্যে নয় হুজুর; ঐ তো বাড়িটা জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিগ্রেটের ধোঁয়ার চেয়েও একটা হালকা ধোঁয়া হুজুর, চোখেও পড়ে না, যোদোর কপালের নেকন, তাইতেই কাল হোল, নয়তো সে বলতে গেলে তো শহরের ঘরে ঘরে অগ্নিকাণ্ড চলছে, অন্তত একটা করে চুলোও তো জ্বলছে বাড়ি পিছু, একবারটি ভেবে দেখুন না হুজুর। এযা কাল্ ফায়ার ব্রিগেড এসেছে শহরে হুজুর, লোকের বিড়িতে আগুন দিতে হাত কাঁপবে এবার থেকে।"

'যাও আইন ওসব বোঝে না। পোস্টমর্টেম করতেই হবে।'

'আইন তো হুজুরেই। বলছিলাম বামনের ছেলে, জীবনটা তো বেচারির এইভাবে কাটল, এখন মিত্যুর পরও যদি একটু শুদ্ধুভাবে সৎকারটা হোত........"

এই সময় এ্যাম্বুলেন্সের গাড়িটা এসে লাসটা সামলে সুমলে তুলে নিয়ে গেল। এদিক'কার গোলমালটা গেল মিটে একটু একটু ক'রে।

যোদো পাগলা যতই কেউকেটা হোক, কেসটা নিয়ে শহরে বেশ একটা গুলতান উঠে গেল, কি রকম দাঁড়াবে, কে কে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়বে, অ্যাক্সিডেণ্ট, না, মার্ডার, না, আত্মহত্যা; আগুনে পুড়ে মরা, না ছাত থেকে প'ড়ে—যতই সময় যেতে লাগল ততই আসল ব্যাপারটা থেকে নানারকম ফিকড়ি বেরুতে লাগল, বারলাইব্রেরীতে খুব ঘোট চলল, ম্যাজিস্ট্রেট সায়েব সিভিল সার্জেনকে ফোন করলেন যেমন শোনা যাচ্ছে, ব্যাপারটা খুবই সন্দেহজনক, পোস্টমর্টেমটা যেন খুব কেয়ারফুলি করা হয়। সিভিল সার্জেন উত্তর দিলেন—অন্যের হাতে না দিয়ে আমি নিজেই করব'খন। আরও দর বেড়ে গেল যোদোর কেসের।

সেদিন ফুরসৎ হোল না সিভিল সার্জেনের তারপর দিন ভোরেই চিরে ফেড়ে তিনি রিপোর্ট দিলেন—পয়েজনিং কেস। যোদো পাগলা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।"

যারা শুনছিল, একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—"সে কি ঠাকুর্দা, বিষ খেলে কখন?...পড়ে মরাও নয়!"

আমিও বাইরের দিকে মুখ করে শুনছিলাম, চকিত হয়েই ফিরে চাইলাম। ভদ্রলোক আমায় সাক্ষী মেনেই হেসে বললেন—"এই দেখুন এদের আবদার! সে একটা সিভিল সার্জেন, তার লাল মুখ, কে বলেছে যোদো পড়ে মরেছে বলে তাকে সেই কথা মেনে নিতে হবে? তার নিজের একটা

শাস্ত্র আছে, তাইতে কি বলছে না বলছে সেইটে বিশ্বাস না করে সে যদি গুজবের ওপরেই নিজের রায় দেয় তাহলে তার এত কণ্ট করে শাস্ত্র পড়াই বা কেন আর মেহনৎ করে নিজের হাতে ছুরি ধরতে যাওয়াই বা কেন? আর এও একটা ভেবে দেখবার কথা —যেমন ফায়ার ব্রিগেড আলাদা, তেমনি গভর্নমেণ্টেরও পুলিশ বিভাগ আলাদা, হাসপাতাল আলাদা, দেওয়ানী আলাদা, ফৌজদারী আলাদা; পুলিস যা বললে তা যদি হাসপাতালকে মেনে নিতে হয়, হাসপাতাল যা বললে তা যদি দেওয়ানীকে মেনে নিতে হয়, তাহলে এত খরচ করে, অত বখেরা করে এতগুলো ডিপার্টমেণ্ট রাখবার দরকার গভর্নমেণ্টের? পোস্টাফিসের মতন মাঝখানে একটা পঞ্চমুখ অফিসার বসিয়ে পাঁচটা জানলা খুলে তাতে পাঁচটা লোক মোতায়েন করে রাখলেই পারত—তোমার গিয়ে মনিঅর্ডার, স্ট্যাম্প, রেজেস্টারি, সেভিংস ব্যাঙ্ক টেলিগ্রাফ......কি বলেন মশাই, খেলাফ বলছি?"

হেসে বললাম—"আজ্ঞে না, রইল আলাদা আলাদা এমারৎ নিয়ে, অথচ একে যা বলছে অন্যে তাইতে সায় দিলে, তাহলে সে রকম আলাদা থাকার মানে? টাকা তো কামড়াচ্ছে না গভর্নমেণ্টের।"

"ঐ শোন, সমঝদার লোকে কি বলেন। সব তালগোল পাকিয়ে গেছে, কোথায় নাড়ি, কোথায় স্টমাক, কোথায় হার্ট, কোথায় লাংস—কিছু বোঝবার জো নেই, কিন্তু ওস্তাদের হাতে ছুরি, নুকিয়ে যাবে কোথায়?......সিভিল সার্জেন রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলে—পিওর পয়েজ্নিং কেস্।"

সবাই আবার গোলমাল করে কি বলতে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক ডান হাতটা তুলে তাদের থামিয়ে নির্বিকারভাবে বললেন—"পিওর পয়েজনিং। অন্য কিছু নয়।'

শহরের গুলতানটা দশগুণ বেড়ে গেল, চায়ের দোকান, পানের দোকান, গলির মোড়, সদরের রক—যেখানেই পাঁচজন জমা হয়েছে, যোদোর পয়েজনিংয়ের গল্প। পাঁচজন থেকে দশজন, দশজন থেকে বিশ জনে দাঁড়াচ্ছে, বিশ রকম আন্দাজে, বিশটা মতে হাতাহাতি হবার উপক্রম হচ্ছে, বিশটা বাড়ির কেচ্ছা বেরিয়ে পড়ছে।

এর ওপর, এতদিন গুলতানটা এদিকেই ছিল, সিভিল সার্জেন রিপোর্ট দেবার পর থেকে ইউরোপীয়ান ক্লাবেও একটা সাড়া পড়ে গেল—কী মারাত্মক জাত এই ইণ্ডিয়ানরা—সবার চোখের নিচে, দিন-দুপুরে হয়কে নয় করে দিচ্ছিল, কি ক'রে চালানো যায় এ্যাড্মিনিস্ট্রেশন!

পুলিস সুপার ডেকে পাঠালেন টাউন দারোগাকে।

'এই শহরের মাঝখানে একজন বিশিষ্ট বড়লোকের বাড়িতে সম্প্রতি একটা সেনসেশন্যাল পয়েজনিং কেস্ হয়ে গেছে, জানো বোধ হয়।

'আজ্ঞে জানি হুজুর।'

'কবে?'

'পরশু'

—'পরশু; তাহলে জানো দেখছি, নেহাৎ নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে না।

ওটাকে যে অগ্নিকাণ্ড, কি ছাত থেকে প'ড়ে অপঘাত মৃত্যু বলে চালিয়ে দেবার অপচেণ্টা হচ্ছিল, এটা তোমার জানা আছে কি?'

'হ্যাঁ-হুজুর, সিভিল সার্জেন নিজে এর মধ্যে না পড়লে হয়তো......'

পুলিস সুপার গর্জন করে উঠলেন—'সিভিল সার্জেন না পড়লে! তুমি কোথায় ছিলে? তোমার সাহায্য করা সিভিল সার্জেনের ডিউটি, কি সিভিল সার্জনকে সাহায্য করা তোমার ডিউটি? ও'র রিপোর্টের আগে তুমি কি করছিলে?'

দারোগার পা কাঁপতে আরম্ভ হয়েছিল, টেবিলের আড়ালে বলে তাড়াতাড়ি সামলে নিলে।

'ইন্ভেসটিগেট করছিলাম হুজুর......'

'কি পেলে?'

'ঐ পয়েজনিং-ই হুজুর—সিভিল সার্জেনের রিপোর্টে যা কনফারমড্ হোল।'

একটু ঠান্ডা হলেন পুলিস-সুপার।

'পয়েজনিং। আত্মহত্যা—স্বইচ্ছায়, কি অন্যে খাইয়েছে বিষ?'

যে-রকম আবার ফেটে পড়বার জন্যে মুখের দিকে চেয়ে আছে স্ব-ইচ্ছায় আত্মহত্যা বলে আর কেস্টাকে হাল্কা করবার সাহস হল না দারোগার। বললে—'না, মেরে ফেলবার জন্যে বিষ দেওয়া হয়েছিল হুজুর।'

'কজন ছিল এর মধ্যে?'

ফার্স্ট বয়ের মতন এসবের উত্তর জিভের ডগায় রাখতে হয় ভালো ভালো দারোগাদের, উত্তর করলে—'আপাতত একজনকে পাওয়া গেছে হুজুর, যে আসল; ফারদার ইনভেস-টিগেশন চলছে। কেসটা জটিল।'

'তাকে হাজতে দেওয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ হুজুর; তখুনি।'

রাঙা মুখের রংটা খুব চড়ে গিয়েছিল, খানিকটা নামল। বললেন—'দেখুন, শহরের পুলিশ অ্যাডমিনস্ট্রেশন অত্যন্ত ঢিলে হয়ে গেছে, এ কেস্ যদি খারাপ হয় তো দায়িত্ব আপনার। এর মানেটা নিশ্চয় বোঝেন, যান।'

ওদিকে ম্যাজিস্ট্রেট সরকারী উকিলকে ডেকে পাঠালেন, প্রায় উপরোউপরি কয়েকটা প্রসিকিউশন ফেল করে শহরে অপরাধের সংখ্যা বড্ড বেশি বেড়ে গেছে। এই সেন্-সেশনাল পয়েজনিং কেস্টা যদি না দাঁড়ায় তো তাঁকে সরকারী উকিল বদলাবার কথা চিন্তা করতে হবে।

পুলিশ সুপারের কাছে ব্যাপারটা আপাতত কোন রকমে সামলে টাউন-দারোগা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিল, আসল লোকটাকে ধরে হাজতে পুরেছে তো বলে এলো সাহেবকে, এখন করা যায় কি? বেটা কিছু বললে না, কিন্তু সন্ধ্যের পর ক্লাবে যাবার মুখে যদি একবার হাজতে ঢু মেরে যাওয়ার খেয়াল হয়, তাহলেই তো চিত্তির।

মোটরবাইকটা খুব আস্তে আস্তে চালিয়ে ভাবতে ভাবতে আসছিল, এমন সময় পুরনো মিডল্ স্কুলের সামনে এসে তাকে বাইকটা রুকে দিতে হোল। জায়গাটা শহরের একটু বাইরের দিকে, স্কুলটা এখান থেকে অনেক দিন সরে গেছে, কাঁচা ই'টের বাড়িটাও গেছে প্রায় পড়ে, শুধু একদিকে একটা ঘর কোন-রকমে আছে দাঁড়িয়ে।

পোড়ো বাড়ির দিকে দারোগার নজর কেমন যেন সহজেই গিয়ে পড়ে, তাইতেই দেখলে ঘরটার মধ্যে একটা মানুষ যেন পাইচারি করতে করতেই উল্ট দিকে মুখ করে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘাড়টা হে'ট করা, হাত দুটো বুকে জড়ানো, খুব যেন চিন্তিত; মোটরটা একটা শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়তে একবার ঘুরে চাইলে, তারপর আবার সেইভাবেই রইল দাঁড়িয়ে। খুন হোক আর নাই হোক, খুনী যে এত শীগ্গির আর এত সহজে হাতের মধ্যে এসে পড়বে এটা আশাই করতে পারে নি দারোগা, একটু ভেবে নিলে, তার-পরেই বাইক থেকে নেমে পড়ে সেটা স্টাণ্ডে দাঁড় করিয়ে স্কুলটার পানে এগুল।

(ক্রমশঃ)

১৪

অনেক খোঁজখবর চেষ্টা-চরিত্রের পর শেষ পর্যন্ত চাকরি একটি মিলিল করবীর। কোন অফিস-টফিসে নয়, পদ্মপুকুর বিদ্যা-পীঠে। মেয়েদের হাইস্কুল। কিন্তু মাইনে বড় কম। মাসে চল্লিশ টাকা। গ্রাজুয়েট হলে যাট হোত। খোঁজটা অরুণই নিয়ে এল। বলল, 'করবেন? এত অল্প টাকায় কি পোষাবে আপনার?'

করবী বলল, 'না পোষালে উপায় কি—এখন যা পাই তাই নিতে হবে।'

অরুণ বলল, 'বেশ তাহলে একদিন চলুন আমার সঙ্গে। মিসেস দত্তের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

মাধবী দত্ত অরুণেরই এক প্রফেসরের স্ত্রী। মনোহরপুকুর রোডে একটি ফ্ল্যাট নিয়ে সস্ত্রীক থাকেন প্রফেসর দত্ত। তাঁর স্ত্রী পদ্মপুকুর বিদ্যাপীঠের হেডমিস্ট্রেস।

আগে থেকে ব্যবস্থা করে করবীকে নিয়ে এক রবিবার তাঁদের বাসায় গিয়ে দেখা করল অরুণ।

কথাবার্তা অরুণ মোটামুটি আগেই বলে রেখেছিল। নতুন করে বেশি কিছু আর বলতে হোল না। মাধবী দেবী করবীদের আপ্যায়ন করে ড্রয়িং-রুমে বসালেন। চা, খাবার আনালেন। দু'চার কথা জিজ্ঞেস করবার পর বললেন, 'আচ্ছা, একখানা এ্যাপলিকেসন আপনি কালই পাঠিয়ে দেবেন। একজন টিচার আমাদের নিতেই হবে। আপনার কেসটি যাতে হয়, আমি তার জন্যে অবশ্যই চেষ্টা করব।'

ইংরেজিতে টাইপ করা আবেদনপত্র করবী সঙ্গেই নিয়েই এসেছিল। হেডমিস্ট্রেসের কাছে সেখানা রেখে গেল।

সেক্রেটারীর কাছে আর একদিন ইণ্টারভিউ দিতে হোল করবীকে। তার দিনকয়েক পরেই এল নিয়োগপত্র।

টুইশন সেরে অরুণ এল রাত্রে দেখা করতে। বলল, 'চাকরি সত্যিই পেলেন তাহলে?'

করবী কৃতজ্ঞতার সুরে বলল, 'পেলাম, আপনার জন্যেই পেলাম। সত্যি, আপনার নিজেরও তো চাকরি-বাকরি নেই। তবু এতদিন ধরে আমার জন্যেই আপনি চেষ্টা করেছেন।'

অরুণ একটু হেসে বলল, 'না, যতটা পরার্থপর আমাকে মনে করেছেন, আমি ততটা নই। চেষ্টা দুজনের জন্যেই চালাচ্ছিলাম, একজনের আপাতত যা হোক কিছু একটা হোল। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় এ কিছুকে সামান্য কিছুও বলা যায় না। তবু একেবারে বেকার থাকার চেয়ে—'

করবী বলল, 'তাতো ঠিকই।'

মাসখানেক পরে আরো একটু সুবিধা হোল। পর পর দুটো টুইশনও জুটে গেল করবীর। দুটোয় মিলে পঞ্চাশ টাকা। স্কুলের মাইনের চেয়ে বেশি। অবশ্য স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের যোগাযোগেই টুইশন দুটো জুটল।

অরুণ খবর পেয়ে বলল, 'বেশ তো, আপনি নেহাৎ কম স্বার্থপর নয় দেখছি। পটাপট ভালো ভালো চাকরি আর টুইশন জুটিয়ে নিচ্ছেন। আর আমি যে বেকার সেই বেকারই রয়ে গেলাম।'

করবী লজ্জিত হয়ে বলল, 'সত্যি, এবার আপনার জন্যেই আমার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু জানেন তো, আমাদের সাধ্যের সীমা।'

অরুণ বলল, 'থাক থাক, আপনাকে আর বিনয় করতে হবে না। আপনার সাধ্য কি কম নাকি?'

করবী বলল, 'কম নয়? কিসে বেশি দেখলেন বলুন?'

অরুণ সংক্ষেপে বলল, 'দেখেছি।'

সাড়ে দশটায় স্কুল বসে। রোজ দশটার মধ্যে করবীকে বেরিয়ে পড়তে হয়। স্নান সেরে তৈরী হয়ে নিতে হয় তারও আগে। প্রথম প্রথম ক'দিন রান্নাও করত; কিন্তু ব্লাডপ্রেসারটা একটু কমে যাওয়ার পর শাশুড়ী নিজেই এসে বসলেন রাঁধতে। করবী আপত্তি করে বলেছিল, 'এ কি, আপনি এলেন কেন?'

নিভাননী বললেন, 'ক'দিন আমিই রাঁধি। তোমার তো কষ্ট হয়!'

করবী বলল, 'তাই বলে আপনি কেন রাঁধবেন। না না তা হবে না।'

নিভাননী এবার কড়া ধমক দিলেন পুত্রবধূকে—'হবে না মানে? তুমি কি সত্যিই একটা শক্ত অসুখ-বিসুখ ঘটাতে চাও করবী? দিন-রাত এই খাটুনি, তারপর ফের যদি তুমি আগুনের তাপে এসে বস, তাহলে কি শরীর থাকবে?'

করবী বলল, 'কিন্তু আপনার শরীরও তো ভালো নয় মা, এই বয়সে আগুনের তাপ আপনারই বা সইবে কেন?'

নিভাননী জবাব দিয়েছেন, 'সইবে সইবে। আগুনের তাপে আমার কিছু হবে না। রাঁধা-বাড়ার অভ্যাস আমার না আছে তাতো নয়। বসে বসে রাঁধব, তাতে কি এমন হবে। কিন্তু বেশি অত্যাচার, অনাচার করে তুমি যদি শুয়ে পড়, তাহলে আর উপায় থাকবে না।'

তারপর থেকে নিভাননী নিজেই রান্না-বান্না শুরু করলেন। কাজে বেরুবার আগে করবী আসন পেতে গিয়ে খেতে বসে।

নিভাননী নিজের পুত্রবধূকে নিরামিষ তরকারীর সঙ্গে ভাত বেড়ে দেন। পাতের সামনে বসে খাওয়ার তদারক করেন। করবীর মনে পড়ে, তার স্বামী পরেশ যখন অফিসে যাওয়ার আগে খেতে বসত, তখনও নিভাননী তার পাতের কাছে বসে এইরকম করতেন। কম খাওয়ার জন্যে অনুযোগ আর বেশি খাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতেন রোজ। ছেলে মারা যাওয়ার পর আজ ছেলের বউ সেই জায়গা নিয়েছে। করবীর রোজগারেই এখন সংসার চলবে। তার ওপরই সবাইকে নির্ভর করতে হবে। তাই তার শরীর যাতে একটু সুস্থ থাকে,

যাতে সে কার্যকর্মে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, সে সম্বন্ধে লক্ষ্য না রাখলে চলে না।

দিনকয়েক পরে দিলীপ করবীর খাওয়ার সময় খুড়িতে করে দু-আনার দই নিয়ে এল।

করবী বলল, 'ও আবার কি?'

দিলীপ বলল, 'খাও বউদি। নিরামিষ খেতে তোমার তো ভারি কষ্ট হয়। পেট ভরে তো খেতেই পার না। মার না হয় খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে গেছে। তোমার তো আর তা হয় নি। কিন্তু একেবারে না খেলে শরীরই বা থাকবে কি করে?'

করবীর চোখ ছল ছল করে উঠল। এই ছোট্ট দেওরের এত দরদ তার ওপর। স্বামী গেছেন। করবী ভেবেছিল, এক-জনের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি সবই গেছে। কিন্তু সব তো যায় নি। তিনি তাঁর স্নেহ-মমতা রেখে গেছেন এদের মধ্যে। ছেলে, দেওর আর শাশুড়ীর আদর যত্নের মধ্যে যেন স্বামীরই সেই ভালোবাসার স্বাদ পেল করবী। না, সব শূন্য হয় নি। সব শূন্য হয় না। রাখতে জানলে একজন গেলেও সব ভরে রাখা যায়। তার স্মৃতি দিয়ে সব ভরে রাখতে হয়।

দইয়ের সবটুকু ঢেলে নিল না করবী। আধাআধি নিয়ে বাকিটুকু খুরিতে রেখে দিল।

নিভাননী বললেন, 'ও কি, ওইটুকু তো দই, তার আবার রাখলে কেন?'

করবী বলল, 'থাক একটু, দিলু আর পিপলুকে দেবেন।'

নিভাননী হেসে বললেন, 'আর আমি বুঝি বাদ যাব। কিন্তু কেবল দিলু আর পিপলুই বা কেন। তোমার ওই ছোট দইয়ের খুরির ভাগ দেওয়ার জন্যে দেখ পাড়াপড়শীদের আর কাকে কাকে ডেকে আনবে।'

দিলীপ কাছে দাঁড়িয়েছিল। সেও হাসল, বলল, 'বউদি, তোমার দই কি গল্পের সেই দীনবন্ধুদাদার দইয়ের মত যে, খুরি থেকে যত ঢালবে, ততই ভরে উঠবে?'

করবী কোন জবাব দিল না। মনে মনে ভাবল, মাঝে মাঝে হৃদয় সেই দীনবন্ধুদাদার খুরিই হতে চায় বটে, এক ফোঁটা করুণা, পৃথিবীর কাছ থেকে এক ফোঁটা সদয় ব্যবহারে শুকনো, শূন্য-হৃদয় অমৃতে এমন কানায় কানায় ভরে ওঠে যে, মনে হয় সবাইকে সেখানে নিমন্ত্রণ করে না আনতে পারলে যেন তৃপ্তি নেই। মনে হয়, যে দাক্ষিণ্য নিজে পেয়েছি, তা সবাই পাক; যে মাধুর্যের স্বাদ নিজে অনুভব করেছি, তার অমৃত-স্বাদে সমস্ত পৃথিবী মধুর হয়ে উঠুক।

খাওয়া সেরে স্কুলে বেরোবার জন্যে তৈরী হোল করবী। কালো ফিতেপেড়ে ফর্সা শাড়ীখানা প'রে নিল। বেরুবার আগে স্বামীর ফটোর সামনে এসে একবার দাঁড়াল করবী। রোজই দাঁড়ায়। মনে মনে অনুমতি নেয়। না, পরেশের কোন গোঁড়ামি ছিল না। মেয়েদের চাকরি-বাকরি করা সে পছন্দ করত। করবী বলত, 'তাহলে আমাকে দাও একটা কিছু জোগাড় ক'রে।'

পরেশ বলত, 'দেব বইকি। যখন দরকার বোধ করব, নিশ্চয়ই দেব।'

কিন্তু পরেশের দরকার বোধ করবার দরকার হয় নি। তার আগেই সে চলে গেছে। আর সমস্ত প্রয়োজনের বোঝা আজ চেপেছে করবীর ঘাড়ে। কিন্তু তার জন্যে দুঃখিত নয় করবী। বিধবা হয়ে অন্যের আশ্রয় যে তাকে ভিক্ষা করতে হয় নি, বরং দেওর, শাশুড়ীকে আশ্রয় দিতে পেরেছে, এর জন্যেই নিজের ভাগ্যকে সে ধন্যবাদ দেয়। নিজের এই শক্তি-সামর্থ্য মনের এই সাহস যেন তার চিরকাল থাকে। স্বামীর কাছেই যেন প্রার্থনা জানাল করবী। প্রতিকৃতির মধ্যে পরেশের মুখ গম্ভীর, প্রশান্ত। তার স্নিগ্ধ দুটি অপলক চোখ করবীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। করবী মনে মনে বলল, 'হ্যাঁ, এমনি করেই তাকিয়ে থেক তুমি। এমনি করেই আমাকে সব সময় দেখ। 'তুমি আমায় নয়নে নয়নে রেখ অন্তরমাঝে।'

'মা, আমাকে ওই তাজমহলটা দাও না। আমি খেলব।'

পিপলুর কথায় চমকে উঠে করবী তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাল। দুষ্টু ছেলে করেছে কি, চেয়ারটা টেনে নিয়ে গেছে কাঁচের আলমারীর কাছে। তারপর তার একটা পাল্লা ধরে ক্রমাগত টানাটানি করছে। ভিতর থেকে ছোট্ট তাজমহলটাকে সে বের করবে। বের করে খেলবে।

ছেলেকে একটু ধমক দিল করবী, 'ও কি হচ্ছে।'

পিপলু আবার বলল, 'আমাকে তাজ-মহলটা দাও না মা।'

করবী বলল, 'ছিঃ, এই দামী জিনিস দিয়ে কেউ খেলে না কি?'

পিপলু বলল, 'খেলে না? তবে কি করে?'

করবী বলল, 'ঘরে তুলে রাখে, ঘর সাজিয়ে রাখে।'

কিন্তু পিপলু নাছোড়বান্দা। আজ ওই তাজমহলটা তার চাই-ই।

বিরক্ত হয়ে শাশুড়ীকে ডাকল করবী। 'মা, পিপলুকে নিয়ে যান তো এখান থেকে। বড় দুষ্টুমি শুরু করেছে।'

নিভাননী এসে ঘরে ঢুকলেন—'কি, হয়েছে কি। সারাদিন তো তোমাকে দেখতে পায় না, তাই যাওয়ার সময় এক-আধটু মাতলামি করে। সেজন্যে কি অমন করে ধমকাতে হয়? কি, চাইছে কি ও।'

করবী বলল, 'ওই তাজমহলটা চায়। দেখুন দেখি আবদার!'

নিভাননী নাতিকে কোলে টেনে নিতে নিতে বললেন, 'ছিঃ, কাজের জিনিস কি নেয় নাকি দাদু?' তারপর করবীর দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। 'এই তাজমহলটাই তো অরুণ কিনে দিয়েছিল না বউমা, আচ্ছা, কি হয়েছে ছেলেটির বল তো? কতদিন ধরে আসে না—একবার খোঁজ নিতে হয়।'

কথাটা নিজেও ভাবছিল করবী। নিজের মনের কথা শাশুড়ীর মুখে শুনতে পেয়ে ও ভারি খুশি হোল। বলল, 'হ্যাঁ, খোঁজ নিতে হবে। ক'দিন ধরে আসছেন না আর। অসুখ-বিসুখ হয়ে পড়ল কি না, কে জানে।'

হঠাৎ অরুণের জন্যে করবী মনে মনে বড় ব্যাকুলতা বোধ করল। বেশ আমুদে, স্ফূর্তিবাজ মানুষ। যতক্ষণ থাকেন, দিলীপ আর পিপলুকে নিয়ে খেলেন। হৈ-হল্লায়, ছুটোছুটিতে সারা বাড়িটা বেশ সরগরম হয়ে ওঠে। দু-একদিন বাদে বাদেই তো আসতেন। সেই মানুষের আজ প্রায় দিন সাতেক ধরে দেখা নেই। করবী নিজেও চাকরি আর নতুন টুইশন নিয়ে এত ব্যস্ত রয়েছে যে, আর কারো কথা ভাববারও সময় পায় নি। ভাববার কথা তার মনেও হয় নি। কিন্তু আজ যেন এই ক'দিনের বিস্মরণ তার শোধ তুলল। করবীর বার বার মনে হতে লাগল, অরুণের খবর তার একবার নেওয়া উচিত ছিল। অমন উপকারী বন্ধুর খোঁজ না নেওয়া তার অন্যায় হয়েছে।

বাইরের ঘরে দিলীপ বসে পড়ছে। করবী যাওয়ার আগে দিলীপের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

'দিলীপ শোন!'

'কি বউদি।'

বইয়ের পাতা থেকে করবীর দিকে তাকাল দিলীপ।

করবী একটু ইতস্তত করে বলল, 'আচ্ছা, অরুণবাবুর কি হয়েছে জানো? তিনি তো বহুদিন যাবৎ আসেন না।

দিলীপ বলল, 'জানিনে তো বউদি। তবে যদি বল স্কুলে খোঁজ নিতে পারি।'

করবী বলল, 'স্কুলে কি করে খোঁজ নেবে?'

দিলীপ বলল, 'অরুণদা যে ছাত্রটিকে পড়ান, সে তো আমাদের ক্লাসেই পড়ে। তার কাছে জিজ্ঞেস করলেই হবে।

করবী খুশি হয়ে বলল, 'ঠিক। তোমার বুদ্ধি আছে বটে। তাহলে তার কাছেই একবার খোঁজ নিয়ে এসো। ভদ্রলোকের অসুখ-বিসুখ করল কি না কে জানে।'

বলে করবী স্কুলে চলে গেল। ছোট ছোট মেয়েদের ক্লাস। একটার পর আধ ঘণ্টা টিফিন আছে। ক্লাস সেরে খানিকক্ষণ বিশ্রামের জন্যে টিচারদের রুমে গিয়ে বসল করবী।

সুলতা চ্যাটার্জী স্কুলের সেকেণ্ড টিচার। বছর তিরিশেক হবে বয়স। কিন্তু মিশতে পারে সব বয়সী মেয়েদের সঙ্গে। করবী ঘরে ঢুকতেই তাকে ডেকে নিজের পাশের চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে আসুন, বসুন এসে এখানে।' করবী তাঁর পাশে গিয়ে বসল।

সুলতা বলল, 'ভালো পড়াতে পারেন বলে এরই মধ্যে আপনার খুব নাম শুনেছি। মেয়েরা বলাবলি করছিল।'

করবী লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি যে বলেন।'

সুলতা বলল, 'আপনার গুণ থাকলে কি হবে দোষও আছে। সেকথাও কিছু বলব।'

করবী বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

সুলতা হেসে বলল, 'আপনি বড় অমিশুক। কারো সঙ্গে মিশবেন না, কথা বলবেন না, হাসি-গল্প করবেন না। শুধু মুখ বুজে কাজ করে যাবেন। তাহলে কি হয়? সে কাজে কি আর রস পাওয়া যায়? একেই তো এই মাস্টারীর মত কাজ। দু'বছর যেতে না যেতেই দেখবেন এমন একঘেয়ে বস্তু আর দুনিয়ায় নেই। যেটুকু সুখ, তা এই পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশায়। অমন করে মুখ গম্ভীর করে থাকবেন না। লোকের সঙ্গে মিশবেন, আলাপ আলোচনা করবেন।'

করবী বলল, 'দেখুন আগে খুব মিশতে পারতুম। আজকাল চেষ্টা করেও আর পারিনে। তেমন যেন ইচ্ছাই হয় না।'

সুলতা একটুকাল চুপ করে থেকে সহানুভূতির সুরে বলল, 'দেখুন, আমি সব শুনেছি। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, আপনার বুঝি বিয়ে-থা হয় নি, আপনাকে দেখলে কিন্তু তাই মনে হয়। পরে হেডমিস্ট্রেসের কাছে শুনলাম সব কথা। শুনে অবশ্য খুব দুঃখই হোল। দুঃখেরই যে কথা। কিন্তু দুঃখ করে কি করব বলুন। আপনিই বা সেই দুঃখের কথা মনে রেখে কি করবেন। আপনাকে সব ভুলতে হবে।'

করবী একটু যেন চমকে উঠল বলল, 'সব ভুলতে হবে!'

সুলতা বলল, 'ভুলতে হবে বই কি। সারা-জীবন কি দুঃখ নিয়ে বাঁচা যায়!'

টিফিনের ঘণ্টা শেষ হওয়ার পর ফের ক্লাস আরম্ভ হোল। মেয়েদের পড়াতে পড়াতে সুলতার কথাটা বার বার করে মনে পড়তে লাগল করবীর। সারাজীবন দুঃখ নিয়ে বাঁচা যায় না। তবে কি নিয়ে বাঁচা যায়, কি নিয়ে বাঁচবে করবী। স্বামীর সঙ্গে তো তার দুঃখের স্মৃতিই জড়ানো। দুঃখকে ভুললে যে তাকেই ভোলা হবে। কিন্তু তাই বা কেন। পাঁচ বছরের দাম্পত্য-জীবনে সুখ-স্মৃতিও তো আছে। সেই সুখ সম্ভোগের দিনগুলির কথা, রাতগুলির কথা মনে করে করে সারাজীবন কাটিয়ে দেবে করবী। সমস্ত জীবন সেই পাঁচ বছরকে অক্ষয় করে রাখবে। তার আর কোন সুখের প্রয়োজন নেই।

স্কুল ছুটির পরে টুইশন। একই বাড়ির চার নম্বর আর ছ' নম্বর ফ্ল্যাটে মাসখানেকের মধ্যে টুইশন দুটি জুটে গেছে।

চার নম্বরে একটি ধনী ফার্নিচার ডিলারের পুত্রবধূকে পড়াতে হয়। ছ'নম্বরে পড়ায় ছোট ছোট দুটি মেয়েকে। দুই জায়গা থেকেই পঁচিশ টাকা করে পায়। প্রত্যেকটি টুইশনের পিছনে দেড় ঘণ্টা সময় যায়। সব মিলিয়ে তিন ঘণ্টা। কোন কোনদিন তার বেশিও লাগে।

কিন্তু আজ একটু সকাল সকালই ফিরতে পারল করবী। চার নম্বরের বউটি তার স্বামীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে। তার শাশুড়ী বললেন, 'দেখুন দেখি কি আক্কেল। সিনেমা দেখবে, রবিবার-টবিবার দেখলেই হয়। মিছামিছি একটা পড়ার দিন নষ্ট।'

বাসায় আসবার সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ বলল, 'অরুণদার খবর পেয়েছি বউদি, ভালো খবর নয়।'

করবী একটু চমকে উঠে বলল, 'সে কি রে। কি হয়েছে তাঁর।'

দিলীপ বলল, 'না না, তেমন কিছু নয়। তাঁর এ পাড়ার টিউশানিটি গেছে।'

করবী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'ও তাই বল। তোমার ভূমিকা শুনে আমি ভেবেছিলাম, কি বিপদ-আপদই না জানি হয়েছে, কিন্তু টুইশনটি গেল কি করে?'

দিলীপ বলল, 'ওঁদের বাড়িতে কি কোন টিউটরের বেশিদিন টিঁকবার জো আছে? বাপ-মা-ছেলে কেউ না কেউ অপছন্দ করে বসলেই হোল। শ্যামল বলল, 'এবার কিন্তু ভাই আমার কোন দোষ নেই। মাস্টার মশাইর বিরুদ্ধে এবার আমি কোন কথা লাগাই নি, তবে ভদ্রলোক অংকটংক কিছু পারতেন না।'

করবী চটে উঠে বলল, 'না, অংক পারতেন না। আর অংকের জাহাজ বুঝি ও নিজে।'
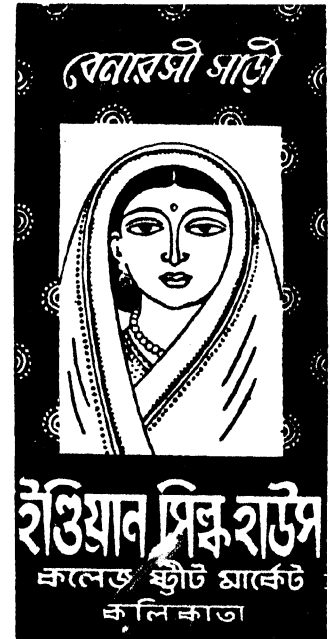
দিলীপ একটু হেসে বলল, 'শ্যামলের একটা কথাও বিশ্বাস করবার মত নয় বউদি। ও ভারি মিথ্যেবাদী। হয়তো ও নিজেই চক্রান্ত করে অরুণদাকে সরিয়েছে। ওর কিচ্ছু হবে না।'

করবী আর কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল। যাক, তাহলে কোন শক্ত অসুখ-বিসুখ নয়। কিন্তু বেকার মানুষের টুইশন যাওয়ার বিপদটাও নেহাৎ কম নয়। নিতান্ত অসুবিধেয় না পড়লে এতদূরে অমন সামান্য মাইনেয় কেউ ছাত্র পড়াতে আসে না। মনে মনে অরুণের জন্যে ভারি সহানুভূতি বোধ করল করবী। কিন্তু এপাড়ার টুইশনটি যে গেছে, এখন যে সে আর আসতে পারবে না, সে খবরটা করবীকে দিয়ে গেলেই তো পারত অরুণ। দেখা করে একবার জানিয়ে গেলে ক্ষতি ছিল কি। না কি লজ্জা বোধ করেছে। কিন্তু চাকরি যাবার চেয়েও কি টুইশন চলে যাওয়াটা এমন বেশি অগৌরবের যে, সেকথা অরুণ তাকে জানিয়ে যেতে পারল না। তাকে না জানাক দিলীপকে না হয় তার মাকে তো জানিয়ে যেতে পারত। মনে মনে একটু অভিমানই হোল করবীর। কেবল ছাত্রের বাড়ি ছাড়া কি এ পাড়ায় আর কোন পরিচিত লোক ছিল না, পরিচিত পরিবার ছিল না অরুণের? টুইশন গেলেও কি তাদের একবার খোঁজ নেওয়ার কথা তাঁর মনে হোল না?

কিন্তু নিজের মনের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মান-অভিমানে করবী এক সময় নিজেই বিস্মিত হোল, লজ্জিতও হোল। সত্যি, এ কি সে ভাবছে, এত দাবী করছে সে কার ওপর? দাদার অগণিত সহকর্মীদের মধ্যে অরুণও একজন। এখন তো আর সহকর্মীও নয়। করবীর সঙ্গে মাত্র কয়েক মাসের আলাপ। তার আর্থিক দুরবস্থার কথা শুনে অল্প মাইনের একটা স্কুল-মাস্টারী জুটিয়ে দিয়েছে, এই পর্যন্ত। সেই পরিচয়ের দাবীতে আর কি আশা করতে পারে করবী? আশা করা সংগতও নয়।

কিন্তু এই যুক্তিতে তেমন স্বস্তিবোধ করল না করবী, তেমন তৃপ্তি পেল না। মনে হোল অরুণের ওপর সে অবিচার করছে। নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণে অরুণ এদিকে আসতে পারে নি। অসুস্থ হয়ে পড়াটাও বিচিত্র নয়। তাছাড়া এখন তো সে একেবারে বেকার, নিশ্চয়ই খুব অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। মন মেজাজও প্রসন্ন থাকবার কথা নয়। এ অবস্থায় করবীরই উচিত অরুণের খোঁজ-খবর নেওয়া। কৃতজ্ঞতা বলে তো একটা জিনিস আছে! উপকার যতটুকুই হোক করেছে তো। তা স্বীকার করবার মত সৌজন্য করবীর কেন থাকবে না? না, শিষ্টাচারের কোন ত্রুটি ঘটতে দেবে না করবী। অরুণের সে খোঁজ নেবে। কিন্তু কি করে খোঁজ-খবর নেওয়া যায়? অরুণের ঠিকানা অবশ্য তার কাছে আছে। ইচ্ছা করলেই অবশ্য একটা চিঠি দেওয়া যায়। কিন্তু চিঠি দেওয়াটা কি ঠিক হবে? স্বামী বেঁচে থাকতে তাঁর দু-একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে অবশ্য করবী পত্রালাপ করেছে। কিন্তু অরুণ তো আর তা নয়। দাদার বন্ধু আর ইদানীং নিজেরও বন্ধু। তবু কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ তার কাছে চিঠি লেখায় কেমন যেন একটু সংকোচ বোধ করল করবী। অথচ না লিখেও স্বস্তি নেই।

খানিকক্ষণ ভেবে উপায় বের করল করবী। পরদিন ভোরে উঠে দিলীপের কাছে গিয়ে বলল, 'আচ্ছা দিলীপ, অরুণ-বাবুর একটা খোঁজ নিলে হয় না? ভদ্রলোক কেমন আছেন, কোন কাজকর্ম পেলেন কি না—'

দিলীপ উল্লসিত হয়ে বলল, 'সত্যি বউদি, আমাদের একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। আমি তো ঠিকানা জানিনে। তাহলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতাম।'

করবী বলল, 'ঠিকানা আমি জানি। কিন্তু যাওয়ার দরকার নেই। তুমি বরং একখানা চিঠি লিখে দাও।'

দিলীপ বলল, 'চিঠি! বেশ লিখব। কিন্তু কি লিখব বল তো?'

করবী বলল, 'বাঃ রে, একখানা চিঠি কি করে লিখতে হয়, তাও কি তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না কি? কেন স্কুলেও তো ইংরেজি-বাঙলায় চিঠি লেখা শেখায়।'

দিলীপ বলল, 'তা শেখায়' তবু সে তো স্কুলের চিঠি। তেমন চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে না। তার চেয়ে তুমি বরং বল, আমি লিখছি।'

শেষ পর্যন্ত তাই হোল। করবীই বলে বলে গেল কথাগুলি। দিলীপ একটা কাগজে লিখে নিল। অনেক কাটাকুটি অদল-বদলের পর চিঠিটা এইরকম দাঁড়াল ঃ শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অনেকদিন হোল আপনি এদিকে আসেন নি। দেখা-সাক্ষাৎ তো হয়ই না, সামান্য খোঁজ-খবরটুকু পর্যন্ত নেই। আমরা বড়ই চিন্তিত রয়েছি। আপনার শরীর কেমন আছে, বাড়ির সব কে কেমন আছেন, জানাতে দেরী করবেন না। আর সময় করে একবার যদি আসতে পারেন, খুবই ভালো হয়। সকলেরে সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারে। আশা করি, শীগ্‌গির একদিন আসবেন। সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন। ইতি।'

কিন্তু করবীর মুসাবিদায় মোটেই খুশি হোল না দিলীপ। বলল, 'এরকম চিঠি তো আমিও লিখতে পারতাম।'

করবী হেসে বলল, 'তুমি যা লিখতে পারতে, তাইতো লিখিয়েছি।'

নিজের নাম স্বাক্ষর করেই চিঠিটা অবশ্য ডাকে দিল দিলীপ। কিন্তু মনটা ওর খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। এমন চিঠি সে লিখতে পারত, কিন্তু লিখত না। চিঠির একটি শব্দও তার নয়, সব বউদির। কথা-গুলি যেন বড় মেয়েলী মেয়েলী। এমন হবে জানলে সে বউদিকে তার চিঠির মুসাবিদা করতে বলত না। কোনদিন আর বলবেও না। যা পারে, সে নিজেই লিখবে। নিজের কথা নিজে বানিয়ে না লিখলে কি মনের কথা লেখা যায়? (ক্রমশঃ)

পদব্রজে টাইগার হিল্

শ্রীনিরঞ্জন ঘোষ

রাত্রি সাড়ে আটটায় বাসায় ফিরলাম। কয়েকদিন আগে আমার বাসায় কয়েকজন বিদেশীয় এসে অতিথি হয়েছেন। কিন্তু এ কয়েক দিনের ঘনিষ্ঠতায় তারা আমাদের এত নিকটে এসে পড়েছেন যে, উভয়পক্ষের ব্যবহারটা ঠিক আত্মীয়ের ব্যবহার বলা চলে; সঙ্কোচ, দ্বিধা, ভয়, লজ্জা দু পক্ষেরই কেটে গেছে।

রাত্রের আকাশটা বেশ ঝকঝকে নীল, চাঁদও রয়েছে আকাশে। দিগন্তের কোল ঘেঁষে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় দু' একখানি মেঘ মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে না তা নয়। অনন্তকালের ধ্যানমৌন পর্বতমালা রাত্রির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বন্দনা-গীতি ছড়াচ্ছে মহাশূন্যের।

বাসায় পা দিতেই একজন বললেন, চলুন আজ যাওয়া যাক্ "টাইগার হিল", রাতটা ভালই হবে বলে মনে হচ্ছে। স্বীকার তখনকার মত করতেই হল, রাতটা ভাল যাবে। তবুও প্রকৃতির বিশ্বাসঘাতকতা এখানে অবিশ্বাস্য রকমের। এই নীল আকাশ, চাঁদিনী রাত, ফুটফুটে জ্যোৎস্না —সব নিমেষে অন্ধকার হয়ে যেতে পারে।

একটা চিন্তা ও উদ্বেগ নিয়েই ঘুমিয়েছিলাম বলে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। রাত্রি বারোটা বেজে কয়েক মিনিট। উঠেই ওদের কাছে গেলাম; ওরা সবাই খাওয়া-দাওয়ার পর ইলেক্‌ট্রিক লাইটটি নিবিয়ে দিয়ে, হ্যারিকেনের আলোটাকে স্তিমিত করে, আধশোয়া অবস্থায় মৃদুস্বরে আলাপ করে চলেছেন দেখলাম। আমি যেতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অর্থাৎ যেন আমার আসবার জন্যে সবাই অপেক্ষা করছিলেন।

আমার বেশি দেরি হল না। ওদের সংখ্যা চার—সুতরাং একটু দেরিই হল। প্রায় মিনিট পনেরোর মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে একটা ফ্লাস্কে চা, টিফিন ক্যারিয়ারে কিছু রুটি, তরকারি, চিনি। ইচ্ছাটা এই যে, 'টাইগার হিল' থেকে ফিরবার পথে 'ঘুম' স্টেশনে বসে সকাল বেলাকার জলযোগটা ওতেই হবে।

দুজনের কাছে দুটো ঘড়ি ছিল, তাতেও অমিল। তবুও আন্দাজ ১২-২০ মিঃ সময় বেরিয়ে পড়লাম পাঁচজন। কিছুক্ষণ আগে বর্ধমান রাজবাড়িতে রাত বারোটার ঘণ্টা পড়েছে—ক্লান্ত ও নির্জীব যেন তার সুর।

দার্জিলিংয়ে রাত বারোটা গভীর রাত্রি; শীতের দিনে তো কথাই নেই, গ্রীষ্মেও তার ব্যতিক্রম নেই। আমরা যখন বেরুলাম, তখন সারা শহর উদার পরিচ্ছন্ন আকাশের তলায় যেন মরণ-ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘন নীল আকাশের বুকে উজ্জ্বল চাঁদ মাঝ-গগনের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে। রাস্তায় জন-প্রাণী দূরের কথা, একটা কীট-পতঙ্গের সাড়া-শব্দ পর্যন্ত নেই—এ হেন নিশুতি আর নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। এখানকার আকাশ-বুকে নিশাচর-নিশাচরী কম্পন-লহরী তোলে না, প্রহর ঘোষণা করে না শিবাকুল, অন্ধকার শাখাশ্রয়ে কর্কশ-স্বরে চীৎকার তোলে না বাদুড়ের দল। এখানকার সঙ্গীহারা নিস্তব্ধতা তাই যেন খুব বেশি ঘন। সে যেন স্পর্শ করা যায়—এত গাঢ়, এত দিগন্ত-প্রসারী সে গভীর নির্জনতা। এ হেন রাত্রিতে যেন মনে হয় এর শেষ নেই, এর আদি নেই; যেদিকে তাকাই, মনে হয় যেন স্বপ্ন—নীল আকাশের সীমানায় ঘেরা, শৈলশিলার মাথায় গাঁথা আজকের এ কাহিনী, এ স্বপ্ন। এ রাতের পথচলা যে-কোন মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে,—তাই আমাদেরও হয়েছিল।

এমন নিস্তব্ধ নির্জন রাত্রিতে এর আগে কখনও বেরোই নি। আমরা পাঁচজন সমবয়সী না হলেও, কিছু ক্ষতি নেই। এ নিশ্ছিদ্র নির্জনতা ভেদ করে আজ আর কোন জাগতিক প্রশ্নই জাগছে না—যত সব অপার্থিব-লোকের কথাই মনে এসে ভিড় জমাচ্ছে।

এখান থেকে ক্রমে ক্রমে উপরে উঠতে হবে। দার্জিলিংয়ের ঘুমন্ত হিয়ার উপরে চাঁদিনী রাতের অপরূপ মায়াজাল ছড়ানো। পিচের রাস্তার উপর যেন জলে-ধোয়া মনে হচ্ছে—জ্যোৎস্না যেন পিছলে যাচ্ছে পথের 'পরে। চাঁদ পশ্চিমে বেশ খানিকটা হেলে পড়েছে। কখনও কখনও দুই একটি টুকরো মেঘ এসে চাঁদকে নিয়ে লুকোচুরি খেলছে; আকৃতি তার একবার দেখলাম ঠিক একটা বাদুড়ের মত—পক্ষবিস্তার করে চাঁদকে ঢেকে ফেলেছে।

রেলের লাইন ধ'রে যাত্রা শুরু করলাম। আমরাও চলেছি, লাইনও চলেছে—কখনও বা ডাইনে, কখনও বামে। চকচকে লাইনের উপর চাঁদের আলো পড়ছে, মনে হচ্ছে সুপ্ত সরীসৃপ। লাইনের পাশে পাশে আরো একটা জিনিস আমাদের নির্জন রাতির সাথী হয়ে চলেছে—সে বিজলী বাতির সারি। দু এক জায়গায় হয়ত বাল্‌ব 'ফিউজড' হয়ে যাবার জন্যই বাতি নেই। হঠাৎ সেরকম জায়গায় এসে পড়লে গা-টা ছমছম করছে। বাঁ দিকে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ শিলাখণ্ড মাথার উপরে প্রায় ২০০ ফুট উঁচু, গাছের পাতায় পাতায় 'মধ্যরাত্রির বাতাস ছুটোছুটি করছে—ঝড়ের মত তার শব্দ, পাথরের বুক চিরে অপরিসর ধারায় কোথাও বা নির্ঝরিণী নেমে আসছে—বন্দিনী জলকন্যার চাপা কান্নার মত তার শব্দ। টর্চ থাকলেও তা জ্বালাতে মন বলছে না। নৈশ-নিস্তব্ধতা-ছাওয়া তারা-খচিত আকাশ থেকেই যেন একটা অস্বচ্ছ আলোর আভাস এসে পড়ছে আমাদের পথে।

অনেকক্ষণ এইভাবে চলবার পর একবার পিছনে তাকালাম। ঘুমন্ত দার্জিলিং। তার বুকে অগণ্য আলোর মালা। দূরে বহুদূরে সে আলোর মালা, মনে হয় যেন নৈসর্গিক। বাঁ দিকে চাঁদের আলো তখন পাণ্ডুর, ম্লান হয়ে আসছে। ঘন সন্নিবিষ্ট আলোর সারি দূরে থেকে আরো ঘন দেখা যায়। হীরকখণ্ডের মত এক একটা আলো শহরের বুক উজ্জ্বল করে আছে। মনে হয়, দেওয়ালীর আলোকসজ্জার বন্যা অফুরন্ত খুশীতে উজ্জ্বল, উচ্ছল হয়ে নেমে এসেছে শহরের বুকে। দিনের দার্জিলিং আর রাতের দার্জিলিংয়ে যে এত তফাৎ কে জানত?

নারী সে যতই সুন্দরী হউক না কেন, সুপ্তাবস্থায় তার একটা বিশিষ্ট লোভনীয় রূপ যেমন থাকে, আজকের এ নগরীর রূপও তাই। চাঁদিনী রাত, নিঃশব্দে সন্তরমান মুহূর্তে, সুপ্ত নগরীর বুকে হীরক-খণ্ডের মত জ্বলছে আলোর মালার সারি,

মাথার উপরে নির্বাক নীলাকাশ বিস্ময়ে থমথম্ করছে;—এ মায়া অপরূপ, এ স্মৃতি অভিনব।

লাইনের ধারে ধারে চলেছি আর দেখছি, (ল্যান্ড স্লাইডের পরে) কোথাও বা লাইন ন্তুন করে বসানো হয়েছে, কোথাও বা লাইনের পাশে রাস্তার অংশাবিশেষ মেরামত হচ্ছে। খণ্ড খণ্ড পাথর ছড়ানো রয়েছে রাস্তার পাশে। সামনে অদূরেই 'ঘ্ম'—পিছনে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে নিষুপ্ত দার্জিলিং। বিজলী বাতি ছাড়া সাথী কেউ নেই; চাঁদ এতক্ষণে অস্ত গেছে। এবার বেশ একটু শীত শীত করছে। কিন্তু অনবরত হাঁটছি বলে শরীরটা গরম হয়ে আছে, শীতে বাবুদের বিশেষ কাবু করতে পারছে না। রাত প্রায় ২টা হবে। কুয়াশা-ঘন নিদ্রাচ্ছন্ন 'ঘ্ম' সামনে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছ্লাম। কুয়াসা ভেদ ক'রে স্টেশনের বাতি আলো ছড়াতে পারছে না। একেবারে স্টেশনে এসে ব্ঝলাম যে স্টেশনে এসে গেছি।

রাত্রি ২।১০ মিঃ, ঘ্ম স্টেশনে পৌঁছ্লাম। কুয়াসা আরও ঘন হয়ে এল। ঘ্মন্ত রাত্রির ম্খমণ্ডলে ধীরে ধীরে কে যেন অবগ্ণ্ঠন টেনে দিচ্ছে—কুয়াসার পর্দাটা সেইভাবে নেমে আসছে। টিনের ছাদের উপরে টপ-টপ করে ব্ষ্টি-পড়ার মত শব্দ। স্টেশনটা চারিদিক একবার ঘ্রে এলাম। চারি ধার ভয়াবহভাবে নির্জন। শ্ন্য চেয়ার প্রতি ঘরেই, অথচ বাতি জ্বলছে ঠিকই। কাচের জানলায় নিষিদ্ধ প্রবেশ কুয়াসার অভিমানের অশ্র্ জল গড়িয়ে পড়ছে।

ঘ্রে ফিরে এসে এক জায়গায় বসলাম। এখানে আমরা কিছ্ক্ষণ বিশ্রাম করব। সঙ্গীরা আগেই জায়গা ঠিক করে ফেলেছেন—ওয়েটিং র্মের সামনে। আমিও বসে পড়লাম। খানিকক্ষণের মধ্যেই ২।১জনের ঘ্ম পেয়ে গেল, বসে বসেই তারা ঘ্ম দিতে লাগলেন। ঘ্মের ঠান্ডা হাওয়ায় তাদের ঘ্ম আসতে দেরি হল না। কিন্তু আমার চোখে ঘ্ম এল না। বসে বসে দেখতে লাগলাম, স্ষ্প্ত নির্জন স্টেশনের ক্লান্তিহীন কুয়াসা-স্নান; শ্নতে লাগলাম, ঘড়ির অনন্তকালের প্রবাহ গোণার অবিরাম শব্দ; চোখের সামনে 'ওয়েটিং র্ম' সাইন বোর্ডটা বাতাসে অল্প অল্প দ্ ্ছে; স্টেশনের গায়ে লেখা GHOOM, El...ation 7407. স্টেশনের বাতিগ্লোর প্রত্যেকটার চারি ধারে

একটা করে গোলাকার আগুনের স্তুপ, লাগছে রং।

বসে বসে অনেকক্ষণ কাটল, আমার চোখে কিন্তু ঘুমের লেশ মাত্র আভাস নেই।

হঠাৎ মোটরের শব্দে চমকে উঠলাম—সত্যিই একখানা মোটর আসছে এ দিকে, station wagon ধরণের গাড়ি। গাড়িটা রাস্তার বাঁ ধার ঘেঁষে দাঁড়াল বোধ হয় মিনিট দুই—তারপর সশব্দে বেরিয়ে গেল।

বিয়ের কনে বের করতে হলে সে যেমন বেরিয়েও বেরোয় না, আমাদের যাত্রার দ্বিতীয় পর্বে সেই রকম রোগে পেয়ে বসল। উঠি উঠি করেও উঠা আর হয়ে উঠল না। অবশেষে একজন ঘড়ি দেখে বললেন—২-৪০ মিঃ। আমি বললাম, একটু আগে বেরোলে ক্ষতি কি? না হয় ধীরে ধীরেই রাস্তা এগোনো যাবে! আমার এ কথায় হাঁ দেওয়ার মত গা কারুরই দেখলাম না। তবু একটা ফল হল এই যে, সবাই একটু সচল হওয়ার লক্ষণ দেখালেন,—শুধু একজন বাদে। তিনি একটা জানলার খোপে প্রকাণ্ড একটা 'দ'-এর মত হয়ে বেশ ঘুম দিচ্ছেন। তাকে জাগাতে এবং রাগাতে খানিকক্ষণ গেল। ওদিকে ঘড়ির কাঁটা চলেছে তিনের তীরে। অবশেষে জোগাড়-যন্ত্র করে এখান থেকে উঠতেই তিনটে বাজল।

স্টেশন প্ল্যাটফর্ম থেকে মাটিতে পা দিতেই একজন খাঁটি মাতালের সঙ্গে দেখা। সঘন কুয়াসায় তাকে দেখতেই পেতাম না যদি না সে একেবারে প্ল্যাটফর্ম ঘেঁষে এসে পড়ত। মাতাল জ্ঞান হারালে আর মাতাল থাকে না, মানুষও থাকে না; কিন্তু এর মাঝামাঝি আর একটা রূপ যা আছে সেই রূপটারই সঙ্গে আমাদের সেদিন পরিচয় হয়েছিল। জ্ঞান সে হারায়নি একথা যেমন সত্যি, তার বিকৃতিও ঘটে নি, একথা তার চাইতেও সত্যি এবং একটা রসিকতা করতেই তার প্রমাণও আমরা পেয়ে গেলাম। তার যাত্রাপথের সঙ্গে আমাদের মিল ছিল না বলেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল অতি অল্পেতেই—বাড়াবাড়ি না করেই।

একটু দূরে যেতে না যেতেই আবার দেখা সেই মোটর-গাড়িটার সঙ্গে। এবারে গাড়িটা আমাদের কাছ ঘেঁষে এসে একেবারে থেমে গেল। আমরা—বিশেষে আমি একটু সন্দিগ্ধ হলাম, কারণ এই গাড়িখানিকেই আমি দেখেছি কিছুক্ষণ আগে 'ঘুমে', ঠিক আমাদের বিশ্রাম-স্থলের পাশেই; আবার এখনও ঠিক আমাদেরকেই লক্ষ্য করে একেবারে সামনে এসে গেছে। তবে কি এরা পুলিশের লোক, গতিবিধি লক্ষ্য করছে? তা যদি হয়, তবে বরং ভয়ের কারণ কম,—কিন্তু যদি পুলিশের ছদ্মবেশে অন্য কেউ হয়? আজকাল তো হামেশাই এ রকম হচ্ছে! আমার এ সন্দেহের কথা অবশ্য কাউকে বলিনি; বিদ্যুৎ গতিতে এ সমস্ত সন্দেহ আমার মনের উপর খেলে গেল।

দেখলাম, এ সন্দেহের কথা ওদের না বলেই ভাল করেছি। কারণ গাড়িখানা থেকে নামলেন একজন স্যুট-পরিহিত Gentleman—ভদ্রলোক বললাম না কেন তা পরে বলব। ভদ্রলোকটা নেহাৎ বাঙলা কথা। যাই হোক, গাড়ি থেকে নেমে তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, আমরা 'টাইগার হিলে' যাচ্ছি কিনা। তার এ প্রশ্ন অসংগত ছিল না। কারণ রাত্রির এই অবাঞ্ছিত মুহূর্তে যারা বেরোয় তারা সাধারণের পর্যায়ে পড়ে না—হয় মাতাল, নয় চোর নয়ত বা—। প্রথমে তিনি ইংরেজীতেই প্রশ্ন করলেন। আমরাও সেই ভাষাতেই কথা বললাম। টাইগার হিলের রাস্তা বাৎলে দিলে গাড়িখানাকে আবার সেই মুখে যাবার জন্যে তিনি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন।

গাড়িটাকে পিছনে রেখে আমরা চললাম এগিয়ে। আমাদের ২।১জনের আশা ছিল ও ভদ্রলোক হয়ত তার গাড়িতে আমাদের তুলে নেবেন। সেই ক্ষীণ আশা বুকে নিয়ে কুয়াশা ভেদ করে চলেছি। কিন্তু তুলে নেওয়া দূরে থাক, গাড়ি নিয়ে ভদ্রলোক পাড়ি জমালেন আরও জোরে, পাশ দিয়ে সাঁ করে গাড়িটা বেরিয়ে গেল।

দুধারে দোকান-পসারী গাঢ় ঘুমে অচেতন। রাত তিনটার 'ঘুম'—নিশ্চল, নিঝুম; একটু লক্ষ্য করলে রাস্তার ধারের দোকানীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও পাওয়া যাবে বোধহয়। কোন কোন জায়গায় বিজলী বাতির একটা সূক্ষ্ম রশ্মিরেখা কাঠের দরজার ফাঁকে রাস্তায় এসে পড়েছে। আমরা কটি প্রাণী ছাড়া রাস্তায় পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গের চিহ্নমাত্র নেই। শ্মশানভূমিও বোধ করি এত নির্জন নয়।

খানিক দূরে গিয়ে রাস্তা একেবারে চড়াই। এই পথে উঠতে যাব, দেখি—সেই গাড়িখানা আমাদের সামনে গজ ২০।২২ দূরে দাঁড়িয়ে। স্থান ও কালের মিল ছিল না, তবু দিল বলছিল, পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? বুঝলাম, ওরা পথ ভুলেছে। ওদের পিছনে রেখে যেতে কোথায় যেন বাধছিল, তাই অত্যন্ত ধীরে ধীরে চড়াই উঠতে লাগলাম।

অল্পক্ষণ পরেই দেখি তারা সবাই উঠে আসছেন, আমাদের পিছনে পিছনে। আমরা 'ঘুম' স্টেশনেই দেখেছিলাম ওদের সঙ্গে কয়েকজন মহিলাও আছেন, শিশু বয়সেরও ২।৩ জন। মনে হল বলি—পথিনারী বিবর্জিতা, সে-কথা কি ভুলেছেন? বিশেষত যেখানে পথির গতি জানা নেই। তখনই আবার ভাবলাম, শিশুদের সম্বন্ধে শাস্ত্রে তো এমন কথা কিছু বলেনি; ওটা হয়ত indirectly implied—নারী বিবর্জিতা হলে তার শিশুও সেই সঙ্গে—।

ওদের আসতে দেখে আমরা একটু দাঁড়ালাম। মোটরে নেয়নি বলে যাদের ক্ষোভ ছিল, তাদের সেটা দূর হল। তবুও সুরটা তখনই বদলাল না, বললে, চল্, ওদের Caventer Co.র পথটা বাৎলে দিই। অন্ধকারে ঘুরে মরুক। একজন বাধা দিলে, সঙ্গে মেয়েরা আছে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েও আছে, সেটা কি উচিত হবে? আমাদের দুজন তো কিছুটা ফিরেই গেল ওদের হালচাল জানবার জন্যে। ফিরে এসে বললে—ওরা আসছে এবং গাড়িকে আড়ি করেছে। আমরা একটু আশ্চর্য হলাম; কারণ রাস্তা অল্প নয়, অধিরোহণের দুর্গমতা ততোধিক; সঙ্গে নারী, শিশু—অসম্ভাব কিছুরই নেই। এ অবস্থায় ভদ্রলোকের সাহসকে সাবাস দিই। একটু অপেক্ষা করতেই মাস্তুল দেখা গেল প্রথম অর্থাৎ ভদ্রলোককে দেখলাম; তারপর নারী ও শিশুবাহিনী।

এক সঙ্গে মিলিত হবার পর ভদ্রলোককে আমরা বললাম, গাড়ি নিয়ে অনায়াসেই পাড়ি জমাতে পারতেন। তবে শেষ রক্ষা হত না, বেশ খানিকটা হাঁটতেই হত। ভদ্রলোক বললেন, ড্রাইভার রাস্তা চেনে না, কাজেই তার হাতে জান প্রাণ সমর্পণ ক'রে এ দুর্গম গিরি-শিখরে মনুষ্যহীন বিজনতায় আমিই তাকে বারণ করেছি। তাছাড়া গাড়িটা খুব বড়—আমাদের প্রায় গোটা বাড়িটাই ওর গর্ভে ডুবতে পারে।

এর পর নিরুত্তরে পথ চলতে লাগলাম। এক সময় দেখি, আমাদের পদক্ষেপে বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে; তাই দল থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়েছে। এখন আর রাত্রির চিহ্নমাত্র নেই। [illegible] সব সময় জ্বালিয়ে রাখতে হচ্ছে। বাঁদিকে—প্রায় গা ঘেঁসেই গিরিমালার শ্রেণী চলেছে। রাত্রিশেষের

মৌন আকাশের সাথে নীরব ভাষায় চলেছে তার অন্তরের ভাব-বিনিময়।

ওরা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে—বেশ বুঝতে পারছি। তাই একটা বাঁক ঘুরেই এক জায়গায় বসলাম। এতক্ষণ দেখবার অবকাশ হয়নি, এবার দেখলাম—কোট, মাফলার, র‍্যাপার প্রভৃতি ভিজে চপ্‌চপ্‌ করছে। আমরা ব'সে ব'সে আলোর সংকেতে আমাদের অবস্থান স্থান বুঝিয়ে দিলাম; উত্তরও এল আলোর সংকেতে।

সামনে আমাদের দুরন্ত অন্ধকার; তারই মাঝে দৈত্যের মত প্রহরারত উদ্ধত-শির গিরিশিখর। সন্-সন্ শব্দে অবাধে চলমান বাতাস কাঁপিয়ে চাচ্ছে ঋজুরেখ গাছের ঝাঁকড়া মাথা। একবার আমাদের পিছনে টর্চ ফেলতেই যা দেখলাম তাতে অন্তরাত্মা পর্যন্ত চমকিয়ে উঠল। গহন, বিজন, অরণ্যানি ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে—তার সীমা নেই. টর্চের আলো হার মানল। আমাদের অন্তরের কাঁপুনি বোধ হয় তখনও থামেনি—

আলোর সংকেতে বুঝলাম, ওরা নিকটে এসে পড়েছে; তখন আমরা উঠলাম। এবার আমাদের দলে কয়েকজন লোক বাড়ল। তার মধ্যে একজন বালিকা। অন্ততঃ তাই মনে হল। বালিকা বললাম, তার কারণ, মেয়েদের বয়স কেউ জিজ্ঞেস করে না; যেখানে দরকার, সেখানেও প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় ব'লে আমার মনে হয় না। আর এতো রাত্রির অন্ধকারে মাত্র চোখের দেখা। যাই হউক, তাতে আমাদের কোন কিছু আসে যায় না।

আমরা চলেছি অসমতল পথ বেয়ে। পায়ের তলায় প্রস্তরাকীর্ণ জনহীন পথ, মাথার উপরে নিশীথ রাত্রির নিস্তব্ধ আকাশ—আর সেই আকাশের নীচে সাদা, ঘন কুয়াসার আচ্ছাদন। এই দিগন্তপ্রসারী কুয়াসার ভিতর দিয়ে আমাদের পথ ক্রমেই চড়াই।

রাত্রি ক্রমে শেষ হয়ে আসছে—তার আভাস ফুটে বেরুচ্ছে আকাশতলে। কুয়াসা কেটে গেলে আমরাও বেশ বুঝতে পারছি তার চিহ্ন। রাস্তা চিনে নেওয়া যায়, সাদা একটা রেখার মত সামনে বিস্তৃত —এই আমাদের পথ। কথা চলছে মাঝে মাঝে; দুপক্ষেই সমানে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু শেষটা ?ত মনের মাঝেই রয়ে যাচ্ছে অর্ধেক, মুখে ?র আসছে না, কারণ বেশ হাঁফাতে হচ্ছে, সব সময়।

বাঁদিকে এক সময় দেখলাম, বেশ ফর্সা। ঠিক নীচের গ্রীষ্মকালের প্রত্যুষের মত তার চেহারা। দিক্‌চক্ররেখা পর্যন্ত দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র; পরক্ষণেই আবার ছড়িয়ে পড়ল কুয়াসার জাল, যেন কেউ ছুড়ে ফেলে দিল। অন্ধকার হয়ে গেল দৃষ্টিসীমা, অস্পষ্ট হয়ে এল অপরিচিত পথ।

একবার একজন শুধালেন, ঐ বুঝি দেখা যাচ্ছে—ঐ যে বাঁ দিকে। বস্তুতঃ বাঁ দিকে রেলিং ঘেরা একটা জায়গা দেখা যাচ্ছিল। সেটা যে নয়, তা তখন জানা লোকেরও ভুল হয়ে গেল। আমার তো তখন কোনটা ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না। দূর দিগন্তে রাত্রিশেষের স্বচ্ছতা, পদতলে প্রস্তরময় পথ, শিশির-সিক্ত ঘাসের ছোট ছোট মাঠ ডাইনে-বাঁয়ে, সুদীর্ঘ সমুন্নত ঘন পাইন-বন, গভীর নির্জন চারিধার—সব কিছুই দেখবার মত, সমস্তটাই মনে গেথে রাখবার যোগ্য। মানুষের পদচিহ্ন এখানে কালে-ভদ্রে পড়ে,—তাতে এখানে যে এক দেব-দুর্লভ পবিত্রতা আছে তার গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচও লাগে না। এখানকার নির্জনতাকে ভয় করে না, বরং মনে হয় কাম্য; মনুষ্যহীনতা শ্বাস রোধ করে না, মানুষ থাকলেই মনে হয় বিঘ্ন। শহরের কর্মচাঞ্চল্য, কোলাহল, ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা—সব ভুলে যেতে হয়, এখানকার পারি-পার্শ্বিক এমনই—বিশেষ করে রাত্রির এই শেষ মুহূর্তে, দিন-রাত্রির সন্ধিক্ষণে।

যাই হউক, সেটা যে কিছু নয় তা তখনই বুঝতে পারা গেল যখন সেটাকে পেরিয়েও রাস্তার দূরত্বের কোন হদিস পাওয়া গেল না। কিছুক্ষণ পর একজন বলে উঠলেন, আর বেশি দূরে নয়, এই যে এইখান পর্যন্ত মোটর আসে, এইখানে ছাড়া মোটর ঘোরাবার মত জায়গা নেই।

এবার যে রাস্তা বেয়ে চললাম, তা সব চেয়ে কঠিন, সব চেয়ে খাড়াই। ক্রমাগত প্রায় আধ মাইল এইভাবে উঠতে হবে। ৫০।৬০ গজ উঠতেই আমাদের অনেকেরই বত্রিশ-নাড়ীতে টান ধরল। এবারে দেখলাম, সেই পূর্ব-কথিত Gentleman-এর চেহারা ভালভাবে। তিনি কোন্ দেশীয়, তা চেহারাতে মালুম হবার উপায় নেই। যেটুকু বা ছিল, সেটুকু ইউরোপীয় বেশ-ভূষায় বেশ ক'রে চেপে রেখেছেন। তার সঙ্গের বালিকাটিরও তাই। যাক—তিনি উপদেশ দিলেন, একটু সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটিতে। বুকে আমাদের তখন নিঃশ্বাস জমে যাচ্ছে, hill-এর ঢিলে পা এগোতে চাইছে না মোটে। Gentlemanটি, উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও পিছিয়ে পড়লেন নিজে।

শিখরদেশে যখন এসে ঠেকলাম তখন ৪।৩০টা বাজেনি। এর আগেই কিছু দর্শক এসেছেন।

বসলাম একটু Rest-house-এ; যারা এটা তৈরী করিয়েছিলেন তাঁরা best উদ্দেশ্যেই করিয়েছিলেন। কিন্তু সব জিনিস যে-নিয়মে চিরদিন ক্ষয় হয়, লয় পায়, ঠিক সেই নিয়মেই এরও শরীরে জরা ভর করেছে। মানুষেও কিছুটা এগিয়ে এনেছে তার সে জরাগ্রস্ত অবস্থাকে। ভিতরে বাইরে সারা দেয়ালে খেয়ালের চিহ্ন আঁকা। পটু অপটু হস্তে, চিত্র-বিচিত্র অক্ষরে কত অপরিচিত দর্শক সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখে রেখেছে।

মিনিট পাঁচেক বসবার পর ছাদে গেলাম। সারা রাস্তা যা ভোগ করে তৃপ্তি হয়নি, এখানে তাতে অরুচি ধরে গেল।—কুয়াসার ঝড়। তাই বটে—প্রায় ৫০ মাইল বেগে পিছন দিক থেকে অনবরত কুয়াসা আর কুয়াসা আসছে আর আসছেই। ছাদের উপরে বেঞ্চিগুলোতে জল ঢালা; রেলিং বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল ঝরে পড়ছে। আমাদের মত আরও অনেকে দাঁড়িয়ে আছে পূর্বদিকে মুখ ক'রে, সূর্যের উদয়-রেখা লক্ষ্য ক'রে। Gentlemanটিকে দেখলাম; তিনি Gentle না হলেও man বটে, তার সঙ্গে আরও womanও ছিল, তাদের চেহারা ও বেশভূষা Woman ও Ladyর মিশ্রণ—ওলা-বিবি (Wo-la) আর কি!

আকাশ ফর্সা হলেও ভরসা তেমন হচ্ছিল না। কুয়াসাই না সব আশা মাটি করে! সবাই কাঁপছে, কিন্তু নড়ছে না কেউ এক ইঞ্চিও। ইতিমধ্যে তর্ক বেধে গেল, দিগন্ত ঘেঁষে কালো রেখা একটা প্রাচীরের মত সূর্য আর আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে—ওটা কি? কেউ বলেন—মেঘ, কেউ বলেন—পাহাড়ের শীর্ষদেশ। আমি কিন্তু গোড়া থেকেই বলছিলাম, মেঘ নয়; কারণ, মেঘ হলে নিশ্চয়ই স্থির থাকবে না, —শীর্ষরেখা অবশ্যই পরিবর্তিত হবে। তাই হল। ১০ কি ১৫ মিনিটেও যখন ওর কোন পরিবর্তন দেখা গেল না, তখন মেঘ নয় বলেই স্থির হল।

দর্শকদের কেউ কেউ বোধ হয় বাড়ি থেকে আজকের সূর্যোদয়ের সময় মুখস্থ করে এসেছিলেন। না হলে ঘণ্টা মিনিট দিয়ে এভাবে সময় বলা একটু দুরূহ বৈকি! সবারই লক্ষ্য উদয় তোরণের দিকে—যেন মহাপুরুষ আসছেন আকাশ বেয়ে। উদয় রেখাটিকে লক্ষ্য ক'রে যেন সেই মহাপ্রার্থিত বস্তুকে বরণ ক'রে নেবার জন্য পূব-আকাশে খানিকটা জায়গা রঙীন হয়ে আছে, অর্ঘ্য রচনা ক'রে চলেছে মেঘের অঞ্জলি দিয়ে। বহুদূরে কাঞ্চনজঙ্ঘাতে রং ফলতে আরম্ভ করেছে। রক্তের মত তার রং। একের কোলে এক পর পর তিনটি পাহাড়—Three Weird Sisters এর মত পৃথক্ হয়েও অবিচ্ছিন্ন। তিনটিরই রং রক্তাভ। রক্ত-রাঙা কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রমে ধারণ করল কাঞ্চনবর্ণ। কাঞ্চন-এর সারা অঙ্গে, চূড়া থেকে পাদদেশ অর্থাৎ যতটা দেখা যায়, সম্পূর্ণ এর স্বর্ণমণ্ডিত'। তবু এর নাম যে কাঞ্চনজঙ্ঘা তা সার্থক। বোধ করি, এ নাম বাঙলাদেশ থেকেই দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, এমন ভাবৈশ্বর্য কোন জাতি পাবে, কেই বা তাকে এমন চোখে দেখবে?

সূর্য উঠছে—আধখানা মাত্র দেখা দিয়েছে; তারও রং তপ্ত কাঞ্চনের মত। প্রকাণ্ড একটা গোলকের মত ঐ দিগন্ত-বিদারি "উদার অভ্যুদয়"। গোলকের চারিপাশ ঘিরে পরিধি ঘেঁষে যেন একটা অগ্নিময় চক্র সবেগে ঘুরছে বলে মনে হ'চ্ছে। প্রতিবার ঘূর্ণনে অন্ততঃ এক ইঞ্চি উপরে উঠছে দিনমণি।

একটা বাইনোকুলার পাওয়া গেল। আবার দেখলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। কোথায় সে রূপ? এবার সে-রং একেবারে রূপোর মত সাদা, ঝক্‌ঝকে শুভ্র।

কুমারীর পবিত্রতা নিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা থাকে ঘুমিয়ে। সবার অলক্ষিতে, জন-মনুষ্য জাগবার আগেই রবিকরস্পর্শে যখন তার ঘুম ভাঙে তখন তার হয় লাজ-ভীরু নম্র নত রঙীন অন্তর,—বাইরেও সে-রং ফুটে বেরোয়। তারপরে তার যে রং সে তো অতি-পরিচয়ে ফ্যাকাশে; সে-রঙে স্থায়িত্ব আছে, মধুরতা নেই,—ঐশ্বর্য আছে, সুষমা নেই,—শুচিতা আছে, মোহ নেই।

এখন কাঞ্চন-জঙ্ঘার রং তুষার-শুভ্র। তবুও উৎসুক চোখের আশ মেটে না। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণই যেন এক মহা-মূল্য স্মৃতি সঞ্চয় করছি, এমনই একটা ভাব থাকে মনের মধ্যে। সূর্যের দিকে এখন আর তাকানো যায় না। কাঞ্চনজঙ্ঘার দেহভূমিতে লুটিয়ে পড়বার আগে তারও কেমন যেন একটা অস্থির ভাব থাকে, প্রণয়-চঞ্চল তার অন্তরের নিবেদন ছড়িয়ে পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে শিখরে; কিন্তু ঘুম ভাঙা কাঞ্চনজঙ্ঘার শুচি-শুভ্র সৌম্য মূর্তি বিচ্ছেদ-ব্যথায় ভারাক্রান্ত বাণী বয়ে আনে তার অন্তরে—সেও ক্রমে ক্রমে স্থির ও শান্ত হয়।

দুই-ই মহৎ—দুই-ই করুণ। সূর্যের প্রথম স্পর্শে ঘুম ভেঙে উঠতে-না-উঠতেই কাঞ্চনজঙ্ঘা তাকে হারায়। দূর হতে এই ক্ষণিকের স্পর্শটুকুর জন্যই যেন কাঞ্চনজঙ্ঘা লালায়িত হয়ে থাকে। আবার সূর্যও তার চঞ্চল অন্তরের সমস্ত ভাষা নিবেদন করবার আগেই বিচ্ছেদের পথে আহ্বান আসে। অমিত তেজের সামান্যতম অংশ বিলিয়ে তার পরিতৃপ্তি আসে না। ভাল ক'রে পাওয়ার আগেই এ ওকে হারায়, আর তাতেই জাগ্রত হয়ে থাকে চিরদিনের জন্যে পাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা। প্রতিদিন ভোরের আকাশতলে এই দুই মহতের প্রণয়-লীলা তাই যেমন ক্ষণিক তেমনি করুণ।

ছাদ থেকে নীচে নামলাম। উদ্দেশ্য, চা-এর সদ্ব্যবহার করব। নীচে নামতেই দেখি, এক ভদ্রলোক বসে হাঁপাচ্ছেন। তিনিই শুধালেন, আচ্ছা কতক্ষণ আগে সূর্যোদয় হয়েছে? আঁ, মিনিট ১৫ আগে। আর কি করব! শুনলাম, ভদ্রলোকের ইতিহাস। আসছিলেন তিন বন্ধুতে। রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার দরুণ গাড়ি ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেন। অপর দুই বন্ধুর একজন, অল্প কিছুদিন হল, টাইফয়েড থেকে উঠেছেন। তাই তাঁদের দেরী হচ্ছে। ভদ্রলোক বলছিলেন, তার মুখে-চোখে হতাশার ভাব সকরুণভাবে ফুটে উঠছিল।

মিনিট ১৫ বসে থাকবার পরও যখন অপর দুই বন্ধু এসে পৌঁছুলেন না, তখন তিনিই নিজে থেকে বললেন—চলুন, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক, ওদের সঙ্গে রাস্তাতেই সাক্ষাৎ হবে। একবার তাকে বলতে ইচ্ছা হল, আপনাদের তিনঘটিত দোষ ঘটে গেছে; কিন্তু তার অসহায় মুখের দিকে চেয়ে কিছুই বলাটা ভাল মনে করলাম না।

এক সঙ্গেই নেমে চলেছি, আর তিনি তাঁর অসমাপ্ত কাহিনী বলে চলেছেন—"......মোটর আসবার কথা ছিল ৩টার সময়, ও বেটা এল ৪।১৫টার সময়। আমরা গোটা গাড়িটাই চুক্তি করেছিলাম মোটা টাকাতে—২০ টাকা—টাইগার হিল, সিঞ্চল লেক ইত্যাদি দেখাবে বলে। তা আসলেই ফে'সে পড়লাম। ......" আমাদের একজন বললেন, ঠিক আছে, ড্রাইভারকে এক পয়সাও দেবেন না।—তা কি করে হবে? ভদ্রলোক কাতরকণ্ঠে বললেন—ও তবে স্যানাটোরিয়াম (কলকাতা থেকে এসে তারা এখানেই উঠেছেন) পর্যন্ত গিয়ে ধাওয়া করবে। লোক জমবে। তারপর হয়ত একটা কিছু ডিসিসন হবে।

আমার সঙ্গী অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বললেন—আচ্ছা চলুন তো। দেখাই যাক না।

একা দেখা আর দলবল নিয়ে দেখা, এ দুয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তাই আমি মনে মনে একটা অশুভ ব্যাপারের অনর্থ সূচনার আভাস আঁচ করছিলাম।

প্রায় আধ মাইল বাদে ভদ্রলোকের অপর দুই সঙ্গীর সঙ্গে দেখা। তারা উপরে আসছিলেন, কিন্তু আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গল্প তাঁদের অল্প না—দ্বিগুণ উৎসাহে আবার শুরু হল গত রাত্রি থেকে আরম্ভ করে আজকে সকাল পর্যন্ত। একজন বললেন, চলুন, দেখবেন—ড্রাইভার গাড়ি ঠিক করে এনেছে; তাছাড়া যাওয়ার জন্যও বলছে আবার। বক্তাই পূর্বকথিত সদ্যোত্থিত টাইফয়েড রোগী। তাঁর কথার সুরে মনে হল, তিনি গাড়িতে বাড়ি যাওয়ার পক্ষপাতী।

গাড়ির কাছে এসে সবাই দাঁড়ালাম। ড্রাইভার তার কর্তব্য করতে কসুর করল না। বার বার বলল, গাড়িতে যাবার জন্য। কিন্তু যাত্রীরা তখন না যাওয়ার ভোটে ভারী। কাজেই বেশী বাক্যব্যয় না করে সোজা নামতে লাগলেন।

ড্রাইভার আমাদেরই পাশ কাটিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমরা নির্বিবাদে তাকে যেতে দিলাম। কিন্তু তার এ অপূর্ব নীরবতায় আমাদের কেমন সন্দেহ হল।

বেলা তখন বেশি না হলেও এদিকে মনে হয় অনেক বেলা হয়েছে,—রৌদ্রতাপও দুঃসহ রকমের। বহুদিন আগেকার বিজ্ঞানের জ্ঞান মনে উঁকি মেরে গেল—চারিপার্শ্বে পাথর-ঘেরা বলেই এমন হয়; যেমন গরম, তেমনি নরম—মানে ঠাণ্ডা।

যদিও আমরা নীচে চলছিলাম, তাকাচ্ছিলাম কিন্তু উপরের দিকে। রবি-করোজ্জ্বল প্রভাত, পাহাড়ের চূড়ায় সাদা বাড়িগুলোর শুভ্রতা চোখে ধাঁধা লাগায়। পাহাড়ের গায়ে পথ বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, গত বছরের Landslipএর চিহ্ন বিরাট ক্ষতচিহ্নের মত চারিদিকেই দৃশ্যমান। Caventar Co.'র বাড়ি ছবির মত সাজানো পাহাড়ের গায়। একজন দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, ঐ যে ড্রাইভারটা গাড়ি নিয়ে এসে এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

ড্রাইভারের মূর্তিতে ফূর্তির কোন লক্ষণ আগেও ছিল না; এখন যেন সে-চেহারা আরও বেয়াড়া রকমের হয়েছে মনে হল।

গাড়ির পাশে সে দাঁড়িয়েছিল। আমরা জানতাম, সে নিশ্চয়ই কিছু বলবে আমাদেরকে উদ্দেশ করে। তাই আমরা যতটা সম্ভব অকারণ গাম্ভীর্যময় চালে চলতে লাগলাম। প্রায় কাটিয়েও গিয়ে-ছিলাম তাকে—হঠাৎ সে ডাকলে, বাবু! বিশেষ কাকেও যে সে লক্ষ্য করে বলছে, না-ও হতে পারে, কিন্তু guilty mindএর kind-ই আলাদা, তাই সাথে সাথেই ভদ্রলোকেরা—যাঁরা গাড়ি ভাড়া করেছিলেন, থেমে পড়লেন। আমরাও যোগ দিলাম।

তর্ক-বিতর্ক কিছুক্ষণ হল এবং সেটা আশ্চর্যও কিছু নয়। কারণ আমরা বাঙালীরা কাজের চেয়ে কথাতেই কর্তামি করি বেশি। শেষে ঠিক হল, দার্জিলিং থেকে ঘুম স্টেশন পর্যন্ত তাকে ভাড়া দেওয়া হবে। সে অনেক কাকুতি-মিনতি, হাতজোড়, অনেক কিছু করলে। তার ভাগ্যদোষে গাড়ি বিগড়োল; সে তো আর অন্তর্যামী নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের তখন শিভালরাস স্পিরিট জেগে উঠেছে—ভদ্রলোকদের উপকার করতেই হবে। আমাদের এক কথা। অবশেষে আট আনা হিসাবে তিনজনের দেড় টাকা না দিয়ে পুরোপুরি দু' টাকাই দেওয়া গেল। ড্রাইভারটি দূর আকাশের মত মুখখানা কালো ক'রে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। আমার কিন্তু সত্যিই দুঃখ হচ্ছিল, কেবলই ওর ওই কথাটা মনে আসছিল—গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে ও কি করবে? অথচ শেখানো বুলির মত আমিও তাকে একবার বলেছিলাম, টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে পেলে বাবুরা তো পুরো টাকাই দিতেন—যে কথাটা পরে মনে হয়েছিল অবান্তর।

Ghoom monastery'র পাশ দিয়ে আরও খানিকটা নেমে সদর রাস্তায় এসে পড়লাম; দাঁড়ালাম একটা খাবারের দোকানের সামনে। বলা বাহুল্য, খাবারের জন্য নয়—একটা আলোচনার জন্য। বাসে না ট্রেনে, অষ্টবসুর দলের ফিরতি-যাত্রা শুরু হবে তারই আলোচনা।

নিকটেই যে 'বাস'টা দাঁড়িয়েছিল, তার ড্রাইভারটা পাণ্ডার চাইতেও নাছোড়বান্দা। আমাদের আলোচনার অর্থ না বুঝলেও তার পাণ্ডাগিরি ব্যর্থ হল না, আমরা ধরা পড়লাম তার হাতে। উঠে বসলাম তার বাসে।

মাঝে তিনজনকে নামিয়ে দিয়ে থামলাম এসে বাস-স্ট্যাণ্ডে। নামলাম যখন রাস্তায়, "Capitol"-এর শীর্ষে ঘড়িতে তখন ৭-৪০ মিঃ অর্থাৎ মিনিট ২৫-এর মধ্যেই 'ঘুম' থেকে দার্জিলিং।

আজকের প্রভাতও অতি রমণীয়। আকাশ ঘন নীল; পাইনের ঝাঁকড়া মাথায় বাতাস ফিরছে নেচে নেচে; দূরবর্তী পর্বতশিখরে সূর্যের আশীর্বাদ ছড়িয়ে পড়েছে অনেক আগেই, জনপ্রাণী না থাকার দরুণ প্রাণ-চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয় না; দ্রুত-চলমান কুয়াশার অতি-মাত্রার ব্যস্ততা নেই কোথাও; পাখীরা যেন প্রাণ খুলে এ প্রভাতকে বন্দনা করছে।

আমাদের রাত্রি-জাগরণের অবসন্ন, ক্লান্ত দেহ, নির্মল নীল আকাশতলে, প্রভাতের অজস্র দাক্ষিণ্যে এক মুহূর্তেই যেন সজীব হয়ে উঠল।

দক্ষিণ ভারতে

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য

২

কান্দালুর অভিমুখে

মাদ্রাজ * হইতে বন্ধুটি বলিয়া দিয়াছিলেন পণ্ডিচেরী হইতে ট্রেন না ধরিয়া মোটরে সোজা কান্দালুর যাইতে। কারণ ট্রেন ধরিলে পণ্ডিচারী হইতে ভেলুপুরা ঘুরিয়া কান্দালুর দিয়াই ত্রিচিনাপল্লী যাইতে হইবে। সোজা কান্দালুরে গিয়া গাড়ি ধরিলে সময়সংক্ষেপ হইবে। চারুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কান্দালুরে যাইবার উপায় 'মোটর বাস'. উহা বৈকাল ৪টায় পণ্ডিচেরী হইতে ছাড়ে। আমি প্রস্তুত হইলাম। তিনি একজন আশ্রমকর্মীকে সঙ্গে দিলেন। কর্মীটি একখানি সাইকেল-রিক্সা করিয়া আমাকে বাস-স্ট্যান্ডে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। দশ আনার টিকিট কাটিয়া 'বাসে' উঠিয়া বসিলাম। যাত্রা সুরু হইল।

কান্দালুরে 'বাসে' উঠিতে গিয়া প্রথমে অসুবিধা উপলব্ধি করিলাম ভাষা। কণ্ডাক্টার কিছু বলিল, যাহাতে মনে হইল, আমার সুটকেসটার জন্য পৃথক ভাড়া চাহিতেছে। আপত্তি জানাইলাম। আশ্রমকর্মীটি যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তাহাকে ডাকিলাম। সে কণ্ডাক্টারকে বলিয়া গোলমাল মিটাইয়া দিল, অবশ্য তামিল ভাষায়। পূর্বেই বলিয়াছি, অন্য কোন ভাষা এদেশে অচল। হিন্দী চলে না। ইংরেজী শিক্ষিত, অল্প-শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত মহলে চলে, কিন্তু সাধারণে ও পথে তাহা অচল। দেবালয়ে সংস্কৃত চালাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি; এক মাদুরা মন্দিরে ছাড়া অন্য কোথাও সে ভাষাতে কোন সাড়া পাই নাই। তামিল-রাজ্য মাদ্রাজের উপপ্রদেশ মাত্র। কিন্তু তামিলীরা আপনাদের ভাষাকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, অন্য কোন প্রদেশে কোন প্রাদেশিক ভাষা সেরূপ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে কি না সন্দেহ। 'বাসের' টিকিটে ও 'বাসের' গায়ে মূল্যের ও গন্তব্য-স্থানের পরিচয়ে তামিল ভাষা ও তামিল অক্ষর ব্যবহৃত। সম্মুখের বোর্ড দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই, কোন্ 'বাস' কোথায় যাইবে। একমাত্র চিহ্ন যাহা বোঝা যায়, একটা নম্বর, নম্বরটা ইংরেজীতে; উহা বাস-রুটের পরিচয়। আমি এই নম্বর অনুযায়ী রুট-পরিচয় জানিয়া লইতাম এবং তাহাতেই কাজ চালাইতাম। কান্দালুর স্টেশনে পৌঁছিয়া পরবর্তী ট্রেনের সময় জানিতে গিয়া দেখিলাম টাইম-টেবলটি আগাগোড়া তামিল ভাষায় মুদ্রিত। রেলগাড়ির প্রথম প্রবর্তন বাঙলা দেশে, কিন্তু এ পর্যন্ত স্টেশনে পুরোপুরি বাঙলা ভাষায় মুদ্রিত টাইম-টেবলের ব্যবহার চোখে পড়ে নাই। অথচ কান্দালুর স্টেশনে দেখিয়াছিলাম, ইহাই একমাত্র টাইম-টেবল। শিক্ষিত তামিলীরা মুখে ইংরেজিতে খুব দড়, কিন্তু আমাদের এখানে ইংরেজি ভাষা যেরূপ প্রধান হইয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তামিল অঞ্চলে তাহার প্রমাণ পাই নাই।

পথের দেখা

বাস ছাড়িল। তখন উপলব্ধি করিলাম আমি একা। যাহাদের ভাষা পর্যন্ত বুঝি না, তাহাদের সহিত মিলিয়া চলিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যেই থাকিতে হইবে। কাহাকেও না কাহাকেও আপন করিয়া না লইলে ইহা সম্ভব নহে। বাসের আরোহীদিগের সকলের মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া একজনের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলাম; ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাস কান্দালুরে পৌঁছিবে কখন? তিনি বলিলেন, সন্ধ্যায়। কান্দালুর হইতে ত্রিচীতে নামিয়া কাবেরীস্নানে ও রঙ্গনাথ-দর্শনে যাইব শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'ত্রিচীতে যাইবেন কেন? ত্রিচী. তো রঙ্গনাথ ছাড়াইয়া। তাহা না করিয়া শ্রীরঙ্গম স্টেশনে নামাই আপনার ঠিক হইবে। সেখানেই কাবেরী ও রঙ্গনাথের মন্দির। শ্রীরঙ্গমে পৌঁছিতে ভোর হইবে, সেখান হইতে একটা গরুর গাড়ি লইয়া কাবেরীতে যাইবেন। সকাল সকাল স্নান সারিয়া সেই গাড়িতেই মন্দিরে আসিবেন, রঙ্গনাথ দেখিয়া মন্দিরের সামনে খাবারের দোকানে কিছু খাইয়া লইবেন। সেখানেই 'বাস' দাঁড়ায়। 'বাসে' উঠিয়া জম্বুকেশ্বর শিবের মন্দিরে যাইবেন। তথা হইতে ফিরিতে মধ্যাহ্ন হইবে। এই দুইটি দেখিবার পর যাহা ইচ্ছা করিবেন, পাহাড়ের উপর স্বর্ণ-মন্দির আছে, তাহাও দেখিয়া লইতে পারেন। তাহার পর স্টেশনে ফিরিয়া আসিবেন। ইচ্ছা হইলে ত্রিচী যাইতে পারেন, কিন্তু যাইবার দরকার নাই।' পথের আরও একটি সন্ধান তাঁহার নিকট হইতে পাইলাম—শ্রীরঙ্গম যাইতে বৃদ্ধাচলম জংসনে নামিয়া গাড়ি বদল করিয়া লইলে পথের অনেকটা সংক্ষেপ হয়।

যাঁহার সহিত এইভাবে পরিচয় হইল, তিনিও কান্দালুরের যাত্রী। যথেষ্ট আগ্রহের সহিত তিনি আলাপ করিতেছিলেন এবং অত্যন্ত আপনার জনের মত সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। সম্ভবত, এই দূরদেশে বাঙালী-পরিচ্ছদ-পরিহিত মূর্তি তাঁহার কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। আলাপে জানিলাম, ভদ্রলোক বি-এ, বি-টি, নাম পণ্ডাপগেশম, পণ্ডিচেরীর এক কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। তিনিও আমার পরিচয় লইলেন এবং পণ্ডিচেরীতে বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আসিয়াছিলাম শুনিয়া পণ্ডিচেরীর কথা তুলিলেন। পণ্ডিচেরী আশ্রম সম্বন্ধে তাঁহার মতামত বলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, স্থানীয় লোকের ধারণাও ইহাই। প্রস্তাবিত বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্বন্ধে বলিলেন, উহার ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যাহাতে স্থানীয় লোকেরা এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের সন্তানেরা উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। উহার শিক্ষা যেন কেবল ধনীর লভ্য না হয়।

---

*মাদ্রাজ সম্বন্ধে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা পূর্বে বলা হয় নাই; এখানে বলিয়া রাখি। শহরে নিম্নতর বৃত্তির যে সকল কাজ তাহার জন্য কলিকাতার মতো প্রদেশের বাহির হইতে লোক আনাইতে হয় না। পথ পরিষ্কার, ময়লা অপসারণ প্রভৃতি কাজের জন্য স্থানীয় লোকই পাওয়া যায়।

এই দিকটাতে লক্ষ্য রাখিবার জন্য তিনি বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। আলাপের প্রসঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনা উঠিল। টেনিসনের "Passing of Arthur"-এর একটা অংশ তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন, তাহা মনে লাগিয়াছিল। তিনি বুঝাইলেন এবং আমারও মনে হইয়াছিল, তাঁহার কথা ঠিক, যে, উহাতে ভক্তি-শুষ্ক নদীর খাত। দণ্ডকারণ্য বর্ণনাচ্ছলে যোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ—ত্রয়ের সম্মিলন ঘটিয়াছে। তিন দিক দিয়াই ইহার ব্যাখ্যা হইতে পারে। স্বীকার করিলাম, তাঁহার এ-ব্যাখ্যা অভিনব।

দক্ষিণের প্রকৃতি

তাঁহার সহিত যতক্ষণ আলাপ করিতেছিলাম, ততক্ষণ গাড়ি হু-হু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, আর আমি বসিয়া বসিয়া দক্ষিণের গ্রাম্য প্রকৃতির শোভা দেখিতেছি। বিস্তৃত প্রান্তর—ঘন নারিকেল-বনের সারি—মধ্যে মধ্যে পাহাড় ও বালুকাময়, বিশাল, দক্ষিণের প্রাকৃতিক শোভার যে বর্ণনা ভবভূতি 'উত্তরচরিতে' দিয়াছেন, বসিয়া বসিয়া তাহাই মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিলাম :—

"স্নিগ্ধশ্যামা ক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরুক্ষা
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাং
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্গর্তকান্তারমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ ॥"

'কোথাও বনরাজীর স্নিগ্ধ শ্যামলিমা—কোথাও বিস্তৃত প্রান্তরের ভীষণ রুক্ষতা—স্থানে স্থানে নির্ঝরের পতন-শব্দে ধ্বনিত দিঙ্মণ্ডল; পুণ্য জলাশয়, আশ্রম, পর্বত, নদী, গহ্বর ও অরণ্যের সংমিশ্রণে প্রকৃতির বিচিত্র রচনা এই ভূভাগ।'

ভবভূতি দাক্ষিণাপথের কবি।

একে একে চারিটি নদীর সেতু পার হইতে হইল—দুইটি নদীর নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই, দুইটির নাম জানিতে পারিয়াছিলাম—পেন্নার ও গরুড়। সমুদ্রের যে অত্যন্ত নিকট দিয়া যাইতেছি, তাহা নদী পার হইবার সময়ে বুঝিতে পারিতেছিলাম। বনরাজীনীলা সমুদ্র-বেলার তরুপ্রাচীর বিভক্ত করিয়া নদী সমুদ্রে মিশিয়াছে এবং সেই মুক্ত পথে সমুদ্রতরঙ্গ দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। সম্ভবত, পেন্নার নদীর মোহানা দিয়াই সমুদ্র-দর্শনের চমৎকার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

ইহারই মধ্যে পূর্বের না। দুইবার শুল্ক-সীমানা পার হইতে হইল। পণ্ডিচেরীতে আসিবার সময়ে মোটরে ছিলাম, আমাকে শুল্ক-অফিসে যাইতেও হয় নাই, শুল্ক-বিভাগীয় পরীক্ষার রকমটা বুঝিতে পারি নাই। এবার তাহা বুঝিলাম। যাত্রিবাহী 'বাস' শুল্ক সীমায় পৌঁছিবামাত্র আরোহী-দিগকে নামাইয়া দেওয়া হয়। তারপর খালি 'বাসটি' শুল্ক-সীমানা পার হইয়া পার্শ্ববর্তী মাঠে অপেক্ষা করে। একজন কর্মচারী 'বাসটির' ভিতরে, বাহিরে, তলায় ও উপরে সমস্ত দেখিয়া লন। আর যাত্রীরা শুল্ক-অফিস গৃহে প্রবেশ করিয়া একটি সরু পথের মধ্য দিয়া একে একে মালপত্র লইয়া অগ্রসর হইতে থাকে এবং অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া পুনরায় 'বাসে' ওঠে। অফিস গৃহের মধ্যে ব্যবস্থাটা অনেকটা ব্যাঙ্কের কাউণ্টারের মত। তাহার এক দিক দিয়া যাত্রীরা যায় এবং অপর দিকে দাঁড়াইয়া শুল্ক-কর্মচারীরা মালপত্র পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেয়। এই পরীক্ষা লইয়া আমাকে কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় নাই। সুটকেসের উপরে নাম লেখা ছিল। কলিকাতা হইতে আসিতেছি শুনিয়া নিয়ম রক্ষার জন্য বাক্সটি খুলিয়া মোটামুটি দেখিয়া তাঁহারা আমাকে অব্যাহতি দেন।

কান্দালুর—সন্ধ্যা

চলিতে চলিতে 'বাস' কান্দালুরে আসিয়া পৌঁছিল। তখন সন্ধ্যা। বাহিরে অন্ধকার নামিতেছে—মনের মধ্যেও অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে। বুঝিতেছি, এইবার সত্যই একা হইতে হইবে। পঞ্চাপগেশম্ চলিয়া যাইবেন। তারপর যদি সময়মতো গাড়ি না পাই, রাত্রিতে কোথায় থাকিব, জানি না। মনের অবস্থা হয়তো মুখের ভাবে খানিকটা ফুটিয়া উঠিয়া থাকিবে। অধ্যাপক আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আপনি ইচ্ছা করিলে রাত্রিতে আমাদের বাড়িতে থাকিয়া যাইতে পারেন, কাল সকালে না-হয় যাইবেন। তাঁহার সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু তখন পথের আকর্ষণের বেগে চলিয়াছি, কোথায়ও থাকিয়া যাইবার মত মনের অবস্থা ছিল না।

'বাস' হইতে নামিয়া তিনি একটি কুলী ডাকিলেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া কান্দালুর স্টেশনে আসিলেন। আমার জন্য নিজে গিয়া টিকিট কিনিলেন এবং আমার যাহাতে কোন অসুবিধা না ঘটে, তজ্জন্য স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনুরোধ করিলেন। উচ্চ শ্রেণীর টিকিট পাওয়া গেল না। এই সকল স্থানীয় গাড়িতে থাকে শুধু তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণী; মধ্যম শ্রেণীর টিকিট লইয়া বৃদ্ধাচলমে গিয়া বদলাইয়া লইতে বলিলেন। অধ্যাপকের ইচ্ছা ছিল আমাকে একেবারে বৃদ্ধাচলম পৌঁছাইবার গাড়িতে তুলিয়া দিয়া যাইবেন, তাহা হইল না। পূর্বে কান্দালুর হইতেই গাড়ি ছাড়িয়া বৃদ্ধাচলম যাইত। নূতন ব্যবস্থায় তাহা উঠিয়া গিয়াছে, এখন এখান হইতে গাড়ি ছাড়ে না। মায়াভরম্ হইতে গাড়ি কান্দালুর দিয়া ভেলুপুরম যায়, ফিরিবার সময়ে বৃদ্ধাচলমের যাত্রী লইয়া কান্দালুরের পরবর্তী স্টেশনে নামাইয়া দিয়া যায়। সেখানে অন্য গাড়ি ধরিয়া বৃদ্ধাচলম যাইতে হয়। বৃদ্ধাচলমে রাত্রি বারটার পর মাদ্রাজের গাড়ি ধরিয়া শ্রীরঙ্গম যাইতে হইবে। আমরা যখন কান্দালুর পৌঁছিয়াছি, তখনও মায়াভরমের গাড়ি আসে নাই। আমরা যাইবার কিছুক্ষণ পরেই উহা আসিয়া ভেলুপুরমের দিকে চলিয়া গেল। আমাকে তুলিয়া দেওয়ার জন্য গাড়ি পুনরায় ফিরিয়া আসার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা পঞ্চাপগেশমের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি একটি ছোকরা কুলীকে ডাকিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন, আমাকে উঠাইয়া দিতে বলিলেন এবং গাড়ি ভেলুপুরম হইতে ফিরিয়া স্টেশনের যেখানে আসিয়া দাঁড়ায়, সেই জায়গায় আমাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন। বিদায় দিতে ক্লেশ হইল।

অন্ধকার ঘনীভূত

পঞ্চাপগেশম চলিয়া যাইবার পর নিজের অবস্থা আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিলাম—সম্পূর্ণ একাকী, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। অনিশ্চয়তার গুরুভারে মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। নিঃসঙ্গ-ভ্রমণ আমাকে অনেক করিতে হইয়াছে, সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে, নিতান্ত অপ্রত্যাশিত অবস্থায় পড়িয়া অসহায় ও একাকী ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হইয়াছে। কিন্তু উহা কখনও এমন অসহনীয় বোধ হয় নাই। আপনার নিয়তির উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল মন কখনও বিচলিত হয় নাই। এবারকার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নূতন, সম্পূর্ণ আকস্মিক। একাকিত্বের চিন্তাই মনকে পীড়িত করিতেছিল। অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ একটা ঘটনাচক্র। তথাপি মনে হইতেছিল, তিনি যেন কত আপনার। তাঁহার সহিত অন্তত ভাব বিনিময়ের উপায়

ছিল। কিন্তু এখন আমি যেন সমাজ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। গৃহে অশীতিপর বৃদ্ধা জননী, নিতান্ত অসুস্থ। সেইজন্য বাহিরে যাইতে হইলে—গৃহের সহিত দ্রুত সংবাদ আদানপ্রদান করা যায় এবং দ্রুত ফিরিয়া আসিবার উপায় থাকে, ইহা লক্ষ্য রাখিয়া যাতায়াত করি। কিন্তু এখন? দ্রুত ফিরিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, সংবাদ পাইবার পর্যন্ত কোন উপায় নাই; কারণ আমার নিজের অবস্থানই অনিশ্চিত। দীর্ঘকাল এরূপভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ি নাই। মনে হইল, এরূপ অবস্থায় হঠকারীর মত চলিয়া আসাটা ঠিক হয় নাই। একবার ভাবিলাম, এখান হইতেই ফিরিয়া যাই। কিন্তু ফিরিতে হইলেও ফিরতি-গাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত থাকিতে হইবে। নির্জন প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত স্টেশনে রাত্রিযাপনের স্থান কোথায়? স্টেশন অফিসের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম—দেবদর্শন ও তীর্থস্নান সংকল্প করিয়া আসিয়াছি, তাহা ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া যাইবার কথা ভাবিতে নাই। ইহাও বুঝিতেছিলাম, এতদূরে আসিয়া ফিরিয়া গেলে এ সুযোগ হয়তো আর আসিবে না। অনিশ্চয়তার, সংশয়ের ও উদ্বেগের ভার অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। সে এক অপ্রত্যাশিত ও অদ্ভুত মানসিক সংকট! চতুর্দিককার নির্জনতাকে ঘিরিয়া অন্ধকার নামিয়াছে—প্রান্তরসীমায় দেখাইতেছে বনভূমির মত এবং অন্ধকারের মধ্য হইতে আসিতেছে পশুপক্ষীর শব্দ। আকাশ নির্মল, চন্দ্র নাই, কিন্তু নক্ষত্রের আলোক খচিত। মন স্থির করিবার জন্য অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম। যে দেবতাকে দেখিতে চলিয়াছি, তাঁহার চিন্তায় মনকে নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম। শ্রীরঙ্গনাথের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে যামুনাচার্যস্তোত্রের কয়েক ছত্র মনে পড়িল—

"নিমজ্জতোঽনন্ত-ভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধ-
স্ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী—
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ।"

আলোক প্রকাশ

যামুনাচার্যস্তোত্র স্মরণে আসিতেই সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ হইল মহাপ্রভুর কথা। যেন চক্ষের উপরে দেখিতে পাইলাম, বাহ্যজ্ঞানহীন সন্ন্যাসী দক্ষিণের পথে একা ছুটিয়া চলিয়াছেন। নিজের দুর্বলতায় লজ্জা অনুভব করিলাম। ভাবিলাম, বিংশ শতাব্দীর এত আয়োজনের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমি আপনাকে অসহায় বোধ করিতেছি। প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বে মহাপ্রভু যখন একা এই পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন ভরসা কি ছিল? সহায়-সম্বলই বা কি ছিল? মহাপ্রভুর চিন্তা কিছুকাল মনকে অধিকার করিয়া রাখিবার পর সহসা যেন অন্ধকারের মধ্যে আলোক-চ্ছটার প্রকাশ অনুভব করিলাম; সহসা মনে হইল, মহাপ্রভুর একটা বড় সহায় ছিল। সে সহায় কয়েক ছত্র পদ—যাহা আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি পথ চলিতেছিলেন—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্"

অন্ধকারের মধ্যে একা দাঁড়াইয়া আবিষ্টের মত শেষ দুই ছত্র ক্রমাগত আবৃত্তি করিতে লাগিলাম।

ট্রেনটা আসিতে বিলম্ব হইতেছিল। তাহাও এক উৎকণ্ঠার হেতু। ভাবিতেছিলাম, হয়তো গাড়ি ভুল করিয়াছি। কাদ্দালুর স্টেশনের লাইনের অপর পার্শ্বে অন্য একটি স্টেশনের নাম লেখা দেখিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, হয়তো ভিন্ন লাইনের কোন গাড়ি এখান দিয়া গিয়াছে। ভাবিতেছিলাম, সেই ভেলুপুরমের গাড়িই যখন আমাকে ধরিতে হইল, তখন ছুটাছুটি করিয়া এখানে এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। পণ্ডি-চেরী স্টেশনে খোঁজ লইয়া ভেলুপুরম হইতে এই গাড়ি ধরিবার ব্যবস্থা করিলেই ভালো হইত; আরও ভালো হইত ভেলুপুরম হইতে একেবারে ইহার পরবর্তী মাদ্রাজের গাড়ি ধরা। তাহা হইলে দফায় দফায় এত গাড়ি বদল না করিয়া একেবারে শ্রীরঙ্গমে গিয়া নামিতে পারিতাম। কিন্তু সেকথা তখন আর ভাবিয়া লাভ নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হইতেছিল, ট্রেনে আসিলে পথে যাহা দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহা দেখা ঘটিত না—যে ব্যক্তিগত পরিচয় হইয়াছে (এবং পরে আরও যে পরিচয় হইল) সে পরিচয়ের সুযোগও মিলিত না। ট্রেনের বিলম্বের কারণ এবং ঠিক ট্রেনের জন্য দাঁড়াইয়া আছি কি না জানিবার জন্য উদ্বেগ হইতেছিল। স্টেশন অফিস পূর্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পথ্যাপগেশম যে ছোকরা কুলীটিকে জুটাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে কোনমতে বুঝাইতে পারিতেছিলাম না—বুঝিলেও সে আমার উত্তর দিতে পারিতেছিল না। আর একটি কুলী দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সহিত কেবল হাসাহাসি করিতেছিল। উভয় দিক হইতে পরস্পরকে বুঝাইবার অনেকক্ষণ চেষ্টার পর ছোকরা কুলীটি যথেষ্ট চেষ্টায় দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিল—'হাফ আওয়ার'। বুঝিলাম, ট্রেন অন্তত আধ ঘণ্টা লেট। ছোকরাটি এতক্ষণে বুঝিল যে, আমি বুঝিয়াছি এবং আমাকে যে বুঝাইতে পারিয়াছে, সেই আনন্দেই উভয় সঙ্গী মিলিয়া হাসিতে হাসিতে প্লাটফর্মের উপর গড়াগড়ি।

এতক্ষণ আমি মহাপ্রভুর নামমন্ত্র ক্রমাগত আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছি। আবৃত্তি করিতে করিতে মনের দ্রুত অবস্থান্তর উপলব্ধি করিলাম। রসায়ন সেবনে দুর্বল দেহে যেমন বল ফিরিয়া আসে, তেমনি নামমালা আবৃত্তি করিতে করিতে মন শান্ত ও সুস্থ হইয়া আসিল। সংশয়ব্যাকুল মন আবার আত্মবিশ্বাসে স্থির হইল। সংকল্প পুনরায় দৃঢ় হইল। সংশয়, উদ্বেগ, দ্বিধা, অনিশ্চয়তা কাটিয়া আশ্বাস জাগিল। নৈশ অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে যে সঙ্কটের অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছিল, তাহা কাটিয়া গেল। স্থির করিলাম, যতক্ষণ পথ চলিব, মহাপ্রভুর অবলম্বিত এই নামমালা আবৃত্তি করিতে থাকিব।

ভাবিতে ভাবিতে ট্রেন আসিয়া পড়িল। এতক্ষণের সঙ্গী ছোকরা কুলীটি আমাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া বিদায় লইল। গাড়িতে লেখা আছে সেকেন্ড ক্লাস, অথচ ইণ্টার ক্লাস টিকিট লইয়া উঠিতে হইতেছে, একটা সংকোচ অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু এখানকার এই ব্যবস্থা, বিশেষত আমাকে যাইতে হইবে মাত্র একটা স্টেশন পর্যন্ত। পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না, নামিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া বৃদ্ধাচলমের গাড়িতে উঠিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। এখানেও সেই ব্যবস্থা। ইণ্টারের টিকিটে সেকেন্ড ক্লাসে ভ্রমণ। বৃদ্ধাচলম পৌঁছিতে কিছু সময় লাগিল। গাড়িতে বসিয়া একটু ভাবিবার সময় পাইলাম। ভাবিতেছিলাম, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু কয়েক শত যুবক যে দক্ষিণের রেলপথে

কাজ লইয়াছে, তাহাদের কাহারও সহিত দেখা হয় না! দেখিতে দেখিতে যাই, কেহ না কেহ চোখে পড়িবেই। কোন স্টেশনে গাড়ি থামিলেই আলোকমিশ্র অন্ধকারের মধ্য দিয়া যথাসম্ভব মনোযোগের সহিত লোকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম—বাঙালী মুখের ছাপ দেখা যায় কিনা, অনুমান করিয়া দুই-একজনের সঙ্গে আলাপও করিলাম। কাজে আসিল না। গাড়ি বৃদ্ধাচলম স্টেশনে পৌঁছিয়া গেল।

বৃদ্ধাচলম—কূল মিলিল

বৃদ্ধাচলম একটি বৃহৎ জংসন স্টেশন। দক্ষিণ ভারতের সব কয়টি প্রধান রেলপথ এই জংসনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। নামিয়াই দেখিয়া লইলাম স্টেশন মাস্টারের ঘর কোথায়। স্যুটকেসটি হাতে লইয়া সোজা-সুজি লাইনের উপর দিয়া অপর দিকের প্ল্যাটফরমে উঠিলাম। স্টেশন মাস্টার ঘরে নাই, ডেপুটি আছেন, যুবক। স্যুটকেসটি নামাইয়া বলিলাম, কলিকাতা হইতে আসিতেছি, ত্রিচীনপল্লীর লাইনে যাইব; তিন দফা সাহায্য চাই—প্রথম, ইণ্টার ক্লাস টিকিটটি বদলাইয়া সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট দিতে হইবে; দ্বিতীয়, গাড়িতে তুলিয়া দিতে হইবে এবং তৃতীয়, আমার গন্তব্য ও দর্শনীয় স্থানগুলি যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে এবং সুবিধায় ভ্রমণ করা যায়, তাহার একটি প্ল্যান করিয়া দিতে হইবে। সাড়ে নয়টায় বৃদ্ধাচলম পৌঁছিয়াছি—সাড়ে বারটার পর মাদ্রাজ হইতে তুতিকোরিন এক্সপ্রেস আসিয়া পৌঁছিবে। এই সময়টার মধ্যে ভ্রমণের প্ল্যানটা করিয়া লইতে চাই। সহসা এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়া যুবকটি খানিকটা বিব্রত হইয়াই আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু আমারও ইহা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। উত্তরটা কি আসিবে, ভাবিতেছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কেহ বলিয়া উঠিল—'স্যার, আপনি কি বাঙালী!' আকস্মাৎ দেবতা স্বয়ং আসিয়া আবির্ভূত হইলেও বোধ হয় এতটা বিস্মিত হইতাম না। বিদ্যুৎগতিতে ফিরিয়া দেখিলাম, দুইটি প্রিয়দর্শন বাঙালী যুবক রেলকর্মীর পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যামুনাচার্য-স্তোত্র মনে পড়িল—'নিমজ্জতোঽনন্তভবার্ণ-বান্তশ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ'। পাথারের মধ্যে সহসা কূল মিলিল।

সন্ধ্যায় কান্দালুর স্টেশনে দাঁড়াইয়া মনের অবস্থাটা যাহা হইয়াছিল, এখনকার অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। দীর্ঘ সময়ের নৈরাশ্যবোধ, অনিশ্চয়তা ও আকুল সন্ধানের পর সহসা বৃদ্ধাচলমে আসিয়া পরিচিত বাঙালী সম্বোধন শুনিয়া মনটা অননুভূতপূর্ব আশ্বাসে ভরিয়া উঠিল। গ্লানি ও অবসন্নতা কাটিয়া গেল' সংশয়-দুর্বল মনে ভরসা ও স্বস্তিবোধ ফিরিয়া আসিল। যুবকদ্বয়ের প্রতি গভীরতম প্রীতি অনুভব করিলাম। ডেপুটি স্টেশন মাস্টার মহাশয়কে বলিলাম—'আমার উপায় মিলিয়াছে, আপনাকে আর বিব্রত করিব না। আপনার এই যুবক সহকর্মীদ্বয়কে কিছু-কাল আমার জন্য ছাড়িয়া দিন, তাহাতেই আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইবে'। তিনি সানন্দে সম্মত হইলেন, আমিও সানন্দে যুবকদ্বয়ের সহিত বাহির হইয়া আসিলাম।

এই যুবকদ্বয়ের সহিত এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ আমার ভ্রমণের এক বিশেষ ঘটনা। পরবর্তী ভ্রমণ-তালিকা যে অভিপ্রায়ানুরূপ সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার জন্য এই যুবক-দ্বয়ের নিকট আমি ঋণী। রেলওয়ের কার্য উপলক্ষে ভ্রমণ করিয়া দক্ষিণের প্রায় সর্বস্থান ইহাদের জানা। ডেপুটি স্টেশন মাস্টার মহাশয়কে যে প্ল্যানের জন্য অনুরোধ করিয়া-ছিলাম সে প্ল্যান ইহারাই তৈয়ারী করিয়া দিল। কোথায় কোন লাইনে যাইতে হইবে, কাহার পর কোথায় যাইতে হইবে, কোথায় কি কি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং কোথায় কিভাবে আশ্রয় পাওয়া যাইবে সমস্তটা ইহারা আমাকে মোটামুটি বুঝাইয়া দিয়াছিল। তাহারই উপরে নির্ভর করিয়া চলাফেরা করিয়াছি।

ভুলিবার নহে

যুবকদ্বয় আমাকে সঙ্গে লইয়া ওয়েটিং রুমে আসিল, আমি বলিলাম সমস্ত পথটা তোমাদেরই খুঁজিতে খুঁজিতে আসিয়াছি। অপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে তাহাদের দেখিয়া আমার যেমন আনন্দ হইয়াছিল, বাঙলা হইতে আগত একজন বাঙালীকে পাইয়া তাহাদেরও তেমনি আনন্দের সীমা ছিল না। স্টেশনেই তাহারা আমার মুখ হাত ধুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল এবং রাত্রের আহার্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে চাহিল। নিবৃত্ত করিয়া আমি তাহাদিগকে আমার কাছেই থাকিতে বলিলাম। তাহারা আমার পরিচয় লইল। আমি তাহাদের পরিচয় এবং বর্তমান জীবনযাত্রার সন্ধান লইলাম। যুবকদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জ্যেষ্ঠ ফণীন্দ্রনাথ বসুর বাড়ী বোয়ালমারী, ফরিদপুর, তাহার পরিবার এখন যাদবপুর ল্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ট্রাস্টের এলাকায় বাস করিতেছে। অপরটির নাম প্রণবকুমার রায় চৌধুরী, বাড়ী উলপুর, ফরিদপুর; তাহার পরিবার বাস করিতেছে বেলঘরিয়া চাঁদমারী কলোনীতে। ইহারা যাহা উপায় করে তাহা হইতে আপনাদের খরচা চালাইয়া সম্ভব হইলে পরিবারকে অর্থ সাহায্য করে। তাহাদের জীবনযাত্রার সন্ধান লইয়া জানিলাম, তাহাদের বাস স্টেশন-প্ল্যাটফরম, পরিচ্ছদ দুই প্রস্থ পোষাক, আহার সন্নিকটস্থ হোটেলে। আহারের অসুবিধা—টকের প্রাধান্য। মাংস খাইবার সময়েও তাহার মধ্যে খানিকটা টক ঢালিয়া দেয়। মাছ নাই তবে একটু ঘি পাওয়া যায় সেটুকু ভাল। প্রধানত জীবনযাত্রার এই অসুবিধার জন্য অনেকে ইতিমধ্যেই ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের বুঝাইয়া বলিলাম এই অবস্থায় ছাড়িয়া যাওয়ার অর্থ পরাজয় স্বীকার করা। পরাজয় স্বীকার করা উচিত নহে। কষ্ট বা অসুবিধা যতই হউক তাহাদিগকে সহিয়া থাকিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত তাহাতে ভালই হইবে। সে কথা তাহারা স্বীকার করিল। তাহারা যখন প্রথম এই অজানা অঞ্চলে আসিয়াছিল তখন একটা অস্পষ্ট ভয়ে ও সন্দেহে তাহাদের মন পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু কয় মাস কাজ করিবার পর এখন তাহাদের আত্মবিশ্বাস আসিয়াছে, এখন তাহাদের ভরসা হইয়াছে তাহারা যে কোনো অবস্থার সম্মুখীন হইতে পারে। তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া সে কথা আমার বিশ্বাস হইল। তাহারা বলিল আরও উদ্বাস্তু যুবক দক্ষিণের স্টেশনে স্টেশনে ছড়াইয়া আছে—ত্রিচিনপল্লীতে এবং মাদুরাতে নিশ্চয়ই আমি তাহাদের দেখা পাইব। কয়েকটি নামও দিল—বলিলাম খোঁজ লইব।

আমার ভ্রমণ তালিকা শুনিয়া যুবকদ্বয় তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া দিল। মাদ্রাজ হইতে বন্ধুটি যে ত্রিচিনপল্লীতে নামিয়া শ্রীরঙ্গম যাইতে বলিয়াছিল তাহারা তাহাই বহাল করিল। পণ্ডাপগেশম শ্রীরঙ্গমের টিকিট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বদলাইয়া ত্রিচীর টিকিট লইতে বলিল। শ্রীরঙ্গম, গোল্ডেন রক, ত্রিচী টাউন স্টেশন এবং ত্রিচী জংসন পরপর এই যে কোনো স্টেশনে

নামিয়া রঙ্গনাথ দর্শনে যাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা আমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল আমি যেন ত্রিচী জংসন স্টেশনেই নামি। তাহাদের কথায় বুঝিলাম শ্রীরঙ্গমে নামিলে কোনো আশ্রয় মিলিবে না, স্যুটকেসটি কোথাও রাখিয়া যে চলাফেরা করিব তাহারও উপায় থাকিবে না। ত্রিচীতে নামিলে সবই পাওয়া যাইতে পারে। আর কিছু না মেলে স্টেশনে ঘর লইতে পারিব অথবা স্টেশন ঘরে স্যুটকেস জমা রাখিয়া শ্রীরঙ্গমের কাজ সারিয়া আসা যাইবে। ত্রিচী যাইতে শ্রীরঙ্গম ছাড়াইয়া যাইতে হয় বটে; কিন্তু ত্রিচী হইতে শ্রীরঙ্গম যাইতে বাস পাওয়া যায়; ভাড়া মাত্র ৵১০। তাহাদের কথায় সম্মত হইয়া টিকিটটি পালটাইয়া ত্রিচিনপল্লীর সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট আনিতে বলিলাম। ডেপুটি স্টেশন মাস্টার বলিলেন ভেলুপুরম হইতে গাড়ী ছাড়িবার সময়ে যদি সেকেণ্ড ক্লাস খালি পাওয়া যায়, তবেই টিকিট দিব। যুবকদ্বয়ের নিকট জানিলাম, যে গাড়ীতে আমি যাইব উহার নাম "তুতিকোরিণ এক্সপ্রেস", মাদ্রাজ হইতে ছাড়িয়া ভেলুপুরম দিয়াই আসিবে। একবার ভাবিলাম সোজাসুজি ভেলুপুরম হইতে এই গাড়ীতেই আসিতে পারিতাম। পরক্ষণেই মনে হইল তাহা হইলে পথের এই হৃদ্যতাপূর্ণ পরিচয়গুলি হইত না।

বৃদ্ধাচলম স্টেশনে যুবকদ্বয়ের নিকট হইতে যে সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়াছিলাম তাহা ভুলিবার নহে। তাহারা একটা দুঃখের কথা বলিয়াছিল শুনিয়া গভীর বেদনা পাই। দক্ষিণে তীর্থযাত্রায় যাইতে হইলে ত্রিচিনপল্লী জংসন দিয়া যাইতে হয়। বাঙালী যাত্রী দেখিলেই তাহারা ঘনিষ্ঠভাবে আলাপের চেষ্টা করে। কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতার কোনো প্রতিদান তাহারা পায় না। বরং সকলেই এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করে—করুণার ভাব দেখায়—মনে করে বুঝি কিছু চাহিতে আসিয়াছে। তাহাদের বলিলাম যতক্ষণ আমি স্টেশনে আছি আমার সহিত থাকিবে এবং আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তারপর ছুটি পাইবে। যুবকদ্বয়ের মধ্যের একটির—প্রণবকুমারের বদলীর আদেশ হইয়াছিল। আমি থাকিতে থাকিতেই সে মাদ্রাজ চলিয়া গেল। প্রণাম করিয়া সে যখন বিদায় চাহিল তখন এই ক্ষণিক পরিচয়ের বিচ্ছেদেও বেদনা অনুভব করিলাম। গৃহের জন্য একটা চিঠি লিখিয়া তাহার হাতে দিলাম। মাদ্রাজ গিয়া ছাড়িবে। গৃহে দ্রুত সংবাদ পেঁৗছাইবার এই একটি ব্যবস্থাই কয়েকদিনের মধ্যে পাইয়াছিলাম। ফণীন্দ্র আমার সহিত রহিয়া গেল, দেখিলাম সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর ঘুমে তাহার চক্ষু ভারি হইয়া আসিতেছে। ফণীন্দ্রের যথাসাধ্য চেষ্টাতেও উচ্চ শ্রেণীর টিকিট মিলিল না। "তুতিকোরিণ এক্সপ্রেস" আসিবার আগে দুইটি গাড়ি শ্রীরঙ্গমের দিকে গেল। তাহাতে ভিড় কম ছিল। কিন্তু পেঁৗছিবে অসময়ে সেইজন্য উঠিলাম না। "তুতিকোরিণ এক্সপ্রেস" যখন আসিল, তখন দেখি "ন স্থানং তিলধারণং"। ফণীন্দ্রের সাহায্যে একটা ইন্টার ক্লাসে উঠিয়া প্রথমে দাঁড়াইবার পরে কোনোপ্রকারে বসিবার একটু জায়গা পাইলাম। বাকি রাত্রি সেই-ভাবেই কাটাইতে হইল। আমাকে বসাইয়া ফণীন্দ্র বিদায় লইল। প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। রাত্রি ২॥টায় বৃদ্ধাচলম্ ছাড়িয়া চলিলাম।

ত্রিচিনপল্লী

যাহা বলিতে এতক্ষণ সময় লাগিয়াছে তাহা বুধবার দিবারাত্রের প্রধানত অপরাহ্ন হইতে রাত্রের ঘটনা। ত্রিচিনপল্লীতে যখন পেঁৗছিলাম তখন বৃহস্পতিবার ভোর ৬টা—পথে শ্রীরঙ্গম ও 'গোল্ডেন রক' ছাড়াইয়া সুদীর্ঘ কাবেরী-সেতু পার হইয়া আসিয়াছি। স্টেশনে নামিয়াই একটি ছোকরা মজুর জুটিয়া গেল। তাহার হাতে সুটকেসটি দিয়া স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে চলিলাম। স্টেশন-মাস্টার ঘরে নাই। সন্ধান-বিভাগে সন্ধান লইলাম—লোক নাই। কিছুকাল অপেক্ষার পর সন্ধান-কর্মচারীটি আসিলেন। তাঁহাকে জানাইলাম আমি এখনকার কাজ সারিয়া আজই ধনুষ্কোটি রওয়ানা হইতে চাই—সুবিধা মত গাড়ী ঠিক করিয়া দিতে হইবে এবং একটি সেকেণ্ড ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করিয়া দিতে হইবে। সেকেণ্ড ক্লাস রিজার্ভ দিতে তাঁহার অক্ষমতা জানাইলেন। রাত্রি ১০টায় ধনুষ্কোটির গাড়ি যায়, সেই গাড়িতে যাইবার পরামর্শ দিলেন। ধনুষ্কোটি ও রামেশ্বর হইয়া মাদুরা যাইতে চাই শুনিয়া বলিয়া দিলেন রামেশ্বর হইতে রাত্রি ৩টার সময় গাড়ী ছাড়ে সেই গাড়ীই আমার পক্ষে সুবিধা হইবে। বৃদ্ধাচলমের যুবকেরা যেখানে আশ্রয় লইবার কথা বলিয়াছিল তাহা তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি ছোকরা মজুরটিকে তাহা বুঝাইয়া দিয়া আমাকে লইয়া যাইতে বলিলেন। বলিয়া রাখি মজুর ও আমার মধ্যে কথাবার্তা চলিতেছিল হাতের ভঙ্গীতে ও চোখের ইঙ্গিতে।

স্টেশন হইতে বাহির হইতেই ত্রিচীর স্টেশন গৃহটির গঠনশোভা চোখে পড়িল। গৃহটি বিশাল বা জমকালো নহে; কিন্তু এমন সুদৃশ্যভাবে গঠিত স্টেশন-গৃহ বড় দেখি নাই। আমার গন্তব্যস্থান সন্নিকটে; মজুর ও সুটকেস সহ গিয়া দেখিলাম তথায় স্থানাভাব। অগত্যা অন্য আশ্রয় খুঁজিতে হইল—সমস্ত রাত্রির পথক্লেশ, অনিদ্রা এবং মানসিক হর্ষবিষাদে দারুণ অবসন্নতা আসিয়াছিল; কিন্তু অবসন্নতাকে প্রশ্রয় দিবার মত অবস্থাও তখন নাই। ক্লান্তপদে ছোকরাটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। সে আমাকে একটা আশ্রয়ে আনিয়া পেঁৗছাইল—তথায় একটু দাঁড়াইবার জায়গা মিলিল। আমাকে পেঁৗছাইয়া সে বিদায় লইল, বলিয়া গেল রাত্রি ৯টায় আসিয়া আমাকে লইয়া ধনুষ্কোটির গাড়িতে তুলিয়া দিবে। সমস্ত কথা ভঙ্গীতেই হইল। তাহার কাছ হইতে একটা তামিল কথা শিখিলাম—"আর" মানে ছয়। পরে আরও শিখিয়াছিলাম—"আরুমুখম" অথবা সংক্ষেপে "আরুম" কথাটির অর্থ ষন্মুখম অর্থাৎ কার্তিক।

কাবেরী স্নান

এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কাবেরী-স্নান ও শ্রীরঙ্গনাথ দর্শনের সন্ধান লইলাম। সন্নিকট দিয়াই 'বাস' যাইতেছে। পরিচয় তামিলে কিন্তু রুট নম্বর ইংরাজীতে। ১নং 'বাসটি' সোজা শ্রীরঙ্গমে যায় এবং মন্দিরের সম্মুখে থামে। পথে কাবেরী। ত্রিচিনপল্লী নদীর দক্ষিণে এবং শ্রীরঙ্গম কিছুদূর উত্তরে। 'বাসে' উঠিয়া বলিতে হইবে "Mango grove"। স্থানটি কাবেরীরই উপরে; তথা হইতে তীরপথ ধরিয়া কিছু অগ্রসর হইলে স্নানের ঘাট। স্নান সারিয়া পুনরায় 'বাস' ধরিয়া মন্দির। তাহাই করিলাম; স্নানের উপকরণ ও গঙ্গাজল লইয়া মন্দির যাইবার বেশে 'বাসে' উঠিলাম। পথে কাবেরী পার হইবার সময়ে অপর তীরে পুরাতন দুর্গ, দুর্গে গণেশের স্বর্ণ মন্দির। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই স্থানীয় স্টেশনের নাম হইয়াছে 'গোল্ডেন রক'। কণ্ডাক্টারের নিকটে 'ম্যাঙ্গো গ্রোভ' বলিতে কাবেরীর অপর পারে আমাকে নামাইয়া দিল।

নদীর স্নানের ঘাটে যাইবার পথ সম্বন্ধে স্থানীয় পুলিশ প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম স্থানটির নাম হইতেছে "আম্র-মণ্ডপম"। পশ্চিম মুখে পথ স্নানের ঘাটে গিয়াছে। চলিতে চলিতে পার্শ্বেই নদী দেখা যায়। পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য এক জায়গায় নামিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু এক সন্ন্যাসী সঙ্গী জুটিয়াছিল। সে নিষেধ করিল ইহা স্নানের ঘাট নহে। সন্ন্যাসী আমার পরিচ্ছদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি বাঙালী দেখিতেছি, কোথায় কোথায় যাইবেন?' উত্তর শুনিয়া বলিল, 'আপনি দূরদেশ হইতে একা এইভাবে আসিয়াছেন বড় আশ্চর্যের কথা! একা একা কেহ এভাবে চলে না'। কথা বলিতে বলিতে দুই পার্শ্বের আম্রবন ও বেণুবনের ঘন সন্নিবেশের মধ্য দিয়া স্নানের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। সুপ্রাচীন বিশাল ঘাট। প্রবেশ পথের দুই পাশে দ্বারপাল মূর্তি এবং তোরণের ঊর্ধদেশে শ্রীরঙ্গশায়ী বিষ্ণুর মূর্তি—বাঙলা দেশে আমরা যাহাকে বলি অনন্ত-শয্যায় নারায়ণ—সম্মুখে প্রশস্ত চত্বর এবং তাহার পর প্রশস্ত সোপানের শ্রেণী নদীর মধ্যে নামিয়াছে। নদীর গর্ভে পীতবর্ণের বালুকা, জলও পীতবর্ণ—নদীতে স্রোত আছে, কিন্তু জল নাই, দাঁড়াইলে এক হাঁটু; মজ্জন ও অবগাহনের পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইলে প্রণামের ভঙ্গীতে অতি কষ্টে উপুড় হইতে হয়। জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া সহসা পায়ে কিসের দংশন অনুভব করিলাম; বিচলিত হইয়া সরিয়া আসিতেছি দেখিয়া একজন স্নানার্থী বলিলেন—"এক প্রকার মৎস্য"। যতক্ষণ জলে রহিলাম, ক্রমাগত দংশন চলিতে লাগিল। কেবল ইহাই নহে—সুস্থ হইয়া স্নানাদি করিবার অসুবিধা অনেক—পার্শ্বে এক অশ্বপাল অশ্বস্নান করাইতেছে, অশ্ববিষ্ঠায় প্রায় আমারই কাছে, ঘাটের একাংশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঘাটের অপর পার্শ্বে এক রজক-প্রবর প্রচণ্ড ক্ষেপে কাপড় কাচিতেছে—ময়লা কাপড়ের ক্ষারজল ছিটাকাইয়া আসিয়া গায়ে লাগিতেছে—একটু সরিয়া কয়েকজন যুবতী স্নান করিতেছে আর ঠিক তাহাদেরই পার্শ্বে আসিয়া স্নানে নামিলেন এক ব্রাহ্মণ যুবক—সুদীর্ঘ, সবল, সুঠাম ও সুগঠিত দেহ পরিধেয় বস্ত্রখানি ঘাটে খুলিয়া রাখিলেন—আবরণ রহিল মাত্র পাঁচ ছয় আঙুল প্রশস্ত এক ফালি কৌপীনের মত। বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু উপস্থিত আর কাহারও কোনো অসুবিধা দেখিলাম না; বুঝিলাম ইহাই এদেশের প্রথা। স্নান সারিয়া উঠিয়া এই অবস্থাতেই যুবক পরিধেয় বস্ত্র কাচিয়া পরিষ্কার করিলেন তাহার পর সেইটি পরিধান করিয়া উঠিয়া গেলেন।

স্নানের পর তীর্থকৃত্য করিতে এই সকল অসুবিধায় বেশ বিঘ্ন ঘটিল। ঘাটে পাণ্ডা আছে তাহাদের পীড়াপীড়িও আছে; নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিবার পক্ষে তাহাও কম বিঘ্ন নহে। আমার পক্ষে পাণ্ডার প্রয়োজন ছিল না। তথাপি তীর্থে আসিয়া তাঁহাদের শরণ লইতেই হইবে কারণ তাঁহারা তীর্থগুরু। অনুষ্ঠানের মন্ত্রে স্থানীয় বিশেষত্বের দরুণ কিছু পার্থক্য থাকিলেও মোটামুটি বাঙলাদেশের মত, তবে একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার। সংকল্পের মন্ত্রটি একটু বৃহৎ আড়ম্বরপূর্ণ—পশ্চিম ভারতেও এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। সঙ্গে গঙ্গাজল আনিয়াছিলাম, তাহা কাবেরীতে ঢালিয়া দিয়া কাবেরীর জলে শিশি ভরিয়া লইলাম। পাণ্ডা মহাশয় প্রাপ্তিতে ঠিক সন্তুষ্ট হইলেন না। তাহার জন্য তেমন ভাবি নাই। কিন্তু তীর্থের কাজে যে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে তাহা মনের মধ্যে খচ খচ করিতে লাগিল।

স্নান ও তীর্থকৃত্য সারিয়া যখন উঠিয়া আসিলাম তখন বেশ বেলা হইয়াছে, বৈশাখের সূর্য দক্ষিণের আকাশে মাথার উপর উঠিয়াছে। পদতলে পথের অসহনীয় উত্তাপ—পথপার্শ্বে ছায়ার লেশমাত্র নাই। এই অবস্থায় নদীতীরের পথ অতিক্রম করিয়া বড় রাস্তায় আসিলাম। কিন্তু 'বাসের' জন্য খানিকক্ষণ দাঁড়াইতে হইল। এই খানিকক্ষণ একটা অসহনীয় অবস্থায় গিয়াছে। উপরের সূর্যের তাপ কোনোমতে সহ্য করিতেছিলাম। কিন্তু নিম্নে কংক্রীট-ঢালা পথে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব বোধ হইতেছিল। বাসে উঠিয়া যেন বাঁচিয়া গেলাম। শহরতলীর পথ দিয়া 'বাস' একেবারে মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

(ক্রমশ)

সূর্য, তুমি, আমি

মহিমকুমার ঘোষ

ভোরের নতুন-সূর্য তোমার কপোলে চুমু আঁকে,
ভালবেসে ছুঁয়ে যায় ঘামে-ভেজা ঘুমে-ঢাকা মুখ;
নির্মম কঠিন হাস্যে তার সঙ্গে জানায় আমাকে
আগামী রোদের কাজ অপেক্ষায় রয়েছে উন্মুখ।
দুপুরের রক্ত-রবি তোমার চোখেতে টানে ঘুম—
আবছা তন্দ্রার মধ্যে এলোমেলো স্বপ্ন নেমে আসে,
কাজের লাগাম-[illegible]াতা আমি দেখি দুপুর নিঝুঝুম—
ক্লান্ত মন কেঁদে[illegible]ঠে একটানা বিষন্ন নিঃশ্বাসে।

তোমার সুশুভ্র ভালে সন্ধ্যাসূর্য আঁকে জয়টীকা
মুখর নরম মন মূক হয় আনন্দ-আবেশে,
অন্যপক্ষে আমি দেখি কাজের অস্পষ্ট বিভীষিকা
কর্মলীন দিনগুলি মনে জাগে একটি নিমেষে।

সৃষ্টির-আড়ালে-থাকা বুঝি কাকে উদ্দেশে প্রণামি'
আপনার বাঁধা গতে গেয়ে চলি সূর্য, তুমি, আমি।

মহর্ষি রমণ

শ্রীবিভূপদ কীর্তি

১৪ই এপ্রিল ১৯৫০ তারিখে দক্ষিণ ভারতের মহর্ষি রমণ মরদেহ পরিত্যাগ করে ৭১ বৎসর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন। বাঙলা দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে খবরটি যথারীতি প্রকাশিত হয়েছে। মহর্ষি রমণের সুদীর্ঘ জীবনকালের মধ্যে বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে তাঁর নাম প্রচারিত হয় নি। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের মহর্ষি রমণ, সারা-জীবন একান্ত প্রচ্ছন্নভাবে তিরুভান্নামালাই

তরুণ তাপস

পল্লীর সুদূর নিবিড় ছায়ায় আত্মগোপন করে থেকেও বাঙলা দেশের দৃষ্টি সীমার বাইরে যেতে পারেননি বলেই তাঁর নাম আমরা অল্পবিস্তর অনেকেই জানি। মহর্ষির অলোক-সামান্য তপশ্চর্যার সমগ্র বিবরণ এখানে দেওয়া যাবে না। বড় জোর দেওয়া যাবে তাঁর অনন্যসাধারণ জীবনের প্রথমাংশের সামান্য একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ভেঙ্কটরমণের জন্ম হয়েছিল ৩০শে ডিসেম্বর ১৮৭৯ সালে। পিতা সুন্দরম আয়ার ছিলেন তিরুচুজী শহরের অধিবাসী সামান্য একজন মোক্তার। সেকালের তিরুচুজীকে গ্রাম বলে অভিহিত করলেই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত হয়। মাদুরা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩০ মাইল। গ্রামের ৫০০ ঘর অধিবাসীর মধ্যে সুন্দরম আয়ারের বিশেষ একটু প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল। ভদ্র অভদ্র সকল শ্রেণীর অতিথি অভ্যাগতের জন্য তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। এ ছাড়াও তাঁর চরিত্রের আর একটি দিক ছিল। সেটি তাঁর বৈরাগ্যের দিক। মানুষটি যেন সকলের মাঝখানে বসবাস করেও সকলের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকতেন। বংশ পরম্পরায় যে ত্যাগ বৈরাগ্যের ধারাটি ছিল প্রবাহিত, তারই একটি অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তাঁর ব্যবহারে যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে সুন্দরম আয়ারের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কয়েকজনই ছিলেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যখন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে সুন্দরম আয়ার তিনটি শিশুপুত্র এবং তাদের বিয়োগবিধুরা জননী অলগাম্মলকে রেখে পরলোকের পথে যাত্রা করলেন তখন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ভেঙ্কটরমণের বয়স মাত্র ১২ বৎসর। ভেঙ্কটরমণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাগস্বামীর বয়স তখন ১৪ বৎসর এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাগসুন্দরমের বয়স মাত্র ৬।

পিতৃবিয়োগের পূর্বে এবং পরে ভেঙ্কটরমণের ছাত্রজীবনের যতটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তাতে মনে হয় পড়াশুনায় তাঁর প্রবৃত্তি বা রুচি ছিল না। নিতান্ত দায়ে পড়ে স্কুলে নিয়মিত হাজিরা দিতেন। আর দশটা সাধারণ ছেলের মত খেলাধূলো নিয়ে মেতে থাকাটাই যেন তাঁর অধিকতর কাম্য ছিল। বিধবা জননী এবং অভিভাবক-স্থানীয় আত্মপরিজনের দৃষ্টিতে ভেঙ্কটরমণের ভবিষ্যৎ যখন ক্রমেই অন্ধকারময় বলে প্রতীয়মান হয়ে উঠছিলো—সেই সময়েই ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে অতিমানস-লোকের অপ্রত্যক্ষ দিগন্তে ঘনিয়ে আসছিলো সূর্যোদয়ের সূচনা। নিঃশব্দ এই আবির্ভাব তাঁর জীবনে এমন অতর্কিতে এসে আত্মপ্রকাশ করেছিল যে, ভেঙ্কটরমণ নিজেও সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। লোকে কেবল এইটুকুই দেখতে পেতো যে যখন তখন এই শিশু বালকটি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এমন সে ঘুম যে কিছুতেই তা ভাঙানো যায় না। কিসের এই ঘুম, কেন এই অচেতন আচ্ছন্নতা সে বিষয়ে কারুর কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তথাপি এরই মধ্যে হয়তো রহস্যের মর্মকথাটি ছিল লুকিয়ে।

গ্রাম্য পাঠশালার প্রথম পাঠ সাঙ্গ করে ভেঙ্কটরমণ মাদুরা শহরে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য মিসনরী পরিচালিত ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হলেন। পড়াশুনার দিক দিয়ে এখানে এসেও যে বিশেষ কিছু উন্নতি হয়েছিল তা মনে হয় না। বাইরের দিক থেকে এমন কিছু বিশেষ পরিবর্তন চোখে না পড়লেও এখানে অবস্থানকালে তাঁর জীবনের একটি অচিন্ত্যপূর্ব বিস্ময়কর পরিণতির
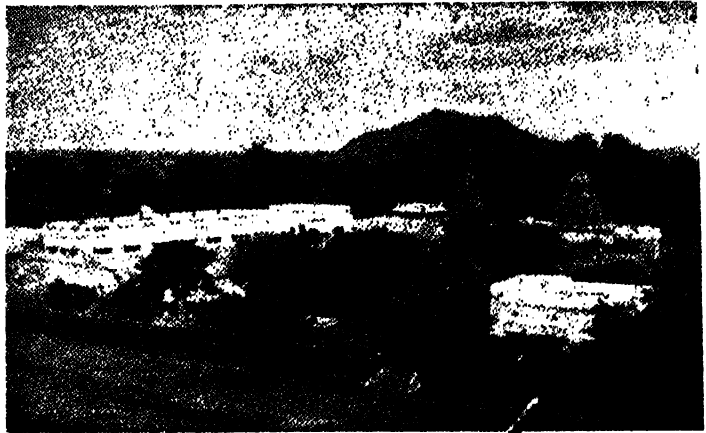
বর্তমান রমণাশ্রম

পরিণত বয়সে মহর্ষি রমণ

স্বার খুলে গেল। ভেঙ্কটরমণ খেলাধূলো ভুলে গেলেন। সহপাঠী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে যেন কিসের এক দুর্বার আকর্ষণে দিনের পর দিন তিনি মাদুরার সুবিখ্যাত মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনায় অতিবাহিত করতেন। এতটুকু বালকের অন্তরে কোথা থেকে এলো এত প্রার্থনার আকুল আবেদন তা জানবার উপায় নেই। যন্ত্রচালিতের মত বালক মন্দিরে অন্ধকারাচ্ছন্ন অলিন্দের অন্তর্বর্তী সিদ্ধ-মহাপুরুষগণের মূর্তির সম্মুখে একান্ত বিহ্বলভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে স্থাণুর মত অবস্থান করতেন।

এইভাবে যে প্রস্তুতির সূত্রপাত হল তারই অনিবার্য পরিণতিরূপে অনতিকাল পরে আর একটি ঘটনা ঘটলো। ঘটনা হিসাবে সামান্যই। কিন্তু ইঙ্গিত হিসাবে সুদূর-প্রসারী। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন ভেঙ্কট-রমণের বয়স ১৫ বৎসরের অনধিক, সেই সময়ে নবেম্বর মাসের শেষের দিকে স্কুলে যাওয়ার পথে অত্যন্ত অভাবনীয় ভাবে ভেঙ্কটরমণের সাক্ষাৎ হল এক অতি পরিচিত প্রবীণ আত্মীয়ের সঙ্গে। নিছক কৌতূহল বশে ভেঙ্কটরমণ জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি এলেন কোথা থেকে?" উত্তর পেলেন—"আসছি অরুণাচল থেকে!" ভেঙ্কটরমণের মনে হল এই নামটি যেন তাঁর বহুদিনের পরিচিত। মনে হল যেন যুগযুগান্তরের জন্ম জন্মান্তরের বিস্মৃতির পুঞ্জীভূত আবরণ ভেদ করে তাঁর চেতনার গভীরতম কেন্দ্রে জাগলো অকস্মাৎ এক পরমাশ্চর্য আলোড়ন। মনে হল যেন 'অরুণাচল' শব্দটির ধ্বনির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল কোন এক মন্ত্রশক্তির ইন্দ্রজাল। চক্ষের নিমেষে চারি-দিকের ঘরবাড়ী রাজপথের প্রাত্যহিক আবেষ্টন তাঁর কাছে হয়ে গেল ছায়াবাজীর মত মিথ্যা। তথাপি বহু আয়াসে নিজেকে সংযত রেখে ভেঙ্কটরমণ আবার জিজ্ঞাসা করলেন "অরুণাচলম্! কতদূরে, কোথায় এই অরুণাচলম্? আপনি কি সত্যিই এখন অরুণাচলম্ থেকে আসছেন?" প্রশ্নটি স্বাভাবিক; কিন্তু এই অতি স্বাভাবিক প্রশ্নের মধ্যেও যে উত্তেজনাটি স্পষ্ট হয়ে ছিল তাই লক্ষ্য করে প্রবীণ আত্মীয়টি স্মিত-হাস্যে বললেন—"অরুণাচলের নাম শোননি? সেইখানেই ত তিরুভান্নামালাই? সেখান থেকে আসছি শুনে তুমি অবাক হচ্ছ কেন"

এ 'কেন'র উত্তর ছিল না। সেদিনকার প্রশ্নোত্তরের পরেও ব্যাপারটির সমাপ্তি হল না। ধ্বনির শেষে এলো প্রতিধ্বনি। মনের সমস্ত শূন্যতল পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল এই অনাদ্যন্তধ্বনির গুঞ্জরণে। উদ্‌ভ্রান্তের মত বালকটি যখন সেদিন দিবসের পাঠ সমাপ্ত করে ঘরে ফিরে এলো তখন সে আর এক মানুষ—অরুণাচলের মন্ত্রমুগ্ধ একটি রূপান্তরিত সত্তা।

কয়েক দিনের মধ্যেই ইঙ্গিতটি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠলো। ভেঙ্কটরমণ দিনে দিনে অনুভব করতে লাগলেন যে চিরাচরিত জীবনধারার মাঝখানে তাঁর অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে অর্থহীন। এমনি সময়ে ঘটলো আর একটি ঘটনা—যার তাৎপর্য অনুসন্ধান করতে হলে মহর্ষি রমণের সমগ্র জীবনের ভিত্তি-ভূমিতে টান পড়ে।

মাদুরায় কাকার বাড়ীর দোতালায় ভেঙ্কট-রমণ বসে আছেন। বিশেষ যে কিছু চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন তা নয়। স্বাস্থ্যও কিছু খারাপ ছিল না। অকস্মাৎ তাঁর মনে হল যেন তাঁর মৃত্যু আসন্ন। কেন মৃত্যু হবে কি মৃত্যুর লক্ষণ, আশঙ্কার কারণ কি—এসব

প্রশ্নের কোনরকম সন্তোষজনক উত্তর মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে না থেকেও তাঁর অন্তরে এই আকস্মিক প্রত্যয়টি প্রত্যক্ষ মৃত্যুর রূপ পরিগ্রহণ করে এতই বাস্তব হয়ে উঠলো যে তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝে নিলেন যে শেষের আর বিলম্ব নেই। আশ্চর্যের বিষয় এই আসন্ন মৃত্যু তাঁর কাছে কিছুমাত্র ভীতিপ্রদ বলে মনে হল না। বরং মনে হল মৃত্যুরূপী চরম সমস্যার পরম সমাধান তাঁকে নিজেই করে নিতে হবে।

অত্যাসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভেংকটরমণের মনভূমিকায় বিচার-বিতর্কের আত্মগত প্রশ্নোত্তর মালা এইভাবে চলতে লাগলোঃ "এই ত এলো মৃত্যু। এ মৃত্যুর অর্থ কি? আমার মধ্যে কে মরছে? মরছে ত এই দেহটা।" প্রাথমিক সমাধানের সংগে সংগে দেহটি শবদেহের মত আড়ষ্ট হয়ে গেল; নিশ্বাস হয়ে গেল স্থির-নিস্পন্দ। চিন্তা এবার নতুন পথ ধরে চলতে লাগলো "এই ত ঘটে গেল দেহের মরণ। কিন্তু দেহের আশ্রয়ে রয়েছে যে 'আমি' তার সমাপ্তি হল কই! দেহকে অতিক্রম করেও অব্যাহত হয়ে রইলো—এই তো আমার 'আমি'র অস্তিত্ব। দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও মরণাতীত সত্তার বিলুপ্তি হবে না। এর অবস্থিতি মৃত্যুর এলাকার বাইরে যদি না হত তা হলে দেহের মৃত্যুর সংগে সংগে ঘটতো এরও বিনাশ। অতএব দেহের মৃত্যুতে আমার মৃত্যু নেই।"

এইভাবে সমগ্র সমাধানের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে তাঁর প্রতীতি হল যে তিনি শেষ প্রশ্নের শেষ সমাধান পেয়ে সংশয়ের পরপারে পৌঁছে গেছেন। মৃত্যুভয় যেন চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। দেহের অস্তিত্ব অনস্তিত্বকে ছাপিয়ে সেই থেকে তাঁর অন্তরে ভাস্বর হয়ে রইলো একটি মাত্র শাশ্বত সিদ্ধান্ত—অবিনাশী আত্মার সত্যতা। দেহবোধ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এই ঘটনার পর থেকে ভেংকটরমণের স্বভাবচরিত্রে যে রূপান্তরের প্রতিক্রিয়া চলতে লাগলো, কথা প্রসংগে নিজেই তিনি তার বর্ণনা করেছেন। "ইতিপূর্বে আমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন, পড়াশুনা ইত্যাদি ব্যাপারে বাহ্যিক যোগাযোগ বা আগ্রহ যেটুকু ছিল—তাও গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে। যন্ত্রচালিতের মত চলতে লাগলো পাঠাভ্যাসের অভিনয়। নিতান্ত লোক দেখানো ভাবে চোখের সামনে বইটি থাকতো খোলা। এই সব বাইরের ব্যাপারকে পিছনে ফেলে মন যে কোন্ সুদূরে কি নিয়ে ব্যাপৃত থাকতো তা আমি নিজেও সঠিক জানি না। লোক-ব্যবহারে আমার মধ্যে উদিত হল দীনতা, নম্রতা— ঔদাসীন্য। যে মানুষটা স্বকীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আগের দিনে অনুযোগ বা আপত্তি জানাতো—তার প্রতিবাদের প্রবৃত্তিটাই গেল এককালে অবলুপ্ত হয়ে।...একা একা নিভৃতে গিয়ে ধ্যানের আসনে চুপচাপ বসে থাকতাম। চোখ বুজে আসতো—নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে যেন কিসের সর্বগ্রাসী আবেগে তলিয়ে যেতাম। আমার দাদা আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে উপহাস করতেন। বলতেন আমার বনে গিয়ে মুনি ঋষির মত তপস্যা করাই উচিত!"

নিছক ব্যঙ্গের ভংগীতে পরিহাসের মত করে দাদা যে কথাগুলি বললেন বালক রমণ যেন তারই মধ্যে চকিত বিস্ময়ে, নিজেকে আবিষ্কার করলেন। তাঁর সারা অন্তর সাড়া দিয়ে বলে উঠলো—"হ্যাঁ ঠিকই ত', সত্যই ত! আমি ত এখানকার কেউ নই; যা কিছু নিয়ে আছি তাদের সংগে আমার সম্বন্ধও ত কিছু নেই। কি হবে আমার এই পড়াশুনায়? কিসের জন্য আমার এই সংসারের কারাবাস!" বলা বাহুল্য কিশোর বালকের মনে, তখনো পর্যন্ত তথাকথিত ধর্মসংস্কার বা বৈরাগ্যের চিহ্ন কেউ লক্ষ্য করে নি। এমন কোন কারণই ঘটে নি যার ফলে তার অন্তরে অকস্মাৎ সমস্ত সংসার বিস্বাদ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু অলক্ষ্যের বীজ থেকে জন্মায় যে অমূল তরু, সবার চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে রাতারাতি তারই শাখা প্রশাখা সমস্ত আকাশকে ফেললো ঢেকে। রমণের আর কোন দিকে চোখ ফেরাবার উপায় রইলো না। অরুণাচলের দুর্বার অমোঘ আহ্বানকে বুকের মধ্যে নিয়ে কিশোর বালক শীঘ্রই একদিন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো।

অরুণাচল পর্বতের পাদদেশে এসে যেখানে রমণের মহাযাত্রার শেষ হল সেইখানেই তিরুভান্নামালাই। এখানে যে রমণ রয়ে গেলেন তাঁর সংগে অতীতকালের কিশোর ছাত্রের যোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। যাবার কথাও নয়; কারণ জন্মান্তরে পূর্বজন্মের কিছুই ত আর থাকে না।

কলকাতার জু-বাগানে

রূপদর্শী

মেঝেতে ছক কেটে, গুটি সাজিয়ে, খেলা খেলা বাঘবন্দী নয়, সত্যিকার বন্দী বাঘকে তম্বিরে তোয়াজে তাজা রাখা। একি চাট্টিখানি কথা?

আর চিড়িয়াখানায় শুধু কি এক বাঘই, সিংহ নেই? গণ্ডার নেই? উল্লুক নেই? ভাল্লুক নেই? হাতী, উট, জিরাফ, জেব্রা নেই?

চিড়িয়াখানায় যদি চিড়িয়াই না থাকল, তবে আর কী দেখতে যাওয়া? কিসের তরে কষ্ট করে চাওয়া? রকম রকম জানোয়ার, রকম রকম পাখী, রকম রকম সরীসৃপে যে চিড়িয়াখানার অন্দর যত গিসগিস, কুলীন কুলে সে তত নৈকুষ্যি। খেচরে ভূচরে জলচরে টাপুটুপু না হলেও কলকাতার জু নেহাৎ 'তুশ্চু'ও নয়। এশিয়ার মধ্যে তো ফার্স্ট'ই, দুনিয়ার হাটেও এর 'প্রেস্টিজ-পজিশন' ধর্তব্যের মধ্যেই।

চিড়িয়াখানার চাইতে জু কথাটা আমার ভাল লাগে। চিড়িয়াখানা কথাটা কেমন যেন কম্যুনাল কম্যুনাল। আমার মনে হয়, জানোয়ারদেরও এতে বিশেষ আপত্তি। অবিশ্যি ওদের মনের ইচ্ছা জানবার ফুরসৎ পাইনি। আর পশুশালা কথাটা তো কেবল কেতাবের পাতাতেই, জায়গা-জমিন মৌরসী করে নিয়েছে।

তাছাড়া চিড়িয়াখানায় যদি জানোয়ারদের আপত্তি তো পশুশালায় চিড়িয়ারাই বা সায় দেবে কেন? কিন্তু আমি বলি, অত কষা-কষির কাম কি বাপু, জুলজিক্যাল গার্ডেনস নামটাই তো খাসা। অনেক বেশি খোলতাই, আর কারো গায়ে ফোস্কাও পড়বে না। অত বড় নামখান যদি মুখে আটকে যায়, উচ্চারণে যদি তক্‌লিফ্ হয়, তো ছোট্টখাট্ট 'জু'টাকেই আটপৌরে করে নাও।

শহর কলকাতার এই যে জু এখন আলীপুরে, যে জায়গায় জমজমাট, আগে হেথায় ছিল বস্তি। সামনেই বেলভেডিয়ারে লাট বাড়ির বোলবোলা। আর তারই সামনে কিনা ভাঙাচোরা নোংরার ডিপো! খানকতক খোলার ঘর ট্যাম ট্যাম করছে। চেরাগের তলেই অন্ধকার! বস্তি উঠিয়ে পত্তন হল জু-এর। সে সন ১৮৭৬ সালের কথা। তার অনেক আগে থেকেই বাতচিৎ চলছিল একটা জু বানাবার। ডাঃ ফেয়ার বলে এক জেণ্টেলম্যান বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে চেষ্টা করছিলেন ১৮৬৭ সাল থেকে, কিন্তু ধোঁয়া ছাড়া তাঁর চেষ্টায় আগুন আর বেরুলো না। কাজেই তাঁর প্রচেষ্টা ধামা চাপা পড়ল। সন ১৮৭৩-এ স্যার রিচার্ড টেম্পল এলেন বাঙলার লাট বাহাদুর হয়ে। আর তাঁরই উৎসাহে আবার ধোঁয়ায় ফুঁ পড়ল। এবার ফুঁক দিলেন এক জর্মন—
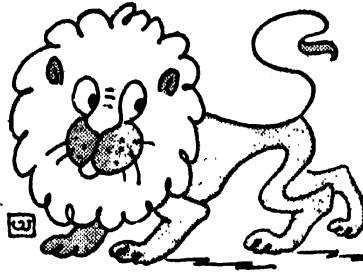
এ'কে আর কী চেনাব

মিঃ এল শেবেন্‌ড্‌লার। পত্তন হল কলকাতা জু-এর। সন ১৮৭৬-এ। প'য়তাল্লিশ একর জায়গা জুড়ে আজকের এই জু-বাগানখান। যদ্যপি সরকার বাহাদুর উৎসাহ আর রেস্ত দুই-ই জুগিয়ে এসেছেন, তথাপি জু-বাগানের খাস খরচা জুটেছে পাবলিকের কাছ থেকে।

এত বড় নয়, তবু শহর কলকাতায় এর আগেও জু-বাগান ছিল। মল্লিকদের বাড়ি, রামমোহন রায়ের বাড়িতে। দু-তিনটে বাঘ, দু-পাঁচটা পাখী নিয়ে ছোটখাটো মতোন জু তো ছিলই। একটু বড়সড়ও দু-একটা ছিল। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে শ্যামবাজার ছেড়ে একটু এগিয়ে গেলেই একটা রাস্তা ডানহাতি মোড় নিয়ে টক করে দমদমের দিকে ছুট মেরেছে। এই মোড়টায় এখন আছে একটা কোতোয়ালি। ১১৮ বচ্ছর আগে এইখানটায় এক বাঙালীর চিড়িয়াখানা ছিল। পোস্তার রাজা সুখময় রায়ের পূর্বপুরুষ রাজা বদ্যিনাথ রায় ছিলেন চিড়িয়াখানাটার মালিক। মোড়টার নাম এখনো চিড়িয়াখানার মোড়। আরেকটা চিড়িয়ার মোড় আছে ব্যারাকপুরে। ওখানেও একটা জু-বাগান ছিল। সেটা ভেঙেই আলীপুরেরটা হয়েছে।

ইংলণ্ডের রাজ-ফ্যামিলিতে পুরুষরা যদ্দিন বাঁচেন, মেয়েরা তার দ্যাড়া। যদি যোগাযোগে মেয়েরা একবার গদীতে উঠতে পারনে তো ব্যস্, হাজারে নামলেন ব্যাট করতে, ধিকিস্ ধিকিস্ চলল খেলা, আউট হবার নামগন্ধও নেই। প্রিন্সের বারটা বাজল। সাজ-পোষাক পরে বসেই থাক, নাক ডাকাও, তোমার খেল শুরু হতে হতে দাড়ি-গোঁফ পেকে খরখরে হয়ে যাবে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে সপ্তম এডওয়ার্ডের হল এই দুর্দশা। ষাট বচ্ছর রাজত্ব করে যখন চোখ দুটো বুঁজলেন, মহারাণী, ততদিনে ছেলের চোখেও ছানি পড়ো পড়ো, ঢুলু ঢুলু হয়ে এসেছে বয়সের ভারে। মা জেঁকে বসেছেন, প্রিন্স দেখলেন, সেঞ্চুরীর আগে তাঁর নট্ নড়ন-চড়ন নট্ কিচ্ছু, কি আর করেন, রাজ্য-খানার পাড়া বেড়াতে বের হলেন। ১৮৭৬ সালের জানুয়ারীর এক তারিখে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর কলকাতায় এসে হাজির। সেই উপলক্ষে সেইদিন প্রথম জু-বাগানের দরজা খুলল পাবলিকের কাছে। সে দরজা আজো খোলা, সকাল ছটা থেকে আর সন্ধ্যের অন্ধকার পর্যন্ত।

আলীপুর জু-বাগানের মোটামুটি তিনটে ভাগ। একটা পাখীদের, একটা পশুদের, আর একটা সরীসৃপদের। আর জলের তলে যাদের বাস, তাঁদের ব্যবস্থা কলকাতায় নেই। আগে তামাম হিন্দুস্থানেই ছিল না, তবে বৎসর অবধি বোম্বাইতে একটা হয়েছে।

খাঁচায়-ভরা বাঘ-সিংহ দেখতে আমার ভাল লাগে না। এ যেন দুরন্ত মেয়ে, হঠাৎ বিয়ে হয়ে দজ্জাল শাশুড়ীর কড়া গার্জেয়ানীতে পড়েছে। চলন-টলন শান্ত-শিষ্ট, গর্জনটা অবধি যেন বন্ধক দিয়ে ফেলেছে। দেখলে বড্ড মায়া হয়।

সব চাইতে সখের প্রাণ পাখীর। খাঁচায় পুরেছো তো পুরেছো, আমার ঘণ্টা করেছো, এখন ঠিকমতো আমার রসদ জোগাও। খবরদার কোনক্রমেই যেন আমার নাচন-কোদন, কিচির-মিচির বন্ধ না হয় বাপু।

আমাদের আর কি? দু-আনা পয়সা দিলুম, ভেতরে ঢুকলুম, ঘণ্টাতিনেক, বড়-জোর দিনমানটাই ঘোরাঘুরি করলুম জু-বাগানে। খুশি হলে তারিফ দিলুম, খারাপ লাগলে 'হাত্তোরি, এই দেখতে আসে আবার মানুসে' বলে কেটে পড়লুম। কিন্তু যারা প্রতিনিয়ত হেপাজত করছে এই সব ভূচর, খেচর, জলচর, উভচরদের, তারাই বুঝছে দাঁতের যন্ত্রণায় রাত পোহাতে বাকী
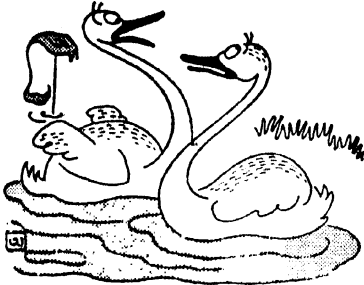
খাল কেটে জলের বন্দোবস্ত

কতো? একটা গল্প মনে পড়ল। এক ভদ্রলোক ডিম কিনছিলেন। কিছুতেই আর পছন্দ হয় না। বললেন, ডিমগুলো বড্ড ছোট হে। দোকানি জবাব দিয়েছিল, কর্তা আপনি তো কইলেন ছুটো, কিন্তু যে পাড়ছে হে-ই বুঝছে যন্ত্রণা কেমুন। যারা নিরন্তর এই জীব-জানোয়ারদের তদ্বির-খিদমদ করছে, 'যন্ত্রণাটা কেমুন' বোঝে শুধু তারাই।

তাদের কাজের দফা হরেক, রীতি-প্রকৃতিও রকম-বেরকমের। শুধু তো ধরে এনে খাঁচায় পুরে রাখলেই হল না। তাদের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে কড়া নজর চাই। সব চাইতে হাঙ্গামা এদের খাওয়াতে। নানারকম পশু-পক্ষী নিয়ে কারবার। নানারকম আবার তাদের জাত। কাজেই ধাত বুঝে পথ্য জোগাতে না পারলেই সব গুবলেট্।

পাখীরা বনে থাকে, কি খায়, না-খায়, সারা দিনেই বা কতটুকু খায়, তারাই জানে। আর জানেন জু-বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তাঁকে সবই জানতে হয়। যে পাখীটা আনা হল, সেটা কোন্ দেশের, সেই দেশটা কেমন, গরম বেশি না ঠান্ডা বেশি, বৃষ্টি কেমন হয়, পাখীটি কি জাতীয়, কি খায়, কেমনতরো বাসায় থাকে? কোন পাখী শুধু পোকা-মাকড় খায়, কোন পাখী শস্য খায়, কোন পাখী ঘাসের দানা খায়, কোন পাখী ফল খায়, কোনটা বা মাংস খায়, সাপ, ছুঁচো, ইঁদুর, ব্যাঙ, ফড়িং—দুনিয়ায় জীব যত, তার খাদক তত। সে সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা দরকার। অনেক পাখী আবার দুষ্প্রাপ্য। গহন বনে থাকে, কি খায়, কে জানে? জানা সম্ভবও নয়। তাই সে পাখীর ভাই-বেরাদর যদি কেউ থাকে, খোঁজ নাও তাদের খাদ্য কি? সেই খাদ্য খাওয়াও একে। ষোল আনা যদি না মিলাতে পার, দশ আনা মেলাও। কোন পাখী আবার বাচ্চা-কালে পোকা-মাকড় খায়, বড় হলে নিরামিষ ধরে, সে সব সন্ধান পুরো রাখা চাই।

কাকাতুয়া কি তোতা পাখীরা খায় বাদাম, বীজ, ফল, বিভিন্ন রকমের ঘাসের দানা, মেজের দানা, সূর্যমুখী ফুলের বীজ, ওটের দানা, নানা ধরণের পাকা ফল। কিন্তু এই পাখীগুলোকে পোষ মানালে গরম দুধে রুটির কি বিস্কুটের টুকরো ভিজিয়ে দিলে দিব্যি খেয়ে নেয়।

পায়রা জাতীয় পাখীদের পুষতে কোন হাঙ্গামা নেই। ঘুঘু কথাটা শুনতে সুবিধের নয়, কিন্তু এরাই যন্ত্রণা কম দেয়। আহারে-বিহারে একেবারে সুবোধ বালক গোপাল। যাহা পায়, প্রায় তাহাই খায়।

আবার এক জাতীয় পাখী আছে, যারা কখনো পোকা-মাকড়, কখনো বা ফল-ফুলুরি—যখন যা প্রচুর পায়, খায়। কাজেই যিনি এদের তদ্বির-তদারক করেন, এসব
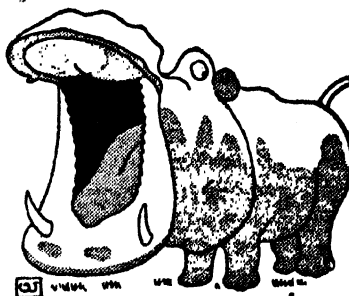
যেন বিশ্বরূপ দেখালে

বিষয়ে যাবতীয় খবরাখবর তাঁকে বুড়ো আঙুলের নখে নিয়ে বসতে হয়।

জু-বাগানে পাখীদের সাধারণত দিনে দুবার খেতে দেওয়া হয়। জামাইকে আর কি আদর করা হয়? পাখীকে জামাই আদরে রাখা হয়েছে শুনলে পাখীরা ফায়ার হয়ে উঠবে। কিন্তু জামাইকে পাখীর আদরে রাখলে জামাই যে দুনো খুশি হবে, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।

খাবার জোগাবার বেলাতেই যে শুধু এত যত্ন তা নয়, সব ব্যাপারেই এই রকম। পাখীর থাকবার জায়গাটিও অশেষ যত্ন নিয়ে বানাতে হয়। অনেকখানি জায়গাকে লোহার খুঁটি আর মজবুত তারের জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। নয়তো ফাঁক পেলেই পাঁয়ষট্টি যে মারবে না, এমন গ্যারাণ্টি কে
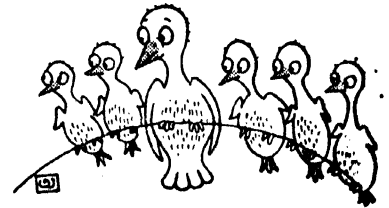
পাখীরা সখের প্রাণ

দেবে? প্রত্যেকটা ঘেরের মধ্যে একটা করে ছাত-আঁটা ঘরের মতো থাকে। বর্ষা-বৃষ্টি হলে, কি শীতাতপ থেকে জান বাঁচাতে গেলে ঢোকো ওর মধ্যে।

এই চিড়িয়াখানায় বহু পাখী ডিম পাড়ে। বহু বাচ্চা হয়। এমনি করেই জু-বাগানের পরিবার বৃদ্ধিচক্র গড়তে থাকে। ডিম পাড়বার প্রকার-পদ্ধতিও বেড়ে মজাদার। এই সব সামলাতেও তত্ত্বাবধায়ক মশায়ের প্রাণটি ঠোঁটের ডগে এসে পড়ে। পাখীর বাসা বাঁধবার সুযোগ করে না দিলে তারা বহাল তবিয়তে থাকতে চাইবে কেন? রকম রকম বাসা বানাতে হিমসিম খেয়ে যায় ছুতোরের পো। যেমন-তেমন বাসা বাঁধলে তো চলবে না। যেমনটি বাসা এরা বনে থাকলে বানাতো, বাসা অবিকল তেমনটি হওয়া চাই। খড়, কুটো, পালক, খাঁচার মধ্যে সাপ্লাই দিলে অনেকে নিজের বাসা নিজেই গড়ে। অনেকে আবার গুড্ ফর নাথিং। যেমন তোতারা। খাবার বেলায় আঁটিশুটি, কাজের বেলায় কদলীরম্ভা। নিজের বাসাটুকু তাও বানিয়ে নিতে পারে না। যতদিন
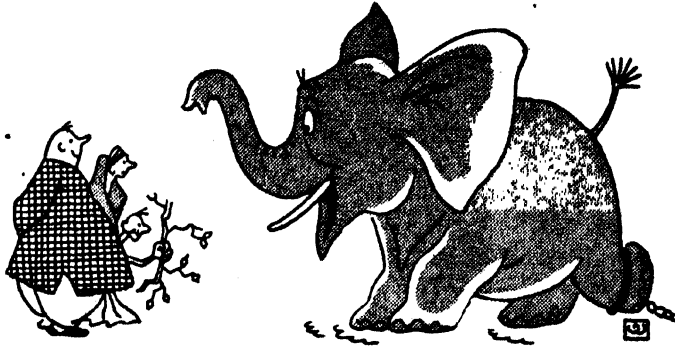
মাইডিয়ার হাতী

বাইরে থাকেন স্বাধীনভাবে, ততদিন ডিম পেড়ে আসেন পাহাড়ের খাঁজে। তার জন্যে তো আর আস্ত পাহাড় একটা জু-বাগানে উপড়ে আনা যায় না। কাজেই অন্য ব্যবস্থা করতে হয়। এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, যাতে ডিম পাড়বার সময় তোতা পাহাড় না হোক পাহাড়ের আস্বাদটা অন্তত পায়। কাঠঠোকরা ঠকর ঠকর না করলে তার ঠোঁট সুলুনি বন্ধ হয় না। অতএব তার জন্যে গাছের গুঁড়ি চাই। ছাতের আড়াল না পেলে যে পাখীর ঘুম হয় না, সে-পাখীর জন্যে আড়াল চাই। পেলিকান, হাঁস, রাজহাঁসদের জল না হলে প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, অতএব তাদের জন্যে খাল কেটে জলের বন্দোবস্ত।

এতো গেল পোষ-মানা পাখীদের কথা, যাদের বারো মাস বন্দী করে রাখতে হয়। এরা ছাড়া আর একদল আগন্তুক পাখী আসে। তাদের অবিশ্যি সব সময় দেখা যায় না। শীতকালে এরা এসে জোটেন জু-বাগানের ঝিলে। তখন সেখানে পাখীতে পাখীতে ভরে যায়। মেলা-মচ্ছব বসে যায় একটা। কোথায় সেই হিন্দুকুশ পর্বতের পারের দেশ, কোথায় বা সাইবেরিয়া, যেখানে হি-হি শীতের আক্রমণে টিঁকতে পারে না এই পাখীর দল। শীতের শুরু হতে না হতেই ঝাঁক বেঁধে রওনা দেয় গরম দেশের দিকে। একটি দল এসে হাজির হয় জু-বাগানের ঝিলে। কতদিন ধরে যে আসছে, কে বলবে। একটি দলই বারবার আসে কিনা, পরখ করবার জন্যে কতকগুলো পাখী ধরে তাদের পায়ে আংটা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। পরের বছর দেখা গেল, আংটাদার পাখীগুলো ঠিক এসে হাজির হয়েছে। শুধু যে কলকাতাতেই আসে তা নয়, এই যাযাবর পাখীরা নানা দেশে গিয়ে হাজির হয়।

গল্প কথা নয়। একটা দেশের পার্লামেন্টে এই নিয়ে তুমুল তর্ক বেঁধে গেছে। বিরোধী দল জোর সওয়াল তুলেছেনঃ সাইবেরিয়ার পাখী আর চীনা মুলুকের পাখী, যেন খবরদার তাদের দেশে না ঢোকে। ও দুটো কম্যুনিস্ট দেশ। সরকার পক্ষ বলেছেন, তাতে কি। ওদেশের নীতির সঙ্গে মতবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু ওদেশের পাখীর সঙ্গে আমাদের কি দুষমনি? বিরোধী পক্ষ তাই শুনে তুমুল সোরগোল তুলেছেন। এই রকম ম্যাদামারা সরকার বলেইনা দেশের আজ এই অবস্থা। এত হেনস্থা আমাদের। কে জানে সরকারের সঙ্গে হয়ত কম্যুনিস্টদের যোগা-যোগ আছে কিছু। তারা জিগীর তুললেন, পাখী আসা বন্ধ করো। শীতকালের শুরুতে হাড়-ডিগডিগে পাখীগুলো পেটে এক রাজ্যের খিদে নিয়ে আমাদের দেশে ঢুকবে, তারপর ভালমন্দ আচ্ছা করে চর্ব্য-চোষ্য সাঁটিয়ে চর্বি-চকচক নিজের দেশে পাড়ি মারুক, আর কম্যুনিস্টরা সেগুলো ধরে ধরে খেয়ে কোঁদল-কাঁদল হয়ে আমাদেরই ঝাড়ের বাঁশ কাটুক।

যাহোক, যাযাবর পাখীর জিম্মাদার কেউ নয়। খুশি মতো আসে, খুশি মতো যায়। কিন্তু পোষা পাখীগুলোর বেলায় যেন পান থেকে চুণ না খসে। দুটো পাখী মারা গেছে? কেন? শীঘ্র ডাক্তারবাবুকে খবর দাও। পোস্ট মর্টেম করুন, দেখুন, কেন মারা গেল হঠাৎ? বুড়ো হয়েছিল। স্বাভাবিক মৃত্যু। যাক। নাকি মড়ক লাগল? সর্বনাশ। দেখুন দেখুন। রোগা পাখী আলাদা করে রাখো। হাসপাতালে নিয়ে যাও। সবাইকে মড়ক প্রতিরোধক ইঞ্জেকশন দাও। ঘর পরিস্কার রাখ। বাইরের কেউ যেন ভেতরে না ঢোকে, সর্দার, লক্ষ্য রেখো। এই খিদমদগাররা নিজের ছেলেমেয়েকেও এত যত্ন করে কিনা সন্দেহ।

জু-বাগানের মধ্যেই ডাক্তারখানা। সকলেরই দিনরাতের ডিউটি। শনিবার, রবিবার নেই। শুধু পাখীর বেলায় নয়। জন্তু-জানোয়ারদের বেলাতেও এই একই রকম হুঁশিয়ারী। জানোয়ার হিসেবে থাকবার জায়গার তারতম্য হয়। বড় বড় ইটের দেয়াল দেওয়া আর মোটা পোক্ত লোহার রডের খাঁচায় থাকেন বাঘ, সিংহ, হায়না, ভাল্লুক—যত হিংস্র আর মাংসভোজীর দল। ভাল্লুক মাংস খায় না। ভাত খায় আর গুড়। পাখীদের খাওয়া দিনে দুবার। পশুদের দিনে একবার, হপ্তায় একদিন ফাঁক, আর সরীসৃপদের হপ্তায় একদিন খেতে দেয়। প্রতিদিন ভোর হতে না হতেই খাঁচা পরিস্কার, জল বদলানো শুরু হয়। কি পাখী, কি পশু, কি সরীসৃপ, জু-বাগানের বাসিন্দাদের জলের কোন কষ্ট নেই। প্রত্যেকের মুখের কাছেই পাইপ দিয়ে জল আসে। বড় বড় বাঘ-সিংহকে সের পনের মাংস দেওয়া হয়। ছোটদের সের পাঁচেক।

তৃণভোজীদের মধ্যে সবচেয়ে মাইডিয়ার হাতী। কাঁধে চড়ো পিঠে চড়ো, রা-টি নেই। জিরাফ বেচারার বেশ মুশকিল। আঁকশি পানা গলাটাকে দিয়ে যে একটু কাজ করে নেবে তার উপায় কোথায়। কাছাকাছি পছন্দ-সই এমন গাছ নেই, যার মগডাল থেকে এক খাবলা কচি পাতা মুখে পুরে সোয়াদটা ঝালিয়ে নেবে। কি আর করে, তাই থেকে থেকে গলাটা বাড়িয়ে চাঁদ-সুর্যিকে একটু ঢুঁ দিতে মন চায়। দুই গুলিখোর জু-বাগানে ঘুরছে। জিরাফ দেখে একজন শুধালো, জিরাফের গলাটা অত লম্বা কেন? বন্ধুটি জবাব দিলে, বন্ধু

কাহেকা, এই বাঙ্গলা কথাটা বুঝলিনে। দেখছিস নে ধড় থেকে মাথাটা কতদূরে? ওই মাথার নাগাল পাবার জন্যে গলাটা লম্বা হয়েছে।

পশুপক্ষী তবু যাহোক ভালই আছে এক রকম জু-বাগানে। গত বছর জাপান থেকে একজোড়া স্যালামান্ডার এসেছিল। মারা গেছে। শীতের জীব গরম দেশে টেকানো শক্ত। আলাদা ঘর তৈরী করে, বরফের চাঙড় জমিয়ে, খসখস দিয়ে ঘিরে হাজারো চেষ্টা করেও বাঁচানো গেল না। এবারে আমেরিকা থেকে এসেছে দুটো পুমা আর উট জাতীয় লামা। জু-সংসার একরকম ভরভরোন্ত বটে, কিন্তু সব চাইতে কাহিল হচ্ছে রেপটাইল হাউস—অর্থাৎ সরীসৃপ ভবন। যুদ্ধের আগে কেমন জমজমাট ছিল আর এখন? যেন ছেড়ে আসা গ্রাম। ঘরগুলো খাঁ খাঁ। গোটা দুই ময়াল, গোটা কয়েক গোখরো, আর কেউটে, দাঁড়াশ আর লাউ-ডগা, বালি-সাপ আর বোড়া। আর চৌবাচ্চায় ট্যাম ট্যাম করছে এক কুমীর।

যুদ্ধের সময় জু-বাগানের আর কিছু ছিল না। সব সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। যাকে তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল জন্তু-জানোয়ার। পাছে জাপানী হামলা হয়, পাছে বোম পড়ে চিড়িয়াখানায়, তাই এই ব্যবস্থা। মিলিটারীর তাঁবু হয়েছিল ভিতরে। সব ভেঙে চুরে তচনচ। যুদ্ধের পর জু-বাগানের উন্নতি হয়েছে অসাধারণ। দেখে তাজ্জব হয়ে গেছি। এখন তো আর সেই ন্যাড়া খাড়া মাঠ নেই। মৌশুমী ফুলে আলো হয়ে আছে ভেতরটা। যাঁর কৃতিত্বে এই জু-বাগানের থ্যাঁতলানো মুখে হাসি ফুটেছে তিনি এখনকার সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ লাহিড়ী।

এই যাঃ, এত কথা বললুম, অথচ হিপোর কথাটাই বাদ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ওঃ জন্তু তো নয়, একখানা যন্তর। যেন্তা জাইগান্টিক, তেন্তা বদসুরৎ। উট সম্পর্কে এক গল্প শুনেছিলুম। বিধাতা জন্তু জানোয়ার সব আপন খেয়ালে বানাবার পর হাঁফ জিরিয়ে নিচ্ছেন। দেখলেন সামনে দিয়ে উট যাচ্ছে। ওই বদখদ চেহারা দেখে বিধাতার মনে দয়া হল। ডাক দিয়ে বললেন, ওহে উট এদিকে এস, তোমার গড়ন পিটন একটু শুধরে দিই। উট দার্শনিক উত্তর একখানা ঝেড়ে দিলে, মালিক, যব্ বন্ চুকা হ্যায় তব ঠিক হ্যায়। তা ঠিক তো বটেই। হিপোর পাশে উট তো কার্তিকটির পো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম। এমন সময় ছোট্ট একটু হাই তুললে। ব্বাপ্‌স্, কি হাঁ! যেন বিশ্বরূপ দেখিয়ে ছাড়লে।

তাহলে একটা শোনা গল্প বলি। ভদ্রলোক বলছিলেন: দেশে একবার কুমীরের উৎপাত হল। সে কুমীর নয়তো যেন দুশো মণি একখানা ভাওলা নৌকো। উৎপাতে দেশে গাঁয়ে টেকা হল অসম্ভব। এর গরু খায়, ওর জরু খায়। কুমীরের অত্যাচারে দেশ ফাঁক হয়ে গেল। পুজোর সময় কলকাতা থেকে দেশে যাচ্ছিলেন এক ভদ্রলোক। সঙ্গে স্ত্রী। এক নৌকো জিনিস। আর বৌএর গা ভর্তি গহনা। লেজের ঝাপটায় নৌকো উলটিয়ে বৌটিকে কুমীর গহনাসমেত টপাস করে মুখে পুরে দিলে। তখন আমার টনক নড়ল। কুমীর আর যা করুক সোনা হজম করতে পারবে না। আমি এবার কুমীরটি মারলেই বেবাক সোনাটি আমার। চললুম কলকাতা। জাহাজ বাঁধা কাছি আর একটা নোঙর কিনে গ্রামে ফিরলুম দুদিন পরে। বাড়ীতে পা দিয়েই শুনি, এক সাঁওতাল মেয়ে বেগুন বেচতে ঝুড়ি মাথায় হাটে যাচ্ছিল, কুমীর ঝুড়ি শুদ্ধ তাকে গিলে খেয়েছে। আর দেরী করলুম না। কাছিতে নোঙর বেঁধে, আর নোঙরে এক বড় ছাগল গেঁথে নদীতে ফেলে দিলুম আর শ আড়াই লোক কাছি ধরে বসে রইলুম। যাঁহাতক ছাগল গেলা আর আমরা কাছিতে দিলুম টান। টেনে কুমীরকে তো ডাঙায় তুললুম। করাতি ডেকে কুমীর চেরা হল। পেটটা দুফাঁক করে দেখি, কি আশ্চর্য কান্ড! সাঁওতাল মাগীটা গহনাগুলো পরে বসে বসে বেগুন বেচছে। ভদ্রলোক খুব জমিয়ে নিয়েছিলেন। সবাই থ মেরে গেছে। একজন অবিশ্বাসী সেখানে উপস্থিত ছিল। বললে, বাপধন, গুল মারবার আর জায়গা পাওনি? মাগীটা কুমীরের পেটে বেগুন বেচছিল! কুমীরের পেটে সে খদ্দের পেলে কোথায়? ভদ্রলোক বললেন, আরে ওই দেখেই তো আমার চক্ষু চড়কগাছে। খদ্দের দেখবার ফুরসৎ পেলাম কোথায়?

ভদ্রলোক কুমীর দেখেছিলেন। হিপো দেখেননি। তাহলে আর প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতেন না। খদ্দের তো খদ্দের হিপো হাঁ করলে তামাম নিউ মার্কেটটা ঢুকেও এক বিঘৎ জায়গা থাকে। বিশ্বাস না হয় একদিন জু-বাগানে গিয়ে হিপোকে হাসিয়ে দেখবেন।

দুটি কথা: একটি মুহূর্ত

দীপংকর দাশগুপ্ত

পাখীর কাকলি শেষ, কুয়াশার মতো অন্ধকার
ঘন হয়ে ঝরে পড়ে। তারারা ক্রমশ ভিড় করে।
সিলুয়েট দেওদার। নীড়ে ফেরা পাখীর পাখার
কখনো অস্পষ্ট শব্দ। চূর্ণি ফল গাছের উপরে
পথ খুঁজে ফেরে হাওয়া—কী উদ্দাম, কী উদ্দাম হাওয়া!
এ মুহূর্তে মনে হয় সব কথা গান হয়ে গেছে

তুমি যদি কথা কও: যতকিছু চাওয়া আর পাওয়া
এ সময় বিনিঃশেষ। পৃথিবীকে আকাশ ঢেকেছে।
সব নাম মুছে গেছে। বিশীর্ণ এ হৃদয়ের নদী
উচ্ছলিত। গান শুধু। সময়ের নেই কিছু দাম।
সমাহিত অন্ধকারে শুধু দু'টি কথা কও যদি
এ মুহূর্তে, মনে হয়, পৃথিবীর হৃদয়ে পেলাম॥

সৌদি আরব

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহ তৈল-সম্পদের জন্য পৃথিবী-খ্যাত। এই খ্যাতি তাদের সম্পদ ও বিপদ—এই দুয়েরই কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরের কাঁচামাল লুণ্ঠন করে নিজেদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করবার লিপ্সায় পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি এখানে এসে ভীড় জমিয়েছে। নিজ সম্পদ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ রাজা, আমীর আর শেখ-এর দল 'ক্যাডিলাক্' 'রোলস-রয়েস' প্রভৃতি সৌখীন বস্তু পেয়ে ঢালা ফরমান দিয়ে দিয়েছেন বিদেশী কোম্পানীগুলিকে মাটি খুঁড়ে 'তরল সোনা' লুণ্ঠন করবার জন্যে। তাঁরা তখন বুঝতে প্যারেন নি, কি তাঁরা হারালেন। মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা তৈল যে একদিন মানুষের জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠবে এবং তা যে আনবে অফুরন্ত সোনাদানা তা আর তাঁদের খেয়াল হয় নি। আজ যখন সে খেয়াল হয়েছে, দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য যখন পাশাপাশি এসে তাঁদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে, তখন তাঁরা আটকা পড়ে গেছেন নিজেদের জালে। বাইরে যাবার পথ নেই। এই অসহায় ভাবের বিরুদ্ধেই বিক্ষোভ। সারা মধ্যপ্রাচ্যে আজ আলোড়ন। ইরান জাল কেটে বেরিয়ে গেছে। এবার কার পালা কে জানে। অবশ্য এখন পশ্চিমী কোম্পানিগুলিও চালাক হয়ে গেছে। 'বিপদে পড়লে অর্ধেক পরিত্যাগ করাই সুবুদ্ধির লক্ষণ, এই নীতি মেনে চলার দিকে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যের ইরান, ইরাক, সৌদী আরব, কুয়াইত, বাহেরিন প্রভৃতি রাষ্ট্রেরই মাটির নীচে আছে তৈল। আজ পর্যন্ত প্রোথিত তৈলের আনুমানিক যে হিসাব করা হয়েছে, তার পরিমাণ হবে ৫০ বিলিয়ন পিপা। ডলারের অঙ্কে এর মূল্য হবে প্রায় একশত বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় ৯০০ কূপ থেকে তৈল তোলা হচ্ছে। গত ১০।১৫ বছরে এই সব কূপ থেকে যত তৈল তোলা হয়েছে তার পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ৬০ বছরে যত তৈল তোলা হয়েছে তার চেয়ে বেশী। তাছাড়া, ১৯৩৮ সাল থেকে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৫০ গুণ। তারপর, মধ্যপ্রাচ্যের কূপ থেকে তৈল উত্তোলনের হার অন্য যে কোনখানকার হারের চেয়ে অনেক বেশী। যেখানে মধ্যপ্রাচ্যের কূপগুলো থেকে দৈনিক গড়ে তৈল ওঠে ৩৭০০ পিপা, সেখানে ভেনিজুয়েলায় ওঠে দৈনিক ২০৯, আর যুক্তরাষ্ট্রে ১১ পিপা। টাকার অঙ্কে এর হিসেব করলে সত্যি মনে হবে, যে অঞ্চলে রয়েছে এত সম্পদ সে অঞ্চলের মানুষ এত দরিদ্র কেন? - এর একমাত্র জবাব হচ্ছে রাষ্ট্রগুলি রাজ-সেলামি হিসাবে বিদেশী কোম্পানি থেকে অর্থ পায় সত্য, কিন্তু লাভের 'সিংহ অংশই' চলে যায় বিদেশী কোম্পানির ধনভাণ্ডারে, অবশিষ্ট যা থাকে, তা অকিঞ্চিৎকরই বলা যেতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের যে-সব রাষ্ট্র এমনিভাবে শোষিত হচ্ছে সৌদি আরব তাদেরই অন্যতম। সে দেশেরই ইতিহাস আজ বলব।

আধুনিক আরবের পত্তন হয় ওয়াহবী আন্দোলনের আরম্ভ থেকে। সে প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। তার আগে সমগ্র আরব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এরা সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। এর মধ্যে আনলেন মুহাম্মদ ইবন্ আবদুল ওয়াহাব তার গোঁড়াপন্থী ধর্ম আন্দোলন। এ নিয়ে গোল পাকালো অনেক এবং অনেক রক্তপাত হলো। সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বর্ণনায় না গিয়ে এই ধর্মমতের সমর্থক এবং একদা আরব রাজ্যের দু একটি অঞ্চলের শাসক ও ও আজিকার 'সৌদী আরবীয় রাজ্যের' অধীশ্বর আবদুল-আজিজ ইবন্ আবদুর-রহমান অল-ফৈজল অল্ সৌদ-এর কথা বললেই সৌদি আরবের ইতিহাসের কতকটা আঁচ পাওয়া যাবে।

রাজা ইবন্ সৌদ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। যখন তাঁর বয়েস মাত্র ২০ বৎসর তখন তিনি আরব রাজ্যে ওয়াহাবীদের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য আক্রমণ চালান। এর পূর্বে ওয়াহাবী মতাবলম্বীদের হাত থেকে আরবের শাসনক্ষমতা চলে গিয়েছিল, কিন্তু যে বংশের হাতে ঐ ক্ষমতা চলে যায়, সেই বংশের শেষ রাজা মুহাম্মদ ইবন্ রশিদ অপুত্রক মারা যাওয়াতে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল-আজিজ রাজা হন। কিন্তু তাঁর ক্ষমতা না থাকাতে রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, সেই সুযোগে ইবন্ সৌদ আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইবন্ সৌদের পিতা আবদুল রহমান ছিলেন ওয়াহাবী রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ফৈজলের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। রাজ্য হতে বিতাড়িত হয়ে আবদুল রহমান পুত্রকে নিয়ে কুয়াইতে বন্দী জীবনযাপন করছিলেন। যা হোক, ইবন্ সৌদ রিয়াদ-এর গভর্নরকে হত্যা করে আমীর হয়ে বসলেন। পরে ১৯০৪ সালে কাসিম নামক প্রদেশটি দখল করে নিলেন। তারপর থেকে আরম্ভ হল তাঁর জয়ের গৌরব। ১৯২১ সালে তিনি হেইল দখল করলেন। এর পর নিজের আসন ও ব্যবস্থাকে আরও শক্ত করে নিয়ে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেন। ১৯১৪ সালের প্রথম ভাগে তিনি পূর্ব জয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য হাসা আক্রমণ করলেন এবং প্রায় বিনা বাধায় 'হুফুফ্' দখল করে নিলেন। এর পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধল। ইংরেজ এগিয়ে এল ইবন্ সৌদের সহযোগিতার আশায়। সেই সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে ইবন্ সৌদ 'জবল সামার'এর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করলেন। ওটা শেষ হওয়ার আগেই আরেক ঘটনা ঘটল। মক্কার আমীর সরিফ হোসেন ইবন্ আলি তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে (১৯১৬) হেজাজে স্বাধীন ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিলেন এবং নিজেকে 'আরব রাজ্যের অধীশ্বর' বলে ঘোষণা করলেন। এটা ইবন্ সৌদের ভাল লাগল না। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের প্রকোপে এটা চাপা রইল। ১৯১৭ সালের শেষে হেজাজ-নেজ্ সীমান্তের খুরমা নামক গ্রাম নিয়ে আবার বিবাদ দেখা দিল। যুদ্ধ থেমে গেলে রাজা হোসেন খুরমা-বিবাদ নিষ্পত্তি করে দেবার জন্যে ইংরেজের স্বারস্থ হলেন। লর্ড কার্জন রাজা হোসেনের পক্ষে রায় দিয়ে ইবন্ সৌদকে হুঁসিয়ার করে দিলেন। ইংরেজের অপ্রীতিভাজন হওয়ার ভয়ে ইবন্ সৌদ চুপ করে গেলেন। কিন্তু পরে হোসেনের রাজ্যের তুরাবা নামক স্থানটি দখল করে নিলেন। তারপর ১৯২০ সালে দখল করলেন আসির, ১৯২১ সালে হেইল

এবং ১৯২২ সালে জৌফ্। ফলে মধ্যবর্তী সমগ্র আরব ইবন্ সৌদের দখলে এসে গেল। ১৯২৪ সাল থেকে আরম্ভ হল হেজাজ দখলের অভিযান। সে বৎসরই মক্কা দখল করলেন, ইবন্ সৌদ। ১৯২৫ সালে জিদ্দা ও মদিনা তাঁর দখলে এসে গেল। ১৯২৬ সালের ৮ই জানুয়ারী তিনি হেজাজের রাজা বলে ঘোষিত হলেন। ১৯২৭ সালে তিনি তাঁর উপাধি পরিবর্তন করে হলেন 'হেজাজ ও নেজ্ এবং তার অধীন অঞ্চলসমূহের' রাজা। ১৯২৭ সালের ২০শে মে জেদ্দাতে গ্রেট ব্রিটেন ও ইবন্ সৌদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তি দ্বারা গ্রেট ব্রিটেন ইবন্ সৌদের রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিল। সৌদি আরবের সীমান্ত এই সময়ই প্রায় নির্ধারিত হয়ে যায়। পরবর্তী কালে (১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর) একটি ঘোষণাপত্র দ্বারা রাষ্ট্রের নাম পরিবর্তন করে রাখা হল 'সৌদি আরবীয় রাজ্য'।

ইবন্ সৌদের বর্তমান বয়স প্রায় ৭১ বৎসর, বর্তমানে তিনি প্রায় অথর্ব। একটা চাকাযুক্ত চেয়ারে বসেই থাকেন তিনি বেশীর সময়। এ চেয়ারটা পেয়েছিলেন তিনি ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের কাছ থেকে উপহারস্বরূপ। তাঁর মত এত দীর্ঘদিন কোন রাজা শাসনকার্য চালান নি। তাঁর এক পা সপ্তদশ শতাব্দীতে, আর একটি বিংশ শতাব্দীতে। ১,৩০০শত বৎসরের আগেকার সাজপোষাক আর রীতিনীতি তিনি যেমন ভালবাসেন, তেমনি ভালবাসেন আধুনিক যুগের বিস্ময় রেডিও, টেলিফোন, মোটর গাড়ি আর এরোপ্লেন। তাঁর শাসনক্ষমতা, রণলিপ্সা আর গোঁড়ামি ছিল ক্রমওয়েলের মত। তাঁর অদ্ভুত আকর্ষণশক্তি আর উদ্যমের জন্য তিনি সহজেই বেদুইনদের বশ করতে পেরেছিলেন। তিনি একজন বাকপটু ব্যক্তি। বক্তা হিসাবেও তাঁর সুনাম আছে। সময়মত তিনি যেমন বিনয়ী হতে পারেন, তেমনি হতে পারেন বধ্য। বহু রাজপ্রাসাদ থাকলেও তিনি তাঁর উট আর হাওয়া গাড়ি নিয়ে মরুতে শিবির বানিয়ে থাকতে ভালবাসেন। খোলা শিবিরগুলি পাহারা দেয় স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারে সজ্জিত গার্ডেরা, আর তাঁকে ঘিরে বসে থাকেন শেখ এবং উপজাতিদের প্রধানরা। দিনে তিনি দুবার করে প্রজাদের কথা শোনেন এবং গাধা বা উট চুরি থেকে পেট্রোলিয়ম সম্পর্কেও বিচার করেন। তাঁর পায়ের কাছে বসে সেক্রেটারী বিশ্ববার্তা তাঁকে শুনিয়ে যায়।

ইবন্ সৌদের পুত্রসংখ্যা প্রায় ৩০। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছেন রাজকুমার সৌদ। তিনিই রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। অপর পুত্র প্রিন্স ফৈজল হচ্ছেন বৈদেশিক সচিব ও হেজাজের ভাইসরয়। প্রিন্স মনসুর হচ্ছেন দেশরক্ষা সচিব, আর মহম্মদ হচ্ছেন মদিনার আমীর।

কার্যত রাজার ক্ষমতা অপ্রতিহত হলেও, আইনত তা সীমাবদ্ধ। শরিয়তের আইনই দেশের সাধারণ আইন। ধর্মসম্বন্ধীয় আদালত ঐ আইন কার্যকরী করেন। 'কাউন্সিল অব এল্ডার্স' বা বয়োবৃদ্ধদের পরিষদ কোরাণ থেকে ঐ আইনের ভাষ্য দেন। প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন ধর্মসম্বন্ধীয় আদালতের মাথা। তিনি সব সময় দায়ী থাকেন আইন বিভাগীয় দপ্তরের কাছে। এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা ভাল। সে হচ্ছে এখনও নেজ ও হেজাজকে পৃথক করে দেখা হয়। নেজ হল ইবন সৌদের আসল স্থান, হেজাজ জীত রাজ্য। তাই দুঅংশে একই আইন প্রবর্তনের জন্য ১৯৩২ সালে যে প্রস্তাব হয়েছিল, তা আর কার্যকর হয় নি। হেজাজকে এখনও ১৯২৬ সালের গঠনতন্ত্র অনুসারে শাসন করা হয়ে থাকে। উপরে যে ব্যবস্থা বলা হয়েছে তা ছাড়া গঠনতন্ত্রে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের অনুজ্ঞা রয়েছে। ঐ পরিষদের সভাবা হয় হবেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী অথবা রাজা কর্তৃক সমর্থিত বা অনুমোদিত ব্যক্তি।

রাজ্যের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য হচ্ছে খেজুর। চারটি প্রদেশেই তা অফুরন্ত হয়ে থাকে। তারপর হয় জোয়ার আগে গমও হত, কিন্তু বাইরে থেকে ধান আমদানী বৃদ্ধি পাবার পর ওর উৎপাদন হ্রাস পেয়ে গেছে। কোন কোন অঞ্চলে নানা ধরণের ফল আর তরিতরকারী উৎপন্ন হয়। উট এখনও এখানকার প্রয়োজনীয় জন্তু। দুধ, মাংস আর যানবাহন—এই তিনের কাজই উট চালিয়ে যাচ্ছে। গরুর পরের দিক দিয়ে এর পর নাম করা যায় ভেড়ার। এই ভেড়ার চর্বি থেকে রান্নার জন্য তৈল করা হয়। তারপর ছাগল। গাধা হচ্ছে ভারবাহী। গভীর কূয়ো থেকে জল তোলার জন্য এদের ব্যবহার করা হয়। আরবী ঘোড়ার সুনাম এখনও শোনা যায়

স্থানীয় শিল্পের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। তৈল কোম্পানির কাছ থেকে যে অর্থ আসে, তদ্ব্যতীত প্রতি বছর মক্কা-মদিনায় তীর্থ করার জন্যে যে হাজার হাজার যাত্রী আসে তাদের অর্থেই রাজ্য পরিচালিত হয়।

সৌদি আরবের অধিবাসীদের অর্ধেক উটের লোম দিয়ে ছাউনি তৈরী করে বসবাস করে। আর বাকী অর্ধেক বহু দুষ্প্রাপ্য জল কূপের কাছাকাছি মাটির ঘর তৈরী করে বাস করে। ঐ জল থেকেই চাষ-আবাদও করা হয়। আরববাসীরা সাধারণত দুধ, ভাত এবং খেজুর খেয়েই দিন যাপন করে। তবে মাঝে মাঝে মাংসও খায়। মিঠাই তাদের খুব প্রিয় খাদ্য।

হেজাজে রাস্তা বলতে বিশেষ কিছু নেই, একমাত্র জেদ্দা থেকে মক্কা পর্যন্ত (৪৫ মাইল) দীর্ঘ রাজপথ ছাড়া। ১৯৪১ সালে এ রাজপথটি তৈরী করা হয়েছে। অধুনা ট্রাক ও মোটর গাড়ি চলাচলের জন্য দীর্ঘ পথ, যেমন, রিয়াদ থেকে কয়াইত, রিয়াদ থেকে হেইল, জেদ্দা থেকে 'ধাবা' প্রস্তুত করেছে এবং করছে। সৌদি আরব এয়ার লাইন অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের মালিক। আরব সরকার এই বিমান কোম্পানির ব্যবস্থাপক। রিয়াদ ও পারস্য উপসাগরস্থ রাস তানুরার মধ্যে রেলপথ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু তা সম্পূর্ণ হয় নি। তবে তৈল এলাকায় যে অংশে রেলপথ পাতা হয়েছিল, তা আজও চালু আছে। জেদ্দা ও মক্কার মধ্যে বাস চলাচল করে।

তৈল কোম্পানি কাজ শুরু করার আগে ইবন্ সৌদের রাজকোষে অর্থ আসত তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে আর শুল্ক থেকে। তার পরিমাণ গড়ে বাৎসরিক ১৬০ লক্ষ ডলারের বেশী হত না। কিন্তু Aramco কাজ শুরু করার পর থেকে রাজকোষে যে অর্থ আসছে তার পরিমাণ বেড়ে গেছে। কেবল গত ৪ বৎসরেই 'আরামকো' নজরানা বাবদ ইবন্ সৌদকে দিয়েছে ৩০ কোটি ডলার। সুতরাং রাজকোষের অর্থ বৃদ্ধি করার জন্য যে কোম্পানি এত টাকা দিতে পেরেছে, তাদের আয়ের পরিমাণও নিশ্চয় মন্দ নয়। সেই ভাগ্যবান বিদেশী কোম্পানিটির কথা প্রসঙ্গে সৌদি আরবের তৈলের ইতিহাস এবার পর্যালোচনা করা যাক।

'Aramco' কোম্পানিটির পুরো নাম হচ্ছে Arabian American Oil Co. মধ্যপ্রাচ্যে যে কয়টি বিদেশী তৈল কোম্পানি কাজ করছে, তার মধ্যে এটিই পুরোপুরি মার্কিন কোম্পানি, এর মালিক মার্কিন, প্রধান কর্মচারীরা মার্কিন এবং এর ব্যবসাও

পরিচালিত হয়, মার্কিন পদ্ধতিতে। তৈল উৎপাদন ব্যবসাতে এ'রা যে নীতি ও রীতি অনুসরণ করে, তা ইংরেজদের থেকে পৃথক। ইংরাজ কর্মচারীদের উন্নাসিকতা এদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। যে সব কর্ম-চারী বেশী 'সাহেবিয়ানা' দেখায় এবং আরবের রীতিনীতিকে সম্মান দেখাতে পারে না তাদের অবিলম্বে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শোনা যায়, 'আরামকো'র প্রথম ভূতত্ত্ব-বিদ্ নাকি দাড়ি রেখে আরবের বেশ ধারণ করে কাজ করেছেন। এই সতর্কতার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আরবদের কোনভাবে না চটান। কারণ, ইবন্ সৌদ বৃটিশ কোম্পানির বদলে আমেরিকান কোম্পানিকে তৈল উত্তোলনের অধিকারপত্র দেওয়ার সময় বলে-ছিলেন, 'আমেরিকানরা মাটির নীচে থেকে তৈল তোলে, কিন্তু রাজনীতি থেকে দূরে থাকে।' আমেরিকানরা এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে। তাদের দেওয়া অর্থ কিভাবে রাজা খরচ করেন তা তারা খোঁজ নেয় না। রাজার অমিতব্যয়িতার বিরুদ্ধে কোন দিন তর্ক করে না। আরব রাজনীতিতে নাক গলায় না। ফলে আজ তারা ৪,৪০,০০০ বর্গ মাইল ভূমির নীচ থেকে তৈল উত্তোলনের অধিকার পেয়ে গেছে। যতগুলি বিদেশী কোম্পানি কনসে-শন পেয়েছে এটা তার মধ্যে সর্ববৃহৎ। এর আয়তন যুক্তভাবে টেক্সাস ও ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বড়। এবং আনুমানিক হিসাবে জানা যায়, ঐ এলাকায় তৈল আছে প্রায় পনর বিলিয়ন পিপা অর্থাৎ সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের সঞ্চয়ের অর্ধেক।

১৯৩০ সালে বাহেরিন দ্বীপে তৈল পাওয়া যায়। সৌদি আরবের উপকূল থেকে বাহেরিন ২৫ মাইলের মত। সৌদি আরবের মূল ভূখণ্ডেও তৈল আছে বলে ভূতত্ত্ববিদ্-দের ধারণা হয়। ইবন্ সৌদও বাহেরিনে পেট্রোলিয়ম আবিষ্কারে কথা শুনে অনু-সন্ধিৎসু হন। ফলে ১৯৩৩ সালে আরা-বিয়ান-আমেরিকান তৈল কোম্পানিকে তিনি অনুমতি দিলেন তৈল উত্তোলনের। এই অধিকার পাওয়ার জন্যে কোম্পানি ইবন্ সৌদকে প্রতি টন নিষ্কাষিত তৈলের জন্য ৪টি স্বর্ণ শিলিং দিতে রাজী হল। পরে ১৯৫০ সালে ঐ হার বদলে লাভের আধা-আধি দেবার কথা হয়েছে। এর ফলে ১৯৫১ সালে ইবন্ সৌদ পেয়েছেন, ১২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার।

আরাবিয়ান-আমেরিকান তৈল কোম্পানি গত বছর পর্যন্ত ৩৭ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করেছে। কোম্পানি ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে সর্বপ্রথম 'ডামাম ডোমে' তৈল অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ করে। প্রথম দিকে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায়
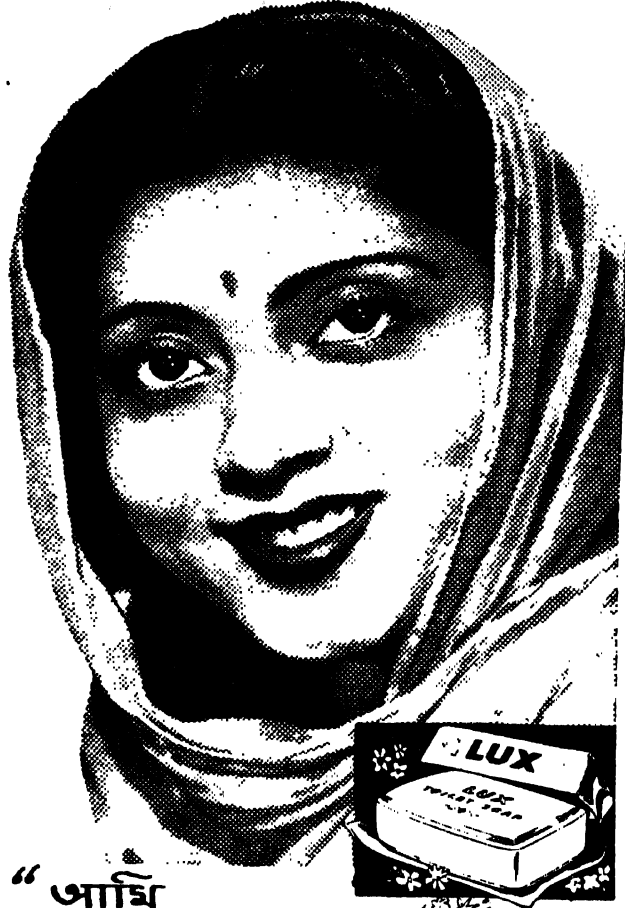
পর্যবসিত হয়। ৩ বৎসর পরে অবশ্য তৈল আবিষ্কৃত হয়। সৌদি আরব থেকে সর্বপ্রথম পেট্রোলিয়ম বিদেশে চালান দেওয়া হয় ১৯৩৯ সালের মে মাসে। এ পর্যন্ত আরও আটটি তৈল খনি আবিষ্কৃত হয়েছে সৌদি আরবে। সেগুলোর নাম হচ্ছেঃ আবু হাদ্রিয়া, আবকুইক বক্কা, কাটিফ্, ফাধিলি, আইন জার, হারাদ, ইতমানিয়া এবং সাফানিয়া। আবকুইক-বক্কা পৃথিবীর বৃহত্তম তৈলখনিগুলির অন্যতম। স্থানটি দৈর্ঘ্যে ৩০ মাইল এবং বিস্তার ৭৭,০০০ একর। এখানে প্রায় ৫ বিলিয়ন পিপা তৈল আছে বলে ধরা হয়েছে।

রাস তানুরাতে কোম্পানির তৈল শোধনাগার অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যতগুলো তৈল শোধনাগার আছে তার মধ্যে এটা পঞ্চম। ১০৬৮ মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইন দিয়ে তৈল চালান দেওয়া হয় শোধনের জন্য। ১৯৪৫ সালে এই শোধনাগারটি তৈরী করা হয়। এর পূর্বে জাহাজে করে অশোধিত তৈল পাঠান হত বাহেরিনে, শোধনের জন্য। কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে ঐ তৈল প্রেরণে বিঘ্ন ঘটায় নূতন শোধনাগার তৈরীর পরিকল্পনা করা হয়। ৭ কোটি ডলার ব্যয়ে ঐ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়। প্রথমত দৈনিক ৫০,০০০ পিপা অশোধিত তৈল শোধন করা হবে বলে নির্ধারিত ছিল পরে দৈনিক ১৪০,০০০ পিপা শোধনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫০ সালে রাস তানুরা তৈল শোধনাগারে ৩৮০ লক্ষ পিপা তৈল পরিশোধন করে ৮১,৯৩,০০০ পিপা গ্যাসোলিন, ২৯,৪৭,০০০ পিপা কেরোসিন, ১,০৫,৪২,০০০ পিপা ডিজেল তৈল, ১,৩৯,৩৪,০০ পিপা জ্বালানী তৈল এবং ৩০,০০০, পিপা আস্‌ফল্‌ট্ পাওয়া গেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে যে রকম নবচেতনা দেখা দিয়েছে এবং ইরানে ইংরেজ যে শিক্ষা পেয়েছে এর পর ইবন্ সৌদ যদি মারা যায়, তবে কোম্পানির কি অবস্থা হবে, তা নিয়ে অনেকে মাথা ঘামাচ্ছেন। ইংরেজ অবশ্য আমেরিকাকে উস্কানি দিচ্ছে। কারণ তারা বলছে, ইবন্ সৌদের মৃত্যুর পর যদি রাজ্যের আমীররা পরস্পরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন এবং দেশে অরাজকতা দেখা দেয়, তবে কোম্পানির পক্ষে সেখানে কাজ করা সুবিধাজনক নাও হতে পারে। সুতরাং আরব রাজনীতিতে মার্কিনের নাক ঢোকান উচিত। ইংরেজ কিছুটা ঢুকিয়েছেও। তারা চাচ্ছে বর্তমান রাজার মৃত্যুর পর রাজার দ্বিতীয় পুত্র মন্ত্রী ফৈজল রাজা হোক। রাজার বিশ্বস্ত বন্ধু এবং রাজ পরিবারের বাইরে দেশের অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি অর্থসচিব আবদুল্লা অল-সোলিমানও তা-ই চান। এটা ইংরেজের পক্ষেই সুবিধাজনক। ফলে ইবন্ সৌদের মৃত্যুর পর সৌদি আরবে একটা বিশৃঙ্খলার আশংকা রয়েছে।

আর একটি কথা বলে প্রবন্ধ শেষ করব, সে হচ্ছে সৌদি আরবের উন্নতির কথা। বিদেশী কোম্পানি দেশের অর্থ লুটে নিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কোম্পানি আসার পরই মধ্যযুগীয় ভাবধারাপুষ্ট একটি দেশ আধুনিক প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে। জনগণের দারিদ্র্য ঘোচেনি ঠিকই এবং বিদেশী কোম্পানি সৌদি আরবকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার জন্য যা করছে, তা একান্তভাবে স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত তাও ঠিক, কিন্তু এও ঠিক যে তারা অগ্রগামী না হলে হয়ত সৌদি আরবের এতটা উন্নতি সম্ভব হত না।

আলোচনা

"নাবিক"

সবিনয় নিবেদন,

'রূপদর্শী'র "নাবিক" চমৎকার লাগল। তথ্য-পরিবেশনে, সরস-ভঙ্গিমায়, নিবন্ধটিতে এদেশীয় নাবিকদের জীবন-চিত্র চমৎকার ফুটে উঠেছে।

প্রসঙ্গতঃ, আরও কিছু তথ্য আছে ওদের সম্বন্ধে, যা পরিবেশন-যোগ্য। ক'লকাতা-বন্দরের মুসলমান-নাবিক প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, এক—পূর্ববঙ্গের, দুই—খিদিরপুর অঞ্চলের; যাদের মেটিয়াবুরুজের লস্কর বলা হ'য়ে থাকে। পূর্ববঙ্গীয় ভাষার কথা বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেদের ভাষা হিন্দী বা উর্দু টানের বাঙলা ভাষা। সব থেকে কৌতুককর ব্যাপার, কাপ্তেনকে বাইরের লোকের কাছে 'কাপ্তান' অনেক সময় বললেও নিজেদের মধ্যে এরা কাপ্তেনের নাম দিয়েছে—'বাড়ীওলা'। মেটিয়াবুরুজের লস্কর বিশেষ করে 'বাড়ীওলা' বলবেই। আর একটি সংবাদ,—'ইঞ্জিন ডিপার্টের কাম' পূর্ববঙ্গীয় নাবিকদের প্রায় একচেটিয়া এবং ওদের এদিকে দক্ষতাও নাকি বেশী, তেমনি 'সেলুন ডিপার্টের কাম' মেটিয়াবুরুজের লোকদের। 'ডেক ডিপার্টের' কাজেই দুই শ্রেণীরই লোক দেখা যায়, তবে এ'বিভাগে 'বোম্বাইয়ের লস্করদের' নামডাকই খুব বেশী।

অফিসারদের ক্রম-বিভাগে 'রূপদর্শী' ডেক ডিপার্টের প্রধানকে বলেছেন 'ফার্স্ট অফিসার'। এ'শব্দটা খুব কমই ব্যবহৃত হয়, 'চীফ মেট' বা 'চীফ অফিসার' কথাটারই চলন বেশী। আমাদের নাবিকরা যার নাম দিয়েছে,—'বড়ো বা বড়া মালিম।'

'সেলুন ডিপার্টে'র ব্যাপারে 'রূপদর্শী' লিখছেন, 'এখানে সবার উপরে বাট্‌লার।' কথাটা খুব সত্য নয়। বাট্‌লার 'সেলুন ডিপার্টে'র খাদ্যাদির বিষয়ে একপ্রকার সর্বেসর্বা হ'লেও 'অফিসার-গ্রেডের' সে নয়, সেইজন্য প্রধানতঃ একজন অফিসার তার ওপরে থাকেন, তাঁকে বলা হয় 'চীফ ষ্টুয়ার্ড'। তেমনি, "রাইটার" বা "কেরাণী"র ওপরেও একজন থাকেন,—তিনি পার্সার। অবশ্য, অনেক জাহাজে 'চীফ ষ্টুয়ার্ড' ও 'পার্সার' দেখা গেছে একই ব্যক্তি। কোনো কোনো জাহাজে 'পার্সার'কে 'সিনিয়র পার্সার' ও 'রাইটার'কে 'জুনিয়র পার্সার' বলা হয়ে থাকে।

ক'লকাতার নাবিকদের 'আনফিট' সমস্যার অথবা 'কাজ-না-পেয়ে-ব'সে-থাকা'র সমস্যার কথা তুলে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়েরই অবতারণা করেছেন 'রূপদর্শী'। কিন্তু ওসব ছাড়া, আরও একটি আসন্ন সমস্যার দিকে শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ওই নাবিকরা। সে হচ্ছে নৌ-চালনার ক্ষেত্রে তাদের চেয়ে শিক্ষিত ছেলেদের আবির্ভাব। ক'লকাতার 'ভদ্রা' ও বিশাখাপত্তনের 'মেখলা',—এই দু'টি শিক্ষার্থী জাহাজে সেই সব ছেলেরা হাতেকলমে নাবিকবিদ্যা শিক্ষা করছে।

এ'সব ত গেল নাবিক-জীবনের বহিরঙ্গ পরিচয়,—অন্তরঙ্গ পরিচয় আরও চিত্তাকর্ষক,—কিন্তু তার স্থান এ ক্ষুদ্র পত্র নয়। ইতি—

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশাখাপত্তন।

"বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ"

মহাশয়,

গত ১৬ই চৈত্র, ১৩৫৮ সালের 'দেশে' শ্রীযুত জীবনানন্দ দাশ লিখিত 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পড়েছি। বাঙলা ও বাঙালীর এই ঘোর দুর্দিনে প্রত্যেক বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিরই প্রবন্ধটি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়া কর্তব্য। আমার মতে বাঙলা ভাষার সর্বাপেক্ষা বেশী আশঙ্কার কথা হোল এর প্রসার ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান সঙ্কোচন। পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলনের ফলাফল কি হবে বলতে পারি না, কিন্তু পূর্ব বিহারে বাঙলা ভাষার ভবিষ্যৎ কি হবে তা বলতে পারা যায়। বিহার সরকার অধুনা এক সার্কুলার জারী করেছেন যে, ১৯৫৩ সাল থেকে বিহারের সমস্ত উচ্চ ইংরেজী স্কুলে (বে-সরকারী স্কুল) হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষা দিতে

হবে। বাঙলা আর অবশ্য পাঠ্য বিষয় থাকবে না, optional হবে, হিন্দী এবং ইংরেজী অবশ্য পাঠ্য হবে। অর্থাৎ বাঙালী ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষায় উত্তর দেওয়া ত' দূরের কথা—বাঙলা পড়বার ন্যায়সংগত অধিকারটুকুও কেড়ে নেবার ইন্তেজাম করা হোল। বিহার সরকার বাঙালী ছাত্রদের জন্য ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি যে সমস্ত বই অনুমোদন করেছেন তাদের অধিকাংশই মূল হিন্দী বই-এর অনুবাদ; অনুবাদের সময় কোনও বাঙালী শিক্ষকের সহায়তা নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না, কারণ অনুবাদ অতি জঘন্য হয়েছে—অনেক স্থলে ভাষা অদ্ভুত ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাশ মহাশয় 'প্লোয়ার ঐতিহাসিক কাহিনীমালা' [২য় শ্রেণীর জন্য], 'ব্যবহারিক ভূগোল [৬ষ্ঠ শ্রেণী], 'বিজ্ঞানের পথে [৩য়, ৪র্থ ভাগ] ইত্যাদি বইগুলি একবার পড়ে দেখতে পারেন। অনেক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রের বাঙলা অংশগুলির ভাষাও এইরূপ অদ্ভুত ও অর্থহীন দেখা যায়!

মোদ্দা কথা, বিহারের এই অঞ্চলগুলি পশ্চিম বঙ্গ ফিরে না পেলে বাঙলা ও বাঙালীর কল্যাণ নাই।

হিন্দী সংস্কৃতের মতো একক ভারতীয় ভাষা হতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দী বরাবর ভারতের রাষ্ট্রভাষার স্থান অধিকার ক'রে থাকতে পারবে না। এজন্য তিনি তাঁর 'শিক্ষা প্রকল্প' শীর্ষক পুস্তকে হিন্দী শিক্ষার উপর মোটেই জোর দেননি। অবশ্য আমার মতে সাহিত্যানুরাগী প্রত্যেক বাঙালীর হিন্দী শিক্ষা করা কর্তব্য। বাঙালী সাহিত্যিকরা সাধারণতঃ হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। এরূপ মনোভাব সর্বদা নিন্দার্হ। প্রত্যেক ভাষার সাহিত্যেরই কিছু না কিছু দেবার মতো জিনিস থাকে। হিন্দীরও আছে। হিন্দী সাহিত্য থেকে আমাদের কি কি নেবার আছে, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বা শ্রদ্ধেয় প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় আমাদের জানাতে পারেন; উর্দু-সাহিত্য-রসের খোরাক যোগাবেন শ্রদ্ধেয় আলী সাহেব। বাঙলা সাহিত্যের সেবা ও সমৃদ্ধিই আমাদের উদ্দেশ্য। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন। ইতি—শ্রীপ্রশান্তকুমার সরকার, হাজারীবাগ।

৭২
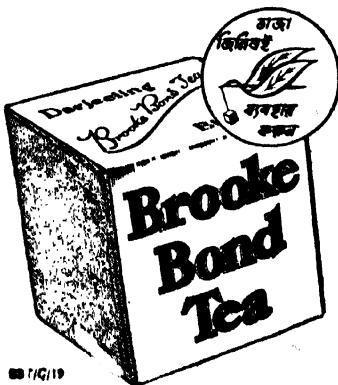
মহাশয়,

১৬ই চৈত্র তারিখের 'দেশে' প্রকাশিত জীবনানন্দ দাশ মহাশয়ের 'বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' পড়িয়া সুখী হইলাম। স্বাধীনতা পাওয়ার মুহূর্ত হইতেই বাঙলা দেশকে যে দুর্যোগের মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে তাহাতে বর্তমানে এই প্রকার চিন্তার প্রয়োজন। কেবলমাত্র রাজনৈতিক জীবনেই নয়, আজ বাঙলার আর্থিক ও নৈতিক জীবনেও ভয়ঙ্কর বিপর্যয় চলিতেছে; এবং ঐ কারণেই বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনও এলোমেলো বিশৃঙ্খল হইয়া একটা বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। বাঙলার সংস্কৃতি আপন বৈশিষ্ট্য লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে কি? না ক্ষমতাবান, ধনবান ও শক্তিমান অন্যান্যদের কাছে নিজেকে বিলাইয়া দিবে? এই প্রশ্ন আজ বড় নিদারুণ রূপ লইয়াই প্রকট হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে আর কিছু বলা না গেলেও এটুকু বেশ সহজেই বলা চলে যে, বাঙলার সংস্কৃতি আজ একটা বিরাট বাঁক ঘুরিয়া অনেক পরিবর্তিত হইয়া যাইতে চলিয়াছে। তাহার ইঙ্গিতও দেখা যাইতেছে। বাঙলা আজ বহু বাঙালীকে হারাইয়াছে এবং যাহারা আছে তাহারাও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুই ভাগে বাঁচিতেছে ও ভাবিতেছে। এই দুই অংশের জীবনের দুই ভিন্ন রূপ প্রকাশ পাইতেছে। শুধুমাত্র পোষাক আসাক আচার রীতিনীতির দিক দিয়াই নয় ভাষার দিক দিয়াও একটা বড় তফাতের সৃষ্টি হইতেছে। জীবনানন্দ দাশ মহাশয় ভয় পাইয়াছেন যে, ক্রমে পূর্ব পাকিস্থান হইতে বাঙলা ভাষা উঠিয়া যাইতে পারে—তাহা হইবে না কারণ তিনিই বলিয়াছেন, "শুধু নাম বা অন্য দু'চারটে ছোট বড় জিনিসেরও পরিবর্তনে অনেক দিনকার রক্তমাংস আত্মার পরিবর্তন হওয়া কঠিন। বাঙলা পূর্ব বাঙলার লোকদের অনেক শত বৎসরের সাহিত্য ও সমাজ সংসারের ভাষা।" এ ছাড়া অধুনা কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনও এই দিক হইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পূর্ব পাকিস্থানের বাঙলা ভাষায় তথা সাহিত্যে একটা বিরাট রূপ-পরিবর্তন হইবে। নিঃসন্দেহেই বলা চলে, উর্দু আরবি ফার্সি হইতে বহু নূতন নূতন শব্দ আসিয়া বাঙলাকে অনেকখানি জোরাল এবং সচল করিবে। শুধু এইখানেই এই রূপ পরিবর্তন শেষ হইবে না, এমন অনেক শব্দ এবং বাচনভঙ্গি প্রবেশ করিবে যে আধুনিক বাঙলা ভাষার সহিত তাহার কোন মিল বা যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। শুধু মাত্র লিখিত ভাষাতেই যে এরূপ পরিবর্তন ঘটিবে তাহা নহে, নূতন নূতন উপভাষারও সৃষ্টি হইবে। বহু অবাঙালী এবং পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালী পূর্ব পাকিস্থানের গ্রামে গিয়াও বাস করিতেছে, যাহার ফলে চলতি ভাষাতেও বাঙলার বাইরের ভাষাগুলির প্রভাব পড়িয়া এইসব নূতন উপভাষাগুলির জন্ম হইবে। এই উপভাষাগুলি শুধুমাত্র জন্মিয়াই ক্ষান্ত হইবে না। নূতন নূতন সূচনা লইয়া মাতৃভাষাকে, সমৃদ্ধির পথে সাহায্য করিবে।

পূর্ব বাঙলার উপভাষায় রচিত সাহিত্যের যে সমাদর বর্তমান সুধীসমাজ দিতে শুরু করিয়াছেন পূর্ব পাকিস্থানে তাহার ঘাটতি নাই বরং লোকসাহিত্য হিসাবে সেগুলি নূতন মর্যাদা পাইতেছে। আগামী কয়েক বছরের ভিতর এই লোকসাহিত্যগুলির রূপ বদলাইয়া যাইবে সত্যি, কিন্তু তাহার আদরের হ্রাস ঘটিবার আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয় না। তাই জীবনানন্দ দাশ মহাশয় পূর্ববঙ্গে জীবন্ত উপভাষাগুলির হারাইয়া যাইবার যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহার খুব একটা কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

ইসলাম এবং ইসলামের ইতিহাস নিয়াও পূর্ব পাকিস্থানে একটা নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে। সে সাহিত্য যে শুধুমাত্র কোরান হাদিসের অনুবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে তা নয়। হজরত মহম্মদ ও অন্যান্য মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনী এবং ঐশ্লামিক আচার অনুষ্ঠানের বিবিধ আখ্যান ও ব্যাখ্যা লইয়াই ইহা গড়িয়া উঠিবে। হয়তো ইসলামের ইতিগাথা এবং কাহিনী লইয়া 'মঙ্গল কাব্যে'র মত কতকগুলি কাব্য-উপন্যাসের সৃষ্টি হইবে। বাঙলা সাহিত্যের এদিকের সৃষ্টি শুরু হইয়া গিয়াছে কোরাণ হাদিসের অনুবাদের ভিতর দিয়া। সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাকে একটি নূতন যুগ বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। তাই বাঙলা সাহিত্যের অনেক দিনকার বড় ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়িবার আশঙ্কা কম, তবে একথা সত্য রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা সাহিত্যের মহত্ত্ব অনেকাংশেই থাকিবে না।

পূর্ব বাঙলার বাঙলা সাহিত্যের নূতন সম্ভাবনার আরও দুই একটা দিক আছে। পূর্ব বাঙলার জীবনযাত্রা লইয়া বাঙলা সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাস সাহিত্যে বিশেষ কিছু আজ পর্যন্ত রচিত হয় নাই। এখন পূর্ব পাকিস্থানের রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া যে নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে তাহাতে তাহার প্রকাশ ঘটিবে। যদিও এখন পর্যন্ত ঐরূপ সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে না তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে পূর্ব পাকিস্থানের সাহিত্যিককে পূর্ব পাকিস্থানের জীবনযাত্রার আলেখ্য তৈরি করিতেই হইবে। তাই পূর্ব পাকিস্থানের বাঙলা ভাষা নূতন রূপ পরিগ্রহ করিলেও বাঙলা সাহিত্যে বহু নূতনের প্রবেশের সম্ভাবনা রহিয়াছে। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে এই সকল দিকে কোন প্রতিশ্রুতিশীল নূতন লেখকের আগমন দেখা যাইতেছে না, তবে আশার কথা যে নবীন লেখক গোষ্ঠীর ভিতরে এই বিষয়ে একটা চেতনা আসিয়াছে।

বাঙলা সাহিত্যে বাঙলার মুসলমান সমাজ লইয়া বিশেষ কিছু সৃষ্টি হয় নাই। কয়েকজন আধুনিক সাহিত্যিক কয়েকটি ছোট গল্প লিখিয়াছেন সত্যি, কিন্তু তাহাতে মুসলমান সমাজের জীবনের রূপ কতটুকু বা প্রকাশিত হইয়াছে। মুসলমানপ্রধান পূর্ব পাকিস্থানের সাহিত্যে এই সমাজের কাহিনী উদ্ঘাটনের এক বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে। এখন পর্যন্ত কোন শক্তিশালী লেখক বা লেখিকা এই পথে চলিতে প্রবৃত্ত না হইলেও মুসলমান সমাজের সাহিত্যিকদের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে। দুই একটা ছোট উপন্যাস কিছু আলোড়নও তুলিয়াছে।

এই ত গেল পূর্ববঙ্গের কথা।

পশ্চিমবঙ্গেও নূতন সাহিত্যের সম্ভাবনা রহিয়াছে। উপভাষার কথাই ধরা যাক। পূর্ববঙ্গের যে সব উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতেছে তাহাদের সন্তানসন্ততিরা পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলির চল রাখিতে পারিবে না এ ঠিক, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হারাইয়া ফেলিতেও পারিবে না। পূর্ববঙ্গের উপভাষাগুলি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন উপভাষার সহিত মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া নূতন নূতন উপভাষার সৃষ্টি করিবে এবং কালের গতিতে ঐ ভাষাগুলিও প্রাণের কাজে খাঁটি হইয়া জোরাল হইয়া উঠিবে। তাই পশ্চিমবঙ্গেও নূতন নূতন উপভাষা বিকশিত হইয়া উঠিবে।

"যে বাঙলা একদিন ভাত কাপড়ে ঘরে তৃপ্তি পেয়ে গল্প রূপকথা বচন ছড়া ইত্যাদি তৈরি করেছিল বাঙলার সে হৃদয় নেই এখন, সে সব লোক নেই, সে প্রবাদ ছড়ালেখ, লেখন নতুন যুগে কোন যুক্তিঘন ক্রমবিকাশ লাভ করল না, মরেই গেল—মানুষই মরে যাচ্ছে বলে।" কিন্তু শুধুমাত্র জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বা তৃপ্তি নিয়ে তৈরি গল্প রূপকথা ইত্যাদিইত সাহিত্য নয়। মানুষের আত্মার কান্না লইয়া হৃদয়ের আর্তরোল লইয়াই সাহিত্য হয়। আজ বাঙলার ক্লিষ্ট মানুষদের আত্মার হাহাকার লইয়া গড়া সাহিত্যের আভাষ এদিকে সেদিকে পাওয়া যাইতেছে। তাহাতে প্রেমগাথা না থাকিলেও প্রেমসুন্দর জীবনের আকাঙ্ক্ষা বেশ পরিস্ফুট। এই সাহিত্যে বাঙলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকিবে।

হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হইয়া বাঙলার মঙ্গল করিতে না পারিলেও 'যথেষ্ট অমঙ্গল' করিবে বলিয়া বোধ হয় না। হিন্দি সরাসরি হয়ত বাঙলাকে কিছু দিতে পারিবে না, কিন্তু হিন্দির মাধ্যমে বাঙলার বাইরের হিন্দী প্রচলিত জায়গাগুলির জীবনযাত্রার একটা সম্যক উপলব্ধি সহজ হইবে; এবং ঐ বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন জীবনছন্দ লইয়া বাঙলায় নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারিবে। ইংরেজি বা ফরাসী ভাষার মত বাঙলা ভাষাকে একটা আন্তর্জাতিক সমাদর পাইতে হইলে এদিকটারও একটা বিশেষ দরকার। বাঙলা সাহিত্যে অ-বাঙ্গালী সমাজের আলেখ্যের ভীষণ অভাব। এপথে কেহ চলিতে শুরু করিয়াছেন বলিয়া জানিনা, তবে আশার কথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সুধী এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন। তাই বলিতেছিলাম, বাঙ্গালী যদি দুই বেলা পেট ভরাইবার মত অর্থের সংকুলান করিতে পারে তবে নিকট ভবিষ্যতেই বাঙলা সাহিত্য কিছু রূপ পরিবর্তন করিয়া অধিক বিস্তৃত হইয়া উজ্জ্বলতর হইবে।

ইতি—জনৈক পূর্ব পাকিস্থানবাসী।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

ভাঙা বাংলার সাহিত্য

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যের বলিষ্ঠ গতিপথ সম্বন্ধে আজকের দিনে কারো কারো মনে শুধু দ্বিধার অবকাশ আছে—একথা বলতে পারলেও তবু কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া চলতো। কারণ সাহিত্যের নতুন অভিযাত্রার লগ্নে প্রাচীন বিধৃত মন বরাবরই সন্দেহ অনিশ্চয়তায় দোদুল্যমান থাকে। সব দেশের সাহিত্যের ইতিহাসই এ সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু বেদনাদায়ক হলেও আজ তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাঙলা সাহিত্য যে সুষ্ঠু সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করেছিল সেই অগ্রগতি কোন পূর্ণাঙ্গ সার্থকতায় রূপায়িত হবার আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। প্রগতির প্রতিবন্ধকতায় রক্ষণশীল রুচি আজকের দিনে যদি ভবিষ্যৎ বক্তার ভূমিকায় আত্মপ্রসাদ অনুভব করে থাকে, তবে তা সমীচীন হচ্ছে একথা বলবো না নিশ্চয়। বলবো না তাঁদের সম্মার্জনী-সুলভ সমালোচনায় সাহিত্যের প্রগতি ব্যাহত হবে। কিন্তু তাদের নৈয়ায়িক চক্কানিনাদে কর্ণপাত না করেও আজ সত্যি একবার আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, অপরিহার্য হয়ে পড়েছে প্রগতি সাহিত্যের গতিপথ পুনর্বিচারে। এ কাজ আজ প্রত্যেক প্রগতিশীল সাহিত্যিকের—প্রত্যেক সাহিত্যরস পিপাসুর।

রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাঙলা সাহিত্য যে দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করে এগিয়ে চলছিল, তা প্রধানত দুটি ভাবধারায় উদ্দীপ্ত। একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক সমাজ-সচেতনতা বা পরিব্যপ্ত মানবতা বোধ, অপর দিকে তেমনি বস্তুবাদী মননশক্তি রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে Renaissance উদ্বুদ্ধ য়ুরোপ বাঙলার উপকূলেও আঘাত হেনেছিল। তারই আলোড়নে বাঙলা সাহিত্যে প্রথম সূচনা হলো Humanism বা মানবতাবাদের অভিষেক। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম এবং বঙ্কিমের পর রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় য়ুরোপীয় মানবতাবাদ এদেশের জল-বায়ুতে সংবর্ধিত হয়ে পথ কেটে নিল। তারপর রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা সাহিত্য সে মানবতাবাদকে আরো সুস্পষ্ট পরিপুষ্টি দান করতে সমর্থ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো বিশাল প্রতিভার অনুপস্থিতির পরে সাময়িকভাবেও আড়ষ্ট না হয়ে বাঙলার সাহিত্যিক যে সেই মানবতাবাদকে একটা সম্পূর্ণ নতুন খাদে বয়ে নিয়ে চললেন তা বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। Humanism-এর এই নতুন খাদে বাঙলার সাহিত্যিক সংযোজিত করলেন বস্তুবাদী মননশক্তি—যা পূর্বসূরীদের সৃষ্টিতে নেই বললেই চলে। বাঙলা সাহিত্যে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ তাই বিশেষ করে আধুনিক সাহিত্যিকদের অবদান। কিন্তু এমন সুষ্ঠু আদর্শের অধিকারী হয়েও এমন নির্দিষ্ট পথের সাক্ষাৎ পেয়েও আমরা বাঙলা সাহিত্যকে একটা স্বাভাবিক সমুজ্জ্বল লক্ষ্যস্থলে আজ নিয়ে আসতে পেরেছি কিনা সন্দেহ জাগছে। বিভ্রান্ত পথিকের সংশয়-আকুল কণ্ঠস্বর দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে আজকের সাহিত্যে। এই হতাশার আকুতি কেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে? কেন এই চিন্তার বিকলন? প্রগতিবান মানস এর কারণ অনুসন্ধানে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই—দেখতে পাচ্ছি। এখানেই ভরসার কথা, বাঙলা সাহিত্যের এই সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ তাই খতিয়ে দেখা একাধিক দিক দিয়ে প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে এবং যুদ্ধের অবসানে বাঙলার সমাজ-ব্যবস্থায় সংঘাতশীল পরিবর্তন নগ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। সাহিত্যিকের সংবেদনশীল মনে তার প্রতিচ্ছবি অনিবার্য না হয়ে পারেনি। তখনকার বাঙলা দেশকে স্মরণ করলে দেখতে পাই—রাজধানীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত, মন্থর গ্রামীণ জীবনও অস্বাচ্ছন্দ্যের বাতাসে অস্থির। শহরে, গ্রামের নিভৃত অঞ্চলে সাগর পারের নানান জাতের সৈনিকেরা এসে প্রতিরোধ শিবির গড়ে তুলেছে। এরি মাঝে শোনা গেল পঞ্চাশের মন্বন্তরের পদধ্বনি। দেখতে দেখতে একদিকে যেমন সাধারণের জীবন নির্বাহ দুঃসহ হয়ে পড়লো, অন্য দিকে তেমনি ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো মজুতদার চোরাকারবারীদের পৈশাচিক জীবিকা। সেই মর্মান্তিক পরিবেশে জনসাধারণের জীবন যখন নিপীড়িত নিষ্পেষিত, তখন Humanism-এর নতুন রূপকার—রবীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরাধিকারী বাঙলার সাহিত্যিক বঞ্চিতের মর্মবেদনা সামগ্রিক তীব্রতায় অনুভব করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। বেদনা-বিক্ষুব্ধ অনুভূতিকে সেদিন ভাষায় রূপ দেবার শৈথিল্যও দেখায় নি, বাঙলার সাহিত্যিক। কিন্তু নিতান্ত পরিমিত সীমানা ছাড়া সে রূপায়ণ সার্থক-সৃষ্টির বার্তাবহ হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। কেন পারেনি,—আন্তরিকতা সত্ত্বেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সাহিত্যিকেরা কেন ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন—তাই এবার বুঝে দেখা যাক। সংঘাতক্লিষ্ট সমাজে রাজনীতির ঢেউ উদ্দাম অসংযত হয়ে পড়ে। রাজনীতির ঘূর্ণিতে সাধারণ চিত্ত থাকে উত্তেজনায় মুখর। সাধারণের একজন হয়েও দৃষ্টিবোধের তারতম্যে সাহিত্যিক স্বতন্ত্র, একথা ভুললে চলেব না। রাজনীতির হাওয়া সাহিত্যিকের হৃদয়ে প্রেরণা আনবে সত্যি। কিন্তু সে প্রেরণা সাহিত্যিকের শিল্প-সজাগ মনে পরিশীলিত হয়ে একটা বিশিষ্ট জীবন-দর্শনরূপে দেখা দেবে—যাতে করে মানুষের পরিচয় বহু বিচিত্রতায় ধরা দেবে তাঁর চোখে। সংবেদনশীল শিল্পীমন শুধু মাত্র তখুনি বিবৃত করতে পারবেন নিপীড়িতের সার্থক ইতিহাস। কিন্তু সাহিত্যের এই নিরিখ তখন অধিকাংশ সাহিত্যিক বিস্মৃত হয়েছিলেন, কিংবা সচেতনভাবেই অর্থহীন বিবেচনায় পরিত্যাগ করেছিলেন। তাই মানুষের মর্মকথা প্রতিভাসিত না করে সাহিত্য শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠলো চরম রাজনীতি-সমাচ্ছন্ন কোন কোন বিশিষ্ট মতবাদের প্রচার-বাহন। মতবাদ বা রাজনীতি হয়ে দাঁড়ালো লক্ষ্য আর মানুষ হয়ে পড়লো উপলক্ষ্য। সাহিত্যিকও সরে দাঁড়ালেন তাঁর স্বধর্ম থেকে। মতবাদের উদগ্র নেশায় এদেশের মানুষকে, জল-বায়ুকে ভুলতে দেরি হলো না। এদেশের কবি লিখতে লাগলেন, "কসাকের কড়া পাল্লায় চূড়ান্ত মীমাংসা এবার", কিংবা "পোল্যান্ড সীমান্ত কাঁপে সমাগত লালা সেনা।" ইত্যাদি। উপন্যাস সৃষ্টিতে মন্দা দেখা

দিল, অধীর, অস্থির মানসিকতা উপন্যাসের অনুকূলও নয়। ছোটগল্পের প্রচলন ব্যাহত হলো না অবশ্য। কিন্তু সেসব গল্পে ততটা শিল্পনিষ্ঠা রইলো না, যতোটা রইলো আক্রমণাত্মক মনোভাবের আস্ফালন—একটা সর্ববিধ্বংসী মতবাদের রণহুঙ্কার। এভাবে সাহিত্য নিছক প্রোপাগাণ্ডার হাতিয়ার হিসাবে পরিগণিত হতে চললো। বলছি না—এ সময়ে সার্থক সাহিত্য মোটেই সৃষ্টি হয়নি, মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্যিক এরি মধ্যে তবু বিস্ময়কর সৃষ্টিসম্ভার উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন বাঙলা সাহিত্যকে। কিন্তু তা সম্ভব হয়েছে শুধু মাত্র তাঁদের ব্যক্তিগত প্রতিভার জন্যেই। সাহিত্যের ব্যাপক ভাবধারার দিকে তাকিয়ে তাঁদের আমরা আশ্চর্য ব্যতিক্রম বলে ধরে নিতে পারি।

সাহিত্য ও রাজনীতির বিচারবোধে এই যে বিভ্রান্তি, তা যুদ্ধান্তে কয়েক বছরের মধ্যেই আরো চরম আকারে দেখা দিল। কিন্তু চরমে উপনীত হতেই এই মারাত্মক ভাবধারার প্রাচীরে ফাটল শুরু হলো—দেখতে পেলাম আমরা। সাহিত্যের পলিমাটিতে এই উগ্র রাজনীতির এমন নিরংকুশ সম্প্রসারণ কতোটুকু যুক্তিসহ এবং কার্যকরী তা নিয়ে দ্বিধার উদ্রেক হলো। নিজেদের মধ্যেই শুরু হলো মতবৈষম্য। একটা বদ্ধমূলে সম্মিলিত বিশ্বাস ভেঙে যেতে লাগলো দেখতে দেখতে। তখন মনে হলো—এবার বুঝি সত্যি আত্মস্থ হলেন বাঙলার সাহিত্যিক। বুঝি এবার সত্যি প্রকৃতিস্থ হচ্ছেন—অনেক দিনের শেষে রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতায় সম্পৃক্ত তাঁর মন দেখতে পাচ্ছে আরো মহত্তর স্বধর্ম, নতুনতর কোন গতিপথ। কিন্তু বেদনার্ত হয়ে দেখতে হলো তার আভাস ফুটে উঠলো না সাহিত্যে। সাহিত্যিক তাঁর ভুল বুঝতে পারছেন বটে। কিন্তু মন তবু সংশয়াচ্ছন্ন; আর তাছাড়া এতদিনকার ব্যর্থ পরিশ্রমে প্রতিভাও যেন একটু অবসন্ন; নিঃশেষিত। তাই একটা গতিহীনতার ছায়া নেমে এলো বাঙলা সাহিত্যের আকাশে।

জন-জীবনের মর্মকথায় উদ্দীপ্ত সাহিত্য—যা মানবতাবাদেরই যথার্থ স্বরূপ, তা সাহিত্যিকের বুদ্ধি-বিভ্রাটে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হতে পারলো না বাঙলা সাহিত্যে। একথা আজকের দিনে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই ব্যর্থতার কারণ শুধু মাত্র সাহিত্যিকের মানস-দৈন্যে নিহিত এমন কথাও অর্বাচীন উক্তির মতোই শোনাবে। বাঙলার সাহিত্যিক যখন আত্মপ্রত্যয়শীল হতে চলেছেন, তখুনি যদি আবার একটা সংহার-সংক্ষুব্ধ আত্মঘাতী পরিবেশ সামনে এসে না দাঁড়াতো, তবে সত্যিকারের পথ হয়তো অচিরেই দেখতে পেতেন সাহিত্যিক। কারণ প্রগতির জয়যাত্রা ব্যাহত হলেও কখনো রুদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না সাহিত্যে। অন্তত বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে একথা নিঃসংকোচে বলা যায়—যে সাহিত্যের প্রাণধর্ম প্রগতির বিজয়-বন্দনা করে আসছে বরাবর। কিন্তু যুদ্ধপরবর্তীকালে কয়েক বছর না পেরুতেই সাহিত্যিক দেখতে পেলেন তাঁর সংস্থিত পরিবেশকে সংহার করা হচ্ছে নির্মমভাবে। দ্বিখণ্ডিত হলো বাঙলা দেশ। সমাজের প্রতিটি স্তরে এবার যে বিপর্যয় নেমে এলো, তা অভাবিত, অভূতপূর্ব। বাঙলা সংস্কৃতির প্রাণযন্ত্র হয়েছিল যে ভূখণ্ড, তা বাঁধা পড়ে গেল একটা মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার শৃংখলে। বাঙলার বৃহত্তর অংশে—পূর্ব-পাকিস্থান, যার নাম—সংস্কৃতিবিধ্বংসী একটা শাসন-ব্যবস্থা কায়েম হলো। ভবিষ্যতে সেখানেও অবশ্য একদিন ইতিহাসের অনিবার্যতায় প্রগতির পদধ্বনি শোনা যাবে নিশ্চয়। কিন্তু আপাতকালে সেই পরিবেশে শিল্পীমন পঙ্গু না হয়ে পারে না। বাঙলার বৃহত্তর পরিবেশ থেকে সেই শিল্পী এবং শিল্পোন্মুখ চেতনা নির্বাসিত হলো অনিশ্চিতকালের জন্যে। যে কৃষিজীবী জীবন বা গ্রামীণ সভ্যতা বাঙলা সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য তা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হলো বাঙলার সাহিত্যিককে। পশ্চিম বাঙলার শিল্পপ্রধান পরিবেশ আজকের সাহিত্যের একমাত্র বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল। এই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে সার্থক সাহিত্যের আবির্ভাব যে অপর্যাপ্ত হবে, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু বলা বাহুল্য, এতে করে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের সূচনা দেখতে পাবো না আমরা। মানবতাবোধের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে অনুপ্রাণিত হয়েও আজকের বাঙলার সাহিত্যিক বৃহত্তর জন-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হয়েছেন, এটাই সবচেয়ে বিয়োগান্তক পরিস্থিতি। তা হলেই দেখা গেল, রবীন্দ্রোত্তর যুগের পরিব্যাপ্ত মানবতাবোধ একদিকে যেমন সাহিত্যিকের নিজস্ব মনোবিকলনে সংকুচিত হলো, অন্যদিকে তেমনি সংকীর্ণ হতে বাধ্য হলো প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে।

এ প্রসঙ্গেই এসে পড়ে বস্তুবাদী মননশক্তির অধঃগতির কথা। সাহিত্যে বস্তুবাদ মানে একথা নয় যে, শিল্প-সুষমা-বিমুক্ত বাস্তব পরিপ্রেক্ষা হুবহু তুলে ধরাই
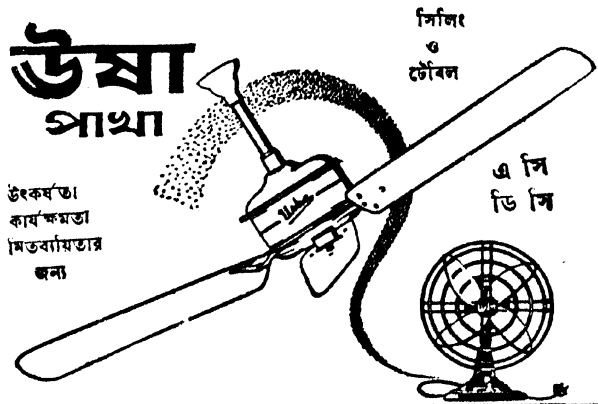
যথেষ্ট। কারণ ভুললে চলবে কেন—

"The content of an art is an expression of the peculiar emotional and intellectual response of a given social group to the material conditions of its existence, response that is given an immediately convincing, because emotionally heightened, form in art." (F. D. Klingender).

কিন্তু সাহিত্যিকের এই ব্যক্তিগত মেধা এবং আবেগ নিঃসৃত বাস্তবতাবোধ আজকের সাহিত্যে শোচনীয়ভাবে অনুপস্থিত। সাহিত্যসৃষ্টিতে হৃদয়াবেগ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই একথা ঘোষণা করা হচ্ছে তারস্বরে। যে ঐকান্তিক পর্যবেক্ষণ এবং নিবিড় উপলব্ধির ফলে মননশক্তি সম্ভব, তাও আয়ত্ত করতে যত্নশীল নন আজকের সাহিত্যিক। মননশীলতার পরিবর্তে একটা সহজ বুদ্ধিবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে সাহিত্যে। এই বুদ্ধিবাদের অন্তর্গত তাগিদ—ঐতিহ্যকে অস্বীকার করো—শুধুমাত্র অর্থনীতির কষ্টিপাথরে যাচাই করো শিল্পের সংজ্ঞা। এই বুদ্ধিবাদও এসেছে কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ কবলিত চিন্তাধারা থেকে। জনগণের সাহিত্যই সাম্প্রতিক যুগ-ধর্ম। তাই বস্তি-সাহিত্য, মজদুর-সাহিত্য রচনা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই—এই ভাবনা-ধারণাকে একমাত্র পুঁজি করে কাজে নামছেন আজকের সাহিত্যিক। শ্রেণীগত লেবেলের আড়ালে, মতবাদগত গোঁড়ামির কুয়াশায় হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের সত্যিকার পরিচয়। সাহিত্যের স্বতন্ত্র মানদণ্ড স্বীকৃত হচ্ছে না বলে নির্যাতিত মানবাত্মার সাহিত্যিক রূপায়ণও সার্থক হতে পারছে না অধিকাংশ ক্ষেত্রে। একদিকের ছবি এই। অন্যদিকে নরনারীর সম্বন্ধ সম্পর্কে এই সহজ বুদ্ধিবাদ একটা অবাধ যৌনতার সংক্রমণ সৃষ্টিতে প্রয়াস পাচ্ছে। আজকের দিনে বাঙলা সাহিত্যের আসরে যৌন-সাহিত্যের নামে যে নোংরামির প্রসার বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন যে কোন রুচিবান পাঠক তা লক্ষ্য করে থাকবেন। এই রুচি-বিগর্হিত প্রচার-পুস্তিকা বেশ কেটেও যাচ্ছে। তা নইলে এ জিনিসের প্রকাশ দিন দিন বাড়বেই বা কেন? লেখক ও পাঠকের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যে চিন্তাধারায় কতোখানি অসুস্থ, তা এই নিখুঁত ফটো-সম্বলিত পুস্তিকার প্রসারেই বোঝা যায়। অত্যল্পকালের মধ্যেই বস্তুবাদী মননশক্তির এই দ্বিমুখী অধোগতি সাহিত্যের সৃজনে ক্ষমতার অপমৃত্যু ছাড়া আর কোন তাৎপর্য বহন করে আনছে না আজ। দ্বিধাহীনভাবে বোধ হয় বলবার সময় এসেছে—বাঙলা সাহিত্যে প্রগতির অগ্রগমন চিন্তাধারার দিক থেকে এমন দৈন্য প্রপীড়িত হয়নি আর কোনকালে।

যুদ্ধোত্তর বাঙলা তথা খণ্ডিত বাঙলার পটভূমিকায় সাহিত্যিকের সৃষ্টিশীল প্রতিভায় যে জড়ত্ব কার্য-কারণ পরম্পরায় এসে গেছে, সে সম্বন্ধে প্রগতিশীল মানসও সাথে সাথে অবহিত হচ্ছেন, আজকের দিনে এটাই বিশেষ আশার কথা। সাহিত্যিক সচেতন হচ্ছেন—তাই বিভ্রান্তির কারণসমূহ সর্বপ্রথমে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। সাহিত্যিক স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবেন—দল ও মতবাদের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে মানুষকে শত-বিভিন্নতায় জানবার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হবেন। মানতে হবে—সাহিত্যের ঐতিহ্য আছে—চিরন্তন মূল্য আছে। সমসাময়িককালের ঘটনা বিবৃত করেই চিরন্তনের মূল্যমান বহন করে সাহিত্য। পরিবেশের সার্থক প্রতিরূপ ছাড়া সাহিত্য চিরন্তনতার দাবী করতে পারে না কিছুতেই। টি এস এলিয়টের কথায় বলা যায়—

"Permanent literature is always a presentation : either a presentation of thought, or a presentation of feeling by a statement of events in human action or objects in the external world."

এ হলো প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা যা—তা-ই আসলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনীতির কৃত্রিম বিভেদ সত্ত্বেও যুগ-যুগান্তের সংস্কৃতিলব্ধ যে ঐক্যবদ্ধ বাঙলা তার উত্তরাধিকারী হবেন আজকের সাহিত্যিক। বাঙলার বৃহত্তর পরিবেশ পূর্ব বাঙলা আজ প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের কার্যক্ষেত্রের বাইরে। কিন্তু সেই স্থানে প্রগতিশীল চিন্তাধারার ধারক ও বাহক যাঁরা আছেন, তাঁরাই এগিয়ে আসবেন ঐক্যবদ্ধ কৃষি-বাঙলার যথার্থ আলেখ্য নিয়ে। এ দায়িত্ব বিশেষ করে সেখানকার মুসলিম প্রগতিশীলদের। তাঁদের শক্তি ও স্বাধীনতার স্বল্পতা যদিও স্পষ্টই চোখে পড়ছে আজ—তবু প্রগতির ধর্ম হিসাবে, ইতিহাসের অনিবার্য অধ্যায়ে সার্থক শিল্পী হিসাবে কর্তব্যকর্মে বিরত হবেন না তাঁরা—এ ভরসাই পোষণ করে থাকবো। মুসলিম প্রগতিশীল চিন্তানায়ক কি সত্যি বিস্মৃত হবেন—বাঙলার ঐতিহ্য-সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত মেধায় পরিশ্রুত? ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যা-ই হোক—আজ ভাংগা বাঙলার সংস্কৃতির সংকটক্ষণে একথা ভুললে সাহিত্য আন্দোলন এগোতে পারবে না কিছুতে—না পূর্ব পাকিস্থানে, না পশ্চিম বাঙলায়। রাজনীতিবিদরা যা-ই বলুন—আজকের দিনে উভয় বাঙলার প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা এগিয়ে আসুন। খণ্ডিত বাঙলায় বাঙলার সমৃদ্ধ সাহিত্য যে সত্যি বিধ্বস্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছে, তাকে তাঁরাই বাঁচাতে পারেন। রাজনীতিবিদরা নন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, আলওল-নজরুলের সাহিত্য আজো কি একীভূত চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে না আমাদের? গংগা-পারের মানুষ আর কর্ণফুলী-পারের মানুষ সত্যি কি অস্পৃশ্য পরস্পর? এই প্রশ্নের মীমাংসার উপরই নির্ভর করছে প্রগতিশীল বাঙলা সাহিত্যের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

পুস্তক পরিচয়

হিত্য পাঠকের ডায়ারি (প্রথম পর্যায়) **:** হরপ্রসাদ মিত্র; শ্রীযুক্ত অতুল গুপ্ত লিখিত ভূমিকা সংবলিত; গুপ্ত প্রকাশনী, ৮, গুপ্ত লেন, কলিকাতা ৬; মূল্য সাড়ে চার টাকা।

'সাহিত্য পাঠকের ডায়ারি' কবি-অধ্যাপক রপ্রসাদ মিত্র রচিত সমালোচনা-গ্রন্থ। মালোচনা-গ্রন্থের এটি প্রথম পর্যায়; ক্রমশঃ ারও কয়েকটি পর্যায় প্রকাশিতব্য। নামেই ন্থের স্বরূপের কিঞ্চিৎ পরিচয় বিধৃত আছে—াহিত্যের বিভিন্ন প্রসংগ নিয়ে গ্রন্থকার বিভিন্ন পলক্ষে যে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা করেছেন শথিলবন্ধন আলোচনার আকারে সেগুলিকে য়ায়ারি নাম দিয়ে তিনি এই গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। ডায়ারির বৈশিষ্ট্য এবং অসম্পূর্ণতা দুইই এই রচনাগুলিতে সুস্পষ্ট। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে সঞ্চরণের অবাধ স্বাধীনতা লেখক এই গ্রন্থে নিয়েছেন, ফলে গ্রন্থের বিষয়সমূহ সুরক্ষিত হয়েছে; অন্য পক্ষে প্রবণতা ও কৌতূহলের অপ্রতিরোধ্য বহুমুখিতার ফলে বক্তব্যের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়ে পাঠকের অপরিতৃপ্তির কারণ সৃষ্টি হয়েছে। এ জাতীয় সঞ্চরণধর্মী রচনায় যা না হয়ে উপায় নেই, গ্রন্থটিতে বিস্তার আছে, কিন্তু গভীরতা কম। কোনো কোনো প্রবন্ধে (যথা 'চিরন্তনী', 'দৃষ্টি-কোণ, প্রকরণ ও পরিভাষা', 'সাহিত্যে সংকেত-ভাষণ', 'কবিতায় অস্পষ্টতা') লেখক গভীরতার ধার ঘেঁষে গেছেন, কিন্তু ক্ষেত্রান্তরে মনোযোগ ন্যস্ত করবার তাগিদে পরমুহূর্তেই তিনি গভীর তলদেশ থেকে দৃষ্টি প্রত্যাহরণ করে বিষয়ের পৃষ্ঠদেশে তাকে স্থাপন করেছেন। ফলে পাঠকের মন ভ'রেও ভ'রে উঠতে চায় না। বিষয়ের বৈচিত্র্যের দ্বারা পাঠক স্বাদবৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতা লাভ করে মাত্র।

কিন্তু, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অবলীলাক্রমে বিহারের ক্ষমতাই বা কী কম! মনের এই সচলতাগুণ অনেকেরই মধ্যে থাকে না। লেখকের মধ্যে এই গুণ পুরোমাত্রায় আছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাতেই হোক আর গদ্যবন্ধের বিশ্লেষণেই হোক আর কাব্যের স্বরূপ নির্ণয়েই হোক, লেখক সর্বক্ষেত্রে সমান স্বচ্ছন্দতার সংগে চলতে জানেন তার প্রমাণ এই বইতে আছে। এতে বোঝায় এই কথা যে, লেখকের অভিনিবেশ বহুমুখী, দৃষ্টি বৈচিত্র্যপ্রয়াসী এবং বিষয়ভেদে নিজেকে তদনুরূপভাবে প্রস্তুত করবার ক্ষমতা লেখক রাখেন, অর্থাৎ adaptability গুণ লেখকের অসীম। লেখকের মন খুব সজাগ, সজীব, সচল। সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করবার পর যদি কারও মনে কোনো ধারণার সৃষ্টি হয় সে এই সজীবতার ধারণা। গভীরতার অভাবজনিত ত্রুটি লেখক সজীবতার দ্বারা অনেকাংশে পূরণ করেছেন।

লেখকের রচনাভঙ্গী মনোরম এবং তা তথ্য-ভারসমৃদ্ধও বটে। যদিও জায়গায় জায়গায় কোটেশনের বাহুল্য পাঠকের স্বাচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করে, তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হয় যে, লেখক সাহিত্যের নানা বিভাগে তাঁর অধ্যয়নজিজ্ঞাসাকে সঞ্চালিত করেছেন এবং তার দ্বারা তিনি সমৃদ্ধও হয়েছেন। রচনার ছত্রে ছত্রে এই সমৃদ্ধির ছাপ আছে। অধিকন্তু লেখকের সাহিত্যবোধক্ষমতা সহজাত। কিন্তু একথা বলার সংগে সংগে একটি আক্ষেপের কারণও বলতে হয়। বড়ো মাপের ক্ষমতাকে ছোটো মাপের কাজে প্রযুক্ত ও বিক্ষিপ্ত হতে দেখলে কার না দুঃখ হয়? লেখক গ্রন্থের ভিতর যে সকল বিষয়ের অবতারণা করেছেন তাদের সব কটিই উপাদেয় প্রসঙ্গ। এগুলিকে ঢিলেঢালা নাতিক্ষুদ্র ডায়ারি-আকারে না রাখলেই কি নয়? আদি-মধ্য-অন্ত-সম্বন্ধযুক্ত সুসংহত প্রবন্ধের রূপ দিয়ে বিষয়গুলিকে বৃহত্তর পরিসরের মধ্যে মুক্তি দেবার পথে বাধা কোথায়? ডায়ারিধর্মী রচনায় রচয়িতার স্ফূর্তি বেশী, দায়িত্ব কম। আর, যে অনুপাতে লেখায় দায়িত্ব-বোধ অনুপস্থিত সেই অনুপাতে লেখার মূল্যমান খর্বীকৃত। গভীর অভিপ্রায়মূলক পূর্ণাংগ রচনার বেলায় সে ভয় কম। কাজেই শক্তিশালী লেখকের মনোযোগ সেই দিকেই প্রধাবিত হওয়া উচিত নয় কি?

যাই হোক, 'সাহিত্য পাঠকের ডায়ারি' ডায়ারির সীমাবদ্ধতার মধ্যেই একটি উল্লেখযোগ্য সমালোচনা-গ্রন্থ। সাহিত্যামোদী বাঙালী পাঠক মাত্রের পক্ষেই বইটি অপরিহার্য হয়ে রইল।

২৩৪।৫১

ছোটদের রামায়ণ—শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। প্রকাশক—ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩। মূল্য—১৷৷০ টাকা।

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের অমূল্য সম্পদ। বিভিন্ন রুচির আবালবৃদ্ধবনিতা ভারতবাসী এই মহান্ পুস্তকদ্বয় হইতে তাহাদের রস-পিপাসা চরিতার্থ করিতেছেন এবং তাহাদের আদর্শ, লক্ষ্য, আশা-উৎসাহ, প্রেরণা, সাহস, বল, নীতি সমস্তরই সন্ধান পাইয়া আসিতেছেন। রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন ছোট বড় চরিত্র ও ঘটনা অবলম্বনে অসংখ্য সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে। রস-সিন্ধু হইতে যে যেমন পারে রস সংগ্রহ করিয়া দিকে দিকে এমনকি, বিদেশেও বিতরণ করিতেছে। বড়দের নিকট আনন্দ, তৃপ্তি ও নীতির উৎস স্বরূপ রামায়ণ-মহাভারত আমাদের ছোটদের মানসিক পুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধনেও সমধিকরূপে অপরিহার্য এবং তুলনাবিহীন। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব তাহাদের গ্রন্থদ্বয়ের সংগে পরিচিত এবং তৎপঠনে আগ্রহান্বিত করা হয় ততই মংগল। এজন্য তাহাদের উপযোগী সংক্ষিপ্ত ও সহজ সরল শিশু সংস্করণ অবশ্যই প্রয়োজন—আগ্রহ সৃষ্টি, সহজবোধন এবং সুস্পষ্ট ধারণা গঠন করিবার জন্য উহা সুচিত্রিত হওয়াও আবশ্যক। শিল্পীরূপে সুপরিচিত শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় বহুল চিত্র-সম্পদে শোভিত এইরূপ রামায়ণ প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

৭৬।৫২

মিঠে কড়া: সুকান্ত ভট্টাচার্য, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা; দু টাকা।

যুদ্ধোত্তরকালের বাঙালী কবিদের মধ্যে অত্যন্তই অল্পবয়সে যাঁরা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁদের অন্যতম। সুকান্তর রচনা আবেগপ্রধান, মূলতঃ এই আবেগকে আশ্রয় করেই তাঁর কাব্যশক্তির বিকাশ ঘটেছে। ফলতঃ তাঁর কবিতায় উচ্ছ্বাস এবং রৌদ্ররসের যতটা প্রাবল্য, শান্তরসের ততটা নয়। আরও কিছুকাল বেঁচে থাকলে পরিণত মনের স্বভাবধর্মেই তাঁর কবিকর্মে হয়তো ঈষৎ প্রশান্তি সঞ্চারিত হতো, জীবনের আরও গভীরে ডুব দেবার অবকাশও হয়তো তিনি পেতেন। বেদনার কথা, আপাতসত্যের অন্তরালবর্তী সেই মহত্তর সত্যকে উপলব্ধি করবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

তাঁরই অপ্রকাশিত কয়েকটি ছড়ার সমষ্টি এই 'মিঠে কড়া'। কিছু ছড়া, বিশেষত 'গোপন খবর', আমাদের ভাল লেগেছে; অন্যান্যগুলি লাগেনি। ছন্দের উগ্রতা তার অন্যতম কারণ। ছড়া এমনই জিনিস, একটু ঢিলেঢালাভাবে সাজাতে না পারলে তার স্ফূর্তি ঘটে না। অথচ এ-বইয়ের ছন্দ ঈষৎ আঁটোসাটো, কড়া-ইস্ত্রী। কবিতার গায়ে মানালেও, ছড়ার গায়ে ওটা একটু বেমানান লাগে।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আঁকা ছবি কটি প্রশংসনীয়।

১৯৭।৫১

পদধ্বনি—অনিল বিশ্বাস; জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা।

কাব্য বিচারে কোন ছকে কাটা আদর্শ নির্দেশ্ট না থাকলেও এটুকু বলা যায় প্রসাদগুণের অভাব ঘটলে সাহিত্যিক সামর্থ্যে তা শক্তিহীন। তথ্য-বহুলতা ও তত্ত্বসম্ভার থাকলেই যে কাব্যিক উৎকর্ষ আনবে, এবম্প্রকার ধারণা অযৌক্তিক। 'কবিতা' শীর্ষক সনেট বোধ হয় এ গ্রন্থের একমাত্র রসোত্তীর্ণ কবিতা। অন্যান্য অধিকাংশ কবিতা নিছক তথ্য বিবৃতিতেই পর্যবসিত। ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

৩৫।৫২

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি দেশ পত্রিকায় সমালোচনার্থ আসিয়াছে। পরে সমালোচনা বাহির হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশক অথবা গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিত হইবে।

প্রাত্যাহিক—তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ১৬ পাল রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য—২৲।

বিদায় বর্মা—মানসী মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৲।

৭৯।৫২

চলচ্চিত্র প্রদর্শনানুমোদনের যোগ্যতা নির্ণয়

চলচ্চিত্র সেন্সর করা বিষয়ে ভারত গভর্নমেণ্ট গত ১লা মার্চ তারিখের গেজেট অফ ইণ্ডিয়াতে একটি নির্দেশনামা প্রকাশিত করেছেন। এই নির্দেশ অনুযায়ীই এবার থেকে চলচ্চিত্রের প্রদর্শনযোগ্যতা নির্ধারিত হবে। প্রথমে নির্দেশনামার একটি খসড়া প্রস্তুত করে ভারতের প্রযোজক ও চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ঐ সম্পর্কে মতামত চেয়ে পাঠানো হয়। অতঃপর গত বছরের ৫ই নভেম্বর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সেন্সার কর্তাদের একটি

'বসু পরিবার' চিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

আলোচনা-সভা হয় কলকাতায়। তর্ক-বিতর্কের পর চূড়ান্তভাবে নিম্নলিখিত নির্দেশনামাটি গ্রহণ করা হয় এবং বর্তমানে কোন ছবি সাধারণ্যে প্রদর্শনযোগ্য কি না, সেটা বিচার করার জন্যে কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের চলচ্চিত্র পরীক্ষাকরণ কমিটিগুলি এই নির্দেশনামাই অনুসরণ করবে।

উদ্দেশ্য

১। নির্দেশনামাটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতেঃ কোন ছবি সাধারণ্যে প্রদর্শনের অনুমতি-পত্র দেওয়া না হয় যে ছবি যাঁরা দেখবেন, তাঁদের নৈতিক মান নীচু করে দেবে। এতে অপরাধ, দুষ্কার্য, শয়তানি ও পাপের দিকে দর্শকের সহানুভূতি পড়বে না।

২। জীবনের সঠিক নিরিখ, নাটক ও প্রমোদে যেটুকু দরকার, সেই মতই দেখাতে হবে।

রঙ্গজগৎ

৩। প্রাকৃতিক হোক আর মনুষ্যকৃত হোক, আইনকে উপহাস করা চলবে না বা তা অমান্য করার জন্যে সহানুভূতি আকর্ষণ করা যাবে না।

উদ্দেশ্যের প্রয়োগ

এইটেই যেহেতু অভিপ্রেত যে, যতদূর সম্ভব, কোন ছবির সাধারণ্যে অবাধ প্রদর্শন অথবা প্রদর্শন কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত কি না, নির্ণয় করার জন্যে একটি সমভাবের মান নির্দিষ্ট করা, সেই হেতু কেন্দ্রীয় বোর্ড কমিটি-গুলির নির্দেশার্থে নিম্নলিখিত আইনগুলি সূত্রায়িত করেছেন।

১। এটা অভিপ্রেত নয় যে, কোন ছবি অবাধভাবে বা প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে সাধারণ্যে প্রদর্শনযোগ্য বলে অনুমতি পাবে যদি সে ছবিঃ

(ক) অপরাধকে এমনভাবে দেখায়, যাতেঃ

১ম—অপরাধমূলক কাজের গুরুত্ব হ্রাস করে;

২য়—অপরাধীদের কার্য-প্রক্রিয়া রূপায়িত করে;

৩য়—অপরাধী চরিত্রের ওপরে রোমান্স ও বীরত্বের চটক আরোপ করে;

৪র্থ—অপরাধী চরিত্রের ওপরে দর্শকের সহানুভূতি বা প্রশংসা আকর্ষণ করে;

৫ম—অপরাধীদের নিবৃত্ত, অনুসরণ বা শাস্তি বিধানে যাঁরা দায়ী, তাঁদের অবমাননা করা;

৬ষ্ঠ—এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করে যে দুষ্কার্যে লাভ আছে অথবা অপরাধ সাধারণ জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা এবং ধিক্কার দেওয়া উচিত নয়।

(অপরাধী তার কাজের জন্যে শাস্তি পেয়েছে, কোন ছবিতে শুধু যদি এই থাকে, তাহলেও সে-ছবি প্রদর্শন-অনুমতি লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে না, যদি তা এমনিই নিম্নস্তরের হয় এবং তাতে কোন ত্রুটি শোধন লক্ষণ না থাকে)।

(খ) পাপ ও অনৈতিকতা এমনভাবে প্রয়োগ করে, যাতেঃ

১ম—পাপ বা নীতিবিরুদ্ধ কাজের গুরুত্ব হ্রাস করে;

২য়—শালীনতার সর্বজনগ্রাহ্য ছোট করে;

৩য়—পাপ ও অনৈতিকতাকে ত করে রূপায়িত করে;

৪র্থ—দুরাত্মা ও নীতিহীনের সাফল্য ও গৌরবের ছটা যুক্ত ক

৫ম—দুরাত্মা ও নীতিহীনে দর্শকের সহানুভূতি ও প্রশংসা করে;

৬ষ্ঠ—এমন আভাস দেয় যে, ভাল করতে অপকর্ম বা নীতিবিরুদ্ধ ও কাজ যুক্তিযুক্ত;

৭ম—ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে, পাপ অনৈতিকতা তিরস্কৃত হওয়া উচিত ন

N. B.—দুরাত্মা বা নীতিহীন ব্যক্তিকে পাপকর্ম ও অনৈতিকতার প্রতিফল ভু দেখানো হয়েছে বলেই কোন ছবি প্রদ অনুমতি পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হ পারে না, যদি সেটা এমনিতে খ নিম্নস্তরের হয় এবং তাতে কোন দে শোধন লক্ষণ না থাকে।

(গ) নারী-পুরুষের সম্পর্ক এমনিভ দেখায়, যাতেঃ

১ম—বিবাহ-রীতির পবিত্রতা নষ্ট ক হয়;

২য়—ধারণা করিয়ে দেয় যে, অবৈধ যৌন-সংযোগ জীবনের স্বাভাবিক নিয়ম এব ধিক্কৃত হওয়া উচিত নয়;

৩য়—রূপায়িত করে—

১। ধর্ষণ, পূর্ব-সঙ্কল্পিত অপহরণ বা স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার;

২। নারী ব্যবসা;

৩। বারবনিতাপনা বা নারী আহরণ;

৪। অবৈধ যৌন সম্পর্ক;

৫। অত্যধিক কামোদ্দীপক প্রণয়-দৃশ্য;

৬। শিষ্টাচারবিরোধী যৌনতামূলক দৃ

৭। অনৈতিকতাজ্ঞাপক দৃশ্য।

(ঘ) মানুষের চেহারা যদি দেখায় প্র চেহারা অথবা ছায়াকৃতিঃ

১ম—উলঙ্গ অবস্থায়;

২য়—অভব্য বা ইঙ্গিতাত্মক ভূষণে;

(ঙ) যদি অবমাননা করেঃ

১ম—জনপ্রিয় ব্যক্তিদের; জনহিতকর কা বা কোন কার্যরত জনসেবককে, দেশী বা বিদেশী যেই হোক;

২য়—ধর্মশিক্ষক এবং ধর্মাধিকার ব্যক্তি;

৩য়—আইন প্রয়োগের দায়িত্ব যাঁদের;

৪র্থ—আইন (মনুষ্যকৃত বা নৈসর্গিক) আইন প্রতিষ্ঠান বা বিচারকদের;

(চ) স্বেচ্ছাকৃত অথবা সম্ভাবনাযুক্ত;

১ম—কোন জাতির বা কোন ধর্মের অনুসরণকারীর সংবেদনপ্রবণতা আহত হওয়ার;

২য়—সামাজিক অস্থিরতা বা অসন্তোষ উস্কে দেওয়ার;

৩য়—বিশৃংখলা, হিংসাত্মক কাজ, আইন-ভংগ অথবা গভর্নমেণ্টকে অপছন্দ বা প্রতিরোধ করায় উৎসাহিত করে।

১। ১ ধারায় যা সন্নিবেশিত করা হয়েছে, তা ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আপত্তিকর হতে পারেঃ

১ম—পবিত্র বিষয়াবলীর অশ্রদ্ধাজনক প্রয়োগ;

২য়—কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার আকৃতি রূপায়ন;

৩য়—আটক;

৪র্থ—অস্ত্রোপচারের বিশদ দৃশ্য;

৫ম—যৌন ব্যাধি;

৬ষ্ঠ—আত্মহত্যা বা খুন;

৭ম—নারীর অন্তর্বেশের অহেতুক প্রদর্শন;

৮ম—Indecarous নৃত্য;

৯ম—পোষাক, ব্যবহার, বক্তৃতা বা গানের আপত্তিকর অশ্লীলতা বা অশোভনতা;

১০ম—শিশুদের ওপর নির্দয়তা;

১১শ—বড়োদের ওপর নৃশংসতা;

১২শ—পাশবিক যুদ্ধ, জঘন্য হত্যা বা শ্বাসরোধের দৃশ্য;

১৩শ—ফাঁসি;

১৪শ—অত্যধিক রক্তপাত বা বিকৃতি;

১৫শ—পশুদের উপর নৃশংসতা;

১৬শ—কাহিনীর বিষয়বস্তুতে অত্যাবশ্যক নয়, এমন মাতলামি বা পান করা;

১৭শ—অবৈধ মাদক ব্যবসা বা মাদক ব্যবহার;

১৮শ—শ্রেণী বিভাগ সুনির্দিষ্ট করা বা শ্রেণীবিদ্বেষে প্রণোদিত করা;

১৯শ—যুদ্ধের প্রকৃত ভয়ঙ্করতা;

২০শ—যুদ্ধের সময়ে শত্রুর কাজে আসতে পারে, এমন দৃশ্য বা ঘটনা;

২১শ—যুদ্ধের মর্মান্তিক ঘটনাকে স্বার্থ-সাধনের বিষয়ীভূত করা;

২২শ—অনৈতিকতার সংগে যুক্ত জোচ্চুরি;

২৩শ—'অবাধ প্রেম' ও চুক্তি-বিবাহ;

২৪শ—জীবতত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ;

২৫শ—ন্যায়বিচারের প্রহসন;

২৬শ—অশমনীয় নীচতা;

২৭শ—ভারতীয়, সংস্কৃতি, আচার, প্রথা ও নীতিকে জঘন্যভাবে প্রদর্শন;

২৮শ—জীবিত চরিত্র উপস্থাপন;

৩। কোন ছবির অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান বা কোন ছবির অংশবিশেষ বাদ দিলে যদি সেখানি অবারিত প্রদর্শনের যোগ্য হয় তো তাকে কেবলমাত্র প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্যে অনুমোদন করার সংকল্প নেই, যদি-না সে ছবিখানি এমনি নিম্ন-স্তরের হয় যে, কেটে বাদ দিলেও তার দোষ স্খালন হতে পারবে না।

৪। এটা অবাঞ্ছিত যে, কোন ছবি এমন গল্প দেখায় বা এমন ঘটনাসম্বলিত হয়, যা ছোটদের পক্ষে অনুপযুক্ত, তাকে অবারিত প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হোক।

এই পর্যায়ে বিশেষ করে আপত্তিকর বিষয় হচ্ছেঃ

১ম। (ক) যাকিছু ছোটদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে; যথা, ভূত দেখানো, নৃশংসতা, বিকৃতি, নির্মম অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি;

২য়। যাকিছু পারিবারিক স্বচ্ছন্দ বা পিতামাতার প্রতি সন্তানের বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে; যথা, পিতামাতার একজন

আর একজনকে আঘাত করছে কিংবা কেউ অথবা উভয়েই দুর্নীতিকর কাজ করছে; ৩য়। যাকিছু অল্পবয়স্কদের অপরের প্রতি বা পশু-পক্ষীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে নিঃশঙ্ক করে তোলে।

সিরাজউদ্দৌলা (এ কে ডি প্রডাকসন্স—ইষ্টার্ণ টকীজ)—রচনা ও সংলাপঃ প্রবোধ সরকার; পরিচালনাঃ অমর দত্ত, আলোকচিত্রঃ দিব্যেন্দু ঘোষ, বিভূতি চক্রবর্তী, শচীন দাশগুপ্ত; শব্দ-যোজনাঃ পরিতোষ বসু, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়; সুর-যোজনাঃ পবিত্র চট্টোপাধ্যায়; শিল্প-নির্দেশঃ গোপী সেন। ভূমিকায়ঃ সমীর মজুমদার, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ বসু, শিশির মিত্র, বেচু সিংহ, নরেন চক্রবর্তী, শিশির বটব্যাল, উৎপল দত্ত, কেষ্টধন, প্রীতি মজুমদার, অনুভা, মঞ্জু, পদ্মা, জয়শ্রী, সিরিয়ম স্টার্ক প্রভৃতি।

প্রাইমা ফিল্মসের পরিবেশনে গত ৪ঠা এপ্রিল রূপবাণী, অরুণা, ভারতীতে মুক্তিলাভ করেছে।

সিনেমাকে ইংরিজীতে make-believe আখ্যা দেওয়া হয়েছে; চলতি বাঙলায় এর মানে হচ্ছে ধাপ্পা দেওয়া। কিন্তু ধাপ্পা হচ্ছে প্রকরণ ব্যাপারে, অর্থাৎ একটা বিষয়-বস্তুকে দাঁড় করাবার জন্যে নানাভাবে ধাপ্পাদারী কাজের সহায়তা গ্রহণ করা। কিন্তু যেটা ধাপ্পার আশ্রয়ে সৃষ্টি করা হলো, সেটা শুধু ধাপ্পা হয়ে দাঁড়াবে, এমন কিন্তু কথা নয়। 'সিরাজদ্দৌলা' কিন্তু তাও করে বসেছে। অত বড়ো একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, যার ফলে সারা ভারতের চেহারাই বদলে গেল—ইংরেজের দু'শ' বছরের কায়েমী শাসনের গোড়াপত্তন—সেটাকে স্রেফ ফাঁকিতে ভরিয়ে একটা উদ্দীপনবিহীন জড় কথিকার রূপ দিয়ে দেখানো হয়েছে। বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে যে চেষ্টা করেছিলেন, তার সেই কীর্তি বাঙলার মনে আজও যে আবেগ সঞ্চারিত করে আসছে, চিত্রনির্মাতা সেই সুযোগের দাঁও মারতেই গিয়েছিলেন, নয়তো এগার হাজার ফিট ছবির মধ্যে কোথাও এতটুকুও এমন কৃতিত্ব, চিন্তাশক্তি বা ইতিহাসের প্রতি মমতার পরিচয় দিতে পারেন নি তিনি, যাতে তার এই প্রচেষ্টাকে অন্যভাবে সাদরে গ্রহণ করা যেতে পারে

এ পর্যন্ত দু-তিনখানি নাটকে সিরাজউদ্দৌলার যে কাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে, এই চিত্রনাট্যের যাকিছু মাল-মশলা তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু ছবির ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত, এর ঘটনাসম্ভার অনেকখানি ব্যাপক ক্ষেত্রকে নিয়ে গড়ে তুলতে হয়। তার ওপর ঐতিহাসিক কাহিনীর আরও ঝামেলা হচ্ছে দৃশ্যপট, সাজ-পোষাক, চেহারা প্রভৃতির খুঁটিনাটি বিষয়েও মিল রাখা নিয়ে। অন্তত বেমানান যাতে কিছু না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকারী 'সিরাজউদ্দৌলা'র প্রযোজক-পরিচালক সেসব গ্রাহ্যের মধ্যেই রাখতে চাননি। মঞ্চের ওপরে নাটক হয়ে অভিনীত হতে তিনি যা দেখে এসেছেন, ছবিতে তিনি আকারে-প্রকারে সেই চেহারাই বজায় রেখেছেন। ফলে নবাব সিরাজউদ্দৌলার গল্প ছবিতে আছে, কিন্তু ইতিহাসের ব্যাপার বলে দাঁড়াবার মতো প্রাণশক্তি ও ঐশ্বর্য পায়নি

টাইটেল আরম্ভ হতেই মন বিরূপ হয়ে ওঠে—এত বিশ্রীভাবে সেটা তোলা যে, সেটার অন্তে যে কিছু ভালো জিনিস থা[illegible] পারে না, তা মূল ছবি আরম্ভ হবার ত[illegible] ধরা পড়ে যায়। ছবি আরম্ভ আলীবর্দি খাঁর মৃত্যুকালের দৃশ্য [illegible] বেচারা নবাব শুয়ে শুয়ে মিনিট ধরে কাতরভাবে ডেকে যেতে লা[illegible] কিন্তু ত্রিসীমানায় কারুর সাড়া পেলেন তখনো কিন্তু তিনি মসনদে অ[illegible] প্রেক্ষাগৃহের মঞ্চের ওপরে তৈরি দৃশ্যের মতো দেখতে। তারপর শেষ প[illegible] রইলো এমনি ধারাই মঞ্চের ওপরে একটার পর একটা দৃশ্য; বেমানান পশ্চাদপট, আশেপাশে ঝোলানো ঝা[illegible] এই হলো নবাবী শৌর্যের সম্বল, যে বিলাসিতার ইতিহাস রচনা করে গিয়ে সিরাজউদ্দৌলার দরবার একটা আসরের চেয়েও অনাড়ম্বর। পলাস[illegible] যুদ্ধ-দৃশ্যটা সামলে নিয়েছেন দি[illegible]

...জাতী ছবি থেকে যুদ্ধের দৃশ্য আহরণ করে জুড়ে দিয়ে। আরো কতো রকমের অসদৃশতা ও অযৌক্তিকতা। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বারুদের স্তূপ রাখা রয়েছে, কিন্তু এমনি অরক্ষিতভাবে যে, ঘসেটি বেগম অনায়াসেই সেই গুদামে প্রবেশ করে ...কা হাতেই সব ভিজিয়ে দিয়ে এলো। ইতিহাসের ব্যাপার বলে ছাপ রেখে দেবার জন্যে তৎকালীন ঐতিহাসিক প্রাসাদ ও অট্টালিকার বহির্দৃশ্য তুলে দেখানো হয়েছে—কিন্তু সেই সব প্রাসাদ ও অট্টালিকার এখনকার জীর্ণ ও মলিন চেহারাটাই তোলা হয়েছে—তখনকার বলে দেখাবার জন্যে পরিষ্কার করে নেওয়ার দরকারই পরিচালক অস্বীকার করে গিয়েছেন। তার ওপর ঐসব ... বাইরের চেহারায় যে ... র অন্দরের চেহারায় আর এক। ... বোঝা গেল, নবাবরা কোন রকম আসবাব ব্যবহার করতেন না বা ঘর-দালানের সাজ ব...ও তাঁদের কিছু থাকতো না। পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যাপারেও কালের ও পাত্রপাত্রীর শ্রেণী এবং পদানুসারিক সামঞ্জস্য নেই।

চরিত্রগুলির ব্যাপারেও সমান বৈসাদৃশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। একমাত্র ওয়াট্স ছাড়া যে একদল লোক একটা রাজ্যের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের নায়ক হয়েছিলো, তাদের কারুর মধ্যে ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিলো না এতটুকুও, সবাই ছিলো এক-একজন ভাঁড়বিশেষ—ছবিখানি এই তথ্যই পরিবেষণ করে। যা-তা করে ছবিখানি পূর্ণাঙ্গ করে দেওয়ার আরও উদাহরণ পাওয়া যায় দৃশ্যগুলি তোলার রকম দেখে। অজস্র ক্লোজ-আপ ব্যবহার ঘটনার নাটকীয়তা একেবারেই ব্যাহত করে দিয়েছে। দৃশ্যস্থলগুলি যথা-সম্ভব সংক্ষিপ্ত ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এক দৃশ্যে দু-তিনজনের বেশি পাত্র-পাত্রী রাখা হয়নি; আবার তার ওপর পাত্রপাত্রীর একসঙ্গে মুখোমুখি কথা কম—কেবলই একক ক্লোজ-আপ—দৃশ্যের খুঁটিনাটি ও অপরিসরতা চাপা দেবার চেষ্টা—আরো মনে হয়, যখন যে শিল্পীকে হাতের কাছে পাওয়া গিয়েছে, তাকেই ধরে এনে কেবল তারই ক্লোজ-আপ নিয়ে কাজ সারা হয়েছে, পরে সুবিধামত এক সময়ে সে দৃশ্যের অপর চরিত্রকে ধরে এনে তার আবার ক্লোজ-আপ নেওয়া হয়েছে। এতে সময়ও বেঁচেছে, পয়সাও বেঁচেছে, কিন্তু নাটককে বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। একই দৃশ্য, কিন্তু চরিত্রগুলিকে একসঙ্গে না রেখে আলাদা আলাদাভাবে দেখিয়ে এমন একটা বিক্ষিপ্ততার ভাব এনে দেওয়া হয়েছে যে, কাহিনীর সাবলীল ধারাবাহিকতাটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সিরাজদ্দৌলার জীবন-কথা ভারতের ইতিহাসের এক অতি উদ্দীপনাময় অধ্যায়, কিন্তু ছবিখানি তার আভাসও দেয় না। যত দোষ-ত্রুটি থাকুক, ছবিখানি বেশ পরিচ্ছন্নই ছিলো, কিন্তু হঠাৎ শেষের দিকে পলাশীর যুদ্ধের পর এমন অভব্য এক বাঈজীর নাচ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে ছবিখানিকে অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে অপাংক্তেয় করে দিয়েছে। নাচটা দেখানোর উদ্দেশ্য ছিলো, যুদ্ধে জয়লাভের পর ক্লাইভের উল্লাস প্রকাশ করা—কিন্তু এমনি আলাদা করে নাচটা তোলা যে, বাঈজী আর ক্লাইভ দুজনকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জায়গায় বলে মনে হয়।

প্রযোজকদের কাছে অনুরোধ ইতিহাসকে নিয়ে তাঁরা যেন এমন হেনস্তা না করেন। সামর্থ্যে বা সময়ে যদি না কুলোয়, তো তাঁরা তাঁদের অভিলাষ তুলে রেখে দিন, কিন্তু এমনভাবে নষ্ট যেন না করেন। দোহাই তাঁদের।

হকি

কলিকাতা হকি লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের চ্যাম্পিয়নসিপ বর্তমানে ক্রীড়ামোদিগণের [illegible] গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহা হওয়াও [illegible] কাস্টমস, মোহনবাগান ও পাঞ্জাব স্পোর্টস এই তিন দলের [illegible] পয়েন্টের সংখ্যার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য [illegible] ইহাদের মধ্যে যে কোন দল যে কোন সময়ে অগ্রগামী হইতে পারে। তবে ইহাদের মধ্যে মোহনবাগান দলই বিশেষ ভাগ্যবান। এই পর্যন্ত এই দল কোন খেলাতেই পরাজিত হয় নাই। অধিকাংশ খেলায় অপর দুইটি দল অপেক্ষা অধিক গোলে বিজয়ী হইয়াছে। গত বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল এইভাবে অপরাজিত ও বিভিন্ন খেলায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যলাভ করায় সকলেরই ধারণা হইয়াছে এইবারেও মোহনবাগান পূর্ব অর্জিত গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবে। এই ধারণা যে একেবারেই অমূলক ও যুক্তিহীন তাহা নহে, তবে পূর্ব হইতে কোন [illegible] স্থির নিশ্চিত থাকা উচিত নহে। বিশেষ করিয়া খেলায়। কোন দল কখন কি অবস্থায় পড়িবে, তাহা পূর্ব হইতে কেহই নিশ্চিতভাবে বলিতে পারে না। তবে আমাদের যতদূর ধারণা মোহনবাগান দলের চ্যাম্পিয়ান হইবার সম্ভাবনাই অধিক যদি না দলের খেলোয়াড়গণ কোনরূপ খেলায় দৃঢ়তার অভাব পরিদর্শন না করেন। কাস্টমস আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া প্রথম রাউণ্ডের খেলায় পরাজিত হইয়া যেরূপ ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া এই দলের খেলোয়াড়দের পূর্বের ন্যায় উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া খেলা অসম্ভব। অপর দিকে পাঞ্জাব স্পোর্টস দলও আগা খাঁ কাপ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন খেলায় যোগদান করিয়া [illegible] অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে [illegible] লীগের খেলায় পুনরায় যোগদান করিয়া পূর্বের ন্যায় উৎসাহপূর্ণ ক্রীড়াকৌশলের অবতারণা করিতে পারিবে না। যে দলই এই বিভাগের চ্যাম্পিয়ান হউক না কেন, আমাদের আন্তরিক [illegible] নিশ্চয়ই ঐ দল লাভ করিবে। নিম্নে উক্ত তিনটি দলের লীগ তালিকা প্রদত্ত হইল—

	খে:	জ	ড্র:	[illegible]	স্ব:	বি:	প:
কাস্টমস	১৬	১৩	২	১	[illegible]	৪	২৮
মোহনবাগান	১৪	১২	২	০	[illegible]	২	২৬
পাঞ্জাব স্পোর্টস	১৫	১২	১	২	৪০	৭	২৫

এরিয়ান ক্লাবের সাফল্য

এরিয়ান ক্লাবের ফুটবল খেলার খ্যাতি বহুকাল হইতেই আছে। হকি খেলায় এই দল কোনদিন যে প্রথম শ্রেণীর দল বলিয়া পরিগণিত হইবে, ইহা পূর্বে কেহই কল্পনা করে নাই। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই দলের এইবারে প্রথম ডিভিসনে খেলিবার যোগ্যতালাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এরিয়ানের মত একটি খ্যাতিসম্পন্ন ক্লাব প্রথম ডিভিসন হকি লীগ প্রতিযোগিতায় খেলিবার যোগ্য বিবেচিত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

বিশিষ্ট হকি খেলোয়াড়কে শিক্ষক নিযুক্তের ব্যবস্থা

কোন খেলাতেই উপযুক্ত শিক্ষক ব্যতীত অসাধারণ সফলতালাভ করা যায় না ইহা সকলেই জানে। অথচ এই শিক্ষক নিয়োগের মধ্য দিয়া দলের খেলোয়াড়দের উন্নতির পথে চালিত করিবার কোনরূপ প্রচেষ্টা হয় নাই। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ভবানীপুরের কর্তৃপক্ষগণ এইবারের ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের অধিনায়ক বাবুকে শিক্ষকভাবে নিযুক্ত করিবার তোড়জোড় করিতেছেন। এই ব্যবস্থা ফলবতী হউক এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, অপর সকল প্রথম শ্রেণীর ক্লাবও এইরূপভাবে হকি শিক্ষক নিয়োগের জন্য উৎসাহিত হইবেন। কেহ কেহ বলিবেন, 'এত শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাইবে?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বাঙলার বহু প্রবীণ হকি খেলোয়াড়ের নাম করিতে পারি, যাঁহারা এই শিক্ষকের অভাব অনায়াসে পূরণ করিতে পারেন।

বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানে ভারতীয় হকি দল

এইবারের বিশ্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠান ফিনল্যাণ্ডের হেলসিংকি সহরে অনুষ্ঠিত হইবে। এই অনুষ্ঠানে গত চারিবারের বিশ্ব হকি চ্যাম্পিয়ান ভারতীয় হকি দল সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিবে কিনা ইহা আমাদের বহু পাঠক-পাঠিকা প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহাদের প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু বলিতে পারি যে, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি দেশের হকি খেলোয়াড়গণ পূর্ব অপেক্ষা অনেক উন্নতি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখনও ইহাদের ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ডের সমতুল্য হইতে দেরী আছে। একমাত্র ভয় পাকিস্থান দলকে। এই দলের খেলোয়াড়গণ সকলেই সুযোগসন্ধানী, কিন্তু মন্থর গতিতে খেলিয়া থাকেন। এইরূপ মন্থর গতিবেগসম্পন্ন খেলোয়াড়দের পরাস্ত করিতে হইলে খেলার সূচনা হইতেই তীব্র আক্রমণধারা রচনা করিতে হইবে। মন্থর গতিতে খেলিয়া মোটেই সুবিধা করিতে পারিবে না। এই জন্য আমরা আশা করি, ভারতীয় হকি দলের শিক্ষার ভার যাহার উপর অর্পিত হইয়াছে, তিনি দ্রুত গতিতে খেলা পরিচালনায় ভারতীয় খেলোয়াড়গণকে অভ্যস্ত করিয়া তুলিবেন।

ক্রিকেট

ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেট দল শীঘ্রই ভারত ত্যাগ করিবেন। এই দলের মনোনীত খেলোয়াড়দের নিয়মিত শিক্ষাধীনে রাখিবার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আমরা ধারণা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কোনই লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশের যে কয়েকজন খেলোয়াড় মনোনীত হইয়াছেন, তাঁহারা শারীরিক পটুতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে কোন প্রকার শারীরিক কসরৎ করেন তাহারও নিদর্শন এই পর্যন্ত আমরা পাই নাই। অধিকাংশ সময়ে ইতস্তত ভ্রমণ করিতেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যাঁহারা ইহাদের মনোনীত করিয়াছেন, তাঁহারাও অন্যান্য কার্যে এতই ব্যস্ত যে, দেশের মনোনীত ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ কি করিতেছেন, তাহা পর্যন্ত লক্ষ্য রাখেন না। সেই দিন এক সম্বর্ধনা সভায় বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকমণ্ডলীর একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে বাঙলা দেশের খেলোয়াড়দের ভর্ৎসনাসূচক উক্তি করিতে শোনা গেল। তিনি বলিলেন, 'আমাদের দেশের খেলোয়াড়গণ একবারও অনুশীলন করেন না বা অনুশীলন করিবার উৎসাহই প্রদর্শন করেন না।' এইরূপ কটূক্তি করিবার কি যে কারণ থাকিতে পারে, তাহা আমরা উপলব্ধিই করিতে পারিলাম না। অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকিলেও খেলোয়াড়গণ যোগদান না করিলে তখন ইহা বলা শোভা পাইত। খেলোয়াড়গণ যে অলস জীবনযাপন করিতেছেন, ইহার জন্য তাঁহারাই যে দায়ী, ইহা যদি বলা হয়, [illegible] হয় খুব অন্যায় হইবে না। [illegible] দৌলার দরবার

ক্রিকেট [illegible] চেয়েও অনাড়ম্ব

ইংলণ্ড ভ্রমণকারী [illegible] দলের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে নাকি এক অভিযোগ কোটে